# আহকামুল কুরআন

ইমাম আল হুজ্জাতুল ইসলাম
আবূ বকর আহমাদ বিন আলী যাস্সাস (র)

১

অনুবাদ
মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (র)

# আহ্কামুল কুরআন

( কুরআনের বিধান )

১ম খণ্ড

ইমাম হুজ্জাতুল ইসলাম আবূ বকর আহ্মাদ ইবনে
আলী আর-রাযী আল-যাস্সাস আল-হানাফী (রহ)

অনুবাদ ঃ মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

খায়রুন প্রকাশনী
বিক্রয় কেন্দ্র ঃ বুক্স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
দোকান নং - ২০৯, ৪৫, বাংলাবাজার ঢাকা -১১০০ ফোন ঃ ৭১১৫৯৮২

## প্রসঙ্গ কথা

আল্লামা আবূ বকর আল-যাস্‌সাস রচিত 'আহ্‌কামুল কুরআন' তাফসীর সাহিত্যে একটি অসামান্য অবদান। প্রায় বারো শো বছর পূর্বে রচিত এই গ্রন্থখানি তাফসীর জগতে এক অমূল্য সম্পদ রূপে বিবেচিত হয়ে আসছে। আল্লামা আল-যাস্‌সাস ছিলেন সেকালে হানাফী মাযহাবের অবিসম্বাদিত ইমাম। তাই এই ঐতিহাসিক গ্রন্থে স্বভাবতই তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি কুরআন মজীদের হুকুম-আহকাম সম্পর্কিত আয়াতসমূহ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে হানাফী ফিকাহ অনুসারে সমস্যাবলীর সমাধান নির্দেশ করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি এক অসামান্য খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান হানাফী মাযহাবের অনুসারী। তাদের দৈনন্দিন জীবনের তাবৎ কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এই গ্রন্থে। এ কারণে তাফসীর সাহিত্য হিসেবে এ গ্রন্থখানি এক অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। ইসলামী পণ্ডিত ও আলেম সমাজেও এটি বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে।

এই ঐতিহাসিক তাফসীরখানির ভাষা অত্যন্ত সুপ্রাচীন–ক্লাসিকধর্মী; এর বাক-রীতিও বেশ জটিল। আধুনিক কোন ভাষায় এর অনুবাদ করার কাজও অত্যন্ত দুরুহ। তবু গ্রন্থটির গুরুত্ব ও উপযোগিতা বিবেচনা করে বাংলায় এর ভাষান্তরের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ও অনুবাদক হযরত মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)। জীবনের শেষভাগে নানান কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যে তিনি এ কাজটি আঞ্জাম দিচ্ছিলেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। পুরো গ্রন্থটির ভাষান্তর সুসম্পূর্ণ করার জন্যে তিনি চেষ্টা করছিলেন প্রাণপনে। কিন্তু মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল অন্য রকম। তাই গ্রন্থের অর্ধেকের কিছু বেশি অংশের ভাষান্তর সম্পন্ন হবার পরই তিনি এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চির-বিদায় গ্রহণ করেন। ফলে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আকাংক্ষা থাকা সত্ত্বেও তাঁর অনুবাদ কর্মটি সুসম্পূর্ণ হতে পারেনি।

তবে মরহুম মওলানার ইন্তেকালের পর অনুবাদ কর্মের উদ্যোক্তা ইসলামিক ফাউন্ডেশন তাঁর অনূদিত অংশটিকে দুটি বিরাট খণ্ড রূপে প্রকাশ করে এবং বিদগ্ধ পাঠক মহলে তা যথারীতি সমাদৃতও হয়। তারপর দীর্ঘ একটি যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ফাউণ্ডেশন কর্তৃপক্ষ গ্রন্থটির পুনঃমুদ্রণের ব্যাপারে আর কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। এদিকে গ্রন্থটির পুনঃমুদ্রণের ব্যাপারে পাঠক মহল থেকে মওলানা মরহুমের গ্রন্থাবলী প্রকাশনার দায়িত্বে নিয়োজিত খায়রুন প্রকাশনীর কাছে ক্রমাগত দাবি আসতে থাকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে খায়রুন প্রকাশনী আজ গ্রন্থটি পুনঃমুদ্রণের এই মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মওলানা মরহুমের সৃষ্টি ও অবদানকে ধরে রাখার এবং এর বাকী অংশ অনুবাদ করার জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমানকে দায়িত্ব দেয়ায় খায়রুন প্রকাশনী নিঃসন্দেহে ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।

গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ দুটি বিরাট খণ্ড রূপে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে পাঠকদের ক্রয়-ক্ষমতা ও ব্যবহারের সুবিধার দিকে বিবেচনা করে দুটি খণ্ডকে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারে তিন খণ্ডে প্রকাশ করা হচ্ছে। বর্তমানে মুদ্রণ ব্যয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থটির অঙ্গ সৌষ্ঠব ও মুদ্রণ পারিপাট্য যথাসম্ভব উন্নত করার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। আমরা দৃঢ়ভাবে আশা রাখি, গ্রন্থটির এই সংস্করণও বিদগ্ধ পাঠক মহলে যথারীতি সমাদৃত হবে। মহান আল্লাহ্ গ্রন্থকার ও অনুবাদক উভয়কে এই মহতী উত্তম কর্মের প্রতিফল দান করুন।

বিনয়বনত

**মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান**

মওলানা আবদুর রহীম ফাউণ্ডেশন

ঢাকা ঃ ১৬ মে, ২০০১

# অনুবাদকের কথা

আবূ বকর আহ্মাদ আল-যাস্সাস রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'আহ্কামুল কুরআন'-এর প্রথম খণ্ডের অনুবাদ পাঠকবৃন্দের সম্মুখে পেশ করলাম। ৩৭০ হিজরী সনের পূর্বে এই গ্রন্থখানি রচিত হয়।

যে সময়ে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, সেই সময়ের আরবী ভাষা আজকের তুলনায় প্রায় এগারো-বারো শ' বছর পূর্বের। এর মধ্যে আরবী ভাষাসহ অন্যান্য আধুনিক সকল ভাষারই বিশ্লেষণ রীতি ও বর্ণনাভঙ্গীতে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে সেই সময়কার ভাষায় রচিত গ্রন্থের একালে অনুবাদ অনেকখানি কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। সেকালের বর্ণনাভঙ্গী ও বিশ্লেষণরীতি অনেকটা প্যাঁচানো। তা থেকে মর্মোদ্ধার করে অনুবাদ করা খুব একটা সহজ কাজ নয়। তবু পূর্ণ সচেতনতা সহকারে গ্রন্থকারের বক্তব্য যথাযথভাবে ভাষান্তরিত করতে আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি।

'আহকামুল কুরআন'-এর বাংলা অর্থ 'কুরআনের বিধান বা হুকুম'। কুরআনের আদেশ নিষেধমূলক আয়াতসমূহের ফিক্হী দৃষ্টিকোণে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ গ্রন্থে। কিন্তু ফিক্হী কিতাবের বিন্যাস এ গ্রন্থে পাওয়া যাবে না। এ গ্রন্থ যেহেতু কুরআনের আয়াতভিত্তিক ফিকহী আলোচনা, তাই এ গ্রন্থে কুরআনের পরম্পরাকেই অনুসরণ করা হয়েছে।

গ্রন্থের আলোচনার শুরুতে 'আবূ বকর বলেছেন' এ কথাটির উল্লেখ বারবার হয়েছে। মনে হচ্ছে, মূল গ্রন্থকার আবূ বকর আল-যাস্সাস মুখে বলেছেন, অপর কেউ তা লিখেছেন তাঁরই কথা, তাঁরই নামে।

বলাবাহুল্য, কুরআন মজীদ আল্লাহ্র কালাম। এতে মানুষের পালনের জন্যেই জীবন-প্রসঙ্গের আইন বিধান দেয়া হয়েছে। ফলে ফিকাহ বা ব্যবহারশাস্ত্রের মৌল বিধান হচ্ছে এ গ্রন্থ।

এ থেকে মুসলিম জনগণ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন—এ আশা পোষণ করছি।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ এ অনুবাদের উদ্যোক্তা এবং প্রকাশক। এজন্য ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ।

এপ্রিল ১৯৮৭ ইং — (মওলানা) মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

## অনুবাদকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) বর্তমান শতকের এক অনন্যসাধারণই ইসলামী প্রতিভা। এ শতকে যে ক'জন খ্যাতনামা মনীষী ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েমের জিহাদে নেতৃত্ব দানের পাশাপাশি লেখনীর সাহায্যে ইসলামকে একটি কালজয়ী জীবন দর্শন রূপে তুলে ধরতে পেরেছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম।

এই ক্ষণজন্মা পুরুষ বাংলা ১৩২৫ সনের ৮ ফাল্গুন, (ইংজেী ১৯১৮ সালের ২ মার্চ) সোমবার বর্তমান পিরোজপুর জিলার কাউখালী থানার অন্তর্গত শিয়ালকাঠি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সনে তিনি শর্ষীনা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আলিম এবং ১৯৪০ ও ১৯৪২ সনে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে যথাক্রমে ফাযিল ও কামিল ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সন পর্যন্ত তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণায় নিরত থাকেন। ১৯৪৬ সালে তিনি এ ভূখণ্ডে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং অত্যল্প কালের মধ্যেই একজন দক্ষ সংগঠকরূপে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) শুধু পথিকৃতই ছিলেন না, ইসলামী জীবন-দর্শনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ৬০ টিরও বেশি অতুলনীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা', 'ইসলামের অর্থনীতি', 'মহাসত্যের সন্ধানে', 'বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব', 'আজকের চিন্তাধারা', পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি', 'কমিউনিজম ও ইসলাম', 'সুন্নাত ও বিদয়াত', নারী', 'ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন', 'পরিবার ও

পারিবারিক জীবন', 'আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ', 'আল-কুআনের আলোকে শিরক ও তওহীদ', আল-কুরআনের রাষ্ট্র ও সরকার', 'আল-কুরআনের আলোকে নবুয়্যাত ও রিসালাত', 'বিজ্ঞান ও জীবন বিধান', 'ইসলাম ও মানবাধিকার', 'ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা', 'ইসলামী শরীয়াতের উৎস', 'অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম' ইত্যাকার গ্রন্থ দেশের সুধীমহলে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছে। এছাড়া অপ্রকাশিত রয়েছে তাঁর অনেক মূল্যবান পাণ্ডুলিপি।

মৌলিক ও গবেষণামূলক রচনার পাশাপাশি বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী মনীষীদের রচনাবলী বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারেও তাঁর কোন জুড়ি নেই। এসব অনুবাদের মধ্যে রয়েছে মাওলানা মওদূদী (রহ)-এর বিখ্যাত তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন', আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী কৃত 'ইসলামের যাকাত বিধান' (দুই খণ্ড) ও 'ইসলামের হালাল-হারামের বিধান', মুহাম্মদ কুতুবের 'বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত' এবং ইমাম আবূ বকর আল-যাস্‌সাসের ঐতিহাসিক তাফসীর 'আহ্‌কামুল কুরআন'। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা ৬০টির উর্ধ্বে।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-র অন্তর্গত ফিকাহ একাডেমীর একমাত্র সদস্য ছিলেন। তিনি ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ সূচিত 'আল-কুরআনের অর্থনীতি' এবং 'ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস' শীর্ষক দুটি গবেষণা প্রকল্পেরও সদস্য ছিলেন। প্রথমোক্ত প্রকল্পের অধীনে প্রকাশি দুটি গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ তাঁরই রচিত। শেষোক্ত প্রকল্পের অধীনে তাঁর রচিত 'সৃষ্টিতত্ত্ব' ও 'ইতিহাস দর্শন' নামক দুটি গ্রন্থ এখনও প্রকাশের অপেক্ষায়।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) ১৯৭৭ সনে মক্কায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন ও রাবেতা আলমে ইসলামীর সম্মেলন, ১৯৭৮ সনে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইসলামী দাওয়াত সম্মেলন, একই বছর করাচীতে অনুষ্ঠিত

প্রথম ইসলামী মহাসম্মেলন, ১৯৮০ সনে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত আন্তঃপার্লামেন্টারী সম্মেলন এবং ১৯৮২ সনে তেহরানে অনুষ্ঠিত ইসলামী বিপ্লবের তৃতীয় বার্ষিকী উৎসবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

এই যুগস্রষ্টা মনীষী বাংলা ১৩১৯ সনের ১৪ আশ্বিন (ইংরেজী ১৯৮৭ সনের ১ অক্টোবর) বৃহস্পতিবার এই নশ্বর দুনিয়া ছেড়ে মহান আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে চলে গেছেন। ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন।

## গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আহ্‌মাদ ইবনে আলী আবূ বকর আর-রাযী আল-যাস্‌সাস তাঁর জীবনকালে হানাফী মাযহাবের ইমাম ছিলেন। তাঁর শিক্ষক ছিলেন আবূ সহল আজ্‌-জুজাজ ও আবুল হাসান আল-কারাখী। তাঁরা জ্ঞান লাভ করেছেন আবূ সাঈদ আল-বারদয়ী থেকে, তিনি মূসা ইবনে নুসাইর আর-রাযী থেকে, তিনি মুহাম্মাদ থেকে। আহ্‌মাদ আবূ বকর আর-রাযী নিজে বাগদাদে অধ্যাপনা শুরু করেন। তাঁর বিদেশ যাত্রা এখানেই সমাপ্ত হয়। তাক্‌ওয়া পরহেজগারীতে তিনি ইমাম আল-কারখীর পন্থার অনুসারী ছিলেন। তিনি তাঁর নিকট থেকে উপকৃত হন, হাদীসের শিক্ষাও তিনি তাঁর নিকটই লাভ করেন।

ইমাম আল-যাস্‌সাস বেশ কয়টি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে আহ্‌কামুল কুরআন, মুখতাসার আল-কারখীর শরাহ, মুখতাসার তাহাভীর শরাহ, জামে মুহাম্মাদ-এর শরাহ প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ফিকাহ শাস্ত্রের মৌলনীতি (উসূল) পর্যায়েও তাঁর একখানি গ্রন্থ রয়েছে। তিনি 'শরহে আল-আসমাউল হুসনা' ও 'আদাবুল কাযা' এ দুইটি গ্রন্থেরও রচয়িতা। তিনি বাগদাদে ৩০৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৭০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

আল-জামে বলেছেন, তিনি 'জিপসাম' (Gypsum—নরম খনিজ পদার্থ)-এর কারিগর ছিলেন বলেই 'আল-যাস্‌সার' নামে খ্যাত। সাময়ানীও এই কথার উল্লেখ করেছেন। 'তাবকাতুল কারী' গ্রন্থে লিখিত হয়েছে, আহ্‌মাদ ইবনে আলী আবূ বকর আর-রাযী বিপুল খ্যাতিসম্পন্ন ইমাম ছিলেন। তিনি আল-যাস্‌সাস অভিধায় পরিচিত। এটা তাঁর জন্যে উপাধি বা উপনাম বিশেষ। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে 'আর-রাযী' অভিধায় অভিহিত করেছেন, আর কেউ কেউ 'আল-যাস্‌সাস' বলে। মূলত একই ব্যক্তিত্ব। যদিও কোন কোন লোক এ দুই অভিধায় অভিহিত দুইজন ব্যক্তি মনে করেছেন নিতান্তই ভুলবশত। 'আল-কামুস' গ্রন্থকার তাঁর 'তাবাকাত' গ্রন্থে এ কথাটি স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন।

আহ্‌মাদ আবূ বকর বাগদাদেই বসবাস করেছেন। এই নগরীর ফিকাহ শিক্ষার্থিগণ তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। হানাফী মতের প্রাধান্য তাঁর নিকটই পরিণত হয়। খতীব বাগদাদী বলেছেন, তাঁর জীবনকাল অবধি ইমাম আবূ হানীফার মাযহাবের অনুসারীদের তিনি-ই ছিলেন ইমাম। তিনি তাকওয়া-পরহেজগারীতে বিশেষ প্রখ্যাত ছিলেন। তাঁকে বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দিলে তিনি তা গ্রহণ করতে অসম্মতি জানান। পরে আরও একবার এই প্রস্তাব দেয়া হয়; কিন্তু সেবারেও তিনি তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হন নি।

তিনি আবূ সহল ও আবুল হাসান আল-কারখীর নিকট ফিকাহ শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ৩২৫ হিজরীতে বাগদাদ নগরে প্রবেশ করেন। পরে আহওয়াজ চলে যান এবং পুনরায় বাগদাদে ফিরে আসেন। পরে তাঁর শিক্ষক ও শায়খ আবুল হাসান আল-কারখীর মত ও পরামর্শক্রমে নিশাপুরের শাসকের সঙ্গে নিশাপুর চলে যান। তিনি নিশাপুর-এ থাকাকালে আল-কারখী ইন্তিকাল করেন। তাই ৩৪৪ হিজরীতে তিনি আবার বাগদাদে চলে আসেন।

বিপুল সংখ্যক লোক তাঁর নিকট ফিকাহ্‌ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণকারীদের মধ্যে আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া আল-জুরজানী কুদুরীর শায়খ এবং আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ আল-জাফরানী বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদুল বাকী ইবনে কানে-এর নিকট থেকে। কুরআনের আহকাম-বিধি-বিধান পর্যায়েও তাঁর নিকট থেকে অনেক জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি বহু প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। খতীব বাগদাদীর মতে তিনি ৩৭০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

এই জীবনী লেখকের বক্তব্য হল, একাধিক ব্যক্তিই এরূপ উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল বাকী আজ-জুরকানী তাঁর 'শরহিল-মাওয়াহিবুল-লাদুন্নিয়া' গ্রন্থের সপ্তম ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখেছেন, তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ৩১৫ হিজরীতে। তিনি এ-ও লিখেছেন যে, আবূ বকর আর-রাযী ইমাম, হাদীসের হাফেজ এবং নিশাপুরস্থ হানাফী ইমামগণের মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি আবূ হাতিম ও উসমান

আদ-দারেমীর নিকট হাদীস শ্রবণ করেছেন। আর তাঁর নিকট থেকে শুনেছেন আবূ আলী ও আবূ আহমদ আল-হাকেম। ইবনে উক্দা বলেছেন, আবূ বকর আরা-রাযী হাদীসের হাফেয ছিলেন। তিনি ৩১৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন।

'কাশফুয-যুনূন' গ্রন্থকার 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেছেন, এ গ্রন্থটি আল-যাস্সাস আর-রাযী অভিধায় পরিচিত মুহাম্মাদ ইবনে আহ্মাদের রচিত। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ৩৭০ হিজরীতে। 'উসূলে ফিকাহর উল্লেখ পর্যায়েও এ মৃত্যুসনেরই উল্লেখ করেছেন। আদাবুল কাযীর শরাহ লেখকদের সঙ্গেও এ মৃত্যুসনই লিখেছেন। 'জামে সগীর' গ্রন্থের শরাহ লেখকদের প্রসঙ্গে ইমাম আবূ বকর আহমাদ ইবনে আলী আল-জাস্সাস-এর মৃত্যুসন ৩৭০ লিখেছেন। 'আল-জাম' আল কবীর গ্রন্থে শরাহ প্রসঙ্গেও তাই লিখেছেন। মুখতাসার আল-কারখীর শরাহ গ্রন্থাবলীর উল্লেখ পর্যায়েও আবূ বকর আল-যাস্সাস-এর মৃত্যু সন ৩৭০ হিজরী লিখেছেন।

মৃত্যু সন পর্যায়ে এই মতপার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে নামের পার্থক্যও লক্ষণীয়। কোথাও আহমাদ ইবনে আলী, কোথাও মুহাম্মাদ ইবনে আলী এবং কোথাও মুহাম্মাদ ইবনে আহ্মাদ লিখিত হয়েছে। কিন্তু এই জীবনী লেখকের মতে প্রথমোক্ত কথাই সত্য ও যথার্থ।[১]

---

১. কোন মাযহাবের তাকলীদকারী, যারা মূলতই ইজতিহাদ করতে অক্ষম, কিন্তু দুইটি সম্ভাবনাময় মোটামুটি কথার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম। মূল নীতিসমূহ করায়ত্ত থাকার দরুন ইমাম আবূ বকরকে অনেকে সেই পর্যায়ের মনীষী গণ্য করেছেন। কিন্তু অনেকে এরূপ উক্তিকে তাঁর প্রতি জুলুম রূপে চিহ্নিত করেছেন। বলেছেন, এতে তাঁর মর্যাদাহানী হয়েছে। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী ও তাঁর নিকট থেকে বর্ণিত কথাসমূহ যাচাই করলেই সত্যতা প্রমাণিত হবে এবং তিনি মুজতাহিদ ফিল মাযহাব প্রমাণিত হবেন।

# সূচীপত্র

بسم الله الرّحمن الرحيم

আবূ বকর আহমাদ ইবনে আলী আর-রাযী (র) বলেছেন, এই গ্রন্থের পূর্বে আমি একটি ভূমিকা গ্রন্থ প্রকাশ করেছি।[১] তাতে যেসব কথা লিখিত হয়েছে, তা অবশ্যই স্মরণীয়। তাতে তওহীদের মৌল নীতি, কুরআনের অর্থ ও তাৎপর্য বোঝার উপায়-পন্থা, তার দলীলসমূহ প্রকাশকরণ, তার শব্দ থেকে পাওয়া হুকুম বা নির্দেশ-নিষেধ এবং আরবদের বাক্যের রূপ পরিবর্তন, আভিধানিক নাম ও শরীয়াত পর্যায়ে বাক্যসমূহ বুঝবার জন্যে যা যা প্রয়োজন, তা বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। কেননা এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম প্রয়োজন আল্লাহ্‌র এককত্ব প্রমাণ, তাঁর সৃষ্টির সাথে তাঁর সাদৃশ্যমুক্ততা এবং মিথ্যা অপবাদকারীরা যেসব জুলুম সম্পর্কিত কথাবার্তা বলেছে, তা থেকে তাঁকে পবিত্র প্রমাণ করা।

সেই ভূমিকা-গ্রন্থের পর এক্ষণে সরাসরি কুরআনের বিধান পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনার পথ উন্মুক্ত হয়েছে। এ গ্রন্থে শরীয়াতের প্রত্যেকটি হুকুম সংক্রান্ত দলীলসমূহও পেশ করা হবে। এ কাজে আমি আল্লাহ্‌র নিকট তওফীক প্রার্থনা করছি, যা আমাকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য দান করবে, আমাকে তাঁর নিকটে পৌঁছিয়ে দেবে। কেননা তিনিই তো আমার অভিভাবক, একমাত্র তিনিই তা করতে সক্ষম।

## بسم الله الرحمن الرحيم পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা

আবূ বকর বলেছেন ঃ এ বিষয়ে কয়েকটি দিক দিয়ে কথা বলতে হবে। প্রথম কথা 'বিসমিল্লাহ্'র পূর্বে উহ্য শব্দের সর্বনাম সম্পর্কে। অর্থাৎ এর পূর্বে 'আমি শুরু করছি' বা 'শুরু কর' কথাটি উহ্য রয়েছে। এর কর্তা কে তা নির্ধারণ করতে হবে।

দ্বিতীয়, 'বিসমিল্লাহ্.....' বাক্যটি যা শুরুতেই রয়েছে, তা কি কুরআনের অংশ কিংবা অন্য কিছু ?

তৃতীয়, তা সূরা আল-ফাতিহার অংশ কিংবা নয় ?

চতুর্থ, তা কি প্রত্যেকটি সূরার প্রথমেই স্থাপিত হতে হবে ?

পঞ্চম, এই বাক্যটি কি পূর্ণাঙ্গ বাক্য, না পূর্ণাঙ্গ বাক্য নয় ?

---

১. ভূমিকা-গ্রন্থ বলে বুঝিয়েছেন তাঁর রচিত 'উসূলে ফিকহ্' গ্রন্থ। কুরআন থেকে হুকুম আহকাম বের করার মৌল নীতিসমূহ তাতে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

ষষ্ঠ, এই বাক্যটি নামাযেও পাঠ করতে হবে কি ?

সপ্তম, নামাযে যে সূরা বা কুরআনের অংশ পড়া হয়, তার শুরুতে তা বারবার পড়তে হবে কি ?

অষ্টম, তা উচ্চস্বর পড়তে হবে কিনা ?

নবম, তাতে যে তত্ত্বসমূহ নিহিত রয়েছে ও ব্যাপক তাৎপর্য সন্নিবেশিত হয়েছে, তা প্রকাশ করা।

এর কারণ, আরবী ভাষার নিয়মে যে বাক্যেই শুরুতে ب অক্ষরটি রয়েছে, তা একটি ক্রিয়া পদের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া আবশ্যক, তা উহ্য হোক, কি প্রকাশমান। উহ্য হলে ক্রিয়া পদের সর্বনাম (ضمير) এখানে দুটি অবস্থার যে কোন একটি হতে হবে। হয় কাজের সংবাদদান পর্যায়ের হবে, না হয় হবে কাজের আদেশ। সংবাদদান পর্যায়ের হলে বাক্যটি হবে ঃ اَبْدَأُ بِسْمِ اللّٰه 'আমি আল্লাহ্র নামে শুরু করছি ......। পরে اَبْدَأُ 'আমি শুরু করছি' অংশ উহ্য করা হয়েছে। এ সংবাদদানের বিশেষ আবশ্যকতা থাকেনি। কেননা পাঠক যে পড়া শুরু করেছে তা শব্দের উচ্চারণে বলে দেয়া প্রয়োজন থাকেনি, বাস্তব অবস্থা থেকেই তা স্পষ্ট প্রতিভাত। আর যদি ابدأوا। 'শুরু কর' এই শব্দটি উহ্য ধরা হয়, তাহলে তার অর্থ হবে ঃ 'আল্লাহ্র নামে পড়া শুরু কর।'

এ দুটি সম্ভাবনার যে কোন একটি হতে পারে। সূরা পাঠ করার ধারায় মনে হয় আদেশসূচক শব্দই উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ বলা হয়েছে 'আল্লাহ্র নাম নিয়ে পড়াশুনা কর'। যেমন সূরা ফাতিহার শব্দ اِيَّاكَ نَعْبُدُ 'কেবলমাত্র তোমারই হে আল্লাহ্ আমরা দাসত্ব করছি'। এর পূর্বে 'তোমরা বল' উহ্য ধরা হয়েছে। 'বিসমিল্লাহ্' বাক্যেও এই সম্বোধন উহ্য আছে বলা যায়। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এই উদেশ্য স্পষ্ট ভাষায় উদ্ধৃত রয়েছে। যেমন ঃ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ 'তোমার রব্ব-এর নামে পড়'। এখানে পাঠ শুরু করার পূর্বে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করতে বলা হয়েছে। অপর এক আয়াতে কুরআন পাঠের পূর্বে আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করতে অর্থাৎ 'আ'উযু বিল্লাহ্' বলতে আদেশ করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে যদি সংবাদদানের তাৎপর্য অনুযায়ী 'আমি পড়া শুরু করছি' এই কথা উহ্য ধরা হয়, তা হলেও তাতে আদেশ নিহিত রয়েছে মনে করা যায়। কেননা যখন জানা যাবে যে, আল্লাহ নিজেই আল্লাহ্র নামে পড়া শুরু করছেন, তখন সেই আল্লাহ্র নামে শুরু করার জন্যে আমাদের প্রতি আদেশ করা হচ্ছে বোঝা যাবে। কেননা তাঁর নাম করে পাঠ শুরু করলে তাতে বরকত হবে। আমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আমরাও যেন তাই করি।

উপরোক্ত দুটি তাৎপর্যের উভয়ই এখানে বৈধ মনে করাও অসমীচীন নয়। অর্থাৎ এখানে যেমন সংবাদ দেয়া হয়েছে, তেমনি তা করার আদেশও করা হচ্ছে। শব্দের গঠন প্রণালীতে এ দুটিরই সমান সম্ভাবনা বিদ্যমান।

কেউ বলতে পারেন, সংবাদদানের কথা এখানে স্পষ্ট উল্লেখ থাকলে উভয় তাৎপর্য একসাথে গ্রহণ করার অবকাশ থাকত না।

জবাবে বলা যায়, হ্যাঁ সংবাদদানের ভাবটি (অর্থাৎ 'আমি শুরু করছি' কথা) স্পষ্ট উল্লিখিত হলে দুটি তাৎপর্য একসাথে গ্রহণ করা সম্ভব হতো না। কেননা একটি শব্দ থেকে একই সময় আদেশ ও সংবাদদান উভয় তাৎপর্য গ্রহণ করার অবকাশ থাকতো না। কেননা সংবাদদান থেকে আদেশ বোঝা হলে তা পরোক্ষ অর্থ হয়ে যেত, প্রত্যক্ষ হতো না। প্রকৃত সংবাদদান বোঝা গেলে প্রকৃতপক্ষেও তাই হতো। একটি শব্দের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অর্থ একই সময় গ্রহণ করা বৈধ নয়। কেননা প্রকৃত অর্থ তো তাই, যে অর্থে শব্দটি মূলতই ব্যবহৃত হয়েছে। আর পরোক্ষ অর্থ প্রকৃত অর্থকে বাদ দিয়ে অন্যদিকে লক্ষ্য দিলেই গ্রহণ করা যেতে পারে। আর একই সময় ও একই অবস্থায় যথাযথ ব্যবহৃত অর্থ এবং তা বাদ দিয়ে ভিন্ন অর্থ গ্রহণ অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তাছাড়া একটি শব্দের দ্বারা সংবাদদান ও আদেশদান উভয় তাৎপর্য গ্রহণ নিষিদ্ধ কাজ। সর্বনাম এখানে উহ্য, অনুল্লিখিত। তা ইচ্ছার সাথে সংশ্লিষ্ট। শব্দে দুটিরই সম্ভাবনা থেকে থাকলে উভয় অর্থ গ্রহণ কঠিন নয়। তখন তার অর্থ হবে ঃ আমি আল্লাহ্র নামে শুরু করছি। অর্থাৎ এই বলে সংবাদ দেয়া হয়েছে এবং সেই সাথে আদেশ হচ্ছে তোমরাও আমার ন্যায় ও বরকত লাভের লক্ষ্যে আল্লাহ্র নামে শুরু কর। এ দুটিরই ইচ্ছা বৈধ হওয়া সত্ত্বেও সাধারণভাবে ও নিঃশর্তে এ দুটিরই দলীল দ্বারা প্রমাণিত হওয়া জরুরী নয়। কেননা তা শব্দের সাধারণ তাৎপর্যের দৃষ্টিতে ঠিক নয়। কোন অকাট্য প্রমাণ ব্যতিরেকে সম্ভাব্য দুটি দিকের কোন একটিকে নির্দিষ্ট করা যায় না। দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে নবী করীম (স)-এর একটি হাদীস উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেছেন ঃ

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِيْ الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ –

অনিচ্ছাসত্ত্বে ভুল করা ও ভুলে যাওয়া বা বিস্মৃতি এবং কোন কাজ জোরপূর্বক করতে বাধ্য করার দরুন কৃত কাজের দায়িত্ব আমার উম্মতের উপর থেকে তুলে নেয়া হয়েছে (অর্থাৎ এই তিনটি পর্যায়ের কাজের গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়েছে)।

কেননা যে হুকুম সর্বনাশের সাথে সংশ্লিষ্ট, সেখানে মূল হুকুমটাই উঠে যাবার আশঙ্কা, গুনাহ্ হওয়ারও আশঙ্কা, সেখানে এ দুটিই একসাথে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ নয়। এভাবে যে, সে কাজের বাধ্যবাধকতা যেমন আমার উম্মতের উপর নেই, তেমনি তাতে আল্লাহ্র নিকট কোন গুনাহ্ও হবে না। কেননা ব্যবহৃত শব্দে এ দুটি তাৎপর্যের সম্ভাবনা রয়েছে। দুটিরই ইচ্ছা করা সম্পূর্ণ বৈধ। তবে তা সত্ত্বেও তা শব্দের সাধারণত্বের দরুন নয়। তা হলে সে দুটিরই সংবদ্ধতা থাকতো। এই কারণে এ ছাড়া ভিন্নতর দলীলকে লক্ষ্য প্রমাণের জন্যে পেশ করা হয়েছে। দুটির কোন একটি বা উভয়টিই বোঝাবার জন্যে দলীল দাঁড় করা নিষিদ্ধ নয়। আর আরবী ভাষায় এরকম হয়ে থাকে যে, দুটি সম্ভাবনার সর্বনাম

ব্যবহার করা হল, যে দুটির এক সাথে ইচ্ছা করা সঠিক কাজ নয়। যেমন নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

কাজসমূহ নিয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট।

জানাই আছে যে, এখানে যে সর্বনাম উহ্য আছে তা কাজের বৈধতা প্রমাণ করে যেমন, তেমনি কাজটির আফজালিয়ত—অতীব উত্তম হওয়ার কথাও প্রকাশ করে। তাই যখন বৈধতার অর্থ গ্রহণ করা হবে, তখন 'কাজের অতীব উত্তম হওয়ার' তাৎপর্য গ্রহণ নিষিদ্ধ হবে। কেননা বৈধতার ইচ্ছা নিয়ত না হওয়া অবস্থায় তার হুকুম প্রমাণিত হওয়া নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আর অতীব উত্তম হওয়ার ইচ্ছা গ্রহণ দাবি করে যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন ইতিবাচক হুকুম প্রমাণ করা হবে অবশ্যম্ভাবীরূপে। তা ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় হোক, কি অতীব উত্তম হওয়ার নিষেধের মধ্যে হোক। আর একই অবস্থায় মূল অস্বীকার করা ও পূর্ণত্বকে অস্বীকার করার ইচ্ছা করা সম্ভব নয়। যে অবস্থায় দুটি তাৎপর্যের ইচ্ছা করা মূলকে অস্বীকার করা ও ক্ষতিকে প্রমাণ করা সহীহ্ হয় না, উক্ত কথা সেই পর্যায়ের। উভয়টির ইচ্ছা প্রমাণ করতে চাওয়া সহীহ্ নয়।

আবূ বকর বলেছেন, আদেশের তাৎপর্য গ্রহণের ইচ্ছা প্রমাণিত হলে, তখন তা বিভক্ত হয়ে যাবে, হয় ফরয হবে, কিংবা হবে নফল। ফরয হচ্ছে নামায শুরু করার সময়ে আল্লাহ্‌র স্মরণ করা। যেমন কুরআনের আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَاسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى –

নিঃসন্দেহে কল্যাণ পেল সে, যে পরিশুদ্ধতা পবিত্রতা গ্রহণ করল এবং তার রব্ব-এর নাম উল্লেখ করে নামায কায়েম করল।

আয়াতে আল্লাহ্‌র নামে উল্লেখ বা স্মরণ করার পর নামায কায়েমের কথা বলা হয়েছে। বোঝা গেল, এখানে তাকবীর-তাহরীমা—নামাযের সূচনাকালীন হাত তুলে 'আল্লাহু আকবার' বলার কথা বলা হয়েছে ঃ

আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا – (المزمل – ٨)

তোমরা রব্ব-এর নামের যিকর—স্মরণ করতে থাক ও সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন ও নিঃসম্পর্ক হয়ে তাঁরই দিকে মনোযোগী হয়ে থাক।

তাফসীর লেখকদের মতে এ আয়াতেও তাকবীরে-তাহ্রীমার কথাই বলা হয়েছে ।

وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى – (الفتح – ٢٦)

এবং মুমিনদেরকে তাক্ওয়ার নীতির অনুসারী বানিয়ে রাখলেন।

আল্লাহ্‌র এ বাণীর অর্থ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলতে অভ্যস্ত করা।

জন্তু যবেহ্‌ করা কালেও আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা ফরয। আল্লাহ্‌ নিজেই তার তাগিদ করেছেন। বলেছেন ঃ

وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ - (الحج - ٣٦)

কাতার বাঁধা অবস্থায় জন্তুগুলোর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ কর।

বলেছেন ঃ

وَلَاتَاْكُلُوْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ -

যে জন্তু যবেহ্‌ করাকালে আল্লাহ্‌র নাম বলা হয়নি, তা খেয়ো না। কেননা এ কাজটি ফাসিকী, ইসলামের সীমালঙ্ঘন।

এক কথায়, তাহারাত, খাওয়া, পান করা ও যাবতীয় কাজ শুরু করার পূর্বে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা নফল অর্থাৎ ফরয নয়।

কেউ বলতে পারেন, এ কথা বলে তো তুমি বাহ্যিকতার উপর নির্ভর করে ও প্রতিপক্ষের দলীল গ্রাহ্য না করেই অযূ করাকালে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করাও ওয়াজিব নয় বলে প্রমাণ করছে। অথচ রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَاوُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ -

যে লোক আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে অযূ করেনি, তার অযূই হয়নি।

জবাবে বলতে হবে, এখানে সর্বনাম প্রকাশ্যভাবে নেই। কাজেই এর সাধারণ অর্থ গ্রহণ করতে হবে। প্রমাণিত বলে ধরা হবে শুধু তা, যা দলীল দ্বারা প্রমাণিত। আর রাসূলে করীম (স)-এর উক্ত কথাটি অযূর অতীব উত্তম না হওয়ার কথা বুঝিয়েছে, দলীল থেকে তাই প্রমাণিত। আদপেই অযূ না হওয়ার কথা বোঝায় না।

## بسم الله الرحمن الرحيم কুরআনের আয়াত—এ পর্যায়ে আলোচনা

আবূ বকর বলেছেন ঃ 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' কুরআনের একটি আয়াত। এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই। সূরা আন-নমলে পূর্ণ আয়াত এভাবে উদ্ধৃত রয়েছে ঃ

اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمَانَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - (٣٠)

এই চিঠি সুলায়মানের নিকট থেকে এসেছে এবং তা দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করা হয়েছে।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত জিবরাঈল (আ) সর্বপ্রথমবার কুরআন নিয়ে যখন নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন তিনি প্রথমে বললেন ঃ اِقْرَأْ 'পড়।'

রাসূল (স) বললেন ঃ مَا اَنَا بِقَارِى 'আমি তো পড়তে সক্ষম নই।' পরে বললেন ঃ – اِقْـرَاْ بِـاسْـمِ رَبِّـكَ الَّذِىْ خَلَقَ 'পড় তোমার সেই রব্ব-এর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন'।

আবূ কতন আল-মাসউদী থেকে, তিনি আল-হারম আল-আকলী থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ নবী করীম (স) চিঠিসমূহের শুরুতে প্রথমে লিখতেন ঃ بِـاسْـمِـكَ اللّٰهُمَّ হে আমাদের আল্লাহ্, তোমার নাম করে (শুরু করছি)।

পরে এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِيْهَا وَمُرْسٰهَا – (هود-٤١)

আল্লাহ্র নাম নিয়ে (নৌকায় আরোহণ কর), যিনি নৌকাকে চালু রাখবেন এবং শক্ত করে উঁচু করে ধারণ করবেন।

অতঃপর রাসূল (স) বিস্‌মিল্লাহ লিখাতে শুরু করেন। পরে নাযিল হল ঃ

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِادْعُوا الرَّحْمٰنَ –

বল, তোমরা আল্লাহ্কে ডাক কিংবা ডাক রহমানকে।

পর তিনি চিঠির উপর আল্লাহ্র পর 'রহমান'ও লিখতে থাকেন। পরে সুলায়মান (আ) সংক্রান্ত উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। তখন তিনি পূর্ণ 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখতে শুরু করেন।

সুনানে আবূ দাউদ গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে—শাবী, মালিক, কাতাদাহ্ ও সাবিত প্রমুখ তাবেয়ী বলেছেন ঃ নবী করীম (স) সূরা 'আন-নম্‌ল' নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পত্রাদির শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখেন নি। হুদায়বিয়ার সন্ধি কালে তাঁর ও সুহায়ল ইবনে আমর-এর মধ্যকার চুক্তিপত্র রচনার সময় হযরত আলী ইবন আবূ তালিব (রা)-কে বললেন ঃ প্রথমে বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখ। সুহায়ল বলল ঃ না, بِـاسْـمِـكَ اللّٰهُمَّ 'হে আল্লাহ্ তোমার নামে' লিখতে হবে। কেননা আমরা রহমানকে চিনি না। নবী করীম (স) সুহায়লের কথা মেনে নিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বাক্যটি পূর্বে কুরআনে নাযিল হয়নি। পরে সূরা আন-নমল নাযিল হওয়ার পরই তা ব্যবহৃত হতে থাকে। (সূরাটি মক্কায় হিজরতের পূর্বে নাযিল হওয়ার কথা সর্বসম্মত)।

## বিসমিল্লাহ্ কি সূরা ফাতিহার অংশ

আবূ বকর বলেছেন, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' সূরা ফাতিহার অংশ কিনা—এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন মত রয়েছে। কূফা পন্থী কুরআন পাঠকবৃন্দ তাকে সূরা

আল-ফাতিহার অংশ গণ্য করেছেন। বলেছেন, তা এই সূরার মধ্যেরই একটি আয়াত। কিন্তু বস্‌রাপন্থী পাঠকগণ তা গণ্য করেন নি। আমাদের হানাফী ফিকাহ্‌বিদদের পক্ষ থেকে এ পর্যায়ে কোন স্পষ্ট অকাট্য মত বর্ণিত হয় নি, তা সূরা আল-ফাতিহারই একটি আয়াত তা-ও বলা হয়নি। তবে আমাদের উস্তাদ শায়খ আবুল হাসান আল-কারখী নামাযে তা উচ্চস্বরে পাঠ না করাই তাঁদের মত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, তাঁদের মতে তা সূরা আল-ফাতিহারই কোন আয়াত নয়। কেননা তা যদি তাঁদের মতে সূরা আল-ফাতিহারই একটি আয়াত হতো, তাহলে নামাযে তা তাঁরা উচ্চস্বরে পড়ার নীতিই গ্রহণ করতেন, যেমন সূরার অন্যান্য আয়াত পাঠ করা হয়। ইমাম শাফিয়ীর মতে তা সূরা ফাতিহারই একটি আয়াত। তাই তা পাঠ করা না হলে নামায আবার পড়তে হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ দুটি মতের কোন একটিকে সহীহ্‌ বলে ঘোষণা করা মূর্খতা ও প্রচ্ছন্নতা আরোপ মাত্র। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাবে, ইনশা আল্লাহ্‌।

## বিসমিল্লাহ্‌ প্রত্যেকটি সূরার প্রথমেই উল্লেখ্য কিনা

আবূ বকর বলেছেন, বিসমিল্লাহ প্রত্যেকটি সূরার শুরুতে উল্লেখ্য কোন আয়াত কিনা—এ পর্যায়েও মনীষীদের বিভিন্ন মত রয়েছে। এই মাত্র আমরা বলে এসেছি যে, আমাদের হানাফী মনীষীদের যেহেতু তা নামাযে উচ্চস্বরে পড়ার নীতি গৃহীত হয়নি, তাই তা প্রত্যেকটি সূরার শুরুতে উল্লেখ্য কোন আয়াতও নয়। আর তা যখন সূরা ফাতিহার অংশ নয়, তাই অন্যান্য সূরার ব্যাপারেও সেই কথা। অন্যান্যের মতে তা সূরা ফাতিহার অংশ নয় বটে তবে তা সূরা আল-ফাতিহার শুরুতে উল্লেখ্য আয়াত।

কিন্তু ইমাম শাফিয়ীর মত হল—তা প্রতিটি সূরার অংশ একটি আয়াত। তবে তাঁর পূর্বে এ ধরনের মত অন্য কেউ দেন নি। কেননা পূর্বগামীদের মধ্যে এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে যে, তা সূরা ফাতিহার আয়াত কিনা। তাকে সব কয়টি সূরার আয়াত কেউ-ই মনে করেন নি। তা যে সূরা ফাতিহার আয়াত নয়, একটি হাদীস থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। হাদীসটি সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না, তিনি আলা ইবনে আবদুর রহমান থেকে, তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে এবং তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হল নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى قُسِّمَتِ الصَّلَاةُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِىْ، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِىْ،وَلِعَبْدِىْ مَا سَالَ، فَاِذَا قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ، قَالَ اللّٰهُ : حَمِدَنِىْ عَبْدِىْ، وَاِذَا قَالَ : الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ، قَالَ : مَجَّدَنِىْ عَبْدِىْ اَوْ اَثْنٰى عَلَىَّ عَبْدِىْ، وَاِذَا قَالَ:

مَـالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ، قَـالَ : فَـوَّضَ اِلَـىَّ عَـبْـدِىْ، وَاِذَا قَـالَ : اِيَّـاكَ نَعْـبُـدُ وَاِيَّـاكَ نَـسْـتَـعِـيْـنُ، قَـالَ : هٰذِهٖ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَـبْـدِىْ، وَلِعَبْدِىْ مَاسَأَلَ، فَـيَـقُـوْلُ عَـبْـدِىْ، اِهْـدِنَـا الصِّرَاطَ الْـمُسْـتَقِيْمَ اِلٰى اٰخِرِهَا، قَالَ : لِعَبْدِىْ مَا سَأَلَ-

আল্লাহ্‌র তা'আলা বলেছেন, নামায আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দুই ভাগে ভাগ করে দেয়া হয়েছে। তার অর্ধেক আমার জন্যে আর অপর অর্ধেক আমার বান্দার জন্যে। আমার বান্দার জন্যে তা-ই আছে যা সে চেয়েছে। সে যখন আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন বলে, তখন আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমার হাম্‌দ (প্রশংসা) করেছে। যখন সে বলে 'আর-রাহমান আর-রাহীম', তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ আমার বান্দা আমাকে মর্যাদাবান করেছে বা আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করেছে। যখন সে বলে মালিক ইয়াওমিদ্দীন, তখন আল্লাহ্ বলেন—আমার বান্দা আমার নিকট সব কিছু সোপর্দ করেছে। যখন সে বলে ইয়্যাকা-না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন, তখন আল্লাহ্ বলেন—এই কথাটি আমার ও আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার। আমার বান্দা যা চেয়েছে, তা-ই সে পাবে। এর পর বান্দা ইহ্‌দিনাস-সিরাতাল মুস্তাকীম সূরার শেষ পর্যন্ত পড়ে, তখন আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা তা-ই পাবে, যা সে চেয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, বিস্‌মিল্লাহ .... যদি সূরা ফাতিহার একটি আয়াত হতো, তাহলে সূরাটির আয়াতসমূহের উল্লেখে সেটিরও উল্লেখ হতো। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, বিসমিল্লাহ.... সূরা ফাতিহার অংশ নয়। আর একথা তো সকলেরই জানা যে, উপরোদ্ধৃত হাদীসে 'সালাত' বা নামাযকে দুই ভাগে ভাগ করার কথা বলে সূরা ফাতিহাই বুঝিয়েছেন, আর তাকেই দুই ভাগ করার কথা বলেছেন। 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' যে সূরা ফাতিহার অংশ নয়, তা তার মধ্যকার কোন আয়াত নয়, তা এ প্রেক্ষিতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হল। দুটি দিক দিয়ে কথাটির ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমত, উক্ত বিভক্তিতে তা উল্লেখ করা হয়নি। দ্বিতীয়, তা এই বিভক্তিতে থাকলে তা দুভাগে বিভক্ত হতো না। কেননা তাতে বান্দার অংশের তুলনায় আল্লাহ্‌র অংশ অনেক বড়। এই বিসমিল্লাহ্.......... আল্লাহ্‌র গুণ বর্ণনা সমন্বিত। তাতে বান্দার কোন অংশই নেই।

কেউ বলতে পারেন যে, তা উল্লেখ করা হয়নি এ জন্যে যে, তাতে সূরার 'আর-রাহমান— আর রাহীম' দুবার উল্লেখ করতে হয়।

জবাবে বলা যাবে, দুটি দিক দিয়ে এ কথাটি ভুল। একটি এই যে, তা যখন একটি স্বতন্ত্র আয়াত যেমন বলা হয়, তখন তার উল্লেখ একান্তই জরুরী। তার উল্লেখ না করা যদি বৈধ হয়ে থাকে, তাহলে মূল সূরায় যে 'আর-রাহমান, আর-রাহীম' রয়েছে তাকে যথেষ্ট মনে করাও বৈধ হতো।

আর দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, বিস্‌মিল্লাহ্‌...... কথায় আল্লাহ্‌র গুণ বর্ণনা রয়েছে, তা সত্ত্বেও তা আল্লাহ্‌র বিশেষ নাম, এই নামে অন্য কাউকে অভিহিত করা যেতে পারে না। এমতাবস্থায় সূরাটির বিভক্তিকালে তার উল্লেখ একান্তই জরুরী ছিল। কেননা তার উল্লেখ পূর্বে হয়নি। সূরার আয়াত বিভক্তিতেও তার উল্লেখ কোন একটি ভাগেও নেই।

উপরোদ্ধৃত হাদীসটি অপর এক সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবন আবূ বকর আবূ দাঊদ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, কানবী মালিক থেকে, তিনি আলা ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (হিশামের মুক্ত গোলাম—সায়েব) বলেছেন ঃ আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ বলেছেন, নামায আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দুই খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে, তার অর্ধেক আমার আর অপর অর্ধেক আমার বান্দার। আমার বান্দা যা চেয়েছে, তা সে অবশ্যই পাবে। বান্দা বলে 'আলহাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন', তখন আল্লাহ্‌ বলেন ঃ আমার বান্দা আমার হাম্‌দ করেছে। বান্দা বলে ঃ আর-রাহ্‌মান আর-রাহীম। আল্লাহ্‌ বলেন ঃ আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করেছে। বান্দা বলে ঃ 'মালিক ইয়াওমিদ্দীন,' তখন আল্লাহ্‌ বলেন ঃ আমার বান্দা আমার মর্যাদার কথা বলেছে। আর এই আয়াত আমার ও আমার বান্দার মধ্যের ব্যাপার। বান্দা বলে ঃ ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যাকানাস্তাঈন, এই আয়াতও আমার ও আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার। বান্দার তা-ই রয়েছে যা সে চেয়েছে। এই হাদীসে অতঃপর 'মালিক ইয়াওমিদ্দীন' পর্যায়ে বলা হয়েছে ঃ এ আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দুই ভাগে বিভক্ত। এটা বর্ণনাকারীর একটি ভ্রান্তি মাত্র। কেননা 'মালিক ইয়াওমিদ্দীন' একান্তভাবে আল্লাহ্‌র গুণ বর্ণনা, এতে বান্দার কিছু নেই। যেমন আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন-এ বান্দার ভাগের কিছু নেই। ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যাকানাস্তাঈন-এ আল্লাহ্‌ ও বান্দা—উভয়ের অংশ আছে তা বলার কারণ হল, তাতে একদিকে যেমন আল্লাহ্‌র গুণের উল্লেখ আছে, তেমনি আছে বান্দার প্রার্থনা। লক্ষণীয় যে, এর পরবর্তীতে আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'ইহ্‌দিনাস্‌ সিরাতাল মুস্তাকীম-এ বিশেষভাবে বান্দার অংশ বলা হয়েছে এজন্যে যে, তাতে আল্লাহ সম্পর্কিত কোন কথা নেই। এটা বান্দার একটি পূর্ণাঙ্গ প্রার্থনা মাত্র। অপর দিক থেকে 'মালিক ইয়াওমিদ্দীন এবং অনুরূপ 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন' যদি আল্লাহ্‌ ও বান্দার মধ্যে বিভক্ত হতো, তাহলে তা দুভাগে বিভক্ত হতো, যারা বিস্‌মিল্লাহ.... কে সূরার একটি আয়াত গণ্য করে তারা যেমন বলে। তাহলে আল্লাহ্‌র জন্যে চারটি আয়াত হয়ে যেতো—আর-রাহমান আর-রাহীম বাদে। আর বান্দার জন্যে হতো মাত্র তিনটি আয়াত।

বিস্‌মিল্লাহ্‌ .....সূরাসমূহের প্রাথমিক আয়াত না হওয়ার আর একটি প্রমাণ হল তা দুটি সূরার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির মাধ্যম মাত্র। যেমন মুহাম্মাদ ইবনে বকর..... আবূ দাঊদ.... আমর ইবনে আওন বলেছেন .... হুশাইম আওফ আল আরাবী থেকে ...... যায়দ আল কারী থেকে বর্ণিত হয়েছে। বলেছেন, আমি আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা) কে বললাম ঃ

مَا حَمَلَكُمْ عَلٰى اَنْ عَمَدْتُمْ اِلٰى بَرَاَةٍ وَهِىَ مِنَ الْمِئِيْنِ وَاِلَى الْاَنْفَالِ وَهِىَ الْمَثَانِىْ، فَجَعَلْتُمُوْهُمَا فِى السَّبْعِ الطِّوَالِ، وَلَمْ تَكْتُبُوْا بَيْنَهُمَا سَطَرَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা 'বরায়াত' (তওবা) দুইশ' আয়াত সমন্বিত, সূরা আন্ফাল মাসানীর মধ্যে গণ্য, এ দুটিকে আপনারা সাতটি সুদীর্ঘ সূরার মধ্যে গণ্য করেছেন এবং দুটির মধ্যে বিসমিল্লাহ্... লিখেন নি, তার কারণ কি ?

জবাবে হযরত উসমান (রা) বললেন ঃ নবী করীম (স)-এর প্রতি যখন বহু কয়টি আয়াত একসঙ্গে নাযিল হতো, তখন তিনি নিয়োজিত লেখককে ডেকে বলতেন, এই আয়াত অমুক সূরায় ....... যাতে এই এই কথা বলা হয়েছে—শামিল কর। আর যখন একটি বা দুটি আয়াত নাযিল হতো তখনও এরূপ বলতেন। সূরা আনফাল মদীনায় প্রথম নাযিল হয়েছিল, আর সূরা 'বরায়াত' কুরআনের শেষ সূরা হিসেবে নাযিল হয়েছিল। আর এ দুটি সূরার আলোচ্য সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। আমি মনে করেছি, এ সূরাটি ওটির-ই অংশ। এই কারণে আমি এ দুটিকে সুদীর্ঘ সাত সূরার মধ্যে গণ্য করেছি, এ দুটির মধ্যে 'বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' ছত্রটি লিখিনি।

বোঝা গেল, হযরত উসমান (রা) বিস্মিল্লাহ ..কে সূরার অংশ গণ্য করেন নি, তিনি তা দুটি সূরার মধ্যে পার্থক্য করার জন্যেই লিখতেন মাত্র। এছাড়া অন্য কিছু নয়। উপরন্তু তা যদি প্রত্যেক সূরার অংশ হতো, অংশ হতো সূরা ফাতিহার, তাহলে তা নবী করীম (স)-এর স্থাপন নীতি থেকেই জানা যেতো, যেমন সব সূরার আয়াতসমূহের স্থাপন থেকেই তা জানা যায় এবং তাতে কোনরূপ মতপার্থক্যেরই সৃষ্টি হতো না। কেননা সকল আয়াত সম্পর্কে জানার এবং এই সম্পর্কেও যথার্থ জ্ঞানের উৎস তো একটাই। সকলের মিলিত উদ্ধৃতি ও বর্ণনা হল কুরআন প্রমাণের একটি মাত্র উপায়। তাই আয়াতের স্থান ও বিন্যাস পর্যায়ের জ্ঞানও সেই একই সূত্র থেকে জানতে হবে। কুরআনের আয়াতসমূহের বিন্যাস ভঙ্গ করা ও কোন আয়াতকে তার নির্দিষ্ট স্থান থেকে উঠিয়ে অন্য স্থানে বসানো যে কারোর জন্যেই জায়েয নয়, সেকথা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। কেউ তা করলে সে তো মূল কুরআনকেই ক্ষতিগ্রস্ত করল। তাই বিসমিল্লাহ....সূরাসমূহের প্রথম আয়াত যদি হতো, তাহলে সে কথা সকলেই জানতে পারতেন, তা নিয়ে কোন মতপার্থক্যের সৃষ্টি হতো না। যেমন সকলেই জানেন যে, বিস্মিল্লাহ্... একটি আয়াত হিসেবে সূরা আন-নম্ল-এ শামিল রয়েছে। কিন্তু তার অপর কোন সূরার অংশ বা আয়াত হওয়ার কথা যখন পূর্ববর্তী মনীষীরা উল্লেখ করেন নি, তখন আমাদের পক্ষে তা মনে করা কোন ক্রমেই জায়েয হতে পারে না। তাকে প্রত্যেকটি সূরার প্রথম আয়াতও আমরা মনে করতে পারি না।

কেউ বলতে পারেন, পূর্ববর্তীরা সব একত্রিত হয়ে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে একথা আমাদের পর্যন্ত পৌছিয়েছেন যে, সহীফার মধ্যে যা-ই আছে, তা সবই কুরআন। তাই সহীফার যেখানে যা যে ভাবেই আছে সে ভাবেই তা আমাদের মেনে নেয়া উচিত। জবাবে বলব, তারা সূরাসমূহের উপরে তা লিখিতভাবে আমাদের নিকট পৌছিয়েছেন; কিন্তু তা এসব সূরার কোনটির অংশ—সূরা নম্‌ল ছাড়া দেখান নি। যে যে সূরার উপরে তা লিখিত, তা সেই সূরার অংশ বা একটি আয়াত, তা নিয়েই আমাদের মধ্যের এই বিতর্ক। আমরা বলি, তা কুরআনের আয়াত বটে; কিন্তু যে যে সূরার উপরে তা বসানো আছে, তা সেই সূরার অংশ, তা আমরা বলতে পারি না। তা সেই সূরার সঙ্গে পড়তে হবে, তা থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে, তা সেই সূরার আয়াত। কেননা কুরআনের কতক অংশ অপর কতক অংশের সাথে মিলিত, সম্পর্কিত। কিন্তু বিসমিল্লাহ.... কোন্ সূরার সাথে মিলিত সম্পর্কিত, তা বলা হয়নি। আর তার দরুন এটাও প্রমাণিত হয় না যে, এই সবটাই একটি সূরা।

কেউ যদি বলেন, সহীফা আমাদের নিকট আনা হয়েছে, বলা হয়েছে, তাতে যা-ই আছে, তা সবই কুরআন, তার সংবদ্ধতা-সংলগ্নতা ও বিন্যাস সহকারে। এমতাবস্থায় প্রত্যেক সূরার উপরে যে বিসমিল্লাহ..... মূল সূরার অংশ না হলে তা তাঁরা অবশ্যই বলতেন। তাঁরা বলেছেন যে, তা প্রত্যেক সূরার উপরে বসানো হয়েছে সূরা দুটি মিলে এক হয়ে না যায় সেজন্যে।

জবাবে বলা যায়, বিস্‌মিল্লাহ... কুরআনের অংশ নয় যারা বলে, তাদের প্রতিই এই প্রশ্ন হতে পারে। যারা বলে তা কুরআনের কথা, তাদের প্রতি এই প্রশ্ন অবান্তর। কেউ যদি বলে যে, তা যদি সূরার অংশ না হতো, তা হলে, তা সকলেই জানতে পারতেন, কারোরই ভিন্ন মত হতো না। তা হলে যাঁরা বলেন, তা সূরার অংশ তাদের প্রতিও এই প্রশ্ন হতে পারে না—

তাঁকে বলা যাবে, না, তা জরুরী নয়। কেননা যা সূরার অংশ নয়, তা সব বলে দেয়া কর্তব্য নয়, যেমন যা কুরআনের নয় তা চিহ্নিত করে দেয়াও তাদের কর্তব্য নয়। যা সূরার অংশ তা উদ্ধৃত করাই তাদের দায়িত্ব। বলা কর্তব্য যে, এটা সূরার অংশ। যা কুরআনের, তা বলে দেয়া যেমন তাদের কর্তব্য। তাই তা সূরার অংশ একথা যখন বলা হয়নি এবং তা নিয়ে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে, তখন মূল কুরআনকে প্রতিষ্ঠিত করার মত তাকেও প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের জায়েয নয়।

তা সূরাসমূহের প্রথম আয়াত নয়—এ কথা প্রমাণের আর একটি দলীল হচ্ছে অপর একটি হাদীস। হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে জাফর ইবনে আবান, মুহাম্মাদ ইবনে আয়ূব মুসাদ্দাদ ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ, শুবা, কাতাদা, হযরত আব্বাস আল-জাশী, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত। নবী করীম (স)-এর এই কথাটি বর্ণনা করেছেন ঃ

سُوْرَةٌ فِى الْقُرْاٰنِ ثَلَا ثُوْنَ اٰيَةً شَفَعَتْ لِصَاحِبِهَا حَتّٰى غُفِرَلَهُ : تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ -

কুরআনে ত্রিশটি আয়াত সমন্বিত সূরা তার পাঠকের জন্যে শাফা'আত করবে। শেষ পর্যন্ত সমগ্র রাজ্যের কর্তা আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মাফ করে দেবেন।

কুরআনের সব কারীই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, যে ত্রিশটি আয়াতের কথা বলা হয়েছে তাতে নিশ্চয়ই বিসমিল্লাহ.......গণ্য নয়। যদি তা গণ্য হতো তাহলে তো ত্রিশটি না—একত্রিশটি আয়াত হয়ে যাবে। তা হলে তা রাসূলে করীম (স)-এর কথার বিপরীত হয়ে যাবে। উপরন্তু সমস্ত দেশ ও নগরের কারী এবং ফিকাহবিদ একমত হয়ে বলেছেন, সূরা আল-কাওসার তিন আয়াতবিশিষ্ট, সূরা ইখ্লাসের মাত্র চারটি আয়াত। বিসমিল্লাহ....যদি সূরার আয়াত গণ্য হতো, তাহলে এ দুটি সূরার আয়াত সংখ্যা একটি করে বেশি ধরতে হতো, তা ধরা হয়নি। যদি বলা হয় যে, বিসমিল্লাহ....কে বাদ দিয়েই এই সংখ্যা ধরা হয়েছে, কেননা তাঁদের নিকট এটা কোন সমস্যা নয়। আমরা বলব, তাহলে তাঁদের পক্ষে একথা বলা জায়েয ছিল না যে, সূরা ইখলাস চার আয়াতবিশিষ্ট এবং সূরা আল-কাওসার তিন আয়াতবিশিষ্ট। তিন বা চার আয়াত বললে সম্পূর্ণ সংখ্যা বলা হয় না। আর তা-ই যদি হতো তাহলে সূরা আল-ফাতিহার ছয়টি আয়াত বলা উচিত ছিল।

আবূ বকর বলেছেন, আবদুল হুমাইদ ইবনে জাফর, নূহ ইবনে আবূ জালাল—সাঈদ আল মকবেরী আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) বলছিলেন—আল হাম্দুলিল্লাহ্র সাত আয়াত, তার একটি হচ্ছে বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এই সনদে হযরত আবূ হুরায়রার উল্লেখ অনেকেই সন্দেহ করেছেন। আবূ বকর আল-হানাফী আবদুল হুমাইদ ইবনে জাফর নূহ্ ইবনে আবূ জালাল সাঈদ ইবনে আবূ সাঈদ—আবূ হুরায়রা নবী করীম (স) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

اِذَا قَرَأْتُمْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، فَاقْرَؤُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، فَاِنَّهَا اِحْدٰى اٰيَاتِهَا -

তোমরা যখন আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন পড়বে, তখন তোমরা বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীমও পড়বে। কেননা তা সূরা ফাতিহারই একটি আয়াত।

আবূ বকর বলেছেন, অতঃপর আমি নূহ-এর সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি তখন সাইদ আল-মকবেরী আবূ হুরায়রা সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা শোনালেন, কিন্তু কথাটি রাসূলে করীম (স) বলেছেন, তার উল্লেখ করেন নি। উক্ত হাদীসটির সনদে এমনি ভাবেরই পার্থক্য রয়েছে। তা রাসূলের কথা হওয়ায়ও মতপার্থক্য রয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে,

হাদীসটি মূলতই মজবুত বা শক্ত ভিত্তিক নয়। তাই তা থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে, রাসূল নিজেই বিস্‌মিল্লাহ....কে সূরা ফাতিহার আয়াত বলেছেন। তবু তা রাসূলে করীম (স)-এর কথা হওয়াটা অসম্ভব নয়। কেননা তা আবূ হুরায়রা (রা)-এর কথানুযায়ী সূরা ফাতিহারই একটি আয়াত। তার কারণ, বর্ণনাকারী অনেক সময় নিজের কথাও হাদীসের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে থাকেন এবং মূল বর্ণনা ও নিজের কথার মধ্যে কোন পার্থক্য করেন না।.........হাদীসের বর্ণনায় এরূপ ঘটনা কিছু মাত্র বিরল নয়। তাই যে হাদীসে এরূপ হওয়ার আশঙ্কা, তা রাসূলের কথা বলে চালিয়ে দেয়া সঠিক কাজ নয়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) নিজেই এরূপ বলেছেন। কেননা তিনি [নবী করীম (স)] উচ্চস্বরে বিস্‌মিল্লাহ ......পড়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। তাতে তিনি হয়ত মনে করে নিয়েছেন যে, বিস্‌লিল্লাহ্ সূরা ফাতিহারই অংশ।

এতদসত্ত্বেও যদি প্রমাণিত হয় যে, এই হাদীসের সনদে উল্টা-পাল্টা অবস্থানেই রাসূলের কথা হওয়ার ব্যাপারেও মতপার্থক্য নেই এবং তা আবূ হুরায়রার কথা, এই সন্দেহও দূর হয়ে যায়, তবু বিসমিল্লাহ....কে সূরার অংশ বলা আমাদের জন্যে জায়েয নয়। কেননা তা কেবল তখনই বলা যেত যদি মুসলিম উম্মতের নিকট থেকে পূর্ব থেকেই সেরূপ বর্ণিত ও উদ্ধৃত হয়ে আসতো, আর ইতিপূর্বেই বলেছি যে, তা হয়নি।

বিস্‌মিল্লাহ...... কোন আয়াত কিনা এ পর্যায়ে কথা হল, তা যে একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত নয়, এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই। সূরা নম্‌ল-এ এটি একটি অসম্পূর্ণ আয়াত বা একটি পূর্ণ আয়াতের অংশ মাত্র। এর প্রথমাংশ হচ্ছে وَإِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ ‘এ চিঠি সুলায়মানের নিকট থেকে এসেছে’। তবে সূরা আন্-নম্‌ল-এ তা একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত না হলেও অপর কোন সূরায় তা পূর্ণ আয়াত হতে পারবে না—এমন কোন কথা নেই। কেননা কুরআনে এরূপ আরও পাওয়া যায়। সূরা ফাতিহায় ‘আর-রাহমান আর-রাহীম’ রয়েছে এবং তা পূর্ণাঙ্গ আয়াত হিসেবেই রয়েছে। তা সত্ত্বেও ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত নয়—একথা সর্ববাদীসম্মত। অনুরূপভাবে ‘আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন’ সূরা ফাতিহায় একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত[১] কিন্তু وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ-এ তা একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াতের অংশ মাত্র। অবস্থা যখন এই, তখন তার কোন কোন সূরার আয়াতের অংশ হওয়া সম্ভব। অথবা কথিত ভাবে কোন আয়াত হতে পারে। আমরা ইতিপূর্বে প্রমাণ করেছি যে, তা সূরা ফাতিহার কোন আয়াত নয়। তাহলে সূরা আন্-নম্‌ল ছাড়া কুরআনের কোন পূর্ণাঙ্গ আয়াত হতে পারে, কেননা সূরা আন্ নম্‌ল-এ তো তা কোন পূর্ণাঙ্গ আয়াত নয়। একটি হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, তা একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত। হাদীসটি ইবনে আবূ মুলাইকা উম্মে সাল্‌মা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলে করীম (স) নামাযে কিরাআত পাঠ করলেন এবং তিনি

---

১. এবং তাদের শেষ দো'আ হচ্ছে ঃ সমস্ত তারীফ সারেজাহানের মালিক আল্লাহ্‌র জন্যে।
—সূরা ইউনুস ঃ আয়াত ১০

তাকে একটি আয়াত বলে অভিহিত করলেন। অন্য কথায় নবী করীম (স) বিসমিল্লাহ.......কে একটি বিচ্ছিন্নকারী আয়াত গণ্য করতেন। এ হাদীসটির সূত্র হায়সাম ইবনে খালিদ করীম ইকরামা—আমর ইবনে হারুন-আবূ মুলাইকা উম্মে সালমা নবী করীম (স)। আসবাত মুদ্দী আবদ-খায়ব আলী সূত্রের হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বিস্মিল্লাহ্কে একটি আয়াত গণ্য করতেন। ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত। অবদুল করীম আবূ উমাইয়া তা আল-বাসরী ইবনে আবূ বরদাতা-তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لاَأَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتّٰى اَخْبِرُكَ بِاٰيَةٍ اَوْسُوْرَةٍ لَمْ تَنْزِلْ عَلٰى نَبِىٍّ بَعْدَسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامِ غَيْرِىْ فَمَشٰى وَاَتَّبَعْتُهُ حَتّٰى انْتَهٰى اِلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ وَاَخْرَجَ اِحْدٰى رِجْلَيْهِ مِنْ اَسْكُفَّةِ الْبَابِ وَبَقِيَتِ الرِجْلُ الْاُخْرٰى، ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَىَّ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ : بِاَىِّ شَىْءٍ تَفْتَحُ الْقُرْاٰنَ اِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ ؟ فَقُلْتُ : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ، قَالَ : ثُمَّ خَرَجَ –

আমি মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার পূর্বে তোমাকে এমন একটি আয়াত বা সূরা জানিয়ে দেব, যা সুলায়মান (আ)-এর পর আমার ছাড়া অন্য কোন নবীর প্রতি নাযিল হয়নি। অতঃপর তিনি উঠে বলতে লাগলেন, আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌছলেন এবং তাঁর একটি পা দরজার বাইরে রাখলেন, আর একটি পা ভেতরে ছিল, তখন আমার প্রতি মুখ করে দাঁড়িয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি পড়ে কুরআন পড়া শুরু কর যখন নামায পড়তে শুরু কর ? বললাম—'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়ে। অতপর তিনি বের হয়ে গেলেন।

আবূ বকর বলেছেন, এ আলোচনা থেকে প্রমাণিত হল যে, তা একটি আয়াত বটে; কেননা তার একটি আয়াত না হওয়া পর্যায়ে হাদীসসমূহের এই হাদীসটির কোন বিরোধ বা বৈপরীত্য নেই।

কেউ যদি বলেন, খবরে ওয়াহিদ-এর ভিত্তিতে তাকে একটি আয়াত প্রমাণ করতে চেষ্টা না করাই বরং তোমার কর্তব্য। তা-ই তো তোমার মূল দাবি। কেননা তুমি আগেই বলেছ যে, সূরাসমূহের উপর লিখিত বিসমিল্লাহ........সূরার কোন আয়াত নয়।

তাহলে তার জবাবে বলা যাবে, আয়াতের খণ্ড সম্পর্কে রাসূলের পক্ষ থেকে উম্মতকে নির্ধারণ নীতি দেয়ার পূর্বে তা জরুরী নয়, তাই খবরে ওয়াহিদ-এর ভিত্তিতে তাকে একটি

আয়াত প্রমাণ করা সম্পূর্ণ জায়েয।[১] তবে সূরার মধ্যে তার স্থান হওয়া তাকে কুরআনের জিনিস প্রমাণ করার মতই, তার উপায় একমাত্র মুতাওয়াতির হাদীস, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা তা প্রমাণ করা জায়েয নয়। অন্যান্য সূরার ন্যায় শুধু কিয়াস করেও তা বলা যেতে পারে না। সূরা নম্‌ল-এর তা আছে বলে অন্যান্য সূরারও আয়াত হতে হবে, এমন কোন কথা নেই। লক্ষণীয়, নবী করীম (স) আয়াতের স্থান নির্ধারণ (توقيف)-এর কাজ সম্পন্ন করেছেন। যেমন ইবনে আব্বাস (রা) উসমান (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। পূর্বে আমরা এর উল্লেখ করেছি। সব আয়াতের শুরু ও পরিমাণের ক্ষেত্রে রাসূলের নিকট থেকে توقيف পাওয়া যায়নি। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, আয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ আমাদের কর্তব্যভুক্ত নয়। আজ একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, তা একটি আয়াত, তখন কুরআনের যেখানেই তা লিখিত আছে সেখানেই তা একটি আয়াত অবশ্যই হতে পারে, সূরা সমূহের প্রথম আয়াত না হলেও অথবা এসব স্থানে এককভাবে বারবার উল্লিখিত হলেও। যেমন সমস্ত কিতাবের শুরুতে বরকতের জন্যে আল্লাহ্র নাম লেখা হয়। কাজেই যেখানেই তা লিখিত আছে সেখানেই তা একটি আয়াত হতে পারে। কেননা গোটা উম্মত থেকে সেই রূপই চলে এসেছে যে, কুরআনে যা-ই লিখিত আছে, তা-ই কুরআনের জিনিস। তার মধ্যে কোন জিনিসকে খারিজ করা হয়নি। এসব স্থানে বারবার লিখিত হওয়ার দরুনই তা কুরআনের বাইরের জিনিস হয়ে যায়নি। যেমন اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ সূরা আল-বাকারা ও সূরা আল-ইমরানে উদ্ধৃত হয়েছে। আর فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ 'কোন্ কারণে তোমাদের দুজনের রব্বকে তোমরা অস্বীকার করতে পার', কুরআনে বিচ্ছিন্ন ও এককভাবে উদ্ধৃত হয়েছে বারবার, তা একটি আয়াতের বারবার উল্লেখের কারণ নয়, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমও তাই। নবী করীম (স) তাকে একটি আয়াত বলেছেন। তাই যেখানেই তা উল্লিখিত হয়েছে, সেখানেই তা একটি আয়াত গণ্য হবে।

## নামাযে বিসমিল্লাহ পাঠ

নামাযে বিসমিল্লাহ্ পাঠ পর্যায়ে ইমাম আবূ হানীফা, ইবনে আবূ লায়লা, সওরী হাসান ইবনে সালেহ আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফার ও শাফিয়ী প্রমুখ প্রখ্যাত ফিকাহ্‌বিদ বলেছেন, নামাযে আউযু পাঠ করার পর তা অবশ্যই পড়তে হবে সূরা ফাতিহা পড়ার পূর্বে। তবে প্রতি রাক'আত নামাযের শুরুতে সূরা শুরু করার পূর্বে তা পুনরায় পড়তে হবে কিনা, সে বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। আবূ ইউসূফ ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, তা প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহা শুরু করার সময় একবার পাঠ করতে হবে। পরবর্তী সূরা পাঠের সময় তা পুনরায় পড়তে হবে না। এ মত আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ-এর। মুহাম্মাদ ও হাসান ইবনে জিয়াদ আবূ হানীফা থেকে

১. গ্রন্থকারের বক্তব্য হচ্ছে, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা বিসমিল্লাহ...... যে একটি পূর্ণ আয়াত প্রমাণ করা জায়েয। খবরে ওয়াহিদ দ্বারা তার কুরআনী হওয়ার কথা গ্রন্থকারের বক্তব্য নয়।

বর্ণনা করেছেন, কির'আত শুরু করার সময় প্রত্যেক রাক'আতের প্রথম দিকে যখন একবার পড়া হবে, তখন সেই নামাযে সালাম ফেরানো পর্যন্ত তা আর পড়তে হবে না। তবে প্রত্যেক সূরা পাঠ কালে তা পড়া হলে খুবই ভাল। হাসান বলেছেন, মসবুক হলে যে নামায 'কাযা' করা হবে, তাতে তা পড়তে হবে না। কেননা ইমাম তো নামাযের শুরুতে পড়েছেনই। তাই ইমামের পড়া তার জন্যেও যথেষ্ট হবে।

আবূ বকর বলেছেন, এ কথা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি বিসমিল্লাহ..... কে কুরআনের অংশ মনে করেছেন কিরা'আত পাঠের শুরুতে। তা শুধু বরকতের জন্যে স্বতন্ত্রভাবে কুরআনের জিনিস নয়—ও যেমন সব কাজের ও লেখার শুরুতেই তা পড়া বা লেখা হয়। তা তার স্থান থেকে আলাদা করে নেয়ার প্রয়োজন নেই।

হিশাম আবূ ইউসূফ থেকে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, আমি সূরা ফাতিহার পূর্বে বিস্‌মিল্লাহ.........পাঠ এবং সূরা ফাতিহার পর যে সূরা পড়া হয় তার পূর্বে তা নতুন করে পড়া সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফাকে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, ফাতিহার পূর্বে তা পড়াই যথেষ্ট। আবূ ইউসূফ নিজে বলেছেন, প্রত্যেক রাক'আতে কিরা'আতের পূর্বে তা পড়বে, পরবর্তী রাক্'আতে ফাতিহার পূর্বে অনুরূপ তা আবার পড়বে যখন সূরা পড়তে ইচ্ছা করবে। মুহাম্মাদ বলেছেন, খুব বেশী সূরা পড়লে এবং তা অনুচ্চ শব্দে পড়লে প্রত্যেক সূরার শুরুতে তা পড়বে। আর যদি উচ্চস্বরে পড়ে, তাহলে তা পড়বে না। কেননা তখন দুই সূরার মাঝে খানিকটা সময় থেমে থাকাই পার্থক্য করার জন্যে যথেষ্ট।

আবূ বকর বলেছেন, ইমাম মুহাম্মাদের এই কথা থেকে বোঝা যায়, তাঁর মতে বিস্‌মিল্লাহ পাঠ দুটি সূরার মধ্যে পার্থক্য করার জন্যে মাত্র কিংবা কিরা'আত শুরু করার জন্যেই তা পড়তে হয়। তা সূরার অংশ নয়। তা থেকে একথা বোঝা যায় না যে, তিনি তাকে একটি আয়াত মনে করতেন এবং তা কুরআনের অংশ নয়।

ইমাম শাফিয়ী (রা) বলেছেন, তা প্রত্যেকটি সূরার প্রথমে লেখা রয়েছে। অতএব তা প্রত্যেকটি সূরা পাঠের শুরুতে পড়তে হবে।

আবূ বকর বলেছেন, ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তা প্রতি রাক্'আতেই পড়তে হবে। ইবরাহীম বলেছেন, প্রত্যেক রাক্'আতের প্রথমে তা একবার পড়লে পরবর্তীর জন্যে তাই যথেষ্ট হবে। মালিক ইবনে আনাস বলেছেন, ফরয নামাযে তা উচ্চস্বরে কিংবা গোপনে পড়বেই না। নফল নামাযে ইচ্ছা হয় পড়বে, না হয় পড়বে না। সকল নামাযেই তা পড়তে হবে। এই কথার দলীল হচ্ছে একটি হাদীস। হাদীসটি উম্মে সালমা ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত ঃ নবী করীম (স) নামায এভাবে পড়তেন ঃ বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম—আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ আমি রাসূলে করীম (স)-এর মুকতাদী হয়ে নামায পড়েছি; হযরত আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা)-এর পেছনেও পড়েছি। তাঁরা সকলেই বিসমিল্লাহ অস্পষ্ট স্বরে পড়তেন। কোন কোন নামাযে তা তাঁরা প্রচ্ছন্ন রাখতেন এবং কোন কোন নামাযে তাঁরা তা উচ্চস্বরে পড়তেন না। আর এ তো

জানাই আছে যে, তা ফরয নামাযের ব্যাপার। কেননা ফরয নামাযেই তাঁরা ইমামতি করতেন ও তাঁরা মুকতাদী হতেন। নফল নামাযে নয়। কেননা নফল নামায জামা'আতে পড়া সুন্নাত নয়। হযরত আয়েশা (রা) আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফল, আনাস ইবনে মালিক বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) আলহামদু থেকেই কিরা'আত পাঠ শুরু করতেন। তাতে বোঝা যায় যে, বিসমিল্লাহ.......উচ্চস্বরে পড়তেন না। তা আদপেই পড়তেন না, তা বোঝা যায় না।

কেউ যদি বলেন, আবূ যুরয়া ইবনে আমর ইবনে জরীর আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) যখন দ্বিতীয় রাক'আতে উঠে দাঁড়াতেন, তখন আলহামদু ....... দিয়েই শুরু করতেন, চুপ থাকতেন না। তাঁকে বলা হয়েছে, এতে মালিকের পক্ষের কোন প্রমাণ নেই, যদ্দারা বোঝা যাবে যে, দ্বিতীয় রাক'আতে তা পড়তেন না প্রমাণিত হয়েছে। যারা শুধু প্রথম রাক'আতে পড়া যথেষ্ট মনে করেন, তাদের পক্ষে এতে দলীল রয়েছে। তবে তা আদৌ পড়তেন না, এর পক্ষেও তা কোন দলীল নয়। নামাযের শুরুতে তা পড়তেন, একথা আলী, আমর ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর থেকে বর্ণিত হয়েছে। তা সাহাবীদের মতের বিপরীত নয়। তাতে ফরয ও নফল উভয় নামাযে তা পড়া প্রমাণিত হল। কেননা রাসূল ও সাহাবীগণ থেকে তা বর্ণিত হয়েছে তাঁদের বৈপরীত্য ছাড়াই। আর ফরয ও নফল-এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, না তা প্রমাণ করণে, না নিষেধকরণে। যেমন সমস্ত সুন্নাত নামাযে তাঁরা ভিন্নমত পোষণ করেন না।

ইমাম আবূ হানীফা (র) প্রথম রাক'আতে তা পড়াকেই যথেষ্ট মনে করতেন, সব রাক'আতে ও সব সূরায় তা পড়ার প্রয়োজন মনে করতেন না। তা থেকে একথা বোঝা যায় না যে, তাঁর মতে তা সূরাসমূহের শুরু কথা নয় যদিও তা দুই সূরার মধ্যে পার্থক্যকারী নিজ স্থানে একটি আয়াত। বরকতের জন্যে তা দিয়ে শুরু করার জন্যে আমরা আদিষ্ট। পরে একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, তা নামাযের শুরুতে পঠনীয়—পূর্বে যেমন বলেছি। সব নামাযের মর্যাদা তো এক ও অভিন্ন। নামাযের সব কাজ তাহ্‌রীমার উপর ভিত্তিশীল। ফলে সমস্ত নামায একটি কাজের ন্যায় অখণ্ড। তাই তার শুরুতে আল্লাহ্‌র নাম লওয়াই যথেষ্ট। তা বারবার পড়ার কোন প্রয়োজন পড়ে না, তা যতই দীর্ঘ হোক-না কেন। যেমন কিতাবের একেবারে শুরুতে তা লেখা হয় একবার মাত্র। রুকূ, সিজদা, তাশাহ্‌হুদ ও নামাযের অন্যান্য সমস্ত রুকন-এ তা নতুন করে পড়া হয় না, সূরা, রাক'আতের শুরুতে তা যেমন পড়া হয়। তা তো দুই সূরার মাঝে পার্থক্য করার উদ্দেশেই পড়া হয়। মুহাম্মাদ ইবনে বকর তা-ই বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, আবূ দাঊদ, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা আমর, সাঈদ ইবনে যুবায়র-ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, বিস্‌মিল্লাহ..... নাযিল হওয়ার পূর্বে দুই সূরার মাঝে পার্থক্যের কথা জানতেন না। এ থেকে জানা গেল যে, দুই সূরার মাঝে পার্থক্য করাই বিস্‌মিল্লাহ্‌র আসল কাজ। তা সূরার অংশ নয়। তাই প্রত্যেক সূরা শুরু করার সময় তা বারবার পড়ার প্রয়োজন নেই।

কেউ যদি বলেন, বিসমিল্লাহ্‌.....র কাজ যখন দুই সূরার মাঝে পার্থক্য করা, তখন তা পড়ে দুই সূরার মাঝে পার্থক্য করাই তো বাঞ্ছনীয়। তাহলে তাঁকে বলা হবে, তা ওয়াজিব নয়। কেননা তা নাযিল হওয়ার দ্বারাই তো এই পার্থক্য বোঝা গেল। এখন বরকতের জন্যে তা শুরুতে পড়ার দরকার মাত্র। আর নামাযের শুরুতে তা পড়া হয়েছে। দ্বিতীয় রাক'আত কালে নামায তো নতুন করে শুরু করা হচ্ছে না, যেজন্যে তা আবার পড়ার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। এজন্যে শুরুতে একবার পড়াই যথেষ্ট হবে। তা প্রত্যেক রাক্'আতে পড়ার একটি কারণই হতে পারে। তা হল—বলা হয়েছে, প্রত্যেক রাক'আতেই কিরা'আত রয়েছে, যা তাতে শুরু করা হয়, তা তার পূর্বের রাক্'আতের কিরা'আতের স্থলাভিষিক্ত নয়। এ কারণে তা নতুন করে পড়া দরকার, যেমন প্রথম রাক'আতে তা পড়া হয়েছে। প্রথম রাক'আতে তা পড়া মস্‌নুন যেমন, দ্বিতীয় রাক'আতেও তেমনি করতে হবে। কেননা তখনও তো নতুন করে কির'আত শুরু করতে হয়। তবে প্রত্যেক সূরা পড়ায় তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয় না, কেননা তা একই ফরয নামায। আর সূরার ব্যাপার এক রাক'আত তার পূর্ববর্তী রাক্‌আতের মতই। কেননা তা এমন কাজের ধারাবাহিকতা যা আগেই শুরু করা হয়েছে, ধারাবাহিক কাজের অবস্থা শুরুর মতই। যেমন রুকূ—যদি তা দীর্ঘ করা হয়, সিজদাও তেমনি। সমস্ত নামাযই একই কাজের ধারাবাহিকতা মাত্র। কাজেই তার দাবি শুরুর দাবি। শুরু করা যেমন ফরয, পরবর্তী কাজও তাই হবে। প্রত্যেক সূরায় তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন যাঁরা মনে করেন, তাঁরা দু'ভাগে রয়েছেন। এক ভাগের মনীষীরা বিসমিল্লাহকে সূরার অংশ মনে করেন না। অন্য ভাগের লোকেরা তাকে সূরাসমূহের প্রথমে উল্লিখিত মনে করেন। যাঁরা তাকে সূরাসমূহের প্রথমে উল্লিখিত মনে করেন, তাঁরা বিসমিল্লাহ...... কে পুনরাবৃত্তি করা জরুরী মনে করেন, যেমন সূরার সমস্ত আয়াত পড়া হয়। যাঁরা তাকে সূরার অংশ মনে করেন না, তাঁরা প্রত্যেকটি সূরাকে নতুনভাবে শুরু করা নামাযবৎ মনে করেন। অতএব তা পড়েই শুরু করতে হবে, যেমন নামাযের শুরুতে করা হয়েছে। কেননা সহীফায় তেমনই তো রয়েছে। যেমন নামাযের বাইরে সূরা পড়া শুরু করা হয় বিস্‌মিল্লাহ........ পড়ে, তেমন অপর কোন সূরা পড়ার সময়ও করতে হয়। আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

'আমার উপর কিছু সময় পূর্বে একটি সূরা নাযিল হয়েছে,' এই বলে পড়তে শুরু করে পড়লেন 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।' তার পরই পড়লেন ঃ ইন্না আ'তাইনা কাল কাওসার .....। পড়ে সূরাটি শেষ করলেন।

আবূ বুরদাতা তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন—নবী করীম (স) পড়লেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الرٰ تِلْكَ اٰيَاتُ الْكِتَابَ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (স) নামাযের বাইরে এই বিসমিল্লাহ্ ...পড়েই কুরআন পাঠ শুরু করতেন। নামাযেও এই নীতি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয় হবে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে দীনার ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি সূরা ফাতিহা বিস্‌মিল্লাহ ...... পড়েই পড়া শুরু করতেন। অন্যান্য সূরাও সে ভাবেই পড়তেন। জরীর মুগীরা থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ ইবরাহীম নামাযে আমাদের ইমামত করলেন। মাগরিবে তিনি আলামতারা কাইফা ফা'আলা রাব্বুকা .....পড়লেন। সে সূরাটি শেষ করে তার সাথে মিলিয়ে লি-ই-লাফি .... সূরা পড়লেন। দুটি সূরার মাঝে বিসমিল্লাহ ... পড়ে পার্থক্য রচনা করলেন না।

## উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ্ পাঠ

বিসমিল্লাহ্ উচ্চস্বরে পড়ার ব্যাপারে হানাফী ফিক্‌হবিদগণ এবং সওরী বলেছেন, তা অনুচ্চস্বরে পড়বে। ইবনে আবূ লাইলা বলেছেন, ইচ্ছা হয় উচ্চস্বরে পড়বে, ইচ্ছা হয় অনুচ্চস্বরে। ইমাম শাফিয়ী বলেছেন, উচ্চস্বরে পড়বে। এই মতপার্থক্য ইমামের পশ্চাতে জামা'আতে নামায পড়ার ক্ষেত্রে। জামা'আতে উচ্চস্বরে কুরআন পড়ার নামাযে এরূপ করবে।

সাহাবা থেকে বর্ণিত, এ ব্যাপারে বড় মতপার্থক্য রয়েছে। উমর ইবনে যুর তাঁর পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি ইবনে উমর (রা)-এর পেছনে নামায পড়েছি। তিনি বিস্‌মিল্লাহ উচ্চস্বরে পড়তেন। হাম্মাদ ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, উমর (রা) বিস্‌মিল্লাহ চুপে চুপে পড়তেন। পরে সূরা ফাতিহা উচ্চস্বরে পড়তেন। আনাস (রা) তাঁর থেকে এইরূপ কথাই বর্ণনা করেছেন। ইবরাহীম বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং তাঁর সঙ্গিগণ বিসমিল্লাহ গোপনে পড়তেন, উচ্চস্বরে পড়তেন না। আনাস বর্ণনা করেছেন, আবূ বকর ও উমর (রা) বিসমিল্লাহ গোপনে পড়তেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্‌ফলও তাঁর নিকট থেকে এরূপই বর্ণনা করেছেন। মুগীরা ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, ইমাম বিস্‌মিল্লাহ্ উচ্চস্বরে পড়ে নামায শুরু করলে তা হবে বিদ'আত। জরীর আসিমুল-আহ্ ওয়াল থেকে বর্ণনা করেছেন, নামাযে বিস্‌মিল্লাহ্.... উচ্চস্বরে পড়া সম্পর্কে ইকরামার নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন, আমি এখানে একজন এ'রাবী মাত্র। আবূ ইউসূফ আবূ হানীফা থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, ইবনে মাসউদের এ কথাটি আমার নিকট পৌঁছেছে যে, নামাযে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ্....... পড়া আরবীয় ধরন। হাম্মাদ ইবনে যায়দ কাসীর থেকে বর্ণনা করেছেন, হাসানকে নামাযে উচ্চস্বরে বিস্‌মিল্লাহ পড়া বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, এক কাজ এ'রাবীরা করে। ইবনে আব্বাস থেকে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া গেছে। আসেম সাঈদ ইবনে যুবায়র সূত্রে শরীক বর্ণনা করেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বিসমিল্লাহ্ উচ্চস্বরে পড়েছেন। এটা হয়ত নামাযের বাইরের ব্যাপার হবে। আবদুল মালিক ইবনে আবূ হুসায়ন-ইকরামা-ইবনে আব্বাস সূত্রে বিস্‌মিল্লাহ ........উচ্চস্বরে পড়া পর্যায়ে বর্ণনা করেছেন, এটা আরবদের কাজ। হযরত আলী সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি সেটিকে একটি আয়াত গণ্য করেছেন। তিনি বলেছেন, এটা ধরে সূরা ফাতিহা সাত

আয়াতে সম্পূর্ণ। নামাযে তা উচ্চস্বরে তিনি পড়তেন, এমন কথা প্রমাণিত নয়। আবূ বকর ইবনে আইয়্যাশ আবূ সাইদ আবূ ওয়ায়েল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমর ও আলী (রা) বিসমিল্লাহ্‌ ও আউযু উচ্চস্বরে পড়েতন না। আমীন-ও জোরে বলতেন না। ইবনে উমর নামাযে তা উচ্চস্বরে পড়তেন বলে বর্ণিত হয়েছে। যেমন পূর্বে বলেছি, আসলে এ বিষয় সাহাবীগণের মতপার্থক্য রয়েছে। আনাস ও আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফল বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স), আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা) গোপনে পড়তেন, কোন কোন নামাযে অনুচ্চস্বরে পড়তেন। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফল এরূপ কাজকে বিদ'আত বলেছেন। আবূল জাওজা হযরত আয়েশা (রা)-এর এই কথাটি বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলে করীম (স) তাকবীর ও আল-হাম্‌দু পড়ে নামায শুরু করতেন এবং সালাম ফেরানো দ্বারা তা শেষ করতেন। আবূল হাসান উবায়দুল্লাহ ইবনুল হুসায়ন আল-কারখী (রা) বলেছেন ঃ হাযরামী মুহাম্মাদ ইবনুল-উলা-মুআবিয়া ইবনে হিশাম-মুহাম্মাদ ইবনে জাবির-হাম্মাদ-ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলে করীম (স) ফরয নামাযে বিসমিল্লাহ্‌ উচ্চস্বরে পড়েন নি। আবূ বকর উমরও নয়।

কেউ যদি বলেন, তোমার মতে তো তা নিজ স্থানে একটি আয়াত বিশেষ, তা হলে তা উচ্চস্বরে পড়াই ওয়াজিব হবে, নামাযে উচ্চস্বরে কিরা'আত পড়ার মত। বিশেষ করে যে নামাযে কুরআন উচ্চস্বরে পড়া হয়। কোন কোন নামাযের কোন রাক'আত তো উচ্চস্বরে কির'আত না পড়াই মৌলনীতি। আবার কোন কির'আত উচ্চস্বরে পড়াই নিয়ম।

জবাবে বলা হবে, তা সূরা ফাতিহার অংশ নয়, শুধু তা পড়ে শুরু করতে হয় বরকতের জন্যে, তখন তা উচ্চস্বরে না পড়াই শ্রেয়। লক্ষণীয়, ইন্নি ওয়াজ্জাহ্‌তু .... কুরআনের আয়াত হওয়া সত্ত্বেও এবং তা পড়ে নামায শুরু করতে হয়, তা সত্ত্বেও তা সব সময়ই অনুচ্চস্বরে পড়তে হয়, উচ্চস্বরে নয়। এখানেও সেই রূপ করা সমীচীন।

আবূ বকর (রা) বলেছেন, রাসূলে করীম (স) বিসমিল্লাহ না শুনিয়ে পড়তেন বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাতে প্রমাণিত হয় যে, তা সূরা ফাতিহার অংশ নয়। যদি অংশ হতো, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই তা উচ্চস্বরে পড়তেন অন্যান্য আয়াতের মতই। নয়ীম আল মুজবার বলেছেন, আমি আবূ হুরায়রার পেছনে নামায পড়েছি, তিনি নামাযে বিসমিল্লাহ .... পড়লেন। সালাম ফিরিয়ে বললেন ঃ আমি ঠিক রাসূলের মতই নামায পড়লাম। ইবনে জুরাইজ ইবনে আবূ মুলাইকা-উম্মে সালমা (রা) সূত্রে বির্ণত হয়েছে, নবী করীম (স) নিজের ঘরে নামায পড়েছিলেন, তাতে বিস্‌মিল্লাহ.... আলহামদু .... পড়তেন। জারির আল-জাফী-আবূত-তোফাইল-আলী ও আম্মার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে নবী করীম (স) বিসমিল্লাহ্‌ জোরে পড়তেন।

এর জবাবে বলা হবে, নয়ীম আল-মুজমার-আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণিত হাদীসে বিস্‌মিল্লাহ্‌.... উচ্চস্বরে পড়ার কোন প্রমাণ নেই। তাতে বলা হয়েছে, তিনি পড়েছেন; কিন্তু উচ্চস্বরে পড়েছেন, তা তো বলা হয়নি। হতে পারে, তিনি উচ্চস্বরে পড়েন নি।

পড়েছেন, তা তো বর্ণনাকারীর জানা-ই আছে। হযরত আবূ হুরায়রার সে বিষয় খবর মাধ্যমে, অথবা তিনি ইমামের খুব নিকটে দাঁড়িয়েছিলেন বলেই তা শুনতে পেয়েছিলেন। উচ্চস্বরে না পড়লে তা শুনা অসম্ভব নয়, এরূপ বর্ণনা রয়েছে যে, নবী করীম (স) যোহর ও আসর-এর নামাযে যে 'কির'আত' পড়তেন তা অনেক সময় আমরা শুনতে পেতাম। কিন্তু তা যে তিনি উচ্চস্বরে পড়েন নি, সে বিষয়ে কোন মতভেদই নেই। আবদুল ওয়াহিদ ইবনে জিয়াদ-আমরাতা ইবনুল কা'কা-আবূ জুরয়া ইবনে আমর ইবনে জরীর—আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলে করীম (স) যখন দ্বিতীয় রাক'আতের জন্যে উঠতেন, তখন আল-হামদু...দিয়ে শুরু করতেন, থামতেন না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি বিস্‌মিল্লাহ....কে সূরা ফাতিহার অংশ মনে করেন না। আর তা হয়ে থাকলে তা উচ্চস্বরে পড়ার প্রশ্ন উঠে না। যা তার অংশ নয়, তা জোরে না পড়াই তো স্বাভাবিক, তবে উম্মে সালমার হাদীস.......লাইস আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদ ইবনে আবূ মুলাইকা থেকে বর্ণিত, মা'লী উম্মে সালমাকে রাসূলে করীমের 'কির'আত' পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তার বর্ণনা বিস্তারিতভাবে ও অক্ষরে অক্ষরে বলেন। এ বর্ণনায় রাসূলের 'কির'আত' পাঠের নিয়ম পদ্ধতিই বলা হয়েছে; কিন্তু তা নামাযে পড়ার উল্লেখ নয়, তা জোরে বা গোপনে পড়ারও কথা নয়। আর তিনি তা বহুবারই পড়ে থাকবেন, তা আর বিচিত্র কি ?

অনুরূপভাবে আমরাও বলব, কিন্তু তা উচ্চস্বরে পড়া হবে না। হতে পারে নবী করীম (স) তাঁর কির'আত-এর বিবরণ দিয়েছেন, উম্মে সালমা তা-ই শুনিয়াছেন। হতে পারে, তিনি তাঁকে পড়তে শুনেছেন অনুচ্চস্বরে, তা তিনি শুনতে পেয়েছিলেন নিকটে থাকার সুযোগে। এ থেকে এ-ও বোঝা যায়, তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স) তাঁর ঘরে এভাবে নামায পড়তেন, তা ফরয নামায ছিল না। কেননা তিনি ফরয নামায কখনই একাকী পড়তেন না। জাম'আতের সাথে পড়তেন। আর আমাদের মতে এককভাবে নফল নামায গোপনে বা উচ্চস্বরে যেভাবেই ইচ্ছা পড়তে পারে। আবূত তোফাইল থেকে জাবির বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে কথা হচ্ছে, তাঁর সম্পর্কে যেসব বিবরণ পাওয়া গেছে, তাতে তার বর্ণিত হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। ..........তিনি বহু বর্ণনায় মিথ্যা বলেছেন, পূর্ববর্তী মুহাদ্দিস ইমামগণ তাকে মিথ্যাবাদী বলে চিহ্নিত করেছেন। আবূ ওয়ায়েল আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তা উচ্চস্বরে পড়তেন না। যদি জোরে পড়া তাঁর নিকট প্রমাণিত হতো তাহলে তিনি তার বিরোধিতা কখনই করতেন না। জোরে বা অনুচ্চস্বরে পড়া সংক্রান্ত বর্ণনা যদি সমান সমানও হতো নবী করীম (স) থেকে, তাহলেও অস্পষ্টভাবে পড়াই উত্তম। তার দুটি কারণ। আগের লোকদের অস্পষ্টভাবে পড়ার কথা প্রকাশমান, জোরে পড়া নয়। আবূ বকর, উমর, আলী, ইবনে মাসঊদ, ইবনুল মুগাফ্ফল, আনাস ইবনে মালিক—সকলেই অস্পষ্ট স্বরে পড়তেন। তা জোরে পড়া পর্যায়ে ইবরাহীমের কথা বিদআত। কেননা নিয়ম হচ্ছে, একই বিষয়ে রাসূলের দুটি পরস্পর

বিপরীত বর্ণনা প্রমাণিত হলে আগের কালের মহান ব্যক্তিদের আমল থেকে যা সমর্থিত হবে, তা-ই অধিকভাবে গ্রহণযোগ্য হবে। আর দ্বিতীয় কারণ, জোরে পড়া যদি প্রমাণিত হয়, তা রদ করে মুতাওয়াতির হাদীস বর্ণিত পাওয়া যায়—যেমন অন্যান্য সব কির'আত পর্যায়ে পাওয়া যায়, তাহলে মুতাওয়াতির বর্ণনা না পাওয়ার দরুনই বুঝতে হবে যে, তা প্রমাণিত নয়। কেননা তা জোরে পড়া মস্‌নুন এই কথা জানার প্রয়োজন। সূরা ফাতিহা জোরে পড়া মস্‌নুন হওয়ার কথা তো সেই ভাবেই জানা গেছে।

আবূল আব্বাস মুহাম্মাদ ইবনে ইয়া'কুব আল-আসম-রবী ইবনে সুলায়মান শাফিয়ী ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে উসমান ইবনে হাস্তম-ইসমাঈল ইবনে উবাইদ ইবনে রাফায়াতা তার পিতার সূত্রে পাওয়া বর্ণনা হচ্ছে মুআবিয়া মদীনায় এলেন ও তাদের নিয়ে নামায পড়লেন, কিন্তু বিসমিল্লাহ....পড়লেন না, যখন রুকূতে গেলেন ও রুকূ থেকে উঠলেন, তখন তাকবীরও বললেন না, তখন নামায ফেরানোর পর মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ বলে উঠলেন ঃ

হে মুআবিয়া, তুমি তো নামায চুরি করেছ। কোথায় তোমার বিসমিল্লাহ্........রুকূতে যাওয়া ও উঠার সময় কোথায় তোমার তাকবীর ?

অতপর তিনি তাদের নিয়ে পুনরায় নামায পড়াতে বাধ্য হন। এখানে যে ত্রুটি সাহাবীগণ ধরলেন, তা হচ্ছে জোরে না বলা। তাহলে বোঝা গেল, বিসমিল্লাহ্....জোরে না পড়া নামাযে বিশেষ ত্রুটি।

এর জবাব হচ্ছে, আসলেও যদি তা-ই হতো, তাহলে তা আবূ বকর, উমর, উসমান, আলী, ইবনে মাসউদ, ইবনুল মুগাফফল, ইবনে আব্বাস এবং অন্যান্যরা বিসমিল্লাহ্ চুপচাপ পড়েছেন, জোরে পড়েন নি—এরা সকলেই তা জানতেন। কেননা রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلَامِ وَالنُّهٰى –

বুদ্ধিমান-বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিরাই যেন আমার নিকটে থাকে।

উপরোক্ত ব্যক্তিগণই তো রাসূলের অতীব নিকটবর্তী লোক ছিলেন। নামাযেও তাঁরাই অন্যদের অপেক্ষা বেশি নিকটে অবস্থান নিতেন। তাঁদের বাদ দিয়ে অন্য যাঁদের উল্লেখ করা হয়েছে, তারা তো অপরিচিত। আর বর্ণনাটিও পূর্ণ মাত্রায় উত্তীর্ণ নয়। কেননা তা যে মুহাজির ও আনসারগণ বর্ণনা করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা তো একক ব্যক্তি, একক সূত্রে বর্ণনা। তা ছাড়া তাতে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ.... পড়ার কথাও বলা হয়নি। তাতে বলা হয়েছে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়েন নি। আমরাও তা না পড়ার কথা বলি না, তা জোরে পড়া হবে কি অনুচ্চস্বরে .... এর মধ্যে কোন্‌টা উত্তম, তাই নিয়েই তো আমাদের আলোচনা।

## বিসমিল্লাহ্ পর্যায়ে শরীয়াতের হুকুম

বিস্মিল্লাহ্ .... পড়ে সব কাজ শুরু করাই শরীয়াতের হুকুম। তা বরকতের জন্যে, আল্লাহ্র বড়ত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে, যবেহ করাকালে তা বলা দ্বীন-ইসলামের বিশেষত্ব ও মর্যাদাসম্পন্ন নিয়ম, তা বলে শয়তান তাড়ানো হয়। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ খাওয়ার সময় বান্দা যদি আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে, তাহলে শয়তান তার সাথে খেতে বসতে পারে না, তাঁর নাম উচ্চারণ না করা হলে শয়তান অবশ্যই খাওয়ায় শরীক হবে। মুশরিকরা তাদের কাজ কর্ম শুরু করে তাদের দেবদেবী মূর্তির নামে, যাদের ওরা পূজা করে। ওদের বিরোধিতা করা হবে যদি আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে কাজ শুরু করা হয়, তা ভীতকে সাহসী বানায়, তা উচ্চারণ করলে বান্দা একান্তভাবে আল্লাহমুখী হয়ে যেতে পারে। তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে, শ্রোতা তাঁর সাথে ঘনিষ্টতা পায়, এতে আল্লাহ্কে স্বীকার করা হয়। তার নিয়ামতের স্বীকৃতি হয়, তাঁর নিকট পানা চাওয়া হয়। এতে আল্লাহ্র দুটি বিশেষ নাম রয়েছে ঃ রহমান, রহীম। আল্লাহ ছাড়া এ নাম কারোর হতে পারে না।

## নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ

আমাদের ফিকাহবিদগণ সকলেই একমত হয়ে বলেছেন, সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে আর একটি সূরা বা আয়াত প্রথম দুই রাক'আতেই পড়তে হবে। সূরা ফাতিহা পড়া না হলে বা তার পরিবর্তে অন্য কিছু পড়া হলে খুবই খারাপ হবে। তবে তার নামায হয়ে যাবে। মালিক ইবনে আনাস বলেছেন, প্রথম দুই রাক্'আতে সূরা ফাতিহা না পড়া হলে নামায আবার পড়তে হবে। ইমাম শাফিয়ী বলেছেন, যে কম-সে-কম পরিমাণ পড়লে নামায হয়ে যায়, তা হল সূরা ফাতিহা। তার একটি অক্ষরও বাদ দিলে —না পড়লে ও নামায শেষ করে ফেললে সে নামায আবার পড়তে হবে।

আবূ বকর বলেছেন, আ'মাশ খায়সামাতা-উবাদ ইবনে রব্যী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর (রা) বলেছেন, যে নামাযে সূরা ফাতিহা ও দুই আয়াত বা তারও বেশী পড়া হবে না, সে নামায হবে না। ইবনে আলীয়াতা-জরীরী ইবনে বুরায়দা সূত্রে ইমরান ইবনে হুসায়ন থেকে বর্ণিত হয়েছে। বলেছেন, যে নামাযে সূরা ফাতিহা ও দুই আয়াত বা তার বেশি পড়া হয়নি সে নামায হয়নি। মুআম্মার আইয়ুব আবূল আলীয়া সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, প্রত্যেক রাক্'আতের 'কির'আত' সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, কম-বেশী যাই হোক পড়। কুরআনের কম বলতে কোন জিনিস নেই। হাসান-ইবরাহীম-শা'বী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যে লোক সূরা ফাতিহা পড়া ভুলে গেছে, তাকে বাদ দিয়ে অন্য কিছু পড়েছে, তার নামায ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, তা হয়ে যাবে। অকী'-জরীর ইবনে হাজিম-ওয়ালদি ইবনে ইয়াহ্ইয়া সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, একদা জাবির ইবনে যায়দ নামায পড়তে দাঁড়িয়ে مُدْهَامَّتَانِ পড়ে রুকূতে গেলেন।

আবূ বকর বলেছেন, উমর ও ইমরান ইবনে হুসায়ন থেকে সূরা ফাতিহা ও আরও দুই আয়াত না পড়লে নামায হবে না বলে যা বর্ণিত হয়েছে, তার অর্থ নামাযের পূর্ণাঙ্গ না হওয়া। নামায একেবারেই হবে না, সে অর্থ নয়। কেননা শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়লেও নামায হয়ে যাবে; এ বিষয়ে ফিকাহবিদ্‌দের মধ্যে কোন মতপার্থক্যই নেই। সূরা ফাতিহা না পড়লেও নামায হয়ে যাওয়া সংক্রান্ত দলীল ঃ

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ –

সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত আচ্ছন্ন হওয়া পর্যন্ত নামায কায়েম কর এবং ফজরের কুরআন পড়ার স্থায়ী রীতি অবলম্বন কর।

আয়াতটির পক্ষে অসুবিধাজনক হলেও তা যথার্থ। তার অর্থ ফজরের নামাযে কুরআন পড়া। কেননা ফজরের নামাযের সময় কির'আত পাঠ ফরয না হওয়ার ব্যাপারে মুসলমানদের ঐকমত্য রয়েছে। তবে মূল নামাযে কুরআন পাঠ ফরয। এখানকার আদেশই ফরয প্রমাণ করে। মুস্তাহাব হওয়ার কোন দলীল নেই। অতএব বাহ্যিকভাবে যতটুকুই কুরআন পড়া হোক, তাতেই নামায আদায় হয়ে যাবে। কেননা তাতে কোন কিছু থেকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি।

কুরআনের আয়াত ঃ فَاقْرَءُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ 'কুরআন থেকে সহজেই যা সম্ভব পড়।' এই পড়ার আদেশ নামাযে কুরআন পড়া বোঝায়।

উক্ত আয়াতের পূর্ববর্তী কথাসমূহই তার প্রমাণ। আয়াতটির শুরু হচ্ছে ঃ

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَىِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ ....

তোমার রব্ব জানেন, তুমি রাতের দুই-তৃতীয়াংশ সময়, তার অর্ধেক এবং তার এক-তৃতীয়াংশ সময় তুমি নামাযে দাঁড়াও ........

মুসলিম উম্মত এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, এ আয়াতে রাত্রিকালীন নামাযের কথা বলা হয়েছে। আর 'কুআনের যতটুকু বা যা-ই পড়া সহজ, তাই পড়' এই আদেশ রাত্রিকালীন নফল নামায এবং অন্য সব ফরয নামাযের ক্ষেত্রে সাধারণভাবেই প্রযোজ্য। এ আয়াতে যে ফরয নফল সব নামাযই শামিল, তার প্রমাণ একটি হাদীস। হাদীসটি আবূ হুরায়রা ও রিফায়া ইবনে রাফে' বর্ণিত। নবী করীম (স) একজন এ'রাবীকে নামায পড়ার নিয়ম পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছিলেন। কেননা সে সুন্দরভাবে নামায পড়তে পারছিল না। রাসূল (স) তাকে বললেন ঃ 'অতপর তোমার পক্ষে কুরআনের যা পড়া সম্ভব ও সহজ, তা-ই পড়।' রাসূলের এ কথাটি কুরআনেরই ভিত্তিতে বলা। কেননা একথা সর্ববাদীসম্মত যে, নবী করীম (স)-এর কোন আদেশ কুরআনে উল্লিখিত কোন হুকুমের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয় তাহলে বলতেই হবে, তিনি এই হুকুম কুরআন থেকেই দিয়েছেন। যেমন তিনি চোরের হাত কাটা ও ব্যভিচারীকে দোররা মারা ইত্যাদির আদেশ

কুরআনের ভিত্তিতেই দিয়েছেন। কুরআন পড়া সম্পর্কিত উপরোক্ত আয়াতে ফরযকে বা দিয়ে শুধু নফল নামাযের জন্যেই আদেশ আসেনি। অতএব বুঝতেই হবে যে, উক্ত আদেশ সকল নামাযেই পালনীয়। আর এই আদেশের দৃষ্টিতে সূরা ফাতিহা না পড়লেও নামায হয়ে যাওয়ার কথা প্রমাণিত হয়। দুটি দিক দিয়ে কথা বিবেচ্য ঃ একটি হল, হাদীসটি থেকে বোঝা যায়, আয়াতটি সব নামাযেই প্রযোজ্য। দ্বিতীয়, সূরা ফাতিহা ছাড়াও যে নামায হয়, তা স্বতন্ত্রভাবে তা থেকে প্রমাণিত হয়। কেননা নামায হিসেবে ফরয ও নফলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। 'কির'আত' পাঠও উভয়ের মধ্যেই জরুরী। আর যা নফল নামাযে জায়েয, ফরয নামাযেও তা জায়েয। দুই নামযের রুকূ-সিজদার মধ্যেও কোনরূপ পার্থক্য নেই। সব নামাযের 'রুকন' এক ও অভিন্ন।

কেউ বলতে পারেন, তোমার মতে নফল ও ফরয নামাযের মধ্যে পার্থক্য আছে। কেননা তোমার নিকটে ফরয নামাযের শেষ দুই রাক'আত কির'আত ফরয নয়। অথচ নফল নামাযে তা ওয়াজিব।

এর জবাবে বলা যাবে, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফরয নামাযের তুলনায় নফল নামাযে কুরআন পাঠের হুকুম অধিক তাগিদপূর্ণ। সূরা ফাহিতা না পড়লেও নফল নামায হয়ে যায় যখন, তখন ফরয নামায অবশ্যই হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, এ দু'নামাযের মধ্যে কেউই পার্থক্য করেন নি। দু'এর কোন একটি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয মনে করলে অপর নামযেও তা ফরয মনে করতে হবে। আর একটিতে তা অ-ফরয ধরলে অপরটিতেও তাই ধরতে হবে। একথা যখন প্রমাণিত হল যে, আমাদের মতে আয়াতের বাহ্যিক দিক দিয়ে সূরা ফাতিহা ছাড়াও নফল নামায জায়েয, তখন ফরয নামাযেও তাই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যদি প্রশ্ন করা হয়, সূরা ফাতিহা ছাড়াও নামায হয় একথা আয়াত থেকে কি করে প্রমাণিত হল ? জবাবে বলতে হবে, 'কুআনের যা সহজ ও সম্ভব, তা-ই পড়' এই আয়াত থেকে পূর্ণ ইখতিয়ার প্রমাণিত হয়। এ যেন বলা হয়েছে, 'পড় যা-ই তুমি ইচ্ছা কর।' কেউ যদি কাউকে বলে ঃ আর এ দাসটিকে তুমি যে-কোন মূল্যে বিক্রয় করে দাও, তা হলে এ-ই বোঝা যাবে যে, যে-কোন মূল্যে দাসটি বিক্রয় করার ইখতিয়ার রয়েছে। অনুরূপভাবে আয়াতটি যখন নামাযীকে কুরআনের যে-কোন অংশ পড়ার ইখতিয়ার দিচ্ছে, তখন তা অগ্রাহ্য করা আমাদের জন্যে জায়েয হতে পারেনা। আমরা কোন একটি অংশকে নির্দিষ্ট করে দিতে পারি না। বলতে পারি না যে, সূরা ফাতিহাই পড়তে হবে। তা বললে আয়াতে দেয়া ইখতিয়ারকে মনসূখ করে দেয়া হবে।

প্রশ্ন হতে পারে, কুরআনের আয়াত ঃ

فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

যে-কোন জন্তু কুরবানী করা সহজ হবে.... তাই কর।

এতেও ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে ইখতিয়ারকে উট, গরু ও ছাগলের মধ্যে সীমিত করে দেয়া হয়েছে। অথচ ব্যবহৃত শব্দ هدى গরু, উট ও ছাগল ছাড়া অন্যান্য জন্তুও বোঝায়। এ করার কারণে ইখতিয়ার মনসূখ করা হয়েছে বলে তো মনে করা হয় না ?

জবাবে বলা যাবে, উক্ত তিন প্রকারের জন্তুর যে-কোন একটি দেয়ার ইখতিয়ার তো রয়েছে। ফলে ইখতিয়ারের সুযোগ এখানে নষ্ট হয় নি, মনসূখ করা হয়েছে বলেও মনে করার কারণ ঘটেনি। বহু কতগুলোর মধ্য থেকে তিনটির মধ্যে সে ইখতিয়ার বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, কোন আয়াত পাঠের পক্ষে যদি সাহাবীদের কোন কথা বা কাজ পাওয়া যায়, যা এক আয়াতের কম নয়, তাহলে তাতেও মূল হুকুম মনসূখ হওয়ার কারণ ঘটে না। কেননা তখনও কুরআনের যে-কোন আয়াত পড়ার ইখতিয়ার পুরাপুরিভাবে অবশিষ্ট থাকে।

একজন মনীষী বলেছেন, 'কুরআনের যা-ই পড়া তোমার পক্ষে সহজ হবে তা-ই পড়' এই আদেশ সূরা ফাতিহা বাদে কুরআনের অপরাপর অংশ পর্যায়ে গ্রহণীয়। তাহলে তাতে কোন কিছু মনসূখ হওয়ার প্রশ্ন দেখা দেবে না।

কিন্তু এ গ্রন্থকারের মতে তা জায়েয হতে পারে না। তার কয়েকটি কারণ রয়েছে। একটি এই যে, উক্ত আয়াতে কুরআন পাঠের যে আদেশ দেয়া হয়েছে, তা নামাযে পড়ার জন্যে কাজেই তা বাদ দিলে ইবাদতই হতে পারে না। তা নামাযের রুকন। এ রুকন আদায় না হলে নামাযই সহীহ্ হবে না।

দ্বিতীয়, নামাযে যা-ই পড়া হবে, তার সমস্তটাতেই এই ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। কাজেই তার কিছুকে বাদ দিয়ে অপর কিছুকে নির্দিষ্ট করা জায়েয হতে পারে না। তৃতীয় فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ 'পড় যা-ই সহজ....' একটি আদেশ। তা অবশ্যই পালনীয়। কাজেই তাকে মুস্তাহাব বলা জায়েয হতে পারে না। পড়া ফরযই মনে করতে হবে। এখানে যা বলেছি তা একটি হাদীসের ভিত্তিতে বলা হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, মুমাল ইবনে ইসমাঈল, হাম্মাদ, ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবূ তালহা—আলী ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে খাল্লাদ সূত্রে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, এই হাদীসের বক্তব্য হল এক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে নামায পড়ল। পরে রাসূলের নিকট এসে তাঁকে সালাম জানালো। রাসূলে করীম (স) তার জবাব দিয়ে বললেন ঃ তুমি ফিরে গিয়ে আবার নামায পড়। কেননা তোমার নামায পড়া হয়নি। লোকটি ফিরে গিয়ে নামায পড়ল পূর্বের মতই। পরে আবার রাসূলের নিকট এসে সালাম দিল। রাসূলে করীম (স) জবাব দিয়ে বললেন ঃ তুমি আবার গিয়ে নামায পড়। কেননা তোমার নামায পড়া হয়নি। এভাবে লোকটি তিন তিন বার উঠে গিয়ে নামায পড়ল। শেষে রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ

لَاتَتِمُّ صَلَاةُ اَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ حَتّٰى يَتَوَضَّا فَيَضَعُ الْوُضُوْءَ مَوَاضِعَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ اللّٰهَ تَعَالٰى وَيُثْنِىْ عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ بِمَا شَاءَ مِنَ الْقُرْاٰنِ، ثُمَّ يَقُوْلُ : اللّٰهُ اَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ حَتّٰى يَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ......

একজন লোকের নামায তখন সম্পূর্ণতা ও পূর্ণাঙ্গতা লাভ করতে পারে, যদি সে অযূ করে, ঠিক ঠিক ভাবে প্রত্যেকটি অঙ্গ ধৌত করে, পরে সে তাকবীর বলে আল্লাহ্‌র হামদ ও সানা করে, কুরআন থেকে ইচ্ছামত কিছু পড়ে, পরে আল্লাহু আকবর বলে রুকূ করে ও তাতে তার সমস্ত জোড়া স্থিত হয়ে বসে ....

মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, মুহাম্মাদ ইবনুল মসান্না, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ, আবদুল্লাহ, সাইদ ইবনে আবূ সাঈদ তাঁর পিতা সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে নামায পড়লো। পরে এসে সালাম করল ।...... এই সূত্রের বর্ণনা পূর্ববর্তীটির মতই। রাসূলের কথাটি তাতে এ ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اَقْرَأْ مَاتَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ، ثُمَّ ارْكَعْ –

তুমি যখন নামাযে দাঁড়াবে, তখন তাকবীর দেবে। পরে কুরআনের যা পড়া তোমার পক্ষে সম্ভব পড়বে। অতপর রুকূ দেবে ....

আবূ বকর বলেছেন, প্রথমোক্ত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ 'অতপর যা তুমি চাও'। আর দ্বিতীয় হাদীসের কথা ঃ 'যা সহজ সম্ভব'। দু'টিতেই নামাযীকে যা ইচ্ছা পড়ার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। সূরা ফাতিহা পাঠ যদি ফরয হতো তা হলে তার বিশেষভাবে অবশ্যই শিক্ষা দিতেন। কেননা লোকটি যে নামায কিভাবে পড়তে হয় তা জানে না, একথা তো জানাই আছে। অজ্ঞ-মূর্খ ব্যক্তিকে তো অসম্পূর্ণ শিক্ষা দেয়া জায়েয হতে পারে না। তাকে কতক ফরয জানানো হবে, অপর কতক ফরয জানানো হবে না, তা সমীচীন হতে পারে না। এ থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল যে, সূরা ফাতিহা পড়া ফরয নয়।

আবদুল বাকী ইবনে কাবে, আহমাদ ইবনে আলী আল-জাজার, আমের ইবনে সাইয়ার আবূ শায়বা ইবরাহীম ইবনে উসমান সুফিয়ান আবূ নজরাতা আবূ সাঈদ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَاصَلٰوةَ اِلَّا بِقِرَأَةٍ يَقْرَأُ فِيْهَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ اَوْغَيْرَهَا مِنَ الْقُرْاٰنِ –

এমন কির'আত—যাতে সূরা ফাতিহা কিংবা কুরআনের জন্যে কোন অংশ পড়া না হলে তার নামায হবে না।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাঊদ, ওহাব ইবনে বকীয়া, খালদ, মুহাম্মাদ ইবনে আমর, আলী ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে খাল্লাদ, রিফায়া ইবনে রাফে' সূত্রেও এই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তাতে উদ্ধৃত হয়েছে, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اِذَاقُمْتَ فَتَوَجَّهْتَ اِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَبِمَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ تَقْرَأَ -

তুমি যখন নামাযে দাঁড়াবে তখন কিবলামুখী হবে, পরে তাকবীর বলবে। অতপর সূরা ফাতিহা ও আল্লাহ্ যা পড়া পছন্দ করেন তাই পড়বে ....

এতেও সূরা ফাহিতা ও তাছাড়া অন্য কিছু পড়ার উল্লেখ হয়েছে। এ কথা অন্যান্য হাদীসের বিপরীত নয়। কেননা এর বক্তব্য হল, সূরা ফাতিহা পড়বে যদি তা পড়া সহজ হয়। এতে কোন আয়াত নির্দিষ্টভাবে পড়া ফরয বলা জায়েয হতে পারে না। অন্যথায় দেয়া ইখতিয়ার মনসূখ করা হবে। এ-ও জানা আছে যে, দুটি হাদীসের কোন একটি, অপরটির দ্বারা মনসূখ হয়নি। দুটি হাদীসই তো একই ঘটনার বিষয়ে।

প্রশ্ন হতে পারে, দুটি হাদীসের একটিতে কুরআন পড়া পর্যায়ে ইখ্তিয়ার থাকার কথা রয়েছে, আর অপরটিতে কোন ইখ্তিয়ার ছাড়া-ই সূরা ফাতিহা পড়ার হুকুম রয়েছে, তাতে সূরা ফাতিহা পড়ার পর আর 'যা পড়া হোক বলে আল্লাহ চান' এই কথা বলে ইখ্তিয়ার দেয়া হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সূরা ফাতিহা পড়া-না-পড়ার কোন ইখতিয়ার দেয়া হয় নি, ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে সূরা ফাতিহা পড়ার পর অন্য আয়াত পড়ার ব্যাপারে। কোন হাদীসে সূরা ফাতিহার উল্লেখ না হয়ে থাকলে বুঝতে হবে যে, তা হয়েছে বর্ণনাকারীর ভুলের কারণে। তা ছাড়া এ হাদীসটিতে অতিরিক্ত কথা হিসেবে রয়েছে কোন ইখতিয়ার ছাড়া সূরা ফাতিহা পড়ার কথা।

জবাবে বলা যাবে, যে হাদীসে ইখতিয়ারের কথা আছে তাকে যে হাদীসে সূরা ফাতিহা পড়ার নির্দেশ আছে তার উপর নিরংকুশভাবে প্রয়োগ করা জায়েয হতে পারে না, যেমন দাবি করা হয়েছে। কেননা সম্ভবত দুটিকেই কোনরূপ বিশেষত্ব ছাড়াই ব্যবহার করা হয়েছে। বরং আমাদের বলা উচিত যে, সাধারণভাবে যে ইখতিয়ারের উল্লেখ করা হয়েছে হাদীসে, তার হুকুমটা সেই হাদীসেও প্রয়োগযোগ্য, যাতে বিশেষভাবে সূরা ফাতিহা পড়ার কথা বলা হয়েছে। তাতে ফাতিহা ও অন্য যে-কোন আয়াত পড়ার ব্যাপারে ইখতিয়ারটা ধারণ রূপ পাবে। যেন বলা হয়েছে, ইচ্ছা করলে সূরা ফাতিহা পড়তে পার তার সাথে অন্য কিছু আয়াত মিলিয়ে। তাতে সূরা ফাতিহা পড়ায় যে ইখতিয়ার রয়েছে, তার প্রয়োগ ব্যাপক হবে এবং কোনটি বাদ দিয়ে কোনটি পড়ার ব্যাপারে বিশেষত্ব আরোপ করা হবে না।

এ কথা আর একটি হাদীস থেকেও প্রমাণিত। হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাঊদ, ইবরাহীম ইবনে মূসা, ঈসা, জাফর ইবনে মায়মূল বসরী, আবূ উসমান নহদী সূত্রে আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

أُخْرُجْ فَنَادِفِي الْمَدِيْنَةِ اَنَّهُ لَاصَلَاةَ اِلَّا بِقُرْاٰنٍ، وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَازَادَ –

বের হয়ে মদীনার সর্বত্র ঘোষণা করে দাও যে, কুরআন ছাড়া নামায হবে না। সূরা ফাতিহাও যদি হয়... আর তার বেশী যাই হোক (অবশ্যই পড়তে হবে)।

রাসূলের কথা ঃ 'কুরআন ছাড়া নামায হবে না' থেকে বোঝা যায়, কুরআনের যা-ই পড়া হবে তাতেই নামায হয়ে যাবে। আর 'সূরা ফাতিহাও যদি হয় তার পর যা বেশি হয়' কথাটি থেকে বোঝা যায়, সূরা ফাতিহা না পড়লেও নামায হবে। কেননা কুরআনের কোন অংশ পড়া নির্দিষ্টভাবে ফরয হলে কথাটি এভাবে বলা হতো না, বরং সূরা ফাতিহা পড়ার কথা অকাট্যভাবে বলা হতো। এ পর্যায়ে আরও একটি হাদীস উল্লেখ্য। হাদীসটি ইবনে উয়ায়না উলা ইবনে আবদুর রহমান তাঁর পিতার সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اِنَّمَا صَلَاةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَجٍ –

যে নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া হবে না, তা ত্রুটিপূর্ণ।

মালিক ও ইবনে জুরাইজ আল-উলা থেকে আবূস-সায়েব হিশাম ইবনে জুহরা সূত্রে আবূ হুরায়রা থেকে নবী করীমের উক্ত কথাটি বর্ণনা করেছেন। সনদে এই পার্থক্য হাসীসটিকে দুর্বল করে দেয় নি। কেননা একথা বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর পিতা ও আবূস সায়েব উভয় থেকেই শ্রবণ করেছে। তাতে বলা হয়েছে—নামাযের ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার কথা। তাতে বোঝা যায়, নামায তো হয়ে যায়, যদিও তা হয় ত্রুটিপূর্ণ। কেননা নামায বৈধ না হলে তাতে 'ত্রুটি' হওয়ার কথা বলা হতো না। ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার কথা বলা হলে তাতে নামায বাতিল হয়ে যাওয়ার কথার বিপরীত বলা হয়। কোন জিনিস প্রতিষ্ঠিত না হলে তার ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার প্রশ্ন উঠে না। কোন উট যদি গর্ভবতী না-ই হয়, তাহলে একথা বলা হয় না যে, তা ত্রুটিপূর্ণ বাচ্চা প্রসব করেছে। হ্যাঁ, ত্রুটিপূর্ণ বাচ্চা প্রসব হলেই তবে বলা যাবে যে, ত্রুটিপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে বাচ্চাটি জন্ম গ্রহণ করেছে, অথবা যদি গর্ভের মেয়াদ পূর্ণ না করেই প্রসব করা হয় তাহলেও তা বলা যায়। কিন্তু মূলতই যদি গর্ভবর্তী না হয়ে থাকে তাহলে তার ত্রুটিপূর্ণ বাচ্চা প্রসবের কথা বলা যায় না। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, সূরা ফাতিহা ছাড়াও নামায হয়, যদিও ত্রুটিপূর্ণভাবে। ত্রুটিপূর্ণ হওয়াটা মূলকে অস্বীকার করে না। বরং মূলটা হওয়ার কথাই প্রমাণ করে। তবেই না তার সহীহ হওয়ার কথা বলা যায়।

উবাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনুজ জুবায়র হযরত আয়েশা (রা) সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

كُلُّ صَلَاةٍ لَايَقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِىَ خِدَاجٌ –

যে নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া হয়নি, তা ত্রুটিপূর্ণ।

এ নামায ত্রুটিপূর্ণ অবস্থায়ই হবে। ত্রুটিপূর্ণ হলে মূল নামায হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। নবী করীম (স) থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ

اِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّى الصَّلٰوةَ يُكْتَبُ لَهُ نِصْفُهَا خُمُسُهَا عَشْرُهَا –

ব্যক্তি যেন অবশ্যই নামায পড়ে। তা হলে তার অর্ধেক, পাঁচ ভাগের এক ভাগ, দশ ভাগের এক ভাগ তার জন্যে লিখিত হবে।

এতেও ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার দরুন তার কোন অংশ বাতিল হয়ে যায় নি।

কেউ যদি বলেন, এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে আজলান তাঁর পিতার নিকট থেকে, তিনি হিশামের মুক্ত গোলাম আবুস্ সায়েব থেকে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে রাসূলের করীম (স)-এর এই কথা রয়েছে ঃ

مَنْ صَلَّى صَلَاةً وَلَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا شَيْئًا مِنَ الْقُرْاٰنِ فَهِىَ خِدَاجٌ فَهِىَ خِدَاجٌ فَهِىَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ –

যে লোক নামায পড়ল, কিন্তু তাতে কুরআনের কোন অংশ পড়লো না, তাতে নামায ক্ষতিগ্রস্ত হল, ক্ষতিগ্রস্ত হল, অসম্পূর্ণ থাকল।

এ হাদীসটি মালিক ও ইবনে উয়ায়না বর্ণিত হাদীসের বিপরীত হল, কেননা এ দুজন তাঁদের বর্ণিত হাদীসে সূরা ফাতিহার উল্লেখ করেছেন, অন্য কিছুর নয়। আর নিয়ম অনুযায়ী দুটি হাদীসের একটি অপরটির বিপরীত হলে দুটিই গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। তাতে সূরা ফাতিহা না পড়লে যে নামায অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ হবে সে কথা প্রমাণিত হল না।

এর জবাবে বলা যাবে, মুহাম্মাদ ইবনে আজলানের বর্ণনাকে মালিক ও ইবনে উয়ায়নার বর্ণনার বিপরীত বলা যাবে না। বলতে হবে, ভুল-ভ্রান্তি ও গাফিলতিই ও-দুজনের তুলনায় এর উপর অধিক গ্রাসী হয়েছে। অতএব তা দিয়ে ও-দুজনের বর্ণনার উপর কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না। আর মূলতও এ দুটির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা হতে পারে—নবী করীম (স) সব কথাই বলেছেন। পরের কখনও সূরা ফাতিহার উল্লেখ করেছেন, আর অন্য বারে শুধু কুরআন পাঠের কথা বলেছেন। আর এ-ও হতে পারে যে, এ দুটি হাদীসের নির্দিষ্ট করে যা বলা হয়েছে, সাধারণভাবে সেই কথাটিই বলা হয়েছে।

প্রশ্ন হতে পারে, নবী করীম (স) দুটি কথাই বলেছেন, এ যখন তোমার ধারণা তখন দেখা যায়, মুহাম্মাদ ইবনে আজলান বর্ণিত হাদীস কোনরূপ কির'আত ছাড়াই নামায হতে পারে বলছে। কেননা তা কির'আত ছাড়াই নামাযকে ক্ষতিগ্রস্ত বা ত্রুটিপূর্ণ বলছে।

এর জবাবে বলতে হবে, এ প্রশ্নটি আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য। আমরা বলব, উভয় হাদীস থেকে বাহ্যত তা-ই বোঝা যায়। তবে এতটুকু তো প্রমাণিত হয় যে, কির'আত পাঠ না করলে তাতে নামায নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে আমরা এই দ্বিতীয় অর্থটিই গ্রহণ করেছি।

আবূ বকর বলেছেন—সূরা ফাতিহা পড়া পর্যায়ে আরও বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যাঁরা তা পড়া ফরয মনে করেছেন, তাঁরা সে সব হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। আল-উলা ইবনে আবদুর রহমান আয়েশা (রা) থেকে হিশাম ইবনে জুহরার মুক্ত গোলাম আবূস সায়েব আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত একটি হাদীস এ পর্যায়ে উল্লেখ্য। তাতে রাসূল (স) বলেছেন ঃ

يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى : قَسَمْتُ الصَّلٰوةُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِىْ، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِىْ، فَاِذَا قَالَ الْعَبْدُ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : حَمِدَنِىْ عَبْدِىْ ...

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ নামায আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। তাঁর অর্ধেক আমার আর অপর অর্ধেক আমার বান্দার। বান্দা যখন আলহামদুলিল্লাহ ........ বলে, তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ আমার বান্দা আমার হাম্দ করেছে ......।

এ হাদীসের 'সালাত' বলে সূরা ফাতিহা বুঝিয়েছেন। তাতে বোঝা যায় যে, নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ অন্যতম ফরয। যেমন وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ বলে ফজর নামাযে কুরআন পাঠ বোঝানো হয়েছে। তাতেও বোঝা যায় যে, নামাযে কুরআন পাঠ ফরয وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ এবং রুকূকারীদের সাথে মিলিত হয়ে রুকূ দাও বলেও বুঝিয়েছে নামাযে কুরআন পাঠের এবং তার ফরয হওয়ার কথা।

এর জবাবে বলা যাবে, না, বলা কথাসমূহ নামাযে কুরআন পাঠ ফরয করে দেয় না, রুকূ করার আদেশ ও রুকূ করাকেই ফরয করে ইতিবাচকভাবে। আর উপরোদ্ধৃত হাদীসে 'নামায'-এর আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে বিভক্ত হওয়ার কথা দ্বারাও নামাযে কুরআন পাঠ ফরয প্রমাণিত হয় না। তা থেকে বড় জোর এতটুকুই প্রমাণিত হয় যে, নামায সূরা ফাতিহাসহ আদায় করতে হবে। কিন্তু তাতে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। কেননা 'নামায' বলতে নফল ও ফরয নামায সবই বোঝায়। বরং উক্ত হাদীস দ্বারা

নবী করীম (স) তা ফরয না হওয়ার কথাই প্রমাণ করেছেন। কেননা হাদীসটি শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ 'যে লোক নামাযে সূরা ফাতিহা পড়েনি, তার নামায ক্রটিযুক্ত।' এতে 'নামায হয়নি' বলা হয়নি, ক্রটিপূর্ণ বলা হয়েছে সূরা ফাতিহা না পড়ার দরুন। আর একথা তো জানা-ই আছে যে, কথার প্রথমাংশ দ্বারা দ্বিতীয় অংশকে নাকচ করতে চাওয়া হয়নি। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ্র কথা ঃ 'নামায আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে; এবং সেই পর্যায়ে সূরা ফাতিহার উল্লেখ থেকে নামাযে তা পড়া ফরয প্রমাণিত হয় না। এ পর্যায়ে একটি হাদীসও উল্লেখ্য। হাদীসটি শুবা আবদে রাব্বিহি ইবনে সাইদ থেকে, আনাস ইবনে আবূ আনাস থেকে আবদুল্লাহ ইবনে নাফে ইবনুল উমইয়ান আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস মতলব ইবনে আবূ অদায়াতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى، وَتَشَهَّدٌ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَبَاسٌ وَتَمَسْكُنٌ وَتَقْنَعُ لِرَبِّكَ، وَتَقُوْلُ اللّٰهُمَّ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِىَ خِدَاجٌ -

(নফল) নামায দুই দুই রাক্'আত করে পড়বে। প্রতি দুই রাক'আত বসে তাশাহ্হুদ পড়বে, বসবে, স্থিত হবে এবং তোমার রব্ব-এর জন্যে একান্ত হবে, বলবে ঃ হে আমাদের আল্লাহ্ ....... । যে তা করবে না, তার নামায ক্রটিযুক্ত হবে।

এ হাদীসে যেসব কাজকে 'সালাত' বলা হয়েছে, তা তাতে ফরয করা হয়নি। বিরুদ্ধবাদীরা যে হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করেন, তা হযরত উবাদাত ইবনে সামেত থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَاصَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَا بِفُتِحَةِ الْكِتَابِ -

সূরা ফাতিহা যে না পড়বে, তার নামায হবে না।

মুহাম্মাদ ইবনে বরক, আবূ দাউদ, ইবনে বিশার, জাফর আবূ উসমান সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

اَمَرَنِى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اُنَادِىْ اَنْ لَاصَلٰوٰةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَازَادَ -

রাসূলে করীম (স) আমাকে এই কথা ঘোষণা করে দিতে আদেশ করেছেন যে, সূরা ফাতিহা ও আরও বেশী আয়াত না পড়লে নামায হবে না।

আবূ বকর বলেছেন, 'সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায হয় না'—রাসূলের এ কথাটির অর্থ দুটি হতে পারে ঃ মূলতই না হওয়া কিংবা পূর্ণাঙ্গ না হওয়া। যদিও আমাদের মতে বাহ্যত

মূলত না হওয়াই এর অর্থ; যেন শেষ পর্যন্ত এ কথাই বোঝা যায় যে, নামায পূর্ণাঙ্গ না হওয়াই এর তাৎপর্য। দুটি অর্থ একসঙ্গে গ্রহণ করা যেহেতু জায়েয নয়। কেননা যখন মূলত না হওয়ার অর্থ করা হবে, তখন তা থেকে কিছুই প্রমাণিত হয় না। যখন পূর্ণাঙ্গ না হওয়া ও ক্ষতিগ্রস্তভাবে হওয়ার অর্থ নেয়া হবে, তখন তাতে তার কিছু অংশ হওয়া প্রমাণিত হবে। দুটি অর্থ এক সাথে গ্রহণ নিষিদ্ধ, কঠিন। রাসূল (স) ও কথা বলে মূলতই না হওয়া বোঝাতে চান নি। তার প্রমাণ এই যে, তা প্রমাণিত হলে 'পড় কুরআনের যা পড়া সহজ,' এই আদেশে যে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে, তা বাতিল হয়ে যায়। তাতে আয়াত মনসূখ হওয়া বোঝায়, কিন্তু 'খবরে ওয়াহিদ' পর্যায়ের হাদীস দ্বারা কুরআনের আয়াত মনসূখ হওয়া জায়েয নয়। আবূ হানীফা, আবূ মুআবিয়া, ইবনে ফুযায়ল ও আবূ সুফিয়ানের আবূ নজরাতা সাঈদ সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিও উক্ত কথাই প্রমাণ করে। হাদীসটি হচ্ছে, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَاتَجْزِئُ صَلَاةٌ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدُ اللّٰهِ وَسُوْرَةٍ فِيْ الْفَرِيْضَةِ وَغَيْرِهَا –

ফরয ও অন্যান্য নামাযের প্রতি রাক'আত সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা যে পড়েনি, তার নামায জায়েয হয়নি।

তবে আবূ হানীফা সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কিছু পড়ার কথা বলেছেন। আর মুআবিয়া বলেছেন ঃ لاصلاة 'নামায নেই বা হয় না।' একথা জানাই আছে যে, মূল নামায না হওয়ার কথাই তাঁরা মনে করেন নি। পূর্ণাঙ্গ না হওয়ার কথাই বোঝাতে চেয়েছেন, কেননা সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, সূরা ফাতিহা পড়াই কুরআন পাঠের জন্যে যথেষ্ট। তার সাথে অন্য কিছু না পড়লেও নামায হয়ে যাবে।

এ থেকে বোঝা গেল—তাঁরা সকলেই নামাযের পূর্ণাঙ্গ হওয়ার কথাই বুঝেছেন, নামাযের ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার কথা বুঝেছেন। মূলত না হওয়া ও অপূর্ণাঙ্গ হওয়া—এ দুটি পরস্পর বিরোধী কথা বলে দুটি অর্থই একসাথে গ্রহণ করা যেতে পারে না। একটি শব্দের দুই পরস্পর বিপরীত অর্থ গ্রহণ নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত।

কেউ যদি বলেন, এই হাদীসটি উবাদাতা ও আবূ হুরায়রা বর্ণিত হাদীস থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর। আর হতে পারে, রাসূলে করীম (স) একবার বলেছেন ঃ لَاصَلَاةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ। 'সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায নেই' এ বলে নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয করে দিয়েছেন। আর অন্যবারে বলেছেন, সাঈদ বর্ণিত হাদীসটি যাতে সূরা ফাতিহা ও তার সাথে অন্য কিছু পড়ার কথা বলেছেন। আর তা বলে বোঝাতে চেয়েছেন যে, সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কিছু না পড়লে নামায পূর্ণাঙ্গ হবে না ?

এর জবাবে বলা হবে, হাদীস দুটির ইতিহাস তোমার বা কারোর জানা নেই। রাসূলে করীম (স) দুই সময় দুই অবস্থায় বলেছেন, তারও কোন প্রমাণ নেই। দুইরূপ অবস্থায়

দুটি হাদীস বলা হয়েছে তার অকাট্য প্রমাণ থাকা আবশ্যক। অন্যথায় তোমার বিরোধী মতের লোক বলতে পারে যে, নবী করীম (স) এ দুটি কথা দুই অবস্থায় বলেছেন, তা প্রমাণিত নয় কেন ? অথচ দুটি শব্দই হাদীস দুটিকে একই হাদীসে পরিণত করেছে। কোন কোন বর্ণনাকারী হাদীসের শব্দকে সেভাবেই চালিত করেছেন। আর কেউ কেউ তার কোন কোন শব্দকে উপেক্ষা করেছেন। তা হল সূরার উল্লেখ। এমতাবস্থায় দুটি হাদীসই সমান ও অভিন্ন। বেশীর ভাগ প্রমাণ এ-ই পাওয়া যায় যে, হাদীস একই অবস্থায় বলা হয়েছিল। এর ফলে তোমার বিরোধীর পক্ষে তোমার উপর অধিক মর্যাদা হওয়া স্বাভাবিক। কেননা দুটির ইতিহাস না জানার দরুন দুটিকে একই সময়ের বলে ধরে নেয়াই উত্তম পন্থা। আর এ কথা যখন প্রমাণিত হল যে, সূরার কথা বাড়তি সহ দুটি কথাই একই সময় বলেছেন। আর জানা-ই আছে যে, সূরার উল্লেখ হলেও তাতে মূলতই নামায না হওয়ার কথা প্রমাণিত হয় না, শুধু ত্রুটিযুক্ত হওয়ার কথাই প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছে। আমরা এভাবে এর ব্যাখ্যা দিতে চাই। ফলে কথাটি এই হাদীসের মতই হয়ে যাবে, যাতে তিনি বলেছেন ঃ

لاصَلواةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ الاَّ فِىْ الْمَسْجِدِ –

মসজিদের প্রতিবেশীর নামায মসজিদে না পড়লে তা হবে না।

وَمَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَجِبْ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ، وَلاَ ايْمَانَ لِمَنْ لاأَمَانَةَ لَهُ –

যে লোক আযান শুনে তার জবাব দিল না, তার নামায নেই এবং যার আমানতদারী নেই, তার ঈমানই নেই।

কুরআনের এ আয়াতটিও সেইরূপ ঃ

انَّهُمْ لاَاَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ – اَلاَتُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْا اَيْمَانَهُمْ – (التوبه : ١٢-١٣)

কেননা তাদের কসমের কোন বিশ্বাস নেই। সম্ভবত (আবার তরবারির আঘাতের ভয়ে-ই) তারা বিরত হবে। তোমরা কি এমন লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না, যারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতেই থাকে.... ?

এ হাদীস ও কুরআনের আয়াতে প্রথমে অস্বীকৃতি এবং পরে স্বীকৃতি রয়েছে। কেননা পূর্ণাঙ্গ না হওয়ার কথাই বলতে চাওয়া হয়েছে। মূলকে অস্বীকার করার ইচ্ছা নয়। অর্থাৎ (আয়াতটির অর্থে) ওরা ওয়াদা পূরণ করবে এমন কসম ওরা করেনি এ জন্যে সে 'কসম' বিশ্বাস্য নয়।

প্রশ্ন হতে পারে, হাদীস কয়টির বাহ্যিক অর্থই গ্রহণ করা হবে না কেন, আর

কুরআনের আয়াতে যে ইখ্‌তিয়ার দেয়া হয়েছে তা সূরা ফাতিহাকে বাদ দিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

এর জবাবে বলা যাবে, হাদীস যদি আয়াত নিরপেক্ষ ধরা হয়, তাহলেও সূরা ফাতিহা পড়া ফরয হওয়ার মত কোন অকাট্য দলীল তাতে পাওয়া যাবে না। যেমন পূর্বেই বলেছি যে, তার আলোকে প্রমাণিত হয় যে, সূরা ফাতিহা না পড়লেও মূল নামায হওয়া প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। আর অন্যান্য হাদীস মূলত না হওয়া ও পূর্ণাঙ্গ না হওয়া দুটিরই সম্ভাবনা প্রকাশ করে। তাছাড়া এসব হাদীস যদি নামাযে নির্দিষ্ট কিছু পড়া ফরয প্রমাণ করত, তাহলে আয়াতের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা এবং তাকে ফরয নামাযের বদলে নফল নামায মনে করা সঠিক হতে পারে না। এ বিষয়ে শুরুতেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তা পুনরায় পড়ে নিলে পূর্ণ জবাব পাওয়া যাবে, ইনশা আল্লাহ্।

আবূ বকর বলেছেন, সূরা ফাতিহা সংক্রান্ত উল্লিখিত হুকুমসহ তা পাঠ করার স্বাভাবিক দাবি হচ্ছে, আল্লাহ বিশেষভাবে আমাদেরকে হাম্‌দ করার আদেশ করেছেন, শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে আমরা তাঁর হাম্‌দ করব, তাঁর গুণ পরিচিতি বর্ণনা করব, কিভাবে তাঁর নিকট দো'আ করব। এ কথাও বোঝাচ্ছে যে, সর্বপ্রথম-ই আল্লাহ্‌র হাম্‌দ করতে হবে, তার পরে তাঁর তারীফ-প্রশংসা, তার পরে দো'আ করা অধিক উত্তম কাজ এবং এই পদ্ধতির দো'আই কবুল হওয়ার অধিক উপযোগী। এ কারণে সূরা ফাতিহার সূচনা হয়েছে হাম্‌দ দ্বারা, তারপর সানা ও তারীফ। বলা হয়েছে ঃ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন মালিক ইয়াওমিদ্দীন পর্যন্ত। তারপর তাঁর দাসত্বের স্বীকৃতি এবং সে কথাটি স্বতন্ত্র ও এককভাবে বলা হয়েছে ঃ اِيَّاكَ نَعْبُدُ। তারপর তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে সেই সমস্ত কাজে ও ব্যাপারে, ইহকালীন ও পরকালীন যেসব ব্যাপারেই আমরা তাঁর মুখাপেক্ষী, তা আল্লাহ্‌র দাস হয়ে করার সুযোগ পাওয়ার জন্যে اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ। বলে। পরে হেদায়েতের উপর দৃঢ়তার প্রার্থনা করা হয়েছে। এ কারণেই তো আল্লাহ্‌র হাম্‌দ করার দরকার হয়েছে, তাঁর তারীফ করা জরুরী হয়েছে এবং তাঁর দাস হয়ে থাকা আমাদের জন্যে কর্তব্য হয়েছে। اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ বলে যেমন হেদায়েত প্রার্থনা করা হয়েছে, তেমনি তার উপর দৃঢ় হয়ে থাকার তওফীকও চাওয়া হয়েছে এবং তা ভবিষ্যতের জন্যে। অতীতের জন্যে এরূপ প্রার্থনা হয় না। কাফিররা আল্লাহ্‌কে চিনতে পারেনি, তাঁর হাম্‌দ ও সানাও করেনি। ফলে তারা গুম্‌রাহ হয়ে গেছে। তা থেকে রক্ষা পাওয়ার তওফীক চাওয়া হয়েছে। কেননা কাফিররা আল্লাহ্‌কে চিনতে পারেনি বলে তাঁর গজব ও আযাব পাওয়া যোগ্য হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ .... বলে আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর হাম্‌দ করার শিক্ষা যেমন দিয়েছেন, তেমনি তা করার আদেশও করেছেন ঃ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ বাক্যটিই তার প্রমাণ।

মনে রাখতে হবে, 'হাম্‌দ' করার জন্যে আল্লাহ্‌র আদেশ সূরার শুরুতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, এই কথা দ্বারা আল্লাহ্‌র গজব ও আযাব থেকে বাঁচতে চাওয়া

হয়েছে, আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে এবং রোগের প্রতিকার চাওয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে একটি হাদীস উল্লেখ্য। হাদীসটি আবদুল বাকী, মুআজ ইবনুল মুসান্না, সাঈদ ইবনুল মুয়াল্লা, আবূ মুআবিয়া, আমাশ, জাফর ইবনে ইয়াস আবূ নজরাতা সূত্রে বর্ণিত। আবূ সাঈদ বলেছেন ঃ আমরা একটি যোদ্ধা বাহিনীতে ছিলাম। আরবের কোন এক গোত্রের এলাকায় পৌঁছলাম। গোত্রের লোকেরা এসে বলল ঃ আমাদের সরদারকে সাপে দংশন করেছে। তোমাদের মধ্যে কি কেউ আছে যে ঝাড়-ফুঁক করতে পারে ? আমরা বললাম, হ্যাঁ, কিছু তো করতে পারি, কিন্তু আমাদের জন্যে মেহ্‌মানদারীর ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত আমরা কিছুই করছি না। ফলে তখনই তারা আমাদের জন্যে ছাগলের ব্যবস্থা করল। এরপর আমি সূরা ফাতিহা সাতবার পড়ে ফুঁ দিলাম। এতে সে লোকটি ভালো হয়ে গেল এবং আমরা ছাগলটি নিয়ে নিলাম।

পরে আমরা রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলাম। জবাবে তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমি জানি, সূরা ফাতিহা রোগমুক্ত করে। এটা ভালো তদবীর। ছাগলের একটা অংশ আমাকেও দাও।

সূরা ফাতিহার বহু কয়টি নাম রয়েছে। একটি হল উম্মুল কিতাব। কেননা তা-ই কুরআনের প্রথম সূরা। 'উম্মুল কুরআন' ও বলা হয়। দুটি কথার একটি অপরটির বিকল্প। 'উম্মুল কিতাব' বললে উম্মুল কুরআনই বোঝা যায়। কেননা 'কিতাব' অর্থ কুরআন, তা সকলেরই জানা। তাই কখনও উম্মুল কিতাব বলা হয়েছে, কখনও উম্মুল কুরআন। এই উভয় নাম রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত। ফাতিহাতুল কিতাবও বলা হয়। বলা হয় মাবউল মাসানী—বারবার আবৃত্তির সাতটি আয়াত। সাঈদ ইবনে জুবায়র হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট 'মাবউল মাসানী' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাবে বললেনঃ মাবউল মাসানী বলতে উম্মুল কুরআন-ই বোঝায়। 'মাবউল' অর্থ সাত, আর 'মাসানী' বলতে বোঝায়, তা প্রতি রাক'আতে আবৃত্তি করতে হয়।

এটাই তার নিয়ম । প্রতি রাক'আতে পড়তে হয়, সমগ্র কুরআনে এছাড়া আর কোন অংশ নেই।

## সূরা আল-বাকারা

আল্লাহ্ বলছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ -

যারা গায়ব-এর প্রতি ঈমান রাখে, নামায কায়েম করে ও আমাদের দেয়া রিযিক থেকে ব্যয় করে।

এ আয়াতে নামায ও যাকাত-এর আদেশ রয়েছে। যেমন এ দুটি কাজ মুত্তাকী লোকদের গুণ রূপে উল্লিখিত হয়েছে। তাক্ওয়ার শর্তও হচ্ছে তাই। যেমন 'গায়ব-এর

প্রতি ঈমান' বলে আল্লাহ্ পরকাল প্রভৃতির প্রতি ঈমান বুঝিয়েছে। এছাড়াও যুক্তি দলীলের ভিত্তিতে আরও যা যা বিশ্বাস করা প্রয়োজন তা-ও তাক্ওয়ার শর্ত। ফলে আয়াতে উল্লিখিত নামায ও যাকাত ফরয প্রমাণিত হল।

'নামায কায়েম' কথাটির কতগুলো তাৎপর্য রয়েছে।

প্রথমত, তা সম্পূর্ণ করা, একটি জিনিসকে যথার্থভাবে দাঁড় করে দেয়া। তাকে বাস্তবায়িত করা। আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ

এবং ন্যায়পরতা সহকারে তোমরা ওজন দাঁড় কর।—ও এই ধরনেরই কথা।

কেউ কেউ বলেছেন ঃ يُقِيْمُوْنَ অর্থ 'তারা আদায় করে।' কেননা নামাযে 'কিয়াম' (দাঁড়ানো) তো কর্তব্য। এ কারণে আদায় করার কথা বোঝাবার জন্যে 'তারা কায়েম করে' বলা হয়েছে। নামাযে 'কিয়াম' ফরয, তা-ও এ থেকে বোঝা যায়, যদিও 'কিয়াম' জাড়াও নামাযে আর কয়েকটি ফরয রয়েছে। যেমন ঃ

فَاقْرَءُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ –

কুরআনের যা পড়া সহজ সম্ভব, তাই তোমরা পড়।

অর্থাৎ নামাযে 'সালাত' সেই নামায বোঝানো হয়েছে যাতে কুরআন পাঠ করা হয়। আর قران الفجر বলতে বোঝায় ফজরের নামাযে কুরআন পড়া।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا لاَيَرْكَعُوْنَ –

যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ তোমরা রুকূ কর, তখন তারা রুকূ করে না।

اَرْكَعُوْا وَسْجُدُوْا

রুকূ দাও সিজদা কর।

وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ –

রুকূকারীদের সাথে মিলিত হয়ে রুকূ কর।

এ সব আয়াতে 'রুকূ' করতে বলা হয়েছে নামাযের একটি ফরয রুক্ন হিসেবে। এসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হল যে, নামাযে রুকূ করা ফরয। যা ফরয তা করার কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে " يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ তারা 'নামায কায়েম করে' বলার দরুন নামাযে কিয়াম করা ফরয হয়ে গেছে। এ রকম বলে নামাযের একটি ফরযের কথাই জানিয়ে দেয়া হল يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ এর আর একটি অর্থ হতে পারা ঃ তারা ফরযসমূহ তা আদায় করার নির্দিষ্ট সময়ে চিরন্তনভাবেই আদায় করে।

যেমন বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًامَّوْقُوْتًا –

নামায মুমিনদের জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে লিখিত ফরয।

অর্থাৎ নির্দিষ্ট জ্ঞাত সময়ে নামায আদায় করা ফরয। قَائِمًا بِالْقِسْطِ অর্থ 'ন্যায়পরতা কায়েম করে'। তার বিপরীত কাজ করে না। চলমান নিয়মিত চিরন্তন কাজকে আরবরা 'কায়েম' বা দাঁড়োনা কিংবা 'দণ্ডায়মান' বলে। আর তা থেকেই হয় مُقِيْمٌ কায়েমকারী। বলা হয় ঃ অমুক ব্যক্তি সৈন্যবাহিনীর খাবারের ব্যবস্থা কার্যকর করে। আর যখন বাজারের লোকেরা এসে যায়, তখন বলা হয় ঃ قَامَتِ السُّوقِ বাজার দাঁড়িয়ে গেছে।' তার অর্থ ঃ সব কিছু থেকে বিমুখ হয়ে একটি কাজ একান্তভাবে লেগে যাওয়া। আর قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةَ 'নামায দাঁড়িয়ে গেছে' কথাটিও এ পর্যায়ের। আয়াতটির এ সব তাৎপর্যই হতে পারে। আর আল্লাহ্র কথা ঃ

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ –

তাদেরকে আমরা যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।

সম্বোধনের তাৎপর্যে এই অর্থ নিহিত রয়েছে যে—এর অর্থ হচ্ছে, অর্থ ব্যয় ফরয। তা আল্লাহ্র হক্ হিসেবে ধার্যকৃত ব্যয় যেমন যাকাত ইত্যাদি। কেননা অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِيَ اَحَدَ كُمُ الْمَوْتُ –

তোমাদের কারোর মৃত্যু আসার পূর্বেই তোমরা আমার দেয়া রিয্ক থেকে ব্যয় কর।

অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ –

এবং আল্লাহ্র পথে তোমরা ব্যয় কর।

বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَيُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ –

আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীকৃত করে রাখে, তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না। ....

এ সব আয়াতেই যাকাত দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এই 'ব্যয়'-র কথা নামায-এর সঙ্গে একত্রিত ও পাশাপাশি রেখে বলা হয়েছে। আর নামায যেহেতু ফরয, তাই এ 'ব্যয়'টাও ফরয, তা স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়। আর তা আল্লাহ্র ঈমানের কথা বলার পর বলা হয়েছে বলে সে 'ব্যয়'টা ঈমানের মতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে। এই 'ব্যয়' হচ্ছে মুত্তাকীদের অন্যতম গুণ পরিচিতি। নামায ও যাকাত উভয়ই ফরয, তা বোঝা যায় এ

ভাবেও যে, 'নামায শব্দটি যখন সিফাতহীন ও শর্তহীন ব্যবহৃত হবে, তখন তা থেকে সর্বজনপরিচিত ফরয নামাযই বোঝা যাবে। যেমন বলা হয়েছে : أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ। 'সূর্য ঢলে পড়া সময়ে নামায কায়েম কর', বলা হয়েছে : حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى। 'তোমরা নামাযসমূহ সংরক্ষণ কর, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সময়ের নামায।'

এখানে 'সালাত' শব্দ বলে যখন ফরয নামায বোঝানো হয়েছে, তখন এই 'ইনফাক' বা ব্যয় বলতেও ফরয ব্যয় বুঝাবে। আর ব্যয় করতে বলা হয়েছে আল্লাহ্র দেয়া রিয্ক থেকে। তা থেকে বোঝা যায়, 'রিয্ক' নাম হতে পারে শুধু মুবাহ (অ-নিষিদ্ধ) রিয্কের। নিষিদ্ধ রিয্ক এ পর্যায়ে গণ্য নয়। যা অপহরণ করা হয়েছে এবং যা অন্যের উপর জুলুম করে নেয়া হয়েছে, তা রিয্ক গণ্য হতে পারে না। কেননা তা আল্লাহ্ তাকে রিয্ক হিসেবে দেন নি। তা রিয্ক হলে তা ব্যয় করাও জায়েয হবে, অন্যকে দান হিসেবে দেয়া সঙ্গত হবে। তা দিয়ে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের আশা করাও অসমীচীন হবে না। কিন্তু মুসলিম সমাজ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে অপহরণকারীর অপহৃত মাল-সম্পদ সাদ্কা করা হারাম। নবী করীম (স) তাই বলেছেন :

لَاتُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ –

অপহৃত ধন-মালের সাদকা কবুল হয় না।

রিয্ক-এর আভিধানিক অর্থ অংশ। আল্লাহ্ বলেছেন :

وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ – (الواقعه – ٨٢)

আর এই নিয়ামতে তোমরা নিজেদের এই অংশ নির্দিষ্ট করে রেখেছ যে, তাকে তোমরা মিথ্য মনে করছ, অবিশ্বাস করছ?

অর্থাৎ অবিশ্বাস করার ব্যাপারে তোমাদের এই অংশ....। ব্যক্তির অংশ তার ভাগ্যে একান্তভাবে যা হয় অন্যের অংশ ছাড়া। কিন্তু এখানে রিয্ক বলতে তা-ই বোঝায়, যা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের দান করেছেন। আর তা মুবাহ্—পবিত্র। রিয্ক-এর আর-ও একটি তাৎপর্য আছে। তা হল, প্রাণীকুলের খাদ্য হিসেবে আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন। কাজেই তা আল্লাহ্র দেয়া রিয্ক হওয়া খুবই যুক্তিসঙ্গত। কেননা আল্লাহ্ই তা খাদ্য ও উপজীব্য বানিয়েছেন।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে, তারা মুসলমানদের নিকট এসে যে নিজেদের ঈমান জাহির করত বিশ্বাস না করেও এবং তাদের শয়তান সহযোগীদের নিকট তাদের কুফর প্রকাশ করত, এ পর্যায়ে বলেছেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ –

এমন লোকও রয়েছে, যারা মুখে বলে ঃ আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি; কিন্তু আসলে তারা ঈমানদার নয়।

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ -

ওরা আল্লাহ্‌ ও ঈমানদার লোকদের ধোঁকা দিতে চায়, কিন্তু আসলে তারা নিজেদেরকেই ধোঁকা দেয় (ধোঁকার কুফল তারা নিজেরাই ভোগ করে)।

এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ لا قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ لا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ -

আর যখন তারা ঈমানদারদের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে ঃ আমরা ঈমান এনেছি। কিন্তু পরে যখন তারা তাদের শয়তান নেতাদের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন তারা বলে ঃ আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি, ওদের সাথে শুধু ঠাট্টা-বিদ্রূপ করি মাত্র।

যেসব লোক নিজেদের কুফর গোপন রাখে, তারা আরবী পরিভাষায় 'জিন্দীক'। তারা যদি ঈমান জাহির করে, তাহলে তাদের প্রতি তওবা করার দাবি জানাতে হবে। উপরোক্ত আয়াতকে তার দলীল হিসেবে পেশ করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে তাদেরকে অবহিত করেছেন। তাদেরকে হত্যা করার আদেশ দেয়া হয়নি। রাসূলে করীম (স)-কে তাদের বাহ্যিক কথাকে কবুল করতে, আল্লাহ তাদের আসল অবস্থা ও তাদের আকীদার খারাবী সম্পর্কে যা জানিয়ে দিয়েছেন তার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করতে বলেছেন। একথা জানা-ই আছে যে, যুদ্ধ ও অস্ত্র প্রয়োগে শত্রু নিধন সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পরই উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে। তা মদীনায় নাযিল হয়েছে কয়েক বছর পর। অথচ হিজরতের পর-পরই মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয করে দিয়েছেন। সূরা বারায়াত ও সূরা মুহাম্মাদ প্রভৃতির আয়াতেও মুনাফিকদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের মৌখিক কথাকেই গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। অন্যান্য যে মুশরিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ করা হয়েছে, তাদেরকে তাদের মধ্যে গণ্য না করতে বলা হয়েছে। যে পর্যায়ে আমরা তাদের সংক্রান্ত যাবতীয় বিধান সম্পর্কে আলোচনা করব। 'জিন্দীক' পর্যায়ে লোকদের মতপার্থক্য এবং উপরোক্ত আয়াতকে দলীল হিসেবে পেশ করা সম্পর্কেও আলোচনা করা হবে। এ কথাটি রাসূলে করীম (স) -এর এই ঘোষণা থেকে প্রকাশিত হয়েছে ঃ

اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَآاِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ، فَاِذَا قَالُوْهَا عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَ هُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ -

লোকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে আমি আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে। যদি তারা তা বলে তা হলে তারা আমার হাত থেকে তাদের রক্ত ও ধন-মালের নিরাপত্তা পেয়ে গেল। তবে আইন মত কিছু করা হলে বিভন্ন কথা। আর তাদের চূড়ান্ত হিসেব গ্রহণ তো আল্লাহ্‌র কাজ।

এক যুদ্ধযাত্রায় এক ব্যক্তির উপর আক্রমণ করা হলে সে সঙ্গে সঙ্গে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে উঠল। কিন্তু আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করা হল না। হযরত উসামা ইবনে যায়দ তাকে হত্যা করেছিলেন। রাসূলে করীম (স) তাঁর এই কাজ যথার্থ বলে মেনে নিতে অস্বীকার করলেন। তাঁকে বললেন ঃ

هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ –

তুমি তার হৃদয়টাকে ছিন্ন করে দেখলে না কেন ?

অর্থাৎ তুমি তার মৌখিক কলেমা পাঠ থেকে তাকে ঈমানদার মনে করলে না কেন ? সে আসলেও ঈমানদার কিনা, তা দেখার কোন দায়িত্ব তোমার উপর ছিল না। আর মূলত তা জানবার কোন উপায়ও আমাদের নিকট নেই।

আবূ বকর বলেছেন, উপরোক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত বিশ্বাস ছাড়া শুধু মৌখিক স্বীকৃতিকে ঈমান বলা যায় না। কেননা আল্লাহ তাদের ঈমানের মৌখিক স্বীকৃতির উল্লেখের পর-ই বলেছেন ঃ ওরা আসলে মুমিন নয়। মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, সূরা আল-বাকারার প্রথম চারটি আয়াতে মুমিনদের পরিচিতির উল্লেখ হয়েছে। পরে দুটি আয়াতে কাফিরদের পরিচিতি দেয়া হয়েছে, আর মুনাফিকদের সম্পর্কিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে তেরোটি আয়াতে।

'নিফাক' একটি শরীয়াতী পরিভাষা। যে লোক ঈমান প্রকাশ করে কিন্তু কুফর গোপন রাখে তাদেরকে মুনাফিক বলা হয়েছে। এই নামকরণে তাদের প্রকৃত অবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখা হয়েছে। তারা আসলে মুশরিক। কেননা তারা সকল ক্ষেত্রেই শিরক করার দ্বারা মুসলমানদের বিরুদ্ধ পক্ষ হয়ে রয়েছে। অভিধানে এই শব্দের মূল উৎস হচ্ছে ঃ نافقاء اليربوع। তা একটি গর্ত। যা Jurbos থেকে তাড়া মাত্র বের হয়। তার বহু কয়টি গর্ত রয়েছে। যখন ইচ্ছা তার কোন একটিতে প্রবেশ করে। একদিক থেকে তাড়া করলে অন্য গর্তে চলে যায়।

আল্লাহ্‌র কথা, يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এখানে পরোক্ষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা الخديعه। আমল অর্থ লুকিয়ে রাখা। মুনাফিকরা নিজেদের শিরক লুকিয়ে রাখে ও ঈমান জাহির করে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকটতো কোন কিছুই লুক্কায়িত নেই। প্রকৃতপক্ষে তাঁকে ধোঁকা দেয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। যাদের পরিচিতি প্রসঙ্গে আল্লাহ এই কথাটি বলেছেন, তাদের দুটি অবস্থার যে কোন একটি অবশ্যই হবে। একটি, হয় তারা আল্লাহ্‌কে যথাযথভাবে জানতে ও চিনতে পারা

লোক হবে এবং জেনে গিয়ে থাকবে যে, কোন জিনিস গোপন করে বা রেখে আল্লাহ্কে ধোঁকা দেয়া যায় না। কিংবা তারা আল্লাহ্কে আদৌ জানতে ও চিনতে পারেনি। কিন্তু তা সুদূরবর্তী ব্যাপার। কেননা তা মনে করা যথার্থ কথা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের ব্যাপারে তা-ই প্রয়োজন করা হয়েছে। কেননা তারা কাজ করেছে ঠিক ধোঁকাবাজের মতই। আর ধোঁকাবাজির অশুভ প্রতিক্রিয়া অবশ্যই তাদের উপর প্রবর্তিত হবে। পরিণতি দাঁড়াল এই যে, তারা নিজেরাই নিজেদের ধোঁকা দিল।

কারো কারো মতে এর অর্থ—তারা ধোঁকা দিচ্ছে রাসূলে করীম (স)-কে। কিন্তু তাঁর কথাটা উহ্য করে দেয়া হয়েছে। আর রাসূলকে ধোঁকা দেয়া ভিন্ন কোন ব্যাপার নয়। কুরআনেই বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ - (احزاب - ٥٧)

যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে পীড়া দেয় ....

এর তাৎপর্য হল, তারা পীড়া দেয় আল্লাহ্র বন্ধুগণকে .......।

এ দুটির যেটি-ই হোক, তা পরোক্ষ কথা, প্রত্যক্ষ নয়। তা ব্যবহার করা যায় শুধু সেখানে, যেখানে তার দলীল পাওয়া যাবে। তারা রাসূলকে ধোঁকা দিয়েছে মুশরিকদের হত্যা করার জন্যে রাসূল ও মুমিনদের প্রতি যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্য। তারা মুমিনদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক হওয়ার মতলবেও তারা নিজেদের ঈমান প্রকাশ করে থাকতে পারে। মুমিনরা তো পরস্পরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক হতোই ঈমানের কারণে। পারস্পরিক গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাদের পরস্পরের মধ্যে। তারা এ উদ্দেশ্যেও ঈমান জাহির করে থাকতে পারে যে, তারা মুসলমানদের নিকট থেকে এ উপায়ে গোপন তত্ত্ব জেনে নেবে। তা তারা সে গোপন তত্ত্ব মুসলমানদের শত্রুদের নিকট পৌছাতে পারবে।

আল্লাহ্র কথা ঃ اللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ। 'আল্লাহ্ও তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন' অনুরূপ একটি পরোক্ষ কথা। এর তাৎপর্যে কয়েকটি দিক তুলে ধরা হয়েছে। একটি হচ্ছে, কথার জবাব অনুরূপ কথা দিয়ে দেয়া হয়েছে, যদিও তার আসল অর্থে নয়। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا - (الشورى - ٤٠)

খারাপের প্রতিফল অনুরূপ খারাপ

দ্বিতীয়, মূলত খারাপ নয়; বরং ভাল ও উত্তম। কিন্তু তদ্দারা খারাপের মুকাবিলা করা কালে সেই খারাপ শব্দটাই ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্র কথা ঃ

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ -

(البقره - ١٩٤)

যে লোক তোমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করেছে, তোমরা তার উপর সীমালঙ্ঘন কর (করতে পার), যেমন সে তোমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করেছেন।

সীমালঙ্ঘনের এই দ্বিতীয় কথটি মূলত সীমালঙ্ঘন নয়। অনুরূপ কথা ঃ

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ - (النحل -١٢٦)

তোমরা প্রতিশোধ লও তাহলে প্রতিশোধ নেবে ততটা যতটা তোমরা নিপীড়িত হয়েছ।

এখানে প্রথম প্রতিশোধ কথাটি কিন্তু মূলত পীড়নের প্রতিশোধ, আসলে প্রতিশোধ নয়। প্রতিশোধ শব্দের মুকাবিলায়ই তা বলা হয়েছে। আরবরা বলে থাকে اَلْجَزَاءُ بِالْجَزَاءِ 'প্রতিফল প্রতিফলের দ্বারা'। প্রথমটা কিন্তু প্রতিফল নয়। এই কবিতা ছত্রটিও অনুরূপ ঃ

ألالا يجهلن أحدٌ علينا - فنجهلَ فوقَ جهلِ الجاهلينا -

সাবধান! কেউ যেন আমাদের উপর মূর্খতা না করে।

তাহলে আমরাও আমাদের মূর্খদের মূর্খতার উপরের মূর্খতা করব।

একথা জানাই আছে যে, কবি মূলতই মূর্খতাচ্ছন্ন হননি; কিন্তু কথার সাথে মিল রেখে জবাবী কথা বলাই আরবদের অভ্যাস বিধায় এরূপ বলা হয়েছে। কারো কারো মতে কথাটি বলা হয়েছে কথার সাদৃশ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। ঠাট্টা-বিদ্রূপের অশুভ ফল যেহেতু তাদেরই ভোগ করতে হবে, তখন বলা যেতে পারে যে, তাদের সাথেও ঠাট্টা-বিদ্রূপই করা হয়েছে। এ তাৎপর্যও বলা হয়েছে যে, ওরা যখন দুনিয়ায় যথেষ্ট সময় অবকাশ পেয়ে গেছে, খুব দ্রুত ও তাৎক্ষণিকভাবে আযাবে নিক্ষিপ্ত হয়নি, অন্যান্য মুশরিকের ন্যায় হত্যার সম্মুখীন হয়নি, তাদের শাস্তি বিলম্বিত হয়েছে, তারা এতে ধোঁকায় পড় গেছে, ফলে তাদের সাথেও যেন ঠাটা-বিদ্রূপই করা হয়েছে, এমনই হয়ে গেল।

মূলত সমগ্র কাফির ও কুফরের ধ্বজাধারীদের তুলনায় মুনাফিকদের অপরাধ অনেক বেশী কঠিন ও সাংঘাতিক। কেননা তারা ধোঁকা-প্রতারণা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ একত্রিত করেছে, যেমন বলা হয়েছে ঃ يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ 'ওরা আল্লাহ্কে ধোঁকা দেয়', اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ 'আমরা তো ঠাটা-বিদ্রূপকারী'। আর এই হচ্ছে কুফর কর্মে অনেক বাড়াবাড়ি। আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের পরিণতি সম্পর্কে আগাম সংবাদ জানিয়েছেন, বলেছেন ঃ

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ - (النساء : ١٤٥)

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতর স্তরে থাকবে।

পরকালে তাদের যে আযাব ও অন্যান্য শাস্তি হবে, সে বিষয়ে খবর দেয়া সত্ত্বেও

দুনিয়ায় তাদের অবস্থা বিভিন্ন হবে। শিরক জাহিরকারী লোকেরা যদি ঈমান প্রকাশ করে তাহলে তাদেরকে হত্যা করা হবে না, পারস্পরিক মীরাস প্রাপ্তিতেও তারা মুসলমানদের মতই আচরণ পাবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দুনিয়ার আযাবসমূহ তাদের অপরাধ অনুপাতে হবে না। এর মধ্যে কি কল্যাণ নিহিত আছে, তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। এই দৃষ্টিতেই তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। এ কারণে বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করলে তার জন্যে 'রজম' শাস্তি নির্দিষ্ট করেছেন বাধ্যতামূলকভাবে। তওবা করলেও 'রজম,' শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি দেয়ার ব্যবস্থা দেয়া হয়নি। নবী করীম (স) মায়েজ সম্পর্কে তাকে 'রজম' করার পর যা বলেছিলেন এবং গামেদীয়ার উপর 'রজম' শাস্তি কার্যকর করার পর যা বলেছিলেন, সেদিকে কি লক্ষ্য দাওনি ? বলেছিলেন ঃ

لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَلَهُ –

ওরা এমন এক তওবা করেছে, অত্যাচারমূলক কর আদায়কারী ব্যক্তিও যদি এই রকম তওবা করত, তাহলে তাকে মাফ করে দেয়া হতো।

অথচ কুফর ব্যভিচার থেকেও অধিক বড় গুনাহ। কোন ব্যক্তি 'কুফর' করার পর যদি তওবা করে, তা হলে তার তওবা কবুল হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْسَلَفَ –

যারা কুফর করেছে তাদেরকে বল, তারা যদি এখনই বিরত হয়ে যায়, তাহলে যা পূর্বে হয়েছে তা ক্ষমা করে দেয়া হবে। (সূরা আনফাল ঃ ৩৮)

ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগকারীকে ৮০ দোররা মারার শাস্তি ঘোষিত হয়েছে, কিন্তু কারোর উপর কুফর আরোপকারীর জন্যে কোন শাস্তি ঘোষিত হয়নি, যদিও তা জ্বিনার তুলনায় অধিক বড় গুনাহ। মদ্যপানকারীর জন্যে শাস্তি ঘোষিত হয়েছে, কিন্তু রক্ত পানকারী ও মৃত ভক্ষণকারীর জন্যে কোন শাস্তি ধার্য হয়নি। এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, দুনিয়ার শাস্তিসমূহ অপরাধ অনুপাতে নির্ধারিত হয়নি। আর ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ আরোপ ও চুরির অপরাধে কোন দণ্ড মূলতই ধার্য না হওয়া যখন বিবেকসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত, পরকালীন শাস্তিকেই এসব অপরাধের যথেষ্ট শাস্তি মনে করাই যখন যথার্থ, তখন এ দুটির মধ্যে পার্থক্য হওয়াই সঙ্গত। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে অপর কোন কোন ক্ষেত্রের তুলনায় অধিক কঠোর শাস্তি নির্ধারিত হওয়া কিছুমাত্র অযৌক্তিক বিবেচিত হবে না। এ কারণে আমাদের ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন—নিছক কিয়াস বা ধারণা-অনুমানের ভিত্তিতে দণ্ড নির্ধারণ করা বৈধ নয়, যুক্তিসম্মত নয়। তা নির্ধারণের জন্যে আল্লাহ্র বিধানের (التوقيف) উপরই নির্ভর করা সমীচীন। অথবা ফিকাহ্‌বিদদের ঐকমত্যও তার ভিত্তি হতে পারে। আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা যা কিছু বলেছেন, তাদের বহাল রেখেছেন এবং তাদের হত্যা করার জন্যে আমাদেরকে তিনি আদেশ করেন নি। এ একটি মৌল নীতি বিশেষ। যেসব দণ্ড ও শাস্তি ঘোষিত হয়েছে তা

রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারের কিংবা শরীয়াতের ব্যাপারাদি কার্যকর করার দায়িত্বশীলের করণীয় করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আযাব হিসেবে যে কষ্ট ও পীড়া দিয়ে থাকেন, এগুলো ঠিক সেই পর্যায়ের ব্যাপার। এটা যখন সঙ্গত যে, দুনিয়ায় মুনাফিকদেরকে রোগ-ব্যাধি, দারিদ্র্য, ক্ষুধা ইত্যাদির দ্বারা আযাব দেয়া হবে না; বরং এদের বিপরীত আচরণই তাদের সাথে করা হয়, তাদের কুফর ও মুনাফিকীর শাস্তি পরকাল পর্যন্ত বিলম্বিত হবে, তখন দুনিয়ায় তাদেরকে হত্যা করা এবং তাদের কুফর ও নিফাকের শাস্তি ত্বরান্বিত করার কোন আদেশ আমাদের প্রতি না দেয়াই সঙ্গত হয়েছে। নবী করীম (স) নবুওয়াত লাভ কারার পর দীর্ঘ তেরোটি বছর পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করেছেন। এই সময় তিনি মুশরিকদেরকে আল্লাহ্‌র দাসত্ব স্বীকার এবং তাঁর রাসূলকে সত্য বলে মেনে নেয়ার জন্যে অবিশ্রান্তভাবে আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু তাদের সাথে যুদ্ধ করার কোন আদেশ তাঁকে দেয়া হয়নি। বরং তাদেরকে খুবই নম্রতা ও সহৃদয়তা সহকারে আহ্বান জানাতে থাকারই নির্দেশ তাঁকে দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ - (النحل : ١٢٥)

তোমার রব্ব-এর দিকে লোকদেরকে আহ্বান জানাও যুক্তিভিত্তিক কথা, উত্তম উপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক কর বলেছেন ঃ

وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا - (الفرقان : ٦٣)

এবং জাহিল মূর্খ লোকেরা যখন তাদের সাথে বিতর্ক শুরু করে, তখন তারা বলে সালাম।

বলেছেন ঃ

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ - وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ج وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا ذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ - (حم السجده : ٣٤-٣٥)

উত্তম পন্থায় প্রতিরক্ষা কর। তাহলে যার সাথে তোমার পরম শত্রুতা রয়েছে, সে-ও উষ্ণ বন্ধুতে পরিণত হবে। এই কাজ করতে পারে কেবল তারা, যারা ধৈর্যের নীতি গ্রহণ করেছে এবং তা করতে পারে শুধু বিরাট ভাগ্যের অধিকারী ব্যক্তি।

এই ধরনের আরও বহু আয়াত কুরআন মজীদে রয়েছে, যাতে উত্তমভাবে দ্বীনের দিকে আহ্বান জানাবার কথা বলা হয়েছে। অতঃপর হিজরতের পর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয করা হয়েছে। আল্লাহ তো উভয় অবস্থার কল্যাণ সম্পর্কে অধিক ভালো জানেন এবং প্রত্যেক অবস্থায় বান্দার করণীয় সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। এ পর্যায়ে কোন কোন কাফিরকে

হত্যা করার বিশেষ হুকুম দেয়া হয়ে থাকলে তা খুবই যক্তিসঙ্গত হয়েছে। ওরা হচ্ছে কট্টর ধরনের কাফির, ওরা কখনই ঈমান প্রকাশ করে না, কুফরও গোপন করে না। যদিও মুনাফিকদের অপরাধ কাফিরদের তুলনায় অনেক কঠিন ও বড়। আল্লাহ্‌র কথাঃ

اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا –

যিনি পৃথিবীকে শয্যা বানিয়েছেন।

অর্থাৎ স্থিতিশীল ও ধীরস্থির অ-নড়বড় বানিয়েছেন। অপর আয়াতে পর্বতকে গ্রাফী বানাবার কথা বলা হয়েছে। পর্বতকে গ্রাফী বলার তাৎপর্যে জটিলতা নেই, যেমন সূর্যকে চেরাগ বা প্রদীপ বলা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন ঃ কোন লোক যদি শয্যায় না শোয়ার কিরা করে এবং পরে সে জমিনের উপর শয়ন করে, তাহলে সে কিরা ভঙ্গ করল না, সেজন্যে তাকে কোন কাফ্‌ফারাও দিতে হবে না। অনুরূপভাবে যদি কেউ কিরা করে—সে প্রদীপের আলোতে বসবে না, আর সে সূর্যের আলোতে বসে, তবুও তার কিরা ভঙ্গ হবে না। কেননা কিরা-কসম সাধারণ পরিচিত বিষয়ের উপর হয়। কিন্তু সূর্য বা পৃথিবীকে নিয়ে এরকম কিরা কসম সাধারণভাবে করা হয় না। এটা ঠিক তেমনি, যেমন আল্লাহ্‌ অস্বীকারকারীকে আল্লাহ্‌ কাফির বলেছেন। অথচ কৃষককেও (আভিধানিক অর্থে) কাফির বলা হয়। সংশয় পোষণকারীকেও কাফির বলা হয়েছে। অথচ সাধারণভাবে নিঃশর্তে এরূপ নামকরণ করা হয় না। এ থেকে শুধু তাকেই বোঝায়, যে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার ও অমান্য করে। শর্তহীন নাম ও শর্তযুক্ত নামের দৃষ্টান্ত বহু রয়েছে। শরীয়াতের হুকুম আহকাম জানার জন্যে এগুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা আবশ্যক। তাই স্বভাবত তা সাধারণ ও নিঃশর্ত, নিঃশর্তই থাকবে। আর যা শর্তাধীন তাকেই সেই শর্তের উপর রাখতে হবে। কোনটাই যেন স্বীয় স্থান অতিক্রম না করে।

উপরোদ্ধৃত আয়াতে আল্লাহ্‌র তওহীদ ও স্রষ্টার প্রমাণ বিধৃত। কোন জিনিসই মহা শক্তিশালী স্রষ্টার সমতুল্য বা সমকক্ষ নয়। তাঁকে কেউ অক্ষম করতেও সমর্থ নয়। তাতে আকাশমণ্ডলের উর্ধ্বে অবস্থান এবং কোনরূপ স্তম্ভ ছাড়াই স্থিত হয়ে থাকার কথা বলা হয়েছে। সুদীর্ঘকাল ধরে তা স্ব-অবস্থায় বর্তমান থাকারও উল্লেখ হয়েছে কোনরূপ নড়চড় বা স্থান বিচ্যুতি কিংবা পরিবর্তন ছাড়াই।

অপর আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا – (الانبياء : ٣٢)

এবং আকাশমণ্ডলকে সংরক্ষিত ছাদ বানিয়েছি।

অনুরূপভাবে পৃথিবীর স্থিতিস্থাপকতা এবং কোনরূপ কম্পন ব্যতিরেকে অবস্থিত থাকায় আল্লাহ্‌র একত্বের বিরাট দলীল নিহিত রয়েছে। তার স্রষ্টার কুদরত যে অসীম তা-ও প্রমাণিত হচ্ছে। কোন কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে না। এ সবের ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ উপস্থাপন এবং তাঁর দেয়া নিয়ামতসমূহের স্মরণ করার তাগিদ উৎসাহদানও রয়েছে তাতে। আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًالَّكُمْ -

অতঃপর সেই বৃষ্টির পানির দ্বারা তোমাদের রিয্‌ক হিসেবে অফুরন্ত ফল ও ফসল জন্মিয়েছেন।

যেমন বলেছেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِىْ الْاَرْضِ جَمِيْعًا -

সেই আল্লাহ্‌ পৃথিবীর সব কিছুই তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন।

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّافِىْ السَّمٰوٰتِ وَمَا فِىْ الْاَرْضِ -

তিনিই আসমান ও জমিনের সব কিছু তোমাদের জন্যে কর্মে নিযুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন।

আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ -

বল, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্যে যে সৌন্দর্য ও উত্তম পবিত্র রিয্‌ক বের করেছেন তা কে হারাম করে দিতে পারে?

এই সব আয়াতকে দলীল হিসেবে পেশ করে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার সমস্ত জিনিসই মুবাহ্‌, বিবেক-বুদ্ধি এগুলো ব্যবহারে কোন দোষ দেখতে পায় না। অতএব তা মৌলিক ভাবে হারাম নয়। তবে কোনটির হারাম হওয়ার দলীল পাওয়া গেলে ভিন্ন কথা।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ص وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -

আমরা আমাদের বান্দার প্রতি যা কিছু নাযিল করেছি, সে বিষয়ে তোমরা যদি কোন সন্দেহের মধ্যে পড়ে গিয়ে থাক, তাহলে অনুরূপ একটি সূরা বানিয়ে নিয়ে আস এবং এজন্যে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের অন্যান্য সাহায্যকারীদের ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

এ আয়াতে আমাদের নবীর নবুয়্যতের সত্যতার দলীল উপস্থাপিত হয়েছে। কয়েকটি দিক দিয়েই তা বিবেচনা করা যায় ঃ

একটি, লোকদেরকে অনুরূপ একটি সূরা পেশ করতে বলা হয়েছে। তারা যে তা করতে সক্ষম নয়, অথচ তাদের আত্মাভিমান রয়েছে প্রচণ্ড। কুরআন তাদেরই ভাষার

কালাম। নবী করীম (স) তাদের মধ্যেরই একজন আরবী ভাষাভাষী। কোন প্রভাষক তাঁর মুকাবিলায় দাঁড়াতে পারেনি। কোন কবিও এই চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে পারেনি, যদিও এজন্যে তারা বহু অর্থ ব্যয় করেছে, প্রাণপণ চেষ্টা করেছে এই চ্যালেঞ্জের জবাব দেয়ার জন্যে। তাঁর সত্যতাকে প্রমাণের সব কথা বাতিল করার জন্যে। রাসূলের দাবিকে বাতিল প্রমাণের লক্ষ্যে তারা সর্বোচ্চ মাত্রায় চেষ্টা চালিয়েছে, চেষ্টা করেছে রাসূলের সঙ্গী-সাথীগণকে তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের ব্যর্থতা প্রকট হয়ে দেখা দিল। এই ব্যাপারটি প্রমাণ করল যে, কুরআন আল্লাহ্‌র নিকট থেকেই নাযিল হয়েছে, তার মুকাবিলা কেউ করতে পারে না। অনুরূপ কালাম রচনা করাও তাদের সামর্থ্যের বাইরে। তারা সবচেয়ে বড় যে কথা বলছে তা হচ্ছে কুরআন পূর্বকালীন কাহিনী মাত্র, কিংবা যাদু—এ কথার জবাবে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَلْيَأْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖٓ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ -

ওরা সত্যবাদী হলে তারই মত কোন কালাম রচনা করে তারা নিয়ে আসুক।

বলেছেন ঃ

فَأْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ -

তাহলে তোমরা স্বরচিত দশটি সূরা নিয়েই আস।

এ পর্যায়ের কুরআনের সংবদ্ধতাই হচ্ছে চ্যালেঞ্জের বিষয়বস্তু। কুরআনের অর্থ নয়। আর তা করতেই তাদের অক্ষমতা প্রমাণিত হয়েছে। ফলে এই কালাম রাসূলে করীম (স)-এর একটি বড় সুশিক্ষা হয়ে গেছে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। আল্লাহ্ তাঁর নবীকে এই মহিমায় মহিমান্বিত করেছেন, আতি উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। অন্যান্য সব নবীর মুজিযা তাঁদের জীবনের অবসানের সাথে সাথেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। সে সব মুজিযার কথা আমরা হাদীসের বর্ণনার মাধ্যমে জানতে পারি। কিন্তু মুহাম্মাদ (স)-এর এই মুজিযা শাশ্বত, চিরন্তন, তাঁর চলে যাওয়ার পরও তা চিরদিন থাকবে। সব আপত্তিরই জবাব হচ্ছে এই চ্যালেঞ্জ। অন্য সব কিছুর অক্ষমতাই প্রমাণিত হবে কুরআনের সম্মুখে। আর এ থেকেই তাঁর নবুয়তের পরম সত্যতা অকাট্যভাবে ও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে, ঠিক যেমন তাঁর জীবনকালেও তা তাঁর নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ হয়ে দেখা দিয়েছিল।

দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, মুমিন সমাজ ও নবীর নবুয়ত অস্বীকারকারী উভয়ের নিকট একথা জাজ্জল্যমান যে, মুহাম্মাদ (স) সমস্ত লোকের মধ্যে অধিক বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ নৈতিকতা ও অতীব উত্তম রায়দানে সক্ষম ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির ব্যাপারে কোন প্রশ্ন তোলা-ই সম্ভব ছিল না। তাঁর ধৈর্য সহিষ্ণুতা ছিল তুলনাহীন। তাঁর রায় ও সিদ্ধান্তসমূহও ছিল নির্ভুল এবং যথার্থ। এরূপ এক মহান ব্যক্তিত্ব মিথ্যা নবুয়তের দাবি করবেন, বলবেন যে, তাঁকে সমগ্র মানুষের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে, তা কল্পনাই

করা যায় না। অতঃপর তাঁর নবুয়তের আলামত এবং তাঁর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ হিসেবে এক মহান কালাম নাযিল করেছেন। এই কালাম সকলের নিকট প্রকাশমান, সকলের শোবাহ্ সন্দেহের উপর চরম আঘাতকারী। যদিও একথা জানাই আছে যে, এরা সকলেই একই সমাজের ও একই সময়ের লোক। ফলে লোকদের মিথ্যাবাদিতা ও দাবির বাতুলতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে। জানা গেছে যে, তাদেরকে চ্যালেঞ্জ দেয়ারও অক্ষম বলে ঘোষণা করার একমাত্র কারণই এই ছিল যে, এই কালাম আল্লাহ্‌র নিকট থেকে নাযিল হয়েছে। কোন মানুষই এরূপ কালাম রচনা করতে সক্ষম হতে পারে না।

তৃতীয়, কথার ধারাবাহিকতায় বলা হয়েছে ঃ

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا ......

তোমরা যদি তা না পার, —আর তা কখ্‌খনই পারবেও না.....

এতে বলা হয়েছে যে, তারা কুরআনের মুকাবিলা করতে পারে না। এ হচ্ছে 'গায়ব' পর্যায়ের সংবাদ দান। তাদের অক্ষমতাই প্রকট হয়ে উঠেছে। সংবদ্ধতার মুজিযার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তাঁর নবুয়তের সত্যতা প্রমাণের জন্যে তা স্বতঃউজ্জ্বল প্রমাণ।

কেউ যদি বলে ঃ তোমাদের সুস্বাস্থ্য ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পূর্ণ সুস্থতা সত্ত্বেও তোমাদের কেউ আমার মস্তক স্পর্শ করতে পারবে না, আর তারা দাঁড়িয়েও এবং তার দাবিকে মিথ্যা প্রমাণ করতে চেয়েও কেউ তা করতে না পেরে থাকে, তাহলে তাতে তার কথার সত্যতাই প্রমাণিত হবে।

তাই আল্লাহ্‌র উক্ত চ্যালেঞ্জমূলক কথাটি নবীর নবুয়তের সত্যতাই প্রমাণ করে। তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, এই কালাম মহাশক্তিমান আল্লাহ্‌র নিকট থেকেই নাযিল হয়েছে।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কালামের অনুরূপ কালাম রচনা করতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হওয়ার চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন মানুষ, জ্বিন সহ সমগ্র সৃষ্টিলোককে। যেমন তিনি ঘোষণা করেছেন ঃ

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَايَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا - (الاسراء : ٨٨)

বল, সমস্ত জ্বিন ও মানুষও যদি একত্রিত হয়ে এই কুরআনের মত কোন কোন কালাম রচনা করতে চেষ্টা করেও, তবু তারা অনুরূপ কালাম রচনা করতে সক্ষম হবে না, তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হলেও।

শেষ পর্যন্ত তাদের অক্ষমতা যখন প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন তাদের বলা হল ঃ

فَأْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيٰتٍ –

তা হলে মনগড়াভাবে রচিত অনুরূপ দশটি সূরা-ই না হয় নিয়ে আসে।

তা করতেও তারা যখন অসমর্থ হল, তখন বলা হল ঃ

فَلْيَأْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهِ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ –

তা হলে অন্তত ঃ অনুরূপ একটি কথাই তারা নিয়ে আসুক, যদি তারা সত্যবাদী হয়।

এরপর তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করা হল ক্ষুদ্রতম এক সূরা রচনা করে নিয়ে আসার জন্য। তা করতেও যখন তারা অক্ষম হয়ে গেল, তাদের বিরুদ্ধে দলীল দাঁড়িয়ে গেল, তখন তারা মুকাবিলা করা ত্যাগ করল। তখন যুদ্ধ করে বিজয়ী হওয়ার পথ গ্রহণ করল। আর আল্লাহও তাঁর নবীকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে আদেশ দিলেন। 'তোমাদের সঙ্গী-সাক্ষীদের ডাক—আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ্র এ কথায় তাদের দেবদেবীর কথাই বুঝিয়েছেন, যাদের তারা পূজা উপাসনা করত আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে। কেননা তারা মনে করত, এরা তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট শাফা'আত করবে। কারো কারো মতে এ চ্যালেঞ্জ হয়েছে যারা তোমাদের সত্য মনে করে ও তোমাদের কথার আনুকূল্য করে তাদের সকলের প্রতি। আর এই চ্যালেঞ্জ দিয়ে তাদের সকলেরই অক্ষমতা প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছে, ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবেও। ......এভাবে সূরা ফাতিহা থেকে এ পর্যন্তকার কালেমা একটা সংবদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এতে আল্লাহ্র নাম করে শুরু করা ও তাঁর প্রতি হাম্‌দ-সানা করা এবং তাঁর নিকট দো'আ করার শিক্ষা রয়েছে। তাঁর পরিচিতি লাভের পথের সন্ধান লাভের জন্যে তাঁর প্রতি আকুল আগ্রহী হওয়ার উৎসাহ দেয়া হয়েছে। তাঁর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের আকাঙ্ক্ষী হতে বলা হয়েছে। সেসব পথ থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে যার পথিকরা আল্লাহ্ কর্তৃক অভিশপ্ত হয়। যারা তাঁর পরিচিতি লাভ করতে না পেরে গুমরাহ হয়ে গেছে, তাদের থেকেও পানাহ্ চাওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তাঁর দেয়া নিয়ামতের শোকর আদায় করতে বলা হয়েছে। এরপরই সূরা আল-বাকারার শুরু। শুরুতেই মুমিনদের উল্লেখ এবং তাদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। তার পর কাফিরদের পরিচতি দেয়া হয়েছে। এরই পর বলা হয়েছে মুনাফিকদের সম্পর্কিত কথা, তাদের কার্যকলাপের ও চরিত্রের বর্ণনা। আমাদের সম্মুখে তাদের চরিত্রকে স্পষ্ট ও প্রকট করে তোলার উদ্দেশ্যে একটি রূপক উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি যেন আগুন জ্বালালো। বিদ্যুৎ চমকের উদাহরণও দেয়া হয়েছে, যা নিমেষের জন্যে অন্ধকারের বক্ষ দীর্ণ করে চতুর্দিক উদ্ভাসিত করে তোলে। কিন্তু তা স্থিতি পায় না। ফলে জনগণ আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে অন্ধকারেই নিমজ্জিত থাকতে বাধ্য হয়। কোথাও কিছুই দেখতে পায় না। এসবের উল্লেখের পর তওহীদের দলীল-প্রমাণ পেশ করা শুরু হয়েছে। এসব প্রমাণ অকাট্য, অনস্বীকার্য। যেমন পৃথিবীকে

বিস্তীর্ণকরণ, তাকে নিষ্কম্প বানানো, পৃথিবী থেকে মানুষের নানাবিধ ফায়দা বা কল্যাণ লাভ, তা থেকেই তাদের জীবন-জীবিকা অর্জন ও জীবনের অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া, কোনরূপ শংকা বা ভয়-ভীতি ছাড়াই তার উপর অবস্থান গ্রহণ প্রভৃতিই স্রষ্টার অস্তিত্ব ও একত্বের অকাট্য প্রমাণ।

এই পৃথিবী যখন একটি নতুন সৃষ্টি, তখন এর চূড়ান্ত সমাপ্তি অনিবার্য। এর ধারক, চালক ও স্থিতিস্থাপক এক সত্তা অবশ্যই আছেন। তিনি আল্লাহ্‌, তিনিই এর সৃষ্টিকর্তা, সব মানুষের সৃষ্টিকর্তাও তিনি। তিনিই তোমাদের নিয়ামত দেন, খোরাক-পোশাক দেন। ফল ও ফসল যা-ই হয়, তা তোমাদের জন্যেই তিনি উৎপাদন করেন। এই সব কাজ কেবল সেই মহা শক্তিমান সত্তাই করতে পারেন, যাঁকে কেউই অক্ষম করতে পারে না, যাঁর সমতুল্য কেউ নেই, কিছু নেই। এসব দলীল-প্রমাণ পেশ করার জন্য উৎসাহ দেয়া হয়েছে। তাঁর নিয়ামতসমূহ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। এরপর নবী করীম (স)-এর নবুয়ত প্রমাণ করা হয়েছে। স্পষ্ট দেখিয়ে দেয়া হয়েছে যে, অবিশ্বাসীরা কুরআনের ন্যায় কোন কালাম কখনই রচনা করতে পারে না। এসব বলার পর সকল লোককে একমাত্র আল্লাহ্‌র দাসত্ব স্বীকার করার আহ্বান জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ –

অতএব তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে কাউকেই স্বীকৃতি দেবে না। কেননা তোমরা তো জান (যে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ হতে পারে না)।

অর্থাৎ তোমরা তো জান যে, যাদেরকে তোমরা 'ইলাহ্‌,' বা মাবুদ বানিয়েছ, তারা কিছুই করতে সক্ষম নয়। আল্লাহ্‌ই হচ্ছেন তোমাদের প্রতি নিয়ামতদাতা, ওরা নয়। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা, ওরা নয়।

'তোমরা জানো' কথাটির আর একটি অর্থ বলা হয়েছে ঃ কর্তব্য ও অকর্তব্যের মধ্যে যে পার্থক্য, তা তো তোমরা জান। তার অর্থ, আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন। তদ্দ্বারা তোমরা এই কথা অনুধাবন করতে পার। এ কারণেই তোমাদেরকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কেননা অনুধাবন শক্তি না দিয়ে মূর্খ রেখে অনুধাবনের দায়িত্ব দেয়া বিবেক-বুদ্ধির বিপরীত।

দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে এ সব কথা যখন লোকদের নিকট অকাট্যভাবে প্রমাণিত হল, তখন ভয়ের বাণী উচ্চারণ করা হল। বলা হল ঃ

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوْا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ج اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ –

তোমরা যখন পারলে না, আর তা কখনই পারবে না, সে তো জানা কথা। অতএব

তোমরা সেই জাহান্নামকে ভয় কর যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ ও পাথর। এই জাহান্নাম তো কাফিরদের জন্যেই প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

এরপর মুমিনদের জন্যে পরকালীন সুখ ভোগের ব্যবস্থাপনার উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهٰرُ -

সেই লোকদের সুসংবাদ দাও, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে যে, তোমাদের জন্যে পরকালে জান্নাত রয়েছে, যার নিম্নদেশ থেকে ঝরনা ধারাসমূহ সদা প্রবহমান।

আবূ বকর বলেছেন ঃ উদ্ধৃত আয়াতসমূহ তওহীদের দলীল হওয়ার ও নবুয়তের সত্যতার দলীল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই আদেশও বহন করে এনেছে যে, আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও একত্ব সম্পর্কে বিবেক-বুদ্ধিসঞ্জাত যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপিত করতে হবে। আল্লাহ্র দেয়া দলীলসমূহ প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করতে যারা নিষেধ করে, উক্ত কথা তাদের মতকে বাতিল প্রমাণ করেছে। তারা মনে করে, শুধু শুনা খবরই আল্লাহ্কে চেনা ও রাসূলকে সত্য বলে জানার জন্যে যথেষ্ট। কেননা আল্লাহ্ তার একত্ব ও রাসূলের সত্যতা সম্পর্কে শুধু সংবাদ দিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি, তিনি বিবেক-বুদ্ধি সম্মত অকাট্য যুক্তি-প্রমাণও উপস্থাপিত করেছেন।

উপরোদ্ধৃত আয়াতটি থেকে বোঝা যায় যে, সুসংবাদ মানে আনন্দ উদ্রেককারী সংবাদ। আনন্দ ও সুখ বাহক সংবাদই সাধারণত ও বেশির ভাগ সুসংবাদ হয়ে থাকে। অবশ্য কখনও কখনও অন্য অর্থেও তা ব্যবহৃত হয়, হয় শর্তাধীন হয়ে। যেমন ঃ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ -

তাদের পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।

এ কথার একটি দৃষ্টান্ত এই—কেউ যদি বলে যে, যে দাস অমুক কন্যার সন্তান প্রসবের সুসংবাদ দেবে সে মুক্ত হবে। অতঃপর একজনের পর একজন করে বহু সংখ্যক দাস উক্ত সুসংবাদ দেয়, তাহলে হানাফী ফিকাহ্বিদদের মতে কেবলমাত্র প্রথম জনই মুক্তি পাবে, সে ছাড়া অন্য কেউ মুক্তি পাবে না, যদিও একই সুসংবাদ বহু কয়জন দাস দিয়েছে। কেননা সুসংবাদ কেবল সেই দিয়েছে, অন্যরা নয়। তাঁদের মতে কথাটি এরূপ নয়, যে যে দাস অমুকের সন্তান প্রসবের খবর দেবে সে মুক্ত। পরে একজনের পর একজন এই খবর দিল, তাতে সকলেই মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা এ কথাটি শর্তহীন একটি খবরের উপর عقد يمين কিরা চুক্তি পর্যায়ের। এতে সকল সংবাদদাতা শামিল

হবে। কিন্তু সুসংবাদ হচ্ছে এক বিশেষ গুণবচক খবর। যা ব্যক্তিকে আনন্দ ও সুখ দেবে, কেবল তা-ই 'সুসংবাদ' নামে অভিহিত হতে পারে। এ থেকে বোঝা যায়—সুসংবাদের ফলশ্রুতিতে শ্রোতার মুখমণ্ডলে আনন্দ ও মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। জান্নাতবাসীদের মুখমণ্ডলের বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ - ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ - (عبس : ٣٨-٣٩)

সেই দিন কিছু কিছু মুখমণ্ডল ঝকঝক করতে থাকবে, হাসিখুশি ভরা ও সন্তুষ্ট স্বচ্ছন্দ হবে।

তাদের চেহারায় আনন্দ ও সুখের যে আলামতসমূহ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, আয়াতে তারই খবর দেয়া হয়েছে।

সুসংবাদ দাতাকে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ وَبَشِيْرًا খারাজ নয়; ভালো খবর দানের প্রতি গুরুত্ব আরোপের জন্যে। আর সুসংবাদদাতার দেয়া খবরকে বলা হয়েছে بُشْرَى —তাতে বোঝা যায়, এই ব্যবহার সন্তুষ্টি ও সুখ উদ্রেককারী খবরই এর মধ্যে গণ্য। আর খারাপ অর্থে ব্যবহৃত হলেও তা থেকে সংবাদই মুখ্য। 'ওদেরকে পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও' আল্লাহ্‌র এ কথাটির অর্থ 'ওদেরকে আযাবের খবর জানিয়ে দাও'। পূর্বে রূপক দৃষ্টান্ত দিয়ে যেমন বোঝাতে চাওয়া হয়েছে, প্রথম সুসংবাদদাতাই মূলত 'বশীর' বা সুসংবাদদাতা রূপে গণ্য। এ ব্যাপারে সুসংবাদাদি আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়েছে—আরবদের এরূপ কথার অর্থ সেই প্রথম সুসংবাদদাতা। সেটি তারা খারাপ অর্থে ব্যবহার করে না। যা মানুষকে চিন্তা ভারাক্রান্ত করে, তাতেও নয়।

শুধু সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধিমূলক সংবাদের ক্ষেত্রেই তারা এই শব্দটি ব্যবহার করে। কিছু লোক মনে করেন, মূলত শব্দটির ব্যবহার সুখের বা দুঃখের উভয় প্রকার সংবাদেই ব্যবহৃত হয়। কেননা শব্দটির আসল অর্থ হচ্ছে, সুখের বা দুঃখের সংবাদ পাওয়ার পর শ্রোতার মুখমণ্ডলে যে পরিবর্তনটা লক্ষ্য করা যায়, তা। তবে তার অধিক ব্যবহার সুখদায়ক সংবাদে। এই ব্যবহার হচ্ছে শব্দটির বিশেষ ব্যবহার। আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِىْ بِاَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -

এবং আল্লাহ্ আদমকে সমস্ত (জিনিসের) নাম শিক্ষা দিলেন। পরে সেগুলো ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করেন এবং বলেন ঃ তোমরা সত্যবাদী হলে তোমরা এই জিনিসগুলোর নাম আমাকে জানিয়ে দাও।

'আল্লাহ্ সমস্ত নাম শিক্ষা দিলেন' অর্থ সমস্ত জিনিসের নাম। কেননা শব্দটি সাধারণ অর্থবোধক। 'পরে সেগুলো ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করলেন' বলে সেই জিনিসসমূহের অধস্তন বুঝিয়েছেন। হাদীসের বর্ণনায় তা-ই বলা হয়েছে। রুবাই ইবনে আনাস হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ আল্লাহ আদমকে সমস্ত

জিনিসের নাম শিক্ষা দিয়েছেন। শব্দের বাহ্যিক অর্থ-ও তা-ই বোঝায়। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আল্লাহ্ عَرَضَهُمْ বললেন কেন? এতে তো মনে হয় নামের জিনিসগুলো বিবেকবান জাতীয়। কেননা هُمْ শব্দটি তাদের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়, বিবেক-বুদ্ধিহীন জিনিস সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় না। এর জবাবে বলা যায়, মূলত বিবেকবান ও বিবেক-বুদ্ধিহীন সব জিনিসকেই তাতে শামিল করা হয়েছে। আরবী নিয়মে একে تَغْلِيْب 'একটির উপর অপরটিকে প্রাধান্য দান' বলা হয়। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِي عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ - (النور - ٤٥)

আল্লাহ্ সমস্ত জীব-জন্তুকে পানি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। পরে তাদের মধ্যে কেউ পেটের উপর ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে চলে, কেউ দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে চলে, আবার কেউ চলে চার পায়ের উপর ভর দিয়ে।

এতে বিবেকবান ও বিবেকহীন উভয় শ্রেণীর সৃষ্টিই শামিল রয়েছে; কিন্তু সকলকেই বিবেকবান পর্যায়ের ধরা হয়েছে।

## আদম ও আদম বংশের ভাষা

এ থেকে আরও বোঝা যায় যে, সমস্ত ভাষার মৌল নীতিসমূহ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত (تَوْقِيْف) আদম (আ)-এর জন্যে, যদিও তা বিভিন্ন। তিনিই তার অর্থ ও তাৎপর্য সহ আদমকে শিক্ষা দিয়েছেন। কেননা শুধু নামের কোন গুরুত্ব নেই, তার অর্থ জানা না থাকলে। এ থেকে জ্ঞান ও শিক্ষার মর্যাদাও প্রমাণিত হয়। কেননা আল্লাহ্ আদমকে ফেরেশতাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও অধিক মর্যাদাবান প্রমাণ করার লক্ষ্যেই তাকে সর্বাগ্রে সমস্ত জিনিসের নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন সে সবের যথার্থ অর্থ ও তাৎপর্য সহ। ফেরেশতাদেরও সে বিষয়ে অবহিত করেছেন। কিন্তু তারা তা থেকে সে জ্ঞান লাভ করতে পারেনি, যা আদাম লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে তারা আদমের শ্রেষ্ঠত্ব ও অধিক মর্যাদা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল।

অনেকের মতে আদম ও তাঁর সন্তানদের ভাষা নূহের তুফান পর্যন্ত এক ও অভিন্ন ছিল। আল্লাহ যখন সমস্ত বিশ্ববাসীকে তুফানে ডুবালেন, কেবল নূহের সঙ্গী-সাথীরাই বেঁচে থাকল, পরে নূহ (আ)-ও চলে গেলেন, তাঁর সেই সঙ্গী-সাথীরা বংশ বিস্তার করল, সংখ্যায় তারা বিপুল হয়ে গেল, তখন তারা ব্যাবিলনে একটি বাঁধ নির্মাণ করতে চাইল তুফান-বন্যা থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে। এ সময় আল্লাহ্ তাদের ভাষা পরস্পর সংমিশ্রিত করে সংশয়পূর্ণ করে দিলেন। ফলে তাদের প্রত্যেক জনগোষ্ঠি তার নিজের ভাষা ভুলে গেল। পরে আল্লাহ নতুন করে তাদেরকে শিক্ষা দিলেন সেই সেই ভাষা, যা নিয়ে

এক-একটি গোষ্ঠি সম্মুখে চলতে লাগল এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে নতুন করে বসতি স্থাপন করে নিজেদের ভাষার ব্যবহার ও উন্নয়ন সাধন করতে লাগল। অবশ্য অপর কিছু লোক এই ঐতিহাসিক তত্ত্ব মেনে নেননি। তাঁরা বলেন—বিবেক সমস্ত মানুষ গতকাল পর্যন্ত যে ভাষায় কথাবার্তা বলেছে, তা সমস্তই তারা একদিনের ব্যবধানে ভুলে যাবে, তা বিশ্বাসযোগ্য বা যুক্তিসম্মত কথা নয়, মূলত তারা সব ভাষাই জানতো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় পর্যন্ত। পরবর্তীতে তারা যখন আলাদা হয়ে গেল ও এক গোষ্ঠি থেকে অনেক দূরে অন্য গোষ্ঠির বসতি গড়ে উঠল, তখন তারা নিজ ভাষা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকল যে ভাষায় বর্তমানে তারা কথা বলছে, আর অন্যান্য ভাষার সাথে তারা সম্পর্কহীন হয়ে গেল। অথচ সেসব ভাষা তাদের অজানা বা অপরিচিত ছিল না, তাদের বংশধররা সেই সব ভাষার উত্তরাধিকার পায়নি বলে সমস্ত ভাষার সাথে সব আদম সন্তান সমভাবে অবহিত থাকেনি।

## আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে সিজদা করা

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا –

স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন আমরা ফেরেশতাদের বললাম ঃ তোমরা আদমের জন্যে সিজদা কর। পরে তারা সকলেই সিজদা করল।

শুবা কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, এই নির্দেশ পালনটা ছিল আল্লাহ্র জন্যে, আদমের উদ্দেশ্যে সিজদা করার মাধ্যমে তা পালিত হয়েছে। এই করিয়ে আল্লাহ আদকে সম্মানিত করেছেন।

মামর কাতাদাহ থেকে وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا 'তারা সকলে আদমের উদ্দেশে সিজদায় পড়ে গেল' আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, তাদের সম্মান প্রদর্শনের কাজটি এই সিজদা দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছিল। এ সিজদাটা আল্লাহ্র ইবাদত হওয়াও অসম্ভব নয়। যদিও তা ছিল আদমের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা। হযরত ইউসূফ (আ)-এর ভাই ও পরিবারবর্গ ইউসূফের প্রতি যে সিজদা করেছিল, তা-ও এ পর্যায়েরই কাজ ছিল। কেননা ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্যে জায়েয নয়, কিন্তু সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন জায়েয, যে তা পাওয়ার যোগ্য তার জন্যে এক ধরনের তাজীম হিসেবে।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে সিজদা তো আল্লাহ্র জন্যেই করা হয়েছিল, আদম ছিলেন তাদের জন্যে কিবলাস্বরূপ। কিন্তু এ কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তাহলে তাতে আদমের প্রতি মর্যাদা প্রদানের কোন ব্যাপার ছিল, তা প্রমাণিত হয় না। অথচ এখানে আদমের সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যেমন যে লোক হাম্দ পাওয়ার যোগ্য অধিকারী, তার জন্যে হাম্দ করা। তা তো প্রকৃত ব্যাপার, তা পরোক্ষ ব্যাপার বলার কোন উপায় নেই। যেমন, যদি বলা হয়, অমুকের চরিত্র প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয়। এরূপ বলা যায়, কেননা 'শব্দ' তো তার পর্যায়ে প্রকৃতই হবে।

উক্ত আয়াত থেকে এ-ও বোঝা যায় যে, সিজদা করার আদেশ করে আল্লাহ্ আদমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেই চেয়েছিলেন। তার মর্যাদা বৃদ্ধিই ছিল লক্ষ্য। ইবলীস তো সেই কারণেই বলেছিল ঃ

أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا- قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ -

(الاسرا : ٦١-٦٢)

আমি কি সিজদা করব তাকে, যাকে তুমি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছ ? তুমি কি লক্ষ্য করনি, এতে করে তুমি আমার উপর তাকে বেশি সম্মানিত করে দেবে ?

এই কথা বলে ইবলীস জানিয়ে দিয়েছিল যে, সে যে সিজদা করা থেকে বিরত থাকছে, তার কারণ হচ্ছে—আদমকে সিজদা করার জন্যে আল্লাহ্‌র এই আদেশ দ্বারা আদমকে অধিক মর্যাদা ও সম্মান দেয়া হবে। আদমকে কিবলার স্থানে দাঁড় করে সিজদাকারীদেরকে সিজদা করার আদেশ করা হলে তাতে আদমের কোন সম্মান বা মর্যাদার ব্যাপার হতো না। তাতে তো আদমের কোন ব্যাপার থাকত না, মর্যাদা দানের ব্যাপারও হতো না, যাতে করে ইবলীসের হিংসা হওয়ার কারণ হতো। যেমন কাবাকে কিবলা হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তার প্রতি মুখ করেই তো নামায পড়া ও সিজদা দেয়া হয়। তাতে কাবার কোন মর্যাদা হয় না।

এ-ও বলা হয়েছে যে, আদমের শরীয়াতে সৃষ্টির জন্যে সিজদা করা জায়েয ছিল। সম্ভবত সেই শরীয়াতী বিধান হযরত ইউসূফ (আ) পর্যন্ত কার্যকর ছিল।[১] ফলে তাদের মধ্যে সম্মান পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তিদের জন্যে সাধারণভাবেই সিজদা করা হতো। তার প্রতি সম্মান-মর্যাদা ও মাহাত্ম্য প্রদর্শনই হতো তার উদ্দেশ্য। যেমন 'মুসাফিহা' (করমর্দন) মুয়ানিকা গলায়-গলায় মেলানো। অথবা তা ছিল হস্ত চুম্বন পর্যায়ের কাজ। হস্ত চুম্বন জায়েয হওয়া সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যদিও তা অপছন্দ করার বর্ণনাও আছে। তবে সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের জন্যে সিজদা করা মনসূখ হয়ে গেছে হাদীস দ্বারা। হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা) জাবির (রা) ও আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَا يَنْبَغِىْ لِبَشَرٍ اَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ ، وَلَوْ صَلُحَ لِبَشَرٍ اَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ الْاَمْرَتِ الْمَرْأَةُ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا -

কোন ব্যক্তির উচিত নয় অপর ব্যক্তিকে সিজদা করা। এক ব্যক্তির তারই মত অপর ব্যক্তিকে সিজদা করা যদি ন্যায়সঙ্গত হতো, তাহলে আমি নিশ্চয়ই স্ত্রীকে হুকুম দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্যে। কেননা স্ত্রীর উপর স্বামীর তো অনেক বড় অধিকার রয়েছে।

---

১. কিন্তু আদমকে সিজদা করার এই ব্যাপারটি ছিল তাঁকে সৃষ্টি করার পরই। তখন কি আদমের কোন শরীয়াত ছিল ? শরীয়তের প্রশ্ন উঠতে পারে তাঁর দুনিয়ার জীবন শুরু করার পর। তার পূর্বে কোন শরীয়াত থাকার কথা নয়।—অনুবাদক

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاٰمِنُوْ بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُنُوْا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ –

এবং তোমরা ঈমান আন সেই কিতাবের প্রতি যা আমি নাযিল করেছি সেই কিতাবের সত্যতা ঘোষণাকারী হিসেবে, যা তোমাদের নিকট রয়েছে এবং তোমরাই তার প্রথম অস্বীকারকারী হবে না।

'কুফর' প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল অবস্থায় অত্যন্ত বীভৎস। সব মানুষকেই তা করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে প্রথম দিকে যারা কুফরী করে, পরবর্তী লোকেরা তারই অনুসরণ করে। এ কারণে প্রথম কুফরকারীর অপরাধ সর্বাধিক বিরাট। অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ – (العنكبوت -١٣)

এবং তারা অবশ্যই তাদের বোঝাসমূহ বহন করবে, বহন করবে তাদের বোঝার সাথে আরও অনেক বোঝা।

বলেছেন ঃ

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ج كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْفَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا – (المائده :٣٢)

এ কারণেই আমরা বনি ইসরাঈলীদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে লোক অন্য লোককে কোন মানুষ হত্যা বা বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ ছাড়া হত্যা করল, সে যেন সমস্ত মানুষকেই হত্যা করেছে।

নবী করীম (স)-এর এই কথাটিও বর্ণিত হয়েছে ঃ

اِنَّ عَلٰى اِبْنِ اٰدَمَ الْقَاتِلَ كِفْلًا مِنَ الْاِثْمِ فِىْ كُلِّ قَتِيْلٍ ظُلْمًا لِاَنَّهٗ اَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ –

অন্যায়-অকারণে যে হত্যাকাণ্ডই সঙ্ঘটিত হবে, তার গুনাহের একটা অংশ আদমের হত্যাকারী পুত্রের ভাগেও থাকবে। কেননা নরহত্যার প্রচলনকারী সে-ই প্রথম ব্যক্তি।

রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهٗ أَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ –

যে লোক কোন ভালো কাজের প্রচলন করে সে তার শুভ প্রতিফল পাবে তার নিজের কাজের, তার কাজের ও যে তা করবে—কিয়ামতের দিন পর্যন্ত।

হাদীসের শেষ অংশে রয়েছে খারাপ কাজের প্রচলনের কথা।

## নামাযের রুকূ

وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ –

তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকূকারীদের সাথে মিলিত হয়ে রুকূ কর।

এর অর্থ প্রচলিত নামায ও যাকাত হতে পারে, যা সকলেই জানে। কিংবা হতে পারে মোটামুটি সব নামায, সব দান-খয়রাত। তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। তবে এক্ষণে আমরা জানতে পেরেছি, এই আদেশ ফরয নামায ও ফরয যাকাত পর্যায়ের সব কিছুর জন্যে। আদেশ জারি হওয়ার সময়ের সব লোকই তা বুঝেছিলেন। সম্বোধন থেকে তা আরও জোরদার হয়েছে। অথবা তা ছিল মোটামুটি ধরনের কথা। পরে তার ব্যাখ্যাদান করা হয়েছে। ফলে সকলেরই জানা হয়ে গেছে। তবে আল্লাহ্‌র কথা وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ 'রুকূকারীদের সাথে একত্রিত হয়ে রুকূ কর' কথাটি থেকে নামাযে রুকূ করা ফরয প্রমাণিত হয়েছে।

কারো কারো মতে এখানে বিশেষভাবে রুকূর কথা বলা হয়েছে এজন্যে যে, আহলি কিতাব লোকদের নামাযে রুকূ ছিল না। তাই এখানে দৃঢ়তার সাথে রুকূ করতে বলা হয়েছে। আর এ-ও হতে পারে যে, রুকূ করার আদেশ দিয়ে মূল নামাযেরই হুকুম দেয়া হয়েছে, যেমন 'কুরআন থেকে যা পাঠ করা সহজ তাই পড়' বলে এবং 'ফজরের কুরআন, ফজরের কুরআনে ফেরেশতা উপস্থিত হয়' বলে মূল নামাযই বোঝানো হয়েছে। এই শেষোক্ত কথাটি ফজরের নামায বুঝিয়েছে। এতে করে দুধরনের ফায়দা পাওয়া গেল। একটি রুকূ—ফরয হওয়ার কথা জানা গেল। কেননা রুকূ নামাযে ফরয বলেই তা করতে বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় হল—নামাযীদের সাথে একত্রিত হয়ে অর্থাৎ জামা'আতে নামায পড়ার আদেশ। প্রশ্ন হতে পারে—আয়াতের শুরুতেই তো নামায কায়েম করার আদেশ দেয়া হয়েছে। তারপরে রুকূর আদেশ দিয়ে আবার সেই নামাযের কথাই বলা হবে—তা বাঞ্ছনীয় নয়। এর জবাব হচ্ছে, এরূপ বলা অসঙ্গত নয়। কেননা শুরুতে যে নামাযের কথা বলা হয়েছে, তা হল বিধিবদ্ধ নামায। এ হচ্ছে রুকূ সহ যাবতীয় ফরয আদায় সহকারে নামায। তাছাড়া আহলি কিতাবের নামায যেহেতু রুকূ বিহীন প্রথমোক্ত নামায কায়েমের হুকুমে সেই নামায বুঝবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই শেষ কথাটি দ্বারা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আহলি কিতাবের নামায পড়তে বলা হয়নি, বলা হয়েছে সেই নামায পড়তে, যাতে রুকূ দিতে হয়।

## সবর ও নামায

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةَ –

তোমরা সবর ও নামায দ্বারা সাহায্য চাও।

এর অর্থ, আল্লাহ যা যা ফরয করেছেন, সেই সব ফরয অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে আদায় করতে থাক। আর তাঁর হুকুম অমান্য করা থেকে বিরত থাক। ফরয নামায কার্যত আদায় কর।

সাঈদ কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ এই সবর ও নামায—দুটিই আল্লাহ্র ইবাদত ও আনুগত্যকরণে বিশেষ সহায়ক। আল্লাহ্র নাফরমানী পরিহার এবং তাঁর ফরযসমূহ আদায় করায় নামায কাজটি বিশেষ আনুকূল্য ও মাধুর্য দেয়। যেমন বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ - (العنكبوت : ٤٥)

নিশ্চয়ই নামায নির্লজ্জতা-অশ্লীলতা এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখে।

এ-ও হতে পারে যে, এই সবর ও নামায বলতে নফল নামায বুঝিয়েছেন। ফরয নামায নয়। তা হচ্ছে, নফল রোযা ও নফল নামায। কিন্তু বাহ্যত মনে হয়, ফরয নামাযই বুঝিয়েছেন। কেননা যে-বিষয়ে আদেশ হয়েছে, সেই কাজটাই ফরয। সেদিক থেকে ফিরে অন্য অর্থ গ্রহণ করা কেবল তখনই সম্ভব, যদি তার দলীল পাওয়া যায়।

আল্লাহ্র কথা ঃ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَاةٌ ঃ 'এবং তা নিঃসন্দেহে বড় কাজ'।

পূর্বে দুটি জিনিস থাকা সত্ত্বেও এখানে শুধু নামাযের কথা বলা হয়েছে। কুরআনের ভাষায় এরূপ হতে পারে। যেমন কুরআনের এই কথাটিতে রয়েছে ঃ

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ - (التوبه : ٦٢)

আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই সবচেয়ে বেশী অধিকারসম্পন্ন যে লোকেরা তাঁকেই রাজী করবে।

বলেছেন ঃ

وَاِذَا رَاَوْتِجَارَةً اَوْلَهْوَ ن ا انْفَضُّوْا اِلَيْهَا - (اجمعة - ١١)

এবং লোকেরা যখন ব্যবসা কিংবা খেল-তামাশার ব্যাপার দেখল, তখন তারা সেদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এ কয়টি আয়াতে দুটি জিনিসের উল্লেখের পর ইঙ্গিত করা হয়েছে একটি জিনিসের দিকেই অর্থাৎ দ্বিবচনের পরিবর্তে একবচনের সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ -

জালিমদেরকে যে কথা বলা হয়েছিল, তারা সেই কথাটিকে বদলে দিয়েছে।

যিক্র ও কথাবার্তা, যা আল্লাহ্র নিকট থেকে এসেছে তা পরিবর্তন করা ও তদস্থলে অন্য কিছু বসানো জায়েয নয়। কেননা তা আল্লাহ্র তরফ থেকে নির্ধারিত। উপরোক্ত আয়াতকে এই কথার দলীল হিসেবে পেশ করা হয়েছে, আমাদের বিপরীত মতের লোকেরাও আমাদের মতের বিরুদ্ধে এই আয়তটিকে দলীল হিসেবে পেশ করেছে।

কেননা আমরা তো তাজীম ও তাসবীহ্ শব্দ বলেও (অর্থাৎ আল্লাহু আযম, সুবহান-আল্লাহ বলে,) নামাযের তাহ্‌রীমা বাঁধা জায়েয মনে করি, ফারসী ভাষায় কুরআন পাঠও জায়েয ইমাম আবূ হানীফার মতে।[১] মালিক বানিয়ে দেয়া বা এই ধরনের শব্দ বললেও হেবা বা বিক্রয় জায়েয বলে আমাদের মত। এতে তো মূল ব্যবহার্য শব্দটি ও ভাষা বদলে দেয়া হয়। অথচ উপরোদ্ধৃত আয়াতে তা নিষিদ্ধ হয়েছে।

আমরা বলব—না, এই প্রশ্ন আমাদের উপর আসে না। কেননা উক্ত আয়াতের কথা হল—যেসব লোকের জন্যে কথাটি বলা হয়েছিল, সেই মূল কথাটিকেই তারা বদলের দিয়েছিল, সেই মূল কথাটিকেই তারা বদলে দিয়েছিল, ভিন্ন কথা বলে দিয়েছিল। আমরা সেরূপ করিনি।

আল্লাহ্ কথা ঃ اُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ 'তোমরা দরজা দিয়ে প্রবেশ কর সিজদাকারী (বিনীত-অবনত) হয়ে এবং বল ক্ষমা...ক্ষমা।' অর্থাৎ আমাদের অপরাধ আমাদের থেকে দূর করে দাও। হাসান ও কাতাদাহ বলেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই আয়াতটির তাফসীরে বলেছেন ঃ 'তাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকট মাগফিরাত চাইতে বলা হয়েছিল।'

তাঁর এই কথাটিও বর্ণিত হয়েছে, তাদের এই কথা বলার আদেশ করা হয়েছিল যে, এই কথাটি সত্য। যেমন তোমাদের বলা হয়েছে। ইকরামা বলেছেন ঃ তাদেরকে 'লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহ্' বলার আদেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা বলেছিল, লাল লাল গম, যব ঠাট্টাচ্ছলে বা ভুলে যাওয়ার দরুন। ইবনে আব্বাস সহ কয়েকজন সাহাবী ও হাসান বসরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, ওদেরকে যে শব্দ বলার আদেশ করা হয়েছিল সেখানে বিপরীত অর্থের শব্দ তারা বলেছিল। এই বদল করার দরুন তাদের নিন্দা করা হয়েছে এ আয়াতে। কেননা তাদেরকে তওবা করার ও মাগফিরাত চাওয়ার জন্যে আদেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা তার বিপরীতটা করার উপরই অবিচল হয়ে থাকল। কিন্তু যারা অর্থ ঠিক রেখে শব্দের পরিবর্তন করেছিল মাত্র, উক্ত আয়াত তাদের সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। উক্ত আয়াত তো সেই লোকদের অবস্থার বর্ণনা দিয়েছে যারা শব্দ ও অর্থ উভয়ই বদলে দিয়েছিল। আর এই কাজটাই ছিল তাদের নিন্দা করার মূল কারণ। অতএব যারাই এ কাজে শরীক তারা নিন্দিত হওয়ার দিক দিয়েও শরীক। যেমন কাজ, তেমনই তার ফল। কিন্তু যারা শব্দের পরিবর্তন করেও মূল অর্থ বহাল রেখেছে, আয়াতটি তাদেরকে আওতার মধ্যে নেয়নি।

তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেসব লোক, যারা 'মুত'আ' বিয়ে জায়েয বলে মনে করে। অথচ আল্লাহ্‌র কথা হচ্ছে ঃ

اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ -

তাদের স্ত্রীগণ, কিংবা তাদের দাসীগণ ছাড়া ....

---

১. কিন্তু মশহূর কথা এই যে, ইমাম আবূ হানীফা পরবর্তীতে এটা প্রত্যাহার করেছেন—অনুবাদক

অর্থাৎ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা জায়েয হবে কেবল স্ত্রীদের সাথে এবং দাসীদের সাথে। যারা المتعة। শব্দের সুযোগে তাকে মুবাহ মনে করে, অথচ نكاح 'বিবাহ' ও 'দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্ত অর্থাৎ দাসী এই কথা দুটি শব্দ ও অর্থ—উভয় দিক দিয়েই 'মুত্'আ' থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। উক্ত আয়াতে এ ধরনের পরিবর্তন করাকে নিন্দনীয় কাজ বলা হয়েছে।

## গাভী যবেহ্ প্রসঙ্গে

আল্লাহ্র কথা ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً قَالُوْا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا –

আল্লাহ্ তোমাদেরকে গাভী যবেহ করার আদেশ করছেন। তারা বলত ঃ তুমি কি আমাদেরকে বিদ্রূপ করছ?

এ পর্যায়ের শেষ আয়াত হচ্ছে ঃ

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا – وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ – فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ......

এবং যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করলে, তখন তোমরা হত্যাকারীর সন্ধানে আন্দাজ অনুমানে লিপ্ত হয়েছিলে। কিন্তু তোমরা যা গোপন করতে চেয়েছিলে আল্লাহ তা প্রকাশে ইচ্ছুক ছিলেন। তখন আমরা বললাম, তোমরা ওটির কিছু অংশ দিয়ে অপর অংশের উপর আঘাত দাও।

আবূ বকর বলেছেন, এসব আয়াতে এবং নিহত ব্যক্তির কাহিনী ও গাভী যবেহ করা পর্যায়ে আর যা কিছু বলা হয়েছে, তা কয়েক ধরনের আইন সম্পন্ন এবং মহান তাৎপর্যের প্রমাণ। প্রথমত, আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমরা যখন এক ব্যক্তিকে হত্যা করলে' তিলাওয়াতের দিক দিয়ে শেষে উল্লিখিত হলেও তাৎপর্যগতভাবে সবকিছুর আগে উল্লেখ্য। গাভী সংক্রান্ত কথার এটাই সূচনা। কেননা গাভী যাবেহ করার আদেশ তো এই নরহত্যার ঘটনার কারণেই দেয়া হয়েছিল। এর আরও দুই দিকের উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হত্যার উল্লেখ তিলাওয়াতের দিক দিয়ে পেছনে হলেও নাযিল হওয়ার দিক দিয়ে তা অগ্রবর্তী। আর দ্বিতীয় হচ্ছে—তা নাযিল হওয়ার বিন্যাস তিলাওয়াতের বিন্যাস অনুরূপই, যদিও তাৎপর্যগতভাবে তা অগ্রবর্তী। কেননা واو অক্ষরটি পরম্পরা বা বিন্যাস বোঝায় না। যেমন যদি কেউ বলে স্মরণ কর, আমি তখন যায়দকে এক হাজার দিলাম যখন সে আমার ঘর নির্মাণ করেছিল। এতে মূলত ঘর নির্মাণের কাজটি অর্থ দেয়ার পূর্বে সঙ্ঘটিত হয়েছে। গাভীর উল্লেখ আগে নাযিল হয়েছে তার প্রমাণ হচ্ছে ঃ আমরা বললাম ওর কতকাংশ দিয়ে ওটিকে আঘাত দাও ...... আল্লাহ্র এই কথাটি। এ থেকে বোঝা গেল, গাভীর উল্লেখ এর পূর্বে হয়েছে। এই দিকেই সর্বনাম ইঙ্গিত করছে। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে নূহ (আ) সম্পর্কে বন্যার উল্লেখ ও তার নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কথার পর বলা আল্লাহ্র কথা ঃ

قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ ط وَمَآ اٰمَنَ مَعَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلٌ – (هود : ٤٠)

আমরা বললাম ঃ নৌকায় বোঝাই দাও প্রত্যেকটি জিনিসের দুই জোড়া করে এবং পরিবারবর্গকে। তবে যার সম্পর্কে পূর্বেই সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে তাকে ছাড়া। আর তাতে আরোহী বানাও যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে। তবে তাঁর প্রতি খুব কম সংখ্যক লোকই ঈমান এনেছে।

একথা জানা-ই আছে যে, বন্যায় লোকদের ধ্বংস হওয়ার পূর্বে এই কথা বলা হয়েছিল। কেননা কথার অগ্রবর্তিতা ও পশ্চাদবর্তিতা واو অক্ষর দ্বারা বলা হলেই চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়ে যাওয়া জরুরী নয়।

আল্লাহ্র কথা ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً –

আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করছেন যে, তোমরা একটি গাভী যবেহ কর।

এ থেকে বোঝা গেল, অজ্ঞাত-অপরিচিত ও অনির্দিষ্ট যে-কোন একটি গাভী যবেহ করার আদেশ দেয়া বৈধ কাজ। তাতে আদিষ্ট ব্যক্তি স্বাধীনভাবে যে কোন একটা গাভী যবেহ করলেই আদেশ পালন হয়ে যায়। এখানে দুই পর্যায়ের কথা রয়েছে। এ পর্যায়—কথাটি সাধারণ আর দ্বিতীয় পর্যায়, কথাটি অনির্দিষ্ট, প্রত্যেক মতের সমর্থনে দলীল পেশ করা হয়েছে। যাদের মতে কথাটি সাধারণ ও অনির্দিষ্ট, তাদের দলীল হচ্ছে, কথাটি তো নিঃশর্ত এসেছে। ফলে এ এক বাধ্যতামূলক আদেশ, তা একক সমূহের প্রত্যেকের জন্যেই পালন করা বাধ্যতামূলক। ওরা যখন বারবার আল্লাহ্র নবীর নিকট এসে গাভী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে থাকল, তখন আল্লাহও তাদের প্রতি আদেশটি কড়া ও কঠোর করে তুললেন। বারবার নবীকে প্রশ্ন করার জন্যে আল্লাহ ওদের নিন্দা করেছেন। বলেছেন ঃ

فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ –

শেষ পর্যন্ত ওরা গাভী যবেহ করল, যদিও ওরা তা করতে পারছিল না।

হাসান বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

والذى نفسُ محمدٍ بيده لواعترضُوادنى بَقَرةٍ فَذَبَحُوها لَاَجْزَت عَنْهُمْ ولكنّهم شدّدوا فَشَدّد الله عليهم –

যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, ওরা যদি যে কোন একটি গাভী ধরে এনে যবেহ করে দিত, তা হলে তা-ই ওদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু ওরা কঠোরতা করেছে, আল্লাহ্ও ওদের প্রতি কঠোরতা আরোপ করেছেন।

এরূপ একটি বর্ণনা ইবনে আব্বাস, উবায়দা, আবুল আলীয়া, হাসান ও মুজাহিদ থেকেও বর্ণিত ও উদ্ধৃত হয়েছে।

যারা এটাকে সাধারণ আদেশ মনে করেন না, তাঁরা প্রমাণ হিসেবে বলেছেন, বারবার নবীকে প্রশ্ন করার শুরুতে আল্লাহ্ তাদের প্রতি ভর্ৎসনা করেন নি। তোমরা যেমন বলছ, প্রথম আদেশ কার্যকর করাই যদি তাদের জন্যে বাধ্যতামূলক হতো তা হলে প্রশ্ন করার শুরুতেই অস্বীকৃতি ও অসম্মতি প্রকাশ পেতো।

কিন্তু এদের এই কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তাদের প্রতি তো অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছেই। প্রথমত, তাদের কাজটিকে ক্রমশ শক্ত করে দেয়া হয়েছে। এ-ও এক ধরনের অসন্তুষ্টি প্রকাশ। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ - (النساء : ١٦٠)

ইয়াহূদী হয়ে যাওয়া লোকদের জুলুমের কারণে আমরা তাদের প্রতি হারাম করেছিলাম সেসব পাক-পবিত্র খাদ্য যা তাদের জন্যে হালাল করা হয়েছিল।

আর দ্বিতীয় হচ্ছে আল্লাহ্র কথা ঃ 'ওরা করতে চায়নি .......'। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শুরুতে ওরা আদেশ পালন এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। কেননা ওদের তো কর্তব্য ছিল আদেশ পাওয়া মাত্রই দ্রুত ও অবিলম্বে গাভী যবেহ কাজে চলে যাওয়া। এ কারণে আয়াতটি থকে কতিপয় তাৎপর্য পাওয়া গেছে।

একটি, শব্দের সাধারণত্ব গণ্য করাই কর্তব্য, যখন তা করা সম্ভব। দ্বিতীয়—আদেশটি ছিল তাৎক্ষণিকভাবে পালনীয়। আর আদিষ্টের কর্তব্য ছিল সাধ্যানুযায়ী অবিলম্বে তা পালন করা, যতক্ষণে বিলম্ব করা বৈধ হওয়ার দলীল পাওয়া না যায়। তৃতীয় —গুণ-পরিচিতির অনুপস্থিতি সহকারে কোন কাজের আদেশ করা অসঙ্গত নয়। তবে উল্লেখ করা নামের কাজটি না পাওয়া পর্যন্ত তা পালনে বিলম্ব করা আদিষ্টের পক্ষে অসঙ্গত নয়। চতুর্থ—আদেশ পালন অবশ্য কর্তব্য। তাকে অবশ্য কর্তব্য মনে না করার দলীল পাওয়া গেলে অন্য কথা। কেননা আলোচ্য শর্তহীন আদেশ এড়িয়ে গেলে তবেই তা নিন্দনীয় হতে পারে, কোনরূপ ভর্ৎসনার উল্লেখ ব্যতিরেকে। আর পঞ্চম —আদেশ পালনে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কাজটি করার পূর্বে তা নাকচ করা অসঙ্গত নয়। কেননা গাভীর গুণ বর্ণনায় একটির পর একটির উল্লেখ করা হয়েছে পূর্বের গুণটি নাকচ করে। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ

আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা একটি গাভী যবেহ্ কর।

যে-কোন একটি গাভী যবেহ করারই দাবি করছিল। তারা যে-কোন ধরনের গাভী যবেহ্ করলেই আদেশ পালন হয়ে যেতো, আর তা করতে তারা সক্ষম ছিল। কিন্তু তারা যখন বলল ঃ

اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَاهِيَ -

আমাদের জন্যে তোমার রব্বকে বল, গাভীটি কি রকম তা তিনি বলে দেবেন।

তখন আল্লাহ্‌র বললেন ঃ

اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ- عَوَانٌ بَيْنَ ذٰلِكَ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ.

গাভীটি বেশী বয়স্ক নয়, আর এমন যে, এখনও বাচ্চা দেয়নি, বরং এ দুয়ের মাঝে মধ্যম বয়সের। অতএব তোমাদেরকে যে কাজ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, তাই কর।

গাভী যবেহ করা সংক্রান্ত প্রথম আদেশে যে ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা ছিল, এ কথা দ্বারা তা নাকচ হয়ে গেল। কেননা এ আদেশে গাভীর ব্যাপারে বিশেষ কয়েকটি গুণের শর্ত আরোপিত হয়েছে, যা প্রথম আদেশে ছিল না। এখন তো বর্ণিত গুণের গাভী যবেহ করতে তারা বাধ্য। এতে বলা হয়েছে ঃ

তোমাদেরকে যে ধরনের গাভী যবেহ করতে বলা হয়েছে, তোমরা তাই কর। তার বর্ণ বা অবস্থা যা-ই হোক না কেন। তা চাষ কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকুক আর না-ই থাকুক।

কিন্তু লোকেরা বললো ঃ

اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا -

হে নবী, আপনি আমাদের জন্যে আপনার রব্ব-এর নিকট দো'আ করুন, তিনি যেন আমাদেরকে গাভীর বর্ণনাটা কি, তা বলে দেন।

পূর্ববর্তী আদেশ পর্যন্ত বর্ণের ব্যাপারে যে স্বাধীনতা ছিল, যে কোন বর্ণের গাভী যবেহ করলেই আদেশ পালন হয়ে যেতো, তা এই কথায় নাকচ হয়ে গেল। অবশ্য এখনও অন্য দিকগুলোতে স্বাধীনতা অবশিষ্ট রয়ে গেছে। তা-ও নাকচ করবার জন্যে তারা যখন আবার এলো, বর্ণিত গুণের গাভী যবেহ করার হুকুম দেয়া হল, তখন তা করাই ফরয হয়ে দাঁড়াল দৃঢ়ভাবে। এতে কষ্ট বেড়ে গেল, দায়িত্ব কঠিন হয়ে গেল। মনসূখ বা নাকচ হওয়া পর্যায়ে এই যা কিছু আমরা বলছি, এ থেকে বোঝা যায় যে, কোন হুকুম চূড়ান্তভাবে স্থির হওয়ার পর মূল হুকুমে কিছু অতিরিক্ত কথা এলে পূর্ববর্তী কথা নাকচ হয়ে যায়। আর লোকদের বারবার ফিরে এসে নতুন করে গাভীর পরিচিত জিজ্ঞাসা করায় সেই বারবারই পরবর্তী কথার উপর বাড়তি কথা বলা হয়েছে। ফলে পূর্ববর্তী কথা মনসূখ হয়ে যায় এবং পরবর্তী কথা চূড়ান্ত হয়ে দাঁড়ায়। এই দিকের উপর গুরুত্ব দিয়ে কিছু লোক এই যুক্তি দেখিয়েছেন যে, কোন ফরয আদায় করার নির্দিষ্ট সময় আসার পূর্বেই তো মনসূখ করা জায়েয। কেননা একথা জানা ছিল যে, লোকদের উপর শুরুতে একটি নির্দিষ্ট গাভী যবেহ করাই ফরয ছিল। কিন্তু তা কার্যত করার পূর্বেই তা মনসূখ হয়ে যায়।

কিন্তু এই যুক্তি প্রদান ভুল। কেননা উল্লিখিত প্রত্যেকটি হুকুম পালন আদেশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফরয হয়ে গিয়েছিল। প্রথম সম্ভাব্য অবস্থায় সেটাই তাদের উপর দৃঢ় স্থিত

ফরয ছিল। কিন্তু কাজ করার পূর্বেই তা মনসূখ করা হয়। ফলে সেটি দলীল হিসেবে ধরা যায় না এবং বলা যায় না যে, কাজটি করার সময় আসার পূর্বে তা মনসূখ করা জায়েয। ফিকাহ্র উসূল-এর গ্রন্থে এ পর্যায়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে।

ষষ্ঠ, আল্লাহ্র কথা ঃ বেশী বয়সের নয়, নয় নাবালিকা, বরং এ দুয়ের মধ্যবর্তী বয়সের .... এই কথা থেকে শরীয়াতের বিধানে ইজতিহাদ করা ও অগ্রবর্তী ধারণা প্রয়োগ করা জায়েয বলে প্রমাণিত হয়। কেননা গাভীটি বেশী বয়সের, না কম বয়সের, তা ইজতিহাদ ছাড়া অন্য কোনভাবে জানা যেতে পারে না।

সপ্তম, অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে বিপরীত হওয়া জায়েয হওয়া সত্ত্বেও বাহ্যিক দিককে ব্যবহার করা। আল্লাহ্র কথা ঃ مُسَلَّمَةٌ لاشِيَةَ فِيْهَا দাগ কলংকমুক্ত, বর্ণের বিকৃতি নেই তাতে।

এই কথাটির প্রকৃত অবস্থার দিক দিয়ে আমরা জানতে পারি না। শুধু বাহ্যিকভাবেই আমরা এ বিষয়ে জানতে পারি। তা সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে সেটির মধ্যে কোন ত্রুটি কমতি হওয়াটা একেবারে অসম্ভব নয়।

অষ্টম, সর্বশেষে লোকেরা বলেছিল ঃ

وَاِنَّا اِنْ شَاءَاللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ –

এবারে আমরা আল্লাহ চাইলে সঠিকভাবে কাজটা করতে পারব।

এই কথায় লোকেরা সংবাদটিকে আল্লাহ্র ইচ্ছার সাথে যুক্ত করেছে—'ইনশা আল্লাহ্' বলেছে। ফলে পরে আবার তাদের ফিরে এসে নতুন করে দো'আ করার প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকল না। যা করতে বলা হয়েছে, তা করতে তারা এক্ষণে সক্ষম হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এ সময় তারা যদি ইনশা আল্লাহ না বলত, তা হলে তারা কখনই সঠিকভাবে কাজটি করতে পারত না। তাদের মধ্যে মন্দ অবস্থা চিরস্থায়ী হয়ে যেত। আল্লাহ্র এ কথাটিও সেই পর্যায়ের وَمَاكَادُوْا يَفْعَلُوْنَ 'ওরা আসলে এ কাজটি করবার মত অবস্থায় ছিল না।' একথা বলে আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ভবিষ্যতের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন সংবাদ দেয়ার সময় 'ইনশা আল্লাহ্' অবশ্যই বলতে হবে। তাহলে আল্লাহ্র মাশিয়াত' (সিদ্ধান্ত) পাওয়া যাবে। অন্য স্থানেও আল্লাহ্ আমাদেরকে এই কথা জানিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন ঃ

وَلَاتَقُوْلَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا – اِلَّااَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ

(الكهف : ٢٣ –٢٤)

আমি আগামীকাল এই কাজ করব, এরূপ কথা তোমরা বলো না। বরং বল ঃ যদি আল্লাহ চান তাহলে .....

এরূপ বলায় আল্লাহ্র সাহায্য চাওয়া হয়, কাজটির সম্পূর্ণতা আল্লাহ্র উপর ছেড়ে

দেয়া হয়, তাঁর অসীম কুদরত এবং ইচ্ছার কার্যকরতা স্বীকার করা হয়। প্রকারান্তরে বলা হয় যে, কাজের প্রকৃত মালিক তো আল্লাহ্‌, ব্যবস্থাপক একমাত্র তিনি-ই।

নবম, আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ –

বলল, তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছ ? বললে ঃ আমি জাহিল লোকদের মধ্যে গণ্য হওয়া থেকে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্‌ চাই।

আয়াতটি থেকে বোঝা যায়, ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী এক ধরনের মূর্খতার মধ্যে নিমজ্জিত। উক্ত কথাটিতে মূসা (আ) ঠাট্টাকারী হওয়াকে অস্বীকার করে বললেন, আমি মূর্খতার মধ্যে ডুবে নেই। এ থেকে একথাও বোঝা যায় যে, দ্বীনি ব্যাপারটি লয়ে ঠাট্টা -বিদ্রূপ করা অন্যতম কবীরা—অত্যন্ত বড় গুনাহ্‌। যদি তা না হতো, তাহলে মূসা (আ) মূর্খতার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া থেকে এভাবে পানাহ চাইতেন না।

মুহাম্মাদ ইবনে মুসায়েব উল্লেখ করেছেন, তিনি উবায়দুল্লাহ ইবনে আল-হাসান-আল আনবরী আল-কাযীর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি পশমের একটা জুব্বা পরিহিত ছিলেন। উবায়দুল্লাহ ছিলেন খুব ঠাট্টা-মশকরা করা লোক। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পরনের জুব্বাটি ভেড়ার চামড়ার তৈরী, না ছাগলের চামড়ার ? আমি তাঁকে বললাম ঃ আপনি মূর্খতা দেখাবেন না, আল্লাহ্‌ আপনাকে বাঁচিয়ে রাখুন। তিনি বললেন ঃ আমি মূর্খতার কারণেই হাসি-ঠাট্টা করছি। তখন আমি উক্ত আয়াত পাঠ করলাম। অতঃপর তিনি এই কথা বাদ দিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, যার বাহ্যিক দিকে কুফরী দেখতেন, মূসা (আ) তাকে হত্যা করতে অভ্যস্ত ছিলেন না। মূলত তিনি আদিষ্ট ছিলেন লোকদের বাহ্যিক কথা গণ্য করার জন্যে। কেননা আল্লাহ্‌র নবীকে তারা বললে ঃ 'আপনি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছেন; এ কথাটি কুফরী। এ কথাটি ঠিক সেই কথার মতই, যেমন তারা হযরত মূসা (আ)-কে বলেছিল ঃ

اِجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ – (الاعراف : ١٣٨)

আমাদের জন্যে একটি 'ইলাহ' বানাও যেমন ওদের বহু ইলাহ রয়েছে।

অবশ্য তাদের এই কুফরীর দরুন তাদের স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রয়োজন দেখা দেয়নি। হযরত মূসা (আ) তা করতে তাদেরকে আদেশ করেন নি। তাদের সাথে তাদের স্ত্রীদের বিবাহ বহাল রাখার কথাও বলা হয়নি।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ –

তোমরা যা গোপন রাখছ, আল্লাহ তা অবশ্যই বের করবেন।

এ থেকে বোঝা যায়, বান্দা ভালো বা মন্দ যা-ই গোপন করে, তা তারা যতদিন-ই গোপন রাখুক, আল্লাহ্ একদিন-না-একদিন তা অবশ্যই প্রকাশ করাবেন। তখন তা আর গোপন থাকবে না। রাসূলে করীম (স) থেকেও এ পর্যায়ের একটি বর্ণনা এসেছে। তিনি বলেছেন ঃ

انَّ عَبْدًا لَوْ اَطَاعَ اللّٰهَ مِنْ وَرَاءِ سَبْعِيْنَ حِجَابًا لَاَظْهَرَ اللّٰهُ لَهُ ذَلِكَ عَلٰى اَلْسِنَةِ النَّاسِ وَكَذَلِكَ الْمَعْصِيَةُ -

বান্দা যদি সত্তরটি পর্দার আড়ালে থেকেও আল্লাহ্র বন্দেগীর কোন কাজ করে তা হলেও আল্লাহ্ তা জনগণের মুখে মুখে প্রকাশ করে দেবেন। গুনাহ্-নাফরমানীর ব্যাপারও তেমনি।

বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ মূসা (আ)-এর প্রতি ওহী পাঠালেন ঃ 'আপনি বনূ ইসরাইলীদেরকে তাদের নেক আমল আমার জন্যে গোপন করতে বলুন। জানিয়ে দিন, তা প্রকাশ করার দায়িত্ব আমার।' আল্লাহ্র 'তোমরা যা গোপন কর, আল্লাহ তা অবশ্যই প্রকাশ করবেন', কথাটি সার্বিক ও সাধারণ (common)। কিন্তু তার তাৎপর্য বিশেষ ও নির্দিষ্ট। কেননা তারা সকলেই নির্দিষ্টভাবে হত্যাকারীকে জানত না। এ কারণে হত্যাকারী সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতের পার্থক্য দেখা দেয়। আল্লাহ্র উক্ত কথাটি সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রেও সাধারণ হতে পারে। কেননা কথাটি মূলত ভবিষ্যৎ পর্যায়ের। আর তাদের ও অন্যদের ব্যাপারে তা সাধারণ কথা। এই কাহিনী পর্যায়ে আমরা যা কিছু বলেছি তাছাড়া আরও একটি কথা নিহিত রয়েছে। তা হচ্ছে নিহত ব্যক্তির মীরাস থেকে হত্যাকারীর বঞ্চিত হওয়া। আবূ আইয়ূব ইবনে সিরীন উবায়দাতা-আস-সালমানী সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ বনূ ইসরাইলী বংশের এক ব্যক্তির একজন নিকটাত্মীয় ছিল, সে ছিল তার উত্তরাধিকারী। সে তাকে হত্যা করল তার উত্তরাধিকার আগেই দখল করার মতলবে। পরে নিহত ব্যক্তির লাশ অন্য লোকদের বাড়ির দরজায় রেখে দিল, এরপর গাভী সংক্রান্ত উক্ত কাহিনীর উল্লেখ করল। তারপর উল্লেখ করেছে যে, হত্যাকারী তার উত্তরাধিকার পায়নি।

## হত্যাকারীর মীরাস প্রাপ্তি

হত্যাকারীর মীরাস প্রাপ্তি পর্যায়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। উমর, আলী, ইবনে আব্বাস (রা), সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকে বর্ণিত হয়েছে—হত্যাকারী মীরাস পাবে না। সে হত্যা ইচ্ছাপূর্বক হোক, কি ভুলবশত। নিহতের দীয়ত থেকেও কোন অংশ পাবে না। তার অন্যান্য মাল থেকেও নয়। ইমাম আবূ হানীফা, সওরী, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ ও জুফর এই মত ঘোষণা করেছেন। তবে হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন ঃ হত্যাকারী নাবালেগ বালক বা পাগল হলে সে মীরাস পাবে। উস্মান আল-বত্তী বলেছেন, ভুলবশত যে হত্যা করেছে, সে মীরাস পাবে। ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকরী পাবে না। ইবনে শাবরামাতা বলেছেন, ভুলবশত হত্যাকারী ও মীরাস পাবে না। ইবনে ওহাব ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা

করেছেন ঃ ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারী নিহতের দীয়ত থেকেও তার ধন-মাল থেকে মীরাস বাবদ কিছুই পাবে না। আর যদি ভুলবশত হত্যা করে, তার মূল সম্পত্তির মীরাস পাবে; কিন্তু তার বাবত প্রাপ্ত দীয়ত থেকে কিছুই পাবে না। হাসান বসরী, মুজাহিদ, জুহরী থেকেও এরূপ মত পাওয়া গেছে। ইমাম আওজায়ীর মতও তাই। আল-মুজানী ইমাম শাফিয়ীর এই মত বর্ণনা করেছেন, বিদ্রোহী যদি ন্যায়পরায়ণকে হত্যা করে কিংবা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি যদি বিদ্রোহীকে হত্যা করে, তাহলে তারা পরস্পরের মীরাস পাবে না। কেননা তারা দুজন-ই হত্যাকারী।

আবূ বকর বলেছেন, ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারী বয়স্ক-সুস্থ বিবেক সম্পন্ন হলে এবং না-হক্ হত্যা করলে সে নিহত ব্যক্তির মীরাস পাবে না, এ ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদ্‌দের মধ্যে কোনই মতপার্থক্য নেই। ভুলবশত হত্যাকারীর ব্যাপারে বিভিন্ন দিক দিয়ে মতের পার্থক্য হয়েছে। সে দিকসমূহ ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

আবদুল বাকী, আহ্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আম্বামাতা ইবনে লকীত-আজ্জরী-আলী ইবনে হাজার-ইসমাঈল ইবনে আইয়্যাশ ইবনে জুরাইজ আল-মুসান্না-ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাইদ-আমর ইবন শুয়াইব তাঁর পিতা-তাঁর দাদা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيْرَاثِ شَيْءٌ 'হত্যাকারীর জন্যে মীরাসের কিছুই নেই'।

আবদুল বাকী মূসা ইবনে জাকারিয়া আত-তস্তুরী সুলায়মান ইবনে দাউদ-হিফ্চ ইবনে গিয়াস আল হাজ্জাজ-আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতা-তাঁর দাদা-উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ 'হত্যাকারীর জন্যে কোন মীরাস নেই'। লাইস ইসহাক ইবনে আবদিল্লাহ্ ইবনে আবূ ফরওয়াতা-জুহরী-হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান-আবূ হুরায়রাতা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলের করীম (স) বলেছেন ঃ اَلْقَاتِلُ لاَيَرِثُ হত্যাকারী উত্তরাধিকারী হয় না।

ইয়াযীদ ইবনে হারুন মুহাম্মাদ ইবনে রাশেদ-মক্হুল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْقَاتِلُ عَمَدًا لاَيَرِثُ مِنْ اَخِيْهِ وَلاَمِنْ ذِىْ قَرَابَتِهِ شَيْئًا وَيَرِثُ اَقْرَبُ النَّاسِ اِلَيْهِ نَسَبًا بَعْدَ الْقَاتِلِ ـ

ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারী তার ভাইর ও নিকটাত্মীয়ের মীরাস পাবে না। তখন নিহতের বংশীয় নিকটবর্তী লোকেরা হত্যাকারী বাদে ওয়ারিস হবে।

হিচ্ন ইবনে মাইসারাতা আবদুর রহমান ইবনে হারমালাতা-আদী-আল-জুযামী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলে করীম (স)-কে বললাম ঃ আমার দুজন স্ত্রী ছিল। ওরা পরস্পর মারামারি করেছে। তখন আমি ওদের একজনের উপর তীর নিক্ষেপ

করলাম। রাসূলে করীম (স) বললেন, তুমি তার দীয়ত দাও, কিন্তু তুমি তার ওয়ারিস হবে না।

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির সমস্ত সম্পদ-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে। এ ক্ষেত্রে ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারী ও ভুলবশত হত্যাকারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা এই প্রসঙ্গে রাসূলে করীম (স)-এর কথা সার্বিক ও নির্বিশেষ। ফিকাহবিদগণ এই হাদীসটিকে ভিত্তি করেছেন এবং এটিকে গ্রহণ করেছেন। ফলে হাদীসটি 'মুতাওয়াতির' বর্ণনার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। যেমন রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটি لَاوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ 'উত্তরাধিকারীর জন্যে কোন অসিয়ত নেই, করা যাবে না।' যেমন তাঁর এই কথা ঃ

لَاتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا -

কোন মেয়েলোক তার ফুফু বা খালার সতীন হিসেবে বিবাহিতা হতে পরবে না।

দুটি বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হলে বিক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে অথবা দুটিই প্রত্যাহৃত হবে। ব্যক্তির থেকে বর্ণিত আরও অনেক হাদীস এ পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। ফলে তা মুতাওয়াতির রূপে গণ্য হয়েছে। কেননা ফিকাহবিদগণ তা গ্রহণ করেছেন, তাকে ভিত্তি করে মাসলার রায় দিয়েছেন। ফলে মীরাস সংক্রান্ত আয়তকে এই পর্যায়ে 'খাস' করে দেয়া সঙ্গত বিবেচিত হয়েছে। ইচ্ছাপূর্বক ও ভুলবশত উভয় প্রকারের হত্যাকারীই যে এ ক্ষেত্রে অভিন্ন, পার্থক্যহীন বরং সমান, তা অপর একটি হাদীস থেকেও জানা যায়। হাদীসটি হযরত আলী, উমর ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অভিন্নভাবে বর্ণিত। সাহাবীগণের এই ধরণের বর্ণনায় কোনরূপ মতপার্থক্য হতে পারে না। তা ব্যাপকভাবে প্রচারিত বলে কোন তাবেয়ীর কথা নিয়ে তার উপর আপত্তি উত্থাপন করা যায় না। ইমাম মালিক এই মত দিয়েছেন যে, নিহতের বাবদ প্রাপ্ত দীয়ত থেকেও হত্যাকারী মীরাস পাবে না। এই মতটি নিহতের সব মাল-সম্পত্তিতেই প্রযোজ্য হওয়া আবশ্যক, তার কয়েকটি কারণ আছে। একটি এই যে, তার বাবদ প্রাপ্ত দীয়তও মূলত তারই মাল, তারই মীরাস। কেননা তা থেকেই তার ঋণ শোধ করা হয়, তার কোন অসিয়ত থাকলে তা-ও কার্যকর করা হয়। আল্লাহ্ যেমন সম্পত্তি বণ্টনের বিধান করেছেন তেমনি তার সকল সম্পত্তি বণ্টিত হবে। অন্যান্য ওয়ারিস তা যথারীতি পাবে। দীয়ত থেকেও হত্যাকারী মীরাস পাবে না, এ ব্যাপারে সকলেই যখন একমত, তখন অন্যান্য যাবতীয় মাল-সম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথাটিও চূড়ান্ত। যেমন সব মাল থেকে মীরাস পেলে তার বাবদ প্রাপ্ত দীয়ত থেকেও পাবে, মীরাস প্রাপ্তির ব্যাপারে সব ধন-মাল সর্বতোভাবে অভিন্ন। পক্ষান্তরে যখন প্রমাণিত হল যে, তার দীয়ত থেকে অংশ পাবে না, তখন তার অন্যান্য যাবতীয় মাল সম্পর্কেও এই নিয়ম কার্যকর হবে। কেননা হাদীসে এই দুই ধরনের মালের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। ইমাম মালিক বলেছেন ঃ ভুলবশত হত্যাকারী দীয়ত ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় মালের মীরাস পাবে, কেননা তার এই হত্যা আগাম মীরাস দখল করার মতলবে হয়েছে, তা মনে করা যায় না। দীয়তের ক্ষেত্রেও এই সম্ভাবনা বিদ্যমান। তা বরং উক্ত

সন্দেহ থেকে আরও অনেক দূরে অবস্থিত। এই কারণে তার দীয়তের অংশ পাওয়াটা যুক্তিসঙ্গত। অন্য দিক দিয়েও বিবেচনা করা যায়। ইচ্ছামূলকভাবে হত্যাকারী বা প্রায় ইচ্ছামূলক হত্যাকারী নিহতের যাবতীয় সম্পদে উত্তরাধিকারী হবে না, এ ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদগণের মধ্যে কোন মতবৈষম্য নেই, যেমন দীয়তের অংশ পাওয়ার ব্যাপারেও কোন দ্বিমত নেই। ভুলবশত হত্যাকারীর ব্যাপারেও এই সিদ্ধান্ত হওয়া আবশ্যক। কেননা দীয়ত থেকে বঞ্চিত হওয়ার দিক দিয়ে এ দুজন অভিন্ন। উপরন্তু ইচ্ছামূলক ও প্রায়-ইচ্ছামূলক হত্যায় এই সন্দেহ প্রবল যে মীরাস আগাম দখল করার উদ্দেশ্যেই তা করা হয়েছে, ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রেও এই সন্দেহ বিরাজমান। কেননা বাহ্যত সে হয়ত অন্য কারোর দিকে আক্রমণ করা দেখিয়ে তার প্রতি আক্রমণ চালিয়েছে, যেন তাকে হত্যাকারীরূপে চিহ্নিত না করা হয় এবং মীরাস থেকেও বঞ্চিত না হয়। এই সন্দেহ যখন বর্তমান, তখন এই সন্দেহ ইচ্ছামূলক ও প্রায়-ইচ্ছামূলক হত্যার ক্ষেত্রেও তা থাকতে পারে। আর মোট সম্পত্তির কিছু অংশের মীরাস হওয়া ও অপর কিছু অংশের না হওয়া মীরাসের মৌল নীতি বহির্ভূত। কেননা তাতে এমন লোক হবে যে তার মীরাসের কোন অংশের মীরাস পেল, তাতে তার সমস্তটারই মীরাস পেয়ে গেল। আর যে লোক তার কিছু অংশের মীরাস থেকে বঞ্চিত হল সে সবটা থেকেই বঞ্চিত হল। আমাদের ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, বালক ও পাগল হত্যাকারী হলে তারা মীরাস থেকে বঞ্চিত হবে না। তার কারণ হচ্ছে, তারা শরীয়াত পালনে বাধ্য مكلف নয়। আর মীরাস থেকে বঞ্চিত হওয়ার ব্যাপারটি হল মৌলিকভাবে এক প্রকারের শাস্তি বা দণ্ড। এ কারণে তাদেরকে ভুলবশত হত্যাকারীর স্থানে গণ্য করা হয়েছে। যদিও ভুলবশত হত্যাকারী রক্ত দিয়ে শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হয় না। যদিও তাতে এই সম্ভাবনা থেকে যায় যে, তাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে বা তাকে মেরে তাকেই হত্যা করার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু কার্যত তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেছে। এ-ও হতে পারে যে, সে অন্য কারো নিয়োজিত ব্যক্তি হবে। যার সম্পর্কে তা জানা যাবে, তাকেও সেখানেই গণ্য করা হবে। বালক ও পাগলের যে অবস্থাই হোক না-কেন, তারা মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারে না। নবী করীম (স) ঘোষণা করেছেন ঃ

رَفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَنْتَبِهَ، وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَفِيْقَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ -

তিন শ্রেণীর লোকের আমল লেখা হয় না। নিদ্রিত ব্যক্তি, যতক্ষণ জাগ্রত না হয়। পাগল, যতক্ষণ না সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হবে। বালক, যতক্ষণ না পূর্ণ বয়স্কতা পাবে।

আবূ বকর বলেছেন, এই হাদীসটি বাহ্যত এই তিনজনের হত্যাকার্য ও মূলত দণ্ডমুক্ত হবে। দীয়ত দেয়ার বাধ্যবাধকতা থেকেও মুক্তি দেয়া হতো, যদি তার দলীল না থাকত।

প্রশ্ন হতে পারে, নিদ্রিত ব্যক্তি নিদ্রিতাবস্থায় কোন শিশুর উপর পড়ে যদি তার মৃত্যু ঘটায়, তাহলে সেও কি মীরাস থেকে বঞ্চিত হবে ? জবাবে বলা হবে, তখন সে ভুলবশত হত্যাকারী মাত্র। হতে পারে—সে নিজেকে নিদ্রিত জাহির করেছে, কিন্তু আসলে সে নিদ্রিত ছিল না। অথবা ইমাম শাফিয়ীর কথা ঃ ন্যায়পরায়ণ বিদ্রোহীকে হত্যা করলে মীরাস থেকে বঞ্চিত হবে। এখানেও সেই ব্যাপার। কেননা সে তো বাস্তবিকই তাকে হত্যা করেছে। আর বিদ্রোহী তো হত্যার যোগ্যই ছিল। তাহলে তার মীরাস থেকে বঞ্চিত হওয়া ঠিক নয়। আর যাকে দণ্ড দেয়া আবশ্যক, তাকে হত্যা করা হলে হত্যাকারী মীরাস থেকে বঞ্চিত হবে না, এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্যের কথা আমাদের জানা নেই। হ্যাঁ, ন্যায়পরায়ণ যদি বিদ্রোহীকে হত্যা করে আর সেজন্যে সে মীরাস থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে তো সে যদি যুদ্ধকারী হয়ে 'হদ' স্বরূপ হত্যা দণ্ডের উপযুক্ত হয় তাহলে তার মীরাস মুসলিম জনগণের জন্যে না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা রাষ্ট্রপ্রধান—ইমাম—আইন কার্যকরকরণে গোটা সমাজে স্থলাভিষিক্ত। তাই এই হত্যাকারী যেন সমস্ত লোককেই হত্যা করেছে। এরূপ অবস্থায় মুসলমান জনগণ যদি তার মীরাস পাওয়ার যোগ্য হয়, তাহলে ইমাম যেহেতু সেই জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে স্থলাভিষিক্ত, তাই একথা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, আইনের কারণে কেউ নিহত হলে হত্যাকারী মীরাস থেকে বঞ্চিত হবে না।

আমাদের ফিক্‌াহবিদগণ বলেছেন, এক ব্যক্তি পথে একটা গর্ত খুড়ল কিংবা কোন প্রস্তর রেখে দিল। তাতে যদি কোন লোক মরে যায়, তাহলে তদ্দরুন সে ব্যক্তি মীরাস থেকে বঞ্চিত হবে না। কেননা প্রকৃত হত্যাকাণ্ডটি সে নিজে তো ঘটায়নি। সে নিজে হত্যাকারী ছিলনা। নিহতের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন কারণও তার দ্বারা ঘটেনি। তার দলীল হচ্ছে—'হত্যা' তিন প্রকারের ঃ ইচ্ছামূলক হত্যা, ভুলবশত হত্যা এবং প্রায় ইচ্ছামূলক হত্যা। পথে প্রস্তর স্থাপনকারী এর মধ্যে কোনটাতেই পড়ে না।

যদি বলা হয়, গর্ত খোড়া ও পাথর স্থাপন হত্যার কারণ, যেমন তীর নিক্ষেপকারী ও অস্ত্র দ্বারা আক্রমণকারী যখমকারী। ওরা দুজনই হত্যাকারী। কেননা ওরা দুজনই কারণ সৃষ্টি করেছে। জবাবে বলা হবে, তীর নিক্ষেপ ও তৎসৃষ্ট তীর যাওয়া এটা তার কাজ। আর তাতেই হত্যাকাণ্ড সজ্ঘটিত হয়েছে, যখমও তারই কাজ। অতএব সে অবশ্যই হত্যাকারী সাব্যস্ত হবে। কেননা তার কৃত কর্মটিই নিহতের মরার কারণ হয়েছে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির পাথরের সাথে আঘাত খাওয়া এবং ব্যক্তির গর্তে পড়ে যাওয়া সেই লোকটির কাজ নয়, যে গর্ত খুঁড়েছিল বা পাথর রেখে দিয়েছিল। অতএব এ দুজন হত্যাকারী সাব্যস্ত হতে পারে না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيْقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ
كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ –

তোমরা কি এই বাসনা পোষণ কর যে, ওরা তোমাদের ন্যায় ঈমানদার হবে ? অথচ ওদেরই এক গোষ্ঠী আল্লাহ্র কালাম শুনে পরে তাকে বিকৃত করে দিচ্ছিল তা স্পষ্ট বুঝে নেয়ার পর এবং জেনে শুনে।

এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, সত্যকে যে জানে, সে-ই যদি তার বিরোধী হয়, তাহলে সে নিশ্চিতই সত্যপথ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। সে কোন্ দিন সংশোধন গ্রহণ করবে, জাহিল ব্যক্তির তুলনায় তার প্রতি এ ব্যাপারে অধিক নৈরাশ্য হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা, আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমরা কি এই বাসনা পোষণ কর যে, ওরা তোমাদের জন্যে ঈমানদার হবে'। তাদের সৎপথ প্রাপ্তির ব্যাপারে বাসনা পোষণ করাকে অযৌক্তিক বলা হয়েছে। কেননা ওরা সত্যকে জানার পর নিজেরা তার অহংকার করেছে। আর আল্লাহ্র কথা ঃ

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً –

মাত্র গণা কয়েকটি দিন ছাড়া আমাদেরকে আগুন কখ্খনই স্পর্শ করতে পারবে না।

'গণা কয়েকটি দিন' অর্থ অল্প কয়েকটি দিন মাত্র। ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহ্ এই 'গণা কয়েকটি দিন' বা 'অল্প কয়েকটি দিন' বলতে চল্লিশ দিন বুঝেছেন। কেননা তারা এই চল্লিশ দিন পর্যন্তই বাছুর-পূজা করেছিল। হাসান বসরী, মুজাহিদ বলেছেন, তার অর্থ মাত্র সাতদিন।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ – اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ –

তোমাদের প্রতি সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল এই আশায় যে, তোমরা তাকওয়া অর্জন করবে। তা মাত্র গণা কয়েকটি দিন ....।

আয়াতে রোযা রাখার দিনগুলোকে 'গণা কতিপয় দিন' বলা হয়েছে। রমযান মাসের সব দিনই বুঝিয়েছে এই 'গণ কতিপয় দিন' বলে।

আমাদের ফিকাহবিদ উস্তাদগণ বলেছেন, হায়য-এর কম-সে-কম ও বেশি দিন থেকে বেশি দিন হল তিন ও দশ দিন। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا –

হায়য-রোগী নামায পড়বে না তার অপবিত্র থাকার দিনগুলোতে।

কোন কোন হাদীসের ভাষা হল ঃ

دَعِىْ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ حَيْضِكِ –

তোমার হায়য-এর দিনগুলোতে নামায ত্যাগ কর।

এ কথাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে তাঁরা বলেছেন, হায়য-এর মেয়াদকে 'গণা কতিপয় দিন' নাম দেয়া হয়েছে। এর কম-সে-কম হল তিন দিন, আর বেশির দিন হল দশ দিন। কেননা তিন দিনের কম তো হতে পারে এক বা দুই দিন। আর দশের বেশি হলে তাকে এগার দিন বলা হবে। এই শব্দ তিন থেকে দশ পর্যন্তকার সংখ্যার উপর ব্যবহৃত হয়। অতএব তা তার কম ও বেশি দিনের উপর ব্যবহৃত হতে পারে।

এই দলীল উপস্থাপনের উপর কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন এই বলে যে, 'গণা দিন' বলতে মাসের সমস্ত দিন বোঝায়। আর اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً বলে চল্লিশ বুঝেছেন কেউ কেউ। কিন্তু উক্তরূপ দলীল উপস্থাপন আমাদের মতে কিছুমাত্র দূষণীয় নয়। কেননা আল্লাহ্ 'কতিপয় গণ্য দিন' বলে হতে পারে তিনি কম দিন বুঝিয়েছেন। যেমন دراهم معدودة 'কতিপয় গণা দিরহাম' বোঝায়। একথা বলে কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট করার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়নি। পরিমাণ ও সুনির্দিষ্টকরণ توقيف ঈপ্সিত নয়। এর তাৎপর্য হচ্ছে, লোকদের উপর কঠিন ও দুঃসাধ্য হয়—এমন রোযা ফরয করা হয়নি। ওকথা দ্বারা কোন অস্পষ্ট সময়ও বোঝানো হতে পারে। যেমন বলা হয়, বনু উমাইয়্যার যুগ 'হাজ্জাজের দিন'। একথা বলে দিন সংখ্যা নির্দিষ্ট করার ইচ্ছা প্রকাশ পায় না। এ থেকে বোঝাতে চাওয়া হয় তাদের শাসনকাল। নবী করীম (স)-এর কথা 'তোমার অপবিত্র থাকার দিনগুলোতে নামায ত্যাগ কর' থেকে কিন্তু দিন নির্দিষ্টকরণ-এর ইচ্ছাই বোঝায়। কেননা 'হায়য'-এর একটা নির্দিষ্ট সময় থাকা অনিবার্য। যা হবে বিশেষ দিন, যা অতিক্রম করা হবে না, যার কম-ও হবে না। তাই 'দিনসমূহ'-এর সাথে কোন বিশেষ সংখ্যা যুক্ত হলে তিন থেকে দশ পর্যন্তকার দিনগুলো শামিল হবে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـئَتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ
النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ –

বরং যে লোক কোন পাপের কাজ করবে ও তার পাপ তাকে পরিবেষ্টিত করে ফেলবে, ওরা তো জাহান্নামী হবে, চিরদিন সেখানে অবস্থান করবে।

এ থেকে বোঝা গেছে যে, অর্জিত পাপ ও পাপ দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ার ফল হচ্ছে জাহান্নামে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন। এতে প্রতিফল ভোগ করতে বাধ্য হবে দুটি শর্তের উপস্থিতিতে। তার একটি উপস্থিত না হলে তা হবে না। এ থেকে এ-ও বোঝা যায় যে, যে লোক দুটি শর্তের ভিত্তিতে কিরা করবে—দাসমুক্তি বা তালাক দান ইত্যাদি কোন কাজ সম্পর্কে, তার একটি পাওয়া গেলেও অপরটি পাওয়া না গেলে কিরা ভঙ্গ করবে না।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ لَاتَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَ
الِدَيْنِ اِحْسَانًا –

স্মরণ কর, আমরা যখন বনু ইসরাইলের নিকট থেকে এই চুক্তি গ্রহণ করলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই দাসত্ব করবে না এবং পিতামাতার সাথে ভালো দয়াপূর্ণ ব্যব্যহার করবে ....।

পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কে অধিক তাগিদ করা হয়েছে এবং গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাদের প্রতি দয়াপূর্ণ ভালো ব্যবহার করা একান্তই কর্তব্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তারা দুজন কাফির হোক কিংবা মুমিন। কেননা আয়াতে আল্লাহ্‌র ইবাদতের আদেশের সাথে মিলিয়ে এই আদেশটি দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَذِى الْقُرْبٰى এবং নৈকট্য সম্পন্ন লোক—নিকটাত্মীয়। এ থেকে সেলায়ে রেহমী করা এবং ইয়াতীম ও মিসকীনদের প্রতি দয়া করা কর্তব্যের কথা বোঝায়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حَسْنًا এবং লোকদের জন্যে উত্তম কথা বল। আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইবনে আলী বলেছেন, এর অর্থ, সমগ্র মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে।

আবূ বকর বলেছেন, এ থেকে বোঝা যায় যে, সব মানুষই মুসলিম-কাফির—নির্বিশেষে সব মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করার জন্যে আদিষ্ট।

কেউ কেউ বলেছেন, এ কথাটি আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত কথার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ –

তোমার রব্ব-এর পথের দিকে আহ্বান জানাও যুক্তি-কৌশল ও উত্তম উপদেশ-নসীহত দ্বারা এবং তাদের সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হও সেসব কথা নিয়ে, যা অতীব উত্তম।

এসব আয়াতে যে, ইহ্‌সান-এর উল্লেখ হয়েছে, তা হচ্ছে, প্রত্যেককেই আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানানো এবং তাদের কল্যাণ কামনা করা, তাদেরকে সুপরামর্শ দেয়া। ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহ্‌র কথা বর্ণিত হয়েছে যে, এই আয়াতটি মনসূখ হয়ে গেছে যুদ্ধের জন্যে দেয়া আদেশ দ্বারা। তাছাড়া আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

لَايُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ –

কোন খারাপ কথা প্রকাশ করে দেয়াকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। তবে যদি কেউ মজলুম হয়, তার কথা আলাদা।

আল্লাহ কাফির লোকদের উপর অভিশাপ বর্ষণ, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকরণ এবং গুনাহ্‌গার লোকদের প্রতি ঘৃণা পোষণের আদেশ করেছেন। এ ব্যাপারে নবী-রাসূলগণের শরীয়াতসমূহের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নেই। বোঝা গেল, উত্তম কথা বলা ও ভালো

আচরণ করার এই আদেশের দুটি দিক। হয় তা বিশেষভাবে মুসলমানদের জন্যে হবে নির্দিষ্টভাবে, যারা অভিশাপ ও ঘৃণা পাওয়ার যোগ্য নয়, তারাও এদের মধ্যে শামিল, যদিও তা সাধারণ পর্যায়ের হুকুম। আর তা হচ্ছে, সকলের কল্যাণের জন্যে দো'আ করা, ভালো কাজের আদেশ করা ও মন্দ কাজের নিষেধ করা—এসবই উত্তম। আল্লাহ্ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি বনী ইসরাইলের নিকট থেকে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন। মূলত তা এক তাগিদপূর্ণ চুক্তি। হয় তা ভীতিপূর্ণ কথা সহকারে হবে অথবা হবে কিরা সহকারে। এ ঠিক তেমন, যেমন আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত শর্তের ভিত্তিতে নবী করীম (স)-এর হাতে বায়'আত করার জন্যে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে আদেশ করেছিলেন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَاتَسْفِكُوْنَ دِمَاءَ كُمْ وَلَاتُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ -

স্মরণ কর, আমরা তোমাদের নিকট থেকে চুক্তি গ্রহণ করেছিলাম যে, তোমরা তোমাদের রক্তপাত কর না এবং তোমরা নিজেদের লোকদের বহিষ্কৃত কর না তোমাদের নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে।

এর দুটি তাৎপর্য হতে পারে। একটি তারা পরস্পরকে হত্যা করবে না। যেমন তাঁর এই কথা ঃ وَلَاتَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ 'তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে হত্যা কর না।' এমনিই আদেশ ঃ তোমাদের নিজেদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত না করা এবং তাঁর কথা ঃ وَقَاتَلُوْا وَقُتِلُوْا 'এবং তারা পরস্পর হত্যাকার্য-যুদ্ধ করেছে এবং নিহত হয়েছে।' আর দ্বিতীয়টি, কেউ-ই নিজেকে হত্যা করবে না। এ কাজ প্রত্যক্ষভাবে নিজে করবে না, যেমন ভারতীয় হিন্দু বা বৌদ্ধরা করে কোন কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়ে, নৈরাশ্য ও হতাশা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে। অথবা একজন অপরজনকেও হত্যা করবে না, যার দরুন সে নিজে নিহত হতে পারে। তাও আত্মহত্যারই শামিল। ব্যবহৃত শব্দ এই উভয় অর্থ-ই দেয়। এসবই তাদের জন্যে অবশ্য পালনীয়। আল্লাহ্ এই ভাষায় যা জানিয়ে দিয়েছেন, তা তওরাত কিতাবের শরীয়াতের হুকুম। ইয়াহুদীরা এই হুকুম গোপন করে রাখছিল। এটা ছিল তাদের অবমূল্যায়নের ব্যাপার। আর তার জন্যে তারা নিন্দনীয় হয়েছে অনিবার্যভাবে। এজন্যে আল্লাহ তাঁর নবীকে এ বিষয়ে জানিয়ে দিয়েছেন এবং এই কাজকে তাদের বিরুদ্ধে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। এ থেকে প্রমানিত হয়েছে যে, তারা নবীর নবুয়তকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করেছে। কেননা নবী কিতাব পাঠ করেন নি। তাতে কি লেখা আছে, তা-ও তিনি জানতেন না। জানতেন শুধু ততটুকু, যতটুকু আল্লাহ্ তাঁকে বিশেষভাবে জানিয়ে দিতেন। তাদের সম্পর্কে এ আয়াত কয়টির পর আরও যা যা বলেছেন তা সবই এ পর্যায়ের কথা। যেমন বলেছেন ঃ

وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا -

পূর্বে তারা এ কথা বলে কাফিরদের উপর বিজয় লাভের দাবি জানাত।

এ ছাড়া আরও যেসব কথা বলা হয়েছে, তা সবই আল্লাহ্‌র নিকট থেকে توقيف পর্যায়ের কথা। সে কথা তারা যা গোপন করে রাখত সেই বিষয়ে। তাদের জুলুম, কুফরী ও মন্দ সমূহ প্রকাশ ঘটানোর ব্যাপারে তাদেরকে সাবধান করা ইত্যাদি বিষয়ে। আর এই সবই হযরত মূসা (আ)-এর নবুয়তের দলীল ও প্রমাণ মাত্র।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاِنْ يَّاتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ -

তোমাদের নিকট বন্দী লোক এলে তোমরা তাদেরকে ফিদিয়া দিয়ে ছাড়িয়ে নাও, অথচ তাদেরকে বহিষ্কার করাই তোমাদের জন্যে সম্পূর্ণ হারাম ছিল। তাহলে কি তোমরা কিতাবের কতকাংশ বিশ্বাস কর, আর অপর কতকাংশ কর অবিশ্বাস ?

আয়াতটি বলছে, বন্দীদের 'ফিদিয়া' বা বিনিময় মূল্য দিয়ে মুক্ত করা তোমাদের জন্যে কর্তব্য ছিল। সেই সাথে তাদের একাংশকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে বঞ্চিত করাও তাদের উপর হারাম ছিল। তাদের কতককে যখন তাদের শত্রুরূপে বন্দী করে, তখন ফিদিয়া দেয়া তাদের কর্তব্য হয়ে পড়ে। তাই তাদেরকে বহিষ্কার করায় তারা কিতাবের কতকাংশের অমান্যকারীতে পরিণত হয়, কেননা তারা আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ কাজ করেছেন। আবার তারা যখন ফিদিয়া দিয়ে বন্দীদেরকে ছাড়িয়ে নিত, তখন তারা কিতাবের কতকাংশের প্রতি ঈমানদার প্রতিপন্ন হতো। কেননা তারা আল্লাহ্‌র ওয়াজিব করে দেয়া কাজটি করত।

বন্দীদের ফিদিয়া দিয়ে ছাড়িয়ে আনা আমাদের উপরও প্রযোজ্য প্রমাণিত হয়েছে। হাজ্জাজ ইবনে আরতাত হিকাম তাঁর দাদার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে একটি চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাতে লেখা ছিল, তাদের আকেলা দেয়ার ব্যাপারাদিতে তারা আকেলাদের এবং তাদের বন্দীদের জন্যে ফিদিয়া দেবে প্রচলিত নিয়মে। মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে কল্যাণ স্থাপন করবে। মনসূর শফীক ইবনে সালমা থেকে আবূ মূসা আল-আশআরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَطْعِمُوْا الطَّعَامَ وَاَفْشُوْا السَّلَامَ وَعُوْدُوْا الْمَرِيْضَ وَفُكُّوْا الْعَانِىْ.

তোমরা খাবার খাওয়াবে, নামায ছড়িয়ে দেবে, রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করবে, দেখবে এবং বন্দীকে মুক্ত করবে।

এ দুটি হাদীসই বন্দীদের মুক্ত করার বিধান দিয়েছে।

ইমরান ইবনে হুসায়ন ও সালমা ইবনুল আক্ওয়া বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) কতিপয় মুসলিম বন্দীকে মুশরিকদের সাথে বিনিময় করেছেন। সওরী আবদুল্লাহ্ ইবনে শরীক, বশার ইবনে গালিব থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী (রা)-এর পুত্র হুসায়ন

(রা)-এর নিকট কিসের ভিত্তিতে বন্দীকে ফিদিয়া দিলেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন ঃ যে জমিনের জন্যে যুদ্ধ হচ্ছিল সেই জমিনের ভিত্তিতে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -

**বল, পরকালটা যদি আল্লাহ্‌র নিকট অন্য লোকদের থেকে কেবল তোমাদের জন্যেই খালেস হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা মৃত্যুর কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকে।**

বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ 'ইয়াহূদীরা যদি মৃত্যুর কামনা করত, তাহলে তারা মরে যেত এবং তারা জাহান্নামে তাদের আসনসমূহ দেখতে পেত! আল্লাহ্‌র রাসূলের সাথে যারা 'মুবাহিলা' করতে চেয়েছিল, তারা যদি বের হতো, তা হলে তারা ফিরে গিয়ে তাদের বংশ পরিবার ও ধন-মাল কিছুই বর্তমান দেখত না। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, ইয়াহূদীরা মৃত্যুর কামনা করলে তারা তার সাথে যুক্ত হয়ে যেত এবং অবশ্যই মরে যেত। মৃত্যুর কামনা পর্যায়ে দুটি দিক উল্লেখ করা হয়েছে। একটি—হযরত ইবনে আব্বাসের কথা, ওরা চ্যালেঞ্জ করেছিল এই বলে যে, ওরা মৃত্যুর কামনা করবে এই কথার উপর যে, দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে যে গোষ্ঠী মিথ্যাবাদী হবে, সে মরবে। আবুল আলীয়া, কাতাদাহ ও রবী ইবনে আনাস বলেছেন ঃ ওরা যখন বলেছিল যে, যারা ইয়াহূদী বা খৃস্টান, তারা ছাড়া কেউ-ই কখ্‌খনই জান্নাতে দাখিল হবে না, বলেছিল আমরাই আল্লাহ্‌র সন্তান, তাঁর প্রিয়জন। তখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, তাহলে তোমরা মৃত্যুর কামনা কর। কেননা যার অবস্থা এরূপ তার জন্যে দুনিয়ার জীবনের তুলনায় মৃত্যুই শ্রেয়। আয়তটির দুটি অর্থ। একটি হল, তাদের মিথ্যাবাদিতা ও সেজন্যে তাদের কান্নাকাটির কথা প্রকাশ করা। আর দ্বিতীয়, নবী করীম (স)-এর নবুয়ত প্রমাণ করা । আর তা এজন্যে যে, তারা এর উপর চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল। খৃস্টানদের চ্যালেঞ্জের জবাবে তাদেরকে 'মুবাহিলা' করতে ডাকা হয়েছিল। রাসূলে করীম (স) সত্যতা ও তাদের নিজেদের মিথ্যাবাদিতা সম্পর্কে তারা পূর্ণমাত্রায় অবহিত না হতো, তাহলে তারা মৃত্যুর কামনা করতে একটুও বিলম্ব করত না। আর খৃস্টানরা 'মুবাহিলা' করার জন্যে অবশ্যই এগিয়ে আসত। তাদের উভয় গোষ্ঠীকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, তারা যদি তা করে, তাহলে অবশ্যই মৃত্যু হবে, তাদের উপর আযাব নাযিল হবে। মৃত্যুর কামনা ও মুবাহিলার কথা বলায় তাদের মিথ্যাবাদিতাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের প্রতি যার ওয়াদা করা হয়েছিল, তা নাযিল না হলে তাদের প্রমাণ খণ্ডিত হয়ে যেত। কিন্তু চ্যালেঞ্জ দেয়া সত্ত্বেও তারা যখন তা থেকে বিরত থাকল এবং এই কথার সহজতার সঙ্গে আযাবের ভয় দেখান হল, তখন প্রমাণিত হল যে, তারা নবীর নবুয়তের সত্যতা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত। তারা তাদের কিতাব থেকে তাই জেনেছিল। কেননা তাতে রাসূলের গুণ-পরিচিতি বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত রয়েছে।

যেমন আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ –

ওরা যেসব পাপ কাজ অগ্রে পাঠিয়েছে, সেই কারণে ওরা কখ্‌খনই মৃত্যুর কামনা করবে না।

এতে নবীর নবুয়তের সত্যতা প্রমাণের আর একটি দলীল পাওয়া গেল। তা হল, ওরা মৃত্যুর কামনা করবে না, যদিও মনে প্রচ্ছন্নভাবে সে কামনা রয়েছে, উচ্চারণকারীর পক্ষে তা উচ্চারণ করা খুবই সহজ, তাদের মুখে ভাষাও ছিল সুস্থ-সঠিক। ফলে একথাটি ঠিক এরূপ হল, যেমন, তাদেরকে যদি বলা হয় ঃ আমার নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ হচ্ছে, তোমাদের কেউ-ই তার মাথা স্পর্শ করবে না, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ থাকা সত্ত্বেও। মাথা স্পর্শ করা তাদের প্রত্যেকের পক্ষেই সম্ভব। পরে তারা কেউই তার মাথা স্পর্শ করল না। যদিও তার প্রতি তাদের দুশমনি ছিল তীব্র প্রবল এবং তাঁকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্যে তাদের আগ্রহ ছিল। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও ছিল পূর্ণ সুস্থ। এমতাবস্থায় প্রমাণিত হবে যে, তা আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে এসেছে। তা দুইভাবে। এক—কোন বুদ্ধিমান মানুষই তার শত্রুদেরকে এই ধরনের কথা বলে চ্যালেঞ্জ দেয় না। কেননা এরূপ চ্যালেঞ্জ দিলে তা ঘটে যাওয়া অসম্ভব নয়, একথা জানা-ই আছে। আর দ্বিতীয়—এটা গায়ব পর্যায়ের সংবাদ দান। কেননা ওদের একজনও মৃত্যুর কামনা করেনি। ওদেরকে কুরআনের প্রসঙ্গে যে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছিল, এটা ঠিক তেমনি। ওদেরকে অনুরূপ অন্তত একটি সূরা তৈরী করে নিয়ে আসতে বলা হয়েছিল এবং শেষ পর্যায়ে তাদের সম্পর্কে বলে দেয়া হয়েছিল যে, ওরা তা করবে না। কথাটি এই ঃ

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا –

তোমরা যদি না কর, আর তা কখ্‌খনই করতে পারবে না বা করবে না।

একজন বলেছেন, ওরা মৃত্যুর কামনা করবে না। কেননা তা যদি ওরা করে, তাহলে তা হবে লোকদের থেকে সম্পূর্ণ গোপন ও প্রচ্ছন্নভাবে। একথা বলা যেত যে, তোমরা অন্তর থেকে মৃত্যুর কামনা করেছ।

এর জবাবে বলা যায়, এই কথা দুটি কারণে বাতিল। একটি এই যে, অন্তরের কামনা-বাসনা প্রকাশ করার জন্যে আরবদের ভাষায় দুটি বাক্য পরিচিত ঃ হায়, আল্লাহ যদি আমাকে ক্ষমা করতেন এবং যায়দ যদি আসত; এই ধরনের আরও কিছু বাক্য এবং এও এক ধরনের উক্তি। কেউ যখন এই কথা বলে তখন তাদের মতে সে কামনাকারী গণ্য হয়, তার মন ও আকীদার হিসাব করা ছাড়াই। যেমন তারা খবর, খবর চাওয়া এবং আওয়াজ দেয়া বা ডাকার ব্যাপারে বলে। মৃত্যুর কামনা করতে বলে চ্যালেঞ্জ দেয়া তাদের ভাষায় সেই কথার মুখাপেক্ষী যা কামনার জন্যে ব্যবহৃত হয়। আর দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, প্রয়োজনের সময় চ্যালেঞ্জ দেয়া এবং তাঁর নবুয়তের সত্যতা সম্পর্কিত তাদের জ্ঞানের উপর توقيف ও মিথ্যা আরোপের ব্যাপার, তাঁর ব্যাপারে তাদের অহংকার প্রদর্শন।

তারপর তাদেরকে এই চ্যালেঞ্জ দেয়া যে, তারা যেন তাদের অন্তর থেকে মৃত্যুর কামনা করে। অথচ সকলেরই জানা যে, মনের চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা কেউ করতে পারে না। তাই তা থেকে কথার সত্যতা বোঝায় না, তার খারাবীও নয়। এই কথা বলে চ্যালেঞ্জদাতার পক্ষে একথা বলা সম্ভব যে, আমি আমার মন দ্বারা এই কামনা করেছি। তার এই কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করার মত কোন দলীল তার প্রতিপক্ষের নিকট নেই। তা যদি হৃদয় দ্বারা কামনা করার দিকে প্রত্যাবর্তন করে, মুখের কথার উচ্চারণ ছাড়া, তাহলে তারা অবশ্যই বলত ঃ আমরা আমাদের হৃদয় দ্বারা সে কামনা করেছি। তাতে তারা সম্পূর্ণ সমান সমান হয়ে যেত। তাতে তাদের মিথ্যুক হওয়া প্রমাণ করা যেত না। নবুয়তের সত্যতাও প্রমাণিত হতো না। কিন্তু তারা যখন তা বলেনি। কেননা তারা যদি তা বলত, তাহলে তার উল্লেখ হতো। যেমন তারা যদি যে কোন ধরনের কালাম দ্বারা কুরআনের মুকাবিলা করত, তা হলে তারও উল্লেখ করা হতো। এ থেকে জানা গেল যে, মূলত চ্যালেঞ্জটা দেয়া হয়েছিল মুখে শব্দের মাধ্যমে কামনা করার জন্যে শুধু, মনে মনে ও বিশ্বাসগতভাবে কামনা করার জন্যে নয়।

## সিজদা ও যাদুকর প্রসঙ্গ

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوْا الشَّيٰطِيْنُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ –

সেই সব জিনিস তারা মানতে শুরু করল, যা শয়তানেরা সুলায়মানের রাজত্বের নামে পেশ করছিল। প্রকৃতপক্ষে সুলায়মান  কখনই কুফরি করেনি।

কাহিনীর শেষ পর্যন্ত আমাদের আলোচ্য। আবূ বকর বলেছেন, সর্বপ্রথম 'যাদু' সম্পর্কিত কথাই আলোচনায় নিয়ে আসা কর্তব্য। কেননা তা আগে বিদ্বজ্জনের নিকটই অস্পষ্ট। সাধারণ মানুষের কথা আর কি-ইবা বলা যায়। পরে সে সম্পর্কে শরীয়াতের রায় আলোচনা করব। আয়াতের তাৎপর্য ও তৎনিঃসৃত হুকুমসমূহের এটাই দাবি। আমাদের বক্তব্য হল, ভাষা বিশারদ উল্লেখ করেছেন, অভিধানে 'যাদু'র মূল অর্থে তাই বোঝায়, যা সূক্ষ্ম প্রচ্ছন্নতার কারণ। আর سَحَرٌ অর্থ খাদ্যপ্রাণ, তা প্রচ্ছন্ন ও তার চলাচল খুবই সূক্ষ্ম। হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ

تَوَفِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَحْرِىْ وَبَحْرِىْ –

রাসূলে করীম (স) ইন্তিকাল করে গেছেন আমার এক দুর্বোধ্য রহস্যময় অবস্থায়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ – (الشعراء : ١٨٠)

নিশ্চয়ই তুমি যাদু-আহত ব্যক্তিগণের একজন।

অর্থাৎ সে-ই সৃষ্টিকূলের মধ্যের একজন, যারা খায়, পান করে। এই রকমই কথা ঃ

مَـاَاَنْتَ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا – (الشعراء : ١٥٤)

তুমি আমাদের মতই একজন মানুষ বই তো নও।

এই কথাটিও অনুরূপ ঃ

مَـالِ هٰـذَا الـرَّسُـوْلِ يَـاْكُـلُ الـطَّـعَـامَ وَيَـمْـشِىْ فِىْ الْاَسْـوَاقِ – (الفرقان-٧)

এই রাসূলের কি হয়েছে, সে খাবার খায় ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করে?

প্রথমোক্ত কথাটির ঃ 'তুমি আমাদের মতই একজন মানুষ বই তো নও' অর্থ ঃ আমাদের মতই যাদুওয়ালা হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে 'যাদু' শব্দের উল্লেখ হয়েছে এসব অবয়বের দুর্বলতার কারণে। এ সবের সূক্ষ্মতার কারণে। তা সত্ত্বেও মানুষের সত্তার ও কাঠামোর অবস্থিতি রয়েছে। অতএব যার গুণ এইরূপ, সে তো দুর্বল, অক্ষম, পরমুখাপেক্ষী। অভিধানে ঃ سحر শব্দের এই-ই অর্থ। পরে তা ব্যবহৃত হয়েছে প্রত্যেকটি প্রচ্ছন্ন সূক্ষ্ম কারণের জিনিসের জন্যে। যা অবাস্তব কল্পনা পর্যায়ের, তার জন্যে। তা সম্মোহন, বিভ্রান্তি ও ধোঁকার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। শব্দটি যদি কোন শর্ত বা রূপ বর্ণনা ছাড়াই ব্যবহৃত হয়, তাহলে যাদু কাজ যে করে তার নিন্দার তাৎপর্য আছে মনে করতে হবে। যেখানে তা প্রশংসনীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে শর্তাধীন উল্লিখিত হয়েছে।

যেমন রাসূলে করীম (স)-এর কথা, '

اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا –

নিশ্চয়ই ভাষণ-বর্ণনায়ও এক প্রকারের যাদু আছে।

আবদুল বাকী ইবরাহীম আল-হাররানী, সুলায়মান ইবনে হরব, হাম্মাদ ইবনে যায়দ, মুহাম্মাদ ইবনুয-যুবায়র সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, বলেছেন ঃ

রাসূলের করীম (স)-এর নিকট জবরকান ইবনে বদর, আমর ইবনুল আহ্‌তম ও কায়স ইবনে আসেম উপস্থিত, তিনি আমরকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'আমাকে জবরকান সম্পর্কে সংবাদ দাও।' বললেন ঃ তিনি তাঁর সমাজের আনুগত্য পান, শক্ত কঠোর প্রতিরোধক, পেছনে পড়ে থাকা জিনিসের নিষেধকারী। জবরকান বললেন ঃ 'আল্লাহ্‌র কসম, সে জানে যে, আমি তার তুলনায় উত্তম। আমর বললেন ঃ তিনি আত্মমর্যাদা সম্পন্ন, সংকীর্ণ অবস্থান স্থান, পিতার দিক দিয়ে বোকা, খালুর দিক দিয়ে তিরস্কৃত হেয় রাসূল, আমি ওদের দুজনের ব্যাপারে সত্য কথাই বলেছি। আমি যা জানি, তার উত্তম কথাই বললাম। সে আমাকে ক্রুদ্ধ-অসন্তুষ্ট করেছে। পরে বললাম, তার খারাপ যা জানি তা। তখন রাসূলে করীম (স)-বললেন ঃ

اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا –

নিশ্চয়ই তোমার এ বর্ণনায় যাদু রয়েছে।

ইবরাহীম আল হাররানী মুসয়িব ইবনে আবদুল্লাহ্‌, মালিক ইবনে আনাস, যায়দ ইবনে আসলাম, ইবনে উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ

দুজন লোক এগিয়ে এল। তাদের একজন ভাষণ দিল। তা শুনে লোকেরা আশ্চার্যান্বিত হয়ে গেল। তখন রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ 'নিশ্চয়ই বক্তৃতা-ভাষণে যাদু আছে।'

মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে ফারেস, সাইদ ইবনে মুহাম্মাদ আবূ নুমাইলাতা, আবূ জাফর নাহ্‌ভী আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সাবিত, সখর ইবনে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে বুরায়দাতা তাঁর পিতা, তাঁর দাদা সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ আমি রাসূলে করীম (স) কে বলতে শুনেছি ঃ

اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا وَاِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جِهْلاً وَاِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمًا وَاِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عَيَالاً -

নিশ্চয়ই বক্তৃতা-ভাষণে যাদু আছে। জ্ঞান বা বিদ্যার মধ্যেও এক ধরনের মূর্খতা আছে, কাব্য বা কবিতায় যুক্তিপূর্ণ কথা আছে। আর কথার-ও একটা ঝুঁকি বা বোঝা আছে।

সা'সয়া ইবন সুহান বলছেন, নবী করীম (স)-এর এই কথাটি সত্য। বক্তৃতা-ভাষণে যাদু আছে—এই কথাটি প্রসঙ্গে বলা যায়, যে কথা বলে সে ব্যক্তির উপর একটা হক আছে। সে হয়ত খুব যুক্তি দেখাতে অধিক পারঙ্গম হবে যার হক তার অধিক। ফলে তার সুমিষ্ট ও যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে জনগণ হয়ত যাদুকৃত হয়ে পড়বে। আর তার ফলে সেই অন্য লোক হক নিয়ে নেবে। এটা অসম্ভব নয়। তাঁর জ্ঞান বা বিদ্যায়ও মূর্খতা আছে, কথাটি সত্য এজন্যে যে, দেখা যায়, অনেক আলিম জ্ঞানী বা বিদ্বান ব্যক্তি কৃত্রিমভাবে এমন সব বিষয়ে স্বীয় জ্ঞানের বা বিদ্যাবুদ্ধির সম্ভার দেখায় যে-বিষয়ে মূলত সে কিছুই জানে না। ফলে সে মূর্খতার পরিচয় দেয়। 'কাব্য-কবিতায় যুক্তি আছে' কথাটিও এ পর্যায়েরই। জনগণ যে সব ওয়ায-নসীহত মনোযোগ দিয়ে শুনে এবং যার দ্বারা প্রভাবিত হয়, তা এই ধরনের। আর 'কথাবার্তার ঝুকি আছে'—তার তাৎপর্য হল, তোমার কথাই তোমার সম্মান, যাকে যা বলা উচিত নয়, তাকে তা বলা এ পর্যায়ে পড়ে। অথচ সে হয়ত তা বলতে চায়নি। এ জন্যেই নবী করীম (স) কোন কোন কথা বা বক্তৃতা ভাষণকে যাদু বলে অভিহিত করেছেন। কেননা কথক হয় কোন হক সম্পর্কে খবর দেবে, সে সেটিকে স্পষ্ট করে তুলবে, উদ্ভাসিত করবে তার বিশ্লেষণ দক্ষতার দ্বারা। অথচ পূর্বে তা প্রচ্ছন্ন ছিল।

বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি হয়রত উমর ইবনে আবদুল আজীজের সম্মুখে খুব উচ্চতর অলংকার সমৃদ্ধ কথা বলল। উমর বললেন ঃ هٰذَا وَاللّٰهِ السِّحْرُ الْحَلَالُ আল্লাহ্‌র কসম, হালাল যাদু এই। কেউ হয়ত বাতিলকে তার বক্তৃতার যাদু বলে সত্য রূপে উদ্ভাসিত করে তুলতে পারে। তা করে শ্রোতৃমণ্ডলীকে তার সম্মোহন শক্তি দ্বারা অভিভূত করে দিতে পারে। এই 'যাদু' শব্দটি নির্গুণ বা শর্তহীন ব্যবহৃত হলে তা হবে বাতিল সম্মোহনকারী ব্যাপার। তার প্রকৃত বাস্তবতা কিছু নেই। তা স্থিতিশীলও নয়। আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ – (الاعراف – ١١٦)

ওরা লোকদের চোখকে যাদু প্রভাবিত করেছিল।

অর্থাৎ তাদের উপর বিভ্রান্তি চাপিয়ে দিল, সম্মোহিত করে দিল। তারা ধারণা করতে লাগল যে, ওদের রশি ও লাঠিগুলো দৌড়াচ্ছে এবং বলেছে ঃ

يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى – (طه : ٦٦)

যাদুকরদের যাদুর প্রভাবে তার মনে হল—ওটি দৌড়াচ্ছে।

আল্লাহ্ জানিয়ে দিলেন যে, ওরা যে মনে করেছে ওটা দৌড়ায়, তা প্রকৃতপক্ষে দৌড়াচ্ছিল না। ওটা ছিল শুধু কল্পনা। বলা হয়েছে যে, ওটির ভেতর শূন্য একটি লাঠি ছিল এবং তা পারদে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। অনুরূপভাবে রশিগুলো চামড়া দিয়ে তৈরী ছিল, পারদে ভর্তি ছিল। এর পূর্বে তারা বহু কয়টি স্থানে গর্ত খুড়ে রেখেছিল। তারা লম্বা ঘর বানিয়ে রেখেছিল এবং আগুনে ভর্তি করে ফেলেছিল। যখন তার উপর তা ফেলা হল এবং পারদ উত্তপ্ত হয়ে নড়ে উঠল। কেননা পারদের ধর্মই হচ্ছে, তাতে আগুন লাগলে তা উড়তে থাকে। এ বিষয়ে আল্লাহ্ জানিয়ে দিলেন যে, ওটা ছিল সম্মোহন, প্রকৃত কোন জিনিস ছিল না। এই কারণে আরবরা এক প্রকারের অলংকারকে বলে যাদুকৃত। অর্থাৎ যে তা দেখবে তাতে সে যাদুর প্রভাবে সম্মোহিত হয়ে পড়বে। তাই যে বর্ণনা-বিশ্লেষণ-বক্তৃতা-ভাষণ সত্যকে স্পষ্ট করে তোলে তা হালাল যাদু। কিন্তু যার দ্বারা লোকদের সম্মোহিত করা ও ধোঁকা দেয়া উদ্দেশ্য, বাতিলকে সত্য রূপে উদ্ভাসিত করা যার মূলে নিহিত ইচ্ছা, তা নিন্দিত যাদু।

যদি বলা হয়, যাদুর উদ্দেশ্যই যখন সম্মোহন, প্রচ্ছন্নকরণ, তখন তদ্দ্বারা কোন সত্য উদ্ভাসিত হতে পারে কেমন করে বলা যায়। সত্য সম্পর্কে যে খবর দেয়া হয়, তা-ই তো যাদু, যা প্রচ্ছন্ন তা জাহির করে দেয়। যা প্রকাশমান তাকে গোপন করা এবং তা জাহির করাটাও অবাস্তব।

জবাবে বলা যায়, তাকে যাদু বলা হয় শ্রোতার বিজয়ী ধারণা অনুসারে কেননা কোন ঘৃণ্য শব্দ দ্বারা যদি কোন তত্ত্ব বোঝান হয়, তাহলে তা কবুল হবে না, সেদিকে মনোযোগ দেয়া হবে না। কিন্তু কোন তাৎপর্যপূর্ণ কথা যদি সুমিষ্ট ভাষায় শুনতে পাওয়া যায়, তাতে অনভিপ্রেত কিছু না থাকে, তা ঘৃণার উদ্রেক না করে, তা হলে তা কবুল হবে। তাই তা মিষ্ট শব্দে বলা ও উত্তমভাবে বর্ণনা করা আবশ্যক। যা শুনলে নাবুঝ লোক-ও সে দিকে উৎকর্ণ হবে, তা শুনবে ও কবুলও করবে। তাই এই বর্ণনা-বিশ্লেষণের প্রতি মনের ঝোঁক অনুযায়ী এক ধরনের যাদু বলে তাকে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন করে যাদুকর উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে কথার যাদুজালে জড়িত ও সম্মোহিত করে। বর্ণনা-বিশ্লেষণ ও বক্তৃতা-ভাষণকে এই দৃষ্টিকোণে যাদু বলা হয়েছে, সে দৃষ্টিকোণে নয়, যা তুমি মনে করেছ। বর্ণনা-বিশ্লেষণকে এ কারণে যাদু নাম দেয়া হতে পারে যে, এ রূপ বর্ণনা দানে সক্ষম ব্যক্তি অনেক সময় উত্তম কথাকেও খারাপভাবে বলে। যা প্রকৃতই অসুন্দর, তাকে

বর্ণনার যাদু দ্বারা সুন্দর করে তোলে। যেমন সম্মোহনকারী অসত্য ও অবাস্তব কথা দিয়ে সম্মোহনের সৃষ্টি করে।

আবূ বকর বলেছেন, বর্ণনা-ভাষণকে যাদু বলার ব্যাপারটি পরোক্ষ, প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ কথা নয়। প্রকৃত কথা—যেমন আমরা বলেছি—শব্দটির প্রয়োগকালে এমন প্রত্যেকটি ব্যাপার গণ্য হবে, যা সম্মোহনকারী, যার দ্বারা ধোঁকা দেয়াই উদ্দেশ্য। গোলক ধাঁধার সৃষ্টি করা এবং যা প্রকৃত নয়, যার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই, স্থিতি নেই, তা প্রকাশ করাই যার একমাত্র কাজ। এই কারণে আমরা বলেছি যে, অভিধানের দৃষ্টিতে سحر বা যাদুর আসল অর্থ এবং প্রয়োগ তাৎপর্য পর্যায়ে—এই নামটি যে সব জিনিসকে শামিল করে, তার ব্যবহারকারী তদ্দ্বারা যা কিছু করতে ইচ্ছা করে এবং যে উদ্দেশ্যে তা ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এই সব পর্যায়ে আল্লাহ্র অনুগ্রহ চেয়ে বলব ঃ তা কয়েক প্রকার দিকে বিভক্ত হয়ে থাকে। ব্যবিলনবাসীদের ব্যবহৃত যাদুও তার একটা প্রকার। আল্লাহ্ তাঁর এই কথায় তাদেরই উল্লেখ করেছেন ঃ

يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَرُوْتَ وَمَارُوْتَ -

ওরা লোকদেরকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দেয় এবং ব্যবিলনে হারুত মারুতের এই ফেরেশতার প্রতি যা নাযিল হয়, তাও শিক্ষা দেয়।

ব্যবিলনবাসীরা সাবেয়ী ধর্মের অনুসারী ছিল। ওরা সাত তারকার পূজা-উপাসনা করত এবং সেগুলোকেই ইলাহ্ বলত। তারা বিশ্বাস করত যে, সমগ্র বিশ্ব জাহানে যা কিছু ঘটে তা সবই এদের কাজ। আসলে ওরা নাস্তিক। একক সৃষ্টিকারী তারকা ও বিশ্বের তাবত অবয়বের অস্তিত্ব দানকারী হিসেবে ওরা কাউকে বিশ্বাস করত না। আল্লাহ তা'আলা এই লোকদের প্রতিই তাঁর খলীল হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে পাঠিয়েছিলেন। তিনি এদেরকে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানিয়েছিলেন। আল্লাহ্র শিখিয়ে দেয়া যুক্তি ও দলীল পেশ করে তিনি তাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। তিনি এমন যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপিত করেছিলেন, যার প্রতিরোধ করার কোন সাধ্যই তাদের ছিল না। পরে তারা তাঁকে অগ্নিকুণ্ডলীতে নিক্ষেপ করেছিল। আল্লাহ্ সে আগুনকে শীতল ও শান্তিপূর্ণ বানিয়ে দিয়েছিলেন। পরে আল্লাহ তাঁকে সিরিয়ার দিকে হিজরত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ব্যবিলন, ইরাক-এলাকা, সিরিয়া, মিসর ও রোম—এই সব দেশের জনগণ বিউয়ারাসিব-এর সময় পর্যন্ত যাকে আরব যা 'দহাক' নামে অভিহিত করে—এই বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়েছিল। দাম্বাওন্দ অধিবাসী আফরীদুন এসব অঞ্চলের উপর সৈন্য পরিচালনা করেছিল। যারাই তার আনুগত্য স্বীকার করেছিল, তাদের সাথে চুক্তি করেছিল। তার কাহিনী অত্যন্ত দীর্ঘ। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তার রাজত্ব নিঃশেষ করে দেন। তাকে বন্দী করে দিলেন। আমাদের সমাজের জাহিল নারী-পুরুষ বিশ্বাস করে যে, আফরীদুন বিউয়ারাসিবকে দাম্বাওন্দ পর্বত-শীর্ষে বন্দী করে রেখেছে, সে জীবিত রয়েছে

সেখানে বন্দী অবস্থায় এবং যাদুকররা তার নিকট সেখানে আসে এবং তার নিকট থেকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করে। সে শীঘ্র মুক্তি ও প্রকাশিত হবে এবং সমগ্র পৃথিবী জয় করে নেবে। বস্তুত সে-ই হচ্ছে দাজ্জাল, রাসূলে করীম (স) তার সম্পর্কেই আগাম সংবাদ দিয়েছেন। তার সম্পর্কে আমাদেরকে সাবধান ও সতর্ক করে দিয়েছেন। এই গ্রন্থের—রচয়িতার ধারণা এই সব কথা অগ্নিপূজকদের নিকট থেকেই শুনা ও পাওয়া গেছে। তার ব্যবিলন সাম্রাজ্য ফারেসের দখলে চলে গেছে। তাদের কোন কোন লোক কখনো কখনো সেখানে স্থানান্তরিত হয়েছে। সেখানেই বসবাস শুরু করেছে। তারা অবশ্য মূর্তিপূজারী ছিল না। তারা তওহীদ বিশ্বাসী ছিল। আল্লাহ্কে বিশ্বাস করত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা আগুন-পানি-মাটি-বাতাস—এই চার মৌল উপাদানের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে। কেননা তাতে সৃষ্টিকূলের জন্যে অনেক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তার দ্বারা জীবের স্থিতি। অগ্নিপূজক জনগোষ্ঠী এদের মধ্যে থেকেই আত্মপ্রকাশ করে পরবর্তীকালে কুশ্তাসিবের সময়ে। যারদাশ্ত তাকে আহ্বান করেছিল। সে তার ডাকে সাড়া দিয়েছিল কতিপয় শর্তের ও বিষয়ের ভিত্তিতে। কিন্তু তার ব্যাখ্যা দীর্ঘ আলোচনার ব্যাপার। এখানে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে ব্যবিলনের যাদুকরদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা। পারসিকরা যখন এসব অঞ্চলে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তখন তারা যাদুকরদের হত্যা করত ধর্মীয় কাজ হিসেবে। তাদেরকে ধ্বংস করার তাদের এ অভিযান বহুদিন চেলেছে। তাদের মধ্যে অগ্নিপূজার ধর্ম উদ্ভূত হওয়ার পরও, এমনকি তাদের রাজত্বকাল অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও। পারসিকদের আত্মপ্রকাশের পূর্বে ব্যবিলনীয়দের জ্ঞান-বিদ্যা ছিল কলা কৌশলী, انير نجيات তারকা নক্ষত্রের নিয়মাদি। তারা মূর্তিপূজা করত। এই মূতিগুলো তারা বানিয়েছিল সপ্ত তারকার নাম অনুসারে এবং প্রত্যেকটির জন্যে আলাদা 'হায়কাল' বা মন্দির বানিয়েছিল। তাদের মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। নানা ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা তার নৈকট্য অর্জন করত। এসব অনুষ্ঠান হতো সেই নক্ষত্রটির নিকট প্রার্থিত আনুকূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী। এই প্রার্থিত বিষয় কখনো ভাল হতো, কখনো হতো মন্দ। 'ভালো' চাইত, কল্যাণ পাওয়ার আশা করত, তার ধারণা অনুযায়ী সে বৃহস্পতি গ্রহর নিকট উপস্থিত হতো। তা হতো ধুয়া তাবীজ, গিরা ও তার উপর 'ফু' দেয়া। আর যে মন্দ, যুদ্ধ, মৃত্যু ধ্বংস ইত্যাদির কোন একটি চাইত অন্য কারো জন্যে, সে Satura গ্রহের নৈকট্য অর্জন করত তার উপযুক্ত অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে। যে বিদ্যুৎ, জ্বলন, মহামারী চাইত, সে তার ধারণানুযায়ী মঙ্গল গ্রহের নৈকট্য অর্জন করত। তার সাথে সামঞ্জস্যশীল অনুষ্ঠানাদি পালন করত। যেমন, জন্তু যবেহ্ করা। তাবীজগুলো নিবতী ভাষায়। তাতে সেসব তারকা-নক্ষত্রের প্রতি তাযীম-সম্মান দেখানো হতো। ভালো, মন্দ, ভালোবাসা, ক্রোধ ইত্যাদি যা চাইত, তার জন্যে। তা তাদেরকে তাই দিত। ফলে তারা মনে করত যে, তারা তার নিকট যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। অন্যদের প্রতিও তারা যা-ইচ্ছা তা-ই করতে পারে, তাতে কোন দোষ হবে না। তারা যেসব নক্ষত্রের নিকট যা চায়, তাকে সন্তুষ্ট করা ও তার নেকট্য লাভের জন্যে তারা তা-ই করত। তাদের সাধারণ ধারণা এই ছিল যে, ওরা মানুষকে গাধা বা কুকুর বানিয়ে দিতে পারে। পরে আবার

তাকে 'মানুষ' বানিয়ে দিতে পারে। ওরা ডিম্ব, গির্জা ও নির্জন ধ্বংস প্রাপ্ত স্থানে থাকে। বাতাসে উড়ে। ইরাক থেকে ভারত পর্যন্ত চলে যায়। চলে যায় যে কোন দেশে ইচ্ছা হয়। পরে সেই রাতেই ফিরে আসে। সাধারণ জনগণেরই এই বিশ্বাস ছিল। কেননা ওরা গ্রহ-নক্ষত্রের পূজা করত। এই ভক্তি-শ্রদ্ধায় তারা যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করত। যাদুকররা এরই মধ্যে নানা কৌশল অবলম্বন করত। জনগণের উপর সম্মোহন চাপিয়ে দিত তাদের সুস্বাস্থ্যের আশা দিয়ে। তাদের কথাকে যারা সত্য বলে বিশ্বাস করে তারা ছাড়া আর কেউ এসব করে উপকার পেতে পারে না। তাদের রাজা-বাদশাহ্রা তাদের এসব কার্যকলাপের উপর কোন আপত্তি তুলতো না। বরং যাদুকররা মহিমান্বিত মহলে অবস্থান করত। কেননা সাধারণ মানুষ তাদেরকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করত, মহামহিম মনে করত। কেননা সে সময়ের রাজা বাদশাহ্রা তা-ই বিশ্বাস করত, যা যাদুকররা তারকা-নক্ষত্র সম্পর্কে প্রচার করত। এ ভাবে সেসব রাজত্বও নিঃশেষ হয়ে যায়।

লক্ষণীয়, ফিরাউনের বাদশাহীর আমলে জনগণ জ্ঞান-বিদ্যা, যাদু, কলা-কৌশল ও অগ্নি প্রজ্বলন ইত্যাদির দক্ষতা অর্জন করেছিল, এ কারণেই হযরত মূসা (আ) তাদের প্রতি নবী-রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। সঙ্গে এনেছিলেন অসি ও এমন সব নিদর্শন, যে সম্পর্কে যাদুকররা নিশ্চিতই জানত যে, তা কোনক্রমেই যাদুর ব্যাপার নয়। সে কাজ আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ করতে পারে না, যা হযরত মূসা (আ) কর্তৃক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেই রাষ্ট্র ও সম্রাট যখন বিলীন হয়ে গেল, তারপর তথায় তওহীদবাদীদের অবস্থান হয়েছিল। তারা পূর্ববর্তীদের সন্ধান করছিল এবং তাদেরকে হত্যা করে আল্লাহ্র নৈকট্য পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করত। তারা গোপনে ও প্রকাশ্যে সাধারণ মানুষকে এবং মূর্খদের আহ্বান জানাচ্ছিল। এই সময় যারা তার আহ্বান জানাচ্ছিল তাদের বহু লোকই মেয়েলোক সহ ডাকছিল। মূর্খরা একত্র হয়ে গিয়েছিল, যারা তাদের জন্যে এই কাজ করে দেবে—এমন লোকদেরকে তারা আহ্বান জানাচ্ছিল, তাদের কথার সত্যতা স্বীকার করার জন্যে। তাদেরকে যারা সত্য বলে মেনে নিত, তারা কাফির হয়ে যেত কয়েকটি দিক দিয়ে। এক—তারকা নক্ষত্রের তাযীম করা ও সেগুলোর নাম 'ইলাহ' রাখা কর্তব্য বলে তারা বিশ্বাস করত। দুই—এ কথা বিশ্বাস করা যে, তারকা-নক্ষত্রগুলো তার ক্ষতি করতে পারে যেমন, তেমনি উপকারও করতে পারে। তৃতীয়—যাদুকররা নবীগণের মতই মুজিযা দেখাতে সক্ষম একথা স্বীকার করা। তাই আল্লাহ তাদের প্রতি দুজন ফেরেশতা পাঠালেন। ওরা যে জিনিসের দাবি করছিল তার নিগূঢ় তত্ত্ব তাঁরা প্রকাশ করে দিচ্ছিল এবং তারা যেসব কথার উল্লেখ করে তার বাতুলতা উদ্ঘাটিত করছিল। যে সব উপায়ে ওরা জনগণকে সম্মোহিত করছে, তার বিভ্রান্তির জাল তারা ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিল। ওসব তাবীজ-তুমারের তাৎপর্যও জানিয়ে দিচ্ছিল। বলে দিচ্ছিল যে, তা শিরক ও কুফর। তারা যে সব কৌশল দ্বারা জনগণকে সম্মোহিত করতে সমর্থ হতো তাও বলে দিচ্ছিল। তার মূলে কি রহস্য রয়েছে তা-ও প্রকাশ করে দিত। তা গ্রহণ করার ও সে সব আমল করার মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে লোকদেরকে সাবধান করে দিচ্ছিল। আল্লাহ্র বলা এই কথাটি তারা বলত ঃ

إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ –

মূলত আমরা তোমাদের মহাপরীক্ষার জন্যে এসেছি। অতএব তোমরা কুফর করো না।

এই হচ্ছে ব্যবিলনের যাদুর মৌল কাহিনী। বরং এসব সত্ত্বেও যাদুর অন্যান্য সব দিক ও ধরন তারা প্রয়োগ করত। পূর্বোল্লিখিত কলা-কৌশল ব্যবহার করতেও তারা সংকোচ করত না। সে সব দ্বারা তারা জনগণের উপর প্রচণ্ড সম্মোহনী প্রভাব বিস্তার করত। তারকা-নক্ষত্রের কার্যক্রমের কথা বলে তারা শক্তি অর্জন করত। সে বিষয়ে কোন বিতর্কে তারা অবতরণ করত না। লোকেরা তা মেনে নিক—এটাই ছিল তাদের একমাত্র চেষ্টা।

মূলত যাদু পর্যায়ে অনেক চিন্তা কল্পনা রয়েছে। তার প্রকৃত অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত তার বাহ্যিক প্রকাশ। এক প্রকারের যাদু আছে, জনগণ তা জানে অভ্যাস চলার মাধ্যমে। অভ্যাসের মধ্য দিয়েই তার প্রকাশ ঘটে। কোন কোনটা প্রচ্ছন্ন ও অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তার নিগূঢ় তত্ত্ব যে কি, তা জানা-বোঝা যায় না। তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও বুঝাবার উপায় নেই। তার পরিচিতি মেনে নিতে হয়। কেননা প্রত্যেক প্রকারের বিদ্যার ধর্ম হল তা প্রকাশমান বা প্রচ্ছন্ন এই প্রকারের হবে। হবে জাহির ও সূক্ষ্ম। প্রকাশমান যা, তা যে তা দেখবে সে-ই বুঝতে পারবে। বিজ্ঞ লোকদের নিকট থেকে তা শোনা হয়েছে। আর সূক্ষ্ম প্রচ্ছন্ন যা, তা তার উপর দক্ষতা সম্পন্ন লোক ছাড়া অন্যরা বুঝতে পারে না। সে বিষয়ে আলোচনা করা নিষ্ফল চেষ্টা মাত্র। তার দৃষ্টান্ত এই, যেমন, নৌকার আরোহী যখন খালে চলছে, তখন সে দেখতে পায় যে, তীরে অবস্থিত গাছপালা ও ঘরবাড়িও তার সঙ্গে সঙ্গে চলছে। অথবা যেমন উত্তর আকাশে অবস্থিত চন্দ্রকে দেখে দক্ষিণ আকাশের মেঘের ছায়ায় চলছে। যেমন সুগন্ধিযুক্ত পাউডারের গোল পাত্র; সেটিকে একটি গোল কলারের মত দেখে। কোন চাকা যখন খুবই দ্রুতগতিতে আবর্তিত হতে থাকে, তখনও এই রকম দেখে। কোন কাষ্ঠের এক মাথায় থাকলে সেটিকে যদি কেউ ঘুরায়, তা হলেও সেটিকে গোল গলাবন্ধনীর মত দেখা যাবে। যেমন পানি ভরা পাত্রে রক্ষিত একটি আঙুর জাম সদৃশ দেখা যাবে। যেমন ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তি কুয়াশার মধ্যে বিরাট বড় ব্যক্তি মনে হবে। যেমন জমিন নিঃসৃত বাষ্প সূর্যের উদয় কালে তার কিরণ বিরাট দেখা যাবে। যখন তুমি তা থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, সূর্য উপরে উঠে যাবে, তখন তা ক্ষুদ্র হয়ে দেখা দেবে। যেমন সোজা ঋজু বংশদণ্ড পানির মধ্যে ভাঙ্গা বা বাঁকা দেখা যাবে। যেমন অঙ্গুরীয়কে তোমার চোখের নিকটে এনে দেখলে প্রশস্ত বালারূপে দেখা যাবে। এ পর্যায়ের দৃষ্টান্তরূপে বিপুল, অসংখ্য জিনিসের উল্লেখ করা যেতে পারে, যা তার আসল অবস্থা থেকে ভিন্নতর কল্পিত হবে। জনগণ তা চিনতে পারবে। এমন জিনিসও আছে যা খুবই সূক্ষ্ম। তবে তা ধরলে ও চিন্তা করলে প্রকৃত জিনিস বোঝা যাবে। যেমন যাদুকরের সূতা, কখনো তা লাল, কখনো হলুদ, আবার কখনো কালো দেখা যায়। যাদুকররা তা নেড়েচেড়ে দেখিয়ে থাকে, কিন্তু তার আসল অবস্থার বিপরীতটা কল্পনায় প্রকাশ করে। যেমন একটা চড়ুই পাখী যবেহ করা হয়েছে; কিন্তু তোমাকে দেখাবে, পাখীটি চট করে উড়ে গেছে যবেহ করার পরই

তার মাথাটা বিচ্ছিন্ন করে। আসলে তা হয় তার হালকা গতিশীলতার কারণে। যেটি যাবেহ করা হয়েছে, সেটি নয়, উড়ে গেছে অন্যটি। কেননা যাদুকরদের নিকট দুটি চড়ুই থাকে। তার একটিকে লুকিয়ে রাখে, অপরটিকে প্রকাশ করে। যবেহ্‌কৃতটির হালকা নড়া-চড়ার কারণে মানুষ ধোঁকায় পড়ে যায়। যাদুকর প্রকাশ্যভাবে দেখায় যে,সে একটি মানুষকে যবেহ করেছে, তরবারি তার উপর চালিয়ে দিয়েছে, তা তার পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আসলে কিছুই নয়। এভাবেই সব যাদুকর একেবারে শূন্য থেকে নামা, নড়া-চড়া বা গতিবিধির মাধ্যমে নানা বিস্ময়কর দৃশ্য দেখিয়ে থাকে। যেমন দেখায়, দুজন অশ্বারোহী পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, একজন অপরজনকে হত্যা করল। এজন্যে নানা কৌশল অবলম্বন ও ব্যবহার করা হয়। তারা বিশেষ প্রক্রিয়ায় নিতান্ত শূন্য থেকে বিরাট কিছু দেখিয়ে দেয়। যেমন একজন অশ্বারোহী, তার হাতে একটি পটাহ। দিনের একটি ঘন্টা অতিবাহিত হলেই সেই পটাহ্‌টিকে স্পর্শ না করেই সেটির উপর আঘাত হানে, সেদিকে একটু অগ্রসরও হয় না। কলবী উল্লেখ করেছেন, একজন সৈনিক সিরিয়ার কোন এলাকায় শিকারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিল। তার সঙ্গে ছিল একটি কুকুর ও একটি দাস (গোলাম), তখন সে একটি বিরাট অজগর দেখতে পেল। তা দেখে কুকুরটি ক্ষেপে উঠল, ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করল। তখন অজগরটি সেখানকার একটি গর্তে প্রবেশ করল, তার পেছনে পেছনে কুকুরটিও তাতে প্রবেশ করল। অনেকক্ষণ ধরে কুকুরটি বের হল না। তখন গোলামটিকে সেই গর্তে প্রবেশ করতে বলল। পরে সেও প্রবেশ করল। সৈনিকটি বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু বহু সময় অপেক্ষা করার পরও যখন কুকুর বা গোলাম কেউ বের হল না, তখন সে নিজেও সেই গর্তে প্রবেশ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করল। এই সময় সেখানে এক ব্যক্তি উপস্থিত হল। সে তাকে অজগর, কুকুর ও গোলাম সম্পর্কে খবর দিল। এদের একটিও যে বের হয়নি, তা তাকে বলল। এখানে সে নিজেও গর্তে প্রবেশ করতে প্রস্তুত হয়েছে। এই কথা শুনে আগত ব্যক্তি তার হাত ধরল ও তাকে সহ গর্তের মধ্যে প্রবেশ করল। তারা একটি দীর্ঘ সুড়ঙ্গের মধ্যে পৌঁছে গেল এবং চলতে লাগল। তারা পৌঁছে গেল একটি ঘরে। ঘরের আলো তাদের সম্মুখে একটি স্থান উজ্জল করে তুলেছিল, যেখানে দুটি সিঁড়ি নেমেছে। তারা প্রথম সিঁড়িতে চড়ে বসল। তখন কিছু সময়ের জন্যে ঘরটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। লোকটি তাকে বলল ঃ তাকাও। সে তাকাতে কুকুর, গোলাম ও অজগর—তিনটিকেই দেখতে পেল নিহত অবস্থায়। সহসা ঘরের মাঝখানে এক ব্যক্তিকে দেখা গেল। সে লৌহ বর্ম পরিহিত। তার হাতে একটি তরবারি। সে লোকটিকে বলল—দেখেছ ? এখানে যদি এক হাজার ব্যক্তিও আসত, তাহলেও সে সেই সবকে হত্যা করে ফেলত। জিজ্ঞাসা করল, কি ভাবে ? বলল ঃ কেননা সে একটি পন্থা উদ্ভাবন করে যথাযথ সাজ-সরঞ্জাম সহকারে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যখনই কোন ব্যক্তি এই দ্বিতীয় সিড়িঁটিতে পা রাখে নিচে যাওয়ার জন্যে, তখনই সে এগিয়ে এসে তাকে তরবারির দ্বারা আঘাত হানে। অতএব তুমি সেদিকে যাবে না, সাবধান। সে বললে, তাহলে এখন উপায়। বললে, উপায় হচ্ছে তুমি লোকটির পেছনের দিক দিয়ে একটি সুড়ঙ্গ করবে। সেই সুড়ঙ্গ পথে তুমি তার

নিকটে যাবে। সেই দিক দিয়ে তুমি যদি তার নিকটে পৌছতে পার, তাহলে লোকটি নড়া-নড়া করতে পারবে না। তখন সৈনিক লোকটি মজুরীর বিনিময়ে কারিগর নিয়োগ করে লোকটির পেছন দিয়ে একটি সুড়ঙ্গ খুড়ল। তখন তারা সেই পথে লোকটির নিকট পৌছে গেল। দেখা গেল, যাদুকৃত ব্যক্তি সশস্ত্র হয়েছে ও তরবারি দিয়ে দিয়েছে। তখন তাকে উৎপাটিত করল। সেই ঘরেই তখন আর একটি দরজা দেখতে পেয়ে সেটি খুলে ফেলল। দেখল, সেখানে একটি সমাধি রাজবংশের কোন ব্যক্তির। ব্যক্তিটি পালংকের উপর মরে পড়ে আছে।

যাদুর এ ধরনের কার্যকলাপের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। রোম ও ভারতীয় চিত্র প্রদর্শকরা এ ধরনের যাদুর অনেক চিত্র তৈরী করে রেখেছে। দর্শক একজন মানুষ ও চিত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য করতে পারে না। যে লোক আগে থেকে ওটিকে একটি বানানো প্রতিকৃতি রূপে জেনে না নেবে সে সেটি দেখে কোন সন্দেহই করতে পারবে না। বরং সেটি একটি জীবন্ত মানুষই মনে হবে তার কাছে। সে হয়ত দেখবে, মানুষটি হাসছে কিংবা কাঁদছে। এমন কি লজ্জার হাসি ও আনন্দের হাসির মধ্যেও এবং ক্রোধান্বিতের হাসির মধ্যে পার্থক্য করা যাবে। এগুলো আসলে খুবই সূক্ষ্ম ব্যাপার। আকাশ-কুসুম কল্পনার ব্যাপার, এক দুরন্ত প্রচ্ছন্ন ও গোপন ব্যাপার। এ পর্যায়ের কিছু কিছু স্পষ্ট ব্যাপার আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। ফিরাউনের যাদুকরদের যাদুর ব্যাপারটিও এই ধরনেরই ছিল। যষ্ঠি ও রশির কলা-কৌশলের কীর্তি প্রসঙ্গে আমরা বয়ান করেছি। প্রাচীন ব্যবিলন অধিবাসীদের বিভিন্ন মত, তাদের যাদু ও কলা-কৌশলের বিভিন্ন রূপ ও ধরন পর্যায়ে আমরা যে সব ব্যাপারে উল্লেখ করেছি, এর বিষয়ে অবহিত ব্যক্তিগণের নিকট থেকেই আমরা শুনেছি ও জেনেছি। বইতে লিখিতও পেয়েছি তার কিছু কিছু। নিবতী ভাষা থেকে একটি ঘটনা আমি আরবীতে অনুবাদ করেছি। তাদের যাদু ও তার বিভিন্ন প্রকারের উল্লেখ একটি কিতাবে লিখিত পেয়েছি। এগুলোর মূলে নিহিত রয়েছে তারকার প্রতি তাযীম ও তার উদ্দেশ্যে কুরবানী করা, সেই সাথে অনেক কুসংস্কারাচ্ছন্ন কিসসা-কাহিনী। সেগুলোর উল্লেখ এখানে সামঞ্জস্যশীল নয়। আর তাতে ফায়দা তো কিছু নেই।

আর এক প্রকারের যাদু আছে। তা জ্বিন শয়তান সম্পর্কিত কাহিনী, তাদের পূজা ও অনুসরণে তাবীজের ব্যবহার। ওরা এ সবের সাহায্যে ওদের লক্ষ্যে পৌছতে চায় কতগুলো ব্যাপারকে এগিয়ে দিয়ে, যা লোকদের কর্তৃক ব্যবহৃত, এই উদ্দেশ্যেই তারা তা প্রস্তুতও করেছে। জাহিলিয়াতের জামানায় আরব গণকরা সেগুলো চালু করেছিল। তার অধিকাংশই মানুষকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে মনগড়াভাবে বানানো। উক্ত বইটি না থাকলে এ পর্যায়ে কিছু বলাই সম্ভব হতো না। আমি সে বিষয়ে জানবার জন্যে অনেকগুলো মনগড়া কাহিনীর উল্লেখ করেছি। এ ধরনের মনগড়া কাহিনী অনেক রয়েছে। তা বলিষ্ঠ সংকল্পসিদ্ধ লোকদের জন্যে ক্ষতিকর। অবশ্য লোকদেরকে বিপদে ফেলা খুব একটা সহজসাধ্য কাজ নয়। এই জন্যে তারা লোকদের উপর প্রভাব বিস্তার করে এ কথা বলে যে, জ্বিন তাদের আনুগত্য করে আল্লাহ্ তা'আলার নামে তাবীজের কারণে। ওরা এর দ্বারা যার যার জবাব দিতে চায়, তাদেরকে জবাব দেয়। যার জন্যে ইচ্ছা তারা জ্বিন বের করে।

এভাবে তারা সাধারণ মানুষকে ধোঁকায় ফেলে, তারা তাদেরকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। কেননা ওদের সামনে প্রকাশ পায় যে, জ্বিনেরা আল্লাহ্র নামের কারণে ওদের আনুগত্য করছে। সুলায়মান ইবনে দাঊদ (আ)-এরও ওরা আনুগত্য করত এই আল্লাহ্র নামের বরকতে। ওরা তাদেরকে প্রচ্ছন্নতা ও চুরি করে নানা বিষয়ে সংবাদ দিত। মুতাজিদ বিল্লাহ (আব্বাসীয় খলীফা) বিপুল দাপট-প্রতাপ ও জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সব যাদুকরের কথায় প্রতারিত হয়েছিলেন। ইতিহাস লেখকগণ তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর অন্দরমহলে যেখানে তিনি তাঁর বেগম ও পরিবারবর্গের সাথে একান্তে মিলিত হতেন—এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছিল। তার হাতে ছিল তরবারি। সে বিভিন্ন সময়ে প্রায়ই তথায় দেখা দিত। তবে যুহরের সময়ই বেশী আসত। কিন্তু তাকে ধরার জন্যে যখনই তার খোঁজ করা হতো, তাকে ধরা যেত না। তার কোন চিহ্নও কোথাও দেখা যেত না শত তালাশ করা সত্ত্বেও। অথচ তিনি কয়েকবারই তাকে নিজ চোখে দেখতে পেয়েছেন। এ অবস্থায় তিনি খুব চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তখন তিনি রাষ্ট্রের চিন্তাশীল পদাধিকারী লোকদের ডাকলেন। তারা এলে সেই সঙ্গে আরও বহু পুরুষ ও নারীকেও উপস্থিত করা হল। মনে করা হল যে, এদের মধ্যেরই কোন ব্যক্তি হবে। তিনি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে আদেশ দিলেন সেই ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার জন্যে। তারা তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে চিহ্নিত করল। মনে করল যে, নিঃসন্দেহে এই ব্যক্তিই হবে সেই কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি। এর পরই লোকটি প্রচ্ছন্ন হয়ে গেল। তখন তারা দিশা হারিয়ে ফেলল, এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগল। তাকে তো তারা দেখছিল। মুহূর্তের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল, দিশা পাওয়া গেল না। তখন তারা বুঝতে পারল যে, এটা অতি মাত্রার চালাকি। এরূপ কীর্তি খুব একটা সাধারণ নয় এবং তা সম্ভব জ্বিনের আনুগত্যের কারণে। জ্বিনের সাহায্যেই এই আত্মগোপন সক্ষম হয়েছে। যখনই সে আত্মগোপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তখনই সে আত্মগোপন করতে সক্ষম হয়েছে। এই কারণে মুতাজিদের নিকট ব্যাপারটি অসহ্য হয়ে পড়ে। তবুও তিনি তাদের সেই লোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, যে লোকটি তার ঘরে সময় সময় আত্মপ্রকাশ করে। লোকেরা তাঁর প্রতি কতগুলো জিনিস আরোপ করে, তাদের নিকট যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সে বিষয়ে না জেনেই তাঁর মন ভিন্ন দিকে মগ্ন হয়ে গেল। তখন তিনি লোকদেরকে ফিরে যেতে ও উপস্থিত প্রত্যেককে পাঁচ দিরহাম করে দেয়ার আদেশ করলেন। পরে তিনি চূড়ান্ত মাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন করেন, যতটা তার পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল। তিনি ঘরের প্রাচীরসমূহে এমন শক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ দিলেন, যেন কারোর পক্ষে তা টপকানো বা উপর থেকে প্রবেশ করা সম্ভব না হয়। আর প্রাচীরের উচ্চ ভাগে এমন বাধা স্থাপন করে দিয়েছিল, যেন চোর যেরূপ সেগুলো ফেলে দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে সেরূপ প্রবেশ করা কারোর পক্ষে সম্ভব না হয়। অতঃপরও অবস্থা এই ছিল যে, সেই ব্যক্তির পূর্বের ন্যায় ঘরের মধ্যে সময় সময় আত্মপ্রকাশ চলতেই থাকে। এই অবস্থার মধ্যেই মুতাজিদ ইন্তিকাল করে যান। অথচ প্রাচীরের উপর স্থাপিত বাধা-বিপত্তি যথাযথ বর্তমান ছিল। মুতাজিদ নির্মিত সেই প্রাচীর সেই অবস্থায় আমি দেখতে পেয়েছি। তখন আমার এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম। পরবর্তী শাসক মুক্তাদির বিল্লাহ সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কিছুই

জানতেন না। তিনি পরে তা জানতে পরেছেন কিনা জানতে চাইলে বললেন, হ্যাঁ, সেই ব্যক্তি সম্পর্কে মুকতাদির বিল্লাহ্র শাসনামলেই প্রকৃত ব্যাপার জানা যায়। সে ব্যক্তি আসলেই ছিল বাড়ির একজন খাদেম। সাদা বর্ণের লোক ছিল। তার নাম ছিল ইয়াকাক। শাহী হেরেমের অভ্যন্তরে বসবাসকারী কোন দাসীর প্রতি সে আকৃষ্ট ছিল। সে বিভিন্ন রঙ ও বর্ণের দাড়ি নিজের নিকট রাখত। তার কোন একটি যখন সে নিজের মুখে লাগাত, তখন যে-ই তাকে দেখত, সে দাড়ি যে তার নিজের মুখে গাজান, এ বিষয়ে দর্শকের মনে কোন সংশয় জাগত না। সে যে-সময় যে দাড়ি ইচ্ছা পরিধান করত এবং নতুন বেশে সেখানেই সে আত্মপ্রকাশ করত। তার হাতে তরবারি কিংবা অন্য কোন অস্ত্র থাকত। আর এর-ই উপর মুতাজিদের নযর পড়ত। পরে যখন তাকে খোঁজ করা হতো, তখন বাগানের গাছপালার মধ্যে প্রবেশ করত। অথবা কোন চলাচল পথে বা আশ্রয়স্থলে চলে যেত। সে যখন তার খোঁজকারীর দৃষ্টির আড়ালে চলে যেত, তখন তার মুখের দাড়ি টেনে খুলে ফেলত এবং সেটি আস্তিনে বা কেটে গর্ত করা অঙ্গে লুকিয়ে রাখত। হাতিয়ারটি তার নিকটে থেকে যেত। তখন মনে হতো, সে এ বাড়িরই একজন কর্মচারী, কোন ব্যক্তির সন্ধান কাজে নিয়োজিত। তাকে কেউ সন্দেহ করত না। তাকেই বরং লোকেরা জিজ্ঞাসা করত এই বলে যে, এ দিকে কাউকে আসতে দেখেছ? আমরা একটি লোককে এদিকে আসতে দেখেছি। জবাবে সে বলত—না, আমি তো কাউকে দেখিনি। ঘরের মধ্যে এ কারণে একটি ভীতির সঞ্চার হতো। তখন ঘরের অভ্যন্তর থেকে দাসীরা বের হয়ে আসত এই স্থানটিতে। তখন সে তার কাঙ্ক্ষিত দাসীটিকে দুই চোখ ভরে দেখত এবং মনের মত কথা-বার্তা বলত। আসলে তার এ সব কাজের মূলে দাসীটির সাক্ষাৎ পাওয়াই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। মুকতাদির বিল্লাহর সারা শাসন আমলব্যাপী তার এই ভাবে কথা বলা চলতে থাকে। তারপর সে দেশ বিদেশের সফরে বের হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তরসূস-এ উপনীত হয়। সেখানেই সে অবস্থান গ্রহণ করে। শেষ পর্যন্ত সে মরে যায়। পরে সেই দাসীটি তার কাহিনী বর্ণনা করেছে। তাতে তার অবলম্বিত কলা-কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত জানা গেছে। বস্তুত এ হচ্ছে একজন খাদেমের অবলম্বিত বিচিত্র লীলাখেলা। তা এতই প্রচ্ছন্ন ছিল যে, মুতাজিদ বিল্লাহ্র শত চেষ্টা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তার নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়নি। তবু তার এ সব কার্যকলাপ কোন নতুন উদ্ভাবিত কলা-কৌশল ছিল না। এগুলোকে অনেকে আবার জীবিকার উপায় হিসেবেও গ্রহণ করেছে।

আর এক প্রকারের যাদু হচ্ছে মিথ্যা অপবাদ রচনা ও প্রচার (calumny)। লোকসমাজে তা ব্যাপকভাবে প্রচার ও ঘরে ঘরে পৌঁছানো (Slander) এবং এর মাধ্যমে সমাজে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করা এবং গোপন প্রচ্ছন্ন উপায়ে লোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্টকরণ। বস্তুত এই ব্যাপারটি জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রসারিত। বর্ণনা করা হয়েছে, একটি মেয়েলোক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টির সংকল্প গ্রহণ করে প্রথমে স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল যে, তোমার স্বামী তোমার প্রতি বিরাগভাজন। তার উপর যাদু করা হয়েছে, তাকে তোমার দিক থেকে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে। এ জন্যে আমিও তোমার

খাতিরে তার উপর যাদু ক'রবো, যেন সে তোমাকে ছাড়া অন্য কারো দিকে মনোযোগী না হয়, অন্য কারোর দিকে চোখ তুলে না তাকায়। কিন্তু সেজন্যে তার তিন গাছি মাথার চুলের দরকার, যা তুমি ক্ষুর দিয়ে কেটে আমার হাতে দেবে। তাতেই কাজটি সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। স্ত্রী তার কথায় প্রতারিতা হল, তাকে সত্যবাদী বলে গ্রহণ করল। এর পর সেই স্ত্রীলোকটি স্বামীর নিকট গেল। বলল, তোমার স্ত্রী তো অপর এক ব্যক্তির গলায় ঝুলে পড়েছে। এখন সে তোমাকে হত্যা করার সংকল্প গ্রহণ করেছে। আমি তার এই সংকল্প সম্পর্কে তার নিকট থেকেই জানতে পেরেছি এবং তদ্দরুন আমি তোমার ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছি। তোমার কল্যাণ কামনাই আমাকে তোমার নিকট আসতে ও এ বিষয়ে তোমাকে অবহিত করতে বাধ্য করেছে। তোমার জন্যে উপদেশ, তুমি তোমার স্ত্রীর কুহক-জালে পড়ো না, তার দ্বারা প্রতারিত হয়ো না। সে তোমাকে হত্যা করবে ক্ষুর দ্বারা। তুমি নিজেই তা দেখতে পাবে। এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। রাতে স্বামী তার ঘরে ঘুমের ভান করে শুয়ে পড়েছে। স্ত্রী যখন মনে করল তার স্বামী এখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন সে এক ধারাল ক্ষুর নিয়ে তার দিকে অগ্রসর হল এবং তার মাথা থেকে তিনটি চুল কেটে নিতে উদ্যত হল। ঠিক তখনই স্বামী চোখ খুলে দেখতে পেল, তারই স্ত্রী ক্ষুর দিয়ে তার গলা কাটতে উদ্যত হয়েছে। সে যে তাকে হত্যা করতে চাচ্ছে, এ বিষয়ে তার মনে আর কোন সন্দেহই থাকল না। তখন সে চট করে স্ত্রীকে হত্যা করল। শেষে এই হত্যার বিনিময়ে সে-ও নিহত হল। এই ধরনের কুচক্রের অনেক কাহিনীই রয়েছে, যা বলে শেষ করা যাবে না।

আর এক প্রকারের যাদু আছে, তা হচ্ছে খাদ্যে এমন ঔষধ সংমিশ্রণ যা বিবেক-বুদ্ধিকে প্রভাবিত ও বিলুপ্ত করে। যেমন গাধার মগজ কোন মানুষ খেলে তার বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাবে, তার বুঝ-সমঝ হারিয়ে যাবে বা কম হয়ে পড়বে। এ ছাড়া আরও অনেক ঔষধ আছে, যার উল্লেখ তিব-এর কিতাবে রয়েছে। লোকেরা সেই ঔষধ খাদ্যের সাথে মিশিয়ে দেয়। কেউ তা খেলে তার বুদ্ধিমত্তা হ্রাস পেয়ে যাবে, তখন সে নানা অবাঞ্ছিত কাজকর্ম করে। লোকেরা তখন বলে—এই ব্যক্তির উপর যাদু করা হয়েছে। কিন্তু যথার্থ বিবেক বুদ্ধি বলে দেয়—এগুলো সব কল্পিত—এর মূলে কোন বাস্তবতা নেই। এ পর্যায়ে লোকেরা দাবি করে যে, যাদুকর ও সংকল্পকারী যদি তাদের দাবিকৃত উপায়ে মানুষের উপকার বা ক্ষতি করতে পারত, যদি উড়তে, গায়বের জ্ঞান জানত, দূরবর্তী নগর জনপদের খবর দিতে সক্ষম হত, গোপন বিষয়ে জানিয়ে দিতে পারত, চুরির হদিস করতে পারত বা উল্লিখিত উপায় ছাড়া অন্যভাবে মানুষের ক্ষতি-উপকার করতে পারত, তা হলে তো তারা রাজ্য, সাম্রাজ্যও উড়িয়ে দিতে পারত, মাটির তলায় রক্ষিত মূল্যবান সম্পদ উদ্‌ঘাটিত করতে এবং রাজা-বাদশাহকে হত্যা করে দেশের পর দেশ জয় করে নিতে পারত। অথচ তা করতে গিয়ে তারা নিজেরা কোন অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থার সম্মুখীন হতো না, কোন খারাপ অবস্থায় পড়ত না। তারা যে-কোন ইচ্ছা বাস্তবায়ন থেকে বিরত থাকত না। মানুষের হাতের সম্পদ দাবি করার কোন প্রয়োজনই তাদের হতো না। কিন্তু তার কোনটাই যখন হয় না; বরং ওসব ক্ষমতার

দাবিদারদের অভ্যাস অত্যন্ত খারাপ। ওদের অধিকাংশই হয় লোভী, নানা কৌশল অবলম্বন করে লোকদের নিকট থেকে টাকা-পয়সা পাওয়ার জন্যে। নিজেদের দারিদ্র্য লোকদের নিকট প্রকাশ করে। এ থেকে নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, ওরা আসলে কিছুই করতে পারে না। সমাজের মূর্খ ও শীর্ষস্থানীয় বোকা লোকেরাই ওদেরকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করে যাদুকরদের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড ঘটাবার ভিত্তিহীন দাবি। যারা তাদেরকে সত্য বলে মেনে নিতে অস্বীকার করে, ওরা তাদের প্রতি কঠোর আচরণ করে। ওরা স্বকপোলকল্পিত বানোয়াট অনেক কথাবার্তাই প্রচার করে সেগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। যেমন হাদীসে একটি বর্ণনা রয়েছে। একটি মেয়েলোক হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে যে, সে একজন (স্ত্রী) যাদুকর। আমার এই গুনাহ্ থেকে তওবা করার কোন পথ আছে কি ? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি যাদুকর ? জবাবে বলে, আমি ব্যবিলনে হারুত-মারুতের অবস্থান স্থানে ভ্রমণ করেছি এই যাদুবিদ্যা লাভের জন্যে। তারা দুজনই বলেছে—না, হে আল্লাহ্‌র বান্দী, তুমি দুনিয়ার সুখ লাভের লোভে পরকালীন আযাবের পথ অবলম্বন করবে না। কিন্তু আমি তাদের কথা মেনে নিতে অস্বীকার করি। তখন তারা দুজন আমাকে বলে ঠিক আছে, তুমি ওদিকে ছাই-স্তূপের উপর গিয়ে প্রস্রাব করে আস। আমি তাদের আদেশ মত তাই করতে চলে যাই। তখন আমার মনে দ্বিধা জাগল, আমি কথাটি বিবেচনা করলাম। ফলে আমি তা করলাম না। অথচ ওদের নিকট ফিরে এসে আমি ওদের কথামত কাজ করেছি বলে জানালাম। তারা বলল ওখানে কি দেখেছ ? বললাম কিছুই দেখতে পাইনি সেখানে। তখন ওরা দুজনই বলল ঃ না, তুমি আমাদের কথামত কাজ করনি। যাও, যা বলেছি, তাই করে এস। তখন আমি আবার গেলাম প্রস্রাব করলাম। তখন দেখলাম, আমার গুপ্তস্থান (স্ত্রী-অঙ্গ) থেকে লৌহ বর্ম পরিহিত এক অশ্বারোহী বের হয়ে এসেছে। পরে সে আকাশে উঠে গেল। তখন ওদের নিকট ফিরে এসে ঘটনার খবর দিলাম। তখন ওরা দুজন বলল—ও হচ্ছে তোমার ঈমান, তোমার ঈমান তোমার কাছ থেকে চলে গেছে। তুমি ভালো যাদুকর হয়ে গেছ। বললাম—তা কেমন করে ? বলল—এক্ষণে তুমি যা-ই করতে চাইবে, তার কল্পনা মনে মনে করে নেবে, তা-ই হয়ে যাবে। তখন আমি মনে করলাম যবের একটি দানা। আর অমনি যবের একটি দানা পেয়ে গেলাম। আমি দানাটিকে লক্ষ্য করে বললাম—এখন ফসল ফলাও। অমনি অল্প সময়ের মধ্যে তা গাছ হয়ে তাতে ছরা ধরল। সেই যবের ছরার দানাসমূহকে গুড়ি হয়ে আটায় পরিণত হয়ে রুটি হয়ে যেতে বললাম। অমনি তাই হয়ে গেল। এভাবে আমি মনে যে জিনিসেরই ধারণা বা কল্পনা গ্রহণ করি, বাস্তবে তাই হয়ে যায়। এসব শুনে হযরত আয়েশা (রা) বললেন—না, তোর তওবা নেই। বর্ণনায় তার 'কিসাস' হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণ মূর্খ মানুষের নিকট এই ধরনের কথা বর্ণনা করা হলে তারা তা সত্য বলে মেনে নেয়। তারাই তা প্রচার করে।

এ পর্যায়ে আর একটি কাহিনী বর্ণনা করা হয় ইবনে হুরায়রা সম্পর্কে। বলা হয়—সে একটি যাদুকর মেয়েলোক আটক করে। সে তার নিকট যাদু করার বিষয়ে স্বীকারোক্তি করে। তখন ইবনে হুরায়রা শরীয়াত বিশেষজ্ঞদের ডাকেন এবং এই যাদুকর স্ত্রীলোকটির

কি শাস্তি হতে পারে তা জিজ্ঞাসা করেন। তাঁরা রায় দিলেন যে—ওকে হত্যা করতে হবে। ইবনে হুরায়রা বলেন, আমি ওকে হত্যা করব পানিতে ডুবিয়ে। তিনি একটি লৌহ নির্মিত চরকির সাথে ওর পা শক্ত করে বেঁধে ফোরাত নদীতে ফেলে দিলেন। পরে সে সেই লৌহ চরকিটিসহ পানির উপর ভেসে উঠে এবং পানির সাথে ওলট-পালট খেতে লাগল। তা দেখে লোকেরা ভয় পেয়ে গেল। ইবনে হুরায়রা ঘোষণা করল—ওকে যে ধরে দেবে তাকে বিরাট পুরস্কার দেয়া হবে। উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন পুরুষ যাদুকর ছিল। সে সে-কাজে আগ্রহী হয়ে বলল আমাকে একটি পানি ভর্তি কাঁচের পেয়ালা দিন। লোকেরা তা উপস্থিত করল। লোকটি সে পাত্রের উপর বসে প্রস্তরের নিকটে গেল। পাত্র দ্বারা পাথরটি ভাঙ্গল টুকরা টুকরা করে। তখন সে স্ত্রী যাদুকরটি ডুবে গেল। লোকেরা তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করল।

কিন্তু যে লোক এইসব কীর্তিকলাপকে প্রকৃত ও সত্য বলে বিশ্বাস করবে, সে নবুয়তকে বুঝতে পারবে না। সে মনে করবে, নবী-রাসূলগণের মুজিযাও বুঝি এই ধরনেরই ব্যাপার। তারাও নাউজুবিল্লাহ—যাদুকর ছিলেন। এ পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَلَايُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى – (طـه : ٦٩)

যাদুকর যা-ই নিয়ে আসুক, সে কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারে না।

যাদুকরদের এরও অধিক খারাপ ও বীভৎস কার্যাবলীর লোকশ্রুতি রয়েছে। ওরা ধারণা করেছে, নবী করীম (স) যাদু করেছেন—(নাউজুবিল্লাহ) এবং যাদু কার্যের মধ্যেও বুঝি সত্য নিহিত আছে। এমনকি এতদূরও বলা হয়েছে যে, মনে খেয়াল জাগে যে, আমি কিছু বলছি বা করছি। অথচ আসলে আমি কিছু বলিওনি, করিওনি। বলা হয়, এক ইয়াহূদী নারী রাসূলে করীম (স)-কে চিরুনী ও চুল ইত্যাদি সহযোগে যাদু করেছিল। এই সময় জিবরাঈল (আ) তাঁর নিকট এসে তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করলেন। ঐসব জিনিস একটি কূপের তলদেশে লুক্কায়িত ছিল। সেগুলো বের করা হল। ফলে তিনি ভাল হয়ে গেলেন। যাদুর প্রভাব তাঁর উপর থেকে দূরীভূত হয়ে গেল। কিন্তু কাফিররা নবী করীম (স) সম্পর্কে যা বলত, আল্লাহ্ তা'আলা ওদের সে কথাকে মিথ্যা বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِذْيَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا – (الاسرا : ٤٧)

জালিম-কাফিররা বলে যে, তোমরা তো একজন যাদু প্রভাবিত ব্যক্তির অনুসরণ করছ।

নাস্তিক মুলহিদ লোকেরা বহু কথাই বলেছেন। বলে, খাদ্যের মাধ্যমে তাঁকে যাদু করা হয়েছে। আর এ সবের সাহায্যে তারা নবী-রাসূলগণের মুজিযাকে বাতিল প্রমাণ করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। সে ব্যাপারে লোকদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করেছে। প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে যে, নবী-রাসূলগণের মুজিযা ও যাদুকরদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই—এ

সবই একই পর্যায়ের জিনিস। যারা নবীগণকে সত্য মানে, তাঁদের মুজিযাকেও সত্য বলে বিশ্বাস করে, আবার সেই সাথে যাদুকরদের এসব কার্যকলাপ কেউ যথার্থ বলে বিশ্বাস করে, তাদের নীতি খুবই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেনঃ 'যাদুকররা যা-ই নিয়ে আসুক, কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারে না।' তা করে তারা সত্য মানে তাকে, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা মিথ্যাবাদী বলে ঘোষণা করেছেন, যাদের দাবি ও কলা-কৌশলকে বাতিল বলে জানিয়ে দিয়েছেন। হ্যাঁ, এটা অসম্ভব নয় যে, ইয়াহুদী নবী মূর্খতাবশতই সে কাজ করেছিল একথা মনে করে যে, এর ফলে শরীর প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হবে। নবী করীম (স) সম্পর্কেও সে তাই মনে করে ঐ কাজ করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাদুর জিনিস লুকিয়ে রাখার স্থানটির গোপনীয়তা দূর করে তাঁকে সব জানিয়ে দিলেন। তাতে স্ত্রীলোকটির মুর্খতা-ই প্রমাণিত হল। তাই জানিয়ে দেয়াটা নবী করীম (স)-এর নবুয়তের সত্যতার অকাট্য প্রমাণ হিসেবে পরিগণিত। না, তাঁকে তা এক বিন্দু ক্ষতি করতে পারেনি, তাঁর নবুয়তের ব্যাপারটিও অস্পষ্ট মিশ্রিত করতে পারে নি। সব কয়জন বর্ণনাকারী রাসূলে করীম (স)-এর ব্যাপার অস্পষ্ট সংমিশ্রিত করেছিল বলে বর্ণনা করেন নি। আসলে এ সম্পর্কিত কথা মূল হাদীসে বাড়তি ও সংযোজন ছাড়া কিছুই নয়। তার কোন ভিত্তি নেই।

বস্তুত নবী-রাসূলগণের মুজিযা এবং উল্লিখিত ধারণা ও কল্পনার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। নবী-রাসূলগণের মুজিযা বাস্তব ভিত্তিক, পরম সত্য। তার বাহ্যিক যেমন, ভেতরের দিক থেকেও তা ঠিক তেমনি। যতই চিন্তা বিবেচনা করা হবে, তার সত্যতা সম্পর্কে দৃষ্টি ততই সূক্ষ্ম ও প্রসারিত হবে। সমগ্র সৃষ্টিও যদি তার মুকাবিলা ও বিরোধিতা করতে চেষ্টা করে বা অনুরূপ ঘটনা সঙ্ঘটিত করতে চেষ্টা করে, তবুও তা করতে সক্ষম হবে না। তাতে তাদের অক্ষমতা অবশ্যই প্রকাশিত হবে। প্রমাণিত হবে যে, যাদুকরদের মনগড়া সব কার্যকলাপ ও কল্পনা ধারণা এক প্রকারের কলা-কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। ভিত্তিহীন জিনিস প্রকাশ করার একটা কৌশল মাত্র। আর তারা ভিত্তিহীন যে সব জিনিস প্রকাশ করে, একটু চিন্তা পর্যালোচনা করলেই তার অন্তঃসারশূন্যতা উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে। আর এ জিনিস যে-ই যখন চাইবে শিখতে পারবে। তাতে দক্ষতাও অর্জন করতে পারবে এবং অন্যরা যেমন দেখিয়েছে তারাও তেমনি সব আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটিয়ে দেখাতে পারবে, যার মূলে আসলেই কোন বস্তু নেই।

আবূ বকর বলেছেন, আমরা এ পর্যন্তকার আলোচনায় যাদুর তাৎপর্য ও তার সারবস্তু সম্পর্কে অনেক তত্ত্বকথা বলেছি। পাঠক তা সহজেই বুঝতে পারবেন। এই কলা-কৌশলের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা, তার সকল দিক ও শাখা প্রশাখার ব্যাখ্যা দেয়া দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ। এজন্যে আমরা স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন বোধ করি। এখানে প্রসঙ্গত যাদুর শুধু তাৎপর্য ও সে সম্পর্কে কুরআনে সিদ্ধান্ত আলোচনা করা মুখ্য। এখন যেখানে আমরা এসে পৌছেছি তাতে ফিকাহ্বিদদের মতামত উল্লেখ এবং এ পর্যায়ের আয়াতের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার সময় এসেছে। যাদু ও যাদুকরদের গুনাহ্ অনুপাতে তাদের শাস্তি নির্ধারণ তাদের কাজের দরুন সৃষ্ট বিপর্যয়ের বিপুলতা ও ব্যাপকতার পর্যালোচনা এখানেই করতে হবে। প্রকৃত সত্য আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

## যাদুকরদের ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদদের বিভিন্ন মত

## এ বিষয়ে আগের কালের শরীয়াতবিদদের মন্তব্য

আবদুল বাকী উসমান ইবনে উমর আযযবী আবদুর রহমান ইবনে রিজা ইসরাইল, আবূ ইসহাক হুরায়রা সূত্রে আবদুল্লাহ্‌ থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ

مَنْ اَتَى كَاهِنًا اَوْ عَرَّافًا اَوْسَاحِرًا فَصَدَّ قَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

যে লোক কোন গণকদার বা গোপন কথার খোঁজদাতা কিংবা কোন যাদুকরের নিকট গেল এবং সে যা বলে তাকে সত্য বলে মেনে নিল, সে মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি কাফির হয়ে গেল।

আবদুল্লাহ নাফে—ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ একটি দাসী হযরত হাফ্‌সা (রা)-এর উপর যাদু করেছিল। লোকেরা তার যাদুর জিনিসপত্র পেয়ে গেল। দাসীও স্বীকার করল যাদু করার কথা। তখন আবদুর রহমান ইবনে যায়দ তাকে হত্যা করলেন। এই সংবাদ হযরত উসমান (রা)-এর নিকট পৌঁছল। তিনি এই কাজকে অপছন্দ করলেন। পরে হযরত ইবনে উমর (রা) তার নিকট এলেন এবং দাসীটি সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যাপার তাঁকে জানলেন।

পরে দেখা গেল যে, হযরত উসমান (রা) এই হত্যাকে অপছন্দ করেছিলেন শুধু এই কারণে যে, তাঁর অনুমতি ছাড়াই তা করা হয়েছিল।

ইবনে উয়াইনা আমর ইবনে দীনার থেকে উল্লেখ করেছেন, তিনি বাজালাকে বলতে শুনেছেন—আমি জজী ইবনে মুআবিয়াকে লিখতে চেয়েছিলাম। এ সময়ই হযরত উমর (রা)-এর চিঠি এসে গেল এই ফরমান নিয়ে ঃ

اَنِ اقْتُلُوْا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ -

প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রী যাদুকরকে হত্যা কর।

অতঃপর আমরা তিনজন যাদুকরকে হত্যা করেছি।

আবূ আসিম আশ্‌আস-হাসান সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ

يُقْتَلُ السَّاحِرُ وَلَا يُسْتَتَابُ -

যাদুকরকে হত্যা করতে হবে, তাকে তওবা করতে বলা যাবে না।

আল-মুসান্না ইবনুস্‌ সালাহ্‌ আমর ইবনে শুয়াইব সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) একটি যাদুকরকে ধরে বুক পর্যন্ত মাটিতে দাফন করে রেখে দিয়েছিলেন। পরিণামে সে মরে গিয়েছিল।

সুফিয়ান আমর সালিম ইবনে আবুল জায়াদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, কায়স

ইবনে সাদ মিসরের শাসনকর্তা ছিলেন। তখন কেউ তার গোপন কথা সব প্রকাশ করে দিচ্ছিল। তিনি বলে উঠলেন, আমার সব গোপন কথা কে প্রকাশ করে দিচ্ছে? লোকেরা বলল ঃ এখানে একজন যাদুকর আছে। সে-ই তা করছে। তাকে তিনি ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন। বলল, আপনি যখন খোলা চিঠি পাঠান তখন আমরা তার বিষয়বস্তু জানতে পারি। কিন্তু চিঠি সিলমোহরকৃত বন্ধ থাকলে আমরা তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছুই জানতে পারি না। পরে তাকে হত্যা করার আদেশ দেয়া হয়।

আবূ ইস্‌হাক শায়বানী জামে' ইবনে শাদ্দাদ-আস্‌ওয়াদ ইবনে হিলাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) বলেছেন ঃ

اِنَّ هٰؤُلَاءِ الْعَرَّفِيْنَ كُهَّانُ الْعَجَمِ، فَمَنْ اَتَى كَاهِنًا يُؤْمِنُ لَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَهُوَ بَرِيٌّ مِمَّا اُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

এসব গোপন কথা ফাসকারী লোকেরা অনারব গণকদার। যে লোক কোন গণকদারের নিকট আসবে ও সে যা বলে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি অবতীর্ণ দ্বীনের সাথে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কহীন হয়ে যাবে।

মুবারক হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন, জনৈক (তিনি জুনদুব ইবনে সুফিয়ান আল-বাজালী) একজন যাদুকরকে হত্যা করেছিলেন।

ইউসুফ জুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন; বলেছেন ঃ

يُقْتَلُ سَاحِرُ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَايُقْتَلُ سَاحِرُ اَهْلِ الْكِتَابِ -

মুসলমানের যাদুকরকে হত্যা করা হবে। আহলি কিতাব যিম্মীদের যাদুকরকে হত্যা করা যাবে না।

কেননা নবী করীম (স)-কে একজন ইয়াহূদী ব্যক্তি যাদু করেছিল। তার নাম ছিল ইবনে আসাম। আর খায়বরের এক ইয়াহূদী নারী যাদু করেছিল। তার নাম ছিল যয়নব। কিন্তু নবী করীম (স)-সে দুজনকে শাস্তিস্বরূপ হত্যা করেন নি।

উমর উবনে আবদুল আজীজ বলেছেন ঃ

يُقْتَلُ السَّاحِرُ -

যাদুকরকে হত্যা করতে হবে।

আবূ বকর বলেছেন ঃ আগের দিকের ফিকাহবিদগণ যাদুকরকে হত্যা করা ওয়াজিব এই সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ একমত। কেউ কেউ অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে যাদুকরের কাফির হওয়ার কথা প্রমাণ করেছেন।

একালের বিভিন্ন এলাকার ফিকাহবিদরা যাদুকর সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

ইবনে শুজু' হাসান ইবনে যিয়াদ সূত্রে ইমাম আবূ হানীফার মত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

যাদুকরকে হত্যা করা যাবে যখন নিঃসন্দেহে জানা যাবে যে, সে একজন যাদুকর। তার নিকট থেকে তওবা কবুল করা যাবে না। আমি যাদু ত্যাগ করব। এবং তওবা করব তার এই কথাও গ্রহণ করা যাবে না। সে যদি স্বীকার করে যে, সে একজন যাদুকর, তাহলে তার রক্তপাত সম্পূর্ণ হালাল। দুজন সাক্ষী যদি তার যাদুকর হওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং তার কাছে যাদু কাকে বলে তার পরিচিতিও পেশ করা হয় তাহলে তাকে হত্যা করা হবে, তাকে তওবা করতে বলা যাবে না। সে যদি স্বীকার করে যে, আমি একজন যাদুকর এবং আজ থেকে বহু পূর্বেই আমি তা ত্যাগ করেছি, তাকে হত্যা করা যাবে না। অনুরূপ যদি কেউ সাক্ষ্য দেয় যে, হ্যাঁ, সে কোন এক সময় যাদুকর ছিল এবং সে তা বহুকাল পূর্বে ত্যাগ করেছে, তাহলেও তাকে হত্যা করা যাবে না। তবে সাক্ষীরা যদি বলে যে, সে এখনও একজন যাদুকর, আর সে-ও তার স্বীকৃতি দেয়, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। মুসলমান গোলাম, যিম্মী ও স্বাধীন যিম্মী যদি সাক্ষীদের নিকট স্বীকার করে যে, সে একজন যাদুকর, তাহলে তার রক্তপাত হালাল। তাকে হত্যা করা হবে। তার তওবা কবুল করা যাবে না। অনুরূপ কোন ক্রীতদাস কিংবা যিম্মী সম্পর্কে যদি কেউ সাক্ষ্য দেয় যে, সে যাদুর গুণ পরিচিতি সহ সে জানে যে, তা-ই যাদু, তা হলে তার তওবা কবুল করা যাবে না, তাকে হত্যা করা হবে। দাস বা যিম্মী যদি নিজেকে যাদুকর বলে স্বীকারোক্তি করে কিংবা বহুকাল পূর্বেই তা ত্যাগ করেছে বলে দাবি করে আর যদি বহু লোক সাক্ষ্য দেয় যে, সে অতীতে কোন এক সময় যাদু করছিল, সেই সময়ও সে যাদুকর বলে লোকেরা সাক্ষ্য না দেয়, তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে না। কোন নারী সম্পর্কে যদি লোকেরা সাক্ষ্য দেয় যে, সে যাদুকর কিংবা সে নিজেও তার স্বীকৃতি দেয়, তাহলেও তাকে হত্যা করা যাবে না। তাকে বন্দী করে তার উপর মারপিঠ করতে হবে। শেষে যদি দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, সে যাদু কাজ ত্যাগ করবে, অথবা দাসী ও নারী যিম্মী সম্পর্কে যদি লোকেরা সাক্ষ্য দেয় যে, সে যাদুকর বা সে নিজে তা স্বীকার করে তবু তাকে হত্যা করা যাবে না। তাকে আটক করে রাখতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না জানা যাবে যে, সে সব কিছু ত্যাগ করেছে। এই সবই ইমাম আবূ হানীফার কথা। ইবনে শুজা বলেছেন, যাদুকর পুরুষ স্ত্রীর ব্যাপারে সেই সিদ্ধান্তই কার্যকর হবে, যা মুর্তাদ পুরুষ নারী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত। তবে তাকে ধরে নিয়ে এলে সে যদি যাদুকর হওয়ার কথা স্বীকার করে বা কেউ তার সাক্ষ্য দেয় যে, তা-ই তার কাজ, তাহলে তা তার মুর্তাদ হওয়ার প্রমাণ হবে।

মুহাম্মাদ ইবনে শুজা আবূ আলী আর-রাযী থেকে বর্ণনা করেছেন—আমি ইমাম আবূ ইউসূফকে প্রশ্ন করেছিলাম যে, ইমাম আবূ হানীফা যাদুকরকে হত্যা করতে ও তার তওবা কবুল না করতে বলেছেন। কিন্তু সে মুর্তাদের ন্যায় নয়? জবাবে তিনি বলেছিলেনঃ হ্যাঁ, যাদুকর কুফর করার পর সে সমাজে পির্যয় সৃষ্টিও করতে চেষ্টা করেছে। আর সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টির জন্যে চেষ্টাকারী যদি হত্যাকাণ্ড করে তবে তাকে দণ্ডস্বরূপ নিশ্চয়ই হত্যা করতে হবে। তখন আবূ ইউসূফ (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম—যাদুকর কে? বললেন, ইয়াহূদী ব্যক্তি নবী করীম (স)-এর প্রতি যে আচরণ করেছিল, তারই মত কাজ যে করবে, সে-ই যাদুকর। তার দেয়া সংবাদের ফলে কোন হত্যাকাণ্ড সঙ্ঘটিত হলে

উভয়কেই হত্যা করা হবে, কোন হত্যাকাণ্ড না ঘটলে তাকে হত্যা করা হবে না। কেননা লবীদ ইবনুল আসাম রাসূলে করীম (স)-কে যাদু করেছিল; কিন্তু তিনি তাকে হত্যা করেন নি, কেননা সেই যাদুর কারণে কোন হত্যাকাণ্ড সঙ্ঘটিত হয়নি।

আবূ বকর বলেছেন, এই যা বলা হয়েছে, তাতে সেই যাদুর তাৎপর্য বলা হয়নি, যার দরুন যাদুকরকে হত্যা করা প্রয়োজন দেখা দেয়। ইমাম আবূ ইউসূফ (র) সম্পর্কে এই ধারণা করা ঠিক নয় যে, তিনি যাদু সম্পর্কে সেই বিশ্বাস পোষণ করবেন, যা বাজে লোকেরা পোষণ করে। কোনরূপ স্পর্শ করা বা ঔষধ সেবন করানো ব্যতিরেকেই যাদুকৃত ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম, এরূপ ধারণা তিনি পোষণ করতে পারেন না। এটাও সম্ভব যে, ইয়াহূদী ব্যক্তি নবী করীম (স)-কে কোন খাদ্য দ্বারা হত্যা করতে ইচ্ছা করেছিল। ঠিক সময়ে আল্লাহ্ তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন তার গোপন ইচ্ছার কথা। যেমন ইয়াহূদী যয়নব বিষাক্ত ছাগলের গোশ্‌ত খাইয়ে তাকে হত্যা করতে সংকল্প গ্রহণ করেছিল। ছাগলটিই তাঁকে এ বিষয় জানিয়ে দিয়েছিল। তখন রাসূলে করীম (স) বলেছিলেন ঃ এই ছাগীটিই আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, সে একটি বিষাক্ত ছাগী।

আবূ মুসয়িব ইমাম মালিক-এর এই মত বর্ণনা করেছেন যে, কোন মুসলিম ব্যক্তিও যদি যাদুকর্মের কর্তা হয়, তাহলে তাকেও হত্যা করা হবে। তারও তওবা গ্রহণ করা হবে না। কেননা বাহ্যত মুসলিম ব্যক্তি যদি গোপনে মুর্তাদ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে মুসলমানিত্ব প্রকাশ করার দরুন তার তওবাকে 'তওবা' গণ্য করা যায় না।

ইসমাঈল ইবনে ইসহাক বলেছেন, আহ্‌লি কিতাবের যাদুকরকে ইমাম মালিকের মতে—হত্যা করা যাবে না! হ্যাঁ, তদ্দরুন মুসলমানদের ক্ষতি সাধিত হলে তাকে অবশ্যই হত্যা করা হবে। কেননা সে এই কাজ করে মুসলমানদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেছে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেছেন, যাদুকর যদি বলে যে, আমি কাউকে হত্যা করার লক্ষ্যে একটা আমল করি। তবে কখনো এই আমল ব্যর্থ হয়ে যায়। আবার কখনো সঠিকভাবে কাজ করে। অমুক ব্যক্তি আমারই আমলের কারণে মরেছে। তাহলে তাকে দীয়ত দিতে বাধ্য করা হবে। সে যদি স্বীকার করে যে, আমার কৃত আমল যার উপর হবে, সে নিহত হবে। আর আমি তাকে হত্যা করার সংকল্প নিয়েই তা করেছি, তাহলে সেজন্যে তাকে হত্যা করা হবে শাস্তিস্বরূপ। যদি বলে আমার আমলের দরুন সে রোগাক্রান্ত হয়েছে, মরে যায়নি, আর মৃতের অভিভাবকগণ যদি 'কসম' করে বলে যে, তার দরুনই সে মরেছে, তাহলে দীয়ত ধার্য হবে।

আবূ বকর বলেছেন, ইমাম শাফেয়ী যাদুকরকে যাদুর কারণে কাফির গণ্য করেন নি। তাকে একজন সাধারণ অপরাধী গণ্য করেছেন মাত্র, যেমন অন্যান্য অপরাধী হয়ে থাকে। অথচ আগের কালের ফিকাহ্‌বিদদের যে মতের আমরা উল্লেখ করেছি, তাতে যাদুর বিষের দরুন নিহত হওয়ার যোগ্য অবশ্যই হবে বলে প্রমাণিত হয়। তাহলে বুঝতে হবে, তারা তাকে কাফির গণ্য করেছেন। এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ীর মত সমস্ত ফিকাহবিদদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর। তাঁদের একজন তাকে হত্যা করার পক্ষে।

কেননা সে অন্য একজনকে হত্যা করেছে তার যাদুকর্মের দ্বারা। অতএব তাকে হত্যা করা ওয়াজিব (ফরয)।

আবূ বকর বলেছেন, এ আলোচনার মাধ্যমে আমরা যাদুর অর্থ ও তাৎপর্য এবং তার বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছি। তার মধ্যে প্রথম প্রকারের যে যাদুর কথা আমরা বলেছি, তা হচ্ছে ব্যবিলনবাসীদের যাদু। তা অতি প্রাচীন কালের ব্যাপার। সাবেয়ীদের ধর্মমত এই যাদু থেকেই গড়ে উঠেছে। আর আল্লাহ এই যাদু সম্পর্কে বলেছেন ঃ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ 'আর যা নাযিল হয়েছে সেই দুজন ফেরেশতার প্রতি,' তাতে মনে হয় প্রকৃত কথা আল্লাহ জানেন, এই যাদুর পক্ষপাতী ও তার সত্যতা স্বীকারকারী এবং সেই যাদুকর্ম যে করে সে সম্পূর্ণ কাফির। আমার মতে হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ এই বিষয়েই বলেছেন যে, তার তওবা কবুল করা যাবে না। কুরআনের আয়াতে এই ধরনের যাদু সম্পর্কেই বলা হয়েছে, তার দলীল হচ্ছে সেই হাদীস, যা আবদুল বাকী ইবনে নাফে' ফতীর-আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বাহ-ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাতান-আবদুল্লাহ্ ইবনুল আখনাস-ওয়ালীদ ইবনে আবদুল্লাহ ইউসূফ ইবনে মাহিক সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তা হল নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُوْمِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ –

যে লোক তারকা-গ্রহ-নক্ষত্রসমূহ সম্পর্কিত কোন বিদ্যা অর্জন করল, যে যাদুর একটা শাখা আয়ত্ত করল।

এর দুটি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, আয়াতে সেই যাদুবিদ্যার কথা বলা হয়েছে, যা গ্রহ-তারকার গতিবিধির উপর ভিত্তিশীল। আর আমরা তাকেই বলেছি সাবেয়ীন ও ব্যবিলনবাসীদের যাদুবিদ্যা। কেননা আমাদের উল্লিখিত সমস্ত প্রকারের যাদুরই সম্পর্ক তারকা-গ্রহ-নক্ষত্রের সাথে নয়। আর দ্বিতীয় নিন্দিত যাদুর শব্দটি তন্মধ্যে কেবল এই প্রকারের যাদুকেই শামিল করে। এ থেকে বোঝা যায় যে, আগের কালের ফিকাহ্‌বিদদের নিকট এই প্রকারের যাদুই পরিচিত ছিল। মুজিযা সম্পর্কে যা কিছু দাবি করা হয়, তা তারকা-নক্ষত্র-গ্রহের সাথে সম্পর্কিত না হলেও আমাদের উল্লিখিত প্রকারসমূহ ছাড়া অন্য কিছু। এই কাজ যে করে তাকে হত্যা করার মূলে এই লক্ষ্যই নিহিত। কেননা তাতে ঔষধ, মিথ্যা অপবাদ রটানো, বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও ভোজবাজি-ম্যাজিক (Jugglary) দেখানো দ্বারা যাদুর কর্তা ও অন্যদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। আর একথা সর্বজনবিদিত যে, এই যাদুর এই প্রকারসমূহ তার কর্তাকে হত্যা করা ফরয করে দেয় না। কেননা তাতে মানুষের পক্ষে অসাধ্য মুজিযা সৃষ্টির দাবি করা হয় না। প্রমাণিত হল যে, যাদুকরকে হত্যা করা ওয়াজিব হয় যদি মুজিযার যাদু করার দাবি করা হয়, তবে। কেননা তা এবং তার মত ঘটনা ঘটানো কেবলমাত্র নবী-রাসূলগণ কর্তৃকই সম্ভবপর। এসবের দ্বারাই তাঁদের নবুয়তের সত্যতা প্রমাণিত হয়। এই বিষয়টি দুটি তাৎপর্যে বিভক্ত। একটি—প্রথমেই আমরা ব্যবিলনবাসীদের যাদুর উল্লেখ করেছি। আর

দ্বিতীয় হচ্ছে—যে সম্পর্কে তার কর্তারা তা শয়তানের বিচিত্র সেবা-সহযোগিতার মাধ্যমে করা হয় বলে দাবি করে। এই উভয় গোষ্ঠীই কাফির। প্রথমোক্ত গোষ্ঠী কাফির এজন্যে যে, তাদের কৃত যাদুকে গ্রহ-তারকা-নক্ষত্রের প্রতি তাযীম শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন রয়েছে এবং সেসবকে 'ইলাহ' পর্যায়ে গণ্য করা হয়। আর দ্বিতীয়োক্ত গোষ্ঠী কাফির এজন্যে যে, তারা আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও এই বিশ্বাসটাও তাদের রয়েছে যে, জ্বিন তাদেরকে গায়ব-এর সংবাদ দেয়। জীব-জন্তু, বাতাসে উড্ডয়নকারী পাখী, পানির উপর দিয়ে হেঁটে চলা প্রভৃতি বিভিন্ন পরিবর্তনশীল ক্ষমতা দান করে বলে মনে করা হয়। নবী-রাসূলগণের সংবাদ দানকে আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ মিথ্যা খবরদাতাদের মধ্যে সাদৃশ্য প্রমাণ করতে চাওয়া হয়। আর এরূপ বিশ্বাস যাদের, তারা নবী-রাসূলগণের সত্যতা সত্যবাদিতা সম্পর্কে কিছুই জানে না। আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে সংবাদদাতাগণের দ্বারা যা কিছু প্রকাশিত হয়, তা এবং নবী রাসূলগণের সংবাদ দান কখনই এক ও অভিন্ন হতে পারে না। এই গোষ্ঠী কাফির হয়েছে তো এই কারণে। ওরা তো নবী-রাসূলগণের সত্যতা সত্যবাদিতা সম্পর্কে কিছুই জানে না। আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে সংবাদদাতাগণের সত্যতার পরম মাহাত্ম্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ মূর্খ ও অজ্ঞ। সাহাবায়ে কিরাম (রা) যাদুকরদের পর্যায়ে তাদের অবস্থার বিস্তারিত আলোচনা ও তাদের কৃত যাদুর তাৎপর্য বিশ্লেষণ ছাড়াই তাদের হত্যা করা সম্পর্কে যে মত দিয়েছেন, তারা হচ্ছে সেসব যাদুকর, যাদের সম্পর্কে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ –

ওরা লোকদেরকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দেয়, শিক্ষা দেয় তা, যা সেই দুজন ফেরেশতার প্রতি নাযিল হয়।

শুরুতে যাদুর যে বিভিন্ন প্রকারের উল্লেখ করেছি, এরা হচ্ছে সেই যাদুকর। ওদের যাদুবিদ্যার মূল উৎস প্রাচীন ব্যবিলনবাসীদের যাদুবিদ্যা। সেই সময় হয়ত সেই যাদু বিদ্যাই সাধারণ ও ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ-ও অসম্ভব নয় যে, তখন এই সর্বপ্রকারের যাদুর ধারক লোকও পাওয়া যেত। তারা গায়ব সম্পর্কে সংবাদদান, ব্যবিলনীয় পদ্ধতিতে জীব-জন্তুর আকার-আকৃতি বদলে দেয়ার দাবি করত। আরব গণকদাররাও উল্লিখিত সর্বপ্রকারের যাদুর ধারক হতো বলে সকলেই কুফর-এর পথের অনুসারী ছিল এসব দাবি-দাওয়ার কারণে। তারা নবী-রাসূলগণের মুজিযায় তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাকেও তারা জায়েয মনে করত। মোটকথা, আগের কালের শরীয়াতবিদদের নিকট যাদু বলতে এই জিনিসই প্রচলিত ও চিহ্নিত ছিল। যাদুকরকে হত্যা করা ফরয বলে তাঁরা যে মত দিয়েছেন, তা কোন অপরাধের উস্কানিদানের পর্যায়ে গণ্য নয়। বরং যাদু সম্পর্কে তাদের যে আকীদা ছিল এবং তার দ্বারা তারা অন্যদের উপর যে অপরাধজনক কর্মকাণ্ড ঘটাত, কেবল সেই কারণেই তাদেরকে হত্যা করা ফরয বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। ভোজবাজির খেলা প্রদর্শনকারী, হাতের নাড়ানো-চাড়ানোর-লুকানোর মাধ্যমে বা ঔষধ দ্বারা মানুষকে নির্বোধ বানানো কিংবা প্রাণ সংহারকারী বিষ প্রয়োগে যা করত, মিথ্যা দোষ আরোপ, দুর্নাম রটানো, মারধোর ও বিপর্যয় সৃষ্টি ইত্যাকার যারা করত, তারা সেগুলোকে নিতান্ত কলা-কৌশল বলত, মনগড়াভাবে উদ্ভাবন করত, লোকদের নিকট

থেকে তারা তা গ্রহণ করত, ওরা কাফির হতো না। ওদের জন্যে কড়া শাসনের ভয়-ভীতি প্রদর্শনের সাহায্যে এসব কাজ থেকে ওদের বিরত রাখাই যথেষ্ট এবং সম্ভবপর।

আয়াতে যে যাদুকরদের উল্লেখ হয়েছে, তাদের উপর যে 'কাফির' শব্দটি যথার্থভাবে প্রয়োগ হতে পারে, তার দলীল হচ্ছে আল্লাহ্‌র এই কথা ঃ

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوْا الشَّيٰطِيْنُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ –

ওরা অনুসরণ করত সেই জিনিসের, যা শয়তানেরা সুলায়মানের রাজত্বে পাঠ করে শুনাত। তবে সুলায়মান কিন্তু কুফরী করেনি।

তাফসীরকারগণ বলেছেন ঃ ملك سليمن অর্থ—সুলায়মানের রাজত্বকাল। আর, تَتْلُوْا অর্থ, খবর দিত, পাঠ করত। আল্লাহ্‌র এই কথাটিও ঃ

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا –

সুলায়মান কুফরী করেনি; বরং শয়তানেরা কাফির হয়ে গেছে।

এ থেকে বোঝা যায় যে, শয়তানেরা যেসব খবর দিত এবং বলত যে, তারা সুলায়মানের উপর যাদু করেছে তা-ই ছিল কুফরী। সুলায়মানের কুফরীকে আল্লাহ্ তা'আলা অস্বীকার করেছেন, তিনি কুফরী করেননি বলে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন। তবে শয়তানেরা যে কুফরী করেছে, সে কথা তিনি ইতিবাচকভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন। ওরাই কুফরীর ধারক এবং কুফরী নীতিতে আমলকারী। এই কথার সাথে যুক্ত (عطف) করে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ أَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ –

আর যা নাযিল হয়েছে ব্যবিলনের হারুত-মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি, তারা তার-ই প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। অথচ তারা (ফেরেশতারা) যখনই কাউকে এই জিনিসের শিক্ষা দিত, তখন প্রথমেই এই কথা স্পষ্ট ভাষায় বলে হুঁশিয়ার করে দিত যে, দেখ, আমরা নিছক একটা পরীক্ষা মাত্র। তোমরা কুফরীর পংকে নিমজ্জিত হয়ো না।

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদ্বয় সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন যে, তারা যাকেই কিছু শিক্ষা দিতেন, স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতেন যে, তোমরা কুফরীর মধ্যে পড়ে যেও না এই যাদুকর্মের কারণে এবং এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, এই কাজটি কুফর, যখন তার উপর আমল করা হবে এবং সেই বিশ্বাস গ্রহণ করা হবে। অতঃপর বলেছেন ঃ

وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ –

তারা ভালো করেই জানত যে, এই জিনিস যে লোকই ক্রয় করবে, পরকালে তার ভাগ্যে কোনই কল্যাণ নেই।

অর্থাৎ যে লোক আল্লাহ্‌র দ্বীনের বদলে যাদুকে অবলম্বন করবে, পরকালে তার কোন অংশ নেই। এর পর বলেছেন ঃ

وَالَبِئْسَ مَا شَرَوْابِه اَنْفُسَهُمْ - لَوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -

তারা যে জিনিসের বিনিময়ে নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে, তা যে কত নিকৃষ্ট, সে কথা যদি ওরা জানতে পারত।

এ আয়াতে যাদুকর্মকে ঈমানের বিপরীতে দাঁড় করা হয়েছে। কেননা তারাই ঈমানকে বাদ দিয়ে তার বিপরীতে যাদুকে অবলম্বন করেছে।

এ থেকেও বোঝা যায় যে, যাদুকর কাফির। যাদুকরের কাফির হওয়া প্রমাণিত হল তখন, তার পূর্বে মুসলিম থেকে থাকলেও কিংবা সে বাহ্যিকভাবে কোন এক সময়ে নিজে ইসলাম পালন করে থাকলেও এই যাদুকর্মের দরুন সে কুফরী করে বসেছে। অতএব সে হত্যাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার যোগ্য হয়েছে। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ -

যে লোক তার দ্বীন বদলে দিয়েছে, তাকে তোমরা হত্যা কর।

ইমাম আবূ হানীফার কথা হাসান উল্লেখ করেছেন, তা হল যাদুকরকে হত্যা করা হবে। তার তওবা কবুল করা হবে না। হানাফী মাযহাবের কোন ইমাম এর বিপরীত কথা বলে তাঁর বিরোধিতা করেছেন বলে আমরা জানি না। ইমাম আবূ ইউসূফ যাদুকর ও মুর্তাদ এই দুজনের মধ্যে পার্থক্যের কথা বলে ইমাম আবূ হানীফা থেকে ভিন্ন মত দিয়েছেন বলে যে কথা বলা হয়, তা হল এই যে, যাদুকর তার কুফরীর সাথে মিলিয়ে নিয়েছে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টাকে।

কেউ বলতে পারেন, গলা বা শ্বাস রুদ্ধকারী ও যুদ্ধকারীকে তোমরা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কর কেবল তখন, যদি তারা কোন হত্যাকাণ্ড করে। তাহলে যাদুকর সম্পর্কে তোমরা সেরকম বল না কেন?

জবাবে বলা হবে, এ দুটির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। উক্ত দুজন হত্যাকাণ্ড করার পূর্বে এবং পরেও কাফির হয়নি। অতএব তাদেরকে হত্যা করার প্রশ্ন উঠে না। কেননা যে কারণে কেউ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে তারা সেই কারণ সৃষ্টি করেনি। কিন্তু যাদুকর যাদুকর্মের দরুনই কাফির হয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার যোগ্য হয়েছে, সে নিজে হত্যাকাণ্ড করেছে কিংবা না-ই করেছে, তার প্রশ্ন পরে। তার কুফরীর কারণেই সে হত্যার যোগ্য হয়েছে। এই কুফরীর সাথে দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টির কাজও যখন সে করল, তাকে হত্যা করা ফরয হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে 'হদ্দ'—শরীয়াত নির্ধারিত শাস্তি। এ শাস্তি তওবার দ্বারা এড়ানো যায় না। যেমন যুদ্ধকারী ব্যক্তি যখন হত্যাযোগ্য হয়, তখন তওবা করলে তাকে রেহাই দেয়া যায় না। সে এই দিক দিয়ে যুদ্ধকারীর সদৃশ হল যে, সে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তাকে হত্যা করাই তার জন্যে 'হদ্দ'। তওবা করে তা থেকে মাফ পাওয়া যেতে পারে না। আর মুর্তাদের সাথে তার পার্থক্য হয় এই দিক দিয়ে যে, মুর্তাদ হত্যার দণ্ড

ভোগ করবে তার কুফরীর উপর স্থির হয়ে দাঁড়ানোর কারণে। আর এই যথেষ্ট কারণ। তা থেকে সে সরে গেলে কুফরও তার থেকে দূরে সরে যাবে, সেই সাথে মৃত্যুদণ্ডও বাতিল হয়ে যাবে। এই যা বললাম, তার কারণে যিম্মী যাদুকর ও মুসলিম যাদুকরের মধ্যে তাঁরা পার্থক্য করেন নি। যেমন যিম্মী যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী হয়, হয় কোন মুসলিম তা হলেও কোন পার্থক্য করা হয় না। উভয়ই এই যুদ্ধকর্মের দরুন হত্যার যোগ্য হবে। এই কারণে স্ত্রী যাদুকরকে হত্যা করা হয় না। কেননা যুদ্ধকারী স্ত্রীলোককে দণ্ড হিসেবে হত্যা করা হয় না। হত্যা করা হয় শুধু হত্যার দণ্ড হিসেবে। যাদুকরের তওবা কবুল না করা সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফার মতের আর একটি কারণ ইমাম তাহাভী উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, সুলায়মান ইবনে শুয়াইব, তার পিতার নিকট থেকে—আবূ ইউসূফ থেকে বর্ণনা করেছেন, ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেছেন ঃ

اُقْتُلُوْا الزِّنْدِيْقَ سِرًّا فَاِنَّ تَوْبَتَهُ لَاتُعْرَفُ -

নাস্তিককে গোপনে হত্যা কর, কেননা তার তওবা পরিচিত কিছু নয়।

আবূ ইউসূফ এর বিপরীত কিছু বলেন নি, যাদুকরের ব্যাপারটি এই আলোকে বিবেচনা করা যেতে পারে। কেননা যাদুকর তো গোপনেই কুফরীর পথে চলে যায়। ফলে সে নাস্তিকরূপে গণ্য হয়। অতএব তার তওবা কবুল না করাই সমীচীন।

যদি বলা হয়, তাহলে তো যিম্মী যাদুকরকে হত্যা করা বাঞ্ছনীয় হতে পারে না, কেননা সে বাহ্যত কাফির। সেই জন্যে তাকে হত্যা করা যায় না।

জবাবে বলা যাবে, তার যে কুফরকে আমরা বাহ্যত মেনে নিয়েছি, তা হচ্ছে তার বাহ্যত কাফির হওয়া। কিন্তু যাদু কর্মের দরুন তার যে কুফরী, তা তো মেনে নেয়া হয়নি। তা মেনে নিয়ে তাকে যিম্মী হয়ে থাকতেও দেয়া হয়নি। লক্ষণীয় যে, জিযিয়া দিয়ে সে যদি যাদুকর্ম করার জন্যে আমাদের যিম্মী হয়ে থাকতে চাইত, তা হলে আমরা তাকে কিছুতেই অনুমতি দিতাম না। তাকে সে কাজ করতেও অনুমতি দিতাম না। তার ও আহ্লি মিল্লাতের যাদুকরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উপরন্তু যিম্মী যাদুকর যদি তার কুফরীর দুরুন হত্যাযোগ্য না হয়, তাহলেও দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টার অপরাধে সে মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য হতো, যেমন মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী ব্যক্তি—যার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে—আর জিন্দীক নাস্তিকের তওবা কবুল না করা পর্যায়ে যা বলা হয়েছে, সেদিক দিয়ে ইসমাঈলীদেরও তওবা কবুল না করা বাঞ্ছনীয়। আর সমস্ত নাস্তিক, তাদের কুফরী বিশ্বাসের কথা জানা গেছে, তারা সমস্ত নাস্তিক যিম্মীর মতই। তারা তওবা প্রকাশ করলেও তাদেরকে হত্যা করা হবে। এই যা বললাম, এর ভিত্তিতেই যাদুকরকে হত্যা করা কর্তব্য। ইবনে কানে' বিশর ইবনে মূসা ইবনুল ইস্ফাহানী আবূ মুআবিয়া ইসরাঈল ইবনে মুসলিম—হাসান ইবনে জুনদব সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَهُ بِالسَّيْفِ -

যাদুকরের শাস্তি তরবারির আঘাত দিয়ে দিতে হবে।

ওয়ালীদ ইক্‌বা'র সময়ে কূফা নগরে জুনদব যে যাদুকরকে হত্যা করেছিলেন, সে কাহিনী সবারই জানা। নবী করীম (স)-এর কথা ঃ

حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفَ –

যাদুকরের দণ্ড হয়েছে তরবারি দিয়ে মারা।

এর দুইটি অর্থ হতে পারে। একটি—তাকে হত্যা করা একান্তই কর্তব্য। দ্বিতীয়—তা এমন শাস্তি, যা তওবা দ্বারা প্রত্যাহৃত হতে পারে না। শরীয়াতের সব 'হদ্দ'ই এরূপ, যখন তা সাব্যস্ত হয়ে যায়, তখন তা অবশ্যই কার্যকর করতে হয়।

তাকে যুদ্ধকারীর ন্যায়ই হত্যা করতে হবে বলে যা বলেছি, সে পর্যায়ে হাদীস রয়েছে। হাসান ইবনে যিয়াদ বর্ণনা করেছেন, লোকটি যখন বলল ঃ 'আমি যাদুকর ছিলাম'—প্রমাণিত হয়েছে যে, তাকে হত্যা করা যাবে না। সে যেন সেই ব্যক্তির মত, যে নিজেই স্বীকার করেছে যে, সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী ছিল। এক্ষণে সে তওবাকারী হয়ে এসেছে। এই ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত ঘোষণার কারণে ঃ

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ج فَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ –

তবে যারা তাদেরকে তোমাদের ধরে ফেলার পূর্বে তওবা করে, তারা এই শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। তোমরা জানবে যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

যাদের উপর দণ্ড কার্যকর হওয়া যথারীতি সাব্যস্ত হয়েছে, তাদেরকে তোমাদের ধরে ফেলার পূর্বেই যদি তারা তওবা করে, তবে তাদের তওবা কবুল করা হবে। আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اِنَّمَا جَزَاۤؤُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا .....

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টির তৎপরতা করে, তাদের চূড়ান্ত শাস্তি .............

এই বাহ্যিক অর্থের আলোকে দণ্ডস্বরূপ যাদুকরকে হত্যা করা কর্তব্য হয় বলে দলীল পেশ করা হয়। কেননা যাদুকর তার যাদুকর্মের দ্বারা দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের মধ্যে শামিল। ওরা তো লোকদেরকে সেই কাজে শরীফ হওয়ার জন্যে আহ্বান জানাতে থাকে। সাফাদ সৃষ্টি করে। সেই সাথে তারা যাদুর কারণে কুফরীও করেছে।

তবে মালিক ইবনে আনাস (রা) যাদুকরকে জিন্দীক বা নাস্তিকদের পর্যায়ে গণ্য করেছেন। তাই তাঁর তওবা কবুল না করারই পক্ষপাতী তিনি, ঠিক যেমন নাস্তিককে তওবা করার সুযোগ দেয়া হয় না। তাঁর মতে যিম্মী যাদুকরকে হত্যা করা যায় না

এজন্যে যে, তার কুফরীর দরুন সে হত্যার যোগ্য নয়। তাকে আমরা থাকার সুযোগ তো আগেই দিয়েছি। তাই তাকে হত্যা করা যাবে শুধু তখন, যদি সে মুসলমানদের জন্যে ক্ষতিকর কাজ করে। কেননা তার এই কর্মটি চুক্তিভঙ্গের পর্যায়ে পড়ে। কেবল এই কারণেই তাকে হত্যা করা যাবে, যেমন যুধ্যমান শত্রুকে হত্যা করা যায়। যিম্মী যাদুকর ও নাস্তিক যে সমান, সে কথা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি। কেননা যিম্মী নতুন করে কুফরী করেছে যাদু কর্ম করে গোপনভাবে। তাই জিযিয়ার বিনিময়ে সেই নতুন কুফর করার সুযোগ দেয়া যেতে পারে না। তাই যিম্মী লোক এবং মিল্লাতে ইসলামের বেশ ধারণকারীর মধ্যে কোন পার্থক্য করা যাবে না।

ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব—আগেই বলেছি—আগের লোকদের মত থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কেননা এ মাযহাবের অনুসারীদের কেউ যাদুর কারণে হত্যা করার পক্ষপাতী নয়। অথচ আগের ফিকাহ্‌বিদগণ নিঃশর্তভাবেই—যাদুকর পরিচিতির কারণেই হত্যা করার পক্ষপাতী। তা সত্ত্বেও কথাটির দুটি দিক রয়েছে, তার কোন-না-কোন একটি দিককে সামনে রাখতে হবে। যেমন বলা হয়েছে, যাদুকরকে হত্যা করা যাবে সে অন্য কাউকে হত্যা করেছে বলে। যাদুকরের এই হত্যাকর্ম যে প্রত্যক্ষভাবে হয়নি, তার রচিত কোন কারণের ফলশ্রুতিতে নয়—যেমন যাদুকররা দাবি করে থাকে। আর তা অত্যন্ত গর্হিত ও বীভৎস ব্যাপার। আল্লাহ্ ও রাসূল সম্পর্কিত ইল্‌ম ধারকদের কেউ-ই তাকে যাদুকরের বৈধ কাজ বলে মেনে নেননি। যেমন তার ব্যাখ্যায় আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, তা নবী-রাসূলগণের ঘোষণাবলীর পরিপন্থী। অথবা তা ঔষধ পান করানোর মাধ্যমে করে থাকবে। যদি তা-ই হয়, তা হলে কোন লোককে কেউ ঔষধ দিলে সে যদি মরে যায়, তাহলে ঔষধ সেবনকারী নিজ ইচ্ছায়ই যদি নিজের উপর অপরাধ চাপিয়ে নিয়ে থাকে, তা হলে তার কোন দীয়ত দেয়া ফরয হবে না। কেননা এ ঘটনাটি ঠিক এরূপ, যেমন কেউ এক ব্যক্তিকে একটি তরবারি দিল। সে ব্যক্তি তরবারি দ্বারা নিজেই নিজেকে হত্যা করল। কাজেই সে জন্যে সে নিজেই দায়ী, অন্য কাউকে বা হত্যার উপকরণদাতাকে তো দায়ী করা যেতে পারে না। ঔষধদাতা এ জন্যে তো ঔষধ দেয় নি যে, তা অবশ্যই পান করতে হবে বা তাকে তা পান করতে বাধ্যও করেনি। যেমন তরবারিদাতা তাকে হত্যা করেনি, তেমনি ঔষধদাতাও। তা পান করা বা না করার পূর্ণ ইখতিয়ার ছিল পানকারীর। জোরপূর্বক বা নিদ্রিত অবস্থায় কেউ তাকে পান করতে বাধ্য করেনি। তবে যদি সে তার ইচ্ছাই পোষণ করত, তা হলে তাতে যাদুকর ও অন্যরা সমান।

তা ছাড়া যাদুকর যখন বলেছে যে, তার পদক্ষেপ কখনো ঠিকমত হয়, কখনো সে ভুল করে বসে। এই ব্যক্তি আমার কাজের ফলেই মরেছে। অতএব তাতে দীয়ত দিতে সে বাধ্য। অন্যথায় তার কোন অর্থ নেই। কেননা এক ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তিকে আহত করে লোহার দ্বারা, তা হলে এ ধরনের আঘাতের যখমে লোকটি মরেই যেতে পারে এটা তো স্বাভাবিক। কিন্তু সে নাও মরতে পারে। কিন্তু এ অপরাধের 'কিসাস' অবশ্যই হবে। কখনো মরে, কখনো মরে না—এটা 'কিসাস' প্রত্যাহারের কোন যুক্তি দেয় না। কেননা আঘাতকারীর হাতে লৌহদণ্ড থাকাই তার প্রধান কারণ। বিশেষত এজন্যে যে, যাদুকর নিজেই স্বীকারোক্তি করেছে যে, তারই কাজের ফলে লোকটি মারা গেছে।

যদি বলা হয়, এই পদক্ষেপটিকে বড়জোর 'প্রায়-ইচ্ছামূলক' বলা যায়। আর লাঠির দ্বারা আঘাত ও থাপ্পর তো এমন যে, তার দ্বারা মানুষ কখনো নিহত হয়, কখনো হয় না।

এর জবাবে বলা যায়, তা হলে লাঠির দ্বারা হত্যা ও থাপ্পরের তুলনায় লৌহদণ্ড ব্যবহার করা অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ, এ দুটির মধ্যে যদি পার্থক্য করা হয়, বলা হয় এটি অস্ত্র আর ওটি অস্ত্র নয়, তা হলে যেটা অস্ত্র হবে না তার দ্বারা হত্যা করা হলে তার 'কিসাস' না হওয়াই উচিত। আর অস্ত্র সাব্যস্ত হলে তারই দণ্ড দেয়া একান্ত কর্তব্য হয়ে পড়বে। ইমাম শাফেয়ীর কথা হচ্ছে, যদি বলে যে, তার কাজের দরুন লোকটি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে, কিন্তু তাতে মরেনি, মৃতের অভিভাবকদের 'কসম' করে বলতে হবে যে না, সে তার কারণেই মরেছে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ীর এই কথা মৌলিকভাবে অপরাধ আইনের পরিপন্থী। কেননা যে একটি লোককে আহত কারেছে, পরে আহত ব্যক্তি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছে, শেষ পর্যন্ত মুত্যমুখে পতিত হয়েছে, তার এ অপরাধ দণ্ডণীয় হবে। কেননা মৃত ব্যক্তি যখমের কারণেই মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়েছে। সেখানে অভিভাবকদের কিরা-কসমের প্রয়োজন হবে না। যাদুকরের ক্ষেত্রেও এই রূপই হতে হবে, যদি সে স্বীকার করে যে, তার যাদুর কারণেই যাদুকৃত ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

যদি বলা হয়, আঘাতে সৃষ্ট যখমের দরুন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়া ব্যক্তির ব্যাপারেও আমরা তাই বলব। কেননা সে তো সেই কারণেই অব্যাহতভাবে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিল। আর শেষ পর্যন্ত মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। তারা বিভিন্ন মত পোষণ করলে তাকে হত্যার নির্দেশ দেয়া হবে না যতক্ষণ আহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ তার মৃত্যু সম্পর্কে কসম করে সাক্ষ্য না দেবে।

এর জবাবে বলা যাবে, তাহলে অনুরূপ কথা বলাই বাঞ্ছনীয় হবে যদি তাকে তরবারি দ্বারা মারা হয় এবং সেই মুহূর্তে তার মৃত্যু হয়ে যায়। তখন আঘাতকারী বলল, এই দ্বিতীয় বার তরবারি মারার পূর্বেই সে একটা রোগে আক্রান্ত ছিল, আঘাতের পর সে পূর্বের রোগের কারণেই মারা পড়েছে। অথবা বলল, আল্লাহ্‌ই তাকে ডেকে নিয়েছেন, আমার আঘাতে মরেনি। এ ব্যাপারে মৃতের অভিভাবকদের 'কসম' লওয়া হোক। কিন্তু একথা কেউ বলবে না বা বলতে পারে না।

আবূ বকর বলেছেন, এ পর্যন্তকার আলোচনা আমরা যাদুর তাৎপর্য পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। যাদুকর সম্পর্কে ফিকাহ্‌বিদদের মতের পার্থক্যের কথাও আমরা যথেষ্টভাবে উল্লেখ করেছি। এক্ষণে আমরা কুরআনের মূল আয়াত পর্যায়ে কথা বলব। আয়াতের দাবি ও চাহিদাও ব্যাখ্যা করব।

আমাদের কথা হল আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوْا الشَّيٰطِيْنُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ –

ওরা অনুসরণ করেছে সেই জিনিসের, যা শয়তানেরা সুলায়মানের রাজত্বকালে পাঠ করত।

এ আয়াত পর্যায়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, মূল লক্ষ্য হচ্ছে ইয়াহূদীরা, দাঊদ (আ)-এর পুত্র মুসলায়মান (আ)-এর সময়ে যে ইয়াহূদীরা ছিল। নবী করীম (স)-এর সময়ে যে সব ইয়াহূদী রয়েছে, এ কথা তাদের সম্পর্কেও। ইবনে জুরাইজ ও ইবনে ইসহাক থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া গেছে। রুবাই ইবনে আনাস ও মুদ্দী বলেছেন, আয়াতে সুলায়মান (আ)-এর সময়ে ছিল, তেমনি ছিল রাসূলে করীম (স)-এর সময়েও। কেননা ইয়াহূদীরা সেই সুলায়মানের সময় থেকেই সর্বকালে যাদুর অনুসরণকারী ছিল কোনরূপ ব্যতিক্রম ছাড়াই রাসূল করীম (স)-এর সময়কাল পর্যন্ত। আয়াতে এই ইয়াহূদীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, ওরা কুরআন গ্রহণ করেনি। কুরআনকে ওরা পৃষ্ঠদেশে নিক্ষেপ করেছে। সেই সাথে রাসূলে করীম (স)-এর প্রতি কুফরও করেছে। কুরআনকে বাদ দিয়ে ওরা সুলায়মানের সময়ে শয়তানেরা যা পাঠ করে শুনিয়েছে, তারই অনুসরণ করেছে। শয়তানেরা বলতে জ্বিন ও মানুষ উভয় গোষ্ঠীর শয়তানদের কথাই বোঝানো হয়েছে। تَتْلُوْا অর্থ সংবাদ দিত, পাঠ করত। বলা হয়েছে تَتَّبِعُ 'অনুসরণ করে'। কেননা পেছনের অধীন লোকেরা তো অনুসরণকারীই মাত্র। আর عَلَى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ অর্থ বলা হয়েছে সুলায়মানের শাসনামলে। তাঁর রাজত্বকালে। সেকালে ওরা তাঁকে অস্বীকার ও অমান্য করেছিল। কেননা 'খবর' যখন 'মিথ্যা' হয়, তখনই বলা হয় ঃ تَلَا عَلَيْهِ আর খবর সত্য হলে বলা হয় تَلَا عَنْهُ আর যদি অস্পষ্ট হয়, তাহলে এই উভয় অর্থ-ই হতে পারে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَالَاتَعْلَمُوْنَ –

তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে সেই কথা বল, যা তোমরা জান না।

ইয়াহূদীরা বলত, যাদু তো সুলায়মান কর্তৃক প্রচলিত হয়েছে। তাদের ধারণা ছিল, তাঁর রাজত্বটা ছিল এই যাদুর বলে। আল্লাহ্ এ কথার প্রতিবাদ করে তাঁকে এই মিথ্যা অপবাদ থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে যুবায়র ও কাতাদাহ থেকে একথা বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসাহাক বলেছেন, কোন কোন ইয়াহূদী পণ্ডিত বলেছেন, তোমরা মুহাম্মাদ (স)-কে নিয়ে বিস্মিত হবে না। তিনি মনে করেন, সুলয়মান নবী ছিলেন না, আল্লাহ্‌র কসম, তিনি তো ছিলেন একজন যাদুকর মাত্র। এর-ই প্রতিবাদ করে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ –

না, সুলায়মান কুফর করে নি।

অনেকে বলেছেন, ওরা জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য বানাবার লক্ষ্যেই যাদুকে সুলায়মানের সাথে সম্পৃক্ত করত, যেন ওদের যাদু জনগণ মেনে নেয়। এ ব্যাপারে তাদের প্রতি তারা আস্থাবান হয়। কিন্তু এরূপ করে তারা সম্পূর্ণ মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। কেউ কেউ এ-ও বলেছেন—সুলায়মান (আ) যাদুবিদ্যার কিতাবাদি সংগ্রহ করেছিলেন এবং সে সবগুলোকে তাঁর সিংহাসনের তলায় দাফন করে রেখেছিলেন কিংবা তাঁর খাজাঞ্চিখানায় রেখে দিয়েছিলেন, যেন তা ব্যবহৃত হতে না পারে। পরে তিনি ইন্তিকাল করে গেলে সে

সব প্রকাশ হয়ে পড়ে। তখন শয়তানেরা বলাবলি করল যে, এর-ই জোরে সুলায়মানের রাজত্ব চলেছে। এই কথাটি ইয়াহূদীদের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। তারা এটা ধারণা করে এবং যাদুকে সুলায়মানের নামে চালাতে শুরু করে। এই শয়তান বলতে মানুষ শয়তান-ও অর্থ হতে পারে। এ-ও হতে পারে যে, শয়তানেরাই ওসব সুলায়মানের সিংহাসনের তলায় পুতে রেখেছিল তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁর অজ্ঞাতসারে। পরে তাঁর মৃত্যুর পর তা প্রকাশ করে এবং সুলায়মানের নামে চালিয়ে দেয়। মানুষ শয়তানেরাও এ কাজ করতে পারে। তারাই তাঁর ইন্তিকালের পর তা বাইরে নিয়ে আসে ও লোকদেরকে এই ধারণা দেয় যে, সুলায়মানই লোকদেরকে বিভ্রান্ত করে ধোঁকা দেয়ার জন্যে এই কাজ করেছিলেন।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ –

আর সেই হারুত-মারুত নামের দুই ফেরেশতার প্রতি যা নাযিল করা হতো।

হারুত মারুত দুজন ফেরেশতা ছিলেন বলে বলা হয়েছে । আর অন্যরা বরং বলেছেন, তাঁরা ফেরেশতা ছিল না।

এ পর্যায়ে দহাক-এর মত হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা দুজন ব্যবিলনবাসী কাফির ছিল। আমার মতে এই দু'ধরনের পাঠ সহীহ। এ দুটির মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। হতে পারে, আল্লাহই দুজন ফেরেশতা পাঠিয়েছিলেন এ দুজন বাদশাহ্র সময়ে তাদের উপর যাদুর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। এ দুজনের দ্বারা তাদেরকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে। যে সব লোক এ দুজনের কথা গ্রহণ করে এবং তা মেনে নেয়। দু'জন ফেরেশতা যখন তা পৌঁছাতে এবং তাদের দুজন ও সমস্ত মানুষকে যাদুকর পরিচিত বানাবার কাজে নিয়োজিত হয়েছিল, যাদুর অস্বাভাবিক কার্যাবলীর কথা বলতে ও তা অস্বীকার করার কথা বলতে এসেছিল তারা। এটা সম্ভব। এই দুই ফেরেশতার উপরই তা নাযিল হতো। এ-ও হতে পারে যে, লোকদের নিকট থেকে সে দুজনকে অনেক কথাই বলা হতো। কেননা ফেরেশতাদ্বয় তা পৌঁছিয়ে দেয়া ও পরিচিতকরণের জন্যে নিয়োজিত ছিলেন। যেমন রাসূল (স)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ – (النحل : ٨٩)

এবং সব জিনিসের বিশ্লেষণ সম্বলিত কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করেছি।

অপর একটি আয়াত ঃ

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا –

বল—আল্লাহ্র প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে তার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি।

দুটি আয়াতের একটি আয়াতে রাসূলের প্রতি নাযিল হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর অপরটিতে জনগণের প্রতি নাযিল হওয়ার কথা বলা হয়েছে, কেননা যে রাসূলের প্রতি

কুরআন নাযিল হয়েছে তিনি তো জনগণের প্রতিই প্রেরিত হয়েছিলেন। ফেরেশতাদ্বয়কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও তারা দুজন সকলের নিকট পরিচিত করার দায়িত্বে নিয়োজিত ও নির্দেশিত ছিল। কেননা জনগণ ফেরেশতাদ্বয়ের অধীন ছিল। তাই যাদুর অর্থ ও তাৎপর্য নির্ধারণে সব কিছুর তুলনায় বেশী প্রচারিত ছিল। তার বাতিল হওয়ার কথা বোঝাবার জন্যে ফেরেশ্তাদ্বয়কে এ কাজে বিশেষভাবে নিয়োজিত করা হয়েছে, যেন জনগণ সে দুজনকে অনুসরণ করে। যেমন মূসা ও হারুনকে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِذْ هَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى - فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى - (طه -٤٣-٤٤)

তোমরা দুজন ফিরাউনের নিকট যাও। নিঃসন্দেহে সীমালঙ্ঘন করেছে, পরে তোমরা দুজন তাকে নরম কথা বল। সম্ভবত সে নসীহত কবুল করবে অথবা ভয় করতে শুরু করবে।

এরা দুজন যেমন ফিরাউনের প্রতি প্রেরিত ছিলেন, তেমনি প্রেরিত হয়েছিলেন ফিরাউনের অধীন প্রজা-সাধারণের প্রতিও। কিন্তু নির্দেশ দানের বাক্যে কেবল ফিরাউনের উল্লেখ করা হয়েছে বিশেষভাবে। বস্তুত তার এবং তার অধীন প্রজা-সাধারণের ইসলামের দিকে নিয়ে আসার জন্যে এটাই ছিল অধিক সুফলদায়ক। অনুরূপভাবে নবী করীম (স) কিস্‌রা ও কাইজারের প্রতি আদালা আলাদা পত্র প্রেরণ করেছিলেন। চিঠিতে বিশেষভাবে তাদের দুজনের উল্লেখ ও সম্বোধন ছিল, প্রজা-সাধারণের জন্য তাতে কোন কথা ছিল না, যদিও তিনি সমগ্র মানুষের জন্যে রাসূল হয়ে এসেছিলেন। এর কারণ, যেমন পূর্বে বলেছি, জনগণ তো শাসকের অধীন। এই জন্যেই রাসূলে করীম (স) কিসরার প্রতি লিখিত পত্রে বলেছিলেন ঃ

اَمَّا بَعْدُ فَاَسْلِمْ تَسْلَمْ وَاِلَّا فَعَلَيْكَ اِثْمُ الْمَجُوْسِ -

অতঃপর কথা এই যে, তুমি এই চিঠি পাওয়ার পর ইসলাম কবুল কর, তাহলে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে। অন্যথায় তোমার উপর অগ্নিপূজকের অপরাধ ধার্য হবে।

আর কাইজারকে লিখেছিলেন ঃ

اَسْلِمْ تَسْلَمْ وَاِلَّا فَعَلَيْكَ اِثْمُ الْاَرِسِيِّيْنَ -

ইসলাম কবুল কর, শান্তি ও নিরাপত্তা পাবে। নতুবা তোমার উপর এরীসীনের অপরাধ আরোপিত হবে।

অর্থাৎ তুমি যখন ঈমান গ্রহণ করবে, তখন তোমার প্রজা-সাধারণও তোমার অনুসরণ করবে। আর তুমি যদি তা অস্বীকার কর, তাহলে তোমার প্রজা-সাধারণ ইসলাম থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে, তা গ্রহণ করবে না তোমার ভয়ে। ইসলাম বা কুফর গ্রহণের ব্যাপারে ওরা তোমার অনুসরণকারী বৈ তো নয়।

এখানেও অনুরূপ কথা; প্রকৃত জ্ঞান তো আল্লাহ্‌র। ব্যবিলনবাসীদের মধ্য থেকে দুজন বাদশাহ্‌র প্রতি দুজন ফেরেশতা বিশেষভাবে পাঠিয়েছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ – (الحج : ٧٥)

আল্লাহ্ ফেরেশতাদের মধ্য থেকেও রাসূল বাছাই করেন, আর মানুষের মধ্য থেকেও।

যদি বলা হয়, ফেরেশতা কি করে লোকদের নিকট প্রেরিত হতে পারে ? তারা তাদের উপর নাযিলই বা হয় কি করে ?

এর জবাবে বলা যাবে, এটা তো খুবই সম্ভব, বৈধ এবং তা তো হয়ে-ই থাকে। কেননা আল্লাহ্ কোন কোন ফেরেশতাকে অপর কোন কোন ফেরেশতার প্রতি পাঠিয়ে থাকেন, যেমন তাদেরকে নবী-রাসূলগণের প্রতি পাঠান। তাদের দেহ উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং মানুষের আকৃতি ধারণ করে, যেন মানুষ তাদেরকে অপরিচিত বা অবাঞ্ছিত মনে না করে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا – (الانعام : ٩)

নবী বা রাসূল হিসেবে যদি একজন ফেরেশতাকেই পাঠাতাম তাহলে তাকে অবশ্যই মানুষের আকৃতিতে পাঠাতাম।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ –

তারা লোকদেরকে যাদু শিক্ষা দেয়, আর যা দুই ফেরেশতার প্রতি নাযিল হয় তা-ও।

তার অর্থ—আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন—আল্লাহ দুজন ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন, তারা লোকদেরকে যাদুর অর্থ বোঝাবে এবং তাদের জানিয়ে দেবে যে এটা একটা কুফর, মিথ্যা ও ভিত্তিহীন জিনিস, ধোঁকা ও সম্মোহন ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব তারা যেন তা পরিহার করে চলে। যেমন রাসূলগণের জবানীতে আল্লাহ্ সব হারাম ও নিষিদ্ধ কার্যাবলীর কথা বলিয়েছেন এ উদ্দেশ্যে যে, তারা যেন সেসব গ্রহণ না করে। তাই যাদু যখন কুফর, সম্মোহন ও ধোঁকা, অথচ সে কালের লোকেরা তার প্রতারণায় পড়ে গিয়েছিল, তারা যাদুকে সত্য মনে করে গ্রহণ করেছিল। যাদুকর তা তার ভিত্তিতে জনগণের নিকট অসাধ্য সাধনের ক্ষমতার দাবি করেছিল এই দুজন ফেরেশতার মাধ্যমে, যেন মূর্খতার অন্ধকার দূর হয়ে যায় এবং তাদেরকে এই ধোঁকা থেকে রক্ষা করা যায়।

যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ –

এবং (ভালো ও মন্দের) উভয় স্পষ্ট পথই আমরা তাকে দেখিয়েছি।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন—ভালো ও কল্যাণের এবং মন্দ ও অকল্যাণের পথের বিবরণ আমরা বলে দিয়েছি। যেন লোকেরা ভালো ও কল্যাণের পথ অবলম্বন করে এবং

মন্দ ও অকল্যাণের পথ পরিহার করে চলে। যেমন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলা হল, অমুক ব্যক্তি মন্দ কি জিনিস, তা জানে না, চেনে না। শুনে তিনি বললেন, তাহলে তার পক্ষে তোমাদের মন্দের মধ্যে পড়ে যাওয়া খুবই সম্ভব।

বস্তুত যাদুর তাৎপর্য বলে তা থেকে লোকদেরকে হুঁশিয়ার করা এবং কুফর যত প্রকারের হতে পারে, মা ও বোন মুহররম হওয়ার, যিনা, সূদ ও মদ্যপান হারাম হওয়ার কথা বলার মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। কেননা নিষিদ্ধ ও খারাপ জিনিসগুলো লোকদের দ্বারা পরিহার করানোই আসল উদ্দেশ্য। তা ভালোর কথা বলার মতই ব্যাপার। কেননা তা বুঝিয়ে না দিলেও সে বিষয়ে জ্ঞান লাভ না হলে তা কার্যত করা কখনই সম্ভব হয় না। আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পথ ও কর্তব্যসমূহ—যেমন তা কর্তব্য বলে ঘোষিত হয়েছে—পালনের জন্যেই মন্দের কথা বলা প্রয়োজন, যেন তা পরিহার করা যায়। অন্যথায় মন্দকে এড়িয়ে চলা সম্ভব হবে না। তা সম্ভব হতে পারে সে বিষয়ে জ্ঞান লাভের পরই।

কেউ কেউ মনে করে, আল্লাহ্‌র, 'আর যা নাযিল হয় ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি' কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে, শয়তানেরা ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি নাযিল হওয়া বাণীকে অসত্য মনে করেছে, যেমন অগ্রাহ্য ও অমান্য করেছে সুলায়মান (আ)-কে। ওরা যে যাদু প্রয়োগ বা তার কথা প্রচার করে, তা ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি নাযিল হয়নি। মনে করে, আল্লাহ্‌র কথা ঃ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا 'লোকেরা সে দুজনের নিকট শিখে' এর অর্থ, যাদু ও কুফর কি জিনিস তা জেনে নেয়। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَلٰكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا 'বরং শয়তানরাই কুফর করেছে'-এর মধ্যে যে 'কুফর' শব্দটি রয়েছে, তা সে দুজনের প্রতি আরোপিত হয়। অর্থাৎ শয়তানেরা সে দুজনকে অমান্য করেছে। যেমন আল্লাহ্‌র এই কথাটি ঃ

سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقٰى -

নিশ্চয়ই নসীহত কবুল করবে যে ভয় করে এবং তা এড়িয়ে যাবে খারাপতম ব্যক্তি।

অর্থাৎ নসীহত অগ্রাহ্য করবে সেই ব্যক্তি, যে লোকদের মধ্যে অধিক বদ।

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ -

অর্থাৎ ফেরেশতাদ্বয় তা কাউকেই শিখায় না। তা সত্ত্বেও তারা তা না শিখিয়েই ক্ষান্ত হয়ে থাকে তাও নয়; বরং তারা চূড়ান্ত মাত্রায় নিষেধও করে তা শিখা থেকে। তখন তারা দুজন বলে ঃ

اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ -

নিঃসন্দেহে আমরা একটা পরীক্ষা, অতএব তুমি কুফর করো না।

এরূপ ব্যাখ্যা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে যে জিনিস, তা হল, ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি আল্লাহ যাদু নাযিল করতে পছন্দ করেন না। যদিও তিনি যাদুবিদ্যা ও যাদুকরের নিন্দাবাদ করেছেন।

কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা জরুরী নয়। কেননা নিন্দিত হচ্ছে তো সে যদি কর্ম করে। তা লোকদেরকে যে বলে ও তা থেকে সাবধান করে, সে নয়।

যেমন লোকদের মধ্য থেকে যে-ই যাদুর অর্থ ও তাৎপর্য জানতে পারবে, তার কর্তব্য হচ্ছে তা তাকে বলা যে তা জানে না এবং তা থেকে তাকে নিষেধ করবে। যেন সেই লোক তা পরিহার করে চলে। এটা তো একটা ফরয কাজ। আল্লাহ তা'আলাই তা আমাদের উপর ধার্য করেছেন, যখন আমরা দেখব যে, একটি লোক তা দ্বারা প্রতারিত ও সম্মোহিত হচ্ছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ -

আমরা তো পরীক্ষা মাত্র, অতএব তুমি কুফর করো না।

কেননা 'ফিতনা' বলতে তা বোঝায় যদ্দ্বারা কোন জিনিসের ভালো বা মন্দ হওয়া প্রকাশিত হয়। আরবরা বলে ঃ

فَتَنْتُ الذَّهَبَ اِذَا عَرَضْتُهُ عَلَى النَّارِ -

আমি স্বর্ণকে আগুনের উপর রেখে পরীক্ষা করি। তখনই জানা যায় তা খাঁটি কিংবা ভেজাল।

যাচা-ই পরীক্ষাও তাই। কেননা তাতে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তখন তা হয় পরীক্ষিত বস্তু।অন্যত্র 'ফিতনা' শব্দটি আযাব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ - (الذريت : ١٥)

তোমরা তোমাদের আযাবের স্বাদ আস্বাদন কর।

ফেরেশতাদ্বয় যখন যাদুবিদ্যার নিগূঢ় তাৎপর্য ও অর্থ প্রকাশ করছিলেন, তখন তারা দুজন বলতেন, আমরা কিন্তু ফিতনা—আযাব। কাতাদাহ বলেছেন—আমরা 'ফিতনা' অর্থ আমরা বিপদ। এই অর্থও যথার্থ। কেননা নবী-রাসূলগণ যে লোকদের প্রতি প্রেরিত হন, তাদের জন্যে 'বালা' বা বিপদ। কেননা তাদের মধ্যে উত্তম আমলকারী কে, তার যাচাই ও পরীক্ষা হয়ে যায়। 'ফিতনা' শব্দের অর্থ হিসেবে তারা দুজন আত্মরক্ষার উপায়ও মনে করতে পারে। কেননা যারা তাদের দুজনের নিকট থেকে তা জেনে নেবে, তারা তা খারাপ কাজে ব্যবহার করতে পারে এবং তার মধ্যে পড়ে যাওয়া থেকে নিরাপদ নয়। তখন তা একটা রক্ষামূলক পরীক্ষা হয়ে দাঁড়াতে পারে, অন্যান্য সমস্ত ইবাদত যেমন। সে দুজনের কথা ঃ فَلَا تَكْفُرْ 'অতএব তুমি কুফর করো না' থেকে বোঝা যায় যে, যাদুকর্ম একটি কুফর। তারা দুজন বিশেষ করে এই জিনিসটির শিক্ষা দেয় যেন তদানুযায়ী কাজ করা না হয়। তারা দুজনই জানে যে, যাদু কি, তার কলা-কৌশল কিরূপ কার্যকর হয়, যেন তা এড়িয়ে চলা হয় এবং যেন তার দ্বার জনগণকে সম্মোহিত করা না হয়। এই কাজ

নবী-রাসূলের কাজের পর্যায়ে গণ্য। অতএব এই কথাকে দলীল হিসেবে পেশ করা বাতিল। আল্লাহ্র কথা ঃ

فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ –

লোকরা তাদের দুজনের নিকট থেকে সে জিনিসই শিখে, যদ্দারা তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়।

এই বিচ্ছেদ ঘটানো দুভাবে হতে পারে। হতে পারে, শ্রোতা সেই অনুযায়ী আমল করবে। আর তখন সে কাফির হয়ে যাবে। তাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। স্ত্রী মুসলিম হলে স্বামী মুর্তাদ হয়ে যাওয়ার দরুন এই বিচ্ছেদ। এর বিপরীতটাও হতে পারে। দ্বিতীয় হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে চোগলখুরী করে এককে অপরের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে মিথ্যা-মিথ্যা বানোয়াট কথা বলে এককে অপরের প্রতি ঘৃণ্য বানিয়ে এবং তার পরিণতিতে উভয়ের মধ্যের সম্পর্ক বিপর্যস্ত করে বিচ্ছেদ ঘটানো। এটা মূলত বাতিল পন্থায় সম্মোহনমূলক কাজ। তাতে প্রত্যেকেই নিজেকে সত্য ভাবতে শুরু করে। তার পরে একজন অপর জন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَمَا هُمْ بِضَارِّيْنَ بِهٖ مِنْ أَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ –

তারা যাদুর দ্বারা কারোরই একবিন্দু ক্ষতি করতে পারে না। তবে আল্লাহ্র অনুমতি হলে ভিন্ন কথা।

আয়াতে اِذْنٌ। অর্থ অনুমতি। অর্থাৎ ক্ষতি করার সুযোগ দেয়া। হাসান বলেছেন, আল্লাহ যাকে চাইবেন নিষেধ করবেন। তখন যাদু তার কোন ক্ষতি করবে না আর যাকে চাইবেন উভয়ের মধ্যকার পথ উন্মুক্ত করে দেবেন। তখন তা ক্ষতি সাধন করতে পারবে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ –

তারা নিঃসন্দেহে জেনে নিয়েছিল যে, এই জিনিস যে লোক ক্রয় করবে, পরকালের কোন কল্যাণই তার ভাগ্যে নেই।

বলা হয়েছে, এর অর্থ, আল্লাহ্র দ্বীনের বদলে যে লোক যাদুবিদ্যা গ্রহণ করবে, পরকালে তার কোন কল্যাণের অংশ নেই। হাসান বলেছেন, তার দ্বীন নেই। এ থেকে বোঝা যায় যে, যাদু কর্ম ও যাদু গ্রহণ অবলম্বন সুস্পষ্ট কুফর ।

وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْابِهٖ اَنْفُسَهُمْ –

তারা নিজেদেরকে যে জিনিসের বিনিময়ে বিক্রয় করে, তা অত্যন্ত খারাপ।

এ থেকেও বোঝা যায়, যাদু গ্রহণ ও তার সাহায্যে কাজ করা কুফরী। আল্লাহ্র এই কথা ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا –

যদি তারা ঈমান আনত এবং ভয় করে চলত-টিরও দাবি হচ্ছে তাই।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا –

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা 'রায়েনা' (আমাদের খেয়াল রাখুন) বলো না।

কুত্‌রুব বলেছেন এটা হিজাযীদের ব্যবহৃত শব্দ। গালি স্বরূপ তারা এই শব্দটির ব্যবহার করে। এও বলা হয়েছে, এই শব্দটি ইয়াহুদীরা বলত। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন ঃ

وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِىْ الدِّيْنِ – (النساء :٤٦)

ওরা বলে 'সামেনা'-আ-আসাইন,. আস্‌মা গায়রা মুস্‌মায়িন ও 'রায়েনা' জিহ্বা ওলট-পালট করে এবং দ্বীনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রকাশের উদ্দেশ্যে তারা এরূপ শব্দ উচ্চারণ করত পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে দ্বীনের বিরুদ্ধে ঠাট্টা ও বিদ্রূপের লক্ষ্যে।

যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاِذَا جَآءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ – (المجادله :٨)

ওরা যখন তোমার নিকট আসে, তখন ওরা তোমাকে সালাম করে এমন সব শব্দে যদ্দ্বারা আল্লাহ্ তোমাকে সম্ভাষণ করেন নি।

কেননা ওরা বলত ঃ اَلسَّامُ عَلَيْكَ ওরা শব্দ উচ্চারণে এই ধারণা দিতে চাইত যে, ওরা আপনার প্রতি সালাম করছে। পরে ওদের এই হীন মানসিকতা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে অবহিত করেন এবং মুসলমানদেরকে এরূপ শব্দ উচ্চারণ করতে নিষেধ করে দেন। তাদের উচ্চারিত শব্দ رَاعِنَا -এর অর্থ হতে পারেঃ আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন, আমাদের প্রতি দৃষ্টি দিন। কিন্তু শব্দটি গঠন প্রকৃতির দিক দিয়ে ইয়াহূদীরা ব্যবহার করত ঠাট্টা ও বিদ্রূপ অর্থে, তাই এই শব্দটি ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এতে নিষিদ্ধ তাৎপর্যও নিহিত রয়েছে। এর মধ্যে বিদ্রূপাত্মক ভাবধারা পূর্ণ মাত্রায় নিহিত রয়েছে। যদিও আমাদের জন্য অপেক্ষা করুন—এই অর্থও তার হয়। আরবী অভিধানে এর দৃষ্টান্ত বহু রয়েছে যেমন اَلْوَعْدُ ভালো ও মন্দ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হতে পারে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اَلنَّارُ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا – (الحج : ٧٢)

জাহান্নাম, আল্লাহ কাফিরদের জন্য তার-ই ওয়াদা করেছেন।

বলেছেন ঃ

ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ –

এ এমন ওয়াদা যা মিথ্যা হবে না।

'ওয়াদুন' শব্দটি নিঃশর্ত ব্যবহৃত হলে তা থেকে কল্যাণই বোঝা যাবে, মন্দ বা অকল্যাণ নয়। 'রায়েনা' শব্দের অর্থেও দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। তা নিঃশর্ত ব্যবহৃত হলে 'আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন' বা 'আমাদের জন্যে অপেক্ষা করুন' এই বিশেষ অর্থের পরিবর্তে বিদ্রূপের অর্থটি প্রবল হয়ে উঠে। এ থেকে বোঝা যায়, প্রত্যেকটি শব্দের অর্থে ভালো ও মন্দ উভয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। এ-ও জানা যায় যে, দ্বীনের ক্ষেত্রে উপহাস (Derision) নিষিদ্ধ। এরূপ উভয় সম্ভাবনামূলক শব্দের ব্যবহারও নিষিদ্ধ।

মূলত আল্লাহ্-ই তাঁর কিতাবের প্রকৃত তাৎপর্য অধিক ভালো জানেন।

## সুন্নাত দ্বারা কুরআনের হুকুম মনসূখ হওয়া এবং মনসূখ হওয়ার বিভিন্ন দিক

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا –

আমরা যে আয়াতকেই মনসূখ (নাকোচ) করি কিংবা ভুলিয়ে দেই, তার থেকে অধিক উত্তম কিংবা তার মতই (আর একটি) নিয়ে আসি।

অনেক বিশেষজ্ঞের মতে 'নূসূখ' অর্থ দূর করা। অন্যরা বলেছেন ঃ বদলে দেয়া। আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ – (الحج : ٥٢)

শয়তান যা উদ্রেক বা প্রবর্তিত করে, আল্লাহ্ তা দূর করেন।

করে দেন এবং তদস্থলে সুদৃঢ় আয়াত বসিয়ে দেন। 'নুসূখ'-এর অর্থ কেউ কেউ বলেছেন স্থানান্তরকরণ। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ – (الجاثيه : ٢٩)

তোমরা যে কাজ করছিলে আমরা তা স্থানান্তর করে সংরক্ষিত করছিলাম।

মতের এই পার্থক্য তার আসল স্থানে অভিধান ভিত্তিক ব্যাপার। মূল আভিধানিক অর্থ যা-ই হোক, শরীয়াতী প্রয়োগে তা হচ্ছে আদেশটির মুদ্দত, পাঠের সময়কাল। অনেক সময় শুধু পাঠের দিক দিয়েই 'নুসূখ' হয়, যদিও তার হুকুমটা বহাল থাকে। এর বিপরীত পাঠ থেকে যায়, হুকুমটা নাকচ হয়ে যায়।

আবূ বকর বলেছেন, ফিকাহ্বিদগণ উত্তর কালের মনীষীদের কেউ কেউ মনে করেছেন, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (স)-এর শরীয়াতে নুসূখ (অর্থাৎ বাদ করে দেয়া) নেই। নুসূখ

পর্যায়ে যেসব কথা বলা হয়েছে, তা হযরত মুহাম্মাদ (স) পূর্ববর্তী সব নবী-রাসূলের শরীয়াত রদ হয়ে যাওয়া সম্পর্কিত কথা, যেমন শনিবার দিনের উৎসব, কাবার দিক ছাড়া অন্যদিকে ফিরে নামায আদায়, কেননা আমাদের নবী হল সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর প্রবর্তিত শরীয়াত কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। উক্ত কথা যে ব্যক্তি বলেছেন, তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও দক্ষতার অধিকারী ছিলেন, যা এখন সংরক্ষিত নয়। ফিক্‌াহ, উসূলে ফিকাহও তাঁর আয়ত্তাধীন ছিল। তার আকীদাও সঠিক ছিল, নিছক ধারণা অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলতেন না। তাঁর এই পরিচিতি সকলের জানা ছিল না। তাই এই কথাটি প্রকাশ করার সুযোগ পান নি এবং তাঁর পূর্বেরও কেউ এ কথা বলেনি। হ্যাঁ, একথা সত্য যে, প্রাচীন ও পরবর্তীকালের মুসলিম উম্মাহ পূর্ববর্তী দ্বীনের ও শরীয়াতের মনসূখ হওয়া অনেক কিছুই একত্র করে আমাদের উপর এমনভাবে চাপিয়ে দিয়েছেন, যা কেউ সন্দেহও করেনি। তার ব্যাখ্যা দেয়ারও সুযোগ পায়নি।

যেমন মুসলিম উম্মাহ্ বুঝেছেন যে, কুরআনের কথাসমূহ সাধারণ عام বিশেষ خاص সুদৃঢ় অপরিবর্তনীয় محكم এবং সুস্পষ্টভাবে অর্থ নির্ধারণ করা যায় না এমন (متشابه) প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত। কাজেই কুরআন ও সুন্নাহতে নুসূখ থাকার প্রতিরোধক যেমন তার 'খাস' ও 'আম' মুহ্‌কাম ও মুতাশাবিহ্-এর প্রতিরোধ হবে। কেননা সবই উপস্থিত এবং একই দিক দিয়ে চলে এসেছে। তখন এই ব্যক্তি মনসূখ হওয়া ও মনসূখকারী আয়াত এবং তার হুকুম নির্ধারণে এমন সব বিষয়ের অবতারণা করেছে যা মুসলিম উম্মাহর কথার বাইরে এবং তদ্দরুন অর্থ ও তাৎপর্যও হয়ে গেছে অনেক কঠিন। আমি জানি না, কোন্ জিনিস এই ব্যক্তিকে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে। তবে আমার অধিক মাত্রার ধারণা হচ্ছে পূর্বের লোকদের কথা বর্ণনার ব্যাপারে তার ইলম ছিল খুবই অল্প। সে ব্যাপারটি ভালো করে না জেনেও তাতে নিজের মত জাহির করেছে। আগের লোকেরা কি বলেছেন তা-ও যেমন তার জানা ছিল না, উম্মত সেই কথাগুলো পরবর্তীদের নিকট কিভাবে পৌঁছিয়েছে, তাও ছিল তার অজানা। অথচ লোকটি রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত এই হাদীসটির অন্যতম বর্ণনাকারী ঃ

مَنْ قَالَ فِيْ الْقُرْاٰنِ بِرَاْيِهٖ فَاصَابَ فَقَدْ اَخْطَا –

যে লোক কুরআনের নিজ ইচ্ছা ও মতের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা দেবে, তা যথাযথ হলেও সে বড় ভুল করে বসেছে।

আল্লাহ্ আমাদিগকে ও তাকে মাফ করুন।

উসূলিল ফিকাহ-এর কিতাবে 'নুসূখ' সম্পর্কে বিস্তারিত কথা আলোচনা করেছি, কোন্ ধরনের 'নুসূখ' হতে পারে, কোন প্রকারের নয়, তাও বিস্তারিত বলা হয়েছে। আমার বিশ্বাস এ পর্যায়ে তাই যথেষ্ট। আল্লাহ্‌র কথা اَوْنُنْسِهَا অথবা তা ভুলিয়ে দিই। শব্দটির মূল وَنَنْسَاهَا – نَسْيَاتُ এর অর্থ, আমরা বিলম্বিত করলাম তা। এ থেকে গঠিত اَلنَّسْئَةُ এর অর্থ বিলম্বিত ঋণ। কুরআনের আয়াত ঃ

اِنَّمَا النَّسِيْءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ –

হারাম মাস বিলম্বিতকরণ কুফরিত্বে প্রবৃদ্ধি।

অর্থাৎ মাস বিলম্বিতকরণ। কিন্তু এর যখন ভুলে যাওয়া অর্থ করা হবে, তখন আয়াতের অর্থ বুঝতে হবে যে, আল্লাহ্ তার পাঠ লোকদেরকে ভুলিয়ে দেবেন, যেন তারা তা পাঠই না করে। এটা দুভাবে ঘটে। একটি, হয় আল্লাহ্ তার পাঠ ত্যাগ করতে বলবেন। ফলে লোকেরা কালের অতিক্রমণে তার পাঠ ছেড়ে দেবে। হঠাৎ করে তা ভুলে যাওয়াও সম্ভব। তাদের চিন্তা থেকেই তা দূর হয়ে যাবে। আর তা হবে নবী করীম (স)-এর একটি মুজিযা। আর শব্দটি نَنْسَاهَا 'আমরা তা ভুলে যাই' হলে তার অর্থ হবে ঃ তা বিলম্বিত করা হবে, তা নাযিল করবেন না, তার পরিবর্তে তা নাযিল করবেন যা সেটির স্থলাভিষিক্ত হবে কল্যাণের কাজে অথবা বান্দাদের জন্যে তা হবে অধিক কল্যাণকর অপরটির তুলনায়। অথবা এও হতে পারে যে, পরবর্তীটা নাযিল হওয়ার সময় পর্যন্ত সেইটি নাযিল করার কাজ বিলম্বিত করে দেবেন। অতঃপর তার বদলে অন্যটি নাযিল হয়ে যাবে। সেটি যদি পূর্ববর্তী সময়ে নাযিল হতো, তাহলে কল্যাণের দিক দিয়ে সেটিই তার স্থলাভিষিক্ত হতো। আল্লাহ্র কথা ঃ

نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا –

আমরা নিয়ে আসি তার তুলনায় বেশি কল্যাণের জিনিস কিংবা তার-ই মত জিনিস।

হযরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ তার তুলনায় তোমাদের জন্যে অধিক কল্যাণকর সহজতা ও সুবিধাজনকতার দিক দিয়ে। যেমন, যুদ্ধে একজন দশজন কাফিরের মুকাবিলার জন্যে দায়িত্বশীল বানানো হয়েছিল বিশজনের পরিবর্তে। তখন আল্লাহ্র কথা সত্য হয়েছিল ঃ اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ এক্ষণে তোমাদের দায়িত্ব অনেকটা হালকা করে দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা। অথবা অনুরূপ, যেমন বায়তুল মাকদিসের পরিবর্তে কাবার দিকে মুখ করার আদেশ। এটা তাদের জন্যে খুবই সহজ ও সুবিধাজনক। আর হাসান থেকে এর অর্থ এই বর্ণিত হয়েছে ঃ তাৎক্ষণিকভাবে তা অধিক কল্যাণকর কল্যাণের বিপুলতার দিক দিয়ে কিংবা তার অনুরূপ। এক্ষণে সকলেরই মতৈক্য হল এই তাৎপর্য যে, তা তোমাদের জন্যে অধিক মঙ্গলজনক বোঝা হালকা হওয়ার দিক দিয়ে কিংবা কল্যাণের বিপুলতার দিক দিয়ে পাঠে অধিক কল্যাণকর, এ অর্থ কেউ-ই বলেন নি। কেননা কুরআনের কতকাংশ পাঠের দিক দিয়ে অধিক কল্যাণকর অপর কতকাংশের তুলনায় একথা বলা জায়েয হতে পারে না। কেননা কুরআনের সব কিছুই মুজিযা তা— একান্তভাবে আল্লাহ্র কালাম।

আবূ বকর বলেছেন, অনেকেই বলেছেন, সুন্নাত বা হাদীস দ্বারা কুরআন মনসূখ হওয়া জায়েয নয়। কেননা সুন্নাত আর যা-ই হোক, তা কুরআনের তুলনায় অধিক কল্যাণকর হতে পারে না। এই কথাটি যিনি বলেছেন, খুব বুঝে শুনে বলেছেন বলে মনে হয় না কয়েকটি কারণে। একটি এ যে, পাঠের দিক দিয়ে ও নজম—সুসংবদ্ধতার দিক দিয়ে কুরআনের তুলনায় অধিক কল্যাণকর, এই অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা নজ্‌ম-এর মুজিযা হওয়ার ক্ষেত্রে মনসূখকারী ও মনসূখ—দুটিই সমান মানের। আর দ্বিতীয়, আগের কালের মনীষিগণ এ ব্যাপারে একমত যে, 'নজম' উপস্থিত নেই। কেননা তাঁদের কথা

দুটি কথার একটিকে ভিত্তি করে হয়েছে। হয় বোঝা হালকাকরণ কিংবা কল্যাণময়তা। আর তা সুন্নাত দ্বারাও হতে পারে। যেমন হতে পারে কুরআন দ্বারা। তাদের কেউ বলেন নি যে, পাঠের কথাই বুঝিয়েছেন। কাজেই উপরোদ্ধৃত আয়াত থেকেই প্রমাণিত হয় যে, সুন্নাত দ্বারা কুরআনের আয়াত মনসূখ হওয়া (অর্থাৎ কুরআনের বিপরীত কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলে হাদীসকে অগ্রাধিকার দেয়া) জায়েয। একথা অধিক সুস্পষ্ট ও প্রকাশমান তা জায়েয না হওয়ার কথার তুলনায়। উপরন্তু একথার নিগূঢ় অর্থ হল পাঠ মনসূখ হওয়া। আয়াতে এর কোন হুকুম নেই। আল্লাহ্ কথা مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ আয়াত থেকে যা মনসূখ করি। আর আয়াত হল তা যা পাঠ করা হয়। আর পাঠ মনসূখ হলে হুকুমটাও মনসূখ হবে—এমন কথা নেই। অবস্থা যখন এই, তখন এই অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে যে, আয়াতের পাঠ যদি মনসূখ করি কিংবা ভুলিয়ে দিই, তাহলে তোমাদের জন্যে তদপেক্ষা উত্তম জিনিস নিয়ে আসি সুন্নাতের পথে, যা মুহকাম—সুদৃঢ় ও মজবুত। এই বিষয়ে ব্যাপক কথা 'উসুলিল ফিকাহ্' কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছি, যা খুবই যথেষ্ট। তা পাঠ করলেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সব জানা যাবে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ -

অতএব তোমরা ক্ষমা করে দাও, ঝঞ্ঝাট দূর কর, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তার ফরমান নিয়ে আসবেন।

মূ'মার এ আয়াতের তাফসীরে কাতাদাহ্‌র এই কথা বর্ণনা করেছেন ঃ উক্ত আয়াতটিকে মনসূখ করেছে আল্লাহ্‌র এই কথাটি ঃ

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ -

অতএব তোমরা মুশরিকদের হত্যা কর, যেখানে যেভাবেই তাদেরকে তোমরা পাবে।

আবূ মুহাম্মাদ জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াসেতী আবুল ফজল জাফর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল ইয়ামন আবূ উবায়দ আবদুল্লাহ্ ইবনে সালিহ মুআবিয়াত ইবনে সালিহ আলী ইবনে আবূ তালহা ইবনে আব্বাস থেকে لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ 'তুমি তাদের উপর দারোগা নও' এবং আল্লাহ্‌র কথা: وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ 'তুমি তাদের উপর জোর-জবরদস্তিকারী নও' فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ 'তাদের দিক থেকে তুমি মুখ ফিরিয়ে নাও এবং সাফ সাফাই করে নাও। আয়াত ঃ

قُلْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ -

ঈমানদার লোকদেরকে বল, তারা যেন ক্ষমা করে দেয় আল্লাহ্‌র শাসনামলকে যারা আশা করে না, তাদেরকে।

বলেছেন যে, এই সব কয়টি আয়াতকেই মনসূখ করে দিয়েছে আল্লাহ্‌র এই কথা ঃ 'মুশরিকদের হত্যা কর যেখানেই যেভাবেই তোমরা পাবে।' আর এই আয়াতটিও ঃ

قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلاَيُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلاَ يَدِيْنُوْنَ .......

তোমরা যুদ্ধ কর তাদের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান গ্রহণ করেনি এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন, তাকে তারা হারাম (বন্ধ) ঘোষণা করেনি এবং দ্বীন পালন করছে না ........

এই আয়াতটিও অনুরূপ ঃ

فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّاالْحَيَاةَ الدُّنْيَا –

যে লোক আমার দ্বীন ও বিধান থেকে পেছনে সরে গেছে এবং কেবলমাত্র এই বৈষয়িক জীবনটাকেই লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে, হে নবী, আপনি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

এ আয়াতও ঃ

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ – فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ –

এবং ওদের সাথে আপনি বিতর্ক করুন উত্তম কথাবার্তার দ্বারা। অবস্থা যদি এই হয় যে, তা ও আপনার মাঝে শত্রুতা রয়েছে, তাহলে সে খুবই উচ্ছসিত বন্ধু হয়ে যাবে। (সূরা নহল ঃ ১২৫ ও সূরা হা-মীম-সিজদা)

এই কথাটিও ঃ

وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلاَمًا –

তাদেরকে জাহিল লোকেরা যখন (খারাপ কথা দ্বারা) সম্বোধন করে, তখন তারা বলে সালাম।

আল্লাহ্ই ভালো জানেন, যুদ্ধ করা ফরয হওয়ার আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে নাযিল হওয়া এসব আয়াতের নির্দেশ যুদ্ধের আয়াত নাযিল হওয়ার পর আর কার্যকর নয় (অন্তত কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করা কালে—অনুবাদক)। এসব আয়াত হিজরতের পূর্বে নাযিল হয়েছিল। আর এসব কয়টি আয়াতেরই লক্ষ্য ছিল কাফির-মুশরিকদেরকে দ্বীনের দিকে আহ্বান জানানো এবং তা হিজায এলাকায়। নবী করীম (স)-এর মুজিযা—যা আল্লাহ তাঁর দ্বারা দেখিয়েছিলেন—বিবেচনা করলে একথা অনস্বীকার্য হবে যে, নবী-রাসূল ছাড়া এ কাজ অন্য কারো দ্বারা সাধিত হতে পারে না। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

قُلْ اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا مَابِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ – (سبا : ٤٦)

বল, আমি তোমাদেরকে একটি উপদেশ দিচ্ছি। তা হল তোমরা দুজন করে বা এক একজন আল্লাহ্‌র জন্যে (দাঁড়িয়ে যাও। অতঃপর) চিন্তা করে দেখ, তোমাদের এই সঙ্গীর উপর জ্বিনের কোন আসর নেই বা পাগলামীর কিছুই নেই।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

قُلْ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ –

বল, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের যে নীতি-আদর্শের অনুসারী পেয়েছ, তার চাইতেও অধিক উত্তম হেদায়েতের বিধান যদি আমি নিয়ে এসে থাকি, তাহলেও .....

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَافِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى- فَاَنّٰى تُوْفَكُوْنَ –

তাদের নিকট কি অকাট্য প্রমাণ আসেনি, যা প্রাথমিক সহীফাসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে? তা হলে তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছ? (সূরা ত্বহা ঃ ১৩৩ ও আনফাল ঃ ৯৫)

اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ –

তোমরা কি বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগাও না?

فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ –

তা হলে তোমাদেরকে কোন্ দিকে ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে?

এই ধরনের আয়াতসমূহে নবী করীম (স)-এর সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপের আদেশ রয়েছে। নবুয়তের চিহ্ন ও নিদর্শন এবং তার সত্যতা অকাট্য দলীল-প্রমাণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার আহ্বান রয়েছে। পরে নবী করীম (স) যখন মদীনায় হিজরত করে গেলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেননা তখন দলীল প্রমাণ পেশ করার পর্যায় এবং তাদের ওযর-অক্ষমতা প্রকাশের স্তর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। নগরবাসী ও মরুবাসী, নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকল লোকের নিকট নবীর মুজিযা, তাঁর নিদর্শনাদি স্থিতি লাভ করেছে। তা সত্ত্বেও তারা কুফর ও শিরকের উপর অবিচল হয়ে রয়েছে। অথচ তারা নিজেদের চোখে ওসব প্রমাণাদি করেছে, নির্ভুল খবরও পেয়ে গেছে। তা থেকে যে জ্ঞান অর্জিত হয়েছে, তা কোন ক্রমেই মিথ্যা হতে পারে না, তার সত্যতা অস্বীকার করা যেতে পারে না। যুদ্ধ ফরয হওয়ার আয়াতসমূহের তাফসীর লেখার সময়ে আমরা আরও বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا - أُولٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوْهَا اِلَّا خٰئِفِيْنَ –

**যারা আল্লাহ্র মসজিদসমূহে আল্লাহ্র নামের যিকির নিষিদ্ধ করে এবং তা ধ্বংস করার চেষ্টা করে তাদের তুলনায় অধিক জালিম আর কে হতে পারে ? ওদের পক্ষে সেখানে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ছাড়া অন্যভাবে প্রবেশ করার অধিকার থাকতে পারে না।**

মা'মার কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন; বখ্তে নসর বায়তুল মাকদিস ধ্বংস করেছিল। খৃস্টানরা এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েছে। আয়াতে তাদের কথাই বলা হয়েছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ 'ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া ছাড়া ওদের পক্ষে সেখানে ওদের প্রবেশ করার অধিকার থাকতে পারে না' দ্বারা খৃস্টানদেরকেই বুঝিয়েছেন। ওরা তথায় চুরি করেই প্রবেশ করে। ওদের উপর শক্তি স্থাপিত হলে ওদেরকে এই দুনিয়ায়ই লাঞ্ছনা-গঞ্ছনার শাস্তি দেয়া হবে। ওরা নিজেদের হস্তে-আনুগত্য স্বীকার করে জিযিয়া দিতে বাধ্য হবে।

ইবনে আবূ নুজাইহ্ মুজাহিদ থেকে এ আয়াতের তাফসীর বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, ওরা খৃস্টান। তারাই বায়তুল মাকদিসকে ধ্বংস করেছে।

আবূ বকর বলেছেন, কাতাদাহ্ থেকে বর্ণিত হাদীসে বর্ণনাকারী থেকে সম্ভবত ভুল হয়ে গেছে। কেননা প্রাচীন কালের ইতিহাস সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোকদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনই দ্বিমত নেই যে, বখ্তে নসর ছিল ঈসা মসীহ্ (আ)-এর জন্মের পূর্বে একজন বাদশাহ, সে-ও অনেক দীর্ঘকাল পূর্বের। আর নাসারা খৃস্টানদের উৎপত্তি তো হয়েছে ঈসা (আ)-এর পর। তা হলে তারা বায়তুল মাকদিস ধ্বংসের ব্যাপারে কি করে বখ্তে নসরের সাহায্যকারী হতে পারে বা তারাই বা তার ধ্বংসকারী হতে পারে কি রূপে ? সম্রাট কসতনতাইনের শাসনামলে তারা সিরিয়া ও রোমে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে। দ্বীন-ইসলামের দুই-আড়াইশ বছর পূর্বে এই ঘটনা, তার পূর্বে তারা ছিল সাবেয়ী—মূর্তিপূজারী। এই সময় খৃস্টধর্ম গ্রহণকারীরা ছিল প্রচ্ছন্ন, আত্মগোপনকারী সমাজ ও সরকারের ভয়ে। তা সত্ত্বেও খৃস্টানরা বায়তুল মাকদিসকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকে (অবশ্য ইয়াহূদীরাও তাই)। এমতাবস্থায় তারা বায়তুল মাকদিসের ধ্বংসের কাজে সাহায্য করেছে—তা অকল্পনীয়। কেউ কেউ বলেন, আলোচ্য আয়াতটিতে মুশরিকদের কথা বলা হয়েছে। কেননা তারাই মক্কায় অবস্থিত মাসজিদুল হারামে আল্লাহ্র ইবাদত করা থেকে মুসলমানদের বাঁধা দিয়েছিল। তাকে ধ্বংস করার জন্যে চেষ্টা করার যে কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে, সেখানে আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগী ও যিকির-আযকার করে তাকে আবাদ রাখা থেকে মুসলমানদের বিরত রাখা।

আবূ বকর বলেছেন, এ আয়াতে যিম্মী-বিধর্মী রাষ্ট্রানুগত নাগরিকদেরকে মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে নিষেধ করার দলীল রয়েছে। তা দুটি কারণে ঃ একটি আল্লাহ্র কথা উপরোদ্ধৃত আয়াত। এই নিষেধ দুভাবে হতো। একটি মসজিদে হারামের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে ও শক্তি প্রয়োগ করে। আর দ্বিতীয়টি হতো কাফির-মুশরিকদের আকীদা-বিশ্বাস, ধর্ম ও আইন-শাসন। কেননা ধর্ম পালনের দিক দিয়ে বিশ্বাসের কারণে যারা মুসলমানদেরকে সেখানে এক আল্লাহ্র যিকির ও ইবাদত করতে বাধা দিত, তাদের

সম্পর্কেও কথা বলা সঙ্গত যে, তারা মুসলমানদেরকে তাদের ইবাদত-বন্দেগী করতে বাধা দিয়েছে। তাহলে এখানে নিষেধ বা বাধাদান অর্থ আপত্তি তোলা, অপছন্দ করা। যেমন আল্লাহ কাফিরদেরকে কুফর করতে নিষেধ করেছেন। নাফরমানদেরকে নাফরমানী করতে নিষেধ করেছেন। এর অর্থ, তাদের জন্যে ক্ষতিকর মনে করা হয়েছে, সে কাজ করলে তাদের পরিণতি খারাপ হবে বলে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। ব্যবহৃত শব্দ উভয় অর্থই দিচ্ছে। তাই শব্দটি থেকে উভয় অর্থই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

আল্লাহ্র কথা ঃ 'ওদের অধিকার থাকতে পারে না ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া ছাড়া তথায় প্রবেশ করার' এ থেকে বোঝা যায় যে, সেখান থেকে ওদের বহিষ্কার করা মুসলমানদের কর্তব্য, যদি তারা তথায় প্রবেশ করে। অন্যথায় তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হবে কিভাবে! وَسَعٰى فِىْ رَابِهَا আর দ্বিতীয় ' তারা তা ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছে। তা-ও দুভাবে হতে পারে। একটি তারা ধ্বংস করবে নিজেদের হাতে। আর দ্বিতীয়, তাকে ধ্বংস করা হবে তাদের ধর্মীয় কর্তব্য। কেননা তাদের ধর্মেরই দাবি হচ্ছে তাই। এর পরই বলা হয়েছে—ওদের অধিকার নেই সেখানে প্রবেশ করে। হলেও হবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে। এ থেকে বোঝা যায়, তাদের এই নিষেধকরণ সেভাবেই, যেমন বলেছি। আর নিম্নোক্ত আয়াতটি থেকে যেমন বোঝা যায়, তেমনও হতে পারে ঃ

مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ –

মুশরিকদের অধিকার নেই যে, তারা আল্লাহ্র মসজিদসমূহের নির্মাণ কাজ করবে।

এই নির্মাণ দুভাবে হতে পারে। একটি হচ্ছে তা বানানো, তার সংস্কার করা, আর দ্বিতীয় হচ্ছে, তথায় উপস্থিত হওয়া, তার সাথে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক স্থাপন। যেমন বলা হয়, 'অমুকে মজলিস নির্মাণ করে'। অর্থাৎ সে মজলিসে উপস্থিত হয়। কোন মজলিস থেকে সে দূরে থাকে না। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اِذَا رَاَيْتُمُ الرَّجُلَ يَمْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهُ بِالْاِيْمَانِ –

তোমরা যখন কোন ব্যক্তিকে মসজিদে যেতে অভ্যস্ত দেখবে, সে যে একজন ঈমানদার তার সাক্ষ্য তোমরা দেবে।

তার কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ –

আল্লাহ্র মসজিদসমূহ নির্মাণ করে কেবল সে লোকই, যে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছে।

লোকটির মসজিদে হাজির হওয়াকে মসজিদ নির্মাণের কাজ বলা হয়েছে। আমাদের মাযহাবের ফিকাহবিদগণ মসজিদে তাদের প্রবেশ করা জায়েয বলেছেন। যথাস্থানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, ইন্শাআল্লাহ্। এ-ও জানা যায় যে, এ হুকুম মসজিদ সম্পর্কে প্রযোজ্য। কেবলমাত্র বায়তুল মাকদিস সম্পর্কেই এই কথা নয়, নয়

কেবল মসজিদুল হারাম সম্পর্কে। কোন্‌টির জন্যে এটা বিশেষ হুকুম, তা কেবলমাত্র দলীল দ্বারাই প্রমাণিত হতে পারে।

যদি বলা হয়, মসজিদের প্রত্যেকটি স্থানকেই মসজিদ বলা সঙ্গত। যেমন মজলিসের প্রত্যেকটি স্থানকেই মজলিস বলা যায়। এই কারণে কখনও সমগ্রটার উপর এই নাম প্রয়োগ করা হবে, আবার কখনও সিজদার প্রতি স্থানকেই মসজিদ বলা হবে ?

এর জবাবে বলা যাবে, ভাষাবিদের মতে একটি মসজিদকে বহু বচনে مَسَاجِدُ বলা অসঙ্গত নয়। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। তবে مَسْجِدَانِ দুটি মসজিদ বলা যায় না একটি মসজিদকে। যেমন একটি ঘরকে বহু ঘর বলা যায় না। এতে প্রমাণিত হল যে, শুধু মসজিদ বললে তা শামিল করে না। যদিও সিজদার স্থানসমূহকে মসজিদ নাম রাখা হয়ও। তা বলা যাবে শর্তাধীন, নিঃশর্তে নয়। বিনাশর্তে তার ব্যবহার হবে যেখানে তার চাহিদা এবং সমস্ত মসজিদের ক্ষেত্রে নিঃশর্তে বলা নিষিদ্ধ হতে পারে না। তুমি তো বিশেষভাবে কতক মসজিদকে অপর কতক মসজিদকে বাদ দিয়ে বোঝাতে চাইছ। কিন্তু তা দলীল ছাড়া মেনে নেয়া যায় না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ -

পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই জন্যে। অতএব তোমরা যেদিকেই মুখ করবে সে দিকেই আল্লাহ্ রয়েছেন (সে দিকই আল্লাহ্‌র দিক)।

আবূ আশ্‌য়াম আস-সামান আসিম ইবনে উবায়দুল্লাহ-আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে রবী'আতা তাঁর পিতার থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ এক অন্ধকার রাতে আমরা রাসূলে করীম (স)-এর সাথে ছিলাম। তখন কিবলা কোন্ দিকে তা আমরা ঠিক পাচ্ছিলাম না। তখন আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি যে দিকে কিবলা মনে করেছিল, সে দিকে ফিরে নামায পড়েছি। যখন সকাল হল, তখন ব্যাপারটি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট প্রকাশ করলাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন।

আইউব ইবনে উতবা কায়স ইবনে তলক্-তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ কতিপয় লোক এক সাথে সফরে বেরিয়েছিল। তারা এক সাথে নামায পড়ল, কিন্তু কিবলা ঠিক করতে পারল না। পরে তারা বুঝতে পারল যে, কিবলার ভিন্ন দিকে তারা নামায পড়েছে। পরে এই ঘটনার বিবরণ রাসূলে করীম (স)-কে জানালে তিনি বললেন ঃ

تَمَّتْ صَلَاتُكُمْ -

তোমাদের নামায সম্পূর্ণ আদায় হয়ে গেছে।

ইবনে লেহ্‌ইয়াতা বকর ইবনে সওয়াদাতা থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ এক ব্যক্তি ইবনে উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন সেই ব্যক্তি সম্পর্কে, যে সফরে কিবলা ভুল করে নামায পড়ে। জবাবে তিনি বললেন ঃ 'যেদিকেই তোমরা মুখ কর সেটিই আল্লাহ্‌র দিক।'

আবূ আলী আল-হুসায়ন ইবনিল হাফেজ মুহাম্মাদ ইবনে সুলায়মান আল-ওয়াসেতী-আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল হালাল আল-আম্বরী থেকে হাদীস বর্ণনা করছেন ঃ বলেছেন, আবূ উবায়দ আল-হাসানের কিতাবে লিখিত পেয়েছি যে, আবদুল মালিক ইবনে আবূ সুলায়মান আল আরজামী আতা ইবনে আবূ রিবাহ্-জাবির ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) এক যোদ্ধা বাহিনী পাঠিয়েছিলেন। আমি তার মধ্যে একজন ছিলাম। এক স্থানে অন্ধকার আমাদেরকে গ্রাস করল। তাই তখন কিবলা ঠিক পেলাম না। তখন কতিপয় উত্তর দিক দেখিয়ে বললে—এ দিকেই কিবলা। তখন সকলে সেই দিকে মুখ করে নামায আদায় করলেন এবং কয়েকটি রেখা আঁকলেন। অপর কিছু লোক দক্ষিণ দিক দেখিয়ে বললে—কিবলা এই দিকে এবং সেদিকেও কয়েকটি রেখা এঁকে রাখলেন। পরে সকাল হলে ও সূর্যোদয় হলে দেখা গেল অংকিত রেখাগুলো কিবলার বিপরীত দিকে রয়েছে। সফর থেকে ফিরে আসার পর রাসূলে করীম (স)-কে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। রাসূলে করীম (স) নিশ্চুপ থাকলেন। পরে উক্ত আয়াত নাযিল হল ঃ 'তোমরা যে দিকেই মুখ করবে, সেটাই আল্লাহ্‌র দিক।

আবূ বকর বলেছেন, এ সব হাদীসের পেছনে আয়াতটি নাযিল হওয়ার উপলক্ষ রয়েছে এবং তার কারণ ছিল সেই সব লোকের কিবলার দিক ছাড়া অন্য দিকে নামায পড়া।

অপর এক হাদীসে ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে—নবী করীম (স) তাঁর সওয়ারীর উপর বসে নামায পড়ছিলেন। তিনি মক্কা থেকে মদীনার দিকে মুখ করে নামায পড়ছিলেন। এই প্রসঙ্গেই নাযিল হয়েছে ঃ 'তোমরা যে দিকেই মুখ করবে, সেটাই আল্লাহ্‌র দিক।' এ আয়াত পর্যায়ে কাতাদাহ্ থেকে মা'মর বর্ণনা করেছেন ঃ এটা ছিল প্রথম কিবলার সময়ের ব্যাপার। পরে তা বাতিল হয়ে যায় এবং মসজিদুল হারাম কিবলা নির্দিষ্ট হয়। বলা হয়েছে, কাবার দিককে কিবলা বানানোর বিরুদ্ধে ইয়াহূদীরা প্রচণ্ড বিরোধিতা করে। কেননা নবী করীম (স) প্রাথমিক পর্যায়ে বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াত নাযিল করেন। কেউ কেউ বলেন, নবী করীম (স)-এর জন্যে ইখতিয়ার ছিল, তিনি যে কোন দিকে মুখ করে নামায পড়তে পারতেন। বায়তুল মাকদিসের দিকে ফিরে নামায পড়াটা তাঁর ইখতিয়ারের ব্যাপার ছিল। তা তাঁর জন্যে ফরয ছিল না। শেষ পর্যন্ত কাবাকে কিবলা বানানোর আদেশ দেয়া হল এবং আল্লাহ্‌র কথা ঃ যে দিকেই ফিরবে, তা-ই আল্লাহ্‌র দিক কথাটি সেই সময়ের অবস্থার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছিল। তা ছিল কাবাকে কিবলা বানানোর আদেশ দানের পূর্বের ব্যাপার।

আবূ বকর বলেছেন, সফরে কিবলা নিশ্চিতকরণের চেষ্টা করে যে-লোক নামায পড়ল, পরে প্রমাণিত হল যে, কিবলা ভুল হয়েছে, তার নামায সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন মত রয়েছে। আমাদের ফিকাহ্‌বিদগণ সকলে এবং সওরী বলেছেন, জিজ্ঞাসা করে কিবলা নির্ধারণ না করলে এবং তার কারণে ভুল কিবলার দিকে নামায পড়া হলে তার নামায সহীহ্ হবে না। জিজ্ঞাসা করার লোক পাওয়া না গেলে নিজেই চিন্তা-বিবেচনা চেষ্টা করে

ভুল কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়লে তার নামায হয়ে যাবে। তা কিবলাকে পেছনে রেখে নামায পড়া হোক কিংবা সে দিকেই মুখ করে পড়া হোক। এই মত মুজাহিদ, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, ইবরাহীম, আতা শবী থেকেও পাওয়া গেছে। হাসান জুহরী, রবী আতা ও ইবনে আবূ সালমা বলেছেন, পরে সঠিক কিবলার সন্ধান পেলে নামায আবার পড়ে নেবে যদি সময় থাকে। আর সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়ে থাকলে পুনরায় পড়তে হবে না। ইমাম মালিকের এই মত। ইবনে অহব তাঁর থেকে এই মত বর্ণনা করেছেন। আবূ মুসয়িব তাঁর থেকেই এই মত বর্ণনা করেছেন যে, কিবলাকে পেছনে রেখে নামায পড়ে থাকলেও সময় অতিবাহিত না হয়ে গিয়ে থাকলে পুনরায় নামায পড়ে নেবে। যদি কিবলার দিকে থেকে সামান্য বামে বা ডানে ফিরে নামায পড়ে থাকে, তাহলে পুনরায় নামায পড়ার কোন প্রয়োজন নেই।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যে লোক চেষ্টা করেও পূর্ব দিকে ফিরে নামায পড়েছে, পরে দেখা গেল, কিবলা রয়েছে পশ্চিম দিকে, তাহলে নামায আবার শুরু করবে। যদি পূর্ব দিকে হয়ে থাকে, পরে দেখল যে, তা বাঁকা তাহলে তা সেই একই দিক গণ্য হবে। বাঁকা থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াবে যা পড়া হয়ে গেছে, তা সহীহ্ গণ্য হবে।

আবূ বকর বলেছেন, আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দৃষ্টিতে যে কোন দিকে মুখ করে নামায পড়লে তা সহীহ্ হবে। কেননা আল্লাহ্‌র কথা, 'যে দিকেই মুখ করবে তাই আল্লাহ্‌র দিক'-এর অর্থ, সে দিকেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, সে দিকে মুখ করার জন্যেই তুমি আদিষ্ট। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ –

তোমাদেরকে খাবার দিই কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে, তিনি আমাদের নিকট তা-ই পেতে চেয়েছেন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ –

আল্লাহ্‌র 'সত্তা' ছাড়া আর সবই ধ্বংস হয়ে যাবে অর্থাৎ যা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে, তাঁর ইচ্ছানুক্রমে, তা ধ্বংস হবে না।

আমর ইবন রবী'আতা ও জাবির-এর বর্ণিত হাদীস থেকে জানা গেছে যে, আয়াতটি এই প্রসঙ্গেই নাযিল হয়েছে।

যদি বলা হয় ঃ এ কথাও তো বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াতটি জন্তুযানের উপর নফল পড়ার প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে এবং কিবলার বর্ণনা দেয়ার জন্যেই তা নাযিল হয়েছে।

তাহলে জবাবে বলা যাবে এসব অবস্থা একই সময়ে ও এক সাথে বিরাজমান থাকা তো অসম্ভব বা নিষিদ্ধ কিছু নয় এবং নবী (স)-কে এই প্রত্যেকটি অবস্থায়ই জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। তার পরেই আল্লাহ্ আয়াতটি নাযিল করেছেন এবং এর দ্বারা সব প্রশ্নের জবাব দিতে চেয়েছেন। লক্ষণীয়, প্রত্যেক অবস্থার উল্লেখ করেই যদি কথা বলা হতো,

বলা হতো তোমরা যদি কিবলার দিক সম্পর্কে নিশ্চিত অবহিত হও এবং সেদিকে মুখ করে নামায পড়তে সমর্থ হও, তাহলে জানবে, সে দিকেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, সেদিকে ফিরেই নামায পড়। আর তোমরা যদি কিবলার দিকে ফিরতে ভীত হও কিংবা থাক সফরে, তাহলে যে কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়া তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে, সে দিকেই রয়েছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। আর তোমরা যদি দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড় বা দিক সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়, তা হলে যে দিকে ফিরে নামায পড়বে, সেদিকই আল্লাহ্‌র দিক। এই সব অর্থ একসাথে গ্রহণ করতে যখন নিষেধ কিছুই নেই, তাহলে আয়াতটির তাৎপর্য সেভাবেই গ্রহণ করা কর্তব্য। তাহলে এই সবই আল্লাহ্‌রই ইচ্ছানুরূপ হবে, যেমন বলছি।

জারি ও আমর ইবনে রবী'আতা বর্ণিত হাদীসের বক্তব্য হল আয়াতটি নাযিল হয়েছে মুজতাহিদ (চেষ্টাকারী) সম্পর্কে যদি সে ইজতিহাদে অর্থাৎ কিবলা নির্ধারণে চেষ্টা কারেও ভুল করে বসে। এ প্রসঙ্গে এ-ও বলেছেন যে, নামাযটা কিবলা পেছনের দিকে রেখে হোক, ডান দিকে রেখে হোক বা বাম দিকে রেখে, তাতে কোন পার্থক্য হবে না। কেননা সে লোকদের কেউ উত্তর দিকে কেউ দক্ষিণ দিকে মুখ করে নামায পড়েছে। এ দিক দুটি পরস্পর বিপরীত। তা যে জায়েয, সে বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি আবূ সাঈদ (বনু হাশিমের মুক্ত দাস) আবদুল্লাহ্ ইবংন জাফর উসমান ইবনে মুহাম্মাদ সাঈদুল মুকবেরী সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ -

পূর্ব ও পশ্চিম দিকের মধ্যে কিবলা।

এ থেকে বোঝা যায় যে, সব দিকই কিবলারূপে প্রমাণিত। কেননা এ কথা ঠিক এই কথার মত-ই সমস্ত দিগন্ত।

লক্ষ্য করনি, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ 'পূর্ব ও পশ্চিমের রব্ব'। এ কথা বলে সমগ্র জগত—সমস্ত দুনিয়া বোঝানো হয়েছে। লোকদেরকে যখন সমগ্র দুনিয়া বোঝাতে চাওয়া হবে, তখন পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের উল্লেখ করা হয়। এই শব্দ সমগ্র জগতকেই শামিল করে। উপরন্তু যেমন বলেছি, আগের কালের মনীষিগণ বলেছেন, এ ব্যাপারটি প্রকাশমান ও গ্রহণযোগ্য হওয়া সম্মিলিতভাবে, কারো থেকে কোন ভিন্নমত প্রকাশিত হওয়া উচিত নয়। এ থেকে একথাও বোঝায় যে, যে লোক মক্কায় অনুপস্থিত, তার বাইরে অবস্থিত, তাকে কাবার দিকে নামায পড়তে হলে অবশ্যই ইজতিহাদ অর্থাৎ দিক জানতে চেষ্টা করতে হবে। কেননা কাবার বিপরীত দিকে বসে যে লোক নামায পড়ছে সে যে ঠিক কাবার দিকে মুখ করতে পেরেছে, তা থেকে ভিন্ন দিকে নয়, তা নিশ্চয় করে বলতে পারে না। তাহলে সকলের নামাযই সহীহ—বৈধ। কেননা এছাড়া অন্য কিছু করা সম্ভব নয়, করতে বলাও হয়নি।

অনুরূপভাবে সফরে গিয়ে যে লোক কিবলা নির্ধারণের চেষ্টা করে ফরয নামায আদায় করল, তার নামাযও হবে। কেননা এছাড়া তার আর কোন দায়িত্ব নেই। এরূপ অবস্থায় পুনরায় নামায আদায় করা কর্তব্য যাঁরা বলেন, তারা আর একটা ফরয চাপিয়ে দেন

মাত্র। কিন্তু ফরয ছাড়া অপর একটি ফরয বিনা দলীলে চাপিয়ে দেয়া অসঙ্গত। যে কাপড় পরে নামায পড়া হল, পরে জানা গেল, সে কাপড় নাপাক, অথবা যে পানি দ্বারা 'তাহারাত' অর্জন করা হল, পরে জানা গেল, সে পানি পাক ছিল না—এ উভয় অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উভয় অবস্থায়ই ফরয আদায় হয়ে গেছে; কিন্তু দলীলের ভিত্তিতে উভয় অবস্থায়ই পুনরায় নামায পড়া ফরয হবে। কিন্তু কিবলার দিক নির্ধারণের চেষ্টা করার পর নামায আদায় করা সত্ত্বেও পুনরায় নামায পড়া ফরয করা বিনা দলীলে হবে। কেননা নামায তো যে-কোন দিকে ফিরে পড়লেই আদায় হয়ে যাবে। বিশেষ করে সওয়ারীর উপর নফল নামায। এ নামায জরুরী নয়। কেননা তা তার উপর ফরয নয়। অ-জরুরী নামায যখন অ-কিবলার দিকে জায়েয, তখন অ-কিবলার দিকে ফরয নামায—যা পড়তে বাধ্য—পড়া হলে যখন জানা যাবে যে, কিবলা ভুল ছিল, তখনও তা আবার পড়ার কোন দায়িত্ব নেই। আর প্রয়োজন ছাড়া নাপাক কাপড়ে নামায এবং নাপাক পানি দিয়ে 'তাহারাত' অর্জন—এরূপ অবস্থায় পুনরায় পড়া কর্তব্য।

অন্যদিক দিয়ে বিবেচনা করলে সঠিক কিবলা নির্ধারণের চেষ্টাকারী তার মত যে তায়াম্মুম করে নামায পড়েছে পানি না পাওয়ার কারণে। পানি পাওয়ার পর সে নামায আবার পড়া ফরয নয়।

কেননা নামাযে যে দিকে মুখ করেছে, সেদিকটিই তার জন্যে আসল কিবলার স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে। যেমন তায়াম্মুম অযুর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। কিন্তু নাপাক কাপড়ে নামায পড়ায় ও নাপাক পানি দিয়ে তাহারাত করার স্থলাভিষিক্ত কিছুই পাওয়া যায় না। তখন তার অবস্থা তায়াম্মুম বা অযূ ছাড়াই নামায পড়ার মত। এ থেকে আর একটি মৌল বিষয় জানা যায়। যার ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয়ে আলো পাওয়া যায়। তা হল—ভয় পাওয়া ব্যক্তির নামায পড়া অ-কিবলার দিকে ফিরে। দুটি দিক দিয়ে এতে ভিত্তি পাওয়া যায়। একটি—সেই দিকটি যে দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়া হয়েছে, সেই দিকটি ছাড়া বর্তমান অবস্থায় অন্য কোন দিকই তার নেই। দ্বিতীয় সে দিকটি আসল কিবলার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। অতএব তাকে পুনরায় নামায পড়তে হবে না, যেমন 'তায়াম্মুম' করে যে লোক নামায পড়ল, পরে পানি পেলেও অযূ করে পুনরায় পড়তে হবে না। এ থেকে একথাও বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র কথা ঃ فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ সেদিকেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, এর তাৎপর্য হচ্ছে, অ-কিবলার দিকে নামায পড়া। কেননা জানা-ই আছে, কাবার পরিধি কাবা থেকে দূরে অবস্থিত লোকদের জন্যে পরিব্যাপক নয়। প্রত্যেকটি মানুষ-ই সোজা-সঠিক কাবামুখী হয়ে নামায পড়তে পারে না। কাবা থেকে দূরে অবস্থিত লোকদের পরিধি ব্যাপ্তি কাবার পরিধি-ব্যাপ্তির তুলানায় কয়েক গুণ বেশী। সে ব্যাপ্তির মধ্যে যে সব লোক নামায পড়ে, তারা সকলেই ঠিক ঠিক ভাবে কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়তে পারে না। অথচ সেই সব লোকেরই নামায বৈধ ও সঙ্গত। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, এই সব লোকের দায়িত্ব ছিল সেই দিকে মুখ করে দাঁড়ানো, যে দিকটি তাদের বিবেচনায় কাবামুখী। ঠিক কাবার অপর দিকের মুখী হতে পারার কোন দায়িত্ব তাদের ছিল না।

এ থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, ওযরের সময় প্রত্যেকটি দিকই কাবার দিকের স্থলাভিষিক্ত।

যদি বলা হয়, উল্লিখিত সমস্ত লোকের নামাযই সঙ্গত ও বৈধ। কেননা তাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই কাবামুখী হতে পারে, যারা কাবা থেকে দূরে তাদের ছাড়া। কাবার দিক ছাড়া অন্য দিকে মুখ করেছে, পরবর্তীতে তা প্রকাশিত-ও হয়নি। তার নামায সহীহ্ হয়ে গেছে এই কারণে। কিন্তু এ ব্যাপারটি আমাদের আলোচ্য বিষয়ের দৃষ্টান্ত নয়। কেননা আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সেই চেষ্টাকারী, যে প্রকৃত কিবলার দিক জানার জন্যে চেষ্টা করেছে; কিন্তু নামাযের পর স্পষ্ট হয়েছে যে, যেদিকে মুখ করে সে নামায পড়েছে সেদিকে কিবলা নয়।

এর জবাবে বলা যাবে, দুটির মধ্যে পার্থক্যের এটাই যদি আসল ও সমগ্র কারণ হয়ে থাকে, তা হলে তো সকলের নামায সঙ্গত না হওয়াই আবশ্যক। কেননা সোজা কাবামুখিতার পরিমাণ যদি হয় বিশ গজ, অতঃপর আমরা দেখলাম পূর্ব ও পশ্চিমের লোকদের নামায হয়ে গেল একথা জানা সত্ত্বেও যে, যারা যথার্থভাবে কাবামুখী হয়ে দাঁড়াতে পেয়েছে, তারা খুবই কম সংখ্যক, সকলের তুলনায় তাদের সংখ্যা অতি স্বল্প। তা সত্ত্বেও ঠিক কাবামুখী হয়েছে এমন লোক তাদের মধ্যে নেই—এ ও সম্ভব। অতঃপর সকলের নামায সম্পন্ন হয়ে গেল। তাতে আম লোকদের অবস্থাকে গুরুত্বপূর্ণ রূপে গণ্য করা হয়নি। যদিও নীতির দিক দিয়ে অধিক ও 'আম' লোকদের সাথে-ই শরীয়াতী হুকুমের সম্পর্ক। কেননা ইসলামী রাজ্যে (দারুল ইসলাম) ও শত্রু রাজ্যের (দারুল হরব) প্রত্যেক ব্যক্তি সংক্রান্ত হুকুম অধিক সংখ্যক ও 'আম' লোকদের সাথে সংশ্লিষ্ট, স্বল্প সংখ্যক 'খাস' লোকদের সাথে নয়। এ কারণে দারুল-ইসলামের লোকদের হত্যা করা নিষিদ্ধ যদি জানা যায় যে, তাদের মধ্যে মুর্তাদ, নাস্তিক, শত্রু যোদ্ধা ইত্যাদি হত্যাযোগ্য লোক আছে, তা সত্ত্বেও। পক্ষান্তরে 'দারুল হরব'-এর লোকদের হত্যা করা মুবাহ যদি জানাও যায় যে, তাদের মধ্যে মুসলিম ব্যবসায়ী বা বন্দী আছে। শরীয়াতের সব মূলনীতি-ই এই দৃষ্টিকোণেই নির্ধারিত হয়েছে। কাজেই নামায বাতিল হওয়ার ব্যাপারে অধিকাংশ 'আম' লোকের জন্যে কোন হুকুম নেই, একথা জানা সত্ত্বেও যে, তারা যথাযথভাবে কাবামুখী হতে পারেনি। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, প্রত্যেক ব্যক্তি এজন্যে দায়িত্বশীল যে, নামাযের সময় হলে কাবামুখী যে দিকটিই তাদের সম্মুখে প্রতিভাত হবে, সেদিকেই নামায আদায় করবে। তার পক্ষে সঠিক কিবলা জানার জন্যে যতটা চেষ্টা করা সম্ভব ছিল তা সে করেছে। এদের কারোর-ই আবার নামায পড়তে হবে না।

যদি বলা হয়, কারোর নিকট জিজ্ঞাসা করে কিবলা নির্ধারণ সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও নিজের চেষ্টায় যে লোক যে-কোন একটি দিকে ফিরে নামায পড়েছে, পরে বিপরীত দিকে কিবলা প্রমাণিত হলে তার জন্যে নামায আবার পড়া কর্তব্য বলে তুমি রায় দিয়েছ?

জবাবে বলা হবে, জিজ্ঞাসা করে সঠিক কিবলা জানতে পারা গেলে তখন নিজস্বভাবে সেজন্যে চেষ্টা করার কোন প্রশ্ন থাকে না। যেখানে জিজ্ঞাসা করে জানার উপায় নেই,

কেবল সেখানেই নিজস্বভাবে চেষ্টা করা ছাড়া উপায় থাকে না বলে সে অবস্থার নামাযকে আমরা বৈধ ও সঙ্গত বলেছি। কিন্তু যেখানে জিজ্ঞাসা করে জানার উপায় আছে সেখানে নিজস্ব চেষ্টায় কিবলা ঠিক করে নামায পড়ার কোন দায়িত্ব তার উপর চাপানো হয়নি। তখন জিজ্ঞাসা করে নেয়ারই দায়িত্ব তার উপর বর্তায়। যা বলেছি তা থেকে এ-ও বোঝা যায় যে, নবী করীম (স)-এর নিকট অনুপস্থিত লোকেরা নিজস্ব চেষ্টায় কিবলা ঠিক করে নেবে, এতো জানাই আছে। সে ফরয তার উপর থেকে মনসূখ হয়ে যাওয়াও জায়েয। প্রমাণিত হয়েছে যে, কুবাবাসীরাও বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামায পড়ছিলেন, এই সময় একজন লোক এসে তাঁদেরকে খবর দিলেন যে, কিবলা পরিবর্তিত হয়েছে এবং এক্ষণে কাবাই কিবলা হয়েছে। তখন তাঁরা নামাযের মধ্যেই কাবার দিকে ঘুরে গেলেন। অথচ পূর্বে তাঁরা কাবাকে পেছনের দিকে রেখেই নামায পড়ছিলেন। কেননা মদীনায়ও যে লোক বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করবে কাবা পড়বে তার পেছনের দিকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদেরকে পুনরায় শুরু থেকে নামায পড়তে বলা হয়নি। অথচ তারা নামাযের কতকাংশ বায়তুল মাকদিসের দিকে ফিরে পড়েছেন, আর তা তখন মনসূখ হয়ে গেছে। এ-ও সত্য যে, তারা নামায শুরু করেছেন যখন, তখন সে কিবলা মনসূখ হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও তাদের গোটা নামায সহীহ্ হয়েছে। কেননা পূর্বের কিবলা মনসূখ হওয়ার কথা নবী করীম (স)-এর প্রতি নাযিল হয়েছে মদীনায়। সংবাদদাতা 'কুবা' গেছেন মনসূখ হওয়ার পর। এই দুই জনপদের মাঝে দূরত্ব কয়েক ফার্লং মাত্র। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারা নামায শুরু করেছেন আগের কিবলা মনসূখ হয়ে যাওয়ার পর। মদীনা থেকে 'কুবা'য় যাওয়ার পথ অতিক্রমে যে সময় লাগে ততক্ষণ পর্যন্ত নামাযে অবস্থান করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। পূর্বের কিবলা মনসূখ হওয়ার পূর্বে যদি তারা শুরু করে থাকতেন, তা হলেও তাদের পক্ষে একটা দলীল হতো। ফলে তাঁরা নামাযের কতক অংশ বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে পড়েছেন সে কিবলা মনসূখ হয়ে যাওয়ার পর। এতদ্সত্ত্বেও তাঁদের পূর্ণ নামাযই সহীহ্ হয়েছে।

যদি বলা হয়, তাঁদের নামায জায়েয হয়েছে এজন্যে যে, তাঁরা নামায শুরু করেছেন সে কিবলা মনসূখ হয়ে যাওয়ার পূর্বে। আর তখন তা-ই তাঁদের জন্যে ফরয ছিল। এছাড়া অন্য কিছু করা তাদের জন্যে ফরয ছিল না।

এর জবাবে বলা যাবে, যে লোক চেষ্টা করে কিবলা ঠিক করে নামায পড়েছে তার অবস্থাও অনুরূপ। সেটাই তার জন্যে ফরয ছিল। এছাড়া অন্য কিছু করা তার জন্যে ফরয ছিল না।

যদি বলা হয়, যখন জানা যাবে যে, সে কাবার দিকে ফিরে নামায পড়েনি, তা হলে তার চেষ্টা করে কিবলা ঠিক করাটা একটা দুর্ঘটনা মনে করতে হবে। পরে সে দলীল পেয়েছে। তাই তখন তার চেষ্টা বাতিল গণ্য হবে এই দলীলের কারণে।

জবাবে বলা যাবে, ব্যাপারটা তা নয়, যা মনে করা হচ্ছে। কেননা কাবার দিকে মুখ করার দলীল তো তখন, যখন তা দেখা যাবে কিংবা সে বিষয়ে জানা যাবে। আর

নামাযের জন্যে কোন একটি দিক নির্দিষ্ট নয় যে, সব নামাযী কেবল সেদিকে ফিরেই নামায পড়বে। সমস্ত দিক-ই নামাযীর নামায পড়ার দিক। অবস্থার ও অবস্থানের পার্থক্যের ভিত্তিতে এক-একটা দিক ব্যবহৃত হয়। যে লোক কাবা দেখছে বা সেদিকটি জানতে পারছে কাবা থেকে দূরে থাকা অবস্থায়, তার জন্যে ফরয হচ্ছে সেই দিকে ফেরা, যেদিকে ফেরা তার পক্ষে সম্ভব। কাবা তার জন্যে ফরয দিক নয়। দিক অনির্দিষ্ট হয়ে গেলে চিন্তা ও চেষ্টা করে একটা দিক ঠিক করে নামায পড়াই তার জন্যে ফরয। কাজেই তোমার কথা সে চেষ্টা-ভাবনা করে দলীলের দিকে এসেছে ঠিক নয়, ভুল কথা। কেননা সে যখন চেষ্টা করে দিক ঠিক করছিল, তখন ঠিক কাবার দিকটি তার জন্যে ফরয ছিল না। দলীল তো সেখানে কাজে আসে যেখানে সেদিকে মুখ করে নামায পড়া সম্ভব বা সে দিকটি জানা যাবে। কাবা থেকে দূরবর্তী ব্যক্তির জন্যে চেষ্টাই একমাত্র উপায়। কাবার দিক জানুক আর না জানুক। যদি তা সেই দলীলের স্থলাভিষিক্ত গণ্য হয়, তা হলে চেষ্টা-ভাবনার কোন অবকাশ থাকতো না। কেননা জানা আছে যে, হুকুমের পেছনে আল্লাহ্র একটি نَصٌ অকাট্য দলীল আছে। কিন্তু দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে কোন হুকুমের পেছনে আল্লাহ্র কোন দলীল নেই, একথা জানা-ই আছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَقَالُوْا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ - بَلْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -

আর ওরা বলেছে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। না, তিনি তো মহান-পবিত্র। বরং সমগ্র আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছুই আছে সব-ই তো একমাত্র তাঁরই।

আবূ বকর বলেছেন, এ আয়াতে প্রমাণ করছে যে, সন্তানের উপর মানুষের (তার পিতার) মালিকানা অবশিষ্ট নেই। কেননা উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্র নিরংকুশ মালিকানার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ আসমান জমিনের সব কিছু আল্লাহ্র মালিকানা, তাঁর সন্তান কেউ নয়। এই কথাই ঘোষিত হয়েছে এ আয়াতে ঃ

وَمَا يَنْبَغِىْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا - اِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّاۤ اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا - (مريم:٩٢ - ٩٣)

রহমান আল্লাহ্র পক্ষে সন্তান গ্রহণ শোভন হতে পারে না। বরং আসমান-জমিনের যা কিছুই আছে, তা সবই রহমান-আল্লাহ্র বান্দা হয়ে আছে।

অতএব কারোর সন্তান যদি তার ক্রীতদাস হয়ে পড়ে তাহলে তখনই মুক্ত হয়ে যাবে পিতার মালিকত্ব থেকে। নবী করীম (স)-এর সময়ে ঘটনাক্রমে পিতা সন্তান দাসের মালিক হয়ে পড়েছিল। নবী করীম (স) তৎক্ষণাৎ তাকে মুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন ঃ

لَايَجْزِئ وَلَدٌ وَالِدَهُ اِلَّا اَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوْكًا فَيَشْتَرِيْهِ فَيُعْتِقَهُ –

সন্তান তার পিতার বিনিময় হবে না। তবে পিতা যদি তাকে মালিকানাধীন পায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ক্রয় করবে এবং মুক্ত করে দেবে।

এ দৃষ্টিতে আয়াতটি থেকে প্রমাণিত হচ্ছে—পিতা সন্তানের মালিক হয়ে পড়লে সে সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত হয়ে যাবে। হাদীসটি থেকেও প্রমাণিত হয় পিতা সন্তানের মালিক হলে পিতা তাকে মুক্ত করবে।

কোন কোন মূর্খ ব্যক্তি বলেছে, সন্তান যদি পিতার মালিক হয়ে বসে তাহলে তাকে মুক্ত করে দেয়া সন্তানের কর্তব্য নয়। আপনা-আপনিও মুক্ত হয়ে যাবে না। কেননা হাদীসে বলা হয়েছে ঃ তাকে ক্রয় করবে। অতঃপর তাকে মুক্ত করবে। এ কথা মালিক হওয়ার পর তাকে নতুন করে মুক্ত করবে। এই ব্যক্তি ভাষা ও প্রচলন সবই ভুলে গেছে। কেননা যুক্তিসঙ্গত কথা হচ্ছে, ক্রয় করতেই সে মুক্ত হয়ে যাবে। তাকে ক্রয় করাই মুক্ত করার উদ্দেশ্যে। নবী করীম (স)-এর কথাও অনুরূপ। বলেছেন ঃ

اَلنَّاسُ غَادِيَانِ فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوْبِقُهَا، وَمُشْتَرٍ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا –

মানুষ দুটি চুক্তিতে আবদ্ধ। সে নিজের বিক্রেতা। ফলে সে নিজেকে ধ্বংস করে এবং সে নিজের ক্রেতা। ফলে তাকে মুক্ত করে।

এর অর্থ, ক্রয়ের দ্বারাই সে তার মুক্তিদাতা। ক্রয়ের পরে নতুন করে মুক্তি দানের অপেক্ষা নেই।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاِذَا بْتَلٰى اِبْرَاهِيْمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ –

ইবরাহীমকে তার রব্ব যখন কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন করে দিলেন, তখন তিনি সে কয়টি বিষয় পূর্ণ পরিণত করে দিল।

এই আয়াতের তাফসীরে মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, কয়েকটি আনুষ্ঠানিক ইবাদত-কুরবানী ইত্যাদি দিয়ে ইবরাহীম (আ)-কে পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। হাসান বলেছেন, তাঁর নিজের পুত্রকে হত্যা করার আদেশ তাঁকে পরীক্ষায় ফেলেছিল। তাঁকে তারকা-চন্দ্র-সূর্য দ্বারা পরীক্ষা করেছেন। তায়ূস ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ মাথায় পাঁচটি ও দেহে পাঁচটি পবিত্রতার নির্দেশ দিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করেছেন। মাথার পাঁচটি পবিত্রতা হচ্ছে ঃ গোঁফ কাটা, কুলি করা, নাক পরিষ্কার করা, মিসওয়াক করা ও মাথায় সিঁথি কাটা। আর দেহে পাঁচটি পবিত্রতা হচ্ছে—নখাগ্র কাটা, নাবীর নিচের পশম কাটা, খাতনা করানো, বগলের পশম উপড়ানো, পায়খানার অবশিষ্ট ধৌতকরণ—(শৌচ কর্ম করা) প্রস্রাবের পর পানি দ্বারা ধোয়া।

নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ عَشْرٌ مِنَ لْفِطْرَةِ দশটি কাজ

স্বভাবসম্মত।[১] তারপর তিনি উক্ত কার্যাবলীর উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি মাথায় সিঁথি কাটার স্থলে দাড়ি ছেড়ে দেয়া (না কাটা)-র কথা বলেছেন। তাতে আয়াতটির ব্যাখ্যা হিসেবে কিন্তু এই কথা বলা হয়নি। আম্মার, আয়েশা ও আবূ হুরায়রা (রা) উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে সে বর্ণনায় কার্যাবলীর উল্লেখে বেশি কমের পার্থক্য রয়েছে। তার সনদসমূহের উল্লেখ করছি না, তাতে ব্যবহৃত শব্দগুলোর তাৎপর্যও বলছি না আলোচনার দীর্ঘতা এড়াবার জন্যে। বিশেষত এ বিষয়গুলো তো প্রখ্যাত। লোকেরা মুখের কথা দ্বারা যেমন এর প্রচার করেছে, তেমনি নিজের আমল দ্বারাও। এগুলো রাসূলে করীম (স)-এর সুন্নাত হিসেবেও পরিচিত।

উদ্ধৃত আয়াতটির ব্যাখ্যায় আমরা আগের মনীষীদের বিভিন্ন উক্তির উল্লেখ করেছি। সার কথা হচ্ছে, আল্লাহ্ তার বান্দা ও বন্ধু ইবরাহীম (আ)-কে এক সাথে এই সব দিক দিয়েই পরীক্ষার সম্মুখীন করে থাকতে পারেন, তা অসম্ভব কিছু নয় এবং আয়াতের অর্থে এই সবগুলো শামিল থাকাও বিচিত্র নয়। তবে এতে সন্দেহ নেই যে, ইবরাহীম (আ) এই সব গুলো পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রত্যেকটাকেই তিনি পূর্ণ করেছেন। আল্লাহ্ যেমন করে আদেশ করেছেন, তিনি প্রতিটি কাজ তেমনিভাবেই পালন ও পূরণ করেছেন, কোন দিক দিয়ে এক বিন্দু কম করেন নি, ত্রুটি রাখেন নি।

কেননা সম্পূর্ণ করার বিপরীত কথা হচ্ছে অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ করা। কিন্তু আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন ঃ فَاَتَمَّهُنَّ সে সেই সবগুলোই সম্পূর্ণ করেছে।

নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা এসেছে যে, দশটি কাজ মাথা ও দেহে প্রকৃতসম্মত। এ ব্যাপারে, হতে পারে তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-কে অনুসরণ করেছেন। কেননা আল্লাহ্-ই নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا – (النحل : ١٢٣)

অতঃপর হে নবী! তোমার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি এই বলে যে, তুমি একমুখী হয়ে ইবরাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করে চল।

আরও নির্দেশ ঃ

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰهُمُ اقْتَدِهْ – (الانعام : ٩٠)

উপরোক্ত লোকেরাই এমন যাদেরকে আল্লাহ্ হেদায়েত দিয়েছেন। অতএব হে নবী! আপনি তাঁর পদাংক অনুসরণ করুন।

উপরোক্ত কার্যাবলী ইবরাহীমী ও হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সুন্নাত রূপে প্রমাণিত ও প্রচাতি হয়েছে। এই কাজগুলো পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা ও মলিনতা-আবর্জনা দূরীভূত করার উদ্দেশ্যে চালু হয়েছে। এর ফলে শরীর ও পরিচ্ছদ থেকে ময়লা দূর হয়। আর এই

---

১. من الفطرة অর্থ, নবীগণের সুন্নাত। এ কয়টি কাজ করে তাঁদের অনুসরণ করার জন্যে আমরা আদিষ্ট। 'নিহায়া' গ্রন্থেও এরূপ বলা হয়েছে।

লক্ষ্যেই তা বিধিবদ্ধ হয়েছে। যেমন ইহ্রামে চুল-নখ দূর করার বিধান করেছেন, তাই হালাল হওয়ার জন্যে তা কাটার ব্যবস্থা করেছেন। বলেছেন ঃ

ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ – (الحج : ٢٩)

অতঃপর যেন তারা শেষ করে তাদের নখ ইত্যাদি ময়লা-আবর্জনা।

হাদীসেও এই কথা বলা হয়েছে। জুম'আর দিনের গোসল পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اَنْ يَّسْتَاكَ وَاَنْ يَّمَسَّ مِنْ طِيْبِ اَهْلِهِ –

যেন মিস্ওয়াক করে এবং ঘরে রাখা সুগন্ধি স্পর্শ করে।

এই কাজগুলো খুবই ভালো ও পছন্দনীয় সহজ বিবেক-বুদ্ধির দৃষ্টিতেও। স্বভাব ও নৈতিকতার দিক দিয়েই অতীব উত্তম বলে বিবেচিত। রাসূলে করীম (স) কর্তৃকও এগুলো নির্ধারিত।

আবদুল বাকী মুহাম্মাদ ইবনে উমর ইবনে হায়্যান আত্তামার-আবুল-ওয়ালীদ আবদুর রহমান ইবনুল মুবারক-কুরায়শ ইবনে হায়্যান আল-আজলী সুলায়মান ফররুখ আবূ ওয়াসিল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, আমি আবূ আইউবের নিকট উপস্থিত হয়ে সালাম ও 'মুসাফিহা' (করমর্দন) করলাম। তিনি আমার নখগুলো বড় বড় ও বাড়তি দেখলেন। তখন বললেন ঃ এক ব্যক্তি নবী করীম (স)-এর নিকট এলো। সে তাঁকে আসমান জগতের খবরাদি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল। তখন নবী করীম বললেন ঃ

يَجِئُ اَحَدُكُمْ يَسْئَلُ عَنْ خَبَرِ السَّمَاءِ وَاظْفَارُهُ – كَاَنَّهَا اَظْفَارُ الطَّيْرِ يَجْتَمِعُ فِيْهَا الْخَبَائَةُ وَالتَّفَثُ –

হ্যাঁ, তোমাদের এক-একজন এসে আসমানের খবর জানতে চায়, কিন্তু তার নিজের অবস্থা হচ্ছে, তার নখগুলো যেন পাখীর নখ। তাতে যত মলিনতা ও আবর্জনা জমা হয়ে থাকে।

আবদুল বাকী আহমাদ ইবনে সহল ইবনে আইউব, আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান, আল হায্যা-দাহক ইবনে যায়দ আল-আহ্ওয়াজী, ইসমাঈল ইবনে খালিদ, কায়স ইবনে আবূ হাজিম সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি বলেছেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্, আপনি ভুল করছেন।[১] জবাবে বললেন ঃ আমি কেন ভুল করব না? অথচ তোমাদের এক-একজনের অবস্থা হচ্ছে, তোমাদের নখ ও অঙ্গুলীর মধ্যে রয়েছে পুঞ্জীভূত ময়লা ও আবর্জনা।

১. হাদীসে ব্যবহৃত মূল শব্দ হচ্ছে تهم অর্থ غلط ভুল। অপর বর্ণনার শব্দ হল انك لتوهم। নিশ্চয়ই আপনি ভুল ধারণা করেছেন। رفغ احد كم তোমাদের এক-একজনের ময়লা। رفغ-এর বহুবচন رفاغ। অর্থ, অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গের জোড়া, বগল ইত্যাদি এবং তাতে যে ময়লা আবর্জনা পূঞ্জীভূত হয় তা।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) তাঁর নখ কাটতেন, গোঁফ ছাটতেন জুমআর দিনে জুম'আর জন্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আল-বসরী আবূ দাউদ, উসমান ইবনে আবূ শায়বা, অকী, আওজায়ী, হাস্‌সান, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির সূত্রে বর্ণিত। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) বলেছেন ঃ রাসূলে করীম (স) আমাদের নিকট উপস্থি হলেন। তিনি এক ব্যক্তিকে আলু-থালু-মলিন অবস্থায় দেখতে পেলেন। লোকটির মাথার চুল ছিল আউলানো-ঝাউলানো। তখন তিনি বললেন ঃ

اَمَا كَانَ يَجِدُ هٰذَا مَا يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ –

এ লোকটি তার কাপড়-চোপড় ধোয়ার জন্যে কোন কিছু পায় না না-কি ?

আবদুল বাকী হুসায়ন ইবনে ইসহাক, মুহাম্মাদ ইবনে আকাবা আস্‌সকুমী, আবূ উমাইয়্যাতা ইবনে ইয়ালা, হিশাম ইবনে ওরওয়াতা তার পিতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ

خَمْسُ لَمْ يَكُنِ النَّبِىَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُهُنَّ فِىْ سَفَرٍ وَلَاحَضَرٍ : اَلْمِرْاٰةُ وَالْمِكْحَلَةُ وَالْمَشْطُ وَالْمُدْرِىْ وَالسِّوَاكُ –

নবী করীম (স) সফরে ও বাড়ী পাঁচটি জিনিস কখনই হাতছাড়া করতেন না। তা হল, আয়না, সুর্মাদানী, চিরুনী, মুদারী[১] ও মিসওয়াক। একটি বর্ণনায় এসব জিনিস ব্যবহারের মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হয়েছে চল্লিশ দিন।

আবদুল বাকী হুসায়ন ইবনুল মুসান্না-মুআয মুসলিম ইবনে ইবরাহীম মাদাকাতুদকীক আবূ ইমরান আওজাওকী সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, হযরত আনাস ইবনে মালিক বলেছেন ঃ

وَقَّتَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَلْقِ الْعَانَةِ وَقَصِّ الشَّارِبِ وَنَتْفِ الْاِبْطِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا –

রাসূলে করীম (স) নাভীর নিম্নের পশম কামানো, গোঁফ খাটো করা ও বগলের চুল উপড়ানোর জন্যে চল্লিশ দিনের মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি নিজেই চুলায় আগুন ধরাতেন।

আবদুল বাকী ইদ্‌রীস, আল-হাদ্দাম, আমিম ইবনে আলী, কামিল ইবনুল উলা হুবাইব ইবনে আবূ সাবিত সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেছেন ঃ

كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَطْلَى وَلِىَّ مَغَابِنَهُ بِيَدِهِ –

১. المدرى মুদারী এমনএকটা জিনিস যা লোহা কিংবা কাঠ দিয়ে তৈরী করা হয় চিরুণীর কাটার আকৃতিতে ও তা থেকে লম্বা। তা দিয়ে তিনি মাথা ঘষতেন।

আবদুল বাকী মতীর, ইবরাহীম ইবনুল মুনযির, মাআন ইবনে ঈসা ইবনে আবূ নুজাইহ্ মুজাহিদ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন; হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলছেন ঃ

اَطَّلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلاهُ رَجُلٌ فَسَتَرَ عَوْرَتَهُ بِثَوْبٍ وَطَلَى الرَّجُلُ سَائِرَ جَسَدِه، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُخْرُجْ عَنِّيْ ثُمَّ طَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوْرَتَهُ بِيَدِه -

রাসূলে করীম (স) মর্দন করেছেন। পরে এক ব্যক্তি তাঁকে মর্দন করে। তখন একটি কাপড় দিয়ে তাঁর লজ্জাস্থানকে আবৃত করে নেয়। লোকটি রাসূলে করীম (স)-এর সমগ্র দেহ মর্দন করে। লোকটি কাজ শেষ করলে নবী করীম (স) লোকটিকে বললেন, তুমি এখন যাও। অতঃপর তিনি নিজের লজ্জাস্থান নিজে মর্দন করেন।

হুবাইব ইবনে আবূ সাবিত হযরত আনাস (রা) থেকে একথাটি বর্ণনা করেছে ঃ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لايَتَنَوَّرُ فَاِذَا كَثُرَ شَعْرُهُ حَلَقَهُ

নবী করীম (স) সাধারণত চুল কাটতেন না। চুল বেশী হয়ে গেলে তা কামিয়ে ফেলতেন।

এই হাদীসটির বক্তব্য সম্ভবত এই যে, নবী করীম (স)-এর সাধারণ অভ্যাস ছিল মাতা মুণ্ডন করানো। আর এটাই ছিল তাঁর সাধারণ ও অধিক সময়ের অভ্যাস। এরূপ তাৎপর্যে দুটি হাদীসই সহীহ্ প্রমাণিত হয়। পূর্বোদ্ধৃত হাদীসে যে চল্লিশ দিনের মেয়াদের কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ সম্ভবত এই যে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত বিলম্বিত ও দেরী করা জায়েয। চল্লিশ দিনের পরও বিলম্বিত করা নিন্দনীয়। যে তা করবে সে তিরস্কার পাওয়ার যোগ্য সুন্নাতের বিরোধিতা করার কারণে। বিশেষ করে গোঁফ কাটা ও নখ কাটার ব্যাপারে।

আবূ বকর বলেছেন, আবূ জাফর ত্বহাতী উল্লেখ করেছেন, ইমাম আবূ হানীফা, জুফার, আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদ (স)-এর মাথার চুল ও গোঁফ সম্পর্কে মত হচ্ছে, তা খাটো করার পরিবর্তে কিছুটা লম্বা করা উত্তম। যদিও তাতে কিছু চুল মুণ্ডন করতে হয়।

ইবনুল হায়সাম ইমাম মালিকের এই মত বর্ণনা করেছেন, আমার মতে গোঁফ বাড়ানো চেহারার বিকৃতি সাধন। মালিক (রা) এ-ও বলেছেন, গোঁপ বাড়ানো পর্যায়ে রাসূলে করীম (স)-এর হাদীসের ব্যাখ্যা হচ্ছে, তাকে বড় উচ্চ করে রাখা। তার উপর থেকে কাটা তিনি পছন্দ করতেন না। শুধু বৃদ্ধি করে বিনির্মাণে প্রশস্ততা দিতেন, আশহুব তাঁর এই মত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, যে লোক তার গোঁফ বাড়ায়, তার সম্পর্কে ইমাম মালিকের নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলাম। জবাবে তিনি বলেছেন ঃ

أَرَى أَنْ يُوْجَعَ ضَرْبًا –

আমি মনে করি, তাকে মেরে ব্যথা করে দেয়া উচিত।

এটা নবী করীম (স)-এর হাদীস নয়। গোঁফ বাড়ানো পর্যায়ে তিনি বলেছেন ঃ গোঁফ বাড়ানোর অবস্থা এই ছিল যে, ওষ্ঠের দুই পাশ প্রকাশমান হতো। অতঃপর বললেন, গোঁফ কামানোর যে প্রচলন রয়েছে, তা বিদআত। কোন ব্যাপার যখন হযরত উমর ফারুক (রা)-কে ভাবান্বিত করত, তখন তিনি মুখে 'ফুঁ' দিতেন এবং তাঁর গোঁফ পাকাতেন। ইমাম আওজায়ীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—এক ব্যক্তি তার মাথা কামিয়ে ফেলেছে, এ বিষয়ে আপনার মত কি ? বললেন—বাড়িতে অবস্থানরত (সফরে নয়) থাকা অবস্থায় কেবলমাত্র কুরবানীর দিন-ই করা পছন্দনীয় ও তার প্রচলন আছে। আবাদাতা ইবনে আবূ লুবাবাতা এই কাজে বিরাট শুভফল আছে বলে উল্লেখ করতেন। ফিকাহবিদ লাইস বলেছেন, তোমাদের কেউ তার গোফ কামিয়ে ফেলুক, আমি তা পছন্দ করি না। কেননা তাতে চামড়া প্রকাশমান হয়ে পড়ে। বরং তা আমি ঘৃণা করি। তবে গোঁফের চারধারে যে পশম থাকে তা কেটে খাটো করা উচিত। আর লম্বা গোঁফও আমি অপছন্দ করি।

ইসহাক ইবনে আবূ ইসরাঈল বলেছেন, আমি আবদুল মজীদ ইবনে আবদুল আযীয ইবনে আবূ দাউদকে মাথা মুণ্ডন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, মক্কায় তা করাতে কোন দোষ নেই। কেননা এই শহরটাই হল মাথা মুন্ডনের শহর। তার বাইরে অন্যান্য স্থানে তা করা উচিত নয়।

আবূ জাফর বলেছেন, এ পর্যায়ে ঈমাম শাফেয়ীর কোন দলীলভিত্তিক মত পাইনি। তাঁর সঙ্গী ছাত্র আল-মুজানী ও রুবাইকে আমি দেখেছি,. তাঁরা দুজনই তাদের গোঁফ বড় করে রাখতেন। বোঝাই যায় যে, তাঁরা ইমাম শাফেয়ী থেকেই এই নিয়ম গ্রহণ করেছেন। হযরত আয়েশা ও আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (স)-এর এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ঃ

اَلْفِطْرَةُ عَشَرَةٌ مِنْهَا قَصُّ الشَّارِبِ –

স্বভাবসম্মত কাজ দশটি। তন্মধ্যে রয়েছে গোঁফ কাটা।

মুগীরা ইবনে শুবা বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) তাঁর গোঁফ কেটেছেন মিসওয়াকের  ওপর রেখে। এটা জায়েয ও মুবাহ নিঃসন্দেহে, যদিও তার বিপরীতটাও উত্তম, তখন পরিমাণ মতো কাটার কোন অস্ত্র না থাকার দরুনও সে কাজ করে থাকতে পারেন।

ইক্রামা ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) তাঁর গোঁফ কাটতেন। সম্ভবত একটু বড় করেই কাটতেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর নাফে ইবনে উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَحِفُّوْا الشَّارِبَ وَاَعْفُوْا اللِّحٰى -

তোমরা গোঁফ খাটো কর এবং দাড়ি রেখে দাও।

এ থেকে বোঝা যায়, প্রথমোক্ত হাদীসের অর্থ হচ্ছে গোঁফ খাটোকরণ, যেন চুল সরে যাওয়ায় চামড়া প্রকাশমান হয়। আরবী কথনে বলা হয় رَجُلٌ حَافٌّ খালি পা ব্যক্তি।

حَفِيَتْ رِجْلُهُ - حَفِيَتِ الدَّابَّةُ

পায়ের নিম্নভাগে যখন আঘাত লাগে, তখন এই শব্দ বলা হয়। শব্দটি حفا থেকে এসেছে।

আবূ সাঈদ খুদরী, আবূ উসাইদ, রাফে ইবনে খদীজ, সহল ইবনে সাদ, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা সকলেই তাঁদের গোঁফ খুব ছোট করে রাখতেন। ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে খাত্তাব বলেছেন, আমি ইবনে উমর (রা) কে দেখেছি, তিনি তাঁর গোঁফ কামাচ্ছেন, অর্থাৎ গোঁফের পশমগুলো যেন উপড়াচ্ছেন। বাড়তি কথা এ-ও কেউ বলেছেন যে, তার ফলে তাঁর চামড়ার শ্বেত দেখা যাচ্ছিল।

আবূ বকর বলেছেন, গোঁফ খাটো করা যখন সুন্নাত সকলের মতে, তখন কামিয়ে ফেলা তো অধিক উত্তম কাজ হবে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

رَحِمَ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِيْنَ - ثَلَاثًا -

আল্লাহ্ রহমত করেছেন মুণ্ডনকারীদেয় প্রতি।

এই কথা তিনি তিনবার বলেছেন। এবং যারা গোঁফ কেটে খাটো করে রাখে, তাদের জন্যে তিনি একবারই রহমতের দো'আ করেছেন।

এতে মাথা মুণ্ডন চুল খাটো করার তুলনায় উত্তম প্রমাণিত হয়। ইমাম মালিক দলীলরূপে পেশ করেছেন যে, উমর (রা) তাঁর গোঁফ উচুঁ করে পাকাতে থাকতেন যখন তিনি ক্রুদ্ধ হতেন—এই কথার ব্যাখ্যায় বলা যায়, হয়ত তিনি কোন সময় গোঁফ রেখে দিয়েছেন, যেন তা পাকানো মোড়ানো যায়। পরে কামিয়ে ফেলেছেন। এ রকম তো অনেক লোককেই করতে দেখা যায়।

আল্লাহ্র কথা ঃ

اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا -

আমি তোমাকে জনগণের ইমাম (নেতা) রূপে বানাব।

ইমাম তো বলা হয় তাকে, যাকে সকলে মানে, আনুগত্য ও অনুসরণ করে দ্বীনি ব্যাপারাদিতে নবীর দেখানো পন্থায়। এ দৃষ্টিতে সব নবী-রাসূলই জনগণের ইমাম। কেননা আল্লাহ্ তাদেরকে অনুসরণের জন্যে বাধ্য করেছেন। দ্বীনি ব্যাপারাদিতে তাঁদেরকে মেনে চলতে বলেছেন। খলীফাগণও জনগণের ইমাম কেননা তাঁরা তো এমন মর্যাদায়

অভিষিক্ত যে, জনগণ তাদের আনুগত্য অনুসরণ করতে বাধ্য, তাঁদের আদেশ-নিষেধ, কথা ও বিচার ফায়সালাও তারা অবশ্যই মানবে। ফিকাহবিদগণও ইমাম তা এই দিক দিয়ে যে, যার ইমামতিতে লোকেরা নামায আদায় করে সে নামাযীদের ইমাম। তার পেছনে যে-ই নামাযে দাঁড়াবে, সে তাকে অনুসরণ করেই নামায পড়বে, তাকে ইমাম মেনে নিলেই তখন তার নামায সহীহ্ হবে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ اِمَامًا لِيُؤْتَمَّ بِهٖ فَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا –

ইমামকে ইমাম বানানোই হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে, তাকে অনুসরণ করে নামায পড়া হবে। অতএব ইমাম রুকূতে গেলে তোমরাও রুকূতে যাও, ইমাম সিজদায় গেলে তোমরাও সিজদায় যাও।

বলেছেন ঃ

لَاتَخْتَلِفُوْا عَلٰى اِمَامِكُمْ

তোমরা তোমাদের ইমামের সাথে পার্থক্য করো না।

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, যার অনুসরণ বাধ্যতামূলক, তাকেই 'ইমাম' বলে অভিহিত করা যাবে। দ্বীনি ব্যাপারাদিতে যাকে মানতে হয়, যে কোন বিষয়েই হোক সে-ই তো ইমাম রূপে বরিত। হ্যাঁ, বাতিল ইসলাম বিরোধী কাজে যাকে মেনে চলা হয়, তাকেও ইমাম বলা যায়। তবে তাতে এই দুই ইমাম অভিন্ন ও সমান সমান হয়ে যায় না। বাতিল পথে যাদেরকে মানা হয় কুরআনে তাদেরকেও 'ইমাম' বলা হয়েছে। আয়াতে ঃ

وَجَعَلْنَا هُمْ اَئِمَّةً يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ – (القصص : ٤١)

এবং আমরা তাদেরকে ইমাম বানিয়েছি যারা (লোকদেরকে) জাহান্নামের দিকে ডাকে।

বাতিল পথের নেতৃত্ব দানকারীরাও কুরআনের পরিভাষা অনুযায়ী 'ইমাম' নামে অভিহিত। কেননা তারাও দ্বীনি বা ধর্মীয় ব্যাপারে এমন স্থানে অবস্থিত, যে লোকেরা তাদেরকে মেনে চলে। তাদের অনুসরণ করে। যদিও তাদেরকে ইমাম (নেতা) মেনে তাদের অনুসরণ করা ফরয নয়। তার কোন শুভ ফলও নেই। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَمَآ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِىْ يَدْعُوْنَ –

তাদের যেসব ইলাহ্ তাদেরকে ডাকে, তারা তাদেরকে রক্ষা করতে পারে নি।

বলেছেন ঃ

وَانْظُرْ اِلٰٓى اِلٰهِكَ الَّذِىْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا – (طه : ٥٧)

দেখ, তাকাও তোমার সেই ইলাহ্‌র প্রতি, যার সম্মুখে তুমি একান্ত হয়ে বসে পড়েছ।

অর্থাৎ তোমার বিশ্বাস ও ধারণায় যে তোমার ইলাহ্ তার দিকে নজর দাও। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَخْوَفُ مَا اَخَافُ عَلَى اُمَّتِىْ اَئِمَّةٌ مُضِلِّيْنَ -

আমার উম্মতের উপর যে সব বিপদের আমি ভয় করি, তন্মধ্যে সর্বাধিক ভয় হচ্ছে পথভ্রষ্টকারী নেতাদের ব্যাপারে।

এই সাধারণ কথায় সেই সব নেতাই গণ্য, যাদেরকে আল্লাহ্‌র দ্বীন, সত্য ও হেদায়েতের ব্যাপারে অনুসরণ করা কর্তব্য বলে মনে করা হয়। লক্ষণীয়, আল্লাহ্ হযরত ইবরাহীমকে বলেছেন ঃ

اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا -

আমি তোমাকে লোকদের ইমাম বানাব।

এখানেও 'ইমাম' এর কোন গুণ পরিচিতির শর্তের উল্লেখ হয়নি। কিন্তু পথভ্রষ্টতা ও গুমরাহীর নেতাদের কথা যেখানে বলা হয়েছে সেখানে পরিচিতির শর্তেরও উল্লেখ হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ 'ওরা জাহান্নামের দিকে ডাকে'। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, 'ইমামত' (নেতৃত্ব) শব্দটি সকলকেই শামিল করে। নবীগণ ইমামতের উচ্চতর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। তাঁদের পর খলীফা রাশেদগণ। তাঁদের পর আলিমগণ, শরীয়াত অনুযায়ী বিচারকগণ, আর যারা তাদের মেনে চলার নীতি গ্রহণ করেছেন তাঁরা। এঁদের পরে আসেন নামাযের ইমামগণ। এমনিভাবে আরও অনেক। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-কে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি তাঁকে জনগণের ইমাম বানাবেন। ইবরাহীম (আ) وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ আমার বংশধরদের মধ্যে থেকেও ? পূর্ব কথার পরই এই কথা এসেছে। ফলে কথাটি এই দাঁড়ায় যে, আমার বংশধর-সন্তানদের মধ্য থেকেও বানাও। এ-ও হতে পারে যে, তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকেও 'ইমাম' বানানো হবে কিনা, তা তিনি জানতে চেয়েছেন। জবাবে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

لاَيَنَالُ عَهْدِىْ الظّٰلِمِيْنَ -

জালিমরা আমার প্রতিশ্রুতি পেতে পারে না।

এর দুটি অর্থ হতে পারে। হ্যাঁ, তাঁর বংশধর সন্তানদের মধ্যে থেকেও ইমাম বানাবেন। তিনি যা জানতে চেয়েছেন সেই বিষয়ে তাঁকে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে। অথবা তিনি তাঁর সন্তানদের জন্যে যে ইমামত চেয়েছেন, সে বিষয়ে জবাবস্বরূপ উক্ত কথাটি বলা হয়েছে। কেননা 'আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও' কথাটির অর্থ তা-ই দাঁড়ায়। এ-ও হতে পারে যে, তিনি উভয় দিকে লক্ষ্য রেখেই কথাটি বলেছেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর সন্তানদের নেতা বানাবার জন্যে বলেছেন এবং তাঁর পরবর্তী ইমামত সম্পর্কে তিনি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা জানতে চেয়েছেন। আর উক্ত কথাটি তার এই উভয় প্রার্থনার জবাবস্বরূপ এসেছে। কেননা হযরত ইবরাহীমের জিজ্ঞাসার জবাব যদি না হতো—তাহলে বলা

হতো—না, তোমার বংশে কেউ ইমাম হবে না, অথবা বলা হতো তোমার বংশের কেউ আমার এই প্রতিশ্রুতির আওতার মধ্যে নয়। কিন্তু আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

لَايَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ –

জালিম লোকেরা আমার এই প্রতিশ্রুতি পাবে না।

তাতে প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ্র এই জবাবে বলে দেয়া হয়েছে, তোমার বংশে ইমাম হবে। তবে তোমার বংশধরদের মধ্যে যারা জালিম তারা ইমাম হবে না। তাদেরকে নেতৃত্ব দান ও অনুসরণের কেন্দ্রস্থলে কখনই বসানো হবে না।

সুদ্দী থেকে বর্ণিত এ আয়াতের عهد অর্থ নবুয়ত। মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ বলতে চেয়েছেন যে, জালিম ইমাম হবে না। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। বলেছেন, জালিমকে দেয়া ওয়াদা পূরণের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তাই কোন জুলুমের কাজে শরীক হওয়ার কারো সাথে তোমার চুক্তি হলে তুমি তা ভেঙ্গে দাও। হাসান বলেছেন, এর অর্থ, আল্লাহ্র নিকট জালিমদের জন্যে এই প্রতিশ্রুতি নেই যে, তিনি পরকালে তাদেরকে কল্যাণ দান করবেন।

আবূ বকর বলেছেন, আসলে আয়াতটির এই সব অর্থই একসাথে হতে পারে এবং তা-ই বুঝতে হবে। ব্যবহৃত শব্দ এই সব অর্থই দেয়। আল্লাহ্ হয়ত এই সত্য কথাই বলতে চেয়েছেন ঐ ছোট কথাটির মাধ্যমে। আমার মতে এই কথাই সত্য। অতএব জালিম কখনও নবী হতে পারে না। খলীফা হতে পারে না কোন নবীর। বিচারক হতে পারে না, দ্বীনের ব্যাপারে যার কথা শোনা লোকদের জন্যে বাধ্যতামূলক, জালিম তেমন হতে পারে না। জালিম মুফতি হতে পারে না, সাক্ষী হতে পারে না। নবী করীম (স) থেকে কোন সংবাদদাতা (বা হাদীসের বর্ণনাকারী) হতে পারে না। আয়াতটি বলে দিয়েছে যে, দ্বীনের ব্যাপারে মান্যতার স্থানে আসীন হওয়ার জন্যে ন্যায়বাদী العدلة। ও কল্যাণকামী হওয়া জরুরী শর্ত। উপরন্তু এ আয়াত এ-ও বলছে যে, নামাযের ইমামকে হতে হবে সালিহ্—নেক আমলকারী। ফাসিক লোক নামাযেরও ইমাম হতে পারে না, জালিমরাও নয়। কেননা দ্বীনের ব্যাপারে আনুগত্য পাওয়ার অধিকারের ন্যায়পর হওয়া শর্ত। কেননা আল্লাহ্র عهد হচ্ছে, আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ। জালিমদের নিকট থেকে তা গ্রহণ করার নীতি ইসলামে গ্রহণীয় নয়। দ্বীনের কোন কিছুই তাদের নিকট রক্ষিত নয়। কেবলমাত্র নেক্কার লোকদের কথা কবুল করারই অনুমতি আছে, লোকদেরকে তা করারই আদেশ দেয়া হয়েছে। তাদেরকেই মেনে চলতে, অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।

এই প্রেক্ষিতেই আল্লাহ্র এ কথাটি বিবেচ্য ঃ

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْا الشَّيْطٰنَ – اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ –

হে আদম সন্তানগণ, আমি কি তোমাদের সাথে এই চুক্তি করিনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করবে না, কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন ?

অর্থাৎ শয়তানের ব্যাপারে আগেই তোমাদের জানিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ বলেছেন, যারা বলেছে যে, আল্লাহ আমাদের প্রতি এই ওয়াদা করেছেন। খলীফাগণের অধীন আঞ্চলিক শাসক-কর্মকর্তাদের সাথেও বিচারপতিদের সাথেও এরূপ চুক্তিই থাকে। এরাই হচ্ছে নিম্নস্থ দায়িত্বশীল কর্মকর্তা। এদের প্রতিই খলীফাগণ থেকে অগ্রিম আদেশ আসে, তারা সেই অনুযায়ী লোকদের পরিচালনা করে, তারই ভিত্তিতে লোকদের শাসনকার্য পরিচালনা করে। তা এ জন্যে যে, আল্লাহ্‌র চুক্তি যখনই হয়, তখন তা তাঁর আদেশ-নিষেধ সমন্বিত ব্যাপার হয়। তাতেই নিহিত থাকে আল্লাহ্‌র এই কথা : 'জালিমরা আমার চুক্তি প্রতিশ্রুতি পেতে পারে না'। অর্থাৎ জালিমরা আদিষ্ট নয়, এ কাজে নিয়োজিত বা নিয়োগ প্রাপ্ত নয়। অথবা জালিমরা এমন পদে আসীন হতে পারে না, যার নিকট থেকে আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ গ্রহণ করা যেতে পারে, মানা যেতে পারে তাদের হুকুম। কেননা তাদের প্রতি আস্থা-বিশ্বাস কিছুই নেই। অতএব প্রথম দিকটা বাতিল হয়ে গেল। কেননা মুসলমানগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, আল্লাহ্‌র আদেশ জালিমদের জন্যে বাধ্যতামূলক, যেমন অন্যান্যদের জন্যেও বাধ্যতামূলক। তারা আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ অমান্য করেই তো জুলুমের দিকে চলিত হয়েছে। ফলে দ্বিতীয় দিকটিও প্রমাণিত হয়ে গেল। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে অবিশ্বাস্য, সে ব্যাপারে তারা অনুসরণীয় হওয়ার যোগ্য নয়। আর এ কারণেই তারা দ্বীনের ইমাম হতে পারে না। তাই এই আয়াতের আলোকে ফাসিক লোকদের 'ইমামত' বা নেতৃত্ব বাতিল প্রমাণিত হল। ওরা মুসলমানদের খলীফাও হতে পারে না। যে লোক নিজেকে এই উচ্চতর আসনে আসীন বানাবে, সে ফাসিক, লোকেরা তাকে মানতে ও আনুগত্য করতে বাধ্য নয়। নবী করীম (স)-এর এ কথাটি এই অর্থেই :

لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ -

স্রষ্টা—আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে সৃষ্টির আনুগত্য করা যায় না।

একথাও বোঝা গেল, ফাসিক শাসক হতে পারে না। তার দেয়া আদেশ-ফরমানসমূহ কার্যকর হবে না, হুকুম দানের দায়িত্বশীল সে নয়। এই লোকের সাক্ষ্যও গ্রহণ করা যেতে পারে না। নবী করীম (স)-এর দিক থেকে তার দেয়া খবরও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সে মুফতি হয়ে ফতোয়া দিলে তা মানা যাবে না। নামাযে তাকে ইমামতি করতে দেয়া যেতে পারে না। যদি ফাসিক ব্যক্তিকে নামাযের ইমামতি করতে দেয়া হয় এবং তার ইমামতিতে নামায পড়ে কোন মুক্‌তাদী—তার নামায হবে না, তা আল্লাহ্‌র এই কথার আ◌তার মধ্যে এসে যায় 'জালিমরা আমার অঙ্গীকার পেতে পারে না।' এ সবই উক্ত আয়াতের অর্থ।

কেউ কেউ মনে করে, হানাফী মাযহাব বুঝি ফাসিকের ইমামতি জায়েয মনে করে। ফাসিক ব্যক্তিকে খিলাফতের আসনেও বসানো যায়। এই মাযহাব ইমাম ও শাসকের মধ্যে পার্থক্য করে বলে শাসকের হুকুম দানের অধিকার স্বীকার করে না। কোন কোন মুসলিম দার্শনিক কালামবিদ থেকে এই কথার উল্লেখ এসেছে। এই ব্যক্তির নাম

জরকান। কিন্তু উক্ত কথা মিথ্যা। ভিত্তিহীন কথা বলা হয়েছে হানাফী মাযহাব সম্পর্কে। এ লোকের বর্ণনাও গ্রহণযোগ্য নয়।

মূলত ইমাম আবূ হানীফার মতে বিচারক, বিচারপতি ও খলীফার মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই, এই দিক দিয়ে যে, উভয় ক্ষেত্রেই عدالة ন্যায়পরতা, সততা, বিশ্বস্ততা শর্ত হিসেবে স্বীকৃত। তাই ফাসিক খলীফা হতে পারে না, শাসক হতে পারে না, যেমন তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে না, তার দেয়া খবরও গ্রহণযোগ্য নয়। নবী করীম (স) থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করলেও তা গ্রহণ অযোগ্য। এরূপ ব্যক্তি খলীফা কি রূপে হতে পারে, তার বর্ণনাই অগ্রহণযোগ্য। তার আদেশ-নিষেধ—ফরমান অকার্যকর। কাজেই উক্ত মত ইমাম আবূ হানীফা (রা)-কে বিচারপতির পদ গ্রহণের জন্যে তাঁর উপর জোর প্রয়োগ করা হয়েছে, তাঁকে এজন্যে নির্মম নির্যাতনের শিকার বানানো হয়েছে। কিন্তু তিনি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন, তা থেকে বিরত রয়েছেন। এ জন্যে তাঁকে কয়েদ করা হয়। তখন ইবনে হুবায়রা প্রতিদিন অসংখ্যবার চাবুক মেরে তাঁকে জর্জরিত করতো। এই অবস্থায় তাঁর জীবনের ব্যাপারে যখন আশংকা দেখা দিল, তখন অন্যান্য ফিকাহবিদ সরকারী কিছু কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্যে—যেন তার উপর থেকে এই নির্মম অত্যাচার নিঃশেষ হয়ে যায়—পরামর্শ দিলেন। অতঃপর খলীফা মনসুরও তাঁকে এরূপ কোন কাজ গ্রহণের জন্যে আহ্বান করলেন। কিন্তু ইমাম তা অস্বীকার করলেন। তখন আবার তাঁকে বন্দী করা হয়। সেখানে বাগদাদ নগরের প্রাচীর নির্মাণের কাঁচা ইট দিয়ে তাঁকে মারা হয়।

বস্তুত জালিম ও অত্যাচারী শাসক-প্রশাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফার মত অত্যন্ত প্রখ্যাত ও প্রবল। এই কারণে ইমাম আওজায়ী বলেছেন, আবূ হানীফাকে আমরা সব জিনিসের জন্যেই সামলিয়ে রেখেছিলাম; কিন্তু তিনি জালিমদের বিরুদ্ধে তরবারি দ্বারা যুদ্ধ করার ব্যাপারটি নিয়ে যখন এলেন, তখন আর আমরা তাঁকে সামলাতে পারিনি। তিনি প্রকাশ্যভাবে বলতেন, মুখের কথার দ্বারা 'আমার বিল মারূফ ও নিহী আনিল মনকার'—'ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করা' ফরয। কিন্তু তা যদি কার্যকর না হয়, তাহলে তরবারি ব্যবহার দ্বারাই তা কার্যকর করতে হবে। নবী করীম (স) থেকে এ কথাই বর্ণিত হয়েছে। খুরাসানের সর্বজনমান্য বড় ফিকাহ্‌বিদ ইবরাহীম আয্‌যায়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বহু সংখ্যক হাদীসেও এ কথাটি এসেছে। তিনি বলেছেন, তা ফরয। ইবনে আব্বাস থেকে ইকরামা বর্ণিত হাদীসেও এই কথাটারই সমর্থন পাওয়া যায়। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَرَجُلٌ قَامَ اِلَى اِمَامٍ جَائِرٍ فَاَمَرَهُ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَقُتِلَ -

শহীদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র হামযা এবং এমন ব্যক্তি যে কোন অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে মারুফের আদেশ ও মুনকার-এর নিষেধ করলে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

পরে ইবরাহীম 'মরো' নগরে উপস্থিত হল। সেখানে রাষ্ট্রচালক ও শাসক ছিলেন আবূ মুসলিম। তিনি তাকে আদেশ ও নিষেধ করলেন এবং তাঁর জুলুমের প্রতিবাদ করলেন, অন্যায়ভাবে রক্তপাত করার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললেন। ফলে তাঁর উপর কয়েকবার নির্মম হামলা চালানো হয় এবং তাঁকে হত্যা করা হয়। যায়দ ইবনে আলীর সাথে তাঁর গভীর যোগাযোগ ও সহযোগিতার কথা সকলেরই জানা। তিনি মনসুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কাজে বিপুল পরিমাণে আর্থিক সাহায্য দিয়েছিলেন। সেই সাথে তিনি গোপনে এই ফতোয়াও প্রচার করেছেন যে, যায়দ ইবনে আলীর সাহায্য করা এবং যুদ্ধে তাঁর সাথে শরীক হওয়া সকলেরই কর্তব্য। আবদুল্লাহ ইবনে হাসানের দুই পুত্র—মুহাম্মাদ ও ইবরাহীমের সাথেও তাঁর সম্পর্ক ছিল। আবূ ইসহাক আল-ফুজারী তাঁকে বললেন, "আপনি আমার ভাইকে ইবরাহীমের সাথে একত্র হয়ে বিদ্রোহ করার জন্যে উস্কানি দিয়েছেন কেন, যার ফলে সে নিহত হয়েছে?" এর জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ তোমার ভাইয়ের বিদ্রোহ তোমার বিদ্রোহের চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয় ও পছন্দ। আবূ ইসহাক বসরায় চলে গিয়েছিলেন। তাঁর মূলে ছিল হাদীস বর্ণনাকারী লোকদের তাঁর প্রতি অস্বীকৃতি ও অসহযোগিতা। ফলে 'আমার বিল মারূফ ও নিহি আনিল মুনকার' কাজ বন্ধ হয়ে গেল। আর এরই ফলে জালিম লোকেরা ইসলামের ব্যাপারাদির উপর বিজয়ী হয়ে বসল।

'আমর বিল মারূফ ও নিহি আনিল মুনকার' পর্যায়ে এই যার ভূমিকা ও অবদান, তিনি কি করে ফাসিকের ইমামত (নেতৃত্ব) জায়েয বলতে পারেন?....... এটা যে একটা সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ তাতে এক বিন্দু সন্দেহ নেই। তাঁর প্রতি উক্ত রূপ মিথ্যা অভিযোগের আরও একটা কারণ রয়েছে। ইরাকী সব বিশেষজ্ঞেরই মত হচ্ছে, বিচারক নিজে যদি ন্যায়পরায়ণ-নিরপেক্ষ হন এবং তিনি যদি অত্যাচারী শাসকের পক্ষ থেকে নিয়োজিত হন, তাহলে তার আদেশাবলী কার্যকর হওয়া জায়েয এবং তাঁর বিচার ও রায়সমূহ সহীহ গণ্য হবে। তার ইমামতিতে নামাযও জায়েয হবে শাসকদের ফাসিক ও জালিম হওয়া সত্ত্বেও। শরীয়াতের দৃষ্টিতে এই মত ঠিক। কিন্তু এতে এ কথা প্রমাণ করে না যে, হানাফী মাযহাব ফাসিকের ইমামত জায়েয় মনে করে। এই মতের পক্ষে যুক্তি হল, বিচারক যদি ন্যায়পরায়ণ হয়, তা হলে তার পক্ষে ফায়সালা ও বিচারসমূহ কার্যকর করা হয়ত সম্ভবপর হবে। তার হাতে একটি শক্তি ও কর্তৃত্ব আসতে পারে, যে তা মানতে অস্বীকার করবে, তা সে কবুল করতে বাধ্য হবে। প্রয়োজনে সে তার উপর জোর প্রয়োগ করতে পারবে। কে তাকে এই পদে নিয়োজিত করেছে, সে প্রশ্ন এখানে একান্তই অবান্তর। কেননা তার নিয়োগকারী তো তার বহু সংখ্যক সাহায্যকারীর মধ্যে একজন মাত্র। আর বিচারকের সাহায্যকারীদেরও 'ন্যায়পর' হতে হবে, তার কোন শর্ত নেই। যেমন যে দেশের কোন সার্বভৌম শাসক ও চালক নেই; সেখানকার জনগণ যদি একজন ন্যায়পরায়ণকে এই কর্তৃত্বের অধিকারী বানায় সকলে একমত হয়ে, তা হলে তা কি বাস্তবায়িত হবে না? এই বিচার কার্যটিও এই পর্যায়েরই। যে লোকই বিচার বা হুকুম মানতে অস্বীকার করবে তাকে তো মানতে বাধ্য করার জন্যে এরা সাহায্যকারী হবে।

তাহলে বিচারকের বিচার ও রায় কার্যকর হবে। রাষ্ট্রপ্রধান বা ক্ষমতাসীন নেতার দিক দিয়ে তাকে ক্ষমতা না দিলেও তাতে কিছুই আসে যায় না। এই যুক্তির ভিত্তিতেই কাযী শুরাইহ ও তাবেয়ী যুগের বহু সংখ্যক বিচারক বিচারকের আসন গ্রহণ করেছিলেন। শুরাইহ বিচারপতি ছিলেন কূফা শহরে হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফের শাসন আমল পর্যন্ত। আর সমগ্র আরব ও মারওয়ান বংশের খলীফা আবদুল মালিকের চেয়ে বড় জালিম, বড় কাফির আর কেউ ছিল না। আর আবদুল মালিকের প্রাদেশিক শাসকবর্গের মধ্যে হাজ্জাজের তুলনায় অধিক বড় জালিম ও কাফির আর কেউই ছিল না। সে লোকদের জিহ্বা কেটে দিত 'আমর বিল-মারূপ ও নিহি আনিল-মুনকার' করলে। খলীফা আবদুল মালিক মিম্বরে দাঁড়িয়ে একটি মারাত্মক ভাষণ দেন। বলেন ঃ আল্লাহ্‌র নামে শপথ, আমি কোন দুর্বল খলীফা নই। [অর্থাৎ উসমান (রা)] কৃত্রিমভাবে বানানো খলীফাও (মুআবিয়া) আমি নই। তোমরা আমাকে এমন অনেক কাজ করতে বলো, যা করার দায়িত্ব তোমাদেরও আছে, যা তোমরা ভুলে যাও। আজ আমি এখানে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করছি অতঃপর যে লোকই আমাকে আল্লাহ্‌র তাকওয়া গ্রহণ করার নসীহত করবে, আমি তার গর্দান মেরে দেব, আলিম-ফিকাহ্‌বিদগণ বায়তুল মাল থেকে জীবিকা পেয়ে থাকতেন। মিথ্যাবাদী মুখতার ইবনে আব্বাস, মুহাম্মাদ ইবনুল হানফীয়া ও ইবনে উমর (রা) প্রমুখ সর্বজনমান্য ব্যক্তিকে ধন-মাল দিতেন। তারা তা গ্রহণও করতেন।

মুহাম্মাদ ইবনে আজলান কাকার সূত্রে উল্লেখ করেছেন, আবদুল আজীজ ইবনে মারওয়ান হযরত ইবনে উমর (রা)-কে লিখে পাঠালেনঃ

اِرْفَعْ اِلَىَّ حَوَائِجَكَ –

আপনার প্রয়োজন পরিমাণের কথা আমার নিকট তুলে ধরুন।

জবাবে তিনি লিখলেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَاَحْسِبُ اَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا يَدُ الْمُعْطِىْ وَاَنَّ الْيَدَ السُّفْلَى يَدُ الْاٰخِذِ، وَاَنِّىْ لَسْتُ سَائِلُكَ شَيْئًا وَلَارَادًّا عَلَيْكَ رِزْقًا رَزَقْنِيْهِ اللّٰهُ مِنْكَ، وَالسَّلَامُ –

উচ্চ হাত নিম্ন হাতের তুলনায় অনেক উত্তম। আমি মনে করি, উচ্চ হাত হচ্ছে দাতার হাত আর নিম্ন হাত হচ্ছে গ্রহীতার হাত। আমি তো তোমার নিকট কোন কিছুর প্রার্থী হয়ে দাঁড়াইনি। আর আল্লাহ্‌ তোমার মাধ্যমে আমাকে যে রিযিক দেন, তার প্রত্যাখ্যানকারীও আমি নই।

হাসান, সাঈদ ইবনে জুরাইর, শাবী, সব তাবেয়ী এসব জালিমদের নিকট থেকেই তাঁদের জীবিকা গ্রহণ করতেন। তাদের এই রিযিক গ্রহণ এ জন্যে ছিল না যে, তাঁরা জালিমদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। বরং তা ছিল এ জন্যে যে, তা ছিল তাঁদের অধিকার। ঘটনাক্রমে তা দেয়ার কর্তৃত্ব এসব ফাসিক-ফাজির-জালিম লোকের হাতে পড়ে গেছে।

তাবেয়ীগণ কখনও তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন নি। তারা তো হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফের ন্যায় প্রতাপ-দাপটশালী ব্যক্তিকেও তরবারি দিয়ে আগাত দিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, তাবেয়ী যুগের সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গ, এ কালের ফিকাহবিদ ও হাফিজ-কারীদের চার হাজার ব্যক্তি আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল আশয়াস-এর সঙ্গে মিলে আহওয়াজ নামক স্থানে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। পরে বসরা এবং তারও পর ফুরাত নদীর পাশে কূফা নগরের কাছাকাছি দীরুল জামাজুম নামক স্থানেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। তাঁরা সকলে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী, তার উপর অভিসম্পাত বর্ষণকারী ও তাদের জুলুম-দুঃশাসনের দায়িত্ব অস্বীকারকারী ছিলেন। হযরত আলী (রা)-কে শহীদ করার পর মুআবিয়া (রা) যখন জোরপূর্বক ক্ষমতাসীন হয়ে বসলেন, তখনও তাবেয়ীদের পূর্ববর্তী সাহাবায়ে কিরামগণও এই নীতিই অনুসরণ করেছিলেন। ইমাম হাসান ও হুসায়ন (রা)-ও দান গ্রহণ করতেন। এ কালে অন্যান্য যে সব সাহাবায়ে কিরাম (রা) জীবিত ছিলেন, তারাও তা-ই করতেন। তাঁরা কেউই জালিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন নি। তাদের নির্যাতনমূলক শাসনের সাথে তেমনি নিঃসম্পর্ক ছিলেন। যেমন হযরত আলী (রা) নিজের জীবনের শেষ পর্যন্ত এই পথের অনুসারী ছিলেন। এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, তাদের পক্ষ থেকে অর্পিত বিচারকের পদ এবং তাদের দেয়া দান গ্রহণের অর্থ কখনই এই হতে পারে না যে, তাঁরা জালিমদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থন করতেন কিংবা তাদের ইমামত বা নেতৃত্বের প্রতি তাঁরা কিছু মাত্র আস্থাবান ছিলেন।

রাফেযী গোষ্ঠীর নির্বোধ লোকেরা অনেক সময় 'আমার প্রতিশ্রুতি জালিমরা পাবে না'—আল্লাহ্‌র এই কথাটিকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত উমর (রা)-এর ইমামত প্রত্যাখ্যান করার দলীল হিসেবে পেশ করে থাকে। কেননা তাঁরা তো এক সময় মুশরিক-কাফির ছিলেন ইসলামের পূর্বে জাহিলয়াতের যামানায়। কিন্তু এটা যে কত বড় মূর্খতা ও বাড়াবাড়ি তা না বললেও চলে। কেননা আয়াতের সম্পর্ক হচ্ছে সেসব লোকের সাথে যারা সারাজীবন অব্যাহতভাবে জুলুমের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু যাঁরা তা থেকে তওবা করে দ্বীন কবুল করেছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে এই আয়াত প্রযোজ্য নয়। কেননা কোন আয়াতের হুকুম যখন কোন গুণ-এর সম্পর্কিত হয়, তাহলে সেই গুণ দূর হয়ে গেলে হুকুমটাও কার্যকর হয় যায়। আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'জালিমরা আল্লাহ্‌র নেতৃত্ব দেয়ার প্রতিশ্রুতি পাবে না' কথায় প্রতিশ্রুতি না পাওয়ার জন্যে 'জালিম' হওয়া দরকার। জালিম না হলে প্রতিশ্রুতি পাওয়ার অধিকার প্রমাণিত হয়। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَاتَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا – (هود : ١١٣)

এবং তোমরা জালিমদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না।

এ আয়াতে লোকেরা যতক্ষণ জালিম থাকবে, জুলুমের কাজে রত থাকবে, ততক্ষণ তাদের প্রতি মনকে ঝুঁকাতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র এই কথাটিও এ পর্যায়েরই ঃ

مَاعَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ -

মুহসিন লোকদের জন্যে কোন পথ নেই।

এই কথাটিও কেবল ততক্ষণ পর্যন্ত প্রযোজ্য, যতক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা মুহসিন থাকবে, অতএব 'আমার প্রতিশ্রুতি জালিমরা পাবে না' আল্লাহ্র এই কথাটি সেই লোকদেরকে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি পাওয়া থেকে বঞ্চিত করে না, যারা জুলুম থেকে তওবা করেছে। কেননা এই সময় ও এই অবস্থায় তাদেরকে জালিম বলা যায় না। যেমন কুফর থেকে তওবাকারীকে কাফির বলা যায় না। যে লোক ফিস্ক থেকে তওবা করেছে, তাকে ফাসিক বলা যায় না। হ্যাঁ, বলা যেতে পারে, অতীতে সে কাফির বা ফাসিক ছিল, জালিম ছিল। আল্লাহ তো বলেন নি—যে জালিম ছিল, সে আমার প্রতিশ্রুতি পাবে না। বলেছেন, যে এখন জালিম, জুলুম কাজে রত, সে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি পাবে না।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَاَمْنًا -

স্মরণ কর, আমরা যখন আল্লাহ্র ঘরকে জনগণের আবর্তন কেন্দ্র ও শান্তিপূর্ণ বানিয়ে দিয়েছিলাম ....

البيت। বলতে আল্লাহ্র বায়তুল হারাম। بيت শব্দের উপর আলিফ ও লাম বসিয়ে ক্ষান্ত থাকা হয়েছে, যথেষ্ট মনে করা হয়েছে বায়তুল্লাহ্ বোঝাবার জন্যে। এ থেকে সেই সর্বজন পরিচিত ঘরই বোঝায়। অথবা বোঝায় ঘর জাতীয় সব। যাদেরকে সম্বোধন করে কথাটি বলা তাঁরা নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছেন যে, এখানে البيت। অর্থ সাধারণ ঘর জাতীয় সব নয়; বরং একান্ত ও নির্দিষ্টভাবে কাবা। আর লোকদের আবর্তনের কেন্দ্র তো মক্কায় অবস্থিত কাবা-ই। হাসান থেকে বর্ণিত, এর অর্থ লোকেরা প্রতি বছর এই ঘরে আসে ও এখান থেকে চলে যায়। ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, এই ঘর থেকে কেউ-ই ফিরে যায় না বরং সে এখান থেকে তার উদ্দেশ্য পূরণ করে নিয়ে যায়। তখন তারা প্রত্যাবর্তন করে। এ-ও বলা হয়েছে যে, লোকেরা এই ঘরে এসে হজ্জ করে। সে জন্যে তারা বিপুল সওয়াব পেয়ে যায়।

আবূ বকর বলেছেন, অভিধান-জ্ঞানীরা বলেছেন ঃ ثَابَ يَثُوْبُ مَثَابَةً وَثَوَابًا বলা হয় যখন কেউ প্রত্যাবর্তন করে। অন্যরা বলেছেন مَثَابَةً শব্দে ة বা و বসানো হয়েছে অর্থের আতিশয্য বোঝাবার জন্যে। কেননা যে লোক এখানে আসে, সে বিপুল সওয়াব পায়। যেমন نَسَّابَةً বংশতালিকা-পারদর্শী, عَلَّامَةً অতিশয় ইল্ম-ওয়ালা। مَثَابَةً খুব দ্রুত চলমান। ফররা বলেছেন—এ শব্দটি যেমন বলা হয় سَيَّارَةً

والمقامة والمقام শব্দটিও ঠিক তেমনি। আগের কালের তাফসীর বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, লোকেরা প্রতি বছর এই ঘরে আসে ও চলে যায়, ব্যবহৃত শব্দে এই তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। অন্যরা বলেছেন, এখান থেকে যে-ই ফিরে যায়, সেই-ই পুনরায় এখানে আসতে আগ্রহী বা লোকেরা এখানে এসে হজ্জ করে। ফলে সে বিপুল সওয়াবের

অধিকারী হয়, এ সব-ই এই আয়াতের অর্থ ও বক্তব্য হতে পারে। ফিরে যাওয়ার পর আবার এখানে আসবার জন্যে লোকেরা আগ্রহী হয়, এই অর্থ যারা করেছে, তাঁদের কথার সমর্থন রয়েছে এই দো'আর মধ্যে ঃ

فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىٓ اِلَيْهِمْ – (ابراهيم : ٣٧)

অতএব লোকদের হৃদয়কে এদের প্রতি আকৃষ্ট বানিয়ে দাও।

মূলত مَثَابَةً শব্দটি কাবার তওয়াফ করা বোঝাবার জন্যে ব্যবহৃত। কেননা আল্লাহ্‌র ঘরই লক্ষ্য, তওয়াফের কেন্দ্রস্থল। এই যে ফরয, শব্দটি তা বোঝায় না, তা করলে সওয়াব পাওয়া যাবে, একথা নিশ্চিত। যারা উমরা করা ফরয মনে করেন, তারা এই আয়াতটিকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। তাঁরা বলেছেন, আল্লাহ্‌ নিজেই যখন কাবাকে مَثَابَةً আবর্তিত হয়ার ও সওয়াব পাওয়ার কেন্দ্র বানিয়েছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন, লোকেরা এখানে বারবার আসবে বলেছেন, তখন সেখানে হজ্জ আদায়ের পর উমরা করার জন্যেই বারবার যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই তাৎপর্য গ্রহণীয় নয়। কেননা উমরা করা ওয়াজিব বা ফরয, এমন অর্থ আয়াতের কোন শব্দ থেকেই পাওয়া যায় না। এ আয়াতের সারকথা হচ্ছে, কাবাকে আল্লাহ এমন স্থান বানিয়েছেন যেখানে লোকেরা বারবার আসবে, সেজন্যে তাদেরকে সওয়াব দেয়ার ওয়াদা করা হয়েছে। এতে বড় জোর মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়, ফরয নয়। কেউ যদি বলে তুমি উমরা কর এবং তুমি সেখানে নামাযও পড়তে পার; তাতে তো বোঝা যাবে না যে, সেখানে যাওয়া ও নামায পড়া ফরয। দ্বিতীয়ত সেখানে বিশেষভাবে কেবল উমরা করার জন্যেই যেতে হবে, হজ্জ করার জন্যে নয়, এমন কথাও প্রমাণিত নয়। তা সত্ত্বেও হজ্জে তওয়াফুল কুদুম, তওয়াফুয যিয়ারত ও তওয়াফুস-সদর করতে হয় আর সে জন্যে সেখানে বারবার যেতে হয়, ফিরে আসতে হয়। যখন কেউ তা করে, সে শব্দের দাবি পূরণ করে। তাহলে এ আয়াতে উমরা ফরয হওয়ার কোন কথা নেই, তা-ই সত্য প্রমাণিত হল।

আর اَمْنًا। শব্দটি দ্বারা আল্লাহ্‌র ঘরকে শান্তিপূর্ণ হওয়ার পরিচিতিতে পরিচিত করা হয়েছে। এর আওতায় সমগ্র হারাম এলাকা পড়ে, যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ। কাবা পর্যন্ত পৌছে যাওয়া কুরবানী।

এর আওতায় সমগ্র হারাম, কেবলমাত্র কাবাই নয়, তার কারণ, কাবাতে তো কুরবানীর জন্তু যবেহ করা হয় না, মসজিদে হারামেও নয়। তাই জন্তু যবেহ্‌ করার স্থান এর মধ্যে শামিল। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِىْ جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ نِ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ – (الحج : ٢٥)

আর মসজিদে হারামকে আমরা জনগণের জন্যে বানিয়েছি, সেখানে অবস্থানকারী ও বাইরে থেকে আগমনকারী সকলেই সমান।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, এই কথা এজন্যে যে, মসজিদের সবটাই হারাম বা হারামের সবটাই মসজিদ। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন।

إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوْا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا - (التوبة : ٢٨)

নিঃসন্দেহে মুশরিকরা অপবিত্র। অতএব তারা এই বছরের পর মসজিদে হারামের নিকটেও আসতে পারবে না।

আল্লাহ্ এ আয়াত দ্বারা মুশরিকদের হজ্জের স্থানসমূহে আসতে না পারার বা তাদের আসতে না দেয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। সূরা বরাআত নাযিল হলে তা সহ হযরত আলী (রা)-কে এই ঘোষণা দেয়ার দায়িত্ব দিয়ে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন যে, এ বছরের পর মুশরিকরা হজ্জ করতে আসতে পারবে না। এটা ঠিক উদ্ধৃত আয়াতেরই বক্তব্য। অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا -

ওরা কি লক্ষ্য করেনি যে, আমরা হারামকে শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ বানিয়েছি?

ইবরাহীম (আ)-এর দো'আর উল্লেখ করেছেন এই ভাষায় ঃ

رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا -

হে রব্ব, তুমি এই শহরকে শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ বানাও।

এই সব কয়টি আয়াতে আল্লাহ্র ঘর—হারাম-নগরকে শান্তিপূর্ণ বানাবার কথাই বলা হয়েছে। এতে সমগ্র হারাম এলাকাই গণ্য। আর হারাম-এর এই 'হুরমাত' বা মর্যাদা-মাহাত্ম্য আল্লাহ্র ঘরের সাথে সম্পৃক্ত, তাই 'বায়ত' বা ঘর নামে অভিহিত করা সঙ্গত। [redacted] সেখানেই শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজিত। সেখানে যুক্ত ও রক্তপাত নিষিদ্ধ। হারাম মাসসমূহের 'হুরমাত'-ও এই ঘরের সাথেই সম্পৃক্ত। এখানকার শান্তি ও নিরাপত্তা হজ্জের জন্যে। এই হজ্জ তো আল্লাহ্র ঘরকে কেন্দ্র করেই পালিত হয়।

আল্লাহ্র কথা ঃ 'আমরা যখন ঘরকে জনগণের আবর্তন কেন্দ্র ও শান্তিপূর্ণ বানালাম। মূলত এটা আল্লাহ্র হুকুম। শুধু একটা খবর দেয়াই এর উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ্র এই কথাটি ঃ 'হে রব্ব, এই নগরকে শান্তিপূর্ণ বানাও' এবং 'যে লোক সেখানে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ হবে'—এসবই হুকুম-নির্দেশ হিসেবে বলা হয়েছে। নিছক সংবাদ শোনানোই এর উদ্দেশ্য নয় যে, সেখানে যে প্রবেশ করবে, সে কোন মন্দের সম্মুখীন হবে না। যদি নিছক খবর হতো, তাহলে খবরদাতা যে খবর দিচ্ছে সে তা পেত। এ তো আল্লাহ্র তরফ থেকে ঘোষণা। তাই যার উপর এই খবর দেয়া হয়েছে তার অস্তিত্ব বা উপস্থিতি জরুরী। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ فَاِنْ قَاتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ -

ওদের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করো না মসজিদে হারামের নিকট, যতক্ষণ না ওরা তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে। তারাই যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তাহলে তোমরা তাদেরকে হত্যা কর।

এ আয়াতে মসজিদে হারামে হত্যা সজ্ঘটিত করার খবর দেয়া হয়েছে। বোঝা গেল, উপরোক্ত আদেশ সেখানে শান্তি স্থাপিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহ্‌র এই হুকুম। আর সেখানে যে পানাহ নেবে, আশ্রয় গ্রহণ করবে, তাকে হত্যা করা যাবে না। বস্তুত ইবরাহীম (আ) থেকেই হারাম সংক্রান্ত এই হুকুম কার্যকর ছিল এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত তা রয়েছে। জাহিলিয়াতের যুগেও আরবরা হারামের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করত। সেখানে হত্যাকাণ্ড ঘটানোকে অতি বড় গুনাহ্ মনে করত। কেননা তখন পর্যন্ত ইবরাহিমী শরীয়াতের রেশ অবশিষ্ট ছিল।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, আহমদ ইবনে হাম্বল, ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম, আওজায়ী, ইয়াহ্ইয়া, আবূ সালমা সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ঃ আল্লাহ্ যখন তাঁর রাসূলের দ্বারা মক্কা বিজয় করেন, তখন রাসূলে করীম (স) ভাষণ দেয়ার জন্যে দাঁড়িয়ে প্রথমে আল্লাহ্‌র হামদ্ সানা করলেন। অতঃপর বললেনঃ আল্লাহ মক্কা থেকে হাতীবাহিনী বিরত রেখেছেন। তৎপরিবর্তে তিনি তাঁর রাসূল ও মুমিনদের তার উপর আধিপত্যশালী বানিয়ে দিলেন। আমার জন্যে দিনের কিছু সময়ের তরে এই নগরকে 'হালাল' করে দিয়েছেন, তার পরই তা কিয়ামত পর্যন্ত 'হারাম' হয়ে গেছে। এর বৃক্ষ কর্তন করা যাবে না, এখানকার শিকার (হত্যার জন্যে) তাড়ানো যাবে না। এখানে প্রাপ্ত পড়ামাল কেবল তার জন্যেই হালাল হবে, যে তার ঘোষণা দিয়ে তার মালিক পাবে না। তখন হযরত আব্বাস (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ। ঘাস কি এর বাইরে গণ্য ? কেননা তা আমাদের কবর ও ঘর-বাড়ির জন্যে জরুরী। তখন রাসূলে করীম (স) বললেন, হ্যাঁ, ঘাস এর বাইরে।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, উসমান ইবনে আবূ শায়বা, জরীর, মনসূর, মুজাহিদ, তায়ূস সূত্রে ও হযরত ইবনে আব্বাসের নিকট থেকে এই হাদীসটির কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এতে কোন শূন্যতা বা অসম্পূর্ণতা থেকে যায়নি। বলেছন, আল্লাহ্ তা'আলা মক্কাকে আসমান-জমিন সৃষ্টির দিনই হারাম করে দিয়েছেন। আমার পূর্বে এই নগর কারোর (প্রয়োজনীয় রক্তপাতের) হালাল করা হয়নি। আর আমার জন্যেও তা দিনের মাত্র কিছু সময়ের (এক ঘন্টার) জন্যে হালাল করা হয়েছে।

ইবনে আবূ যেব সাঈদুল মুকাবেরী, আবূ শুরাইহ্ আল-কাবী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, রাসূলে করীম (স) ঘোষণা করেছেন—নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা মক্কাকে হারাম করেছেন, মানুষের কেউ তাকে হারাম করেনি। অতএব এখানে রক্তপাত করা যাবে না। আল্লাহ্ আমার জন্যে দিনের এক ঘন্টাকালের তরে তা 'হালাল' করে দিয়েছেন। তা-ও সাধারণ মানুষের জন্যে নয়।

রাসূলে করীম (স) এই সংবাদও দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তাকে হারাম করেছেন

আসমান-জমিন সৃষ্টির দিন এবং এখানে রক্তপাত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এই নগরের 'হুরমাত' কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাক, এই খবরও দিয়েছেন। মক্কাকে 'হারাম' করার মধ্যে এখানকার শিকার, বৃক্ষ কর্তন ও শূন্যতা শামিল ও গণ্য।

যদি প্রশ্ন করা হয়, ঘাসকে নিষেধের আওতার বাইরে রাখার কারণ কি ? যা হযরত আব্বাসের প্রশ্নের ফলে রাখা হয়েছে। অথচ তার পূর্বে তিনি সবকিছুই নিষিদ্ধ হওয়ার সাধারণ ও ব্যাপক কথা বলেছিলেন ? আর এটা তো জানা-ই আছে যে, কোন কিছু নাকচ করা কাজটা বাস্তবভাবে করার পূর্বে হতে পারে না ?

জবাবে বলা যাবে, হতে পারে, আল্লাহ্ তা'আলা ঘাসকে মুবাহ করার ইখতিয়ার তাঁর রাসূলকে নিজেই দিয়েছেন। যে লোক তার মুবাহ হওয়ার প্রশ্ন করলেন, তার জবাবে তা বলে দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ - (النور : ٦٢)

তারা যখন তাদের কোন কোন অবস্থার কারণে তোমার নিকট অনুমতি চাইবে, তখন তাদের মধ্য থেকে তোমার যাকে ইচ্ছা হবে তাকে অনুমতি দেবে।

এ আয়াতে অনুমতি চাইলে তখন অনুমতি দানের ইখ্‌তিয়ার রাসূলে করীম (স)-কে আল্লাহ্ নিজেই দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ অকাট্য দলীল (ص) দ্বারা মক্কার 'হুরমাত' পর্যায়ে যা হারাম করেছেন, সেই সাথে তওকীফও (আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারণ), তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র তওহীদের নিদর্শন এবং প্রমাণ। তা মক্কার জন্যে আল্লাহ্‌র বিশেষ ঘোষণা পর্যায়ের। অতএব এর তাযীম করা এবং তথায় শিকারের নিরাপত্তার যে ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা যাচ্ছে তা অত্যন্ত বড় ব্যাপার। এ প্রেক্ষিতে সমস্ত হারাম এলাকা সমগ্র পৃথিবীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এখানে হরিণ ও কুকুর একত্র হয়। কুকুর হরিণ শিকারে লাফিয়ে উঠে না। হরিণও কুকুর দেখে পালায় না। কিন্তু হারাম থেকে উভয়েই বাইরে চলে গেলে কুকুর হরিণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর হরিণ পালিয়ে যায় প্রাণের ভয়ে। এ ব্যাপারটিও আল্লাহ্‌র তওহীদেরই প্রমাণ। সেই সাথে ইসমাঈল (আ)-এর বিরাট ফযীলত ও তাঁর মর্যাদার উচ্চতাও স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। বিপুল সংখ্যক সাহাবী হারাম এলাকায় শিকার করা, তার বৃক্ষ কাটা, সেখানে হত্যাকাণ্ডের প্রতিফল দান ফরয হওয়া বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى -

এবং তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ কর।

এটি একটি আদেশ এবং বাহ্য দৃষ্টিতে তা ফরয। এই যুক্তিও রয়েছে যে, তওয়াফ নামায ফরয করে দেয়। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে বোঝা যায়, উক্ত

আদেশে তওয়াফের নামাযের কথাই বলা হয়েছে। সে হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাঊদ, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আন নুফাইলী, হাতিম ইবনে ইসমাঈল, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ তাঁর পিতার সূত্রে হযরত জাবির থেকে বর্ণিত। তাতে নবী করীম (স)-এর হজ্জ আদায়ের বিবরণ দেয়া হয়েছে। শেষে বলা হয়েছে, নবী করীম (স) রুকনে ইয়ামনীকে চুম্বন করলেন। পরে তিনবার 'রমল' করলেন। চারবার বললেন। পরে মাকামে ইবরাহীমে এসে উক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন। অতঃপর মাকামটিকে কাবা এবং তার মাঝখানে রেখে দুই রাকআত নামায পড়লেন। মাকামের পেছনে নামায পড়ার ইচ্ছা করলে তিনি উক্ত আয়াত পড়লেন। এ থেকে বোঝা গেল, আয়াতটির অর্থ হচ্ছে তওয়াফের পর কার্যত নামায পড়া। আর আয়াতে তার-ই আদেশ দেয়া হয়েছে এবং তা ফরয। বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) দুই রাক'আত নামায আল্লাহ্র ঘরের নিকটে পড়েছেন। সে হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাঊদ, আবদুল্লাহ্ ইবন উমর, আল-কাওয়ারিরী, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ, সায়েব, মুহাম্মাদ আল-মাখজুমী, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুস সায়েব-তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। বলা হয়েছে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে ধরে চালিয়ে নিচ্ছিলেন। তিনি তাঁকে তৃতীয় ভাগের স্থানে দাঁড় করালেন। এটা সেই রুকনের সাথে মিলিত, যার পাশে রয়েছে হাজরে আসওয়াদ। আর তা হচ্ছে কাবার দরজার সাথে মিলিত। তখন ইবনে আব্বাস (রা) বলতে লাগলেন ঃ থাম, এখানেই নবী করীম (স) নামায পড়তেন, দাঁড়াতেন এবং তারপর আবার নামায পড়তেন। এ আলোকেও বোঝা গেল, তওয়াফের নামায ফরয। নবী করীম (স)-এর কাজ কখনো মাকামের নিকটে সম্পন্ন হয়েছে, কখনো হয়েছে অন্যত্র। তবে মাকামের নিকটেই পড়তে হবে—এমন কথা নেই।

আবদুর রহমান আল-কারী হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, ফজরের নামাযের পর তিনি তওয়াফ করেছেন। পরে সওয়াব হয়ে যী-তাওয়াতে উট থামালেন। তখন তিনি তাঁর তওয়াফের নামায পড়লেন। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি হিত্তীম-এ নামায পড়েছেন। হাসান ও আতা থেকে বর্ণিত—মাকামের পেছনে নামায না পড়লেও কোন ক্ষতি নেই। 'মাকামে ইবরাহীম' বলে আল্লাহ কোন স্থান বোঝাতে চেয়েছেন, এ বিষয়ে আগের কালের মনীষিগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। ইবনে আব্বাস বলেছেন, তার অর্থ—হজ্জ সবই মাকামে ইবরাহীমে। আতা বলেছেন, আরাফ হচ্ছে মাকামে ইবরাহীম। সেই সাথে মুজদালিফা ও পাথর-নিক্ষেপের স্থানও। মুজাহিদ বলেছেন, হারাম সবই মাকামে ইবরাহীম। সুদ্দী বলেছেন—মাকামে ইবরাহীম হচ্ছে সেই প্রস্তুর খন্ড যা কাবা নির্মাণকালে হযরত ইসমাঈলের স্ত্রী হযরত ইবরাহীমের পায়ের নিচে রেখে দিয়েছিলেন, যখন তাঁর মাথা ধুয়ে দিচ্ছিলেন। ইবরাহীম (আ) তার উপর তাঁর পা রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন তার উপর আরোহী অবস্থায়। তখন ইসমাঈল (আ)-এর স্ত্রী তাঁর পাশ ধুয়ে দিলেন। পরে তিনি তাঁর পায়ের নিচ থেকে তা তুলে নিলেন। তখন পাথরে তাঁর পা ডুবে গিয়েছিল, তখন তিনি (স্ত্রী) অপর পাশের নিচে রেখে দিলেন। আর তাঁর পা ধুয়ে দিলেন। তখনও তাঁর পা ডুবে গিয়েছিল। ফলে আল্লাহ্ এই পাথরখানাকে

তার নিদর্শন (شعار) বানিয়ে দিলেন। বললেন ঃ 'তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে মুসল্লারূপে গ্রহণ কর।

হাসান, কাতাদাহ্ ও রুবাই ইবনে আনাস থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে। অধিক প্রকাশমান কথা এই যে, মূলত তা-ই এখানে বক্তব্য। কেননা হারাম সাধারণভাবে কেবল মাকামে ইবরাহীমই বোঝায় না। সেই সমস্ত স্থানও বোঝায়, যেখানকার কথা অন্যান্যরা বলেছেন। সেটাই যে ব্যক্তব্য তার প্রমাণ এই হাদীস, যা হুমাইদ আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত উমর (রা) বলেছেন, আমি বললাম—হে রাসূল! আপনি যদি মাকামে ইবরাহীমকে মুসাল্লা হিসেবে গ্রহণ করতেন ? তখন আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াত নাযিল করেন। ফলে তিনি সেখানে নামায পড়লেন। বোঝা গেল, মাকামে ইবরাহীম বলে আল্লাহ্ সেই পাথরটিকেই বুঝিয়েছেন। আর রাসূলের কার্যত সেখানে নামায পড়ায়ও তা-ই বোঝায়। নামাযের সাথে হরম-এর কোন সম্পর্ক নেই, অন্যান্যরা যেসব স্থানের উল্লেখ করেছেন, সেই স্থানেরও তাই।

এই মাকামটা আল্লাহ্র তওহীদের অকাট্য প্রমাণ। হযরত ইবরাহীমের নবুয়তেরও তাই প্রমাণ। কেননা আল্লাহ্ পাথরকে মাটির ন্যায় নরম বানিয়ে দিয়েছিলেন বলেই তাতে তার পা বসে গিয়েছিল। এই কাজ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। আর সেই সাথে তা হযরত ইবরাহীমের একটা মুজিযাও বটে। আর নবুয়ত না হলে মুজিযা হতে পারে না।

মুসাল্লা (مصلى) বলতে কি বুঝিয়েছেন, সে বিষয়ে বিভিন্ন কথা এসেছে। মুজাহিদ এ বিষয়ে বলেছেন, তার অর্থ দো'আর স্থান এবং সে দো'আ নামাযের মাধ্যমে। 'সালাত' অর্থ তো দো'আই। যেমন বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ –

হে ঈমানদারগণ, তোমরা তার প্রতি দো'আ কর।

হাসান বলেছেন, মুসাল্লা অর্থ কিবলা। কাতাদাহ, সুদ্দী বলেছেন, তার নিকটে নামায পড়তে আদেশ করেছেন। শব্দের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা তা-ই বোঝায়। কেননা 'সালাম' শব্দ নিঃশর্ত উল্লিখিত হবে, তদ্দারা রুকূ-সিজদা নামায বোঝাবে। مصلى المصر বলতে তো সেই স্থানই বুঝিয়েছেন, যেখানে ঈদের নামায পড়া হয়। নবী করীম (স) উসামা ইবনে যায়দকে বলেছেন ঃ المصلى امامك। তোমার সম্মুখেই নামাযের স্থান। নবী করীম (স)-এর আমল থেকেও তা-ই বোঝায়। কেননা তিনি আয়াতটি পাঠ করে নামাযই পড়েছিলেন। যিনি তার অর্থ কিবলা বলেছেন তা-ও নামাযই বোঝায়। কেননা কাবা ঘর ও তা মাঝখানে তাকেই তো নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ করা হয়। ফলে তা-ই কিবলা হয়ে যায়। আর নামাযের মধ্যে যেহেতু দো'আও রয়েছে, তাই মুসাল্লা অর্থ 'দো'আ'র স্থান বলা খুবই উত্তম। তাতে সব অর্থ সমন্বিত হয়, আয়াতের ব্যাখ্যায় যে যে অর্থ বলা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَعَهِدْنَا اِلَى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ الطَّئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ -

আমরা ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে নির্দেশ দিলাম যে, তোমরা দুজন আমার ঘরকে পবিত্র করে রাখ তওয়াফকারী, অবস্থান গ্রহণকারী এবং রুকূ-সিজদাকারীদের জন্যে।

কাতাদাহ, উবায়দ ইবনে উমায়র, মুজাহিদ ও সাঈদ ইবনে জুবায়র প্রমুখ বলেছেন—আদেশ হয়েছে শিরক ও মুর্তিপূজার মলিনতা থেকে পবিত্র রাখার। কেননা ইবরাহীম (আ)-এর হাতে পূনঃনির্মিত হওয়ার পূর্বে সেখানে মুশরিকরা তা-ই তো করত। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, মক্কা জয় হলে নবী করীম (স) মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। দেখতে পেলেন, তার মধ্যে মূর্তি দিয়ে ভর্তি হয়ে রয়েছে। তখন তিনি তা ভেঙ্গে ফেলার জন্যে নির্দেশ দিলেন। আর তাঁর হাতে রক্ষিত লাঠি দ্বারা এক-একটিকে ঠোকা দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন ঃ

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ - اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا -

সত্য সমুপস্থিত। মিথ্য বিলীয়মান। আর বাতিল তো বিলীন হওয়ার জন্যেই।

কারো কারো মতে কাবাকে গোবর ও রক্ত থেকেও পবিত্র করার নির্দেশ এই নির্দেশের মধ্যেই রয়েছে। কেননা মুশরিকরা কাবার নিকটে সেগুলো ফেলে দিয়ে পরিবেশ পূতিগন্ধময় করে রাখত।

সুদ্দী বলেছেন ঃ طهرا بيتى তোমরা দুজন আমার ঘর পবিত্র করে রাখ' এর অর্থ, কাবাকে পবিত্রতার উপর নির্মাণ কর। যেমন আল্লাহ্ অন্যত্র বলেছেন ঃ

اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ -

যে লোক তার ভিত্তি আল্লাহ্‌র তাকওয়া ও তার সন্তুষ্টির উপর প্রতিষ্ঠা করবে, তা কি অতীব উত্তম ও অধিক কল্যাণময় নয়? (সূরা-তওবা ঃ ১০৯)

আবূ বকর বলেছেন, এখানে যে কয়টি অর্থের উল্লেখ হয়েছে, তার সব কয়টিই এক সাথে তার অর্থ হতে পারে, শব্দে তার সম্ভাব্যতা বর্তমান। ফলে আয়াতাংশের অর্থ হবে ঃ তোমরা দুজন আল্লাহ্‌র তাক্ওয়ার ভিত্তির উপর তাকে নির্মাণ কর, সেই সাথে তাকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন রাখ গোবর, রক্ত প্রভৃতি সকল ময়লা আবর্জনা থেকে, মূর্তির কলুষতা থেকে তা যেন তার মধ্যে স্থান পেতে না পারে, তার নিকটেও ঘেষতে না পারে।

طائفين এর অর্থে ও তাৎপর্যেও বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। জুয়াইবির দহাক থেকে বর্ণনা করেছেন, طائفين বলতে সমাগত হজ্জ যাত্রীদের বোঝানো হয়েছে। العاكفين। অর্থ মক্কাবাসী, তারাই সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। আবদুল মালিক আতা থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ العاكفون। বলতে বিভিন্ন শহর, নগর ও প্রতিবেশী এলাকার লোক বোঝায়।

আবূ বকর আল-হজালী বলেছেন, ব্যক্তি যখন তওয়াফকারী, তখন সে طائفين-এর মধ্যে গণ্য। আর যখন সে উপবিষ্ট, তখন সে العاكفين। -এর মধ্যে গণ্য। আর যখন সে নামায পড়ছে, তখন সে রুকূ-সিজদাকারী রূপে অভিহিত।

ইবনে ফুযায়ল ইবনে আতা সাঈদ ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ

طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَا كِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ –

এর তাৎপর্য হচ্ছে—নামাযের পূর্বে তওয়াফ করা।

আবূ বকর বলেছেন, দহাকের কথা হচ্ছে, হাজীদের যে-ই আসবে, সে তায়েফীন-এর মধ্যে গণ্য। এই কথাটিরও তাৎপর্য হচ্ছে বায়তুল্লাহ্‌ তওয়াফ করা। কেননা যে লোকই আল্লাহ্‌ ঘরে যাওয়ার উদ্দেশ্য গ্রহণ করবে, সে তা গ্রহণ করে আল্লাহ্‌র ঘরের তওয়াফ করার জন্যে, তবে বিদেশী মুসাফিরদের কথা স্বতন্ত্র। আয়াতে বিশেষভাবে কেবল তাদেরকেই বোঝাবার মত কোন প্রমাণ নেই। কেননা মক্কাবাসী ও বহিরাগতদের তওয়াফ কাজ তো অভিন্ন।

যদি বলা হয়, দহাক তওয়াফকারীকে বুঝিয়েছেন, যে এখন তওয়াফ করছে। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ –

রাত্রিবেলা তাদের (নিদ্রামগ্ন থাকা অবস্থায়) তোমার রব্ব-এর নিকট থেকে সেই বাগানের উপর একটি বিপদ আপতিত হল।

অথবা তাঁর কথা ঃ

اِذَا مَسَّهُمْ طَآئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ –

যখন তাদেরকে স্পর্শ করল শয়তান থেকে কোন আবর্তনশীল বিপদ।

বলা হয়েছে, উক্ত আয়াতে আর যা-ই হোক, তওয়াফ করাকেই বোঝাতে চেয়েছেন নিঃসন্দেহে। কেননা বহিরাগত লোক তো কাবার তওয়াফের উদ্দেশ্যেই আগত হয়েছে। এই কারণে অন্যদের পরিবর্তে বিশেষভাবে এদের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এর কোন প্রমাণ আয়াতে নেই। কাজেই তার যদি অর্থ গ্রহণ করা হয় তওয়াফ কাজটি, তাহলে وَالْعَاكِفِيْنَ অর্থ হবে সেখানে ইতিকাফকারী লোকগণ। এর দুটি দিক। একটি—সে ইতিকাফ হচ্ছে তাই, যা এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِى الْمَسَاجِدِ। এবং তোমরা মসজিদসমূহের মধ্যে ইতিকাফে অবস্থানকারী। এখানে আল্লাহ্‌র ঘরকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় দিক—মক্কায় অবস্থানকারী লোক। যারা এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। কেননা ইতিকাফ-এর অর্থ হচ্ছে অবস্থান গ্রহণ। عاكفون-এর অর্থ চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকদেরও মনে করা হয়েছে। কেউ বলেছেন মক্কাবাসী লোকগণ। এই সব অর্থই কাবা ঘরকে কেন্দ্র করে। সেই স্থানে অবস্থান ও স্থিতি গ্রহণ।

আবূ বকর বলেছেন, 'তায়েফুন' বলতে যারা বহিরাগতদের বুঝেছেন, তাদের কথাই ঠিক। বোঝা যায় বহিরাগতদের পক্ষে নামাযের তুলনায় তওয়াফই অধিক উত্তম কাজ। আল্লাহ্‌র কথা থেকেই এই তাৎপর্য বোঝা যায় নিঃসন্দেহে ও নিশ্চিতভাবে। এ জন্যে যে, তারা কাবা ঘরের তওয়াফ করাকে উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করেই মক্কায় এসেছে। এখানে ইতিকাফ করা জায়েয, তা-ও এ আয়াত থেকে বোঝা যায়। কেননা আল্লাহ্‌ই العاكفون বলে তার উল্লেখ করেছেন। সেই সাথে সেখানে নামায পড়ার কথার উল্লেখ পাওয়া গেছে। তবে বহিরাগতদের জন্যে কাবা তওয়াফের কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত। অতএব প্রমাণিত হল যে, বহিরাগতদের জন্যে নামযের তুলনায় কাবার তওয়াফ-ই অধিক উত্তম। আর শুধু ইতিফাক—যাতে শুধু অবস্থান গ্রহণ করা হয়, তওয়াফ করা হয় না, তার তুলনায়ও সেই তওয়াফ উত্তম।

ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও আতা থেকে বর্ণিত, বিভিন্ন দেশের লোকদের জন্যে তওয়াফ উত্তম, মক্কার আধিবাসীদের জন্যে নামায উত্তম। তাহলে আয়াতটির অর্থে ও তাৎপর্যে আল্লাহ্‌র ঘরের তওয়াফ শামিল রয়েছে, তা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপায়। তওয়াফকারী বিপুল সওয়াব পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত। বহিরাগতদের জন্যে নামাযের তুলনায় তা-ই অধিক উত্তম। সেখানে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ্‌র ঘরে ইতিকাফ করার চাইতেও অধিক ভালো। বায়তুল্লাহ্‌র অভ্যন্তরে নামায পড়া যে জায়েয তা-ও এ আয়াত থেকে প্রমাণিত। সে নামায ফরয হোক, কি নফল। কেননা আয়াতে দু'ধরনের নামাযের মধ্যে পার্থক্য করার কোন দলীল নেই। কিন্তু ইমাম মালিক এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁর মতে কাবাঘরে ফরয নামায পড়া নিষিদ্ধ। নবী করীম (স) মক্কা বিজয়ের দিন কাবা ঘরের অভ্যন্তরে নামায পড়েছেন, তা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তাহলে অনুরূপভাবে কাবার অভ্যন্তরে নামায পড়া জায়েয হতে পারে, তা নিঃসন্দেহ। তবে রাসূলে করীম (স)-এর সে নামায ছিল নফল নামায। কেননা তিনি যখন কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন, তখন দিনের প্রথম উজ্জ্বল আলোমন্ডিত সময় ছিল। সেটা ফরয নামাযের কোন সময় ছিল না। অনুরূপভাবে মক্কার প্রতিবেশী হওয়াও জায়েয, তা-ও আয়াত থেকে বোঝা যায়। কেননা আল্লাহ্‌র কথা والعاكفين -এর অর্থ যেমন অবস্থান গ্রহণ হতে পারে, তেমনি সেই দৃষ্টিতে প্রতিবেশী হওয়াও বোঝায়। এ-ও বোঝায় যে, নামাযের পূর্বে তওয়াফ হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন পূর্বে উল্লেখ করেছি, হযরত ইবনে আব্বাস সেই ব্যাখ্যাই করেছেন।

যদি বলা হয়, আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ নামাযের পূর্বে তওয়াফ হতে হবে—এই তরতীব-এর কোন প্রমাণ নেই। প্রত্যেকটি কথা 'و' দিয়ে একের পর এক উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। তাতে সেকথা প্রমাণিত হয় না।

জবাবে বলা যাবে, শব্দে তওয়াফ ও নামায উভয়েরই উল্লেখ রয়েছে। আর নামাযের সাথে তওয়াফের উল্লেখ হলে দুটি কারণে নামাযের পূর্বেই তওয়াফ হতে হবে। একটি রাসূলে করীম (স)-এর কাজ। তিনি তা-ই করেছিলেন। আর দ্বিতীয়, ইসলাম বিশেষজ্ঞগণ আগে তওয়াফ করার মতে একত্রিত হয়েছেন।

যা বলেছি সে ব্যাপারে কোন আপত্তিকারী আপত্তি যদি এই তোলেন যে, কাবা ঘরের অভ্যন্তরে নামায পড়া জায়েয—একথা আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় বলে তুমি দাবি করেছ। কিন্তু ব্যবহৃত শব্দে তো সে কাজের কোন প্রমাণ নেই ? কেননা আয়াতে ঘরের মধ্যে রুকূ-সিজাদা করার কথা বলা হয়নি। আর কাবা ঘরের ভেতরে যেমন তওয়াফ জায়েয হওয়ার কথা বোঝায় না, তা ঘরের বাইরে করারই প্রমাণ রয়েছে, তেমনি কাবার দিকে মুখ করেই নামায পড়ার কথা বোঝায়, নামায কেবল সে ভাবেই জায়েয।

এর জবাবে বলা যাবে—আল্লাহ্‌র কথা ঃ তোমরা দুজন আমার ঘর পবিত্র-পরিচ্ছন্ন রাখ তওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকূ-সিজদাকারীদের জন্যে—এতেই কাবাঘরের মধ্যে নামায পড়ার দাবি নিহিত রয়েছে। ঠিক যেমন কাবার মধ্যে ইতিকাফ করা জায়েয বোঝায়। তওয়াফ অবশ্য এর বাইরে করারই বিধান। এ বিষয়ে সকলেরই ঐকমত্য রয়েছে। তা ছাড়া ঘরের তওয়াফ হয় তার চারপাশে প্রদক্ষিণ করলে। ঘরের বাইরে এই কাজটি হতে হবে। ঘরের পেটের মধ্যে এই কাজ করলে তাতে ঘরের তওয়াফ হতে পারে না। অথচ আল্লাহ্ আমাদেরকে ঘরের তওয়াফ করতে বলেছেন, তার মধ্যে তওয়াফ করতে বলেন নি। আল্লাহ্ কথা ঃ

وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ –

তারা যেন অবশ্যই এই মহান-প্রাচীন ঘরের চারপাশে তওয়াফ করে।

যে লোক কাবার ভেতরে নামায পড়ল, তার এই নামায আয়াতের মধ্যে পড়ে। কেননা তার মধ্যে তো নামায পড়া হয়েছে। আর ঘরের দিকে মুখ করে নামায পড়া যদি অর্থ হয়, তা হলে বলা যাবে যে, রুকূকারী-সিজদাকারীদের জন্যে ঘরকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন রাখার কথা বলার কোন কারণ ছিল না। কেননা ঘরে উপস্থিত এবং যারা তার বাইরে, তারা ঘরের দিকে মুখ করার জন্যে সমানভাবে আদিষ্ট। আর জানা-ই আছে যে, তাকে পবিত্র করে রাখার আদেশ তো দেয়া হয়েছে যারা সেখানে উপস্থিত, কেবল তাদের জন্যে। বোঝা গেল, সেকথা বলে তার প্রতি মুখ করে দাঁড়ানোর কথা-ই বলা হয়নি, তাতে নামায পড়ার কাজ ব্যতীত।

লক্ষণীয়, আয়াতে মূল ঘরটিকে রুকূকারী-সিজদাকারীদের জন্যে পবিত্র রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে তুমি যদি বল যে, নামায ঘরের বাইরে পড়তে হবে, তাহলে ঘরের চারপাশ পবিত্র রাখার নির্দেশ দেয়া হতো, মূল ঘর নয়। এমতাবস্থায় ব্যবহৃত শব্দ যখন উভয় অর্থের সম্ভাব্যতার ধারক, তখন উভয় অর্থই গ্রহণ করা উচিত। মনের করা উচিত যে, এই উভয় কথাই বলতে চেয়েছেন। তখন নামায ঘরের বাইরে ও ভেতরে—উভয় স্থানেই জায়েয মনে করতে হয়।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্ যেমন বলেছেন, 'অবশ্যই তওয়াফ করা কর্তব্য এই প্রাচীনতম ঘরের' তেমনি বলেছেন ঃ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ –

অতএব মসজিদে হারামের দিকে মুখ করে দাঁড়াও। আর যেখানেই তোমরা থাক না কেন, সেখানেই তোমাদের মুখসমূহ সেদিকে ফিরাও।

এ কথার দাবি হচ্ছে, নামায ঘরের বাইরে পড়তে হবে। তবেই-না সেদিকে মুখ করে দাঁড়ানো সম্ভব।

জবাবে বলা যাবে, শব্দের মূল অর্থের দৃষ্টিতে মসজিদে হারামের মধ্যে নামায জায়েয নয়। কেননা আয়াতে মসজিদে হারামের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে বলা হয়েছে। এক্ষণে নামায যদি মসজিদে হারামের ভেতরে পড়া হয়, তাহলে 'মসজিদে হারামের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো' হয় না। আর মসজিদে হারাম বলতে যদি কাবাঘর বোঝানো হয়েছে বলা হয়, যেহেতু সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, মসজিদে হারামের দিকে মুখ করতে বলা হয়েছে বলে কাবা ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো হয়নি, তাই নামায বৈধ হয়নি।'

জবাবে বলা হবে, যে লোক কাবাঘরের ভেতরে, সেও কাবাঘরের মুখী। কেননা ঘরের মধ্যে যে ঘরের পার্শ্ব রয়েছে, তা-ও তো ঘরই। তাই ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে নামায পড়লে ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো হল। কেননা যে লোক ঘরের বাইরে, সে যখন ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ায়, তখন সে ঘরের একটি পার্শ্বই সম্মুখে রাখতে পারে, সমগ্র ঘরটির দিকে মুখ করতে পারে না। অনুরূপভাবে যে লোক ঘরের ভেতরে, সে নিঃসন্দেহে ঘরের দিকেই মুখ করে আছে। অতএব তার কাজটা উভয় আয়াতের সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন। দুটি আয়াত ঃ "আমার ঘর 'তওয়াফকারী-ইতিকাফকারী' রুকূ-সিজদাকারীদের জন্যে পবিত্র রাখ" এবং 'এতএব তোমার মুখ মসজিদে হারামের দিকে নিবদ্ধ কর'—অনুযায়ী এক সঙ্গে আমল করা হল। কেননা পূর্বেই বলেছি, যে লোক ঘরের ভেতরে, সে ঘরের একটি পার্শ্বের দিকে মুখ করে আছে, তেমনি মসজিদে হারামের দিকেও মুখ করে আছে।

আবূ বকর বলেছেন, উক্ত আয়াতে যে তওয়াফের কথা বলা হয়েছে, তা সাধারণ ও নির্বিশেষ। ফরয, ওয়াজিব, মুস্তাহাব—যে তওয়াফই করা হোক না কেন। কেননা এই ধরনের তওয়াফ আমাদের মতে এই তিন প্রকারেরই হতে পারে। ফরয হচ্ছে তওয়াফে যিয়ারত। এরই নির্দেশ রয়েছে এ আয়াতে ঃ

وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ –

অবশ্যই তওয়াফ করবে প্রাচীনতম মহান ঘরের।

ওয়াজিব হচ্ছে তওয়াফে সদর। এই তওয়াফ যে ওয়াজিব, তা সুন্নাত থেকে প্রমাণিত। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ اٰخِرَ عَهْدِهٖ بِالْبَيْتِ الطَّوْفُ –

যে লোক আল্লাহ্‌র ঘরের হজ্জ করেছে, ঘরের সাথে তার শেষ বিদায়ী কর্ম হবে তওয়াফ।

আর মসনুন ও মুস্তাহাব তওয়াফ—যা ওয়াজিব নয়—হচ্ছে তওয়াফে কুদুম। হজ্জের জন্যে গমণ করার ও মক্কায় উপস্থিতির জন্যে এই তওয়াফ। নবী করীম (স) যখনই হাজী

হিসেবে মক্কায় উপস্থিত হয়েছেন, তখনই এই তওয়াফ করেছেন। আর তওয়াফে যিয়ারত তার কোন বিকল্প নেই। হাজী স্ত্রী থেকে মুহরিম থাকবে ও শেষে এই তওয়াফ করবে। আর তওয়াফে সদর না করলে একটি (জন্তু যবেহ) করতে হবে হাজী যদি তার পরিবারবর্গের নিকট ফিরে আসে তওয়াফ না করে, তা হলেই এই 'দম' দিতে হবে। তওয়াফে সদর না করলে সেজন্যে কিছুই করতে হবে না।

আল্লাহ্ই তাঁর বিধান সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী।

## তওয়াফ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা

আবূ বকর বলেছেন, তওয়াফের পর সাঈ سعى রয়েছে এবং তাতে 'রমল' করতে হবে প্রথম তিন বারে। যে তওয়াফের পর সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করা হয় না, তাতে 'রমল' করতে হবে না। প্রথম যেমন তওয়াফে কুদুমে তওয়াফের পর 'সাঈ' করতে প্রস্তুত হবে, আর তওয়াফে যিরারত তা-ই, যার পর সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করা হয় না। তা করা হয় যখন একজন মক্কায় উপস্থিত হয়। প্রথম উপস্থিত হওয়ার পর যদি সাঈ করে থাকে তওয়াফে কুদুমের পর, তাহলে তাতে 'রমল' করতে হবে না। উমরার তওয়াফে অবশ্য রমল করতে হয়। কেননা এই তওয়াফের পরই তো সাফা মারওয়ার মাঝে সাঈ করা হয়, নবী করীম (স) হাজী হিসেবে যখন মক্কায় এসেছেন, তখন তিনি রমল করেছেন। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও ইবনে আব্বাস এবং একটি বর্ণনায় আতা নবী করীম (স)-এর এই কথার বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনে উমর বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) তিনবারে হাজ্জরে আস্ওয়াদ থেকে শুরু করে হাজরে আস্ওয়াদ পর্যন্ত 'রমল' করেছেন। উমর ইবনে মাসউদ ও ইবনে উমর থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। তাতে উক্তরূপ কথাই বলা হয়েছে। আবূত তুফায়ল ইবন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) রুকনে ইয়ামনী থেকে রমল করেছেন। পরে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত সহজভাবে চলেছেন। আনাস ইবনে মালিকও নবী করীম (স) সম্পর্কে অনুরূপ কথা বর্ণনা করেছেন। একটু বিবেচনা করলেই বোঝা যাবে, প্রাথমিক বর্ণনাকারিগণ যেমন পূর্বে তাদের মতৈক্যের কথা বর্ণনা করেছেন যে, এই শেষ চারবারের তওয়াফে স্বাভাবিকভাবে বলেছেন, তা-ই যথার্থ মনে হয়। তবে প্রথম তিনবারের তওয়াফে অভিন্নভাবে রমল করতে হবে কা'বার চারপাশেই। কেননা তওয়াফ সংক্রান্ত গোটা বিধানে ঘরের চারপাশেই সহজভাবে চলা ও রমল করার হুকুমে কোন পার্থক্য নেই মূলগতভাবে। তবে রমল করার সুন্নাত এখনও কার্যকর কিনা—এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী ফিকাহবিদগণদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কিছু সংখ্যক লোক বলেছেন, নবী করীম (স) যখন তা করেছিলেন, সেই সময়ই তা করা সুন্নাত ছিল। 'রমল' করে কাযা উমরায় মুশরিকদের সম্মুখে মুসলমানদের শক্তি, স্বাস্থ্যের প্রাখর্য প্রকাশ করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। কেননা মুশরিকরা বলে বেড়াচ্ছিল যে, মদীনায় মুসলমানরা জ্বর রোগে আক্রান্ত হয়ে নেহায়েত কাবু ও শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। এই কারণে নবী করীম (স) মুসলমানগণদের শক্তি-সামর্থ্য প্রকাশ করতে বলেছিলেন, যেন তারা তা দেখে তাদের প্রতি কোন হীন

কামনা পোষণ না করে। যায়দ ইবনে আসলাম তাঁর পিতার সূত্রে বলেছেন, ‘উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে আমি বলতে শুনেছি, ‘এখানে আর রমল এবং কাঁধযোলা রেখে ইহরাম করা কিসের জন্যে ? আল্লাহ্‌ তো ইসলামকে বিজয়ী করেছেন। কুফর ও কাফিরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কৃত করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাসূলে করীম (স)-এর সঙ্গে মিলে আমরা যে যে কাজ করেছি, তার কোনটিই আমরা ত্যাগ করব না।’

আবূত-তুফায়ল ইবনে আব্বাসকে সম্বোধন করে বললেন ঃ তোমার লোকজন মনে করে, রাসূল (স) কাবার চারপাশের তওয়াফে ‘রমল’ করেছেন এবং তা করা সুন্নাত। জবাবে তিনি বললেন, কথাটিতে সত্যও আছে, মিথ্যাও আছে। রাসূলে করীম (স) ‘রমল’ করেছেন, তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু তা করা সুন্নাত নয়।

আবূ বকর বলেছেন, আমাদের হানাফী মাযহাবে তা প্রমাণিত সুন্নাত। তা ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয় নয়। যদিও নবী করীম (স) তখনকার সময়ে মুশরিকদের সম্মুখে মুসলমানদের সুস্বাস্থ্য ও শক্তি-সামর্থ্য দেখানো ও প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই তা করেছিলেন। কেননা একথা বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (স) বিদায় হজ্জে রমল করেছেন। তখন তো আর কোন মুশরিক মক্কায় ছিল না। হযরত আবূ বকর, উমর, ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর প্রমুখ সাহাবী (রা)ও তা করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, ‘রমল’ করার হুকুম এখনও বহাল রয়েছে। মূলত যে কারণটির উল্লেখ করা হয় ‘রমল’ করার জন্যে, তার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তাহলে তো হুকুম থাকার কোন প্রশ্ন উঠে না। জমরাতে প্রস্তর নিক্ষেপ ব্যবস্থার কারণ হিসেবে বলা হয় যে, ইবলীশ শয়তান এখানে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র কুরবানীর কাজে বাধ দেয়ার জন্যে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল। তিনি তাকে তাড়ানোর জন্যেই এই প্রস্তর নিক্ষেপ করেছিলেন। পরে প্রস্তর নিক্ষেপ স্থায়ী সুন্নাতরূপে গৃহীত ও চালু হয়ে যায়। যদিও সেই কারণটি এখন আর বহাল নেই। তেমনি সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করার কারণ হিসেবে বলা হয় যে, হযরত ইসমাঈলের মা পানির সন্ধানে মারওয়ার উপরে চড়ে গিয়েছিলেন। পরে সেখান থেকে নেমে আসেন। উপত্যকার গর্ভে তিনি দৌড় দিয়েছিলেন। কেননা বাচ্চা ইসমাঈল তখন তার চোখের আড়ালে পড়ে গিয়েছিলেন। পড়ে যখন উপত্যকা থেকে উপরে এলেন, তখন তিনি বাচ্চাকে দেখতে পেলেন। তাই তখন তিনি স্বাভাবিকভাবে চলেছেন। কেননা তখন বাচ্চাকে দেখতে পাচ্ছিলেন। পরে মারওয়ার উপরে উঠেছেন পানির সন্ধানে। এভাবে সাতবার উঠা-নামা করেছেন দুই পাহাড়ের মাঝে। এই কারণে পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করা সুন্নাত হিসেবে রেওয়াজ পেয়ে যায়। সেই সাথে উপত্যকার গর্ভে দ্রুত চলাও সুন্নাতরূপে গৃহীত। যদিও যে কারণে তিনি তা করেছিলেন, তা এখনে আর অবশিষ্ট নেই। তওয়াফে ‘রমল’ করার ব্যাপারটিও অনুরূপ।

আমাদের হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, রুকনে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামনী চুম্বন করা যাবে। এ ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ কথা ইবনে উমর সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস থেকেও এরূপ বর্ণনা এসেছে। হযরত আয়েশা (রা)-এর কথা ‘হাজরে আসওয়াদের কিছুটা অংশ ঘরের মধ্যে শামিল’ ইবনে উমরকে জানালে তিনি

বললেন—আমি মনে করি না যে, নবী করীম (স) এই দুটির চুম্বন ত্যাগ করেছেন, তবে সে দুটি ঘরের প্রাচীরের মধ্যে নয়। হাজরে আসওয়াদের বাইরে, লোকেরা এজন্যেই তওয়াফ করে। ইয়ালা ইবনে উমায়া বলেছেন, আমি হযরত উমরের সঙ্গে তওয়াফ করেছি। হাজরে আসওয়াদের সাথে মিলিত রুকনের নিকট যখন আমরা পৌছলাম তখন আমি সেটি চুম্বন করতে লাগলাম। তখন তিনি বলেছেন, তুমি কি রাসূলে করীম (স)-এর সাথে মিলে তওয়াফ করেছ ? বললাম—হ্যাঁ, বললেন—তুমি কি তাঁকে রুকনে ইয়ামনী চুম্বন করতে দেখেছ ? বললাম—না। তখন তিনি বললেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ –

নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসূলের অতীব উত্তম আদর্শ রয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا اٰمِنًا –

ইবরাহীম (আ) যখন বললেন—হে রব্ব! তুমি এই শহরটিকে শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ বানিয়ে দাও।

আয়তটির দুটি দিক হতে পারে। একটি হচ্ছে, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা। যেমন অন্য প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ 'উত্তম-সন্তুষ্টিপূর্ণ জীবনে' ..... অর্থাৎ 'সন্তুষ্টিপূর্ণ সুখের জীবন।' আর দ্বিতীয়—শহরবাসীদের শান্তি নিরাপত্তা। যেমন আল্লাহ্ وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ 'জনপদকে জিজ্ঞাসা কর'-এর অর্থ জনপদের অধিবাসীদের জিজ্ঞাসা কর।' এটা পরোক্ষ কথন। কেননা নিরাপত্তা বা ভীতি নগরের সাথে সংশিষ্ট নয়, যারা সেখানে বসবাস করে, তাদের সাথেই সংশ্লিষ্ট হয়।

এ আয়াতে যে শান্তি-নিরাপত্তার প্রার্থনা করা হয়েছে, তার তাৎপর্য কি, সে পর্যায়ে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। অনেকে বলেছেন, এতে দুর্ভিক্ষ ও শুষ্কতা থেকে নিরাপত্তা ও সুরক্ষার প্রার্থনা করা হয়েছে। কেননা এখানে লোকবসতি হয়েছে এমন অবস্থায় যে, তথায় না আছে চাষাবাদ—কৃষি ফসল না জন্তুর স্তন ভরা দুগ্ধ। ধ্বস ও ক্ষেপণ থেকে নিরাপত্তার প্রার্থনা নিশ্চয়ই করা হয়নি। কেননা মক্কা নগর এসব থেকে স্বভাবতই নিরাপত্তাপূর্ণ ছিল, সেজন্যে প্রার্থনার প্রয়োজন ছিল না। অন্যরা বলেছেন, এ দুটি জিনিস থেকে এক সাথে নিরাপত্তার প্রার্থনা করা হয়েছে ঃ

আবূ বকর বলেছেন, উক্ত প্রার্থনাসূচক কথাটি ঠিক এইরূপ, যেমন বলা হয়েছে مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا লোকদের আগমন-নির্গমনের কেন্দ্র এবং শান্তি নিরাপত্তাপূর্ণ। যেমন বলা হয়েছে ঃ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا যে লোক সেখানে প্রবেশ করবে, নিরাপত্তাপূর্ণ হয়ে যাবে। এ পর্যায়েরই হচ্ছে এই প্রার্থনা ঃ 'হে রব্ব, এই শহরটিকে শান্তিপূর্ণ বানাও।' এর তাৎপর্য আল্লাহ-ই ভালো জানেন। তবে আমরা মনে করি, মারামারি থেকে নিরাপত্তার প্রার্থনা করা হয়েছে। আর এই প্রার্থনার সঙ্গে মিলিয়ে সেখানকার অধিবাসীদেরকে ফল ও ফসলের রিযিক দেয়ার প্রার্থনা করেছেন। কেননা পূর্ণ আয়াতটি হচ্ছে ঃ

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ -

হে রব্ব! এই শহরটিকে শান্তি-নিরাপত্তাপূর্ণ বানাও এবং এখানকার অধিবাসীদেরকে ফল-ফসলের রিযিক দাও।

আর শান্তি-নিরাপত্তার প্রার্থনার পর-পরই এই দো'আও করা হয়েছে ঃ

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ -

এবং আমাকে ও আমার বংশধরকে মূর্তিপূজা থেকে রক্ষা কর।

মূল কাহিনী বর্ণনা পর্যায়ে একথাও বলা হয়েছে ঃ

رَبَّنَا اِنِّيْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ -

হে আমাদের রব্ব! আমি আমার সন্তানের একাংশকে পুনর্বাসিত করেছি তোমার মহাসম্মানিত ঘর সংলগ্ন কৃষি-ফসলহীন উপত্যকায়।

তারপর বলা হয়েছে ঃ

وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ -

এবং তাদেরকে ফল-ফসলের রিযিক দাও।

অর্থাৎ তিনি নিরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গে ফল-ফসলের রিযিক দেয়ারও দো'আ করেছিলেন। কাজেই কাহিনীর শুরুতে যে শান্তি-নিরাপত্তার প্রার্থনা করা হয়েছিল এবং তার সঙ্গে মিলিয়ে রিযিক বিষয়েও প্রার্থনা করা হয়েছে, শেষ পর্যায়ের নিরাপত্তার প্রার্থনার একটা নতুন তাৎপর্য হওয়া আবশ্যক।

কেউ যদি বলে, এই শহরের রক্তপাত থেকে নিরাপত্তা প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র হুকুম হযরত ইবরাহীমের উক্ত দো'আরও বহু পূর্বেই কার্যকর হয়েছে। সেজন্যে নতুন করে দো'আ করার প্রয়োজন ছিল না। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মক্কাকে 'হরম' বানিয়েছেন আসমান-জমিন সৃষ্টির দিনই। আমার পূর্বে এখানে রক্তপাত অন্য কারোর জন্যেই হালাল করা হয়নি। আর আমার পরেও কারোর জন্যেই তা হালাল করা হবে না, আমার জন্যেও হালাল করা হয়েছে অল্পক্ষণের জন্যে মাত্র।'

এর জবাবে বলা যাবে, উক্ত কারণে পরবর্তীতে নতুন করে শান্তি নিরাপত্তার জন্যে প্রার্থনা করার যৌক্তিকতা নিষিদ্ধ হয়ে যায় না। কেননা তথায় রক্তপাত ও যুদ্ধ হারাম হওয়ার হুকুম কখনো মনসুখও হয়ে যেতে পারে, তা অসম্ভব কিছু নয়, নয় কিছুমাত্র অসঙ্গত। তাই হযরত ইবরাহীম (আ) এই হুকুমেরই স্থায়িত্ব ও নিরবচ্ছিন্নতারই প্রার্থনা করেছেন মাত্র, পরবর্তী নবী-রাসূলগণের মুখেও সেই একই প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করানোর জন্যে। তাছাড়া কোন লোকও বলতে পারে যে, এ শহর 'হারাম' ছিল না। নিরাপত্তাপূর্ণও

ছিল না ইবরাহীমের প্রার্থনার পূর্বে। কেননা নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, "ইবরাহীম (আ) মক্কাকে 'হরম' বানিয়েছেন এবং আমি মদীনাকে 'হরম' বানিয়েছি।" নবী করীম (স) থেকে আরও বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যাতে বলা হয়েছে যে, মক্কাকে আসমান-জমিন সৃষ্টির দিনই আল্লাহ্ 'হরম' করেছেন। আমার পূর্বে তা কারোর জন্যেই হালাল করা হয়নি, আমার পরও কারোর জন্যেই তা 'হালাল' হবে না। রাসূলের এই কথাটি উক্ত কথার তুলনায় অধিক সহীহ, অধিক শক্তিশালী। তা সত্ত্বেও তাঁর পূর্বে মক্কা নগর 'হরম' ছিল না—একথার কোন প্রমাণ নেই। কেননা তার পূর্বেই ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্‌র 'হরম' করণের ভিত্তিতে 'হরম' করেছিলেন। তিনি এই ব্যাপারে আল্লাহ্‌র অনুসরণ করেছেন মাত্র। ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বেও তা 'হরম' ছিল না, অন্য কোন দিক দিয়ে, যে দিকের নিরাপত্তার জন্যে হযরত ইবরাহীম (আ) দো'আ করেছিলেন—এরও কোন দলীল নেই। প্রথম দিকটি কার্যকর হয়েছে সেখানকার অধিবাসীদের শান্তি-নিরাপত্তার দ্বারা, তাদের নিয়ে ধ্বসনামা ও আসমানী বিপদ নিক্ষিপ্ত না হওয়ার দরুন। অথচ এসব বিপদ অন্যদের উপর এসেছে। তাছাড়া জনমনে তার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি, সম্ভ্রমবোধ ও তার দাপটের ভীতির দ্বারা। আর দ্বিতীয় দিকটি কার্যকর হয়েছে আল্লাহ্‌র রাসূলগণের মুখে সেখানের নিরাপত্তার হুকুম দ্বারা। আল্লাহ্ এই প্রার্থনার জবাব দিয়েছেন, তা কবুল করেছেন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَمَنْ كَفَرَ আর যে কুফর করেছে, (তাকেও রিযিক দেয়া হবে) ইবরাহীম (আ)-এর দো'আর জবাবের মধ্যে এই কথাটুকুও রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ ইবরাহীম (আ)-এর দো'আ অনুযায়ী কাজ করবেন অধিবাসীদের মধ্যে যারা দুনিয়ায় কুফর অবলম্বন করবে তাদের সাথেও। কেননা ইবরাহীম (আ)-এর দো'আ ছিল বিশেষ করে কেবলমাত্র ঈমানদার লোকদের জন্যে। তাঁর এই দো'আ কবুলের অংশ হিসেবে এই কথাটিও উচ্চারিত হয়েছে। এই অগ্রিম সংবাদ দানের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কাফিরদেরও তিনি সামান্য বা স্বল্প পরিমিত রিযিক দেবেন। এখানে 'وَ' অক্ষরটি ব্যবহৃত না হলে বলা যেত যে, একটি প্রথম কথা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কথা এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দো'আ কবুলের সাথে এই কথার কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ্‌র কথা ঃ أُمَتِّعُهُ 'আমি তাদের জীবনোপকরণ দেব' এর অর্থ সেই জীবন-উপকরণ দেব, যা তাদের মৃত্যু পর্যন্ত সাধারণভাবে দিয়ে থাকি। অন্যদের মতে সে জীবন-উপকরণ দুনিয়ার স্থায়ী রাখব। হাসান বলেছেন ঃ আমি তাদেরকে রিযিক ও নিরাপত্তার উপকরণাদি দেব মুহাম্মাদ (স)-এর আগমন পর্যন্ত। তখন যদি তারা কুফরীর উপর অবিচল হয়ে থাকে, তাহলে তিনি ওদের হত্যা করবেন। অথবা মক্কা থেকে তাদেরকে নির্বাসিত করে দেবেন। ফলে আয়াতে সেই লোকদের হত্যা করা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে, যারা মক্কায় আশ্রয় নিয়েছে। এই কথাটির দুটি দিক। একটি ঃ 'হে রব্ব! তুমি এই নগরটিকে নিরাপত্তাপূর্ণ বানাও' দো'আ। এই দো'আ আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হয়েছে। আর দ্বিতীয় হচ্ছে আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'আর যে কুফর করবে তাকে আমি স্বল্প পরিমিত জীবন-উপকরণ দেব'। এতে জীবনের শেষ পর্যন্ত জীবন-উপকরণ দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ -

স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম এবং ইসমাঈল আল্লাহ্‌র ঘরের প্রাচীর গড়ে উচ্চে তুলছিলেন ... অর্থ ঘরের ভিত্তি বা প্রাচীরসমূহ।

ইবরাহীম (আ)-এর কাবাঘর নির্মাণের ব্যাপারে বিভিন্ন কথা রয়েছে। তিনি কি তার প্রাচীন ভিত্তির উপর তা নির্মাণ করছিলেন কিংবা তিনি নতুন করে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে তার উপর নির্মাণ করেছিলেন—এই প্রশ্ন প্রকট। মামর আয়ূব, সাঈদ ইবনে যুবায়র, ইবনে আব্বাস সূত্রে উক্ত কথাটির পর্যায়ে বর্ণনা করেছেন, এই ভিত্তি ও প্রাচীর তারই উপর নির্মাণ করছিলেন, যা পূর্বে ভিত্তি ও প্রাচীর ছিল। আতা-থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে। মনসূর মুজাহিদ আবদুল্লাহ ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ

خَلَقَ اللّٰهُ الْبَيْتَ قَبْلَ الْاَرْضِ بِاَلْفَىْ عَامٍ ثُمَّ دُحِيَتِ الْاَرْضُ مِنْ تَحْتِهِ -

আল্লাহ পৃথিবীর দুই হাজার বছর পূর্বে কাবাঘর সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর এই ঘরের নিচেই পৃথিবী বিছিয়ে দেয়া হয়েছে।

আনাস থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَحُجُّ الْبَيْتَ قَبْلَ اٰدَمَ، ثُمَّ حَجَّهُ اٰدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ -

আদম (আ)-এর পূর্বে ফেরেশতাগণ এই ঘরের হজ্জ করতেন। তার পরে আদম (আ) হজ্জ করেছেন।

মুজাহিদ ও আমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত হয়েছে, ইবরাহীম (আ) বিশেষভাবে আল্লাহ্‌র আদেশানুক্রমে এই ঘরকে উদ্ভাবন করেছেন। হাসান বলেছেন ঃ

এই ঘরের সর্বপ্রথম হজ্জ করেছেন ইবরাহীম (আ)। এ দুজনের মধ্যে ঘরের আসল নির্মাতা কে, সে বিষয়ে নানা মত রয়েছে। ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইবরাহীম (আ)-ই এই ঘর নির্মাণ করেছিলেন। আর ইসমাঈল (আ) তাঁকে পাথর যোগাড় করে দিচ্ছিলেন। এই দৃষ্টিতে ইবরাহীম ও ইসমাঈল উভয়ই নির্মাণ কাজ করেছেন—বলা সঙ্গত। যদিও একজন অপর জনের সাহায্যকারী ছিলেন এই কাজে। নবী করীম (স) হযরত আয়েশা (রা)-কে বলেছিলেন ঃ তুমি যদি আমার পূর্বে মৃত্যুবরণ কর, তাহলে আমি সাহায্য করতাম। (ঠিক গোসল করাতাম নয়)। সুদ্দী ও উবায়দ ইবনে উমায়র বলেছেন, তাঁরা দুজন একত্র হয়েই কাবা ঘরের নির্মাণের কাজ করেছেন। একটি বিরল বর্ণনায় বলা হয়েছে, ইবরাহীম (আ) এককভাবে কা'বার প্রাচীর গড়ে তুলেছেন। প্রাচীর নির্মাণ সময়ে ইসমাঈল ছিলেন খুব ছোট বয়সের। কিন্তু এ কথাটি ভুল। কেননা আল্লাহ নির্মাণের

কাজটি তাঁদের দুজনের বলে উল্লেখ করেছেন। এ কথাটি যথার্থ হতে পারে যদি তাঁরা দুজন-ই নির্মাণ কাজে সমানভাবে শরীক হয়ে থাকেন। কিংবা একজন নির্মাণ করবেন, আর অপরজন সে নির্মাণের জন্যে পাথর যোগাড় করে দেবেন। প্রথম উল্লিখিত দুটি দিক-ই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু তৃতীয় দিকটি সঙ্গত নয়।

এর আরও একটি কারণ হল, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'তোমরা দুজন আমার ঘরটি পবিত্র-পরিচ্ছন্ন করে রাখ।' অপর আয়াতে বলেছেন ঃ 'অবশ্যই তওয়াফ করতে হবে এই প্রাচীন মহিমান্বিত ঘরের।' দুটি আয়াতেরই দাবি হচ্ছে, তওয়াফ করতে হবে সেটা কাবা ঘরের। হিশাম ওরওয়া তাঁর পিতা সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি বলেছেন—রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ 'জাহিলিয়াতের (ইসলামের পূর্বের) লোকেরা কাবা নির্মাণে সংকীর্ণতার আশ্রয় নিয়েছে। হাজরে আসওয়াদকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে, তার সাথে মিলিয়ে দিয়েছে। এ কারণে নবী করীম (স) এবং তাঁর সাহাবিগণ হাজরে আসওয়াদের চারপাশে তওয়াফ করেছেন। যেমন সমগ্র ঘরটির তওয়াফ করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় অর্জন করা যায়। ইবনুয যুবায়র-ও ঘর নির্মাণকালে 'হাজর'টিকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি এই ঘরের পুনর্নির্মাণ করেছিলেন সেটিকে জ্বালিয়ে দেয়ার পর। কিন্তু পরে হজ্জাজ ইবনে ইউসুফ এসে সেটি বাইরে স্থাপন করেছেন।

আল্লাহ্র কথা ঃ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا 'হে আমাদের রব্ব! তুমি আমাদের নিকট থেকে এই কাজ কবুল করে নাও।'

অর্থাৎ তাঁরা দুজন-ই এই দো'আ করেছিলেন। এই কথাটি ঠিক সেইরূপ, যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

وَالْمَلٰئِكَةُ بَاسِطُوْآ اَيْدِيْهِمْ اَخْرِجُوْآ اَنْفُسَكُمْ – (الانعام – ٩٣)

আর ফেরেশতাগণ তাদের হস্তসমূহ প্রসারিত করে করে বলতে থাকে—তোমাদের জান বের করে দাও।

কবুল করা অর্থ, কাজের জন্যে সওয়াব দেয়া। এ থেকে বোঝা যায়, মসজিদ নির্মাণের কাজটি আল্লাহ্র নৈকট্য বিধায়ক। কেননা তারা দুজন কাবা নির্মাণ করেছেন আল্লাহ্র জন্যে। তাই এই কাজে তাঁরা সওয়াব পাওয়ার অধিকারী হয়েছেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন। ঠিক এই কথাটিই নবী করীম (স) তাঁর ভাষায় বলেছেন ঃ

مَنْ بَنَى مَسْجِدً وَلَوْ مِثْلَ مَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِىْ الْجَنَّةِ –

যে লোক কোন মসজিদ নির্মাণ করল তা বালুর স্তুপের মত হলেও আল্লাহ্ তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।

আল্লাহ্র কথা ঃ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا 'এবং আমাদের ইবাদতের নিয়মাবলী আমাদেরকে জানিয়ে দাও।' বলা হয়, نُسُك এর মূল আভিধানিক অর্থ الغسل। ধৌত

করা। যেমন বলা হয় نَسَكَ ثَوْبَهُ 'সে তাঁর কাপড় ধৌত করেছে।' আর শরীয়াতের পরিভাষায় نُسُكٌ ইবাদতের নাম। বলা হয় رَجُلٌ نَاسِكٌ 'ইবাদতকারী ব্যক্তি'। বরা ইবনে আজেব বলেছেন, নবী করীম (স) কুরবানীর দিন ঘরের বাইরে এলেন। তখন তিনি বললেন ঃ

اِنَّ اَوَّلُ نُسُكِنَا فِيْ هَذَا الْيَوْمِ الصَّلَاةَ ثُمَّ الذَّبْحُ –

আজকের দিনে আমাদের প্রথম ইবাদত হচ্ছে নামায, তার পরে জন্তু যবেহ করা।

এ কথাটিতে নামায ও যবেহ করাকে نسك বলা হয়েছে। তা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ অর্থে, তার নাম দেয়া হয়েছে نسك ; আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْصَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ –

তাহলে ফিদিয়া দিতে হবে রোযা থেকে; কিংবা সাদকা দিয়ে অথবা কোন ইবাদত করে।

অর্থাৎ ছাগল যবেহ এবং হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠানই হচ্ছে 'মানাসিক'। এর তাৎপর্য নবী করীম (স) যখন মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন, তখন বলেছিলেন ঃ خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ 'হজ্জের ব্যাপারে যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি এবং তার নিয়ম-কানুন আমার নিকট থেকে জেনে নাও।' পূর্বোক্ত 'আমাদের মানাসিক আমাদেরকে দেখাও' এ কথারই বাস্তব প্রতিধ্বনি। এর মধ্যে হজ্জ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম শামিল। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁদের দুজনকে হজ্জের জন্যেই কাবাঘর নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইবনে আবূ লায়লা ইবনে আবূ মুলায়কা, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন—জিবরাঈল ইবরাহীম (আ)-এর নিকট উপস্থিত হল। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা পর্যন্ত গেলেন, তার পরে 'মিনা'তে উপস্থিত হলেন। তাঁকে জানিয়ে দিলেন হজ্জের যাবতীয় কার্যাদি, ঠিক সেই ভাবেই, যেভাবে এই কাজসমূহ নবী করীম (স) সম্পন্ন করেছেন তাঁর হজ্জে। পরে আল্লাহ তাঁর নবীর প্রতি ওহী পাঠালেন। বললেন ঃ

اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا –

তুমি সর্ব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ইবরাহীমের আদর্শ অনুসরণ কর।

অনুরূপভাবে নবী করীম (স) আরাফাতে তাঁর পরে অবস্থানকারী লোকদের নিকট লোক পাঠিয়েছিলেন। তিনি মক্কায় অবস্থানকারী ছিলেন। বলিয়েছিলেন ঃ তোমরা তোমাদের হজ্জের কার্যাবলী আঞ্জাম দাও। কেননা তোমরা ইবরাহীমের উত্তরাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ –

ইবরাহীমের মিল্লাত থেকে বিমুখ ও তার প্রতি অনাগ্রহী যে-ই হবে, সে তো সে-ই, যে নিজেকে নির্বোধ বানিয়েছেন।

এ আয়াত ইবরাহীমী শরীয়াতে তাঁর অনুসরণ বাধ্যতামূলক বানিয়ে দিয়েছে। তবে এখনো যা মনসুখ বা নাকচ হয়ে যায়নি, শুধু তা-ই মানতে হবে। এ থেকে একথাও বোঝা গেল যে, যে লোক মুহাম্মাদ (স)-এর 'মিল্লাত' থেকে বিমুখ হবে, সে ইবরাহীম (আ)-এর মিল্লাত থেকেও বিমুখ এবং তার অনুসারী নয়। কেননা মুহাম্মাদ (স)-এর মিল্লাত ইবরাহীম (আ)-এর মিল্লাতেরই আধুনিক সংস্করণ এবং তার উপর বাড়তিও।

## দাদার মীরাস

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ - قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَاءِكَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا -

ইয়াকুবের নিকট যখন মৃত্যু উপস্থিত হল, তখন সে তার পুত্রদের বলল ঃ আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে ? তারা বলল ঃ আমরা ইবাদত করব তোমার যিনি ইলাহ তাঁর, যিনি তোমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক-এর এক ও একক ইলাহ, তাঁর।

আয়াতটিতে দাদা ও চাচা সকলকেই 'পিতা' (اب) বলে অভিহিত করা হয়েছে। ইউসুফ (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা ব্যাপদেশে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَائِيْ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ -

এবং আমি অনুসরণ গ্রহণ করেছি আমার বাপ-দাদা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের মিল্লাতের।

ইবনে আব্বাস এই আয়াতদ্বয়কে ভাইদের পরিবর্তে দাদাকে মীরাস দেয়ার নীতির সমর্থনে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। হাজ্জাজ, আতা, ইবনে আব্বাস-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যে চায় আমি হাজরে আসওয়াদের নিকট তাকে লা'নত করে বলতে পারি যে, দাদা হচ্ছে পিতা। আল্লাহ্‌র কসম দাদা ও দাদীকে 'বাপ' (اباء) হিসেবেই উল্লেখ করেছেন। উপরোক্ত আয়াত-ই তার অকাট্য দলীল। ভাইদের স্থলে দাদাকে উত্তরাধিকারী বানানো এবং তাকে পিতার স্থানে নামিয়ে তাকে মীরাস দেয়া পিতার অবর্তমানে এবং এজন্যে উক্ত আয়াতকে ইবনে আব্বাসের পক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَوَرِثَهٗ اَبَوَاهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ -

তার পিতা-মাতা ওয়ারিস হলে তার মার জন্যে এক-তৃতীয়াংশ এই কথার পক্ষে দলীল হওয়া বৈধ।

এরূপ অবস্থায় ভাইরা কিছু পাবে না, দাদা দুই-তৃতীয়াংশ পেয়ে যাবে।[১] যেমন পিতা থাকলে এদের সকলের পরিবর্তে সে তা পেয়ে যায়। এই কথা প্রমাণ করে যে, 'পিতা' বললে দাদাও শামিল হয়ে যায়। অতএব তার সম্পর্কে হুকুম বা সিদ্ধান্ত পিতার থেকে ভিন্নতর কিছু না হওয়াই বাঞ্ছনীয়, অন্তত মীরাসের ক্ষেত্রে যখন সেই পিতা বর্তমান থাকবে না, তখন। সাহাবীগণের মধ্যে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর এই মত। উসমান (রা) বলেছেন, আবূ বকর (রা) ফায়সালা দিয়েছেন যে, দাদা পিতা। তার উপর পিতৃত্বের নামটি প্রযোজ্য। ইমাম আবূ হানীফারও এই মত। আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, মালিক, শাফেয়ী প্রমুখ দাদার ব্যাপার যায়দ ইবনে সাবিতের মত গ্রহণ করেছেন। সে মতটি হল দাদা ভাইদের স্থলাভিষিক্ত, যতক্ষণ মীরাস বণ্টন এক-তৃতীয়াংশের কম না হয়। তখন তাকে এক-তৃতীয়াংশ দেয়া হবে। তা থেকে কম হবে না। ইবনে আবূ লায়লা দাদার ব্যাপারে হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা)-এর মতকে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন—দাদা ভাইদের একজনের পর্যায়ে গণ্য যতক্ষণ মীরাস বিভক্তি এক-ষষ্ঠাংশের কম না হয়। অতএব তাকে এক-ষষ্ঠাংশই দিতে হবে। তা থেকে কিছু মাত্র কম হবে না। এ ব্যাপারে সাহাবীগণের বিভিন্ন মত আমরা مختصر الطحاوى গ্রন্থের ব্যাখ্যায় বলে দিয়েছি। সাহাবীগণের দলীল উপস্থাপনেও ভিন্নতা রয়েছে। তবে আলোচ্য আয়াতকে দলীল হিসেবে উপস্থাপনে দুটি দিক রয়েছে। একটি—আল্লাহ্ আয়াতে দাদাকে প্রকাশ্যভাবে 'বাপ' বলে নাম রেখেছেন। আর দ্বিতীয়—এ আয়াতকে ইবনে আব্বাসের দলীল হিসেবে উপস্থাপক। তিনি সাধারণভাবেই দাদাকে বাপ বলেছেন। হযরত আবূ বকর (রা)-ও তাই করেছেন। তাঁরা দুজনই আরবী ভাষাভাষী লোক। অভিধানের দৃষ্টিতে বিভিন্ন নামের তাৎপর্য তাদের নিকট অস্পষ্ট থাকতে পারে না। যদিও তারা দুজনই শরীয়াতের দৃষ্টিতেও এই নামকরণকে সমর্থন করেছেন। শরীয়াতের নামসমূহ যখন আল্লাহ্‌র নিকট থেকে নির্ধারিত توقيق পন্থায় তখন তাদের এই যুক্তি অবশ্যই গ্রহণীয়। কিন্তু যাঁরা বাহ্যিক দিক দিয়ে এই রূপ দলীল উপস্থাপনকে সমর্থন করেননি, তাঁরা বলেছেন, আল্লাহ্ আয়াতে চাচাকেও তো 'পিতা' اب। নাম দিয়েছেন। কেননা হযরত ইউসূফের কথায় ابائى। আমার 'পিতৃকুল' কথাটিতে ইসমাঈল (আ)-এর নাম-ও উল্লিখিত হয়েছে। আর তিনি তো তার চাচা। তিনি তো কোনক্রমেই পিতার স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন না। অথচ নবী করীম (স) বলেছেন ঃ ردوالعلى ابى 'তোমরা আমার বাবাকে নিয়ে আস' এই বলে তিনি হযরত আব্বাসকেই ইঙ্গিত করেছিলেন।

আবূ বকর বলেছেন, এ কথার উপর প্রশ্ন উঠে যে, দাদাকে বাপ বলা হয়েছে পরোক্ষ অর্থে, প্রত্যক্ষ ও যথার্থ অর্থে নয়। দাদাকে বাপ না বলা তো সম্পূর্ণ জায়েয। কেননা দাদাকে যদি তুমি বল, সে বাপ নয়, তা হলে সত্য কথাই বলা হবে। অথচ প্রকৃত অবস্থার নাম কোন অবস্থায়ই সেই নামের ব্যক্তি থেকে সরিয়ে নেয়া যায় না। অপর দিক থেকে

১. অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির পিতা ও সন্তানাদি নেই, আছে মা, ভাই ও দাদা। এরূপ অবস্থায় ভাইরা কিছু পাবে না। মা পাবে এক-তৃতীয়াংশ। অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ পাবে দাদা—অনুবাদক।

দাদাকে বাপ বলা হয়েছে শর্ত সহকারে। নিঃশর্ত বললে সে বাপ হিসেবে গণ্য হতে পারে না। অতএব এই কথাকে যুক্তি ও দলীল হিসেবে পেশ করা সহীহ্ হতে পারে না। আয়াতে যে 'দুই বাপ' শব্দ রয়েছে, তা সাধারণভাবে রয়েছে। আর অপর দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র কথা ঃ তার উত্তরাধিকারী হবে তার দুই বাপ'—এতে নিকটবর্তী পিতাকেই বোঝানো হয়েছে। কাজেই এ থেকে দাদাকে বোঝানো যেতে পারে না। কেননা দাদা পরোক্ষ বাপ হতে পারে, প্রত্যক্ষ নয়। আর একই শব্দে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুটি দিককে এক সঙ্গে গ্রহণ নিঃশর্ত বক্তব্যে শামিল হতে পারে না।

আবূ বকর বলেছেন, সাধারণ অর্থবোধক শব্দ পিতাকে দাদা প্রমাণ করতে চাওয়া এ হিসেবে যে, আয়াতে চাচাকে 'বাপ' নাম দেয়া হয়েছে অথচ চাচা পিতার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না এই মতে পূর্ণ ঐকমত্য রয়েছে—কোন ক্রমেই মেনে নেয়া যায় না। কেননা 'পিতা' নামটি সাধারণভাবে অভিধান ও শরীয়াতের দিক দিয়ে দাদা ও চাচাকে শামিল করলেও তা সাধারণ ও নিঃশর্তভাবেই জায়েয হতে পারে বটে; কিন্তু কোন কারণে দাদাকে বাদ দিয়ে শুধু চাচাকে গণ্য করা হলেও দাদার ব্যাপারে এই সাধারণ দিকটা নিষিদ্ধ হয়ে যায় না। অর্থেও তারা দুজন ভিন্নি ভিন্ন হয়ে যায় এই দিক দিয়ে যে, বাপকে বাপ নাম রাখা হয়েছে এজন্যে যে, জন্মের দিক দিয়ে সে পিতার পুত্র। দাদার ক্ষেত্রেও এই অর্থ বিদ্যমান। যদিও অন্য দিক দিয়ে বাপ ও দাদা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। তা হচ্ছে সন্তান ও দাদার মাঝখানে পিতা রয়েছে। পিতা ও পুত্রের মাঝে তৃতীয় কেউ নেই। চাচার এক্ষেত্রে কোন স্থানই নেই। কেননা জন্মের দিক দিয়ে সন্তান ও তার চাচার মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। দাদা তাৎপর্যগতভাবে অনেক দূরবর্তী হলও সাধারণ নাম ব্যবহারের দিক দিয়ে নিকটে আছে। অতএব তাকে 'বাপ' বলা অসমীচীন হতে পারে না। কেননা পিতার অবর্তমানে দাদার চাইতে সন্তানের নিকটবর্তী আর কেউ নেই। এভাবে দাদার একটা বিশেষ স্থান রয়েছে, যার মীরাস বন্টন হবে, তার কাছে। কিন্তু চাচার যেহেতু এরূপ কোন বিশেষত্ব নেই, এ কারণে তাকে নিঃশর্ত ও সাধারণ 'বাপ' বলা হয়নি। আর তা থেকে তা বোঝাও যায় না। তবে বিশেষ পরিচিতির বন্ধনে তাকে পিতার পর্যায়ে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু দাদা পিতার সমকক্ষ জন্মের দিক দিয়ে। কাজেই 'পিতা' বললে দাদাও বোঝা যেতে পারে। আর পিতার অবর্তমানে দাদা পিতার স্থান পেতে পারে। যাঁরা বলেছেন, দাদাকে পিতা বলা হয়েছে পরোক্ষভাবে, প্রত্যক্ষ ও প্রকৃতভাবে নয় এবং আয়াতে নিকটবর্তী ও প্রত্যক্ষ পিতাকেই বোঝানো হয়েছে বলে যাঁরা আমাদের দেয়া দলীলের মুকাবিলা করতে চেয়েছেন, তাঁদের এই চেষ্টার জবাবে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, এ দ্বারা দাদাকে বোঝানো সঙ্গত নয়। কেননা একটা নাম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অর্থে হওয়া সম্ভব নয়। তা জরুরীও নয় এই হিসেবে যে, যে কারণে পিতার নাম লওয়া হয়েছে জন্মের দিক দিয়ে তার সাথে নিকট সম্পর্ক রয়েছে বলে, তা ঠিক নয়। কেননা তা দাদার ক্ষেত্রেও রয়েছে। আর এদের প্রত্যেকের নাম 'বাপ' রাখা হয়েছে যে কারণে, সেদিক দিয়ে পিতা ও দাদার মধ্যে পার্থক্য নেই। অতএব এই নামে উভয়কে অভিহিত করা সঙ্গত। যদিও তার এক জন অপরজনের অপেক্ষা বিশেষ মর্যাদা ও কারণের অধিকারী। যেমন ভাই বললে সকল ভাই-ই গণ্য হয়,

সে ভাই একই পিতামাতার সন্তান হিসেবে হোক, কি শুধু একই পিতার সন্তান (মা দুই) হিসেবে হোক। যে ভাই বাপ-মা উভয় দিক দিয়ে সে অন্য ভাইদের অপেক্ষা অধিক অগ্রসর মীরাস পাওয়ার ক্ষেত্রে। কেবল পিতার দিক দিয়ে যে ভাই, তাদের অপেক্ষা ভাই হওয়ার হুকুমে অধিক প্রকৃত। আর কোন নাম প্রকৃত দুই অর্থে হতে পারে, যদিও সাধারণভাবে বললেও একজন অপরজনের অপেক্ষা অগ্রসর গণ্য হবে। লক্ষণীয়, 'তারকা' বললে আকাশমার্গে জ্বলজ্বল করা প্রত্যেকটি তারকাকেই বোঝাবে, এ না প্রকৃত বলে। কিন্তু আরবদের মতে তাতে শুধু কীর্তিকা নক্ষত্রই বোঝায়। যেমন তারা বলত ঃ আমি এই এই কাজ করেছি, তখন তারকা ছিল মাথার উপর। একথা বলে তারা 'সুরাইয়া' তারকাকেই বুঝত। 'নক্ষত্রের উদয় হয়েছে'—এই নিঃশর্ত ও নির্বিশেষ উল্লেখে তারা 'সুরাইয়া' তারকা ছাড়া আর কিছুই বুঝত না। অথচ আকাশমার্গের সমস্ত তারকাই প্রকৃতপক্ষে এই নামে অভিহিত ও পরিচিত। 'পিতা' নামটিও ঠিক তেমনি। 'পিতা' বললে কোন যুক্তি প্রদর্শনের নিকট পিতা ও দদা উভয়ের জন্যে প্রকৃত ব্যবহার হতে কোন বাধাই নেই। যদিও প্রকৃত পিতাকেই বিশেষভাবে বোঝাবে কোন কোন সময়ে আর পিতা শব্দটি নিকটস্থ প্রকৃত পিতা ও দাদা উভয়কে বোঝালে তাতে একটি শব্দের একই সময় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবহার হওয়া—যা হতে পারে না—জরুরী নয়।

যদি বলা হয়, 'পিতা' নামটি যদি শুধু জন্মের দিক দিয়ে বিশেষ নাম হয়ে থাকে, তাহলে মা অবশ্যই এই নামের মধ্যে শামিল হবে। কেননা সন্তান তো মার গর্ভেই জন্মগ্রহণ করে। এরূপ অবস্থায় মাকে 'বাপ' নাম দেয়া উচিত হয়ে পড়ে। আর তখন মা-ই পিতা ও দাদার তুলনায় অধিক অগ্রসর হবে। কেননা সন্তানের জন্ম মার দ্বারাই হয় প্রকৃত।

জবাবে বলা যাবে, না, সেটা কোন যুক্তিসঙ্গত কথা নয়। কেননা 'মা'কে তো একটা বিশেষ নামে অভিহিত করা হয়েছে, যাতে অন্য কেউ শামিল নেই এবং তা পিতা ও মার মধ্যে পার্থক্য করার জন্যে। যদিও সন্তান জন্মের দিক দিয়ে পিতা ও মাতা—উভয়ের সাথে প্রকৃত পক্ষেই সম্পর্কিত। আর আল্লাহ তা'আলাও মাকে 'বাপ' এর সাথে একত্র করেছেন যখন বাপ ও মা'র কথা একসাথে বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ –

এবং তার মা ও বাপ উভয়ের প্রত্যেকের জন্যে এক-ষষ্ঠাংশ।

হযরত আবূ বকর (রা) এবং তাঁর মত সমর্থনকারীদের জন্যে এটাই প্রমাণ এই কথার যে, দাদা জন্ম সম্পর্ক ও 'আসাবা' এই উভয় দিক দিয়েই মীরাস পাওয়ার অধিকারী হয়, কেউ যদি একটি কন্যা ও দাদা রেখে মরে যায়, তাহলে সে কন্যা পাবে অর্ধেক, আর দাদা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। আর অবশিষ্ট যা থাকবে, তা-ও দাদা পাবে জন্ম সম্পর্ক ও আসাবা হিসেবে। যেমন কেউ যদি একটি কন্যা ও পিতা রেখে যায়, তাহলে সেই একই অবস্থায় পিতা জন্ম সম্পর্ক ও আসাবা উভয় দিক দিয়েই মীরাস পাবে। তাই পিতার অবর্তমানে দাদা মীরাস পাওয়ার দিক দিয়ে পিতার স্থলাভিষিক্ত হবে ভাই ও বোনদের

পরিবর্তে। আরও একটি কারণ রয়েছে। দাদা জন্মের দিক দিয়ে আসাবা হয়ে মীরাসের অধিকারী হয়ে থাকে। অতএব দাদা পিতার স্থলাভিষিক্ত হবে ভাইদের শরীক না হওয়ার কারণে কেননা ভাইরা আসাবা হয় স্বতন্ত্রভাবে জন্মসূত্র ছাড়া-ই। আর 'মুকাসিমা' দিক দিয়ে দাদা ও ভাইরা মীরাসে শরীক হয় না এভাবে যে, দাদা মৃতের এক পুত্র থাকা অবস্থায়ও এক-ষষ্ঠাংশের অধিকারী হয়। যেমন এক পুত্র থাকলে পিতাও তাই পায়। পিতার বর্তমানে ভাইরা যেমন মীরাস পায় না এই কারণে, দাদা থাকলেও ঠিক সেই একই কারণে ভাইরা পাবে না।

যদি বলা হয়, পুত্র থাকলেও মা এক-ষষ্ঠাংশের অধিকারী হয় আর তাতে মা থাকা সত্ত্বেও ভাইদের মীরাস না পাওয়ার কারণ ঘটে না।

জবাবে বলা হবে, এ কারণে সম্পত্তি দুই ভাগে বিভক্ত হবে। কেননা 'মুকাসিমা'র দিক দিয়ে দাদা ও ভাইরা সমানভাবে মীরাস পাওয়ায় শরীক হয় না। আর দাদার বর্তমানে মুকাসিমায় ভাইরা ও দাদা শরীক হয় না, যখন তারা এককভাবে থাকে, মীরাস অবশিষ্ট থাকে না। কেননা যারাই দাদার বর্তমানে উত্তরাধিকারী হয়, তার ও তাদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন ওয়াজিব হয়ে যায় যখন অন্যরা কেউ বর্তমান থাকে না এক-তৃতীয়াংশ বা এক-ষষ্ঠাংশ হিসেবে। কিন্তু মা ও ভাইদের মধ্যে কোন অবস্থায়ই 'মুকাসিমা' হয় না। আর বণ্টন না হওয়ার পরিণতি তাদের মীরাস না, পাওয়া হয় না। আর ভাইরা একক হলে দাদার সাথে ভাইদের 'মুকাসিমা' না হওয়ার অর্থ দাদার সাথে ভাইদের মীরাস নষ্ট হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। তাদেরকে ওয়ারিস বানানো যায় 'মুকাসিমা' দ্বারা। দাদার সাথে ভাইদের শরীক হওয়ার কারণে। এই 'মুকাসিমা' যখন পরিত্যক্ত হয় বর্ণিত কারণে, তখন দাদার সাথে ভাইদের মীরাসও পরিত্যক্ত হবে। কেননা এ পর্যায়ে দুটি কথা রয়েছে মাত্র। একটি কথা, দাদার সাথে যাদের মীরাস মূলতই থাকে না আর একটি কথা তাদের যাদের মধ্যে মুকাসিমা কর্তব্য হয়। বর্ণিত কারণে মুকাসিমা যখন বাতিল হয়ে যাবে, তখন দাদার সাথে তাদের মীরাস না পাওয়া প্রমাণিত। জনৈক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, দাদা মৃতের পুত্রের সাথে ঝুলে পড়ে, সে হচ্ছে মৃতের পিতা ঃ আর ভাই ঝুলে পড়ে মৃতের পিতার সাথে। অতএব এই দুজনের মধ্যে শরীকানা জরুরী—যেমন, মৃত রেখে গেল তার পিতা ও পুত্রকে। তাকে বলা যাবে, এ কথা দুটি কারণে ভুল। একটি হচ্ছে, এই হিসেব ও বিবেচনা যদি সহীহ্ হয়, তাহলে দাদা ও ভাইয়ের মধ্যে 'মুকাসিমা' ওয়াজিব হয়ে পড়বে। বরং ওয়াজিব হচ্ছে, দাদার জন্যে এক-ষষ্ঠাংশ হবে, আর অবশিষ্ট হবে ভাইয়ের জন্যে। যেমন মৃত যদি পিতা ও পুত্র রেখে যায়, তাহলে পিতা এক-ষষ্ঠাংশ পাবে, আর অবশিষ্ট পাবে পুত্র। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, মৃত যদি পিতার দাদা ও চাচা রেখে যায়, তাহলে চাচা 'মুকাসিমা' করবে। কেননা পিতার দাদা নিকটবর্তী দাদার সাথে ঝুলে পড়বে। চাচাও তার সাথে ঝুলে পড়বে। কেননা সে তার পুত্র। পিতার দাদার সাথে চাচা থাকলে তার মীরাস থাকে না কারণ থাকার দরুন এ ব্যাপারে সকলেই সম্পূর্ণ একমত। এ থেকে বোঝা যায় সে কারণ ঠিক নয়। আর এই কারণে ভাইর পুত্র মীরাসে দাদার সাথে শরীক হবে। কেননা সে বলে যে, পিতার পুত্রে পুত্র এবং পিতার পিতা দাদা। যদি পিতা ও

পুত্রের পুত্র রেখে যায়, তাহলে পিতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ, আর অবশিষ্ট পুত্রের জন্যে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ - لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ - وَلَاتُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

এরা ছিল একটি জনসমষ্টি, যা অতীত হয়ে গেছে। তারা যা অর্জন করেছে, তা তাদের জন্যেই। আর তোমরা যা কিছু অর্জন করবে, তার ফল তোমরাই পাবে, তারা যা করছিল সে বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।

এ আয়াতটির তিনটি অর্থ হতে পারে। একটি—পিতা, মাতা, দাদার ইবাদত ও নেক আমলের সওয়াব পুত্ররা পাবে না। তাদের গুনাহের আযাবও পুত্ররা—বংশধররা—ভোগ করবে না। যারা এই মত পোষণ করে যে, মুশরিক পিতা, মাতা, দাদার গুনাহের জন্যে সন্তান-বংশধররা আযাব ভোগ করবে, উক্ত আয়াত তাদের উক্ত মতকে খণ্ডন করেছে। যে সব ইয়াহূদী মনে করে যে, তাদের পিতা-মাতা-দাদা পূর্ববংশের লোকদের নেক আমলের দৌলতে তারা ক্ষমা পেয়ে যাবে, তাদের মত-ও বাতিল প্রমাণিত হয়েছে এ আয়াতটির দ্বারা। অনুরূপ বহু কয়টি আয়াতে এই কথাই বলা হয়েছে। যেমন ঃ

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا -

প্রতিটি মানুষ যা অর্জন করবে, তার উপর শুধু তারই দায়িত্ব আসবে।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى -

এবং কোন বোঝা বহনকারীই অপর কারোর বোঝা বহন করবে না।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّاحُمِّلْتُمْ - (النور : ٥٤)

ওরা যদি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাহলে তার উপর চাপবে যা চাপান হয়েছে এবং তোমাদের উপর চাপবে যা তোমাদের উপর চাপান হয়েছে।

নবী করীম (স)-ও এই তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন, তিনি আবূ রমসাকে তার পুত্রের সঙ্গে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ও কি তোমার পুত্র ?' বললেন, 'জি, হ্যাঁ।' তখন বললেন ঃ

أَمَّا أَنَّهُ لَايَجْنِى عَلَيْكَ وَلَاتَجْنِى عَلَيْهِ -

সে তোমার উপর কোন অপরাধ চাপাবে না, তুমিও তার উপর কোন অপরাধ চাপাবে না।

রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ হে বনু হাশিমের লোকেরা, তোমরা লোকদের আমল নিয়ে আমার নিকট আস না, আস তাদের বংশীয় গৌরব নিয়ে। আমি বলব, আমি আল্লাহ্‌র আযাব থেকে তোমাদেরকে একবিন্দু বাঁচাতে পারব না।

রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ بَطَابِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ -

যার আমল বিলম্বিত, তার বংশ গৌরব তাকে দ্রুততা সম্পন্ন বানাতে পারে না।

আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ - (البقره : ١٣٧)

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ই তাদের সাথে তোমার পরিবর্তে বোঝাপড়া করতে যথেষ্ট সক্ষম। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ তাঁর নবীর জন্যে পুরা মাত্রায় যথেষ্ট। তাঁর শত্রুদের মুকাবিলা তিনিই করবেন। তাদের সংখ্যা ও লোভ-লালসা যত বেশিই হোক, তাদের মুকাবিলা করতে আল্লাহ্ পুরা মাত্রায় সক্ষম। নবী তাঁর সংবাদদাতাকেই পেয়েছেন দেয়া সংবাদের জন্যে কাজ করতে। এই কথাটিও এ পর্যায়েরই। বলেছেন ঃ

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ - (المائده : ٦٧)

আল্লাহ্‌ই তোমাকে—হে নবী—লোকদের থেকে রক্ষা করবেন।

বস্তুত আল্লাহ্‌ই তাকে তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছেন। তাদের অত্যাচার জুলুম ও ধোঁকা-প্রতারণা ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচিয়েছেন। আর তাই তাঁর নবুয়তের সত্যতার অকাট্য প্রমাণ। কেননা সংবাদদাতাকে তার দেয়া সংবাদের উপর সকল অবস্থায় সক্ষম পাওয়া সম্ভব হয় না, হয় কেবলমাত্র তখন, যদি সে সংবাদটা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এসে থাকে। তিনিই তো অনুপস্থিত-উপস্থিত সর্ববিষয়ে অবহিত। মিথ্যাবাদী ও আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে সংবাদদাতাকে তার দেয়া সংবাদ অনুযায়ী পাওয়া অসম্ভব, অসঙ্গত। বরং তাদের দেয়া অধিকাংশ খবরই মিথ্যা, ভিত্তিহীন। শ্রোতা শোনা মাত্রই তার বাতুলতাও অন্তসারশূন্যতা বুঝতে পারে। তার সত্যতা যথার্থতা খুব কম-ই প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَاوَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا -

নির্বোধ লোকেরা অবশ্যই বলে উঠবে, ওরা যে কিবলামুখী ছিল, সে কিবলা থেকে ওদেরকে কোন্ জিনিস অন্যদিকে ফিরিয়ে দিল ?

আবূ বকর বলেছেন, নবী করীম (স) মক্কায় থাকাকালে বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন। হিজরতের পরও একটা সময়কাল (প্রায় ষোল মাস) পর্যন্তও এই নিয়মই চলেছে, এ ব্যাপারে সকলেই সম্পূর্ণ একমত। ইবনে আব্বাস ও বরা ইবনে আজেব বলেছেন, নবী করীম (স)-এর মদীনায় উপস্থিতির ১৭ মাস পর তিনি কাবাকে

কিবলা বানিয়েছিলেন। কাতাদাহ্ বলেছেন, ছয় মাস পর। আনাস ইবনে মালিক নয় কি দশ মাসের উল্লেখ করেছেন। পরে আল্লাহ্ তাঁকে কাবার দিকে মুখ করে দাঁড়াবার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ এ পর্যায়ের আয়াতসমূহে তার অকাট্য দলীল উপস্থাপন করেছেন। এতে বলা হয়েছে, নামায কাবা ছাড়া অন্যদিকে মুখ করে পড়া হতো। পরে আল্লাহ কাবার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং সেজন্যে বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে যে সব আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে, সেই পর্যায়ে বলেছেন ঃ ওরা যে কিবলামুখী ছিল, সেদিক থেকে ওদেরকে কোন্ জিনিস ভিন্ন দিকে ফিরিয়ে দিল ? এই বলে যারা প্রশ্ন তুলে, তারা না-বুঝ লোক। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ –

তুমি যে কিবলামুখী ছিলে, তা আমরা কিবলা বানিয়েছিলাম তো শুধু এইজন্যে—যেন আমরা পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে পারি সেই লোকদেরকে যারা রাসূলের অনুসরণ করে সে লোকদের থেকে যারা ফিরে যায়।

আল্লাহ্র কথা ঃ

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ – فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا –

হে নবী! তোমার মুখমণ্ডলের আসমানে ঘোরাফেরা আমরা অবশ্যই লক্ষ্য করেছি। অতএব আমরা সেই কিবলার দিকে অবশ্যই ফিরিয়ে দেব, যা তুমি পেয়ে সন্তুষ্ট হবে।

এই সব আয়াতই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, নবী করীম (স) প্রথমে কাবা ছাড়া অন্যদিকে মুখ করে নামায পড়তেন। পরে তাঁকে বর্তমান কিবলা—কাবার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। যারা বলে, ইসলামী শরীয়াতে নাসেখ-মনসূখ নেই, উক্ত কথা তা বাতিল প্রমাণ করে। অবশ্য নবী করীম (স)-এর বায়তুল মাকদিসমুখী হয়ে নামায পড়ার ব্যাপারে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামায পড়া কি তখন ফরয ছিল, তাছাড়া অন্যথা করা কি জায়েয ছিল না ? কিংবা তাঁকে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছিল যে, সেদিকে মুখ করবে, কি অন্য দিকে—তা তাঁর ইচ্ছাধীন ছিল? এ পর্যায়ে রুবাই ইবনে আনাস বলেছেন, এটা তাঁর ইখতিয়ারের ব্যাপার ছিল। ইবনে আব্বাস বলেছেন—না, সেদিকে মুখ করা তাঁর জন্যে ফরয ছিল। এতে তাঁর কোন ইখতিয়ার বা ইচ্ছা প্রয়োগের ব্যাপার ছিল না। এর মধ্যে যেটাই হোক, যিনি বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করতেন, তাঁর জন্যে তা ফরয ছিল। কেননা ইখতিয়ার থাকাটাও ফরযহীন ছিল না। যেমন কসমের কাফফারা দেয়া। যা দিয়েই কাফফারা দেয়া হোক-না কেন, কাফফারা দেয়া কিন্তু ফরয ছিল। যেমন সময়ের শুরুতেই নামায ফরয হয়ে যায়, যদিও মধ্যম সময়ে বা শেষ সময়েও পড়া যায়।

জা'ফর ইবনে মুহাম্মাদ-আল-ইয়ামান আবদুল্লাহ্ ইবনে সালিহ, মুআবিয়াতা ইবনে সালিহ, আলী ইবনে আবূ তালহা, ইবনে আব্বাস সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

اَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْاٰنُ شَاَنُ الْقِبْلَةِ –

কুরআনে সর্বপ্রথম কিবলার ব্যাপারটি মনসূখ হয়েছে।

আর তা এভাবে সঙ্ঘটিত হয়েছিল যে, নবী করীম (স) যখন মদীনায় হিজরত করলেন, তখন আল্লাহ্ তাঁকে বায়তুল মাকদিসমুখী হওয়ার আদেশ করলেন। এর ফলে ইয়াহুদীরা খুবই উল্লাস বোধ করল। নবী করীম (স) কয়েক মাস পর্যন্ত সেদিকে মুখ করেই নামায পড়লেন। কিন্তু তিনি নিজে পিতা ইবরাহীম (আ)-এর কিবলামুখী হয়ে নামায পড়তে খুবই পছন্দ করতেন। তাই তিনি সেজন্যে আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করছিলেন এবং ওহী পাওয়ার জন্যে বারবার উর্ধ্ব পানে তাকাতেন। এ পর্যায়ে আল্লাহ্ নাযিল করেছিলেন ঃ 'উর্ধ্বপানে তোমার বার বার তাকানোকে আমরা লক্ষ্য করেছি।' অতঃপর পূর্ণ কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। এই প্রেক্ষিতে ইবনে আব্বাস জানিয়েছেন, বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করা ফরয ছিল। উপরোক্ত আয়াত দ্বারা তা মনসূখ হয়ে গেছে কিন্তু যাঁরা বলেন, কোনরূপ ইখতিয়ার ছাড়াই সেদিকে মুখ করা ফরয ছিল, উক্ত আয়াতে তার কোন প্রমাণ নেই। কেননা ফরয তো ইখতিয়ার সহও হতে পারে। পরে এই ইখতিয়ারই মনসূখ হয়ে গেছে এবং তখন কেবলমাত্র কাবার দিকে মুখ করাই স্থায়ী হয়ে থাকল কোনরূপ ইখতিয়ার ছাড়া। বর্ণিত হয়েছে, মদীনা থেকে কিছু সংখ্যক লোক রাসূলে করীম (স)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্যে মক্কার দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন হিজরতের পূর্বে। তাঁদের মধ্যে বরা ইবনে মারুর-ও ছিলেন, তিনি পথের নামাযে কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়লেন। অন্যরা তা করতে অস্বীকার করলেন। তাঁরা বললেন, নবী (স) তো বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামায পড়েন। পরে তারা সকলে মক্কায় উপস্থিত হলে এই বিষয়ে রাসূলে করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং সেই সাথে সব ঘটনার বিবরণ দিলেন। তখন তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমি তো বায়তুল মাকদিসের দিকেই কিবলা করেছি। তিনি তাদেরকে পুনরায় নামায পড়তে বলেন নি। এ থেকে বোঝা গেল, তাঁরা কিবলার ব্যাপারে ইখতিয়ার সম্পন্ন ছিলেন। তাঁরা নিজেরাই বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করা গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

যদি বলা হয়, ইবনে আব্বাস এই কথা দ্বারা বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করার আদেশে কুরআনের আয়াত প্রথম মনসূখ হওয়ার কথা বলেছেন।

জবাবে বলা যাবে, পাঠ মনসূখ হওয়াই লক্ষ্য হতে পারে কুরআন মনসূখ হওয়ার কথা বলার মূলে। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ নির্বোধ লোকেরা বলবে, ওরা যে কিবলার উপর ছিল সে দিক থেকে ওদেরকে কোন্ জিনিস ফিরাল ? এ পর্যায়েরই হতে পারে। এ আয়াত নাযিল হয়েছে কিবলা মনসূখ হওয়ার পূর্বে। এ আয়াতে খবর দেয়া হয়েছে যে, তাঁরা কাবা ছাড়া অন্য কিবলামুখী ছিলেন। এবং কুরআন থেকে তা সর্বপ্রথম মনসূখ হয়েছে, বলা যেতে পারে। তাহলে বক্তব্য হবে কুরআনই মনসূখকারী। এতে কুরআন মনসূখ হয়নি।

ইবনে জুরাইজ, ইবনে আতা, ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, কুরআন থেকে সর্ব প্রথম কিবলার ব্যাপারটা মনসূখ হয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ - فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ -

পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই জন্যে। তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও সেদিকেই আল্লাহ্‌ আছেন।

এর পরে নাযিল করেছেন এ আয়াতটি, যাতে বলা হয়েছে ঃ নির্বোধ লোকেরা অবশ্য বলবে, ওরা যে কিবলার দিকে ছিল সে দিক থেকে ওদেরকে কোন্ জিনিস ফিরিয়ে দিল ? শেষ বলা হয়েছে ঃ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ -

অতএব তোমার মুখ মসজিদে হারাম-এর দিকে ফিরাও!

এই হাদীসটির দুটি অর্থ হতে পারে। এক—তাঁরা যে দিকে ইচ্ছা মুখ করার ইখতিয়ার সম্পন্ন ছিলেন। আর দ্বিতীয়—এ আয়াতে যে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে তা মনসূখ করা হয়েছে, 'তোমার মুখ মসজিদে হারাম-এর দিকে ফিরাও' কথা দ্বারা এবং 'নির্বোধ লোকেরা বলবে .....' এই কথা দ্বারা। এ পর্যায়ে বলা হয়েছে, নির্বোধ লোক বলতে এখানে ইয়াহুদীদেরকে বোঝানো হয়েছে। কিবলা পরিবর্তনে তারাই বড় আপত্তি তুলেছিল। এই হাদীসটি ইবনে আব্বাস ও বরা ইবনে আজেব কর্তৃক বর্ণিত। তাঁরা আসলে মনসূখ হওয়াকেই অস্বীকার করেছেন। কেননা অনেক লোকই এতে মনসূখ হওয়ার কোন ব্যাপার দেখতে পান না। এ-ও বলা হয়েছে, যে তারা বলেছে ঃ হে মুহাম্মাদ! তুমি যে কিবলামুখী ছিলে সেদিক থেকে তোমাকে ফিরাল কে ? তুমি সেই দিকে ফিরে যাও, তাহলে আমরা তোমার অনুসরণ করব, তোমার প্রতি ঈমান আনব। আসলে ওরা তাঁকে বিপদে ফেলতে চেয়েছিল। মোটকথা, এই দুটি কারণের মধ্যে যে কোন একটি কারণে কিবলা পরিবর্তন—প্রথম অনুসৃত কিবলার দিক থেকে দ্বিতীয় কিবলা—কাবার দিকে মুখ করার উপর কঠোর আপত্তি তুলেছিল। হাসান বলেছেন, রাসূলে করীম (স) যখন বায়তুল মাকদিস থেকে ফিরে কাবাকে কিবলা রূপে গ্রহণ করলেন, তখন আরব মুশরিকরা বলতে লাগল, হে মুহাম্মাদ! তুমি তোমার পূর্বপুরুষের মিল্লাত থেকে বিরাগী হয়ে গিয়েছিলে। এক্ষণে আবার সে দিকেই ফিরে এসেছ। তাই আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, তুমি অবশ্যই তোমার পূর্বপুরুষদের ধর্মের দিকেও ফিরে আসবে। আল্লাহ যে কারণে পূর্বানুসৃত কিবলার দিক থেকে দ্বিতীয় কিবলার দিকে তাঁর নবীকে ফিরিয়েছিলেন তা তিনি বলে দিয়েছেন, এই আয়াতে ঃ

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ -

তুমি যে কিবলামুখী ছিলে সেটিকে কিবলা বানিয়েছিলাম এই উদ্দেশ্যে আমরা বাস্তবভাবে জানব রাসূলকে কে অনুসরণ করে সেই লোকদের থেকে আলাদা করে, যারা তাদের পেছনের দিকে ফিরে গেছে।

বলা হয়েছে, এই লোকদেরকে মক্কাতেই বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করতে বলা হয়েছিল। যেন তারা সেখানকার মুশরিকদের থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়াতে পারে। কেননা মক্কার সব মুশরিক তো কাবা মুখীই ছিল। হিজরত করার পর মদীনায় প্রতিবেশী ইয়াহূদীরা বায়তুল মাকদিসকেই কিবলা বানিয়েছিল। পরবর্তীতে তারা কাবার দিকে মুখ ফিরাল, যেন তারা তাদের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়াতে পারেন, ঠিক যেমন মক্কায় তাঁরা সেখানকার মুশরিকদের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে গিয়েছিলেন কিবলার পার্থক্যের ভিত্তিতে। এই পূর্ব কিবলা বায়তুল মাকদিসের দিকে বাতিলকরণকে ইয়াহূদীরা প্রতিবাদ করলে আল্লাহ্ তাদের কথার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করলেন এই বলে ঃ

قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

বল, পূর্ব ও পশ্চিম সব-ই তো আল্লাহ্‌র। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন সঠিক-নির্ভুল পথে পরিচালিত করেন।

এই যুক্তি ও প্রমাণের তাৎপর্য হল, পূর্ব ও পশ্চিম সব-ই যখন আল্লাহ্‌র, তখন উভয় দিকে মুখ করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বিবেক-বুদ্ধির বিচারে তা অভিন্ন। আল্লাহ্ এই দিকসমূহের মধ্য থেকে কোন একটি দিককে নির্দিষ্ট করেছেন দ্বীনি কল্যাণের দৃষ্টিতে এবং সঠিক নির্ভুল পথে হেদায়েত দানের লক্ষ্যে। অন্য দিক দিয়ে, ইয়াহূদীরা মনে করে রেখেছিল যে, বায়তুল মাকদিসই কিবলা হওয়ার দিক দিয়ে অন্য সবকিছুর তুলনায় অধিক উত্তম। কেননা তা পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত এবং নবীগণের স্বদেশ। আল্লাহ্ এই স্থানকে অধিক মর্যাদা ও পবিত্রতা দান করেছেন। অতএব সেদিক থেকে অন্য দিকে ফিরে যাওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। আল্লাহ ওদের ধারণাকে ভিত্তিহিন ও অন্তঃসারশূন্য প্রমাণ করে দিয়েছেন। দিয়েছেন এভাবে যে, পূর্ব ও পশ্চিমে অবস্থিত সব বাসস্থানই আল্লাহ্‌র অধীন। প্রত্যেক সময়ই তিনি বান্দাগণের সার্বিক কল্যাণের দৃষ্টিতে যেটিকে চান, ইবাদতের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেন। কেননা ভূমি বা স্থান নিজস্ব গুণে স্বতঃই কোন বিশেষ মর্যাদার অধিকারী নয়। আল্লাহ্ তাকে সম্মানার্হ বানাবার কারণ অনুযায়ী সেখানে আমল করাকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেন।

আবূ বকর বলেছেন, যারা মনে করেন, কুরআন দ্বারা সুন্নাত মনসূখ হতে পারে, উক্ত আয়াত (এবং গোটা ব্যাপার-ই) তার দলীল। কেননা নবী করীম (স) নিজের ইখতিয়ার ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বায়তুল মাকদিসকে কিবলা বানিয়েছিলেন। এটা ছিল তাঁর সুন্নাত, যদিও আল্লাহ সেটিকে কিবলা হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু তা প্রত্যক্ষভাবে কুরআনের কোন নির্দেশ ছিল না। ফলে রাসূলের গৃহীত কিবলা এ আয়াত দ্বারা মনসূখ হয়ে যায়। প্রমাণিত হল, কুরআন দ্বারা 'সুন্নাত' মনসূখ হতে পারে। পক্ষান্তরে যারা উক্ত নীতি মানেন না, তারা বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) উল্লেখ করেছেন, তা মনসূখ করেছে কুরআনের এই আয়াত, যাতে বলা হয়েছে ঃ 'যে দিকেই তোমরা মুখ কর না কেন, তা-ই আল্লাহ্‌র দিক।' ফলে রাসূল যেদিককে কিবলা বানিয়েছিলেন, সেদিকে মুখ করাটা

আয়াতের মধ্যে শামিল ছিল। পরে কাবাকে কিবলা নির্ধারণের আয়াত এই আয়াতকে মনসূখ করেছে। তাতে কুরআন দ্বারা কুরআন মনসূখ হওয়ার নীতি গড়ে উঠেছে, সুন্নাত দ্বারা কুরআন মনসূখ হওয়ার নীতি নয়।

আবূ বকর বলেছেন, আমাদের মতে – فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ আয়াতটি মনসূখ হয়ে যায়নি। বরং তা কিবলা নির্ধারণের চেষ্টাকারীর জন্যে কার্যত অনুসরণীয়, যদি সে কাবা ছাড়া অন্য কোন দিকে মুখ করে নামায পড়ে থাকে। যে ভীত তার জন্যেও এবং চলমান যানবাহনে যে নামায পড়ে, তার জন্যেও। ইবনে উমর ও আমের ইবনে রবী'আতা বলেছেন, এ কথাটি কিবলা নির্ধারণের চেষ্টাকারীর জন্যে নাযিল হয়েছে। চেষ্টা করে একটি দিককে কিবলা মনে করে নামায পড়ার পর যখন স্পষ্ট প্রতিভাত হবে যে, সেদিকটি কাবার দিক ছিল না, তখন এই আয়তটিই তার দলীল এবং আয়াত অনুযায়ী তার নামায সহীহ্, যদিও তা সঠিক কিবলামুখী হয়ে পড়া হয়নি। ইবনে উমরও চলমান যানবাহনের উপরে নামায-পড়া লোক। তিনি বলেছেন—আমরা প্রয়োজনে এ আয়াতের ভিত্তিতে আমল করেছি। আয়াতটিকে অবশ্যই মনসূখ মনে না করেই। সেটিকে মনসূখ মনে করলে তদানুযায়ী আমল করা আমাদের জন্যে জায়েয হতো না। এ বিষয়ে আমরা যথেষ্ট বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি 'উসূলিল ফিকাহ' কিতাবে।

আলোচ্য আয়তটিতে আরও একটি ব্যাপার রয়েছে। তা একটি বর্ণনার দ্বারা প্রকাশিত হবে। হাম্মাদ ইবনে সালমা সাবিত, আনাস, ইবনে মালিক সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখে করে নামায পড়ছিলেন। এই নামাযের মধ্যেই নাযিল হল ঃ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ –

তুমি তোমার মুখ মসজিদে হারাম-এর দিকে ফিরাও।

অতঃপর রাসূলে করীম (স) নিয়োজিত ঘোষণাকারী ঘোষণা করতে লাগলেন ঃ

قَدْ أُمِرْتُمْ أَنْ تُوَجِّهُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ –

মুসলমানগণ! তোমাদেরকে তোমাদের মুখমণ্ডল মসজিদে হারাম-এর দিকে ফেরাবার জন্যে আদেশ দেয়া হয়েছে।

ফলে বহু লোক নামাযের রুকূতে থাকা অবস্থায় উক্ত ঘোষণা শুনতে পেয়ে আল্লাহ্র ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

আবদুল আজীজ ইবনে মুসলিম, আবদুল্লাহ ইবনে দীনার ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ কুবার মসজিদের লোকেরা ফজরের নামায পড়ছিল। এই সময় এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে বলল ঃ "রাসূলে করীম (স)-এর প্রতি কুরআন নাযিল হয়েছে। তাতে কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়তে আদেশ করা হয়েছে। অতএব তোমরাও কাবার দিকে ঘুরে যাও। শুনামাত্রই তারা সকলে কাবার দিকে ঘুরে গেল, যদিও তারা সিরিয়ার দিকে মুখ করে নামায পড়ছিল।" ইসরাঈল, আবূ ইসহাক, বরা' সূত্রে বর্ণনা

করেছেন, নবী করীম (স) কাবার দিকে মুখ ফিরালেন 'আসমানে তোমার বারবার মুখ ঘোরানকে আমরা লক্ষ্য করেছি'—আল্লাহ্‌র এ কথাটি নাযিল হওয়ার পর। তখন রাসূলে করীম (স)-এর সাথে নামায পড়েছে এমন এক ব্যক্তি আনসার লোকদের নিকট গেলেন। তখন তাঁরা বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামায পড়ছিলেন। তখন সেই লোক বললেন, রাসূলে করীম (স) তো কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়েছেন। এ কথা শুনার সঙ্গে সেঙ্গ তাঁরা সকলে রুকূ দেয়ার আগেই এবং নামাযের মধ্যে থাকা অবস্থায়ই কাবার দিকে ঘুরে গেলেন।

আবূ বকর বলেছেন, এই সব বর্ণনাই সহীহ্। হাদীসবিদদের নিকট গৃহীত ও দলীল হিসেবে ব্যবহৃত। তারা অন্তর দিয়ে তা কবুল করেছেন। ফলে এই বর্ণনা মুতাওয়াতির হাদীসের মর্যাদায় পৌঁছে গেছে। তা অবশ্যই মানতে হবে। আর কিবলা নির্ধারণে চেষ্টাকারী যখন নিঃসন্দেহে জানতে পারবে যে, সেই দিকটিই কিবলা, তখন নামাযের মধ্যে থাকা অবস্থায়ই সেদিকে ফিরে ও ঘুরে যাবে।[১]

অনুরূপভাবে ক্রীতদাসী যদি নামাযের মধ্যে থাকা অবস্থায়ই মুক্ত হয়ে যায়, তাহলে নামাযের মধ্যে থেকেই সেই তার মুখাবরণ গ্রহণ করবে।

এই ঘটনা 'খবরে ওয়াহিদ' একক বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস দ্বীনি ব্যাপারে গ্রহণ করার আসল ভিত্তি। উপরোদ্ধৃত হাদীস থেকে জানা গেছে, আনসারগণ একজন সংবাদদাতার দেয়া সংবাদ গ্রহণ করেছেন। আর তা করেই তাঁরা কাবার দিকে ঘুরে গিয়েছিলেন কিবলা পরিবর্তনের ধ্বনি শোনার সঙ্গে সঙ্গে। অপর দিক দিয়ে নবী করীম (স) ঘোষণাকারীকে প্রথম কিবলা পরিবর্তনের ঘোষণা দেয়ার জন্যে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁরা যদি 'খবরে ওয়াহিদ'—একজন ব্যক্তির দেয়া সংবাদ গ্রহণের পক্ষপাতী না হতেন, তাহলে রাসূলে করীম (স) একজন ঘোষণাকারীকে ঘোষণা দেয়ার জন্যে নির্দেশ দিতেন না এবং একজনের সে ঘোষণার কোন ফায়দাও হতো না।

যদি প্রশ্ন তোলে যে, তোমাদের মৌল নীতি হচ্ছে, যে পন্থায় ইলম ওয়াজিব হয়, সেই পন্থায় যা প্রমাণিত হয়, সেটিকে রাসূলের কথা মনে করায় একজনের দেয়া খবর গ্রহণ জায়েয নয়। অথচ লোকেরা বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামায পড়ছিলেন রাসূলে করীম (স)-এর নির্ধারণের (توقيف) ভিত্তিতে। পরে তাঁরা সকলেই 'খবরে ওয়াহিদ' পেঁয়ে তার বিপরীত ফিরে গেলেন, আগের কিবলা ত্যাগ করে।

এর জবাবে বলা যাবে, তারা নির্দ্বিধায় খবরে ওয়াহিদ কবুল করেছিলেন এ জন্যে যে, রাসূলের নিকট থেকে চলে যাওয়ার পর প্রথম নিয়ম অবশিষ্ট থাকার উপর দৃঢ় প্রত্যয়শীল ছিলেন না। কেননা তাঁরা মনসূখ হওয়ার ব্যাপারকে জায়েয মনে করতেন। তখনও প্রথম কিবলার স্থিতির উপর বিজয়ী ধারণার ধারক ছিলেন, যদিও ইয়াকীন—দৃঢ় প্রত্যয় ছিল না। এ কারণেই তাঁরা 'খবরে ওয়াহিদ' কবুল করে নিয়েছিলেন তা রাসূলের দেয়া ও রাসূলের নিকট থেকে পাওয়া খবর হিসেবে।

১. তাতে নতুন করে নামায শুরু করতে হবে না।

যদি কেউ কথা তোলে, তায়াম্মুমকারী নামাযে দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর পানি পাওয়া গেলে তার নামাযে স্থিতিশীল থাকাকে তোমরা জায়েয মনে কর না কেন; যেমন তাঁরা কিবলা পরিবর্তনের পরও পূর্ব কিবলার উপর স্থিতিশীল ছিলেন ?

জবাবে বলা যাবে, যা বলেছে, তা এক ভিন্ন কথা, তায়াম্মুমকারীর স্থিতিশীল থাকা জায়েয হওয়ার দরুন তার জন্যে অযূ ওয়াজিব হয়ে যায় না। তায়াম্মুমে নামায শেষ করাই তার জন্যে জায়েয পানি পাওয়া সত্ত্বেও। আর আলোচ্য ক্ষেত্রে লোকেরা যখন কিবলা পরিবর্তনের খবর পেয়ে গেলেন, তখন-ই তাঁরা সে দিকে ফিরে ও ঘুরে গেলেন। যে দিকে ফিরে তারা নামায পড়ছিলেন, সে দিকে আর মুখ করে থাকলেন না। কিবলার এই দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণিত হয় যে, তায়াম্মুম করে যে নামায পড়ছে, সে পানি পেলে তার অযূ করা উচিত এবং তারই উপর তার ভিত্তি হওয়া উচিত। এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই যে, তায়াম্মুমকারী পানি পেলে তাকে অযূ করতে হবে, তায়াম্মুমের উপর স্থিতি গ্রহণ জায়েয হবে না। অপর দিক দিয়ে কথা হচ্ছে ,তায়াম্মুমকারীর জন্যেও আসল ফরয হচ্ছে পানি দ্বারা অযূ করা। মাটি হচ্ছে এই পানির বিকল্প, বদল। ফলে পানি পাওয়া গেলে অযূ করার সেই আসল ফরয ফিরে চাপবে। যেমন 'মোজা'র উপর মসেহ্‌কারীর মসেহ্ করার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে সেই 'মসেহে'র উপর স্থিতি গ্রহণ করা জায়েয হবে না। তায়াম্মুমকারীর জন্যেও এই নিয়ম। ঠিক এ রূপই ব্যাপার কিবলার ক্ষেত্রেও। নামাযীদের জন্যে বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করা ফরয ছিল না, যখন কাবা কিবলা রূপে নির্দেশিত হয়ে গেল। অতঃপর কাবামুখী হওয়াই বাধ্যতামূলক ফরয হয়ে গেল। ক্রীতদাসী নামাযের মধ্যেই যখন স্বাধীনা হয়ে গেল, তার উপর 'সতর' ঢাকা পূর্বে ফরয না থাকলেও এক্ষণে তা-ই তার জন্যে বাধ্যতামূলক ফরয। আনসারগণ যখনই কিবলা পরিবর্তনের সংবাদ পেয়ে গেলেন, তখন সেই কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়াই তাদের জন্যে ফরয হয়ে গেল। অনুরূপভাবে কিবলা নির্ধারণের চেষ্টাকারীর জন্যে ফরয হল সেই দিকে মুখ করে নামায পড়া, যেদিককে কিবলা রূপে নির্ধারণে তার চেষ্টা সফল হয়েছে। তা ছাড়া অন্য কোন দিকে মুখ করা তার জন্যে ফরয-ই ছিল না। তার দলীল আল্লাহ্‌র এই কথা ঃ তোমরা যে দিকেই মুখ করে দাঁড়াও, সেটিই আল্লাহ্‌র দিক।' সে এক্ষণে একটি ফরয থেকে অপর একটি ফরযের দিকে ফিরে গেল মাত্র, বিকল্প থেকে আসল ফরযের দিকে ফিরে যায়নি।

আলোচ্য আয়াতে আরও একটি নির্দেশ আছে। তা হল আনসারদের কাজটি —যা বলেছি তাতেই আমল। কেননা আদেশ ও নিষেধে সিদ্ধান্তটি জানার সাথে সংশ্লিষ্ট। যা জানা, তা-ই আসল। এ কারণে আমাদের হানাফী মাযহাবের ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, যে লোক দারুল হরব-এ ইসলাম কবুল করলেন, সে জানতে পারল না যে, তার উপর নামায ফরয হয়ে পড়েছে। পরে সে দারুল-ইসলামে চলে এল। এখানে সে যথারীতি ওয়াক্তের নামায-ই পড়বে, তাকে পেছনের না-পড়া নামায কাযা করতে হবে না। কেননা সে নামায ফরয হওয়ার কথা জানতে ও শুনতে পায়নি। আর যে বিষয়ে জানা যাবে না, শুনা হবে না, তা পালন করার কোন দায়িত্ব আসে না। যেমন কিবলা পরিবর্তন করে কাবামুখী হওয়ার

কোন দায়িত্ব আনসার (এবং কুবা'র মুসলমানদের) উপর ছিল না। তা জানা ও শুনার পূর্ব পর্যন্ত প্রাচীন কিবলা-ই তাদের জন্যে কিবলা ছিল। ওকালাত, মুজারিবাত (দায়িত্ব গ্রহণ ও পারস্পরিক ব্যবসায়) এবং অনুরূপ ব্যাপারাদিতেও সেটাই মৌল নীতি। যে তা ভেঙ্গে দিতে পারে সে যদি তা ভেঙ্গেও দেয়, তবুও কোন কিছুই বাতিল ও নাকচ হয়ে যাবে না অপর পক্ষ তা না জানা পর্যন্ত। তেমনি যে পূর্ণ বয়স্ক হয়নি, তার জন্যেও শরীয়াতের কোন আদেশ পালনীয় হয় না। এ কারণে ফিকাহবিদগণ বলেছেন, উকীলের ওকালতী কাজ-কর্ম করা ও ওকালাত সম্পর্কে জানার পূর্বে জায়েয নয়।

আল্লাহ্-ই তাঁর শরীয়াত ও কিতাব সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

## ইজমা সত্য ও সহীহ্—এ পর্যায়ের আলোচনা

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ –

আর এভাবেই আমরা তোমাদেরকে একটি মধ্যম পন্থার অনুসারী উম্মত বানিয়েছি, যেন তোমরা দুনিয়ার লোকদের জন্যে সাক্ষী হও .....

অভিধান বিশারদগণ বলেছেন ঃ الوسط। শব্দের অর্থ العدل। 'ন্যায়পরায়ণ, নিরপেক্ষ, (সুবিচারক, উন্নত আদর্শ চরিত্রের অধিকারী)। সীমালঙ্ঘনকারী ও সীমার মাত্রার কমকারী—এই দুয়ের মধ্যবর্তী। কেউ কেউ বলেছেন, উত্তম, অধিক কল্যাণময়। আসলে এই সব অর্থই এক ও অভিন্ন। কেননা العدل। -এর অর্থও الخيار। — অতীব উত্তম ও কল্যাণময়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ –

যেন তোমরা সাক্ষী হও জনগণের উপর।

এর অর্থ, যেন তোমরা হও, যেন হতে পার সাক্ষী। شهداء সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা লোকদের সেসব কার্যাবলীর বিষয়ে সাক্ষী দেবে, যা তারা সত্য দ্বীনের বিরোধিতা এই দুনিয়ায় ও পরকালে করবে। যেমন একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَجِائْىَ بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَاءِ –

যেন তোমরা সাক্ষী হও জনগণের উপর।

এ পর্যায়ে বলা হয়েছে, তারা নবীগণের পক্ষে তাঁদের সত্য অমান্যকারী উম্মতগণের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, তারা তো দ্বীন পৌছিয়ে দিয়েছেন। আর এ সাক্ষ্য তারা দেবে নবী করীম (স) তাদেরকে এ বিষয়ে জানিয়েছেন, এর ভিত্তিতে, বলা হয়েছে, তোমরা হবে অকাট্য দলীল, যে বিষয়ে তোমরা সাক্ষ্য দেবে সেই বিষয়ের। যেমন নবী করীম (স) নিজে সাক্ষী অর্থাৎ অকাট্য দলীল হবেন তাদের প্রত্যেকের জন্যে।

আবূ বকর বলেছেন, ব্যবহৃত শব্দসমূহ এই সব অর্থ-ই দিতে পারে। আর এসব অর্থই এক সাথে গ্রহণও করা যেতে পারে। এ সবই এখানে আল্লাহ্‌র বক্তব্য। অতএব তারা জনগণের কাজ-কর্মের সাক্ষ্য দেবে ইহকালে ও পরকালে—উভয় ক্ষেত্রেই। তারাই নবীগণের পক্ষে তাদের সত্য দ্বীন অমান্যকারী উম্মতদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তারা এই সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হবে এই কারণে যে, আল্লাহ্ নিজেই এ বিষয়ে তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। এই সব সত্ত্বেও এবং সেই সাথেই তাদের পরবর্তীতে আসা লোকদের জন্যে অকাট্য দলীল—শরীয়াতের উত্তরাধিকার বলার ব্যাপারে, এক বংশ থেকে তার পরবর্তী বংশের নিকট হস্তান্তরিত হওয়ার ব্যাপারে। তারা নিজেরা যে সব হুকুম জারি করেছে, ফায়সালা গ্রহণ করেছে, বিশ্বাস করেছে যে, এগুলো আল্লাহ্‌র বিধান, সেই সব ব্যাপারেও তারা অকাট্য দলীল।

এ আয়াতে এই দলীল রয়েছে যে, মুসলিম উম্মতের 'ইজমা' (اجماع) নিঃসন্দেহে সহীহ্ অবশ্য গ্রহণীয় শরীয়াতের ভিত্তি হিসেবে। এর দুটি কারণ। একটি—আল্লাহ্ নিজেই মুসলিম উম্মতকে ন্যায়পরায়ণ, সুবিচারক, নিরপেক্ষ, বিশ্বাস্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন। অতএব তারা সর্বোত্তম, সকলের তুলনায় অধিক কল্যাণময়। অতএব তাদেরকে সত্যবাদী মানতে হবে। সুবিচারক—নিরপেক্ষ রায় প্রদানকারী বলে বিশ্বাস করতে হবে। তাদের কথাকেও সত্য ও ন্যায় ভিত্তিক বলে স্বীকার করতে হবে। তারা সমষ্টিগতভাবে গুমরাহীর মধ্যে পড়তে পারে—এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী ও নিষেধকারী।

আর দ্বিতীয় কারণ—আল্লাহ্ বলেছেন ঃ তারা লোকদের উপর সাক্ষ্যদাতা অর্থাৎ অকাট্য দলীল। অনুরূপ রাসূল (স) তাদের জন্যে অকাট্য দলীল বলে আল্লাহ্ তাঁর পরিচিতিতে বলেছেন ঃ তিনি তাদের জন্যে সাক্ষ্যদাতা। আর আল্লাহ্ই যখন তাদেরকে অন্য সব লোকের জন্যে 'সাক্ষ্যদাতা' বলেছেন, তখন তিনি এই ফায়সালা দিয়েছেন যে, তারা সকলে ন্যায়পর, নিরপেক্ষ, সুবিচারক। তাদের কথা অবশ্যই কবুল করা যাবে, কবুল করতে হবে নির্দ্বিধায়। কেননা আল্লাহ্ ঘোষিত সাক্ষী তো আর কাফির হতে পারে না, গুমরাহ্ বা পথভ্রষ্ট হতে পারে না। অতএব আয়াতটির দাবি হচ্ছে, তারাই পরকালে সাক্ষ্যদাতা হবে সেইসব লোকের জন্যে বা বিরুদ্ধে, যারা প্রত্যেক যুগে তাদের আমল দ্বারা সাক্ষ্য দিয়েছেন, যারা তাদের সময়ের পূর্বে মরে গেছে তাদের ছাড়া। যেমন নবী করীম (স)-কে সাক্ষী বানানো হয়েছে তাঁর সময়ের লোকদের উপর। এ কথা তখনকার জন্যে যদি তাদের আমলের ব্যাপারে পরকালে সাক্ষ্যদানের কথা মনে করা হয়। কিন্তু এই 'শাহাদাত'-এর অর্থ যদি করা হয় অকাট্য দলীল, তাহলে তা অকাট্য দলীল তাদের উপর, যাদের তিনি দেখেছেন। তারা তাঁর পরবর্তী দ্বিতীয় সময়ের লোকজন এবং তাদের পরে কিয়ামত পর্যন্ত যারা আসবে, তাদের জন্যেও। যেমন নবী করীম (স) সমগ্র উম্মতের উপর অকাট্য দলীল—প্রাথমিক পর্যায়ের ও শেষ পর্যায়ের। আর আল্লাহ্‌র অকাট্য দলীল কোন সময় প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হলে তা চিরদিনই প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত, এ থেকে পরকালের লোকদের আমল-এর সাক্ষ্যদান এবং যে সাক্ষ্যদান অকাট্য দলীল—এ দুয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তা উক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত।

**আল্লাহ্‌র কথা ঃ**

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۭ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰۤؤُلَاۤءِ شَهِيْدًا -

তখন কি অবস্থা হবে যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত থেকে সাক্ষী উপস্থিত করব এবং হে নবী! তোমাকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করব সেই সকলের উপর ?

আল্লাহ্‌ যখন জনগণের আমলের সাক্ষ্যের কথা বলতে চেয়েছেন, তখন বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেছেন তাঁর সময়ের লোকদের কথা এবং যে সেই বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে, তার কথা। যেমন আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আ)-এর কথার উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ - فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ -

আমি যতদিন তাদের মধ্যে বসবাস করেছি, ততদিন আমি তাদের সাক্ষী ছিলাম। অতঃপর তুমি যখন আমাকে তুলে নিলে, তখনকার লোকদের পাহারাদার তুমিই ছিলে হে আল্লাহ।

এ থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হল যে, আমলের বিষয়ের সাক্ষ্য সাক্ষ্যদানের অবস্থার সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। আর যে সাক্ষ্য 'হুজ্জাত' বা অকাট্য দলীল, তা শুধু প্রাথমিক ও শেষ পর্যায়ের উম্মতের সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট নয়। এ কারণে নবী করীম (স)-এর তাদের জন্যে অকাট্য দলীল ও 'হুজ্জাত' হওয়া সকল যুগ ও কালের সাথে জড়িত। কেননা তারা সকলেই আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যদাতা ছিল 'হুজ্জাত'—অকাট্য দলীল হিসেবে। তাই তারা অবশ্যই 'হুজ্জাত' হবে তাদের সময়ের লোকদের জন্যে, যারা তাদের সঙ্গে শামিল এবং তাদের পরবর্তী লোকদের সমস্ত যুগ ও কালের লোকদের জন্যেও। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এক সময়ের লেকেরা কোন বিষয়ে 'একমত' ও একত্রিত হলে এবং পরে তা থেকে কিছু সংখ্যক লোক তাদের ঐকমত্য থেকে বের হয়ে গেলে তারা পূর্ববর্তী লোকদের ইজমা বা ঐকমত্যকে অকাট্য দলীল হিসেবে উপস্থাপিত করবে। কেননা নবী করীম (স) এই জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাদের কথা সত্য ও নির্ভুল এবং তিনি তাদের কথার সত্যতাকে হুজ্জাত ও অকাট্য দলীল রূপে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। পরে যারা সেই ঐকমত্যের বাইরে চলে যাবে, তা থেকে ভিন্নতর মত গ্রহণ করবে, তারা তাদের দলীল ও হুজ্জাতের সিদ্ধান্ত পরিহারকারী হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র দলীল পাওয়া গেলে সেই দলীল দ্বারা যা প্রমাণিত তা না পাওয়া অসম্ভব, অবাঞ্ছনীয়। আর নবী করীম (স)-এর পর তার মনসূখ হয়ে যাওয়াও অসম্ভব বা কঠিন। তখন তার সিদ্ধান্ত মনসূখ হওয়ার প্রক্রিয়াই পরিত্যক্ত হতে পারে।

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, উম্মতের যে-কোন উপায়ে অর্জিত ইজমা বা ঐকমত্য

আল্লাহ্র নিকটও হুজ্জাত বা অকাট্য দলীল। তা পরিত্যাগ করার কোন উপায় নেই কারোর জন্যেই। তা থেকে বের হয়ে যাওয়া বা তা থেকে ভিন্নতর মত গ্রহণ করার অধিকার থাকতে পারে না কারোরই।

উদ্ধৃত আয়াতটি প্রাথমিক পর্যায়ের লোকদের সাহাবায়ে কিরামের ইজমাকে সহীহ ও নির্ভুল প্রমাণ করে। বিভিন্ন যুগ ও সময়ের লোকদের ইজমাকেও সহীহ্ প্রমাণ করে উদ্ধৃত আয়াতটি।

কেননা সে ঐকমত্য বা ইজমা এমন নয় যে, তা কোন এক বিশেষ যুগের জন্যে সহীহ্ হবে, অন্য যুগ বা কালের জন্যে সহীহ্ হবে না। আয়াত অনুযায়ী যদি কেবল প্রাথমিক যুগের লোকদের ঐকমত্যের যথার্থতা স্বীকৃত হয়, অন্যান্য সকল যুগের জন্যে যথার্থ বিবেচিত না হয়, তাহলে প্রাথমিক যুগের পরিবর্তে অন্যান্য সকল যুগের লোকদের ইজমাকে যথার্থ বলে গ্রহণ করা জায়েয হবে। কিন্তু তা সম্ভব নয়।'

কেউ যদি বলে, আল্লাহ যখন বলেন ঃ এভাবেই তোমাদেরকে মধ্যবর্তী উম্মত বানিয়েছি, তখন এই কথাগুলো কেবল তা নাযিল হওয়ার সময়ে বর্তমান থাকা লোকদেরকে সম্বোধন করেই বলা হয়েছিল। তাই বুঝতে হবে যে, এই কথাগুলো কেবল মাত্র সেই লোকদের সাথে সম্পর্কিত, অন্যদের জন্যে তা প্রযোজ্য নয়, তাদের ছাড়া অন্যরা এই সম্বোধনের আওতায় পড়ে না। যদি তাদেরকেও গণ্য করতে হয়, তা হলে সেজন্যে স্বতন্ত্র দলীলের প্রয়োজন।

এর জবাবে বলা হবে, এরূপ ধারণা আদৌ ঠিক নয়, কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ 'এভাবে তোমাদেরকে মধ্যম পন্থানুসারী উম্মত বানিয়েছি'—এটা সমগ্র মুসলিম উম্মতকে সম্বোধন করে বলা কথা। প্রাথমিক কালের লোকেরা যেমন এর মধ্যে গণ্য, তেমনি শেষের লোকেরাও এর মধ্যে শামিল। আয়াতটি নাযিল হওয়ার সময়ে বর্তমান থাকা লোকদের জন্যে এই কথা যেমন, তেমনি তাদের পরে কিয়ামত পর্যন্ত যেসব লোক এই উম্মতের মধ্যে শামিল হবে, নির্বিশেষে তাদের সকলের জন্যেও এই কথা, যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ -

তোমাদের প্রতি সিয়াম ফরয করে দেয়া হয়েছে, যেমন করে তা ফরয করে দেয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্বে চলে যাওয়া লোকদের জন্যেও।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ -

তোমাদের প্রতি কিসাস ফরয করে দেয়া হয়েছে।

এই ধরনের যত সম্বোধনমূলক ঘোষণা কুরআনে রয়েছে, তা সবই সমগ্র মুসলিম উম্মতের জন্যে। তা থেকে কেউ বাদ পড়বে না। যেমন নবী করীম (স) তাঁর সময়ে বর্তমান থাকা সমগ্র লোকদের জন্যে প্রেরিত নবী ও রাসূল, তেমনি যারা তাঁর পরে আসবে, তাদের প্রতিও প্রেরিত। আল্লাহ বলেছেন ঃ

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا وَّدَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا -

আমরা তোমাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা, সাবধানকারী, ভয় প্রদর্শক এবং আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল আলো বিতরণকারী চেরাগরূপে পাঠিয়েছি।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ -

আমরা আপনাকে সারে জাহানের জন্যে রহমত হিসেবে পাঠিয়েছি।

কোন মানুষ একথা মনে করতে পারে যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) প্রাথমিক কালের ও শেষ কালের সমস্ত মানুষের প্রতি প্রেরিত হন নি, তিনি তাদের জন্যে হুজ্জাত ও সাক্ষ্যদাতা নন, সমগ্র জাহানের জন্যে রহমত ছিলেন না, কোন মানুষ—কোন মুসলিম এরূপ ধারণা রাখে—এমন কল্পনাও করা যায় না।

যদি কেউ প্রশ্ন তুলে যে, আল্লাহ যখন বলেছিলেন ঃ 'আমরা এভাবেই তোমাদেরকে মধ্যম পন্থানুসারী উম্মত বানিয়েছি,' তাতে ব্যবহৃত 'উম্মত' শব্দটি তো নবীর সময়ে বর্তমান থাকা লোকদেরকেই বোঝায়, বোঝায় তাঁর পরে কিয়ামত পর্যন্তকার লোকদেরকে। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর নেতৃত্বে গঠিত সমাজকে নিরপেক্ষ সুবিচারক বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তাদের সাক্ষ্য অবশ্যই গ্রহণীয় বলেছেন। অথচ তাতে কেবলমাত্র একটি যুগের লোকদের ন্যায়বাদী-সুবিচারক (العدل) হওয়ার ও সাক্ষ্য কবুলের কথা নেই। তাহলে তুমি সমস্ত যুগের ও কালের লোকদের 'ন্যায়বাদী সুবিচারক' হওয়ার কথা কেমন করে বলছ? তাদেরকে তাদের পরবর্তী কালের ও যুগের লোকদের জন্যে 'হুজ্জাত' কেমন করে বানাচ্ছ?

এর জবাবে বলা যাবে, যিনি তাদেরকে অন্যদের জন্যে ন্যায়পর সুবিচারক হওয়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তাদের দেয়া খবরে এবং আল্লাহ্র হুকুম বলে যার প্রতি বিশ্বাস রাখে সেই ব্যাপারে, আর একথা তো জানাই আছে যে, এ এমন একটা গুণ, যা দুনিয়ায় অর্জিত হয়েছে এবং আল্লাহ্ জানিয়েছেন যে, তারা সমগ্র মানুষের জন্যে সাক্ষী। এমতাবস্থায় উম্মতের প্রথম ও শেষের লোকদের তাদের জন্যে 'হুজ্জাত' হওয়ার কথা গণ্য করা হয় তাহলে আমরা এ থেকেই জানতে পারি যে, আসলে লক্ষ্য হচ্ছে সমস্ত যুগ ও কালের লোকেরা, তারা সকলেই এই গুণ ও মর্যাদার অধিকারী।

কেননা প্রত্যেক যুগ ও কালের লোকদেরকেই 'উম্মত' নামে অভিহিত করা সঙ্গত। কেননা 'উম্মত' তো নাম হচ্ছে সেই জনসমষ্টির, যারা একটি মাত্র দিকমুখী একই লক্ষ্যের অভিসারী, আর প্রত্যেক যুগ ও কালের লোকগণ তাদের স্বঅবস্থায়ই এই নামের ধারক। 'উম্মত' শব্দটি তো সাধারণ প্রয়োগীয় নিঃশর্ত। তাই এক যুগের সব লোককেই উক্ত কথা বলা হয়েছে। যেমন, যদি বলি ঃ আল্লাহ্ মা ও বোনদের হারাম করে দিয়েছেন, এই

ব্যাপারে গোটা উম্মত একমত এবং তা যেমন উম্মত বয়ে নিয়ে চলেছে, তেমনি কুরআনও। তাহলে এই কথা নিঃসন্দেহে সহীহ হবে। বোঝা গেল ও প্রমাণিত হল যে, উক্ত কথাটি আল্লাহ্ বলেছেন সকল যুগ ও কালের লোকদের জন্যে। তাছাড়া আল্লাহ তো বলেছেন, 'তোমাদেরকে মধ্যম পন্থানুসারী বানিয়েছি, এই গুণ-সম্পন্ন জনসমষ্টি অনির্দিষ্ট ও সাধারণ। আর তাদেরকেই তিনি 'হুজ্জাত' বানিয়েছেন। আর তা সকল কাল ও যুগের লোকেরাই হতে পারে, হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা جعلناكم 'তোমাদেরকে বানিয়েছি' সকল লোকের জন্যে সাধারণ সম্বোধন, বর্ণিত গুণটি সম্বোধিত সব মানুষেরই অর্জনযোগ্য ঃ

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسَى أُمَّةٌ يَهْدُوْنَ بِالْحَقِّ –

মূসার লোকজনদের মধ্য থেকে একটি উম্মত জনগোষ্ঠী রয়েছে, যারা সত্য দ্বীনের হেদায়েত গ্রহণ করে ও মেনে চলে।

মূসা (আ)-এর সময়ের সমস্ত লোক একটা উম্মত। তাদের কতকাংশকে স্বতন্ত্রভাবে 'উম্মত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা তাদেরকে একটা ভিন্নতর গুণে ভূষিত করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, প্রত্যেক যুগের লোকেরাই 'উম্মত' নামে অভিহিত হতে পারে। যদিও তা একটি উম্মতের প্রাথমিক ও শেষের লোকদের সাথেই তার সম্পর্ক। এ আয়াতে এ প্রমাণও রয়েছে যে, যার কুফরী প্রকাশমান, যেমন, আল্লাহ্র সদৃশ নির্মাণকারী আর যে লোক জাহিলিয়াতের মত গ্রহণ করেছে এবং সেই দিক দিয়ে পরিচিতি লাভ করেছে, সে মুসলিম গণ্য হবে না ইজমার ভিত্তিতে। অনুরূপভাবে যার ফাসিকীও প্রকাশমান, সে-ও ইজমায় মুসলিম গণ্য হবে না। যেমন খারেজী ও রাফিযী মতের লোকেরা যার ফাসিকী আমল-এর দিক দিয়ে কিংবা যার ফাসিকী আকীদা বিশ্বাসের দিক দিয়ে, তারা সকলেই সমান। কেননা আল্লাহ 'সাক্ষী' বলে অভিহিত করেছেন কেবল সেই লোকদেরকে, যারা ন্যায়পরতা-নিরপেক্ষতা ও কল্যাণ প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত। আর এই গুণের অধিকারী কাফির ফাসিক লোকেরা হতে পারে না। ব্যাখ্যার দিক দিয়ে যারা কাফির ও ফাসিক তারা একের থেকে ভিন্নতর কিছু নয়। কেননা নিন্দনীয় 'গুণ'টিতে এরা সকলেই সমানভাবে শামিল, কোন অবস্থায়ই তারা ন্যায়পরতা, নিরপেক্ষতা, নির্ভরযোগ্যতা, সততা প্রভৃতি গুণ পেতে পারে না।

## কিবলা মুখী হওয়া

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا –

তোমার বারবার আকাশের দিকে ফিরে তাকানোকে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করছি। এখন তোমার মুখ আমরা সেই কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, যা তুমি পছন্দ কর (যে দিকে মুখ করে নামাযে দাঁড়াতে পারলে তুমি সন্তুষ্ট হবে)।

বলা হয়েছে, اَلتَّقَلُّبُ অর্থ اَلتَّحَوُّلُ বারবার ঘুরে যাওয়া। নবী করীম (স) যেহেতু বারবার আকাশের দিকে মুখ তুলতেন এজন্যে যে; কাবার দিকে কিবলা ঘুরিয়ে দেয়ার

তাঁকে ওয়াদা দেয়া হয়েছিল। এজন্যে তিনি এ পর্যায়ে ওহী নাযিল হওয়ার অপেক্ষায় উদগ্রীব হয়েছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র নিকট তারই প্রার্থনাও করছিলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তার-ই অনুমতি দান করলেন। নবী-রাসূলগণ আল্লাহ্‌র নিকট কিছু চান—প্রার্থনা করেন তাঁর নিকট থেকে পূর্বানুমতি প্রাপ্তির পর। তাঁরা যা চান, তাতে পূর্ণ কল্যাণ হওয়ার ব্যাপারে তাদের মনে নিরাপত্তাবোধ থাকা আবশ্যক। আল্লাহ্ তাঁদের এই ধরনের প্রার্থনাকেই কবুল করেন। তখন তাঁদের জনগণের জন্যে তা একটি কঠিন পরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায়। রাসূলের আকাশপানে বারবার তাকানোর তাৎপর্য এই।

এ পর্যায়ে আরও বলা হয়েছে, নবী করীম (স) অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন, পছন্দ করতেন যে, আল্লাহ্ কাবাকে তাঁর জন্যে কিবলা নির্দিষ্ট করে দিন। তাহলে ইয়াহূদীদের থেকে তাঁর কিবলা স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর হতে পারে। এ পর্যায়ে মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, ইবনে আব্বাস বলেছেন, কাবা কিবলা হোক, তা অধিক প্রিয় ছিল এজন্যে যে, তা-ই ছিল হযরত ইবরাহীমের কিবলা। এ-ও বলা হয়েছে যে, তা কিবলা হিসেবে অধিক প্রিয় ছিল এজন্যেও যে, তাতে আরবের লোকদেরকে ঈমানের দিকে নিয়ে আসা অধিক সহজ ছিল। 'আমরা তোমাকে তোমার পছন্দনীয় কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি'-এ কথার একটাই তাৎপর্য। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ –

অতএব তুমি তোমার মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফিরাও।

অভিধান বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, الشَّطْرُ। শব্দটি একটি মিলিত (common) নাম বিশেষ দুটি অর্থে তার প্রয়োগ। একটি অর্থ অর্ধেক। যেমন বলা হয় شَطَرْتُ الشَّيْءَ 'জিনিসটাকে দ্বিখণ্ডিত করেছি।' সেটিকে দুই ভাগে ভাগ করেছি। আরবরা বলে اَحْلُبُ حَلَبًا لَكَ شَطْرُهُ আমি দুগ্ধ দোহন করব, তার অর্ধেক তোমার' আর দ্বিতীয় অর্থ দিক। এখানে এই দ্বিতীয় অর্থই যে লক্ষ্য ও গ্রহণীয়, সে ব্যাপারে কোন মতবৈষম্য নেই। ইবনে আব্বাস, আবুল আলীয়া, মুজাহিদ ও রুবাই ইবনে আনাস প্রমুখ উক্ত কথাটি বলেছেন। এখানে প্রথম অর্থটি গ্রহণীয় হতে পারে না। কেননা অর্ধেক মসজিদে হারামকে কিবলা বানানোর কোন অর্থই হয় না। সে কথা কেউ বলেওনি।

তবে মুসলিমগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, মসজিদে হারামের কোন একটা পার্শ্বের দিকে মুখ করে নামায পড়লে সে নামায হয়ে যাবে। এতে এই দলীলও রয়েছে যে, আল্লাহ্‌র ঘরের একটি পার্শ্বের দিকে মুখ করে নামায পড়লে যে নামায আদায় হয়ে যাবে। কেননা সে ঘরের একাংশের দিকে মুখ করেছে। আর আল্লাহ্ যে মসজিদে হারামের কোন একটা পার্শ্বের দিকে মুখ করে দাঁড়ানোর কথা বলেছেন, তাতে সেই আসল ঘরটাই লক্ষ্য। কেননা মক্কার লোক যদি তার নামাযে সোজাসুজি কাবামুখী হয়ে নামায না পড়ে তাহলে তার নামায যে আদায় হবে না—এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ -

তোমরা যেখানেই থাকো, তোমাদের মুখমণ্ডল তার (মসজিদে হারাম) দিকেই নিবদ্ধ কর।

এ আয়াতের সম্বোধন সেই লোকের প্রতি, যে কাবা নিজ চক্ষে দেখতে পাচ্ছে। যে লোক সেখানে অনুপস্থিত—দূরে অবস্থিত, তাকেও এ নির্দেশই দেয়া হয়েছে। উক্ত কথাটি বলা হয়েছে তাকে, যে কাবার নিকট উপস্থিত, প্রত্যক্ষ চোখে কাবা দেখতে পাচ্ছে। তাকেও, যে সেখান থেকে দূরে থেকে তার নিকট যে দিকটি কাবার দিক, সে দিকে মুখ করে দাঁড়াবে। তাকে এই দিক নির্ধারণ করতে হয়। কেননা সেখানে অনুপস্থিত লোককে কাবা প্রত্যক্ষভাবে দেখার দায়িত্ব দেয়া হয় নি। কেননা তার পক্ষে তা সম্ভব নয়, তার কোন উপায়ই তার নেই। আল্লাহ তো বলেই দিয়েছেন ঃ

لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّاوُسْعَهَا -

আল্লাহ্ কোন ব্যক্তিকে এমন দায়িত্ব দেন না, যার সামর্থ্য তার নেই।

তিনি বান্দাকে সেই কাজেরই দায়িত্ব দেন, যা করার সামর্থ্য তার আছে। তএব যে লোক চোখের সামনে কাবা দেখতে পারছে না, তাকে তা দেখার দায়িত্ব দেয়া হয়নি। আমরা এ থেকে জানতে পারলাম, বান্দার বেশীর ভাগ বলিষ্ঠ ও বিজয়ী ধারণানুযায়ী যে দিকটি কাবার দিক, সে দিকে মুখ করে নামায পড়ার জন্যেই সে দায়িত্বপ্রাপ্ত। সেখানে অনুপস্থিত, অন্যত্র অবস্থান করছে, আল্লাহ্র নিকট থেকে তাকে কাবা চোখে দেখতে থাকা অবস্থায় নামায পড়ার দায়িত্ব থেকে মুক্ত করা হয়েছে।

এ একটি মৌলনীতি। এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, নিত্য নব সঙ্ঘটিত ব্যাপারাদিতে শরীয়াতের হুকুম জানার জন্যে ইজতিহাদ করা সম্পূর্ণ জায়েয। প্রত্যেক ইজতিহাদকারীই তার ইজতিহাদ অনুযায়ী কাজ করার জন্যে দীয়ত্বশীল। সাধারণ ধারণাকে ভিত্তি করেই তাকে এই কাজ করতে হয়, এ থেকে এ-ও বোঝা যায় যে, অস্পষ্ট ঘটনাবলীর মূলে একটি কাঙ্ক্ষিত তত্ত্ব ও নিগূঢ় সত্যতা নিহিত আছে। যেমন ইজতিহাদ ও বিজয়ী আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে কিবলা জানা একটা কাঙ্ক্ষিত সত্য। এই কারণে সে কিবলার সন্ধানে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানোর দায়িত্বও সহীহ্ ঠিক যেমন চেষ্টা করে কিবলার প্রকৃত দিকটি জানতে যত্নবান হতে হবে। কেননা তার একটা মহা বাস্তবতা ও সত্যতা রয়েছে। আদপেই যদি কোন কিবলা না হতো, তা হলে তার সন্ধান ও নির্ধারণের জন্যে চেষ্টা করার কোন দায়িত্বই আমাদের থাকত না। আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا -

প্রত্যেকের জন্যেই একটা দিক নির্দিষ্ট রয়েছে, সে সেই দিকটির মুখী হয়।

الو جهة। অর্থ কিবলা। মুজাহিদ এই কথাটি বর্ণনা করেছেন। হাসান তার অর্থ

বলেছেন طريقة পন্থা বা প্রক্রিয়া। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র কৃত বিধান ইসলাম। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও সুদ্দী বলেছেন ঃ

لأهل كل ملة من اليهود والنصارى وجهة –

ইয়াহূদী-খ্রিস্টান প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর জন্যে মুখ ফেরানোর একটা দিক আছে।

হাসান বলেছেন ঃ

لكل نبي الوجهة واحدة –

প্রত্যেক নবীরই একটি মাত্র দিক রয়েছে, আর তা হচ্ছে ইসলাম।

শরীয়াতের হুকুম-আহকামে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا –

তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে একটি বিধান ও একটি প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি বানিয়ে দিয়েছি।

কাতাদাহ বলেছেন, তা হচ্ছে তাদের নামায বায়তুল মাকদিসের দিকে এবং তাদের নামায কাবার দিকে।

এ পর্যায়ে বলা হয়েছে, সমগ্র দিগন্তবাসীদের মধ্য থেকে প্রত্যেক মুসলিম জনতার জন্যে কাবার দিকসমূহ রয়েছে, তার পেছন বা সম্মুখ, কিংবা তার ডান বা বাম। বলতে চাওয়া হয়েছে যে, এই দিকগুলোর মধ্যে কোন একটি বিশেষ দিক কিবলা হওয়ার জন্যে অপর দিক অপেক্ষা অধিক উত্তম নয়। বর্ণিত হয়েছে, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) মীজাব-এর বিপরীত দিকে বসা ছিলেন। তখন এই আয়াতাংশ পাঠ করলেন ঃ

فلنولينك قبلة ترضاها –

তোমাকে এমন একটা কিবলার দিকে ফিরাচ্ছি যা তুমি পছন্দ কর।

বললেন, এটাই হচ্ছে কিবলা। যে লোক মনে করে যে, একথা বলে 'মীজাব'কে বোঝানো হয়েছে, তার এ ধারণা ঠিক নয়। কেননা আয়াতে কাবার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কোন বিশেষ দিককে—মীজাব-এর দিককে—বোঝানো হয় নি অন্য দিকসমূহ বাদ দিয়ে। তা হতেই বা পারে কি করে, যখন আল্লাহ্‌র এই কথাটি রয়েছে ঃ তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানকে মুসাল্লা বানাও। এবং আল্লাহ্‌র কথা ঃ তোমার মুখ মসজিদে হারাম-এর দিকে ফিরাও। সেই সাথে মুসলিম জনগণের এই ঐকমত্যকেও স্মরণে রাখতে হবে যে, কাবার সবগুলো দিকই কিবলা তার জন্যে, যে সেদিকে ফিরে নামায পড়ে। আল্লাহ্‌র কথা ঃ

ولكل وجهة هو موليها –

প্রত্যেকেরই জন্যে একটা দিক আছে, যে দিকে সে মুখ করে দাঁড়ায়।

এটি প্রমাণ করে যে, কাবার নিকট থেকে অনুপস্থিত ব্যক্তির দায়িত্ব হচ্ছে কিবলার

সেই দিকে মুখ করা, তার বেশির ভাগ ধারণায় যে দিকটি কিবলা মনে হবে। সোজাসুজি ও অব্যাহতভাবে শুধু তারই দিকে মুখ করা এবং তাতে নির্ভুল হওয়া তার দায়িত্ব নয়। কেননা তা করার কোন সাধ্যই তার নেই। কাবার দূরে অবস্থিত সব মানুষের পক্ষে যথাযথভাবে কাবা দর্শকের ন্যায় তার মুখী হওয়া এক অসঙ্গত ব্যাপারও বটে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَاسْتَبِقُوْا الْخَيْرَاتِ –

তোমরা সকলে কল্যাণসমূহের দিকে এগিয়ে যাও।

এর অর্থ দ্রুত ও অবিলম্বে ইবাদত-বন্দেগীসমূহ পালন কর। এই দলীলের ভিত্তিতে বলা হয়েছে, ইবাদত—আনুগত্যের কাজ অবিলম্বে করা উত্তম, তা বিলম্বিত করা অপেক্ষা। বিলম্বিত করার পক্ষে কোন দলীল থাকলে ভিন্ন কথা। যেমন ওয়াক্ত শুরু হতেই নামায পড়া, যাকাত ফরয হতেই তা দিয়ে দেয়া, হজ্জ ফরয হতেই তা আদায় করা—এমনিভাবে অন্যান্য যাবতীয় ফরয তার জন্যে নির্দিষ্ট সময় হতেই, তার কারণ সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আদায় করা যেমন কাম্য, তেমনি অতীব উত্তম। তার কারণ এসব কাজের আদেশ অবিলম্বে পালনীয়। এ সব কাজ বিলম্বিত করা কেবল কোন দলীলের ভিত্তিতেই জায়েয হতে পারে। যেমন, কোন আদেশ পালনের জন্যে যদি কোন সময় নির্দিষ্ট না হয়ে থাকে তা সত্ত্বেও সকলেরই মত হচ্ছে যে আদেশটিই অবিলম্বে পালন করে ফেলা আবশ্যক; তাই কল্যাণময়। তাই আল্লাহ্র উক্ত আদেশের প্রেক্ষিতে সব ন্যায় কাজ—ভাল কাজ বা শরীয়াতের নির্দেশ খুব শীগ্গীর এবং অবিলম্বে পালন করা বাঞ্ছনীয়। কেননা তার আদেশ তো এজন্যেই দেয়া হয়েছে যে, আদেশ শুনা মাত্রই তা পালিত হবে। আল্লাহ্র কথা ঃ

لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ –

যেন তোমাদের বিরুদ্ধে লোকেরা কোন প্রমাণ পেতে না পারে।

তবে যারা জালিম, তাদের মুখ যে কখনই বন্ধ হবে না, তা নিঃসন্দেহ। কোন কোন লোক বলেন, আয়াতে ٧। বলে যে (exception) করা হয়েছে তা غير جنسى এর অর্থ সম্পর্কে অভিধান বিজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেছেন, এটা واستناء منقطعএর অর্থ বরং তাদের মধ্যে যারা জালিম তারা সব সময়ই শোবাহ-সন্দেহের মধ্যে পড়ে থাকে এবং অকাট্য যুক্তি প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তারা সন্দেহের সৃষ্টি করতেই থাকে। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ –

এ বিষয়ে ওদের কিছুই জানা নেই। আছে শুধু ভিত্তিহীন ধারণা-অনুমানের অনুসরণ।

অর্থাৎ কিন্তু ধারণা-অনুমানের অনুসরণই ওদের একমাত্র সম্বল, উপরে উদ্ধৃত আয়াতের حجة শব্দটির অর্থ, পারস্পরিক যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন, বিতর্ক করা।• তাই বলেছেন, লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে যেন কোন যুক্তি বা প্রমাণ পেয়ে না যায়। তবে জালিম

লোকদের কথা-ই আলাদা। তারা বাতিল যুক্তি প্রমাণ খাড়া করবেই। আবূ উবায়দাতা বলেছেন, এখানে لا অর্থ 'و' যেন বলেছেন, লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পেয়ে না যায়। ফরা' এবং অন্যান্য অভিধানবিদের এই কথা অস্বীকার করেছেন। ফরা বলেছেন لا কখনই 'و' অর্থে ব্যবহৃত হয় না। তবে استثناء যদি অগ্রবর্তী হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। কবির কথা ঃ

مَا بِالْمَدِينَةِ دَارٌ غَيْرُ وَاحِدَةٍ
دَارُ الْخَلِيفَةِ إِلَّا دَارُ مَرْوَانٍ

যেন বলেছেন, মদীনায় মারওয়ানের ভবন খলীফার ভবন ব্যতীত আর কোন ভবনই নেই।

কুতরব বলেছেন, তার অর্থ লোকদের জন্যে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণের সৃষ্টি যেন না হয়। তবে জালিমদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হতে কোন দোষ নেই। কোন কোন আরবী ব্যাকরণবিদ এই অর্থ মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন।

## আল্লাহ্‌র যিকির ওয়াজিব

আল্লাহ্‌র কথা ঃ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ 'তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। এ আয়াতে আল্লাহ্‌র যিকির করার নির্দেশ রয়েছে। এই বিষয়টিকে আমরা কয়েকটি দিক দিয়ে আলোচনা করব। এ পর্যায়ে আগের কালের মনীষীদের অনেক উক্তি বর্ণিত হয়েছে। একটা ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ঃ

اذْكُرُونِي بِطَاعَتِي أَذْكُرْكُمْ بِرَحْمَتِي -

তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমার আনুগত্য ও ইবাদত পালন করে, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব আমার রহমত নাযিল করে।

এ-ও বলা হয়েছে ঃ তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমার নিয়ামতের খানা-সিফাত করে, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। বলা হয়েছে, এ আয়াতের অর্থ— 'তোমরা শোকর আদায় করে আমার যিকির কর, আমি সওয়াব দিয়ে তোমাদেরকে স্মরণ করব।' বলা হয়েছে—'তোমরা দো'আ করে আমাকে স্মরণ কর, আমি দো'আ কবুল করে তোমাদেরকে স্মরণ করব।' আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ এসব অর্থই দিতে পারে। এ সবই এক সাথেই আল্লাহ্‌র বক্তব্য হতে পারে। কেননা ব্যবহৃত শব্দ এসব অর্থই শামিল করে, এসব অর্থ হওয়া সম্ভব।

যদি প্রশ্ন তোলা হয়, একই শব্দ থেকে এতসব বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ সঙ্গত নয়, আর এ সবই আল্লাহ্‌র বক্তব্য হওয়াও সম্ভব নয়। কেননা শব্দ বিভিন্ন অর্থের মিলিত তাৎপর্য দিতে পারে।

জবাবে বলা যাবে, সে কথা ঠিক নয়। কেননা 'যিকির'-এর যত দিকই রয়েছে, তা বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এক অভিন্ন তাৎপর্যের লক্ষ্যাভিসারী। তা যে 'মানুষ'-এর মত একটা

নাম। পুরুষ ও নারী সবাই তার অন্তর্ভুক্ত। যেমন 'ভাই'। বিভিন্ন ব্যক্তিকেই 'ভাই' বলে অভিহিত করা যায়। শরীকানাও তেমনি একটি ব্যাপার। যদি তার বিভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে, তাহলে যে কারণে সকলকে একই নাম দেয়া হয়েছে, তা অভিন্ন অর্থের ধারক, আল্লাহ্‌র যিকিরও ঠিক তেমনি। তার অর্থ, আল্লাহ্‌র ইবাদত ও বন্দেগী হতে পারে। আর এই ইবাদত বা বন্দেগী কখনো মুখের উচ্চারণে হয়, কখনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা বাস্তব কাজের মাধ্যমে, কখনো হয় হৃদয়ের আকীদা ও বিশ্বাস দ্বারা, কখনো চিন্তার দ্বারা তাঁর পক্ষের দলীল ও প্রমাণের মাধ্যমে। কখনো তাঁর বিরাটত্ব-মহানত্ব স্বীকারের মাধ্যমে। কখনো তাঁর নিকট দো'আ-প্রার্থনা করে, কখনো তার নিকট কিছু চেয়ে। একই শব্দের দ্বারা এই সবই বোঝানো যেতে পারে। অথবা শুধু 'ইবাদত' শব্দটি। এই শব্দ বলে যাবতীয় ইবাদত বোঝানো যেতে পারে—তা বাহ্যত যতই বিভিন্ন হোক—যদি নিঃশর্ত হুকুম আসে। যেমন ঃ

أَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ –

তোমরা ইবাদত আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, অনুসরণ কর রাসূলকে।

অনুরূপভাবে 'গুনাহ' শব্দ বললে সর্ব প্রকারের নিষিদ্ধ কাজ করাই বোঝায়। ঠিক এই ভাবেই فَاذْكُرُوْنِىْ তোমরা আমার 'যিকির' কর বলে যিকির-এর সকল দিক এর মধ্যে শামিল মনে করা যেতে পারে। সমস্ত ধরনের ইবাদতও এর অন্তর্ভুক্ত ধরা যেতে পারে। এ হল ব্যপক অর্থবোধক শব্দ। আল্লাহ্‌র বড়ত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব-মাহাত্ম্য মুখে প্রকাশ করার দ্বারাও 'যিকির' হতে পারে। তাঁর তারীফ প্রশংসা করেও তাঁর 'যিকির' করা যায়। 'শোকর' করলেও যিকির হয়, তার দেয়া নেয়ামতের স্বীকারোক্তি করলেও 'যিকির' হয়। লোকদেরকে তাঁর দাসত্ব কবুলের আহ্বান জানালেও তাঁর যিকির হয়। তাঁর এক ও এককত্বের অকাট্য দলীল-প্রমাণ পেশ করলেও তাঁর যিকির হয়। সে সব দলীল-প্রমাণ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলেও 'যিকির' হয়। তাঁর কুদরত ও মহানত্বের কথা বললেও যিকির হয়, আর এ সব-ই হচ্ছে সর্বোত্তম 'যিকির'। অন্যান্য সকল প্রকারের যিকির এর-ই উপর ভিত্তিশীল—এর অধীন। এভাবেই আয়াতের অর্থ সহীস্ ও স্পষ্ট হয়ে উঠে। কেননা দৃঢ় প্রত্যয় ও মনের স্বস্তি-প্রশান্তি এভাবেই লাভ করা যায়। আল্লাহ তো বলে দিয়েছেন ঃ

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ –

জেনে রাখো। আল্লাহ্‌র যিকিরে অন্তরসমূহ স্বস্তি ও নিশ্চিন্ততা লাভ করতে পারে।

এ হচ্ছে অন্তরের যিকির। আর তার অর্থ, আল্লাহ্‌র দলীল ও অকাট্য প্রমাণাদি সম্পর্কে গভীর-সূক্ষ্ম চিন্তা চালানো। আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ সন্ধান ও বিশ্লেষণ ও অনুধাবনের মাধ্যমে অর্জিত হয়। একালের চিন্তা-বিবেচনা-গবেষণা যতই বৃদ্ধি পাবে, অন্তরের স্থিতি-স্বস্তি নিশ্চিন্ততা তত বেশী লাভ করা যাবে। আর এজন্যে তা-ই হচ্ছে সর্বোত্তম যিকির। কেননা সকল প্রকারের যিকির তাঁর অস্তিত্ব ও একত্ব প্রমাণিত হলেই সহীহ্ হতে পারে। নবী করীম (স) বলেছেন বলে বর্ণনা এসেছে, خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِىُّ 'গোপন-নিঃশব্দ যিকির-ই হচ্ছে সর্বোত্তম 'যিকির'। ইবনে নাফে আবদুল মালিক ইবনে

মুহাম্মাদ মুসাদ্দাদ, ইয়াহ্ইয়া উসামা ইবনে যায়দ, মুহাম্মাদ, আবদুর রহমান, সা'দ ইবনে মালিক সূত্রে নবী করীম (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ وَخَيْرُ الرِّزْقِ مَايَكْفِيْ -

গোপন নিঃশব্দ যিকির সর্বোত্তম এবং সর্বোত্তম রিযিক হচ্ছে তাই যা যথেষ্ট হবে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ -

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা সবর ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য পেতে চাও।

এই কথাটি এসেছে ঃ 'তোমরা আমার যিকির কর, তা হলে আমিও তোমাদের যিকির করব' এই কথার পর। এতে বোঝা যায়, সবর ও নামায কার্যটি আল্লাহ্র যিকির বাধ্যতামূলকভাবে আঁকড়ে ধরায় এক মহাতৃপ্তি ও সুস্বাদ নিহিত রয়েছে। আর এ যিকিরই হচ্ছে আল্লাহ্র দলীল ও প্রমাণ, তাঁর কুদরত, বড়ত্ব—শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সুগভীর চিন্তা। এই কথাটির মতই কথা ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ -

নিঃসন্দেহে নামায (মানুষকে) নির্লজ্জতা ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।

এরই পরে বলা হয়েছে ঃ ولذكر الله اكبر 'এবং আল্লাহ্র যিকির নিঃসন্দেহে অনেক বড় কাজ।'

হৃদয় দ্বারা আল্লাহ্র যিকির হচ্ছে, তাঁর দলীল সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা এবং তা নামায কাজের তুলনায়ও বড়। তা হচ্ছে এই যিকির-এর সহায়তাকারী এবং এই যিকির ধারণ করে রাখার আনন্দ-স্বাদ, তাকে চিরস্থায়ী করার উপায়।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتَ بَلْ اَحْيَاءُ وَلٰكِنْ لَّاتَشْعُرُوْنَ -

যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বল না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পার না।

মৃত্যুর পরও যারা জীবিত, তারা হচ্ছে শহীদ। এই শহীদের সম্পর্কেই এ আয়াতে কথা বলা হয়েছে। তারা কিয়ামতের দিন জীবিত হবে, তা বলা হয়নি। কেননা তা-ই যদি বক্তব্য হতো তহলে 'কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পার না' বলা হতো না। মৃত্যুর পর তারা যে জীবিত, এ বিষয়ে আমাদের কিছুই জানা নেই। এ কথাটাই এখানে বলা উদ্দেশ্য। আর কিয়ামতের দিন তাদের জীবন হবে এ-ই যদি বক্তব্য হতো তাহলে মুমিনরা তাদের অনুভব করতে পারবে, চিনতেও পারবে তার পূর্বে। তাহলে প্রমাণিত হল যে, এখানে বক্তব্য হচ্ছে, তাদের মৃত্যুর পর কিয়ামতের দিনের আগেই তারা নবতর

জীবন লাভ করবে। মুমিনদেরকে যখন তাদের কবরে কিয়ামতের দিনের পূর্বেই জীবিত করা হবে, তারা সেখানে নিয়ামত প্রাপ্ত হবে, তাহলে কাফিরদেরকে তাদের কবরে কিয়ামতের পূর্বেই জীবিত করে তাদেরকে আযাব দেয়া হয়, এটা কোনক্রমেই অসঙ্গত কথা হতে পারে না। আর যারা কবর আযাব অস্বীকার করে—হবে না বলে, তাদের কথা যে বাতিল ও ভিত্তিহীন, তা এ থেকেই প্রমাণিত হয়।

যদি বলা হয়, সমস্ত মুমিনই যখন মৃত্যুর পর নিয়ামত প্রাপ্ত হবে, তখন আল্লাহ্‌র পথে নিহতদেরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা ও কেবল তারাই নিয়ামত প্রাপ্ত হবে, বলা কি করে যুক্তি-সঙ্গত হতে পারে ?

জবাবে বলা যেতে পারে, তাদের অবস্থার উল্লেখ করে অগ্রিম সুসংবাদ দেয়ার নিয়মে বিশেষভাবেই তাদের উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, এটা তো সম্ভব। অপর আয়াতে তাদেরকে যে বিশেষ নিয়ামত দেয়া হবে, তার কথা বয়ান করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ –

তারা জীবিত, তাদের রব্ব-এর নিকট তারা নিয়ামত প্রাপ্ত হচ্ছে।

যদি প্রশ্ন করা হয়, তারা কি করে জীবিত হতে পারে ? আমরা তো তাদেরকে কবরসমূহে জরাজীর্ণ অবস্থায় দেখতে পাই কালের পর কালের অতিক্রমণের পর ?

জবাবে বলা হয়, এ ব্যাপারে লোকেরা দুটি মতে বিভক্ত। এক ভাগের লোকদের বিশ্বাস, মানুষ মূলত হচ্ছে রূহ্‌। তা এক সূক্ষ্ম নিয়ামতপ্রাপ্ত অবয়ব। যা কিছু দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়, তা তাকেই করতে হয়, দেহকে নয়। এ-ও বলা হয়েছে যে, মানুষ হচ্ছে এই পর্যবেক্ষিত স্থূল অবয়ব। আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন পরিমাণ অংশ ভাগ করে নেন, যার দ্বারা জৈব সংস্থা দাঁড়িয়ে যায়। সমস্ত নিয়ামত তাকেই পৌঁছায়। এই সূক্ষ্ম অংশসমূহকেই আল্লাহ্‌ যে রূপ চাহেন, আযাব দেন। কিংবা পাওনা অনুপাতে নিয়ামত দেন। পরে তা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, যেমন অন্যান্য সমস্ত সৃষ্টিই বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে থাকে এবং তা কিয়ামতের আগেই। পরে কিয়ামতের দিন তাকেই জীবিত করা হবে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার জন্যে।

এ পর্যায়ে আবুল কাসেম আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইস্‌হাক আল-মেরওয়াজী হাসান ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আবূ রুবাই আল-জুরজানী আবদুর রায্‌যাক, মামর, জুহরী, কা'ব ইবনে মালিক সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

نَسَمَةُ الْمُسْلِمِ طَيْرٌ تُعَلَّقُ فِيْ شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَهَا إِلَى جَسَدِهِ –

মুসলিমের আত্মা (রূহ) পাখীর ন্যায় জান্নাতের গাছে ঝুলে থাকে। শেষ পর্যন্ত তাকে তার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَنَبْلُوَ نَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ - وَبَشِّرِ الصَّبِرِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ -

এবং অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে পরীক্ষা করব ভয়, ক্ষুধা, ধন-মাল, জান-প্রাণ ও ফল-ফসলের ঘাটতি দ্বারা। আর সুসংবাদ দাও সে সব ধৈর্যশীলদের, যারা তাদের উপর কোন বিপদ এলে তারা বলবে ঃ আমরা তো আল্লাহ্‌রই জন্যে এবং আমরা তাঁর-ই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।..... এবং তারাই হেদায়েত প্রাপ্ত পর্যন্ত।

আতা, রুবাই ও আনাস মালিক থেকে বর্ণিত আয়াতে হিজরতের পর নবী করীম (স)-এর সাহাবীগণকে সম্বোধন করা হয়েছে।

আবূ বকর বলেছেন, হতে পারে, আল্লাহ্‌র পথে এসব বিপদ ও মুসীবতের আগমন বার্তা তাদেরকে আগাম জানিয়ে দেয়া হয়েছে এ আয়াতের মাধ্যমে দুটি উদ্দেশ্যে। একটি যেন তারা নিজেদেরকে ধৈর্যের স্থিত রাখতে সক্ষম হন। এ সবের কোন একটি বিপদ যখন তাদের উপর আসবে, তখন যেন তারা ঘাবড়ে না যান, ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ভেঙ্গে না পড়েন এবং তা সহ্য করা তাঁদের জন্যে সহজতর হয়। আর দ্বিতীয়—সেই কথা জানিয়ে দেয়ার যা মনের পরম ধৈর্য গ্রহণের সওয়াব হিসেবে পাবে।

وَبَشِّرِ الصَّبِرِيْنَ পূর্বে যে সব বিষয়ের বিপদের কথার উল্লেখ করা হয়েছে, সেই বিপদ-সমূহের ধৈর্যধারণের সুফল লাভের সুসংবাদ আগাম জানিয়ে দিতে বলা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ তাদের উপর যখন বিপদ আসবে, বলবে ঃ আমরা তো আল্লাহ্‌রই এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। অর্থাৎ সেই অবস্থায় আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও মালিকানা স্বীকৃতির মাধ্যমে নিজেদেরকে ধৈর্যশীল করে রাখা। একথা জানিয়ে দেয়া যে, আল্লাহ্‌র অধিকার আছে তাদেরকে যে-কোন বিপদে ফেলা এবং ধৈর্যের শুভ প্রতিফল পাওয়ার আশাবাদী বানাবেন এবং তার মাধ্যমে তাদের কল্যাণ সাধন করবেন। কেননা তিনি তো সর্বজ্ঞ, তিনি মহান, কল্যাণ ও মঙ্গলময় কার্যসাধনে তিনি তুলনাহীন। তাঁর সমস্ত কাজেরই একটা যৌক্তিকতা ও উদ্দেশ্যমূলকতা রয়েছে। তাদেরকে আল্লাহ্‌র বান্দা হিসেবে স্থিত রাখা, গোটা ব্যাপার আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত করা, তার ফায়সালায় রাজী হওয়া ও রাজী থাকা, পরীক্ষার কাঠিন্যের মধ্যেও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা বান্দার কর্তব্য। কেননা তিনি সত্যের পক্ষে ফায়সালা গ্রহণ করেন। যেমন তিনিই বলেছেন ঃ

وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِه لَايَقْضُوْنَ بِشَىْءٍ.

আল্লাহ্ পরম সত্যতা সহকারে ফায়সালা করেন। যারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্যকে ডাকে, তারা কোন ফায়সালাই দেয় না, দিতে পারে না।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন ঃ যে বিষয়ের ফায়সালা আল্লাহ্ দিয়েছেন, সেই বিষয়ে হয়, যদি তা না হতো তাহলে কতই না ভালো হত, এ কথা বলার তুলনায় আকাশ থেকেই তার বিলম্বিত হওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয়।

আল্লাহ্র কথা ঃ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ 'আমরা তো আল্লাহ্রই জন্যে উৎসার্গিত' এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী,' এতে পরকালে, পুনরুত্থান, ও পুনরুজ্জীবনের স্পষ্ট স্বীকৃতি ও ঘোষণা রয়েছে। এ কথার প্রতিও ঈমান প্রকাশিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদেরকে তাদের প্রাপ্য অনুপাতে শুভ কর্মফল দান করবেন। পরম ইহ্সান সহকারে যারা কাজ করে, তাদের প্রাপ্য আল্লাহ্র নিকট কখনই বিনষ্ট হবে না, এ সব কঠিন বিপদে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ্র আনুগত্য ও ইবাদতে অবিচল থাকার যে ফলশ্রুতি, সে বিষয়েও স্পষ্ট জানিয়ে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ –

তাদের প্রতি রব্ব-এর নিকট থেকে বিপুল অনুগ্রহ ও অশেষ রহমত বর্ষিত হবে।

এ সব অনুগ্রহ ও রহমতের নিয়ামতের পরিমাণ ও মাত্রা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোরই জানা নেই। যেমন অপর আয়াতে তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ –

নিঃসন্দেহে ধৈর্যশীলদেরকে তাদের সুফল কোনরূপ হিসেব ছাড়াই পূর্ণ মাত্রায় পৌঁছিয়ে দেয়া হবে।

উদ্ধৃত আয়াতে যে সব বিপদ-মুসীবতের কথা উল্লিখিত হয়েছে, কাফির-মুশরিকরা তাঁদের উপর যে নিপীড়ন চালায়, তা-ও তার মধ্যে রয়েছে। আর স্বয়ং আল্লাহ্ যেগুলো দেন, তা-ও। মুশরিকদের কৃত আযাবের মূল কথা হচ্ছে গোটা আরব রাসূলে করীম (স) ও মুসলমানদের চরম শত্রুতায় উঠে পড়ে লেগেছিল। মদীনায় মুহাজির ও আনসারদের উপর যা ঘটেছে, তা তো আলাদা রয়েছেই। তা ছাড়া তাদের সংখ্যার বিপুলতা ও মুসলমানদের সংখ্যাল্পতার কারণে তাদের উপর যে ভীতি ও সন্ত্রাস চাপিয়া দেয়া হয়েছিল, তার কথা না বললেও চলে।

ক্ষুধার কারণ ছিল নিদারুন অর্থাভাব, খাদ্যহীনতা। তাদের উপর চেপে বসা কঠিন দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্য কখনো আল্লাহ্র দিক থেকেও আসত। তিনি তাদের ধন-মাল নষ্ট করে দিতেন। ফলে তারা দরিদ্রের গ্রাসে পড়ে যেতেন। তারা এঁদের উপর বিজয়ী হতো। ফলে তারা ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে পড়ত। ধন-মাল-জান-প্রাণ ও ফল-ফসলের ব্যাপক ঘাটতি দেখা দিত। এই দুটি কারণই থাকা সম্ভব। কেননা ধন-মালের ঘাটতির কারণ শত্রুরাও সৃষ্টি করত। ফল-ফসলের ঘাটতির ব্যাপারটিও ঘটতো, বিশেষ করে এজন্যে যে, তাঁরা কাফির মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কাজে এতটা মশগুল হয়ে পড়তেন যে, ফল-ফসল জন্মাবার অবসরই পেতেন না। তারা ব্যস্ত হয়ে পড়তেন সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের কাজে। ফলে জমি চাষাবাদের কোন সময়ই পেয়ে উঠতেন না। তা ছাড়া আল্লাহর কাজ

হিসেবে তাদের ধন-মাল ও ফল-ফসলের উপরও নানা প্রাকৃতিক বিপদ-আপদ এসে পড়ত। আর জান-প্রাণের ঘাটতি হতো, যুদ্ধে শত্রুরা তাদেরকে হত্যা করত। এমনি রোগ-ব্যাধিতেও অনেক লোক মরে যেত।

আল্লাহ্‌র কাজ হিসেবে যে সব বিপদ আসত তাতে ধৈর্য ধারণের অর্থ ছিল আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ, আল্লাহ্‌র কাজে রাজি থাকা এবং একথা জানা যে, আল্লাহ্ যা করেন ভালোর জন্যেই করেন, তা অবশ্যই উত্তম ও কল্যাণময়, আর আল্লাহ্ যদি তাদেরকে কিছু না দিয়ে থাকেন, তা হলে যথাসময়ে তিনি তা দেবেন। আল্লাহ্‌র না দেয়াটাও মূলত দেয়াই।

আর যা শত্রুদের শত্রুতামূলক কাজের ফলে ঘটতো, সেখানে সবর হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করা ও আল্লাহ্‌র দ্বীনের উপর অবিচল হয়ে থাকা। সে জিহাদ-যুদ্ধ থেকে বিরত না হওয়া, পিছু না হটা। আর এসব বিপদের মধ্যেও অব্যাহতভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত ও আনুগত্য করে যাওয়া। মুশরিকরা মুসলমানদের উপর যে জুলুম-নির্যাতন চালাত, তা আল্লাহ করাচ্ছেন একথা মনে করা ঠিক নয়। আল্লাহ্ কাউকে কারোর দ্বারা জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে পরীক্ষা করেন না। তিনি তা চানও না। সে জুলুম-নির্যাতনে সন্তুষ্ট বা ধৈর্যশীল নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। বরং তার মুকাবিলা ও প্রতিরোধ করা আবশ্যক। কেননা আল্লাহ্ই যদি জুলুম ও কুফর দ্বারা কাউকে পরীক্ষা করতেন, তা হলে তাতে রাজি থাকা, তা সয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয় হতো। কিন্তু আল্লাহ্ এ কাজের অনেক উর্ধ্বে।

আয়াতটিতে ধৈর্যশীলদের প্রশংসাও রয়েছে, যারা কঠিন বিপদ ও মুসীবতে পরম ধৈর্য ধারণ করেন এবং এই ধৈর্যের বিনিময়ে যে সওয়াব ও উত্তম প্রশংসা আছে তারও উল্লেখ হয়েছে। তাতে তাদের জন্যে দ্বীন ও দুনিয়ায় বিপুল কল্যাণ ও মুনাফা আছে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এই যা কিছু তারা পাবেন, তা শুধু আল্লাহ্‌র আদেশ পালনের মাধ্যমে। আর এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করার ফলে দুশ্চিন্তা থেকে সান্ত্বনা পাওয়া যায়। মনের উদ্বেগ হতাশা দূরীভূত হয়। মানসিক যন্ত্রণা থেকেও অনেকটা রক্ষা পাওয়া যায়। এ হচ্ছে সবর-এর বৈষয়িক সুফল। আর পরকালীন সুফল হচ্ছে অসীম অফুরন্ত সওয়াব। এই সওয়াবের পরিমাণ কত, তা আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই বলার সাধ্য নেই।

আবূ বকর বলেছেন, আলোচ্য আয়াতটিতে দুটি হুকুম রয়েছে। একটি ফরয আর অপরটি নফল। ফরয হচ্ছে, আল্লাহ্‌র আদেশের সম্মুখে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, আল্লাহ্‌র ফায়সালায় রাজি থাকা, ফরযসমূহ পালনে ধৈর্যাবলম্বন করা এবং দুনিয়ার কোন বিপদ ও কাঠিন্য-কঠোরতা এই সবর-এর বাঁধ ভাঙ্গতে না পারা। আর নফল হচ্ছে, মুখে উচ্চারণ করা ঃ আমরা তো আল্লাহ্‌রই, তাঁরই দিকে আমরা প্রত্যাবর্তনকারী।' এ কথার উচ্চারণে অনেক কল্যাণ নিহিত আছে। আল্লাহ যা নফল কাজ হিসেবে পেশ করেছেন, তা কার্যত করা। সে কাজে আল্লাহ্‌র ঘোষিত সওয়াব পাওয়ার অধিকারী হওয়া। তা ছাড়া অন্যদের সে উচ্চারণ শুনে অনুরূপ কথা মুখে উচ্চারণে উৎসাহিত হওয়া। এ উচ্চারণ শুনে

কাফিরদের অন্তর জ্বলে-পুড়ে যাওয়া এবং আল্লাহ্‌র কুদরত সম্পর্কে তাদেরও জানতে পারা। উচ্চারণকারীর পক্ষে আল্লাহ্‌র দ্বীনের জন্যে কষ্ট স্বীকার করতে রাজি হওয়া, তাঁর আনুগত্য ইবাদতে অবিচল থাকা, শত্রুদের মুকাবিলা করা। দাউদ-আত্‌তায়ীর এই কথাটি বর্ণিত হয়েছে ঃ বলেছেন, দুনিয়ায় যে লোক পরহিযগারী অবলম্বন করে, সে লোক এখানে স্থিতিশীল হয়ে থাকতে রাজি হয় না, পছন্দ করে না। সর্বোত্তম আমল হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। বিপদে অস্থির হয়ে পড়া মুসলিমের জন্যে বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা সে তো জানে যে, প্রতিটি বিপদ-মুসীবতই এমন যে, তাতে ধৈর্য ধারণ করতে পারলে বিপুল সওয়াব পাওয়ার সম্ভাবনা।

## সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মাঝে দৌড়ানো

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ - فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا -

নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয় আল্লাহ্‌র নিদর্শনাদির মধ্যে গণ্য। অতএব যে লোক হজ্জ করেছে কিংবা উমরা করেছে, তার জন্যে এ পাহাড় দুটির তওয়াফ করায় কোন দোষ নেই।

ইবনে উয়াইনা, জুহরী, উরওয়া সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন—আমি হযরত আয়েশা (রা)-এর সম্মুখে এ আয়াতটি পাঠ করলাম। তখন বললাম, আমি যদি তা না করি, তাহলে আমার কি আসে যায়! একথা শুনে তিনি বললেন, হে বোন পুত্র। তুমি খুবই খারাপ কথার উচ্চারণ করেছ। রাসূলে করীম (স) নিজে এই পর্বতদ্বয়ের তওয়াফ করেছেন। মুসলিম জনগণও তওয়াফ করেছেন। ফলে তা 'সুন্নাত' হয়ে গেছে। আল্লাহ্‌দ্রোহী 'মানাত'-এর পরিবারবর্গ পর্বতদ্বয়ের তওয়াফ করত না। পরে ইসলামী যুগেও লোকেরা এ পাহাড় দুটির তওয়াফ করা পছন্দ করত না। পরে উপরোদ্ধৃত আয়াতটি নাযিল হয়। অতঃপর নবী করীম (স) সেখানে তওয়াফ করেছেন। এভাবেই এই তওয়াফ—সাফা-মারওয়ার মাঝের সাঈ شعى সুন্নাত হয়ে যায়। এক সময় এ কথাটি আবূ বকর ইবনে আবদুর রহমানকে বললে তিনি বললেন ঃ এটা জানার বিষয়। জ্ঞানবান লোকেরা বলতেন; যে সব লোক সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করতেন তাদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। আমি মনে করি, আয়াতটি উভয় জনগোষ্ঠী সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

ইকরামা, ইবনে আব্বাস থেকে এ আয়াত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, বলেছেন, সাফা পর্বতের উপর অনেক ছবি ও মূর্তি রক্ষিত ছিল। এই কারণে মুসলিমগণ সেখানকার তওয়াফ করতেন না। তখন আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا -

এ দুটি পর্বতের তওয়াফ করায় কোন দোষ নেই।

আবূ বকর বলেছেন, এখানে মানাত মূর্তির কারণে ইসলাম-পূর্বকালে যারা এ পাহাড়ের তওয়াফ করত না, তারা হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিল, তাদের এই জিজ্ঞাসার দরুনই এ আয়াতটি নাযিল হয়। ইবনে আব্বাস ও আবূ বকর ইবনে আবদুর রহমান উল্লেখ করেছেন, যারা সাফা-মারওয়ায় তওয়াফ করত, তাদের জিজ্ঞাসাই ছিল আয়াতটির নাযিল হওয়ার কারণ। কেননা এ পাহাড় দুটির উপর মূর্তি রক্ষিত ছিল। ইসলামের যুগে লোকেরা সে দুটির তওয়াফ করতেন না। যারা এ দুটি পাহাড়ের তওয়াফ করতেন ও যারা তা করত না তাদের উভয়ের সওয়ালের কারণেই হয়ত এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল।

এ পর্বতদ্বয়ের মাঝে সাঈ সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। হিশাম ইবনে উরওয়া তাঁর পিতা থেকে, অইয়ূব ইবনে আবূ মুলাইকা থেকে এক সঙ্গে বর্ণনা—হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ

مَا اَتَمَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرِىءٍ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً مَالَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ –

সাফা ও মারওয়ার মাঝে তওয়াফ করেনি এমন ব্যক্তির হজ্জ বা উমরা সম্পূর্ণ হয়েছে বলে রাসূলে করীম (স) কখনই স্বীকার করেন নি।

আবুত তুফায়ল ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ এই পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করা সুন্নাত। নবী করীম (স) নিজে তা করেছেন। আমিরুল আহ্ওয়াল আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, আমরা সাফা ও মারওয়ার মাঝে তওয়াফ করাকে অপছন্দ করতাম। শেষ পর্যন্ত এ আয়াতটি নাযিল হল। এ দুটির মাঝে তওয়াফ করা নফল। আতা ইবনুয যুবায়র থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন—যার ইচ্ছা না হয় সে সাফা-মারওয়ার মাঝে তওয়াফ করবে না। আতা ও মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, যে তা করবে না, তার কোন গুনাহ নেই। বিভিন্ন এলাকার ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত দিয়েছেন। হানাফী ফিকাহবিদ সওরী ও মালিক মত দিয়েছেন যে, তা করা হজ্জ ও উমরার সময় ওয়াজিব। তা না করলে জন্তু যবেহ করতে হবে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এই সাঈ বা তওয়াফ না করলে শুধু জন্তু যবেহ করলে যথেষ্ট হবে না। তারু ফিরে গিয়ে তওয়াফ করা কর্তব্য।

আবূ বকর বলেছেন, হানাফী ফকীহগণের মতে তা হজ্জের অনুসঙ্গ। না করা হলে ও ঘরে ফিরে গিয়ে থাকলে জন্তু যবেহ করাই যথেষ্ট। যেমন মুজদালিফায় অবস্থান গ্রহণ, প্রস্তর নিক্ষেপণ ও তওয়াফে সদর। তা যে ফরয নয়, তার দলীল হচ্ছে নবী করীম (স)-এর হাদীস। শাবী উরওয়া ইবনে মদরস আততায়ী থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন—আমি মুজদালিফায় রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। বললাম, “হে রাসূল! আমি ‘তাই’ পর্বত থেকে এসেছি। পথের প্রতিটি পাহাড়ের উপরই অবস্থান গ্রহণ করেছি। আমার জন্যে কি হজ্জ করা জরুরী?” জবাবে তিনি বললেন ঃ

مَنْ صَلَّى مَعَنَا هٰذِهِ الصَّلٰوةَ وَوَقَفَ مَعَنَا هٰذَا الْمَوْقِفَ وَقَدْ اَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلُ لَيْلًا اَوْنَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ –

যে লোক আমাদের সঙ্গে মিলে এই নামায পড়বে এবং এসব অবস্থান স্থানে অবস্থান গ্রহণ করবে, সে আরাফা পেয়ে গেছে—তা রাতে হোক বা দিনে। তার হজ্জ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং তার ময়লা ঝেড়ে ফেলার কাজটি করে ফেলেছে।

নবী করীম (স)-এর এ কথাটি সাফা-মারওয়ার মধ্যকার সাঈ ফরয হওয়ার পরিপন্থী। এর দুটি দিক। একটি—নবী করীম (স) তাঁর হজ্জ সম্পূর্ণ হওয়া পর্যায়ে জরুরী খবর দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাতে পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে সাঈ শামিল নয়। আর দ্বিতীয়—তা যদি ফরয হতো তা হলে প্রশ্নকারীর জবাবে সে কথা অবশ্যই বলে দেয়া হতো। কেননা প্রশ্নকারী যে জানে না, তা তো তাঁর জানা-ই ছিল।

যদি প্রশ্ন তোলা হয়, তওয়াফে যিয়ারত তো ফরয; কিন্তু উক্ত বিবরণে তারও উল্লেখ করা হয়নি কেন ?

জবাবে বলা যাবে, শব্দের বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে তা-ই উচিত ছিল। আমরা তো দলীলের ভিত্তিতেই প্রমাণ করেছি যে, তা ফরয।

যদি প্রশ্ন করা হয়, এ থেকে মনে করা যেতে পারে যে, তা সুন্নাতও নয়। নফলই হবে সম্ভবত। যেমন আনাস ও ইবনুয যুবায়র থেকে বর্ণিত হয়েছে। বলা যাবে, হ্যাঁ বাহ্যিক শব্দের দিক দিয়ে তা-ই জরুরী ছিল, সন্দেহ নেই। আমরা অবশ্য দলীলের ভিত্তিতে তাকে হজ্জের অনুসঙ্গ হিসেবে সুন্নাত প্রমাণ করেছি। তার ওয়াজিব হওয়া পর্যায়ে এই দলীল দেয়া হয় যে, আল্লাহ্‌র কিতাবে হজ্জের ফরয হওয়ার বিষয়টি মোটামুটি অ-বিস্তারিত বলা হয়েছে। কেননা অভিধানে 'হজ্জ' অর্থ, اَلْقَصْدُ। ইচ্ছা করা, সংকল্প গ্রহণ করা। আর শরীয়াতের পরিভাষায় তার অন্যান্য কয়েকটি অর্থ হতে পারে। অভিধানে তার জন্যে কোন নাম স্থিরকৃত ছিল না। এই কথা অস্পষ্ট—অ-বিস্তারিত। তা বিস্তারিত করে বলা আবশ্যক। নবী করীম (স)-এর কাজ হিসেবে যা যা বর্ণিত হয়েছে তা-ই তার বিস্তারিত বিবরণ। আর তা থেকে ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। নবী করীম (স) নিজেই যেহেতু পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করেছেন, এ কারণেই তা ওয়াজিব হয়ে গেছে। তার মুস্তাহাব হওয়ার দলীল না পাওয়া পর্যন্ত তা ওয়াজিব-ই থাকবে।

অন্য দিকে দিয়ে দেখা যায়, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

خُذُوْا عَنِّىْ مَنَاسِكَكُمْ –

তোমরা আমার নিকট থেকে তোমাদের হজ্জ কুরবানী সংক্রান্ত কার্যাবলীর নিয়ম-কানুন জেনে নাও।

এ একটি আদেশ। এতে রাসূলের অনুকরণ-অনুসরণ ওয়াজিব প্রমাণিত হয় হজ্জের যাবতীয় কাজ-কর্মে। অতএব সাঈর ব্যাপারেও তাঁর অনুসরণ-অনুকরণ করতে হবে।

তারিক ইবনে শিহাব আবূ মূসা আল-আশআরী থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন—আমি নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থি হলাম। তিনি তখন বতহায় অবস্থান করছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কিভাবে আত্মসমর্পণ করলে ? বললাম, যেভাবে নবী করীম (স) করেছেন, আমিও ঠিক সেই ভাবেই করেছি। তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, ভালোই করেছ। তুমি কাবা ঘরের তওয়াফ কর, দৌড়াও সাফা-মারওয়ার মাঝে। তার পরে হালাল হয়ে যাও।

এ হাদীসে রাসূলে করীম (স) সাফা-মারওয়ার মাঝে দৌড়াতে আদেশ করেছেন। আর এই আদেশের কারণে তা করা ওয়াজিব হয়ে গেছে। এ পর্যায়ে আরও একটি হাদীস এসেছে, কিন্তু তার সনদ ও মতন আউলানো مضطر বর্ণনাকারী অজ্ঞাত। তা মা'মার ওয়াসিল মূসা ইবনে আবূ উবায়দ-সফিয়া বিনতে শাইবা সূত্রে বর্ণিত। তা হচ্ছে, জনৈক মহিলা নবী করীম (স)-কে সাফা-মারওয়ার মাঝে বলতে শুনেছেন كُتِبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيُ فَاسْعَوْا। 'তোমাদের প্রতি সাঈ ফরয করে দেয়া হয়েছে, অতএব তোমরা সেখানে দৌড়াও।' এ হাদীসে বলা হয়েছে, মহিলা নবী করীম (স)-কে সাফা-মারওয়ার মাঝে এ কথা বলতে শুনেছেন। কিন্তু সে মহিলার নাম উল্লেখ করা হয়নি। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে মাহ্ইয়াসান আতা ইবনে আবূ রিবাহ সাফিয়া বিনতে শাইবা হাবীবা বিনতে আবূ তাজ যায়াতা নামের জনৈক মহিলা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ আমি আবূ হুসায়নের নিকট উপস্থিত হলাম। আমার সঙ্গে কুরাই গোত্রে কয়েকজন মহিলা ছিলেন। তখন নবী করীম (স) কা'বা ঘরের তওয়াফ করছিলেন। তখন তাঁর পরিধেয় কাপড় ঘুরপাক খাচ্ছিল। তিনি তাঁর সাহাবীগণকে বলছিলেন ঃ

اِسْعَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ -

তোমরা সকলে সাঈ কর। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি সাঈ করাকে লিখে দিয়েছেন (ফরয করেছেন)।

এ হাদীসে নবী করীম (স) এই কথাটি বলেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তখন তিনি নিজে সেই সাঈর কাজে রত ছিলেন। বাহ্যত মনে হয়, এই সাঈ বলতে কাবার তওয়াফে সাঈ অর্থাৎ 'রমল' ও তওয়াফ—উভয়ই বুঝিয়েছেন। কেননা চলার কাজটিও সাঈ নামে অভিহিত হতে পারে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ -

তোমরা দ্রুত আল্লাহ্র যিকির-এর দিকে চলে যাও।

দ্রুত চলা এর বক্তব্য নয়। বরং মসজিদে নামাযের জন্যে পৌছার আদেশ হয়েছে। প্রথমোক্ত হাদীসটিতে নবী করীম (স) সাঈ করতে বলেছেন যখন, তখন তিনি সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ কাজে লিপ্ত ছিলেন। একথা দ্বারা তিনি যে সাফা-মারওয়ার মাঝের সাঈর কথাই বলেছেন, এমন কোন প্রমাণ নেই। কেননা ঐ সময়ও কাবা ঘরের তওয়াফ ও তাতে রমল করার কথা বলতে পারেন। এই 'রমল'ই হল সাঈ—দ্রুত চলা।

বাহ্যত তা যে কোন সাঈ হতে পারে। কাবার তওয়াফকালে যে 'রমল' করা হয়, তা-ও সাঈ। একই কথার পুনরাবৃত্তি করা ওয়াজিব—তার কোন প্রমাণ নেই। অতএব পূর্বোদ্ধৃত হাদীসসমূহ সাঈ করা ওয়াজিব প্রমাণ করে। কেননা তা এমন সুন্নাত, যা কখনই ত্যাগ করা উচিত নয়—আর যদি কেউ তা না করে, তাহলে একটি জন্তু যবেহ করা তার ক্ষতি পূরণকারী হবে না, তারও কোন প্রমাণ নেই। বরং দলীল তো এই পাওয়া গেছে যে, সে সাঈ করা না হলে তা ক্ষতিপূরণ হিসেবে পশু যবেহ করতে হবে তার পরিবারবর্গের নিকট ফিরে আসা পর্যন্তকার সময়ের মধ্যে। ইহরাম বাঁধার পরবর্তী যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দিয়ে 'হালাল' হয়ে যাওয়ার পরও সাঈ করা জায়েয, এ বিষয়ে আগের কালের ফিকাহ্‌বিদগণ সম্পূর্ণ একমত। যেমন 'রমি' (পাথর নিক্ষপণ) করা সহীহ্। সফর-তওয়াফ করাও যেতে পারে। অতএব সাঈ না করে থাকলে পশু যবেহ্ করবে তার বিকল্প হিসেবে।

যদি বলা হয়, 'হালাল' হওয়ার পরও যিয়ারত, তওয়াফ করা যায়; কিন্তু পশু যবেহ করা তার বিকল্প হয় না কেন?

জবাবে বলা যাবে, ব্যাপার তা নয়। কেননা যিয়ারত তওয়াফ না করা পর্যন্ত ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় থাকা ওয়াজিব। তওয়াফ করা হয়ে গেলে সবকিছু তার জন্যে হালাল হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। সাঈ না করা হলেও ইহ্‌রাম বাধা অবস্থায়ই থাকতে হবে—এমন কোন কথা নেই। যেমন 'রমি' ও তওয়াফে সদর।

যদি কেউ বলে, ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যিয়ারত তওয়াফ করা হলেই স্ত্রী ব্যবহার হালাল হয়ে যায় না। সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করা পর্যন্ত তা হারাম থাকবে।

এর জবাবে বলা যাবে, প্রাথমিক যুগের তাবেয়ী এবং তাঁদের পরবর্তী বুযুর্গ ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, কাবা ঘরের তওয়াফ হয়ে গেলেই স্ত্রী গ্রহণ হালাল হতে পারে। কেননা তারা মস্তক মুণ্ডনের পরবর্তী কাজের ব্যাপারে তিনটি কথায় বিভক্ত। কিছু লোক বলেছেন, কাবা ঘরের তওয়াফ না হওয়া পর্যন্ত ভালো পোশাক পরা, শিকার করা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা হারাম থাকবে। উমর ইবনুল খাত্তাব বলেছেন ঃ হ্যাঁ, তখন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ ও সুগন্ধির ব্যবহার হারাম থাকবে। ইবনে উমর প্রমুখ বলেছেন, তওয়াফ না করা পর্যন্ত শুধু স্ত্রী ব্যবহার হারাম থাকবে। প্রাচীনকালীন ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, শুধু কাবা ঘরের তওয়াফ হলেই স্ত্রী হালাল হবে। সাফা-মারওয়ার মধ্যকার সাঈ ছাড়া-ই। কেননা এ সাঈ তো কাবার তওয়াফের আনুসঙ্গিক কাজ হিসেবেই করা হয়। কেননা যার জন্যে তওয়াফ ফরয নয়, তার সাঈ করাও জরুরী নয়। পাহাড়দ্বয়ের মধ্যকার সাঈ নফল হয় না, যেমন 'রমি' নফল হয় না স্বতন্ত্রভাবে। এতে প্রমাণিত হল যে, এ কাজ হজ্জ ও উমরার আনুসঙ্গিক, স্বতন্ত্রভাবে এর কোন একটা কাজও করা হয় না।

যদি প্রশ্ন তোলা হয় যে, আরাফায় অবস্থান তো ইহ্‌রাম বাঁধার পরই গ্রহণ করা হয় আর তওয়াফে যিয়ারত করা হয় আরাফায় অবস্থান গ্রহণ শেষ হলে, সেখান থেকে ফিরে আসার পর এ দুটিই হজ্জের মধ্যে শামিল ফরয।

এর জবাবে বলা যাবে, আমরা তো বলেছি, এ সব কাজ হজ্জের অনুসঙ্গ। অতএব তা করা আমাদের জন্যে বাধ্যতামূলক। আমরা বলেছি এ সব কাজ হজ্জের ও উমরার আনুসঙ্গিক কাজ হিসেবেই আঞ্জাম দিতে হবে। ওগুলো অনুসঙ্গ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফরয নয়। তবে আরাফায় অবস্থান অপর কোন কাজের অধীন হিসেবে করা হয় না। করা হয় স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি অনুষ্ঠান হিসেবে। কিন্তু সেজন্যে দুটি শর্ত রয়েছে। একটি ইহরাম আর দ্বিতীয়টি সময়। অতএব তা কোন কিছুর অনুসঙ্গ হিসেবে যে করা হয়, তার কোন প্রমাণ নেই। অনুরূপভাবে তা একটা নির্দিষ্ট সময়ে সঙ্গত, অন্য সময়ে নয়। তাতেও প্রমাণিত হয় না যে, তা অপর কোন ফরয কাজে অনুসঙ্গ বা অধীন হিসেবে করা হয়। যিয়ারত তওয়াফ-এর বৈধতা একটি নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর আরাফায় অবস্থান বৈধ হওয়ার সম্পর্ক ইহরাম ও সময়ের সাথে। কিন্তু তার সহীহ্ হওয়ার অপর কোন কাজ সম্পন্ন হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। তবে ইহরামের কথা আলাদা। তবুও তা অপর কোন কাজের অধীন নয়। কিন্তু সাফা-মারওয়ার মধ্যকার সাঈ কাজটি তার সময় উপস্থিত হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। আর তা নির্ভরশীল অপর একটি কাজ হওয়ার উপর, যা তা থেকে ভিন্নতর। আর তা হচ্ছে তওয়াফ। অতএব প্রমাণিত হল যে, তা হজ্জ ও উমরার অনুসঙ্গ। তা নিজস্বভাবে ফরয নয়। তাই তা তওয়াফে সদর সদৃশ হল। কেননা তার সহীহ্ হওয়া নির্ভর করে যিয়ারত তওয়াফের উপর। যা হজ্জের অনুসঙ্গ, তা না করা হলে পশু যবেহ করাই তার স্থলাভিষিক্ত বা বিকল্প কাজ হবে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত।' বোঝা গেল, এই পর্বতদ্বয়ের মাঝের সাঈ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের মাধ্যম। কেননা شعائ বা شعار হচ্ছে ইবাদত-বন্দেগীর নিদর্শন, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের মাধ্যম। এই শব্দটি الاشْعَارُ। থেকে, এর অর্থ الاعلام। জানিয়ে দেয়া। شَعَرْتُ بِكَذَا وَكَذَا। বলা হয়। এর অর্থ আমি তা জানতে পেরেছি, তার অনুভূতি লাভ করেছি। তা জানতে পেরেছি। এ থেকেই বলা হয় ঃ اشْعَارُ الْبُدْنَةِ। অর্থাৎ ছাগলকে নৈকট্য লাভের জন্যে যবেহ করা। যুদ্ধের আলামতকেও شَعار বলা হয়। তদ্দ্বারা পরস্পর পরস্পরের সাথে পরিচিত হয়। অতএব شَعَائِر হচ্ছে নৈকট্যের নিদর্শন।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ –

যে লোক আল্লাহ্‌র নিদর্শনাদিকে বড় করে তুললো, তাদের এই হৃদয়সমূহের তাকওয়ার পরিচায়ক।

হজ্জের شعائر হচ্ছে হজ্জের অনুষ্ঠানাদি। المشعر الحرام। এ থেকেই বানানো হয়েছে। আয়াতটি প্রমাণ করছে যে, পর্বতদ্বয়ের মাঝের সাঈ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের মাধ্যম। তারপর, তাঁর কথা ঃ 'সে দুটির তওয়াফ করায় কোন দোষ নেই।' হযরত আয়েশা (রা) প্রমুখ বলেছেন, এ কথাটি জবাবের স্থানে এসেছে। একটি জিজ্ঞাসার। তাতে এই পর্বতদ্বয়ের মাঝে সাঈ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। এই সাঈকে

ওয়াজিব মনে করা ব্যবহৃত শব্দের বাহ্যিক অর্থের পরিপন্থী নয়। যদিও প্রত্যক্ষভাবে সেই কথাই বলে না। আয়াতটি ছাড়া অন্য দলীল দ্বারা কিন্তু তা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। সে দলীলের উল্লেখ ইতিপূর্বেই আমরা করেছি।

উপত্যকার গর্ভে দ্রুত দৌড়ানোর ব্যাপারে মনীষিগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। নবী করীম (স) থেকে এ পর্যায়ে বিভিন্ন বর্ণনাও পাওয়া গেছে। আমাদের হানাফী মাযহাবে এই 'দ্রুত দৌড়ানো' মসনুন অর্থাৎ সুন্নাত। তা ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয় নয়। যেমন তওয়াফে 'রমল' করা। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ, তার পিতা-জাবির সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) যে মুহূর্তে তাঁর দুই পা এই উপত্যকায় রাখলেন, অমনি দৌড়াতে লাগলেন এবং দৌড়ানো অবস্থায়ই তা অতিক্রম করে গেলেন।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা সাদকা থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন—ইবনে উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনি নবী করীম (স)-কে সাফা-মারওয়ার মাঝে 'রমল' করতে দেখেছেন ? বললেন, হ্যাঁ, তিনি লোকদের পরিবেষ্টনে ছিলেন। তখন সকলেই 'রমল' করলেন। তাঁদের সকলকে 'রমল' করা ছাড়া আর তো কিছু করতে দেখিনি। নাফে বলেছেন, ইবনে উমর উপত্যকার গর্ভে দ্রুত দৌড়াচ্ছিলেন। মসরুক বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) উপত্যকার গর্ভে দ্রুত দৌড়েছেন। আতা ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, যার ইচ্ছা মক্কার প্রবাহের স্থানে সাঈ করবে আর যার ইচ্ছা হবে না সে সাঈ করবে না। এ কথা বলে তিনি উপত্যকা গর্ভে 'রমল' করাই বুঝিয়েছেন সাঈদ ইবনে যুবায়র বর্ণনা করেছেন, আমি ইবনে উমরকে সাফা ও মারওয়ার মাঝে হেঁটে চলতে দেখেছি। বলেছেন, তুমি যদি ধীরে চলতে চাও, তা পার। কেননা আমি রাসূলে করীম (স)-কে ধীরে চলতে দেখেছি। আর যদি দ্রুত দৌড়াতে চাও, তবে তাও পার। কেননা আমি রাসূলে করীম (স)-কে দ্রুত দৌড়াতেও দেখেছি। আমর আতা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, নবী করীম (স) সাফা-মারওয়ার মাঝে মুশরিকদেরকে তাঁর শক্তি দেখাবার জন্যে দৌড়িয়েছেন। পরে আমি ইবনে আব্বাসের নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি বললেন, নবী করীম (স) উপত্যকাগর্ভে দৌড়িয়েছেন। যে কারণে তিনি তা করেছিলেন, তারও উল্লেখ করেছেন। আর তা হচ্ছে নিজেদের দৃঢ়তা, বলিষ্ঠতা ও শক্তি মুশরিকদেরকে দেখানো। তাঁর কাজটি এই কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও তা সুন্নাত হতে কোন বাঁধা নেই। যদিও সে কারণ এখন আর অবশিষ্ট নেই। তওয়াফে 'রমল' করা পর্যায়েও আমরা এ কথাই ইতিপূর্বে বলেছি। এরও উল্লেখ করেছি যে, জমরায় প্রস্তর নিক্ষেপের কারণ ছিল—ইবরাহীম (আ) ইবলীসের প্রতি তা নিক্ষেপ করেছিলেন, যনযন মেনাতে ইবলীস তাঁর পথে বাধা দিতে এসেছিল। পরে সেটাই সুন্নাত হয়ে দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে উপত্যকা গর্ভে 'রমল' করার কারণ ছিল, হাজেরা যখন তাঁর পুত্র ইসমাঈলের জন্যে পানির সন্ধান করেছিলেন এবং সেজন্যে তিনি সাফা-মারওয়ার মাঝে বারবার উঠা-নামা করছিলেন, যখন তিনি উপত্যকা গর্ভে নেমে আসতেন, তখন বাচ্চাকে তিনি দেখতে পেতেন না বলে খুব দ্রুত দৌড়িয়ে পর্বতের উপরে উঠে যেতেন। আবুত তুফায়ল ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন,

ইবরাহীম (আ) যখন হজ্জের অনুষ্ঠানাদি জানতে পেরেছিলেন এবং সেই প্রসঙ্গে সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ করছিলেন, তখন এই সাঈর স্থানে শয়তান তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাকে দেখে ইবরাহীম (আ) দ্রুত দৌড়িয়ে শয়তানকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। এখানে দ্রুত দৌড়ানোর এ-ই ছিল ঐতিহাসিক কারণ। এখানে তা সুন্নাত। এর দৃষ্টান্ত আরও রয়েছে। যেমন আমরা বলেছি, সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈর ক্ষেত্রে উপত্যকা-গর্ভে 'রমল' করার ব্যাপারটি মুসলিম উম্মতের নিকট একটি ঐতিহ্যের ব্যাপার। মুখের কথা ও বাস্তব কাজের মাধ্যমে তা বংশানুক্রমিকভাবে চলে এসেছে। নবী করীম (স) নিজেও এই কাজ করেছেন। এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতের কোন অবকাশ নেই। যা কিছু মতপার্থক্য তা শুধু তার সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে—যা পরবর্তীতে হয়েছে। কার্যত তার এ অব্যাহতভাবে চলে আসা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তা এখনও চালু রয়েছে এবং থাকবে, এ পর্যায়ের দলীলাদি আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

## আরোহী অবস্থায় তওয়াফ

আবূ বকর বলেছেন, আরোহী থাকা অবস্থায় তওয়াফ করা পর্যায়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ তা জায়েয মনে করেন নি। তবে ওযরের দরুন হলে ভিন্ন কথা। আবুত তুফায়ল বলেছেন, তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বললেন ঃ আপনার জনগণ মনে করেন, সাফা-মারওয়ার মধ্যে জন্তুর পিঠে সওয়ার হয়ে তওয়াফ করা সুন্নাত এবং রাসূলে করীম (স) নিজে তা করেছেন। তখন ইবনে আব্বাস বলেছেন, হ্যাঁ, তাঁরা যা বলেছেন, তা সত্যও যেমন, তেমনি মিথ্যাও। রাসূলে করীম (স) তা করেছেন। কেননা তিনি ছিলেন এমন যে, তাঁকে কেউ ধরে চালাতে পারত না। কিন্তু তা সুন্নাত নয়। উরওয়া ইবনুয যুবায়র জয়নব বিনতে আবূ সালমা উম্মে সালমা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট অভিযোগ করলেন যে, আমি তো অসুস্থ, তওয়াফ করব কিভাবে? রাসূলে করীম (স) বললেন, লোকদের ছাড়িয়ে জন্তুযানে সওয়ার হয়ে তুমি তওয়াফ করবে। অথচ উরওয়া যখন লোকদেরকে জন্তুর পিঠে সওয়ার হয়ে তওয়াফ করতে দেখতেন,তখন তাদেরকে তা করতে নিষেধ করতেন। তখন লোকেরা রোগাক্রান্ত হওয়ার বাহানা করত। তা শুনে তিনি বলতেন, ওরা ব্যর্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইবনে আবূ মুলাইকা হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন—সাফা-মারওয়ায় সাঈ করতে হয়; কিন্তু তা সওয়ার হয়ে করা আমি অপছন্দ করি। হজ্জ ও উমরা করা থেকে এ জিনিসই আমাকে বিরত রেখেছে। ইয়াযীদ ইবনে আবূ যিয়াদ ইকরামার সূত্রে ইবনে আব্বাসের এই কথাটি বর্ণনা করেছেন—নবী করীম (স) অসুস্থ অবস্থায় আসলেন এবং তাঁর উটের উপর সওয়ার হয়েই তওয়াফ করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মহজন। তিনি যখনই হাজরে আসওয়াদের নিকটে পৌছতেন, তাকে চুম্বন করতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি যখন তওয়াফ শেষ করলেন, তখন উটটিকে বসিয়ে নেমে পড়লেন এবং দু রাক'আত নামায পড়লেন। উপত্যকা-গর্ভে দৌড়ানো সাফা-মারওয়ার তওয়াফের সুন্নাত—যেমন পূর্বে বিস্তারিত বলেছি—একথা যখন প্রমাণিত,

আরোহী ব্যক্তি তো সেই সাঈ নিজে করে না, তখন তার এই কাজ সুন্নাত পরিপন্থী, তবে মাযুর অক্ষম হলে অন্য কথা। রাসূলে করীম (স) থেকে তা-ই প্রমাণিত এবং সাহাবাগণ তা জায়েয মনে করতেন।

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ তাঁর পিতা-জাবির সূত্রে বর্ণনা করেছেন এই হাদীস, যাতে নবী করীম (স)-এর হজ্জের উল্লেখ আছে, উল্লেখ আছে কাবা ঘরের তওয়াফের কথাও বক্তব্যে এসেছে দুই রাক'আত নামাযের পর। পরে মক্কার দিকে চলে গেলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি কাবাকে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। তখন বললেন ঃ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ আল্লাহ প্রথমেই যে পর্বতটির উল্লেখ করেছেন, আমরা এই সাঈ সেখান থেকেই শুরু করছি। তবে আয়াতের শব্দে এই পরম্পরা রক্ষা করার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কেননা আয়াত থেকে যদি তা-ই বোঝা যেত, তাহলে রাসূলে করীম (স) উক্ত কথা বলতেন না। সাফা থেকে তওয়াফ শুরু করা হয়েছে মারওয়ার পূর্বে। তার মূলে রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটি রয়েছে ঃ আমরা শুরু করছি সেই পাহাড় থেকে যার কথা বলে আল্লাহ্ কথা শুরু করেছেন। আমরাও রাসূলের অনুসরণে তাই করব। কেননা রাসূলই বলেছেন ঃ 'তোমরা তোমাদের হজ্জের কার্যাবলীর কথা আমার কাছ থেকে জেনে নাও।' তবে 'সাফা 'থেকে শুরু করাই যে সুন্নাত, মারওয়া পরে, তাতে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। তিনিই যদি সাফার পূর্বে মারওয়া থেকেই শুরু করতেনও, তবু হানাফী মাযহাবের মশহুর বর্ণনায় তা গণ্য হয়নি। ইমাম আবূ হানীফা থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'মারওয়া' থেকে শুরু করা সাঈর সে 'বার' পুনরায় চলতে হবে। যদি তা না করে, তাহলে তার উপর কিছুই দায়িত্ব হবে না। তখন এই কাজটি শুরু এ পর্যায়ে গণ্য হবে যে, অযূতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার পরম্পরা ভঙ্গ হয়েছে মাত্র।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا 'আর যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছা-আগ্রহ-উৎসাহে কোন মঙ্গলজনক কাজ করবে,' সাফা-মারওয়ার তওয়াফের উল্লেখের পরপরই এই কথার উল্লেখ। যে লোক উক্ত তওয়াফকে নফল মনে করে, সে এই কথাকে দলীল হিসেবে পেশ করে তা এজন্যে যে, পূর্বে যে পর্বতদ্বয়ের তওয়াফের কথা বলা হয়েছে, এ কথাটি তারই সাথে সম্পর্কিত। সেই সাথে একথাও জানা আছে যে, যারা হজ্জ ও উমরায় পর্বতদ্বয়ের মাঝে তওয়াফ করাকে ওয়াজিব মনে করেন তাদের নিকট তা নফল হিসেবে করা হয় না। আর হজ্জ ও উমরা ছাড়া অন্যত্র যারা তা করা দরকার মনে করে না, তাদের নিকট এই যে ব্যক্তি নিজ-ইচ্ছা-আগ্রহ-উৎসাহে কোন মঙ্গলজনক কাজ করে, কথাটিকে সংবাদ দান পর্যায়ে গণ্য করে, মনে করে, হজ্জ ও উমরায় তা 'নফল' হিসেবেই করা হয়। কেননা ও দুটির প্রসঙ্গ ছাড়া সে কাজ না নফল হিসেবে করার কোন সুযোগ আছে, না অন্য কোন ভাবে। কিন্তু এ কথাটুকুতে তাদের এসব কথার কোন দলীল নেই। কেননা এটা সঙ্গত যে, এরূপ অর্থ গ্রহণ করা হবে ঃ যে লোক হজ্জ ও উমরা নফল হিসেবে আদায় করবে। কেননা পূর্বের শুরু কথায় তার-ই উল্লেখ হয়েছে ঃ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ আল্লাহ্‌র এই কথায়।

## 'ইলম' গোপন রাখা নিষিদ্ধ

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى -

যারা আমাদের নাযিল করা উজ্জ্বল আদর্শ ও জীবন-বিধান গোপন করে রাখবে .....

অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا -

যারা আল্লাহ্র নাযিল করা কিতাব গোপন করে রাখে এবং তদ্দ্বারা সামান্য মূল্য ক্রয় করে ......

বলেছেন ঃ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ -

স্মরণ কর, আল্লাহ্ আহলি কিতাব লোকদের নিকট থেকে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন যে, তোমরা তা অবশ্যই বয়ান ও প্রকাশ করবে এবং তা তোমরা গোপন করবে না।...

এই সব কয়টি আয়াতই দ্বীনী ইল্‌ম প্রকাশ করা—ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা ও লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়াকে একান্ত কর্তব্য বলে ঘোষণা করে এবং তা গোপন করতে প্রবলভাবে নিষেধ করে। আর যেসব বিষয়ের উপর অকাট্য দলীল এসেছে, অকাট্য দলীল যা যা নিঃসন্দেহে ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত করে অনিবার্যভাবে, তা-ও অবশ্যই বয়ান ও প্রকাশ করতে হবে, তা গোপন করে রাখা পরিহার করতে হবে। কেননা আল্লাহ্ তাঁর নাযিল করা অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও হেদায়েতের বিধান গোপন করতে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। তাঁর এই ঘোষণায় সেইসব আইন-বিধানই শামিল, যা স্পষ্ট দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত এবং যা সেসব দলীলের ভিত্তিতে উদ্ভাবিত। কেননা আয়াতের শব্দ الهدى। এই সবকেই শামিল করে। আল্লাহ্র কথা ঃ

يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ -

গোপন করে আল্লাহ্র নাযিল করা কিতাব।

প্রমাণ করে যে, যা অকাট্য স্পষ্ট দলীল থেকে জানা গেছে এবং যা সেই দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত, এ দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা আল্লাহ্র কিতাবে আল্লাহ্র হুকুম-আহকামের দলীল রয়েছে যেমন, তেমনি সেই কিতাবে বলা হয়েছে ঃ 'হে নবী, তুমি তো লোকদের নিকট প্রকাশ করবে, তা গোপন করবে না।' এই উভয় বিষয়

পরিব্যাপ্ত এই নির্দেশ। রাসূলে করীম (স)-এর সংবাদদানের মাধ্যমে যা জানা গেছে, তা-ও এরই মধ্যে গণ্য। নবী করীম (স) থেকে 'খবরে ওয়াহিদ'—এক ব্যক্তির দেয়া খবরও কবুল করার পক্ষের প্রমাণ এ কিতাবেই রয়েছে। অতএব কিতাবের যা দাবি, অকাট্য দলীলভিত্তিক যে কথা, যা তার দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত, উক্ত আয়াত সে সবকেই আওতাধীন করে। এ কারণে আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র কিতাবে এই আয়াতটি না থাকলে আমি তোমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করতাম না। এ কথা বলে তিনি উক্ত আয়াতটির তিলাওয়াত করলেন। তিনি জানালেন যে, রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীস আল্লাহ্‌র নাযিল করা 'বাইয়্যেনাত' ও 'আল হুদা'—অতএব তা গোপন করা যায় না। শুবাহ কাতাদাহ থেকে 'স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ আহলি কিতাব লোকদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন'...... এ আয়াতের ভিত্তিতে বলেছেন, এ একটি চুক্তি। আল্লাহ্ আহলি ইলমদের নিকট থেকে তা গ্রহণ করেছে। তাই যে কোন ইল্‌ম পাবে, তার উচিত তা অন্যদেরকে জানানো। ইল্‌ম গোপন করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা তা গোপন করা ধ্বংসাত্মক। 'ইল্‌ম' বয়ান করার পর্যায়ে এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঃ

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ -

প্রত্যেক জনগোষ্ঠী থেকে কিছু সংখ্যক লোক কেন বের হয়ে যাচ্ছে না দ্বীনী ইল্‌মে পারদর্শিতা অর্জনের উদ্দেশ্যে, যেন তারা তাদের জনগণের নিকট ফিরে এসে তাদেরকে সাবধান ও সতর্ক করবে ?.... সম্ভবত এর ফলে তারা সতর্ক হয়ে যাবে।

হাজ্জাজ আতা আবূ হুরায়রা সূত্রে নবী করীম (স) থেকে এ হাদীটি বর্ণনা করেছেন ঃ

مَنْ كَتَمَ عِلْمًا يَعْلَمُهُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ مِنْ نَّارٍ -

যে লোক কোন প্রকারের ইলমই—যা সে জানে—গোপন করবে, কিয়ামতের দিন সে আগুনের লাগাম পরা অবস্থায় উঠে আসবে।

যদি প্রশ্ন তোলা হয়, ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আয়াতটি ইয়াহূদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। ইয়াহূদীদের কিতাবে রাসূলে করীম (স)-এর যে পরিচিতি ও গুণ-সিফাত উল্লেখিত রয়েছে, তা তারা গোপন করে রেখেছিল, প্রকাশ করে নি, প্রকাশ হতে দেয়নি।

জবাবে বলা যাবে, আয়াতটি যে কারণে নাযিল হয়েছে, তা সাধারণ ব্যাপক ভিত্তিক কারণ এবং সব কিছু তাতে শামিল মনে করার পথে কোন প্রতিবন্ধক নেই। কেননা আমাদের মতে 'হুকুম' শব্দ থেকে পাওয়া যায়, কারণ থেকে নয়। তবে কেবল কারণের উপর ভিত্তিকতার দলীল পাওয়া গেলে ভিন্ন কথা। এ আয়াতকেই দলীল হিসেবে পেশ করা হয় দ্বীনি ব্যাপারাদি পর্যায়ে সংবাদদাতার ইল্‌ম দেয়া ওয়াজিব হওয়া থেকেও কম

মাত্রায় খবর গ্রহণের জন্যে। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ যারা আল্লাহ্‌র নাযিল করা কিতাব গোপন করে এবং আহ্‌লে কিতাব লোকদের নিকট থেকে যখন চুক্তি নেয়া হয়েছিল ..... এ দুটিই ইলম গোপন করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করে এবং প্রকাশের মাধ্যমে তার বয়ান সজ্ঘটিত করতে আদেশ করে। এমতাবস্থায় শ্রোতাদের পক্ষে তা কবুল করা যদি বাধ্যতামূলক না হয়, তাহলে এ বিষয়ের সংবাদদাতা আল্লাহ্‌র হুকুম প্রকাশকারী হতে পারে না। কেননা হুকুম যদি ওয়াজিব না হয় তা হলে তাঁর বয়ান করে প্রকাশ করার হুকুমও থাকে না। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, গোপন করা থেকে নিষেধপ্রাপ্ত লোকেরা যা গোপন করেছিল তা যখনই প্রকাশ করবে, তখনই সেই সংবাদ অনুযায়ী আমল করা তাদের অবশ্য কর্তব্য হবে। উক্ত কথার ধারাবাহিকথায় বলা হয়েছে ঃ

إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَأَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا - (البقره : ١٦٠)

তবে যারা তওবা করেছে, নিজেদের সংশোধন করে নিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করে দিয়েছে ....।

সংবাদ দেয়ার ফলে যে ইল্‌ম লাভ হল তা বাস্তবায়িত করার হুকুম দেয়া হয়েছে এ আয়াতে।

কেউ যদি বলেন, প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী আমল করার বাধ্যবাধকতা প্রমাণের কোন দলীল এ কথাটিতে নেই। এটা সঙ্গত যে, তাদের প্রত্যেকেই গোপন করা থেকে নিষেধ প্রাপ্ত এবং বয়ান ও প্রকাশকরণের আদেশপ্রাপ্ত। উদ্দেশ্য হচ্ছে সংবাদদাতাদের সংখ্যা যেন বিপুল হয় এবং সংবাদসমূহ যেন নিরবচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক-অব্যাহত সূত্রে এক স্তর থেকে পরবর্তী স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

এর জবাবে তাকে বলা যাবে, এ ধারণা ঠিক নয়। কেননা তাদেরকে গোপন করতে নিষেধ করা হয়েছে শুধু এজন্যে যে, তাদের জন্যে পারস্পরিক সম্পর্ক-সহযোগিতার সম্ভাবনা রয়েছে। আর গোপন করার ব্যাপারে যাদের পারস্পরিক সহযোগিতা করা সম্ভব তাদেরই পারস্পরিক সহযোগিতা হওয়া সম্ভব তা লোকদের নিকট পৌঁছানোর ব্যাপারেও। তখন তাদের দেয়া খবর ইলম লাভের কারণ হবে না। এ কারণে ইল্‌ম আবশ্যকীয় বানানোর স্তর থেকে নিম্নমানের খবর কবুল করার পক্ষে সাহাবীগণের বহু কথা বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া তুমি যে কথার দাবি তুলছ, তা প্রমাণের অকাট্য কোন দলীল নেই। অতএব আয়াতসমূহের বাহ্য প্রকাশে যে জ্ঞান হয়, তার আদেশটা পালন করা অবশ্যই বাঞ্ছনীয় হবে। কেননা আল্লাহ্‌র হুকুম বয়ান ও প্রকাশ সজ্ঘটিত হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে অপর একটি হুকুম রয়েছে, এ আয়াত যেমন ইলম প্রকাশ করার ও গোপন না রাখার বাধ্যবাধকতার দলীল, তেমনি ইলম প্রকাশের কাজে মজুরী গ্রহণ জায়েয না হওয়ারও দলীল। কেননা যে কাজ করা একজন লোকের নিজের কর্তব্যরূপে নির্ধারিত সে কাজ করে কোন মজুরী বা পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার থাকতে পারে না। তা গ্রহণ বৈধও হতে পারে না। ঠিক যেমন দ্বীন-ইসলাম কবুল করার কোন মজুরী কোন ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি পেতে পারে না। বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম

(স)-কে বলল ঃ আমি আমার লোকদেরকে একশটি ছাগল দিয়েছি, যেন তারা ইসলাম কবুল করে। একথা শুনে নবী করীম (স) বললেন, তুমি ছাগলগুলো নিজের নিকট ফিরিয়ে নাও। এরপর তারা যদি ইসলাম ত্যাগ করে তাহলে আমরা ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। 'যারা আল্লাহ্র নাযিল করা কিতাব গোপন করে রাখে এবং তার বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করে' আল্লাহ্র এই কথাটি অন্য দিক দিয়ে দ্বীন প্রচারের কাজে বা তা গোপন করে মজুরী গ্রহণ উভয়কেই নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। কেননা তার বিনিময়ে সামান্য মূল্য ক্রয় করে কথাটি বিনিময় সর্বদিক দিয়েই নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। অভিধানে ثمن অর্থ, বিনিময়—বদল।

এ থেকে প্রমাণিত হল, কুরআন ও দ্বীনি সব ইল্ম শিক্ষাদানের শ্রমে মজুরী গ্রহণ সম্পূর্ণ বাতিল, নাজায়েয। আর 'তবে যারা তওবা করেছে, নিজেদের সংশোধন করেছে এবং গোপন করা ইলম বয়ান ও প্রকাশ করা শুদ্ধ করেছে' কথাটি প্রমাণ করে যে, গোপন করা থেকে তওবা হবে তা প্রকাশ ও বয়ান করার কাজের মাধ্যমে। গোপন করার অপরাধের জন্যে শুধু লজ্জিত হওয়া বা অনুতপ্ত হওয়া তওবার জন্যে কিছুমাত্র যথেষ্ট নয়।

## কাফিরদের উপর অভিসম্পাত

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَا تُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

যারা কুফ্রী পথে চলেছে এবং কাফির অবস্থায়ই মরে গেছে, তাদের উপর আল্লাহ্র ফেরেশতাগণ এবং মানুষ—এই সকলেরই অভিশাপ।

আয়াতটি থেকে বোঝা যায়, যারা কাফির অবস্থায় মরে গেছে, তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ মুসলমানদের কর্তব্য।[১] মরে গেলে দ্বীন পালনের কোন দায়িত্ব থাকে না—একথা সত্য হলেও তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ এবং তাদের থেকে নিঃসম্পর্ক হওয়ার ঘোষণা দেয়ার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ সমস্ত মানুষ আমাদের প্রতি এই দায়িত্ব চাপিয়ে দেয় যে, কাফিরদের মৃত্যুর পরও তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করতে হবে। এ আয়াত এ কথাও প্রমাণ করে যে, কাফির যদি পাগলও হয়ে যায় তবু দ্বীন পালনের দায়িত্ব তখন না থাকলেও তার এই পাগলামী তার উপর অভিশাপ বর্ষণ থেকে মুক্তি দেবে না। তার সাথে নিঃসম্পর্কতাও নিঃশেষ হয়ে যাবে না। অনুরূপভাবে ঈমানের দিক দিয়ে প্রশংসা, বন্ধুত্ব ও কল্যাণ কামনা ওয়াজিব হওয়ার পথ-ও তাই, অর্থাৎ যে লোক ঈমানদার হিসেবে মৃত্যুবরণ করবে, এগুলো তার জন্যে। কেউ পাগল হয়ে গেলে এই দুর্ঘটনার পূর্বের কাজ কর্মের আলোকেই তার বিচার-বিবেচনা হবে।

---

১. গ্রন্থকারের বক্তব্যের তাৎপর্য হচ্ছে, যে লোক কাফির অবস্থায় মরে গেছে বলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে, সে অভিশাপ পাওয়ার যোগ্য হয়েছে। তার উপর অবশ্যই লা'নত বর্ষণ করতে হবে, এমন কথা নয়। যদিও বাহ্যত কথা থেকে তাই মনে হয়।—অনুবাদক

যদি বলা হয়, আবুল আলীয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে, আয়াতটির তাৎপর্য হচ্ছে, লোকেরা কাফিরদেরকে অভিশাপ দেবে কিয়ামতের দিন। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا –

অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদের কতক লোক অপর কতক লোককে অস্বীকার (বা কাফির বলে অভিহিত) করবে এবং তোমাদের কতক লোক অপর কতকের উপর অভিশাপ বর্ষণ করবে।

জবাবে বলা যাবে, 'কেবল কিয়ামতের দিন অভিশাপ করা হবে' বলার কোন দলীল নেই। এটা বিনা দলীলের কথা। আয়াত অনুযায়ী কাফিররা এই দুনিয়ায়ই আল্লাহ্ ও ফেরেশতাদের অভিশাপ পাওয়ার উপযুক্ত, তেমনি জনগণের অভিশাপও। যে লোক ধারণা করে যে, মানুষ তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করবে সে বিষয়ে আল্লাহ খবর দিয়েছেন। এই কারণে তার ধারণা অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। আসলে ব্যাপার তা নয়। বরং এ খবর দানটা হচ্ছে লোকদের অভিশাপ পাওয়ার জন্যে তাদের উপযুক্ত হওয়ার। তারা কার্যত অভিশাপ বর্ষণ করুক আর না-ই করুক।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ "اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ"। 'তোমাদের ইলাহ মাত্র একজন ইলাহ'। আল্লাহ নিজেই তাঁর নিজের পরিচয় দিয়েছেন এ আয়াতাংশে। জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি এক ও একক। ব্যবহৃত শব্দ এই তাৎপর্য উপস্থাপিত করছে যে, তিনি এক ও একক, তার দৃষ্টান্ত কিছু নেই। তাঁর সদৃশও কেউ নেই। তাঁর সমান কেউ নেই কোন একটি দিক দিয়েও। এই কারণে তিনি এক ও একক, এই গুণে অভিষিক্ত হওয়ার যোগ্য। অন্য কারোরই এ গুণ নেই, এ গুণ পাওয়ার যোগ্যতাও নেই। এই দিক দিয়ে তিনি একাই ইবাদত পাওয়ার অধিকারী। তাঁকে ইলাহ-উলুহিয়াত-এর গুণে ভূষিত করাই বাঞ্ছনীয়। এই ক্ষেত্রে তাঁর সাথে কেউ-ই শরীক হতে পারে না। অনুরূপভাবে তিনি এক ও একক সর্ব দিক দিয়ে, সর্বতোভাবে। উলুহিয়াতকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা সম্ভবও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। কেননা যাকে অংশে বা খণ্ডে বিভক্ত করা যায় বা করা সঙ্গত বিবেচিত হয়, সে প্রকৃত পক্ষেই এক ও একক হতে পারে না।

তিনি সত্তার দিক দিয়েও এক। তিনি-ই সকলের আগে (যখন কেউ বা কিছু ছিল না, তখন তিনি ছিলেন)। তিনি অনাদি অনন্ত, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অনাদি হওয়ার দিক দিয়ে। তিনি ছাড়া তার সঙ্গে কেউ ছিল না। আয়াতে তিনি নিজেই নিজের এসব গুণের উল্লেখ করেছেন। উল্লিখিত সর্বদিক দিয়েই তিনি ইলাহ্ এক ও একক। আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ....

নিঃসন্দেহে আসমান জমিনের সৃষ্টি এবং রাত দিনের আবর্তনে .....

এ আয়াতটিতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও একত্বের বহু কয়টি প্রমাণের উল্লেখ রয়েছে। তাঁর সুদৃশ, তাঁর দৃষ্টান্ত কেউ নেই, কিছুই নয়। এ আয়াতের দলীলসমূহ পেশ করে আল্লাহ্‌র তওহীদ প্রমাণ করা আমাদের জন্যে কর্তব্য করে দেয়া হয়েছে। কেননা আয়াতের

শেষাংশে বলা হয়েছে لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ 'বিবেকবান লোকদের জন্যে বহু ও বিপুল নিদর্শন রয়েছে।' অর্থাৎ আল্লাহ সৃষ্টিকুলকে দাঁড় করেছেন, যেন এসবকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয় এবং এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্র পরিচিতি ও তওহীদ স্পষ্ট করে তোলা হয়। আর তাঁর সদৃশ, সমতুল্য বা সমকক্ষ কেউ নেই, কিছুই নেই—একথা প্রচার করা হয়। যারা মনে করে, আল্লাহ্কে শুধু সংবাদের মাধ্যমেই চেনা যায়, আল্লাহ্কে চিনবার ব্যাপারে জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেকের কোন ভূমিকা নেই, তাদের কথার বাতুলতা ও অযৌক্তিকতাও উক্ত আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

আসমান-জমিন আল্লাহ্র অস্তিত্ব তওহীদের অকাট্য প্রমাণ হয় এভাবে যে, আমাদের ঊর্ধ্বদেশে কোনরূপ স্তম্ভ বা খুঁটি ছাড়া আসমানের দাঁড়িয়ে ও টিকে থাকা সম্ভব হচ্ছে কেবলমাত্র আল্লাহ্র কুদরতে।তা যেমন বিরাট বিশাল, তেমনি বিস্তীর্ণ ও ভারী। অনন্তকাল ধরে তা ঊর্ধ্বে স্থায়ী ও অব্যাহতভাবে রয়েছে। জমিন অর্থাৎ পৃথিবী তো আমাদের পায়ের তলে অনন্তকাল ধরে রয়েছে। অথচ আমরা জানি, এর প্রত্যেকটিরই একটা শেষ আছে। একই সময় তা বর্তমান আছে বটে তবে তা বাড়তি কমতির সম্ভাব্যতাময়। আমরা এ-ও জানি যে, সমগ্র সৃষ্টিকুলও যদি একত্র হয়ে একটি প্রস্তর মহাশূন্যে ঝুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করে কোন স্তম্ভ ছাড়াই, তাহলে তা করতে তারা কখনই সক্ষম হবে না। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, ঊর্ধ্বলোকে যা কিছু আছে তার প্রত্যেকটিকে ঊর্ধ্বে রক্ষাকারী একজন আছেন। তিনিই কোন স্তম্ভ ছাড়াই আসমান ঊর্ধ্বে রেখেছেন, তিনিই জমিনকেও রেখেছেন কোন ভিত্তি ছাড়া। আর এই যুক্তি মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। দ্বিতীয়—এ-ও প্রমাণিত হয় যে, তিনি দেহ সদৃশ নন। তিনি মহাশক্তিমান, কোন কিছুই তাঁকে অক্ষম বা পরাভূত করতে পারে না। কোন শরীরী জিনিসই তা করতে পারে না। এ যখন সত্য, তখন প্রমাণিত হল যে, তিনি দেহ উদ্ভাবন ও নবসৃষ্টির ক্ষমতাবান। কেননা দেহ ও অবয়বসমূহের সৃষ্টি ও উদ্ভাবন তার বিরাটত্ব সত্ত্বেও তাকে কায়েম রাখা অপেক্ষা অধিক দূরবর্তী কাজ নয়। তার ঘনত্ব কোন পাত্র বা ভিত্তি ছাড়াই গড়ে তোলা কেবল তার পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। অপর দিক দিয়ে তা প্রমাণ করে, এই সৃষ্টিলোকের প্রত্যেকটিই নবতর সৃষ্টি। সে গুলোর পরস্পর বিপরীত অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার বৈধতা নিষিদ্ধ নয়। আর এসব জিনিসই নবতর সৃষ্টি। এক সময়ে এগুলো ছিল না, পরে অস্তিত্বমান হয়েছে। আর যা পূর্বে ছিল না এখন আছে, তা-ই নব সৃষ্টি। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, এই সমগ্র বিশ্বলোক নবোদ্ভাবিত, নতুন সৃষ্টি। আর সে জন্যে স্রষ্টা অবশ্যম্ভাবী। যেমন কোন নির্মাণ কাজের জন্যে নির্মাতার প্রয়োজন। কোন লেখার জন্যে লেখকের প্রয়োজন। কোন প্রতিক্রিয়ার জন্যে ক্রিয়ার প্রয়োজন। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, এই আসমান-জমিন এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে, তা সবই আল্লাহ্র (অস্তিত্ব ও তওহীদের) নিদর্শন। তার প্রত্যেকটিই আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

রাত্র ও দিনের আবর্তন—একটির পর অপরটির আগমন-নির্গমনও আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও এককত্ব প্রমাণ করে। একটি যখন চোখের সম্মুখে অস্তিত্বমান, অপরটি তখন অপসৃত অনুপস্থিত। পূর্বটির অবসানে দ্বিতীয়টির বিস্তৃতি। এ কাজ একজন পরিচালকের প্রয়োজন

প্রমাণ করে। অতএব রাত্র-দিনের স্রষ্টা যিনি, তিনিই আল্লাহ কেননা আল্লাহ ছাড়া কেউ রাত্র আনতে পারে না, পারে না তার অবসান ঘটাতে। দিনের ব্যাপারও তাই। এই রাত্র দিন আল্লাহ্ সদৃশ নয়। এ দুটি তো আল্লাহ্র সৃষ্টি। আর সৃষ্টি কখনই স্রষ্টা সদৃশ হয় না। নির্মাতা হয় না নির্মিতের সদৃশ, লেখক হয় না তার লেখার সদৃশ। অপর দিক দিয়ে সৃষ্টি যদি স্রষ্টা সদৃশ হয়, তাহলে স্রষ্টা সৃষ্টির মতই নব-অস্তিত্বমান হয়ে পড়ে। তাহলে স্রষ্টা সৃষ্টির তুলনায় উত্তম হতে পারে না। তাহলে অবয়ব ও রাত্র দিনের স্রষ্টা যে সকলের পূর্ববর্তী, তা সত্যনিষ্ঠ হয় না। তাহলে স্রষ্টা সৃষ্টির মত নয়, একথাই সত্য। এ কথা প্রমাণ করে যে, এ সবের উদ্ভাবক ও স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে এগুলোর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এ-ও প্রমাণিত হয় যে, স্রষ্টা ও উদ্ভাবন চিরঞ্জীব। কেননা চিরঞ্জীব স্রষ্টা ছাড়া অন্য কারোর দ্বারা সৃষ্টিকর্ম অনুষ্ঠিত হতে পারে না। এ থেকে এ-ও প্রমাণিত হয় যে, স্রষ্টা ও উদ্ভাবক সর্ববিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী। কেননা সুদৃঢ়, সুষ্ঠু, সুনিপুণ, সুসংবদ্ধ কোন কাজ তার দ্বারাই কার্যকর হতে পারে, যে সে বিষয়ে পুরোপুরি জ্ঞানবান এবং জ্ঞানবান ছিলেন এ সবের অস্তিত্ব দানের পূর্বেই। অন্যথায় রাত্র-দিনের আবর্তন অব্যাহতভাবে ও একই নিয়মে কার্যকর হতে পারত না। বছর কালের পুরো সময় ধরে রাত্র দিন দৈর্ঘ্যে ও স্বল্পতায় বাড়তি ও কমতিতে একই অব্যাহত ধারায় হচ্ছে, তাতে কোনরূপ পার্থক্য কখনই হয় না। এ তত্ত্ব প্রমাণ করে যে, রাত্র-দিনের উদ্ভাবক বা স্রষ্টা তা করতে সক্ষম, সেই সাথে প্রয়োজনীয় জ্ঞানেরও পূর্ণ অধিকারী। অন্যথায় তাঁর দ্বারা এর কোন একটি কাজও সম্পন্ন হতে পারত না। প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী না হলে তার কাজ সুষ্ঠু সুনিপূণ হতে পারত না।

নদী-সমুদ্রে চলাচলকারী নৌকা-জাহাজও আল্লাহ্র তওহীদের প্রমাণ। কেননা এটা জানা কথা যে, মৌল উপাদান পরস্পর মিলিত হলেই পানির ন্যায় তরল প্রবহমান জিনিস—যা নৌকা-জাহাজকে নিজের বুকের উপর ভাসিয়ে রাখতে পারে—অস্তিত্বশীল হতে পারে না। বাতাসের প্রবাহও অনুকূল হতে পারে না নৌকা-জাহাজের জন্যে। বাতাস প্রবহমান না হলে নৌকা-জাহাজ পানির উপর ভাসমান-স্থির অচল হয়ে পড়ে থাকত।[১] কোন একটা সৃষ্টির পক্ষেও চলাচল করা ও স্থানান্তরিত হওয়া সম্ভবপর হতো না। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ.(الشورى : ٣٣)

আল্লাহ্ চাইলে তিনি বাতাসকে স্তব্ধ-নিশ্চল করে দেবেন। তখন তা তার পৃষ্ঠের উপর স্থির দাঁড়ানো অবস্থায় পড়ে থাকবে।

আল্লাহ তা'আলাই পানিকে নিয়ন্ত্রণ করেন নৌকা-জাহাজ বুকে ধারণের জন্যে, তিনিই সেই বাতাসকে তাঁর নিজ নিয়ন্ত্রণে রেখে চলমান করেন। এ ঘটনা আল্লাহ্র তওহীদ প্রমাণের অত্যন্ত বড় দলীল। তা প্রমাণ করে, তিনি যেমন অনাদি সর্বক্ষমতা সম্পন্ন, সর্ব

১. এটা যন্ত্রযুগের পূর্বে কথা। বোঝা যায়, তখনও যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি। যন্ত্রযুগে এ আয়াতের ব্যাখ্যা ভিন্নভাবে দেয়া প্রয়োজন—অনুবাদক।

বিষয়ে জ্ঞানবান, চিরঞ্জীব, তেমনি এর কোন একটি দিক দিয়েও তাঁর সাথে কারোরই সাদৃশ্য নেই, সমকক্ষতা নেই। কেননা অবয়বসমূহ স্বতঃই এই কাজ করতে সক্ষম নয়। এজন্যেই আল্লাহ নিজে পানিকে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছেন তার বুকে নৌকা-জাহাজ বহন ও চলাচল করার জন্যে। বাতাসকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন তাকে প্রবহমান বানাবার জন্যে, সৃষ্টিকুলের প্রতি সার্বিক কল্যাণ বহন করে নেয়ার জন্যে আল্লাহ্র একত্ব সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করার জন্যে, তাঁর নিয়ামতের বিরাটত্ব ও বিপুলতা প্রদর্শনের জন্যে। সৃষ্টিকুলকে এ বিষয়ে গভীর সূক্ষ্মভাবে চিন্তা-ভাবনা করার আহ্বান জানিয়েছেন, যেন তারা জানতে পারে যে, তাদের স্রষ্টা তাদের জন্যে এই তুলনাহীন নিয়ামতের ব্যবস্থা করেছেন, যেন তারা তাঁর শোকর করে তাঁর এই নিয়ামত পেয়ে এবং শেষে মহাশান্তির ঘরে চিরন্তন সওয়াব পাওয়ার অধিকারী হয়।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্র পানি বর্ষণ ব্যবস্থাও আল্লাহ্র তওহীদের অকাট্য প্রমাণ। প্রত্যেক বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন সৃষ্টি জানে যে, পানির প্রকৃতিই হচ্ছে অবতরণ ও স্রোত প্রবাহ সৃষ্টি। পানি নিম্নদেশ থেকে উর্ধ্বলোকে উত্তোলিত হচ্ছে। তা সম্ভব হচ্ছে একজন কর্তার কীর্তি হিসেবে। কাজেই মেঘে পানির পুঞ্জীভূত হয়ে থাকার অর্থ হয় তা নতুন সৃষ্টি, মেঘের মধ্যে নতুন করে পানি একত্র হয়েছে অথবা তা পানির পাত্র পৃথিবী ও তার সমুদ্রসমূহ থেকে উত্থিত হয়েছে। এর যেটাই হোক, একজন মহান স্রষ্টার অস্তিত্বেরই প্রমাণ করে। সে স্রষ্টা কোন কাজেই অক্ষম নন। পানি (বাষ্পাকারে) উর্ধ্বে তোলা এবং মেঘের মধ্যে তা অপ্রবাহিত অবস্থায় ধরে রাখা এবং যে সব স্থানে তার বর্ষণ ঘটানোর ইচ্ছা সেসব স্থানে বাতাসের সাহায্যে তা পৌঁছানো আল্লাহ্র তওহীদের অকাট্য প্রমাণ। এই কুদরত কেবল তাঁরই আছে। তিনিই মেঘকে পানি সম্বলিত এবং বাতাসকে পানির চালক বানিয়েছেন। তার ফলেই তা এক স্থান থেকে ভিন্নতর স্থানে স্থানান্তরিত হতে পারছে। তার কল্যাণ সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া ও ব্যাপক করাই তার উদ্দেশ্য। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَاءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا تَاْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ -(السجده : ٢٧)

ওরা কি লক্ষ্য করে না, আমরাই পানি বন্ধ্যা জমিনের দিকে চালিয়ে নিই। পরে তার দ্বারা আমরা কৃষি ফসল উৎপাদন করি। তা-ই খায় তাদের চতুষ্পদ জন্তু এবং তারা নিজেরা।

মেঘ থেকে পানি বিন্দু বিন্দু করে বর্ষিত হয়। শূন্যলোকে একটি বিন্দু অপর বিন্দুর সাথে মিলেমিশে একত্রিত হয়ে যায় না। তা-ও এই বাতাসের গতিশীলতার কারণে। ফলে প্রত্যেকটি ফোঁটা তার জন্যে নির্দিষ্ট স্থানে পতিত হতে পারে। এই গোটা ব্যাপার যদি এক মহাশক্তিশালী মহাবিজ্ঞানী মহা ব্যবস্থাপক দ্বারা ব্যবস্থিত ও পরিচালিত না হতো, তাহলে এ কাজটি এত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন হতে পারত না। পানির বিপুলতা কি করে মেঘের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারত ? এই ব্যবস্থা ও পদ্ধতিতেই বড় বড় প্রবাহ

প্রবাহিত করা হচ্ছে, তার মধ্যে এই বিন্যাস ও শৃঙ্খলা কি করে আসত ? বিন্দুগুলো মহাশূন্যে একত্রিত হয়েও বরবাদ হয়ে যেত, কোন কাজে আসত না। হয়ত তা পৃথিবীর উপর পড়ে এমন বন্যাপ্রবাহের সৃষ্টি করত, যার মুখে সবকিছু ভেসে যেত, ধ্বংস হয়ে যেত সব বাড়ি-ঘর, ফসল, বাগান। পৃথিবীর বুকে গাছ-পালা-পশু ইত্যাদি কোন কিছুই টিকে থাকতে পারত না। তখন আকাশের পানির পতনে সেই অবস্থারই সৃষ্টি হতো, যা আল্লাহ বলেছেন এ ভাষায় ঃ

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ - (القمر : ١١)

অতঃপর আমরা আকাশমণ্ডলের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিলাম প্রচণ্ড বহমান পানির জন্যে।

তখন পানির প্রচণ্ড বর্ষণ হতো আকাশ থেকে, যেমন নদী সমুদ্র প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হয় পৃথিবীর বুকে। তাই শূন্যে মেঘের সঞ্চার হওয়া, সেখানে পানিকে পুঞ্জীভূত করা ও তাকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া আল্লাহ্‌র তওহীদের ও কুদরতেরই অকাট্য দলীল। তিনি দেহধারী নন, নন দেহ সদৃশ। কোন দেহ বা দেহধারীর পক্ষেই এ কাজ করা সম্ভব নয়।

জমিনের মরে যাওয়ার পর তার পুনরুজ্জীবিত হওয়াও তওহীদেরই প্রমাণ। কেননা সমগ্র সৃষ্টিও যদি একত্রিত হয় এর কোন একটি জিনিসকে জীবিতকরণে, তবুও তারা তা করতে সক্ষম হবে না। সম্ভব হবে না তাদের দ্বারা কোন বৃক্ষলতা উৎপাদন করা। আল্লাহ পানি দ্বারা মৃত জমিন পুনরুজ্জীবিত করেন, উৎপাদন করেন নানা প্রকারের গাছপালা গুলমলতা। অথচ আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, এর কোন একটিও পূর্বে ছিল না। আমাদের বাস্তব পর্যবেক্ষণও তাই যে, শূন্য ধূলি-ধুসরিত মাঠে ঘাস, উদ্ভিদ, গাছপালা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে, তা এক মহাশিল্পীরই শৈল্পিক অবদান, চাকচিক্যময় কারুকার্য এক মহান কারিগরের। যিনি মহাজ্ঞানী, সুবিজ্ঞানী, তিনি অংশসমূহের পারস্পরিক সংযোজন এবং চূড়ান্ত মাত্রার সুসংবদ্ধতা সম্পন্নকরণ এক মহান স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ, যিনি সবকিছুরই স্রষ্টা এবং তিনি এক ও একক। এটা প্রকৃতির নিজস্ব কোন কীর্তি নয়। নাস্তিকদের ধারণা বিশ্বাস একেবারেই ভিত্তিহীন। আকাশ থেকে বর্ষিত পানি অভিন্ন প্রকৃতির। জমি ও বাতাসের মধ্যেও সেই অভিন্নতা অথচ তার দরুন জমিনে উদ্ভূত গাছপালা, ফুল-ফল ও ফসল, বৃক্ষলতা বিচিত্র রঙে, বর্ণে, আকারে, স্বাদে। তা প্রকৃতির স্বাভাবিক কর্মের ফলশ্রুতি হলে তাতে এই বৈচিত্র্য দেখা দেয়া অসম্ভব হতো। কেননা সেজন্যে কারণও এক ও অভিন্ন হওয়া প্রয়োজন। কেননা এক ও অভিন্ন কারণ বিভিন্ন জিনিসের উদ্ভাবক হতে পারে না। প্রমাণিত হল যে, এই সবকিছু এক মহাবিজ্ঞানী কারিগরের কীর্তি। তাকে সৃষ্টি করেছেন, পরিমিত করেছেন, যদিও তা বিভিন্ন প্রকারের, বিভিন্ন স্বাদ ও গন্ধের এবং এ সবকিছুই আল্লাহ্‌র বান্দাগণের রিযিক এবং সেই সাথে এ সবই তাঁর শিল্পনৈপূণ্য ও নিয়ামতের নিদর্শন।

পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকা জীব-জন্তু প্রাণীও আল্লাহ্রই তওহীদের প্রমাণ। প্রকার-বৈচিত্র্যও আল্লাহ্র এককত্বের প্রমাণ। জীব-জন্তু স্বতঃই সৃষ্ট হতে পারে না, নিজেকে নিজে সৃষ্টি করতে পারে না। কেননা সে নিজেই নব সৃষ্ট, তা হয় এখন বর্তমান আছে না হয় তা নিঃশেষ, নিশ্চিহ্ন, অস্তিত্বহীন। যে নিজে অস্তিত্বহীন, তার পক্ষে অন্য কোন জিনিসকে অস্তিত্বশীল বানানো অসম্ভব। আর তা যদি এখন বর্তমান, অস্তিত্বমান, তাহলে তা বর্তমান আছে বলে এক্ষণে তার অস্তিত্বদানকারীর কোন প্রয়োজন নেই। এতদ্সত্ত্বেও আমরা জানি, একটি জিনিস কারোর দ্বারা অস্তিত্বমান হয়ে সে অন্য কোন জিনিসকে অস্তিত্বশীল বানাতে পারে না। আর তার অস্তিত্বহীন অবস্থায় সেকাজ করতে সক্ষম হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। কোন জীব বা প্রাণী নিজের অংশসমূহে বাড়তির সৃষ্টি করতে পারে না। কেননা গোটাটার উদ্ভাবনের শক্তি-সামর্থ্য না থাকা অংশ বৃদ্ধিতে অক্ষম হওয়ারই প্রমাণ করে। অতএব বোঝা গেল, যিনি নবসৃষ্টিকারী, তিনিই সক্ষম, মহাবিজ্ঞানী। তাঁর সদৃশ কেউ নেই, হতে পারে না। এসব জীব-জন্তু-প্রাণীর উদ্ভাবক বা স্রষ্টা যদি এ সবের সদৃশ হয় কোন একটি দিক দিয়েও, তাহলে দেহ সৃষ্টির ঘটনা সঙ্ঘটিত না হওয়ার সিদ্ধান্তই হবে তার সিদ্ধান্ত।

বাতাসের আবর্তন আল্লাহ্র তওহীদের প্রমাণ এভাবে যে, সমগ্র সৃষ্টিও যদি বাতাস প্রবাহিত করতে চেষ্টা চালায়, তবুও তা করতে সক্ষম হবে না। আর জানা-ই আছে, তা কখনো প্রবাহিত হয় দক্ষিণ দিক থেকে, কখনো উত্তর দিক থেকে। কখনো প্রচণ্ডভাবে, ঝড় সৃষ্টিতে, কখনো মৃদুমন্দ বেগে। এসব-ই স্রষ্টার সৃষ্টি। জানা গেল, যিনি বাতাসের এই বৈচিত্র্যময় প্রবাহের সৃষ্টি করেন, তিনি মহাশক্তির অধিকারী। তিনি বাতাস সদৃশ নন। কেননা সৃষ্ট কোন জিনিস করতে বা উদ্ভাবন করতে পারে না।

এসব দলীল-প্রমাণ আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন দুনিয়ার বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী লোকদেরকে এবং তিনি এসব বা অনুরূপ দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও এককত্ব প্রমাণ করার আদেশ করেছেন। আল্লাহ তো গাছপালা-বৃক্ষলতা পানি ছাড়াই উদ্ভাবন করতে পারতেন। সেজন্যে চাষাবাদেরও কোন প্রয়োজন হতো না, জন্তু-জানোয়ার সৃষ্টি কোনরূপ যৌন সংযোজন ব্যতীতই করতে পাতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এই নিয়মই চালু ও কার্যকর করেছেন যে, এ সবের মাধ্যমেই তা করবেন। তাঁর উদ্দেশ্য, কেবল উপাদান-উপকরণ ও মাধ্যম হলেই কোন জিনিস উদ্ভাবিত বা সৃষ্ট হতে পারে না। সেজন্যে উদ্ভাবক ও স্রষ্টা থাকা অবশ্যম্ভাবী।

তবু এই পদ্ধতিতেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর গোটা সৃষ্টিকে রূপ দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, প্রত্যেকটি ঘটনা সঙ্ঘটিত হয় আল্লাহ্র ইচ্ছায় ও জানার আওতার মধ্যে। যেন মানুষ তাঁর বিরাটত্ব সম্পর্কে চিন্তা করে। মানুষ যখনই তাঁর ব্যাপারে গাফিল অসতর্ক হয়ে যাবে, তখনই যেন তার ভেতর তীব্র চেতনা জাগিয়ে দেয়, যা উপেক্ষা করে চলেছে সে বিষয়ে যেন চিন্তার একটা আলোড়ন জাগিয়ে দেয়। আল্লাহ্ আসমান-জমিনকে দুই স্থায়ী ও দৃঢ় হয়ে থাকা জিনিস সৃষ্টি করেছেন। যে অবস্থায় সৃষ্টি করে রেখেছেন, সে অবস্থার মধ্যে কোন পরিবর্তন বা বিকৃতি আসছে না। সৃষ্টি করেছেন

এ দুটিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। এ দুটির ধ্বংস হওয়াও অবধারিত করে দিয়েছেন, অতঃপর জীব-জন্তু ও মানুষ প্রভৃতি এই পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। পরে এই সবের জন্যে রিযিক সৃষ্টি করেছেন, ক্ষুধা নিবৃত্ত করার ব্যবস্থা করেছেন, যেন ওরা জীবনে বেঁচে থাকতে পারে। এই রিযিক সারা জীবনের জন্যে এক সাথে দেন নি। যদি এক সাথে সারা জীবনের রিযিক পেয়ে যেত, তা হলে তারা সকল চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে যেত। কারোরই ধার ধারতে হতো না, কারোরই রিযিক দানের অপেক্ষায় থাকতে হতো না, বরং প্রতি বছর হিসেবে খাদ্য ও রিযিক দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন, যা সেই সময়ের জন্যে যথেষ্ট। যেন তারা অহংকারী হয়ে না উঠে। বরং তারা প্রতি মুহূর্তই তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী ও নির্ভরশীল হয়ে থাকে সর্বাবস্থায়। কতিপয় উপায়-উপকরণ মানুষের হাতে সঁপে দিয়েছেন, এগুলোর দ্বারা তারা সাম্বাৎসরিক রিযিক উৎপাদন করতে পারে। যেন ক্ষেতে জমি চাষ ও ফসল উৎপাদন। এ থেকে যেন তারা এই চেতনা লাভ করতে পারে যে, শ্রম ও কাজের ফল আছে, তা যেমন ভালো হতে পারে, তেমনি মন্দও হতে পারে। এই জিনিসই তাদেরকে ভালো ও কল্যাণময় কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। যেন তার ভালো ও কল্যাণময় ফল তারা লাভ করতে পারে এবং মন্দ কাজ থেকে যেন তারা বিরত থাকে, যেন তারা খারাপ ফল থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে। পরে আল্লাহ্ তাদের জন্যে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, যা করা তাদের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। এজন্যেই উর্ধ্বলোকে মেঘের সঞ্চার করেন, পানির সংগ্রহ হয় এবং পরে তা জমিনের উপর বর্ষিত হয় প্রয়োজন অনুপাতে। এরই সাহায্যে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে সমস্ত খোরাক-পোশাকের ও অন্যান্য যাবতীয় জিনিসের ব্যবস্থা করেছেন। পানির ব্যাপারে শুধু বৃষ্টিপাতের একটা ব্যবস্থা করেই তিনি ক্ষান্ত হয়নি। তিনি পৃথিবীর বুকে অসংখ্য বিরাট গভীর পানি সঞ্চিত করা পাত্রও বানিয়েছেন। সংখ্যাতীত ঝর্ণা, স্রোতধারার সৃষ্টি করেছেন। সেখান থেকে দূরে দূরে অবস্থিত জনবসতি ও ক্ষেত খামারে পানি পৌছাবার ব্যবস্থাও করেছেন। আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ

اَلَمْ تَرَاَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ - (الزمر : ٢١)

তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ্ উর্ধ্বলোক থেকে পানি বর্ষিয়েছেন। পরে সে পানি পৃথিবীর ধারা ও উৎসসমূহের মধ্যে চালিয়ে দিয়েছেন।

বস্তুত আসমান থেকে বর্ষিত পানি যদি পৃথিবীতে ধরে রাখার ব্যবস্থা না হতো, তাহলে প্রয়োজনের সময় তাৎক্ষণিকভাবে যেমন তা পাওয়া যেত না, তেমনি তা চতুর্দিকে প্রবাহিত হয়ে পৃথিবীর বুকে অবস্থিত জান-মাল প্রবাহিত হয়ে যেত এবং প্রয়োজনের সময় পানি না পেয়েও ধ্বংস হয়ে যেত অনেক কিছু।

এ প্রেক্ষিতেই বলতে হয়, রাব্বুল আলামীন অতীব বরকতওয়ালা, মহামহিম। তিনি পৃথিবীকে একটি বসতবাটির মতো বানিয়েছেন। মানুষ এখানে সর্বাবস্থায় আশ্রয় পায়।

আর আসমানকে বানিয়েছেন ছাদের মত। আর বৃষ্টি, উদ্ভিদ ও জীবজন্তু প্রভৃতিকে বানিয়েছেন সে সব জিনিসের মত, যা মানুষ নিজের কল্যাণ ও প্রয়োজন পূরণের জন্যে নিজের ঘরে নিয়ে আসে। তা ছাড়া তিনি এই পৃথিবীটাকে আমাদের জন্যে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন, এটিকে নরম ও মসৃণ করে বানিয়েছেন আমাদের চলাচলের জন্যে, পথ ঘাট বানিয়েছেন দুর্লঙ্ঘ্যকে লংঘন করার জন্যে। ঘর-বাড়ি নির্মাণের জন্যে এখানকার জিনিসপত্র, মাটি ও গাছপালা ব্যবহার করা সম্ভব করে দিয়েছেন আমাদের পক্ষে। এই ঘর-বাড়ি নির্মাণ করেই তো আমরা বৃষ্টির পানি ও রৌদ্রের তাপ থেকে বাঁচতে পারছি, বাঁচতে পারছি ঠাণ্ডা ও গরম থেকে। রক্ষা পাচ্ছি শত্রুর ক্ষতিকর আচরণ ও আক্রমণ থেকে। আমরা তো যে কোন স্থানে ঘর-বাড়ি নির্মাণ করেই এই কল্যাণ অর্জন করতে পারছি। প্রস্তর, চুনা, মাটি, গাছপালা কাষ্ঠ আমরা আমাদের নানাবিধ কাজে অবাধে ব্যবহার করছি, খনির গর্ভে স্বর্ণ রৌপ্য, লৌহ, তাম্র ইত্যাদি বহু রকমের মহামূল্য পদার্থ আমাদের উত্তোলনের অপেক্ষায় পুঞ্জীভূত করে রেখে দিয়েছেন। এর প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا - (حم السجدة : ١٠)

এবং পরিমিত করে রেখেছেন সেখানে তার সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

এগুলো ছাড়াও আরও কত বিপুল পরিমাণ ও সংখ্যার জিনিস রয়েছে, যে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান এখনও পূর্ণ হয়নি। যে সবের অশেষ কল্যাণ ভাষায় অবর্ণনীয়। এছাড়া আমাদের ও জীবজন্তুর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাও অনিবার্য। এ জন্যে মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্যেও এই পৃথিবীই আশ্রয়, যেমন আশ্রয় জীবনে বেঁচে থাকা সময়ের জন্যে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا - اَحْيَاءً وَّاَمْوَاتًا - (المرسلت : ٢٥-٢٦)

আমরা কি পৃথিবীকে জীবিত ও মৃতদের সামলাতে ও আয় করে নিতে সক্ষম বানাইনি?

বলেছেনঃ

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا -

وَاِنَّا لَجَاعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا - (الكهف ٧-٨)

পৃথিবীর উপরিভাগে যা কিছু আছে আমরা সেই সবকে পৃথিবীর সৌন্দর্য ও অলংকার বানিয়েছি, যেন লোকদের মধ্যে অধিক উত্তম কাজ কে করে তার যাচাই করতে পারি। এবং পৃথিবীর উপরে যা আছে শেষ পর্যন্ত আমরা সেই সব কিছুকে একটি প্রস্তরময় মরুভূমিতে পরিণত করে দেব।

তিনি উদ্ভিদ ও জন্তু-জানোয়ার যা সৃষ্টি করেছেন তা সবই স্বাদ দানকারী বানিয়েছেন, পীড়াদানকারী নয়। খাদ্যকে বিষ মিশ্রিত করে দেন নি, মিষ্টকে তিক্ত বানান নি। যেন তা

আমাদের মধ্যে এই চেতনা জাগিয়ে দিতে পারে যে, আমরা কেবল স্বাদ আস্বাদনেই নিমগ্ন হয়ে থাকি, তা তিনি চান না। সেগুলো পেয়েই যেন আমরা নিশ্চিন্ত, নিষ্ক্রিয়, শান্ত-শিষ্ট, নিবৃত্ত হয়ে না থাকি। তাহলে তো আমরা পরকাল সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ব। অথচ আল্লাহ্ আমাদেরকে সেই পরকালের জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। ফলে দ্বীনের ক্ষেত্রে ফায়দা ও সুবিধা পাওয়া যাবে পীড়াদায়ক কষ্টদায়ক জিনিসে। আমাদের মধ্যে এই চেতনাও জাগাতে চান যে, এই দুনিয়ায় কষ্টদায়ক অবস্থা রয়েছে, তদ্দ্বারা পরকালের দুর্ভোগ সম্পর্কে আমাদেরকে সচেতন বানিয়ে দেয়া হয়েছে, যেন আমরা সেই বীভৎস ও খারাপ কাজ ও জিনিস থেকে দূরে থাকি, যার ফলে আমরা পরকালে আল্লাহ্‌র নিয়ামত প্রাপ্ত হতে পারব। যে নিয়ামতে মলিনতা নেই। বস্তুত আল্লাহ্ এই একটি আয়াতে তাঁর তওহীদের যে সব দলীলের উল্লেখ বা তার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী লোকেরা যদি এগুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা চালায়, তা-ও তাঁর প্রতি ঈমান আনার জন্যে যথেষ্ট হবে। বিভিন্ন প্রকৃতি ও ধরনের নাস্তিকদের কথাবার্তা যে বাতিল ও ভিত্তিহীন, তা-ও বুঝতে পারবে। যারা দ্বৈতবাদে বিশ্বাসী কিংবা আল্লাহ্‌র সাদৃশ্যে বিশ্বাসী, তারাও নিজেদের বিভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতন হতে পারবে। আয়াতটির অর্থ ও তাৎপর্য যতই বিস্তারিত করা হবে, আলোচনা ততই দীর্ঘ হবে। যতটুকু আলোচনা করা হয়েছে তা এ স্থানে যথেষ্ট হতে পারে। মূলত আয়াতটিতে যে তওহীদের দলীলসমূহ রয়েছে, সে বিষয়ে খানিকটা আভাস দান-ই আমাদের এ আলোচনার উদ্দেশ্য। সব কথা এখানেই বলতে হবে, এমন কোন তাগিদ নেই। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁরই উপস্থাপিত দলীল প্রমাণসমূহের গভীর সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা জানবার, বুঝবার এবং প্রকাশ করার তওফীক দিন, এই প্রার্থনাই তাঁর নিকট জানাচ্ছি।

## সমুদ্রে চলাচল বৈধ ও দোষমুক্ত

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِىْ فِىْ الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسُ –

আর নৌকা-জাহাজ, যা নদী সমুদ্রে জনকল্যাণমূলক পণ্যাদিসহ চলাচল করে.....

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, নদী সমুদ্রে চলাচল করায় কোন দোষ নেই। তা সম্পূর্ণ মুবাহ কাজ। সে চলাচল যোদ্ধা হিসেবে হোক কি ব্যবসায়ী হিসেবে হোক, বৈষয়িক কল্যাণ সংগ্রহের লক্ষ্যেই হোক না কেন। কেননা আয়াতে মুনাফাদায়ক ও কল্যাণকর জিনিসের কথা বলা হয়েছে। তাতে কোন এক প্রকারকে অন্যান্য প্রকার সফর থেকে আলাদা করে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। বলেছেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ يُسَيِّرُكُمْ فِىْ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ – (يونس : ٢٢)

সেই আল্লাহ-ই তোমাদেরকে স্থলভাগে ও নদীসম্মুখে পরিভ্রমণ করিয়েছেন।

বলেছেন ঃ

رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِىْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِىْ الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِه –

তোমাদের রব্ব-ই তিনি, যিনি তোমাদের জন্যে নদী-সমুদ্রে নৌকা-জাহাজ চালান, যেন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের সন্ধান করতে পার।

এসব আয়াতে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বলা হয়েছে। যেমন আর একটি আয়াত ঃ

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ -

যখন নামায পড়া শেষ হয়ে যাবে, তখন তোমরা দুনিয়ায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের সন্ধান কর।

বলেছেন ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ -

তোমরা তোমাদের রব্ব-এর নিকট থেকে তাঁর অনুগ্রহ চাইবে, তাতে তোমাদের কোন দোষ হবে না।

বহু কয়জন সাহাবীর মত হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যে, নদী-সমুদ্রে চলাচলের মাধ্যমে ব্যায়সা-বাণিজ্য করা সম্পূর্ণ জায়েয। অবশ্য হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) নদী সমুদ্রে যুদ্ধ-বিগ্রহ চালাতে নিষেধ করেছেন মুসলমানদের প্রতি স্নেহের বশবর্তী হয়ে। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, নদী-সমুদ্রে তোমাদের কেউ যেন জলযানে আরোহণ করে চলাচল না করে। যদি তা করতেই হয়, তাহলে যেন যোদ্ধা হিসেবে কিংবা হাজী হিসেবে বা উমরাকারী হিসেবে করে। সম্ভবত এটা তাঁর একটা পরামর্শ কিংবা জলযানে আরোহী সম্পর্কে তার মনে একটা ভীতি ছিল, সেই কারণে এ কথা বলেছেন। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে, যা মুহাম্মাদ ইবনে বকর আল-বসরী আবূ দাউদ সাঈদ ইবনে মনসূর, ইসমাঈল ইবনে যাকারিয়া, মুতরফ বশর, আবূ উবায়দুল্লাহ, বুশায়র ইবনে মুসলিম, আবদুল্লাহ ইবনে উমর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَايَرْكَبِ الْبَحْرَ اِلَّا حَاجٌّ اَوْمُعْتَمِرٌ اَوْ غَازٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَاِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا -

হজ্জযাত্রী, উমরাকারী কিংবা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধকারী ছাড়া অন্য কেউ যেন সমুদ্রপথে চলাচল না করে।[১] কেননা সমুদ্রের নিচে আগুন রয়েছে এবং সে আগুনের নিচেও সমুদ্র রয়েছে।

---

১. নবী করীম (স)-এর কথার শেষাংশ হচ্ছে ঃ فَاِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارٌ اَوْ تَحْتَ النَّارِ بَحْرٌ — কেননা সমুদ্রের নিচে আগুন আছে কিংবা আগুনের নিচে সমুদ্র রয়েছে। যারা বলেন, পৃথিবীর গর্ভ দাউ দাউ করে জ্বলা আগুন দ্বারা বেষ্টিত, উক্ত কথাটি তাদের দলীল। ভূ-মণ্ডলের বিরাট অংশ সর্বদিক দিয়েই সমুদ্রের পানিতে ডুবন্ত।

রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটি সম্ভবত পছন্দ-অপছন্দ পর্যায়ের। অর্থাৎ তিনি দ্বীনি অপরিহার্য কাজ ছাড়া সমুদ্রপথে চলাচল করা পছন্দ করেননি। কেননা মানুষ বৈষয়িক আনন্দ-স্ফূর্তির জন্যে আত্মপ্রতারিত হয়ে পড়তে পারে। তা যাতে না হয়, সেজন্যেই এ কথা। যুদ্ধ, হজ্জ ও উমরা প্রভৃতির জন্যে সমুদ্রপথে চলাচলে কোন নিষেধ নেই। কেননা এসব কাজের জন্যে সমুদ্র সফরে কোনরূপ ধোঁকা-প্রতারণার অবকাশ নেই। এই কাজে সমুদ্রপথে চলতে গিয়ে যদি কেউ ডুবে মরে, তাহলে সে শহীদ হবে।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, সুলায়মান ইবনে দাউদ আল আতকী, হাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে হাব্বান, আনাস ইবনে মালিক, উম্মে হারাম বিনতে মিলহা উম্মে সুলায়মের বোন সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলের করীম (স) তাদের নিকট ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। পরে জাগ্রত হয়ে হাসতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, হে রাসূল! আপনি হাসছেন কোন্ কারণে ? বললেন, আমি কিছু সংখ্যক লোক[১] কে—যারা সমুদ্রে চলাচল করে—দেখতে পেয়েছি। তারা এই সমুদ্রে চলাচল করছে পরিবার বা গোত্রের বাদশাহর ন্যায়। জিজ্ঞাসা করলাম, হে রাসূল! আপনি দো'আ করুন, আল্লাহ্ আমাকে তাদের মধ্যের একজন বানান। বললেন, হ্যাঁ, তুমি তাদের একজন। পরে রাসূল আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। আবার জেগে উঠলেন ও হাসতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, হে রাসূল! কোন্ কারণে আপনি হাসছেন ? জবাবে তিনি পূর্বানুরূপ কথা বললেন। বললাম, হে রাসূল! আপনি দো'আ করুন, আল্লাহ যেন আমাকে তাদের মধ্যের একজন বানান। বললেন ঃ তুমি প্রথম দিকের একজন।

বিনতে মিলহানকে পরে হযরত উবাদাত ইবনে সামিত বিবাহ করেন। এ সময় সমুদ্র পথে তিনি যুদ্ধযাত্রা করেন। সঙ্গে তাঁকে নিয়ে গেলেন। ফিরে এলে পরে একটি গাধার পিঠে সওয়ার হতে চাইলেন। কিন্তু গাধাটি তাঁকে ফেলে দিল। তাতে তাঁর ঘাড় ভেঙ্গে গেল এবং মরে গেলেন।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, আবদুল ওহাব ইবনে আবদুর রহীম আল-জুয়ায়রী, আদদে মাশকী, মারওয়ান, হিলাল ইবনে মায়মুন রমলী, ইয়ালা ইবনে শাদ্দাদ, উম্মে হারাম সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْمَائِدُ فِى الْبَحْرِ الَّذِىْ يُصِيْبُهُ الْقَىْءُ لَهُ اَجْرُ شَهِيْدٍ وَالْغَرِقُ لَهُ اَجْرُ شَهِيْدَيْنِ -

সমুদ্রপথের যাত্রী যদি বমি করে, তাহলে সে এক শহীদের সওয়াব পাবে, আর যে ডুবে মরবে, সে দুই শহীদের সওয়াব পাবে।

---

১. সমুদ্রগামীদের মধ্য থেকে—অপর বর্ণনায়—আমার উম্মত থেকে যারা সমুদ্র পথে চলাচল করে।

## মৃত জীব খাওয়া হারাম

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ -

এ ব্যাপারে আল্লাহ শুধু হারাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত ও শূকরের গোশত এবং এমন জিনিস যার উপর আল্লাহ ছাড়া অপর কারোর নাম লওয়া হয়েছে।

আবূ বকর বলেছেন الميتة। বলতে শরীয়াতের দৃষ্টিতে মৃত জীব-জন্তু বুঝিয়েছেন, যা যবেহ্ করা হয়নি। জীব-জন্তু অনেক সময় দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার দরুন মরে যায়, যার মৃত্যুর কোন কারণ মানুষ ঘটায়নি। অনেক সময় আবার মানব সৃষ্ট কারণের দরুনও হয়ে থাকে। যখন মানুষ মুবাহ নিয়মে যবেহ্ করার উদ্দেশ্যে তার মৃত্যুর কোন কারণের সৃষ্টি করেনি।

পরে জন্তু যবেহ্ করার শর্তাবলীর উল্লেখ যথাস্থানে করা হবে ইনশাআল্লাহ্। জন্তুর মৃত্যু যদি আল্লাহ্র করা কোন কাজের দরুন হয়ে থাকে, তা-ও হারাম হবে। যদিও আমরা জানি যে, হারাম-হালাল নিষেধ ও মুবাহ্ ইত্যাদি আমাদের কাজ-কর্মের সাথে সম্পর্কিত। আমাদের ছাড়া অন্য কারোর কাজের সাথে শরীয়াতের এসব বিধান সম্পর্কিত হয় না। কেননা মানুষকে অপরের কাজ থেকে বিরত রাখা সঙ্গত নয়। কোন কাজের জন্যে আদেশও করতে পারে না। কেননা তার অর্থ কখনই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না শ্রোতাদের নিকট। তাতে হারাম-হালালকরণ শব্দ ব্যবহৃত হতে পারে, যদিও তা প্রকৃত নয়। বরং তা হারামকরণের হুকুমের তাগিদের দলীল হয়ে যায়। তা মুনাফা বা ফায়দা লাভের সব দিকই পরিব্যাপ্ত হয়। এ কারণে আমাদের হানাফী ফিকাহ্বিদগণ বলেছেন—মৃত জন্তু দ্বারা কোনরূপ ফায়দা লাভ জায়েয নয়। নিজেদের পালিত কুকুর ও যখমকারীকে খাওয়ানোও জায়েয নয়। কেননা তা-ও এক প্রকারের ফায়দা লাভ। অথচ আল্লাহ মৃত জীবকে নিঃশর্তভাবে হারাম করেছেন। মূল মৃতটাই হারাম। এই নিষেধের হুকুমের উপর অত্যন্ত জোর দেয়া হয়েছে। ফলে তার একবিন্দু জিনিস থেকেও কোনরূপ ফায়দা গ্রহণ জায়েয নয়। তবে মানবার যোগ্য কোন দলীল দ্বারা কোন জিনিস বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা হলে ভিন্ন কথা। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীস মৃত মাছকে এই সাধারণ হারামকরণ থেকে আলাদা করে দিয়েছে। পঙ্গপাল (Rocusts)-ও এ পর্যায়ে গণ্য বলে তা মুবাহ্।

আবদুর রহমান ইবনে যায়দ ইবনে আসলাম, তাঁর পিতার নিকট থেকে তিনি ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

أُحِلَّتْ لَنَا مِيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَامَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجُرَادُ وَالسَّمَكُ وَاَمَّا الدَّمَانِ فَالطَّحَالُ وَالْكَبِدُ -

আমাদের জন্যে দুপ্রকারের মৃত জীব ও দুপ্রকারের রক্ত হালাল করে দেয়া হয়েছে। মৃত দুই প্রকারের জীবের মধ্যে পঙ্গপাল ও মাছ রয়েছে এবং দুই প্রকারের রক্তের মধ্যে তিল্লী ও কলিজা।

আমর ইবনে দীনার জাবির থেকে 'জায়শুল খাব্ত' ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, সমুদ্র তাদের দিকে একটি মাছ নিক্ষেপ করল, তারা তা থেকে অর্ধমাসকাল ধরে আহার করে। পরে তাঁরা যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন তার সমস্ত বিবরণ নবী করীম (স)-কে জানালেন। তখন তিনি বললেন ঃ

هَلْ عِنْدَ كُمْ مِنْهُ شَيْءٌ تُطْعِمُوْنِيْ –

তোমাদের নিকট সে মাছের কোন অংশ অবশিষ্ট থেকে থাকলে তোমরা তা আমাকে খাওয়াও।

নদী-সমুদ্রে মরে ভেসে উঠেনি এমন সব মাছ খাওয়া মুবাহ, এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। পঙ্গপালও এ পর্যায়ের।

কারো কারো মতে মৃত হারামকরণের আয়াতের সাধারণ ভাবধারা থেকে আলাদা করে বিশেষভাবে চিহ্নিত করার জন্যে অপর এক আয়াতকে দলীল হিসেবে অনেকে পেশ করেছেন। সে আয়াতটি হচ্ছে ঃ

اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ –

সমুদ্রের শিকার এবং তার থেকে পাওয়া খাদ্য তোমাদের জন্যে হালাল করে দেয়া হয়েছে তোমাদের জন্যে জীবনোপকরণ হিসেবে।

এ পর্যায়ে রাসূলে করীম (স)-এর একটি হাদীসও রয়েছে। হাদীসটি সফওয়ান ইবনে সুলায়ম জরকী, সাঈদ ইবনে সালমা, মুগীরা ইবনে আবূ বুরদাতার সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

فِيْ الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهٗ الْحِلُّ مَيْتَتُهٗ –

সমুদ্রের পানি পবিত্র, তার মৃত জীব হালাল।

কিন্তু এ হাদীসের সনদের সাঈদ ইবনে সালমা অজ্ঞাত-অপরিচিত ব্যক্তি। তার বর্ণিত হাদীস প্রমাণিত নয়। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদুল আনসারী সনদে তার বিরোধিতা করেছেন। তিনি হাদীসটি মুগীরা ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ বরদাতা তাঁর পিতা থেকে রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসের সনদে এই পার্থক্য মূল হাদীসটিকে 'মুজতারাব' বানিয়ে দেয়। আর তার বলে কোন 'মুহ্কাম' আয়াতকে বিশেষ কোন অর্থে গ্রহণ করা সঙ্গত নয়।

ইবনে যিয়াদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-বুকারী সুলায়মান আল-আমাশ তাঁর ওস্তাদগণের মাধ্যমে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

فِى الْبَحْرِ ذَكِىٌّ صَيْدُهُ طَهُوْرٌ مَاؤُهُ –

সমুদ্রের শিকার যবেহকৃত, তার পানি পবিত্র।

হাদীস বর্ণনাকারীদের মতে এ হাদীসটি প্রথম থেকেই আরও অধিক যয়ীফ। এ পর্যায়ে আরও একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেটি ইয়াহইয়া ইবনে আয়ূব জাফর ইবনে রবী'আতা ও আমার ইবনুল হারিস, বকর ইবনে সওয়াদাতা, আবূ মুআবিয়া আল-আলাভী, মুসলিম ইবনে মখশী, আল-মুদলেজী, ফরাসেবী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

فِى الْبَحْرِ هُوَ طَهُوْرٌ مَاؤُهُ الْحِلُّ مِيْتَتُهُ –

সমুদ্রের পানি পবিত্র, তার মৃত জীব হালাল।

এ হাদীসটিও দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা রেওয়াতটি অজ্ঞাত। কুরআনের বাহ্যিক সাধারণত্বকে এর ভিত্তিতে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে ক্ষুণ্ন করা যায় না।

আবদুল বাকী আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল, আহমাদ ইবনে হাম্বল, আবুল কাসিম ইবনে আবুয যিনাদ, ইসহাক ইবনে হাযিম, আব্দুল্লাহ ইবনে মাকসাম, আতা, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স)-কে সমুদ্র সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ

هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ اَلْحِلُّ مِيْتَتُهُ –

সমুদ্রের পানি পবিত্র, তাতে মৃত জীব হালাল

আবূ বকর বলেছেন ঃ মরে ভেসে উঠা মাছ জায়েয কি জায়েয নয়—এ নিয়ে মত-পার্থক্য রয়েছে। হাদীসের শব্দ الطافى। 'পানিতে মরা জীব' বোঝায়, যা স্বাভাবিকভাবে মরে যায়। হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণ তা 'মাকরূহ' মনে করেন। হাসান ইবনে হাই'র তা-ই মত। তবে ইমাম মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন, তাতে কোন দোষ নেই। আগের কালের ফিকাহ্‌বিদগণের বিভিন্ন মত রয়েছে এ ব্যাপারে। আতা ইবনে মায়িব মায়সারা থেকে, তিনি হযরত আলী (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

مَا طَفَا مِنْ مِيْتَتُهُ الْبَحْرِ فَلَاتَأْكُلْهُ –

সমুদ্রের যে মরা ভেসে উঠে তা খাবে না।

আমর ইবনে দীনার জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও আবদুল্লাহ ইবনে আকল হুযায়ল, ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা দুজনই পানিতে মরে ভেসে উঠা মাছ খাওয়া মাকরূহ মনে করতেন। সাহাবীদের মধ্যে এ তিনজন সে মাছ খাওয়া মাকরূহ বলে মত দিয়েছেন।

জাবির ইবনে যায়দ, আতা, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, হাসান, ইবনে সিরীন ও ইবরাহীম নখয়ী প্রমুখ ফিকাহ্‌বিদ তাবেয়ীও তা মাক্‌রূহ মনে করতেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও আবূ আইয়ূব আনসারী পানিতে মরে ভেসে উঠা মাছ খাওয়া মুবাহ মনে

করতেন। অথচ আল্লাহ্‌র কথা الميتة। শব্দটি সব মরা সম্পর্কে নিষেধ বোঝায় বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে।

তবে মুসলিম সমাজ মরে ভেসে উঠা মাছ ছাড়া অন্যান্য জিনিসকে এই আয়াতের সাধারণ হুকুম থেকে আলাদা করে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে। তাই আমরাও সেই মতকে গ্রহণ করেছি। মরে ভেসে উঠা মাছ সম্পর্কে বিভিন্ন মত হওয়ার সাধারণ হুকুম গ্রহণ করাই কর্তব্য। মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, আহমাদ ইবনে আবাদাতা, ইয়াহইয়া ইবনে সুলায়ম, তায়েফী, ইসমাঈল ইবনে উমাইয়্যাতা, আবূ যুবায়র, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَا اَلْقَعِى الْبَحْرُ اَوْجَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوْهُ، وَمَا مَاتَ فِيْهِ وَطَفَا فَلا تَاكُلُوْهُ –

নদী-সমুদ্র যা নিক্ষেপ করে কিংবা ভাটার টানে বা স্রোতে উঠে আসে, তোমরা তা খেতে পার। আর যা তাতে মরে যায় ও ভেসে উঠে, তা তোমরা খাবে না।

ইসমাঈল ইবনে আয়াশ, আবদুল আজীজ ইবনে আবদুল্লাহ, অহব ইবনে কায়সান ও নয়ীম ইবনে আবদুল্লাহ, আল মুজমার, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন[১] ঃ

مَاجَزَرَ عَنْهُ الْبَحْرُ فَلَا تَأْكُلْ وَمَا اَلْقَى فَكُلْ، وَمَا وَجَدْتَهُ مَيِّتًا طَافِيًا فَلَاتَأْكُلْهُ –

নদী-সমুদ্র থেকে যা স্রোতে উঠে এসেছে, আর যা উপরে নিক্ষেপ করেছে তা খাও। আর যা তুমি মরা ভেসে উঠা পাবে, তা খাবে না।

ইবনে আবূ যিব আবুয যুবায়র, জাবির সূত্রে নবী করীম (স) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবদুল বাকী ইবনে নাফে, মূসা ইবনে যাকারিয়া, সহল ইবনে উসমান, হিফ্‌স ইয়াহইয়া ইবনে আবূ উনাইসাতা আবুয যুবায়র, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ

اِذَا وَجَدْتُمُوْهُ حَيًا فَكُلُوْهُ،وَمَا اَلْقَى الْبَحْرُحَيًا فَمَاتَ فَكُلُوْهُ، وَمَا وَجَدْتُمُوْهُ مَيْتًا طَافِيًا فَلَا تَأْكُلُوْهُ –

তোমরা যখন তা জীবিত পারে, তা খাও। আর সমুদ্র যা জীবিতাবস্থায় উপরে নিক্ষেপ

---

১. রাসূলের কথা مَاجَزَرَ عَنْهُ الْبَحْرُ فَلا تَأكُلْ 'যা সমুদ্র স্রোত তুলে দিয়েছে, খাবে না' আমাদের নিকট রক্ষিত এই গ্রন্থের সব কয়টি সংস্করণে এ রূপ বর্ণনাই রয়েছে। কিন্তু ইবনুল অমীর কৃত জামে উল-উসূলে এই বর্ণনা আমরা পাইনি। সূয়ূতীর جمع الجوامع গ্রন্থেও নেই। এ বর্ণনাটি এ পর্যায়ের অন্যান্য বর্ণনার বিরোধী। সে সব বর্ণনায় রয়েছে ঃ যা সমুদ্র স্রোত তুলে দিয়েছে তা সেই রকমই যা সমুদ্র উপরে নিক্ষেপ করেছে।

করবে এবং পারে মরে যাবে, তাও খেত পার। কিন্তু যা মরা ভেসে উঠা অবস্থায় তোমরা পাবে, তা খাবে না।

ইবনে নাফে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা ইবনে আবূ উসমান আদ-দহবান, হুসায়ন ইবনে ইয়াযীদ, আত-তহান, হিফস ইবনে গিয়াস ইবনে আবূ যিব আবুয যুবায়র জাবির ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَاصِدْ تُمُوْهُ وَهُوَ حَيٌّ فَمَاتَ فَكُلُوْهُ، وَمَا اَلْقَى الْبَحْرُ مَيْتًا طَافِيًا فَلَا تَأْكُلُوْهُ –

তোমরা যে মাছ শিকার করে জীবিতাবস্থায় পাবে, প'রে মরে যাবে, তা তোমরা খেতে পার। আর নদী-সমুদ্র যা মৃতাবস্থায় ভাসিয়ে উঠাবে, তা তোমরা খাবে না।

যদি প্রশ্ন তোলা হয়, এ হাদীসটি সুফিয়ান সওরী, আইয়ূব ও হাম্মাদ আবুয যুবায়র জাবির-এর কথা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তা রাসূলের কথা নয়?

জবাবে বলা যাবে, এ কারণে তা আমাদের নিকট খারাপ হয়ে যায়নি। কেননা হাদীস কখনো সরাসরি রাসূলের নাম নিয়ে বর্ণনা করা হয়, কখনো তাঁর নাম ছাড়াই 'মুরসাল' হিসেবেও বর্ণনা করা হয়। তাই তার ভিত্তিতে ফতোয়া দেয়া যেতে পারে। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে ফতোয়া দেয়া অসমীচীন নয়। বরং সে ফতোয়া তাগিদ করে যে, ইসমাঈল ইবনে উমাইয়্যাতা আবুয্ যুবায়র থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তা যেমন বলেছি, তা ছাড়া কিছু নয়। অনুরূপভাবে ইবনে আবূ যিব হাদীসটিকে রাসূলের কথা হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তা-ও গ্রহণীয়।

যদি বলা হয়, নবী করীম (স) থেকে এই হাদীসও বর্ণিত হয়েছে ঃ

اُحِلَّتْ لَنَا مِيْتَتَانِ وَدَمَانِ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ –

আমাদের জন্যে দুটি মৃত জীব ও দুটি রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃত জীব দুটি হচ্ছে মাছ ও পঙ্গপাল।

এ তো সব বিষয়ে সাধারণ অর্থজ্ঞাপক।

জবাবে বলা যাবে, আমরা যা উল্লেখ করেছি এবং মরে ভেসে উঠা জীব খাওয়া নিষেধ পর্যায়ে যে বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছি, তা সে দুটিকে বিশেষভাবে হালাল রূপে চিহ্নিত করে। আমাদের থেকে বিরোধী মত পোষণকারীদের কর্তব্য তার আসল ও মূলের উপর স্থিত হওয়া হাদীসের পরম্পরা রক্ষায়। যা সাধারণ তাকে যা বিশেষ, তার উপরে রাখতে হবে। এভাবেই দুটিকে ব্যবহার করতে হবে। সাধারণ হুকুম দ্বারা বিশেষ হুকুমকে নাকচ করা যাবে না। তাছাড়া হাদীসটি মরফূ'—সরাসরি রাসূলের কথা—হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। মরহুম আল-আত্তার আবদুর রহমান ইবনে যায়দ ইবনে আসলাম তাঁর পিতার নিকট থেকে ইবনে উমর থেকে 'মওকূফ' (সাহাবীর কথা) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর ইয়াহইয়া আল-হুমানী আবদুর রহমান ইবনে যায়দ থেকে মরফূ—রাসূলের

কথা—হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অতএব তা তোমাকে মানতে হবে, যেমন করে আমাদেরকে মানতে হবে যা মরে ভেসে উঠা মাছ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

নবী করীম (স) এর 'সমুদ্রের পানি পবিত্র, তার মৃত হালাল' এ হাদীসটিকে দলীল হিসেবে পেশ করা হলে, যাতে মরে ভেসে উঠা মাছকে আলাদা করা হয়নি, তাহলে ?

বলা যাবে, আমরা দুটি বর্ণনাকেই একসাথে কাজে লাগাব। দুটি একসাথে এসেছে মনে করব। মরে ভেসে উঠা মাছ সংক্রান্ত হাদীসকে নিষেধ পর্যায়ে গণ্য করব এবং মুবাহ্ প্রমাণকারী হাদীসটিকে আমরা ব্যবহার করব মরে ভেসে উঠা মাছ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে।

যদি বলা হয়, ইমাম আবূ হানীফার মূলত বিশেষ (خَاس) ও সাধারণ (عام) পর্যায়ে নীতি হচ্ছে, দুটি হাদীসের কোন একটিকে ব্যবহার করার ব্যাপারে ফিকাহ্বিদগণ যদি একমত হন এবং অপরটির ব্যবহারে মতপার্থক্যে পড়ে যান, তাহলে যে হাদীস সম্পর্কে ঐকমত্য হয়েছে, তার ফায়সালাকারী হবে মতপার্থক্যের হাদীসটির ব্যাপারে। নবী করীম (স)-এর কথা 'সমুদ্রের মৃত হালাল' এবং 'আমাদের জন্যে দুটি মৃত হালাল করা হয়েছে' দুটিকে ব্যবহার করতে সকলে একমত হয়েছেন। আর 'মরে ভেসে উঠা মাছ'—এ হাদীসটিতে মতপার্থক্য হয়েছে। এমতাবস্থায় শেষোক্ত হাদীসদ্বয়ের উপর তার ফায়সালা কার্যকর হবে (তাতে হানাফী মত টিকে না)।

এর জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, এটা তাঁর মাযহাবরূপে পরিচিত। আর তাঁর যে কথাটি কুরআনের অকাট্য দলীল সমর্থন করে না সে পর্যায়ে কথা হচ্ছে, কুরআনের যে সাধারণ হুকুম ব্যবহার সম্পর্কে বিভিন্ন মত সম্পন্ন হাদীসের সমর্থন, সে ব্যাপারে তাঁর কোন কথা আমাদের জানা নেই। তাই একথা বলা সঙ্গত যে, কুরআনের সাধারণ হুকুম যখন তা সমর্থন করে তখন সে হাদীস ব্যবহারে মতপার্থক্য গণ্য করার যোগ্য নয়। অতএব তা ব্যবহার করা হবে যে হাদীস ব্যবহারে সকলে একমত ও সাধারণ হুকুমের, তার সাথে একত্র করে। আর তা হবে তা থেকে বিশেষভাবে আলাদ করা।

জায়শুল খাবত প্রসঙ্গ বর্ণনার জাবির বর্ণিত হাদীসকে যদি দলীল হিসেবে পেশ করা হয় এবং ধরে নেয়া হয় যে, নবী করীম (স) সমুদ্র নিক্ষিপ্ত মাছ খাওয়া মুবাহ্ ঘোষণা করেছেন, তাহলে আমরা বলব, তা طاف অর্থাৎ মরে ভেসে উঠা সম্পর্কে বলা হয়নি। কেননা طافى হচ্চে সেই মাছ যা ঘটিত কোন কারণ ছাড়াই পানির মধ্যে স্বাভাবিকভাবে মরেছে। কিছু লোক মনে করে, পানিতে মরে ভেসে উঠা মাছ পানির মধ্যেই রয়ে গিয়েছিল বলেই তা মাকরূহ। তার ফলেই তা উপরে ভেসে উঠেছে। যবেহ করা জীব যদি পানিতে নিক্ষিপ্ত হয়, পরে তা ভেসে উঠে তা হলে তা খাওয়া আমাদের জন্যে হালাল হওয়া বাধ্যতামূলক।

তাদের এই কথা মূর্খতার পরিচায়ক। কথা এবং মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে তা অর্থহীন, কেননা মাছ যদি মরে ও পরে পানির উপর ভেসে উঠে, তাহলে তা খাওয়া যাবে, যদিও তা স্বাভাবিকভাবেই মরেছে; কিন্তু পানির উপর ভেসে উঠেনি, তা হলে তা খাওয়া যাবে না। আমাদের মতে এর অর্থ হচ্ছে, মাছের মৃত্যুটা পানির মধ্যেই স্বাভাবিকভাবে হয়েছে, অন্য কোন ভাবে নয়।

আবদুল বাকী আমাদের নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, সে হাদীসটি منكر —গ্রহণ অযোগ্য। তিনি উল্লেখ করেছেন, উবায়দ ইবনে শরীক আল-বাজ্জার আবুল জামাহীর সাঈদ ইবনে বুশায়র আবানা ইবনে আয়াশ, আনাস ইবনে মালিক সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

كُلْ مَا طَفَا عَلَى الْبَحْرِ –

যে মাছ মরে সমুদ্রের উপরে ভেসে উঠেছে, তা খাও।

কিন্তু আবান ইবনে আয়াশ তাঁর বর্ণনা দ্বারা তা প্রমাণ করেন না। শুবা বলেছেন ঃ

لَانْ اَزْنِى سَبْعِيْنَ زَنْيَةً اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَرْوِىْ عَنْ اَبَانِ بْنِ عياش –

আবান ইবনে আইয়াশের নিকট থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করার তুলনায় সত্তরবার যিনা করাও উত্তম ও অধিক শ্রেয়।

কেউ যদি আল্লাহ্‌র এই কথাটি দলীল হিসেবে পেশ করেন ঃ

اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ –

সমুদ্রের শিকার ও তার নিকট থেকে পাওয়া খাদ্য তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে।

এবং বলে যে, এ আয়াতে মরে ভেসে উঠা ও অন্যান্য সবই তো হালাল করে দেয়া হয়েছে। জবাবে বলা হবে দুটি কথা। একটি—এটা একটি বিশেষভাবে নির্দিষ্ট বিষয়। মৃত জীব হারাম হওয়া থেকে এটা আলাদা। মরে ভেসে উঠা মাছ খাওয়া নিষিদ্ধকারী হাদীসসমূহ থেকেও তা স্বতন্ত্র। আর দ্বিতীয়— وطعامه 'এবং তার খাদ্য' আল্লাহ্‌র এ কথাটির তাফসীরে বলা হয়েছে ঃ যা সমুদ্র ছুঁড়ে ফেলেছে এবং পরে মরে গেছে, (তা-ই হচ্ছে সমুদ্রের দেয়া খাদ্য)। আর وصيده বলতে যা লোকেরা শিকার করে তা বুঝিয়েছে। তা জীবিত মরে ভেসে উঠা জিনিস এ দুটির বাইরে। কেননা তা সমুদ্র ছুঁড়ে ফেলে নি। তা শিকার করেও পাওয়া যায়নি। কোন মরা মাছ কেউ শিকার করেছে—একথা বলা যুক্তিযুক্ত নয়। যেমন কোন মরা জীব শিকার করা হয়েছে—বলা যায় না। তাহলে প্রমাণিত হল যে, উক্ত আয়াতটি মরে ভেসে উঠা মাছকে জায়েয খাদ্যের মধ্যে শামিল করে নি।

## পঙ্গপাল খাওয়া

হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণ ও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, পঙ্গপাল খাওয়ার কোন দোষ নেই। যা তুমি ধরতে পার এবং যা মরা অবস্থায় তুমি পাবে, তা খাও। ইবনে অহব ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তা জীবিত ধরে মাথা কেটে ফেলতেন, তার শুরুয়া তৈয়ার করতেন ও খেতেন। আর যা জীবিত ধরেছে, পরে সে বিষয়ে বেখেয়াল

হয়েছে এবং মরে গেছে, তা খাওয়া যাবে না। তা তো সেই রকমের যা শিকার করার পূর্বেই মরে গেছে—অতএব তা খাওয়া যাবে না। ইমাম জুহ্রী ও রবী'আরও এই মত। মালিক বলেছেন, অগ্নিপূজক যা হত্যা করেছে, তাও খাওয়া যাবে না। লাইস ইবনে সায়াদ বলেছেন ঃ মরা পঙ্গপাল খাওয়া আমি মাকরূহ মনে করি। আর যা জীবিত ধরা যাবে তা খেতে দোষ নেই।

আবূ বকর বলেছেন, ইবনে উমর বর্ণিত হাদীস হচ্ছে ঃ

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ –

আমাদের জন্যে দুটি মৃত জীব ও দুটি রক্ত হালাল করা হয়েছে। মাছ ও পঙ্গপাল।

এ হাদীস তো সর্বপ্রকারের পঙ্গপাল হালাল করে দিয়েছে। অতএব হাদীসটিকে তার সাধারণ অর্থেই ব্যবহার করা, তার উপর ধারকের তা হত্যা করার শর্ত-আরোপ না করাই বাঞ্ছনীয়। কেননা নবী করীম (স) নিজে এ বিষয়ে কোন শর্ত আরোপ করেন নি।

আবদুল বাকী হাসান ইবনুল মুসান্না, মুসলিম ইবনে ইবরাহীম, যাকারিয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে উমারাতাল, আনসারী, ফায়েদ আবুল আওয়াম, আবূ উসমান, নহদী সালমান সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স)-কে পঙ্গপাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ

اَكْثَرُ جُنُوْدِ اللّٰهِ، لَا اٰكُلُهُ وَلَا اُحَرِّمُهُ –

এগুলোর অধিকাংশই আল্লাহ্র সেনাবাহিনী। আমি নিজে তা খাই না, আর তা খাওয়া হারামও করি না।

নবী করীম (স) নিজেই যা খাওয়া হারাম করেন নি তা খাওয়া মুবাহ্। তাঁর নিজের তা না খাওয়া থেকে কোন নিষেধ প্রমাণিত হয় না। কেননা মুবাহ জিনিস না খাওয়া—খাওয়া ত্যাগ করাও মুবাহ, দোষহীন। পক্ষান্তরে যা হারাম, নিষিদ্ধ, তাকে হারাম না বলা সঙ্গত হতে পারে না। যা মরে গেছে কিংবা ধারক বা শিকারী যা ধরেছে তার হত্যা করা—এ দুয়ের মাঝে তিনি কোনরূপ পার্থক্য করেন নি। আতা জাবির থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاصَبْنَا جَرَادًا فَاَكَلْنَاهُ –

আমরা রাসূলে করীম (স)-এর সঙ্গে যুদ্ধে গিয়েছি। সেখানে আমরা পঙ্গপাল পেয়ে গেলাম। সেগুলো আমরা খেয়ে ফেললাম।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ আওফা বলেছেন ঃ

غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَاْكُلُ الْجَرَادَ وَلَا تَاْكُلُ غَيْرَهُ –

আমি রাসূলে করীম (স)-এর সঙ্গে যুদ্ধে গিয়েছি। এ সময় আমরা পঙ্গপাল ছাড়া আর কিছুই খাইনি।

আবূ বকর বলেছেন, মৃত কি নিহত, এর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। আবদুল বাকী মূসা ইবনে যাকারিয়া, আত-তস্তুরী, আবুল খাত্তাব, আবূ উনাব, নুমান, উবায়দাতা, ইবরাহীম, আল-আসওয়াদ, আয়েশা (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) পঙ্গপাল খেতেন এবং বলতেন যে, নবী করীম (স) তা খেতেন।

আবূ বকর বলেছে, পঙ্গপাল পর্যায়ে, সাহাবীগণের এই কথাসমূহে তা মৃত কি জীবিত, কি নিহত—এর মধ্যে কোনই পার্থক্য করা হয়নি।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্‌র কথা ঃ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ 'তোমাদের প্রতি মৃত জীব হারাম করা হয়েছে' এর বাহ্যিক অর্থ সর্বপ্রকারের মৃত জীব নিষিদ্ধ হওয়ারই দাবি করে। অতএব যে বিষয়ে সকলেই একমত সেগুলো ছাড়া অন্য কোনটিকে এর আওতা থেকে বের করা যেতে পারে না। যা তার ধারক হত্যা করবে, আর যা তার বাইরে, তা আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দৃষ্টিতেই হারাম গণ্য করতে হবে।

এর জবাবে বলা যাবে, যেসব হাদীস সব কিছু মুবাহ্ বলে নির্ধারিত করে, তাই সেগুলোতে সাধারণ থেকে আলাদা করে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে। আয়াতের অর্থ সীমিতকরণে সকলের নিকটই এসব হাদীস ব্যবহৃত হয়েছে। আর এসব হাদীস তার কোন জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করেনি। অতএব তার মধ্য থেকে কোন একটি জিনিসকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায় না, আয়াতের ভিত্তিতে তার উপর আপত্তিও তোলা যেতে পারে না। কেননা সেসব হাদীস এ আয়াতের উপর ফায়সালাকারী এবং তার সাধারণত্বকে খতম করে বিশেষ অর্থে গ্রহণের নির্দেশ দানকারী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা পানিতে মরে ভেসে উঠা জীবকে অন্য সবের অপেক্ষা বেশী খারাপ মনে করি। তাই এ দিক দিয়ে পঙ্গপাল আমাদের মতে মাছের মত নয়। কেননা সমস্ত মৃত জীব থেকে মাছকে আলাদা করে নেয়ার ব্যাপারে যে সব হাদীস এসেছে, তার মুকাবিলায় অন্য বহু সংখ্যক হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে, যা তন্মধ্যে থেকে মরে ভেসে উঠা মাছকে আলাদা করে দিয়েছে। তাই আমরা এসব হাদীসকেই কাজে লাগিয়েছি এবং সাধারণ হুকুমের উপর বিশেষ হুকুম বানিয়ে দিয়েছি। যদিও আয়াতটি নিষেধ প্রকাশক হাদীসসমূহেরই সমর্থক। উপরন্তু আমরা ইমাম মালিক ও তাঁর অনুসারীদের আনুকূল্য ও সমর্থন পেয়েছি তন্মধ্য থেকে যা হত্যা করা হবে তার মুবাহ হওয়ার ব্যাপারে। তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, হত্যা না হলে তার ও মৃতের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কেননা হত্যা যবেহ নয়। যবেহ তো দুভাবে হয়। হয় তা থেকে প্রবহমান রক্ত বের হয়ে যাবে গলা ও রগগুলো সাধ্যমত কেটে দেয়ার ফলে । আর দ্বিতীয় হচ্ছে, যবেহ সম্ভব না হলে যেভাবেই হোক, রক্ত প্রবাহিত করতে হবে। যেমন শিকার করা জীব। আঘাত পৌঁছলেই তা স্বতঃই যবেহ হয়ে যায় না। সেজন্যে সেটিকে যখম ও আহত করা ও তার দেহ থেকে রক্ত প্রবাহিত করে দেয়া আবশ্যক। কিন্তু পঙ্গপালের দেহে প্রবহমান রক্ত নেই। তাকে হত্যা করা ও স্বাভাবিক

মৃত্যুবরণ অভিন্ন। যেমন যে জীবের প্রবহমান রক্ত রয়েছে তার রক্ত প্রবাহিত না করা ও তার স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ—উভয় অবস্থাই তার অ-যবেহকৃত হওয়ার দিক দিয়ে অভিন্ন। তেমনি পঙ্গপালের হত্যা ও তার স্বাভাবিক মৃত্যুর ব্যাপারও অভিন্ন। কেননা তার রক্ত-ই নেই, যা প্রবাহিত করা যেতে পারে।

যদি বলা হয়, মরে ভেসে উঠা মাছ এবং তার ধারকের দ্বারা তার হত্যা হওয়া কিংবা কোন দুর্ঘটনায় পড়ে তার মরে যাওয়া—এ দুই অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। তাহলে যে পঙ্গপাল মরে গেছে বা হত্যা করা হয়েছে এ দুটির মাঝে আমরা যে পার্থক্য করি, তা অস্বীকার করছ কেন ? এর জবাব দেয়া যাবে দুভাবে। একটি—মাছ সম্পর্কে এটা একটা 'কিয়াস' মাত্র, যা তার যবেহটা সহীহ্ হওয়াটা রক্ত প্রবাহিতকরণের ব্যাপারে কেউ যুক্তি হিসেবে পেশ করেনি, তবে আমরা এখানে 'কিয়াস' তরক করেছি। তার কারণ হচ্ছে সাহাবীগণের বর্ণিত মতামত। আর আমাদের মূলনীতি হল, সাহাবীগণের মতামত দ্বারা 'কিয়াস'কে বিশেষ অর্থে নির্দিষ্ট করা। কিন্তু পঙ্গপালের কোনটিকে মুবাহ বলা অন্য কোনটিকে বাদ দিয়ে, এ পর্যায়ে তোমার নিকট সাহাবীর কোন উক্তি নেই। এ কারণে সবকিছুর ব্যাপারে মুবাহ্ প্রমাণকারী হাদীসসমূহকেই কাজে লাগানো কর্তব্য হয়ে পড়েছে। আর দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, মাছের প্রবাহশীল রক্ত আছে। তাই তা যবেহ্ করা এক ধরনের হত্যা। কিন্তু যবেহের শর্তে তার রক্ত প্রবাহিত করার যুক্তি কেউই পেশ করেনি। কেননা মাছের রক্ত পবিত্র। মাছ তার রক্ত সহই (রান্না করে) খাওয়া যেতে পারে। এর কারণে তার এমন ঘটনায় মরে যাওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে, যা তাকে যবেহ করার বিকল্প হবে সেই সব ব্যাপারে যার যার প্রবহমান রক্ত রয়েছে। কিন্তু পঙ্গপালের এই দিকটি অনুপস্থিত। এ কারণে ও দুটি আলাদা আলাদা চিহ্নিত ও আলোচিত হয়েছে। হযরত ইবনে উমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ الجراد كله ذكى। পঙ্গপাল সবই যবেহ করা। উমর সুহায়ব ও মিকদা (রা) থেকে পঙ্গপাল খাওয়া মুবাহ বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে কোন দিক দিয়ে পার্থক্য করেন নি।

## ভ্রূণের যবেহ

আবূ বকর বলেছেন—উট, গাভী ইত্যাদি যবেহ করার পর তার গর্ভ থেকে মৃত ভ্রূণ বের হয়ে আসে, এই ভ্রূন খাওয়া জায়েয, কি জায়ে নয়—এ নিয়ে ইসলামী মনীষীদের বিভিন্ন মত পাওয়া গেছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেছেন, মৃত পাওয়া গেলে খাওয়া যাবে না। আর জীবিত পাওয়া গেলে সেটিকেও যবেহ করতে হবে। তবে খাওয়া হালাল হবে। হাম্মাদও তা-ই বলেছেন। আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, ইমাম শাফেয়ী প্রমুখ বলেছেন, ভ্রূণটি খাওয়া যাবে তা সচেতন থাক কি না-ই থাক। ইমাম সওরীর মতও তাই। হযরত আলী ও ইবনে উমর বলেছেন ঃ ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ মার যবেহ তার ভ্রূণের যবেহ।' (অর্থাৎ মাকে যখন যবেহ করা হয়েছে, তখন তার গর্ভের বাছুরেরও যবেহ হয়েছে—মনে করতে হবে। ভিন্নভাবে তাকে যবেহ করার প্রয়োজন হবে না)। ইমাম মালিক বলেছেন, গর্ভের বাচ্চাটি যদি পূর্ণাঙ্গ হয়ে থাকে, তার গায়ে পশম গজিয়ে থাকে,

তাহলে তা খাওয়া যাবে, অন্যথায় নয়। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব এই মতই প্রকাশ করেছেন। ইমাম আওজায়ী বলেছেন, ভ্রূণের সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ হলে তার মার যবেহই তার যবেহর জন্যে যথেষ্ট। আল্লাহ বলেছেন ঃ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ 'তোমাদের প্রতি মৃত প্রাণী ও রক্ত হারাম করা হয়েছে'; আর শেষে বলা হয়েছে ঃ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ। 'তবে যা তোমরা যবেহ করেছ, তা হারাম করা হয়নি, বরং তা হালাল', যেহেতু মৃত হারাম করার কথাটি নিঃশর্ত তা থেকেই আলাদা করা হয়েছে যা যবেহ্ করা হয়েছে তা, আর নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلذَّكَاةُ فِيْ الْمَقْدُوْرِ عَلَى ذَكَاتِهِ فِيْ النَّحْرِ وَاللَّبَّةِ وَفِيْ غَيْرِ الْمَقْدُوْرِ عَلَى ذَكَاتِهِ بِسَفْحِ دَمِهِ –

যেটিকে যবেহ্ করা সাধ্যায়ত্ত, তার যবেহ হচ্ছে গলায় ও মজ্জায়। আর যাকে যবেহ করা সাধ্যায়ত্ত নয়, তার রক্ত প্রবাহিতকরণই যবেহ।

রাসূলে করীম (স) বলেছেন اَنْهِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ 'রক্ত প্রবাহিত কর যার দ্বারাই তুমি চাও।' যে জন্তু খাদে পড়ে গেছে, তাকে বর্শা বা সূচ চালিয়ে রক্তপাত করা গেলে, তা খাবে অন্যথায় খাবে না। দেখা যাচ্ছে, যবেহর কাজটি এ দুটি পন্থায় বিভক্ত। আর আল্লাহ্র সাধারণ হুকুম হচ্ছে মৃত জীব হারাম হওয়ার। তা থেকে আলাদ করে নেয়া হয়েছে, যা যবেহ করা হয়েছে তা। সে যবেহ অবশ্য বর্ণিত পদ্ধতিতে হতে হবে। নবীর হাদীস থেকেই তা প্রমাণিত। যে ভ্রূণের এরূপ অবস্থা নয়, তা মার যবেহতেই হালাল হবে না, হারাম থাকবে। আয়াতের বাহ্যিক অর্থে তা-ই বোঝা যায়।

আবূ সাঈদ আল-খুদরী, আবুদ্দারদা, আবূ ইমামাতা, কাব ইবনে মালিক, ইবনে উমর, আবূ আইয়ূব ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ 'ভ্রূণের যবেহ তার মার যবেহতেই সম্পন্ন হয়েছে।' কিন্তু এসব সূত্রে যে সব হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে, তা হাদীসবিদদের নিকট নেহায়েত বাজে সনদ। সনদসমূহ পূর্ণভাবে উল্লেখ করা দীর্ঘতার ব্যাপার বলে তা করা পছন্দ করিনি। এ সব সনদের যেমন দুর্বলতা প্রকট, তেমনি হাদীসও 'মুজতরাব'— 'আউলানো-ঝাউলানো। কেননা মতের পার্থক্যের ক্ষেত্রে এসব হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কেননা হদীসের কথা ভ্রূণের যবেহ তার মার যবেহ। সম্ভবত বলতে চাওয়া হয়েছে, ভ্রূণের মা'র যবেহটাই তার নিজের যবেহ। এ-ও সম্ভাবনা আছে যে, তার মাকে যেমন যবেহ করা হয়েছে তাকেও তেমনি যবেহ করতে হবে। কাজেই ভ্রূণ যবেহ না করে খাওয়া যাবে না, এটাই সিদ্ধান্ত।

যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ –

এবং এমন জান্নাত যার দৈর্ঘ্য আসমান-জমিন।

এর অর্থ, আসমান-জমিন যত বড়, জান্নাতও তত বড়। যেমন একজন বলে ঃ 'আমার কথা তোমার কথা, আমার মত তোমার মত।' এর অর্থ হয়ত এই যে, আমার কথা

তোমার কথার মতই, আমার মত তোমার মতের মতই। আর ব্যবহৃত শব্দ যখন একাধিক অর্থ দেয়, তখন দুটি অর্থ একই সঙ্গে গ্রহণ করা যেতে পারে না। এরূপ করা নিষিদ্ধ। কেননা উক্ত হাদীসের একটি অর্থে ভ্রূণকে যবেহ করা কর্তব্য প্রমাণিত হয়। কেননা যবেহ না করে কোন জীব খাওয়াই যেতে পারে না। আর তার অপর অর্থে মার যবেহর দ্বারাই তা খাওয়া মুবাহ হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের মতে মার যবেহটাকে তার যবেহর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না বলে আয়াতটিকে আমরা সেই বিশেষ অর্থে নিতে পারি না। আমাদেরকে আয়াত অনুযায়ীই কথা বলতে হবে। কেননা 'খবরে ওয়াহিদ' দ্বারা আয়াতের সাধারণত্বকে ক্ষুণ্ন করে তা থেকে কিছু আলাদা করে তার জন্যে বিপরীত হুকুম প্রমাণ করা যায় না। বরং হাদীসটি থেকে এ কথারই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাঁর কথা হচ্ছে, ভ্রূণটিকেও যবেহ্ করতে হবে, যেমন যবেহ করা হয়েছে তার মাকে। এটাই সর্বসম্মত মত। কেননা জীবিত পাওয়া গেলে ভ্রূণটিকে যবেহ করা সর্বসম্মতভাবে ওয়াজিব। মাকে যবেহ করা হয়েছে বলে তাকে যবেহ করতে হবে না—একথা ঠিক নয়। হাদীস থেকেও এই বক্তব্যই পাওয়া যায়। কাজেই মাকে যবেহ করা হয়েছে বলে তার ভ্রূণের যবেহ তাতেই সম্পন্ন হয়েছে, একথা হতে পারে না। কেননা এ ব্যাপারটি পরস্পর বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। হাদীসটির একটি অর্থে ভ্রূণকে যবেহ করতে হবে আর অপর অর্থে যবেহ করতে হবে না—এ পরস্পর বিরোধী কথা।

কেউ যদি বলে, আমরা দুই অবস্থায় দুটি হুকুম আলাদা আলাদাভাবে গ্রহণ করব, তাতে তোমার আপত্তি কেন ? আর তা এ ভাবে যে, ভ্রূণ জীবিত পাওয়া গেলে তা যবেহ করা ওয়াজিব হবে। আর মৃত পাওয়া গেলে তার মার যবেহকেই যথেষ্ট মনে করা হবে, তাতে দোষ কি ?

জবাবে বলা হবে, বর্ণিত হাদীসে তো দুটি অবস্থার উল্লেখ নেই। এখানে শব্দ একটাই আর একটি শব্দের দুটি অর্থ এক সঙ্গে গ্রহণ করা সঙ্গত হতে পারে না। দুটির কোন একটি অর্থ গ্রহণ করার ইচ্ছা হলে একটি অক্ষর ك বাড়াতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয় অর্থে একটি অক্ষর বৃদ্ধি করার কোন অবকাশ নেই। আর একটি শব্দে কখনো একটি অক্ষর বাড়িয়ে ধরা হবে, আবার কখনো তা দূরে রাখা হবে, এটাই সঙ্গত হতে পারে কি রূপে ? কাজেই যারা একটি শব্দের দুটি অর্থ দুই অবস্থায় গ্রহণে ইচ্ছুক, তাদের মত বাতিল প্রমাণিত হয়ে গেল।

যদি বলা হয়, দুটি অর্থের একটি গ্রহণের ইচ্ছা হলে ك অক্ষর বাড়াতে হয়; কিন্তু দ্বিতীয় অর্থে তা বাড়াতে হয় না। অতএব যে অর্থে অক্ষর বাড়াতে হয় না, সেই অর্থ গ্রহণই উত্তম। কেননা বাড়তি অক্ষরটি যখন বাদ দেয়া হবে, তখন শব্দটি পরোক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক হবে। আর যদি তা বাদ দেয়া না হয়, তা হলে তা হবে প্রকৃত। আর শব্দটির প্রকৃত অর্থ গ্রহণ তার পরোক্ষ অর্থ গ্রহণের তুলনায় অনেক ভালো।

তাকে জবাব দেয়া হবে দুভাবে। একটি এই—ভ্রূণটির তার মা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও সেটিকে 'ভ্রূণ' বলা এদিক দিয়ে সঙ্গত হতে পারে যে, সেটি কিছুক্ষণ পূর্বেও তার

মার গর্ভে ভ্রূণ হয়েই ছিল। তার ভ্রূণ শেষ হয়েছে, খুব বেশি সময় হয়নি। কাজেই কেউ যদি বলে যে, ভ্রূণ যদি জীবিত বের হয়, তা হলে সেটিকে তার মা'র মতই যবেহ করা হবে, তা হলে তাকে এরূপ নামকরণ থেকে বিরত রাখা যায় না। এরূপ অবস্থায় মা'র গর্ভ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ও যবেহ হওয়ার পরও 'ভ্রূণ' নামেই অভিহিত হবে। হামল ইবনে মালিক বলেছেন, আমি আমার দুটি ক্রীতদাসীর মধ্যে পরিবেষ্টিত ছিলাম। তার একটি অপরটিকে মারধোর করল তাঁবুর খুঁটি দিয়ে। তখন সেটি একটি মৃত ভ্রূণ প্রসব করল। তখন নবী করীম (স) দাস বা দাসীর অসাবধানতার ফায়সালা দিলেন। এ কথাটিতেও গর্ভ থেকে বাইরে পতিত হওয়ার পরও 'ভ্রূণ' নামেই অভিহিত করা হয়েছে। আর তা যখন হয়, তখন নবী করীম (স)-এর ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ কথাটির তাৎপর্য এই হতে পারে যে, ভ্রূণের যবেহ তার মাকে যবেহ করার মতই করণীয়, যদি সেটি জীবিত নিক্ষিপ্ত হয়। আর দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, তাঁর কথার তাৎপর্য যদি এই হয় যে, ভ্রূণটির যবেহ কাজ যথারীতি হয়ে গেছে তার মা'র যবেহ দ্বারা, তাহলে মার যবেহকেই ভ্রূণের যবেহ মনে করতে হয়। তা যদি জীবিত বের হয় এবং তার মৃত্যু হয় বের হওয়ার পর, তা হলে তার উপর মৃতের হুকুম বহাল করা যাবে না, তার মার গর্ভে হওয়া মৃত্যুর মত হবে। ভ্রূণ জীবিত অবস্থায় মার গর্ভ থেকে বের হলে তার মার যবে হতে তার যবেহ সম্পন্ন হয়েছে, একথা মনে না করায় সকল ফিকাহ্‌বিদই সম্পূর্ণ একমত। এ থেকে প্রমাণিত হল মা'র যবেহটা ভ্রূণের যবেহরূপে গণ্য হতে পারে না মার সাথে তার মিলিত থাকা সত্ত্বেও।

যদি কেউ বলে, মার যবেহটা ভ্রূণের যবেহ ধরা হবে সেটি যদি মৃত অবস্থায় বের হয়। জবাবে বলা যাবে—এ কথা নবী করীম (স) উল্লেখ করেন নি। তাই তার ভ্রূণ অবস্থায় তার মৃত্যু হওয়া যদি শর্ত ধরা হয়, যদিও নবী করীম (স) তার উল্লেখ করেন নি, তা হলে সেটি জীবিত বের হোক, কি মৃত—উভয় অবস্থায়ই সেটি হালাল হওয়ার জন্যে তার যবেহ হওয়াটাকে শর্ত ধরতে পারি। তাই তার নিজের যবেহ না হওয়া পর্যন্ত তা খাওয়া জায়েয হবে না। আর আমরা যদি মূল ভ্রূণটির যবেহ শর্ত করি, তাহলে সে যবেহ তার মার ব্যাপারে গণ্য হবে না, বলিব তা হলে হাদীসটিকে সাধারণ ও নিঃশর্তভাবেই গ্রহণ করা হবে। এ অবস্থায় সেটি খাওয়া মুবাহ্ হবে তার ভ্রূণ অবস্থায় মার গর্ভ থেকে বের হওয়ার পর যবেহ কাজ সম্পন্ন হলে, আর হাদীসটিকে এই অর্থে গ্রহণ সর্বনামটা করা অতীব উত্তম সীমাবদ্ধ অর্থে গ্রহণের পরিবর্তে যেমন পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর তার জন্যে প্রমাণ করা হাদীসে উল্লিখিত হয়নি, তার কোন প্রমাণও নেই।'

কেউ যদি বলে, হাদীসটিকে ভ্রূণের বের হওয়ার পর তার যবেহ জরুরী প্রমাণে ব্যবহার করলে তার সমস্ত ফায়দাই শেষ হয়ে যায়। কেননা সে কথা তো আগেই জানা ছিল।

জবাবে বলা যাবে, ভ্রূণটি জীবিতাবস্থায় বের হলে তার যবেহ কর্তব্য, সেটি যবেহ করা যখন সম্ভব ছিল না। সেই অবস্থায় মরে গিয়ে থাকুক, কি বেঁচে থাকুক, উভয় অবস্থাই

সমান। এ থেকে তার কথা বাতিল হয়ে গেল, যে বলে যে, সেটি যবেহ্ করা সম্ভব ছিল না। এমন অবস্থায় মরে গিয়ে থাকলে তার মার যবেহ্‌কেই তার জন্যে যবেহ্ গণ্য করা হবে। বরং উক্ত কথায় সেটিকে যবেহ্ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। সেটি মৃত বের হলে খাওয়া যাবে না। কেননা সেটি যবেহ্ করা হয় নি। আর জীবিত বের হলে যবেহ্ করা হবে। বোঝা গেল, সেটি মৃত, খাওয়া যাবে না। সে ব্যক্তির কথাও বাতিল হয়ে গেল, যে বলে যে, সেটি মৃত বের হলে তখন সেটিকে যবেহ্ করার কোন প্রয়োজন নেই।

যাকারিয়া ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া আস্-সাজী বেনদার-ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ আত-তায়মী থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা দুজন বলেছেন—ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ, মুজালিদ, আবুল ওদাক, আবূ সাঈদ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স)-কে ভ্রূণ সম্পর্কে—যা মৃত বের হয়েছে—সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বললেন ঃ

اِنْ شِئْتُمْ فَكُلُوْهُ فَاِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ اُمِّهِ –

তোমরা ইচ্ছা করলে তা খেতে পার। কেননা সেটির যবেহ্ তার মার যবেহ্।

এর ভিত্তিতে যদি কেউ যুক্তি দেয়, তা হলে জবাবে বলা যাবে, এ হাদীসটি সিকাহ্ বর্ণনাকারীদের একটি জামা'আত ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা তাতে সেটির মৃতাবস্থায় বের হওয়ার কথা উল্লেখ করেন নি। অপর কতিপয় বর্ণনাকারী মুজালিদ থেকে হুশায়ম, আবূ উসামা ও ঈসা ইবনে ইউনুস প্রমুখও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা বলেন নি যে, ভ্রূণটি মৃতাবস্থায় বের হয়েছে (তখন এই করা হবে)। তাঁরা বলেছেন, রাসূলে করীম (স)-কে গাভী বা ছাগী বা উষ্ট্রীর গর্ভে অবস্থিত ভ্রূণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ তোমরা তা খাও। কেননা তার যবেহ্ তার মা'র যবেহ্।

এই হাদীসটি আবূ লায়লা ও আতীয়াতা, আবূ সাঈদ সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স) থেকে যারাই হাদীস বর্ণনা করেছেন—যেমন উদ্ধৃত হয়েছে—সকলেই একই কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের একজনও একথার উল্লেখ করেননি যে, ভ্রূণটি মৃতাবস্থায় বের হলে তার এই হুকুম। এ কথাটি কেবলমাত্র সাজীর বর্ণনায় এসেছে। তাতে স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ হয় যে, এ শব্দটি তাঁরই বানানো। কেননা তা সংরক্ষিত নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامْ –

তোমাদের জন্যে ঘরে পালা চতুষ্পদ জন্তু খাওয়া হালাল করা হয়েছে।

এ পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, তা ভ্রূণসমূহ। অর্থাৎ ভ্রূণ হালাল হওয়ার কথা এতে বলা হয়েছে। এর ভিত্তিতে যদি কেউ সকল প্রকারের ভ্রূণই হালাল বলতে চায় ? আমরা জবাবে বলব, ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এটা চতুষ্পদ জন্তু সম্পর্কিত কথা। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ। 'সেই সব বাদে যা একটু পরেই

তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে' বলে শূকর-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। হাসান থেকেও বর্ণিত হয়েছে যে, গৃহপালিত পশু হচ্ছে ছাগল, উট-গাভী—এ কথা সব জন্তু প্রসঙ্গে হওয়াই উত্তম। তা কেবল ভ্রূণ বোঝায়, অন্য কিছু নয়, তা বলা ঠিক নয়। কেননা এই বিশেষীকরণের কোন দলীল নেই। উপরন্তু তার অর্থ যদি ভ্রূণসমূহ হয়, তাহলে তা মুবাহ হবে কেবল যবেহর মাধ্যমে, যেমন করে সব জন্তুই যবেহর দ্বারা মুবাহ্ হয়ে থাকে। আর যেমন করে জীবিত ভ্রূণ মুবাহ হয় যাবেহ করা হলে। আরও বিবেচনার বিষয়, আল্লাহ্র কথা ঃ

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَايُتْلَى عَلَيْكُمْ -

তোমাদের জন্যে গৃহপালিত ধরনের পশু হালাল করা হয়েছে, তবে তা নয়, যার কথা পরে তোমাদেরকে বলা হবে।

এর অর্থ যদি হয় শীগ্গীরই তোমাদেরকে ভবিষ্যতে জানানো হবে, যা বর্তমানে তোমাদের জন্যে হারাম। এ এক অস্পষ্ট কথা। একে দলীল হিসেবে পেশ করা যায় না। এ কথাটি এই রকম ঃ কতক জন্তু হালাল, কতক জন্তু হারাম—নিষিদ্ধ। কিন্তু সে জন্তুগুলো কি, তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। ফলে এই সাধারণ ঘোষণাকে কোন বিশেষ অর্থে গ্রহণ করা সঠিক হতে পারে না।

কেউ যদি বলেন, ভ্রূণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত যদি তা-ই হয়, যা মা'র সম্পর্কে, তাহলে যদি কেউ কোন মেয়েলোকের পেটের উপর আঘাত হানে, তাতে যদি সে মরে যায় এবং একটি মৃত ভ্রূণ প্রসব হয়ে যায়, তাহলে তার জন্যে স্বতন্ত্র কোন হুকুম তো হবে না। অনুরূপভাবে ভ্রূণ যদি মাতৃগর্ভে মরে যায়, মার মৃত্যুর কারণে, তা হলে সেই একই হুকুম হবে। আর সন্তান যদি জীবিতাবস্থায় বের হয় এবং তার পরে মরে যায়, তবে তার জন্যে স্বতন্ত্রভাবে হুকুম হবে। তার মা'র হুকুম তার উপর বর্তিবে না। পশুর ভ্রূণও সেই রকম। মা'র মৃত্যুর কারণে তার গর্ভস্থ ভ্রূণও যদি মরে যায় এবং মৃত অবস্থায় বের হয়ে আসে, তবে খাওয়া যাবে। আর জীবিতাবস্থায় বের হলে তা যবেহ না করা পর্যন্ত খাওয়া যাবে না।

জবাব দেয়া হবে, এ একটা অমূলক ধারণা। কেননা অপর একটা হুকুমের উপর ভিত্তি করে একটা বিষয়ের হুকুমের ধারণা করা হচ্ছে। দুটি বিষয়কে একই হুকুমে একত্রিত করে কিয়াস করা হলে তা সহীহ্ হবে, যদি এমন 'ইল্লাত' বা কারণকে ভিত্তি করা হয়, যা একটিকে অপরটির উপর স্থাপন করবে। দুটি ভিন্ন ভিন্ন হুকুমে একটি বিষয়কে অপর একটি বিষয়ের উপর কিয়াস করা হয়, তাহলে তা কিয়াস হবে না। আমরা জেনেছি, যে বিষয়টি দেখা হয়েছে, তার হুকুম হল—ভ্রূণটি যদি মা থেকে তার মৃত্যুর পর জীবিতাবস্থায় বিচ্ছিন্ন হয়, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মার যবেহকে ভ্রূণের যবেহ প্রমাণ করা এক অবস্থায় এবং অপর এক অবস্থায় তা না করা। তাহলে এরূপ অবস্থায় এটিকে অপরটির উপর রেখে কিয়াস করা যাবে কেমন করে ? তা সত্ত্বেও ছাগী বা অন্য কিছুর পেটে যদি আঘাত করা হয়, ফলে মৃত ভ্রূণ

প্রসব করে তাহলে ভ্রাণের জন্যে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না, আঘাতকারী তার মূল্য দিতেও বাধ্য হয় না। তাকে মা'র ক্ষতিপূরণই দিতে হয়, যদি তার কোন ক্ষতি সাধিত হয়। পালিত পশুর ভ্রূণের বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর কোন হুকুম মা'র জীবনের ক্ষেত্রে ধার্য হয় না। আর তা মেয়ে লোকটির ভ্রূণের জন্যেও প্রমাণিত হয়, তাহলে পশুকে কি করে মানুষের উপর রেখে ধারণা করা যেতে পারে! যা উল্লেখ করেছি, সেই মূল বিষয়েই দুটির হুকুমে মতপার্থক্য রয়েছে।

যদি বলা হয়, ভ্রূণটি মার সাথে যুক্ত থাকা অবস্থায় যদি মা'র একটি অঙ্গ ধরা হয়, তাহলে মা'র যবেহকে সেই অঙ্গেরও যবেহ মনে করতে হবে (কোন অঙ্গের আলাদা যবেহর কোন প্রশ্ন হয় না,) তাহলে মা'র যবেহতেই ভ্রূণটির হালাল হওয়া উচিত।

জবাবে বলা হবে, ভ্রূণ তার মার একটি অঙ্গ—একথা মনে করা সঙ্গত নয়, কেননা সেটির মা'র জীবনেই জীবিত বের হওয়া সম্ভব, আবার কখনো তার মৃত্যুর পরও বের হওয়া সম্ভব। কিন্তু কোন অঙ্গই তার আসল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তা জীবিত—এ হুকুম প্রমাণ করা যায় না। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, ভ্রূণ তা জীবিতাবস্থায়ও মা'র অধীন নয়, তার মৃত্যুর পরও নয়।

যদি বলা হয়, যবেহর ব্যাপারে ভ্রূণ তার মার অনুসারী হবে, এটাই স্বাভাবিক। যেমন গোলামী থেকে আযাদকরণে সন্তান মা'র অধীন ও অনুসারী বিবেচিত হয়। মুক্তির জন্যে সন্তান হওয়া বা অন্য কোন চুক্তি সীমাবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রেও তাই।

জবাবে বলা হবে, একথা সেই দিক দিয়ে ভুল, যেখানে আমরা আগেই বলেছি যে, একটির হুকুমের উপর অপর একটি হুকুমকে কিয়াস করা যায় না—তা নিষিদ্ধ। অপর দিক দিয়ে তা অসঙ্গত যে, দাসীকে আযাদ করে দেয়া হবে, আর তারই সন্তানকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে দাস বানিয়ে রাখা হবে। কেননা ওসব হুকুমে সন্তান মা'র অধীনই হয়ে থাকে। আর আলোচ্য ক্ষেত্রে যেহেতু মাকে যবেহ করা হলে তার সন্তান জীবিত বের হতে পারে, তাহলে মার যবেহতে তার যবেহ হয়ে যাবে না। এ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, ভ্রূণ যবেহর দিক দিয়ে মা'র অধীন হবে না। কেননা ভ্রূণ যদি মা'র অনুসারী ও অধীন হয় যবেহর দিক দিয়ে, তাহলে মার যবেহ হওয়ার পর তার নিজের যবেহ সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন হয় না।

তবে ইমাম মালিক এ ক্ষেত্রে সেই মতই গ্রহণ করেছেন, যা সুলায়মান, আবূ ইমরান তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তা হল, নবী করীম (স) ফায়সালা দিয়েছেন যে, পশুর ভ্রূণের যবেহ তার মার মত যবেহ হবে যদি তা চেতনাসম্পন্ন অবস্থায় বের হয়। জুহরী ইবনে কাব ইবনে মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স)-এর সাহাবীগণ বলতেন, ভ্রূণ সচেতন বা গায়ে পশম সম্পন্ন হলে তার মার যবেহই তারও যবেহ গণ্য হবে। আলী ও ইবনে উমর (রা) থেকেও এরূপ কথাই বর্ণিত হয়েছে।

এ পর্যায়ে বলা যাবে যে, এ হাদীসটিতে চেতনা বা পশমের উল্লেখ আছে। কিন্তু অপরাপর হাদীসে—যা অধিক সহীহ্—একথাটি অস্পষ্ট। তা জাবির, আবূ সাঈদ, আবুদ

দারদা, আবূ ইমামাতা প্রমুখ কর্তৃক বর্ণিত। তাতে চেতনা বা পশম হওয়ার কোন শর্তের উল্লেখ নেই। তাহলে এসব হাদীস অভিন্ন ধরা হবে না কেন ? কেননা এসব হাদীস তো সেসব হাদীসকে অস্বীকার করে না, যাতে এই পশম বা চেতনার উল্লেখ আছে। আসলে এই উভয় ধরনের হাদীসই একটি হুকুমকেই অপরিহার্য করে তোলে। একটিতে সেই হুকুমের বিশেষীকরণ রয়েছে অন্যান্য হাদীসকে অস্বীকার না করেও। আর অপরাপর হাদীসে কথাটি অস্পষ্ট এবং সাধারণ, ব্যাপকভিত্তিক। আর আমরা যখন সকলেই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, পশম বা চেতনা না হলে মার যবেহটা ভ্রূণের যবেহরূপে গণ্য হবে না, সেটির যবেহ স্বতন্ত্রভাবে হতে হবে, এই অবস্থায় তা মা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তার অঙ্গের মতই হওয়ার অতি নিকটবর্তী। চেতনা বা পশম হলে তার হুকুম নিজস্বভাবে হওয়া আবশ্যক। তখন হাদীসটির অর্থ হবে এই ঃ মা'র যবেহটা হলে তাকেও যবেহ করতে হবে, যেমন করে তার মাকে যবেহ করা হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ীর সঙ্গী-সাথীদেরকে বলা যাবে, ইমাম শাফেয়ীর কথা হচ্ছে ঃ চেতনা বা পশম হলে মার যবেহ তার যবেহ হয়ে যাবে—এ কথাটি মা'র যবেহকে নাস্তি করে দেয় যখন তা চেতনা সম্পন্ন হবে না। তাহলে অস্পষ্ট হাদীসসমূহকে কেন বিশেষীকরণের আওতায় নিয়ে আসা হবে না ? এই ধরনের দলীল কি আপনাদের মতে সাধারণকে বিশেষী করণের জন্যে যথেষ্ট ? না, তার চাইতেও উত্তম ?

ইমাম শাফেয়ীর মতের বিপরীত দলীল হল নবী করীম (স)-এর এ কথাটি, যাতে তিনি বলেছেন ঃ আমাদের জন্যে দুটি মৃত ও দুটি রক্ত হালাল করা হয়েছে। এই হাদীসের দলীল তাঁর নিকট দাবি করে সমস্ত মৃত জীবকেই হারাম গণ্য করা ওদুটি ছাড়া। তাই রাসূলের কথা ঃ ভ্রূণের যবেহ তার মার যবেহটির অর্থ এ হাদীস অনুযায়ী গ্রহণ করাই বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায়।

## মৃতের চামড়া পাকা করার পর তা ব্যবহার করা

আল্লাহ্র কথা ঃ

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ –

তোমাদের জন্যে মৃত ও রক্ত হারাম করে দেয়া হয়েছে।

তিনি বলেছেন ঃ

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْدَمًا –

বল, আমার নিকট যে ওহী নাযিল করা হয়েছে, তাতে কোন খাদ্য গ্রহণকারীর জন্যে কিছু খাওয়া হারাম করা হয়নি শুধু মৃত বা রক্ত ব্যতীত।

আয়াতদ্বয়ের দাবি হচ্ছে সর্বপ্রকারের মৃতকে হারাম মনে করতে হবে, তার দেহের

অংশ তার চামড়াও এই হারামের আওতাভুক্ত। 'কেননা তার মধ্যে যে জীবন ছিল তার পরিবর্তে এখন মৃত্যু তাকে গ্রাস করেছে।' 'কোন খাদ্য গ্রহণকারীর খাওয়া' কথাটি প্রমাণ করে যে, এ হারামকরণ কথাটি শুধু খাওয়ার দিক দিয়ে মাত্র খাওয়া হারাম। খাওয়া ছাড়া অন্য কাজে লাগানো হারাম নয়। পাকাকরণ (Tanning)-এর পর মৃত জন্তুর চামড়া ব্যবহার পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) এই কথাই বলেছেন। তাঁর কথা হল ঃ

اِنَّمَا حَرَّمَ اَكْلُهَا وَاِنَّمَا حَرِّمَ لَحْمُهَا –

তা খাওয়া হারাম, হারাম মৃত জন্তুর গোশ্‌ত।

পাকাকরণের পর মৃত জন্তুর চামড়া সম্পর্কে হুকুম কি, সে বিষয়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা এবং তাঁর সঙ্গীগণ, হাসান ইবনে সালিহ্‌, সুফিয়ান সওরী, আবদুল্লাহ্‌ ইবনুল হাসান আল-আকবরী, আওজায়ী, শাফেয়ী বলেছেন, সে চামড়া পাকা করণের পর বিক্রয় করা জায়েয, তা কোন-না-কোন কাজে লাগিয়ে তা থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, কুকুর ও শূকরের চামড়া এ পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু আমাদের হানাফী ফিকাহবিদগণ কুকুর ইত্যাদি চামড়ার মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। বলেছেন, বিশেষভাবে শূকরের চামড়া ছাড়া আর সব জন্তুর চামড়াই পাকাকরণের দ্বারা পবিত্র করা যায়। ইমাম মালিক বলেছেন—মৃত জন্তুর চামড়ার উপর বসে ফায়দা পাওয়া অন্য কথায় এভাবে তা ব্যবহার করা যেতে পারে। বড় বড় ফুটাওয়ালা লম্বা চালনি বানানো ও সেভাবে তা ব্যবহার করা যায়। তবে তা বিক্রয় করা যায় না, তার উপর নামাযও পড়া যায় না।

ইমাম লাইস ইবনে সাদ বলেছেন, মৃত জন্তুর চামড়া পাকাকরণের আগেও বিক্রয় করা যায়, যদি বলে দেয়া হয় যে, এটা মৃত জন্তুর চামড়া । যারা এই চামড়াকে পবিত্র বলেন, বলেন তা পরিচ্ছন্ন, তাদের দলীল হচ্ছে রাসূলে করীম (স) থেকে বিভিন্ন শব্দে ও বিভিন্ন সূত্রের মুতাওয়াতির বর্ণনায় বর্ণিত হাদীস, যার প্রত্যেকটি দ্বারা তার পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা প্রমাণিত হয়। একটি হাদীস হযরত ইবনে আব্বাসের। বলেছেন ঃ

اَيُّمَا اَهَابَ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ –

পাকাকরণ দ্বারা প্রস্তুত করা হলে যে কোন চামড়াই পবিত্র হবে।

হাসান উনজুন ইবনে কাতাদা, সালমা ইবনুল মুহবিক সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তাবুক যুদ্ধে নবী করীম (স) একটি ঘরে উপস্থিত হল। তার আঙ্গিনার নিকটে ঝুলানো একটি মশক ছিল। তাঁকে বলা হল, এটা মরা জন্তুর চামড়া। রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ

ذَكَاةُ الْاَدِيْمِ دِبَاغَتُهُ –

চামড়ার পবিত্রতা হচ্ছে তাকে পাকাকরণ (Tanning)।

সাঈদ ইবনুল মুয়াইয়্যিব যায়দ ইবনে সাবিত থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

دِبَاغُ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ طُهُوْرُهَا –

মৃত জন্তুর চামড়ার পাকাকরণই তার পবিত্রতা।

সামাক ইকরামা সওদা বিনতে জাম'আতার এই কথাটি বর্ণনা করেছেন—তিনি বলেছেন—আমাদের একটি ছাগী ছিল। পরে সেটি মরে যায়। আমরা সেটি দূরে ফেলে দিলাম। তখন নবী করীম (স) এসে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমাদের ছাগীটিকে কি করলে? বললাম, দূরে ফেলে দিয়েছি। তখন নবী করীম (স) কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ –

বল, আমার প্রতি যে ওহী নাযিল হয়, তাতে কোন খাদ্য গ্রহণকারীর পক্ষে খাওয়া হারাম কিছুই পাইনি মৃত ও রক্ত ছাড়া।

তোমরা তো সেটির চামড়া প্রস্তুত ও পাকা করে উপকৃত হতে পারতে। তখন আমরা সেটির জন্যে লোক পাঠালাম ও তার ছামড়া চাড়ালাম, সেটিকে পাকা করলাম, সেটিকে পানি বহনের পাত্র বানালাম, তাতে রেখে পানি পান করলাম। শেষ পর্যন্ত সেটি কুশ্রী হয়ে গেল। উম্মে সালমা (রা) বলেছেন, নবী করীম (স) পড়ে থাকা একটি মৃত ছাগী দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, এর মালিকের কি হয়েছে? তারা তো এর চামড়া পাকা করে উপকৃত হতে পারত। জুহরী, উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ, ইবনে আব্বাস, মায়মুনা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন—রাসূলে করীম (স) তাদের একটি মৃত ছাগী দেখতে পেলেন। বললেন ঃ তারা কেন এর চামড়া পরিপক্ক করল না? তাহলে ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারত। তখন তারা বলল, হে রাসূল! ওটা তো মরা। বললেন, মরা জীব খাওয়াই শুধু হারাম (তার অন্যান্য অংশ কাজে ব্যবহার করা হারাম নয়)। এই ধরনের বহু সংখ্যক হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তার সব কয়টিতেই মৃত জন্তুর চামড়া পাকিয়ে পাক করে ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। সেই সব হাদীস দীর্ঘতার ভয়ে এখানে উদ্ধৃত করলাম না।

এসব হাদীসের সব কয়টিই 'মুতাওয়াতির' নির্ভুল ও সন্দেহমুক্ত জ্ঞান দেয় এবং তদানুযায়ী আমল করা ওয়াজিব প্রমাণ করে। উদ্ধৃত আয়াত সম্পর্কে এটা সিদ্ধান্ত দেয় দুভাবে। একটি—এ হাদীসসমূহ বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাই তা কোন ভুল ধারণা বা মিথ্যার উপর এই ঐক্যবদ্ধতা কল্পনাতীত। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, ফিকাহবিদগণ তা সমানভাবে ও নিঃসন্দেহে গ্রহণ করেছেন এবং তাদের মত গ্রহণে তাকে ভিত্তিরূপে ব্যবহার করেছেন। সেসব হাদীস গৃহীত ও ব্যবহৃত হওয়া প্রমাণিত, মৃত জীব হারাম ঘোষণাকারী আয়াত সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও। তাই আয়াতটির তাৎপর্য হচ্ছে, মরা জন্তুর চামড়া পরিপক্ক করার পূর্ব পর্যন্তই তা হারাম। তাছাড়া শুধু খাওয়াই যে হারাম তার বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে করেছি। عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ আয়াতাংশের ভিত্তিতে শুধু-খাওয়াই হারাম, চামড়া পরিপক্ক করার পর তো তা খাওয়ার আওতার বাইরে চলে যায়। অতএব তা হারামের আওতায় পড়ে না।

এতদসত্ত্বেও এসব হাদীসের উৎপত্তিই হয়েছে আয়াতে মৃত জন্তু হারাম ঘোষিত হওয়ার পর। তা যদি না হতো, তাহলে মৃত ছাগীর ব্যাপারে লোকেরা সংশয়ে পড়ে যেত। তাহলে তারা বলত না যে, ওটা মৃত। নবী করীম (স)-কেও বলতে হতো না যে, হারাম হচ্ছে শুধু খাওয়া। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, মৃত জন্তুর হারাম ঘোষণা এসব হাদীসের উৎপত্তিরও আগের ব্যাপার। এসব হাদীস ব্যাখ্যাকারী আয়াতটির এ দিক দিয়ে যে, পরিপক্ককরণের পর চামড়া সম্পর্কে উদ্ধৃত আয়াতে কিছু বলা হয়নি।

ইমাম মালিক আমাদের সাথে একমত এ ব্যাপারে যে, চামড়া পরিপক্ক করার পর তা ব্যবহার করে উপকৃত হওয়া যায়। উদ্ধৃত হাদীসসমূহে পবিত্রকরণের পর তা ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। তা বিছানা হিসেবে বিছানো, তার উপর নামায পড়ার মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। তা বিক্রয় করা যাবে, তা বিছিয়ে নামায পড়া যাবে। বরং সব হাসীসেরই বক্তব্য হচ্ছে, তাকে পরিপক্ককরণই তার পবিত্রতা। আর তা যখন পবিত্র, তখন তার উপর নামায পড়ায় কোন মতদ্বৈততার অবকাশ থাকতে পারে না। সমস্ত চামড়া সম্পর্কেই একই কথা। লক্ষণীয়, চামড়া পরিপক্ককরণের পূর্ব পর্যন্ত তা হারামের আওতায় থাকে। তখন তার কোনরূপ ব্যবহার-ই হালাল নয়। যেমন তার গোশত কোন কাজে লাগানো যেতে পারে না। পরিপক্ককরণের পর তা মৃত জীবের হারাম হওয়ার আওতা-বহির্ভূত হওয়ার ব্যাপারে আমরা সকলেই যখন একমত, তখন প্রমাণিত হল যে, তা পবিত্র ও পাক মৌলিকভাবে, এ-ও প্রমাণিত যে, তা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করাই শুধু হারাম। আর তা যখন খাওয়ার সীমার বাইরে পড়ে গেল, তখন তা কাপড় বা কাষ্ঠের মত দোষমুক্ত হয়ে গেল। ইমাম মালিকের আমাদের সাথে এই ঐকমত্য প্রমাণ করে যে, মৃত জন্তু পশম ও চুল ব্যবহার করাও জায়েয। কেননা তা শুধু খাওয়া নিষিদ্ধ, অন্য ব্যবহার নিষিদ্ধ নয়। চামড়া পরিপক্ক করার পরও পশম বা চুল চামড়ার সাথে থাকে। অতএব চামড়া যখন ব্যবহার করা যাচ্ছে, তখন তার পশমও ব্যবহার করা যাবে।

যদি কেউ বলেন, চুল ও পশম ব্যবহার করাই শুধু জায়েয। কেননা তা জীবিত থাকা অবস্থায়ও গ্রহণ করা ও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

জবাবে বলা যাবে, তার মুবাহ হওয়ার 'ইল্লাত' পশম ও চুল ব্যবহার নিষেধ করে না। অর্থাৎ যে কারণে চামড়া ব্যবহার জায়েয, সেই কারণে চুল ও পশম ব্যবহারও জায়েয। তা হলে মুবাহ্ হওয়ার দুটি 'ইল্লাত' হয়। একটি যার কারণে তা খাওয়া যায় না। আর দ্বিতীয়টি, তার জীবিত থাকা অবস্থায় তা গ্রহণ করা হলে তবে তা ব্যবহার করে ফায়দা পাওয়া। এ দুটি কর্তব্যের নিয়ামক একই এবং অভিন্ন। আর এই 'ইল্লাত' যখন আমরা নির্দিষ্ট করলাম, তখন চামড়াকে তার উপর কিয়াস করা কর্তব্য। আর যদি অন্য কোন 'ইল্লাত' নির্ধারিত হয়, তা হলে হুকুমটা ভিন্ন হবে।

আল-হাকাম আবদুর রহমান ইবনে আবূ লায়লা, আবদুল্লাহ্ ইবনে উকাইম থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, রাসূলে করীম (স) লিখে পাঠানো এক পত্র আমাদেরকে পড়ে শোনান হয়েছে। তাতে লেখা ছিল ঃ 'তোমরা মৃত জন্তুর চামড়া প্রস্তুতকরণ এবং তার

হাড় দ্বারা উপকার গ্রহণ করবে না।' এ দলীলের ভিত্তিতে কেউ কেউ মৃত জন্তুর চামড়া পরিপক্ককরণের পরও নিষিদ্ধ হওয়ার মত প্রমাণ করতে চেয়েছে। অথচ তা মুবাহ প্রমাণকারী হাদীসমূহের এই হাদীসটি দ্বারা বিরোধিতা বা মুকাবিলা করা সঙ্গত হতে পারে না। তার কয়েকটি কারণ রয়েছে। একটি হচ্ছে, আমরা ইতিপূর্বে যে সব হাদীস উদ্ধৃত করেছি, তা 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের, তা নিশ্চিত ইল্‌ম দেয়। আর আবদুল্লাহ্ ইবনে উকাইম বর্ণিত হাদীসটি 'খবরে ওয়াহিদ' হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। আসিম ইবনে আলী কায়স ইবনে রুবাই, হুবাইব ইবনে আবূ সাবিত, আবদুর রহমান ইবনে আবূ লায়লা, আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম থেকে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) আমাদের নিকট লিখে পাঠিয়েছেন, তোমরা মৃতু জন্তু থেকে কোনভাবেই উপকৃত হবে না, তাকে প্রস্তুত করে কিংবা কোন অস্থি দ্বারা। এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, উমর উবনুল খাত্তাব তাদের প্রতি এই কথা লিখে পাঠিয়েছেন। অতএব এই ধরনের হাদীস দ্বারা আমাদের পূর্বোদ্ধৃত হাদীসসমূহের মুকাবিলা করা কোনক্রমেই সঙ্গত হতে পারে না। অন্য একটি দিক দিয়ে বলা যায়, এই উভয় হাদীস যদি সমান মানে বর্ণিত হয়ে থাকত, তবুও মুবাহ প্রমাণকারী হাদীস অতীব উত্তম বিবেচিত হতো। কেননা মানুষ তা ব্যবহার করছে। আর ফিকাহবিদগণ তা কবুলও করেছেন। আর একটি কারণ হচ্ছে—আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম বর্ণিত হাদীস যদি আমাদের উপরোদ্ধৃত হাদীস সমূহ থেকে আলাদা হয়ে যায়, তা হলে তাতে পরিপক্ককরণের পর চামড়ার ব্যবহার হারাম হওয়ার কোন কারণই আর অবশিষ্ট থাকে না। কেননা তাতে বলা হয়েছে, মৃত জন্তুর চামড়া প্রস্তুত করে এবং অস্থি কোন উপকারী কাজে ব্যবহার করবে না। এটা পরিপক্ককরণ পূর্বের অবস্থা সম্পর্কিত কথা। যা পরিপক্ক করা হয়েছে তাকে اهَاب বলা হয় না। তখন বলা হয় 'আকিম' Leather বা চামড়া। তা হলে এ হাদীসে পরিপক্ক চামড়া হারাম হওয়ার কিছুই নেই। লাইস ইবনে সাদ মৃত জন্তুর চামড়া পরিপক্ক করার পূর্বে বিক্রয় করা.পর্যায়ে যা বলেছেন, তা ফিকাহবিদদের ঐকমত্যের সম্পূর্ণ বাইরের ব্যাপার। কেউই সে কথার সমর্থন করেন নি। তা সত্ত্বেও তা রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটির পরিপন্থী ঃ

لَاتَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِاِهَابٍ وَلَاعَصَبٍ -

কেননা এই কথাটি পরিপক্ককরণের পূর্বাবস্থার সাথে—চামড়া যখন কাচা থাকে—সংশ্লিষ্ট। সেই অবস্থায়ই اهَاب বলা হয়। আর বিক্রয় করা চামড়া থেকে ফায়দা লাভের একটা বিরাট দিক। তাও নিষিদ্ধ মনে করতে হয় রাসূলের এই কথাটির কারণে।

আবূ বকর বলেছেন, কেউ যদি বলে যে, রাসূলে করীম (স)-এর কথা ঃ

اِنَّمَا حُرِّمَ مِنَ الْمَيْتَةِ اَكْلُهَا -

মৃত জীব শুধু খাওয়াই হারাম ঘোষিত হয়েছে।

এ থেকে প্রমাণিত হয়, চামড়া শুধু খাওয়াই হারাম, বিক্রয় করা নয়। তা হলে তো তার গোশত বিক্রয় করা হালাল হয়ে যায়। কেননা হাদীসের কথা শুধু খাওয়া হারাম,

খাওয়া ছাড়া অন্য কিছু বা অন্য কোনভাবে ব্যবহার করা হারাম নয়। তা সত্ত্বেও 'মৃত জীবের গোশত খাওয়া হারাম' এই কথা সত্ত্বেও গোশত বিক্রয় করা যদি হারাম হয়ে থাকে, তা হলে পরিপক্ক করার পূর্বে চামড়া সম্পর্কেও সেই সিদ্ধান্তই হবে। যদি কেউ বলে, গোশত বিক্রয় করাও হারাম হয়েছে খাওয়া হারাম হওয়ার দরুন। জবাবে বলা যাবে, আমরা চামড়া বিক্রয় নিষিদ্ধ করব রাসূলের এই কথার ভিত্তিতে ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ -

তোমাদের উপর মৃত জীব হারাম করা হয়েছে।

এই হাদীসে চামড়া ও গোশতের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নি। এই সমস্তটা থেকে বিশেষীকরণের আওতায় আসে শুধু পরিপক্ক করার মাধ্যমে। অন্য কোনভাবে নয়। নবী করীম (স) থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَبَاعُوْهَا وَاَكَلُوْا اَثْمَانَهَا -

আল্লাহ্ ইয়াহূদীদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। তাদের উপর চর্বি হারাম করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তা বিক্রয় করে তার মূল্য খেয়েছিল।

আর চামড়াও যখন পরিপক্ককরণের পূর্বাবস্থায় খাওয়া হারাম, যেমন গোশত হারাম, তখন তা বিক্রয় করা জায়েয না হওয়াই আবশ্যক, যেমন গোশত বিক্রয় করা হারাম। যেমন অন্যান্য সমস্ত হারাম জিনিস বিক্রয় করা—যেমন মদ্য, রক্ত প্রভৃতি হারাম। আর কুকুরের চামড়া যদি পরিপক্ক করা হয়, তা হলে তা পবিত্র হতে পারে মৃত কুকুরের চামড়া হলেও কেননা নবী করীম (স)-এর কথা ঃ

اَيُّمَا اِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ -

যে কোন কাঁচা চামড়া পাকা করা হলে তা পাক ও পবিত্র হয়ে যায়।

বলেছেন ঃ

دِبَاغُ الْاَدِيْمِ ذَكَاتُهُ -

চামড়া পরিপক্ককরণ-ই তার পবিত্রতা।

এ সব কথায় কুকুরের চামড়া ও অন্যান্য জন্তুর চামড়ার মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। আর এজন্যে যে, তা যবেহ করে তার চামড়া পরিপক্ক করা হলে আমাদের মতে তা পবিত্র হয়ে যায়।

যদি বলা হয়, জীবদ্দশায় যদি নাপাক হয়, তাহলে শুধু পরিপক্ককরণের দ্বারা তা পাক ও পবিত্র হবে কি করে ? জবাবে বলা যাবে, তা পবিত্র হবে, যেমন করে মৃত জন্তুর চামড়া পবিত্র হয়, যদিও তা নাপাক। কেননা পরিপক্ককরণই তার পবিত্রতা। যেমন যবেহ্। অবশ্য শূকর কোন অবস্থায়ই পবিত্র হতে পারে না। কেননা তার মূল ও সবটাই

হারাম। ঠিক মদ্য যেমন, রক্ত যেমন, তাতে পবিত্রকরণের কোন কাজ হতে পারে না। তার জীবদ্দশায়ও তা থেকে কোনরূপ উপকৃত হওয়া বা ফায়দা লাভ করা জায়েয হয় না। কুকুর দ্বারা তার জীবদ্দশায়ও ফায়দা গ্রহণ করা জায়েয। কেননা তা মৌলিকভাবে হারাম নয়।

## মরা জন্তুর চর্বি ব্যবহার হারাম

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَلَدَّمُ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ –

নিশ্চিতভাবে তোমাদের প্রতি হারাম করেছেন মৃত জন্তু রক্ত ও শূকরের গোশত।

বলেছেন ঃ

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً –

বল, আমার নিকট যে ওহী নাযিল হয় তাতে কোন খাদ্য গ্রহণকারীর খাওয়া হারাম এমন কিছুই পাই না। তবে যদি মৃত হয় ....

এ দুটি আয়াত এক সাথে মৃত জীবের চর্বি বা তেল নিষিদ্ধ করে দিয়েছে, যেমন করে এ সবের গোশত ও অন্যান্য সমস্ত অংশ নিষিদ্ধ।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আতা জাবির সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন—রাসূলে করীম (স) যখন মদীনা উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর নিকট ক্রুশধারী-(গোশত থেকে চর্বি নিষ্কাশনকারী) লোকেরা উপস্থিত হল। তারা বলল ঃ হে রাসূল! আমরা তো এ সব চর্বি একত্র করি মৃত জন্তুর গোশত থেকে, তার কর্দমাক্ততা থেকে। তা চামড়ায় ও নৌকায় ব্যবহৃত হয়। জবাবে রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ

قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَبَاعُوْهَا وَاَكَلُوْا اَثْمَانَهَا –

আল্লাহ তো ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তাদের প্রতি চর্বি হারাম করা হয়েছিল। কিন্তু তারা তা বিক্রয় করে তার মূল্য খেয়েছিল।

অতঃপর নবী করীম (স) তাদেরকে সে কাজ করতে নিষেধ করে দিলেন।

এ ভাবে নবী করীম (স) জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ্‌র চর্বি হারামকরণ সাধারণ ও নিঃশর্তভাবে হয়েছে। ফলে তা বিক্রয় করাও হারাম হয়ে গেছে। যেমন তা খাওয়া হারাম ঘোষিত। ইবনে জুরাইজ আতা সূত্রে বর্ণনা এসেছে যে, মৃত জন্তুর চর্বি দ্বারা নৌকার পিঠ মর্দন করা হয়। এই কথাটি বিরল। তার হারাম হওয়া পর্যায়ে সাহাবীর কথাও এসেছে। আর উদ্ধৃত আয়াত দ্বয়ের বাহ্যিক অর্থ থেকেও তা-ই প্রমাণিত হয়।

## চর্বি-মাখনের মধ্যে ইঁদুর মরলে

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ -

তোমাদের প্রতি মৃত জীব হারাম করা হয়েছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ -

তোমাদের প্রতি মৃত জীব হারাম করা হয়েছে।

এসব আয়াতে তরল প্রবহমান জিনিসের মধ্যে পড়ে যা মরে, তা হারাম হওয়ার কোন দাবি দেখা যায় না। শুধু মূল মৃত জীবটাই হারাম হওয়ার দাবি প্রকট। আর যা মৃতের পারিপার্শ্বিক, তা-ও হারাম। তাকে মৃত বলা যায় না। তাই তা হারামের আওতার মধ্যে পড়ে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা খাওয়া হারাম নবী করীম (স)-এর সুন্নাতের ভিত্তিতে। সুন্নাত বা হাদীসটি জুহরী বর্ণনা করেছেন সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, আবূ হুরায়রা সূত্রে। তিনি বলেছেন, নবী করীম (স)-কে চর্বি বা তেলের মধ্যে পড়া ইঁদুর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেছেন, যদি তা জমাট বাঁধা অবস্থায় থাকে, গলে গিয়ে না থাকে, তা হলে তা এবং তার আশ-পাশের জমাট বাঁধা চর্বি বা তেল ফেলে দাও। আর যদি তা তরল ও প্রবহমান হয়, তাহলে তার কাছেও যাবে না।

আবূ সাঈদ খুদরী নবী করীম (স) থেকে অনুরূপ কথাই বর্ণনা করেছেন। জুহরী উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস-মায়মুনা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একটি ইঁদুর চর্বির মধ্যে পড়েছিল ও মরে গিয়েছিল। তখন নবী করীম (স) বললেন, সেটি এবং সেটির আশ-পাশ ফেলে দাও। তার পরে যা থাকবে তা খাও।

আবদুল জব্বার ইবনে উমর ইবনে শিহাব—সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, তিনি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট ছিলেন। সেখানে এক ব্যক্তি তাঁকে তৈলে পড়া ইঁদুর সম্পর্কে জিজ্ঞাস করল। রাসূল (স) জিজ্ঞাসা করলেন, তা জমাট বাঁধা কিনা ? বলল, হ্যাঁ। তখন বললেন, 'ইদুর ও তার আশ-পাশ থেকে তৈল বাইরে ফেলে দাও। তার পরে যা থাকে তাই খাও।' তারা বলল, হে রাসূল, চর্বি তো তরল ও প্রবহমান। তখন তিনি বললেন, তাহলে তা অন্যভাবে ব্যবহার কর; কিন্তু খাবে না।

নবী করীম (স) সে চর্বি খাওয়া ছাড়া অন্যভাবে তা ব্যবহার করে উপকৃত হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। এর ফলে তা বিক্রয় করা জায়েয প্রমাণিত হয়। কেননা তা দিয়ে উপকৃত হওয়ার অনেকগুলো দিকের মধ্যে বিক্রয় করাও একটি দিক। তার মধ্যে কোন একটি দিককে রাসূলে করীম (স) নির্দিষ্ট করে দেননি।

ইবনে উমর, আবূ সাঈদ খুদরী, আবূ মূসা আল-আশ'আরী ও হাসান—প্রাচীন ফিকাহবিদদের মধ্যে এই কয়জন তা খাওয়া ছাড়া অন্য যে-কোন ভাবে ব্যবহার ও তা

থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয বলে ঘোষণা করেছেন। আবূ মূসা বলেছেন ঃ 'তোমরা তা বিক্রয় করে দাও। তা লোকদের খাওয়াবে না'। কোন একজন ফিকাহ্বিদও তদ্দারা উপকৃত হওয়া নিষিদ্ধ মনে করেন বলে আমাদের জানা নেই। তা থেকে উপকৃত হওয়া যায় তা প্রদীপে জ্বালিয়ে আলো লাভ করে এবং তদ্দারা চামড়া পরিপক্ক করে। আমাদের ফিকাহবিদদের মতে তা বিক্রয় করা জায়েয। তবে বিক্রয়ের সময় তার দোষটা বলে দিতে হবে। ইমাম শাফেয়ীর মত হিসেবে বলা হয়েছে, তা বিক্রয় করা জায়েয নয়, তবে তা জ্বালিয়ে আলো গ্রহণ জায়েয। ইবনে উমর নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীসে কোনরূপ বিশেষীকরণ ব্যতীতই তা থেকে ফায়দা গ্রহণ সাধারণভাবেই জায়েয। কোন দিক দিয়ে জায়েয ও কোন দিক দিয়ে জায়েয নয়—এমনটা নয়। তা থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, শুধু খাওয়াই হারাম, অন্যভাবে তা থেকে উপকৃত হওয়া হারাম নয়। তা বিক্রয় করাও জায়েয। যেমন করে ফায়দা গ্রহণ করা জায়েয এমন সমস্ত জিনিসই বিক্রয় করা জায়েয। যেমন গাধা ও খচ্চর। কেননা এসব জন্তু বিক্রয় নিষিদ্ধ করার কোন অধিকার স্বীকৃত নয়। কেননা এগুলো মৌলিকভাবে হারাম নয়।

যদি বলা হয়, উম্মে ওয়ালাদ—যে ক্রীতদাসীর গর্ভে সন্তান হয়েছে এবং যে ক্রীতদাসীর সাথে কাজের বিনিময়ে মুক্তি দেয়ার চুক্তি হয়েছে—এ দুজন থেকেও উপকৃত হওয়া জায়েয; কিন্তু অদের বিক্রয় করা জায়েয নয়, তাহলে ?

জবাবে বলা যাবে, এখানে আমরা যে বিষয়ের আলোচনা করছি, তোমার এ প্রশ্ন সে বিষয়ের আওতায় পড়ে না। কেননা আমরা তো একটা অর্থ নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। প্রমাণ করেছি, যা থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয, তা বিক্রয় করা নিষেধ করার কারো অধিকার নেই। তা খাওয়া হারাম বলে তা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ নয়। কেননা খাওয়া ছাড়া অন্যভাবে তা থেকে উপকৃত হওয়া সম্পূর্ণ জায়েয। তার বিক্রয় নিষিদ্ধ করা অধিকার কারো নেই। কিন্তু মুদাব্বির ও উম্মে ওয়ালাদ—যে দুই ধরনের ক্রীতদাস সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, ওদের ন্যায্য হক হচ্ছে দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাওয়া, আযাদ হওয়া। তাদের বিক্রয় করা জায়েয হলে তাদের এই মানবিক অধিকার অপহৃত হয়ে যায়। এই কারণে তাদের বিক্রয় করা নিষিদ্ধ, যদিও তাদের দ্বারা উপকৃত হওয়ার সব পথই উন্মুক্ত। কিন্তু এটা মৃত জন্তুর তেল-এর মত নয় ফিকাহবিদদের মতে। কেননা এটা তো মৌলিকভাবেই হারাম। যেমন তার গোশত থেকে যে কোনভাবে উপকৃত হওয়াও হারাম। ইঁদুর যে তরল জিনিসের মধ্যে পড়ে মরেছে, তা নিজস্ব ও মূলগতভাবে হারাম নয়, তা খাওয়া হারাম এজন্যে যে, তা একটা মৃত জীবের পাশে ছিল। খাওয়া ছাড়া তা থেকে উপকৃত হওয়ার যত দিক রয়েছে, তা সবই হালাল নিঃশর্তভাবে। তবে খাওয়া যাবে না। তাই তা বিক্রয় করা গাধা খচ্চর কুকুর বিক্রয়ের মতই ব্যাপার। এ সবের দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়েয, যদিও তা খাওয়া জায়েয নয়। যেমন ক্রীতাদাসদের বিক্রয় করা জায়েয, যেমন তাদের থেকে সর্বতভাবে উপকৃত হওয়াও জায়েয। নবী করীম (স) ইঁদুরটা ফেলে দিতে বলেছেন, আর তার চারপাশে জমাট বাঁধা চর্বি ও তেলও ফেলে দিতে বলেছেন। তার দুটি অর্থ, একটি—যা মূলতই নাপাক, তা তার চতুষ্পার্শ্ব-প্রতিবেশও নাপাক করে দেয়। তাই মরা

ইঁদুরের চারপাশও নাপাক, মনে করতে হবে। আর যা তার প্রতিবেশকে নাপাক করে, তার প্রতিবেশ কিন্তু তার চারপাশকে নাপাক করে না। এ কারণে মরা ইঁদুরের চারপাশ না-পাক বলা হলেও সেই চারপাশের প্রতিবেশকে না-পাক বলা হয়নি। তা না হলে পাত্রের সমস্ত চর্বি ও তেলকেই নাপাক বলতে হয়। কেননা তার প্রতিটি অংশই তার প্রতিবেশী। একটি মৌলনীতি। তা সুন্নাত থেকে প্রমাণিত। আর তার প্রতিটিই প্রমাণ করে যে, নাজাসাত বা নাপাকির কয়েকটা স্তর রয়েছে, তা হচ্ছে নাজাসাতে বালীশাহ্—কঠিনভাবে নাপাক আর নাজাসাতে খলীফা—হালকা নাপাক। তা মর্যাদার দিক দিয়ে সমান নয়। এ কারণে খলীফা ও গলীনার দলীল অনুযায়ী কোনটিতে এক দিরহাম পরিমাণের বেশি ও কোনটিতে অনেক বেশি পরিমাণ গণ্য করতে হবে।

## যে পাত্রে পাখী পড়ে মরে যায়

আবূ জাফর আত-তাহাভী বলেছেন, আমি আবূ হাযিম আল-কাযীকে সুয়ায়দ ইবনে সাঈদ আলী ইবনে মশহুর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি (আবূ হাযিম) বলেছেন, আমি ইমাম আবূ হানীফার নিকট বসা ছিলাম। সেখানে ইবনুল মুবারক একজন খুরাসানীর সুরত-শিকল সহ উপস্থি হল। পরে তিনি ইমামকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, সে একটি বড় ডেগ চুলার আগুনের উপর বসাল, তাতে গোশত রাখা ছিল। একটি পাখী উড়ে তাতে পতিত হল ও মরে গেল। এরূপ অবস্থায় শরীয়াতের নির্দেশ কি ? ইমাম আবূ হানীফা তাঁর সঙ্গীদের বললেন ঃ এ ব্যাপারে তোমরা কি মনে কর ? তাঁরা তাঁকে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত একটি মত শোনালেন। তাহলে সে গোশত ধুয়ে খাওয়া যাবে। শুরুয়া ঢেলে ফেলতে হবে। তখন ইমাম আবূ হানীফাও এ কথাই সমর্থন করলেন। কিন্তু আমাদের মতে তাতে একটি শর্ত আছে—পাখীটি যদি এমন অবস্থায় পড়ে যখন ডেগের গোশত শান্ত হয়ে পড়ে আছে—যেমন উক্ত বর্ণনায় বলা হয়েছে—তবে উক্ত হুকুম। কিন্তু পাখি যদি এমন অবস্থায় পড়ে যখন তা ওলট-পালট খাচ্ছিল, তাহলে সে গোশত ও শুরুয়া কিছুই খাওয়া যাবে না। ইবনুল মুবারক তাঁকে বললেন ঃ তা কেন ? বললেন, কেননা গোশতের ওলট-পালট খাওয়া অবস্থায় যদি পাখিটি পড়ে ও মরে যায়, তাহলে একটা মরা জীব হালাল গোশতের সাথে মিশে গেল। আর যদি ডেগের গোশত শান্ত থাকা অবস্থায় পড়ে ও মরে যায়, তাহলে একটা মৃত জীব হালাল গোশতকে ময়লাযুক্ত করে দিল মাত্র। তখন ইবনুল মুবারক বললেন, এটা স্বর্ণখচিত কথা।

ইবনুল মুবারক উবাদ ইবনে রাশেদ, হাসান সূত্রে ও ইমাম আবূ হানীফার জবাবের মতই বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা উল্লেখ করেছেন, ডেগের গোশত ওলট-পালট খাওয়া অবস্থায় পড়া ও তার শান্ত থাকা অবস্থায় পড়ার মধ্যে পার্থক্যের 'ইল্লাত' হচ্ছে সুস্পষ্ট পার্থক্য। ইবনে অহব ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন গোশত ভরা ডেগের মুরগী পড়া সম্পর্কে। তা পাকানর কারণে যদি ডেগের মধ্যে পড়ে মরে যায়, তাহলে সে ডেগের গোশত খাওয়া যায় বলে মনে করি না। কেননা তাতে একটি মৃত জীব পড়ে

মিশে একাকার হয়ে গেছে। ইমাম আওজায়ী বলেছেন, ডেগের গোশত ধুয়ে ফেলতে হবে, তার পর খাওয়া যাবে। লাইস ইবনে সাদ বলেছেন, সে গোশত খাওয়া যাবে না। তবে বারবার ধুতে ও আগুনের তাপে উত্তপ্ত করতে হবে, যেন তাতে যতটা মিশেছে, তা সব দূর হয়ে যায়, তার পরই খাওয়া যাবে।

ইবনুল মুবারক উসমান ইবনে আবদুল্লাহ্ আল-বাহিলী থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, ইকরামা ইবনে আব্বাস থেকে এমন একটা পাখি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, যা ডেগের মধ্যে পড়েছে ও মরে গেছে। বলা হল সব শুরুয়া ফেলে দিতে হবে এবং তার গোশত খাওয়া যাবে। এ বর্ণনায় গোশতের ওলট-পালট অবস্থার উল্লেখ নেই। মুহাম্মাদ ইবনে সওবান সায়েব ইবনে খাব্বার থেকে বর্ণনা করেছেন, তার একটা ডেগ চুলার উপর বসান ছিল। হঠাৎ করে তার উপর একটি মুরগী পড়ল, মরে গেল এবং গোশতের সঙ্গে রান্না হয়ে গেল। তখন আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কি করা যাবে? বললেন ঃ মৃত মুরগীটা বাইরে নিক্ষেপ কর, তার শুরুয়া বাইরে ফেলে দাও এবং গোশত খাও। আর যদি তোমার খেতে ঘৃণা হয়, তাহলে তার থেকে এটা বা দুটা অংশ আমার নিকট পাঠিয়ে দিও। এ হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, ডেগের গোশতের ওলট-পালট খেতে থাকা অবস্থার কোন বিশেষত্ব নেই। কেননা হতে পারে তা ওলট-পালট খাওয়া থেমে যাওয়ার পর তাতে মুরগীটি পড়েছে, আর শুরুয়া তখন উত্তপ্ত হওয়ার কারণে মুরগীটিও রান্না হয়ে গেছে।

## মৃত জন্তুর দম্বল ও দুগ্ধ

ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন ঃ মৃত জীবের দুগ্ধ ও ঘ্রাণ পাক, সে দুটিকে নাপাক বলা যায় না। আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ ও সওরী বলেছেন, মৃত জন্তুর দুগ্ধ মাকরূহ। কেননা তা নাপাক পাত্রে রয়েছে। তার দম্বল যদি তরল প্রবহমান হয় এবং হয় জমাটবাঁধা, তাহলে তাতে কোন দোষ নেই। তাঁরা সকলেই মৃত মুরগীর আন্ডা সম্পর্কে বলেছেন—তাতেও কোন দোষ নেই। মালিক, আবদুল্লাহ্ ইবনে হাসান ও শাফেয়ী বলেছেন, মৃতের স্তনে থাকা দুধ হালাল নয়। লাইস ইবনে সাদ বলেছেন, মৃত মুরগীর পেট থেকে যে ডিম বের হয়, তা খাওয়া যাবে না। আবদুল্লাহ্ ইবনুল হাসান বলেছেন, এ ব্যাপারে কোন সুবিধাদান আমি অপছন্দ করি।

আবূ বকর বলেছেন, মৃতের দুগ্ধকে মৃত্যু হুকুমের অধীন বানানো ঠিক হবে না। কেননা দুগ্ধের জীবন বা মৃত্যুর কোন প্রশ্ন উঠে না। বোঝা যায়, মৃত জীবিত থাকা অবস্থায় তা তার থেকে নিয়ে নিতে হবে, তাহলে তা খাওয়া যাবে। যদি তার মৃত্যু ঘটে থাকে, তা হলে তা খাওয়া হালাল হবে না মূলকে যবেহ করা ব্যতীত। যেমন ছাগীর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। উপরন্তু আল্লাহ্‌র কথা ঃ

نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ -

চতুষ্পদ জন্তুর পেট থেকে গোবর ও রক্তের মাঝ থেকে আমরা একটি জিনিস তোমাদেরকে পান করাই, তা হল খাঁটি দুগ্ধ, যা পানকারীদের জন্যে খুবই উপাদেয় ও পিপাসা নিবারক।

আল্লাহ্‌র এই কথা সর্ব প্রকারের দুগ্ধে প্রযোজ্য। সর্ব প্রকারের দুগ্ধ সম্পর্কেই একথা সত্য। ফলে দুই জিনিস আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। একটি হচ্ছে—দুগ্ধ কখনই মরে না। ছাগীর মৃত্যুতে তার স্তনের দুগ্ধ হারাম হয়ে যায় না। আর দ্বিতীয় হচ্ছে—ছাগীর মৃত্যুতে সে দুগ্ধ নাপাক হয়ে যায় না। কোন মৃতের পাত্রে রক্ষিত দুগ্ধের মতও হয়ে যায় না তা।

যদি বলা হয়, এই দুধ ও জীবিত ছাগীর স্তন থেকে দোহন করে নাপাক পাত্রে রাখা দুগ্ধের, আর যে দুগ্ধ স্তনে রয়েছে তার মধ্যে পার্থক্য কি?

জবাবে বলা যাবে, এ দুগ্ধসমূহের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, সৃষ্টির স্থান নাপাক করে না, যা তার চারপাশে রয়েছে, তা স্বাভাবিকভাবেই হয়েছে। এর প্রমাণ, রগ-রিশ রক্তের প্রতিবেশি হওয়া সত্ত্বেও গোশত খাওয়া পর্যায়ে সব মুসলমানের ঐকমত্য। তাকে পাক করা হয়নি, ধৌতও করা হয়নি। তা থেকে প্রমাণিত হল—সৃষ্টির স্থানে যা সৃষ্টি করা হয়েছে তার প্রতিবেশী হওয়ার কারণে নাপাক হয়ে যায় না। আর দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'গোবর ও রক্তের মাঝ দিয়ে খাঁটি দুগ্ধ, যা পানকারীদের জন্যে পিপাসা নিবৃত্তকারী,' এ কথাটি দুদিক দিয়ে আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণ করে। একটি —আলোচনার শুরুতে আমরা আগেই যা বলেছি, জীবন্ত জীবের দুধ ও মৃত জীবের দুধ প্রসঙ্গে আর দ্বিতীয়, আল্লাহ এই খবর দিয়েছেন যে, তা গোবর ও রক্তের মাঝ দিয়ে বের হয়ে আসে। আর এই গোবর ও রক্ত নাপাক। অথচ দুধ পরম পবিত্র। তা গোবর রক্তের প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও তার নাপাক হওয়ার কারণ ঘটেনি। কেননা দুধ তো সেখানেই সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে মৃতের স্তনে ছিল বলেই তার নাপাক হওয়ার কারণ দেখা দেয়নি। তা একথাও প্রমাণ করে, যা শরীক জাবির-ই করাম ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, নবী করীম (স) তায়েফ যুদ্ধে পনির নিয়ে এলেন। তা লাঠি দিয়ে কুড়িয়ে তুলতেন। জিজ্ঞাসা করলেন, এ জিনিস কোথায় বানানো হয়? লোকেরা বলল, পারস্য দেশে। বললেন, তোমরা বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে তারপর খাও। অথচ এটা জানা কথা যে, পারসিক অগ্নিপূজকদের যবেহকৃত জন্তু মৃত জন্তুবৎ। রাসূলে করীম (স) তা খাওয়া মুবাহ করেছেন, একথা জানা সত্ত্বেও যে, তা পারসিকদের তৈরী করা জিনিস। সেকালে তারা অগ্নিপূজক ছিল। তারা পনির বানাত দম্বল দিয়ে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, মৃত জীবের দম্বল পবিত্র। কাসিম ইবনুল হাকিম, তালিব ইবনে আবদুল্লাহ, আতা ইবনে আবূ বিরাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মায়মূনা—রাসূলে করীম (স)-এর বেগম—বলেছেন ঃ আমি নবী করীম (স)-কে পনির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখন তিনি বলেছিলেন, চাকু চালাও, বিসমিল্লাহ্ বল এবং খাও। এ হাদীসেও রাসূলে করীম (স) এসব খাওয়া মুবাহ বলে ঘোষণা করেছেন এবং কোন্‌টা মৃত জীবের দম্বল থেকে বানানো হয়েছে ও কোন্‌টা অন্য কিছু থেকে, এ ধরনের কোন পার্থক্য তার মধ্যে করেননি। হযরত আলী, উমর, সালমান, আয়েশা, ইবনে উমর, তালহা ইবনে

উবায়দুল্লাহ, উম্মে সালমা, হাসান ইবনে আলী (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম (রা) মৃত জীবের দম্বল দিয়ে বানানো পনির খাওয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, দম্বল পবিত্র, তা মৃত জীব থেকে নেয়া হলেও। তা যদি পবিত্র হয়, তা হলে তা থেকে মৃতের দুধ ও দম্বল সবই পবিত্র বলে প্রমাণিত হল। এই দৃষ্টিতে মৃত মুরগীর পেট থেকে বের হওয়া ডিমও পবিত্র ও খাওয়া যেতে পারে বলে প্রমাণিত হয়। কেননা তা জীবিত মুরগীর পেট থেকে বের হওয়া ডিমের মতই পবিত্র, তা খাওয়া জায়েয যেমন, মৃত্যুর পরও তেমন। তাকে যদি ভিন্নভাবে পবিত্রকরণের প্রয়োজন হতো, তা হলে তা খাওয়া মুবাহ ঘোষিত হতো না। তার মূল পবিত্র, যেমন পবিত্র তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। কেননা তাকে পবিত্রকরণ শর্ত হলে, তার মূল পবিত্রকরণ ছাড়া সম্ভব হতো না।

## মৃত জীবের চুল, পশম, হিংস্র জন্তুর চামড়া ও লোম

ইমাম আবূ হানীফা,আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফার, মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ্ উবায়দুল্লাহ ইবনুল হাসান বলেছেন, মৃত জন্তুর হাড় ব্যবহার করে উপকৃত হওয়া জায়েয। আর মৃত জন্তুর চুল, পশম বা লোম ব্যবহারে কোন দোষ নেই। তা মৃত নয়। কেননা তা জীবের জীবিতকালেও আলাদা করে নেয়া হয়। লাইস বলেছেন, মৃত জন্তুর নার্ভ-শিরা ও স্নায়ু ব্যবহার করে উপকৃত হওয়া যাবে না। তার পায়ের গোড়ালিও ব্যবহার করা যাবে না। তবে তার শিং, পায়ের ক্ষুর ইত্যাদি ব্যবহার করে উকৃত হওয়া কোন দোষ দেখতে পাই না। মৃত জন্তুর হাড়, চুল, পশম ও লোমেরও কোন দোষ নেই।

আদুল বাকী ইবনে কানে, ইসমাইল ইবনুল ফজল, সুলায়মান ইবনে আবদুর রহমান দামিশকী, ইউসুফ ইবনুশ শাকর, আওজায়ী, ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবূ কাসীর, আবূ সালমা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ আমি উম্মে সালমা (রা)-কে বলতে শুনেছি; আমি নবী করীম (স)-কে বলতে শুনেছি, মৃত জন্তুর নাভি পরিপক্ক করা হলে এবং তার পশম, লোম, চুল ও শিং পানি দিয়ে ধুয়ে নিলে তা ব্যবহার করায় কোন দোষ নেই।

আবদুল বাকী ইবনে কানে ইসমাইল ইবনুল ফজল, হাসান ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে সালামাতা, ইবনে আবূ লায়লা, সাবিতুল বানানী, আবদুর রহমান ইবনে আবূ লায়লা, আবূ লায়লা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ লায়লা নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি পশুচর্মের উপর ও পশুচর্মে নির্মিত বিশেষ ধরনের পোশাক পরে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। জবাবে বললেন, তোমরা যদি তা পরিপক্ক করে নাও, তাহলে কোন দোষ থাকবে না।

ইয়াহইয়া আল হুমানী, সায়ফ ইবনে হারুন, আল বরজমী, সুলায়মান, তীমী, আবূ উসমান নহদী, সালমান আল ফারিসী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স)-কে পশুচর্ম, পনির ও মাখন চর্বি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন—হালাল তাই, যা আল্লাহ কুরআনে হালাল বলেছেন এবং হারাম তাই, যা আল্লাহ কুরআনে হারাম বলেছেন। আর যে বিষয়ে কুরআনে কিছুই বলা হয় নি, মনে করতে হবে যে, সে জিনিসের গুনাহ তিনি মাফ করেছেন (অর্থাৎ তাতে গুনাহ নেই)।

আবূ বকর বলেছেন, এসব হাদীস অনুযায়ী চুল, পশম, পশুচর্ম ও পনির ইত্যাদি মুবাহ। তার দুটি দিক। একটি, যা উম্মে সালমা বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে আমরা বলেছি যে, মৃত জন্তুর চুল, পশম ইত্যাদি মুবাহ। আর ইবনে আবূ লায়লা বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী পশুচর্ম, পশুচর্ম নির্মিত সংকীর্ণ হাতার জামা ইত্যাদি মুবাহ। আর দ্বিতীয় তাই, যা সালমান বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে। আর তা থেকে এ সব মুবাহ প্রমাণিত হয় দুটি দিক দিয়ে। একটি—যদি তা হারাম হতো, নবী করীম (স) অবশ্যই তা হারাম হওয়ার জবাব দিতেন। আর দ্বিতীয়—যা হারাম বা হালাল কোন পর্যায়ে উল্লিখিত হয়নি, তা মুবাহ। রাসূলে করীম (স) তাই বলেছেন যে, যে বিষয়ে চুপ থাকা হয়েছে, কিছুই বলা হয়নি, তা ক্ষমা। কিন্তু কুরআনে চুল, পশম, লোম ইত্যাদি হারাম বলা হয়নি; বরং কুরআন থেকেই তা মুবাহ প্রমাণিত হয়। সে প্রমাণকারী আয়াত হচ্ছে ঃ

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ - (النحل : ٥)

তিনি জীব-জন্তু সৃষ্টি করেছেন। তাতে তোমাদের জন্যে পোশাকও রয়েছে। আরও নানাবিধ অন্যান্য ফায়দাও ...

دِفْءٌ পশুর পশম, লোম, চুল ইত্যাদি দিয়ে যে পোশাক বানানো হয়। এ থেকে মৃত ও জীবিত পশুর সব কিছু থেকে ফায়দা গ্রহণ মুবাহ প্রমাণিত হয়।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ - (النحل : ٨٠)

তিনি জন্তু-জানোয়ারের পশম, চুল ও লোম দ্বারা তোমাদের জন্যে পরবার ও ব্যবহার করার অসংখ্যা জিনিস পয়দা করেছেন একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্তকার জন্যে।

এ আয়াতে যবেহ কৃত ও মৃত জন্তুর মধ্যে মুবাহ্ হওয়ার দিক দিয়ে কোনরূপ পার্থক্য বা তারমত্য করা হয়নি। মৃত জন্তুর এসব জিনিসকে যারা নিষিদ্ধ বলেন, তাদের দলীল হচ্ছে ঃ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ 'তোমাদের প্রতি মৃত জীব-জন্তু হারাম করা হয়েছে।' এতে মৃত জীব-জন্তুর সব অঙ্গ ও অংশই শামিল রয়েছে। পশম, লোম, চুল, অস্থি ইত্যাদি মৃত জন্তুর অংশ বলে আয়াতে সেই সবকেও হারাম করেছে।

এর জবাবে বলা যাবে, এ আয়াতে মৃত জন্তু এবং তার সমস্ত অংশ ও অঙ্গ খাওয়া নিষিদ্ধ হয়েছে। অপর আয়াতও তাই প্রমাণ করে ঃ

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ -

বল, আমার প্রতি যে ওহী নাযিল হয়েছে তাতে কোন খাদ্য গ্রহণকারীর জন্যে খাওয়া নিষিদ্ধ হারাম আমি পাচ্ছি না ....

এ আয়াত স্পষ্ট ঘোষণা দিচ্ছে—মৃত জীব শুধু খাওয়া—খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করাই হারাম, অন্যভাবে ব্যবহার করা হারাম নয়। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

إِنَّمَا حُرِّمَ مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمُهَا –

মৃতের গোশত খাওয়াই শুধু হারাম।

অপর হাদীসে বলা হয়েছে إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا। মৃত জীব শুধু খাওয়াই হারাম করা হয়েছে। আল্লাহ যে মৃত জীব হারাম করেছেন, তাতে নিহিত আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য রাসূলে করীম (স)-ই স্পষ্ট ও ব্যাখ্যা করেছেন। আর পশম, লোম, অস্থি প্রভৃতি তো খাদ্য বস্তু নয়। অতএব তা নিষেধ ও হারামকরণের আওতায় পড়ে না। আর এই কারণে আমরা পরিপক্ককৃত চামড়াকে বিশেষীকরণের মাধ্যমে মুবাহরূপে চিহ্নিত করেছি এই পর্যায়ে আসা হাদীসসমূহের ভিত্তিতে। কেননা এসব হাদীস থেকে বিশেষভাবে চুল, পশম ও লোম, আর যা খাদ্যবস্তু হিসেবে গণ্য নয়, তা হারামকৃত দ্রব্য সমষ্টি থেকে আলাদা করে মুবাহ সাব্যস্ত করেছি। সে হাদীসসমূহ আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। অপর দিক দিয়েও তা-ই প্রমাণিত হয়। তা হল মৃত জীবের চামড়া পরিপক্ককরনের মাধ্যমে খাদ্যবস্তুর আওতার বাইরে পড়েছে ও মুবাহ্ প্রমাণিত হয়েছে, তখন চুল, পশম, লোম ইত্যাদি যা খাদ্যবস্তুর তালিকায় পড়ে না, তার সমস্তই মুবাহ্ হয়ে যাবে। তা ছাড়া যেসব হাদীসে মৃত জীবের চামড়া মুবাহ্ হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তাতে চুল, পশম, লোম ইত্যাদি উল্লিখিত হয়নি। বরং সাধারণভাবে তা সবই মুবাহ্ গণ্য হয়। অতএব সেসব জিনিস ব্যবহার করে ফায়দা গ্রহণ অবশ্যই মুবাহ্ হবে। চুল ও পশম এর মধ্যে গণ্য। এই চুল ও পশম যদি হারামই হতো তাহলে নবী করীম (স) তা অবশ্যই বলতেন। কেননা এটা তাঁর অজানা ছিল না যে, চামড়া জীব-জন্তুর দেহের অংশ এবং ওর নিজস্ব কোন জীবন নেই। আর যার বা যে জিনিসের নিজস্ব কোন জীবন নেই, তার মৃত্যুরও কোন প্রশ্ন উঠে না।

চুল, পশম, লোম ইত্যাদি নিজস্ব কোন জীবন নেই—এর বড় প্রমাণ হল, জীবন্ত পশুর গাত্র থেকে এগুলো কাটা হলে পশুটি কোন ব্যথা পায় না। যদি ওগুলোর নিজস্ব জীবন থাকত, তাহলে তা কাটার সময় জন্তুটি অবশ্যই ব্যথা অনুভব করত। যেমন অন্যান্য যে কোন অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ কাটলে ব্যথা পায়। প্রমাণিত হল যে, চুল, পশম, লোম, অস্থি, শিং, ক্ষুর ও পাগাড় ইত্যাদির কোন জীবন নেই। আর জীবন না থাকলে তার মৃত্যু হওয়ার কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না, তাতে বৃদ্ধি পাওয়ার—বাড়ার ও বড় হওয়ার (growth) যে ভাবধারা লক্ষ্য করা যায়, তা সেগুলোর নিজস্ব জীবনের প্রমাণ করে না। কেননা বৃক্ষ ও উদ্ভিদও বাড়ে, অথচ ওদেরও তো জীবন (জীবের জীবন) নেই। ওদের মৃত্যু হয় বলা যায় না।[১] জীব-জন্তুর পশম, লোম ও চুলের ব্যাপারও তাই। নবী করীম (স)-এর এই কথাটিও তা-ই প্রমাণ করে ঃ

مَا بَانَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيِّتٌ –

চতুষ্পদ জন্তুর থেকে জীবন্ত থাকা অবস্থায় যা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তার ফলে তা মৃত অবস্থায় হয়ে যায়, তা-ই জীবন।

---

১. আধুনি জ্ঞানের আলোকে এ যুক্তি অগ্রহণীয়। আধুনিক বিজ্ঞান বৃক্ষ-গুল্মেরও জীবন আছে বলে প্রমাণ করেছে এবং ওদের ব্যথা বা আনন্দেরও অনুভূতি আছে—অনুবাদক।

চুল ও পশম জীবন্ত জীব থেকে বিচ্ছিন্ন হলে এগুলোতে মৃত্যু এলো বলা যায় না। যদি তাতে মৃত্যু আসে বলা যায়, তা হলে তার মূল্যটা যাবেহ না করা পর্যন্ত হালাল হতে পারে না। যেমন জীবের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, তাতে মৃত্যু সংঘটিত হয় না। তার যবেহ করার প্রয়োজন হয় না।

হাসান, মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব ও ইবরাহীম নখয়ী থেকে মৃত জন্তুর চুল ও পশম ব্যবহার মুবাহ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। আতা থেকে মৃত জন্তুর এসব জিনিস ব্যবহার মাকরূহ হওয়ার বর্ণনা এসেছে। সেই সাথে হাতীর অস্থিও। তায়ূস থেকেও হাতীর অস্থির মকরূহ হওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। ইবনে উমর বর্ণনা করেছেন, তিনি একটি লোকের গায়ে পশুচর্মের জামা দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, আমি যদি জানতে পারতাম যে, ওটি পবিত্র, তাহলে ওর একটা কাপড় আমার হওয়া আমার জন্যে খুবই আনন্দের কারণ হতো। আনাস উল্লেখ করেছেন, হযরত উমর একজন লোকের মাথায় অজগরের চামড়া নির্মিত একটি উচুঁ টুপী দেখলেন। পরে তিনি সেটি টেনে খুলে নিলেন, বললেন, তুমি কি জান, সম্ভবত এটা এমন চামড়ায় তৈরী যা পরিচ্ছন্ন—পবিত্র করা হয়নি।

হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহার করার ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। অনেক লোক তা মাকরূহ বলেছেন। কিন্তু হানাফী মাযহাবের মনীষিগণ তা মুবাহ বলেছেন। সাহাবা ও তাবেয়ীনের বিষয়ে মতামত আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আতা ইবনে আব্বাস থেকে আবুয যুবায়র জাবির থেকে এবং মুতরফ আম্মার থেকে হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহার মুবাহ হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। আলী ইবনে হুসায়ন, হাসান, ইবরাহীম, দহাক ও ইবনে সিরীন থেকে বর্ণিত হয়েছে, একজন বর্ণনাকারী বলেছেন, কাতাদাহ আবুল মুলাইহ থেকে, তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ নবী করীম (স) হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। কাতাদাহ আবূ শায়খ-আল-হানায়ী থেকে বর্ণনা করেছেন, মুআবিয়া নবী করীম (স)-এর কয়েকজন সাহাবীকে সম্বোধন করে বললেন ঃ তোমরা কি জান, নবী করীম (স)-চিতাবাঘের জ্বিন ধরে তার উপর আরোহণ করতে নিষেধ করেছেন? লোকেরা বলল ঃ হ্যাঁ, জানি।

এ দুটি হাদীসের প্রকৃত তাৎপর্য কি, সে বিষয়ে জ্ঞানবানদের বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এ নিষেধ অর্থ হারাম করা। অর্থাৎ তা পরিধান করা সর্বাবস্থায়ই হারাম। অন্যরা বলেছেন, তা বড় জোর মাকরূহ। অবশ্য তা অনারবদের সাথে সাদৃশ্য। যেমন আবূ ইসহাক হুবাইরাতা ইবনে মরিয়ম হযরত আলী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী করীম (স) স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, নিষেধ করেছেন রেশম মিশ্রিত কাতানের কাপড়[১] পরতে ও লাল বর্ণের কাপড় পরতে। সাহাবায়ে কিরাম থেকেও হিংস্র জন্তুর পোশাক পরা ও তা ব্যবহার করা মুবাহ হওয়ার বর্ণনা এসেছে। বোঝা যায়, যে নিষেধ বর্ণিত হয়েছে, তা শুধু মাকরূহ হওয়া বোঝায়, তাতে অনারবদের

১. আরবী ভাষায় القسى। বলতে বোঝায় রেশম মিশ্রিত কাতানের কাপড়। তা মিসর থেকে 'আমদানী করা হতো। মিসরের যে গ্রামে তা তৈরী হতো তার নাম القس।

সাথে সাদৃশ্য দেখায়। পূর্বেই আমরা সালমান প্রমুখ বর্ণিত পশুচর্মের পোশাক পরা ও তা ব্যবহার করা সম্পর্কিত নবী করীম (স)-এর হাদীস উদ্ধৃত করেছি। তাঁর কথা ঃ

اَيُّمَا اِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ –

যে কোন কাঁচা চামড়া পরিপক্ক করা হলেই তা পাক হয়ে যায়।

তাঁর কথা ঃ

دِبَاغُ الْاَدِيْمِ ذَكَاتُهُ –

চামড়া পরিপক্ক (tanning)-ই তার পবিত্রতা।

এই সব হাদীস প্রমাণ করে যে, হিংস্র জন্তুর চামড়া কোন ক্রমেই অপবিত্র নয়। বরং তার ব্যবহার বড়জোর মাকরূহ এবং অনারবদের সাথে সাদৃশ্য মাত্র।

## রক্ত খাওয়া হারাম

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ –

তোমাদের প্রতি শুধু মৃত জন্তু ও রক্ত হারাম করা হয়েছে।

বলেছেন ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ –

তোমাদের প্রতি মৃত জীব ও রক্ত হারাম করা হয়েছে।

রক্ত হারাম হওয়া পর্যায়ে এ দুটি আয়াত ছাড়া আর যদি কিছু না পাওয়া যেত; তাহলে সমস্ত প্রকারের রক্ত—তার পরিমাণ কম বা বেশী—অবশ্যই হারাম হয়ে যেত। পরে অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ لَّاَاَجِدُ فِىْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا –

বলে দাও, আমার নিকট যে ওহী নাযিল হয় তাতে কোন খাদ্য গ্রহণকারীর খাদ্য হিসেবে কিছুই হারাম পাই না। তবে যদি মৃত বা প্রবাহিত রক্ত হয় (তাহলে তা হারাম)।

এ আয়াতটি প্রমাণ করে যে, রক্ত শুধু প্রবাহিত হলেই হারাম। যা প্রবাহিত হয় না, তা হারাম নয়।

কেউ যদি বলে, আল্লাহ্র কথা ঃ اَوْدَمًا مَّسْفُوْحًا 'অথবা প্রবাহিত রক্ত'। বিশেষীকৃত হয়ে শুধু তা-ই বোঝায় তা প্রবাহিত হওয়ার গুণে বিশেষিত আর শেষোক্ত দুই আয়াতের কথা সর্বপ্রকারের রক্ত শামিল করে। কাজেই তা সাধারণ ও ব্যাপকভিত্তিকই রাখতে হবে। কেননা আয়াতে বিশেষী করে চিহ্নিত করার কিছুই নেই।

জবাবে বলা যাবে, আল্লাহ্‌র এ কথাটিতে সর্ব প্রকারের রক্ত হারাম নয়—এর প্রমাণ রয়েছে। হারাম শুধু তা যা 'প্রবাহিত' বলে পরিচিত। কেননা তিনি বলে দিয়েছেন ঃ 'মৃত জীব ও প্রবাহিত রক্ত ছাড়া আল্লাহ্‌র নাযিল করা ওহীতে কোন খাদ্য গ্রহণকারীর পক্ষে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ হারাম আর কিছুই পাওয়া যায় নাই, যদি রক্ত প্রবাহিত হয়, তা হলে দুটি অবস্থার একটি হবে। হয় 'তোমাদের প্রতি মৃত জীব ও রক্ত হারাম করা হয়েছে' কথাটি 'অথবা প্রবাহিত রক্ত' কথাটির পেছনে হবে। অথবা এ দুটিই একই সাথে নাযিল হয়ে থাকবে। কিন্তু কথা দুটির নাযিল হওয়ার তারিখ আমাদের জানা নেই। তাই আমরা ধরে নেব, দুটি আয়াত একসাথে নাযিল হয়েছে। তাই এক্ষণে রক্ত হারাম শুধু তাই যার এই পরিচিতি—প্রবাহিত হওয়ার পরিচিতি রয়েছে।

আবুল কাসিম আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আল-মেরওয়াজী, হুসায়ন ইবনে আবূ রুবাই আল-জুরজানী, আবদুর রাজ্জাক ইবনে উয়াইনাতা, আমর ইবনে দীনার-ইকরামা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ أَوْدَمًا مَّسْفُوْحًا 'অথবা প্রবাহিত রক্ত' এই আয়াতাংশ যদি নাযিল না হতো, তা হলে মুসলমানরাও ঠিক ইয়াহূদীদের পথ অনুসরণ করত। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ, হাসান, আবদুর রাজ্জাক, মামার, কাতাদা সূত্রে أَوْدَمًا مَّسْفُوْحًا এই আয়াতাংশ পর্যায়ে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, রক্তের প্রবাহিত যা, শুধু তা-ই হারাম। গোশতের সাথে যে রক্ত মিশ্রিত থাকে, তা হারাম নয়।

আল-কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁকে গোশতের সাথে মিলে-মিশে থাকা রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এবং যবেহর স্থানে পড়ে থাকা যে রক্ত সে সম্পর্কে। জবাবে তিনি বললেন ঃ

إِنَّمَا نَهَى اللّٰهُ عَنِ الدَّمِ الْمَسْفُوْحِ -

কেবলমাত্র প্রবাহিত রক্তকেই আল্লাহ্ খেতে নিষেধ করেছেন।

রগে-রিশায় রক্তের অংশ থাকা সত্ত্বেও গোশত রান্না করে খাওয়া ফিকাহবিদদের মতে জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই। কেননা তা প্রবাহিত নয়। তার উপর পানি নিক্ষিপ্ত হলেই সে সব অংশ স্পষ্ট প্রকট হয়ে দেখা দেয়। তা কিন্তু হারাম নয়। কেননা তা তো مَسْفُوْحٌ 'প্রবাহিত' নয়। আমাদের ফিকাহবিদগণ বলেছেন, পক্ষহীন নীল মাছি, লক্ষ দিয়ে সবেগে চলা পোকা ও মাছির রক্ত নাপাক নয়। তাঁরা এও বলেছেন, মাছের রক্ত নাপাক নয়। তা রক্ত সহই খাওয়া যেতে পারে। পক্ষহীন নীল মাছির রক্ত সম্পর্কে ইমাম মালিক বলেছেন, তার পরিমাণ বেশী হলে তা দুয়ে নেবে। মাছির রক্তও ধুয়ে নেবে। মাছের রক্তও তাই। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, অযূ নষ্ট হয় যদি অঙ্গে রক্ত, মূত্র প্রভৃতির নাপাকি লাগে। সব রক্তই তার মধ্যে গণ্য। কেউ যদি বলেন, 'তোমাদের প্রতি মৃত জীব ও রক্ত হারাম করা হয়েছে' এবং 'অথবা প্রবাহিত রক্ত' কথা দুটি মাছের রক্তকেও হারাম করে। কেননা তা প্রবাহিত। জবাবে বলা যাবে, তা হারামের সাধারণ হুকুম থেকে বিশেষীকরণের মাধ্যমে আলাদা হয়ে গেছে রাসূল করীম (স)-এর এই কথার বলে ঃ

'আমার জন্যে মৃত মাছ ও পঙ্গপাল এই দুটির রক্ত হালাল করা হয়েছে' মাছের রক্ত প্রবাহিত ও দূরীভূত করা হয়নি, তা সত্ত্বেও তা মুবাহ বলা হয়েছে, মুসলিম জনতা এই হাদীসকে কবুল করে। দূর করা হয় নি মাছের এমন রক্ত মুবাহ্ প্রমাণ করেছেন। তখন আয়াতের সাধারণত্ব ও ব্যাপকত্বকে বিশেষীকরণের মাধ্যমে মাছের রক্ত মুবাহ্ গণ্য করাই বাঞ্ছনীয়। কেননা তা যদি নিষিদ্ধ হতো তাহলে রক্ত প্রবাহিত না করা অবস্থায়ও তা হালাল হয়ে যেত—যেমন ছাগী, বকরী ও রক্তশীল অন্যান্য সমস্ত জীব-জন্তু।

## শূকর হারাম

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ -

তোমাদের প্রতি মৃত জীব, রক্ত ও শূকরের গোশত হারাম করেছেন।

বলেছেন ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ -

তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে মৃতজীব, রক্ত ও শূকরের গোশত।

বলেছেন ঃ

قُلْ لَّاَجِدُ فِيْ مَا اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَطْعَمُهٗۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْدَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمُ الْخِنْزِيْرِ -

বলে দিন, আমার নিকট যা পাঠানো হয় তাতে কোন খাদ্য গ্রহণকারীর জন্যে খাওয়া হারাম কিছুই পাইনি মৃত জীব বা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের গোশত ছাড়া।

এই সব কয়টি আয়াতেই শূকরের গোশত হারাম ঘোষিত হয়েছে। গোটা মুসলিম উম্মাহ্ এই তাৎপর্যই বুঝেছে ও গ্রহণ করেছে। এ আয়াতসমূহে বিশেষ করে ও স্পষ্টভাবে শূকরের গোশতের কথাই বলা হয়েছে নিষিদ্ধ বা হারাম হিসেবে, কিন্তু মূলত শুধু গোশতই নয়, তার সমস্ত অংশ ও অঙ্গই হারাম ও নিষিদ্ধ। তাহলে বিশেষভাবে গোশতের উল্লেখ কেন ? তার কারণ, মূলত গোশত-ই প্রধান, মানুষ গোশত থেকেই বেশী ফায়দা গ্রহণ করে। গোশতটাই লক্ষ্য। যেমন মুহরিমের জন্যে শিকার হত্যা করা হারাম। আসলে বক্তব্য হচ্ছে—শিকার সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যকলাপই নিষিদ্ধ। তা সত্ত্বেও তা হত্যা না করতে বিশেষভাবে বলার কারণ হচ্ছে, শিকার কাজের আসল লক্ষ্য হচ্ছে প্রাণীটিকে হত্যা করা। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ -

জুম'আর দিন যখন নামাযের জন্যে আযান দেয়া হবে, তখন তোমরা আল্লাহ্র যিকির-এর দিকে অবিলম্বে অগ্রসর হও এবং ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ কর।

এ আয়াতে শুধু ক্রয়-বিক্রয় পরিহার করতে বলা হয়েছে স্পষ্ট ভাষায়। কেননা সেটাই অধিক লাভজনক ব্যস্ততা। মানুষ বেশীর ভাগ তাতেই মশগুল হয়ে থাকে। আসলে কিন্তু শুধু ক্রয়-বিক্রয় পরিহার করতে বলাই মূল উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে নামায থেকে বিরত ও বিমুখ রাখার সকল প্রকারের ব্যস্ততা পরিহার করতে বলা। নামায থেকে বিরত রাখা ও বিমুখ করার এই প্রধান ব্যস্ততার কথাটি সবকিছু পরিহার করার উপর তাগিদ ও বলিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যেই সেটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। উপরোদ্ধৃত আয়াতসমূহের لَحْمَ الْخِنْزِيرِ শূকরের গোশতের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে শুধু এই পরিপ্রেক্ষিতে। গোটা শূকর হারাম হওয়ার উপর অধিক তাগিদ আরোপের উদ্দেশ্যে, তার সবকিছু পরিহার করতে বলার তাগিদস্বরূপ।

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, শূকরের শুধু গোশতই নয়, তার সবকিছু হারাম ও নিষিদ্ধ যদিও দলীলে বিশেষভাবে গোশতের উল্লেখ করা হয়েছে।

শূকরের চুল বা পশম ব্যবহার করা ও উপকার লাভ করা জায়েয কিনা, এ পর্যায়ে ফিকাহবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মাদ তা পশমী বস্ত্র বা টুপী হিসেবে ব্যবহার করা জায়েয বলেছেন। ইমাম আবূ ইউসূফ বলেছেন, পশমী বস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা আমি অপছন্দ বা ঘৃণা করি। তবে অন্য বর্ণনায় তা মুবাহ বলা হয়েছে। আওজায়ী বলেছেন, শূকরের পশমের সাথে সংমিশ্রণ করে ব্যবহার করা জায়েয।

আবূ বকর বলেছেন, কুরআনে যখন বিশেষভাবে শূকরের গোশতের কথা বলা হয়েছে এবং তা সমগ্র শূকরের দেহ হারাম হওয়ার তাগিদস্বরূপ বিশেষভাবে গোশতের কথা বলা হয়েছে, তখন বলা সঙ্গত যে, তা তার পশম ও অন্য সব সহই হারাম এবং একথাও বলা সঙ্গত যে, যে যে জিনিসের জীবন নির্ভর তার উপর নির্ভরশীল, যা কেটে নিলে কষ্ট পেতে হয় না, সেগুলোও হারাম। কিন্তু পশমের যেহেতু জীবন নেই, তাই তা জীবদেহের অংশের মধ্যে গণ্য নয়, অতএব তা হারাম—এই হুকুম লাগানো যায় না। যেমন ইতিপূর্বে আমরা মৃত জীবের চুল ও পশম সম্পর্কে বলে এসেছি। যবেহকৃত জীব এবং মৃত জীবের চুল-পশম-লোম অভিন্ন। তবে আমাদের ফিকাহবিদগণ তা ব্যবহার করে ফায়দা গ্রহণ মুবাহ বলেছেন। তাঁরা উল্লেখ করেছেন, তারা তা ভাল মনে করেই জায়েয বলে মনে করেন। তা প্রমাণ করে যে, তাদের মতে চুল পশমসহ শূকরের সবকিছুই হারাম। তা পশমী কাপড়ে সংমিশ্রণ করে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন ভালো মনে করেই। তবে তা বিক্রয় করা বা ক্রয় করা জায়েয নয়। কেননা মুসলিম জনগণ ও আলিমগণ জুতা নির্মাণকারীদেরকে কোনরূপ আপত্তি ছাড়া তা ব্যবহারের উপর বহাল রাখতে দেখেছেন। তাহলে তা ব্যবহার করা জায়েয হওয়া পর্যায়ে আগের কালের লোকদের ইজমা হয়েছে, বলা চলে। আর সাধারণের কোন কাজ চলতে থাকা ও আগের লোকদের তাদেরকে সে কাজে বহাল রাখা এবং তার প্রতিবাদ না করা প্রমাণ করে যে, একাজ তাঁদের নিকট মুবাহরূপে গণ্য হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত কোন জ্ঞান পরিমাণের জ্ঞাত মজুরীর শর্ত ছাড়াই হাম্মামে (সাধারণ গোসল খানায়) প্রবেশ করা পর্যায়ে তাঁরা যা বলেছেন, তা। তাতে পানির ব্যবহার ও সেখানে অবস্থানের সময় মেয়াদ অনির্দিষ্ট থাকে। এটা আগের কালে

প্রকাশ্যভাবেই প্রচলিত ছিল। সে কাজ যারা করত, তাদেরকে সে কাজ থেকে বিরত রাখার কোন চেষ্টাই হতো না। ফলে তা-ও তাদের ইজমায় পরিণত হয়েছে। অনুরূপভাবে ফিকাহবিদগণ বলেছেন, যাদের নিকট শিল্পকর্মের অর্ডার দেয়ার ব্যাপারে। সাধারণ মানুষ এই কাজ করত বলে তারা এর অনুমতি দিয়েছেন, তাদের লক্ষ্য ছিল সব পূর্বকালীন মনীষীদের রায়কে বহাল রাখা এবং তা ব্যবহার করার কোন প্রতিবাদ না করা, তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তা মূলতই জায়েয। এর দৃষ্টান্ত অনেক।

মনীষিগণ পানির শূকর পর্যায়ে ভিন্ন মত দিয়েছেন। আমাদের হানাফী মাযহাবের ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, তা খাওয়া যাবে না। মালিক ইবনে আবূ লায়লা, শাফেয়ী ও আওজায়ী বলেছেন নদী-সমুদ্রে যতকিছু আছে তার কোন একটি খাওয়ায় কোন দোষ নেই। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, পানির মধ্যে বসবাসকারী শূকর খাওয়ায় কোন দোষ নেই। অনেকে সেটির নাম রেখেছেন পানির গাধা। লাইস ইবনে সাদ বলেছেন, পানির মধ্যের 'মানুষ' খাওয়া যাব না, পানির শূকরও নয়।'[১]

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্ কথা ঃ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ এবং শূকরের গোশত হারাম হওয়ার কথাটি স্থলভাগ ও জলভাগের সব শূকরকে শামিল করে। কেননা সবটার নাম তো শূকরই। যদি বলা হয়, কথাটি মূলত স্থলভাগের শূকরকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে, কেননা এ নামটি সাধারণভাবেই ব্যবহার করা হয় স্থলভাগের শূকরের জন্যে। এ নাম পানির মধ্যে থাকা শূকরের জন্যে ব্যবহার করা হয় না। তা বোঝাতে হলে শর্তসহ নামটি বলতে হবে যেমন পানির মধ্যে শূকর। আর শুধু শূকর বললে স্থলভাগের শূকরই বোঝাবে, পানির শূকর নয়। এজন্যে পানির শূকরকে সাধারণত পানির গাধা বলা হয়।

জবাবে বলা যাবে, পানির শূকর হয় স্থলভাগের শূকরের আকার-আকৃতি হয়ে থাকবে। তার গুণ-পরিচিতও তা-ই হবে অথবা তা থেকে ভিন্নভাবে ও ভিন্ন গুণ-পরিচিতিতে। যদি তা স্থলভাগের শূকরের আকার-আকৃতির তাহলে নাম ব্যবহারের দুটির মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না। আর কোনটির পানিতে থাকায় তার সম্পর্কিত শরীয়াতের হুকুমের কোন পরিবর্তন হবে না। কেননা এ উভয়টিই অভিন্ন আকার-আকৃতির। যদিও বিশেষভাবে স্থলভাগের শূকরই বোঝাবে। আর যদি ভিন্নতর আকার-আকৃতিতে সৃষ্ট হয়ে থাকে, আর এই কারণেই সেটিকে 'পানির গাধা' নাম দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হবে—যা শূকর নয় সেটিকেই শূকর বলা হচ্ছে। আর একথা জানাই আছে যে, এগুলোর নামকরণে কেউ ভুল করে না। তাই বলতে হবে, পানির মধ্যের শূকরও আসলে শূকরই। 'শূকর' নামটাও তা শামিল করে। সেটিকে কথা-বার্তায় 'পানির গাধা' বললে সেটির শূকর হওয়া তো আর বদলে যায় না। হতে পারে দুটির মধ্যে পার্থক্যকরণের জন্যে পানি শূকরকে 'পানির গাধা' বলতে শুরু করা হয়েছে। স্থল-কুকুর ও জল-কুকুরও তো এই রূপ পার্থক্যহীন। কেননা 'কুকুর' নামটাই উভয়কেই পরিব্যাপ্ত করে। যদিও গুণ-পরিচিতির কোন কোন দিক দিয়ে দুটির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।

১. বলা বাহুল্য এই কথা এ ধারণার উপর ভিত্তিশীল যে, পানির উপরে স্থলভাগে যত প্রকারের প্রাণী আছে, পানিতেও ঠিক তত প্রকারের প্রাণী রয়েছে—অনুবাদক।

## আল্লাহ্ ছাড়া অন্য নামে যবেহ করা জীব হারাম

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ -

আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি মৃত জীব, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যে জন্তু আল্লাহ্ ছাড়া অন্য নামে উৎসর্গ করা হবে তা হারাম করে দিয়েছেন।

অর্থাৎ যে পশু যবেহ করার সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য নাম উচ্চারণ করা হবে, তা হারাম। এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই।

অনেকের মনে করেছেন—এ আয়াতের শেষ কথাটি মূর্তি পূজারীদের বলিদানকৃত জীব-জন্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে। ওরা তো আল্লাহ্র নামে নয়, ওদের মূর্তি ও দেব-দেবীর নামে পশু বলিদান করে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ -

এবং যা কোন আস্তানায়[১] যবেহ করা হয়েছে।

তাঁরা ঈসা-মসীহ্র নাম উচ্চারণ করে খৃস্টানরা যে পশু যবেহ করে তা মুসলমানদেরকে খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। আতা, মকহুল, হাসান, শবী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যির প্রমুখ তাবেয়ী ফিকাহবিদ এই মত দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের যবেহকৃত পশু খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন একথা জানা সত্ত্বেও যে, তারা তাদের যবেহকৃত পশুর উপর আল্লাহ্র নাম নয়, ঈসা মসীহ্র নাম উচ্চারন করে।

ইমাম আওজায়ী লাইস ইবনে সাদেরও এই মত। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফার, মালিক ও শাফেয়ী প্রমুখ বলেছেন—না, তাদের যবেহকৃত পশু খাওয়া যাবে না। কেননা তারা যবেহ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে না, উচ্চারণ করে ঈসা-মসীহর নাম।

আল্লাহ্ কথা وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নাম উচ্চারণ করা হয় যে সব যবেহ কালে। এর বাহ্যিক অর্থের দৃষ্টিতে এরূপ পশু খাওয়া হারাম হওয়া অনিবার্য ও নিশ্চিত। কেননা তা যবেহ করার সময় তারা আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করেনি, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করেছেন। أُهِلَّ শব্দটির মূল إِهْلَال, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নাম উচ্চারণ করা। পশু যবেহ কালে আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্য কারোর নাম উচ্চারণ—সে ঈসা মসীহ্র নাম হোক, কি অপর কারো নাম—এর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি উক্ত আয়াতে। কেননা তা আল্লাহর নাম তো হবে না, হবে তিনি ছাড়া অপর কারো নাম। আর সেই অপর যার নামই হোক না কেন, তা-ই উক্ত আয়াতের আওতায় পড়ে হারাম হয়ে যাবে।

---

১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে পশু বলিদানের জন্যে নিদিষ্ট স্থানকে কুরআনে نصب বলা হয়েছে।

অপর আয়াতাংশ 'যা কোন আস্তানায় যবেহ্ করা হবে' আরবদের তাদের মূর্তি দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ্ করার যে প্রচলন ছিল, তার কথাই বলা হয়েছে এবং এই কথাটি ব্যাপাক ও সাধারণ। নির্দিষ্টভাবে কেবল তাই বোঝায় না। অতএব আল্লাহ্‌র পরিবর্তে আর যারই নাম উচ্চারণ করা হোক, তা-ই এই আয়াতাংশের মধ্যে পড়ে হারাম হয়ে যাবে।

আতা ইবনে সায়েব জাদান ও মায়মারাতা থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী বলেছেন ঃ তোমরা যখন শুনবে যে ইয়াহূদী ও খৃস্টানরা পশু যবেহকালে আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নাম উচ্চারণ করছে, তখন তোমরা তা খাবে না। আর তোমরা নিজেদের কানে যদি তা শুনতে না পাও, তাহলে তা খেতে পার। কেননা আল্লাহ ওদের যবেহকৃত পশু মুসলমানদের জন্যে হালাল করেছেন। অথচ যবেহকালে ওরা কি বলে তা আল্লাহ্‌র খুব ভালো করেই জানা আছে। যারা তাদের যবেহকৃত পশু খাওয়া মুবাহ্ বলেছেন, তাঁরা এই দলীলও দিয়েছেন যে, আহলি কিতাব লোকদের খাবার তো আল্লাহ্ মুবাহ্ করে দিয়েছেন, তারা যবেহকালে কি বলে তা জানা থাকা সত্ত্বেও । কিন্তু এটা তাদের পক্ষের কোন দলীল হতে পারে না। কেননা আহলি কিতাবের খাদ্য মুবাহ্ করা হয়েছে শর্তের ভিত্তিতে। আর সে শর্ত হচ্ছে এই যে, তারা আল্লাহ আড়া অন্য কারো নাম উচ্চারণ করবে না। কেননা আমরা তো উদ্ধৃত উভয় আয়াত অনুযায়ী একসাথে আমল করতে বাধ্য। তাই অনুমতির অর্থ হবে. আহলি কিতাবের খাবার (পশু) হালাল হবে যদি তারা যবেহকালে আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নাম উচ্চারণ না করে।

যদি কেউ বলে, খৃস্টানরা যদি আল্লাহ্‌র নামও বলে, তাহলেও তা ঈসা-মসীহ্‌কেই মনে করে ও বোঝায়। প্রকৃত পক্ষে তা-ই যখন তাদের ইচ্ছা এবং তাদের যবেহকার্য সহীহ্ হওয়াটা নিষিদ্ধ হয় না, যদিও তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম উচ্চারণ করে। তেমনি তাদের আল্লাহ্‌র নাম লওয়াকালে তাদের মনের কথা যখন প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈসা-মসীহ্‌র নাম লওয়া, তখন তো সেই অনুযায়ীই সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় ?

জবাবে বলা হবে, না, তা জরুরী নয়। কেননা বাইরে যা হতে দেখা যায় বা কানে শুনা যায়, তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণই আমাদের উপর আল্লাহ্‌র অর্পিত দায়িত্ব। কেননা কথা উচ্চারণের ব্যাপার। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নাম উচ্চারিত হলে তাদের যবেহকৃত পশু হালাল হবে না وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ অনুযায়ী। আর আল্লাহ্‌র নামই যখন শব্দে উচারিত হবে, তখন তা বলে তারা ঈসা-মসীহকে বুঝিয়েছেন বা মনে করেছেন, তা আমাদের ভাবনার কারণ নেই। নাম যখন উচ্চারিত হয়, তখন সেই নামের বাস্তব সত্তাকেই মনে করা বাঞ্ছনীয়। উচ্চারিত না আমলে যা বোঝায় না, তার উপর প্রয়োগ করা ঠিক নয়। এটাই আমাদের মত। তা সত্ত্বেও নাম প্রকাশ করাকেই আমরা গণ্য করব, তা বলে তারা কি মনে করেছেন, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর আমাদের প্রয়োজন নেই। যে লোক প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ্‌র তওহীদের প্রতি ঈমান ও রাসূলের সত্যতা বিশ্বাস ঘোষণা করে, তখন তো সে একজন মুসলিম বলেই গণ্য হয়, যদিও তওহীদ বিরোধী

নানা খুচরা বিশ্বাস তার মনের মধ্যে থেকে যেতে পারে। নবী করীম (স)-এর একথাটি এই অর্থে গ্রহণীয় ঃ

أُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، فَاِذَا قَالُوْهَا عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَ هُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ –

আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলবে। তারা যদি তা বলে, তাহলে তারা তাদের রক্ত ও ধন-মালকে আমার আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে নিতে পারবে। তবে এই কালেমার দাবিতে কিছু করা হলে ভিন্ন কথা। তাদের চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশ তো আল্লাহ্‌র নিকট অর্পিত।

আল্লাহ্ তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, জনগণের মধ্যে অনেক মুনাফিকও রয়েছে। তারা আসলে যা বিশ্বাস করে তার বিপরীতটাই তারা প্রকাশ করে। তা সত্ত্বেও তাদেরকে সব মুশরিকদের মত মনে করা হয় নি এবং তাদের সাথে সেরূপ আচরণ করা হয়নি যা মুশরিক কাফিরদের প্রতি অবলম্বিত হয়েছিল, বরং তাদের প্রকাশ্য ব্যাপারাদির প্রেক্ষিতে মুসলমান মনে করা হয়েছে এবং মুসলিমরূপেই তাদের সাথে যাবতীয় বৈষয়িক আচরণ গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের মনের মধ্যে তারা কি গোপন করে রেখেছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করা হয়নি। অনুরূপভাবে খৃস্টানদের যবেহকে সহীহ্ মনে করা সঙ্গত। কেননা তারা আল্লাহ্‌র নাম প্রকাশ করে। তবে তারা যদি ঈসা-মসীহ্‌র নাম উচ্চারণ করে, তাহলে তাদের যবেহ সহীহ ধরা যাবে না। যেমন মুশরিকদের যবেহ্ সহীহ্ নয়। কেননা তারা তো যবেহকালে তাদের মূর্তি ও দেব-দেবীর নাম উচ্চারণ করে।

## মৃত জন্তু খাওয়া মুবাহ হয় কঠিন প্রয়োজনকালে

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ –

যে লোক কঠিন ঠেকায় পড়ে যাবে—বিদ্রোহী হয়ে নয়, সীমা লঙ্ঘনকারী হয়েও নয়; তার উপর কোন গুনাহ্ চাপবে না।

বলেছেন ঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ فِىْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ –

অবশ্য যে ব্যক্তি ক্ষুধার কারণে বাধ্য হয়ে তার মধ্য থেকে কোন জিনিস খাবে গুনা করার প্রবণতা ছাড়াই তা হলে আল্লাহ নিশ্চয়ই গুনাহ মাফকারী ও দয়াবানা।

আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَااضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ –

আল্লাহ নিশ্চয়ই বিস্তারিত করে বলে দিয়েছেন যা তোমাদের জন্যে হারাম করে দিয়েছেন। তবে যা খাওয়ার জন্যে তোমরা নেহায়েত ঠেকায় পড়ে বাধ্য হয়ে যাও .....।

এসব আয়াতে সেই কঠিন প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে, যখন মানুষ বাধ্য হয়ে নিষিদ্ধ খাবার খায়। কঠিন প্রয়োজনে পড়ে কোনরূপ শর্ত ছাড়াই তা খাওয়া মুবাহ বলে ঘোষণা করেছেন, যেমন শেষোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে। এতে সর্বাবস্থায় প্রয়োজন হলে তা খাওয়া মুবাহ হওয়া খুবই যুক্তিসঙ্গত। শুধু একটি শর্ত', তা হচ্ছে কঠিন প্রয়োজন হওয়া।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ –

যে লোক কঠিন ঠেকায় পড়ে বাধ্য হবে, বিদ্রোহী হয়েও নয়, সীমালঙ্ঘনকারী হয়েও নয়।

এর বিভিন্ন অর্থ বলেছেন মনীষিগণ। ইবনে আব্বাস, হাসান ও মস্রূক বলেছেন ঃ غَيْرَ بَاغٍ فِى الْمَيْتَةِ এর অর্থ মৃতের গোশতের ব্যাপারে বিদ্রোহী নয়; আর وَّلَا عَادٍ অর্থ খাওয়ার পরিমাণে সীমালঙ্ঘনকারী নয়। হানীফী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ ও মালিক ইবনে আনাস প্রমুখও তা-ই বলেছেন। মুসলমানদের উপর বিদ্রোহী ব্যক্তিদের জন্যে যেমন মৃত জন্তু খাওয়া মুবাহ প্রয়োজনের কারণে, তেমনি ন্যায়পন্থী লোকদের জন্যেও তাঁরা তা মুবাহ বলেছেন। মুজাহিদ ও সাঈদ ইবনে যুবায়র বলেছেন, মুসলমানদের ইমাম তথা রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না হলে এবং তার বিদেশ গমণ কোনরূপ নাফরমানীর কাজের জন্যে না হলে ঠেকায় পড়ে মৃত জন্তুর গোশত খাওয়া হালাল হবে। কিন্তু কারোর বিদেশ গমন আল্লাহ্র নাফরমানীর কাজের জন্যে হলে কিংবা মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হলে তার জন্যে তা খাওয়া হালাল হবে না। ইমাম শাফেয়ী এই মত দিয়েছেন।

আল্লাহ্র কথা ঃ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ। তবে যা খাওয়ার জন্যে তোমরা নিতান্তই ঠেকায় পড়ে যাও। আয়াতাংশ অনুগত বিদ্রোহী সব মুসলমানের জন্যেই মৃত জন্তুর গোশত খাওয়া মুবাহ করে দেয়। আল্লাহ্র অপর কথটি غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ 'বিদ্রোহী নয়, সীমালঙ্ঘকারী নয়' এবং غَيْرُ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ 'কোন গুনাহের প্রবণতা ব্যতীতই;' এ দুটি আয়াতাংশে খাওয়ায় বিদ্রোহ ও সীমালঙ্ঘন অর্থ শামিল রয়েছে। তেমনি মুসললিম রাষ্ট্র প্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রভৃতি অর্থও হতে পারে। তাই শুধু সম্ভাব্যতা দেখে আয়াতের সাধারণত্বকে বিশেষীকরণ আমাদের জন্যে জায়েয হতে পারে না। বরং কোনরূপ বিশেষীকরণ ছাড়াই সাধারণত্বের তাৎপর্য রক্ষা করাই কর্তব্য। অধিকন্তু ফিকাহ্বিদদের মতের ঐক্য হয়েছে এ বিষয়ে যে, বিদেশ গমন যদি আল্লাহ্র নাফরমানীর কোন কাজে না হয়, বরং সফর হয় হজ্জ বা জিহাদ অথবা ব্যবসায়ের জন্যে, তা সত্ত্বেও সে তার মাল গ্রহণের কারণে কোন ব্যক্তির উপর বিদ্রোহী হয়; কিংবা নামায তরক করে,

যাকাত না দিয়ে সীমালজ্ঘনকারী হতে পারে, তা সত্ত্বেও তার এই বিদ্রোহ ও সীমালজ্ঘন প্রয়োজনে মৃত জীব ভক্ষণ মুবাহ্ হওয়ার প্রতিবন্ধক হবে না।

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ্র কথা غَيْرَ بَاغٍ وَّلاَ عَادٍ 'বিদ্রোহীও নয়, সীমালজ্ঘনকারীও নয়' সর্বপ্রকারের বিদ্রোহ-সীমালজ্ঘন বন্ধ করার ইচ্ছা করা হয়নি। আয়াতে তেমন কোন বিশেষ জিনিসের উল্লেখও নেই। তাহলে বলতে হবে আয়াতটি অস্পষ্ট, ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। অতএব প্রথমোক্ত আয়াতটি বিশেষ অর্থে বিশেষীকৃত করা সঙ্গত হবে না। কেননা তা তার প্রকৃত অর্থে ও বাহ্যিক অর্থে ব্যবহার করা কঠিন। খাওয়ায় সীমালজ্ঘন ও বিদ্রোহ অর্থে তা ধারণ করা হলেই তাকে তার আসল ও সাধারণ অর্থে প্রয়োগ করা হবে। যা বলতে চাওয়া হয়েছে, তা-ই গ্রহণ করা হবে। অতএব সে অর্থে ধারণ করা দুটি কারণে উত্তম। একটি, আয়াতটি তার সাধারণ ও ব্যাপক অর্থে গৃহীত হবে, আর দ্বিতীয়, তদ্দারা إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ। 'তবে যা করতে তোমরা চূড়ান্তভাবে বাধ্য হয়েছ, কথাটিকে বিশেষীকরণ করাকে কর্তব্য করে দেব না। আল্লাহ্র কথা : غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ 'কোন গুনাহের প্রবণতা ব্যতিরেকেই'-এর দুটি অর্থ হতে পারে। হয়, সমস্ত গুনাহ্ করার প্রবণতা হবে শেষ পর্যন্ত ঠেকায় পড়া ব্যক্তির জন্যে মুবাহ্ হওয়ার শর্ত হবে যে, সে খাওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে মূলতই কোন গুনাহ্ প্রবণ হবে না। এমন কি এক দিরহাম পরিমাণের জুলুম প্রতিহত করার দায়িত্ব ত্যাগ করা বা নামায, কিংবা রোযা তরক করার কাজে লিপ্ত হলেও, তা থেকে তওবা না করলে তার পক্ষে মৃত খাওয়া হালাল হবে না। অথবা তার পক্ষে খাওয়া জায়েয হবে কোন প্রকারের গুনাহ্ কাজে ব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও যদি তার বিদেশ সফর কোন গুনাহের জন্যে হবে না, রাষ্ট্রপ্রধানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীও হবে না। সকলের নিকটই একথা প্রমাণিত যে, কোন কোন গুনাহে লিপ্ত হলেই তার জন্যে প্রয়োজন কালে মৃত খাওয়া মুবাহ্ হওয়া নিষিদ্ধ হয়ে যায় না। বোঝা গেল—তা বলা লক্ষ্য নয়। তার পরেও প্রয়োজন হচ্ছে সেই গুনাহ্ প্রমাণ করা উক্ত আয়াত ছাড়া আলাদা কোন দলীলের ভিত্তিতে যে, সে অবস্থায় মৃত খাওয়া মুবাহ্ হবে না। এমতাবস্থায় শব্দটি অস্পষ্ট ও ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। তাহলে আয়াতটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ অপর কোন দলীলের উপর নির্ভরশীল হবে। আয়াতের হুকুমটি কাজে লাগাতে সমর্থ হলেই তা খাওয়ায় বিদ্রোহ ও সীমালজ্ঘন অর্থে ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। তাহলে কেবলমাত্র সেই পরিমাণ খাওয়াই জায়েয হবে, যে পরিমাণ খেলে প্রাণটা বাঁচানো যাবে, মৃত্যু ও ধ্বংসের ভয়টা দূর হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তো বলেই দিয়েছেন : وَلاَ تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ 'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করবে না'। যে লোক 'মুবাহ' খাওয়া থেকে বিরত থেকে মরবে, সে তো নিজেকে ধ্বংস করল, নিজেকে নিজেই হত্যা করল। এটাই সকল ইল্মওয়ালা লোকদের মত। এ ব্যাপারে গুনাহ্গার কিংবা অনুগত, এর মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না। বরং সেই অবস্থায় না খাওয়াই নাফরমানীর কারণ হয়ে পড়বে। অতএব প্রয়োজনের সময় মৃত খাওয়া মুবাহ্ হওয়ার ব্যাপারে অনুগত ও নাফরমান অভিন্ন হবে। মুবাহ্ খাওয়া থেকে বিরত থাকলে ও তার ফলে মরে গেলেই বরং সে আল্লাহ্র নাফরমান হয়ে যাবে। যদি রাষ্ট্রদ্রোহী হয় এবং নাফরমানীর কাজের জন্যে সফরে বের

হয়ে থাকে, তাহলে প্রয়োজনের সময় সম্ভাবনা ও প্রশস্ততাকালে যে যবেহ করা হয়, ঠেকার সময় মৃতটার সেই অবস্থায় গণ্য হবে।

যদি বলা হয়, তওবা করার মাধ্যমে মৃত খাওয়া মুবাহ হওয়া সম্ভব। আর যদি তওবা না করে, তা হলে সে নিজের উপরই অপরাধী।

জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, সে অপরাধী বটে; কিন্তু মৃত না খাওয়ার দরুন সে নিজের উপর যে অপরাধ করেছেন, তা তার জন্যে মুবাহ্ নয় যদি সে তওবা না-ও করে। কেননা তওবা না করলেও তার আত্মহত্যা মুবাহ হবে না। আর এই নাফরমান-গুনাহ্গার ব্যক্তি প্রয়োজনকালে যদি না খায় এবং তদ্দরুন মরে যায় তাহলে সে এক সঙ্গে দু'ধরনের গুনাহ্ করল। একটি হল সে গুনাহের কাজে ঘর থেকে বাইরে গিয়েছে। আর দ্বিতীয়, সে মৃত না খেয়ে নিজের বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে। তা ছাড়া এ ব্যাপারে অনুগত ও নাফরমান খাদ্য হালাল কিংবা হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন নয়, অভিন্ন। কেননা যেসব খাদ্য অনুগত বান্দাদের জন্যে হালাল, তা নাফরমান বান্দাদের জন্যেও হালাল। যা হারাম, তা উভয়ের জন্যেই হারাম। তাই প্রয়োজনে যে মৃত জন্তু খাওয়া অনুগত বান্দার জন্যে হালাল, তা নাফরমান বান্দাদের জন্যেও মুবাহ্।

যদি বলা হয়, মৃত জীব খাওয়া কঠিন ঠেকায় পড়া লোকের জন্যে রুখসাত নাফরমান—গুনাহ্গারের জন্যে তা রুখসাত নয়।

জবাবে বলা যাবে, এ কথাটি দুটি কারণে ভুল। একটি তোমার কথা ঃ ঠেকায় পড়া লোকের জন্যে মৃত খাওয়া মুবাহ্ হওয়াটা একটা রুখসত। কেননা ঠেকায় পড়া লোকের জন্যে মৃত খেয়ে জান বাঁচানো ফরয। ঠেকায় পড়াটা নিষেধকে দূর করে দিয়েছে। ঠেকায় পড়া ব্যক্তি যখনই মৃত খাওয়া থেকে বিরত থেকে মরে যাবে, তখনই সে আত্মহত্যাকারী হবে। সাধারণ অবস্থায় রুটি-ভাত খাওয়া, পানি পান করা থেকে মরে গেলে যেমন হয়। তখন সে আল্লাহ্র নাফরমান হয়ে যাবে, নিজের উপর অপরাধকারী হবে। আর ঠেকায় পড়া অ-বিদ্রোহী ব্যক্তির জন্যে এই মৃত খাওয়ার হুকুমে কোন মত-পার্থক্যই নেই। কাজেই ঠেকায় পড়া ব্যক্তির জন্যে মৃত খাওয়া মুবাহ্। 'একটি রুখসাত' বলা ঠিক এই রকমেরই একটি কথা যে, ঠেকায় না পড়া ব্যক্তির জন্যে রুটি-ভাত খাওয়া ও পানি পান করা মুবাহ্। কোন বুদ্ধিমান মানুষেই এরূপ কথা বলে না; বরং সকল মানুষই বলে ঃ ঠেকায় পড়া ব্যক্তির জন্যে মৃত জন্তু খেয়ে প্রাণ বাঁচানো ফরয। অতএব এ দুটি কথার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আর রুটি-ভাত খাওয়া ও পানি পান করায় অনুগত বান্দা ও নাফরমান বান্দা যেমন অভিন্ন, তেমনি প্রয়োজন কালে মৃত জীব খাওয়ার ব্যাপারেও তারা অভিন্ন। আর দ্বিতীয় ভুল হচ্ছে, তোমার এই কথা যে, নাফরমান গুনাহ্গারের জন্যে কোন রুখসাত নেই। মুসলিম জনগণের ঐকমত্যের কারণে এ একটা বাজে কথা। কেননা তারা রমযান মাসে রোযা না রাখা বাড়িতে অবস্থানকারী গুনাহ্গার ব্যক্তির জন্যেও রুখসাত আছে যদি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। পানি না পেলে তায়াম্মুম করাও জায়েয তার জন্যে।

নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বাড়িতে অবস্থানকারীর জন্যে একদিন-একরাত ও মুসাফিরের জন্যে তিন দিন-তিন রাত্র পর্যন্ত মোজাহ পরা পায়ে অযূতে না ধুয়ে মসেহ করার রুখসাত দিয়েছেন। এ রুখসাতে অনুগত ও নাফরমানের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। কাজেই উক্ত কথার অর্থহীনতা স্পষ্ট হয়ে গেল। আল্লাহ্র কথা ঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ –

যে লোক ঠেকায় পড়বে, বিদ্রোহী না হয়ে, সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে, তার কোন গুনাহ হবে না (মৃত জীব খেয়ে প্রাণ বাঁচালে)।

আর তাঁর কথা ঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ فِىْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ –

যে লোক ঠেকায় পড়বে অভাব-অনটনকালে, কোন গুনাহের প্রবণতাকারী না হয়ে, (সে মৃত জীব খেলে) আল্লাহ বড়ই গুনাহ্ মাফকারী, দয়াবান।

এ দুটি আয়াতেই সর্বনাম هو সম্পর্কে কথা বলা আবশ্যক। কেননা ঠেকায় পড়ার ব্যাপারটি ঠেকায় পড়ে যাওয়া ব্যক্তির নিজস্ব কাজ নয়। তাই 'তার গুনাহ হল' এবং 'আল্লাহ্ বড় গুনাহ মাফকারী দয়াবান'—কথা দুটি তার জন্যে সুসংবাদ পর্যায়ের। 'আর যে লোক ঠেকায় পড়ল' তার পরিণতি সম্পর্কে একটা সংবাদ অবশ্যই থাকতে হবে। তা ছাড়া হুকুমটা যদি মূল প্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট না হয়, আর তার পরিণতির খবর যদ্দারা কথাটি পূর্ণ হয় তা হল খাওয়া। তাহলে মোট কথাটি দাঁড়ায় ঃ যে ব্যক্তি ঠেকায় পড়ল, অতঃপর মৃত জীব খেল, তার কোন গুনাহ হবে না।

আল্লাহ্র কথা ঃ 'বিদ্রোহী নয়, সীমালঙ্ঘনকারী নয়' পর্যায়ে বলা হয়েছে ঃ বিদ্রোহী নয় মৃত জীবের ক্ষেত্রে এবং সীমালঙ্ঘনকারী নয় খাওয়ার। ফলে এই বিদ্রোহ ও সীমালঙ্ঘন দুটি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা খাওয়ার ব্যাপারে। তাহলে মোট কথাটি দাঁড়ায়; সে বিদ্রোহী নয়, সীমালঙ্ঘনকারী নয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে। অতএব যে লোক মুসলমানদের বিদ্রোহী সীমালঙ্ঘনকারী না হওয়া অবস্থায় নিতান্ত ঠেকায় পড়ে মৃত জন্তু খায়, তাহলে তার কোন গুনাহ্ হবে না। এ অর্থের দিক দিয়ে বিদ্রোহ ও সীমালঙ্ঘন তার প্রয়োজনকালীন অবস্থার চিত্র মৃত জন্তু খাওয়ার পূর্বে। তাই তো খাওয়া সংক্রান্ত পরিচিতি হবে না। অথচ পূর্বকালীন ফিকাহবিদদের মতে তা মৃত খাওয়া সংক্রান্ত অবস্থার চিত্র। তাই এখানে একটি শব্দ উহ্য ধরতে হবে, যেমন আল্লাহ্র এই কথায় উহ্য রয়েছে ঃ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْعَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ –

তোমাদের মধ্যে যারা রোগী বা প্রবাসী হবে, (সে রোযা ভাঙ্গবে) তার রোযা থাকার সময় হবে অন্যান্য দিনসমূহ।

এখানে সে রোযা ভাঙ্গবে فَأَفْطَرَ কথাটি উহ্য রয়েছে। এই কথাটিতেও উহ্য রয়েছে ঃ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْبِهِ اَذًى مِّنْ رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ –

তোমাদের মধ্যে যে রোগী হবে কিংবা তার মাথায় কোন কষ্টদায়ক ব্যথা হবে, সে রোযার ফিদিয়া (বিনিময়) দেবে।

এ আয়াতে فَحَلَقَ 'সে মাথামুণ্ডন করল' শব্দটি উহ্য রয়েছে। এই উহ্য কথা বা থাকা বৈধ হয় যাদের কথা বলা হচ্ছে, তাদের জানা-শুনা অবস্থায় এবং মূল কথাটিতে এমন প্রমাণ থাকতে হবে। এই প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে বিদ্রোহ ও সীমালঙ্ঘন শব্দদ্বয় খাওয়ার প্রসঙ্গে ধরা 'মুসলিমদের' তুলনায় অধিক উত্তম। অর্থাৎ এই বিদ্রোহ ও সীমালঙ্ঘন মুসলিমদের বিরুদ্ধে নয়; বরং খাওয়ার ব্যাপারে বিদ্রোহ ও সীমালঙ্ঘন। বিশেষত এ জন্যে যে, মুসলিমদের কোন উল্লেখ এ আয়াতে উহ্য বা উল্লেখ্য কোন ভাবেই নেই—কথাটি তাদের প্রসঙ্গেও নয়। এখানে প্রসঙ্গ হচ্ছে খাওয়ার—মৃত জীব খাওয়ার। তাই আয়াতের দাবি হল, এখানে খাওয়ার অবস্থা ধরতে হবে। তা ধরা অন্য যে কোন অবস্থা ধরার তুলনায় অধিক উত্তম।

আল্লাহ্র কথা ঃ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ। 'তবে যে অবস্থায় পড়ে তোমরা ঠেকে গেছ। এখানে সর্বনাম বা উহ্য কিছুরই প্রশ্ন নেই। এখানে ব্যবহৃত শব্দ স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থদায়ক। এখানে لا। বলে যে আলাদাকরণ (Exemption) করা হয়েছে, তা পূর্বে উল্লেখিত حَرَّمَ শব্দ থেকে। অর্থাৎ ঠেকায় পড়ে খাওয়া হারাম নয়। তখন হারাম হুকুমের আওতার বাইরে পড়ে তা। তখন তা মুবাহ হয়ে যায় তোমাদের সকলের জন্যে। এই শব্দটির সর্বনাম-এর কোন প্রয়োজন পড়ে না। 'প্রয়োজন'-এর অর্থ এখানে নিজের প্রাণের উপর বা তার কোন কোন অঙ্গের উপর ক্ষতির আশংকা—এই খাওয়া পরিহার করার কারণে। এতে দুটি অর্থ নিহিত রয়েছে। একটি, এমন এক স্থানে আসে, যেখানে মৃত ছাড়া খেয়ে প্রাণ বাঁচানোর আর কিছুই পাওয়া যায় না। আর দ্বিতীয়—মৃত জীব ছাড়া অন্য কিছু আছে বটে কিন্তু তা খাওয়া অপছন্দ করে এজন্যে যে, তা খেলে তার প্রাণ যাবে; কিংবা তার কোন অঙ্গের ক্ষতি সাধিত হবে। আমাদের মতে আয়াতের এ দুটি অর্থই গ্রহণীয়, কেননা এ দুটি অর্থই গ্রহণ করা যায়। মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি আয়াতটির তাৎপর্য বলেছেন বাধ্যতার প্রয়োজন। কেননা অর্থ যদি মৃত জীবের প্রয়োজনে নিহিত থাকে, তাহলে তা না খেলে নিজের প্রাণের উপর কোন ভয় থাকবে না। প্রাণের উপর ভয় থাকে শুধু বাধ্যতার প্রয়োজনে (ضرورة الاكراه), তা হতে তার হুকুমটাই তার সাথে সম্পর্কিত হয়ে যায়, একই কারণে আমাদের ফিকাহবিদগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃত জীব খেতে বাধ্য হয়েছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও তা খায়নি বলে সে মরে গেছে। তাহলে সে অবশ্যই আল্লাহ্র নাফরমান হবে। যেমন যে ব্যক্তি মৃত জীব খেতে বাধ্য হয়, কেননা তাছাড়া খাদ্য পর্যায়ের কোন কিছুই নেই, তা সত্ত্বেও যদি না খায়, আর তার ফলে সে মরে যায়, তাহলে সে গুনাহগার হবে, ঠিক যেমন খাদ্য-পানীয় পাওয়া সত্ত্বেও যদি না খাওয়ার দরুন মরে যায়, তা হলে তার এই মৃত্যুই না খাওয়ার কারণে আল্লাহ্র অবাধ্য ও

নাফরমান হিসেবে হবে। কেননা প্রয়োজনের সময় মৃত জীব খাওয়া মুবাহ্, ঠেকায় না পড়া অবস্থায় খাদ্য না খাওয়ার কারণে যেমন হয়।

## মদ্যপানে বাধ্য হওয়া

আবূ বকর বলেছেন, মদ্যপানে বাধ্য হওয়া ব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রকাশিত হয়েছে। সাঈদ ইবনে যুবায়র বলেছেন, শরীয়াতের অনুগত ব্যক্তি যদি কোন সময় ঠেকে যায়, মদ্যপান করতে বাধ্য হয়, তাহলে সে তা পান করবে। আমাদের হানাফী মাযহাবের সকল মনীষীর মতও তাই। তখন সে পান করবে ঠিক ততটা পরিমাণ, যতটা পরিমাণ পান করলে তৃষ্ণার জ্বালায় মরে যাওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারে।

হারিসুল আকী ও মকহুল বলেছেন—না, মদ্য পান করবে না। কেননা তাতে তৃষ্ণা কমাবে না, আরও তীব্র করে তুলবে। ইমাম মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন, পান করবে না, কেননা তাতে তৃষ্ণা যেমন বেড়ে যাবে, তেমনি ক্ষুধাও। ইমাম শাফেয়ী এ-ও বলেছেন যে, মদ্যপানে বিবেক-বুদ্ধি রহিত হয়ে যায়। ইমাম মালিক বলেছেন, মৃত জীব খাওয়ার কথা কুরআনে বলা হয়েছে, মদ্যপানের কথা বলা হয়নি।

আবূ বকর বলেছেন, যাঁরা বলেছেন, মদ্যপান পিপাসা ও ক্ষুধার প্রয়োজন দূর করে না, তাঁদের কথা দুটি কারণে অর্থহীন। একটি হল, একথা তো জানাই আছে যে, কঠিন প্রয়োজনের সময় মদ্যপানও প্রাণটা বাঁচাতে পারে। পিসাসা দূর করে। অমুসলিম যিম্মীদের মধ্যে যারা যুগ যুগ ধরে পানি পান করে না, শুধু মদ্যপান করেই পিপাসা নিবৃত্ত করে, তাদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি (যে, মদ্যপান পিপাসা ও ক্ষুধা নিবৃত্ত করে)। কাজেই মধ্যপায়ীদের এই অবস্থা জানার পর উল্লিখিত ব্যক্তিদের কথা যুক্তিসঙ্গত বলে গ্রহণ করা যায় না। আর দ্বিতীয় কারণ, যদি ব্যাপার বাস্তবিকই তাই হয় তাহলে কথাটি ফিরিয়ে আমাদের বলা উচিত যে, মাদ্যপানের কোন প্রয়োজনই দেখা দিতে পারে না। বিবেক-বুদ্ধি রহিত হওয়ার যে যুক্তি ইমাম শাফেয়ী দেখিয়েছেন, তা আমাদের আলোচ্য নয় কোন দিক দিয়েই। কেননা প্রশ্ন তো ঠেকায় পড়ে অতি সামান্য পরিমাণ খাওয়ার। আর ইমাম মালিক যে বলেছেন, মৃত জীব খাওয়ার প্রয়োজনের কথাই কুরআনে বলা হয়েছে, মদ্যপানের প্রয়োজনের কথা কুরআনে বলা হয়নি, এ বিষয়ে বক্তব্য হল ঃ মৃত জীব খাওয়া ও তার সঙ্গে আর যে যে জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে কিছুটা বলা হয়েছে। আর কিছুটা বলা হয়েছে সর্বপ্রকারের হারাম বিষয়ে বলা কথায়। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ –

তোমাদের প্রতি যা যা হারাম করা হয়েছে, তা সবই আলাদা ও বিস্তারিত করে বলে দিয়েছেন। তবে যে জিনিসের দিকে তোমরা ঠেকে যাও তা বাদে।

কুরআনের বহু কয়টি আয়াতে মদ্যপান হারাম করার কথা বলা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি-আয়াত ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ –

লোকেরা তোমার নিকট মদ্য ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বলে দাও ঃ এ দুটিতে বড় গুনাহ রয়েছে।

বলেছেন ঃ

اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالاِثْمَ –

আমার রব্ব যাবতীয় নির্লজ্জ কার্যাবলী হারাম করে দিয়েছেন, যা প্রকাশমান তাও এবং যা গোপন থাকে তাও এবং গুনাহ.......।

বলেছেন ঃ

اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ –

নিশ্চয়ই মদ্য, জুয়া, বলিদানের স্থান এবং ভাগ্য জানার উপকরণ শয়তানের কাজের মলিনতা। অতএব তোমরা তা পরিষ্কার কর ....

এসব আয়াতে মদ্য হারাম করার কথাই জানিয়ে দেয়া হয়েছে। আর যে প্রয়োজনের কথা আলোচনাধীন আয়াতে বলা হয়েছে তা এই সব হারাম মৃত জিনিসসমূহের সাথেই জড়িত হতে পারে। আলোচনাধীন আয়াতে তার উল্লেখ আর তার সঙ্গে যুক্ত করে আর যে যে জিনিসের উল্লেখ হয়েছে, সমগ্র হারাম জিনিসের যে উল্লেখ অন্যান্য আয়াতের রয়েছে, সে সবের সাধারণত্বে তা গণ্য করার প্রতিবন্ধক কিছুই নেই। অপর দিক দিয়ে মৃত জীব খাওয়া যদি মুবাহ হয়ে থাকে তা খেয়ে নিজেকে জীবিত রাখার জন্যে, আর না খেলে জীবন ধ্বংস হওয়ার যদিও ভয় হয়, তা হলে তা সকল প্রকারের হারাম জিনিস সম্পর্কেই প্রযোজ্য হতে পারে। তখন সেই নিতান্ত প্রয়োজনে ও ঠেকায় পড়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্যেই তা খাওয়া হয়েছে, মনে করতে হবে।

## ঠেকায় পড়ে যাওয়া ব্যক্তি কতটুকু পরিমাণ গ্রহণ করবে

ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফার, শাফেয়ী (মুজানী সূত্রের বর্ণনায়) বলেছেন ঃ ঠেকায় পড়ে যাওয়া ব্যক্তি মৃত জীবের শুধু প্রাণ বাঁচানোর পরিমাণ খাবে, তার বেশি নয়। ইবনে অহব ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, যে পরিমাণ খেলে পরিতৃপ্ত হওয়া যায়, তত পরিমাণ খাবে। শুধু তাই নয়, তা থেকে পাথেয়ও বানিয়ে নেবে। পরে যদি তা খাওয়া প্রয়োজন না হয়, তা হলে ফেলে দেবে। আবদুল্লাহ ইবনুল হাসান, আল-আম্বরী বলেছেন, যে পরিমাণ খেলে ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়, সেই পরিমাণ খাবে।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্র কথা হচ্ছে ঃ

اِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ –

তবে যে জিনিসের প্রতি তোমরা ঠেকায় পরে যাবে (যা খেতে তোমরা নিরুপায় হয়ে বাধ্য হবে) তা হারামের মধ্যে নয়।

বলেছেন, যে লোক বাধ্য হবে, বিদ্রোহীও নয়, সীমালঙ্ঘনকারীও নয়। এ কথাতে মৃত জীব খাওয়া মুবাহ্ হয় শুধু প্রয়োজনের কারণে। আর প্রয়োজন হচ্ছে, না খেলে খাওয়া থেকে বিরত থাকলে ক্ষতির ভয় হওয়া—হয় প্রাণের ক্ষতি, অর্থাৎ মৃত্যু, না হয় দেহের কোন একটি অঙ্গের ক্ষতি। তাই যে পরিমাণ খেলে এই ক্ষতির ভাটা দূর হয়ে যাবে অন্ততঃ উপস্থিতভাবে সে পরিমাণ খেলেই তো সেই প্রয়োজনটা পূর্ণ হয়ে যায়। তাতে ক্ষুধা নিবৃত্ত হওয়া প্রশ্ন নেই। কেননা ক্ষুধা প্রাথমিক পর্যায়েই মৃত জীব খাওয়া মুবাহ্ করে দেয় না। কেননা তখন না খেলে ক্ষতির আশংকা হতে পারে না। উপরন্তু আল্লাহ্‌র কথাঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ –

যে লোক ঠেকায় পড়বে, বিদ্রোহীও হবে না, সীমালঙ্ঘনকারীও নয়।

আমরা পূর্বেই বিশ্লেষণ করেছি যে, এই বিদ্রোহী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হওয়া খাওয়ার ব্যাপারে। আর একথা জানাই আছে যে, খাওয়ার পরিতৃপ্তির উপরে কখনো উঠে না। কেননা মৃত জীব ও অন্যান্য মুবাহ্ জিনিস খাওয়ার ব্যাপারে পরিতৃপ্তিরও বেশি খাওয়া তো নিষিদ্ধ। তাই প্রমাণিত হল যে, সে বিদ্রোহী হবে না, সীমালঙ্ঘনকারী হবে না পরিতৃপ্তির পরিমাণের বেশি খেয়ে। তা করলেই সে বিদ্রোহী ও সীমালঙ্ঘনকারী হয়ে যাবে। কেননা সে খাওয়ার ব্যাপারে তা-ই করেছে। বিশেষ করে মৃত জীব খাওয়ার ব্যাপারে এই জিনিসটি অবশ্যই অনুসরণীয়। মৃত জীব খাওয়ার অনুমতিটাই এই শর্তের অধীন এবং তাতে যথেষ্ট ফায়দা রয়েছে। আর তা হচ্ছে, প্রয়োজন দূর হওয়া পরিমাণই খাবে। তার অন্য একটি যুক্তি হচ্ছে, এই ঠেকার সময়ে তার নিকট যদি এমন পরিমাণ হালাল খাদ্য থাকত, যা খেয়ে সে জীবন বাঁচাতে পারত, তা হলে তার পক্ষে মৃত জীব কখনই জায়েয হতো না। তাই সে যদি সেই খাবার খেত ও ক্ষতি বা মৃত্যুর ভয় দূর হয়ে যেত, তা হলে তো তার জন্যে মৃত জীব খাওয়া জায়েয হতো না। অনুরূপভাবে মৃত জীব থেকে যতটা খেলে ক্ষতির ভয় দূর হয়ে যায়, ততটা খাওয়ার পরও তা খাওয়া সম্পূর্ণ হারাম। কেননা মৃত জীব খাওয়া মূলতই মুবাহ্ খাবার খাওয়ার পর প্রয়োজন দূর হয়ে গেলে তার পরও খাওয়া মুবাহ্ থাকে না।

আওজায়ী হাসসান ইবনে আতীয়া লাইসী থেকে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (স) কে জিজ্ঞাসা করেন, আমরা এমন স্থানে থাকি, যেখানে না খাওয়ার অবস্থা দেখা দেয়। এরূপ অবস্থায় ঠিক কখন মৃত জীব খাওয়া আমাদের জন্যে হালাল হবে? জবাবে রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ

مَتَى مَالَمْ تَصْطَبِحُوْا اَوْتَغْتَبِقُوْا اَوْتَجِدُوْا بِهَا بَقْلًا فَشَأْنُكُمْ بِهَا –

যখন তোমরা সকালে খাদ্য-পানীয় পাবে না, রাত্রে খাদ্য পানীয় পাবে না, শাক-সবজিও পাবে না, ঠিক তখন তোমরা মৃত জীব খেতে পার।

এ হাদীসে মৃত জীব খাওয়া মুবাহ বলা হয়েছে শুধু তখন, যখন সকালে কিংবা বিকালে রাত্রেও খাবার পাবে না, খাওয়ার জন্যে শাক-সব্জিও পাওয়া যাবে না। কেননা যে লোক সকালে বা কিবালে কিংবা শাক-সব্জি খেতে পারবে, সে তো مضطر 'খাবার না পেয়ে 'ঠেকায় পড়া'' ব্যক্তি নয়। এই কথার দুটি অর্থ। একটি—প্রয়োজন মৃত জীব খাওয়া মুবাহ করে দেয়। তা তার অনুগত কি নাফরমান বান্দা হওয়ার অবস্থা থেকে ভিন্নতর। সে مضطر এটাই বড় কথা। কেননা নবী করীম (স) প্রশ্নকারীর জবাবে মৃত খাওয়া মুবাহ হওয়ার ব্যাপারে অনুগত কি নাফরমান—এর মধ্যে কোন পার্থক্য দাঁড় করেন নি। বরং দুজনই যে এ ব্যাপারে অভিন্ন, তা স্পষ্ট। আর দ্বিতীয় অর্থ, মৃত জীব খাওয়া মুবাহ শুধুমাত্র ক্ষতির ভয় হওয়া অবস্থায়। অন্য অবস্থায় নয়।

## ধন-মালের যাকাত দেয়ার পরও কি কোন হক থাকে

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبْ الاٰيَةَ –

তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফেরাবে, এটাই কোন পূর্ণমাত্রার পূণ্যশীলতা নয় .....

বলা হয়েছে, আল্লাহ এই আয়াতে ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের লক্ষ্য করে কথা বলেছেন, তারা যখন কিবলা পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারল না, অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করল, তখন আল্লাহ জানিয়ে দিলেন যে, পূর্ণ মাত্রায় পূণ্যশীলতা হচ্ছে আল্লাহ্র আনুগত্য স্বীকার করা, তাঁর আদেশ পালন ও অনুসরণ। পূর্ব কিংবা পশ্চিমে মুখ করে দাঁড়িয়ে যাওয়াটাই কোন পূর্ণশীলতা নয়, যদি তা আল্লাহ্র আদেশ পালন ভিত্তিক না হয়। আর এক্ষণে আল্লাহ্র আনুগত্য হচ্ছে আল্লাহ্র আদেশানুক্রমে কাবার দিকে মুখ করা। কেননা কাবা ছাড়া অন্য কোন দিকে মুখ করে দাঁড়ানো মনসূখ হয়ে গেছে। অন্য কোন দিকে মুখ করলে আল্লাহ্র আনুগত্য লঙ্ঘন করা হবে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ –

বরং পূর্ণ মাত্রায় পূণ্যশীলতা হচ্ছে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি যথার্থ ঈমান আনা।

বলা হয়েছে, এখানে একটি শব্দ উহ্য রয়েছে। সঠিক অর্থ হচ্ছে, প্রকৃত পূর্ণশীলতা হচ্ছে তার পূণ্যশীলতা, যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে। এ-ও বলা হয়েছে যে, এ আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে, প্রকৃত পূণ্যশীল হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ অর্থাৎ প্রকৃত পূর্ণশীল সেই ব্যক্তি, যে তাঁর (আল্লাহ্র) ভালোবাসার কারণে মাল, ধন, সম্পদ দান করবে। عَلٰى حُبِّهٖ অংশের দুটি

অর্থ। একটি, ধন-মালের মুহব্বত। অর্থাৎ ধন-মালের মায়া-মুহব্বত থাকা সত্ত্বেও তা দান করে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ -

তোমরা কখনই পূর্ণমাত্রার পূণ্যশীলতা লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা সেই জিনিস থেকে ব্যয় করবে, যা তোমরা ভালোবাস।

দ্বিতীয় অর্থ বলা হয়েছে দান করার ভালোবাসা। অর্থাৎ দান করার সময় ক্রুদ্ধ অসন্তুষ্ট হবে না। হ্যাঁ, আরও একটা অর্থ হতে পারে, আর তা হল আল্লাহ্‌র মুহব্বত। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ -

বল তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালোবাস, তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ কর।

আর এক সাথে এই সব কটি অর্থ ও বক্তব্য হতে পারে।

নবী করীম (স) থেকে এ পর্যায়ে যে বর্ণনা এসেছে, তাতে মনে হয়, এখানে ধন-মালের মুহব্বতের কথাটাই মূল বক্তব্য। হাদীসটি জরীর ইবনে আবদুল হামীদ উমরাতা ইবনুল কাকা আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। বলছেন—এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট এসে প্রশ্ন করল, হে রাসূল! কোন দান-সাদকা অতীব উত্তম ? জবাবে বললেন ঃ

اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنٰى وَلَا تُمْهِلُ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ -

তুমি সাদকা করবে এ অবস্থায় যে, তুমি সুস্থ-সবল, তুমি দারিদ্র্যকে ভয় পাও, ধন-ঐশ্বর্যের আশা পোষণ করছ। আর তুমি অপেক্ষা করবে না সেই মুহূর্তের, যখন প্রাণটা কণ্ঠনালী পর্যন্ত উঠে এসেছে বের হয়ে যাওয়ার জন্যে। আর তখন তুমি বলতে থাক ঃ অমুককে এত, অমুককে এত আর অমুকের পাওনা ছিল ইত্যাদি।

আবুল কাসিম আবদুল্লাহ ইবনে ইসহাক আল-মেরওয়াজী, হাসান ইবনে রুবাই আল জুরজানী, আবদুর রাজ্জাক, সওরী, জুবায়দ, মুররা, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ সূত্রে 'এবং দিল ধন-মাল তার ভালোবাসা সত্ত্বেও' প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন ঃ এর অর্থ, তুমি ধন-মাল দান করবে এ অবস্থায় যখন তুমি সুস্থ-সবল জীবনে বেঁচে থাকার আশা পোষণ কর, দারিদ্র্যকে ভয় পাও। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى -

এবং মাল দেয় তার মায়া থাকা সত্ত্বেও নিকটাত্মীয়কে।

এর অর্থ এ-ও হতে পারে যে, ফরয সাদকা—অর্থাৎ যাকাত দেয়—হতে পারে নফল দান দেয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে এ আয়াতে ফরয সাদকা অর্থাৎ যাকাত দানের কথা বলা হয়েছে, তার কোন প্রমাণ নেই। এতে দান কাজে উৎসাহ দেয়া হয়েছে এবং সেজন্যে বিপুল সওয়াবের ওয়াদাও রয়েছে। কেননা এটা অধিক মাত্রার পূণ্যশীলতার ব্যাপার। এ শব্দটি ফরয দান ও নফল দান—উভয়কেই বোঝায়। তবে আয়াতটির পূর্বাপর প্রসঙ্গ ও পাঠের বিন্যাস থেকে বোঝা যায় যে, এখানে ফরয যাকাতের কথা বলতে চাওয়া হয়নি। কেননা এ আয়াতেই রয়েছে ঃ

وَاَقَامَ الصَّلٰوةِ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ –

এবং নামায কায়েম করেছে ও যাকাত দিয়েছে।

'যাকাত' শব্দটির স্পষ্ট উল্লেখ প্রমাণ করে যে, وَاٰتَى الْمَالَ বলে ফরয যাকাতের কথা বোঝাতে চাওয়া হয়নি।

কোন কোন লোক মনে করেন, وَاٰتَى الْمَالَ 'এবং মাল দিয়েছে' বলে যাকাত ছাড়া ধন-মালে আরও যে সব হক্-হকুক অবশ্যই আদায় করতে হয়, তার কথা বলা হয়েছে। যেমন সেলায়ে রেহমী হক—যখন কঠিন প্রয়োজন তীব্র হয়ে দেখা দেয়, তখন তা অবশ্যই আদায় করতে হয়। এ-ও হতে পারে যে, কোন নিকটাত্মীয়ের কঠিন ক্ষুধা নিকটাত্মীয়কে অত্যন্ত কাতর করে তুলেছে, যাতে ধ্বংস অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। তখন তাকে তার ক্ষুধা নিবৃত্ত করার পরিমাণ দেয়া একান্তই কর্তব্য।

শরীক আবূ হাসানাহ, আমের, ফাতিমা বিনতে কায়স সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

فِىْ الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكٰوةِ –

ধন-মালে যাকাত ছাড়াও হক ধার্য রয়েছে।

অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। সুফিয়ান আবুয-যুবায়র জাবির সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি উটের উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, তাতেও হক রয়েছে। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন ঃ

اِطْرَاقُ فَحْلِهَا وَاِعَارَةُ ذَلُوْلِهَا وَمِنْحَةُ سَمِيْنِهَا –

তার পুরুষ উটগুলোকে ঠাণ্ডা করা, তার পিঠে আরোহণকে ধার দেয়া এবং তার চর্বি দান করা।

বলেছেন, এ দুটি হাদীসের বক্তব্য হল ধন-মালে ফরয যাকাত ছাড়াও হক্ রয়েছে, যা অবশ্যই আদায় করতে হবে। প্রথম হাদীসটি সম্পর্কে বলা হয়েছে, তা— لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وَجُوْهَكُمْ اِلَيْهَ এর ব্যাখ্যা। ধন-মালে যাকাত ছাড়াও হক রয়েছে—একথার অর্থ এ-ও হতে পারে যে, দরিদ্র মুহররম লোকদের জন্যে অর্থ খরচ করে 'সেলায়ে রেহমী' রক্ষা করতে হবে। পিতা-মাতা ও রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়রা দরিদ্র, কামাই-রোজগারে

অক্ষম হলে সন্তানকে সরকার বাধ্য করবে তাদের জরুরী প্রয়োজন পূরণ করার জন্যে। এ ছাড়া সাধারণ ক্ষুধাকাতর বিপদগ্রস্ত লোকদের খাবার দেয়ার কথাও বলা হতে পারে এ আয়াতে। মুস্তাহাব—ওয়াজিব—ফরয নয়, এমন হক আদায়ের কথাও হয়ত এ আয়াতের বক্তব্য। কেননা ধন-মালের উপর হক ধার্য আছে—এ কথা থেকে ওয়াজিব ফরয প্রমাণ হয় না। কেননা মুস্তাহাব হকও তো রয়েছে। অবশ্য ফরয হকও যে আছে, তা-ও স্বীকার্য।

আবদুল বাকী আহমদ ইবনে হাম্মাদ ইবনে সুফিয়ান কাসীর ইবনে উবায়দ, বাকীয়াতা বনু তমীম গোত্রের এক ব্যক্তি—উপনাম আবূ আবদুল্লাহ—জবিশাবী মসরূক হযরত আলী (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

نَسَخَتِ الزَّكٰوةُ كُلَّ صَدَقَةٍ –

যাকাত ফরয হয়ে সর্ব প্রকারের সাদকা নাকচ করে দিয়েছে।

আবদুল বাকী হুসায়ন ইবনে ইসহাক তসতরী, আলী ইবনে সাঈদ, মুসাইয়্যিব ইবনে শরীক, উবায়দ-আল-মাকতব, আমের মসরূক হযরত আলী (রা) সূত্রে 'যাকাত সব দানকে মনসূখ করেছে' এই মর্মের হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসটি যদি নবী করীম (স) থেকে সহীহও প্রমাণিত হয়ে থাকে, তা হলে বুঝাতে হবে, সব ওয়াজিব সাদ্কা ফরয যাকাত দ্বারা মনসূখ হয়ে গেছে। আর তা যদি স্বয়ং রাসূলে করীম (স)-এর কথা (মরফু) না হয়ে থাকে বর্ণনাকারীকে তা না জানার কারণে, তবু হযরত আলীর কথা হিসেবে তা উত্তম সনদে حسن বর্ণিত। তা-ও পূর্বে ওয়াজিব থাকা সব দান-সাদকা ফরয যাকাত দ্বারা মনসূখ হওয়া পুরামাত্রায় প্রমাণিত মনে করতে হবে, বুঝতে হবে, তা توقيف 'আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত' পন্থায়ই জানা গেছে। আর এ-ও জানা গেল যে, হযরত আলী (রা) যা বলেছেন, তা নবী করীম (স) বিশেষভাবে তাঁকে জানিয়েছিলেন বলেই তিনি তা বলেছেন। এখন যে সব দান-সাদকা মনসূখ হয়ে গেছে, তা পূর্বে ওয়াজিব ছিল। প্রথম দিক দিয়ে তা আদায় করা একান্তই কর্তব্য ছিল। পরে তা নাকচ হয়ে যায় ফরয যাকাত দ্বারা। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ –

মীরাস বণ্টনকালে নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীন যদি উপস্থিত থাকে, তা হলে সে মীরাস থেকে তাদের রিযিক দানের ব্যবস্থা কর।

আল্লাহ্র আদেশ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ এবং ফসল কাটার দিন ফসলের (বা আল্লাহ্র) হক দিয়ে দাও। পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, কোন কোন লোক মনে করেন, ওশর ও অর্ধ ওশর ফরয হওয়ার কারণে এ আদেশ মনসূখ হয়ে গেছে।[১] মনসূখ হয়েছে যাকাত

১. এ আয়াত দ্বারাই বরং ওশর ও অর্ধ-ওশর ফরয হয়েছে। তা হলেও আয়াত মনসূখ হয়েছে, এ কথা কি করে সহীহ হতে পারে ?—অনুবাদক

ফরয দ্বারা, যেমন ধন-মালে বিনা প্রয়োজনে এসব ওয়াজিব হক মনসূখ হয়েছে। আমরা যে হক-এর কথা উল্লেখ করেছি, তা কামাই-রোজগারে অক্ষম রক্ত সম্পর্কে আত্মীয়দের জন্যে ব্যয় করার আবশ্যক হয়ে পড়ে এবং ক্ষুধার্ত ঠেকায় পড়া লোককে খাবার খাওয়ানো জরুরী হয়ে পড়ে। এই ফরযগুলো নিতান্তই বাধ্যতামূলক, তা যাকাত দ্বারা কখনই মনসূখ হয়ে যায় নি। সাদকায়ে ফিতরও ওয়াজিব হয়ে রয়েছে সব ফিকাহবিদদের মতে, তা-ও যাকাত দ্বারা মনসূখ হয়ে যায় নি। যদিও শুরুতে তা আল্লাহ্র দিক থেকে ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছিল, বান্দার দিক থেকে কোন কারণ ছিল না তার ওয়াজিব হওয়ার। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যাকাত 'সাদকায়ে ফিতর' বাতিল করেনি। ওয়াকিদী আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান, জুহরী, উরওয়া, আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ নবী করীম (স) যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বেই সাদকায়ে ফিতর দেয়ার আদেশ করেছিলেন। পরে যখন যাকাত ফরয হল, তখন তিনি নতুন করে সে বিষয়ে কোন আদেশও দেন নি, তা দিতে নিষেধও করেননি, লোকেরা তা যথারীতি দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই সংবাদ যদি সত্য—বিশ্বাস্য হয়, তা হলে এক্ষণে তা যাকাত ফরয হওয়ার দরুন মনসূখ হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। সাদকায়ে ফিতর যথারীতি ওয়াজিব থাকা নিষিদ্ধ হয়ে যায়নি। আর অধিক উত্তম কথা এই যে, যাকাত ফরয হয়েছে সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ারও পূর্বে। কেননা হা-মীম আস্‌সিজদা সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। সূরাটি প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। আর তাতেই রয়েছে এ আয়াত ঃ

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ لَايُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ -

> সেসব মুশরিকদের জন্যে দুঃখময় পরিণতি, যারা যাকাত দেয় না এবং পরকালের প্রতিও তারা অবিশ্বাসী।[১]

আর সাদকায়ে ফিতর দেয়ার আদেশ হয়েছে মদীনায়। তাতে প্রমাণিত হয় যে, যাকাত আগে ফরয হয়েছে, সাদকায়ে ফিতর দেয়ার হুকুম হয়েছে পরে। ইবনে উমর ও মুজাহিদ থেকে 'এবং দাও তার হক ফসল কাটার দিন' এ আদেশ পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে; তা জনগণের উপর ধার্য একটি ওয়াজিব হক এবং যাকাতের বাইরে। বান্দাদের সৃষ্ট কারণে যেসব হক-হুকুক ওয়াজিব হয়েছে, তা হচ্ছে কাফ্ফারা ও মানতসমূহ। যাকাত যে এসব হক বাতিল করেনি, সে বিষয়ে সকলেই একমত। আর ইয়াতীম বলতে আয়াতে যেসব অল্প বয়স্ক দরিদ্র ছেলেমেয়েদের বোঝানো হয়েছে, যাদের পিতা মরে গেছে। আর 'মিসকীন' কারা এ বিষয়ে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। পরে সূরা 'বরায়াত' পর্যায়ে আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করব। 'ইবনুস সাবীল'—'পথের পুত্র', মুজাহিদ থেকে বর্ণিত সে হচ্ছে পথিক, প্রবাসী (যার পাথেয় নিঃশেষ হয়ে গেছে), কাতাদাহ্র মতে সে হচ্ছে

---

১. এ আয়াত দ্বারা যাকাত ফরয হয়ে যায়নি। বস্তুত মক্কী আয়াতসমূহে যাকাত দেয়া মুসলিমদের বিশেষ গুণ ও না দেয়া কাফির মুশরিকদের পরিচিতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু 'যাকাত দাও' এই ধরনের কোন হুকুম মক্কী আয়াতে নাযিল হয়নি। তা হয়েছে মাদানী সূরায়—অনুবাদক।

মেহমান। প্রথম অর্থটিই অধিক ঠিক। কেননা নাম-ই রাখা হয়েছে 'ইব্‌নুস সাবীল—পথের পুত্র। সে তো মুসাফির বা প্রবাসীই হতে পারে। কেনা সে পথিক, পথ অতিক্রম করে যাওয়াই তার কাজ। যেমন পাখিকে বলা হয়েছে الاوزابن ماء কেননা তা সব সময় পানিতেই অবস্থান করে।

السائلين। প্রার্থনাকারী, সাদকা বা দান চাওয়া লোকেরা; যারা দান বা সাহায্য চেয়ে বেড়ায়। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ –

তাদের ধন-মালে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতের প্রাপ্য হক রয়েছে।

আবদুল বাকী ইবনে নাফে মুয়ায ইবনুল মুসান্না, মুহাম্মাদ ইবনে কাসীর, সুফিয়ান, মুসয়িব ইবনে মুহাম্মাদ, ইয়ালা ইবনে আবূ ইয়াহ্ইয়া, ফাতিমা বিনতে হুসায়ন ইবনে আলী (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لسَّائِلِ حَقٌّ وَاِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ –

প্রার্থনাকারী ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে এলেও তার 'হক' (প্রাপ্য) রয়েছে।

আবদুল বাকী ইবনে কানে উবায়দ ইবনে শরীক, আবুল জামাহির, আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ ইবনে আসলাম, তাঁর পিতা আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَعْطُوْالسَّائِلَ وَاِنْ اَتَى عَلَى فَرَسٍ –

প্রার্থনাকারীকে তোমরা দাও, যদিও সে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে আসে।

## কিসাস

আল্লাহ্‌র তা'আলা বলেছেন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِىْ الْقَتْلٰى –

হত্যাকাণ্ডে তোমাদের প্রতি কিসাস ফরয করা হয়েছে।

এ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ কথা। এর পরে যা মূল আয়াতে বলা হয়েছে, তার কোন প্রয়োজন পড়ে না, তা বলা না হলেও পূর্ণ তাৎপর্য পাওয়ায় কোন অসুবিধা হতো না। এতটুকু বলে শেষ করলেও তাতে ব্যবহৃত শব্দ থেকে তার তাৎপর্য সহজেই বোঝা যেত। এর বাহ্যিক অর্থই এ কথা বুঝিয়ে দেয় যে, সমস্ত নরহত্যার ক্ষেত্রে কিসাস কার্যকর করা মুমিনদের কর্তব্য। আর 'কিসাস' হচ্ছে একজনের সাথে যে আচরণ কেউ করেছেন, তার সাথে সেইরূপ আচরণ করা। এটা 'কিসাস'-এর শব্দার্থ। আরবী ভাষায় বলা হয়, অমুকে যেমন করেছে তার সাথে সমান সমান তেমনই কর। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَارْتَدَّا عَلَى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا – (الكهف : ٦٤)

অতঃপর তারা দুজনই নিজেদের পায়ের চিহ্ন দেখে দেখে পুনরায় ফিরে গেল।

এ আয়াতের قَصَصًا অর্থ পায়ের চিহ্নের উপর পা রাখা।

আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيْهِ – (القصص : ١١)

এবং তার বোনকে বলল ঃ তার পেছনে পেছনে যাও। তার পায়ের চিহ্ন অনুসরণ ও অনুসন্ধান কর।

মূল আলোচ্য আয়াতে كُتِبَ عَلَيْكُمْ অর্থ তোমাদের প্রতি ফরয করা হয়েছে। যেমন ঃ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ 'তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে।' এবং

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا نِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ –

তোমাদের কারোর মৃত্যু নিকটে উপস্থি হলে যদি সে ধন-মাল রেখে যেয়ে থাকে, পিতা-মাতার জন্যে অসয়িত করা ফরয করা হয়েছে।

বস্তুত মীরাসী আইন নাযিল হওয়ার পূর্বে পিতা-মাতার জন্যে অসিয়ত করা ফরয ছিল। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও এমনিভাবে ফরয করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে মুমিনদের উপর কিসাস ফরয করে দেয়া হয়েছে, যখন তারা হত্যাকার্য করবে। এই কিসাস সকল নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীর উপর কার্যকর হবে। কেননা 'নিহত' কথাটি সাধারণ ও ব্যাপক। বিশেষভাবে লক্ষ্য হচ্ছে হত্যাকারীরা। কেননা হত্যাকাণ্ড ঘটলে সে কাণ্ডের কর্তা হবে হত্যাকারী। তাই প্রত্যেক হত্যাকারীর উপরই 'কিসাস' কার্যকর হতে হবে। তা অস্ত্র দ্বারা ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারীর উপরই জারী হবে, সব হত্যাকারীই সমান ও নির্বিশেষভাবে দণ্ডনীয়। নিহত ব্যক্তি যে-ই হোক, ক্রীতদাস হোক, যিম্মী হোক, পুরুষ হোক, নারী হোক। কেননা মূল আয়াতে ব্যবহৃত اَلْقَتْلٰى 'নিহত' শব্দটি এই সবকেই শামিল করে। আয়াতে সম্বোধন যদিও মুমিনদের প্রতি, নিহতের জন্যে 'কিসাস' কার্যকর করা তাদের উপর বাধ্যতামূলক কর্তব্য। তার অর্থ এ নয় যে, মুমিন ব্যক্তি নিহত হলেই 'কিসাস' করতে হবে, অন্য কেউ নিহত হলে 'কিসাস' করতে হবে না। না, সে অর্থ নয়। ব্যবহৃত শব্দের সাধারণ ও নির্বিশেষ তাৎপর্য অনুসরণ করাই আমাদের কর্তব্য বিশেষীকরণের দলীল না পাওয়া পর্যন্ত। আর এ আয়াত কোন কোন নিহতের কিসাস করতে হবে, অন্য কোন কোন নিহতের 'কিসাস' করতে হবে না, এমন কথা নেই।

যদি কেউ বলেন, القتلى। শব্দটিতেই হুকুমটি বিশেষীকরণ করা হয়েছে। তা দুটি দিক দিয়ে বোঝা যায়। একটি, আয়াতটির বিন্যাস ঃ

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ –

অবশ্য কোন হত্যাকারীর প্রতি তার ভাই যদি কিছু নম্র ব্যবহার করতে প্রস্তুত হয়, তাহলে প্রচলিত ন্যায়-নীতি অনুযায়ী রক্তপাতের প্রতিবিধান করা আবশ্যক।

কাফির ব্যক্তি তো মুসলমানদের ভাই হতে পারে না। তাহলে আয়াতটিই প্রমাণ করল যে, এই কিসাস কেবলমাত্র মুমিন নিহত ব্যক্তির ক্ষেত্রেই কার্যকর হবে। আর দ্বিতীয়, আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاَنْثٰى بِالْاُنْثٰى –

স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন নিহত ব্যক্তির বদলে, মেয়ে লোক নিহতের বদলে মেয়েলোক...

এ কথায় 'কিসাস' যথার্থ হয় না।

জবাবে বলা যাবে, এই গোটা কথাই সম্পূর্ণ ভুল দুটি দিক দিয়ে। একটি হচ্ছে সম্বোধনের প্রাথমিক শব্দগুলো নির্বিশেষে সকলকেই সমানভাবে শামিল করেছে। পরে তার উপর বিশেষের শব্দে যুক্ত করে যা বলা হয়েছে, তা শব্দের সাধারণ তাৎপর্যকে বিশেষীকরণ করা কর্তব্য বানিয়ে দেয় না। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ –

তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা নিজেদেরকে তিন হায়য সময়কাল পর্যন্ত (পুনর্বিবাহ) থেকে বিরত রাখবে।

তিন তালাকপ্রাপ্তা সব মেয়েই এ হুকুমে সাধারণভাবেই শামিল রয়েছে। যারা তিন তালাক পায়নি, সময় পেয়েছে তারাও এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। পরে এরই সাথে যোগ করে বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَابَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْفَرِّقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ–

যখন তারা তাদের ইদ্দতের মেয়াদ পূর্ণ করে ফেলবে, তখন হয় তাদেরকে প্রচলিত নিয়মে বেঁধে রাখ অথবা প্রচলিত ন্যায়-নীতি অনুযায়ী তাদেরকে ছেড়ে দাও।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ –

এ ক্ষেত্রে ফিরিয়ে নেয়ার বেশি অধিকার সম্পন্ন।

এ হুকুমটি বিশেষভাবে সেই স্ত্রীর জন্যে, যাকে তিন তালাকের কম দেয়া হয়েছে। তাদের সকলের জন্যে তিন 'কুরূ' ইদ্দত পালন ওয়াজিব করে দেয়নি সাধারণ অর্থবোধক শব্দকে এই বিশেষীকরণের দরুন। কুরআনে এর বহু সংখ্যক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, উপরের আয়াতে তাই বলা হয়েছে বংশীয় সম্পর্কের দিক দিয়ে, দ্বীন-এর দিক দিয়ে নয়। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدً 'এবং আদ গোত্রের লোকদের প্রতি পাঠানো হয়েছিল তাদের ভাই হূদকে।'

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'স্বাধীন স্বাধীনের বদলে, দাস দাসের বদলে'—'নিহত ব্যক্তি' বলে সাধারণ অর্থের কথা বলা হয়েছে। উক্ত কথাটি দ্বারা শব্দের সাধারণত্বে বিশেষীকরণ জরুরী হয় না। কেননা প্রথম সম্বোধনে যখন স্বয়ংসম্পূর্ণ, পরবর্তী কথার মুখাপেক্ষী নয়,

তখন তাতে সীমাবদ্ধ করা আমাদের জন্যে সঙ্গত হতে পারে না। اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ আল্লাহ্র এই কথা পূর্বে বলা কথার ব্যাখ্যা তাগিদ স্বরূপ বলা হয়েছে। তাতে কথাটি যে অবস্থার প্রেক্ষিতে বলা, তারই উল্লেখ হয়েছে। শাবী ও কাতাদাহ বলেছেন, দুটি আরব গোত্রের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধে চলছিল। তাদের একটি অপর গোত্রের উপর প্রাধান্য সম্পন্ন ছিল। তখন তারা বলল ঃ 'আমরা থামব না, থামব তখন, যখন আমাদের একটি গোলামের বদলে প্রতিপক্ষের একজন স্বাধীন ব্যক্তিকে, আমাদের একজন মেয়ে লোকের বদলে প্রতিপক্ষে একজন পুরুষকে হত্যা করতে পারব। তখন আল্লাহ্ নাযিল করলেন ঃ

তোমাদের প্রতি তো 'কিসাস' (সমান সমান দণ্ড) ফরয করা হয়েছে। একজন স্বাধীন ব্যক্তির বদলে অনুরূপ একজন স্বাধীন ব্যক্তি, একজন গোলামের বদলে অনুরূপ একজন গোলাম মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

এ কথার দ্বারা ওদের কথাটিকে বাতিল করে দেয়া হয়েছে এবং হত্যাকারীর উপর কিসাস যে ফরয তা তাগিদ করে বলা হয়েছে। এর কমে কিসাস হয় না। কেননা ওরা হত্যা করত যে আসল হত্যাকারী নয় তাকে। এই কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে এই কাজ করতে নিষেধ করেছেন। রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীসের অর্থও তাই। তিনি বলেছেন ঃ

مِنْ اَعْتَى النَّاسَ عَلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِه، وَرَجُلٌ قَتَلَ فِى الْحَرَمِ، وَرَجُلٌ اَخَذَ بِذُحُوْلِ الْجَاهِلِيَّةِ –

কিয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে অধিক দুষ্ট প্রকৃতির প্রমাণিত হবে তিন ব্যক্তি। একজন—যে হত্যা করল যে হত্যা করেনি তাকে, আর এক ব্যক্তি যে হারাম শরীফে হত্যাকাণ্ড করেছে, আর এক ব্যক্তি যে জাহিলিয়াতের যুগের প্রতিহিংসার কারণে পাকড়াও করেছে।

উপরন্তু আল্লাহ্র কথা ঃ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ – وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ তাফসীর হচ্ছে শব্দের সাধারণ অর্থ যত কিছু শামিল করে তার। তাতে শব্দটিকে বিশেষীকরণের আওতায় আনা জরুরী হয় না। বিবেচ্য রাসূলের এই কথাটি ঃ – اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ 'গম গমের বদলে, সমান সমান' এ পর্যায়ে ছয় প্রকারের ফসলের উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু সূদ সংক্রান্ত হুকুম মাত্র এই ছয়টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকা জরুরী নয়। এছাড়া অন্যান্য শস্য দানায় সূদ হয় না। তা বলা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়। আল্লাহ্র স্বাধীন স্বাধীনের বদলে, দাস-দাসের বদলে কথাটিও এ পর্যায়েই। শুরুতে বলল 'তোমাদের নিহতের কিসাস লওয়া ফরয করে দেয়া হয়েছে' কথাটিতে যে সাধারণত্ব রয়েছে, তা গণ্য ঐ কথাটি নিষেধ করে না। 'কিসাস'-এর সাধারণ আদেশকে ঐ কথার বিশেষীকরণের মধ্যে সীমিত করে দেয়া কোনক্রমেই জরুরী হয় না। তাতে যাদের উল্লেখ নেই তাদের কিসাস করতে কোন বাঁধা নেই। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে গোলাম হত্যা করা এবং পুরুষের বদলে মেয়েলোক হত্যা করা নিষিদ্ধ নয়; বরং ইতবাচকভাবে তাতে সকলেই একমত।

তাই 'স্বাধীনের বদলে স্বাধীন' কথাটি সকল ধরনের নিহতের ক্ষেত্রে কিসাস কার্যকর করার পথে কিছু মাত্র প্রতিবন্ধক নয়।

কেউ যদি বলেন, নিহতের অভিভাবক যখন ক্ষমা করে দেয়া ও কিসাস লওয়া এ দুটির যে কোন একটি করার অধিকারী, তখন 'কিসাস' কার্যকর হবে কি করে?

জবাবে বলা যাবে—না, ক্ষমা করে দেয়ার (বা রক্তমূল্য গ্রহণের) ইখতিয়ার অভিভাবকের আছে বটে; কিন্তু তা তার উপর ফরয রূপে ধার্য করা হয়নি। বরং হত্যাকারীর উপর ফরয, সে অভিভাবকের নিকট থেকে যে কোন ভাবে ক্ষমা নিতে চেষ্টা করতে পারে। 'তোমাদের উপর নিহতের জন্যে কিসাস লিখে দেয়া হয়েছে' এই কথার ভিত্তিতে। 'কিসাস' অভিভাবকের উপর নয়; বরং এটা তার হক। অতএব তা হত্যাকারীর উপর কিসাস ফরয হওয়ার পরিপন্থী নয়। যার জন্যে এই কিসাস, যদিও তার ইখতিয়ার আছে যা কিছু করার। এ আয়াত প্রমাণ করে যে, দাসের বিনিময়ে স্বাধীন ব্যক্তি, যিম্মীর পরিবর্তে মুসলিম ব্যক্তি এবং মেয়েলোকের পরিবর্তে পুরুষ ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে। কেননা সম্বোধনের শুরুতে সমস্ত হত্যাকাণ্ডে সাধারণভাবে কিসাসের হুকুম দেয়া হয়েছে। স্বাধীনকে স্বাধীনের পরিবর্তে ও অন্য যার যার উল্লেখ হয়েছে, তার বিশেষীকরণে 'কিসাস' কেবল তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে—এমন কথা জরুরী নয়। কিসাস ফরয হওয়ার প্রাথমিক সম্বোধন সাধরণ ও ব্যাপক অর্থ সম্পন্ন। তা অগ্রাহ্য করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

এরই দৃষ্টান্ত—যে সব আয়াতে কিসাসকে সাধারণ রাখা হয়েছে—এই আয়াতটি ঃ

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا –

যে লোক মজলুম হিসেবে—অকারণ নিহত হবে, তার অভিভাবকের জন্যে অধিকার কর্তৃত্ব বানিয়ে দিয়েছি।

জুলুম হিসেবে—আকারণে ও অন্যায়ভাবে—যত লোকই নিহত হবে, তাদের সকল লোকই এই সাধারণ সিদ্ধান্তের আওতাভুক্ত। তাদের অভিভাবকগণের জন্যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তা হল প্রতিশোধ গ্রহণ। সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, سُلْطَانٌ অর্থ প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার। কোন স্বাধীন মুসলিম ব্যক্তি নিহত হলে তার অভিভাবকের অধিকার রয়েছে সেই প্রতিশোধ গ্রহণের। কেননা আয়াতের এই তাৎপর্যই সর্বসম্মত। তাই আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। سُلْطَانٌ শব্দটি অস্পষ্ট হলেও সর্বসম্মতভাবে গৃহীত তাৎপর্য দ্বারা তা জ্ঞাত ও পরিচিত।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا এক সাধারণ ও ব্যাপক ভিত্তিক কথা। তার বাহ্যিক অর্থের এই দিকটিকেই সামনে রাখতে হবে। শব্দের দাবিও তাই।

আরও একটি আয়াতে তার দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ্য। তা হচ্ছে ঃ

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ –

কিসাসে তাদের উপর ফরয করে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ .....

এই আইন বনী ইসরাঈলীদের উপর জারী করা হয়েছিল। সব ধরনের নিহত ব্যক্তির জন্যে কিসাস ফরয হওয়ার ব্যাপারে এ এক সাধারণ বিধান। ইমাম আবূ ইউসূফ এই আয়াতকে দলীল রূপে ভিত্তি করেই ক্রীতদাসের বদলে স্বাধীন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার রায় দিয়েছিলেন। এ থেকে তাঁর এই মতটিও জানা যায় যে ঃ

إِنَّ شَرِيْعَةَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ثَابِتَةٌ عَلَيْنَا مَالَمْ يَثْبُتْ نَسْخُهَا عَلَى لِسَانِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

আমাদের পূর্বগামী নবীগণের শরীয়াত যদি রাসূলে করীম (স) দ্বারা মনসূখ প্রমাণিত না হয়ে থাকে, তাহলে তা আমাদের উপর অবশ্যই প্রযোজ্য হবে।

আর কুরআন ও সুন্নাতে এমন কিছুই আমরা পাই নি, যদ্দ্বারা বলা যেতে বলা যে, এই আইনটি মনসূখ হয়ে গেছে। এতএব এ আইনটি তার শব্দের বাহ্যিক দাবি অনুযায়ী আমাদের উপর অবশ্যই কার্যকর হবে। আর তা হচ্ছে, সকল মানব প্রাণীকে হত্যার কিসাস অবশ্যই হতে হবে। তার দৃষ্টান্ত আরও একটি আয়াত ঃ

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ -

অতএব যে লোক তোমাদের উপর বাড়াবাড়ি করেছে, তোমরাও তার উপর বাড়াবাড়ি কর যতটা বাড়াবাড়ি সে তোমাদের উপর করেছে।

কেননা যে লোক তার অভিভাবককে হত্যা করেছে, সে তো তার উপর একজন বাড়াবাড়িকারী, সীমালঙ্ঘনকারী। সব নিহতের ব্যাপারে এ-ও একটি সাধারণ ব্যাপক ভিত্তিক কথা।

এ আয়াতটিও অনুরূপ ঃ

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ -

তোমরা যদি প্রতিশোধ লও-ই তাহলে যতটা তোমাদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে।

এ আয়াতও স্বাধীন গোলাম, পুরুষ-নারীর ও মুসলিম-যিম্মী—সকলের ক্ষেত্রেই কিসসা সাধারণভাবে ফরয করেছে।

## স্বাধীন ব্যক্তিকে ক্রীতদাসের বিনিময়ে হত্যা করার সমস্যা

আবূ বকর বলেছেন, স্বাধীন মানুষ ও ক্রীতদাসের পারস্পরিক বদলে কিসাস কার্যকর করার ব্যাপারে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ ও জুফর প্রমুখ বলেছেন, স্বাধীন মানুষ ও গোলাম মানুষের মধ্যে পারস্পরিক 'কিসাস' কার্যকর হবে শুধু নরহত্যার ক্ষেত্রে। তাই গোলামের বদলে স্বাধীন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে হবে। অনুরূপভাবে গোলাম ব্যক্তিকেও হত্যা করা হবে স্বাধীন ব্যক্তির বদলে।

ইবনে আবূ লায়লা বলেছেন, তাদের পারস্পরিকভাবে কিসাস কার্যকর হবে সকল

যখমের ক্ষেত্রেও, যেখানে 'কিসাস' কার্যকর করা সম্ভব। ইবনে অহব ইমাম মালিকের এই মত বর্ণনা করেছেন, যখম করার অপরাধের ক্ষেত্রে স্বাধীন ও গোলামের মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের অবকাশ নেই। বরং স্বাধীন মানুষের বদলে গোলাম হত্যা হবে, কিন্তু গোলামের বদলে স্বাধীন মানুষকে হত্যা করা যাবে না।

লাইস ইবনে সা'দ বলেছেন, গোলাম যদি অপরাধী হয়, তাহলে তার কিসাস করতে হবে। কিন্তু গোলামের জন্যে স্বাধীন মানুষের উপর কিসাস কার্যকর করা যাবে না। বলেছেন, গোলাম যদি স্বাধীন মানুষকে হত্যা করে, তাহলে নিহতের অভিভাবক হত্যাকারী গোলামের প্রাণ হরণের অধিকারী হবে। গোলাম যদি প্রাণ হরণের কম মাত্রার অপরাধ করে, তাহলে আহত ব্যক্তি চাইলে অপরাধীর উপর কিসাস কার্যকর করতে পারবে।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যার উপর প্রাণ হরণ অপরাধের কিসাস কার্যকর করা যাবে, তার উপর অহতকরণ অপরাধের কিসাসও কার্যকর করা যাবে। কিন্তু গোলামের বদলে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না এবং প্রাণ হরণ অপরাধের কর্মে গোলামের জন্যে স্বাধীন মানুষের কিসাস করা যাবে না। আয়াতটি স্বাধীন মানুষ ও গোলামদের পরস্পরের মধ্যে কেবলমাত্র প্রাণ হরণ অপরাধের ক্ষেত্রেই কিসাস ফরয হওয়ার দলীল এই দিক দিয়ে যে, আয়াতটিতে নিহতের প্রসঙ্গে হুকুম এনেছে মাত্র। তার তুলনায় কম মাত্রার অপরাধে—আঘাতে যখমে—কসাস লওয়ার বিষয় কিছুই বলা হয়নি। প্রতিশোধ গ্রহণ ও সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রেও কিসাসের আয়াত নীরব। কুরআনের আয়াতের এই সাধারণত্ব গোলামের বদলে স্বাধীন মানুষকে হত্যা করার দাবি রাখে। আর যেহেতু স্বাধীন মানুষের বদলে গোলাম হত্যা করার ব্যাপারে সকলেই একমত; তাই গোলামের বদলে স্বাধীন মানুষ হত্যা করা অবশ্যই কর্তব্য হবে। প্রমাণিত হল যে, আয়াতটির এটাই মূল বক্তব্য। আয়াতটির ভাবধারা দাস নিহত হোক, কি হত্যাকারী হোক, তার মধ্যে কিসাস লওয়ার ব্যাপারে পার্থক্যের সৃষ্টি করে নি। তা এই উভয় অবস্থার প্রেক্ষিতেই সাধারণ ও ব্যাপক। একথা এই আয়াতটিও সমর্থন করে। বলা হয়েছে ঃ

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ -

হে বুদ্ধিমান লোকেরা। কিসাসেই তোমাদের জীবন নিহিত।

আল্লাহ এ আয়াতটির দ্বারা জানিয়ে দিয়েছেন যে, কিসাস অবশ্যই কার্যকর হতে হবে, তা কার্যকর করা ওয়াজিব। কেননা আমাদের জীবন তাতেই নিহিত এ আয়াতের সম্বোধনে স্বাধীন ও গোলাম সর্বশ্রেণীর মানুষই শামিল। আয়াতটির শেষে 'হে বুদ্ধিমান লোকেরা' বলে যাদের সম্বোধন করা হয়েছে, তা ব্যাপক অর্থবোধক, কোন মানুষই তার বাইরে নয়। সকলের মধ্যেই যখন সেই একই 'ইল্লাত' রয়েছে, তখন লোকদের মধ্য থেকে কতককে তার মধ্যে শামিল মনে করা ও অন্যদেরকে তার বাইরে মনে করা কোন ক্রমেই সঙ্গত হতে পারে না।

আর সুন্নাতের দৃষ্টিতেও সকলকেই তার মধ্যে সমানভাবে গণ্য মনে করতে হবে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَا فَأُ دِمَاؤُهُمْ -

মুসলমানদের রক্ত সম্পূর্ণ সমান মর্যাদার।

এই কথাটি স্বাধীন গোলামসহ মুসলিমকে পরিব্যাপ্ত করে। কোন দলীল ছাড়া এর মধ্য থেকে কাউকে বিশেষীকরণের আওতায় আনা যেতে পারে না।

উক্ত কথাটি অপর একটি দিক দিয়েই প্রমাণিত। তা হল, গোলাম যদি হত্যাকারী হয়, তাহলে যেমন তার কিসাস হবে, তেমনি সে নিহত তলেও তার হত্যাকারীর কিসাস হবে—এ ব্যাপারে সকল ফিকাহবিদই সম্পূর্ণ একমত। এক্ষেত্রে হত্যাকারী হওয়া বা নিহত হওয়ার মাঝে কোন পার্থক্যই করা হয়নি।

যদি বলা হয়, হাদীসের শুরুতে যখন বলা হয়েছে وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ اَدْنَاهُمْ 'তাদের সাধারণ হীন-নীচ ব্যক্তি সেই লোকদের যিম্মায় চেষ্টা করবে' এতে সেই গোলামের কথাই বলা হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, সম্বোধন সূচনায় গোলামকে লক্ষ্য করা হয়নি।

জবাবে বলা যাবে, এই কথাটি ভুল এদিক দিয়ে যে, গোলাম হত্যাকারী হলে তার কিসাস হওয়ার ব্যাপারে কোন ভিন্নমত নেই। তাই উক্ত কথাটিও বক্তব্য হতে পারে, যখন সে হত্যাকারী হবে। তখন সে নিহত হলে তখনও যে সেই একই লক্ষ্য সামনে থাকতে পারে, তার প্রতিবন্ধক কিছু নেই। তাছাড়া 'তাদের যিম্মায় নিকৃষ্ট ব্যক্তি চেষ্টা করবে' কথায় গোলামকে অপর লোক থেকে বিশেষীকরণ করার কোন ভাব নেই। কেননা اَدْنَاهُمْ অর্থ সংখ্যায় কম হওয়া। যেমন বলা হয়, তাদের মধ্য থেকে একজন। অতএব সম্বোধনের সূচনায় কেবল স্বাধীন মানুষের কথা বলা হয়েছে, গোলামের কথা বলা হয়নি, এই সংকীর্ণতা আবশ্যিক হওয়ার সাথে তার কোনই সম্পর্ক নেই। তাছাড়া যদি বলা হতোঃ 'তাদের যিম্মায় তাদের গোলাম চেষ্টা করবে' তবুও স্বাধীন ব্যক্তির রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের তার হুকুমটি বিশেষীকরণ কর্তব্য হতো না। কেননা ওটা একটা স্বতন্ত্র হুকুম, নতুন করে তার উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বিশেষভাবে গোলামের উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন বোঝা যায় যে, গোলাম নয় এমন ব্যক্তির তাদের যিম্মায় চেষ্টা করা অধিক উত্তম। তাই ওই হুকুমে গোলামকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলেও তারই সাথে তা বিশেষীকৃত হবে, অন্যদেরকে শামিল করা হবে না, তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কেননা কিসাসের সাধারণ হুকুমকে বিশেষীকরণ উত্তম হবে, তা জরুরী নয়।

যদি বলা হয়, রাসূলের কথা ঃ اَلْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ 'মুসলমানদের রক্ত সমান মর্যাদার অধিকারী' কথাটির দাবি হচ্ছে রক্তের সমমূল্যতা, সমান মর্যাদা ও অধিকার। অথচ গোলাম স্বাধীনের সমান নয়।

জবাবে বলা যাবে, নবী করীম (স) রক্তের ব্যাপারে উভয়কেই সমান ও পার্থক্যহীন বানিয়েছেন। কেননা এই সমতা ও অভিন্নতাকে ভিত্তি করা হয়েছে ইসলামের উপর। যে বলেছেন যে, স্বাধীনের রক্ত গোলামের রক্তের সমান নয়, সে রাসূলের ঘোষণার বিদ্রোহী এবং দলীল প্রমাণহীন বিরোধী।

এই কথা প্রমাণ করে আবদুল বাকী ইবনে নাফে বর্ণিত হাদীস। তিনি মুয়ায ইবনুল মুসান্না, মুহাম্মাদ ইবনে কাসীর, ফিয়ান, আল-আমাশ, আবদুল্লাহ ইবনে মুররা, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَايَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰه اِلَّا فِىْ اِحْدَى ثَلَاثٍ : اَلتَّارِكُ لِلاِسْلَامِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِىْ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ -

যে মুসলিম ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কালেমার সাক্ষ্য দেয়, তার রক্তপাত হালাল হবে না তিনটি অবস্থার কোন একটি ছাড়া। প্রথম—ইসলাম ত্যাগকারী, ইসলামী সমাজ বিচ্ছিন্নকারী ব্যক্তি, বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচারী হওয়া এবং প্রাণের বদলে প্রাণ লওয়া অবশ্যম্ভাবী হওয়া।

এ হাদীসে স্বাধীন ও গোলামের মাঝে পার্থক্যের কোন কথা বলা হয়নি। বরং প্রাণের বদলে প্রাণ সংহার করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে নির্বিশেষে, আর এই ভাবধারা বনী ইসরাইলের উপর লিখে দেয়া বিধানের আল্লাহ কথিত ধারার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। এই হাদীসের তাৎপর্য দুটি। একটি—বনী ইসরাঈলীদের উপর যে আইন জারী হয়েছিল, তা আমাদের উপর কার্যকর হবে, আর দ্বিতীয়—কিসাস ফরয হওয়ার ব্যাপারে তা স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধান, সকল মানুষের প্রাণের ক্ষেত্রে তা সাধারণ ও ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য।

সুন্নাতের দিক দিয়েও তা প্রমাণিত। হাদীসটি আবদুল বাকী ইবনে কানে মূসা ইবনে যাকারিয়া তসতরী, সলহ ইবনে উসমান, আল আসকারী, আবূ মুআবিয়া, ইসমাঈল ইবনে মুসলিম, আমর ইবনে দীনার-তায়ূস ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْعَمْدُ قَوَدٌ اِلَّا اَنْ يَعْفُوَ وَلِىُّ الْمَقْتُوْلِ -

ইচ্ছাপূর্বক হত্যা অবশ্যই বিচার্য, প্রতিশোধ গ্রহণযোগ্য। তবে নিহতের অভিভাবক ক্ষমা করে দিলে ভিন্ন কথা।

এই হাদীসটির দুটি অর্থ হতে পারে। একটি নির্বিশেষে সর্ব প্রকারের ইচ্ছামূলক হত্যার বিচার অবশ্য কর্তব্য। এই বিচার গোলামের হত্যাকারীর উপরও অবশ্যই কার্যকর হবে।

আর দ্বিতীয় অর্থ, এই সিদ্ধান্ত মাল দিয়ে দণ্ড থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। কেননা দণ্ড দান ও মাল গ্রহণের মধ্যে যে কোন একটি করার ইখতিয়ার থাকলে শুধু বিচার বা প্রতিশোধ গ্রহণের কথাই বলা হতো না। অন্যটা—অর্থাৎ মাল গ্রহণের কথা না বলে ছেড়ে দেয়া হতো না।

যুক্তির দিক দিয়েও আমাদের কথাটি অনস্বীকার্য। গোলাম তো রক্ত প্রবাহ কেন্দ্র। সময়ের অতিবাহনে তা উঠানো যায় না। হত্যাকারীর সন্তানও সে নয়। তার উপর তার মালিকানাও নেই। ফলে অনাত্মীয় স্বাধীনতা সদৃশ হল। অতএব এ দুজনের মধ্যে কিসাস অবশ্যম্ভাবী। যেমন করে গোলাম কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করলে তার উপর অবশ্য কিসাস কার্যকর হয়। তার মূলে সেই একই 'ইল্লাত' নিহিত। অনুরূপভাবে স্বাধীন ব্যক্তি যদি গোলামকে হত্যা করে, তা হলেও তার কিসাস অবশ্যই হতে হবে। কেননা এখানেও সেই একই 'ইল্লাত' বর্তমান।

অতএব যে ব্যক্তি গোলামের হত্যার কারণে স্বাধীন ব্যক্তির উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে ও কিসাসে তাকে হত্যা করতে নিষেধ করে, তার এই নিষেধকরণ তো গোলামের অপূর্ণ ব্যক্তি হওয়ার কারণে মাত্র। সেখানে মানবীয় সাম্য পরিত্যক্ত। হত্যার কম মানের অপরাধে তা গণ্য হয় বটে। তার দলীল এই যে, দশজন লোক মিলে যদি একজনকে হত্যা করে তা হলে সেই একজনের জন্যে হত্যাকারী দশজনকেই হত্যা করতে হবে। এখানে সংখ্যা সমতার কোন গুরুত্ব নেই। অনুরূপভাবে একজন পূর্ণাঙ্গ ও সুস্থ মুসলিম ব্যক্তি কোন পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী অঙ্গ কাটা ব্যক্তিকে হত্যা করে, তা হলে তাকে হত্যার কিসাসস্বরূপ সেই সুস্থ পূর্ণাঙ্গ দেহ ব্যক্তিকে হত্যাকারী হিসেবে হত্যা করা হবে। সেইরূপে নারীর বিনিময়ে পুরুষকে হত্যা করা হবে, যদিও দ্বীনের দৃষ্টিতে বিবেক-বুদ্ধি ও দ্বীন পালনের দিক দিয়ে খাটো ও পেছনে। তার দীয়তও পুরুষের দীয়তের অর্ধেক। এ থেকে প্রমাণিত হল, প্রাণ হরণের ক্ষেত্রে নিহতের ব্যাপারে সমতার কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না। 'খোটা' বা কম-এর জন্যে 'পূর্ণ' কে দণ্ডিত করতে হবে কিসাস। তবে প্রাণ-সংহার ছাড়া তার কম মাত্রার অপরাধের ব্যাপারে হুকুমটা এর কমের নয়। কেননা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাতের বদলে সুস্থ সবল হাত দণ্ড পাবে না বা রোগী ব্যক্তিকে হত্যার ফলে সুস্থ পূর্ণাঙ্গ দেহ সম্পন্ন ব্যক্তির প্রাণ নাশ হবে না—এটা কোন কথাই হতে পারে না। লাইস হাকাম থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী ও ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন :

مَنْ قَتَلَ عَبْدًا عَمَدًا فَهُوَ قَوْدٌ –

যে (স্বাধীন) ব্যক্তি একটি গোলামকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করবে, তার উপর তার প্রতিশোধ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

## দাসের বদলে মনিব হত্যা

মনিব তার দাসকে হত্যা করলে কি কিসাসস্বরূপ সেই মনিবকে হত্যা করা হবে কিনা এ বিষয়ে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। খুব বিরল সংখ্যক লোক বলেছেন, হ্যাঁ অবশ্যই হত্যা করা হবে। সর্বসাধারণ ফিকাহবিদগণের মত হচ্ছে, হত্যা করা যাবে না। যারা মনিবকে দাস হত্যার দায়ে দায়ী করে তাকে হত্যা করার পক্ষপাতী, তাঁরা কিসাসের আয়াতের বাহ্যিক অর্থকেই দলীল হিসেবে ভিত্তি করেছেন। কেননা আল্লাহ কথা : নিহতের ব্যাপারে তোমাদের উপর কিসাস লিখে দেয়া হয়েছে। স্বাধীন স্বাধীনের বদলে...

কথা থেকে তা-ই প্রকাশিত হয়। আর এই দলীলের ভিত্তিতেই স্বাধীনকে স্বাধীনের বদলে হত্যা করার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তাদের দলীল আল্লাহ্‌র এই কথাও ঃ প্রাণ প্রাণের বদলে। এই কথাও ঃ 'যে লোক তোমাদের উপর সীমালজ্ঘন করবে, অনুরূপ প্রতিশোধ তোমরা তার উপরও গ্রহণ করবে। নবী করীম (স)-এর এই কথাও 'মুসলমানদের রক্ত পারস্পরিক অভিন্ন '। সামুরাতা ইবনে জুনদবও নবী করীম (স) থেকে তাঁর এই কথা বর্ণনা করেছেন ঃ

مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ –

যে লোক তার গোলামকে হত্যা করবে, আমরাও দণ্ডস্বরূপ তাকে হত্যা কর। যে লোক তার গোলামের অঙ্গ কাটবে, আমরাও কিসাস স্বরূপ তার অঙ্গ কাটব।

তবে উপরোক্ত কিসাসের আয়াতের বাহ্যিক অর্থ তাদের পক্ষের দলীল হতে পারে না। কেননা আল্লাহ্ এ পর্যায়ের মনিব-মালিকের কিসাস করার দলীল বানিয়েছেন এ আয়াতটিকে ঃ

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا –

যে লোক মজলুম অবস্থায় নিহত হবে, তার অভিভাবকের জন্যে আমরা অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছি।

গোলামের অভিভাবক তার মনিব-মালিক—তার জীবদ্দশায় ও তার মৃত্যুর পরও। কেননা গোলাম তো কোন জিনিসেরই মালিক হয় না। সে যা কিছুর মালিক হয়, তা তো তার মনিব-মালিকের মালিকানা স্বত্ব। মীরাসের দিকে দিয়েও সে কিছু পায় না। কাজেই সে-ই যখন অভিভাবক, তখন তার নিজের কিসাস কার্যকর হতে পারে না। কিন্তু সে নিজের উত্তরাধিকারী—যে হত্যা করে তার অবস্থায়ও হয় না। ফলে এদিক দিয়েও তার উপর কিসাস ফরয হয় না। গোলাম মনিবের উত্তরাধিকারীও হয় না। কেননা উত্তরাধিকারী যা পায়, তা যার উত্তরাধিকারী হয় مورث তার মালিকানা না থেকেই হস্তান্তরিত হয়। আর হত্যাকারী উত্তরাধিকারী হয় না। অতএব এই অপরের জন্যে কিসাস ওয়াজিব হবে। গোলাম যেহেতু কোন জিনিসের হয় না, মালিক তাই তার কোন মালিকানা মনিব মালিকের দিকে হস্তান্তরিতও হয় না। গোলামের পুত্র যদি হত্যা করে, তাহলে তার হত্যাকারীর উপর কিসাস কার্যকর হবে না। কেননা সে কোন কিছুর মালিক নয়। এমনিভাবে অন্যের উপরও কিসাস কার্যকর হবে না। তার হত্যাকারীর উপর প্রতিশোধ আবশ্যিক হল, তা পাওয়ার যোগ্য হবে তার মনিব, সে হবে না। অতএব এই কারণেই গোলামের মনিবের উপর তাকে হত্যা করার দরুন কিসাস আবশ্যিক হওয়া অবধারিত। গোলামের জন্যে তা প্রমাণিত নয়, এ কথার দলীল এই আয়াত ঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ –

আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত দাঁড় করেছেন একজন গোলাম মনিবের মালিকানাধীন। সে কোন কিছুর উপর ক্ষমতা রাখে না।

এ আয়াতে গোলামের মালিকানা অধিকার অস্বীকৃত হয়েছে এবং সাধারণভাবে সকল জিনিসকেই এই নিষেধের আওতার মধ্যে এনেছে। এ কারণে কারোর উপর কোন জিনিস প্রমাণিত হতে পারে না। গোলাম নিজেই অন্য কারোর মালিকানাভুক্ত বলে তার জন্যে কোন জিনিসই প্রমাণিত হবে না। তার মনিব-মালিক যদি কোন কিছু পাওয়ার অধিকারী সাব্যস্থ হয়, তা হলে তার নিজের উপর তার প্রতিশোধ গ্রহণ জরুরী হতে পারে না। এ ব্যাপারে গোলাম স্বাধীন ব্যক্তির মত নয়। কেননা স্বাধীন ব্যক্তির জন্যে কিসাস কার্যকর হবে। পরে তার থেকে তার উত্তরাধিকারীদের দিকে হস্তান্তরিত হবে। তারা তাদের মীরাসী অংশ হিসাবে তা থেকে হিসসা পেয়ে যাবে। তাই হত্যার কারণে যার মীমাস-ই হারাম হয়ে গেছে, তার প্রতিশোধ বর্ধিত প্রাপ্তির উপর মীরাস কার্যকর হবে না। যে উত্তরাধিকারী হবে, প্রতিশোধ (নিহতের বদলে হত্যাকারীকে হত্যা) হবে তার জন্যে।

যদি বলা হয়, এ দিক দিয়ে গোলামের রক্ত তার অর্জিত ধন-মালের মত নয়। কেননা মালিক-মনিব তাকে হত্যা করার অধিকারী নয়। হত্যার সাহায্যে তাকে গোলামীকে প্রতিষ্ঠিত রাখারও কোন অধিকার তার থাকতে পারে না। এ ব্যাপারে সে একজন অনাত্মীয়, সম্পর্কহীন ব্যক্তি মাত্র।

জবাবে বলা যাবে, মালিক-মনিব যদি তার গোলামকে হত্যা করার অধিকারী ও মালিক না হয়ে থাকে এবং গোলামীতে তাকে প্রতিষ্ঠিত স্থায়ী করারও অধিকারী না হয়ে থাকে তাহলেও সে-ই তো তার অভিভাবক। তার হত্যার উপর কিসাস লওয়ার সে-ই অধিকারী যদি হত্যাকারী ভিন্ন কোন ব্যক্তি হয়। তার এ অধিকার গোলামের মালিক হিসেবে, মীরাসী সূত্রে নয়। গোলামের আত্মীয়-স্বজনদের মুকাবিলায়ও সে-ই প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকারী তার হত্যাকারীর উপর। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, তার মালিক-মনিবই তার প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকারী, যেমন সে-ই তার গর্দানেরও মালিক। তা সত্ত্বেও সে নিজেই যদি তার গোলামের হত্যাকারী হয়, তা হলে অন্য কেউ তো এমন নেই যে তার উপর প্রতিশোধ আরোপ করতে পারে এবং তার অধিকারী হতে পারে। সে নিজে কি নিজের উপর প্রতিশোধ নেবে ? না, তা সম্ভব নয়। তা ছাড়া আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যে তোমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করবে তোমরাও তার উপর ততটা সীমালঙ্ঘনমূলক আচরণ কর' এই সম্বোধন গোলামের মালিকের প্রতি হতে পারে না, যদি সে নিজেই তার গোলামকে হত্যা করে তার উপর সীমালঙ্ঘনকারী হয়। কেননা সে যদি নিজের উপর সীমালঙ্ঘনকারী হয়ে তার নিজের গোলামকে হত্যা করে তার নিজের মালিকানাকে ধ্বংস করে, তা হলে সে তার নিজের কাছ থেকে প্রতিশোধ আদায় করার জন্যে আদিষ্ট হতে পারে না। আর অন্য কেউও তার কাছ থেকে প্রতিশোধ দেয়ার জন্যে আদিষ্ট হতে পারে না। কেননা সে তো তার উপর সীমালঙ্ঘনকারী নয়। আল্লাহ সে অধিকার দিয়েছেন তাকে, যে তার উপর সীমালঙ্ঘনকারী হবে অন্যদের ছাড়া।

কেউ যদি বলেন, তার উপর রাষ্ট্র সরকার প্রতিশোধ কার্যকর করবে, যেমন উত্তরাধিকারী নেই এমন ব্যক্তি নিহত হলে সরকারই বাদি হয়ে তার প্রতিশোধ আদায় করে।

তার জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, রাষ্ট্র সরকার (ইমাম) সমগ্র মুসলমানের জন্যে প্রতিশোধ কার্যকর করার জন্যে দাঁড়াবে যখন তারা নিহতের মীরাস পাওয়ার অধিকারী হবে। কিন্তু গোলামের তো কোন উত্তরাধিকারী নেই, হতে পারে না। তা যদি হতো তা হলে হত্যাকারী থেকে সমগ্র মুসলমানের জন্যে কিসাস লওয়ার অধিকার প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হতো। তা ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের জন্যেও প্রমাণিত হয় না। কেননা গোলাম যদি ভুলক্রমে নিহত হয় তা হলে তার হত্যাকারীর নিকট থেকে রক্তমূল্য পাওয়ার অধিকারী হবে তো মনিব-মালিক। মুসলিম জনগণ নয়। রাষ্ট্রপ্রধান মুসলমানদের ইমামও নয়। আর যে স্বাধীন ব্যক্তির কোন উত্তরাধিকারী নেই ভুলবশত নিহত হলে তার রক্তমূল্য বায়তুলমালে জমা হবে। অনুরূপভাবে মনিবের উপর প্রতিশোধ কার্যকর হলে রাষ্ট্র প্রধান তা পাবে না, তার মনিব মালিক-ই তা পাবে। সে জিনিসটি তার নিজের উপর কার্যকর করা কঠিন, তাই তা বাতিল। এই পর্যায়ে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, তা এর পরিপন্থী। হাদীসটি ইবনে কানে মুকবেরী, খালিদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে সফওয়ান-নওফলী জমরাতা ইবনে রবী'আতা ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি আওযায়ী আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতা তাঁর দাদা সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। তা হল, এক ব্যক্তি ইচ্ছা করেই তার গোলামকে হত্যা করেছে। নবী করীম (স) তাকে দোররা মেরেছেন এবং দেশ থেকে নির্বাসিত করে দিয়েছেন এক বছরের মেয়াদের জন্যে। আর মুসলমানদের থেকে তার অংশ মুছে ফেলেছিলেন। সে জন্যে অন্য কোনরূপ প্রতিশোধ নেননি। অপর দিকে সামুরাতা ইবনে জুনদুব বর্ণিত হাদীস যে হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করে এই কথার আনুকূল্য করেছেন যে, বাহ্যত ও তৎপর্যগতভাবে আল্লাহ তা'আলা মনিবের জন্যে প্রতিশোধ ওয়াজিব করে দিয়েছেন, গোলামের মালিকের জন্যে তা নিষেধ করেছেন এ জন্যে যে, কুরআনের কথা ঃ لَايَقْدِرُ عَلٰى شَىْءٍ 'গোলাম কোন কিছুর উপর ক্ষমতাবান হয় না'। এ হাদীসের বহ্যিক অর্থ পূর্বোক্ত হাদীসের বিপরীত। সামুরা বর্ণিত হাদীস যদি পূর্বোদ্ধৃত হাদীসের সাথে বৈপরীত্য থেকে আলাদা হয়ে যায় তবু তার ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হতো না। কেননা তার বাহ্যিক অর্থের বাইরে আর একটা তাৎপর্য রয়েছে। আর তা হচ্ছে এই যে, এটা সম্ভব, মালিক-মনিব তার গোলামকে মুক্ত ও আদায় করে দিল, পরে তাকে হত্যা করল অথবা তার অঙ্গ কর্তন করল কিংবা তাকে অঙ্গ কর্তনের হুমকি দিল। পরে এই সংবাদ নবী করীম (স) পর্যন্ত পৌঁছে গেল। তখন বললেন ঃ 'যে লোক তার গোলামকে হত্যা করবে, আমরাও তাকে হত্যা করব।' অর্থাৎ সে মনিবের আযাদ করা গোলামকে হত্যা করেছে, অতএব তাকে এর শাস্তিস্বরূপ আমরা হত্যা করব। আরবী ভাষায় এই কথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। লোকদের অভ্যাস-ও আছে এরূপ বলার। হযরত বিলাল (রা) ফজর উদয় হওয়ার পূর্বে আযান দিলে নবী করীম (স) তাঁকে বললেন ঃ

اَلَا اِنَّ الْعَبْدَ نَامَ وَقَدْ كَانَ حَرًّا فِىْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ –

জেনে রাখো ঃ বান্দা ঘুমিয়ে পড়েছে। অথচ সেই সময় সে মুক্ত ও আযাদ ছিল।

হযরত আলী (রা) বলেছেন ঃ এই গোলামকে আমার নিকট ডেকে নিয়ে আস। অর্থাৎ শুরাইহ্‌কে, যখন সে চাচার দুই পুত্রের মধ্যে ফায়সালা করে দিয়েছেন, তাদের দুজনের একজন মায়ের দিক দিয়ে ভাই। ফায়সালা দিয়েছিলেন, মায়ের দিক দিয়ে (বৈপিত্রেয়) ভাই মীরাস পাবে। কেননা জাহিলিয়াতের যমানায় তার উপর গোলামী চেপেছিল। তাকে গোলাম বা বান্দা নাম দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

وَاٰتُوْا الْيَتٰمٰى اَمْوَالَهُمْ –

ইয়াতীমদেরকে তাদের মাল বুঝিয়ে দাও।

অথচ মাল ফিরিয়ে দেয়ার সময় তারা আর 'ইয়াতীম' নামে অভিহিত হওয়ার অধিকারী থাকেনি। পূর্বে অবশ্য তারা ইয়াতীম ছিল। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

تَسْتَأْمَرُ الْيَتِيْمَةُ فِىْ نَفْسِهَا –

ইয়াতীম মেয়েকে তাঁর নিজের বিয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা ও তার নিকট থেকে আদেশ গ্রহণ করা হবে।

অর্থাৎ সে পূর্বে ইয়াতীম ছিল, যদিও এই মুহূর্তে তাকে 'ইয়াতীম' বলে অভিহিত করা যায় না। এভাবে নবী করীম (স) যখন বললেন সে তার 'গোলাম'কে হত্যা করেছে,, তখন তার বক্তব্য ছিল পূর্বে যে তার গোলাম ছিল, তাকে যদি হত্যা করে। গোলাম ছিল, পরে তাকে মুক্তি দিয়েছে। এ আলোচনার দ্বারা সেই সংশয় দূর হতে পারে যে, পিতাকে যেমন তার পুত্রের প্রতিশোধের জন্যে দায়ী করা যায় না, তেমনি মনিবকেও তার গোলামের জন্যে প্রতিশোধের সম্মুখীন করা যায় না।

কারো কারো ধারণা এই দিকেও যেতে পারে যে, রাসূলে করীম (স) মনিবকে প্রতিশোধের সম্মুখীন করতে পারতেন না। কেননা তিনি নিজেই মনিবের হক ও কর্তৃত্ব তার গোলামের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যেমন সন্তানের উপর তার পিতার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। তার দলীল হচ্ছে রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটি ঃ

لَنْ يَجْزِىْ وَلَدٌ وَّالِدَهُ اِلَّا اَنْ يَّجِدَهُ مَمْلُوْكًا فَيَشْتَرِيْهِ فَيُعْتِقَهُ –

সন্তান পিতাকে দায়ী করতে পারে না। তবে পিতা যদি তাকে ক্রীতদাস হিসেবে পায় তাহলে সে তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেবে।

এই গোলাম পুত্রকে মুক্ত করাকে তার পিতার জন্যে তার অধিকারের সাথে সাম স্যশীল বানিয়েছেন। তার হাতের সমান বানিয়েছেন এবং তার নিকট যে নিয়ামত রয়েছে তারও।

## পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে কিসাস

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى -

তোমাদের উপর নিহতের ব্যাপারে কিসাস ফরয করে দেয়া হয়েছে।

বলেছেন ঃ

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا -

যে লোক নিতান্তই অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছে, তার অভিভাবকের জন্যে একটা অধিকার আমরা প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছি।

এ আয়াতদ্বয়ের বাহ্যিক অর্থ, দাস ও স্বাধীন মানুষের পরস্পরের মধ্যে যেমন কিসাস ওয়াজিব করে দিয়েছে, তেমনি পুরুষ ও নারীর মাঝেও সেই কিসাসকে অবশ্য কার্যকর বানিয়েছে।

অবশ্য এ ব্যাপারে ফিকাহ্বিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফার ও ইবনে শাবরামাতা বলেছেন, পুরুষ নারীর মধ্যে কিসাস কার্যকর হবে শুধু প্রাণ সংহারের ক্ষেত্রে।

ইবনে শাবরামাতা থেকে অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, পুরুষ নারীর মধ্যে কিসাস কার্যকর হবে প্রাণ সংহার ছাড়া অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রে। ইবনে আবূ লায়লা, মালিক, সওরী, লাইস, আওযায়ী ও শাফেয়ী বলেছেন, পুরুষ ও নারীর মাঝে প্রাণ সংহার ও তার কম যে কোন অপরাধেই কিসাস কার্যকর হবে। তবে লাইস বলেছেন, পুরুষ যদি তার স্ত্রীর উপর কোন অপরাধ করে, তা হলে তাকে বন্দী করা হবে, তার কিসাস করা হবে না। উসমান-আলবত্তী বলেছেন, স্ত্রী যদি পুরুষকে হত্যা করে, তা হলে দণ্ডস্বরূপ তাকেও হত্যা করা হবে এবং সেই সাথে তার (স্ত্রীর) ধন-মাল থেকে অর্ধেক দীয়ত আদায় করা হবে। অনুরূপভাবে পুরুষ যদি স্ত্রীর দ্বারা আহত হয়, তাহলেও অনুরূপ কিসাস হবে। বলেছেন, পুরুষ যদি স্ত্রীকে হত্যা করে কিংবা তাকে আহত করে, তাহলে তার উপর প্রতিশোধ কার্যকর হবে। তাকে কোন জিনিস ফিরিয়ে দেয়া হবে না। এ ব্যাপারে আগের কালের ফিকাহবিদের বিভিন্ন মতের উল্লেখ করা হয়েছে। কাতাদাহ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর (রা) সানয়াবাসীদের মধ্য থেকে কয়েক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন একজন মেয়েলোকের বদলে, তার জন্যে তাদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। আতা শাবী ও মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, নারীর কারণে পুরুষকে হত্যা করা হবে। এ ব্যাপারে হযরত আলী (রা) থেকে ভিন্ন মত বর্ণিত হয়েছে। লাইস হিকাম-আলী আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা দুজন বলেছেন, পুরুষ যদি স্ত্রীকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে, তাহলে সে স্ত্রীর জন্যে পুরুষটির উপর প্রতিশোধ লওয়া হবে। আতা, শাবী ও হাসান বসরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আলী (রা) বলেছেন, তারা চাইলে তাকে হত্যা করবে ও অর্ধেক দীয়ত দিয়ে দেবে। আর চাইলে

পুরুষের অর্ধেক দীয়ত গ্রহণ করবে। আশয়াস হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন, একটি মেয়েলোক ইচ্ছামূলকভাবে একজন পুরুষকে হত্যা করল। এ পর্যায়ে তিনি বলেছেন, তাকে হত্যা করা হবে এবং অর্ধেক দীয়ত ফেরত দেয়া হবে।

আবূ বকর বলেছেন, হযরত আলী থেকে যে দুটি কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তা 'মুরসাল'; তা মূল বর্ণনাকারীর নামে বর্ণনা করা হয়নি। তার একজন বর্ণনাকারী হযরত আলী থেকে হাদীসটি শুনেন নি। দুটি হাদীসই যদি সত্য প্রমাণিত হয়, তার পরিণতি হবে ঃ দুটি পরস্পর বিপরীত, অতএব প্রত্যাহৃত যেন, তাঁর নিকট থেকে কিছুই বর্ণনা করেনি তারা। হিকামের বর্ণনায় প্রতিশোধ গ্রহণের কথা আছে, ধন-মাল গ্রহণের কথা নেই, তাই তা উত্তম। কেননা তা কুরআনের বাহ্যিক অর্থের সাথে সামঞ্জস্যশীল। তা হচ্ছে আল্লাহ্র কথা ঃ 'নিহতের ব্যাপারে তোমাদের উপর কিসাস লিখে দেয়া হয়েছে।' এ ছাড়া অন্যান্য যে সব আয়াত প্রতিশোধ গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী প্রমাণ করে, তার কোন একটিতেও দীয়তের কথার উল্লেখ নেই। কাজেই মূল দলীলে তা বাড়িয়ে দেয়া—অনুরূপ কোন অকাট্য দলীল ছাড়াই—সঙ্গত হতে পারে না। কেননা মূল অকাট্য দলীলে বৃদ্ধি সাধনে দলীলটিই মনসূখ হয়ে যায়।

ইবনে নাফে ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী হুমাইদ আনাস ইবনে মালিক সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ নজর কন্যা রুবাই একটি ক্রীতদাসীকে চপেটাঘাত করল। তাতে তার দাঁত ভেঙ্গে গেল। পরে তারা তার রক্তমূল্য দিয়ে দেয়। কিন্তু তা গ্রহণ করতে তারা অস্বীকার করে। পরে তারা নবী করীম (স)-এর নিকট ব্যাপারটি পেশ করে। তিনি কিসাসের নির্দেশ দিলেন। পরে তাদের ভাই আনাস ইবনে নাসর এসে বলল ঃ হে রাসূল আপনি রুবাইর দাঁত ভেঙ্গে দেয়ার আদেশ দিচ্ছেন! না, যিনি আপনাকে পরম সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম করে বলছেন। তখন নবী করীম (স) বলেছেন ঃ হে আনাস! আল্লাহ্ তো কিসাস-ই ফরয করেছেন। অতঃপর জনগণ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স) আরও বললেন ঃ

اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ مَنْ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَ بَرَّهُ –

আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে এমন লোক অবশ্যই আছে, যে আল্লাহ্র নামে কসম করলে তিনি অবশ্যই তাকে বাঁচিয়ে দেবেন।

এতে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্র কিতাবে কিসাস-ই বিধিবদ্ধ। ধন-মাল গ্রহণ নয়। অতএব কিসাস ও ধন-মাল এক সাথে গ্রহণ জায়েয নয়। অপর একটি দিক দিয়ে বলা যায়, মূল হত্যার দরুন যদি কিসাস-ই কার্যকর না হল তা হলে মাল দেয়ার সঙ্গে তা কার্যকর করা নিশ্চিয়ই জায়েয হবে না। কেননা তখন মাল-ই তো প্রাণের বিনিময় হয়ে দাঁড়াবে। আর নরহত্যার প্রতিশোধ মাল দ্বারা করা জায়েয নয়। বিবেচ্য, যে ব্যক্তি হত্যা করতে রাযী হল সেই সঙ্গে মালও দিল যা তার ওয়ারিশরা পেল, এটা সহীহ্ কাজ হবে না। প্রাণ সংহারের যোগ্য হবে মালের বিনিময়ে—এটা জায়েয্ হতে পারে না। অতএব মাল দেয়ার ভিত্তিতে কিসাস মওকুফ করা বাতিল হয়ে গেল।

হাসান-এর মত উসমান-আল-বত্তীরই কথা। তা হচ্ছে, স্ত্রী যদি হত্যাকারী হয়, তা হলে বদলে তাকে হত্যা করা হবে, সেই সাথে তার মাল থেকে অর্ধ দীয়তও আদায় করা হবে। এ এমন একটি কথা, যা কিসাস অনিবার্য প্রমাণকারী আয়াতসমূহের বাহ্যিক অর্থ প্রত্যাখান করে এবং যার হুকুম আয়াতে নেই, তা বাড়িয়ে দেয়া হয়।

কাতাদাহ আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, একজন ইয়াহূদী একটি দাসীকে হত্যা করল। তার উপর তার লক্ষণসমূহ প্রকট ছিল। ব্যাপারটি নবী করীম (স)-এর নিকট পেশ করা হয়। তিনি সেই দাসীকে হত্যার দণ্ডস্বরূপ ইয়াহূদীটিকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। জুহরী, আবূ বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযম তাঁর পিতা—তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ পুরুষ স্ত্রীলোকের হত্যার বদলে হত্যা করা হবে। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) কর্তৃক একজন স্ত্রীলোক হত্যার বিনিময়ে কয়েকজন পুরুষ হত্যা করা প্রমাণিত হয়েছে। এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই। তার প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্য থেকে একজন একথা প্রকাশ করেছেন জিজ্ঞাসার জবাবে। সেই সাথে এই ঘটনার বিবরণ প্রসিদ্ধিলাভও করেছে। আর এ ভাবেই একটি মতের উপর ইজ্জমা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

নিহত স্ত্রীর বদলে পুরুষকে হত্যা করা, তার বদলে টাকা-পয়সা গ্রহণ না করা প্রমাণিত হয়েছে আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায়। আমরা দেখিয়েছি সুস্থ দেহী ও রোগীর মধ্যে সমতার প্রশ্ন গ্রাহ্য হওয়ার যোগ্য নয়, পাগলের বদলে সুস্থ বিবেক বুদ্ধির লোক, বালকের বদলে পূর্ণ বয়স্ক পুরুষকে হত্যা করা শরীয়াত ভিত্তিক কাজ। এ থেকে প্রাণের ব্যাপারে সমতার প্রশ্ন অবান্তর। প্রাণ সংহারের কমে অবশ্য সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখা ওয়াজিব। তার দলীল হচ্ছে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাত ভাঙ্গার বদলে সুস্থ সবল হাতের উপর প্রতিশোধ নেয়া নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। অনুরূপভাবে প্রাণ সংহার ছাড়া তার তুলনায় কম মানের অপরাধে পুরুষ নারীর মধ্যে কিসাস কার্যকর করা হানাফীর ফিকাহবিদদের মতে ওয়াজিব নয়। দাস ও স্বাধীন মানুষদের পারস্পরিক ব্যাপারেও তাই। কেননা প্রাণ সংহারের কম মানের অপরাধে সকলের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমতাপূর্ণ নয়।

যদি কেউ বলেন, একজন পুরুষের হাত ভেঙ্গে দেয়া বা কেটে ফেলার বদলে ক্রীতদাস বা স্ত্রী হাত কেন কাটা যাবে না ? যেমন সুস্থ সবল হাতের বদলে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাত কেটে দেয়া হয় ?

জবাবে বলা যাবে—এ ধরনের ক্ষেত্রে কিসাস নেই। কেননা এ পর্যায়ের বিধানে বিভিন্নতা রয়েছে। কমতির দিক দিয়েই নয়। ফলে ব্যাপারটি এরূপ দাঁড়াল যে, ডান হাতের বদলে বাম হাত নেয়া যাবে না। আমাদের ফিকাহবিদগণ প্রাণ-সংহারের—অন্য কথায় হত্যা-কর্মের অপরাধে নারীদের পরস্পরের মধ্যে কিসাস অবশ্যই কার্যকর করতে হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন। কেননা সে দুজনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সমতা রয়েছে। অবশ্য সেই সংক্রান্ত আইনে কোনরূপ পার্থক্য নেই। প্রাণ-সংহারের কম মানের অপরাধে দাসদের মধ্যে কিসাস ওয়াজিব করেন নি। কেননা সে দুটির মধ্যকার সমতা মূল্যায়ন

পন্থায়ই জানা যেতে পারে। আন্দাজ-অনুমানের অধিক জোরের সাহায্যেও জানা যায়, যেমন হাত অর্ধ বাহুর স্থানে কাটা যাবে না। কেননা এই কাটার ব্যাপারটি ইজতিহাদের মাধ্যমে জানা ও পাওয়া গেছে। তাঁদের মতে দাসের অঙ্গের হুকুম সর্বদিক দিয়েই ধন-মালের মাধ্যমে হুকুমের মত। তাই তা থেকে 'আকিলা' গ্রহণ বাধ্যতামূলক হবে না। তবে তার মালে যে অপরাধ করেছে, তার জন্যে তা বাধ্যতামূলক হবে। প্রাণ-হরণ সে রকমের ব্যাপার নয়। কেননা ভুলবশত হত্যা হলে তাতে 'আকিলা' বাধ্যতামূলক। তাতে কাফফারা দেয়াও ওয়াজিব। ফলে ধন-মালের ক্ষেত্রে কৃত অপরাধ ভিন্নতর হয়ে গেল।

## কাফির ব্যক্তির বদলে মুমিন হত্যা

ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফর, ইবনে আবূ লায়লা ও উসমানুলবত্তী বলেছেন, যিম্মী হত্যার দায়ে মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে। ইবনে শাবরামাতা, সওরী, আওযারী ও শাফেয়ী বলেছেন, হত্যা করা যাবে না।

ইমাম মালিক ও লাইস ইবনে সাদ বলেছেন, যদি প্রতারণাপূর্ণভাবে হত্যা করে থাকে, তাহলে তার বদলে মুসলিমকে হত্যা করতে হবে। অন্যথায় নয়।

আবূ বকর বলেছেন, পূর্বে আমরা যত আয়াত উদ্ধৃত করেছি, তার বাহ্যিক অর্থ যিম্মী হত্যার দায়ে মুসলিমকে হত্যা করার কথাই প্রমাণ করে, যেমন পূর্বে ব্যাখ্যা করে বলেছি। কেননা এ ব্যাপারে মুসলিম ও যিম্মীর মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয়নি।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى –

নিহতের বদলে কিসাস তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হয়েছে।

সকলের ক্ষেত্রেই সাধারণ হুকুম। আল্লাহ্‌র এ কথাটিও তাই; স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, গোলামের বদলে গোলাম, নারীর বদলে নারী।' আয়াতের শেষে বলা হয়েছে; 'যার' জন্যে তার ভাইর দিক দিয়ে কিছু, ক্ষমা করা হল। কিন্তু তা কাফিরদের ছাড়া মুসলমানদের মধ্যে আয়াতের প্রথম অংশে বিশেষীকরণের কোন দলীল নেই। কেননা এই ভাই বংশের দিক দিয়ে ভাই হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তা ছাড়া সাধারণ অর্থের শব্দের পরে বিশেষ হুকুম যুক্ত করা হলে গোটা হুকুমটিকে বিশেষীকরণ প্রমাণিত হয় না। এ বিষয়ে পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেখানে আমরা আয়াতের হুকুম নিয়ে আলোচনা করেছি। আল্লাহ্‌র এ কথাটিও অনুরূপ ঃ

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ –

তাতে তাদের উপর ফরয করে দিয়েছি যে, প্রাণের বদলে প্রাণ (নিতে হবে)।

এ কথাটিও কাফিরের বদলে মুমিন হত্যার সাধারণ বিধানই উপস্থাপিত করে। কেননা আমাদের নবীর পূর্ববর্তী নবীগণের শরীয়াত আমাদের উপর কার্যকর, যদি তা আমাদের

নবীর যবানীতে মন্‌সূখ করে দিয়ে না থাকেন। এরূপ অবস্থায় তা আমাদের নবীরও শরীয়াত হয়ে গেছে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ –

সেসব লোককে আল্লাহ হেদায়েত দান করেছেন। অতএব তাদের হেদায়েতকে তোমরা অনুসরণ কর।

এ আয়াতে যে 'প্রাণের বদলে প্রাণ' নেয়ার কথা আছে, তা আমাদের নবীর শরীয়াত হয়ে আছে। তিনি দাঁত যখম করার ক্ষেত্রে কিসাস ওয়াজিব করেছেন। হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসে তার উল্লেখ রয়েছে। তাতে আনাস ইবনে নসর বলেছেন ঃ আল্লাহ্র কিতাবে লিখিত কিসাসে রুবাইর দাঁত ভাঙ্গা যাবে না। আল্লাহ্র কিতাবে 'দাতের বদলে দাঁত লওয়ার কথা লেখা নেই। যা কিছু আছে, তা এই আয়াতে।' ফলে নবী করীম (স) এই আয়াতটি আমাদের জন্যে অবশ্য পালনীয় বানিয়ে দিয়েছেন। পূর্ববর্তী নবীগণের শরীয়াত যদিও আমাদের জন্যে সে হুকুম নিয়ে না-ও আসত, তা হলেও এই আয়াতটি আমাদের জন্যে পালনীয় প্রমাণিত হওয়ার জন্যে রাসূলে করীম (স)-এর কথাই যথেষ্ট হতো। এই আয়াতটির হুকুম আমাদের জন্যেও পালনীয়, যেমন তা পালনীয় ছিল বনী ইসরাঈলীদের জন্যে।

নবী করীম (স)-এর এই কথাটি দুটি অর্থ। একটি—আয়াতটির হুকুম আমাদের জন্যে বাধ্যতামূলক। তা আমাদের উপরও কার্যকর। আর দ্বিতীয়—তিনি আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কিতাবের বাহ্যিক হুকুম আমাদের জন্যে বাধ্যতামূলক হয়ে আছে। এ সম্পর্কে রাসূলে করীমের জানানোরও পূর্বে। এ থেকে বোঝা গেল, আল্লাহ্ অন্যান্য নবীর শরীয়াতের যে উল্লেখ, তাঁর বর্তমান কিতাব—কুরআনে করেছেন, তার হুকুমটা কার্যকর ও প্রমাণিত, কেননা তা মনসূখ হয়ে যায়নি। আমরা যা বললাম তা যদি সত্য হয়, তাহলে বলা যাবে, আয়াতে মুসলিম ও কাফির-এর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। অতএব তার হুকুমটি উভয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই কার্যকর হতে হবে। আল্লাহ্র এই কথাটিও তাই প্রমাণ করে ঃ

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطَانًا –

যে লোক অন্যায়ভাবে নিহত হবে, তার অভিভাবকের জন্যে একটা অধিকার আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি।

এ কথাও সর্ববাদীসম্মত হিসেবে প্রমাণিত যে, আয়াতে এ পর্যায়ে যে سلطان এর উল্লেখ হয়েছে, তা প্রতিশোধ গ্রহণকে শামিল করেছে। তাতে মুসলিমকে কাফির থেকে বিশেষীকরণের চিহ্ন মাত্রও নেই। অতএব তা দুজনের উপর সমানভাবেই কার্যকর হবে।

সুন্নাতের দিক দিয়ে উল্লেখ্য হচ্ছে আওযায়ীর ইয়াহইয়া ইবনে আবূ কাসীর সালমাতা আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণিত হাদীস। রাসূলে করীম (স) মক্কা বিজয়ের দিন প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন।

اَلاوَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَوَلِيُّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَيْنَ اَنْ يَّقْتَصَّ اَوْيَاْخُذَ الدِّيَةَ -

জেনে রাখ, যে লোক কোন হত্যাকাণ্ড ঘটালো, নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের ইখতিয়ার রয়েছে দুটির যে-কোন একটি গ্রহণের। হয় সে 'কিসাস' করাবে, না হয় 'দীয়ত' গ্রহণ করবে।

আবূ সাঈদ আল মুকবেরী আবূ শুরাইহ্ আল-কাবী সূত্রে নবী করীম (স) থেকে অনুরূপ কথা বর্ণনা করেছেন। উসমান, ইবনে মাসউদ ও আয়েশা (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

لَايَحِلُّ دَمُ اَمْرِءٍ مُسْلِمٍ اِلَّابِاِحْدَى ثَلَاثٍ : زِنًا بَعْدَ اِحْصَانٍ وَكُفْرٍ بَعْدَ اِيْمَانٍ وَقَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ -

তিনটি অপরাধের যে কোন একটি অপরাধ হলে মুসলিম ব্যক্তিরও রক্তপাত হালাল ঃ বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচার করা, ঈমানের পর কাফির হয়ে যাওয়া এবং প্রাণদণ্ড ছাড়া কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা।

আর ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীস হচ্ছে ঃ اَلْعَمْدُ قَوْدٌ 'ইচ্ছাপূর্বক হত্যা অবশ্যই প্রতিশোধযোগ্য'।

এ সব হাদীস খুবই সাধারণ আইন, নির্বিশেষে সকলের উপর ও সর্বাবস্থায় কার্যকর হওয়ার আইন উপস্থাপিত করেছে। মুসলিম ও অমুসলিম যিম্মীর ক্ষেত্রে তা অবশ্যই প্রযোজ্য ও কার্যকর হবে।

রবী'আতা ইবনে আবূ আবদুর রহমান আবদুর রহমান আস-সালমানী থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) অমুসলিম যিম্মী হত্যায় মুসলিমকে দায়ী করে প্রতিশোধ নিয়েছেন। বলেছেন ঃ اَنَا اَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ 'যিম্মার দায়িত্ব পালনকারীদের মধ্যে তা পালন করার জন্যে আমি সবচেয়ে বেশি অধিকারী।'

তাহাভী, সুলায়মান ইবনে শুয়াইব, ইয়াহইয়া ইবনে সালাম, মুহাম্মাদ ইবনে আবূ হুমাইদ আল-মাদানী, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাফির সূত্রে নবী করীম (স) থেকে অনুরূপ কথা-ই বর্ণনা করেছেন।

উমর, আলী ও আবদুল্লাহ (রা) থেকে সুমকে যিম্মীর বদলে হত্যা করার বর্ণনা এসেছে। ইবনে কানে আলী ইবনুল হাইসাম-উসান—আল ফয়ারী-মাসউদ ইবনে জুয়ায়রিয়া, আবদুল্লাহ ইবনে খারাশ-ওয়াসিত-হাসান ইবনে মায়মূন-আবুল জুনুব আল-আসাদী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হীরাবাসীদের এক ব্যক্তি হযরত আলী কাররামাল্লাহু আজহাহুর নিকট এসে বললে ঃ হে আমীরুল মুমিনীন; একজন মুসলমান ব্যক্তি আমার পুত্রকে হত্যা করেছে। আমার নিকট তার প্রমাণ রয়েছে। পরে সাক্ষী আনা হল, তারাও

সাক্ষ্য দিল। তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা ভালো লোক বলা হল। তখন সেই অভিযুক্ত মুসলিমকে নিয়ে আসা হল এবং তাকে বসানো হল। অতঃপর হীরাবাসীকে তরবারি দেয়া হল এবং হযরত আলী (রা) বললেন, দুর্বল-ভীরুতার কারণে ওকে বের করে নিয়ে হত্যা কর। তাকে তরবারি চালাতে সক্ষম কর। কিন্তু হীরাবাসী তরবারী চালায়ে হত্যা করতে খুব দেরী করছিল। তার বংশের কোন কোন লোক তাকে বলল ঃ তুমি কি দীয়ত দিয়ে বেঁচে যেত চাও ? এ করে তুমি আমাদের সাথে একটা শক্ত সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাও ? সে বলল, হ্যাঁ। সে তরবারি কোষবদ্ধ করল এবং হযরত আলী (রা)-এর নিকট চলে গেল। তিনি বললেন ঃ ওরা কি তোমাকে গালমন্দ করেছে ও নানা ওয়াদা করে তোমাকে হত্যার প্রতিশোধ নেয়া থেকে বিরত করেছে ? সে লোকটি বলল ঃ না, আল্লাহ্র কসম, আমি বরং দীয়ত গ্রহণ করেছি। তখন হযরত আলী (রা) বললেন ঃ এ বিষয়ে তুমিই জান। পরে হযরত আলী (রা) জনগণের নিকট গেলেন। বললেন ঃ আমরা তো তোমাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছিলাম যেন আমাদের তোমাদের রক্তের সমান হয় এবং আমাদের দীয়ত তোমাদের দীয়তের মতই মর্যাদা পায়।

ইবনে কানে মুয়ায ইবনুল মুসান্না-আমর ইবনে মরযুক—শুবা আবদুল মালিক ইবনে মায়সাবাতা-নিজাল ইবনে সবরাতা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, একজন মুসলমান ইবাদী বংশের (খৃস্টান ধর্মাবলম্বী) এক ব্যক্তিকে হত্যা করল। নিহতের ভাইরা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট মামলা পেশ করল। তখন হযরত উমর সেই হত্যাকারীকে হত্যা করার জন্যে ফরমান লিখে পাঠালেন। তখন তারা বলতে লাগল ঃ হে যুবায়র, তুমি এই হত্যাকারীকে হত্যা কর। এভাবেই বলতে থাকল, যেন তার মধ্যে ক্রোধের উদ্রেক হয়। তা দেখে হযরত উমর (রা) ফরমান লিখলেন, না, তাকে হত্যা করা হবে না, তার 'দীয়ত' আদায় করা হবে।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। তখন হযরত উমর (রা) 'দীয়ত' দেয়ার ভিত্তিতে সন্ধি করার প্রস্তাব করেন। জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, হত্যাকারী মুসলমানের একজন অশ্বারোহী যোদ্ধা। আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা ইবনে ইদরিস লাইস হিকাম-আলী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণিত, তাঁরা দুজনই বললেন ঃ একজন ইয়াহূদী কিংবা খৃস্টানকে হত্যা করা হলে হত্যাকারী মুসলমানকে হত্যা করা হবে।

হুমাইদ আত-তায়ালী মায়মুন-মেহবান সূত্রে বর্ণনা করেছেন, উমর ইবনে আবদুল আজিজ ফরমান জারী করেছেন যে, একজন ইয়াহূদীকে হত্যা করার অপরাধে একজন মুসলিমকে হত্যা করা হবে এবং কার্যত তা-ই করা হয়েছিল।

বস্তুত এই তিনজন মহান সাহাবী, তাঁদের সম্পর্কে উপরোক্ত বর্ণনা পাওয়া গেছে। উমর ইবনে আব্দুল আজিজ তাঁদেরই অনুসরণকারী। তাদের সমকক্ষ অপর কেউ ভিন্নমত দিয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই।

যিম্মী হত্যার দায়ে হত্যাকারী মুসলিমকে হত্যা করার বিরোধী মত ধারণকারীরা

তাদের মতের দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস। তাতে তাঁর কথা এই বর্ণিত হয়েছে ঃ

لَايُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُوْعَهْدٍ فِىْ عَهْدِهِ –

মুসলমান কাফির-এর বদলে হত্যা করা যাবে না। কোন চুক্তিভুক্ত (যিম্মী) ব্যক্তিও তার চুক্তি বহাল থাকা কালে হত্যা করা যাবে না।

আমাদের মতে এই হাদীসটির নানা প্রকারের ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে। সে সব কয়টি ব্যাখ্যাই পরস্পর সঙ্গতিসম্পন্ন।

উপরে আমরা যে সব আয়াত ও হাদীস উদ্ধৃত করেছি, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে রাসূলে করীম (স) প্রদত্ত মক্কা বিজয় দিনের ভাষণ। ব্যক্তিটি ছিল খুজায়া বংশের। সে হুযায়ল বংশের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল জাহিলিয়াতের শত্রুতাবশত। তখন নবী করীম (স) বলেছিলেন ঃ

الَاانَّ كُلَّ دَمٍ كَانَ فِىْ الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مَوْضُوْعٌ تَحْتَ قَدَمَىَّ هَاتَيْنِ لايُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُوْعَهْدٍ فِىْ عَهْدِهِ –

জেনে রাখো ঃ জাহিলিয়াতের যুগের সব রক্তপাত আমার এই পায়ের তলে পরিত্যক্ত। কোন মুমিন কোন কাফির হত্যার দায়ে হত্যা করা যাবে না। কোন চুক্তিভুক্ত ব্যক্তিও তার চুক্তি বহাল থাকা কালে।

এখানে কাফির বলতে জাহিলিয়াতের যুগের কোন কাফিরকে হত্যার দায়ে এখন কোন মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না। 'সর্ব প্রকারের রক্তপাত আমার এই দুই পায়ের তলায় রক্ষিত, প্রত্যাহারকৃত' বলতে এই কথাই বোঝানো হয়েছে। কেননা এই দুটি কথা একই হাদীসের ভাষণে বলা হয়েছে।

যুদ্ধের ইতিহাস লেখকগণ উল্লেখ করেছেন, যিম্মার চুক্তি অনুষ্ঠিত হয়েছিল মক্কা বিজয়ের পর। তবে তার পূর্বে নবী করীম (স) ও মুশরিকদের মধ্যে বহু চুক্তি ছিল যা 'সাহায্য চুক্তি' নামে অভিহিত। কিন্তু তার অর্থ এই ছিল না যে, তারা ইসলামের যিম্মাহভুক্ত ছিল ও তাতে যিম্মাহর হুকুম কার্যকর ছিল। না, তা নয়। মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর কথা 'কাফির-এর বদলে মুসলিম হত্যা করা যাবে না'টি চুক্তিবদ্ধ কাফিরদের সাথে সম্পর্কিত ব্যাপার ছিল। কেননা তখনো কোন যিম্মী ছিল না, যার সম্পর্কে উক্ত কথা বলা হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে। রাসূলের কথা ولاذوعهد فىْ عهده থেকেই তা প্রমাণিত হয়। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَاَتِمُّوْاَ اِلَيْهِمْ عَهْدَ هُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ –

তোমরা তাদের প্রতি তাদের সাথে কৃত চুক্তি তাদের মেয়াদ পর্যন্ত সম্পূর্ণ কর।

বলেছেন ঃ

فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ –

অতঃপর তোমরা পৃথিবীতে চারমাস কাল চলাফেরা করতে থাক।

এই সময়ের মুশরিক দুই ভাগে গণ্য হতো। এক ভাগে যুধ্যমান মুশরিক, যারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। তাদের সাথে নবী করীম (স)-এর কোন চুক্তি ছিল না। আর দ্বিতীয় ভাগে ছিল চুক্তিবদ্ধ মুশরিক। একটা মেয়াদ পর্যন্তকার জন্যে তাদের সাথে 'যুদ্ধ নয়'-এর চুক্তি ছিল। তখন পর্যন্ত মুসলমানদের যিম্মী কেউ ছিল না। অতএব রাসূলে করীম (স)-এর উপরোক্ত কথা এই দুই ভাগের মুশরিকদের সাথে সম্পর্কিত ছিল বলে মনে করতে হবে। যারা এই দুই পর্যায়ের কোন ভাগে পড়ে না, তারা সেকথার আওতায় পড়ে না। এই হাদীসটির শুরুতেও সে বক্তব্যে এই দলীল রয়েছে যে, উল্লিখিত হুকুমটি 'কিসাস'কে অকার্যকর করে দিয়েছে, চুক্তিবদ্ধ যুধ্যমানদের জন্যে সীমাবদ্ধ কোন যিম্মী নয়। কেননা কথাটি শেষে যুক্ত করে বলা হয়েছে ঃ তারাও নয়, যারা চুক্তিবদ্ধ এবং চুক্তিটি এখনও বহাল আছে। কেননা একথা জানা আছে যে, এই শেষের কথাটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কথা নয়। কাজেই কথার ফায়দাটা তারা এককভাবে পাবে না। যদি কথাটি আগের কথা থেকে আলাদা ও বিচ্ছিন্ন হয়, তাহলে তাতে পূর্বে উল্লিখিত কথার সাথে সম্পর্ক তালাশ করতে হবে। জানা আছে যে, যে চুক্তিবদ্ধ নিরাপত্তা লাভকারী ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না, সে আসলে মুসলমানদের সাথে যুধ্যমান। কাজেই প্রমাণিত হল যে, কথার তাৎপর্য ও লক্ষ্য সীমাবদ্ধ যুধ্যমানের মধ্যে।

'কোন চুক্তিমান চুক্তি বহাল থাকা অবস্থায় হত্যা করা যাবে না' কথাটির দুটি তাৎপর্য হতে পারে। একটি—যে হত্যার উল্লেখ প্রথমে হয়েছে তা যদি 'কিসাস'-এর হত্যা হয়, তা হলে ঠিক সেই হত্যার কথাই দ্বিতীয় কথায় নিহিত। তাহলে আমরা শুধু হত্যার কথা বুঝতে পারি না। কেননা পূর্বে—কথার মধ্যে শুধু হত্যার কথা—যার সাথে কিছু পরিচিতি নেই—উল্লেখ করা হয়নি।

কেননা সে হত্যা ছিল প্রতিশোধমূলক—হত্যার বদলে হত্যার ব্যাপার। তাই وَلَاذُوْعَهْدٍ فِىْ عَهْدِه 'চুক্তিবদ্ধও কেউ নয় তার চুক্তি বহাল থাকা অবস্থায়' কথাটি দ্বারা সেই হত্যা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তা হলে কথাটি দাঁড়ায় ঃ

'কোন মুমিন কাফির-এর বদলে হত্যা করা যাবে না, কোন চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকেও হত্যা করা যাবে না চুক্তি বহাল থাকা অবস্থায় কাফির ব্যক্তির বদলে, যার কথা শুরুতেই বলা হয়েছে।'

আমরা যদি নিঃশর্ত হত্যা মনে করি, তা হলে ইঙ্গিতটা দ্বারা এমন প্রমাণ করা হবে, যার কথা গোটা ভাষণে বলাই হয়নি। কিন্তু তা সঙ্গত নয়। এটা যখন প্রমাণিত হল আর যে কাফিরের বদলে চুক্তিবদ্ধ যুধ্যমান কাফির হত্যা করা যাবে না, তখন তাঁর কথাটি এই দাঁড়াল যে, মুমিনকে কাফির-এর বদলে হত্যা করা যাবে না, তার অর্থ, কোন মুমিন

যুধ্যমান কাফির-এর বদলে হত্যা করা যাবে না। তাহলে নবী করীম (স)-এর নিকট থেকে মুমিন যিম্মী কাফিরের বদলে হত্যা করা যাবে না, এমন কথা পাওয়াই যায়নি।

আর দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে, একথা জানা আছে যে, চুক্তির কথা উল্লিখিত হওয়ার কারণে চুক্তি বহাল থাকাকাল পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধকে হত্যা করা নিষিদ্ধ হবে। রাসূলের 'চুক্তিবদ্ধ তার চুক্তি বহালকালে' কথাটির অর্থ যদি আমরা এই রূপ গ্রহণ করি যে, 'চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি চুক্তি বহাল থাকা কাল' পর্যন্ত হত্যা করা যাবে না, তাহলে কথাটিকে অর্থহীন নিষ্ফল করে দেয়া হবে। বরং রাসূলে করীম (স)-এর কথার প্রকৃত তাৎপর্যকে বাস্তবায়িত করাতেই ফায়দা ও কল্যাণ নিহিত। তাকে বেকার ও নিষ্ফল করে দেয়া সম্পূর্ণ অসঙ্গত। তাঁর হুকুম কোন ক্রমেই প্রত্যাহার করা যেতে পারে না।

যদি কেউ বলেন, আবূ হুযায়ফা আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে নবী করীম (স)-এর এ কথা বর্ণিত হয়েছে ঃ 'মুমিন কাফিরের বদলে হত্যা করা যাবে না' তাতে চুক্তিবদ্ধ লোকদের কথা বলা হয়নি। ফলে এরূপ হাদীস সকল প্রকারের কাফিরের বদলে মুমিনকে হত্যা করা যায় না বোঝা যায়।

এর জবাবে বলা যাবে, সেই একটি হাদীস। আবূ হুযায়ফা হাদীসটিকে তাঁর সহীফায়ও সন্নিবদ্ধ করেছেন। কায়স ইবনে উবাদও তাই করেছেন। হ্যাঁ, কোন কোন বর্ণনাকারী চুক্তি সম্পর্কিত কথাটি বাদ দিয়েছেন। কিন্তু মূল হাদীস একই। তা সত্ত্বেও যদি তা একই হাদীস প্রমাণিত না হয়, তবুও এ দুটোকে একসাথে সৃষ্ট হাদীসই বলতে হবে। কেননা নাবী করীম (স) উক্ত কথা দুইবার বলেছেন, একবার শুধু প্রথম অংশ 'মুমিন কাফিরের বদলে হত্যা করা যাবে না' চুক্তিবদ্ধদের উল্লেখ না করেই, আর অন্যবার তাদের কথা উল্লেখসহ, সে কথা প্রমাণিত নয়। ইমাম শাফেয়ী এ ব্যাপারে আমাদের হানাফী মাযহাবের আনুকূল্য করেছেন। তাঁর কথা হল—এক যিম্মী যদি অপর যিম্মীকে হত্যা করে, তারপর সে ইসলাম কবুল করে, তাহলে তার উপর প্রতিশোধ লওয়া প্রত্যাহার হয়ে যাবে না। শুরুতেই যদি ইসলাম কিসাস করার প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই তা পরবর্তীতে নিষিদ্ধ হয়ে যাবে তা পূর্ণ করার পূর্বেই। পিতা তার সন্তানকে হত্যা করলে যদি কিসাস ফরয না হয়ে থাকে, তার পুত্র যখন তার উত্তরাধিকারী হবে তখন অন্য থেকে তার প্রতিশোধ লওয়া তার কর্তব্য হবে। অতএব ফরয হওয়ার শুরুতে যেমন তা নিষিদ্ধ, তেমনি তা পূর্ণত্বের পর্যায়েও নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে যদি কোন 'মুরতাদ'কে হত্যা করে, তাহলে তার কোন প্রতিশোধ লওয়ার থাকবে না। মুসলিম থাকা অবস্থায় যদি তাকে আহত করে, তারপর সে 'মুরতাদ' হয়ে যায়, পরে সেই যখমের ফলে সে মরে যায়, তাহলেও প্রতিশোধ গ্রহণ বাতিল হয়ে হবে। তাতে শুরুর ও স্থিতির হুকুম সমান হয়ে যাবে। তাই শুরুতেই যদি হত্যা করা ওয়াজিব না হয়ে থাকে, তাহলে হত্যার পর ইসলাম কবুল করলে তা কখনই ওয়াজিব হতে পারে না, উপরন্তু কিসাস ফরয করায় মানুষের জীবনই লক্ষ্য, তারও কোন অর্থ হতো না। আল্লাহ তো বলেছেনই ঃ

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ –

কিসাসে তোমাদের জন্যে জীবন নিহিত।

যিম্মীর ক্ষেত্রে এই তাৎপর্য বর্তমান। কেননা আল্লাহ যিম্মাহ গ্রহণের মাধ্যমে তার রক্ত রক্ষার ইচ্ছা করেছেন। তাই তারও মুসলিমের মধ্যে 'কিসাস' কার্যকর হওয়া একান্তই আবশ্যক। যেমন তাদের পরস্পরের মধ্যেও কার্যকর হওয়া কর্তব্য।

যদি বলা হয়, এ নীতি অনুযায়ী নিরাপত্তা গ্রহণকারী যুধ্যমান (কাফিরের) বদলে মুসলিমকে হত্যা করা তোমার জন্যে বাধ্যতামূলক করে দেয়। কেননা তার রক্তপাতও তো নিষিদ্ধ।

জাবাবে বলা যাবে—না, ব্যাপার তা নয়। বরং তার রক্তপাত মুবাহ, যদিও তা বিলম্বে ও মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর। কেননা আমরা তো দারুল ইসলামে এমনি ছেড়ে দেব না, তাকে তার জন্যে নিরাপদ স্থানে আমরা পৌঁছিয়ে দেব। এই বিলম্ব তার রক্তপাত মুবাহ হওয়াকে দূরীভূত ও বাতিল করে না। যেমন বাকী মূল্যে কিছু বিক্রয় করা। এ বিলম্ব মূল্য দেয়ার কর্তব্যকে নাকচ করে না।

যারা এই কিসাস নিষিদ্ধ মনে করে, তাদের আর একটি দলীল হল রাসূলে করীম (স)-এর কথা ঃ اَلْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَا دِمَاؤُهُمْ 'মুসলমানদের রক্ত সমমর্যাদার।' এ কথাটি কাফিরের রক্তকে মুসলমানদের রক্তের সমান মর্যাদার হওয়াকে বাধা দান করে।

এর জবাবে বলব, এটা তাদের মতের পক্ষের কোন দলীল হল না, কেননা রাসূলের কথা ঃ 'মুসলমানদের রক্তের মর্যাদা সমান' অমুসলিমদের রক্তের সমতা নিষিদ্ধ করে না। বরং তার ফায়দাটা স্পষ্ট। আর তা হল স্বাধীন ও গোলামের রক্তের সমমর্যাদা উচ্চভদ্র ব্যক্তির নীচ অনভিজাত এবং সুস্বাস্থ্যবান ও রোগাক্রান্তের মাঝেও সমতা বিধান করে। এই সবই এ হাদীসের কল্যাণময় অবদান। পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের এবং তাদের রক্তের সমতার বিধানও এরই একটি ফায়দা। আর হত্যাকারীকে যদি নিহতের লোকেরা হত্যা করে তাহলে নারীর ক্ষেত্রে তার অভিভাবকদের নিকট থেকে কোন জিনিস গ্রহণ হত্যাকারী নারীকে হত্যা করার পর-ও তার ধন-মাল থেকে অর্ধেক দীয়ত দেয়ানো নিষিদ্ধ হওয়াটি এ হাদীস থেকেই প্রাপ্ত ফায়দা। রাসূলের মুসলমানদের রক্তের সমান মর্যাদা কথাটি থেকেই এসব তাৎপর্য লাভ করা গেছে। এ হুকুমটি উল্লিখিত ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবু অমুসলিমদের এবং তাদের ছাড়া অন্যান্য যিম্মীদের পরস্পরে মধ্যে সমতা নিষিদ্ধ হওয়ার কোন দলীল এতে নেই। কাফিরদের রক্তের ও পারস্পরিক সমতাও নিষিদ্ধ হয়ে যায়নি। ফলে তাদের একজন থেকে অন্য জনের প্রতিশোধ গ্রহণের নিয়ম কার্যকর হবে, যখন আমাদের যিম্মী হবে। মুসলমানদের ও যিম্মীদের রক্তের সমমর্যাদাও নিষিদ্ধ হয়নি।

যিম্মী হত্যার দায়ে মুসলিমকে দায়ী করে তাকে হত্যা করার বিধান সর্বসম্মত। মুসলমান চুরি করলে তার হাত-ও কাটা যাবে। অতএব তার উপর দিয়ে হত্যাকার্যের প্রতিশোধ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। কেননা তার মালের হুরমাত ও মর্যাদা অপেক্ষা তার রক্তের মর্যাদা অনেক বেশি। লক্ষণীয়, গোলাম তার মনিবের মাল চুরি করলে এই চুরির অপরাধে তার হাত কাটা যাবে না। কিন্তু হত্যার বিনিময়ে অবশ্যই তাকে হত্যা করা হবে।

ইমামা শাফেয়ীর দলীল হচ্ছে—মুসলমানকে যুধ্যমান নিরাপত্তা গ্রহণকারীকে হত্যার বিনিময়ে হত্যা করা হবে, কিন্তু যিম্মী হত্যার দায়ে মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না। হত্যা নিষিদ্ধ হওয়ার দিক দিয়ে তারা দুজনই সমান। তবে এ দুজনের মধ্যে পার্থক্যের যে দিকগুলো রয়েছে তার ব্যাখ্যা আমরা ইতিপূর্বে দিয়েছি।

ইমাম শাফেয়ী যে ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন তা তেমন নয়, যেমন তিনি মনে করেছেন। কেননা বিশর ইবনুল ওলীদ ইমাম আবূ ইউসূফ থেকে বর্ণনা করেছেন, মুসলিম ব্যক্তিকে নিরাপত্তা গ্রহণকারী যুধ্যমানকে হত্যার দণ্ড হিসেবে হত্যা করা হবে। তবে ইমাম মালিক ও লাইস ধোঁকাবাজির হত্যা পর্যায়ে যা বলেছেন, তা তাঁরা দুজন 'হদ্দ' মনে করেই বলেছেন, প্রতিশোধ মনে করেন নি। যে আয়াতসমূহে হত্যার উল্লেখ আছে, তাতে ধোঁকাবাজির হত্যা ও অন্যান্য ধরনের হত্যার মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। আমাদের উল্লিখিত হাদীসসমূহেও তাই। তা যে সাধারণ ও নির্বিশেষ ভাবধারা নিয়ে এসেছে তা কিসাস হিসেবে হত্যা করাকে ফরয করে দেয়, হদ্দ হিসেবে নয়। অতএব যারা দলীল ছাড়াই কথা বলেন, তারা দলীলের নিকট পরাভূত।

## সন্তানের বদলে তার পিতাকে হত্যা করা

পিতা তার সন্তানকে হত্যা করলে সেই পিতাকে সন্তান হত্যার দায়ে হত্যা করা পর্যায়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত। সাধারণ ফিকাহবিদগণের বক্তব্য হচ্ছে, পিতাকে তার সন্তান হত্যার দায়ে হত্যা করা যাবে না। বরং তাকে তার মাল থেকে দীয়ত দিতে হবে। হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ এবং আওজায়ী ও ইমাম শাফেয়ী এই মত প্রকাশ করেছেন। এ ব্যাপারে তারা পিতা ও দাদাকে সমান রেখেছেন। হাসান ইবনে সালিহ ইবনে হাই বলেছেন, পুত্রের পুত্রকে হত্যার দায়ে দাদার উপর প্রতিশোধ নিতে হবে। আর তিনিই পুত্রের পুত্রের জন্যে দাদার সাক্ষ্য গ্রহণীয় বলে মত দিয়েছেন। কিন্তু পিতার সাক্ষ্য তার পুত্রের জন্যে গ্রহণীয় মনে করেন নি। উসমান আল-বত্তী বলেছেন, পিতা যদি তার পুত্রকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে, তা হলে সে হত্যার জন্যে পিতাকে অবশ্যই হত্যা করা হবে। ইমাম মালিকেরও এই মত। তাঁর নামে এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, পিতা যদি তার সন্তানকে যবেহ করে তা হলে সেজন্যে তাকে হত্যা করা হবে। আর যদি তাকে তরবারির দ্বারা ঠেলা দেয়—নিক্ষেপ করে, তা হলে সেজন্যে তাকে হত্যা করা হবে না। সন্তান হত্যার দায়ে পিতাকে হত্যা করা যাবে না বলে যাঁরা মত দিয়েছেন, তাঁদের দলীল হচ্ছে এই একটি হাদীস। হাদীসটি আমর ইবনে শুয়াইব—তার পিতা—তাঁর দাদা উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ -

আমি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ সন্তান হত্যার দণ্ডে তার পিতাকে হত্যা করা যাবে না।

এই হাদীসটি উন্নত মর্যাদার এবং খুবই প্রসিদ্ধ। হযরত উমর (রা) সাহাবীগণের উপস্থিতিতে এই হাদীসের ভিত্তিতেই ফায়সালা দিয়েছেন। কিন্তু কোন একজন সাহাবীও তার বিপরীত মত প্রকাশ করেন নি। ফলে রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটি لَاوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ওয়ারিসের জন্যে 'অসিয়ত নেই' কথার মতই অবশ্য পালনীয় হয়ে গেছে। এ হাদীসটি মুতাওয়াতির পর্যায়ে গণ্য।

আবদুল বাকী ইবনে কানে ইবরাহীম ইবনে হাশিম, ইবনুল হুসায়ন আবদুল্লাহ ইবনে মিনাসুল মারওয়াজী ইবরাহীম ইবনে রুস্তম হাম্মাদ ইবনে সালমাহ ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, আমি রাসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ لَايُقَادُ الْاَبُ بِابْنِهِ 'পিতা তার সন্তানের জন্যে প্রতিশোধের সম্মুখীন হবে না।' আবদুল বাকী বিশর ইবনে মূসা খাল্লাদ ইবনে ইয়াহইয়া-কায়স-ইসমাঈল ইবনে মুসলিম-আমর ইবনে দীনার-তায়ূস-ইবনে আব্বাস সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ لَايُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ। 'পিতাকে তার সন্তান হত্যার দায়ে বিচারের সম্মুখীন করা যাবে না।' নবী করীম (স) এই কথা এক ব্যক্তিকে বলেছেন বলেও বর্ণিত হয়েছে ঃ اَنْتَ وَمَالُكَ لِاَبِيْكَ 'তুমি নিজে এবং তোমার ধন-মাল তোমার পিতার জন্যে।' সন্তানকে পিতার মালিকানা বলা হয়েছে, যেমন ধন-মালের মালিকানা হয়ে থাকে। আর এরূপ মালিকত্ব ঘোষণার কারণেই মনিবকে তার গোলামের কারণে শাস্তি ও দণ্ডের সম্মুখীন করা যাবে না। কেননা তাতেও গোলাম মনিবের মালিকানাভুক্ত বলা হয়েছে স্পষ্টভাবে। পিতা যদিও পুত্রের প্রকৃত 'মালিক' নয়, তবুও সন্তানকে পিতার সাথে সম্পর্কিত اضافت। করা হয়েছে বিধায় আমাদের যুক্তি প্রদর্শন নিশ্চয়ই ভিত্তিহীন হবে না। কেননা এখানে যে সাদৃশ্য রয়েছে, তা পিতার উপর প্রতিশোধ চাপানোকে প্রত্যাহৃত করে। আর এই সম্পর্ক স্থাপন তা প্রত্যাহারে সংশয় সৃষ্টি করে।

রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীসও তাই প্রমাণ করে। তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّ اَطْيَبَ مَا اَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسَبِهِ وَاِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ –

ব্যক্তি তার নিজের উপার্জনে যা আহার করে তা-ই অতীব পবিত্র এবং তার সন্তানও তার উপার্জিত বটে।

তিনি আরও বলেছেন ঃ

اِنَّ اَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوْا مِنْ كَسْبِ اَوْلَادِكُمْ –

নিশ্চয়ই তোমাদের সন্তানরা তোমাদের উপার্জন। অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে আহার কর।

এ হাদীসসমূহে সন্তানকে পিতার উপার্জন বলা হয়েছে। যেমন করে কারো গোলাম তার উপার্জন। এ কারণে প্রতিশোধ প্রত্যাহৃত হওয়ায় উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। তাই

গোলাম যদি তার পুত্রকে হত্যা করে তাহলে সে জন্যে তাকে হত্যা করা যাবে না। কেননা নবী করীম (স) তাকে তার উপার্জন বলেছেন। অনুরূপভাবে সে যদি নিজকে নিজে হত্যা করে।

আল্লাহ্ তা'আলাও বলেছেন ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصَالُهُ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ - اِلَىَّ الْمَصِيْرُ - وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ -

এবং মানুষকে তাঁর পিতা-মাতা সম্পর্কে উপদেশ (আদেশ) দিয়েছি। তার মা তাকে দুর্বলতার উপর দুর্বলতা নিয়ে বহন করেছে। আর দুই বছর ধরে দুধ খাইয়ে তা ছাড়িয়েছে। আদেশ হল তুমি আমার ও তোমার পিতা-মাতার শোকর কর। শেষ পর্যন্ত তো আমার নিকটই পরিণতি লাভ হবে। আর এই পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে বাধ্য করতে চেষ্টা করে, তা হলে তুমি তাদের কথা মানবে না ......

এ আয়াতে কাফির পিতা-মাতার সঙ্গ গ্রহণ ও তাদের সাথে ভালো আচরণ অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেই সাথে তাদের শোকর আদায় করতেও হুকুম করা হয়েছে। পিতা-মাতার শোকর করার আদেশের পূর্বেই আল্লাহ্র শোকর করতে বলা হয়েছে। তাই কোন পিতা যদি তার সন্তানকে হত্যা করে তা হলে এই সন্তানের বদলে তাকে হত্যা করতে নিষেধ করে। অনুরূপভাবে সন্তান যদি পিতাকে হত্যা করে, তা হলেও সন্তানের বিচার ও কিসাস করা চলবে না। কেননা যে লোক নিজ সন্তান হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত ও প্রতিশোধের সম্মুখীন হয়, পুত্র নিহত হলে তার দিক থেকেও তা-ই প্রমাণিত ও কার্যকর হবে। কিন্তু সে নিহত যদি নিজে তা না পায়, তা হলে তার দিক থেকেও কেউ তা পেতে পারে না। আল্লাহ্র এই কথাও অনুরূপ ঃ

اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا - وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا -

তোমার নিকট যদি তাদের (পিতা-মাতার) একজন বা দুজনই বার্ধক্যে উপনীত হয়, তাহলে তুমি তাদেরকে 'উহ' বলবে না। তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না, বরং তাদের দুজনকে সম্মানজনক কথা বলবে। তাদের দুজনের জন্যে বিনয়ের বাহু বিছিয়ে দেবে দয়া-মমতা সহকারে এবং বলবে ঃ হে রব্ব! তাঁদের দুজনকে তুমি দয়া কর, যেমন করে তাঁরা দুজন (দয়া সহকারে) আমাকে ছোটকাল থেকে লালন-পালন করেছেন।

অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। উপরোক্ত আদর্শ সর্বাবস্থায়ই অবশ্য পালনীয়। এ এক নিঃশর্ত নির্দেশ। কাজেই তাকে সন্তানের দরুন অভিযুক্ত করার কোন অধিকার কখনই প্রমাণিত হতে পারে না। কেননা সন্তানের জন্যে পিতাকে হত্যা করা পিতা-মাতার জন্যে আল্লাহ্‌র আদিষ্ট কার্যাবলীর পরিপন্থী। উপরন্তু নবী করীম (স) জিনজালা ইবনে আবূ আমের (পাদ্রী)-কে তার পিতাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। অথচ সে ছিল মুশরিক, আল্লাহ ও তার রাসূলে বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী। সে কুরায়শদের সাথে মিলিত হয়ে ওহুদ-এর যুদ্ধে রাসূলে করীম (স)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। কাজেই পুত্রের পক্ষে তার পিতাকে যে কোন অবস্থায় হত্যা করা যদি জায়েযহতো, তাহলে সমস্ত অবস্থার মধ্যে সেই অবস্থা ছিল তা করার অধিক উপযুক্ত, যখন সে (পিতা) মুশরিক থাকা অবস্থায় রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল। কোন ব্যক্তির শাস্তি পাওয়ার, নিন্দা পাওয়ার ও নিহত হওয়ার অধিক যোগ্য এর চাইতে অন্য কোন সময়ই হতে পারে না। কিন্তু সেই অবস্থায়ও রাসূলে করীম (স) তাকে তার পিতাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন। তাহলে এ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, সন্তান কোন অবস্থায়ই পিতাকে হত্যা করতে পারে না।

আমাদের ফিকাহবিদরা একথাও বলেছেন যে, পিতা যদি তার পুত্রের বিরুদ্ধে মিথ্যা ব্যভিচারের অভিযোগ করে তবু এই মিথ্যা অভিযোগের কারণে পিতার 'হদ্দ' করা যেতে পারে না। যদি তার হাত কেটে ফেলে, তবু তার 'কিসাস' করা যেতে পারে না। যদি তার ঋণ থাকে তার নিকট, তাহলে সেজন্যে তাকে বন্দী করা যেতে পারে না। কেননা এই সবই কুরআনের সে সব আয়াতের সাথে সাজ্ঞর্ষিক, যা আমরা এই মাত্র উদ্ধৃত করলাম।

এমন কিছু ফিকাহবিদ আছেন, যাঁরা পুত্রের মাল প্রকৃতপক্ষেই পিতার মাল মনে করেন, ঠিক যেমন গোলামের মাল তার মনিব-মালিকের। সে যদি তা নিয়ে যায়, তাহলে তা ফেরত দিতে বলা যাবে না। তাহলে পিতার উপর প্রতিশোধ না লওয়ার ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মতপার্থক্য ছাড়া আর কোন কারণ নাও থাকত, তবুও প্রতিশোধ প্রত্যাহৃত হওয়ার সংশয় সৃষ্টি জন্যে তা-ই যথেষ্ট, যা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি। আমরা এখানে যেসব দলীলের উল্লেখ করেছি, তা কিসাসের আয়াতসমূহকে বিশেষীকরণ করে দেয় এবং প্রমাণ করে যে, পিতা তার আওতার মধ্যে পড়ে না।

## এক ব্যক্তিকে হত্যা করায় দুজন শরীক হলে

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا–

যে লোক ইচ্ছাপূর্বক কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, তার প্রতিফল জাহান্নাম। সেখানেই সে চিরকাল থাকবে।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ –

যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে ভুলবশত হত্যা করবে, তার দণ্ড হচ্ছে একটি মুমিন দাস মুক্তকরণ।

এই ভীতি ও খারাপ পরিণতির খবর নিশ্চয়ই তার জন্যেও, যে ব্যক্তি অপরকে হত্যা করার কাজে শরীক হয়েছে। এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই।

যদি দশজন মিলেও একজন ব্যক্তিকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে, তাহলে তাদের প্রত্যেকেই এই খারাপ পরিণতির সম্মুখীন হবে নিঃসন্দেহে। কেননা তারা সকলে মিলে একজন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। অনুরূপভাবে দশ ব্যক্তি মিলে যদি ভুলবশত এক ব্যক্তিকে হত্যা করে, তাহলে তাদের প্রত্যেকেই হত্যাকারী হিসেবে অভিযুক্ত হবে এবং তাদের প্রত্যেককেই উপরোক্ত কাফফারা দিতে হবে, যেমন একজন একক ব্যক্তি কোন মুমিনকে হত্যা করলে তাকে সেই একই কাফফারা দিতে হবে। এ ব্যাপারেও কোন দ্বিমত নেই যে, প্রাণ সংহারে কম অপরাধ করলে তাতে উক্ত কাফফারা দিতে হবে না। তাতে প্রমাণিত হয় যে, তাদের প্রত্যেকেই যেন কার্যত সমস্ত মানুষকে ধ্বংস করার অপরাধ করে বসেছে। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا -

এই কারণে আমরা বনী ইসরাঈলীদের এই আইন জারী করে দিয়েছি যে, যে লোক প্রাণ হত্যা বা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির কারণ ছাড়াই অপর কোন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, সে যেন সমস্ত মানুষকেই হত্যা করল।

অতএব একটি দল মিলিত হয়ে এক ব্যক্তিকে হত্যা করে, তাহলে সে দলের প্রত্যেকেই প্রাণ হরণকারী হত্যাকারী সাব্যস্ত হবে অতএব তারা সকল মানুষকে হত্যা করেছে—বলা যাবে। এরূপ হলে, দুজন লোক মিলিত হয়ে যদি দুজনের একজনকে ইচ্ছাপূর্বকভাবে হত্যা করে বা অপরজনকে ভুলবশত হত্যা করে অথবা দুজনের একজন হয় পাগল আর অপর জন সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির, তা হলে জানা যাবে, সেই ভুলকারী ব্যক্তি সমস্ত মানুষের প্রাণ হরণকারী হয়ে গেল। তাই তাদের সকলেই ভুলবশত হত্যকারী সাব্যস্ত হবে। তাতে ইচ্ছাপূর্বক হত্যার হুকুম থেকে তারা দুজনই নিস্কৃতি পেয়ে যাবে। কেননা সকলেই ভুল করেছে; এই কথা প্রমাণ করা যায় না। আবার সকলেই ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারী এমন কথাও বলা মুশকিল। অনুরূপভাবে পাগল, বুদ্ধিমান এবং বালক ও পূর্ণবয়স্কের ব্যাপার মনে করতে হবে। কেননা সকলেই ভুল করে হত্যা করেছে—এই কথা যদি প্রমাণিত হয়, তা হলে পূর্ণ মাত্রার দীয়ত দেয়া ওয়াজিব হয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে সকলেই ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করেছে, একথা প্রমাণিত হলে সকলেই হত্যার প্রতিশোধের সম্মুখীন হবে। তবে প্রাণ-সংহারে পূর্ণ দীয়ত ফরয না হওয়ার ব্যাপারে এবং সেই সাথে প্রতিশোধ অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় ফিকাহবিদদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। অতএব তাতে কর্তব্য হয়ে গেল, প্রাণ-সংহারের কাজে শরীক হওয়ার কারণে দীয়ত ফরয হবে, তখন তাদের কারো উপর প্রতিশোধ গ্রহণ জরুরী হবে না। কেননা তাতে সকলেরই ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করা প্রমাণিত হতে হয়। আর সকলেই ইচ্ছাপূর্বক হত্যা প্রমাণিত হলে সেজন্যে কোন জরিমানা গ্রহণ না করা প্রমাণিত হবে।

বালক ও পূর্ণ বয়স্ক এবং পাগল ও সুস্থ বিবেক সম্পন্ন, ইচ্ছা গ্রহণকারী ও ভুলকারী

দুজন ব্যক্তি যদি এক ব্যক্তিকে হত্যা করে, তা হলে তার হুকুম কি হবে—এ বিষয়ে ফিকাহবিদগণের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর সঙ্গীদ্বয় (আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদ) বলেছেন, তাদের দুজনের একজনের উপরও কিসাস কার্যকর হবে না। অনুরূপভাবে তাদের একজন যদি নিহতের পিতা হয়, তা হলে পিতার উপর ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি লোকটির উপর তার মালের অর্ধেক দীয়ত ধার্য হবে। আর ভুলকারী ও বালকের ক্ষেত্রে তার 'আকিলা'র উপর ধার্য হবে। এই মত হাসান ইবনে সালিহ দিয়েছেন। মালিক বলেছেন, বালক ও পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি যদি এক ব্যক্তির হত্যায় শরীক হয়, তা হলে পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিকে দণ্ডস্বরূপ হত্যা করা হবে। আর বালকের 'আকিলা'র উপর অর্ধেক দীয়ত ধার্য হবে। ইমাম আওজায়ী বলেছেন, তাদের দুজনের আকিলার উপরই দীয়ত দেয়া কর্তব্য হবে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন—একজন ব্যক্তি কোন বালকের সাথে মিলিত হয়ে যদি এক ব্যক্তিকে হত্যা করে, তা হলে ইচ্ছা গ্রহণকারী বালককে অর্ধ দীয়ত দিতে হবে তার মাল থেকে। অনুরূপভাবে স্বাধীন ব্যক্তি ও গোলাম একত্র হয়ে যদি অপর কোন গোলামকে হত্যা করে, তা হলেও সেই হুকুম কার্যকর হবে। ভুলবশত যে লোক এই হত্যা কাজে শরীক হবে, আর যে ইচ্ছামূলক হত্যায় লেগে যাবে, এই শেষোক্ত ব্যক্তির উপর তার মালে অর্ধেক দীয়ত ধার্য হবে, আর ভুলবশত শরীক ব্যক্তির আকিলার উপর ধার্য হবে তার ভুলের মাশুল।

আবূ বকর বলেছেন, এ ব্যাপারে আমাদের হানাফী ফিকাহবিদদের মূল কথা হল, এক ব্যক্তিকে হত্যা কাজে যখনই দুজন অংশ নেবে, সে দুজনের উপরই প্রতিশোধ আবর্তিত হবে না। একজনের উপর তা প্রবর্তিত হবে। পূর্বে আমরা আমাদের দলীলাদি পেশ করাকালে উল্লেখ করেছি যে, যে একজন ইচ্ছামূলক হত্যায় শরীক হয়েছে, তার উপর বিচার কার্যকর হওয়া এবং অপর জনের উপর মাল দেয়া কর্তব্য হওয়া নিষিদ্ধ, এজন্যে যে, নিহত ব্যক্তির প্রাণের উপর সে ভুলবশত আঘাত হেনেছে, আর ইচ্ছাপূর্বক ও ভুলবশত হত্যা মাল দেয়া ও শাস্তি পাওয়া একই অবস্থায় একটি মানুষের জন্যে—যা বিভক্ত হয় না—তা সঙ্গত নয়। কেননা নিহত ব্যক্তির কতক ধ্বংসপ্রাপ্ত আর কতক জীবিত, এটা তো হতে পারে না। একই সময় এক ব্যক্তি জীবিত ও মৃতও, এরূপ হওয়া তো অসম্ভব। আর তা যখন অসম্ভব, তখন প্রমাণিত হল যে হত্যাকারীদ্বয়ের প্রত্যেকজন গোটা মানুষটির ধ্বংসকারী হয়ে দাঁড়াবে। অতএব সে জনের উপর প্রতিশোধ ধার্য হবে না, তার দীয়ত দেয়া কর্তব্য হবে। এরূপ অবস্থায় সকলেই ভুলবশত হত্যাকারীতে পরিণত হবে। এরূপ অবস্থায় একজনকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারী সাব্যস্ত করা যায় না। কেননা তা যদি যেত, তাহলে উভয়কেই গোটা দীয়ত দিতে বাধ্য করা হতো। এই দিক দিয়েই সাদৃশ্যপূর্ণ হয় সে ব্যক্তি, যে দাসীর সাথে সঙ্গমকারী, তার ও অপরের মধ্যে 'হদ্দ' প্রত্যাহৃত হওয়ার ব্যাপারে ভাগাভাগি হতে পারে। কেননা তার কাজ তার ভাগে বিভক্ত হবে, এ কাজে তার শরীকের ভাগ বাদ দিয়ে, তা হতে পারে না। তার ভাগের কাজে যখন হদ্দ ওয়াজিব হল না, তার শরীকের ভাগে তা ওয়াজিব হওয়া নিষিদ্ধ হয়ে গেল। কেননা এই কাজে অংশ ভাগ হয় না। এই ভিত্তিতেই আমাদের ফিকাহবিদগণ বলেছেন, দুই ব্যক্তি একত্রিত হয়ে তাদের একজনের পুত্রের কোন মাল চুরি করল। এক্ষেত্রে তাদের দুজনের হাত সেই চুরি

জন্যে কাটা যাবে না। কেননা সে শরীক হয়েছে এমন ব্যক্তির সংরক্ষণ ছিন্ন করার কাজে যার হাত কাটা যাবে না।

কেউ যদি বলেন, ইচ্ছা-সংকল্প সংশ্লিষ্ট হচ্ছে ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারীর সাথে। আর সুস্থ সবল ও পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির উপর প্রতিশোধ আরোপিত হবে তোমার উল্লিখিত আয়াতসমূহের যৌক্তিকতার কারণে, যখন সে সমস্ত মানুষের হত্যাকারী, সমস্ত জীবন বরবাদকারী। এই কারণে অংশীদারিত্ব ও একককত্বের—উভয় অবস্থায়ই আল্লাহ ঘোষিত অশুভ পরিণতি ভোগ করার যোগ্য হয়েছে। অনুরূপভাবে যে লোকেরা একত্র হয়ে এক ব্যক্তিকে হত্যা করার সংকল্প গ্রহণ করেছে, তাদের প্রত্যেকেই প্রতিশোধের সম্মুখীন হবে অনিবার্যভাবে। কেননা তারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে সমস্ত মানুষকে হত্যা করার মত কাজ করেছে। এই জিনিসটিই দুজনের মধ্যে যে লোকটি সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন, দণ্ডস্বরূপ তাকে হত্যা করা কর্তব্য হবে। বালক ও পূর্ণবয়স্ক—এ দুজনের মধ্যে পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিই অনুরূপভাবে হত্যাযোগ্য হবে। প্রতিশোধ ধার্য হয় না যে বালকের উপর, তার অংশীদারিত্ব থাকা সত্ত্বেও।

জবাবে বলা যাবে, না, তা কর্তব্য নয়। তার কারণ হচ্ছে, যে শরীকের উপর প্রতিশোধ আবর্তিত হয় না, তার ভাগের দীয়ত দেয়া তার জন্যে বাধ্যতামূলক হবে। তাতে জরিমানা দেয়া ওয়াজিব হবে না। তখন সকলের ক্ষেত্রেই সংকল্প না থাকার কথা প্রমাণিত হবে কেননা ধ্বংস সাধনের কাজে অংশ ভাগ নিষিদ্ধ। সকলেই ভুলবশত হত্যা করেছে, বলতে হবে। আর তাতে খুনের প্রতিশোধের প্রশ্ন উঠবে না। যে শরীকের উপর প্রতিশোধ ধার্য হয় না, তার দীয়তের অংশ সম্পূর্ণ দীয়ত নয়—দেয়া যখন কর্তব্য সাব্যস্ত হল, তখন প্রমাণিত হল যে, সকলেই ভুলবশত হত্যায় শরীক হয়েছে। তা না হলে সম্পূর্ণ দীয়ত দেয়াই ওয়াজিব হতো। লক্ষণীয়, হত্যাকারীদের সকলেই যদি এমন হতো যে, তাদের সকলেরই উপর প্রতিশোধ কার্যকর হওয়া কর্তব্য, তা হলে তাদের সকলেরই উপর তাই করা হতো, যদিও তাদের প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র হত্যাকারী। যার উপর প্রতিশোধ কার্যকর হয় না, সেই শরীকের উপর যখন তার ভাগের দীয়ত দেয়া ওয়াজিব সাব্যস্ত হল তখন বোঝা গেল যে, প্রতিশোধ গ্রহণ প্রত্যাহৃত হয়েছে। আর প্রাণ সংহারের কাজটা ভুলবশত হয়ে গেছে। এ কারণে দীয়ত হত্যাকারীদের সংখ্যানুপাতে বিভক্ত হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী ইচ্ছাপূর্বক ও ভুলবশত এই দুই হত্যাকারীর ব্যাপারে এই মত দিয়েছেন যে, দুজনের মধ্যে ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারীর উপর প্রতিশোধ কার্যকর হবে না। সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির লোকও পাগল এবং বালক ও পূর্ণ বয়স্ক লোক একটি হত্যাকাণ্ডে পরস্পর শরীক হলে—এর মধ্যে এমন ব্যক্তি রয়েছে, যার উপর প্রতিশোধ কার্যকর হয় না—এজন্যে অনুরূপ রায়ই চূড়ান্ত ধরতে হবে।

এ থেকে আমরা এই মৌল নীতি পেলাম যে, একই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রতিশোধ কার্যকর হওয়া এবং মালও দেয়া কর্তব্য হওয়া নিষিদ্ধ। লক্ষণীয় যে, হত্যাকারী যদি একজন মাত্র হতো, তাহলে মাল দেয়াই তার কর্তব্য হত। কিসাস না হওয়াই সাব্যস্ত হতো। যৌন

সঙ্গমের ব্যাপারেও তাই। তার কারণে মহরানা দেয়া ওয়াজিব সাব্যস্ত হলে তার উপর 'হদ্দ' হতে পারে না। চুরির ব্যাপারেও তাই। যদি তার ক্ষতিপূরণ দেয়া ওয়াজিব হয়, তাহলে তার হাত কাটা যেতে পারে না। এটা আমাদের মত। কেননা এসব ক্ষেত্রে মাল দেয়া ওয়াজিব হয় শুধু প্রতিশোধের 'হদ্দ' উভয় বাতিলকারী সংশয়ের উপস্থিতিতে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে মাল দেয়া যখন ওয়াজিব সাব্যস্ত হল, তখন কিসাস ওয়াজিব হওয়া নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রতিশোধ প্রত্যাহৃত হওয়া তা ওয়াজিব হওয়ার পরিবর্তে অধিক উত্তম—এ কথার প্রমাণ এই যে, প্রতিশোধ মালে রূপান্তরিত হয়ে যায় তা প্রমাণিত হওয়ার পর। কিন্তু মাল কখনও প্রতিশোধে রূপান্তরিত হয় না কোন রূপেই। কাজেই যা ভেঙ্গে অন্যটা হয় না, তা স্থিতিশীল থাকে, তা অধিক উত্তম সেই ব্যবস্থার তুলনায় যা প্রমাণিত হওয়ার পর ভেঙ্গে অন্যটা হয়ে যায়। আর দুজনের একজনের উপর থেকে প্রতিশোধ প্রত্যাহৃত হওয়া অপর জনের উপর থেকেও তার প্রত্যাহৃত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াল।

যদি বলা হয়, দুজন লোক ইচ্ছাপূর্বকভাবে এক ব্যক্তিকে হত্যা করল। পরে নিহতের অভিভাবক একজনকে ক্ষমা করে দিল, এক্ষেত্রে তোমরা বল যে, অপর জনকে কিসাসে হত্যা করা হবে। অনুরূপভাবে আলোচ্য বিষয়ে তোমাদের সে কথা বলা উচিত।

জবাবে বলা যাবে, এই প্রশ্নটি ইমাম শাফেয়ীর মূলনীতির বাইরে। কেননা ভুলক্রমে হত্যাকারীর সাথে শরীক হয়—এমনভাবে যে, যার উপর প্রতিশোধ ওয়াজিব তার উপর তা কার্যকর না করার ব্যাপারে কোন অংশ নেই তাহলে তাকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারী থেকে আলাদা করাকে তিনি বাধ্যতামূলক মনে করেন। কেননা সে একক হত্যাকারী হলে তা-ই হতো। ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারী দুজনের একজনকে ক্ষমা করার কারণে তার উপর প্রতিশোধ প্রত্যাহৃত হলে অপরজনের উপর থেকে তা প্রত্যাহৃত হবে না। কিন্তু ভুলবশত হত্যাকারী ও ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারীর ব্যাপারে তা যখন বাধ্যতামূলক নয়, তখন আমরা বালক ও পূর্ণবয়স্ক এবং পাগল ও সুস্থবুদ্ধির লোকদের শরীকানায় যে হত্যাকাণ্ড হয়, তাতেও আমরা বাধ্যতামূলক করিনি। দুজনের অপরজনের ক্ষেত্রে প্রশ্নটি উঠে না এই কারণে যে, কথা হচ্ছে পূর্ণ মাত্রায় দিয়ে দেয়ার ব্যাপারে। আর শরীকানার কারণে একজনের পূর্ণ মাত্রায় দিয়ে দেয়ার কর্তব্য হতে পারে না। কেননা দুজনের একজনকে অপরজনের আগেই কিসাসের দ্বারা হত্যা করা হয়ে যেতে পারে। এও হতে পারে যে, দুজন আসামীর মধ্যে একজনকে পেয়ে হত্যা করা হল আর অপরজনকে ধরা যায়নি বলে তাকে হত্যাও করা যায়নি।

হত্যাকাণ্ড যদি কয়েকজনের অংশীদারিত্বে সংঘটিত হয়, তখন প্রাথমিক কর্তব্য আমাদের একটি আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কেননা তখন দুজনের প্রত্যেকেই হুকুমের আওতার মধ্যে হবে, তা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। যেমন একজন প্রকৃত ধ্বংসকারী হত্যাকারী, অপরজন নয়। এখন শরীক ব্যক্তি ছাড়াই একজনের উপর হুকুম কার্যকর করা

কঠিন। তখন সম্পূর্ণ প্রাপ্য আদায় করা ছাড়াই হুকুম কার্যকর করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। তখন সম্পূর্ণ প্রাপ্য আদায় করতে বাধ্য করা সঙ্গত হয় না। কেননা পূর্ণ প্রাপ্য আদায় করার অবস্থাকে কর্তব্যের অবস্থার দৃষ্টিতে বিবেচনা করা অসঙ্গত।

লক্ষণীয়, সম্পূর্ণ প্রাপ্য আদায় করা অবস্থায় সে তওবাকারী ও আল্লাহ্র বন্ধু হয়ে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু যে হত্যা প্রতিশোধযোগ্য, সেই হত্যা কালে কারোর অলী-আল্লাহ্ (আল্লাহ্র বন্ধু) হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ব্যভিচারীও তওবা করতে পারে। তাহেল পূর্ণ 'হদ্দ' দেয়ার অধিকার তার উপর অবশিষ্ট থেকে যাবে। আর 'হদ্দ' ওয়াজিব হলে তা এ অবস্থায় পড়ে থাকবে, তা সঙ্গত নয়। এরূপ অবস্থায় ওয়াজিব হওয়ার অবস্থাকে প্রাপ্য পূর্ণ আদায়ের অবস্থার সাথে বিবেচনা করবে, সে তার উপর ধার্য কর্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফিল।

তাছাড়া দুজনের একজন থেকে প্রাপ্য ক্ষমা করা হলে তাকে হত্যা করার হুকুম নাকচ হয়ে যাবে। তখন একক হত্যাকারীর হুকুমও অবশিষ্ট থেকে যাবে। তখন তার প্রতিশোধ গ্রহণ বাধ্যতামূলক হবে। তখন অপর জনের উপর থেকে তা নাকচ হয়ে যাওয়ার দরুন সে প্রতিশোধ নাকচ হয়ে যাবে না। অর পাগল এবং আর যার উপর প্রতিশোধ লওয়া ওয়াজিব হয় না, তার কাজের হুকুম প্রতিষ্ঠিত হবে ভুলের উপর। বলা হবে, সে ভুলবশত হত্যা কাণ্ড ঘটিয়েছে। আর তা তার সাথে শরীক ব্যক্তির রক্তপাত নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কেননা হত্যাকাণ্ডে দুজনই শরীক বলে উভয়ের ক্ষেত্রে হুকুম হবে অভিন্ন।

আমরা এ পর্যায়ে কুরআনের যে আয়াত এবং যে যুক্তি পেশ করেছি তাতে যখন যার উপর প্রতিশোধ ওয়াজিব হয় না তার সাথে শরীক ব্যক্তির উপর থেকে প্রতিশোধ নাচক হয়ে যাওয়া প্রমাণিত হল, তখন তাদের দুজনের ক্ষেত্রে আয়াতসমূহের সিদ্ধান্ত বিশেষীকরণ সঙ্গত হবে। এ সে সব আয়াত, যা কিসাস পর্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে, যেমন ঃ 'তোমাদের উপর নিহত ব্যক্তির জন্যে কিসাস ফরয করে দেয়া হয়েছে,' 'স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যার দরুন নিহত হবে,' 'যে লোক মজলুম হিসেবে নিহত হয়েছে,' 'তার অভিভাবকের জন্যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছি' এবং 'প্রাণের বদলে প্রাণ হরণ করতে হবে।' সেই সাথে যেসব হাদীস কিসাস ফরয প্রমাণ করে, তার সাধারণ ও ব্যাপক প্রয়োগ। কেননা এই সবই সাধারণ ও ব্যাপক তাৎপর্য নিয়ে এসেছে। সে সব থেকেই বিশেষীকরণ সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই বিশেষীকরণ সঙ্গত যুক্তির ভিত্তিতে।

আল-মুজানী উল্লেখ করেছেন, ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারীর সাথে যদি কোন বালক বা পাগল শরীক হয়, তা হলে ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারীর উপর প্রতিশোধ ধার্য করার নিষিদ্ধ হওয়া পর্যায়ে ইমাম মুহাম্মাদের বিপরীত মত দিয়েছেন ইমাম শাফেয়ী এবং যুক্তি হিসেবে বলেছেন, তুমি তো তার উপর থেকে হত্যার অভিযোগ তুলে নিয়েছ। কেননা তাদের দুজনের উপর থেকে কলম উঠে গেছে। আর তাদের হত্যা-ইচ্ছা ভুলবশত হত্যা পর্যায়ে গণ্য। তা হলে পিতার সাথে একজন লোক ইচ্ছাপূর্বক হত্যায় কোন ভিন্ন ব্যক্তি থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ কর না কেন? কেননা পিতার উপর থেকে কলম তুলে নেয়া হয়নি। তা তার আমলকে ত্যাগ করার শামিল।

আল-মজানী বলেছেন, এই বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মুহাম্মাদ যা অস্বীকার করেছেন, তাতে তাঁর সাথে শরীক হয়েছেন। কেননা ভুলবশত হত্যাকারী ও পাগলের উপর থেকে কিসাস তুলে নেয়া একই ব্যাপার। অনুরূপভাবে ইচ্ছামূলক হত্যায় হত্যাকারীদের সাথে যে শরীক হয়েছে, তারাও অভিন্ন।

আবূ বকর বলেছেন, আল-মুজানী ইমাম শাফেয়ীর নামে যা কিছু প্রকাশ করেছেন, তা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। কেননা তিনি বিপরীত কথাই চাপিয়ে দিয়েছেন। যার ইচ্ছা ভুল, তার সাথে হত্যা কাজে শরীককে আলাদা করা যাবে না, এই মূল নীতির ভিত্তিতে হত্যায় শরীক ব্যক্তিকে আলাদা করা যাবে না, সে ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারী হলেও। তবে যার ইচ্ছাটা ভুল নয়, তাদের দুজনের প্রসঙ্গের হুকুমটা পরস্পর বিপরীত হওয়া জরুরী নয়। বরং সে প্রসঙ্গে হুকুম তার দলীলের উপর নির্ভরশীল। কেননা তা 'ইল্লাত'-এর বিপরীত। আর শরীয়াতে যেলোক কোন 'ইল্লাত' ধারণ করবে, সে তার বিপরীত করবে, তা বাধ্যতামূলক নয়। আর তা না হওয়ার সময়ে তার হুকুম বিপরীত হবে, তার উপস্থিতকালীন হুকুমের, তাও জরুরী নয়। লক্ষণীয়, আমরা যদি বলি غرر ধোঁকা প্রতারণা হলে ক্রয়-বিক্রয়ের জায়েয হওয়া নিষিদ্ধ, তখন غرر না হলে তা জায়েয বলে হুকুম লাগানো আমাদের জন্যে বাধ্যতামূলক হয় না। বরং غرر না হলেও ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়া সম্ভব। সম্ভব অপর এক অর্থের দৃষ্টিতে। তা এভাবে যে, বিক্রেতা তা দখলে নিল না কিংবা এমন শর্ত আরোপ করল, যে শর্ত ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি বাধ্যতামূলক করে না। কিংবা মূল্যটা অজ্ঞাত হতে পারে। এই ধরনের আরও যে সব কারণে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি ভেঙ্গে দেয়, তা-ও হতে পারে। غرر দূর হয়ে গেলে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হতে পারে জায়েয হওয়ার দলীল প্রাপ্তির অনুপাত অনুযায়ী বা তা ভেঙ্গে যাওয়ার অনুপাত অনুযায়ী। ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির ক্ষেত্রে এ রকম ঘটনার দৃষ্টান্ত অনেক রয়েছে। ইসলামী ফিকাহ সম্পর্কে ধারণা রাখেন এমন লোকদের নিকট তা কিছু মাত্র অস্পষ্ট নয়। এ পর্যায়ে দলীল হিসেবে যা যা উল্লেখ করা হয়, তন্মধ্য থেকে একটি হচ্ছে হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীস। নবী করীম (স) বলেছেন :

اَلاَاِنَّ قَتِيْلَ خَطَاءَ الْعَمْدِ قَتِيْلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا -

জেনে রাখো! ভুল ইচ্ছার ফলে যে লোক নিহত হয়, সে চাবুক ও লাঠির আঘাতে নহিত।

এতে ভারী দীয়ত হবে। বালক-পূর্ণ বয়স্ক, পাগল-সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির লোক এবং ভুলকারী ও ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারী, এরা ইচ্ছাকারী ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত। তা দুটি দিক-দিয়ে। একটি—নবী করীম (স) বলেছেন, ইচ্ছা-ভুলকারীর দ্বারা নিহত সে, যে চাবুক ও লাঠির আঘাতে নিহত। এতে পাগল যদি শরীক হয় লাঠি নিয়ে, আর সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির লোক তরবারি নিয়ে, তা হলে সে ভুল-ইচ্ছার অধীন নিহত। কেননা নবী করীম (স) এই রূপই ফয়াসালা দিয়েছেন, কাজেই তাতে কিসাস না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, বালক ও পাগলের ইচ্ছা-সংকল্প ভুল। কেননা নিহত ব্যক্তির

তিনটির মধ্যে যে-কোন একটি কারণে নিহত হয়ে থাকবে। হয় ভুলবশত, না হয় ইচ্ছা-সংকল্পের ফলে, অথাব প্রায় ইচ্ছামূলকভাবে। কিন্তু বালক ও পাগলের হত্যাকরণ যখন ইচ্ছামূলকভাবে হয়নি, তখন তা ভুল বা প্রায় ইচ্ছামূলক—এই শেষ দুটির কোন একটি দিক দিয়ে নিহত হয়ে থাকবে। এর যে-টিই হোক, নবী করীম (স) ব্যবহৃত শব্দের বাহ্যিক অর্থের দাবি হচ্ছে, হত্যায় তার শরীকের উপর থেকে প্রতিশোধ প্রত্যাহৃত হওয়া। কেননা সে ভুলে নিহত, অথবা নিহত ভুল ইচ্ছার ফলে। উপরন্তু যে লোক এই পরিচিতির অধিকারী হয়েছে, তার উপর ভারী দীয়ত ধার্য করেছে। আর দীয়ত যখন পূর্ণ মাত্রার ওয়াজিব করা হবে, তখন তার উপর প্রতিশোধ নেয়া নিষিদ্ধ হবে।

যদি বলা হয়, নবী করীম (স) তার 'ভুল ইচ্ছার ফলে নিহত' কথাটি দ্বারা বলতে চেয়েছেন, যদি কেউ এককভাবে চাবুক ও লাঠির দ্বারা হত্যা করে। জবাবে বলা যাবে, তার সঙ্গে তরবারি নিয়ে হত্যাকারীর অংশিদারিত্ব রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার চাবুক ও লাঠির দ্বারা নিহত হওয়া মিথ্যা হয়ে যায় না। আর তা-ই হচ্ছে ভুলে ফলে হত্যা। কেননা দুজনের প্রত্যেকেই হত্যাকারী হিসেবে তার প্রত্যেকের দ্বারা নিহত হওয়াই বাস্তব কথা। তা হলে নবী করীম (স)-এর কথাটি দুটি অর্থ সমন্বিত এবং উভয় অবস্থায়ই কিসাস নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এবং তাতে আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। পাগলের সাথে সুস্থ বুদ্ধির ও ভুলক্রমে হত্যাকারীর ইচ্ছামূলক হত্যাকারীর সাথে শরীক হওয়ার হুকুম বিভিন্ন হতে পারে না। এক ব্যক্তি যদি অপর এক ব্যক্তিকে আহত করে যে ব্যক্তি পাগল। পরে সে সুস্থ হয়ে যায়। এই সুস্থ হওয়ার পর তার উপর আবার আহত করে, পরে সে আহত ব্যক্তি মরে যায়, তা হলে হত্যাকারীর উপর প্রতিশোধ আরোপিত হবে না। যেমন ভুলবশত তাকে আহত করা হলে পারে ইচ্ছাপূর্বক আবার আহত করা হলে ও এ দুটি আঘাতের ফলে সে মরে গেলে আঘাতকারীর উপর প্রতিশোধ ধার্য হবে না। অনুরূপভাবে 'মুরতাদ' অবস্থার এক ব্যক্তিকে আহত করা হলে পরে সে ইসলাম কবুল করলে পর তাকে আবার আহত করা হলে, পরে এই দুটি আঘাতে সে মৃত্যুবরণ করলে যখমকারীর উপর প্রতিশোধ কার্যকর হবে না। এর দুটি অর্থ হতে পারে। একটি এই যে, তার মৃত্যুটা দুইটি যখমের দরূন হয়েছে। তার একটি প্রতিশোধ গ্রহণকে জরুরী করে না। আর দ্বিতীয়টি এমন কারণ সৃষ্টি করেছে, যার দুরুন প্রতিশোধ প্রত্যাহৃত হওয়া জরুরী হয়, আর যে একক যখমের কোন সংশয় নেই তাতে প্রতিশোধ আবশ্যিক হওয়ার কোন হুকুম নেই; বরং হুকুম আছে প্রতিশোধ আবশ্যিক না হওয়ার। এমতাবস্থায় দুই ব্যক্তির একজনের কৃত যখমের দুরুন যদি সে মরে গিয়ে থাকে, আর সে একক হয়ে থাকে, তা হলে তার কৃত যখম প্রতিশোধ গ্রহণকে আবশ্যিক বানায়। আর অপর যখমটির প্রতিশোধ প্রত্যাহৃত হওয়ার পরিবর্তে তা কার্যকর হওয়ার হুকুমই উত্তম হবে। কেননা মৃত্যুটা উভয় যখমের দরুন হয়েছে। তা হলে প্রতিশোধ প্রত্যাহৃত হওয়ার আবশ্যকতা প্রমাণকারী হুকুম তা আবশ্যিক করার হুকুমের তুলনায় অধিক উত্তম। এ দুটিতে 'ইল্লাত' হচ্ছে উভয় যখমের ফলে ঘটিত মৃত্যু। সে যখম দুটির একটি প্রতিশোধ আবশ্যিক বানায়, অন্যটি আবশ্যিক বানায় না।

আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, শুরুতেই আমরা তার ভিত্তিতে কথাকে বিভক্ত করে এসেছি ভুলবশত হত্যাকারী ও ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারী এবং পাগল ও সুস্থ বিবেকবানের কোন পার্থক্য করা যায় না। যদি হত্যা কাজে শরীকানা হয়। যেমন পাগলের পাগলামী অবস্থায় কৃত অপরাধ এবং পরে তার সুস্থ অবস্থায় কৃত অপরাধের বিভিন্ন হয় না, যদি উভয় অবস্থায় কৃত অপরাধের দরুন মৃত্যু সঙ্ঘটিত হয়। আর ভুলবশত ও ইচ্ছাকৃত অপরাধ—যদি উভয়ের ফলে মৃত্যু সঙ্ঘটিত হয়, তাহলে উভয় অবস্থায় প্রতিশোধ প্রত্যাহৃর হওয়ার ক্ষেত্রেও ভিন্নতর কিছু হয় না। অনুরূপভাবে সুস্থ ব্যক্তির অপরাধ তার সাথে গাপলের শরীক হওয়ার কারণে ভিন্নতর কিছু না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর ইচ্ছাপূর্বক কৃত অপরাধের সাথে ভুলকারীর শরীক হওয়াতেও পার্থক্য হয় না।

## ইচ্ছাপূর্বক হত্যায় নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের করণীয়

আল্লাহ বলেছেন ঃ 'তোমাদের উপর কিসাস ফরয করা হয়েছে নিহতের ব্যাপারে।' বলেছেন ঃ 'তাতে তাদের উপর লিখে দিয়েছি যে, জানের বদলে জান নিতে হবে' বলেছেনঃ 'যে লোক অন্যায়ভাবে নিহত হবে, তার অভিভাবকের জন্যে আমরা অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছি।'

ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, এ সব আয়াতে নিহতের জন্যে হত্যাকারীর উপর প্রতিশোধ লওয়া কর্তব্যের কথাই বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন—তোমরা যদি প্রতিশোধ লও, তাহলে প্রতিশোধ লও ঠিক সেইভাবে, যেভাবে তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়েছে। বলেছেন, 'তোমাদের উপর যে সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ করবে, তোমরাও তার উপর অনুরূপ কাজ কর, যেমন তারা তোমাদের উপর করেছেন।'

এই সব আয়াত 'কিসাস' করাকে ফরয করে দিয়েছে, অন্য কিছু নয়, ইচ্ছামূলক হত্যা কি ফরয করে, সে বিষয়ে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর সঙ্গীগণ, মালিক ইবনে আনাস, সওরী, ইবনে শাবরামাতা, হাসান ইবনে সালিহ্‌ বলেছেন, নিহতের অভিভাবক 'কিসাস' করার অধিকারী। এ ছাড়া অন্য কিছু করার তার অধিকার নেই। আর দীয়ত গ্রহণ করতে হলে হত্যাকারীর সেজন্যে রাজি হওয়া জরুরী, অন্যথায় দীয়ত গ্রহণ করতে পারবে না।

ইমাম আওজায়ী, লাইস ও শাফেয়ী বলেছেন, কিসাস লওয়া বা দীয়ত গ্রহণ করা—এ দুটির যে কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার রয়েছে অভিভাবকের, হত্যাকারী রাজি না হলেও। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, দরিদ্র অভিভাবক যদি কিসাস মাফ করে দেয়, তাহলে তা করা জায়েয হবে। যাদের জন্যে নিহতের অসিয়ত রয়েছে, কিংবা ঋণ প্রাপ্য রয়েছে, তাদের তাকে নিষেধ করার অধিকার নেই। কেননা ধন-মালের মালিক হওয়া শুধু সংকল্পের দ্বারা সম্ভব নয়। যার উপর অপরাধটা করা হয়েছে তার ইচ্ছা হওয়া আবশ্যক, যদি সে জীবিত থাকে। কিংবা সে মরে গেলে তার ওয়ারিসগণের ইচ্ছা থাকতে হবে।

আবূ বকর বলেছেন, কুরআনের আয়াতে যাহিরী অর্থে পূর্বে বলা হয়েছে। শব্দে বিভিন্ন

তাৎপর্য নেই, নিহিত বক্তব্য স্পষ্ট। তা কিসাসকেই ওয়াজিব করে, মাল গ্রহণ নয়। ইখতিয়ার হিসেবেও মাল লওয়া ওয়াজিব হওয়া সঙ্গত নয়। তবে যা দ্বারা তা মনসূখ করা জায়েয, তাহলে ভিন্ন কথা। কেননা কুরআনের দলীলে বাড়তি ধরলে তা মনসূখ হওয়ার শামিল হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র এই কথাটি থেকেও তা-ই প্রমাণিত হয় ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ –

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বাতিল পন্থায় ধন-মাল ভক্ষণ করো না। তবে পারস্পরিক ব্যবসা যদি তোমাদের পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে হয়, তাহলে ভিন্ন কথা।

মুসলমানদের পারস্পরিক ধন-মাল গ্রহণ নিষিদ্ধ। তবে ব্যবসায়ের মাধ্যমে সন্তুষ্টির ভিত্তিতে তা হতে পারে।

অনুরূপ কথা নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে। বলেছেন ঃ

لَايَحِلُّ مَالُ امْرَىءٍ مُّسْلِمٍ اِلَّابِطِيْبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ –

মুসলিম ব্যক্তির মাল অন্যজনের পক্ষে হালাল হবে কেবল তখন যদি তা তার মনের খুশীতে দেয়।

কাজেই হত্যাকারী যদি মাল দীয়ত দিতে রাজি না হয়, তার মন দিতে আনন্দ বোধ না করে, তা হলে তার মাল সকলেরই উপর নিষিদ্ধ হবে। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, পূর্বে এর সনদ উল্লেখ করা হয়েছে—রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْعَمَدُ قَوَدٌ اِلَّااَنْ يَعْفُوَ وَلِىُّ الْمَقْتُوْلِ –

ইচ্ছামূলক হত্যার প্রতিশোধ অবশ্যই গ্রহণীয়। তবে নিহতের অভিভাবক যদি ক্ষমা করে দেয়, তাহলে ভিন্ন কথা।

সুলায়মান ইবনে কাসীর আমর ইবনে দীনার, তায়ূস ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ قُتِلَ فِىْ عِمِّيًا اَوْفِىْ زَحْمَةٍ لَمْ يُعْرَفْ قَاتِلُهُ اَوْ رِمِيًا تَكُوْنُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ اَوْسَوْطٍ اَوْعَصَا فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَاَ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدَيْهِ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ –

যে লোক দুর্বোধ্য বা গুপ্তভাবে কিংবা ভিড়ের মধ্যে পড়ে নিহত হবে তার হত্যাকারীকে চিহ্নিত করা যায় না অথবা যে ব্যক্তি উড়ো আঘাতে নিহত হবে, পরস্পরের মধ্যে

পাথর, চাবুক বা লাঠি চলছিল, তাতে মরে গেল, তার এই হত্যা ভুলক্রমে হত্যারূপে অভিহিত হবে। আর যে লোক কারো দ্বারা ইচ্ছাপূর্বক নিহত হবে, তার হস্তদ্বয় থেকে প্রতিশোধ অবশ্যই নিতে হবে। এরূপ অবস্থায় যে লোক এর ও ওর মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে, তার উপর আল্লাহ্‌র ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের অভিসম্পাত।

রাসূলে করীম (স) উপরোদ্ধৃত হাদীস দুটিতে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, ইচ্ছামূলক হত্যার প্রতিশোধ অবশ্যই নিতে হবে। দীয়ত গ্রহণের ইখতিয়ার থাকলে তিনি শুধু প্রতিশোধ লওয়ার কথাই বলতেন না; দীয়তের কথাও বলতেন। কিন্তু তা তিনি বলেন নি। ইখতিয়ারের ভিত্তিতে দুটি জিনিসের মধ্যে একটি গ্রহণ করার অধিকার থাকবে, আর খোদ রাসূলে করীম (স)-ই তার একটি মাত্রের উল্লেখ করবেন, অন্যটির কথা বলবেন না—তা হতেই পারে না। কেননা তাতে ইখতিয়ারকেই অস্বীকার করা হয়। এর পরও তাতে ইখতিয়ার আছে বলা তাঁর কথাকেই মনসূখ করে দেয়ার শামিল।

যদি বলা হয়, ইবনে উয়াইনা অপর একটি হাদীস আমর ইবনে দীনার তায়ূস সূত্রে (মওকূফ) বর্ণনা করেছেন, তাতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)–এর নাম উল্লেখ করা হয়নি। তা নবী করীম (স) কথা হিসেবেও বর্ণিত হয়নি।

জবাবে বলা যাবে, ইবনে উয়াইনা কখনও এই হাদীসটি 'অ-মরফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন, আবার কখনও বর্ণনা করেছেন সুলায়মান ইবনে কাসীরের বর্ণনার ন্যায়। মূলত ইবনে উয়াইনা খুব খারাপ স্মরণ শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি বর্ণনায় খুব বেশি ভুল করতেন। তা সত্ত্বেও তায়ূস-ই হয়ত কখনও ইবনে আব্বাস (রা)-এর মাধ্যমে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, কখনও তিনি এই মর্মে ফতোয়া দিয়েছেন, তাঁর নিজের বিশ্বাসটা প্রকাশ করেছেন কিন্তু তাতে হাদীসকে দুর্বল করে দেবার মত কিছুই নেই।

ইলমওয়ালা মনীষীদের মধ্যে আল্লাহ্‌র এই কথাটি নিয়ে বিশেষ মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে ঃ

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ بِاِحْسَانٍ –

অবশ্য কোন হত্যাকারীর প্রতি তার ভাই যদি কিছু নম্র ব্যবহার করতে প্রস্তুত হয়, তা হলে প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী রক্তপাতের প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক এবং নিষ্ঠা ও সততার সাথে রক্তপাতের বিনিময় আদায় করা হত্যাকারীর অবশ্য কর্তব্য।

কিছু লোক বলেছেন, আয়াতের لعفو শব্দের অর্থ, যা সহজ এবং অনায়াসে করা যায়। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ خُذِ الْعَفْوَ অর্থাৎ যে ব্যবহার ও আচরণ, নৈতিকতা সহজসাধ্য। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللّٰهِ وَاٰخِرُهُ عَفْوُ اللّٰهِ –

প্রথম সময় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির, আর শেষ সময় আল্লাহ্‌র কৃত সহজাতের।

অর্থাৎ যা বান্দার জন্যে সহজসাধ্য ও সুবিধাজনক। অতএব আল্লাহ্‌র কথা فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ 'নিহতের অভিভাবককে যখন কোন মাল দেয়া হয়, তখন তা তার গ্রহণ করা উচিত এবং প্রচলিত নিয়মে তা অনুসরণ করা উচিত, এবং হত্যাকারীর উচিত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা সহকারে তা যথাযথভাবে দিয়ে দেয়া। এর অর্থ, হত্যাকারীর পক্ষ থেকে মাল দেয়া সহজ ও সম্ভব হলে তা গ্রহণ করা আল্লাহ্‌র দিক থেকে মুস্তাহাব বানানো হয়েছে। জানিয়ে দিয়েছেন যে, এটা আল্লাহ্‌র দিক থেকে বান্দাগণের প্রতি সহজতা বিধান এবং রহমতের ব্যবস্থা। যেমন সূরা আল-মায়িদায় 'কিসাস' সম্পর্কিত আয়াতের শেষেই বলা হয়েছে ঃ

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ –

যে লোক তা সাদ্‌কা করে দেবে, তা তার জন্যে কাফফারা স্বরূপ হবে।

এ আয়াতে ক্ষমা ও সাদকাকে মুস্তাহাব বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে এ আয়াতে অপরাধী দীয়ত দিলে তা কবুল করাকেও মুস্তাহাব বলা হয়েছে। কেননা তার উল্লেখ শুরু করা হয়েছে অপরাধীকে ক্ষমা করা দীয়ত দানের বিনিময়ে থেকে। পরে অভিভাবককে তা অনুসরণ করার—মেনে নেয়ার এবং অপরাধীকে তা আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে আদায় করে দেয়ার আদেশ করা হয়েছে।

অন্যান্য কিছু লোক বলেছেন ঃ উক্ত আয়াতের অর্থ তাই, যা এ হাদীসটিতে বলা হয়েছে—হাদীসটি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তা আবদুল বাকী ইবনে নাফে—আল হুমাইদী, সুফিয়ান সওরী, আমর ইবনে দীনার, মুজাহিদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ

كَانَ الْقِصَاصُ فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَلَمْ يَكُنْ فِيْهِمُ الدِّيَةُ –

বনী ইসরাঈলীদের সমাজে কিসাস কার্যকর ছিল, কিন্তু সেখানে দীয়তের প্রচলন ছিল না।

তাই আল্লাহ মুসলিম উম্মতের জন্যে এই আয়াতটি নাযিল করেছেন ঃ হে ঈমানদার লোকেরা! নিহতের ব্যাপারে তোমাদের উপর কিসাস ফরয করে দেয়া হয়েছে .... তবে যদি কারুর জন্যে তার ভাইর দিক থেকে কিছু সুবিধা করে দেয়া হয় ....

ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ আয়াতের اَلْعَفْوُ শব্দের অর্থ হচ্ছে ইচ্ছামূলক হত্যায় দীয়ত কবুল করা। আর প্রচলিত ন্যায়নীতির অনুসরণ এবং তা আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে দিয়ে দেয়া—'এটা তোমাদের রব্ব-এর দিক থেকে বোঝা হালকাকরণ ও রহমত ব্যবস্থা' কথাটি তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যা ফরয করা হয়েছিল, তার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে ঃ

فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ –

'এরপরও যে সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্যে পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে' কথাটি দীয়ত কবুল করার পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ কথাগুলোর মাধ্যমে ইবনে

আব্বাস জানালেন যে, এ আয়াতটি বনী ইসরাঈলীদের জন্যে কার্যকর আইন নাকচকারী হিসেবে নাযিল হয়েছে। কেননা তাদের সমাজে হত্যার ক্ষেত্রে দীয়ত গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। আর মুসলিম সমাজের জন্যে নিহতের অভিভাবককে 'দীয়ত' গ্রহণ মুবাহ করে দিয়েছে, যদি হত্যাকারী তা দিতে প্রস্তুত হয় এবং এটা আমাদের প্রতি আল্লাহ্র বোঝা হালকাকরণ ব্যবস্থা এবং বিশেষ রহমত। কাজেই আমাদের বিপরীত মতের লোকেরা যে বলেছেন ঃ নিহতের অভিভাবকের জন্যে দুটির যে-কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার রয়েছে অবশ্যম্ভাবীরূপে, ব্যাপার যদি প্রকৃতপক্ষে তাই হতো, তা হলে দীয়ত গ্রহণ اَلْعَفْوُ। পর্যায়ের কাজ এই কথাটি কখনই বলা হতো না। কেননা কবুল করার প্রশ্ন হয় প্রতিপক্ষ যদি তা দেয়। যদি তাই বলতে চাওয়া না হতো, তাহলে নিশ্চয়ই বলা হতো ঃ অভিভাবক যখন গ্রহণ করবে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, উভয় পক্ষে দীয়ত দেয়া ও গ্রহণ করায় যখন উভয়ই রাজি হবে, তখন তা গ্রহণ করা জায়েয।

কাতাদাহ থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে বোঝা যায়, বনী ইসরাঈলীদের প্রতি দীয়ত করা নিষিদ্ধ ছিল, সেটি মুসলিম সমাজে প্রযোজ্য হবে দীয়ত কবুল করার পরও হত্যাকারীকে হত্যা করার অবস্থায়। এ কথাটিই বলা হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আল-মিওয়াজী বর্ণিত হাদীসে। বলেছেন, হুসায়ন ইবনে আবূ রুবাই আল-জুরযানী আবদুর রাযযাক—মা'মার কাতাদাহ সূত্রে বর্ণনা করেছে 'যে লোক অতঃপর সীমালঙ্ঘন করবে' আল্লাহ এই কথার পর্যায়ে। তার অর্থ দীয়ত গ্রহণের পর যদি হত্যাকারীকে হত্যা করা হয়, তাহলে তাকে সেজন্যে হত্যা করা হবে, তার কাছ থেকে দীয়ত কবুল করা হবে না।

এ পর্যায়ে একটি তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে। তা সুফিয়ান ইবনে হুসায়ন ইবনে আশু—শাবী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, দুটি আরব গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। তাতে উভয় পক্ষ থেকে বিপুল সংখ্যক লোক নিহত হয়েছিল। তখন একটি গোত্র বলল ঃ একজন মেয়ে লোককে হত্যা করা হলে আমরা তার বদলে একজন পুরুষ এবং একজন পুরুষ হত্যা করা হলে আমরা তার বদলে দুজন পুরুষকে হত্যা না করে ছাড়ব না। পরে ব্যাপারটি নবী করীম (স)-এর সমীপে পেশ করা হয়। তখন তিনি বলেন, اَلْقَتْلُ بَوَاءٌ। হত্যা সমান সমান। এ থেকেই 'দীয়ত' পরিভাষাটি তারা বানিয়ে নেয়। এতে গোত্রদ্বয়ের একটিকে অপরটির উপর অধিক মর্যাদা দেয়া হয়েছে। আর তা-ই হচ্ছে আল্লাহ্র উক্ত কথা ঃ তোমাদের প্রতি কিসাস ফরয করা হয়েছে ... যদি কাউকে তার ভাই কোন কিছু ক্ষমা করে—পর্যন্ত। সুফিয়ান বলেছেন ঃ এই কথাটির অর্থ হচ্ছে ঃ যাকে তার ভাইর কোন অনুগ্রহ দান করা হবে, তা অবশ্যই প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী আদায় করে দেয়া কর্তব্য হবে। শাবী উক্ত আয়াতের নাযিল হওয়ার উপলক্ষের কথা জানিয়ে দিলেন। সুফিয়ান উল্লেখ করেছেন, اَلْعَفْوُ। এর এখানে অর্থ হচ্ছে اَلْفَضْلُ। অনুগ্রহ। শব্দটি এই অর্থটিও দিতে পারে। আল্লাহ বলেছেন ঃ حَتّٰى عَفَوْا। এমন কি তারা বিপুলভাবে ছিল। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ اَعْفُوْا الْاَحَى। 'তোমরা শত্রু বৃদ্ধি কর'। এ প্রেক্ষিতে

আয়াতটির তাৎপর্য হবে ঃ 'যাকে তার ভাইর উপর অধিক মর্যাদা দেয়া হবে—দীয়ত স্বরূপ কিছু (এই পরিভাষাই তৈরী হয়েছে) তাহলে তা অনুসরণ করা উচিত তার, যে তা পাওয়ার অধিকারী প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী এবং তা দিয়ে দেয়া উচিত আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে।

এ আয়াতের আরও একটা তাৎপর্য বলা হয়েছে। তা হচ্ছে, এ আয়াতটির কথা একদল লোকের মধ্যকার রক্তের ব্যাপারে প্রযোজ্য। তাদের কিছু লোক যদি অপর লোকদের ভাগ্যকে মালে রূপান্তরিত করে ক্ষমার সাহায্যে। হযরত উমর, আলী ও আবদুল্লাহ (রা) থেকে এ কথা বর্ণিত হয়েছে। যদিও তারা এ কথাকে আয়াতটির ব্যাখ্যা তাৎপর্য হিসেবে বলেন নি। তবে এ এমন একটি ব্যাখ্যা, যা আয়াতের শব্দগুলোর সাথে সামঞ্জস্যশীল। কেননা আয়াতটি হচ্ছে "فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ" 'যে লোকের জন্যে তার ভাইর দিক থেকে কোন কিছু ক্ষমা করা হবে' এর দাবি হচ্ছে, রক্তের দাবির কোন অংশের উপর যদি ক্ষমা সঙ্ঘটিত হয়। সমস্ত দাবি নয়। তাহলে শরীক লোকদের অংশ মালে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। তখন তাদের কর্তব্য হবে হত্যকারীকে অনুসরণ করা প্রচলিত ন্যায়-নীতির নিয়ম অনুযায়ী। আর হত্যাকারীর কর্তব্য—তা তাদের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে আদায় করে দেয়া।

অপর লোকেরা তার তাৎপর্য বলেছেন, রক্তের অভিভাবকের জন্যে হত্যাকারীর রাজি না হওয়া সত্ত্বেও তার কাছ থেকে মাল গ্রহণ জায়েয। কিন্তু এই ব্যাখ্যা আয়াতটির বাহ্যিক অর্থের পরিপন্থী। কেননা اَلْعَفْوُ দীয়ত গ্রহণ করার দ্বারা তো হতে পারে না। লক্ষণীয়, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ "اَلْعَمَدُ قَوَدٌ" ইচ্ছামূলক হত্যা অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণযোগ্য। অভিভাবকগণ তাকে ক্ষমা করে দেবেন, একথা নয়। এতে দুটি জিনিসের একটি প্রমাণিত হল—হয় হত্যার বদলে হত্যা, না হয় ক্ষমা। মাল গ্রহণ প্রমাণিত হয় না কোন অবস্থাতেই।

যদি কেউ বলেন, রক্তপাত যখন ক্ষমা করে দেয়া হল মাল (দীয়ত) গ্রহণের জন্যে, তখন সে ক্ষমাকারী হয়ে গেল। আয়াতের শব্দ এই তাৎপর্যের ধারক।

জবাবে বলা যাবে, দুটি জিনিসের কোন একটি যখন অবশ্য কর্তব্য হবে, তখন মাল গ্রহণ না করে বরং প্রতিশোধ গ্রহণ করেও সে ক্ষমা দানকারী হতে পারে। এরূপ অবস্থায় অভিভাবক হয় হত্যা ক্ষমা করবে, না হয় মাল গ্রহণ ক্ষমা করবে (অর্থাৎ দীয়ত গ্রহণ করবে না)। কিন্তু এরূপ কথা বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। তা কেউ গ্রহণ করতে পারে না। অপর দিক দিয়ে তা আয়াতটির বাহ্যিক অর্থকে নস্যাৎ করে। তা এভাবে যে, অভিভাবক যদি প্রতিশোধ গ্রহণ ও মাল গ্রহণ না করে ক্ষমাদানকারী হয়, তাহলে তখন তার সম্পর্কে বলা হবে না যে, সে তাকে ক্ষমা করেছে। বলা হবে তার থেকে ক্ষমা করেছে। কিন্তু এই অর্থটা গ্রহণ করা কঠিন। কেননা তাতে عن – لام এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে পড়ে। অথবা তার অর্থ হবে তার জন্যে রক্তের মূল্য ক্ষমা করেছে। তাতে একটি অক্ষর উহ্য মানতে হয়, যা এখানে উল্লিখিত হয়নি। কিন্তু আমরা যদি যা উল্লিখিত, তাকে যথেষ্ট মনে করি,

তা হলে উহ্য প্রমাণ করা আমাদের জন্যে জায়েয হয় না। অথচ আমাদের যাবতীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বাহ্যিকের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাতে কোন সর্বনাম প্রতিষ্ঠিত না করেই কথা বলা হয়েছে। আর তা হচ্ছে, হত্যাকারীর দিক থেকে মাল দানের সাহায্যে সহজতা করে দেয়া। অপর একটি দিক থেকে তা আয়াতটির বাহ্যিক অর্থের বিপরীত। তা হচ্ছে مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ। তার ভাইর দিক থেকে কোন জিনিস .... এতে ব্যবহৃত مِنْ কিছু অংশ বোঝায়। তার তা মূল ব্যাপারের সাথে সামঞ্জস্যশীল। তবে তার বিপরীতের কোন দলীল পাওয়া গেলে ভিন্ন কথা। তখন অবশ্যম্ভাবী রূপে তার ভাইর রক্তের কিছু অংশ ক্ষমা করা হবে। আর বিপরীত মতের লোকের নিকট তা-ই রক্তের সমস্ত দাবিই ক্ষমা করা ও ছেড়ে দেয়া এবং বিনিময়ে দীয়ত লওয়া। তাতে مِن শব্দের হুকুম নাকচ করা হয়। আরও একটি কারণ আছে। তা হল ঃ شَيء তা-ও রক্তের কিছুটা ক্ষমা করা কর্তব্য করে দেয় ও তার সম্পূর্ণটা নয়। যার মতে সম্পূর্ণটা ক্ষমা করা অর্থ, তা বলা কথা দ্বারা বোঝা যায় না, তার অনিবার্য দাবিও তা নয়। কেননা তা এ পর্যায়ের কথা হয়ে যায় যে, যদি বলা হতো, فَمَنْ عَفِيَ لَهُ عَنِ الدَّمِ যে লোক ক্ষমা করে দেয়া হবে রক্ত থেকে (অর্থাৎ রক্তের দাবি ক্ষমা করা হবে) 'এবং দীয়ত চাওয়া হবে'। এতেও مِن ও شَيء শব্দের হুকুমটা নাকচ হয়ে যায়। আয়াতটির এমন ব্যাখ্যা দেয়া যাতে شَيء শব্দের গুরুত্ব অস্বীকৃত হয়, কারো অধিকার থাকতে পারে না। বরং সেটি তার প্রকৃত তাৎপর্যের উপর যতটা সম্ভব দাঁড় করে রাখা আবশ্যক। আর আমরা যেমন বলেছি, সেই অর্থে যখনই ব্যবহার করা হবে, তা আয়াতের বাহ্যিক অর্থের অনুকূল হবে। তা থেকে কোন কিছু ফেলে দেয়ার প্রশ্ন হবে না। কেননা শাবী আয়াতের শানে নুযুল পর্যায়ে যা বলেছেন, তা-ই যদি তার ব্যাখ্যা হয় এবং দীয়ত দিয়ে কতক লোকের উপর অপর কতক লোকের অনুগ্রহ ধরা হয়, তাহলে তা ব্যবহৃত শব্দের সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে। কেননা عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ অর্থ হচ্ছে, তাকে অনুগ্রহ করে কিছু মাল দেয়া হয়েছে। তাতে রয়েছে তাগাদা করা। তা বাক্যের একটা অংশ। তা থেকে একটি জিনিস। তাতে শব্দটি তার আসল ও প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করে। আর ব্যাখ্যা যদি এই করা হয় যে, যদি মালের কোন অংশ দিয়ে তার জন্যে সহজতা করে দেয়া হয়, তা হলে অভিভাবকের তা গ্রহণ করা মুস্তাহাব—পছন্দনীয়, সেজন্যে সওয়াব দেয়ার প্রতিশ্রুত। এই ব্যাখ্যা এমন লোককে শামিল করে, যে কতক দীয়ত ব্যয় করবে। আর তা ব্যয় করা সমগ্র মালের একটা অংশ।

আর বনী ইসরাঈলীদের প্রতিশোধ গ্রহণ কর্তব্য এবং দীয়ত গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার আইন মনসূখ হয়ে যাওয়া পর্যায়ের বর্ণিত হাদীসই যদি ব্যাখ্যা ধরা হয়, তা হলে আমাদের দেয়া ব্যাখ্যা আয়াতের অর্থের সাথে বিপুলভাবে আনুকূল্যপূর্ণ, সন্দেহ নেই। কেননা আমরা বলছি, আয়াতটির দাবি হচ্ছে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সন্ধি গ্রহণ জায়েয, তাতে পরিভাষাটি অল্প বা বেশি যা-ই অনুকূল হোক। কিছুর উল্লেখ এবং তার উপর সমগ্রটার হুকুম আরোপ করা—যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ – فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا 'তুমি পিতা-মাতার জন্যে 'উহ' বলো না এবং সে দুজনকে ভর্ৎসনা করো না। 'সরাসরি এই

কথাটির প্রসঙ্গে একটি অকাট্য দলীল। আসলে আয়াতটিতে বলা অতটুকু কথাই লক্ষ্য নয়। বরং তার চাইতেও অনেক উঁচু ও বড় লক্ষ্য রয়েছে এই কথার মূলে। কুরআনে এ ধরনের কথার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

আর তার ব্যাখ্যা যদি হয় কতক অভিভাবকের তার অংশ ক্ষমা করা, তা হলেও তা আয়াতের বাহ্যিক অর্থের সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে। কেননা ক্ষমা তো কতক থেকেই হবে, সমগ্র থেকে নয়। পূর্বে উদ্ধৃত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্য থেকে যে ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হোক, তা আয়াতের বাহ্যিক অর্থের সাথে সামঞ্জস্য সম্পন্ন হবে। তবে সেই ব্যাখ্যা নয়, যাতে অভিভাবকের সবকিছু ক্ষমা করে দেয়ার অধিকার আছে বলে বলা হয়েছে—দীয়ত বাবত গ্রহণসহ। আমরা উপরে যেসব ব্যাখ্যার কথা বলেছি, তার সবই অর্থ হওয়াও নিষিদ্ধ নয়। তা হলে বলা যাবে যে, আয়াতটি নাযিল হয়ে বনী ইসরাঈলীদের জারী হওয়া আইন মুসলমানদের ক্ষেত্রে মনসূখ হয়ে গেছে। ফলে কিছু পরিমাণ বা বেশী মাল গ্রহণ আমাদের জন্যে মুবাহ করা হয়েছে। হত্যাকারী তা দিয়ে ব্যাপারটিকে সহজ করে দিতে প্রস্তুত হলে অভিভাবকের পক্ষে তা কবুল করা মুস্তাহাব এবং তাতে সওয়াবেরও ওয়াদা করা হয়েছে। আর আয়াতটির নাযিল হওয়ার উপলক্ষ হবে ঃ কতক থেকে কতকের উপর দীয়তের অনুগ্রহ লাভ। এরূপ অবস্থায় তাদের সকলকে প্রচলিত ন্যায়নীতির অনুসরণ করতে এবং হত্যাকারীকে তা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে আদায় করে দিতে আদেশ করা হয়েছে। আর কতিপয় অভিভাবক যদি ক্ষমা করে দেয়, তাহলে রক্তের ব্যাপারটি বর্ণনা পার্থক্যপূর্ণ হবে। এই সব কয়টি দিকই আয়াতের অর্থের বিভিন্নতার ভিত্তিতে, আয়াতটিতে সবগুলো ধারণের ক্ষমতা আছে। এরূপ অর্থ গ্রহণে শব্দের কোন অংশ ফেলে দিতে হয় না।

যদিও বলেন, হত্যাকারীর রাজি না হওয়া অবস্থায়ও অভিভাবকের জন্যে দীয়ত গ্রহণ ওয়াজিব, বিপরীত মতের লোকদের এই ব্যাখ্যা ও আয়াত ধারণ করে, তাই তা এ আয়াতের অর্থ হওয়া উচিত। কেননা অন্যান্য ব্যাখ্যার অসম্ভব হওয়া প্রমাণিত নয়। আর فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ এর অর্থ হবে, তার জন্যে ছেড়ে দেয়া হবে। আরবী ভাষায় যেমন বলা হয় عَفَتِ الْمَنَازِلُ অর্থাৎ ঘরসমূহ পরিত্যক্ত হয়েছে, শেষ পর্যন্ত জীর্ণ হয়ে গেছে। আর عفو عن الذنوب গুনাহ মাফ করে দেয়া অর্থ, গুনাহের শাস্তি না দেয়া। এ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ ছেড়ে দিয়ে দীয়ত গ্রহণের উপর নির্ভর করা বোঝায়।

এর জবাবে বলা যাবে, যদি তা-ই হয়, তাহলে দীয়ত ছেড়ে দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করলে অভিভাবকের ক্ষমাকারী বলে অভিহিত হওয়া বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়ে। কেননা সে দীয়ত গ্রহণ ত্যাগ করেছে। মাল ছেড়ে দেয়া ও তা প্রত্যাহার করাকে ক্ষমা করা বলা হয়। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ -

তা হলে ধার্যকৃত মহারানার অর্ধেক দিতে হবে। তবে তারা যদি ক্ষমা করে দেয় অথবা যার হাতে বিয়ের বন্ধনটা নিবদ্ধ সে যদি ক্ষমা করে দেয়।

এ আয়াতের মালে দাবি ছেড়ে দেয়াকে اَلْعَفْوُ বলা হয়েছে। আর সকলেই জানা আছে, যে লোক প্রতিশোধ গ্রহণ ও দীয়ত গ্রহণ ত্যাগ করাকে অগ্রাধিকার দেবে—গ্রহণ করবে, তার জন্যে العفو শব্দের প্রয়োগ নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে যে লোক প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে ফিরে গিয়ে দীয়ত গ্রহণকে অবলম্বন করল, তাকেও ক্ষমাকারী বলা যায় না। কেননা সে গ্রহণীয় দুটি জিনিসের মধ্যে থেকে একটি গ্রহণ করেছে। সে দুটির যে কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার সম্পন্ন ছিল। কেননা দুটি জিনিসের মধ্যে থেকে একটি জিনিস গ্রহণ করলে সে তো তার প্রকৃত প্রাপ্যটা—যা তার জন্যে নিশ্চিত—গ্রহণ করেছে। সেটা গ্রহণকালে তার জন্যে সেটাই নির্দিষ্ট হয়ে যায়। তখন অন্য কোনটা তার জন্যে গ্রহণীয় থাকে না। লক্ষণীয় কসমের কাফফারা হিসেবে যে লোক গোলাম আযাদ করাকে গ্রহণ করল, এই গোলাম আযাদকরণই তার জন্যে কাফফারা হয়ে যায়। যেন অন্য কোনটি তার জন্যে কাফফারা ছিলই না। অন্যটির হুকুমই তার উপর থেকে পড়ে গেছে, তা তার জন্যে ফরয ছিল না। অনুরূপভাবে আলোচ্য অভিভাবক যদি প্রতিশোধ গ্রহণ কিংবা মাল গ্রহণের যে কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার সম্পন্ন ছিল, পরে সে তার একটিকে গ্রহণ করল, তা হলে সে তো ক্ষমাকারী নাম পাওয়া অধিকারী হতে পারে না। কেননা সে একটি ছেড়ে অন্যটি গ্রহণ করেছে মাত্র, কিছুই ক্ষমা করেনি। আমরা যার অবস্থা বললাম, তার পক্ষে ক্ষমার ব্যাপারটি যখন নেতিবাচক হয়ে গেল, তখন আয়াতটির যেন-তেন ব্যাখ্যা দেয়া জায়েয হতে পারে না, বরং আমরা তার যে তাৎপর্য ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, তা-ই আয়াতটির যথার্থ ব্যাখ্যা।

অতঃপর মূল হত্যাকাণ্ডের ব্যাপের নিহতের অভিভাবকের পক্ষে প্রতিশোধ ও দীয়ত—উভয়টা গ্রহণই কর্তব্য হবে অথবা শুধু প্রতিশোধ গ্রহণ—দীয়ত নয় কিংবা দুটির যে কোন একটি ইখতিয়ার সম্পন্ন হওয়ার দিক দিয়ে। কিন্তু উভয়টা গ্রহণ জায়েয নয় এ ব্যাপারে সকলেই একমত। আর ইখতিয়ার হিসেবে দুটির একটি গ্রহণও কর্তব্য হতে পারে না। যেমন কসম ভঙ্গের কাফ্ফারায় হতে পারে। তার কারণ, কুরআনে আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্টভাবে কর্তব্য ঘোষণা করেছেন কিসাসকে। এখানে কিসাস গ্রহণ কিংবা তার বদলে অন্য কিছু গ্রহণের ইখতিয়ার থাকার কথা বলা কুরআনের মূল দলীলের উপর বৃদ্ধি, কিসাস কার্যকর হওয়ার বিপরীত। আমাদের মতে এ রকমটা করা হলে কুরআনী বিধানকে মনসূখ করা হয়। ফলে প্রতিশোধ গ্রহণটাই বাধ্যতামূলক থেকে যায়। অন্য কিছু করণীয় থাকতে পারে না। অতএব অভিভাবকের পক্ষে মাল গ্রহণ জায়েয হতে পারে না। তবে হত্যাকারীর সন্তুষ্টির ভিত্তিতে হলে ভিন্ন কথা। কেননা আর কিছুর পূর্বেই যে জিনিসটির হক্ হবে, তার পুরা মাত্রায় নিয়ে নেয়া সম্ভব, তাকে অন্য কিছুর দিক সরিয়ে দেয়া—যার উপর হক ধার্য হয়েছে তার সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে—জায়েয হতে পারে না। তাই হতে পারে বলে যে দাবি করে, যে মূল কথা বুঝতে ভুল করেছে, যখনই বলেছেন যে, প্রতিশোধ গ্রহণ-ই কর্তব্য, তবে তার ইখতিয়ার রয়েছে মাল গ্রহণের। কেননা এ কথার

দ্বারা তার ইখতিয়ার সম্পন্ন হওয়ার কথাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া হয়েছে। কেননা সে বলেছে, সে চাইলে প্রতিশোধ আদায় করতে পারে, চাইলে মাল গ্রহণ করতে পারে।

কেউ যদি বলে, মাল লওয়াই কর্তব্য, তবে তার বদলে প্রতিশোধও তার জন্যে সমান সমান। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। কেননা সে বলেছে, মাল গ্রহণই কর্তব্য, তবে তার বদলে সে প্রতিশোধও নিতে পারে, তার এই ইখতিয়ার রয়েছে, অনুরূপভাবে তার কথাও বাতিল, যে বলে যে প্রতিশোধ গ্রহণই মূল কর্তব্য, তবে সে তা মালে বদলে দিতে ও তার বদলে মাল গ্রহণ করতে পারে। এর উভয় অবস্থায়ই মূল হত্যার ব্যাপারে ইখতিয়ারকেই ওয়াজিব প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ সুবহানাহু তো হত্যাকারীর উপর কিসাস অবশ্য কর্তব্য রূপে ফরয করে দিয়েছেন। বলেছেন ঃ 'তোমাদের উপর নিহতের ব্যাপারে কিসাস লিখে দেয়া হয়েছে। এ কথাও বলেন নি ঃ 'তোমাদের উপর নিহতের ব্যাপারে কিসাস অথবা মাল লিখে দেয়া হয়েছে।'

যিনি বলতে চেয়েছেন, প্রতিশোধ লওয়া কর্তব্য। তবে তার অধিকার আছে তাকে মালে বদলে দেয়া, তিনি ইখতিয়ার থাকার কথাই বলতে চেয়েছেন যে, তা-ই তার জন্যে বাধ্যতামূলক যদিও তার নাম নেন নি। আর তিনি আসলে কথা বোঝাতে ভুল করেছেন।

যদি কেউ বলেন, এ কথাটি তো তেমনই, তুমি বল যে, ওয়াজিব হচ্ছে কিসাস। আর উভয়ের (হত্যাকারী ও নিহতের অভিভাবক) জন্যে সব কিছুই মালে পরিণত করার অধিকার রয়েছে উভয়ের রাজি থাকার ভিত্তিতে। মালে পরিণত করাতে উভয়ের রাজি থাকা জায়েয় হওয়ার আয়াতের ওয়াজিব হুকুম কিসাস ফেলে দেয়ার কিছুই নেই।

জবাবে বলা যাবে, আমরা তো শুরুতেই বলে দিয়েছি যে, নিহতের অভিভাবকের হত্যাকারীর উপর কিসাসই হচ্ছে হক—প্রতিশোধ বা অন্য কিছুর মধ্যে কোনরূপ ইখতিয়ার ছাড়াই। আর তাকে মালে পরিবর্তন করায় উভয়ের রাজি হওয়াতে তারই বাধ্যতামূলক হক হওয়া এবং অন্য কিছুর হক না হওয়ার আওতার বাইরে যাওয়ার ঘটনা ঘটে না। কেননা যার হুকুম উভয়ের রাজি থাকার সাথে সম্পর্কিত, তা কোনরূপ ইখতিয়ার ছাড়াই মূলে ওয়াজিব হওয়ার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না। লক্ষণীয়, এক ব্যক্তি একজন গোলামের মালিক হল, মালিক হল একটি ঘরের। অন্যরা তার সন্তুষ্টিতে তার থেকে তা খরিদ করেও নিতে পারে। তা জায়েয হলে তার প্রথম মালিকের মালিক হওয়াটা নিষিদ্ধ হয়ে যায় না। আর তার মালিকানা কোন ইখতিয়ারের উপর নির্ভরশীল হওয়াও জরুরী হয় না। অনুরূপভাবে পুরুষ স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয়ার মালিক হতে পারে, খোলা তালাকের অধিকার দেয়ারও মালিক হতে পারে এবং তালাক দেয়ার বদলে মালও গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তাতে স্ত্রীর রাজি হওয়া ছাড়াই এবং শুরুতেই তালাকের মালিকানা মালে পরিণত করার ইখতিয়ার সম্পন্ন হওয়ার কথা প্রমাণ করে না। তার যদি তালাক দেয়ার বা মাল গ্রহণের অধিকার থাকে শুরুতেই স্ত্রীর রাজি হওয়া ছাড়াই, তাহলে তদ্দরুন সে তালাক কিংবা মাল এ দুটির যে কোন একটির মালিক হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে যেত।

হত্যার প্রতিশোধ লওয়াই ওয়াজিব হয়, অন্য কিছু নয়, এ কথা প্রমাণকারী একটি দলীল হচ্ছে সেই হাদীস, যা হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন। রুবাই তার ক্রীতদাসীর দাঁত ভেঙে দিলে যে কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে, তার বর্ণনায় আমরা তার সনদেরও উল্লেখ করেছি। সে ব্যাপারে রাসূলে করীম (স) বলেছিলেন ঃ كِتَابُ اللّٰهِ الْقِصَاصُ। 'আল্লাহ্ তো কিসাস-ই লিখে দিয়েছেন; এতে তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এরূপ অবস্থায় আল্লাহ কিসাস কার্যকর করার বিধান দিয়েছেন। অতএব তার সাথে অতিরিক্ত কিছু প্রমাণ করার কারোর কোন অধিকার থাকতে পারে না। অন্য কোন জিনিসে তাকে পরিণত করাও যাবে না। যদি করা হয়, তাহলে কুরআনকে মনসূখ করার শামিল হবে, যার অধিকার কারোই নেই। অন্যরা আয়াতের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, 'যার জন্যে তার ভাইর দিক থেকে কোন কিছু ক্ষমা করা হলে'.... আয়াতের ভিত্তিতে হত্যাকারীর রাজি হওয়া ছাড়াই মাল গ্রহণ জায়েয বলেছেন, আয়াতটির এ ব্যাখ্যা সম্ভব একথা যদি আমরা মেনে নেই, আমরা যেসব দিকের উল্লেখ করেছি সেগুলো সম্ভাবনা সহ তাহলে তার সবচেয়ে বড় অবস্থা এই হবে যে, শব্দটিকে বহু অর্থ সমন্বিত মনে করা হবে। আর তার ফলে আয়াতটি 'মুহকাম' (স্পষ্ট অকাট্য অর্থবোধক) থাকবে না, 'মুতাশাবিহ' (যার অর্থ ও তাৎপর্য স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট নয়) হয়ে যাবে। অথচ একথা জানা যে, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ একটি 'মুহকাম' আয়াত, 'মুতাশাবিহ্' নয়। এর অর্থ ও তাৎপর্য স্পষ্ট, নির্দিষ্ট। এর অর্থে বহু অর্থের সমন্বয় ঘটেনি। তার ব্যাখ্যায়ও বহু সম্ভাবনা নিহিত নয়। আর 'মুতাশাবিহ্' আয়াতের হুকুম হচ্ছে, তাকে 'মুহকাম' অর্থে ধারণ করতে হবে। আল্লাহ এই কথাটি স্মরণীয় ঃ

مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ....... وَابْتِغَاءَ تَاْوِيْلِهٖ –

এই কিতাবে দুই প্রকারের আয়াত রয়েছে। এক মুহকামাত, যা কিতাবের মূল বুনিয়াদ। আর দ্বিতীয়, মুতাশাবিহাত। যাদের মনে কুটিলতা আছে, তারা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সব সময়ই 'মুতাশাবিহাত'-এর পিছনে লেগে থাকে এবং তার অর্থ বের করতে চেষ্টা করে।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুতাশাবিহ্ আয়াতকে মুহকাম আয়াতের উপর ফেলবার (অর্থাৎ তার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা বের করার) আদেশ করেছেন। কেননা মুহকাম আয়াতকে উম্মুল কিতাব—কিতাব আসল বলে পরিচয় দেয়া হয়েছে। এর দাবি হচ্ছে অন্যান্য আয়াতকে তার উপর রেখে (তার আলোকে) ব্যাখ্যা দিতে হবে। এর অর্থ তারই সাথে যুক্ত হবে। কেননা একটি জিনিসের মা-ই হয় তার নিরাপত্তার স্থান, তার শুরু যেখান থেকে, পরিণতিও সেখানেই। পরে নিন্দা করা হয়েছে তাদের যারা 'মুতাশাবিহ' আয়াতের পিছনে পড়ে থাকে এবং তার যে ব্যাখ্যা 'মুহকাম' আয়াত ভিত্তিক নয়, যার অর্থ মুহকাম আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়, সেগুলোকেই যথেষ্ট মনে করে নেয়। বলা হয়েছে, এই লোকদের অন্তরের মধ্যে বক্রতা রয়েছে। আয়াতটি এই ঃ

فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاوِيْلِهِ -

তবে যাদের অন্তরে বক্রতা ও কুটিলতা রয়েছে, তারা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সব সময়ই মুতাশাবিহাত-এর পিছনে লেগে থাকে এবং তার অর্থ বের করতে চেষ্টা করে।

আর যখন প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমাদের প্রতি কিসাস ফরয করা হয়েছে' একটি 'মুহ্‌কাম' আয়াত এবং তাঁর কথা যার ভাই তার জন্যে কিছু ক্ষমা করে দেবে .... একটি মুতাশাবিহ আয়াত, তখন এ আয়াতটিকে মুহকাম আয়াতের উপর স্থাপন করে তার আলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে, যেন তার ব্যাখ্যাটা 'মুহ্‌কাম' আয়াতের বিপরীত কিছু না হয়। তার হুকুম থেকেও যেন কোন জিনিস দূর করাতে না হয়। তাই আমাদের পূর্বে উল্লিখিত যে-কোন একটি দিকের ভিত্তিতে হতে হবে। তাতে আয়াতে 'কিসাস' শব্দের দাবি অস্বীকৃত হবে না, তার সাথে অপর কোন তাৎপর্যকেও মেলানো হবে না, সে দিক থেকে অন্য কোন দিকে ফিরেও যাওয়া হবে না। আল্লাহ্‌র এই কথাটিও তেমন ঃ

যে লোক তোমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করেছে, তোমরাও তার উপর অনুরূপ আচরণ কর যেমন করে সে তোমাদের প্রতি করেছে।

কেননা নরহত্যায় নিহতের অভিভাবক প্রতিশোধ লওয়ার অধিকারী। কেননা তাই তার কাজের সমান। হত্যাকারী যখন একটি প্রাণ সংহার করেছে, সেই প্রাণ সংহারের প্রতিশোধস্বরূপ তারও প্রাণ সংহার করা হবে। যেমন কেউ যদি কারোর মাল ধ্বংস কর, তার অনুরূপ মাল দিয়ে ক্ষতিপূরণ করতে হবে। তাছাড়া অন্য কিছু করতে হলে সে পক্ষকে সেজন্যে রাজি হতে হবে। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ 'ঠিক যেমন তোমাদের উপর সীমাজ্ঞনমূলক কাজ করেছে।' মৌলনীতিও তা-ই বলে।

যারা মনে করেন, হত্যাকারীর রাজি হওয়া ছাড়াই প্রতিশোধ ও মাল গ্রহণ—এ দুটির যে কোন একটি গ্রহণের অভিভাবকের ইখতিয়ার রয়েছে এবং তাদের মতের সমর্থনে কতিপয় হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন, তার মধ্যে একটি হাদীস ইয়াহইয়া ইবনে কাসীর, আবূ সালমা, আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত। নবী করীম (স) মক্কা বিজয়কালে বলেছেন ঃ

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ اِمَّا اَنْ يَّقْتُلَ وَاِمَّا اَنْ يُّوْدَى -

যার নিকটাত্মীয় নিহত হবে, তার দুটির যে কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার রয়েছে। হয় সে হত্যা করবে, না হয় সে আদায় করবে।

আর একটি হাদীস ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আবূ যিব, সাঈদুল মুকবেরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, আবূ শুরাইহকে বলতে শুনেছি, নবী করীম (স) মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর ভাষণে বলেছেন ঃ

اَلَا اِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتَمْ هَذَا الْقَتِيْلَ مِنْ هُذَيْلَ وَاِنِّيْ عَاقِلُهُ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَا لَتِيْ هذهِ قَتِيْلٌ فَاَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ : بَيْنَ اَنْ يَّأْخُذُوْا الْعَقْلَ وَبَيْنَ اَنْ يَقْتُلُوْا –

জেনে রাখো, হে খুজায়া গোত্র, তোমরা হুযায়ল গোত্রের এই লোকটিকে হত্যা করেছ। আমি তার আকিলা। আমার এই কথার পর যদি কেউ নিহত হয়, তাহলে তার পরিবারবর্গের দুটি জিনিসের মধ্যে ইখতিয়ার থাকবে। হয় 'দীয়াত' গ্রহণ করবে, না হয় হত্যাকারীকে হত্যা করবে।

এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক, হারস ইবনে ফুযায়ল, সুফিয়ান, আবুল আরজা, আবূ শুরাইহ আল-খুজায়ী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ اُصِيْبَ بِدَمٍ اَوْ بِخَبَلٍ – يُعْنِيْ الْجَرَّاحِ – فَوَلِيُّهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ اِحْدَى ثَلَاثٍ بَيْنَ الْعَفْوِ اَوْ يَقْتَصَّ اَوْ يَاخُذُ الدِّيَةَ –

যে লোকের রক্তপাত (অর্থাৎ হত্যা) করা হবে, কিংবা ক্ষতকারী বিহ্বলতায় পড়বে, তার অভিভাবকের তিনটি জিনিসের যে-কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার রয়েছে, ক্ষমা অথবা কিসাস কিংবা দীয়ত গ্রহণ।

কিন্তু যে মতের সমর্থনে এই হাদীসসমূহে দলীল হিসেবে পেশ করা হয়েছে, এই হাদীসসমূহ সে মতকে প্রমাণ করে না। কেননা হাদীসে যে দীয়ত গ্রহণের কথা বলা হয়েছে, তা হয়ত হত্যকারী তাতে রাজি থাকার ভিত্তিতে দীয়ত গ্রহণের কথাই মূল বক্তব্য হয়ে থাকবে। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً –

হয় অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে, না হয় বিনিময় গ্রহণ করে ছেড়ে দেয়া হবে।

এ আয়াতে বলা বিনিময় গ্রহণটা বন্দীর রাজি থাকার ভিত্তিতে হওয়ার কথাই বলা হয়েছে। বন্দীর রাজি থাকার কথাটি এখানে উহ্য রয়েছে। কেননা মালের উল্লেখটাই যে মালদাতার তাতে রাজি থাকার শর্ত রয়েছে, তা সংশ্লিষ্ট সকলেরই জানা আছে, সেই জন্যে তার উল্লেখের প্রয়োজন বোধ করা হয়নি। তাছাড়া দাতার রাজি থাকা ছাড়া তার মাল গ্রহণ তো কোনক্রমেই জায়েয হতে পারে না। রাসূলে করীম (স)-এর 'অথবা দীয়ত গ্রহণ করবে' কথাটিও ঠিক তেমনি। আর তাঁর 'অথবা আদায় করবে' কথাটিও সেরূপ অর্থ দেয়। যেমন অপর কারো উপর কারো ঋণ থাকলে বলে ঃ 'তুমি চাইলে তোমার ঋণ দিরহামে নিয়ে নাও; চাইলে দীনারে নিয়ে নাও'; যেমন রাসূলে করীম (স)

হযরত বিলাল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যখন তিনি তাকে বিশেষ ধরনের খেজুর (تمر) দিয়েছিলেন ঃ اَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا 'খায়বরের সব খেজুরই কি এই রকম ?' তখন তিনি বলেছিলেন ঃ না, তা নয়। বরং আমরা তার এক সা পরিমাণ নিই দুই সা'র বিনিময়ে কিংবা দুই সা নিই তিন সা' দিয়ে। তখন নবী করীম (স) বলেছিলেন ঃ

لَاتَفْعَلُوْا وَلٰكِنْ بِعْ تَمْرَكَ بِعَرْضٍ ثُمَّ خُذْ بِالْعَرْضِ هٰذَا –

তোমরা এরূপ করবে না। বরং তুমি তোমার খেজুর একটা দামের বিনিময়ে বিক্রয় করে দাও। পরে এই খেজুর মূল্যের বিনিময়ে খরিদ কর।

আর একথা তো জানাই আছে যে, নবী করীম (স) মূল্যের বিনিময়ে খেজুর বিক্রেতার বিক্রয় করতে রাজি না হওয়া সত্ত্বেও নিতে বলেন নি নিশ্চয়ই।

রাসূলে করীম (স) দীয়তের কথা বলেছেন বনী ইসরাঈলীদের উপর জারি থাকা বিধানকে আল্লাহ তা'আলা মনসূখ করেছেন—তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্যে। সে বিধান ছিল হত্যাকারীর রাজি থাকা সত্ত্বেও তার দেয়া দীয়ত নিষেধের বিধান। তার রাজি না থাকা অবস্থায়ও তা গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। আল্লাহ মুসলিম উম্মতের উপর এই আইনটাকে সহজ ও হালকাভাবে পালনযোগ্য করে দিয়েছে। যেমন ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

বনী ইসরাঈলী সমাজে কিসাস আইন কার্যকর ছিল কিন্তু দীয়ত গ্রহণের ব্যবস্থা তাদের মধ্যে ছিল না। আল্লাহ এ উম্মতের জন্যে আইনটি হালকা করে দিয়েছেন।

আমরা বলছি, রাসূলে করীম (স)-এর কথার তাৎপর্য হচ্ছে, হত্যাকারী রাজি থাকার ভিত্তিতে দীয়ত গ্রহণ করা যেতে পারে। এই কথার আর একটি দলীল হচ্ছে আওজায়ী বর্ণিত হাদীস। তিনি আবূ হুরায়রা বর্ণিত হাদীস ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে কাসীর আবূ সালমা সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাতে বলেছেন ঃ

مَنْ قُتِلَ لَهٗ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ اِمَّا اَنْ يَّقْتُلَ وَاِمَّا اَنْ يُّفَادَ –

যার লোক নিহত হবে, তার দুটির মধ্যে উত্তমটি গ্রহণের ইখতিয়ার রয়েছে। হয় সে হত্যাকারীকে হত্যা করবে কিংবা ফিদিয়া—রক্ত-বিনিময়—গ্রহণ করবে।

ফিদিয়ার লেন-দেন তো দুজনের মধ্যে সাধিত হয়, যেমন যুদ্ধ, মারামারি ও গালাগালি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সব হাদীসেই দীয়ত গ্রহণটা হত্যাকারীর রাজি থাকার সাথে সংযুক্ত ও তার শর্তাধীন, তা থেকে মুক্ত নয়। আর এ সব হাদীস তাদের কথা বাতিল করে দেয় যারা বলে যে, হত্যাকারীর উপর প্রতিশোধ লওয়াই মূল কর্তব্য। আর অভিভাবক তাতে দীয়তে পরিবর্তিত করতে পারে। বাতিল এ জন্যে যে, তার সব কয়টিতেই অভিভাবকের মূল হত্যাকাণ্ডে প্রতিশোধ গ্রহণ ও দীয়ত গ্রহণ—হত্যাকারীর রাজি থাকার ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়েছে। যদি প্রতিশোধ গ্রহণই কর্তব্য হতো, অন্য কিছু

নয়, তাহলে অভিভাবক তা প্রমাণিত হওয়ার পর দীয়তে রূপান্তরিত করতে পারত। যেমন ঋণটা মূল্যে ও মূল্যটা ঋণে রূপান্তরিত করা যায় বিনিময়ের নিয়মে।

কিন্তু মূল হত্যাকাণ্ডে ইখতিয়ারের কোন প্রশ্ন নেই। এখানে একটাই করণীয়। আর তা হচ্ছে প্রতিশোধ গ্রহণ। যে লোক বলে, হত্যায় প্রতিশোধ গ্রহণই কর্তব্য, অন্য কিছু নয়, তবে অভিভাবক তাকে দীয়তে রূপান্তরিত করতে পারে, তার এই কথা এসব হাদীসের পরিপন্থী। আনসারী হুমাইদ তয়ীল আনাস ইবনে মালিক থেকে রুবাইর ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ্র লিখন হচ্ছে কিসাস। এই কথাটি কিতাবের অর্থ মাল বা কিসাস হওয়ার পরিপন্থী। আল-কামা ইবনে অয়েল তার পিতা ও সাবিতুল বানানী, আনাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। তখন নবী করীম (স) সেই হত্যাকারীকে নিহতের অভিভাবকের হাতে ছেড়ে দিলেন। বললেন ঃ তুমি কি একে ক্ষমা করে দিচ্ছ ? সে বলল, না। বললেন ঃ তা হলে কি দীয়ত গ্রহণ করতে প্রস্তুত? বলল ঃ না। তখন রাসূল (স) বললেন ঃ মনে রেখ, তুমি যদি ওকে হত্যা কর, তাহলে তুমি ওরই মত হয়ে গেলে। পরে লোকটি চলে গেল। তখন লোকেরা তার সাথে সাক্ষাত করে বলল ঃ রাসূলে করীম (স) তো বলেছেন ঃ তুমি ওকে হত্যা করলে তুমি ওরই মত হয়ে যাবে। লোকটি পরে তাকে ক্ষমা করে দিল।

যারা প্রতিশোধ বা মাল গ্রহণের ইখতিয়ার অভিভাবকের আছে বলে মত পোষণ করে, এই হাদীসটিকে তারা দলীল হিসেবে পেশ করেছে। কিন্তু এ হাদীসে তাদের মতের কোন সমর্থন বা প্রমাণ নেই। কেননা সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি হয়ত বলেছেন, দীয়ত গ্রহণ করবে হত্যাকারীর রাজি থাকার ভিত্তিতে। যেমন তিনি সাবিত ইবনে কায়স-এর স্ত্রীকে বলেছিলেন, যখন সে তাঁর নিকট অভিযোগ নিয়ে এসেছিল أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ 'তুমি কি তোমার স্বামীর নিকট থেকে তা—বাগানটি—নিয়ে নিতে চাও ? (অর্থাৎ তুমি কি তার কাছ থেকে তালাক নিতে চাও) বলল ঃ হ্যাঁ! এই নিয়ে নেয়ায় স্বামীর অনুমতি থাকার যে শর্ত রয়েছে, তা তো জানা কথাই। তা মূল ভাষণে উল্লিখিত না হলেও কোন ক্ষতি নেই। কেননা স্বামীর রাজি থাকা ছাড়া তালাকের ও বাগানের মালিকানা অন্যকে দেয়ার যে পক্ষপাতি ছিলেন না, তা তো জানা কথা। এ-ও হতে পারে যে, নবী করীম (স) তিনি মালের উপর একটা চুক্তি করাতে চেয়েছিলেন। আর এই চুক্তি যে হত্যাকারীর রাজি থাকা ছাড়া সম্ভব নয়, একথা তো প্রমাণিত কিংবা এই ধরনের চুক্তি ভঙ্গ করতে চেয়েছিলেন। আর এ-ও হতে পারে যে, তিনি নিজেই দীয়ত দিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করেছিলেন। যেমন মক্কায় খুজায়ী গোত্রের—নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে করেছিলেন, বলেছিলেন ঃ আমি-ই তার 'আকিলা'। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে সহলকে খায়বরে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলে তিনি ইয়াহূদীদের পক্ষ থেকে দীয়ত বহন করেছিলেন।

নবী করীম (স)-এর কথা ঃ 'তুমি যদি ওকে হত্যা কর, তাহলে তুমি ওরই মত হয়ে গেলে' এর দুটি অর্থ হতে পারে। একটি, 'তুমিও হত্যাকারী, যেমন সে একজন হত্যাকারী।' 'তুমি তারই মত গুনাহগার' তা বলা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। কেননা, সে (অভিভাবক) হত্যাকারীকে হত্যা করে তার হক্ই আদায় করেছে মাত্র। তাতে সে কোন

অপরাধ করেনি, সে জন্যে সে নিন্দা পাওয়ার যোগ্য হতে পারে না। প্রথমটা তো এমন কাজ, যা করার কোন অধিকার তার ছিল না। এই কারণে সে অপরাধী, গুনাহ্‌গার। বোঝা গেল, তিনি অভিভাবকও প্রতিশোধের হত্যা কার্য করে গুনাহ্‌গার হবে, তা বলতে চাননি।

আর দ্বিতীয় অর্থ, তুমি যদি হত্যাকারীকে হত্যা কর, তাহলে তুমি তার কাছ থেকে তোমার পাওনা পুরামাত্রায় আদায় করে নিলে। তোমাদের কোন বিশেষত্ব থাকল না। আল্লাহ্‌ও ক্ষমা করে বিশেষত্ব অর্জনকে মুস্তাহাব বলেছেন। তাঁর কথা হল ঃ

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ –

যে লোক তার সাদকা করল (হত্যাকারীকে মাফ করে দিল) তা তার জন্যে কাফফারা হয়ে যাবে।

যদি কেউ বলে, অভিভাবকের যখন হত্যাকারীর জীবন রক্ষা করার অধিকার আছে, সে হত্যাকারীর নিকট থেকে মাল গ্রহণ করলে তা করার তার ইখতিয়ার আছে বলে হুকুম করাই বাঞ্ছনীয়।

জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, প্রত্যেকেরই কর্তব্য অপরকে বাঁচিয়ে রাখা, যখন সে তার উপর ধ্বংসের ভয় পাবে। যেমন কেউ যদি কোন লোককে দেখতে পায় যে, সে অন্যকে হত্যা করার প্রস্তুতি নিয়েছে—কিংবা কেউ পানিতে ডুবে যাবে বলে ভয় পায়, আর তাকে রক্ষা করার ক্ষমতা তার আছে বলে মনে করে, কেউ যদি দেখে, একটি লোক ক্ষুধা তাড়নায় ছটফট করে মরে যাচ্ছে, আর তার নিকট খাবার রয়েছে, যা খাইয়ে তাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে, তাহলে তাকে তা খাইয়ে তাকে বাঁচানোই তার কর্তব্য—তার মূল্য যত বেশিই হোক না কেন। এতে কোনই সন্দেহ নেই। অনুরূপভাবে হত্যাকারী যদি মাল দিয়ে নিজের জীবন রক্ষা করতে পারে, তাহলে নিহতের অভিভাবকের কর্তব্য, সম্ভব হলে মাল গ্রহণ করে তাকে বাঁচিয়ে দেয়া, এও নিঃসন্দেহ কথা। এমতাবস্থায় হত্যাকারী যদি মাল দিয়ে নিজের জীবন রক্ষা করতে পারে, তাহলে নিহতের অভিভাবকের কর্তব্য, সম্ভব হলে মাল গ্রহণ করে তাকে বাঁচিয়ে দেয়া, এও নিঃসন্দেহ কথা। এমতাবস্থায় হত্যাকারী মাল দিতে চাইলে নিহতের অভিভাবককে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা কর্তব্য হয়ে পড়ে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তা করা হলে আল্লাহ্‌র দেয়া কিসাস-এর হুকুম মূলতই বাতিল হয়ে যায়। কেননা প্রত্যেকেই যদি হত্যাকারীর জান বাঁচানোর চেষ্টায় লেগে যায়, তাহলে হত্যার প্রতিশোধে হত্যাকে বাদ দিয়ে উভয়ই ধন-মালের লেন-দেন করতেই উঠে পড়ে লেগে যাবে, কিসাসের ধার কেউ ধারবে না। উপরন্তু অভিভাবক যদি হত্যাকারীর বাড়ি-ঘরের দাবি করে বসে বা তার গোলাম কিংবা বিপুল পরিমাণের দীয়ত চেয়ে বসে তাহলে তা-ই তাকে দিতে হবে। কেননা জীবন রক্ষার জন্যে যা দরকার, তার বেশি বা কমের কোন প্রশ্ন থাকে না। এ মত গ্রহণকারীদের দৃষ্টিতেও প্রকৃত দীয়তের বেশী দেয়া যখন বাধ্যতামূলক নয়, তখন বেশী দিতে বাধ্য হলে তদ্দরুন বিরাট ক্ষতি হয়ে যাওয়ার আশংকা। ফলে গোটা ব্যাপারটিই বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

এই ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ীর মতের অনুকূলে আল-মুজানী একটি দলীল সংগ্রহ করেছেন। তা হল, কযফ বা যিনার মিথ্যা অভিযোগের দণ্ডের ব্যাপারে যদি কেউ কিছু পরিমাণ মালের ভিত্তিতে সন্ধি করে কিংবা প্রাণের দায়িত্ব গ্রহণের ভিত্তিতে, তাহলেও তার জন্যে শরীয়াত নির্ধারিত হদ্দ ও কাফালত উভয়ই অকার্যকর হয়ে যায়। ফলে সে কিছুই পাওয়ার অধিকারী থাকে না। অনুরূপভাবে ইচ্ছামূলক হত্যার ব্যাপারটিতেও যদি অর্থের ভিত্তিতে মীমাংসা হয়ে যায়, সকলেরই ঐকমত্যের ভিত্তিতে এবং তা কবুল করে নেয়া হয়, তাতে বোঝা যাবে যে, ইচ্ছামূলক হত্যার মূল শাস্তিই বুঝি মাল দেয়া, অন্যথায় মালের ভিত্তিতে উভয়ের মধ্যে সন্ধি সহীহ্ হতে পারত না, যেমন সহীহ্ হতে পারে না, কযফ ও কাফালতের ব্যাপারে।

আবূ বকর বলছেন, এরূপ যুক্তি উপস্থাপনে বিরাট ভুল রয়েছে। রয়েছে পরস্পর বিরোধিতা। ভুল হচ্ছে, এ ব্যাপারে আসল কথা হচ্ছে, সন্ধি-সমঝোতার দ্বারা নির্দিষ্ট শরীয়াতী শাস্তি হদ্দ কখনই বাতিল করা যেতে পারে না। এরূপ করা হলে মাল ও কিফালাহ্-ই বরং বাতিল হয়ে যাবে। এ পর্যায়ে দুটি বর্ণনা উল্লেখ্য। একটি—না, তা বাতিল করা যেতে পারে না। আর দ্বিতীয়—হ্যা, বাতিল করা যায়।

আর পরস্পর বিরোধিতা হচ্ছে, তালাকের বিনিময়ে মাল গ্রহণ সর্বসম্মতভাবে ও কোনরূপ মতদ্বৈততা ছাড়াই—জায়েয। অথচ এটাও সর্বসম্মত যে, মালের বিনিময়ে তালাক লওয়া তালাকের আসল বিধান নয়। স্ত্রীর সম্মতি ছাড়া তার নিকট থেকে মাল গ্রহণের বিনিময়ে তালাক দেয়া স্বামীর কোন অধিকার নেই। ইমাম শাফেয়ীও তাঁর পক্ষ থেকে আল-মাজানীর বর্ণনানুযায়ী বলেছেন, নিষিদ্ধ সমাজচ্যুত (Interdicted) ব্যক্তিকে রক্তপাতের দায়িত্ব থেকে ক্ষমা করা জায়েয। যাদের জন্যে অসিয়ত করা হয়েছে কিংবা যারা পাওনাদার তাদের পক্ষে তা নিষেধ করার কোন অধিকার নেই। কেননা ইচ্ছামূলক হত্যায় যার উপর অপরাধটা হয়েছে, তার ইখতিয়ার ব্যতীত মালের মালিক হওয়া যায় না। হত্যার প্রতিশোধ যদি মূলত মালই হয়, তাহলে তার উপর পাওনাদারদের দাবি অবশ্যই স্বীকৃত হবে। যাদের জন্যে অসিয়ত করা হয়েছে তারাও পাবে।

এ থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর মতে ইচ্ছামূলক হত্যার দণ্ড হচ্ছে প্রতিশোধ গ্রহণ, অন্য কিছু নয় এবং তা হত্যা ও দীয়তের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার থাকার দরুন তা জরুরী হয় নি।

কেউ যদি বলেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ যে লোক মজলুম হিসেবে নিহত হবে, তার অভিভাবকের জন্যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছি-ই প্রতিশোধ গ্রহণ কিংবা মাল গ্রহণের মধ্যে অভিভাবকের ইখতিয়ার থাকার কথা প্রমাণ করে—যদি 'সুলতান' শব্দটি তার উপর প্রযোজ্য হয়। আর তার দলীল হচ্ছে, জুলুমস্বরূপ নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে কারো কারো ক্ষেত্রে দীয়ত গ্রহণই কর্তব্য হয়। যেমন প্রায়-ইচ্ছামূলক হত্যায় বা পিতা যদি তার পুত্রকে হত্যা করে, তাহলে তাই হয়ে থাকে। আর কতকের ক্ষেত্রে প্রতিশোধ লওয়াই কর্তব্য হয়। মনে হয়, এই সব অর্থই আয়াতের তাৎপর্য। কেননা ব্যবহৃত শব্দে তার

সম্ভাবনা বিদ্যামান। দহাক ইবনে মুযাহিম এই ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। তিনি فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, ইচ্ছা করলে হত্যাকারীকে হত্যা করতে পারে, আর ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারে। আর ইচ্ছা করলে দীয়ত গ্রহণ করতে পারে। দেখা যায়, 'সুলতান' শব্দটিতে এসব অর্থ নিহিত আছে, তখন মাল গ্রহণে তার সুলতান (অধিকার) থাকার কথাও প্রমাণিত, যেমন প্রমাণিত প্রতিশোধ গ্রহণের অর্থে। কেননা 'সুলতান' শব্দটিতে এ দুটি অর্থই হয়। উপরন্তু সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত যে, এ দুটির প্রত্যেকটিই একই অবস্থায় আল্লাহ্র বক্তব্য হতে পারে। এরূপ অবস্থায় মূল আয়াতটির বক্তব্য হচ্ছে ঃ

যে ব্যক্তি মজলুম হিসেবে নিহত হয়েছে, তার অভিভাবকের জন্যে কর্তৃত্ব (সুলতান) প্রতিষ্ঠিত করেছি প্রতিশোধ ও দীয়ত গ্রহণের।

আর একথাও যখন প্রমাণিত যে, এ দুটি কাজ এক সাথে করা যেতে পারে না, তখন মনে করতে হবে যে, দুটির যে কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ারই কার্যকর হবে। তোমরা যেমন করে—"নিশ্চয়ই তার অভিভাবকের জন্যে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছি" কথা দ্বারা প্রতিশোধ গ্রহণকে কর্তব্য করে দিয়েছ তার উপর সকলের ঐকমত্য হওয়ার কারণে। আর তা-ই এ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ও অকাট্য হয়ে গেছে। তোমরা এই শব্দটিকে 'প্রতিশোধ' শব্দটির মতই সাধারণ ও ব্যাপক অর্থবোধক বানিয়ে দিয়েছ। অতএব মাল গ্রহণ প্রমাণ করা অনুরূপভাবে তোমার জন্যে বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। জুলমমূলক হত্যায় অভিভাবকের ক্ষমতা আছে মাল গ্রহণের।

জবাবে বলা যাবে, এই শব্দের অর্থ হিসেবে 'প্রতিশোধ'-কে গ্রহণ করা অধিক উত্তম তাকে দীয়ত গ্রহণ অর্থে গ্রহণের তুলনায়। তা এ জন্যে যে, 'সুলতান' শব্দটি যখন বহু অর্থের ধারক মনে করা হচ্ছে, তখন তা 'মুতাশাবিহ' গণ্য হবে। আর 'মুতাশাবিহ'কে 'মুহকাম' বানানো ওয়াজিব। 'মুহকাম'-এর অর্থ গ্রহণই বাঞ্ছনীয়। আর তা হচ্ছে, "তোমাদের প্রতি ফরয লিখে দেয়া হয়েছে কিসাস নিহতের জন্যে" এ আলোচনার প্রমাণিত কথা হল যে, আয়াতের শব্দ 'সুলতান' বলতে 'প্রতিশোধ'ই বুঝতে হবে। তাই মুহকাম আয়াতের পরে পরে সংযোজনের মাধ্যমে সংযোজিত। কিসাসই ওয়াজিব, ইচ্ছামূলক হত্যায় মাল গ্রহণ ওয়াজিব প্রমাণকারী কোন আয়াত নেই। এতে করে 'মুতাশাবিহ' আয়াতের 'মুহকাম' আয়াত ভিত্তিক অর্থ হয়ে যায়। আর সেজন্যে তার অর্থ কেবলমাত্র প্রতিশোধ গ্রহণই বুঝতে হবে, মাল নয়। এই অর্থই 'মুহকাম' আয়াতের সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন। এ শব্দে অন্য কোন অর্থের শরীকদারী নেই। যে লোক এ থেকে দীয়ত বা প্রতিশোধ গ্রহণের ইখতিয়ার আছে বলে মনে করেছেন, সে কোন 'মুহকাম' আয়াতের উপর ভিত্তি করতে পারে নি। কাজেই ইখতিয়ার প্রমাণ করার কোন অবকাশ নেই। যদিও শব্দটিতে তার সম্ভাবনা আছে।

আয়াতে সূচনায় এমন কিছু আছে, যা প্রতিশোধ অর্থই প্রমাণ করে, তাছাড়া অন্য কিছু নয়। কেননা পূর্ণ আয়াতটি হচ্ছে ঃ

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا - فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا

যে লোক মজলুম হয়ে নিহত হবে, তার অভিভাবকের জন্যে আমরা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছি। অতএব সে যেন হত্যায় সীমালঙ্ঘন না করে। সে অবশ্যই সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

হত্যায় সীমালঙ্ঘন হচ্ছে হত্যাকারীর পরিবর্তে অন্য কাউকে হত্যা করা। অথবা হত্যাকারীকে এমনভাবে হত্যা করবে, যেভাবে নিহত হওয়ার সে যোগ্য বা অধিকারী নয় কিংবা তাকে বিকৃত করে দেবে।

এতে এই দলীল রয়েছে যে, 'সুলতান'-এর অর্থ প্রতিশোধ গ্রহণ । উপরন্তু যখন প্রমাণিতই হল যে, প্রতিশোধই আয়াতটির আসল বক্তব্য, তখন মাল গ্রহণ নিষিদ্ধ হয়ে গেল। কেননা প্রতিশোধ গ্রহণের সাথে সাথে মাল গ্রহণও যদি বৈধ হতো তাহলে একই অবস্থায় সেই দুটিই গ্রহণ করা কর্তব্য হতো—ইখতিয়ার হিসেবে নয়। কেননা আয়াতে ইখতিয়ারের কোন কথাই নেই। আর সে দুটিকেই এক সাথে গ্রহণ যখন নিষিদ্ধ, তখন প্রতিশোধ গ্রহণই তার অর্থ হবে অবশ্যম্ভাবীরূপে। এ থেকে আমরা বুঝলাম, মাল গ্রহণের কথা মূলতই বলা হয়নি। কোন কোন জুলুমের হত্যাকাণ্ডে আমরা যে দীয়ত গ্রহণ জায়েয বলি, তা এ আয়াতের ভিত্তিতে অবশ্যই নয়।

## 'আকিলা'—ইচ্ছামূলক হত্যায় 'আকিলা'র অবকাশ আছে কি ?

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ -

অবশ্য কোন হত্যাকারীর প্রতি তার ভাই যদি কিছু নম্র ব্যবহার করতে প্রস্তুত হয়। তাহলে প্রচলিত ন্যায়-নীতি অনুযায়ী রক্তপাতের প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক এবং নিষ্ঠা ও সততা সহকারে রক্তপাতের বিনিময় দিয়ে দেয়া হত্যাকারীর কর্তব্য।

পূর্বে আমরা এ আয়াতের ব্যাখ্যা নানা পর্যায়ে পেশ করেছি। নিহতের অভিভাবক বহু হলে এবং তাদের মধ্য থেকে কতক যদি তাদের অংশের দাবি ছেড়ে দেয়, আয়াতে তাদের কথা বলা হয়েছে বলে যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, তারও উল্লেখ করা হয়েছে। তখন অবশিষ্টদের জন্যে জরিমানা (ارش) দেয়া কর্তব্য হবে। ব্যবহৃত শব্দের এই তাৎপর্য হতে পারে। তাতে প্রমাণিত হয় যে, যে হত্যাকারী মাল দিয়ে ক্ষমা পায়নি, যে ইচ্ছামূলক হত্যায় হত্যাকারীর উপর প্রতিশোধ লওয়া কর্তব্য তাতে মাল দিয়ে ক্ষতিপূরণ করবে। যেমন বাপ—যদি সে তার পুত্রকে হত্যা করে অথবা হত্যার কম শুধু যখমের ঘটনা হয় এবং যাতে কিসাস লওয়া সম্ভব হয় না। যেমন বাহুর মাঝখান থেকে হাত কেটে ফেলা। এক্ষেত্রে ইচ্ছাকারী ও ভুলকারী দুজনই যদি হত্যায় শরীক হয়, তাহলে ইচ্ছাকারীকে তার মাল থেকে অর্ধদীয়ত দিতে হবে, আর ভুলকারীকে যা দিতে হবে, তা

দেবে তার 'আকিলা'। হানাফী ফিকাহবিদদের এটাই কথা। উসমান আলবত্তী, সওরী ও শাফেয়ীরও এই মত। ইবনে অহব ও ইবনুল কাসিম মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন, তা আকিলার উপর ধার্য হবে। এটা ইমাম মালিকের সর্বশেষ কথা। ইবনুল কাসিম বলেছেন, কোন ব্যক্তির ডান হাত কাটা হলে তার ডান হাত থাকে না। তার হাতের দীয়ত দিতে হবে মাল দিয়ে কিন্তু তা 'আকিলা' বহন করবে না। আওজায়ী বলেছেন ঃ সে দীয়ত অপরাধী মাল থেকে দিতে হবে। হ্যাঁ, তার মাল যদি দীয়ত দেয়ার জন্যে যথেষ্ট না হয় তাহলে তা দেয়ার দায়িত্ব বর্তিবে 'আকিলা'র উপর। অনুরূপভাবে স্ত্রী যদি তার স্বামীকে হত্যা করে ইচ্ছাপূর্বক ও সংকল্প নিয়ে, এক অবস্থায় যে, সে স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া সন্তান তার রয়েছে, তাহলে তার দীয়ত স্ত্রীর মাল থেকে দিতে হবে বিশেষ করে। তার মাল যদি সেই পরিমাণ না হয়, তাহলে তার 'আকিলা'কে তা দিতে হবে।

আবূ বকর বলেছেন, আয়াতটি বাহ্যতই প্রমাণ করে যে, ইচ্ছাপূর্বক হত্যার ব্যাপারে কোনরূপ সন্ধি করা এবং কোন কোন অভিভাবকের ক্ষমার দরুন প্রতিশোধ লওয়া প্রত্যাহৃত হলে অপরাধীর মাল থেকে দীয়ত আদায় করতে হবে। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'যে হত্যাকারীকে তার ভাইর পক্ষ থেকে কিছু ক্ষমা করা হবে....' এখানে হত্যাকারীকে বোঝানো হয়েছে, যখন কোন কোন অভিভাবকের ক্ষমা সঙ্ঘটিত হবে।

এরপর আল্লাহ্ বলেছেন فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ 'প্রচলিত নিয়মনীতির অনুসরণ করা হত্যাকারীর জন্যে জরুরী' অর্থাৎ হত্যাকারীকে নিহতের অভিভাবকের অনুসরণ করতে হবে। এরপর বলেছেন وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ 'তার দিকে আন্তরিকভাবে আদায় করে দিতে হবে।' অর্থাৎ হত্যাকারী দীয়ত আদায় করে দেবে, তা তার মাল থেকে দেবে। যারা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, মালের ভিত্তিতে সন্ধি করা হলে উভয়ের সে জন্যে রাজি হতে হবে, সে ব্যাখ্যায়ও হত্যাকারীকেই দীয়ত দেয়ার দায়িত্ব পালন করতে হবে, অন্য কাউকে নয়। কেননা আয়াতে 'আকিলার' কোন উল্লেখ নেই। তাতে অভিভাবক ও হত্যাকারীর উল্লেখ আছে মাত্র। ইবনে আবুজ্জিনাদ তার পিতা উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উৎবাতা ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ

لَاتَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمَدًا وَلَاعَبْدًا وَلَاصُلْحًا وَلَااعْتِرَافًا –

ইচ্ছামূলক হত্যায়, কোন দাসকে, সন্ধির ভিত্তিতে বা অঙ্গীকার হিসেবে 'আকিলা' দীয়ত দেয়ার দায়িত্ব বহন করবে না।

আবদুল বাকী আহমদ ইবনুল ফযল আল খতীব—ইসমাঈল ইবনে মূসা, শরীক জাবির ইবনে আমির সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ

اِصْطَلَحَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى اَنْ لَا يَعْقِلُوْ عَبْدًا وَلَا عَمَدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا –

মুসলমানগণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তারা কোন ক্রীতদাসকে, ইচ্ছামূলক হত্যাকারীকে, হত্যায় সন্ধি করা হলে এবং কোনরূপ প্রতিশ্রুতিতে আকিলা দিবেন না।

আমর ইবনে শুয়াইব, তাঁর বাবা, তাঁর দাদা থেকে কাতাদাহ্‌ ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুদলেজী সংক্রান্ত ঘটনার প্রসঙ্গে—কাতাদাহ্‌ তার পুত্রকে হত্যা করেছিলেন—বর্ণনা করেছেন, উমর (রা) তাঁর উপর এক শত উট ধার্য করেছিলেন এবং হত্যাকারী তা নিহতের ভাইদেরকে দিয়ে দিয়েছিলেন। তা থেকে কোন মীরাস বন্টন হয়নি। এই উটগুলো হত্যাকারীর। নিজের মাল থেকেই দেয়া হয়েছিল। কেননা এই হত্যা ছিল ইচ্ছামূলক। তা মূল হত্যার দরুনই ধার্য হয়েছে। তা করে হযরত উমর (রা) সাহাবায়ে কিরামের মতের বিপরীত কাজ করেননি। হত্যা ছাড়া তার কম মানের অপরাধে কিসাস কার্যকর করা হয়নি।

হিশাম ইবনে উরওয়াতা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَقْلٌ فِى عَمْدٍ وَانَّمَا عَلَيْهِمُ الْخَطَأُ –

ইচ্ছামূলক হত্যায় আকিলার উপর আকিলা দেয়ার দায়িত্ব নেই, তা তাদের উপর বর্তায় শুধু ভুলবশত হত্যার ব্যাপারে।

উরওয়া আরও বলেছেন ঃ

مَاكَانَ مِنْ صُلْحٍ فَلَا تَعْقِلُهُ الْعَشِيْرَةُ اِلَّا اَنْ تَشَاءُ –

হত্যার ব্যাপারে যখন পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সন্ধি হয়, তখন গোত্রের লোকেরা তাতে আকিলা দেবে না। তবে তুমি চাইলে ভিন্ন কথা .......।

কাতাদাহ্‌ বলেছেন ঃ

كُلُّ شَىْءٍ لَايُقَادُ مِنْهُ فَهُوَ فِىْ مَالِ الْجَانِىْ –

যেসব হত্যার প্রতিশোধ লওয়া যায় না, তাতে দীয়ত দিতে হবে হত্যাকারীর নিজের ধন-মাল থেকে।

ইমাম আবূ হানীফা হাম্মাদ, ইবরাহীম সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ

لَاتَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ صُلْحًا وَلَا عَمَدًا وَلَا اعْتِرَافًا –

হত্যার মীমাংসায় সন্ধি হলে, ইচ্ছামূলক হত্যা হলে বা তাতে কোন অঙ্গীকার হলে গোত্রের লোকেরা আকিলা দেবে না।

আল্লাহর কথা ঃ

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَّاُولِى الْاَلْبَابِ –

হে বুদ্ধিমান লোকেরা! কিসাসে তোমাদের জন্যে জীবন নিহিত।

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ জানিয়ে দিয়েছেন যে, কিসাস কার্যকর করায় জনগণের জীবন নিহিত রয়েছে। জীবনের স্থিতির কারণ বা মাধ্যমই হচ্ছে এই কিসাস। কেননা যে লোকই কাউকে হত্যা করার ইচ্ছা করবে, তাকে এই হত্যা থেকে বিরত রাখবে এই জ্ঞান যে, এর বদলে তাকেও হত্যা করা হবে। আর স্বাধীন ও গোলাম, পুরুষ ও নারী এবং

মুসলিম ও যিম্মীর মধ্যে সাধারণত কিসাস কার্যকর হওয়াই কর্তব্য। কেননা আল্লাহ তো সকলকেই বাঁচিয়ে রাখার পক্ষপাতী এবং ইচ্ছুক। কাজেই কিসাসের 'ইল্লাত' দুজন স্বাধীন মুসলমানের মাঝে পুরামাত্রায় মওজুদ রয়েছে যেমন তেমন এসব লোকের পরস্পরের মধ্যেও। তাই সকলের মধ্যেই আইনের পূর্ণ সমতা রক্ষা করা একান্তই আবশ্যক। আয়াতে কেবলমাত্র বুদ্ধিমান লোকদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করায় এই সার্বিক সাম্য ও সমতার পরিপন্থী কিছুই হয়নি। কেননা এর তাৎপর্য হচ্ছে, যে কারণে এই বিধানটি দেয়া হয়েছে তা বুদ্ধিমান লোক ছাড়া অন্যদের মধ্যেও বর্তমান রয়েছে। তা সত্ত্বেও কেবল বুদ্ধিমান লোকদের সম্বোধন করার কারণ হচ্ছে, মূলত তারাই এই বিধানের গভীরে নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারে, পারে এই বিধানকে কার্যকর করতে, এ থেকে উপকৃত হতে। যে ঘটনায় কিসাস কার্যকর হয় তা থেকে বিরত থাকার জন্যে বুদ্ধিমত্তা জাগ্রত থাকা আবশ্যক। যে নরহত্যার কারণে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার প্রতিরোধ করাও তাদের পক্ষে সম্ভব। আল্লাহ্‌র এই কথাটিও অনুরূপ ঃ

اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشَاهَا –

হে নবী! আপনি ভয় প্রদর্শনকারী কেবল তার জন্যে, যে পরকালকে ভয় করে।

যদিও নবী করীম (স) সকল মানুষের জন্যেই ভয় প্রদর্শক, সাবধানকারী, তাঁর এই ভয় প্রদর্শন থেকে উপকৃত হতে পারে কেবল তারাই যারা পরকালের প্রতি ঈমানদার ও তাকে ভয় পায়। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ –

তিনি তো কঠিন আযাবের পূর্বেই তোমাদের জন্যে সাবধানকারী।

যেমন ঃ هدى للمتقين 'কুরআন মুত্তাকী লোকদের জন্যে হেদায়েতকারী।'

কুরআন সকলের জন্যেই হেদায়েতকারী হিসেবে নাযিল হয়েছে, একথা ঠিক; কিন্তু কুরআন থেকে হেদায়েত কার্যত পেতে পারে কেবল তারাই, যাদের মনে তাকওয়া রয়েছে। তাই অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ –

রমযান মাস, এই মাসেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে সমগ্র মানুষের জন্যে হেদায়েত হিসেবে।

কুরআনের হেদায়েতে সমগ্র মানুষ শরীক।

আর একটি আয়াত ঃ

قَالَتْ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا – (مريم : ١٨)

মরিয়ম বলল, তুমি যদি সত্যিই কোন আল্লাহ্‌কে ভয়কারী ব্যক্তি হয়ে থাক, তাহলে আমি তোমা হতে রহমানের আশ্রয় প্রার্থনা করি।

যদিও 'তকী' তো সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র আশ্রয় লয় ক্ষতিকর সব জিনিস থেকে বাঁচার জন্যে। কোন কোন বুদ্ধিমান লোক থেকে তাদের এই কথা বর্ণিত হয়েছে ঃ

قَتْلُ الْبَعْضِ اِحْيَاءُ الْجَمِيْعِ –

কতিপয় লোককে হত্যা সমগ্র মানুষের জীবনের নিরাপত্তা।

অপর লোকদের কথা ঃ اَلْقَتْلُ اَقَلُّ لِلْقَتْلِ 'হত্যা হত্যা হ্রাসকারী' বা اَكْثِرُوْا الْقَتْلَ لِيَقِلَّ الْقَتْلُ 'বেশি বেশি করে হত্যা কর, তাহলে হত্যা কম হয়ে যাবে।'

বস্তুত এ হচ্ছে সব বিবেক-বুদ্ধিমান লোকদের জ্ঞানপূর্ণ কথাবার্তা। এসব কথার তাৎপর্য নিহিত রয়েছে আল্লাহ্‌র এই কথায় "وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ" 'কিসাসে তোমাদের জন্যে জীবন নিহিত।'

কিন্তু এই কথাসমূহ যখন পারস্পরিক তুলনা ও যাচাই করে দেখা হল, তখন এসব কথার মধ্যে بلاغت-এর দিক দিয়ে বিরাট দূরত্ব পাওয়া গেল। অর্থের সঠিকতার দিক দিয়েও যথার্থ মানদণ্ডে উত্তীর্ণ পাওয়া গেল না। কয়েকটি দিক দিয়ে তা বিবেচনা করা যেতে পারে। একটি, আল্লাহ্‌র কথা ঃ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ 'কিসাসেই জীবন' কথাটি 'কতককে হত্যা সমগ্রের জীবনের নিরাপত্তা' ও 'হত্যা হত্যাকেই হ্রাস করে' কথার মতই এবং অভিন্ন তাৎপর্যবহ। এ সব বাক্যে শব্দ বা অক্ষর কম হলেও প্রয়োজনীয় তাৎপর্য পুরামাত্রায়ই তাতে রয়েছে যা না হলে কথা-ই হয় না। কিন্তু এসব কথায় তা নেই। কেননা এতে হত্যার উল্লেখ হয়েছে ন্যায় বিচারের দৃষ্টিতে, সে জন্যে 'কিসাস' শব্দের উল্লেখ জরুরী। কুরআনে এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্যেই 'কিসাস' ফরয করা হয়েছে। আর তাতেই জীবন নিহিত। কিন্তু বুদ্ধিমানদের 'কতকের হত্যা সমগ্রের জীবনের নিরাপত্তা' 'হত্যা হত্যাকে হ্রাস করে', 'হত্যা হত্যা বন্ধ করে' ইত্যাদি কথাসমূহের তাৎপর্য যাচাই করলে তা যথার্থ মনে হয় না। কেননা সব হত্যাই যে হত্যা বন্ধ করে, সব হত্যায়ই যে হত্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং সব হত্যায়ই যে জীবন নিহিত, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। বরং অনেক হত্যা জুলুম ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হয়। তাহলে তো তা কোনক্রমেই মেনে নেয়া যায় না। তার যথার্থতা স্বীকার করা অত্যন্ত কঠিন। অতএব এসব কথার তাৎপর্য অব্যবহৃত, অবাস্তবায়িত। এসব কথার প্রতিক্রিয়ায় এই প্রশ্ন অনিবার্যভাবে উঠে যে, কোন হত্যা সমগ্রের জীবনের নিরাপত্তা বিধান করে (যেমন আজকের দিনে প্রশ্ন উঠেছে ঃ কোন্ যুদ্ধ যুদ্ধের ধ্বংসকারিতা থেকে মানবতাকে রক্ষা করতে পারে?) অতএব এসব কথা অসম্পূর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ। তার কার্যকারিতা অ-স্বীকার্য। কিন্তু আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'কিসাসে তোমাদের জন্যে জীবন' এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্য। তার লক্ষ্য কার্যকর হওয়ার যোগ্য, তা বাস্তবতা ভিত্তিক। শব্দ যা বলে, তা-ই যথার্থ, তার ভিন্নতর কোন ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না, যদিও তাতে অক্ষর বা শব্দ বেশি নয়। বস্তুত فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ 'কিসাসে জীবন' তুলনামূলকভাবে খুব কম অক্ষর সম্পন্ন বাক্য—'কতকের হত্যা সকলের নিরাপত্তা' 'হত্যা হত্যা কমকারী' বা 'হত্যা হত্যা বন্ধ করে' ইত্যাদি কথার অপক্ষে।

অপর দিক দিয়ে আল্লাহ 'কিসাসে জীবন' কথাটির বুদ্ধিমান লোকদের কথা অপেক্ষা অধিক মর্যাদাপূর্ণ প্রমাণিত হয়। ওদের কথায় শব্দের পুনরাবৃত্তি রয়েছে। আল্লাহ্‌র কথায় তা নেই। ভিন্ন ভিন্ন শব্দের অর্থের দিক দিয়ে পুনরাবৃত্তি অধিক উত্তম 'বালাগত'-এর দৃষ্টিতে, যা কুরআনের কথায় রয়েছে। একই কথা বিভিন্ন শব্দ দ্বারা একই বাক্যে বলা একই ধরনের শব্দের পুনরাবৃত্তির দ্বারা তা বলার তুলনায় অনেক সুন্দর ও উন্নতমান সম্পন্ন। যেমন আল্লাহ্‌র কথা وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ 'গাঢ় কৃষ্ণ'।

একই কথা দুটি শব্দ দ্বারা বলা হয়েছে। আরবী ভাষায় এরূপ ব্যবহার ব্যাপকভাবে প্রচলিত। কিন্তু একই শব্দের বারবার ব্যবহার সঠিক কাজ নয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ-এ তা নেই। অথচ তার তাৎপর্য ব্যাপক। তা হত্যাকারীর হত্যা বোঝায়। 'কিসাস' শব্দ শুনলেই এই অর্থ মনে জেগে উঠে যে, হত্যাকারীর হত্যাকাণ্ডের শরীয়াতী বিচারে প্রদত্ত দণ্ডই হচ্ছে 'কিসাস'। হত্যাকাণ্ড না ঘটলে 'কিসাস'-এর প্রশ্ন উঠে না। আর হত্যাকাণ্ড হলে একজন হত্যাকারী যেমন হয়, হয় একজন লোক নিহত এবং ঘটে হত্যার ঘটনা, যার শরীয়াতী বিধান অনুযায়ী অবশ্য বিচার হতে হবে। কিন্তু ওদের কথায় একই 'হত্যা' শব্দের বারবার ব্যবহার রয়েছে। আরবী 'বালাগাত'-এর দৃষ্টিতে তা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। এভাবে যত বিবেচনা ও যাচাই করা হবে, কুরআনের ঘোষণাটি অত্যন্ত উন্নতমানের প্রমাণিত হবে। এটাই কুরআনের 'মুজিযা'। কোন মানুষের পক্ষে এই ধরনের বাক্য রচনা সম্ভব নয়, আল্লাহ্‌র কালামের অল্প কথায় যে বিরাট বিশাল বিস্তীর্ণ তাৎপর্য পাওয়া যায়, তা উচ্চতর সাহিত্যিকদের রচিত কথায় কুত্রাপি পাওয়া যায় না।

## কিসাস-এর ধরন

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى –

হে ঈমানদারগণ তোমাদের প্রতি কিসাস ফরয করে দেয়া হয়েছে নরহত্যার ব্যাপারে।

অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ – فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عْتَدٰى عَلَيْكُمْ –

এবং সকল প্রকারের যখমে সমান সমান বদলা নির্দিষ্ট। অতএব যে তোমাদের উপর সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ করবে তোমরাও তার উপর অনুরূপ কর, যেমন তোমাদের উপর করেছে।

বলেছেন ঃ

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ -

তোমরা যদি প্রতিশোধ লও-ই তাহলে প্রতিশোধ নাও ঠিক তেমন, যেমন তোমাদের উপর জ্বালাতনের কাজ করা হয়েছে।

এসব আয়াতে যেমন অপরাধ তেমন শাস্তিদান পুরামাত্রায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমনটা অপরাধ, তার অধিক করার অধিকার কাউকে—তার অভিভাবককেও দেয়া হয়নি।

ফিকাহ্‌বিদগণ কিসাসের ধরন পর্যায়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ ও জুফর বলেছেন, প্রথম হত্যা যেভাবেই হয়ে থাকুক, তার দণ্ডের হত্যা কেবলমাত্র তরবারির দ্বারাই হতে হবে। ইবনুল কাসিম ইমাম মালিক-এর এই মত বলেছেন যে, যদি লাঠি বা পাথর কিংবা আগুন অথবা পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়, তাহলে দণ্ডস্বরূপ অনুরূপভাবে হত্যা করতে হবে। কিন্তু তাতে যদি না মরে তাহলে যে জাতীয় ঘটনার দ্বারা প্রথম হত্যা হয়েছে, সেই জাতীয় ঘটনা বারবার ঘটিয়ে হত্যাকারীকে মারতে হবে। তা যদি প্রথম হত্যাকারীর কাজের তুলনায় বেশি বা বাড়তি হয়ে যায়, তবুও।

ইবনে শাবরামাতা বলেছেন, যেমন করে সে মেরেছে, আমরাও সেই ভাবেই অকে মারব। তার চাইতে বেশি কিছু করে মারব না। তবে সকলেই দেহ বিকৃতকরণকে অপসন্দ করেছেন। বলেছেন, তরবারিই এসব ক্ষেত্রে যথেষ্ট হতে পারে। সে যদি পানিতে ডুবিয়ে মেরে থাকে, তা হলে তাকে পানিতে ডুবিয়েই মারব, যেন তার মৃত্যুটা নিশ্চিত হয়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন ঃ

যদি পাথরের আঘাতে মেরে থাকে, তা হলে তাকে পাথর দিয়েই মারা হবে, তার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তা বন্ধ করা বা সরানো হবে না। এটা যেমনটার জন্যে তেমনটার ব্যবস্থা মাত্র। যদি খাদ্য পানীয় না দিয়ে আটকে রেখে মেরে থাকে, তাহলে তাকে সেই ভাবেই বন্দী করে রাখা হবে। অনুরূপ সময়ের মধ্যে যে যদি না মরে, তাহলে শেষ পর্যন্ত তাকে তরবারি দিয়ে হত্যা করা হবে।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্‌র উপরোদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ে ঠিক ঠিক অনুরূপ দণ্ড দেয়ার কথা বলা হয়েছে কোনরূপ অতিরিক্ত কাজ ছাড়া-ই, তাই নিহতের অভিভাবকের পক্ষে আপরাধীর কাজের অধিক করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আর যখনই উক্ত মত অনুযায়ী আগুনে জ্বালানো হবে, পানিতে ডুবানো হবে, পাথর বর্ষণ করা হবে, আটকে রাখা হবে, তখন তাতে প্রথম হত্যাকারী যা করেছে তার চাইতে অতিরিক্ত করার আশংকা থাকে। কেননা অনুরূপ কাজে সে না মরলে, তাকে শেষ পর্যন্ত তরবারী দ্বারা হত্যা করতেই হবে। সমজাতীয় কাজ অতিরিক্তও হয়ে যেতে পারে। তাতে সীমালঙ্ঘনের অপরাধ হয়ে যেতে পারে। অথচ আল্লাহ্ তা করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। বলেছেন ঃ

فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ –

এই কিসাসের ব্যবস্থা দেয়ার পরও যদি কেউ সীমালঙ্ঘমূলক কাজ করে, তা হলে তার জন্যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে।

কেননা সীমালঙ্ঘন কিসাস-এর বিধান অতিক্রম করে যাওয়া। কিসাস হচ্ছে, যেমন করা হয়েছে ঠিক তেমন করা। তা করা সম্ভব হোক কি কঠিন হোক, উভয়ই সমান। তাকে যদি হত্যার ওই প্রদত্ত পন্থায় হত্যা করা হয়, তা হলে কিসাসটা প্রাণ সংহারের পর্যায়ে গণ্য হবে, প্রদত্ত পন্থার সীমালঙ্ঘন করা হবে না তাতে। ইমাম মালিক পূর্বকৃত কাজটি বারবার করেও মারতে হলে তাই করতে হবে বলে যা বলেছেন, তাতে প্রথম হত্যাকারীর কাজের অতিরিক্ত করার আশংকা নিহিত এবং তাতে ঠিক কিসাস-এর তৎপর্য বিনষ্ট হবে। আর ইমাম শাফেয়ীর কথা ঃ 'যা করা হয়েছে তাই করা হবে।' তাতেই প্রতিশোধটা পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ হয়ে যাবে। তার পরেও তাকে তরবারির দ্বারা হত্যা করা—এটাও সীমালঙ্ঘন এবং বাড়াবাড়ি—কিসাস-এর সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া হবে। অথচ আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ –

যে লোক আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, সে তো নিজের উপর নিজেই জুলুম করল।

যদিও কিসাস-এর মূল তাৎপর্য হল প্রাণের বদলে প্রাণ সংহার, প্রথম করা কাজের পরিমাণ অতিক্রম না করেই। এই কথাই তো বলা হয়েছে। তা হলে কিসাস ফরয হওয়ার কারণ সেই দিক দিয়ে—যেদিক দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা আয়াতেরও বিরোধিতা করেছে কিসাস-এর সীমালঙ্ঘন করার মাধ্যমে—তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাচ্ছে না। কেননা সেভাবে যে-ই কাজ করবে, সে-ই সীমালঙ্ঘনের পর্যায়ে পড়ে যাবে। অথচ আল্লাহ্ এই সীমালঙ্ঘনকে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। তিনি তো বলে দিয়েছে ঃ তোমরা প্রতিশোধ নিলে ঠিক যেভাবে তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়েছে, ততটুকু কষ্টই তোমরা দেবে। যতটা যখম করা হয়েছে তার তুলনায় বেশি যখম করা বা যা করা হয়েছে তার চাইতে বেশি করা এ আয়াত দ্বারা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।

আয়াত থেকে এ-ও বোঝা যায় যে, যা করা হয়েছে তা-ই করা, তার চাইতে এক বিন্দু বেশি না করা সকলেরই এই মত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। তাই যদি কেউ কোন ব্যক্তির হাত বাহু পর্যন্ত কেটে ফেলে, তা হলে তার কিসাস লওয়া যায় না। কেননা ঠিক ততটুকু কেটে হক আদায় করা নিঃসন্দেহ ও নিশ্চিত হতে পারে না। যদি বহু চিন্তা-ভাবনা ও চেষ্টা-সাধনা করে ঠিক সেই স্থানে চাকু রাখা যেখানে প্রথম কর্তনকারী রেখেছিল, যদি সম্ভব হয়ও, তবুও। এতে ইজতিহাদের যদি কোন ভূমিকা না থাকে, তা হলে কিসাস কি করে জায়েয হবে, যাতে আমরা নিশ্চিত জানতে পারব যে, সে তার পাওনা হক্-এর বেশি আদায় করেছে, তার অপরাধ পরিমাণের চাইতে বেশি অপরাধ করেছে ?

তবে এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই যে, অভিভাবকের পক্ষে হত্যাকারীকে হত্যা করা তো জায়েয; কিন্তু তাকে জ্বালিয়ে মারা বা ডুবিয়ে মারা জায়েয হতে পারে না। এ থেকে এ-ও বোঝা যায় যে, আয়াতের বক্তব্যও তাই। তরবারির দ্বারা হত্যাই যদি লক্ষ্য হয়, তা হলে প্রমাণিত হল যে, হত্যার বহু দিক ও উপায়-পন্থার মধ্যে এটাই অধিক সহজ পন্থা। আর সেটাই বক্তব্য হলে জ্বালিয়ে, ডুবিয়ে, পাথর মেরে বা অনুরূপ কোন কাজ দ্বারা মারা নিষিদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়, কেননা হত্যাকারিকে তরবারি দ্বারা হত্যা করা যখন সহজতর পন্থা, তখন অন্য কোন ভাবে হত্যা করা নিষিদ্ধ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

যদি বলা হয়, 'কিসাস'-এ অনুরূপ বা সমান সমান হতে পারে তরবারির দ্বারা হত্যা করা হলে। কিংবা যেমন করেছিল, তেমনটা করা হলে। তাতে না মরলে তরবারির দ্বারা হত্যা করা তার জন্যে জায়েয। তার জন্যে এটাও জায়েয যে, শুরুতেই—অন্য কিছু না করে—তরবারির দ্বারাই হত্যা কার্য সম্পাদন করবে। তাতে হয়ত সে তার হক্-এর কিছু অংশ ছেড়ে দেবে। আর তা করা তার জন্যে জায়েয।

জবাবে বলা যাবে, তরবারির দ্বারা হত্যা করা হলে তার প্রতি পাথর বর্ষণ বা তাকে জ্বালানোর অধিকারী সে হতে পারে না। কেননা তা 'কিসাস'-এর পবিত্র ভাবধারার সম্পূর্ণ পরিপন্থী কাজ—সমান কাজ করা হয় না। আর আল্লাহ তো কিসাস-এর বিধান দিয়েছেন, অন্য কিছু করার নয়। অতএব আয়াতের এমন অর্থ করা উচিত নয়, যা শব্দে নিহিত ভাবধারার পরিপন্থী। পাথর নিক্ষেপণ, জ্বালানো, ডুবানো বা তীর নিক্ষেপ প্রভৃতির দ্বারা পূর্ণ মাত্রার কিসাস সম্ভব হয় না। কেননা কিসাস হচ্ছে সমপরিমাণ সমমাত্রায় আদায় করা। পাথর মারার কোন সীমা তো নির্দিষ্ট ও জ্ঞাত নেই। ফলে তার দ্বারা হত্যাকারীর পাথর নিক্ষেপণ পরিমাণের সাথে সমতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। তীর নিক্ষেপ ও জ্বালিয়ে মারার ব্যাপারটিও তাই। তা কখনই কিসাস-এর লক্ষ্য হতে পারে না। তাই সহজতর পন্থায় প্রাণ সংহার-ই লক্ষ্য হওয়া উচিত।

নবী করীম (স) এর একটি হাদীস থেকেও তা-ই প্রমাণিত হয়। সে হাদীসে স্থানান্তরকরণ বা নির্বাসন কিংবা বল্লমের পেটের অভ্যন্তর ভেদী আঘাত দ্বারা কিসাস হয় না—বলা হয়েছে। কেননা কৃত অপরাধের বিভিন্ন অংশের পরিমাণ পুরামাত্রায় আদায় হওয়া কঠিন। তীর নিক্ষেপ করে বা প্রস্তর বর্ষণের দ্বারা কিসাস হয়, তা বলা যায় না। কেননা প্রথম ব্যক্তি যেভাবে কষ্ট দিয়েছে, যে কাজ দ্বারা প্রাণ সংহার করা হয়েছিল, ঠিক সেইভাবে করা এ সবের দ্বারা সম্ভব হয় না।

যদি বলা হয়, ঠিক অনুরূপ কাজ কেবল দুভাগে সম্ভব, কিসাস-ও তাই। একটি হত্যাকারীর প্রাণ সংহার, যেমন সে প্রাণ সংহার করেছে। এতে কিসাস কার্যকর হবে। আর এক্ষেত্রে অনুরূপ কাজ হচ্ছে প্রাণের বদলে প্রাণ সংহার। আর দ্বিতীয়, হত্যাকারীর সাথে ঠিক তেমনই করা, যেমন সে করেছে। শব্দের দাবি এ ক্ষেত্রে দুটিতেই ব্যবহৃত হয়। কেননা সাধারণ ও ব্যাপক অর্থে তারই দাবি করে। তখন আমরা বলব, আমরা তার সাথে তেমনই করব, যেমন সে করেছে। তাতে যদি সে মরে যায়, তো ভালো-ই। অন্যথায় অনুরূপ কাজ পূর্ণ মাত্রায় করা হবে প্রাণ সংহার করে।

জবাবে বলা যাবে, অনুরূপ ও কিসাস-এর অর্থ এই দুটি কাজই এক সঙ্গে হতে পারে না। সে নিহতের সাথে যা করেছে, তার সাথে তেমন করা, তার পরে তাকে হত্যা করা—এটা হয় না। যদিও আলাদা আলাদা ভাবে দুটিকে একত্রিত না করে উভয় অর্থের প্রত্যেকটি হওয়া সম্ভব ও সঙ্গত। কেননা এই নামটাই তা শামিল করে, তা আয়াতের আদেশেরও পরিপন্থী নয়। কিন্তু উভয়টিকে একত্রিত করা হলে একত্রিতভাবে তা লক্ষ্য হতে পারে না। কেননা তা কিসাস ও অনুরূপ কাজের সীমা ছাড়িয়ে যায়। বরং তার চাইতে অতিরিক্ত করা হয়। কিন্তু আয়াতটির এমন অর্থ করা যা তার মূল প্রতিপাদ্যের পরিপন্থী এবং তার লক্ষ্যকে ব্যর্থ করে দেয়, তা জায়েয নয়। এই কারণে প্যাথর নিক্ষেপকরণ, ডুবানো, বন্দী করে অভুক্ত রাখা ইত্যাদি করার পর তাকে তরবারির দ্বারা হত্যা করার সংকল্প করাই নিষিদ্ধ।

সুফিয়ান সওরী জাবির-আবূ আযিব নুমান ইবনে বশীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلاَقَوَدَ اِلاَّ بِالسَّيْفِ -

হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ কেবলমাত্র তরবারির দ্বারাই করতে হবে।

এই হাদীসটি দুটি অর্থ পরিব্যাপ্ত। একটি—কিসাস ও অনুরূপ কাজের উল্লেখে আয়াতটির আসল বক্তব্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করা। আর দ্বিতীয়—সাধারণ তাৎপর্যের সূচনার দ্বারা অন্য কিছু করে প্রতিশোধ গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ। এই হাদীসটিও তা-ই বোঝায়, যা ইয়াহইয়া ইবনে আবূ উনায়সাতা যুবায়র জাবির সূত্রে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لاَيُسْتَقَادُ مِنَ الْجِرَاحِ حَتَّى تَبْرَءَ -

যখমের প্রতিশোধ সে যখম ভালো হওয়ার আগে নেয়া যাবে না।

এ হাদীসটি আমাদের বিপরীত মতটি অস্বীকার করে এভাবে যে, অপরাধীর সাথে যে যেমনটা করেছে তা করাই যদি কর্তব্য হয়, তা হলে তাকে বাদ দেয়া সম্ভব নয়। যদি বাদ দেয়া প্রমাণিত হয়, তাহলে যখম কি অবস্থায় পরিণত হয়, যখম সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত তারই দৃষ্টিতে নিতে হবে।

যদি বলা হয়, ইয়াহইয়া ইবনে আবূ উনায়সাতা বর্ণিত হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করা যায় না, তা হলে তার জবাবে বলা হবে ঃ

এটা জাহিল লোকদের কথা। তাদের এ 'জরহ' ও 'তা'দীল'[১] লক্ষযোগ্য নয়। আর হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণের জন্যে ফিকাহবিদদের এটা নিয়ম নয়। তাছাড়া প্রখ্যাত

১. জরহ তা'দীল جرح وتعديل হাদীস বিজ্ঞানের একটি বিশেষ পরিভাষা। হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা বের করার জন্যে তার সনদের যাচাই করা—বর্ণনাকারীদের চরিত্র, স্মরণ শক্তি ও ধারাবাহিকতার দিক দিয়ে বোঝায়।

হাদীস সনদবিদ আলী ইবনুল মদীনী ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ সূত্রে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেছেন, জুহরীর সূত্রে হাদীস বর্ণনায় মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা ইয়াহইয়া ইবনে আবূ উনায়সাতা আমার নিকট অধিক প্রিয় ব্যক্তি।

খালিদুল হাযযা আবূ কালাবাতা, আবূল আসয়াস, শাদ্দাদ ইবনে আউস সূত্রে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তা-ও এই কথাই প্রমাণ করে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْاِ حْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ ، فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الذَّبْحَ -

আল্লাহ্ তা'আলা সব জিনিসের উপরই ইহসান—দয়া করা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা যখন (দণ্ড হিসেবে) হত্যা করবে, তখন এই হত্যাকার্যটি দয়া সহকারে ও উত্তমভাবে সম্পন্ন করবে। আর যখন পশু যবেহ করবে তখনও দয়া সহকারে ও উত্তমভাবে এই যবেহ কার্যটি সম্পন্ন করবে।

এ হাদীসের সাধারণ ও নির্বিশেষ বক্তব্যের দাবি হচ্ছে, যে লোক অন্য কাউকে হত্যার দণ্ড হিসেবে হত্যা করবে, সে যেন হত্যা করার সর্বোত্তম পন্থায় হত্যা করে। সেই পন্থায় হত্যা করে যা অধিক সহজ, কম কষ্টদায়ক। এতে তাকে আযাব দিয়ে মারা, তাকে বিকৃত করা (হাত-পা-কান-নাক কাটা, চক্ষু উৎপাটিত করা ইত্যাদি) সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।

নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীসও এই কথা-ই বলে। তা হল, তিনি প্রাণীদেহের কোন অংশকে লক্ষ্য বানিয়ে সেই স্থানে তীর মেরে মেরে তাকে হত্যা করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন।

বর্ণিত হয়েছে, কসম ইবনে মায়ান শরীফ ইবনে আবদুল্লাহকে সঙ্গে নিয়ে কোন সুলতানের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। সুলতান জিজ্ঞাসা করলেন—যে ব্যক্তি তীর মেরে মেরে এক ব্যক্তিকে হত্যা করল, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি করতে বল ? বললেন—তাকেও তীর মেরে মেরেই হত্যা করতে হবে। বললেন—প্রথম তীর নিক্ষেপে যদি সে না মরে ? বললেন, তা হলে দ্বিতীয় বারও মারা হবে। বললেন, তুমি কি তাকে তীর নিক্ষেপের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে গ্রহণ করতে বল ? অথচ নবী করীম (স) কোন প্রাণীকে তীর নিক্ষেপের লক্ষ্যবস্তুরূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। শরীফ বললেন, সে মরছে না তো! তখন কসম বললেন, হে আবূ আবদুল্লাহ্, এ এমন একটি ক্ষেত্র, এতে আমরা যদি পরস্পর প্রতিযোগিতা করি, তাহলে তুমি আমাদেরকে ছাড়িয়ে যাবে।

ইমরান ইবনে হুসায়ন প্রমুখ বর্ণিত হাদীস-ও এ কথাই প্রমাণ করে। তিনি লাশ বিকৃত করণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। সামুরাতা ইবনে জুনদুব (রা) বলেছেন ঃ নবী করীম (স) আমাদের সামনে যে ভাষণই দিয়েছেন, তাতে আমাদেরকে সাদ্‌কা করতে আদেশ করেছেন এবং লাশ বিকৃত করতে নিষেধ করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ্ ও প্রমাণিত। ফিকাহবিদগণ এ হাদীসটি কবুল করেছেন। এ হাদীসটির ভিত্তিতে মাসআলার

রায় দিয়েছেন। আর তার ফলে হত্যাকারীকে বিকৃত অবয়বে পরিণত করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। সেই সাথে এ হাদীসটি দ্বৈতভাবে কিসাস ও অনুরূপ হক আদায় পূর্ণ করাকেও ওয়াজিব করে দিয়েছে। তাই কিসাস অবশ্যম্ভাবী করে দিয়েছে; কিন্তু দেহ বিকৃতকরণ চিরতরে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। আয়াতটির তাৎপর্য এমনভাবে ব্যাখ্যা হয়েছে, যার ফলে তা হাদীসের তাৎপর্যের পরিপন্থী হয়নি। প্রাথমিক পর্যায়ে নবী করীম (স) عرنيين দের দেহ বিকৃত করিয়েছিলেন, তাদের হাতসমূহ ও পা সমূহ কেটে দেয়া হয়েছিল। তাদের চক্ষুগুলোও উৎপাটিত করা হয়েছিল এবং তাদেরকে সূর্যতাপে ফেলে রাখা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তারা সকলে মরে গিয়েছিল।

কিন্তু পরে চক্ষু উৎপাটন নিষিদ্ধ হয়ে যায়, নিষিদ্ধ হয়ে যায় বিকৃতকরণও। এ প্রেক্ষিতে কিসাসের আয়াতের অর্থ হবে হত্যাকারীকে এমনভাবে হত্যা করা, যাতে তার দেহ-মুখাবয়ব বিকৃত করা হবে না।

আমাদের বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা তাদের মতের সমর্থনে দলীল হিসেবে একটি হাদীস পেশ করেছেন। হাদীসটি হুম্মাম, কাতাদাতা, আনাস সূত্রে বর্ণিত। তাতে বলা হয়েছে, একজন ইয়াহুদী একটি বালকের মাথা দুখানি পাথরের মধ্যে রেখে ছেঁচে দিয়েছিল। নবী করীম (স) তার মাথাটিও দুটি পাথরের মধ্যে রেখে ছেঁচে দেয়ার আদেশ করেছিলেন।

এ হাদীসটি যদি সহীহ ও প্রমাণিত বলে সাব্যস্ত হয়, তাহলে বুঝতে হবে, তা মনসূখ হয়ে গেছে দেহ বিকৃতকরণ নিষিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। তা এজন্যে যে, বিকৃতকরণ সকলের নিকট নিষিদ্ধ। হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের এই পন্থার ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। আর নবী করীম (স) থেকে কোন বিষয় দুটি হাদীস বর্ণিত হলেও জনগণ তার একটিকে গ্রহণ করলে এবং অপরটি গ্রহণে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হলে সর্বজনগৃহীত হাদীসটিই অপরটির উপর—যেটি সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে—বিচারকারী হবে। তা বিশেষ হোক, কি সাধারণ। তা সত্ত্বেও ইয়াহুদীকে 'হদ্দ' হিসেবেই হত্যা করা হয়েছে, এটা খুবই সঙ্গত। যেমন শুবা হিশাম ইবনে জায়দ আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ এক ইয়াহুদী একটি মেয়ের উপর বাড়াবাড়ি করে। লোকেরা তাকে এমনভাবে পাকড়াও করল যে, মেয়েটির উপর বলাৎকারের সব চিহ্ন প্রকট ছিল। সে মেয়েটির মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল, পরে মেয়েটির পরিবারের লোকে তাকে রাসূলে করীম (স)-এর নিকট নিয়ে এল। তখন তার মুমূর্ষ অবস্থা। রাসূলে করীম (স) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাকে কে মেরেছে, অমুকে কি ? মেয়েটি মাথা নেড়ে প্রথমে বলল, না। পরে নবী করীম (স) বললেন, অমুক ইয়াহুদী ? বলল, হ্যাঁ, তখন নবী করীম (স)-এর আদেশক্রমে ইয়াহুদীর মাথা দুটি পাথরের মধ্যে রেখে ছেঁচে দেয়া হয়।

তাহলে বোঝা গেল, এটা ছিল 'হদ্দ'। কেননা ইয়াহুদীটি মাল নিয়েছিল, হত্যাও করেছিল।

পূর্বে এই বিকৃতকরণ জায়েয ছিল, যেমন عرنيين দের চক্ষু উৎপাটিত করা হয়েছিল। কিন্তু পরে বিকৃতকরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

ইবনে জুরাইজ মামর আইয়ূব আবূ কালাবা আনাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ইয়াহুদী ব্যক্তি একটি মেয়ের মস্তক চূর্ণ করে দিয়েছিল, তার অঙ্গে ছিল অলংকার। নবী করীম (স) তাকে পাথর মেরে মেরে রজম করে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ হাদীসে 'রজম' করার কথা বলা হয়েছে। অথচ 'রজম' কিসাস নয়, এটা সর্বসম্মত মত। এ-ও হতে পারে যে, ইয়াহুদী ব্যক্তিটি চুক্তি ভঙ্গ করে দারুল হরব-এ চলে গিয়েছিল। ইয়াহুদীর অবস্থার স্থান থেকে তা নিকটেই অবস্থিত ছিল। তখনকার সময়ে 'দারুল হরব' মদীনা থেকে খুব একটা দূরেও ছিল না। পরে তাকে পাকড়াও করা হয়েছিল এবং তাকে যুধ্যমান حربى ও চুক্তি ভঙ্গকারী হিসেবে হত্যা করা হয়েছিল। সে অভিযুক্ত ছিল এক বালিকাকে হত্যা করার জন্যে। অন্যথায় একটি বালিকার ইঙ্গিতে এবং সে তাকে হত্যা করেছে—এই ইশারা পেয়েই তো তাকে হত্যা করা যেতে পারে না। কেননা কারোর উপর হত্যার অভিযোগ হওয়া মাত্রই তো আর তাকে হত্যা করা যায় না। এ বিষয়ে সকলেই একমত। তাই মনে করতে হবে, তাকে হত্যার নির্দেশ দেয়ার মূলে অন্য একটি বড় কারণ অবশ্যই ছিল। আর সেই কারণে সে হত্যা দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। যদিও হাদীসের বর্ণনাকারী তা বর্ণনা করেন নি।

আমরা যে বলেছি, কিসাস-এর লক্ষ্য হচ্ছে যে-কোন সহজ পন্থায় প্রাণ সংহার, এবং তা তরবারির দ্বারা হত্যা, তার বড় প্রমাণ হচ্ছে, এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, যদি কাউকে পারিশ্রমিক হিসেবে মদ্য দিয়ে মারা হয়ে থাকে, তাহলে তাকে অনুরূপভাবে মদ্য পারিশ্রমিক হিসেবে দিয়ে তরবারির দ্বারা হত্যা করানো জায়েয হতে পারে না।

যদি বলা হয়, মদ্যপান তো গুনাহ, তাহলে বলা হবে, হ্যাঁ, দেহবিকৃতকরণও অনুরূপ গুনাহ্ বটে।

## অসিয়ত ওয়াজিব—এই পর্যায়ে আলোচনা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا نِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَ الِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ –

তোমাদের মধ্যে কারোর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে এবং সে ধন-সম্পত্তি রেখে যেতে থাকলে তার পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে প্রচলিত ন্যায়-নীতি অনুযায়ী অসিয়ত করাকে তোমাদের প্রতি ফরয করে দেয়া হয়েছে। মুত্তাকী লোকদের জন্যে তা নির্দিষ্ট অধিকার বিশেষ।

আবূ বকর বলেছেন, আগের দিকের ফিকাহবিদদের থেকে যে বর্ণনা এসেছে, তাতে দেখা যায়, আয়াতের خير শব্দের অর্থ হচ্ছে ধন-মাল। এ বিষয়ে তাদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। তবে এই ধন-সম্পদের কত পরিমাণ হলে তাতে অসিয়াত করা ফরয, সে বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। কেননা كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ -এর অর্থ তোমাদের প্রতি

ফরয করে দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ -এর অর্থ, 'তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করে দেয়া হয়েছে।' যেমন ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا -

নিশ্চয়ই নামায মুমিনদের প্রতি সময় ভিত্তিক ফরয।

হযরত আলী কাররামাল্লাহু আজহাহু (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি তাঁর এক আযাদ করা ব্যক্তির রোগাক্রান্ত অবস্থায় তার ঘরে গেলেন। তখন তার মালিকানায় সাতশ কি ছয়শ দিরহাম নগদ মুদ্রা ছিল। সে বলল ঃ আমি অসিয়ত করব না। হযরত আলী (রা) বললেন ঃ না। কেননা আল্লাহ তো বলেছেন ঃ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا যদি বিপুল রেখে যেতে থাকে। আর তোমার এই ছয়শ' কি সাতশ' দিরহাম কোন বিপুল বিরাট সম্পদ নয়। হযরত আলী (রা) থেকে অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ

اَرْبَعَةُ اٰلَافِ دِرْهَمٍ وَمَا دُوْنَهَا نَفْقَةٌ -

চার হাজার দিরহাম হলে অসিয়ত, তার কম হলে তা তো দৈনন্দিন খরচের সম্পদ মাত্র।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছে ঃ لَاوَصِيَّةَ فِىْ ثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمْ 'আটশ দিরহামে কোন অসিয়ত নেই। হযরত আয়েশা (রা) অসিয়ত করতে ইচ্ছুক এক মহিলাকে বলেছিলেন, 'না, তুমি অসিয়ত করবে না। লোকেরা বলেছে, সে মহিলার সন্তানাদি ছিল। আর তার মাল ছিল খুবই সামান্য। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তার সন্তান কয়টি ? বলল, চারটি। বললেন, তার মাল কত ? বলল, তিন হাজার। যেন সে তাদের নিকট স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। তখন হযরত আয়েশা (রা) বললেন, এ মাল তো ভাল পরিমাণের। ইবরাহীম নখয়ী বলেছেন, সম্পদের পরিমাণ হাজার দিরহাম থেকে কমের দিকে পাঁচশ দিরহাম হলে অসিয়ত করা যাবে।

হুম্মাম কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, 'যদি মাল রেখে থাকে' বলতে হাজার দিরহাম ও তদুর্ধ্ব পরিমাণ মনে করা হয়েছে। জুহরী বলেছেন, পরিমাণ কম হোক, কি বেশি—যাকেই মাল বা সম্পদ বলে অভিহিত করা যাবে, তাতেই অসিয়ত ফরয। এই সব ফিকাহবিদ মালের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন মুস্তাহাব হিসেবে। এই পরিমাণ মাল হলে অসিয়ত অবশ্যই কর্তব্য হবে, এ হিসেবে নয়। আর তাও তাঁরা ইজতিহাদের মাধ্যমে বলেছেন যে, এই পরিমাণের মাল হলে অসিয়ত করা যায়। আর একথা তো জানা-ই আছে যে, যদি কেউ একটি দিরহাম রেখে যেতে থাকে, তাহলে বলা যাবে না যে, সে خير (বিপুল মাল) রেখে যাচ্ছে। বস্তুত এই নামটি সাধারণ প্রচলনের উপর নির্ভরশীল, আর এ ব্যাপারে পরিমাণ নির্ধারণ কেবল ইজতিহাদের পন্থায়ই সম্ভব। আর অধিক মাত্রার ধারণাই সেখানে কাজ করবে। একথা জানা সহকারে যে, কম বা সামান্য পরিমাণের মালকে এই নামে خير অভিহিত করা যায় না। মালের পরিমাণ বেশি ও বিপুল হলেই এই নাম দেয়া যায়। তাই خير পরিমাণ নির্ধারণ কেবল ইজতিহাদ ও বেশির ধারণার

মাধ্যমেই করা সম্ভব। সেই সাথে রাসূলে করীম (স)-এর সুন্নাতকেও সামনে রাখতে হবে। তিনি বলেছেন ঃ اَلثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ। এক-তৃতীয়াংশ এবং এক-তৃতীয়াংশই অনেক। বলেছেন ঃ

وَاَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ –

তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদের পরমুখাপেক্ষী রেখে যাবে, তা এ অবস্থায় রেখে যাওয়ার তুলনায় অনেক ভালো যে তারা হবে শূন্য হাত, লোকদের পথ আগলে ভিক্ষা চাইবে।

উপরোদ্ধৃত আয়াতের যে অসিয়তের কথা বলা হয়েছে, সে বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে এদিকে দিয়ে যে, তা ফরয, কি ফরয নয়। কিছু সংখ্যক ফিকাহবিদ বলেছেন, তা ফরয বা ওয়াজিব ছিল না, ছিল মুস্তাহাব। তার পথটা দেখিয়ে দেয়া হয়েছে মাত্র। অন্যরা বলেছেন, পূর্বে তা ফরয ছিল, পরে তা মনসূখ হয়ে গেছে। তবে মনসূখ হয়েছে কিনা, এ বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। যারা বলেছেন, তা ফরয বা ওয়াজিব ছিল না, মুস্তাহাব ছিল, তারা দলীল হিসেবে বলেছেন, আয়াতটির পূর্বাপর প্রেক্ষিত ও কথার ধরনে এমন কিছু আছে যা প্রমাণ করে যে, অসিয়ত ওয়াজিব বা ফরয নয়। তা হচ্ছে 'অসিয়ত পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের জন্যে' ন্যায়নীতি অনুযায়ী কথাটি। এতে যখন بالمعروف 'ন্যায়নীতি অনুযায়ী' এবং তা 'মুত্তাকীদের জন্যে' বলা হয়েছে, তখন বুঝতেই হবে যে, তা ফরয বা ওয়াজিব নয়। তার তিনটি কারণ। একটি হল بالمعروف 'ন্যায়নীতি অনুযায়ী' কথাটি ফরয বা ওয়াজিব নয়, প্রমাণ করে। আর দ্বিতীয়, 'তা মুত্তাকী লোকদের জন্যে'—কেবল মুত্তাকীদের জন্যে এই কথা। আর সব মানুষই যে মুত্তাকী হবে, এমন কোন কথা নেই। তৃতীয়—এ কাজটি বিশেষভাবে মুত্তাকী লোকদের জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামী শরীয়াতে ওয়াজিব বা ফরয কখনও মুত্তাকী ও মুত্তাকী নয় এমনভাবে লোকদের মধ্যে পার্থক্য সহকারে বিধিবদ্ধ করা হয়নি।

আবূ বকর বলেছেন, এই মতে যে অসিয়ত ওয়াজিব নয় বলা হয়েছে, মূলত তার কোন অকাট্য প্রমাণ আয়াতে নেই। কেননা معروف বা প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী বলায় তার ওয়াজিব হওয়ার পথে কোন প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হয়নি। কেননা لمعروف অর্থ, সুবিচার ও ন্যায়পরতা। এতে কোন মাত্রাতিরিক্ততা নেই, নেই মাত্রাভাব। যেমন আল্লাহ্‌র কথাঃ

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ –

যার সন্তান, সেই পিতার দায়িত্ব হচ্ছে প্রসূতি ও প্রসূতের রিযিক ও পরিধেয়ের ব্যবস্থা করা প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী।

এখানে এই রিযিক ও পরিধেয় পরিবেশনের ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোনই মতপার্থক্য নেই। আল্লাহ্‌র কথা وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ 'এবং স্ত্রীদের সাথে ন্যায়নীতি অনুযায়ী জীবন যাপন কর।' এখানেও এই আদেশ পালন ওয়াজিব। আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ –

এবং আদেশ কর প্রচলিত ন্যায়-নীতি ইনসাফের এবং নিষিদ্ধ ও শরীয়াত বিরোধী কাজ থেকে বিরত রাখ।

বলেছেন ঃ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ 'তারা ন্যায়-নীতি ইনসাফের আদেশ করে'। এসব আয়াতে اَلْمَعْرُوْف কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে সেই সব কাজে, যা আল্লাহ ওয়াজিব করেছেন। অসিয়তও এই পর্যায়েরই একটি। তার আয়াতে اَلْمَعْرُوْف ব্যবহৃত হওয়ায় তার ওয়াজিব হওয়া নিষিদ্ধ হয়নি। বরং তা ওয়াজিব, এই কথারই তাগিদ করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ্‌র সব আদেশ-ই তো منكر-معروف বা অপসন্দনীয় বা খারাপ কিছু নয়। এ-ও জানা আছে যে, معروف-এর বিপরীতটাই হচ্ছে منكر যা معروف নয়, তা-ই منكر – منكر নিন্দিত, তা করা নিষিদ্ধ। অতএব যা معروف তা-ই ওয়াজি। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ 'মুত্তাকী লোকদের হক।' একথা বলে তা ওয়াজিব করা হয়েছে, তার উপরই তাগিদ করা হয়েছে। কেননা লোকদের তো মুত্তাকী হওয়াই উচিত।

আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ –

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর।

মুসলমানরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত—কোনই দ্বিমত নেই যে, আল্লাহ্‌র তাকওয়া গ্রহণ ফরয। আর অসিয়ত কার্যকর করার জন্যে তাকওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এজন্যে আল্লাহ তা ফরয করে দিয়েছেন। উল্লেখ্য তাকে মুত্তাকীদের জন্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, কিন্তু তার ওয়াজিব হওয়ার পথে কোন বাধার সৃষ্টি করা হয়নি। কেননা তার ওয়াজিব হওয়াটা অন্তত মুত্তাকী লোকদের দ্বারা তো অবশ্যই কার্যকর হবে। সে জন্যে তা অ-মুত্তাকীদের জন্যে ওয়াজিব নয়, তা তো বলা যায় না। যেমন هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ বললে অ-মুত্তাকীদের জন্যে তা হেদায়েতকারী নয়, এমন কথা বলার কোন যুক্তি নেই। বরং আয়াত অনুযায়ী মুত্তাকী লোকদের জন্যে তো অবশ্যই ওয়াজিব হবে। আর সেই দাবিতে অ-মুত্তাকীদের জন্যেও তা ওয়াজিব। তবে উল্লেখে মুত্তাকীদের বিশেষীকরণের ফায়দা হচ্ছে, একথা বোঝানো যে, এই কাজটি আল্লাহ্‌র তাকওয়া পর্যায়ের কাজ। আল্লাহ্‌র তাকওয়া থাকলে পরেই তা করা সম্ভব। আর সেই সাথে লোকদের কর্তব্য হচ্ছে মুত্তাকী হওয়া। তা হলেই সব মানুষের পক্ষে তা কার্যকর করা সম্ভব হবে।

অসিয়তের আয়াত বাহ্যতই অসিয়তকে ওয়াজিব করেছে। তা যে ফরয, এর উপর তাগিদও রয়েছে। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ كُتِبَ عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর লিখে দেয়া হয়েছে, এর অর্থ, ফরয করা হয়েছে। পূর্বে একথা বলে এসেছি। এই কথারই তাগিদ করা হয়েছে ঃ

بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ –

ন্যায়নীতি অনুযায়ী মুত্তাকী লোকদের হক।

একথায় ওয়াজিব প্রমাণিত হয় অত্যন্ত তাগিদ সহকারে। যেমন লোকেরা বলে ঃ هٰذَا حَقٌّ عَلَيْكَ এটা তোমাদের প্রতি হক, অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। আল্লাহ্‌র প্রতি তাকওয়া পোষণকারী লোকদের কথা বিশেভাবে বলে এই হুকুমকে অধিকতর তাগিদপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। এ কথা পূর্বে আমরা বলেছি। সেই সাথে আগের কালের তাফসীর লেখকরাও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, অসিয়ত এই আয়াত দ্বারা ওয়াজিব হয়ে গেছে।

নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীসও প্রমাণ করে যে, অসিয়ত ওয়াজিব ছিল। হাদীসটি আবদুল বাকী ইবনে কানে সুলায়মান ইবনুল ফযল ইবনে জিবরীল, আবদুল্লাহ ইবনে আইয়ূব, আবদুল ওয়াহাব নাফে ইবনে উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَايَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ يَبِيْتُ ثَلَاثًا اِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ –

কোন মুমিন ব্যক্তির তিন রাত্রি সময় অসিয়ত না লিখে অতিবাহিত করা হালাল নয়।

আবদুল বাকী বশর ইবনে মূসা আল হুমাইদী, সুফিয়ান আইয়ূব নাফে' ইবনে উমর (রা) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَاحَقُّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَالٌ يُوْصِى فِيْهِ تَمُرُّ عَلَيْهِ لَيْلَتَانِ اِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوْبَةٌ

যে মুমিন ব্যক্তির মাল আছে, তার লিখিত অসিয়ত নিজের নিকট লিখিত না রেখে দুটি রাত অতিবাহিত করার কোন হক নেই।

এই হাদীসটি হিশাম ইবনুল গাজী নাফে ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَايَنْبَغِىْ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّبِيْتَ لَيْلَتَيْنِ اِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوْبَةٌ –

মুসলিম ব্যক্তির নিজের নিকট লিখিত অসিয়ত না রেখে দুই রাতও যাপন করা বাঞ্ছনীয় নয়।

এই সব বর্ণনা প্রমাণ করে যে, অসিয়ত ওয়াজিব ছিল। আর যাঁরা তা ওয়াজিব মনে করেন, তাঁরা আবার শুরুতেই তা ওয়াজিব ছিল কিনা, তা নিয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ

করেছেন। তাঁদের কিছু লোক বলেছেন, এই আয়াতে অসিয়ত ওয়াজিব হওয়ার যেসব কথাবার্তা রয়েছে, তা পরে মনসূখ হয়ে গেছে। তাঁদের মধ্যে ইবনে আব্বাস (রা) একজন। আবূ মুহাম্মাদ জাফর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ আল-ওয়াসেতী, আবূল ফযল জাফর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল ইয়ামান আল মুয়াদ্দিব, আবূ উবায়দুল কাসিম ইবনে সালাম, হাজ্জাজ ইবনে জুরাইজ ও উসমান ইবনে আতা আল-খুরাসানী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ

اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ –

মাল-সম্পদ রেখে যেতে থাকলে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে অসিয়ত করা কর্তব্য।

আয়াতটিকে মনসূখ করেছে এ আয়াত ঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلْاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا –

পুরুষদের জন্যে অংশ রয়েছে সেই সম্পদ-সম্পত্তি থেকে, যা পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়রা রেখে গেছে এবং মেয়েদের জন্যে অংশ রয়েছে সেই সম্পদ সম্পত্তি থেকে যা তার পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়া রেখে গেছে, তা কম হোক কি বেশি এবং সে অংশ সুনির্দিষ্ট।

ইবনে জুরাইজ ইকরামা থেকে এবং ইবনে আব্বাস (রা) থেকে اِنْ تَرَكَ خَيْرًا। 'যদি ধন-সম্পদ রেখে গিয়ে থাকে' এই আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, যারা মীরাস পাবে তাদের বেলায় অসিয়ত সম্পর্কিত এ আয়াত মনসূখ হয়ে গেছে। কিন্তু মীরাসী আইন অনুযায়ী যারা মীরাস পাবে না, তাদের বেলায় অসিয়তের আয়াত মনসূখ হয়নি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ পর্যায়ে একটি বর্ণনা এসেছে এই বলে যে, তা সবই—সবার বেলায়ই মনসূখ হয়ে গেছে। কিন্তু অপর একটি বর্ণনায় যারা আদৌ মীরাস পায় না তাদের বেলায় নয়, যারা নিকটাত্মীয়দের থেকে মীরাস পায় তাদের বেলায় তা মনসূখ হয়ে গেছে।

আমাদের নিকট আবূ মুহাম্মাদ জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আবূল ফযল আল-মুয়াদ্দিব, আবূ উবায়দ, আবূ মাহদী আবুদুল্লাহ ইবনুল মুবারক উমারাতা আবূ আবদুর রহমান সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অসিয়তের আয়াত সম্পর্কে ইকরামাকে আমি বলতে শুনেছি نَسَخَتْهَا الْفَرَائِضِ ফরায়েযের আয়াত সে আয়াতটিকে মনসূখ করেছে।

ইবনে জুরাইজ মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ মীরাস ছিল সন্তানদের জন্যে। আর অসিয়ত ছিল পিতা-মাতার ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে। পরে তা মনসূখ হয়ে গেছে।

অপর কিছু লোক বলেছেন, অসিয়ত ওয়াজিব ছিল পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে। পরে ওয়ারিসদের জন্যে তা মনসূখ হয়ে গেছে এবং তা নির্দিষ্ট করা হয়েছে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে, যারা ওয়ারিস হয় না। হাদীসটি ইউনুস ও আশয়াস আল-হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন। আল-হাসান জাবির ইবনে যায়দ ও আবদুল মালিক ইবনে ইয়ালী থেকে বর্ণিত হয়েছে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে যে অ-নিকটাত্মীয়ের জন্যে অসিয়ত করেছে। অথচ তার এমন নিকটাত্মীয় রয়েছে যারা তার মীরাস পায়নি। তারা বলেছেন, দুই-তৃতীয়াংশের এক-তৃতীয়াংশ নিকটাত্মীয়ের জন্যে এবং অপর এক-তৃতীয়াংশ যার জন্যে অসিয়ত করা হয়েছে সে পাবে।

তায়ূস বলেছেন, সমস্ত সম্পত্তি নিকটাত্মীয়দের জন্যে প্রত্যাবর্তিত হবে। দহাক বলেছেন, নিকটাত্মীয়ের জন্যে কোন অসিয়ত নেই। তবে মৃতের কোন নিকটাত্মীয় না থাকলে ভিন্ন কথা।

অপর কতিপয় লোক বলেছেন, অসিয়ত মোটামুটিভাবে নিকটাত্মীয়দের জন্যে ওয়াজিব ছিল। কিন্তু তাদের সকলের জন্যে অসিয়ত করা অসিয়তকারীর কর্তব্য ছিল না। বরং তাদের মধ্যেই অসিয়ত সীমাবদ্ধ কর্তব্য ছিল। তা হলে তা দূরবর্তীদের জন্যে ওয়াজিব ছিল না। পরে নিকটাত্মীয়দের জন্যে অসিয়ত করা মনসূখ হয়ে যায়। অতপর তা অবশিষ্ট থেকে যায় দূরবর্তীদের জন্যে। তবে তাদের জন্যে অসিয়ত করা জায়েয মনে করতেন আর তা না করলেও কোন কথা নেই।

যাঁরা বলেছেন, অসিয়ত মনসূখ হয়ে গেছে, তারা কোন্ আয়াত দ্বারা মনসূখ হয়েছে সে বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। আমরা ইতিপূর্বে ইবনে আব্বাস ও ইকরামার মত উদ্ধৃত করেছি। তাঁদের মতে মীরাসের আয়াতই তা মনসূখ করেছে। অন্যরা বলেছেন, তাতে মনসূখ করেছে রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত لَاوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ 'ওয়ারিসের জন্যে অসিয়ত নেই' এই হাদীস। হাদীসটি শহর ইবনে হাওশব, আবদুর রহমান ইবনে উসমান, আমর ইবনে খারেজাতা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ উত্তরাধিকার যে পাচ্ছে, তার জন্যে অসিয়ত নেই।

আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতা—তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ "لَايَجُوْزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ" 'ওয়ারিসের জন্যে অসিয়ত জায়েয নেই'। ইসমাঈল ইবনে আইয়্যাশ শারাহবীল ইবনে মুসলিম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি আবূ আমামাতাকে বলতে শুনেছি, বলছিলেন, রাসূলে করীম (স) তাঁর এক ভাষণে বিদায় হজ্জের দিনে বলছিলেন ঃ

اَلَا اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّه فَلَاوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ –

জেনে রাখো! আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চিত ও নির্দিষ্টভাবে প্রত্যেককে তার হক দিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর ওয়ারিসের জন্যে কোন অসিয়ত নেই।

হাজ্জাজ ইবনে জুরাইজ আতা আল-খুরাসানী ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

لَايَجُوْزَلِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ اِلَّا اَنْ يُّجِيْزُهَا الْوَرَثَةُ –

কোন ওয়ারিসের জন্যে অসিয়ত জায়েয হবে না। তবে অন্যান্য ওয়ারিসরা যদি তার অনুমতি দেয়, তাহলে ভিন্ন কথা।

সাহাবীগণের এক জামাআতের নিকট থেকেও এই বর্ণনা পাওয়া গেছে। তা বর্ণনা করেছেন হাজ্জাজ আবূ ইসহাক হারিস আলী সূত্রে। তিনি বলেছেন ঃ 'উত্তরাধিকারীর জন্যে কোন অসিয়ত হতে পারে না। আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ হযরত ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ ওয়ারিসের জন্যে কোন অসিয়ত জায়েয নয়। এ পর্যায়ে নবী করীম (স) থেকে এই সব হাদীসই বর্ণিত হয়েছে। আমরা পূর্বে যেমন বলেছি, বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত এই হাদীস 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ে গণ্য হয়। কেননা তা মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও বিপুলভাবে পরিচিতি লাভ করেছে এবং বিশেষ করে ফিকাহবিদগণ তা সম্যকভাবে কবুল করেছেন ও কাজে ব্যবহার করেছেন। আর এই ধরনের হাদীস দ্বারা কুরআনের আয়াত মনসূখ হতে পারে বলে আমরা মত পোষণ করি। কেননা প্রকৃত পক্ষেই নিশ্চিত জ্ঞানের মাধ্যম ও উৎস এবং তদানুযায়ী আমল করা আবশ্যক। তবে আল্লাহ মীরাস তার ওয়ারিসগণের জন্যে অবশ্য প্রাপ্য বানিয়েছেন; তার দরুন কিন্তু অসিয়ত মনসূখ হয়ে যায়নি। কেননা অসিয়ত ও মীরাসী আইন উভয়ই একসাথে কার্যকর হতে পারে। লক্ষ্য করা যায়, নবী করীম (স) ওয়ারিসের জন্যেও অসিয়ত জায়েয় বলেছেন যদি অন্যান্য ওয়ারিসগণ তা করার অনুমতি দেয়। তাহলে মীরাস বণ্টনের সাথে সাথে অসিয়তও কার্যকর হতে পারে। তার জন্যে যে মীরাসের অংশ পাচ্ছে। তবে মীরাস বণ্টিত হবে অসিয়ত কার্যকর হওয়ার পর। তাহলে অসিয়তের অংশ দেয়ার পর মীরাস দেয়ার পথে প্রতিবন্ধক কি হতে পারে?

ইমাম শাফেয়ী তাঁর 'কিতাবুল-রিসালা' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ সম্ভবত মীরাস অসিয়তকে মনসূখ করেছে। এ-ও হতে পারে যে, অসিয়ত মীরাসের সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হবে। নবী করীম (স) থেকে মুজাহিদ সূত্রে মুনকাতা হাদীস[১] হিসেবে বর্ণিত হয়েছে ঃ 'ওয়ারিসের জন্যে অসিয়ত নেই। তা সত্ত্বেও আমাদের দলীল হচ্ছে, মীরাস পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে অসিয়তকে মনসূখ করেছে। মুনকাতা হাদীস সত্ত্বেও।

আবূ বকর বলেছেন, অসিয়ত ও মীরাস উভয়ই যখন একসাথে কার্যকর হতে পারে, তখন মীরাসী আয়াতে নাযিল হওয়ার এমন কিছুই নেই, যা ওয়ারিসের জন্যে অসিয়ত করাকে মনসূখ করতে পারে, তখন বলতে হবে যে, অসিয়ত মীরাসের কারণে মনসূখ হয়ে যায়নি। কেননা এ দুটি এক সাথে কার্যকর হতে পারে। ইমাম শাফেয়ীর নিকট উক্ত হাদীস হয়ত প্রমাণিত নয় বা গৃহীত হয়নি। কেননা হাদীসটি মুনকাতা সনদে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসকে মুরসালও[২] বলা যায়, আর ইমাম শাফেয়ীর নিকট 'মুরসাল' হাদীস

১. রাসূল করীম (স)-এর হাদীস বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত হলে তাকে মুনকাতা হাদীস বলা হয়।

২. তাবেঈ যদি সাহাবীর নাম উল্লেখ না করেই রাসূলের হাদীস বর্ণনা করেন, তা হলে তাকে হাদীসে মুরসাল বলা হয়।

গ্রহণীয় নয়। যদিও তা 'মুত্তাসিল' ও 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের হাদীস হোক না কেন—কেননা এ দ্বারা আয়াতের প্রতিপাদ্যের উপর হুকুমদারী করতে পারে। তা এজন্যে যে, তাঁর মতে সুন্নাত দ্বারা কুরআন মনসূখ হওয়া জায়েয নয়। এমতাবস্থায় পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে অসিয়ত অবশ্যই কার্যকর হতে পারে, তা মনসূখ হয়ে যায়নি, অনায়াসেই বলা যেতে পারে। কেননা তা মনসূখ করতে পারে এমন কিছুই আসেনি।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ছয়জন গোলামকে এক ব্যক্তি আযাদ করে দিয়েছিল। কিন্তু এ ছাড়া সে ব্যক্তির আর কোন সম্পদ বা সম্পত্তি ছিল না। তখন নবী করীম (স) আযাদকৃত গোলামদেরকে তিন ভাগে ভাগ করলেন। তন্মধ্যে দুজনকে মুক্তই রাখলেন, আর অবশিষ্ট চারজনকে গোলাম বানিয়েই রেখে দিলেন। এদেরকে মুক্ত করেছিল একজন আরব ব্যক্তি। আর আরবরা কেবল মাত্র তাদেরকেই গোলাম বানিয়ে রাখে, যারা তাদের নিকটাত্মীয় নয়। পরে নবী করীম (স) তাদের জন্যে অসিয়ত করা জায়েয ঘোষণা করেছিলেন। এ থেকে বোঝা গেল, অ-নিকটাত্মীয়ের জন্যে অসিয়ত না-জায়েয হলে আযাদকৃত এই গোলামদের জন্যে এই অসিয়ত নিঃসন্দেহে বাতিল হয়ে যেত। কেননা উক্ত বর্ণনায় তাদের জন্যে অসিয়ত করতে স্বয়ং রাসূলে করীম (স) বলেছেন, তারা কেউ সে ব্যক্তির নিকটাত্মীয় ছিল না।

আবূ বকর বলেছেন, এই কথাটি খুবই গণ্ডগোলের। তার মূলের সাথে সাংঘর্ষিক। গণ্ডগোলের এজন্যে যে, আরবরা যে সব অনারব লোক তাদের নিকটাত্মীয় নয়, তাদেরকেই গোলাম বানাত। আর তা ভুল এই দিক দিয়ে যে, তার মা হয়ত অনারব হবে। ফলে অনারব লোক তার মায়ের দিক দিয়ে নিকটাত্মীয় হতে পারে। তা হলে রোগী ব্যক্তি যে গোলাম আযাদ করলো, তা তার নিকটাত্মীয়দের জন্যে অসিয়ত হয়ে থাকবে। অন্য দিক দিয়ে যদি প্রমাণিত হয় যে, মীরাসের আয়াত পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে অসিয়তকে মনসূখ করেছে, তা হলে তা মনসূখ করে থাকবে তাদের মধ্যকার ওয়ারিসদের জন্যে। যারা তার ওয়ারিস হচ্ছে না, তা অন্যদের জন্যে মীরাস প্রমাণ করে না বলে তাতে এমন কিছু নেই, যা তার জন্যে অসিয়তকে মনসূখ করতে পারে।

আর তার মূলের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণ নিকটাত্মীয়দের জন্যে অসিয়ত অবশ্যই মনসূখ করা, ইমরান ইবনে হুসায়ন বর্ণিত এই ঘটনা যে, একজন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি তার গোলামকে আযাদ করে দিয়েছিল। আর মূল কথা হচ্ছে, সুন্নাত কুরআনের আয়াতকে মনসূখ করতে পারে না। প্রাথমিক কালের সাহাবী ও তাবেঈনের এক জামাআতের পক্ষ থেকে অনাত্মীয়দের জন্যে অসিয়ত জায়েয বলে বর্ণিত হয়েছে। যাদের জন্যে অসিয়ত করা হয়েছে, তাদের উপর তা কার্যকর হবে।

বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমর (রা) তাঁর সন্তানদের মাদের জন্যে (যারা তাঁর দাসী ছিল) অসিয়ত করেছেন। তাদের প্রত্যেক স্ত্রীলোকের জন্যে চার হাজার দিরহাম করে। হযরত আয়েশা, ইবরাহীম, সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, সালিম ইবনে আবদুল্লাহ, আমর ইবনে দীনার ও জুহুরী থেকে বর্ণিত হয়েছে—তার অসিয়ত কার্যকর হবে যাদের জন্যে তা করা

হয়েছে তাদের জন্যে। তাবেঈ যুগের পরবর্তীকালীন ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত হয়েছে যে, নিকটাত্মীয় ও অনাত্মীয় সকলের জন্যেই অসিয়ত করা সম্পূর্ণ জায়েয। আমাদের মতে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে অসিয়ত মনসূখ করেছে মীরাস সম্পর্কে বলা আল্লাহ্র এই কথাটি ঃ

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَا أَوْدَيْنٍ –

মীরাস বণ্টনের কাজ করা হবে মৃত যে বিষয়ে অসিয়ত করেছে তা দেয়া এবং ঋণ আদায়ের পর।

এ আয়াতে অসিয়তকে নিঃশর্তভাবে জায়েয বলা হয়েছে এবং তা অন্যদের বাদ দিয়ে কেবল নিকটাত্মীয়দের জন্যেই জায়েয করা হয়নি। আর তাতেই পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে অসিয়ত মনসূখ হয়ে গেছে অনিবার্যভাবে। কেননা তাদের জন্যে পূর্বে অসিয়ত ফরয হয়ে থাকলেও এ আয়াতে তাদের জন্যে তা ত্যাগ করার এবং অন্যদের জন্যে অসিয়ত করার অনুমতি রয়েছে। তার পরে যা অবশিষ্ট থাকবে, তা ওয়ারিসদের মধ্যে তাদের নির্দিষ্ট অংশ অনুযায়ী বণ্টন করে দেয়া হবে। আর তা সম্ভব হচ্ছে তাদের জন্যে সে অসিয়ত মনসূখ হয়ে যাওয়ার পর।

যদি বলা হয়, এই অসিয়ত ঠিক তা-ই যা মীরাসের আয়াতে বলা হয়েছে। পরবর্তীতে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে অসিয়তটাই মীরাসে পরিণত হয়েছে। তাহলে যারা ওয়ারিস হয়নি, তাদের জন্যে সে অসিয়ত অবশিষ্ট থেকে যায়।

জবাবে বলা যাবে, একথা ভুল। তার কারণ এই যে, এখানে অসিয়তকে নিরংকুশ ও নিঃশর্ত রাখা হয়েছে। ব্যবহৃত হয়েছে نكره শব্দ وصية - অনির্দিষ্টভাবে। তাতে সর্বপ্রকারের অসিয়তই এর মধ্যে শামিল ও ব্যাপক পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়। কেননা نكره শব্দের হুকুমই তাই। কিন্তু পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে যে অসিয়ত-এর কথা বলা হয়েছে, তার শব্দ نكر নয়; বরং معرفه এর শব্দ। কাজেই তাকে نكره পর্যায়ে গণ্য করা সঠিক হবে না, কেননা আল্লাহ্র যদি সেই অসিয়তের কথা বলাই উদ্দেশ্য হত, তাহলে বলতেন ঃ مِنْ بَعْدِ الْوَصِيَّةِ – معرفه শব্দ দ্বারা। বোঝা যেত যে, এ সেই অসিয়তের কথা বলা হচ্ছে, যা পূর্বেই জানা হয়ে আছে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُوْابِاَرْبَعَةِ شُهَدَاۤءَفَاجْلِدُوْهُمْ.

যারা সুপরিচিত পবিত্র-সংরক্ষিত মহিলাদের নামে কোন চারিত্রিক অভিযোগ তোলে কিন্তু তা প্রমাণের জন্যে চারজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে দোররা মার ............

এই সাক্ষীদের কথা বলতে গিয়ে অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَاِذْ لَمْ يَاتُوْ بِالشُّهَدَاۤءِ –

পরে সে সাক্ষীদের যদি নিয়ে আসা না হয়....

এ আয়াতে شهدا শব্দের উপর الف ও لام বসে তাকে معرفه বানানো হয়েছে। অর্থাৎ সেই সাক্ষীগণকে যাদের কথা পূর্বে বলা হয়েছে...কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে মীরাসের আয়াতে যে অসিয়ত-এর কথা বলা হয়েছে, তা نكره শব্দ وصية—তাতে প্রমাণিত হল যে, এ অসিয়ত পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে অসিয়ত নয়। এ অসিয়ত সাধারণ। তা সব মানুষের জন্যেই জায়েয। তবে সুন্নাত বা ইজমা যদি কোন অসিয়তকে বিশেষীকৃত করে থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা। যেমন কোন উত্তরাধিকারীর জন্যে অসিয়ত করা; কিংবা হত্যাকারীর জন্যে অসিয়ত করা। আর তা যখন প্রমাণিত হল, তখন পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে অসিয়ত মনসূখ বলে ধরে নিতে হবে।

আবূ বকর বলেছেন, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান দলীল দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, পিতা-মাতা নিকটাত্মীয়দের মধ্যে গণ্য হয় না। নিকটাত্মীয় বললে পিতা-মাতাকে বোঝায় না। কুরআনের আয়াত ঃ

اَلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَلْاَقْرَبُوْنَ –

অসিয়ত পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে। (এ আয়াতে এবং অন্যান্য আয়াতেও নিকটাত্মীয়দের থেকে স্বতন্ত্রভাবে পিতা-মাতার উল্লেখ করা হয়েছে)

বিশেষ করে এ জন্যে যে, পিতা-মাতা বললে পিতা-মাতাই বোঝায়; অন্যদের বোঝায় না। এদের পরস্পরে রক্তের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। রক্ত সম্পর্কের দিক দিয়ে অন্যান্য আত্মীয়জন পিতা-মাতার বাইরে, তাদের ছাড়াই এদেরকে বোঝায়। তাই قربون বলতে বোঝায় সেই আত্মীয়দের যারা অন্যদের অপেক্ষা নিকটবর্তী। বলেছেন, নিজ ঔরসজাত সন্তানও নিকটাত্মীয়দের মধ্যে গণ্য নয়। কেননা সে তো নিজেই তার রক্ত সম্পর্কের দিক দিয়ে—তার ও তার পিতার মধ্যে তৃতীয় কোন মাধ্যমে ছাড়াই সম্পর্কিত। আর পিতা-মাতা নিকটাত্মীয়দের মধ্যে গণ্য নয় বলে এবং সন্তান তার পিতার নিকটবর্তী—পিতা তার সন্তানের নিকটবর্তী হওয়ার—তুলনায়। কাজেই সে নিকটাত্মীয়দের মধ্যে গণ্য না হওয়াই অধিক উপযুক্ত। এজন্যে অমুকের গোত্রের নিকটাত্মীয়দের যে লোক অসিয়ত করেছে, তাতে তার সন্তান শামিল নয়। শামিল নয় তার পিতাও। হ্যাঁ, তাতে সন্তানের সন্তান, দাদা ও ভাইগণ শামিল হবে। এরূপ অবস্থা আর যার যার, সে-ও। কেননা এদের প্রত্যেকেই কোন মাধ্যমের সাহায্যে 'নিকটবর্তী' হয়ে থাকে। এভাবে নিকটবর্তীর অর্থ ও তাৎপর্যে বিভিন্ন মত রয়েছে।

## অন্যান্য ওয়ারিসদের অনুমতিক্রমে কোন ওয়ারিসের জন্যে অসিয়ত

আবূ বকর বলেছেন, ওয়ারিসগণের জন্যে অসিয়ত মনসূখ হওয়ার কথা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

لَاوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ اِلَّا اَنْ يُّجِيْزَهَا الْوَرَثَةُ –

কোন উত্তরাধিকারীর জন্যে অসিয়ত করা জায়েয নয়। তবে অন্যান্য উত্তরাধিকারী অনুমতি দিলে তা জয়েয।

এ হাদীসে বলে দেয়া হয়েছে যে, যেসব হাদীসে 'উত্তরাধিকারীদের জন্যে অসিয়ত জায়েয নয়', উল্লিখিত হয়েছে তার সাথে 'উত্তরাধিকারীদের অনুমতি হলে জায়েয' এই কথার উল্লেখ হয়নি, সে সব হাদীসের অর্থ হবে, অনুমতি না দিলে তা জায়েয হবে-ই না। তা একথাও বোঝায় যে, উত্তরাধিকারীদের অনুমতি গণ্য হবে সম্পত্তি-মালিকের মৃত্যুর পর। কেননা তার জীবদ্দশায় তো কেউ-ই উত্তরাধিকারী নয়। সম্পত্তি-মালিকের মৃত্যুর পরই নির্দিষ্ট হবে তার উত্তরাধিকারী কে, আর কে নয়। ওয়ারিস না হয়েও অনুমতি দিলে সে অনুমতি অর্থহীন, নিষ্ফল হবে। কেননা রাসূলের 'উত্তরাধিকারীর জন্যে অসিয়ত নেই', কথাটি সাধারণ ভিত্তিক। এ-ও বোঝা যায় যে, উত্তরাধিকারীরা যখন অসিয়ত করার অনুমতি দেবে, তখন তা তাদের দিক থেকে প্রাথমিক ধরনের কোন 'হেবা' গণ্য হবে না। কেননা 'হেবা' হলে তাতে সমর্পণ ও দখল হওয়া শর্ত হয়ে দাঁড়ায়। যাদের মধ্যে মীরাস বণ্টন হবে তাদের মধ্যে তা ব্যাপক প্রচলিত হবে না, তাতে প্রত্যাবর্তনও হবে না। বরং তখন তা 'বৈধ অসিয়ত' গণ্য হবে। অনুমতি দানকারী ওয়ারিসদের পক্ষ থেকে 'হেবা' গণ্য হবে না। এ থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, অনুমতি দানকারীর অনুমতির উপর নির্ভরশীল চুক্তিসমূহও জায়েয।

কেননা মরে যাওয়া ব্যক্তি যে মালের উপর অসিয়ত করেছে, তা এক্ষণে অসিয়ত কার্যকর হওয়ার সময়ে ওয়ারিসদের মাল। আর নবী করীম (স) তাকে উত্তরাধিকারীদের অনুমতির উপর ভিত্তিশীল বানিয়েছেন। ফলে তা মূল হয়ে দাঁড়াল ক্রয়-বিক্রয়, গোলাম মুক্তকরণ, হেবা, রেহন বা অন্যের মালের ইজারাদারী ইত্যাদির জন্যে। এক্ষণে তা তার মালিকের অনুমতির উপর নির্ভর করবে। কেননা যে চুক্তিই থেকে থাকুক, তার একজন মালিক রয়েছে, যে তা শুরু করার ও তা ঘটানোর মালিক। এ কথাও বোঝা যায় যে, মরে যাওয়া ব্যক্তি যদি এক-তৃতীয়াংশের অধিক পরিমাণের অসিয়ত করে থাকে, তা হলেও তার কার্যকরতা অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের অনুমতির উপর নির্ভরশীল হবে। যেমন করে নবী করীম (স) উত্তরাধিকারীর জন্যে অসিয়তকেও তাদের অনুমতির উপর নির্ভরশীল বানিয়েছেন। এ সব কথা-ই রাসূলের কথা, ওয়ারিসরা অনুমতি না দিলে কোন উত্তরাধিকারীর জন্যে কৃত অসিয়ত কার্যকর হবে না।

মোট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের অধিকের উপর অসিয়ত করা হলে কি করা হবে, সে বিষয়ে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। এক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীরা সম্পত্তির মালিকের মৃত্যুর পূর্বে অনুমতি দেবে। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফর, হাসান ইবনে সালিহ ও উবায়দুল্লাহ ইবনুল হাসান বলেছেন, তার জীবদ্দশায় যদি তারা অনুমতি দেয় তাহলে তা জায়েয হবে না। তা মৃত্যুর পরে অনুমতি দিতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, শুরাইহ ও ইবরাহীম থেকেও এ কথাই বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আবূ লায়লা ও উসমান-আল-বত্তী বলেছেন, সম্পত্তি-মালিকের মৃত্যুর পর দেয়া-অনুমতি প্রত্যাহার করতে পারবে না। তা তাদের জন্যে জায়েয নয়। ইবনুল কাসিম মালিকের এই মত বর্ণনা করেছেন, ওয়ারিসদের অনুমতি চাওয়া হলে তখন প্রত্যেক ওয়ারিস মরে যাওয়া লোকটির নিকট সম্পর্কহীন। যেমন যে সন্তান তার পিতা থেকে সম্পর্কহীন, ভাই চাচার পুত্র যে

দুজন তার পরিবারবর্গের মধ্যে গণ্য নয়, তাদের জন্যে অনুমতি থেকে ফিরে যাওয়ার কোন অধিকার নেই। তার স্ত্রী ও কন্যারা—যা মৃত ব্যক্তি থেকে আলাদা হয়নি, আর তার পরিবারের সকলে—তারা পূর্ণবয়স্কতা পেয়ে গেলে—তারা ফিরে যেতে পারে। চাচা ও চাচার পুত্র আর যে-ই তাদের থেকে ভয় পাবে যে, তারা অনুমতি না দিলে দৈনন্দিন খরচ ব্যবস্থা বন্ধ হওয়ার দরুন ক্ষতিগ্রস্ত হবে—তাদের অধিকার আছে ফিরে যাওয়ার।

ইবনে অহব মালিক থেকে সেই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি সম্পর্কে এই মত বর্ণনা করেছেন যে, সে তার কোন ওয়ারিসের জন্যে অসিয়ত করার অনুমতি তার হবু ওয়ারিসদের নিকট চেয়েছে, তারা তাকে তার অনুমতি দিয়েছে, তাদের সে অনুমতি থেকে একবিন্দু পরিমাণ ফিরে যাওয়ার কোন অধিকার নেই। যদি সুস্থ অবস্থায় অনুমতি চেয়ে থাকে, তা হলে তাদের পক্ষে সে অনুমতি থেকে ফিরে যাওয়ার অধিকার আছে যদি তারা ইচ্ছা করে। মূলত রোগাক্রান্ত অবস্থায়ই তাদের অনুমতি বৈধ হতে পারে। কেননা তারা তার মালে তাদের যে হক রয়েছে, তা থেকে ঢাকা পড়েছে। অতএব তাদের জন্যে তা জায়েয। এ পর্যায়ে ইমাম লাইস-এর কথা ইমাম মালিকের মতের সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন। আর সম্পত্তি-মালিকের মৃত্যুর পর যদি তারা অনুমতি দেয়, তাহলে তাদের এ অনুমতি থেকে ফিরে যাওয়ার তাদের কোন অধিকার নেই—এ বিষয়ে ফিকাহবিদদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই।

তায়ূস ও আতার এই মত বর্ণিত হয়েছে যে, জীবদ্দশায় অনুমতি দিয়ে থাকলে তা তাদের জন্যে জায়েয হবে।

আবূ বকর বলেছেন; রাসূলে কথা ঃ 'ওয়ারিসের জন্যে অসিয়ত নেই, তবে যদি অন্যান্য ওয়ারিসান তার অনুমতি দেয়', তা হলে জায়েয, কথাটি সাধারণ অর্থবোধক ও ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ। তাই সর্বাবস্থায় অসিয়ত করা জায়েয নয়, জায়েয এই শর্তের অধীন। সাধারণ কথাকে বিশেষীকৃত করে বলা হয়েছে—তবে অন্যান্য উত্তরাধিকারীরা তার অনুমতি দিলে'—বলে। কিন্তু তারা প্রকৃত ও বাস্তবভাবে উত্তরাধিকারী হতে তো সম্পদ-সম্পত্তির মালিকের মৃত্যুর পর, তার বেঁচে থাকা অবস্থায় নয়। তাই মৃত্যুর পর তাদের অনুমতি দেয়ার কথা মোটামুটি কথা থেকে বিশেষীকৃত কথা। তা ছাড়া যা কিছু তা ধার্য হবে অবশিষ্ট সাধারণ কথার উপর। একটু চিন্তা-বিবেচনা করলেই তার যৌক্তিকতা বোঝা যায়। সম্পত্তির মূল মালিকের জীবদ্দশায় তারা কেউ প্রকৃতপক্ষে উত্তরাধিকারী নয়। এমতাবস্থায় তাদের অনুমতি কার্যকর হতে পারে না। যেমন তাদের 'হেবা'ও কার্যকর হবে না, তাদের ক্রয়-বিক্রয়ও নয়। তার পর-পরই মৃত্যু সঙ্ঘটিত হলেও নয়। অনুমতি তো তা থেকে অনেক দূরে। যার জন্যে অসিয়ত করা হয়েছে, তা কার্যকর হবে সম্পত্তি-মালিকের মৃত্যর পর। ওয়ারিসদের অনুমতিও তাই। অসিয়ত কার্যকর হওয়ার সময়ই তা কার্যকর হবে, যদিও অসিয়ত কার্যকর হওয়ার পূর্বে তা কোন কাজ করবে না।

মরে যাওয়া ব্যক্তির পক্ষে বেঁচে থাকা অবস্থায় কৃত অসিয়ত প্রত্যাহার করা জায়েয।

কেননা তখন পর্যন্ত সে-ই তো সম্পদ-সম্পত্তির মালিক। তা হলে যারা অনুমতি দিয়েছে তারা সে অনুমতি প্রত্যাহারও করতে পারে। আর তাদের জন্যে অনুমতি প্রত্যাহার করা যখন জায়েয, তখন জানা গেল যে তাদের অনুমতি তখন সহীহ হয়নি।

যদি বলা হয়, সম্পত্তি-মালিকের অসুস্থতা কালে তার মাল সম্পর্কে ওয়ারিসদের হক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারণেই তার রোগে পড়া অবস্থায় তার জন্যে তার মালে এক-তৃতীয়াংশের অধিকের উপর তার হুকুম চালানো নিষিদ্ধ হয়েছে—যেমন মৃত্যুর পর হয়ে থাকে। তা হলে তারা অনুমিত দিলে সে অনুমতির হুকুমটা তাদের জন্যে বাধ্যতামূলক হওয়ার ব্যাপারে সম্পত্তি মালিকের রোগাক্রান্ত অবস্থাকে মৃত অবস্থা মনে করা যেতে পারে। জবাবে বলা হবে, আমাদের মতে সম্পত্তি-মালিক তার সমস্ত মালে রোগাক্রান্ত অবস্থায়ও হেবা, সাদকা, গোলাম আযাদকরণ ও অন্যান্য সর্ব প্রকারের ও সর্বধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারে। তা খতম হয়ে যাবে মৃত্যুর পর, যদি এক-তৃতীয়াংশের অধিকের উপর কিছু করে থাকে। কেননা এক-তৃতীয়াংশের অধিকের উপর সম্পত্তি-মালিকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই উত্তরাধিকারীদের হক ধার্য হয়ে গেছে। তার পূর্বে ওয়ারিসানের কোন কথার গুরুত্ব নেই। মূল সম্পত্তি-মালিকের কোন চুক্তি তার মৃত্যুর পূর্বে উত্তরাধিকারীরা বাতিল করতে পারে না। হ্যাঁ, তাদের হক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তার উপর কিছু হস্তক্ষেপ হয়ে থাকলে তা তার মৃত্যুর পরই পণ্ড করে দিতে পারে। তার মৃত্যুর পূর্বে ওয়ারিসানের অনুমতির অবস্থাও তাই। যেমন অনুমতি দেয়া হয়নি, তেমন তার কৃত চুক্তি ভঙ্গকরণে তারা কোন কাজ করতে পারে না। অনুমতি প্রত্যাহার করা হলে তার দিক থেকে ক্ষতির যে ভয় করে, এবং যে ভয় করে না, এ দুজনের মধ্যে ইমাম মালিক যে পার্থক্যের কথা বলেছেন, তার কোন তাৎপর্য নেই। কেননা তার দিক থেকে ক্ষতির ভয় তার কৃত চুক্তির সত্যতা-যথার্থতা নিষিদ্ধ করে না। আর তার কথা ঃ কেননা তাতে জোরপূর্বক বাধ্যকৃত মনে করা যায় না। লক্ষণীয়, যদি সে তার নিকট কোন জিনিস বিক্রয় করে, তাহলে তা তার কাছ থেকে চাওয়া হবেই। বলেছেন ঃ আমি ভয় করছি, আমার থেকে তার ব্যয় বহন বন্ধ হয়ে যাবে তার কথায় সাড়া না দিলে, এটাও কোন ওযর হতে পারে না ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করে দেয়ার। অনুরূপভাবে রোগী ব্যক্তিকে যদি কিছু 'হেবা' চাওয়া হয় এবং সে তা তাকে হেবা করে, তাহলে তার হেবাকরণে তার ডাকে সাড়া না দেয়ায় কোন ভয়ের কারণ প্রভাবশালী হবে না। তাহলে তা হবে তার মত যে, তার দিক থেকে ক্ষতির ভয় করছে। কাজেই এরূপ অবস্থায় ব্যয়ভার বহন বন্ধ হয়ে যাওয়ার ক্ষতির ভয় গোলাম মুক্তকরণ জরুরী হওয়া—এবং যে তার পরিবারবর্গের মধ্যে শামিল বা শামিল নয় ব্যক্তির মধ্যে ভয়ের কোন হিসেব বা গুরুত্ব হবে না।

## অসিয়ত বদলে দেয়া

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَاِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهُ –

যারা অসিয়ত শুনতে পেল এবং পরে তা পরিবর্তন করে দিল, এই পরিবর্তনকারীদের উপরই তার সব পাপ বর্তিবে ....

বলা হয়েছে, فَمَنْ بَدَّلَهُ -তে যে ه আছে, তা অসিয়তের দিকে ইঙ্গিত করেছে। পুরুষ বাচক এ ه এ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে। কেননা আরবী وصية ও الايصا। অভিন্ন। আর الـمـه। তে ه তা পরিবর্তনের কাজটি বুঝিয়েছে—যা বদলানো হয়েছে। فمن বলে সম্ভবত অসিয়তের সাক্ষীদেরকে বুঝিয়েছে। ফলে আয়াতটির অর্থ এই দাঁড়ায়, এতে অসিয়ত বদলে দেয়ার ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে, বলা হয়েছে, এ অত্যন্ত জঘন্য ও অভিশাপের কাজ। এটা ঠিক সেই রকম, যেমন এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَا -(المائده : ١٠٨)

এই পন্থায় বেশি আশা করা যায়, লোকেরা যথাযথ ভাবে সাক্ষ্য দান করবে।

আর এ-ও হতে পারে যে, তদ্দ্বারা অসিয়ত বাস্তবায়নকারী وصى -কে বোঝানো হয়েছে। কেননা সে-ই তো অসিয়ত বাস্তবায়নের জন্যে দায়িত্বশীল। তা কার্যকর করার কর্তৃত্ব প্রাপ্ত। এই কারণে তার-ই পক্ষে সম্ভব অসিয়ত বদলে দেয়া। সাধারণভাবে সমস্ত মানুষকে বুঝিয়েছে, একথা সুদূরপরাহত। কেননা তাদের পক্ষে এ কাজে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করার আদৌ কোন সুযোগ নেই। তাতে তারা কোনরূপ রদবদল করবে এমন সাধ্য কারোরই নেই।'

এ কথাটি আমাদের মতে সাক্ষী ও অসিয়ত বাস্তবায়নে দায়িত্বশীল এই দুজন লোককেই বোঝানো হয়েছে। কেননা ব্যবহৃত শব্দ তাদের দুজনকেই বোঝাতে পারে। সাক্ষী যা শুনেছে, তাতে কোনরূপ রদ-বদল না করেই ঠিক কথারই সাক্ষ্য দেবে যখন তাকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে ডাকা হবে। আর অসি—অসিয়ত কার্যকরকরণের দায়িত্বশীল অসিয়তটিকে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করবে। যেমন শুনতে পেয়েছে, ঠিক তেমনি—তেমনই বাস্তবে করে ফেলবে। আতা ও মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তারা দুজনই বলেছেন, অসিয়ত-এর দায়িত্বশীল এবং তাঁর সাক্ষীকে বোঝানো হয়েছে। হাসান বলেছেন, তা হচ্ছে অসিয়ত, যে-ই অসিয়ত শুনবে এবং পরে তার মূল কথা বদলে দেবে এই বদলানোর গুনাহ তারই হবে, যে তা বদলে দেয়ার কাজটি করবে।

আবূ বকর বলেছেন, শাসকও তার অর্থ হতে পারে। কেননা এ ব্যাপারে তার একটা কর্তৃত্ব রয়েছে। তার সম্মুখে যখন ব্যাপারটি যাবে, তখন সে তাতে হস্তক্ষেপ করে বসতে পারে। তখন সে তা বাস্তবায়নের জন্যে আদিষ্ট, যখন শাসনে তা বৈধ হবে, তখন তাতে কোনরূপ পরিবর্তন সৃষ্টি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাতে রয়েছে তা কার্যকর ও বাস্তবায়নের আদেশও পরম সত্যতা সহকারে।

আল্লাহ্র কথা ঃ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ 'অসিয়ত নিজ কানে শুনার পর যে তা বদলে দেবে'। অসিয়তকারীর নিকট থেকে অসিয়তের কথাগুলো শুনতে পেয়েছে, অসির পক্ষে তা কার্যকর করা সম্পূর্ণ জায়েয—এ কথাও তাতে রয়েছে। তাতে কেউ সাক্ষী থাক আর না-ই থাক। আসলে সে-ই হচ্ছে মূল ব্যক্তি, যে তা শুনতে পেয়েছে যাকে বলা হয়েছে ও কার্যকর করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সম্ভব সামর্থ্য হলেই তা যথাযথভাবে

কার্যকর করা তার জন্যে সম্পূর্ণ জায়েয। সেজন্যে কোন সরকারী নির্দেশের অপেক্ষা থাকবে না। কোন সাক্ষীর ও সাক্ষ্যের প্রয়োজন নেই। এ আয়াত থেকে একথাও বোঝা গেল, মৃত্যুমুখী মানুষটি কোন ব্যক্তির ঋণ পাওনা থাকার কথার স্বীকারোক্তি করলে, সেই অসির জন্যে জায়েয় রয়েছে কোন ওয়ারিসকে না জানিয়েই সে তা বাস্তবায়িত করে দেবে। সেজন্যে শাসন কর্তৃপক্ষকেও জানাবার কোন প্রয়োজন নেই, অন্য কাউকেও নয়। কেননা অসিয়ত শুনতে পাওয়ার পর তদানুযায়ী কাজ করা ত্যাগ করলে—কাজ না করলে অসিয়তকারীর অসিয়ত বদলে দেয়ার শামিল হবে। আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَاِنَّمَا اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ –

তাঁর গুনাহ্ কেবল তাদেরই উপর বর্তিবে, যারা তা বদলে দেয়ার কাজটি করছে।

এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। একটি—জানা-ই আছে যে, এই কথাটি অসিয়ত-এর কথার সাথে যোগ করে বলা হয়েছে, যা পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে পূর্বে ফরয করে দেয়া হয়েছিল। তা অবশ্যই এই কথার তাৎপর্যে নিহিত রয়েছে। তা না হলে কথাটাই ঠিক মতো হয় না, কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ

যে লোক তা শুনার পর তা বদলে দেবে, গুনাহ্‌টা তাদেরই হবে।

কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্য নয়, তা থেকে কোন ফায়দাও পাওয়া যায় না। কেননা যে ইঙ্গিত ও সর্বনাম দুটি রয়েছে, তা যে দিকে ইঙ্গিত করে তা পূর্বে প্রকাশমান থাকা একান্তই। কিন্তু আয়াতে প্রথমে যা উল্লিখিত হয়েছে, তা ছাড়া অন্য কোন প্রকাশমান শব্দ নেই। ব্যাপার যখন এই, তখন আয়াতটি একথা বোঝাতে পারল যে, অসিয়তকারীর দায়িত্ব—অসিয়ত করা হলেই শেষ হয়ে গেছে। তার মৃত্যুর পর সে অসিয়তে কোনরূপ রদ-বদল করা হলে তার গুনাহ তাকে স্পর্শ করবে না।

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, যারা বলে, পিতৃ পুরুষদের গুনাহের দরুন ছোট বাচ্চাদেরকে আযাব দেয়া হবে, তাদের কথা সম্পূর্ণ বাতিল। যেমন অপর আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى –

প্রত্যেকটি যে কাজই করে, তা কেবলমাত্র তারই উপর বর্তাবে। আর কোন বোঝা বহনকারীই অন্য কারোর বোঝা বহন করবে না।

আয়াতটি থেকে একথাও প্রমাণিত হল যে, যার উপর ঋণের বোঝা হয়েছে, সে যদি তা শোধ করার অসিয়ত করে যায়, পরকালের তার কুফর ভোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে। তার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিসানরা তা শোধ না করলেও তার কোন জবাবদিহি তাকে করতে হবে না। কোন গুনাহ তার হবে না। গুনাহ হবে তার, যে অসিয়তকে বদলে দেবে। যে অসিয়ত করেছে বা যার জন্যে অসিয়ত করেছে, সে নয়।

এ আয়াতে এ প্রমাণও রয়েছে যে, যার উপর তার মালের যাকাত অদেয়া রয়েছে, পরে সে সে বিষয়ে অসিয়ত না করেই মরে গেল সে তো তার দায়িত্ব অ-পালনকারী থেকে

গেল। যাকাত না-দেয়া লোক হয়ে গেল। যাকাত দিতে অস্বীকারকারীর পর্যায়ে পড়ে গেল। কেননা অসিয়ত যদি ধন-মাল সংক্রান্ত হয়ে থাকে, যেমন তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে মৃত্যুকালে সে মাল সম্পর্কে যে অসিয়ত করল, তার-ই স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেল। ফলে অসিয়তকারী নিজে গুনাহ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে গেল। এখন তাতে যে কোনরূপ রদবদল করবে, সে-ই হবে সে কাজের গুনাহের বোঝাবহনকারী। যাকাত না দিলে মৃত্যুকালে সে তা দেয়ার ব্যবস্থা করার জন্যে দায়িত্বশীল হবে। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْ لَاۤ اَخَّرْتَنِىْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ -

এবং তোমরা আল্লাহ্র দেয়া রিযিক থেকে ব্যয় কর তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগে। তখন তো বলবে, হে রব্ব, তুমি কেন একটা নিকটবর্তী সময়ে জন্যে আমাদের নিয়ে যাওয়ার সময়টা বিলম্বিত করলে না ? যদি করতে তাহলে আমি সত্যকে গ্রহণ করতাম ও নেক আমলকারীদের মধ্যে গণ্য হয়ে যেতাম।

এ আয়াতে দায়িত্ব না পালনের ও যাকাত না দেয়ার ফলে যে অবস্থা দেখা দেবে তারই সংবাদ দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে ওয়ারিসদের বা 'অসি'র মৃতের মীরাস থেকে দায়িত্ব পালন যদি বাকী থেকে যায়, তাহলে সেই লোকেরাই তিরস্কার ও ধমক পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে তা না করার কারণে। মৃত ব্যক্তি এই অপরাধের আওতার বাইরে থেকে যাবে। এতে আমাদের কথার সত্যতাই প্রমাণিত হল। আমরা বলেছি যে, যাকাত আদায় না করে থাকলে মৃত্যুকালে তার মীরাস থেকে তা দিয়ে দেয়া অসিয়ত না করলেও তা দিতে হবে।

যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, অসিয়ত কার্যকর করা কিংবা তা বদলে দেয়া অবস্থায় আল্লাহ্র নিকট অসিয়তকারীর অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য হবে কি ? উভয় অবস্থায়ই সে অসিয়তের সওয়াব পাওয়ার অধিকারী হবে কি ?

জবাবে বলা যাবে অসিয়তকারীর অসিয়তে দুটি জিনিস রয়েছে। একটি হচ্ছে—তার অসিয়তের কারণে তার সওয়াব পাওয়ার ব্যাপার। আর দ্বিতীয়—সেই অসিয়তটি যার জন্যে তা করা হয়েছে, তার পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া এবং তদ্দরুন আল্লাহ্র শোকর ও অসিয়তকারীর জন্যে আল্লাহ্র নিকট দো'আ করার কারণ হওয়া। তার কারণে অসিয়তকারীর কোন সওয়াব হবে না। কিন্তু যার জন্যে সে অসিয়ত করেছে তার দো'আ সে অবশ্যই পাবে। তার আল্লাহ্র শোকর আদায় করা তাই কর্মফল, অসিয়তকারীর নয়। এ থেকে অসিয়তকারী দুটি দিক দিয়ে উপকৃত হবে অসিয়ত কার্যকর ও বাস্তবায়িত হলে। আর তা কার্যকর না হলে সে যে অসিয়ত করেছে তার দরুন সে যে সওয়াব পাওয়ার অধিকারী হয়েছে, তারই মধ্যে সীমিত থাকবে।

যদি বলা হয়, যার উপর ঋণের বোঝা চাপা আছে, মৃত্যুকালে তা শোধ করার জন্যে সে অসিয়ত করেনি; কিন্তু ওয়ারিসানরা তা শোধ করে দিল, মৃত ব্যক্তি কি তার শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাবে ?

জবাব হচ্ছে, তার ঋণ শোধ করা থেকে বিরত থাকার মধ্যে দুটি জিনিস সমন্বিত। একটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র হক। আর দ্বিতীয়টি মানুষের হক। মানুষের হক যদি পূর্ণ মাত্রায় আদায় হয়ে যায়, তা হলে তার কুফল ও খারাপ পরিণতি থেকে বেঁচে গেল। তবে ঋণ শোধে বিলম্ব হওয়ার দরুন সাধিত জুলুম ও ক্ষতির কারণে মানুষের হক অ-পূরিত থেকে যাবে। তার থেকে তওবা না করলে পরকালে তাকে পাকড়াও করা হবে। অবশিষ্ট থেকে যাবে আল্লাহ্‌র হক। ঋণগ্রস্তের জীবনকালে যে জুলুম হয়েছে ঋণদাতার প্রতি এবং সে জন্যে তওবা করেনি; তাহলে ব্যাপারটি তার ও আল্লাহ্‌র মধ্যের হওয়ার কারণে তাকে পাকড়াও করা হবে। যেমন, কেউ যদি অপর কারোর মাল ছিনতাই করে নেয়, তা না দেয়ার জন্যে পৌনপুনিকতা করে, এ জন্যে সে দুটি দিক দিয়ে অপরাধী হবে। একটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র হক, তা ফিরিয়ে না দেয়ার কারণ আর দ্বিতীয় ব্যক্তির হক, তার উপর জুলুম করার দরুন এবং তার ক্ষতি করার কারণে। এক্ষণে ব্যক্তি যদি ছিনতাইকারীর ইচ্ছা ছাড়াই তার হক্‌টা নিয়ে নেয়, তা হলে তার হক সম্পর্কিত ঝুকি থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। থেকে যাবে আল্লাহ্‌র হক। সে জন্যে তওবা করা একান্তই আবশ্যক। তওবা না করেই মরে গেলে তার শাস্তিটা তাকে ভোগ করার জন্যে থেকে যাবে। এ কথাই বলা হয়েছে আল্লাহ্‌র কথাটিতে ঃ

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهُ –

অসিয়ত শুনার পর যে তা পরিবর্তিত করবে, তার এই কাজের গুনাহ্ তাদেরই হবে যারা এই পরিবর্তনের কাজটা করল।

অসিয়ত বদলে দেয়ার কাজট যদি সঠিকভাবে জায়েয পন্থায় ও ন্যায়বাদের ভিত্তিতে হয়, তা হলে তার উপরই আয়াতের হুকুম প্রযোজ্য, আর অসিয়ত যদি জুলুমমূলক হয়, তা হলে তা বদলে দেয়া অবশ্য কর্তব্য হবে। তাকে ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ

غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ –

অসিয়ত কারোর জন্যে ক্ষতিকর হবে না, এটাই আল্লাহ্‌র উপদেশ।

তা হলে অসিয়ত কার্যকর করা হবে যদি তা ন্যায়নীতিভিত্তিক হয়, জুলুমমূলক না হয়। আল্লাহ সে কথা এরই পরবর্তী আয়াতে বলে দিয়েছেন।

## সাক্ষী ও অসী যখন জানবে যে, অসিয়তে জুলুম রয়েছে ঃ

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ –

অবশ্য কারোর যদি এই আশংকা বোধ হয় যে, অসিয়তকারী জ্ঞাতসারে কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে অবিচার করেছে বা কারো হক নষ্ট করেছে, তখন যদি সে সংশিষ্ট ব্যক্তিদের পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা ও ব্যাপারটির সংশোধন করে দেয়, তবে তার কোন দোষ হবে না।

আবূ বকর বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ, ইবনে ইসহাক, হাসান ইবনে আবূ রুবাই, আবদুর রাযযাক সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, মামর কাতাদাহ থেকে উপরোক্ত আয়াত প্রসঙ্গে খবর জানিয়েছে যে, এ আয়াতে বলা হয়েছে—এমন এক ব্যক্তি বা অসিয়তকারীর কথা, সে অসিয়তে জুলুম ও পক্ষপাতিত্ব করেছে, তা হলে কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি তাতে পরিবর্তন সাধন করে ন্যায়পরতা ও প্রকৃত হক প্রতিষ্ঠিত করবে। আবূ জাফর আর-রাযী রুবাই ইবনে আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন الجنف। অর্থ ভুল এবং الاثم। অর্থ ইচ্ছা বা সংকল্প করে জুলুম বা অন্যায় করা। ইবনে আবূ নুজাইহ মুজাহিদ এবং ইবনে তায়ূস তাঁর পিতা থেকে উদ্ধৃত আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, এ আয়াতে সেই অসিয়তকারী সম্পর্কে বলা হয়েছে, যে তার পুত্রের পুত্রের জন্যে অসিয়ত করে তার বংশের সন্তানদের প্রতি লক্ষ্য রেখে।

আল-মুতামির ইবনে সুলায়মান তাঁর পিতা এবং তিনি আল-হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন, এ আয়াত সেই ব্যক্তি সম্পর্কে যে দূরবর্তী লোকদের জন্যে অসিয়ত করেছে কিন্তু নিকটবর্তী লোকদের জন্যে করেনি। বলেছেন, তার অসিয়তকে তিন ভাগে ভাগ করতে হবে। তার দুই ভাগ নিকটবর্তীদের জন্যে এবং এক-তৃতীয়াংশ দূরবর্তীদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।

তায়ূস থেকে বর্ণিত হয়েছে, আয়াতটি সেই ব্যক্তি পর্যায়ে, যে দূরবর্তীদের জন্যে অসিয়ত করে। বলেছেন, তাদের নিকট থেকে তা কেড়ে নিয়ে নিকটবর্তীদের দেয়া হবে। তবে দূরবর্তীদের মধ্যে কোন দরিদ্র ব্যক্তি থাকলে তাকে অবশ্যই দিতে হবে।

আবূ বকর বলেছেন, اَلْجَنَفُ। অর্থ, সত্য থেকে তার বিপরীত দিকে ঝুকে পড়া। আমরা রুবাই ইবনে আনাসের একথা উদ্ধৃত করেছি যে, তিনি বলেছেন ঃ الجنف। অর্থ الخطا। ভুল। তার অর্থ ভুলবশত সত্য থেকে তার বিপরীত দিকে ঝুঁকে পড়া। আর ইচ্ছা করে সত্য থেকে ভিন্ন দিকে ঝুঁকে পড়া হল الاثم। -এ এক সুদৃঢ় ও সুষ্ঠু ব্যাখ্যা। আল-হাসান এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন নিকটাত্মীয় থাকা সত্ত্বেও অনাত্মীয় নিঃসম্পর্ক লোকের জন্যে অসিয়ত করা বলে। এরূপ কাজই جنف এবং সত্য থেকে বিপরীত দিকে ঝুকে পড়া। কেননা তাঁর মতে অসিয়ত অংশ মীরাসের পায় না এমন লোকদের জন্যে হতে হবে। তায়ূস তার দুটি অর্থ করেছেন। একটি দূরবর্তীদের জন্যে অসিয়ত। তা হলে তা নিকটবর্তীদের দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। আর দ্বিতীয়—তার কন্যার পুত্রের জন্যে অসিয়ত করা তার কন্যার উদ্দেশ্যে। পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে অসিয়ত মনসূখ হয়ে গেছে। কাজেই 'যে লোক অসিয়তকারী থেকে কোন পক্ষপাতিত্ব কিংবা ইচ্ছামূলক গুনাহের ভয় পাবে' আল্লাহ্র এই কথাটি এর পূর্বে উল্লিখিত অসিয়তের মধ্যে সীমাবদ্ধ

হয়ে যাবে তা জরুরী নয়। কেননা এ একটা স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর কথা, স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্য। এটা দিয়েই কথা শুরু হয়েছে, বলা যেতে পারে পূর্ব কথার সাথে সম্পর্কিত নয়। সর্ব প্রকারের অসিয়তেই এ কথাটি প্রযোজ্য যদি তাতে ইনসাফ পরিপন্থী ও জুলুম কিছু থাকে, তা হলে তাকে ইনসাফ ও ন্যায়বিচারসম্পন্ন করতে হবে। অবশ্য এর মধ্যেই শামিল হয়ে গেছে সে অসিয়তও যা পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে করা পূর্বে ওয়াজিব ছিল। পূর্বে তা কার্যকর ছিল এখন নেই। এ আয়াত শামিল করেছেন তা ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকারের অসিয়তকে। তাই সব লোকের মধ্যে যে অসিয়তকারীর অসিয়তেই পরম সত্য থেকে ভিন্ন দিকে ঝোঁক ও জুলুমমুখী দেখতে পাওয়া যাবে বা তার ভয় হবে, তারই কর্তব্য হবে, তাকে ন্যায় ও ইনসাফের দিকে নিয়ে যাওয়া, কল্যাণের ব্যবস্থা করা। তা বিশেষভাবে শুধু সাক্ষী অসী ও শাসকেরই দায়িত্ব নয়। সব মানুষেরই দায়িত্ব। কেননা ব্যাপারটি আমর বিল মারুফ ও নিহী আনিল মুনকার পর্যায়ে গণ্য।

যদি বলা হয়, 'যে ভয় পাবে অসিয়তকারী থেকে পক্ষপাতিত্বের বা গুনাহের, সে তাদের পরস্পরের মধ্যে সংশোধন বা মীমাংসা করে দেবে' এই কথার তাৎপর্য কি? ভয় তো বলা হয় ভবিষ্যতে যে অঘটন ঘটার সম্ভাবনা বোধ করা হয়, তাকে। অতীতের ব্যাপারে ভয়ের কথা আসে না। এখানে তো অসিয়ত অতীতে ঘটে যাওয়া ব্যাপার?

জবাবে বলা যাবে, অসিয়তকারীর অবস্থা দেখে এ ধারণা প্রবল হওয়া সম্ভব যে, সে জুলুম করতে উদ্যত হয়েছে, ওয়ারিসকে সে বঞ্চিত করতে চাচ্ছে। কাজেই এই ভয় যাদের হবে, তাদেরই কর্তব্য হবে, তাকে সে জুলুম ও বঞ্চনা থেকে বিরত রাখা। তার দ্বারা ন্যায়পূর্ণ কাজ করানো। জুলুমের খারাপ পরিণতি সম্পর্কে তাকে ভীত করা অথবা অসিয়তকারী ও ওয়ারিসদের মধ্যে সুষ্ঠু মীমাংসা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা করা। কেউ কেউ خَافَ অর্থ করেছেন عَلِمَ জানতে পেরেছে—জানতে পেরেছে যে, তার অসিয়তের জুলুম ও বঞ্চনা রয়েছে। তা হলে তাকে ইনসাফের দিকে ফিরিয়ে নেয়া কর্তব্য হবে।

আল্লাহ বলেছেন ঃ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ 'তার উপর গুনাহ নেই, তা ন্যায়পরতা, সুবিচার ও কল্যাণের দিকে ফিরিয়ে দেয়া তার কর্তব্য' এ কথা তো বলেন নি। তাতে কোন সওয়াব পাওয়ার অধিকার হওয়ার কথাও বলা হয়নি। পরস্পর বিবাদমান লোকদের মধ্যে মীমাংসার পথ হচ্ছে, তাদের প্রত্যেককেই তার পাওনার একটা অংশ ত্যাগ করতে বলা। এরূপ অবস্থায় মীমাংসাকারীর মনে এই ধারণা প্রবল হয়ে উঠতে পারে যে, তা করা তার মনে জেগে উঠা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে কাজ করে। প্রকৃত অবস্থা জানতে পারা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। এই কারণে বিবদমানদের মধ্যে মীমাংসার কাজ করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কিছুটা সুবিধা দিয়েছেন। ধারণাকারীর ধারণা দূর করেছেন। কেননা তা হওয়া নিষিদ্ধ, এ কারণেই আল্লাহ বলেছেন ঃ 'তার কোন গুনাহ্‌ হবে না।' তাই এ অবস্থায় প্রযোজ্য এই ধরনের অন্যান্য কাজেও সওয়াব হওয়ার কথা তো আল্লাহ বলেই দিয়েছেন। বলেছেন ঃ

لَاخَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ

اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ - وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا -

লোকদের গোপন কান-পরামর্শের অনেকটিতেই কোন কল্যাণ নেই। তবে যারা কোন দান বা ভালো কাজ কিংবা লোকদের মধ্যে মীমাংসাকরণের উদ্দেশ্য তা করবে, তা করবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পাওয়া আশায়, তাদেরকে আমরা বিরাট সওয়াব দেব।

অসিয়তে জুলুম ও সত্য-পরিপন্থী কাজ করা কঠোর ভাষায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে কতিপয় হাদীসে। আবদুল বাকী ইবনে কানে, আহমদ ইবনুল হাসান, আবদুস সামাদ ইবনে হাসসান, সুফিয়ান সওরী ইকরামা ইবনে আব্বাস সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ

اَلْاِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ -

অসিয়তের মাধ্যমে কারোর ক্ষতি সাধন কবীরা গুনাহ।

পরে তিনি এ আয়াতাংশ পাঠ করেছেন ঃ

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا -

এসব হচ্ছে আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমা। এতএব তোমরা সে সীমা লঙ্ঘন করবে না।

আবদুল বাকী কাসিম ইবনে যাকারিয়া ও মুহাম্মাদ ইবনুল মাইস, আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ, উমর ইবনুল মুগীরা, দাউদ ইবনে আবূ হিন্দু ইকরামা—ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ 'অসিয়তে কারোর ক্ষতি করা কবীরা গুনাহর মধ্যে গণ্য'। আবদুল বাকী, তাহের ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ইসহাক আল-কাযী, ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন, আবদুর রাযযাক, মামর আশয়াস শহর ইবনে হাওশর, আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ سَبْعِيْنَ سَنَةً فَاِذَا اَوْصٰى خَافَ فِيْ وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ سَبْعِيْنَ سَنَةً فَيَعْدِلُ فِيْ وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ -

এক ব্যক্তি হয়ত সত্তর বৎসর ধরে জান্নাতী হওয়ার উপযোগী আমল করল কিন্তু জীবনশেষে সে যে অসিয়ত করল, তাতে সে ভয় পেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের আমল করে বসল। ফলে সে জান্নাতে না গিয়ে জাহান্নামে চলে গেল। অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি হয়ত জাহান্নামে যাওয়ার উপযোগী আমল করল জীবনে সত্তর বৎসর ধরে। কিন্তু সে

অসিয়ত করতে গিয়ে পরম ন্যায়পরতা অবলম্বন করল। ফলে সে উত্তম আমল করে জীবন শেষ করল এবং পরিণামে সে জান্নাতে চলে গেল।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, আবাদাতা ইবনে আবদুল্লাহ্‌, আবদুল সামাদ ইবনে আবদুল ওয়ারিস, নসর ইবনে আলী আল-হাদ্দানী, আল-আশয়াস ইবনে জাবির শহর ইবনে হাওশব সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ আবূ হুরায়রা আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْءَةَ لَيَعْمَلانِ بِطَاعَةِ اللّٰهِ سِتِّيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُ هُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِيْ الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ ثُمَّ قَرَاءَ عَلَىَّ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مِنْ هٰهُنَا مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِى بِهَا اَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ -

একজন পুরুষ ও একজন মেয়েলোক ষাট বৎসর ধরে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের কাজ করতে থাকল। পরে তাদের উভয়ের মৃত্যু উপস্থিত হল। তখন তারা অসিয়ত করতে গিয়ে লোকদের ক্ষতি সাধন করল। ফলে তাদের জন্যে জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেল। পরে আবূ হুরায়রার নিকট পাঠ করা হল কুরআনের আয়াত ঃ যে অসিয়ত করা হয় তা কিংবা যে ঋণ অ-পরিশোধিত রয়েছে, তা যথাযথ আদায়ের পরই (সম্পত্তি বণ্টন হবে); কিন্তু তাতে কোনরূপ ক্ষতি সাধন করা যাবে না।

এ আয়াতটি ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ এ অতীব বিরাট সাফল্য' পর্যন্ত পাঠ করা হল।

এ হাদীস এবং পূর্বোদ্ধ অপরাপর হাদীস প্রমাণ করছে যে, যে লোকই অসিয়তে অসিয়তকারীর কোন জুলুম বা অ-ইনসাফমূলক পদক্ষেপের কথা জানতে পারবে, তারই কর্তব্য হল, তাকে ন্যায়পরতা ও সুবিচারের দিকে ফিরিয়ে দেয়া—যদি তার পক্ষে তা করা সম্ভব হয়।

যদি প্রশ্ন তোলা হয়, আয়াতে بَيْنَهُمْ 'তাদের পরস্পরে' বলে কাদের পরস্পরের কথা বলা হয়েছে ?

জবাবে বলা যাবে, আল্লাহ যখন অসিয়তকারী উল্লেখ করেছেন, তখন সহজেই বোঝা যায় যে, এখানে অবশ্যই একজন আছে, যার জন্যে সে অসিয়ত করেছে। আর আছে ওয়ারিসান। এদের মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ্ব ও বিবাদ হতে পারে। উক্ত 'তাদের পরস্পরে' বাক্যাংশে তাদের কথাই বলা হয়েছে। কেননা আয়াতের সম্বোধন হচ্ছে তাদের পরস্পরে মীমাংসা করে দেয়ার প্রসঙ্গে।

কেউ কেউ বলেছেন, সম্বোধনের সূচনায় যে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের উল্লেখ হয়েছে 'তাদের পরস্পরে' বলে তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে। এ আয়াত এই তত্ত্ব জানিয়েছে যে, 'অসী', শাসক সরকার, উত্তরাধিকারী এবং অন্য যে-লোকই অসিয়তে

ভুলবশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন জুলুম বা অবিচারের প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে বলে জানতে পারবে, তার-ই কর্তব্য হল, তাকে সুবিচার ও ন্যায়পরতার দিকে ফিরেয়ে দেয়া। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'অসিয়তের কথা জানার পর যে লোক তা পরিবর্তন করবে' ন্যায়ভিত্তিক অসিয়ত প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, জুলুম ও অবিচারপূর্ণ অসিয়ত প্রসঙ্গে নয়। এ থেকে ইজতিহাদের মাধ্যমে রায় ঠিক করা এবং বিজয়ী প্রভাবশালী ধারণার ভিত্তিতে কাজ করা জায়েয বলে নিঃসন্দেহে জানা গেল। কেননা অন্যায়ের প্রতি ঝোঁক তো বিজয়ী ধারণার ভিত্তিতেই বুঝতে হবে। সেখানেই ভয় পাওয়ার প্রশ্ন। সংশ্লিষ্ট লোকদের মধ্যে সংশোধন ও মীমাংসা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ার অনুমতিও প্রমাণিত হচ্ছে। যদিও তাতে কিছুটা বাড়াবাড়ি বা সত্য থেকে কমতি সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সে কাজ করতে হবে সংশ্লিষ্ট লোকদের অনুমতিক্রমে।

## সিয়াম (রোযা) ফরয

আল্লাহ্‌র তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের প্রতি সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন তা ফরয করা ছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্যে এই আশায় যে, সম্ভবত তোমরা তাকওয়া সম্পন্ন হবে।

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতের দ্বারা আমাদের প্রতি সিয়াম ফরয করেছেন কেননা আল্লাহ্‌র কথা— كُتِبَ عَلَيْكُمْ 'তোমাদের উপর লিখে দেয়া হয়েছে'-এর অর্থ 'তোমাদের প্রতি ফরয করা হয়েছে।' যেমন তাঁর কথা ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ -

তোমাদের উপর সশস্ত্র যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, যদিও তা তোমাদের অপছন্দ।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا -

নামায মুমিনদের লিখিত সময় ভিত্তিতে।

অর্থাৎ সময়ের ভিত্তিতে নামায ফরয। اَلصِّيَامُ -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে اَلْاِمْسَاكُ বিরত রাখা। আল্লাহ বলেছেন ঃ

اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا -

আমি রহমানের জন্যে চুপ থাকার—কথা বলা থেকে বিরত থাকা—মানত করেছি। অতএব আজকের দিন আমি কোন মানুষের সাথে কখ্‌খনই কথা বলব না।

কথা বলা থেকে বিরত থাকাকে صَوْم শব্দ দিয়ে বোঝানো হয়েছে। অশ্বকে ঘাস খাওয়া থেকে বিরত রাখা হলে আরবী ভাষায় বলা হয় ঃ خَيْلٌ صِيَامٌ রোযা রাখা (বিরত থাকা) ঘোড়া। বলা হয় صَامَتِ الشَّمْسُ نِصْفُ النَّهَارِ 'অর্ধ দিবস কালে সূর্য রোযা রেখেছে।' অর্থাৎ চলা ও গতি থেকে থেমে রয়েছে। মূলত এ একটা হুকুম আর তার আভিধানিক অর্থেই এখানে বলা হল।

আর শরীয়াতের পরিভাষায় 'সিয়াম' হচ্ছে পানাহার ও অনুরূপ কার্য এবং স্ত্রীসঙ্গম থেকে রোযার দিনের বেলা বিরত থাকা। আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের নিয়তে বা ফরয হিসেবে।

এই শব্দটি অস্পষ্ট, ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। তার ব্যবহার কালে তার বিশ্লেষণ হওয়া আবশ্যক। কেননা এটা শরীয়াতের দেয়া নাম। এর এক সাথে কয়েকটি অর্থ হতে পারে। সে সব অর্থ অভিধানে উল্লেখ করা হয়েনি। তবে তা ফরয প্রমাণিত হওয়ার ও শরীয়াতের বিধান রূপে স্থিরকৃত হওয়ার পর তার প্রকৃত ব্যবহারিক অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে। তা হয়েছে স্বয়ং রাসূলে করীম (স)-এর توقيف নির্ধারণের মাধ্যমে। তিনি এই অর্থ নির্ধারণ করে উম্মতকে জানিয়ে দিয়েছেন।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ –

যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্যে।

—এর তিনটি অর্থ হতে পারে। তিনটিরই প্রত্যেকটি আগের কালের বিশেষজ্ঞদের নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছে।

আল-হাসান, শবী ও কাতাদাহ বলেছেন ঃ 'আমাদের পূর্বে যারা ছিল, তাদের প্রতিও ফরয করা হয়েছিল বলে খৃষ্টানদের বোঝানো হয়েছে।' তাদের প্রতি রমযান মাস কিংবা অনুরূপ সংখ্যক দিনসমূহে রোযা পালন ফরয ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা তা পরিবর্তন করে, ঘুরিয়ে দেয়, দিনের সংখ্যাও বাড়িয়ে দেয়। ইবনে আব্বাস, রুবাই ইবনে আনাস ও সূফী বলেছেন, আগে রোযা ছিল এক অন্ধকার থেকে আর এক অন্ধকার পর্যন্ত এবং ঘুমের পরে পানাহার ও সঙ্গম হালাল ছিল না। পরে তা মনসূখ হয়ে যায়।

অন্যরা বলেছেন, তার অর্থ আমাদের উপর কিছু দিনের রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তাদের উপরও কিছু দিনের রোযা ফরয করা হয়েছিল। দিনের সংখ্যা উভয় ক্ষেত্রে সমান, এমন কথা এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং তাতে কম-বেশি হওয়া অসঙ্গত নয়।

মুজাহিদ ও কাতাদাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'তোমাদের পূর্ববর্তী লোক' বলে আহলি কিতাব লোকদেরকে বুঝিয়েছেন। আবদুর রহমান ইবনে আবূ লাইলা হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, সিয়ামের উপর দিয়ে তিনটি অবস্থা

অতিবাহিত হয়েছে। নবী করীম (স) মদীনায় উপস্থিত হয়ে প্রথমে প্রত্যেক মাসের তিন দিনের রোযা চালু করেন। আর সেই সাথে চালু করেন আশুরার রোযা। পরে আল্লাহ তা'আলা নিজে كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ 'তোমাদের প্রতি সিয়াম ফরয করা হয়েছে' আয়াতটি নাযিল করেন। অতঃপর পূর্বোদ্ধৃত ইবনে আব্বাসের কথাটি উল্লেখ করেন।

আবূ বকর বলেছেন, 'যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল' আল্লাহ্‌র এ কথাটিতে দিনের সংখ্যা বোঝাবার মতো কিছু নেই। সিয়ামের পরিচিতি নিয়ম-কানুনও কিছু বলে দেয়া হয়নি, সময়ও নির্ধারণ করা হয়নি, শব্দ ছিল অস্পষ্ট। পূর্বের লোকদের রোযার সময়টা ও সংখ্যাটা যদি আমরা জানতে পারতাম, তাহলে তার মাধ্যমে আমরা আমাদের জন্যে ফরয করা রোযার নিয়ম-পরিচিতি জানতে পারতাম, ঘুমের পরে কোন্ কাজ নিষিদ্ধ তা-ও জানা যেত। ফলে আমাদের পূর্ববর্তীদের রোযার পরিচিতি জানবার জন্যে শব্দের বাহ্যিক অর্থ ব্যবহারের কোন উপায়ই আমাদের জন্যে ছিল না। তাই এর পরেই আল্লাহ বলেছেন ঃ أَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ 'গণ্য কতিপয় দিন।' কম সংখ্যক বা বেশি সংখ্যক দিন বোঝাবার জন্যে এরূপ বলা খুবই সঙ্গত। পরে আয়াতের ধারাবাহিকতায় যখন আল্লাহ বললেন ঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ - فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ -

রমযানের মাস, এ মাসেই কুরআন নাযিল হয়েছে গোটা মানবজাতির জন্যে হেদায়েত ও সত্য পথ প্রদর্শক সুস্পষ্ট উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণ এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী হিসেবে। অতএব তোমাদের মধ্যকার যে লোক এই মাস পাবে, সে যেন এই মাস ভরে সিয়াম পালন করে।

এ আয়াতে রোযার দিনের সংখ্যা ও সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং এই মাস কাল ধরে রোযা রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইবনে আবূ লাইলা থেকে এই তাৎপর্যেরই বর্ণনা পাওয়া গেছে। ইবনে আব্বাস ও আতার বর্ণনা এই পাওয়া গেছে যে, 'নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন'-এর তাৎপর্য হল প্রতি মাসে তিন দিনের রোযা। রমযান সংক্রান্ত এ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে তা-ই ছিল। পরে এ আয়াত দ্বারা তা মনসূখ হয়ে গেছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْعَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ -

রমযান মাসে তোমাদের কেউ রোগাক্রান্ত কিংবা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোই হবে তার সময়।

আবূ বকর বলেছেন, এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দৃষ্টিতে রোগী ও বিদেশ যাত্রীর পক্ষে রোযা ভঙ্গ করার অনুমতি রয়েছে। রোযা তার জন্যে ক্ষতির কারণ হোক, আর না-ই হোক। কিন্তু আমরা জানি, রোযা রাখা রোগীর জন্যে ক্ষতিকর না হলে তার জন্যে এই রুখসত নয়। তার জন্যে রোযা না রাখার অনুমতি নেই।

এই পর্যায়ে ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদ বলেছেন, রোগীর যদি চক্ষুর ব্যথা বৃদ্ধি পাওয়ার বা জ্বর তীব্র হয়ে উঠার ভয় হয়, তাহলে সে রোযা ভাঙ্গতে পারবে। পরে তা কাযা করবে। ইমাম মালিক তাঁর 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে বলেছেন ঃ 'রোযা যাকে কষ্ট দিচ্ছে সে ভাঙবে ও কাযা করবে। সেজন্যে কোন কাফফারা দিতে হবে না।' আমি যা শুনেছি তা হচ্ছে, কোন ব্যক্তি যদি রোগাক্রান্ত হয়, তাহলে এ অবস্থায় রোযা তার জন্যে খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ে। রোযা রাখলে কষ্ট বৃদ্ধি পায়। তাহলে তখন তার জন্যে রোযা না রাখার অনুমতি আছে, পরে সে তা কাযা করবে।

ইমাম মালিক ও অন্যান্য শরীয়াতবিদ বলেছেন, গর্ভধারী মহিলার পক্ষে রোযা রাখা যদি কষ্টকর হয়, তাহলে সে রোযা ভাঙবে, পরে কাযা করবে। তাঁদের মতে সে যে কোন রোগই হোক, তাতে রোযা ভাঙা জায়েয। ইমাম আওজায়ী বলেছেন, যে-কোন রোগে কেউ আক্রান্ত হলে, তার পক্ষে রোযা ভাঙ্গা হালাল, সাধ্য না হলে রোযা রাখবে না। কিন্তু যদি রোযা রাখার সাধ্য থাকে তা কষ্ট হলেও রোযা ভাঙ্গবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, রোগীর রোগ যদি স্পষ্টভাবে বৃদ্ধি পেয়ে যায়, তাহলে রোযা ভাঙ্গবে, সে বৃদ্ধি যদি সহ্য করা সম্ভব হয়, তা হলে রোযা ভাঙ্গবে না। তাহলে জানা গেল যে, রোগীর জন্যে রোযা ভাঙ্গার রুখসত নির্ভর করে রোযার দরুন রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার উপর। যদি ক্ষতির ভয় না হয়, তাহলে রোযা রাখাই তার কর্তব্য।

এ থেকে একথাও বোঝা যায় যে, রোগীর রোযা ভাঙ্গার রুখসত সম্পর্কিত হচ্ছে ক্ষতির আশংকার সাথে। আনাস ইবনে মালিক আল-কুশাইর নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلٰوةِ وَالصَّوْمَ وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ -

আল্লাহ তা'আলা দূরযাত্রীর উপর থেকে অর্ধেক নামায এবং রোযা সরিয়ে নিয়েছেন। গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়িনী মাতার উপর থেকেও রোযা সরিয়ে নিয়েছেন।

অথচ জানা আছে যে, এই শেষোক্ত গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়িনী মাতার রোযা না রাখার রুখসত তাদের নিজেদের কিংবা তাদের সন্তানদের ক্ষতির আশংকার উপর নির্ভরশীল। এ থেকে বোঝা গেল, এই ধরনের ব্যাপারে রোযা না রাখার জায়েয হওয়া ক্ষতির আশংকার সাথে সংশ্লিষ্ট। গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়িনী মাতা সুস্থ ও রোগহীনা হওয়া সত্ত্বেও শুধু ক্ষতির কারণেই রোযা না রাখা তাদের জন্যে মুবাহ।

আল্লাহ্ তা'আলা মুসাফির দূরযাত্রীর জন্যে রোযা ভাঙ্গা মুবাহ করেছেন। কিন্তু সফরের কোন সীমা অভিধানে নির্দিষ্ট নয়। তার কম দূরত্ব ও বেশি দূরত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য করা যায় না। অবস্থা যখন এই তখন ফিকাহবিদগণ যে সফরে রোযা ভাঙ্গা মুবাহ তার একটা পরিমাণ শরীয়াতে নির্দিষ্ট রয়েছে বলে মনে করেন। যদিও সে পরিমাণটা কত, তা নিয়ে মতপার্থক্য আছে। হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, তিন দিন তিন রাত্রির দূরত্বে

যাওয়াকে সফর বলা হয়। অন্যান্যরা বলেছেন, দুই দিনের দূরত্বের কথা। কিন্তু অভিধানে এই পরিমাণ নির্দিষ্ট নয়। কেননা সময় দিয়ে তার কম মাত্রা এমন নির্দিষ্ট করা যে, তার কম হলে সফর হবে না, সম্ভব নয়। কেননা তা মূলত অভ্যাস থেকে গৃহীত। আর অভ্যাস দ্বারা যা নির্দিষ্ট করা হয়, তার কম-সে কম মাত্রা নির্ধারণ করা যায় না।

বলা হয়েছে, 'সফর' আরবী শব্দের উৎপত্তি হয়েছে আরবদের এরূপ কথন থেকেঃ سَفَرَاتِ الْمَرْاَةُ عَنْ وَجْهِهَا 'মেয়েলোকটি তার মুখমণ্ডল উদ্ঘাটন করেছে, উন্মুক্ত করেছে।' বা সকাল বেলা যখন চুতর্দিক উজ্জ্বল হয়ে উঠে, তখন বলা হয়ঃ اَسْفَرَ الصُّبْحُ। 'প্রভাত বেলা উদ্ভাসিত হয়েছে।' বলা হয়ঃ سَفَرَتِ الرِّيْحُ السَّحَابَ 'বাতাস মেঘকে সরিয়ে নিয়েছে।' اَلْمُسْفِرَةُ। অর্থ, اَلْمُكْنَسَةُ। অনেখানি জায়গা জুড়ে থাকা। কেননা তা পৃথিবী থেকে মাটির ধূলি-কণা আবর্জনা সরিয়ে নিয়ে যায়। وَاَسْفَرَ وَجْهُهُ 'তার মুখমণ্ডল উম্মুক্ত করল' বলা হয় তা উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। আল্লাহ্র এই কথাটিও অনুরূপ অর্থ দেয়ঃ

وَجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ –

মুখমণ্ডলসমূহ আজকের দিনে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত।

এই প্রেক্ষিতে দূরবর্তী স্থানের লক্ষ্যে ঘর থেকে বাইরে যাওয়া ও সেই লক্ষ্যে চলতে থাকাকে 'সফর' নাম দেয়া হয়েছে। কেননা এই সফর ব্যপদেশেই মুসাফিরের চরিত্র ও আচার-আচরণ উদ্ঘাটিত হয়। বোঝা যায় তার প্রকৃত অবস্থা। আর জানাই আছে যে, যেমন বিশ্লেষণ করেছি সে দৃষ্টিতে 'সফর'-এর তাৎপর্য সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে বা একদিন দুদিনের মধ্যে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠতে পারে না। বরং সেজন্যে একটু লম্বা সময়ের প্রয়োজন, বেশী দূরত্বের যাত্রা হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় দূরযাত্রীর চরিত্র জানা যাবে না। এ দৃষ্টিতে সাধারণ অভ্যাসের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হলে আমরা জানতে পারি যে, নিকট দূরত্বকে 'সফর' নাম দেয়া যায় না, এই নাম দেয়া যায় দূরের দূরত্বকে।

তবে ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, তিনটি সফর-ই সঠিক। সেই সফর কয়টিতেই শরীয়তের বিধান প্রয়োগযোগ্য। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, তিন দিনের ও তার চাইতে কম দিনকে গণ্য করা যায় না এ জন্যে যে, তার উপর 'সফর' নাম প্রয়োগ করা হয়নি। তাতে তওকীফ-ও নেই, তার নির্ধারণেও ঐকমত্য হয়নি। নবী করীম (স) থেকে যে কয়টি হাদীস এ পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, তার দাবি হচ্ছে, শরীয়ত অনুমোদিত সফর হওয়ার তিন-কে গণ্য করতে হবে। এ পর্যায়ের একটি হাদীস ইবনে উমর বর্ণিত। নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি মুহরিম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া তিনদিনের সফর করতে নিষেধ করেছেন। আবূ সাঈদ খুদরী সূত্রে নবী করীম (স) থেকে হাদীস বর্ণনাকারিগণ পার্থক্যের সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের কতক বলেছেন, তিন দিন। কতক বলেছেন, দুই দিন। আবূ সাঈদ খুদরী সূত্রে নবী করীম (স)থেকে বর্ণিত হাদীসে এই ধরনের বিভিন্ন শব্দ এসেছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসেও এরূপ বিভিন্নতা রয়েছে। সুফিয়ান আজলান সাঈদ ইবনে আবূ সাঈদ আবূ হুরায়রা সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীসের ভাষা হল ঃ

لَاتُسَافِرُ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ اِلَّا وَمَعَهَا ذُوْ مُحْرَمٍ –

মেয়েলোক তিনদিনের ঊর্ধ্ব সময়ের সফর করবে না মহররম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া।

কাসীর ইবনে যায়দ সাঈদ ইবনে আবূ সাঈদ আল-মুকবেরী সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ الَاتَخْرُجِ امْرَأَةٌ مَسِيْرَةِ لَيْلَةٍ اِلَّا مَعَ ذِىْ مُحْرَمٍ –

হে মুমিন নারী সমাজ, কোন মেয়েলোক মুহররম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া এক রাত্রি পথের যাত্রায় বের হবে না।

এমনিভাবে আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসসমূহ মূলত একই হাদীস। বর্ণনাকারিগণ হাদীসের শব্দে পার্থক্য করেছেন। নবী করীম (স) বিভিন্ন অবস্থায় এরূপ বিভিন্ন কথা বলেছেন, তা প্রমাণিত নয়। তাই বেশী সময় বর্ণনাকারী হাদীসটি গ্রহণ করাই শ্রেয় ঃ আর তা হচ্ছে তিন। কেননা এই শব্দটির ব্যবহারে সকলের ঐকমত্য রয়েছে। তার কম সংখ্যায় মতপার্থক্য রয়েছে। বর্ণনাকারীদের এই বিভিন্নতা ও শব্দগত পার্থক্যের কারণে তা প্রমাণিত নয় বলেই মনে করতে হবে। আর ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীসসমূহেও পরস্পর পার্থক্য রয়েছে বটে, তবু তা প্রমাণিত। আর তাতে তিন-এরই উল্লেখ রয়েছে। আর আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রা বর্ণিত হাদীসসমূহ সে সবের বিভিন্নতা সত্ত্বেও প্রমাণিত মনে করলে তার অধিক মাত্রায় অবস্থাই পরস্পর বিরোধী প্রমাণিত হবে। ফলে তা গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। মনে হবে, এসব হাদীস বর্ণিত-ই হয়নি। এক্ষণে 'তিন' গণ্যকরণে আমাদের জন্যে শুধু ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীস কয়টিই থেকে যায়। তাতে পরস্পর বিরোধিতা নেই।

যদি বলা হয়, আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রা বর্ণিত হাদীসসমূহও পরস্পর বিরোধিতাশূন্য। তাই এ পর্যায়ে বর্ণিত সব কয়টি হাদীসকেই আমরা প্রমাণিত ও তওকীফ পর্যায়ের ধরব না কেন ? তাহলে আমরা বলতে পারি যে, মেয়ে লোক একদিন বা দুই দিনের কিংবা তিনি দিনের সফরেও যাবে না মুহররম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া ?

জবাবে বলা যাবে, যখন-ই বলা হবে ঃ তিন দিনের কম, তখনই 'তিন' কথাটি অর্থহীন হয়ে যাবে। তার বর্ণিত হওয়া ও না-হওয়া এমন পর্যায়ে পড়ে যাবে যে, 'তিন'-এর বর্ণনাকারী হাদীস অ-ব্যবহৃত হয়ে থাকবে। আর তা শুধু 'তিন'-এর কম' শব্দটি ব্যবহারের কারণে। আর 'তিন'-এর অংশ ব্যবহার ও অপর অংশের নিরর্থকতা ছাড়া যখন কিছুই নেই, তখন তিন-এর হাদীস ব্যবহার করাই উত্তম। কেননা এটি বেশি মাত্রার দিন। উপরন্তু 'তিন' ব্যবহার করা সম্ভব একদিন বা দুই দিন বর্ণনাকারী হাদীসে ফায়দা প্রমাণ সহকারে। আর তা এভাবে যে, যখন 'তিন'-এর সফরের ইচ্ছা করবে, তখন একদিন বা দুইদিন সে 'তিন' থেকে বাইরে পড়বে না। তা- ও মুহররম পুরুষসহই সম্পন্ন হবে। কেউ হয়ত ধারণা করতে পারে যে, 'তিন' যখন সীমা হিসেবে নির্ধারিত হল, তখন এক বা দুই দিনের সফর মুহররম সঙ্গী ছাড়াই করা যেতে পারে। যদি তিন দিনের

সফরের ইচ্ছা করে, আর তা মুহররম ছাড়াই করা নিষিদ্ধ, তখন তার কম সময়ের সফর তো অবশ্যই নিষিদ্ধ হবে, যখনই তার ইচ্ছা করা হবে।

মুহররম ছাড়া সফরে বের হওয়া নিষেধের ব্যাপারে 'তিন' যখন নির্ধারিত হল, তখন এই তিন দিনের দূরত্বের সফরে বের হলে রমযানের রোযা না রাখা মুবাহ পর্যায়ে অবশ্যই গণ্য হবে। তার দুটি কারণ। একটি মেয়েলোকের ঘরের বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে যখন তিন গণ্য করা হয়েছে, তখন এই তিন রোযা না রাখার ক্ষেত্রেও অবশ্যই গণ্য হবে। আর একদিন বা দুই দিনের যে পরিমাণের কথা বলা হয়েছে, রোযা না-রাখার ক্ষেত্রেও সেই পরিমাণ গণ্য হবে। আর দ্বিতীয় কারণ—তিন-এর সাথে শরীয়াতের হুকুম জড়িত, তার কমের সাথে জড়িত নয়। ফলে এই তিন-এর সাথে সংশ্লিষ্ট হুকুম। তার কম-এর সাথে কোন হুকুম সংশ্লিষ্ট নয়। ফলে দিনের একটি ঘণ্টা কালের জন্যে বের হওয়ার পর্যায়ে পড়ে গেল। নিজ বাড়িতে উপস্থিত ব্যক্তির জন্যে এক দিন এক রাত্রি সময় কাল ধরে মোজার উপর মসেহ্ রাখার রুখসত দান নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত। আর মুসাফিরের জন্যে তিন দিন ও তার রাতগুলোর সময় পর্যন্ত। আর এ কথা জানা যে, তা সব মুসাফিরের জন্যে শরীয়াতের হুকুম বর্ণনার ক্ষেত্রে এসেছে। কেননা যে কোন বিষয়ের বর্ণনার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ তার হুকুম সবকেই পরিব্যাপ্ত হবে এটাই স্বাভাবিক। পরিমাণ সংক্রান্ত বিশ্লেষণের এটাই দাবি। এ প্রেক্ষিতে মুসাফির সে-ই, যার সফর তিন দিনের জন্যে হবে। তিন দিনের কম মেয়াদের সফর যদি শরীয়াতে গণ্য হয়, তা হলে অন্যান্য মুসাফিরের অবস্থা এই হবে যে, তাদের জন্যে কোন হুকুম বলা হয়নি। আর কোন প্রকাশনার দাবির সব কিছুকে আয়ত্তাধীন করে না ব্যবহৃত শব্দ। তা প্রকাশের আওয়াতার বাইরে ঠেলে দেয়।

অন্য দিক দিয়ে কথা হচ্ছে, 'মুসাফির' একটা সাধারণ নাম। তার উপর 'আলিফ' ও 'লাম' ব্যবহৃত হওয়ার কারণে। অতএব সব ধরনের মুসাফির-এর জন্যেই এই হুকুম প্রযোজ্য। তার বাইরে পড়লে সে মুসাফির গণ্যই হবে না। তার সফর সম্পর্কে শরীয়াতের কোন হুকুম ধার্য নয়। আর এই কথায় সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে এ কথার যে, যে সফরের সাথে শরীয়াতের হুকুম সম্পর্কিত, তা হচ্ছে তিন-এর সফর। তার কম-এর সফর হলে তার সাথে রোযা না-থাকা সংক্রান্ত কোন হুকুমের সম্পর্ক নেই। তাতে নামাযের কসর-ও করা যাবে না।

অপর দিক দিয়ে বলতে হয়, এই ধরনের পরিমাণ নির্ধারণ নিছক 'কিয়াস'-এর ভিত্তিতে করা সম্ভব হয় না। তা প্রমাণের একটি মাত্র উপায় হচ্ছে ঐকমত্য ও তওকীফ—রাসূল কর্তৃক নির্ধারণ। কিন্তু তিন দিন-এর কমে কোন ঐকমত্য বা তওকীফ নেই। তাই তিন-এর উপর স্থিতি গ্রহণই সমীচীন। সে ব্যাপারে ঐকমত্য আছে যে, এই সময়ের সফরে রোযা না-রাখা জায়েয। তা ছাড়া রোযা ফরয হওয়াটাই মূল ভিত্তি। রোযা ভাঙ্গার রুখসতের মেয়াদ সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। কাজেই মতপার্থক্য হলে ফরয ছেড়ে দেয়া কখনই জায়েয হতে পারে না। হ্যাঁ, যদি সে বিষয়ে 'ইজমা' অনুষ্ঠিত হয়, তা হলে ভিন্ন কথা। আর সে 'ইজমা' হয়েছে তিন-এর উপর। কেননা ফরয কাজে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন একান্তই জরুরী।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিন দিনের কমের সফরে রোযা ভাঙ্গা যায় না। এ পর্যায়ে আল্লাহ্র কথা হচ্ছে ঃ

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ –

আর যারা রোযা রাখতে সমর্থ হয়েও (রাখবে না), তারা যেন মিসকীনকে খাবার দিয়ে তার 'ফিদিয়া' (বিনিময়) আদায় করে।

আগের কালে ফিকাহবিদগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মত দিয়েছেন। আল-মসউদী আমর ইবনে মুররা আবদুর রহমান ইবনে আবূ লাইলা মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ সিয়াম তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। পরে আল্লাহ 'তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে' নাযিল করেছেন। এর শেষ কথাটাই হয়েছে ঃ 'যারা তা রাখতে সমর্থ হয়েও (রাখবে না), তারা মিসকীনের খাবার দিয়ে তার বিনিময় দেবে।' ফলে, হুকুমটা এরূপ দাঁড়াল যে, যার ইচ্ছা সে রোযা রাখবে আর যার ইচ্ছা সে রোযা ভাঙ্গবে ও মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে। তা-ই তার জন্যে যথেষ্ট হবে। পরে আল্লাহ এ আয়াতটি নাযিল করেন ঃ "রমযান মাস। এই মাসেই কুরআন নাযিল হয়েছে"; আর এর শেষে রয়েছে ঃ 'যে এই মাসটি দেখতে পাবে, সে যেন এ মাসের রোযা রাখে।' এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ রোযাকে নিজ ঘরে উপস্থিত সুস্থ ব্যক্তি উপর কার্যকর করে রাখলেন এবং রোগী ও মুসাফিরের জন্যে না রাখার রুখসত দিলেন। আর যে বেশি বয়সের লোক রোযা রাখার ক্ষমতা রাখে না, তার পক্ষ থেকে মিসকীনকে খাবার দেয়ার ব্যবস্থা করলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ইবনে উমর ইবনে আব্বাস (রা) সালমা ইবনুল আকওয়া, আল কামা, জুহরী ও ইকরামা থেকে 'যারা সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও রোযা রাখবে না, তারা মিসকীনের খাবার ফিদিয়া দেবে' আয়াত পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, পূর্বব্যবস্থা এই ছিল যে, যার ইচ্ছা রোযা রাখবে, যার ইচ্ছা ভাঙ্গবে। তবে সে ফিদিয়া দেবে প্রতিদিন একজন মিসকীনের খাবার। পরে নাযিল হল ঃ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ –

যে এই মাস পাবে, সে যেন সে মাসের রোযা রাখে।

এ পর্যায়ে আরও বর্ণনা রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে মূসা ইসরাইল আবূ ইসহাক হরস আলী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ

مَنْ اَتَى عَلَيْهِ رَمَضَانُ وَهُوَ مَرِيْضٌ اَوْمُسَافِرٌ فَلْيَفْطِرْ وَلِيُطْعِمْ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا صَاعًا –

যার নিকট রমযান মাস আসবে এ অবস্থায় যে, সে রোগাক্রান্ত কিংবা মুসাফির, সে যেন রোযা না রাখে; বরং সে যেন প্রত্যেক দিন এক সা' পরিমাণ খাবার মিসকীনকে দেয়।

এই কথাটিই কুরআনে বলা হয়েছে ঃ যারা তা পারে না, তাদের উপর একজন মিসকীনের খাবার ফিদিয়া স্বরূপ দেয়া কর্তব্য।

এর আর একটি দিক হল, মনসুর মুজাহিদ ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এ আয়াত وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطَيَّقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ পাঠ করছিলেন। বললেন, একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি, যে পূর্বে যুবক থাকা কালে রোযা রাখতে সমর্থ ছিল, এক্ষণে তাকে বার্ধক্য পেয়েছে, এখন দুর্বলতার কারণে রোযা রাখতে পারছে না, খাবার না খেয়ে থাকতে পারছে না, সে বাধ্য হয়ে রোযা ভাঙ্গছে। সে প্রত্যেক দিন একজন মিসকীনকে এক অর্ধ সা' পরিমাণ খাবার দেবে। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা)-ও এ আয়াত পড়েছিলেন। খালিদুর হাযা ইকরামা সম্পর্কে বর্ণনা করেছে যে, তিনিও এ আয়াত পড়ছিলেন। সকলেই বলেছেন, এ আয়াতটি মনসূখ হয়ে যায়নি।

হাজ্জাজ আবূ ইসহাক-হারস-আলী সূত্রে এ আয়াত বর্ণনা করেছেন যে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সম্পর্কে এ আয়াত এসেছে।

আবূ বকর বলেছেন, সাহাবী ও তাবেঈনের এক সংখ্যক লোক যারা সংখ্যায় অনেক বেশি—বলেছেন ঃ শুরুতে রোযা ফরয হয় ইখতিয়ারী ভাবে সামর্থ্য অনুযায়ী, রোযা রাখা বা ফিদিয়া দেয়ার ইখতিয়ার ছিল। পরে তা সামর্থ্যবানদের ক্ষেত্রে মনসূখ হয়ে যায় এ আয়াত দ্বারা ঃ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ –

যে লোক এ মাস পাবে সে যেন সে মাসের রোযা রাখে।

অপর লোকেরাও বলেছেন, উক্ত আয়াত মনসূখ হয়ে যায়নি, বরং তা রোগী ও মুসাফির-এর বেলায় পুরাপুরি কার্যকর আছে। তারা রোযা ভাঙ্গবে, তবে কাযা করবে, তাদের সেজন্যে 'ফিদিয়া'ও দিতে হবে, কাযাও করতে হবে। ইবনে আব্বাস, আয়েশা (রা), ইকরামা ও সায়ীদুবনুল মুসাইয়্যিবও এ আয়াত পাঠ করতেন। এ আয়াতের শব্দসমূহ কয়েকটি অর্থ দেয়। তার কয়েকটি ইবনে আব্বাস বলেছেন। এ আয়াতে বলা হয়েছে, যারা রোযা রাখতে সমর্থ ছিল, পরে বৃদ্ধ হওয়ার কারণে রোযা রাখতে অক্ষম হয়ে পড়েছে, তাদের উচিত বিনিময়ে মিসকীনকে খাদ্যদান। অপর অর্থ হচ্ছে, তারা রোযা রাখতে পারে খুবই কষ্ট সহকারে, এক্ষণে খুবই কঠিন হওয়ার দরুন রাখতে পারছে না, তাই তাদের কর্তব্য খাবার খাওয়ানো। অপর অর্থ, তারা রোযা রাখতে সামর্থ্যবান না হওয়া সত্ত্বেও তাদের উপর তার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তাই না রাখার দরুন রোযা রাখার দায়িত্বের স্থলাভিষিক্ত হবে 'ফিদিয়া' দান। লক্ষণীয়, পানি দ্বারা 'তাহারাত' অর্জনেরই হুকুম দেয়া হয়েছে যে তায়াম্মুম করছে, তার উপরও। কিন্তু পানি না পাওয়ার বা ব্যবহার করতে না পারার দরুন মাটি সে পানির স্থলাভিষিক্ত হবে। অন্যাথায় তায়াম্মুম অযূর বদল হতে পারে না। নামায পড়ার দায়িত্ব নিদ্রামগ্ন ও ভুলে যাওয়া ব্যক্তির উপরও অর্পিত।

কাযা করে তারা সে দায়িত্ব পালন করবে। তরক করেছে বলে তা জরুরী, সে হিসেবে নয়। রোযা রাখতে অক্ষমতা ও কাযা করতে পারবে তার আশা না থাকায় আল্লাহ্ ফিদিয়া ওয়াজিব করে দিয়েছেন। এটাও আল্লাহ্‌র নিকট থেকেই অর্পিত দায়িত্ব। কেননা 'ফিদিয়া' অন্যের স্থানে দাঁড়িয়ে গেছে। এখানে দুই ধরনের পাঠ ব্যবহৃত রয়েছে। তবে উত্তম পাঠ এটিই ঃ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ এটি অবশ্যই মনসূখ হয়ে গেছে বলে ধরতে হবে। সাহাবিগণ থেকে আমরা যেসব বর্ণনা উদ্ধৃত করেছি, তার ভিত্তিতেই কথা। তাঁরা রোযা ফরয হওয়ার ধারণাটাও বর্ণনা করেছেন, বলেছেন শুরুতে তা কিভাবে ছিল। তাদের মধ্যে রোযা রাখতে সক্ষম লোকের ইখতিয়ার ছিল রোযা রাখার ও না-রাখার—না রাখায় ফিদিয়া দেয়া ফরয ছিল। এটা কোন 'রায়' দেয়ার ব্যাপার নয়। কেননা তা সেই অবস্থার বর্ণনা যা তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং জেনেছেন যে, তা নবী করীম (স) কর্তৃক তাদের জন্যে 'তওকীফ' সম্বোধনের বক্তব্যে উজ্জ্বলতর প্রমাণ রয়েছে এ বিষয়ের যে, আমাদের নিকট আগের লোকদের থেকে কোন বর্ণনা যদি না-ও থাকত, তবু তার তাৎপর্য অনুধাবনের জন্যে যথেষ্ট হতো। আর তা হচ্ছে ঃ

وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ -

যে লোক রোগী বা মুসাফির হবে, তার রোযা রাখার সময় হবে অন্য দিনসমূহ।

এ আয়াতে শুরুতেই রোগী ও মসাফিরের কথা বলা হয়েছে এবং তাদের জন্যে কাযা করা ফরয করেছেন যদি তারা রোযা না রাখে। এর পরে বলেছেন ঃ

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ -

যারা সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও রোযা রাখবে না, তাদের কর্তব্য একজন মিস্‌কীনের খাবার ফিদিয়া দেয়া।

কাজেই এ আয়াতে রোগী ও মুসাফিরের কথা বলা হয়েছে—এ কথা মনে করা সঙ্গত নয়। কেননা এদের সম্পর্কে পূর্বোদ্ধৃত আয়াতে এদের উল্লেখ সহকারে কথা বলে দেয়া হয়েছে, তাদের কর্তব্য জানিয়ে দেয়া হয়েছে নাম উল্লেখসহ। এরপর আবার ইঙ্গিতে তাদের সম্পর্কে কোন কথা বলা হয়েছে মনে করা সঙ্গত হতে পারে না। কেননা আরবী নিয়মে عطف স্থলে পরেরটা পূর্বেরটা থেকে ভিন্নতর কিছু হতে হবে। কোন জিনিস নিজের থেকেই عطف হতে পারে না। এখানে বক্তব্য হচ্ছে সে সব নিজ বাড়িতে উপস্থিত ও রোযা রাখতে সামর্থ্যবান লোকদের সম্পর্কে। এ আয়াতে বলা হয়েছে সেই রোগী সম্পর্কে, যে রোযার ক্ষতির ভয় পায়। কাজেই তাদের রোযা রাখার সামর্থ্য আছে একথা মনে করা যায় কিভাবে? তাকে না-রাখার রুখসত দেয়া হয়েছে সামর্থ্য না থাকার দরুন, ক্ষতির ভয়ের কারণে। কথার ধারাবাহিকতায় পরে যে আয়াত এসেছে, তা থেকেও তা-ই বোঝা যায়। তা হচ্ছে ঃ

وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ -

রোযা তোমরা রাখবে, তা-ই তোমাদের জন্যে কল্যাণময়।

কিন্তু যে রোগী রোযা রাখলে নিজের ক্ষতি হওয়ার ভয়ে ভীত, রোযা তার জন্যে কল্যাণময় হতে পারে না। বরং এই অবস্থায়ই তাকে রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। এ-ও বোঝা যায় যে, রোগী ও মুসাফিরকে ফিদিয়া দিতে বলা হয়নি। এ দুজনের ফিদিয়া দেয়া কর্তব্য নয়। ফিদিয়া তাকে বলা হয় যা অন্যের স্থানে দাঁড়ায়। রোগী ও মুসাফিরের জন্যে তো রোযা কাযা করার হুকুম রয়েছে। 'কাযা'ই মূল ফরযের স্থলাভিষিক্ত। এক্ষেত্রে খাবার দেয়া ফিদিয়া নয়। এ থেকে এ কথাও বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যারা তা করতে সক্ষম তাদের একজন মিসকীনের খাবার ফিদিয়া দেয়া কর্তব্য বলে রোগী ও মুসাফিরকে ফিদিয়া দিতে বলা হয়নি। তাদের বেলায় এ আয়াত মনসূখ—যেমন পূর্বে বলেছি। এ আয়াত বোঝায় যে, রোযা রাখাই আসল ফরয। তাকে ফিদিয়ায় পরিণত করা রোযার বদল হিসেবে মাত্র। কেননা ফিদিয়া তো তা-ই, যা অন্য কিছুর স্থলাভিষিক্ত হয়। খাবার খাওয়ানো মূলতই যদি ফরয হতো রোযা মতো ইখতিয়ার হিসেবে, তা হলে তার বদলে কিছু হতো না। যেমন কসমের কাফফারায় তিনটি জিনিসের মধ্যে যে-কোন একটি দ্বারা কাফফারা—তা অন্য কিছুর বদল হয় না। ফিদিয়াও হয় না অপর কিছুর বদল। যাঁরা বলেছেন, এ আয়াতে বয়োবৃদ্ধদের সম্পর্কে বলা হয়েছে তাঁদের কথা গ্রহণ করা হলে আয়াতটি মনসূখ মনে করতে হয় না। কিন্তু একটি সর্বনাম ضَمِير উহ্য ধরে নিতে হয়। তা হলে অর্থ দাঁড়ায় ঃ

> আর সেই সব লোকের উপর যারা পূর্বে তা পালন করতে সক্ষম ছিল এক্ষণে বার্ধক্য ও সেই সাথে কাযা করতে পারবে এই আশা না থাকার কারণে তা রাখতে অক্ষম হয়ে গেছে ...

কিন্তু এরূপ করা জায়েয নয়। তবে দুভাবে তা হতে পারে। হয় এ বিষয়ে সকলেই একমত হতে হবে অথবা توقيف এর মাধ্যমে তা করা হবে। কিন্তু এরূপ অর্থ করতে গেলে ব্যবহৃত শব্দের প্রকৃত অর্থকে অস্বীকার করতে হয়। বাহ্যত এখানে এমন কিছু নেই, যা তা বোঝাতে পারে। সেই সাথে এ কথাটির মূল ফায়দাটাই নষ্ট হয়ে যায়। কেননা ফরয বাধ্যতামূলক হওয়ার পর যারা তা পালন করতে সক্ষম ছিল আর যাদের উপর রোযা রাখা পরে ফরয হয়েছে এক্ষণে বার্ধক্যের কারণে অক্ষম হয়ে পড়েছে, এদের সকলের জন্যে অভিন্ন হুকুম হয়ে দাঁড়ায়। আর তার অর্থ এরূপ হয়ে পড়ে যে, বয়োবৃদ্ধ রোযা রাখতে অক্ষম—কাযা করতে পারার আশা নেই, তাদেরকে ফিদিয়া দেয়া কর্তব্য। এতে وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ আয়াতটির মূল ফায়দাটাই বিনষ্ট হয়ে যায়। কেননা পরে সামর্থ্য না থাকার কোন ফায়দা বা তাৎপর্য এরূপ অর্থ করণে থাকে না।

যারা يُطِيْقُوْنَهٗ কে يُطَوَّقُوْنَهٗ পড়েছেন, তাদের পাঠ অনুযায়ী বৃদ্ধ—কাযা-নিরাশ লোকের জন্যেই ফিদিয়া দেয়া কর্তব্য হয়ে পড়ে। কেননা يُطَوَّقُوْنَهٗ এর অর্থ হয়, তাদের উপর রোযা রাখার দায়িত্ব অর্পিত; তা করতে কঠিন কঠোর কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও। তাদের জন্যেই ফিদিয়া রোযার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। এরূপ পাঠের অর্থ যদি আমরা যেমন বলেছি তেমনই হয়, তাহলে তা মনসূখ হয়নি বুঝতে হবে, বরং তা পুরাপুরি চালু

ও প্রতিষ্ঠিত এবং কার্যকর। কেননা তার অর্থে শুধু সেই লোকদের বোঝাবে যারা বয়োবৃদ্ধ, কাযা করতেও অক্ষম। আর তাদের জন্যেই ফিদিয়া দেয়ার হুকুম হয়েছে।

## 'শায়খুলফানী'—থুরথুরে বুড়ো সম্পর্কিত আলোচনা

ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ ও জুফর বলেছেন, শায়খুল কবীর হচ্ছে সেই থুরতুরে বুড়ো, যে রোযা রাখতে সক্ষম নয় বলে রোযা ভাঙ্গতে পারে এবং তার পক্ষ থেকে প্রতিদিন অর্ধ সা' গম বা আটা খাবার দেয়া হবে, এ ছাড়া তার উপর অন্য কিছুর দায়িত্ব নেই।

সওরী বলেছেন, হ্যাঁ খাওয়াবে, তবে তার পরিমাণের উল্লেখ নেই। মুজানী ইমাম শাফেয়ীর মত বর্ণনা করেছেন, প্রত্যেক রোযার দিনের বদলে এক 'মুদ্দ'[১] পরিমাণ খাবার দিতে হবে। রবী'আতা মালিক বলেছেন, আমি খাওয়াবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। তবে খাওয়ালে ভাল।

আবূ বকর বলেছেন, আয়াতটির ব্যাখ্যায় আমরা ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনার উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি। তাঁর পাঠ অনুযায়ী আয়াতটির রূপ হচ্ছে ঃ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطَوَّقُوْنَهُ এবং এতে বয়োবৃদ্ধ লোক সম্পর্কে বলা হয়েছে। আয়াতে যদি এরূপ ব্যাখ্যার অবকাশ না থাকত, তাহলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সেরূপ কখনই দিতেন না। তাঁর থেকে এই ব্যাখ্যার বর্ণনা যাঁরা করেছেন, তাঁরাও তাঁর বর্ণনা চালাতেন না। তাই এ আয়াত অনুযায়ী কেবলমাত্র বয়োবৃদ্ধ বা থুরথুরে বুড়োর পক্ষেই রোযা না রেখে ফিদিয়া দেয়ার আদেশ হয়েছে মনে করতে হবে। হযরত আলী (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। তিনিও এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সেই থুরথুরে বুড়োর কথাই বলেছেন। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا -

যে-লোক মরে গেছে এ অবস্থায় যে তার উপর রোযা না-রাখার বোঝা রয়েছে, তার অভিভাবক যেন তার পক্ষ থেকে প্রত্যেক দিনের হিসেবে একজন করে মিসকীন খাওয়ায় (এটা তার কর্তব্য)।

মৃতের উপর রোযার দায়িত্ব থাকলেই যদি তাই করতে হয়, তাহলে থুরথুরে বুড়োর পক্ষ থেকে তো অবশ্যই করতে হবে। কেননা এ ধরনের বুড়োরা তো রোযা রাখতেই পারে না।

যদি প্রশ্ন করা হয়, বুড়ো কেন তার মত হবে না, যে রোগী হওয়ার কারণে রমযান মাসে রোযা রাখতে পারেনি ? পরে সে ভালো হয়নি, মরে গেছে, কাযাও তার উপর বর্তে নি ?

১. A half bushel —আট গ্যালন পাত্রে যত ধরে তার অর্ধেক।

জবাবে তাকে বলা হবে, রোগীকে তো অন্য সময় বাদ পড়ে যাওয়া রোযাগুলো কাযা করতে হবে, রোগীর জন্যে রোযা ফরযের সময় নির্দিষ্ট হয়েছে এই বলে ঃ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ 'তার রোযা রাখার সময় অন্য দিনগুলোতে।' তাই সেই 'অন্য সময়' না আসা পর্যন্ত রোগীর কিছুই করণীয় নেই। সেই সময়টাই যখন আসেনি, তার উপর কোন কর্তব্যও চাপে নি। যেমন যে লোক রমযান মাস পায়নি। কিন্তু থুরথুরে বুড়ো অন্য সময় কাযা করবে, সে আশা তো আর নেই। তাই তার প্রতি তাৎক্ষণিকভাবে ফিদিয়া দেয়ার কর্তব্যটাই বাধ্যতামূলক হবে। এ কারণেই তো ফিকাহবিদদের মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে।

থুরথুরে বুড়ো সম্পর্কে আগের কালের ফিকাহবিদদের কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তার উপর তাৎক্ষণিকভাবে ফিদিয়া দেয়া ওয়াজিব হওয়ার কথাও বলেছি। এ পর্যায়ে কারো কোন ভিন্ন মত পাওয়া যায় নি। ফলে সে মতটির উপর ইজমা হয়েছে, বলতে হবে, যে বিষয়ে কারোর কোন ভিন্ন মত পাওয়া যায়নি।

ফিদিয়ার পরিমাণ বলা হয়েছে অর্ধ সা' গম। তা হাদীস থেকে জানা গেছে। আবদুল বাকী ইবনে কানে আখু খাত্তাব, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদুল মুসতামলী-ইসহাকুল আজরাক, শরীক, আবূ লায়লা, নাফে, ইবনে উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ فَلَمْ يَقْضِهِ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ نِصْفُ صَاعٍ لِمِسْكِيْنٍ -

যে লোক মরে গেল রমযানের রোযা না রেখে, সে কাযাও করেনি, তার পক্ষ থেকে যেন প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে অর্ধ সা' খাবার খাওয়ায়।

রমযান মাসে রোযা ভেঙ্গে যে মরে গেছে, তার জন্যে ফিদিয়া দেয়া প্রমাণিত হল, থুরথরে বুড়োর জন্যেও তাই প্রমাণিত হবে। তার কয়েকটি কারণ রয়েছে। একটি—কথাটি থুরথুরে বুড়ো ও অন্যান্যদের জন্যে সাধারণ ও সমানভাবে সকলের জন্যে প্রযোজ্য। কেননা বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির উপরও রোযা অভিন্নভাবে ফরয, ফলে তার মৃত্যুর পর বলা যেতে পারে যে, সে রোযা না রেখেই মরে গেছে। শব্দের নির্বিশেষ অর্থ তাকেও শামিল করে। আর অপর দিক দিয়ে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, আয়াতে যে ফিদিয়ার কথা বলা হয়েছে, তাতে এই পরিমাণই বুঝিয়েছে। সে ফিদিয়া এই বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষ থেকেই দিতে হবে। কাজেই তার উপর এই পরিমাণ ধার্য হওয়া আবশ্যক। অতপর একটি দিক থেকে যে রোযা কাযা না করে মরে গেছে, তার বেলায় যখন তা প্রমাণিত হয়েছে, বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির ফিদিয়ার পরিমাণও তাই হওয়া আবশ্যক। কেননা বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির উপর ফিদিয়া ওয়াজিব হওয়ার দুটি কারণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ইবনে আব্বাস, জাহিলিয়াতের যুগে রাসূলে করীমের শরীক কায়স ইবনুস সায়েব, আয়েশা, আবূ হুরায়রা (রা) ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি সম্পর্কে এই কথা বর্ণিত

হয়েছে যে, প্রত্যেকটি দিনের রোযার বদলে অর্ধ সা' গম (সমপরিমাণ যে-কোন খাদ্য) দেবে। নবী করীম (স) কা'ব ইবনে উজরাতার প্রতি ছয়জন মিসকীনকে—প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধ সা' গম দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, রোযার ফিদিয়া হিসেবে 'মুদ্দ'-এর পরিবর্তে অর্ধ সা' পরিমাণ নির্ধারণ করাই উত্তম। কেননা এখানে মৌলিকভাবে ইখতিয়ার রয়েছে রোযা রাখা ও ফিদিয়া দেয়ার মধ্যে যে-কোন একটি করার। ইবনে উমর ও তাবেয়ীনের এক জামা'আত থেকে প্রতিদিনের জন্যে এক 'মুদ্দ' পরিমাণ দেয়া উত্তম বলে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু পূর্বেরটাই অধিক গ্রহণযোগ্য। কেননা, তা রাসূলে করীম (স) এবং অধিক সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ীন থেকে বর্ণিত। চিন্তা-বিচেনা করলেও তা-ই বোঝা যায়। আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ এর শেষে লাগানো ه সর্বনাম কিসের ইঙ্গিত করছে, সে বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। কিছু লোক বলেছেন, তা রোযা-কে ইঙ্গিত করছে (অর্থাৎ যারা রোযা রাখতে সমর্থ)। আর অন্যরা বলেছেন, ফিদিয়াকে ইঙ্গিত করছে। কিন্তু প্রথমটাই ঠিক। কেননা সেই রোযা পূর্বে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে 'ফিদিয়া' শব্দ এর পূর্বে উল্লিখিত হয়নি। সর্বনাম তো পূর্বে উল্লিখিতকেই ইঙ্গিত করতে পারে। আর অপর একটি দিক দিয়ে বলা যায়, اَلْفِدْيَةُ শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ, অথচ সর্বনামটি পুরুষ বাচক। এ থেকে 'জবরিয়া' পন্থীদের মত বাতিল প্রমাণিত হয়। তারা বলে, আল্লাহ তাঁর বান্দাগণের উপর এমন কাজ করার দায়িত্ব চাপান, যা করার সাধ্য তাদের নেই। তারা কাজ করতে ক্ষমতাবান নয় তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে। কাজ করার তাদের নিজস্ব কোন ক্ষমতাই নেই।[১] কেননা আল্লাহই তা করার পূর্বে তা করতে সক্ষম বলে চূড়ান্ত ঘোষণা দিয়েছে। বলেছেন ঃ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَه فِدْيَةٌ 'যারা তা করতে সক্ষম হয়েও করে না তাদের উপর ফিদিয়া ধার্য।' এ আয়াতে রোযা না রেখেও তা করতে পারে বলা হয়েছে। তাকে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে ফিদিয়ার দিকে। ব্যবহৃত শব্দ তা বোঝাচ্ছেও। কেননা সর্বনাম ফিদিয়াকেই বোঝায়। রোযা ওয়ালাকে তা করতে সক্ষম বানিয়ে দিয়েছে, যদিও সে তা করেনি।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ –

রমযান মাস। এই মাসেই কুরআন নাযিল হয়েছে মানুষের হেদায়েতের বিধান ও হেদায়েতের সুস্পষ্ট নিদর্শন এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী রূপে।

এ আয়াতটি জবরিয়াদের মতকে বাতিল প্রমাণ করেছে। ওরা বলে যে, আল্লাহ কাফিরদের হেদায়েত করেনি। কেননা আল্লাহ্ এ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কুরআন শরীয়াত পালনে বাধ্য সমস্ত মানুষের জন্যে হেদায়েত। যেমন অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

১. এই মতটিকেই জবরিয়া মত বলা হয়।

وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَ يْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوْا الْعُمْىَ عَلَى الْهُدٰى –

আর সামুদ গোত্র, আমরা তাদেরকে হেদায়েত দিয়েছি। কিন্তু পরে তারা গুমরাহীকে হেদায়েতের উপর অধিক পছন্দ করে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

আল্লাহ্র এই কথাটিও ঃ

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌلَّهٗ –

যে লোক কোন কল্যাণকর কাজ নিজের থেকে করবে, তা তার-ই জন্যে মঙ্গলকর হবে।

এটা হতে পারে যে, কথার শুরুটা তার পূর্বের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে না। কেননা তা ফায়দা দানের দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। সম্বোধনের শুরু তা দিয়ে করা সঠিক হবে। তখন নফল ইবাদতের উৎসাহ দানকারী হবে। এ-ও সঙ্গত যে, ফিদিয়ার খাবার বেশি বেশি দিয়ে অধিক নফল সওয়াবের কাজ করবে। যদিও ধার্যকৃত খাদ্যের পরিমাণ অর্ধ সা'। এর অধিক এক সা' বা দুই সা' দিলে তা তারই জন্যে কল্যাণের কারণ হবে। কায়স ইবনুস-সায়েব থেকেও এ তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে। তিনি বুড়ো হয়ে গিয়েছিলেন। রোযা রাখতে সক্ষম ছিলেন না। তখন তিনি বলেছিলেন ঃ প্রত্যেকটি লোকের পক্ষ থেকে প্রত্যেক দিন দুই 'মুদ্দ' খাবার খাওয়াতে হবে। অতএব তোমরা আমার পক্ষে থেকে তিন জনকে খাবার দাও। এর লক্ষ্য এমন এক ব্যক্তি হবে যার উপর রোযা বা খাবার দেয়া ইখতিয়ারি কার্যকর হয়েছে, সঙ্গত নয়। কেননা সে দুটির যে কোনটি আলাদাভাবে করা হবে, তা-ই তার জন্যে ফরয, নফল নয় মনে করতে হবে। কাজেই উক্ত দুটি কাজের যে কোন একটি অর্থ হবে, তা মনে করা সঙ্গত হবে না। হ্যাঁ, রোযা ও খাবার দেয়া উভয়টিই এক সাথে লক্ষ্য হতে পারে। তার একটি হবে ফরয; অপরটি নফল। আর আল্লাহ্র কথা ঃ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ 'তোমরা রোযা রাখবে, এটাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর।'

এ থেকে বোঝা যায় যে, আয়াতের প্রথম কথা তার সম্পর্কে যে স্বাস্থ্যবান, নিজ বাড়িতে উপস্থিত এবং রোযা রাখতে সক্ষম। যে রোগী নয়, মুসাফিরও নয়, গর্ভবতী নয়, নয় স্তন দানকারিণী। তা এজন্যে যে, রোগীর পক্ষে রোযা না-রাখা জায়েয। কেননা সে রোযার ক্ষতিকে ভয় করে। যার অবস্থা এরূপ তার পক্ষে রোযা রাখা ভালো হয় না। রোযা রেখে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া থেকে তাকে নিষেধ করা হয়েছে। গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়িনী মাতাও তাই। রোযা তাদেরকেও ক্ষতি করতে পারে। অথবা তা তাদের সন্তানদের জন্যেও ক্ষতিকর হতে পারে। তা যা-ই হোক, রোযা না রাখাই তাদের জন্যে কল্যাণকর। বরং রোযা থাকাই তাদের জন্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তা তাদের বা তাদের সন্তানদের ক্ষতি না করলে তাদের রোযা থাকাই কর্তব্য। তখন রোযা ভাঙ্গা জায়েয নয়। এ থেকে আমরা জানলাম যে, وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ আল্লাহ্র এ কথাটি এবং وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ কথাটি সম্বোধনের শুরুতে যাদের কথা বলা হয়েছে, তাদের প্রতিই আরোপিত হয়েছে। তবে وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ কথাটি

মুসাফিরদের বলা হতে পারে। যদিও রোযা ও খাবার দেয়ার ইখতিয়ার প্রাপ্ত নিজ বাড়িতে অবস্থানকারী লোকদেরকেও বলা হয়ে থাকতে পারে। তা হলেই এই সকলের জন্যেই রোযা থাকা কল্যাণকর বিবেচিত হচ্ছে। সাধারণত বহু বিদেশ সফরকারীর পক্ষেই রোযা থাকা সম্ভব, তাতে তাদের কোন ক্ষতি হয় না। অবশ্য স্বীকার্য যে, তাতে তাদের কষ্ট হতে পারে। তবে এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সফরে রোযা রাখা তা ভাঙ্গা থেকে অনেক ভালো। তা থেকে এ-ও বোঝা যায় যে, এক দিনের নফল রোযা রাখা অর্ধ সা' সাদকা দেয়া অপেক্ষা অনেক উত্তম। কেননা এটা ফরয রোযার ব্যাপার। লক্ষণীয় যে, ফরয রোযায়ই তাকে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে, হয় সে রোযা রাখবে, না হয় অর্ধ সা' পরিমাণ সাদকা দেবে। এতেও রোযা রাখাই উত্তম প্রমাণিত হয়। নফল রোযার ব্যাপারেও অনুরূপ হুকুম হবে, পছন্দনীয়।

## গর্ভবতী ও স্তন দানকারী

ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, জুফর, সওরী, আল-হাসান ইবনে হাই বলেছেন, গর্ভবতী নারী ও স্তন দানকারী মাতা যদি নিজেদের বা তাদের সন্তানদের ক্ষতি হবে রোযা রাখলে মনে করে, তা হলে তারা তা রাখবে না। পরে কাযা করবে। এদের জন্যে তাদেরকে কোন কাফফারা দিতে হবে না। ইমাম মালিক দুগ্ধদানকারী মাতা সম্পর্কে বলেছেন, রোযা থাকলে তার সন্তানের ক্ষতি হবে বলে যে ভয় পায়, শিশুও অন্য কারো দুধ না খায়, তা হলে সে রোযা রাখবে না, পরে কাযা করবে ও সেই সাথে প্রত্যেক দিনের বদলে এজন মিসকীনকে এক 'মুদ্দ' করে খাবার খাওয়াবে। আর গর্ভবতী অনুরূপ কারণে রোযা না রাখলে তাকে খাবার খাওয়াতে হবে না; লাইস ইবনে সাদও এই মত দিয়েছেন। ইমাম মালিক বলেছেন, ওরা দুজন নিজেদের ক্ষতি হওয়ার ভয় পেলে ওরা ঠিক রোগীর মত গণ্য হবে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, তারা দুজন তাদের সন্তানদের ক্ষতির আশংকা বোধ করলে তারা রোযা ভাঙ্গবে। তবে তাদের দুজনকেই তা কাযা করতে হবে, কাফফারাও দিতে হবে। রোযা রাখতে সক্ষম না হলে তারা যেন রোগী। তাদের রোযা কাযা করতে হবে, কাফফারা দিতে হবে না।

البو يطى।গ্রন্থে তাঁর থেকে বর্ণনা এসেছে, গর্ভবতীকে রোযা ভাঙ্গার দরুন খাবার খাওয়াতে হবে না। আগের কালের ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে তিনটি দিক দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। হযরত আলী (রা) বলেছেন, রোযা ভাঙ্গলে তাদের দুজনকেই তার 'কাযা' করতে হবে। তবে তাদের ফিদিয়া দিতে হবে না। ইবরাহীম, হাসান ও আতা প্রমুখ তাবেয়ীন এই মত-ই গ্রহণ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন : তাদের ফিদিয়া দিতে হবে, রোযা কাযা করতে হবে না। ইবনে উমর (রা) ও মুজাহিদ বলেছেন, তাদেরকে ফিদিয়া দিতে হবে, রোযা কাযাও করতে হবে।

আমাদের হানাফী ফিকাহবিদদের দলীল হচ্ছে একটি হাদীস। হাদীসটি জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ আল-ওয়াসেতী আবুল ফযল জাফর ইবনে মুহাম্মাদ

আল-ইয়ামানী আবূ উবায়দ আল-কাসে ইবনে সালাম ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম, আইয়ূব আবূ কালাবাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। পরে বলেছেন, যিনি আমাকে এই হাদীস শুনিয়েছেন, তুমি কি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাও ? পরে তিনি আমাকে পথ জানিয়ে দিলেন, আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। বললেন, আমাকে আমার নিকটবর্তী আনাস ইবনে মালিক এই হাদীস বলেছেন। বললেন, আমার এক প্রতিবেশীর উট নিয়ে তাতে বসে রাসূলের করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। আমি তাঁর পাশে বসলাম। তিনি তখন খাবার খাচ্ছিলেন। আমাকে তিনি খাবার খেতে আহ্বান করলেন। তখন আমি বললাম, আমি রোযাদার। তখন তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমি তোমাকে বলব, আল্লাহ মুসাফির-এর অর্ধেক নামায ও রোযা হ্রাস করে দিয়েছে। গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী মাতারও। এ কথা বলার পর হাঁপাইতেছিলেন এবং বলছিলেন ঃ আমাকে যখন তিনি খাবার খেতে ডাকলেন তখন তাঁর খাবার থেকে খাওয়া কি আমার উচিত ছিল না ?

আবূ বকর বলেছেন, মুসাফিরের নামায চার রাক'আতের অর্ধেক। এ কথা ঠিক। কিন্তু গর্ভবতী ও স্তনদায়ী মাতার অর্ধেক নামায পড়ার তো কোন প্রশ্ন উঠে না। উপরোদ্ধৃত হাদীসে আমাদের পক্ষের প্রমাণ আছে এদিক দিয়ে যে, গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ীর রোযা প্রত্যাহার করাটা ঠিক মুসাফিরের রোযা প্রত্যাহারের মতই ব্যাপার। মুসাফিরের রোযা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, ঠিক সেই কথাই রয়েছে দুগ্ধদায়ী মাতা ও গর্ভবতী সম্পর্কে। কেননা বর্ণনাধারায় তাকে এমনভাবে সংযোজিত করা হয়েছে যে, মাঝখানে অন্য কোন জিনিসের উল্লেখ করা হয়নি। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী মাতার রোযা প্রত্যাহারকরণ মুসাফিরের রোযা প্রত্যাহার করার মতই। এ দুয়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। আর এ তো জানা-ই আছে যে, মূসাফিরের রোযা প্রত্যাহারের অর্থ হচ্ছে, না-থাকা রোযা কাযা করতে হবে কোন ফিদিয়া দেয়া ছাড়া-ই। ফলে তা অনিবার্যভাবে গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী মাতার মতোই হল। আর তা থেকেই বোঝা গেল যে, গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী মাতার মধ্যে তখন কোন পার্থক্য থাকে না, যখন তারা দুজনই রোযার কারণে নিজেদের ও তাদের সন্তানদের ক্ষতি হওয়া আশঙ্কা বোধ করে। স্বয়ং নবী করীম (স) এ দুজনার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করেন নি। উপরন্তু গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী মাতা কাযা করতে পারবে—এই আশা হওয়া সত্ত্বেও তাদের দুজনার জন্যে রোযা ভাঙ্গা মুবাহ, তখন তারা দুজন অবশ্যম্ভাবীরূপে রোগী ও মুসাফিরের মতো হয়ে গেল।

রোযা কাযা করা ও ফিদিয়া দেয়া—উভয়ই কর্তব্য বলে যাঁরা মনে করে এবং وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ – আয়াতকে দলীল হিসেবে পেশ করেন, তা কিন্তু সহীহ নয়। কেননা ও আয়াত থেকে তাদের দাবি সত্য প্রমানিত হয় না । তা এজন্যে যে, আমরা ইতিপূর্বে সাহাবিগণের এক জামা'আতের এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেছি যে, তা নিজ বাড়িতে উপস্থিত সুস্থ ব্যক্তির জন্যে ফরয এবং তার ইখতিয়ার ছিল রোযা রাখা ও না রেখে ফিদিয়া দেয়ার। এ পর্যায়ে যা যা প্রমাণিত হয়, তা-ও আমরা বলেছি। এ পর্যায়ের কথা নিছক কোন 'রায়' নয়। তা হচ্ছে تَوْقِيْف রাসূল কর্তৃক নির্দিষ্ট। অতএব

গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী মাতার সম্পর্কে তারা যা বলেছে, তা সঙ্গত হতে পারে না। অতএব তার ব্যাখ্যা আমরা যা বলেছি, তা-ই গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু তা فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ। আয়াতাংশ দ্বারা মনসূখ হয়ে গেছে।

অপর একটি দিক দিয়ে বলা যায়, এ আয়াতকে তাদের মতের দলীল হিসেবে পেশ করা সঠিক কাজ নয়। কেননা সে কথাটি এই কথার ধারাবাহিকতায় বলা হয়েছে ঃ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ 'রোযা রাখাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর।' জানা আছে, এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে তাদেরকে, যারা আয়াতের শুরু অংশে শামিল রয়েছে। আর তা গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী মাতার প্রসঙ্গে বলা হয়নি। কেননা তারা দুজন যখন রোযার ক্ষতির ভয় পায়, তখন রোযা রাখা তাদের জন্যে কল্যাণকর নয়। বরং তা তাদের জন্যে নিষিদ্ধ। আর যদি তাদের নিজেদের বা তাদের সন্তানদের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা না থাকে, তাহলে তাদের জন্যে রোযা ভাঙ্গাই জায়েয নয়। এ কথায় এ বিষয়ে স্পষ্ট দলীল রয়েছে এই বিষয়ের যে, উক্ত আয়াতে তাদের কথা বলা হয়নি। যারা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী মাতাকে এ আয়াতের আওতায় নিয়ে আসেন এবং বলেন যে, তাদের ফিদিয়া দান ও কাযা দুটাই করতে হবে, তাদের কথা বাতিল প্রমাণিত হয়েছে। কেননা আল্লাহ এই খাবারের নাম রেখেছেন 'ফিদিয়া'। আর ফিদিয়া অন্য কোন জিনিসের স্থলাভিষিক্ত হয়, এটা করলেই সেটার দায়িত্ব যথেষ্টভাবে পালিত হয়ে যায়। এ কারণে রোযা কাযা করা ও ফিদিয়া দেয়া—উভয়টার একত্রিত হওয়া সঙ্গত নয়। কাযা ওয়াজিব হলে তা যে-কাজ করা হয়নি তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেল। অতএব এ ক্ষেত্রে খাবার খাওয়ানো ফিদিয়া হবে না, আর যদি ফিদিয়াটা সহীহ্ হয়, তা হলে কাযা করা জরুরী হবে না। কেননা ফিদিয়াই তো তার পক্ষে যথেষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে।

যদি বলা হয়, না-রাখা রোযার কাযা ও খাবার খাওয়ানো দুটোই না-রাখা রোযার স্থলাভিষিক্ত হওয়া কেন নিষিদ্ধ হবে ? কোন্ জিনিস নিষেধ করছে ?

জবাবে বলা হবে, দুটো একত্রিত হয়ে না-রাখা রোযার স্থলাভিষিক্ত হলে খাবার খাওয়ানোটা ফিদিয়ার কতকাংশ হবে, সম্পূর্ণ ফিদিয়া হবে না। অথচ আল্লাহ্‌র রাখা নাম হল ফিদিয়া। এর ফলে তোমার ব্যাখ্যাটা আয়াতের বক্তব্যের বিপরীত হয়ে যাবে। উপরন্তু গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী মাতার রোযা ভাঙ্গা মুবাহ হয়েছে যে কারণে, তা হল; ফিদিয়া দেয়া। আমরা পূর্বের ফিকাহবিদদের এই মত উল্লেখ করেছি যে, ফিদিয়া দেয়া বা রোযা রাখা এ দুটির একটি করা ওয়াজিব। এক সাথে দুটি নয়। তাহলে তাকে এ দাবির পক্ষে দলীল হিসেবে কি করে পেশ করা যায় যে, গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী মাতাকে এক সাথে দুটো কাজই করতে হবে—রোযাও রাখতে হবে আর ফিদিয়াও দিতে হবে ?

অন্যদিক দিয়ে একথা জানাই আছে যে আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ-এ 'রোযা না-থাকা' কথাটি উহ্য আছে। যেন বলা হয়েছে ঃ

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَه فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ –

**যারা রোযা রাখার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও না-রাখে, তাদের জন্যে মিসকীনকে খাবার ফিদিয়া হিসেবে দেয়া ওয়াজিব।**

আল্লাহ্ যখন শুধু ফিদিয়ারই উল্লেখ করেছেন ওয়াজিব হিসেবে, তখন তা ছাড়া বা তার সাথে অন্যে কিছু ওয়াজিব হিসেবে উল্লেখ করা কিছুতেই সঙ্গত হতে পারে না। কেননা তা করা হলে আল্লাহ্‌র ঘোষণার উপর অতিরিক্ত বাড়িয়ে দেয়া হবে। কেননা نص -এর উপর অনুরূপ আর একটি نص ছাড়া কিছু বাড়ানো যেতে পারে না। কিন্তু তারা দুজন থুড়থুড়ে বুড়োর মত নয়। সে যে রোযা রাখতে পারবে, তার তো কোন আশা-ই করা যেতে পারে না। সে তার রোযা পালন থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ ও অক্ষম হয়ে গেছে। অতএব তার না-রাখা রোযা কাযা করার কথা বলা সম্পূর্ণ অর্থহীন। আর যে খাবার দেয়া তার কর্তব্য, তা তার জন্যে ফিদিয়া। কেননা তা তার রোযার স্থানে বিকল্প হিসেবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী মাতা পরে কাযা করতে পারবে বলে আশা করা যায়। অতএব তারা দুজন রোগীও মুসাফিরের মতো। ইবনে আব্বাসের পক্ষে আয়াতটির বাহ্যিক অর্থকে দলীল হিসেবে পেশ করার সুযোগ রয়েছে। কেননা তিনি শুধু ফিদিয়া ওয়াজিব হওয়ার কথা বলেন, রোযা কাযা করার কথা বলেন না। তা সত্ত্বেও গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী মাতা যদি তাদের সন্তানের ক্ষতি হওয়ার ভয় পায়, নিজেদের ক্ষতির ভয় নয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, তারা রোযা রাখতে সক্ষম। তাহলে আয়াতটির বাহ্যিক অর্থে তারা দুজনই শামিল। ইবনে আব্বাস এ কথাই বলেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, মূসা, ইবনে ইসমাঈল, আবান, কাতাদাহ সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, ইকরামা তাঁকে বলেছেন যে, ইবনে আব্বাস তাকে হাদীস শুনিয়েছেন এই আয়াত وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ পর্যায়ে। বলেছেন, এ আয়াত গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়িনী মাতার জন্যে ফিদিয়া প্রমাণ করেছে। মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, ইবনুল মুসান্না, ইবনে আবূ আদী সাঈদ, কাতাদাহ, উজরাতা সাইদ ইবনে জুবায়র ইবনে আব্বাস সূত্রে এ আয়াত পর্যায়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, থুড়থুড়ে বুড়োর ও সে মেয়ে লোকদের জন্যে রুখসত প্রমাণ করেছে। রোযা রাখতে সমর্থ হয়েও তারা তা ভাঙ্গতে পারে ও প্রত্যেক দিনের বদলে একজন মিসকীন খাওয়াবে। আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মাতা তাদের সন্তানদের ক্ষতির ভয় পেলে তারা রোযা ভাঙ্গবে ও মিসকীন খাওয়াবে। এ পর্যায়ে ইবনে আব্বাস আয়াতের বাহ্যিক অর্থকেই দলীল হিসেবে পেশ করেছেন এবং ফিদিয়া ওয়াজিব বলেছেন, রোযা কাযা করা নয়। যদি তারা তাদের সন্তানদের ক্ষতির ভয়ে রোযা ভাঙ্গে, রোযা রাখতে নিজেরা সক্ষম হয়েও—আয়াতটির হুকুম তাদের দুজনকে শামিল করে।

আবূ বকর বলেছেন, যে লোক এ কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, তারা এ মত প্রকাশ করেছে যে, ইবনে আব্বাস প্রমুখ উল্লেখ করেছেন যে, রোযা রাখতে সক্ষম সব লোকের জন্যেই এ হুকুম, রোযা রাখা বা ফিদিয়া দেয়া—দুটির যে কোন একটি করার

ইখতিয়ার সকলেরই রয়েছে। এ কথায় একজন সুস্থ্য—রোযা রাখতে সক্ষম—ব্যক্তিকেও শামিল করে। তাই গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়িনীর মধ্যে গণ্য হওয়া সঙ্গত নয়। কেননা তাদেরকে তো এই ইখতিয়ার দেয়া হয়নি। কেননা তারা দুজন হয় ভয় পেয়ে গেছে। তাই তাদের জন্যে রোযা ভাঙ্গা একমাত্র কাজ, কোন ইখতিয়ার ছাড়াই। অথবা রোযা রাখায় তাদের কোন ভয়-ই রোধ হয়নি বলে তাঁদের কোন ইখতিয়ারেরও প্রশ্ন নেই। আয়াতটি এই শ্রেণীর লোককে একটি হুকুমের অধীন শামিল করবে তা বাহ্যিকভাবে ফিদিয়া ওয়াজিব হওয়ার কথা বোঝায়—তা সঙ্গত নয়। আর দুই শ্রেণীর এক শ্রেণীর লোকদের জন্যে খাবার দেয়া ও রোযা রাখার ইখতিয়ার এবং অপর শ্রেণীর জন্যে ফরয হিসেবে রোযা—কোনরূপ ইখতিয়ার ছাড়াই অথবা শুধু ফিদিয়া দেয়া কোন ইখতিয়ার ছাড়াই প্রমাণ করাও সঙ্গত নয়। আয়াত তো তাদের দুশ্রেণীর লোকদেরকে একই দিক দিয়ে শামিল করেছে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, আয়াতটি গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়িনী মাতাকে শামিল করে না, আয়াতটিতে তাদের সম্পর্কে কথা বলা হয়নি।

আয়াতের ধারাবাহিকতায় وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ আয়াতটিও উপরের কথাটিকেই সত্য প্রমাণ করে। গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়িনী মা তাদের সন্তানদের ক্ষতির ভয়ে রোযা না রাখলে আলোচ্য আয়াতে তাদের জন্যে কোন হুকুম নেই, কেননা রোযা তাদের জন্যে কল্যাণময় হয় না। আমরা উপরে আনাস ইবনে মালিক আল-কুশাইরী থেকে বর্ণিত যে হাদীস উদ্ধৃত করেছি, তাও ঐ কথাই বোঝায়। তাতে রাসূলে করীম (স) রোগী, মুসাফির, গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়িনী মাতাকে রোযা সংক্রান্ত হুকুমে সমান ও অভিন্ন করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্‌র ঃ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ 'রমযান মাস, এ মাসেই কুরআন নাযিল হয়েছে' আয়াতেও তা-ই বলা হয়েছে।

আবূ বকর বলেছেন, আমরা পূর্বে আগের মনীষীদের এই কথা উল্লেখ করেছি যে, প্রথমে প্রতি মাসে তিন দিনের রোযা ফরয ছিল। পরে তা মনসূখ হয়ে গেছে আল্লাহ্‌র এ কথাটির দ্বারা। কেউ কেউ বলেছেন, রমযান মাসের কুরআন নাযিল হওয়া সংক্রান্ত এ আয়াতটি 'তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববতীর উপর ফরয করা হয়েছিল,' এবং তাঁর কথা 'নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনসমূহ' এ দুটির ব্যাখ্যা দিয়েছে। ফলে তার পূর্ণাঙ্গ রূপ হচ্ছে ঃ নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন রমযান মাসেরই। এক্ষণে 'কতিপয় দিনের রোযা' কথাটি 'রমযান মাস' এই আয়াত দ্বারা মনসূখ হয়ে গেছে ধরে নিলে তা হলে এক সাথে প্রথম আয়াত থেকে দুটি হুকুম মনসূখ মনে করতে হয়। একটি 'কয়েকটি দিন' যা রমযান মাসের নয়। আর দ্বিতীয় রোযা রাখা ও খাবার দেয়ার মধ্যে—যে-কোন একটি করার ইখতিয়ার যেমন আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি—আগের ফিকাহবিদদের মত হিসেবে। আর 'রমযান মাস' 'কয়েকটি নির্দিষ্ট দিন'-এর ব্যাখ্যা হয়ে থাকে, তা হলে তা অবশ্যই ফরয রোযার হুকুম নাযিল হওয়ার পর হবে, —যাতে রোযা থাকা বা ফিদিয়া দেয়ার মধ্যে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছিল প্রাথমিক অবস্থায়। তা হলে এ হুকুমটি স্থিতিশীল ও প্রমাণিত হয়ে গেল। তার পরে তা মনসূখ হয়ে গেছে কাজ ও দৃঢ়তা

লাভের পূর্বেই। কিন্তু দ্বিতীয় কথাটিই সহীহ্‌। কেননা আগের ফিকাহবিদদের এই বর্ণনা ব্যাপকভাবে চালু হয়ে গেছে যে, রোযা রাখা ও ফিদিয়া দেয়া—এ দুটির যে কোন একটি করার ইখতিয়ার রমযান মাসেই কার্যকর ছিল। পরে তা মনসূখ হয়ে গেছে فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ 'যে লোক এই মাসটি পাবে সে যেন অবশ্যই সে মাস ভরে রোযা রাখে' এই কথাটি দ্বারা।

যদি বলা হয়, আয়াতটির তাৎপর্যেই এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, 'কয়েকটি নির্দিষ্ট দিন' অর্থ রমযান মাস ছাড়া অন্য সময়ের দিন। কেননা কথাটি রোযা রাখা ও ফিদিয়া দেয়ার ইখতিয়ারের উল্লেখের সঙ্গে মিলিয়ে ও পাশাপাশি বলা হয়েছে। 'কতিপয় নির্দিষ্ট দিন' যদি মোটামুটিভাবে ফরয রোযার দিন হিসেবে বলা হয়ে থাকত, যার ব্যাখ্যার প্রয়োজন, তাহলে ফরয প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে ইখতিয়ারের কথা বলার কোন অর্থ হতে পারে না।

এর জবাবে বলা যাবে, একটা ফরযের কথা মোটামুটিভাবে বলা—যার সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে এবং যা ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল—নিষিদ্ধ নয়। যখনই তার ব্যাখ্যা এসে যাবে, যা বলা উদ্দেশ্য তা স্পষ্ট করে তোলা হবে, তখন তার হুকুমটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তখন বক্তব্যটা এরূপ দাঁড়াবে ঃ

'কতিপয় নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন, তার সময়টা নির্দিষ্ট করে বলে দিলেও তার পরিমাণ (বা সংখ্যা) জানিয়ে দিলে তখন লোকেরা—যাদেরকে কথাটি বলা হয়েছে—রোযাও 'না' রেখে ফিদিয়া দেয়ার মাঝে ইখতিয়ার সম্পন্ন হবে।

যেমন আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا -

তুমি তাদের ধন-মাল থেকে যাকাত নিয়ে নাও, তুমি তদ্দারা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।

এ আয়াতে 'মাল' একটা সাধারণ ও অনির্দিষ্ট কথা। এদিক দিয়ে যে কোন মালের প্রসঙ্গে এই হুকুমটা কার্যকর করা যেতে পারে। আর আয়াতের শব্দ الصدقة। অস্পষ্ট ও মোটামুটি কথা। তার ব্যাখ্যা হওয়া আবশ্যক। পরে যখন এই 'সাদকা' শব্দের ব্যাখ্যা এসে যাবে, তখন মালের নামের সাধারণত্ব সেই সাদকার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে যাবে। এর বহু কয়টি দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র কথা وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ হয়ত শেষে নাযিল হতে থাকবে, যদি পাঠকালে তা প্রথমেই আসে। এ অবস্থায় আয়াতটির মূল বক্তব্য ও তার অর্থের বিন্যাস এই হবে ঃ

কতিপয় নির্দিষ্ট দিন, তা রমযান মাসেরই। তোমাদের মধ্যে যে রোগী হবে বা হবে বিদেশ সফরে, তার রোযা রাখার সময়কাল হবে অন্য দিনে। আর যারা তা রাখতে অক্ষম, তাদের একজন মিসকীনের খাবার ফিদিয়া দেয়া কর্তব্য।

তাহলে এটা একটা প্রমাণিত হুকুম হয়ে যায়। কালের একটা সময়ের উপর স্থিতিশীল হয়ে দাঁড়ায়। এর পর নাযিল হয় ঃ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ –

যে এই মাসটা পাবে, সে যেন সে মাস ভরে রোযা রাখে।

ফলে রোযা না-রেখে ফিদিয়া দেয়া এবং রোযা রাখার মধ্যকার ইখতিয়ার মনসূখ হয়ে যায়, যেমন পূর্বে বলেছি—আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'মূসা যখন তার লোকদেরকে বলল, আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গাভী যবেহ করার আদেশ করেছেন। 'শব্দ ও বিন্যাসে' শেষে এসেছে। এর দুটি অর্থ হতে পারে। একটি—তা পাঠের শেষে এলেও নাযিল হওয়ার দিক দিয়ে আগে। আর দ্বিতীয়—এখানে দুটি কথার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে واؤ দিয়ে। তা কিন্তু বিন্যাস বোঝায় না। বরং বুঝতে হবে, সবই যেন একত্রে বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে 'কতিয় নির্দিষ্ট দিন' 'রমযান মাস' পর্যন্ত উপরোক্ত গাভী সংক্রান্ত কাহিনীর মতোই। 'আর যে লোক এই মাস পারে, সে যেন সে মাস ভরে রোযা রাখে'—এ কয়েকটি হুকুম নিহিত রয়েছে। একটি—যে লোক মাসটি পাবে, রোযা রাখা তার জন্যে ফরয। যে পাবে না তার জন্যে নয়। এমতাবস্থায় কুরআনে যদি শুধু বলা হতো ঃ 'তোমাদের প্রতি রোযা ফরয বলা হয়েছে .... রমযান মাসের, যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে'—তা হলেই উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যেত। তা হলেই শরীয়াত পালনে বাধ্য সব মানুষের জন্যে রোযা বাধ্যতামূলক হয়ে যেত, কিন্তু তার পরে যখন বলা হল ঃ 'যে এই মাসটি পাবে সে যেন রোযা রাখে' —তখন এর দ্বারা বলে দেয়া হল যে, রমযান মাসের রোযা কেবল কিছু লোকের জন্যে ফরয, অপর কিছু লোকের জন্যে নয়। অর্থাৎ যারা মাসটিকে পাবে তারাই রোযা রাখবে, যারা পারে না তারা রাখবে না।

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ 'যে লোক সে মাসটি পাবে'-এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যে লোক পেল—অর্থাৎ এই মাসে নিজ বাড়িতে উপস্থি থাকবে—মুসাফির হবে না যেমন উপস্থিত ও অনুপস্থিতকে 'মুকীম' ও 'মুসাফির' বলা হয়। তাতে রোযা বিশেষভাবে বাধ্যতামূলক হবে নিজ বাড়িতে অবস্থানকারী লোকদের জন্যে। যারা মুসাফির, বিদেশ প্রবাসী, তাদের জন্যে নয়। যদি এতটুকুই বলা হতো তাহলে রোযা সীমিত হয়ে থাকত বাড়ীতে থাকা লোকদের মধ্যে, মুসাফিরদের মধ্যে রোযার কোন প্রশ্ন হতো না। কেননা আয়াতে তাদের কথা বলা হয়নি। ফলে তাদের না রোযা রাখার দায়িত্ব, না তাদের কাযা করার। কিন্তু পরে আল্লাহ্‌ যখন বললেন ঃ

وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْعَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ –

তোমাদের মধ্যে যে রোগক্রান্ত বা বিদেশ সফরে থাকবে, তাদের রোযা রাখার সময় অন্য দিনগুলোতে।

এত রোগী ও মুসাফির সম্পর্কে বলে দেয়া হল যে, তাদের রোযা কাযা করতে হবে যদি তারা না রেখে থাকে। এই তাৎপর্য তখনকার فَمَنْ شَهِدَ -এর অর্থ যদি হয়

বাড়িতে উপস্থিত ও অবস্থানকারী বলা হয়। এর অর্থ এ-ও হতে পারে যে, যে লোক এই মাসের আগমন জানতে পারবে অথবা যে লোক রোযার মাসের রোযা রাখা কর্তব্য বুঝবে, কেননা পাগল তা বুঝে না, অতএব তার উপর রোযা ফরয নয়। তা হলে এ আয়াতে মাস দর্শন বা মাসে বাড়িতে উপস্থিত থাকাই হল রোযা রাখার দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার কারণ। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ

বোবা, কালা, অন্ধ।

বলা হয়েছে সে সব লোককে যারা ঈমানের আহ্বান শুনেও তা গ্রহণ করে না, সত্য দেখেও মেনে নেয় না, সত্য পথ সম্মুখে উদ্ঘাটিত হওয়া সত্ত্বেও তারা দেখতে পায় না।

অথবা যেমন বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ

নিশ্চয়ই তাতে নসীহত রয়েছে তার জন্যে, যার হৃদয় আছে।

'হৃদয়' মানে বিবেক-বুদ্ধি। কেননা যে-লোক তার বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা উপকৃত হয় না, তার যেন হৃদয়ই নেই। বিবেক-বুদ্ধির সম্পর্ক হৃদয়ের সাথে। এমনিভাবে এটা সঙ্গত যে, রমযান মাস বাড়িতে উপস্থিত থাকাই রোযা পালনের দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার কারণ। কেননা যে লোকের উপর রোযা ফরয হয়নি, সে যেন বর্তমানই নেই অর্থাৎ তার উপর থেকে রোযা রাখার হুকুমটাই পড়ে গেছে, সরে গেছে। আর—

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ -

যে লোক এ মাস পেল, সে যেন এ মাসের রোযা রাখে।

আয়াতটি থেকে যে আইন-বিধান পাওয়া গেল, তা হল, রমযান মাস ভরে রোযা ফরয, এই মাসের উপস্থিত থাকার অর্থ, সে রোযা রাখতে বাধ্য। পাগল ও অন্যান্য যার যার উপর তা অর্পিত নয়, তাদের জন্যে এই মাসের রোযা বাধ্যতামূলক নয়।

## রমযানের সমগ্র মাস কিংবা তার কিছুদিন যে লোক পাগল থাকে

ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফর ও সওরী বলেছেন, কেউ যদি সারা রমযান মাসে পাগল হয়ে থাকে, তাহলে তার পক্ষে রোযা থাকা হয়নি বলে তা কাযা করা তার জন্যে জরুরী নয়। তবে এই রমযান মাস শেষ হওয়ার আগেই এবং কিছুদিন থাকা অবস্থায় সে যদি সুস্থ হয়, তাহলে পরে সমস্ত রোযা করাই তার কর্তব্য হবে। মালিক ইবনে আনাস বলেছেন, পূর্ণ বয়সপ্রাপ্ত কোন লোক যদি পাগল হয়, অথচ সে রোযা রাখতে সক্ষম, পাগল অবস্থায় দুই বছর অতিবাহিত হয় এবং পরে সুস্থ হয় তাহলে এ বছরগুলোর রোযা তাকে কাযা করতে হবে। অবশ্য নামায কাযা করতে হবে না।

উবায়দুল্লাহ ইবনুল হাসান জড় বুদ্ধির লোক সম্পর্কে বলেছেন, সে নামায-রোযা কিছুই আদায় না করে থাকলে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়ার পর তা কাযা করার প্রয়োজন নেই। আর গাপল সম্পর্কে বলেছে, যে পাগল সুস্থ হয় কিংবা যে পৈতৃক রোগে আক্রান্ত হয় এবং পরে ভালো হয়ে যায়,—আমি মনে করি, তার না-করা নামায-রোযা কাযা করা কর্তব্য। ইমাম শাফেয়ী البويطى গ্রন্থে বলেছেন, যে লোক রমযান মাসে পাগল হবে, তাকে রোযা কাযা করতে হবে না। রমযান মাসের কোন একদিন সূর্যাস্তের পূর্বেই যদি ভালো হয়ে যায়, তবুও কাযা করা তার কর্তব্য হবে না।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ 'যে লোক এই মাস পাবে, তার উচিত সে মাস ভরে রোযা থাকা'। সারামাস ধরে পাগল অবস্থায় থাকা ব্যক্তির জন্যে তা কাযা করা ওয়াজিব নয় বলে ঘোষণা করছে, কেননা সে তো সে মাস পায়নি, পেলেই না তার রোযা থাকা কর্তব্য হতো, পাগলের উপর শরীয়াত পালনের দায়িত্ব নেই। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيْرِ حَتّٰى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰى يَفِيْقَ -

তিন ব্যক্তির উপর থেকে কলম তুলে নেয়া হয়েছে। নিদ্রামগ্ন ব্যক্তি যতক্ষণে সে জেগে না উঠছে, বালক যতক্ষণে সে পূর্ণ বয়স্কতা না পাচ্ছে এবং পাগল, যতক্ষণে সে পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে না উঠছে।

যদি বলা হয়, উপরোদ্ধৃত আয়াতে রযমান মাস পাওয়া বলতে নিজ বাড়িতে উপস্থিত থাকা ও বিদেশ সফরে না-থাকা বুঝিয়েছে। রমযান মাস পাওয়ার যে অর্থ করা হল শরীয়াত পালনে বাধ্য হওয়া—তা তো বলা হয়নি। তোমার এ কথার যথার্থতার ভিত্তি কি? এতে তো বাড়িতে থাকা বলা হয়নি?

জবাবে বলা যাবে, আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ দুটি অর্থই দিতে পারে। অর্থ দুটি পরস্পর বিরোধী নয়। এক সাথে উভয় অর্থই গ্রহণ করা যেতে পারে। রোযা রাখা কর্তব্য হওয়ার জন্যে এ দুটিই শর্ত হতে পারে। অতএব সে হিসেবেই তার তাৎপর্য গ্রহণ করতে হবে। আমরা হানাফী মাযহাবে তা-ই গ্রহণ করেছি। কেননা রোযা পালনে বাধ্য—তা না-রাখার রুখসত প্রাপ্ত নয়, এমন ব্যক্তি হতে পারে কেবল সে, যে পূর্ণ বয়স্ক ও নিজ বাড়িতে অবস্থানকারী। আর শরীয়াত পালনে বাধ্য হলেই না তাকে তা পালন করতে বলা যেতে পারে। একথা যখন প্রমাণিত হল, পাগল শরীয়াত পালনের যোগ্যই থাকেনি এই রমযান মাসে। কাজেই তাকে রোযা থাকতে বলা যেতে পারে না। অতএব রোযা কাযা করাও তার কর্তব্য হবে না। রাসূলে করীম (স) উপরোদ্ধৃত কথা থেকেই তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। রাসূল (স)-এর উপরোদ্ধৃত কথা থেকেই তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। রাসূল (স)-এর উপরোদ্ধৃত কথায় যে رُفِعَ الْقَلَمُ 'কলম তুলে নেয়ার' কথা বলা হয়েছে তার অর্থ—সে তিন জনের উপর শরীয়াতের হুকুম পালনের দায়িত্ব নেই। উপরন্তু পাগল

হয়ে যাওয়া লোকের পাগলামী স্থায়ী হলে তার উপর নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব অপর একজনকে করতে হবে। ফলে তখন সে অপ্রাপ্ত বয়সের বালক সমতুল্য হয়ে যাবে। রমযানের সারা মাস পাগল থাকলে সারা মাসই তার উপর শরীয়াত পালনের কর্তব্য রহিত হয়ে থাকবে। তবে এই তাৎপর্য মূর্ছা যাওয়া অবস্থা থেকে ভিন্ন অবস্থা বোঝায়। কেননা কেউ মূর্ছা গেলে সেই সময়ের জন্যে তার উপর কারোর পরিচালক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রশ্ন উঠে না। তা যত দীর্ঘই হোক-না-কেন। মূর্ছা-যাওয়া ব্যক্তি পাগল ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক অভিন্ন নয়। বরং মূর্ছা যাওয়া ব্যক্তিকে নিদ্রামগ্ন ব্যক্তির সমতুল্য মনে করা যেতে পারে। আর নিদ্রামগ্ন ব্যক্তির উপর কারোর নতুন অভিভাবকত্বের প্রশ্ন উঠে না।

যদি বলা হয়, মূর্ছা-যাওয়া ব্যক্তিকেও তো শরীয়াতের কোন হুকুম পালন করতে বলা যায় না, ঠিক যেমন পাগলকে বলা যায় না। শরীয়াত পালনের দায়িত্ব تكليف এদের দুজনের উপর থেকেই সমানভাবে উঠে যায়। অতএব মূর্ছা-যাওয়া ব্যক্তিরও রোযা কাযা করার প্রশ্ন তোলা যায় না।

জবাবে বলা যাবে, মূর্ছা-যাওয়া ব্যক্তিকে ঠিক অবস্থায় শরীয়াত পালনের নির্দেশ দেয়া যায় না, একথা ঠিক। কিন্তু অপর একটি ভিত্তিতে তার রোযা কাযা করা কর্তব্য বলা যেতে পারে। তা হল আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ –

যে লোক রোগাক্রান্ত হবে বা হবে বিদেশ সফরে তার রোযা থাকার সময় অন্য দিনগুলোতে।

মূর্ছা-যাওয়া ব্যক্তি যে একজন রোগী বা রোগাক্রান্ত তাতে তো কোন সন্দেহ নেই। অতএব সাধারণ ভাবেই তার না-রাখা রোযা কাযা করা ওয়াজিব বলতে হবে। যদিও ঠিক মূর্ছা যাওয়ার সময়টিতে সে শরীয়াত পালনে বাধ্য ছিল না; কিন্তু সে সময়টা অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর তো সে শরীয়াত পালনে বাধ্য। কিন্তু পাগলকে সাধারণভাবে ঠিক 'রোগী' বলা যায় না। কাজেই যাদের উপর আল্লাহ রোযা কাযা করা কর্তব্য করেছেন, পাগল তাদের মধ্যে গণ্য নয়। তবে রমযান মাস শেষ হওয়ার পূর্বেই যদি পাগলামী থেকে ভালো হয়ে যায়, তবে ফিকাহবিদগণ মনে করেছে, না-থাকা রোযাগুলো তাকে কাযা করতে হবে। কেননা সে তখন 'যে লোক এই মাস পেল, সে যেন এ মাস ভরে রোযা থাকে' আল্লাহ্‌র এ কথার মুখোমুখী হয়ে পড়ে। সে তো মাস পেয়েছে। একটি অংশ হলেও সে তখন শরীয়াত পালনে বাধ্য। কেননা 'মাস পাওয়া' কথার অর্থ গোটা মাস পাওয়া যেমন হতে পারে, তেমনি তার কোন অংশ পাওয়া হতে পারে। তবে গোটা মাসই মাস পাওয়ার শর্ত হবে, দুটি কারণে তা সঙ্গত নয়। একটি হচ্ছে, তাতে ব্যবহৃত শব্দের পারস্পরিক বৈপরীত্য দেখা দেয়। কেননা যদি তা-ই হয় তাহলে গোটা মাস অতিবাহিত হয়ে না-যাওয়া পর্যন্ত 'মাস পেয়েছে' বলা যাবে না। আর সমস্ত মাসটির অতিবাহিত

হওয়া রোযা পালনের জন্যে শর্ত হওয়া একটা অসম্ভব ব্যাপার। কেননা মাসের যে সময়টা অতিবাহিত হয়ে গেছে, তাতে রোযা পালন তো সম্ভব হয়নি। কাজেই বুঝতে হবে মাস পাওয়ার জন্যে গোটা মাস পাওয়াই অর্থ হতে পারে না। আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই যে, যার উপর রমযান মাস এসে যাবে, সে-ই রোযা পালনের দায়িত্ব প্রাপ্ত , তারই কর্তব্য প্রথম দিন থেকেই রোযা থাকা। কেননা সে মাসের একটা অংশ তো পেয়ে গেছে। আর সেজন্য রোযা পালনে দায়িত্বশীল হয়েছে।

যদি বলা হয়, যেমন বলেছ, মাসের একটা অংশ পেলেই সে মাসটা পেয়ে গেছে বুঝতে হবে এবং যে অংশ সে পেয়েছে সেই অংশেরই রোযা পালন করতে হবে, অন্যটা নয়, কেননা মাসের অংশ পাওয়াটাও রোযা পালনের বাধ্যবাধকতার জন্যে শর্ত। তাহলে মোট কথাটি দাঁড়ায়, যে লোক মাসের কতক অংশ পাবে, সে সেই কতকাংশের রোযা রাখবে।

জবাবে বলা যাবে, যা ধারণা করেছ, ব্যাপারটা তা নয়। মাসের কিছু অংশ রোযা পালন বাধ্যতামূলক হওয়ার শর্ত—এ কথার কোন প্রমাণ না পাওয়া গেলে ব্যবহৃত শব্দের সাধারণ দাবিই হচ্ছে সমগ্র মাসটা পাওয়া রোযা পালন বাধ্যতামূলক হওয়ার জন্যে। যখন এ কথার দলীল পাওয়া গেল যে, রোযা পালনের বাধ্যতার জন্যে অংশই লক্ষ্য—সম্পূর্ণটা নয়, তখন আমরা সেই অর্থেই তা গ্রহণ করলাম। সমস্ত মাস রোযা রাখার কর্তব্য পর্যায়ে শব্দের হুকুম অবশিষ্ট থেকে গেল। কেননা মাসের নাম গোটা মাসেরই নাম। তাই কথাটি এরূপ হবে; তোমাদের যে লোক মাসের খানিকটা সময়-ও পাবে, তার-ই কর্তব্য সমগ্র মাসটা ধরে রোযা রাখা।

যদি বলা হয়, পাগল যদি সুস্থ হয় এমন সময়, যখন মাসের বেশ কিছু দিন তখনও বাকী আছে, তখন অতীত দিনগুলোর রোযার কাযা করা বাধ্যতামূলক করা খুবই কঠিন ব্যাপার। সে বাধ্যবাধকতা মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোর ব্যাপারেই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

জবাবে বলা যাবে, অতীত হয়ে যাওয়া দিনগুলোর রোযা কাযা করা তার কর্তব্য হবে ঠিক মূল সেই দিনগুলোরই রোযা রাখা হিসেবে নয়। তখন রোযা রাখার হুকুম তার প্রতি না থাকলেও বা সেরূপ নির্দেশ দেয়া নিষিদ্ধ হলেও কাযা করা বাধ্যতামূলক হতে পারে। লক্ষণীয়, যে রোযা রাখতে ভুলে গেছে, যার উপর মূর্ছা চেপেছে, যে ঘুমে অচেতন হয়ে আছে, এদের প্রত্যেককে বর্ণিত অবস্থায় রোযা রাখতে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু সে কারণে তার কাযা করাও বাধ্যতামূলক হবে না, তার তো কোন কারণ নেই। অনুরূপভাবে যে লোক নামায পড়তে ভুলে গেছে বা নামাযের সময় নিদ্রামগ্ন থাকার দরুন পড়েনি, তাদের অবস্থাও অনুরূপ। রোযা রাখার জন্যে আদেশ করা দুটি দিক দিয়ে কার্যকর হতে পারে। একটি—যখন তা ফরয, আদায় করা বাধ্যতামূলক, তখন তা করা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে—সেই সময় ছাড়া অন্য সময়ে তার কাযা করা। যদিও মূর্ছা যাওয়া বা ভুলে যাওয়ার মুহূর্তে তার প্রতি তা পালনের নির্দেশ আরোপিত হয়নি।

## রমযানের কিছু দিন অবশিষ্ট থাকতে বালকের পূর্ণ বয়স্কতা লাভ ও কাফির-এর মুসলিম হওয়া

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ -

যে লোক সে মাসটি পেল, সে যেন সে মাস ভরে রোযা রাখে।

আমরা বলেছি, মাসটি পাওয়ার অর্থ, মাসের যে কোন অংশ পাওয়া। যে বালক রমযানের কোন অংশে পূর্ণ বয়স্কতা লাভ করে কিংবা কোন কাফির এই সময়ে ঈমান গ্রহণ করে মুসলিম হয়, রোযা রাখার ব্যাপারে তার করণীয় পর্যায়ে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফর, মালিক ইবনে আনাস তাঁর 'আল-মুয়াত্তা' গ্রন্থে এবং উবায়দুল্লাহ ইবনুল হাসান, লাইস ও শাফেয়ী প্রমুখ বলেছেন, অবশিষ্ট দিনগুলোর রোযা তাকে রাখতে হবে। তবে অতীত হয়ে যাওয়া দিনগুলোর রোযা 'কাযা' করতে হবে না। যে দিনটিতে বালক পূর্ণবয়স্কতা পেয়েছে আর যে দিনটিতে কাফির ইসলাম কবুল করেছে সেই দিনটিরও রোযা কাযা করতে হবে না। ইবনে অহব ইমাম মালিকের এই মত বর্ণনা করেছেন যে, আমার পছন্দ তো এই যে, সে দিনটির রোযা কাযা করা উচিত।

ইমাম আল-আওজায়ী বালকের অর্ধ রমযানে পূর্ণ বয়স্কতা লাভ করলে অতীত হয়ে যাওয়া দিনগুলোর রোযা তার কাযা করা উচিত বলে মত প্রকাশ করেছেন। কেননা সে তো রোযা রাখতে সক্ষম। আর কাফির ইসলাম কবুল করলে অতীত দিনগুলোর রোযা কাযা করতে হবে না। হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, ঠিক সেই দিনের রোযাটা না রাখলেও বালকের পূর্ণবস্কতা লাভ ও কাফিরের ইসলাম গ্রহণের দিন ঠিক রোযাদারের মতই পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা মুস্তাহাব।

আবূ বকর (রা) বলেছেন, আল্লাহ্র কথা, 'যে লোক মাসটি পাবে, সে যেন সে মাসটির রোযা রাখে' আয়াতটির অর্থ ও তাৎপর্য আমরা পূর্বে বিস্তারিত বলে এসেছি। রোযা রাখা বাধ্যতামূলক হওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে শরীয়াত পালনে বাধ্য হওয়া। অপূর্ণবয়স্ক বালক তো পূর্ণবয়স্কতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত শরীয়াত পালনে বাধ্য নয়। কাজেই তার প্রতি রোযা রাখার হুকুম করা সমীচীন নয়। তা ছাড়া বালকত্ব রোযার শুদ্ধতার পরিপন্থী। রোযা রাখলেও তা যথার্থ হয় না। তাদেরকেও যদি রোযা রাখতে বলা হয়, তা হবে শিক্ষার জন্যে—রোযা রাখার অভ্যাস করার জন্যে। যেমন পূর্ণ বয়স্কতা লাভের পর তাকে বলা হয় না—বলা যায় না যে, তোমার বালক থাকালীন নামাযসমূহ এখন কাযা কর। অনুরূপভাবে রোযা কাযা করারও প্রশ্ন নেই। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, ছোট বয়সে না-পড়া নামায ও না-রাখা রোযাসমূহ পূর্ণ বয়স্কতা পাওয়ার পর কাযা করা বাধ্যতামূলক হতে পারে না। ঠিক এভাবেই রোযার মাসের যে দিনগুলো অতীত হয়ে গেছে তা কাযা করা বাধ্যতামূলক হলে বিগত বছরের রোযা কাযা করাও কর্তব্য হয়ে পড়ে। সে তা পারে

না—এমন তো নয়। এ কারণে সমগ্র মুসলমান এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, বিগত বছরগুলোর বা এক বছরের রোযা কাযা করা জরুরী নয়, যদিও তা করার সাধ্য তার আছে। তাই যে মাসের কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় যদি বালক পূর্ণবয়স্কতা পায় বা কাফির মুসলিম হয়, তা হলে অতীত হয়ে যাওয়া দিনগুলোর রোযা কাযা করতে হবে না।

কাফিরও এদিক দিয়ে বালকের মতই। কেননা তাকে রোযা রাখার দায়িত্বশীল মনে করা যায় না। তার পূর্বে ঈমান গ্রহণ জরুরী শর্ত। কুফরকে অস্বীকার করা আবশ্যক। তবেই না তার রোযা রাখা সহীহ্ হতে পারে। এ কারণে সে বালকের মতই হয়ে গেল। তবে পাগল এ থেকে ভিন্ন। সে যদি মাসের কিছু দিন অবশিষ্ট থাকাকালে সুস্থ হয়, তা হলে যে দিনগুলোর রোযা সে রাখতে পারে নি, তার কাযা করা তার কর্তব্য। কেননা পাগলামী রোযা সহীহ হওয়ার পরিপন্থী নয়। কিন্তু কুফর রোযার পরিপন্থী। এ দিক দিয়ে কাফির বালকের মতই হয়ে যায়। তবে এ দুজনের মধ্যে এদিক দিয়ে পার্থক্য আছে যে, কাফির আযাব পারে, পাগল পাবে না। রমযান মাসের কিছু অংশ থাকা অবস্থায় যে কাফির ইসলাম কবুল করল, তার অতীত রোযাসমূহ কাযা করা জরুরী নয়, তা এই আয়াতটি থেকেও প্রমাণিত হয় ঃ

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ –

কাফির হয়ে যাওয়া লোকদের বল, তারা যেন বিরত থাকে। তাহলে তাদের পূর্বের কুফরী বা গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْاِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ وَالْاِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ –

ইসলাম তার পূর্বের সবকিছু কেটে দেয়, ইসলাম তার পূর্বের সবকিছু ধ্বংস করে দেয়।

আমাদের হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, ইসলাম গ্রহণকারী রমযানের কিছু দিন এবং বালক তাদের দিনের অবশিষ্ট সময় খাওয়া-পান থেকে বিরত থাকবে। কেননা তারা এ সময় রোযাদার ছিল না। যদি তারা দিন শুরু হওয়ার সময় পূর্ণবয়স্কতা পেত ও মুসলিম হতো, তাহলে তারা উভয়ই রোযা রাখার জন্যে আদিষ্ট হতো। অতএব দিনের অবশিষ্ট অংশ পানাহার থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। এ ব্যাপারে মূল দলীল হচ্ছে নবী করীম (স)-এর হাদীস। তিনি আশুরার দিন উঁচু স্থানের অধিবাসীদের নিকট লোক পাঠালেন, বললেন, 'যে খেয়েছে সে যেন দিনের অবশিষ্ট সময়টা পানাহার থেকে বিরত থাকে আর যে খায়নি যে যেন রোযা রাখে'।

অপর বর্ণনায় যারা খেয়েছেন, তাদেরকে কাযা করতে বললেন এবং অবশিষ্ট সময়টা পানাহার থেকে বিরত থাকতে বললেন। যদিও তারা রোযা না-রাখা লোক ছিল। তারা যদি না খেয়ে থাকত, তাহালে তাদেরকে রোযা রাখতে বলা হতো। এই চিন্তাটিকে

আমরা ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছি। দিন অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় সে যদি রোযা না-রাখা থাকে, তাহলে রোযাদারের মতই তাকে পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা দিনের শুরুতে তারা রোযা পালনের যোগ্য হলে তাদের প্রতি রোযা রাখারই হুকুম হতো। এক্ষণে যদি রোযা তার প্রতি ফরয হয়ে থাকে অথচ সে রোযা রাখেনি, এ কারণে তাকে অবশিষ্ট সময়টা পানাহার থেকে বিরত থাকা অবস্থায় কাটাতে বলা হয়েছে। যদি তার প্রতি এখন রোযা ফরয না হতো, তাহলে অবশ্য অবশিষ্ট সময়টা পানাহার থেকে বিরত থাকতে বলা হতো না।

এ কারণেই হায়য-এর স্ত্রীলোক সম্পর্কে বলা হয়েছে, রোযার দিনের কোন এক সময় সে পাক হলে বা মুসাফির বাড়িতে ফিরে এলে তখন তার-ও তাই কর্তব্য। যদিও উভয়ই পূর্বে রোযাদার ছিল না। অবশিষ্ট সময় তাদেরকে পানাহার থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। কেননা দিনের শুরুতে যদি সে পাক থাকত বা নিজের বাড়িতে থাকত, তাহলে তো তারা রোযা রাখার জন্যে আদিষ্ট হতো।

কোন কোন ফিকাহবিদ বলেছেন, দিনের কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যদি হায়য আসে তাহলে পানাহার থেকে বিরত থাকতে বলা হবে না। কেননা দিনের শুরুতে হায়য হলে তাকে নিশ্চয়ই রোযা রাখতে বলা হতো না।

যদি বলা হয়, যে লোক দিনের শুরুতে বাড়িতে অবস্থানকারী ছিল, পরে সফরে যাত্রা করেছে, তার পক্ষে রোযা ভাঙ্গা মুবাহ হবে না কেন ? কেননা দিনের শুরুতে সফর অবস্থা হলে তো সে রোযা থাকতে আদিষ্ট হতো না।

তাকে বলা হবে, পূর্বে আমরা রোযা ভাঙ্গার বা রোযা রাখার কোন 'ইল্লাত' ঘোষণা করিনি। আমরা ইল্লাত বানিয়েছি রোযা না-থাকা লোকের পানাহার থেকে বিরত থাকার জন্যে। রোযা ভাঙ্গা মুবাহ হওয়া বা নিষিদ্ধ হওয়ার অপর এক শর্ত রয়েছে, যার উল্লেখ আমরা ইতোপূর্বে করিনি। তা আল্লাহ্র এ কথায় শামিল রয়েছে ঃ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ –

যে লোক এ মাস পাবে, সে যেন মাস ভরে রোযা রাখে।

এ আয়াতে পূর্বে উল্লিখিত হয়নি—এমন কতগুলো হুকুম সমন্বিত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, এ আয়াত বলছে, যে লোক সকাল বেলা জানতে পারবে যে, এটা রমযান মাস, তার কর্তব্য হল, সে তার রোযা শুরু করে দেবে। কেননা যে রাতে জানলো আর যে দিনে জানলো, এ দুয়ের মধ্যে আয়াত কোন পার্থক্য করেনি। উভয় অবস্থাই আয়াতের আওতার মধ্যে রয়েছে। এ থেকে এ-ও জানা গেল যে, রমযানের রোযার নিয়্যত রাতেই করতে হবে না, না করলে কোন দোষ হবে না, জায়েয হবে। মূর্ছা-যাওয়া ও পাগল হওয়া ব্যক্তি দিনের কোন অংশে ভালো হয়ে গেলে, পূর্বে রাতে রোযার নিয়্যত নাও করে থাকলে তৎক্ষণাৎই তাদের রোযা শুরু করে দেয়া ওয়াজিব। কেননা তারা রমযান মাস পেয়েছে। আর আল্লাহ রোযা বাধ্যতামূলক হওয়ার জন্যে রমযান মাস পাওয়ারই শর্ত করেছেন।

আয়াতটিতে আরও একটি হুকুম রয়েছে। আয়াতটি থেকে বোঝা যায়, রমযান মাসে যদি কেউ নফল রোযা রাখার নিয়্যত করে কিংবা অপর কোন ফরয রোযার নিয়্যত করে, সে রমযানের রোযারই সওয়াব বা প্রতিফল পাবে। কেননা রমযান মাসে রোযা রাখারই তো হুকুম হয়েছে এবং সে হুকুম নিঃশর্ত, কোন বিশেষ ধরনের শর্ত দিয়ে তাকে শর্তপূর্ণ করা হয়নি। ফরযেরই যে নিয়্যত করতে হবে, এমন কোন কথা নেই। রোযা—তা যে ভাবে ও যে ধরনের রাখা হোক—আয়াতের অর্পিত দায়িত্ব তাতেই পালন হয়ে যাবে। তা ছাড়া আর কিছুর কর্তব্য নেই।

আরও হুকুম আছে। রমযান মাসের দিনের শুরুতেই রোযা থাকা বাধ্যতামূলক। কোন লোক একাকীও যদি রমযান মাসের চাঁদ দেখে, তবে তার একারই তা ফরয, অন্যরা তা গ্রহণ না করলেও। তার পক্ষে রোযা না রাখা কোন ক্রমেই জায়েয নয়। যদিও সেই দিনের রোযা রাখার হুকুম সকলেরই জন্যে। তাদের নিকট তা শাবান মাসের দিন হলেও চাঁদ যে দেখেছে, তার নিকট তা রমযান মাস। রূহ ইবনে উবাদাতা হিশাম ও আশয়াস হাসান সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যে লোক একাকী রমযান মাসের চাঁদ দেখতে পাবে, সে একাকী রোযা রাখবে না দেশের রাষ্ট্রপ্রধান সহকারে রোযা রাখবে। ইবনুল মুবারক ইবনে জুরাইজ-আতা ইবনে আবূ রিবাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রমযান মাসের চাঁদ যে লোক দেখতে পাবে অন্যান্য লোকদের আগের সন্ধ্যায়, সে জনগণকে বাদ দিয়ে একাকী রোযা রাখবে না, রোযা শেষও করবে না তাদের পূর্বে।

এই লেখকের মনে সংশয় জেগেছে যে, ব্যাপারটি অস্পষ্ট হয়ে গেছে। আল-হাসান খুব সাধারণ ও নিঃশর্ত জবাব দিয়েছেন, বলেছেন, সে রোযা রাখবে না। তার মানে কি এই যে, যে-চাঁদ নিজে দেখেছে, তার মনে চাঁদ দেখতে পাওয়ার বিষয় দৃঢ় প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই তার মনে নেই, তবুও সে রোযা রাখবে না ? আতা হয়ত রোযা না রাখা মুবাহ মনে করেছেন চাঁদ দেখা সম্পর্কে তার মনে সন্দেহ হওয়ার কারণে। সে হযরত প্রকৃতপক্ষেই চাঁদ দেখতে পায়নি। সে চাঁদ বলে কল্পনা ও ধারণা করেছে মাত্র।

যে চাঁদ দেখেছে, আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে তার-ই রোযা রাখা ফরয। কেননা চাঁদ কে একাকী দেখেছে আর কে লোকদের সঙ্গে এক সাথে দেখেছে এ দুয়ের মাঝে কোন পার্থক্যই করা হয়নি।

এতে আরও একটি হুকুম রয়েছে। কিছু লোকে বলে, রমযান মাস শুরু হয়েছে একথা নিঃসন্দেহে না জেনে নিয়ে রোযা থাকা জায়েয নয় এবং তাঁরা দলীল হিসেবে এ আয়াত পেশ করেন ঃ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ –

যে লোকই রমযান মাস পাবে, সে-ই যেন মাসভরে রোযা রাখে।

এ আয়াত রোযা ফরয করেছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির উপরই, যে জানতে পেরেছে যে,

রমযান শুরু হয়ে গেছে। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ مَنْ شَهِدَ অর্থ شَاهَدَ وَعَلِمَ প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ করেছে ও জানতে পেরেছে। যে জানতে পারেনি, সে তার ফরয আদায় করবে না। যদি কেউ সন্দেহের বশবর্তী হয়ে রোযা রাখে, পরে আর সন্দেহ থাকে না, দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যায়, তখন আর সন্দেহ-সংশয়ের কোন ব্যাপার থাকে না। যেমন দারুল হরব-এ মুসলিম বন্দী যদি একটি মাস ধরে রোযা রাখে আর ঘটনাবশত সেই রমযান মাস হয়ে যায়, ফিকাহবিদদের মতে যার এরূপ অবস্থা, তার রোযা হবে না। আগের দিনের মনীষীদেরও এই মত বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী থেকে এ পর্যায়ে দুটি কথা বর্ণিত হয়েছে। একটি—সে রোযা হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয়—তা হবে না। আওজায়ী এহেন বন্দী সম্পর্কে বলেছেন, হ্যাঁ, যদি ঠিক ঠিক ভাবে রমযান মাস হয়, তা হলে তা হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে পরবর্তী কোন মাস হলেও হবে। আমাদের হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ তার রোযা হয়ে যাবে বলে মত দিয়েছেন। রোযাটা ঠিক রমযান মাস ব্যাপী হোক, কি তার পরবর্তী মাসে হোক। ফিকাহবিদদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য আছে বলে আমরা জানি না। কেউ যদি আন্দাজ-অনুমানের সাহায্যে রমযান মাসের সন্ধান করে, আর শেষ পর্যন্ত কোন মাস সম্পর্কে তার বিজয়ী ধারণা এই হয় যে, সেটাই রমযান মাস, পরে এই ধারণা দৃঢ় প্রত্যয়ে পরিণত হয় এবং সেটির রমযান মাস হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহই না থাকে, তা হলে তার রোযা হয়ে যাবে। ঠিক যেমন কেউ কোন মেঘাচ্ছন্ন দিনে নামাযের সময় জানবার জন্যে চেষ্টা চালায় এবং শেষ পর্যন্ত বিজয়ী ধারণার ভিত্তিতে একটা সময় ঠিক করে নামায পড়ে, পরে তার উপর তার দৃঢ় বিশ্বাসও জন্মে, তাহলে তার এ নামায হয়ে যাবে। আলোচ্য আয়াত فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ যদি জানার প্রয়োজনই প্রকাশ করে, তা হলে তার রোযা হওয়ার পথে কোন প্রতিবন্ধক থাকে না। তা রোযা ফরয হওয়ার জন্যে শর্ত, একথা যদি পূর্বে না-ও জেনে থাকে তার বিলম্বিত হওয়াটাই প্রতিবন্ধক হয় তবু। তা জায়েয হওয়ার কোন দলীল নেই, যা তা প্রমাণ করে। তা জায়েয হবে না বলে যারা মত দিয়েছে, ব্যাপার যদি তা-ই হয়, তা হলে তো যারা দারুল হরব-এর অধিবাসী হওয়ার কারণে নিশ্চিতভাবে মাসগুলো সম্পর্কে জানতে পারে না তাদের উপর রোযা ফরয না হওয়াই উচিত হয়ে পড়ে। কেননা সেও রমযান মাসের আগমনের কথা জানতে পারেনি। এজন্যে তাদের কাযা করতে হবে। সে তো রমযান মাসের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ পায়নি। তা এসেছে বলেও জানতে পারেনি।

যে লোক রমযান মাসের আগমন জানলো না, তা সত্ত্বেও রোযা রাখলো, তাকে সে রোযা কাযা করতে হবে। এ কথায় সব মুসলমানই একমত। তা থেকে বোঝা গেল, রোযা জায়েয হওয়ার জন্যে রমযান মাস সম্পর্কে জানতে পারা শর্ত নয়, যেমন তা কাযা করা ওয়াজিব হওয়ার জন্যে ও সে মাসের আগমন জানা শর্ত নয়।

যার কথা এই মাত্র বললাম, তার অবস্থা যখন এই হয়েছে রমযান মাসের কথা না জানার কারণে, তাই রোযা না থাকার দরুন তা কাযা জরুরী। যখন সে তার চক্ষু তা

দ্বারা প্রত্যক্ষ করবে তখন তার রোযা থাকা জায়েয হবে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্র কথা 'তোমাদের যে লোক মাসটি পেল' এর অর্থ হচ্ছে, সে মাসে লোক রোযা পালনের জন্যে দায়িত্বশীল। তাই মাসটি যে অবস্থায়ই দেখতে পেল তার জন্যে রোযা রাখা জায়েয হবে। সে তো মাসের পর্যবেক্ষক, এ কারণেই সে শরীয়াতের দায়িত্বশীল। অতএব আয়াতটি বাহ্যিক অর্থ তাকে জায়েয করে যদিও সে রমযান মাস শুরু হওয়ার বিষয়ে কিছুই জানে না।

মাসের আগমন না জানলে রোযা রাখা জায়েয হওয়াকে যারা অস্বীকার করে, তারা দলীল হিসেবে পেশ করেছে রাসূলে করীম (স)-এর এই হাদীস ঃ

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ، فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا عِدَةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ -

তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখবে, চাঁদ দেখেই রোযা রাখা বন্ধ করবে। ২৯ তারিখ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে চাঁদ দেখতে না পারলে শাবান মাসকে ত্রিশ দিনে পূর্ণ কর।

তাঁরা বলেছেন, পূর্বাহ্নে চাঁদ দেখেই রোযা রাখতে আদেশ করা হয়েছে, তাই যখন সে তা দেখতে পেল না, তখন বুঝতেই হবে যে, তখনও শাবান মাস আছে। অতএব তার পক্ষে রোযা রাখা জায়েয নয়। কেননা সেদিনটি তো শাবান মাসের। আর শাবান মাসের রোযা কখনই রমযান মাসের রোযার বিকল্প হতে পারে না।

আসলে এই জিনিসও রোযা জায়েয হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। যেমন পরে যদি জানতে পারে যে, সেটা রমযান মাস ছিল তবুও রাখেনি বলে কাযা করা কর্তব্য হবে, তার পথেও কোন প্রতিবন্ধক নেই। না জানার কারণেই সেটা শাবান মাস ধরে নিয়েছিল। পরে যখন জানতে পারল যে, সেটা শাবান মাস নয়, সেটাই ছিল রমযান মাস, তখন সেই মাসের ফরযটা পালনের জন্যে সে আদিষ্ট। তখন তার একমাত্র উপায় রোযা কাযা করা। এ কথাই আমরা শুরুতে বলে এসেছি। অনুরূপভাবে সেই দিনের রোযা—যেদিন বালক পূর্ণ বয়স্ক হল, কাফির মুসলিম হল—অবশ্যই বিবেচ্য হবে। যদি সুস্পষ্ট রূপে জানা যায় যে, তা রযমান মাসের দিন, তা হলে সে রোযা ফরয হিসেবেই আদায় হবে। অন্যথায় তা নফল।

যদি বলা হয়, সেদিন রোযা না রাখলে তা কাযা করা ওয়াজিব। তাই বলে তা জায়েয প্রমাণ করে না যদি সেদিনের রোযা রাখে। কেননা হায়যই রোযা রাখতে দেয়নি, অতএব কাযা করা বাধ্যতামূলক। আর কাযা করা ওয়াজিব হলে তা তার জায়েয হওয়া বোঝায় না।

জবাবে বলা যাবে, রমযান মাস সম্পর্কে জানা না যাওয়াই সেদিন রোযা জায়েয হওয়ার প্রতিবন্ধক। তাই এ তাৎপর্যই রোযা না রাখলে তার কাযা বাধ্যতামূলক হওয়ার প্রতিবন্ধক। যেমন পাগল ও বালক। কেননা তুমি ধারণা করেছ যে, সে মাস প্রত্যক্ষ করেনি, জানতে পারেনি, এটাই তার রোযা জায়েয হওয়ার প্রতিবন্ধক। যে মাস প্রত্যক্ষ

করেনি, তার পক্ষে রোযা কাযা করা জরুরী নয়, যদি রোযা ওয়াজিব হওয়ার হুকুম সীমাবদ্ধ হয় কেবল মাসের প্রত্যক্ষকারীদের মধ্যে, যারা প্রত্যক্ষ করেনি, তাদের জন্যে তা ওয়াজিব না হয়। এই সীমায় এসে রোযা থাকলে তার জায়েয হওয়ার হুকুম এবং না থাকলে তার কাযা করার হুকুম ভিন্ন ভিন্ন হয় না। তবে হায়য-হওয়া নারীর ব্যাপারের সাথে রোযা পালনে বাধ্য হওয়ার হুকুমের কোন সম্পর্ক নেই—তার মাস দেখা ও মাস সম্পর্কে জানার দিক দিয়ে। কেননা তা জানলেও তার পক্ষে রেযা থাকা জায়েয নয়। আর তার রোযা না রাখার দরুন তা কাযা ওয়াজিব হওয়ার সঙ্গেও তার সম্পর্ক নেই। কেননা রোযা ভাঙ্গার ব্যাপারে তার নিজের কোন ভূমিকা নেই। এ কারণেই তার উপর কাযা করার দায়িত্ব চেপে থাকবে, তা পড়ে ও সরে যাবে না। কেননা তার রোযা রাখাই জায়েয নয়।

এতে আরও একটি দিকের হুকুম রয়েছে। কিছু লোক বলে, যে লোক বাড়িতে থাকা অবস্থায় রমযান মাস শুরু হল, পরে সে সফর শুরু করল, তার পক্ষে সে রোযাটা ভাঙ্গা জায়েয নয়। এ পর্যায়ে হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, উবায়দাতা ও আবূ মজলজ থেকেও হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হাসান, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, ইবরাহীম ও শবী বলেছেন, সফরের চলে গিয়ে ইচ্ছা করলে রোযা ভাঙ্গতে পারে। বহু ফিকাহবিদই এই মত প্রকাশ করেছেন। প্রথমোক্ত মতের ফিকাহ্‌বিদগণ দলীল হিসেবে পেশ করেছেন আল্লাহ্‌র এই কথাটি ঃ 'তোমাদের মধ্যে যে লোক মাসটি পাবে, সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে'। এ ব্যক্তি যেহেতু মাসটা পেয়েছে, তাই তার কর্তব্য হচ্ছে তার রোযা পূর্ণ করা। শব্দের বাহ্যিক অর্থেরও দাবি তাই। কিন্তু অন্যদের নিকট এর তাৎপর্য হচ্ছে, তার নিজ বাড়িতে উপস্থিত থাকা অবস্থায় রোযা রাখা বাধ্যতামূলক হওয়া। কেননা তার পর-পরই মুসাফির সংক্রান্ত হুকুম বলা হয়েছে এই ভাষায় ঃ

وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ -

যে লোক রোগী বা বিদেশগামী হবে, তার রোযা রাখার সময় অন্য দিনগুলোতে।

কে মাসের শুরুতে নিজ বাড়িতে ছিল, পরে সফর শুরু করেছে, আর কে মাসের শুরুতেই মুসাফির ছিল, আয়াতে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। এ থেকে বোঝা গেল, উপরোক্ত রোযা রাখার হুকুমটি বাড়িতে উপস্থিত থাকাকালীন, তার পরে সফর কাল সম্পর্কিত নয়। উপরন্তু তারা যা বলেছে, তা-ই যদি তাৎপর্য হয়, তা হলে যে লোক মাসের শুরুতে মুসাফির ও পরে নিজ বাড়িতে উপস্থিত, তার পক্ষে রোযা না-রাখাই অনিবার্য হয়ে পড়ে। আল্লাহ এ কথাটি এই শেষোক্ত আয়াতে বলেছেন। কেননা সে তো মুসাফিরই ছিল। অনুরূপভাবে যে লোক মাসের শুরুতে রোগী ছিল, পরে ভালো হয়ে গেছে, তার জন্যে রোযা না-রাখাই ওয়াজিব হয়ে পড়ে বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে। কেননা এদের একজনের মুসাফির ও অপর জনের রোগী পরিচিতি তো অর্জিত হয়েছে। তাই সফর থেকে ফিরে লোকটির নিজ বাড়িতে অবস্থানকারী হওয়ায় এখনে তার রোযা বাধ্যতামূলক হওয়ার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়নি। বা রোগ সেরে যাওয়ার পর তার রোযা

রাখার পথেও কোন বাধা নেই। রোযা ভাঙ্গার অনুমতি ছিল সফরে বা রোগী অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র কথা 'তোমাদের যে-লোক মাসটি পাবে' সীমাবদ্ধ হচ্ছে নিজ বাড়িতে থাকা অবস্থার মধ্যে। জীবন-চরিত রচয়িতাগণ উল্লেখ করেছেন, মক্কা বিজয়ের বছর সফর শুরুই করেছেন রমযান মাসে। এ সফরের পূর্বে তার রোযা রাখা এবং তার পরে সফরে তা ভাঙ্গা এবং লোকদেরকেও রোযা ভাঙ্গতে আদেশ করা বহু হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত ও সর্বজনবিদিত। তার সনদের উল্লেখের কোন প্রয়োজনই পড়ে না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ -এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বক্তব্য বাড়িতে থাকা অবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তখনই রোযা রাখা বাধ্যতামূলকভাবে ফরয। তখন রোযা ভাঙ্গা যাবে না, না রেখে পারা যাবে না।

আবূ বকর বলেছেন, আমরা এ দীর্ঘ আলোচনায় فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং এ থেকে শরীয়াতের যেসব হুকুম-আহকাম পাওয়া যায়, তা সবই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। এক্ষণে আমরা فَلْيَصُمْهُ শব্দের তাৎপর্য এবং তাতে নিহিত হুকুম আহকাম আলোচনা করব।

আমরা বলব, রোযা দুই প্রকারের। এক—আভিধানিক রোযা আর দ্বিতীয়—শরীয়াতের পারিভাষিক রোযা। আভিধানিক রোযার মূল হল اَلْاِمْسَاكُ নিজেকে বিরত রাখা। তা পানাহার থেকে বিরত রাখা হোক কিংবা অন্য কোন কিছু থেকে। সর্বপ্রকারের 'বিরত রাখা'ই এর অন্তুর্ভুক্ত। আর আভিধারিক অর্থে তা-ই হচ্ছে صَوْمٌ বা صِيَامٌ রোযা। আল্লাহ বলেছেন ঃ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا 'আমি রহমান আল্লাহ্‌র রোযার মানত করেছি। এখানে صَوْمًا বিরত রাখা বা থাকা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং কথা বলা থেকে বিরত থাকা বুঝিয়েছেন। যেমন অপর আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا (مريم : ٢٦)

আজকের দিন আমি কোন মানুষের সাথে কখখনই কথা বলব না।

লাগাম-পরা ঘোড়াকে خَيْلٌ صِيَامٌ বলা হয়। প্রাচীন আরবী কবিতায় এই কথন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবরা বলে ঃ صَوْمٌ النَّهَارَ 'দিন থেকে গেছে।' صَامَتِ اشَّمْسُ عِنْدَ قِيَامَ الظَّهِيْرَةَ দ্বিপ্রহরে সূর্য থেমে গেছে।' অর্থাৎ সূর্য চলা থেকে বিরত হয়ে গেছে, চলছে না। মহাকবি ইমরাইল কায়স বলেছে ঃ اِذَا صَامَ النَّهَارَ। 'দিন যখন থেমে গেছে'। এ সব হচ্ছে আভিধানিক অর্থ। আর শরীয়াতের পরিভাষায় কয়েক প্রকারের বিরত থাকা বোঝায়। তাতে এমন কতগুলো শর্ত আরোপিত হয়েছে, যা আভিধানিক অর্থে আরোপিত হয়নি। শরীয়াতী পরিভাষায় صوم সবকিছু থেকে বিরত থাকার অর্থ গ্রহণ সঙ্গত নয়। কেননা কার্যত তা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা তা বহু সংখ্যক পরস্পর বিরোধিতার শূন্যতায় পড়ে যাওয়া মানুষের জন্যে

অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এমন কি তার পক্ষে স্থির হওয়া সম্ভব হয় না, সম্ভব হয় গতিশীল হওয়া। খাবার গ্রহণকারী হওয়া সম্ভব হয় না, তার ত্যাগকারী হওয়াও নয়। না দণ্ডায়মান হওয়া, না উপবিষ্ট হওয়া, না শয্যাশায়ী হওয়া। কিন্তু তা এক মহা অসম্ভব ব্যাপার। তাই তা বৈধ ও সঙ্গত ধরে নেয়া যায় না। তার ফলে কোন ইবাদত হওয়াই সম্ভবপর হয় না। কাজেই শরীয়াতী পরিভাষায় صوم হবে এক বিশেষ ধরনের বিরত থাকার অর্থে। সর্বপ্রকারের বিরত থাকা তার অর্থ হতে পারে না। তাই মুসলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, পানাহার ও সঙ্গম কাজ থেকে বিরত থাকার দিকটিই রোযার ক্ষেত্রে গ্রহণীয়। সাধারণ ফিকাহবিদগণ সে বিরত থাকার সঙ্গে সঙ্গে ইনজেকশ লওয়া, ঘ্রাণ লওয়া, ইচ্ছাপূর্বক মুখ ভরে বমি করা ইত্যাদি থেকেও বিরত থাকার শর্ত রয়েছে। অনেকে আবার ইনকেজশন ও ঘ্রাণ লওয়ায় রোযা ভাঙ্গে ও কাযা করা প্রয়োজন—এ কথা মনে করেন না। তবে তা বিরল মত। জমহুর ফিকাহবিদ তার বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন। ইচ্ছাপূর্বক বমি করার ব্যাপারটিও তাই। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত মত হচ্ছে, যা ভেতরে যায়, তাতেই রোযা ভেঙ্গে যায়, কিন্তু যা শরীর থেকে বাইরে আসে, তাতে রোযা ভাঙ্গে না। তায়ূস ইকরামা ও বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ বিপরীত মত পোষণ করেন। যে লোক ইচ্ছা করে বমি করেছে তার রোযা কাযা করা দরকার—এ কথা মনে করেন না। প্রবহমান বা জমাট বাঁধা যখম থেকে পেটের মধ্যে যা কিছু পৌঁছে, তাতে রোযা নষ্ট হয় কিনা, এ পর্যায়ে নানা মত প্রকাশিত হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা ও শাফেয়ী বলেছেন, তাকে কাযা করতে হবে। আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদ বলেছেন, কাযা করতে হবে না। হাসান ইবনে সালিহও এই মত দিয়েছেন। রোযায় রক্ত মোক্ষণ (cupping) ত্যাগ করতে হবে কিনা—এ বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। সাধারণ ব্যাপক সংখ্যক ফিকাহবিদ বলেছেন, রক্ত মোক্ষণে রোযা ভাঙ্গে না। আওজায়ী বলেছেন, ভাঙ্গে। পাথরকুচি গলধঃকরণ পর্যায়েও বিভিন্ন মত। হানাফী ফিকাহবিদ, মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন, তাতে রোযা নষ্ট হয়। হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, না, তাতে রোযা ভাঙ্গে না। দুই দাঁতের মধ্যে যে খাদ্য আটকে থাকে তা ইচ্ছা করে খেলে রোযা ভেঙ্গে যাবে কি না তাতেও বিভিন্ন মত রয়েছে। হানাফী ফিকাহবিদগণ, মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন, তাতে রোযা ভাঙ্গে না কাযাও করতে হবে না। হাসান ইবনে জিয়াদ জুফর-এর এ মত বর্ণনা করেছেন, দাঁতের মধ্যে আটকে থাকা জিনিস যদি গোশত (বা মাছ) হয় কিংবা ছাতু 'বা রুটির টুকরা' তার কিছু অংশ জিহ্বার উপর এসে গেলে পর তা যদি গিলে ফেলে সে—যে রোযাদার, তা তার স্মরণেও থাকে, তা হলে তাকে কাযা করতে হবে এবং কাফফারাও দিতে হবে। আবূ ইউসূফ বলেছেন, তাকে কাযা করতে হবে, কাফফারা দিতে হবে না। সওরী বলেছেন, তার রোযা কাযা করাই মুস্তাহাব। হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, রোযাদারের পেটের মধ্যে মাছি ঢুকে গেলেও কাযা করতে হবে। কিন্তু হানাফী ফিকাহবিদ ও মালিক বলেছেন, না, তাকে কাযা করতে হবে না। হায়য হওয়া মেয়েলোকের রোযা সহীহ হয় না।, এ বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। নাপাক শরীর নিয়ে রোযা পালন সম্পর্কেও বিভিন্ন মত। সর্ব সাধারণ ফিকাহবিদগণের

মত হচ্ছে, তাকে রোযা কাযা করতে হবে না। তার রোযা এই নাপাক শরীরেও পূর্ণ হয়ে যাবে। হাসান ইবনে হাই বলেছেন, তার সেই দিনের রোযা কাযা করাই মুস্তাহাব এবং বলছিলেন, সে নফল রোযা রাখবে, যদি নাপাক অবস্থায় তার সকাল হয়। হায়য সম্পন্না স্ত্রীলোক সম্পর্কে বলেছেন, সে যদি রাত্রিবেলা পাক হয়ে যায় ও সকাল পর্যন্ত গোসল না করে, তাহলে তাকে সেদিনের রোযা কাযা করতে হবে। এই সব ক্ষেত্রেই সম্মিলিত মত হচ্ছে, এসব থেকে বিরত থাকাই হচ্ছে রোযা। আবার কতগুলো ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। সর্বসম্মত মত হচ্ছে, যৌন সঙ্গম, আহার ও পান করা—খাদ্য পানীয় থেকে বিরত থাকা-ই হচ্ছে রোযা । এর ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ্‌র কথা ঃ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَاءِكُمْ –

রোযার রাত্রে তোমাদের স্ত্রীদের নিকট যাওয়া (ও সঙ্গম করা) তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে।

فَالْئٰنَ بَاشِرُوْ هُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ – ثُمَّ اَتِمُّو الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ –

এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং আল্লাহ যে স্বাদ গ্রহণ তোমাদের জন্যে জায়েয করে দিয়েছেন, তা আস্বাদন কর। আর রাত্রিবেলা পানাহার কর যতক্ষণ না তোমাদের সম্মুখে রাত্রির বুক থেকে প্রভাতের শেষ আভা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে, তখন এ কাজ ত্যাগ করে রাত্রি পর্যন্ত রোযা সম্পূর্ণ কর।

এ আয়াতে রাত্রিকালে স্ত্রী সঙ্গম ও পানাহার মুবাহ করেছেন সন্ধ্যাকাল থেকে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত। তার পরে রাত্রি পর্যন্ত রোযা সম্পূর্ণ করতে বলেছেন। এ আয়াতের মূল বক্তব্যে দিনের বেলা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে সে সব কাজ, যা রাত্রিবেলা মুবাহ ছিল। আর তা হচ্ছে স্ত্রী-সঙ্গম ও খাওয়া, পান করা। আয়াতের হুকুমেই প্রমাণিত হয়েছে যে, এই তিনটি জিনিস থেকে বিরত থাকাই হচ্ছে শরীয়াতী রোযা পালন। এ তিনটি কাজ ছাড়া অন্য কোন কিছু থেকে বিরত থাকা রোযা নয়, একথার কোন প্রমাণ আয়াতে নেই। তবে তার প্রমাণটা স্থগিত। তার প্রমাণ পাওয়ার উপর নির্ভরশীল। হাদীস ও সুন্নাত এবং জাতির আলিমগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ তিনটি ছাড়াও কোন কোন জিনিস থেকে বিরত থাকা শরীয়াতী রোযার মধ্যে গণ্য। পরেও এ বিষয়ে বিস্তারিত বলা হবে, ইনশাআল্লাহ।

শরীয়াতভিত্তিক এ রোযার বাধ্যতামূলক হওয়ার কয়েকটি শর্ত রয়েছে, যদিও তা বিরত রাখা পর্যায়ে নয়, নয় রোযা পর্যায়ে। তা হচ্ছে ইসলাম ও পূর্ণ বয়স্কতা। কেননা অল্প বয়স্কদেরকে যে রোযা রাখতে বলা হয়নি, তা সর্বসম্মত। কাফিররা যদিও সেজন্যে আদিষ্ট, তা না করলে শাস্তিযোগ্য, তথাপি তাদেরকে যেন দুনিয়ায় শরীয়াতের হুকুম আহকাম

পালন করার নির্দেশই দেয়া হয়নি। কেননা কুফর অবস্থায় রোযা পালন করেনি বলে তাকে কাযা করতে বলা যায় না। স্ত্রীলোকের হায়য থেকে পবিত্র হওয়াও রোযা পালনের শর্ত। সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি, নিজ বাড়িতে অবস্থান ও সুস্থ শরীর হওয়াও রোযার বাধ্যবাধকতার জন্যে শর্ত—এ কয়টি ক্ষেত্রে পরে কাযা করা ফরয। তবে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি থাকার ব্যাপারটি নিয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করা হয়েছে। রমযান মাসে পাগল হওয়া লোকদের সম্পর্কে মনীষিগণের ব্যাখ্যা আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করেছি।

'রোযার নিয়ত সর্বপ্রকারের রোযার সহীহ্ হওয়ার শর্ত।' তা তিন প্রকারের। প্রত্যক্ষ বা ফরয হওয়া রোযা। তা রমযান মাসের রোযা। কোন নির্দিষ্ট দিনে রাখার মানত করা রোযা, নফল রোযা, জিম্মায় চাপা রোযা। নির্দিষ্ট ভাবে ফরয হওয়া রোযা ও নফল রোযায় আগের রাত্রে নিয়ত না করলেও এবং রোযার দিনে যুহরের পূর্বে নিয়ত করলেই জায়েয হবে। জিম্মায় চাপা রোযা আগের রাত্রিতে নিয়ত না করা হলে জায়েয হবে না। জুফর বলেছেন, রমযান মাসের রোযা নিয়ত ছাড়াই জায়েয। মালিক বলেছেন, গোটা মাসের জন্যে একবার নিয়ত করাই যথেষ্ট।

আমরা বলেছি, পাথরকুচি গলধঃকরণে রোযা ভেঙ্গে যায়, তা সাধারণত খাদ্যবস্তু না হওয়া সত্ত্বেও। তা আহার্য নয়, তা ঔষধ-ও নয়। তার ভিত্তি এ আয়াতে ঃ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ। 'পরে তোমরা রাত্রি পর্যন্ত রোযাকে সম্পূর্ণ কর'-এ আয়াত দ্বারা খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ হয়েছে, তা সর্ব প্রকারের খাদ্য সম্পর্কেই সাধারণ নির্দেশ। তাই পাথরকুচি গলধঃকরণ রোযাদারের জন্যে জায়েয হতে পারে না। তবে তা করলে রোযা কাযা করতে হবে, এ বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। এ বিষয়ে সকলে একমত যে, পাথরকুচি গলধঃকরণ নিষেধটি আয়াত থেকেই প্রমাণিত, অতএব তা বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত মনে করতে হবে। তা রোযা রাখার সাধারণ আদেশের মধ্যেই রয়েছে পানাহার ও পাথরকুচি গলধঃকরণের নিষেধ। অন্যান্য সাধারণ খাদ্যবস্তুর মতই। আর এ কারণেই এই সব খাদ্যের ক্ষেত্রেই রোযা কাযা করা ওয়াজিব, এ কথা আয়াত থেকেই প্রমাণিত। পাথরকুচি গেলাও এর মধ্যে রয়েছে।

এই কথা নবী করীম (স)-এর কথা থেকেই প্রমাণিত। তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ اَكَلَ اَوْشَرِبَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ -

যে রোযাদার ভুলবশত পানাহার করবে, তাকে রোযা কাযা করতে হবে না।

এ দৃষ্টিতে ইচ্ছা করে খেলে কাযা ওয়াজিব হওয়ায় যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য আহারের অন্তর্ভুক্ত হবে। ইনজেকশন লওয়া, ভেতরের প্রবহমান বা জমে থাকা যখম থেকে পৌঁছার ব্যাপারে মত গ্রহণের ভিত্তি হচ্ছে। লকীত ইবনে সবরাতা বর্ণিত হাদীস। নবী করীম (স) খুব বেশি করে নাক ধৌত করে ঝাড়তেন, কিন্তু রোযাদার হলে তা করতেন না। তিনি খুব বেশি করে নাকের ভেতরটা ধৌত করে তা ঝাড়তে বলেছেন, তবে রোযার কারণে তা করতে নিষেধ করেছেন। এ থেকে বোঝা গেল, নাকের ভেতর থেকে গলায় বা মগজে যা পৌঁছায়, তা রোযা ভেঙ্গে দেয়। অন্যথায় রোযায় তিনি নাক বেশি করে ঝাড়তে নিষেধ

করতেন না। যদিও অ-রোযায় তিনি তা করতে আদেশ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা পেটে কিছু পৌঁছলেই রোযা কাযা করতে বলেছেন এই দলীলের ভিত্তিতে। তাই তা যতটা রোধ করা সম্ভব তা অবশ্যই করতে চেষ্টা করতে হবে। তা খাদ্য পানীয় পৌঁছার পথে যাক কিংবা মানব দেহের অপর কোন ফাটলের পথে যাক—তা সবই সমান। কেননা আসল লক্ষণীয় হচ্ছে পেটে কিছু পৌঁছা ও তথায় স্থিতি গ্রহণ, যা রোধ করা স্বভাবতই সম্ভব। তবে মাছি, ধোঁয়া, ধূলা-বালি ইত্যাদি যা গলায় প্রবেশ করে, তাতেও রোযা কাযা করা জরুরী হয় না। কেননা এ সবকে প্রতিরোধ করা স্বভাবতই সম্ভব হয় না। মুখ বন্ধ করে রাখলেই যে সেগুলোর প্রবেশ বন্ধ হবে এমন কথা নয়।

যদি বলা হয়, ইমাম আবূ হানীফা الاحليل-এ রোযা ভাঙ্গে ও তার কাযা করা দরকার, একথা মনে করে নি।

জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, তিনি তাতে রোযা ভাঙ্গে, অতএব কাযা করা দরকার মনে করেন নি। কেননা তিনি মনে করেন, তা المثانة এতে পৌঁছে না। এ বিষয়ে তাঁর মত দৃঢ়ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে এ কথা বোঝা যায় যে, তা المثانة -এ পৌঁছলে তাতে রোযা ভেঙ্গে যাবে। তবে আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদ মনে করেন, যা দেহের বহু ছিদ্র থেকে পেটে পৌঁছে যায়, তা মানবদেহে জন্মগতভাবেই রয়েছে। যে লোক ইচ্ছা করে বমি করবে, তার রোযা কাযা করা ওয়াজিব, তার কারণ আছে। ভেতর থেকে যার বমি আসবে, তার কথা আলাদা। ইচ্ছাপূর্বক বমি করলে 'কিয়াস' বলে তার রোযা ভাঙ্গে না, কাযা করতে হবে না। কেননা মূলত পানাহারেই রোযা ভাঙ্গে। আর স্ত্রী সঙ্গমেও। ইবনে আব্বাস তাই বলেছেন, ইচ্ছাপূর্বক বমি করলে রোযা ভাঙ্গবে না। কেননা রোযা ভাঙ্গে ভেতরে কিছু প্রবেশ করলে, যা বের হবে, তাতে রোযা ভাঙ্গার কথা নয়। অযূও ভাঙ্গে কিছু বের হলে, কিছু প্রবেশ করলে ভাঙ্গে না। শরীর থেকে আর যা যা বের হয় তাতেও অযূ নষ্ট হয়। কিন্তু তাতে রোযা ভাঙ্গে না, কাযাও করতে হয় না। এটা সর্বসম্মত মত। তাই বমি বের হওয়া তারই মতো ব্যাপার। যদি তা তার নিজের কাজ হয়, তবুও। তবে হাদীসের মুকাবিলায় এই কিয়াস পরিত্যক্ত। এ বিষয়ে রাসূলে করীম (স)-এর কথা প্রমাণিত। সে কারণে এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ও বুদ্ধি খাটানোর অবকাশ নেই। প্রমাণিত সে হাদীসটি ঈসা ইবনে ইউনুস হিশাম ইবনে হাসসান, মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন, আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يَفْطِرْ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ –

যার ভেতর থেকে বমি আসবে, তার রোযা ভাঙ্গেনি, তার কাযাও করতে হবে না। আর যে ইচ্ছা করে বমি করবে, তাকে রোযা কাযা করতে হবে।

যদি বলা হয়, হিশাম ইবনে হাসসান ইবনে সিরীন সূত্রে বর্ণিত হাদীস অ-রক্ষিত غير محفوظ এ পর্যায়ে ভুলবশত খাওয়ার হাদীসটি সহীহ।

জবাবে বলা যাবে, ঈসা ইবনে ইউনুস এক সাথে দুটি সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। একটি সূত্র হিশাম ইবনে হাসসান থেকে। ঈসা ইবনে ইউনুস ছিকাহ, নির্ভরযোগ্য, তাঁর বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতা সর্বসম্মত। মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, হিফস ইবনে গিয়াস হিশাম সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আওজায়ী ইয়াঈশ ইবনুল ওয়ালীদ—মিদান ইবনে আবূ তালহা আবুদ দারদা সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (স) বমি করলেন। পরে রোযা ভাঙ্গলেন। বললেন, পরে আমি সওবানের সাথে সাক্ষাৎ করি ও এই বিষয়ে তাকে বলি। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি সত্য বলেছ, আমি-ই তার অযূর পানি ঢেলেছিলাম। ওহব ইবনে জরীর—জরীর—ইয়াহইয়া ইবনে আইয়ূব ইয়াযিদ ইবনে আবূ হুবাইব আবূ মরযূক-হুবাইশ কুজালাতা ইবনে উবায়দ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তিনি পানি পান করলেন। আমি বললাম, হে রাসূল! আপনি কি রোযাদার ছিলেন না? বললেন, হ্যাঁ, তবে আমি বমি করেছি। এই হাদীসের মুকাবিলায় ফিকাহ্‌বিদগণ 'কিয়াস' পরিত্যাগ করেছেন।

যদি বলা হয়, বর্ণিত হয়েছে, বমি রোযা ভাঙ্গে না। মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ-মুহাম্মাদ ইবনে কাসীর-সুফিয়ান-যায়দ ইবনে আসলাম-তার একজন সঙ্গী-একজন সাহাবী সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَايُفْطِرُ مَنْ قَاءَ وَلَا مَنِ احْتَلَمَ وَلَا مَنِ احْتَجَمَ –

যে বমি করেছে, যার ইহতিলাম হয়েছে, সে রোযা ভাঙ্গবে না। তবে যার রক্ত মোক্ষণ হয়েছে, সে নয়।

জবাবে বলা হবে, এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে আবান যায়দ ইবনে আসলাম আবূ উবায়দুল্লাহ আস-সানাবিজী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ اَصْبَحَ صَائِمًا فَذَرَعَهُ الْقَىْءُ فَلَمْ يُفْطِرْ، وَمَنْ احْتَلَمَ فَلَمْ يُفْطِرْ، وَمَنِ احْتَجَمَ فَلَمْ يُفْطِرْ –

যে লোক রোযাদার হয়ে সকাল করল, পরে তাকে বমি কাবু করেছে, সে রোযা ভাঙ্গে নাই। যার ইহতিলাম (স্বপ্নে বীর্যপাত) হয়েছে, সে রোযা ভাঙ্গে নাই। যার রক্ত মোক্ষণ করা হয়েছে, সে-ও রোযা ভাঙ্গে নাই।

এই হাদীসে বলা হয়েছে, বমি করলে রোযা ভেঙ্গে যায় না। এই ভাষ্যের মধ্যে তা বলা না হলেও এই অর্থই তা থেকে গ্রহণ করা অনিবার্য ছিল যদিও দুটি হাদীসের একটি অপরটি দ্বারা ফেলে দেয় নি। তা এজন্যে যে, রাসূলে করীম (স) থেকে পরস্পর বিরোধী দুটি হাদীস বর্ণিত হলে এবং বৈপরীত্যকে এড়িয়ে দুটিকেই কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হলে দুটোকেই ব্যবহার করা কর্তব্য। তা কোন একটিকেও অর্থহীন করে দেয়া হয় না। এই প্রেক্ষিতে ফিকাহবিদগণ বলেছেন, বমি যদি মুখ ভর্তির কম পরিমাণে হয়, তা হলে তাতে

রোযা ভাঙ্গবে না। কেননা তা বমি শব্দটির আওতায় আসে না। বিবেচ্য, যদি কারোর জিহ্বায় ঢেকুরের সাথে কিছু বের হয়ে আসে, তবেই তাকে বমি বলা যাবে। আবুল হাসান আল-করখী (রা) মুখভর্তির পরিমাণ নির্ধারণ পর্যায়ে বলেছেন, তা এতটা যে তা মুখে আটকে রাখা যায় না তার পরিমাণ বেশী হওয়ার কারণে। তখনই বলা যাবে, বমি করেছে।

রক্ত মোক্ষণ, ফিকাহবিদগণ বলেছেন, তাতে রোযাদারের রোযা ভাঙ্গে না। কেননা এ পর্যায়ে আসল কথা হচ্ছে, শরীর থেকে কিছু বের হলেই রোযা ভেঙ্গে গেছে বুঝতে হবে, তা নয়। তবে প্রস্রাব, পায়খানা, ঘাম ও দুগ্ধ ইত্যাদি শরীর থেকে বের হলেও এতে রোযা ভেঙ্গে যায় না। অনুরূপভাবে কেউ যদি আহত হয়, দেহে ক্ষত হয়, শিরা কেটে রক্ত মোক্ষণ করা হয়, তা হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে না। সে দিকে দৃষ্টি রেখেই বলা হয়েছে, রক্ত মোক্ষণে حجامة রোযা ভাঙ্গবে না। এটা কিয়াসের ফসল। আর তাছাড়া যখন প্রমাণিত হয়েছে যে, সব কিছু থেকে বিরত থাকাই শরীয়াতসম্মত রোযা নয়, তখন توقيف থেকে যা জানা গেছে তাকেই ভিত্তি করতে হবে, তার সাথে নিজেদের থেকে কিছু যোগ করা জায়েয হতে পারে না। তবে গোটা উম্মত যে যে বিষয়ে একমত হয়েছে, তাকেই চূড়ান্ত ধরে নিতে হবে। রোযাদারের রগ কেটে রক্ত মোক্ষণ করা জায়েয, এ পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্য থেকে একটি হাদীস আবদুল বাকী ইবনে কানে বর্ণনা করেছেন উবাইদ ইবনে শরীক আল-বাজ্জার-আবুল-জামাহির আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ ইবনে আসলাম—তাঁর পিতা—আতা ইবনে ইয়াসার-আবূ সাঈদ খুদরী সূত্রে। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

ثَلَاثٌ لَايُفْطِرْنَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ وَلْاَحْتِلَامُ وَالْحِجَامَةُ –

তিনটি জিনিস রোযাদারের রোযা ভাঙ্গে না ঃ বমি, স্বপ্নে বীর্যপাত এবং রক্ত মোক্ষণ।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ দাঊদ হিফস ইবনে উমার শুবাইয়াযিদ ইবনে আবূ যিয়াদ-মাকসাম ইবনে আব্বাস সূত্রে, রাসূলে করীম (স) একজন রোযাদার ইহরাম বাঁধা ব্যক্তির রক্ত মোক্ষণ করেছেন। আবদুল হাদীস বর্ণনা করেছেন, হুসাইন ইবনে ইসহাক-মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে সহম ঈসা ইবনে ইউনুস—আইয়ূব ইবনে মুহাম্মাদ আল-ইমানী আল-মুসান্না ইবনে আবদুল্লাহ আনাস ইবনে মালিক সূত্রে। তিনি বলেছেন, রমযান মাসের আঠার তারিখ অতি প্রত্যূষে এক ব্যক্তির নিকট গেলেন, সে রক্ত মোক্ষণ করছিল। তখন রাসূলে করীম (স) বললেন, রক্ত মোক্ষণকারী ও যার তা করা হচ্ছে—উভয়ের রোযা ভেঙ্গে গেছে। পরে তাঁর নিকট অপর এক ব্যক্তি এল। তখন তিনি তাকে রমযান মাসে রক্ত মোক্ষণ করাতে নিষেধ করলেন। পরে বললেন ঃ

اِذَا تَبَيَّغَ بِاَحَدِ كُمُ الدَّمُ فَلْيَحْتَجِمْ –

তোমাদের কারোর রক্ত টগবগ করে উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠলে সে যেন মোক্ষণ করিয়ে নেয়।

আবদুল বাকী মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনে হুবাইব আবূ হিসন আল-কূকী ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মায়মুন—আবূ মালিক-হাজ্জাজ-আল হিকাম মাকসাম ইবনে আব্বাস সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, রাসলে করীম (স) রোযাদার অবস্থায় রক্ত মোক্ষণ করিয়েছেন। ফলে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন। এ কারণে তিনি তা অপছন্দ করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে আবূ বকর আবূ দাউদ-আল-কানবী সুলায়মান ইবনুল মুগীরা-সাবিত সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, আনাস বলেছেন ঃ

مَاكُنَّا نَدَعُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ اِلَّا كِرَاهِيَةَ الْجُهْدِ –

আমরা রোযাদারের জন্যে রক্ত মোক্ষণ করা ত্যাগ করতাম না। তবে কষ্টকে অপছন্দ করার দরুন তা করতাম।

যদি কেউ বলে, মকহুল সওবান সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ রক্ত মোক্ষণকারী ও যার তা করা হয়—উভয়েরই রোযা ভেঙ্গে গেছে। আবূ কালাবাতা আবূল আশয়াস শাদ্দাদ ইবনে আওস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বকী নামক স্থানে এক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হল। সে তখন রক্ত মোক্ষণ করছিল। সে আমার হাত ধারণ করেছিল। এটা ছিল রমযান মাসের আঠার তারিখ। তখন রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ 'রক্ত মোক্ষণকারী ও যার তা করা হয়, উভয়েরই রোযা ভেঙ্গে গেছে .... এসব কয়টি হাদীস থেকেই রক্ত মোক্ষণকে রোযা ভঙ্গকারী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

জবাবে বলা যাবে, এ হাদীসটির সহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। মুহাদ্দিসদের মতেও এ হাদীস সহীহ্ নয়। কেননা বর্ণনাকারীদের মধ্যে কিছু লোক হাদীসটি আবূ কালাবাতা আবূ আসমা সওবান সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর কিছু লোক বর্ণনা করেছে আবূ কালাবাতা শাদ্দাদ ইবনে আউস সূত্রে। এটা সপক্ষে বিশৃঙ্খলা ও অবিন্যস্ততা প্রমাণ করে। এর ফলে হাদীসটি দুর্বল হয়ে গেছে। কিন্তু মকহুল বর্ণিত হাদীস-এর মূল একটি গোত্রের অজ্ঞাত (مجهول) প্রধান থেকে এসেছে সওবান সূত্রে। তাছাড়া اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمُحْجُوْمُ। কথাটিতে নির্দিষ্ট কিছু বোঝালেও রোযা রক্ত মোক্ষণের দরুন কার্যক ভেঙ্গে গেছে—এমন কোন ইঙ্গিত নেই। কেননা এ ধরনের কথায় الحجامة। বা রক্ত মোক্ষণের উল্লেখ সে লোক দুজনের পরিচিতি হিসেবে এসেছে। যেমন বলা হয় ঃ اَفْطَرَ الْقَائِمُ وَالْقَاعِدُ 'দাঁড়ানো ব্যক্তি ইফতার করেছে' 'বসে থাকা ব্যক্তি ইফতার করেছে।' اَفْطَرَ زَيْدٌ যায়দ ইফতার করেছে, যখন এ কথার দ্বারা নির্দিষ্ট কাজের দিকে ইশারা হবে। তাহলে শুধু দাঁড়ানোটা রোযা ভাঙ্গা—এমন কোন প্রমাণ নেই। বা এর-ও কোন প্রমাণ নেই যে, যায়দ রোযা ভেঙ্গেছে। اَفْطَرَ وَالْحَاجِمُ الْمَحْجُوْمُ কথাটিও অনুরূপ। এতে দুটি লোকের প্রতি নির্দিষ্টভাবে ইশারা করা হয়েছে। তাতে রক্ত মোক্ষণের কারণে রোযা ভেঙ্গে গেছে, এমন কোন প্রমাণ নেই। এটা খুবই সঙ্গত যে, তিনি সে

দুজনকে এমন অবস্থায় দেখেছেন যে, খাওয়া ইত্যাদির কারণে রোযা ভেঙ্গেছে। তারপরই এই রোযা ভাঙ্গার কথা বলেছেন, তার ইল্লাতের উল্লেখ ব্যতীতই। এ-ও তো হতে পারে যে, তিনি যে দুজনকে দেখেছেন, তারা দুজন লোকের গীবত করতে ব্যস্ত ছিল। পরে বলেছেন যে, তারা দুজন ইফতার করেছে। যেমন ইয়াযিদ ইবনে আবান আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ اَلْغَيْبَةُ تَفْطِرُ الصَّائِمُ 'গবীত রোযাদারের রোযা ভেঙ্গে দেয়।' ফিকাহবিদদের মতে এর অর্থ রোযা থেকে বের হয়ে যাওয়া নয়। তার অর্থ শুধু এতটুকু যে, তাদের রোযার সওয়াব বাতিল হয়ে গেছে। রক্ত মোক্ষক ও রক্ত মোক্ষিত—দুজনের রোযা ভেঙ্গে যাওয়ার কথা হয়ত এই তাৎপর্যের দিক দিয়ে বলেছেন। তাছাড়া আমরা উপরে যেসব হাদীস উদ্ধৃত করেছি, তাতে প্রথমে রোযা রেখে রক্ত মোক্ষণ করতে নিষেধ করা হলেও পরে সে কাজের রুখসত দেয়া হয়েছে। এ-ও হতে পারে যে, রোযাদারের রক্ত মোক্ষণ হলে সে দুর্বল হয়ে পড়তে পারে, এই ভয়ে তা করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন বিদেশ সফরকালে রোযা থাকতে নিষেধ করেছেন যখন এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন তার উপর ছায়াচ্ছন্ন হয়েছে। দাঁতের মধ্য থেকে কোন জিনিস মুখে এলে তা গিলে ফেললে রোযা ভাঙ্গবে না বলা হয়েছে এজন্যে যে, তা কুল্লি করার জন্যে মুখে দেয়া পানির অবশিষ্ট অংশের মত। আর তা যে পেটে যাবে, তা তো জানা কথাই। তাই সেজন্যে কোন দোষ নেই। অনুরূপভাবে মুখে অবশিষ্ট থাকা সব অংশই। যেমন কেউ রাত্রিবেলা ছাতু খেল। অসম্ভব নয়, সকাল বেলা পর্যন্ত তার কিছু কিছু অংশ তার দাঁতের মধ্যে রয়ে গেল। খেলালে তা বের করে কুল্লি করে তা সব বের করে ফেলতে কেউ হয়ত বলে নি, আর সে নিজেও তা করেনি। এ থেকে বোঝা গেল, দাঁতের মধ্য থেকে সে খাদ্যাংশের ব্যাপারে শরীয়াতের কিছু বলার নেই।

যে মাছি পেটের মধ্যে ঢুকে পড়ে, তা তো কেউ ইচ্ছা করে না। তাতে রোযা ভেঙ্গে যাবে না কেননা মানুষের পক্ষে সাধারণত এ থেকে কেউ রেহাই পায় না। মুখটা সব সময় বন্ধ করে রাখা সকলের পক্ষে সব সময় সম্ভব হয় না। মুখ খুলে কথা বলা ও বন্ধ রাখা—এই ভয়ে যে, 'হা' করলেই মুখে মাছি ঢুকে পড়বে ও পেটের মধ্যে চলে যাবে, তাতে রোযা ভেঙ্গে যাবে—সম্ভব হতে পারে না। ধূলিবালি ও ধোঁয়াও গলার মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু তাতে রোযা ভেঙ্গে যেতে পারে না। তবে যে লোক রোযা রেখে মুখের মধ্যে পানি দিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও নাড়াচাড়া করে, তা কিন্তু ভিন্ন অবস্থা। তাতে রোযা নষ্ট হবে। কেননা এটা সাধারণ ও অভ্যাসগত ব্যাপারে মনে করা যায় না। মুখে মাছি পৌঁছে যাওয়ার ব্যাপার এ রকমের নয়। কথা বলার জন্যে মুখ খুললেই তা ঘটে যেতে পারে। কথা বলার সময় মুখ 'হা' করা শুধু স্বভাব-ই নয়, তা ছাড়া কথাই বলা যায় না। এই কারণে আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি সহজতা বিধান করেছেন, দ্বীন-ইসলামের কোন কঠিনতা ও অসুবিধার প্রশ্রয় দেন নি। তাই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ 'তোমাদের উপর দ্বীন পালনে কোন অসুবিধা চাপিয়ে দেন নি।

শরীরের নাপাকিও রোযা সহীহ্ হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। কেননা শরীর নাপাক হয় যে কারণে, তা করার অনুমতি আল্লাহই দিয়েছেন। বলেছেন ঃ

এক্ষণে তোমরা স্বামী-স্ত্রী সঙ্গম কর এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে যে স্বাদ আস্বাদন জায়েয করে দিয়েছেন, তার সন্ধান কর। আর পানাহার কর কালো তমিশ্রার মধ্য থেকে ফজরের শ্বেত আলো ফুটে উঠার সময় পর্যন্ত। অতঃপর তোমরা রাত্রি পর্যন্ত সিয়াম সম্পূর্ণ কর।

সন্ধ্যা রাত থেকে রাতের শেষ পর্যন্তকার সময়ে সঙ্গম করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আর একথা তো জানা-ই আছে যে, রাতের শেষ ভাগে যারা সঙ্গমে লিপ্ত হবে, তা থেকে অবসর পাওয়া পর্যন্ত ফজরের উদয় হয়ে যাবে এবং তারা না-পাক শরীর হয়েই থাকবে। এই লোকদের রোযা সহীহ্ হওয়ার কথা স্বয়ং আল্লাহ্ই বলেছেন ঃ ثُمَّ اَتِمُّوْا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ। অতঃপর তোমরা সিয়ামকে রাত্রি পর্যন্ত সম্পূর্ণ করে দাও।

হযরত আয়েশা ও উম্মে সালমা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) সকাল পর্যন্ত শরীর নাপাক অবস্থায় থাকতেন। কিন্তু শরীরের এই নাপাকি স্বপ্নে বীর্য স্খলনের কারণে ছিল না। পরে সেই দিনটার রোযা পুরা পালন করতেন। বোঝা গেল, শরীরের নাপাকি সিয়াম সহীহ্ হওয়ার পরিপন্থী নয়, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (স) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ اَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُوْ مَنَّ يَوْمَهُ ذَلِكَ -

যে লোক নাপাক শরীরে সকাল পর্যন্ত থাকবে, সে সেই দিনের রোযা রাখবে না।

তবে পরে তিনি যখন হযরত আয়েশা ও উম্মে সালমা বর্ণিত উপরোদ্ধৃত হাদীসের কথা জানলেন, তখন তিনি (হযরত আবূ হুরায়রা) বললেন ঃ

لَاعِلْمَ لِىْ بِهٰذَا اَخْبَرَ نِىْ بِهِ الْفَضَلُ بْنِ عَبَّاسٍ -

আমার বর্ণনা করা হাদীসটি সম্পর্কে আমি ভালো জানি না। ফযল ইবনে আব্বাস আমার নিকট তা বর্ণনা করেছেন।

এ কারণে হযরত আবূ হুরায়রা তাঁর এ সংক্রান্ত ফতোয়া প্রত্যাহার করেছেন বলেও বর্ণিত হয়েছে।

আবদুল বাকী ইসমাঈল ইবনুল ফযল ইবনে শবাবাতা 'আমর ইবনুল হাইসম হিশাম কাতাদাতা সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সেই হাদীস বর্ণনা প্রত্যাহার করেছেন, যাতে এ কথা বর্ণনা করতেন যে, যে লোক সকাল বেলা পর্যন্ত নাপাক শরীরে থাকবে, সে সেই দিনের রোযা রাখবে না। তা ছাড়া হযরত আবূ হুরায়রা কর্তৃক এতদসংক্রান্ত হাদীস যদি সহীও হতো, তাহলে তা হযরত আয়েশা ও উম্মে সালমা (রা) বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী না-ও হতে পারত। তা এ ভাবে যে, সে কথাটা হতো তার সম্পর্কে যে, নাপাকির কারণ সহ সকাল করবে অর্থাৎ সকালে তাঁর স্ত্রীর সাথে যৌন মিলনে সংযুক্ত থাকবে, সে সে দিনের রোযা রাখবে না। তা হলে দুটো হাদীস দুটি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা সম্পর্কিত হতো। আর দুটো হাদীস-ই হলে একই সাথে দুটোকেই কাজে লাগানো যেত। দুটির মধ্যে পারস্পরিক কোন পার্থক্য থাকত না।

যদি বলা হয়, হযরত আয়েশা ও উম্মে সালমা বর্ণিত হাদীস কেবলমাত্র রাসূলে করীম (স)-এর জন্যে এক বিশেষ ব্যবস্থার প্রেক্ষিত সম্পর্কিত, তার উম্মতের জন্যে সে ব্যবস্থার সুযোগ নেই। কেননা তাঁরা দুজন যা বলেছেন, তা নবী করীম (স)-এর একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। আর হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস সর্ব সাধারণ মানুষের জন্যে।

জবাবে বলা যাবে, হযরত আবূ হুরায়রা তাঁর বর্ণনা দ্বারা এই ব্যাপারে সর্ব সাধারণের সাথে নবী করীম (স)-এর অভিন্নতা ও পার্থক্যহীনতা মনে করেছেন। কেননা তিনি হযরত আয়েশা ও উম্মে সালমা বর্ণিত হাদীস যখন শুনতে পেলেন, তখন বললেন لَاعِلْمَ لِىْ بِهٰذَا এই বিষয়ে আমার কিছুই জানা নেই। আমাকে ফযল ইবনে আব্বাস এ খবর দিয়েছেন। তিনি একথা বলেন নি যে, এই দুই মহিলার বর্ণনা আমার বর্ণনার পরিপন্থী নয়। কেননা তাঁদের দুই জনের বর্ণনা একান্তভাবে রাসূলে করীম (স)-এর নিজ সম্পর্কিত। আর আমার বর্ণনা সমস্ত মানুষের জন্যে সাধারণভাবে। এর ফলে প্রশ্নকারীর ব্যাখ্যা অর্থহীন ও বাতিল হয়ে যায়। আর রাসূলে করীম (স) তো সর্ব ব্যাপারেই তাঁর উম্মতের সাথে সম্পূর্ণ অভিন্ন, পার্থক্যহীন শুধু সেই কয়টি ব্যবস্থা ব্যতিরেকে, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্যে বিশেষ করে দিয়েছেন। সে ব্যাপারে তিনি এক ও একক। উম্মতের জন্যে সে বিশেষ ব্যবস্থা تَوقِيف একান্তভাবে আল্লাহ্‌র করা ব্যবস্থা। আর উম্মতের জন্যে নির্দেশ ঃ فَاتَّبِعُوْهُ 'তোমরা তাঁকে অনুসরণ কর, মেনে নাও।' আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ –

তোমাদের জন্যে আল্লাহ্‌র রাসূলে অতীব উত্তম আদর্শ রয়েছে।

এ সব ব্যাপারে আমরা আল্লাহ্‌র বান্দা হিসেবে রমযানের দিনে নিজেদেরকে বিরত রাখি। এ তো সেই রোযা, যার কথা আল্লাহ বলেছেন এই আয়াত ثُمَّ اَتِمُّوْا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ 'অতঃপর তোমরা রাত্র পর্যন্ত রোযা সম্পূর্ণ কর।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ -তে যে রোযা রাখতে বলা হয়েছে, তা যেমন আভিধানিক অর্থে রোযা, তা শরীয়াতের পারিভাষিক রোযাও। আমরা যে বিষয়ে বলেছি, যা থেকে বিরত রাখা হয় না, তা-তার শর্তের অন্তর্ভুক্ত। সেসব শর্ত পাওয়া না গেলে যে রূপ বিরত রাখাকে আমরা রোযা বলেছি, তা শরীয়াতসম্মত রোযা হবে না। আর তা হচ্ছে, মুসলিম হওয়া, পূর্ণ বয়স্ক হওয়া, নিয়ত করা এবং মেয়েলোকের তুহর অবস্থায় থাকা। এসব শর্তের কোন একটি পাওয়া না গেলে তা শরীয়াতসম্মত রোযা হবে না। নিজ বাড়িতে উপস্থিত থাকা ও সুস্থ নিরোগ থাকা—এ দুটি শর্ত হচ্ছে রোযা বাধ্যতামূলক হওয়ার শর্ত। রোগ হলে ও প্রবাসে থাকলে রোযা সহীহ্‌ হওয়ার পথে কোন বাঁধা হয় না। তা ফরয হিসেবে বাধ্যতামূলক হওয়ার পরিপন্থী মাত্র। কেননা তারা দুজন রোযা রাখলে সে রোযা অবশ্যই সহীহ্‌ হবে। রোযা বাধ্যতামূলক হওয়ার জন্যে পূর্ণ বয়স্কতার শর্তের কথা আমরা বলেছি। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

তিনজন লোকের আমলনামায় কিছু লেখা হয় না। নিদ্রিত ব্যক্তি—যতক্ষণ যে ঘুম থেকে জেগে না উঠবে, পাগল—যতক্ষণ ভালো না হয় এবং বালক—যতক্ষণ পূর্ণ বয়স্ক না হয়।

এদের জন্যে যেমন কোন ইবাদতই বাধ্যতামূলক হয় না, তেমনি রোযাও বাধ্যতামূলক হবে না। তবে বালককে রোযা রাখতে বলা হবে শিক্ষাদান ও অভ্যস্ত করে তোলার লক্ষ্যে। যেন আল্লাহ্‌র এ আদেশ পালিত হয় : قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا 'তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারের লোকদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও।'

এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে :

مُرُوْاصِبْيَانَكُمْ بِالصَّلٰوةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوْاهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ –

তোমরা তোমাদের বালক-বালিকাদেরকে সাত বছর বয়সে পৌঁছলে নামায পড়তে বল। আর দশ বছর বয়সের হলে প্রয়োজন হলে সেজন্যে মারধোরও কর।

এটা এজন্যে নয় যে, তারা শরীয়াত পালনে বাধ্য, তাদের উপর শরীয়াত চেপে বসেছে। মূলত তা শিক্ষাদান, প্রশিক্ষণ ও অভ্যস্ত করার উদ্দেশ্যে মাত্র। আর মুসলমান হওয়া—ইসলামে বিশ্বাসী হওয়ার শর্ত এ জন্যে যে, তা হলেই না তার রোযা পালন সহীহ হবে। কেননা মুশরিক কাফিরের কোন ইসলামী ইবাদত পালন সহীহ্ হতে পারে না।

আল্লাহ্ বলেছেন :

لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ –

তুমি শিরক করলে তোমার নেক আমল ছারখার হয়ে যাবে।

অতএব কাফির-মুশরিকের আল্লাহ্‌র নৈকট্যমূলক কোন কাজ সহীহ্ হতে পারে না। তা সহীহ্ হতে পারে কেবল তখন, যদি সে মুমিন হয়। আর বিবেক-বুদ্ধি-পূর্ণতা না হলে নিয়ত ও ইচ্ছাটা পরিপক্ক হতে পারে না। আর তা না হলে রোযা সহীহ্ হতে পারে না নিয়ত না হওয়ার কারণে। রাত্রিবেলা থেকে রোযার নিয়ত হলে পরে তার বিবেক-বুদ্ধি বিলুপ্ত হলে তার রোযা সহীহ হওয়া নিষিদ্ধ হবে না। আমরা বলেছি, নিয়ত রোযা সহীহ হওয়ার শর্ত এ কারণে যে, শরীয়াতসম্মত রোযা হতে পারে তখন, যদি রোযাদার তার রোযা পালনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনে ইচ্ছুক হয়। আর নিয়ত ছাড়া আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জিত হতে পারে না। আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন :

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ –

কুরবানী জন্তুর গোশত ও রক্ত আল্লাহ্‌কে পায় না। বরং আল্লাহ্‌কে পায় তোমাদের তাকওয়া।

আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন, তাকওয়ার শর্ত হচ্ছে আল্লাহ্‌র আদেশের আনুকূল্য সন্ধান। ফরয রোযার জন্যে রোযাদারের মুত্তাকী হওয়া শর্ত। তা নিয়ত ছাড়া পাওয়া যেতে পারে

না। কেননা তাকওয়া আল্লাহ্র আদেশের আনুকূল্য সন্ধান ছাড়া পাওয়া সম্ভব নয়। সেজন্যে মনে স্পষ্ট তীব্র ইচ্ছাও বাসনা জাগতে হবে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ –

লোকদেরকে কেবলমাত্র এই আদেশ-ই দেয়া হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্র ইবাদত করবে আনুগত্যকে একমাত্র তাঁরই জন্যে খালেস করে দিয়ে।

আর দ্বীনকে তাঁরই জন্যে খালেস করা সম্ভব ইবাদত দ্বারা শুধু তাঁকে পাওয়ার ইচ্ছা হলে, তাঁরই সন্তুষ্টি পাওয়ার আগ্রহী হলে এবং তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে পাওয়ার ইচ্ছা আদপেই না হলে। নিয়তের সাহায্যে ফরয ইবাদতসমূহ সহীহ হওয়ার প্রাসঙ্গিক মৌলনীতি হচ্ছে এগুলোই। মুসলমানদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতদ্বৈততা নেই যে, নামায, যাকাত, হজ্জ ও কাফফারা ইত্যাদির শর্ত হচ্ছে সেজন্যে নিয়ত জাগিয়ে তোলা। কেননা ফরযসমূহ তো উদ্দেশ্যমূলক, শুধু ফরয কাজটা করে দেয়াই যথেষ্ট নয়। অতএব রোযা কাজটির হুকুম এই ইল্লাতের দরুনই লক্ষ্যভুক্ত।

যদি বলা হয়, রোযা ও অন্যান্য ফরয কাজে নিয়ত শর্ত হওয়ার পক্ষে যত দলীলই পেশ করা হল, তাহারাত—পবিত্রতা অর্জনেও সেই শর্তসমূহই রয়েছে। কেননা তা-ও একটি ফরয যাবতীয় ফরযের মধ্যে।

জবাবে বলা হবে, যা ধারণা করা হয়েছে, ব্যাপারটি তা নয়। কেননা তাহারাত—শুধু তাহারাত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে কোন ফরয কাজ নয়। তা অন্য উদ্দেশ্য সফল করার মানসে ফরয। তাতেই তা ফরয। আমাদেরকে বলা হয়েছে, 'তাহারাত' অর্জন না করে নামায পড়বে না। এর অর্থ, নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জন না করে নামায পড় না, লজ্জা স্থান আবৃত না করে নামায পড় না। এই তাহারাত ও লজ্জাস্থান আবৃতকরণ নিজস্বভাবে কোন ফরয নয়। কাজেই এ দুটির জন্যে কোন নিয়তের প্রয়োজন হয় না। নিয়ত যখন অন্য কাজের জন্যে শর্ত, তা নিজস্বভাবে ফরয নয়, তাই তা কোনরূপ নিয়ত ছাড়াই হতে পারে, আমরা এই যা বললাম, তাতে উদ্দেশ্য পূর্ণ ফরযসমূহ আলাদা হয়ে গেল, আর অন্য কাজের জন্যে শর্ত হিসেবে যা ফরয, তা-ও আলাদা হয়ে গেল। তা নিজস্বভাবে ফরয নয়। পানি দ্বারা তাহারাত অর্জন অন্য কাজের জন্যে শর্ত। তা অন্য কোন কাজের বিকল্প বা বদলও নয়। এজন্যে তাতে নিয়ত বাধ্যতামূলক নয়। এই কারণে তায়াম্মুমেও নিয়ত বাধ্যতামূলক ওয়াজিব নয়। কেননা তা অন্য কাজের বিকল্প। তাই নিয়ত তার সাথে যুক্ত না হলে তা 'তাহারাত' হবে না। কেননা তা মৌলিক ভাবে কোন তাহারাত নয়, তা অন্য একটি কাজের পরিবর্তে করা হয় মাত্র। মুসলিম উম্মত এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, প্রত্যেকটি রোযা ব্যক্তির যিম্মায় দেয়া ফরয। অতএব তার সহীহ্ হওয়ার জন্যে নিয়ত করা শর্ত। রমযান মাসের রোযার নিয়ত শর্ত হওয়ায় তার সহীহ্ হওয়ার জন্যে জরুরী। ইমাম জুফর রমযান মাসের রোযাকে তাহারাতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে করেছেন নিয়ত জরুরী না হওয়ার দিক দিয়ে। তার কারণ বলেছেন, তাহারাত ফরযরূপে ধার্যকৃত কয়েকটি নির্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিক দিয়ে। নির্দিষ্ট সময়ে ফরয হওয়ার দিক দিয়ে রোযা তার সাথে

সাদৃশ্যপূর্ণ। সমগ্র ফিকাহবিদের মতে তা অনুরূপ ব্যাপার নয়। কেননা তাহারাত-এর 'ইল্লাত' হিসেবে যার উল্লেখ হয়েছে, তা রোযায় অনুপস্থিত। কেননা তাহারাত তো নির্দিষ্ট কয়েকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করাকে 'ইল্লাত' ধরা হয়েছে। রোযায় এই তাৎপর্য নেই। কেননা তা কোন নির্দিষ্ট স্থানে রক্ষিত নয়। তা নির্দিষ্ট সময়ে স্থাপিত কোন নির্দিষ্ট স্থানে নয়। এই 'ইল্লাত'টা তওয়াফের সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা তা-ও নির্দিষ্ট স্থানে ফরয। কোন ব্যক্তি যদি কুরবানীর দিন কাবার চারপাশে তার কোন দেনাদারের পেছনে দৌড়ায়, তাহলে সে 'তওয়াফে যিয়ারত' করেছে বলা যাবে না। সেখানে ও সাফা-মারওয়ায় যদি কেউ লোকদেরকে পানি পান করায়, তাহলে তাতে তার ফরয বা ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে না। এ 'ইল্লাত'টা তওয়াফ ও সাঈ'র উপর প্রভাবশীল ও কার্যকর হবে না। তা থেকে প্রকাশিত হল যে, যেখানে তা অনুপস্থিত সেখানে তার হুকুম আরো বেশিভাবে কার্যকর হবে না। তাছাড়া তাহারাত ও রোযা এক ও অভিন্ন নয়। পূর্বে যেমন বলেছি, তাহারাত নিজস্ব কারণে ফরয নয়, তা অন্য কাজের জন্যে শর্ত মাত্র। তা-ও বিকল্প হিসেবে নয়। তাই তাতে নিয়ত শর্ত হওয়া ওয়াজিব নয়। যেমন বলা হয়েছে ঃ তুমি নামায পড়বে কেবল তখন যখন তুমি নাপাকি نجاست و حدث থেকে পবিত্র। তুমি নামায পড়বে লজ্জাস্থান আবৃত করে। (নাপাক দূর না করে ও লজ্জাস্থান আবৃত না করে নামায পড়বে না)। নাজাসাত ধৌত করা—গোসল করার এবং লজ্জাস্থান আবৃতকরণে নিয়ত শর্ত নয়। পানি দ্বারা তাহারাত অর্জনও এরূপ।

কিন্তু রোযা মৌলিকভাবেই উদ্দেশ্যপূর্ণ ও ফরয, অন্যান্য যাবতীয় ফরয-এর মতই। তাই তা সহীহ্ হওয়ার জন্যে নিয়ত জরুরী শর্ত। এতে আরও একটি তাৎপর্য রয়েছে। তা হচ্ছে, আমরা জানি, রোযা দুই প্রকারের। একটি আভিধানিক অর্থের রোযা আর অপরটি শরীয়াতের পারিভাষিক রোযা। এদুটির একটি অপরটি থেকে আলাদা হয় নিয়তের ভিত্তিতে। সেই সাথে সে সব শর্ত সহকারে, যার উল্লেখ ইতিপূর্বে আমরা করেছি। আর নিয়ত না পাওয়া গেলে রোযা হয়ে যাবে আভিধানিক অর্থে রোযা। তাতে শরীয়াতের কোন দিক থাকবে না। এই কারণে রমযান মাসের রোযায় নিয়তের শর্ত করা হয়েছে। রমযান ছাড়া অন্য সময় যদি কেউ বিরত থাকার কাজ করে, যেমন করে রোযাদার বিরত থাকে, আর তার রোযার নিয়ত না হয়, তাহলে শরীয়াতের রোযা হবে না। নফল রোযা ও শরীয়াতভিত্তিক রোযা সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে সেজন্যে আগের রাতে নিয়ত না করার দিকে দিয়ে। নিয়ত ব্যতিরেকে নফল রোযাদার যদি নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকার কাজ করে, তাহলে রমযানের রোযাও সেরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। রমযান মাসে যে লোক কয়েকদিন বেহুঁশ হয়ে থাকে, ইমাম জুফর তাকে 'রোযাদার' গণ্য করেছেন। কেননা সেও তো পানাহার করেনি, বিরত থাকার কাজটি করেছে। বস্তুত এরূপ কথা যে বলে, সে একটি অত্যন্ত খারাপ কথা বলে।

পূর্বে আমরা বলেছি, রমযানের রোযায় প্রত্যেক দিন আগে রাতে বা সেদিনের সূর্যের পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পূর্বে নতুন করে নিয়ত করা জরুরী। তার কারণ, রমযানের রোযা নিয়ত ছাড়া সহীহ্ হয় না। মাসের নিয়ত করা জরুরী হলে দ্বিতীয় দিনও অনুরূপ

নিয়ত করা জরুরী হবে। কেননা সে দিনটি একটি রাতের কারণে রোযার বাইরে চলে গেছে। যদি বাইরে চলে গিয়ে থাকে, তাহলে তাকে আবার তার মধ্যে নিয়ে আসার জন্যে নিয়তের প্রয়োজন। ইমাম মালিক বলেছেন, নির্দিষ্টভাবে রোযা ফরয হওয়া প্রমাণিত না হলে তা আগের রাত্রিতে নিয়ত না করা হলে রোযা সহীহ্ হবে না। আর যা নির্দিষ্ট সময়ে ফরয, রোযাদার হিসেবে সেই সময়টাও তার জানা ছিল, তাহলে এর দরুন সিয়ামের নিয়ত না করলেও চলবে। যদি কেউ বলে ঃ আল্লাহ্র জন্যে আমার কর্তব্য ক্রমাগতভাবে একটি মাসকাল রোযা রাখা, আর এই বলে সে প্রথম দিনের রোযা রাখলো, তার জন্যে পরবর্তী দিনগুলোর রোযা নিয়ত ছাড়াই জায়েয হবে। লাইস ইবনে সাদও এ মতই দিয়েছেন। সওরী বলেছেন, নফল রোযার নিয়ত দিনের শেষে করলেও যথেষ্ট হবে। ইবরাহীম নখ্য়ী বলেছেন, সামনের কাজের সুফল সে পাবে। হাসান ইবনে সালিহরও সেই মত। সওরী বলেছেন, রমযান মাসের রোযার জন্যে আগের রাতের নিয়ত করা জরুরী। আওজায়ী বলেছেন, অর্ধদিনের পরে নিয়ত করলেও রমযানের রোযার জন্যে যথেষ্ট হবে। শাফেয়ী বলেছেন, রাত্রিতে নিয়ত না করলে রমযানের প্রত্যেক দিনের ফরয রোযা হবে না। তবে দিনের সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার পূর্বে নিয়ত করলে নফল রোযা সহীহ্ হয়ে যাবে। সমস্ত মাসের রোযার জন্যে একটি রোযাকে শামিল করার জন্যেও তো নিয়তের প্রয়োজন। কিন্তু সেই প্রবেশের জন্যেও নিয়তের দরকার। তাই দ্বিতীয় দিনের জন্যে নতুন করে নিয়ত করতে হবে প্রথম দিনের মতই।

যদি বলা হয়, প্রথম দিনের নিয়তই গোটা মাসের রোযার নিয়তের জন্যে যথেষ্ট। যেমন নামাযের শুরুতে একটি নিয়তের দ্বারা গোটা নামায সহীহ্ হয়ে যায়। প্রতি রাক'আতে নতুন করে নিয়তের প্রয়োজন হয় না। তাহলে দুটির সমন্বয়কারী অর্থ হচ্ছে, একই নামায তার বিভিন্ন রাক'আত দ্বারা ভাঙচুর হয় না, তেমনি রমযান মাসের সব রোযাও একই নিয়তের দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে, দিনের বিভিন্নতায় সে নিয়ত চুরমার হয়ে যাবে না।

জবাবে বলা যাবে, গোটা মাসের রোযার জন্যে একটি নিয়ত যথেষ্ট হলে সমগ্র জীবনের রোযার জন্যেও একটি নিয়তের যথেষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু তা বাতিল কথা। প্রত্যেক বছরের রমযান মাসের প্রথম দিনের রোযার জন্যে নতুন করে নিয়ত জরুরী। সেই নিয়তটি গোটা মাসের সবগুলো দিনের রোযার জন্যে অনুরূপভাবে যথেষ্ট হবে না, প্রত্যেক দিনের রোযার জন্যে নতুন করে নিয়তের প্রয়োজন হবে। যেমন করে সমগ্র জীবনের রোযার জন্যে এক বছরের রোযার নিয়ত যথেষ্ট হবে না। নামাযের সাথে তার সাদৃশ্য স্থাপন সম্পূর্ণ অর্থহীন। কেননা গোটা নামাযের জন্যে একটি নিয়ত যথেষ্ট হয় এ কারণে যে, তা একবারের তাহরিমা বাঁধার দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে, প্রত্যেক রাকআতের জন্যে আলাদা আলাদা তাহরিমা বাঁধার দরকার হয় না। কেননা সে নামাযের কোন অংশ বাদ দিয়ে অপর অংশ সহীহ্ হয় না। ফলে এক নামাযের সবগুলো রাক'আত সেই একই তাহরিমার অধীন পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। তার কোন রাক'আত বাদ দিয়ে নামায শেষ করলে গোটা নামাযটাই বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু রমযান মাসের একটি দিনের রোযা যদি কোন

কারণে ভেঙ্গে যায়, তা হলে সমগ্র মাসের সবগুলো রোযা বাতিল হয়ে যাবে না। অন্য দিক দিয়ে বলা যায়, নামাযের প্রথম রাক'আত পড়ার পর নামাযী নামাযের বাইরে চলে যায় না, তাই নতুন করে আবার নিয়তের প্রয়োজন হয় না দ্বিতীয় রাক'আতে প্রবেশ করার জন্যে। কেননা নিয়ত তো নতুন করে প্রবেশ করার জন্যে জরুরী হয়। তাই রোযার মাঝখানে রাত এসে গেলে রোযাদার রোযার বাইরে চলে যায়। তাই দ্বিতীয় দিনের রোযায় প্রবেশ করার জন্যে আবার নিয়তের প্রয়োজন। এজন্যেই নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اِذَا اَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هٰهُنَا وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ –

এখানে রাত এল ও সূর্য অস্তমিত হলে রোযাদার রোযা ভাঙ্গবে।

প্রথম দিনের রোযা থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় দিনের রোযায় প্রবেশ লাভ করার জন্যে নতুন করে নিয়ত করতে হবে। আর তা নতুন করে নিয়ত না করা হলে সহীহ হবে না।

হানাফী ফিকাহবিদগণ প্রত্যেক দিনের রোযার জন্যে আগের রাতে নিয়ত না করলেও রোযা হয়ে যাবে বলেছেন, যদি সেই দিনের সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার পূর্বেই নিয়ত করা হয়। তার দলীল হচ্ছে ঃ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

অতএব তোমাদের মধ্যে যে লোকই মাসটি পাবে, সে-ই যেন রোযা রাখে।

যে লোক মাসটি পেল, সে-ই রোযা রাখার জন্যে আদিষ্ট। যা করতে বলা হয়েছে, তা করলেই তার শুভ কর্মফল সে পাবে। আর হাদীসের দলীল হচ্ছে সেই বর্ণনা, যা নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি আশুরার দিনে মাওয়ালীদের নিকট লোক পাঠালেন এই ঘোষণা দেয়ার জন্যে যে, যে খেয়েছে সে যেন আর না খায় (খাওয়া থেকে বিরত থাকে) আর যে খায়নি, সে যেন দিনের অবশিষ্ট সময়টার রোযা পালন করে। এও বর্ণিত হয়েছে যে, যারা খাওয়ার কাজটা করে ফেলেছিল, তাদেরকে রোযা কাযা করার আদেশ করেছেন।

আবদুল বাকী ইবনে কানে আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুসলিম, মুহাম্মাদ ইবনে মিসহাল, ইয়াযীদ ইবনে রুবাই, শুবা, কাতাদাহ, আবদুর রহমান ইবনে সালামাতা তাঁর চাচা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, আমি আশুরার দিন নবী করীম (স)-এর খিদমতে হাযির হলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

اَصُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هذَا قَالُوْا لاَ قَالَ فَاَتِمُّوْا يَوْمَكُمْ هذَا وَاقْضُوْا –

তোমরা কি তোমাদের আজকের দিনে রোযা রেখেছ? লোকেরা বলল ঃ না। বললেন, তাহলে তোমাদের এই দিনটিকে পূর্ণ কর এবং কাযা কর।

এ হাদীসটি থেকে দুটি অর্থ বোঝা যায়। একটি—আশুরার দিনের রোযা প্রথমে ফরয

ছিল। এ কারণেই নবী করীম (স) কাযা করার হুকুম দিয়েছিলেন, যারা তখন খাবার খেয়েছিল তাদেরকে। আর দ্বিতীয়—যারা তখন খেয়েছিল এবং যারা খায়নি তাদের মধ্যে তিনি পার্থক্য করেছেন। যারা তখন খাবার খেয়েছিল, তাদের আর না খেতে আদেশ করলেন এবং বললেন, কাযা করতে হবে। আর যারা খাবার তখনও খায়নি, তাদেরকে রোযা রাখতে বলেছেন। বোঝা গেল, যা একটা নির্দিষ্ট সময়ে ফরয ছিল, তা ছিল রোযা। তাতে বিগত রাতে নিয়ত করা ছিল না। বোঝা গেল, রাতে নিয়ত না করলেও রোযা হবে। কেননা বিগত রাতে নতুন করে নিয়ত করা যদি রোযার সহীহ্ হওয়ার জন্যে শর্ত হতো, তাহলে দিনের বেলা রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন না। তাদের রোযা সহীহ্ না হওয়া ও তাদের উপর কাযা ফরয হওয়ার দিক দিয়ে তারা নিশ্চয়ই খাবার-খাওয়া লোকদের মতই হয়ে যেত। যা বললাম, তা থেকে প্রমাণিত হল যে, নির্দিষ্টভাবে রোযা সহীহ্ হওয়ার জন্যে আগের রাত থেকে নিয়ত নতুন করে করা শর্ত নয়। দিনের কোন এক সময় নতুন করে নিয়ত সম্পূর্ণ জায়েয।

যদি বলা হয়, বিগত রাতে নিয়ত না করা জায়েয হয়েছে এজন্যে যে, সেই সময়ের পূর্বে রোযা ফরয-ই ছিল না। তা ফরয এবং রাখা বাধ্যতামূলক—একথা লোকেরা জানতেই পেরেছিল দিনের বেলার একটি সময়ে। এই কারণে আগের রাতে নিয়ত না করা সত্ত্বেও রোযা জায়েয হয়েছিল। কিন্তু রোযা ফরয—একথা জানা ও প্রমাণিত হওয়ার পর আগের রাতে নিয়ত না করা সঙ্গত হতে পারে না।

জবাবে বলা যাবে, রোযা সহীহ্ হওয়ার জন্যে আগের রাতে নতুন করে নিয়ত করা শর্ত হলে তা না করা অবস্থায় নিশ্চয়ই তা সহীহ্ হতো না। যেমন খাওয়া বন্ধ করা রোযা সহীহ্ হওয়ার জন্যে শর্ত, তাই খাওয়া রোযা সহীহ্ হওয়ার প্রতিবন্ধক। আর যে রোযার ফরয হওয়ার হুকুম আগে জানা গেছে এবং যার ফরয হওয়ার কথা জানা গেছে দিনের বেলার কোন এক সময়ে—এদুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য করা যায় না। নবী করীম (স) খাওয়া লোকদেরকে আর খেতে নিষেধ করলেন এবং তাদের সকলকে রোযা কাযা করতে আদেশ করলেন, কেননা খাওয়া বন্ধ করা রোযা সহীহ্ হওয়ার শর্ত। যারা বিগত রাতে নিয়ত করেনি তাদেরকে রোযা কাযা করার আদেশ করেন নি, দিনের কোন এক সময়ে রোযা শুরু করায় ও তাদের রোযা সহীহ্ হওয়ার হুকুম দিয়েছেন, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নির্দিষ্ট দিনের রোযায় আগের রাতে নিয়ত নতুন করে করা শর্ত নয়। এ ঘটনা তার দৃষ্টান্তসমূহের মূল ভিত্তিরূপে পরিগণিত হয়েছে। এভাবে মানুষ নির্দিষ্ট দিনের রোযাকে নিজের উপর ফরয করে নেয়া এবং দিনের বেলা—সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়ার পূর্বে নিয়ত করলেই তার রোযা সহীহ্ প্রমাণিত হতে পারে।

যদি বলা হয়, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার কারণে আশুরার রোযা মনসূখ হয়ে গেছে। তা হলে মনসূখ হয়ে যাওয়াকে কি করে সেই রোযার ব্যাপারে দলীল বানানো যেতে পারে, যা ফরয রূপে প্রমাণিত, প্রতিষ্ঠিত ও এখন কার্যকর।

জবাবে বলা যাবে, আশুরার রোযা যদিও ফরয হিসেবে মনসূখ হয়ে গেছে; কিন্তু

দ্বীনের ব্যাপারে একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে তা অবশ্যই কাজ করতে পারে। কিবলা হিসেবে বায়তুল মাকদিসের কিবলাত্ব মনসূখ হয়ে গেছে; কিন্তু নামাযের বিধানসমূহ তো মনসূখ হয়ে যায়নি। আল্লাহ্‌র এ কথাকে দলীল হিসেবে পেশ করা তার মনসূখ হওয়ার দরুন নিষিদ্ধ হয়ে যায়নি। সে কথা হল ঃ فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ 'অতএব তোমরা পড় কুরআনের যে অংশ পড়া তোমার পক্ষে সহজ ও সম্ভব হয়। এতে কুরআনের যে কোন অংশ পড়ার পূর্ণ ইখতিয়ার প্রমাণিত হয়েছে এবং তা এখনও বাকী আছে যদিও তা রাত্রিকালীন নামাযের ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল। বলা হয়েছে—সূর্যের পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার আগেই নিয়ত করলে তা যথেষ্ট হবে। কিন্তু তার পরে করলে রোযা জায়েয হবে না। কেননা কোন কোন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) মাওয়ালীদের নিকট লোক পাঠিয়ে বলেছিলেন, যারা খাদ্য গ্রহণ করে ফেলেছে, তারা যেন আর না খায়। আর যারা খাবার খায়নি তারা এখন থেকে রোযা রাখবে, এ খাওয়া ও সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়ার পূর্বের ব্যাপার। তার পরে খাবারের উল্লেখ দুটি কারণে হতে পারে। হয় তদ্দ্বারা সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়ার পূর্বের খাদ্য গ্রহণ বুঝিয়েছে অথবা তাদেরকে বলা হয়েছে যে, নিয়ত জায়েয হওয়াটা সম্পর্কিত হচ্ছে সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়ার পূর্বে তার অস্ত হওয়ার সাথে, সেই সময়, যখন খাবারকে أعد বলা হয়। অন্যাথায় শুধু খাওয়ার কথা বলা হতো, খাদ্যের উল্লেখ হতো না যদি সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়ার পূর্বে ও পরের হুকুম অভিন্ন হতো। শব্দের এই ফায়দাটা যখন লাভ করা যায়—কেননা রাসূল (স) ব্যবহৃত কোন শব্দ ফায়দাহীন হতে পারে না—রোযার সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়ার পূর্বে ও পরের মধ্যে পার্থক্য হওয়া অবশ্যম্ভাবী। নফল নামাযে আগের রাতে নিয়ত না করার অনুমতি হয়েছে একটি হাদীসের ভিত্তিতে। আবদুল বাকী ইবনে কানে ইসমাঈল ইবনুল ফযল ইবনে মূসা মুসলিম ইবনে আবদুর রহমান আসসুলামী আল বলখী—উমর ইবনে হারুন-ইয়াকুব ইবনে আতা-তাঁর পিতা আতা-ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকেট হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হল, নবী করীম (স) সকাল বেলায়ও রোযার নিয়ত করেন নি। পরে তা শুরু করতেন ও রোযা রাখতেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ রাসূলে করীম (স) আমাদের নিকট এসে বলতেন, তোমাদের নিকট কিছু খাবার আছে ? যদি খাবার থাকত, (তাহলে তিনি তা খেতেন) নতুবা বলতেন, তাহলে এখন থেকে আমি রোযাদার।

যদি বলা হয়, রাত্র থেকে রোযার নিয়ত ঠিক করা না হলে এবং সকাল পর্যন্ত তা না করলেও দিনের একটা অংশ তিনি অ-রোযাদার হিসেবে কাটিয়েছেন। তার ফলে তিনি খাবার গ্রহণকারী হয়ে গেলেন যেন। ফলে তাঁর সেদিনের রোযা তো হল না ?

জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, দিনের কোন সময়ে রোযা শুরু করার ঘটনা রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত আছে। ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। তাঁরা দিনের অতীত হয়ে যাওয়া অংশকে নিয়তহীন হওয়া সত্ত্বেও তাঁর রোযা সহীহ হওয়ার প্রতিবন্ধক মনে করেন নি। তাই নফল রোযা সহীহ হওয়ার প্রতিবন্ধকতায় দিনের প্রথম অংশের খাবার গ্রহণের সমতুল্য মনে করা হয় নি। অনুরূপভাবে নির্দিষ্ট দিনে রোযার নিয়ত না থাকাকে তা শুরু করার প্রতিবন্ধক নয় বলে মনে করা হয়েছে। দিনের শুরুতে নিয়ত না হওয়াকে

খাদ্য গ্রহণের সমতুল্য মনে করা হয়নি। যেমন নফল তা তার হুকুম হয়ে যায়নি। উপরন্তু রাত্র থেকেই যদি রোযার নিয়ত করা হতো, পরে সে নিয়ত না থাকত, তা হলে তার এই নিয়ত না থাকা তার রোযার প্রতিবন্ধক হতে পারেনি। আর তার স্থিতির জন্যে নিয়ত সহকারে থাকাও শর্তরূপে গণ্য হয়নি। এ কারণে কোন কোন রোযায় দিনের প্রথমাংশে নিয়ত না থাকাকে জায়েয মনে করা হয়েছে। দলীল থেকে তা-ই প্রমাণিত হয়। আর তা তার রোযার সহীহ হওয়ার প্রতিবন্ধক হয়নি। দিনের প্রথমাংশে খাওয়া ত্যাগ করল, পরে দিনের শেষভাগে খাবার খেল, তাতে তার রোযা নষ্ট হয়ে গেল। খাওয়াটা নিয়ত না থাকার সমান হল না। শুরুতে খাওয়া ও তাতে স্থিত থাকা অভিন্ন হয়ে গেল। তাতে নিয়তের ব্যাপারটি বিভিন্ন হয়ে গেল। এ কারণে দুটি ভিন্ন ভিন্ন হল। আমাদের ছাড়া অন্যরা তা হতে নিষেধ হল না কিছু। দিনের প্রথমে রোযা, পরে দিনের কোন অংশে তার নিয়ত করা হলে দিনের অতীত সময়টাও রোযার হুকুমের অধীন গণ্য হবে, যেমন করে তাকে রোযা মনে করা হবে নিয়ত না করা সত্ত্বেও।

যদি বলা হয়, নিয়ত ছাড়া, নিয়তকে আনুসঙ্গিক না বানিয়ে যখন নামাযে প্রবেশ করা যায় না, তাহলে রোযার প্রবেশও নিয়ত ছাড়া হওয়া উচিত নয় ?

জবাবে বলা যাবে, একথা ঠিক নয়; বরং ভুল। কেননা যে লোক আগের রাত্রে রোযার নিয়ত করল, পরে সে ঘুমাল, নিদ্রিতাবস্থায়ই তার সকাল হল, তার রোযা সহীহ্ হওয়া নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে কোনই মতপার্থক্য নেই। তার রোযা সম্পূর্ণ, সহীহ্, রোযায় প্রবেশ কালে তার সাথে নিয়ত যুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও। যদি কেউ নামাযের নিয়ত করে, তারপর সে অন্য কাজে মশগুল হয়ে যায়, তার পরে এসে তাহ্‌রিমা বাঁধে, তাহলে নামাযে প্রবেশ মুহূর্তে নতুন করে নিয়ত না করলে তার নামায সহীহ হবে না। কিন্তু রোযায় দাখিল হওয়ার জন্যে তার তাৎক্ষণিক নিয়ত হওয়া যখন সর্বসম্মতভাবেই শর্ত নয়, নামাযে দাখিল হওয়ার জন্যে তার তাৎক্ষণিক নিয়ত হওয়া শর্ত, তাই রোযাকে এ দিক দিয়ে নামাযের ন্যায় মনে করা ঠিক হবে না। নামাযে দাখিল হওয়ার জন্যে তার শুরুতে তাৎক্ষণিক নিয়ত হওয়া একান্তই জরুরী। নিয়তের ব্যাপারে নামাযকে রোযার সাথে তুলনা করা সহীহ হতে পারে না। উপরন্তু নবী করীম (স) থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি নফল রোযা দিনের কোন এক সময়ে শুরু করে দিতেন। ফিকাহবিদগণ এ বর্ণনাকে কবুল করেছেন, তারা এর ভিত্তিতে ফিকহী মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা এ বিষয়েও একমত হয়েছেন যে, নফল নামাযে তাৎক্ষণিক নিয়ত ছাড়া প্রবেশ করা সহীহ হবে না। ফলে আমরা এ থেকে জানতে পারলাম যে, রোযার নিয়ত নামাযের নিয়তের মত গণ্য হবে না, তুল্য নয়, আমরা যে দিক দিয়ে আলোচনা করলাম সে দিক থেকে। কিন্তু যে রোযা নিজ যিম্মায় ও নির্দিষ্ট সময়ে ওয়াজিব করা হয়েছে, অথচ যা ফরয নয়, তাতে আগের রাত্রে নিয়ত না করা জায়েয নয়। এ কথার ভিত্তি হচ্ছে হযরত হাফসা (রা) বর্ণিত হাদীস। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ لَاصِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ 'আগের রাত্রে যে লোক নিয়ত দৃঢ় করেনি, তার রোযা হবে না।' এই কথার সাধারণ ও

ব্যাপক তাৎপর্যের দাবি হচ্ছে আগের রাত্রিতেই নিয়ত করতে হবে সর্বপ্রকারের রোযার। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনের রোযা ও নফল রোযায় যখন প্রমাণ পাওয়া গেছে এর ব্যতিক্রমের, তখন সেই দলীল আমরা মেনে নিয়েছি এবং মোটামুটি সর্ব প্রকারের রোযা থেকে সেই রোযাকে বিশেষীকৃত করেছি। অপর রোযাসমূহের ক্ষেত্রে আমরা উক্ত হাদীসের কথাকে প্রয়োগ করেছি। পর-পর দুই মাসের রোযা ও রমযানের রোযার কাযা তা থেকে ভিন্ন কিছু নয়। কেননা পরপর দুই মাসের রোযা অনির্দিষ্ট, যখনই ইচ্ছা তা 'শুরু' করা যেতে পারে, যখনই শুরু করা হবে, তাই হবে তার ফরয সময়। ফলে তা যিম্মায় লওয়া সব রোযার মতই হয়ে গেল।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ আয়াত থেকে যে সব হুকুম-আহকাম পাওয়া যায়, তার মধ্যে একটি হচ্ছে, রোযা তার জন্যে বাধ্যতামূলক, যে এ মাসটি পাবে। আর মাসটি পাওয়া তিন পর্যায়ে গণ্য হতে পারে। একটি হচ্ছে রোযার মাস এসেছে একথা জানতে পারা। আরবী ভাষায় বলা হয় ঃ شَاهَدْتُ كَذَا وَكَذَا 'আমি এই-এই পর্যবেক্ষণ করেছি।' দ্বিতীয়—নিজ বাড়িতে উপস্থিত থাকা। যেমন কথা-বার্তায়ই বলা হয়। মুকীম ও মুসাফির, শাহেদ ও গায়েব। তৃতীয় লোকটি এমন হবে যে, তার উপর শরীয়াত পালনের দায়িত্ব চেপেছে অর্থাৎ পূর্ণ বয়স্ক হতে হবে। ايام। هدود। 'নির্দিষ্ট দিনগুলোর রোযা' বলে যে দিনগুলোকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, উক্ত আয়াত তা মনসূখ করে দিয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, পূর্বে এই দিনগুলোর রোযা ফরয ছিল, পরে তা উক্ত আয়াতের দ্বারা মনসূখ হয়ে গেছে। সুস্থ ও নিজ বাড়িতে উপস্থিত ব্যক্তির জন্যে রোযা ও ফিদিয়া দেয়ার মাঝে যে-কোন একটি করার যে ইখতিয়ার ছিল, তাও বাতিল হয়ে গেছে। এ কথাও জানা গেছে যে, যে লোক একাকী নতুন চাঁদ দেখবে, তার জন্যে তার রোযা রাখা বাধ্যতামূলক। রমযানের প্রথম দিন সকালে যে লোক জানতে পারল যে, মাস শুরু হয়ে গেছে কিংবা যে লোক অসুস্থ রোগী ছিল, এক্ষণে ভালো হয়ে গেছে, কিন্তু খাদ্য-পানীয় এখনও গ্রহণ করেনি; অথবা যে ছিল মুসাফির, এখনে বাড়িতে ফিরে এসেছে, তারা সকলেই নিজ নিজ রোযা রাখতে বাধ্য। কেননা তারা সকলে রমযান মাস প্রত্যক্ষকারী। একথাও জানা গেছে যে, সিয়াম ফরয কেবল ও বিশেষভাবে তারই জন্যে যে মাসটিকে প্রত্যক্ষ করেছে—যে তা করেনি, তার জন্যে নয়। যার পক্ষে শরীয়াতই এখন পর্যন্ত ফরয হয়নি কিংবা বাড়িতে অবস্থানকারী নয়, বিদেশ সফরে রয়েছে, কিংবা রমযান মাসের আগমন-সম্পর্কে জানতেই পারেনি, তার জন্যে রোযা রাখা বাধ্যতামূলক নয়। এ ফায়দাটাও পাওয়া গেছে যে, এই ফরয রোযার জন্যে একটা মাস নির্দিষ্ট হতে হবে। তা আগে নিয়ে আসাও জায়েয হবে না, জায়েয হবে না তা পিছিয়ে দেয়া—যে সে মাসকে প্রত্যক্ষ করেছে তার পক্ষে। রোযা বাধ্যতামূলক হওয়ার শর্তে মাসের কিছু অংশ লক্ষ্য, গোটা মাস নয়। কাফির রমযানের কোন অংশে কোন দিন ইসলাম কবুল করলে, বালক পূর্ণ বয়স্কতা লাভ করলে, অবশিষ্ট দিনগুলোর রোযা রাখাই তার কর্তব্য। এ ফায়দাও আমাদের লাভ হয়েছে যে, যে লোক নফল রোযার নিয়ত

করেছে, তা-ই তারজন্যে যথেষ্ট। কেননা রোযা রাখার শর্তহীন আদেশ হয়েছে, কোন বিশেষ গুণ দ্বারা তাকে বিশেষিত করা হয়নি। কোন শর্তের কয়েদ লাগানো হয়নি। তাই রোযা যেভাবেই রাখা হবে, তা-ই বৈধ হবে। এই আয়াতটিকে দলীল বানিয়েছে যে বলেছে, রমযান মাস আসার খবর না জেনেই যে-লোক রোযা রেখেছে, তার জন্যে সে রোযা জায়েয হবে না। যার উপর রমযান মাস এসে গেছে, সে নিজ বাড়িতে অবস্থান আছে, পরে সে বিদেশ যাত্রা শুরু করেছে, সে যেন সে দিনের রোযা না ভাঙ্গে। কেননা সে তো উক্ত আয়াতের আওতার মধ্যে এসে গেছে। আমরা উক্ত আয়াত থেকে এ সব তত্ত্ব ও মাস'আলা জানতে পেরেছি। এ আয়াতে আরও অনেক তত্ত্ব ও মাসআলা নিহিত থাকা অসম্ভব নয়, আমাদের ইলম হয়ত তা আয়ত্ত করতে পারেনি। অন্য সময় হয়ত আমরাই তা জানতে পারি অথবা অন্য লোকেরা এ আয়াতটি থেকে হয়ত আরও বহু হুকুম-আহকাম বের করবেন, তা কিছু মাত্র অসম্ভব নয়। আর فَلْيَصُمْهُ শব্দটি থেকে আমরা অনেক তত্ত্বই পেয়েছি, যার উল্লেখ ইতিপূর্বেই আমরা করেছি। বলেছি, রোযা থাকা অবস্থায় কি কি জিনিস থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে, সেসব বিষয়ে সর্বসম্মত মত স্থিরকৃত হয়েছে। কিছু কিছু বিষয়ে অবশ্য ভিন্ন মতও আছে। তার শর্তসমূহও আমরা উল্লেখ করেছি, যদিও তা মূল ও আসল রোগী সম্পর্কিত কথা নয়। রোগী ও বিদেশ যাত্রী সংক্রান্ত মাস'আলাও আমরা আল্লাহ্র সাহায্য ও অনুগ্রহে বলে এসেছি।

## মাস পাওয়ার অবস্থা

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ –

যে লোক রমযান মাস পেল, সে যেন সেই মাসটি ধরে রোযা রাখে।

বলেছেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ –

লোকেরা তোমাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল—তা লোকদের জন্যে সময় ও হজ্জ-এর তারিখের ঘোষক ও নির্ধারক।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, সুলায়মান ইবনে দাউদ, হাম্মাদ, আইউব, নাফে ইবনে উমর সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ মাস উনত্রিশ দিনে। তোমরা চাঁদ না দেখে রোযা রাখবে না, চাদ না দেখে রোযা ভাঙ্গবে না। যদি (ঐ তারিখ) তোমাদের উপর মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তা হলে তার পরিমাণ ঠিক কর। হযরত ইবনে উমর (রা) শাবান মাসের উনত্রিশ তারিখ হলেই চাঁদ দেখতে চেষ্টা করতেন। দেখতে পেলে পরের দিন থেকেই রোযা শুরু করতেন। যদি দেখতে না পেতেন অথচ কোন মেঘ আড়াল করেনি কিংবা কোন কুণ্ঠা তা হলে সকালে রোযা রাখতেন না। যদি মেঘের আড়ালের কারণে চাঁদ দেখতে না পেতেন বা কোন কুণ্ঠা

আড়াল করত তা হলে সকাল বেলা রোযাদার হয়েই দেখা দিতেন। বলেছেন, ইবনে উমর (রা) জনগণের সাথে একত্রিত হয়েই ইফতার করতেন এবং এ ব্যাপারে কোন হিসেব গ্রহণ করতেন না।

আবূ বকর (রা) বলেছেন, নবী করীম (স)-এর কথা ঃ তোমরা চাঁদ দেখে রোযা থাকো.... "আল্লাহ্র লোকেরা তোমাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বল—তা লোকদের সময় ও হজ্জ্ব নির্ধারণের মাধ্যম"-এ কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আয়াতটির এ তাৎপর্যে মুসলমানগণ সম্পূর্ণ একমত। আর হাদীসটি হচ্ছে রমযানের রোযা ফরয হওয়ায় চাঁদের ভূমিকা প্রসঙ্গে। বোঝা গেল, নতুন চাঁদ দেখাটাই হল রমযানের মাস পাওয়া। আল্লাহ্র কথাঃ 'লোকেরা তোমাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে' থেকেই তা প্রমাণিত। প্রমাণিত এভাবে যে, যে রাত্রে নতুন চাঁদ দেখা যাবে, তা পরবর্তী মাসের রাত, বিগত মাসের নয়।

রাসূলে করীম (স)-এর কথা فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهٗ এর তাৎপর্য পর্যায়ে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। কিছু সংখ্যক লোক বলেছেন, এ কথাটিতে চন্দ্রের বিভিন্ন মনযিল বোঝানো হয়েছে। চন্দ্রের স্থান যদি মেঘ ও কুয়াশার আড়ালে পড়ে গিয়ে না থাকে, বরং তা স্পষ্ট দেখা যায়, তা হলে হুকুম হবে যে, চাঁদ দেখা গিয়েছে, রোযা থাকতে হবে, রোযা ভাঙ্গা যাবে না। অন্য কোন অবস্থা হলে 'চাঁদ দেখা গেছে' বলা যাবে না। অন্যান্যরা বলেছেন, প্রথমোক্ত অবস্থায় শাবান মাস ত্রিশ দিনের ধরতে হবে। (আর ত্রিশ দিনের বেশী যেহেতু চান্দ্র মাস হয় না, তাই তার পর থেকেই রমযান মাস হবে)।

প্রথম ব্যাখ্যা গণ্য হওয়ার যোগ্য নয়। কেননা চন্দ্রের মনযিলের ব্যাপার তো জ্যোতির্বিদদের ব্যাপার। চন্দ্রের বিভিন্ন মনযিল ও স্থান সম্পর্কে যারা জানে, রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে তাদেরই দ্বারস্থ হতে হবে। কিন্তু তা আল্লাহ্র কথা ঃ 'লোকেরা—হে নবী তোমাকে নতুন চাঁদসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বলে দাও, তা লোকদের জন্যে সময়ের নির্ধারক'—এর পরিপন্থী। আয়াতে চাঁদ দেখার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এটা তো সকল মানুষের জন্যে বাধ্যতামূলক ইবাদত। তাই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এমন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া উচিত নয় যা কেবলমাত্র বিশেষ শ্রেণীর লোকেরাই জানে সর্বসাধরণ জানে না। আর সেই বিশেষ মুষ্টিমেয় লোকদের কথায় সকলের হৃদয় সান্ত্বনা না-ও পেতে পারে।

তবে উক্ত আয়াতের শেষোক্ত দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি সহীহ্। সর্ব সাধারণ ফিকাহ্বিদদের তা-ই মত। হযরত ইবনে উমর (রা) এ হাদীসটির বর্ণনাকারী। হাদীসে তাঁর থেকে এ-ও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি এ হিসেব মেনে নিতেন না। রাসূলে কথা ঃ فَاقْدُرُوْا لَهٗ এই কথার আর একটি তাৎপর্য বলা হয়েছে,তা কোন ব্যাখ্যাদান নয়; বরং তা একটি হাদীসের কথা। হাদীসটি আবদুল বাকী ইবনে কানে' মুহাম্মাদ ইবনুল আব্বাস আল মুয়াদ্দিব গুরাইহ ইবনে নুমান ফুলাইহ ইবনে সুলায়মান নাফে ইবনে উমর সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ঃ 'রাসূলে করীম (স)-এর নিকট রমযান মাসের উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন ঃ

لَاتَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، فَانْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا ثَلَاثِيْنَ -

তোমরা রমযানের চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রাখবে না। (শাবান মাসের ঊনত্রিশ তারিখ) তোমাদের উপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে থাকলে তোমরা সে মাসটিকে ত্রিশ দিনের পরিমাণ করবে।

এ হাদীসটি রাসূলের কথা فَاقْدُرُوْا لَهُ -এর ব্যাখ্য ও অর্থ স্পষ্ট বলে দিয়েছেন। ফলে ব্যাখ্যাকারীদের ব্যাখ্যা প্রত্যাহৃত হল। অপর একটি বর্ণনাও তাদের ব্যাখ্যাকে বাতিল প্রমাণ করেছে। বর্ণনাটি হাম্মাদ ইবনে সালমা-সামাক ইবনে হরব ইকরামা-ইবনে আব্বাস সূত্রে এসেছে। বলা হয়েছে, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ، فَانْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ اَوْقَتَرَةٌ فَعَدُّوْا ثَلَاثِيْنَ -

তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখবে, রোযা রাখা বন্ধও করবে সেই চাঁদ দেখে, যদি তোমাদের ও চাঁদ দেখার মাঝে মেঘ বা কুয়াশা আড়াল হয়ে দাঁড়ায় (আর সে কারণে চাঁদ দেখতে না পার) তাহলে মাসে ত্রিশ দিন গণনা কর।

তাহলে রাসূলে করীম (স) ত্রিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর থেকেই রোযা রাখতে শুরু করে দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন। অবশ্য যদি লোকদেরও চাঁদের মাঝে মেঘ বা কুয়াশা প্রতিবন্ধক না হয়। তা সেই লোকের কথা মেনে নিতেও বাধ্য করে না, যে বলেছিল যে, আমাদের ও চাঁদের মাঝখানে কোন মেঘ আড়াল হয়ে না দাঁড়ালে আমরা অবশ্যই তা দেখতাম।

এ পর্যায়ে একটি বর্ণনা এসেছে, যা আরও স্পষ্ট কথা বলেছে। তা আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে আহমাদ ইবনে ফারেস ইউনূস ইবনে হুরায়রা আবূ দাউদ তায়ালিসী আবূ আওয়ানাতা সামাক ইকরামা ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

صُوْمُوْا رَمَضَانَ لِرُؤْيَتِهِ فَانْ حَالَ بَيْنَكُمْ غَمَامَةٌ اَوْضَبَابَةٌ فَاكْمِلُوْا عِدَّةَ شَهْرِ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ وَلَا تَسْتَقْبِلُوْا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ -

তোমরা রমযান মাসে রোযা রাখো তার চাঁদ দেখে। যদি তোমাদের মাঝে কোন মেঘাচ্ছন্নতা বা ধুলিস্তর কুয়াশা আড়াল হয়ে পড়ে, তা হলে তোমরা শাবান মাস ত্রিশ দিনের মেয়াদে পূর্ণ কর। আর তোমরা শাবান মাসের একদিন রোযা রেখে রমযানকে অগ্রে নিয়ে এসো না।

এ হাদীস কোন প্রতিবন্ধকতার কারণে রমযান মাসে চাঁদ দেখতে না পেলে শাবান মাসকে ত্রিশ দিনের বানাবার আদেশ দিয়েছেন। কাজেই যারা চন্দ্রের মনযিলের হিসেব

করতে বলেছেন এবং জ্যোর্তিবিদদের নিকট থেকে চাঁদের খবর জানতে বলেছেন, শরীয়াতে সে কথার কোনই মূল্য নেই, তা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

এ ব্যাপারে ইজতিহাদ করারও কিছু নেই। কেননা এ বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ স্পষ্ট কথা বলেছে। ফিকাহবিদদের ইজমাও রয়েছে। রাসূলের কথা ঃ 'তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখবে, চাঁদ দেখেই রোযা রাখা বন্ধ করবে, যদি তোমাদের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহলে শাবান মাস ত্রিশদিন গণনা কর। এটাই এ ব্যাপারে ভিত্তি হয়ে আছে। হ্যাঁ, তার পূর্বে চাঁদ দেখা গেলে অন্য কথা। তবে যে কোন মাসের শেষ দিন (উনত্রিশ তারিখ) আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলেই সে মাসকে ত্রিশদিনের মাস বানানো আমাদের কর্তব্য। এটা প্রত্যেক মাসেই করা যাবে, বিশেষ করে যে মাসের সাথে শরীয়াতের কোন হুকুমের সম্পর্ক রয়েছে, সে মাসে তো তা-ই করণীয়। অবশ্য উনত্রিশ তারিখে চাঁদ দেখা গেলে সে মাস ত্রিশদিনের কম উনত্রিশ দিনের হবে। এ নীতির ভিত্তিতে আমাদের ফিকাহবিদগণ বলেছেন ঃ যে লোক তার ঘর দশ মাসের ভাড়ায় দিয়েছে তা কোন কোন মাসের কারণে নয় মাস হয়ে যাবে চাঁদের কারণে—একমাস ত্রিশদিনে প্রথম মাসটি পূর্ণ হবে, মাসের শেষের তুলনায় তার কমতির পরিমাণ অনুযায়ী। কেননা প্রথম মাস চাঁদ ছাড়াই শুরু হবে। পরে সে মাসকে ত্রিশদিনে পূর্ণ করা হবে। অন্যান্য মাসও এই চাঁদের কারণে। অন্যরা তা গণ্য করবে না। তাঁরা বলেছেন, মাসের প্রথম দিনই যদি ভাড়ায় দিত তাহলে সব মাসই চাঁদ অনুযায়ী হতো।

## চাঁদ দেখার সাক্ষ্য

চাঁদ দেখার সাক্ষ্যের ব্যাপারে নানা মত রয়েছে। আমাদের মাযহাবের ফিকাহবিদগণ একত্রিত হয়ে বলেছেন, রমযান মাসের চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে যদি আকাশে কোন প্রতিবন্ধক থাকে তবে। যদি আকাশে কোনরূপ প্রতিবন্ধক না থাকে, তাহলে একজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না। তখন বহু কয়জনের সাক্ষ্য জরুরী হবে। কেননা একটি বিষয়ে বহু সংখ্যক লোক সাক্ষ্য দিলে সে বিষয়ে 'ইলম' লাভ হয়। ইমাম আবূ ইউসূফ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি এ ব্যাপারে পঞ্চাশ জনের সীমা নির্ধারণ করেছেন। শওয়াল ও যিলহজ্জ মাসের নতুন চাঁদ সম্পর্কেও এ কথা, যদি আসমানে কোন আড়াল বা বাঁধা না থাকে। আকাশে কোন প্রতিবন্ধক থাকলে দুজন বিশ্বস্ত ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী সাক্ষ্য ছাড়া ইতিবাচক ভাবে কিছু গ্রহণ করা যাবে না। অধিকার প্রমানের জন্যেও এই রকম দুজনের সাক্ষ্যই প্রয়োজনীয় হয়ে যাবে। মালিক, সওরী, আওজায়ী, লাইস, আল-হাসান ইবনে হাই ও উবায়দুল্লাহ বলেছেন, রমযান ও শওয়াল মাসের চাঁদ দেখার ব্যাপারে দুজন বিশ্বস্ত ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর কম গ্রহণযোগ্য নয়। মুজানী শাফেয়ীর মত বর্ণনা করেছেন, রমযানের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য যদি একজন বিশ্বস্ত ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি দেয়, তা হলে আমি মনে করি, তা কবুল করা উচিত। কেননা এ পর্যায়ে একটি হাদীস এসেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে সতর্কতার নীতি ও 'কিয়াস' হচ্ছে দুজন

সাক্ষীর কম গৃহীত হওয়া উচিত নয়। তবে শওয়ালের চাঁদ-দেখা প্রমাণের জন্যে দুজন বিশ্বস্ত ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী অবশ্যই পেতে হবে।

আবূ বকর বলেছেন, আমাদের হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ বহু সংখ্যক লোকের চাঁদ দেখার শর্ত করেছেন, আকাশ যদি উন্মুক্ত থাকে, তা হলে। তবেই না 'ইলম' হাসিল হতে পারে তাদের দেয়া সংবাদ থেকে। এটা ফরয এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজন ব্যাপক ও সাধারণ। জনগণকে চাঁদের সন্ধানে লিপ্ত হতে আদেশও করা হয়েছে। তাই বহু লোক চাঁদ দেখতে চেষ্টিত হবে, আকাশেও কোন আড়াল বা প্রতিবন্ধক নেই, সকলেরই লক্ষ্য ও উদ্যোগ চাঁদ দেখার দিকেই নিবদ্ধ কিন্তু খুব সংখ্যক লোক চাঁদ দেখতে পেল, অবশিষ্টরা দেখল না, তাদের দৃষ্টিশক্তি স্বচ্ছ বাধাও কিছু নেই। এরূপ অবস্থায় চাঁদ দেখার কথা বলল অল্প সংখ্যক লোক, সকলে বলল না। তা বিশ্বাস্য হতে পারে না। সহজেই বলা যায়, তারা ভুল করেছে, প্রকৃতপক্ষে তারা চাঁদ দেখেনি। তারা হয়ত কোন কাল্পনিক জিনিস দেখে তাকে চাঁদ মনে করে বসেছে অথবা ইচ্ছা করেই মিথ্যা কথা বলছে। এটা কিছু মাত্র অসম্ভব নয়। এ এক নির্ভুল মৌল নীতি। তা সত্য বলে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি অবশ্যই মেনে নেবে। শরীয়াতের ব্যাপার এরই উপর ভিত্তিশীল। এ ক্ষেত্রে ভুল করা হলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে। নাস্তিক আল্লাহ্‌দ্রোহীরা সংশয় সৃষ্টি করতে পারে, সাধারণ লোকদেরকে ধোঁকা দিতে পারে, যারা কম বিশ্বাসী তারা প্রতারিত হতে পারে।

এ কারণে আমাদের ফিকাহবিদগণ বলেছেন, শরীয়াতের যেসব ব্যাপার জনগণের সাথে সম্পর্কিত, তার ব্যাপক প্রচারই তার প্রমাণের একমাত্র উপায়। তাতে বিশ্বাস্য ইলম অর্জিত হতে পারে। এ ধরনের ব্যাপার 'খবরে ওয়াহিদ' দ্বারা প্রমাণিত হওয়া উচিত নয়। যেমন পুরুষাঙ্গ স্পর্শকরণে অযূ ফরয হওয়া, নারী স্পর্শে উযূ ফরয হওয়া, অগ্নিদগ্ধ কিছু খেলে অযূ ফরয হওয়া এবং বিসমিল্লাহ না বলে অযূ করা ইত্যাদি। এসব ব্যাপার যখন এক সাধারণ রীতিতে পরিণত হয়েছে, তার অসংখ্য দৃষ্টান্তও রয়েছে। তখন এসব ব্যাপারে আল্লাহ্‌র হুকুমটা তওকীফ পর্যায়ে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তবে এ বিষয়ে নবী করীম (স)-এর নিকট বাণী পৌঁছেছে এবং তার উপর সকল মানুষকে থামিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, আর সকলেই যখন তা জেনে নিয়েছে, তখন তার বর্ণনা ত্যাগ করা এবং একজনের বর্ণনাকে যথেষ্ট মনে করা উচিত নয়। কেননা তারা সকলেই তা বর্ণনার জন্যে আদিষ্ট। তাদের প্রতি যা বর্ণিত হয়েছে, তা তাদের সকলেরই উপর হুজ্জাত—অকাট্য দলীল। যেখানে সে হুজ্জাত—দলীল উপস্থাপন প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রকে বিনষ্ট করা আদৌ সঙ্গত নয়। এ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, এ সব ব্যাপারে এবং অনুরূপ অন্যান্য ব্যাপারে নবী করীম (স) থেকে তওকীফ হয়নি। অবশ্য এটা হতে পারে যে, তাঁর থেকে একটা কথা এসেছে, যার বহু কয়টি অর্থ হতে পারে। তার বর্ণনাকারী একক ব্যক্তিগণ সেটিকে তাদের ধারণা অনুযায়ী প্রয়োগ করেছে। অন্যভাবে প্রয়োগ করেনি। যেমন পুরুষাঙ্গ স্পর্শকরণে অযূ করা জরুরী হওয়া। হতে পারে তাঁর আসল বক্তব্য শুধু হাত ধৌতকরণ। যেমন রাসূলে করীম (স)-এর অপর একটি কথা এই মর্মে রয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ اَنْ يُدْخِلَهَا فِى الْاِنَاءِ فَاِنَّهُ لَا يَدْرِى اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ -

তোমাদের কেউ যখন নিদ্রা থেকে জেগে উঠবে, তখন তার হাত তিনবার ধুবে পাত্রে হাত ঢুকাবার পূর্বে। কেননা তার হাত রাত্রিবেলা কোথায় কোথায় বিচরণ করেছে, তা তো জানা নেই।

উসূলিল ফিকাহ্-এ এর মৌল আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। এ মৌলনীতি হারানোর ফলে এক শ্রেণীর লোকদের উপর সংশয় প্রবল হয়ে উঠেছে রাসূলের কথা গুরুত্ব সহকারে ধারণ করার দরুন। তারা বলেছে, রাসূলের কথা একজন ব্যক্তির উপর যথাযথভাবে অকাট্য দলীল, মুসলিম উম্মতের জন্যে তাকে খলীফা বানানো হয়েছে আর উম্মত তা গোপন করেছে। ফলে তারা হেদায়েতের পথ হারিয়ে ফেলেছে, অন্যদেরকেও গুমরাহ করেছে। ইসলামী শরীয়াতের বড় বড় কতগুলো বিধান তারা প্রত্যাখান করেছে। এতে তারা এমন কতগুলো জিনিসের দাবি করেছে যার বাস্তবতা কিছুই নেই। স্থিতিও নেই। দলবদ্ধভাবে তার বর্ণনা করার দিক দিয়েও নয়। একক বর্ণনার দিক দিয়েও নয়। ফলে তারা নাস্তিক ও ইসলাম বিরোধী মতের ধারক লোকদের জন্যে শরীয়াতে এমন কিছুর দাবি করার পথ সুগম করে দিয়েছে, যা আসলে শরীয়াতের জিনিস নয়। ইসমাঈলী ও যিন্দীক লোকদের জন্যে গোপন করা জিনিসকে কুয়াশাচ্ছন্ন করে রাখার সাহসী বানিয়ে দিয়েছে। যেমন 'ইমামত'-এর ব্যাপার। তা অত্যন্ত বিরাট ও অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ, জনগণের মনে তার বিশেষ স্থান রয়েছে। তারা তাকে গোপন রাখা জায়েয বলে ঘোষণা করেছে। তারা তাদের জন্যে নতুন শরীয়াত রচনা করেছে। বলেছে, তা গোপন জিনিস। তারা এর এমন এমন ব্যাখ্যা দিয়েছে, যে সম্পর্কে তারা দাবি করেছে যে, এটাই ইমামের দেয়া ব্যাখ্যা। এর ফলে তারা লোকদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে এবং তাদেরকে 'খজমীয়া' মাযহাবে দাখিল করে দিয়েছে, দাখিল করেছে সাবেয়ীনের মধ্যে। তাদের কথা যারা যারা কবুল করেছে, তারা যেমন যেমন দাবি করেছে, তেমনই তারা করেছে। তাদের মুখে নতি স্বীকার করে তাদের মনস্তুষ্টি সাধনের চেষ্টা করেছে। আমরা জানি, এই গোপনতাকে বৈধ মনে করা হলে নবী করীম (স)-এর নবুয়ত স্থিতিশীল থাকতে পারে না। তাঁর মুজিযাসমূহ সহীহ মানা হয় না। সব নবী রাসূলেরই অবস্থা একই রকম হয়ে যায়—তাদের সংখ্যা যা-ই হোক না কেন। ইমামত গোপন করা যদি জায়েয-ই হয় তাহলে সম্পূর্ণ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণও বৈধ হয়ে যায়। কেননা যে জিনিস গোপন রাখা যায়, তার নামে ভিত্তিহীন খবর রটনাও অবশ্যই বৈধ হয়ে যায়। তখন নবীর মুজিযা সংক্রান্ত সংবাদদাতাগণ-ও যে মিথ্যার আশ্রয় নেন নি, তা জোর করে বলা যায় না। তারাও তো মিথ্যা বলতে পারেন, যেমন করে ওরা ইমামের নামে অকাট্য দলীল মিথ্যামিথ্যি প্রচার করছে।

অন্য এক দিক দিয়ে নবী করীম (স)-এর মুজিযা বর্ণনাকারিগণ এই জনগোষ্ঠিকে গুমরাহ-ফিরকা ঘোষণা করেছেন। বলেছেন, ওরা কাফির হয়ে গেছে, মুরতাদ হয়ে গেছে

নবী করীম (স)-এর ইন্তিকালের পর ইমামের ব্যাপারটি গোপন রেখে। তাদের মধ্য থেকে মাত্র পাঁচজন কি ছয়জন ব্যক্তি মুরতাদ হয়নি। এই সংখ্যা সংক্রান্ত খবর অবশ্য বিশ্বাস্য নয়। তাদের দ্বারা মুজিযাও প্রমাণিত হয় না। তাদের মতে বিপুল সংখ্যক লোকের দেয়া খবর অ-গ্রহণযোগ্য। কেননা তাদের ধারণা, এই বিপুল সংখ্য লোক-ও তো একত্রিত হয়ে মিথ্যা বলতে পারে। ফলে বর্ণনা সহীহ্ হওয়া স্বল্প সংখ্যকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। এভাবেই নবী করীম (স) এর মুজিযা অস্বীকার ও তাঁর নবুয়ত বাতিল ঘোষণা করা তাদের জন্যে বাধ্যতামূলক হয়ে গেল।

যদি বলা হয়, আযান, ইকামত, রুকূর তাকবীরে ও দুই ঈদের তাকবীরসমূহে হাত উপরে তোলা ও আইয়্যামে তাশরীকে হাত তোলা সাধারণভাবেই প্রচলিত হয়ে পড়েছে। অথচ এ ব্যাপারে মতপার্থক্যও যথেষ্ট রয়েছে। এ বিষয়ে যিনিই নবী করীম (স) থেকে কোন কথা বর্ণনা করেছেন, তা 'খবরে ওয়াহিদ' হিসেবেই বর্ণনা করেছেন। এরূপ অবস্থায় দুটির যে কোন কারণ দেখা যাবে। হয় তাতে রাসূলে করীম (স) থেকে সকলের জন্যে—তার ব্যাপক প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও—কোন 'তওকীফ' হয়নি।—এতে কিন্তু সেই মৌল নীতিটি বাতিল হয়ে যায়, যাতে বলা হয়েছে যে, সর্বসাধারণ মানুষের জন্যে যা প্রয়োজন, তা অবশ্যই সাধারণ ভিত্তিক ও ব্যাপক হবে। তাহলে এ বিষয়ে নবী করীম (স) থেকে উম্মতের উপর 'তওকীফ' হওয়া জরুরী। অথবা হয়ত নবী করীম (স) থেকে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে সর্বসাধারণের জন্যে 'তওকীফ' ছিল; কিন্তু তা যখন একক সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণিত হল, তখন তার বর্ণনা করা হল না। এতেও তো সেই মৌল নীতি ধ্বংস হয়ে যায়, যাতে বলা হয়েছে যে, সাধারণ্যে ব্যাপক হয়ে থাকা জিনিসের বর্ণনা সর্বসাধারণের পক্ষ থেকেই হতে হবে।

জবাবে বলা যাবে, এ ধরনের প্রশ্ন তারই পক্ষে করা সম্ভব, মাস'আলাটি প্রসঙ্গে আমাদের কথার ভিত্তিকে যে লোক আয়ত্ত করতে পারেনি। আমরা বলেছি, যা সকলের জন্যে বাধ্যতামূলক, সকলে যে ফরয পালন করে চলেছে, তা ত্যাগ করা জায়েয নয়, তার বিরোধিতা করাও নয়। যেমন ইমামত-এর ব্যাপার। সে সব ফরয, যা পালন করা সকলেরই জন্যে বাধ্যতামূলক। তবে যা ফরয নয়, জনগণ তাতে ইখতিয়ার সম্পন্ন, যতটা ইচ্ছা করবে। এ ক্ষেত্রে উত্তম নীতি কি, তাই নিয়েই ফিকাহবিদদের মধ্যে মতের বিভিন্নতা রয়েছে। নবী করীম (স) তার মধ্যে উত্তম নীতির উপর কোন 'তওকীফ' আসেনি। এতে তো তাদেরকে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। এ পর্যায়েই আমি আযান, ইক্বামত, দুই ঈদের ও তাশরীকের তকবীরের উল্লেখ করেছি। এ ধরনের আরও যেসব ব্যাপার রয়েছে, যাতে আমরা করা না-করার ইখতিয়ার প্রাপ্ত হয়ে আছি। এর মধ্যে উত্তম কোনটা, তা নিয়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। এ কারণে কোন কোন খবর একক সূত্রে আসা জায়েয হয়েছে। ব্যাপারটির এ তাৎপর্য গ্রহণ করতে হবে যে, এ সবই রাসূলে করীম (স) প্রদত্ত শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল ইখতিয়ার দান হিসেবে। তা সে রকমের নয়, যার উপর তাদেরকে থামিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তা ত্যাগ ও অতিক্রম করে যেতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। যদিও তা ব্যাপক ও সাধারণভাবে প্রচলিত। আমরা নতুন চাঁদ দেখার

ব্যাপারে যে হাদীসের উল্লেখ করেছি—যখন আকাশে প্রতিবন্ধক কিছু নেই তা সেই মৌল নীতি ব্যাপক ও সাধারণভাবে প্রচলিত, তার মুতাওয়াতির বর্ণনা হলেই 'ইলম' পাওয়া যায়। আর আকাশে প্রতিবন্ধক থাকলে চাঁদ সকলের পক্ষে দেখা সম্ভব না-ও হতে পারে। এও হতে পারে যে, লোকদের মধ্যে থেকে মাত্র একজনই বা দুজনই তা দেখতে পেল মেঘের আড়াল থেকে। অন্য লোকদের দেখার আগেই হয়ত তা মেঘে ঢাকা পড়ে গেল। এ কারণে এ বিষয়ে 'খবরে ওয়াহিদ' কবুল করা যাবে। দুজনের কথাও মেনে নেয়া যাবে। দৃঢ় লাভ হওয়া তাতে শর্ত করা হয়নি।

আমাদের হানাফী ফিকাহবিদগণ রমযানের নতুন চাঁদ দেখার ব্যাপারে 'খবরে ওয়াহিদ' কবুল করার নীতি গ্রহণ করেছেন। তার দলীল হচ্ছে একটি হাদীস। হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, মূসা ইবনে ইসমাঈল, হাম্মাদ ইবনে সালমা, সামাক ইবনে হরব, ইকরামা, ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছন। তা হচ্ছে, একবার সাহাবীগণ রমযানের হিলাল সম্পর্কে সন্দেহে পড়ে গেলেন। তাঁরা ইচ্ছা করলেন, তারাবীহ-ও পড়বে না, রোযাও রাখবে না। এ সময় 'হররা' থেকে একজন বেদুইন এসে উপস্থিত। সে সাক্ষ্য দিল, সে রমযানের চাঁদ দেখেছে। তখন তাঁরা তাকে নিয়ে নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হল। তখন তিনি বললেন ঃ তুমি কি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র সাক্ষ্য দাও ? বলল, হ্যাঁ। সেই সাথে সে নতুন চাঁদ দেখারও সাক্ষ্য দিল। তখন নবী করীম (স) হযরত বিলাল (রা)-কে লোকদের মধ্যে ঘোষণা দিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন, তিনি লোকদের মধ্যে ঘোষণা দিলেন যে, 'কিয়ামে লাইল' করতে হবে, রোযাও রাখতে হবে। আবূ দাউদ বলেছে, 'কিয়ামে লাইল' বাক্যটি শুধু হাম্মাদ ইবনে সালমা (জনৈক বর্ণনাকারী)-ই বলেছেন (অন্য কোন বর্ণনাকারীর বর্ণনায় এই শব্দ নেই), মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, মুহাম্মাদ, ইবনে খালিদ ও আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান আস্-সামারকান্দী (তাঁর বর্ণিত হাদীসের প্রতি আমি দৃঢ় প্রত্যয়ী) মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ ইবনে অহব, ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে সালিম আবূ বকর ইবনে নাফে, তার পিতা, ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনে উমর (রা) বলেছেন ঃ লোকেরা নতুন চাঁদ দেখতে চেষ্টা করছিল। আমি রাসূলে করীম (স)-কে খবর দিলাম যে, আমি চাঁদ দেখেছি। তখন তিনি নিজে রোযা রাখলেন এবং লোকদেরকেও তাদের রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন। বস্তুত রমযানের রোযা হচ্ছে ফরয। দ্বীনের দিক দিয়েই তা বাধ্যতামূলক। তাতে যদি ব্যাপক প্রস্তুতি ব্যাহত হয়, তা হলে 'খবরে ওয়াহিদ'কে শরীয়াতের ব্যাপারে নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত 'খবরে ওয়াহিদ'-এর মতোই মনে করতে হবে। তাতে খবরের ব্যাপক বিস্তৃতি শর্ত হতে পারে না। এ কারণে তারা একজন মেয়েলোক, দাস ও 'কযফ' অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির দেয়া খবরও কবুল করেছেন। তবে তাতে বর্ণনাকারীর عدل হওয়ার শর্ত রয়েছে। যেমন নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত অনেক বর্ণনাই 'কিয়াস' বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও কবুল করা হয়। শওয়াল ও যিলহজ্জ মাসের নতুন চাঁদ দেখার ব্যাপারে তারা দুজন عدل সাক্ষীর সাক্ষ্যই গ্রহণ করতেন, তার কম গ্রহণ করতেন না। তারা এমন যে, শরীয়াতের বিধানে তাদের

সাক্ষ্যই গৃহীত হয়ে থাকে। এর দলীল হচ্ছে সেই হাদীস, যা মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহীম আবূ ইয়াহইয়া আল-বাজ্জার, সাঈদ ইবনে সুলায়মান, উবাদ, আবূ মালিক আল-আশজায়ী, হুসায়ন ইবনুল হরস, আল জদলী, জুদায়লাতা কায়স সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, মক্কার আমীর (শাসনকর্তা) ভাষণ দিলেন। পরে বললেন, রাসূলে করীম (স) আমাদের প্রতি এই ফরমান দিয়েছেন যে, আমরা চাঁদ দেখেই হজ্জ ও কুরবানী করব। যদি দেখতে না পাই, তখন যদি দুইজন عدل সাক্ষীও সাক্ষ্য দেয়, তাহলে সেই দুই জনের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আমরা হজ্জ ও কুরবানীর অনুষ্ঠান পালন করব। পরে আমি মক্কার আমীরের এই কথা সম্পর্কে হুসায়ন ইবনুল হরসকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমি জানি না। পরে আমার সাথে সাক্ষাৎ হলে বললেন, তিনি আল-হরস ইবনে হাতিব মুহাম্মাদ ইবনে হাতিব-এর ভাই। পরে মক্কার আমীর জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ্ ও রাসূল সম্পর্কে আমার চাইতে বেশি জানে, তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে, যে সাক্ষ্য দেবে যে, এটা রাসূলের কথা ? তখন এক ব্যক্তিকে ইঙ্গিতে দেখালেন। হুসায়ন বললেন, আমি আমার পাশে বসা শায়খকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমীর কাকে ইঙ্গিত করে দেখালেন ? বললেন, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমর এবং সত্যই বললেন। তিনি আল্লাহ রাসূল সম্পর্কে তার তুলনায় বেশীই জানতেন। তিনিও সেই কথাই বললেন যে, রাসূলে করীম (স) আমাদেরকে তা-ই করার আদেশ করেছেন।

তাঁর কথা ঃ 'আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমরা 'হিলাল' দেখে (হজ্জ ও কুরবানীর) ইবাদত অনুষ্ঠান করব। এ হচ্ছে ঈদের নামায ও কুরবানীর দিনের পশু যবেহ করা। কেননা এখানে 'নুসুক' نسك শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, রমযানের রোযার কথা নয়। এ শব্দটি রোযাকে আদৌ শামিল করে না। অবশ্য সালাত ও যবেহ-এর মধ্যে শামিল হয়। যেমন কুরআনের আয়াত ঃ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْصَدَقَةٍ اَوْنُسُكٍ এতে نُسُكٌ -কে সিয়াম থেকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। نسك শব্দ ঈদের নামায শামিল করে, তা বরা ইবনে আজিব (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়। তাতে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ النَّحْرِ اِنَّ اَوَّلَ نُسُكِنَا فِيْ يَوْمِنَا هٰذَا الصَّلَاةُ ثُمَّ الذَّبْحُ -

রাসূলে করীম (স) কুরবানীর দিন বলেছেন, আমাদের আজকের দিন সর্বপ্রথম নুসুক হচ্ছে ঈদের নামায। তার পরে পশু যবেহ করা।

এতে নামাযকে 'নুসুক' বলা হয়েছে। পশু যবেহ করাকে 'নুসুক' বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌র এই কথাটিতে ঃ

اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ -

নিশ্চিয়ই আমার নামায, আমার 'নুকুস' আমার বেঁচে থাকা ও মৃত্যু বরণ করা আল্লাহ্র জন্যে ....

اَوْصَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ

এ কথাতেও কিংবা সাদকা, অথবা নুসুক।

এ থেকে প্রমাণিত হল রাসূলে করীম (স) আমাদের প্রতি আদেশ করেছেন যে, দুজন عدل সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আমরা হজ্জ ও কুরবানীর অনুষ্ঠান করব—এ কথার মধ্যে ঈদুল ফিতর-এর নামায ও কুরবানীর দিনের পশু যবেহ করা শামিল রয়েছে। অতএব তাতে দুজন সাক্ষীর কমের সাক্ষ্য কিছুতেই গ্রহণ করা যেতে পারে না।

অন্য দিক দিয়ে, ফরয কাজ করার দ্বারা তাকে প্রকাশ করা, তা না করে প্রকাশ করার তুলনায় অনেক ভালো। অতএব তোমরা দুই ব্যক্তির সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রোযা রাখা বন্ধ করে তার প্রকাশ ঘটাও। কেননা যে দিন রোযা নেই, সেদিন খাওয়া থেকে বিরত থাকা রোযার দিন খাদ্য গ্রহণের তুলনায় অনেক ভালো।

যদি বলা হয়, এতে প্রকাশমানতাকে তরক করা হয়। কেননা এটা সম্ভব যে, ফিতরের দিন হবে, একজন সাক্ষীও তার সাক্ষ্য দিয়েছে। এক্ষণে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা না হলে এবং দুই ব্যক্তির দ্বারা প্রকাশ ঘটানোকে গণ্য করা হবে, তাহলে ফিতরের দিন তোমার রোযাদার হওয়া থেকে তুমি বাঁচতে পার না। তাতে যেমন নিষিদ্ধ কাজ ঘটানো হবে, তেমনি তা সতর্কতার নীতিরও পরিপন্থী হবে।

জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, সেদিন রোযা রাখা আমাদের জন্যে নিষিদ্ধ কেবল তখন, যদি আমরা জানতে পারি যে, সেটি ফিতরের দিন। যদি আমাদের নিকট ফিতরের দিন বলে প্রমাণিতই না হয়, তাহলে সেদিন রোযা রাখা আমাদের জন্যে তো নিষিদ্ধ হয়নি। সেদিন ফিতরের দিন প্রমাণিত না হলে আমরা দাঁড়িয়ে যাই রোযা রাখা ও না-রাখার মাঝে, তাহলে তা না রাখা অপেক্ষা রাখাই অধিক সতর্কতার কাজ। কেননা তা ফিতরের দিন প্রমাণিত হতে পারে এমন ব্যক্তির সাক্ষ্যে, যার সাক্ষ্যে মানুষের হক নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়ে থাকে।

আল্লাহ্র কথা ঃ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ সন্দেহের দিন রমযানের রোযা রাখা নিষিদ্ধ প্রমাণ করে। কেননা যার মনে সন্দেহ রয়েছে, সে তো রমযান মাস পায়নি, প্রত্যক্ষ করেনি। সে তো জানে না যে, রমযানের মাস শুরু হয়েছে। তাই রমযানের রোযা রাখা তার জন্যে জায়েয নয়, নবী করীম (স)-এর এ কথাটিও তা-ই প্রমাণ করে ঃ 'তোমরা রোযা রাখ চাঁদ দেখে, রাখা বন্ধ কর চাঁদ দেখে। সেদিন তোমাদের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে শাবান মাস ত্রিশ দিনের গণনা কর'। যে দিনটিতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকবে, নতুন চাঁদ দেখা যাবে না, সে দিনটি শাবান মাসের গণ্য হবে। ফলে শাবান মাসে রমযান মাসের রোযা রাখা যায় না। কেননা সে মাস এখানো আসেনি, ভবিষ্যতে আসবে। একথা অপর একটি হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয়। হাদীসটি আবদুল

বাকী ইবনে কানে ফজল ইবনে মুখাল্লাদ আল-মুয়াদ্দিব মুহাম্মাদ ইবনে নাসেহ বাকীয়া, আলী, আল-কুরাশী মুহাম্মাদ ইবনে আজলান, সাহিল মাওলা তাওয়ামা, আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ

نَهَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمَ الدَّادَاةِ ، وَهُوَ الْيَوْمَ الَّذِىْ يُشَكُّ فِيْهِ لَايَدْرَى مِنْ شَعْبَانَ هُوَاَمْ مِنْ رَمَضَانَ -

দা'দার দিন—যেদিন হবে সন্দেহের যে, সেটা শাবান মাসের দিন, না রমযান মাসের দিন তা নিশ্চিত করে জানা যাবে না—রোযা রাখতে রাসূলে করীম (স) নিষেধ করেছেন।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নুমাইর, আবূ খালিদুল আহমার, আমর ইবনে কায়স-আবূ ইসহাক, সিলাতু সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, চাঁদের ব্যাপারে সন্দেহের এক দিন আমরা আম্মারের নিকট ছিলাম। তখন একটি হাদীস আনা হল। পরে কোন লোককে তা দিয়ে দেয়া হল, পরে আম্মার বললেন ঃ আজকের দিন যে লোক রোযা রেখেছে, সে আবুল কাসিম মুহাম্মাদ (স)-কে অমান্য করেছে।

আবদুল বাকী আলী ইবনে মুহাম্মাদ, মূসা ইবনে ইসমাঈল, হাম্মাদ, মুহাম্মাদ ইবনে আমর, আবূ সালমা, আবূ হুরায়রা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেনঃ

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَافْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ، وَلَاتُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْهِ بِصِيَامِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ اِلَّا اَنْ يُّوْا فِقَ ذٰلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُوْمُهُ اَحَدُكُمْ -

তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখবে, চাঁদ দেখেই তা বন্ধ করবে। আর রমযানের রোযার আগে একদিন বা দুদিনের রোযা রাখবে না। তবে তোমাদের কারোর রোযা রাখার ধারাবাহিকতায় একটি রোযা পড়ে গেলে ভিন্ন কথা।

এ হাদীসসমূহের তাৎপর্য কুরআনের এ আয়াতের সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন ঃ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ -

তোমাদের যে লোক মাসটি পেল, সে যেন মাসকাল ধরে রোযা রাখে।

তবে আমাদের হানাফী ফিকাহবিদগণ সেদিন নফল রোযা রাখায় কোন দোষ দেখতে পাননি। কেননা নবী করীম (স) যখন ফায়সালা দিয়েছেন যে, সেদিনটি শাবান মাসের, তখন সেদিনের রোযা নফল হিসেবে রাখতে কোন দোষ থাকতে পারে না।

দিনের বেলা রমযানের নতুন চাঁদ দেখা গেলে কি করা যাবে, এ বিষয়ে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। আবূ হানীফা, মুহাম্মাদ, মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন, 'দিনের বেলা নতুন

চাঁদ দেখা গেলে বুঝতে হবে চাঁদ পরবর্তী রাত্রির। তা সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়ার আগে দেখা গেল, না তার পরে—তাতে কোন পার্থক্য করা হয়নি। হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব, ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, উসমান ইবনে আফফান, আনাস ইবনে মালিক (রা) আবূ অয়েল, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, আতা ও জারি ইবনে জায়দ প্রমুখ থেকেও অনুরূপ কথাই বর্ণিত হয়েছে। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে এ পর্যায়ে দুটি বর্ণনা পাওয়া গেছে। একটি হচ্ছে, সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়ার পূর্বে চাঁদ দেখা গেলে সেটিকে বিগত রাত্রের চাঁদ ধরতে হবে। আর তার পরে দেখা গেলে পরবর্তী রাত্রের—যা পরে আসবে—চাঁদ মনে করতে হবে। আবূ ইউসূফ, সওরী এ মত গ্রহণ করেছেন। সুফিয়ান সওরী রকীম ইবনে রুবাই—তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি সুলায়মান ইবনে রবীআতার সাথে ব্যবলাঞ্জর ছিলাম। সেখানে নতুন চাঁদ দেখলাম উজ্জ্বল সকাল বেলা। আমি তাকে সে কথা জানালাম, তিনি এসে গেলেন। তিনি একটি গাছের তলায় দাঁড়ালেন। তিনি চাঁদের দিকে তাকালেন। তিনি নিজেই যখন চাঁদটি দেখতে পেলেন তখন তিনি লোকদেরকে রোযা ভাঙ্গতে ও বন্ধ করার আদেশ করলেন।

আবূ বকর (র) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ -

তোমরা খাও পান কর সেই সময় পর্যন্ত, যখন রাত্রি শেষে অন্ধকারের বুক থেকে উজ্জ্বল আলো স্পষ্ট হয়ে আসে। তারপর থেকে রাত্রি পর্যন্ত সিয়াম সম্পূর্ণ কর।

এই ব্যক্তি রমযানের শেষে রোযার জন্যে আদিষ্ট ছিল—এ-ই হল উক্ত আয়াতের তাৎপর্য। কাজেই 'পরে রাত পর্যন্ত রোযা সম্পূর্ণ কর' এই সম্বোনের মধ্যে একথা শামিল থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। কেননা আল্লাহ তাঁর এ কথায় কোন বিশেষ অবস্থাকে বিশেষী করেন নি অন্যান্য অবস্থা থেকে। এ আদেশ তো সর্বাবস্থায়ই প্রযোজ্য, তার পরে নতুন চাঁদ দেখুক, আর না-ই দেখুক, তা সম্পূর্ণ অভিন্ন।

এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার পর চাঁদ দেখা যায়; সর্বাবস্থায়ই রোযা সম্পূর্ণ করার এই আদেশ অব্যাহত থাকে। বরং শব্দের তাৎপর্যেই তা শামিল রয়েছে। অনুরূপভাবে সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়ার পূর্বেই তা দেখা হোক। কেননা তা শব্দের সাধারণত্বের মধ্যে দাখিল রয়েছে। নবী করীম (স)-এর এই কথাটি—'তোমরা রোযা রাখ চাঁদ দেখে, রোযা বন্ধ কর চাঁদ দেখেও' তা-ই প্রমাণ করে। জানা আছে যে, এর অর্থ চাঁদ দেখার পরে রোযা রাখা। দুভাবে তা প্রমাণ করে। একটি—রোযা রাখার আদেশ বিগত দিনের জন্যে তো হতে পারে না। আর দ্বিতীয়—মুসলিমগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, শাবান মাসের শেষদিনের রাত্রে চাঁদ দেখা গেলে পরবর্তী দিনগুলোতে রোযা রাখা তার জন্যে ফরয। প্রমাণিত হল যে, রাসূলের 'তা দেখে তোমরা রোযা রাখ' কথাটি চাঁদ দেখার পরবর্তী সময়ে প্রযোজ্য।

কাজেই যে লোক দিনের বেলা সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়ার পূর্বে চাঁদ দেখল শাবান মাসের শেষ দিনে, তার জন্যে পরবর্তী দিন থেকে রোযা রাখা বাধ্যতামূলক, বিগত দিনের নয়। কেননা রাসূলের কথাটি চাঁদ দেখার পরে রোযা রাখার মধ্যে সীমাবদ্ধ। নবী করীম (স) এ-ও বলেছেন ঃ 'তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ, চাঁদ দেখেই রোযা রাখা বন্ধ কর। তোমাদের উপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে শাবান মাস ত্রিশ দিনের গণনা কর।' এ থেকে প্রতিটি মাস ত্রিশ দিনের গণনা করা কর্তব্য হয় যে মাসের শেষ দিন চাঁদ অদৃশ্য থাকবে। দিনের বেলা যে চাঁদ দেখা গেছে, তা যেমন বিগত রাতের চাঁদ হতে পারে, তেমনি হতে পারে পরবর্তী রাতের চাঁদ। তাহলে এ সম্ভাবনাও আছে যে, চাঁদটি বিগত রাতে আমাদের নিকট অদৃশ্য হয়েছিল। তাহলে মাসটিকে ত্রিশ দিনের গণনা করতে হবে নবী করীম (স)-এর ফায়সালা অনুযায়ী।

যদি বলা হয়, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ وَافْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهٖ 'তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখা বন্ধ কর' বাহ্যিকভাবে কথাটির দাবি এই হয় যে, চাঁদ যখনই দেখা যাবে, তখনই রোযা ভাঙ্গতে ও বন্ধ করতে হবে। কিন্তু এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়ার পর চাঁদ দেখে রোযা ভাঙ্গতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। আমরা তা বিশেষী করে নিয়েছি তা থেকে। সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়ার পূর্বে চাঁদ দেখায় সাধারণ হুকুমটা বহাল থেকে গেছে।

জবাবে বলা যাবে, নবী করীম (স)-এর কথার অর্থ হচ্ছে রাত্রিবেলা দেখা। তার প্রমাণ, সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়ার পর চাঁদ দেখলে তখনই রোযা ভাঙ্গা ওয়াজিব নয়। কেননা তা দিনের বেলা দেখা গেছে, রাত্রে নয়। সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়ার পূর্বে দেখলেও সেই হুকুমই কার্যকর। কেননা তখনও এই তাৎপর্যই থাকে। উপরন্তু কথাটি থেকে প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা হলে বুঝতে হবে, শাওয়াল মাসের সেই দিন চাঁদ দেখার পর। তার পূর্বে তো রমযান মাস। কেননা এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, নবী করীম (স) অগ্রে দেখার কথা বলেছেন, পেছনে দেখার কথা বলেন নি। কেননা দেখার পূর্বে যে সময়টা অতীত হয়ে গেছে, তখন রোযা ভাঙ্গার জন্যে আদেশ দেয়া যেতে পারে না। তা হলে তা শওয়ালের এই দিনে দেখার পর ইফতার করতে হবে। তার পূর্বে তো রমযান মাস। তাহলে মাসটি উনত্রিশ দিনের হয়ে যাবে। আর একটি দিনের কিছু সময়। নবী করীম (স) তো বলে দিয়েছেন যে, মাস হবে ত্রিশ কিংবা উনত্রিশ—এই দুটি সংখ্যার দিনে। তাঁর কথা ঃ اَلشَّهْرُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ 'মাস উনত্রিশ দিনে।' বলেছেন ঃ اَلشَّهْرُ ثَلَاثُوْنَ মাস ত্রিশ দিনে। মুসলিম উম্মত এই কথার তাৎপর্য বুঝতে সম্পূর্ণ অভিন্ন যে, মাস এই দুই সংখ্যার মধ্যে যে কোন এক সংখ্যার হতে পারে। যে সব মাসের সাথে শরীয়াতের হুকুম জড়িত, তা এ দুটি সংখ্যার যে কোন একটি পূর্ণতায় হবে। উনত্রিশ ও একদিনের কিছু সময় কখনই মাস হবে না। কম ও বেশী হয় ভগ্নাংশের কারণে; কিন্তু ইসলামী মাসসমূহে তা হয় না। তা হতো রোমানদের মাসসমূহে এবং একমাসে আটাশ দিন ও একদিনের এক-চতুর্থাংশে এক মাস হতো। আর তা হল ফেব্রুয়ারী মাস। তবে

Leapyear[১] পূর্ণ ২৯ দিনে হয়। রোমানদের কোন কোন মাস ৩১ দিনেও হয়, আবার কোন কোন মাস হয় ত্রিশ দিনে। কিন্তু ইসলামী মাসসমূহে তা কখনই হয় না। ইসলামী হিসেবে মাস যখন ত্রিশ বা উনত্রিশ দিনে হওয়াই চূড়ান্ত কথা, তখন এ থেকে জানা গেল যে, রাসূলের কথা ঃ চাঁদ দেখে রোযা রাখ, চাঁদ দেখে রোযা রাখা বন্ধ কর' কথাটির অর্থই হচ্ছে এই যে, চাঁদ অবশ্যই রাত্রি বেলা দেখা যাবে। দিনের বেলা দেখা গেলে তা গণ্য করা যাবে না। কেননা তাতে দিনের কোন অংশ এ মাসে এবং কোন অংশ অন্য মাসের ধরতে হয়। কিন্তু আরবী মাস তা হতে পারে না। তাছাড়া এই যে, বললেন ঃ তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ, চাঁদ দেখেই রোযা বন্ধ কর, তাতে সেই কথাই, যাতে বলা হয়েছে ঃ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে মাস ত্রিশ দিনের গণনা কর, তা দিনের বেলা দেখার অর্থ, আগের রাতে মেঘাচ্ছন্ন হয়েছিল, দেখা যায়নি। সেই কারণেই তা গত রাতের না আগামী রাতের, তা ঠিক করা যাচ্ছে না। এ অবস্থায়ই ত্রিশ দিনের মাস গুণতে হয়। উপরন্তু নবী করীম (স)-এর প্রমাণিত কথা হল ঃ তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ, চাঁদ দেখেই রোযা বন্ধ কর। তোমাদের ও চাঁদের মাঝে কোন মেঘ বা কুয়াশার আড়াল এসে পড়লে ত্রিশ দিনের মাস গণনা কর। হাদীসটি ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন। এর সনদ তো আগেই উল্লিখিত হয়েছে। অতএব যে চাঁদের ও আমাদের মাঝে আড়াল দাঁড়িয়েছে, তা দেখা যায়নি বলে ধরতে হবে। বুঝতে হবে মেঘের আড়াল না থাকলেও চাঁদ দেখা যেত না। যদিও আমরা জানি যে, মেঘের আড়াল না থাকলে চাঁদ অবশ্যই দেখা যেত। অন্যথায় রাসূলের কথা ঃ 'তোমাদের ও চাঁদের মাঝে কোন মেঘ বা কুয়াশার আড়াল দাঁড়ালে তোমরা ত্রিশদিন গণনা কর' এর কোনই অর্থ হতে পারে না। কেননা আমাদের ও চাঁদের মাঝে মেঘের আড়াল হয়ে দাঁড়ানো পর্যায়ে জানতে পারা যদি অসম্ভব হত, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি 'তোমাদের ও চাঁদের মাঝে মেঘ আড়াল হয়ে দাঁড়ালে তোমরা ত্রিশ দিনের মাস গণনা কর—এ কথা কখনই বলতেন না। তাহলে ত্রিশ দিনের মাস গণনার জন্যে তা একটি শর্ত বানিয়ে দিয়েছে, যদিও সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান হওয়ার নৈরাশ্য সম্পর্কে তিনি অবহিত। তা যখন এরূপ, তখন নবী করীম (স)-এর এই কথার দাবি হচ্ছে, আমরা যখন জানব যে, আমাদের ও চাঁদের মাঝে মেঘের আবরণ আছে, না থাকলে আমরা তা অবশ্যই দেখতাম, তাই আমাদেরকে চাঁদ না দেখার সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হচ্ছে, কেননা বিগত রাত্রে তা দেখা যায়নি। যদিও দিনের বেলায় তা আমরা দেখেছি। কাজেই এই দিনটি আগের দিনের মনে করতে হবে। আর সেদিনটি হবে বিগত মাসের, পরবর্তী মাসের নয়। কেননা আগের রাত্রে তো চাঁদ দেখা যায়নি। আমাদের ও চাঁদ দেখার মাঝে মেঘের আড়াল হয়ে দাঁড়ানোর অবস্থার তুলনায় দুর্বলতর। কেননা তা আমাদের জ্ঞানের আওতার মধ্যে। আর এটা বিগত রাতের, তা আমাদের জ্ঞানের আওতার মধ্যে পড়ে না। শুধু এতটুকুই আমাদের জ্ঞানের আওতাধীন যে, আমরা তা বিগত রাতে দেখিনি, তার ও আমাদের মাঝে মেঘ বা অন্য কিছুর আড়াল হয়ে না থাকা সত্ত্বেও।

১. ইংরেজী পঞ্জিকার প্রতি চতুর্থ বৎসরান্তরিক মাস। এই বৎসরগুলোতে ফেব্রুয়ারী মাস ২৮ দিনের বদলে ২৯ দিনের হয়।—অনুবাদক

## রমযানের রোযা কাযা করা

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ - يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوْا الْعِدَّةَ -

আর যে রোগী হবে কিংবা হবে বিদেশ প্রবাসে, তার রোযা রাখার সময় অন্যান্য দিন। আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি সহজতা চান, কঠিনতা তিনি তোমাদের উপর আরোপ করতে চান না। আর যেন তোমরা মেয়াদটাকে পূর্ণ কর।

শায়খ আবূ বকর বলেছেন, উপরোদ্ধৃত আয়াতটি রমযানের রোযা বিচ্ছিন্নভাবে কাযা করা জায়েয প্রমাণ করে। তার তিনটি কারণ। একটি—তাঁর কথা ঃ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ 'অন্য দিনগুলোতে তার সময়কাল হবে।' কথাটি রোযা কাযা করা বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন দিনেও অনির্দিষ্টভাবে করা জায়েয ঘোষণা করে। ব্যক্তি না-রাখা রোযাসমূহ পরবর্তী যে-কোন সময়ে বিচ্ছিন্ন বা একটানা ও ধারাবাহিকভাবে 'কাযা' করার অনুমতি দেয়া। কেউ যদি মনে করে যে, না-রাখা রোযাসমূহ একটানা ও ধারাবাহিকভাবে রাখতে হবে, তা হলে আয়াতটির বাহ্যিক অর্থেরই বিরোধিতা করবে। তার দুটি কারণ। একটি—তাতে এমন একটি বিশেষত্বকে বাড়িয়ে ধরা হবে, যা কুরআনের শব্দে নেই। আর কুরআনের আয়াতে কিছু বাড়ানো জায়েয নয়। বাড়াতে হলে তা অনুরূপ কোন অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে বাড়াতে হয়। হজ্জ-এ তিন দিনের রোযা রাখার কথা বলা হয়েছে, আর সাতটি রোযা রাখতে বলা হয়েছে বাড়িতে ফিরে আসার পর। তাতে পরপর ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্নভাবে রাখার জরুরী করা হয়নি। কেননা তা মূল আয়াতেই উল্লেখ করা হয়নি। আর দ্বিতীয় হচ্ছে—রোযা 'কাযা' করাকে বিশেষী কৃত করা হবে অনির্দিষ্ট দিনগুলোতে। অথচ যা সাধারণভাবে—কোনরূপ শর্ত ছাড়াই—আদায় করার হুকুম দেয়া হয়েছে, তার বিশেষীকরণ কোন ক্রমেই জায়েয হতে পারে না। তার কোন দলীল থাকলে ভিন্ন কথা।

আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে আল্লাহ বলেছেন ঃ আল্লাহ তোমাদের প্রতি সহজতা বিধান করতে চান, তোমাদের প্রতি কঠোরতা আরোপ করতে তিনি চান না। তাই যা সহজতর, বাহ্যত তা করাই কর্তব্য এবং জায়েয। যদি একটানা রোযা রাখা শর্ত করা হয়, তা হলে এই সহজতা অস্বীকৃত হয়। সেখানে কঠোরতাকে স্থান দেয়া হয়। আয়াতের বাহ্যিক অর্থে তা করা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।

আর তৃতীয় কারণ আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ 'আর তোমরা যেন রোযার মোট দিনগুলো পূর্ণ কর।' অর্থাৎ যে দিনগুলোতে রোযা রাখা হয়নি সেই সংখ্যার দিনগুলো দিনগুলোর সেই সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে। দহাক ও আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ ইবনে আসলামও এই মত দিয়েছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। এতে আল্লাহ্ জানিয়েছেন যে, তিনি আমাদের নিকট সেই দিনগুলোকে পূর্ণত্বে দাবি করেছেন, রোযা না-রাখায় যে

দিনগুলো অপূর্ণ রয়ে গেছে। তাতে বাড়তি কোন শর্তের সংযোজন কোন ক্রমেই জায়েয হতে পারে না। কারোর তা করার অধিকার নেই। কেননা তাতে আয়াতের বাড়তি অর্থ করা হয়। কয়েকটি স্থানেই আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, তা করা সম্পূর্ণ বাতিল, অধিকারবিহীন কাজ।

আগের কালের ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ইবনে আব্বাস, মুয়ায ইবনে জাবাল, আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ, আনাস ইবনে মালিক ও আবূ হুরায়রা (রা) এবং মুজাহিদ, তায়ূস, সাঈদ ইবনে যুবায়র ও আতা বলেছেন, ইচ্ছা করলে রমযানের না রাখা রোযাসমূহ বিচ্ছিন্নভাবে 'কাযা' করতে পার, আর ইচ্ছা করলে একটানা ও এক সাথে কাযা করতে পার।

শরীক আবূ ইসহাক আল-হরস আলী (রা) থেকে বর্ণিত, রমযানের না-রাখা রোযাসমূহ একটান ভাবে কাযা কর। আর বিচ্ছিন্নভাবে কাযা করলেও চলবে। হাজ্জাজ আবূ ইসহাক আল হরস-আলী সূত্রে রমযানের রোযা কাযা করা পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, তা বিচ্ছিন্নভাবে আদায় করা উচিত নয়। তবে বিচ্ছিন্নভাবে রাখা হলে তা জায়েয পর্যায়ে গণ্য হবে। শরীক এরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবনে উমর (রা) বলেছেন, যেমন কাযা করেছে, সে কাযা তেমনভাবেই আদায় কর। আমাশ ইবরাহীম-এর এই মত বর্ণনা করেছেন যে, রমযানের কাযা রোযা একটানা ও ধারাবাহিকভাবে পালন করতে হবে। মালিক হুমাইদ ইবনে কায়স আল-মক্কী বলেছেন, আমি মুজাহিদের সাথে এক সাথে কাবার তওয়াফ করছিলাম। তখন এক ব্যক্তি রমযানের না-রাখা রোযাসমূহ রাখার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল, তা কি ধারাবাহিকভাবে রাখতে হবে ? বললাম, না। তখন মুজাহিদ আমার বক্ষের উপর হাত মেরে বললেন, উবাই ইবনে কাব-এর পাঠ অনুযায়ী সে রোযা একটানাভাবেই রাখতে হবে। উরওয়া ইবনুয যুবায়রও সেই ধারাবাহিকতার কথাই বলেছেন। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফর, আওজায়ী, শাফেয়ী বলেছেন, চাইলে ধারাবাহিক একটানাও থাকতে পারে, চাইলে বিচ্ছিন্নভাবেও পারে। মালিক, সওরী, আল-হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, তা ধারাবাহিক ও পর পর রাখতে হবে, তা-ই আমার পছন্দ। বিচ্ছিন্নভাবে রাখলেও আদায় হয়ে যাবে। বিভিন্ন এলাকার ফিকাহবিদদের ইজমা হয়েছে এই কথায় যে, বিচ্ছিন্নভাবে কাযা করা সম্পূর্ণ জায়েয। আয়াত থেকে যা প্রমাণিত হয় তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

হাম্মাদ ইবনে সালামাতা ইবনে হরব-হারুন ইবনে উম্মে হানী বা হানী-কন্যার পুত্র সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) পানি পান করার পর পাত্রে যা অবশিষ্ট থাকল, তা তাকে পান করতে দিলেন। আমি তা পান করলাম। বললাম, হে রাসূল! আমি আজ রোযাদার ছিলাম। কিন্তু আপনার পানির অবশিষ্ট পান প্রত্যাখ্যান করা আমি পছন্দ করিনি, তাই পান করলাম। রাসূল (স) বললেন ঃ এ রোযা যদি রমযানের কাযা হয়ে থাকে, তা হলে আজকের স্থলে আর একদিন রোযা রাখ। আর যদি নফল রোযা হয়ে থাকে তা হলে ইচ্ছা করলে এর কাযা করতে পারে, ইচ্ছা না করলে কাযা করো না। এতে নবী করীম

(স) সে দিনের স্থানে আর একদিন কাযা করতে বলেছেন। নতুন করে রোযা রাখা শুরু করতে বলেন নি, যদি এ রোযা রমযানের কাযা রোযা হয়ে থাকে। এ থেকে দুটি তাৎপর্য বোঝা গেল। একটি—একটানা ও ধারাবাহিকভাবে রোযা কাযা করা ওয়াজিব-ফরয নয়। আর দ্বিতীয়, বিচ্ছিন্নভাবে রাখা অপেক্ষা একটানা ধারাবাহিক রাখা সর্বোত্তম নয়। কেননা তা যদি সর্বোত্তম হতো তা হলে নবী করীম (স) তা অবশ্যই বলতেন এবং তা করারই নির্দেশ দিতেন। চিন্তা-বিবেচনার দিক দিয়েও বোঝা যায়, রমযানের আসল রোযাও ধারাবাহিক ও একটানা নয়। তা শুধু পর-পর—এক দিনের পাশে আর একদিন—রাখা হয়, তা সহীহ হওয়ার জন্যে একটানা ধারাবাহিক রাখার শর্ত আরোপ করা হয়নি। কেননা রমযানের রোযা যদি ধারাবাহিক হতো একটি দিনের রোযা ভাঙ্গা হয়ে থাকলে তা তেমনি ধারাবাহিকভাবেই আদায় করতে হতো। কেননা কেউ যদি পর পর ধারাবাহিক দুই মাসের মধ্যে একটি দিনের রোযা ভাঙ্গে, তাকে আবার শুরু থেকে ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখতে হবে।

যদি বলা হয়, আল্লাহ কসমের কাফফারা বাবদ যে, রোযার বিধান করেছেন তা এই ধারাবাহিক ও একটানা আদায় করতে হয়। সেই শর্তটাকে তুমি রমযানের রোযা কাযা করার ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছ। তাতে কুরআনের মূল বিধানের উপর অতিরিক্ত আরোপ করা হয়েছে।

জবাবে বলা হবে, এটা প্রমাণিত যে আবদুল্লাহ্‌র পাঠে مُتَتَابِعَاتٍ 'ধারাবাহিক পর-পর একটানা শব্দটি আছে। ইয়াযীদ ইবনে হারুন ইবনে আওন-ইবরাহীম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কসমের কাফফারার রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলাম। তিনি বললেন, আমাদের পাঠে فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ রয়েছে। জাফর-আর-রাযী রুবাই ইবনে আনাস-আবুল আলীয়া সূত্রে বর্ণনা করে বলেছেন, আমার পিতা فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ পড়তেন। আমি আগেই বলেছি, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ কথা উসলুল ফিকাহ কিতাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

যদি বলা হয়, আল্লাহ বলেছে , فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ না-রাখা রোযাগুলো রাখার সময়-কাল অন্যান্য দিন। আর ব্যাপারটি আমাদের নিকট ছিল সব এক সাথে তাৎক্ষণিভাবে। তাই সম্ভাব্য অবস্থার প্রথম সুযোগেই এবং কোনরূপ বিলম্ব না করেই না-রাখা রোযাসমূহ রাখা কর্তব্য। আর সেদিক দিয়ে এক দিনের পর একদিন বিলম্বহীনভাবে তা আদায় করা কর্তব্য হয়, তা ফরযও হয়েছিল ধারাবাহিক—এক দিনের পর একদিন রাখা হিসেবে। প্রথম দিনই রোযা রাখা সম্ভব হয়ে থাকলে, তা রাখবে। পরে রোগাক্রান্ত হলে রোযা ভাঙ্গবে। তা হলে তাৎক্ষণিক ও ধারাবাহিকভাবে রাখার ব্যাপারটি বাধ্যতামূলক হয় না। যে দিন রোযা ভেঙ্গেছে, সে দিন থেকে আবার নতুন করে শুরু করারও প্রশ্ন হয় না। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, ধারাবাহিক ও পরপর রোযা রাখাটার বাধ্যতামূলক হওয়া কোনরূপ ফাঁক-অবকাশ ছাড়াই তাৎক্ষণিকভাবে কাযা করার আদেশের সাথে সম্পর্কিত। ধারাবাহিক ও পরপর রাখা অপর একটি গুণবাচক ব্যাপার।

## রমযানের রোযার কাযা বিলম্বে করা জায়েয

আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ –

তোমাদের মধ্যে যে লোক রোগাক্রান্ত হবে কিংবা বিদেশ-সফরে থাকবে, তার রোযা রাখার সময়কাল অন্যান্য দিনে।

'আয়াতে' না-রাখা রোযা কাযা করার দিনগুলোকে অনির্দিষ্ট রাখা হয়েছে। এই ভিত্তিতে আমাদের হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, না-রাখা রোযাগুলো যে-কোন সময়ে রাখতে পারে। বছর শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তা বিলম্বিত করা জায়েয হওয়া সম্পর্কে তাঁদের থেকে বর্ণিত কোন কথা সংরক্ষিত হয়নি। তবে আমার মত হচ্ছে, পরবর্তী রমযান শুরু হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তা বিলম্বিত করা জায়েয নয়। ফিকাহবিদদের মতের ভিত্তিতেই আমার এই মত। কেননা তাঁদের নিকট ব্যাপারাটি হচ্ছে, যার সময় নির্দিষ্ট নয়, তা তাৎক্ষণিকভাবেই করা উচিত। উসূলুল ফিকাহ গ্রন্থে তা বিস্তারিত বলেছি। ব্যাপার যখন এই, তখন রমযানের রোযা কাযা করার বছরের সময়ও নির্দিষ্ট নয় বলে দ্বিতীয় ফিতরের দিন পর্যন্ত বিলম্বিত করা কখনই জায়েয হতে পারে না। ফরয রোযা কাযা করা ওয়াজিব হওয়ার শেষ সময়টা জানা নেই বলে দ্বিতীয় ফিতরের দিন থেকেও তা বিলম্বিত করা হবে, তা কিছুতেই জায়েয হতে পারে না। যেমন অজ্ঞাত ফরয আদায় করতে আদিষ্ট ব্যক্তির ইবাদত কাজে পরিণত করা, পরে সে বিষয়ে কিছু বলার পূর্বে তা তরক করার কারণে সে জন্যে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা জায়েয হতে পারে না। এ দুটির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ব্যাপার যখন এই, আর এ-ও আমরা জানি যে, রমযানের না-রাখা রোযার কাযা সম্ভাব্য সময় থেকেও বিলম্বিত করা তাঁদের মতে জায়েয। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, তার বিলম্বিতকরণ বছর অতিবাহনের সময়ের মধ্যে নির্ধারিত। তা যুহর-এর সময়ের অবস্থায় পড়ে গেছে। যখন তার প্রথম সময় ও শেষ সময়—দুটিই জানা আছে, তখন এর মধ্যে যে কোন সময় নামায পড়লেই হয়ে যাবে। তা এমন সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা না-জায়েয, যখন নামায পড়লে তা আদায় হবে না। কেননা তার শেষ সময় সেটা, যার বেশি দেরী করলে আর সময় থাকে না।

আগের কালের ফিকাহবিদদের অনেকেই বছরের মধ্যে যে কোন সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা জায়েয মনে করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আবূ সালমাতা ইবনে আবদুর রহমান সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, 'আমার উপর রমযান মাসের রোযা বাকী থাকলে তা পরবর্তী শাবান মাস আসার আগে তার কাযা করতে আমি সক্ষম হই না। ইবনে উমর ও আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, দশ (মাসের) মধ্যে রমযানের রোযার কাযা করায় কোন দোষ নেই। সাঈদুবনে যুবায়র-ও তা-ই বলেছেন। আতা, তায়ূস ও মুজাহিদ বলেছেন, রমযানের রোযা কাযা কর, যখন তুমি চাও। আগের কালের এই ফিকাহবিদগণ সম্ভাব্য প্রথম সময় থেকে তার কাযা বিলম্বিত করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত হয়েছেন।

পরবর্তী রমযানের আগমন হওয়া পর্যন্ত রোযা কাযা করাকে বিলম্বিত করার ব্যাপারে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। আমাদের হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, দ্বিতীয়টি নিজের থেকে রোযা রাখবে, পরে আগেরটা কাযা করবে। সেজন্যে কোন 'ফিদিয়া' দিতে হবে না। মালিক, সওরী, শফেয়ী, আল-হাসান ইবনে সালিহ্ বলেছেন, প্রথমটির কাযা করতে অক্ষম হলে কাযার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক দিন একজন করে মিসকীন খাওয়াবে। সওরী ও আল-হাসান ইবনে হাই বলেছেন, প্রত্যেক দিনের বিনিময়ে অর্ধ সা' ওজনের গম দিলে হবে। মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন, প্রত্যেক দিন এক 'মুদ্দ' করে খাবার দেবে। আর কোন রোগ বা সফরের কারণে যদি অক্ষম হয়ে না থাকে, তাহলে সেজন্যে খাবার খাওয়াতে হবে না। আওজায়ী বলেছেন, প্রথমটির কাযা করতে অক্ষম হলেও দ্বিতীয়টি থাকার সময়ে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে ও শেষ পর্যন্ত মরে গেলে প্রথমটি বাবদ প্রত্যেক দিনের বদলে দুই 'মুদ্দ' করে খাবার দিতে হবে। তা পারেনি, এজন্যে এক মুদ্দ। আর রোযার জন্যে এক 'মুদ্দ' আর দ্বিতীয় রোযার জন্যে প্রত্যেক দিনের বদলে এক-এক 'মুদ্দ' করে দিতে হবে। আওজায়ীর পূর্বে যাদের মতের উল্লেখ করেছি, তারা এ ব্যাপারে একমত হয়েছে যে, রমযান মাসে রোগাক্রান্ত হলে, পরে মরে গেলে রোযা রাখতে না পারার দরুন তার পক্ষ থেকে খাবার খাওয়ানো ওয়াজিব নয়।

আবদুল বাকী ইবনে কানে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ আল-হাজরামী, ইবরাহীম ইবনে ইসহাক, জবী, কায়স, আল-আসওয়াদ ইবনে কায়স তাঁর পিতা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যিলহজ্জ মাসে বিগত রমযানের রোযা কাযা করায় নবী করীম (স) কোন দোষ দেখতেন না।

আবদুল বাকী বিশর ইবনে মূসা ইয়াহইয়া ইবনে ইসহাক ইবনে লাহইয়াতা আল-হরস ইবনে ইয়াযীদ আবূ তমীমুল জায়শানী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ত্রিপলীতে আমরা এক মজলিসে একত্র হলাম। আমাদের সঙ্গে ছিলেন হুবাইব ইবনে মাকাল আল গিফারী ও আমর ইবনুল আস—রাসূলের দুজন সাহাবী। মজলিসে আমর বললেন, আমি রমযানের রোযা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রাখি। গিফারী বললেন, না, রমযানে আমরা বিচ্ছিন্নতা আনি না। তখন আমর বললেন, রমযানের রোযা কাযা করায় আমরা বিচ্ছিন্নতা আনি না। আল্লাহ্ তো বলেছেন ঃ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ 'কাযার সময় অন্যান্য দিনগুলো।'

আবদুল্লাহ ইবনে আবদে রাব্বিহি আগলানী ঈসা ইবনে আহমাদ আল-আসকালানী বকীয়া সুলায়মান ইবনে আরকাম আল-হাসান আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, এক ব্যক্তি বলল ঃ হে রাসূল! রমযানের কয়েকটি রোযা আমাকে কাযা করতে হবে। আমি কি তা বিচ্ছিন্নভাবে রাখব ?

জবাবে তিনি বললেন ঃ 'হ্যাঁ, ভেবে দেখ, তোমার উপর যদি কোন ঋণের বোঝা থাকে, তা যদি তুমি কিস্তিতে আদায় কর, তাহলে তা আদায় হয়ে যাবে না ? লোকটি বলল, হ্যাঁ, তা হবে। তা হলে আল্লাহ তো ক্ষমা করা ও ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে অনেক বেশি অধিকারী।'

এ ধরনের সব হাদীসই রমযানের রোযা কাযা সম্ভাব্য প্রথম সময় থেকে বিলম্বিত করা জায়েয প্রমাণ করে। সাহাবিগণের বহু সংখ্যক থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা মনে করেন, রমযানের রোযার কাযা পরবর্তী বছর পর্যন্ত বিলম্বিত করলে কাযার সাথে সাথে ফিদিয়াও দিতে হবে—দেয়া ওয়াজিব। তাদের মধ্যে ইবনে আব্বাস বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ইয়াযীদ ইবনে হারুন, আমর ইবনে মায়নূন ইবনে মিহ্রানতাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে—এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট এসে বলল ঃ আমি পর-পর দুই রমযানে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম (এ জন্যে রোযা রাখতে পারিনি)। ইবনে আব্বাস জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি দুই রমযান পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে রোগাক্রান্ত ছিলে, না মাঝখানে নিরাময় হয়েছ ? বলল, না মাঝখানে নিরাময় হয়েছি। জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি একই রোগ ছিল ? বলল, না। বললেন, তাহলে ওকে ছেড়ে দাও, সুস্থ হয়ে আসুক। লোকটি তার সঙ্গীদের নিকট চলে গেল ও কথাবার্তা সম্পর্কে তাদের জানাল। তারা বলল, তুমি আবার যাও, বল যে, হ্যাঁ, সেই একই রোগ ছিল। তখন ইবনে আব্বাস (রা) বললেন ঃ তুমি দুই রমযানের রোযা রাখবে এবং ত্রিশ জন মিসকীনকে খাওয়াবে।

রুহ্ ইবনে উবাদা আবদুল্লাহ ইবনে উমর নাফে ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রমযানের রোযা কাযা করতে গাফিলতি করেছে, এমনকি পরবর্তী রমযানও এসে গেছে। বললেন, যে রমযানটা উপস্থিত, সেটির রোযা রাখবে। আর পূর্বেরটির বাবদ প্রত্যেক দিনের বিনিময়ে এক 'মুদ্দ' গম খাবার দেবে। আর কাযা করতে হবে না। এ মতটির সার কথা পূর্বের রমযানের রোযার বদলে খাবার খাওয়াবে, কাযা করতে হবে না। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও ইবনে আব্বাসের কথার মতই বর্ণিত হয়েছে (দুজনের মত এক)। ইবনে উমর থেকে এ পর্যায়ে অপর একটি কথা বর্ণিত হয়েছে। হাম্মাদ ইবনে সালমাতা আইয়ূব-হুমাইদ-আবূ ইয়াজীদুল মাদানী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এক ব্যক্তি মুমূর্ষু অবস্থায় পৌছে গেছে। তখন সে তার ভাইকে বলল, আমার উপর আল্লাহ্র একটা ঋণ রয়েছে। আর লোকদেরও একটি ঋণ আমার উপর আছে। অতএব তুমি আল্লাহ্র এই ঋণটি আদায় করে দিতে শুরু করবে। পরে জনগণের ঋণটা আদায় করবে। আমার উপর দুই রমযানের রোযা রয়েছে, আমি রাখিনি। হযরত ইবনে উমরকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, দুটি ছাগল দিতে হবে গলায় রশি বাঁধা অবস্থায়। পরে ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনিও তাই বললেন। বললেন, 'আল্লাহ্ আবূ আবদুর রহমানকে রহম করুন, তোমার ভাইর পক্ষ থেকে ষাট জন মিসকীন খাওয়াও।' আইয়ূব বলেছেন, তাঁরা মনে করেছেন, লোকটি দুই রমযানের মাঝে সুস্থ হয়ে গিয়েছিল। ত্বাহাভী ইবনে আবূ উমর থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি ইয়াহ্ইয়া ইবনে আকসামকে বলতে শুনেছি, সাহাবীদের নিকট থেকে ছয়জন মিসকীনকে খাবার দেয়া ওয়াজিব, এই মত পেয়েছি। সাহাবীদের মধ্যে তাঁদের বিপরীত মতের কাউকে আমি পাইনি। হ্যাঁ কাযার পূর্বে যদি কেউ মরে যায়, তা তার পক্ষ থেকে তা খাওয়ালে যথেষ্ট হবে।

আল্লাহ্‌র কথা فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ প্রমাণ করে যে, না-রাখা রোযাসমূহ বিচ্ছিন্নভাবে কাযা করলেও এবং তা বিলম্বে করলেও জায়েয হবে। তাকে সে জন্যে 'ফিদিয়া'ও দিতে হবে না। কেননা কাযা করার সাথে সাথে ফিদিয়া দিতে হলে কুরআনের অকাট্য দলীলের উপর অতিরিক্ত ধার্য করা হবে। কিন্তু কোন অকাট্য দলীলের উপর অনুরূপ অকাট্য দলীল ছাড়া কোন কিছু বাড়ানো জায়েয হতে পারে না। ফিকাহবিদগণ একমত হয়ে বলেছেন, পরবর্তী বছরের শেষ পর্যন্ত কাযাকে বিলম্বিত করলেও সে জন্যে কোনরূপ ফিদিয়া দিতে হবে না। কুরআনের আয়াত তো অনুরূপ সংখ্যক রোযা কাযা করতে বলেছে ফিদিয়া দিতে বলে নি। আর এ কথা জানাই আছে যে, পরবর্তী বছর অনুরূপ সংখ্যক রোযা কাযা করাই কর্তব্য। আয়াতের আওতা ভুক্ত সব ব্যাপারেই সেই একই নীতি কার্যকর হবে, ফিদিয়া দিতে হবে না। অনুরূপ কোন ক্ষেত্রে কাযা এবং ফিদিয়া দুটোকেই বাধ্যতামূলক করা জায়েয হতে পারে না। কেননা তা-ও একইভাবে আয়াতের আওতার মধ্যে শামিল। এমনিভাবে কোন কোন চোরের হাত দশ দিরহাম পরিমাণ চুরি করার অপরাধে কেটে দেয়া হবে, আর কারও কাটা হবে তার কম পরিমাণে চুরি করার অপরাধে, এটা জায়েয হতে পারে না। তাই فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ-এর অর্থ গ্রহণ করা হবে শুধু কাযা করার, ফিদিয়া দেয়ার নয়, আর কতকের ক্ষেত্রে রোযা কাযা করা ও ফিদিয়া দেয়া—দুটিকেই কর্তব্য বলা হবে, তাও হতে পারে না।

অন্য এক দিক দিয়ে বলতে হবে, কোন জিনিসের কি কাফফারা, তা কেবল মাত্র توقيف এর পথেই নির্ধারণ করা সম্ভব, অথবা বিশেষজ্ঞদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে। কিন্তু এখানে এ দুটোর কোন একটিও নেই। তাই শুধু কিয়াসের ভিত্তিতে ফিদিয়া প্রমাণ করা জায়েয হতে পারে না। উপরন্তু 'ফিদিয়া' তো কোন কোন জিনিসের বিকল্প হয়ে থাকে। তা-ই হয় তার জন্যে যথেষ্ট। যার উপর কাযা ফরয নয়, কেবল তার জন্যেই ফিদিয়া দেয়া ফরয বলা যেতে পারে। যেমন থুড়থুড়ে বুড়ো, আর যে লোক রোযা কাযা না করেই মরে গেছে, তার জন্যে। কিন্তু কাযা ও ফিদিয়া দুটোকেই একত্রে বাধ্যতামূলক করা নিষিদ্ধ, যেমন গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মাতার প্রসঙ্গে আমরা ইতিপূর্বেই বলে এসেছি। এ ব্যাপারে হযরত ইবনে উমর (রা)-এর মত সর্বাধিক প্রকাশমান যে, শুধু ফিদিয়া দিতে কাযা করতে হবে না। যারা দুটোকে একত্রে করার মত দিয়েছেন, তাঁদের সে মত গ্রহণীয় নয়। নবী করীম (স) থেকে আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত যে হাদীসটি ইতিপূর্বে আমরা উদ্ধৃত করেছি, তাতে বলা হয়েছে যে, রোযার কাযা বিলম্বিত করা হলে ফিদিয়া দেয়া কর্তব্য হয় না। তার দুটি কারণ। একটি—বিচ্ছিন্নভাবে কাযা করলে ফিদিয়া দিতে হবে, তা বলা হয়নি। বিলম্বিত হলে যদি ফিদিয়া দেয়া ওয়াজিব হতো, তাহলে নবী করীম (স) তা অবশ্যই বলতেন। আর দ্বিতীয় কারণ রোযা না রাখাকে ঋণের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর একথা জানা-ই আছে, ঋণ ফেরত দিতে বিলম্ব হলে মূল প্রাপ্যটা ছাড়া আর কিছুই দিতে হয় না। তার সাথে যার তুলনা করা হয়েছে, না-থাকা রোযার কাযা করা, তাতেও যে কয়টি রাখা হয়নি, ঠিক সে কয়টিরই কাযা করতে হবে।

যদি বলা হয়, আমরা যখন একমত হয়েছি যে, পরবর্তী বছর পর্যন্ত কাযাকে বিলম্বিত করা নিষিদ্ধ, তাই যদি বিলম্বিত করা হয়, তাহলে তাকে অপরাধী মনে করতে হবে। আর এ অপরাধ স্খালনের জন্যে ফিদিয়া দেয়া কর্তব্য হবেই। যেমন, যদি কেউ তা কাযা না করে মরে যায়, তাহলে এ ত্রুটির জন্যে ফিদিয়া দিতে হয়।

জবাবে বলা হবে, অপরাধ বা ত্রুটি হলেই ফিদিয়া দেয়া বাধ্যতামূলক নয়। যে লোক 'কাযা'টা ঠিকমত করতে পারেনি, ফিদিয়া কেবল তাকেই দিতে হয়। তার দলীল হচ্ছে, যদি কেউ রমযানে দিনের বেলা ইচ্ছা করে খাবার খায় তাহলে সে অপরাধী। সে বছরই যদি সেই রোযাটি কাযা করা হয়, তাহলে ফিদিয়া দেয়া ওয়াজিব নয়। এ ব্যাপারে সকলেই একমত। বোঝা গেল, অপরাধ হওয়াটা ফিদিয়া ওয়াজিব হওয়ার 'ইল্লাত' বা কারণ নয়। কুম-এর অধিবাসী আলী ইবনে মূসা বর্ণনা করেছেন, দাঊদ আল-ইসফাহানী বলেছেন, রমযানের কোন একটি রোযা যদি কেউ কোন ওযরের দরুন ভাঙ্গে তাহলে পরবর্তী মাস শওয়ালেই তার কাযা করা কর্তব্য। যদি সে কাযা না করে, তাহলে গুনাহগার হবে, সে অপরাধী হবে, আগের ও পরের ফিকাহবিদদের ঐকমত্য থেকে এ মতটি ভিন্ন এবং ইজমার বাইরের মত। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ-এর বাহ্যিক তাৎপর্যরও বিরোধী। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَلِتُكْمِلُوْا الْعِدَّةَ-এর বিপরীত। নবী করীম (স) থেকে আমাদের উদ্ধৃত হাদীসসমূহেরও পরিপন্থী। আমি একদা এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে তাকে বলেছিলাম—আপনি এরূপ কথা বললেন কেন? জবাবে বললেন, বলেছি এজন্যে যে, পরবর্তী দিনে যদি লোকটি রোযা না রাখে এবং মরে যায়, তাহলে সে অপরাধী ও গুনাহ্গার হবে, সমস্ত ইল্‌মধারী লোকেরাই একথা বলেছেন। এ থেকে বোঝা গেল, তার সেই পরবর্তী দিন-ই রোযাটা কাযা করা কর্তব্য। কেননা তার এই রোযা কাযা করার সময় যদি বেশী প্রশস্ত বা দীর্ঘ হয়, তাহলে সেই রাতেই লোকটি মরে গেলে সে অপরাধী হতো না।

আমি বললাম, কোন ব্যক্তির উপর তার দাস মুক্তকরণ যদি কর্তব্য ও ওয়াজিব হয়, তখন যদি সে এমন একটি দাস পেল যে সমমূল্যে বিক্রয় হচ্ছে, তাহলে তার পক্ষে সে দাসটি বাদ দিয়ে অপর দাসটি ক্রয় করা কি জায়েয হবে?..... এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি?

তিনি বললেন না, জায়েয হবে না। কেন জায়েয হবে না জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন, কেননা তার কর্তব্য হয়েছে প্রথম দাসটি মুক্ত করা, যা সে আগেই নির্দিষ্ট করেছে। যখন সে আর একটি দাস পেয়ে গেছে, তখন তার ব্যাপারে ফরযটা বাধ্যতামূলক হয়ে গেছে তার জন্যে। প্রথম দাসটির ব্যাপারে যখন ফরযটা বাধ্যতামূলক ছিল, তখন তাকে বাদ দিয়ে অপর একটি দাস মুক্ত করা—যদি সে তা পায়—তার পক্ষে জায়েয হতে পারে না। আমি বললাম, যদি সে সেটি বাদে অপর একটি দাস ক্রয় করে এবং সেটিকে মুক্ত করে, সে প্রথমটিও পেয়ে আছে, তাহলে? বলেন, তা তার জন্যে জায়েয হবে না, যথেষ্ট হবে না তার নিকট যদি একটা দাস থাকে, তাহলে সেটাকে মুক্ত করাই তার কর্তব্য। তার জন্যে

সেটি ছাড়া অন্য একটি ক্রয় করা কি জায়েয হবে ? বললেন, না। বললাম, তা এজন্যে যে, তার নিকট যে দাসটি আছে, সেটাকে মুক্ত করাই তার কর্তব্য, সেটি ছাড়া অন্য কোনটি নয়। তিনি বললেন, হ্যাঁ বললাম, তার নিকট সে দাসটি যদি মরে যায়, তাহলে দাস মুক্তির দায়িত্ব তার উপর থেকে কি বাতিল হয়ে যাবে ? যেমন কোন নির্দিষ্ট দাস মুক্ত করার মানত করলে পর সেটি মরে গেলে তার মানত শেষ হয়ে যায়, তেমন ? বললেন, না, তার কর্তব্য অপর একটি দাস মুক্ত করা। এ বিষয়ে পূর্ণ মতৈক্য রয়েছে। বললাম, এমনিভাবে ইজমার ভিত্তিতে যার উপর দাসমুক্ত করা ওয়াজিব, তার সেটি ছাড়া অন্যটি মুক্ত করা উচিত। বললেন, তুমি কাদের ইজমার কথা বলছ ? আপনি একটু আগে যে ইজমার কথা বলেছেন, তা কাদের ইজমা ? ইজমার কথাও বলা যায় না। বললাম, তাহলে দ্বিতীয় যে ইজমার কথা আমি বলেছি, তার কথাও বলা যায় না। এভাবে কথা শেষ হয়ে গেল।

আবূ বকর বলেছেন, শওয়ালের দ্বিতীয় দিনই কাযা করা নির্দিষ্টভাবে ফরয বলে দাউদ যে দাবি করেছেন, যে দাস মুক্ত করা ওয়াজিব সেটি পেলে সেটি ছাড়া অন্যটাকে মুক্ত করা সব মুসলিমেরই ইজমার পরিপন্থী। আর ইলম ধারকদের সম্পর্কে যে দাবি করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় দিন থেকেও কাযা বিলম্বিত করে যে মরে গেল, সে ত্রুটিকারী ও অপরাধী, এর কোন কথাই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা যাকে বছরের শেষ পর্যন্ত কাযা বিলম্বিত করার অধিকার দেয়া হয়েছে, তার মরে যাওয়ার কারণে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যায় না। কেননা পরবর্তী রমযানের আগমন হওয়া পর্যন্তই তার পরবর্তী বছরের সময়-কাল। বিলম্বিত করার বিপুল ও প্রশস্ত ক্ষেত্র রয়েছে ঠিক নামাযের সময়ের মত। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নামায বিলম্বিত করার অবকাশ নামাযীদের জন্যে রয়েছে। তাই নামায বিলম্বিত করলে গুনাহগার হতে হবে না। সময় শেষ হয়ে যাওয়ার আগে মরে গেলেও নয়। রমযানের রোযা কাযা হয়ে গেলেও সেই হুকুম।

যদি বলা হয়, বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই কাযা না করে মরে গেলে যদি অপরাধী না হয়, তাহলে তার ফিদিয়া দেয়া বাধ্যতামূলক হতো না।

জবাবে বলা যায়, ফিদিয়া বাধ্যতামূলক হওয়ার ব্যাপারটি এ জন্যে নয় যে, তার অপরাধী হওয়ার কথা জানা গেছে। কেননা থুড়থুড়ে বুড়োর পক্ষে ফিদিয়া দেয়া বাধ্যতামূলক, যদিও রোযা না রেখে ও তা কাযা না করে সে কোন অপরাধ করে নি। দাউদের ইজমা সম্পর্কিত কথা কোন রূপরেখা-ই পেশ করে না কেননা, ইজমা তো তেমনিভাবে পেশ হতে হবে, যেমন করে অকাট্য দলীলসমূহ পেশ হয়ে থাকে কিংবা যেমন করে মতপার্থক্যের কথা বলা হয়ে থাকে। যদি একথা বোঝাতে চাওয়া হয়ে থাকে যে, তাদের কিছু সংখ্যক লোকসমষ্টির বক্তব্য তাদের উপস্থিতিতে প্রকাশ করার পর তাদের পরস্পরের বিরোধিতা না করা অবস্থায় ইজমাকারী কারোর পক্ষ থেকে তা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই, তাহলে সেটা তাদের ব্যাপার। তা সত্ত্বেও ইজমার বর্ণনা হয় না, সাধারণভাবে এরূপ বলা সঙ্গত নয়। কেননা অনেক ইজমার ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট জনসমষ্টির

কথা ও মত বর্ণনা করা হয়। ঠিক তখনই তাদের ইজমা সংক্রান্ত কথা যথার্থভাবে বর্ণিত হতে পারে। এমন ইজমাও আছে, যাতে একটি জনসমষ্টির বক্তব্য—যা ব্যাপকভাবে বিস্তারিত ও প্রকাশিত, অন্যদের তা শ্রবণ সহকারে বর্ণনা করা হয়। তাতে বিরোধিতার প্রকাশ করা হয় না। এটাও ইজমা, যার বর্ণনা প্রচার করা হয়। কেননা অন্যদের প্রতিবাদ ও বিপরীত মত প্রকাশ করা না হলে তা আনুকূল্য ও সমর্থনের স্থলাভিষিক্ত হয়। বিশেষ ধরনের ইজমা এই দুই প্রকারের হয়ে থাকে। ফিকাহ্‌বিদগণ তা একত্রে বর্ণনা করেন। আর এক প্রকারের ইজমা রয়েছে, যাতে সাধারণ ও বিশেষ—সকল শ্রেণীর লোকই শরীক থাকে। যেমন সকলেরই মতে যিনা-ব্যভিচার ও সূদ সম্পূর্ণ হারাম। এই মতে কোন পার্থক্যের প্রশ্নই উঠে না কারোর দিক থেকে। নাপাকি থেকে পাক হওয়ার জন্যে গোসল ফরয, পাঁচ ওয়াকতের নামায ফরয ও এই ধরনের অন্যান্য জিনিস। এসব ব্যাপারে সব মুসলমানের পূর্ণ ঐকমত্য আগের থেকেই জানা। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত দিক থেকে তার বর্ণনা ও এই বিশ্বাসের কথা প্রকাশ ও প্রচার না হলেও দোষ নেই। সকলেরই এই বিশ্বাস যেমন, সকলেই তা পালনও করে। ইজমা বলতে যদি এই জিনিস বোঝানো হয়, তাহলে এই সুযোগ আছে যে, তা বর্ণনা করা হয় না বলে দাবি করা হবে। অবশ্য এ ধরনের ইজমারও বর্ণনা করার প্রচুর অবকাশ রয়েছে বলা চলে। যেমন নামাযী লোকদের নামায সম্পর্কিত ধারণা ও তাঁর বাস্তব পালন। এ ব্যাপারে তাদের বিশ্বাস ও ধারণা এবং তাদের তা শক্তভাবে পালন করার কথা বর্ণনা করা হয়। তারা সকলেই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। যেমন কোন ব্যক্তির ঈমান ও ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করা, বলা যে, সে একজন মুসলমান, এ কথা প্রকাশ করায় কোন দোষ নেই। শুধু তা-ই নয় বরং তা প্রকাশ করাই বাঞ্ছনীয়। এজন্যেই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ -

তোমরা যদি তাদেরকে মুমিনরূপে জান, তাহলে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাবে না।

## সফরে সিয়াম

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْعَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ - يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ -

তোমাদের মধ্যে যে লোক রোগাক্রান্ত হবে কিংবা হবে বিদেশ সফরে, তার রোযা রাখার সময়কাল অন্যান্য দিনে। আল্লাহ তোমাদের প্রতি সহজতা বিধানে ইচ্ছুক, কঠোরতা বিধানের ইচ্ছুক নন।

এ আয়াতটি স্পষ্টভাবে বলেছে যে, সফরে রোযা না-রাখার অনুমতি রয়েছে। আল্লাহ এ অনুমতি দিয়ে আমার জন্যে সহজতার বিধান করেছেন। তবে সফরে রোযা ভঙ্গ

করা—না-রাখাও ফরয করে দেন নি। দিলে তাঁর পরবর্তী কথা ঃ 'তিনি তোমাদের প্রতি সহজতার বিধান করতে ইচ্ছুক' কথাটির কোন ফায়দা হতো না, নিরর্থক হয়ে যেত। তাতে বোঝা গেল, বিদেশ প্রবাসী ব্যক্তির ইখতিয়ার রয়েছে, সে রোযা রাখতেও পারে, আবার না-রাখতেও পারে। এ ঠিক কুরআন পাঠের আদেশের মত। বলেছেন, فَاقْرَؤُا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ 'তুমি পড় কুরআনের যা পড়াই তোমার পক্ষে সহজ হয়। যেমন فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ 'কুরবানীর যে পশু যবেহর ক্ষেত্রে সহজে পৌঁছতে পারে'-এ সব আয়াতেই يسر সহজতার উল্লেখ করা হয়েছে। তাই প্রমাণ হচ্ছে এই ইখতিয়ারের। আবদুর রহীম আল-জজরী তায়ূস ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

لَانَعِيْبُ عَلَى مَنْ صَامَ وَلَا عَلَى مَنْ اَفْطَرَ –

সফরে যে রোযা রাখল তার উপর দোষ আরোপ করবো না, তার উপরও নয়, যে রোযা ভাঙ্গল—রাখল না।

কেননা "আল্লাহ্ তা'আলা তো তোমাদের প্রতি সহজতার বিধান করতে ইচ্ছুক, কঠোরতার বিধান করতে ইচ্ছুক নন" বলে আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস জানিয়ে দিলেন যে, আয়াতে যে সহজতার বিধান করার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে, তার অর্থ—সফরে রোযা রাখা না-রাখার ইখতিয়ার দান। আয়াতে যদি এই ভাষাটা না থাকত, তাহলে তার এরূপ ব্যাখ্যা অবশ্যই দেয়া হতো না। উপরন্তু আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যে লোক এ রমযান মাস নিজ বাড়িতে উপস্থিত থাকবে, সে যেন অবশ্যই মাস ভরে রোযা রাখে' এর পরই সংযোজিত করা হয়েছে এ কথাটি ঃ 'তোমাদের যে লোক রোগাক্রান্ত হবে বা হবে প্রবাসী, তার রোযা রাখার সময় অন্য দিনগুলো। এতে রমযানের রোযা রাখা রোগী ও মুসাফিরের জন্যে না ফরয করা হয়েছে, না রোযা না-রাখা। মুসাফিরও তো রমযান মাসের প্রত্যক্ষদর্শী। তা দুভাবে। এক—সে জানতে পারে যে, রমযানের মাস এসে গেছে। আর দ্বিতীয় এই যে, সে শরীয়াত পালনে বাধ্য ব্যক্তি। বোঝা গেল, রমযান মাসে যাদেরকে রাখতে বলা হয়েছে, সে-ও তাদেরই একজন। তবে তা সত্ত্বেও তাকে রোযা না-রাখার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। আর 'তোমাদের যে লোক রোগী বা বিদেশ প্রবাসী হবে, তার রোযা রাখার সময় অন্যান্য দিন' কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে, যদি রোযা না রাখে, তাহলে অন্য দিনগুলোতে তা রাখতে হবে। যেমন আল্লাহ্‌র এই কথাটি ঃ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْبِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ – (البقره : ١٩٦)

যে লোক হবে রোগী কিংবা যার মাথায় কোন কষ্টের রোগ হবে, তাকে রোযা রেখে ফিদিয়া দিতে হবে।

এর অর্থ যে মাথা মুণ্ডন করাতে পারবে না, সে রোযা রেখে ফিদিয়া দেবে। তা একথাও বোযায় যে, এ বিষয়ে মুসলমানদের ঐকমত্য নিহিত আছে যে, রোগী রোযা

ভাঙ্গে, তাহলে ভিন্ন কথা। তাহলে রোযা ভাঙ্গা বা না-রাখার কথাটি এখানে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। ব্যাপার যখন এই, তখন মুসাফিরের জন্যেও তা শর্ত। কেননা দুটো বিষয়েই বলা হয়েছে, একটির পর অন্যটি। রোযা না-রাখা যদি শর্ত হয় অন্য সময়ে রোযা রাখার, তাহলে মুসাফির সফরে রোযা রাখলেও তাকে কাযা করতে হবে বলা আয়াতের সিদ্ধান্তের পরিপন্থী কথা বলার শামিল। সাহাবী ও তাঁদের পরে তাবেয়ীগণ এবং বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ একমত হয়েছেন এ ব্যাপারে যে, মুসাফির রোযা রাখলে তা জায়েয হবে। তবে হযরত আবূ হুরায়রা এসবের বিরুদ্ধে বলেছেন যে, সফরে যে রোযা রাখবে, সে রোযা তাকে কাযা করতে হবে। কতিপয় বিরল ব্যক্তি তা সমর্থনও করেছেন। তবে তাদের এই বিরোধিতা গণ্য হওয়ার যোগ্য নয়। নবী করীম (স) থেকে এক ব্যাপক প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা দৃঢ় জ্ঞান দান করে। তা হল তিনি সফরে রোযা রেখেছেন। সফরে রোযা রাখা মুবাহ, একথাও তাঁর থেকে বর্ণিত। সেই পর্যায়ের একটি হাদীস হিশাম ইবনে উরওয়া তাঁর পিতা আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তা হল হামযাতা ইবনে আমর আল-আসলামী রাসূলে করীম (স)-কে বলেছেন, আমি সফরে রোযা রাখি। শুনে তিনি বললেন ঃ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ 'তুমি ইচ্ছা করলে রোযা রাখ আর ইচ্ছা করলে রোযা ভাঙ্গো'। ইবনে আব্বাস, আবূ সাঈদুল খুদরী, আনাস ইবনে মালিক, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, আবুদ-দারদা ও সালামাতা ইবনুল মুহবিক প্রমুখ প্রখ্যাত ব্যক্তি নবী করীম (স) সফরে রোযা রেখেছেন—একথার বিবরণ বর্ণনা করেছেন।

যে লোকেরা বলেছেন যে, হ্যাঁ, মুসাফির রোযা রাখতে পারে, তবে তার কাযা করা ওয়াজিব, তাঁর দলীল একথা ঃ 'যে লোক রোগী কিংবা বিদেশ সফরে, তার রোযা রাখার সময় অন্যান্য দিন'-এর বাহ্যিক অর্থ। তাঁরা বলেছেন, 'ইদ্দত' উভয় অবস্থায়ই বাধ্যতামূলক। আয়াতে যে রোযা রাখল আর যে তা ভাঙ্গল, এ দুয়ের মাঝে কোন পার্থক্য করা হয়নি। কাব ইবনে আসিম আল-আশআরী, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ। 'সফরে রোযা রাখা কোন নেক বা সওয়াবের কাজ নয়।' আমাদের নিকট আবদুল বাকী ইবনে কানে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-হাজরামী, ইবরাহীম ইবনে মুনযির আল-হাজামী, আবদুল্লাহ ইবনে মূসা আততায়মী, উসামা ইবনে জায়েদ, জুহরী আবূ সালামাতা, ইবনে আবদুর রহমান—তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ اَلصَّائِمُ فِى السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِى الْحَضَرِ 'সফরে যে রোযা রাখে, সে নিজ বাড়িতে থেকে রোযা ভঙ্গকারী ব্যক্তির মত। আনাস ইবনে মালিক আল-কুশাইরী নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ -

আল্লাহ্ তা'আলা মুসাফিরের অর্ধেক নামায ও রোযা এবং গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী মাতার রোযা তুলে রেখেছেন।

মূল আয়াতটিতে তাদের পক্ষের কোন দলীল নেই। বরং তা মুসাফির-এর রোযা রাখার পক্ষে রায় দেয়। এ বিষয়ে পূর্বে আমরা বাখ্যা দিয়েছি। আর নবী করীম (স)-এর কথা ঃ 'সফরে রোযা রাখা কোন নেক কাজ নয়' বলে যা বর্ণিত হয়েছে, তা বিশেষ অবস্থা বাহির্ভূত কথা। এ কথাটি একটি বিশেষ অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তা মুহাম্মাদ ইবনে বকর বর্ণিত হাদীসে বিবৃত হয়েছে, হাদীসটি আবূ দাউদ, আবুল অলীদ তায়ালসী, শুবা, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে সাদ ইবনে জরারাতা, মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনুল হাসান, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ সূত্রে বর্ণিত। রাসূলে করীম (স) এক ব্যক্তিকে ছায়ায় বসা ও তার উপর লোকদের ভিড় দেখতে পান। তখন বললেন। সফরে রোযা রাখা কোন নেক কাজ নয়। কথাটি নবী করীম (স) লোকটির বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন। কেউ কেউ এ কথার কারণও নির্ধারণ করেছেন, কেউ কেউ তা বাদ দিয়েছেন। রাসূলের শুধু কথাটির বর্ণনা করেছেন। আবূ সাঈদুল খুদরী (রা) তাঁর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁরা মক্কা বিজয়ের দিন রমযান মাসে নবী করীম (স)-এর সঙ্গে একসাথে রোযা রেখেছেন, পরে তিনি তাদেরকে বলেছেন ঃ 'তোমরা তোমাদের শত্রুদের খুব নিকটে এসে গেছ। এ সময় রোযা না-রাখা তোমাদের শক্তিবৃদ্ধির কারণ হবে। অতএব 'তোমরা রোযা রেখো না,' এটা ছিল রাসূলে করীম (স)-এর সুউচ্চ দুঃসাহসিকতার অতিশয় বলিষ্ট মন-মানসিকতার ব্যাপার। আবূ সাঈদ বলেছেন ঃ এর পূর্বেও তুমি আমাকে নবী করীম (স)-এর সঙ্গে রোযা রাখতেই দেখলে এবং তার পরেও। মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, আহমাদ ইবনে সালিহ, ইবনে অহব, মুয়াবীআতা, রবীয়াতা ইবনে ইয়াযীদ সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন কযআতা থেকে। তিনি বলেছেন, আমি আবূ সাঈদকে সফরে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। এরপর পূর্ণ হাদীসের উল্লেখ করেছেন। এই হাদীসে রোযা না-রাখার জন্যে রাসূলের আদেশের 'ইল্লাত' বা কারণটির উল্লেখ করেছেন। বলেছেন—রোযা না-রাখলে তারা তাদের শত্রুদের সাথে লড়াই করতে অধিক সক্ষম হবে। এটা এজন্যে যে, জিহাদ করা তাদের জন্যে ফরয ছিল। কিন্তু সফরে রোযা রাখাটা সেরূপ ফরয ছিল না। ছিল বিশেষ মর্যাদা ও সওয়াবের কাজ। সেজন্যে কোন ফরয ত্যাগ (বা ক্ষতিগ্রস্ত) করা তাদের জন্যে জায়েয ছিল না।

আবূ সালামাতা ইবনে আবদুর রহমান তাঁর পিতার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ সালামাতা কিন্তু তাঁর পিতার নিকট হাদীস শুনতে পান নি। তাহলে মুতাওয়াতির হাদীস একটি বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত হাদীসের জন্যে ত্যাগ করা যেতে পারে ? এ হাদীসটি তো বহু হাদীসবিদ লোকের নিকট প্রমাণিতও নয়। তা সত্ত্বেও হাদীস কোন কারণের উপর ভিত্তিশীল হতে পারে। আর তা হচ্ছে, যুদ্ধেরত থাকা অবস্থা। একথা জানা যে, রোযা রেখে যুদ্ধ করা দুরূহ কাজ। কাজেই এই বিশেষ অবস্থার মধ্যে রোযা না রাখার অনুমতি বিশেষভাবে দেয়া হয়েছিল। কেননা তা রাসূলের কথার বিপরীত। আর

তাতে জিহাদ ত্যাগ করার কারণ ঘটাতে পারে। আর মুসাফিরের অর্ধেক নামায এবং রোযা আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মাতার রোযা বাদ দেয়ার পর্যায়ে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তার তাৎপর্য হচ্ছে, রমযান মাস আসার কারণে ফরযটা তাদের উপর নির্দিষ্ট হয়ে চাপেনি। তারা এ মাসে রোযা না রাখতেও পারে। ত সত্ত্বেও রোযা যদি কেউ রাখে-ই, তবে জায়েয হবে না, এমন কথাও প্রমাণিত নয়। যেমন গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী মাতা যদি রোযা রাখে, তবে তা-ও জায়েয হবে।

হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, সফরে রোযা রাখা না-রাখার চেয়ে উত্তম। মালিক ও সওরী বলেছেন, সফরে রোযা রাখা অধিক পছন্দনীয় আমাদের নিকট। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সফরে রোযা রাখলে তা জায়েয় ও যথেষ্ট হবে। এ ছাড়া রোযার মূল হুকুমের আয়াতটি থেকেও তা-ই প্রমাণিত। তার শেষে স্পষ্ট বলা হয়েছে ঃ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ 'তোমাদের রোযা রাখাটা তোমাদের জন্যে অতীব কল্যাণময়।

আয়াতে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তাদের সকলের জন্যেই এ কথা। কেননা কথাগুলো একটির সাথে সংযোজিত করে পরেরটি বলা হয়েছে। তাই অপর কোন দলীল ব্যাতিরেকে কারোর জন্যে বিশেষীকরণ করা যায় না। কাজেই মুসাফিরের পক্ষে রোযা রাখা না-রাখার চেয়ে অনেক উত্তম।

যদি বলা হয়, উক্ত কথাটি পূর্ববর্তীদের জন্যে নয়, পরবর্তী লোকদের ব্যাপারে প্রযোজ্য। আর তারা হচ্ছে ঃ 'যারা তার সামর্থ্যবান, তারা একজন মিসকীনকে খাবার দেবে।'

জবাবে বলা যাবে, 'তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করা হয়েছে' কথাটির সম্বোধন সকলের প্রতি। সফরে যারা, নিজ বাড়িতে যারা, তারা সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই 'তোমাদের রোযা রাখাই তোমাদের জন্যে অধিক কল্যাণকর' কথাটিরও সম্বোধন সেই সকলেরই প্রতি। আয়াতের শুরুর সম্বোধনে যারা শামিল, আয়াতের শেষের সম্বোধনে তারা সকলে শামিল হবে, একটা তো স্বাভাবিক। তাদের কতককে বাদ দেয়া কোন পর্যায়েই জায়েয হতে পারে না।

উপরন্তু রোযা ফরয বলে সফরে রোযা রাখাও জায়েয, আমরা এ বিষয়ে পূর্বে বিস্তারিত বলেছি। আর যা এরূপ, তা অবশ্যই কল্যাণময় হবে। আর আল্লাহ কল্যাণময় কাজে দ্রুত এগিয়ে যেতে বলেছেন فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ বলে। তিনি কিছু সংখ্যক লোকের প্রশংসা করে বলেছেন ঃ

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ -

তারা কল্যাণময় কাজে দ্রুত অগ্রসর হয়ে যাচ্ছিল।

তাই কল্যাণময় কাজে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা করা এবং সে কাজকে অগ্রবর্তী করা পশ্চাদবর্তী করার তুলনায় উত্তম হওয়া অতীব আবশ্যক। তা ছাড়া ফরযসমূহ তার জন্যে

নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা তাকে অন্য সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা অপেক্ষা অনেক উত্তম। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ اَرَادَ اَنْ يَّحُجَّ فَالْيُعَجِّلْ -

যে লোক হজ্জ করার ইচ্ছা করেছে, তার তা অবিলম্বে করে ফেলা দরকার।

এতে নবী করীম (স) বিলম্ব না করে হজ্জ আদায় করার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নির্দিষ্ট সময়ে করণীয় সব ফরয কাজের বেলায়ই এ কথা সত্য। তার জন্যে নির্দিষ্ট সময়েই তা করা উচিত, সে সময় থেকে সরিয়ে নেয়া উত্তম হাতে পারে না।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, উকবা ইবনে মকরম, আবূ কুতায়বা, আবদুস সামাদ ইবনে হুবায়ব ইবনে আবদুল্লাহ আল-আজদী হুবাইব ইবনে আবদুল্লাহ্ সিনান, ইবনে সালামাতা ইবনুল মুহবিক আল হ্যালী তাঁর পিতার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ كَانَتْ لَهُ حَمُوْلَةٌ يَاْوِى اِلَى شِبَعٍ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ اَدْرَكَهُ -

যার বাহন আছে, পরিতৃপ্তিতে আশ্রয় নিতে পারে, তার রমযান যেখানেই তাকে পাবে সেখানেই রোযা রাখা উচিত।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, নসর, ইবনুল মুহাজির, আবদুস সামাদ ইবনে আবদুল ওয়ারিস, আবদুস সামাদ ইব্‌নে হুবাইব, তাঁর পিতা, সিনান ইবনে সালামাতা, সালামাতা ইবনে মুহাবিক সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ اَدْرَكَهُ رَمَضَانُ فِىْ السَّفَرِ .....

রমযান যাকে সফরে পাবে...

এর তাৎপর্য হল—সফরে তার রোযা রাখা উচিত। এ হল অতীব উত্তম হওয়ার দলীলসমূহের বক্তব্য। তবে রোযা না-রাখাটা নিশ্চয়ই ওয়াজিব নয়। কেননা সফরে রোযা রাখা যে ওয়াজিব নয়, সে বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই। উসমান ইবনে আবুল আস, আস-সফাফী ও আনাস ইবনে মালিক বর্ণনা করেছেন, সফরে রোযা রাখা রোযা না-রাখার তুলনায় অধিক উত্তম।

## সফরের রোযা রেখে ভেঙ্গে ফেলা

সফরে যে লোক রোযা রাখল, পরে কোন ওযর ব্যতীতই রোযা ভাঙ্গল বা রোযা বন্ধ করল, তার এ কাজটি সম্পর্কে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, তাকে না-রাখা রোযাগুলো কাযা করতে হবে, কোন কাফফারা দিতে হবে না। অনুরূপভাবে যদি কেউ সকাল পর্যন্ত রোযাদার থাকল, পরে সফর যাত্রা

শুরু করে সে রোযা ভাঙ্গল কিংবা মুসাফির অবস্থায় রোযা রেখে পরে বাড়িতে ফিরে এসে রোযা ভাঙ্গতে থাকে, রাখে না—তাকেও এসব কারণেই রোযা কাযা করতে হবে। তবে কাফফারা কিছু দিতে হবে না। ইবনে অহব ইমাম মালিকের এ মত উদ্ধৃত করেছেন যে, সফরে যে লোক রোযা রেখেছে সে যদি রোযা রাখা বন্ধ করে, তা হলে তাকে সে রোযার কাযা করতে হবে, তার কাফফারাও দিতে হবে। মুররা বলেছেন, কাফফারা দিতে হবে না। ইবনুল কাসিম ইমাম মালিকের এ মত উদ্ধৃত করেছেন যে, তাকে কাফফারা দিতে হবে। বলেছেন, নিজ বাড়িতে সকাল পর্যন্ত রোযা থেকে পরে সফরে যাত্রা করে সে রোযা ভাঙ্গলে—না রাখলে তাকে শুধু কাযা-ই করতে হবে। আওজায়ী বলেছেন, মুসাফির রোযা না-রাখলে বা ভাঙ্গলে কাফফারা দিতে হবে না। লাইস বলেছেন, কাক্ফারা দিত হবে।

আবূ বকর বলেছেন, এ পর্যায়ে মূল কথা হল, রমযানের কাফফারা সে বিষয়ে সংশয়ে নিক্ষেপ করে। তখন তা 'হদ্দ'-এর মত হয়ে যায়। তার দলীল হচ্ছে, তাতে এক বিশেষ গুনাহ হয়ে যায়, যেমন শরীয়াতে 'হদ্দ'সমূহ। যখন 'হদ্দ' ছিল, সংশয় তা ফেলে দেয়, রমযানের কাফফারা তারই স্থলাভিষিক্ত হয়ে পড়ে। একথা যখন প্রমাণিত হল, তখন আমরা বলব, সফরে থাকা অবস্থায় যখনই রোযা ভাঙ্গে—রোযা রাখা বন্ধ করে, এই অবস্থাটার অস্তিত্ব কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার প্রতিবন্ধক হবে। কেননা সফরে রোযা ভাঙ্গা বা না-রাখাকে মুবাহ্ করে দেয়। ফলে তা বিয়ের আক্দ ও ডান হাতের মালিকা (দাসীর মালিকত্ব) নারী-পুরুষের যৌন সঙ্গম মুবাহ্ করে দেয়। যদিও হায়েয সম্পন্না স্ত্রীলোকের সাথে সঙ্গম মুবাহ করে না। তবে ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে এক মত যে, মূলত সঙ্গম মুবাহকারী কারণের অস্তিত্ব 'হদ্দ' কার্যকর হওয়ার পরিপন্থি। যদিও ঠিক সেই সঙ্গমকেই মুবাহ বানায় না। সফরও তদ্রূপ। তা যদি রোযা ভাঙ্গা বা না-রাখাকে রোযায় প্রবেশ করার মুবাহ্ না-ও বানায়, তা কাফফারা ওয়াজিব হতে দেয় না। কেননা মূলত তাকে রোযা ভাঙ্গা—না-রাখাকে মুবাহ্ বানানোর কারণ বানানো হয়েছে। এ কারণেই আমরা বলেছি, মুসাফির থাকা অবস্থায় রোযা ভাঙ্গলে বা না রাখলে তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে না। ইবনে আব্বাস, আনাস ইবনে মালিক প্রমুখ সাহাবী বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) সফরে রোযায় প্রবেশ করার পর সফরে রোযা ভেঙ্গেছেন, রোযা রাখেন নি। তা করেছেন লোকদেরকে এই শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে যে, সফরে রোযা ভাঙ্গা বা রাখা বন্ধ করা যায়। তা হলে যে কথিত ক্ষেত্রে এই নীতি, তাতে রোযা ভঙ্গকারী বা যে রোযা রাখে নি, তার উপর কাফফারা ওয়াজিব মনে করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। এর আর-ও একটি কারণ রয়েছে। তা হচ্ছে সফরে রোযা রাখা যদি জরুরীই না হয়ে থাকে, তা হলে রমযানের কাযা কিংবা মানতের, অথবা কাফফারার রোযাদারের মতো হয়ে গেল। তাই তা ভঙ্গকারী বা যে রোযা রাখবে না তার উপর কাফফারা দেয়া ওয়াজিব হবে না। কেননা তার জন্যে শুরুতেই রোযা না-রাখার সুযোগ ছিল। তাতে প্রবেশ করার দরুন তা সম্পূর্ণ করার বাধ্যবাধকতা তার উপর রোযা ভাঙ্গার দরুন কাফফারা দেয়া অবশ্য কর্তব্য করে না। মুসাফিরও যদি রোযা রাখে এবং পরে ভাঙ্গে বা না-রাখে তা হলে তাকেও কাফফারা দিতে হবে না। আর যদি কেউ নিজ বাড়িতে অবস্থানকারী হয়ে সকাল পর্যন্ত

রোযা রাখে, পরে সফরে রওয়ানা হয় এবং তখন রোযা ভাঙ্গে তা হলেও সে—যেমন বলেছি—এমন অবস্থায় রয়েছে, যখন রোযা না-রাখা মুবাহ। আর তা হচ্ছে সফরের অবস্থা। যেমন বিয়ের আকদ ও দাসীর মালিকত্ব সঙ্গম মুবাহ করে, কিন্তু হায়েয সম্পন্না স্ত্রীলোকের সাথে সঙ্গম মুবাহ করে না।

যদি বলা হয়, দিনের শুরুতে যে নিজ বাড়িতে অবস্থানকারী ছিল বলে রোযা না-রাখা তার জন্যে জায়েয ছিল না। কিন্তু পরে রোযা ভেঙ্গেছে বলে তার কাফফারা দেয়া ওয়াজিব হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা দিনের শুরুতে রোযা রাখা তার কর্তব্য ছিল-ই।

জবাবে বলা যাবে, না, তা ওয়াজিব হবে না। কেননা কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার অবস্থা তার উপর দিয়ে অতিক্রম করে গেছে। সেই অবস্থায় কাফফারা ওয়াজিব হতে পারে না। কেননা শুরুতে রোযা না রাখারই ইখতিয়ার ছিল তার। ফলে রমযানের রোযার কাযা ও কসমের কাফফারা বাবদ যে রোযা রেখেছে সে তারই মত হয়ে গেল।

যে লোক মুসাফির বলে রোযা রাখেনি, আর সেই রোযা না-রাখা অবস্থায়ই সেই দিনই সে বাড়িতে ফিরে এল, হায়য সম্পন্না মেয়েলোক রোযা না-রাখা অবস্থায় দিনের কোন এক সময়ে পাক হয়ে গেল, তার বিষয়ে ফিকাহবিদদের নানা মত রয়েছে। হানাফী ফিকাহবিদগণ আল-হাসান ইবনে সালিহ ও আওজায়ী বলেছেন, উক্ত দু জনকেই রোযা কাযা করতে হবে এবং দিনের অবশিষ্ট সময়ে তাকে ঠিক রোযাদারের মতই নিষিদ্ধ সব কিছু থেকে বিরত থাকতে হবে। উবায়দুল্লাহ ইবনুল হাসানও সে কথাই বলেছেন। ইবনে শাবরামাতা বলেছেন, যে মুসাফির রোযার দিনে রোযা না-রাখা অবস্থায় নিজ বাড়িতে ফিরে এল, সে যদি সে পর্যন্ত কিছু না খেয়ে থাকে, তা হলে সে দিনের অবশিষ্ট সময় রোযা পালন করবে এবং পরে সে দিনের কাযা করবে। মেয়েলোক যদি তার হায়য থেকে থাকে, তা হলে সে খাবার খাবে, রোযা রাখবে না। ইবনুল কাসিম ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন, মেয়েলোক পাক হল, মুসফির নিজ বাড়িতে ফিরে এল সফরে থাকাকালে রোযা না রেখে, সে খাবে, পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবে না। এটা ইমাম শাফেয়ীর কথা। জাবির ইবনে ইয়াযীদ থেকে অনুরূপ মত বর্ণিত হয়েছে। সওরী আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, যে লোক দিনের শুরুতে খেয়েছে, দিনের শেষেও সে খাবে। সুফিয়ান সওরী তাঁর নিজের মত-এর বিপরীত প্রকাশ করেন নি। ইবনুল কাসিম মালিক থেকে বলেছেন, সকাল বেলা যদি রোযা না-রাখার নিয়ত করে থাকে, সে জানে না যে এটা রমযান মাস, সে পানাহার থেকে বিরত থাকবে। সেদিনই রোযার মাস বলে জানার পরও যদি সে পানাহার করে, তাহলে তাকে (কাযা করতে হবে), কাফফারা দিতে হবে না। তবে সে যদি বেপরোয়া হয়ে যায়, তাহলে তাকে কাফফারা দিতে হবে।

আবূ বকর বলেছেন, ফিকাহবিদগণ যখন একমত হয়েছেন যে, রমযানের নতুন চাঁদ মেঘের কারণে না দেখতে পেয়ে পরের দিন খাবার খেল, পরে চাঁদ দেখার খবর জানল, তাহলে তাকে রোযাদারের মতই বিরত থাকতে হবে। হায়েয সম্পন্না মেয়েলোক ও মুসাফিরও তাই। এ দুজনের মধ্যে সাধারণ সম্পর্ক হচ্ছে—রোযা ভাঙ্গার পর তাদের উপর

দেখা দেয়া অবস্থা দিনের শুরুতে যদি বহাল থাকে, তখন তারা রোযা রাখতেই আদিষ্ট ছিল। পরে অবস্থার পরিবর্তনে তারা হল রোযা না-রাখা লোক, তারা বিরত থাকতে আদিষ্ট। নবী করীম (স) আশুরার দিন খাবার গ্রহণকারী লোকদেরকে পরে পানাহার থেকে বিরত থাকতে আদেশ করেছিলেন। যদিও তাদের উপর তার কাযা করা ফরয ছিল, এ কথা থেকেও উপরোক্ত সিদ্ধান্তই পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তসমূহের মধ্যে তা একটি মূল হয়ে দাঁড়াল। ইমাম মালিক বলেছেন, রোযা না-রাখার দুসাহসিকতা সহকারে যদি খাবার খায়, তাহলে তাকে কাফফারা দিতে হবে, এ কথার কোন তাৎপর্যই নেই। কেননা এ কাফফারা বিশেষভাবে দেয়া ওয়াজিব হয় রোযা ভেঙ্গে ফেললে। এ খাবার গ্রহণকারী খেয়ে তার রোযা বিনষ্ট করেনি। অতএব তার উপর কাফফারা দেয়া ওয়াজিব হবে না।

## মুসাফির যদি রমযানের রোযা অন্য কারোর পক্ষে থেকে রাখে

মুসাফির প্রবাসী অন্য কারোর উপর ধার্য ফরয রোযা যদি রমযান মাসে রাখে, এ বিষয়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেছেন, যার পক্ষ থেকে রোযা রাখার নিয়ত হবে, রোযা তার পক্ষ থেকেই হবে। যদি তা নফল স্বরূপ রাখা হয়, তাহলে এ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফার দুটি মত বর্ণিত হয়েছে। একটি—তা রমযানের রোযা হবে। আর দ্বিতীয়—তা নফল রোযা হিসেবেই গণ্য হবে। আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদ বলেছেন, উভয় দিক দিয়েই তা রমযানের রোযা গণ্য হবে। সব হানাফী ফিকাহবিদ একমত হয়ে বলেছেন, লোকটি নিজ বাড়িতে অবস্থান করে রোযা রাখে আর নিয়ত করে অন্যের পক্ষ থেকে ফরয রোযা আদায়ের অথবা নফল রোযার, তা রমযানের রোযা হিসেবেই গণ্য হবে এবং তা তার জন্যে যথেষ্ট হবে। সওরী ও আওজায়ী বলেছেন, যদি কোন মেয়েলোক রমযানে রোযা রাখে নফল হিসেবে, তা রমযান মাসের রোযা হিসেবে তার পক্ষ থেকে গণ্য হবে। আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদ বলেছেন, শত্রুদেশে যদি কেউ রোযা রাখে, সে জানে না যে, তা রমযান মাস, তাহলেও তার ফরয রোযা আদায় হয়ে যাবে। মালিক ও লাইস বলেছেন, রমযানের প্রথমে যে রোযা রাখবে, তা যে রমযান মাস তা না জেনেই তার রমযানের রোযা আদায় হবে না। শাফেয়ী বলেছেন, রমযান মাসে অন্য কারোর জন্যে ঋণ বা কাযা হিসেবে রোযা রাখলে তা রমযানের রোযা গণ্য হবে না। অন্যের জন্যেও হবে না।

আবূ বকর বলেছেন, আমরা শুরুতেই নিজ বাড়িতে থেকে রমযান মাসে নফল রোযা রাখা সম্পর্কে কথা বলব। বাহ্যিক দৃষ্টিতে হানাফী ফিকাহবিদদের কথা যথার্থতা স্বীকারের কয়েকটি কারণ রয়েছে। একটি হচ্ছে—আল্লাহ্র কথা ঃ তোমাদের প্রতি সিয়াম ফরয করা হয়েছে .... 'তোমাদের রোযা রাখাই তোমাদের জন্যে কল্যাণবহ' পর্যন্ত। এতে বিশেষ কোন রোযার কথা বলা হয়নি। নফল বা ফরয সব রোযাই এর মধ্যে শামিল হতে পারে। এ সব রোযাই ফরয আদায়ের জন্যে যথেষ্ট হবে। কেননা রোযাদার নফল বা অন্য কারোর ফরয রোযা রাখলে তা তো রোযাই হবে, যার রোযা বলে নিয়ত হবে, তারই

পক্ষ থেকে আদায় হবে রমযান মাস ছাড়া। অথবা তা বেহুদা বা অর্থহীন হবে, সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তই হবে না। সে যেন রোযাই রাখে নাই। অথবা তা হবে রমযানের রোযা হিসেবে। যার পক্ষ থেকে তা আদায় করার নিয়ত হবে, তা যখন তার দিক থেকেই সঙ্ঘটিত হবে অথবা তা অর্থহীন হবে, এ রোযা তার জন্যে কল্যাণকর হওয়ার প্রতি-বন্ধক হবে। বরং তা রমযান মাসের হওয়াটাই তাদের জন্যে কল্যাণকর হবে, তাহলে তা অবশ্যই অর্থহীনও হবে না, রমযান ছাড়া অন্য যার দিক থেকেই নিয়ত করা হবে, তার পক্ষ থেকেও হবে না। এ কথাটি প্রমাণ করছে আল্লাহ্র এ কথাটিও ঃ 'তোমাদের মধ্যে যে মাসটি পাবে, সে যেন রোযা রাখে।' এরই ধারাবাহিকতায় বলা হয়েছে ঃ যে রোগী হবে, কিংবা হবে সফরে, তার রোযা রাখার সময় কাল অন্যান্য দিন'। এ কথা ছাড়া মুসাফির ও রোগীর রোযা কাযা ফরয করা হয়েছে, যদি তারা রোযা না-রেখে থাকে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, নিজ বাড়িতে অবস্থানকারী যে লোক রোযা রাখবে, ভাঙ্গবে না, তার রোযা কাযা করতে হবে না। আয়াতেই এ কথা নিহিত রয়েছে। আদেশপ্রাপ্ত সব লোকের রোযাই সিদ্ধ হবে। তবে রোগী ও মুসাফিরদের মধ্যে যারা রোযা রাখবে না, তাদের কথা ভিন্ন। নবী করীম (স)-এর কথা ঃ তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখবে, চাঁদ দেখেই রোযা রাখা বন্ধ করবে'ও তা-ই বোঝায়। এসব কথার বাহ্যিক অর্থ রোযাকে সঙ্গত করে দেয়, তা যেভাবেই রাখা হোক-না কেন। তা নফল রোযা হোক, কি অন্য কিছু। একটু বিবেচনা করলেই বোঝা যাবে, রমযানের রোযা তো সময়ভিত্তিক নির্ধারিত রোযা। যেমন কুরবানীর দিন তওয়াফে যিয়ারত। তা যেভাবেই আদায় করা হোক, তা ফরয হিসেবেই আদায় হয়ে যাবে। তা অন্য কারোর পক্ষ থেকে নিয়ত করা হলে সে নিয়ত অনুযায়ী হবে না। কেননা তা ফরয হিসেবে আদায় না হলে যার পক্ষ থেকে তা করার নিয়ত হবে তার পক্ষ থেকেই হবে। অন্যান্য সমস্ত দিনের রোযার মত, যার পক্ষ থেকে রাখার নিয়ত হবে, তার পক্ষ থেকেই হয়ে যাবে।

যদি বলা হয়, যুহরের নামায তার জন্যে নির্দিষ্ট সময়েই আদায় করতে হয়, যদি ততটুকু সময় বাকী থাকে যতটুকু সময় যুহরের নামায পড়তে লাগে। তা নফলের নিয়তে পড়লে জায়েয হবে না।

জবাবে বলা যাবে, যুহরের নামাযের সময় বিস্তীর্ণ প্রশস্ত, কোন একটা মুহূর্ত তার জন্যে নির্দিষ্ট নয়। সময়ের প্রথম দিক ও শেষের দিকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সময়ের শুরুতে যদি নফল পড়া হয় তাহলে তাতে ফরয আদায় হয়ে যাবে না। শেষে নফল পড়লেও নয়। উপরন্তু সময়ের শেষ ভাগে পড়া তার নামাযকে নফল বা অন্য কারোর ফরয হিসেবে পড়ার নিয়ত করে, তাহলে নিয়ত অনুযায়ীই তা আদায় হবে। অথচ আমরা এ বিষয়ে একমত হয়েছি যে, ঠিক নির্দিষ্ট রমযানের রোযা অন্য কারোর পক্ষ থেকে আদায় হবে না। এ থেকে বোঝা গেল, তা সুনির্দিষ্ট, তাতে অন্য কারোর রোযা জায়েয হওয়া নিষিদ্ধ। আর সেই গোটা সময়টাই যেহেতু ফরয আদায়ের জন্যে সম্পূর্ণ জরুরী, তা তার আগে ধরা যায় না, তাকে বিলম্বিতও করা যায় না। যুহরেরও এটা সময় আছে। সময়ের মধ্যে বিলম্বিত করা হলে তা করা তার জন্যে জায়েয হবে।

যদি বলা হয় নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَّانَوَى -

সমস্ত আমলই নিয়ত অনুযায়ী কার্যকর হবে। যে যার নিয়ত করবে, কাজটা সেইভাবেই গৃহীত হবে।

এতে রমযানের রোযা নফল রোযার নিয়তে রাখা জায়েয না হওয়াই প্রমাণিত হয়।

জবাবে বলা হবে, নবী করীম (স)-এর কথা ঃ 'আমল নিয়ত অনুযায়ী হয়' কে দলীল হিসেবে পেশ করাই সহীহ্ নয়। কেননা তাতে কতগুলো অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে—জায়েয হওয়া বা মর্যাদা সম্পন্ন হওয়া, যদিও শব্দে তা উল্লিখিত নয়। এ বিষয়ে যখনই মতপার্থক্য করা হবে, তা প্রমাণের জন্যে দলীলের প্রয়োজন দেখা দেবে। অতএব তাকে দলীল হিসেবে পেশ করা যায় না। রাসূলের কথা, 'যে জিনিসের নিয়ত করবে তার জন্যে তা-ই হবে' নিয়ে আমরা যদি বিতর্কে লিপ্ত হই, তাহলে এ ব্যাপারে সঙ্গতিপূর্ণ কথা এই হবে যে, নফল বা অন্য কারোর ফরয-এর নিয়ত করা হলে তা গ্রহণীয় হবে না। কেননা আমরা আগেই বলেছি যে, রমযানের রোযা ছাড়া নফল বা অন্য কারোর ফরয আদায় হবে না। আর সে বলেছে, রমযানের রোযাও হবে না। যার পক্ষ থেকে রোযা রাখার নিয়ত তার পক্ষ থেকেও হবে না। এতে সকলের ঐকমত্যে জানা গেল যে, রাসূলের কথা ঃ 'প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে তা যার নিয়ত সে করেছে' টি বাহ্যিকভাবে এ ধরনের বিষয় ব্যবহৃত হয় না। সকলের মত অনুযায়ী বলা যায়, কথাটি তার আসল অর্থেও ব্যবহৃত হয় না। কেননা কথাটির দাবি তো এই হয় যে, যে লোক রোযার নিয়ত করবে, সে রোযাদার হবে, যে নামাযের নিয়ত করবে, সে নামাযী হবে। এর কোন একটি কাজ না করলেও। একথা তো জানাই আছে যে, শুধু নিয়ত করলেই নামায হয়ে যায় না, তা না করা পর্যন্ত। রোযা এবং অন্যান্য যাবতীয় ফরয ও যাবতীয় ইবাদত বন্দেগীও তেমনি। তা থেকে প্রমাণিত হল, উক্ত হাদীসে ব্যবহৃত শব্দগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কোন হুকুম প্রমাণ করতে পারে না। সেজন্যে একটি নিদর্শন অবশ্যই থাকতে হবে। ফলে বিপরীত মত প্রমাণের উদ্দেশ্যে হাদীসের বাক্য দলীল হিসেবে পেশ করা যাবে না। তার দুটি কারণ। একটি—বক্তব্যটিতে একটা তাৎপর্য উহ্য রয়েছে। দলীল হিসেবে কোন কিছু প্রমাণের জন্যে তার প্রতিষ্ঠা জরুরী। তাহলে একথার নিয়ত সে করেছে রাসূলের এ কথাটি প্রমাণ করে যে, রমযানের নফলের নিয়ত করে রোযা রাখলেও হবে। আর তার রোযা যখন কার্যত হবে, তখন তা ফরয হিসেবে আদায় হবে। কেননা আমরা একমত হয়েছি এই কথায় যে, যখন ফরয হিসেবে হবে না, তখন যার নিয়ত করা হয়েছে, তাও হবে না। তাহলে এ কথাটির ফায়সালাতেই যার নিয়ত করবে, তাই অর্জিত হবে। অন্যথায় গোটা কথাটাই অর্থহীন ও নিষ্ফল হয়ে যাবে। রাসূলের কথাটি থেকেই বোঝা যায় যে, নিয়ত যার দাবি করে ফরয, কিংবা ফযীলত, সওয়াব বা অনুরূপ কিছু, তা-ই সে পাওয়ার অধিকারী হবে। কাজটা সংঘটিত হওয়াই চাওয়া হয়েছে, তা মনে করা সঙ্গত নয়। কেননা কাজ ফলবতী হবে নিয়ত হোক আর নাই হোক। নিয়ত ইচ্ছানুরূপ হুকুম কার্যকর

করে মাত্র। ফরযের বা ফযীলতের কিংবা হামদ অথবা নিন্দা নিয়ত অনুযায়ী তার সওয়াব পাওয়ার অধিকার হবে। তা যখন এই রূপই, তখন তার দুটি অর্থের যে কোন একটি অবশ্যই হবে। হয়, রোযা জায়েয হওয়ার বা বাতিল হওয়ার কথা প্রমাণে ব্যবহৃত শব্দের কার্যকরতা গণ্য করা হবে না এবং তা বাদে অন্য কোন দলীল চাওয়া জরুরী হবে। অথবা তার বক্তব্যের দাবি অনুযায়ী কথাটি ব্যবহৃত হবে, সওয়াব বা হামদ কিংবা নিন্দা সম্পর্কিত ফায়দা লাভ হবে। সেটিকে সে অনুযায়ী ব্যবহার করা যখন জরুরী হবে, অথচ তার নিবদ্ধ হয়েছে কোনরূপ নৈকট্য লাভের উপর, তখন তা লাভ হওয়া জরুরী হবে। অতঃপর এ ব্যাপার তার কম-সে কম অবস্থা—ফরযের নিয়তকারীর সওয়াবের মতো তার সওয়াব না হওয়া তার তুলনায় কম হবে। সওয়াব কম হওয়ায় তা ফরয হিসেবে আদায় হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। একথার দলীল হচ্ছে নবী করীম (স)-এর এই কথাটি ঃ

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي الصَّلٰوةَ فَيُكْتَبُ لَهُ نِصْفُهَا، رُبْعُهَا، خُمْسُهَا، عُشْرُهَا –

এক ব্যক্তি নামায পড়ে, কিন্তু তার জন্যে লেখা হয় তার অর্ধেক, চার ভাগের এক ভাগ, পাঁচ ভাগের এক, দশ ভাগের এক ভাগ।

এ থেকে জানা গেল যে, নামায জায়েয ও সঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও তার সওয়াব কম হওয়া অসম্ভব নয়। আমরা বলেছি, শব্দের হুকুম সওয়াব, আযাব কিংবা হামদ ও নিন্দার সাথে সম্পর্কিত। তা রাসূলের এ কথাটিতে প্রমাণ করে ঃ

وَلِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ، وَرَسُوْلُهُ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ –

প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে তাই, যার নিয়ত সে করেছে। অতএব যার হিজরত হবে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের দিকে, তার হিজরত আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের দিকেই হবে। পক্ষান্তরে যার হিজরত হবে দুনিয়ার দিকে তা পাওয়ার আশায় কিংবা কোন নারীর দিকে তাকে বিয়ে করার জন্যে, তার হিজরত সে দিকেই গণ্য হবে যেদিকে সে হিজরত করেছে।

ইমাম শাফেয়ী মনে করেছেন, যার উপর হজ্জ ফরয, সে যদি নফলের নিয়তে ইহ্‌রাম বাঁধে, তা হলেও তার ফরয হজ্জ আদায় হবে। নফলের নিয়ত অর্থহীন হয়ে যাবে। তা ফরয গণ্য হবে। যদিও তিনি বলেছেন যে, ফরয হজ্জের জন্যে যথেষ্ট অবকাশ থাকে। তা এমন নয় যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তা আদায় করতে হবে, নতুবা আদায় হবে না। এই কথাটির সাথে রমযান মাসে নফল রোযা জায়েয হওয়ার দূরতম সম্পর্ক-ও নেই। কেননা রমযানের রোযার জন্যে সময় নির্দিষ্ট। সেই নির্দিষ্ট সময় তা আদায় না

করলে আদায় হবে না। তাই সেই নির্দিষ্ট সময়ের আগেও আদায় করা যায় না সময়ের পরেও আদায় করা যায় না। তাই রাসূলের কথা ঃ আমলের মূল্যায়ন নিয়ত অনুযায়ী হবে। যে লোক যার নিয়ত করবে, তার জন্যে তা-ই হবে এর বাহ্যিক অর্থ অগ্রহণীয়। তাতে নির্ভুল দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে না যা মূল বক্তব্যের সমর্থক হবে। আর এই হাদীসটির বাহ্যিক যে অর্থের তারা দাবি করে, তা গণ্য করা কর্তব্য হবে।

আমাদের মূল কথা—পূর্বেই বলেছি—এই হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করাই সঙ্গত নয়। এর প্রকৃত তাৎপর্য ও বক্তব্যের দাবি আমরা পূর্বেই স্পষ্ট করে বলেছি। বলেছি যে, সে রোযা ফরয হিসেবেই কার্যকর হবে। সে ক্ষেত্রে আমাদের দলীল অবশ্যই গৃহীত হবে। এ হাদীস তার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না। মুসাফির যদি রমযান মাসে ফরয রোযা রাখে ইমাম আবূ হানীফার মতে তা যার পক্ষ থেকেই রাখার নিয়ত হবে, তার পক্ষ থেকেই হবে। কেননা মুসাফির অবস্থায় রোযা রাখাটাই দাবিকৃত নয়। তার তো ইখতিয়ার রয়েছে রোযা রাখার বা না—রাখার। তার ব্যাপারে রমযান ছাড়া অন্যান্য সব দিন সমান। সেই সব দিনের রোযা যার পক্ষ থেকেই রাখার নিয়ত হবে, তা যখন জায়েয, সফরে থাকা ব্যক্তির জন্যে রমযান মাসও সেরূপই। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে নফলের নিয়ত করলে তা নফল হিসেবেই আদায় হবে। এ কথাটি হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে বলা। দুটি বর্ণনার মধ্যে তা অধিক গ্রহণীয় বর্ণনা।

যদি বলা হয়, যে রোগীর রোযা না-রাখা জায়েয, সে যদি রোযা রাখে, তবে তা জায়েয হওয়া উপরোক্ত কথার ভিত্তিতে বাধ্যতামূলক হয় রমযান ছাড়া অন্য সময়ে। এ ভাবে যে নিয়ত করেছে নফলের, কিংবা তার উপর ধার্য ফরযের পূর্বোল্লিখিত ইল্লাতের কারণে, যা মুসাফির পর্যায়ে উল্লেখ করেছ।

জবাবে বলা যাবে, না তা বাধ্যতামূলক নয়, মুসাফির পর্যায়ে যে কারণের উল্লেখ করেছি তা এখানে নেই বলে। তা এজন্যে যে, মুসাফির সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে যা-ই বলেছি, তা জরুরী তাৎপর্য হিসেবেই বলেছি। সে রোযা রাখা ও না-রাখার ইখতিয়ার সম্পূর্ণ তার—কোনটিতেই তার কোন ক্ষতি নেই। রমযান ছাড়া অন্য সময়ই তার অবস্থা অধিক সামঞ্জস্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু রোগী সে রকমের নয়। কেননা তার জন্যে রোযা না-রাখার অনুমতি কেবল তখনই হতে পারে, যদি রোগ বৃদ্ধির ও ক্ষতির আশংকা হয়। অন্যথায় রোযা না-রাখার অনুমতি তার জন্যে নেই। তার দুটি অবস্থা অবশ্যম্ভাবী। হয় রোযা তার জন্যে ক্ষতির কারণ হবে না। তাহলে তার রোযা রাখাই কর্তব্য। অথবা রোযার রাখায় তার ক্ষতি হবে। তা হলে তার রোযা রাখা জয়েযই নয়। অবস্থা যখন এই, তখন রোযা রাখার কাজটি তার জন্যে বাঞ্ছনীয় হবে। অথবা তা ত্যাগ করা—না রাখা বাঞ্ছনীয় হবে। তাতে কিন্তু তার কোন ইখতিয়ারের প্রশ্ন হয় না। তাই যখনই সে রোযা রাখবে, তখনই তা ফরয রোযা গণ্য হবে। কেননা তার পক্ষে রোযা না রাখা মুবাহ ছিল কেবলমাত্র ক্ষতির ভয়ের কারণে। তাই যখনই সে রোযা রাখল, তখন বোঝা গেল, তার ক্ষতির আশংকা নেই। সে সুস্থ সবল মানুষের মতই রোযা রাখতে সক্ষম প্রমাণিত হল। তাই তার রোযা রমযান মাসের রোযা হয়ে যাবে, যে ভাবেই সে রোযা রাখুক না-কেন।

## রমযানের রোযা কাযা'র সংখ্যা

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ اَيَّامٍ اُخَرَ –

তোমাদের মধ্যে কেউ রোগী হলে কিংবা সফরে থাকলে তার রোযা রাখার সময় অন্যান্য দিন।

বিশর ইবনুল অলীদ আবূ ইউসূফ, হিশাম ও মুহাম্মাদ-এর মত হানাফী ফিকাহবিদদের কোনরূপ ভিন্নমত ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, কোন শহর বা জনপদের লোকেরা যদি উনত্রিশ দিন রোযা রেখে থাকে চাঁদ দেখে, আর সেখানেই এক ব্যক্তি রোগক্রান্ত থাকার কারণে রোযা না রেখে থাকে, তা হলে সুস্থ হওয়ার পর সেই উনত্রিশ দিনের রোযা সে কাযা করবে। আর জনগণ যদি ত্রিশ রোযাই রেখে থাকে উনত্রিশ তারিখ চাঁদ দেখতে না পাওয়ার ফলে, অপর জনপদের লোকেরা যদি উনত্রিশ তারিখ চাঁদ দেখে রোযা শেষ করে থাকে, পরে তারা অপর জনপদের ত্রিশ রোযা রাখার খবর জানতে পারে, তাহলে তাদের সকলের কর্তব্য হবে একটি রোযা কাযা করা। আর রোযা না-রাখা রোগীকে পরে সেই ত্রিশ রোযারই কাযা করতে হবে। মালিক ইবনে আনাস-এর সঙ্গীরা তাঁর এ মত বর্ণনা করেছেন, সে রোযা কাযা করবে চাঁদ অনুযায়ী। আশহুব তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, একটি লোক একাধারে দুই বছর পর্যন্ত রোগাক্রান্ত রয়েছে, পরে সে কোন রোযার কাযা না করেই মরে গেছে, এখন কি করা হবে ? জবাবে তিনি বলেছেন, তার পক্ষ থেকে ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে হবে, প্রত্যেক মিসকীনকে এক 'মুদ্দ' পরিমাণ খাবার দিতে হবে।

সওরী বলেছেন, একজন লোক সারা রমযান মাস রোগী হয়ে থাকল। আর মাসটি ছিল উনত্রিশ দিনের। রোগী ভালো হয়ে সেই উনত্রিশটি রোযাই কাযা করবে। আল-হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, কেউ যদি রমযান মাসে অসুস্থ থাকে, মাসের শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত সেই একটি রোযাও রাখল না, পরে একটি মাসে সে রোযা কাযা করতে শুরু করল। এই মাসটি হল উনত্রিশ দিনের। তার রমযান মাসে না-থাকা রোযা এই মাস কাযা করলেই পূর্ণ হয়ে যাবে, যদিও তা ত্রিশ দিনেরই হোক না-কেন। কেননা এখানে এক মাসের বদলে আর এক মাস এসে গেছে। কাযা যদি কোন মাসের মাঝামাঝি সময়ে শুরু করে তাহলে তাকে ত্রিশ দিন পূর্ণ করতে হবে। রমযান মাস উনত্রিশ দিনের হলেও। কেননা উনত্রিশ দিনে তো একটা মাস হয়ে যায় তার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মিলে।

আবূ বকর বলেছেন, মাস যদি উনত্রিশ বা ত্রিশ দিনের হয়, পরে রোগী ব্যক্তি কাযা রোযা করার ইচ্ছা করল, সে রোযার মাসের যে দিনগুলোতে রোযা রাখেনি সেই সংখ্যক দিন সে রোযা রাখবে কাযা বাবদ। তা মাসের শুরুতেই কাযা শুরু করুক, কি মাঝখান থেকেই শুরু করুক। তা এজন্যে যে, আল্লাহ বলেছেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে কেউ রোগী

হলে কিংবা সফরে থাকলে তার রোযা রাখার মেয়াদ অন্যান্য দিনে।' এর অর্থ, রোযা না-রাখা দিন যে কয়টি, সেই কয়টি দিন অন্য সময় রোযা রাখবে। নবী করীম (স)-এর এ কথাটি থেকেও তা-ই বোঝায়; যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, তা হলে মাস ত্রিশ দিনের ধরবে। অর্থাৎ অত অসংখ্য দিন, আল্লাহ্ যখন রোযা না-রাখার দিনগুলোর সময় অন্যান্য দিনে নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তখন তার বেশি দিন কাযা রোযা রাখা জায়েয নয়। তার কম-ও করা যাবে না। যে মাসে কাযা রোযা রাখবে, সে মাসটা কম দিনের হোক কিংবা পূর্ণ হোক, তাতে কোন পার্থক্য হবে না।

যদি বলা হয়, রোযা রাখেনি, তা যদি একটি মাস হয়, আর নবী করীম (স) বলেছেন, উনত্রিশ দিনেও একটি মাস হতে পারে, হতে পারে ত্রিশ দিনেও। তাই যে মাস-ই হোক, সে কাযা করবে মাত্র সেই দিনগুলোর, যে দিনগুলো সে রোযা রাখেনি। কেননা একটি মাস অপর একটি মাসের বদল।

জবাবে বলা যাবে, আল্লাহ তো فَشَهْرٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ 'অন্যান্য দিনের একটি মাস'-তো বলেন নি, বলেছেন ঃ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ 'কাযা করা দিনগুলোর সংখ্যা অন্যান্য দিন থেকে গুণতে হবে। রোযা না-রাখা দিনগুলো পূর্ণ করাই দায়িত্ব। আয়াতের এই বাহ্যিক অর্থ অনুসরণ করাই কর্তব্য। তা থেকে অর্থকে অন্য দিকে নিয়ে যাওয়া—ভিন্নরূপ অর্থ করা—যা বলা হয়নি, তা বলতে চেষ্টা করা জায়েয হতে পারে না। وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ 'এবং যেন তোমরা সময় কালটা পূর্ণ কর'—আল্লাহ্র এ কথাটি থেকেও তাই বোঝায়। এ কথাটিতেও সে সংখ্যাই পূর্ণ করতে বলা হয়েছে। তাই রোযা না-রাখা মাস যদি ত্রিশ দিনের হয়, তা হলে অন্য সময় থেকে সেই ত্রিশ দিনই পূর্ণ করতে হবে। যদি উনত্রিশ দিনের একটি মাসে সীমাবদ্ধ হয়, তা হলে মেয়াদটা পূর্ণ হল না। তাতে যারা 'এক মাসের বদলে এক মাস' বলে তাদের কথা বাতিল প্রমাণিত হয়। সংখ্যার হিসেবটা বাদ পড়ে যায়। তাছাড়া রমযান মাসের কিছু দিন রোযা রাখা না হলে কাযা করবে সেই দিন কয়টি, এ কথার উপর সকলেরই ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এ ব্যাপারটিও উপরোক্ত কথাকেই সত্য প্রমাণ করে। আর সমস্ত রমযান মাস রোযা রাখা না হলে সেই দিনগুলোই সংখ্যা গণনার ভিত্তিতে কাযা করতে হবে। কোন জনপদের লোক যদি চাঁদ দেখে উনত্রিশটি রোযা রাখে, আর অপর কোন জনপদের লোকেরা সেই চাঁদ দেখার ভিত্তিতে ত্রিশ দিনের রোযা রাখল, হানাফী ফিকাহবিদগণ যারা উনত্রিশ দিনের রোযা রেখেছে, তাদের জন্যে আর একটি দিনের কাযা করা জরুরী মনে করেছেন। কেননা 'ইদ্দত' পূর্ণ করার নির্দেশ আল্লাহ্ই দিয়েছেন। মাসের মেয়াদটা পূর্ণ করাই দায়িত্ব। অপর এক জনপদের লোকেরা ত্রিশ দিনের 'ইদ্দত' পালন করেছে, অতএব অপর লোকদেরও সেই ত্রিশ দিনই রোযা রাখতে হবে। কেননা 'ইদ্দত' পূর্ণ করার নির্দেশ তো সকলের প্রতি, এক দলের বা এক জনপদের লোকদের প্রতি নয়, অপর জনপদের লোকেরা তার বাইরে নয়। তা সর্বসাধারণ মুসালমানদের জন্যে নির্দেশ। আল্লাহ্র কথা ঃ 'যে মাসটি পাবে সে-ই যেন সে মাস ভরে রোযা রাখে' এটাও তারই একটা দলীল। আর

'মাস পাওয়া' বলে বুঝিয়েছেন রমযানের মাস শুরু হওয়া সম্পর্কে জানতে পারা। কেননা রমযান মাসের আগমন সম্পর্কে যে জানলই না, তার উপর রোযা রাখা ফরয নয়। তাই নিঃসন্দেহে যখন জানা গেল যে, মাসটি ত্রিশ দিনের, তারা চাঁদ দেখেই ত্রিশ দিনের রোযা রেখেছে তখন যারা ঊনত্রিশ দিনের রোযা রেখেছে, তাদের আর একটি দিনের কাযা করে ত্রিশদিন পূর্ণ করতে হবে।

যদি বলা হয় যে, তা যারা মাসের শুরুতেই জানবে, এই হুকুম তাদের জন্যে। তা হলে বলা হবে, হ্যাঁ, তা যারা জানবে মাসের শুরুতে তাদের জন্যে, আর যারা জানবে মাস ফুরিয়ে যাওয়ার পর, তাদের জন্যেও। যে লোক দারুল হরব-এ থাকার কারণে রমযান মাসে আগমন সম্পর্কে জানতে পারল না, তা জানল সে মাস গত হয়ে যাওয়ার পর, তার তো কর্তব্য সেই পূর্ণ মাসটির রোযা কাযা করা। এ থেকে বোঝা গেল যে, পূর্ণ মাসের রোযা রাখার নির্দেশে নির্বিশেষে সকলেই শামিল। নবী করীম (স)-এর কথা ঃ 'চাঁদ দেখে রোযা রাখ, চাঁদ দেখে রোযা রাখা বন্ধ কর' থেকেও সেই কথাই প্রমাণিত হয়। কেননা শেষে বলা হয়েছে ঃ 'ঊনত্রিশ তারিখ মেঘের কারণে চাঁদ দেখতে না পেলে মাসটিকে ত্রিশ দিনের গণনা কর।' তাই যারা ঊনত্রিশ দিনের রোযা রেখেছে, তারা মেঘের আড়াল হওয়ার কারণে চাঁদ দেখতে পারে নি বলে মনে করতে হবে। তাই তাদেরকে ত্রিশটি রোযা পূর্ণ করতে হবে।

যদি বলা হয়, নবী করীম (স)-এর কথা হল ঃ 'চাঁদ দেখে রোযা রাখতে শুরু কর, চাঁদ দেখেই রোযা রাখা বন্ধ কর।' তাই প্রত্যেক দেশ ও নগরীর লোকদের চন্দ্র দর্শন গণ্য করতে হবে। অন্যান্য শহরে বা দেশে চাঁদ দেখা গেছে, কিংবা যায় নি, তা নিয়ে সে দেশ ও শহরের লোকদের কোন দায়িত্ব নেই। প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীই নিজস্বভাবে চাঁদ দেখেছে ও দেখবে, তাই রোযা রাখা শুরু করা ও তা রাখা বন্ধ করার ব্যাপারে প্রত্যেক দেশের লোকদের নিজস্ব চন্দ্র দর্শন অনুযায়ী আমল করাই কর্তব্য ও ফরয। তা ছাড়া সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, প্রত্যেক দেশের লোকেরা নিজস্বভাবে চন্দ্র দেখার ভিত্তিতে রোযা রাখা শুরু করবে ও রোযা রাখা বন্ধ করবে। সারা দুনিয়ার লোকেরা চাঁদ দেখল কি দেখল না, তার কোন দায়িত্ব সে দেশের লোকদের উপর বর্তাবে না। প্রত্যেক দেশের লোকেরা নিজস্ব চন্দ্র দর্শন অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য, এটাই চূড়ান্ত কথা।

এর জবাবে বলা যাবে, রাসূলের করীম (স)-এর কথা ঃ 'চাঁদ দেখে রোযা রাখা শুরু কর, চাঁদ দেখেই তা বন্ধ কর' তো নির্বিশেষে সমস্ত মুসলমানের প্রতি, কোন বিশেষ দেশ বা শহরের লোকদের জন্যে বিশেষীকৃত নয়। আর প্রকৃত অবস্থা যখন এই, তখন এক দেশের লোকদের চাঁদ দেখা যেমন সেই দেশের লোকদের রোযা রাখার ব্যাপারে বাধ্যতামূলক তেমনি অন্য দেশের লোকদের চাঁদ দেখাও তাদের জন্যে রোযা রাখার কারণ হিসেবে বাধ্যতামূলক। তাই এক দেশের লোকেরা চাঁদ দেখেই রোযা ঊনত্রিশটা করেছে আর অপর দেশের লোকেরা চাঁদ দেখেই ত্রিশটা রোযা রেখেছে, তখন ঊনত্রিশটি রোযা রাখা লোকদের কর্তব্য আর একটি রোযা কাযা করা। কেননা চাঁদ তো ত্রিশ দিনের দেখা

গেছে বলে তারা ত্রিশটি রোযা রেখেছে। ফলে সকলের জন্যেই ত্রিশটি রোযা রাখা ফরয হয়েছে। যারা বলেন যে, প্রত্যেক দেশের লোকদের চন্দ্র দেখা সেই দেশের লোকদের রোযা রাখা বা না-রাখার ব্যাপারে বাধ্যতামূলক এবং এই কথায় সকলেই একমত, হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিতে এ কথা গ্রহণযোগ্য হতে পারে একটি শর্তের ভিত্তিতে। আর তা হল উভয় দেশের বা সব দেশের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে রোযার দিনের সংখ্যায় কোন পার্থক্য হবে না। তাই তাৎক্ষণিকভাবে তো প্রত্যেক দেশের জনগণ তত সংখ্যক দিনের রোযা রাখবে রোযার দিন বলে যত সংখ্যক দিনের কথা তাদের পক্ষে জানা সম্ভব ও সহজ। যা জানা সম্ভব ও সহজ নয়, তার দায়িত্বও তাদের নেই। কিন্তু পরবর্তীতে যখন ভিন্ন কথা জানা যাবে—জানা যাবে যে, রোযা উনত্রিশ দিনের নয়, ত্রিশ দিনের তখন তাদের একটি দিনের রোযা কম পড়ে গেল। তাই উনত্রিশ তারিখের রোযা রাখা লোকদেরকে ত্রিশদিনের রোযা রাখতে হবে।[১] কেননা পরে যখন জানা গেল যে, মাস উনত্রিশ দিনের নয়, ত্রিশ দিনের তখন তাদেরকে ত্রিশ দিনের রোযা পূর্ণ করতে হবে। তাদের পূর্ণ জানা ছিল, তা ক্ষণে ভুল হয়ে গেছে।

এ পর্যায়ে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বিপরীত মতের লোকেরা সে হাদীসটিকে দলীল রূপে পেশ করেছে। হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, মূসা ইবনে ইসমাঈল, ইসমাঈল ইবনে জাফর, মুহাম্মাদ ইবনে আবূ হারমালাতা কুরাইব সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কুরাইব বর্ণনা করেছেন, উম্মুল ফযল বিনতুল হরস তাঁকে (কুরাইবকে) মুআবিয়ার নিকট সিরিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। বললেন, আমি সিরিয়ায় উপস্থিত হয়ে তার প্রয়োজন পূর্ণ করলাম। তখন রমযান মাসের চাঁদ দেখা গেল, আমি তখন সিরিয়ায় উপস্থিতও। আমি জুম'আর দিনের রাত্রে (বৃহস্পতিবার দিনগত সন্ধ্যায়) চাঁদ দেখলাম। মাসের শেষের দিকে আমি মদীনায় ফিরে এলাম। তখন ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি চাঁদের উল্লেখ করলেন, বললেন, তোমরা সিরিয়ায় কবে রমযানের চাঁদ দেখেছিলে ? বললাম, জুম'আর দিনের রাত্রে। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নিজে দেখেছিলে ? বললাম হ্যাঁ, আমি ছাড়া অন্যান্য মানুষও দেখেছে। তারা রোযা রেখেছে, আমীর মুআবিয়াও রোযা রেখেছেন। হযরত আব্বাস বললেন, কিন্তু আমরা (মদীনায়) চাঁদ দেখেছি শনিবারে রাত্রে (অর্থাৎ শুক্রবার দিনগত রাতে) তাহলে আমাদের তো আর একটি দিনের রোযা রাখতে হবে, তাহলে আমরা ত্রিশদিনের রোযা পূর্ণ করতে বাধ্য। অথবা তার কম দিনে যদি আমরা চাঁদ দেখি, তাহলে অন্য কথা হবে। আমি বললাম, মুআবিয়ার চাঁদ দেখা ও তার রোযা রাখা কি যথেষ্ট ভিত্তি নয় ? বললেন, না। রাসূলে করীম (স) এই করার জন্যেই আমাদেরকে আদেশ করেছেন।

---

১. কথাটি সম্পূর্ণ উল্টা বলে মনে হয়। উনত্রিশ তারিখ যারা চাঁদ দেখে রোযা রাখা বন্ধ করল তাদের রোযা উনত্রিশটি হল চাঁদ দেখতে পারার কারণে। যারা সেদিন চাঁদ দেখলনা—যে কারণেই হোক—তারাই রোযা ত্রিশটি রেখেছে। এক্ষণে চাঁদ দেখতে পেয়ে যারা উনত্রিশটি রাখল তারা কেন ত্রিশটি পূরণ করতে বাধ্য হবে ?—অনুবাদক

কিন্তু এই হাদীস সে কথা প্রমাণ করে না। কেননা এতে নবী করীম (স)-এর জবাব পূর্ণভাবে বলা হয়নি। ঠিক এই প্রশ্নটাই তাঁকে করা হয়েছিল এবং তিনি তার জবাবও দিয়েছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস শুধু এতটুকুই বললেন যে, রাসূলে করীম (স) আমাদেরকে এরূপই আদেশ করেছেন। হতে পারে, তিনি এ পর্যায়ে রাসূলের কথা ঃ চাঁদ দেখে রোযা রাখা শুরু কর, চাঁদ দেখে রোযা রাখা বন্ধ কর' এরই ব্যাখ্যা যেমন তাঁরা বলেছেন সেরূপই মনে রেখেছেন। বরং এ থেকে আমাদের কথাই প্রমাণ করে, যেমন পূর্বে বলেছি। অতএব এ হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করা সঙ্গত নয়, বিশেষ করে, যে বিষয়ে আমাদের মত-পার্থক্য রয়েছে।

হাসানুল বসরী থেকেও উল্লেখ করা হয়েছে এই হাদীসটি, যা মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, আবদুল্লাহ ইবনে মুয়ায, মুয়ায, আশয়াস, হাসান সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ এক ব্যক্তি কোন এক দেশের (শহরের) অধিবাসী ছিল। সে সোমবার দিন রোযা রাখল। তখন দুজন লোক সাক্ষ্য দিল যে, তারা রোববারে চাঁদ দেখেছ, বলেছেন, সে ব্যক্তি সেই দিনটির রোযার কাযা করবে না। তার নিজের দেশ বা শহরবাসীরাও না। হ্যাঁ, যদি জানা যায় যে, কোন শহর বা দেশের লোকেরা রোববারদিন রোযা রেখেছে, তাহলে তারাও সেই একদিনের কাযা করবে, কিন্তু উপরোদ্ধৃত হাদীসে একথা বলা হয়নি যে, তারা তাদের নিজেদের চাঁদ দেখা বা অন্যদের দেখার ভিত্তিতে রোযা রেখেছে। অথচ আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে দুই দেশ বা শহরের লোকেরা অপরদের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে নয়, নিজেদের দেখার ভিত্তিতে রোযা রেখেছেন।

বিপরীত মতের লোকেরা এ ব্যাপারে অপর একটি হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন, হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, মুহাম্মাদ ইবনে উবায়দ, হাম্মাদ, আইয়ূব, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির, আবূ হুরায়রাতা সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ

وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَاَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّوْنَ، وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ وَكُلُّ جَمْعٍ مَوْقِفٌ -

তোমরা যেদিন রোযা রাখা বন্ধ করবে সেদিন তোমাদের ঈদুল ফিতরের দিন। যেদিন তোমরা কুরবানী করবে, সেদিন তোমাদের ঈদুল আযহা, প্রত্যেক আরফা'রই একটা অবস্থান স্থান, প্রত্যেকটি মিনা পশু যবেহ করার স্থান । মক্কার প্রত্যেকটি পর্বতঘাঁটি পশু যবেহ করার স্থান। আর প্রত্যেকটি সমাবেশই একটি অবস্থান স্থান।

আবূ খায়সামাতা মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-মাদানী, আবদুল্লাহ ইবনে জাফর, উসমান ইবনে মুহাম্মাদ, আল-মুকবেরী, আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

'রোযা' যেদিন তোমরা রোযা রাখবে, যেদিন তোমরা রোযা রাখা বন্ধ করবে সেদিন ঈদুল ফিতর। ঈদুল আযহা সে দিন, সে দিন তোমরা কুরবানী করবে।

এর উপর ভিত্তি করে ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, হাদীসের এ কথাগুলো প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর রোযা সেই দিন, যে দিন সকলে রোযা রাখবে। তাদের ঈদুল ফিতর সে দিন, সে দিন তারা রোযা রাখা বন্ধ করেন। এ কথা দ্বারা হয়ত সে কথা বলতে চেয়েছেন, যা সকলের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠেনি। তা সত্ত্বেও এ কথা দ্বারা কোন নির্দিষ্ট জনপদকে বিশেষভাবে বোঝায়নি। কম সংখ্যক লোক যদি রোযা রাখে যা তাদের জন্যে বাধ্যতামূলক, তা হলে বেশী সংখ্যক লোক রোযা রাখলে তা সকলের জন্যেই বাধ্যতামূলক হবে। তাহলে তা-ই হবে সকলের রোযা। যারা কম সংখ্যক দিন রোযা রেখেছে, বেশী সংখ্যক লোকদের রাখা রোযার সমান সংখ্যক রোযা রাখা তাদের কর্তব্য হবে। তাই অবশিষ্ট দিনগুলোর রোযা কাযা করতে হবে।

এ হাদীসটি সহীহ কিনা, এ বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কিছু সংখ্যক লোকের মতে হাদীসটি সহীহ। অপর লোকেরা বলেছেন সহীহ নয়। হাদীসটির অর্থ নির্ধারণেও নানা কথা বলা হয়েছে। কিছু সংখ্যক লোক বলেছেন, সমস্ত লোক যেদিন রোযা রাখার ব্যাপারে একমত হবে, সেই দিনই হবে তাদের রোযা। যদি তাতে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়, তাহলে নিজেদের মতের পক্ষের দলীল পেশ করা আবশ্যক হবে। কেননা হাদীসে একথা বলা হয়নি যে, তোমাদের কিছু সংখ্যক লোক যেদিন রোযা রাখবে, সেদিনই তোমাদের রোযা। বলা হয়েছে, যেদিন তোমরা সকলে রোযা রাখবে, সেদিনই তোমাদের রোযা। তাতে সকলেরই রোযা রাখা আবশ্যক হয়। অন্যরা বলেছেন, উক্ত হাদীসে স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সম্বোধন করে কথাটি বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের প্রমাণের ভিত্তিতে ইবাদত পালনে বাধ্য। অন্যের নিকট যে প্রমাণ রয়েছে, তার দ্বারা সে চালিত হতে পারে না। তাই যে ব্যক্তি রযমান মাস মনে করে রোযা রাখবে সে পালন করল তার উপর অর্পিত দায়িত্ব। অপরের নিকট যা আছে, তা পালনের দায়িত্ব তার উপর অর্পিত নয়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যক ব্যক্তিকে শরীয়াত পালনের দায়িত্ব দিয়েছেন তার নিজের যা কিছু আছে তার ভিত্তিতে। অপরের যা কিছু আছে তার ভিত্তিতে দেন নি। যে অনুপস্থিত তাকেও এই সম্বোধনে শরীয়াত পালনে দায়িত্বশীল বানান নি। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ -

আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সহজতার বিধান করতে চান। তিনি তোমাদের প্রতি কঠোরতার বিধান করতে চান না।

আবূ বকর বলেছেন, ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ্, মুজাহিদ ও দহাক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ঃ সহজতা হচ্ছে সফরে রোযা না-রাখা। আর কঠোরতা হচ্ছে সফরের রোযা রাখা এবং রোগে ভোগার মধ্যে রোযা রাখা। সফরে রোযা না-রাখা বিষয়ে যা বলা হয়েছে, তা সম্ভবত তার জন্যে, যার পক্ষে রোযা রাখা কষ্টকর এবং ক্ষতিদায়ক। যেমন নবী করীম

(স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি সফরে এক ব্যক্তিকে ছায়াচ্ছন্ন দেখতে পেলেন, জানলেন যে, সে রোযাদার। তখন তিনি বলেছিলেন ঃ সফরে রোযা রাখা খুব একটা পূণ্যের কাজ নয়। এ প্রেক্ষিতে আয়াতটির তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহ্ তোমাদের রোযা রাখা চান যতটা সহজসাধ্য হবে। যা কষ্টদায়ক হবে, তা রাখা চান না। কেননা নবী করীম (স) নিজে সফরে রোযা রেখেছেন, সফরে রোযা রাখা মুবাহ ঘোষণা করেছেন তার জন্যে, যাকে রোযা ক্ষতি করে না, কষ্ট দেয় না। আর একথা জানা আছে যে, নবী করীম (স) তো আল্লাহ্র বিধানের অনুসারী ছিলেন, পালনকারী ছিলেন সেই কাজের আল্লাহ তাঁর নিকট যে কাজ চান। এ থেকে বোঝা গেল যে, আল্লাহ্র কথা ঃ 'আল্লাহ তোমাদের প্রতি সহজতার বিধান করতে চান, কঠোরতার বিধান করতে চান না' কথাটি সফরে রোযা জায়েয হওয়ার পরিপন্থী নয়। তা বোঝায়, সফরে রোযা যার জন্যে ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক, আল্লাহ তাকে এই ক্ষতি করতে ও কষ্ট দিতে চান না। বরং তার পক্ষে রোযা রাখাই মাকরূহ। এ-ও বোঝা যায় যে, সফরে যে লোক রোযা রাখবে, তার রোযা রাখার ফরয আদায় হয়ে যাবে। তাকে সে রোযার কাযা করতে হবে না। কেননা কাযা করা ওয়াজিব বলা হলে তা তার জন্যে অবশ্যই কষ্টদায়ক হবে। আর আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ اليسر। ইখতিয়ার দান — التخيير। —বোঝায়। যেমন ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে। রোযা রাখার ব্যাপারে যখন কেহ ইখতিয়ারসম্পন্ন হবে এবং সেই সুযোগে সে রোযা রাখবে না তাকে সে রোযা কাযা করতে হবে না। এ-ও বোঝা যায় যে, রোগী, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা—আর রোযা রাখা যার যার পক্ষে ক্ষতিকর হবে বা বালক, তাদের সকলেরই পক্ষে রোযা না-রাখা জায়েয। জেননা রোযার ক্ষতি ও কষ্টের সম্ভাবনা এক ধরনের কষ্ট। আর আল্লাহ্ নিজে কাউকে কষ্ট দেবেন না—এটাই তাঁর ঘোষণা। তিনি আমাদের প্রতি কোনরূপ কঠোরতার পক্ষপাতী নন। এরই দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেই হাদীস যাতে বলা হয়েছে ঃ

اَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَيِّرَ بَيْنَ اَمْرَيْنِ اِلَّا اَخْتَارَ اَيْسَرَهُمَا -

নবী করীম (স)-কে যখনই দুটির মধ্যে যে-কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে অধিক সহজটিই তিনি গ্রহণ করেছেন।

এই দিক দিয়ে উপরোক্ত আয়াতটি একটি মৌল নীতি নির্ধারক, মৌলনীতি হচ্ছে 'যা-ই মানুষের ক্ষতি সাধন করে, মানুষকে কষ্ট দেয়, তার রোগ টেনে আনে; কিংবা রোগ বৃদ্ধি করে, তা পালন করার দায়িত্ব তার উপর অর্পিত নয়।' কেননা তা আল্লাহ্র কাঙ্খিত সহজতার পরিপন্থী। যেমন, যে লোক হজ্জের জন্যে পায়ে হেটে চলে যেতে পারে; কিন্তু প্রয়োজনীয় পাথেয় ও যানবাহন পায় না, আয়াতটি বলছে যে, হজ্জ করার দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতা তার উপর নেই। কেননা তা-ও তার জন্যে কষ্টদায়ক। আর তা 'সহজতার বিপরীত।' এ আয়াত থেকে একথাও বোঝা যায় যে, যে লোক রমযানের রোযা কাযা করতে সমর্থ হয়েও ক্রটি করবে, তাকে সেজন্যে কোন ফিদিয়া দিতে হবে

না। কেননা কঠোরতা প্রমাণিত হয়, সহজতা অস্বীকৃত হয়। এ-ও বোঝা যায় যে; যাবতীয় ফরয ও নফল কাজ করার আদেশ দেয়া হয়েছে কিংবা মুবাহ করা হয়েছে এই শর্তের ভিত্তিতে যে, তাতে কঠোরতা ও নির্মম কষ্ট থাকবে না। এ-ও বোঝা যায় যে, রমযানের রোযা না থেকে থাকলে তা বিচ্ছিন্নভাবে কাযা করা যাবে। কেননা এ কাযা করার কথাটি فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ এর পরপরই বলা হয়েছে। এ থেকে উক্ত কথাটি বোঝা যায় দুটি দিক দিয়ে। একটি—আল্লাহ্র কথা ঃ 'আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সহজতার বিধান করতে চান, কঠোরতার বিধান করতে চান না'। বান্দাকে রমযানের রোযা কাযা করার ব্যাপারে ইখতিয়ার দিয়েছে, একাধারে ও একটানাভাবে কাযা করবে; কিংবা ভেঙ্গে ভেঙ্গে কাযা করবে, এটা তার ইচ্ছা। আর দ্বিতীয়, সহজতার অর্থের দিক দিয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে কাযা করাটাই সামঞ্জস্যশীল। তাতে সম্ভাব্য কষ্ট থেকে বাঁচা যায়। একটার পর একটা—একটিও না ভেঙ্গে কাযা করা বাধ্যতামূলক হলে কঠোরতার সৃষ্টি করা হতো। আর রমযান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে কাযা করতে শুরু করা ওয়াজিব—দেরী করা ঠিক নয় বলে যাঁরা মত দিয়েছেন, উক্ত আয়াতের বিশ্লেষণে তাদের মত বাতিল প্রমাণ হয়ে গেছে। কেননা তাতে সহজতার তাৎপর্য অস্বীকৃত হয় ও কঠোরতাকে প্রশ্রয় দেয়া হয়।

'জবরীয়া' মতের লোকদের কথা এবং যারা বলে যে, বান্দারা যে কাজ করতে সক্ষম নয়, আল্লাহ্ তাদের উপর সেই কাজ করার দায়িত্ব চাপিয়ে দেন, তাদের মত উক্ত আয়াতের আলোকে সম্পূর্ণ বাতিল মনে করতে হবে। কেননা বান্দা যে কাজ করতে সমর্থ নয়, সেই কাজের দায়িত্ব তার উপর চাপানো—যা করার ক্ষমতাই নেই তা করতে বলা কঠোরতার উপর কঠোরতা আরোপ। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতে তাঁর বান্দাদের জন্যে কোনরূপ কঠোর ব্যবস্থা আরোপ করাকে নিজের থেকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তাদের কথা আর-ও একটি দিক দিয়ে বাতিল প্রমাণিত হয়। তা হচ্ছে, যে লোক নিজেকে কঠিন কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করে নিজেকে নির্মমভাবে কষ্ট দেয়, যেমন রোযা রেখে কঠিন কষ্টের মধ্যে নিজেকে ফেলে, আল্লাহ্ তার নিকট সে কাজ চান না। বান্দা তা করুক, আল্লাহ্ তা আদৌ পছন্দ করেন না। তিনি তাতে বান্দার প্রতি একবিন্দু খুশী হবেন না। উক্ত আয়াতের এটাই বক্তব্য।

কিন্তু 'জবরীয়া' গোষ্ঠী মনে করে যে, বান্দা যত কুফর ও নাফরমানীর কাজ-ই করুক, আল্লাহ্ তা-ই তাদের নিকট চান। কিন্তু এ কথা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। বান্দা আল্লাহ্র নাফরমানী করুক, তা তিনি কিছুতেই চাইতে পারে না। কেননা আল্লাহ্র উক্ত আয়াতে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সহজতার বিধান করতে চান, যেন তারা তাঁর হামদ করে, তাঁর শোকর আদায় করে। তারা তাঁর প্রতি কুফর করে পরিণামে কঠিন আযাবে নিক্ষিপ্ত হওয়ার যোগ্য হোক, তা তিনি কিছুতেই চাইতে পারেন না। কেননা এটা যে চাইবে, সে সহজতা চাইতে পারে না। সে কঠোরতা চায় চলে বোঝা যাবে। সেজন্যে সে হামদ ও শোকর পেতে পারে না। আয়াতটি এসব দিক দিয়ে 'জবরীয়া' মতের লোকদের কথাকে মিথ্যা, বাতিল ও ভিত্তিহীন প্রমাণ করেছে। কেননা ওরা আল্লাহ্র প্রতি

এমন 'সিফাত' বা 'গুণ' আরোপ করেছে, যা তাঁর নেই বলে তিনি নিজে ঘোষণা দিয়েছেন। সে 'গুণ' তার জন্যে শোভন নয় বলে তিনি নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلِتُكْمِلُوْا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوْا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ -

এবং যেন তোমরা ইদ্দতটি পূর্ণ কর এবং আল্লাহ্‌র তকবীর কর যেমন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।

আবূ বকর বলেছেন, 'যেন তোমরা 'ইদ্দত' পূর্ণ কর'—এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। একটি হল, রমযানের নতুন চাঁদ যদি দেখা না যায়, তা হলে শাবান মাস ত্রিশ দিনে পূর্ণ ধরতে হবে। এই কথাটি রাসূলের একথার ভিত্তিতে বলা যে, তোমরা রোযা রাখ চাঁদ দেখে এবং রাখা বন্ধ কর চাঁদ দেখে। যদি ঊনত্রিশ তারিখে চাঁদ দেখা না যায়, তাহলে তোমরা ত্রিশ দিনের ইদ্দত পূর্ণকর। অর্থাৎ চাঁদ অদৃশ্য থেকে গেলে ত্রিশ দিনের মেয়াদ পূর্ণ করতে হবে। এ থেকে রমযানের কাযা একসাথে কিংবা ভেঙ্গে ভেঙ্গে রাখার ইখতিয়ারও বোঝায়। শুধু সংখ্যাটি পূর্ণ করার বাধ্যবাধকতা আছে। কেননা তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, এই মেয়াদটা পূরণ করাই কর্তব্য। আর ভেঙ্গে ভেঙ্গে রোযা রেখেও মেয়াদ পূর্ণ হতে পারে; একটা পরপর রেখেও মেয়াদ পূর্ণ করা যেতে পারে। আর তাৎক্ষণিকভাবেই কাযা শুরু করতে হবে, তাও ওয়াজিব নয়। কেননা মূল মেয়াদটা পূর্ণ করাই যখন লক্ষ্য, তখন যেভাবে রোযা রেখেই পূর্ণ করা হোক, তা-ই গৃহীত হবে। তা তাৎক্ষণিকভাবে কাযা করা হোক বা কিছুদিন পর ভেঙ্গে ভেঙ্গে করা হোক, কি এক সাথে ও একটানাভাবে রাখা হোক, তাতে কোন পার্থক্য হয় না। মোট সংখ্যক রোযা রাখা হলেই হল। উপরন্তু রোযা বিলম্বে কাযা করলে কোন ফিদিয়া দিতে হবে না। না-রাখা রোযাগুলো কাযা করা ছাড়া আর কিছুই করণীয় নেই, কেননা আল্লাহ্ চান ইদ্দত পূর্ণ হওয়া। আর তা পূর্ণ হয়ে গেছে, তার উপর ফিদিয়া দেয়া বাধ্যতামূলক বললে কুরআনের মূল দলীলের উপর কথা বাড়িয়ে দেয়া হয়। যা চাওয়া হয়নি তা-ই প্রমাণ করা হয়। যে লোক রমযান মাসে ত্রিশ দিন রোযা রাখেনি তার পক্ষে ঊনত্রিশ দিনের এক মাসব্যাপী রোযা রাখা জায়েয হবে না। কেননা আল্লাহ 'ইদ্দত পূর্ণ' করতে বলেছেন, ঊনত্রিশ দিনে ইদ্দত পূর্ণ হয় না। একদিন কম থেকে যায়, 'ইদ্দত পূর্ণ কর' কথাটি সংখ্যাগত পূর্ণতার দাবি রাখে। কম সংখ্যক দিনের একমাস রোযা রাখলে জায়েয হবে বলে যারা দাবি করেছেন, তাদের দাবি আয়াতের হুকুমের বিপরীত।

এ-ও বোঝা যায় যে, এক জনপদের লোকেরা যদি চাঁদ দেখার ভিত্তিতে ঊনত্রিশটি রোযা রাখে এবং অপর জনপদের লোকেরা যদি চাঁদ দেখেই ত্রিশটি রোযা রাখে তাহলে ঊনত্রিশটি যারা রেখেছে তাদেরকে আর একটি রোযা কাযা করতে হবে আল্লাহ্‌র 'এবং যেন তোমরা ইদ্দত পূর্ণ কর' আদেশের কারণে।[১] কেননা রমযান মাস ত্রিশ দিনের বোঝা

১. আগেই বলেছি, চাঁদ দেখেই যদি ঊনত্রিশটি রোযা রাখে, চাঁদ দেখে রাখা শুরু করে ও চাঁদ দেখে রোযা বন্ধ করে, তাহলে রোযা ঊনত্রিশটি বুঝতে হবে। তার কাযা করতে হবে কেন?

গেছে সেই জনপদের লোকদের জন্যে। অতএব উনত্রিশটি রোযা রাখা লোকদের জন্যে ত্রিশ সংখ্যাপূর্ণ করা কর্তব্য। কেননা একই জনপদের—দেশের কতক লোক উনত্রিশটি আর অপর কতক লোক ত্রিশটি রোযা রাখবে—এই ব্যবস্থা তো দেন নি।

আর আল্লাহ্র কথা ঃ 'এবং যেন তোমরা তকবীর কর আল্লাহ্র যে জিনিসের উপর তকবীর করতে তিনি তোমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন।'

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, মুসলিমদের কর্তব্য হচ্ছে, তারা যখন শওয়ালের নতুন চাঁদ দেখবে, তখন 'আল্লাহু আকবার' বলবে। আর এ তকবীর করতে থাকবে ঈদের শেষ পর্যন্ত। তা এজন্য যে, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'এবং যেন তোমরা ইদ্দত পূর্ণ কর ও আল্লাহ্র তকবীর কর সেই জিনিসের উপর যার হেদায়েত তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন'। ইমাম জুহরী বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) ঈদুল ফিত্র-এর দিন তকবীর বলতেন ঈদের নামাযের জন্যে যাওয়ার পথে এবং নামায শেষ হলে তাকবীর বলাও বন্ধ করে দিতেন। হযরত আলী, কাতাদাতা, ইবনে উমর, সাঈদ, ইবনুল মুসাইয়্যিব, উরওয়া, আল-কাসিম, খারেজাতা ইবনে জায়দ, নাফে ইবনে যুবায়র, ইবনে মুতঈম প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা ঈদের দিনের তকবীর বলতেন নামাযের জন্যে যাওয়ার সময়। জায়েদ ইবনুল মুতামির আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি ঈদুল আযহার দিন তার খচ্চরের পিঠে সওয়ার হয়েছিলেন। তিনি সর্বক্ষণ তাকবীর বলছিলেন। এভাবেই তিনি 'জাবানাতা' নামক স্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

ইবনে আবূ যিব শুবা মওলা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে ঈদের নামাযের দিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি শুনতে পেলেন, লোকেরা তাকবীর বলছে। তখন ইবনে আব্বাস বললেন, লোকদের অবস্থা কি? ইমাম কি তাকবীর করেছেন? আমি বলছিলাম, না, তখন তিনি বললেন, লোকেরা কি শুষ্ক হয়ে গেছে?

এ হাদীসে ইবনে আব্বাস নামায পড়তে যাওয়ার পথে তাকবীর বলাকে অপসন্দ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, আয়াতে যে তাকবীরের কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে, নামাযের খুতবায় ইমাম যে তাকবীর করেন, তা। তখন জনগণেরও উচিত ইমামের সাথে সাথে তাকবীর বলা। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হাদীস ঃ 'মুসলমানরা যখন শওয়াল মাসের নতুন চাঁদ দেখবে, তখন ঈদ শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাকবীর বলতে থাকা তাদের কর্তব্য। এতে খুব জোরে বা উচ্চস্বরে তাকবীর করতে হবে এমন কোন প্রমাণ নেই। মনে মনে তাকবীর বলাকেই তিনি মনে করেছেন হয়ত।

ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন যখন নামাযের জন্যে যেতে থাকতেন, তখন তিনি তাকবীর বলতেন। বলতেন উচ্চস্বরে। আর বলতে বলতেই নামাযের স্থানে পৌঁছে যেতেন। জায়দ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণিত। কুরআনের তাকবীর বলার আগে ঈদুল ফিতরের তাকবীর বলে পালন করতে হবে বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন বক্তব্য দিয়েছেন।

আল-মুয়াল্লা আবূ ইউসূফ ও আবূ হানীফার মত বর্ণনা করে বলেছেন, ঈদুল আযহায় যে লোক ঈদের নামাযে যাবে, সে তাকবীর বলবে এবং উচ্চস্বরে তাকবীর বলবে। ঈদুল ফিতরে তাকবীর বলবে না। আবূ ইউসূফ বলেছেন, ঈদুল আয্‌হা ও ঈদুল ফিতর উভয়েই তাকবীর বলবে। তাকবীর কোন সময় নির্ধারিত নয়। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ যেন তোমরা তাকবীর কর আল্লাহ্‌র—যেমন তিনি তোমাদেরকে হেদায়েত করেছেন কথাটিতে কোন সময় নির্ধারিত নয়।

আমর বলেছেন, দুই ঈদে তাকবীর বলা সম্পর্কে আমি ইমাম মুহাম্মাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই তাকবীর করবে, আমাদের মত-ও তাই, আল-হাসান ইবনে যিয়াদ ইমাম আবূ হানীফার এই মতের উল্লেখ করেছেন যে, দুই ঈদে পথে পথে তাকবীর বলা ফরয নয়, নামাযের স্থানেও ফরয নয়। শুধু ঈদের নামাযে তাকবীর বলা ওয়াজিব। তাহাভী উল্লেখ করেছেন, ইবনে আবূ ইমরান আমাদের সকল ফিকাহবিদের এই মত জানিয়েছেন যে, ঈদুল ফিতরের নামাযে যাওয়া কালে পথে পথে নামাযের স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত তাকবীর বলা ও বলতে থাকা তাঁদের মতে সুন্নাত। আল-মুয়াল্লাহ তাঁদের যে মতের উল্লেখ করেছেন, তা আমরা জানি না, তার সাথে আমরা পরিচিত নই। আওজায়ী ও মালিক বলেছেন, উভয় ঈদেই নামাযের স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত তাকবীর বলবে ঘর থেকে বের হয়ে। ইমাম মালিক বলেছেন, মুসল্লায় বসেও তাকবীর বলবে ইমামের আসার সময় পর্যন্ত। ইমাম উপস্থিত হলে (কিংবা নামাযে দাঁড়িয়ে গেলে) তাকবীর বলা বন্ধ করবে। ফিরে যাওয়ার সময় তাকবীর বলবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ঈদুল ফিতরের রাতে ও কুরবানীর রাতে উচ্চস্বরে তাকবীর বলা আমি পছন্দ করি, তার পরও সকাল বেলা নামাযের স্থানে যাওয়ার সময় পথে ও সে স্থানে পৌঁছার পর ইমামের দাঁড়ানোর সময় পর্যন্ত তাকবীর বলা খুবই পছন্দনীয় কাজ। অপর এক স্থানে বলেছেন, ইমামের নামায শুরু করার সময় পর্যন্ত তাকবীর বলতে থাকতে হবে।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্‌র তাকবীর অর্থ আল্লাহ্‌র বিরাটত্ব, মহানত্ব ঘোষণা ও প্রতিষ্ঠা। তা তিনটি দিক দিয়ে বাস্তবায়িত হতে পারে। মনের দৃঢ়তা ও স্থিতি, মুখের কথার মাধ্যেমে উচ্চারণ ও তদনুযায়ী বাস্তব কাজ। মনের দৃঢ়তা, হচ্ছে, আল্লাহ্‌র তওহীদ—সার্বিক একত্ব ও অনন্যতা, তাঁর ন্যায়পরতা এবং তাঁর সম্পর্কে নির্ভুল সুস্থ পরিচিতি লাভ। সকল প্রকার শোবাহ-সন্দেহের অপনোদন ও অবসান। মুখের উচ্চারণের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র উচ্চতর গুণাবলীর দ্বিধাহীন স্বীকৃতি, তাঁর পবিত্র সুন্দর নামসমূহের স্বীকৃতি এবং তিনি নিজেই নিজের যে সব প্রশংসা প্রকাশ করেছেন তাকে সত্য বলে মেনে নেয়া। আর বাস্তব কাজ বলতে বোঝায় তাঁর ইবাদত, দৈহিক ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগত আমল। যেমন নামায ও অন্যান্য যাবতীয় ফরয যথারীতি পালন। প্রথমে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপিত না হলে এবং তা বর্ণিত মাত্রায় না হলে দৈহিক আমল আল্লাহ্‌র নিকট স্বীকৃতব্য হবে না। আর এই সমস্ত কাজ-ই হতে হবে আল্লাহ্‌র আদেশ ও বিধান অনুযায়ী। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ - فَاُولٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا -

আর যে লোক পরকাল পেতে চাইবে এবং সে জন্যে তার উপযোগী চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাবে ঈমানদার হওয়া অবস্থায়, এদের চেষ্টা-প্রচেষ্টাই গ্রহণীয় হবে।

আল্লাহ্র আদেশ ও বিধানের আনুকূল্য লাভের প্রথম শর্ত হচ্ছে পরকাল পাওয়ার দৃঢ় ইচ্ছা ও বাসনা। এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়নি। আমলটা হতে হবে একান্তভাবে আল্লাহ্র জন্যে—এটাও বলা হয়েছে। আর 'আমল' বলতে যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা বুঝিয়েছে, যা-ই মানুষ জীবনব্যাপী করে। আর এ সব কিছুকে যুক্ত করা হয়েছে ঈমানের শর্তের সাথে। বলা হয়েছে ঃ وَهُوَ مُؤْمِنٌ 'সে মুমিন হয়ে আছে।' এরপরই আল্লাহ্র ওয়াদার উল্লেখ হয়েছে, সে ওয়াদার মূল কথা হচ্ছে—এসব আমল তারই জন্যে গৃহীত হবে, যার ঈমান রয়েছে আল্লাহ্র প্রতি। তাই আল্লাহ্র নিকট দাবি করা হয়েছে, তিনি যেন আমাদেরকে এই আয়াতের উপযুক্ত পাত্র বানান। তিনি যেন আমাদেরকে সেই সেই কাজ করার তওফীক দেন, যা তার সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্যে আমাদেরকে উপযুক্ত করে দেবে।

আল্লাহ্র তাকবীর-এ যখন এত সব তাৎপর্য নিহিত রয়েছে তখন আমরা নিঃসন্দেহে জানি যে, 'তওহীদের আকীদা' আল্লাহ্র প্রতি ঈমান ও রাসূলের প্রতি ঈমান—আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের প্রধান শর্ত। তা বিশেষ কোন ধরনের ইবাদতের সাথে বিশেষীকৃত নয়। এ-ও জানা আছে যে, যেসব ফরয কাজ অন্যান্য কারণের সাথে সম্পর্কিত তা শুধু রমযানের রোযার উপর নির্ভরশীল নয়। প্রমাণিত হল যে, উক্ত আয়াতে আল্লাহ্র যে বিরাটত্ব প্রকাশের উল্লেখ হয়েছে, তা রমযানের ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার সাথে সম্পর্কিত হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়। আর তন্মধ্যে উত্তম পন্থা হচ্ছে 'তাকবীর' শব্দ প্রকাশ ও উচ্চারণ করা। মানুষ মনে মনেও আল্লাহ্র 'তাকবীর' করতে ও বলতে পারে। পারে শওয়ালের নতুন চাঁদ দেখার সময় তাকবীর বলতে। আর নামাযের জন্যে চলে যাওয়াও 'তাকবীর' করার অর্থ হতে পারে। আগের কালের বহু তাফসীরকার এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ঈদের নামাযের মধ্যে যে তাকবীর বলা হয়, তা-ও এর অর্থ হতে পারে। শব্দে এ সব অর্থেরই সম্ভাব্যতা বর্তমান। কোনটাকে বোঝাবে, কোনটাকে বোঝাবে না, এমন কোন প্রমাণ-ই এখানে নেই। তাই এর যেটাই করা হবে তদ্দ্বারাই আয়াতের দাবি পূরণ হবে। তার দৃষ্টিকোণে কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু তা ওয়াজিব বা ফরয—এ কথার কোন প্রমাণ আয়াতে নেই। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ 'এবং যেন তোমরা আল্লাহ্র তাকবীর কর' ওয়াজিব ফরয প্রমাণ করে না। তা নফলও হতে পারে। আমরা তো নফল হিসেবেও আল্লাহ্র তাকবীর করি, তাঁর তাজীম করি। তাকবীর উচ্চস্বরে প্রকাশ করা যে ওয়াজিব বা ফরয নয়, এ ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। যদি কেউ তাকবীর বলে তবে তা তার খুব পছন্দ বলেই বলে। তা সত্ত্বেও অতি সাধারণভাবে যখনই তাকবীর

নাম করা যায়, এমন কিছু কেউ করবে, সে-ই আয়াতের দাবি অনুযায়ী কাজ করল, বুঝতে হবে।

তবে নবী করীম (স)-এর প্রাথমিক কালের অগ্রবর্তী মুসলিমগণ এবং তাবেয়ীদের তাকবীর বলা প্রসঙ্গে যা বর্ণিত হয়েছে—ঈদুল ফিতরের দিন নামাযে যাওয়ার পথে পথে তাকবীর বলা পর্যায়ে, তা-ই সম্ভবত আয়াতের আসল বক্তব্য বলে তাঁরা মনে করেছেন। এ থেকেও প্রকাশিত হয় যে, এই তাকবীর বলা নিঃসন্দেহে অতি পছন্দনীয়—কাজ মুস্তাহাব। তবে ওয়াজিব ফরয নয়, একথা নিশ্চিত।

ইবনে আবূ ইমরান উল্লেখ করেছেন, ইমাম আবূ হানীফার মাযহাবে এবং হানাফী মাযহাবের সব ফিকাহবিদের মতে তা খুবই উত্তম কাজ। কেননা নবী করীম (স) থেকে জুহরীর সূত্রে তা বর্ণিত হয়েছে, যদিও হাদীসটির সূত্রে 'মুরসাল'—অর্থাৎ সনদে সাহাবীর নামের উল্লেখ নেই। আগেরকালের ফিকাহবিদদেরও এই মত জানা গেছে। কেননা এ মতই আয়াতের সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন। 'ইদ্দত' অর্থাৎ রমযানের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সময় তাকবীর হওয়াই আয়াতের দাবি। আর সে জন্যে ঈদুল আযহা অপেক্ষা ঈদুল ফিতর-ই অধিক উপযুক্ত সময়। আর ঈদুল আযহায় তাকবীর বলা যখন তাঁরা সুন্নাত মনে করেন, তখন ঈদুল ফিতর-এও সুন্নাত হবে, তাতে সন্দেহ নেই। কেননা দুই ঈদের নামাযের মধ্যে তাকবীর বলার দিক দিয়ে কোনই পার্থক্য নেই। দুটিতেই নামাযের পর 'খুতবা' দেয়া হয়। সে দুটির সব সুন্নাত কাজের পরই তা করা হয়। অতএব সে দুই নামাযের জন্যে যাওয়ার পথে তাকবীর বলা অবশ্যই সুন্নাত হবে।

জবরীয়া গোষ্ঠীর মত এ আয়াত দ্বারা বাতিল হয়ে গেছে। কেননা আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ্র শরীয়াত পালনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের নিকট ইদ্দতের পূর্ণতা চেয়েছেন, সহজতা চেয়েছেন। চেয়েছেন, তারা যেন তাঁর তাকবীর বলে ও তাঁর হামদ করে, শোকর করে তাঁর নিয়ামত পাওয়ার দরুন। তাঁর হেদায়েত পাওয়ার কারণে। তিনিই এসব ইবাদতের পথ দেখিয়েছেন। এসব ইবাদত করেই তারা অফুরন্ত সওয়াব পাওয়ার অধিকারী হতে পারে। তিনি সকলের নিকট থেকেই এসব ইবাদত আনুগত্য পেতে চেয়েছেন। চেয়েছেন শোকর। যদিও তাদের মধ্যে আল্লাহ্র নাফরমান লোকও রয়েছে। অতএব এ আয়াত প্রমাণ করেছে যে, কেউ তাঁর নাফরমানী করুক, তা তিনি চান নি। তাঁর ফরয ও আদেশসমূহ তরক করুক তা-ও তিনি চান নি। বরং চেয়েছেন, সকলেই তাঁর হুকুম পালন করুক, তাঁর আনুগত্য করুক। তাঁর শোকর আদায় করুক। মানুষের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিও তাই বলে। বান্দার নিকট যা চাওয়া হয়েছে, তা যদি সে করে, তা হলেই আল্লাহ্র ইচ্ছা পূরণ হয়, তাঁর আদেশ পালিত হয়। আল্লাহ্ যদি বান্দার নিকট নাফরমানীই চাইতেন, তাহলে তো তাঁর নাফরমানরাই তাঁর অনুগত ও তাঁর আদেশ পালনকারী সাব্যস্ত হতো। অতএব আয়াতের বক্তব্য ও বিবেক-বুদ্ধির সিদ্ধান্ত পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ। এ দুয়ের মধ্যে একবিন্দু পার্থক্য নেই।

## রমযানের রোযার রাত্রে পানাহার ও যৌন সঙ্গম

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ -

রোযার রাত্রিতে তোমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন তোমাদের জন্যে হালাল করে দেয়া হয়েছে।

পরে বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ اَتِمُّ الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ -

পরে তোমরা রাত্র পর্যন্ত সিয়ামকে সম্পূর্ণ কর।

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, প্রথম দিক দিয়ে রোযায় তা-ই ফরয ছিল। যেমন বলা হয়েছে ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ -

তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল।

তখন প্রতি মাসের তিনদিনের রোযা ফরয ছিল। তাতে সন্ধ্যাকালীন নামাযের সময় থেকে পরের দিন পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রীসঙ্গম সম্পূর্ণ হারাম ছিল। এই বর্ণনাটি আতীয়া কর্তৃক ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইকরামা ইবনে আব্বাস থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে বলা হয়নি যে, তা প্রথম রোযায় ছিল। আতা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, সন্ধ্যার নামায হয়ে গেলে মানুষ যখন ঘুমাতো, তখন তার উপর পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম হারাম হয়ে যেত। দহাক বর্ণনা করেছেন, সন্ধ্যার নামায থেকেই তাদের উপর এই সবই হারাম হয়ে যেত। মুয়ায থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাদের উপর তা হারাম হতো ঘুমাবার পর। ইবনে আবূ লায়লা মুহাম্মাদ (স)-এর সাহাবীগণ থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা সকলেই বলেছেন, একজন আনসার ব্যক্তি কিছু খায়নি, পান করেনি, ঘুমিয়ে পড়েছে, সকাল পর্যন্ত রোযা রয়েছে। এতে রোযা রাখা খুবই কষ্টদায়ক হয়ে দেখা দিল। হযরত উমর (রা) নিদ্রা যাওয়ার পর সঙ্গম করেছিলেন বলে অপরাধী মনে রাসূলের নিকট উপস্থিত হল। পরে সব কথা তিনি রাসূলের নিকট প্রকাশ করলেন। অতপর এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

তোমাদের জন্যে রোযার রাত্রে স্ত্রীদের নিকট গমন হালাল করে দেয়া হয়েছে।

এ আয়াতে দ্বারা রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার পর পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম হারাম হওয়ার গোটা বিধানই মনসূখ হয়ে গেছে।

আয়াতের اَلرَّفَثُ শব্দের অর্থ اَلجِمَاعُ স্ত্রী সঙ্গম। ইল্‌মওয়ালাদের মধ্যে এ নিয়ে কোনই মতপার্থক্য নেই। অবশ্য اَلرَّفَثُ শব্দটির আরও অর্থ আছে। তা যেমন স্ত্রী সঙ্গম

বোঝায় তেমনি নির্লজ্জ অশ্লীল কথাবার্তাও বোঝায়। তবে তার ইঙ্গিতমূলক অর্থ সঙ্গম। এ শব্দটি সঙ্গমের দিকেই ইঙ্গিত করে। ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ 'অতঃপর না সঙ্গম করা যাবে, না ফিসক ফুজুরী করা যাবে।' অর্থাৎ স্ত্রীর নিকট গমন ও সঙ্গমের ইচ্ছা প্রকাশ বোঝায়। العجاج। বলেছেন, رفث নিরর্থক বেহুদা কাজ ও অশ্লীল কথাবার্তা বোঝায়। আয়াতের উত্তম অর্থ হচ্ছে, আসল স্ত্রী সঙ্গম, কেননা কথাবার্তার অশ্লীলতা মুবাহ নয়, স্ত্রীর নিকট গমন করলেই সঙ্গম হবে, তার সাথে রোযার কোন সম্পর্ক নেই। পূর্বেও ছিল না। এখনও তা নয়। বরং তার অর্থ স্ত্রী সঙ্গম। তা-ই তা তখন নিষিদ্ধ ও হারাম ছিল সকলের প্রতি। শেষে নাযিল হওয়া আয়াত দ্বারা তা হালাল ও মুবাহ করা হয়েছে, আগের নিষেধ মনসূখ হয়ে গেছে।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ -

স্ত্রীরা তোমাদের ভূষণ, তোমরা তাদের জন্যে ভূষণ।

অর্থাৎ পোশাক পরিধান যেমন তোমাদের জন্যে মুবাহ্, স্বামী-স্ত্রী মিলিত হওয়াও তেমনি মুবাহ।

لبس শব্দের অর্থ ستر আবরণ-ও হতে পারে। কেননা পোশাক তা-ই যা লজ্জাস্থান আবৃত করে। আল্লাহ রাত্রিকে لباس বলেছেন। কেননা তা সব কিছু আবৃত করে দেয়। অন্ধকার আচ্ছন্ন হওয়ার দরুন কিছুই দেখা যায় না। যদি এই অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহলে অর্থ হবে, স্বামী স্ত্রী পরস্পরের জন্যে আবরণ। যাবতীয় নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতাকে আবৃত ও অপ্রকাশিত রাখে। প্রত্যেকেই অপরের দ্বারা পবিত্র থাকতে পারে। পারস্পরিক নির্লজ্জতাকে অন্যান্য লোকের চোখের আড়ালে রাখতে পারে। আল্লাহ্‌র কথা ঃ

عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ -

আল্লাহ্ জানতে পেরেছেন যে, তোমরা নিজেরাই নিজেদের সাথে বিশ্বাসভঙ্গের আচরণ করছিলে।

আয়াতে যে অবস্থাকে সামনে রেখে কথা বলা হয়েছে, সেই অবস্থারই বর্ণনা হয়েছে এই কথাটিতে। রাত্রিকালে সঙ্গম মুবাহ্ করে আমাদের সংকট দূর ও হালকা করে দিয়েছেন এবং আমাদের প্রতি নিয়ামত দানের কথা বুঝিয়েছেন। এর দ্বারা রোযার রাত্রিকালে পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম হালাল ও মুবাহ্ করে দেয়া হয়েছে। এ জন্যে তিনি আমাদের নিকট শোকর দাবি করেছেন। আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা নিজেরাই নিজেদের সাথে বিশ্বাসভঙ্গের আচরণ করছিলে।' অর্থাৎ তোমরা রোযার রাত্রিসমূহে পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম করে নিষিদ্ধ কাজ করতে বলে মনে ধারণা করতে। যেমন বলা হয়েছে ঃ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ। 'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করছ।' অর্থাৎ 'পরস্পরকে হত্যা করছ।' এ-ও হতে পারে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজকে বিশ্বাস ভঙ্গকারী মনে করছিল। এতে নিজের

প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গকারী বলা হয়েছে এ হিসেবে যে, এই কাজের ক্ষতিটা নিজেরই সাধিত হতো। এ-ও হতে পারে যে, তার অর্থ হচ্ছে, নিজের নিকট অধিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কাজটি করে ঠিক বিশ্বাস ভঙ্গকারীর ন্যায় কাজ করেছে। 'খিয়ানত' অর্থ পারস্পরিক আবৃত রাখার দিক দিয়ে অধিকার ক্ষুণ্ন করা। আল্লাহ বলেছেন ঃ فَتَابَ عَلَيْكُمْ 'অতপর তিনি তোমাদের প্রতি 'তওবা' করেছেন। 'এর দুটি অর্থ হতে পারে। একটি—তাদের নিজেদের জন্যে খিয়ানত থেকে তওবা করাকে কবুল করা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, তোমাদের বোঝা হালকা করা, তোমাদের জন্যে রুখসত ও মুবাহ করে দেয়া। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ –

আল্লাহ জানতে পেরেছেন যে, তোমরা কক্ষণই তা গণনা করতে সক্ষম হবে না। তাই তিনি তোমাদের প্রতি তওবা করেছে (অনুগ্রহ করেছেন)।

অর্থাৎ তোমাদের উপর থেকে বোঝা হালকা করেছেন। ভুলবশত হত্যা সংক্রান্ত হুকুমের পর পরই যেমন বলা হয়েছে ঃ

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ –

যে লোক তা পাবে না, তাকে পর পরই একটানা দুই মাস রোযা থাকতে হবে। এই ব্যবস্থা আল্লাহ্র দিক থেকে তওবা স্বরূপ।

এটা আল্লাহ্র দিক থেকে বান্দার উপর অর্পিত বোঝা হালকাকরণ পর্যায়ে গণ্য। কেননা ভুলবশত হত্যাকারী ব্যক্তি এমন গুনাহ করেনি, যার জন্যে তাকে তওবা করতে হবে।

আল্লাহ্র কথা ঃ وَعَفَا عَنْكُمْ এবং তিনি তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। এই মাফ গুনাহের মাফী হতে পারে, যে গুনাহ তারা নিজেদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে করেছে। পরে তারা যখন নতুন করে খিয়ানত থেকে তওবা করেছে তখন তিনি তাদের ক্ষমা করেছেন। এ-ও হতে পারে যে, আল্লাহ যে কাজকে মুবাহ বানিয়ে দিয়েছেন, তার দ্বারা তিনি কর্মক্ষেত্রে ব্যাপকতা ও সহজতা এনে দিয়েছেন, কেননা অভিধানে العفو। শব্দের অর্থ 'সহজতা বিধান' লেখা হয়েছে। যেমন নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللّٰهِ وَاٰخِرُهُ عَفْوُ اللّٰهِ –

সময়ের প্রথম দিকটায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং সময়ের শেষ ভাগ আল্লাহ্র ক্ষমা।

অর্থাৎ সময়কে আল্লাহ প্রশস্ত করে দিয়েছেন এবং সময়ের শেষভাগে কাজ করার সুযোগ দিয়ে সহজতার বিধান করেছেন।

আল্লাহ্র কথা فَالْاٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ 'এক্ষণে তোমরা সঙ্গম করতে পার।' অর্থাৎ পূর্বে রাত্রিবেলায়ও যে সঙ্গম নিষিদ্ধ ছিল, এক্ষণে তা মুবাহ করা হয়েছে। المباشرة। শব্দের

অর্থ চামড়ার সাথে চামড়া মিলিত হওয়া। এখানে এ শব্দটি ইঙ্গিতমূলকভাবে স্বামী-স্ত্রীর যৌন সঙ্গম বুঝিয়েছে। জয়ন ইবনে আসলাম বলেছেন। 'আল মুবাশিরাতু' বলতে পরস্পরের সাথে মিলিত হওয়ার ও সঙ্গম করা বোঝায়। কেননা তাতে একজনের চামড়ার সাথে অন্যজনের চামড়া মিলিত হয়। আল-হাসান বলেছেন ঃ المباشرة النكاح। 'মুবাশিরাত' অর্থ 'বিয়ে', মুজাহিদ বলেছেন, যৌন সঙ্গম। যেমন আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলেছেন ঃ

وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ –

এবং তোমরা তাদের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হবে না মসজিদে ইতিকাফে থাকা অবস্থায়।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ –

এবং সন্ধান কর—পেতে চাও তা যা আল্লাহ তোমাদের জন্যে লিখে দিয়েছেন।

আবদুল ওহহাব তাঁর পিতার সূত্রে ইবনে আব্বাস-এর এই কথা বর্ণনা করেছেন ঃ এর অর্থ সন্তান। মুজাহিদ, হাসান, দহাক ও আল-হিকামও এরূপ বলেছেন। মুয়ায ইবনে হিশাম, তাঁর পিতা, আমর ইবনে মালিক আবুল জাওযা ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ উক্ত আয়াতের অর্থ হচ্ছে কদর রাত্রি। কাতাদাহ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ আল্লাহ্র লিখে দেয়া রুখ্সত—সুযোগ-সুবিধা।

আবূ বকর বলেছেন, এখন তোমরা 'মুবাশিরাত' পরস্পর মিলমিশ কর বলে যদি যৌন সঙ্গম বুঝিয়ে থাকে, তা হলে আল্লাহ্র কথা ঃ 'সন্ধান কর আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে যা লিখেছেন তা-এর অর্থ নিশ্চয়ই যৌন সঙ্গম হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা তাতে একই কথা একই সম্বোধনে পুনর্বার বলায় দোষ হয়। আমাদের পক্ষে প্রত্যেকটি শব্দের নবতর যে অর্থ গ্রহণ সম্ভব হবে তাই ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। একটি ফায়দার জন্যে একাধিক শব্দের ব্যবহার বৈধ নয়। আল্লাহ্র কথা ঃ 'এখন তোমরা মুবাশিরাত কর' সঙ্গম মুবাহ বুঝিয়েছে। কাজেই তার পরবর্তী 'আল্লাহ যা তোমাদের জন্যে লিখে দিয়েছেন তার সন্ধান কর' এর অর্থ অন্য কিছু হতে হবে। তাই এর অর্থ কদর রাত্রিও হতে পারে। ইবনুল জাওযা ইবনে আব্বাস থেকে এ কথার বর্ণনা করেছেন। কিংবা হতে পারে 'সন্তান'। যেমন তা ইবনে আব্বাস থেকেই বর্ণিত। অন্যদের কাছ থেকেও এর বর্ণনা পাওয়া গেছে—পূর্বে তাদের উল্লেখ করেছি। কিংবা অর্থ হতে পারে 'রুখ্সত'। তা কাতাদাহ থেকে বর্ণিত। আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের এই সব অর্থই যখন হতে পারে—সে সম্ভাব্যতা না থাকলে আগেরকালের মনীষীরা এসব অর্থ নিশ্চয়ই বলতেন না—তাই এ সব অর্থই গ্রহণ করা বাঞ্ছণীয়। আল্লাহ্ এই সব কয়টি কথাই বোঝাতে চেয়েছেন বলে মনে করতে হবে। তাহলে ব্যবহৃত শব্দে কদরের রাত্রি অর্থ হওয়ার সম্ভাব্যতা রয়েছে, যা রমযান মাসে পাওয়া যায়। আল্লাহ্র দেয়া রুখসতও বোঝাতে পারে। সন্তান চাওয়ার নির্দেশও হতে পারে। বান্দা এ কয়টির মধ্যে থেকে যেটাই চাইবে, সেটাই পেতে চাইলে সে সওয়াবের

অধিকারী হবে। আর সন্তানের সন্ধান করার আদেশ হলে তা হবে সেই হাদীসেরই কথা, যা নবী করমী (স) বলেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। তা হচ্ছে ঃ

تَزَوَّجُوْا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَانِّىْ مُكَا ثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ –

তোমরা বিয়ে করবে প্রেমময়ী অধিক সন্তানদায়িনী নারী। কেননা আমি কিয়ামতের দিন তোমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে অপরাপর উম্মতের উপর গৌরব প্রকাশ করব।

যেমন হযরত যাকারিয়া (আ) তাঁর আল্লাহ্র নিকট দো'আ করেছিলেন তাঁকে একটি সন্তান দানের জন্যে। বলেছিলেন ঃ

فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَّرِثُنِىْ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ –

হে আমার রব্ব! আমাকে তোমার নিকট থেকে একজন ওলী দাও, যে ইয়াকুব বংশধর থেকে আমার উত্তরাধিকারী হবে।

আল্লাহ্র কথা ঃ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا 'এবং তোমরা খাও, পান কর।' খাওয়ার নিষেধ থেকে মুক্তি দান করা হয়েছে একথা বলে। বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةَ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ –

নামায সম্পূর্ণ হয়ে গেলে তোমরা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহের সন্ধান কর।

যেমন বলা হয়েছে ঃ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا যখন তোমরা ইহরাম থেকে বের হয়ে আসবে, তখন শিকার করা তোমাদের জন্যে মুবাহ।

নিষেধের পর মুবাহ্ করে দেয়ার পর্যায়ে এ ধরনের দৃষ্টান্ত বিপুল রয়েছে। তাই উক্ত আয়াতের নির্দেশটি মুবাহ্ পর্যায়ের কাজের জন্যে। তা করা ওয়াজিব নয়। মুস্তাহাব-ও নয়। আল্লাহ্র কথা ঃ

حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ –

এ কাজের সুযোগ থাকবে অন্ধকারের বুক থেকে ফজরকালীন আলোর সাদা রেখার স্ফুরিত হওয়ার সময় পর্যন্ত।

আবূ বকর বলেছেন, আয়াত থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, ফজরের সময়কালীন অন্ধকারের বুক থেকে আলোর শ্বেত রেখা স্ফুরিত হওয়ার সময় পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী-সঙ্গম সম্পূর্ণ মুবাহ।

বর্ণিত হয়েছে—কিছু সংখ্যক লোক উক্ত আয়াত থেকে আসল কালো সূতা ও সাদা

সূতা মনে করেছিলেন এবং তার একটি অপরটি থেকে স্পষ্ট হওয়ার কথা বুঝেছিলেন। হযরত আদী ইবনে হাতিম (রা) তাঁদের একজন। মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, মুসাদ্দাস, হুসায়ন ইবনে নুসায়র, আবূ দাউদ, উসমান ইবনে আবূ শায়বা, ইবনে ইদরীস, হুসায়ন, শবী, আদী ইবনে হাতিম সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, উক্ত আয়াতটি যখন নাযিল হল, তখন আমি সাদা ও কালো সূতা গ্রহণ করলাম এবং তা আমার বালিশের নিচে রেখে দিলাম। আমি তা তাকিয়ে দেখছিলাম। কিন্তু আমার নিকট কিছুই স্পষ্ট হল না। পরে আমি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট ব্যাপারটি বললাম। তিনি আমার কথা শুনে হাসলেন। বললেন, তাহলে তোমার বালিশ তো খুব লম্বা-চওড়া মনে হয়। আসলে বলা হয়েছে রাত্র ও দিনের কথা। উসমান বলেছেন, আসলে আয়াতে রাতের অন্ধকার ও দিনের শ্বেত শুভ্র রেখা বোঝানো হয়েছে।

বলেছেন, আমাদের নিকট আবূ মুহাম্মাদ জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াসেতী আবুল ফযল জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ইয়ামী, আবূ উবায়দ, ইবনে আবূ মরিয়াম, আবূ গাসান মুহাম্মাদ ইবনে মতরফ, আবূ হাজিম, সহল ইবনে সায়াদাতা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র উক্ত কথাটি যখন নাযিল হয়েছিল, তখন مِنَ الْفَجْرِ অংশটি নাযিল হয়নি। পরে যখন লোকেরা রোযা রাখার ইচ্ছা করল, তখন তারা সাদা সূতা ও কালো সূতা নিজেদের পায়ে বেঁধে নিত। তার পর নির্বিকার নিশ্চিতভাবে পানাহারে মশগুল হতো। তারপরে مِنَ الْفَجْرِ অংশ নাযিল হয়। তাতে তারা জেনে গেল যে, আসলে তার অর্থ রাত ও দিন।.

আবূ বকর বলেছেন, যখন এই مِنَ الْفَجْرِ অংশ নাযিল হল তখন সব পরিষ্কার হয়ে গেল। অতঃপর কারোর মনে আর কোন সংশয় বা দ্বন্দ্ব সন্দেহ থাকল না, সকলেই বুঝলেন, এ আসল সূতার কথা নয়। ফজরকালীন অন্ধকার ও আলোর ব্যাপার মাত্র। যারা প্রকৃত সূতা মনে করেছেন, যেমন হযরত আদী, তাঁরা পূর্বে ভুল বুঝেছিলেন। এই বোঝায় তাঁদের কোন দোষ নেই। কেননা আসলে الخيط বলতে তো সূতাই বোঝায়। কিন্তু আয়াতে শব্দটি প্রত্যক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, পরোক্ষ ও ইঙ্গিতমূলক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ-ও হতে পারে যে, কুরায়শদের ভাষায় এবং আয়াতটির নাযিল হওয়ার সময় যাঁরাই রাসূলের নিকট উপস্থিত ছিলেন তাদের সকলেরই ভাষায় সূতা বুঝিয়েছে। আদী ইবনে হাতিম এবং অন্যান্য যাদের বুঝতে ভুল হয়েছিল, তাঁরা সে ভাষা জানতেন না। কেননা সব আরবরা সব ভাষাই বুঝবেন, এমন কথা নেই। তা সত্ত্বেও হতে পারে, তাঁরা خيط-এর প্রকৃত অর্থ সূতা এবং দিনের শুভ্রতা ও রাতের অন্ধকারের পরোক্ষ অর্থ জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁরা সেটিকে প্রকৃত অর্থেই গ্রহণ করেছিলেন। পরে যখন তাঁরা নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি জানিয়ে দিলেন আল্লাহ্‌র কথার আসল তাৎপর্য। আর তার পরই مِنَ الْفَجْرِ অংশ নাযিল হয়েছিল। ফলে সন্দেহ-সংশয় দূর হয়ে গেল। আর শব্দের অর্থ হিসেবে স্থির হল রাতের অন্ধকার ও দিনের শুভ্রতা।

ইসলামের পূর্বে জাহিলিয়াতের সময়েও এই শব্দ বলে রাতের অন্ধকার ও দিনের আলো-ই বোঝা যেত। কুরআনের পূর্ববর্তী ভাষায়ও এই অর্থের ব্যাপক প্রচলন ছিল।

আবূ উবায়দাতা মামর ইবনুল মুসান্না বলেছেন ঃ الخيط الابيض। অর্থ, সকাল প্রভাত কাল এবং الخيط الاسود। অর্থ রাত। আর الخيط। অর্থ রঙ বা বর্ণ।

যদি প্রশ্ন করা হয়, রাতকে সাদা সূতার সাথে তুলনা করা হল কিভাবে ? রাত তো সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করে। আমরা জানি সকালকে সূতার সাথে তুলনা করা হয়েছে এজন্যে যে, তা দিগন্তে বিস্তীর্ণ ও দৈর্ঘ্য প্রস্থে প্রশস্ত। কিন্তু রাত ও সূতার পারস্পরিক কোন সাদৃশ্য নেই।

জবাবে বলা যাবে, কালো সূতা সেই কালো, যা সে স্থানে রক্ষিত, যা তাতে সাদা সূতার প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে ছিল। তা সেই স্থানে সে সাদা সূতার সমান, যা তার পরে প্রকাশিত হয়। এ কারণে তার নাম দেয়া হয়েছে কালো সূতা। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি রোযাদারের প্রতি পানাহার হারাম হওয়ার সময়টা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আমাদের নিকট মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ মুসাদ্দাদ হাম্মাদ ইবনে জায়দ আবদুল্লাহ ইবনে সওয়াদাতা আল-কুশায়রী তাঁর পিতার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ আমি সমুরাতা ইবনে জুনদুব (রা) -কে খুতবায় বলতে শুনেছি, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سُحُوْرِكُمْ اَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الْاُفُقِ الَّذِيْ هَكَذَا حَتّٰى يَسْتَطِيْرَ -

বিলালের আযান এবং দিগন্তের শ্বেত শুভ্রতা বিস্তীর্ণ হয়ে না পড়া পর্যন্ত তোমাদেরকে সেহরী খাওয়া থেকে নিষেধ করবে না।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা মুলাজিম ইবনে আমার আবদুল্লাহ ইবনে নুমান-কায়স ইবনে তালক তাঁর পিতার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا يَهِيْدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الْاَحْمَرُ -

তোমরা শেষ রাতে পানাহার কর, উচ্চ হয়ে আসা আলোক রেখা তোমাদেরকে কস্মিন কালেও পথ দেখাবে না। অতএব তোমরা লাল বর্ণ সম্মুখে আসা পর্যন্ত পানাহার চালাতে থাক।

এই হাদীসে الاحمر। শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর শ্বেত ফজর দিগন্তে দেখা দেয় লাল বর্ণের প্রকাশ হওয়ার পূর্বে এবং সেই লাল বর্ণ দেখা দেয়ার সময় রোযাদারের প্রতি পানাহার হারাম হয়ে যায়, এ বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে কোনই মতপার্থক্য নেই। নবী করীম (স) থেকে আদী ইবনে হাতিম (রা) বলেছিলেন ঃ

اِنَّمَا هُوَ بَيَاضُ النَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ -

তা আর কিছুই নয়, তা হচ্ছে দিনের শুভ্রতা ও রাতের অন্ধকার।

এ বর্ণনায় লাল বর্ণের উল্লেখ নেই। যদি বলা হয়, হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে ,বলেছেন ঃ

تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ نَهَارًا اِلاَّ اَنَّ لشَّمْسَ لَمْ تَطْلِعْ -

আমরা রাসূলে করীম (স)-এর সাথে·একত্রে সেহরী খেয়েছি, তখন দিন, তবে সূর্যের উদয় হয়নি।

এর জবাবে বলা যাবে, এ হাদীসটি হুযায়ফা থেকে প্রমাণিত নয়। তাছাড়া এটি একটি খবরে ওয়াহিদ। তা নিয়ে কুরআনের উপর আপত্তি তোলা যেতে পারে না। আল্লাহ্‌র কথা হল ঃ 'যতক্ষণ না,শুভ্র রেখা কালো রেখা থেকে স্ফূরিত হবে ফজরের সময়ে। কাজেই রোযা রাখা ও পানাহার থেকে বিরত হওয়া উচিত ফজরের সময়কালীন শুভ্রতা প্রকাশিত হওয়ার সময়। আর হুযায়ফা বর্ণিত হাদীস যদি প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ ধরা হয়, তাহলে কুরআন যা নিষিদ্ধ করেছে, তা-ই মুবাহ হয়ে যাবে। নবী করীম (স) আদী ইবনে হাতিম বর্ণিত হাদীসে বলেছেন, তা দিনের শুভ্রতা ও রাতের অন্ধকার। তাহলে রোযায় দিনের বেলায় কি করে পানাহার করা যেতে পারে ? অথচ আল্লাহ্ কুরআন ও রাসূলের সুন্নাত তা হারাম ঘোষণা করেছে। হুযায়ফা বর্ণিত হাদীস যদি বর্ণনা সূত্রের দিক দিয়ে প্রমাণিতও হয়, তবু ঠিক সেই সময় পানাহার করা জায়েয প্রমাণিত হয় না। কেননা হাদীসে নবী করীম (স) খেয়েছেন, তা তো বলা হয়নি। তিনি নিজে সেই সময় খেয়েছেন বলে খবর দিয়েছে মাত্র। নবী করীম (স)-এর সঙ্গে থাকার কথা প্রমাণিত হয় না যে, তিনি সে বিষয়ে অবহিত-ও ছিলেন এবং তাঁকে তা করতে অনুমতিও দিয়েছে। নবী করীম (স) তা জানতেন এবং তিনি তাঁকে তা করতে নিষেধ করেন নি, একথা যদি প্রমাণও হয়, তাহলে বলতে হবে, সেই সময়টা ছিল শেষ রাতে ফজর উদয় হওয়ার নিকটবর্তী আর সেটিকেই তিনি দিন বলেছেন যেমন মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ আমর ইবনে মুহাম্মাদ নাকেদ—হাম্মাদ ইবনে খালিদ আল-খাইয়াত-মুআবিয়াতা ইবনে সালিহ, ইউনুস ইবনে সায়ফ, হারস ইবনে যিয়াদ, আবূ রহম-ইরবায ইবনে মারিয়াতা সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, কোন এক রমযানে নবী করীম (স) সেহরী খাওয়ার জন্যে আমাকে ডাকলেন। বললেন, 'বরকতওয়ালা সকালের খাবার খেতে আস। এ হাদীসে সেহরীকে সকাল বেলার খাবার বলেছেন। কেননা সকাল বেলাটা তো অতি নিকটেই ছিল। অনুরূপভাবে হযরত হুযায়ফাও হয়ত সেহরীকে দিনের খাবার বলেছেন। কেননা দিন তো খুব একটা দূরে ছিল না।

আবূ বকর বলেছেন, আমরা ইতিপূর্বে যে আয়াত পাঠ করেছি এবং নবী করীম (স)-এর যে 'তওকীফ'-এর উল্লেখ করেছি, তা থেকে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, রোযা শুরু

করার প্রথম সময় হচ্ছে দ্বিতীয় ফজর সুবহে সাদিক—উদয় হওয়ার সময় যখন উচ্চতর দিগন্তে তা ভেসে উঠে। সুদীর্ঘ ফজর মধ্য আকাশ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ থাকে। তখনও রাত। আরবরা তাকে ذنب السرحان বলে।

ফজর উদয় হওয়া সম্পর্কে সন্দেহভাজন ব্যক্তির করণীয় ব্যাপারে মনীষিগণ নানা কথা বলেছেন। আবূ ইউসূফ املاء। গ্রন্থে বলেছেন, ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, ফজরের উদয়ের ব্যাপারে সন্দেহ হলে সেহরী খাওয়া ছেড়ে দেয়া উচিৎ। এটাই আমার পছন্দ। তখন যদি সেহরী শেষ করে, তাহলে তার রোযা সম্পূর্ণ হবে। মূলত এটাই সব ফিকাহবিদের কথা। বলেছেন, তখনও যদি খায়, তা হলে তাকে রোযা কাযা করতে হবে তা নয়। ইবনে সামায়াতা আবূ ইউসূফ থেকে ইমাম আবূ হানীফার এই মত বর্ণনা করেছেন যে, সন্দেহভাজন হয়ে যদি খাবার খায়, তাহলে তাকে একদিনের রোযা কাযা করতে হবে। আবূ ইউসূফ বলেছেন, না, সন্দেহ করে খেলেও রোযা কাযা করতে হবে না। আল-হাসান ইবনে যিয়দ আবূ হানীফার এই মত বর্ণনা করেছেন ঃ 'যদি এমন স্থানে থাকে, যেখানে ফজর উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, এবং যেখান থেকে সূর্যের উদয় হয় সেই স্থানটি দেখতে পাওয়া যায়, আর সেখানে প্রতিবন্ধক-ও কিছু না থাকে, তাহলে সেখানে ফজর স্পষ্ট প্রতিভাত হওয়ার সময় পর্যন্ত পানাহার করবে। এ কথাই আল্লাহ বলেছেন এ আয়াতে ঃ 'তোমরা খাও, পান কর, যতক্ষণ না তোমাদের সম্মুখে ফজরের শ্বেত শুভ্র রেখা কালো রেখা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।' ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, এমন স্থানে যদি কেউ থাকে, যেখান থেকে ফজর দেখা যায় না, কিংবা রাত্র চন্দ্রোজ্জ্বল বলে ফজর সম্পর্কে সন্দিহান হয়, তাহলে তখন খাবে না। তখন খাবার খেলে সে খারাপই করল। তার জোরদার মত যদি হয় এরূপ যে, সে খেয়েছে, আর ফজর-ও উদয় হয়েছে, তাহলে তাকে কাযা করতে হবে। অন্যথায় কাযা করতে হবে না। সফরে থাকুক; কিংবা নিজ বাড়িতে, তাতে কোন পার্থক্য হবে না। জুফর ও আবূ ইউসূফ-ও এ কথাই বলেছেন। আর আমরাও এই মত গ্রহণ করেছি। সূর্যের অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি হলে তখনও এই পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে বলে তাঁরা মত দিয়েছেন।

আবূ বকর বলেছেন, মূলের বর্ণনা ও املاء। -এর বর্ণনায় ফজর হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হলে পানাহার করা 'মাকরূহ' এ পর্যায়ে যা বলা হয়েছে, তা আল-হাসান ইবনে যিয়দের বর্ণনার সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন মনে করতে হবে। কেননা তার শেষ দুটি বর্ণনায় যা অস্পষ্ট ও মোটামুটিভাবে বলা হয়েছে, তাই হাসান ইবনে যিয়দের বর্ণনায় ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। কিতাবের বাহ্যিক অর্থেরও তা অনুকূল। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রোযায় ফজর উদয় হওয়ার দৃশ্য অবলোকন করার জন্যে দুজন লোক পাঠিয়েছিলেন। তাদের একজন এসে বলল, ফজর উদয় হয়েছে। আর অপরজন বলল, এখনও ফজর উদয় হয়নি। তখন তিনি বললেন, তোমরা দুজন একই ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত দিচ্ছ। এই বলে তিনি সেহরী খেলেন। ইবনে উমর (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া গেছে। এ ব্যাপার কেবলমাত্র সেই স্থানের জন্যে প্রযোজ্য যেখানে ফজর উদয় হওয়ার বিষয়ে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানতে পারা সম্ভব। আল্লাহ বলেছেন ঃ

حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ –

এ আয়াত অনুযায়ী ফজর স্পষ্ট প্রতিভাত হওয়া পর্যন্ত পানাহার চলতে পারে। তা মুবাহ।

التبين। অর্থ প্রকৃত ইলম লাভ। একথা জানা-ই আছে যে, এ আদেশ কার্যকর হতে পারে কেবল মাত্র সেখানে, যেখানে ফজর উদয় হওয়া সম্পর্কে প্রকৃত ইল্‌ম লাভ করা সম্ভব। কিন্তু রাত্র যদি চন্দ্রোজ্জ্বল হয়; কিংবা হয় মেঘাচ্ছন্ন আকাশের রাত; অথবা এমন স্থানে হয় যেখানে ফজরের উদয় স্থূল পর্যবেক্ষণই করা যায় না, সেখানে রোযার ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী। কেননা সেখানে ফজরের উদয় সম্পর্কে জানার কোন উপায় নেই। অতএব দ্বীনি কাজের নির্ভুলতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পানাহার থেকে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়। এর দলীল শুবা বর্ণিত একটি হাদীস। তিনি ইয়াযিদ ইবনে আবূ মরিয়ম আসসলুলী, আবুল জাওজা আস্‌সাদী সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, আমি হাসান ইবনে আলী (রা)-কে বললাম, আপনি রাসূলে করীম (স) থেকে কোন্ কথা স্মরণ করতে পারছেন? বললেন, তিনি বলেছেন ঃ

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ اِلٰى مَا لَا يُرِيْبُكَ، فَاِنَّ الصِّدْقَ طَمَانِيْنَةٌ وَالْكَذِبَ رِيْبَةٌ –

যাতে তোমার মনে সংশয় জাগে তা ত্যাগ করে যাতে তোমার কোন সংশয় নেই তা-ই গ্রহণ কর। কেননা অস্বস্তিপূর্ণ নিশ্চিন্ততা বিধানকারী সংশয়মুক্ত এবং মিথ্যা সংশয়পূর্ণ।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, আহমাদ ইবনে ইউনুস, আবু শিহাব, ইবনে আওন, আওন, শবী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি নুমান ইবনে বশীরকে বলতে শুনেছি—তারপর আর কাউকে এ কথা বলতে শুনি নাই—তিনি বলছিলেন, আমি রাসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ

اِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَاِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا اُمُوْرٌ مُتَشَابِهَاتٌ وَسَاَضْرِبُ فِىْ ذٰلِكَ مَثَلًا : اِنَّ اللّٰهَ حَمَى حِمًى وَاِنَّ حِمَى اللّٰهِ مَا حَرَّمَ، وَاِنَّهُ مَنْ يَّرْعَ حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ اَنْ يُّخَالِطَهُ، وَاِنَّهُ مَنْ يُّخَالِطُ الرِّيْبَةَ يُوْشِكُ اَنْ يَّجْسُرَ –

হালাল স্পষ্ট প্রতিভাত, হারামও তাই। এ দুয়ের মাঝখানে বহু বিষয় রয়েছে যা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ ও অস্পষ্ট। এ কথা বোঝাবার জন্যে আমি একটি দৃষ্টান্ত দেব। তা হচ্ছে, আল্লাহ একটি সংরক্ষিত এলাকা রক্ষা করেন। আর আল্লাহ্‌র সংরক্ষিত এলাকা

হচ্ছে যা তিনি হারাম করে দিয়েছেন, তা। যে লোক সংরক্ষিত এলাকার পাশে পাশে চলে, তার পক্ষে সংরক্ষিত এলাকার সাথে সংমিশ্রিত হয়ে পড়ার খুব বেশি আশংকা রয়েছে। আর যে লোক সংশয়ের মধ্যে পড়ে যাবে, তার দুঃসাহস বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, ইবরাহীম, ইবনে মূসা আর রাযী, ঈসা, জাকারিয়া, আমের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমি নুমান ইবনে বশীর (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন, আমি রাসূলে করীম (স)-কে উক্ত হাদীসের কথাগুলো বলতে শুনেছি। তাতে একটু পার্থক্য সহকারে এই কথাটি ছিল ঃ

وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُتَشَابِهَاتٌ لَايَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ عِرْضَهُ وَدِيْنَهُ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ -

হালাল ও হারামের মাঝে বহু কতগুলো বিষয় সাদৃশ্যপূর্ণ (সংশয়পূর্ণ) রয়েছে। তা বহু লোকই জানে না। তাই যে লোক এই সংশয়পূর্ণ ব্যাপারগুলো থেকে দূরে থাকবে সে তার ইজ্জত-সম্মান ও তার দ্বীনদারীকে রক্ষা করতে পারবে, আর যে লোক সংশয়পূর্ণ কাজ করবে, সে হারামের মধ্যে পড়ে যাবে।

এই সব কয়টি হাদীসই মুমিনকে সংশয়পূর্ণ কাজ করতে নিষেধ করছে। তা মুবাহও হতে পারে। হতে পারে নিষিদ্ধ। অতএব দুটিরই ব্যবহার হওয়া উচিৎ। কাজেই যে লোক সন্দেহে পড়ল, তার পক্ষে ফজরের প্রথম উদয় মুহূর্ত স্পষ্ট দেখার কোন উপায়ই থাকতে পারে না। ফলে সে নিজের দ্বীনদারীও রক্ষা করতে পারে না। পারে না স্বীয় সম্মান রক্ষা করতে। কেননা সে সন্দেহপূর্ণ জিনিস থেকে দূরে সরে থাকেনি। আল্লাহ্‌র সংরক্ষিত এলাকায়—নিষিদ্ধ কাজে পড়ে—যেতে পারে। এই কারণে আল্লাহ্‌র কথা ঃ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ কে আমরা সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করি, যার পক্ষে ফজর উদয়ের প্রথম অবস্থা অবলোকন করা সম্ভবপর। আমাদের হানাফী আলিমদের মাযহাব এটাই। উল্লিখিত দলীল সমূহই তাদের প্রমাণাদি। মালিক-ইবনে আনাস বলেছেন, ফজরকালের ব্যাপারে সন্দেহ হলে খাওয়া আমি পছন্দ করি না। যদি খায়, তাহলে তার সেদিনের রোযার কাযা করতে হবে। সওরী বলেছেন, সন্দেহে পড়েও মানুষ সেহরী খাবে ফজর উদয় ও স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত। উবায়দুল্লাহ্‌ ইবনুল হাসান ও শাফেয়ী বলেছেন, ফজর উদয়ের ব্যাপারে সন্দেহে পড়ে গিয়ে যদি খায়, তাতে তার কোন দোষ হবে না, কাযাও করতে হবে না।

যে লোক বলেছেন যে, সন্দেহে পড়েও লোক সেহরী খাবে, ফজর উদয় হওয়ার সম্ভাব্যতা বা অসম্ভাব্যতার হিসেব না করেই, সে মূল বিষয়ের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে। কেননা কোন অন্ধ ব্যক্তি যদি এমন স্থানে থাকে, যেখানে ফজর উদয় হওয়া

সম্পর্কে তাকে জানাবার কেউ নেই, তার পক্ষে সন্দেহে পড়ে খাওয়া জায়েয হতে পারে না। কেননা এটা অসম্ভব নয় যে, সে এমন সময় সেহরী খাবে, যখন রীতিমত সকাল হয়ে গেছে। যে লোক অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে রয়েছে, ফজর উদয় হওয়া সম্পর্কে সে সেখানে থেকে কিছুই জানতে পারে না, তার সন্দেহে পড়ে পানাহারে উদ্যোগী হওয়া উচিত নয়। তা যদি জায়েয মনে করা হয় এবং সন্দেহকে উড়িয়ে দেয়, তাহলে সর্বস্থানেই সন্দেহকে উড়িয়ে দেয়া ও পানাহারে উদ্যোগী হওয়া তার কর্তব্য হয়ে পড়ে। ফলে স্ত্রী সঙ্গম ধরনের কঠিন নিষিদ্ধ কাজে বা এ ধরনের অন্য কোন কাজে লিপ্ত হওয়াও অসম্ভব থাকে না। আর তা করা হলে রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীসের বিরোধিতা করা হবে। তিনি তো সর্ব প্রকারের সংশয়পূর্ণ কাজ এড়িয়ে যেতে বলেছেন, সন্দেহের কাজ পরিহার ও দৃঢ় প্রত্যয়পূর্ণ কাজ গ্রহণ করতে আদেশ করেছেন। তাছাড়া তাতে মুসলমানদের ইজমারও বিরোধিতা করা হবে। কেননা একজন পুরুষ অপরিচিত—তার স্ত্রী রূপে নিঃসন্দেহে নিশ্চিত নয় এমন নারীর সাথে সঙ্গম করা বা তার স্ত্রী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রেখে কোন নারীর সাথে সঙ্গম করতে উদ্যোগী হওয়া সম্পূর্ণ না-জায়েয—এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে একবিন্দু মতপার্থক্য নেই। যে লোক তার কয়েকজন স্ত্রীর মধ্যে নির্দিষ্টভাবে একজনকে তিন তালাক দেয়, পড়ে সে ভুলে যায় কাকে তালাক দিয়েছে, তা হলে তখন কোন একজন স্ত্রীর সাথেও সঙ্গম করতে উদ্যোগী হওয়া তার জন্যে জায়েয নয়। এ বিষয়ে সমস্ত ফিকাহবিদ সম্পূর্ণ একমত। তবে যে স্ত্রী সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান হবে যে, তাকে সে তালাক দেয়নি, তার সাথে সঙ্গম করতে পারবে।

ফজর উদয়ের ব্যাপারে সন্দেহ হয়েও যে লোক খাবার খাবে, তার রোযা কাযা করা হবে ওয়াজিব, এ কথাটি সন্দেহপূর্ণ কাজে উদ্যোগী হওয়া ঠিক নয়, এই কথাটির মতই। এ সন্দেহের কারণে কাযা করা ওয়াজিব নয়। কেননা মূল ফরয আদায়ের ব্যাপারে সন্দেহের কারণে কাযা বাধ্যতামূলক করা বা জায়েয হতে পারে না। আয়াতটির এক পর্যায়ে বলা হয়েছে ঃ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ -

রোযার রাত্রে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম করা তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে।

আর বলা হয়েছে ঃ وَمِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ এর দ্বারা সূর্যাস্ত ও নিদ্রার পর পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম হারাম হওয়ার বিধান মনসূখ হয়ে গেছে। এ থেকে কুরআন দ্বারা সুন্নাত মনসূখ হওয়ার কথা প্রমাণিত হয়। কেননা প্রথম দিকের নিষেধ তো কেবলমাত্র হাদীস থেকেই প্রমাণিত ছিল, কুরআন দ্বারা নয়। পরে কুরআনের তা মুবাহ ঘোষিত হওয়ার ফলে হারাম হওয়ার বিধান মনসূখ হয়ে গেল।

এতেই প্রমাণিত হয়েছে যে, হাম্বলী মাযহাবে রোযা সহীহ হওয়ার পরিপন্থী হয় না। কেননা রোযার প্রথম রাত থেকে শেষরাত পর্যন্ত স্ত্রী সঙ্গম করা মুবাহ ঘোষিত হয়েছে একথা জানা থাকা সত্ত্বেও যে শেষরাতের স্ত্রী সঙ্গম কাজটি ফজর উদয়ের কালেও ঘটতে পারে, আর তাহলে সকাল বেলা তাকে অপবিত্র অবস্থায় থাকতে বাধ্য হতে হবে। তা সত্ত্বেও রোযা জায়েয হওয়ার কথা পরে বলা হয়েছে, বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ اَتِمُّوْا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ -

পরে তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা সম্পূর্ণ কর।

আর এরপর 'আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে যা লিখে দিয়েছেন, তা তালাস কর' বলে সন্তান চাইতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। যিনি আয়াতের এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেই ব্যাখ্যা সহকারে। আয়াতের এ তাৎপর্যের সম্ভাবনা রয়েছে। এ থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, কদর রাত্রি রমযান মাসেই হয়। ইবনে আব্বাস (রা) উক্ত আয়াতের সেই অর্থ-ই করেছেন। কদর রাত্রি যদি রমযান মাসে না হতো তাহলে ওরূপ ব্যাখ্যাদান কিছুতেই জায়েয হতো না। আল্লাহ যে রুখসত দিয়েছেন তা গ্রহণ করা খুবই পছন্দনীয় কাজ। আগেরকালের মনীষীরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা থেকে সে কথাই প্রমাণিত হয়। একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, শেষরাত দ্বিতীয় ফজর উদয়কাল পর্যন্ত থাকে। উপরোক্ত আয়াত থেকেই প্রমাণিত যে, ফজর উদয় হওয়া পর্যন্তই রাত্র থাকে, আর তার উদয় হওয়ার পর থেকেই দিন শুরু হয়ে যায়।

এসব আয়াত থেকে একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম ফজর উদয় স্পষ্ট প্রতিভাত ও সে বিষয়ে দৃঢ়প্রত্যয় হওয়ার সময় পর্যন্ত মুবাহ। নিছক সন্দেহ তা নিষিদ্ধ করতে পারে না। কেননা স্পষ্ট প্রতিভাত হওয়ার পর কোনরূপ সন্দেহের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। একথা তার জন্যে যার পক্ষে ফজর উদয় হওয়া স্পষ্ট প্রতিভাত হওয়ার স্থানে পৌঁছা সম্ভব। যার পক্ষে সেখানে পৌঁছা সম্ভব নয়; কিংবা যার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল, অথবা অনুরূপ কিছু, উক্ত সম্বোধনে সে শামিল নয়; তার কারণ আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় বিস্তারিতভাবে বলে এসেছি। নিষেধের পর মুবাহ হওয়ার কথাটি আসায় একথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তা ওয়াজিব নয়। কেননা নিষেধের পর এই শব্দের ব্যবহার হলে তা-ই হতে পারে। তার দৃষ্টান্তসমূহও আমরা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করেছি। যেমন وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا 'ইহরামের বন্ধন থেকে তোমরা যখন বের হয়ে আসবে তখন শিকার কর', আর 'নামায শেষ হয়ে যাওয়ার পর তোমরা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়'। এসব আয়াতের যে আদেশ আছে, তা পালন করা ওয়াজিব নয়, নিছক অনুমতি থাকার কথাই প্রমাণিত হয়। তা সত্ত্বেও কোন কোন পানাহার মুস্তাহাবও হতে পারে। শেষ রাতে সেহরী খাওয়া তো মুস্তাহাব বটে। আবদুল বাকী ইবনে কানে ইবরাহীম আল হর্বী, মুসাদ্দাদ, আবূ আওয়া, কাতাদাহ, আনাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السُّحُوْرِ بَرَكَةً -

তোমরা সেহরী খাও। কেনন সেহরী খাওয়ায় বরকত রয়েছে।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, মসাদ্দাদ, আবদুল্লাহ, ইবনুল মুবারক, মূসা ইবনে আলী ইবনে রিবাহ, তাঁর পিতা আবূ কায়শ আমর ইবনুল আস সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

إِنَّ فَصْلًا بَيْنَ صِيَامِكُمْ وَصِيَامُ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السُّحُوْرِ –

তোমাদের (মুসলমানদের) রোযা ও আহলি কিতাবের রোযার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সেহরী খাওয়া (অর্থাৎ ওরা খায় না, তোমরা খাও)।

আবদুল বাকী আহ্‌মাদ ইবনে আমর জয়বকী, আবদুল্লাহ ইবনে সুবাইব, আবদুল্লাহ্ ইবনে সাঈদ, আবদুর রহমান ইবনে জায়দ ইবনে আসলাম তাঁর পিতা ইবনে উমর সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

نِعْمَ غَدَاءُ الْمُؤْمِنَ السُّحُوْرُ وَاِنَّ اللّٰهُ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِيْنَ –

সেহরী মুমিনের উত্তম খাবার। আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশতারা সেহরী খাওয়া লোকদের প্রতি দরূদ পাঠান।

এসব হাদীসে নবী করীম (স) সেহরী খাওয়াকে মুস্তাহাব—খুবই পছন্দনীয় কাজ বলে অভিহিত করেছেন। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা ফজরের সময়ে কালো রেখা থেকে শুভ্র রেখার স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠার সময় পর্যন্ত পানাহার করতে থাক' দ্বারা এই সেহরী খাওয়া বুঝিয়েছেন, মনে করাও খুবই সঙ্গত। ফলে সেহরী খাওয়া মুস্তাহাব হওয়ার কথা এ আয়াত থেকেই প্রমাণিত মনে করা অবাঞ্ছনীয় নয়।

যদি বলা হয়, আয়াত খাওয়া মুবাহর রুখসতের কথা-ই প্রমাণ করে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা প্রথম রাত্রে যা খাওয়া হয়, তাই। সেহরী খাওয়া বিষয়টি তাতে গণ্য নয়। তাহলে একই আয়াত মুস্তাহাব ও মুবাহ উভয়-ই প্রমাণ করে একথা কি করে বলা যেতে পারে ?

জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, আয়াতটির বাহ্যিক অর্থ থেকে তা প্রমাণিত হয় না, একথা ঠিক। আমরা তা প্রমাণ করেছি প্রকাশ্য সুন্নাত বা হাদীস দ্বারা। তাতে ব্যবহৃত শব্দের বাহ্যিক অর্থই তা মুবাহ প্রমাণ করে।

তাতে এই প্রমাণও রয়েছে যে, حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَبْيَضُ বলে যে সময়টা নির্ধারণ করা হয়েছে, তাতে মূল লক্ষ্যটা (বা শেষ পর্যায়টা) শামিল নয়। যে সময়টা ফজর উদয় হওয়ার ও স্পষ্ট প্রতিভাত হওযার জন্যে নির্দিষ্ট, খাওয়া মুবাহ হওয়ার পরিধিতে সেই সময়টা শামিল নয়। তা বোঝানো-ও হয়নি। পরে বলেছেনঃ 'অতঃপর তোমরা রাত পর্যন্ত সিয়াম সম্পূর্ণ করো।' এ কথায় রোযার শেষ পর্যায় নির্দিষ্ট করা হয়েছে রাত হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু রাত এই রোযার মধ্যে শামিল নয়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে তা শামিল হয়-ও। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَبِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا –

নাপাক অবস্থায়ও নয়, তবে পথ অতিক্রমকারী হলে অন্য কথা—এই নিষেধ গোসল করা পর্যন্ত।

গোসল শেষ কথা। নামায মুবাহ হওয়ার জন্যে এই গোসল শামিল। অর্থাৎ গোসল হয়ে গেলেই নামায পড়া যাবে। আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ –

এবং তোমাদের হাতসমূহ ধৌত কর কনুই পর্যন্ত।

অর্থাৎ কনুই সহ ধুতে হবে। وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ এবং তোমাদের পাসমূহ ধৌত কর গিরা পর্যন্ত। অর্থাৎ গিরাসহ। এতে শেষ পর্যায়টি মূল কথার মধ্যে শামিল। তাতে এই মৌলনীতি পাওয়া যায় যে, শেষটা অনেক সময় গণ্য হয়, অনেক সময় গণ্য হয় না। মূল হুকুমটা শেষের উপর প্রযোজ্য কিংবা প্রযোজ্য নয়, তা দলীলের দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ –

রাত পর্যন্ত রোযা সম্পূর্ণ কর।

এর মধ্যে রাত শামিল নয়। অর্থাৎ রাত্রে রোযা থাকতে হবে না। সূর্যাস্ত হলেই যে রাত, সেই রাতের আগেই—সূর্যাস্তের পর-পরই রোযা ভাঙ্গতে হবে। এর পূর্বে রাত্রিকালে পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম মুবাহ হওয়ার যে কথা বলা হয়েছে, তা প্রমাণ করে যে, এসব থেকে বিরত হয়ে যাওয়াই হচ্ছে নির্দেশিত রোযা পালনের অর্থ। এ বিষয়ে পূর্বে বিস্তারিত বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, শরীয়াতসম্মত রোযা এ সব তাৎপর্যে পূর্ণ। তার কোন কোনটি হচ্ছে বিরত থাকার বিষয়, কতগুলো হচ্ছে রোযার শর্ত। এই শর্ত পূরণ হলেই পানাহার বর্জন শরীয়াতসম্মত রোযায় পরিণত হতে পারে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'অতঃপর রাত পর্যন্ত রোযা সম্পূর্ণ কর' প্রমাণ করে যে, কোন ওযর ছাড়াই যে রোযা রাখেনি, অতঃপর তার পানাহার করা জায়েয নয়। বরং রোযাদার যে সব কাজ থেকে বিরত থাকে, তারও উচিত সেসব কাজ থেকে বিরত থাকা। কেননা এই বিরত থাকাটাও এক প্রকারের রোযা-ই। বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) আওয়ালী অধিবাসীদের নিকট আশুরার দিন লোক পাঠিয়েছিলেন। এই কথার ঘোষণা দেয়ার দায়িত্ব দিয়ে যে, যারা খাবার খেয়েছে, তারা যেন সেদিনের অবশিষ্ট সময় রোযা রাখে। আর যারা এখনও খায়নি, তারা যেন তাদের রোযা পূর্ণ করে। এতে খাওয়ার পরও পরবর্তী পানাহার থেকে বিরত থাকাকে রোযা নামে অভিহিত করেছেন।

যদি বলা হয়, শরীয়াতসম্মত রোযা না হলে শব্দ তা শামিল করে না। কেননা 'অতঃপর তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা সম্পূর্ণ কর' এ কথাটির লক্ষ্য হচ্ছে শরীয়াতসম্মত রোযা বোঝানো, আভিধানিক অর্থের রোযা নয়।

জবাবে বলা যাবে আমাদের নিকট তা শরীয়াতসম্মত রোযা হিসেবেই গৃহীত। নবী করীম (স) তা রাখতে আদেশ করেছেন, যদিও সেই দিনের রোযাটির কাযা করা ওয়াজি। আর যার কাযা করা ওয়াজিব, তা মুস্তাহাব রোযা না হয়ে যায় না। সেজন্যে অবশ্যই সওয়াব পাওয়ার অধিকার জন্মিবে। তাতেই প্রমাণিত হয় যে, যে লোক সকাল

বেলা পর্যন্ত রোযার নিয়ত করেনি তার কর্তব্য হচ্ছে রোযা সম্পূর্ণ করা। তা করা হলে তা ফরয রোযা হিসেবেই আদায় হয়ে যাবে। অবশ্য যদি পানাহার বা যৌন সঙ্গম ইত্যাদি রোযা সহীহ্ হওয়ার পরিপন্থী কার্যকলাপ যদি না করে, তবে।

যদি বলা হয়, রোযা পূর্ণ করার আদেশের বাহ্যিক তাৎপর্যের দৃষ্টিতে, তার উপর লক্ষ্য রাখতে হবে। পূর্ণতা বিধান হতে পারে সেই কাজের যার মধ্যে শরীক হওয়া সহীহ্ হবে। সে তাতে প্রবেশ করেনি বলেই তার প্রতি তা পূর্ণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

জবাবে বলা যাবে, রোযাদারকে যেসব কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়, সকাল বেলা পর্যন্ত যদি তা থেকে বিরত থাকে, তা হলে সে রোযায় প্রবেশ করেছে বুঝতে হবে। তার কারণ হিসেবে আমরা পূর্বেই বলেছি যে, বিরত থাকাটাও অনেক সময় শরীয়াত সম্মত রোযা হয়ে যায়। যদিও তার কাযা করা ফরয নয়। নফলও নয়। এ-ও বোঝা যায় যে, তা রোযা বটে, যদিও তার নিয়ত করা হয়নি। এই মত সকল ফিকাহবিদের নিকট গৃহীত। রমযান মাস ছাড়া অন্য সময়ে রোযাদার যে সব কাজ থেকে বিরত থাকে সকাল বেলা পর্যন্ত সে সব কাজ থেকে যদি বিরত থাকে, রোযার নিয়ত না করেই, তার জন্যে নফলের নিয়ত করে রোযা শুরু করতে পারে। তার জন্যে তা জায়েয ও যথেষ্ট হবে। যদি তার পূর্বে শেষ হওয়া সময়টা শরীয়াতসম্মত রোযা হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। সেখানে সে পরে নতুন করে নিয়ত করলে তার এই কাজটা রোযা গণ্য হবে। লক্ষণীয়, পান ও আহারের পর যদি নফল রোযার সংকল্প গ্রহণ করে তা তার জন্যে সহীহ্ হবে না। উপরে যে-বিশ্লেষণ দিয়ে এলাম, তার আলোকে বলা যায়, 'অতঃপর রাত পর্যন্ত রোযা সম্পূর্ণ কর কথাটি দিনের কোন এক সময় রমযানের রোযার নিয়ত করা জায়েয।

## নফল রোযা শুরু করলে তা সম্পূর্ণ করা বাধ্যতামূলক

আল্লাহ্র কথা হল ঃ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ 'অতঃপর তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা সম্পূর্ণ কর'। এ আয়াতে প্রমাণ করে যে, যদি কেউ নফল রোযা রাখতে শুরু করে, তাহলে সে রোযা সম্পূর্ণ করা তার জন্যে বাধ্যতামূলক। কেননা 'রোযার' রাত্রে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম করা তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে আল্লাহ্র এই কথাটি যে, যে রাতের পর সকাল বেলা থেকে রোযা রাখার সংকল্প গ্রহণ করে, সেই সব রাতই এই ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত। আর কেবলমাত্র রমযানের রোযার রাত্রের জন্যেই এই হুকুম, একথা মনে করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, না, তা উক্ত ধরনের সব রাত্রিকেই শামিল কর। কোন দলীল ব্যতীত সাধারণকে বিশেষীকৃত করা যায় না। ব্যবহৃত শব্দ থেকে যখন বোঝা যায় যে, নফল রোযার রাত্রিতে পানাহার করা মুবাহ তখন বুঝতে হবে যে, তা শব্দ থেকেই বোঝা যায়। এই পরই যোগ করা হয়েছে এই কথাটি ঃ 'অতঃপর রাত্রি পর্যন্ত রোযা সম্পূর্ণ কর।' বোঝা গেল, শুরু করা রোযাকে সম্পূর্ণ করা ফরয হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে রোযা নফল হোক; কিংবা ফরয। আল্লাহ্ তা ফরয হিসেবেই পূর্ণ করার আদেশ দিয়েছেন। অতএব নফল বা ফরয—যে রোযা-ই শুরু করা হোক, কোন গ্রহণীয় ওযর ব্যতীত তা ভাঙ্গা কারোর জন্যেই জায়েয নয়। আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়েই যখন তা পূর্ণ করা

কর্তব্য, তখন বুঝতে হবে, তা ফরয। তা যদি ভেঙ্গে ফেলা হয়, তাঁহলে তার কাযা করা অবশ্য কর্তব্য। অন্যান্য সব ফরয কাজের মতই।

যদি বলা হয়, আয়াতটি ফরয রোযার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, তাই তার ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ তার সীমার মধ্যেই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

জবাবে বলা যাবে, আয়াতটি হয়ত একটি কারণ বা বিশেষ উপলক্ষে নাযিল হয়েছে, কিন্তু তাতে ব্যবহৃত শব্দের সাধারণত্ব তার সাধারণ প্রয়োগকে নিষেধ করে না, কেননা আমাদের মতে হুকুমটা শব্দের থেকে নিতে হবে, নাযিল হওয়ার কারণ থেকে নয়। হ্যাঁ, হুকুমটা যদি কারণের মধ্যে সীমিত হয়, তাহলে তা থেকে বিশেষভাবে সেই লোকদেরকেই বুঝতে হবে, যারা নিজেদের সাথে খিয়ানতের আচরণ করেছে। কিন্তু সকলেই যখন হুকুমটার সাধারণ হওয়ার ব্যাপারে একমত এবং তা যাদের উপলক্ষে নাযিল হয়েছে তাদের ও অন্যান্যদের ব্যাপারে প্রয়োগযোগ্য—যারা তাদের মত অবস্থায় নয়, তখন বোঝা গেল যে, হুকুমটা নাযিল হওয়ার উপলক্ষের মধ্যে সীমিত নয়, তা সমস্ত প্রকারের রোযা পরিব্যাপ্ত। যেমন রমযানের রোযার ক্ষেত্রে সমস্ত মানুষের জন্যে সাধারণ, তখন—যেমন পূর্বে বলেছি—'অতঃপর তোমরা রাত পর্যন্ত রোযাকে সম্পূর্ণ কর' এই কথাটি 'রোযা শুরু করলেই তা পূর্ণ করা বাধ্যতামূলক' এই কথা প্রমাণের দলীল হিসেবে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ জায়েয হবে।

অবশ্য এ ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ ও জুফর বলেছেন, যে লোক নফল রোযা বা নফল নামায শুরু করেছে, পরে তা যদি বিপর্যস্ত হয়; কিংবা বিপর্যস্ত হওয়ার কারণ দেখা দেয়, তাহলে তাকে তার 'কাযা' করতে হবে। ইমাম আওজায়ীও এ কথাই বলেছেন যে, তা ভঙ্গ হয়ে গেলে অবশ্য 'কাযা' করতে হবে। আল-হাসান ইবনে সালিহ্ বলেছেন, সে যখন নফল নামায পড়া শুরু করে দেয়, তখন তাকে কম হলেও অন্তত দু রাকা'আত তো পড়তেই হবে। ইমাম মালিক বলেছেন, হ্যাঁ, যদি সে নামায বাঁধাগ্রস্ত বা বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তা 'কাযা' করতে হবে। তবে কোন অপ্রতিরোধ্য কারণ যদি তাকে নামায ত্যাগ করতে বাধ্য করে, তাহলে তার কাযা করতে হবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, নফল নামায শুরু করার পর তা যদি কোন কারণে বাধাগ্রস্ত বা বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার 'কাযা' করতে হবে না। ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর (রা)-ও এই মত দিয়েছেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

আবদুল বাকী ইবনে কানে বিশর ইবনে মূসা, সাঈদ ইবনে মনসুর, হুসায়ম, উসমান আলবতী, আনাস ইবনে সীরীন সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি একদা রোযা রাখলাম। কিন্তু বড় কষ্টের সম্মুখীন হয়ে গেলাম, পরে তা ভেঙ্গে ফেললাম। তখন ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর (রা)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা আমাকে আর একটি দিনের রোযা রাখতে আদেশ করলেন। তালহা ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া মুজাহিদের এই কথা বর্ণনা করেছেন যে, ব্যাপারটি সাদকার মত। একটি লোক তার ধন-মাল থেকে তা বের করে। অতঃপর সে ইচ্ছা করলে দেবে, ইচ্ছা না হলে দেবে না। তবে হজ্জ ও উমরার জন্যে নফল হিসেবে ইহ্‌রাম বাঁধার পর তা যদি করা না হয়, তাহলে তার দুটিরই 'কাযা' করার কর্তব্য সম্পর্কে ফিকাহ্‌বিদদের কোন মতপার্থক্য নেই। এ দুটি করার সময়

লোকটি যদি বন্দী হয়ে যায়, তাহলে কাযা করা জরুরী কিনা, এ বিষয়ে লোকদের বিভিন্ন মত রয়েছে। হানাফী ফিকাহবিদ ও তাঁদের অনুসারীরা বলেছেন, হ্যাঁ, তাকে 'কাযা' করতে হবে। ইমাম মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন, কাযা করতে হবে না। কিন্তু আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, আল্লাহ্র নির্দেশ 'অতঃপর তোমরা সিয়ামকে রাত পর্যন্ত সম্পূর্ণ কর' থেকে কাযা করা ফরয প্রমাণিত হয়। কোন ওযরের কারণে না করতে পেরে থাকুক; কিংবা ওযর ছাড়াই না করতে পেরে থাকুক, উভয় অবস্থায়ই তা 'কাযা' করতে হবে। কেননা এ আয়াত প্রমাণ করে যে, শুরু করলে তা অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে। যদি ওয়াজিব ফরয কাজ হয়ে থাকে আর শুরু করার পর না করা হয়ে থাকে, তাহলেও কাযা করতে হবে। এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্যই নেই। তা ওযরে না করা হোক বা ওযর ছাড়াই। আল্লাহ যে রোযা বা নামাযই ফরয করেছেন—যেমন মানত স্বরূপ করা—সর্বক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের লক্ষ্যে ওয়াজিব কাজ শুরু করার পর তা পূর্ণ করার কর্তব্য সম্পর্কে আর-ও দলীল রয়েছে। যেমন এই আয়াত ঃ

وَجَعَلْنَا فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَأْفَةً وَّرَحْمَةً ط وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا -

যারা তা মেনে চলেছে তাদের হৃদয়ে আমরা দয়া ও সহানুভূতির সৃষ্টি করে দিয়েছি। আর 'রাহবানিয়াত' তারা নিজেরা রচনা ও উদ্ভাবন করে নিয়েছে। আমরা তা তাদের প্রতি ফরয করে দিইনি। কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি সন্ধানে তারা নিজেরাই এই বিদআত বানিয়েছে। তা যথার্থভাবে পালন করার যে দায়িত্ব তাদের ছিল, তারা তা-ও করেনি।

'বিদআত' রচনা কখনও কার্যত হয়, কখনও তা হয় শুরু কথার দ্বারা। এই বিদআত রচনার পরও যারা তা যথাযথভাবে পালন করা পরিহার করে, তাদের নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে আয়াতে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের বিদআতী পন্থা যদি উদ্ভাবন করা হয় কিংবা তা মুখের কথার দ্বারা নিজের উপর ওয়াজিব করে নেয়া হয় তাহলেও তা পূর্ণ করা তার দায়িত্ব। কেননা তা পূর্ণ করার পূর্বেই যদি পরিত্যক্ত হয়, তাহলে বোঝা গেল যে, সে তার হক আদায় করেনি। আর নিন্দা করা হয় শুধু ওয়াজিব কাজ না করা হলে। তাহলে বোঝা গেল, তা শুরু করলে তা সম্পূর্ণ করা বাধ্যতামূলক, অবশ্যই করতে হবে। যেমন কোন মানত মানা হলে তা অবশ্যই পূরণ করতে হবে। কেননা তা মুখের কথার দ্বারা নিজের জন্যে ফরয করে নেয়া হয়েছে। এ আয়াতটিও তার দলীল হিসেবে পেশ করা হয় ঃ

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِىْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا -

তোমরা সেই বৃদ্ধার মত হবে না যে নিজের হাতে সূতা শক্ত করে পাকাবার পর টুকরা টুকারা করে কেটে ফেলেছে।

এ একটি দৃষ্টান্তমূলক কথা। যে আল্লাহ্র সাথে ওয়াদা প্রতিশ্রুতি শক্ত করে করার পর

তা ভঙ্গ করে, কিংবা আল্লাহ্র নামে কিড়া-কসম করে, তারপরই তা ভঙ্গ করে, ওয়াদা পূরণ করে না, তার দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে সেই বৃদ্ধার সাথে যে নিজের হাতে সূতা পাকিয়ে শক্ত করার পর নিজ হাতেই তা টুকরা টুকরা করে। এই কথাটি সাধারণভাবে সেই সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যে আল্লাহ্র নৈকট্যমূলক কোন নেক আমল করতে শুরু করে তা পূর্ণ করে না। কেননা তা শুরু করার পর তা সম্পূর্ণ না করা ও ভেঙ্গে দেয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেননা তা ভেঙ্গে ফেললে করা কাজ নষ্ট করা হয়। অথচ তা শুরু করার অর্থ হচ্ছে সে তা যথাযথভাবে করবে। যদি তা না করে, তাহলে সেই মেয়েলোকটির মতো হয়ে যাবে, যে তার সূতা পাকানোর পর তা টুকরা টুকরা করে। এর অর্থ, যদি কেউ আল্লাহ্র হক আদায়ে কোন কাজ শুরু করে তা নফল এবং বিদআত হলেও তা পূর্ণ করাই তার কর্তব্য। অন্যথায় সে সেই মেয়েলোকটির মত হয়ে যাবে।

যদি বলা হয়, এ আয়াতটি তো নাযিল হয়েছে তার সম্পর্কে, যে আল্লাহ্র সাথে কোন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, কিরা শক্ত করার পর তা কার্যত করে না। তাই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُّمْ –

তোমরা যখন পারস্পরিক কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হও, (তখন কার্যতঃ তা আল্লাহ্র সাথে কৃত চুক্তিতে পরিণত হয়। অতএব) আল্লাহ্র সাথে কৃত ওয়াদা তোমরা পূর্ণ কর।

এর পরই যোগ করা হয়েছে এই কথাটি ঃ 'তোমরা সেই বৃদ্ধার মত হবে না, যে নিজ হাতে সূতা পাকিয়ে তা টুকরা টুকরা করেছে।

জবাবে বলা যাবে তা বিশেষ উপলক্ষে নাযিল হলেও তার সাধারণ প্রয়োগ নিষিদ্ধ নয়। কেননা ব্যবহৃত শব্দ তো সাধারণ তাৎপর্যবহ। কয়েকটি প্রসঙ্গেই এ বিষয়ে ইতিপূর্বে কথা বলেছি। আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ –

তোমরা তোমাদের আমলসমূহকে নিষ্ফল নিরর্থক করবে না।

আমরা নিঃসন্দেহে জানি যে, রোযা কম-সে-কম পূর্ণ একটা দিন রাখাই সহীহভাবে ফরয আদায়ের জন্যে জরুরী। আর নামাযে কম-সে-কম পরিমাণ দুই রাক'আত। আর নফল ইবাদত—যা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্যে করা হয়—তা ফরয আদায়ের নিয়ত অনুযায়ীই হতে হবে। আর ফরয কাজের জন্যে যে সব শর্ত ধার্য হয়েছে, সেই শর্ত পূরণ করেই তা করতে হবে। আর মূল ফরয নামাযে এক রাক'আত গণনার যোগ্য নয়, একটি দিনের কিছু অংশ রোযা রাখা যায় না। আর নফল রোযা ঠিক ফরয রোযার মতই রাখতে হবে। ফরয রোযার যে পানাহার ও সঙ্গম কার্য থেকে বিরত থাকতে হবে, নফল রোযায়ও তা-ই করতে হবে। তাই সব নফল কাজ ফরয কাজের মতই আদায় করতে হবে। অতএব তার কোন কাজ শুরু করা হলে তারপরে তা বিনষ্ট বা অনুরূপ হয়ে গেলে তা বাতিল বা নিষ্ফল হয়ে যাবে। যতটুকু করা হয়েছে, তার-ও কোন সওয়াব হবার নয়। 'তোমরা তোমাদের আমলসমূহ নিরর্থক ও নিষ্ফল করে দিও না। আল্লাহ্র এই কথাটিও সে কাজ পূর্ণ না করে শেষ করে ফেলতে নিষেধ করছে। কেননা কাজকে বাতিল করতে

আল্লাহ্‌র নিষেধ স্পষ্ট অকাট্য। আর তা সম্পূর্ণ করা যখন বাধ্যতামূলক, তখন তা পূর্ণ না হয়ে থাকলে তা 'কাযা' করা কর্তব্য হবে। অপূর্ণ রাখার কারণ কোন ওযর হোক বা বিনা ওযরেই হোক। হাদীস থেকেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) نَهَى عَنِ الْبَتْيْرَاءِ 'এক রাক'আত নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।' অতএব নামায অবশ্যই পূর্ণ দুই রাক'আত হতে হবে। শুরু করা কাজ অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে। তাই সে কাজ যদি মাঝখানে নষ্ট হয়ে যায় বা কোন ওযরে নষ্ট করা হয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও, তবু তা কাযা করতে হবে। যেমন অন্যান্য যাবতীয় ফরয কাজে তা কর্তব্য। হাজ্জাজ ইবনে আমর, আল-আনসারী বর্ণিত হাদীসও তা-ই প্রমাণ করে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ كَسَرَ اَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ -

যে ভাঙ্গল বা পরিবেষ্টিত হল, সে ইহ্‌রামের বাইরে এসে গেল। অতএব পরবর্তী বছরই তার হজ্জ করা কর্তব্য।

ইকরামা বলেছেন, আমি ইবনে আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা)-কে এই কথাটি বললে তারা দুজনই বললেন, হ্যাঁ, সে সত্য বলেছে। এভাবে নবী করীম (স) থেকে হাদীসটির সরাসরি বর্ণনাকারী তিনজন হলেন। এর দুটি অর্থ হতে পারে। একটি তা করতে শুরু করার পর তা তার জন্যে বাধ্যতামূলক হয়ে যায়, তাতে ফরয ও নফলের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। দ্বিতীয়, অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি তা অসম্পূর্ণ রাখা হয়, তাহলে তার 'কাযা' অবশ্যই করতে হবে। আরও একটি হাদীস থেকেও তা প্রমাণিত হয়। হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, আহমাদ ইবনে সালিহ, আবদুল্লাহ ইবনে অহব, হায়াত ইবনে শুরাইহ, ইবনুল হাদ, জমীল, উরওয়া, ইবনুয যুবায়র, আয়েশা (রা) সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ

اُهْدِيَ لِيْ وَلِحَفْصَةَ طَعَامٌ، وَكُنَّا صَائِمَيْنِ فَاَفْطَرْنَا، ثُمَّ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَةٌ فَاشْتَهَيْنَا هَا فَاَفْطَرْنَا، فَقَالَ لَاعَلَيْكُمَا صَوْمًا مَكَانَهُ يَوْمًا اٰخَرَ -

আমাকে ও হাফসাকে একটা খাবার হাদিয়া দেয়া হয়েছিল। আমরা দুজনই তখন রোযাদার ছিলাম, আমরা সে রোযা ভেঙ্গে ফেললাম। পরে রাসূলে করীম (স) উপস্থিত হলে আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের একটা খাবার হাদিয়া দেয়া হয়েছে। আমরা তা খেতে আগ্রহী হলাম। সেজন্যে আমরা রোযা ভেঙ্গে ফেলেছি। তখন তিনি বললেন, না, তার স্থলে তোমাদের দুজনকে আর এক দিনের রোযা রাখতে হবে।

এ হাদীস থেকেও নফল রোযা ভাঙ্গলে তার কাযা করা ফরয প্রমাণিত হয়। কেননা

তাঁরা দুজন রোযা কিসের ছিল তা বলেনি। তা সত্ত্বেও তাঁর কাযা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আবদুল বাকী ইবনে কানে ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ, কানবী আবদুল্লাহ ইবনে উমর, ইবনে শিহাব, উরওয়া, আয়েশা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি ও হাফসা দুজনই নফল রোযাদার ছিলাম। সকালে আমাদেরকে একটা খাবার হাদিয়া দেয়া হয়। আমরা রোযা ভেঙ্গে ফেললাম। পরে হাফসা রাসূলে করীম (স)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ

اَقْضِيَا يَوْمًا مَّكَانَه –

তদস্থলে তোমরা দুজন একটি রোযা 'কাযা' করে ফেল।

আবদুল বাকী আবদুল্লাহ ইবনে উমাইদুল ইসবাহানী আল-আকবর আজহার ইবনে জামীল আবু হুমাম মুহাম্মাদ ইবনুয জবরকান আবদুল্লাহ ইবনে উমর, জুহরী, উরওয়া, আয়েশা (রা) সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবদুল বাকী ইসহাক, আল-কানবী, মালিক, ইবনে শিহাব, জুহরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত হাফসা ও আয়েশা (রা)... এরপর পূর্বোক্ত ঘটনার উল্লেখ করেছেন। জবাবে রাসূলে করীম (স) বলেছিলেন ঃ তোমরা দুজনই তদস্থলে একটি দিনের রোযা কাযা কর। মুহাদ্দিসগণ এই হাদীসের সনদ সম্পর্কে কথা বলেছেন ও কয়েকটি দিক দিয়ে হাদীসটিকে ঘায়েল করেছেন। একটি হল আবদুল বাকী ইবনে কানের বর্ণনা। তাতে তিনি বলেছেন, আমাদের নিকট বাশর ইবনে মূসা আল-হুমাইদী বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি সুফিয়ান জুহরী থেকে সে হাদীসটি বর্ণনা করতে শুনেছি। তখন জুহ্রীকে বলা হল যে, ওটা উরওয়া বর্ণিত হাদীস। তখন জুহ্রী বলেছেন, না, ওটি উরওয়া বর্ণিত হাদীস নয়। হুমাইদী বলেছেন, তা যদি জুহরী বর্ণিত হাদীস হতো, তাহলে আমি তো ভুলে যেতাম না। এই যা বলা হয়েছে, তাতে আমাদের মতে হাদীসটি বাতিল হয়ে যায় না। কেননা জুহ্রী হয়ত ওকথা বলে বোঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি হাদীসটি উরওয়ার নিকট থেকে শুনেন নি, উরওয়া ছাড়া অন্য লোকদের নিকট থেকে শুনেছেন। তার অবস্থা বেশীর পক্ষে হলে তা 'মুরসাল' হবে। কিন্তু আমাদের মতে 'মুরসাল' হাদীস গ্রহণ অযোগ্য হয় না। আর মামর যে বলেছেন, হাদীসটি জুহ্রীর বর্ণিত হলে আমি তা ভুলে যেতাম না, এটা ধর্তব্য কথা নয়। কেননা জুহ্রীর বর্ণিত হাদীসটি ভুলে যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়, অসঙ্গতও নয়। যেমন অন্য লোকদের হাদীসেও তা হতে পারে। আর বেশির পক্ষে অবস্থা এই হতে পারে যে, মামর হাদীসটি জুহরীর নিকট থেকে শুনেন নি। মামর ছাড়া অন্যরা হয়ত তা জুহ্রীর নিকট থেকে শুনেছেন, কিন্তু বর্ণনা করেছেন জুহরীর সূত্রেই। তাতে সনদের ত্রুটি হয় না। মামর তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করেন নি, উরওয়ার 'মাওলা' জমলি তা উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন।

মুহাদ্দিসগণ তাতেও হাদীসটিকে ঘায়েল করেন ইবনে জুরাইজ যা উল্লেখ করেছেন তা দিয়ে। তিনি জুহরীকে বললেন ঃ আপনি কি এই হাদীসটি উরওয়ার নিকট থেকে

শুনেছেন? জবাবে বললেন, বাবে আবদুল মালিক-এ এক ব্যক্তি আমাকে এই হাদীসটি বলেছেন। এই হাদীসটি ছাড়া অন্য হাদীসের বর্ণনায় বলেছেন, সে ব্যক্তি হচ্ছে সুলায়মান ইবনে আরকাম। অবস্থার যে কোন পরিবর্তনই হোক, তাতে ফিকাহবিদদের নিকট অগ্রাহ্য হওয়ার মত তাতে কিছুই নেই। হাদীস পারদর্শীদের আপত্তিও হাদীসটিকে বিপর্যস্ত করেনি। তাতে কোন দোষ বা ত্রুটিও দেখা দেয়নি। খসীফ ইকরামা ইবনে আব্বাস সূত্রেও বর্ণনা করেছেন, হাফসা ও আয়েশা দুজন রোযাদার হিসেবে সকাল করলেন। তখন তাদের দুজনের জন্যে একটি খাবার উপহার দেয়া হল। তাঁরা দুজন তাঁদের রোযা ভেঙ্গে ফেললেন। পরে নবী করীম (স) তাঁদের দুজনকেই তদস্থলে একটি রোযা কাযা করতে বললেন।

আবদুল বাকী আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল, মুহাম্মাদ ইবনে উবাদ, হাতিম ইবনে ইসমাঈল, আবূ হামযা, আল-হাসান, আবূ সাঈদ খুদরী সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আয়েশা ও হাফসা দুজন সকাল বেলা রোযাদার ছিলেন। তখন তাঁদের দুজনকে একটা খাবার উপহার দেয়া হয়, তখন নবী করীম (স) ঘরে এলেন এমন সময় যখন তাঁরা দুজন সে খাবার খাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা দুজন-না রোযাদার ছিলে ? বললেন, হ্যাঁ, বললেন, তাহলে এই রোযার স্থলে তোমরা একটি রোযা কাযা করবে। আর এরকমটা করবে না। অপর একটি সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। তা আবদুল বাকী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, ইসমাঈল ইবনুল ফযল ইবনে মূসা হারমালাতা, ইবনে অহব, জরীর ইবনে হাজেম, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, উরওয়াতা, আয়েশা (রা) সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি ও হাফসা সকাল বেলা পর্যন্ত নফল রোযাদার ছিলাম। তখন আমাদেরকে একটা খাবার উপহার দেয়া হয়। তা পেয়ে আমরা খুব খুশী হলাম। আমরা রোযা ভেঙ্গে ফেললাম। পরে নবী করীম (স) যখন ঘরে এলেন। হাফসা আমাকে উদ্বুদ্ধ করলে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি বললেন, এর স্থানে একটি রোযা রাখতে হবে।

আল-হাজ্জাজ ইবনে আরতাত জুহরী, উরওয়াতা, আয়েশাতা সূত্রেও এ রকমই একটি হাদীস আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। উবাইদুল্লাহ্ ইবনে উমর নাফে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর সূত্রেও এই কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে রোযা যে নফল ছিল, তার উল্লেখ করা হয়নি।

এ পর্যায়ে এই সব হাদীসই ব্যাপক পরিচিত সম্পন্ন। এর কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তাঁরা দুজন নফল রোযা রেখেছিলেন। আর কোনটিতে এই নফল-এর কথার উল্লেখ নেই। আর সব কয়টি বর্ণনায়ই রোযা কাযা করার আদেশের উল্লেখ রয়েছে।

এই ভেঙ্গে ফেলা রোযা যে কাযা করতে হবে, তা এই বর্ণনাটি থেকেও প্রমাণিত হয়। বর্ণনাটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাঊদ, মুসাদ্দাদ, ঈসা ইবনে ইউসূফ, হিশাম ইবনে হাসসান, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন, আবূ হুরায়রাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ -

যার ভেতরের দিক থেকে বমি আসবে রোযাদার অবস্থায় তাকে সে রোযা কাযা করতে হবে না। আর যদি কেউ নিজে ইচ্ছা করে বমি করে, তাহলে তাকে কাযা করতে হবে।

এই হাদীসেও নফল রোযায় কাযা করতে বলা হয়েছে, যদি রোযাদার নিজে ইচ্ছা করে বমি করে। কেননা নবী করীম (স) তাঁর উক্ত কথায় নফল রোযাদার ও ফরয রোযাদারের মধ্যে কাযা করার ব্যাপারে কোন পার্থক্য করেন নি।

বিষয়টি চিন্তা-ভাবনা করলে বোঝা যায়, যে লোক নফল সাদকা দেয় সে যখন তা যে লোককে সে সাদকা দিয়েছে সে তার নিকট থেকে হাতে নেয়, তাহলে সে দান থেকে সে বিরত হতে পারে না। কেননা তদ্দারা আল্লাহ্‌র যে নৈকট্য সে অর্জন করেছে, তা বাতিল হয়ে যাবে, যা করা তার জন্যে জায়েয নয়। অনুরূপভাবে যে লোক নফল নামায বা নফল রোযা শুরু করে দিয়েছে, তা পূর্ণ না করে সে সেকাজ থেকে বিরত হতে পারে না, তা তার জন্যে জায়েয নয়। কেননা তাতে সে যে কাজে এগিয়ে গেছে সেই গোটা কাজটাই বাতিল হয়ে যায়। ব্যাপারটি হাতে নিয়ে নেয়া দানের মত। তা দানকারী ফেরত নিতে পারে না।

যদি বলা হয়, তা দান গ্রহণকারী দানটা হাতে নেয়নি এমন অবস্থার মত। কেননা নামায রোযার অবশিষ্ট অংশ আদায় করা থেকে সে বিরত রয়েছে। এ যেন দানকারী দানের জিনিসটি দান গ্রহণকারীর হাতে সঁপে দেয়া থেকে বিরত থাকার অবস্থা।

জবাবে বলা যাবে, যদি তাছাড়া অন্য কিছু না হয়, তাহলে তাই হবে, যেমন তুমি বলেছ। কিন্তু কাজটা সম্পূর্ণ করার পূর্বেই কাজটি থেকে বের হয়ে গেলে যদি তা বাতিল হয়ে গেছে বলে মনে করা না যায়, তাহলে তা পুনরায় করার তো কোন পথ থাকে না। যখনই তা আবার করা হবে, তা সেই আগে শুরু করা কাজেরই কাযা করা হবে। একটি দিনের কিছু সময় রোযা থাকা ও কিছু সময় রোযা না থাকা তো সম্ভব নয়। যে লোক দিনের প্রথম অংশে খাবার খেয়েছে, তার পক্ষে সেই দিনটির অবশিষ্ট সময়টার রোযা থাকলে তাতে সহীহ্ রোযা হতে পারে না, অনুরূপভাবে যে লোক দিনের প্রথম ভাগে রোযা রাখল, পরে অবশিষ্ট সময়টায় সে রোযা ভেঙ্গে ফেলল, সে মূলত সেই দিনের রোযা রাখার হুকুমের বাইরে চলে এল। যতটুকু সময় সে রোযা রাখার কাজটা করেছে, তাকে সে বাতিল করে দিল। ঠিক যেমন একটি লোক দান করে দেয়া ও গ্রহীতার হাতে যাওয়া জিনিস যদি ফিরিয়ে নেয়, তাহলে সে তো সেই রোযাদারের মতই কাজ করল। কাজেই এই দান ফিরিয়ে নেয়া ব্যক্তিকে তার দান গ্রহীতাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। যে লোক হজ্জ বা উমরার ইহরাম বাঁধবে, তার পরে যদি তা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার কাযা করার আবশ্যকতা সম্পর্কে সকলেই একমত। তাতে প্রবেশ করা কথার দ্বারা ওয়াজিব করার মতই।

যদি বলা হয়, তাকে কাযা করতে হবে। কেননা ইহরাম নষ্ট হয়ে গেলে তা করে বের হয়ে এসেছে, তা তো বলা যায় না। সেটা নামায ও রোযা প্রভৃতি আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের ইবাদতের মত নয়। কেননা এ দুটি থেকে বের হয়ে আসা হলে দুটিই নষ্ট হয়ে যায়।

জবাবে বলা যাবে, শুরু করা হলে মূল কাজটা ফরয হওয়ার ব্যাপারে দুটিরই অভিন্ন হওয়াকে এই পার্থক্য নিষেধ করে না। এই ইহরামকারী ইহরামে প্রবেশ করার পর তা তার জন্যে হয় বাধ্যতামূলক হবে,—তাহলে তা পূর্ণ করাই কর্তব্য; না হয় তা তার জন্যে বাধ্যতামূলক হবে না। যদি তা সম্পূর্ণ করা বাধ্যতামূলক হয়, তাহলে তার কাযা করা ফরয হবে, তা অন্যায়ভাবে লালসা করে করুক বা নিজের কাজ দ্বারাই তা নষ্ট করুক, তাতে কোন পার্থক্য হবে না। কেননা যা ফরয হয়েছে, তাতে বিপর্যয় তার কাজের দরুন হয়েছে; কিংবা কোন কারণ ছাড়াই নষ্ট করুক, তার মধ্যে কোন পার্থক্য হয় না। যেমন মানত ও ইসলামের হজ্জ। যদি আমরা একমত হয়ে বলি যে, যখন-ই তা নষ্ট করা হবে, তখনই তা কাযা করা বাধ্যতামূলক হবে, সেই হুকুম হবে যদি তা ইচ্ছামূলকভাবে এবং তা করা কঠিন হবে বিনা কারণে করা হয়। যেমন সব ফরয ওয়াজিব কাজ। প্রতিপক্ষের কথা হাদীসই বাতিল করে দিয়েছে। সে হাদীসটি হচ্ছে রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

যে পূর্ণ করল বা থেমে গেল, সে হালাল হয়ে গেল। পরবর্তী বছরই হজ্জ করা তার কর্তব্য হবে।

এ হাদীস হজ্জ কাযা করা ফরয করে দিয়েছে, যদিও তা অন্য দ্বারা বাধাগ্রস্ত হওয়ার দরুন করা যায় নি। হজ্জ ও উমরায় যখন একথা প্রমাণিত হল, সব ইবাদতেই তা ফরয হবে। কেননা তার সহীহ্ হওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে তার পূর্ণ হওয়া। তার কতকটা অপর কতকের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে। আর তা নামায ও রোযার মতই। তা থেকে নিজের কাজ দ্বারা বের হয়ে আসুক, কিংবা তা ছাড়াই, তার কাযা করা ফরয হওয়ার ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই। যেমন অন্যান্য সব ফরয কাজেই করা হয়।

এই মতের বিরোধীরা একটি হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেছে। সে হাদীসটি উম্মে হানী (রা) বর্ণিত। নবী করীম (স) যখন তাঁর পানাবশিষ্ট তাকে দিলেন, তিনি তা অমনি পান করে ফেললেন। তারপরে তিনি বললেন, আমি তো রোযাদার ছিলাম, কিন্তু আপনার পানাবশিষ্ট প্রত্যাখ্যান করাকে আমি অপছন্দ করেছি। তখন নবী করীম (স) বললেন, তোমার এই রোযা যদি রমযান মাসের রোযার কাযা হয়ে থাকে, তাহলে এর স্থানে আর একটি রোযা কাযা করবে। আর যদি তা নফল রোযা হয়ে যাকে, তাহলে ইচ্ছা হলে কাযা করতেও পার, ইচ্ছা না হলে কাযা করবে না।

কিন্তু এই হাদীসটির সনদ ও মূল বক্তব্য কোনটিই ঠিক নয় (مضطرب) সনদের দোষ হচ্ছে, সামাক ইবনে হারস হাদীসটি একবার বর্ণনা করেছেন সেই ব্যক্তির নিকট থেকে যিনি উম্মে হানীর নিকট শুনেছেন। আবার কখনও উম্মে হানীর পুত্র হারুন, কখনও উম্মে হানীর কন্যার পুত্র, আবার কখনও উম্মে হানীর দুই পুত্রের নিকট থেকে—কখনও উম্মে হানীর এক পুত্র থেকে বর্ণনা করেছেন। আবার বলেছেন, আমার পরিবারবর্গ আমাকে জানিয়েছে। কোন হাদীসের সনদে এরূপ অস্থিরতা প্রমাণ করে যে, এর বর্ণনাকারী নির্দিষ্ট ও সুসংবদ্ধ নয়। আর মূল বক্তব্যেরও নানা রকম-ফের দেখা যায়। পূর্বে

যেমন বলেছি, মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, উসমান ইবনে আবূ শায়বা, জরীর ইবনে আবদুল হামীদ, যিয়াদ ইবনে আবূ যিয়াদ, আবদুল্লাহ ইবনুল হারস, উম্মে হানীর সূত্রে আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছেন। তাতে উম্মে হানী বলেছেন, বিজয় বিদসে যখন মক্কা বিজয় হল, তখন ফাতিমা (রা) এলেন এবং রাসূলে করীম (স)-এর বাম পাশে বসলেন। আর তাঁর ডান দিকে বসলেন উম্মে হানী। তখন অলীদাহ্ একটা পাত্র নিয়ে এল। তাতে পানীয় ছিল। আমি তা নিয়ে নিলাম এবং নবী করীম (স) তা থেকে পান করলেন। পরে তা উম্মে হানী নিয়ে তা থেকে পান করেন। পরে তিনি বললেন, হে রাসূল! আমি তো রোযাদার ছিলাম, এই পানীয় পান করে আমি ভেঙ্গে ফেলেছি। তখন তিনি বললেন, তুমি কি কোন রোযা করেছিলে নাকি ? বললেন, হ্যাঁ। বললেন, যদি নফল রোযা হয়ে থাকে, তাহলে তা তোমাকে কোন ক্ষতি করবে না।

এ হাদীসের বলা কথা ঃ 'তাহলে তোমাকে কোন ক্ষতি করবে না' থেকে তার কাযা ওয়াজিব হওয়াকে নিষেধ বা অস্বীকার করা হয়নি। কেননা এ রকমের কথা তো আমরা সাধারণত বলেই থাকি। 'তার ক্ষতি করবে না' কথাটি থেকে এ-ও তো বোঝা যেতে পারে যে, তার ক্ষতি করবে না এজন্যে যে, রোযা ভাঙ্গার এই কাজটা যে তার করা উচিত ছিল না, এ কথা তাঁর জানা ছিল না। কিংবা হয়ত তাঁর জানা ছিল, কিন্তু তিনি পান করে রোযা ভেঙ্গে রাসূলের অনুসরণে পান করাকেই হয়ত তিনি উত্তম কাজ মনে করেছেন রোযাকে রক্ষা করা অপেক্ষা।

আমাদের নিকট আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে আহমাদ ইবনে ফারিস, ইউনুস ইবনে হুবায়ব, আবূ দাউদ, তায়ালিসী, শুবা কুরায়শ বংশের জাদাতা নামক ব্যক্তি—তিনি উম্মে হানীর পুত্র সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সামাক ইবনে হরবও তাঁর নিকট হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে বলেছেন, উম্মে হানীর দুই পুত্র আমার নিকট হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। শুবা বলেছেন, তাদের দুজনের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি হিসেবে জাদাতার সাথে আমি সাক্ষাৎ করি। তিনি আমার নিকট উম্মে হানীর কথা হিসেবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এভাবে যে, রাসূলে করীম (স) তার নিকট এলেন। তিনি পানীয় এনে দিলেন। তিনি তা পান করলেন। পরে উম্মে হানী পাত্রটি নিয়ে তা থেকে পান করলেন। তখন তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ্র রাসূল আমি রোযাদার ছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ নফল রোযার রোযাদার নিজেরই আমানতদার; কিংবা নিজের উপর আদেশকারী। চাইলে রোযা রাখবে, চাইলে ভাঙ্গবে। তখন আমি জাদাতাকে বললাম, আপনি নিজে উম্মে হানীর মুখে এই কথা শুনেছেন ? বললেন, আমার ঘরের লোকেরা আমাকে এই সংবাদ দিয়েছে। আর উম্মে হানীর মুক্ত করা গোলাম আবূ সলিহ বলেছে উম্মে হানী থেকে সামাক হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সেই লোকটি থেকে, যে উম্মে হানীর নিকট থেকে শুনেছেন। তাতে বলা হয়েছে, রাসূলে করীম (স) বলেছেন, 'নফল রোযাদারের ইখতিয়ার রয়েছে, চইলে রোযা রাখবে, চাইলে ভেঙ্গে ফেলবে।' সামাক হাদীসটি উম্মে হানীর পুত্র, উম্মে হানীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তার কথা হচ্ছে, রমযান মাসের রোযার কাযা হলে এর বদলে একটা রোযা থাকবে। আর নফল রোযা হলে চাইলে রোযা রাখতে পার, চাইলে ভাঙ্গতে পার। কিন্তু এসব কথায় 'কাযা করতে হবে না' এমন কোন কথা নেই। তার বক্তব্য হচ্ছে, নফল রোযাদার ইখতিয়ার সম্পন্ন, সে নিজেরই আমানতদার। নফল রোযা হলে সে তা ভাঙ্গতে

পারে। তোমাকে কাযা করতে হবে না, একথা বলা হয়নি। মূল কথার মধ্যে এরূপ পার্থক্য (اضطراب) রয়েছে। তাতে বোঝা যায় যে, মূল কথা যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়নি। আর ব্যবহৃত এই শব্দগুলো যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে তাতে কাযা ফরয না হওয়ার কোন কথা নেই। তাতে বড়জোর রোযা ভাঙ্গা মুবাহ্ প্রমাণিত হয়। আর রোযা ভাঙ্গা মুবাহ কাযা প্রত্যাহৃত হওয়া প্রমাণ করে না। আর তাঁর কথা, রোযাদার নিজের আমানতদার, আর 'রোযাদারের ইখতিয়ার আছে' ইত্যাকার কথা থেকে হয়ত বলতে চাওয়া হয়েছে যে, রোযার নিয়ত ছাড়াই সে যদি রোযাদারের মতই পানাহার থেকে বিরত থাকে, তাহলে তার ইখতিয়ার আছে, নফল রোযার নিয়ত করবে, কিংবা ভাঙ্গবে। রোযাদারের মত যে বিরত থাকে, তাকেও রোযাদার বলা হয়। যেমন নবী করীম (স) আশুরার দিন বলেছিলেন ঃ 'যে খেয়েছে, সে দিনের অবশিষ্ট সময়টা রোযা রাখবে।' তাঁর বক্তব্য হল, রোযাদার যেমন বিরত থাকে তেমনি বিরত থাকা। তেমনি কথা ঃ রোযাদারের ইখতিয়ার আছে, রোযাদার নিজের আমানতদার এসব কথাই এই অর্থে। এ হাদীসের কোন কোন শব্দে যদি এরূপ কথা পাওয়া যায় যে, ইচ্ছা হলে কাযা কর, ইচ্ছা হলে করবে না, তা হলে বুঝতে হবে, এটা বর্ণনাকারীর ব্যাখ্যা। বর্ণনাকারী রাসূলের কথা তোমার ক্ষতি করবে না, ইচ্ছা হলে ভাঙ্গ, রোযাদারের ইখতিয়ার আছে—এসব কথায় তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন মাত্র। অবস্থা যখনই এই, তখন কাযা না করার কথা প্রমাণিত হয়নি, বুঝতে হবে।

তবে নবী করীম (স) থেকে কোনরূপ ব্যখ্যার সম্ভাবনা ছাড়াই কাযা ফরয না হওয়ার কথা যদি প্রমাণিত হয়, আর সেই সাথে সনদ সহীহ্ হয়, মূল কথার সুসংবদ্ধতা প্রমাণিত হয়, তবুও কাযা করার আবশ্যকতাটাই উত্তম প্রমাণিত হবে এ হাদীস থেকে। তার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথম, দুটি হাদীসের একটি যদি কোন কাজকে মুবাহ্ প্রমাণ করে, আর অপরটি নিষিদ্ধ প্রমাণ করে, তাহলে নিষেধ প্রমাণকারী অনুযায়ী আমল করা উত্তম। আমাদের বর্ণিত হাদীস কাযা না করার নিষেধ প্রমাণ করে। আর ওদের হাদীস তার (কাযা না করার) মুবাহ হওয়া প্রমাণ করে। তাই এ দিক দিয়ে আমাদের হাদীসই উত্তম। অপর দিক দিয়ে কাযা নিষেধকারী হাদীস মূল ভিত্তিতে উপস্থিত হয়েছে। আর কাযা ফরযকারী হাদীস তার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। এই হাদীসটি উত্তম। কেননা তা তাৎপর্যগতভাবে পরে বর্ণিত হয়েছে। যেমন তার তারীখ জেনে গেছে। অপর দিক থেকে বলা যায়, ফরয ত্যাগ করলে আযাব ভোগ করতে হবে। কিন্তু মুবাহ্ কাজ করলে তাতে আযাব হবে না। অতএব নিষেধমূলক হাদীসের তুলনায় ফরয প্রমাণকারী হাদীস অনুযায়ী আমল করা উত্তম। রোযা ভাঙ্গা মুবাহ্ হওয়ার ক্ষেত্রে উম্মে হানী সংক্রান্ত হাদীসের বিপরীত হাদীস হচ্ছে সেটি, যা মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, আবদুল্লাহ্ ইবনে সাঈদ, আবূ খালিদ, হিশাম, ইবনে সীরীন, আবূ হুরায়রা সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তাতে রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَاِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَاِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ -

তোমাদের কেউ যদি খাওয়ার জন্যে নিমন্ত্রিত হয়, তা হলে গ্রহণ করা ও যাওয়া উচিত। যদি রোযা ভঙ্গকারী হয়, তা হলে সে খাবার খাবে। আর যদি রোযাদার হয় তাহলে সে নামায পড়বে।

আবূ দাউদ বলেছেন, হাদীসটি হিফ্‌স ইবনে গিয়াসও বর্ণনা করেছেন, আমাদের নিকট মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, মুসাদ্দাদ, সুফিয়ান, আবূজজিনাদ, আরাজ, আবূ হুরায়রা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ 'তোমাদের কেউ খাবার খাওয়ার জন্যে আহূত হলে, সে যদি রোযাদার হয়, তাহলে সে বলবে, আমি রোযাদার। এ দুটি হাদীস রোযাদারকে বিনা ওযরে রোযা ভাঙ্গতে নিষেধ করে। এতে নবী করীম (স) নফল রোযাদার ও ফরয রোযাদারের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। লক্ষণীয়, তিনি প্রথমোক্ত হাদীসে বলেছেন ঃ নিমন্ত্রিত ব্যক্তি রোযাদার হলে সে যেন নামায পড়ে। নামায রোযা ভঙ্গের বিপরীত। রোযাদার ও রোযা ভঙ্গকারীর মধ্যে পার্থক্যও করেছেন। তাই রোযাদারের পক্ষে রোযা ভাঙ্গা যদি জায়েয হতো তাহলে তিনি বলতেন ঃ তার খাওয়া উচিত।'

যদি বলা হয়, নামায পড়ার কথা বলে তিনি আসলে দো'আ করার কথা বলেছেন। আর দো'আ করা তো খাওয়ার পরিপন্থী নয়।

জবাবে বলা যাবে, নামায পড়তে বলা হয়েছে, তা তো প্রচলিত ও পরিচিত নামায। কথা বলার দ্বারা তো তা-ই বোঝায়। যে নামাযের রুকূ সিজদা আছে তার অর্থ দো'আ বলা কোনক্রমেই সঙ্গত নয়। কোন দলীল থাকলে তা বলা যেতে পারে বটে, যদি 'দো'আ'-ই বলা হতো তাহলে তার দলীল উপস্থিত থাকত। তবে সে রোযা ভাঙ্গবে না যখন রোযা ভঙ্গকারী ও রোযাদারের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে।

হাদীসে নবী করীম (স)-এর কথা ঃ 'তার বলা উচিত যে আমি রোযাদার' একথা বোঝায় যে, রোযা তাকে খাবার খেতে নিষেধ করে। অথচ আমরা আগেই জেনেছি যে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ দাওয়াত কবুল করা মুসলমানের হক। যেমন সালাম দেয়া ও জবাব দেয়া। রোগীকে দেখতে যাওয়া জানাযায় শরীক হওয়া ইত্যাদি। দাওয়াত কবুল করতে যদি তাকে কেউ বাধা দেয়, বলেছেন, তখন সে বলবে ঃ 'আমি রোযাদার'। এ থেকে বোঝা যায় যে, ওযর ছাড়া কোন রোযা-ই ভাঙ্গা যেতে পারে না, তা নিষিদ্ধ।

যদি বলা হয়, আবূদ-দারদা ও জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা দুজন নফল রোযা ভাঙ্গায় কোন দোষ দেখতে পেতেন না। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) মসজিদে প্রবেশ করলেন, এক রাক'আত নামায পড়লেন। পরে তা থেকে ফিরে গেলেন। অপর এক ব্যক্তি তাঁকে অনুসরণ করল। এক সময় বলল ঃ আমীরুল মুমিনীন! আপনি তো মাত্র এক রাক'আত নামায পড়েছেন? বললেন, ও তো নফল নামায। ইচ্ছা হলে বেশি পড়তে পার, ইচ্ছা হলে কম।

এর জবাবে বলা যাবে, আমরা পূর্বে ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর (রা) থেকে নফল রোযা ভাঙ্গলে তার কাযা করা ফরয হওয়ার বর্ণনা উদ্ধৃত করেছি। আবুদ দারদা ও জাবির (রা) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, তাতে কাযা করাকে অস্বীকার করা হয়নি। তাতে শুধু রোযা

ভাঙ্গা মুবাহ্ বলা হয়েছে। আর হযরত উমর (রা) সংক্রান্ত হাদীসের বক্তব্য এ-ও হতে পারে যে, পড়া কর্তব্য মনে করে যে লোক নামায শুরু করল, পরে তার মনে হল, তা তার কর্তব্যভুক্ত নয়, তখন তা নফল হয়ে যাবে, তা ভেঙ্গে ফেলা তার জন্যে জায়েয, তার কাযা করা কর্তব্য নয়, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ এক রাক'আত নামায কখনই জায়েয হতে পারে না।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'কুরআন থেকে যা সহজে পড়া যায় তাই পড়' থেকে তো এক রাক'আত জায়েয হওয়া প্রমাণিত হয়।

জবাবে বলা যাবে, উক্ত আয়াত নামাযে কুরআন পাঠের ক্ষেত্রে ইখতিয়ারের কথা বলা হয়েছে। নামাযের রাক'আত পর্যায়ে ইখতিয়ার থাকার কথা বলা হয়নি। কুরআন পাঠে ইখতিয়ার থাকলে এ দ্বারা নামাযের সব রুকন-এ ইখতিয়ার থাকার কথা প্রমাণিত হয় না। অতএব তাতে রাক'আতের বিষয়ে কোন হুকুম নেই। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, কুরবানীর জন্তু ধ্বংস করে ফেললে তার বদলে আর একটি করবানী করতে হবে। তাই নৈকট্য লাভের সব ইবাদতেই অনুরূপ করা বাধ্যতামূলক।

ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ 'অতঃপর রোযা রাত পর্যন্ত সম্পূর্ণ কর' আল্লাহ্‌র এ কথাটি থেকে শরীয়াতের বহু কয়টি আইন জানা যায়। যেমন, যদি কেউ বাড়িতে সকাল পর্যন্ত রোযা থাকে, পরে সফরে যায়, সেই দিনের রোযা ভাঙ্গা তার জন্যে জায়েয নয়। আয়াতটির বাহ্যিক অর্থ থেকেই তা প্রমাণিত। রোযা শুরু করার পর কে সফরে রওয়ানা হয়েছে আর কে নিজ বাড়িতে থেকে গেছে, তার মধ্যে কোন পার্থক্য উক্ত আয়াতে করা হয়নি। উক্ত আয়াত থেকে এ-ও জানা যায় যে, ফজর উদয় হওয়ার পর যে লোক খাবার খাবে তখনও রাত আছে মনে করে, কিংবা সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই খাবার খেল, যদিও সে সূর্যকে অস্ত যেতে দেখেছে, পরে স্পষ্ট হল যে, তখনও সূর্য অস্ত যায়নি, তাহলে তাকে সেদিনের রোযা কাযা করতে হবে উক্ত আয়াতের ভিত্তিতে। কেননা উক্ত অবস্থায় রোযা সম্পূর্ণ হয়নি। কেননা রোযা তো হয় পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম থেকে বিরত থাকার দ্বারা। কিন্তু সে তো বিরত থাকেনি। এ কারণে সে রোযাদার থাকতে পারেনি।

এ পর্যায়ে নানা মতের উল্লেখ হয়েছে। মুজাহিদ, জাবির ইবনে যায়দ, ও আল-হিকাম বলেছেন, তার রোযা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। তাকে তার কাযা করতে হবে না। যে লোক রাত্র আছে মনে করে সেহরী খাবে (অথচ তখন রাত্র নেই) তার জন্যেও এই হুকুম। মুজাহিদ বলেছেন, সূর্য ডুবে গেছে মনে করে যদি কেউ ইফতার করে, পরে সূর্য ডুবেনি বলে জানতে পারে, তাহলে তাকে কাযা করতে হবে। সেহরী খাওয়া লোক এবং সূর্য অস্ত হয়েছে মনে করে সূর্যাস্তের পূর্বেই খাওয়া লোকের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'যতক্ষণ ফজর কালে সাদা রেখা কালো রেখা থেকে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে না যায়' তাই যার নিকট তা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়নি, তার জন্যে তখনও সেহরী খাওয়া মুবাহ্। তাকে সে রোযা কাযাও করতে হবে না। কেননা ফজর উদয় হওয়ার ব্যাপারটি তার নিকট স্পষ্ট প্রতিভাত হওয়ার পূর্বেই সে খাবার খেয়েছে। কিন্তু যে লোক সূর্য ডুবেছে ধারণা করে ইফতার করেছে, তার রোযা তো নিশ্চিত, সূর্যের অস্ত যাওয়া স্পষ্ট প্রতিভাত না হওয়া পর্যন্ত তার ইফতার করা জায়েয হতে পারে না। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন, সাঈদ

ইবনে যুবায়র, সব হানাফী ফিকাহবিদ, মালিক, সওরী ও শাফেয়ী বলেছেন, রোযা কাযা করতে হবে উভয় অবস্থাতেই। তবে ইমাম মালিক বলেছেন, নফল রোযা চলে যাবে, ফরয রোযা কাযা করতে হবে। আমাশ, জায়দ ইবনে অহব থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর (রা) নিজে এবং অন্যান্য সব লোক মেঘাচ্ছন্ন দিনে ইফতার করেছেন এমন সময় সূর্য প্রকাশিত হয়ে পড়ল, তখন তিনি বললেন, এটায় আমাদের কোন দোষ নেই। আল্লাহ্‌র কসম, আমরা ও রোযা কাযা করব না। তার থেকে এ-ও বর্ণনা হয়েছে, উমর ইবনুল খাত্তাব বললেন, খুব সহজ, আমরা একটি রোযা কাযা করে নেব। কুরআনের হুকুম ঃ 'অতঃপর তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা সম্পূর্ণ কর'-এর বাহ্যিক অর্থ, রোযা বাতিল হলেই তা কাযা করতে হবে । কেননা সে রোযা সম্পূর্ণ করেনি। যে সময় না জেনে খেয়েছে, আর যে জেনে খেয়েছে, এ দুজনের মধ্যে আয়াতে কোন পার্থক্যের কথা বলা হয়নি।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'তোমরা খাও, পান কর যতক্ষণ না ফজরকালীন অন্ধকার থেকে আলো প্রতিভাত হয়ে উঠে' অনুযায়ী ফজর যার নিকট প্রতিভাত হয়নি, তার জন্যে তখন পর্যন্ত খাবার খাওয়া মুবাহ।

জবাবে বলা যাবে, এই খাওয়াটা দুটি অবস্থার যে কোন একটি অবস্থায় হবে। হয় সে ব্যক্তির খাওয়ার ব্যাপার হবে, যার পক্ষে ফজর উদয় হওয়ার স্পষ্ট হওয়া এবং দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে জানতে পারা সম্ভব, সে সেই সময়টা চিনে ফজর ও তার মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক নেই। তার অবস্থা যদি সেই রকমের হয়, তা সত্ত্বেও তার নিকট স্পষ্ট প্রতিভাত না হয়ে থাকে, বুঝতে হবে, এই বিষয়টি চিন্তা-ভাবনার ব্যাপারে ত্রুটির কারণেই তা হওয়া সম্ভব হয়েছে। আর যার অবস্থা এরূপ, তার খাবার খাওয়ার জন্যে অগ্রসর হওয়া জায়েয হবে না। তবু যদি খায়, তাহলে তার পক্ষ করা উচিত ছিল না এমন কাজ সে করে বসেছে। কেননা সে সংশ্লিষ্ট বিষয় দৃঢ় জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে উপেক্ষা করেছে। কিন্তু তার উপেক্ষা ও ত্রুটির কারণে রোযার ফরয তো নষ্ট হতে পারে না, সে-ও সে দায়িত্ব এড়াতে পারে না। যে লোক ফজর উদয় হওয়ার ব্যাপারটি চিনে না, বোঝে না; কিংবা তার ও ব্যক্তির মাঝে যদি কোন প্রতিবন্ধক থাকে, অথবা চন্দ্রোজ্জ্বল রাত হয়, বা চোখের দুর্বলতা থাকে, এই ব্যক্তির পক্ষে নিছক আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে কোন কাজ করা ঠিক হতে পারে না। বরং তার দৃঢ় জ্ঞান অর্জন করতে চেষ্টা করা এবং সন্দেহের বশবর্তী হয়ে খাবার না খাওয়াই উচিৎ। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে যদি তা-ই করে থাকে, তাহলে তার কাযা করা থেকে সে রেহাই পেতে পারে না। রোযার ব্যাপারে যে সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য ছিল, তা সে করেনি, দোষ তো তারই। অনুরূপভাবে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিনে সূর্য ডুবেছে মনে করে যদি কেউ খায়, তা তাকেও কাযা করতে হবে আয়াতের বাহ্যিক বক্তব্য অনুযায়ী।

যদি বলা হয় ফজর উদয় হওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র নিকট প্রমাণিত ও স্পষ্ট প্রতিভাত হওয়ার কোন দায়িত্ব মানুষের নেই, মানুষ যতটা পারে, ততটাই তার দায়িত্ব।

জবাবে বলা যাবে, আল্লাহ্‌র ফজর উদয় হওয়ার ব্যাপারটি জানা যখন সম্ভব তখন তা জানার জন্যে চেষ্টা করা বান্দার কর্তব্য। যদি তা জানার পথে কোন প্রতিবন্ধক না থাকে,

তা সত্ত্বেও কেউ যদি সে বিষয়ে গাফিল হয়, তাহ্‌লে তার এই গাফিলতির অবস্থায় তার খাওয়া মুবাহ্ হতে পারে। কিন্তু খাওয়া মুবাহ্ হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তার কাযাও করতে হবে না। যেমন রোগী ও মুসাফির। এ ব্যাপারে এই দুই জনই মূল মানদণ্ড। কেননা এ দুজন বাস্তবিকই মাযুর। ফজর উদয় হওয়া যার নিকট সংশয়পূর্ণ হয়েছে; কিংবা তার উদয় হয়েছে বলে যার ধারণা হয়েছে, সে-ও খাওয়ার ব্যাপারে মাযুর। কিন্তু এই ওযর তার কাযা করাকে বাতিল করে না। এর দলীল পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। রমযান মাসের প্রথম রাত্রে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার দরুন যদি নতুন চাঁদ না দেখে থাকে, আর তার ফলে পরের দিন রোযা না রাখে, পরে তারা জানতে পারল সেটি রমযানের দিন ছিল, তাহলে তাকে কাযা করতে হবে, এ ব্যাপারে সকলেই একমত। এই ঐকমত্যও পূর্বোক্ত কথার প্রমাণ। অনুরূপভাবে দারুল হরব-এ বন্দী মুসলমান রমযান মাস শুরু হওয়ার কথা জানতে পারেনি, এমনিই কাটিয়ে দিয়েছে, পরে তা জানতে পারল, তাকে রোযা কাযা করতে হবে। অথচ যখন রোযা রাখেনি তখন রমযান মাসের কথা জানা তার দায়িত্ব ছিল না। কিন্তু এই না-জানাটা রোযা কাযা করাকে বাতিল করে দেয় না। অনুরূপভাবে ফজর উদয় হওয়া যার নিকট প্রচ্ছন্ন থাকল, সূর্যের অস্ত যাওয়ার কথা জানলো না, তাকেও কাযা করতে হবে।

যদি বলা হয়, যে ভুলক্রমে রোযায় খায়, তাকে তো কাযা করতে হয় না। তার মতো সে হবে না কি ? কেননা খাওয়ার সময় তার রোযা ফরয হওয়ার কথা তার জানা ছিল না।

জবাবে বলা হবে, এ কারণটি গণ্য করা ঠিক নয়। কেননা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে চাঁদ দেখতে না পাওয়ার কারণে রোযা না রাখলে তাকে তো কাযা করতে হবে, যখন সে রমযানের কথা জানতে পারবে। দারুল হরব-এ বন্দী থাকা লোক রমযান মাসের কথা জানতে পারেনি, মাস শেষ হয়ে গেছে, তাকে তো কাযা করতে হবে, এ বিষয়ে সকলেই একমত। কেননা তার উপর রোযা ফরয হওয়ার কথা পূর্বে সে জানতে পারে নি।

হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, যে লোক ভুলে গিয়ে খেয়েছে, কিয়াস বলে তার রোযা কাযা করা উচিত। তবে হাদীসের কারণে তারা কিয়াস বাদ দিয়েছেন, যদি আয়াতের বাহ্যিক অর্থ—ভুলবশতঃ খাদ্য গ্রহণকারীর রোযা সহীহ্ হয় না। কেননা সে তো তার রোযা পূর্ণ করেনি। অথচ আল্লাহ্ রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করতে বলেছেন। পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকাকেই তো রোযা বলে। কিন্তু সে বিরত থাকে নি। বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, সে যদি মূলতই রোযার কথা ভুলে যায়, তাকে যে রোযা কাযা করতে হবে, এ বিষয়ে কোন মতবিরোধ নেই। তার এই ভুলে যাওয়াটা কাযা ফরয না হওয়ার কারণ হতে পারে না।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাঊদ, হারুন ইবনে আবদুল্লাহ ও মুহাম্মাদ ইবনুল উলা, আবূ উসামাতা, হিশাম ইবনে উরওয়াতা, ফাতিমা বিনতুল মুনযির, আসমা বিনতে আবূ বকর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আসমা) বলেছেন, রাসূলের সময়ে এক মেঘাচ্ছন্ন দিনে আমরা ইফতার করলাম। তারপরে সূর্য প্রকাশমান হয়ে গেল। আবূ উসামা

বলেছেন, আমি হিশামকে বললাম, লোকদেরকে রোযা কাযা করার আদেশ কর। তিনি বললেন, তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেছে। 'রাত পর্যন্ত রোযা সম্পূর্ণ কর' এই আদেশে তার রোযাও বাতিল হয়ে যাবে যাকে জোরপূর্বক খাবার খেতে বাধ্য করা হয়েছে। কেননা সে খাওয়া থেকে কার্যত বিরত থাকেনি। যে পাগল হয়ে খাবার খেয়েছে, তার রোযাও বাতিল হয়ে গেছে। কেননা আল্লাহ রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করা হলে তবেই গ্রহণ করবেন। রোযার পক্ষে নিষিদ্ধ কোন কাজ এর মধ্যে করা হলে সে রোযা পূর্ণ করেনি। অতএব তাকে কাযা করতে হবে। রোযার শেষ সময়ে যখন ইফতার করার সময় উপস্থিত হয়, সে পর্যায়ের হাদীস মুহাম্মাদ ইবনে বকর আমাদের নিকট আবূ দাঊদ, মুসাদ্দাদ, আবদুল্লাহ ইবনে দাঊদ, হিশাম ইবনে উরওয়াতা তাঁর পিতা, আসেম ইবনে ইমরান, তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ এদিক থেকে যখন রাত আসে আর দিন যখন এদিক থেকে চলে যায়, সূর্য অস্ত যায়, তারপর রোযাদার ইফতার করবে।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাঊদ, মুসাদ্দাস, আবদুল ওয়াহিদ, সুলায়মান শায়বানী, আবদুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ তোমরা যখন দেখবে রাত এদিক থেকে এগিয়ে এসেছে, তখন রোযাদার ইফতার করবে। এ সময় তিনি অঙ্গুলি দিয়ে পূর্বদিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। আবূ সাঈদুল খুদরী (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

اِذَا سَقَطَ الْقَرَصُ اَفْطَرَ -

সূর্য ডুবে গেলেই ইফতার করবে।

সূর্য ডুবে গেলেই যে রোযার সময় শেষ হয়ে যায়, এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই। তখনই রোযাদারের পক্ষে পানাহার সঙ্গম জায়েয হয়ে যায়। রোযাদারের জন্যে আর যা যা নিষিদ্ধ তা-ও। রাসূলের কথা ঃ 'সূর্য অস্ত গেলেই রোযাদার ইফতার করবে' সূর্যের অস্ত গমণের সাথে সাথে রোযাদার রোযা খুলবে, কিছু খেয়ে; কিংবা না-খেয়ে। এই কারণে নবী করীম (স) ধারাবাহিকভাবে—রোযা না খুলে—রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। কেননা তাতে সূর্যাস্তের পর-ও তাকে পানাহার থেকে বিরত থাকতে হয়। যে মিলিয়ে (وصال) রোযা রাখে, সে একাধারে দুই বা তিন পর্যন্ত কিছু খায় না, পান করে না। কোন সময় যদি সামান্য হলেও পানাহার করে, তাহলে মিলিত রোযা ভেঙ্গে যায়।

ইবনুল হাদ আবদুল্লাহ ইবনে খুবাব, আবূ সাঈদুল খুদরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) মিলিত রোযা (মাঝখানে ইফতার না করে) রাখতে নিষেধ করেছেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, হে রাসূল, আপনি কি মিলিয়ে—ইফতার না করে—রোযা রাখেন ? জবাবে তিনি বললেন, তোমরা তো আমার মতো নও। আমাকে রাত্রে কেউ খাওয়ায়, পান করায়। তোমরা রোযা মিলিয়ে রাখলে এক সেহরী থেকে পরবর্তী সেহরী পর্যন্ত রাখবে। তিনি জানিয়েছেন যে, সেহরীতে পানাহার করলে তার মিলিয়ে ধারাবাহিক রোযা রাখা হয় না। তিনি এ-ও জানিয়েছে যে, তিনি মিলিয়ে ধারাবাহিক রোযা রাখেন না। কেননা আল্লাহই তাঁকে পানাহার করান। আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (স) থেকে

একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁকে বলা হল, আপনি কি মিলিত ধারাবাহিক রোযা রাখেন ? বললেন ঃ আমি তো রাত্রিতে এমন থাকি যে, আমার রব্ব আমাকে পানাহার করান। অনেকে বলেন, মিলিত ধারাবাহিক রোযা রাখা রাসূলে করীম (স)-এর জন্যে বিশেষভাবে মুবাহ্ ছিল। তাঁর উম্মতের জন্যে মুবাহ্ নয়। নবী করীম (স) জানিয়েছেন যে, আল্লাহ্ই তাঁকে পানাহার করান। যার জন্যে এই ব্যবস্থা নেই সে মিলিত ধারাবাহিক রোযা রাখবে না ঃ

## ই'তিকাফ

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا تُبَاشِرُوْا هُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِى الْمَسٰجِدِ –

আর তোমরা স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম করবে না মসজিদসমূহে ই'তিকাফ করতে থাকা অবস্থায়।

অভিধানে 'ই'তিকাফ' শব্দের অর্থ অবস্থান গ্রহণ। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

مَاهٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِىْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ –

এইসব মূর্তি ও চিত্র কি, যেগুলোর জন্যে তোমরা অবস্থান গ্রহণকারী হয়ে আছে।

অন্যত্র বলেছেন ঃ

فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ –

আমরা তার জন্যে অবস্থান গ্রহণকারী হয়ে থাকলাম।

পরে শরীয়াত পরিভাষা হিসেবে শব্দটি গ্রহণ করা হয়। তাতে অবস্থানসহ অন্যান্য ভাবধারাও জড়িত হয়, যা অভিধানিক অর্থে গণ্য হতো না। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে মসজিদে থাকা, রোযা রাখা, মৌলিকভাবেই স্ত্রী সঙ্গম পরিহার। আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের নিয়ত করা। ই'তিকাফকারীর মধ্যে এসব তাৎপর্য ও অর্থ অবশ্যই থাকতে হবে। صِيَامٌ صَوْمٌ – পর্যায়ে আমরা যেমন বলে এসেছি, এ-ও তারই মত। বলেছি, 'সিয়াম'-এর অভিধানিক অর্থ, বিরত থাকা। পরে তার অর্থে প্রবৃদ্ধি ও বিস্তৃতি সাধিত হয়েছে। সেই ব্যাপকতাকে বাদ দিলে শরীয়াতসম্মত 'সিয়াম' হবে না। মসজিদে অবস্থানের কাজটি কেবলমাত্র পুরুষের জন্যে জায়েয, মেয়েদের জন্যে নয়। 'ই'তিকাফ' মসজিদে হতে হবে এটা শর্ত হিসেবে এসেছে কুরআনের এ আয়াত থেকে وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِى الْمَسٰجِدِ 'অবস্থা এই যে, তোমরা মসজিদে অবস্থানকারী হয়ে আছ'। এ থেকে ই'তিকাফ মসজিদে হওয়ার শর্ত বের হয়েছে। মসজিদ যেহেতু নানা ধরনের, আকারের, এজন্যে কোন্ ধরনের মসজিদে ই'তিফাক জায়েয, এ নিয়ে বিভিন্ন মত দেয়া হয়েছে আগেরকালের ফিকাহবিদদের পক্ষ থেকে। আবূ অয়েল হুযায়ফা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবদুল্লাহকে বললেন ঃ আপনি কি সে লোকদের দেখেছেন যারা আপনার ও আশয়ারীর

ঘরের মাঝে অবস্থানকারী হয়ে রয়েছে ?..... আমি জানি যে, তিনটি মসজিদ ছাড়া ই'তিকাফ হয় না। অথবা মসজিদুল হারামে হবে। আবদুল্লাহ্ বললেন, সম্ভবত ওরা ঠিকই করেছে, তুমি ভুল করেছ। ওরা স্মরণে রেখেছে, তুমি ভুলে গেছ। ইবরাহীম নখয়ী বর্ণনা করেছেন, হুযায়ফা বলেছেন ঃ

لَا اعْتِكَافَ اِلَّافِىْ ثَلَاثَةَ مَسَاجِدَ، اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامَ، وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصَى، وَمَسْجِدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم –

তিনটি মাত্র মসজিদে ই'তিকাফে বসা যায়। তা হচ্ছে ঃ মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা ও মসজিদে নববী।

কাতাদাহ্ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

لا اعْتِكَافَ اِلاَّ فِىْ مَسْجِدِ نَبِىٍّ –

নবীর মসজিদ ছাড়া অন্যত্র ই'তিকাফ হতে পারে না।

এ কথা হযরত হুযায়ফার মাযহাবের সাথে সঙ্গতি সম্পন্ন। কেননা তিনটি মসজিদই নবীগণের মসজিদ। এ পর্যায়ে আর একটি কথা রয়েছে। সে কথাটি ইসরাইল আবূ ইসহাক, আল হরস, আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত। হযরত আলী (রা) বলেছেন ঃ

لَااعْتِكَافَ اِلَّافِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَوْمَسْجِدِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ لسَّلَامُ –

মসজিদে হারাম কিংবা মসজিদে নববী ছাড়া অন্যত্র ই'তিকাফ হয় না।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ আয়েশা (রা), ইবরাহীম, সাঈদ ইবনে যুবায়র, আবূ জাফর, উরওয়া ইবনুয যুবায়র থেকে বর্ণিত لَااعْتِكَافَ اِلاَّ فِىْ مَسْجِدِ جُمُعَةَ জুম'আর মসজিদ ছাড়া অন্যত্র ই'তিকাফ হয় না। আগেরকালের সব ফিকাহ্‌বিদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে ই'তিকাফের শর্ত হচ্ছে তা অবশ্যই মসজিদে হবে। সে মসজিদ সাধারণভাবে সব মসজিদ কি বিশেষ বিশেষ মসজিদ, এ ব্যাপারে যে মত-পার্থক্য তা আমরা পূর্বেই বলেছি। তবে জামা'আত (জুম'আ) অনুষ্ঠিত হয় যে সব মসজিদে তার প্রত্যেকটিতেই যে ই'তিকাফ জায়েয, এ বিষয়ে বিভিন্ন ফিকাহ্‌বিদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। তবে ইমাম মালিক থেকে সামান্য একটু কথা বলা হয়েছে। ইবনে আবদুল হিকাম সে কথাটুকুর উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, জামে মসজিদ বা মসজিদের প্রশস্ত আঙ্গিনা—যেখানে নামায জায়েয—ছারা অন্য কোথায়ও কেউ ই'তিকাফ করবে না। আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِى الْمَسَاجِدِ 'এবং তোমরা মসজিদসমূহে ই'তিকাফরত আছ' এর বাহ্যিক অর্থ সবরকমের মসজিদেই ই'তিকাফ জায়েয প্রমাণ করে। কেননা ব্যবহৃত শব্দে কোন বিশেষীকরণ নেই। কোনটিতে বিশেষীকরণের মত কারো থাকলে তার দলীল পেশ করা উচিত। আর জুম'আর মসজিদকে বিশেষ করে বলারও কোন দলীল মূলত নেই। যেমন নবীগণের মসজিদকে বিশেষী করারও কোন দলীল নেই। আর যে কথার সমর্থনে কোন দলীল নেই, তা গণ্য হওয়ারও যোগ্য নয়।

যদি বলা হয়, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لاتُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلٰى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَسْجِدِيْ هٰذَا -

মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা ও আমার এই মসজিদ ছাড়া অন্য কোথায়ও যাওয়ার জন্যে যানবাহন প্রস্তুত করবেন না।

এ থেকে তো উক্ত তিনটি মসজিদকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা এবং ই'তিকাফ কেবল এ তিনটি মসজিদেই হয় বলা তো দলীল ভিত্তিক কথা? সেই সাথে নবী করীম (স)-এর এই কথাটিও।

মসজিদে হারাম ছাড়া অন্য সব মসজিদ অপেক্ষা আমার মসজিদে নামায পড়া অধিক উত্তম।

প্রমাণ করে যে, এ দুটি মসজিদকে অন্যান্য মসজিদের মুকাবিলায় বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত করা হয়েছে।

জবাবে বলা যাবে যে, হ্যাঁ, নবী করীম (স) এই তিনটি মসজিদকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করেছেন বিশেষ একটি অবস্থার প্রেক্ষিতে আর অপর দুটি মসজিদকে চিহ্নিত করেছেন অপর একটি অবস্থায়। এ মসজিদ তিনটি অন্যান্য সব মসজিদ অপেক্ষা অধিক ফযীলতপূর্ণ, এটা তারই দলীল মাত্র। আমরাও তাই বলি, যা নবী করীম (স) বলেছেন। কিন্তু এ দুটি বা তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদে ই'তিকাফ জায়েয হবে না, তা থেকে একথা প্রমাণিত হয় না। যেমন এ দুটি ছাড়া কোথায়ও জুম'আর জামা'আত করা জায়েয হবে না বলে প্রমাণিত হয় না। অতএব মূল আয়াত যা সাধারণ করেছে, তাকে বিশেষীকরণ করা আমাদের পক্ষে জায়েয যাতে পারে না। বিশেষ করে যখন সে বিশেষীকরণের কোন দলীলই নেই। ইমাম মালিকের যে মতটিতে এই বিশেষীকরণ এসেছে জুম'আর সাধারণ মসজিদ থেকে কয়েকটি বিশেষ মসজিদকে, তার কোন অর্থ হয় না। যেমন সব মসজিদেই জুম'আর নামায হতে পারে, কোথায়ও নিষিদ্ধ নয়। অনুরূপভাবে সবটাতেই ই'তিকাফ হতে পারে, কোথায়ও নিষিদ্ধ নয়। তাহলে বিশেষভাবে কোন জুম'আর মসজিদে ই'তিকাফ হবে' আর কোন কোন মসজিদে হবে না, একথা কি করে বলা যেতে পারে। তবে মেয়েদের ই'তিকাফ করার স্থান সম্পর্কে ফিকাহবিদদের মত-পার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ ও জুফর বলেছেন, 'মেয়েরা তাদের নিজেদের ঘরের মসজিদ ছাড়া অন্য কোথায়ও ই'তিকাফ করবে না। জুম'আর মসজিদে তারা ই'তিকাফ করবে না। ইমাম মালিক বলেছেন, জুম'আর মসজিদেও মেয়েরা ই'তিকাফ করতে পারে। তারা ঘরের মসজিদে ই'তিকাফ করে খুশী হওয়া উচিত নয়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, গোলাম, মেয়েলোক ও মুসাফির যেখানেই ইচ্ছা ই'তিকাফ করতে পারে। কেননা এদের প্রতি জুম'আ ফরয নয়।

আবূ বকর বলেছেন, নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

لَاتَمْنَعُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ، وَبَيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ –

তোমরা আল্লাহ্র বান্দীদেরকে আল্লাহ্র মসজিদে যেতে নিষেধ করবে না। তবে তাদের ঘরই তাদের জন্যে ভালো।

নবী করীম (স) মেয়েদের ঘরকেই তাদের জন্যে ভালো বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু নামায ও ই'তিকাফে তাদের দুই অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। ফিকাহবিদদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে মেয়েদের পক্ষেও যখন ই'তিকাফ করা যায়েয, তখন তা তাদের নিজেদে ঘরেই করা উচিত। কেননা নবী করীম (স) তাদের জন্যে তাদের ঘরকেই উত্তম বলেছেন। যদি মসজিদে তাদের ই'তিকাফ করা মুবাহ্ হতো, তাহলে মসজিদে ই'তিকাফ করা উত্তম হতো। তাদের ঘর তুলনামূলকভাবে তাদের জন্যে উত্তম হতো না। কেননা মসজিদে যাদের ই'তিকাফ করা মুবাহ্ তাদের ই'তিকাফ মসজিদে হওয়াই শর্ত। নবী করীম (স)-এর এ কথাটিও তা প্রমাণ করে, বলেছেন ঃ

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِىْ دَارِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِىْ مَسْجِدِهَا، وَصَلَاتُهَا فِيْ بَيْتِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِىْ دَارِهَا، وَصَلَاتُهَا فِيْ مَخْدَاعِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِىْ بَيْتِهَا –

মেয়েদের মসজিদে নামায পড়া অপেক্ষা তাদের ঘরে নামায পড়া উত্তম। ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে নামায পড়া অপেক্ষা তাদের ঘরের কক্ষে নামায পড়া তাদের জন্যে উত্তম। আর তাদের ঘরের কক্ষে নামায পড়া অপেক্ষা তাদের কুঠরির মধ্যে নামায পড়া উত্তম।

মসজিদে মেয়েদের নামায পড়া অপেক্ষা তাদের ঘরে নামায পড়া যখন তাদের জন্যে উত্তম, তখন ই'তিকাফও সেখানে করাই উত্তম হবে। এ থেকে বোঝা যায় যে, মেয়েদের পক্ষে মসজিদে ই'তিকাফ করা মাকরূহ। তার দলীল হচ্ছে সেই হাদীসটি যা মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, উসমান, ইবনে আবূ শাইবা, আবূ মুআবিয়া ও ইয়ালা ইবনে উবায়দ, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, উমরাতা, আয়েশাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ 'নবী করীম (স) যখন ই'তিকাফ করার নিয়ত করতেন, তখন ফজরের নামায পড়তেন, তারপর তাঁর ই'তিকাফ স্থানে প্রবেশ করতেন।' তিনি বলেছেন, তিনি একবার রমযানের শেষ দশদিনে ই'তিকাফ করার ইচ্ছা করলেন, পরে তিনি তার ঘর নির্মাণের আদেশ করলেন। পরে তিনি দরজায় করাঘাত করলেন—আমি যখন তা দেখলাম আমার জন্যেও নির্মাণ করতে বললাম। তিনি করাঘাত করলেন। আমি ছাড়া নবী করীমের অন্যান্য বেগমদেরকে তা নির্মাণের আদেশ করলেন। পরে তিনি করাঘাত করলেন। ফজরের নামায পড়ার পর তিনি নির্মাণসমূহ দেখলেন। বললেন, এ গুলো কি ? এতো কোন নেক নয়। বললেন, পরে তিনি পুণরায় নির্মাণের আদেশ করলেন। পরে তিনি তা ভেঙ্গে ফেললেন। তাঁর বেগমগণকে তাদের নির্মাণ কাজের আদেশ করলেন। পরে আমি তা ভেঙ্গে ফেললাম। পরে শাওয়াল মাসের প্রথম দশ দিন পর্যন্ত ই'তিকাফ বিলম্বিত করেছিলেন।

এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, মসজিদে ই'তিকাফ করা মেয়েদের জন্যে মাকরূহ। কেননা যা নির্মাণ করানো হয়েছিল, তাকে রাসূলে করীম (স) কোন নেক কাজ বলে চিহ্নিত করেননি। নবী করীম (স) রমযানের সে মাসটিতে ই'তিকাফ করলেন না। এজন্যে যে নির্মাণ কাজ হয়েছে, তা তিনি নষ্ট করে দিয়েছিলেন। তাঁর বেগমদের নির্মাণ কাজগুলোও। তাঁর মতে মেয়েদের ই'তিকাফের কোন অবকাশ থাকলে সংকল্প গ্রহণের পর তা না করে ছাড়তেন না। তাঁর বেগমদের পক্ষেও তা ত্যাগ করা সঙ্গত হতো না। কেননা এটা তো আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের কাজ। নবী করীম (স) মসজিদে মেয়েদের ই'তিকাফ করা পছন্দ করেননি, একথাও তা থেকে প্রমাণিত হয়।

যদি বলা হয়, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা এই হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ, উমরাতা, আয়েশাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) তাতে বলেছেন ঃ আমি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট ই'তিকাফ করার অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। পরে জয়নব তাঁর নিকট অনুমতি চাইনের। তাঁকেও অনুমতি দিলেন। পরে ফজরের নামায পড়ার পর মসজিদে চারটি নির্মাণ কাজ দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, এ গুলো কি ? লোকেরা বললেন, এগুলো জয়নব, হাফসা ও আয়েশার নির্মাণ। তখন তিনি বললেন, এটা কোন নেক কাজ নয়। পরে তাঁরা আর ই'তিকাফ করেননি। এ হাদীসে মেয়েলোকদের ই'তিকাফ করার ব্যাপারে রাসূলে করীম (স)-এর অনুমতি ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

জবাবে বলা যায়, রাসূলে করীম (স) মেয়েদেরকে মসজিদে ই'তিকাফ করার অনুমতি দিয়েছেন, এমন কোন কথা উক্ত হাদীসে নেই। সম্ভবত ঃ তাঁদেরকে তাদের ঘরে ই'তিকাফ করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। তাছাড়া তিনি যখন মসজিদে মেয়েদের নির্মাণসমূহ দেখলেন, তখন তিনি ই'তিকাফ করা ত্যাগ করলেন। তাঁরাও ই'তিকাফ করলেন না। বোঝা গেল, শুরুতেই তাঁদেরকে ই'তিকাফ করার যে অনুমতি দেয়া হয়েছিল, তা মসজিদে করার অনুমতি ছিল না। যদি মসজিদে করার অনুমতি ছিল বলে ধরা হয়, তাহলে তা মাকরূহ হওয়ার কারণে মনসূখ হয়ে গেছে। আর রাসূলের শেষ নির্দেশ প্রথম নির্দেশের তুলনায় উত্তম ছিল।

যদি বলা হয়, তাতে অনুমতি মনসূখ হয়ে গেছে, বলা যেতে পারে না। কেননা কাজটি করতে সমর্থ হওয়ার পূর্বেই তার মনসূখ হয়ে যাওয়া তোমাদের মতেই জায়েয নয়।

জবাবে বলা যাবে, হতে পারে, তারা সামান্য সময়ের ই'তিকাফ করেছেন। কেননা সে দিনের ফজর উদয় হওয়ার সময় থেকে নবী করীম (স)-এর তাদের কাজে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা পর্যন্ত অনেক সময় ছিল। তাতে ই'তিকাফ করতে সমর্থ হওয়ার ব্যাপারটি অসম্ভব থাকেনি। এর ফলে পরবর্তীতে তার মনসূখ হয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ সঙ্গত হতে পারে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যার উপর জুম'আ ফরয নয়, সে যেখানে ইচ্ছা ই'তিকাফ করতে পারে। তাঁর এ কথার কোন অর্থ নেই। কেননা ই'তিকাফের জুম'আর নামাযের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। সকল প্রকারের মসজিদে ই'তিকাফ করা জায়েয হওয়া বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী আমাদের সাথে একমত রয়েছেন। জুম'আ যার উপর ফরয এবং যার উপর ফরয নয়, তাদের উভয়ের ব্যাপার অভিন্ন। তাদের ই'তিকাফের স্থানের ব্যাপারে কোন পার্থক্য

হয় না। তবে মেয়েদের জন্যে মসজিদে ই'তিকাফ করা মাকরূহ। কেননা মসজিদে পুরুষদের সাথে তাদেরকে একত্রে অবস্থান করতে হয়। আর তা তাদের জন্যে মাকরূহ। তা ই'তিকাফ করা অবস্থায় হোক, বা অন্য অবস্থায়। তবে অন্যদের জন্যে হুকুম বিভিন্ন নয়। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা মসজিদসমূহে ই'তিকাফ রত' কথাটি কার উপর জুম'আ ফরয, কার উপর নয়, এ দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ই'তিকাফ করার ব্যাপারে এ দুজনের মধ্যে কোন পার্থক্য করা যায় না। কেননা ই'তিকাফ তো নফল ইবাদত, কারোর উপর তা ফরয নয়।

ই'তিকাফ-এর সময় কত, এ নিয়ে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতের পার্থক্য হয়েছে। আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফর ও শাফেয়ী বলেছেন, ই'তিকাফ একদিনের আর যা ইচ্ছা তাই। যেলোক ই'তিকাফ করা শুরু করল, (দুটি বর্ণনার একটির মতে) ওয়াজিব হওয়া ছাড়াই, সে যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবে, ততক্ষণ ই'তিকাফকারী। তার যখন ইচ্ছা, তা শেষও করতে পারে। তবে ই'তিকাফ করার সময়ে তাকে রোযাদার থাকতে হবে। অপর বর্ণনায় ই'তিকাফকারীকে একটি দিন সম্পূর্ণ করতে হবে। হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদদের বর্ণনা এ ব্যাপারে বিভিন্ন। ইবনে অহব ইমাম মালিকের এই মতের উল্লেখ করেছেন, বলেছেন, আমি শুনেছি, একজন লোক দশ দিনের কম সময়ের ই'তিকাফ করেছে, যে তা করবে, তার উপর কোন কিছু চাপবে না। ইবনুল কাসিম ইমাম মালিকের এই মতের উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলতেন, ই'তিকাফ হচ্ছে একদিন একরাত্রি। পরে এই মত প্রত্যাহার করেছেন। বলেছেন, দশ দিনের কমে ই'তিকাফ হয় না। উবাইদুল্লাহ ইবনুল হাসান বলেছেন, দশ দিনের কমে ই'তিকাফ করা আমি পছন্দ করিনা।

আবূ বকর বলেছেন, ই'তিকাফের সময়কাল নির্ধারণ তওকীফ দ্বারা হওয়া বাঞ্ছনীয়। অথবা ঐকমত্যের ভিত্তিতে হতে পারে। কিন্তু এ দুটোই অনুপস্থিত। তা সত্ত্বেও যদি কেউ সময়কাল সীমিত করে, তাহলে তা জোরপূর্বক করা হবে কোন দলীল ছাড়াই।

যদি বলা হয়, দশ দিনের সময় নির্ধারণ করা যায় একটি হাদীসের ভিত্তিতে। বর্ণনাটি হচ্ছে, নবী করীম (স) রমযান মাসের শেষ দশ দিনের ই'তিকাফ করতেন। এ বর্ণনাও আছে যে, তিনি কোন কোন বছর শওয়াল মাসের শেষ দশ দিনের ই'তিকাফ করেছেন। তার কম সময়ের ইতিকাফ তিনি করেছেন, তার কোন বর্ণনা নেই।

জবাবে বলা যাবে, ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন নি যে, নবী করীম (স) যে ই'তিকাফ করেছেন, তা ওয়াজিব ছিল না। তা কারোর উপরই ওয়াজিব ফরয নয়। তাঁর ই'তিকাফই যখন ফরয ছিল না, তখন প্রথম দশ দিন নির্দিষ্ট করা অন্ততঃ তাঁর আমল দ্বারা প্রমাণিত নয়। তা সত্ত্বেও তিনি কাউকে তা করতে নিষেধ করেন নি। তাই আমরা বলব দশ দিনের ই'তিকাফ করা জায়েয, তার কম যায়েয নয়, এ কথা বলার জন্যে দলীলের প্রয়োজন। আল্লাহ তো নিঃশর্তভাবে শুধু ই'তিকাফের কথারই উল্লেখ করেছেন মাত্র। সেজন্যে কোন সময় নির্দিষ্ট করেন নি। সময়ের পরিমাণও বলেন নি। তাই দলীল ছাড়া তা নির্দিষ্ট ও সীমিত করা কোন ক্রমেই জায়েয হতে পারে না।

## রোযা ছাড়া ই'তিকাফ জায়েয কি ?

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَاتُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِى الْمَسٰجِدِ –

তোমরা মসজিদে ই'তিকাফ করতে থাকা অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম করবে না।

পূর্বেই আমরা বলেছি, 'ই'তিকাফ' একটি শরীয়াত নির্ধারিত নাম। এ ধরনের নাম রাখা হলে তা এমন একটি অস্পষ্ট ও মোটামুটি কথা হয়, যার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ একান্তই আবশ্যক হয়। এ ব্যাপারে আগেরকালের ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। আতা ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস ও আয়েশা (রা) এই মত বলেছেন যে, ই'তিকাফকারীর রোযা রাখা উচিত। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, ই'তিকাফকারীর রোযা রাখা সুন্নাত। হাতিম ইবনে ইসমাঈল, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ, তাঁর পিতা, আলী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রোযা ছাড়া ই'তিকাফ হয় না। শাবী, ইবরাহীম, মুজাহিদ প্রমুখেরও এই মত। অন্যান্যরা বলেছেন, রোযা ছাড়াও ই'তিকাফ হয়। আল হিকাম আলী, আবদুল্লাহ, কাতাদাহ, হাসান, সাঈদ, আবূ মাশর, ইবরাহীম থেকে এই মতের উল্লেখ করেছেন, ই'তিকাফকারী ইচ্ছা হলে রোযা রাখবে, না হয় রাখবে না। তাউস ইবনে আব্বাস থেকে অনুরূপ মত বর্ণনা করেছেন। অবশ্য বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, জুফর, মালিক, সওরী ও আল-হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, রোযা ছাড়া ই'তিকাফ হবে না, লাইস ইবনে সাদ বলেছেন, ইতিকাফ রমযান মাসে করতে হয়। রমযান মাস ছাড়া অন্য সময়ও ই'তিকাফ হয়। যে তা অতিক্রম করবে, তার সেই কর্তব্য, যা ই'তিকাফকারীর উপর রোযা রাখা কর্তব্য হয়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, রোযা ছাড়াও ই'তিকাফ করা যায়।

আবূ বকর বলেছেন, পূর্বে বলেছি, 'ই'তিকাফ' একটি নাম, অস্পষ্ট ও ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। নবী করীম (স) ই'তিকাফে যা করেছেন, তা সবই ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। তাই তা ওয়াজিব হিসেবেই হওয়া উচিত। কেননা তাঁর কাজ যখন ব্যাখ্যা সাপেক্ষ, তা ওয়াজিব হবে। তবে যার দলীল পাওয়া যাবে তার কথা স্বতন্ত্র। তাই নবী করীম (স) থেকে যখন এটা প্রমাণিত যে, রোযা ছাড়া ই'তিকাফ হয় না, তখন রোযা ই'তিকাফের জন্যে শর্ত হওয়া উচিত। তাই তাছাড়া ই'তিকাফ হবে না। যেমন নামাযে রাক'আত ঠিক করা, কিয়াম, রুকূ ও সিজদা ইত্যাদি। তা যখন ব্যাখ্যা হিসেবে হচ্ছে, তখন তা ওয়াজিব হিসেবেই হবে। আর সুন্নাত পাওয়া যায় সেই হাদীসে যা মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, আহমদ ইবনে ইবরাহীম, আবূ দাউদ, আবদুল্লাহ ইবনে বুদায়ল ইবনে অরকা আল-লাইসী, আমর ইবনে দীনার, ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হযরত উমর (রা) জাহিলিয়াতের যুগে কাবার নিকট এক রাত্রি ও এক দিনের ই'তিকাফ করা নিজের জন্যে ফরয করে। পরে ইসলামের যুগে এ বিষয়ে নবী করীম (স)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, হ্যা, ই'তিকাফ কর ও রোযা থাক।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, ইবনে মুহাম্মাদ, ইবনে আবান ইবনে সালিহ আল-কুরাশী, অমর ইবনে মুহাম্মাদ, আবদুল্লাহ ইবনে বুদায়ল তাঁর সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স)-এর আদেশ তো ওয়াজিব। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, রোযা ই'তিকাফের শর্ত। হযরত আয়েশা (রা)-এর কথাও এ কথারই প্রমাণ। তিনি বলেছেন ঃ مِنْ سُنَّةِ الْمُعْتَكِفِ اَنْ يَّصُوْمَ 'ই'তিকাফকারীর জন্যে রোযা রাখাই সুন্নাত।' একটু চিন্তা করলেও এর যৌক্তিকতা বুঝতে পারা যায়। মানত মানা হলে সেজন্যে রোযা যে বাধ্যতামূলক, সে ব্যাপারে সকলেই একমত। ই'তিকাফের সাথে রোযার এই সম্পর্ক না থাকলে মানত মানার কারণে তা বাধ্যতামূলক হতো না। কেননা যা মূলতই ওয়াজিব নয়, তার মানত মানলে ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক হয়ে যায় না। তথা ওয়াজিবও হয় না। যেমন যা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের দিক দিয়ে মূল জিনিস নয়, তার দ্বারা নৈকট্য হয় না। একথাও একটা প্রমাণ যে, ই'তিকাফ হচ্ছে একটি স্থানে অবস্থান গ্রহণ। যেমন আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা হয়, মিনাতে থাকতে হয়। অথচ একটি স্থানে অবস্থান করলেই আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জিত হবে না। তবে তার সাথে যদি অপর কোন তাৎপর্য মিলানো হয় যা আসলে নৈকট্যমূলক, তাহলে ভিন্ন কথা। তাই আরাফাতে অবস্থান ইহ্রাম সহ হতে হয় এবং মিনাতে অবস্থান প্রস্তর নিক্ষেপের সাথে জড়িত।

যদি বলা হয়, রোযা যদি ই'তিকাফের শর্ত হতো, তাহলে রাত্রিকালে ই'তিকাফ থাকত না। কেননা রোযার সাথে রাত্রের কোন সম্পর্ক নেই।

জবাবে বলা যাবে, ই'তিকাফের শর্ত হচ্ছে মসজিদে অবস্থান গ্রহণ। পরে প্রাকৃতিক হাজতের জন্যে বা জুম'আর নামাযের জন্যে বের হলেই ই'তিকাফ ভেঙ্গে যায় না। তাতে মসজিদে আটকে থাকাকে ইতিকাফের শর্ত হতে বাঁধা হয়নি। রোযাও তেমনি একটি শর্ত বিশেষ এবং রাত্রিকালে রোযা না রেখেও ই'তিকাফ সহীহ হতে পারে। তাতে তার শর্ত হওয়া নিষিদ্ধ হয়নি। মিনাতে পাথর নিক্ষেপের জন্যে অবস্থান নৈকট্যমূলক ইবাদত। পরবর্তি দিনের বেলা পাথর নিক্ষেপের উদ্দেশ্য আগের রাত্রিতে মিনায় অবস্থান করতে হয়। রাত্রিকালে ই'তিকাফ সহীহ হবে পরবর্তীদিনে রোযা রাখার জন্যে।

## ই'তিকাফকারীর পক্ষে কোন্ কাজ জায়েয ?

'আল্লাহ বলেছেন, তোমরা মসজিদসমূহে ই'তিকাফ রত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম করবে না।' মূল আয়াতে নিষিদ্ধ হচ্ছে 'মুবাশিরাত' করা। প্রকৃত 'মুবাশিরাত' হচ্ছে চামড়ার সাথে চামড়া মিলানো—তা দেহের যে কোন স্থান থেকে হোক না কেন। তা যৌন সঙ্গমের প্রতিও ইঙ্গিত করে। যেমন 'স্পর্শ' বললেও 'সঙ্গম' বোঝায়। আসলে তা হচ্ছে হাত দ্বারা স্পর্শ করা। সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে স্পর্শ করাও বোঝায়। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَالْاٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ –

এখনে তোমরা সঙ্গম কর এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে যা লিখেছেন, তা পেতে চাও

এর অর্থ, সঙ্গম কর। সকলেই একমত যে, আলোচ্য আয়াতটি ই'তিকাফকারীর জন্যে স্ত্রী সঙ্গম নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এটাই আয়াতের অর্থ। তাই সঙ্গমের ইচ্ছা করাও নিষিদ্ধ হবে অবশ্যম্ভাবীরূপে। যদিও মূলত সঙ্গম নিষিদ্ধ। কেননা একটি শব্দের একটা প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ অর্থ হতে পারে যেমন, তেমনি পরোক্ষ অর্থও হতে পারে।

ই'তিকাফকারীর হাত দিয়ে স্পর্শ করা পর্যায়ে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, তাতে দোষ নেই, যদি তা প্রবল যৌন কামনা সহকারে না হয়, যদি নিজেকে বিরত রাখতে পারবে বলে বিশ্বাস হয়। ই'তিকাফকারীর উচিত নয় প্রবল যৌন কামনা সহকারে স্ত্রীকে স্পর্শ করা। ই'তিকাফ—রাতে হোক, বা দিনে। যদি সেই অবস্থায় করে এবং তাতে বীর্য স্খলিত হয়, তাহলে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। বীর্য স্খলিত না হলে ই'তিকাফ বিনষ্ট হবে না, তবে কাজটি সে ভালো করে নি।

ইবনুল কাসিম ইমাম মালিকের এ মত উদ্ধৃত করেছেন যে, স্ত্রীকে চুম্বন করলেই ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। আল মুজানী ইমাম শাফেয়ীর এ মত উদ্ধৃত করেছেন, দুজনের চামড়া পরস্পর মিলিত হলেই ই'তিকাফ নষ্ট হল। অপর একস্থানে বলেছেন, যে সঙ্গম দণ্ডযোগ্য, কেবল তার কারণেই ই'তিকাফ বিনষ্ট হবে।

আবূ বকর বলেছেন, আমরা আগেই বলে এসেছি যে, আয়াতের 'মুবাশিরাত' শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে সঙ্গম। শুধু হাতে হাতে ধরা বা চুম্বন করা নয়। আবূ ইউসূফও তা-ই বলেছেন, 'তোমরা মসজিদে ই'তিকাফকারী থাকা অবস্থায় 'মুবাশিরাত' করো না, এর অর্থ সঙ্গম করো না। হাসানুল বসরীর কথা হচ্ছে, 'মুবাশিরাত' অর্থ বিয়ে। ইবনে আব্বাস বলেছেন, ই'তিকাফকারী স্ত্রী সঙ্গম করলে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। দহক বলেছেন, লোকেরা ই'তিকাফরত থাকা অবস্থায় সঙ্গম করত। তখন উক্ত আয়াত নাযিল হয়। কাতাদাহ্ বলেছে, লোকেরা ই'তিকাফে বসে পরে মসজিদের বাইরে গিয়ে স্ত্রী সহবাস করে আবার মসজিদে ফিরে এসে ই'তিকাফ করত। উক্ত আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তাদেরকে নিষেধ করেছেন। তাঁদের এসব কথা থেকে বোঝা যায় যে, তারা 'মুবাশিরাত' শব্দের অর্থ নিয়েছেন সঙ্গম। শুধু স্পর্শ করা বা হাতে ধরা নয়। ই'তিকাফকারীর পক্ষে যৌন কামনা ব্যতিরেকে ধরাধরি করা মুবাহ। একথার প্রমাণ হচ্ছে উরওয়া, আয়েশা (রা) সূত্রে জুহরী বর্ণিত হাদীস। তাতে বলা হয়েছে, হযরত আয়েশা (রা) রাসূলে করীম (স)-এর মাথায় চিরুনী লাগাচ্ছিলেন যখন রাসূলে করীম (স) ই'তিকাফ করছিলেন। সে সময় নিশ্চয়ই রাসূল (স)-কে স্পর্শ করছিলেন। তা থেকে বোঝা গেল, যৌন কামনা ব্যতীত স্পর্শ নিষিদ্ধ নয় ই'তিকাফকারীর জন্যে। উপরন্তু একথা যখন প্রমাণিত হল যে, ই'তিকাফ অর্থ রোযা—সঙ্গম নিষিদ্ধ হওয়ার দিকদিয়ে। আর রোযা ধরাধরি ও যৌন কামনাহীন চুম্বনের প্রতিবন্ধক নয়—যদি নিজেকে রক্ষা করতে পারা নিশ্চিত হয়। একথা রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত বহু প্রসিদ্ধ হাদীস।

তা থেকে বোঝা যায় যে, ই'তিকাফ যৌন কামনাহীন চুম্বনের প্রতিবন্ধক নয়। কিন্তু রোযায় যৌন সঙ্গম ও যৌনকামনপূর্ণ চুম্বন দুটিই নিষিদ্ধ। তাই ই'তিকাফেও এ দুটির হুকুম তা-ই হওয়া উচিত। রোযা থাকা অবস্থায় ধরা-ধরির ফলে বীর্য স্খলিত হলে রোযা

নষ্ট হয়ে যায়। তখন ই'তিকাফও নষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা ই'তিকাফ ও রোযা দুটি একই বিশেষত্ব সম্পন্ন, দুটিতেই যৌন সঙ্গম নিষিদ্ধ, যদিও সুগন্ধি ব্যবহার ও পোশাকের দাবি ব্যতিরেকে।

যদি বলা হয়, ইহরামকারী যদি যৌন কামনা উত্তেজনা সহকারে চুম্বন করে, তাহলে তাকে একটা জন্তু যবেহ করতে হয়, বীর্য স্খলিত না হলেও। তাহলে অনুরূপ অবস্থা হলে ই'তিকাফ কেন নষ্ট হবে না?

জবাবে বলা যাবে, ইহরাম ই'তিকাফের মূল নয়। ইহরাম বাঁধার পর যৌন সঙ্গম ও তার আনুসঙ্গিক সুগন্ধি ব্যবহারও নিষিদ্ধ। সোবাহ্-সন্দেহ শিকার ও নিজের শরীর থেকে ময়লা দূরকরণও নিষিদ্ধ। কিন্তু ই'তিকাফকারীর জন্যে এগুলো নিষিদ্ধ নয়। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, ইহরাম ই'তিকাফের জন্যে মূল নয়। ইহরাম বাধলে যেসব হুকুম আহকাম পালনীয় হয়, তাতে তার মর্যাদা অনেক বড়। সেই মুহরিম—যে ইহরাম বেঁধেছে—তার জন্যে স্ত্রী সঙ্গমের সুখ গ্রহণ নিষিদ্ধ। তা তো সে ধরা-ধরি, গালাগালি, মেলা-মেশা থেকেই পেয়ে গেল, যদিও তাতে বীর্য স্খলিত হয় না। তার জন্তু যবেহ করা কর্তব্য হয়। কেননা সে স্ত্রী সুখ অর্জন করেছে, যা তার জন্যে নিষিদ্ধ ছিল। সুগন্ধি ও পোশাক দ্বারা সুখ লাভের মতই তা হয়ে গেল, এ কারণে একটি জন্তু যবেহ করা তার কর্তব্য হয়ে গেল।

যদি বলা হয়, বীর্য স্খলিত হলেও তা ই'তিকাফ নষ্ট করবে না। যেমন তার দরুন ইহরাম নষ্ট হয় না।

জবাবে বলা যাবে, আমরা যা বলেছি তাকে ই'তিকাফ নষ্ট হওয়ার কারণ বলছি না। কাজেই কারণ দর্শানোর দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তে না। আমরা তো বলেছি, স্ত্রী-স্বামী মেলা-মেশা, ধরাধরি করার দরুন বীর্য স্খলিত হলে তবেই তার ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন এই লোকের রোযাও নষ্ট হয়ে যাবে বলে আমরা মত দিয়েছি। ইহরাম কিন্তু কার্যত স্ত্রীর যৌনাঙ্গে সঙ্গম করলে এবং ইহরামে নিষিদ্ধ অন্যান্য কাজের দরুন নষ্ট হওয়ার জন্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। তা ই'তিকাফকে বিনষ্ট করে না। যেমন স্পর্শ, সুগন্ধি ব্যবহার ও শিকার করা—ইহরামে এ সবই নিষিদ্ধ কিন্তু তার মধ্যে পড়ে গেলে ই'তিকাফ বিনষ্ট হয় না। অতএব ইহরামে যা নিষিদ্ধ তা পাওয়া গেলেও ইহরামের স্থিত থাকা ই'তিকাফ ও রোযার তুলনায় অনেক বড়। রোযা যেসব কাজকে নিষিদ্ধ করে, তা করা হলে রোযা ভেঙ্গে যায়। যেমন পান-আহার। অনুরূপভাবে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। এ কারণে আমরা বলেছি, ই'তিকাফে স্বামী-স্ত্রীর গা ডলাডলি করার ফলে বীর্য স্খলিত হলে তাকে নষ্ট করে দেবে। যেমন রোযাও ভেঙ্গে দেবে। আর তা না ঘটলে ই'তিকাফ ভাঙ্গার উপর কোন প্রভাব পড়বে না। যেমন প্রভাব ফেলবে না রোযা নষ্ট করায়।

ই'তিকাফকারীর ব্যাপারে কয়েকটি জিনিসে ফিকাহবিদদের মতপার্থক্য হয়েছে। হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, ই'তিকাফকারী—যে লোক ওয়াজিব ই'তিকাফে বসেছে—একদিন ও একরাত মসজিদের বাইরে যাবে না। তবে প্রস্রাব-পায়খানা ও জুমা'আর নামাযে হাজির হওয়ার মত অত্যাবশ্যকীয় কাজে অবশ্যই বাইরে যেতে পারবে। রোগীকে দেখার জন্যে বাইরে যাবে না। জানাযায় শরীক হওয়ার জন্যেও যাবে

না। তবে ক্রয়-বিক্রয় করা, মসজিদে কথাবার্তা বলা ও গুনাহ্ নয় এমন কাজে মশগুল হওয়া নিষিদ্ধ নয়। বিবাহ-শাদীও হতে পারে। ই'তিকাফে কেবল চুপ করে থাকাই জরুরী নয়। ইমাম শাফেয়ীও এরূপ মত দিয়েছেন।

ইবনে অহব ইমাম মালিকের এ মতের উল্লেখ করেছেন যে, ই'তিকাফকারী ব্যবসায় ইত্যাদি কাজে অংশগ্রহণ করবে না। ই'তিকাফে মশগুল থাকাই তার কর্তব্য। তার শিল্প কর্ম ও পরিবারের জন্যে কল্যাণমূলক কাজের আদেশ করায় কোন দোষ হবে না। নিজের মাল বা অন্য কিছু বিক্রয় করা যেন তাকে ব্যস্ত করে না তোলে। হালকাভাবে হলে কোন দোষ হবে না। ই'তিকাফকারীর ই'তিকাফ হবে না যদি এই অবস্থায় যেসব জিনিস পরিহার করা দরকার তা পরিহার না করে। ই'তিকাফকারীর বিয়ে হতে দোষ নেই, যদি ঝাগড়া-ঝাটি না ঘটে। ইবনুল কাসিম ইমাম মালিকের এ মত উদ্ধৃত করেছেন যে, ই'তিকাফকারী তার কোন বিপদে সহনুভূতি প্রকাশ করতে আসা ব্যক্তির জন্যে দাঁড়াবে না, মসজিদে অনুষ্ঠিত বিয়েতে যদি উঠে যেতে হয়, তাহলে তাতে উপস্থিত হবে না। তবে সে যেখানে বসা আছে সেখানেই যদি অনুষ্ঠান হয়, তাহলে উপস্থিত থাকায় দোষ হবে না বলে মনে করি। বিবাহকারীকে মুবারকবাদ দেয়ার জন্যে উঠে যাবে না। জ্ঞান চর্চার মজলিসে, জ্ঞান লেখার মজলিসে মশগুল হবে না। এটা মাকরূহ। হালকা ধরনের কেনা-বেচা করতে দোষ নেই। সুফিয়ান সওরী বলেছে, ই'তিকাফকারী রোগী দেখতে যেতে পারবে, জুম'আর নামাযের জন্যে যেতে পারবে। মসজিদে যে কাজ ভালোভাবে করা যায় না, তা করার জন্যে পরিবারের কাছে নিজের ঘরে যেতে পারবে। তবে ছাদ দিয়ে ঢাকা স্থানে প্রবেশ করবে না। কিন্তু তা যদি যাতায়াতের পথ হয়, তবে ভিন্ন কথা। তার পরিবারবর্গের নিকট বসবে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরিবারবর্গকে পরামর্শ দিতে পারে, হাঁটা চলা করতে পারে, বেচবে না, কিনবেও না। যদি ছাদ ঘেরা স্থানে যায়, তাহলে তার ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। আল-হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, ই'তিকাফকারী যদি কোন ঘরে প্রবেশ করে, যেটা তার যাওয়ার পথ নয় কিংবা স্ত্রী সঙ্গম করে, তাহলে তার ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে। সে জানাযায় হাজির হতে পারে, রোগী দেখতে যেতে পারে। অযূ করার জন্যে বাইরে যেতে পারে। কোন রোগীর ঘরে যেতে পারে। তবে বেচা-কেনা করা মাকরূহ।

আবূ বকর বলেছেন, জুহরী সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যির, উরওয়াতা ইবনুয যুবায়র সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, ই'তিকাফকারীর জন্যে সুন্নাত হচ্ছে, সে মসজিদ থেকে বাইরে যাবে না মানবিক প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন কাজের জন্যে। সে জানাযার মিছিলে যাবে না, রোগী দেখতে যাবে না, স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না, তার সাথে গা ডলাডলি করবে না। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব ও মুজাহিদ দুজনই বলেছেন, ই'তিকাফকারী রোগী দেখতে যাবে না। বাইরের দাওয়াতে যাবে না, জানাযায়ও হাজির হবে না। মুজাহিদ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, ই'তিকাফকারীর রোগী দেখতে যাওয়া কর্তব্য নয়, জানাযার মিছিলে শরীক হবে না। এখানে যাঁদের মত উদ্ধৃত করা হল, এরা হল সাহাবী ও তাবেয়ীন। এরাঁ ই'তিকাফকারী সম্পর্কে এসব কথাই বলেছেন। অন্যরা এদের বিপরীত কথা বলেছেন। আবূ ইসহাক আসিম ইবনে সখরাতা,

আলী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ই'তিকাফকারী জুম'আর নামাযে শরীক হতে পারে, রোগী দেখতে যেতে পারে, জানাযার মিছিলেও যেতে পারে। হাসান আমের ও সাঈদ ইবনে যুবায়র থেকেও এরূপ কথা-ই বর্ণিত করেছেন, ই'তিকাফকারীর মসজিদ থেকে বাইরে যাওয়ার ও কেনা-কাটা করায় কোন দোষ নেই।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাঊদ, কানবী, মালিক, ইবনে শিহাব, উরওয়াতা ইবনুয যুবায়র, উমরাতা বিনতে আবদুর রহমান, আয়েশাতা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স) ই'তিকাফ করাকালে তাঁর মাথা আমার নিকটে দিতেন, আমি তাঁর মাথায় চিরুনী চালাতাম, মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া তিনি ঘরে প্রবেশ করতেন না। এ হাদীস থেকে মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া অন্য কাজর জন্যে বের হওয়া নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়। নবী করীম (স)-এর কাজ তো ই'তিকাফকারীর জন্যে ব্যাখ্যা। আর তাঁর কাজে যখন ব্যাখ্যা পর্যায়ের হয়, তখন তা ওয়াজিব হয়ে যায়। তাহলে উক্ত হাদীসের আলোকে ই'তিকাফকারীর মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া অন্য প্রয়োজনে বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ প্রমাণিত হল। মানবীয় প্রয়োজন বলতে পায়খানা, প্রশ্রাব মনে করা হয়েছে। ই'তিকাফের শর্ত-ই হল মসজিদের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ। আল্লাহ্‌র আয়াতে ই'তিকাফ কথার সাথে মসজিদ সংলগ্ন হয়ে আছে। তাই মানবীয় প্রয়োজন, ফরয জুম'আ আদায় ছাড়া অন্য কোন কাজে বাইরে যাওয়া জায়েয নয়। কেননা একথা জানা-ই আছে, সে ই'তিকাফকে নিজের উপর এভাবে ধার্য করেনি যে, ওয়াজিবকে সে নফল করে দিবে ও জুম'আর নামায সে ত্যাগ করতে চায়, যা তার উপর ফরয, কাজেই জুম'আয় যাওয়াটা ই'তিকাফের অবস্থান থেকে বাইরে গণ্য হবে।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা মসজিদে ই'তিকাফরত' কি প্রমাণ করে না যে, স্থায়ীভাবে মসজিদে অবস্থান করা ই'তিকাফের শর্ত ? কেননা আয়াতে একটা অবস্থা বোঝানো হয়েছে, যা তার উপর হয়। তার উপর যৌন সঙ্গম নিষিদ্ধ হওয়া যোগ হয়েছে। যখন তারা এই অবস্থায় থাকবে তখন। ই'তিফাক করাকালে মসজিদের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়া তো প্রমাণ করে না ?

জবাবে বলা যাবে, একথা দুটি কারণে ভুল। একটি, একথা জানা যে, ই'তিকাফকারীর জন্যে স্ত্রী সঙ্গম নিষিদ্ধ হওয়ার সাথে তার মসজিদে থাকা অবস্থার কোন সম্পর্ক নেই। কেননা ই'তিকাফকালে তার ঘরে স্ত্রী সঙ্গম করা জায়েয নয়, এ বিষয়ে সব ফিকাহবিদই একমত। আগের লোকদের এই মত আমরা উদ্ধৃত করেছি যে, আয়াতটি নাযিল হয়েছে সেই ব্যক্তির প্রসঙ্গে, যে ই'তিকাফ করা অবস্থায় মসজিদ থেকে বের হয়ে তার ঘরে যায় ও স্ত্রী সঙ্গম করে। আর তা যখন এরূপ, তখন প্রমাণিত হল যে, এখানে মসজিদের উল্লেখের সাথে স্ত্রী সঙ্গমের কোন সম্পর্ক নেই। কেননা তা তো ই'তিকাফের শর্ত। ই'তিকাফ তাছাড়া হতেই পারে না। দ্বিতীয় কারণ হল 'ই'তিকাফ' শব্দটির আভিধানিক অর্থই হচ্ছে একটি স্থানে অবস্থান গ্রহণ। এরপর আল্লাহ্ এই শব্দটির ব্যবহার করেছেন। অতএব অবস্থান গ্রহণই তার অর্থ হবে অবশ্যম্ভাবীরূপ। তার আরও যদি কোন অর্থ করা হয়; যা আভিধানিক অর্থে ছিল না, যেমন সিয়াম। অভিধানে তার অর্থ বিরত থাকা, না করা। পরে শরীয়াতের পরিভাষায় অন্যান্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাতে তার শর্ত হওয়ার

অর্থ বাদ পড়ে যায়নি। কেননা তা তার এমন পরিচিতি, যা ছাড়া রোযা হতেই পারে না। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, ই'তিকাফ হচ্ছে মসজিদে অবস্থান করা। তাই নিতান্ত আবশ্যকীয় কাজ ও জুম'আর নামায আদায় ছাড়া অন্য কোন কাজে মসজিদ থেকে বাইরে যেতেই পারবে না। যদি সে জুম'আ ফরয হয়, যদিও পূর্বোদ্ধৃত হাদীস এই কথার বিপরীত কথা বলেছে। জানাযায় উপস্থিত হওয়া ও রোগী দেখতে যাওয়া যখন ফরয প্রমাণিত নয়, তখন এ দুটি কাজের জন্যে মসজিদের বাইরে যাওয়া যায়েয হবে না।

আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম, তার পিতা, আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন রাসূলে করীম (স) ই'তিকাফ করাকালে রোগী দেখতে যেতেন। তাই এ ব্যাপারে তাঁর উপর প্রশ্ন তোলা যায় না। জুহরীও উমরাতা, আয়েশাতা (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন যা উল্লেখ করলাম, তাতে সকলেই যখন একমত, ই'তিকাফকারীর জন্যে বাইরে যাওয়া জায়েয নয়। সব নেক আমলের ব্যাপারেও তাই। যেমন মানবীয় প্রয়োজন পূরণ করা, পরিবারের কাজ করা, এ গুলোতো ভালো কাজ। রোগী দেখতে যাওয়া তেমনি হওয়া উচিত। যেমন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবে না। রোগী দেখতে যাওয়া তেমনি। কেননা পারস্পরিক হক-হকুকের দিক দিয়ে এ দুটি সমান। অতএব কুরআন, হাদীস ও যুক্তি আমাদের কথাকেই সহীহ প্রমাণ করে। এ পর্যায়ে আল-হায়াজুল খুরাসানীর একটি বর্ণনাকে কেউ দলীল হিসেবে পেশ করতে পারে। তিনি বলছেন, আন-বাসাতা ইবনে আবদুর রহমান আবদুল খালিক, আনাস সূত্রে এ হাদীসটি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْمُعْتَكِفُ يَتْبَعُ الْجَنَازَةَ وَيَعُوْدُ الْمَرِيْضَ، وَاِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَنَعَ رَأْسَهُ حَتّٰى يَعُوْدُ اِلَيْهِ -

ই'তিকাফকারী জানাযার মিছিলে যাবে, রোগী দেখতে যাবে। তবে মসজিদ থেকে যখন বের হবে, তখন ফিরে আসা পর্যন্ত তার মাথা আবৃত রাখবে।

এতে ভিন্ন মত প্রকাশ পায়। এর জবাবে বলা যাবে, এই হাদীসের সনদ অজ্ঞাত (مجهول) জুহরী, উরওয়া, আয়েশা (রা) সূত্রে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার সাথে উক্ত হাদীসের মুকাবিলা হতে পারে না। যিনি বলেছেন যে, ছাদে প্রবেশ করলে তার ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে, ছাদ কে বিশেষিত করার এ কথার কোন দলীল নেই, আর শূন্য স্থানের দিক দিয়ে ছাদ ও অন্য স্থানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বস্তুত খোলা জায়গায় বা মরুভূমিতে গেলে ই'তিকাফ নষ্ট হতে পারে না। ছাদ-ও সেই রকম। পণ্যও দাড়ি পাল্লা ছাড়াই ক্রয়-বিক্রয় করায় তাদের মতে কোন দোষ নেই। বিক্রয় বলতে তাঁরা বুঝেছেন, শুধু মৌখিক কথা বলা, পণ্য ও মূল্য উপস্থাপন বা আদন-প্রদান নয়। তা জায়েয এজন্যে যে, তা মুবাহ কাজ। মুবাহ ব্যাপারে কথা-বার্তা বলার মতই ব্যাপার। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি একটি দিন রাত পর্যন্ত নির্বাক থাকতে নিষেধ করেছেন। চুপ থাকা যখন নিষিদ্ধ, তখন তার অর্থ হয়, কথা বলতে আদেশ করেছেন। তাই চুপ থাকার বিপরীত মুবাহ কথাবার্তা বলার অবকাশ রয়েছে।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-মেরওয়াজী, আবদুর

রাযযাক, মামর, জুহরী, আলী ইবনুল হুসায়ন, সফিয়াতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স) ই'তিকাফ করছিলেন। তখন রাত্রিকালে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে আমি তার নিকটে আসলাম। আমি তার সাথে কথা-বার্তা বলে উঠলাম ও ফিরে আসলাম। তখন তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন আমাকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে। তাঁর (সফিয়ার) বসবাস ছিল উসামা ইবনে জায়দের ঘরে। তখন আনসার বংশের দুজন ব্যক্তির আগমণ হল। তারা নবী করীম (স)-কে দেখতে পেয়ে দ্রুত চলে গেলেন। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ তোমাদেরকে বোঝাবার জন্যে বলছি, এ হচ্ছে হাই'র কন্যা সাফিয়া। তারা দুজন বললেন, পবিত্র মহান আল্লাহ্, বললেন, শয়তান তো মানুষের দেহের রক্ত প্রবাহের সাথে সাথে চলে। আমি ভাবলাম, তোমাদের মনে এই অবস্থা দেখে কোন খারাপ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে, এ জন্যেই এই কথা বললাম। পরে তিনি তার ই'তিকাফে মশগুল হয়ে গেলেন। যদিও এ সময় তিনি সাফিয়ার সাথে কথা-বার্তা বলছিলেন, তিনি তার সাথে মসজিদের দুয়ার পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন। যারা বলেন, ই'তিকাফকারী কথা বার্তায় মশগুল হবে না, উক্ত ঘটনা তাদের কথা বাতিল প্রমাণ করে। কথাবার্তা বলবে না, মসজিদের একদিক থেকে অন্য দিকে উঠে যাবে না, এসব কথা প্রমাণবিহীন।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, সুলায়মান ইবনে হরব ও মুসাদ্দাদ, হাম্মদ ইবনে যায়দ, হিশাম ইবনে উরওয়াতা, তার পিতা আয়েশা (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, রাসূলে করীম (স) মসজিদে ই'তিকাফরত থাকা অবস্থায় জানালা পথে তার মাথা আমার দিকে বাড়িয়ে দিতেন, আমি তাঁর মাথা ধুইয়ে দিতাম, চিরুনী চালাতাম, এই সময় আমি হায়য অবস্থায় ছিলাম। এ হাদীসটি থেকে কয়েকটি হুকুম প্রকাশিত হয়। একটি হল, মসজিদে থাকা অবস্থায় মাথা দৌত করা, স্ত্রীর সাথে কিছুটা মেলা-মেশা-স্পর্শ যৌন উত্তেজনা ছাড়া-ই ই'তিকাফকারীর জন্যে জায়েয। ই'তিকাফ করাকালে মাথা ধৌত করানোও জায়েয। মাথা দৌত করা দেহের সুস্থতার উদ্দেশ্যে। বোঝা গেল, ই'তিকাফকারীর পক্ষে শারীরিক সুস্থতার জন্যে জরুরী কাজ করা জায়েয। এ-ও বোঝা গেলে যে, তার ধন-মালের ভালোর জন্যে কোন না কোন কাজে লিপ্ত হওয়াও জায়েয। সেটা শরীরের সুস্থতার জন্যে জরুরী কাজের মতই। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

قِتَالُ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فِسْقٌ وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ –

মুমিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কুফরী। তাকে গালমন্দ করা ফাসেকী, ইসলামের সীমালঙ্ঘন এবং তার ধন-মাল তেমনি হারাম, যেমন হারাম তার রক্ত।

এ-ও বোঝা গেল যে, ই'তিকাফকারী জাঁকজমক গ্রহণ করতে পারে। কেননা মাথায় চিরুনী চালানো সৌন্দর্য সৃষ্টির একটি দিক। এ-ও বোঝা গেল যে, যে লোক মসজিদের মধ্যে থেকে তার মাথা বাইরে বের করে দেবে, তা কেউ ধৌত করবে, সে যেন মসজিদেই তাকে গোসল করিয়ে দিল। যদি কেউ কিড়া করে যে, সে মসজিদে অমুকের মাথা ধোবে না, যদি তার মাথা মসজিদের বাইরে রেখে দেয় এবং সে তা ধৌত করে,

তাহলে সে কিড়া ভঙ্গ করল, কিড়াকারী মসজিদের বাইরে থাকলেও। কেননা যাকে ধৌত করা, তার স্থানটিই গণনা করতে হবে, দৌতকারীর স্থান নয়। কেননা ধৌত করার কাজটি কাছাকাছি না এসে তো করা যেতে পারে না। তাই যাকে ধৌত করা হবে, তার সাথে ধৌতকারীকে মিলিত হতে হবে। এ কারণেই ফিকাহবিদগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি কিড়া করল এই বলে যে, সে অমুককে মসজিদে মারবে না, তাতে যাকে মারার কথা তাকে মসজিদে থাকতে হবে, যে মারবে তার নয়। এ-ও বোঝা গেল যে, হায়য হয় যে মেয়েলোকের, তার হাত এবং তার খাদ্যাবশিষ্ট পবিত্র। তার হায়য তার হাত ও শরীরের প্রতিবন্ধক নয়। যেমন রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَيْسَ حَيْضُكِ فِىْ يَدِكِ –

তোমার হায়য তোমার হাতে তো নয়।

## শাসক-বিচারকের রায় কোন্ জিনিস হালাল করে, কোন্ জিনিস হালাল করে না ?

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَاتَأْكُلُوْا اَمْوَا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ –

এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ পারস্পরিক অন্যায়ভাবে ভক্ষণ ও হরণ কর না। আর শাসক-বিচারকদের নিকট তা এজন্যে নিয়েও যেয়ো না যে, তোমরা অপরের সম্পদের কোন অংশ ইচ্ছাপূর্বক নিতান্ত অবিচার অমূলকভাবে জেনে-শুনে ভক্ষণ করবে।

এ আয়াতটির ব্যক্তব্য হচ্ছে, তোমাদের কতক লোক অপর কতক লোকের ধন-সম্পদ বাতিল উপায়ে খাবে না। যেমন অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَاتَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ –

তোমরা নিজেদের হত্যা করো না। অর্থাৎ একে অপরকে।

যেমন নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

اَمْوَا لُكُمْ وَاَعْرَضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ –

তোমাদের ধন-মাল এবং তোমাদের সম্মান-সম্ভ্রম তোমাদের উপর হারাম —সম্মানার্হ। অর্থাৎ তোমাদের কতক লোকের ধন-মাল (পরস্পরের জন্যে হারাম)।

বাতিল পন্থায় ধন-মাল ভক্ষণ দুভাবে হতে পারে। একটি জুলুম করে গ্রহণ, চুরি করে, আত্মসাত করে, অপহরণ করে ও এই ধরনের অন্যান্য উপায়ে ধন-মাল গ্রহণ। আর দ্বিতীয়, নিষিদ্ধ ঘোষিত পন্থায় ধন-মাল গ্রহণ। যেমন জুয়া খেলা, গান গাওয়ার

পারিশ্রমিক, বাদ্য বাজানোর মজুরি, খেল-তামাসার মজুরি। বিলাপ করার মজুরি, মদ্য বিক্রয়ের মূল্য, শূকর ও স্বাধীন মানুষ বিক্রয় লব্ধ অর্থ এবং আর যে যে জিনিসের মালিক হওয়া জায়েয নয়—যদিও তার মালিকের মনের খুশীতেই দেয়া হোক। আয়াতে এই সকল উপায়ে ধন-মাল গ্রহণকে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

এর পরবর্তী কথা ঃ 'এবং তা শাসক-বিচারকদের নিকট নিয়ে যাওয়া' .... যে সব বিষয়ের মীমাংসার জন্যে শাসক-বিচারকদের নিকট উত্থাপন করা হয় এবং তারা সে বিষয়ে বাহ্যিকভাবে কোন রায় দেয়। তারা তা তার জন্যে হালাল করে দেয় একথা জানা সত্ত্বেও যে, যাকে সে মাল দেয়ার রায় দেয়া হচ্ছে, সে বাহ্যত ও মূলত তা পাওয়ার অধিকারী নয়। তাই আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, শাসক-বিচারকের রায়ে তা গ্রহণ করা তার জন্যে জায়েয হয়ে যায় নি। আমাদের পরস্পরের মাল বাতিল উপায়ে ভক্ষণ করা সম্পর্কে কঠিন হুমকি দিয়েছেন। পরে জানিয়েছেন যে, শাসক-বিচারকের রায়ের ভিত্তিতে যে মাল গ্রহণ করা হয়, তা-ও এই বাতিল পন্থায় মাল ভক্ষণের মধ্যে শামিল, যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يَـاَيُّهَـا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَـاكُلُوْٓا اَمْـوَالَكُمْ بَـيْـنَـكُمْ بِـالْبَـاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِـجَارَةً عَنْ تَـرَاضٍ مِّنْكُمْ -

হে ঈমানদার লোকগণ! তোমরা তোমাদের ধন-মাল পারস্পরিক বাতিল পন্থায় খাবে না। তবে তোমাদের সন্তুষ্টি ও রাজী থাকার ভিত্তিতে ব্যবসায়ের হলে ভিন্ন কথা।

পারস্পরিক সন্তুষ্টি ও রাজী থাকার ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত ব্যবসায়ের মাধ্যমে যা কিছু পাওয়া যায়, তা হারাম উপায়ে মাল খাওয়ার বাইরে গণ্য। তা বাতিল উপায় গণ্য করা হয় নি। তবে তা-ও জায়েয ব্যবসা হতে হবে, নিষিদ্ধ ব্যবসা নয়। আমরা এইমাত্র যে আয়াতটি উদ্ধৃত করলাম, তার মূল কথা হল, যে মাল কারোর প্রাপ্য নয়, শাসক-বিচারক তা যদি তার জন্যে হওয়ার রায় দিয়েও দেয়, তবু তা তার জন্যে মুবাহ হবে না।

এ পর্যায়ে অনুরূপ কথা সম্বলিত বহু কয়টি হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। আমাদের নিকট আবদুল বাকী ইবনে কানে বাশর ইবনে মূসা, আল হুমায়দী, আবদুল আযীয ইবনে আবূ হাজিম, উসামাতা ইবনে যায়দ, আবদুল্লাহ ইবনে রাফে, উম্মে সালামাতা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেছেন, আমি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় সেখানে দুই ব্যক্তি উপস্থিত হল, তারা মিরাস ও বিলীন বা পুরাতন হয়ে যাওয়া কিছু জিনিস নিয়ে ঝগড়া করছিল। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ

اِنَّمَا اَقْضِىْ بَيْنَكُمَا بِرَأْىٍ فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَىَّ فِيْهِ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحُجَّةٍ اَرَا هَا فَاَ قْتَطَعَ بِهَا قِطْعَةً ظُلْمًا فَاِنَّمَا يَقْتَطِعُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَاْتِىْ بِهَا اَسْطَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِىْ عُنُقِه -

আমি তোমাদের মধ্যকার বিষয়ে একটি মতের ভিত্তিতে ফায়সালা করি যে বিষয়ে

আমার প্রতি কোন ওহী নাযিল হয়নি। অতএব কোন দলীলের ভিত্তিতে আমার বিবেচনা মতে কারোর জন্যে যদি কোন ফায়সালা করি, তাতে যদি কারোর জন্যে জুলুম করে কোন অংশ দেয়ার ফায়সালা করি, তাহলে তা জাহান্নামেরই একটি অংশ দেয়ার সিদ্ধান্ত দেয়া হবে। কিয়ামতের দিন তা তার গলার বন্ধক বানিয়ে দেয়া হবে।

এ কথা শুনে লোক দুটি কাঁদতে আরম্ভ করল। তারা প্রত্যেকেই বলে উঠল ঃ হে রাসূল, আমার প্রাপ্য অংশ ওকে দিয়ে দিলাম। তখন নবী করীম (স) বললেন, না, তোমরা দুজন এখন যাও। তোমরা দুজন 'হক' পাওয়ার জন্যে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হও। পরে দুজনে অংশ ভাগ করে নাও। আর তোমাদের প্রত্যেকেই তার সঙ্গীর জন্যে হালাল করে দাও।

এ হাদীসের অর্থ হল, যে বিষয়ে ওহী নাযিল হয়েছে তাতে এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে যে, বিচারকের হুকুমেই কোন মাল কারোর জন্যে মুবাহ করে দেয় না। অতএব তা নিয়ে নেয়া উচিৎ নয়।

এ হাদীসটিতে আরও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। একটি হচ্ছে, নবী করীম (স) নিজে ইজতিহাদ করেও রায় দিতেন। অবশ্য যে বিষয় ওহী নাযিল হয়নি, সেই বিষয়ে। যেমন উপরোক্ত হাদীসে বলেছেন ঃ 'আমি তোমাদের দুজনের মধ্যে আমার নিজের মতের ভিত্তিতে ফায়সালা দেই সেই বিষয়ে, যে বিষয়ে আমার প্রতি ওহী নাযিল হয়নি।

তা থেকে একথাও বোঝা যায় যে, বিচারক বাহ্যিকভাবে যা বুঝবে দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে, সে সেই অনুযায়ীই বিচার করবে। আল্লাহ্‌র নিকট যা গায়েব, তার ভিত্তিতে বিচার করার কোন দায়িত্ব তার নেই। তা এ-ও প্রমাণ করে যে, মুজতাহিদ তার সামর্থ্যানুযায়ী ইজতিহাদ করবে, তাতেই সে যথার্থ সিদ্ধান্তে পৌছেছে বলে মনে করতে হবে। তার ইজতিহাদ যে পর্যন্ত তাকে পৌছায়নি, সে জন্যে তার কোন দায়িত্ব নেই। লক্ষণীয় যে, খোদ নবী করীম (স) জানিয়েছেন যে, বাহ্যিকভাবে তাঁর সিদ্ধান্তে তিনি সঠিক। গায়েবী দিকদিয়ে তার বিপরীত হলেও দোষ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার জন্যে যে জিনিসের ফায়সালা সে দিয়েছে, তা তার গ্রহণ করা উচিত নয়। একথাও বোঝা যায় যে, বিচারক একজনকে কোন মাল দিয়ে দেয়ার ফায়সালা দিতে পারে—জায়েয, তাকে তা নিতেও হুকুম দিতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যখন জানে যে, সে জিনিস সে পেতে পারে না, তখন তার তা নিয়ে নেয়া উচিত নয়।

এ থেকে একথাও বোঝা গেল যে, কোনরূপ অঙ্গীকার ছাড়া-ই পারস্পরিক সন্ধি করা যেতে পারে, যদিও তারা দুজন জিনিসটি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়নি। এ-ও বোঝা যায় যে, জমি-ক্ষেত ইত্যাদির বন্টন অবশ্য কর্তব্য, যখন দুজনের একজন তার দাবি করবে। এ-ও বোঝা যায় যে, বিচারক বা শাসক সে বন্টনের নির্দেশ দিতে পারে। যে বিষয়ে জানা নেই, সে বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীনতা জায়েয হওয়ার কথাও জানা যায়। কেননা যেসব জিনিস পুরাতন হয়ে গেছে, সেগুলো সম্পর্কে না জেনেও উভয়কে পারস্পরিকভাবে হালাল করে নেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। সেগুলো যে মিরাসের জিনিস, পুরাতন হয়ে গেছে, তার উল্লেখ না হলেও তাঁর কথার দাবি-ই তাই ছিল। কেননা যা জানা ও যা অজানা, এদুটির মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। বিচারকের ছাড়াও দুই

শরীকের পক্ষে তাদের জিনিস পারস্পরিকভাবে বণ্টন করে নেয়া-ও জায়েয। যে কোন অংশ এখনও নির্দিষ্ট হয়নি, তা অন্যকে দান করলে সে তা গ্রহণ না করলে সে দান সহীহ হবে না। তার মালিকানা দাতার নিকট ফিরে যাবে। কেননা দুজনের প্রত্যেকেই অপরজনের দানকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদের প্রত্যেকেই নিজের হকটা অন্যজনকে দিয়ে দিয়েছিল। আর এক্ষেত্রে মূল বস্তু ও ঋণের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। তাই সকলের অবস্থান অভিন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয় দায়িত্বহীনতা ও দান বাতিল হওয়ার দিক দিয়ে।

যদি কেউ বলে যে, আমার মাল থেকে হাজার টাকা অমুকের জন্যে, তাহলে সেটা তার দান হয়ে যাবে। অঙ্গীকার নয়। রাসূলে করীম (স) উক্ত দুই ব্যক্তির কথাকে অঙ্গীকার গণ্য করেন নি। কেননা তা অঙ্গীকার হলে তার জন্যে সেটা জায়েয হয়ে যেত। পরে তারা সন্ধি করার বণ্টন ও হালাল করার প্রয়োজন বোধ করত না। যে বলল, আমার মাল থেকে অমুকের জন্যে হাজার টাকা, তার সম্পর্কে হানাফী ফিকাহবিদগণ সেই কথাই বলেছেন। সত্য লাভের জন্যে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা ও চেষ্টা-সাধনা করা জায়েয, একথাও জানা যায়। যদিও তা ঠিক 'ইয়াকীন' দৃঢ় প্রত্যয় পর্যায়ের হবে না। কেননা নবী করীম (স) বলেছিলেন ঃ সত্য ও অধিকার পাওয়ার জন্যে তোমরা দুজন চেষ্টা চালিয়ে যাও। বিচারকের নিকট পেশ করা ব্যাপারটি পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সন্ধি ও সমঝোতা করার জন্যে ফেরতও দিতে পারে, যদি তা-ই সে ভালো মনে করে। এ জন্যে হযরত উমর (রা) বলেছিলেন ঃ

رُدُّوا الْخُصُوْمَ كَيْ يَصْطَلِحُوْا -

পারস্পরিক সুরাহ করার জন্যে ঝগড়া বিবাদের মামলা ফেরত দিয়ে দাও।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, মুহাম্মাদ ইবনে কাসীর, সুফিয়ান, হিশাম ইবনে উরওয়াতা তাঁর পিতা, যয়নব বিনতে উম্মে সালমা, উম্মে সালমা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, উম্মে সালমা বলেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَاَنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ اِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَنْ يَّكُوْنَ اَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ صَاحِبِهِ فَاَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مِمَّا اَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ اَخِيْهِ بِشَيْءٍ فَلَا يَاْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَاِنَّمَا اَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ -

আমি একজন বই তো নয়। আর তোমরা তোমাদের পারস্পরিক বিবাদের বিষয় আমার নিকট নিয়ে আস। আর তোমাদের কেউ হয়ত আর সঙ্গী প্রতিপক্ষের অপেক্ষা প্রমাণ পেশ করতে অধিক বাকপটু, ফলে আমি তার কাছ থেকে যা শুনতে পাই, তারই ভিত্তিতে ফায়সালা দেই। এরূপ অবস্থায় আমি যদি কারোর পক্ষে তার ভাইর 'হক' দেয়ার রায় দেই, তাহলে তা সে যেন গ্রহণ না করে। কেননা আমি তো তাকে জাহান্নামের একটা খণ্ড দেয়ার রায় দিয়েছি।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, রুবাই ইবনে নাফে, ইবনুল মুবারক-উসামা ইবনে যায়দ, আবদুল্লাহ ইবনে রাফে, উম্মে সালমা সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ বলেছেন, রাসূলে করীম (স)-এর নিকট বিবদমান দুই ব্যক্তি আসল। তাদের ঝগড়া ছিল তাদের মিরাসের ব্যাপার নিয়ে। তাদের মৌখিক দাবি ছাড়া কারোর কোন প্রমাণ ছিল না। তখন নবী করীম (স) বললেন, ..... অতঃপর পূর্ব হাদীসের কথাগুলো বলা হয়েছে। পরে সে ব্যক্তিদ্বয় কাঁদতে লাগল এবং প্রত্যেকেই বলতে লাগল ঃ আমার অংশ তোমাকে দিলাম। তখন নবী করীম (স) তাদেরকে বললেন, তোমরা যা করেছ তো করেছ। এখন তোমরা মিরাস ভাগ করে নাও, তাতে হক পাওয়ার জন্যে দুজনই চেষ্টা কর। পরে নিজ নিজ অংশ নিয়ে নাও।

এ দুটি হাদীস-ই পূর্বোদ্ধৃত হাদীসটির মতই। সব কয়টিরই বক্তব্য হল, বিচারক কারোর পক্ষে রায় দিলেও সে যখন জানে যে, সে তা পায় না, তখন তা তার গ্রহণ করা উচিত নয়।

এতে আরো অনেক তত্ত্ব রয়েছে। যয়নব বিনতে উম্মে সালমাতা বর্ণিত হাদীসের কথা ঃ اَقْضِىْ لَهُ عَلٰى نَحْوِ مِمَّا اَسْمَعُ 'আমি যা শুনি তারই ভিত্তিতে ফায়সালা দেই' থেকে প্রমাণিত হয় যে, লোক নিজের সম্পর্কে যা অঙ্গীকার করে, তার নিজের পক্ষে সে কথার স্বীকৃতি দেয়া জায়েয। কেনন নবী করীম (স) উক্ত কথাটির মাধ্যমে এই স্বীকারোক্তি করেছেন যে, তিনি যা শুনেন, তারই ভিত্তিতে বিচারের রায় দিয়ে থাকেন। প্রত্যক্ষদর্শী যে বিষয়ের সাক্ষ্য দেয়, তা থেকে যা শুনা যায়, বিচারের রায়টা তেমনি হবে—এত স্বাভাবিক। যে বিষয়ে ফায়সালা দেবে তাতে ব্যবহৃত শব্দের গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

আবদুল্লাহ ইবনে রাফে বর্ণিত হাদীসের কথা ঃ 'তোমরা মিরাস ভাগ করে নাও, হক পাওয়ার জন্যে চেষ্টা চালাতে থাক। তারপরে নিজের নিজের অংশ নিয়ে নাও।' এ হল 'কুরয়া' ফেলে অংশ নিয়ে নেয়া। বন্টনের সময় কোন ভাগ কে নেবে, তা নির্ধারণের জন্যে এরূপ করা হয়ে থাকে। এ থেকে বন্টনের সময় 'কুরয়া' ব্যবহার করা জায়েয প্রমাণিত হয়। বিচারক যার জন্যে যে ফায়সালা দেবে, তাতে যার পক্ষে রায় পড়েছে সে যদি জানতে পারে যে, আসলে যার পক্ষে রায় যায়নি, জিনিসটা তার-ই প্রাপ্য, তাহলে তা নেয়া তার জন্যে জায়েয নয়। এ বিষয়ে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। এ বিষয়ে গোটা মুসলিম উম্মত একমত। অন্য ব্যক্তির রক্ষিত জিনিসের উপর যদি কেউ দাবি দায়ের করে, তার প্রমাণও সে দেয়, ফলে ফায়সালা তার পক্ষে চলে যায়, তবু তা তার গ্রহণ করা উচিত নয়। কেননা জিনিসটা মূলত তার নয়। এরূপ অবস্থায় বিচারকের রায় যদি তার পক্ষে যায়, তবু তা তার জন্যে মুবাহ হবে না। কেননা তা তার জন্যে পূর্বেই মুবাহ ছিল।

সাক্ষীর সাক্ষের ভিত্তিতে কোন চুক্তির পক্ষে বা তা ভঙ্গের পক্ষে বিচারক রায় দিলে যার পক্ষে রায় গেছে সে যদি জানে যে, সাক্ষীরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে, তাহলে বিচারকের রায়ের কি হবে, এ নিয়ে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, বিচারক যখন কোন চুক্তির বিষয়ে বা তা ভেঙ্গে দেয়ার ব্যাপারে দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে রায় দেয় তা অবশ্যই কার্যকর হবে। তখন তা এমন একটি চুক্তি গণ্য হবে, যা দুই ব্যক্তির মধ্যে সঙ্ঘটিত হয়েছে, যদিও তার সাক্ষীগণ মিথ্যা সাক্ষ্যই দিয়েছে। আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ ও শাফেয়ী বলেছেন, বিচারকের রায় বাহ্যিকভাবে যেমন, অভ্যন্তরীণ দিক দিয়েও তেমন। আবূ ইউসূফ বলেছেন, বিচারক যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের রায় দেয়, তাহলে স্ত্রীর পক্ষে অন্য স্বামী গ্রহণ জায়েয হবে না। অবশ্য তার স্বামীও স্ত্রীর নিকটে যাবে না।

আবূ বকর বলেছেন, আবূ হানীফার যে মত তা হযরত আলী, ইবনে উমর (রা) এবং শবীরও মত বলে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবূ ইউসূফ আমর ইবনুল মেকদাম, তাঁর পিতা সূত্রে উল্লেখ করেছেন, হাই গোত্রের এক ব্যক্তি একটি মেয়েলোককে বিয়ের প্রস্তাব দেয়; কিন্তু মেয়েলোকটি মর্যাদার দিক দিয়ে তার চাইতে হীন। তখন মেয়ে লোকটি তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে। কিন্তু পুরুষটি তাকে বিয়ে করেছে বলে দাবি করে এবং তার প্রমাণস্বরূপ দুজন সাক্ষী হযরত আলী (রা)-এর নিকট পেশ করে। মেয়েলোকটি স্পষ্ট কণ্ঠে বলে যে, সে তাকে বিয়ে করেনি। হযরত আলী (রা) বললেন, এ দুজন সাক্ষী তোমাকে তার নিকট বিয়ে দিয়েছে। তখন তিনি সাক্ষীদ্বয়ের উপর বিয়ে কার্যকর করেন।

আবূ ইউসূফ বললেন, শুবা ইবনুল হাজ্জাজের প্রতি যায়দ থেকে বর্ণনা করা এই ঘটনা লিখে পাঠান, দুই ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। এ সাক্ষ ছিল মিথ্যা মিথ্যি। বিচারক সেই সাক্ষ্যের ভিত্তিতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ করে দেয়। পরে দুজনের মধ্যের একজন সাক্ষী সেই মেয়ে লোকটিকে বিয়ে করে। শবী বলেছেন, এটা জায়েয। তবে হযরত ইবনে উমর (রা) একটি ক্রিতদাস সম্পর্কহীনতার সাথে বিক্রয় করেন। ক্রেতা তাকে হযরত উসমান (রা)-এর নিকট উপস্থিত করেন। তখন উসমান (রা) বলেন, তুমি কি আল্লাহ্র নামে হলফ করে বলতে পার যে, আমি সেটি বিক্রয় করিনি। বরং ওর একটা রোগ আছে যা আমি গোপন করেছি। তিনি হলফ করতে অস্বীকার করেন। তখন উসমান (রা) সেটিকে তার নিকট ফেরত পাঠিয়ে দেন। তখন তিনি দাসটিকে অন্য একজনের নিকট অধিক মূল্যে বিক্রয় করেন, তাতে ইবনে উমর (রা) ক্রিতদাস বিক্রয় জায়েয মনে করেছেন, একথা জানা সত্ত্বেও যে, এ হুকুমের ভেতরটা বাইরের থেকে ভিন্ন। উসমান (রা) যদি তার সম্পর্কে তেমন জানতেন যেমন ইবনে উমর (রা) জেনেছিলেন, তাহলে তিনি সেটি কখনই তাঁর নিকট ফেরত পাঠাতেন না। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, এইটা ছিল তাঁর মত যে, বিচারক যদি কোন চুক্তি ভেঙ্গে দেয়, তাহলে তার মালিকের নিকট ফেরত পাঠানো কর্তব্য, যদিও ভেতরে তার বিপরীত থাকুক।

ইমাম আবূ হানীফার মত যে সত্য ও সহীহ তা প্রমাণ করছে একটি হাদীস। হাদীসটি হিলাল ইবনে উমাইয়্যাতার কিসসা সংক্রান্ত হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত। নবী করীম (স) তাদের দুজনার মধ্যে 'লেয়ান' (لعان) কার্যকর করেছিলেন। পরে বলেছিলেন, মেয়েলোকটি যদি এই এই গুণে তার নিকট আসে, তাহলে সে হিলাল ইবনে উমাইয়্যাতার জন্যে হালাল হবে। কিন্তু ভিন্নতর গুণে আসলে সে শরীক ইবনে সাহমার

হবে, যার সম্পর্কে তার উপর দোষারূপ করেছে। পরে মেয়েলোকটি ঘৃণিত অবস্থায় আসলে তখন নবী করীম (স) বললেন কিড়া-কসমের ব্যাপারই যদি না হতো, তাহলে আমার ও সে মেয়েলোকটির অবস্থা ভিন্নতর হতো, তাদের দুজনের মধ্যেকার লেয়ানের দরুণ সঙ্ঘটিত বিচ্ছেদ বাতিল করে দেন নি। যদিও তিনি জানতেন যে, মেয়েলোকটি মিথ্যা বলেছে এবং স্বামী সত্য বলেছে। ফলে এই ঘটনা চুক্তি ও তা ভঙ্গ করার ব্যাপারে নীতি নির্ধারক হয়ে গেল—বিচারক যখনই তার হুকুম দেবে। এমন কি, বিচারকের হুকুমে তা সূচিত হলেও তা-ই ঘটতো।

তার আর-ও একটি প্রমাণ হচ্ছে, বিচারক তো সাক্ষী দ্বয়ের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় দেবে ও তা কার্যকর করবে। সাক্ষী দুজন বাহিক্যভাবে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাস্য হলেই হল, সাক্ষীর যদি কোন চুক্তি হওয়ার বা তার ভেঙ্গে যাওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তার ভিত্তিতে রায় কার্যকর করা স্থগিত রাখলে সে গুনাহগার হবে, আল্লাহ্‌র হুকুম তরককারী হবে। কেননা তাকে বাহ্যিক অবস্থার বিবেচনা করারই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। গোপন ইলম—যা আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে তা অনুসরণের দায়িত্ব তাকে দেয়া হয় নি। বিচারকের রায় যদি কোন চুক্তির পক্ষে পড়ে, তাহলে তা এমন চুক্তি হবে, যেন তা নতুন করে সুচিত হয়েছে। অনুরূপভাবে কোন চুক্তি ভেঙ্গে দেয়ার রায় দিলে তাতে পক্ষদ্বয়ের মধ্যের চুক্তি ভেঙ্গে যাবে। তবে চুক্তির পক্ষদ্বয় যদি এ পর্যায়ে আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী কাজ করতে রাজী হয়, তাহলে চুক্তি কার্যকর হওয়া; কিংবা ভেঙ্গে যাওয়া আইনসিদ্ধ হবে। বিচারকের রায়ও কার্যকর হবে।

যদি বলা হয়, কোন ক্রীতদাসের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে যদি রায় দেয়া হয়, সে রায় কার্যকর হবে না, যদিও তার হুকুম কার্যকর করার জন্যেই সে আদিষ্ট, এ কথা জানা আছে।

জবাবে বলা যাবে, তার রায় কার্যকর হবে না এই কারণে যে, দাসত্বের একটা তাৎপর্য আছে, আদালতী রায়ের দিক দিয়ে তা প্রমাণিত হওয়া সহীহ। শিরক এবং মিথ্যা যেনার অভিযোগের দণ্ডের ব্যাপারও তাই। ফলে তার সাক্ষ্যে বিচারকের রায় ভঙ্গ হওয়া জায়েয, সে রায় সঙ্ঘটিত হওয়ার পর। সে ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাওয়া সহীহ। সে ব্যাপারে বিচারকের নিকট মামলা দায়ের করাও সঠিক। এই কারণে ও লোকদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারকের রায় কার্যকর হবে না। কেননা পূর্বে যেমন বলেছি, বিচারের উপায়ে তা প্রমাণিত হওয়া সম্পূর্ণ সহীহ। তবে ফিসক ও সাক্ষ্যের জেরায় তা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণিত হলে তাতে এরূপ তাৎপর্য নেই যে, বিচারের সূত্রে তার প্রমাণিত হওয়া সহীহ হবে। আর তাতে মামলা গ্রহণ করা হবে না। তখন বিচারক যা কার্যকর করেছে তা ভেঙ্গে দেয়া যাবে না। তাই চুক্তি বাধ্যতামূলক করা হলেও নিরংকুশ মালিকানার রায় ভঙ্গকে বাধ্যতামূলক করা হলে তা গ্রহণ করার সুযোগ যদি তাকে না দেয়া হয়, তাহলে তা আমাদের জন্যে বাধ্যতামূলক হবে না। কেননা আমাদের মতে বিচারক শুধু হস্তান্তর করার রায় দেয়, মালিক বানিয়ে দেয়ার নয়। কেননা মালিকত্বের রায় দিলে সে জন্যে সাক্ষীদের সাক্ষ্যে কি ধরনের মালিকানার কথা বলা হয়েছে, তার উল্লেখের প্রয়োজন হবে। যখন এ ব্যাপারে সব একমত যে, সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে মালিকত্বের রূপ কি

হবে তা উল্লেখ ব্যতীতই, তাহলে বোঝা যাবে যে, যাকে দেয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে, তার নিকট হস্তান্তরিত করারই রায় দেয়া হয়েছে, আর হস্তান্তরের নির্দেশ কাউকে মালিকত্ব দেয়ার কারণ হতে পারে না। তাই জিনিসটি মালিকের মালিকানায় থেকে যাবে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ –

যেন তোমরা লোকদের মাল-সম্পদের একটা অংশ গুনাহ সহকারে জেনে শুনে খেতে পার।

এ থেকে বোঝা যায়, এ কথা তার সম্পর্কে, যার সম্পর্কে জানা যাবে যে, সে যা নিয়েছে, তা তার নয়। আর জানা না গেলে তা তার গ্রহণ করা সম্পূর্ণ জায়েয বিচারকের রায় অনুযায়ী—যদি তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তার এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, যদি এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তার মৃত পিতার অমুক ব্যক্তির নিকট এক হাজার টাকা পাওনা আছে; কিংবা এ ঘরটি মৃত ব্যক্তি মিরাস হিসেবে রেখে গেছে, তাহলে উত্তরাধিকারীর পক্ষে তার দাবি করা এবং বিচারকের রায় অনুযায়ী তা নিয়ে নেয়া সম্পূর্ণ জায়েয। যদিও মূল ব্যাপারের সত্যতা জানা যায় নি। সে যে তা গ্রহণ করছে, তাতে সে তা বাতিল পন্থায় নিচ্ছে, তা সে জানে না। আল্লাহ্ তো তাঁর কথা ঃ 'যেন তোমরা জেনে শুনে গুনাহস্বরূপ লোকদের মালের একটা অংশ ভক্ষণ করতে নিন্দা করেছেন জেনে শুনে নেয়াকে। এখানে তো সেই জানা-শুনা-ই নেই। পূর্বে যে বলেছি, চুক্তির বা চুক্তি ভঙ্গের ব্যাপারে বিচারকের রায় কার্যকর হবে, সে বিষয়ে তো সকলেই একমত। ফিকাহবিদগণ যে বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন, তা হল, মতপর্থক্যের দিকগুলোর মধ্যে কোন একটি দিকের উপর যদি বিচারক রায় দেয়, তাহলে তা কর্যকর হবে। তা প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে ইজতিহাদের দেয়া অনুমতিক্রমে যা করা হয়েছে, তা কর্তিত হবে। যার পক্ষে রায় হয়েছে, তার জন্যে তা গ্রহণ করার অনুমতি হবে। রায় যার বিপক্ষে গেছে, তার তা নিষেধ করার অধিকার থাকবে না। যদিও উভয়ের ধারণা তার বিপরীতই হোক না কেন। যেমন প্রতিবেশী হওয়ার দরুন 'শুফায়া'র দাবি ও ওলী ছাড়া বিয়ে। এ ধরনের আরও যে সব ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মতপার্থক্য রয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ –

হে নবী! লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে নতুন উদিত চাঁদ সম্পর্কে। তুমি বল, তা হচ্ছে লোকদের জন্যে ও হজ্জ-এর সময় নির্ধারক।

'হিলাল' বলা হয় পশ্চিম আকাশের ভালে প্রথম যে চাঁদ দেখা হয় তাকে। কিংবা তার নিকটবর্তী। কেননা চাঁদের গত মাসের শেষে লুকিয়ে যাওয়ার পর এ সময়ই সর্বপ্রথম দেখা দিয়েছে। হজ্জের জন্যে 'লব্বাইকা' ধ্বনি দেয়াই এই শব্দ থেকেই বোঝায়। সদ্য প্রসূত বাচ্চার জীবনের প্রকাশ ঘটানো কোন শব্দ করে বা নড়া-চড়া করে তা-ও এই শব্দ থেকে বানানো। লোকদের কেউ কেউ বলে, هَلَالٌ। হচ্ছে শব্দ উচ্চারণ করা। নতুন চাঁদ

উঠলে যে ধ্বনি দেয়া হয়, তা-ও শব্দ দিয়ে বোঝায়। কেননা তা দেখে উচ্চস্বরে চাঁদ উঠার কথা বলা হয়। তবে প্রথম কথাটাই অধিক স্পষ্ট ও অধিক প্রকাশমান। আরবরা বলে : تَهَلَّلَ وَجْهُهُ তার মুখে আনন্দ ও স্ফূর্তি প্রকাশিত হয়েছে। অথচ তাতে কোন শব্দ উচ্চারিত হয় না।

কিন্তু ঠিক কোন সময় هلال 'হিলাল' বলা যাবে, সে বিষয়ে আভিধানিকগণ কয়েকটি কথা বলেছেন। কেউ বলেছেন, মাসের প্রথম দুই রাতের চাঁদকে 'হিলাল' বলা যাবে। কেউ বলেছেন, তিন রাতের চাঁদকে বলা যাবে। তার পরে তার নাম হবে قمر —চন্দ্র। আস্‌সায়ী বলেছেন, এটা সূক্ষ্ম বৃত্তে আবর্তিত হওয়ার সময় পর্যন্ত 'হিলাল' বলা যাবে। কারোর মতে নতুন চাঁদ উজ্জ্বলতাময় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত 'হিলাল' থাকে। তখন রাত কালো অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। তার ঔজ্জ্বল্য প্রবল হলে তাকে قَمَرٌ বলতে হবে। তাঁদের মতে তা সপ্তম রাত্রিতে হয়। হাজ্জাজ বলেছেন, দুই রাতের চাঁদকেই অধিকাংশ লোক 'হিলাল' বলে।

আয়াতের যে জিজ্ঞাসার কথা বলা হয়েছে, তা চাঁদের শীর্ষরেখা ও বড় হওয়ার মূলে কি তত্ত্ব ও যৌক্তিকতা নিহিত রয়েছে, সে বিষয়ে। তার জবাবে বলা হয়েছে, তা হচ্ছে পরিমাপ মাধ্যম। জনগণ রোযা, হজ্জ, স্ত্রীদের দিনক্ষণ গণনা, পাওয়া, আদায় ইত্যাদি ব্যাপারাদিতে এর খুব প্রয়োজন বোধ করে। ফলে এই চাঁদের বাড়তি-কমতি বৃহত্তর জনগণের সাধারণ কল্যাণের ব্যবস্থা। এর দ্বারাই তো মাস চেনা যায়। বছর ঠিক করা যায়। এতে আরও যে কত কল্যাণ নিহিত রয়েছে, তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না।

এ আয়াতটির আলোকে বছরের যে-কোন সময় ইহরাম বাঁধা জায়েয মনে হয়। কেননা সব চাঁদ সম্পর্কেই সাধারণ কথা বলা হয়েছে যে, তা হজ্জ-এর সময় নির্ধারক। কিন্তু প্রত্যেক মাসেই তো আর হজ্জ করা যায় না। তাই হজ্জ-এর পরিবর্তে 'ইহরাম' বাধা-ই তার অর্থ করতে হবে। আল্লাহ্‌র কথা :

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ –

হজ্জের জানা কয়েকটি মাস রয়েছে।

তা আমাদের পূর্বোক্ত কথার বিপরীত নয়। কেননা 'হজ্জের জানা কয়েকটি মাস' এতে যে ইঙ্গিত রয়েছে, তাতে কথা বলার সুযোগ আছে। তাহল, হজ্জের বহু কয়টি মাস তো নয়। 'হজ্জ' বলতে 'হজ্জ' সংক্রান্ত কার্যাবলী। আর হজ্জ সংক্রান্ত কার্যাবলী কয়েকটি মাসে ছড়ানো হয় না। কেননা কয়েকটি মাস বলতে তো সময়ের ধারাবাহিকতা ও তার প্রবাহ বোঝায়। আর সময়ের স্রোত প্রবাহ তো আল্লাহ্‌র কাজ। হাজীর তাতে কিছু করার নেই। অথচ হজ্জ হচ্ছে হাজীর কাজ। তাতে প্রমাণিত হল যে, কালামে যে ইঙ্গিত রয়েছে, তা যথেষ্ট নয়। সে ইঙ্গিতে দুটির যে-কোন একটি বোঝাতে পারে। হয় হজ্জ সংক্রান্ত কাজ বোঝাবে, অথবা বোঝাবে হজ্জের ইহরাম বাঁধা। এর একটিকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র অপর একটি বোঝানোর ইখতিয়ার কারোরই নেই। অবশ্য তার দলীল থাকলে ভিন্ন কথা। আয়াতের ব্যবহৃত শব্দেই যখন এই সম্ভাব্যতা রয়েছে, তখন আল্লাহ্‌র 'বল, তা

লোকদের জন্যে ও হজ্জের সময় নির্ধারক' কথাটিকে বিশেষীকরণ জায়েয হতে পারে না। কেননা যা সাধারণ ভাবধারা সম্পন্ন তাকে সম্ভাব্যতার দ্বারা বিশেষীকরণ আমাদের জন্যে জায়েয হতে পারে না।

আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, যদি কথার অর্থ হয় হজ্জের ইহরাম বাঁধা, তাহলে অন্যান্য মাসে ইহরাম বাঁধা সহীহ না হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। বরং সে সব মাসে ইহ্‌রাম বাঁধা যে জায়েয, সেই কথাটিই রয়েছে আয়াতটিতে। তাই আমরা বলছি, এই আয়াত অনুযায়ীই অন্যান্য মাসেও ইহরাম বাঁধা জায়েয, অন্যান্য মাসেও তা জায়েয। অবশ্য তা অন্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। কেননা তার কোন একটিতেও অপরটিকে বিশেষীকরণ অনিবার্য হওয়ার মত কিছুই নেই। আর শব্দের বাহ্যিক যা দাবি করে, তা হচ্ছে হজ্জের কাজকর্মই আসল বক্তব্য। তার ইহরাম নয়। তবে তাতে في 'তে' অক্ষরের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। ফলে এক্ষণে অর্থ হবে, 'হজ্জ জানা মাসগুলোতে।' তাতে এই মাস কয়টিতে হজ্জ সংক্রান্ত কাজকর্ম বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করার অর্থ রয়েছে। অন্যান্য মাসের নয়। এই কারণে হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে যদি কেউ হজ্জের ইহরাম বাঁধে তার পরে আল্লাহ্‌র ঘরের তওয়াফ করে এবং হজ্জের মাসসমূহের পূর্বেই সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ' করে, তাহলে তা তার জন্যে যথেষ্ট হবে না। তাকে তা পুনরায় করতে হবে। কেননা হজ্জ সংক্রান্ত কার্যক্রম হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে করা যায় না। এই প্রেক্ষিতে 'হজ্জ কয়েকটি জ্ঞাত মাসে' এর অর্থ হবে, হজ্জের কর্মকাণ্ড জ্ঞাত মাসসমূহে অনুষ্ঠিত হতে হবে। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'লোকেরা তোমাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'তা লোকদের কাজের ও হজ্জের সময় নির্ধারক'—হজ্জের ইহরামের ব্যাপারে সাধারণ তাৎপর্যবহ। তা হজ্জের ওয়াজিব কর্মকাণ্ডে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট নয়। আর 'বল, তা লোকদের কাজের ও হজ্জের সময় নির্ধারক কথাটিতে হজ্জের মাসসমূহের জন্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট, চাঁদ-এর কথা বলা হয়েছে মনে করা সঠিক কথা নয়। যেমন এসব চাঁদ লোকদের কাজ-কর্ম, তাদের ঋণের নির্দিষ্ট মেয়াদ, রোযা ও রোযা খোলা ইত্যাদি কেবলমাত্র হজ্জের মাসসমূহে বিশেষভাবে করতে হবে, অন্য মাসে করা যাবে না, তা-ও সঙ্গত কথা নয়। তাই সর্বপ্রকারের চাঁদ জনগণের কাজের সময় নির্ধারক সাধারণ অর্থেই যখন প্রমাণিত হল, তখন হজ্জের ক্ষেত্রেও সেই হুকুম হওয়া অবশ্য বাঞ্ছনীয়। কেননা আয়াতে যে চাঁদের কথা বলা হয়েছে লোকদের জন্যে সময় নির্ধারক, সেই সেই চাঁদগুলোকে হজ্জের-ও সময় নির্ধারক বলা হয়েছে। তাছাড়া আমরা যদি কেবল হজ্জ সংক্রান্ত কার্যক্রমই এই মাসগুলোতে করা যাবে মনে করি, তাহলে উক্ত আয়াতটির অর্থ তার ফায়দা প্রত্যাহার করা হবে। তার আসল হুকুমটা ফেলে দেয়া হবে। আর কোন প্রমাণ ছাড়া-ই শব্দটির বিশেষীকরণ করা হলে 'হজ্জের কতিপয় জানা মাস আছে' কথাটিকে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করা হবে। ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দের যথার্থ অর্থ করাই যখন কর্তব্য, তার হুকুম ও ফায়দা গ্রহণই যখন তার দাবি, তখন সব চাঁদের ব্যাপারেই তার প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। তা হচ্ছে হজ্জের ইহরাম বাঁধার সময় নির্ধারক। এ পর্যায়ের অন্যান্য কথা যথাস্থানে আলোচনা করা হবে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'বল, তা লোকদের জন্যে সময় নির্ধারক' থেকে মনে করা যায় যে, একই ব্যক্তির উপর যদি দুটি ইদ্দত পালন ওয়াজিব হয়, তাহলে তাতে দুটি একসাথে

অতিবাহিত করাই যথেষ্ট হবে, তার প্রত্যেকটিকে নতুন করে শুরু করার প্রয়োজন হবে না। যেমন হায়য এবং অপর মেয়াদ ছাড়া মাসসমূহেরও প্রয়োজন হবে না। কেননা আল্লাহ্ দুটির কোন একটিকে বিশেষভাবে সমস্ত মানুষের সময় নির্দিষ্ট করেনি তার কতককে সহ, অপর কতককে বাদ দিয়ে, একটি মেয়াদ গত হতে থাকলে তা তো সে দুটি মেয়াদের প্রত্যেকটির সময়। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا –

.... তখন তোমাদের দিক থেকে তাদের কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না, যা পূর্ণ হওয়ার জন্যে তোমরা দাবি করতে পার।

এ আয়াতে 'ইদ্দত' পালনকে স্বামীর হক বানিয়ে দেয়া হয়েছে। পরে 'ইদ্দত' সময়ের প্রবাহ, আর আল্লাহ নতুন চাঁদকে সমস্ত মানুষের জন্যে সময় নির্ধারক বানিয়েছেন, তখন দুটি ইদ্দতের জন্যে একটি সময়কাল অতিবাহিত হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করা কর্তব্য হয়ে পড়েছে। লক্ষণীয়, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'বল, তা লোকদের জন্যে সময়ের নির্ধারক' সম্বোধনের তাৎপর্য থেকে বোঝা গিয়েছে যে, তা সমস্ত মানুষের ইজারার মুদ্দাদ হবে। তাদের সমস্ত ঋণের জন্যেও সেই সময়। তার মধ্য থেকে একটি হলেই কোন কোন চাঁদের সাথে অপর কিছু থেকে আলাদা বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনের কোন প্রয়োজন নেই। ইদ্দত পর্যায়ে আয়াতের তাৎপর্যও তাই। দুই ব্যক্তির জন্যে একটি মুদ্দাত অতিবাহিত হওয়াই কাম্য।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'বল, তা লোকদের সময় নির্ধারক' থেকে বোঝা যায় যে, সময় মেয়াদের সূচনা হয় নতুন চাঁদ থেকে। আর 'মাসসমূহ' অন্তত তিনটি মাসের সূচনা নতুন চাঁদ থেকেই হওয়া উচিত—যদি তা তিন হয়। আর মৃত্যুজনিত ইদ্দত হলে তাহলে নতুন চাঁদ দেখে চার মাস গুনতে হবে। তাতে দিনের সংখ্যা গণনার কোন গুরুত্ব নেই। অনুরূপভাবে বোঝা যায়, সিয়ামের মাসও নতুন চাঁদ দেখে শুরু হবে। শেষও করা হবে তার দ্বারাই। হ্যাঁ, চাঁদ দেখা না গেলেই দিন গণনার প্রয়োজন দেখা দেবে। এ-ও বোঝা যায় যে, যে লোক তার স্ত্রীর সাথে 'ঈলা' করল মাসের প্রথমে, তাহলে তালাক সঙ্ঘটিত হওয়ার ব্যাপারে চারটি মাস চাঁদ দেখেই অতিবাহিত করতে হবে। ত্রিশ দিন গণনার কোন গুরুত্ব নেই। ইজারা, কসম, কিড়া ও ঋণের মেয়াদ ইত্যাদিতে শুরু যদি চাঁদ দেখে হয়, তাহলে সব কয়টি মাস অনুরূপই হতে হবে। ত্রিশ সংখ্য গণনার গুরুত্ব থাকবে না। এ কারণেই নবী করীম (স) নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ –

তোমরা রোযা রাখ চাঁদ দেখে, রোযা রাখা বন্ধ কর চাঁদ দেখে। আর শেষ দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার দরুন চাঁদ দেখতে না পেলে তোমরা সে মাসের ত্রিশ দিন গণনা কর।

এতে রাসূলের করীম (স) চাঁদ দেখতে না পাওয়ার দরুন দিনের সংখ্যা গণনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوْا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا –

**ঘরসমূহের মধ্যে সে সবের পেছনের দিক থেকে প্রবেশ করা কোন পূণ্য ও সওয়াবের কাজ নয়।**

এ পর্যায়ে একটি হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে। হাদীসটি আমাদের নিকট আবদুল্লাহ ইবনে ইসহাক আল-মারওয়াজী, আল-হাসান ইবনে আবূ রবী আল-জুরজানী, আবদুর রাযযাক, মামর, জুহরীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, আনসারগণ উমরার ইহরাম বাঁধলে তাদের ও আকাশের মাঝে কোন প্রতিবন্ধক বা আড়াল করতেন না। সেটাকে তারা খারাপ মনে করতেন। উমরার জন্যে ইহরাম বেঁধে ঘর থেকে একবার বের হলে পরে আবার ঘরের মধ্যে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে তখন তারা ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতেন না। কেননা তাহলে দরজার ছাদ তাদের ও আকাশের মাঝে আড়াল হয়ে দাঁড়াত। তখন তারা ঘরের পেছনের দিকদিয়ে প্রাচীর খুলে ফেলতেন। তার পরে কক্ষে প্রবেশ করে তার প্রয়োজনের জিনিস নিয়ে আসতে বলতেন, তার পরে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেন। আমাদের নিকট এ খবর পৌঁছেছে যে, নবী করীম (স) হুদায়বিয়ার বছর উমরার নিয়ত করে বের হয়ে পরে তাঁর কক্ষে প্রবেশ করলেন। একটি লোক তাঁর পেছনে-পেছনে ঘরে প্রবেশ করলেন। লোকটি ছিলে বনু সালমা গোত্রের। তখন নবী করীম (স) اِنِّىْ اَحْمَسُ। 'আমি তারাতারি আসছি'। জুহরী বলেছেন, সাময়িক উত্তেজিত হওয়াকে লোকেরা তেমন পরোয়া করত না। তখন আনসারী বললেন, আমিও উত্তেজনা বোধ করছি। আমি তো আপনার দ্বীনে-ই রয়েছি। তখন আল্লাহ্ উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন।

ইবনে আব্বাস, বরা (রা) কাতাদাতা ও আতা থেকে বর্ণিত হয়েছে, জাহিলিয়াতের যুগে বহু লোক এমন ছিল যে, তারা ইহরাম বাঁধার পর তাদের ঘরসমূহের পেছনের দিকে সংকীর্ণ পথ বানিয়ে নিত ঘরের মধ্যে যাতায়াতের জন্যে। উক্ত আয়াতটি লোকদেরকে এরূপ ধার্মিকতা করতে নিষেধ করা হয়েছে। বলেছে, তারা যেন ঘরের দুয়ার পথেই যাতায়াত করে। এই মতও প্রকাশ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ উক্ত আয়াতে একটি রূপক কথা বলেছেন যে, লোকেরা যেন নেক কাজে সরাসরি আসে। সে সরাসরি পথ হচ্ছে তাই, যে পথে আসতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন। এ পর্যায়ের সব কথা বলে দেয়াই আল্লাহ্‌র লক্ষ্য নয়। তার ব্যাখ্যা হচ্ছে, ঘর সমূহের সে ঘরের পৃষ্ঠ দেশ থেকে প্রবেশ করা বা আসা-যাওয়াই আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের কোন উপায় নয়। এটা আল্লাহ্‌র বিধানও নয়। কোন পছন্দনীয় কাজ-ও নয় এটা। তবু তা একটি দৃষ্টান্তমূলক কথা। আল্লাহ্‌র সব ব্যাপারের সরাসরি ও মুখোমুখী হতে হেদায়েত করেছেন যত বিষয়েই তিনি আদেশ করেছেন, তাতে। তা-ই পছন্দনীয় কর্মনীতি। তাতে এ ব্যাখ্যাও দেয়া হয়েছে যে, যে কাজকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপায়রূপে নির্দিষ্ট করা হয়নি, পছন্দনীয় কাজরূপে চিহ্নিত-ও করা হয়নি, তার দ্বারা কোনক্রমেই আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা সম্ভব নয়। তা

দ্বীনি পন্থাও নয়। সে পথে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা যেতে পারে না। তাকে দ্বীন-ও মনে করা যায় না।

হাদীসে তার দৃষ্টান্ত রয়েছে। নবী করীম (স) একদিন-এরাত্রি পর্যন্ত চুপ থাকতে নিষেধ করেছেন। তিনি এক ব্যক্তিকে রৌদ্রে পুড়তে দেখে বলেছিলেন, লোকটির অবস্থা কি ? বলা হল, লোকটি সূর্যের প্রখর রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থাকার মানত করেছিল। তখন তাকে ছায়ায় নিয়ে আসতে বললেন। নবী করীম (স) নিরবচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক রোযা রাখতেও নিষেধ করেছেন। কেননা রাত্রে তো কোন রোযা হয় না। তখন না খেয়ে থাকাকে রোযা মনে করতে নিষেধ করেছেন। রাত্রে পানাহার না করে আল্লাহ্র নৈকট্য পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করতেও বারণ করেছেন। এ সবই মৌল কথা। এই ভিত্তিতেই বলা হয়েছে যে, যে কাজ আল্লাহ্র নৈকট্য বিধায়ক নয়, তার মানত মানলে সে মানত পুরা করা বাধাতামূলক নয়। তাকে ওয়াজিব করা হলেও তা আল্লাহ্র নৈকট্যের কারণ হবে না। তা থেকে এ-ও বোঝা যায় যে, যার ওয়াজিব হওয়ার কোন ভিত্তি নেই, তা বাহ্যত নৈকট্য বিধায়ক হলেও তা মানতের কারণে ওয়াজিব হয়ে যাবে না। যেমন রোগী দেখতে যাওয়া, দাওয়াত কবুল করা, মসজিদে পায়ে হেঁটে যাওয়া, তাতে বসে থাকা ইত্যাদি।

## জিহাদ ফরয

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا - اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ -

এবং তোমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর সেই লোকদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। আর তাতে সীমালঙ্ঘন করো না। কেননা সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।

আবূ বকর বলেছেন, হিজরতের পূর্বে সসস্ত্র রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল, এ বিষয়ে মুসলিম উম্মত সম্পূর্ণ একমত, কোন মতপার্থক্যই এ ব্যাপারে নেই। তখন নির্দেশ ছিল ঃ মক্কী সূরার আয়াত ঃ

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ - وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ -

তুমি অন্যায় ও মন্দকে দূর কর উত্তম ও ভালো আচরণ দ্বারা। তুমি দেখতে পাবে তোমার সাথে যার শত্রুতা ছিল সে প্রাণের উচ্ছ্বসিত বন্ধু হয়ে গেছে। এই গুণ কেবল তাদের ভাগ্যেই জুটে, যারা ধৈর্যধারণ করতে পারে। আর এই মর্যাদা লাভ করতে পারে কেবল তারাই, যারা বড়ই ভাগ্যবান।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَصْفَحْ –

অতএব তুমি তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দাও এবং তাদের দিক থেকে মন ফিরিয়ে নাও।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ –

তাদের সাথে বিতর্ক কর উত্তম কথা-বার্তা দ্বারা।

তাঁর কথা ঃ

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابَ –

ওরা যদি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেই, (তাতে তোমার কোন ক্ষতি নেই) কেননা তোমার উপর তো শুধু পৌঁছিয়ে দেয়ারই দায়িত্ব। শেষ হিসেবে-নিকেশ নেয়ার কাজ তো আমার।

তাঁর কথা ঃ

وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا –

রহমানের বান্দাদের একটি গুণ হচ্ছে, জাহিল লোকেরা যখন তাদের সাথে কথা বলতে আসে, তখন তারা বলে 'সালাম'।

আর ইবনে দীনার ইকরাম, ইবনে আব্বাস সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) এবং তার কতিপয় সঙ্গী-সাথীর ধন-মাল মক্কায় রয়ে গিয়েছিল হিজরতের সময়। তাঁরা রাসূলে করীম (স)-কে বললেন, হে রাসূল, আমরা মুশরিক থাকা অবস্থায় তো খুবই শক্তিশালী ছিলাম। কিন্তু ঈমান আনার পর আমরা দুর্বল হয়ে যাই। রাসূল (স) বললেন, আমি ক্ষমা করতে বলেছি। তোমরা জনগণের সাথে যুদ্ধ কর না। পরে যখন তাঁরা সকলে মদীনায় এসে গেলেন, তখন তাদেরকে যুদ্ধ করার আদেশ করা হয়। কিন্তু তখন তারা হাত গুটিয়ে নিষ্ক্রিয় থাকতে চেষ্টা করে। তখন আল্লাহ নাযিল করেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْآ اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوْا الزَّكٰوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ –

তুমি কি সেই লোকদের অবস্থা বিবেচনা করেছ, যাদেরকে এক সময় বলা হয়ছিল যে, তোমরা এখন তোমাদের হাতগুলোকে অস্ত্র চালানো থেকে বিরত রাখ। তার পরিবর্তে বরং নামায কায়েম কর, যাকাত দাও, পরে যখন তাদের উপর যুদ্ধ ফরয করে দেয়া হল, তখন তাদের মধ্যের কিছুলোক মানুষকে ভয় করতে লাগল।

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াসেতী, আবূ ফযল জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ইয়ামানী, আবূ উবায়দ, আবদুল্লাহ্ ইবনে সালিহ, আলী ইবনে আবূ তালহা, ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন আল্লাহ্‌র এই কথায় ঃ

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ –

তুমি লোকদের উপর দারোগা নও।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ –

তুমি লোকদের উপর জবরদস্তিকারী নও।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

قُلْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ –

বল ঈমানদার লোকদের, তারা যেন সে সব লোকদের ক্ষমা করে দেয় যারা 'আল্লাহ্‌র দিন' সমূহের (যখন আল্লাহ আল্লাহদ্রোহী লোকদের থেকে প্রতিশোধ নিবেন এবং তাদের খারাপ কাজের বদলে আযাব দিবেন; কিংবা তাঁর অনুগত লোকদেরকে বিশেষ অনুগ্রহ দানে ধন্য করবেন) আশা করে না।

এসব আয়াতের হুকুম মনসূখ করে দিয়েছেন আল্লাহ্‌র এ আয়াতটি ঃ

فَاقْتُلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ –

তোমরা মুশরিকদের যেখানেই পাও, হত্যা কর।

এই আদেশও ঃ

وَاقَاتِلَا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ –

তোমরা যুদ্ধ কর সেই লোকদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না।

প্রথম কোন্ আয়াতটি যুদ্ধ করার আদেশ নিয়ে নাযিল হয়েছে, সেই বিষয়ে আগের কালের মনীষীগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। রুবাই ইবনে আনাস প্রমুখ বলেছেন ঃ

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ –

যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর।

এটিই প্রথম নাযিল হওয়া আয়াত। অন্য এক দল লোক—আবূ বকর সিদ্দীক (রা), জুহরী, সাঈদ ইবনে যুবায়র প্রমুখ বলেছেন, যুদ্ধে অনুমতি নিয়ে সর্বপ্রথম নাযিল হওয়া আয়াত হচ্ছে ঃ

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا –

যারা যুদ্ধ করছে তাদেরকে তা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কেননা তারা মজলুম।

প্রথম যুদ্ধকারী লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়ার ও যুদ্ধ মুবাহ হওয়ার আয়াত ঃ 'তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর' হতে পারে। আর দ্বিতীয় আয়াতটিতে সাধারণভাবে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যারা প্রথম যুদ্ধ শুরু করেছে তাদের বিরুদ্ধে। যেসব মুশরিক যুদ্ধ করেনি, তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

'এবং তোমরা যুদ্ধ কর আল্লাহ্‌র পথে সেই লোকদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে' এ কথার বিভিন্ন অর্থ বলা হয়েছে। রুবাই ইবনে আনাস বলেছেন, মদীনায় যুদ্ধের অনুমতি নিয়ে এই আয়াতটিই প্রথম নাযিল হয়েছে। এরপর নবী করীম (স) সেসব মুশরিকের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতেন, যারা আগে তাদের উপর যুদ্ধ শুরু করত। যারা তা করত না, তাদের বিরুদ্ধে তিনিও যুদ্ধ করতেন না। শেষ পর্যন্ত সব কাফির মুশরিকের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করার নির্দেশ আসে। ইরশাদ হয় ঃ

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً –

তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ কর, যেমন করে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ করছে।

বলা হয়েছে ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ –

তোমাদের প্রতি যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, যদিও তা তোমাদের অপছন্দ ও অসহনীয়।

বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ –

হারাম মাসসমূহ অতীত হয়ে গেলেই তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাবে হত্যা করবে।

অনেকেই বলেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَاتُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ –

এবং তোমরা তাদেরকে মসজিদে হারামের নিকট হত্যা করবে না।

এটি মনসূখ হয়ে গেছে এ কথাটির দ্বারা ঃ

اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ –

তোমরা মুশরিকদের যেখানেই পাবে, হত্যা করবে।

আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, উক্ত হুকুমটি মনসূখ হয়ে যায়নি, তা বহাল রয়েছে। দুশমনরা মসজিদে হারামের নিকট যুদ্ধ না করলে সেখানে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীস সেই কথাটির সমর্থন করে। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন ঘোষণা করেছিলেন ঃ

اِنَّ مَكَّةَ حَرَامٌ حَرَّمَهَا اللّٰهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ –

মক্কা হারাম। আল্লাহ্ যেদিন আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন, সেই দিনই তা হারাম করে দিয়েছেন।

অবশ্য রাসূলে করীম (স) মসজিদে হারামে যে যুদ্ধ করেছিলেন মক্কা বিজয়ের দিন, তাকে দলীল বানিয়ে যদি কেউ বলেন যে, তা করার রুখসত আছে, তাহলে মনে রাখা উচিত যে, সেটা কেবল তাঁর জন্যে দিনের কিছু সময়ের জন্যে হালাল করা হয়েছিল। পরে সেই হারাম-ই পুনর্বহাল হয়ে গেছে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এ থেকে বোঝা গেল যে, আয়াতের হুকুমটা বহাল রয়েছে, মনসূখ হয়নি। তাই যে সেখানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে না, তার বিরুদ্ধে আমরা মসজিদে হারামে যুদ্ধ শুরু করতে পারি না।

হারাম মাসসমূহেও যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছিল। এ আয়াতটি তার দলীল—

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ – قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ – وَصَدٌّ –

লোকেরা তোমার নিকট হারাম মাসসমূহে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বলে দাও, এই মাসে যুদ্ধ করা খুবই বড় অপরাধ। বিরত থাকা কর্তব্য।

পরে এ আয়াত মনসূখ হয়ে যায় এ কথার দ্বারা ঃ

'যখন হারাম মাসসমূহ চলে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদের হত্যা করবে যেখানেই পাবে।'

আবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, না এটা দ্বারা সে আয়াত মনসূখ হয়ে যায় নি। নিষেধ এখনও বহাল রয়েছে।

তবে আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ –

এবং তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে যেখানেই তাদেরকে আয়ত্তে আনতে পারবে এবং তাদেরকে বহিষ্কৃত করবে যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেছিল।

এ আয়াতে মুশরিকদের হত্যা করতে বলা হয়েছে যখনই তাদের আয়াত্তে আনা যাবে। যে সব মুশরিকের বিরুদ্ধে মুসলমানরা যুদ্ধ করত তাদের সকলের ব্যাপারেই এটা সাধারণ নির্দেশ। অবশ্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার যখন উপযুক্ত সময় হবে এবং যাদেরকে হত্যা করা যায় তাদেরকে পাওয়া যাবে, তখন। কেননা বেসামরিক নারী ও শিশুদের হত্যা করা নিষিদ্ধ। নবী করীম (স) তাদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। গির্জার পাদ্রী-পুরোহিতদেরকেও হত্যা করা নিষেধ। 'তোমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে' আদেশটিতে যদি যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুম হয়ে থাকে, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত রয়েছে, তাদের সাথে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ হয়ে থাকে, এবং 'সীমালঙ্ঘন

করবে না, কেননা আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করবে না' যদি নিষেধ হয়ে থাকে তাদের বিরুদ্ধে করা থেকে যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে না, তাহলে তাকে অবশ্যই মনসূখ মনে করতে হবে এবং তা 'তাদেরকে হত্যা কর যেখানেই তাদেরকে আয়ত্তে আনতে পার' কথাটির দ্বারা তা মনসূখ হয়েছে বলতে হবে, কেননা প্রথমোক্ত আয়াতে যাদের হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে, এ আয়াতে তো তাদেরকে হত্যা করতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ 'তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং সীমালঙ্ঘন করবে না।' এ ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন হয়ে যাবে যদি তাদের রুিদ্ধের যুদ্ধ করা হয় যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে না। 'আর তাদেরকে বহিষ্কৃত কর যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেছে।' অর্থাৎ মক্কা থেকে, যখন তোমরা তা করতে সক্ষম হবে। কেননা তারা মক্কায় মুসলমানদেরকে নিপীড়ন করেছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের নিপীড়নে অতিষ্ঠ করে তাদেরকে মক্কা ত্যাগ করে যেতে বাধ্য করেছিল। ফলে তাঁরা ওদের দ্বারাই বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ –

যখন তোমাকে নিয়ে—হে নবী—কাফিররা ষড়যন্ত্র করছিল, হয় তারা তোমাকে তাদের বাপ দাদার ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করবে নতুবা তোমাকে হত্যা করবে, অথবা তারা তোমাকে বহিষ্কৃত করবে .....

এই প্রেক্ষিতেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয করার সময় তাদেরকেও বহিষ্কৃত করার আদেশ করেছিলেন। তা-ও মুসলমানরা যখন তা করতে সক্ষম হবে। কেননা পূর্বে তারা যুদ্ধ না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছিল। ফলে আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তাদেরকে হত্যা কর যেখানেই তাদেরকে আয়ত্তে আনতে পার' সাধারণ হুকুম হয়ে গেল সব মুশরিকের ব্যাপারে। তবে যে সব লোক তখনও মক্কায় ছিল তাদের সম্পর্কেই এই আদেশ। তারাই তো মুসলমানদের সেখান থেকে বহিষ্কার করার আদেশ করেছিল। কিন্তু যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করারই আদেশ হয়েছে।

তার দলিল হিসেবে উল্লেখ হচ্ছে সেই আয়াত, যা তিলাওআতের ধারাবাহিকতায় আসে। তা হচ্ছে ঃ

وَلَا تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ –

তোমরা ওদের বিরুদ্ধে মসজিদে হারামে যুদ্ধ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ওরা তা না করে।

এ থেকে প্রমাণিত হল 'ওদেরকে হত্যা কর যেখানেই ওদেরকে আয়ত্তে পাবে।' আদেশটি মক্কা ছাড়া অন্য স্থানে মুশরিকদের সম্পর্কে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ –

ফিতনা হত্যার চেয়েও অনেক শক্ত ব্যাপার।

আগেরকালের মনীষীদের এই কথা বর্ণিত হয়েছে যে, আয়াতের 'ফিতনা' অর্থ কুফর। বলা হয়েছে, ওরা মুসলমানদেরকে নিপীড়ন করে তাদেরকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করে দিয়েছিল। তাদেরকে কাফির হয়ে থাকতে বাধ্য করছিল। পরে মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছিল। ওয়াকিদ ইবনে আবদুল্লাহ ছিলেন নবী করীম (স)-এর সাহাবী। আমর ইবনুল হাজরামী হারাম মাসগুলোতে মুশরিক ছিল। তারা বলেছিল মুহাম্মাদ (স) হারাম মাসগুলোতে যুদ্ধ করাকে হালাল করে নিয়েছেন। তখন উপরোক্ত আয়াতাংশ নাযিল হয় ঃ ফিতনা হত্যা থেকেও কঠিন ব্যাপার। 'অর্থাৎ তাদের 'কুফর' ও মুসলমানদের উৎপীড়ন ও নির্যাতন দেয়া মসজিদে হারামের শহরে ও হারাম মাসে। এটা হারাম মাসে যুদ্ধ করার তুলনায় অনেক বড় গুনাহ্‌। আল্লাহ্‌র কথা ঃ তোমরা তাদের বিরুদ্ধে মসজিদে হারামের নিকট যুদ্ধ করবে না যতক্ষণে তারা সেখানে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করছে। এর অর্থ, তোমাদের কোন কোন লোককে হত্যা না করছে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 'তোমরা নিজদেরকে দোষী বানিও না।' এর অর্থ, কতক লোক অপর কতক লোককে দোষী বানাবে না। কেননা তাদের সকলকে হত্যা করার পর তাদেরকে ওদেরকে হত্যা করার হুকুম দেয়া অর্থহীন। মক্কায় হত্যা করার নিষেধ এ আয়াতে এসেছে তার জন্যে, যে সেখানে নিহত হয় নি। এ দৃষ্টিতে যুদ্ধমান কোন মুশরিক যদি মসজিদে হারামে আশ্রয় নেয়, সে নিজে যুদ্ধ করেনি, তাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ উক্ত দলীলের ভিত্তিতে। আয়াতটি সাধারণ অর্থবোধক হওয়ায় তা তার জন্যেও দলীল, যে হত্যার কাজ করে হারামে আশ্রয় নিয়েছে। তাকে হত্যা করা যাবে না। কেননা কে হত্যা করেছে, কে করে নাই এদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি তাদের সকলকে হত্যা করা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে। অতএব আয়াতের মূল বিষয়বস্তুর দৃষ্টিতে বাধ্যতামূলক হয়েছে যে, হারামে আমরা যাকেই পাব তাকেই হত্যা করতে পারব না, সে নিজে হত্যাকারী হোক, কি না হোক। তবে হারামে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে থাকলে তাকে হত্যা করা যাবে—এক্ষণে ওরা তোমাদেরকে হত্যা করলে তোমরাও হত্যা কর' এই আদেশের বলে।

যদি বলা হয়, ও আয়াতটির মনসূখকারী আয়াত হচ্ছে এইটি ঃ

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ اللّٰهِ –

তোমরা ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কর যতক্ষণে ফিতনা শেষ হয়ে না যাবে এবং আনুগত্য, কর্তৃত্ব, সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যে ঘোষিত ও প্রতিষ্ঠিত না হবে।

জবাবে বলা যাবে, দুটি আয়াত-ই যদি প্রয়োগ করা সম্ভব হয়, তাহলে কোন্‌টা অপর কোন্‌টি দ্বারা মনসূখ হয়েছে বলা যায় না। তাছাড়া মনসূখ হওয়ার ব্যাপারেই লোকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফিতনা শেষ হয়ে যায়' এর প্রয়োগ হবে হারাম ছাড়া অন্যস্থানের ব্যাপারে।

তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে, হারামে আশ্রয়গ্রহণকারী ব্যক্তিকে হত্যা করা নিষিদ্ধ হওয়া, যদিও সে একজন অপরাধী। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ امِنًا 'যে-ই হারামে প্রবেশ করল সে-ই নিরাপত্তা পেয়ে গেল। এই নিরাপত্তায় শামিল রয়েছে হত্যার ভয়ে ভীত ব্যক্তিও। অতএব বোঝা গেল, হত্যার যোগ্য হওয়া ব্যক্তিও যদি হারামে প্রবেশ করে, তাহলে সেও হত্যা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। যেমন অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا -

স্মরণ কর, আমরা আল্লাহ্র ঘরকে জনগণের আবর্তন কেন্দ্র ও নিরাপত্তার স্থান বানিয়েছি, সেই কথা।

এ সবই প্রমাণ করে যে, হত্যারযোগ্য ব্যক্তি হারামে আশ্রয় নিলে সে নিরাপত্তা পেয়ে যাবে, তাকে হত্যা করা যাবে না। কেননা সে এখন হারামে আছে। তা সত্ত্বেও আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমরা ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ ফিতনা শেষ না হয় এবং আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্টিত না হয়' তো প্রথম সম্বোধনেই নাযিল হয়েছে। যখন নাযিল হয়েছিল ঃ 'তোমরা ওদের বিরুদ্ধে মসজিদে হারামের নিকট যুদ্ধ করো না।' অতএব এটি ওটির মনসূখকারী হতে পারে না। কেনন মনসূখ হওয়ার প্রশ্ন হবে কাজে পরিণত হওয়ার পর, পূর্বে নয়। আর একটি সম্বোধনে বলা কথার এক অংশ মনসূখকারী ও অপর অংশ মনসূখ হতে পারে না। যখন সব কথাই একই সম্বোধনে বলা হয়েছে, তিলাওয়াতের বিন্যাসে তাই রয়েছে, নাযিল হওয়ার সংস্থাও তাই। অতএব দুটি আয়াতের নাযিল হওয়ার একটার তারিখ ঠিক রাখা ও অপরটির নাযিল হওয়ার তারিখ পিছিয়ে দেয়া জায়েয হতে পারে না। তবে সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণ হলে ভিন্ন কথা। একটির দাবি সহীহ্ হওয়া সম্ভবও নয়। একথা রুবাই ইবনে আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, এটি মনসূখ হয়েছে আল্লাহ্র 'ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফিতনা শেষ হয়' কথার দ্বারা। কাতাদাতা বলেছেন, সেটি মনসূখ হয়েছে আল্লাহ্র 'অতঃপর তোমরা মুশরিকদের হত্যা কর যেখানেই তাদের তোমরা পাবে' কথা দ্বারা, ব্যাখ্যার মাধ্যমে তা সঙ্গত হতে পারে, রায় দ্বারাও। কেননা ঃ 'অতএব তোমরা মুশরিকদের হত্যা কর যেখানেই তোমরা তাদের পাবে' আল্লাহ্র এই কথাটি নিঃসন্দেহে সূরা আল-বাকারার পরে নাযিল হয়েছে। এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। আর তাতে কোনটির মনসূখ হওয়ারও কোন প্রমাণ নেই। কেননা দুটির-ই প্রয়োগ সম্ভব—সম্ভব এভাবে যে, মুশরিকদের তোমরা হত্যা কর' কথাটি ওদের বিরুদ্ধে 'মসজিদে হারামের নিকট যুদ্ধ করো না' কথাটির উপর ভিত্তিশীল। এক্ষণে মোট কথাটি এই দাঁড়ায়. তোমরা মুশরিকদের যেখানেই পাবে হত্যা করবে। তবে মসজিদে হারামের নিকট নয়। কিন্তু তারা যদি সেখানেই তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাহলে ভিন্ন কথা। তারা যদি তা করে, তাহলে তোমরাও ওদেরকে হত্যা করবে। একটি হাদীস থেকেও তা প্রমাণিত হয়। হাদীসটি ইবনে আব্বাস, আবূ শুরাইহ্ আল-খুজাঈ ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। বলেছেন, নবী করীম (স) মক্কা বিজয়ের দিন ভাষণ দিয়ে বললেন ঃ

اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَمْ يَحِلَّ لِاَحَدٍ قَبْلِىْ وَلَا تَحِلُّ لِاَحَدٍ بَعْدِىْ، وَاِنَّمَا اُحِلَّتْ لِىْ سَاعَةً مِنْ نَّهَارٍ ثُمَّ عَادَتْ حَرَامًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ -

হে জনগণ! আল্লাহ্ যেদিন আসমান-জমিন সৃষ্টি করেছেন সেদিনই মক্কাকে হারাম বানিয়েছেন। আমার পূর্বে তা কারোর জন্যে হারাম হয়নি, আমার পরেও তা কারোর জন্যে হালাল করা হবে না। আমার জন্যে দিনের কিছু সময়ের হালাল করা হয়েছিল মাত্র। পরে তা পুনরায় কিয়ামত পর্যন্ত হারাম হয়ে গেছে।

কোন কোন হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলে করীম (স)-এর জন্যে হালাল করা হয়েছিল দেখে যদি কেউ রুখসত আছে বলে ধরে নেয়, তাহলে তার মনে রাখা উচিত যে, তাঁর জন্যেও দিনের মাত্র কিছু সময়ের তরে হালাল করা হয়েছিল। এ থেকে হারামে যুদ্ধ নিষিদ্ধ হওয়াই প্রমাণিত হয়। হ্যাঁ, ওরাই যদি তা করে, তাহলে ভিন্ন কথা হবে। আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীস মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক, সাঈদ ইবনে আবূ সাঈদুল মুকবেরী, আবূ শুরাইহ আল খুজাঈ সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে বলেছেন, আমাকে মাত্র একদিনের কিছু সময়ের জন্যে সেখানে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। অপর একটি বর্ণনাও তার সমর্থন করে। মক্কা বিজয়ের দিন খুজায়া বংশের এক ব্যক্তি যখন হুযায়ল বংশের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে বসল, তখন নবী করীম (স) ভাষণ দিয়ে বললেন ঃ 'আল্লাহ্র নিকট অধিক গর্হিত অপছন্দনীয় হচ্ছে তিন ব্যক্তি। সেই ব্যক্তি যে তার হত্যাকারীর পরিবর্তে অন্যকে হত্যা করেছে, যে ব্যক্তি হারামের মধ্যে হত্যাকাণ্ড করেছে এবং সেই ব্যক্তি যে জাহিলিয়াতের যুগের প্রতিশোধস্বরূপ হত্যা করল।

এই হাদীসও হারামে আশ্রয় গ্রহণকারীকে হত্যা করা হারাম প্রমাণ করে। তার দুটি কারণ। প্রথম, হারামে হত্যাকারীকে সাধারণভাবেই নিন্দা করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় সেই সাথেই উল্লেখিত হয়েছে, যে হত্যার যোগ্য নয় তাকে হত্যা করা। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, হত্যা তাকে করা যাবে, যে নিহত হওয়ার যোগ্য প্রমাণিত হয়েছে, পরে সে হারামে আশ্রয় নিয়েছে। এটা রাসূলে করীম (স) কর্তৃক দেয়া খবর যে, হারাম তার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণকারীকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছে। উপরে উদ্ধৃত সব কয়টি আয়াত থেকে এক সাথে প্রমাণিত হচ্ছে যে, হারামে আশ্রয়গ্রহণকারীকে হত্যা করা নিষিদ্ধ। তবে তা নিষিদ্ধ হত্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রাণ হত্যার কমের কোন অপরাধ পর্যায়ে কোন দলীল তাতে নেই। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমরা তাদেরকে মসজিদুল হারামের নিকটে হত্যা করো না।' কথাটি হত্যা সংক্রান্ত ব্যাপারের মধ্যেই সীমিত। আর 'যে লোক সেখানে প্রবেশ করল, সে নিরাপত্তা পেয়ে গেল' এবং 'জনগণের আবর্তন কেন্দ্র ও নিরাপত্তার স্থান' কথা দুটি বাহ্যত হত্যা থেকে নিরাপত্তা লাভ-ই বোঝায়। কোন দলীল পাওয়া গেলে তার ভিত্তিতে অন্যদেরকেও তাতে গণ্য মনে করা যায়। কেননা 'যে সেখানে প্রবেশ করবে' কথাটিতে মানুষ সম্পর্কেই বলা। 'সে নিরাপত্তা পেয়ে গেল' কথাটিও মানুষ সম্পর্কেই। আয়াত যার নিরাপত্তার দাবি করছে, সে মানুষই বটে। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়। তা সত্ত্বেও

শব্দ যদি প্রাণের প্রতি ইঙ্গিত করে ও তার চাইতেও কম জিনিসেও, আর আমরা যদি দলীলের ভিত্তিতে বিশেষীকরণ করে থাকি তার চাইতে কম জিনিসকে, আর শব্দের হুকুমটা প্রমণের ব্যাপারে অবশিষ্ট থেকেই যায়। কারোর উপর ঋণ থাকা অবস্থায় সে যদি হারামে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহলে সেখান থেকেই তাকে কয়েদ করা হবে। তার হারামে প্রবেশ তাকে এই গ্রেফতারী থেকে বাঁচাতে পারবে না। এ বিষয়েও কোন মতপার্থক্য নেই। প্রাণের দায় ছাড়া আর যত হক্-হুকুকের ব্যাপার রয়েছে, হারাম তাকে তা আদায় করা থেকে রক্ষা করতে পারে না যেমন ঋণের বেলায় বলা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَاِنِ انْتَهَوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ–

ওরা যদি বিরত হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তো বড়ই ক্ষমাশীল দয়াবান।

এটা হচ্ছে একটি বিষয়ে শর্ত আরোপ, এ শর্তটা হলে কি হবে সেই কথাটি এর পরই বলে দেয়া দরকার। তা হচ্ছে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারীর জন্যেও তওবা করার সুযোগ রয়েছে। কেননা 'কুফর' হত্যার তুলনায় অনেক বড় গুনাহ। আর আল্লাহ তো জানিয়েই দিয়েছেন যে, কাফির ব্যক্তির তওবা আল্লাহ কবুল করবেন, তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণে না ফিতনা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠি হয়' কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয করে দিয়েছে, যতক্ষণ না তারা কুফর ত্যাগ করবে। ইবনে আব্বাস, কাতাদাতা, মুজাহিদ, রুবাই ইবনে আনাস বলেছেন, 'ফিতনা' শব্দটি এখানে শির্‌ক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে, কুফরকে ফিতনা বলা হয়েছে এজন্যে যে, কুফর মানুকে ধ্বংস করে। ফিতনাও তাই করে। অপরদের মত হচ্ছে, ফিতনা অর্থ যাচাই-পরীক্ষা, বিপদে ফেলে মানুষের খাটিত্ব অ-খাটিত্ব পরখ করা। আর 'কুফর' যাচাই-পরীক্ষাকালে বিপর্যয় প্রকাশ করে। তার 'দ্বীন' অর্থ, আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে তার দাসত্ব বন্ধনে বন্দী হওয়া। তার আসল আভিধানিক অর্থ দুটি। একটি الانقيار। বন্ধনে বন্দী হওয়া। আর দ্বিতীয়টি العادة। অভ্যাস। আর শরীয়াতের দিক দিয়ে দ্বীন-এর অর্থ, আল্লাহ্‌র দাসত্ব বন্ধনে বন্দী হওয়া, তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করা চিরন্তন ও অভ্যাসগতভাবে। এ আয়াতটি বিশেষভাবে মুশরিকদের সম্পর্কে। আহলি কিতাব এর মধ্যে শামিল নয়। কেননা সম্বোধনের শুরুতে তাদেরই উল্লেখ রয়েছে। যাতে বলা হয়েছে ঃ তাদেরকে হত্যা কর যেখানেই তোমরা তাদেরকে আয়ত্তাধীন পাবে' এবং 'তাদেরকে বহিষ্কৃত কর যেখান থেকে তোমাদেরকে তারা বহিষ্কৃত করেছে।' এটা মক্কার মুশরিকদের সম্পর্কে বলা কথা। তারাই নবী করীম (স) এবং তাঁর সাহাবীগণকে মক্কা থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য করেছিল। তাই এই নির্দেশে আহলি কিতাব অন্তর্ভুক্ত নয়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আরব মুশরিকদের নিকট থেকে দুটির যে-কোন একটিই গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ হয় তারা ইসলাম কবুল

করবে, নয় তাদের প্রতি তরবারির ব্যবহার হবে। কেননা আল্লাহ্ তো বলে দিয়েছেন ঃ 'আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যেন ফিতনা নিঃশেষ ও খতম হয়ে যায়।' আর 'ফিতনা' অর্থ, কুফর। আর 'দ্বীন'—আধিপত্য-কর্তৃত্ব-সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে একমাত্র আল্লাহ্র। অর্থাৎ দ্বীন-ইসলাম কায়েম হবে। কেননা আল্লাহ্র নিকট আল-ইসলামই একমাত্র দ্বীনরূপে গ্রহণীয়। আল্লাহ্র কথা ঃ

فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ –

ওরা যদি বিরত থাকে, তাহলে জালিম ছাড়া অন্য কারোর উপর বাড়াবাড়ি করা হবে না। অর্থাৎ জালিম ছাড়া আর কাউকে হত্যা করা হবে না।

শুরুর শব্দ 'হত্যা' 'এবং তাদের বিরুদ্ধে কর' কথার মধ্যে যা রয়েছে, এ তো সেই হত্যা, যা কাফিরদের জন্যে কুফরির কারণে সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা তারা সীমালঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী। আর তা-ই হচ্ছে জুলুমের প্রতিফল। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا –

খারাপ কাজের প্রতিফল অনুরূপ খারাপ কাজ।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَمَنِ اعْتَدَ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدٰى عَلَيْكُمْ –

যে লোক তোমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করেছে তোমরাও তার উপর সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ কর, যেমন সে তোমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করেছে।

তবে প্রতিফলস্বরূপ যা করা হবে, তা সীমালঙ্ঘন নয়, খারাপও নয়।

আল্লাহ্র কথা ঃ

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ –

হারাম মাসসমূহ হারাম মাসসমূহের বিকল্প। আর হুরমত হচ্ছে কিসাস।

হাসান থেকে বর্ণিত হয়েছে, আরব মুশরিকরা নবী করীম (স)-কে বলেছিল, হারাম মাসে আমাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে তুমি বিরত থাকলে ? নবী করীম (স) বললেন, হ্যাঁ,। মুশরিকরা হারাম মাসে তাঁকে বদলে দিতে চেয়েছিল। তখন তারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার ইচ্ছা করেছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা উপরোদ্ধৃত আয়াতটি নাযিল করেন। তার অর্থ, হারাম মাসে তারা যদি তোমার প্রতি কোন আচরণ হালাল করে, তাহলে তোমরাও তাদের ব্যাপারে অনুরূপ হালাল করে নিবে।

ইবনে আব্বাস, রুবাই ইবনে আনাস, কাতাদাতা, দহাক বর্ণনা করেছেন, কুরায়শরা রাসূলে করীম (স)-কে যখন মক্কার মাঝ পথ থেকে ফেরত দিয়ে দিল, এটা ছিল যিলকাদ মাস আর তা হল হারাম মাস। তিনি উমরার ইহরাম বেঁধে মক্কা রওয়ানা হয়েছিল।

আল্লাহ তাঁকে পরবর্তী যিলকাদ মাসে মক্কায় প্রবেশ করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তখন তিনি উমরার কাযা আদায় করেছিলেন। কেননা আগের বছর হুদায়বিয়ার নিকটে তাঁকে বাঁধা দেয়া হয়েছিল ও ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল উমরা না করেই। উক্ত কথার দুটি অর্থ হতে পারে না। মুশরিকরা হারাম মাসে তাঁকে বাঁধা দিয়েছিল, পরবর্তী বছর সেই হারাম মাসেই আল্লাহ তাঁকে আল্লাহ্‌র ঘরে যাওয়ার সম্ভব করে দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও এর মধ্যে এই কথা শামিল রয়েছে যে, হারাম মাসে মুশরিকরা যুদ্ধ করলে মুসলমানদের জন্যেও হারাম মাসে যুদ্ধ করা মুবাহ। কেননা একটি শব্দ একই সাথে খবর ও আদেশ দুটিই হতে পারে না। আর একটি অর্থ গ্রহণ করা হলে তার অপর অর্থ গ্রহণ করা যায় না। তবে আল্লাহ তাঁর জন্যে বিকল্প বানাবার জন্যে এক হারাম মাসের বদলে আর একটি হারাম মাস নির্দিষ্ট করে দিলেন। যে মাসটি শেষ হয়ে গেছে সে মাসটির হুরমত সেই মাসটির হুরমত-এর মতই ছিল, যে মাসে তাঁকে মক্কায় যেতে দেয়া হয়েছিল। এই কারণে الحرمت قصاص। 'হুরমতসমূহ সমান সমান' বলা হয়েছে। এর পর-পরই বলা হয়েছে ঃ 'যে লোক তোমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করলো, তোমরাও তার উপর সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ কর যেমন সে তোমাদের উপর করছে।' এ থেকে বোঝা গেল, কাফিররা হারাম মাসে যুদ্ধ করলে মুসলমানদেরও কর্তব্য সেই হারাম মাসে যুদ্ধ করা। তবে মুসলমানদেরই যুদ্ধ শুরু করা জায়েয নয়। সীমালঙ্ঘনের প্রক্রিয়াস্বরূপ যে কাজ করতে বলা হয়েছে, তাকেও সীমালঙ্ঘন বলা হয়েছে। কেননা এটাও সেই জাতীয় কাজ। এটা তাদের পাওনা। কেননা তারা যা করেছে, তাতে তার জওয়াবস্বরূপ এই কাজটা করা অপরিহার্য। এই কারণে সেটিকেও সীমালঙ্ঘন বলা হয়েছে। এটা প্রত্যক্ষ কথা নয়, পরোক্ষ। কেননা মূলত সীমালঙ্ঘনকারীই জালিম। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যে তোমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করবে, তোমরাও তার সাথে সীমালঙ্ঘনের কাজ কর, যেমন সে করেছে'—সাধারণ অর্থবোধক। ঠিক যেমন কেউ কারোর মাল ধ্বংস করলে তার মালও অনুরূপ ধ্বংস করাই সাধারণ নিয়ম। এই দৃষ্টান্তমূলক কথাটি দুইভাগে বিভক্ত। একটি, সেটি সেই সমজাতীয় কাজ। পাত্র দ্বারা বা পাল্লা দ্বারা ও সংখ্যায় গণিত জিনিস পরিমাপের দিক দিয়ে অভিন্ন। আর দ্বিতীয়টি তারই মতো মূল্যে। নবী করীম (স) একটি ক্রীতদাসের ব্যাপারে দুই ব্যক্তির মধ্যে ফয়সালা দিয়েছিলেন। তাদের একজন সেটিকে মুক্ত করে দিয়েছিল। তার উপর তার মূল্যের অর্ধেকের ক্ষতিপূরণ ধার্য করেছিলেন। সীমালঙ্ঘনে তারই মতো বাধ্যতামূলক সমান বানিয়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তার মূল্য। ফলে এটি একটি ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সমান জিনিস কখনও মূল্যের উপর ধার্য হয়। তখন তা তার নাম হয়ে যায়। বোঝা গেল সমান জিনিস কখনও নামে হয়, যা তার সমজাতীয় নয়, যখন তা ওজনে হয়, কখনও পরিমাপে পরিমাণ ধার্যকরণে। যা কর্মফল হিসেবে পাওয়ার যোগ্য হয়েছে। যদি কেউ কারোর উপর মিথ্যা যিনার দোষারোপ করে সীমালঙ্ঘন করে, তাহলে এই মিথ্যা অভিযোগের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সে যা করার অধিকারী হয়েছে, তাতে অনুরূপ মিথ্যা অভিযোগ আনার অধিকার হয় না। বরং অনুরূপ শাস্তিস্বরূপ সে আশি দোররা খাওয়ার যোগ্য হয়েছে। তেমনি কেউ যদি কাউকে গালমন্দ বলে, যিনার

অভিযোগের তুলনায় তা কম মাত্রার দোষ। তাই তার উপর তাজীর (একটি শাস্তি) ধার্য হবে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, সমান-সমানের নাম কখনও তার সমজাতীয় না-ও হতে পারে।

উক্ত নীতির ভিত্তিতে বলা হয়েছে, কেউ যদি শক্ত কাঠ চুরি করে তার নির্মাণ কাজে ঢুকিয়ে ফেলে, তাহলে তাকে তার মূল্য দিয়ে দিতে হবে। কেননা মূল্যটাই তখন তার সমজাতীয় প্রতিশোধ গণ্য হতে পারে। অপহরণকারী তা নিয়ে সীমালঙ্ঘন করেছে, অতএব সাধারণভাবে হক্ আদায়ের আদেশের দরুন এ ব্যবস্থাই তার জন্যে উপযুক্ত।

যদি বলা হয়, এ সময় তো তার নির্মাণ ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে সেই কাঠ বের করে নিলেই সেই জিনিসটিই উদ্ধার করা যায়। সেটাই হবে তার সীমালঙ্ঘনমূলক কাজের সমজাতীয় প্রতিবিধান।

জবাবে বলা যাবে, তার আসল মালিকানা সম্পদ নিয়ে নিলেই অপহণকারীর উপর সীমালঙ্ঘন হয় না। যেমন কারোর নিকট কোন আমানত থাকলে সেটাই যদি নিয়ে নেয়া হয়, তাহলে তার উপর সীমালঙ্ঘনমূলক আচরণ হয় না। সীমালঙ্ঘনমূলক আচরণ হবে যদি তার মালিকানাকে ক্ষয় করা যায়, যেমন সে একজনের মালিকানাকে ক্ষয় করেছে। অথবা তার হাত বঞ্চিত হবে অনুরূপ সেই জিনিস থেকে যা তার হাত প্রথম ব্যক্তির (যার কাঠ সে হরণ করেছিল) মালিকানা থেকে বঞ্চিত করেছিল। কিন্তু তার আসল মালিকানা গ্রহণে কারোর উপরই কোন সীমালঙ্ঘন থাকে না। তাতে অনুরূপ জিনিস গ্রহণও হয় না।

এই দলীলের ভিত্তিতে বলা হয়েছে, কিসাস ওয়াজিব হবে যাতে সমান সমান ও অনুরূপ জিনিস পূর্ণ মাত্রায় নেয়া সম্ভব। যাতে পূর্ণ মাত্রায় নিয়ে নেয়া হয় বলে জানা যায় না, তা নয়। যেমন অর্ধবাহুর স্থান থেকে হাত কেটে ফেলা, তাতে কিসাস প্রত্যাহৃত হওয়ার কারণে। কেননা তাতে অনুরূপ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ কঠিন ব্যাপার। যেহেতু আল্লাহ্ আমাদেরকে আদেশ করেছেন পূর্ণ মাত্রায় অনুরূপ জিনিস গ্রহণ করতে।

এই আলোকেই ইমাম আবূ হানীফা (রা) বলেছেন, যে লোক এক ব্যক্তির হাত কেটে ফেলেছে এবং তাকে হত্যাও করেছে, নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের অধিকার রয়েছে এই হত্যাকারীর প্রথমে হাত কাটা এবং পরে তাকে হত্যা করার। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'তোমাদের উপর যে লোক সীমালঙ্ঘন করবে, তোমরাও তার উপর অনুরূপ সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ কর যেমন সে করেছে।' অতএব নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের তা-ই করার অধিকার রয়েছে যেমন সে করেছে, এটাই আয়াতের দাবি।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ –

এবং তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর এবং তোমরা নিজেদের হাতেই নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।

আবূ বকর বলেছেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বহু কয়টি দিক উন্মোচিত করা হয়েছে। একটি হচ্ছে হাদীস, মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, আহম্মাদ ইবনে আমর ইবনে সরহ্‌, ইবনে অহব, হায়াত ইবনে শুরাইহ ও ইবনে লেহয়াতা, ইয়াযীদ ইবনে আবূ হুবায়ব, আসলাম আবূ উমর সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, আমরা কনস্ট্যান্টি নোপলের উপর যুদ্ধাভিযান চালালাম। বাহিনীর প্রধান ছিলেন আবদুর রহমান ইবনুল অলীদ। শহরের পৃষ্ঠদেশে রোমানরা একেবারে লেগেছিল। এই ব্যক্তি শত্রুর উপর আক্রমণ চালালো। লোকেরা বলল, থাম, থাম। লোকটি কলেমা পড়তে পড়তে নিজেই নিজেকে ধ্বংস করল। তখন আবূ আইয়ূব বললেন, এ আয়াতটি আনসার জনগণের বিষয়ে নাযিল হয়েছিল, যখন আল্লাহ তাঁর নবীকে সাহায্যদান করেছিলেন এবং তাঁর দ্বীন-ইসলামকে বিজয়ীরূপে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমরা বললাম, আস, আমরা আমাদের সম্পদের মধ্যে থাকব এবং তার সংস্কার করব। তখন আল্লাহ নাযিল করলেন ঃ 'এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ধন-মাল ব্যয় কর এবং নিজদিগকে নিজেদের হাতেই ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।' বোঝা গেল নিজেদের হাতে ধ্বংসে নিক্ষেপ করা বলতে বোঝায়, সম্পদের মধ্যে অবস্থান করা,তার কল্যাণ সাধনে ব্যতিব্যস্ত হওয়া এবং জিহাদ ত্যাগ করা। আবূ ইমরান বলেছেন, অতঃপর আবূ আইয়ূব আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কনস্টান্টিনোপলে সমাহিত হন। আবূ আইয়ুব জানিয়েছেন যে, নিজেদেরকে নিজেদের হাতেই ধ্বংসে নিক্ষেপ অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ পরিত্যাগ করা। আয়াতটি এই বিষয়েই নাযিল হয়েছে। ইবনে আব্বাস, হুযায়ফা (রা), আল-হাসান, কাতাদাতা, মুজাহিদ ও দহাক থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া গেছে।

বরা ইবনে আজিব (রা) ও উবায়দাতুস্‌-সালমানী থেকে বর্ণনা এসেছে, নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র নিকট মাগফিরাত পাওয়া থেকে নিরাশ হওয়া গুনাহের কাজ করার পর। কারো কারো মতে অযথা ব্যয় ও অপচয় করা এমনভাবে যে, শেষ পর্যন্ত তার পানাহারের ব্যবস্থাও থাকবে না। ফলে তার ধ্বংস হয়ে যাওয়া অনিবার্য। অপর লোকদের মতে শত্রুকে উৎক্ষিপ্ত করা ছাড়াই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া। কিন্তু আয়াতটির এই সব ব্যাখ্যাকে আবূ আইয়ূব আনসারী অগ্রাহ্য করেছেন। তিনি বলেছেন, এগুলো কারণ হতে পারে। কিন্তু এই সবই আয়াতের অর্থ হওয়ায় কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। এই সব অর্থই এক সাথে গ্রহণ করা যেতে পারে, তাতে অর্থসমূহের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। তবে এক ব্যক্তির পক্ষে শত্রু আক্রমণ—শত্রুদের এক বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া—মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান তাঁর السير الكبير। গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—এক ব্যক্তি যদি এক হাজার ব্যক্তির উপর আক্রমণ করে, সে একা, নিঃসঙ্গ, তাতে তার কোন ভয় হয় না, যখন সে মুক্তির জন্যে লালায়িত, কিন্তু শত্রুকে লাঞ্ছিত করা। যদি মুক্তির আশা না তাকে, শত্রুকে ক্ষতিগ্রস্ত করাও না হয়, তাহলে আমি তার জন্যে এ কাজ পছন্দ করি না। কেননা সে নিজেদের ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে তাতে মুসলমানদের কোন ফায়দা হয় না। এক ব্যক্তির পক্ষে তা করা বাঞ্ছনীয় হতে পারে, যখন সে মুক্তি লাভের কিংবা মুসলমানদের ফায়দার আশা হবে। যদি তা না হয়, বরং তাতে

মুসলমানরা অধিকতর সাহসী হয়ে উঠবে বলে আশা হয়, মুসলমানরাও তারই মত কাজ করবে এবং যুদ্ধ করবে ও শত্রুকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে বলে আশা থাকে, তা হলে তাতে দোষ হবে না ইন্‌শা আল্লাহ্। কেননা তাতে যদি শত্রুপক্ষের ক্ষতির আশা করা যায়, মুক্তির আশা না-ও হয়, তবু একজন লোক বিরাট শত্রুর উপর আক্রমণ করলে আমি কোন দোষ দেখতে পাই না। অনুরূপভাবে অপরকে যদি জয় করা সম্ভব হয় কোন ব্যক্তির একার আক্রমণে, তাতেও কোন দোষ নেই, বরং তা করে সে বিরাট সওয়াবের অধিকারী হবে বলে আমি আশা পোষণ করি। হ্যাঁ, তাতে যদি কারোরই কোন ফায়দা না হয়, কোন রকমেরই কল্যাণ না হয়, তাহলে তা করা উচিত নয়। যদিও মুক্তি ও বিজয়ের আশা না-ও হয়। তবে তাতে শত্রু যদি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে তা হলে তাতে দোষ হবে না। কেননা এটা একটা উত্তম পন্থা শত্রুকে গায়েল করার। আর তাতে মুসলমানদের যথেষ্ট ফায়দাও রয়েছে।

ইমাম মুহাম্মাদ এই যা কিছু বলেছেন, তা সহীহ্ কথা, তার বিপরীত কিছু জায়েয নয়। এ সব অর্থের দৃষ্টিতে আবূ আইয়ুব বর্ণিত হাদীসে যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, এক ব্যক্তি শত্রুর উপর আক্রমণ করলে নিজেকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করা হবে যখন তাতে কোনরূপ ফায়দা হবে না। অবস্থা যদি তা-ই হয়, তা হলে কোনরূপ ফায়দা ছাড়া-ই নিজেকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করা হবে, তাতে দ্বীনেরও কোন ফায়দা হবে না, মুসলমানদেরও নয়। তবে নিজেকে ধ্বংস করলে দ্বীনের যদি কোন কল্যাণ সাধিত হয়, তাহলে তা অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার ব্যাপার, আল্লাহ্ এই কারণে নবী সাহাবীগণের প্রশংসা করেছেন। বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَ لَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ
يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ -

আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন এই বলে যে, তাদের জন্যে জান্নাত রাখা হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, তাতে তারা হত্যা করে, নিহতও হয়।

বলেছেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَتِ اللّٰهِ -

লোকদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে নিজেকে সম্পূর্ণ বিক্রয় করে দেয় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে।

এর দৃষ্টান্তে আরও বহু আয়াত রয়েছে, তাতে আল্লাহ্ প্রশংসা করেছেন সেসব লোকের, যারা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র জন্যে ক্ষয় করেছে।

এই প্রেক্ষিতে 'আমর বিল মারুফ' ও 'নিহী আনিল মুনকার' সংক্রান্ত হুকুমটা বাস্তবায়িত হবে যদি তাতে দ্বীনের কোনরূপ ফায়দার আশা থাকে। তাতে তার জান-প্রাণ ক্ষয় করবে। এমনকি শেষ পর্যন্ত নিহত হবে। তারা হবে শহীদদের উচ্চতর মর্যাদায় অভিষিক্ত।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ - اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ -

এবং ভালো কাজের আদেশ কর, মন্দ কাজ করতে নিষেধ কর এবং যেসব বিপদ তোমার উপর আসবে, তা সহ্য করে নাও। মনে রেখো, এ অত্যন্ত উচ্চ সাহসিকতা ও দৃঢ় সংকল্পবদ্ধতার ব্যাপার।

ইকরামা ইবনে আব্বাস সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, সর্বোচ্চ মর্যাদার শহীদ হচ্ছে হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব এবং সেই ব্যক্তি, যে অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে সত্য কথা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন।

আবূ সাঈদ খুদরী নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ -

অত্যাচারী শাসকের নিকট সত্যকথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, আবদুল্লাহ্ ইবনুল জাররাহ্, আবদুল্লাহ, ইবনে ইয়াযীদ, মূসা ইবনে আলী ইবনে রিবাহ্, তাঁর পিতা আবদুল আযীয ইবনে মারওয়ান সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী করীম (স) বলেছিলেন, (আমি শুনছিলাম) ঃ

شَرُّ مَا فِيْ الرَّجُلِ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ -

মানুষের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ জিনিস হচ্ছে ধৈর্য-সহ্যহীন অতৃপ্ত লোভ ও লালসা এবং কর্মহীন ভীরুতা, সাহসহীনতা।

ভীরুতা, কাপুরুষতার এই নিন্দা বীরত্ব-সাহসিকতা ও অগ্রসরতার প্রশংসার উদ্ভাবক। তবে যদ্দারা দীন-ইসলামের কল্যাণ সাধিত হয়, তা। তাতে ধ্বংস নিশ্চিত হলেও কোন দোষ নেই।

بسم الله الرحمن الرحيم

## উমরা ফরয, না নফল

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ -

এবং আল্লাহ্র জন্যে হজ্জ ও উমরা সম্পূর্ণ কর।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আগের দিনের মনীষিগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। হযরত আলী, উমর (রা), সাঈদ ইবনে যুবায়র ও তায়ূস থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা বলেছেন, হজ্জ ও উমরা সম্পূর্ণ করার অর্থ, সে দুটির জন্যে ইহরাম বাঁধা হবে তোমার পরিবারের ছোট্ট ঘর থেকে। মুজাহিদ বলেছেন, সে দুটিকে সম্পূর্ণ করার অর্থ সে দুটিকে শেষ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়া তা শুরু করার পর। সাঈদুবনে যুবায়র ও আতা বলেছেন, সে দুটি শেষ পর্যন্ত কায়েম রাখা আল্লাহ্র জন্যে। কেননা এ দুটি ওয়াজিব। মনে হচ্ছে, তাঁরা বুঝেছেন, এ দুটি করা ওয়াজি। কেননা করার আদেশ করা হয়েছে। ঠিক যেন বলেছেন, তোমরা হজ্জ কর, উমরা কর।

ইবনে উমর (রা) ও তায়ূস থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা দুজনে বলেছেন, এ দুটি সম্পূর্ণ করার অর্থ দুটিকে আলাদা-আলাদা করে আদায় করা। কাতাদাতা বলেছেন, উমরা সম্পূর্ণ করার অর্থ, হজ্জের মাসসমূহ ছাড়া অন্যান্য মাসে তা করা। আর 'উমরা আল্লাহ্র জন্যে'— এর ব্যাখ্যা আল-কামা থেকে বর্ণিত হয়েছে, বলেছেন, তা করতে গিয়ে আল্লাহ্র ঘর অতিক্রম করে যাবে না।

উমরা ওয়াজিব কিনা— এ বিষয়ে আগেরকালের ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), ইবরাহীম নখঈ, শবী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা বলেছেন, উমরা নফল। মুজাহিদ উপরোক্ত আয়াত ঃ 'তোমরা হজ্জ ও উমরা সম্পূর্ণ কর' পর্যায়ে বলেছেন, এ আয়াতে ওদুটি করার আদেশ আমাদেরকে করা হয়নি। হযরত আয়েশা, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর (রা), আল-হাসান ও ইবনে সিরীন বলেছেন, তা ওয়াজিব। মুজাহিদ থেকেও এইরূপ মত বর্ণিত হয়েছে। তায়ূস— তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, উমরা ওয়াজিব। যাঁরা উমরা ওয়াজিব বলেছেন, তাঁরা 'তোমরা হজ্জ ও উমরা সম্পূর্ণ কর' আয়াত-এর বাহ্যিক অর্থকেই দলীল হিসেবে ধরেছেন। তাঁরা বলেছেন, ব্যবহৃত শব্দ এই তাৎপর্য বহন করে যে, সে দুটি করতে শুরু করার পর তা অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে। আর এ দুটি কাজ শুরু করার আদেশও তাতে রয়েছে। অতএব কোন দলীল ছাড়া তা থেকে শুধু একটি কথা গ্রহণ করা যায় না।

আবূ বকর বলেছেন, হজ্জ ও উমরা দুটিই ওয়াজিব বা ফরয, এমন কোন দলীল আয়াতটিতে নেই। কেননা আয়াতের তাৎপর্যে বড়জোর এটাই বলা যায় যে, সে দুটি সম্পূর্ণ করারই আদেশ

করা হয়েছে। আর তার অর্থ হচ্ছে, সে দুটির অসম্পূর্ণতা প্রতিরোধ করা, যখন তুমি তা করবে। কেননা সম্পূর্ণতার বিপরীত কথা হচ্ছে অসম্পূর্ণতা। সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যাওয়া নয়। যা অসম্পূর্ণ তাকেই বলা হয় এটা সম্পূর্ণ নয়। কিন্তু তা থেকে যখন কিছুই পাওয়া যায় না, তখন তা বলাও হয় না। বোঝা গেল, সম্পূর্ণ করার আদেশের দাবি হচ্ছে অসম্পূর্ণ না রাখার নির্দেশ। এজন্যেই হযরত আলী ও উমর (রা) বলেছেন, ওদুটিকে সম্পূর্ণ করার অর্থ হচ্ছে, ওদুটির উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধা হবে নিজের ঘর থেকে অর্থাৎ নুকসান বা অসম্পূর্ণতা সম্পূর্ণ করার পূর্ণ মাত্রার ব্যবস্থা হচ্ছে, তার জন্যে নিজের ঘর থেকেই ইহরাম বেঁধে রওয়ানা হওয়া। যা বললাম, তা-ই যখন আসল কথা, তখন মূল কথাটির তাৎপর্য হবে— ওদুটি কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলে রাখবে না। কিন্তু তা ওয়াজিব প্রমাণ করে না। কেননা এই কথা নফল ইবাদত সম্পর্কেও বলা চলে। এই জন্যেই বলা হয়, নফল হজ্জ ও নফল উমরা অসম্পূর্ণ অবস্থায় শেষ করবে না। নফল নামাযও অসম্পূর্ণ করা যাবে না। সম্পূর্ণ করার এই আদেশ মূলত অসম্পূর্ণ না রাখার আদেশ। তাই এ আদেশ থেকে তা ওয়াজিব— ফরয প্রমাণিত হয় না।

উক্ত কথার সত্যতা যথার্থভাবে প্রমাণিত একথা থেকেও যে, নফল উমরা ও নফল হজ্জ অসম্পূর্ণ অবস্থায় শেষ করতে নিষেধ করা হয়েছে এ আয়াতটিতে। মূলতই সে দুটি ওয়াজিব বা ফরয— সে কথা এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় না। আয়াতের শব্দ اَتِمُّو اتمام অর্থ হচ্ছে, কাজ শুরু করার পর তাকে সম্পূর্ণ করা।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّ الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ -

এবং খাও, পান কর যতক্ষণ না তোমাদের জন্যে ফজরকালের কালো রেখা থেকে শুভ্র শ্বেত রেখা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। অতঃপর তোমরা সিয়ামকে রাত পর্যন্ত সম্পূর্ণ কর।

এ আয়াতেও تمام। শব্দের ব্যবহার হয়েছে কাজ শুরু করার পর তা সম্পূর্ণ করার নির্দেশসহ।

ওদুটি কাজ শুরু করার পর তা সম্পূর্ণ করা ওয়াজিব— এই কথা বোঝান-ই তার বক্তব্য। কেননা নফল হজ্জ ও উমরা শুরু করার পর তা সম্পূর্ণ করাই কর্তব্য। যেন বলা হয়েছে ঃ ওদুটি শুরু করার পর তা সম্পূর্ণ করবে। তাই যে আয়াতের অর্থ হচ্ছে কাজ শুরু করার পর তা সম্পূর্ণ করা, তার অর্থ, সে কাজ শুরু করার নির্দেশ হতে পারে না। কেননা তাতে একটি আয়াতের দুই পরস্পর বিপরীত অর্থ করা। যে কথাটি কাজ শুরু করার আদেশ হিসেবে বলা হয়েছে, সেই কথাটির অর্থ তা শুরু করার পূর্বেই করা কর্তব্য— একথা বলা যায় না। তা বললে তা শুরু করার আদেশের পরিপন্থী হয়ে যাবে। যেমন, একথা বলা যায় যে, ইসলামের হজ্জ তা শুরু করলে পর বাধ্যতামূলক হয়। তেমনি একথাও বলা যায় না যে, যুহরের নামায শুরু করলে পর ফরযও বাধ্যতামূলক হয়। কাজেই হজ্জ ও উমরা শুরু করার পর তা বাধ্যতামূলক হয়— এ কথাও বলা সনবে না। তা শুরু করার পূর্বেই তা ওয়াজিব। অতএব যা বললাম, তা থেকে বোঝা গেল যে, উমরা শুরু করার পূর্বেই তা করা ওয়াজিব বা ফরয। তা যে ওয়াজিব— ফরয নয়, তা একটি হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয়। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْعُمْرَةُ هِيَ الْحَجُّ الْاَصْغَرُ -

উমরা হচ্ছে ছোট হজ্জ।

আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ও মুজাহিদ বলেছেন ঃ 'উমরা, সে তো ছোট হজ্জ'। প্রমাণিত হলো যে, 'হজ্জ' শব্দ উমরাকেও শামিল করে। এর পর-ও একটি হাদীস প্রমাণিত হয়েছে। হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর— আবূ দাউদ— যহির ইবনে হরব ও উসমান ইবনে আবূ শায়বা— ইয়াযিদ ইবনে হারুন, সুফিয়ান ইবনে হুসায়ন, জুহ্‌রী, আবূ সিনান ওয়ালী, ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আকরা ইবনে হাবিস নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, বললেন, হে রাসূল!

اَلْحَجُّ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ اَوْمَرَّةً وَّاحِدَةً -

হজ্জ কি প্রত্যেক বছর করতে হবে, না মাত্র একবার ?

জবাবে বললেন, না, বরং মাত্র একবার। তার বেশী যদি কেউ করে, তবে তা নফল হবে। নবী করীম (স) প্রথমোদ্ধৃত হাদীসে উমরাকে 'হজ্জ' বলেছেন। আর আকরাকে বলেছেন ঃ হজ্জ মাত্র একবার। বেশী করলে তা নফল হবে। এই কথা উমরার ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে। কেননা তাকে তো 'হজ্জ' নামকরণ করা হয়েছে। আরও হাদীস তার প্রমাণ। হাদীসটি আবদুল বাকী ইবনে কানে'— ইয়াকুব ইবনে ইউসূফ আল-মুতাওয়াঈ— আবূ আবদুর রহমান, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)— আবদুর রহমান ইবনে সুলায়মান, হাজ্জাজ ইবনে আরতাত, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (স)-কে নামায ও হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাস করল, তা কি ফরয ? বললেন, হ্যাঁ। পরে উমরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, তা কি ফরয (বা ওয়াজিব) ? বললেন, না, তবে তুমি যদি উমরা কর, তাহলে তোমার জন্যেই ভাল। উবাদ ইবনে কাসীর, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির থেকে হাজ্জাজ বর্ণিত হাদীসের মতই একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আমাদের নিকট আবদুল বাকী ইবনে কানে— বশর ইবনে মূসা— ইবনুল ইসফাহানী— শরীক জরীর ও আবুল আহওয়াস, মুয়াবিআতা ইবনে ইসহাক, আবু সালিহ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ -

হজ্জ হচ্ছে জিহাদ। আর উমরা হচ্ছে নফল— ইচ্ছামূলক।

এই মতের আর একটি দলীল হচ্ছে জাফর ইবনে মুহাম্মাদ তার পিতা জাবির (রা) বর্ণিত হাদীস। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ اِلَى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ -

উমরা কিয়ামত পর্যন্তকার জন্যে হজ্জের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে।

তার অর্থ, হজ্জ উমরার বিকল্প। কেননা উমরায় করণীয় যাবতীয় কাজ হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে শামিল রয়েছে। বরং তার চাইতে বেশীও আছে। কাজেই একথা বলা যায় না যে, তার ওয়াজিব হওয়াটা হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার মত।

জাবির বর্ণিত হাদীসও তাই প্রমাণ করে। তিনি তাঁর সাহাবীগণকে আদেশ করেছেন, যখন তাঁরা হজ্জের জন্যে ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন যে, তাঁরা যেন উমরা করে ইহরাম ভাঙ্গেন। আর

সুরাকা ইবনে মালিক বলেছেন ঃ 'আমাদের এই উমরা কি আমাদের এই বছরের জন্যে না চিরদিনের জন্যে ? তিনি বলেছিলেন, না, চিরদিনের জন্যে। একথা জানা-ই আছে যে, এটা ছিল উমরার আমল। তা করে হজ্জের ইহরাম ভাঙ্গা হয়েছিল। যেমন হজ্জ করতে না পারলে উমরা করেই ইহরাম ভাঙ্গা হয়ে থাকে। যারা উমরাকে ফরয মনে করেন, তাঁরা একাজ দ্বারা উমরা করা হয়ে যায় বলে মনে করেন না। এ থেকে বোঝা গেল যে, উমরা ফরয নয়। কেননা তা যদি ফরয হতো তাহলে নিশ্চয়ই বলতেন না যে, তোমাদের এই উমরা চিরকালের জন্যে। এ পর্যায়ে আরও খবর রয়েছে যে, এ ছাড়া তাঁদের উপর আর কোন উমরা ধার্য ছিল না।

যা করে হজ্জের ইহরাম ভঙ্গ করা হয় তা যে উমরা নয়, তার আর একটি দলীল হচ্ছে, যারা হজ্জ করতে পারেনি তারা যদি ইহরাম অবস্থায় পড়ে থাকত, পরে হারাম মাসসমূহে উমরা করে তা ভাঙ্গত এবং এই অবস্থায় পরবর্তী বছরের হজ্জ করত, তাহলে তার 'হজ্জ তামাত্তু' হতো না। এ পর্যায়ে চিন্তা করা হয় যে, ফরযসমূহ তো সময়ের সাথে নির্দিষ্ট, যেই সময়ই তা ফরয হয়। যেমন নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ। উমরাও যদি ফরয হতো, তাহলে তার জন্যে একটা সময় অবশ্যই নির্দিষ্ট করে দেয়া হতো। যখন তার জন্যে কোন সময় নির্দিষ্ট নেই, সময় নির্বিশেষেই তা করা যায়, যখনই করার ইচ্ছা হয়। তখন তা নফল নামায-রোযার সমতুল্য হয়ে গেল।

যদি বলা হয়, নফল হজ্জ তো সময়ের সাথে নির্দিষ্ট; কিন্তু তাই বলে তাতে তা ফরয বলে প্রমাণ হয় না।

জবাবে বলা যাবে— না, তা ফরয হয়ে যায় না। কেননা আমরা বলেছি, কোন কাজের ফরয হওয়ার শর্ত হচ্ছে, তা কোন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট ও বিশেষীকৃত হবে। তাই যা সময়ের সাথে বিশেষীকৃত নয়, তা ফরযও নয়। কিন্তু তাতে কোন কোন নফল কাজের কোন সময়ের সাথে বিশেষীকৃত হতে বাধা হয় না, তা নিষিদ্ধও হয় না। আর কোন কোনটির নির্দিষ্ট সময় ছাড়াই হওয়া অসম্ভব নয়। তাই যে যে কাজ সময়ের সাথে নির্দিষ্ট ও বাঁধা নয়, তা সবই নফল। আর যা সময়ের সাথে বাধা তার কিছুটা ফরয আর কিছুটা নফল। এই পর্যায়ের দলীল হিসেবে একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসটি আমাদের নিকট আবদুর বাকী ইবনে কানে— ইসমাঈল ইবনুল ফযল— হিশাম ইবনে আম্মার আল-হাসান ইবনে ইয়াহইয়া আল-হাসানী— উমর ইবনে কায়স— তালহা ইবনে মূসা, তাঁর চাচা ইসহাক ইবনে তালহা, তালহা ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি নবী করীম (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ হজ্জ হচ্ছে জিহাদ আর উমরা নফল। আবদুল বাকী— আহমাদ ইবনে বহতর আল-আতার— মুহাম্মাদ ইবনে বকর— মুহাম্মদ ইবনুল ফযল ইবনে আতীয়াতা, সালিমুল আফতাস, সাঈদ ইবনে যুবায়র, ইবনে আব্বাস সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ হজ্জ হচ্ছে জিহাদ, উমরা নফল। যাঁরা উমরাকে ফরয মনে করেন, তাঁদের একটি দলীল হচ্ছে ইবনে লেহইয়াতা বর্ণিত হাদীস। তা আতা জাবির সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

اَلْحَجُّ الْعُمْرَةُ فَرِيْضَتَانِ وَاجِبَتَانِ -

হজ্জ ও উমর— দুটি ফরয ও ওয়াজিব ইবাদত।

আরও একটি বর্ণনা এসেছে। আল-হাসান সামুরাতা থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَاٰتُوا الزَّكَاةَ وَحُجُّوْا وَاعْتَمِرُوْا وَاسْتَقِيْمُوا يَسْتَقِمْ لَكُمْ -

তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও, হজ্জ কর, উমরা কর আর সুদৃঢ় থাক। তা হলে তোমাদের জন্যে তা সুদৃঢ় হবে।

এ হাদীসে অন্যান্য কয়েকটি ফরয কাজ করার আদেশের সঙ্গে মিলিয়ে উমরা করতেও আদেশ করা হয়েছে। আর রাসূলের আদেশ তো ওয়াজিব হয়ে যায়। রাসূলে করীম (স) থেকে আরও একটি বর্ণনা এসেছে। তাঁকে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি নামায ইত্যাদির উল্লেখ করে পরে বলেন ঃ

وَاَنْ تَحُجَّ وَتَعْتَمِرَ -

এবং হজ্জ করা ও উমরা করাও ইসলামের বিধান।

সবী ইবনে মা'বাদ-এর কথা ঃ 'আমি হজ্জ ও উমরাকে ফরযই পেয়েছি।' কথাটি তিনি হযরত উমর (রা)-কে বলেছিলেন। কিন্তু উমর (রা) তার প্রতিবাদ করেন নি। তাকে বলেছেন, এ দুটি একসাথে কর। বনু আমের গোত্রের এক ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস হচ্ছে, তিনি নবী করীম (স)-কে বলেছিলেন, 'হে রাসূল! আমার পিতা বড় বুড়ো মানুষ। হজ্জ ও উমরা করতে সক্ষম নন। উষ্ট্রযানেও সফর করতে অপারগ। তখন নবী করীম (স) বলেছিলেন ঃ

اَحْجُجْ عَنْ اَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ-

তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ কর, উমরা কর।

জাবির বর্ণিত যে হাদীসটি ইবনে লেহ্ইয়াতা সূত্রে উমরা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে এসেছে, তা অত্যন্ত দুর্বল, খুব বেশী ভুলে ভরা। বলা হয়, তাঁর লিখিত জিনিস জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। পরে শুধু স্মরণ শক্তির উপর নির্ভরশীল হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর স্মরণ শক্তিও ছিল খুবই খারাপ। পূর্বোদ্ধৃত জাবির বর্ণিত যে হাদীসে তা ওয়াজিব নয় বলা হয়েছে, তার সনদ উত্তম ইবনে লেহ্ইয়াতা বর্ণিত হাদীসের সনদ অপেক্ষা। যদি সনদের দিক দিয়ে দুটি হাদীসকে সমান ধরা হয়, তাহলে বড়জোর, দুটির মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে বলা যায়। ফলে দুটিই প্রত্যাহার যোগ্য। পরে অবশিষ্ট থেকে যায় তালহা ও ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণিত হাদীস। এ দুটির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কোন প্রশ্নকারী যদি বলেন, হাজ্জাজ, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির, জাবির সূত্রে বর্ণিত যে হাদীসে ওয়াজিব নয় বলা হয়েছে, সেটি ইবনে লেহইয়া, আতা, জাবির সূত্রে উমরা ওয়াজিব হওয়া পর্যায়ে বর্ণিত হাদীসের বিরোধী নয়। কেননা হাজ্জাজের হাদীসে আসল কথা বলা হয়েছে। আর ইবনে লেহইয়া বর্ণিত হাদীস তা থেকেই নকল করা। আর যখন দুটি হাদীস এমন হবে যে, একটি নিষেধকারী— না সূচক আর অপরটি প্রমাণকারী— হ্যাঁ সূচক তখন প্রমাণকারী হাদীস-ই উত্তম ও অগ্রাধিকার লাভকারী হবে। অনুরূপভাবে একটি হাদীস যদি ওয়াজিব প্রমাণকারী হয় এবং অপরটি ওয়াজিব নয় প্রমাণকারী হয়, তাহলেও প্রথমটিই টিকবে, দ্বিতীয়টি নয়। কেননা যা ওয়াজিব, তার অর্থ, তা তরক করা নিষিদ্ধ। আর যা ওয়াজিব প্রমাণকারী নয়, তা নিষিদ্ধ নয়। আর নিষিদ্ধের খবর মুবাহকারীর খবরের তুলনায় উত্তম।

এর জওয়াবে বলা যাবে, তা এ কারণে ওয়াজিব হবে না যে, ইবনে লেহইয়া বর্ণিত উমরা ওয়াজিব প্রমাণকারী হাদীস যদি প্রমাণিত হতো, তাহলে তা নফল হিসেবে প্রচারিত হতো তা সাধারণ্যের প্রয়োজন বলে। আর হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার কথা যারা জানে, তারা সকলেই তা

জেনে নিত। কেননা তা হজ্জের মতই ওয়াজিব। যাকে হজ্জ করতে বলা হয়েছে, তাকে উমরা করতেও বলা হয়েছে। যার অবস্থা এইরূপ, তার 'খবরে ওয়াহিদ' হিসেবে বর্ণিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তাছাড়া তার সনদেও দুর্বলতা রয়েছে। বিশেষভাবে তার বিপরীত হাদীসও রয়েছে। উপরন্তু একথা তো জানা আছে যে, দুটি হাদীসই একই ব্যক্তি থেকে এসেছে। তাই ওয়াজিব হওয়ার হাদীস যদি তার নিষেধকারী হাদীসের পরবর্তীতে হয়ে থাকে, তাহলে জাবির (রা) তা তাঁর বর্ণনায় অবশ্যই বলে দিতেন। বলতেন, নবী করীম (স) উমরাকে পূর্বে নফল বলেছিলেন। কিন্তু পরে বলেছেন, তা ওয়াজিব। কেননা তিনি দুটি হাদীস-ই জানেন এবং কোন্‌টি কবে বলেছেন, তা-ও তাঁর জানা আছে। এমতাবস্থায় তিনি তারিখের উল্লেখ না করে কখনও তা নফল বলবেন আর কখনও বলবেন ওয়াজিব— এমনটা হতে পারে না। এ থেকে বোঝা গেল যে, এই দুটি হাদীস পরস্পর বিরোধী হিসেবেই এসেছে। এমতাবস্থায় প্রমাণকারী ও নিষেধকারী হাদীসদ্বয় এভাবে বিবেচিত হবে যে, দুটি বর্ণনা দুই দৃষ্টিকোণে বর্ণিত হয়েছে। সামুরাতা বর্ণিত হাদীসে فَاعْتَمِرُوْا 'তোমরা উমরা কর" কথাটি মুস্তাহাব হিসেবে বলা হয়েছে। পূর্বে একথার দলীলসমূহ আমরা উল্লেখ করেছি। আর ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসার জবাবে যা বলেছেন, তাতে নামায ও অন্যান্য কাজের উল্লেখের পর বলা হয়েছে ঃ তোমরা হজ্জ করবে, উমরা করবে। এ-ও নফল হিসেবে। আর নফল কাজও তো ইসলামেরই কাজ। আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভার্থে যা-ই করা হবে, তা তো ইসলামী শরীয়াতের অন্তর্ভুক্ত। একটি হাদীসে তো বলা হয়েছে— ইসলামের প্রায় সত্তরটি চারিত্রিক কাজ আছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করা।

সবি ইবনে মা'বাদ যে হযরত উমর (রা)-কে বলেছেন, হজ্জ ও উমরাকে আমি ফরয হিসেবেই পেয়েছি এবং তিনি তা শুনে চুপ রয়েছেন, কোন প্রতিবাদ করেন নি, তার কারণ এই যে, তিনি বলেছিলেন, এ দুটি আমার উপর ফরয, সব মানুষের ফরয তাতো বলেন নি। তাই তার বাহ্যিক অর্থের দাবি এই হতে পারে যে, সে দুটির হয়ত মানত ছিল তাঁর। ফলে সে দুটি ব্যক্তিগতভাবে তার জন্যে ফরয ছিল, তা-ও এই মানতের কারণে। উপরন্তু তিনি হয়ত আয়াতের ব্যাখ্যাস্বরূপই কথাটি বলেছিলেন। তাতে সেই ব্যাখ্যার সুযোগ আছে। ফলে হযরত উমর (রা) তার প্রতিবাদ করেন নি। কেননা তার জন্যে সেই অর্থ হওয়ারই সম্ভাবনা আছে। এটা ঠিক এই রকম, যেন একজন নিজস্বভাবে বলল যে, উমরা (আমার উপর) ওয়াজিব। তাই তার প্রতিবাদ করার কিছু থাকে না। কেননা ইজতিহাদ করে এই কথা বলা খুবই সঙ্গত। কিন্তু নবী করীম (স) এক ব্যক্তির পিতার হজ্জ ও উমরা করা সংক্রান্তে প্রশ্নের জবাবে বললেন, তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও উমরা কর, তাতে কিন্তু সে দুটির ওয়াজিব ফরয হওয়া প্রমাণিত হয় না। কেননা এই কথাটিই কোন কাজ ওয়াজিব করার ধরনে বলা হয়নি। কেননা পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করা মূলতই পুত্রের কর্তব্য নয়। উমরা করাও নয়। উমরা ওয়াজিব— একথা প্রমাণের জন্যে কেউ কেউ দলীল হিসেবে আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ (الحج) 'এবং তোমরা ভালো ভালো কাজ কর'-এর উল্লেখ করেছেন। কেননা এই কথাটি দ্বারা বাহ্যত সমস্ত ভালো ও সওয়াবের কাজ করাই ফরয হয়ে যায়। একথা কয়েকটি কারণে অগ্রাহ্য হওয়ার যোগ্য।

একটি হচ্ছে, উমরা ওয়াজিব ও ভালো— একথা প্রমাণ করা প্রথম প্রয়োজন। কেননা যে লোক ওয়াজিব মনে করে না, তার পক্ষে সেটিকে ওয়াজিব মনে করে করা জায়েয নয়। সেই

বিশ্বাস নিয়ে তা করলে তা নিশ্চয়ই ভালো কাজ মনে করা যাবে না। যেমন কেউ নফল নামায পড়ে মনে করল, এটা ফরয। দ্বিতীয়ত, 'তোমরা ভালো কাজ কর' কথাটি অস্পষ্ট। কোন কাজকে ওয়াজিব করতে হলে এরূপ অস্পষ্ট কথা বলা বাঞ্ছনীয় হয় না। কেননা এর মধ্যে নামায, যাকাত ও রোযা— এসব কাজও গণ্য হয়ে পড়ে। অথচ এসব কয়টি কাজই সামষ্টিকভাবে ফরয। আর যা অস্পষ্ট শব্দে বলা হবে, তার হুকুমটা নির্দিষ্ট করার জন্যে আর একটা দলীল দরকার হয়। আর তৃতীয় কারণ এই যে, اَلْخَيْرُ আলিফ ও লাম মিলিয়ে যে শব্দটি, তা জাতীয় পর্যায়ের অর্থবোধক। তার اِسْتِغْرَاق সম্ভব নয়। ফলে তাতে একটা সাধারণ কাজও শামিল হয়ে যায়। যেমন কেউ যদি বলে شَرِبْتُ الْمَاءَ 'আমি পানি পান করেছি' وَتَزَوَّجْتُ النِّسَاءَ 'আর মেয়েলোক বিয়ে করেছি'— এই রকমের কথা হয়ে যায়। কাজেই একটা খুবই নগণ্য জিনিসও শামিল হয়ে গেলে শব্দের তাৎপর্য তাতেই রক্ষিত হয়ে যায়। উপরন্তু আমরা জানি যে, যে শব্দ কিছু জিনিস শামিল করে এবং তাতেই শব্দের দাবি পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে তাতে সমগ্রকে আয়ত্ত করা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ফলে আল্লাহ্র কথাটি 'তোমরা কতক ভালো কাজ কর' অর্থের ধারক হয়ে যায়। কাজেই আদেশটার বাধ্যতামূলক হওয়ার জন্যে একটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

উমরা ওয়াজিব মনে করেন, এমন কেউ কেউ বলেছেন, আমরা এমন কোন নফল কাজ পাই না, যার মূলটা ফরয নয়। তাই উমরা যদি নফল হয়ে, তাহলে তার মূলটা ফরয হতে হবে। তাহলে বলতে হবে যে, উমরা হচ্ছে তওয়াফ ও সাঈ'। আর তার মূল ফরয রয়েছে।

যদি বলা হয়, তওয়াফ ও সাঈ' উমরা ছাড়া অন্য কোথাও স্বতন্ত্রভাবে ফরয পাওয়া যায় না। তা ফরযের অধীন অবশ্য পাওয়া যায়।

জবাবে বলা হবে, কাবা ঘরের শুধু তওয়াফ করাও নফল ইবাদত। যদিও স্বতন্ত্রভাবে তার মূল ফরযে নেই। উমরাও নফল হিসেবে করা যাবে যখন তওয়াফ ও সাঈ' করা হবে। যদিও তার মূল ফরযে নেই। ইমাম শাফেয়ী দলীল পেশ করে বলেছেন, হজ্জ ও উমরা যখন একসাথে করা যায়, তখন বোঝা গেল যে, উমরা ফরয। কেননা যদি তা নফল হতো তাহলে তার সংক্রান্ত কাজ হজ্জের সঙ্গে একসাথে করা কখনই জায়েয হতে পারত না। যেমন দুই নামায একসাথে পড়া যায় না যার একটা ফরয আর অন্যটা নফল। তা চার রাক'আত ফরযের সাথে একত্রিত করা যায় না।

আবূ বকর বলেছেন, এই গোটা বিতর্কটাই অর্থহীন। তাতে উমরা ওয়াজিব হওয়ার কথাটি বাতিল হয়ে যায়। কেননা বলা যাবে, এ দুটি যখন একত্রিত করে করা যায়, অথচ দুটি ফরয নামাযে করা যায় না, তা থেকে প্রমাণিত হল যে, তা ফরয নয়। চার রাক'আতের মধ্যে জমা করার যে কথা বলা হয়েছে, তাতে চার রাক'আতই একটি নামায। যেমন একটি হজ্জে তার সমস্ত রুকন শামিল রয়েছে। যেমন একটি তওয়াফ, তাতে সাতবারের তওয়াফ শামিল রয়েছে। তা সত্ত্বেও তা তার মূলের উপর বিমণ্ডিত। কেননা যদি প্রথমে উমরা করা হয়, তারপরে ফরয হজ্জ করা হয়, আর এ দুটি মিলিয়ে উমরা, তাহলে উমরা নফল হয়ে যাবে, আর হজ্জ ফরয হিসেবে আদায় হবে। এতে করে ফরয ও নফল একসাথে করা সহীহ হলো এই হজ্জ ও উমরায়। এতে সে দলীল চূর্ণ হয়ে গেল, যা হজ্জকে ওয়াজিব হিসেবে জমা করা জায়েয প্রমাণের জন্যে পেশ করা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী এই দলীলও দিয়েছেন যে, উমরার জন্যেও

যেমন হজ্জের মতই মীকাত রক্ষা করতে হয়, তাতে বোঝা যায় যে, উমরাও ফরয। তখন বলা যাবে, কেউ যখন ফরয উমরা সম্পন্ন করল, পরে সে তার বাড়িতে ফিরে গেল, পরে আবার উমরার জন্যে ফিরে এলো। তখন তার 'মীকাত' হজ্জের মতই পালনীয় হবে। অথচ তা নফল। অতএব মীকাত রক্ষার শর্ত উমরাকে ওয়াজিব বা ফরয প্রমাণ করে না। নফল হজ্জেও 'মীকাত' রক্ষা করতে হয় ফরয হজ্জের মতই। তাই বলে নফল হজ্জ তো আর ফরয হজ্জ হয়ে যাবে না। তিনি 'কারেন' হজ্জকারীর পক্ষে জন্তু যবেহ্ করা ওয়াজিব বলেছেন। কিন্তু তার ভিত্তিতে উমরাকে ওয়াজিব প্রমাণ করতে চান নি। তবে দলীল-প্রমাণ ছাড়া-ই একটা দাবি করেছেন। তা সত্ত্বেও তা ক্ষুণ্ন ও চূর্ণ। কেননা কেউ যদি ফরয হজ্জ ও নফল উমরাকে পর পর 'কারেন' করে, তাহলে তাকেও জন্তু যবেহ্ করতে হয়। অনুরূপভাবে এ দুটিকে একত্রে নফল হিসেবে করা হলে তবে জন্তু যবেহ্ করতে হবে।

আল্লাহ্র কথা

فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ -

যদি তোমরা (হজ্জ যাত্রীরা) পথে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়, তাহলে যে কুরবানী সহজভাবে করা সম্ভব তাই করবে।

কাসাঈ, আবূ উবায়দাতা ও অধিক সংখ্যক ভাষাভাষী বলেছেন ঃ الاحصار। অর্থ, নিষিদ্ধ রোগের দরুন কিংবা খরচের সম্বল নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। আর حصر হচ্ছে শত্রুর আবরোধ। বলা হয় أحصرهُ المرض— রোগ তাকে আটকে দিয়েছে। وحصرهُ العدوّ — 'শত্রু তাকে অবরুদ্ধ করেছে।' ফরা'র মত হচ্ছে, এ দুটির প্রত্যেকটি কথা অপরটির স্থানে বলা যেতে পারে। কিন্তু আবুল আব্বাস আল-মুবাররদ ও হজ্জাজ তা অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করেছেন। তারা দুজন বলেছেন, অর্থের দিক দিয়ে এ দুটি ভিন্ন ভিন্ন ও পরস্পর বিপরীত। রোগের ক্ষেত্রে حصرهُ বলা যাবে না, শত্রুর ক্ষেত্রেও أحصرهُ বলা যাবে না। তারা দুজন বলেছেন, এটি লোকদের এই কথার মতই যে, কাউকে আটক করা হলে বলা হয় حبسهُ এবং أحبسهُ যখন তাকে আটকের জন্যে পেশ করা হয়। قتلهُ তার উপর হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে। আর أقتلهُ অর্থ, তাকে হত্যার জন্যে পেশ করা হয়েছে। قبرهُ অর্থ, তাকে করবে দাফন করা হয়েছে। আর أقبرهُ অর্থ, তাকে কবরে দাফন করার জন্যে পেশ করা হয়েছে। حصرهُ -এর অর্থও অনুরূপ, তাকে আটক করা হয়েছে। তার উপর আটক কার্য ঘটানো হয়েছে। আর أحصرهُ অর্থ, তাকে অবরুদ্ধ করার জন্যে পেশ করা হয়েছে। ইবনে আবূ নুজাইহ আতা ইবনে আব্বাস সূত্রে বলেছেন ঃ لا حصر إلا حصر العدوّ— শত্রুর অবরোধই আসল অবরোধ, আর আল্লাহ যাকে আটক করেছেন কোন ভাঙ্গচুর বা রোগ দ্বারা, তাকে "حصر" বলা যায় না। ইবনে আব্বাস জানিয়েছেন যে, الحصر। শব্দটি বিশেষভাবে শত্রুর কর্মরূপে ব্যবহৃত হয়। রোগকে الحصر। বলা যায় না। এই কথা— যেমন আমরা বলেছি— ভাষাবিদদের অনুকূল কথা নয়। এমন লোক আছে, যারা ধারণা করে যে, এ থেকে বোঝা যায় যে, রোগীর পক্ষে হালাল বা মুক্ত হওয়া জায়েয নয়। সে محصر পরিবেষ্টিত হয়েছে, তা-ও বলা যাবে না। লোকেরা যা ধারণা করেছে, তার পক্ষের কোন প্রমাণ তাতে নেই। কেননা তাতে নামের অর্থ বলা হয়েছে। কিন্তু তার যে হুকুম সে বিষয়ে কোন খবর দেয়া

হয়নি। অতএব জেনে রাখ, احصار শব্দটি রোগ পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়। আর حصر ব্যবহৃত হয় শত্রু পরিবেষ্টনের অর্থ বোঝাবার জন্যে। পরিবেষ্টিত হজ্জ যাত্রীদের সম্পর্কে আগেরকালের মনীষীদের তিন পর্যায়ের কথা রয়েছে। ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, শত্রু ও রোগ— দুটিই সমান। জন্তু যবেহ্ করবে এবং ইহ্‌রামে যখন জন্তু যবেহ্ করা হবে, তখন ইহ্‌রাম শেষ হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফর, সওরী তাই বলেছেন। আর দ্বিতীয়, ইবনে উমরের কথা, রোগী হালাল হবে না, পরিবেষ্টিত হবে কেবল শত্রু দ্বারা। মালিক, লাইস ও শাফেয়ীরও এই কথা। আর তৃতীয়— ইবনুয যুবায়র, উরওয়াতা ইবনুয যুবায়র-এর কথা হল, রোগ ও শত্রু দুটিই সমান। তওয়াফ না করা পর্যন্ত হালাল হবে না। কিন্তু বিভিন্ন দেশের ফিকাহ্‌বিদগণের মতের কোন আনুকূল্য তাদের আছে বলে আমরা জানি না।

আবূ বকর বলেছেন, আভিধানিকদের উপরোদ্ধৃত কথার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, احصار নামটি বিশেষভাবে রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ -

যদি তোমরা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়, তাহলে যে কুরবানীই সহজ হয়, তাই করবে।

বুঝতে হবে— শব্দটি তার আসল অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আর তা হচ্ছে রোগ। আর তাৎপর্যগতভাবে শত্রু এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

যদি বলা হয়, ফরা' থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি উভয় ক্ষেত্রে احصار শব্দটির ব্যবহার সঙ্গত বলে মনে করেন।

জবাবে বলা হবে, তা সঠিক হলেও আয়াতটি থেকে তা রোগের ক্ষেত্রেও প্রয়োগীয় প্রমাণিত হওয়া স্থির থাকবে। কেননা তা রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হওয়াটা প্রতিরুদ্ধ বা নিষিদ্ধ হয়নি। শত্রুর ক্ষেত্রে ব্যবহারের তিনি অনুমতি আছে বলে জানিয়েছেন। শব্দটির ব্যবহার উভয় ক্ষেত্রে সঙ্গত হলে সে দুটির ব্যাপারে তা সাধারণ অর্থবোধক হবে। রোগী ও শত্রু পরিবেষ্টিত উভয়ই বোঝা যাবে।

যদি বলা হয়, উক্ত আয়াতটি যে হুদায়বিয়ার সন্ধিকালীন অবস্থায় নাযিল হয়েছিল— এ বিষয়ে হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। নবী করীম (স) ও তাঁর আসহাবগণ মক্কা যেতে শত্রুগণ কর্তৃক বাধাগ্রস্ত হয়েছিলেন। তখন আল্লাহ্ এ আয়াতটি নাযিল করে এখানেই ইহ্‌রাম খুলে ফেলতে আদেশ করেছিলেন। বোঝা গেল, আয়াতটির প্রয়োগ শুধু শত্রু পরিবেষ্টিত হওয়ার ব্যাপারেই হবে।

জবাবে বলা যাবে, শত্রুর পরিবেষ্টনই হচ্ছে আয়াতটির নাযিল হওয়ার কারণ। পরে الحصر। উল্লেখ থেকে ফিরিয়ে বিশেষভাবে রোগ দ্বারা পরিবেষ্টন হওয়ার জন্যে নির্দিষ্ট হয়েছে। বোঝা গেল, রোগের হুকুমে ফায়দা দেয়ার উদ্দেশ্য গ্রহণ করা হয়েছে। যেন শব্দটি তার বাহ্যিক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। নবী করীম (স) তাঁর আসহাবগণকে যখন ইহ্‌রাম ভাঙ্গতে বললেন এবং নিজেও ভাঙ্গলেন, তখন বোঝা গেল যে, তাৎপর্যগতভাবে তা শত্রুপরিবেষ্টন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, শব্দের দিক দিয়ে নয়। ফলে আয়াতটি থেকে উভয় ক্ষেত্রেই পথ-নির্দেশ পাওয়া গেল।

আল্লাহ যদি কেবলমাত্র শত্রু পরিবেষ্টনই বুঝতে চাইতেন, রোগ দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ার কথা আদৌ থাকত না, তাহলে তিনি বিশেষভাবে সেজন্যে নির্দিষ্ট শব্দই ব্যবহার করতেন, অন্যটা করতেন না। তা সত্ত্বেও শব্দের অর্থ যদি সেই দুটিই হয়, তা হলে তার নাযিল হওয়ার কারণ তার হুকুমকে এককভাবে একটা ক্ষেত্রে ব্যবহার হতো না। বরং কারণ ছাড়াই সাধারণ অর্থবোধকতাই গণ্য হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। হাদীস দ্বারা এই কথাটি বোঝা যায়, হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, মুসাদ্দদ ইয়াহ্ইয়া, হাজ্জাজ আস-সওয়াফ, ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবূ কাসীর, ইকরামা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ আমি হাজ্জাজ ইবনে আমর আল-আনসারীকে বলতে শুনেছি, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ مَنْ كُسِرَ اَوْعَرِجَ فَقَدْ حَلَّ যে ভাঙ্গচুর হল কিংবা উর্ধ্বে চড়াই হল, সে হালাল হয়ে গেল, পরবর্তী বছর হজ্জ আদায় করা তার কর্তব্য।

ইকরামা বললেন, আমি ইবনে আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা দুজনই বললেন, সত্য কথা। 'সে হালাল হয়েছে' কথাটির অর্থ, তার জন্যে হালাল হওয়া— ইহ্রাম খুলে ফেলা— জায়েয। যেমন বলা হয় حَلَّتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِ 'স্ত্রীলোকটি স্বামীর জন্যে হালাল হল' অর্থাৎ স্বামীর পক্ষে তাকে বিয়ে করা হালাল হল।

যদি বলা হয়, হাম্মাদ ও ইবনে যায়দ আইয়ুব, ইকরামা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'যে লোক পথে পরিবেষ্টিত হবে, সে তার কুরবানীর জন্তু পাঠিয়ে দেবে। সে জন্তু যখন তার যবেহ হওয়ার স্থানে পৌঁছে যাবে, তখন সে ইহরাম খুলে ফেলবে। আর পরবর্তী বছর তার হজ্জ করা কর্তব্য হবে।' আল্লাহ 'কিসাস' তাঁর বান্দাদের নিকট থেকে গ্রহণ করতে রাজী হয়েছে। আর শত্রু পক্ষ তাকে এক হজ্জের স্থলে আর একটি হজ্জ ও একটি ইহরামের পরিবর্তে আর একটি ইহরাম বাঁধতে বাধ্য করল। এই কথা যিনি বলেছেন, তাঁর ধারণা হল, ইকরামা যদি এই হাদীসটি জানতেন, তা হলে তিনি কুরবানীর জন্তু পাঠিয়ে দেয়ার কথা বলতেন না। বলতেন, ইহরাম ভেঙ্গে ফেলতে। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে।

এই মতের লোক মস্ত ভুল করেছেন, যখন حَلَّ কথা পড়ে ধারণা করেছেন যে, শুধু পরিবেষ্টিত হওয়ায়ই হালাল হওয়া সম্পাদিত হয়ে যাবে শুধুমাত্র পরিবেষ্টনের ফলে। কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়। তার অর্থ শুধু এতটুকু যে, তার পক্ষে হালাল হয়ে যাওয়া সঙ্গত হবে। যেমন পূর্বে দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটি বোঝাতে চেষ্টা করেছি। একটু বিবেচনা করলেই বোঝা যাবে, শত্রু পরিবেষ্টিত হওয়ার কারণে হালাল হওয়া জায়েয, কেননা আল্লাহ্র ঘর পর্যন্ত তার পৌঁছা সম্ভবপর হচ্ছে না। যাঁরা আমাদের বিরোধী মত পোষণ করেন, তাঁরাও এ ব্যাপারে একমত যে, স্বামী যদি স্ত্রীকে নফল হজ্জ করতে যেতে নিষেধ করে ইহরাম বাঁধার পর, তা হলে তখনই তার 'হালাল' হওয়া— ইহরাম খুলে ফেলা জায়েয। সে যেন পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে। যদিও শত্রুর দ্বারা নয় (স্বামীর দ্বারা)। অনুরূপভাবে যদি ঋণের কারণে বন্দী হয়, কিংবা অন্য কোন কারণে, ফলে কাবা ঘর পর্যন্ত তার পৌঁছা সম্ভব না হয়, সে-ও 'পরিবেষ্টিত' গণ্য হবে। রোগী সম্পর্কেও এই কথা। এ থেকে এও বোঝা যায় যে, যত ফরয কাজ শত্রু বা রোগের দরুন বাধাগ্রস্ত হওয়ার কারণে করতে পারবে না, সে সবের হুকুম বিভিন্ন নয়। ভয়গ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে ইশারা-ইঙ্গিতে নামায পড়া, বসে নামায পড়া দাঁড়াতে অক্ষম হলে— সম্পূর্ণ জায়েয। রোগীর জন্যেও তা জায়েয। অনুরূপভাবে রোগের কারণে কাবা ঘর পর্যন্ত পৌঁছা অসম্ভব হলে তার হুকুম

ভিন্নতর কিছু নয়। তা শত্রুর ভয়েও হতে পারে, কিবলামুখী হওয়ার ব্যাপারটিরও সেই রকম। ভয়প্রাপ্ত বা রোগী হলে তার জন্যেও তাই করা জায়েয। পানি পাওয়া না গেলে কিংবা রোগের কারণে পানি ব্যবহার করতে না পারলে তার পক্ষে তায়াম্মুম করা জায়েয। জিহাদের জন্যে প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ না পেলে জিহাদ থেকে বিরত থাকা অথবা রোগী হলে ফরয আদায়ের দায়িত্ব থেকে সে মুক্ত হবে। ইহরাম বাঁধার পর হজ্জ করতে যেতে না পারলেও তা-ই হুকুম। তার হালাল হয়ে যাওয়া জায়েয। এসব ক্ষেত্রেই মূল কারণ হচ্ছে, কাজটা করতে না পারা।

যদি বলা হয়, আল্লাহ যখন বলেছেন, 'তোমরা পরিবেষ্টিত হলে কুরবানীর সহজ পন্থা গ্রহণীয়।' তারপরই বলেছেন ঃ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْبِهٖ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ -

তোমাদের মধ্যে কেউ রোগী হলে কিংবা তার মাথায় কষ্টদায়ক কিছু হলে তাকে রোযা বা সাদ্কা 'ফিদিয়া' (বিনিময়) দিতে হবে।

কথাটি দুটি দিক দিয়ে একথা বোঝায় যে, احصار শব্দের ব্যবহার করে এখানে রোগীর কথা বলা উদ্দেশ্য নয়। কেননা সম্বোধনের শুরুতেই যখন রোগীর কথা আছে, তখন আবার নতুন করে সেই রোগীর কথা বলার কোন অর্থ হয় না। আর দ্বিতীয় কারণ, তা-ই যদি বক্তব্য হতো, তাহলে তদ্দরুন জন্তু যবেহ করা জরুরী হতো, 'ফিদিয়া' দেয়ার প্রয়োজন দেখা দিত না।

জবাবে বলা যাবে, আল্লাহ যখন বলেছেন ঃ

وَلَاتَحْلِقُوْا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ -

তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করবে না কুরবানীর জন্তুর তার যবেহর স্থলে পৌছার পূর্বে।

এখানে احصار পরিবেষ্টন সত্ত্বেও হালাল হতে নিষেধ করা হয়েছে যবেহর জন্তুর তার যথাস্থানে পৌছার পূর্বে। অর্থাৎ হারাম এলাকায় তা যবেহ করা। এতে যবেহর জন্তুর তার যথার্থ স্থানে পৌছার পূর্বে রোগীর হুকুম কার্যকর করতে নিষেধ করেছে। তার জন্যে মাথা মুণ্ডন জায়েয কারেছে, সেই সাথে ফিদিয়া ওয়াজিব করা হয়েছে। আরও একটি কারণ আছে। সব রোগ-ই তো আর রোগীকে কাবা পর্যন্ত পৌছতে বাধা দেয় না। নবী করীম (স) কাব ইবনে উজরাতাকে বলেছিলেন, তোমার মাথার তন্দ্রাচ্ছন্নতা ও জড়তাই কি তোমাকে কষ্ট দেয় ? বললেন, হ্যাঁ, তখন আল্লাহ্ আয়াতটি নাযিল করলেন। কিন্তু তার মাথার তন্দ্রাচ্ছন্নতা ও জড়তা কাবা ঘর পর্যন্ত পৌছতে তাকে বাধা দিচ্ছিল না। তখন আল্লাহ্ তাকে মাথা মুণ্ডনের ও ফিদিয়া দানের অনুমতি ও আদেশ দিলেন। আয়াতে উল্লিখিত রোগের ব্যাপারটিও তাই। তার রোগ হয়ত احصار করেনি। তা সত্ত্বেও রোগকে 'প্রতিবন্ধক' বানিয়েছেন। কেননা তদ্দরুন কাবা পর্যন্ত তাকে পৌছতে দিচ্ছিল না। ফলে আয়াতে রোগের উল্লেখ এভাবে নেই যে, তার কারণে احصار হবে। আর অপর একটি কারণ হল আল্লাহ্র কথা ঃ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضً 'তোমাদের মধ্যে যে লোক রোগী হবে' কথাটি সম্বোধনের শুরু পর্যায়ে গণ্য হতে পারে। যেমন احصار সংক্রান্ত হুকুম সেই দিকে ফিরে এসেছে। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্র কথা ঃ 'এবং তোমরা আল্লাহ্র জন্যে হজ্জ ও উমরা সম্পূর্ণ কর।' এর সাথে যোগ করেই বলেছেন ঃ তোমরা যদি পরিবেষ্টিত হয়ে

পড়' পরিবেষ্টিত হওয়ার পর লোকেরা কি করবে তা বলে দেয়া হল। এর পর-পরই বললেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে যে রোগী হবে'। অর্থাৎ হজ্জ ও উমরা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়া হে লোকেরা ....... এতে احصار-এর পূর্বে যারা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে, তাদের কথাও বলে দেয়া হল। যেমন احصار। অবস্থায় করণীয় বলে দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে 'তোমাদের মধ্যে যে রোগী হবে' কথাটিতে এমন প্রমাণ নেই যদ্দারা বোঝা যেতে পারে, রোগ احصار। এর কারণ হতে পারে না।

যদি বলা হয়, আয়াতের ধারাবাহিকথায় যখন বলা হল ঃ

فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ -

পরে তোমরা নিরাপত্তা পেয়ে গেলে যে লোক উমরা থেকে হজ্জ পর্যন্ত তামাত্তু করবে ...।

বোঝা গেল, উক্ত আয়াতে শত্রু কর্তৃক ভীত ব্যক্তির কথাই বলা হয়েছে। কেননা নিরাপত্তার বিপরীত তো 'ভয়'ই হতে পারে।

জবাবে বলা যাবে, ভীতকারী রোগের ক্ষতি থেকে নিরাপত্তা লাভের কথা বলা হয়েছে মনে করার পথে বাধা কোথায়? সেটা কেবল শত্রু কর্তৃকই হয়, এমন কথা মনে করছ কি কারণে? তা রোগের কারণেও তো হতে পারে। ভয় ও নিরাময়তা বা নিরাপত্তা দুটোই তাতে হতে পারে। উরওয়াতা ইবনুয যুবায়র থেকে فَاِذَا اَمِنْتُمْ আয়াতাংশের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, তার অর্থ, যখন তুমি নিরাপদে এসে যাবে তোমার ভাঙ্গচুর থেকে, তোমার ব্যথা থেকে, তখন তোমার আল্লাহ্‌র ঘরে পৌঁছা কর্তব্য।

যদি বলা হয়, শত্রু ও রোগের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে শত্রু কর্তৃক পরিবেষ্টিত ব্যক্তি সম্মুখের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর না হলেও পেছনে ফিরে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব। কিন্তু রোগী উভয় দিকেই অপারগ।

জবাবে বলা যাবে, এই কারণেই পরিবেষ্টন ও যেতে অক্ষমতায় দুটি জিনিসকেই কারণ ধরা বাঞ্ছনীয়। পিছনে ফিরে যাওয়া যার পক্ষে সম্ভব, রোগী সেদিক দিয়ে অধিক অক্ষম— ভয়ের কারণে সামনে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়লে। এ-ও বলা যেতে পারে যে, শত্রু কর্তৃক পরিবেষ্টিত হলে যে পরিবেষ্টন হয়, তার পক্ষে যদি পিছনে যাওয়াও সম্ভব না হয়, না সামনে যাওয়া, তখন কি ইহরাম খুলে ফেলা জায়েয হবে না ফিকাহবিদদের কোনরূপ মতদ্বৈধতা ছাড়াই? দুটির মধ্যে পার্থক্য করার মূল 'ইল্লাত' বা কারণটাই তো চূর্ণ হয়ে গেল। তা সত্ত্বেও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যে স্ত্রী ইহরাম বেঁধেছে, তখন তার স্বামী হজ্জে যেতে নিষেধ করেছে, আর যে বন্দী হয়েছে, এ দুজন অভিন্নভাবেই পরিবেষ্টিত। এ দুজনের পক্ষেই হালাল হওয়া জায়েয। সম্মুখে অগ্রসর হওয়া ও পিছনে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে তারা দুজনই সমান। কেননা তারা দুজন-ই হজ্জে যেতে নিষেধপ্রাপ্ত দুটি কারণে। ইমাম শাফেয়ী ধারণা করেছেন, রোগী ও ভয়প্রাপ্ত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। আল্লাহ যুদ্ধে ভয় প্রাপ্তের জন্যে একটি বাহিনীর নিটক আশ্রয় গ্রহণকে জায়েয করেছেন। তখন সে ভয় থেকে রেহাই পেয়ে শান্তি ও নিরাপত্তার দিকে আসবে। অনুরূপভাবে রোগীর পক্ষে জিহাদ তরক করা মূলতই জায়েয।

বলেছেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ - (التوبه ٩١)

দুর্বল ও রোগাক্রান্ত লোক— আর যারা জিহাদে শরীক হওয়ার প্রয়োজনীয় সম্বল পায় না, তারা পিছনে থেকে গেলে কোন দোষ হবে না।

এ আয়াত অনুযায়ী রোগীকে প্রশস্ততর রুখসত দেয়া হয়েছে ভীতীর জন্যে দেয়া রুখসতের তুলনায়। কেননা ভীত ব্যক্তিকে যুদ্ধে শরীক হওয়া রুখসত দেয়ার মতো কোন ওযর গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কিন্তু রোগী মাযুররূপে গণ্য। ভীত ব্যক্তির ওযর হলে সে কোন বাহিনীর বেষ্টনীতে আশ্রয় নিতে পারে; কিন্তু যুদ্ধে শরীক হওয়া থেকে মৌলিকভাবে তাকে রেহাই দেয়া যেতে পারে না। তাই রোগী ব্যক্তি হালাল হওয়ার ব্যাপারে ওযর অধিক গ্রহণীয়।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আল্লাহ্ যখন বলেছেন ঃ 'তোমরা হজ্জ ও উমরা আল্লাহ্র জন্যে সম্পূর্ণ কর'। পরে বলেছেন, ভীত পরিবেষ্টিত ব্যক্তির সম্পর্কে যা বলার তা। তাই হজ্জ ও উমরা সম্পূর্ণ করার ফরয দূর হতে পারে কেবল ভীত ব্যক্তির থেকে। তখন তাকেও বলা হবে যা বলা হয়েছে 'হজ্জ ও উমরা আল্লাহ্র জন্যে পূর্ণ কর'। এইখানেই বলা হয়েছে ঃ 'যদি তোমরা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়।' এই কথাটি ভীত ও অ-ভীত— সবারই জন্যে সাধারণভাবে বলা। অতএব কোন দলীল ছাড়া এই দায়িত্ব থেকে কেউ নিষ্কৃতি পেতে পারে না। কিন্তু কেবল ভীত ব্যক্তির জন্যে তা বিশেষীকরণ ও অন্যকে তা থেকে বাদ দেয়ার কি দলীল থাকতে পারে? স্ত্রী ইহরাম বাধলে ও স্বামী তাকে হজ্জে যেতে নিষেধ করলে তার জন্যে হালাল হওয়া জায়েয বলার সব দলীল চূর্ণ হয়ে গেল। সে তো ভীতও নয়। বন্দী ব্যক্তিও সেই রকম, সে হত্যার ভয় করে না। আল-মুজানী বলেছেন, শত্রুর কারণে ভয় পাওয়া ব্যক্তির জন্যে ইহরাম খোলার অনুমতি একটা রুখসত। সেটা অপর কোন জিনিস সদৃশ নয়। যেমন দুপায়ের মোজার উপর তা ধোয়ার পরিবর্তে 'মসেহ' করার অনুমতি একটি বিশেষ ব্যাপার। দুই দাস্তানার সাথে তার কোন সাদৃশ্য নেই। তাহলে তাকে বলা যাবে যে, তা যদি রুখসত হয়ে থাকে, তাহলে অন্যান্য রুখসতের উপর তা 'কিয়াস' করা সমীচীন হবে না। নবী করীম (স) যখন প্রস্তর খণ্ড দ্বারা 'ইস্তিনজা' জায়েয হওয়ার রুখসত দিয়েছেন, তখন টুকরা কাপড় ও বাঁশ-কাঠ দ্বারা ইস্তিনজা করাকে তার উপর 'কিয়াস' করা ও তাকেও জায়েয বলা সঠিক হতে পারে না। কষ্টদায়ক রোগের দরুন মাথা মুণ্ডন করা যখন রুখসত, তাকে শরীরের অন্য কোথাও কষ্টদায়ক রোগের সাথে তার সাদৃশ্য খোঁজ করা ঠিক হবে না, বলা যাবে না যে, তার দরুনও মাথা মুণ্ডন ও ফিদিয়া দেয়া মুবাহ। বন্দী ভীত ব্যক্তির সাথে তার সাদৃশ্য হওয়াও জরুরী নয়। ইহরাম বেধে হজ্জে যেতে প্রস্তুত স্ত্রীকে স্বামী নিষেধ করলে তার সাথেও সাদৃশ্য হতে পারে না। আরও যে যে জিনিসের আমরা উল্লেখ করেছি, তাকে 'কারণ' বানানোও যুক্তিহীন।

আবূ বকর বলেছেন, হজ্জ ও উমরা— উভয় ক্ষেত্রেই احصار। অভিন্ন। মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন-এর মত হচ্ছে, احصار। কেবল হজ্জের ক্ষেত্রেই গণ্য হবে, উমরার ক্ষেত্রে নয়। কেননা উমরা তো কোন বিশেষ সময়ের জন্যে নির্দিষ্ট নয়, কোন একটা সময় হতেই হবে— অন্য সময় হবে না— এমন তো নয়। তা যে-কোন সময় করা যেতে পারে। তা হারানোর কোন ভয় নেই। মুতাওয়াতির হাদীস বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) হুদায়বিয়ার বছর উমরার ইহরাম বাধা ছিলেন। তিনি তওয়াফ করা ছাড়াই সে ইহরাম খুলে ফেলেছিলেন। যদিও পরবর্তী বছর যিলক্বদ মাসে তার 'কাযা' করেছিলেন। তার নামকরণ হয়েছিল 'উমরাতুল কাযা'।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ -

তোমরা আল্লাহ্‌র জন্যে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর।

তারপরে বলেছেন ঃ 'যদি তোমরা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়, তাহলে যবেহ্ জন্তু যা-ই সহজলভ্য, তা যবেহ্ কর।

এই নির্দেশ হজ্জ ও উমরা দুটি ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কেবল একটির ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করা অন্যটিকে বাদ দিয়ে জায়েয হতে পারে না। কেননা তা হলে কোন শব্দকে দলীল ছাড়াই বিশেষীকরণ করা হবে। আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যে জন্তু সহজলভ্য হবে— এ বিষয়ে আবূ বকর বলেছেন, আগেরকালের ফিকাহবিদগণ নানা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। হযরত আয়েশা ও ইবনে উমর (রা) দুজনই বলেছেন, এই জন্তু কেবল উট ও গরু হতে পারে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, ছাগলও হতে পারে। বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত দিয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, জুফর, মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন ঃ কুরবানীর জন্তু তিন প্রকারের; উট, গুরু ও ছাগল। ইবনে শাবরামাতাও এই কথাই বলেছেন। ইবনে শাবরামাতা আরও বলেছেন, البدن বলা হয় এক ধরনের উটকে বিশেষভাবে। হানাফী মাযহাবের আলিম ও শাফেয়ী বলেছেন, উট ও গরু। বয়সের ব্যাপারে বিভিন্ন মত। হানাফী মাযহাবের আলিম ও শাফেয়ী বলেছেন, উট, গরু ও ছাগলের দুই বা ততোধিক বছর কম বয়সের কোন জন্তু দিয়ে কুরবানী হয় না। যুবক বয়সের ছাগলও হতে পারে। মালিক বলেছেন, দুই বা ততোধিক বছরের কম বয়সের জন্তু দিয়ে কুরবানী জায়েয হবে না। আওজায়ী বলেছেন, পুরুষ উটও কুরবানী করা যেতে পারে। উট ও গরু যুবক বয়সের হতে হবে। এর প্রত্যেকটি সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানী করা যাতে পারে।

আবূ বকর বলেছেন, الهدى কুরআনে ব্যবহৃত শব্দ। তার অর্থ এমন জন্তু, যা আল্লাহ্‌র ঘরের দিকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কুরবানী করার জন্যে পাঠানো হয়, সেই জন্তু। সেটিকে সাদকাও বলা যায়, তা সাদকা করার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয় বলে, যদিও সেটিকে আল্লাহ্‌র ঘরের দিকে পাঠানো হবে না। নবী করীম (স) বলেছেন, জুমআর নামাযে যে লোক সকাল সকাল যাবে, সে যেন একটি উট কুরবানীর করল। তার পরে যে যাবে সে যেন একটি গরু যবেহ করল। তার পরে যে যাবে সে যেন একটি ছাগল যবেহ্ করল। তার পরে যে যাবে সে যেন একটি মুরগী যবেহ্ করল। তারপরে যে যাবে সে যেন একটি ডিম দিল। এ হাদীসে ডিম ও মুরগীকে কুরবানীর প্রাণী গণ্য করা হয়েছে, যদিও তা ঠিক আল্লাহ্‌র ঘর পর্যন্ত পৌছানোর ইচ্ছা করেনি। তা সাদ্‌কা করার কিংবা তদ্দারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের ইচ্ছা করল। এই কারণে হানাফী ফিকাহবিদরা বলেছেন, যদি কেউ বলে, আল্লাহ্‌র জন্যে আমার উপর কর্তব্য হচ্ছে, আমার এই কাপড় দিয়ে দেয়া কিংবা এই ঘর দান করা, তার কর্তব্য হবে তা সাদ্‌কা করে দেয়া। ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, উট, গরু ও ছাগল— এই তিন প্রকারের জন্তু ছাড়া অন্য কিছু কুরবানী হতে পারে না। فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ বলে কুরআনে এই জন্তুগুলির কথাই বলা হয়েছে। অবশ্য এ ব্যাপারে যে মতপার্থক্য আছে, তার উল্লেখ ইতিপূর্বে আমরা করেছি। আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে ছাগলও এর মধ্যে গণ্য। কেননা ছাগলকে 'হাদয়িয়ে' বলা হয়। هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ 'কাবায় পৌছে যাওয়া জন্তু'-এর অর্থে কোন মতপার্থক্য

নেই যে, ছাগল এর মধ্যে গণ্য। হজ্জের ইহ্‌রাম বাধার পর শিকার করার বিকল্প হিসেবে তা কুরবানী করা যেতে পারে। ইবরাহীম আসওয়াদ আয়েশা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) একবার ছাগল কুরবানী করেছেন। আমাশ আবূ সুফিয়ান জাবির সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স)-এর কুরবানীর মধ্যে গলায় দড়ি বাঁধা ছাগলও ছিল।

যদি বলা হয়, ছাগল কুরবানী করার ব্যাপারে হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা সহীহ্‌ নয়। কেননা কাসিম তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ছাগলকে فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ এর মধ্যে গণ্য মনে করেন না।

জবাবে বলা যাবে, তার অর্থ হচ্ছে, ছাগল পাঠালে তার কারণে ইহ্‌রামকারী হবে না। উট ও গরুর কুরবানী পাঠালে ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে, যখন তার নিয়ত করা হবে ও জন্তু সেই উদ্দেশ্যে বাঁধা হবে। দুই বছরের ব্যাপারটি পর্যায়ে নবী করীম (স) থেকে আবূ বুরদাতা ইবনে নায়ার-এর কিস্‌সায় বর্ণিত হয়েছে, যখন সে ঈদের নামাযের পূর্বেই কুরবানী করল, তখন নবী করীম (স) তাকে আবার কুরবানী করার আদেশ দিলেন। তখন তিনি বললেন, আমার নিকট ছাগলের চাইতেও ভালো উন্নতমানের 'ছাগল' (معز) আছে, তার গোশ্‌তও ভালো। তখন নবী করীম (স) বললেন, তা তোমার একার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে। তোমার পর অন্য কারোর পক্ষ থেকে তা যথেষ্ট হবে না। এতে ছাগল কুরবানী করতে নিষেধ হয়েছে বলা যায়। কেননা এ দুটির মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। যদিও الجدع - ضان থেকে— করতে অনুমতি দিয়েছেন। কেননা নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে الجدع من الضان। কুরবানী করার অনুমতি দিয়েছেন যদি সেটি এক বছর ছাড়িয়ে আরও কয়েক মাস হবে বয়সের দিক দিয়ে। شرح المختص গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ফরয বা ওয়াজিব কুরবানীর জন্তুতে শরীক হওয়ার জায়েয হওয়া সম্পর্কে ফিকাহ্‌বিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণ ও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, উট ও গরু-গাভী সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানী করা জায়েয। ইমাম মালিক বলেছেন তা নফল কুরবানীতে জায়েয, ওয়াজিব কুরবানীতে নয়। জাবির নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি হুদায়বিয়ার দিন উট ও গরু সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছেন। তা ছিল ওয়াজিব। কেননা তা احصار-এর কারণে দেয়া হয়েছিল। নতুবা নফল বা ওয়াজিব কুরবানীতে সাতজনের পক্ষ থেকে দেয়ার ব্যাপারে একমত হতেন না। কেননা তাঁরা সকল দিক দিয়েই তা জায়েয মনে করেন, তাতে কোন মতপার্থক্য নেই। আল্লাহ্‌র কথা فما استيسر من الهدى -এর বাহ্যিক অর্থে তা-ই মনে হয়। অতএব কোন কোন জন্তু যে সেভাবে কুরবানী করা জায়েয হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

## প্রতিরুদ্ধ— পরিবেষ্টিত হাজী কোথায় কুরবানী করবে

আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ -

এবং তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করবে না, যতক্ষণ না কুরবানীর জন্তু তার নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে যাবে।

এ আয়াতে বলা محله তার নির্দিষ্ট স্থান কোনটি সে বিষয়ে আগের কালের মনীষিগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস (রা), আতা, তায়ূস মুজাহিদ, আল-হাসান, ইবনে সিরীন প্রমুখ বলেছে, সে স্থানটি হারাম। হানাফী ফিকাহবিদগণ ও সওরী এই কথাকেই স্বীকার করেছেন। ইমাম মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন, সে স্থান সেইখানেই যেখানে তারা পরিবেষ্টিত— প্রতিরুদ্ধ হয়েছে। সেখানেই তারা জন্তু যবেহ করে ইহরাম খুলে ফেলবে। প্রথমোক্ত কথাটির পক্ষের দলীল হচ্ছে, 'মহল' দুইটি জিনিসের নাম। হয় তার অর্থ সময় কিংবা হতে পারে, তার অর্থ স্থান। আরবী ভাষায় محل الدين বলা হয়। তার অর্থ, যে সময় ঋণ ফেরত চাওয়া হবে সেই সময়। নবী করীম (স) সাবাগাতা বিনতেজ যুবায়রকে বলেছিলেন, 'তুমি হজ্জে শর্ত কর বলে, আমার 'মহল' (স্থান) হচ্ছে যেখানে আমাকে আটক করা হয়েছে।' এতে একটি স্থান বোঝানো হয়েছে মহল বলে। যখন এ শব্দটি দুটি জিনিস বোঝায়, আর উমরায় احصار-এর জন্তু সকলের নিকট নিশ্চিত ও নির্দিষ্ট নয়, আর তা-ই আয়াতের বক্তব্য— তার অর্থ স্থান হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বোঝা গেল, হালাল হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিরুদ্ধ হওয়ার স্থান ছাড়া অন্য স্থানে কুরবানীর জন্তু না পৌঁছে যাবে। কেননা প্রতিরুদ্ধ হওয়ার স্থানই যদি তার জন্যে নির্দিষ্ট 'মহল' হয়, তা হলে احصار হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে জন্তুর তা 'মহল'-এ পৌঁছে গেছে মনে করতে হয়। কিন্তু আয়াতে বলা চূড়ান্ত লক্ষ্য স্থানে পৌঁছার কথাটি বাতিল হয়ে যায়। তাই বুঝতে হবে যে, এ 'মহল' বলতে 'হারাম' বুঝিয়েছে। কেননা احصار-এর স্থানটিই যদি তার মহল না হয়ে থাকে, তা হলে 'হারাম'ই তার 'মহল' বোঝাতে হবে। পরিবেষ্টিত প্রতিরুদ্ধ হওয়ার স্থানটিকেই 'মহল' মনে করলে আয়াতের ফায়দাটাই বাতিল হয়ে যায়। তার তাৎপর্যও প্রত্যাহৃত হয়।

وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ........ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ -

তোমাদের জন্যে গৃহপালিত জন্তু হালাল করা হয়েছে, তবে যা তোমাদের সম্মুখে তিলাওয়াত করা হয় .... তোমাদের জন্যে তাতে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বহু ফায়দা আছে। পরে তার 'মহল' হচ্ছে কাবার দিকে। (সূরা হজ্জ ঃ ৩০ ও ৩৩)

'মহল' সম্পর্কে আমাদের কথার দলীল উপরোদ্ধৃত আয়াতে রয়েছে। তা দুটি দিক দিয়ে। একটি— সকল প্রকার কুরবানীর জন্তুর ক্ষেত্রেই তা নির্বিশেষ। আর দ্বিতীয়— তাতে 'মহল'-এর অর্থ বলা হয়েছে, যদিও তা পূর্বের কথা 'حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ' 'যতক্ষণ না কুরবানীর জন্তু তার মহল-এ পৌঁছে যায় ...'এর মধ্যে অস্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল। আল্লাহ্ নিজেই যখন মহল নির্দিষ্ট করেছেন কাবা ঘর, তখন অন্য কোন স্থান 'মহল' রূপ নির্দিষ্ট করার কারোর অধিকার থাকতে পারে না। শিকার করার গুনাহের প্রতিকার স্বরূপ বলা হয়েছে ঃ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ 'কাবায় পৌঁছে যাওয়া কুরবানীর জন্তু'— এই কথাটিও তা সমর্থন করে। এসব আয়াতে কুরবানীর জন্তুর পরিচিতি স্বরূপ বলা হয়েছে, তা কাবায় পৌঁছে যাবে। তাই যে জন্তু কাবায় পৌঁছেনি, তা জায়েয হবে না। জিহার ও হত্যার দণ্ড হিসেবে বলা হয়েছে ঃ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ পর পর দুই মাস রোযা থাকা। এতে দুট মাস পর পর হওয়ার শর্ত করা

হয়েছে। তা এভাবেই আদায় করতে হবে, অন্যথায় জায়েয হবে না। এমনিভাবে আল্লাহ্র কথা ঃ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ 'মুমিন ক্রীতদাস মুক্ত করতে হবে।' এই শর্ত সম্পন্ন ক্রীতদাস ছাড়া অন্য কিছু করলে জায়েয হবে না। আমাদের হানাফী ফিকাহবিদগণ সকল প্রকারের কুরবানীর ব্যাপারেই এই কথা বলেছেন, যা যবেহ করা হবে, তা হারাম ছাড়া অন্য কোথাও যবেহ করা হলে তা জায়েয হবে না। احصار -এর উল্লেখের পর কথার ধারাবাহিকতায় যা বলা হয়েছে, তা থেকেও তাই প্রমাণিত হয়। তা হচ্ছে ঃ 'তোমাদের মধ্যে যে রোগী হবে অথবা যার মাথায় কষ্টের কারণ থাকবে, সে সিয়াম বা সাদ্কা বা কুরবানী দেবে ফিদিয়া স্বরূপ।

এতে পরিবেষ্টিত হাজীকে জন্তু যবেহ করতে বলা হয়েছে। এবং কুরবানীর জন্তু যবেহ না করা পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই তার যবেহ যদি হালাল অবস্থায় মাথার কষ্টের লোকের পক্ষে احصار -এর কারণে জায়েয হয়, আর তা করে হালাল হয়ে যায়, কষ্টের ফিদিয়া দেয়া থেকে বেঁচে যায়, তাহলে তা থেকে বোঝা যাবে যে, হালাল হওয়ার স্থানটা কুরবানীর জন্তু যবেহ করার স্থান নয়।

যদি বলা হয়, এই কথা প্রযোজ্য কেবল তার ক্ষেত্রে, যে احصار -এর জন্তু যবেহ করার জন্যে পায় না।

জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, এটা সঙ্গত যে, তার সম্বোধনটা হবে তার ব্যাপারে, যে যবেহর জন্তু পায় না। কেননা তাকে তো রোযা রাখা, সাদকা দেয়া বা কুরবানী করা— এর যে কোন একটি করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। এ তিনটির যে কোন একটি করার ইখতিয়ার দেয়া তখনই তাৎপর্যবহ হতে পারে, যদি সে সেটা পেতে পারে। কেননা যেটা পাওয়া যায় আর যেটা পাওয়া যায় না, এর মধ্যে ইখতিয়ার দেয়ার কোন অর্থ হয় না। তাই প্রমাণিত হল যে, কুরবানীর পশুর পৌঁছার স্থান হচ্ছে হারাম। তা অন্য স্থানে পৌঁছলে কাজ হবে না। যেখানে পরিবেষ্টন হয়েছে, সেখানে যবেহ করলেও কাজ হবে না।

একটু বিবেচনা করলেই বোঝা যায়, ইহ্রাম বাধা অবস্থায় শিকার করলে তার জন্তু যবেহ করার স্থান হচ্ছে হারাম। অন্যত্র করলে দায়িত্বপূর্ণ হবে না। তাই সর্বপ্রকারের জন্তু যবেহর কাজ— যা ইহরামের কারণে ওয়াজিব হয়েছে— সেখানেই হতে হবে। এ দুটোর মধ্যে সমন্বয়কারী তাৎপর্য হচ্ছে— ইহরামের কারণে তা ওয়াজিব হওয়া।

যদি বলা হয়, আল্লাহ বলেছেন ঃ

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْىَ مَعَكُمْ فَاَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ - (الفتح : ٢٥)

ওরা তো সেই লোক, যারা কুফরী করেছে এবং তোমাদেরকে মসজিদে হারাম পর্যন্ত পৌঁছতে দেয়নি এবং কুরবানীর উটগুলোকেও কুরবানীর স্থানে পৌঁছতে বাধাগ্রস্ত করেছে ...।

এ আয়াতটি হুদায়বিয়ার ব্যাপার প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল। এতে প্রমাণ রয়েছে যে, নবী করীম (স) এবং তাঁর সাহাবীগণ হারামের বাইরেই তাঁদের কুরবানীর জন্তুগুলোকে যবেহ করেছিলেন। তা না হলে তা তার আসল স্থানেই পৌঁছে যেত।

জবাবে বলা যাবে, এ থেকে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরবানীর জন্তুর যবেহ হওয়ার স্থানই হল 'হারাম'। পরিবেষ্টিত হওয়ার স্থানই যদি তার যবেহ হওয়ার প্রকৃত স্থান হতো, তা বলা হতো না যে ঃ وَالْهَدْىَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ 'কুরবানীর জন্তুকে তার আসল স্থানে যেতে দেয়া হয়নি।' তাদেরকে যখন জানিয়ে দেয়া হল যে, তারা কুরবানীর জন্তুও তার আসল স্থানে যেতে দেবে না, তখন বোঝা গেল, যেখানে তাঁরা ইহরাম খুলেছিলেন সেটাই তার আসল স্থান ছিল না। আলোচ্য বিষয়ে এইটিই প্রথম দলীল হতে পারে।

যদি বলা হয়, নবী করীম (স) এবং তাঁর সাহাবিগণ যদি ইহরাম খোলার জন্যে জন্তুগুলো যবেহ না করতেন, তা হলে জন্তুগুলোকে তার স্থানে যেতে দেয়া হয়নি— একথা বলার কি অর্থ হতে পারে ?

জবাবে বলা যাবে, যখন প্রথমে সামান্য বাধা পাওয়া গেল, তা থেকেই বোঝা গিয়েছিল যে, তারা জন্তুগুলোকে যেতেই দেবে না। কিন্তু তার অর্থ তো এই নয় যে, এই বাধা চিরদিনই থাকবে। কেউ যদি কারোর হক দিতে অস্বীকার করে তা হলেই বলা যাবে যে, সে তার হক দিতে প্রস্তুত নয়। যেমন বলা যায়, তাকে আটক করা হয়েছে। কিন্তু তাতে সে চিরদিনই আটক থাকবে— এমন তো মনে করা যায় না। মুশরিকরা শুরুতেই যখন কুরবানীর জন্তুর হারামে পৌঁছতে বাধাগ্রস্ত করল, তখনই এ কথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, তারা তা হারামে পৌঁছতেই দেবে না। এই কথা তখন বলাও যেত। যদিও পরে তারা বাধা তুলে নিয়েছিল। আয়াতে মুশরিকদের পরিচয় স্বরূপ বলা হয়েছে যে, ওরা মুসলমানদেরকে মসজিদুল হারামে যেতে বাধা দিয়েছে। যদিও পরবর্তী বছর কুরবানীর জন্তু হারামে যেতে দিয়েছে। আল্লাহ বলেছেন ঃ

قَالُوْا يٰۤاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ -

ওরা বলল, হে আমাদের পিতা, আমাদেরকে মেপে শস্য দিতে অস্বীকার করা হয়েছে।

হ্যাঁ, একটা সময় হযরত ইউসূফের ভাইদেরকে শস্য দিতে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু তা একটা সময়ের জন্যে মাত্র। পরবর্তীতে সে নিষেধ তুলে দেয়া হয়। অনুরূপভাবে মক্কার মুশরিকরা এক সময়ে— শুরুতেই— কুরবানীর জন্তু হারামে পাঠাতে বা নিয়ে যেতে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু সন্ধি হয়ে যাওয়ার পর তা যেতে দেয়া হয় এবং হারাম এলাকায়ই তা যবেহও করা হয়। বলা হয়েছে, নবী করীম (স) পরবর্তী বছর উমরা করতে এসে কাবার তওয়াফের পরই তাঁর নিয়ে আসা জন্তু যবেহ করার জন্যে পাঠিয়ে দেন। প্রথমবারে যখন নিষেধ করেছিল, তখনকার অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহ বলেছিলেন ঃ

وَالْهَدْىَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ -

কুরবানীর জন্তু তার যবেহ স্থানে যেতে বাধাগ্রস্ত করেছিল।

তার কারণ এই যে, প্রথমবারে কুরবানীর জন্তু তার যবেহর স্থানে যেতে দেয়া হয়নি, ঠিক সেই সময়টিকে চিহ্নিত করাই ছিল এই কথার তাৎপর্য। এ-ও সম্ভব যে, এ কথার দ্বারা সেই স্থান বোঝাতে চাওয়া হয়েছে, যেখানে যবেহর জন্তু যবেহ হওয়া পছন্দনীয়। আর তা হচ্ছে 'মারওয়া' কিংবা মিনা। সেখানে যেতে না দেয়ায়ই আল্লাহ্ উক্ত কথাটি বলেছিলেন।

মিস্ওয়ার ইবনে মাখরিমা ও মারওয়ান ইবনুল হিকাম উল্লেখ করেছেন, হুদায়বিয়া বলতে যে বিস্তীর্ণ এলাকা বোঝায়, তার কিছু অংশ হারামের মধ্যে পড়েছে আর কিছু অংশ বাইরে।

রাসূলে করীম (স)-এর অবস্থান হারাম-এর বাইরে থাকলেও তাঁর নামাযের স্থান ছিল হারাম এলাকার মধ্যে। যখন হারাম এলাকায় নামায পড়া সম্ভব হচ্ছিল, তখন যবেহ্‌ও হারাম এলাকার মধ্যে করা সম্ভবপর ছিল। বর্ণিত হয়েছে, নাজিয়াতা ইবনে জুনদুব আল-আসলামী (রা) নবী করীম (স)-কে বললেন ঃ 'আপনি আমার সাথে পশুগুলো পাঠিয়ে দিন। আমি সেগুলোকে মরুভূমি ও পার্বত্য পথে নিয়ে মক্কায়ই যবেহ্ করে দেব।' তা-ই তিনি করেছিলেন। সম্ভবত সব জন্তু নয়, কিছু সংখ্যক জন্তু তাঁকে পাঠিয়েও দিয়েছিলেন। আর অবশিষ্টগুলো হুদায়বিয়ার হারাম এলাকার মধ্যেই যবেহ্ করে দেন।

## পরিবেষ্টিত কুরবানীর পশু যবেহ্ করার সময়

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ— তখন যা কিছু কুরবানী করা সহজ ও সম্ভব হয় ......। কুরবানীর পরই ইহ্‌রাম খুলে ফেলা ও হালাল হওয়া মুবাহ— এ ব্যাপারে মনীষিগণের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। উমরার জন্তু যবেহ করার কোন সময় নির্দিষ্ট নেই। যখনই এবং যে কোন সময় ইচ্ছা হবে, যবেহ করা যাবে এবং যবেহ করেই ইহ্‌রাম খুলে ফেলবে। নবী করীম (স) এবং তাঁর আসহাবগণ হুদায়বিয়ায় পরিবেষ্টিত হয়ে গিয়েছিলেন। তখন তাঁরা উমরার জন্যে ইহ্‌রাম বাধা অবস্থায় ছিলেন। তখন তাঁরা কুরবানীর জন্তু যবেহ্ করেই হালাল হয়ে গিয়েছিলেন। এ ঘটনা জিলকদ মাসের। কিন্তু হজ্জযাত্রীদের যবেহর জন্তু যদি পরিবেষ্টিত ও প্রতিরুদ্ধ হয়ে পড়ে তাহলে সে জন্তুর যবেহ করার সময়ের ব্যাপারে ফিকাহবিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা, মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন, তা যখন ইচ্ছা যবেহ করা যেতে পারে। আর কুরবানীর দিনের পূর্বেই হালাল হয়ে যেতে পারে। আবূ ইউসুফ, সওরী ও মুহাম্মাদ বলেছেন, কুরবানীর দিনের পূর্বে যবেহ করা যাবে না। কুরআনের আয়াত ঃ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ -এর বাহ্যিক অর্থের দৃষ্টিতে তা অনির্দিষ্টভাবে যে-কোন সময়ে যবেহ করা যেতে পারে। যদি কোন সময় বিশেষীকৃত করা হয়, তাহলে কুরআনের সাধারণভাবে সম্পন্ন শব্দকে বিশেষীকৃত করা হয়। কিন্তু তা কোন দলীল ছাড়া জায়েয হতে পারে না।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্‌ই যখন বলেছেন ঃ 'কুরবানীর পশু তার স্থানে পৌঁছার পূর্বে তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করবে না।' আর 'মহল' এমন নাম, যা সময় নির্দিষ্টকরণ বোঝায়। তাই তার জন্যে সময় নির্দিষ্ট হতে হবে।

জবাবে বলা যাবে, আমরা পূর্বেই বলেছি, 'মহল' একটি স্থান বোঝায়। যদিও তা সময়ের জন্যেও ব্যবহৃত হয়। সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, 'মহল' বলে স্থান বোঝানো হয়েছে। তাই পশু যখন হারামে পৌঁছে যাবে ও যবেহ্ করা হবে, তখনই তা জায়েয হবে উক্ত আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দৃষ্টিতে। এক্ষণে সময়ের শর্ত করা হলে তাতে বৃদ্ধি সৃষ্টি করা হবে। কেননা তার অধিকাংশ অবস্থাই এই হয় যে, নাম দুটিকেই একসাথে শামিল করে নেয়। তাই তা দুটির যেটি পাওয়া যাবে, সেটিতেই তা করা জায়েয হবে। কেননা যথাস্থানে জন্তুর পৌঁছে যাওয়াই ইহরামের শেষ মুহূর্ত। অথচ তা হারামেই যবেহ করা হয়েছে। আর যখন বলা হয়েছে ঃ 'কুরবানীর জন্তু তার স্থানে পৌঁছার ব্যাপারে প্রতিরুদ্ধ হয়েছে'; আর এই স্থান বা 'মহল'টা হারাম ছাড়া আর কিছুই নয়। তার পরে ঠিক এই কিসসাটাই বিবৃত হয়েছে ঃ حَتّٰى يَبْلُغَ

الْهَدْيُ مَحِلَّهُ। 'কুরবানীর জন্তু যতক্ষণ তার স্থানে পৌঁছে না যাবে।' এই দ্বিতীয় আয়াতে উল্লিখিত 'মহল' বলতেও সেই হারাম-ই বুঝতে হবে।

এই জন্তু যবেহ করার জন্যে কোন সময় নির্দিষ্ট নেই— এ কথার একটি প্রমাণ এই যে, আল্লাহ্‌র কথা ঃ যদি তোমরা পরিবেষ্টিত হও, তাহলে 'যে পশু যবেহ্ করা সহজ ও সম্ভব হবে' থেকে উমরা ও হজ্জের প্রসঙ্গই বোঝা যায়, যা পালন করতে শুরু করা হয়েছে, সে জন্যে যাত্রা শুরু করা হয়েছে। আর তার কথাই 'এবং তোমরা আল্লাহ্‌র জন্যে হজ্জ ও উমরা সম্পূর্ণ কর' অংশে বলা হয়েছে। হজ্জের জন্যে যে পশু, তা-ই উমরার জন্যেও। সব ফিকাহবিদই একমত যে, তাতে উমরার জন্যে কোন সময় নির্ধারিত হয় নি। হজ্জের ব্যাপারও তাই। কেননা শব্দটি সাধারণ অর্থবোধক। আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'কুরবানীর জন্তু যতক্ষণে তার স্থানে পৌঁছে না যাবে' থেকেও তা-ই বোঝা যায়। উমরার স্থান তো হারামই। কোন নির্দিষ্ট সময় নয়। তাই বুঝতে হবে যে, আয়াতে সেই হারাম-এর কথাই বলা হয়েছে। অতএব হারামে তা যে-কোন সময় যবেহ করা জায়েয— উমরার যে-কোন সময়ে। হজ্জের ক্ষেত্রেও তাই। আর সাধারণ অর্থবোধক শব্দের কারণে উমরাও তাতে শামিল। কেবল হজ্জের জন্যে তা শর্তযুক্ত করা জায়েয হতে পারে না। কেননা তা একটি শব্দের কারণে উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হতে পারে। ব্যবহৃত শব্দ সময় ও স্থান দুটিই যখন বোঝায়, তখন তার একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি বুঝতে চাওয়া জায়েয হতে পারে না। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ। 'চোর পুরুষ ও চোর স্ত্রী'— আয়াতের দৃষ্টিতে কোন চোরকে দশ দিরহাম চুরি ও অপর কোন চোরকে এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ চুরির অপরাধে দায়ী করা জায়েয হতে পারে না। হাদীস থেকেও এই কথা প্রমাণিত হয়। হাদীসটি হাজ্জাজ ইবনে আমর আল আনসারী নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, যার ভাঙ-চুর বা আমন্ত্রিত ও দমিত হবে, সে ইহরাম খুলে ফেলবে। পরবর্তী বছরই হজ্জ করা তার কর্তব্য হবে। তার অর্থ, তার ইহরাম খুলে ফেলা জায়েয। সাবাগাতা বিনতুষ যুবায়র বর্ণিত হাদীসও সেই কথাই প্রমাণ করে। তাতে নবী করীম (স) বলেছেন, তুমি শর্ত কর এবং বল যে, আমার মহল হচ্ছে সেটি, যেখানে আমাকে আটক করা হয়েছে। তার অর্থ, তাকে জানিয়ে দেয়া হল যে, সেটিই তার স্থান। তা এই মৌল নীতির ভিত্তিতে প্রমাণিত যে, ইহরাম যা করতে বলে, তা শর্তের কারণে নিষিদ্ধ হবে না। তাছাড়া মহল-ও সময়ের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট নয়। বিবেচনা করলে সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, যে উমরা পূর্ণ করা যায় নি বলে হালাল হতে হয়েছে, তাতে জন্তু যবেহ করার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। যখনই তা করা হবে, জায়েয হবে। এই জন্তু যবেহও তাই। যখন পরিবেষ্টনের কারণে ওয়াজিব হবে, তা ওয়াজিব হবে সময় অনির্দিষ্টভাবে। কেননা তা ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার কারণে ইহরাম খুলে ফেলার ঘটনা ঘটবে। যেমন পূর্ণ করতে না পারা উমরার ব্যাপার।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ 'এবং তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করবে না।' হজ্জযাত্রী বা উমরার জন্যে যাত্রী উভয়ের জন্যেই মাথা মুণ্ডন না করার এই নির্দেশ। কেননা এর পূর্ববর্তী আয়াত হচ্ছে ঃ 'এবং তোমরা সম্পূর্ণ কর হজ্জ ও উমরা আল্লাহ্‌র জন্যে।' আমাদের কারোর অপর কারোর মাথা মুণ্ডন করে দেয়াও নিষিদ্ধ হয়েছে এবং সকলের নিজের মাথা মুণ্ডন করাও নিষিদ্ধ হয়েছে। কেননা ব্যবহৃত শব্দ দুটি সম্ভাব্যকেই শামিল করে। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ এবং 'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করবে না।' এ আয়াত

আমাদের প্রত্যেককে আত্মহত্যা করতে এবং প্রত্যেককে অপর প্রত্যেককে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই বোঝা গেল, ইহরাম বাধা লোকের পক্ষে অপর কারোর মাথা মুণ্ডন করা নিষিদ্ধ। তা করলেই তার দণ্ড দেয়া জরুরী হবে। এ-ও বোঝা যায় যে, কেরান ও তামাত্তু হজ্জে মাথা মুণ্ডনের পূর্বেই কুরবানীর জন্তু যবেহ করতে হবে। কেননা যাদের একই সময় মাথা মুণ্ডন ও কুরবানী যবেহ করতে হবে, তাদের সকলের জন্যেই উক্ত কথা। তাই কুরবানীর পশু যবেহ করার পূর্বে যে লোক মাথা মুণ্ডন করবে, তাকেই দণ্ড স্বরূপ একটা পশু যবেহ করতে হবে। কেননা সে পশু যবেহ করার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করে সময়ের বরখেলাফ কাজ করেছে।

পরিবেষ্টিত ব্যক্তির ব্যাপারে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন এ বিষয়ে যে, তাকে মাথা মুণ্ডন করতে হবে, কি হবে না। আবূ হানীফা ও মুহাম্মাদ বলেছেন, না, তাকে মাথা মুণ্ডন করতে হবে না। আবূ ইউসূফের দুটি কথার একটি হচ্ছে, তাকে মাথা মুণ্ডন করতে হবে। মাথা মুণ্ডন না করলে অবশ্য তার কোন অপরাধ হবে না। তাঁর থেকে পাওয়া অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে, মাথা মুণ্ডন করা একান্তই জরুরী। স্ত্রীলোক তার স্বামীর অনুমতি না হলেও নফল উমরা বা হজ্জের জন্যে ইহরাম বাঁধতে পারবে, ক্রীতদাস তার মনিবের অনুমতি ছাড়াই ইহরাম বাঁধতে পারবে— এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই। অবশ্য স্বামী ও মনিবের পক্ষে স্ত্রী ও ক্রীতদাসকে মাথা মুণ্ডন বা চুল কাটা ছাড়াই ইহরাম ভাঙ্গানোর অধিকার আছে। আর তা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে ইহরাম ভঙ্গকারী সুগন্ধি ব্যবহার করিয়ে বা ভাল পোশাক পরিধান করিয়ে। এ থেকে বোঝা যায় যে, পরিবেষ্টিত হওয়া ব্যক্তির জন্যে ইহরাম ভাঙ্গতে মাথা মুণ্ডন ওয়াজিব নয়। কেননা এ দুজনই পরিবেষ্টিত যেন। মাথা মুণ্ডন ছাড়াই যে লোক তাদেরকে হালাল হতে বাধ্য করবে সে তাদের উপর জোর-জবরদস্তিমূলক কাজ করেছে'। যদি মাথা মণ্ডন ওয়াজিবও হয়, তাহলে তা সম্ভব ক্রীতদাসের মাথা মুণ্ডন করিয়ে আর মেয়েলোকটির চুল কাটিয়ে। উপরন্তু মাথা মুণ্ডন তো হজ্জের অনুষ্ঠানাবলীর মধ্যে গণ্য। যাবতীয় অনুষ্ঠান যথাযথ পালনের এক পর্যায়ে তা করতেই হয়। এ ছাড়া অন্য কোন উপায় প্রমাণিত নয়। তবে কোন দলীল ছাড়া তাকে হজ্জের অনুষ্ঠানমালার মধ্যে প্রমাণ করা জায়েয হবে না। কেননা একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, মাথা মুণ্ডন মূলত হজ্জের অনুষ্ঠানমালার অন্তর্ভুক্ত নয়। ক্রীতদাস ও স্ত্রীলোকটির ক্ষেত্রেও এই একই 'ইল্লাত' কিয়াস করা যেতে পারে যে, মনিব ও স্বামী উভয়ের জন্যে ক্রীতদাস ও স্ত্রীকে হালাল হতে বাধ্য করা জায়েয মাথা মুণ্ডন ও চুল কাটা ছাড়াই। যেসব অনুষ্ঠানের মধ্যে চুল কাটা বা মাথা মুণ্ডন বিন্যস্ত তা সব না করলে। সব পরিবেষ্টিত লোকের জন্যেই এই ইল্লাতের দরুন মাথা মুণ্ডন ছাড়াই হালাল করানো জায়েয রয়েছে। নবী করীম (স)-এর বলা একটি কথা থেকেও তা-ই বোঝা যায়। হুদায়বিয়ার উমরা সম্পন্ন করতে পারার পূর্বেই উমরা ত্যাগ করে মাথার চুড়া ভেঙ্গে ফেলতে ও চিরুণী চালাতে আদেশ করলেন এবং উমরা ত্যাগ করে গোসল করতে ও হজ্জের তাহলীল বলতে বললেন। কিন্তু তখন তাঁকে না মাথা মুন্ডন করতে ও না চুল কাটতে আদেশ করলেন। অথচ তখন উমরার সমস্ত কাজ অসম্পূর্ণই রয়ে গিয়েছিল। এ থেকে বোঝা গেল যে, অনুষ্ঠানাবলী পালন সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই ইহরাম খুলে ফেলা যার জন্যে জায়েয, তাকে মাথা মুণ্ডন করে হালাল হতে হবে—. এমন বাধ্যবাধকতা নেই। তাতে এই দলীল-ও রয়েছে যে, মাথা মুণ্ডন অনুষ্ঠানমালা পূর্ণ করার শেষ পর্যায়ে করার কাজ। অনুষ্ঠানমালার সমস্ত কাজ-ই এমনিভাবে পরস্পর সুবিন্যস্ত হয়ে আছে। ইমাম মুহাম্মাদ এ পর্যায়ে যুক্তি পেশ করেছেন এই বলে যে, অনুষ্ঠানমালার সব কাজই যখন পড়ে গেছে, তখন মাথা মুণ্ডনও করার প্রয়োজন থাকবে। আর এ-ও সম্ভব যে, ইহরাম শেষ করার জন্যে মাথা

মুণ্ডনও পড়ে যাবে। তাঁর এই কথায় দুই দিকের সম্ভাবনা রয়েছে। একটি, হয়ত তাঁর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে তা যার উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বে করেছি যে, মাথা মুণ্ডন অনুষ্ঠানাবলীর শেষ কাজ। তাই অনুষ্ঠানাবলীর কোন কাজই যখন করা যায় নি, তখন মাথা মুণ্ডন যখন ওয়াজিব, তখন তা অনুষ্ঠানের একটি অংশ। অথচ পরিবেষ্টিত ব্যক্তির পক্ষে কোন অনুষ্ঠান পালনের যখন সুযোগ নেই, তখন মাথা মুণ্ডনের কাজটা না করাই সমীচীন।

যদি বলা হয়, অনুষ্ঠানাবলী পড়ে গেছে তো শুধু এই কারণে যে, তা করা সম্ভব নয়। কিন্তু মাথা মুণ্ডন সম্ভব নয়— এমন কথা তো বলা যায় না। অতএব তা তার করা উচিত।

জবাবে বলা যাবে, কথাটি ভুল। কেননা পরিবেষ্টিত ব্যক্তির পক্ষে যদি মুযদালিফায় অবস্থান গ্রহণ সম্ভব হতো, সে প্রস্তর নিক্ষেপের কাজটা করতে পারত, কিন্তু কাবার নিকট পৌঁছা সম্ভব না হতো, আরাফাতের ময়দানে অবস্থানও অসম্ভব হতো, তাহলে মুযদালিফায় অবস্থান তার জন্যে বাধ্যতামূলক হতো না। পাথরও নিক্ষেপ করতে হতো না— যদিও তা করা সম্ভবপর ছিল। কেননা তাতে অনুষ্ঠানাবলীর শেষে বিন্যস্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে মাথা মুণ্ডন যখন অন্যান্য কাজের শেষে করণীয়, তার পূর্বে তা করণীয় নয়, তাহলে তা পড়ে যাওয়া— ও করা কর্তব্য— না-হওয়া খুবই স্বাভাবিক। যেমন আপত্তি তোলা হয়েছে এ কথায় যে, যে কাজ করা সম্ভব তা কেন করা হবে না? হ্যাঁ, তা সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও তা বাধ্যতামূলক হবে না, যখন সে পরিবেষ্টিত অবস্থায় পড়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসূফের মতের পক্ষে যদি কেউ এই যুক্তি দেখায় যে, আল্লাহ্‌র কথাঃ 'কুরবানীর জন্তু তার স্থানে পৌঁছার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করবে না'— এতে নিষেধের অবসানের জন্যে কুরবানীর জন্তুর লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যাওয়া আবশ্যক। লক্ষ্যস্থল তো তার পূর্বের স্থানের বিপরীত। ফলে মোট কথাটি দাঁড়াবে ঃ 'তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করবে না, যতক্ষণ কুরবানীর জন্তু তার স্থানে পৌঁছে না যাবে,' যখন তা পৌঁছে যাবে, তখন তোমরা মাথা মুণ্ডন কর। এতে মাথা মুণ্ডন করা ওয়াজিব হয়ে দাড়ায়।

জবাবে বলা যাবে, একথাটি সঠিক নয়। কেননা মুবাহ হওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার বিপরীত অবস্থা। ওয়াজিব হওয়াও নিষিদ্ধ হওয়ার বিপরীত। দুই বিপরীতের কোন একটির দিকে তাকে ফিরানো ওয়াজিব হবে না এবং তা অপরটির অপেক্ষা উত্তমও হবে না। তা হল মুবাহ হওয়া। উপরন্তু, নিষেধ উঠে গেলে তার বিপরীতটা ওয়াজিব হিসেবে করা ওয়াজিব হয় না। নিষেধ নিঃশেষ হয়ে গেলে জিনিসটি পূর্বে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় অবশিষ্ট হয়ে থাকাই কাম্য। ফলে ইহরাম বাঁধার পূর্বে যেরূপ ছিল সেই রূপই হয়ে যাবে। অতঃপর ইচ্ছা হলে মাথা মুণ্ডন করবে, না হয় করবে না। জুমআর নামাযের কাজটি সম্পন্ন হয়ে গেলে ক্রয়-বিক্রয়ের নিষেধও চলে যাবে। হালাল হওয়ার পর শিকার করার নিষেধও চলে যাবে। কিন্তু তাই বলে অতঃপর ক্রয়-বিক্রয় করা ওয়াজিব হয়ে যাবে— এমন কথা নয়। আসলে ক্রয়-বিক্রয় ও শিকার করা স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া তো আর লক্ষ্য নয়। মূলত সে দুটি কাজ মুবাহ। শুধু জুম'আ ও হজ্জের ইহরামের কারণে তা নিষিদ্ধ হয়েছিল। আবূ ইউসূফ নবী করীম (স)-এর কথাকে দলীল হিসেবে পেশ করতে পারেন। তিনি বলেছিলেন, তিনবার رَحِمَ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِيْنَ 'আল্লাহ মাথা মুণ্ডনকারীদের প্রতি রহম করুন।' যারা চুল কাটে তাদের জন্যে মাত্র একবার দো'আ করেছেন। হুদায়বিয়ায় পরিবেষ্টিত হয়ে পড়া কালে উমরায় তা বলা হয়েছিল। এ থেকে বোঝা গেল যে, তা নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানাবলীর একটি। যখন তা একটি অনুষ্ঠান, তখন তা করা ওয়াজিব। পরিবেষ্টিত নয় যারা, তারা হজ্জের অনুষ্ঠানমালার শেষ পর্যায়ে তা করে। আর এইরূপ জবাব

দেন যে, নবী করীম (স) ও সাহাবিগণের পক্ষে আল্লাহ্র ঘরের তওয়াফ করার পূর্বেই হালাল হওয়া ও মাথা মুণ্ডন করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছিল, পরে নবী করীম (স) যখন তাঁদেরকে ইহরাম খুলে ফেলে হালাল হতে বললেন, তখন তাঁরা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলেন এই আশায় যে, হয়ত তাদের পক্ষে কাবায় পৌঁছা সম্ভব হবে। তখন পুনরায় তাঁদেরকে হালাল হতে বলা হল। পরে নবী করীম (স) নিজেই অগ্রসর হয়ে তাঁর কুরবানীর জন্তু যবেহ করে দিলেন এবং তাঁর দেখাদেখি সঙ্গীগণও তাই করলেন এবং কেউ মাথা মুন্ডন করলেন, কেউ চুল কাটলেন। তখন নবী করীম (স) মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্যে রাসূলের পূর্ণ মাত্রায় অনুসরণের জন্যে ও দ্রুত আদেশ পালনের জন্যে দো'আ করলেন। তখন বলা হল, হে রাসূল! আপনি মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্যে তিনবার দো'আ করলেন। আর চুল কর্তনকারীদের জন্যে মাত্র একবার দো'আ করলেন— এর কারণ কি? তখন জবাবে নবী করীম (স) বললেন ঃ ওরা কোন সংশয় প্রকশ করেনি। তার অর্থ, তারা সংশয় প্রকাশ করেনি এ ব্যাপারে যে, মাথা মুণ্ডন চুল কাটার তুলনায় অধিক উত্তম বলে তারা জেনে শুনেই তার সওয়াবটা পাওয়ার যোগ্য হয়েছে। অন্যরা সেইমতো সওয়াব পাওয়ার যোগ্য হয়নি।

যদি বলা হয়, অবস্থা যেরূপই হোক, রাসূল (স) তো তাদেরকে মাথা মুণ্ডন করারই আদেশ করেছিলেন। তাঁর এই আদেশ পালন করা ছিল ওয়াজিব। তিনি যে মুণ্ডনকারী ও চুল কর্তনকারী উভয়ের জন্যে দো'আ করেছিলেন, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কাজটা মূলত হজ্জ ও উমরার অনুষ্ঠানমালার মধ্যে গণ্য। আর কাবায় পৌঁছার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করতে তাঁরা অ-রাজী ছিলেন বলে যা বলেছি— যদিও নবী করীম (স) তা করতে আদেশ করেছিলেন— তা দলীলের পরিপন্থী কিছু নয়। তা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, তা নিশ্চয়ই একটি জরুরী কাজ। এ কথা বলা হয় যে, মিসওয়ার ইবনে মাখরিমা ও মারওয়ান উবনুল হিকাম হুদায়বিয়া সংক্রান্ত কাহিনী বর্ণনায় যে কথা বলেছিলেন, তাতে নবী করীম (স) বলেছিলেন ঃ احلوا وانحروا 'তোমরা হালাল হয়ে যাও এবং জন্তু যবেহ কর।' কোন কোন বর্ণনায় মাথা মুণ্ডনের কথাও এসেছে। অতএব আমরা দুটো শব্দকেই রাখব এবং বলব, যা করেই ইহ্রাম খোলা হবে, তাতেই ইহ্রাম খুলে হালাল হওয়া হবে। কেননা নবী করীম (স) এই কথাটিতে শুধু হালাল হতে বলেছেন। আর 'মাথা মুণ্ডন কর' বলে থাকলে তা এই হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যেই বলা। ঠিক যে মাথা মুণ্ডনই করতে হবে, অন্য কিছু করলে হালাল হওয়া যাবে না, এমন কথা নয়। হালাল হলেই তারা সওয়াব পাওয়ার যোগ্য হবে। কেননা তাতেই রাসূলের আদেশ পালন হয়ে যাবে। তবে চুল কাটার তুলনায় মাথা মুণ্ডন করা উত্তম এজন্যে যে, তাতে রাসূলের অনুসরণে চূড়ান্ত মাত্রার চেষ্টা বোঝায়।

## হজ্জের ইহ্রাম খোলার পর পরিবেষ্টিত ব্যক্তির কুরবানীর জন্তু নিয়ে কি করা উচিত

প্রতিরুদ্ধ পরিবেষ্টিত মক্কা যাত্রীর সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কথাসমূহ বলার পর ইরশাদ করেছেনঃ

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ -

তবে তোমাদের যে ব্যক্তি হজ্জের সময় আসা পর্যন্ত উমরার ফায়দা গ্রহণ করবে, সে যেন সামর্থ্য অনুযায়ী কুরবানী দেয় .....।

আগের কালের ও বিভিন্ন দেশের ফিকাহ্‌বিদগণ হজ্জের পথে পরিবেষ্টিত হাজীদের ব্যাপারে তারা যখন কুরবানী করে হালাল হয়ে যাবে— তখন করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন মত দিয়েছে। সাঈদ ইবনে যুবায়র ইবনে আব্বাস থেকে এবং মুজাহিদ আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন, দুজনেই বলেছে, তাকে উমরা ও হজ্জ— দুটিই আবার করতে হবে। হজ্জের মাসসমূহে দুটো যদি এক সাথেই করা হয়, তা হলে তাকে একটি জন্তু যবেহ্ করতে হবে। সে হবে তামাত্তু হজ্জকারী, আর হজ্জের মাসসমূহে দুটো এক সাথে না করলে তাকে জন্তু যবেহ্ করতে হবে না। আল-কামা, আল-হাসান, ইবরাহীম, সালিম, কাসিম ও মুহাম্মাদ ইবনে সিরীনও উক্ত মতই সমর্থন করেছেন, আর হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণও তাই বলেছেন। আইয়ূব ইকরামা ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ কিসাসের হুকুম দিয়েছেন অথবা শত্রু তোমা থেকে এক হজ্জ থেকে আর এক হজ্জ পর্যন্ত ও এক উমরা থেকে আর এক উমরা পর্যন্ত নিয়ে নেবে। শবী বলেছেন, তাকে এক হজ্জ করতে হবে। ইমাম আবূ হানীফা তার হজ্জ ও উমরা— দুটো করাই ওয়াজিব বলেছেন। যখন হালাল হবে, তখন একটা পশু যবেহ্ করতে হবে তাকে। পরে সেই বছর আর হজ্জ করে নি। সে যদি কুরবানীর আগেই তার ইহ্‌রাম খুলে ফেলে, পরে পরিবেষ্টন শেষ হয়ে যায়, তার পরে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধবে ও সেই বছরই হজ্জ করবে, যে বারে উমরা করে নি। তা এজন্যে যে, এই উমরা তো তা-ই যা পূর্বের বারে করা যায় নি। কেননা যে লোক হজ্জ হারিয়ে ফেলবে তার কর্তব্য হচ্ছে উমরা করে হালাল হয়ে যাওয়া। সে যদি হারানো হজ্জ করতে পারে, তাহলে পরে তাকে হারানো উমরা করতে হবে। একটি জন্তুও যবেহ্ করতে হবে। যা পরিবেষ্টনের কারণে অ-কৃত রয়ে গেছে, হালাল হওয়ার জন্যেই তা করতে হবে। হারানোর কারণে যে উমরা করণীয় ছিল, এটা তার স্থলাভিষিক্ত হবে না। কেননা মৌলিকভাবে এমন উমরা নেই, যার বিকল্প হবে পশু যবেহ্ করা। যেমন, কেউ যদি উমরার মানত করে, তার বিকল্প হিসেবে জন্তু যবেহ্ করা যাবে না। ওযর অবস্থায়ও না, সম্ভাব্যের অবস্থায়ও নয়। অনুরূপভাবে যে লোক উমরাকে ফরয বানাবে, তার বিকল্প উমরাকে বানানো যায় না কোন অবস্থাতেই। হারানো বা করতে না পারার দরুন উমরার আমল বাধ্যতামূলক হয়, তাহলে জন্তু যবেহ্ তারও বিকল্প হতে পারে না। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, জন্তু যবেহ্ শুধু ইহ্‌রাম ভাঙ্গার জন্যে— হালাল হওয়ার জন্যে বিধিবদ্ধ হয়েছে। এ থেকে তার বোঝা যায় যে, করতে না-পারার দরুন যে উমরা বাধ্যতামূলক হয়, তা করতে না-পারার পূর্বে করা জায়েয নয়। কেননা তা সময় হয়নি, কারণও ঘটেনি। পরিবেষ্টনের জন্তু যবেহ্ করা জায়েয এবং হারানোর পূর্বে তদ্দ্বারা হালালও হওয়া যায়। এ ব্যাপারে আমাদের হানাফীদের এবং বিরোধীদের পূর্ণ ঐকমত্য রয়েছে। এ থেকে বোঝা গেল, জন্তু যবেহ্ শুধু হালাল হওয়ার জন্যে, তা উমরার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে নয়। ইমাম মালিক ও শাফেয়ীর পক্ষেও পরিবেষ্টনের জন্তু যবেহ্ করাকে করতে না-পারার দরুন ওয়াজিব হওয়া উমরার বিকল্প বলা সম্ভব হয়নি। কেননা তাঁরা দুজনই বলেছেন, যে লোক হজ্জ করতে পারেনি, তাকে হজ্জও করতে না-পারা উমরা দুটিই করতে হবে। আর সেই সাথে কুরবানীও। তাঁদের মতে পরিবেষ্টিত হাজীর কুরবানী— যা হজ্জ করতে না পারার দরুন বাধ্যতামূলক হয়— উমরার বিকল্প হতে পারে না। করতে না-পারার পর-ও তা তার স্থলাভিষিক্ত হয় না।

যদি বলা হয়, কুরবানীর দিনের আগেই উমরার ইহ্‌রাম বাঁধার পর মাত্‌য়ার তিনটি রোযা রাখা তোমার মতে জায়েয, তা কুরবানীর বিকল্প, আর মূল কুরবানীও। তা কুরবানীর দিনের আগে যবেহ্ করা জায়েয হবে না।

জবাবে বলা যাবে, তা জায়েয হয় মাত'আর কারণের দরুন। সে কারণ হচ্ছে উমরা। ফলে কুরবানী করার সময়ের পূর্বে কিছু রোযা রাখা জায়েয হবে। কিন্তু পরিবেষ্টিত হাজীর ক্ষেত্রে উমরা বাধ্যতামূলক হওয়ার কোন কারণ পাওয়া যায়নি। কেননা তাঁর কারণ হচ্ছে কুরবানীর দিন ফজর উদয় হওয়া আরাফায় অবস্থান গ্রহণের পূর্বে। এই কারণে জন্তু যবেহ করা সেই উমরার স্থলাভিষিক্ত হবে না, যা করা যায়নি বলে বাধ্যতামূলক হয়েছে। তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, জন্তু যবেহ করা সেই উমরার স্থলাভিষিক্ত নয় যা করতে না পারার দরুন বাধ্যতামূলক হয়েছে। তবে তা উমরাকারীর জন্যে বাধ্যতামূলক হবে। সে তো করতে না পারার ভয় পায় না। কেননা সে উমরার সময় নির্দিষ্ট নয়, যে-কোন সময়ই করা যেতে পারে। তা থেকে বোঝা গেল, এই জন্তু যবেহ উমরা করতে না পারার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, তা তো হালাল হওয়ার কাজটি ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থিত হয়েছে। তার দলীল হচ্ছে, কে করতে না পারার ভয় করে, কে ভয় করে না— এ দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি পশু যবেহ করার বাধ্যবাধকতার দিক দিয়ে।

যদি বলা হয়, নবী করীম (স)-এর হাজ্জাজ ইবনে আমর আল-আনসারী বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে— যে ব্যক্তি ব্যাহত হল বা যার মোড় ঘুরিয়ে দেয়া হল, সে হালাল হয়ে গেল এবং তাকে পরবর্তী বছর হজ্জ করতে হবে। এতে উমরার কথা উল্লেখ করা হয়নি। যদি হজ্জের সঙ্গে উমরা করাও জরুরী হতো তাহলে এ হাদীসে তার উল্লেখ নিশ্চয়ই করা হতো। যেমন হজ্জ কাযা করার আবশ্যিকতা বলা হয়েছে।

জবাবে বলা যাবে, এ হাদীসে পশু যবেহ করার কথাও তো বলা হয়নি। অথচ পশু যবেহ করা ছাড়া হালাল হওয়া জায়েয নয়। এ হাদীসটিতে নবী করীম (স) রোগের কারণে পরিবেষ্টিত হাজীর কর্তব্য বলতে চেয়েছেন এবং যার কাযা করে হালাল হওয়া কর্তব্য তার উল্লেখ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা) সাঈদুবনে যুবায়র বর্ণিত হাদীসে এতদূর গিয়েছে যে, যে লোক হজ্জ পর্যন্ত উমরার ফায়দা নেবে আল্লাহ্‌র পরিবেষ্টিত ব্যক্তির করণীয় বলার পর বলেছেন, একথা দ্বারা সেই উমরার কথা বলতে চেয়েছেন, হজ্জের ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার কারণে যা করা ওয়াজিব হয়েছিল— যখন উমরা থেকে হজ্জ পর্যন্ত একসাথে করবে। কেননা এই হজ্জের ইহরাম থেকে হজ্জের মাসসমূহে হালাল হয়েছিল। তাকে তার বিনিময় অবশ্যই দিতে হবে। পরিবেষ্টিত হাজী সম্পর্কে ইবনে আব্বাস থেকে আর একটি বর্ণনা এসেছে। সেটি আবদুর রাযযাক, সওরী, ইবনে আবূ নজাইহ, আতা ও মুজাহিদ ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, শত্রুর আটকই গণনার যোগ্য। যদি আটককৃত হয় আর তার সাথে কুরবানীর জন্তু না থাকে, তাহলে সেখানেই হালাল হয়ে যাবে, তার সাথে কুরবানীর জন্তু থাকলে তার দ্বারা হালাল হবে। কিন্তু কুরবানীর জন্তু যবেহ না করে হালাল হবে না। তাকে হজ্জ করতে হবে না। উমরাও নয়। অবশ্য আতা এই বর্ণনাটিকে অস্বীকার করেছেন একটি বর্ণনার ভিত্তিতে। সেটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর ইবনে জুরাইজ আমর ইবনে দীনার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ শত্রু যাকে পরিবেষ্টিত করেছে তাকে হজ্জ করতে হবে না, কুরবানী দেয়াই তার জন্যে যথেষ্ট। উমরাও করতে হবে না। ইবনে জুরাইজ বলেছেন, আমি আতার নিকট এই হাদীসটি উল্লেখ করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি শুনেছেন, ইবনে আব্বাস বলেছেন, যে পরিবেষ্টিত ব্যক্তির কুরবানী করা কর্তব্য নয়, তার এই পরিবেষ্টনের দরুন যা করতে পারল না, তার কাযা করাও জরুরী নয় ? বললেন, না, আমি শুনিনি। তিনি এ হাদীসটিকে অস্বীকার করলেন। বস্তুত এ হাদীসটি গ্রহণ অযোগ্য— কুরআনেরও খেলাফ। নবী করীম (স)-এর মুতাওয়াতির বর্ণনা ধারায় বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ -

তোমরা যদি পরিবেষ্টিত হয়ে পড়, তাহলে যা কুরবানী করা সহজ, তাই করবে। তবে কুরবানীর জন্তু তার স্থানে পৌঁছার আগে তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করবে না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যা কুরবানী করা সহজ তাই করবে' দুটির যে কোন একটি দিক দিয়ে গ্রহণীয়! একটি— যে কুরবানী তার জন্যে সহজ তাই করবে। দ্বিতীয়— সে যে কুরবানীর জন্তু পাঠাতে পারে তাই পাঠাবে। এ কথার দাবি হচ্ছে, পরিবেষ্টিত ব্যক্তিকে— সে যখনই হালাল হতে চাইবে— কুরবানী করবে। এরপর বলা হয়েছে ঃ 'কুরবানীর জন্তু তার স্থানে পৌঁছার পূর্বে তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করবে না।' এরূপ অবস্থায় কুরবানী না করেই হালাল হওয়া সঙ্গত, এমন কথা একজন কি করে বলতে পারে ? অথচ কুরআনের আয়াতই তা ফরয করেছে এবং নবী করীম (স) হুদায়বিয়ায় পরিবেষ্টিত হয়ে সঙ্গীদেরকে কুরবানী করে হালাল হয়ে যাবার আদেশ করেছিলেন।

পরিবেষ্টিত হজ্জযাত্রী যদি হালাল না হয় এবং হজ্জ শেষ হয়ে যাওয়ার পর কাবা ঘরে পৌঁছায়, তাহলে সে কি করবে, এ পর্যায়ে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। হানাফী ফিকাহবিদ ও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, তার উমরা করে হালাল হয়ে যাওয়া উচিত। সেই ইহরাম দ্বারাই হজ্জ কার্য সম্পন্ন করা তার জন্যে সহীহ হবে না। ইমাম মালিক বলেছেন, পরবর্তী বছর হজ্জ করা পর্যন্ত তার ইহরাম বাঁধা অবস্থায় থেকে যাওয়া জায়েয হবে। নতুবা উমরা করে হালাল হতে চাইলেও তাতে আপত্তি নেই।

তার এই ইহরামের থেকে একবার হজ্জ হারানোর পর পরবর্তী হজ্জ করা জায়েয নয়, তার দলীল হচ্ছে, উমরা করে তার হালাল হয়ে যাওয়া সর্বসম্মত মত। তার বর্তমান ইহরাম যদি এরকমের হয়ে গিয়ে না থাকত যে, তদ্দ্বারা পরবর্তী হজ্জ করা যাবে না, তাহলে তা খুলে ফেলে হালাল হয়ে যাওয়া কখনই জায়েয হতে পারত না। প্রথম বছরই তার পক্ষে হজ্জ করা সম্ভব হলে তো সে তা করত, তা না করে হালাল হয়ে যাওয়া তার পক্ষে কখনই জায়েয হতো না। আর এতেই দলীল রয়েছে এ কথার যে, তার বর্তমান ইহরাম এমন হয়ে গেছে যে, তা নিয়ে পরবর্তী হজ্জ কিছুতেই করা যেতে পারে না। উপরন্তু হজ্জ নষ্ট হয়ে যাওয়া বা নষ্ট করে দেয়া তো বাতিল হয়ে গেছে আল্লাহ্‌র এই কথার দ্বারা ঃ 'এবং তোমরা হজ্জ ও উমরা আল্লাহ্‌র জন্যে সম্পূর্ণ কর।'

এ থেকে জানা গেল যে, ইহরাম শেষ করে হালাল হওয়া যখন তার জন্যে জায়েয, তখন এ অবস্থায় উমরার কার্যাবলী করাই তার কর্তব্য, হজ্জের কার্যাবলী নয়। কেননা হজ্জের কার্যাবলী করা সম্ভব হওয়ার পর উমরা করে হালাল হওয়ার কারণে তার হজ্জকে নাকচ করে দেয়া হয়েছে। এই অবস্থা হয়েছিল শুধুমাত্র সেই বছর, যে বছর রাসূলে করীম (স) হজ্জ করতে সক্ষম হয়েছিলেন ও তা করেওছিলেন। পরে তা মনসূখ হয়ে যায়। হযরত উমর (রা) বলেছেনঃ

مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا اَنْهٰى عَنْهُمَا وَاَضْرِبُ عَلَيْهِمَا مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَمُتْعَةُ الْحَجِّ -

নবী করীম (স)-এর যুগে দুটি মাত্‌য়া চালু ছিল। আমি সে দুটি থেকে নিষেধ করছি। তার উপর চালু করছি মেয়েলোকের মাত্‌য়া ও হজ্জের মাত্‌য়া।

হযরত উমর (রা) 'হজ্জের মাত্‌য়া' বলে তা ভেঙ্গে যাওয়াই বুঝিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে যে নবী করীম (স) বিদায় হজ্জে তাঁর সাহাবিগণকে আদেশ করেছিলেন।

যে লোক নফল হজ্জের ইহরাম বাঁধা অবস্থায় পরিবেষ্টিত হয়েছে, সে কি করবে— এই ক্ষেত্রেও ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মতে দিয়েছেন। হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, তাকে কাযা করতে হবে, পরিবেষ্টন রোগের কারণে হোক কিংবা শত্রু কর্তৃক হোক— তাতে কোন পার্থক্য হবে না আর এ দুটো থেকেই যদি কুরবানীর দ্বারা হালাল হয়ে থাকে। ইমাম মালিক ও শাফেয়ী রোগের কারণে পরিবেষ্টিত হওয়াকে গণ্য করেন না। তাঁরা দুজনই বলেছেন, শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হলে, তার পরে হালাল হয়ে থাকলে হজ্জ ও উমরা— কোনটাই তাকে কাযা করতে হবে না। তবে কাযা করা ওয়াজি, বরং ফরয, তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র এই কথা ঃ

এবং তোমরা আল্লাহ্‌র জন্যে হজ্জ ও উমরা সম্পূর্ণ কর।

এই আদেশকে ফরয প্রমাণ করে হজ্জ বা উমরা শুরু করলে তা সম্পূর্ণ করার একান্তই কর্তব্য। শুরু করার পর তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হওয়ার কারণে হজ্জ ও মানত দুটো বাধ্যবাধকথার দিক দিয়ে সমান হয়ে গেছে। অতএব তা সম্পূর্ণ না করে মাঝখানেই তা ত্যাগ করা হলে তা কাযা করা বাধ্যতামূলক হবে। তা করতে মাযুর ছিল কি ছিল না, তাতে কোন পার্থক্য হবে না। কেননা যা একবার ফরয হয়েছে, তা ওযরের কারণে পরিত্যক্ত হতে পারে না। নষ্ট হয়ে গেলে তা কাযা করা ফরয, এ বিষয়ে যখন সব ফিকাহবিদ একমত, তখন পরিবেষ্টিত হওয়ার দরুন অসম্পূর্ণ থেকে গেলে তা-ও অবশ্যই কাযা করতে হবে।

এই কথাটি হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। হাজ্জাজ ইবনে আমর আল-আনসারী বর্ণনা করেছেন ঃ 'যে বাধাপ্রাপ্ত হবে বা যাকে থামিয়ে দেয়া হবে, সে হালাল হয়ে গেল। পরবর্তী বছর তাকে হজ্জ করতে হবে।' এতে ফরয হজ্জ ও নফল হজ্জের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি।

উপরন্তু যে লোক ইহরামের কর্তব্যসমূহ পরিহার করবে, সে হুকুমের বাধ্যবাধকথা পরিহার করায় সে মাযুর ছিল কি ছিল না— এতে পার্থক্য নেই। তার দলীল হচ্ছে, আল্লাহ্‌ মাথার কষ্টদায়ক রোগের দরুন মাথা মুণ্ডনকারীর ওযর কবুল করেছেন; কিন্তু তাকে ফিদিয়া দেয়ার বাধ্যবাধকথা থেকে রেহাই দেন নি। সে ফরয ইহরামে ছিল কি নফল ইহরামে— তার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, দুটিই সমান ও অভিন্ন। অনুরূপভাবে ফরয হজ্জে পরিবেষ্টিত ব্যক্তি সম্পর্কিত হুকুম যা নফল হজ্জে পরিবেষ্টিত ব্যক্তি সংক্রান্ত হুকুম কাযা ফরয হওয়ার ব্যাপারে একই হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনুরূপভাবে তা স্ত্রী-সঙ্গমের কারণে বিনষ্ট হওয়া ও পরিবেষ্টিত হওয়ার কারণে তা ত্যাগ করা সম্পূর্ণ সমান ও অভিন্ন হওয়া কর্তব্য। ইহরাম বাধা থাকা অবস্থায় কোন অপরাধ করে বসলে তার কাফফারা দেয়া ওয়াজিব, মাযুর হোক কি অ-মাযুর। পরিবেষ্টিত হলে কাযা করা ওয়াজিব, মাযুর হলেও। এ বিষয়ে সকলেই একমত, এ ব্যাপারেও যে, রোগীকেও তো কাযা করতে হবে, যদি সে হজ্জ হারিয়ে ফেলে। হারাতো সে মাযুর হলেও। কোন ওযর ছাড়াই হারাবার ইচ্ছা করলেও তা কাযা করা বাধ্যতামূলক।

এর তাৎপর্য হচ্ছে, ইহরাম বেধে কাজ শুরু করার পর যা করণীয় হয়, তাতে মাযুর ও অ-মাযুর উভয়ই সমান। সে তো পরিবেষ্টিত অবস্থায় রয়েছে। অতএব কাযা করার বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহৃত হতে পারে না।

হযরত আয়েশার ঘটনা থেকেও তাই প্রমাণিত হয়। তিনি বিদায় হজ্জের সময় ঋতুবতী হল। তিনি ছিলেন উমরার জন্যে ইহরাম বাঁধা। তখন নবী করীম (স) তাঁকে বললেন, তোমার মাথার চূড়া ভেঙ্গে ফেল, চুলে চিরুনী কর এবং হজ্জের তাহলীল কর, উমরা ত্যাগ কর। পরে হজ্জ সমাপ্ত করার পর আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকরকে তাকে দিয়ে উমরা করানোর আদেশ করলেন। তিনি তানয়ীম থেকে তাঁকে উমরা করালেন। বললেন— এটাই তোমার উমরা শুরু করার স্থান। ওযরের কারণে যে উমরা তিনি করতে পারে নি, তা-ই কাযা করার আদেশ করলেন। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, ইহরাম থেকে বের হতে যে লোক মাযুর, কাযা করা তাঁর কর্তব্য থেকে যায়, তা প্রত্যাহৃত হয় না। এ-ও প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (স) ও তাঁর সঙ্গীগণ যখন হুদায়বিয়ায় পরিবেষ্টিত হল, তখন তাঁরা উমরার ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। পরবর্তী বছর তার কাযা করেন। এই জন্যে তার নামকরণ হয় ঃ عُمْرَةُ الْقَضَا 'কাযা উমরা'। যদি তা আদায় না করতেন, তাহলে তা শুরু করার পর বাধ্যতামূলক হতো না, কাযা করা ওয়াজিব হতো না এবং তার নামও 'উমরাতুল কাযা' রাখা হতো না। আর তাহলে নতুন করে উমরা করার নিয়ত করতে হতো। আর হালাল হওয়ার পর কাযা করা বাধ্যতামূলক হওয়ার এটাই দলীল।

## যে পরিবেষ্টিত হাজী কুরবানীর জন্তু পায় না

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'যদি তোমরা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়, তাহলে যে কুরবানী করা সহজ হবে, তা-ই করবে।

যে পরিবেষ্টিত ব্যক্তি কুরবানী করার জন্তু পায় না, সে কি করবে— এ বিষয়ে মনীষিগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। হানাফী ফিকাহবিদরা বলেছেন, যতক্ষণ কুরবানীর জন্তু পাবে না ও তা যবেহ করবে না, ততক্ষণ হালাল হবে না। আতা বলেছেন, সে দশটি রোযা রাখবে, তারপরে হালাল হবে। যেমন তামাত্তুকারীকে কুরবানীর জন্তু না পেলে করতে হয়। এই পর্যায়ে ইমাম শাফেয়ীর দুটি কথা। একটি— কুরবানী না দিয়ে সে হালাল হতেই পারবে না। আর দ্বিতীয়টি— কোন কিছু করতে না পারলে সে হালাল হয়ে যাবে তাৎক্ষণিকভাবে। আর পরে সে একটি জন্তু যবেহ করবে যখন তা করতে সক্ষম হবে। এ-ও বলা হয়েছে যে, কোন কিছু করতে সক্ষম না হলে তার করার কিছু নেই। যে হয় খাবার খাওয়াবে, কিংবা রোযা রাখবে।

আবূ বকর বলেছেন, এই কথার স্বপক্ষে ইমাম মুহাম্মাদ দলীল এনেছেন এই যে, মাত্য়ার কুরবানী তো দলীলসিদ্ধ ও সমর্থিত। তামাত্তুকারীর জন্যেও হুকুম রয়েছে, যাতে কুরবানী করতে হবে কিংবা রোযা রাখতে হবে, যদি কুরবানীর জন্তু না পায়। আর অকাট্য দলীল সিদ্ধ বিষয়াবলীর একটির উপর অপরটি কিয়াস করা যেতে পারে না। আর একটি দিক হচ্ছে কিয়াস করে কাফফারা প্রমাণ করা যায় না। পরিবেষ্টিত ব্যক্তির জন্যে পশু যবেহ করার কথা যখন বলাই হয়েছে, তখন কিয়াস করে অন্য কিছু প্রমাণ করতে চেষ্টা করা উচিত হতে পারে না। কেননা তা তো অপরাধের কাফফারা হিসেবে পশু যবেহ করার ব্যাপার। কেননা কিয়াস করে কাফফারা প্রমাণ করতে যাওয়া নিষিদ্ধ। উপরন্তু তাতে ঠিক যেটি দলীল ভিত্তিক সেটি পরিহার করা হয়। কেননা আল্লাহ তো বলেছেন ঃ 'কুরবানীর জন্তু তার স্থানে পৌঁছার আগে তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করবে না'। তাই কুরবানীর জন্তুর তার স্থানে পৌঁছার পূর্বেই মাথা মুণ্ডন করা যারা মুবাহ বলে, তারা কুরআনের অকাট্য দলীলের বিরোধিতা করে। আর কিয়াসের সাহায্যে অকাট্য দলীল পরিহার করা কখনই জায়েয হতে পারে না।

## মক্কাবাসীদের পরিবেষ্টিত হওয়া

মক্কার অধিবাসীদের পরিবেষ্টিত হওয়ার ব্যাপার অন্য কোন দিক দিয়ে ঘটতে পারে না, কেবল আল্লাহ্‌র ঘর তওয়াফ করার পথে বাধাগ্রস্ত হলেই পরিবেষ্টিত হওয়ার ব্যাপার ঘটতে পারে। হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, তাদের পক্ষে কাবা ঘর পর্যন্ত পৌঁছা যদি সম্ভবপর হয়, তাহলে পরিবেষ্টিত হওয়ার কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। কেননা হয় তারা হজ্জের ইহরাম বেঁধেছে, না হয় উমরার। যদি তারা উমরাকারী হয়, তাহলে তারা উমরা করবে। আর উমরা তো শুধু কাবা ঘরের তওয়াফ ও সাঈ' মাত্র। আর সে কাজ থেকে পরিবেষ্টিত হওয়ার কোন প্রশ্ন হতে পারে না। আর যদি হজ্জের জন্যে ইহরাম বেঁধে থাকে, তা হলে সে আরাফাতের ময়দানে যেতে বিলম্ব করতে পারে শেষ সময় পর্যন্ত, যদি পরিবেষ্ঠিত নাও হয়, তবু। যদি আরাফাতে অবস্থানের সময় হারিয়ে ফেলে তা হলে সে হজ্জ-ই হারিয়ে ফেলল বলতে হবে। তখন সে খালি সময়ে উমরাটা করে নেবে। তখন সে উমরাকারী হয়ে যাবে, পরিবেষ্টিত হওয়ার প্রশ্ন হবে না।

## ইহরাম বাঁধার পর মাথায় কষ্ট বা কোন রোগ হওয়া

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ কুরবানীর জন্তু তার স্থানে পৌঁছার পূর্বে তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করবে না। তা ছাড়া তোমাদের কেউ যদি রোগী হয়..... ইহরাম বাধা পরিবেষ্টিত হওয়া বা না-হওয়া লোকদের মধ্যে কেউ রোগী হলে বা কারোর মাথায় কোনরূপ কষ্ট হলে সে রোযা রেখে ফিদিয়া দেবে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, পরিবেষ্টিত ব্যক্তি কুরবানীর জন্তু তার স্থানে পৌঁছার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করবে না, তা করা তার জন্যে জায়েয নয়। আর সে যদি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে কিংবা মাথায় যদি কোন কষ্টদায়ক কিছু থাকে এবং সে কারণে সে মাথা মুণ্ডন করে, তা হলে তাকে ফিদিয়া দিতে হবে। সে যদি অ-পরিবেষ্টিতও হয়, তবু সে সেই পরিবেষ্টিত ব্যক্তির অবস্থায় আছে বলে মনে করতে হবে, যার জন্তু এখনও তার স্থানে পৌঁছায়নি। এ থেকে বোঝা গেল, পরিবেষ্টিত ও অ-পরিবেষ্টিত— সকলেই এ দিক দিয়ে অভিন্ন যে, ইহরামে তার মাথা মুণ্ডন জায়েয নয়। জায়েয হবে একটি শর্তে, যা ইতিপূর্বে বারবার উল্লিখিত হয়েছে। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا 'তোমাদের মধ্যে যে-লোক রোগী হবে........' এ আয়াতে সেই রোগের কথা বলা হয়েছে, যাতে পোশাক পরা বা ইহরাম নষ্টকারী কোন কাজ করার প্রয়োজন হয়। তা হলে সে তা করতে পারবে কষ্ট দূর করার জন্যে। তবে তাকে সেজন্যে ফিদিয়া দিতে হবে। 'অথবা তার মাথায় কোন কষ্টদায়ক ব্যাপার হলে ....' আয়াতাংশ-ও সেই কথাই বলেছে। ইহরাম নষ্টকারী কোন জিনিস ব্যবহার করা জরুরী হয়ে পড়ে যে রোগে— যেমন মাথা মুণ্ডন করা বা মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলা। তবে রোগ যদি এমন হয় যে, তদ্দরুন মাথা মুণ্ডন জরুরী হয় না, ইহরামের নিষিদ্ধ কোন কাজও করতে হয় না, তা হলে এরূপ অবস্থায় সে যেন সুস্থ ব্যক্তির মত, যার জন্যে ইহরাম বিনষ্টকারী কোন কিছু করা নিষিদ্ধ। কাব ইবনে ইজরাতা থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) হুদায়বিয়ার বছর তাকে পেলেন এমন অবস্থায় যে, তার মাথার উকুন তার মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ছিল। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার মাথার এই জঞ্জাল তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে ? সে বলল, হ্যাঁ। তখন তাকে ফিদিয়া দিতে আদেশ করলেন। বোঝা গেল, উকুনের আধিক্যই তার মাথার কষ্টের কারণ ছিল। আয়াতে ঠিক এই

কথাই বলা হয়েছে। তার মাথায় কোন দূষিত ক্ষত থাকলে তা বেঁধে রাখা বা ঢেকে রাখার প্রয়োজন হলে তা করা যাবে, তবে সেজন্যে ফিদিয়া দিতে হবে। অন্যান্য রোগের বেলায়ও তাই। তাতে কাপড় পরার প্রয়োজন হলে তা পরবে মুবাহ্ হিসেবে। তবে ফিদিয়া দিতে হবে। কেননা আল্লাহ এ সবের মধ্যে কোন একটিকে বিশেষীকৃত করেন নি। এ সব ব্যাপারে কুরআনের সাধারণ হুকুম রয়েছে।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমাদের মধ্যে কেউ রোগী হলে কিংবা মাথায় কষ্টদায়ক কিছু থাকলে' কথাটি মাথা মুণ্ডন সম্পর্কে। মাথা মুণ্ডন করা হলে রোযা রেখে তার ফিদিয়া দেবে।

জবাবে বলা যাবে, মাথা মুণ্ডন করার কাথা উল্লিখিত হয়নি। যদিও তা-ই বলার আসল উদ্দেশ্য। তেমনি পোশাক পরা ও মাথা ঢেকে রাখা— এর কোনটাই উল্লেখ করা হয়নি। অথচ তার অনুমতি দেয়াই উদ্দেশ্য। কেননা তাতে কোন ওযরের দরুন নিষিদ্ধ কাজের অনুমতি দান-ই আসল লক্ষ্য। অনুরূপভাবে যদি রোগী না হয়; কিন্তু তার দেহে কষ্টদায়ক কিছু থাকে, যার কারণে মাথা মুণ্ডন করার দরকার হয়ে পড়তে পারে, সেক্ষেত্রে মাথার ব্যাপারে তো ফিদিয়া দিতে হবে। কেননা সব কিছুতে তাই বোধগম্য হয়। আর তা হচ্ছে, ইহ্‌রামে নিষিদ্ধ কাজ করা মুবাহ্ হওয়া ওযরের কারণে। আল্লাহ কথা ঃ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ 'রোযা রেখে ফিদিয়া দেবে', নবী করীম (স) থেকে প্রমাণিত যে, তিনি তিনদিনের রোযা রেখেছিলেন। কাব ইবনে আজরাতা বর্ণিত হাদীসে তা উদ্ধৃত হয়েছে। আগেরকালের ও একালের বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদদের কথা-ও তাই। তবে হাসান ও ইকরামা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মাত্'আর রোযার মত দশ দিনের রোযা রাখতে হবে। কাব বর্ণিত হাদীসে সাদকার পরিমাণেরও উল্লেখ হয়েছে। মোটকথা— এ পর্যায়ে নবী করীম (স) থেকে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। তন্মধ্যে একটি আবদুল বাকী ইবনে কানে' আহমদ ইবনে সহল ইবনে আইয়ুব, সহল ইবনে মুহাম্মাদ, ইবনে আবূ জায়দ, তাঁর পিতা, আবদুর রহমান ইবনুল ইসবাহানী, আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কাব ইবনে আজরাতা তাঁকে বলেছেন যে, তিনি নবী করীম (স)-এর সাথে ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। তখন তাঁর মাথা ও দাড়িতে উকুন পাওয়া গিয়েছিল। নবী করীম (স) তা জানতে পেরে একজন হাজ্জাম ডাকলেন। সে তার মাথা মুণ্ডন করে দিল। বললেন, আমরা কি কুরবানী করতে পারব? বললেন, না, তা বোধ হয় পারবে না। তখন তিনি তাঁকে তিনটি রোযা রাখতে, না হয় ছয়জন মিসকীন— প্রত্যেক মিসকীনকে এক সা' পরিমাণ খাদ্য দিতে বললেন। তখন আল্লাহ নাযিল করেছিলেন ঃ

فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْصَدَقَةٍ اَوْنُسُكٍ -

অতঃপর ফিদিয়া হিসেবে হয়ত রোযা রাখবে, না হয় সাদকা দেবে, না হয় কুরবানী দেবে।

সাধারণভাবে সব মুসলমানের জন্যেই এই হুকুম। সালিহ ইবনে আবূ মরিয়াম, মুজাহিদ কাব ইবনে আজরাতা সূত্রেও এরূপ বর্ণনা এসেছে। দাউদ ইবনে আবূ হিন্দু, আমের কাব ইবনে আজরাতা সূত্রেও এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ তিন সা' করে 'তামার' (উন্নতমানের খেজুর) সাদকা দেবে। প্রত্যেক দুজন মিসকীনকে এক সা' পরিমাণ। আবদুল বাকী আবদুল্লাহ ইবনুল হাসান ইবনে আহমাদ, আবদুল আজীজ ইবনে দাউদ, হাম্মাদ ইবনে

সালমাতা, দাঊদ ইবনে আবূ হিন্দ, শবী, আবদুর রহমান ইবনে আবূ লায়লা, কাব ইবনে আজরাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) তাঁকে বলেছেন ঃ

اَنْسُكْ نَسِيْكَةً اَوْصُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اَوْاَطْعِمْ ثَلَاثَةَ اَصْعٍ مِنْ طَعَامٍ لِسِتَّةِ مَسَاكِيْنَ -

ছোটখাটো একটা কুরবানী কর অথবা তিন দিন রোযা রাখ; কিংবা ছয়জন মিসকীনকে তিন সা' খাদ্য খাওয়াও।

পূর্বোক্ত হাদীসে তিন সা' 'তামার' ছয়জন মিসকীনকে দিতে বলা হয়েছে। অপর এক হাদীসে ছয় সা' বলা হয়েছে। এটাই গ্রহণীয়। কেননা এতে বেশী পরিমাণের কথা বলা হয়েছে।

তাছাড়া তিন সা' ছয়জন মিসকীনকে ভাগ করে দেয়ার কথাটির তাৎপর্য হতে পারে, তাতে যবের কথা বলা হয়েছে। এটাই বাহ্যত মনে হয়। জনগণের অভ্যাস যব খাওয়া, এটাই ব্যাপকভাবে পরিচিত। এভাবে তা থেকে বোঝা গেল যে, 'তামার' হলে ছয় সা' আর যব হলে তিন সা' দিতে হবে। আর যে মিসকীনদের মধ্যে তা বণ্টন করার কথা তাদের সংখ্যা ছয়। এতো কোন মতপার্থক্য নেই।

কুরবানীর কথাটি কাব ইবনে আজরাতা বর্ণিত হাদীসে নবী করীম (স) বলেছেন, ছোটখাটো একটা কুরবানী করতে। অপর হাদীসে ছাগল কুরবানীর কথা রয়েছে। ছোট খাটো কুরবানী যে ছাগল দ্বারা হয়, তাতে সব ফিকাহবিদ একমত। সেটা উট বা গরুও হতে পারে। এ তিনটির যে-কোন একটি দেয়ার ইখতিয়ার রয়েছে, এতে কোন মতপার্থক্য নেই। আয়াতের বক্তব্যও তাই। তবে কোন দলীল যদি অন্য কিছু প্রমাণ করে, তাহলে ভিন্ন কথা। এ বিষয়ে যথাস্থানে বিস্তারিত বলা হয়েছে।

জন্তু যবেহ করা বা সাদকা দেয়ার ব্যাপারটির স্থান সম্পর্কে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। যদিও রোযা কোন বিশেষ স্থানে বিশেষীকৃত নয়, এ ব্যাপারেও ঐকমত্য রয়েছে। রোযা যেখানে ইচ্ছা রাখতে পারে। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ ও জুফর বলেছেন, জন্তু যবেহ করতে হবে মক্কায়। রোযা ও সাদকা যেখানে ইচ্ছা। মালিক ইবনে আনাস বলেছেন, জন্তু যবেহ, সাদকা দান কিংবা রোযা রাখা— এ তিনটি যে কোন স্থানে করা যেতে পারে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সাদকা দান ও জন্তু যবেহ মক্কায় করতে হবে। রোযা যেখানে ইচ্ছা রাখবে। কুরআনের কথা ঃ 'ফিদিয়া দিতে হবে রোযা রেখে; কিংবা সাদকা দিয়ে; অথবা কুরবানী করে' ও সাধারণভাবে পালনীয়। যেখানে ইচ্ছা করা যেতে পারে। কোন বিশেষ স্থানের সাথে তা বিশেষীকৃত নয়। অবশ্য অপর কোন আয়াতে হারামে করার বিশেষীতকরণের হুকুম থাকলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ্‌র কথা হচ্ছে ঃ

لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلَى اَجَلٍ مُّسَمًّى -

একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সেখানে তোমাদের জন্যে বিপুল ফায়দা রয়েছে।(সূরা হজ্জ ঃ ৩৩)

অর্থাৎ সেসব জন্তু-জানোয়ার, যার উল্লেখ পূর্বে হয়েছে। পরে বলেছেন ঃ

ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ -

অতঃপর তার স্থান প্রাচীনতম (কাবা) ঘর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। (সূরা হজ্জ ঃ ৩৩)

এই কথাটি সকল জন্তু-জনোয়ার— যেগুলোকে আল্লাহ্র ঘরের দিকে কুরবানীর জন্যে পাঠানো হবে— এর ক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রযোজ্য। আয়াতটির এই অর্থের সাধারণত্বের কারণে তাঁর নৈকট্য লাভে নিবেদিত সব পশুই হারামের জন্যে বিশেষভাবে চিহ্নিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তা অন্যত্র যবেহ করলে কাজ হবে না। আল্লাহ্র কথা, 'কাবায় পৌছা কুরবানীর জন্তু' থেকেও তা-ই বোঝা যায়। এটা হচ্ছে শিকার করার অপরাধের প্রতিকার। অতএব কুরবানীর জন্তুর পরিচিতিই হল কাবায় পৌঁছে যাওয়া। তা না হলে হবে না। উপরন্তু তা যখন যবেহ হবে, তখন তা ইহরামের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে অবশ্যই। তা হারামের সাথে বিশেষভাবে চিহ্নিত হতে হবে। যেমন শিকারের প্রতিকারের যবেহ এবং মাত্য়ার জন্যে কুরবানীর জন্তু।

যদি বলা হয়, নবী করীম (স) কাব ইবনে আজরাতাকে বললেন, একটা ছাগল যবেহ কর, কিন্তু সেজন্যে কোন স্থানকে নির্দিষ্ট করলেন না। কাজেই পশু যবেহর জন্যে কোন স্থানই বিশেষভাবে চিহ্নিত হওয়া উচিত নয়।

জবাবে বলা যাবে, কাব ইবনে আজরাতার পশু যবেহ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল হুদায়বিয়ায়। হুদায়বিয়ার একাংশ হারামের মধ্যে, অপর অংশ তার বাইরে। কাজেই সেখানে বলা উক্ত কথায় কোন স্থানকে নির্দিষ্ট না করলেও অসুবিধা ছিল না। কেননা কাব তো জানতেনই যে, ইহরামের সাথে সংশ্লিষ্ট যবেহ অবশ্যই হারামে করতে হবে। নবী করীম (স)-এর সাহাবিগণ পূর্ব থেকেই জানতেন যে, কুরবানী হারামেই হয়ে থাকে, হতে হবে। কেননা স্বয়ং নবী করীম (স) সেখানে যবেহ করার উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক জন্তু আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তবে সাদকা দান ও রোযা রাখার এ রকমটা নয়। তা যে কোন স্থানে করা যেতে পারে। সেজন্যে কোন স্থানকেই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা হয়নি। অতএব সে দুটি কাজকে হারামেই করতে হবে, এরূপ শর্ত করার কোন অধিকার আমাদের নেই। কেননা কুরআনে যা নিঃশর্ত, তাকে নিঃশর্ত রাখা এবং যা শর্তাধীন তাকে শর্তাধীন রাখাই বান্দাদের কর্তব্য। আর মূলতই সাদকার জন্যে কোন স্থানকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা হয়নি। তা আসলেই এমন নয় যে, তা কোন বিশেষ স্থান ছাড়া অন্যত্র করা যাবে না। সাদকা সম্পর্কে এ কথাই যখন চূড়ান্ত তখন তা কোন বিশেষ স্থানে হতে হবে, এমন শর্ত করা যাবে না। এটা মৌলনীতির পরিপন্থী। তার বাইরে অবস্থিত।

যদি বলা হয়, সাদকাও অবশ্যই হারামেই দান করা বাঞ্ছনীয়। কেননা হারামের মিসকীনদের তো হক্ আছে যেমন যবেহকৃত জন্তুতে হক রয়েছে।

জবাবে বলা যাবে, তার জায়েয হওয়াটার সাথে হারামের কোন সম্পর্ক নেই। মিসকীনদের হক এর কারণেও নয়। কেননা জন্তু যদি হারামে যবেহ করা হয়, তারপরে সেখান থেকে সেটি বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং হারাম ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে তা বিতরণ করা হয়, তাহলে জায়েয হবে। তা সত্ত্বেও তার সাথে হারামের মিসকীনদের কোন বিশেষ সম্পর্ক নেই অন্যদের অপেক্ষা। কেননা তাদেরই যদি হক্ হবে, তাহলে তারা তার দাবি করতে পারবে। তাদের যখন সে দাবি নেই, তখন সহজেই বোঝা যায় যে, তা তাদের হক-এর ব্যাপার নয়। আসলে তা একমাত্র আল্লাহর হক-এর ব্যাপার। তিনিই তা বাধ্যতামূলক করেছেন মিসকীনদের জন্য। তাদের জন্যই তা দান করতে বলেছেন। তাঁর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে। যেমন যাকাত ও অন্যান্য সাদকার সব কাজ। কিন্তু তার কোনটাই কোন একটি স্থানের জন্যে বিশেষীকৃত করা

হয়নি। উপরন্তু সেখানে রক্তপাত যখন আল্লাহর নৈকট্যের কারণ হবে না, তখন তাকে বিশেষভাবে হারামের সাথে জড়িত করা জরুরী নয়। যেমন রোযা রাখার ব্যাপারে।

এ ব্যাপারে আগের কালের ফিকাহবিদগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। হাসান, আতা, ইবরাহীম প্রমুখ বলেছেন, কেননা অপরাধের দরুন যে জন্তু যবেহ, তা মক্কাতেই হতে হবে। আর রোযা রাখা ও সাদকা দেয়ার কাজ যেখানেই ইচ্ছা করা যাবে। মুজাহিদ বলেছেন, ফিদিয়া তুমি যেখানে ইচ্ছা দিতে পার। তায়ূস বলেছেন, কুরবানী ও সাদকা মক্কায় করতে হবে। রোযা যেখানে ইচ্ছা রাখা যাবে। বর্ণিত হয়েছে, হযরত আলী (রা) হুসায়ন (রা)-এর পক্ষ থেকে একটি উট যবেহ করেছিলেন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বলে। তখন তিনি নিজে ইহরামে ছিলেন। তিনি তাঁর মাথা মুণ্ডনের আদেশ করলেন। তখন উটটি যবেহ করার আদেশ করলেন এবং বন্টন করে দিলেন। তাতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, হারাম ছাড়া অন্যত্র যবেহ করাকে তিনি জায়েয মনে করেন। কেননা হতে পারে— তিনি গোশত সাদকা করে দিয়েছেন এবং আমাদের মতে তা জায়েয।

## হজ্জ পর্যন্ত উমরার ফায়দা গ্রহণ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ -

যে ব্যক্তি হজ্জের সময় আসা পর্যন্ত উমরার ফায়দা গ্রহণ করবে ..........

আবূ বকর বলেছেন, এই 'তামাত্তু'র মধ্যে দুটি তাৎপর্য নিহিত আছে। তার একটি হল হালাল হওয়া— ইহরাম খুলে ফেলা এবং স্ত্রীদের নিকট ফায়দা গ্রহণ। আর দ্বিতীয়টি হল হজ্জের মাসসমূহে উমরাকে হজ্জ পর্যন্ত চালিয়ে নেয়া। তার অর্থ, সে দুটোরই আনুকূল্য গ্রহণ। সে জন্যে দুটি সফর গ্রহণ না করা। তা এ জন্যে যে, জাহিলিয়াতের যুগে আরবরা হজ্জের মাসসমূহে উমরা করা জানতো না। বরং তীব্রভাবে তা অস্বীকার করত, বিরোধিতা করত। ইবনে আব্বাস ও তায়ূস থেকে বর্ণনা এসেছে, সেকালের আরবদের নিকট এটা ছিল অত্যন্ত বড় পাপ ও অপরাধের কাজ। আর এই কারণেই নবী করীম (স) তাদের অভ্যাস অনুযায়ী উমরার দ্বারাই হালাল হতে বলেছিলেন, তখন ফিরে গিয়েছিলেন।

আবদুল বাকী ইবনে কানে হাসান ইবনুল মুসান্না, আফফান উহায়ব, আবদুল্লাহ ইবনে তায়ূস তাঁর পিতা ইবনে আব্বাস সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ আরবরা হজ্জের মাসসমূহে উমরা করাকে সর্বাধিক খারাপ কাজ মনে করত। মুহররম মাসকে তারা সফর মাস বানিয়ে নিত। বলত, পেছন দিক যখন বেঁচে গেল, চিহ্ন মুছে গেল এবং সফর মাস অতীত হয়ে গেল, তখন উমরাকারীর জন্যে উমরা হালাল হল। নবী করীম (স) সে মাসের চতুর্থ দিনের অতি ভোরবেলা হজ্জের ধ্বনি সহকারে পদার্পণ করলেন, তখন তিনি তাদেরকে হালাল হতে আদেশ করলেন। তখন তাদের নিকট এই ব্যাপারটি অত্যন্ত বড় হয়ে দেখা দিল। তারা বলল ঃ হে রাসূল, এটা কি রকমের হালাল হওয়া? বললেন, সর্বপ্রকারেই হালাল। বোঝা গেল, হজ্জের মাত্‌য়া এই দুটি অর্থকেই শামিল করে। হালাল হয়ে স্ত্রী সম্ভোগ মুবাহ হওয়াও তার মধ্যে রয়েছে। হজ্জের মাসসমূহে উমরা ও হজ্জ একাত্রিত করার ফায়দা গ্রহণ এবং একই সফরে দুটি কাজই করা জাহিলিয়াতের লোকেরা হালাল মনে করত না। প্রত্যেকটির জন্যে আলাদা সফর

অবলম্বন করত। উমরা করে হজ্জ পর্যন্ত 'তামাত্তু' করার মূলে রয়েছে হজ্জের মাসে দুটিই একই সফরে সম্পন্ন করা এবং এভাবে করে দুটিরই সওয়াব পাওয়ার অধিকারী হওয়া। বোঝা গেল, বেশি ফায়দা ও মর্যাদা-ফযীলত পাওয়ার সুযোগ হয় যে-লোক দুটিই একসাথে পর পর করবে।

'মাত্‌য়া' চার প্রকারের। একটা হচ্ছে 'কারেন'। হজ্জের মাসে উমরার জন্যে ইহ্‌রাম বেঁধে সেই বছরই একই সফরে হজ্জের কাজটা করা— যে লোক মসজিদে হারামের বাসিন্দা নয়, তার জন্যে করা ভালো। আর যে মনে করে যে, পরিবেষ্টিত ব্যক্তি হালাল হবে না; বরং আল্লাহ্‌র ঘর পর্যন্ত পৌঁছার অপেক্ষায় থাকবে, হজ্জ করার পর হালাল হবে। হজ্জ না করতে পারলে উমরার কাজ করবে। আর উমরা করে হজ্জ ভেঙ্গে দেবে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যে লোকই উমরা করে হজ্জ পর্যন্ত ফায়দা গ্রহণ করবে, তার জন্যে 'কুরবানীর যে জন্তু সহজ তাই যবেহ করবে' এই কথার ব্যাখ্যায় বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। ইবনে মাসঊদ (রা) ও আল-কামা বলেছেন, অর্থাৎ হাজী যদি পরিবেষ্টিত হয়, তাহলে সে কুরবানী করে ইহরাম খুলবে; তাকে উমরা ও একটি হজ্জ কাযা করতে হবে। কেননা সে এ দুটিরই ফায়দা গ্রহণ করেছে। হজ্জের মাসসমূহে সে দুটিই একসাথে করেছে একই সফরে। তাকে আর একটি পশু যবেহ করতে হবে এই তামাত্তুর জন্যে। হজ্জের মাসসমূহে উমরা করলে ও তার পর পরিবারবর্গের নিকট ফিরে এলে, পরে সেই বছরই হজ্জ করলে তাকে পশু যবেহ করতে হবে না।

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা) বলেছেন, সফর দুটি ও একটি কুরবানী অথবা কুরবানী দুটি আর সফর একটি। দুটি সফর ও একটি কুরবানী বলে বোঝানো হয়েছে, এই পরিবেষ্টিত ব্যক্তি হজ্জের মাসসমূহে হজ্জ থেকে হালাল হওয়ার পর উমরা করলেও তার পরিবারবর্গের নিকট ফিরে এলে পরে পুনরায় গিয়ে সেই বছরই হজ্জ করলে তাকে একটি কুরবানী করতে হবে। সেটা পরিবেষ্টনের কুরবানী। তা এজন্যে যে, সে তা দুটি সফরে করেছে। অথবা দুইটি কুরবানী ও একটি সফর হবে। অর্থাৎ হজ্জের মাসসমূহে উমরা করে সে তার পরিবারবর্গের নিকট ফিরে এল না। তাহলে তাকে তামাত্তুর কুরবানী করতে হবে প্রথম কুরবানী পরিবেষ্টিত হওয়ার কারণে। এই কারণে দুটি কুরবানী হয়ে যাবে আর সফর হবে একটি। ইবনে আব্বাসের একটি কথা ইবনে জুরাইজ আতা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস পরিবেষ্টন ও বাঁধাহীন সফর সংক্রান্ত দুটি আয়াতকে একত্রিত করতে বলতেন অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কথা, 'যে লোক উমরা করে হজ্জ পর্যন্ত ফায়দা গ্রহণ করবে' আয়াতকে। আতা বলেছেন, 'মাত্‌য়াতুন' বলা হয়েছে এ কারণে যে, সে হজ্জের মাসসমূহে উমরা করেছে। স্ত্রীর যৌনসুখ সম্ভোগ করবে এজন্যে এ নামকরণ হয়নি। এই কারণে ইবনে আব্বাসের মাযহাব হল, আয়তটিতে দুটি ব্যাপারই সমন্বিত। পরিবেষ্টিত লোকেরা যখন উমরার সাথে হজ্জ কাযা করার উচ্ছা করবে— যে উমরা করতে না পারার দরুন হারিয়ে গিয়েছিল বলে তা করা বাধ্যতামূলক হয়েছিল। আর অপরিবেষ্টিত লোকদের মধ্যে যারা উমরা করে হজ্জ পর্যন্ত ফায়দা পেতে চায়, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদের মতে তারা পরিবেষ্টিত লোকদের সাথে এক কাতারে যুক্ত হবে না। বুঝতে হবে, তাদের সম্পর্কেই কথা বলা হয়েছে। তাতে হারানোর কারণে উমরা ওয়াজিব হওয়ার ফায়দা পাওয়া যাবে। এই হুকুমও দেয়া যাবে যে, হারানো হজ্জ হজ্জের মাসের একই সফরে কাযা করার সঙ্গে উমরাকে একত্রিত করলে তাকে একটা জন্তু যবেহ করতে হবে। যদি দুই সফরে করা হয়, তাহলে পশু যবেহ করতে হবে না। এ ব্যাপারে ইবনে মাসঊদের মাযহাব ইবনে আব্বাসের

কথার পরিপন্থী নয়। তবে ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আয়াতটিতে পরিবেষ্টিত ও অপরিবেষ্টিত উভয় সম্পর্কে সাধারণভাবেই কথা বলা হয়েছে। তাতে বিশেষভাবে পরিবেষ্টিত লোকেরা সংশ্লিষ্ট, যেমন ইবনে মাসউদ উল্লেখ করেছেন। আর অ-পরিবেষ্টিত লোকেরাও তাতে শামিল এ হিসেবে যে, তাদের জন্যে 'তামাত্তু' জায়েয। তারা যখন তামাত্তু করবে, তখন তারাও এর মধ্যে পড়বে। ইবনে মাসউদ বলেছেন ঃ আয়াতটির কথার ধরন বিশেষভাবে নির্দিষ্ট পরিবেষ্টিত লোকদের জন্যে। যদিও অ-পরিবেষ্টিত লোকেরা যখন 'তামাত্তু' করবে, তখন তাদের মধ্যেই পড়ে যাবে। আর 'কারেন' হচ্ছে, হজ্জের মাসসমূহে যে উমরা করবে, সেই বছরই একই সফরে যে হজ্জ-ও করবে। তারা দুজনই তামাত্তুকারী দুই দিক দিয়ে। একটি দিক, সে দুটিকে একই সফরে একত্রিত করার সুবিধা পেয়েছে। আর দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, দুটিকে একত্রিত করার ফযীলত লাভ । এ থেকে বোঝা যায়, তা ইফরাদ-এর তুলনায় উত্তম। 'ইফরাদে' প্রত্যেকটির জন্যে আলাদা সফর করতে হয় কিংবা দুটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পার্থক্য সহকারে পালন করা হয়। তাতে উমরা করা হয় হজ্জের মাসসমূহ ছাড়া অন্য সময়ে।

নবী করীম (স)-এর সাহাবীগণ থেকে এই 'মাত্য়া' পর্যায়ে বহু কয়টি বর্ণনা এসেছে। সে সব বর্ণনার বাহ্যিক দিক দিয়ে তার মুবাহ হওয়া পর্যায়ে ভিন্নমত হয়েছে। 'মাত্য়া' অর্জিত হয়ে গেলে মতপার্থক্যটা হবে তার সর্বোত্তম হওয়া পর্যায়ে, নিষেধের পর্যায়ে নয়। মুবাহ হওয়ার পর্যায়েও নয়। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব, উসমান ইবনে আফফান, আবূ যর আল-গিফারী (রা) দহাক ইবনে কায়স থেকে এ বিষয়ে নিষেধ বাণী বর্ণিত হয়েছে। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াসেতী, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ, ইবনুল ইয়ামন আল-মুয়াদ্দিব, আবূ উবায়দ, ইবনে আবূ মরিয়ম, মালিক ইবনে আসান, ইবনে শিহাব, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে নওফল, সাদ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস ও দহাক ইবনে কায়স সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, মুআবিয়া (রা) হজ্জ করার বছর বলেছেন— তাঁরা দুজন উমরা করে হজ্জ পর্যন্ত 'তামাত্তু' করার আলোচনায় দহাক বলেছেন, আল্লাহ্র আদেশ যারা ভুলে যায়নি তাদের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। সাদ বলেছেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র, তুমি অত্যন্ত খারাপ কথা বললে। দহাক বললেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব তা করতে নিষেধ করেছেন। সাদ বললেন, রাসূলে করীম (স) নিজে তা করেছেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে থেকে তাই করেছি।

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াসেতী, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ইয়ামন, আবূ উবায়দ, হাজ্জাজ, শুবা কাতাদাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি জরীর ইবনে কুশায়বকে একথা বলতে শুনেছেন যে, তিনি হযরত উসমানকে এই 'মাত্য়া' গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু হযরত আলী (রা) তা করতে আদেশ করতেন। পরে আমি হযরত আলী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আপনাদের দুজনার মধ্যে একটা খারাপ জিনিস ঢুকে পড়েছে। আপনি 'মাত্য়া' গ্রহণ করতে আদেশ করেন। আর হযরত উসমান (রা) তা করতে নিষেধ করেন। তখন হযরত আলী (রা) বললেন, না, আমাদের দুজনের মধ্যে ভালো সম্পর্ক আছে। বরং আমাদের দুজনের জন্যেই কল্যাণ এখানে যে, আমরা দুজন এই একই দ্বীনের অনুসরণকারী।

হযরত উসমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তা করতে ঠিক নিষেধ করেন নি। তিনি বরং ইখতিয়ার আছে বলেছেন। তার কয়েকটি অর্থ, একটি ফযীলত। যেন হজ্জটা তার জন্যে জানা ও পরিচিত মাসে সম্পন্ন হয়। আর উমরা অন্য যে কোন সময়ে করা হয়। আর দ্বিতীয়, আমি তো আল্লাহ্র ঘরে বেশি বেশি আবাদ হওয়া ভালোবাসি, পছন্দ করি। অন্যান্য মাসসমূহে তার

যিয়ারতকারী লোক বেশি বেশি আসুক, তাই চাই। আর তৃতীয়— তিনি মনে করেন, হারামবাসীদের নিকট বেশি লোক আসার দরুন তাদের সুবিধা বিপুল হোক।

এই কথা হাদীসের বর্ণনা থেকেও প্রমাণিত হয়। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-মুয়াদ্দিব, আবুল ফযল, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ইয়ামন আল-মুয়াদ্দিব, আবূ উবায়দ, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ, উবায়দুল্লাহ্ নাফে ইবনে উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব বলেছেন ঃ

اَنْ تَفَرِّقُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَتَجْعَلُوا الْعُمْرَةَ فِىْ غَيْرِ اَشْهُرِ الْحَجِّ اَتَمُّ الْحَجُّ اَحَدُكُمْ وَاَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ -

তোমরা যদি হজ্জ ও উমরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কর, তাহলে তোমরা উমরা করবে হজ্জের মাসসমূহ বাদ দিয়ে অন্য সময়ে। তাহলে তোমাদের হজ্জ পূর্ণ হবে, আর উমরাও সে নিজের জন্যে সম্পূর্ণ করে নেবে।

আবূ উবায়দ বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালিহ লাইস, উকাইল, ইবনে শিহাব, সালিম, আব্দুল্লাহ্ তাঁর পিতার সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, হযরত উমর (রা) বলতেন, আল্লাহ বলেছেন ঃ 'তোমরা হজ্জ ও উমরা আল্লাহ্‌র জন্যে সম্পূর্ণ কর।' বলেছেনঃ 'হজ্জ কয়েকটি জানা মাসে সম্পন্ন হয়।' অতএব হজ্জের মাসসমূহকে শুধুমাত্র হজ্জের জন্যে একান্ত করে রাখ। আর সে কয়টি মাস বাদ দিয়ে অন্য সময়ে তোমরা উমরা করবে।'

তার কারণ হচ্ছে, হজ্জের মাসসমূহে উমরা করলে কুরবানী করতে হবে, অন্যথায় তার উমরা সম্পূর্ণ হবে না। আর হজ্জের মাস ছাড়া অন্য সময়ে যারা উমরা করবে, তার উমরা সম্পূর্ণ হবে। তখন কুরবানী করা হবে নফল, ওয়াজিব নয়। এই হাদীসে দুটির মধ্যে পার্থক্য করার ইখতিয়ারের দিকটিকে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে।

আবূ উবায়দ বলেছেন, আবূ মুআবিয়া হিশাম, উরওয়াতা, তাঁর পিতা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, হজ্জের মাসসমূহে উমরা করাকে হযরত উমর অপছন্দ করেছেন শুধু এজন্যে যে, হজ্জের মাসসমূহ ছাড়া অন্যান্য সময় আল্লাহ্‌র ঘর জনহীন হয়ে না পড়ে। এ হাদীসে আর একটি কারণের উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হল হজ্জ ও উমরা দুটি ভিন্ন ভিন্নভাবে করা ও এক সঙ্গে না করা।

আবূ উবায়দ আরও বলেছেন, হুশায়ম, আবূ বশর, ইউসূফ ইবনে মাহিক সূত্রে বলেছেন, হযরত উমর 'মাত্‌য়া' নিষিদ্ধ করেছেন মক্কাবাসীদের অবস্থানের জন্যে যেন বছরে দুইটি মওসুম হয়। মক্কাবাসীরা এ দুটি মওসুম ছাড়া বিশেষভাবে উপকৃত হবে। এ হাদীস অনুযায়ী তিনি এ নীতি গ্রহণ করেছিলেন শুধু মক্কাবাসীদের ফায়দা ও কল্যাণের জন্যে। হযরত উমর থেকে অন্য সময় 'মাত্‌য়া' গ্রহণের সংবাদ জানা গেছে। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ ইয়ামন, আবূ উবায়দ, আবদুর রহমান ইবনে মাহ্দী, সুফিয়ান, সালমা ইবনে কুহায়ল, তায়ূস ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, হযরত উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি যদি উমরা করি, তার পর উমরা করি, তার পর উমরা করি, তার পর হজ্জ করি, তা হলে আমি অবশ্যই মাত্‌য়া গ্রহণ করব। এ হাদীসে তাঁর 'মাত্‌য়া' গ্রহণের খবর রয়েছে।

এ থেকে প্রমাণিত হল, মাত্‌য়ার ব্যাপারে তার সম্পর্কে যে সব বর্ণনা এসেছে তা এক মক্কাবাসীদের জন্যে কল্যাণ গ্রহণ স্বরূপ ছিল না, অন্য বার আল্লাহ্‌র ঘরের জন্যে ছিল না। এ দুটির প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্র ও এককভাবে করার উত্তম হওয়ার ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে অথবা কেরান, কিংবা 'তামাত্তু'। হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, 'কেরান' হজ্জ উত্তম। তার পরে 'তামাত্তু' হজ্জ এবং তার পরে 'ইফরাদ' হজ্জ আলাদা-আলাদাভাবে করা।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ইফরাদ হজ্জ উত্তম। কেরান ও তামাত্তু দুটিও ভালো। উবায়দুল্লাহ নাফে ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, শওয়াল অথবা যিলকদ কিংবা যিলহজ্জ প্রভৃতি যে মাসে উমরা করলে আমার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব হয়, তা আমার নিকট অধিক প্রিয় সেই মাসে উমরা করার তুলনায়, যে মাসে উমরা করলে আমার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব হয় না।

কায়স ইবনে মুসলিম তারিক ইবনে শিহাব থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)-কে একজন মেয়েলোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যে তার হজ্জের সাথে উমরা একত্র করে পালন করার ইচ্ছা করেছে। জবাবে তিনি বললেন ঃ শোন, আল্লাহ্ বলেছেন, হজ্জ-এর মাসসমূহ জ্ঞাত। আমি মনে করি, হজ্জের মাসসমূহ সম্পর্কেই এই কথা বলা হয়েছে।

কিন্তু এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় না যে, তিনি ইফরাদ হজ্জকে তামাত্তু ও কেরান হজ্জের তুলনায় উত্তম মনে করতেন। হতে পারে, তার এই কথার তাৎপর্য হচ্ছে সে সব মাসের কথা বলা, যাতে হজ্জ ও উমরা একসাথে করা সহীহ্। আলী কররামাল্লাহু অজহাহু বলেছেন, উমরা সম্পূর্ণ হতে পারে, 'তুমি তোমার ঘর থেকেই ইহ্‌রাম বাঁধবে।' এ থেকে বোঝা যায়, তামাত্তু ও কেরান হজ্জের কথাই বলেছেন, যা উমরা দিয়ে শুরু হয় নিজের ঘর থেকে ইহ্‌রাম বেঁধে খালেসভাবে, তার সাথে হজ্জকে মেলাবে না। বলেছেন, কেননা নিজের ঘর পরিবার থেকে যদি ইহ্‌রাম বাঁধে তা হলে তা নবীর সুন্নাতের পরিপন্থী হয়ে যাবে। কেননা নবী করীম (স) তো মীকাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটা প্রত্যাহারযোগ্য। কেননা হযরত আলী (রা)-র এই কথাটা বর্ণিত হয়েছে, তা সম্পূর্ণ হয়, যদি তুমি দুটির জন্যেই তোমার ঘর থেকে ইহ্‌রাম বেঁধে বের হও। নিজের ঘর থেকে দুটির জন্যেই ইহ্‌রাম বাঁধার ব্যাপারে এটি একটি অকাট্য দলীল। এ কাজকে সুন্নাতের পরিপন্থী বলা নেহায়েত একটি ধারণা মাত্র। কেননা মক্কায় প্রবেশ করার ইচ্ছা যে করবে, তাকে ইহ্‌রাম না বেঁধে কাবার নিকটে যেতে নিষেধ করা হয়েছে রাসূলের সুন্নাতে। মীকাত-এর আগেই ইহ্‌রাম বাঁধার ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে কোন মতপার্থক্যই নেই।

বর্ণিত হয়েছে আল-আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ বলেছেন, আমরা আম্মারকে বের করে আনলাম। আমরা যখন ফিরে এলাম, তখন আবূ যর-এর নিকটে গেলাম। তিনি বললেন, তোমরা কি অবিন্যস্ত আলুথালু চুল মুণ্ডন করেছ এবং ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করেছ? তবে উমরা তোমাদের বাসস্থান থেকেই।

আবূ উবায়দ এ কথার ব্যাখ্যা দিয়েছেন হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসেরই আলোকে। আবূ যর (রা) বলতে চেয়েছেন যে, নিজের ঘর-পরিবার থেকে উমরা সূচিত হওয়াই উত্তম। হযরত আলী (রা) এই উমরাকেই সম্পূর্ণ উমরা বলেছেন। বলেছেন, তোমার নিজের পরিবারবর্গের বাসস্থান থেকে ইহ্‌রাম বেঁধে রওয়ানা হলেই ইহ্‌রাম সম্পূর্ণ হয়। নবী করীম (স)

থেকে মুতাওয়াতির হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি হজ্জ ও উমরার কেরান করেছেন। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াসেতী, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল ইয়ামন, আবূ উবায়দ, আবূ মুআবিয়া, আমাশ আবূ ওয়েল সবি ইবনে মাবাদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, সবি ইবনে মাবাদ খ্রীস্টান ছিলেন। পরে ইসলাম কবুল করেছেন। পরে তিনি জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। তাঁকে বলা হল যে, তুমি হজ্জ থেকেই জিহাদ শুরু কর। পরে তিনি আবূ মূসা আল-আশআরীর কাছে এলেন। তিনি তাকে হজ্জ ও উমরার জন্যে একসাথে ইহরাম বাঁধতে বললেন। তিনি তাই করলেন। যখন তিনি দুটিরই ধ্বনি দিতেছিলেন, তখন সেখানে জায়দ ইবনে সুহান ও সালমান ইবনে রবীআতা উপস্থিত হল। তাঁদের একজন বললেন, এই ব্যক্তি তার উটের অপেক্ষা অধিক পথহারা— গুমরাহ। সবি এই কথা শুনতে পান। কথাটি তার উপর ভারী হয়ে দাঁড়ায়। পরে তিনি যখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট উপস্থিত হল, উমর বললেন, ওরা কিছুই বলছিল না। তোমাকে তোমার নবীর সুন্নাতের কথাই বলা হয়েছে।

আবূ উবায়দ বলেছেন, ইবনে আবূ জায়দ, হাজ্জাজ ইবনে আরতাদ, হাসান ইবনে সাঈদ ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আবূ তালহা আমাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলে করীম (স) হজ্জ ও উমরা এক সাথে করেছেন।

বলেছেন, আবূ উবায়দ হাজ্জাজ ইবনে শুবা, হুমায়দ ইবনে হিলাল, মতরফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে শুখাইর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ইমরান ইবনুল হুসায়ন বলেছেন, নবী করীম (স) হজ্জ ও উমরা একত্রে আদায় করেছেন। পরে তিনি তা করতে নিষেধ করেননি এবং এভাবেই তিনি দুনিয়া থেকে চলে যান। কুরআনেও তা হারাম করা হয়নি।

বলেছেন, আবূ উবায়দ হুশাইম, হুমাইদ বকর ইবনে আব্দুল্লাহ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি আব্বাস ইবনে মালিককে বলতে শুনেছি, রাসূলে করীম (স)-কে হজ্জ ও উমরার তালবিয়া পড়তে আমি শুনেছি।

বকর বলেছেন, ইবনে উমর (রা)-কে আমি এই হাদীস শুনিয়েছি। তিনি বললেন, না তিনি কেবল মাত্র হজ্জের তালবিয়া পড়েছেন। বকর বলেছেন, আমি আনাস ইবনে মালিককে ইবনে উমরের কথা বলেছি। তিনি বললেন, আমাদের বালকরাই আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে। আমি তো রাসূল (স)-কে হজ্জ ও উমরার 'তালবিয়া' একত্রে করতে শুনেছি।

আবূ বকর বলেছেন, হতে পারে, ইবনে উমর রাসূলে করীম (স)-কে শুধু হজ্জের তালবিয়া করতে শুনেছেন। আর হযরত আনাস অপর এক সময়ে হজ্জ ও উমরার এক সাথে তালবিয়া করতে শুনেছেন। তা ছিল কারেন হজ্জ। আর কারেন হজ্জকারীর পক্ষে একবার উমরা ও হজ্জের তালবিয়া করা ও অপর বার শুধু হজ্জের তালবিয়া করা জায়েয। ইবনে উমরের হাদীসে আনাস বর্ণিত হাদীসের বিপরীত কিছু নেই। হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলে করীম (স) চারবার উমরা করেছেন। তার মধ্যে একবার বিদায় হজ্জ-এর সময়ে। ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাসীর ইকরামা ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি তখন 'আকীক' উপত্যকায় অবস্থান করছিলেন। আমার নিকট বিগত রাতে আমার রব্ব-এর নিকট থেকে একজন আগমনকারী এসে বলেছেন, এই মুবারক উপত্যকায় তুমি নামায পড় এবং হজ্জ ও উমরার কথা বল। একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, 'উমরা হজ্জের মধ্যে'। হযরত জাবির প্রমুখ বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (স)-তাঁর সাহাবীগণকে তাদের হজ্জকে উমরা বানাতে আদেশ

করেছেন। বলেছেন, আমার যে কাজ পিছনে করেছি, তা যদি আগে করতাম, তাহলে কুরবানীর জন্তু কখনই চালাতাম না, তাকে উমরা বানাতাম। হযরত আলী (রা)-কে বলেছেন, আপনি এখন কিসের ধ্বনি দিলেন ? বললেন, যেমন নবী করীম (স) ধ্বনি দিয়েছেন, তেমনি ধ্বনি আমিও দিয়েছি। পরে বলেছেন, আমি কুরবানীর জন্তু চালিয়ে দিয়েছি। কুরবানীর দিন পর্যন্ত আমি হালাল হব না। তাঁর এই কুরবানী যদি তামাত্তু ও কেরান-এর কুরবানী না হতো, তাহলে তিনি হালাল হওয়া থেকে বিরত থাকতেন না। কেননা নফল কুরবানীর জন্যে কোন সময় নির্দিষ্ট নেই, যে কোন সময়ই তা যবেহ করা যায় কুরবানীর দিনের আগে।

এই সব হাদীস প্রমাণ করে যে, নবী করীম (স) কারেন হজ্জ করেছিলেন। তিনি 'ইফরাদ' হজ্জ করেছেন বলে যে বর্ণনা এসেছে, তা একথার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। তার কয়েকটি দিক রয়েছে। প্রথম, যেসব হাদীসের বর্ণনায় 'কেরান' হজ্জের উল্লেখ এসেছে, তা খুব প্রসিদ্ধ ও বহুল প্রচারিত নয়। দ্বিতীয়, 'ইফরাদ' হজ্জের বর্ণনাকারী অধিক সংখ্যক এমন, যারা রাসূল (স)-কে শুধু হজ্জ-এর তালবিয়া পড়তে শুনেছেন বলে দাবি করেছেন। এই কথা তাঁর 'কারেন' হজ্জকারী হওয়ার পরিপন্থী নয়। আর তৃতীয়, বর্ণনার দিক দিয়ে এ দুটির বর্ণনা সমান মানের হলেও এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, বেশী লোকের বর্ণনা উত্তম হবে। আর আমরা যা বলেছি, তাতে যখন প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (স) 'কেরান' হজ্জকারী ছিলেন। আর নবী করীম (স)-তো বলেই দিয়েছেন ঃ خُذُوْا عَنِّىْ مَنَاسِكَكُمْ 'তোমাদের হজ্জ কুরবানীর নিয়মাদি আমার নিকট থেকে নাও' তখন রাসূলে করীম (স)-কে অনুসরণ ও অনুকরণ করাই সর্বোত্তম— সব চাইতে ভালো, তাতে আর সন্দেহ কি, তাঁর এই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর করা কাজটা ঠিক সেইভাবে সেই কাজ করাটাই তো অধিক ভালো। আল্লাহ তা'আলাও তাঁকে অনুসরণ করতে আদেশ করেছেন। আরও বলেছেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ -

তোমাদের জন্যে আল্লাহ্র রাসূলের জীবনে উত্তম আদর্শ রয়েছে। (সূরা আহযাব ঃ ২১)

নবী করীম (স) নিজে তো শুধু সর্বোত্তম ও সর্বাধিক ভালো কাজসমূহই করেছেন। এতেই দলীল রয়েছে একথার যে, 'কেরান' হজ্জ তামাত্তু ও ইফরাদ হজ্জের অপেক্ষা অনেক ভালো। তাতে কুরবানীর বাড়তি ব্যবস্থাও রয়েছে। কেননা 'কেরান' হজ্জে যে পশু যবেহ করতে হয়, আমাদের মতে তা কুরবানীরই পশু যবেহ। তাতে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ হয়। তার গোশত খাওয়া যায়, যেমন কুরাবনীর গোশত। তার দলীল হচ্ছে আল্লাহ্র কথা ঃ

فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ - ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ -

তোমরা সে কুরবানীর জন্তুর গোশত নিজেরা খাও, সর্বহারা ফকীর-গরীবকে খাওয়াও। পরে তারা যেন তাদের ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করে, তাদের মানতসমূহ পূর্ণ করে এবং কাবা ঘরের তওয়াফ করে। (সূরা হজ্জ ঃ ২৮-২৯)

এসব সুবিন্যস্ত হতে পারে কেবল মাত্র কেরান ও তামাত্তু হজ্জের কুরবানীতে। আল্লাহ্র কথা যে লোক উমরা থেকে হজ্জ পর্যন্ত ফায়দা লাভ করবে, এতেও তারই দলীল রয়েছে। আমরা

বলেছি তামাত্তু হজ্জের একটা নাম হতে পারে। কেননা তাতে হজ্জ ও উমরা একত্রে করার দরুন একটা ফায়দা অবশ্যই পাওয়া যায়। তাতে একটা বিশেষ ফযিলত রয়েছে। তাতে দুটি কাজ করার সুবিধা পাওয়া যায় একই সফরে, আর একটা সফরে না গিয়েও। আর তা হচ্ছে, দুটি এক সাথে করা। তাই আয়াতটির তাৎপর্যে এই দুটি অর্থ-ই নিহিত থাকতে পারে। তাতে 'কেরান' ও 'তামাত্তু' দুটিই শামিল হয় দুটি দিক দিয়ে। একটি— দুটি একত্রে করার ফযিলত। আর দ্বিতীয়— দ্বিতীয় একটা সফর না করেই দুটি একত্রে করার সুবিধা। এই 'মাত্‌য়া' বিশেষভাবে এই হজ্জের জন্যে নির্দিষ্ট। তা-ও অবশ্যই সেই লোকদের জন্যে যারা মসজিদুল হারামে সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকা বাসিন্দা নয়। কেননা আল্লাহ্‌ই বলে দিয়েছেন ঃ

ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ –

এই সুবিধা ও ফযিলত কেবল তাদের জন্যে যাদের পরিবার মসজিদে হারামে উপস্থিত নেই।

যাদের বাসস্থান মীকাতসমূহে ও মক্কার কাছাকাছি, তাদের জন্যে তামাত্তু ও কেরান হজ্জ নয়। এটাই হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদদের কথা। কাজেই তারা যদি 'কেরান' বা 'তামাত্তু' হজ্জ করে, তবে তারা ভুল করবে, তাদেরকে সেজন্যে একটা পশু যবেহ করতে হবে। কিন্তু তার গোশত খেতে পারবে না। কেননা তা মাত্‌য়ার পশু যবেহ নয়। তা হচ্ছে অপরাধের দণ্ড হিসেবে পশু যবেহ। যেসব লোক উক্ত এলাকাসমূহের বাসিন্দা তাদের জন্যে 'মাত্‌য়া' নেই। নেই উপরোক্ত আয়াতের কারণে। ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّمَا التَّمَتُّعُ رُخْصَةٌ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ –

তামাত্তু কেবলমাত্র তাদের জন্যে বিধিবদ্ধ যাদের পরিবারবর্গ মসজিদে হারামে উপস্থিত নেই।

অন্যরা বলেছেন, তার অর্থ হচ্ছে যার পরিবারবর্গ মসজিদে হারামে উপস্থিত নেই, তামাত্তু হজ্জ করলে তাকে পশু যবেহ করতে হবে না। তাদের জন্যে কুরবানী ছাড়াই তামাত্তু হজ্জ করা জায়েয। কিন্তু আয়াতটির বাহ্যিক অর্থ তাদের উক্ত কথার বিপরীত প্রমাণ করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'এটা করা তাদের জন্যে জায়েয যাদের পরিবার মসজিদে হারামে উপস্থিত নয় অর্থাৎ 'মাত্‌য়া' তাদের জন্যে। কুরবানীর জন্তুর কথা নয়। যদি তা হতো তাহলে তা-ই বলা হতো।

যদি বলা হয়, তার অর্থ হতে পারে, যাদের পরিবার মসজিদে হারামে উপস্থি নেই, তা তাদের জন্যে। কেননা মূল ভাষায় لام কে على অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। যেমন অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ –

তাদের জন্যে অভিশাপ এবং তাদের জন্যে অত্যন্ত খারাপ স্থান। (সূরা রা'দ ঃ ২৫)

এই 'তাদের জন্যে' অর্থ তাদের উপর ধার্য।

জবাবে বলা যাবে, কোন শব্দকে তার আসল অর্থ থেকে সরিয়ে নেয়া এবং তার পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করা সঙ্গত নয়। কোন দলীলের ভিত্তিতে তা করা হলে ভিন্ন কথা।

এ ধরনের প্রতিটি শব্দ বা অক্ষরের একটা প্রকৃত অর্থ আছে, যার জন্যে সে শব্দটি বানানো হয়েছে। কাজেই إلى কে على অর্থে গ্রহণ করা তার আসল অর্থটিকেই নষ্ট করে দেয়ার শামিল। কোন দলীল ছাড়া এরূপ করা জায়েয হতে পারে না। তাছাড়া তামাত্তু সারা দুনিয়ার মানুষের সকলের জন্যেই সঙ্গত, সকলেরই তা করার অধিকার আছে। কেননা এটা আল্লাহ্‌র দেয়া হালকা ব্যবস্থা— বোঝা হালকাকরণ এবং প্রত্যেকটির জন্যে আলাদা-আলাদা সফর গ্রহণের কষ্ট লাঘবকরণ। একটি সফরে দুটো কাজই করার সুবিধা দান। তা সকল ক্ষেত্রে, সব ব্যাপারে। কেননা তা করতে নিষেধ করা হলে তার পরিণতিতে কঠিন কষ্ট ও ক্ষতির উদ্রেক করা হবে। অথচ মক্কাবাসীদের কোন কষ্ট নেই, নেই কোন ক্ষতি যদি তারা হজ্জের মাসসমূহ ছাড়া অন্য মাসে উমরা করে।

এ থেকে এ-ও বোঝা যায় যে, 'তামাত্তু' নামটি দাবি করে হজ্জ ও উমরা এক সফরে করতে পারার সুবিধা লাভ, উমরার জন্যে স্বতন্ত্র সফর অবলম্বনের বাধ্যবাধকথা প্রত্যাহার। এই ব্যাখ্যাই মনীষিগণ দিয়েছেন। যেমন কেউ যদি মানত করে আল্লাহ্‌র ঘর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাওয়ার, তখন যদি সে যানবাহনে চড়ে যায়, তাহলে তাকে একটা পশু যবেহ করতে হবে। কেননা সে যানবাহন ব্যবহারের সুবিধা গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই যবেহকৃত জন্তুর গোশত খাওয়া যাবে না। অথচ মাত্‌য়ার জন্যে যবেহ করা জন্তুর গোশত খাওয়া য়ায়। এইদক দিয়ে দুটির মধ্যকার পার্থক্য আমাদের পূর্বে উল্লেখ করা দিকের সামঞ্জস্যশীল হওয়া নিষেধ করে না। তায়ূস থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, মক্কাবাসীদের জন্যে 'মাত্‌য়া' নেই— তারা তামাত্তু হজ্জ করতে পারবে না। যদি তারা তা করে এবং হজ্জও করে ফেলে, তাহলে তাদের উপর তা-ই ধার্য হবে যা অন্যান্য লোকের উপর ধার্য হবে। অন্য কথায় তাদেরকে কুরবানী করতে হবে। এ কুরবানীটা হবে অপরাধের দণ্ড স্বরূপ। ইবাদতের কুরবানী নয়। প্রাচীন কালীন মনীষিগণ ও পরবর্তীকালের আলিমগণ একমত হয়ে বলেছেন, তামাত্তুকারী হবে এভাবে যে, হজ্জের মাসসমূহে উমরা করবে ও সেই বছরই হজ্জও করবে। এই বছরই যদি উমরা করে ও হজ্জ না করে, হজ্জ করে তার পরবর্তী বছর, তাহলে সে তামাত্তুকারী হল না। তাকে কুরবানীও দিতে হল না।

যে লোক হজ্জের মাসসমূহে উমরা করল, পরে সে তার ঘরে ফিরে এল, পরে সেই বছরই হজ্জও করল, এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণ নানা মত প্রকাশ করেছেন। অধিকাংশ লোক বলেছেন, সে তামাত্তু হজ্জকারী হবে না। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, আতা, তায়ূস, মুজাহিদ, ইবরাহীম, আল-হাসানের দুটি কথার একটিতে উক্ত মত দিয়েছেন। হানাফী ও সাধারণ ফিকাহবিদগণও এই মত প্রকাশ করেছেন। আশ্‌ আস আল-হাসানের এই মত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, হজ্জের মাসসমূহে যে-লোক উমরা করল, পরে সেই বছরই হজ্জও করল, সে তামাত্তু হজ্জকারী হবে। সে নিজ ঘরে ফিরে আসুক, আর নাই-ই আসুক।

কিন্তু প্রথম কথাটির সত্যতা প্রমাণিত হয় এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে মক্কাবাসীদের জন্যে 'মাত্‌য়া'র ব্যবস্থা করেন নি। তা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করেছেন দুনিয়ার অন্যান্য সব মানুষের জন্যে। আর তার অর্থ হচ্ছে, উমরা করার পর হালাল হয়ে নিজ নিজ পরিবারের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ দান। অবশ্য যারা তাদের পরিবারবর্গের নিকট ফিরে যাবে, এটা কেবল তাদেরই জন্যে। তাহলে-ই না উমরার পর তাদের পরিবারবর্গের সাথে মিলিত হওয়া সম্ভবপর। যদি তারা না যায়, তাহলে তারাও মক্কাবাসীদেরই মত হয়ে যাবে। উপরন্তু তামাত্তুকারীদের জন্যে আল্লাহ জন্তু যবেহ করা বাধ্যতামূলক করেছেন। কেননা তারা

দুটি সফরের পরিবর্তে একটি সফরের সুযোগ পাচ্ছে। হ্যাঁ, দুটি কাজের জন্যে দুটি সফরের পরিবর্তে একই সফরে যদি দুটি কাজ-ই সম্পন্ন করে, তা হলে জন্তু যবেহ অপর কোন জিনিসের স্থলাভিষিক্ত হবে না। তখন জন্তু যবেহ করা ওয়জিব হবে না।

যে লোক উমরা করে নিজের পরিবারের নিকট ফিরে আসবে না, বরং সে মক্কায় না থেকে তার বাইরে— এমনকি 'মীকাত' ছাড়িয়েও বাইরে চলে যায়, তার সম্পর্কে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, সেই বছরই যদি সে হজ্জ করে, তা হলে সে তামাত্তু হজ্জকারী হবে। কেননা সে উমরা করার পর তার পরিবারবর্গের সাথে মিলিত হয়নি। ফলে তার অবস্থা এই হবে যে, সে যেন মক্কারই একজন। ইমাম আবূ ইউসূফ থেকে বর্ণিত হয়েছে, সে তামাত্তুকারী হবে না। কেননা এক্ষণে তার মীকাত হবে তার নিজের দেশের লোকদের জন্যে নির্দিষ্ট মীকাত। তার ও মক্কাবাসীদের মধ্যে মীকাতই পার্থক্যকারী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে যেন তার পরিবারবর্গের নিকটই ফিরে গেছে, মনে করতে হবে।

কিন্তু প্রথমোক্ত কথাটিই সহীহ্। তার কারণসমূহ পূর্বেই আমরা বলেছি।

যে লোক রমযান মাসে নতুন করে উমরা করবে এবং শওয়াল মাসে কিংবা তার পূর্বেই মক্কায় প্রবেশ করবে, এই রূপ অবস্থায় কাতাদাহ্ ইবনে ইয়াজের এই কথা বর্ণনা করেছেন যে, তার উমরা সেই মাসেই গণ্য হবে, যে মাসে সে 'লাব্বাইকা' ধ্বনি উচ্চারণ করবে। আল-হাসান ও আল-হিকাম বলেছেন, তার উমরা সেই মাসের গণ্য হবে, যে মাসে সে হালাল হবে। ইবরাহীম নখয়ীরও এই মত বর্ণিত হয়েছে। আতা ও তায়ূস বলেছেন, তার উমরা সেই মাসের গণ্য হবে, যে মাসে সে হারাম শরীফে প্রবেশ করেছে। হাসান ও ইবরাহীম থেকে অপর একটি বর্ণনা এসেছে, তাতে তারা দুজন বলেছেন, তার উমরা সেই মাসে গণ্য হবে যে মাসে সে আল্লাহ্‌র ঘরের তওয়াফ করেছে। মুজাহিদেরও এই মত। হানাফী ফিকাহবিদগণও তাই বলেছেন। তার তওয়াফই গণ্য হবে। যদি বেশীর ভাগ তওয়াফ সে রমযান মাসেই করে ফেলে তা হলে সে তামাত্তুকারী হবে না। যদি বেশীর ভাগ তওয়াফ শওয়াল মাসে করে, তবে সে মাতাত্তুকারী হবে। তা এজন্যে যে, তাদের মূল কথা হল, বেশির ভাগ কাজ তাতে বিপর্যয় সৃষ্টির প্রতিরোধ পর্যায়ে সমগ্র কাজের স্থলাভিষিক্ত। তার উমরা যদি রমযান মাসেই সম্পূর্ণ হয়ে যায়, তা হলে সে হজ্জ ও উমরাকে হজ্জের মাসসমূহে একত্রিত করল না। ইহরাম তখনও টিকে থাকলে তার কোন মূল্য নেই। যেমন যদি সে উমরার জন্যে ইহরাম বাঁধে, পরে তা ভঙ্গ করে, পরে সে তা থেকে হালাল হয়ে যায়, পরে সেই বছরই সে হজ্জ করে, তা হলে সে তামাত্তু হজ্জকারী হবে না। কেননা তার উমরা হজ্জের মাসসমূহে হয়নি। যদিও তার দুটি ইহরাম হজ্জের মাসসমূহে হয়েছে। অনুরূপভাবে যদি 'কেরান' করে, পরে সে তার উমরার তওয়াফ করার পূর্বেই আরাফাতে অবস্থান করে, তা হলে সে তামাত্তু-হজ্জকারী হবে না। হজ্জের মাসসমূহে তার দুটি ইহরাম একত্রিত হওয়া হিসেবে গণ্য হবে না। হজ্জের উমরার কাজ সম্পন্ন করা হলে সেটাই গণ্য হবে। এটা তারই মতো কথা, যে বলেছে তার উমরা সে মাসেই গণ্য হবে, যে মাসে সে 'লাব্বাইকা' ধ্বনি উচ্চারণ করেছে, এই কথার কোন তাৎপর্য নেই। ইতিপূর্বে আমরা বলেছি যে, ইহরাম বাঁধার পর কাজ করা না হলে তা গণ্য করা হবে না।

## মসজিদে হারামে উপস্থিত লোকদের সম্পর্কে বিভিন্ন মত

আবূ বকর বলেছেন, মনীষিগণ এই পর্যায়ে চারটি দিক দিয়ে মতের বিভিন্নতা প্রকাশ

করেছেন। আতা ও মকহুল বলেছেন, নির্দিষ্ট মীকাত থেকে মক্কা পর্যন্ত এলাকার বাসিন্দারাই হচ্ছে মসজিদে হারামে উপস্থিত লোক। হানাফী ফিকাহবিদগণও এই মত দিয়েছেন। তবে তাঁরা বলেছেন, মীকাতের স্থানের লোকেরাও এই পর্যায়ে গণ্য। ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বলেছেন, মসজিদে হারামে উপস্থিত লোক বলে হারাম-এর মধ্যের লোকদের বুঝিয়েছে। আল-হাসান, তায়ূস, নাফে ও আবদুর রহমান আল-আরাজ বলেছেন, মক্কার অধিবাসীরাই এই পর্যায়ে গণ্য। ইমাম মালিক ইবনে আনাসও এই কথাই বলেছেন। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যেসব লোক দুই রাত্রিরও কম সময় সেখানে থাকে, তারাই এই অভিধায় অভিহিত। তারা এক্ষণে মীকাতের অতি নিকটবর্তী। যারা এর বাইরে তাদের উপর 'মাতয়া' ধার্য হবে।

আবূ বকর বলেছেন, মীকাত এলাকার অধিবাসীরাই যখন এতে গণ্য তখন যারা ভেতরের দিকে মক্কা পর্যন্তের লোক, তারা ইহরাম না বেঁধেই সেখানে প্রবেশ করতে পারবে। তারা মক্কাবাসীরূপে গণ্য। তার দলীল হচ্ছে, যারা মক্কা থেকে বের হয়, কিন্তু মীকাত অতিক্রম করে বাইরে যায় না, তাদের জন্যে প্রত্যাবর্তন করা ও ইহরাম ছাড়া-ই মক্কায় প্রবেশ করা জায়েয। কেননা তারা মীকাতের ভেতরে চলাফেরা করেছে। আর যারা মীকাতের ভেতরে চলাফেরা করে, তারা যেন ঠিক মক্কার ভেতরে চলাফেরা করে। তারা মক্কার অধিবাসী বলে অবশ্যই গণ্য হবে 'মাত্য়ার' ব্যাপারে। হারাম ও তার নিকটবর্তী এলাকার অধিবাসীরা 'মসজিদে হারামে উপস্থিত লোক' হিসেবেই গণ্য হবে। এর দলীল হচ্ছে আল্লাহ্র কথা ঃ

اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ -

(মুশরিকদের জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট কোন প্রতিশ্রুতি কি করে হতে পারে) সেই লোকদের ছাড়া, যাদের সাথে তোমরা মসজিদে হারামের নিকট সন্ধি চুক্তি করেছিলে? (সূরা তওবা ঃ ৭)

মক্কাবাসীরা তাদের মধ্যে গণ্য নয়। কেননা তারা তো মক্কা জয় হওয়ার সময় ইসলাম কবুল করেছিল। আয়াতটি মক্কা বিজয়ের পর নাযিল হয়েছিল হযরত আবূ বকর (রা) যখন আমীরে হজ্জ হয়ে এসেছিলেন। ওরা হচ্ছে বনু মুদলিয, বনুদ দিয়ল। ওদের ঘর-বাড়ি মক্কার বাইরে হারাম এলাকার মধ্যেই অবস্থিত ছিল। হারামের কাছাকাছি এলাকার লোকেরাও।

যদি বলা হয়, যুল-হুলায়ফার অধিবাসীরা 'মসজিদে হারামে উপস্থিত লোক' গণ্য হতে পারে কিভাবে, ওরা দশ রাতের সফরের দূরত্বে অবস্থিত।

জবাবে বলা যাবে, তারা প্রত্যক্ষভাবে 'মসজিদে হারামে উপস্থিত লোক' না হলেও তারা তাদের মধ্যেই গণ্য হবে এবং ইহরাম ছাড়াই তারা মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে। এদিক দিয়েও যে, তারা যখনই ইহরাম বাঁধার ইচ্ছা করবে, তখন তারা নিজেদের ঘর থেকেই ইহরাম বাঁধবে, যেমন মক্কাবাসীরা তাই করে। তা থেকে বোঝা গেল, উক্ত আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে, যারা মসজিদে হারামে উপস্থিত এবং যারা তাদের মধ্যে গণ্য।

কুরবানীর উট ও গরু সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ -

পরন্তু এই কুরবানীর জন্তুগুলোর স্থান সেই প্রাচীন ঘরের নিকটেই অবস্থিত। (হজ্জ ঃ ৩৩)

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مِنًى مَنْحَرٌ وَفِجَاجُ مَكَّةَ مَنْحَرٌ -

মিনা কুরবানী করার স্থান, মক্কার ঘাঁটি— ফাঁক-কোন্‌গুলোও কুরবানী করার স্থান।

বোঝা গেল, আল্লাহ্‌র ঘরের উল্লেখ করে এ আয়াতে মক্কার নিকটবর্তী এলাকা বুঝিয়েছেন, যদিও তা মক্কার বাইরে পড়ে।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَ ن الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ -

এবং মসজিদে হারাম— যা আমরা লোকজনের জন্যে বানিয়েছি— তা সেখানে অবস্থানকারী ও বাইরে থেকে আসা লোক— সকলেই সমান, অভিন্ন। (সূরা হজ্জ ঃ ২৫)

এতে মূল মক্কা ও তার আশেপাশের লোকেরা শামিল। এই দুটি মাত্‌য়ারই হুকুম আমরা এখানে বর্ণনা করেছি। আর তা হচ্ছে কেরান ও তামাত্তু আর তৃতীয় মাত্‌য়া আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র ও উরওয়া ইবনুয যুবায়র-এর কথানুযায়ী— হাজীর একাকী কোন রোগ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়া কিংবা কোন কারণ যদি তাকে আটক করে। তখন সে কুরবানীর জন্তু পাঠিয়ে দেবে ও উমরা পালন করবে এবং পরবর্তী বছর হজ্জ করার তামাত্তু গ্রহণ করবে ও তখন হজ্জ করবে। এই লোকই হজ্জ পর্যন্ত উমরা দ্বারা তামাত্তু গ্রহণ করবে। তাঁর মাযহাব হল, পরিবেষ্টিত ব্যক্তি হালাল হবে না, ইহরাম কে রক্ষা করবে তার পক্ষ থেকে কুরবানীর দিন পশু যবেহ না হওয়া পর্যন্ত সেদিন মাথা মুণ্ডন করবে, তার ইহরামকে বাঁচিয়ে রাখবে, মক্কায় উপস্থিত হবে। পরে হজ্জ থেকে হালাল হবে উমরা পালনের মাধ্যমে। কিন্তু এই কথা আল্লাহ্‌র এ কথার পরিপন্থী ঃ

এবং তোমরা পূর্ণ কর হজ্জ ও উমরা আল্লাহ্‌র জন্যে। কিন্তু তোমরা যদি পরিবেষ্টিত হয়ে পড়, তাহলে যে-কুরবানী করা সম্ভব তাই করবে।

পরে বলা হয়েছে ঃ ‘এবং তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করবে না কুরবানীর পশু তার স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত।

এখানে হজ্জ ও উমরার মধ্যে পার্থক করা হয়নি। উভয় ক্ষেত্রে মাথা মুণ্ডন দ্বারা হালাল হয়ে যেতে পারে। উমরা থেকে হালাল হওয়ার এই মাথা মুণ্ডন হজ্জের ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার জন্যেও হবে, এতে কোন মতপার্থক্য নেই। নবী করীম (স) এবং তাঁর সাহাবীগণ হুদায়বিয়ায় পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লে তাঁরা মাথা মুণ্ডন করেছেন, তিনি নিজে হালাল হয়েছেন ও লোকদেরকে তা করতে আদেশ করেছেন। তা সত্ত্বেও উমরা করতে না পারার ফলে তার যে কার্যক্রম, তা ঠিক উমরা নয়। তা উমরা সংক্রান্ত কার্যক্রম মাত্র। তা হজ্জের ইহরাম সহকারে করা হয়। আল্লাহ তা'আলা তো বলেছেন ঃ

যে লোক উমরা থেকে হজ্জ পর্যন্ত তামাত্তু করবে।

হজ্জ হারিয়ে যে লোক উমরার কার্যক্রম সম্পন্ন করে, এখানে তার কথা বলা হয়নি। তিনি এ-ও বলেছেন ঃ ‘যে লোক হজ্জ পর্যন্ত উমরার ফায়দা গ্রহণ করবে, তাকে সেই কুরবানী করতে হবে, যা করা তার পক্ষে সহজ।’ তাকে কুরবানীর পশু পাঠাতে হবে মাত্র। যেন তদ্দারা কুরবানীর দিন মাথা মুণ্ডন করে হালাল হতে পারে। তারপরে হজ্জ করুক, কি না-ই করুক।

দশ বছর পরে যদি হজ্জ করে, তার পূর্বে না করে, তবুও কুরবানী করার এই কর্তব্য অপরিবর্তিত থাকবে। এ থেকে বোঝা গেল, আয়াতে যে তামাত্তুকারীর কথা বলা হয়েছে, তা সেই জিনিস নয় যার কথা ইবনুয যুবায়র বলেছেন। কেননা আয়াতে যা বলা হয়েছে, তা সে পর্যায়ের নয়। উমরার, হজ্জের ও জন্তু যবেহর কার্যক্রমের কারণে কুরবানীর জন্তুই তার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়। এ যবেহটা প্রয়োজনীয় হয়েছে পরিবেষ্টিত হওয়ার কারণে। উমরার পর হজ্জের সাথে তা সংশ্লিষ্ট নয়। এই মাত্য়া স্ত্রীর নিকট যাওয়াও হালাল করে দেয়। তবে তা সেইভাবে, যার উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বে করেছি। তা হল, হজ্জের মাসে উমরা হজ্জ একত্রে করা।

আর চতুর্থ 'মাত্য়া' হচ্ছে, কুরবানীর দিনের পূর্বে আল্লাহ্র ঘরের তওয়াফ করলে হাজীর হজ্জ ভেঙ্গে যাওয়া। ইবনে আব্বাস (রা) ব্যতীত এই কথা অপর কোন সাহাবী বলেছেন বলে আমাদের জানা নেই। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াসেতী, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ইয়ামান, আবূ উবায়দ, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ, ইবনে জুরাইজ, আতা, ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ

لَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ اَحَدٌ اِلَّا اَحَلَّ -

যে কেউ কাবার তওয়াফ করবে, সে হালাল হয়ে যাবে।

বললেন, আমি বললাম, তা তো শুধু মা'রূফ— পরিচিত কাজ-কর্মের পর। বললেন, ইবনে আব্বাস তা পূর্বে ও পরে উভয় ক্ষেত্রের জন্যেই বলেছেন। বললেন, আমি প্রশ্ন করলাম, তা তিনি কোথেকে পেয়েছিলেন ? বললেন, বিদায় হজ্জে রাসূলে করীম (স) প্রদত্ত আদেশ থেকেই পাওয়া গেছে। তিনি সাহাবীগণকে হালাল হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ্র এই কথাটি থেকেও তা জানা যায় ঃ

'পরে তার স্থান হচ্ছে প্রাচীনতম ঘর— কাবার নিকট।'

আবূ উবায়দ বলেছেন, আমার নিকট হাজ্জাজ শুবা, কাতাদাতা আবূ হাস্সান আল আরাজ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বললেন ঃ

مَا هٰذِهِ الْفُتْيَا الَّتِىْ قَدْشَعَبْتَ النَّاسَ -

এসব কি ফতোয়া দেয়া হচ্ছে, যদ্দ্বারা আপনি লোকদেরকে বিভক্ত করে দিয়েছেন।

অর্থাৎ বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন ফতোয়া দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যে লোক কাবা ঘরের তওয়াফ করেছে, সে হালাল হয়ে গেছে। তখন তিনি বললেন ঃ এটা তো তোমাদের নবী করীম (স)-এর সুন্নাত। তাতে তোমরা যতই অসন্তুষ্ট হও না কেন ?

আবূ বকর বলেছেন, বিদায় হজ্জে নবী করীম (স) এবং সাহাবীগণের কাজ সম্পর্কে বহু সংখ্যক মুতাওয়াতির বর্ণনা পাওয়া গেছে। হজ্জ ভেঙ্গে গেছে, অথচ তাদের সাথে কুরবানীর জন্তু ছিল না। ফলে নবী করীম (স) হালাল হননি। পরে বলেছেন, আমি কুরবানীর জন্তু পাঠিয়ে দিয়েছি এবং কুরবানীর দিন পর্যন্ত আমি হালাল হবো না। পরে তিনি সাহাবীগণকে আদেশ করলেন, অতঃপর তারা 'তরবিয়ার' দিন হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন, যখন তারা মিনায় চলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েছিলেন। এটা দুটি মাত্য়ার একটি, যার কথা উমর ইবনুল খাত্তাব বলেছিলেন এই ভাষায় ঃ

রাসূলে করীম (স)-এর সময়ে দুটি 'মাত্‌য়া' ছিল। আমি সে দুটো নিষেধ করছি। আমি তদস্থলে হজ্জের 'মাত্‌য়া' ও স্ত্রীদের 'মাত্‌য়া' স্থাপন করছি।

তারিখ ইবনে শিহাব আবূ মূসা (রা) থেকে হযরত উমর (রা)-এর এই 'মাত্‌য়া' গ্রহণ করতে নিষেধ করার ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। বলেছেন, আমি বললাম, 'হে আমীরুল মুমিনীন; স্ত্রীদের ব্যাপারে আপনি এই যে মাতয়ার কথা নতুন করে বলেছেন, এটা কি ? বললেন, আমরা তো আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে দলীল গ্রহণ করি। আল্লাহ বলেছেন ঃ 'তোমরা আল্লাহ্‌র জন্যে হজ্জ ও উমরাকে পূর্ণ কর।' আর রাসূলের সুন্নাত থেকেও দলীল গ্রহণ করি। কেননা নবী করীম (স) কুরবানী না করে হালাল হন নি। এই বলে হযরত উমর জানালেন যে, এই মাত্‌য়া মনসূখ হয়ে গেছে আল্লাহ্‌র 'তোমরা আল্লাহ্‌র জন্যে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর' কথার দ্বারা। তাঁর এই কথার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন দ্বারা সুন্নাত মনসূখ হতে পারে।

নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, এই কাজটি কেবলমাত্র তাঁদের জন্যেই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ছিল। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াসেতী, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল ইয়ামান, আবূ উবায়দ, নয়ীম, আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ, রবীআতা ইবনে আবূ আবদুর রহমান, হরস ইবনে বিলাল, ইবনুল হরস তাঁর পিতা বিলাল ইবনুল হরস আল মুজানী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ

'আমি বললাম, হে রাসূল! হজ্জ বিনষ্ট হওয়া কি শুধু আমাদের ব্যাপার, না আমাদের পরবর্তীদেরও ব্যাপার ? বললেন, না, বরং এটা বিশেষভাবে আমাদের ব্যাপার। হযরত আবূ যর (রা) বলেছেন, উমরার কারণে হজ্জ ভেঙ্গে যাওয়া কেবলমাত্র রাসূল (স)-এর সাহাবীগণের ব্যাপার। তিনি আলী, উসমান ও সাহাবীদের একটি দলের নিকট থেকে নবী করীম (স)-এর পরও হজ্জ ভেঙ্গে যাওয়ার কথা অস্বীকার করার বর্ণনা এসেছে। হযরত উমর (রা) বললেন, রাসূলের যমানায় দুটি উমরা ছিল। সাহাবীগণ তা জানতেন, তাঁরা এ-ও জানতেন যে, তা মনসূখ হয়ে গেছে। তাঁরা যদি তা না-ই জানতেন, তাহলে তাঁরা তার নিষেধের কথা নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত বলে স্বীকার করতেন না। সাহাবীদের জানা যে, তার মনসূখ হওয়া প্রমাণিত নয়, তা এই বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। হযরত জাবির (রা) থেকে সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, সূরাকা ইবনে মালিক (রা) বলেছেন, হে রাসূল! আমাদের এই উমরা কি শুধু আমাদের এই বছরের, না চিরদিনের জন্যে? বললেন, তা চিরদিনের জন্যে, উমরা হজ্জের মধ্যে শামিল হয়ে গেছে কিয়ামত পর্যন্তকার জন্যে। এ হাদীসে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, যে উমরার কারণে তাঁরা হজ্জ নষ্ট করেছেন তা শুধু সেই অবস্থার জন্যে। তার আর কখনও হবে না। তাঁর কথা ঃ উমরা হজ্জের মধ্যে প্রবেশ করেছে কিয়ামত পর্যন্তকার জন্যে। জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ওয়াসেতী, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল ইয়ামান, আবূ উবায়দ, ইয়াহইয়া ইবনে জাফর, ইবনে মুহাম্মাদ তার পিতা-জাবির নবী করীম (স) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবূ উবায়দ বলেছেন, তাঁর কথা উমরা কিয়ামত পর্যন্ত হজ্জের মধ্যে দাখিল হয়ে গেছে— এর দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে। একটি— উমরা হজ্জের মধ্যে দাখিল হয়ে যাওয়া তা সোজাসুজি ভেঙ্গে যাওয়া, নষ্ট হওয়া। আর তা হচ্ছে, ব্যক্তি হজ্জের জন্যে তালবিয়া বলবে। পরে উমরা করে তা থেকে হালাল হয়ে যাবে কাবার তওয়াফে করার দ্বারা। আর দ্বিতীয়টি, হজ্জের মধ্যে উমরার দাখিল হয়ে যাওয়ার অর্থ মাত্‌য়া। আর তা হচ্ছে, ব্যক্তি হজ্জের মাসসমূহে আলাদাভাবে উমরা করবে। পরে তা থেকে সেই বছরই হজ্জ করে হালাল হয়ে যাবে।

আবূ বকর বলেছেন, এ দুটি জিনিসই পরস্পর মিশ্রিত, শব্দ দ্বারা নয়। তার বাহ্যিক দাবি হচ্ছে, হজ্জ হল উমরার স্থলাভিষিক্ত আর উমরা হজ্জের মধ্যে প্রবিষ্ট। তাই যে লোক হজ্জ করল, তার উমরাও আদায় হয়ে গেল। যেমন বলা হয়, এক দশ-এর মধ্যে শামিল। অর্থাৎ দশ হলে আর এক-এর প্রয়োজন থাকে না। দশ-এর মধ্যেই এক শামিল রয়েছে। অতএব তা নতুন করে পালন করার কোন আবশ্যকতা থাকে না। তার উল্লেখেরও প্রয়োজন হয় না। নবী করীম (স) তাঁর সাহাবীগণকে যে আদেশ করেছিলেন হালাল হয়ে যাওয়ার জন্যে, তার আর একটি অর্থ বলা হয়েছে। সেটি উমর ইবনে যার মুজাহিদ থেকে নবী করীম (স)-এর হালাল হয়ে যাওয়া পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। তার শেষে বলেছে, আমি মুজাহিদকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁরা কি হজ্জ ফরয করেছিলেন এবং ইহরাম বেঁধে তালবিয়া বলতে তাদেরকে আদেশ করেছিলেন ? কিংবা তাঁদেরকে কিসের আদেশ করা হবে তার জন্যে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল ঃ তোমরা তেমনি তালবিয়া বল, যেমন নবী করীম (স) করছেন ? এবং তাদের কি আদেশ দেয়া হবে, সেজন্যে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল। আলী ও আবূ মূসা আল আশ'আরী (রা) প্রত্যেকেই বলেছেন ঃ আমরা নবী করীম (স)-এর মতই ইহরাম বেঁধে তালবিয়া বলছিলাম। নবী করীম (স) শুরু থেকেই ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। তাঁর এই কথা থেকেই তা বোঝা যায় ঃ 'আমি আমার ব্যাপারে অগ্রসর হয়ে গেলে কখনই পেছনে ফিরতাম না। কুরবানীর জন্তু পাঠাতাম না এবং সেটিকে নিশ্চয়ই উমরা বানাতাম অর্থাৎ তিনি যেন বের হয়েছেন, কি কাজের আদেশ করা হয় তার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর সাহাবীগণকে তিনি সেই কাজেরই আদেশ করলেন। তাঁর এই কথাটি তার অকাট্য প্রমাণ— বলেছেন ঃ 'আমার রব্ব-এর নিকট থেকে এই পবিত্র উপত্যকায় আমার নিকট একজন আগমনকারী এসেছেন'। সেটি ছিল আকীক উপত্যকা। পরে বলেছেন ঃ এই পবিত্র উপত্যকায় নামায পড় এবং বল ঃ 'হজ্জ উমরার মধ্যে।' এ থেকে বোঝা গেল, রাসূলে করীম (স) বের হয়েছিলেন কি তাঁকে আদেশ করা হয় তার অপেক্ষায় ছিলেন। পরে যখন উপত্যকায় উপনীত হল, তখন ঃ حَجَّةٌ فِي عُمْرَةٍ -এর ধ্বনি দেয়ার জন্যে আদেশ করলেন। পরে তাঁর সাহাবীগণ ইহরাম বেঁধে হজ্জের তালবিয়ার ধ্বনি দিতে শুরু করলেন। তার এই ইহরাম সহীহ ছিল না। তা ছিল স্থগিত, যেমন আলী ও আবূ মূসা (রা)-এর ইহরাম স্থগিত ছিল। এই সময় ওহী নাযিল হয় এবং মাত্‌য়ার জন্যে তাঁরা আদিষ্ট হন। আদেশ করা হয় কাবার তওয়াফ করার ও হালাল হয়ে যাওয়ার জন্যে এবং উমরার কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্যে। আর তাঁরা ইহরাম বাঁধবেন, যেমন কোন জিনিসের ইহরাম বাঁধার আদেশ করা হয় অথচ তার নাম বলা হয় না। কেননা সেটাকে উমরা বানাতে চাইলে তা পারে। যদিও তাকে হজ্জের নামকরণ করা হয়নি সহীহ নামকরণরূপে। কেননা তাদেরকে নবী করীম (স)-এর আদেশের অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল। ফলে সেই সাহাবীদের জন্যে তা ছিল একটা বিশেষ ব্যবস্থা। তাঁরা ইহরাম বেঁধেছিলেন হজ্জের। কিন্তু এই ইহরামকে তার জন্যে নির্দিষ্ট করা সহীহ ছিল না। তখন তাঁরা ঠিক এমন হল, যেন কোন কিছু দিয়ে ইহরাম বেঁধেছেন কিন্তু ঠিক নির্দিষ্টভাবে কোন কিছুর নিয়ত তাঁরা করেন নি। কেননা তখন তো তাঁরা ও অন্যান্য সব লোককে রাসূলে করীম (স) কি আদেশ করেন তার জন্যে অপেক্ষা করতে আদিষ্ট হয়েছিলেন। তবে যাঁরা নির্দিষ্টভাবে কিছুর জন্যে ইহরাম বাঁধে, তবে তা রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য, তাকে অন্য কোন দিকে ঘুরিয়ে দেয়া জায়েয নয়।

নবী করীম (স) কোন্ অবস্থায় হজ্জ ভেঙ্গে ফেলতে আদেশ করেছেন, এই কথা বহু লোকই অস্বীকার করেছেন। তাঁদের দলীল হচ্ছে যায়দ ইবনে হারুনের বর্ণনা। তিনি বলেছেন, আমাদের নিকট মুহাম্মাদ ইবনে উমর ইয়াহইয়া ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হাতিম সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, আমরা রাসূলে করীম (স)-এর সঙ্গে বের হলাম বিভিন্ন প্রকারের লোক হিসেবে। আমাদের মধ্যে থেকে কেউ মুফরাদ হজ্জের ইহ্রাম বাঁধলেন। কেউ উমরার ইহ্রাম বাঁধলেন। কেউ হজ্জ ও উমরা উভয়ের নিয়তে ইহ্রাম বাঁধলেন। যিনি মুফরাদ হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছিলেন, তিনি তা থেকে হালাল হলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি হজ্জের অনুষ্ঠানমালা পূর্ণভাবে পালন করলেন। যিনি উমরার জন্যে ইহ্রাম বেঁধেছিলেন, তিনি আল্লাহ্র ঘরের তওয়াফ করলেন, সাফা ও মারওয়ার সাঈ' করলেন। অতঃপর তিনি ইহ্রাম থেকে হালাল হয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত হজ্জও করলেন।

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াসেতী, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল ইয়ামান, আবূ উবায়দ, আবদুর রহমান ইবনে মাহ্দী, মালিক ইবনে আনাস, আবুল আসওয়াদ, উরওয়াতা, আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ আমরা রাসূলে করীম (স)-এর সঙ্গে বের হয়ে গেলাম। আমাদের মধ্যে কেউ হজ্জের নিয়ত ও তালবিয়া করলেন, কেউ হজ্জ ও উমরা উভয়ের, কেউ শুধু উমরার তালবিয়া করলেন। আর নবী করীম (স) ইহ্রাম বাঁধলেন হজ্জের। যিনি উমরার ইহ্রাম বেঁধেছিলেন, তিনি কাবার তওয়াফ ও সাঈ' করে হালাল হয়ে গেলেন। যিনি হজ্জ বা হজ্জ ও উমরা দুটিরই ইহ্রাম বাঁধলেন, তিনি কুরবানীর দিন পর্যন্ত হালাল হলেন না।

বলেছেন, আবূ উবায়দাতা আবদুর রহমান, মালিক, আবুল আসওয়াদ, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁরা নবী করীম (স)-এর ইহ্রাম ও তালবিয়া সম্পর্কে কিছু বলেন নি।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে এর বিপরীত কথাও বর্ণিত হয়েছে। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল ইয়ামান, আবূ উবায়দ, ইয়াযীদ, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আবদুর রহমান কন্যা উমরাতা তাঁকে জানিয়েছে যে, তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ আমরা যিলকদ মাসের পাঁচ দিন বাকী থাকতে রাসূলে করীম (স)-এর সঙ্গে বের হলাম। আমাদের লক্ষ্য হজ্জ ছাড়া আর কিছু ছিল না। আমরা যখন নিকটবর্তী হলাম, তখন নবী করীম (স) আদেশ করলেন ঃ যার নিকট কুরবানীর জন্তু নেই, সে যেন শুধু উমরা করে। তখন যার যার নিকট কুরবানীর জন্তু ছিল, তাদের ছাড়া আর সকলেই হালাল হয়ে গেলেন।

বলেছেন, আবূ উবায়দ ইবনে সালিহ্, লাইস, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, উমরাতা, আয়েশাতা (রা) নবী করীম (স) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাতে কিছু অতিরিক্ত কথা বলা হয়েছে। তা হল, ইয়াহইয়া বলেছেন, আমি পরে এই কথা কাসিম ইবনে মুহাম্মাদের নিকট উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন, হাদীসটি যথার্থভাবেই তোমার নিকট এসেছে। নবী করীম (স) তাঁর সাহাবীগণকে হজ্জ ভাঙ্গতে আদেশ করেছেন এবং হযরত উমর (রা) সাহাবীদের উপস্থিতিতে বলেছেন, রাসূলের সময়ে দুটি মাত্য়া ছিল। আমি সে দুটি করতে নিষেধ করছি। তার পরিবর্তে স্ত্রীর মাত্য়া ও হজ্জের মাত্য়া প্রতিস্থাপিত করছি। এ পর্যায়ে যত হাদীস এসেছে মুতাওয়াতির বর্ণনার মাধ্যমে, তার সহীহ রূপ হচ্ছে এই সব। তিনি এসব মাত্য়াই

বুঝিয়েছেন। তাদের কারোর পক্ষ থেকে অস্বীকৃতি প্রকাশ পায়নি। ভিন্ন মতও পাওয়া যায়নি কারোর থেকে।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ পরস্পর বিপরীত হলে তা এমনভাবে প্রত্যাহৃত হতো, যেন এ ব্যাপারে তাঁর নিকট থেকে কিছুই বর্ণিত হয়নি। থেকে যায় অন্যান্য হাদীসসমূহ, যাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী করীম (স) তাঁর সাহাবীগণকে হজ্জ ভেঙ্গে ফেলতে আদেশ করেছেন। সে সব হাদীস পরস্পর বিপরীত নয় এবং তা মনসূখ হয়ে যাবে আল্লাহ্র এই কথা দ্বারা এবং তোমরা আল্লাহ্র ওয়াস্তে হজ্জ ও উমরা সম্পূর্ণ কর— যেমন হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

আর 'যে জন্তু কুরবানী করা সহজ হবে'— আল্লাহ্র এই কথাটি পর্যায়ে আবূ বকর বলেছেন, এ আয়াতে যে কুরবানীর জন্তুর কথা বলা হয়েছে, তা ঠিক সেই কুরবানীর জন্তুর মতই যা পরিবেষ্টিত হলে যবেহ করতে হয়। আর আমরা বলেছি যে, এই কুরবানীর ক্ষুদ্রতম জন্তু হচ্ছে ছাগল। আর ইচ্ছা করলে গরু কিংবা উট-ও কুরবানী করা যায়। তা হলে খুবই উত্তম হয়। আর এই জন্তু কুরবানীর দিনই মাত্র যবেহ করা যায়। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ط كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ -

আর (কুরবানীর পর পর) যখন জন্তুটির পিঠগুলো জমিনের উপর স্থিত ও স্থির হয়ে যায়, তখন থেকে নিজেরাও খাও, আর তাদেরকেও খাওয়া, যারা অল্পে তুষ্ট হয়ে নিশ্চুপ বসে রয়েছে আর তাদেরকেও, যারা এসে নিজেদের প্রয়োজন পেশ করে। এই জন্তুগুলোকে আমরা তোমাদের জন্যে এ ভাবেই নিয়ন্ত্রিত ও অধীন বানিয়ে রেখেছি, যেন তোমরা শোকর আদায় কর। (সূরা হজ্জ ঃ ৩৬)

বলেছেন ঃ

ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ -

পরে তারা যেন তাদের (দেহের) ময়লা-আবর্জনা পরিচ্ছন্ন করে এবং তাদের মানতসমূহ পূর্ণ করে। আর প্রাচীনতম কাবা ঘরখানির যেন তওয়াফ করে। (সূরা হজ্জ ঃ ৩৬)

দেহের ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার ও দূরীভূত করা এবং তওয়াফে যিয়ারত করার কাজ কুরবানীর আগে তো কখনই হয় না। এ সব কাজ যখন জন্তু যবেহ করার উপর বিন্যস্ত, বোঝা গেল যে, সেটি কেরান ও তামাত্তুর কুরবানীর জন্তু। কেননা সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, সকল প্রকারের কুরবানীর জন্তুর উপর এ সব কাজ বিন্যাস হয় না। তাতে তার ইখতিয়ার রয়েছে, যখন-ইচ্ছা তা কুরবানী করতে পারে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, মাত্য়ার কুরবানী কুরবানীর দিনের পূর্বে চলবে না। নবী করীম (স)-এর এই কথাটিও সেই কথা-ই বোঝায় ঃ 'আমি যদি আমার কোন কাজে এগিয়ে যাই, তা হলে আমি পিছিয়ে যাই না, যতক্ষণে আমি কুরবানীর জন্তু পাঠিয়ে দেব ও সেটিকে উমরা বানিয়ে দেব।' নবী করীম (স) নিজে কারেন হজ্জ করেছিলেন এবং কুরবানীর জন্তু মক্কায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি যদি তাঁর কাজে অগ্রসর হয়ে যান, তা হলে তিনি যে জন্তু পাঠিয়ে দিয়েছেন, তার পেছনে

ফিরিয়ে আনবেন না। মাত্‌য়ার জন্তু কুরবানীর দিনের আগে যবেহ করা যদি জায়েয হতো তা হলে তিনি তা অবশ্যই যবেহ করতেন ও হালাল হয়ে যেতেন। যেমন তিনি তাঁর সাহাবীগণকে আদেশ করেছিলেন। আর যা তিনি হারিয়েছেন, তা তিনি ফিরিয়ে পেতেন না। হযরত আলী (রা) যখন বললেন যে, আমি নবী করীম (স)-এর মতই ইহরাম বেঁধেছি, তখন তিনি তাকে বললেন ঃ

আমি কুরবানীর জন্তু পাঠিয়ে দিয়েছি এবং কুরবানীর দিন পর্যন্ত আমি হালাল হব না।

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ خُذُوْا عَنِّيْ مَنَا سِكَكُمْ

তোমরা তোমাদের হজ্জ-কুরবানীর নিয়ম-কানুন আমার নিকট থেকে গ্রহণ কর।

নবী করীম (স) তো কুরবানীর দিন জন্তু যবেহ করেছেন। অতএব তাঁর অনুসরণ করাই কর্তব্য। সেই সময়ের আগে তা করা জায়েয নয়।

## তামাত্তু'র রোযা

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ -

যে লোক কুরবানী দিতে পারবে না, সে হজ্জের সময়ই তিনটি রোযা রাখবে এবং অবশিষ্ট সাতটি রাখবে যখন তোমরা বাড়িতে ফিরে আসবে।

আবূ বকর বলেছেন, 'হজ্জে তিনটি রোযা'— এ কথার তাৎপর্য পর্যায়ে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, সেটা 'তরবিয়াতে'র দিনের একদিন আগে, 'তরবিয়াতে'র দিন এবং আরাফার দিন। আর হযরত আয়েশা ও ইবনে উমর (রা) বলেছেন, যেদিন হজ্জের ইহরাম বাঁধবে সেদিন থেকে আরাফার দিন পর্যন্ত। ইবনে উমর (রা) বলেছেন, এ দিন-কয়টির রোযা রাখবে না ইহরাম না বেঁধে (অর্থাৎ ইহরাম বাঁধার পর রাখবে) আতা বলেছেন, ইচ্ছা করলে এই দিন-কয়টির রোযা রাখতে পারে হালাল অবস্থার দশ দিনে। তায়ূসেরও এই মত। এ দুজনই বলেছেন, উমরা করার আগে এই দিন কয়টির রোযা রাখবে না। আতা বলেছেন, পরবর্তী দশ দিনে এই দিন কয়টির রোযা বিলম্বিত করা যাবে। কেননা কুরবানীর জন্তু পাওয়া সহজ হবে কিনা, তা তখন পর্যন্ত জানা নাও যেতে পারে।

আবূ বকর বলেছেন, এ থেকে বোঝা যায়, তাঁরা দুজন এ সবকে মুস্তাহাব মনে করেন। ওয়াজিব মনে করেন না। আমাদের মতে যেমন, পানি না পাওয়া অবস্থায় তায়াম্মুম করে নামায পড়ার কাজটি নামাযের শেষ সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা মুস্তাহাব। কেননা শেষ পর্যন্ত পানি পাওয়া তো যেতে পারে। আলী (রা), আতা ও তায়ূস-এর মত হচ্ছে, দশ দিনের মধ্যে এই দিন কয়টির রোযা রাখা জায়েয হালাল অবস্থায় হোক, কি ইহরাম অবস্থায়। কেননা তাঁরা এর মধ্যে কোন পার্থক্য আছে বলে মনে করেন নি। হানাফী ফিকাহবিদগণ উমরার ইহরাম বাঁধার পর এই দিন কয়টির রোযা রাখা জায়েয মনে করেন। তার পূর্বে তা জায়েয মনে করেন না। তা এ কারণে যে, উমরার ইহরামই হচ্ছে 'তামাত্তু' হজ্জের কারণ। আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ -

যে লোক উমরা করে হজ্জ পর্যন্ত তামাত্তুর ফায়দা গ্রহণ করবে........

তাই যখন কারণ পাওয়া যাবে, তখন ওয়াজিব হওয়ার সময়ের আগে তা করা জায়েয হবে। যেমন নিসাব পূর্ণ হলে আগেভাগেই যাকাত দিয়ে দেয়া জায়েয। আর যখন পাওয়া গেলে হত্যার কাফফারাও আগে ভাগেই দেয়া জায়েয। কারণ পাওয়ার দরুন ওয়াজিব হওয়ার সময়ের পূর্বেই তা আগেভাগে করা জায়েয এজন্যেও যে, আমরা জানি হজ্জ পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই কুরবানী করা ওয়াজিব হয়। আর হজ্জ পূর্ণ হয় আরাফাতে অবস্থান সম্পূর্ণ হলেই। তার পূর্বে কোন বিপর্যয় ঘটা অসম্ভব নয়, হজ্জ বিনষ্টও হয়ে যেতে পারে। আর তা যদি হয়, তাহলে কুরবানী করা ওয়াজিব হবে না তার প্রতি। তা যদি হয়— আর সকলেরই মতে হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর তিন দিনের রোযা রাখা সকলেরই নিকট জায়েয— যদিও হজ্জের ইহরাম বাঁধলেই তা ওয়াজিব হয়ে যায় না। কেননা কুরবানীর সম্পর্ক হচ্ছে হজ্জ ও উমরা এক সাথে সম্পূর্ণ হওয়ার সাথে। কাজেই কারণ— অর্থাৎ উমরা পালন— পাওয়া গেলে তার পরই তা জায়েয। আর হজ্জের ইহরাম ও উমরার ইহরামের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই যদি তা হজ্জের ইহরামের পর করা হয়। কেননা তা কারণ পাওয়া যাওয়ার দরুনই। আর তা উমরার ইহরাম বাঁধার পরই পাওয়া গেছে।

যদি বলা হয়, তুমি যা বলতে তা-ই যদি জায়েয হওয়ার কারণ হয়, তাহলে অবশিষ্ট সাতটি রোযা রাখাও অবশ্যই জায়েয হবে। কেননা কারণ তো পাওয়াই গেছে।

জবাবে বলা যাবে, উমরার ইহরামের পর তা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে আমাদের কথার ভিত্তিতে তা যদি বাধ্যতামূলকই হয়, তাহলে হজ্জের ইহরামের পর তার অনুমতি দানও অনুরূপভাবে বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। কেননা হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর তিন দিনের রোযা রাখাকে তুমি জায়েয মনে করছ আর বাকী সাতটি রাখা জায়েয মনে করছ না।

যদি বলা হয়, রোযা যখন কুরবানীর বিকল্প, আর জন্তু যাবেহ করার কুরবানীর দিনের পূর্বে জায়েয নয়, তাহলে রোযা রাখা কি করে জায়েয হতে পারে?

জবাবে বলা যাবে, কুরবানীর দিনের পূর্বে রোযা রাখা জায়েয— এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। অথচ কুরবানীর দিনের পূর্বে জন্তু যবেহ করা হাদীসে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে প্রমাণিতভাবে। এ দুটির একটি সর্বসম্মতভাবেই প্রমাণিত। প্রমাণিত আল্লাহ্‌র এই কথার দ্বারা ঃ

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ -

হজ্জের মধ্যেই তিনটি দিনের রোযা রাখতে হবে।

আর দ্বিতীয়টি প্রমাণিত সুন্নাত দ্বারা। ফলে যুক্তির ভিত্তিতে তার উপর আপত্তি তোলার কোন অবকাশ থাকতে পারে না।

উপরন্তু রোযা হচ্ছে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার ব্যাপার। দুটি জিনিস তার জন্যে অপেক্ষমান। একটি হচ্ছে হজ্জের মাসসমূহে উমরা ও হজ্জ সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া। আর দ্বিতীয় হচ্ছে হালাল হয়ে যাওয়া পর্যন্ত কুরবানীর জন্তু না পাওয়া। এ দুটি দিকই যদি পাওয়া যায়, তাহলে মাত্‌য়ার রোযা রাখা জায়েয ও সহীহ। আর এর দুটির কোন একটিও না-পাওয়া গেলে মাত্‌য়ার রোযা হওয়া বাতিল হয়ে যাবে, তা হবে নফল। আর কুরবানীর জন্তুর উপর অপর কতিপয় কাজ বিন্যস্ত। যেমন মাথা মুণ্ডন, ময়লা আবর্জনা পরিষ্কারকরণ ও যিয়ারতের তওয়াফ করা। এই কারণেই সে জন্যে কুরবানীর দিনটি বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

যদি বলা হয়, আল্লাহ বলেছেন ঃ 'যে লোক কুরবানীর জন্তু পাবে না, সে হজ্জের সময়েই তিনটি রোযা রাখবে।' কাজেই তা হজ্জের আগে করা জায়েয নয়।

জবাবে বলা যাবে, 'হজ্জের সময়ে তিন দিনের রোযা রাখার ব্যাপারটি দুটির একটি অর্থ অবশ্যই হবে। হয় তদ্দ্বারা সে সব কাজ সম্পন্ন করার ইচ্ছা হবে, যা হজ্জের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। নবী করীম (স) আরাফাতের অবস্থানকেই হজ্জ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন اَلْحَجُّ عَرَفَةُ 'আরাফাতই হচ্ছে হজ্জ।'

অথবা তা থেকে বোঝানো হয়েছে হজ্জের ইহরামের মধ্যে কিংবা হজ্জের মাসসমূহে। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ 'হজ্জের মাসসমূহ জানা পরিচিত' হজ্জ সংক্রান্ত কার্যক্রম বোঝানো হয়নি নিশ্চয়ই, যা করা না হলে হজ্জ সহীহ্ হতে পারে না। কেননা তা আরাফাতের দিন সূর্যের পশ্চিমদিকে ঢলে পড়ার পরই হয়। তাতে তিনদিনের রোযা রাখা খুবই কঠিন ব্যাপার। তা সত্ত্বেও আরাফাতের দিনের পূর্বেই রোযা রেখে ফেলা জায়েয হওয়ার কোন মতপার্থক্য নেই। তাই এদিকটি বাতিল হয়ে গেল। অবশিষ্ট থাকল সম্ভাব্যতার দিনগুলো হজ্জের ইহরামে কিংবা হজ্জের মাসসমূহে। ব্যহ্যত তা করা জায়েয হতে পারে দুটির যে কোন একটি আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের সাথে সামঞ্জস্যশীল পাওয়া গেলেই। আর আল্লাহ্র কথা ঃ 'হজ্জ তিন দিনের রোযা' কথাটি পর্যায়ে জানা আছে যে, তার কারণ পাওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট হচ্ছে তার জায়েয হওয়া। তার ওয়াজিব হওয়ার সাথে সম্পর্কিত নয়। উমরার ইহরাম বাঁধার সময় এই তাৎপর্য যখন উপস্থিত, তখন তা যথেষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর তা আয়াতের বিপরীত কিছু হবে না। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ -

যে লোক ভুল করে কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, তার কর্তব্য হবে একজন মুমিন ক্রীতদাস মুক্ত করা। (সূরা নিসা ঃ ৯২)

হত্যার আগেই ক্রীতদাস মুক্ত করা জায়েয হওয়া নিষেধ করে না; কেননা তখন কঠিন আঘাত রয়েছে, যার পরিণতিতে মৃত্যু অনিবার্য। তেমনি এই কথাটি ঃ

لاَزَكٰوةَ فِىْ مَالٍ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ -

একটি বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কোন মালের উপর যাকাত ধার্য হয় না।

তাই বলে যাকাতের কারণ— নিসাব পূর্ণ হয়ে গেলে একটি বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই যাকাত দিয়ে দেয়া নিষিদ্ধ নয়, বরং তা জায়েয। অনুরূপভাবে আল্লাহ্র 'হজ্জে তিনটি দিনের রোযা' কথাটি আগে-ভাগে রাখা নিষিদ্ধ করে না, যদি তার কারণটা পাওয়া যায়, যার দরুন তা করা হজ্জের মধ্যেই জায়েয।

যদি বলা হয়, যার বদলে কোন কাজ করা হবে সেই জিনিসের সময়ের আগে তার বদল পেতে পারি না। রোযা হচ্ছে কুরবানীর বিকল্প, কুরবানীর আগে রোযা রাখা তাই জায়েয হতে পারে না।

জবাবে বলা যাবে, এটা আয়াতের ব্যাপারে প্রশ্ন । কেননা নাযিল হওয়া অকাট্য দলীলই কুরবানীর পূর্বে আগে-ভাগেই রোযা রাখাকে জায়েয করে দিয়েছে। তা ছাড়া যার বদলে যেটি, সেটি তার বদলের পূর্বে সম্পূর্ণ তো পাচ্ছি না। তাই কুরবানীর সময়ের পূর্বেই কয়েকটি রোযা

রাখা জায়েয হতে পারে আর তা-ই হচ্ছে দশটি রোযার মধ্যে তিনটি রোযা। আর তার অবশিষ্ট সাতটি রোযা কুরবানীর আগে রাখা কোনক্রমেই জায়েয হতে পারে না। কেননা আল্লাহ্ স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, 'সাতটি রাখবে যখন তোমরা (বাড়িতে) ফিরে যাবে।' মোট রোযা থেকে কেবল ততটা রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে, যা করে কুরবানীর দিন কুরবানী করতে না পারার দরুন হালাল হওয়া যাবে।

উপরন্তু রোযা হচ্ছে কুরবানীর বিকল্প। আর উমরার কুরবানী উমরার ইহ্রাম বাঁধার পরই ওয়াজিব হতে পারে। আর তার সাথে তামাত্তুর হুকুম সম্পর্কিত হয় জন্তু যবেহ করার সময় পর্যন্ত হালাল হওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে। অনুরূপভাবে তার বদলে রোযা জায়েয এ হিসেবে যে, মাত্য়ার কুরবানী দেয়া সহীহ্। এ থেকে তার মাত্য়ার পক্ষ থেকে হওয়া সহীহ্ প্রমাণিত হয়। যখনই মাত্য়ার কুরবানী পাঠিয়ে দেয়া হবে, পরে ইহ্রামের নিয়তে বের হবে, সে ইহ্রামধারী হবে তার সাথে মিলিত হওয়ার পূর্বে। তা থেকে মাত্য়ার জন্তু চালিয়ে দেয়া সহীহ্ প্রমাণিত হয়। অনুরূপভাবে কুরবানী দিতে না পারলে তার বিকল্প রোযা রাখা সহীহ্ হয়।

যদি বলা হয়, উমরার ইহ্রাম বাঁধার আগেই কুরবানী করা সহীহ্। কিন্তু সেই অবস্থায় রোযা রাখা জায়েয হতে পারে না।

জবাবে বলা যাবে, মাত্য়ার ইহ্রামের পূর্বে করা হলে তার সাতে মাত্য়ার হুকুম জড়িত হবে না। তার দলীল এই যে, এই অবস্থায় ইহ্রামের হুকুমে তার কোন প্রভাব পড়ে না। তার হওয়া না-হওয়া উভয়ই সমান। তাই উমরার ইহ্রামের পূর্বে রোযা রাখা সহীহ্ হবে না। উমরার ইহ্রাম বাঁধা হলে তার জন্যে কুরবানীর হুকুম প্রমাণিত হবে হালাল হওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে। এই জন্যেই সে অবস্থায় রোযা রাখা জায়েয হবে। যেমন মাত্য়ার কুরবানী দেয়া সহীহ্ হয়। হজ্জের ইহ্রামের আগে রোযা রাখা জায়েয হওয়ার কথাও প্রমাণিত হয়। কেননা তামাত্তু হজ্জকারীর পক্ষে তরবিয়ার দিন হজ্জের ইহ্রাম বাঁধা সুন্নাত। নবী করীম (স)-তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে তা-ই করার আদেশ করেছিলেন যখন তারা তাঁদের ইহ্রাম থেকে হালাল হয়ে গিয়েছিলেন উমরা করে। আর তা হয় এজন্যে যে, তার পূর্বেই রোযা রাখা হয়ে গেছে।

## তামাত্তু হজ্জকারী কুরবানীর আগে রোযা না রাখলে ......

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ -

যে লোক কুরবানীর জন্তু যোগড়া করতে পারেনি, সে হজ্জের সময়ই তিনটি রোযা রাখবে।

যে লোক কুরবানী দিতে পারেনি এবং কুরবানীর দিনের আগে তিন দিনের রোযাও রাখেনি, তার ব্যাপারে আগেরকালের ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। উমর ইবনুল খাত্তাব, ইবনে আব্বাস (রা), সাঈদ ইবনে যুবায়র, ইবরাহীম ও তায়ূস বলেছেন, কুরবানী তাকে করতেই হবে, কুরবানী ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তার কাজ হবে না। আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদও এই কথাই বলেছেন। ইবনে উমর ও আয়েশা (রা) বলেছেন, সে মিনায় অবস্থানের দিনগুলোতে রোযা রাখবে। ইমাম মালিকেরও এই কথা। আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) বলেছেন ঃ তা শরীকের দিনগুলোর পর সে রোযা রাখবে। ঈমাম শাফেয়ী এই মত গ্রহণ করেছেন।

আবূ বকর বলেছেন, রোযা ইফতারের দিন— ঈদুল ফিতরের দিন, কুরবানীর দিন এবং আইয়্যামে তাশরীকের দিনগুলোতে রোযা রাখা নিষিদ্ধ হওয়ার কথা নবী করীম (স)-এর কথার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তা প্রমাণিত হয়েছে মুতাওয়াতির ও সুপ্রসিদ্ধ হাদীস সমূহের বর্ণনায়। ফিকাহবিদগণ এসব বর্ণনাকে একমত হয়েই কাজে লাগিয়েছেন। কাজেই এই দিনগুলোতে রোযা রাখা কারোর জন্যেই জায়েয নয়। তবে (মাত্‌য়ার রোযা রাখা যেতে পারে), ফরয রোযা নয়, নফল রোযাও নয়। এই সব রোযা সাধারণভাবেই নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে মাত্‌য়ার রোযা রাখাও জায়েয হবে না। আর সকল ফিকাহবিদই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, কুরবানীর দিন রোযা রাখা জায়েয নয়। আর সেটি হজ্জের দিনসমূহের মধ্যেই গণ্য। অতএব তা নিষিদ্ধ দিনগুলোর শামিল। মিনায় অবস্থানকারী দিনগুলোতে রোযা রাখাও জায়েয নয়। রমযান মাসের কাযা রোযা রাখাও এই সময় নিষিদ্ধ। কেননা আল্লাহই বলে দিয়েছেন, রমযানের রোযা কাযা হয়ে গেলে فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ 'তা রাখতে হবে অন্যান্য দিনে।' এসব হাদীসে যে নিষেধ উল্লিখিত হয়েছে, তা আয়াতের সাধারণত্বকে নিয়ন্ত্রিত করে। অন্য সময়ে সে কাযা আদায় করতে বলে। তামাত্তুর রোযাও এই নিষেধের আওতার মধ্যে পড়া অবশ্যম্ভাবী। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'হজ্জে তিনটি দিনের রোযা' এই দিনগুলো বাদ দিয়ে অন্য সময়ই রাখতে হবে।

আবূ বকর বলেছেন, আরও কথা এই যে, 'হজ্জে তিনটি দিনের রোযা' বলা হয়েছে, কিন্তু এই তিন দিনের রোযা তো হজ্জের মধ্যের ব্যাপার নয়। কেননা হজ্জ তো এ সময় নিঃশেষ হয়ে গেছে যখন সে রোযাগুলো রাখা জায়েয ছিল না।

যদি বলা হয়, যখন বলা হয়েছে ঃ 'হজ্জে তিন দিনের রোযা' এবং এই দিনগুলো হজ্জের দিন— কাজেই এই দিনগুলোতেই রোযা রাখা জায়েয হওয়া উচিত।

জবাবে বলা যাবে— না, তা ওয়াজিব নয়। তার কয়েকটি কারণ রয়েছে। একটি— এই দিন গুলোতে নবী করীম (স) রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। তা এক্ষেত্রে চূড়ান্ত ফয়সালাকারী এবং বিশেষভাবে নির্দিষ্টকারী। যেমন করে আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তা আদায় করার সময় অন্যান্য দিন' দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং এই দিনগুলোতে রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়— হজ্জের দিনগুলোতে যদি রোযা রাখা জায়েয হতো, তাহলে কুরবানীর দিন রোযা রাখা অধিক বেশি করে জায়েয হতো। কেননা এই দিনগুলোর মধ্যে সেই দিনটিই হজ্জের কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করার জন্যে অধিকভাবে নির্দিষ্ট। তৃতীয় এই যে, নবী করীম (স) আরাফাতে অবস্থানের দিনটিকে 'হজ্জ হচ্ছে আরাফা' বলে হজ্জের জন্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব 'হজ্জে তিন দিনের রোযা' কথটির দাবি হচ্ছে তার সেদিন হবে আরাফাতে অবস্থানের দিন। আর চতুর্থ হচ্ছে, বর্ণিত হয়েছে ঃ বড় হজ্জের দিন হচ্ছে আরাফাতে অবস্থানের দিন। আর কুরবানীর দিনও সেজন্যে নির্দিষ্ট। আর ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, কুরবানীর দিন রোযা রাখা যাবে না। যদিও সেটিও হজ্জের দিন। রোযা রাখা নিষিদ্ধ দিনগুলোর মধ্যে হজ্জের দিন নাম করে নির্দিষ্ট করা হয়নি। তাই সেদিন রোযা না-রাখা অধিকভাবে নিষিদ্ধ হবে, এটাই স্বাভাবিক। উপরন্তু কুরবানীর পশু যবেহ করার দিনের পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা হল হজ্জের অনুগামী দিনগুলো। আর তা হচ্ছে প্রস্তর নিক্ষেপণের দিন কয়টি। এইদিন কয়টি হজ্জের দিনের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই দিন কয়টিতে রোযা রাখলে তাতে হজ্জে রোযা রাখা হয় না। মিনার দিনগুলোর পরে তিন দিনের রোযা রাখা হানাফী ফিকাহবিদগণ জায়েয মনে করেন নি। কেননা

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'যা কুরবানী করা সহজ হবে।' যে লোক তা করতে পারবে না, সে হজ্জে তিন দিন রোযা রাখবে।' এতে মূল ফরয করা হয়েছে কুরবানী করা। তাকে রোযায় রূপান্তরিত করা হয়েছে একটি নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে। কিন্তু তা-ও শেষ হয়ে গেছে। তাই শেষকালে কুরবানী করার ওয়াজিবটাই থেকে গেল। যেমন তাঁর কথা ঃ 'পর পর দুই মাস রোযা রাখতে হবে' এবং তাঁর কথা ঃ 'একটি মুমিন ক্রীতদাস মুক্তকরণ'— এই শর্তের ভিত্তিতেই তা কাফফারার বিকল্প হতে পারে।

যদি বলা হয়, তাতে বেশীর পক্ষে করণীয় হচ্ছে কাজটা একটা সময়ে করে ফেলা। তা সেই সময়টাতে করতে না পারলে তা প্রত্যাহৃত হয়ে যায় না। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ 'নামায কায়েম কর সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়লে'। এবং 'সংরক্ষণ কর নামাযসমূহ, বিশেষ করে মধ্যম নামায।' এবং তাঁর কথা ঃ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ 'ফজরের কুরআন পাঠ।' এই ধরনের আরও অন্যান্য কথা, যাতে ফরযসমূহকে সময়ের সাথে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এসব ফরয হারিয়ে গেলে তা প্রত্যাহৃত হয়ে যায় না। এ পর্যায়ের জবাব দুটি। একটি— সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করে দেয়া প্রতিটি ফরয সেই সময় চলে গেলে ফরযও শেষ হয়ে যায়। অপর একটি ফরয ধার্য হওয়ার জন্যে আর একটি দলীলের প্রয়োজন। কেননা এই দ্বিতীয় সময়ে যা ফরয করা হয়েছে, তা প্রথম সময়ে ফরয হতো না যদি নবী করীম (স)-এর এই কথাটি পাওয়া না যেত ঃ

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ اَوْنَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَاذَكَرَهَا -

যদি কেউ ঘুমিয়ে থাকে নামায না পড়ে কিংবা তা পড়তে ভুলে যায়, তাহলে পরে যখনই স্মরণ হবে, তা পড়ে নেবে।

এই কথাটি না বলা হলে নামায কাযা হয়ে যাওয়ার পর তা পড়া ফরয হতো না। অনুরূপভাবে فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ 'না-রাখা রোযা রাখার সময় অন্যান্য দিনে।' রোযা রমযান মাসে রাখতে না পারলে তার কাযা করা যখন ফরয, আর এই তিন দিনের রোযা রাখা যখন একটা নির্দিষ্ট সময়ের শর্তাধীন (যে, তা হজ্জের দিনে করতে হবে), তখন তা তার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে রাখতে না পারলে তার কাযা করা ও তদস্থলে অন্য রোযা রাখা কেবলমাত্র 'তাওকীফ' (আল্লাহ্‌র নির্ধারণ) দ্বারাই বাধ্যতামূলকভাবে ধার্য হতে পারে।

দ্বিতীয়, তিন দিনের রোযা কুরবানীর বিকল্প বানানো হয়েছে যখন কুরবানী করা যাচ্ছে না তখন। তার এই শর্তটি জরুরী। রোযাকে কুরবানীর বিকল্প বানানো কেবল এই পরিচিতি সহকারেই সম্ভব। যেমন তায়াম্মুম পানির দ্বারা অযূ করার বিকল্প। তা মাটি ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা করা জায়েয হবে না। মাটি না পেলে সে স্থানে অন্য কিছু প্রতিস্থাপন— ছাতু, আটা ইত্যাদি— কখনই জায়েয হতে পারে না। অনুরূপভাবে রোযাকে যখন কুরবানীর বিকল্প বানানো হয়েছে তা একটি বিশেষ ধরনের রাখার জন্যে, তখন তার স্থানে অন্য কোন রোযাকে সেই বিশেষ ধরনকে বাদ দিয়ে প্রতিস্থাপন জায়েয হতে পারে না। না-পড়তে পারা নামাযসমূহের ব্যাপার সে রকম নয়। কেননা তা যথাসময়ে পড়া না হলে তার কাযা করাকে আমরা বিকল্প হিসেবে দাঁড় করিনি। তা-ও ফরয। তার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা না হলে পরবর্তী সময়ে তা আদায় করা ফরয ও বাধ্যতামূলক।

যদি বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা 'জিহার'-এর রোযা স্ত্রীকে স্পর্শ করার আগে রাখার শর্ত করেছেন। যদি স্পর্শ করে, তাহলে তা আযাদকরণে রূপান্তরিত হতে পারে না। অনুরূপভাবে এই দিনগুলোর রোযাও। যদিও তা হজ্জে রাখার শর্ত করা হয়েছে। তা তখন রাখতে না পারলে তা প্রত্যাহৃত হয়ে যাবে না এবং কুরবানীর দিকে যাওয়া— রোযা না রেখে কুরবানী করা— জরুরী হবে না।

জবাবে বলা যাবে, প্রথম কথা 'জিহার'-এর রোযা স্পর্শের পূর্বে হওয়ার শর্তের অধীন। স্পর্শ করার নিষেধ তার পূর্বে স্থিরকৃত এবং তার পরও। অতএব যে ধরনটার সাথে বিকল্প কাজকে সম্পর্কিত করা হয়েছে, তা উপস্থিত। অতএব তা জায়েয হবে। আর যে হজ্জের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে, তার বিকল্প রোযা রাখাকে, তা এক্ষণে অনুপস্থিত। কেননা হজ্জ তো করা যায় নি। অতএব রোযা রাখার কাজটিও সেই সাথে হারিয়ে যাবে। উপরন্তু তার বাহ্যিক অর্থ স্পর্শের পূর্বে হওয়ার কারণে প্রত্যাহৃত হওয়ার দাবি করে। আয়াত ছাড়া অন্য কোন দলীল না দাঁড়ালে আমরা তা কখনই জায়েয মনে করতাম না। অনেক লোকই এমন আছেন যাঁরা স্পর্শ করার পর কাফফারা দেয়া ওয়াজিব মনে করেন না। সম্ভবত তায়ূসের এই মত। কিন্তু নবী করীম (স) থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, স্পর্শ করার পর কাফ্‌ফারা দেয়ার আগে জিহারের দরুন স্ত্রী-সঙ্গম করতে নিষেধ করেছেন।

## মাত্‌য়ার রোযা রাখা শুরু করার পর কুরবানীর জন্তু পাওয়া গেলে

মাত্‌য়ার রোযা রাখা শুরু করে দেয়া কিংবা হালাল হওয়ার পূর্বেই রোযা রেখে ফেলার পর যদি কুরবানীর জন্তু পায়, তাহলে তখন তার কি করা উচিত— এ পর্যায়ে হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, তখন তার কুরবানী করাই কর্তব্য। কুরবানী ছাড়া তার জন্যে অন্য কিছু করা জায়েয হবে না। ইবরাহীম নখয়ী এই মত দিয়েছেন। মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন, রোযা শুরু করে দেয়ার পর কুরবানীর পশু পেলে তখনও রোযা রাখাই যথেষ্ট ও জায়েয হবে। কুরবানী করা তার জন্যে ওয়াজিব হবে না। আল-হাসান শাবীও এই মত প্রকাশ করেছেন। আতা বলেছেন, একটি রোযা রাখার পরও যদি কুরবানী করার সামর্থ্য হয় তা হলে তখন কুরবানী করবে। আর তিনটি রোযা রাখার পর কুরবানী করার সামর্থ্য হলে তখন আর কুরবানী করতে হবে না। অবশিষ্ট সাতটি রোযা পরে রাখতে হবে।

প্রথমোক্ত কথার সত্যতার দলীল হচ্ছে আল্লাহ্‌র কথা ঃ

যে লোক হজ্জ পর্যন্ত উমরার ফায়দা লাভ করবে, অতঃপর যে কুরবানী তার জন্যে সহজলব্ধ হবে সে তা-ই দেবে। যে তা করতে পারবে না সে হজ্জেই তিনটি রোযা রাখবে।

বোঝা গেল, কুরবানী করা ফরয যতক্ষণ পর্যন্ত হালাল হয়ে না যায় কিংবা কুরবানীর দিনগুলো গত হয়ে না যায়, যা মাথা মুণ্ডনের জন্যে সুন্নাত ও নিয়মবদ্ধ। তাই যখনই তা পাওয়া যাবে, তখনই কুরবানী দেয়া তার কর্তব্য। তখন তার রোযা বাতিল হয়ে যাবে।

আর একথা জানা-ই আছে যে, কুরবানী করা হালাল হওয়ার জন্যে শর্ত। কেননা কুরবানীর জন্তু যবেহ করার পূর্বে হালাল হওয়া জায়েয নয়। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلَاتَحْلِقُوْ رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ -

এবং তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করো না, যতক্ষণ কুরবানীর জন্তু তার স্থানে পৌঁছে না যায়।

তাই হালাল হওয়ার আগেই যদি জন্তু পাওয়া যায়, তাহলে কুরবানী করা তার কর্তব্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে তার রোযা রাখা শুরু করার পূর্বে ও পরের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি।

এ থেকে এ-ও বোঝা যায় যে, কুরবানী করা হালাল হওয়ার জন্যে শর্ত। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ 'জন্তুর পিঠ যখন স্থির হবে, তখন তোমরা তা থেকে নিজেরা খাও এবং নিঃস্ব পথিককে খাওয়াও। অতঃপর তারা যেন তাদের দেহের ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার ও দূর করে এবং তাদের মানতসমূহ পূর্ণ করে।'

এতে কুরবানীর জন্তু যবেহ করার পর ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করতে আল্লাহ আদেশ করেছেন। ব্যাপার যখন তাই, তখন হালাল হওয়ার ঘটনায় সঙ্ঘটিত হওয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। তাই এক ব্যক্তি যদি রোযা রাখে আর তারপর কুরবানীর পশু পায়, তার রাখা রোযা নষ্ট হবে না, কুরবানী করাও তার জন্যে বাধ্যতামূলক হবে না। কেননা তখন সেই অবস্থা বর্তমান যার জন্যে কুরবানী করার শর্ত করা হয়েছে। আর তা না পাওয়ার দরুনই তার বিকল্পের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়। যেমন তায়াম্মুমকারী। নামায শেষ করার পর পানি পেলে, ন্যাংটা ব্যক্তি কাপড় পেলে তাকে যেমন অযূ করতে হয় ও কাপড় পরতে হয়। জিহারকারী যদি রোযা রেখে শেষ করে পরে ক্রীতদাস পায় মুক্ত করার জন্যে। কেননা তার উপর যে ফরয ছিল তা তো আদায় করেছে, সে ফরয মুক্ত হয়েছে। কাজেই যা করা হয়েছে, তার হুকুম ভেঙ্গে যাবে না। তবে এসব কাজ সম্পূর্ণ শেষ করার পূর্বে হলে বিকল্পের ব্যাপারটা বিবেচনা সাপেক্ষ। যদি শেষ করে অবসর নিয়ে ফেলে, তাহলে তা বিকল্প হিসেবেই আদায় হয়ে যাবে। মূলে যেটা ফরয ছিল, সেটা আদায় হয়ে গেল। সম্পূর্ণ শেষ করার পূর্বে মূলটা পাওয়া গেল— যেটা শর্ত— বিকল্পের হুকুম ভেঙ্গে যাবে এবং আসল ফরযের দিকে ফিরে যেতে হবে। যেমন নামায শুরু করার ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত তার অপেক্ষায় থাকতে হবে। কেননা শেষটা যে জিনিসের দ্বারা নষ্ট হয়, তার প্রথমটা সেই জিনিসের দ্বারাই নষ্ট হয়। কাজেই তায়াম্মুম করে নামায শুরু করার পর তার হুকুমটা প্রতীক্ষিত ও বিবেচনা সাপেক্ষ হয়ে যায়। 'জিহার'-এর রোযার ব্যাপারটিও তাই। যখন তা রাখা শুরু করা হবে, তখন তা রক্ষা করা ও সে জন্যে অপেক্ষা করা জরুরী হবে। কেননা তাতে যদি একটা রোযা ভঙ্গ হয়, তাহলে তার সবটাই ভেঙ্গে যায় এবং আসল ফরযের দিকে ফিরে আসতে হয়। অনুরূপভাবে রোযা রাখা অবস্থায় যদি ক্রীতদাস পাওয়া যায়, তাহলে এই 'জিহারে'র রোযা ভেঙ্গে আসল ফরযের দিকে আসতে হবে। যেমন নামাযের জন্যে পানি নাই বলে তায়াম্মুম করেছে, এখনও নামায শুরু করেনি, এই সময় পানি পেয়ে গেল, তখন তার তায়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে। কেননা তায়াম্মুম করা হয়েছিল পানি না পাওয়ার দরুন— শর্ত ছিল পানি না পাওয়া। তার দ্বারাই ফরয আদায় করতে চাওয়া হয়েছিল। ভিন্ন মতের কোন কোন লোক ধারণা করেছে যে, জিহার-এর রোযা শুরু করে দিলেই তার ফরয— ক্রীতদাস মুক্ত করার ফরয— প্রত্যাহৃত হয়ে গেল। কেননা যে কাজ করা হচ্ছিল তা সহীহ ছিল। তায়াম্মুম করে যে লোক নামায শুরু করে দিয়েছে, তারও নামাযের জন্যে অযূ করার ফরয আদায় হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে তামাত্তুর রোযা শুরু করে দিয়ে থাকলে কুরবানী করার ফরয আদায় হয়ে গেছে। কেননা যা করা হয়েছে তার অংশ সহীহ হয়েছে। আর এ ধরনের ব্যাপারে অংশ সহীহ হলে আসলের ফরয আদায় হয়ে যায়। অবশ্য নামায শুরু করার পূর্বে তায়াম্মুমকারীর অবস্থা সেরূপ নয়। কেননা নামাযের জন্যে তায়াম্মুম আসল ফরয ছিল না। নামাযের জন্যে তা পানি না পাওয়ার দরুন ফরয ধরা হয়েছে। তাই নামায শুরু করার পূর্বে পানি পাওয়া গেলে তায়াম্মুম

বাতিল হয়ে যাবে। তায়াম্মুম করে নামায শুরু করা এবং জিহার-এর রোযা পালন শুরু করা যে অবস্থার সম্মুখীন হয়, এ পর্যায়ে এই যা বলা হয়েছে, তা কঠিন পার্থক্যের ব্যাপার, বাহ্যিক বিপর্যয়ের ব্যাপার। কেননা মাত্‌য়ার রোযা শুরু করা হলেই ফরয প্রত্যাহৃত হয়ে যায় না— জিহার-এর রোযা শুরু করলেও। নামায-ও তাই। বরং এইসব শুরু করার অপর একটি হুকুমের উপর নির্ভরশীল। তার দলীল হচ্ছে, অবশিষ্ট নামায নষ্ট হয়ে গেলে আগের অংশ-ও নষ্ট হয়ে যাবে। জিহার-এর অবশিষ্ট রোযা নষ্ট হয়ে গেলে আগে যা রাখা হয়েছে, তা-ও নষ্ট হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে মাত্‌য়ার রোযা রাখা শুরু করে দিলে, পরে তার প্রথম দিনটাই নষ্ট হয়ে গেলে তা সব নষ্ট হয়ে যাবে। যদি কুরবানীর জন্তু পেয়ে যায় তাহলে তার রোযা রাখা জায়েয হাবে না— এটাতে সকলেই একমত।

কাজেই বিকল্পের কৃত অংশ সহীহ হলে আসল ফরয প্রত্যাহৃত হয়ে যাবে বলে যে কথা বলা হয়েছে, তা ভুল। কেননা তার সহীহ হওয়ার হুকুম তো হয়নি। বরং শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করার হুকুমই বহাল রয়েছে। আসল ফরযের ব্যতিক্রম সহ যদি তা সম্পূর্ণ হয়ে যায়, তখনই তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে। তাই তা সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পূর্বেই যদি আসল ফরয পালনের ব্যবস্থা হয়, তাহলে সেই ব্যতিক্রম বা বিকল্প বাতিল হয়ে যাবে এবং আসল ফরযের দিকে ফিরে আসতে হবে। আর তায়াম্মুমকারীর জন্যে নামায শুরু করার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করার যে হুকুম দেয়া হয়েছে, তা নামায শুরু করার পরও বহাল থাকতে হবে। কেননা নামাযের যতটা অংশ পড়া হয়েছে, তা নামায সম্পূর্ণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা পর্যায়ে পড়ে থাকবে। কাজেই তার নামায শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত পানি পাওয়ার অপেক্ষার হুকুমটা তার শেষ হয়ে যাওয়ার পরও বহাল থাকবে। এছাড়া অন্যান্য যে কয়টি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে— যেমন তামাত্তুর রোযা ও জিহার-এর রোযা প্রভৃতি— এসব ক্ষেত্রে একই নীতি চলবে। ফিকাহবিদগণ সকলেই বলেছেন, অল্প বয়স্কা স্ত্রী যদি সঙ্গম কৃতা হয় আর তার স্বামী তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তাহলে তার ইদ্দত হবে কয়েক মাস। তালাকের পূর্বে কিংবা তার পরে— হায়য না হওয়া সে মাসগুলোর হায়য-এ রূপান্তরিত হওয়ার তার হুকুম ভিন্নতর কিছু হবে না। 'মোজা'র উপর মসেহকারীর মসেহ করার সময় শেষ হয়ে গেলে— তা তার নামাযে থাকা অবস্থায় হোক, কি তার পূর্বে— এ ব্যাপারেও ফিকাহবিদগণ এই কথা বলেছে। নামায নিষিদ্ধ হওয়ার ও দুই পা ধৌত করা জরুরীর ব্যাপারে শুরু ও বাকী থাকা— এ দুই অবস্থার ব্যাপারে হুকুম অভিন্ন হবে। হায়য-এর রোগিনীর 'ইস্তিহাযা' যদি শেষ হয়ে যায়— তা তার নামাযের মধ্যে থাকা অবস্থায় হোক কিংবা নামায শুরু করার পূর্বে হোক— উভয় অবস্থায়ই তার নামায নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সমান নীতি হবে। তবে নামাযের জন্যে নতুন করে তাহারাত গ্রহণ করা হলে ভিন্ন কথা। ইমাম শাফেয়ী এই কথা বলেছেন।

ইমাম মালিকের কোন কোন সঙ্গী উল্লেখ করেছেন, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে 'রিজয়ী' তালাক দেয়, পরে সে মরে যায়, তাহলে সে স্ত্রীকে স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দত পালন করতে হবে। কেননা স্বামীর মৃত্যু সঙ্ঘটিত হওয়ার সময় সে তার স্ত্রী হিসেবেই গণ্য ছিল। এক ব্যক্তি, তার বিয়ের অধীন ছিল একটি ক্রীতদাসী এবং সে তাকে তালাক দিল। তাহলে তাকে ক্রীতদাসীর জন্যে নির্দিষ্ট 'ইদ্দত' পালন করতে হবে। ইদ্দত পালন রত অবস্থায় সে যদি তাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেয়, তাহলে তার ইদ্দতটা স্বাধীনা স্ত্রীর ইদ্দতে পরিবর্তিত হয়ে যাবে না, যদিও তার স্বামী তাকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারী ছিল। কেননা সেখানে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি, যার দরুন ইদ্দত পালন জরুরী হতে পারে। যেমন পূর্ববর্তী মাসলায় স্বামীর মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। এই

মৃত্যু তো স্ত্রীকে ইদ্দত পালনে বাধ্য করে। এই কারণে অল্প বয়স্কা মেয়ের হায়য হতে শুরু করলে তার 'ইদ্দত' পরিবর্তিত হবে না। কেননা এখানে ইদ্দত পালন ফরয হওয়ার মতো কোন ঘটনা ঘটেনি। তা হচ্ছে হায়য হওয়া।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ 'আর সাতটি রোযা রাখতে হবে যখন তোমরা বাড়িতে ফিরে যাবে।' আতা থেকে বর্ণিত হয়েছে— তিনি বলেছেন, ইচ্ছা করলে এই সাতটি রোযা মক্কায় থেকেও রাখা যেতে পারে। আর চাইলে পরিবারবর্গের নিকট ফিরে গিয়ে রাখতে পারে। আল-হাসান বলেছেন, পথের মধ্যেও এ রোযা রাখা যেতে পারে। আর চাইলে পরিবারবর্গের নিকট ফিরে গিয়ে রাখবে। মুজাহিদ ও সাঈদ ইবনে যুবায়রও তাই বলেছেন। ইবনে উমর ও শাবী বলেছেন, পরিবারবর্গের নিকট ফিরে গিয়ে রোযা কয়টি রাখবে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ إِذَا رَجَعْتُمْ 'যখন তোমরা ফিরে যাবে' বলে হতে পারে মিনা থেকে ফিরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে, হতে পারে, পরিবারবর্গের নিকট ফিরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই দুই প্রত্যাবর্তনের মধ্যে প্রথমটি থেকে গণ্য হবে। তার তা হল 'মিনা' থেকে প্রত্যাবর্তন করা। তার প্রমাণ এই যে, 'আইয়্যামে তাশ্‌রীকের রোযা রাখতে আল্লাহ্‌ নিষেধ করেছেন এবং প্রত্যাবর্তনের পর সাতটি রোযা রাখতে আদেশ করেছেন। অতএব নিষেধের সময় অতিবাহিত হওয়ার পর অর্থাৎ আইয়্যামে তাশ্‌রীক শেষ হওয়ার পরবর্তী সময় রোযা রাখা মুবাহ্‌ বলে এই সময়টার কথা বলা হয়েছে বলে মনে করা উত্তম।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ 'এই হচ্ছে পূর্ণ দশ।' আবূ বকর বলেছেন, এ পর্যায়ে অনেক দিকের উল্লেখ করা হয়েছে। তা পূর্ণ কুরবানীর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দিক দিয়ে সওয়াব পাওয়ার কাজ হিসেবে। তা এ জন্যে যে, সাতটি রোযা রাখার আগেই কুরবানীর দিন পর্যন্ত। তিনটি রোযা রেখে হালাল হওয়ার ব্যাপারে কুরবানীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই যে কেউ ধারণা করতে পারে যে, তিনটি রোযাই বুঝি পূর্ণ মাত্রায় সওয়াব পাওয়ার ব্যাপারে কুরবানীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই যে কেউ ধারণা করতে পারে যে, তিনটি রোযাই বুঝি পূর্ণ মাত্রার সওয়াব পাওয়ার ব্যাপারে কুরবানীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। তাই আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, দশটি রোযা পূর্ণত্ব সহকারে সওয়াব পাওয়ার ব্যাপারে কুরবানীর স্থলাভিষিক্ত। তবে ইহরাম ভাঙ্গা জায়েয হওয়া তিনটি রোযা রাখার সাথে সংশ্লিষ্ট। আর তাতে অবশিষ্ট সাতটি রোযা রাখার জন্যে উৎসাহ প্রদানের ব্যাপারে বিরাট ফায়দা রয়েছে। কুরবানীর সওয়াব পূর্ণ করার জন্যে বাড়িতে ফিরে এসে সে সাতটি রোযা পূর্ণ করার আদেশ করা হয়েছে। তাতে ইখতিয়ার দানের সম্ভাবতা দূর করা হয়েছে বলেও মত প্রকাশ করা হয়েছে। মূল কুরআন واو (এবং) অক্ষরের অর্থ হবে او — অথবা। আরবী ভাষায় অনেক স্থানেই তা হয়ে থাকে। কিন্তু শেষে বলা 'এই দুশটিই পূর্ণ' কথা দ্বারা সেই সম্ভাব্যতা দূর করা হয়েছে। আবার কেউ বলেছেন, মূল কথার উপর গুরুত্ব আরোপের জন্যেই তা বলা হয়েছে।

কিন্তু ইমাম শাফেয়ী একটিকে কয়েক প্রকারের ব্যাখ্যা দানের একটি ব্যখ্যারূপে গণ্য করেছেন। তিনি বলেছেন, এটা প্রথম বয়ান। কিন্তু অপর কোন মনীষী একটি 'বয়ান'-এর মধ্যে কোন একটি বলেন নি। কেননা আল্লাহ কথা ঃ 'তিন ও সাত'-এর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন করে

না। তাতে কারোর উপর কোন সমস্যাও দেখা দেয় না। তাই বলতে হবে, যিনি একটিকে 'এক প্রকারের বয়ান' বলেছেন, তিনি মূল ব্যাপারে গাফিল রয়েছেন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ 'হজ্জ কয়েকটি জানা মাস'। আবূ বকর বলেছেন, 'হজ্জের মাসসমূহ' পর্যায়ে আগের কালের ফিকাহ্‌বিদগণ নানা কথা বলেছেন। ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর (রা) এবং আল-হাসান, আতা ও মুজাহিদ বলেছেন, শওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জ-এর দশ দিন হচ্ছে হজ্জের মাস। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, শওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জ-এর দশ দিন হচ্ছে হজ্জের মাস। ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর (রা) অপর একটি বর্ণনায় এরূপ কথাই বলেছেন। আতা ও মুজাহিদ থেকেও তা-ই বর্ণিত হয়েছে। লোকেরা বলেছেন, এ সব কথার মধ্যে বাহ্যত সামান্য পার্থক্য দেখে প্রকৃতপক্ষে মৌলিক কোন মতপার্থক্য নয়। যিনি যিলহজ্জ মাসের উল্লেখ করেছেন, তার অর্থ সে মাসের কিছু অংশের কথা মনে করা অসম্ভব নয়। কেননা হজ্জ তো যিলহজ্জ মাসের প্রথমার্ধেই সম্পূর্ণ হয়ে যায়। গোটা মাস তো আর হজ্জে অতিবাহিত হয় না। মিনার দিনগুলোর পর হজ্জের 'মানাসিক'— অনুষ্ঠানমালার আর কিছুই বাকী থাকে না। কেউ কেউ বলেছেন, যিলহজ্জ বলে গোটা মাসও মনে করা যেতে পারে। তার অর্থ এ-ও হতে পারে যে, এগুলোই যখন হজ্জের মাস, তখন এগুলোকে বাদ দিয়ে অন্য সময়ে উমরা করা খুবই পছন্দনীয়। যেমন হযরত উমর (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে, হজ্জের এসব মাস ছাড়া অন্য সময়ে উমরা করা তাঁরা খুবই পছন্দ করতেন। এসব কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। আল-হাসান ইবনে আবূ মালিক ইমাম আবূ ইউসূফ থেকে এই মত বর্ণনা করেছেন যে, শওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জের দশ দিনই হচ্ছে হজ্জের জানা ও নির্দিষ্ট মাস। কেননা যে-লোক কুরবানীর দিনের ফজর উদয় হওয়ার সময় পর্যন্ত আরাফাতে অবস্থান গ্রহণ করতে পারেনি, সে হজ্জ হারিয়ে ফেলেছে। আর اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ বলে পূর্ণ দুই মাস ও এক মাসের কিছু অংশ মনে করায় ভাষাবিদদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। এটা সম্পূর্ণ বৈধ কথা। যেমন নবী করীম (স) বলেছেন, মিনার দিনগুলো হচ্ছে মাত্র তিন দিন। আর সে তিন দিনও হয় দুই দিন পূর্ণ ও এক দিনের কিছু সময় নিয়ে। লোকেরা বলে ঃ 'আমি অমুক বছর হজ্জ করেছি।' অথচ সারা বছর তো দূরের কথা, হজ্জে বছরের মাত্র কিছু অংশই ব্যয় হয়েছে। 'আমি অমুকের সাথে অমুক বছর দেখা করেছি' বললে গোটা বছরই তো আর বোঝায় না। তার কোন এক সময়ে সাক্ষাৎ হওয়ার কথাই বোঝায় মাত্র। 'অমুকের সাথে জুমা'আর দিন কথা বলেছি' বললেও দিনের কিছু সময়ই বোঝায় মাত্র। কোন কাজ যখন কথিত গোটা সময়কে লাগায় না, তখন এরূপ কথার তাৎপর্য তা-ই হয়ে থাকে।

আবূ বকর বলেছেন, যিনি বলেছেন, হজ্জের মাস হচ্ছে শওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জ— তাঁর এই বলার আর একটি কারণ আছে। তা হল কথা বলার প্রচলিত ধরন। জানা মাসসমূহের অর্থে দুটি ভিন্ন ভিন্ন কথা শামিল রয়েছে। তা হল জাহিলিয়াতের যুগের লোকেরা মাসসমূহকে এদিক-ওদিক নাড়িয়ে সরিয়ে দিত। সফর মাসকে তারা মুহররম মাস বানাত। আর মুহররম মাসকে তারা হালাল মাস মনে করে নিত। তা তারা করত তাদের সম্মুখবর্তী যুদ্ধের জন্যে সুবিধা করে নেয়ার উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা উক্ত কথাটি দ্বারা এই نَسِى হারাম মাসকে এদিক-ওদিক নাড়িয়ে সরিয়ে দেয়ার বদ-অভ্যাসকে বাতিল ঘোষণা করেছেন এবং হজ্জের সময়কে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন সেই ভিত্তিতে, যা আসমান জমিনের প্রথম সৃষ্টিকালে স্থাপিত হয়েছিল। যেমন নবী করীম (স) বিদায় হজ্জের দিন বলেছেন ঃ

اَلَا اِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِّنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِىْ بَيْنَ جُمَادٰى وَشَعْبَانَ -

জেনে রাখো, কাল-স্রোত ঘুরে ঘুরে আসমান-জমিনের প্রথম সৃষ্টির দিনের অবস্থায় ফিরে এসেছে। বছর হয় বারো মাসে। তন্মধ্যে চারটি মাস ঃ শওয়াল যুলকাদা, যিলহজ্জ ও রজব— যা দুই জমাদি ও শাবান মাসের মধ্যে অবস্থিত— হারাম মাস।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ অর্থাৎ এই প্রমাণিত ঘোষিত মাস কয়টিতে হজ্জের কার্যসমূহ সম্পন্ন হয়। জাহিলিয়াতের যুগের লোকেরা যেমন মাসগুলোকে অদল-বদল করে দিত। হজ্জের মাস কখনও আগে নিয়ে আসত, কখনও পিছনে নিয়ে যেত, সে কাজকে অগ্রাহ্য করেছেন। হজ্জের সময়টা তাদের নিকট হজ্জের মাসসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। তার মধ্যে এই তিনটি মাসই তারা শান্তি ও নিরাপত্তার তথা যুদ্ধহীন মাস মনে করত। এই সময়ই তারা আসা-যাওয়া করত। তাই আল্লাহ এই মাস কয়টির উল্লেখ করে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, হজ্জের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ স্থির ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। এ কথা বলে তাকে রদ-বদল করতে ও অন্য কোন মাসকে হজ্জের মাসরূপ নির্দিষ্ট করতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

এ ক্ষেত্রে আরও একটি কারণ জানা যায়। তা হল আল্লাহ যখন হজ্জ পর্যন্ত উমরার ফায়দা গ্রহণের কথা فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ বলেছেন, তাতে রুখসত দিয়েছেন এবং এসব মাসেই উমরা করা নিষিদ্ধ বলে যে ধারণা পোষণ করত, তা বাতিল করে দিয়েছেন। বলেছেন, 'হজ্জ সুনির্দিষ্ট ও জানা মাসসমূহে করতে হবে।' এ কথা বলে এই ফায়দাটা করে দিয়েছেন যে, যেসব মাসে উমরা করে হজ্জ পর্যন্ত ফায়দা লাভ করা যায় এবং তার হুকুমটা প্রমাণিত, তা হচ্ছে এই মাস কয়টি। অন্য সময় যে লোক উমরা করবে এবং পরে হজ্জ করবে, সে উমরার এই তামাত্তু ফায়দাটা পাবে না।

## হজ্জের নির্দিষ্ট মাসসমূহের পূর্বে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধা

আবূ বকর বলেছেন, হজ্জের মাসসমূহের পূর্বেই হজ্জের জন্যে ইহরাম বাঁধা জায়েয কিনা, এ পর্যায়ে আগেরকালের ফিকাহবিদগণ নানা কথা বলেছেন। মাকসাম ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, হজ্জের সুন্নাত (তরীকা) হল হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে হজ্জের জন্যে ইহরাম না বাঁধা। আর আবূ যুবায়র হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেছেন, হজ্জের মাসসমূহের আগে যেন কেউ হজ্জের জন্যে ইহরাম না বাঁধে। তায়ূস, আতা, মুজাহিদ, আমর ইবনে মায়মুন ও ইকরামা এই কথাই বলেছেন। আতা বলেছেন, যে লোক হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে হজ্জের ইহরাম বাঁধবে, সে যেন সে ইহরামকে উমরার জন্যে নির্দিষ্ট করে। হযরত আলী (রা) 'তোমরা আল্লাহ্র জন্যে হজ্জ ও উমরাকে সম্পূর্ণ কর' আল্লাহ্র এই কথাটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, হজ্জ ও উমরা সম্পূর্ণ করার অর্থ তুমি সে দুটির জন্যে তোমার পরিবারে ছোট্ট ঘর থেকেই ইহরাম বাঁধাবে। ইহরামকারীর ঘর ও মক্কার মধ্যকার দূরত্ব খুব বেশি কি নিকটবর্তী— এই দুটির মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। এ থেকে বোঝা গেল, হজ্জের মাসসমূহের পূর্বেই হজ্জের জন্যে ইহরাম বাধা তাঁর মতে সম্পূর্ণ জায়েয। মাকসাম ইবনে

আব্বাস (রা) থেকে মাসসমূহের পূর্বেই হজ্জের জন্যে ইহরাম না বাঁধা সুন্নাত তরীকা বলে যে বর্ণনাটিতে উল্লেখ করেছেন বাহ্যত তা থেকে মনে হয় যে, তিনি এ পর্যায়ে সুনিশ্চিত ও চূড়ান্ত পর্যায়ের কথা বলেন নি, হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে হজ্জের ইহরাম বাঁধাই যাবে না— এমন কথা নয়।

ইবরাহীম নখয়ী ও আবূ নয়ীম থেকে হজ্জের মাসসমূহের পূর্বেই হজ্জের জন্যে ইহরাম বাঁধা জায়েয বলে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের হানাফী ফিকাহ্‌বিদ সকলেরই এক মত। মালিক, সওরী ও লাইস ইবনে সাঈদও এই মত দিয়েছেন। আল-হাসান ইবনে সালিহ ইবনে হাই বলেছেন, হজ্জের মাসসূহের আগেই হজ্জের জন্যে ইহরাম বাঁধলে সেটিকে উমরার ইহরাম বানাতে হবে। পরে সেটিকে উমরার জন্যে বানাবার পূর্বেই হজ্জের মাস এসে গেলে সে হজ্জে চলে যাবে এবং তা যাওয়াই তার জন্যে যথেষ্ট হবে। আওজায়ী বলেছেন, সেটিকে উমরার ইহরাম বানাতে হবে। শাফেয়ী বলেছেন, সেটি দ্বারা উমরা করা যাবে মাত্র।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ লোকেরা তোমাকে চাঁদসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, 'বল ঃ তা জনগণের জন্যে সময় ও হজ্জ-এর নির্ধারক' এর ব্যাখ্যা পর্যায়ে ইতিপূর্বে আমরা তা জায়েয হওয়ার দলীল ও প্রমাণ বলেছি। 'সব চাঁদ হজ্জের সময় নির্ধারক' কথাটি সাধারণভাবে বলা হয়েছে। যখন জানা গেল যে, চাঁদসমূহ হজ্জের কার্যাবলীর সময় নির্ধারক নয়, তখন ব্যবহৃত শব্দের অর্থ হবে হজ্জের ইহরাম বাঁধা। ফলে চাঁদের সব মাসেই হজ্জ জায়েয হওয়া উচিত। কোন কোন মাসে হজ্জ, আর কোন কোন মাসে নয়, এরূপ নির্ধারক জায়েয নয়। কেননা আল্লাহ্‌র কথা থেকে সব চাঁদেরই সাধারণভাবে লোকদের জন্যে সময়ের নির্ধারক হওয়ার তাৎপর্য বোঝায়, কোন কোন চান্দ্রমাসকে বাদ দিয়ে অপর কোন চান্দ্রমাসে তা হওয়ার কথা বলার ইচ্ছা বোঝায় না। তাতে সমস্ত মানুষের জন্যে সময়ের নির্ধারক হওয়ার কথা শামিল রয়েছে। তাই তাকে শুধু সেই মাসসমূহের মধ্যে সীমিত করা দরকার, যখন হজ্জ জায়েয। যদিও ব্যবহৃত শব্দে ওদুটোই শামিল রয়েছে।

যদি বলা হয়, চাঁদগুলোকে হজ্জের সময় নির্ধারক বলা হয়েছে, আর হজ্জ মূলত এমন সব কাজ, যে জন্যে ইহরাম বাঁধা প্রয়োজন। আর শুধু ইহরামই তো হজ্জ নয়। তাই তার দ্বারা আসল হজ্জ-ই বোঝাতে হবে। তাহলে চাঁদগুলো হজ্জের সময় নির্ধারণ করবে শওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জ মাসগুলোকে। কেননা এই কয়টি মাসেই হজ্জ সংক্রান্ত কার্যাবলী সহীহ্ হয়। কেননা হজ্জের নির্দিষ্ট মাসগুলোর পূর্বেই তওয়াফ ও সাঈ' করা হলে তা সকলের মতে সহীহ্ হবে না। কাজেই হজ্জ শব্দটি তার প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

জবাবে বলা যাবে, এই কথাটি ভুল। কেননা তাতে মূলতই শব্দের হুকুমটা প্রত্যাহৃত হয়ে যেতে হয়। তা এ জন্যে যে, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'লোকেরা তোমাকে চাঁদসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, তা জনগণের এবং হজ্জের সময় নির্ধারক'-এর তাৎপর্য অনুযায়ী চাঁদসমূহের নিজেরই হজ্জের সময় নির্ধারক হওয়া বাঞ্ছনীয় হয়। আর হজ্জের তিনটি ফরয ইহরাম বাঁধা, আরাফাতে অবস্থান গ্রহণ এবং তওয়াফে যিয়ারত। এ কথা জানা-ই আছে যে, চাঁদসমূহ আরাফাতের অবস্থান ও তওয়াফে যিয়ারতের সময় নির্ধারক নয়। কেননা এ দুটো কাজ চাঁদের হিসেবে হয় না। ফলে চাঁদ সময় নির্ধারক হয় শুধু ইহরাম বাঁধার জন্যে, অন্যান্য ফরয কাজের জন্যে নয়। কথাটিকে যদি আমরা তোমার বক্তব্য অনুযায়ী গ্রহণ করি তাহলে তো কোন একটির জন্যেও চাঁদ সময় নির্ধারক হয় না। তাহলে মূল আয়াত থেকে নতুন চাঁদসমূহ

শব্দটিকেই বাদ দিতে হয়। তার কোন ফায়াদাই থাকে না। কিন্তু তা তো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

যদি বলা হয়, যদি আরাফাতে অবস্থান গ্রহণ নতুন চাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তাহলে বলা যেতে পারে যে, চাঁদ তার জন্যে সময় নির্ধারক।

জবাবে বলা যাবে, তুমি যা ধারণা করেছ, ব্যাপারটা তা নয়। কেননা নতুন চাঁদের একটা সময় আছে, যা সবাইর জানা (পূর্বে এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে) সেই সময়টা অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর তাকে 'হিলাল' বা নতুন চাঁদ বলা হয় না। আরাফাতে অবস্থানের সময় চাঁদ যে আকার ধারণ করে, তাতে তখন তাকে 'হিলাল' বলা যায় না। অথচ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা 'হিলাল'কে হজ্জের সময় নির্ধারক বলেছেন। অথচ তুমি 'হিলাল'কে নয় চাঁদকে সময় নির্ধারক বানাচ্ছ। তাতে ব্যবহৃত শব্দের যথার্থ অর্থ বাদ দিতে হয়। শব্দটি যা বোঝায়, তা তুমি গ্রহণ করছ না। ভেবে দেখ, কোন মাসের 'হিলাল'কে যদি ঋণ শোধের সময় নির্ধারণ করা হয়, তাহলে 'হিলাল' নিজেই সময় ঘোষণা করবে দাবির অধিকার প্রমাণের জন্যে এবং তা আদায় করে দেয়া ওয়াজিব বলার জন্যে। সেই সময়ের পরের কোন সময় নির্ধারণ করবে না। 'হিলাল'-এর হিসেব অনুযায়ী যদি 'ইজারা' ঠিক করা হয়, তাহলে তাতে হিলাল বা নতুন চাঁদ দেখাই তাতে গণ্য হবে। ব্যবহৃত শব্দ থেকে তা-ই বোঝা যায়। কোন সমঝদার ব্যক্তির পক্ষে তা বোঝা কঠিন নয়।

তবে তার কথা ঃ হজ্জ এমন কাজের নাম যার জন্যে ইহরাম বাঁধা জরুরী হয়ে পড়ে। কিন্তু ইহরামকে হজ্জ বলা হয় না, যখন তা কারণ হবে যেসব কাজের। কাজেই সে সব কাজের হুকুম নতুন চাঁদ অনুযায়ীই দেয়া হবে। তাই আমরা যেমন বললাম, কিতাবের প্রথম অংশের নাম অন্য কিছু দিয়ে রাখা অসমীচীন হবে না, যদি তা-ই তার কারণ হয় কিংবা হয় পার্শ্ববর্তী, অতএব ইহরামকে হজ্জ নাম রাখা এই দৃষ্টিকোণ দিয়ে সহীহ হবে। উপরন্তু ইহরামকে উহ্য ধরলে গোটা ভাষা এই দাঁড়ায় قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَلِإِحْرَامِ الْحَجِّ 'বল, নতুন চাঁদগুলো জনগণের ও হজ্জের ইহরাম বাঁধার সময় নির্ধারক।' যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন ঃ وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ। 'জনগণকে জিজ্ঞাসা কর।' এখানে 'অধিবাসী' শব্দ উহ্য রয়েছে, মূল কথাটি হবে ঃ 'জনপদের অধিবাসীদের জিজ্ঞাসা কর'। আর একটি আয়াত ঃ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى -এর যা অর্থ, তা প্রণিধানযোগ্য। সেই অর্থই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। তাহলে 'হিলাল' নতুন চাঁদসমূহকে হজ্জের সময় নির্ধারক বানানোর ব্যাপারে শব্দের হুকুমটা সহীহভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাছাড়া 'হজ্জ' শব্দের আভিধানিক অর্থ القصد। ইচ্ছা করা, সংকল্প গ্রহণ করা। যদিও শরীয়াতের পরিভাষায় কতগুলো কাজ এর সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। তবুও তাকে হজ্জ বলাই সহীহ। অতএব ইহরামকে হজ্জ বলা নিষিদ্ধ হতে পারে না। কেননা সংকল্প গ্রহণের পর যে কাজটি করার হুকুম তা হচ্ছে ইহরাম বাঁধা। ইহরাম বাঁধার পূর্বে এই সংকল্পের সাথে অন্য কোন হুকুম সম্পর্কিত হয় না। এই কারণে ইহরামকে 'হজ্জ' নামকরণ খুবই সঙ্গত। কেননা তা-ই হজ্জ পর্যায়ের প্রথম কাজ। অতএব আল্লাহ্র কথা ঃ 'লোকেরা তোমার নিকট হিলালসমূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বলে দাও, তা লোকদের কাজের ও হজ্জের সময় নির্ধারক ইহরামকেও শামিল করে নিয়েছে।' ইহরাম ছাড়া আর যত কাজ আছে, তা-ও সব মানাসিক-এর অন্তর্ভুত। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, হজ্জের কার্যাবলী যখন আমরা বিভিন্ন নির্দিষ্ট

সময়ে বিশেষীকৃত করে দেই, তা হলে মোটামুটিভাবে সবটাই বিশেষীকৃত করা হয়। অবশিষ্ট থেকে যায় ইহরাম সম্পর্কীয় শব্দের হুকুমটা। অভিধানে 'হজ্জ' শব্দের অর্থ সংকল্প গ্রহণ। অর্থাৎ হজ্জের সংকল্প গ্রহণ করা যেন তার পরিমাণটা জানা যায়। এই সংকল্পের সাথে অন্যান্য যে সব কাজ সংশিষ্ট তা ওয়াজিব হয় না। শরীয়াতে হজ্জ নামটা সেই কার্যাবলী ছাড়া বোঝা যায় না। অথচ তাতে সংকল্পের গুরুত্ব থাকে না। ভেঙ্গে দেখ صَوْمٌ শব্দের মূল আভিধানিক অর্থ হল, তা বিরত থাকার নাম। অথচ শরীয়াতের দৃষ্টিতে তার আরও কতগুলো অর্থ রয়েছে। তা সত্ত্বেও রোযার সহীহ হওয়ার ব্যাপারে সেই বিরত থাকাটা সর্বত্রই গণ্য। ইতিকাফও তেমনি। তার শাব্দিক অর্থ অবস্থান করা। শরীয়াতের দৃষ্টিতে তার আরও অর্থ আছে। সেই সাথে 'অবস্থান' অবশ্যই রয়েছে। তবে এই নামটা রাখার আসল যে উদ্দেশ্য তা অবশ্যই গণ্য হবে। শরীয়াতের দৃষ্টিতে তার সাথে অন্যান্য যত অর্থই মিলিত করা হোক-না-কেন, সেই অবস্থানের ভাব না থাকলে শরীয়াতের দৃষ্টিতে এই নামের হুকুমটা প্রমাণিত হয় না।

হজ্জ-ও তেমনি। আভিধানিক অর্থে তা সংকল্প গ্রহণ। পরে এই সংকল্প গ্রহণের সাথে ইহরামকে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। তার পূর্বে আর কিছুর হুকুম নেই। কাজেই ইহরামকে এই নামে অভিহিত করা খুবই সঙ্গত। যেমন তওয়াফ ও আরাফাতে অবস্থানকেও এই নামে অভিহিত করা হয়। অন্যান্য মানাসিককেও হজ্জই বলা হয়। ফলে এই সাধারণ তাৎপর্যের দিক দিয়ে 'নতুন চাঁদসমূহ' সম্পূর্ণই ইহরাম-এর সময় নির্ধারক হওয়াটা খুবই বাস্তব। আর এই সাধারণত্বই হজ্জের সমস্ত কার্যক্রমকে শামিল করে। সে কাজসমূহ নির্দিষ্ট সময়ের সাথে চিহ্নিত করার আর একটি দলীল হচ্ছে আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'হজ্জ কয়েকটি জানা মাসে সম্পন্ন হয়।' মাসসমূহ সম্পর্কে আগের কালের ফিকাহবিদদের কথা ও মতামত আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কেউ বলেছেন শওয়াল, যিলকাদাহ ও যিলহাজ্জা'র দশ দিন। অন্যরা বলেছেন সওয়াল, যিলকাদা ও যিলহাজ্জা। তাঁদের সকলের ঐকমত্যে একথা জানা গেল যে, কুরবানীর দিনটি হজ্জের মাসসমূহের মধ্যে গণ্য। কাজেই আল্লাহ্‌র কথা 'জানা মাসসমূহ'-এর সাধারণত্বের দ্বারা প্রমাণিত হল যে, কুরবানীর দিনও হজ্জের ইহ্‌রাম থাকা জায়েয। আর কুরবানীর দিন যখন তা পারা যায়, তখন সারা বছর ইহরাম রাখা অবশ্যই জায়েয হবে। কেননা কুরবানীর— জন্তু যবেহ করার দিন ইহরাম রাখা ও বছরের অন্যান্য সব সময় ইহরাম রাখা জায়েয হওয়ার মধ্যে কেউ-ই কোনরূপ পার্থক্য করেনি।

যদি বলা হয়, যিনি যিলহজ্জ মাসের দশ দিনের কথা বলেছেন, তিনি দশ দিন বলে দশ রাত্রি বোঝাতে চেয়েছেন। কুরবানীর দিনটি তাতে ধরা হয়নি। কেননা কুরবানীর দিনের ফজর উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বছরের হজ্জ নিঃশেষ হয়ে যায়।

জবাবে বলা যাবে, দশ দিনের কথা বলে যদি দশ রাত্রি বুঝিয়ে থাকেনও, তবে দশ রাত্রির সাথে জড়িত দিনগুলোও তার মধ্যে গণ্য হবে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্‌র কথা ঃ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا 'তিনটি রাত সমান সমান।' আসলে তিন দিনই বলতে চাওয়া হয়েছে। ঠিক এই ব্যাপারে উল্লেখ প্রসঙ্গে অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে ঃ

ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا -

তিন দিন কথা বলবে না, শুধু ইশারা-ইঙ্গিত ছাড়া।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا -

তোমাদের মধ্যে যেসব লোক মরে যায় এবং স্ত্রীদের রেখে যায়, সেই স্ত্রীরা নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন বিবাহের ব্যাপারে অপেক্ষমান থাকবে।

এ হচ্ছে চার মাস ও দশ দিনের কথা। হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব, আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ও আবদুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, 'বড় হজ্জের দিন হল কুরবানীর দিন, পশু কুরবানীর দিন, পশু কুরবানী করার দিন। পশু যবেহ করার দিন বড় হজ্জের দিন হবে।' কিন্তু তা হজ্জের মাসসমূহের মধ্যে হবে না, তা অসম্ভব। তা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'হজ্জ জানা মাসসমূহ'-এর বাহ্যিক দাবি হচ্ছে তিনটি সম্পূর্ণ মাস হওয়া।' তার থেকে কিছু কম হওয়া উচিত নয় দলীল ছাড়া। দলীল থাকলে ভিন্ন কথা। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, পশু কুরবানী করার দিনটি হজ্জের মাসসমূহের মধ্যে গণ্য। আর তাতে আল্লাহ ইহরাম বাঁধাকে মুবাহ ঘোষণা করেছেন। তাঁর কথা 'হজ্জ কতিপয় জানা মাসে'-এর মাধ্যমে। কাজেই ইহরামের সূচনা সেই সময় অবশ্যই সহীহ হবে। তখন যদি তা সহীহ হয়, তাহলে বছরে সবদিনই তা সহীহ হবে অবশ্যম্ভাবীরূপে ও সর্ব সম্মতভাবে। এই আয়াতটিতেই হজ্জের মাসসমূহ শুরু হওয়ার পূর্বেই ইহরাম বাঁধা জায়েয হওয়ার আরও একটি দলীল রয়েছে। তা হচ্ছে কথার পরবর্তী অংশ ঃ

فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ -

অতঃপর যে লোক এই মাসগুলোতে হজ্জ ফরয করে নেবে .......

অর্থাৎ হজ্জ করা ফরয মনে করে নেবে। এই হজ্জ ফরয করে নিলেই হজ্জ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য করার দায়িত্ব আসে। আর ফরয পালনের জন্যে কোন সময় নির্দিষ্ট করা হয়নি। কাজের জন্যে এই সময় নির্ধারিত করা হয়েছে। কেননা এখানে যে ফরয-এর কথা বলা হয়েছে, তা অবশ্যই সে হজ্জ ছাড়া অন্য কিছু হবে যাকে তার সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। আর ব্যাপার যখন তাই, তা হলে সময় নির্দিষ্ট হবে 'মানাসিক' সংক্রান্ত কার্যাবলীর জন্যে এবং অ-নির্দিষ্ট সময়ের ফরয দ্বারা তাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাই হজ্জের মাসসমূহের পূর্বেই হজ্জের জন্যে ইহরাম বাঁধা অবশ্যই সহীহ হবে। এই হজ্জই মানাসিক-এর সব কাজ ওয়াজিব করে দেয়। এই যা বলা হল, তার ভিত্তিতে একথা প্রমাণিত হয় যে, হজ্জের মাসসমূহের পূর্বেই মানতের হজ্জ শুরু করা সহীহ হবে। তাহলে তার জন্যে শর্তকৃত সময়ে হজ্জ করা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হবে, যদিও তা তার পূর্বেই ওয়াজিব হয়ে আছে। যদি কেউ মানত মানে এই বলে যে, 'আগামীকাল আল্লাহ্‌র জন্যে রোযা রাখা আমার জন্যে কর্তব্য', তাহলে আগামীকালের রোযা তার উপস্থিতির আগেই এই সময় ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে একথা বলাও জায়েয যে, যে লোক হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে হজ্জের জন্যে ইহরাম বেঁধেছে, তা-ই হজ্জের মাসে হজ্জ করা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। যদিও তার ফরয হওয়া ও তার জন্যে ইহরাম বাঁধা শুরু করা অন্য সময়ে হয়েছে। তাই আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যে ব্যক্তি এই নির্দিষ্ট মাসসমূহে হজ্জ ফরয করে

নেবে—হজ্জের নিয়ত করবে'-এর অর্থ, সেই মাসসমূহের পূর্বে কিংবা তার পূর্বে হজ্জের কাজ ফরয করে নেবে। কেননা আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ সমস্ত ফরয দুটি সময়ের মধ্যে শামিল করে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস থেকেও তা-ই প্রমাণিত হয়। তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ اَرَا دَالْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ -

যে লোক হজ্জ করার ইচ্ছা করে সে যেন খুব তাড়াতাড়ি করে।

তাড়াতাড়ি করা অর্থ ইহরাম বাঁধা ও তৎসংক্রান্ত কার্যাবলী করা। তবে যেসব কাজ তার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে না করার দলীল রয়েছে, সে সব কাজের কথা আলাদা।

সময় নির্ধারণ প্রসঙ্গের উল্লেখে যে কথাটি বলা হয়েছে, তা-ও সেই কথা প্রমাণ করে। কথাটি হচ্ছে ঃ هُنَّ لِاَهْلِهِنَّ 'ওগুলোর যারা অধিকারী তাদের জন্যে।' وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ اَهْلِهِنَّ مِمَّنْ اَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ 'এবং তাদের জন্যেও যারা সে সবের অধিকারীদের ছাড়াই সে সবের উপর দিয়ে চলে গেছে সেই লোকদের মধ্য থেকে, যারা হজ্জ ও উমরা করার ইচ্ছা করেছে।' এই সাধারণ নীতি যে-কোন সময়ে হজ্জের জন্যে ইহরাম বাঁধাকে জায়েয করে দিয়েছে বছরের যে-কোন সময়ে।

একটু চিন্তা-বিবেচনা করলেও বোঝা যাবে, কুরবানীর দিন প্রস্তর নিক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত ফজর উদয় হওয়ার পর থেকে হজ্জের ইহরাম তার পূর্ণত্ব সহকারে অবশিষ্ট থাকে, এ বিষয়ে সকলেই সম্পূর্ণ একমত। হজ্জের মাসসমূহ আসার পূর্বেই হজ্জের জন্যে ইহরাম বাঁধা যদি জায়েয না হতো, তাহলে যে সময়ে ইহরাম শুরু করা সহীহ্ নয় সেই সময় পর্যন্ত ইহরাম তার পূর্ণত্ব সহকারে টিকে থাকা সম্ভব হতো না। আর কুরবানীর দিন প্রস্তর নিক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত ইহরাম টিকে থাকার প্রমাণ করে যে, তা শুরু করাও জায়েয। কেননা হজ্জের মানাসিক এমন সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ যে, তাকে তার অগ্রে নিয়ে আসা কিছুতেই জায়েয নয়। কুরবানীর দিনটি যদি ইহরামের সময় না হয়, তাহলে তখন ইহরাম টিকে থাকা কখনই জায়েয হতে পারে না। যেমন জুম'আর নামায একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাকে সেই সময়ের পূর্বে নিয়ে আসা জায়েয হতে পারে না। জুম'আ শুরু করার পর সেই সময়ে টিকে থাকা যখন তা শুরু করা সহীহ্ নয়— জায়েয হতে পারে না। যথা, জুম'আ শুরু করা, পরে তা শেষ করার পূর্বেই আসরের সময় শুরু হয়ে যাওয়া— তাতে জুমআ বাতিল হয়ে যাবে এবং সময় চলে যাওয়ার পর তার হুকুমটা টিকে থাকবে না। সেই সময়ে তা শুরু করাও সহীহ্ হবে না। ইহরামের হজ্জও তেমনি। যদি তা হজ্জের মাসসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়, তাহলে তার শেষ হয়ে যাওয়ার পর তার পূর্ণত্ব সহ বাকী থাকা কখনই সহীহ্ হবে না। যেমন আমাদের বিপরীত মত পোষণকারীদের মতে তার শুরু করা সহীহ নয়। কিন্তু আমরা বলব, পশু যবেহ্ করার দিনও ইহরাম টিকে থাকা যদি সহীহ্ হয়, তাহলে সে দিন ইহরাম শুরু করাও সহীহ্ হবে।

এই কথা এদিক দিয়েও সহীহ্ প্রমাণিত হয় যে, হজ্জের ইহরাম এমন সময়ও জায়েয, যখন তার সংক্রান্ত কার্যাবলী বিলম্বিত হবে এবং সেগুলোর সেই সময়ে সঙ্ঘটিত হওয়া সহীহ্ হবে না। অতএব হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে তাকে এগিয়ে নিয়ে আসা জায়েয হবে অবশ্যই। যেমন তার সংক্রান্ত কাজগুলো সেই সময়ে করা সহীহ্ হবে। কেননা তা যে কাজগুলোকে জরুরী

করে, তা থেকে বিলম্বিত। উপরন্তু ইহরাম বাঁধা যদি কোন সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হতো, তাহলে তার সাথে তার কার্যাবলীর ওয়াজিব হওয়ার কারণ ও মিলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাকে তার থেকে বিলম্বিত হওয়া জায়েয হতো না।

এর আর একটা প্রমাণ হচ্ছে, এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, তামাত্তু হজ্জকারী একই সফরে উমরা ও হজ্জের কার্যাবলী একত্রিত ও সমন্বিত করে— অবশ্য তা যাদের পরিবারবর্গ মসজিদে হারামে উপস্থিত নয়, তাদের জন্যে উমরার ইহরাম হজ্জের মাসসমূহে কিংবা তার পূর্বে হতে পারে। তামাত্তু হজ্জকারীর জন্যে দেয়া হুকুমের এটাই দাবি। অনুরূপভাবে হজ্জের ইহরাম হজ্জের মাসসমূহে কিংবা তার পূর্বে হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এ দুটির মধ্যে সমন্বয়কারী অর্থ হচ্ছে, দুটি ইহরাম যে সব কাজকে ওয়াজিব করে তার প্রত্যেকটির হুকুম সংশ্লিষ্ট হচ্ছে হজ্জের মাসসমূহের মধ্যে সঙ্ঘটিত হওয়ার সাথে। ফলে দুটো ইহরামই সমান হওয়া জরুরী যেমন বলেছি সেই দিক দিয়ে। যেমন সে দুটি কার্যাবলী হজ্জের মাসসমূহের মধ্যে হওয়া সমান হয়ে যায়।

যারা হজ্জের মাসসমূহের আগে হজ্জের ইহরাম বাঁধা জায়েয মনে করেন না, তাদের দলীল হচ্ছে اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ এর বাহ্যিক অর্থ। অথচ আমরা ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছি যে, হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে হজ্জের ইহরাম বাঁধা জায়েয এবং তার দলীলও দিয়েছি। তা সত্ত্বেও 'হজ্জ কয়েকটি জানা মাসে' কথাটির হুকুম একটা ইঙ্গিতের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাকে বাদ দিয়ে কথা বলা যেতে পারে না। আর তা হচ্ছে, একথা জানা-ই আছে যে, হজ্জ বহু কয়টি মাসে হয় না। কেননা হজ্জ তো হল হাজীর কাজ। আর মাসসমূহ হল আল্লাহ্র কাজ, আল্লাহ্র সৃষ্টি। আর আল্লাহ্র কাজ কখনই বান্দার কাজ হতে পারে না। অতএব প্রমাণিত হল যে, এখানে একটি ইঙ্গিত উহ্য আছে। হতে পারে সে ইঙ্গিতমূলক কথাটি এই হবে যে, 'হজ্জের কাজ জানা মাসসমূহে হবে।' আর তাহলে তাতে হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে তার ইহরাম বাঁধা জায়েয না হওয়ার মতো কোন কিছুই নেই। বরং তা থেকে এই ফায়দা লাভ করা যায় যে, হজ্জের কাজগুলো এই মাসসমূহে হবে। আর ইহরামও সেই সময়ে জায়েয। সে সময়ে ইহরাম জায়েয হলে অন্য সময়ে ইহরাম জায়েয হবে না— এমন কোন কথা নেই।

যদি বলা হয়, হজ্জের ইহরাম সংক্রান্ত আদেশ কিংবা তার কার্যাবলী এর মধ্যেই শামিল রয়েছে। অতএব অন্য সময়ে তা করা জায়েয হবে না।

জবাবে বলা যাবে, একথা ভুল। কেননা ব্যবহৃত শব্দের আদেশের কোন দলীল নেই। বরং তাতে তার জায়েয হওয়ারই দলীল রয়েছে। তার ওয়াজিব করার কোন দলীল শব্দে নেই। ব্যাপার যখন এই, তখন এই সব মাসে হজ্জের ইহরাম ও তার সংক্রান্ত কার্যাবলী জায়েয হওয়ারই বরং অনেক দলীল রয়েছে। আর অন্য সময়ে তা না-জায়েয হওয়ার কোন দলীল নেই।

যদি বলা হয়, সারা বছরই যখন ইহরাম বাঁধা জায়েয, তখন তার জন্যে কোন মাসকে নির্দিষ্ট করে দেয়ার কোন অর্থ নেই। এই মত সময় নির্ধারণের ফায়দা বিনষ্ট করে দেয়।

জবাবে বলা যাবে, ব্যাপার তা নয়। বরং তাতে বহু ফায়দা নিহিত রয়েছে। একটি এই যে, হজ্জের কার্যাবলী এই মাসসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। আমরা পূর্বে বলেছি, হজ্জের মাসসমূহের আগেই যদি তওয়াফ ও সাঈ' সম্পন্ন করে, তাহলে তা হজ্জের জন্যে গণ্য হবে না।

তা পুনরায় করতে হবে। আর একটি ফায়দা এই যে, তামাত্তুর হুকুম হজ্জের সাথে উমরার কাজের সাথে সম্পর্কিত এই মাসসমূহে। এমন কি, হজ্জের মাসসমূহের আগেই যদি উমরার তওয়াফ সম্পন্ন করা হয়, আর সেই বছরই হজ্জ করে, তাহলে সে তামাত্তু হজ্জকারী হতে পারবে না। এজন্যে আমাদের হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন সেই ব্যক্তি সম্পর্কে, যে 'কেরান' হজ্জ করবে ও হজ্জের মাসসমূহ আসার আগেই মক্কায় প্রবেশ করবে ও উমরার তওয়াফ ও সাঈ' করে ফেলে এবং কেরান-এর উপরই চলতে থাকে, তাহলে সে তামাত্তু হজ্জকারী হল না। কেরান হজ্জের পশু যবেহ করাও তার জন্যে কর্তব্য হবে না। আয়াতটি এই ফায়দা দিয়ে যে, এই মাসগুলোর সাথেই তামাত্তুর হুকুম জড়িত যখন হজ্জ ও উমরাকে তাতে একত্রিত করা হবে। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'হজ্জ জানা মাসসমূহে' হজ্জকে যদি এই মাসসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়, অন্যান্য মাসকে শামিল না করে, তাহলে ইহরাম ছাড়াই হজ্জের কাজ কর্মের দিকে ফিরে যাওয়া কর্তব্য হয়ে পড়ে। তাতে আল্লাহ্‌র একথাটির সাধারণ তাৎপর্য রক্ষা পায় ঃ 'লোকেরা তোমাকে নতুন চাঁদসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বলে দাও, তা লোকদের ও হজ্জের জন্যে সময় নির্ধারক।' এতে জানা গেল যে, সব নতুন চাঁদেই ইহরাম বাঁধা জায়েয। তার অর্থ যদি ইহরাম ধরা হয়, তাহলে 'তা জনগণের ও হজ্জের জন্যে সময় নির্ধারক' কথাটির সাধারণত্ব ব্যাহত হয়ে যায়। আর 'হজ্জ জানা মাসসমূহ'-এর তাৎপর্যকে সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ করে দেয়া হয়। তা সত্ত্বেও আমরা তার ব্যবহারকারী হবো না। কেননা আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি নতুন চাঁদসমূহকে হজ্জের সময় নির্ধারক বানিয়েছেন। আমরা যখনই তাকে হজ্জের মাসসমূহের মধ্যে সীমিত করে দেব, তখন তার হুকুম নতুন চাঁদসমূহের সাথে সম্পর্কিত থাকবে না। সম্পর্কিত হয়ে যাবে তার পরিবর্তে অন্যান্য সময়ের সাথে, যেমন আরাফাতের দিনটি অবস্থান গ্রহণের জন্যে, আর কুরবানীর দিনটি তওয়াফ ও পাথর নিক্ষেপের জন্যে। ইহরাম ও তার কার্যাবলীর কথা মনে করা জায়েয হবে না। কার্যাবলীর কথা মনে করা হলেই ইহরাম নিষিদ্ধ হবে। কেননা একটি শব্দে দুটিরই ইচ্ছা গ্রহণ নিষিদ্ধ। তার কারণ হল সে দুটির একটি স্বতঃই লক্ষ্যভূত। তা হল 'মানাসিক'-এর কার্যাবলী। আর দ্বিতীয়টি হল তার কারণ। এই নামকরণ পরোক্ষ পন্থায়। অতএব দুটিরই একই শব্দে ইচ্ছা গ্রহণ জায়েয নয়। যে হজ্জ করল, কিন্তু আরাফাতে অবস্থান গ্রহণ করল না, তার সম্পর্কে বলা যাবে যে, সে হজ্জ-ই করেনি। আর অবস্থান গ্রহণ করলে তাকে হাজী নামে অভিহিত করা চলবে। উপরন্তু আল্লাহ যখন বলেছেন ঃ 'হজ্জ কয়েকটি মাসে সম্পন্ন করতে হয়,' আর নবী করীম (স) বলেছেন ঃ 'আরাফা-ই হচ্ছে হজ্জ, তখন বুঝতে হবে, এই কথাটি কুরআনে বলা হজ্জের পরিচিতি। বুঝতে হবে الحج। -এর প্রথম আলিফ ও লাম অক্ষরদ্বয় পরিচিতিমূলক। এক্ষণে আয়াতের মোট কথাটি দাঁড়ায় এই ঃ 'হজ্জ যা আরাফাতে অবস্থানের মাধ্যমে হয়, কয়েকটি জানা মাসে সম্পন্ন করণীয়। মাসসমূহ বলার ফায়দা আমরা পূর্বেই ব্যাখ্যা করেছি। ইহরাম বাঁধার সময় বুঝবার উদ্দেশ্য হলে তা মাসসমূহে মুস্তাহাব হিসেবে ব্যবহার করাই কর্তব্য। আর 'জনগণের ও হজ্জের জন্যে' কথাটি জায়েয বোঝাবার জন্যে। এভাবেই দুটি শব্দের প্রত্যেকটিরই ফায়দা পূর্ণভাবে পাওয়া যায় এবং তার হুকুমের অংশও।

যদি বলা হয়, উক্ত কথা বলে ইহরাম বোঝানোর ইচ্ছা হয়ে থাকলে তা তার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ের আগে তা করা জায়েয হবে না। তখন কথাটি 'নামায কায়েম কর সূর্য পশ্চিমদিকে

ঢলে পড়লে'-এর মত হয়ে যাবে। অথবা 'নামায কায়েম কর দিনের দুই দিকে' এর মত। এইরূপ আরও যে সব আয়াত রয়েছে, সে সব আয়াতের মত, যাতে ইবাদতের জন্যে সময় নির্ধারিত করা হয়েছে।

জবাবে বলা যাবে, আমরা পূর্বেই বলেছি যে, 'হজ্জ কয়েকটি জানা মাসে করণীয়' আল্লাহ্‌র এ কথাটিতে হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার কোন দলীল নেই। কেননা এটা আদেশ সূচক কথা নয়। তাতে একটা ইঙ্গিত রয়েছে, তা প্রমাণের জন্যে একটা ভিন্ন দলীলের প্রয়োজন। কেননা হতে পারে, এই মাসসমূহে হজ্জ জায়েয হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর এ-ও হতে পারে যে, তদ্দ্বারা হজ্জের ফযিলত বলা হয়েছে। অতএব শব্দের বাহ্যিক অর্থে সময় নির্ধারণের কোন অর্থ যে নেই, তা নিঃসন্দেহে। এই কারণে 'মাসসমূহ' বলার দ্বারা ইহরামের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে ওয়াজিবকরণ হিসেবে, এর দলীল বলাও সহীহ হবে না। আর নামায তো আল্লাহ তা'আলা সময় নির্ধারণ সহকারেই ফরয করেছেন এমন শব্দ দ্বারা, যাতে সেই সময়েই তা আদায় করা ফরয হয়ে যায় কোনরূপ শোবা সন্দেহ ছাড়াই। যেমন বলেছেন ঃ أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ 'সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়ার সময় হলে নামায কায়েম কর।' এরূপ আরও আয়াতে নির্ধারিত সময়ে নামায কায়েমের আদেশ করা হয়েছে।

আরও একটি কারণ আছে। আমরা মেনে নিয়েছি যে, সেটি ইহরাম বাঁধার সময়। তখন নামায তার উপর বাধ্যতামূলক হয় না নামাযের ইহরাম তার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ের আগে নিয়ে আসার দিক দিয়ে। তা জায়েয নয় এ হিসেবে যে, তার ফরযসমূহ ও রুকন সমূহ ইহরামের সাথে মিলে গিয়েছে। তার সমস্ত ফরয তার তাহরীমা বাঁধা থেকে বিলম্বিত করে করা জায়েয নয়। এই কারণে তার তাহরীমা বাঁধার হুকুম সমস্ত কাজের হুকুম হয়ে যায়। এমন সময়ে হজ্জের ইহরাম বাঁধা জায়েয হওয়ার কোন মতপার্থক্য নেই, যার পরে বিলম্বিত হবে তার সমস্ত কাজ। তার একটি ফরযও ইহরামের পরে পরে করা জায়েয নয়। এই কারণে হজ্জ ও নামায দুইটি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস হয়ে গেছে।

অপর একটি দিক দিয়েও আলোচনা করতে হবে। তা হল ইহরামের কাজ নিষিদ্ধ হওয়ার দরুন তার বাধ্যবাধকতার সহীহ হওয়া নিষিদ্ধ করে না। আর নামায নিষিদ্ধ হওয়ায় নামায শুরু করা সহীহ হওয়াকে নিষেধ করে। তার দলীল হচ্ছে, যে লোক বিনা অযূ অবস্থায় নামাযের তাহরীমা বাঁধবে অথবা অ-কিবলার দিকে ফিরে তাহরীমা বাঁধবে— ইচ্ছা করে কিংবা সম্পূর্ণ ন্যাংটা অবস্থায়— অথচ তার কাপড় আছে, তার নামায শুরু করাই জায়েয নয়। তেমনি হজ্জের ইহরাম বাঁধল স্ত্রীর সাথে মেলা-মেশা করা অবস্থায় অথবা পোশাক-পরিচ্ছদ পরা অবস্থায়, তার ইহরাম তো সঙ্ঘটিত হবে, তার হুকুম-ও তার জন্যে বাধ্যতামূলক হবে তা নষ্ট করে এমন কাজের সাথে ঘনিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বে। তাই হজ্জের ইহরাম সংক্রান্ত হুকুম-আহকামকে নামাযের সাথে তুলনা করা সঙ্গত হবে না।

আর একটি কারণ এই যে, নামাযের কোন কোন ফরয তরক করলে তাকে নষ্ট করে দেবে। যেমন অযূ না থাকা, কথা বলা, চলাফেরা করা ইত্যাদি। কিন্তু ইহরামের কোন কোন ফরয তরক হলে ইহরাম নষ্ট হয় না। কেননা সুগন্ধি ব্যবহার করলে বা ভালো পোশাক পরলে কিংবা

শিকার করলে ইহরাম ভেঙ্গে যায় না। যদিও এই সব কাজ না করাই ইহরামের ফরয। হজ্জের কোন কোন ফরয তো এমন যা হজ্জের মাসসমূহ শেষ হয়ে যাওয়ার পর করতে হয়। আর কোন কোন ফরয তার জন্যে নির্দিষ্ট সময়েই করতে হয়। কিন্তু নামাযের কোন ফরযই এমন নয়, যা তার জন্যে নির্দিষ্ট সময় অতীত হয়ে যাওয়ার পর করতে হয়। কাযা করার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্নতর। কাজেই নামায ইহরাম সম্পর্কিত মাসলা ঠিক করতে ভিত্তি হতে পারে না। তবে আসল মাসলায় তাকে দলীল বানানো যেতে পারে। তা এ ভাবে যে, হজ্জের কোন কোন ফরয এমন যা হজ্জের মাসসমূহ অতীত হয়ে যাওয়ার পর করা হয়, তা-ই হয় তার আসল সময়। তেমনি তার জন্যে ইহরাম হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে করা জায়েয। তা-ই হবে তার জন্যে আসল সময়। কেননা তা হজ্জের মাসসমূহের আগে করা জায়েয না হলে তার কোন ফরয পেছনে বিলম্বিত করে করা জায়েয হতো না ঠিক নামাযের মতই।

যদি বলা হয়, এ বিষয়ে যখন সকলেই একমত যে, যে লোক হজ্জ করতে পারল না, তার তখনকার ইহরাম দিয়ে পরবর্তী বছরের হজ্জ করা তার জন্যে জায়েয নয়। তার হালাল হয়ে যাওয়া উচিত উমরা করে। তখন বোঝা গেল যে, হজ্জের মাসসমূহ ছাড়া অন্য সময় হজ্জের জন্যে করা ইহরাম উমরা করা ওয়াজিব বানিয়ে দেয়। সেই ইহরাম দ্বারা হজ্জ করা জায়েয নয়।

জবাবে বলা হবে, হজ্জের মাসসমূহের পর-ও তার ইহরাম পুরাপুরিভাবে টিকে থাকা জায়েয। আর তা হচ্ছে কুরবানীর দিন প্রস্তর নিক্ষেপের পূর্বে। এমনকি ইমাম শাফেয়ী (রা) ধারণা করেছেন যে, কুরবানীর দিন যদি স্ত্রী-সঙ্গম করে, তাহলে তার হজ্জ নষ্ট হয়ে যাবে। পূর্বে আমরা দলীল দিয়ে বলেছি যে, হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে হজ্জের ইহরাম বাঁধা জায়েয। কেননা তাঁর মতে কুরবানীর দিনটি হজ্জের মাসসমূহের মধ্যে গণ্য নয়। সে দিনও ইহরাম তার পূর্ণত্ব সহকারে বাকী থাকতে পারে। এর দুটি তাৎপর্য রয়েছে। একটি হচ্ছে প্রশ্নকারীর প্রশ্ন করার সুযোগ না থাকা। যা সে উল্লেখ করেছে তা নিয়ে আপত্তির কারণ হল— হজ্জের মাসসমূহের আগেই হজ্জের জন্যে সহীহ্ ইহরাম পেয়ে যাওয়া সঙ্গত। আর দ্বিতীয় তাৎপর্য হল, হজ্জের মাসসমূহের পূর্বেই হজ্জের ইহরাম শুরু করা জায়েয বোঝায়। কেননা সে সময় পূর্বের ইহরাম টিকে থাকা সঙ্গত, যেমন ইতিপূর্বে আমরা বিস্তারিত বলেছি। ইমাম শাফেয়ী যে বলেছেন যে, হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে হজ্জের ইহরাম যে বাঁধবে, সে কার্যত উমরার জন্যে ইহরাম বেঁধেছে বুঝতে হবে। এই কথাটি বাহ্যিকভাবেই বিপর্যস্ত। কেননা হয় ইহরামের হজ্জ সে নিজের উপর যা চাপিয়ে নিয়েছে, তার জন্যে বাধ্যতামূলক হবে, অথবা বাধ্যতামূলক হবে না। যদি বাধ্যতামূলক না হয়, তাহলে সে ইহরাম বাঁধেনির মতো হয়ে যাবে। অথবা সেই নামাযীর মতো হবে যে যুহরের সময় আসার আগেই যুহরের নামাযের তাহ্‌রীমা বেঁধেছে। তাতে তার জন্যে বাধ্যতামূলক কিছু থাকে না। সে তা শুরুই করেনি। না অন্য কিছুতে সে প্রবেশ করছে। তার জন্যে হজ্জ বাধ্যতামূলক হলে হজ্জের মাসসমূহের পূর্বেই হজ্জের ইহরাম আদায় করা তার জন্যে জায়েয হবে। আর ইহরাম বাঁধা যখন সহীহ্ হবে, তাতে থেকে যাওয়াই তার পক্ষে সম্ভব হবে। উমরা করে তা থেকে হালাল হওয়া তার জন্যে জায়েয হবে না।

যদি বলা হয়, সে তো সেই ব্যক্তির মত, যে হজ্জ হারিয়েছে। কাজেই উমরা করার মাধ্যমে হালাল হওয়াই তার কর্তব্য।

জবাবে বলা যাবে, তা ঠিক উমরা নয়। উমরার কাজ-কর্ম, যা করে হজ্জের ইহরাম থেকে তাকে হালাল হতে হবে। যেমন মক্কায় থেকেও যে হজ্জ করতে পারে না— হারিয়ে ফেলে, তাকে হালাল হওয়ার জন্যে আদেশ করা হয়নি তার জন্যে উমরার যে কাজ করা জরুরী করে দেয়া হয়েছে তার জন্যে। কেননা মক্কার লোকের জন্যে উমরার সময়ও সে হালাল। সে হালাল হওয়ার জন্যে উমরা শুরু করার ইচ্ছা করলেও। এ থেকে বোঝা গেল, হজ্জ হারিয়ে সে যা করবে তা উমরা নয়, তা উমরার কাজ মাত্র। তা করেই সে হজ্জের ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে। হজ্জ হারালেও হজ্জের ইহরাম টিকে থাকবে। উপরন্তু যে হজ্জ হারাবে, হজ্জের ইহরাম তার জন্যে বাধ্যতামূলক। সে উমরার কাজ করে তা থেকে হালাল হওয়ার মুখাপেক্ষী হয়েছে মাত্র। তাহলে ইমাম শাফেয়ী কি বলেন যে, হজ্জের মাসসমূহের পূর্বেই হজ্জের ইহরামকারীর জন্যে হজ্জ বাধ্যতামূলক ? উমরার কাজ করে সে হালাল হয়ে যাবে ? এবং হজ্জ কাযা করা তার কর্তব্য হবে? তাঁর মতে সে যদি হজ্জের ইহরামকারী না হয়, তাহলে এ অবস্থায় দুটি জিনিস তার জন্যে প্রয়োজন। একটি তাকে উমরা করতে হয়, অথচ সে তা নিজের উপর বাধ্যতামূলক করে নেয়নি। তার নিয়তও করেনি। আর দ্বিতীয়— সে হয়ে গেছে সেই ব্যক্তির মতো, যে ইহরাম বাঁধার পর হজ্জ করতে পারেনি। যদিও এটার ইহরাম সে কখনই বাঁধেনি। ফলে উমরা তার জন্যে বাধ্যতামূলক হয়ে গেল, যার কোন কারণই নেই। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِامْرِىءٍ مَّانَوَى -

কাজসমূহ নিয়ত অনুযায়ী গৃহীত হয়। যে লোক যে নিয়ত করবে সে তা-ই পাবে।

তাই যখন কেউ ইহরাম বেঁধে হজ্জের নিয়ত করল, তার তা-ই হওয়া উচিত যার নিয়ত সে করেছে রাসূলে করীম (স)-এর কথানুযায়ী। সে তো হজ্জের নিয়ত করেছে। তার হজ্জ করাই উচিত।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ -

যে লোক এই মাসসমূহে হজ্জের নিয়ত করবে ...

আবূ বকর বলেছেন, এই আয়াতাংশের মূল বক্তব্য সম্পর্কে আগের কালের মনীষিগণের বিভিন্ন কথা রয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রা), আল-হাসান ও কাতাদাতা বলেছেন, এর অর্থ যে-লোক ইহরাম বাঁধল। শরীক আবূ ইসহাক, ইবনে আব্বাস সূত্রে বলেছেন, এ আয়াতাংশের অর্থ হল ঃ যে লোক 'তালবিয়া' বলবে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও ইবনে উমর (রা) ইবরাহীম নখয়ী, তায়ূস, মুজাহিদ ও আতাও তাই বলেছেন। উমরাতা আয়েশা (রা) সূত্রে বলেছেনঃ যে লোক ধ্বনি দিল ও লাব্বাইকা বলল, তার ইহরামই গণ্য হবে।

আবূ বকর বলেছেন, এ আয়াতাংশের যিনি অর্থ করেছেন ঃ 'যে ইহ্‌রাম করেছে' তিনি তালবিয়া বলা ছাড়া ইহ্‌রাম জায়েয মনে করেন— সে কথা বোঝায় না। কেননা হতে পারে তিনি বলেছেন ঃ যে লোক ইহ্‌রাম বেঁধেছে আর ইহ্‌রামের শর্ত হচ্ছে, 'তালবিয়া' বলা। অতএব বলা যায়, তালবিয়া বলা বা অনুরূপ কাজ কুরবানীর জন্তুর গলায় রশি বাঁধা, তাকে চালিয়ে দেয়া প্রভৃতি ধরনের কাজ না করে ইহ্‌রাম শুরু করা জায়েয, তা আগে কালের মনীষীদের মধ্যে কেউ-ই বলেন নি। হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণ তালবিয়া বলা, কুরবানীর জন্তুর গলায় রশি বাঁধা ও সেটি চালনা করা ছাড়া ইহ্‌রাম শুরু করা জায়েয মনে করেন নি। তার দলীল হচ্ছে একটি হাদীস। ফুরাদ ইবনে আবূ নুহ নাফে, ইবনে উমর, আবূ মুলায়কা আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। হযরত আয়েশা (রা) তখন চিন্তা ভারাক্রান্ত অবস্থায় পড়েছিলেন। নবী করীম (স) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার কি হয়েছে ? জবাবে বললেন, হয়নি কিছুই। আমি আমার উমরা পুরা করেছি। কিন্তু হজ্জ আমাকে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। নবী করীম (স) বললেন ঃ 'এ এমন একটা ব্যাপার, যা আল্লাহ্ আমাদের কন্যাদের জন্যে লিখে দিয়েছেন। অতএব তুমি হজ্জ কর এবং বল তা-ই, যা মুসলমানরা তাদের হজ্জে বলে থাকে।'

এ থেকে বোঝা যায় যে, 'তালবিয়া' বলা ওয়াজিব। কেননা মুসলমানরা ইহ্‌রাম বাঁধার পর তালবিয়া বলে। নবী করীম (স)-এর এই নির্দেশ ওয়াজিব প্রমাণ করে। নবী করীম (স)-এর এই কথাটিও পালন করা কর্তব্য ঃ "তোমরা আমার নিকট থেকে তোমাদের 'মানাসিক' হজ্জ সংক্রান্ত কার্যাবলী বুঝে নাও।" তালবিয়া এই মানাসিক-এরই অন্তর্ভুক্ত। তিনি নিজে ইহ্‌রাম বাঁধার পর 'তালবিয়া' বলেছেন। নবী করীম (স)-এর আরও একটি কথা রয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ আমার নিকট জিবরাঈল এসে বলেছেন ঃ

مُرْ أُمَّتَكَ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ فَإِنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْحَجِّ -

আপনি আপনার উম্মতকে উচ্চস্বরে তালবিয়া বলতে আদেশ করুন। কেননা তালবিয়া হজ্জের অঙ্গীভূত একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

এর মধ্যে দুটি তাৎপর্য রয়েছে ঃ তালবিয়া বলা এবং তা উচ্চস্বরে উচ্চারণ করা। তবে ফিকাহ্‌বিদগণ একমত হয়ে বলেছেন ঃ তালবিয়া উচ্চস্বরে উচ্চারণ করা ওয়াজিব নয়। তবে 'তালবিয়া' বলার হুকুম অবশ্যই পালনীয়।

এ থেকে বোঝা যায়, হজ্জ ও উমরায় একই তাহরীমায় বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী কাজ সম্পন্ন করতে হয়। ফলে তা 'নামায' সদৃশ হয়ে গেছে। কেননা তাতে একই তাহরীমায় বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী কাজ করতে হয়। নামায শুরু করতে 'আল্লাহু আকবার' বলতে হয়। হজ্জ ও উমরা শুরু করতেও তেমনি তালবিয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র যিকির করতে হয়। কিংবা তদস্থলে অন্য যা কিছু বলা হয়। হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, যখন পশুর গলায় দড়ি লাগানো হবে ও সেটি চালিয়ে দেয়া হবে ইহ্‌রাম বাঁধার নিয়ত করে, তখনই সে ইহ্‌রাম বাঁধল, মনে করা যাবে। হযরত জাবির (রা)-এর দুই পুত্র তাঁদের পিতার মাধ্যমে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

إِنَّ مَنْ قَلَّدَ بَدَنَةً فَقَدْ أَحْرَمَ -

যে লোক পশুর গলায় দড়ি বাঁধল, সে ইহ্রাম বাঁধল।

এ ব্যাপারে আগের কালের ফিকাহ্বিদগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। ইবনে উমর (রা) বলেছেন ঃ হ্যাঁ, পশুর গলায় দড়ি বাঁধলে বোঝা যাবে, সে ইহ্রাম বেঁধেছে। হযরত আলী, কায়স ইবনে সাদ, ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা), তায়ূস, আতা, মুজাহিদ, শবী, মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন, জাবির ইবনে জায়দ, সাঈদ ইবনে যুবায়র ও ইবরাহীম থেকেও এরূপ বর্ণনাই পাওয়া গেছে। এই কাজটা হল, ইহ্রাম বাঁধার ইচ্ছা করার পর পশুর গলায় দড়ি লাগালো ও তাকে চালিয়ে দেয়া। ইহ্রাম বাঁধার নিয়ত না করলে যে ইহ্রামকারী হওয়া যায় না, এ ব্যাপারে কোন মতবৈষম্যের অবকাশ নেই। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ إِنِّى قَلَّدْتُ الْهَدْىَ فَلَا أُحِلُّ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ 'আমি কুরবানীর জন্তুর গলায় রশি বেঁধেছি। অতএব আমি পশু যবেহ্ বা কুরবানী করার দিন পর্যন্ত হালাল হবো না।' এই বলে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, কুরবানীর পশুর গলায় দড়ি বাঁধা ও সেটিকে চালিয়ে দেয়া তাঁর ইহ্রাম বাঁধার পথে বাঁধা ছিল। বোঝা গেল, ইহ্রাম বাঁধার ব্যাপারে এই কাজের একটা গুরুত্ব রয়েছে। তা তালবিয়া বলার স্থলাভিষিক্ত ইহ্রাম শুরু করার ব্যাপারে। যেমন তা বাঁধা ছিল হালাল হওয়ার পথে। শুধু পশুর গলায় দড়ি বাঁধাই যে ইহ্রাম ওয়াজিব করে দেয় না, তার দলীল হচ্ছে, হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস। নবী করীম (স) তাঁর কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দিতেন এবং দাঁড়িয়ে থাকতেন। তখনও তাঁর ইহ্রাম বাঁধা হয়নি। হযরত আয়েশা (রা)-ও বলেছেন, 'যে তালবিয়া বলেনি সে ইহ্রাম বাঁধেনি অর্থাৎ যে লোক তার জন্তু পাঠিয়ে দেয়নি ও তার সঙ্গে বের হয়ে যায়নি।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ -

হজ্জে স্ত্রী-সঙ্গম নেই, ফিসক-ফুজুরী-শরীয়াত লঙ্ঘনমূলক কাজ বা ঝগড়া-ঝাটি প্রভৃতি কাজের কোন অবকাশ নেই।

আগের কালের মনীষিগণ رفث শব্দের মর্ম বিভিন্ন শব্দে প্রকাশ করেছেন। হযরত ইবনে উমর (রা) বলেছেন ঃ তার অর্থ الجماع। স্ত্রী-সঙ্গম। ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণনাই পাওয়া গেছে। তাঁর একথাও জানা গেছে ঃ التعريض بالنسا 'স্ত্রীলোকদের সাথে যৌনতামূলক ইশারা-ইঙ্গিত।' ইবনুয যুবায়রও তাই বলেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) এই কথা বলেছেন ঃ 'রফস' হচ্ছে সঙ্গমের উল্লেখ সহকারে স্ত্রীদের নিকট ফিরে যাওয়া। আতা বলেছেন ঃ 'রফস' অর্থ স্ত্রী সঙ্গম; কিংবা তার চাইতে কিছুটা কম লজ্জাকর কথাবার্তা। আমর ইবনে দীনার বলেছেন ঃ সঙ্গম বা তার চাইতে কম কাজ স্ত্রীদের সঙ্গে।

আবূ বকর বলেছেন ঃ বলা হয়েছে 'রফস' শব্দের আসল অর্থ লজ্জাজনক কথাবার্তা বলা ও স্ত্রী অঙ্গে সঙ্গম করা। হাত দ্বারা সঙ্গমের ইঙ্গিত দেয়া; তা-ই যখন হবে, তখন হজ্জে 'রফস' নিষিদ্ধ হওয়ার অর্থে এসব কিছুই শামিল মনে করতে হবে। এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, এ আয়াত দ্বারা যৌন সঙ্গমকেই বোঝানো হয়েছে। বোঝা যায়, যুক্তির দিক দিয়েও 'রফস' অর্থ নির্লজ্জতা। যেমন নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلَايَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ فَانْ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلْ انِّىْ صَائِمٌ -

তোমাদের কারোর রোযার দিন হলে সে সঙ্গম করবে না। জাহিলী কাজ করবে না। তার উপর জাহিলী কাজ করা হলে সে বলবে ঃ আমি রোযাদার।

লজ্জাকর কথাবার্তাও তার মধ্যে শামিল। 'রফস' শব্দের অর্থ যদি ইহরামে স্ত্রীদের উল্লেখ সহকারে সঙ্গমের ইশারা-ইঙ্গিত হয়, তাহলে স্পর্শ করা, হাত দিয়ে ধরা ও সঙ্গম অবশ্যই নিষিদ্ধ হবে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَاتَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا -

এবং তোমরা পিতা-মাতার জন্যে 'উহ্' বলো না, তাদেরকে ভর্ৎসনা করো না।

এ থেকে গালাগাল ও মারপিট করার নিষেধও বোঝা গেছে। আল্লাহ রোযার প্রসঙ্গেও 'রফস' শব্দের উল্লেখ করেছেন। বলেছেন ঃ

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ نِسَائِكُمْ -

রোযার রাত্রিতে তোমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন ও সঙ্গম তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে।

এ কথা দ্বারা যে স্ত্রী-সঙ্গম হালাল করার কথা বলা হয়েছে, এতে কোনই মতপার্থক্য নেই। তার কম যা কিছু তাও মুবাহ করা হয়েছে। আর হজ্জে এই সবই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইশারা-ইঙ্গিত এবং স্পর্শকরণ থেকে উপরের দিকে— সঙ্গম পর্যন্ত সবই এই নিষেধের আওতাভুক্ত। কেননা অল্প কাজ নিষিদ্ধ হলে সেই জাতীয় বেশি কাজও অবশ্যই নিষিদ্ধ হবে। বেশি পরিমাণ মুবাহ হলে কম পরিমাণও মুবাহ হবে। এটাই স্বাভাবিক। মুহাম্মাদ ইবনে রাশেদ থেকে বর্ণিত— বলেছেন, আমরা হজ্জ করার জন্যে রওয়ানা হলাম। পরে আমরা 'রুয়াইসা'য় পৌঁছলাম। সেখানে এক শায়খকে দেখলাম, তার নাম আবূ হরম। তিনি বললেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি لِلْمُحْرِمِ مِنْ اِمْرَأَتِهِ كُلُّ شَيْءٍ اِلَّا الْجِمَاعَ 'ইহরাম বাঁধা ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে সঙ্গম ছাড়া আর সব কাজ-ই করতে পারে'— এ কথা শুনার পর আমাদের হজ্জযাত্রীদের মধ্যের একজন তার স্ত্রীর নিকট যেতে আগ্রহী হল, তাকে চুম্বন করল। পরে আমরা মক্কায় পৌঁছলাম। সেখানে আতাকে এই কথার উল্লেখ করে মাসলা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন— আল্লাহ লোকটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। সে মুসলমানদের যাতায়াত পথে বসে গুমরাহীর ফিতনার সৃষ্টি করছে। পরে আরও বললেন, যে লোক ইহরাম বাঁধা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করেছে, সে যেন একটা পশু যবেহ করে (কাফফারা দেয়)। এই শায়খ এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি। সে যে মত প্রকাশ করেছে, গোটা মুসলিম উম্মত তার বিপরীত মতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, ইহরাম বাঁধা অবস্থায় যে লোক স্ত্রীকে চুম্বন করবে, তাকে একটি পশু যবেহ করতে হবে। আলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর (রা), আল-হাসান, আতা, ইকরামা, ইবরাহীম, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব ও সাঈদ ইবনে যুবায়র এ সকল ফিকহবিদ উক্ত মতই প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণেরও মত তাই। যখন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল

যে, ইহরাম অবস্থায় সঙ্গমের উল্লেখসহ স্ত্রীর নিকট যাবে, ইশারা ইঙ্গিত করবে ও স্পর্শ করবে— এই সব কাজই সঙ্গমের প্রাক্কালীন শৃঙ্গা, সঙ্গমের উদ্বোধক, এই সবই ইহরামকারীর জন্যে নিষিদ্ধ। এই দলীলের ভিত্তিতে সুগন্ধি ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ। তা-ও ঠিক এই অর্থেই। হাদীসেও তাই বলা হয়েছে।

তারপর اَلْفُسُوْقُ-এর তাৎপর্য। ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, 'ফুসুক' অর্থ গালমন্দ বলা। جدال অর্থ তিক্ততা, কুতর্ক। ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'জিদাল' বলা হয় তোমার সঙ্গী-সাথীর সাথে তোমার ঝাগড়া-বিবাদ করাকে, যার দ্বারা তুমি তাকে ক্রুদ্ধ করে দেবে। আর 'ফুসুক' অর্থ গুনাহ, নাফরমানী। মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, হজ্জে কোন ঝাগড়া-ফাসাদ করা যাবে না। আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন হজ্জের মাসসমূহ। অতএব এতে কোন সন্দেহ নেই, কোন মতপার্থক্যও নেই।

আবূ বকর বলেছেন, আগেরকালের মনীষিগণের যে সব মত ও মন্তব্য ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে, হতে পারে, তা-ই আল্লাহ্‌র বক্তব্য। তাহলে ইহরামকারী হজ্জের মাসসমূহে গালমন্দ বলা ও ঝাগড়া-ফাসাদ করা থেকে বিরত থাকবে। ফিসক-ফুজুরী ও নাফরমানী ও সর্বপ্রকারের গুনাহের কাজ থেকেও বিরত থাকবে। ফলে বুঝতে হবে, আয়াতটি মুখ ও বাকশক্তি ও সঙ্গম-অঙ্গকে এসব নিষিদ্ধ কাজ— ফিসক-ফুজুরী ও নাফরমানী থেকে বিরত ও পবিত্র রাখবে। যদিও এসব কাজ ইহরাম বাঁধার পূর্বেও নিষিদ্ধই রয়েছে। তাই ইহরামের মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষার্থে আল্লাহ্ তা'আলা তাগিদ সহকারে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন অকাট্য দলীল দিয়ে। আর ইহরাম অবস্থায় নাফরমানী ও গুনাহের কাজ নিশ্চয়ই অতি বড় অপরাধ। তার কঠিন শাস্তি হবে অবশ্যম্ভাবীরূপে। যেমন রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ তোমাদের রোযার দিন হলে কেউ 'রফস' করবে না, জিহালত করবে না। তার উপর যদি জিহালত করা হয়, তাহলে সে বলবে ঃ আমি একজন রোযাদার। বর্ণিত হয়েছে, ফযল ইবনুল আব্বাস (রা) রাসূলে করীম (স)-এর জন্তুযানে সহ-আরোহী ছিলেন মুয্দালিফা থেকে মিনা পর্যন্ত। পথে মেয়েলোক দেখতে পেতেন। তিনি তাদের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপও করতেন। রাসূলে করীম (স) তাঁর মুখমণ্ডল বার বার সে দিক থেকে ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন নিজের হাতে। বললেন, আজকের দিন যে লোক নিজের শ্রবণেন্দ্রিয়, চক্ষুন্দ্রিয়কে সংযত রাখতে পারবে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। এ কাজ অন্যদিনেও নিষিদ্ধ, তা তো জানা। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই দিনটির মর্যাদা ও সম্মানকে বড় করে তোলার জন্যে বিশেষভাবে সেদিন তা নিষিদ্ধ। নাফরমানী, ফিসক-ফুজুরী, ঝাগড়া-বিবাদ ও স্ত্রী-সঙ্গম এসবই নিষিদ্ধ— আয়াত থেকে তা-ই স্পষ্ট হয়। তার কিছু ইহরাম নিষিদ্ধ করেছে কিংবা ইহরামে তা নিষিদ্ধ, অন্য সময়ও তা নিষিদ্ধ। কেননা আয়াতে সাধারণ অর্থবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ইহরাম অবস্থায় তা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ ইহরামের সম্মানের জন্যে।

মাসঊদ, মনসূর, আবূ হাজিম, আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ -

যে লোক হজ্জ করল, কিন্তু তাতে 'রফস' করল না, ফিস্ক-ফুজুরী করল না, সে তার মায়ের তাকে প্রসব করার দিনের মত সব পাপমুক্ত হয়ে যাবে।

এ হাদীস ঠিক আয়াতের কথাটাই বলে দিচ্ছে। তাই এজন্যে যে, আল্লাহ যখন হজ্জে গুনাহ-নাফরমানী ও ফিসক-ফুজুরী করতে নিষেধ করলেন, তার মধ্যে একথাও শামিল রয়েছে, তাকে এসব কাজ থেকে তওবা করার আদেশ করা হয়েছে। বারবার গুনাহ করাই 'ফুসুক' ও নাফরমানী। এইজন্যে আল্লাহ চান যে, হাজী নতুন করে ফিসক-ফুজুরী ও গুনাহ-খাতা থেকে তওবা করবে। যে নাম তার প্রথম জন্ম মুহূর্তের ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে যায়— যেমন নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَلَاجِدَالَ فِى الْحَجِّ 'হজ্জে ঝগড়া-বিবাদ বা মারামারি নেই।' সঙ্গী-সাথীদের তিক্ততার সৃষ্টি করা ও তাদেরকে ক্ষুণ্ন-অসন্তুষ্ট-ক্রুদ্ধ করাও এর মধ্যে শামিল এবং নিষিদ্ধ। হজ্জের সময় এসব নিষিদ্ধ করা হয়েছে এজন্যে যে, জাহিলিয়াতের যামানায় তাই হতো। এক্ষণে একটি সময়ে স্থিরকৃত হয়েছে এবং 'নসী'— হজ্জের মাস অদল-বদল করার নিয়ম বাতিল করা হয়েছে। জাহিলিয়াতের যুগে তাই করা হতো। এটাই হচ্ছে রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটির অর্থ ঃ 'জেনে রাখো, কালস্রোত আবর্তিত হতে হতে আসমান-জমিনের প্রথম সৃষ্টি রূপের মতোই স্থিত হয়েছে।' অর্থাৎ হজ্জ বর্তমানে সেই সময়ই করা হচ্ছে, যে সময়টা আল্লাহ তার জন্যে প্রথমেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। নবী করীম (স)-এর হজ্জ সেইভাবেই হয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'হজ্জে রফস' ফুসুক ও জিদাল নয়, বাহ্যত একটি খবর। কিন্তু মূলত তা নিষেধের ফরমান। এসব কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে একথা বলে, নেতিবাচক শব্দ দ্বারা তা উচ্চারিত হয়েছে। এসব কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন অপর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَالْوَا لِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَيَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ -

মায়েরা তাদের সন্তানদের দুগ্ধ দেবে এবং নিজেদেরকে বিরত রাখবে।

(সূরা বাকারা ঃ ২৩৩ ও ২৩৪)

এই ধরনের আরও অনেক আয়াতে কথাটি সংবাদ আকারে বলা হলেও মূলত তা আদেশ।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَا الزَّادِ التَّقْوٰى -

এবং পাথেয় গ্রহণ কর। কেননা সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া।

মুজাহিদ ও শা'বী থেকে বর্ণিত, ইয়ামেনের কিছু লোক পাথেয় না নিয়েই হজ্জ করতে রওয়ানা হয়ে যেত। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয়। সাঈদ ইবনে যুবায়র বলেছেন ঃ পাথেয় বলতে বোঝায় শুষ্ক খাবার ও জয়তুন তেল। বলা হয়েছে, এক শ্রেণীর লোক তাদের পাথেয় দূরে নিক্ষেপ করে দিত এবং 'ভরসাকারী' নাম ধারণ করত। যখন তাদেরকে বলা হয়, খাবার-দাবার জিনিস পাথেয় হিসেবে গ্রহণ কর। তোমাদের বোঝা লোকদের উপর চাপিয়ে দিও না। কারোর মতে তার অর্থ— নেক আমলকে পাথেয় বানাও। কেননা সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া।

আবূ বকর বলেছেন, আয়াতে দুটি পাথেয়র কথাই শামিল রয়েছে। একটি হচ্ছে খাবার জিনিসের পাথেয় আর অপরটি তাকওয়া। কাজেই এই দুটি পাথেয়ই অচল মনে করা

আবশ্যক। কেননা দুটির কোন একটি বিশেষীকৃত করা হয়নি। হজ্জে নেক আমলের পাথেয় গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। কেননা তা খুব বেশি বেশি করে সংগ্রহ করার অধিক যোগ্য জিনিস। তাতে নেক আমল করা আমল করা হলে তার সওয়াব দ্বিগুণ-তিনগুণ বেশি পাওয়া যাবে। অপরদিকে ফিসক-ফুজুরী ও নাফরমানীর কার্যাবলীও পরিত্যক্ত থাকবে। যদিও তা সকল সময়ই পরিত্যাজ্য। তবে ইহরাম বাঁধার পর এই নিষেধ অত্যন্ত তীব্র ও কঠিন হয়ে দাঁড়ায় ইহরামের সম্মান-মর্যাদা রক্ষার জন্যে এবং একথা জানিয়ে দেয়ার জন্যে যে, ইহরাম বাঁধার পর ওসব কাজ করা অত্যন্ত বড় গুনাহ। ফলে পাথেয় হিসেবে দুধরনের পাথেয় গ্রহণেরই আদেশ এক সাথে করা হল— খাদ্য এবং তাক্‌ওয়ার পাথেয়। পরে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাক্‌ওয়ার পাথেয় উভয় পাথেয়র মধ্যে অধিক উত্তম। কেননা তার ফায়দাটা স্থায়ী ও চিরন্তন সওয়াব। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যারা হজ্জে তাওয়াক্কুলকারী হয়ে পাথেয় ছাড়াই রওয়ানা হয়, তাদের হজ্জ বাতিল, পরিত্যাজ্য। বিশেষত তা আল্লাহ্‌র কথারও পরিপন্থী। হজ্জে যাওয়ার সামর্থ্য থাকতে হবে। আর পাথেয় এবং যানবাহনও সে পাথেয়র মধ্যে গণ্য। আল্লাহ্ যাকে হজ্জ করতে বলেছেন, তাকে এই সামর্থ্য সহ হজ্জে যেতে বলেছেন। এই কথাই নবী করীম (স) বলেছেন, যখন তাঁর নিকট استطاعة —সামর্থ্য বলতে কি বোঝায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন ঃ هِيَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ 'তা হচ্ছে পাথেয় ও যানবাহন'।

## হজ্জে ব্যবসায়

কুরআন মজীদে হজ্জ ও সেজন্যে পাথের গ্রহণের কথা বলার পর-পরই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ -

তোমাদের উপর কোন গুনাহ চাপবে না, যদি তোমরা তোমাদের রব্ব-এর নিকট থেকে 'ফযল' বা অনুগ্রহ পেতে চাও।

অর্থাৎ আয়াতের প্রথমাংশে যাদের সম্বোধন করা হয়েছে, তারা হজ্জের জন্যে পাথেয় গ্রহণের আদেশ প্রাপ্ত। আর উপরোদ্ধৃত আয়াতাংশে তাদের জন্যেই হজ্জের সফরে ব্যবসায় করা মুবাহ ঘোষণা করেযছন। আবূ ইউসূফ আলা ইবনুস সায়েব আবূ আমামাতাগ্রসূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি ইবনে উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আমি মক্কায় যাওয়ার জন্যে উট ভাড়ায় দিই। তাতে কি আমার হজ্জ হয়ে যাবে ? তিনি বললেন ঃ তুমি তালবিয়া বল না ? আরাফাতে অবস্থান কর না ? প্রস্তর নিক্ষেপ কর না ? বললাম, 'হ্যাঁ, তা সবই করি। তখন তিনি বললেন, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-কে ঠিক তোমার এই প্রশ্নের মতই প্রশ্ন করেছিল। কিন্তু তিনি তখনই কোন জবাব দেন নি। পরে যখন এই আয়াত ঃ 'তোমাদের উপর কোন গুনাহ চাপবে না যদি তোমরা তোমাদের রব্ব-এর নিকট ফযল চাও' নাযিল হল। তখন তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তোমরাও হাজী।' আমর ইবনে দীনার বলেছেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, যুল-মাজায ও উক্কায নামে জাহিলিয়াতের যুগে লোকদের দুটি ব্যবসায় কেন্দ্র ছিল। ইসলামের যুগে লোকেরা কেন্দ্র দুটি পরিত্যাগ করে। পরে এই আয়াতটি নাযিল হলে বোঝা গেল, হজ্জের মৌসুমে ব্যবসায় করা নিষিদ্ধ নয়। সাঈদ ইবনে যুবায়র ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, এক ব্যক্তি আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আমি নিজেকে কিছু লোকের নিকট মজুরীর বিনিময়ে নিযুক্ত করেছি, আমি তাদের খিদমত করি, তারা আমাকে নিয়ে হজ্জ

করে। তাতে কি আমার হজ্জ হয়ে যাবে ? ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, এরা সেই লোক, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ঃ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا 'ওরা যা উপার্জন করে তার অংশ ওরা পাবে।' তাবেয়ীন সমাজের বহু সংখ্যক লোক থেকেও এরূপ বর্ণনাই এসেছে। তাঁদের মধ্যে আল-হাসান, আতা, মুজাহিদ ও কাতাদাতা উল্লেখযোগ্য। একথার বিপরীত কোন বর্ণনার কথা আমরা জানি না। সুফিয়ান সওরী আবদুল করীম সাঈদ ইবনে যুবায়র থেকেও এরূপ বর্ণনা পাওয়া গেছে। একজন বেদুঈন বলেছিল, আমি আমার উট ভাড়ায় দিই। আমিও হজ্জ করতে ইচ্ছুক থাকি। আমার জন্যে এ হজ্জটি যথেষ্ট হবে না ? বললেন— না, কোন মতেই না। কিন্তু এটা বিরল মত। জমহুর ফিকাহবিদদের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহ্‌র কুরআনের বাহ্যিক অর্থের সাথেও সঙ্গতিহীন। আল্লাহ্‌ নিজেই বলে দিয়েছেন, হজ্জে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে 'ফযল' চাইলে কোন দোষ হবে না। এ তো হাজীদের সম্পর্কেই কথা। কথার শুরুটাও তাদেরই জন্যে। যে সব আয়াত হজ্জে ব্যবসায় মুবাহ করে তার সব কয়টির বাহ্যিক অর্থও তাই। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ -

অন্যান্য বহু লোকই দুনিয়ায় চলাচল করে আল্লাহ্‌র ফযল সন্ধান করে। ( মুয়যাম্মিল ঃ ২০)

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ -

এবং লোকদের মধ্যে সাধারণ অনুমতি দিয়ে দাও হজ্জ সম্পর্কে। তারা তোমার নিকট সব দূরবর্তী স্থান থেকে পায়ে হেঁটে ও উটের পিঠে সওয়ার হয়ে আসবে। (সূরা হজ্জ ঃ ২৭)

.. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ 'যেন তারা প্রত্যক্ষ করে তাদের জন্যে মুনাফাসমূহ'। (হজ্জ ঃ ২৮)

এই 'মুনাফা' বলতে বিশেষ কোন ধরনের মুনাফার কথা বলা হয়নি। তা সাধারণ এবং সকল প্রকারের মুনাফা তার অন্তর্ভুক্ত। তাতে যেমন দুনিয়ার মুনাফা রয়েছে, তেমনি পরকালীন মুনাফাও।

আল্লাহ বলেছেন ঃ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا 'আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসায়-বাণিজ্য হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন'। (সূরা বাকারা ঃ ২৭৫)

হজ্জের সময় এই ব্যবসায় বাণিজ্য হালাল নয়, তা তো বলা হয়নি। এই সব কিছু থেকেই প্রমাণিত হয়, হজ্জ ব্যবসায়কে নিষিদ্ধ করে না। এই কারণে নবী করীম (স)-এর সময় থেকেই বর্তমান সময় পর্যন্ত মিনায় অবস্থানকালে ও মক্কায় যাবার সময় হজ্জের দিনগুলোতে ব্যবসায় জায়েয করেছেন।

## আরাফাতে অবস্থান

আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ -

তোমরা যখন আরাফাত থেকে রওয়ানা হয়ে যাবে, তখন মাশয়ারিল হারামের নিকট আল্লাহ্‌র যিকির করবে।

আবূ বকর বলেছেন, এই কথা থেকে বোঝা গেছে যে, আরাফাতে অবস্থান হজ্জের মানাসিকের অন্তর্ভুক্ত। বাহ্যত এমন কোন দলীল এ আয়াতে নেই, যদ্দারা বোঝা যাবে যে, আরাফাতে অবস্থান হজ্জের ফরযসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কথার শুরুতে বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ –

অতঃপর তোমরা চলতে শুরু কর সেই স্থান থেকে, যেখান থেকে জনগণ চলা শুরু করেছে।

এ আদেশ আরাফাতে অবস্থান ও সেখানে থাকাকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে স্পষ্ট ভাষায়। কেননা রওয়ানা হওয়ার আদেশ পালন ওয়াজিব। রওয়ানা হওয়া ফরয হলে সেখানে অবস্থান করাও ফরয হবে, যেন সেখান থেকে রওয়ানা হওয়া যায়। সেখানে অবস্থান না করলে সেখান থেকে রওয়ানা হওয়ার আদেশ পালন করা যায় না।

অবশ্য 'অতঃপর তোমরা রওয়ানা হও যেখান থেকে লোকেরা রওয়ানা হয়েছে' আল্লাহ্‌র এই কথাটির তাৎপর্যে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। হযরত আয়েশা, ইবনে আব্বাস (রা), আতা, আল-হাসান, মুজাহিদ, কাতাদাতা ও সদ্দীর এই মত বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে আরাফাত থেকে রওয়ানা। এ আদেশ এজন্যে যে, কুরায়শ ও তাদের ধর্মমতের অনুসারী লোকেরা যাদেরকে 'হামস' বলা হতো— মুযদালিফায় অবস্থান করত। আর অন্যান্য সমস্ত আরব আরাফাতে অবস্থান করত। ইসলামের যুগে আল্লাহ তা'আলা এই আদেশ নাযিল করেন। তখন নবী করীম (স) কুরায়শ ও তাদের মতাবলম্বীদেরকে আরাফাতে পৌঁছার ও সেখানে জনগণের সাথে অবস্থান করার আদেশ করলেন এবং পরে এখান থেকেই জনগণের সাথে সাথে রওয়ানা হতে বললেন। দহাকের এই মত বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াতে মুযদালিফায় অবস্থান করার আদেশ করা হয়েছে এবং ইবরাহীম (আ) যেখান থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন সেখান থেকেই রওয়ানা হতে বলেছিলেন কুরায়শদেরকেও। এই মতও এসেছে যে, লোকেরা 'রওয়ানা করেছে' বলে আসলে একলা ইবরাহীম (আ)-কেই বুঝিয়েছেন। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ 'তারা যাদেরকে লোকেরা বলেছিল।' এই লোকেরা বলেও একজন লোককেই বুঝিয়েছেন। কেননা ইবরাহীম (আ) যখন অনুসৃত ইমাম ছিলেন তখনই তাঁকে 'উম্মত' বলেছেন। অর্থাৎ তিনি বিপুল জনগোষ্ঠী সম্পন্ন উম্মতের স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। এই উম্মতই তাঁর সুন্নাত অনুসরণ করে। কাজেই 'লোকেরা' শব্দ একজন ব্যক্তির ব্যাপারেও প্রয়োগ করা চলে, লক্ষ্য সেই এক ব্যক্তি।

তবে প্রথমোক্ত তাৎপর্যটাই অধিক সহীহ। কেননা আগেরকালের মনীষীরা এতেই একমত। দহাক এ ব্যাপারে তাঁদের সাথে কোন বিতর্কে নামতে রাজী নন, তাঁর মতটি একান্তই বিরল।

আয়াতে 'লোকেরা' বলা হয়েছে এবং কুরায়শদের রওয়ানা হতে আদেশ করা হয়েছে যেখান থেকে লোকেরা রওয়ানা হয়। কেননা তারাই ছিল বেশির ভাগ লোক, সংখ্যায় কুরায়শ ও তাদের অনুসারী লোক ছিল কম। এজন্যেই 'লোকেরা সেখান থেকে রওয়ানা হল'— বলা হয়েছে।

যদি বলা হয়, "তোমরা যখন আরাফাত থেকে রওয়ানা হও" কেন বলা হল, তার পরে পরে বলা হল, 'পরে তোমরা সেখান থেকে রওয়ানা হও, যেখান থেকে লোকেরা রওয়ানা হয়।' এখানে পরম্পরা বিন্যাস তো অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। আমরা জানলাম যে, এই রওয়ানা হওয়াটা আরাফাত থেকে রওয়ানা হওয়ার পরবর্তী কাজ। এর পরবর্তী রওয়ানা হওয়াটা তো হয়

মুযদালিফা থেকে— যাকে 'মাশয়ারিল হারাম' বলা হয়েছে। কাজেই প্রথম রওয়ানা হওয়াটা আরাফাত থেকে রওয়ানা বুঝতে হবে। কেননা আরাফাত থেকে রওয়ানা হওয়ার উল্লেখ আগে করা হয়েছে। কাজেই এখানে পুনরায় তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

জবাবে বলা যাবে, আল্লাহ্র কথা ঃ 'অতঃপর তোমরা রওয়ানা হও যেখান থেকে লোকের রওয়ানা হয়' কথার শুরুর সাথে সম্পর্কিত, যেখানে হজ্জ করার আদেশ করা হয়েছে ও তার মানাসিক শিক্ষা দেয়া হয়েছে, সেই সংক্রান্ত কাজকর্মের কথা বলা হয়েছে। যেন বলা হয়েছে, 'কুরায়শ বংশের হজ্জ করার আদেশপ্রাপ্ত হে লোকেরা'.... এ কথা পূর্বে আমরা যে বলেছি, 'তোমরা রওয়ানা হও, যেখান থেকে লোকেরা রওয়ানা হয়।' ফলে তা এই আদেশ প্রাপ্ত লোকদের প্রতি সম্বোধনের সাথে সম্পর্কশীল হবে। এই কথাটি ঠিক তেমন, যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِىْٓ اَحْسَنَ -

পরে আমরা মূসাকে কিতাব দান করেছিলাম যা মঙ্গলজনক নীতি গ্রহণকারী মানুষের প্রতি ছিল নিয়ামতের পূর্ণতা বিধায়ক। (সূরা আন'আম ঃ ১৫৪)

এর অর্থ হল, পূর্বে তোমাদেরকে যা যা বলেছি, তার পরে তোমাদেরকে এই খবরও দিয়েছি যে, মূসাকে আমরা এমন একখানি কিতাব দিয়েছি, যা পুরামাত্রায় উত্তম নীতি বাহক। এখানে ثُمَّ অর্থ واو অর্থাৎ এবংও হতে পারে। তাহলে মোট কথাটি দাঁড়ায় এইঃ 'তোমরা রওয়ানা হও যেখান থেকে লোকেরা রওয়ানা হয়েছে।' যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا 'পরে, তারা সেই লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল, যারা এনেছে।' ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَفْعَلُوْنَ পরে অর্থাৎ 'আল্লাহ্ সাক্ষী তোমাদের কাজকর্মের উপর।' ভাষাগতভাবে এটা প্রচলিত। তা ছাড়া আগেরকালের ফিকাহবিদগণ থেকেও সেই বর্ণনা এসেছে, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। সেটাকে বাদ দিয়ে অন্যদিকে ফিরে যাওয়া জায়েয হতো না।

তুমি বলেছ, 'তোমরা যখন আরাফাত থেকে রওয়ানা হও'-এর মধ্যে আরাফাত-এর উল্লেখ রয়েছে। তাই পরে তোমরা রওয়ানা হও যেখান থেকে লোকেরা রওয়ানা হয়েছে-এর মধ্যে আবার আরাফাতের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কথাটি ঠিক নয়। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ 'যখন তোমরা আরাফাত থেকে রওয়ানা হবে' কথাটিতে আরাফাতে অবস্থান ফরয হওয়ার কোন দলীল নেই। বরং 'পরে তোমরা রওয়ানা হও যেখান থেকে লোকেরা রওয়ানা হয়েছে', এটি আদেশ। যে কুরায়শরা আরাফাতে অবস্থান গ্রহণ করে না, তাদের জন্যেই এই আদেশ। তাতে আরাফাতের অবস্থান ফরয প্রমাণিত হয়, যা 'যখন তোমরা আরাফাত থেকে রওয়ানা হলে' কথাটি শামিল করেনি। কেননা 'তোমরা যখন আরাফাত থেকে রওয়ানা হলে' কথাটি আরাফাতে অবস্থান ফরয করে না। তা সত্ত্বেও যদিও 'তোমরা যখন আরাফাত থেকে রওয়ানা হলে' কথাটিই শুধু বলা হতো, তাহলে কেউ ধারণা করতে পারে যে, তা সম্বোধন তাদের জন্যে যারা আরাফাতে অবস্থান করে। যারা সেখানে অবস্থান করে না, তাদের জন্যে এই সম্বোধন নয়। ফলে যারা আরাফাতে অবস্থান করে না তাদের সকলের জন্যেই মুযদালিফায় অবস্থান করার আদেশ হয়েছে, আরাফাতে নয়। লোকদের এই ধারণা বাতিল করে দেয়া হয়েছে এই কথাটি বলে ঃ 'অতঃপর তোমরা রওয়ানা হও, যেখান থেকে সব মানুষ রওয়ানা হয়।'

তা সত্ত্বেও মুসলিম উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, আরাফাতে অবস্থান না করলে তার হজ্জই হবে না। এই কথা নবী করীম (স)-এর কথা ও কাজ উভয় থেকেই প্রমাণিত। বুকায়র ইবনে আতা আবদুর রহমান ইবনে ইয়ামার আদ-দেয়লী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলের নিকট প্রশ্ন করা হয়েছে, হজ্জ কি ভাবে? জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ

اَلْحَجُّ يَوْمَ عَرْفَةَ، مَنْ جَاءَ عَرَفَةَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ الصُّبْحِ اَوْ يَوْمَ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ -

হজ্জ হচ্ছে আরাফার দিন। যে লোক একত্রিত হওয়ার রাত্রে ভোরের আগে আরাফাতে আসবে অথবা আসবে একত্রিত হওয়ার দিন, তার হজ্জ পূর্ণ হয়ে গেল।

শ'বী, উরওয়াতা ইবনে মদরস তাঈ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন, মুযদালিফায় যে লোক আমাদের সঙ্গে এই নামায পড়বে এবং আমাদের সাথে এই অবস্থান স্থানে অবস্থান গ্রহণ করবে, তার পূর্বে এক রাত বা এক দিন সে আরাফাতে অবস্থান করল, তার হজ্জ সম্পূর্ণ হল এবং তা ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করে ফেলল। ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, উবনুয যুবায়র ও জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اِذَا وَقَفَ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ -

ফজর উদয় হওয়ার পূর্বে থেকে যে আরাফাতে অবস্থান করল, তার হজ্জ পূর্ণ হয়ে গেল।

ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। যে লোক এক রাত্রি আরাফাতে অবস্থান করল না, তার ব্যাপারে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। তাদের সকলেই বলেছেন, দিনের বেলা অবস্থান করলেও হজ্জ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। সেখান থেকে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে রওয়ানা হলে— চলে গেলে তাকে একটি পশু যবেহ করতে হবে। এটা হানাফীদের মত। অবশ্য ইমামের পূর্বে ফিরে না যাওয়া শর্ত। মালিক ইবনে আনাস বলেছেন, পরবর্তী রাত্রির ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত যদি ফিরে না যায়, তা হলে তার হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে। তাঁর সঙ্গীরা মনে করেছেন, ইমাম মালিক একথা বলেছেন এজন্যে যে, তাঁর মাযহাবে দিনের বেলা নয়— রাত্রি বেলা আরাফাতে অবস্থান করা ফরয। দিনের বেলা অবস্থান করা ফরয নয়। তা বড়জোর মসনূন।

ইবনুয যুবায়র থেকে বর্ণিত, যে লোক আরাফাত থেকে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে চলে যাবে, তার হজ্জ নষ্ট হয়ে যাবে।

প্রথমোক্ত কথাটির সত্যতার দলীল হচ্ছে, উরওয়াতা ইবনে মদরস বর্ণিত হাদীসে উক্ত রাসূলে করীম (স)-এর কথা ঃ যে লোক তার পূর্বে রাত্রে বা দিনে আরাফা থেকে রওয়ানা হয়ে গেল, তার হজ্জ পূর্ণ হবে। এরপর সে তার ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করবে। এতে হজ্জ সহীহ হওয়ার ও তার সম্পূর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে দুইটি সময়ের যে-কোন একটি সময়ে অবস্থান করলেই হবে রাতে বা দিনে। আল্লাহ্‌র এই কথাটিও তা প্রমাণ করে ঃ 'তোমরা রওয়ানা হও যেখান থেকে লোকেরা রওয়ানা হয়েছে,' এতে আরাফাত থেকে রওয়ানা হওয়ার কথাই বলা হয়েছে। ফলে কথাটি এই দাঁড়ায় ঃ 'তোমরা আরাফাত থেকে রওয়ানা হও'....... এতে রাত বা দিনকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। তাতে কোন সময়েরও উল্লেখ করা হয়নি। অতএব তা যে-কোন সময়ের অবস্থানকেই জায়েয করে দিয়েছে। বিবেচনা করলেও তা-ই প্রমাণিত হয়। আমরা হজ্জের সব মানাসিক-এর সূচনা দিনের বেলায়ই দেখতে পাই। পরে আনুসঙ্গিকভাবে

অবশ্য রাত্র এসে যায়। কেবল রাত্রেই তা হতে হবে এমন কথাও নেই। রাত্র ছাড়া অন্য সময় করলে তা সহীহ হবে না, তা-ও বোঝা যায় না। কাজেই যিনি রাত্রিকালে অবস্থান করা ফরয বলেছেন, তা শরীয়াতের মৌল নীতি পরিপন্থী। যিয়ারত, তওয়াফ, মুযদালিফায় অবস্থান, প্রস্তর নিক্ষেপ, পশু যবেহ করা ও মাথা মুণ্ডন করা সবই দিনের বেলায় করা হয়। যে কাজ রাত্রে করা হয়, তা তার জন্যে নির্দিষ্ট সময় বিলম্বিত করে দিনের আনুসঙ্গিক কাজ হিসেবে। কাজেই এই হুকুমটা আরাফাতে অবস্থানের জন্যেই মনে করতে হবে।

তাছাড়া মুসলিম উম্মত সম্মিলিতভাবেই বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স)-এর দিনের বেলায় আরাফাতে অবস্থানের কথা। তা আজ পর্যন্ত চলে এসেছে। বোঝা গেল, আরাফাতে অবস্থান দিনের বেলায়ই হতে হবে। সেখান থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় হচ্ছে সূর্যাস্তের পর। কাজেই অবস্থানের সময়ও রওয়ানা হওয়ার সময় অভিন্ন হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই রাত্রটা অবস্থান করা ফরয হতে পারে না। তাছাড়া এ নামই দেয়া হয়েছে 'আরাফাতের দিন'। এ নাম নবী করীম (স) থেকে বহু সংখ্যক হাদীসের মাধ্যমে। 'আল্লাহ এই আরাফাতের দিন ফেরেশতাদের সাথে আত্মগৌরব প্রকাশ করেন,' 'আরাফার দিনের রোযা এক বছরের রোযার সওয়াব দেয়' প্রভৃতি ধরনের কথাও হাদীসে এসেছে। এই কারণে মুসলিম উম্মত আরাফাতে অবস্থানের জন্যে দিনের বেলাকে ফরয হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন। রাত্রিবেলা আরাফাতের অবস্থান হতে পারে তার, যে দিনের বেলার অবস্থান হারিয়েছে। বিবেচ্য এই যে, যখন বলা হয় জুমআর দিন, কুরবানীর দিন বা ঈদুল ফিতরের দিন, তখন বোঝাই যায়, সংশ্লিষ্ট কাজ এই দিনগুলোতেই সম্পন্ন করতে হবে। এ কারণেই দিনের উল্লেখ করা হয়েছে, রাত্রের কথা বলা হয়নি। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, আরাফাতের অবস্থান দিনের বেলায়ই করতে হবে। রাত্রিবেলা তা করা যেতে পারে কাযা স্বরূপ। যে দিনের বেলায় পারেনি, সে রাত্রিবেলায় অবস্থান করে তার কাযা আদায় করবে। যেমন প্রস্তর নিক্ষেপের কাজ রাত্রিবেলা করা হয় দিনের বেলায় করতে না পারার কারণে। তওয়াফ, পশু যবেহ ও মাথা মুণ্ডনের ব্যাপারটিও তেমনি।

আরাফাতের বিশাল ময়দানে কোথায় অবস্থান গ্রহণ করতে হবে, সে বিষয়েও বিভিন্ন মত রয়েছে। যুবায়র ইবনে মুতয়িম (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

كُلُّ عَرَفَاتَ مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا عَنْ عُرَنَةَ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا عَنْ مَحْسِرٍ-

আরাফাতের সকল স্থানই অবস্থান স্থান। তবে আরেনা থেকে উঠে যাও। মুযদালিফারও সব স্থানই অবস্থান স্থান। তবে মুহাস্‌সর উপত্যকা থেকে উঠে যাও।

জাবির (রা) রাসূলে করীম (স)-এর এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ 'সমস্ত আরাফাতই অবস্থান স্থান। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, 'আরেনা উপত্যকা থেকে উপরে উঠে যাও। মিম্বর তার প্রবাহ স্থান থেকে সরে। তার উপরে যা আছে তা-ও অবস্থান স্থান। নবী করীম (স) সূর্য অস্ত যাওয়ার পরই আরাফাত ত্যাগ করে চলে গেছেন, এই বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। বর্ণিত হয়েছে যে, জাহিলিয়াতের যুগের লোকেরা সূর্য পাহাড়ের চূড়ায় উঠলে আরাফাত ত্যাগ করত। তখন সূর্য যেন তাদের মুখমণ্ডলে লোকদের পাগড়ী হয়ে দাঁড়াত। আর তারা মুযদালিফা ত্যাগ করত সূর্য উদয় হওয়ার পর। কিন্তু নবী করীম (স) এসব ক্ষেত্রে আগের নিয়মের বিপরীত নিয়ম চালু করেছেন। তিনি আরাফাত ত্যাগ

করেছেন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর-পরই। আর মুযদালিফা থেকে চলে গেছেন ফজর উদয় হওয়ার আগেই। সালমাতা ইবনে কুহায়ল হাসানুল আরনী ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, নবী করীম (স) আরাফাতের দিনে জনগণকে লক্ষ্য করে ভাষণ দিয়েছেন। বলেছেন ঃ 'হে মানুষ! ঘোড়া বাধ্য করায় এবং উট ধ্বংস করায় কোন পূণ্য নেই। বরং উত্তম সুন্দর ভ্রমণই কাম্য। তোমরা দুর্বলকে কষ্টে ফেলবে না, কোন মুসলিমকে পীড়ন করবে না।

হিশাম ইবনে উরওয়াতা তাঁর পিতা উসামা ইবনে জায়দ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমরা রাসূলে করীম (স)-এর সঙ্গে চলতে শুরু করতাম আরাফাত ত্যাগ করা কালে। তবে যখন চলার জন্যে পথ উন্মুক্ত পাওয়া যেত।

## একত্রতা সহকারে অবস্থান গ্রহণ

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَاذَا اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ -

তোমরা যখন আরাফাত থেকে রওয়ানা হবে, তখন মুযদালিফায় এসে আল্লাহ্র যিকির করবে।

'মাশয়ারিল হারাম' বলে মুযদালিফাকে বুঝিয়েছেন, তা-ই সে স্থানের নাম। এ বিষয়ে মনীষিগণের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। তবে কেউ কেউ বলেছেন, এই যিকির অর্থ মাগরিব ও এশার নামায একত্র করে মুযদালিফায় পড়তে হবে। আর وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ 'এবং তাঁর যিকির কর যেমন তোমাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে'। এই 'যিকির' হচ্ছে তা, যা মুযদালিফায় সকালের দিকে একত্রে করা হয়। দুটি যিকির এক নয়, ভিন্ন ভিন্ন। নামাযকে যে যিকির বলা হয় তা কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ نَامَ عَنْ صَلٰوةٍ اَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا -

যে লোক নামায না পড়ে ঘুমিয়ে থাকবে বা তা পড়তে ভুলে যাবে, তা যেন সে পড়ে যখন তার কথা স্মরণ হবে।

এর পর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেছেন ঃ

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ -

তুমি নামায কায়েম কর আমার স্মরণের জন্যে।

এ আয়াতে নামাযকে 'যিকির' নাম দেয়া হয়েছে। এই কারণে শুরুতে উদ্ধৃত আয়াতে দাবি হচ্ছে মাগরিবের নামায বিলম্বিত করা ও মুযদালিফায় এশার নামাযের সাথে এক সাথে পড়া। উসামা ইবনে জায়দ (রা) রাসূলের সাথে সহ-আরোহী হয়ে আরাফাত থেকে মুযাদালিফায় এসেছেন। মুযদালিফার পথে তিনি রাসূলকে বললেন ঃ নামায ? তিনি বললেন, নামায তোমার সম্মুখে। পরে মুযদালিফায় পৌছার পর মাগরিব ও এশা এক সাথে পড়লেন।

নবী করীম (স) মাগরিব ও এশার নামায মুযদালিফায় একত্রে পড়েছেন, তা বহু মুতাওয়াতির হাদীস থেকে প্রমাণিত।

মুযাদালিফায় পৌছার পূর্বেই যে লোক মাগরিব পড়ে নিল, তার সম্পর্কে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন কথা রয়েছে। আবূ হানীফা ও মুহাম্মাদ বলেছেন, তা তার জন্যে যথেষ্ট হবে না। আবূ

ইউসূফ বলেছেন, তা-ই যথেষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যখন তোমরা আরাফাত থেকে রওয়ানা দেবে তখন মুযদালিফায় আল্লাহ্‌র যিকির করবে'— এই যিকির-এর অর্থ যদি হয় নামায তাহলে মুযদালিফায় পৌঁছার পূর্বে নামায পড়া যেতে পারে না। নবী করীম (স)-এর পূর্বোদ্ধৃত কথা ঃ 'নামায তোমার সামনে' থেকেও তা-ই প্রমাণিত হয়। তার এই অর্থ গ্রহণ উত্তম, অবস্থানকালে দুই নামায একত্রে পড়াই যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ্‌র 'এবং তাঁর যিকির কর যেমন তোমাদেরকে বলে দিয়েছেন' কথাটিও প্রমাণ করে যে, মুযদালিফায় অবস্থানকালে দুই নামায একত্রে পড়ার কথাই জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে দুটি যিকির-এর কথাটি আমরা নামায অর্থে গ্রহণ করব। তাহলে দুটি যিকিরকেই যথাযথ মূল্য ও গুরুত্ব দেয়া হবে এবং তাতে পুনরুক্তির দোষ থেকেও বাঁচা যাবে। উপরন্তু 'অতঃপর তোমরা মাশ্‌য়ারিল হারামের নিকট আল্লাহ্‌র যিকির কর' আল্লাহ্‌র এই আদেশটি পালন ওয়াজিব হয়ে পড়ে। তবে দুই নামায একত্রে পড়া সকলের মতে ওয়াজিব নয়। মাগরিব নামায একত্র করে পড়ার কথা যখন ধরা হবে, তখন তার দাবি কিন্তু ওয়াজিব হওয়ার উপরই বর্তিবে। অতএব সেই অর্থেই তা গ্রহণ করা কর্তব্য।

মুযাদালিফায় অবস্থান গ্রহণ পর্যায়ে মনীষিগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। তা ফরয কিংবা ফরয নয়, এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কিছু লোক বলেছে, এটা হজ্জের একটি ফরয। যে তা করতে পারবে না, তার হজ্জ হবে না। সে ঠিক আরাফাতে অবস্থান হারানোর মতই হয়ে যাবে। জমহুর আলিমগণ বলেছেন, তার হজ্জ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। মুযদালিফায় অবস্থান না করার দরুন তার হজ্জ বিনষ্ট হয়নি। তার দলীল হচ্ছে, মুযদালিফায় অবস্থান ফরয নয়। যেমন নবী করীম (স) থেকে আবদুর রহমান ইবনে ইয়ামার আদদেয়লী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়। তিনি বলেছেন, আরাফাই হচ্ছে হজ্জ। ফজর উদয় হওয়ার পূর্বে যে লোক সেখানে অবস্থান করবে, তার হজ্জ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। অপর কোন কোন হাদীসের ভাষা হচ্ছে ঃ مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ 'যে লোক আরাফা পেল, সে হজ্জ-ও পেয়ে গেল।' وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَةُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجَّ 'আর যে লোক আরাফা হারাল, সে হজ্জ-ও হারাল।' এ হাদীসের আলোকে হজ্জ সহীহ হওয়ার হুকুম দেয়া যায় আরাফাতে অবস্থান পাওয়া গেলেই। তবে দুই নামায একত্রে পড়ার যে অবস্থান— তা হজ্জ সহীহ হওয়ার জন্যে শর্ত করা হয়নি। ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীস থেকেও তা-ই প্রমাণ হয়। লোকেরা সে হাদীসটি এই বলে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (স) তাঁর পরিবারবর্গের দুর্বল স্বাস্থ্যের— কোন কোন হাদীসে দুর্বল লোকদের সাথে মুযদালিফার রাত্রে সাক্ষাৎ করে বলেছেন, তোমরা সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত আকাবায় প্রস্তর নিক্ষেপের কাজ করবে না। মুযদালিফায় অবস্থান যদি ফরয হতো তাহলে তিনি দুর্বলতার কারণে তা তরক করার রুখসত কখনই দিতেন না। যেমন দুর্বলতার কারণে আরাফাতে অবস্থান তরক করার কোন রুখসত দেন নি। কেননা তারা সেখানে রাত্রিবেলা অবস্থান করছিল, তা-ই ছিল সেখানে অবস্থানের সময়। সালিম ইবনে উমর মুযদালিফা থেকে দুর্বল লোকদেরকে আগে ভাগে পাঠাবার হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী। তিনি তাঁর পরিবারের দুর্বল লোকদেরকে আগে ভাগে পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন। তারা রাত্রে মাশয়ারিল হারামে অবস্থান করত। সেখানে তাদের পক্ষে যে যিকির সম্ভব হতো তাই তারা করত। পরে সেখান থেকে তারা রওয়ানা হয়ে যেত। বলা হয়েছে, মুযদালিফায় অবস্থানের সময় হচ্ছে ফজর উদয় হওয়ার পর। লোকেরা নবী করীম (স)-এর সেখানে ফজর উদয় হওয়ার পর অবস্থান করেছেন বলে

বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স) তাঁর পরিবারের দুর্বল লোকদেরকে সেখানে অবস্থান গ্রহণের আদেশ করেন নি, যখন তাদেরকে রাত্রি বেলায় তরান্বিত করেছেন। সেটাই যদি সেখানে অবস্থানের সময় হতো তা হলে তিনি তাঁদেরকে সেজন্যে আদেশ করতেন। সে অবস্থান ত্যাগ করার অনুমতি দিতেন না। কেননা তা তারা কোনরূপ ওযর ছাড়াই করতে পারত। ইবনে উমর (রা)-এর বর্ণনা থেকে যা জানা যায়, তা তো তাঁর কাজের বর্ণনা। তাও নবী করীম (স) থেকে পাওয়া যায়নি, ইবনে উমর একথাও বলেন নি যে, এটাই অবস্থানের সময়। এটা ছিল মুস্তাহাব পর্যায়ের কাজ। মিনাতে পৌছার পূর্বে যে যিকির করার কথা বলা হয়েছে, তা বলা যায় অবস্থানের সময় ফজর উদয় হওয়ার পর পর্যন্ত। 'মানাসিক' পর্যায়ের সমস্ত কাজের সময় হিসেবে আমরা দিনের উল্লেখ পেয়েছি। রাত তার সাথে যুক্ত হয় আনুসঙ্গিক হিসেবে— যেমন পূর্বে বলেছি। মুযদালিফায় অবস্থান যারা ফরয বলেন, তাঁরা এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থকে দলীল বানিয়েছেন ঃ তোমরা যখন আরাফাত থেকে রওয়ানা হবে, তখন মাশয়ারিল হারামে আল্লাহ্র যিকির করবে। হ্যাঁ, এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দৃষ্টিতে তা ফরযই হয়। তারা মতরস ইবনে তরীক কর্তৃক শ'বী উরওয়াতা ইবনে মুদরস সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিকেও দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। হাদীসটি হচ্ছে— রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ اَدْرَكَ جَمْعًا وَالْاِمَامُ وَاقِفٌ فَوَقَفَ مَعَ الْاِمَمِ ثُمَّ اَفَاضَ مَعَ النَّاسِ فَقَدْ اَدْرَكَ الْحَجَّ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ فَلَا حَجَّ لَهُ -

যে লোক মাগরিব-এশা একত্রে পড়ল, ইমাম ও অবস্থান গ্রহণকারী হল সে ইমামের সাথে অবস্থান করল, পরে সেখান থেকে লোকজনের সাথে রওয়ানা হয়ে গেল, সে নিঃসন্দেহে হজ্জ পেল। যে তা পেল না, তার হজ্জ হল না।

ইয়ালা ইবনে উবাইদের সুফিয়ান বুকাইর ইবনে আতা আবদুর রহমান ইবনে ইয়ামার আদদেয়লী সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীসও তাদের দলীল। হাদীসটিতে বলা হয়েছে ঃ

رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا بِعَرَفَاتَ، فَاَقْبَلَ نَاسٌ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ فَسْئَلُوْهُ عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ وَمَنْ اَدْرَكَ جَمْعًا قَبْلَ الصُّبْحِ فَقَدْ اَدْرَكَ الْحَجَّ -

আমি রাসূলে করীম (স)-কে আরাফাতে অবস্থান করতে দেখেছি। তখন নজদের কিছু লোক তাঁর নিকট এসে হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন ঃ হজ্জ তো আরাফায় অবস্থান। আর যে লোক সকাল বেলার আগেই মাগরিব-এশা একত্রে পড়তে পারল (মুযদালিফায় অবস্থান করে) সে হজ্জ পেল।

তবে আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমরা যিকির কর মাশয়ারে হারামের নিকট' এতে তাদের কথার কোন দলীল নেই। কেননা এতে যিকির করার হুকুম করা হয়েছে। কিন্তু সকলেই একমত যে, সেখানে যিকির ফরয নয়। তা না করলে হজ্জের কোন ক্ষতি লোকসান হবে না। আর এ আয়াতে মুযদালিফায় অবস্থান করারও কোন আদেশ নেই। ফলে একে দলীল রূপে পেশ করা চলে না।

তা সত্ত্বেও আমরা বলেছি যে, এই 'যিকির' বলতে সেখানে মাগরিব নামায পড়া বুঝিয়েছেন। মুতরাফ ইবনে তরীকের শবী সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি মুতরাফ ছাড়া আরও পাঁচজন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন যাকারিয়া ইবনে আবূ জাবেদা, আবদুল্লাহ ইবনে আবুস সফর ও সাইয়ার প্রমুখ। তাঁরা শবী— উরওয়াতা সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ صَلَّى مَعَنَا هٰذِهِ الصَّلٰوةَ وَوَقَفَ مَعَنَا هٰذَا الْمَوْقِفَ وَاَفَاضَ قَبْلَ ذٰلِكَ مِنْ عَرَفَةَ لَيْلاً اَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضٰى تَفَثَهُ -

যে লোক আমাদের সাথে এই নামায পড়ল ও এই অবস্থান স্থানে অবস্থান করল এবং তার পূর্বে রাত্রে বা দিনে আরাফাত থেকে রওয়ানা হয়ে গেল, তার হজ্জ পূর্ণ হয়ে গেল, সে তার ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করবে।

তাঁদের কেউই উল্লেখ করেননি তার হজ্জ হয়নি বলে রাসূল (স) বলেছেন। তা সত্ত্বেও ফিকাহ্‌বিদগণ একমত হয়ে বলেছেন, সেখানে (মুযদালিফায়) নামায না পড়ায় হজ্জ নষ্ট হবে না। নবী করীম (স)-ই তা বলেছেন। অবস্থানের ব্যাপারটিও তাই। তার কথা 'তাঁর নজ্জ নেই'-এর অর্থ এ-ও হতে পারে যে, তিনি হজ্জের ফযিলত না হওয়ার কথা বলেছেন। হজ্জই হবে না, এমন কথা তিনি বোঝাতে চান নি। যেমন রাসূল (স) বলেছেনঃ

لَاوَضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ -

অযূ করার সময় বিসমিল্লাহ না বললে অযূ হবে না।

হযরত উমর (রা) বর্ণিত অনুরূপ একটি হাদীস পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, 'তার হজ্জ হবে না' অর্থাৎ হজ্জের ফযিলত হবে না। আব্দুর রহমান ইবনে ইয়ামার আদ দেয়লীর নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে কাসীর সুফিয়ান— বুকাইর ইবনে আতা— আবদুর রহমান ইবনে ইয়ামার সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলেছেন ঃ

مَنْ وَقَفَ قَبْلَ اَنْ يَّطْلِعَ الْفَجْرُ فَقَدْتَمَّ حَجُّه -

যে লোক ফজর উদয় হওয়ার পূর্বে অবস্থান করল, তার হজ্জ পূর্ণ হয়ে গেল।

বোঝা গেল, এ অবস্থান বলতে আরাফাতের অবস্থান বুঝিয়েছেন এবং তা হজ্জ সম্পূর্ণ হওয়ার জন্যে শর্ত। যে সব বর্ণনাকারী ফজরের পূর্বে একত্রিত করে মাগরিব-এশা পড়ার কথা বর্ণনা করেছেন, তাঁদের ধারণা ভুল। আর আসলেও তা ভুল না হয়ে যায় না। বহু মানুষ সেখানে ফজর উদয় হওয়ার পরে নবী করীম (স)-এর অবস্থানের কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর থেকে এমন বর্ণনা আসেনি, যাতে তিনি সেখানে রাত্রিকালে অবস্থান করতে আদেশ করেছেন বলে উল্লেখ হয়েছে। তা সত্ত্বেও যে সব সহীহ বর্ণনায় ঃ 'যে লোক আমাদের সাথে নামায পড়ল, পরে এই অবস্থান স্থানে, আমাদের সাথে অবস্থান করল, তার হজ্জ পূর্ণ হয়ে গেছে' এবং আবদুর রহমান ইবনে ইয়ামারের সব বর্ণনা— যাতে তিনি বলেছেন ঃ 'যে লোক আরাফা পেল, সে হজ্জ পেয়ে গেল, তার হজ্জ পূর্ণ হয়ে গেল' এবং 'যে আরাফা হারাল, সে হজ্জ-ও হারাল' এই সব বাক্য সম্বলিত বর্ণনা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এ সবের প্রেক্ষিতে মুযদালিফায় অবস্থানকে

যাঁরা হজ্জের জন্যে শর্ত করেন, তাঁদের কথা অস্বীকৃত হয়ে যায়। সম্ভবত আসম্ ও ইবনে উলিয়াতাই এই ধরনের কথা বলেছেন।

যুক্তির দিক দিয়ে তাঁরা এই দলীল দিয়েছেন যে, হজ্জে দুটি অবস্থানের কথা বলা হয়েছে। আমরা তার একটি অবস্থানের ফরয হওয়া একমত হয়েছে মেনে নিয়েছি। তা হচ্ছে আরাফাতে অবস্থান। তাই অপর অবস্থানটিও ফরয হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা আল্লাহ দুটির উল্লেখ কুরআন মজীদে করেছেন। যেমন তিনি রুকূ ও সিজদার উল্লেখ করেছেন। নামাযে এই দুটিই ফরয। তাকে বলা যাবে, এ দুটিই যখন কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে, তখন এই দুটি ফরয, এরূপ বলা ভুল। কেননা তাতে এই নীতি গ্রহণ করতে হয় যে, কুরআনে যে জিনিসেরই উল্লেখ হয়েছে, তা অবশ্যই ফরয হবে। কিন্তু একথাটি সত্যের বিপরীত। তাছাড়া আল্লাহ অবস্থান করার কথা তো বলেন নি, বলেছেন ঃ মাশয়ারিল হারামে আল্লাহ্র যিকির-এর কথা। আর যিকির সকলের মতে ফরযও নয়। তাহলে অবস্থান ফরয হবে কি করে? কাজেই এই যুক্তির ভিত্তিতে মুযদালিফায় অবস্থান প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তবে আরাফাতে অবস্থান ফরয, এর উপর কিয়াস করে মুযদালিফায় অবস্থান ফরয হবে— এই কথা বলা হলে এই কিয়াসের ইল্লাত সহীহ হওয়ার দলীল আবশ্যক। কিন্তু সে রকম কোন দলীল নেই।

তাকে এ-ও বলা যাবে যে, নবী করীম (স) মক্কায় পৌছে তওয়াফ ও সাঈ' করেছিলেন। পরে কুরবানীর দিনও তওয়াফ করেছিলেন। আবার তওয়াফ করেছিলেন, তা করার জন্যে আদেশও করেছিলেন। তাহলে এই সব কয়টি তওয়াফের হুকুম একই হবে এবং সবই ফরয হবে? এর কোনটি ফরয আর কোনটি অ-ফরয অর্থাৎ মুস্তাহাবও তো হতে পারে। আর তা যখন হতে পারে, তখন মাযদালিফায় অবস্থানটাও তেমনি হতে পারে, তা অস্বীকার করা যায় না। এক কথায় কোন অবস্থান— যেমন আরাফাতে ফরয এবং কোনটি মুস্তাহাব— যেমন মুযদালিফায়-মুস্তাহাব হওয়া খুবই সম্ভব।

আল্লাহ্র কথা

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ -

তোমরা যখন তোমাদের হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান পালন সম্পূর্ণ করে ফেলবে, তখন তোমরা আল্লাহ্র যিকির কর, যেমন করে তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাকে স্মরণ কর।

'মানাসিক কাযা করা' অর্থ সব কাজ সম্পূর্ণরূপে আদায় করা। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا -

যখন তোমরা নামায পূর্ণ মাত্রায় আদায় করে ফেলবে, তখন তোমরা আল্লাহ্র যিকির কর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও বসে বসে। (সূরা নিসা ঃ ১০৩)

অপর আয়াত ঃ

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ -

যখন নামায সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়।

(সূরা জুম'আ ঃ ১০)

রাসূলে করীম (স)-এর কথা ঃ

فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا –

যা তোমরা পেলে তাতে নামায পড়, আর যা হারালে তা কাযা কর।

অর্থাৎ পূর্ণ মাত্রায় আদায় কর।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা আল্লাহ্‌র যিকির কর তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে যেমন করে তোমরা স্মরণ কর।' এর দুটি ব্যাখ্যা বলা হয়েছে। একটি— সমস্ত মানাসিকের জন্যে নির্দিষ্ট যিকিরসমূহ করা। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ –

তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দেবে, তখন তোমরা তাদেরকে তালাক দেবে তাদের ইদ্দত পালন হিসেবে এবং সে ইদ্দত তোমরা গণনা করবে।

তালাক দেয়ার আগের জন্যে এই নির্দেশ। যেমন বলা হয় ঃ যখন হজ্জ করবে তখন গোসল কর এবং যখন নামায পড়বে, তখন অযূ কর।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اذَا قُمْتُمْ الَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ –

যখন তোমরা নামাযের জন্যে দাঁড়াবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত কর।

অর্থাৎ অযূ কর। এটাও নামাযের আগে করণীয় কাজ। এই আদেশটাও সেই ধরনেরই ঃ তোমরা যখন তোমাদের মানাসিক আদায় করতে যাবে তখন তোমরা আল্লাহ্‌র যিকির কর।

হতে পারে মসনূন যিকিরসমূহ করার আদেশ করা হয়েছে, যা আরাফাত ও মুযদালিফায় এবং পাথর নিক্ষেপ ও তওয়াফের সময়ে করার জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে আছে। এ-ও বলা হয়েছে যে, জাহিলিয়াতের লোকেরা মানাসিক আদায় করার সময় দাঁড়িয়ে বাপ-দাদার কীর্তিকলাপ ও গৌরবময় কার্যাবলীর স্মরণ ও উল্লেখ করত। আল্লাহ্ সে সবের পরিবর্তে আল্লাহ্‌র যিকির করার, তাঁর নিয়ামতের শোকর করার ও তাঁর তারীফ-প্রশংসা করার আদেশ করেছেন। তাই নবী করীম (স) আরাফাতের ভাষণে বলেছেন ঃ

انَّ اللّٰهَ قَدْ اَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَظُّمَهَا بِالْاٰبَاءِ، اَلنَّاسُ مِنْ اٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰى عَجَمِيٍّ الَّا بِالتَّقْوٰى –

আল্লাহ্ তোমাদের উপর থেকে জাহিলিয়াতের যুগের গৌরব, অহংকার ও বাপ-দাদার বড়ত্ব প্রকাশের নিয়ম দূর করে দিয়েছেন। সমস্ত মানুষ আদম থেকে আর আদম মাটি দিয়ে তৈরী। কোন আরবের শ্রেষ্টত্বের মর্যাদা নেই অনারবের উপর— তবে তাকওয়ার কারণে যা আছে।

এই কথা বলার পর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ انَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ط انَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ –

হে জনগণ! আমরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন দল, জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি শুধু তোমাদের পারস্পরিক পরিচিতির জন্যে। তবে তোমাদের আল্লাহ্‌র নিকট সবচাইতে বেশী সম্মানার্হ সে, যে তোমাদের মধ্যে সবচাইতে বেশী তাকওয়া সম্পন্ন। (সূরা হুজরাত ঃ ১৩)

এই গোটা আয়াতই স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, জাহিলিয়াতের যুগের লোকেরা যেমন তাদের বাপ-দাদাদের নিয়ে গৌরব-অহংকার করত, তার প্রতিবাদ ও পরিবর্তন সাধনের জন্যেই আল্লাহ্‌র এই ঘোষণা এসেছে।

## মিনায় অবস্থানের দিনগুলো ও সেখান থেকে চলে যাওয়া

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاذْكُرُ اللّٰهَ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ -

এবং তোমরা আল্লাহ্‌র যিকির কর সেই গণনা করা দিন কয়টিতে। অতঃপর যে লোক তাড়াহুড়া করে দুই দিনে কাজ শেষ করবে, তার কোন গুনাহ্ হবে না।

আবূ বকর বলেছেন, সুফিয়ান ও শুবা বুকাইর ইবনে আতা— আবদুর রহমান ইবনে ইয়ামার আদ-দেয়লী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَيَّامُ مِنًى ثَلٰثَةُ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ -

মিনায় অবস্থানের দিন হচ্ছে তিনটি। তা-ই আইয়ামে তাশরীক। যে লোক শীঘ্র চলে যাবে, তার কোন গুনাহ হবে না, আর যে বিলম্ব করবে তার-ও কোন গুনাহ হবে না।

মনীষিগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটি উপরোক্ত আয়াতের যথার্থ ব্যাখ্যা। এ বিষয়েও তাঁদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই যে, এই গুনাহকৃত দিন বলতে তাশরীকের দিন কয়টি বুঝিয়েছেন। আলী, উমর, ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকেও সেই কথাই বর্ণিত হয়েছে। তবে ইবনে আবূ লায়লা মিনহাল-জুর আলী সূত্রে একটু ভিন্ন বর্ণনায় বলা হয়েছে, এই গণনাকৃত দিন হচ্ছে কুরবানীর দিন এবং তার পরের দুই দিন। তাতে তুমি যা-ই চাও যবেহ করতে পার। বলা হয়েছে, এটা একটা ভুল ধারণা। সহীহ কথা হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তা জ্ঞানের আওতাভুক্ত। কিন্তু আয়াতের বাহ্যিক অর্থ তাকে অস্বীকার করে। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ 'যে লোক তাড়াহুড়া করবে, দুই দিনে, তার কোন গুনাহ হবে না।' এই দুই দিন প্রস্তর নিক্ষেপের জন্যে নির্দিষ্ট। (কুরবানীর দিনের মধ্যে গণ্য নয়।) তা আইয়ামের তাশরীকেই করা হয়।

আর 'জ্ঞানের আওতাভুক্ত' পর্যায়ে হযরত আলী ও ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ জ্ঞানের আওতাভুক্ত বলতে বোঝানো হয়েছে কুরবানীর দিন ও তার পরের দুই দিন। এই তিন দিনে তুমি যা চাও যবেহ্ কর। ইবনে উমর বলেছেন, গোণা দিনগুলো হচ্ছে আইয়্যামে তাশরীক। সাঈদ ইবনে যুবায়র ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, জানা দিন হচ্ছে

দশ, আর গোণা দিন হচ্ছে আইয়্যামে তাশরীক। আর গোণা দিন বলতে কুরবানী দেয়ার দিন, আর তার পরে তিন দিন তাশরীকের। আবদুল্লাহ ইবনে মূসা ইমারাতা ইবনে যাকওয়ান-মুজাহিদ ইবনে আব্বাস (রা)-সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ গোণা দিনগুলো হচ্ছে দশ দিন, আর জানা দিন হচ্ছে কুরবানীর দিন কয়টি।

তাঁর কথা ঃ গোণা দিন দশ দিন, এটা যে ভুল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কোন বিশেষজ্ঞই সে কথা বলেন নি। তা কুরআনেরও বিপরীত। আল্লাহ তো বলেছেন ঃ 'যে লোকই দুই দিনেই তাড়াহুড়া করে যাবে, তাতে তার কোন গুনাহ হবে না।' দশ দিনের তিন দিন বাদ দিয়ে দুই দিনের সাথে সম্পর্কিত কোন হুকুম নেই। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, জানা দিনসমূহ দশ আর গোণা দিনসমূহ তাশরীকের দিন। তাবেয়ীনের জমহুরের এই কথা। হাসান, মুজাহিদ, আতা, দহাক ও অন্যান্যদের মধ্য থেকে ইবরাহীম এ পর্যায়ে উল্লেখ্য।

আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত, জানা দিন বলতে দশ দিন, আর গোণা দিনসমূহ হচ্ছে তাশরীকের দিনগুলো। তাহাভী তাঁর শায়খ আহমাদ ইবনে আবূ ইমরান-বাশর ইবনুল ওয়ালীদ সূত্রে উল্লেখ করেছেন, বলেছেন, আবুল আব্বাস তূসী আবূ ইউসূফকে 'জানা দিনগুলো' অর্থ কি তার প্রশ্ন করে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। এই চিঠির জবাবে ইমাম আবূ ইউসূফ লিখেছিলেন ঃ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাসূলের সাহাবীগণ বিভিন্ন মত পোষণ করতেন। হযরত আলী ও ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তা হচ্ছে কুরবানীর দিন কয়টি। আমার মত-ও তাই। কেননা আল্লাহ তার পরই বলেছেন ঃ

عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ -

আমরা কুরবানীর একটি নিয়ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছি যে, লোকেরা আল্লাহ্‌র কথা উচ্চারণ করে সেই জন্তুর উপর যা তিনি তাদেরকে রিযিক স্বরূপ দিয়েছেন। (সূরা হজ্জ ঃ ২৮, ৩৪)

আমাদের শায়খ আবুল হাসান আল-কারখী আহমাদুল কারী, মুহাম্মদ আবূ হানীফা সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ المعلومات জানা দিনসমূহ হচ্ছে দশ। আর মুহাম্মাদের মতে তা হচ্ছে কুরবানীর তিন দিন— ঈদুল আযহার দিন ও তার পর দুই দিন।

আবূ বকর বলেছেন, আহমাদুল কারীর মুহাম্মাদ থেকে এবং বাশার ইবনুল ওয়ালীদের আবূ ইউসূফ থেকে পাওয়া বর্ণনা হচ্ছে, জানা দিন কুরবানীর দিন ও তার পর দুই দিন। ইমাম আবূ হানীফা যে বলেছেন, জানা দিন হচ্ছে দশ দিন, আর গোণা দিন হচ্ছে আইয়্যাম তাশ্‌রীক। ইবনে আব্বাস (রা)-এর মশহুর কথা এটিই। আর আল্লাহ্‌র কথাঃ 'যেসব জন্তু আল্লাহ্‌ তাদেরকে রিযিক হিসেবে দিয়েছেন ....' এতে কুরবানীর দিন কয়টি হওয়ার কোন দলীল নেই। কেননা এটা জন্তু-জানোয়ারকে রিযিক হিসেবে দেয়ার কথাই হয়ত আল্লাহ বলেছেন। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلِتُكَبِّرُ وااللّٰهَ عَلٰى مَاهَدَاكُمْ -

এবং যেন তোমরা আল্লাহ্‌র তাকবীর বল যেমন করে তিনি তোমাদেরকে হেদায়েত দিয়েছেন। (সূরা বাকারা ঃ ১৮৫)

অর্থাৎ যে জন্যে তোমাদেরকে হেদায়েত দিয়েছেন। এ-ও হতে পারে যে, তা বলে দশ দিনই বুঝিয়েছেন। কেননা কুরবানীর দিনও এরই মধ্যে রয়েছে। পশু যবেহ এই দিনেই হয়। বছরের বারবার আবর্তনের কারণে বহুদিন হয়ে যায়।

ভাষাভাষীরা বলেছেন— গোণা দিন ও জানা দিন ভিন্ন ভিন্ন। শব্দ থেকেই বোঝা যায় যে, সংখ্যার দিক দিয়ে তা ভিন্ন ভিন্ন। কেননা 'গোণা দিন' বলায় বোঝা যায়, তার সংখ্যা অল্প। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ -

সামান্যতম মূল্যে কয়েক মদ্রার বিনিময়ে (বিক্রয় করে দিল)। (সূরা ইউসুফ ঃ ২০)

عدد বা সংখ্যার বিশ্লেষণ দেয়া হয় পরিমাণে কম বোঝাবার জন্যে। কেননা তা বহুত্বের বিপরীত হয়ে থাকে। যেমন বলা হয় ঃ কম ও বিপুল। ফলে معدوداتসংখ্যা কৃত বা গোণার অর্থই হয়, তা কম علومات জানার তুলনায়। এই জানা মাস দশটি। মনীষিগণ এ ব্যাপারে একমত যে, মিনায় অবস্থানের দিন তিনটি। কুরবানীর দিন ও তার পরবর্তী দুই দিন। হাজীর জন্যে সুযোগ দেয়া হয়েছে যে, দ্বিতীয় দিনের প্রস্তর নিক্ষেপ হয়ে গেলে চলে যেতে পারে। আর তৃতীয় দিন পর্যন্ত যাওয়াকে বিলম্বিত-ও করতে পারে। এই তৃতীয় দিনেও হাজী প্রস্তর নিক্ষেপ করে। তারপরে সেখান থেকে চলে যাবে। দ্বিতীয় দিন সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত-ও যে হাজী মিনা ত্যাগ করে গেল না, তার ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। হযরত উমর, ইবনে উমর, জাবির ইবনে জায়দ (রা), আলহান ও ইবরাহীম বলেছে, দ্বিতীয় দিনের সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে চলে না গিয়ে থাকলে তৃতীয় দিনে প্রস্তর নিক্ষেপ না করে মিনা ত্যাগ করতে পারবে না। হাসান বসরী থেকে বর্ণিত, দ্বিতীয় দিনে যুহর পর্যন্ত পাথর নিক্ষেপ হয়ে গেলে হাজী মিনা ত্যাগ করে যেতে পারে। কিন্তু মিনাতে যদি আসর নামাযের সময় হয়ে যায়, তাহলে তাকে তৃতীয় দিন পর্যন্ত থাকতে হবে, তার পূর্বে মিনা ত্যাগ করতে পারবে না। হানাফী ফিকাহবিদদের মত হচ্ছে, সূর্যের অস্ত যাওয়া পর্যন্ত যদি মিনা ত্যাগ করে না যায়, তাহলে তৃতীয় দিনে পাথর নিক্ষেপ না করা পর্যন্ত তার মিনা ত্যাগ করে চলে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সেজন্যে তার কর্তব্য হচ্ছে তৃতীয় দিন সকাল পর্যন্ত মিনাতে অবস্থান করা। আর তখনই তার উচিত তৃতীয় দিনের পাথর নিক্ষেপের কাজ করা। তা না করা তার জন্যে জায়েয হবে না। তৃতীয় দিনও মিনায় অবস্থান করা সত্ত্বেও পাথর নিক্ষেপ না করে মিনা ত্যাগ করা যে জায়েয নয়, এই বিষয়ে ফিকাহবিদদের মধ্যে কোন মতবিরোধের কথা আমাদের জানা নেই। তাঁরা শুধু বলেছেন, মিনায় সন্ধ্যা পর্যন্ত শুধু থাকার কারণেই তৃতীয় দিনের পাথর নিক্ষেপ তার কর্তব্য হবে না। দ্বিতীয় দিন শেষে যে রাত তার হুকুম হচ্ছে তা সেই দিনের অধীন ও অনুসারী হবে। তার পরের দিনের যে হুকুম তা সে রাত্রির জন্যে হবে না। বিবেচ্য হচ্ছে, প্রথম দিন দিনের বেলা পাথর নিক্ষেপ না করলে বা করতে না পারলে তা পরবর্তী রাত্রে সম্পন্ন করবে। তা হলে তা তার সময় ছাড়িয়ে বিলম্বে করা হল, বলা হবে না। কেননা নবী করীম (স) রাখালদের জন্যে রাত্রিবেলা পাথর নিক্ষেপের রুখসত দিয়েছেন। ফলে রাত্রের হুকুম তাই, যা তার পূর্ববর্তী দিনের হুকুম। সে রাত্রের হুকুম তা হবে না, যা তার পরবর্তী দিনের হুকুম। এই কারণে তাঁরা বলেছেন, দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত মিনায় অবস্থান তার দিনের বেলার অবস্থানের পর্যায়ে গণ্য। যদি তৃতীয় দিনের সকাল পর্যন্ত মিনায় থেকে যায়, তা হলে সে দিন প্রস্তর নিক্ষেপ করা তার কর্তব্য হবে, এতে কোন মতপার্থক্য নেই। ইমাম আবূ হানীফা তৃতীয় দিনে সূর্যের পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পূর্বেই পাথর নিক্ষেপ জায়েয বলেছেন, কেননা পাথর নিক্ষেপ বাধ্যতামূলক হওয়ার সময়টা যথারীতি হয়ে গেছে। এই কথা সহীহ। তার দলীল উপরে বর্ণিত হয়েছে। কেননা একটা কাজের কর্তব্য হওয়ার সময় হবে অথচ তা করা তখন সহীহ হবে না, তা হতে পারে না।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقٰى –

যদি কেউ তাড়াহুড়া করতে গিয়ে দুই দিনেই ফিরে যায়, তা হলে তার কোন গুনাহ্ হবে না। আর যদি কেউ খাওয়া বিলম্বিত করে তা হলেও তার কোন দোষ হবে না— অবশ্য তা তার জন্যে, যে তাকওয়া অবলম্বন করেছেন।

এ আয়াতের তাফসীরের দুটি দিক তোলা হয়েছে। একটি— সে যে তার কবুলকৃত হজ্জ দ্বারা তার দোষ-ত্রুটি ও গুনাহ্ ক্ষালন করেছে, এ জন্যে তার কোন গুনাহ্ হবে না। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া গেছে। অনুরূপ বর্ণনা একটি হচ্ছে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجِعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ –

যে লোক হজ্জ করল, কিন্তু রফস করল না, ফিসক-ফুজুরীও করল না, সে যেন তার মায়ের সদ্যজাত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে গেল।

আর দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, এই তাড়াহুড়া করার কারণে তার কোন গুনাহ্ হবে না। আল-হাসান প্রমুখ থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। বলেছেন ঃ مَتَاَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ 'যে বিলম্ব করবে তারও কোন গুনাহ্ হবে না।' কেননা বিলম্ব করা তার জন্যে মুবাহ্। আল্লাহ্র কথা ঃ لِمَنِ اتَّقٰى 'তার জন্যে,' যে তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করেছে। এর অর্থ এই হতে পারে, ইহ্রামে নিষিদ্ধ কাজ থেকে যে লোক আল্লাহ্কে ভয় করে দূরে থাকল। তার দলীল হচ্ছে ঃ 'রফস নেই, ফিসক-ফুজুরী নেই, ঝগড়া-ফাসাদ নেই হজ্জে'। যদি এই তাকওয়া অবলম্বিত না হয়, তা হলে তার জন্যে সওয়াবের ওয়াদা নেই।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا –

এমন লোকও আছে, যার কথা বৈষয়িক জীবনে তোমাকে খুশী করে দেবে।

আবূ বকর বলেছেন, কারোর বাহ্যিক কথায় প্রতারিত হওয়ার ব্যাপারে এ আয়াতে সাবধান করা হয়েছে। কেননা বাহ্যিক কথা বেশ মিষ্টি হয়ে থাকে। যা প্রকাশমান তার অন্তর্নিহিত মূল ব্যাপার বুঝবার জন্যে চেষ্টা করার তাগিদ করা হয়েছে। তাই আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন যে, কিছু কিছু লোক আছে যারা মুখে এমন কথা প্রকাশ করে যার বাহ্যিক রূপ তোমাকে খুশী করে দেবে।

وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَافِىْ قَلْبِهٖ –

এবং তাদের দিলে যে কথা গোপন আছে তাতে আল্লাহ্কে সাক্ষী বানায়।

এটা আসলে মুনাফিকদের পরিচিতি। যেমন অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ – اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً –

ওরা বলে ঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসূল। হ্যাঁ, আল্লাহ্ জানেন যে আপনি তাঁর রাসূল। সেই সাথে আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা চরম মিথ্যাবাদী। ওরা ওদের কিরা-কসম ঢালস্বরূপ বানিয়ে নিয়েছে। (সূরা মুনাফিকুন ঃ ১)

এ-ও আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ط وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ

ওদের প্রতি যদি তুমি তাকাও তাহলে ওদের অবয়ব তোমাকে বিস্মিত করে দেবে। আর ওরা কথা বললে তুমি ওদের কথায় মগ্ন হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ তাঁর নবীকে ওদের মনের গোপন গহনে নিহিত কথা-বার্তা সম্পর্কে আগে ভাগে জানিয়ে দিলেন, যেন ওদের কথার বাহ্যিক আকর্ষণে তিনি ধোঁকায় না পড়ে যান। আর এই ধরনের লোকদের ব্যাপারে আমাদের জন্যে উপদেশ লাভের মাধ্যম বানিয়েছেন। যেন আমরা লোকদের বাহ্যিক কাজকর্মের উপর নির্ভরশীল হয়ে না পড়ি। কেননা তাদের মনের ক্রোধ-শত্রুতা মনের মধ্যেই গোপন রয়ে যায়, প্রকাশ হতে দেয় না। দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে মুনাফিকদের ব্যাপারে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনের আদেশ করা হয়েছে এ আয়াতে। কাজেই দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারাদিতে মানুষকে বিশ্বাস করার ব্যাপারে এই নীতি অবলম্বন করা অবশ্যক যে, আমরা শুধু বিশ্বাস করেই ক্ষান্ত হয়ে থাকব না, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনাও করব। এতে এই বিষয়েরও দলীল রয়েছে যে, যাকে বিচার কার্যে ফতোয়া দেয়া, ইমামতি করা বা সাক্ষ্য দানের জন্যে নিযুক্ত করা হবে, তার নির্দেশ হওয়াটা অবশ্যই দেখতে হবে। এসব ও এই ধরনের কাজে যাকেই দায়িত্বশীল বানানো হবে, তাদের বাহ্যিক কথাবার্তা গ্রহণ করা যাবে না। তাকে প্রশ্ন করতে হবে, তাদের অনুপস্থিতিতেই খবরাখবর গ্রহণ ও তার উপর আলোচনা পর্যালোচনা করতে হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের সামাজিক ব্যাপারাদির দায়িত্বশীল বানাবার বেলায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছেন ও অসতর্কতা গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা তার পরই আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ -

আর যখন তারা দায়িত্ব লাভ করে (কিংবা পেছনে চলে যায়), তখন তারা দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং ফসল ও বংশ ধ্বংস করতে চেষ্টা চালায়।

এ আয়াতে প্রসঙ্গত تَوَلّٰى শব্দটির কারণে আমাদের এই শিক্ষা দেয়া সম্ভব হয়েছে যে, বিভিন্ন দিক দিয়ে বিবেচনা বিচার করে না দেখে কারোর বাহ্যিক কথাবার্তা ও বেশ-বাস দেখে তার সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আমাদের উচিত নয়।

আল্লাহ বলেছেন ঃ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ 'এবং সে অত্যন্ত বেশী ঝগড়াটে।'

অর্থাৎ ঝগড়াঝাটিতে তার মুখ চলে খুব বেশী ধারাল হয়ে। বলেছেন ঃ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ 'আর আল্লাহ বিপর্যয় বিশৃঙ্খলা আদৌ পছন্দ করেন না।' এ আয়াতাংশে জবরীয়া ফিরকার মতের প্রতিবাদ করা হয়েছে, তাকে বাতিল করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ যা পছন্দ করেন না, তা তিনি চান-ও না। এবং যার ইচ্ছা করে, তিনি তা পছন্দও করেন না। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতাংশের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি ফাসাদ পছন্দ করেন না। আর সেই কারণেই

তিনি ফাসাদ করেনও না। কেননা তিনি যদি তা করতেন, তাহলে তিনি তার ইচ্ছুক হতেন, তা পছন্দও করতেন। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ -

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি জুলুম করতে ইচ্ছুক নন।

একথা বলে তিনি নিজের থেকে জুলুমের কাজটিকে অস্বীকার করলেন। কেননা তিনি যদি তা করতেন, তাহলে তার ইচ্ছুক হতেন। তিনি যা চান না, যার ইচ্ছুক নন, তা তিনি করবেন, এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এ থেকে এ-ও বোঝা যায় যে, কোন কাজ হওয়ার জন্যে তাঁর পছন্দই হচ্ছে তার সেজন্যে ইচ্ছার প্রকাশ। তিনি কোন কাজের হওয়াটা পছন্দ করবেন, অথচ তা হবে না, এটা হতেই পারে না। আর হওয়াটা অপছন্দ করলে তো কথাই নেই। তা পরস্পর-বিরোধিতা। তাই কোন কাজের ইচ্ছা করেন, অথচ তা অপছন্দ করেন। তাহলে এরূপ কথাই অসত্য ও অসংবদ্ধ। এ থেকে এ-ও বোঝা যায় যে, আল্লাহ্র কথা ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِىْ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

যে সব লোক পছন্দ করে যে, ঈমানদার লোকদের মধ্যে নির্লজ্জতা প্রসারিত ও বিস্তৃত হোক, তাদের জন্যে পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে। (সূরা নূর ঃ ১৯)

এর অর্থ যারা তা চায়। বোঝা গেল, পছন্দ করার অর্থ ইচ্ছা করা। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اَحَبَّ لَكُمْ ثَلَاثًا وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا اَحَبَّ لَكُمْ اَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَاَنْ تُنَاصِحُوْا مَنْ وَلَّاهُ اللّٰهُ اَمْرَكُمْ ، وَكَرِهَ لَكُمْ لِقِيْلَ وَالْقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ -

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্যে তিনটি কাজ পছন্দ করেছেন এবং তিনটি কাজ অপছন্দ করেছেন। তিনি পছন্দ করেছেন যে, তোমরা কেবল তাঁরই দাসত্ব করবে, তাঁর সাথে একবিন্দু জিনিস শরীক করবে না এবং যাকে তোমাদের সামষ্টিক ব্যাপারদির দায়িত্বশীল বানিয়েছেন, তার কল্যাণ কামনা ও তাতে নসীহত করবে এবং বাজে কথা বলে বেড়ানো, বেশি বেশি প্রশ্ন করা এবং ধন-মাল বিনষ্ট করাকে তিনি অপছন্দ করেছেন।

এ হাদীসে অপছন্দ করাকে পছন্দ করা ও ভালবাসার বিপরীত দাঁড় করানো হয়েছে। তাই বুঝতে হবে, যার তিনি ইচ্ছা করবেন, তা তিনি পছন্দও করেন এবং অনুরূপভাবে যা তিনি অপছন্দ করেন, তার ইচ্ছা তিনি করেন না। কেননা অপছন্দ করাটা ইচ্ছা করার বিপরীত। তাই অপছন্দ করা যখন ইচ্ছ করা ও পছন্দ করার পরিপন্থী সাব্যস্ত হলো, তখন বোঝা গেল, এ দুটিই সমান।

আল্লাহ্র কথা ঃ فَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ 'অতএব জেনে নাও যে, আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী সুবিজ্ঞানী"।

العزيز অর্থ প্রতিরোধক, প্রতিরোধে সক্ষম। কিন্তু তিনি প্রতিরোধ করেন না العزة শব্দের আসল অর্থ বিরত থাকা। আরবী কথা ঃ ارض عزاز জমিন শক্ত, দুর্ভেদ্য, অনমনীয়। আর الحكيم শব্দটি গুণবাচক। আল্লাহ্ সম্পর্কে তা দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি জ্ঞানবান। তা বোঝতে চাইলে বলা সঙ্গত হবে যে, তিনি চিরন্তনভাবে সুবিজ্ঞানী। আর দ্বিতীয় অর্থ, সুদৃঢ় নিখুঁত কার্য সম্পাদনকারী। তা বোঝাতে চাইলে বলা যাবে না যে, তিনি চিরদিনই 'হাকীম'। যেমন বলা যায় না, তিনি সর্ব সময় কাজকারী। এ গুণটা তাঁর একান্ত নিজস্ব, স্বতঃই এই গুণে গুণান্বিত। বোঝা গেল, তিনি জুলুম করেন না, নির্বুদ্ধিতা দেখান না। খারাপ বীভৎস কাজও করেন না, তার ইচ্ছাও করেন না। কেননা যে তার ইচ্ছা করবে, সে 'হাকীম' হতে পারে না, এটা সব বিবেক-বুদ্ধিমান মানুষের নিকটই স্বীকৃত। আর এভাবেই জবরীয়া আকীদার বাতুলতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়।

আল্লাহ্ কথা ঃ

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّاتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰئِكَةُ -

এই সমস্ত মুল্যবান উপদেশ ও হেদায়েত দেয়ার পরও যদি মানুষ সত্যের দিকে ফিরে না আসে, তাহলে তারা কি এখনও এই অপেক্ষায় বসে আছে যে, আল্লাহ্ মেঘমালার ছত্র লাগিয়ে ফেরেশতাদের সঙ্গে নিয়ে নিজেই সম্মুখে এসে উপস্থিত হবেন?

এটি 'মুতাশাবিহ্' আয়াত। অতএব এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করে 'মুহকাম' আয়াতের দিকেই লক্ষ্য নিবদ্ধ করা বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ্ আমাদেরকে তারই আদেশ করেছেন। যেমন বলা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ - فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ

সেই মহান আল্লাহ্ই তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন তাতে মুহকাম আয়াত সমূহ রয়েছে— তা-ই কিতাবের মূল। আর অন্যান্য সব মুতাশাবিহ্ আয়াত। যাদের দিলে বক্রতা রয়েছে তারা এই মুতাশাবিহ্ আয়াতের পেছনে পড়ে থাকে (তারই অনুসরণ করে)।

(সূরা আলে-ইমরান ঃ ৭)

মুতাশাবিহ আয়াত-এর শব্দের হাকীকত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আল্লাহ্‌র নিয়ে আসা। এ-ও হতে পারে যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ বুঝিয়েছে। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰئِكَةُ اَوْ يَاْتِىَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِىْ بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ -

ওরা কি এই অপেক্ষায় বসে আছে যে, তাদের নিকট ফেরেশতা আসবে কিংবা আসবেন তোমার রব্ব অথবা তোমার রব্ব-এর কোন কোন আয়াত নিয়ে আসবে?

(সূরা আন'আম ঃ ১৫৮)

এই সবই মুতাশাবিহ আয়াত। যেমন 'অথবা তোমার রব্ব আসবেন।' কেননা আল্লাহ্‌র আসা, কিছু নিয়ে আসা বা যাওয়া, স্থানান্তর হওয়া, সরে পড়া— এই সব কথা অকল্পনীয়। এ সব তো অবয়বধারীদের পরিচিতি। নতুনত্ব বোঝায় অথচ 'মুহকাম' আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 'তাঁর মত কোন জিনিস নেই।' ইবরাহীম (আ) তারকা নক্ষত্রসমূহের চলাচল ও স্থানান্তর প্রত্যক্ষ করে বুঝেছিলেন, এসব পরে সৃষ্টি হওয়া জিনিস। তাঁর সময়ের জনগণের সম্মুখে যুক্তি পেশ করে বলেছিলেন যে, এর কোনটিই স্রষ্টা বা আল্লাহ্ হতে পারে না। তাই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اٰتَيْنٰهَا اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ –

এ হচ্ছে আমার অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ। আমি এই প্রমাণ ইবরাহীমকে দিয়ে তার জনগণের সম্মুখে পেশ করেছি। (সূরা আন'আম ঃ ৮৩)

অর্থাৎ তারকা-নক্ষত্রসমূহ পরে সৃষ্ট অবয়ব। আল্লাহ্ এসব থেকে উর্ধ্বে মহান সর্বপ্রকারের সাদৃশ্য থেকে।

যদি বলা হয়, তাহলে 'আল্লাহ্ বা তোমার রব্ব এসেছেন' এইরূপ কথা বলা কি জায়েয ? এই অর্থে যে, তাঁর কিতাব এসেছে বা তাঁর রাসূল এসেছে কিংবা এই ধরনের অন্য কোন কথা?

জবাবে বলা যাবে, এসব কথা অপ্রত্যক্ষ مجاز আর অপ্রত্যক্ষ শব্দ ব্যবহৃত হয় সেখানে, যেখানে আসল প্রত্যক্ষ অর্থ বোঝাবার দলীল থাকে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِىْ كُنَّا فِيْهَا –

সেই জনপদকে জিজ্ঞাসা কর, যেখানে আমরা ছিলাম। (সূরা ইউসূফ ঃ ৮২)

আসলে এ আয়াতে জনপদ নয়, জনপদের অধিবাসীদেরই বুঝিয়েছেন। বলেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ –

যে সব লোক আল্লাহকে এবং তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয় .....। (সূরা আহ্যাব ঃ ৫৭)

'আল্লাহ্‌কে কষ্ট দেয়' অর্থ, আল্লাহ্‌র ওলী, বন্ধু, সাহায্যকারী, নেক বান্দাদের কষ্ট দেয়। কেননা আগেই বলেছি, অপ্রত্যক্ষ শব্দ সেখানেই ব্যবহৃত হয় যেখানে প্রত্যক্ষ অর্থ বোঝাবার দলীল সেখানে থাকবে। অথবা যা শুনলে শ্রোতার পক্ষে প্রকৃত বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ –

এবং আল্লাহ্‌র নিকটই পরিণত হয় সমস্ত ব্যাপার।

এর দুটি দিক রয়েছে। একটি এই যে, যাবতীয় ব্যাপারই মানুষের করায়ত্ত হওয়ার পূর্বে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বাধীন থাকে। পরে আল্লাহ্ অনেক ব্যাপার মানুষের কর্তৃত্ব ও পরিচালনাধীন করেছেন। কিন্তু পরকালে যাবতীয় ব্যাপার নিরংকুশভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বাধীন হয়ে যাবে, মানুষের হাতে কিছুই থাকবে না। এইদিক দিয়ে 'যাবতীয় ব্যাপার আল্লাহ্‌র নিকট পরিণত হবে' বলা খুবই সঙ্গত। আর দ্বিতীয় তাৎপর্যটি পাওয়া যাবে এ আয়াতের আলোকে ঃ اَلَا اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ 'জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র দিকেই ফিরে যাবে সব ব্যাপার'। অর্থাৎ তিনি ছাড়া কেউ কিছুর মালিক হবে না। এটা নয় যে, তাঁর কর্তৃত্বাধীন ছিল এখন হয়েছে, বরং কোন সময়ই তার উপর প্রকৃত কর্তৃত্ব আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোর ছিল-ই না।

অপর আয়াতের কথা ঃ

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّيْنَ -

সমস্ত মানুষ অভিন্ন একই উম্মত ছিল। পরে আল্লাহ নবীগণকে পাঠিয়েছেন।

এ আয়াতের তাৎপর্যে বলা হয়েছে, সমস্ত মানুষ কুফরের ভিত্তিশীল এক উম্মত ছিল। যদিও তাদের ধর্মমত বিভিন্ন ছিল। তাদের মধ্যে মুসলিম থাকাও সম্ভব। তবে তারা নিজেরা খুবই কম সংখ্যক ছিল। উম্মত বলতে জামা'আতও বোঝাতে পারে। কেননা উভয়ের মধ্যে বিপুল জনগোষ্ঠী হওয়ার তাৎপর্য রয়েছে। কাতাদাতা ও দহাক বলেছেন, বরং তারা সবই সত্য দ্বীনের উপর এক ও অভিন্ন ছিল। পরে তাদের মধ্যে পার্থক্য ও দলাদলির সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهِ -

পরে আল্লাহ্ তার অনুমতিক্রমে হেদায়েত করলেন ঈমানদার লোকদেরকে এ জন্যে যে, তাদের মধ্যে 'হক' নিয়ে মতপার্থক্য হয়ে যায়।

আবদুল্লাহ ইবনে তায়ুস তাঁর পিতা আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ، بَيْدَ اَنَّ كُلَّ اُمَّةٍ اُوْتُوا الْكِتٰبَ قَبْلَنَا وَاُوْتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهٰذَا يَوْمُهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ، فَهَدَانَا اللّٰهُ، لَهُ وَلِلْيَهُوْدِ غَدُوَّلِلنَّصَارَى بَعْدَغَدٍ -

আমরা সর্বশেষের লোক হলেও কিয়ামতের দিন সকলের আগে-ভাগে থাকব। তবে অন্যান্য সব উম্মতকে আমল-নামা আমাদের পূর্বে দেয়া হবে। আর আমাদেরকে দেয়া হবে তাদের পরে। তাই তাদের এইদিন হচ্ছে তা-ই যে দিনের ব্যাপারে তারা পরস্পর মতপার্থক্যে লিপ্ত হয়েছিল। তাই আল্লাহ্ আমাদেরকে এই দিনের (শুক্রবারের) হেদায়েত করেছেন আর ইয়াহুদীদের জন্যে পরের দিন আর খ্রীস্টানদের জন্যে তার পরের দিন।

আমাশ আবূ সালিহ, আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রেও নবী করীম (স)-এর অনুরূপ কথা বর্ণনা করেছেন। তবে সে বর্ণনায় হেদায়েত দানের কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে শুক্রবার আমাদের জন্যে, পরের দিন ইয়াহুদীদের জন্যে এবং তার পরের দিন খ্রীস্টানদের জন্যে, এ দুটি হাদীসেই মতপার্থক্যের দিন হিসেবে যে দিনটির কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে জুম'আর দিন। তবে হাদীসের সাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ ভাষা সমস্ত হক-ই বোঝায়, যার হেদায়েত আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাদের দিয়েছেন। তার মধ্যে জুম'আর দিন একটি জিনিস।

## অর্থ ব্যয় কার জন্যে সর্বপ্রথম করা হবে

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ - قُلْ مَآاَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ -

হে নবী! লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কি তারা ব্যয় করবে ? তুমি বলে দাও, যে সম্পদই তোমরা ব্যয় কর না কেন, তা করবে পিতা-মাতা ও নিকটবর্তীদের জন্যে।

মূল প্রশ্নটি ছিল ব্যয়ের পরিমাণ সম্পর্কে। কিন্তু জবাবটা এসেছে কম-বেশী সম্পর্কে এবং সেই সাথে কাদের জন্যে ব্যয় করা হবে সেই পর্যায়ের। জবাবের প্রথম কথা ঃ ধন-মাল যা-ই খচর কর না কেন। এতে পরিমাণ সম্পর্কিত ধারণা দেয়া হয়েছে। তাতে কম বা বেশি পরিমাণ বোঝায়। অর্থাৎ ব্যয়ের পরিমাণ কম-ও হতে পারে, বেশীও হতে পারে। কুরআনের শব্দ خَيْرٌ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভার্থে সর্বপ্রকারের ব্যয়কেই শামিল করে। কার জন্যে ব্যয় করা হবে তা-ও বলে দেয়া হয়েছে ঃ 'পিতা-মাতা ও নিকটবর্তী লোকদের জন্যে। এ ছাড়া আরও যার যার কথা আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, তারাও তার মধ্যে গণ্য। এরাই হচ্ছে অন্যদের অপেক্ষা ব্যক্তির ব্যয়ের অংশ পাওয়ার বেশি অধিকারী। এদের তুলনায় অন্যরা নৈকট্য ও দারিদ্রের দিক দিয়ে অধিক অধিকার সম্পন্ন নয়। কি পরিমাণ ব্যয় করতে হবে সে বিষয় অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ - قُلِ الْعَفْوَ -

লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কি পরিমাণ ব্যয় করবে ? বল, আল-'আফ্‌ও'

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছে, আল-'আফও' বলতে বোঝায়, তোমার পরিবারবর্গের জন্যে ব্যয় করার পর যা উদ্ধৃত থাকবে তা। কাতাদাতা বলেছেন ঃ العَفْوَ الفَضْلُ 'আফ্‌ও' অর্থ অতিরিক্ত, বাড়তি। এই আয়াতে তাই বলা হয়েছে, ব্যক্তির নিজের পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয় করার পর যা অতিরিক্তি ও বাড়তি হবে, তা-ই ব্যয় করতে হবে। এই তাৎপর্যই পাওয়া গেছে রাসূলে করীম (স)-এর কথা থেকেও। তিনি বলেছেন ঃ

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى -

সর্বোত্তম দান হচ্ছে যা সাচ্ছন্দ্য-সচ্ছলতা থেকে করা হবে।

অপর হাদীসের শব্দ হল ঃ

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا أَبْقَتْ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ -

সর্বোত্তম দান হল যা সাচ্ছন্দ্যকে অবশিষ্ট রাখে এবং শুরু কর তোমার পরিবার বর্গ থেকে যাদের জন্যে ব্যয় করা তোমার দায়িত্ব।

এই কথা কুরআনের ঃ 'লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কি ব্যয় করবে ? বল আল-আফ্‌ও' কথাটির সাথে সামঞ্জস্যশীল। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহের ব্যয় শুরু করার ব্যাপারে নিকটবর্তিতার উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমে ব্যয় করতে হবে তার জন্যে যে অন্যদের তুলনায় বেশি নিকটবর্তী, তার পরে যে বেশি নিকটবর্তী। একটি হাদীস ইবনে মাসউদ (রা) কর্তৃক নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ اُمُّكَ وَاَبُوْكَ وَاُخْتُكَ وَاَخُوْكَ وَاَدْنَاكَ فَاَدْنَاكَ -

উপরের (দাতার) হাত নিচের (গ্রহিতার) হাতের তুলনায় অধিক উত্তম। তুমি ব্যয় শুরু কর

তোমার পরিবারবর্গ থেকে। যেমন তোমার মা, তোমার পিতা, তোমার বোন, তোমার ভাই। অতঃপর প্রথম নিকটবর্তী, তার পরে অধিক নিকটবর্তী থেকে।

সালাবাতা ইবনে জহদম ও তারিকও নবী করীম (স) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। সে বর্ণনাটি আয়াতের বক্তব্যকেই ব্যাখ্যা করেছে। আল্লাহ্‌র কথা ঃ বল তুমি যে ধন-সম্পদ ব্যয় করবে, তা পিতা-মাতা ও নিকটবর্তীদের জন্যে।' এর অর্থ বেশি নিকটবর্তীকে আগে দিতে হবে, তার পরে বেশি নিকটবর্তী যে হবে, তাকে দিতে হবে।

হাসান বসরী থেকে বর্ণনা এসেছে, যাকাত ও নফল দান সর্বত্রই আল্লাহ্‌র হুকুম বহাল রয়েছে। কোন হুকুমই মনসূখ হয়ে যায়নি। সুদ্দী বলেছেন, যাকাত ফরয হওয়ার পর নফল ব্যয় সংক্রান্ত আদেশসমূহ মনসূখ হয়ে গেছে। আবূ বকর বলেছেন, না, সাধারণভাবে ফরয ও নফল ব্যয় সংক্রান্ত সব হুকুমই বহাল আছে। ফরয ব্যয় অর্থাৎ যাকাত দানের ব্যাপার পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি নিম্ন পর্যন্ত-এর জন্যে উল্লেখ করা হয়নি। তবে নফল ব্যয় সকলেরই জন্যে সাধারণ। যাকাত ফরয থাকা অবস্থায় আমরা যখন দুটিকেই ব্যবহার করতে পারব, তখন কোনটির হুকুম মনসূখ হয়েছে বলা সহীহ্ হতে পারে না। সমস্ত আয়াতের ব্যাপারে এই কথা। সেই সমস্ত আয়াতকে এক সাথে কাজে লাগানো সম্ভব হলে— কোনটিকে মনসূখ মনে না করেই— আমাদের তা-ই করতে হবে এবং কোনটিকে মনসূখ বলে হুকুম লাগানো জায়েয হবে না। পিতা-মাতা ও নিকটবর্তী লোক যদি অভাবগ্রস্ত হয় তাহলে তাদের জন্যে ব্যয় করার কথা বলাই উদ্দেশ্য। আর তা সম্ভব যদি ব্যক্তি সচ্ছল ও ধনশালী হয়। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'বল ঃ আল-আফ্‌ও' বলছে যে, তাদের জন্যে ব্যয় করা ফরয হবে যা প্রয়োজনাতিরিক্ত থাকবে, তা থেকে। সে নিজেই যদি দরিদ্র বা অভাবগ্রস্ত হয়ে থাকে, তার উপার্জন থেকে যদি কিছুই না বাঁচে তাহলে ব্যয় করা তার জন্যে ফরয নয়।

আয়াতটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে। একটি এই যে, কম বা বেশী ব্যয় আল্লাহ্‌র নিকট থেকে সওয়াব পাওয়ার অধিকার জন্যে— যদি সে ব্যয় দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভই লক্ষ্য হবে। তাতে নফল সাদকা ও ফরযসমূহ শামিল রয়েছে। দ্বিতীয়, আল্লাহ্‌র কথা থেকেই প্রথমে অধিক নিকটবর্তী, তার পরের অধিক নিকটবর্তী— এই অনুসরণ করাই উত্তম। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'পিতা-মাতার জন্যে এবং নিকটবর্তীদের জন্যে' থেকে জানা যায়। নবী করীম (স) আল্লাহ্‌র বক্তব্যকে নিজ ভাষায় ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন ঃ

اِبْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ اُمَّكَ وَاَبَاكَ وَاُخْتَكَ وَاَخَاكَ وَاَدْنَاكَ فَاَدْنَاكَ -

ব্যয় করা শুরু কর তোমার পরিবারবর্গ— তোমার মা, তোমার বাপ, তোমার বোন, তোমার ভাই, তোমার নিকটবর্তী, তার পরে তোমার নিকটবর্তী থেকে।

আর এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, পিতা-মাতা ও নিকটবর্তীদের জন্যে ব্যয় করা ফরয।

যদি প্রশ্ন করা হয়, তাহলে তো মিসকীন, নিঃস্ব পথিক ও আয়াতে উল্লিখিত সব লোকের জন্যে ব্যয় করাই কি বাধ্যতামূলক?

জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, আয়াতের বাহ্যিক অর্থে তা-ই বোঝায়। তবে তাদের মধ্য থেকে কতককে আমরা বিশেষীকৃত করে নিয়েছি নিকটবর্তীদের মধ্যে যাদের জন্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ব্যয় করা জরুরী। তার প্রমাণ হচ্ছে, তারা যাকাত ও নফল ব্যয়ের মধ্যে শামিল।

আবদুল বাকী ইবনে কানে,মায়ায ইবনুল মুসান্না, মুহাম্মদ ইবনে বকর, সুফিয়ান, মুজাহিম ইবনে জুফর, মুজাহিদ, আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ

دِيْنَارٌ اَعْطَيْتَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَدِيْنَارٌ اَعْطَيْتَهُ مِسْكِيْنًا، وَدِيْنَارٌ اَعْطَيْتَهُ فِيْ رَقَبَةٍ، وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ عَلٰى اَهْلِكَ، فَاِنَّ الدِّيْنَارَ الَّذِيْ اَنْفَقْتَهُ عَلٰى اَهْلِكَ اَعْظَمُهَا اَجْرًا -

একটি দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) তুমি আল্লাহ্র পথে দিলে, একটি দীনার তুমি মিসকীনকে দিলে, একটি দীনার তুমি দাসমুক্তিতে ব্যয় করলে, একটি দীনার তুমি তোমার পরিবারবর্গের জন্যে ব্যয় করলে। জেনে রাখবে, এর মধ্যে যে দীনারটি তুমি তোমার পরিবারবর্গের জন্যে ব্যয় করলে, সুফল প্রাপ্তির দিক দিয়ে সব কয়টির তুলনায় সেটিই অনেক বড়।

এই হাদীসটি নবী করীম (স) থেকে 'মরফূ' অর্থাৎ স্বয়ং তাঁর কথা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। সেটির সনদ আবদুল বাকী, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া আল মেরওয়াজী, আসিম ইবনে আলী, আল মাসউদ, মুজাহিম ইবনে জুফর, মুজাহিদ, আবূ হুরায়রা নবী করীম (স) থেকে।

আবদুল বাকী মুয়ায ইবনুল মুসান্না, মুহাম্মদ ইবনে কাসীর, শুবা, আদী ইবনে সাবিত, আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ, ইবনে মাসউদ নবী করীম (স) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّ الْمُسْلِمَ اِذَا اَنْفَقَ نَفَقَةً عَلٰى اَهْلِه كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً -

মুসলিম ব্যক্তি যখন তার পরিবারবর্গের জন্যে ব্যয় করে, তখন তা তার দিক দিয়ে সাদকা হয়ে যায়।

এইসব হাদীস-ই আল্লাহ্র 'প্রশ্ন করে কি ব্যয় করবে বল ঃ 'আল-আফ্‌ও' কথার সাথে সামস্যশীল হয়ে যায়।

এর তাৎপর্য পর্যায়ে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। ইবনে আব্বাস কাতাদাতা আল ফযল, আল-গনী আল-হাসান, আতা আল অসত উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ তা অপব্যয় ও বাড়াবাড়ি খরচ থেকে মুক্ত হতে হবে। মুহাজিদ বলেছেন, উক্ত কথা দ্বারা ফরয সাদকার কথা বলা হয়েছে।

আবূ বকর বলেছেন, 'আল-আফ্‌ও' বলতে যখন বোঝায় যা অতিরিক্ত তা, তখন তার অর্থ ফরয যাকাত-ও হতে পারে। কেননা যাকাত ফরয হয় প্রয়োজন পরিমাণের বাড়তির উপর । তা দেয়ার পর-ও স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত থাকে। সমস্ত ফরয ওয়াজিব সাদকাও ঠিক এই রূপই। নফল সাদকাও তার অর্থ হতে পারে। ফলে নিজের জন্যে ব্যয়, পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয়, নিকটবর্তী তার পরের নিকটবর্তীর জন্যে ব্যয়— এই সবই এর মধ্যে শামিল। এর পরও যা অবশিষ্ট থাকবে, তা আত্মীয়দের জন্যে ব্যয় করতে হবে। ফকীর-দরিদ্রদের জন্যে সাদকায়ে ফিত্র ও অন্যান্য সব সাদকা ফরয নয়, এ কথার দলীল হিসেবে বলা হয়, আল্লাহ্ তো আমাদেরকে 'আল-আফ্‌ও' থেকে ব্যয় করতে আদেশ করেছেন, যা সাচ্ছন্দ্যের অতিরিক্ত হবে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ -

তোমাদের জন্যে যুদ্ধ করা ফরয করা হয়েছে অথচ তা তোমাদের নিকট অসহ্য।

এই কথাটি যুদ্ধ করা ফরয করে দিয়েছে। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমাদের প্রতি লিখে দেয়া হয়েছে'-এর অর্থ ফরয করা হয়েছে। যেমন 'তোমাদের প্রতি সিয়াম লিখে দেয়া হয়েছে' কথাটির অর্থ সিয়াম ফরয করা হয়েছে। পরন্তু আয়াতে বলা 'যুদ্ধ' হয় সেই যুদ্ধ বোঝাচ্ছে যার কথা সকলেরই মনে রয়েছে। অথচ মনের গহনে নিহিত সে যুদ্ধ বোঝাবে না। কেননা শব্দের উপর 'আলিফ' ও 'লাম' কখনও জাতীয় জিনিস বোঝায়, কখনও মনের মধ্যে থাকা জিনিস বোঝায়। লোকেরা যে যুদ্ধ জানে ও চিনে তা-ই যদি বোঝানো হয়ে থাকে, তাহলে কথার তাৎপর্য সেদিকে হবে। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً -

তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর সর্বাত্মকভাবে, যেমন করে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সর্বাত্মকভাবে। (সূরা তওবা ঃ ৩৬)

আর তার কথা ঃ

وَلَا تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قَاتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ -

তোমরা ওদের বিরুদ্ধে মসজিদে হারামের নিকট যুদ্ধ করবে না, যতক্ষণ তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সেখানে যুদ্ধ না করছে। তারা যদি সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তাহলে তোমরা তাদেরকে হত্যা কর। (সূরা বাকারা ঃ ১৯১)

অর্থ যদি তা-ই হয়, তাহলে তাতে একটি বিশেষ পরিচিতির যুদ্ধ করার আদেশ করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে, তারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করলে আমরাও তাদের সাথে যুদ্ধ করব। এরূপ অবস্থায় কথাটি মনে রক্ষিত বিষয় সম্পর্কিত হয়ে যায়। তা বারবার বলা হয়েছে বলে তার হুকুমটা জানা গেছে তাগিদ সহকারে। আর মনে রক্ষিত সেই যুদ্ধ না বোঝালে তা নিঃসন্দেহে অস্পষ্ট কথা, যার ব্যাখ্যা একান্ত প্রয়োজন। তা নাযিল হওয়ার সময়কার অবস্থা জানা আছে, আল্লাহ আমাদেরকে সমস্ত মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ করেন নি। তাই এই আদেশটিকে সাধারণ অর্থে গ্রহণ করা যাবে না। আর যে আদেশকে সাধারণ অর্থে গ্রহণ করা যাবে না, তা-ই অস্পষ্ট, তার ব্যাখ্যা আবশ্যক। তাই জিহাদ ফরয পর্যায়ে মনীষিগণের বিভিন্ন বক্তব্য আমরা পরবর্তীতে উল্লেখ করব।

আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ -

তোমরা মুশরিকদের হত্যা কর যেখানেই (যে অবস্থায়ই) তোমরা তাদেরকে পাবে।

(সূরা তওবা ঃ ৫)

এই আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা সে আলোচনা পেশ করব।

আল্লাহ্‌র কথা وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ 'অথচ তা তোমাদের জন্যে অসহনীয়।' এর অর্থ, ঘৃণ্য, অপছন্দনীয় তোমাদের নিকট। এতে 'মসদার'কে 'মফউল'-এর স্থানে দাঁড় করা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٌ فِيْهِ - قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌبِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ -

তোমাকে লোকেরা হারাম মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, এ মাসে যুদ্ধ করা বড় ব্যাপার। তাতে আল্লাহ্‌র পথে চলাকে বাধাগ্রস্ত করা হয় এবং আল্লাহ্‌র প্রতি কুফর করা হয় এবং মসজিদের হারাম .....।

এ আয়াত হারাম মাসে যুদ্ধকে হারাম করে দিয়েছে। এ-আয়াতটিও সেই কথাই বলে ঃ

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ -

হারাম মাসের বদলে হারাম মাস। আর হুরমাতসমূহ সমান-সমান। (সূরা বাকারা ঃ ১৯৪)

এবং আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ -

মাসসমূহের সংখ্যা আসমান-জমিন সৃষ্টির দিনই নির্দিষ্ট হয়েছে বারো, তন্মধ্য থেকে চারটি হারাম মাস। এটি সুদৃঢ় দ্বীনি বিধান। অতএব তোমরা এই মাস কয়টিতে নিজেদের উপর জুলুম করো না। (সূরা তওবা ঃ ৩৬)

জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ওয়াসেতী, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল ইয়ামান, আবূ উবায়দ, হাজ্জাজ, লাইস ইবনে সা'দ, আবূ যুবায়র, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, রাসূলে করীম (স) হারাম মাসে যুদ্ধ করতেন না। তবে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করা হলে আবশ্যই করতেন। তা যখন সম্মুখে আসত, তিনি যুদ্ধ করতেন যতক্ষণ না শেষ হয়ে যায়।

যুদ্ধ মনসূখ হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। কিছু লোক বলেছেন, তা মনসূখ হয়নি, তার হুকুম বহাল রয়েছে। আতা ইবনে রিবাহ এই মত দিয়েছেন। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আবূ উবায়দ হাজ্জাজ ইবনে জুরাইজ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি আতাকে বললাম, ওদের কি হয়েছে ? হারাম মাসে যুদ্ধ করা তো ওদের জন্যে জায়েয ছিল না কিন্তু তা সত্ত্বেও হারাম মাস শুরু হওয়ার পর-ও তারা যুদ্ধ করছে ? বললেন, পরে তিনি হলফ করে বললেন, 'হ্যাঁ, হারাম শরীফে লোকদের যুদ্ধ করা হালাল কখনই নয়, হারাম মাসেও নয়। কিন্তু ওদের বিরুদ্ধেই যদি যুদ্ধ শুরু করা হয়, তাহলে তারা অবশ্যই যুদ্ধ করবে।' বললেন, যুদ্ধের হুকুম মনসূখ হয়নি, আয়াতও নয়।

সুলায়মান ইবনে ইয়াসার ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব বর্ণনা করেছেন, হারাম মাসেও যুদ্ধ করা জায়েয। বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদদেরও এই মত। প্রথমটি মনসূখ এই আয়াত দ্বারা ঃ

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ -

মুশরিকদের হত্যা কর তাদের যেখানেই তোমরা পাবে। (সূরা তওবা ঃ ৫)

এই আয়াত দ্বারাও ঃ

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ -

তোমরা সেই লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার নয়। (সূরা তওবা ঃ ২৯)

কেননা এদুটি আয়াত হারাম মাসে যুদ্ধ নিষিদ্ধকারী আয়াতের পরে নাযিল হয়েছে। এই বিষয়ে যারা প্রশ্ন করেছে, তারা কারা, এ পর্যায়ে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। আল-হাসান প্রমুখ বলেছেন, কাফিররাই রাসূল (স)-কে এই বিষয়ে প্রশ্ন করেছিল। মুসলমানরা হারাম মাসে যুদ্ধ করা হালাল করে নিয়েছে, এই দোষ ধরেই তারা তাঁকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিল। অন্যরা বলেছেন, মুসলমানরাই এই প্রশ্ন করেছিল। এই হুকুমটা কিভাবে দেয়া হল তা জানা ও বোঝার উদ্দেশ্যে। এ-ও বলা হয়েছে যে, তা একটি কারণের ভিত্তিতে নাযিল হয়েছিল। আর সে কারণ ছিল ওয়াকিদ ইবনে আবদুল্লাহ, আমর ইবনুল হাজরমীকে মুশরিক থাকা অবস্থায় হত্যা করা হয়েছিল। তখন কাফিররা চিৎকার করে বলেছিল, মুহাম্মাদ (স) হারাম মাসে হত্যাকাণ্ড ঘটানোকে হালাল করে নিয়েছে। অথচ জাহিলিয়াতের লোকেরা এসব মাসে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ বলে বিশ্বাস করত। তাই আল্লাহ তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, হারাম মাসে যুদ্ধ তখনও নিষিদ্ধ আছে। তবে মুশরিকরা কুফর-এর উপর অবিচল থেকেও হারাম মাসে যুদ্ধ বা রক্তপাতকে ভয়ানক কাজ মনে করে পারস্পরিক বৈপরীত্যের নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ কুফর হচ্ছে সবচেয়ে বড় হারাম। মসজিদে হারাম থেকে মুসলমানদের বহিষ্কারকরণও বড় গুনাহ। ওরা তো মুমিন, তাই মসজিদে হারামে যাওয়ার অধিকারী কাফিরদের অপেক্ষা ওরাই বেশি। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ -

আল্লাহ্র ও পরকালের প্রতি ঈমানদাররাই আল্লাহ্র মসজিদসমূহ আবাদ করে।

(সূরা তওবা ঃ ১৮)

আল্লাহ্ তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্র প্রতি কুফর এবং মসজিদে হারামের অসম্মান— আল্লাহ্ তো মসজিদ বানিয়েছেন সেখানে মুমিনরা কেবল আল্লাহ্রই ইবাদত করবে এই জন্যে; কিন্তু ওরা সে মসজিদে হারামকে মূর্তি দিয়ে ভর্তি করে দিয়েছে এবং মুসলমানদেরকে সেখানে যেতে বাধা দিচ্ছে। এই আচরণ মসজিদে হারামের প্রতি কুফরের ব্যবহার এবং মুমিনদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কৃতকরণও তাই। কেননা তারা কাফিরদের অপেক্ষা সেখানে যাওয়ার বেশি অধিকারী। আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন যে, কাফিররা এত সব অপরাধ করেও মুসলমানদের দোষ ধরে একজন মুশরিককে হারাম মাসে হত্যা করার জন্যে, এ তো বড়ই হাস্যকর ব্যাপার।

## মদ হারাম

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرُ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا -

লোকেরা তোমাকে মদ্য ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলে দাও, ও দুটিতে বড় গুনাহ, অবশ্য লোকদের জন্যে বিপুল ফায়দাও আছে। তবে ওদুটির ফায়দার তুলনায় ও দুটির গুনাহ অনেক বড়।

এ আয়াত মদ্য হারাম হওয়ার দাবি করে। তা হারাম ঘোষণার জন্যে অপর কোন আয়াত নাযিল না হলেও এটাই যথেষ্ট ছিল। নিষিদ্ধকরণের অপর কোন আয়াতের প্রয়োজন ছিল না। কেননা এতে বলা হয়েছে ঃ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ 'বল ও দুটিতে বড় গুনাহ্ রয়েছে।' সব গুনাহই তো হারাম। কেননা অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ -

বল, আমার রব্ব হারাম করেছে সব নির্লজ্জতা— প্রকাশমান বা গোপন এবং গুনাহ্।

এ আয়াত জানিছে দিয়েছে যে, الاِثْم বা গুনাহ সবই হারাম। শুধু সংবাদ জানিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, তা গুনাহ বলেই কথা শেষ করা হয়নি। বরং ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে তা অতি বড়। তার নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে এটা তাগিদ। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ 'লোকদের জন্যে বহু ফায়দা'— এতে বোঝায় না যে, মদ্য মুবাহ। কেননা ফায়দা বলতে বৈষয়িক ফায়দা বোঝানো হয়েছে। হ্যাঁ, সব হারাম জিনিসেই ফায়দা আছে বটে। এই জন্যেই তো মানুষ তা করে। ফায়দা না থাকলে তো কেউই করত না। তবে সে মুনাফা বা ফায়াদার মধ্যে যে ক্ষতি নিহিত রয়েছে, তা করলে যে কঠিন আযাব ভোগ করতে হবে অনিবার্যভাবে, তা তো সাংঘাতিক ব্যাপার। এ আয়াতে যে মুনাফার কথা রয়েছে, তাতে তা মুবাহ্, তা বোঝায় না। বরং এই ফায়দা বা মুনাফার কথা বলার পরও পরবর্তী কথা হিসেবে বলা হয়েছে ঃ 'সে দুটির গুনাহ সে দুটির ফায়দা ও মুনাফার তুলনায় অনেক বড়।' অর্থাৎ এ দুটি কাজের পরিণামে যে আযাব ভোগ করতে হবে, তা উপস্থিত ফায়দা ও মুনাফার তুলনায় অনেক ভয়াবহ। অতএব তা অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

মদ্য সম্পর্কে আরও একটি আয়াত নাযিল হয়েছে। তা এই ঃ

لَاتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ -

তোমরা নামাযের নিকটেও যেও না মদ্য পানে মাতাল হওয়া অবস্থায়। বরং এমন সুস্থভাবে যাবে যেন তোমরা কি বল তা জানতে পার। (সূরা নিসা ঃ ৪৩)

এ আয়াতে সরাসরিভাবে মাদক দ্রব্য হারাম বলা হয়নি। তবে প্রকারান্তরে তা-ই বলা হয়েছে। কেননা নামায তো ফরয এবং তা নির্দিষ্ট সময়ে পড়ার জন্যে আমরা আদিষ্ট। তাই

তার প্রতিবন্ধক যা হবে, তা অবশ্যই নিষিদ্ধ হবে। অতএব নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়া নিষিদ্ধ হলে নেশাগ্রস্ত হওয়া নিষিদ্ধ হবে অনিবার্যভাবে। মদ্য পান নামায তরক করার অবস্থার সৃষ্টি করে। অতএব তা নিষিদ্ধ। কেননা যে কাজ ফরয আদায়ের প্রতিবন্ধক, সে কাজ অবশ্যই নিষিদ্ধ হবে।

মদ্য নিষিদ্ধকরণ পর্যায়ে চূড়ান্ত আয়াত হচ্ছে আর একটি যার কোনরূপ বিপরীত ব্যাখ্যা দেয়া চলে না। তা হচ্ছে ঃ

اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ –

নিঃসন্দেহে মদ্য, জুয়া, বলিদানের স্থান এবং ভাগ্য জানার জন্যে তীর ব্যবহার শয়তানী কাজের নাপাকী। অতএব তোমরা তার প্রত্যেকটি পরিহার কর। (সূরা মায়িদা ঃ ৯০)

এ আয়াতের শেষ বাক্য হচ্ছে ঃ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ 'তাহলে তোমরা কি বিরত হবে ?'

এ আয়াতে মদ্য সম্পর্কে কয়েকটি দিক দিয়ে কথা বলা হয়েছে। একটি হচ্ছে, তা শয়তানী কাজের অপবিত্রতা। এরূপ কথা কেবলমাত্র হারাম ও নিষিদ্ধ জিনিস সম্পর্কেই বলা যেতে পারে। পরে এই কথাটিকে বলিষ্ট করা হয়েছে, 'অতএব তোমরা তা পরিহার কর' বলে। এ একটি কঠোর আদেশ, তার কারণে মদ্য অবশ্যই পরিহার করতে হবে। তার পরে প্রশ্নবোধক ভাষায় বলা হয়েছে ঃ 'তোমরা কি বিরত থাকবে ? এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা মদ্যপান থেকে বিরত থাক।

যদি প্রশ্ন তোলা হয়, 'ও দুটিতে বড় গুনাহ রয়েছে' কথাটিতে কম পরিমাণ হারাম হওয়ার দলীল নেই। কেননা আয়াতের কথার আলোকে বলা যায়, নেশাগ্রস্ততা, নামায তরক হওয়া, পারস্পরিক উত্তেজনা ও মারামারি ইত্যাদিই গুনাহ্। এগুলোতে গুনাহ্ হলে আয়াতের বাহ্যিক অর্থে বেশি পরিমাণই হারাম হতে পারে। কিন্তু কম পরিমাণ পান করলে তা হয় না বলে তা হারামও না হওয়া উচিত ?

জবাবে বলা যাবে, 'ও দুটিতে বড় গুনাহ' কথাটিতে একটি ইঙ্গিত উহ্য আছে। আর তা হচ্ছে, তা পান করা। কেননা মদ্য জিনিসটি তো আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, তাতে গুনাহ্ নেই। গুনাহ্ হবে আমাদের কাজের দরুন। 'পান' যখন উহ্য, তাহলে তার অর্থ হবে, তা পান করা গুনাহ্। আর জুয়া খেলার কাজটাও বড় গুনাহ্। তাহলে তাকে কম পরিমাণ পানও গুনাহের আওতায় পড়ে যেমন পড়ে তার বেশি পরিমাণ পান করা। 'মদ্য হারাম' এ কথার অর্থ মদ্য পান হারাম। তার দ্বারা উপকৃত হওয়া নিষিদ্ধ। অতএব এতেই প্রমাণিত হয় যে, তার কম ও বেশী উভয় পরিমাণই হারাম।

এই পর্যায়ে বর্ণিত হাদীস জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াসেতী কর্তৃক বর্ণিত। তাঁর সূত্র হচ্ছে, জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ইয়ামান, আবূ উবায়দ, আবদুল্লাহ ইবনে সালিহ, মুআবিয়াতা ইবনে সালিহ, আলী ইবনে আবূ তালহা, ইবনে আব্বাস। হাদীসটি, 'লোকেরা তোমাকে মদ্য ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, ও দুটিতে বড় গুনাহ রয়েছে' এই আয়াত সম্পর্কে। বলেছেন الميسر। অর্থ জুয়া। জাহিলিয়াতের যুগের ব্যক্তি মদ্যপান করে তার পরিবারবর্গ ও ধন-মালের জন্যে বিপদ টেনে আনত।

আল্লাহ্র কথা ঃ

لَاتَقْبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ -

তোমরা নামাযের নিকটেও যাবে না নেশাগ্রস্ত অবস্থায়, যতক্ষণ না তোমরা কি বলছ, তা জানবে। (সূরা নিসা ঃ ৪৩)

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর নামাযের সময় কাছাকাছি থাকলে লোকেরা মদ্যপান করত না। এশার নামায হয়ে গেলে তখন পান করত। এই সময় কিছু সংখ্যক মুসলমান মদ্যপান করে পরস্পর রক্তারক্তি করল এবং পরস্পরে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টিমূলক কথাবার্তা বলল। তখন শেষ পর্যায়ে নাযিল হল ঃ

মদ্য, জুয়া, বলিদানের স্থান ও ভাগ্য জানার জন্যে তীরের ব্যবহার শয়তানী কাজের অপবিত্রতা। অতএব তোমরা তা পরিহার কর।

'মায়সির' অর্থ জুয়া, الانصاب অর্থ মূর্তি দেবতা ও তাদের উদ্দেশ্যে পশু বলিদানের স্থান। আর الازلام অর্থ তীর, তার সাহায্যে তারা ভাগ্য জানতে চেষ্টা করত।

বলেছেন, আবূ উবায়দ আবদুর রহমান ইবনে মাহদী, সুফিয়ান, আবূ ইসহাক, আবূ মাইসারাতা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ اللهم بين لنا فى الخمر 'হে আমাদের আল্লাহ! মদ্য সম্পর্কে আমাদেরকে স্পষ্ট কথা জানিয়ে দাও।' তখন নাযিল হল ঃ 'নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের নিকটেও যাবে না .....' তার পরে তিনি আবার বললেন ঃ 'হে আল্লাহ্! মদ্য সম্পর্কে আমাদেরকে আরও স্পষ্ট কথা বলে দাও।' তখন নাযিল হল 'বল, ও দুটিতে বড় গুনাহ্ রয়েছে এবং জনগণের জন্যে কিছু ফায়দাও। তবে সে দুটির ফায়দার তুলনায় সে দুটির গুনাহ্ অনেক বড়।' তখন আবার দো'আ করে আরও স্পষ্ট কথা বলার দাবি জানালেন। তখন নাযিল হল ঃ

মদ্য, জুয়া, বলিদানের স্থান ও ভাগ্য জানার জন্যে তীর ব্যবহার শয়তানী কাজের অপবিত্রতা। অতএব তোমরা এর প্রত্যেকটি পরিহার কর।

আর শেষে নাযিল হল ঃ 'তাহলে তোমরা কি তা থেকে বিরত থাকবে?' তখন হযরত উমর (রা) বললেন ঃ

اِنْتَهَيْنَا اِنَّهَا تُذْهِبُ الْمَالَ وَتُذْهِبُ الْعَقْلَ -

হ্যাঁ আমরা বিরত থাকলাম। মদ্য তো যেমন ধন-মাল বিনষ্ট করে, তেমনি জ্ঞান-বুদ্ধিকেও বিলুপ্ত করে।

বলেছেন, আবূ উবায়দ হুসাইম, মুগীরা, আবূ রুজাইন সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, সূরা আল বাকারার আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর এবং সূরা আন-নিসার আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর আমি মদ্যপান করলাম, অন্যান্য লোক-ও নামাযের সময় হওয়ার আগে মদ্যপান করত। নামায উপস্থিত হলেই তা ত্যাগ করত। পরে সূরা আল-মায়িদার আয়াত নাযিল হয়, যাতে প্রশ্ন করা হয়; 'তোমরা কি বিরত হবে? তখন লোকেরা তা থেকে বিরত হয়। পরে তারা আর কখনই তা পান করেনি।

কোন কোন লোক মনে করে ঃ 'বল, তাতে বড় গুনাহ্‌, লোকদের বহু ফায়াদও আছে' কথাটি দ্বারা মদ্য পান পূর্ণমাত্রায় হারাম করা হয়নি। কেননা যদি তদ্দ্বারা হারাম-ই করা হতো, তাহলে লোকদেরকে এর পর-ও তা পান করার সুযোগ নবী করীম (স) দিতেন না। হযরত উমর (রা)-ও বারবার আল্লাহ্‌র নিকট এ প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট কথা জানবার জন্যে প্রার্থনা করতেন না। কিন্তু আমাদের মতে ব্যাপার তা নয়। কেননা আল্লাহ্‌র 'লোকদের জন্যে মুনাফা' কথাটি থেকে তা মুবাহ মনে করেছে, সে ফায়দা গ্রহণ নিষিদ্ধ নয় মনে করেছে। কেননা গুনাহ তো হয় বিশেষ একটা অবস্থায়, অন্য সময় হয় না। তারা একটা ব্যাখ্যা দিয়ে আয়াতের মূল বক্তব্যকে পাশ কাটাতে চেয়েছে, 'হারাম করা হলে অতঃপর তা পান করার সুযোগ নবী করীম (স) দিতেন না' বলা হাদীসের ভিত্তিতে সহীহ নয়। কেননা নবী করীম (স) মদ্যপান সম্পর্কে জানতেন এবং তা জানার পর লোকদেরকে তা করতে দিয়েছেন, তা প্রমাণিত নয়। হযরত উমর (রা) মদ্য সম্পর্কে ঘোষণা পাওয়ার জন্যে দো'আ করেছিলেন এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পরও। কেননা প্রাথমিক দুটি আয়াতে ভিন্নতর ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব ছিল ও সুযোগ ছিল। যদিও তাতে হারাম হওয়ার দিকটি কম স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ঘোষণা চেয়েছিলেন এজন্যে যে, অতঃপর যেন ভিন্ন রকমের ব্যাখ্যা দেয়ার কোন অবকাশ না থাকে। তাই তখন আল্লাহ্‌ শেষ আয়াতটি নাযিল করেন, যাতে বলা হয়েছে ঃ 'মদ্য ও জুয়া শয়তানী কাজের অপবিত্রতা ....।

মদ্যপান ইসলামের প্রাথমিক কালে নিষিদ্ধ হয় নি, তখন তা মুবাহ ছিল, মুসলমানরা মদীনায়ও তা পান করতেন, তা ক্রয়-বিক্রয় করতেন, নবী করীম (স) তা জানতেন, তিনি বাধা দেন নি, চলতে দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তা হারাম হয়ে যায়। তাই লোকেরা বলছেন যে, তা নিরংকুশভাবে হারাম হয়ে গেছে এই সর্বশেষে নাযিল হওয়া আয়াত দ্বারাও বলা হয়েছে ঃ 'মদ্য, জুয়া, বলিদানের স্থান ও তীর বানিয়ে ভাগ্য জানা— এসবই শয়তানী কাজের অপবিত্রতা, অতএব তা পরিহার কর।' শেষে প্রশ্ন তোলা হয়েছে ঃ 'তোমরা কি বিরত হবে ?' অবশ্য তার পূর্বেও কোন কোন অবস্থায় তা হারাম ছিল। সে অবস্থা হয়েছে নামাযের সময়। 'নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছেও যেও না' বলে নিষেধ করা হয়েছিল। তার কোন মুনাফা বা ফায়দা গ্রহণ তখন মুবাহ ছিল, আর কোন কোনটি নিষিদ্ধ ছিল। যেমন আয়াতে বলা হয়েছে; 'বল, তাতে বড় গুনাহ্‌ এবং লোকদের কিছু ফায়দাও আছে,' আর সবশেষে 'অতএব তা পরিহার কর' বলে চূড়ান্তভাবে হারাম করা হয়েছে। 'তোমরা কি বিরত থাকবে' কথাটিও এই পর্যায়ের।

প্রসঙ্গত আয়াতসমূহের মধ্যে প্রত্যেকটির বাহ্যিক হুকুমের ব্যাখ্যা আমরা ইতিপূর্বে দিয়েছি।

অবশ্য প্রশ্ন উঠেছে, পানীয়সমূহের মধ্যে 'খামর' বা মদ্য কোনটাকে বলা হয় ? ফিকাহবিদদের মধ্যের বিরাট সংখ্যকের কথা হচ্ছে 'খামর' প্রকৃতপক্ষে আঙ্গুরের রস দিয়ে বানানো পানীয়কে বলা হয়। মদীনার লোকদের মধ্য থেকে অনেকে এবং ইমাম মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন ঃ

اِنْ كُلُّ مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ مِنَ الْاَشْرِبَةِ فَهُوَ خَمْرٌ -

যে পানীয়ের বেশী পরিমাণ নেশাগ্রস্ত করে, তা-ই 'খামর'।

'খামর' বিশেষভাবে আঙ্গুরের রস থেকে বানানো পানীয়ের নাম, অন্য কিছুকে 'খামর' বলা যায় না। অন্য কিছুকে 'খামর' বলা হলেও তা প্রকৃত নাম নয়, আরোপিত নাম। পরোক্ষভাবে তার সাথে সাদৃশ্য আছে বলেই তা বলা হয়। এই কথার দলীল হচ্ছে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেছেন, নবী করীম (স)-এর নিকট নেশাগ্রস্ত বা মাতাল এ

ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হয়। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি 'খামর' পান করেছ ? লোকটি বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল 'খামর' হারাম ঘোষণা করেছেন, সেই সময় থেকে আমি তা কখনই পান করিনি। জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে তুমি কি পান করেছ ? বলল, 'খালীতাইন' الخليطين পান করেছি। তখন নবী করীম (স) 'খালীতাইন' হারাম ঘোষণা করলেন।

বোঝা গেল, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি মাদক দ্রব্যটির নাম 'খামর' বললেন না। তা নবী করীম (স)-এর সামনেই ঘটল। নবী করীম (স) এই 'মাদকের' খামর-এর পরিবর্তে খালীতাইন' নামকরণকে অস্বীকার করলেন না। যদি আভিধানিক বা শরীয়াতের দিক দিয়ে তার নাম 'খামর' বলত, তাহলে নবী করীম (স) তা বহাল রাখতে দিতেন না। কেননা যে জিনিসের সাথে নিষেধ যুক্ত, সেই জিনিসের নাম বললে সে নিষেধটাও তার সাথে যুক্ত করা হতো। আর একথা তো জানা-ই যে, নবী করীম (স) কোন মুবাহ জিনিসকে নিষিদ্ধ বললে তা তিনি বহাল থাকতে দিতেন না। তেমনি নিষিদ্ধ জিনিসকে মুবাহ বললেও তার প্রতিবাদ অবশ্যই করতেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সব মাদক পানীয়কেই 'খামর' বলা যাবে না, তা শুধু আঙ্গুরের রস দিয়ে বানানো পানীয়কেই 'খামর' বলা যাবে। কেননা 'খালীতাইন' কে যখন 'খামর' বলা যায় না, যদিও তাতে পুরামাত্রায় মাদকতা বর্তমান। বোঝা যাচ্ছে 'খামর' নামটি কেবলমাত্র সেই আঙ্গুর রস দিয়ে বানানো পানীয়কেই বলা যাবে। একটি হাদীস থেকেও তা-ই প্রমাণিত হয়। হাদীসটি আবদুল বাকী ইবনে কানে' মুহাম্মাদ ইবনে যাকারিয়া আল-উলায়ী, আল-আব্বাস ইবনে বাক্কার, আবদুর রহমান ইবনে বশাইর, আল-আতফানী, আবূ ইসহাক, আল-হারিস আলী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলে করীম (স)-কে বিদায় হজ্জের বছর পানীয় দ্রব্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। জবাবে বললেন ঃ

حَرَامٌ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ -

আসল খামর তো হারাম। আর প্রত্যেক মাদকতাপূর্ণ পানীয়ও হারাম।

আবদুল বাকী মুহাম্মাদ ইবনে যাকারিয়া আল-উলায়ী, শুরাইব ইবনে ওয়াকিদ, কায়স, কতন-মুনযির, মুহাম্মাদ ইবনুল হানফীয়া আলী (রা) সূত্রে নবী করীম (স) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবদুল বাকী হুসায়ন ইবনে ইসহাক, আইয়াস ইবনুল ওয়ালীদ, আলী ইবনে আব্বাস,' সাঈদ ইবনে আম্মার, আল-হারিস ইবনুন নু'মান সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে রাসূলে করীম (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ

اَلْخَمْرُ بِعَيْنِهَا حَرَامٌ وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ -

আসল 'খামর' হারাম। আর প্রত্যেক মাদক পানীয়ও হারাম।

আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও অনুরূপ কথার বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে 'মরফূ' হিসেবেও বর্ণনা এসেছে।

এই হাদীসের কয়েকটি তাৎপর্য রয়েছে। একটি, 'খামর' নামটি প্রকৃত মদের জন্যে নির্দিষ্ট, অন্য কোন মাদক পানীয়কেও 'খামর' বলা যাবে না। এই নামকরণে কোন মতপার্থক্য নেই। এমনকি আঙ্গুরের অপর কোন রসকেও 'খামর' বলা যাবে না। অন্যান্য পানীয়কেও এই নামে অভিহিত করা চলবে না। কেননা পরের কথা হচ্ছে ঃ 'সব পানীয়ের মাদক'ও হারাম। এ থেকে বোঝা যায় যে, যে পানীয়ই মাদক, তা-ই হারাম। অন্যথায় 'খামর' ছাড়া আলাদা করে বলা

হতো না যে, সব পানীয়ের মাদক হারাম। হারাম দুটিই, তবু দুটির মধ্যে হারাম হওয়ার দিক দিয়ে পার্থক্য করা হয়েছে। এ-ও বোঝা যায় যে, 'খামর' হারামকরণের হুকুমটা তারই মধ্যে সীমিত। অপর কোন জিনিসে তা সংক্রামিত হবে না, কিয়াস করেও অন্য কোন মাদককে 'খামর' বলা যাবে না। তার ভিত্তিতে দলীলও দেয়া যেতে পারে না। কেননা হারাম হওয়ার হুকুমটা লটকানো হয়েছে আসল খামর-এর সাথে, অপর কোন মাদক পানীয়ের উপর নয়। এই কারণে তার উপর কিয়াস করে অপর কিছু পানীয়কে হারাম বলা যাবে না। কেননা প্রত্যেক আসল জিনিসের উপরই কিয়াস করা চলে। তাই যে জিনিসের উপর হুকুম প্রতিষ্ঠিত, সেই হুকুমটা তার পর্যন্তই সীমিত নয়। কেবল সেটাই হারাম, অন্যটা হারাম হতে পারে না, তা-ও নয়। বরং হুকুমটা তার কোন গুণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যে গুণটি অন্য কোন জিনিসের মধ্যে পাওয়া যায়। তাহলে হুকুমটা যেই গুণের অধীন, সেই গুণের সাথে চলবে। যেখানে সেই গুণ পাওয়া যাবে, হুকুমটা সেই জিনিসের উপরও প্রযোজ্য হতে পারবে। কেননা ইল্লাত সেখানেও রয়েছে, যার কারণে তা হারাম।

সব রকমের মাদক পানীয়কে 'খামর' নাম শামিল করে না। এর দলীল রাসূলে করীম (স)-এর কথা। আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে তাঁর কথা হচ্ছে ঃ

اَلْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ : النَّخْلَةُ وَالْعِنَبَةُ -

'খামর' খেজুর ও আঙ্গুর— এই দুইটি বৃক্ষ থেকে পাওয়া যায়।

তা থেকে বোঝা গেল, 'খামর' জাতীয় পর্যায়ের নাম, তার উপর আলিফ ও লাম রয়েছে বলে। ফলে এই নামে যা-ই বোঝাবে তার সবটিকেই তা শামিল করবে। তা হলে সর্বপ্রকারের পানীয়কেই এই নামে অভিহিত করা চলবে। তা সবই এর অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে। বোঝা গেল, এই দুইটি গাছ ছাড়া অন্যান্য গাছ থেকে যা বের হবে তার নাম 'খামর' হবে না। এই দুটি গাছ থেকে যা কিছু বের হয়, তা সব-ই কি 'খামর' নামে অভিহিত হবে কিংবা নয় ? সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, এ দুটি গাছ থেকে যা-ই বের হয় তার সব কিছুকেই 'খামর' নামে অভিহিত করা যায় না। কেননা নিংড়ানো রস, ঘন মিষ্ট রস دبس এবং ভিনেগার প্রভৃতি বহু কিছুই এ দুটি গাছ থেকে পাওয়া যায়; কিন্তু এর কোনটিকেই 'খামর' বলা হয় না। তাহলে বোঝা গেল, এসব ছাড়া আর যা এ দুটি গাছ থেকে পাওয়া যায়, তাকেই 'খামর' বলা হয়। কিন্তু অন্যান্যগুলোর উল্লেখ হাদীসে নেই। তাই আমরা দলীল হিসেবে এ দুটি গাছ থেকে পাওয়া এই পর্যায়ের জিনিসকে বিশেষ 'খামর' নামকরণ ধরে নিলাম। কাজেই এ দুটি গাছ থেকে যা বের হয়, তার সবকিছুকেই 'খামর' নাম রেখে হারাম মনে করার কোন দলীল পাওয়া যেতে পারে না। এ দুটি গাছ থেকে যা যা বের হয়, তার মধ্যে একটি হচ্ছে 'খামর'। অপর আয়াতে যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ -

ও দুটি থেকে মুক্তা ও মুঙ্গা বের হয়।

দুটির বক্তব্য অভিন্ন। হয় বক্তব্য এই হবে যে, ওদুটি বৃক্ষ থেকেই 'খামর' বের হয়, অথবা এর একটি থেকে বের হয়। যদি দুটি থেকেই 'খামর' বের হওয়া বক্তব্য হয়, তাহলে ব্যবহৃত শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, এ দুটি গাছ থেকে প্রথম যে পানীয় বের করা হয়, তা-ই 'খামর' নামে অবিহিত। কেননা একথা যখন জানা গেছে যে, 'ওদুটি বৃক্ষ থেকে'-এর অর্থ প্রত্যেকটি

কিছু কিছু অংশ' বোঝা যাবে না। কেননা তার কোন অংশের 'খামর' হওয়া সম্ভব নয়। বোঝা গেল, দুটি বৃক্ষ থেকে সর্বপ্রথম যে পানীয় বের হয় তা-ই বোঝাতে চাওয়া হয়েছে। কেননা আরবী من শব্দটি কয়েকটি অর্থ দেয়। কোনখানে অংশ বোঝায়, আর কোনখানে 'সূচনা' বোঝায়। যেমন বলা হয় ঃ আমি কূফা থেকে বের হয়েছি। অর্থাৎ কূফা থেকে আমার যাত্রা শুরু। বলা হয়, 'অমুকের নিকট থেকে আসা চিঠি'। অর্থাৎ চিঠির যাত্রা অমুক থেকে হয়েছে। এই ধরনের আরও অনেক ব্যবহার রয়েছে من-এর। এখানে من অর্থ সূচনা বা শুরু হওয়া। অর্থাৎ ও দুটি বৃক্ষ থেকে প্রথম যা বের হয় তাই। আর তাতে যে রস নিংড়ানো হয়, খেজুর গাছ থেকে যে গাঢ়-শুষ্ক জিনিস প্রবাহিত হয় তা। এই কারণে হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি কিরা করে বলল, সে এই খেজুর গাছ থেকে কিছু খাবে না, তার এই কথা প্রযোজ্য হবে তা কাঁচা খেজুর, শুষ্ক খেজুর تمر ও গাঢ় শুষ্ক প্রবহমান রস প্রভৃতির উপর। কেননা তারা শব্দটি من সূচনা অর্থে গ্রহণ করেছেন।

আবূ বকর বলেছেন, সর্বপ্রকারের পানীয়কে 'খামর' বলা যায় না। এই পর্যায়ে আমরা এ পর্যন্ত যা যা বলেছি, তার যথার্থতা একটি হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয়। হাদীসটি হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে এসেছে। তিনি বলেছেন ঃ

لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ يَوْمَ حُرِّمَتْ وَمَا بِالْمَدِيْنَةِ يَوْمَئِذٍ مِنْهَا شَيْءٌ -

যেদিন 'খামর' হারাম ঘোষিত হয়েছিল, সেদিন তার কোন জিনিস মদীনায় ছিল না।

ইবনে উমর (রা) একজন ভাষাবিদ ব্যক্তি। একথাও জানা যে, মদীনায় সেদিন যেমন মাদক দ্রব্য ছিল, তেমনি 'তামার' থেকে বানানো বহু প্রকারের 'নবীয' পানীয় ছিল। কেননা তা-ই ছিল তাদের পানীয়। এই কারণে জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) বলেছেন, 'খামর' হারাম ঘোষিত হল আর মানুষরা সে সময়ে যা পান করত (তা-ও হারাম ঘোষিত হল)। তবে কাঁচা খেজুর (Dates) ও 'তামার' হারাম ঘোষিত হয়নি। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেছেন, আমি আমার ফুফু (আনসার বংশের লোক)-কে পান করাচ্ছিলাম যখন 'খামর' হারাম ঘোষিত হল। তখনকার সময়ে লোকদের পানীয়র নাম ছিল 'আল-ফযীহ'। লোকেরা যখন হারাম হওয়ার ঘোষণা শুনতে পেল, তখন তারা সেইসবকে প্রবাহিত করে দিল।

ইবনে উমর (রা) যখন মদীনায় পানীয় হিসেবে প্রচলিত সর্ব প্রকারের পানীয় থেকে 'খামর' কে আলাদা করে চিহ্নিত করলেন, অন্য পানীয়কে 'খামর' বলা যায় না বলে জানালেন, বোঝা গেল, তাঁর মতে 'খামর' হচ্ছে আঙ্গুরের রস দিয়ে তৈরী পানীয়। তা ছাড়া অন্যান্য পানীয় এই নামে অভিহিত নয়। এ-ও বোঝা যায় যে, তদানীন্তন আরবরা 'খামর'কে سبيئة 'সাবিয়াতুন' বলত। 'তামার' খেজুর থেকে বানানো সকল প্রকারের পানীয়কেই তারা 'খামর' বলতো না। কেননা তা বিদেশ থেকে আমদানী করা হতো।

এই পর্যায়ে আমরা রাসূলে করীম (স)-এর হাদীস, সাহাবায়ে কিরামের কথা ও ভাষাভাষীদের ব্যবহার থেকে যা কিছু এখানে উল্লেখ করলাম, তা থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, 'খমর' একটা বিশেষ নাম, তা কেবল আঙ্গুরের রসকেই বোঝায়। অন্য পানীয় বোঝায় না। আমরা মদীনাবাসীদের অভ্যাস সম্পর্কেও জানতে পেরেছি যে, তারা সাধারণভাবে 'তামার' ও 'বাসার' (কাচাঁ খেজুর) থেকে গৃহীত পানীয় খেতেই অভ্যস্ত ছিল। আরও সাধারণ ব্যবহারে ছিল 'খামর'। বিশেষভাবে 'খামর'-এর ব্যাপারটি বিরল ছিল এই জন্যে যে, তা তাদের নিকট খুব বেশি ছিল না। সব সাহাবীই যখন বুঝতে পারলেন যে, তৈরী করা সব মাদকই হারাম,

তখন তা ছাড়া অন্যান্য পানীয়র ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন মত হয়ে যায়। হযরত উমর, আবদুল্লাহ, আবূ যর প্রমুখ বড় বড় সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, 'নবীয' পানও সাংঘাতিক ব্যাপার, তাবেয়ীন ও তাঁদের পরবর্তী সব মনীষী ও ফিকাহবিদগণ এসব পানীয়কে হারাম করা হয়েছে বলে জানতেন না। এগুলোকে তারা 'খামর' নামেও অভিহিত করতেন না। বরং এগুলোকে 'খামর' বলতে নিষেধ করতেন। এর দুটি তাৎপর্য হতে পারে। একটি এই যে, এসবকে 'খামর' নামে অভিহিত করা যায় না। 'খামর' শব্দ এগুলোকে শামিলও করে না। কেননা 'খামর' পানকারীর নিন্দা করতে তাঁরা সকলেই একমত। আর তার সবটাই হারাম ও নিষিদ্ধ। আর দ্বিতীয় এই যে, 'নবীয' হারাম নয়। কেননা তা যদি হারাম হতো, তাহলে সেকথা তাঁরা সকলেই জানতেন, যেমন 'খামর'-এর হারাম হওয়ার কথা তারা সকলেই জানেন। কেননা সেগুলোর হারাম হওয়ার কথা জানা 'খামর'-এর হারাম হওয়ার কথার তুলনায় অনেক বেশি প্রয়োজনীয় ছিল। কেননা সেগুলো সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল অন্য সবের তুলনায়। আর যে হুকুমটা সাধারণ প্রচলিত বিষয়ে, তার বর্ণনা 'মুতাওয়াতির' ভাবে হওয়া জরুরী, যেন নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয় ও সেই অনুযায়ী কাজ হয়।

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, 'খামর' হারাম হওয়ার দ্বারা এসবের হারাম হওয়ার কথা বোঝা যায় না। যাঁরা মনে করেন, যেসব পানীয় মাদক, তা সবই 'খামর', তাঁদের দলীল হচ্ছে ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীস। রাসূলে করীম (স) বলেছেন, كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ 'সব মাদকই খামর।' শাবী নুমান ইবনে বশীর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةِ اَشْيَاءَ : التَّمْرُ وَالْعِنَبُ وَالْحِنْطَةُ وَالشَّعِيْرِ وَالْعَسَلِ -

'খামর' পাঁচটি জিনিস থেকে তৈরী হয় ঃ তামার, শুকনা খেজুর, আঙ্গুর, যব, বার্লি ও মধু।

উমর (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। উমর (রা) থেকে এ বর্ণনাও এসেছে ঃ

اَلْخَمْرُ مَاخَمَرَ الْعَقْلَ যে জিনিস বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে তা-ই 'খামর'।

তায়ূস ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ كُلُّ مُخَمِّرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ সব মাদক-ই খামর। আর সব মাদকই হারাম। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, বলেছেন, আমি লোকদেরকে আবূ তালহার ঘরে খামর পান করাচ্ছিলাম, যখন তা হারাম ঘোষিত হল। আর এই সময়ে আমাদের খামর ছিল শুধু আল-ফযীহ। লোকেরা যখন 'খামর' হারাম হওয়ার ঘোষণা শুনতে পেলেন, পাত্রসমূহ থেকে পানীয় ঢেলে ফেলে দিলেন, প্রবাহিত করলেন এবং পাত্রসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেললেন। তাঁরা বললেন, নবী করীম (স) এ সব পানীয়কে 'খামর' নাম দিয়েছেন। উমর ও আনাস (রা)-ও তাই করেছেন। আনসারগণ 'খামর' হারাম করে দেয়ায় বুঝেছেন 'আল-ফযীহও' হারাম করা হয়েছে। তা হচ্ছে কাঁচা খেজুরের তরল পদার্থ। এই কারণে তাঁরা তা প্রবাহিত করে দেন। পাত্রসমূহও ভেঙ্গে ফেলেন। এই নামকরণ অভিধানের দিক দিয়ে এ সব পানীয় সম্পর্কে সঠিক প্রয়োগ হবে, না হয় হবে শরীয়াতের দৃষ্টিতে। দুটির যেটিই হোক, তার দলীলের অকাট্যতা প্রমাণিত নাম করণও সঠিক ও যথার্থ। এ থেকে প্রমাণিত হল, যে পানীয়র বেশি পরিমাণ মাদক, তা-ই 'খামর' এবং তা-ই হারাম। আল্লাহ নিজেই স্পষ্ট শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে এই হারামের কথা ঘোষণা করেছেন।

এ সব কথার জবাব এই যে, নামসমূহ দুই প্রকারের। এক প্রকারের নাম যা একটি

জিনিসের জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেই জিনিসের নিগূঢ় তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে। তার তাৎপর্যের প্রকাশ। আর দ্বিতীয় হচ্ছে পারোক্ষভাবে রাখা। প্রথম প্রকারের নাম যথাযথভাবে ব্যবহৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর দ্বিতীয় প্রকার ব্যবহৃত হবে যখন তা বোঝাবার প্রমাণ উপস্থিত থাকবে। প্রথম প্রকার নামের দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঃ

وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوَاتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا -

আল্লাহ্ চাহেন তোমাদের প্রতি তিনি 'তওবা' করবেন এবং যারা নফসের খাহিশ অনুসরণ করে তারা চায় তোমরা পুরামাত্রায় (ইসলামের বিপরীত দিকে) ঝুঁকে পড়বে।

(সূরা নিসা ঃ ২৭)

এ আয়াতে 'ইরাদা' প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর দ্বিতীয় প্রকারের নামের দৃষ্টান্ত হচ্ছে আল্লাহ্র কথা ঃ

فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ -

তারা দুইজন সেখানে একটা প্রাচীর দেখতে পেল, যা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। (সূরা কাহাফ ঃ ৭৭)

এ আয়াতে 'ইচ্ছা' বা 'ইরাদা' শব্দটির প্রকৃত ব্যবহার হয়নি, হয়েছে পরোক্ষ ব্যবহার। আর اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ 'খামর' ও জুয়া— এখানে 'খামর' শব্দের ব্যবহার প্রকৃত অর্থে— অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِنِّىْ اَرَانِىْ اَعْصِرُ خَمْرًا -

আমি আমাকে স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি 'খামর' নিংড়াচ্ছি। (সূরা ইউসূফ ঃ ৩৬)

এ আয়াতে 'খামর' নামটি পরোক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা আঙ্গুর নিংড়ানো হয়, 'খামর' নয়। এ রকমেরই কথা ঃ

رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا -

হে আমাদের রব্ব! আমাদেরকে এই জনপদের জালিম অধিবাসীদের থেকে বের করে নাও। (সূরা নিসা ঃ ৭৫)

এ আয়াতে اَلْقَرْيَةُ 'জনপদ' প্রকৃত নাম। নির্মাণ ভিত্তির কথাই বলতে চাওয়া হয়েছে। এ ছাড়া এই কথাটি ঃ

وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِىْ كُنَّا فِيْهَا -

আমরা যে জনপদে ছিলাম সেই জনপদকে জিজ্ঞাসা কর। (সূরা ইউসূফ ঃ ৮২)

এখানে পরোক্ষ অর্থ সামনে রাখা হয়েছে। কেননা এতে 'জনপদ' শব্দটি ঠিক যা বোঝার জন্যে তৈরী করা হয়েছে, তা বোঝানো হয়নি। বরং 'জনপদ' বলতে জনপদের অধিবাসীদের বুঝিয়েছেন। প্রকৃত অর্থ পরোক্ষ অর্থ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। যে নাম সেই নামের জিনিসটির সাথে বাধ্যতামূলক, কখনই তা থেকে সরে যায় না, তা তার প্রকৃত নাম। আর যে নাম তার

জিনিসটি থেকে কখনও সরে যেতে পারে, তা পরোক্ষ নাম। যেমন যদি বলা হয়, প্রাচীরের তো 'ইচ্ছা' বলতে কিছু থাকে না, তাহলে সত্য কথাই বলা হবে। কেউ যদি বলে, আল্লাহ্ কিছুই চান না বা মানুষের ইচ্ছা বলতে কিছুই নেই, তাহলে তার এই কথাটি বাতিল। অনুরূপভাবে বলা যায়, নিংড়ানো জিনিস 'খামর' নয়। কিন্তু আঙ্গুর নিংড়ানো রস থেকে তৈরী জিনিস 'খামর' নয় বলা যথার্থ নয়। এর দৃষ্টান্ত ভাষায় ও শরীয়াতে অসংখ্য রয়েছে। শরীয়াতী নাম পরোক্ষ নাম হিসেবে তার আসল পরিধি অতিক্রম করে যায় না। আমরা যখন দেখছি যে, 'খামর' নামটি অন্যান্য সর্বপ্রকারের পানীয়র ব্যাপারে অ-প্রয়োগীয়, আঙ্গুরের পানি দিয়ে তৈরী জিনিসও অনুরূপ, আমরা জানতে পারলাম যে, তা প্রকৃতপক্ষে 'খামর' নয়।

'খামর' নামটি অন্যান্য সব পানীয়র জন্যে ব্যবহার না করার দলীল হচ্ছে আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স)-এর নিকট একজন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি 'খামর' পান করেছ? লোকটি বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যেদিন তা হারাম করেছেন, তার পর কখনই তা আমি পান করিনি। জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে তুমি কি পান করেছ ? বলল, আমি 'খালীতাঈন' পান করেছি।' তখন নবী করীম (স) 'খালীতাঈন' পান করাকে হারাম ঘোষণা করলেন। বোঝা গেল, লোকটি 'খালীতাঈন'কে 'খামর' নামে অভিহিত করেনি। রাসূলে করীম (স)ও তা মেনে নিলেন ও বহাল রাখলেন। বোঝা গেল, 'খালীতাঈন' 'খামর' নয়। ইবনে উমর (রা) বলেছেন, 'খামর হারাম করা হয়েছে; কিন্তু সেদিন মদীনায় খামর এর কিছুই বর্তমান ছিল না। বোঝা গেল, খেজুর 'তামার'-থেকে তৈরী পানীয়কে 'খামর' বলা হয় না। যদিও 'খামর' হারাম করার দিন তা বিপুল পরিমাণে মদীনায় ছিল। নবী করীম (স)-এর কথা থেকেও তাই বোঝা যায়। বলেছেন, اَلْخَمْرُ مِنْ هَتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ 'খামর' হয় এই দুটি বৃক্ষ থেকে। সনদের দিক দিয়ে এই হাদীসটি অত্যন্ত সহীহ্ এই পর্যায়ে বর্ণিত সব হাদীসের তুলনায়। যে হাদীসে বলা হয়েছে যে, 'খামর' পাঁচটি জিনিস থেকে তৈরী হয়'— এর চাইতেও সে হাদীসটি বেশি সহীহ্। অতএব এ দুটি ছাড়া অন্যান্যভাবে যে পানীয় তৈরী হয়, তাকে খামর বলা যাবে না। কেননা রাসূলের কথা ঃ 'খামর' এই দুটি গাছ থেকে' জাতীয় পর্যায়ের নাম। এই নামে যেটাকে বোঝায়, তা সবই এর মধ্যে গণ্য। উক্ত হাদীসটি এ হাদীসের বিপরীত। এটির তুলনায় সে হাদীসটি অধিক সহীহ্ও।

এ থেকে এও প্রমাণিত হয় যে, 'খামরকে যে হালাল মনে করবে, সে কাফির। আর তাছাড়া অন্যান্য পানীয়কে হালাল মনে করলে তাকে 'ফাসিক' নামে অভিহিত করা যাবে না। তাহলে তাকে কাফির বলা যাবে কি করে ? তাহলে বোঝা গেল, তা প্রকৃতপক্ষে খামর নয়। এ-ও বোঝা গেল যে, এসব পানীয়র সিরকা খামর-এর সিরকা নয়। খামর-এর সিরকা আঙ্গুরের পানিয়র তৈরী— হালাল। অন্যান্য সব পানীয়কে খামর বলা যাবে না— এটা যখন প্রমাণিত হল, তখন প্রমাণিত হয় না যে, সেই অন্যান্য পানীয়কে 'খামর' বলা প্রকৃত অর্থে নয়। কোন অবস্থায় তাকে 'খামর' বলা হলেও তা শুধু সাদৃশ্যের কারণে মাত্র এবং তাতে মাদকতা পাওয়া গেলেই বলা যাবে। তাই 'খামর' হারাম করা হলে সেগুলোও সেই সঙ্গেই হারাম হয়ে গেল— বলা চলবে না। কেননা পরোক্ষভাবে নামকরণ প্রকৃত নামকরণে শামিল হতে পারে না। অতএব রাসূলের কথা ঃ পাঁচটি জিনিস থেকে 'খামর' হয় কেবল তখনই বলা যাবে, যদি তাতে মাদকতা পাওয়া যায়। কেবল সেই অবস্থায়ই তাকেও 'খামর' নামে অভিহিত করা যাবে।

কেননা তা মাদকতার সৃষ্টি করে খামর-এর কাজই করেছে এবং তা পান করলে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে। হযরত উমর (রা)-এর কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মাদকতার উদ্ভব হলেই তাকে 'খামর' নামে অভিহিত করা যায়। কথাটি হচ্ছে ঃ 'খামর তো তা-ই যা বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে।' অল্প পরিমাণ 'নবীয' বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে না। ফলে তা বিবেক-বুদ্ধি আচ্ছন্নকারী হল না। আর এসব পানীয়র বেশি পরিমাণ মাদক হলেও তার কম পরিমাণ মাদক হয় না। আমাদের কথা থেকে যখন প্রমাণিত হল যে, এসব পানীয়কে 'খামর' বলা প্রকৃত অর্থে নয়, পরোক্ষ অর্থে, তখন এ শব্দটি সেজন্যে যখন তখন ব্যবহার করা যাবে না। হ্যাঁ, তার কোন দলীল পাওয়া গেলেই তবে ব্যবহার করা চলবে। অতএব 'খামর' হারাম হওয়ার আওতায় স্বতঃই তা-ও হারাম হয়ে যাবে না। নবী করীম (স) আবূ তালহার অশ্বটির একটা নামকরণ করেছিলেন, বলেছিলেন ঃ আমি ওটিকে একটা সাগরবত পেয়েছি। অশ্বকে সাগর বলা তখন হয়, যখন সেটিকে অতীব উত্তম, লম্বা পা ফেলে চলা অবস্থায় পাওয়া যাবে। কিন্তু 'সাগর' বললেই সেই উত্তম ঘোড়া বোঝাবে না। নুমান ইবনুল মুরযির-এর কবিতার ছত্র ঃ

فَانَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوْكُ كَوَاكِبُ -

আপনি সূর্য, আর আপনার অধীন বাদশাহরা হচ্ছে তারকা সমতুল্য।

সূর্য তার নাম ছিল না। তারকাও নাম ছিল না বাদশাহদের। এই আলোকে বলা যায়, 'খামর' নামটি অন্যান্য পানীয় সম্পর্কে ব্যবহার করা যাবে না। তা বিশেষভাবে আঙ্গুরের পানি বা রস বোঝায়, যা থেকে প্রকৃত খামর তৈরী হয়। অন্যান্য পানীয়কে খামর বলা হলে তা পরোক্ষভাবে বলা প্রকৃতভাবে বলা নয়।

## জুয়া হারাম

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ -

লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে খামর ও জুয়া সম্পর্কে। আপনি বলে দিন ও দুটিতে বিরাট গুনাহ্ রয়েছে।

আবূ বকর বলেছেন, এ আয়াতটি জুয়াকে হারাম ঘোষণা করছে। এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ ইতিপূর্বেই আমরা করেছি। বলা যায় الميسر 'আল-মাইসির' নামটি আসলে অভিধানের দৃষ্টিতে খণ্ড-বিখণ্ডিতকরণ। যে জিনিসকেই তুমি খণ্ড-বিখণ্ডিত করলে, সেটিকেই তুমি সহজ করে নিলে, যে লোক সব কিছুকে জায়েয বলে, তাকে الياسر বলা যায়। অর্থাৎ সে সহজতাগামী। কেননা সেই কাটছাঁটকে জায়েয করে। আর الْيَسْرُ হচ্ছে মূলত কর্তন, খণ্ডকরণ। আরবরা উট যবেহ করে টুকরা টুকরা করত। বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করত এবং প্রত্যেক ভাগের উপর তীর দ্বারা জুয়া খেলত। এটাই ছিল তাদের সাধারণ অভ্যাস। যার নামে তীর বের হয়ে আসত, তার উপর লিখিত নামটি তারা লক্ষ্য করত। তখন সেই ভাগটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্যে করে দিত। তা-ই ছিল তীরসমূহের বিভিন্ন নাম রাখার দাবি। এই পটভূমিতেই সর্বপ্রকারের জুয়া খেলাকে

'মাইসির' বলা হতে লাগল। ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদাতা, মুআবিয়া ইবনে সালিহ্, আতা, তায়ূস ও মুজাহিদ বলেছেন, الْمَيْسِرُ الْقِمَارُ। 'মাইসির' অর্থ 'কিমার' জুয়া (Gambling)। আতা, তায়ূস ও মুজাহিদ বলেছেন, বাচ্চাদের ফুটবল খেলাও এই পর্যায়ে গণ্য। আলী ইবনে জায়দ, কাসিম, আবূ উমামাতা, আবূ মূসা সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ

اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْكِعَابَ الْمَوْسُومَةَ الَّتِى يَزْجَرُ بِهَا زَجْرًا فَإِنَّهَا مِنَ الْمَيْسِرِ –

তোমরা এই সব সুচিহ্নিত বল খেলা পরিহার কর, যাতে কঠিনভাবে বিরত ও আটকিয়ে রাখা হয়। আসলে তা জুয়া পর্যায়ে গণ্য।

সাঈদ ইবনে আবূ হিন্দু আবূ মূসার সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ –

যে লোক পাশা (বা দাবা) খেলবে, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল।

হাম্মাদ ইবনে সালমাতা কাতাদাতা, হাল্লাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তিকে তিনি বললেন, তুমি যদি এত এত ডিম খেতে পার, তাহলে তোমাকে এই এই দেয়া হবে। পরে তারা দুজনই হযরত আলী (রা)-এর নিকট গেলেন। বললেন, এটা জুয়া এবং তা জায়েয নয়।

জুয়া হারাম হওয়ার ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। বাজি ধরাও জুয়া খেলার অন্তর্ভুক্ত। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ المخاطر قمار। — বাজি ধরা জুয়া। জাহিলিয়াতের লোকেরা ধন-মাল ও স্ত্রীর উপরও বাজি ধরত। তা মুবাহ্ ছিল। শেষ পর্যন্ত তা হারাম ঘোষিত হয়। হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা) মুশরিকদের সাথে বাজি ধরেছিলেন, যখন কুরআনের, সূরা 'আর-রুম' নাযিল হয়েছিল। তখন নবী করীম (স) তাঁকে বলেছিলেন বাজির মূল্য বাড়িয়ে দাও এবং মেয়াদও বৃদ্ধি কর। পরে তা নিষিদ্ধ হয়ে যায় জুয়া হারাম হওয়ার দরুন। অবশ্য তা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কারোরই কোন দ্বিমত নেই। তবে এই পর্যায়ের কোন কোন কাজের রুখসতও আছে। যেমন চতুষ্পদ জন্তু উট বা বল্লম নিক্ষেপণের প্রতিযোগিতায় বাজি ধরা, যাতে একজনই বিজয়ী হতে পারে। অন্যরা সেখানে বিজয়ী হতে পারে না। যদি শর্ত করা হয় যে, দুজনের মধ্যে যে বিজয়ী হবে, সে বাজির শর্ত পাবে, তারপর যে বিজয়ী হবে, তাকে দেয়া হবে। এরূপ বাজি বাতিল। এই দুজনের মধ্যে অন্য কোন ব্যক্তিকে দাখিল করা হলে এবং বিজয়ী হলে সে পাবে। বিজয়ী না হলে পাবে না। এটা জায়েয। এই তৃতীয় যে ব্যক্তি দাখিল হল, নবী করীম (স) তাকে হালালকারী বলেছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

لَاسَبَقَ الَّافِىْ خُفٍّ اَوْ حَافِرٍ اَوْنَصْلٍ –

অল্প লোকের উট বা বল্লম চালনা ছাড়া প্রতিযোগিতা জায়েয নেই।

ইবনে উমর (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ঘোড়ার প্রতিযোগিতা করিয়েছেন। কেবলমাত্র ঘোড়ার প্রতিযোগিতা এইজন্যে যে, তাতে ঘোড়ার দেহ চালনা হয়, দৌড়ানোর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আর তাতে শত্রু পক্ষের উপর শক্তি ও দাপট প্রদর্শন করা সম্ভব হয়। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ -

এবং শত্রুদের মুকাবিলায় তোমরা যত শক্তিই দেখাতে পার তার প্রস্তুতি গ্রহণ কর।
(সূরা আনফাল ঃ ৬০)

তীর চালনাই এই কথার লক্ষ্য। وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ 'এবং সদা সজ্জিত বাঁধা ঘোড়া প্রস্তুত রাখ।' এই কথাটি ঘোড়ার প্রতিযোগিতা করানো জায়েয প্রমাণ করে। কেননা তাতে শত্রুর মুকাবিলায় শক্তির প্রদর্শন হয়। তীর নিক্ষেপণ প্রতিযোগিতায়ও তাই হয়।

আল্লাহ্ জুয়া হারাম করেছেন। এর ফলে ক্রীতদাসদের মধ্যে কুরয়া ফেলে যে রোগী, তাকে মুক্ত করার প্রক্রিয়ায় জুয়া রয়েছে বলে তা-ও হারাম হয়ে গেছে। তাতে কাউকে হক্ দেয়া হয়, কাউকে বঞ্চিত করা হয়। জুয়ার সবচাইতে খারাপ দিক এটাই। সম্পদ বণ্টনে কুরয়া ব্যবহার সেরূপ নয়। কেননা তাতে শরীক প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের ভাগ পুরামাত্রায় পেয়ে যায়। তাতে কাউকে বঞ্চিত করা হয় না।

## ইয়াতীমের ধন-সম্পদে হস্তক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ -

লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, ইয়াতীমদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে হবে? তুমি বলে দাও, যে ধরনের কাজ-কর্মে তাদের কল্যাণ হতে পারে, তা করাই উত্তম। যদি তোমরা তোমাদের নিজেদের এবং তাদের খরচপত্র ও থাকা-খাওয়া একত্রিত রাখ, তবে তাতে কোন দোষ হবে না। তারা তো তোমাদের ভাই-বন্ধুই বটে।

আবূ বকর বলেছেন, ইয়াতীম হচ্ছে সে, যে তার বাপ-মার একজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। মা মরে গেছে ও বাপ জীবিত থাকলে তখনও তাকে ইয়াতীম বলা যাবে। আর মা বেঁচে থাকলে ও পিতা মরে গেলে তখনও সে ইয়াতীম হয়। কিন্তু সাধারণ ব্যবহারের দিক দিয়ে ব্যাপক হচ্ছে, পিতা মরে গেলে বালক-বালিকা ইয়াতীম হয়, মা বেঁচে থাকলেও। বাপ জীবিত থাকলে ও মা মরে গেলেও বালক-বালিকাদেরকে কখনও কখনও ইয়াতীম বলা হয়। তখনও ইয়াতীম সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বলে দেয়া সব হুকুম-আহকাম প্রয়োগ করা যাবে। তবে প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে, অল্প বয়সের বাল-বালিকারা পিতৃহারা হলেই তাদেরকে ইয়াতীম বলা হবে। তাদের পূর্ণবয়স্কতা লাভ করার পর তাদেরকে ইয়াতীম বলা হবে না। বলা হলেও তা হবে পরোক্ষ অর্থে, প্রকৃত অর্থে নয়। কেননা তারা ইয়াতীম ছিল, তা খুব বেশি দিনের কথা নয়। বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে ইয়াতীম বলার দলীল হল, যে মেয়েলোক স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তাকেও يَتِيمَةٌ 'ইয়াতীম' বলা হয়, পূর্ণবয়স্কা হলে, ছোট বয়সের হলেও। 'রাবীআ'কেও ইয়াতীম বলা হয় তাঁর পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে। তাকে বলা হয় دُرَّةٌ يَتِيمَةٌ কেননা সে বিচ্ছিন্ন। তার কোন নযীর নেই। আবুল আব্বাস আস-সাফ ফাহ্‌র স্তুতিতে লিখিত কিতাবের নাম دُرَّةٌ يَتِيمَةٌ খারিজীদের বিভিন্ন মত ও মাযহাবকেও 'আল-ইয়াতীমাতু' বলা হয়।

বিচ্ছিন্ন, একক ও নিঃসঙ্গ হওয়ারই নাম 'ইয়াতীম' হওয়া। সেই কারণে ছোট হোক বড় হোক, পিতা-মাতার একজনকে হারালেই তাকে ইয়াতীম বলা যাবে। কিন্তু এই শব্দের প্রকৃত

ও যথার্থ প্রয়োগ হয় ছোট বয়সে পিতা হারালে। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ইয়ামন, আবূ উবায়দ, আবদুল্লাহ ইবনে সালিহ, মুআবিয়াতা ইবনে সালিহ, আলী ইবেন আবূ তালহা, ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, উপরোদ্ধৃত আয়াত প্রসঙ্গে বলেছেন, আল্লাহ যখন নাযিল করলেন ঃ

انَّ الَّذِيْنَ يَاكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ط وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا -

যারা ইয়াতীমদের ধন-মাল জুলুম করে খায়, তারা তাদের পেটে আগুন ভরে এবং তারা নিঃসন্দেহে জাহান্নামে যাবে। (সূরা নিসা ঃ ১০)

তখনই ইয়াতীমের লালন-পালনকারী মুসলমানরা তাদের সাথে খানাপিনা ও থাকাকে একত্রিত রাখা দূষণীয় মনে করেছিলেন। তখন তারা তাদের ব্যাপারে কি করবেন, এই বিষয়ে নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তখন উপরোদ্ধৃত আয়াতটি নাযিল হয়। সে আয়াতটির শেষে রয়েছে ঃ وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ 'আল্লাহ যদি চাইতেন, তাহলে তিনি তোমাদেরকে কষ্টের মধ্যে, সংকীর্ণতার মধ্যে ফেলে দিতেন। কিন্তু তিনি তা চাননি। তিনি বরং তোমাদের কর্মক্ষেত্র প্রশস্ত ও সহজ করে দিয়েছেন।' বলেছেন ঃ

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ج وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ -

যে লোক সচ্ছল হবে সে যেন পবিত্রতা রক্ষা করে। আর যে লোক গরীব হবে, সে যেন প্রচলিত ভালো নিয়ম অনুযায়ী খায়। (সূরা নিসা ঃ ৬)

নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

اَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِ الْيَتَامٰى لَا تَاكُلُهَا الصَّدَقَةُ -

তোমরা ইয়াতীমদের ধন-মাল এমনভাবে ব্যবহার কর, যেন যাকাত তা খেয়ে না ফেলে।

হাদীসটি হযরত উমর (রা) থেকে 'মওকূফ' হিসেবে বর্ণিত, তাছাড়া হযরত উমর আয়েশা ইবনে উমর (রা) এবং শুরাইহ্ ও তাবেয়ীনের বিপুল সংখ্যক থেকে বর্ণিত হয়েছে, তারা ইয়াতীমের ধন-মাল মুনাফার অংশীদারিত্বে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেছেন। তা নিয়ে তাঁরা ব্যবসায়ও করেছেন।

উপরোদ্ধৃত আয়াত বহু কয়টি আইন-বিধান সমন্বিত। একটি হচ্ছে اصلاح لهم خير 'তাদের কল্যাণমূলক কাজই ভালো।' ইয়াতীমদের ধন-মাল ও তাদের লালন-পালনকারীদের ধন-মাল সংমিশ্রিত করা জায়েয প্রমাণ করে। ক্রয়-বিক্রয়মূলক কাজ দ্বারা তাতে হস্তক্ষেপ করা জায়েয প্রমাণ করে। অবশ্য যদি তা তাদের ও তাদের ধন-মালের জন্যে কল্যাণকর হয়। সে ধন-মাল মুনাফার ভাগের শর্তে ব্যবসায়েও বিনিয়োগ করা যেতে পারে। ইয়াতীমের অভিভাবক নিজেও তার ধন-মাল নিয়ে ব্যবসায় করতে পারে। নিত্য নতুন সজ্ঘটিত ঘটনাবলী সম্পর্কে আইন-বিধান জানার জন্যে ইজতিহাদ করা জায়েয, তা-ও এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, কেননা আয়াতে যে কল্যাণের কথা বলা হয়েছে, তা জানার জন্যে তো ইজতিহাদ করতেই

হবে। চিন্তা-ভাবনা করে দেখতে গেলে সর্বাধিক শক্তিশালী ধারণার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। আর তা-ই হচ্ছে ইজতিহাদ। এটাও জায়েয যে, অভিভাবক নিজেই নিজের জন্যে ইয়াতীমের ধন-মাল থেকে কিছু ক্রয় করবে, যদি তা ইয়াতীমের পক্ষে কল্যাণকর হয়। আর তা তখন জায়েয হবে যখন ইয়াতীম যে মাল দিচ্ছে, তার সর্বাধিক মূল্য সে গ্রহণ করবে। এটা ইমাম আবূ হানীফার মত। অভিভাবক নিজের মাল থেকেও ইয়াতীমের জন্যে বিক্রয় করতে পারবে। কেননা তা-ও তার জন্যে কল্যাণকর।

উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, অভিভাবক ইয়াতীমের বিয়ের ব্যবস্থাও করবে যদি তা তার জন্যে কল্যাণকর হয়। এটা আমাদের মত। তবে তা হতে হবে তার জন্যে সামঞ্জস্যশীল বংশের সাথে। যার বংশের সাথে তার বংশের সামঞ্জস্য হবে না, তার সাথে নয়। যদি কারোর জন্যে অসিয়ত করা থাকে, তাহলে শুধু এই অসিয়তের কারণে বিয়ে দেয়ার কর্তৃত্ব লাভ করা যায় না। তবে বাহ্যিকভাবে স্বাভাবিক নিয়ম হচ্ছে বিচারকর্তা— শাসক-ই ইয়াতীমের বিয়ের ব্যবস্থা করবে এবং কল্যাণের দৃষ্টিতে তার ধন-মালের উপর হস্তক্ষেপ করবে। এটাও প্রমাণিত হয় যে, ইয়াতীমকে দ্বীন ও সুনীতি-সুসংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষা দান করবে, যা তার জন্যে কল্যাণকর হবে। সেজন্যে প্রয়োজন হলে ইজারা দানের কাজও করবে। শিক্ষককে মজুরী দিয়ে নিযুক্ত করবে, যেন সে তাকে কাজকর্মের শিক্ষাদান করে। ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে অবহিত করবে। কেননা এই শিক্ষা ইয়াতীমের জন্যে প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর। এই কারণে হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, ইয়াতীম যদি রক্ত সম্পর্কের কোন আত্মীয়ের লালন-পালনে থেকে থাকে, তাহলে সে তাকে শিক্ষা দানের জন্যে তার সম্পদ ব্যয় করতে পারবে।

ইমাম মুহাম্মাদ বলেছেন, অভিভাবক নিজের ধন-মালও সেজন্যে ব্যয় করতে পারবে। তাঁরা এ-ও বলেছেন যে, ইয়াতীমকে কোন কিছু দান করা হলে তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করতে পারবে। কেননা তাতেও ইয়াতীমেরই কল্যাণ নিহিত। আয়াতটির বাহ্যিক প্রকাশ থেকেই এই সব কথা জানা ও বোঝা যায়।

আয়াতে 'লোকেরা জিজ্ঞাসা করে'— এই লোকেরা হচ্ছে ইয়াতীমদের অভিভাবকগণ, যারা তাদের লালন-পালন-সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কোন মুহররম আত্মীয়ও এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। কেননা ইয়াতীমকে রাখা, তার সংরক্ষণ করা ও তার লালন-পালন করার তার অধিকার রয়েছে। আর 'তাদের কল্যাণের ব্যবস্থা করাই অধিক ভালো কাজ' কথাটিতে তাদের ধন-মালের উপর কল্যাণের দৃষ্টিতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার প্রমাণিত হয়। তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করাও এই পর্যায়েরই কাজ। তাদেরকে ভালোভাবে গড়ে তোলা ও তাদেরকে সুশিক্ষা দান-ও তাই।

আল্লাহ্র ব্যবহৃত শব্দ "خير"-এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। একটি, আমরা যেসব দিকের উল্লেখ করেছি, সেই সব দিক দিয়ে ইয়াতীমের জন্যে কর্ম সম্পাদন করা। তাতে অভিভাবক যথেষ্ট সওয়াবের অধিকারী হবে। কেননা আল্লাহ্ নিজেই এই সব কাজকে "خير" বলেছেন। আর যা "خير" তার সওয়াব পাওয়া নিশ্চিত। সওয়াব পাওয়াটা যদিও আবশ্যিক নয়, তবে তার ওয়াদা করা হয়েছে। তা থেকে বোঝা গেল, ইয়াতীমের ধন-মাল দিয়ে ব্যবসায় ইত্যাদি করা অবশ্য কর্তব্য নয়। ইয়াতীমকে বিয়ে দেয়ার জন্যে জোর প্রয়োগ ও জবরদস্তি করারও কোন অধিকার অভিভাবকের নেই। কেননা আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দৃষ্টিতে তা বড় জোর মুস্তাহাব বলা যেতে পারে। উপদেশ দেয়া ও বোঝানোর অধিকার আছে বলে মনে হয়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ -

আর যদি তোমরা তাদের ধন-মালের সাথে তোমাদের ধন-মালের সংমিশ্রণ কর, তবে তারা তোমাদের ভাই মাত্র।

এতে এই সংমিশ্রণ করাকে মুবাহ বলা হয়েছে। তাদের ধন-মাল নিয়ে ব্যবসায় করা মুবাহ মাত্র। অভিভাবক ইয়াতীমের সাথে বৈবাহিক দিক দিয়েও সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। তার নিকট নিজের কন্যা বিয়ে দিতে পারে। কিংবা নিজের কোন পুত্রের সাথে লালিতা-পালিতা ইয়াতীম কন্যাকে বিয়েও দিতে পারে। এতেও ইয়াতীমের সাথে নিজের সংমিশ্রণই হতে পারে, নিজের পরিবারের লোকদের সাথেও সংমিশ্রণ হতে পারে। এই সব সংমিশ্রণই আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের সাথে সামঞ্জস্যশীল। আয়াতের শব্দ المخالطة থেকে যে এই সব সংমিশ্রণই বোঝায়, তার প্রমাণ হল আরবদের নিত্যকার কথা। তারা বলে فُلَانٌ خَلِيْطُ فُلَانٍ 'অমুক অমুকের সাথে সংমিশ্রিত'— কথাটি বলা হয়, যখন একজন অপর জনের সাথে শরীক হয়, যখন পরস্পর মিলিত কাজকর্ম করে, ক্রয়-বিক্রয় করে, লেন-দেন করে— শরীক না হয়েও। অনুরূপভাবে বলা হয় ঃ قَدْ اخْتَلَطَ فُلَانٌ بِفُلَانٍ 'অমুক অমুকের সাথে মিলে মিশে গেছে'— তা বলা হয় যখন পারস্পরিক বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই সবই الخلطة শব্দ থেকে গৃহীত। তার অর্থ শরীক হওয়া অধিকার লাভের ক্ষেত্রে, তাতে পরস্পর কোন পার্থক্য বা তারমত্য ছাড়াই। এই সংমিশ্রণ জায়েয কল্যাণকর তার দৃষ্টিতে। তার দুটি দিক, একটি আয়াতে صلاح শব্দটি ইয়াতীম সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে শুরুতেই ব্যবহৃত হয়েছে। এটা অগ্রবর্তী শর্ত। আর দ্বিতীয়, পারস্পরিক সংমিশ্রণের কথা বলার পর আল্লাহ বলেছেন ঃ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ 'মুফসিদ'— ফাসাদকারী ও কল্যাণকারীর মধ্যকার পার্থক্য আল্লাহ ভালো করেই জানেন। আয়াতটি যখন ইয়াতীমের মাল অভিভাবকের মালের সাথে সংমিশ্রিত করা জায়েয করেছে এমন পরিমাণে, যাতে নিশ্চিত হবে যে, ইয়াতীম তার মাল-ই খাচ্ছে, অন্যের মাল নয়। এ পর্যায়ে একটি হাদীস ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

লোকেরা বিদেশ ভ্রমণে বের হয়ে পরস্পর মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়, প্রত্যেকেই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পাথেয় বের করে একত্রিত করে নেয় এবং তা থেকে প্রয়োজনমত ব্যয় করে। অথচ একত্রিত সব লোকের খাওয়ার পরিমাণ এক নয়। তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ এই কাজকে মুবাহ করেছেন। ইয়াতীমের মালের সাথে অভিভাবকের মালের অনুরূপ সংমিশ্রণও আল্লাহ মুবাহ করেছেন। তাই পূর্ণ বয়স্ক সমঝদার লোকদের আত্মসন্তুষ্টির ভিত্তিতে উক্তরূপ সংমিশ্রণ ঘটানো অধিক মাত্রায় জায়েয হবে, তাতে কোন সন্দেহ নাই। কুরআনে উল্লিখিত 'কাহাফ'বাসীদের কাহিনী বর্ণনায় এরূপ সংমিশ্রণের উল্লেখ হয়েছে, বলা হয়েছে।

فَابْعَثُوْا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَا اَزْكٰى طَعَامًا -

অতপর তোমাদের মধ্য থেকে একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ শহরে প্রেরণ কর, সে উত্তম খাবার তালাস করে নিয়ে আসবে। (সূরা কাহাফ ঃ ১৯)

আয়াতে উল্লিখিত 'মুদ্রা' তাদের সকলের সম্মিলিত, সংমিশ্রিত। তা তাদের সকলেরই

সম্মিলিত মালিকানা। তাদের সকলের জন্যে খাবার একত্রে নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে, যেন সকলেই একসাথে সে খাবার খেতে পারে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যদি তোমরা তাদের সাথে সংমিশ্রণ কর, তাহলে তারা তো তোমাদের ভাই-ই' প্রমাণ করছে যে, লোকদের পারস্পরিক শরীক হওয়া ও মূলধন একত্রিত-সংমিশ্রিত করা জায়েয। তা দিয়ে যে কল্যাণমূলক কাজ তারা করতে সচেষ্ট হবে, তাতে তারা সওয়াব পাওয়ার অধিকারী হবে। কেননা 'তারা তো তোমাদের ভাই' কথাটি তা স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে। ভাইয়ের সাহায্য-সহযোগিতা, পারস্পরিক কল্যাণ সাধন করা খুবই পছন্দনীয়— মুস্তাহাব কাজ। কেননা আল্লাহ্ অপর আয়াতে আরও স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ভাষায় বলেছেন ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ -

মুমিনরা পড়স্পরের ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত কর। (সূরা হুযুরাত ঃ ১০)

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ

আল্লাহ্ বান্দার সাহায্যে থাকবেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইর কল্যাণে নিযুক্ত থাকবে।

এটা 'তারা তো তোমাদের ভাই' কথারই ব্যাখ্যা। এ থেকে মুস্তাহাবই বোঝায়, পথ দেখানো, উপদেশ দান বোঝায়। আর তার দরুন সওয়াবের অধিকারী হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَأَعْنَتَكُمْ 'আল্লাহ্ যদি চাইতেন, তাহলে তিনি তোমাদেরকে কষ্টের ভিতর ফেলতেন, অর্থাৎ সংকীর্ণতার কষ্টে জর্জরিত করতেন। তাহলে ইয়াতীমের মাল ও খাদ্যের সাথে সংমিশ্রণ ও তাদের ধন-মালে হস্তক্ষেপ করার অধিকার দেয়া হতো না। বরং তাদের ধন-মাল থেকে তোমাদের ধন-মালকে সম্পূর্ণ আলাদা করে আদেশ করতেন। তাদের ধন-মালে হস্তক্ষেপ করাকে ওয়াজিব করে দিতেন। তাদের মাল দিয়ে ব্যবসায় করে মুনাফা অর্জনের আদেশ করতেন। কিন্তু না, এসব কাজকে তিনি ওয়াজিব ফরয করেন নি। তা মুবাহ করেছেন কল্যাণের দৃষ্টিতে এবং তাতে সওয়াব দেয়ার ওয়াদাও করেছেন। বাধ্যতামূলক করে দেন নি। তা করে দিলে তোমাদের জীবন সংকীর্ণ ও কর্তব্য বোঝার চাপে জর্জরিত হয়ে পড়ত।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তাহলে তারা তো তোমাদের ভাই' বুঝিয়ে দেয় যে, মুমিনদের শিশুরাও মুমিনদের মধ্যে গণ্য আইনের দিক দিয়ে, কেননা আল্লাহ তাদেরকে আমাদের ভাই বলেছেন। বলেছেন 'মুমিনরা পরস্পরের ভাই।'

## মুশরিক মেয়ে বিয়ে করা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ -

মুশরিক মেয়েরা ঈমান গ্রহণ না করা পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বিয়ে করবে না।

জাফর ইবনে মুহাম্মদ আল-ওয়াসেতী, জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ইয়ামন, আবূ উবায়দ, আবদুল্লাহ ইবনে সালিহ, মুআবিয়া ইবনে সালিহ, আবূ তালহা ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ তোমরা মুশরিক মেয়েদেরকে ঈমান গ্রহণ না করা পর্যন্ত বিয়ে

করবে না'— এই সাধারণ নিষেধ থেকে আহলি কিতাব, ইয়াহূদী, খ্রীস্টানদের বাদ দেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে বলেন ঃ

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ -

...... এবং সুরক্ষিতা নারীদেরকে তোমাদের পূর্বে কিতাবপ্রাপ্ত লোকদের মধ্য থেকে— যখন তোমরা তাদের মহরানা আদায় করে দিয়ে বিবাহ বন্ধনে তাদের সংরক্ষণকারী হয়ে স্বাধীন লালসা পূরণ ও গোপন বন্ধুত্বকারী হিসেবে নয়— বিয়ে করতে পার। সূরা মায়িদাহ ঃ ৫)

বিয়ে-নিষিদ্ধ মুশরিক নারীদের থেকে আহলি কিতাব নারীদের বিয়ে করা এ আয়াতে জায়েয ঘোষিত হয়েছে। ইবনে উমর (রা) বলেছেন, কিতাবী নারীদের ব্যাপারে এটা সাধারণ ও নির্বিশেষ অনুমতি।

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ, জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ইয়ামন, আবূ উবায়দ, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ, উবায়দুল্লাহ ইবনে নাফে ইবনে উমর (রা) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি আহলি কিতাবের খাদ্য খাওয়ায় কোন দোষ মনে করেন না। তবে তাদের মেয়ে বিয়ে করাকে অপছন্দ করতেন। আবূ উবায়দ, আবদুল্লাহ্ ইবনে সালিহ্, লাইস, নাফে, ইবনে উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তাঁর নিকট ইয়াহূদী কিংবা নাসারা (খ্রীস্টান) মেয়ে বিয়ে করা সম্পর্কে যখনই প্রশ্ন করা হতো, তখনই বলতেন ঃ আল্লাহ মুশরিক মেয়েদের বিয়ে করা মুসলমানদের জন্যে হারাম করেছেন। আমি শিরক-এর তুলনায় বড় কোন পাপ আছে বলে জানি না। অথবা বলেছেন ঃ তুমি বলবে, তার রব্ব ঈসা; কিংবা আল্লাহ্‌র বান্দাগণের মধ্যের একজন বান্দা— এর কোন্‌টা বড় কথা।

দেখা গেল, প্রথমোক্ত হাদীসে তিনি আহলি কিতাব মেয়ে বিয়ে করা অপছন্দ করেছেন, কিন্তু তা হারাম, একথা বলেন নি। আর দ্বিতীয় হাদীস তিনি আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু কোন চূড়ান্ত কথা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বলেন নি। তবে জানিয়েছেন যে, খ্রীস্টানদের ধর্মমত শিরক। আবূ উবায়দ আলী ইবনে সাদ, আবুল সলীহ্, মাইমুন ইবনে মেহরান সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি ইবনে উমর (রা)-কে বললাম ঃ আমরা এমন একটা দেশে বাস করি যেখানে আহলি কিতাব লোকদের সাথে সব সময় সংমিশ্রণ ঘটে। এরূপ অবস্থায় আমরা কি ওদের মেয়েদের বিয়ে করতে পারি ? ওদের খাবার খেতে পারি ? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি আমার সামনে হালাল হওয়ার আয়াত ও হারাম হওয়ার আয়াত দুটিই পাঠ করলেন। আমি বললাম, আপনি যে আয়াত পাঠ করলেন, তা আমরাও তো পড়ি। আপনি বলে দিন, আমরা ওদরে মেয়ে বিয়ে কবর কিনা, ওদের খাবার খাব কি না ? এর পরও তিনি সেই হালাল হওয়ার ও হারাম হওয়ার আয়াত পাঠ করলেন।

আবূ বকর বলেছেন, ইবনে উমর (রা) স্পষ্ট জবাব না দিয়ে শুধু মুবাহ হওয়ার ও নিষিদ্ধ হওয়ার আয়াত পাঠ করেই ক্ষান্ত থাকলেন, এর কারণ হচ্ছে, তিনি হুকুম তো জানতেন, কিন্তু হালাল বা হারাম— কোন একটির উপর তিনি নিশ্চিত ও ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি অপছন্দ করতেন বলে যে কথাটি বর্ণিত হয়েছে, তা শুধু মাকরূহ বোঝায়, হারাম বোঝায় না। যেমন যুধ্যমান আহলি কিতাব লোকদের মেয়ে বিয়ে করাকে তিনি মাকরূহ মনে করতেন। হারাম

মনে করতেন না। বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ীন আহলি কিতাব মেয়েদের বিয়ে করাকে মুবাহ মনে করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াসেতী জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ইয়ামন, আবূ উবায়দ, সাঈদ ইবনে আবূ মরিয়ম, ইয়াহইয়া ইবনে আইয়ূব ও নাফে ইবনে ইয়াযীদ, উমর মাওলা ইফরাতা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আলী ইবনুস সায়িবকে বলতে শুনেছি যে, উসমান (রা) নায়েলা বিনতিল ফারাফিযা আল-কলবীয়া-কে বিয়ে করেছিলেন, সে ছিল খ্রীস্টান। তার পূর্বে তাঁর বিবাহ বন্ধনে মুসলিম মহিলা ছিলেন। নাফে ছাড়া উক্ত সনদে বলা হয়েছে যে, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ সিরিয়ায় এক ইয়াহূদী মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। হুযায়ফা (রা)ও এক ইয়াহূদী মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। হযরত উমর (রা) তাকে ত্যাগ করার জন্যে হযরত হুযায়ফা (রা)-কে চিঠি লিখেছিলেন। জবাবে তিনি লিখেছিলেন ঃ ইয়াহূদী মেয়ে বিয়ে করা কি হারাম ? জবাবে খলীফাতুল মুসলিমীন লিখেছিলেন ঃ না, হারাম নয়, একথা ঠিক। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি যে, আপনি ওদের থেকে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যেতে পারেন। বহু সংখ্যক তাবেয়ীনও আহলি কিতাব মেয়ে বিয়ে সরা মুবাহ বলেছেন। আল হাসান, ইবরাহীম ও শবী প্রমুখ তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য। সাহাবা ও তাবেয়ীনের কেউ তাদের বিয়ে করা হারাম বলেছেন বলে আমরা জানি না। হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, তাতেও তিনি তা হারাম মনে করতেন এমন কোন দলীল নেই। বড় জোর বলা যায়, তিনি মাকরূহ মনে করতেন। যেমন হযরত উমর (রা) হুযায়ফা (রা)-এর কিতাবী মেয়ে বিয়ে করার ব্যাপারে অপছন্দের— মাকরূহ হওয়ার— কথাই প্রকাশ করেছেন, হারাম বলেন নি। তাছাড়া হযরত উসমান, তালহা ও হুযায়ফা (রা) সাহাবীগণ কিতাবী মেয়ে বিয়ে করেছেন। যদি তা হারাম হতো, তাহলে তা নিশ্চয়ই সাহাবীদের নিকট প্রকাশমান হতো। তাঁরা নিজেরাই তা করতেন না বা এ বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিত। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তা জায়েয, এই ব্যাপারে তাঁরা সম্পূর্ণ একমত ছিল।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلَاتَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ -

মুশরিক মেয়েলোক তোমরা বিয়ে করবে না, যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করছে।

কিতাবী মেয়ে বিয়ে করাকে হারাম ঘোষণা করেনি। তা দুটি দিক দিয়ে বিবেচ্য। একটি এই যে, 'মুশরিক' বলতে সাধারণভাবে সব মূর্তিপূজারীও শামিল হয়। তাতে কিতাবী মেয়েলোক গণ্য হয় না। গণ্য হওয়ার কোন দলীল থাকলে ভিন্ন কথা হতো। কুরআনের আয়াতঃ

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَاالْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ -

কাফির লোকেরা এবং মুশরিক লোকেরাও পছন্দ করে না যে, তোমাদের প্রতি তোমাদের রব্ব-এর নিকট থেকে কোন কল্যাণ নাযিল হোক। (সূরা বাকারাহ ঃ ১০৫)

বলেছেন ঃ

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ -

আহ্‌লি কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যেসব লোক কাফির ছিল (তারা নিজেদের কুফর থেকে) বিরত ও বিচ্ছিন্ন হতে প্রস্তুত ছিল না। (সূরা বাইয়্যেনাহ ঃ ১)

এ দুটি আয়াতেই আহলি কিতাব থেকে আলাদা করে মুশরিকদের উল্লেখ করা হয়েছে। দুটি নামের মাঝে واو ব্যবহৃত হওয়ায় দুটি পরস্পর বিপরীত— একটিতে অন্যটি শামিল নয়, প্রমাণিত হচ্ছে। আহ্‌লি কিতাবরা মুশরিক নয়, মুশরিকরা আহলি কিতাব নয়, এটাই স্পষ্ট হয়। হ্যাঁ, যদি উভয়কে একই পর্যায়ে গণ্য করার কোন দলীল পাওয়া যায়, তাহলে ভিন্ন কথা হবে। দুটি আয়াতেই আহলি কিতাব ও মুশরিক আলাদা-আলাদাভাবে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন এ আয়াতটিতে ঃ

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكَالَ -

যে লোক আল্লাহ্‌র, তাঁর ফেরেশতাদের, তাঁর রাসূলগণের এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু হবে ......।

এ আয়াতে প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে প্রত্যেকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ও স্বাতন্ত্র বোঝাবার উদ্দেশ্যে। জিবরাইল ও মীকাইল ফেরেশতার মধ্যে শামিল সত্ত্বেও তাঁদেরকে আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আহলি কিতাব ও মুশরিকদের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে। যার দরুন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মুশরিকরা আহলি কিতাবের মধ্যে শামিল নয়, আহলি কিতাবরা গণ্য নয় মুশরিকদের মধ্যে। অতএব মুশরিকদের মধ্যে কেবল মুর্তিপূজারী মেয়ে বিয়ে করাই হারাম হবে।

আর দ্বিতীয় দিক এই যে, আহ্‌লি কিতাব ও মুশরিক নির্বিশেষে সকলেই যদি এই পর্যায়ে গণ্য হয়ে থাকত, তাহলে আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ -

তোমাদের পূর্বে কিতাব পাওয়া লোকদের সংরক্ষিত মেয়েরাও হালাল। (সূরা মায়িদাহ ঃ ৫)

—এর মধ্যেই শামিল হয়ে যেত। এর কোন একটি আয়াত অপর কোন আয়াত দ্বারা মনসূখও হয়নি। দুটিই নিজ নিজ স্থানে বহাল এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবেই তা কাজে লাগানো সম্ভব।

যদি বলা হয়, এই শেষোক্ত আয়তটি দিয়ে সেসব আহলি কিতাব মেয়েদের বোঝানো হয়েছে যারা ইসলাম কবুল করেছেন। যেমন অন্য আয়াতে স্পষ্টতই বলা হয়েছে ঃ

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ -

আহলি কিতাবের মধ্যে এমন লোক অবশ্যই আছে, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখে এবং তোমাদের প্রতি যে কিতাব নাযিল হয়েছে তা-ও বিশ্বাস করে।(সূরা আলে- ইমরান ঃ ১৯৯)

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ -

আহ্‌লি কিতাব লোকদের মধ্যে একটা সদা প্রস্তুত জনগোষ্ঠী রয়েছে, রাত্রি বেলা আল্লাহ্‌র আয়াত তিলাওয়াত করে এবং তারা সিজদাও করে। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১১৩)

জবাবে বলা যাবে, এ একটা বাজে ধরনের কথা। এই কথাটি কথকের নির্বুদ্ধিতারই প্রমাণ করে। দলীল হিসেবে যে আয়াত দুটি পেশ করা হয়েছে, তা-ও দলীলরূপে গ্রহণীয় নয়। তা দুটি

দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। একটি, এই নামটি সাধারণভাবে বলা হলে তাদের মধ্যকার কাফিরদেরকেও শামিল করে। যেমন এ দুটি আয়াত ঃ

مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ -

কিতাবপ্রাপ্ত লোকদের থেকে যতক্ষণ না তারা নিজেদের হাতে জিযিয়া দেবে।

وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ -

আহলি কিতাবদের মধ্যে এমন লোকও আছে যার নিকট একটা বড় সম্পদ যদি তুমি আমানত রাখ, তাহলে সে তা তোমার নিকট যথাযথ ফিরিয়ে দেবে।

(সূরা আলে-ইমরানা ঃ ৭৫)

এই ধরনের আরও যেসব আয়াতে নিঃশর্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে ইয়াহূদী ও খ্রীস্টান উভয়ই শামিল। তা থেকে এ কথা বোঝা যায় না যে, আহলি কিতাব ছিল পরে ইসলাম কবুল করেছে তাদেরকেই বুঝিয়েছে। তা শুধু ঈমানের উল্লেখের কারণে বোঝা যায় মাত্র। লক্ষণীয় যে, তাদের মধ্য থেকে যারা ইসলাম কবুল করেছে, আল্লাহ যখন কেবল তাদেরকেই বোঝাতে চেয়েছেন, সেখানে তাদের উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ইসলাম কবুল করারও উল্লেখ করেছেন। তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ওরা আহলি কিতাব ছিল, পরে ইসলাম কবুল করেছে। যেমন বলেছেন ঃ

لَيْسُوْا سَوَآءً ۗ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ -

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ -

কিন্তু সমস্ত আহলি কিতাব একই ধরনের লোক নয়। তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা সত্য সঠিক পথে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে ....।

আর আহলি কিতাবের মধ্যে এমন লোক-ও আছে, যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে। (সূরা আলে- ইমরান ঃ ১১৩ ও ১১৯)

আর দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, আয়াতে المؤمنت। মুমিন মেয়েদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে অথচ এই মুমিন মহিলাদের মধ্যে তারাও শামিল যারা আহলি কিতাব ছিল, পরে ইসলাম কবুল করেছে। আর তারাও এদের মধ্যে গণ্য যারা আসলেই ঈমানদার ছিল। কেননা তিনি বলেছেনঃ

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ -

ঈমানদার মেয়েদের মধ্যে যারা সংরক্ষিত এবং তোমাদের পূর্বে কিতাবপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে যারা সুরক্ষিত ...। (সূরা মায়িদাহ ঃ ৫)

তাহলে প্রথম যে মুমিন সংরক্ষিত মহিলাদের কথা বলা হয়েছে, তাতে আহলি কিতাবেব সংরক্ষিতা মেয়েরা কি করে শামিল হতে পারে? শামিল হলে তাদের কথা আলাদা করে উল্লেখ করা প্রয়োজন কি ছিল?

উক্ত কথার লোকেরা অনেক সময় দলীল হিসেবে একটি হাদীস পেশ করে থাকেন। হাদীসটি আলী ইবনে আবূ তালহা থেকে বর্ণিত। বলেছেন, কাব ইবনে মালিক (রা) আহলি

কিতাবের একটি মেয়ে বিয়ে করার ইচ্ছা করলেন। তিনি এ বিষয়ে রাসূলে করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু তাকে তা করতে নিষেধ করলেন। বললেন ঃ انها لاتحصنك না, সে তোমার পবিত্রতা সংরক্ষিত করতে পারবে না।

রাসূলের এই নিষেধ কিতাবী মেয়ে বিয়ে করা বিপর্যয়ের কারণ স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। বলা যেতে পারে যে, এই হাদীস সূত্রের দিক দিয়ে منقطع বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত। এরূপ হাদীস নিয়ে কুরআনের স্পষ্ট প্রকাশ্য ঘোষণার উপর আপত্তি তোলা বা ভিন্ন মত প্রমাণ করতে চেষ্টা করা চলে না। কেননা কুরআন তো সে কথাকে নাকচ করে দিয়েছে। আর তাতে কোন বিশেষীকরণ নেই। যদি তা প্রমাণিতও হয়, তাহলেও হতে পারে তা শুধু মাকরূহ, যেমন হযরত উমর (রা)-এর কথায়ও সেই মাকরূহই বলা যায়। তিনি হযরত হুযায়ফা (রা)-কে হারাম বলে নিষেধ করেন নি, তিনি মাকরূহ মনে করেন, এই হিসেবেই নিষেধ করেছিলেন। তাছাড়া রাসূলের কথা ঃ 'সে তোমার পবিত্রতা রক্ষা করবে না' لاتحصنك যদি প্রমাণিতও হয়, তবু তাতে বিয়ে জায়েয নয়, প্রমাণিত হয় না। কেননা হতে পারে, মেয়েটি নাবালেগ ছিল। আর নাবালেগা তাঁর পবিত্রতা রক্ষা করতে পারবে না, কথাটি তো সত্য। ক্রীতদাসীও তাই। তবে এ দুটি ক্রীতদাসী ও অল্প বয়স্কা— মেয়ে বিয়ে করা যে জায়েয, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মুসলমানদের সাথে যে আহলি কিতাবরা যুদ্ধরত, তাদের মেয়ে বিয়ে করা পর্যায়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল ওয়াসেতী, জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ইয়ামন, আবূ উবায়দ, উব্বাদ ইবনুল আওয়াম, সুফিয়ান ইবনে হুসায়ন, হিকাম, মুজাহিদ, ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ

لَاتَحِلُّ نِسَاءُ اَهْلِ الْكِتَابِ اِذَا كَانُوْا حَرْبًا –

আহলি কিতাব যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকে তাহলে তাদের মেয়েদের বিয়ে করা মুসলমানদের জন্যে হালাল নয়।

এই কথা বলার পর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ –

হে মুসলমান, তোমরা যুদ্ধ কর সেই লোকদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার নয়। (সূরা তওবা ঃ ২৯)

...... শেষ শব্দ وَهُمْ صَاغِرُوْنَ 'তারা ছোট'।

আল-হিকাম বলেছেন; আমি এই ঘটনা ইবরাহীম নখয়ীকে বললাম। তিনি তা শুনে বিস্মিত হলেন।

আবূ বকর বলেছেন, সম্ভবত ইবনে আব্বাস (রা) উক্ত কথা বলেছেন মাকরূহ মনে করে। হানাফী ফিকাহবিদগণও তা মাকরূহ মনে করেন, তবে হারাম মনে করেন না।

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনিও আহলি কিতাবের মধ্য থেকে মুসলমানদের সাথে যুধ্যমান লোকদের মেয়েদের বিয়ে করা মাকরূহ মনে করতেন।

আর আল্লাহ্র কথা ঃ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ

তোমাদের পূর্বে কিতাব পাওয়া লোকদের মধ্যে সুরক্ষিত মেয়েরা .........।

এতে যুধ্যমান ও অ-যুধ্যমান আহলি কিতাব মেয়েদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। যিম্মীরাও এদের মধ্যে শামিল। কোন দলীল ছাড়া কাউকে বিশেষীকৃত করা জায়েয নয়।

আর আল্লাহ্র কথা ঃ 'যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার নয়, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা' কথাটির সাথে বিয়ে জায়েয হওয়া না-হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। বিয়ে নষ্ট হওয়ারও কোন কারণ নেই। যুদ্ধ ফরয হওয়াটা যদি তাদের বিয়ে সহীহ না হওয়ার কোন কারণ হতো, তাহলে খাওয়ারিজদের মেয়ে বিয়ে করাও জায়েয হতো না, বিদ্রোহী লোকদের মেয়ে বিয়ে করাও সহীহ হতো না। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِىْءَ اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ -

তোমরা বিদ্রোহী ফিরকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র দিকে নমনীয় হয়ে ফিরে আসে। (সূরা হুযরাত ঃ ৯)

বোঝা গেল, যুদ্ধ করা ফরয হলেই তাদের মেয়ে বিয়ে করা সহীহ হবে না— এমন কথা নেই। তবে আমাদের হানাফী ফিকাহবিদগণ যে তা মাকরূহ মনে করেছেন, তার কারণ আল্লাহ্র এই কথাটি ঃ

لَاتَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْاۤ اٰبَاۤءَ هُمْ اَوْاَبْنَاۤءَ هُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ -

আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার জনগোষ্ঠীকে সেই লোকদের প্রতি বন্ধুত্ব সম্পন্ন পাবে না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে শত্রুতা ও বিরুদ্ধতা করে,— তারা তার বাপ-দাদা, পুত্র -সন্তান, ভাই বা বংশের লোক-ই হোক-না-কোন। (সূরা মুযাদিলাহ ঃ ২২)

বিয়ে প্রেম ভালবাসা পোষণকে ফরয করে। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَّرَحْمَةً -

এবং তিনি তোমাদের— স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-ভালোবাসার সৃষ্টি করে দিয়েছে। (সূরা রূম ঃ ২১)

তাই যখন জানা গেল যে, বিয়ে প্রেম-ভালোবাসার উদ্রেককারী এবং তা কর্তব্য, এইজন্যে যুধ্যমান আহলি কিতাবের মেয়ে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে, তখন তাঁরা এই বিয়েকে মাকরূহ মনে করবেন, এটাই তো স্বাভাবিক।

আল্লাহ্র কথা ঃ 'বন্ধুত্ব পোষণ করে সেই লোকদের প্রতি, যারা আল্লাহ্র ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধতা ও শত্রুতা করে' এ পর্যায়ে আহলি কিতাবই গণ্য। যিম্মী অমুসলিমরা গণ্য নয়। কেননা حاد শব্দটি حد থেকে উদ্ভূত। ওরা حد-এর মধ্যে রয়েছে। আমরাও حد-এর মধ্যেই আছি। বিভক্তি ও বিভাজনও অনুরূপ কথা। অর্থাৎ তারা এক ভাগে, আমরা আর এক ভাগে। আর এটাই আহলি কিতাবের পরিচিতি। যিম্মীদের নয়। এই কারণে তারা এই বিষয়কে মাকরূহ বলেছেন।

আর একটি দিক হল, এই বিয়ের ফলে যে সন্তান জন্মিবে, তা দারুল হরবে জন্মিবে। দারুল হরবের শিক্ষা-দীক্ষা, ভাবধারা ও চরিত্র তারা অবশ্যই গ্রহণ করবে। তা নিশ্চয়ই ইসলাম সম্মত

হবে না। এই কারণেই সে বিয়েকে মাকরূহ মনে করা হয়েছে। এই বিয়ে নিষেধকরণের মূল কারণও এই। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

أَنَا بَرِئٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ بَيْنَ ظَهْرَانِى الْمُشْرِكِيْنَ -

মুশরিকদের প্রভাবাধীন বসবাসকারী মুসলিম ব্যক্তির দায়িত্ব থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত।

তিনিও বলেছেন ঃ 'মুশরিকদের সাথে বসবাসকারী মুসলিমের কোন দায়িত্ব আমার উপর বর্তায় না।'

যদি প্রশ্ন তোলা হয়, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার জনগোষ্ঠীকে তুমি সেই লোকদের প্রতি বন্ধুত্বশীল পাবে না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি শত্রুতা পোণষ করে যে বিশেষভাবে নিশ্চিতকারী এই কথার ঃ তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রাপ্তদের সুরক্ষিত মেয়েগণ— একথা তো তুমি অস্বীকার কর না ? এই কথাটি কেবলমাত্র যিম্মী মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যুধ্যমান মেয়েদের সম্পর্কে নয়।

জবাবে বলা যাবে, প্রথমোক্ত আয়াতটি বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা পোষণ করতে নিষেধ করেছে। কিন্তু নিছক বিয়ে সম্পর্ক স্থাপন সম্পর্কে এ আয়াত কিছুই বলছে না। যদিও বিয়ে বন্ধুত্ব ভালোবাসার কারণ হয়। কিন্তু শুধু বিয়েটাই তো আর বন্ধুত্ব ভালোবাসার নাম নয়। তবে তা-ই যে শেষ পর্যন্ত বন্ধুত্ব-ভালোবাসার সৃষ্টি করে, তা-ও নিঃসন্দেহ। এই কারণে মনীষীরা ওদের ছাড়া অন্য মেয়ে বিয়ে করাকে অধিক পছন্দ করেছেন, ওদের বিয়ে করা মাকরূহ ঘোষিত হয়েছে।

যদি বলা হয়, মুশরিক মেয়ে বিয়ে করতে নিষেধ করার পর-পরই বলা হয়েছে ঃ أُولٰئِكَ يَدْعُوْنَ إِلَى النَّارِ 'ওরা জাহান্নামের দিকে ডাকে।' বোঝা যায় যে, ঠিক এই কারণেই ওদেরকে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। ঠিক এই কারণই নিহিত রয়েছে আহলি কিতাব, যিম্মী ও যুধ্যমান লোকদের মেয়ে বিয়ে করার ক্ষেত্রে সমানভাবে। তাই এই কারণেই ওদের সবাইকে বিয়ে করা হারাম হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেমন মুশরিক মেয়ে বিয়ে করা হারাম ঘোষিত হয়েছে।

এর জবাবে বলা যাবে, একথা জানা আছে যে, মুশরিক মেয়ে বিয়ে করতে নিষেধ করার আসল কারণ ঠিক এটাই নয়। কেননা যদি তা-ই হতো, তাহলে তাদেরকে বিয়ে করা কোন অবস্থায়ই হালাল হওয়া উচিত ছিল না। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুশরিক মেয়ে বিয়ে করা মুবাহ ছিল, যদিও পরে তাদের বিয়ে করা হারাম ঘোষিত হয়। তখনও তারা জাহান্নামের দিকে আমাদেরকে ডেকে নেয়ার কাজটা করছিল। বোঝা গেল, ওদের বিয়ে করা হারাম হওয়ার মৌল কারণ এটাই নয়। হযরত নূহ (আ) ও হযরত লূত (আ)-এর স্ত্রীও কাফির ছিল, অথচ তারা দুইজন আল্লাহ্‌র দুই বরগজীদাহ নবীর স্ত্রী ছিল। আল্লাহ নিজেই তাদের উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوْحٍ وَّامْرَأَتَ لُوْطٍ ، كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِيْنَ -

আল্লাহ কাফিরদের জন্যে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন নূহ ও লূত-এর স্ত্রীদের কথা। ওরা দুজন আমাদের দুই নেক বান্দার স্ত্রী ছিল। পরে তারা দুইজনের সাথে খিয়ানত করেছে। কিন্তু তারা দুজন তাদেরকে আল্লাহ্‌র ফয়সালা থেকে রক্ষা করতে পারেনি একবিন্দুও। বলা হয়েছে, তোমরা দুজন জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সঙ্গে জাহান্নামে প্রবেশ কর।

(সূরা তাহ্‌রীম ঃ ১০)

দেখা গেল— দুজনের স্ত্রীরা কাফির, তা সত্ত্বেও তাদের সাথে নবীদ্বয়ের বিয়ে সঠিক রূপেই আল্লাহ্ মেনে নিয়েছেন। বোঝা গেল, কুফর বিয়ে সহীহ না হওয়ার আসল কারণ নয়। যদিও আল্লাহ তা'আলা মুশরিক মেয়ে বিয়ে করা হারাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বলে দিয়েছেন যে, 'ওরা জাহান্নামের দিকে ডাকে।' বাহ্যত মুশরিক মেয়ে বিয়ে করা বাতিল হওয়ার এটাই কারণ বলে মনে হয়। এরূপ তাৎপর্যই শরয়ী ইল্লাতের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে। তাই যে নামের সাথে হুকুমটা সম্পর্কিত, তাতে কোন তাগিদ নেই। অতএব তার বিশেষীকৃতকরণ সঙ্গত যেমন নামের বিশেষীকরণ। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'এবং কিতাব পাওয়া লোকদের সংরক্ষিতা মেয়েলোক'— নামের সাথে সম্পর্কিত হারামকরণকে এর সাথে বিশেষীকরণ করা সম্ভব ও বৈধ। তাহলে 'শরয়ী ইল্লাত' হিসেবে যে তাৎপর্য পেশ করা হয়েছে তার উপর হুকুমটিকে বিশেষীকরণ করা যেতে পারে। তার দৃষ্টান্ত আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ -

শয়তান তো শুধু মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের উদ্রেক করতে চায় এবং চায় তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকির করার ব্যাপারে বাধাগ্রস্ত করতে। (সূরা মায়িদাহ ঃ ৯১)

মদ্যপানের ফলে যে নিষিদ্ধ ব্যাপারাদি ঘটে, সেগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে মূল আয়াতে এবং তাকেই ইল্লাতের স্থানে বসানো হয়েছে। কিন্তু তার কার্যে তাকে রাজী করা কর্তব্য নয়। কেননা যদি তা-ই হতো তাহলে তো সকল প্রকারের ক্রয়-বিক্রয়, বিয়ে-শাদী, লেন-দেনের চুক্তিই হারাম হয়ে যেত এইজন্যে যে, শয়তান এই সবের মাধ্যমে আমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট রয়েছে। শয়তান এগুলোর সাহায্যে আমাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকির থেকে বিরত রাখতে চাইতে পারে। তাই যেসবের মধ্যে এই তাৎপর্য রয়েছে, সেই সবকে গণ্য করা যখন জরুরী নয়; বরং যে জিনিসটির উল্লেখ করা হয়েছে, হুকুমটাকে কেবল সেই জিনিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা এবং অন্য কোন কিছু তার মধ্যে শামিল না করাই উদ্দেশ্য। যেসব শরয়ী কারণ বা ইল্লাতের ব্যাপারে অকাট্য দলীল এসেছে, সেই সবের হুকুমও সেইরূপই হবে। শরয়ী ইল্লাতসমূহ বিশেষীকরণের ক্ষেত্রে এভাবেই যুক্তি পেশ করা হয়। অতএব যেমন বলেছি, বিয়ে হারাম হওয়ার হুকুমটি কেবলমাত্র মুশরিক মেয়েদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে, অন্যদেরকে তার মধ্যে শামিল করা যাবে না। ওরা জাহান্নামের দিকে আমাদেরকে ডাকে। এটা বলা হয়েছে মুশরিক নারী বিয়ে করা নিষেধের উপর তাগিদ বোঝাবার জন্যে। অতএব এই নিষেধ অন্য কাউকে আওতার মধ্যে আনবে না। কেননা শিরক ও জাহান্নামের দিকে ডাক ওদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ। তা কিতাবী মেয়েলোকদের মধ্যে অনুপস্থিত। এ কথাও বলা হয়েছে যে, আরবের যুধ্যমান মুশরিকদের মধ্যে ছিল আল্লাহ্‌র

রাসূলের এবং মুমিনদের জন্যে। তাই তাদেরকে বিয়ে করা থেকে তাঁদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। যেন তাদের প্রতি প্রেম-ভালোবাসা সৃষ্টি কারণ হয়ে দাঁড়াতে না পারে। কেননা তাহলে ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দায়িত্ব পালনে ত্রুটি হয়ে পড়তে পারে। তবে এই নিষেধ যিম্মীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাদের প্রতি প্রেম-ভালোবাসা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকার কারণ হবে না, ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার তো কোন প্রশ্ন নেই। এই কারণ যদি কিতাবী যুধ্যমান মেয়েদের ক্ষেত্রেও দেখা দেয়, তাহলে নিষেধের মৌলিক কারণ থাকার দরুন তাদেরকে বিয়ে করাও নিষিদ্ধ হবে। কাজেই এই হুকুমের কারণে কার্যের দিকে প্রত্যাবর্তন ছাড়া কোন উপায় নেই।

আল্লাহ্ কথা ঃ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ

ঈমানদার ক্রীতদাসী মুশরীক মেয়ের তুলনায় অনেক ভালো।

মুমিন ক্রীতদাসী বিয়ে করা জায়েয প্রমাণ করে স্বাধীনা বিয়ে করার সামর্থ্য থাকা অবস্থায়ও। কেননা আল্লাহ্ স্বাধীনা মুশরিক মেয়ে বিয়ে করার পরিবর্তে ক্রীতদাসী মুমিন মেয়ে বিয়ে করার আদেশ করেছেন ঈমানদার লোকদেরকে। যে লোক স্বাধীনা মুশরিক মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্যের অধিকারী, সে স্বাধীনা মুসলিম মহিলাও বিয়ে করতে পারে। কেননা বিয়ের মহরানার পরিমাণে এ দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অবস্থা যখন এই, তখন 'মুশরিক মেয়ে তোমাদের খুব বেশী পছন্দ হলেও ঈমানদার ক্রীতদাসী অনেক ভালো'—আল্লাহ্‌র এই কথা অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে। মুশরিক মেয়ে বিয়ে না করে মুমিন ক্রীতদাসী বিয়ে করার উৎসাহ দান কেবল তখনই সহীহ্ হতে পারে, যদি সে মুসলিম স্বাধীন নারী বিয়ে করার সামর্থ্যের অধিকারী হয়। আয়াতে একথা শামিল হয়েছে যে, স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ক্রীতদাসী মুমিন মেয়ে বিয়ে করা জায়েয। অপর দিক দিয়ে একথাও বোঝা যায় যে, সামর্থ্যবান ও সামর্থ্যহীন নির্বিশেষে মুশরিক নারী বিয়ে করা মুসলমানদের জন্যে সাধারণভাবেই নিষিদ্ধ। ধনী ও গরীব সমান। এই কথার পরই বলা হয়েছে ঃ মুশরিক মেয়ে অপেক্ষা মুমিন ক্রীতদাসী অধিক উত্তম। কাজেই তাকে মুশরিক মেয়ে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে, তাকে ক্রীতদাসী বিয়ে করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। তা-ও ধনী-গরীব সকলের জন্যেই সমান। উভয়ের জন্যেই ক্রীতদাসী মেয়ে বিয়ে করা জায়েয।

## হায়য

আল্লাহ্‌র ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ -

হে নবী, আপনাকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করে 'হায়য' (রজঃস্রাব) সম্পর্কে। আপনি বলে দিন, তা এক অপবিত্র ও ময়লাযুক্ত অবস্থা। অতএব তোমরা তখন এই হায়য অবস্থায়— স্ত্রীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাক।

المحيض কখনও মূল হায়য-এর নাম, হায়য-এর স্থানের নাম-ও হতে পারে। যেমন আরবীতে المقيل শয়ন-বিশ্রামের স্থান, المبيت রাত যাপনের স্থান বলা হয়। কিন্তু শব্দটির ব্যবহারে এখানে এমন ভাব রয়েছে, যার দরুন বোঝা যায় যে, আলোচ্য আয়াতে المحيض অর্থ হায়য। কেননা প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে هُوَ اَذًى তা অপবিত্র ও ময়লাযুক্ত অবস্থা।' এটা

মূল হায়য-এরই পরিচিতি, হায়য-এর স্থানের বর্ণনা নয়। লোকদের প্রশ্ন ছিল মূলত হায়য-এর হুকুম সম্পর্কে এবং এই অবস্থায় তাদের করণীয় কি, সে সম্পর্কে। কেননা তখন মদীনার প্রতিবেশী ইয়াহূদী সমাজে এরূপ অবস্থায় তাদের স্ত্রীদের সম্পূর্ণ 'বয়কট' করা হতো। তাদের সাথে একসাথে পানাহার করা হতো না, একত্রে মাখামাখিও করা হতো না, একত্রে উঠা-বসাও করা হতো না। তা-ই লোকেরা জানতে চেয়েছিল, এরূপ অবস্থায় ইসলামের হুকুমটা কি? আল্লাহ্ জবাবে তাদেরকে বলতে বলেছেন ঃ هُوَ اَذًى 'তা অপবিত্র, ময়লা'। তার এই বিবরণ দেয়ার ঐকান্তিক দাবি হচ্ছে, এরূপ হলে স্ত্রীকে পরিহার করতে হবে। কেননা তারা আগে থেকেই জানতো যে, অপবিত্রতা ও ময়লা আবর্জনা অবশ্যই পাশ কাটাতে ও এড়িয়ে যেতে হবে। তাই এখানে এমন একটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যা অর্থ দাঁড়ায়, তা এড়িয়ে চলার নির্দেশ। এ-ও বোঝা যায় যে, الاذى শব্দটি ময়লা অপবিত্রতা বোঝার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। নবী করীম (স)-এর একটি কথা এর প্রমাণ। তিনি বলেছেন ঃ

اِذَا اَصَابَ نَعْلَ اَحَدِ كُمْ اَذًى فَلْيُمْسَحْهَا بِالْاَرْضِ وَالْيُصَلِّ فِيْهَا فَاِنَّهُ لَهَا طُهُوْرٌ -

তোমাদের কারোর জুতায় ময়লা লাগলে জুতাটি মাটির সাথে ঘসবে ও ময়লা মাটিতে পৌঁছে দেবে। কেননা এটাই তার পবিত্রতা।

এ হাদীসে ময়লা-অপবিত্রতাকে اذى বলা হয়েছে। তাছাড়া যখন জানাই আছে যে, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'বল, তা ময়লা-অপবিত্রতা' এর অর্থ শুধু জানিয়ে দেয়াই উদ্দেশ্য, নয়, শুধু জানলেই কোন ফায়দা হয় না বলে, বরং তার অপবিত্রতার কথা জানিয়ে দেয়া এবং তা এড়িয়ে চলতে বাধ্য করাই এর আসল উদ্দেশ্য। তবে সব الاذى-ই অপবিত্র নয়। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ -

বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হলে তাতে তোমাদের কোন দোষ হবে না। অথচ বৃষ্টি নাপাক জিনিস নয়। (সূরা নিসা ঃ ১০২)

বলেছেন ঃ

وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا -

তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্বে কিতাবপ্রাপ্ত ও শিরককারী লোকদের থেকে অনেক কষ্ট পাবে।

পূর্বোদ্ধৃত আয়াতে الاذى শব্দটি নাপাকি বোঝায়, তা আবর্জনা ও ময়লার অর্থ দেয়। তা এমন যে, তা এড়িয়ে চলা একান্তই কর্তব্য বিবেচিত হয়। কেননা তা-ই করতে বলা হয়েছে, প্রশ্নকারীরা এই করণীয় জানবার উদ্দেশ্যেই প্রশ্ন করেছিল।

হায়য হয় যে স্ত্রীর, তার কোমরের উপর এলাকা থেকে স্বাদ আস্বাধন জায়েয— এই বিষয়ে ফিকাহবিদগণ একমত। অতঃপর আর কি পরিহার করতে হবে, এই প্রশ্নের তাঁরা বিভিন্ন

জবাবে দিয়েছেন। এ পর্যায়ে নবী করীম (স) থেকে توقيف এসেছে যা হযরত আয়েশা ও মায়মুনা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। তা হচ্ছে, নবী করীম (স) তাঁর স্ত্রীদের সাথে মুবাশিরাত করতেন যখন তারা 'হায়য' অবস্থায় ছিল এবং তা করতেন পরিধেয় বস্ত্রের উপর থেকে। এ বিষয়েও সকলে একমত যে, স্ত্রী অঙ্গকে এগিয়ে যেতে হবে। পরিধেয় বস্ত্রের নিম্নদেশ থেকে সুখ লাভ পর্যায়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। অবশ্য তা রক্তের চিহ্ন থেকে সরে থাকার পরবর্তী ব্যাপার।

হযরত আয়েশা ও উম্মে সালমাতা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি স্ত্রী অঙ্গ বাদ দিয়েই তাদের সাথে সঙ্গম করতেন। সওরী ও মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানও তাই বলেছেন। বলেছেন, রক্তের স্থানকে অবশ্যই এড়িয়ে যেতে হবে। আল-হাসান, শবী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব ও দহাক থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, পরিধেয়র উপর থেকে যতটা সুখ পাওয়া সম্ভব ততটা। আবূ হানাফী, আবূ ইউসূফ, আওজায়ী, মালিক ও শাফেয়ীরও এই কথা ।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ -

তোমরা হায়য অবস্থায় স্ত্রীদের পরিহার কর এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের নিকটেও যাবে না।

আয়াতটি দুটি দিক দিয়ে বস্ত্র নিম্ন অংশ নিষেধ বোঝাচ্ছে। একটি— আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমারা হায়য অবস্থায় স্ত্রীদের পরিহার কর।' অর্থাৎ পরিধেয় বস্ত্রের নিচের অংশ ও উপরের অংশ পরিধান করা বাধ্যতামূলক হওয়ার দাবি করে। উপর থেকে সুখ লাভ সম্পর্কে তারা সকলে একমত। আমরা মেনে নিলাম, এটাই আয়াতের ইঙ্গিত। তা বাদে অপরাপর অংশ থেকে সুখ লাভ পর্যায়েই নিষেধ দাঁড়িয়ে আছে।

আর দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, আল্লাহ্‌র কথা وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ 'এবং তোমরা তাদের নিকটেও যাবে না।' প্রথমোক্ত শব্দ থেকে বোঝা যায়, তাই এই কথাটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে। মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে তা থেকে কিছুই বিশেষীকৃত করা যাবে না। তবে যদি কোনটির দলীল পাওয়া যায়, তবে ভিন্ন কথা।

হাদীসও এই কথাটি-ই বোঝায়। তাই ইয়াযীদ, ইবনে আবূ উনায়সা, আবূ ইসহাক, উমাইর মাওলা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইরাকের কিছু লোক 'হায়য' সম্পন্না স্ত্রীরা কি হালাল সে বিষয়ে হযরত উমর (রা)-কে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে জবাবে তিনি বললেন, আমি নবী করীম (স)-কে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ

لَكَ مِنْهَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَلَيْسَ لَكَ مِنْهَا مَا تَحْتَهُ -

'ইজার'— পরিধেয় বস্ত্রের উপর থেকে তোমার সুখলাভের অধিকার আছে। তার নিচ থেকে সুখলাভের তোমার কোন অধিকার নেই।

শায়বানী আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ, তাঁর পিতা, আয়েশা (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, 'আমাদের নবী বেগমদের কোনজন হায়য সম্পন্না হলে নবী করীম (স) তার হায়য এর উথলিয়ে উঠা অবস্থায় শক্ত করে পরিধেয় বস্ত্র বাঁধতে বলতেন। তারপর 'মুবাশিরাত' 'কোলাকুলি' করতেন। এভাবে তোমাদের প্রত্যেকেই তার প্রয়োজন পূরণ করে নিতে পারে,

যেমন নবী করীম (স) তাঁর প্রয়োজন পূরণ করতেন। শায়বানী আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ, মায়মুনা সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা প্রচার করেছেন, পরিধে বস্ত্রের নিচের এলাকা থেকে সুখ লাভ মুবাহ। এই মত যারা পোষণ করেন, তাঁরা হাম্মাদ ইবনে সালমাতা বর্ণিত হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। হাদীসটি সাবিত আনাস সূত্রে বর্ণিত। বলা হয়েছে, ইয়াহূদীরা হায়য সম্পন্না স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করে দিত। তাদের সাথে একত্রে খাওয়া-দাওয়াও করত না। তাদের সাথে ঘরে একত্রিত হতো না। তখন এ বিষয়ে নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে আল্লাহ এ আয়াতটি নাযিল করেন। তিনি এ প্রেক্ষিতে বলেছেন, তোমরা তাদেরকে নিয়ে ঘরে একত্রে বাস কর এবং যৌন সঙ্গম ছাড়া আর সব কিছুই তাদের সাথে কর। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) তাঁকে বলেছেন ঃ فَارِيْنِى الْخُمْرَةَ 'আমাকে স্বাদ আস্বাদনের ব্যবস্থা কর।' তিনি বললেন, আমার হায়য চলছে। বললেন, তোমার হায়য তো তোমার হাতে নয়।'

মনীষীরা বলেছেন, এ থেকে বোঝা যায়, হায়য দেহের প্রত্যেকটি অংশে লেগে থাকে না ও সেগুলো নিষিদ্ধ হয়ে স্পর্শ অযোগ্য হয়ে যায় না। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার তেমনি চলবে, যেমন 'হায়য' হওয়ার আগে পবিত্র অবস্থায় হতো।

সুখ লাভ জায়েয এ বিষয়ে এবং পরিধেয় বস্ত্রের নিচে থেকে সুখ লাভ জায়েয, এই পর্যায়ে যে জবাবে দেয়া হয়েছে, সেই পর্যায়ে হযরত আনাস বর্ণিত হাদীসে যা বলা হয়েছে, তাতে আয়াতটির নাযিল হওয়ার কারণের উল্লেখ রয়েছে। ইয়াহূদীরা যা করত, তা-ও এক্ষেত্রে সামনে রাখতে হবে। তাতে তাদের বিরোধিতা করারই নির্দেশ রয়েছে। আমরা হায়য সম্পন্ন স্ত্রীদের ঘর থেকে বহিষ্কৃত করে দেব না। তাদের সাথে উঠা-বসা ছাড়তে হবে না। রাসূলের কথা 'যৌন-সঙ্গম ছাড়া আর যা চাও, কর' থেকে বোঝা যায় যে, স্ত্রী অঙ্গ ছাড়া অন্যত্র সঙ্গমও করা যাবে। কেননা ও এক প্রকারের সঙ্গম। হযরত উমর (রা) বর্ণিত হাদীস— পূর্বে যার উল্লেখ করেছি— শেষের দিকে বলা এবং তা-ই এ বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসাকারী। তার প্রমাণ এই যে, আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসে আয়াতটির নাযিল হওয়া সংক্রান্ত অবস্থার কথা বলা হয়েছে। আর উমর (রা) বর্ণিত হাদীস তার পরে বলা কথা। কেননা তাতে আয়াতটির নাযিল হওয়ার অবস্থা বলা হয়নি। তাতে প্রশ্ন করা হয়েছে, স্ত্রীর হায়য অবস্থায় তার সাথে কি আচরণ হালাল— সেই বিষয়ে আর তা নিঃসন্দেহে আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসের পরবর্তী ব্যাপার। তা দুদিক দিয়ে বিবেচ্য। একটি, তাতে কি ব্যবহার হালাল, সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়নি। অথচ হায়যধারী স্ত্রীর নিকটে যাওয়া হারাম— একথা আগেই বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় এই যে, তার পেছনে আয়াতটির নাযিল হওয়াকালীন অবস্থা সম্পর্কে যদি প্রশ্ন করা হতো, তাহলে হযরত আনাস নবী করীম (স) থেকে যা-ই বর্ণনা করেছেন, তাই যথেষ্ট ছিল। তাতে তিনি বলেছেন, 'যৌন-সঙ্গম ছাড়া আর সব কিছুই করতে পার।' এতে প্রমাণ রয়েছে এই কথার যে, উমর (রা)-এর প্রশ্ন ছিল তার পর। অপর দিক দিয়ে বিবেচ্য উমর বর্ণিত হাদীস ও আনাস বর্ণিত হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দিলে হযরত উমর বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী আমাল করতে হবে। কেননা তাতে স্ত্রী অঙ্গ ছাড়া অন্যত্র যৌন কর্ম করা নিষিদ্ধ হয়েছে। অথচ আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসে তা মুবাহ বলা হয়েছে। আর একই বিষয়ে মুবাহ ও নিষিদ্ধ— এই দুরকমের কথা আসলে নিষিদ্ধটা মেনে নিতে হবে। অপর দিক দিয়ে হযরত উমর (রা)-এর মনীষা বাহ্যত কুরআনকে সমর্থন দিচ্ছে। আর তা হচ্ছে এই আয়াত ঃ

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ -

তোমরা স্ত্রীদের বিচ্ছিন্ন কর এবং তাদের পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটেও যাবে না।

আনাস (রা) বর্ণিত হাদীস তাকে বিশেষীকৃত করে। আর যে হাদীস কুরআনের সাথে সঙ্গতি সম্পন্ন হবে তা-ই উত্তম সেই বিশেষীকৃতকরণ থেকে। আর একটি দিক হল, আনাস (রা) বর্ণিত হাদীস مجمل অস্পষ্ট, সাধারণ। কোন নির্দিষ্ট স্থান মুবাহ হওয়ার কোন কথা তাতে নেই। আর উমর (রা) বর্ণিত হাদীস পরিধেয় বস্ত্রের উপর থেকে বা নিচ থেকে সুখ লাভের ব্যাপারে ব্যাখ্যাদানকারী।

## হায়য-এর তাৎপর্য ও তার পরিমাণ

আবূ বকর বলেছেন, হায়য রক্তের একটা পরিমাণের নাম। তার সাথে শরীয়াতের হুকুমের সম্পর্ক রয়েছে। যেমন নামায পড়া হারাম হওয়া, রোযা রাখা হারাম হওয়া, যৌন সঙ্গম নিষিদ্ধ হওয়া, ইদ্দত শেষ হওয়া, মসজিদে প্রবেশ না করা, কুরআন গ্রন্থ স্পর্শ না করা, কুরআন পাঠ না করা, মেয়ের পূর্ণ বয়স্কা হওয়া। রক্তস্রাবের সঙ্গে এসব বিষয়ের হুকুম ওতপ্রোত সম্পর্কিত। তাই হায়যের পরিমাণের প্রশ্ন উঠেছে যে, কতটা পরিমাণ রক্তস্রাব হলে হায়য বলা যাবে। এসব সংক্রান্ত হুকুম তার সাথে সম্পর্কিত না হলে তাকে 'হায়য' বলা যাবে না। লক্ষণীয় যে, যার হায়য হয়, সে কতিপয় দিন রক্তস্রাব হতে দেখে। সেই দিনগুলো শেষ হয়ে গেলে একই অবস্থায় ফিরে আসে। তাহলে এই নির্দিষ্ট দিনগুলোতে যে রক্তস্রাব হল তাকে 'হায়য' বলা হবে। কেননা এই কয়দিনে রক্তস্রাব হওয়ার কারণে শরীয়াতের অনেক বিষয়ের হুকুম তার সাথে সম্পর্কিত হয়ে গেছে। তার দিনগুলো শেষ হয়ে যাওয়ার পরবর্তী ব্যাপারের সাথেও অনুরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন রয়েছে। রক্তস্রাব থাকা সত্ত্বেও তার সাথে এই হুকুমসমূহের সম্পর্ক না হলে তার 'হায়য' হয়েছে বলা যাবে না।

গর্ভবতী সম্পর্কেও আমরা বলব, তার হায়য হয় না। তা সত্ত্বেও সে কখনও কখনও রক্তস্রাব হতে দেখতে পারে। কিন্তু সে রক্তস্রাবের সাথে উপরে উল্লেখ করা বিষয়াদির হুকুমের সম্পর্ক হয় না। তাকে হায়য বলা যাবে না। সে হায়য-এর রোগে আক্রান্ত মনে করতে হবে। অনেক সময় দীর্ঘকাল ধরেও সে রক্ত দেখতে পায়। কিন্তু তা তো হায়য নয়। যদি রক্তটা ঠিক হায়য-এর রক্তের মতই হবে। নির্দিষ্ট দিনগুলোতে রক্ত দেখলে তবেই তা হায়য মনে করা যাবে। তাহলে 'হায়য' হচ্ছে সেই রক্তের রক্তস্রাবের নাম, যার সাথে শরীয়াতের উক্ত সব বিষয়ের সম্পর্ক জড়িত হবে, যদি তার একটা পরিমাণ পাওয়া যায়। নামায পড়া, রোযা রাখা, যৌন সঙ্গম করা এবং হায়য অবস্থায় আর যা যা পরিহার করতে হয়, সেই ক্ষেত্রে হায়য ও নিফাস (সন্তান প্রসবজনিত রক্তস্রাব) অভিন্ন। দুটি দিক দিয়েই এ দুটির মধ্যে পার্থক্য হয়। একটি, হায়য-এর সময়কাল ঠিক তা-ই নয়, যা নিফাস এর সময়কাল। আর দ্বিতীয়, নিফাস ইদ্দত শেষ হওয়া না হওয়ার কোন ভূমিকা রাখে না। মেয়ের বালেগা হওয়ার ব্যাপারেও নয়।

আবুল হাসান 'হায়য'-এর সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এই বলে যে, তা সেই রক্ত, যা স্ত্রীর জরায়ু থেকে নির্গত হয়। তা প্রথমত হলে বোঝা যাবে যে, মেয়ে পূর্ণ বয়স্কা হয়েছে। পরে স্ত্রীলোক সময় সময় একটা মেয়াদকাল এই রক্তস্রাবের সম্মুখীন হবে। আমাদের মতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, পূর্বে বয়স বা স্বপ্নদোষ, কিংবা যৌন সঙ্গমে বীর্যপাত ইত্যাদি দ্বারা যদি মেয়ে পূর্ণ বয়স্কা হয়েছে বলে প্রমাণিত না-হয়, তাহলে প্রথম বারের এই মেয়াদী রক্তস্রাবে সে বালেগা

হয়েছে বলে প্রমাণিত হবে। পূর্বে যদি ওসবের দ্বারা তার পূর্ণবয়স্কতা প্রমাণিত হয়ে থাকে, তারপরে রক্তস্রাব দেখে, তাহলে বুঝতে হবে, তার হায়য, যদি তা হায়য-এর নির্দিষ্ট সময়কাল ধরে দেখে যদিও তার পূর্বে তদ্দ্বারা সে বালেগা না-ও হয়ে থাকে।

হায়য-এর সময়কাল কত ? ফিকহবিদগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, হায়য-এর কম সে-কম মিয়াদ হচ্ছে তিন দিন। আর বেশির পক্ষে দশ দিন। সুফিয়ান সওরীও এই মত দিয়েছেন। হানাফী মাযহাবের এটাই প্রসিদ্ধ মত। আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদ বলেছেন, রক্তস্রাব যদি দুই দিন বা তৃতীয় দিনের বেশি সময় থাকে, তাহলে তা হায়য। ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আবূ হানীফার কথা প্রায় এক।

ইমাম মালিক বলেছেন, কম মিয়াদের সময় নির্দিষ্ট নয়। বেশি সময়ও অনির্দিষ্ট।

আবদুর রহমান ইবনে মাহদী ইমাম মালিকের এই মত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মনে করেন, হায়য-এর বেশির পক্ষে সময়কাল হচ্ছে পনের দিন। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে ফারিস, হারুন ইবনে সুলায়মান আল জাজার, আবদুর রহমান ইবনে মাহদী সূত্রে এই বর্ণনা এনেছেন।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, হায়য-এর কম-সে-কম মিয়াদ এক দিন ও এক রাত্রি। আর বেশির মিয়াদ পনের দিন। আবদুর রহমান ইবনে মাহদী ইবনে হাম্মাদ ইবনে সালামাতা, আলী ইবনে সাবিত, মুহাম্মাদ ইবনে জায়দ, সাঈদ ইবনে যুবায়র সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হায়য তেরো দিন পর্যন্ত চলতে পারে। তার বেশি হলে তা হবে 'ইস্তাহাযা'। (হায়যী রোগ)। আতা বলেছেন, পনের দিনের বেশি কাল রক্তস্রাব হলে তা হবে 'ইস্তাহাযা'। আবূ হানীফা আতার মতকেই গ্রহণ করেছিলেন, বলেছিলেন, হায়য-এর কমপক্ষে এক দিন ও এক রাত্রি মিয়াদ, বেশীর পক্ষে পনের দিন। পরে একথা প্রত্যাহার করে সেই মত গ্রহণ করেছেন, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

কম-সে-কম মিয়াদ তিন দিন এবং বেশীর পক্ষে দশ দিন— এই মত যাঁদের, তাঁদের দলীল হচ্ছে একটি হাদীস। হাদীসটি কাসিম আবূ ইমামা— তার সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন ঃ

أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ -

হায়য-এর কম মিয়াদ তিন দিন। আর বেশির পক্ষে দশ দিন।

এই হাদীসটি সহীহ বলে তা অগ্রাহ্য করা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। এরই সমর্থক হচ্ছে উসমান ইবনে আবুল আস, আস্সাকাফী ও আনাস ইবনে মালিক বর্ণিত হাদীস। তাঁরা দুজনই বলেছেন, হায়য তিন দিন। আবার চার দিন থেকে দশ দিন পর্যন্ত। এর বেশি হলে তা 'ইস্তাহাযা'। এ হাদীস থেকে তা-ই বোঝা যায়, যা আমরা বলেছি দুটি দিক দিয়ে। একটি সাহাবীগণের বিপুল সংখ্যকের নিকট যখন কোন কথা প্রকাশিত হয়, খ্যাতি লাভ করে, তার বিপরীত মতের কাউকে পাওয়া না যায়, তখন সেই মতে ইজমা হয়ে যায়। তা পরবর্তীদের জন্যে অকাট্য দলীল হয়ে দাঁড়ায়। উক্ত দুজন সাহাবী থেকে আমাদের কথিত কথা বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের সঙ্গীদের কেউ-ই তার বিপরীত মত দেন নি। ফলে তার অকাট্যতা প্রমাণিত হল। আর দ্বিতীয়, এই পরিমাণ-ই আল্লাহ্র 'হক' ও নিছক ইবাদত। তার প্রমাণ হয় توقيف পদ্ধতিতে কিংবা সর্বসম্মত মতের ভিত্তিতে। যেমন ফরয নামাযের রাক'আত সংখ্যা, রমযানের সিয়াম, দণ্ডের পরিমাণ, উটের যাকাত পরিমাণ। 'হায়য ও তুহর'-এর মিয়াদ পরিমাণ, মহরানা

পরিমাণ, যা বিয়ের বন্ধনে জরুরী শর্ত, নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠ বসার সময় পরিমাণ। এই সবই আমাদের মতে تَوْقِيْفِى আল্লাহ নির্ধারিত। কিয়াসের পন্থায় তা প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

যদি বলা হয়, মেয়েদের সাধারণ অভ্যাসের ভিত্তিতে হায়য-এর মিয়াদকাল নির্ধারণ নিষিদ্ধ নয়, তা হলে তা করতে দোষ কোথায়? উপরন্তু রাসূলে করীম (স) হুমনাতা বিনতে জাহাশ (রা)-কে বলেছিলেন ঃ

تَحِيْضِىْ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ سِتًّا اَوْسَبْعًا كَمَا تَحِيْضُ النِّسَاءُ فِىْ كُلِّ شَهْرٍ -

আল্লাহ্‌র জ্ঞানে তোমার হায়য হয় ছয়, সাত, যেমন মেয়েদের প্রত্যেক মাসেই হায়য হয়ে থাকে।

এই কথা দ্বারা মেয়েদের সাধারণ অভ্যাসকে স্বীকার করা হয়েছে। তা ছয়ও হতে পারে, সাতও হতে পারে। এই প্রেক্ষিতে তিনি দিন কম-সে-কম ও দশ দিন বেশির পক্ষে মিয়াদের কথা যাঁরা বলেছেন, তাঁদের কথা সাধারণ অভ্যাসের দিক দিয়ে যথার্থ বিবেচিত হতে পারে।

এর জবাবে বলা যাবে, আমাদের ও আমাদের বিপরীত মতের লোকদের মাঝে কথা হচ্ছে এমন কম-সে-কম মিয়াদ পর্যায়ে, যার চাইতে বেশি হওয়া সম্ভব নয়। আর সকলেই উল্লিখিত সংখ্যায় সম্পূর্ণ একমত। আর হুমনা (রা)-এর ব্যাপারে তো ছয় কিংবা সাত-এর কোন নির্দিষ্ট সীমা নয়। সময়ের মিয়াদ নির্ধারণে তা গণ্য নয়। ফলে তা দলীল হিসেবে পেশ হতে পারে না মত-পার্থক্যের ক্ষেত্রে। রাসূলে করীম (স) হুমনা (রা)-কে বলেছিলেন ঃ 'তোমার হায়য আল্লাহ্‌র জানা মতে ছয় কিংবা সাত, যেমন মেয়েরা প্রতিমাসেই হায়য-এর সম্মুখীন হয়ে থাকে।' তা আমাদের প্রাথমিক দলীল হতে পারে আমাদের কথার সত্যতার। তার পূর্বে বিবেচ্য রাসূলের কথা ঃ 'যেমন করে মেয়েরা প্রতিমাসে হায়য সম্পন্না হয়' সমস্ত নারী জাতি সম্পর্কিত কথা। সমস্ত নারী জাতি সম্পর্কেই এই কথা বলা যেতে পারে। আর তা-ই তার চাইতে কম সময়কাল ধরে মেয়েদের হায়য সম্পন্না থাকাকে অস্বীকার করে। 'হায়য' তিন দিনের হতে পারে— এই কথায় যদি ইজমার দলীল কায়েম না হতো, তাহলে ছয় কিংবা সাতের কম মিয়াদের হায়য ধরা কারোর পক্ষেই জায়েয হতো না। এ অবস্থায় তিন দিনের হায়য হওয়া পর্যায়ে যখন ঐকমত্য পাওয়া গেল, তখন আমরা হাদীসের সাধারণত্ব থেকে বিশেষীকরণ করে নিলাম। তাই হাদীসের প্রবণতার সাথে সঙ্গতি রেখে তিন দিনের কম মিয়াদের হায়য হতে পারে, একথা আমরা অস্বীকার করলাম। হায়য-এর বেশির মিয়াদ সম্পর্কেও এই দলীল গ্রহণীয়।

একটি হাদীস থেকেও এই কথা প্রমাণিত হয়। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

مَارَاَيْتُ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ اَغْلَبَ لِعُقُوْلِ ذَوِى الْاَلْبَابِ مِنْهُنَّ فَقِيْلَ مَانُقْصَانُ دِيْنِهِنَّ فَقَالَ تَمْكُثُ اِحْدَهُنَّ الْاَيَّامَ وَاللَّيَالِىْ لَا تُصَلِّىْ -

বিবেক-বুদ্ধি ও দ্বীনের দিক দিয়ে কম মাত্রার (মেয়ে) লোকদেরকে তাদের তুলনায় অধিক বুদ্ধিমান লোকদের বিবেক-বুদ্ধির উপর বিজয়ী আর দেখতে পাইনি। জিজ্ঞাসা করা হল

তাদের দ্বীনের দিক দিয়ে ত্রুটিটা কি ? বললেন, ওদের এক-একজন বহু দিন ও রাত্রি এমন অতিবাহিত করে যখন সে নামায পড়ে না।

বোঝা গেল, হায়য-এর মেয়াদটা অবশ্যই এমন হতে হবে, যার বিষয় কয়েক দিন ও কয়েক রাত্রি বলা যেতে পারবে। এই দিক দিয়ে কম-সে-কম হয় তিন দিন এবং অধিকাংশ হয় দশ দিন।

আমাশ-এর-হুবায়ব ইবনে আবূ সাবিত, উরওয়াতা আয়েশাতা (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি থেকেও তা-ই প্রমাণিত হয়। তিনি ফাতিমা বিনতে আবূ হুবায়শ (রা)-কে বলেছিলেন ঃ

اِجْتَنِبِىْ الصَّلَاةَ اَيَّامَ مَحِيْضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِىْ وَتَوَضَّائِىْ لِكُلِّ صَلَاةٍ -

তোমার হায়য-এর দিনগুলোতে তুমি নামায পরিহার কর। পরে গোসল কর এবং প্রতি নামাযের জন্যে অযূ কর।

আল-হিকাম আবূ জাফর-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, সওদা (রা) নবী করীম (স)-কে বললেন, আমার 'ইস্তাহাযা' হয়েছে। তখন তিনি তাঁকে তাঁর হায়য-এর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে (নামায-রোযা থেকে) বিরত থাকতে বললেন। যখন সে মিয়াদ অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তুমি প্রত্যেক নামাযের জন্যে নতুন করে অযূ করে নামায পড়বে। ফাতিমা বিনতে আবূ হুবায়শ (রা) বর্ণিত হাদীসের এ ভাষাও এসেছে ঃ

دَعِى الصَّلَاةَ بِعَدَدِ الْاَيَّامِ الَّتِىْ كُنْتِ تَحِيْضِيْنَ فِيْهَا ثُمَّ اغْتَسِلِىْ -

তোমার হায়য যতদিন থাকবে, সেই কয়টি দিন নামায ছেড়ে দেবে, তার পর গোসল করবে।

উম্মে সালমা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ একটি মেয়েলোক রাসূলে করীম (স)-কে প্রশ্ন করল, তার রক্তস্রাব হয়ে চলেছে, তখন সে কি করবে ? বললেন, মাসে যে কয়দিন ও রাত্রি তুমি হায়য-এ অভ্যস্ত, সেই সময়টা অপেক্ষা করবে ও নামায ত্যাগ করবে মাসের সেই কয়দিন। তার পরে গোসল করে নামায পড়বে। শরীক আবুল ইয়াকযান, আদী ইবনে সাবিত, তাঁর পিতা, তাঁর দাদার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ اَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَغْسِلُ وَتَتَوَضَّاءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ -

হায়য-এর রোগিনী তার হায়যের দিনগুলো নামায ত্যাগ করবে। পরে গোসল করবে ও প্রতি নামাযের জন্যে নতুন করে অযূ করবে।

এই হাদীসেরই কোন কোন সূত্রের বর্ণনার ভাষা হল ঃ তার কুরোর দিনগুলোর নামায ছেড়ে দেবে। নবী করীম (স) ফাতিমা বিনতে আবূ হুবায়শ (রা) আর উম্মে সালমা (রা) যে মেয়েলোকটির বর্ণনা করেছেন, তাদেরকে নবী করীম (স) তাদের হায়যের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দিতে বলেছিলেন তাদের হায়যের পরিমাণ জিজ্ঞাসা না করেই। এসব বর্ণনার ভিত্তিতে স্পষ্ট হয়েছে যে, হায়যের মিয়াদ অবশ্যই তা হতে হবে, যার উপর 'কয়েক দিন' শব্দটির প্রয়োগ বৈধ হতে পারে। আর তা হচ্ছে তিন থেকে দশ। যদিও হায়য তিন দিনের কম সময়ের-ও হয়ে থাকে। অন্যথায় নবী করীম (স) 'কয়েক দিন' ও 'কয়েক রাত্রি' বলতেন না। আদী ইবনে সাবিত (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ 'যার ইস্তাহাযা' হয়েছে, সে তার হায়যের দিন কয়টি

নামায ত্যাগ করবে। আর তা-ই হচ্ছে সাধারণভাবে সব মেয়েলোকের জন্যে ব্যবহৃত শব্দ। আর أَيَّام 'কয়েক দিন' কোন নির্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যে ব্যবহৃত হলে তার কম-সে-কম সময় তিন দিন-ই হয়ে থাকে, আর বেশির মিয়াদ হয়ে থাকে দশ। অতএব তার একটি সুনির্দিষ্ট সংখ্যা থাকা আবশ্যক। যাকে أَيَّام 'কয়েক দিন' বলা যাবে। তাই তার সংখ্যা সেটাই হবে, যার উল্লেখ নবী করীম (স) করেছেন ।

এর আরও একটি দিক আছে। সেই সময়টা যখন সম্মুখে আসবে যাকে 'কয়েক দিন' বলা যাবে, তখন কোন সীমিত সংখ্যা তাকে শামিল করবে না। যেমন লোকেরা বলে ঃ أَيَّامُ السَّنَةِ। 'ছয় দিন' তখন বিশেষভাবে না তিন বলা যাবে, না দশ। আল্লাহ্র কথা ঃ أَيَّامٌ مَّعْدُودَاتٌ 'সখ্যাবদ্ধ দিন কয়টি' বা গোণা দিন কয়টি। তখন তিন থেকে দশ-এর মধ্যের কোন সংখ্যাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায় না। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

তোমাদের প্রতি সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন করে তোমাদের পূর্বের লোকদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল।

কাজেই শ্রোতাদের নিকট যে সময়টার পরিচিতি সুনির্দিষ্ট, তার দিকে যখন সম্পর্কিত করা হবে, তখন তাকে তিন থেকে দশ-এর মধ্যবর্তী কোন কিছুর সাথে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যাবে না। রাসূলের কথা ঃ তার হায়যের দিন কয়টি নামায ত্যাগ করবে। তার কুরুর দিন কয়টি তার দিনের সংখ্যাকে শ্রোতাদের নিকট অগ্রবর্তী হয়ে যায়নি। অতএব দিন কয়টির উল্লেখ সেদিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে, কোন সংখ্যা বিশেষভাবে নির্ধারণ ব্যতীতই। অতএব তা ব্যবহৃত হবে এই সংখ্যার দিক দিয়ে, যা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয় তার উপর। আর তা হচ্ছে তিন থেকে দশ। তা এরূপ এইজন্যে যে, أيام 'কয়েক দিন' ব্যবহার করে একটা অস্পষ্ট সময়ই বোঝাতে চাওয়া হয় অনেক সময়। যেমন কয়েক রাত্রি বললে অনির্দিষ্ট সময় বোঝায়। তা বলে রাত্রির কৃষ্ণতা বোঝানো হয় না। أيام বলে সময়ের পরিচিতি যখন অগ্রবর্তী হবে, তখন 'কয়েক দিন'-এর উল্লেখ এক অস্পষ্ট সময় বোঝাবার জন্যেই হবে। যা বলার উদ্দেশ্য কোন সংখ্যা নয়।

মোটকথা أيام 'কয়েকটি দিন' নামটির দুটি তাৎপর্য। যখন তার পরিচিতি যাতে নির্দিষ্ট হবে, তার সাথে সম্পর্ক দেখানো হলে, তখন তার অর্থ হবে সময়। আর যা শুরুকৃত হুকুম হবে, তাকে ধারণ করতে হবে সেই জিনিসের উপর যার সাথে তার সম্পর্ক স্থাপন সহীহ্ হবে। তখন তার অর্থ হবে সুনির্দিষ্ট এবং তিন থেকে দশ।

এর আরও একটি কারণ রয়েছে। তা হল আরবদের ভাষায় এটাই বোঝা যায় যে, أيام 'কয়েকটি দিন' নামটি যখন কোন সংখ্যার সাথে সম্পর্কিত হবে, তখন সে সংখ্যা কেবল তিন থেকে দশ পর্যন্তই হতে পারে। এই সংখ্যাটি 'কয়েক দিন'-এর নামটি থেকে কখনই বিচ্ছিন্ন হবে না। কেননা তুমি যখন বলবে, এগার, 'কয়েকটি দিন' বললে না, তখন বলবে 'এগার দিন'। অনুরূপভাবে যখন সাধারণভাবে 'মাসের দিনগুলো' বলা হবে তখন বলবে 'ত্রিশ'। তার সাথে 'কয়েক দিন' নামটা শোভন হবে না। তাই বলবে ত্রিশ দিন কিন্তু 'কয়েক দিন' নামটি একটা সংখ্যার সাথে সম্পর্কিত হবে, তখন তা কেবল তিন থেকে দশ পর্যন্তই বোঝাবে। তাই আমরা জানতে পারলাম যে, এটা প্রকৃত প্রয়োগ ও প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ। এটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয়া যাবে না। তবে সেজন্যে কোন দলীল পাওয়া গেলে ভিন্ন কথা। কেননা তা পরোক্ষ

(مجاز) প্রয়োগ। তা থেকে 'কয়েক দিন' নামটি বাদ দেয়া অসঙ্গত নয়। আর তা হচ্ছে, তার সংখ্যা যখন নির্দিষ্ট করা হবে, 'কয়েক দিন' তার সাথে সম্পর্কিত হবে।

যদি বলা হয়, যখন বলা হল, 'তুমি নামায ছেড়ে দাও তোমার কুরুর দিন কয়টিতে' এতে 'কয়েক দিন' নামটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর কুরুর কম-সে-কম মিয়াদ তিন— এটা বহু বচনে। এর কম-সে-কম হচ্ছে তিন প্রত্যেক দিনই কুরুর হয়ে গেল।

জবাবে বলা যাবে, রাসূলের কথা أيام اقرائك বলে আসলে একটি হায়য-এর দিনগুলোই বলতে চাওয়া হয়েছে। তার প্রমাণ এই যে, যার হায়যের অভ্যাস হচ্ছে তিন থেকে দশ পর্যন্ত সময়, তার কথাই বলা হয়েছে। একথা জানা আছে যে, এ ধরনের কথার অর্থই হয় এক হায়য। অনুরূপভাবে, যার সেরূপ অভ্যাস নেই, তার-ও। তার পরবর্তী কথা ঃ 'পরে তুমি গোসল কর এবং প্রত্যেক নামাযের জন্যে অযূ কর'টিও তাই বোঝায়। এ-ও জানা আছে যে, তাঁর বক্তব্য আসলে প্রতিটি হায়য-এর গত হয়ে যাওয়া। বোঝা গেল, أيام اقرائك বলে আসলে 'এক হাযয়-এর কয়েক দিন'ই বুঝিয়েছেন। আমাদের পূর্বে উল্লেখকৃত আ'মাশ বর্ণিত হাদীসে أيام محيضك 'তোমার হায়য-এর দিন কয়টি' বলা হয়েছে। আর অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে أيام حيضك— 'তোমার হায়য-এর দিন কয়টি।' বলেছেন, যে কয়দিন হায়য-এর কারণে বসে থাকে, সেই কয়দিন ও রাত্রির নামায ছেড়ে দিতে হবে। আর দ্বীনের দিক দিয়ে তাদের কমতি হচ্ছে, তাদের এক-একজন কয়েক দিন ও রাত্রি নামায পড়ে না। এসব হাদীসে اقرا বা কুরুর উল্লেখ হয়নি। উল্লেখ করা হয়েছে হায়য-এর। অতএব হায়যকে কয়েকদিনের মনে করতে হবে। আর যে সময়ের উপর ايام 'কয়েক দিন' শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে না, তা হায়য হবে না। কেননা নবী করীম (স) হায়য-এর ব্যাপারে সমস্ত নারীকুলের করণীয় বলে দেবার ইচ্ছা করেছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে শুজা, ইয়াহইয়া ইবনে আবূ বুকাইর, ইসরাইল, উসমান ইবনে সাঈদ, আবদুল্লাহ ইবনে আবূ মুলাইকা, ফাতিমা বিনতে আবূ জুহায়শ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ফাতিমা তাঁর নিজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) হযরত আয়েশা (রা)-কে বলেছেন ঃ

مُرِىْ فَاطِمَةَ فَلْتَمْسِكْ كُلَّ شَهْرٍ عَدَدَ اَيَّامِ اَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ -

তুমি ফাতিমাকে বলে দাও, সে যেন প্রতি মাসে তার হায়য-এর দিনগুলোর সংখ্যানুযায়ী নামায থেকে বিরত থাকে। পরে গোসল করে।

এ হাদীসে اقرا 'কুরু' বলা হলেও আসলে বোঝানো হয়েছে হায়য— প্রতি মাসে। কেননা রাসূলে করীম (স) তো তা-ই বলেছেন। অপর এক হাদীসে জানানো হয়েছে যে, মেয়েদের অভ্যাস হচ্ছে প্রতি মাসে এক হায়য কাল অতিবাহিত করা। রাসূলে করীম (স) হুমনা (রা)-কে বলেছিলেন ঃ তোমার হায়য আল্লাহ্‌র ইলমে ছয় কিংবা সাত, যেমন মেয়েরা প্রতি মাসে হায়য সম্পন্না হয়ে থাকে।

যদি বলা হয়, এক হায়যকে বহু বচনে اقرا 'কয়েকটি কুরু' বলা যায় কি ভাবে। অথচ একটি বোঝাতে হলে এখানে এক বচনের শব্দ قرء ব্যবহৃত হওয়া উচিত ছিল? যখন বহু বচনে বলা হয়েছে, তখন বহু কয়টি 'কুরু' বোঝাতে চেয়েছেন বলে মনে করতে হবে।

এর জবাবে বলা যাবে, কুরু' হচ্ছে হায়য-এর রক্তের নাম। তখন এক হায়যকেই বহু বচনে اقرا বলা অসঙ্গত নয়, যখন সে রক্তের বহু অংশ সামনে রেখে কথা বলা হবে। যেমন 'চরিত্রের কাপড়' বলা হয় প্রতিটি খণ্ডকে সামনে রেখে। একটি জামাকেও বহু খণ্ডের দৃষ্টিতে বহু বচনে বলা যেতে পারে। অনুরূপভাবে একটি হায়য-এর রক্তের বহু অংশের প্রতি লক্ষ্য রেখে اقرا বহু বচনে বলা যেতে পারে।

যদি বলা হয়, ايام 'কয়েক দিন' কথাটি দ্বারা দুই দিনও বোঝানো যেতে পারে, তাহলে হায়য-এর কম-সে-কম মিয়াদ দুই দিন নির্দিষ্ট করা আবশ্যক।

জবাবে বলা যাবে, 'দুই দিন' বোঝাবার জন্যে ايام 'কয়েক দিন' বলাটা প্রকৃত অর্থে নয়, পরোক্ষ অর্থে। প্রকৃত অর্থ— তিন ও ততোধিক। শব্দটির প্রকৃত অর্থ গ্রহণই বাঞ্ছনীয়, পরোক্ষ অর্থের পরিবর্তে। তাহলেই প্রয়োজনে তাকে পরোক্ষ অর্থের দিকে ফেরানো যায়। আর একটি দলীল হচ্ছে, হায়য-এর কম-সে-কম ও বেশির মিয়াদ নির্ধারণ যখন 'কিয়াস' পদ্ধতিতে করা সম্ভব নয়, তার পন্থা হচ্ছে توقيف কিংবা মনীষীদের ঐকমত্য— যেমন পূর্বে বলেছি, তখন সকলেই এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, তার অর্থ তিন দিনের হায়য, দশ-ও তেমনি। তিন-এর কম সময়ে তাঁরা একমত নন। একমত নন দশ দিনের বেশিতে। তাই সর্বসম্মত মত হিসেবেই আমরা তিন দিন ঠিক করেছি। যেখানে তাঁদের মতপার্থক্য, সেটি আমরা গ্রহণ করিনি। কেননা তা 'তওকীফ' বা ঐকমত্য, কোন দিক দিয়েই তা কর্তব্য নয়।

যদি বলা হয়, সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, হায়য শুরু হলেই প্রথম রক্ত দেখার সঙ্গে সঙ্গেই নামায ছেড়ে দিতে হবে। তা যদি একদিন ও এক রাত্রি মাত্র দেখা যায়, তবুও। এ থেকে বোঝা গেল যে, একদিন ও একরাত্রির জন্যেও হায়য হতে পারে। যার মতে সেটা হায়য-এর রক্ত নয়, তাকে তার কথার দলীল দিতে হবে। কেননা উক্ত ঘটনার শুরুতেই হায়য মনে করা হয়েছিল। এক্ষণে কোন দলীল ব্যতিরেকে— যা তা ভাঙ্গতে বাধ্য করে— তা ভাঙ্গা চলবে না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হায়য একদিন ও একরাত্রি কালেরও হতে পারে।

জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, নামাযের সময়ে রক্ত দেখতে পাওয়ার সাথে সাথে নামায ছেড়ে দিতে হবে— এ বিষয়ে সকলেই একমত এবং এ থেকে হায়য-এর সময়কাল হতে পারে নামাযের সময়টা মাত্র। নামাযের সময়ে রক্ত দেখা গেলে নামায ছেড়ে দিতে হবে, এই কারণে শুধু নামাযের সময়টা তো আর হায়য-এর সময়কাল নির্ধারিত হতে পারে না। বলা যেতে পারে না যে, হায়য-এর কম-সে-কম মিয়াদ নামাযের সময়টুকু। বরং সে রক্তের ব্যাপারে লক্ষ্য করতে অপেক্ষা করতে হবে হায়যের সময়কালটা দেখার জন্যে। কেননা তার পূর্ণতার সময়কাল বিভিন্ন হতে পারে। এক দিন এক রাত্রিও হতে পারে।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ -

মেয়েদের গর্ভে আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের জন্যে হালাল নয়।

এ আয়াত অনুযায়ী গর্ভের কথা গোপন না করা কর্তব্য।

জবাবে বলা যাবে, এটা তো আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। তা মেয়ে লোকটির দেয়া খবর কবুল করা সম্পর্কিত কথা। সে তার গর্ভে আল্লাহ্র সৃষ্টি করার কথা যদি বলে

তাহলে আমরা তার কথাই মেনে নেব। কিন্তু তার দেখা দেয়া রক্ত হায়য-এর রক্ত কিনা, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারটি তার উপর নির্ভরশীল নয়। এটা একটা হুকুম। এ হুকুমটা তো তার গর্ভে সৃষ্টি হয়নি। কাজেই তার কথাই এক্ষেত্রে মেনে নিতে হবে। এ পর্যন্ত যা যা বলেছি, তার সব কথাই বাতিল প্রমাণ করে তার কথা, যে বলেছে যে, হায়য-এর কম-সে-কম সময়কাল হচ্ছে এক দিন এক রাত্রি। যারা হায়য-এর কম-সে-কম বা বেশির মিয়াদ নির্ধারণ করেন নি কিংবা যারা এই ব্যাপারটিকে নিছক মেয়েদের অভ্যাসের উপর ছেড়ে দিয়েছেন, তাদের সকলের কথাই বাতিল— প্রত্যাহৃত। আর যাঁরা কম ও বেশি পরিমাণ নির্ধারণ করাকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাঁদের কথাও বাতিল। যদি তা-ই হতো, তাহলে যদ্দিন পর্যন্ত রক্তস্রাব হতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত হায়য চলছে বলতে হবে। তা হলে দুনিয়ার 'ইস্তাহাযা' হায়য-এর রোগ ও সে রোগে আক্রান্ত 'মুস্তাহাযা' বলতে কিছুই থাকতে না, কেউ-ই থাকত না। সব রকমের রক্তস্রাবকেই 'হায়য' মনে করতে হতো। কিন্তু হাদীস দ্বারা এই কথা বাতিল প্রমাণিত হয়েছে। মুসলিম উম্মতেরও ঐকমত্য রয়েছে সে ব্যাপারে। কেননা ফাতিমা বিনতে আবূ হুবায়শ নবী করীম (স)-কে বললেন ঃ আমার ইস্তাহাযা— হায়য-এর রোগ— হয়েছে। আমি তো পাক হতে পারব না। তাহলে ইসলামে আমার কোন অংশ থাকবে না বলে আমি ভয় পাচ্ছি। হুমনা (রা) সাত বৎসর পর্যন্ত ইস্তাহাযা রোগে আক্রান্ত হয়ে রয়েছেন। এই রূপ অবস্থায় শরীয়াতের বিধানদাতা বলেন নি যে, এই সবই 'হায়য'। বরং সে দুই জনকে জানিয়ে দিয়েছেন তার কতটা হায়য আর কতটা 'ইস্তাহাযা'। তা হলে একটা পরিমাণের সময় নির্দিষ্ট হবে হায়য-এর জন্যে আর সে পরিমাণ বলা হয়েছে أيام 'কয়কটি দিন' বলে। আর যে লোক হায়য-এর কম-সে-কম মিয়াদ ও বেশি বেশি মিয়াদ নির্দিষ্ট করেন না তাঁকেও বলতে হবে, রক্তের সূচনা কাল যদ্দিন চলবে, সেটা হায়য হবে। যদি এক বছর কাল রক্তস্রাব চলে, তাহলে তার হায়য-অভ্যস্ত সময়-কাল কিছুই থাকে না। অথচ তার জরায়ুতে রক্ত থেকে যায়। তাই যে কথায় সকলেই একমত উক্ত অবস্থা তার পরিপন্থী।

যদি বলা হয়, হুকুমের দিক দিয়ে 'নিফাস' ও 'হায়য' অভিন্ন অবস্থা। তার সময়ের কোন কম-সে-কম সময়কাল জানা যেতে পারে না। হায়য-এর ও তাই।

জবাবে বলা যাবে, আমরা সর্বসম্মতিক্রমেই তাকে 'নিফাস' ঠিক করেছি। হায়যকে তার উপর আমরা কিয়াস করছি না। কেননা এ ক্ষেত্রে কিয়াস প্রমাণ করার কোন পন্থা নেই। অথচ কম সে-কম ও বেশি সময় প্রমাণকারী উভয় গোষ্ঠীই হায়য-এর রক্ত রূপে প্রমাণ করেছে। আর তার সময়কাল নির্ধারিত হয়েছে একদিন এক রাত্রি। তার দলীল ঃ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ 'তোমরা স্ত্রীদেরকে হায়য কালে পরিহার কর'— এই আয়াত। আর নবী করীম (স)-এর কথাঃ 'যখন হায়য হতে শুরু হবে, তখন নামায ছেড়ে দাও।' এর বাহ্যিক দিক কম ও বেশি মিয়াদ নির্ধারণে আবশ্যক বলে দাবি করে। কেননা শব্দে কোন সময় নির্ধারণ করা হয়নি। তাই যখন এক দিন ও এক রাত্রি কাল রক্তস্রাব দেখবে, বুঝতে হবে, তা উক্ত কথার আওতার মধ্যে পড়েছে। তখন বলা যাবে যে, ওটিকে 'হায়য' নির্ধারণ করতে হবে এবং এই সময়ে স্ত্রীকে আলাদা— সম্পর্কহীন রাখতে হবে। কেননা হায়য-এর অবস্থা ও তার তাৎপর্য ও পরিচিতি পর্যায়ে শব্দে কোন প্রমাণ নেই। যখন প্রমাণিত হল যে, তা হায়য, তখন তার ব্যাপারেই আয়াতের হুকুম প্রয়োগ করা হবে। আর তাতে যদি মতবৈষম্য হয়, তাহলে এ আয়াতে তার তাৎপর্যের কোন প্রমাণ হবে না। বিরুদ্ধ পক্ষের দাবি আলোচ্য বিষয়ে কোন দলীল হতে পারে না।

যদি বলা হয়, শরীয়াতের বিধানদাতা হায়য-এর রক্তের আলামত ও পরিচিত স্বরূপ যা বলেছেন, তাতে তার কোন সময়-পরিমাণ হিসাব করা কোন প্রয়োজন দেখা দেয় না। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন ঃ হায়য-এর রক্ত প্রখর দীপ্তি পূর্ণ কালো। তাই এই পরিচিতির রক্ত যখনই দেখা যাবে, তা অবশ্যই হায়য হবে।

জবাবে বলা যাবে, উক্ত পরিচিতি ছাড়াও যে হায়য-এর রক্ত হতে পারে, তাতে কোন মতপার্থক্য নেই। তা যখন তার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে দেখা যাবে, বুঝতে হবে, তা হায়য। কিংবা শুরুতেই যদি সেরূপ রক্ত দেখা যায় তাহলে তা-ও হায়য। অনেক সময় তার জন্যে নির্দিষ্ট দিনগুলো অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর-ও তা দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় মনে করতে হবে, তার সময়ে যা, তা হায়য আর নির্দিষ্ট সময়ের পর যা, তা 'ইস্তাহাযা'। কাজেই নবী করীম (স) এই পরিচিতির রক্তকে হায়য-এর নাম ও তার দলীল রূপে চিহ্নিত করবেন, তা মনে করা যায় না। তা না হলেও তা পাওয়া যায় এবং তা পাওয়া গেলেও তা না হতে পারে। আমাদের মতে তার কারণ হচ্ছে স্ত্রীর নিজের আসল অবস্থা। তার হায়য সব সময়ই এই পরিচিতির হবে। তাই বিশেষভাবে সেই বিষয়ের হুকুমটা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। অন্য কিছুর হুকুম বলা হয়নি। অতএব সে অবস্থাকে অন্য কোন দিক দিয়ে গণ্য করা ঠিক হবে না।

যারা হায়য-এর সময়ের পরিমাণ এক দিন এক রাত্রি নির্দিষ্ট করেছেন, আর যারা তার সময়-পরিমাণ নির্ধারণের বিরোধী, তারা উভয়ই দলীল হিসেবে পেশ করেছেন এই আয়াতটি ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَاَذَى -

লোকেরা তোমাকে হায়য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বলে দাও, তা ময়লা-আবর্জনা।

সময় নির্ধারণের বিরোধীরা বলেছেন, আয়াতে হায়যকে ময়লা-আবর্জনা বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাই যেখানেই এই ময়লা-আবর্জনা পাওয়া যাবে, তা অবশ্যই হায়য হবে। তাওকীফ-এর কোন গুরুত্ব হবে না। কেননা মূল আয়াতে তার কোন পরিমাণের উল্লেখ নেই। আর যারা এক দিন এক রাত্রি সময় নির্দিষ্ট করেছেন, তাঁরা বলেন, ময়লা-আবর্জনা এক দিন এক রাত্রি পাওয়া যায় বলে সেই সময়টা হায়য। তার কমেও। যা তার কম সময়ে হবে, তাকে বিশেষীকৃত করেছি একটি দলীল দ্বারা। অতএব  শব্দের বাহ্যিক হুকুমটা একদিন-একরাত্রি কাল অবশিষ্ট থাকবে।

তাদেরকে বলা হবে, প্রথম হায়য প্রমাণিত হতে হবে, যেন এই পরিচিতিটা প্রমাণিত হয়। আর তা হচ্ছে তার ময়লা-আবর্জনা হওয়া। কেননা আল্লাহ 'হায়যকে ময়লা-আবর্জনা বলেছেন। ময়লা-আবর্জনাকে হায়য বলেন নি। আমরা নিজেরাও জানি যে, সব ময়লা-আবর্জনাই হায়য নয়, যদিও হায়য মাত্রই ময়লা-আবর্জনা। যেমন সব নাপাকিই হায়য নয়, যদিও হায়য মাত্রই নাপাকি। তাই হায়য আবশ্যিকভাবে প্রমাণিত হতে হবে। যেন তাকে ময়লা-আবর্জনা বলা যায়। এ-ও জানা যে, আল্লাহ যদি সব ময়লা-আবর্জনাকেই হায়য নামে অভিহিত করতে চাইতেনও; তবু তিনি এটা চাইতেন না যে, সব ময়লা-আবর্জনা হায়য গণ্য হবে। কেননা সর্বপ্রকারের ময়লা-আবর্জনাই হায়য নয়। তাই এক্ষণে প্রমাণিত হল যে, ময়লা-আবর্জনা ঘৃণ্য। কেননা তার পরিচয় পাওয়ার জন্যে দলীল আবশ্যক। দলীলের ভিত্তিতে আমরা যখন তা চিনতে পারব, তখন তার উপর হায়য-এর হুকুম প্রয়োগ করব। উপরন্তু ময়লা-আবর্জনা বহু অর্থ সম্পন্ন শব্দ। বহু জিনিসই তার আওতায় আসে। তা বিভিন্ন তাৎপর্য সমন্বিত। আর যেসব নামের অবস্থা এইরূপ, তা অবশ্যই সাধারণ অর্থবোধক হবে।

যারা হায়য-এর বেশির দিকের মিয়াদ পনের দিন বলেছেন, তাঁদের দলীল হচ্ছে নবী করীম (স) বলেছেন ঃ 'বিবেক-বুদ্ধি ও দ্বীন পালনে কম মাত্রার অধিকারিণী (নারীদের)-কে বুদ্ধিমান লোকদের বিবেক-বুদ্ধির উপর বিজয়ী দেখিনি। তখন প্রশ্ন করা হয়েছে, ওদের দ্বীনের দিক দিয়ে কমের ব্যাপারটি কি ? তখন তিনি বলেছেন, ওদের এক-একজন বয়সের অর্ধেক সময়ই অবস্থান করে এমনভাবে যে, তখন সে নামায পড়ে না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হায়য পনের দিনের হয়। আর তুহর হয় অবশিষ্ট পনের দিন। কেননা তুহর-এর তা-ই কম-সে-কম সময়। তাহলে হায়যই হচ্ছে বয়সের অর্ধেক কাল। হায়য যদি এর কম সময় কালের হয়, তাহলে মেয়েলোক তাদের অর্ধেক জীবন নামায পড়ে না, একথা সত্য হবে না। এরূপ অবস্থায় বলতে হবে, অর্ধেক বয়সের কথা বর্ণনায় আসেনি। এই বর্ণনাটি দুটি শব্দে এসেছে। একটিতে বলা হয়েছে شَطْرُعُمْرِهَا 'তার জীবনের অর্ধভাগ'। আর দ্বিতীয় বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ তাদের এক-একজন কয়েক দিন ও রাত্রি অবস্থান করে, নামায পড়ে না। نصف عمرها তার বয়সের অর্ধেক এই ভাষায় কোন বর্ণনায়ই আসেনি। আর شَطْرُعُمْرِهَا কথাটি দ্বারা সোজাসুজি অর্ধেক বোঝা যায় না। তার অর্থ কিছু ভাগ, কতক। যেমন আল্লাহ্‌র কথা, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 'অতএব ফেরাও তোমার মুখ মসজিদের দিকে'।

এ কথাটিতে মসজিদে হারামের দিকটা বুঝিয়েছেন, যে দিকে তা অবস্থিত সেই দিকে মুখ করে দাঁড়াতে বলা হয়েছে। তার অর্ধেক বোঝাতে চাওয়া হয়নি। এই الشطر -এর পরিমাণটা রাসূলের কথার আলোকে বোঝা যায়। তিনি বলেছেন ঃ 'তাদের এক-একজন কয়েক দিন ও রাত্রি নামায না পড়ে থাকে। কাজেই شطر عمرها তার জীবনের এই পরিমাণটাই বুঝতে হবে, ও ছাড়া অন্য কিছু নয়। তা সত্ত্বেও, দুনিয়ায় এমন মেয়েলোক পাওয়া যায় না, যার সারা জীবনের অর্ধেক কাল ধরে হায়য হয়। কেননা তার বালেগা হওয়ার পূর্বে জীবনের যে সময়টা অতিবাহিত হয়েছে তা 'তুহর' কাল। এ সময় হায়য হয়নি। বালেগা হওয়ার পর তার জীবনের শেষ পর্যন্ত পনের দিন করে প্রতি মাসের হায়য হতে থাকলেও সেই সাথে পনের দিন 'তুহর' হতে থাকলে তবুও সমগ্র জীবনের অর্ধেক সময় হায়য হয়েছে বলা যাবে না। কাজেই যারা মনে করেন, জীবনের অর্ধেক সময় ধরে মেয়েলোকের হায়য হয়, তাদের ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল প্রমাণিত হল।

## তুহর-এর কম-সে-কম মিয়াদের পরিমাণে মতপার্থক্য

ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, জুফর, সওরী, আল-হাসান ইবনে সালিহ ও শাফেয়ী বলেছেন— তুহর এর কম-সে-কম সময়কাল পনের দিন। আতাও তা-ই বলেছেন। মালিক ইবনে আনাস বলেছেন, এ ব্যাপারে হাদীসের বর্ণনাসমূহে কোন সময়কাল নির্ধারিত হয়নি। আবদুল মালিক ইবনে হুবায়ব থেকে পাওয়া একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, তুহর পনের দিনের কমে হয় না। আওজায়ী বলেছেন, কখনও কখনও পনের দিনের কমেও 'তুহর' হয়ে থাকে, হতে পারে। সে ব্যাপারে মেয়েলোকের পূর্ববর্তী তুহর-এর পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য দিতে হবে। ইমাম শাফেয়ী থেকে বর্ণনা এসেছে, যদি জানা যায় যে, কোন মেয়েলোকের 'তুহর' পনের দিনের কম রয়েছে, তা হলে তার কথাই গ্রহণ করতে হবে। তাহাভী আবূ ইমরান ইয়াহইয়া ইবনে আকতাম সূত্রে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেছেন, তুহর-এর কম-সে-কম

সময়কাল নয় দিন। দলীল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিমাসে হায়য ও তুহ্র এর বিকল্প বানান। সাধারণত হায়য তুহর থেকে কম সময়ের জন্যে হয়। কাজেই হায়য-এর মিয়াদ পনের দিন হতে পারে না। দশ দিন হওয়াই উচিত। আর মাসের বাকী সময়টা 'তুহর' থাকা বাঞ্ছনীয়। আর তা হচ্ছে উনিশ দিন। কেননা মাস অনেক সময় উনত্রিশ দিনেও হয়। সাঈদ ইবনে যুবায়র থেকে বর্ণনা উল্লেখ করেছি যে, তুহর-এর মিয়াদ তের দিন। তার কম-সে-কম মেয়াদ যে পনের দিন, তার দলীল হচ্ছে, হায়য-এর বেশির পক্ষের সময়-কাল হচ্ছে দশ দিন, অথচ আল্লাহ্ যখন প্রত্যেক মাসের বিকল্প বানিয়েছেন এক তুহর ও এক হায়য, তখন তুহর-এর মেয়াদ তার তুলনায় বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা নবী করীম (স) হুমনা (রা)-কে বলেছিলন ঃ আল্লাহ্র ইলমে তোমার হায়য ছয় কিংবা সাত হয়। যেমন মেয়েরা প্রতিমাসে হায়য দেখে থাকে। এতে ছয় কিংবা সাত হায়য-এর মিয়াদ বোঝায়। আর প্রতি মাসে তুহর-ও রয়েছে। বোঝা গেল, এটা সাধারণভাবে সব মেয়েলোকেরই ব্যাপার, যতক্ষণ পর্যন্ত পনের দিনের দলীল না পাওয়া যাবে, না পাওয়া যাবে দশ দিনের দলীল, তের দিনের দলীল। তাহলে তা সঠিকভাবে 'তুহর' হবে না। তাছাড়া হায়য থেকে তুহ্র হলে নামায বাধ্যতামূলক হয়। এটা ঠিক সফরের পর এক স্থানে স্থিত হওয়ার মত। আর আমাদের মতে এক স্থানে স্থিত হওয়ার কম-সে-কম সময় হচ্ছে পনের দিন, তার বেশির দিকে কোন সময়সীমা নেই। কাজেই হায়য থেকে তুহর-ও অনুরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। একথাও মনে রাখতে হবে যে, তুহর-এর সময়-কাল 'তাওকীফ'-এর মাধ্যমে নির্ধারিত, কিংবা সর্বসম্মতভাবে। আগের দিনের ফিকাহবিদদের ঐকমত্য হচ্ছে, পনের দিন তুহর থাকবে সহীহভাবে। তার কমে নানা মত রয়েছে। তাই আমরা সেই ঐকমত্যকেই ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছি। তার কম সময়ে তুহর হয় বলে আমরা মনে করি না। কেননা তাতে 'তওকীফ' নেই, নেই ঐকমত্য। ইয়াহইয়া ইবনে আকতাম উনিশ দিনের তুহর-এর মিয়াদ ঠিক করেছেন বলে যে বর্ণনা এসেছে, তা কয়েকটি কারণে বিনষ্ট হয়ে যায়। একটি— আগের কালের ফিকাহবিদদের ঐকমত্য, যা পূর্বেই হয়েছে। তাতে তুহর পনের দিনের হওয়ার ব্যাপারে তাঁরা একমত। এতএব তার বিপরীত হওয়া উচিত নয়। তার পূর্বে তাঁরা তিনটি দিক দিয়ে মতপার্থক্য করেছেন। আতা বলেছেন— পনের দিন। সাঈদ ইবনে যুবায়র বলেছেন— তের দিন। ইমাম মালিকের কোন কোন বর্ণনায় পনের দিন বলা হয়েছে। আর কোনটিতে দশ দিন বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁদের কেউ উনিশ দিন বলেন নি। তা এদিক দিয়ে বিনষ্ট হয় যে, তা একটা সময়-পরিমাণ নির্দিষ্ট প্রমাণ করেছে 'তওকীফ' ছাড়াই। ঐকমত্যও নেই। কিন্তু তা সঠিক কথা নয়। এসব ব্যাপারে তা অগ্রহণযোগ্য। তাদের যে দলীলের উল্লেখ পূর্বে করেছি, তা-ও অর্থহীন। কেননা জানা আছে, আল্লাহ্ একটি মাসে হায়য ও তুহ্র-এর স্থানে যা দাঁড় করেছেন, তখন হায়য ও তুহর হবে না এমন কথা নয়। মাসের চেয়ে কম সময়ে। কেননা তার হায়য যদি তিন দিনের হয়, তাহলে এক মাসের কম সময়ে হায়য ও তুহ্র— দুটিই হল। আর এক মাসের কম সময়ে হায়য ও তুহর দুটিই হওয়ার দরুন এক মাসকে হায়য ও তুহর বর্জিত বানিয়েছেন— তার কোন প্রমাণ নেই। দশ দিনের কমেও হায়য হতে পারে। ফলে একটি মাসের কম সময়ে হায়য ও তুহ্র পূর্ণ হয়ে গেল। তিন মাসের কম সময়ে হায়য দ্বারা তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেল। যদিও তার ইদ্দত মাস হিসেবে তিন মাসের কম সময়ে পূর্ণ হওয়া জায়েয নয়, তবু দশ দিনে হায়য পূর্ণ হওয়ার পর তুহরকাল কম হওয়া নিষিদ্ধ নয়, তাহলে মোট সময় উনিশ দিনের কম হয়ে যায়। এই যা বললাম, তা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যার উল্লেখ

করা হয়েছে তা উনিশ দিনে কম-সে-কম তুহর সীমাবদ্ধ করা বাধ্যতামূলক হওয়ার কোন দলীল নয়। তা থেকে বোঝা যায় যে, তুহ্র কখনও কখনও এই পরিমাণের হতে পারে, তাতে এই দলীল নেই যে, তা তার চাইতে কম মিয়াদের হতে পারে না।

## হায়য অবস্থায় দেখা দেয়া তুহ্রে পার্থক্য

হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণ সকলেই বলেছেন, যদি কারোর একদিন হায়য-এর রক্ত আসে, আবার একদিন তুহ্র হয়, তাহলে তাকে অবিচ্ছিন্ন রক্তস্রাবই মনে করতে হবে। আবূ ইউসূফও এভাবেই বলেছেন, পনের দিনের কমে দুই বারের রক্তের মাঝে যদি তুহর দেখা দেয়, তবে তা অব্যাহত স্রাবই মনে করতে হবে। মুহাম্মাদ বলেছেন, দুই রক্তের মাঝে তুহর যদি তিন দিনের কম সময় থাকে, তাহলে তা ধারাবাহিক রক্তস্রাবই বুঝতে হবে। আর যদি তিন দিন বা দশ দিনের বেশী সময়ের হয়, তাহলে দুই রক্ত ও মধ্যবর্তী তুহরকে দেখতে হবে। তুহর যদিও দুটির বেশী সময় ধরে থাকে, তাহলে দুই রক্তের মাঝে পার্থক্য করতে হবে। যদি সমান-সমান বা কম সময়ের হয়, তাহলে তাকে ধারাবাহিক রক্তস্রাব মনে করতে হবে। আর তুহর যদি দুই রক্তস্রাবের বেশি সময় ধরে হয় তাহলেও দুটির মাঝে পার্থক্য করা হবে, দুটিকে স্বতন্ত্র রক্তস্রাব মনে করতে হবে। যদি প্রথমটা তিন দিনের হয়, তাহলে তা হায়য। অনুরূপভাবে প্রথমটা তিন দিনের না হলে আর দ্বিতীয়টা তিন দিনের হল, তাহলে দ্বিতীয়টি হায়য ধরতে হবে। দুটির কোন একটিও যদি তিন দিনের না হয়, তাহলে দুটির কোনটিই হায়য মনে করা যাবে না।

ইমাম মালিক বলেছেন, যদি একদিন রক্ত আসে ও একদিন তুহ্র হয়, কিংবা দুই দিন তুহর হয়, পরে রক্ত দেখে, তাহলে তুহর -এর দিনগুলো অর্থহীন, তাকে হায়য-এর দিন মনে করতে হবে একটিকে অন্যটির সাথে মিলিয়ে। তা অব্যাহত থাকলে হায়য-এর দিনগুলোর উপর এই তিনদিন প্রাধান্য পাবে। এই প্রাধান্য পাওয়া দিনগুলোর মধ্যেও তুহর দেখা গেলে, তাকে বেহুদা মনে করতে হবে, তাতে তিন দিনের প্রাধান্যের রক্ত বোঝা যাবে। আর তুহর-এর দিনগুলোতে নামায-রোযা করতে হবে। স্বামী-স্ত্রী মিলনও হতে পারবে। আর রক্তের দিনগুলো পরস্পর যোগ করে একই হায়য ধরতে হবে। তখন তালাকের ইদ্দত তুহ্র-এর দিন হিসেবে গণনা করা হবে না। আর তার হায়য-এর দিনগুলোর পর তিন দিনের প্রাধান্য হলে প্রত্যেক নামাযের জন্যে নতুন করে অযূ করতে ও প্রত্যেক দিন গোসল করতে হবে, যদি তুহরের দিনগুলো তার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা হয়। গোসল করার আদেশ করা হয়েছে এজন্যে যে, রক্তস্রাব আবার শুরু হয়নি তা তো সে জানে না।

রুবাই, ইমাম শাফেয়ী থেকেও এরূপ কথাই বলেছেন।

আবূ বকর বলেছেন, হায়যে রক্ত অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হতে সব সময় দেখা যায় না। হায়যের রোগিনী সম্পর্কেও এই কথা। সে রক্ত কোন সময় দেখে, কখনও তা সম্পূর্ণ বন্ধ দেখা যায়। আর রক্ত প্রবাহ কিছু সময়ের জন্যে বন্ধ থাকলে হায়যকাল শেষ হয়েছে বলা যাবে না এই তুহ্র দেখা যাওয়ার সময়ে এবং এই ধরনের সময়ে রক্ত বন্ধ থাকলে। এই গোটা সময়ই অ-বিচ্ছিন্ন রক্ত প্রবাহ মনে করতে হবে। সব ফিকাহ্‌বিদই একথা বলেছেন। দুই রক্তের মাঝে দেখা দেয়া তুহর মূলত সহীহ তুহর নয়। এটা সর্বসম্মত কথা। কেননা সঠিক তুহ্র একদিন বা দুই দিন কেউ-ই বলবে না। কেউ বলেনি যে, দুই হায়য এর মধ্যবর্তী তুহর দশ দিনের কমে হয়। এ বিষয়ে পূর্বে বিস্তারিত কথা বলে এসেছি। উপরন্তু দুইবারের রক্তের মাঝখানে একদিন

বা দুই দিনের তুহর দেখা দিলে নামায রোযা ফরয হয়ে দাঁড়ালে দুইবারের প্রত্যেক বারে পূর্ণমাত্রার হায়য ধরা কর্তব্য হয়ে পড়ে। আর সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, দুই রক্তের মাঝে পার্থক্যের দিক দিয়ে এতটুকু পরিমাণের তুহর ধর্তব্য হয় না। দুটির প্রতিটি আলাদাভাবে পূর্ণমাত্রার হায়যও ধরা যায় না। কাজেই তার হুকুমটা এই সময়ে প্রত্যাহার করতে হবে ও পূর্ব ও পরবর্তী রক্তের সাথে তাকে যোগ করতে হবে অব্যাহত রক্তের ন্যায় মনে করে।

হায়যের দিনগুলোতে রক্তের বর্ণ হরিৎ কিংবা ময়লাযুক্ত হলে কি বোঝা যাবে সে বিষয়ে বিভিন্ন কথা পাওয়া গেছে। উম্মে আতীয়া আনসারীয়া বলেছেন, গোসল করার পর হরিৎ বা ময়লা বর্ণের রক্ত দেখা দিলে আমরা তাকে কিছুই গণ্য করতাম না। বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, হায়যের দিনগুলোর মধ্যে হরিৎ বর্ণের রক্ত দেখা দিলেও তাকে হায়যই মনে করতে হবে। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফর, মালিক, লাইস, আবদুল্লাহ্ ইবনুল হাসান ও শাফেয়ী এদের মধ্যে উল্লেখ্য।

ময়লাযুক্ত রক্তের ব্যাপারে বিভিন্ন কথা উঠেছে। এই মাত্র যাঁদের নামের উল্লেখ করলাম তাঁরা সকলেই বলেছেন, হায়যের দিনগুলোতে তা হলে সেটা হায়যই গণ্য হবে, তার পূর্বে কোন রক্ত দেখা না গেলেও। আবূ ইউসূফ বলেছেন, রক্তের সূচনা হওয়ার পর ময়লাযুক্ত রক্ত দেখা গেলে তবেই তা হাযয় গণ্য হবে নতুবা নয়। হযরত আয়েশা ও আসমা— হযরত আবূ বকর (রা)-এর তনয়া বলেছেন, হাযয় সম্পন্না নারী দিনের আলোর মত স্পষ্ট শুভ্রতা না দেখা পর্যন্ত নামায পড়বে না। রক্ত-প্রবাহ শুরুর পর ময়লাযুক্ত রক্ত দেখা গেলে তা হায়যই হবে। রক্তের প্রবাহ শুরু হওয়ার পর তা দেখা গেলে বুঝতে হবে, রক্তের বিভিন্ন অংশের সংমিশ্রণ হওয়ায় ওরূপ হয়েছে।

কাজেই তার হুকুম হায়যের হুকুমই হবে, যদি তা হায়যের দিনগুলোতে পাওয়া যায়। তার পূর্বে রক্তস্রাব শুরু না হলেও ক্ষতি নেই। হায়যের রক্তস্রাবের অভ্যাসগত সময়টাই প্রমাণ করছে যে, রক্তের অংশগুলোর শ্বেত বর্ণের সাথে মিশ্রিত হওয়ার কারণেই এরূপ হয়েছে। এ ব্যাপারে সময়ের প্রভাব রয়েছে। তার প্রমাণ এই, যে মেয়েলোকটি হায়যের দিনগুলোতেই এই ময়লাযুক্ত রক্ত দেখেছে এবং তার পরও। অতএব হায়যের দিনগুলোতে সে যা দেখেছে তা হায়য-ই হবে। আর তার পরে যা দেখেছে তা হায়য হবে না। আর সময়ই হচ্ছে তা হায়য হওয়ার বড় নিদর্শন। অনুরূপভাবে সময়ই দলীল হবে এই কথার যে, ময়লাযুক্ত হওয়াটা হায়যের রক্তের বিভিন্ন অংশের সংমিশ্রণের কারণে হয়েছে এবং তা হায়য ছাড়া আর কিছু নয়।

মেয়েলোক যখন রক্তস্রাব দেখে ও তা চলতে থাকে, তখন শুরুর হায়য কখন, সে বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। হানাফী সব ফিকাহবিদই বলেছেন, তার দশ দিন হায়য ধরতে হবে। আর তার পরবর্তী দিনগুলো মাসের শেষ পর্যন্ত 'ইস্তাহাযা' ধরতে হবে। তাতে তার হায়য হবে দশ দিনের আর তুহর হবে বিশ দিনের। মৌলনীতিতে কোন মতপার্থক্যের উল্লেখ হয়নি। বশর ইবনুল ওলীদ ইমাম আবূ ইউসূফের এই মতের উল্লেখ করেছেন যে, হায়যের কম-সে-কম মিয়াদ তিন দিন ধরে, তার পরে নামায পড়তে শুরু করবে। আর স্বামীর সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে দশ দিন ধরবে। দশ দিনের পর ছাড়া রোযা কাযা করা শুরু করবে না। এভাবে রমযানের দশ দিন রোযা থাকবে। তার সাত দিন কাযা করবে। ইবরাহীম নখয়ী বলেছেন, মেয়েদের সমান দিনগুলোতে সে বসে থাকবে। ইমাম মালিক বলেছেন, এরূপ অবস্থায় মেয়েরা সাধারণত যে দিনগুলোতে বসে থাকে, তাই সে-ও বসে থাকবে। তার পরে সে 'হায়যের রোগিনী' মনে

করতে হবে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, তার হায়য-এর কম-সে-কম মিয়াদ হচ্ছে এক দিন এক রাত্রি। প্রথমোক্ত কথাটির সহীহ্ হওয়ার দলীল হচ্ছে সকলের ঐকমত্য এ ব্যাপারে যে, সেই নারী হায়যের পার্থক্য পূর্ণ বেশি দিনে নামায না পড়ার জন্যে আদিষ্ট। ফলে এই দিনগুলোতে সে হায়য অবস্থায় আছে মনে করতে হবে। এরূপ অবস্থা হায়যের হতে পারে। তাই পূর্ণ দশ দিন হায়য ধরতে হবে, এই সময়টার সেই হুকুম-ই কার্যকর হবে। তার বিপরীত তার কোন অভ্যাস নেই, তা-ই প্রমাণিত হবে। লক্ষণীয়, সকলেই বলেছেন, দশ দিনের আগেই যদি রক্তস্রাব বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তা হলে সেই সব কয়টা দিনই হায়য ধরতে হবে। তাতে প্রমাণিত হল যে, দশ দিনের জন্যে হায়যের হুকুমই বহাল থাকবে। কোন দলীল ব্যতীত এর কম ধরা জায়েয হবে না। উপরন্তু কম-সে-কম মিয়াদের অতিরিক্ত সন্দেহ পূর্ণ হলে— অধিক সময়ের উপরও বেশি হলে শুধু সন্দেহের কারণে তার হায়য হওয়ার হুকুমটা ক্ষুণ্ন হওয়া উচিত হবে না। নবী করীম (স) মাসের উনত্রিশ তারিখ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে ত্রিশ দিন পুরা করার আদেশ করেছেন রোযা রাখা বা ভাঙ্গার ব্যাপারে। বলেছেন ঃ فَانْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاَثِيْنَ 'উনত্রিশ তারিখ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার দরুন নতুন চাঁদ দেখা না গেলে ত্রিশ দিন পূর্ণ গণনা কর।' কেননা মাসের শুরুটা যদি নিশ্চিত হয়, তা হলে তার শেষ হওয়াটা সন্দেহপূর্ণ হওয়া উচিত নয়।

যদি বলা হয় যে, মেয়েলোকের দশ দিনের কমের হায়যের অভ্যাস, তা যদি ছাড়িয়ে গিয়েও রক্তস্রাব চলে, তা হলে তার অভ্যাসের দিকেই ফিরে যেতে হবে। শুরুতেই হায়যের হুকুমে বেশি হওয়াটা তার দিনগুলো গণ্যকরণে প্রতিবন্ধক হবে না, অনুরূপভাবে যে মেয়েলোক তার অভ্যাসের দিনগুলোর শুরুতেই নামায না-পড়ার জন্যে আদিষ্ট হবে—যদিও তা তিন দিনের কম হয়। তিন দিনের কম সময়ে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে আমরা বলব, সে যা দেখেছে, তা হায়য নয়। তিন দিন পূর্ণ হলেই তা হায়য হবে।

জবাবে বলা যাবে, যার হায়যের দিনগুলো জানা-শুনা-পরিচিত, বাড়তি দিনের হুকুম সেখানে গণ্য ও বিবেচিত হবে দশ দিনে তার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّارَةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا -

হায়যের রোগিনী তার কুরুর দিনগুলোর নামায ছেড়ে দেবে।

এ থেকে বোঝা গেল যে, বেশি দিনের ব্যাপারটি অবশ্য বিবেচিত হবে। কেননা আমাদের জানা আছে, তার দিনগুলো জ্ঞাত-পরিচিত। আর সূচনা পর্বের পূর্বে তার কোন দিন ছিল না যা গণ্য হওয়া আবশ্যক। তাই দশ দিনে তার রক্ত দেখতে পাওয়া বিবেচনার বাইরে থাকবে। বরং আমাদের মতে দশ দিনের সূচনা পর্বে সে যা দেখেছে, তা অভ্যাসের মতই। তা সংখ্যা গণনায় তার দিন ও সময় হয়ে যাবে। অবস্থা যখন এরূপ হবে, তখন দশ দিনের সূচনা পর্বে সে যে রক্ত দেখেছে, তা গণ্য হওয়া জায়েয হবে না। বরং তাকে হায়য বলে ধরে নেয়াই কর্তব্য হবে। কেননা হায়য তো এই রূপই হয়ে থাকে। আর যে নারী তার নির্দিষ্ট দিনগুলোর শুরুতে রক্ত দেখেছে, আর নামায রোযা ত্যাগ করার জন্যে সে আদিষ্ট বলে আমরা যে সিদ্ধান্ত দিয়েছি, যা তিন দিনের কমে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তা তার হায়য হওয়ার আওতার বাইরে গণ্য হবে। কেননা তা শুরুতেই বিবেচিত হয়েছে। আমরা জানি যে, হায়যের একটা কম-সে-কম মিয়াদ আছে। তার কম হলে তা সেই হায়য হবে না, যে রক্ত সে দেখেছে। এই কারণে তা বিবেচনার মধ্যে

আসবে। তিন দিন তার রক্ত দেখার পর সূচনা পর্ব গণ্য হওয়া আবশ্যকীয় নয়। তাই সমগ্র দশ দিনই হায়য হবে, তার কমে সীমাবদ্ধ করার আবশ্যকতার কোন প্রমাণ না হওয়ার কারণে।

তবে ইমাম আবূ ইউসূফ তাকে তার অবস্থায় ধরেছেন যার হায়য পাঁচ কিংবা ছয় দিন হয়। ষষ্ঠ দিনে সে সন্দেহে পতিত হবে। তাঁরা সকলেই বলেছেন যে, কমে সে নামায পড়বে। মীরাস ও এক তালাক দেয়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারও তাই। বেশি দিনে স্বামীর ব্যাপার সতর্কতার সাথে গ্রহণ করবে।

আবূ বকর বলেছেন— এটা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের দৃষ্টান্ত নয় এই দিক দিয়ে যে, তার দিনগুলো জানা ছিল। পাঁচ দিনের দৃঢ় বিশ্বাস হলে, ষষ্ঠ দিনে সন্দেহ হয়। এই কারণে নামায-রোযায় আমরা সতর্কতা গ্রহণ করেছি। স্বামীর ব্যাপারেও সতর্কতা গ্রহণ করেছি। সন্দেহের সাথে তাকে আমরা মুবাহ বলিনি। আর যার হায়য প্রথম হয়েছে, তার হিসেবেও গণ্য করার কোন দিন নেই। সে যে রক্ত দেখেছে— যা ঠিক হায়যের মতই হয়— তা হায়য মনে করতে হবে। তাকে কম-সে-কম হায়যের মিয়াদ ধরার কোন অর্থই হয় না। কেননা তার এমন কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই, যা তাকে আবশ্যকীয় বানাবে। এই দিক দিয়েও এই কথাটি নষ্ট হয়ে যায় যে, তার হায়যের কম-সে-কম মিয়াদ কিছু নেই। ফলে তা ও যা তার উপর বেশি হয়েছে তার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই ওটাকে সেই দিকে ফিরিয়ে নেয়া কর্তব্য হওয়ার দিক দিয়ে। কাজেই এরূপ অবস্থায় বেশির মিয়াদটা গণ্য করাই আবশ্যক। কেননা বেশির ভাগে হায়য হওয়া নিশ্চিত হয়। সে হুকুম ভঙ্গ হওয়ার কোন দলীল নেই। ইমাম আবূ হানীফার মতই যে সত্য তার প্রমাণ এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা হায়য হওয়া থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়া বৃদ্ধা ও অল্প বয়সের মেয়ের ইদ্দতকাল তিনমাস নির্ধারিত করেছেন হায়যের বিকল্প হিসেবে। প্রত্যেকটি তুহর ও হায়যের স্থানে একটি মাস ধরেছেন। তা থেকে বোঝা গেল যে, রক্তস্রাব অব্যাহত থাকলে এবং তার অভ্যাসগত সময়কাল কিছু না থাকলে তার এক হায়যও এক তুহর পূর্ণ করে ধরা কর্তব্য হবে। আর জানা আছে যে, তুহর-এর বেশি সময়ের কোন সীমা জানা নেই। যদিও হায়যের বেশির পক্ষের মিয়াদ পরিমাণ জানা আছে। তাই হায়যের বেশির ভাগের মিয়াদ পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। মাসের অবশিষ্ট দিনগুলো হবে তুহর। কেননা মাসের অবশিষ্ট দিনে তুহর-এর সময় পরিমাণ গণ্য হওয়া অন্যের তুলনায় অধিক উত্তম নয়। কাজেই মাসের অবশিষ্ট সময় কালের তুহর গণ্য হবে তা, যা হায়যের অধিক দিন মিয়াদের অবশিষ্ট থাকবে। লক্ষণীয় যে হায়য দশ দিনের কম সময়ে হলে তুহরে যা কম পড়েছে তা বাড়তি ধরতে বাধ্য হবে। আর তুহরের বৃদ্ধি পাঁচ দিন কিংবা ছয় দিন হবে, তাও নয়। তাই হায়যের বেশির পক্ষের দিনগুলোই গণ্য হওয়া আবশ্যক। মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোকে তুহ্‌র মনে করতে হবে। আর এই প্রথম হায়য হওয়া মেয়েটির জন্যে এক মাসে হায়য ও তুহর পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। রাসূলে করীম (স) হুমনা (রা)-কে বলেছিলেনঃ 'তুমি আল্লাহ্‌র জানামতে ছয় কিংবা সাত দিন হায়য অবস্থায় থাকবে, যেমন মেয়েলোকেরা প্রতি মাসে হায়য সম্পন্না হয়ে থাকে।' তিনি একথা বলে জানিয়ে দিলেন যে, মেয়েদের প্রতি মাসের অভ্যাস হচ্ছে একটি হায়য ও একটি তুহর হওয়া।

যদি বলা হয়, নবী করীম (স) যেমন বলেছেন, তার জন্যেও ছয় কিংবা সাত দিন ধার্য করা হল না কেন?

জবাবে বলা যাবে, আমরা তা বলিনি কয়েকটি কারণে। একটি আমরা কোন মনীষী সম্পর্কেই জানি না যে, তিনি প্রথম হায়য হওয়া মেয়ে সম্পর্কে এরূপ কথা বলেছেন। দ্বিতীয়—

যাঁকে একথাটি বলা হয়েছিল, তাঁর অভ্যাস যদি ছয় বা সাত দিনের হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্যে অন্য কোন হিসেবে গ্রহণীয় হবে না। অতএব আমরা হাদীসকে দলীল বানিয়ে যা বলেছি, তা সহীহ। কেননা আমরা তো হায়য ও তুহরকে এক মাসের মধ্যে অভ্যস্ত-পরিচিত পরিবেশের মধ্যে প্রমাণ করতে চেয়েছি। যাঁরা বলেছেন যে, সাধারণ নারীকুলের হায়যের মতই সে-ও বসে থাকবে, তাদের এই কথার কোন তাৎপর্য নেই। কেননা নবী করীম (রা) হায়যের রোগিণী ও অন্যান্য সাধারণ নারীকুলের ন্যায় বসে থাকুক, তা চান নি। তিনি মাত্র একজনকেই তাদের অভ্যাসের দিকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাই বলেছিলেন, সে যেন মেয়েদের কুরুর দিনগুলোতে বসে থাকে এবং অন্যকে আদেশ করেছেন, আল্লাহ্‌র ইলমে ছয় কিংবা সাত দিন বসে থাকতে। অপর একজনকে আদেশ করেছেন, সে যেন প্রতি নামাযের জন্যে একবার গোসল করে। তাদের কাউকেই অন্যান্য মেয়েদের অভ্যাসের দিন পর্যন্ত বসে থাকতে বলেন নি। কেননা সাধারণ মেয়েদের ও অপরিচিতা ভিন্ন মেয়েদের এবং তাদের থেকে কম বয়সের ও বেশি বয়সের মেয়েরা তো অভিন্ন— সমান। আবার বয়সের দিক দিয়ে সমান হয়েও হায়যের ব্যাপারে তাদের অভ্যাস বিভিন্ন হতে পারে। অতএব তাদের মেয়েলোকদের অন্যদের অপেক্ষা কোন বিশেষত্ব নেই।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَاتَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ - فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ -

এবং তোমরা স্ত্রীদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়। যখন তারা পবিত্র হবে, তখন তোমরা তাদের নিকট যাবে।

মনীষী বিশেষজ্ঞগণ এ আয়াতের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, রক্তস্রাব বন্ধ বা বিচ্ছিন্ন হলেই স্ত্রী সঙ্গম মুবাহ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে তাঁরা হায়যের কম-সে-কম বা বেশির মিয়াদের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। কেউ বলেছেন, হায়যের কম-সে-কম ও বেশীর মিয়াদে গোসল করার পূর্বে স্ত্রী সঙ্গম করা জায়েয নয়, গোসলের পরই তা জায়েয হবে। শাফেয়ী মাযহাবের এই মত। হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, রক্তস্রাব বন্ধ হলে ও তার দিন-কাল দশের কম হলে তা-ও হায়য অবস্থা মনে করতে হবে যতক্ষণ না গোসল করছে। অবশ্য পানি পাওয়া গেলে তবে। কিংবা তার নামাযের সময় অর উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গেলে তবে। এ দুটির কোন একটি হলে হায়যের আওতার বাইরে গেল মনে করা যাবে। তখন তার স্বামীর জন্যে তার সাথে সঙ্গম করা জায়েয হবে। আর সেটি শেষ হায়য হলে তার ইদ্দতও সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। আর তার অভ্যস্ত দিন যদি দশ দিন হয়, তাহলে এই দশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেলেই হায়য অবস্থার অবসান হয়ে যাবে। তখন তার অবস্থা হবে অপবিত্র মেয়েলোকের মত স্বামীর সঙ্গম করা মুবাহ হওয়া, ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়া ইত্যাদির দিকদিয়ে।

হায়যের অভ্যস্ত দিনগুলোর শেষ হওয়া ও রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার পর গোসলের পূর্বে সর্বাবস্থায়ই তার সাথে সঙ্গম করা জায়েয— এই মত যাঁরা গ্রহণ করেছেন, তাঁদের দলীল হচ্ছেঃ

وَلَاتَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ -

তোমরা তাদের নিকটে যাবে না, যতক্ষণ তারা পবিত্র না হচ্ছে।

আল্লাহ্‌র এই কথাটি এ আয়াতে একটা সময়সীমা দেয়া হয়েছে, যার পরের অবস্থা পূর্বের বিপরীত হবে। রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার পর তার সাথে সঙ্গম করা সাধারণভাবেই মুবাহ। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ 'ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত।'

এবং

وَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ -

এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র ফায়সালার দিকে ফিরে আসছে। (সূরা হুযারত ঃ ৯)

এভাবে কতগুলো শেষ সময়ের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। তার পরবর্তী অবস্থা পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে ভিন্নরূপ হবে। আল্লাহ্‌র কথা ঃ حَتّٰى يَطْهُرْنَ কথাটিও ঠিক এইরূপ। يَطْهُرْنَ পড়া হলে অর্থ হবে শুধু রক্তস্রাব বন্ধ হওয়া। একে يَطَّهَّرْنَ -ও পড়া হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন। তাতেও সেই অর্থই হয়। যেমন পূর্বোল্লিখিত পাঠের হয়। তাতেও অর্থ দাঁড়াবে রক্তস্রাব বন্ধ হওয়া। কেননা রক্ত বন্ধ হওয়ার কথা বোঝাবার জন্যে উক্ত শব্দের দুরকমের পাঠই সিদ্ধ।

গোসল করার পূর্বে সর্বাবস্থায়ই স্ত্রী-সঙ্গম করা নিষিদ্ধ বলে যাঁরা মত গ্রহণ করেছেন, তাঁদের দলীল হচ্ছে ঃ

فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ -

পরে যখন তারা পবিত্র হবে, তখন তোমরা তাদের নিকটে যাও, যেমন আসতে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন।

এ আয়াতে স্ত্রী-সঙ্গম মুবাহ হওয়ার ক্ষেত্রে দুই শর্তের উল্লেখ হয়েছে। একটি রক্তস্রাব বন্ধ হওয়া আর দ্বিতীয় গোসল করা। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ কথাটি গোসল না করা পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয় না। এই কথাটি ঠিক তেমন, যেমন বলা হয় ঃ 'তুমি জায়দকে কিছুই দেবে না, যতক্ষণ না সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবে।' যখন সে সেখানে প্রবেশ করবে ও বসবে, তখন তুমি তাকে একটি দীনার দেবে। এই কথা থেকে বোঝা যায়, একটি দীনার পাওয়ার অধিকার হওয়া নির্ভর করে ঘরে প্রবেশ করা ও বসা—এই সবের উপর। যেমন কুরআনের আয়াত ঃ

وَلَاتَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَّتَرَاجَعَا -

সে স্বামীর জন্যে তিন তালাক দেয়া স্ত্রী পরে হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে তাকে ছাড়া অপর একজন স্বামী বিয়ে (গ্রহণ) করবে। পরে সে তাকে তালাক দেবে। তারপরে এই দুজনের পুনরায় বিবাহিত হওয়ায় তাদের দুজনার কোন দোষ হবে না।

তিন তালাক দেয়া স্ত্রীকে পুনরায় বিয়ে করা হালাল হওয়ার জন্যে দুটি শর্ত করা হয়েছে। এই আলোচ্য আয়াতটিতেও তেমনি দুটি শর্ত করা হয়েছে স্ত্রী-সঙ্গম মুবাহ হওয়ার জন্যে। তা দুটি— তুহর, যা রক্তস্রাব বন্ধ হওয়া দ্বারা সম্পূর্ণ হয় ও গোসল করা।

আবূ বকর বলেছেন— আল্লাহ্র কথা ঃ حَتّٰى يَطْهُرْنَ -এর অর্থ শুধু রক্তস্রাব বন্ধ হওয়া। এর মধ্যে গোসল করার কথা নেই। কেননা হায়য অবস্থায় গোসল করলেও তো সে পাক হবে না। কাজেই আয়াতাংশের অর্থ শুধু পাক-পবিত্র হওয়া, গোসল করা তার মধ্যে গণ্য নয়। আর রক্তস্রাব বন্ধ হলেই সে হায়য-এর আওতার বাইরে বেরিয়ে গেল। তবে আয়াতাংশ যদি পড়া হয় حَتّٰى يَطَّهَّرْنَ তাহলে তাতে রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে গোসল করার কথাটাও শামিল বুঝতে হবে। তবে আয়তাংশটির প্রথম পাঠ 'মুহকাম' আর দ্বিতীয় পাঠ 'মুতাশাবিহ্'। তবে 'মুতাশাবিহ'র হুকুমটা 'মুহকাম' হুকুমেই পরিণত হবে। তাহলে একইভাবে দুটি পাঠেরই তাৎপর্য সমন্বিত হবে। আর উভয় তাৎপর্যের দাবি হচ্ছে— রক্ত বন্ধ হলেই যৌন সঙ্গম মুবাহ হবে। কেননা রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার অর্থ-ই হল হায়যের আওতার বাইরে চলে যাওয়া। তবে আল্লাহ্র فَاِذَا تَطَهَّرْنَ 'তারা যখন পবিত্র হবে' কথাটির ভাব-তাৎপর্য পূর্বোক্ত আয়াতাংশের দ্বিতীয় পাঠের মতই। তাতেও দুটি তাৎপর্য সমন্বিত হলে কথাটি এই দাঁড়ায় ঃ 'তোমরা তাদের নিকটে যাবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হবে। যখন তারা পবিত্র হবে তখন তোমরা তাদের নিকট যাও।' এতে কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক হল— সুদৃঢ় হল। যেমন এই কথাটি ঃ 'তাকে দেবে না যতক্ষণ না ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবে। যখন প্রবেশ করবে, তখন দেবে।' চরম কাজটির উপর তাগিদ বোঝা যাবে। যদিও তার হুকুমটা পূর্বের কথার বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। আর যখন তার ভাব-তাৎপর্য ব্যাপক হবে সেই দিক দিয়ে, যে দিকের উল্লেখ করেছি এবং চরম লক্ষ্যটাকে তার প্রকৃত অবস্থার উপর ধারণ করা কর্তব্য হবে, তখন বাহ্যিক পাঠেরই দাবি হবে রক্তস্রাব বন্ধ হতেই— যার কারণে সে হায়যের আওতার বাইরে যেতে পারে— তার সাথে সঙ্গম করা মুবাহ হয়ে যাবে।

অপর দিক দিয়ে তাতে আর কটি সম্ভাবনা রয়েছে। তা হচ্ছে, আল্লাহ্র কথা ঃ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ এর অর্থ শামিল হবে। তাদের পক্ষে যখন পানি বা তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্র হওয়া সম্ভব হবে। যেমন বলা হয়েছে ঃ 'সূর্য যখন ডুবে যাবে, তখনই রোযাদার ইফতার করবে।' তার অর্থ, তার ইফতার করা হালাল হবে। যেমন, যে ভাঙ্গল কিংবা উপরে উঠল, সে হালাল হল। তার উপর পরবর্তী বছর হজ্জ করা হালাল হবে। অর্থাৎ তার পক্ষে হালাল হওয়া জায়েয হয়ে গেল। কিংবা তালাকপ্রাপ্তাকে বলা হয়— সে যদি তার ইদ্দতকাল শেষ করে, তাহলে সে স্বামীদের জন্যে হালাল হল। অর্থাৎ সে স্বামী গ্রহণ করতে পারে, বিয়ে করতে পারে। এই তাৎপর্যই রয়েছে রাসূলে করীম (স)-এর এই কথায়, যা তিনি ফাতিমা বিনতে কায়সকে বলেছিলেন ঃ 'যখন তুমি হালাল হবে, তখন আমাকে জানাবে।' এই সম্ভাবনা যখন রয়েছে, তখন চরম পর্যায়টা তার পরে তার সাথে সঙ্গম করার বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে না।

তবে আল্লাহ্র কথা ঃ 'পরে সে তার জন্যে হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে তাকে ছাড়া অন্য স্বামী গ্রহণ করবে।' কেননা এ আয়াতে চরম পর্যায়টা প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ এবং তার সাথে তার সঙ্গমই তৃতীয় পর্যায়ে প্রথম স্বামীকে বিয়ে করার হারামত্ব দূর করে দেয়। দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সঙ্গম হওয়া শর্ত। তার কাছ থেকে তালাক প্রাপ্তির আগেই তার সাথে সঙ্গম কার্য দ্বারা হারামত্ব দূর হয়ে গেল অর্থাৎ শর্ত পূরণ হয়ে গেল। তিনি তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীর দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সঙ্গমের পর তার তালাক দান শর্ত নয়। ইমাম শাফেয়ী তাঁর মতের যথার্থতা প্রমাণের জন্যে যে আয়াতের উল্লেখ করেছেন, তাতে তাঁর পক্ষের কোন দলীল নেই। তাঁর বিপরীত মতের লোকদের কথাও তাতে অস্বীকৃত হয়নি।

তবে আমাদের মাযহাবের দিক দিয়ে আয়াতটি ব্যবহৃত হয়েছে সম্ভাব্য ব্যাখ্যাকে তার প্রকৃত তাৎপর্যের উপর ধারণ করার জন্যে, সেই উভয় অবস্থাতেই, যে দুটিতে সে দুটির প্রয়োগ সম্ভব। তাই আমরা বলব, তাঁর কথা ঃ يَطْهُرْنَ তার প্রকৃত অর্থেই ব্যহৃত। যার হায়যের অভ্যস্ত দিন হবে দশ, তার এই দশ দিন অতিবাহিত হতেই তার স্বামীর পক্ষে তার সাথে সঙ্গম করা মুবাহ হবে। আর তাঁর কথা يَطْهُرْنَ এবং কথা فَإِذَا تَطَهَّرْنَ দুটিরই তাৎপর্যে গোসল রয়েছে। যদি তার হায়যের অভ্যস্ত দিন দশের কম হয় এবং নামাযের সময় অতীত না হয়ে থাকে। কেননা এ ব্যাপারে দলীল পাওয়া গেছে যে, নামাযের সময় অতিবাহিত হলে তার সাথে সঙ্গম করা মুবাহ হবে সেই ব্যাখ্যাসহ, যা আমরা পরে বলছি। তাতে দুটি ক্রিয়ার একটিও পরোক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং প্রকৃত অর্থেই দুটি ব্যবহৃত হয়েছে, উভয় অবস্থাতেই।

যদি বলা হয়, দুই রকমের পাঠকে দুটি স্বতন্ত্র আয়াত মনে করা হবে না কেন, যা একই অবস্থায় এক সাথে ব্যবহৃত হবে?

জবাবে বলা হবে, দুটি পাঠকে দুটি আয়াত মনে করা হলে— যেমন বলেছি— তা উত্তম হবে এই দিক দিয়ে যে, যদি দুটি আয়াতই হতো, যার একটির দাবি হতো সঙ্গম মুবাহ হওয়ার জন্যে রক্তের শেষটুকুও বন্ধ হওয়া। আর অপরটির চরম পর্যায়ে দাবি হবে গোসল করা, তাহলে দুটিকে দুই অবস্থায় প্রয়োগ করা কর্তব্য হয়ে পড়ত। তাতে দুটির প্রত্যেকটিই তার প্রকৃত অর্থে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হতো। যার দাবি হচ্ছে চরম পর্যায়ের হুকুম। আর তা সম্ভব হতো কেবল তখন দুটিই ব্যবহৃত হতো দুই অবস্থায় যেমন বলেছি সেই ভাবে। বিপরীত মতের লোক যেমন বলছে সেই অর্থে যদি আমরা সে দুটিকে ব্যবহার করতাম, তা হলে দুটি চরম পর্যায়ের একটিকে প্রত্যাহার করতে হতো। কেননা সে বলে যে, তারা যদিও পাক হয়েছে, রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে, তবু গোসল না করা পর্যন্ত তার সাথে সঙ্গম করা জায়েয হবে না। আমরা যদি তাকে সূচনাকালীন দলীল বানাই তা হলে তা ব্যাপক ও যথেষ্ট হবে। আমাদের ফিকাহবিদগণ তা গণ্য করেছেন তার ব্যাপারে যার অভ্যস্ত হায়য-কাল দশ দিনের কম।

এই সময়ের মধ্যে তার রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গেল। তবুও পুনরায় তা শুরু হয়ে যাওয়াটা অসম্ভব নয়। তা হলে তা হায়য গণ্য হবে। কেননা মেয়েরা যে তুহর দেখে তার প্রত্যেকটাই প্রকৃত তুহর নয়। যার হায়য চলতে থাকে, সে-ও কখনও রক্তস্রাব হতে দেখে, কখনও দেখে তা বন্ধ হয়ে গেছে। কাজেই যখন রক্তস্রাব বন্ধ থাকল, তখনও হায়য চলছে, হায়য শেষ হয়ে গেছে— এমন কথা বলা যেতে পারে না। এজন্যে তাঁরা বলেছেন, রক্ত বন্ধ হওয়ার কথা গ্রহণযোগ্যভাবে বলা যাবে দুটি জিনিসের কোন একটি হলে। হয় গোসল করা হলে, তাহলে তখন হায়য নেই, মনে করা যাবে ঐকমত্যের ভিত্তিতে এবং নামায পড়া মুবাহ হলে। এ দুটি হায়য অবস্থার পরিপন্থী। কিংবা নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে। তা হলে তখন নামাযের ফরয বাধ্যতামূলক হবে। আর ফরয নামায বাধ্যতামূলক হওয়া হায়য অবস্থা বর্তমান থাকার পরিপন্থী। যার হায়য চলছে তার উপর নামাযের ফরয ধার্য হওয়া জায়েয নয়। তাই হায়য অবস্থা যখন শেষ হয়ে গেল এবং তুহর অবস্থা এসে গেল, শুধু গোসল করাই বাকী, তখন যৌন সঙ্গম নিষিদ্ধ নয়। যেমন না-পাক অবস্থায় থাকা স্ত্রী স্বামীর জন্যে জায়েয। সঙ্গমও হতে পারে। সাহাবীগণ থেকেও ইদ্দত শেষ হওয়ার জন্যে গোসল করার গুরুত্ব পর্যায়ে বর্ণনা এসেছে। ঈসা আল-খাইয়্যাত-শবী সূত্রে তের জন সাহাবী থেকে বর্ণনা এসেছে। তাঁদের মধ্যে হযরত আবূ বকর, উমর, ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ ব্যক্তি তার স্ত্রীর

উপর বেশি হকদার তার তৃতীয় হায়য থেকে গোসল না করা পর্যন্তও। হযরত আলী, উবাদাতা ইবনুস সামিত, আবুদ-দারদা (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে।

তবে তার হায়যের অভ্যস্ত দিন যদি দশ হয়, তাহলে আমাদের মতে দশ দিনের পরও হায়য আছে বলা জায়েয নয়। তাই দশ দিনের পর তা নিঃশেষ হয়ে গেছে বলে মনে করা উচিত হবে। হায়য শেষ হয়ে গেলে হায়যের হুকুম তো আর থাকতে পারে না। আল্লাহ্ তো কেবল সে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম নিষিদ্ধ করেছেন, যার হায়য হচ্ছে। কাজেই হায়যের হুকুম উঠে যাওয়ার ও হায়য শেষ হয়ে যাওয়ার পর স্ত্রী-সঙ্গম নিষিদ্ধ থাকতে পারে না। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ -

তোমরা স্ত্রীদেরকে হায়য অবস্থায় বিচ্ছিন্ন কর এবং পাক না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকট যেও না।

আলোচ্য অবস্থায় স্ত্রী তো পাক হয়ে গেছে। সে তার নির্দিষ্ট সময়-কাল অতিক্রম করেছে, যদি সে ইদ্দত পালন রত থেকে থাকে। এখন সে সব পাক নারীদের মতই। গোসল করা জরুরী হলেও তা সঙ্গম করা জায়েয হওয়ার পথে কোন প্রতিবন্ধক হবে না।

যদি বলা হয় দশ দিনের কমে যদি রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, তা হলে গোসল ওয়াজিব হবে। গোসল বাধ্যতামূলক হওয়া হায়য অবস্থার পরিপন্থী। কেননা যার হায়য হয় তার উপর গোসল বাধ্যতামূলক হওয়া জায়েয নয়। যেমন নামায ফরয হওয়া বাধ্যতামূলক হওয়া প্রসঙ্গে তুমি বলেছ।

তাকে জবাবে বলা হবে, হায়য যখন গোসল ওয়াজিব করে, তখন তার বাধ্যতামূলক হওয়ার পরিপন্থী নয় তার হুকুমের তার স্থিতির। লক্ষণীয়, নামাযের তাহরীমা ওয়াজিব করে সালাম ফেরানো। তার শেষ পর্যন্ত পৌঁছার বাধ্যতামূলক হওয়া তার হুকুম বহাল থাকার পরিপন্থী নয়। তেমনি ইহরাম বাঁধলে শেষে মাথা মুণ্ডন করতে হয়। কিন্তু তার আবশ্যকীয় হওয়াটা তার ইহরাম স্থিতিশীল হওয়ার পরিপন্থী নয় যতক্ষণ পর্যন্ত মুণ্ডন কার্য না করেছে। গোসলও তেমনি। তা হায়য হওয়ার পর জরুরী। তা শেষ কাজ, মেয়েদের হায়যের পর পবিত্র হওয়ার জন্যে তা আবশ্যকীয়। তার বাধ্যতামূলক হওয়ায় হায়যের হুকুমের বিপরীত।

আল্লাহ্র কথা ঃ

حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ -

যতক্ষণ তারা পবিত্র না হচ্ছে, পরে তারা যখন পবিত্র হবে....

এর মধ্যে গোসলের কথাও আছে। তাই এই কথাটি এ কথার মত হয়ে গেল ঃ

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا -

তোমরা যদি না-পাক হয়ে থাক, তাহলে পবিত্র হও।

এ থেকে বোঝা যায়, হায়য নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর নারীর গোসল করা কর্তব্য। নবী করীম (স) থেকেও তা বর্ণিত এবং মুসলিম উম্মাহ সে বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ -

তারা যখন পবিত্র হয়ে যাবে, তখন তোমরা তাদের নিকট আস তেমনিভাবে, যেমন আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্র এই কথাটি নিষিদ্ধ ও মুবাহ্ হওয়ার মাঝে সাধারণ। তা ওয়াজিব হিসেবে নয়। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

فَاذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ -

যখন নামায সম্পূর্ণ আদায় হয়ে যাবে, তখন তোমরা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়। (জুম'আ ঃ ১০)

এবং

وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا -

তোমরা যখন হালাল হয়ে যাবে, তখন তোমরা শিকার কর (শিকার করতে পার)। (সূরা মায়িদা ঃ ২)

এসব হুকুম পরবর্তী কাজটাকে মুবাহ প্রমাণ করে মাত্র। নিষিদ্ধ থাকার পর তা মুবাহ করা হয়েছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ -

যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন।

ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদাতা, রুবাই ইবনে আনাস এর অর্থ বলেছেন, যৌনাঙ্গে সঙ্গম করতে বলা হয়েছে। শুরুতেই হায়যের কারণে স্ত্রীদের সাথে মিলন না করার আদেশের পর এই আদেশ মিলন করার অনুমতি মাত্র। এর আগে বলা হয়েছিল ঃ 'অতএব তোমরা স্ত্রীদেরকে হায়য অবস্থায় ত্যাগ কর।' সুদ্দী ও দহাক বলেছেন, তুহর অবস্থায়, হায়য অবস্থায় নয়। ইবনুল হানফীয়া বলেছেন, বিয়ে করে, যিনাকার হিসেবে নয়।

আবূ বকর বলেছেন— আল্লাহ এই সব কথাই বলতে চেয়েছেন, কেননা এই সবগুলোই হচ্ছে আল্লাহ্র আদেশ। আয়াতে এই সব অর্থই শামিল রয়েছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন, ভালোবাসেন পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের।

আতা থেকে বর্ণিত, পানি দ্বারা নামাযের জন্যে পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের কথা বলা হয়েছে। মুজাহিদ বলেছেন, গুনাহ থেকে পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের কথা বলা হয়েছে। আবূ বকর বলেছেন, পানি দ্বারা পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের সম্পর্কে এই কথা অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা এর পূর্বের আয়াতে 'তাহারাত'-এর কথা বলা হয়েছে। অতএব আয়াতে নামাযের জন্যে পানি দ্বারা তাহারাত গ্রহণের কথাই বলা হয়েছে। 'তারা যখন পবিত্র হবে, তখন তোমরা তাদের নিকট যাও' আয়াতে। অতএব 'আল্লাহ্ পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন' আয়াতে প্রশংসা করা হয়েছে তাদের, যারা নামাযের জন্যে পানির দ্বারা পবিত্রতা গ্রহন করে। তাদের প্রশংসায় আল্লাহ্ এ-ও বলেছেন ঃ

فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

ওখানে এমন সব লোক রয়েছে যারা পবিত্রতা অবলম্বনকে পছন্দ করে। আর আল্লাহ্‌ও ভালোবাসেন পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকে।

বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ তাদের প্রশংসা করেছেন এজন্যে যে, তারা পানি দ্বারা 'ইস্তিন্‌জা' করত।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ -

তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্যে ক্ষেত। অতএব তোমাদের ক্ষেতে আস যেদিক দিয়েই তোমরা ইচ্ছা কর।

'আল-হারস' মানে ক্ষেত। আর ক্ষেত হচ্ছে চাষাবাদের স্থান। ইঙ্গিতে এই স্থানের কথা বলা হয়েছে যৌন সঙ্গমের স্থান হিসেবে। স্ত্রীদেরকে ক্ষেত বলা হয়েছে। কেননা তারাই হচ্ছে সন্তান উৎপাদনের কেন্দ্র স্থান। আল্লাহ্‌র কথা ঃ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ 'তোমরা তোমাদের ক্ষেতে আস যেমন করে তোমরা চাও।' এই কথা সঙ্গমকে মুবাহ করে দিয়েছে, যা স্ত্রী-অঙ্গে হয়। কেননা আসলে 'চাষের' জায়গা সেটাই।

নারীদের পায়খানার পথে সঙ্গম করা সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। হানাফী ফিকাবিদগণ বলেছেন, তা হারাম। খুব তীব্র ও কঠোর ভাষায় তা নিষেধ করেছেন। সওরী ও শাফেয়ীও তাই বলেছেন আল মুজানীর বর্ণনা মতে। তাহাভী বলেছেন, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ্, ইবনে আবদুল হিকাম বলেছেন, তিনি ইমাম শাফেয়ীকে বলতে শুনেছেন— এই কাজের হারাম বা হালাল হওয়া পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) থেকে সহীহ্ কোন বর্ণনা পাওয়া যায়নি। তবে কিয়াস বলে, তা হালাল হবে। আসবাগ ইবনুল ফারজ ইবনুল কাসিম সূত্রে ইমাম মালিকের এই মত বর্ণনা করেছেন ঃ

مَا اَدْرَكْتُ اَحَدً اُقْتَدِىْ فِىْ دِيْنِىْ يَشُكُّ فِيْهِ اَنَّهُ حَلَالٌ -

দ্বীনি ব্যাপারাদিতে অনুসরণ করা হয় এমন কোন ব্যক্তিকে তা হালাল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ্ পোষণ করে এমন কোন ব্যক্তিকে আমি পাইনি।

অর্থাৎ স্ত্রীর পায়খানা অঙ্গে যৌনকর্ম করা তাঁর মতে নিঃসন্দেহে হালাল। এর পরই তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেছেন ঃ 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ক্ষেত বিশেষ। অতএব তোমরা তোমাদের ক্ষেতে আস যেমন ইচ্ছা।'

বললেন, এর চাইতে অধিক স্পষ্ট কথা আর কি হতে পারে। আমি তো এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ করি না। ইবনুল কাসিম বলেছেন, আমি মালিক ইবনে আনাসকে বললাম, মিসরে আমাদের নিকট লাইস্ ইবনে সা'দ রয়েছেন। তিনি হারিস ইবনে ইয়াকুব, আবূল হুবাব সাঈদ ইবনে ইয়াসার সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন। বলেছেন, আমি ইবনে উমর (রা)-কে বললাম ঃ আমি ক্রীতদাসীদের সাথে 'তাহমীধ' করি, এ বিষয়ে আপনার মত কি ? তিনি বললেন ঃ 'তাহমীধ' কি ? তখন আমি পেছনাঙ্গের উল্লেখ করলাম। বললেন, আর তা কোন মুসলমান করে ?

এই কথা শুনে ইমাম মালিক বললেন, শুন, রবীআতা ইবনে আবূ আবদুর রহমান আবুল হুবাব সাঈদ ইবনে ইয়াসার থেকে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ইবনে উমর (রা)-কে এই বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি জবাবে বলেছিলেন : لاباس به। 'তাতে কোন দোষ নেই।'

ইবনুল কাসিম বললেন, এই সময় মজলিসের এক ব্যক্তি বলে উঠল, 'হে আবদুল্লাহ, আপনি সালিম থেকে শুনে কথা বলছেন। তিনি তো বলেছেন, বান্দা মিথ্যা বলেছে কিংবা কাফির ব্যক্তি মিথ্যা বলেছে আমার পিতা নাফের প্রসঙ্গে। যেমন মিথ্যা বলেছেন ইকরামা ইবনে আব্বাস সম্পর্কে। তখন মালিক বললেন, ইয়াযীদ ইবনে রূমানের কথা শোন, তিনি সালিম, তাঁর পিতার সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তা করতেন।

আবূ বকর বলেছেন, সুলায়মান ইবনে বিলাল জায়দ ইবনে আসলাম ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর পশ্চাদ্বারে সঙ্গম করেছে। তাতে মনে মনে সে লজ্জিত ও দুঃখিত হয়। তখন আল্লাহ নাযিল করলেন : তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্যে ক্ষেত, তোমরা তোমাদের ক্ষেতে আস যেমন ইচ্ছা।'

তবে জায়দ ইবনে আসলাম ইবনে উমর (রা) থেকে হাদীস শুনেছেন— তা জানা যায়নি। ফযল ইবনে ফুয়ালাতা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, কাব ইবনে আল-কামাতা, আবুন-নদর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবনে উমরের মুক্ত করা গোলামকে বললেন, লোকেরা খুব বেশি করে বলছে যে, আপনি ইবনে উমর-এর সনদে অনেক কথা বলেন। আপনি বলেন যে, তিনি ফতোয়া দিয়েছেন যে, তোমরা স্ত্রীদের পশ্চাদ্বারে যৌন কর্ম কর। নাফে বললেন, ওরা আমার ব্যাপারে মিথ্যা বলেছে যে, ইবনে উমর একদিন কুরআন পাঠকালে 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ক্ষেত' এই পর্যন্ত এসে বললেন হে নাফে, এই আয়াতটির ব্যাপারে তুমি কিছু জানো কি ? বললাম, না। বললেন, আমরা— কুরায়শ বংশের লোকেরা— মেয়েলোক সংগ্রহ করতাম। আর আনসার বংশের মেয়েরা ইয়াহূদীদের সমাজ থেকে গ্রহণ করত। তারা তাদের নাপাক অবস্থায় ব্যবহৃত হতো। তখন আল্লাহ এই আয়াতটি নাযিল করলেন। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, এখানে বর্ণিত কারণটি ইবনে উমর (রা) থেকে জায়দ ইবনে আসলাম বর্ণিত, কারণ থেকে ভিন্নতর। কেননা নাফে এ কারণের ভিন্ন কথা বলেছেন। মায়মুন ইবনে মিহরানও বলেছেন এই কথা— অর্থাৎ স্ত্রীদের পশ্চাদ্দারে যৌন কর্ম হালাল হওয়ার কথা বলেছেন বয়োবৃদ্ধ হওয়ার ও বিবেক-বুদ্ধি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর।

আবূ বকর বলেছেন, ইমাম মালিকের মশহুর কথা হচ্ছে, তা মুবাহ। কিন্তু তার সঙ্গীরা— তিনি এমন কথা বলেছেন তা অস্বীকার করেন। কেননা এটা একটা হীন, নীচ, জঘন্য কাজ। কিন্তু তা যতই অস্বীকার করা হোক, তার চাইতে অনেক বেশি প্রখ্যাত। মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ, আবূ সুলায়মান আল-জাওজানী সূত্রে বলেছেন, আমি মালিক ইবনে আনাসের নিকট বসা ছিলাম। তখন তাঁকে পশ্চাদ্বারে যৌন কর্ম করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। শুনে তিনি তাঁর হাত দিয়ে প্রশ্নকারীর মাথায় থাপ্পর মারলেন এবং বললেন, এখনই আমি এ থেকে গোসল করেছি। তাঁর থেকে ইবনুল কাসিমও এই রকমেরই বর্ণনা করেছেন।

শরীয়াতের গ্রন্থাবলীতে একথা উল্লিখিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল-কুরামী থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি এ কাজে কোন দোষ মনে করতেন না। তিনি আল্লাহর কথা :

أَتَاتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ - وَتَذَرُوْنَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ -

তোমরা সারা দুনিয়ার পুরুষ ছেলেদের নিকট যাও, আর তোমাদের রব্ব তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের জন্যে যা সৃষ্টি করেছেন, তা পরিহার কর। (সূরা শু'আরা ঃ ১৬৫ ও ১৬৬)

এর অনুরূপ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। অর্থাৎ তোমরা শাহওয়াত পোষণ কর। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ مَحَاشُ النِّسَاءِ حَرَامٌ 'স্ত্রীদের সাথে 'লেওয়াতাত' করা হারাম'। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) এ কাজকে ছোট 'লেওয়াতাত' নামে অভিহিত করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি ইবনে উমর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। সম্ভবত এ বিষয়ে তাঁর থেকে কোন বর্ণনা আসেনি। তাহলে যা তাঁর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে বিরোধ ও পার্থক্য হয়ে পড়ত।

কুরআনের কথার বাহ্যিক অর্থ থেকে বোঝা যায়, স্ত্রীর যৌন অঙ্গে সঙ্গম করার মধ্যেই মুবাহ হওয়াটা সীমাবদ্ধ। কেননা ক্ষেত চাষের স্থান সেটাই। তবেই সন্তান উৎপাদন হওয়া সম্ভব হতে পারে। নবী করীম (স) থেকে সে কাজের হারাম হওয়া পর্যায়ে বিপুল সংখ্যক কথা বর্ণিত হয়েছে। খুজায়মা ইবনে সাবিত, আবূ হুরায়রাতা ও আলী ইবনে তলক (রা)-সকলেই নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ لَاتَأْتُوا النِّسَاءَ فِيْ اَدْبَارِهِنَّ 'তোমরা স্ত্রীদের পশ্চাদ্বারে যাবে না।' আমর ইবনে শুয়ায়ব, তাঁর পিতা, তাঁর দাদা সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, এটা তো ছোট লেওয়াতাত (পুং মৈথুন) অর্থাৎ স্ত্রীদের সাথেও এই কাজ করলে তা নিষিদ্ধ লেওয়াতাতই হয়ে যাবে।

হাম্মাদ ইবনে সালামাতা হাকীমুল আসরীম, আবূ তমীমা, আবূ হুরায়রাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ اَتٰى حَائِضًا اَوِامْرَأَةً فِىْ دُبُرِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ -

যে লোক হায়য হওয়া স্ত্রীর সাথে কিংবা স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে যৌন কর্ম করবে, সে মুহাম্মাদের প্রতি নাযিল হওয়া দ্বীনকে অস্বীকার করল।

ইবনে জুরাইজ মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির যাবির সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ ইয়াহুদীরা মুসলমানদের বলে, যে লোক তার স্ত্রীর সাথে পিছন দিক দিয়ে যৌন কর্ম করবে, তার সন্তান টেরা চোখধারী হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ক্ষেত। অতএব তোমরা তোমাদের ক্ষেতে আস যেভাবেই তোমাদের ইচ্ছা হয়।' তখন রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ 'সম্মুখ দিক দিয়ে পেছন দিক দিয়ে— যেদিক দিয়েই যৌনাঙ্গে সঙ্গম হতে পারে।' হাফসা বিনতে আবদুর রহমান উম্মে সালমা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) একই প্রতিবন্ধকের মধ্যে বলেছে।

মুজাহিদ ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এনেছেন আয়াতের ব্যাখ্যায়। বলেছেন, আয়াতে বলা হয়েছে, সন্তান জন্মের স্থানে আসবে যেমন তুমি চাও। ইকরামা ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَايَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى رَجُلٍ أَتٰى اِمْرَأَتَهُ فِىْ دُبُرِهَا -

যে লোক স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে যৌন কর্ম করবে, তার প্রতি আল্লাহ তাকাবেন না।

ইবনে তায়ূস তাঁর পিতার সূত্রে উল্লেখ করেছেন, ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সেই লোক সম্পর্কে, যে তার স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে যৌন কর্ম করে। তখন তিনি বলেছিলেন, এতো কুফর সম্পর্কে আমার নিকট জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। ইবনে উমর 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ক্ষেত' এই আয়াত সম্পর্কে বলেছেন ঃ যেমন করে তুমি চাও, যদি চাও তাহলে বিচ্ছিন্নভাবে; কিংবা অ-বিচ্ছিন্নভাবে। আবূ হানীফা কাসীর রিয়াহুল আসম থেকে এই বর্ণনাটি করেছেন ইবনে উমর-এর কথা হিসেবে। ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। এই মতটি আমাদের মতে ক্রীতদাসীদের ব্যাপারে প্রযোজ্য। আর স্বাধীনা মহিলার ব্যাপারে তার অনুমতি সাপেক্ষে।

যেমন বলেছি, এরূপ বর্ণনা আমাদের হানাফী মাযহাবে গৃহীত। আবূ বকর, উমর, উসমান, ইবনে মাসঊদ, ইবনে আব্বাস (রা)-ও অন্যান্যদের মত হিসেবে পাওয়া গেছে।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্র কথা ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ - اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَامَلَكَتْ اَيْمَا نُهُمْ -

আর যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের সংরক্ষক, তবে তাদের স্ত্রীদের ও দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্ত ক্রীতদাসীদের ছাড়া'। (সূরা মুমিনুন ঃ ৫৬)

আয়াতটি স্ত্রী ও ক্রীতদাসীদের গুহ্যদ্বারে যৌন কর্ম করা মুবাহ হওয়ার দাবি করে। কেননা এ আয়াতে নিঃশর্ত মুবাহ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কোনরূপ শর্ত আরোপ করা হয়নি। বিশেষ করেও কিছু বলা হয়নি।

জবাবে বলা যাবে, আল্লাহ্ যখন বলেছেন ঃ

فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ -

তোমরা তাদের নিকট আস যেমনভাবে আসবার জন্যে আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ করেছেন।

এরপরই আয়াতের ধারাবাহিকতায় বলেছেন ঃ

فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ -

তোমরা তোমাদের ক্ষেতে আস, যেমন করে তোমরা চাও।

এ থেকে স্পষ্ট হল যে, আদিষ্ট স্থান হচ্ছে ক্ষেতের স্থান যেখানে সন্তান উৎপাদনই হতে পারে। নিষেধের পর নিছক নিঃশর্ত যৌনকর্ম করার আদেশ করা হয়নি। এ যৌন কর্ম হতে হবে ক্ষেতে— সন্তান উৎপাদনের স্থানে। যৌনকর্ম কেবল এই স্থানেই সীমিত। অন্য কোন স্থানে যেতে আদেশ করা হয়নি। আর তা-ই ফায়সালাকারী হচ্ছে اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَا نُهُمْ তবে তাদের স্ত্রীদের ও ক্রীতদাসীদের ক্ষেত্রে যৌনাঙ্গের সংরক্ষণের প্রশ্ন উঠে না। যেমন হায়য হওয়া স্ত্রীর সাথে নিষিদ্ধের আয়াতটি বিচারক ও সিদ্ধান্তকারী ছিল 'তবে তাদের নিজেদের স্ত্রীদের উপর' এই আয়াতাংশের উপর। অতএব এই আয়াতটি বিন্যস্ত হায়য সম্পর্কিত আয়াতের উপর। হায়যধারী স্ত্রীর সাথে যৌনকর্ম নিষেধের যুক্তি হচ্ছে هُوَ اَذًى তা ময়লা-আবর্জনা। অর্থাৎ হায়য অবস্থায় স্ত্রীর সাথে যৌনকর্ম নিষিদ্ধ হয় যে ময়লা আবর্জনা থাকার কারণে। তা মলিনতা, অপবিত্রতা। আর তা-ই সন্তান হওয়ার স্থান ছাড়া অন্যত্র

যৌনকর্ম নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ। কেননা সেখানেও ময়লা-আবর্জনা রয়েছে। তাই এটাই সন্তান হওয়ার স্থান ছাড়া অন্যত্র যৌনকর্ম নিষিদ্ধ হওয়ার আসল কারণ।

যে লোক তা মুবাহ মনে করেন, তিনি এর জবাবে বলেছেন, মুস্তাহাযা— হায়য— রোগিণীর সাথে যৌনকর্ম করা ফিকাহ্‌বিদদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে জায়েয, যদিও সেখানে কষ্টদায়ক ময়লা-আবর্জনা রয়েছে। আর তা হচ্ছে 'ইস্তাহাযা'র রক্ত। তা নাপাক হায়যের রক্তের মতই অন্যান্য সব অপবিত্রতার মতই। তারা এই জবাবও দেন যে, ক্ষেতের স্থানেই চাষ বা যৌনকর্ম হবে বিশেষভাবে। যদিও এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, যৌন অঙ্গ ছাড়া অন্যত্র যৌনকর্ম করা মুবাহ, যদিও সেটা সন্তান উৎপাদনের স্থান নয়। তা থেকে বোঝা গেল, যৌনকর্ম মুবাহ সন্তান উৎপাদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

তাদেরকে এর জবাবে বলা হয়, আয়তটির বাহ্যত অর্থ হচ্ছে, কেবলমাত্র যৌন অঙ্গেই যৌন কর্ম করা মুবাহ। আল্লাহ্ সেদিকেই নির্দেশ করেছেন এই কথা দ্বারা ঃ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ 'যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন। কেননা এই কথাটিতে উক্ত কথার পরই বলা হয়েছে। 'ইজমার' দলীল না থাকলে যৌনাঙ্গ ছাড়া অন্যত্র যৌন কর্ম করা কখনই জায়েয হতো না। কিন্তু আমরা তা মেনে নিচ্ছি এই দলীলের কারণেই। যে বিষয়ে দলীল পাওয়া যায় না সে বিষয়ে নিষেধের হুকুমটাই বহাল থাকল। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِاَيْمَانِكُمْ -

তোমরা তোমাদের কিরা-কসমের জন্যে আল্লাহকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করো না।

এ আয়াতের তাৎপর্যে দুটি দিকের কথা বলা হয়েছে। একটি হচ্ছে— তোমরা তাঁর নামের কিরা কসমকে নেক কাজ, তাকওয়া ও লোকদের মধ্যে কল্যাণ বিধানের পথে প্রতিবন্ধক বানাবে না। যখন কাউকে কোন কাজের কথা বলা হবে, তখনই সে বলবে, 'আমি তো হলফ করেছি।' তখন সে কিরা-হলফকে তার ও তার প্রতি নির্দেশিত কাজের মধ্যে প্রতিবন্ধক বানায়। কিংবা নেক-কাজ, তাকওয়া ও জনকল্যাণের ব্যাপারে যে কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তার পথে বাধা হিসেবে দাঁড় করায়। হলফকারী যদি সে কাজ না-করার হলফও করে থাকে, তাহলেও তা তার করা উচিত এবং তার কিরা-হলফকে বাদ দেয়া উচিত। মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে যুবায়র, ইবরাহীম, আল-হাসান ও তায়ূস থেকেও এই বর্ণনা এসেছে। আর তা এ আয়াতের দৃষ্টান্ত ঃ

وَلَا يَأْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْا اُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

তোমাদের মধ্যে যারা অনুগ্রহশীল ও সামর্থ্যবান, তারা যেন কসম খেয়ে না বসে যে, তারা আপন আত্মীয়, গরীব ও আল্লাহ্‌র পথের মুহাজির লোকদেরকে সাহায্য করবে না ....। (সূরা আন-নূর ঃ ২২)

আশয়াস ইবনে সিরীন থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর ক্রোড়ে লালিত দুই ইয়াতীম সম্পর্কে হলফ করেছিলেন। হযরত আয়েশা (রা)-এর ব্যাপারে যারা খুঁটিনাটি খুঁজে বেড়িয়েছে, তারাও ছিল দুইজন। তাদের একজন মাসতাহ। তিনি বদর যুদ্ধে শরীক

হয়েছিরেন। তাঁর হলফ ছিল, তিনি সে দুজনের সাথে সেলায়ে রেহমীর সম্পর্ক রাখবেন না। তারা দুইজন তাঁর নিকট থেকে কোন মঙ্গল পাবে না। তখন উপরোদ্ধৃত আয়াত নাযিল হয়েছিল। তখন তিনি একজনকে কাপড় পরালেন ও অন্যজনকে ধারণ করলেন। হাদীসেও এর ব্যাখ্যা এসেছে।

আনাস ইবনে মালিক, আদী ইবনে হাতিম এবং আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছে ঃ

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَاتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ -

যে লোক কোন কিরার উপর হলফ করল, পরে সে তার বিপরীতটাকেই উত্তম ও কল্যাণময় দেখতে পেল, তখন যা উত্তম ও কল্যাণময় তা-ই তার করা কর্তব্য এবং কিরা-কসমের কাফফারা দিয়ে দেয়া কর্তব্য।

এই কথাগুলোই এ আয়াতের বক্তব্য ঃ 'তোমরা আল্লাহ্‌কে তোমাদের কিরা-কসমের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করো না', সেই ব্যাখ্যা অনুযায়ী যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কেননা এই ব্যাখ্যানুযায়ী আয়াতটির তাৎপর্য এই হয় যে, কারোর কিরা-কসম যেন সর্বোত্তম ও সর্বাধিক কল্যাণময় কাজ করার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায়। বরং সর্বোত্তম ও সর্বাধিক কল্যাণময় কাজ-ই করতে হবে, কিরা-কসমকে বাদ দিতে হবে।

আর দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, 'তোমাদের কিরা-কসমের লক্ষ্যস্থল' বলে খুব বেশি বেশি হলফ ও কিরা-কসম করার কথা বুঝিয়েছে এবং তা না করতে বলেছেন। তা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে এক দুঃসাহসিক কাজ। তাঁর নামকে হক ও বাতিল এবং ভালো-মন্দ সর্বস্থলে ব্যবহার করা। বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র নামে হলফ কর এবং তাতে গুনাহের মধ্যে পড়া থেকে দূরে থাক।

হযরত আয়েশা (রা) থেকেও এরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে। বলেছেন ঃ

مَنْ اَكْثَرَ ذِكْرَ شَىْءٍ فَقَدْ جَعَلَهُ عُرْفَةً -

যে লোক কোন জিনিসকে বেশি বেশি উল্লেখ করে, সে জিনিসকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে।

কথায় বলে ঃ 'অমুকে আমাকে নিন্দার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে।' কবির কথা ঃ 'তুই আমাকে নিন্দা-মন্দ বলার লক্ষ্য বানাস না। আল্লাহ বেশি বেশি হলফকারীর নিন্দা করেছেন। বলেছেন ঃ

وَلَاتُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مُّهِيْنٍ -

তুমি এমন ব্যক্তির আনুগত্য-অনুসরণ করবে না, যে খুব বেশি বেশি হলফ করে ও মূল্যহীন—হালকা লোক। (সূরা কলম ঃ ১০)

এর অর্থ, আল্লাহ্‌র নামকে সর্বক্ষেত্রে সামনে এনে তাকে ঢালরূপে ব্যবহার করো না, সে নামকে যত্রতত্র ব্যবহার করো না নিজেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে। হলফ করে করে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করো না। কিরা-কসম খুব বেশি বেশি করলে প্রকৃত নেক কাজ ও তাকওয়া থেকে দূরে যেতে বাধ্য হবে এবং গুনাহের খুব নিকটে টেনে নিয়ে যায়। আল্লাহ্‌র

ব্যাপারে মনে দুঃসাহস বেড়ে যায়। তাই অর্থটা দাঁড়াল এই যে, আল্লাহ তোমাদেরকে বেশি বেশি কিরা-কসম, হলফ করে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্র ব্যাপারে দুঃসাহস দেখাতে নিষেধ করেছেন, কেননা তার আশ্রয়ে তোমরা প্রকৃত নেক কাজ, তাকওয়া ও জনকল্যাণমূলক কাজ থেকে দূরে সরে থাকতে চেষ্টা করতে পার। এই নীতি পরিহার করলে তোমরা অতীব আদর্শ মানুষ হতে পারবে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ -

তোমরা হচ্ছ সর্বোত্তম জাতি, জনগণের কল্যাণের জন্যেই তোমাদেরকে গড়ে তোলা হয়েছে। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১১০)

আয়াতটির দুটি অর্থ হতে পারে। সে অর্থ দুটি পরস্পর বিরোধী নয়। অতএব তার সেই দুটি অর্থই গ্রহণ করা আবশ্যক এবং তা এক সাথে গ্রহণ করতে হবে। তাহলে তা কল্যাণকর হবে। হক ও বাতিল সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্র নামে কিরা কসম করে তার অপমান করা নিষিদ্ধ বোঝাবে। আর সেই সাথে আল্লাহ্র নামে করা কিরা-কসমকে সকল প্রকার নেক ও কল্যাণময় কাজের পথে প্রতিবন্ধকরূপে দাঁড় করানোর কু-অভ্যাসও খতম হয়ে যাবে। তাই বেশি বেশি কিরা-কসম না করাই কর্তব্য। আর যদি কখনও কেউ হলফ করেও, তবু তাকে যেন আল্লাহ্র আনুগত্যমূলক, নেক ও তাকওয়া-কল্যাণের কাজের প্রতিবন্ধক হতে না পারে, সে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যেমন নবী করীম (স) বলেছেন ঃ যে কোন কাজের হলফ করল, পরে সে তার বিপরীত কাজকে কল্যাণময় দেখল, তখন তার সেই কল্যাণময় কাজ করা ও হলফের কাফফারা দেয়াই কর্তব্য।

আল্লাহ্র কথা ঃ

لَايُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ -

তোমাদের বেহুদা, অর্থহীন কিরা-কসমের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না।

আবূ বকর বলেছেন, কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তা'আলা اللَّغْوُ শব্দটির ব্যবহার করেছেন। তাই অবস্থা বিশেষে তার অর্থ-ও বিভিন্ন হবে। কথার প্রেক্ষিত অনুযায়ী প্রত্যেকটি স্থানে তার বিশেষ অর্থ গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ বলেছেন ঃ لَاتَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً 'তুমি সেখানে অর্থহীন কথাবার্তা শুনতে পাবে না।' এখানে لاغية অর্থ নির্লজ্জতামূলক ও ঘৃণ্য কথাবার্তা لَايَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَاتَاْثِيْمًا 'তারা সেখানে কোন অর্থহীন ও গুনাহের কথা শুনতে পাবে না।' এই অর্থেই বলা হয়েছে ঃ وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ 'এবং তারা যখনই কোন অর্থহীন কথা শুনেছে, তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।' এখানে শব্দটির অর্থ হচ্ছে কুফর ও নির্লজ্জতামূলক কুৎসিত কথা। বলা হয়েছে ঃ وَالْغَوْا فِيْهِ তাতে বকবক অর্থহীন আওয়াজ তোল, যার কোন ফায়দা নেই; যেন শ্রোতারা তা শুনা থেকে ভিন্ন দিকে লক্ষ্য দেয়। বলেছেন ঃ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا 'তারা যখন কোন বেহুদা কাজের স্থানে পৌঁছে যায়, তখন তারা মর্যাদা রক্ষা করে চলে যায়।' এখানে শব্দটির অর্থ বাতিল। যেমন বলা হয় ঃ لَغَافِىْ كَلَامِهِ 'সে তার কথায় বড় আজেবাজে জিনিস নিয়ে আসে।' অর্থাৎ অর্থহীন ও তাৎপর্যশূন্য কথা বলে। لغو اليمين -এর কয়েকটি অর্থ আগেরকালের মনীষীদের নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে

আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হলফ করে কোন বিষয়ে, সে দেখেও তাই, তাহলে সে এপর্যায়ে পড়বে না। মুজাহিদ ও ইবরাহীম থেকেও এরূপ বর্ণিত হয়েছে। মুজাহিদ বলেছেন ঃ

وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانَ -

বরং তিনি পাকড়াও করবেন সেসব কিরা-কসম, যা দিয়ে তোমরা হলফকে সুদৃঢ় কর।

তুমি কোন্ জিনিসের হলফ করলে এবং তুমি তা জান। এই অর্থেই এ আয়াতাংশ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ 'তোমাদের হৃদয়সমূহ যা উপার্জন করেছে।'

হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ লোকেরা বলে لا والله 'না, আল্লাহ্‌র কসম। بلى والله 'হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম' প্রভৃতি কথা নেহাত বেহুদাভাবে আল্লাহ্‌র নাম বলা।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে মরফু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তেমনি অতীত কালের কোন বিষয়ে কসম করতেও নিষেধ করা হয়েছে, এটা হানাফীদের মত। আতা হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ কেউ বলে— আল্লাহ্‌র কসম, আমি এরূপ করেছি। হাসান ও শবী থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। সাঈদ ইবনে যুবায়র বলেছেন, কেউ যদি কোন হারাম কাজ করার জন্যে কসম করে, তাহলে তা না করলে আল্লাহ্ সেজন্যে পাকড়াও করবেন না। এই ব্যাখ্যা পুরাপুরি সামঞ্জস্যশীল সেই ব্যাখ্যার সাথে যা عرضة لايمانكم-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে। অর্থাৎ কিরা-কসমের কারণে কোন মুবাহ্ কাজ থেকে বিরত থাকা বা কোন নিষিদ্ধ কাজে এগিয়ে যাওয়াও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

لَغْوٌ শব্দের এই সবগুলো অর্থই হতে পারে। আর এর পরই বলা হয়েছে ঃ وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُ بِمَا كَسَبَتْ 'কিন্তু তিনি পাকড়াও করবেন, যা তোমাদের অন্তরসমূহ উপার্জন করেছে'। এর অর্থ তার অন্তর এই ক্ষেত্রে যে মিথ্যা ও অসত্যের উপর দৃঢ়তা গ্রহণ করেছে। আল্লাহ্‌র এই পাকড়াও অবশ্যই পরকালীন আযাব হিসেবেই হবে। সে কিরা ভঙ্গ করে কাফফারা দেয়ার প্রশ্ন উঠে না। কেননা এ কাফফারা অন্তরের উপার্জনের সাথে সম্পর্কহীন। কেননা এ কিরাকারীর অবস্থা ভালো ও মন্দ হওয়ার দিক দিয়ে সমান। ইচ্ছা করে করা বা ভুলবশত করাও এখানে পার্থক্যহীন। অতএব জানা গেল, এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে অতীত কাল সম্পর্কিত কিরার মূলে নিহিত উদ্দেশ্য দ্বারা সে যে আযাব পাওয়ার যোগ্য হবে তা। উদ্দেশ্যকারী বলেছে, কিরার বিপরীতটা মিথ্যা। অতএব তা 'বেহুদা' বা 'অর্থহীন' কথাই হবে, যদ্দারা মিথ্যার উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য দেয়া যায় না। কেননা অতীতের ব্যাপারে ধারণা হয়, যে যেমন সে বিষয়ে 'হলফ' করেছে, তার নাম-ই রেখেছে لَغْوٌ —অর্থহীন, নিরর্থক। কাফফারা ওয়াজিব হওয়া ও আযাব পাওয়ার যোগ্য হওয়ার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। ঠিক এই তাৎপর্যই হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তা এক ব্যক্তির 'না, আল্লাহ্‌র কসম'— 'হ্যাঁ আল্লাহ্‌র কসম' ধরনের কথা, যা সে কথার ধারাবাহিকতার মধ্যে বলে যায়। সে তো নিজেকে একজন সত্যবাদী ব্যক্তি বলেই মনে করে। ফলে তার এরূপ কথা নিতান্তই অর্থহীন— তাৎপর্যশূন্য হয়ে যায়। এর উপর শরীয়াতের কোন হুকুম কার্যকর হয় না। সাঈদ ইবনে যুবায়র যা বলেছেন, তা-ও এর অর্থ হতে পারে। যেমন এক ব্যক্তি কোন হারাম বিষয়ে কিরা-কসম করল, এক্ষণে সে যদি তা না করে, তাহলে আল্লাহ্ সে জন্যে পাকড়াও করবেন না। অর্থাৎ পরকালীন আযাব হবে না, যদিও কিরা ভঙ্গ করার কারণে কাফফারা দেয়া কর্তব্য হয়ে পড়ে।

মসরূক বলেছেন, যে যে কিরা-কসম পূর্ণ করা হবে না, তা নিরর্থক, তাতে কাফফারা দেয়া ওয়াজিব হবে না। এই কথাটি সাঈদ ইবনে যুবায়রের কথার সাথে সামঞ্জস্যশীল। পূর্বে যা বলেছি, তা-ই উত্তম কথা। তবে পার্থক্য এই যে, সাঈদ কাফফারা দেয়া ওয়াজিব বলেন, আর মসরূক তা ওয়াজিব বলেন না— যদি তা ভঙ্গও করা হয়। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অপর একটি বর্ণনা এসেছে। তা হল, নিরর্থক কিরা-কসম হল তা, যাতে কাফফারা দেয়া ওয়াজিব হয় না। দহাক থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ-ও বর্ণিত যে, নিরর্থক কিরা-কসম ভুলে যাওয়াই তা ভঙ্গ করা।

## ঈলা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ -

যারা নিজেদের স্ত্রীদের থেকে 'ঈলা' করে, তাদের জন্যে চার মাস কাল অবস্থান ও অপেক্ষা করার নিধান রয়েছে।

আবূ বকর বলেছেন, 'ঈলা' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'হলফ' বা কিরা-কসম করা। আরবী ভাষায় বলা হয় ঃ الى ء - يولى - ايلا

এ হল আসল আভিধানিক অর্থ। আর শরীয়াতের পরিভাষায় বিশেষ অর্থ হল, যৌন সঙ্গম না করার হলফ করা, যার পরিণতিতে নির্দিষ্ট মিয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় আপনা-আপনি স্ত্রী তালাক হয়ে যায়। এমন কি, যখন বলা হবে, অমুক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে 'ঈলা' করেছে, বোঝা যাবে, সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে।

কি করলে 'ঈলা'কারী হয় সে বিষয়ে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে।

একটি— হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে হাসান ও আতার বর্ণনা হল, যদি কেউ 'হলফ করে বলে যে, স্ত্রী সন্তানকে যে স্তন দেয়— দুধ সেবন করায়, এই মিয়াদ কালে সে তার নিকটে যাবে না (তার সাথে যৌন-সঙ্গম করবে না), তাহলে সে ঈলাকারী হবে না। ইলাকারী হবে, যদি সে হলফ বা কিরা-কসম করে এই বলে যে, সে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করবে না ক্ষতি হওয়ার আশংকার কারণে।

দ্বিতীয়— ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত— স্ত্রী-সঙ্গমের প্রতিবন্ধক হবে যে কিরা-কসম, তা-ই ঈলা। সন্তুষ্টি বা ক্রোধের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। ইবরাহীম, ইবনে সিরীন ও শবীও এই কথা বলেছেন।

তৃতীয়— সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকে বর্ণিত, এই ঈলা সঙ্গমকে কেন্দ্র করে হয়। যেমন, যদি হলফ করে, সে স্ত্রীর সাথে কথা বলবে না, তা হলে সে ঈলাকারী হল। জাফর ইবনে বরকান ইয়াযীদ ইবনুল আসম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি একটি মেয়েলোককে বিয়ে করলাম। পরে আমি ইবনে আব্বাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি বললেন, আমি জানতে পেরেছি, তার গলায় কিছু একটা আছে। তখন বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম, আমি বের করেছি এবং তার সাথে আমি কথা বলব না। বললেন, চার মাস গত হওয়ার পূর্বে তোমাকে তার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। এই কথাটি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের কথার সাথে সঙ্গতিশীল। ইবনে উমর-এর কথার সাথেও সামঞ্জস্যশীল বোঝায় এই দিক দিয়ে যে, কোন

রূপ কিরা-কসম ছাড়া-ই স্ত্রীর সাথে নিঃসম্পর্ক থাকাও 'ঈলা'। আর চতুর্থ হচ্ছে, ইবনে উমর (রা)-এর কথা। বলেছেন, সে তার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, অতএব তা ঈলা। তাতে হলফ-এর উল্লেখ করা হয়নি। স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা ক্ষতির উদ্দেশ্যে তরক করার হলফ করা এবং কোনরূপ ক্ষতির উদ্দেশ্য ছাড়াই তার হলফ করার মধ্যে যাঁরা পার্থক্য করেছেন, তাঁদের মাযহাব হল, যৌন সঙ্গম স্ত্রীর হক পাওনা, সে তার দাবিও করতে পারে। স্বামীর অধিকার নেই স্ত্রীকে তা থেকে বিরত রাখার, কাজেই স্বামী যদি তার হক দিতে— তার সাথে সঙ্গম করা ত্যাগ করার হলফ করে, তাহলে 'ঈলা'কারী হবে। তা থাকবে তার হক পৌঁছানোর সময় পর্যন্ত। বিচ্ছিন্নতা থেকে মিলনের দিকে এলে। কেননা স্ত্রীর ব্যাপারে স্বামীর কেবল দুটি কাজের অধিকার আছে ঃ হয় যথাযথভাবে তাকে স্ত্রী বানিয়ে রাখবে, নতুবা ভালোভাবে তাকে ছেড়ে দেবে। তবে যদি কল্যাণ কামনা করার উদ্দেশ্য থাকে স্ত্রী-সঙ্গম ত্যাগ করার মূলে, এজন্যে যে, সে শিশু সন্তানকে দুধদায়িনী আর তখন তার সাথে সঙ্গম না করার হলফ করে, যেন তার শিশুর ক্ষতি সাধিত না হয়, তা হলে এটা স্ত্রীর হক অস্বীকার করার জন্যে করা হয়নি এবং সে স্ত্রীকে যথাযথভাবে রাখছে না, তা-ও বলা যাবে না। অতএব তাকে ভালোভাবে ছেড়ে দেয়ার প্রশ্ন উঠবে না। আর তার কিরা-হলফের সাথে বিচ্ছিন্নতার প্রশ্ন জড়িত হবে না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ -

যদি সে কসম থেকে ফিরে যায়, তা হলে আল্লাহ্ তো বড়ই ক্ষমাশীল ও অতীব দয়াবান।

ক্ষতির উদ্দেশ্যকে যারা গণ্য করেন, তাঁরা এ আয়াতকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। কেননা এ কথার দাবি হল, সে গুনাহগার হবে। পূর্ণ করা তাঁর ক্ষমার দাবি করে কিন্তু আমাদের মতে তা তাকে বিশেষীকৃতকরণের প্রমাণ করে না— যাঁর এই পরিচিতি তাকে। কেননা আয়াত তো সকলকেই শামিল করে। ক্ষতির ইচ্ছুক তো এই সকলের মধ্যেরই একজন। কাজেই হুকুমটা তার উপর বর্তিবে, অন্য কারোর উপর নয়। অনুগত ও না-ফরমান ব্যক্তির অবস্থা এ ক্ষেত্রে সমান। অর্থাৎ কসম-ভঙ্গ করলে সকলকেই কাফফারা দিতে হবে— দেয়া ওয়াজিব। মিয়াদ অতিবাহিত হলে তালাক দেয়া ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারেও সকলে সমান। শক্ত করে বাধা সব কিরা-কসমই এরূপ। তাতে কে অনুগত আর কে অনুগত নয়— এর মধ্যে কোন পার্থক্য হয় না এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে, যেখানে কাফফারা ওয়াজিব হয়। তালাকের হুকুমও অনুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা এ দুজনই সম্মিলিতভাবে কিরা-কসমের সাথে সম্পর্কিত। ক্ষতির উদ্দেশ্যে রিজয়ী তালাক দেয়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে লওয়ার ব্যাপারটিও ভিন্নতর কিছু নয়। ঈলা-ও ঠিক তেমনি। বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ এর বিপরীত মত পোষণ করেন। কেননা আয়াত তো অনুগত ও অনুগত নয়— এ দুয়ের মাঝে কোন পার্থক্য করে না। সকলের ব্যাপারেই তা সাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ।

কথা না বলার কিরা করে ক্ষতির উদ্দেশ্য গ্রহণ করেছে— এরূপ কথা যিনি বলেছেন, তার কোন তাৎপর্য নেই। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ -

যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে ঈলা করে।

এতে কেউ যদি স্ত্রী-সঙ্গম ত্যাগ করার ব্যাপারে কিরা-কসমকে গোপন রাখে, তাহলে তাতে

কোন মতপার্থক্য নেই। সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, স্ত্রীর সাথে সঙ্গম ত্যাগ করার হলফকারী একজন 'ঈলা'কারী। কাজেই সঙ্গম ত্যাগ করার কথাটি আয়াতে নিহিত রয়েছে। এটা সকলেরই মত। আমরা তা এখানে প্রমাণিত করলাম। এ ছাড়া কথা বন্ধ করার হলফ করা ইত্যাদির আয়াতে লুকানো থাকার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অতএব তা লুকানো মনে করা যাবে না। এই যা বললাম, এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র এই কথা ঃ

فَاِنْ فَاؤُ وَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

যদি সে কসম থেকে ফিরে যায় তাহলে আল্লাহ তো মহা ক্ষমাকারী ও অতীব দয়াবান।

সকলেরই জানা যে, আয়াতে পুরা করার অর্থ হচ্ছে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা। এ ব্যাপারে আগের কালের ফিকাহবিদদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। বোঝা গেল 'যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে ঈলা করে' কথাটিতে সঙ্গম না করার কথা গোপন আছে। অন্য কিছু নয়। ইবনে উমর থেকে বর্ণিত— স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্নকরণ তালাককে আবশ্যকীয় বানায়। এই কথাটি বিরল। এর এই অর্থও হতে পারে ঃ যখন হলফ করল ও ঈলার মিয়াদকাল পর্যন্তকার জন্যে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তা সত্ত্বেও তা কুরআনের পরিপন্থী। কেননা আল্লাহ তো বলেছেন ঃ 'যারা তাদের স্ত্রীদের থেকে 'ঈলা' করে'। আর 'ঈলা' করা মানে কিরা করা, যেমন পূর্বে বলেছি। স্ত্রীকে শুধু নিঃসম্পর্ক করে রাখলেই কিরা-কসম হয়ে যায় না। অতএব তার সাথে কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপার সম্পর্কিত হয় না।

আশয়াস আল-হাসান সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আনাস ইবনে মালিক-এর একজন স্ত্রী ছিল, তার চরিত্র ছিল খারাপ। ফলে তিনি পাঁচ মাস ছয় মাসকাল পর্যন্ত তাকে সম্পর্কহীন করে রাখতেন। পরে তাকে রুজু করতেন। এতে ঈলা হয় বলে তিনি মনে করতেন না।

আগের কালের ফিকাহবিদগণ এবং তাঁদের পর বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ যে সময়কালের হলফ করলে 'ঈলা' হয়, এই বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) সাঈদ ইবনে যুবায়র ও আতা বলেছেন, চার মাসের কম মিয়াদের হলফ করলে, পরে কার্যত তাকে চার মাসকাল নিঃসম্পর্ক করে রাখলে এই সময়ে তার সাথে সঙ্গম না করলে সে 'ঈলা'কারী হবে না। হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ, মালিক, শাফেয়ী ও আওজায়ীও তাই বলেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), ইবরাহীম আল-হিকাম, কাতাদাতা ও হাম্মাদ থেকে বর্ণিত, সে ঈলাকারী হবে এবং চার মাসকাল নিঃসম্পর্ক করে রাখলে স্ত্রী বায়েন তালাক হয়ে যাবে। ইবনে শাবরামাতা ও আল-হাসান ইবনে সালিহ-ও এই মতই দিয়েছেন। আল হাসান ইবনে সালিহ্ এ-ও বলেছেন, স্বামী যদি হলফ করে যে, সে এই ঘরের স্ত্রীর নিকটেও যাবে না, তাহলে সে ঈলাকারী হবে। অতঃপর সে যদি তাকে চার মাস কাল নিঃসম্পর্ক রাখে, তাহলে স্ত্রী ঈলার কারণে বায়েন তালাক হয়ে যাবে। মিয়াদ শেষ হওয়ার আগে সে যদি স্ত্রীর নিকটে যায়, তাহলে 'ঈলা' কেটে যাবে। যদি হলফ করে যে, সে এই ঘরে প্রবেশ করবে না, অথচ সেখানে তার স্ত্রী রয়েছে, আর সে কারণেই সে হলফ করেছে— তা হলে সে ঈলাকারী হবে।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন ঃ

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ -

যারা নিজেদের স্ত্রীদের থেকে ঈলা করে, তাদের জন্যে চারমাস অপেক্ষা করার বিধান রয়েছে।

'ঈলা' হল কিরা-কসম, পূর্বে যা বলেছি। তা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, কোন কিরা-কসম ছাড়া-ই স্ত্রীর সাথে সঙ্গম না করায় ঈলার হুকুম হবে না। চার মাসের কম মিয়াদের হলফ করে থাকলেও কিরার মিয়াদ গত হলে চার মাসের মিয়াদের অবশিষ্ট সময়টা সঙ্গম ত্যাগকারী হলে— এ চার মাস তো কিরা-কসম ছাড়াই অপেক্ষা করা ও কিরা-কসম ছাড়াই সঙ্গম ত্যাগ করান, তাহলে বায়েন তালাক সঙ্ঘটিত হওয়া ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে তার কোন প্রভাব হবে না। আর চার মাসের কম হলেও বায়েন তালাক উপার্জিত হবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে চার মাসের অপেক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কাজেই তাতে বিচ্ছিন্নতা কার্যকর হওয়ার সাথে সম্পর্কশীল কোন তাৎপর্য অবশিষ্ট থাকে না। ফলে সে হয়ে গেল, যেন সে কোন কিরা-কসম ছাড়াই সঙ্গম ত্যাগকারী। কাজেই তার সাথে ঈলার হুকুম জড়িত হবে না।

আল-হাসান ইবনে সালিহ্র কথা হল, এই ঘরে সে স্ত্রীর নিকট যাবে না বলে যদি হলফ করে, তাহলে সে ঈলাকারী হবে। এ কথার কোন তাৎপর্য নেই। কেননা ঈলা হচ্ছে স্ত্রীর ব্যাপারে কিরা-কসম যে, চার মাস কাল তার সাথে সঙ্গম করা নিষিদ্ধ থাকবে। সে কিরা ভঙ্গকারী হবে না— যেমন বলেছি। কিন্তু এই কিরা— এই মিয়াদকাল স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করতে নিষেধ করে না। কেননা সে কিরা ভঙ্গ করা ছাড়াও স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে পৌছা সম্ভব। সম্ভব সে ঘর ছাড়া অন্য কোন ঘরে।

যে লোক চার মাসের হলফ করল, সে সমান এই ব্যক্তির বিষয়েও বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা, জুফর, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ ও সওরী বলেছেন, সে ঈলাকারী। অতঃপর মিয়াদের মধ্যে সে তার স্ত্রীর নিকটে না গেলে, আর ইতিমধ্যে ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে স্ত্রী বায়েন তালাক হয়ে যাবে এই ঈলার কারণেই। আতা ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, জাহিলিয়াতের যুগে ঈলার মিয়াদ ছিল এক কি দুই বছর। পরে কুরআনে আল্লাহ তার সময় নির্ধারণ করেছেন চার মাস। তাই যার ঈলা, এর কম সময়ে হবে, সে ঈলাকারী হবে না। মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন, চার মাসের হলফ করলে সে ঈলাকারী হবে না। তরে বেশি সময়ে করলে তবে ঈলা হবে।

আবূ বকর বলেছেন, কুরআনের আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই কথাকে নস্যাৎ করে দেয়। আয়াতটি এই ঃ 'যারা তাদের স্ত্রীদের থেকে ঈলা করে তাদের জন্যে চার মাসের অপেক্ষার বিধান আছে।' এই মিয়াদটা অপেক্ষা করার জন্যে নির্দিষ্ট। এর মধ্যে শর্ত পূরণ করতে হবে। এর বেশি অবস্থান কাল নেই। কিরা করে যে লোক স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা থেকে এই মিয়াদকাল বিরত থাকবে, সে ঈলার হুকুম হিসেবে তালাক উপার্জন করবে। চার মাসের হলফ ও তার বেশিকালের হলফের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা এই মিয়াদের অধিককাল অপেক্ষা করার কোন সুযোগ তার জন্যে নেই। তা সত্ত্বেও আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দাবি হচ্ছে, চার মাসের মিয়াদের হলফ হলেও সে ঈলাকারী হয়ে যাবে। তার কম বা বেশি করলেও। কেননা হলফের কোন মিয়াদ আয়াতে উল্লিখিত হয়নি। তার চাইতে কম মিয়াদকে আমরা বিশেষীকৃত করেছি দলীলের বলে। তবে শব্দের হুকুম চার মাস কিংবা ততোধিক অবশিষ্ট থাকল।

যদি বলা হয়, যদি পূর্ণ চার মাসের হলফ করে, তার সাথে তালাকের সম্পর্কিত হওয়া সহীহ হবে না। কেননা তুমি তো তালাক সঙ্ঘটিত করছ তা গত হওয়ার পর। কিন্তু তখন ঈলা থাকে না।

জবাবে বলা হবে, তা নিষিদ্ধ হয়। কেননা মিয়াদের শেষ হয়ে যাওয়া যদি তালাক সঙ্ঘটিত হওয়ার কারণ হয় তাহলে তার সঙ্ঘটিত হওয়া অবস্থায় কিরা-কসমের অবস্থিতি গণ্য করা জরুরী নয়। এক বছর অতিবাহিত হওয়া যখন যাকাত ফরয হওয়ার কারণ নির্দিষ্ট হয়েছে, তখন ওয়াজিব হওয়া অবস্থায় সেই বছরটির অবস্থিতি জরুরী নয়।

যে লোক তার স্ত্রীকে বলল ঃ তুমি যদি অমুকের সাথে কথা বল, তাহলে তুমি তালাক। তাহলে এটা একটা 'ইয়ামীন' কিরা হবে, যা শক্ত করে বাঁধা হয়েছে। পরে সে তার সাথে কথা বললে সে তালাক হয়ে যাবে তাৎক্ষণিকভাবে। অথচ সেখানে কিরা অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে ও বাতিল হয়ে গেছে। ঈলার মিয়াদ গত হওয়ার ব্যাপারটিও এরূপ। যখন তা তালাক সঙ্ঘটিত হওয়ার কারণ হবে; তখন তার সঙ্ঘটিত হওয়া নিষিদ্ধ হবে না। অথচ কিরা তখন নেই।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যদি সে কসম থেকে ফিরে যায়' আবূ বকর বলেছেন ঃ الفئ -এর আভিধানিক অর্থ কোন জিনিসের দিকে ফিরে যাওয়া— প্রত্যাবর্তন করা। এ আয়াতটিতেও শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ -

যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়পরতা সহকারে মুবাহ করে দাও। (সূরা হুযরাত ঃ ৯)

অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্রোহ ও সীমালঙ্ঘন থেকে ফিরে না আসছে ন্যায়পরতার দিকে, যা আল্লাহ্‌র নির্দেশ। শব্দের বাহ্যিক অর্থের দাবি হচ্ছে কোন জিনিসের দিকে ফিরে যাওয়া, তখন একজন হলফ করল, সে তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করবে না— ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে, তার পরে তাকে বলল, আমি তোমার দিকে ফিরে এলাম, অথচ সে কিরা করে স্ত্রীর শয্যাত্যাগ করার সংকল্প করেছিল, তা থেকে সে ফিরে এসেছে, তখন সে তার স্ত্রীর নিকটেই ফিরে এসেছে। সে সঙ্গমে সক্ষম হোক কিংবা অক্ষম হোক। শব্দের বাহ্যিক দাবি তো এই। তবে মনীষিগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, স্ত্রী নিকট পৌছা সম্ভব হলে তখন ফিরে আসার ব্যাপারটি কার্যকর হবে সঙ্গম দ্বারা।

রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ঈলা করলে কিংবা ঈলাকারী ও তার স্ত্রীর মধ্যে চার মাসের পথের দূরত্ব হলে অথবা স্ত্রী যদি তালিযুক্ত হয় বা হয় স্বল্প বয়সী অথবা স্বামী হয় নপুংসক, তাহেল কি হবে, এই প্রশ্নে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। হানাফীরা বলেছেন, সে যখন স্ত্রীর নিকট ফিরে যাবে মুখের কথার দ্বারা, ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে, অক্ষমতাও দাঁড়িয়ে আছে, তাহলে এটাই তার সহীহ্‌ ফিরে যাওয়া হবে। সময় শেষ হয়ে গেলেই তালাক ঘটে যাবে না। আর সে যদি হজ্জের ইহরাম বাঁধে এবং তারও হজ্জের মাঝে চার মাসের ব্যবধান থাকে, তখন তার স্ত্রীর নিকট প্রত্যাবর্তন হবে কেবলমাত্র সঙ্গম দ্বারা।

জুফর বলেছেন, তার প্রত্যাবর্তন হবে মুখের কথার দ্বারা। ইবনুল কাসিম বলেছেন, স্বামী ঈলা করেছে এমন সময় যখন স্ত্রী অল্প বয়স্কা, তার সাথে সঙ্গম করা যায় না, তাহলে স্বামী ঈলাকারী হল না, যতক্ষণ না সে পূর্ণ বয়স্কা হয়ে সঙ্গমযোগ্য হবে। তারপর চার মাসের সময় অতিবাহিত হওয়ার সময়কাল ধরে অপেক্ষা করতে হবে পূর্ণ বয়স্কা হওয়ার সময় থেকে। এটা ইবনুল কাসিমের মত। তবে তিনি তা মালিক থেকে বর্ণনা করেন নি। ইবনে অহব মালিকের এই মত বর্ণনা করেছেন, ঈলাকারী চারমাস মিয়াদ শেষ হওয়ার সময় যদি থেমে যায়, তারপরে

তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়, সে তার নিকট পৌঁছল না মিয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত, তাহলে তার জন্যে স্ত্রীর নিকট যাওয়ার কোন পথ থাকল না, ফিরিয়েও আনতে পারবে না। তবে তার যদি কোন রোগের ওযর থাকে কিংবা সে বন্দী হয়ে গিয়ে থাকে বা এরূপ অন্য কোন ঘটনা ঘটে গেল, তাহলে স্ত্রীকে তার ফিরিয়ে আনাটা কার্যকর হল। যদি তার মিয়াদ শেষ হয়ে যায়, তার পরে সে তাকে বিয়ে করে, তখন যদি চার মাসের মিয়াদ শেষ হয়ে যায়, তখনও সে থেকে থাকবে।

ইসমাঈল ইবনে ইসহাক বলেছেন, মালিক বলেছেন, চার মাস গত হলে তখন সে যদি রোগাক্রান্ত থাকে বা বন্দী থাকে, সে পূর্ণ মাত্রায় নিষ্কৃতি না পাওয়া পর্যন্ত থামবে না। কেননা যা করার সাধ্য নেই, তা করার দায়িত্ব-ও নেই। মালিক বলেছেন, চার মাস অতীত হওয়ার পর সে যদি গায়েব হয়ে থাকে, তখন সে চাইলে তার কিরার কাফফারা দেবে এবং তার উপর থেকে ঈলা চলে যাবে। ইসমাঈল বলেছেন, এ ক্ষেত্রে একথা বলেছেন এজন্যে যে, তাঁর মতে কিরা ভঙ্গ করার আগেও কাফফারা দেয়া জায়েয। যদিও তা কেবল কিরা ভঙ্গ করার পরই শোভন হয়। আশজায়ী সওরীর মত বলেছেন, ঈলাকারীর রোগ, বার্ধক্য বা আটকে পড়া ধরনের কোন ওযর হয় কিংবা স্ত্রী হায়যে থাকে, অথবা নিফাসে থাকে, তখন সে মুখের কথার দ্বারা কসম থেকে ফিরে যাবে। বলবে, আমি তোমার নিকট ফিরে এলাম। এটা তার জন্যে যথেষ্ট হবে। আল-হাসান ইবনে সালিহ্-রও এই মত। আওজায়ী বলেছেন, কেউ যখন তার স্ত্রীর সাথে ঈলা করে, তার পর সে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে, বাস করে চলে যায়, তাহলে সে রোগী বা বিদেশ যাত্রী হিসেবে সঙ্গম ছাড়াই স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার সাক্ষী বানাবে। কেননা সে সঙ্গম করতে পারছে না। তাহলেও তার স্ত্রীর নিকট প্রত্যাবর্তন হয়ে যাবে। তখন সে তার কসমের কাফফারা দেবে। স্ত্রী তার হয়ে যাবে। তেমনি স্ত্রী চার মাসের মধ্যে যদি সন্তান প্রসব করে কিংবা হায়য হয় অথবা সরকার তাকে তাড়িয়ে দেয়, তখনও সে স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে সাক্ষী বানাবে। তাহলে তার উপর ঈলা থাকবে না।

লাইস ইবনে সাঈদ বলেছেন, ঈলা করার পর স্বামী রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে ও তার পর যদি চার মাস গত হয়ে যায়, তাহলে সে থেকে যাবে, যেমন একজন সুস্থ ব্যক্তি থেকে থাকে। অতঃপর সে স্ত্রীর নিকট ফিরে যায় কিংবা তালাক দেয়— যা-ই করুক। ভালো হওয়া পর্যন্ত ব্যাপারটিকে বিলম্বিত করবে না।

আল-মুজানী শাফেয়ীর মত হিসেবে বলেছেন, নপুংসক যদি ঈলা করে, তাহলে তার স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়ার কাজটি মুখের কথার দ্বারা সম্পাদিত হবে। 'আল-ইমলা' কিতাবে বলা হয়েছে, নপুংসকের কোন ঈলা হয় না। বলেছেন, স্ত্রী যদি বালিকা হয় ও তার প্রতি ঈলা করা হয়, তাকে চার মাসকাল থেমে থাকতে হবে তার সাথে সঙ্গম করার অবস্থায় পৌঁছে যাওয়ার পর। বন্দী স্বামী স্ত্রীর নিকট মৌখিক কথার দ্বারা ফিরে যাওয়ার কাজটি করবে। হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে থাকলেও সঙ্গম করা ছাড়া স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়া কার্যকর হবে না। স্বামী ঈলা করল যখন স্ত্রী বাকেরা, পরে সে বলল, আমি তাকে আয়ত্তে আনতে সক্ষম নই। তখন তার মিয়াদ হবে 'ইন্নীল'-এর মিয়াদ।

আবূ বকর বলেছেন, মিয়াদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সাথে সঙ্গম করতে সক্ষম হচ্ছে না, তখন তাকে মুখের কথার দ্বারাই স্ত্রীর নিকট প্রত্যাবর্তনের কাজটি করতে হবে— এই কথার দলীল

হল আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যদি সে ফিরে আসে, তাহলে আল্লাহ তো বড়ই ক্ষমাকারী, অতীব দয়াবান।' মুখের কথার দ্বারাও প্রত্যাবর্তন হবে। কেননা একটি জিনিসের দিকে ফিরে যাওয়ার কথাই এ আয়াতে বলা হয়েছে। তা স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা থেকে বিরত থেকে মুখের কথার দ্বারাও হবে। কথার দ্বারা ফিরে এলে, বলল যে, আমি তোমার নিকট ফিরে এলাম, তাহলে সে মুখের কথার দ্বারা যে কাজ থেকে বিরত থাকার কিরা করেছিল, মুখের কথার দ্বারাই সে ফিরে এল তার বিপরীত কাজের দিকে,— না থেকে হ্যাঁ-র দিকে। বোঝা গেল, সাধারণত্বের ভাবধারা এখানে শামিল রয়েছে। তাছাড়া কার্যত সঙ্গম হতে না পারায় মুখের কথা তার স্থলাভিষিক্ত হল, বিরত থাকার দরুন যে বিচ্ছিন্নতা আসত, তা এল না। ইহরামের কারণে সঙ্গম হারাম হওয়ার ব্যাপার এবং হায়য— এ দুটো মূলত কোন ওযর নয়। ইহরাম ওযর নয়। কেননা স্বামী ইহরাম বাঁধলেও স্ত্রীর যৌন সঙ্গম পাওয়ার অধিকার প্রত্যাহৃত হতে পারে না। আর হায়য-নিফাসের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ তা'আলা ঈলাকারীর জন্যে চার মাসের অপেক্ষা করার ব্যবস্থা দিয়েছেন। সেই সময় হায়য হচ্ছে এ কথা জানা সত্ত্বেও।

আগের কালের ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছে যে, الفيء শব্দের অর্থ সঙ্গম— যখন করা সম্ভব। কাজেই স্ত্রী-সঙ্গম সম্ভব হওয়া কালে তার অনুরূপ অর্থ গ্রহণ জায়েয নয়। কোন সময় সঙ্গম হারাম হলে তার সম্ভাব্যতা বিনষ্ট হয় না। তখন অবস্থা এরূপ ধরতে হবে যেমন ইহরাম ও জিহার-এর সময় হয়। কেননা তখন অন্য কোন কারণে সঙ্গম অসম্ভব হয়ে পড়ে, কিন্তু তার কারণ অক্ষমতা বা ওযর নয়। তা ছাড়া স্ত্রীর সঙ্গম পাওয়ার অধিকার যথারীতি বর্তমান থাকে। এ কথা দ্বারাও তা-ই প্রমাণিত হয় যে, যদি স্বামী স্ত্রীকে রায়েন তালাক দেয় খুলা'র কারণে, এ অবস্থায় যে, সে তার প্রতি ঈলা করেছে, তাহলে বাস্তবে ঘটানো হারাম করা হলেও কথার দ্বারা স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়া জায়েয হওয়ার কারণ নিশ্চিত হবে। তা সত্ত্বেও এই অবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে, তাহলে বাতিল হয়ে যাবে।

যদি বলা হয়, মুখের কথার দ্বারা স্ত্রীর নিকট প্রত্যাবর্তন যদি কিরাকে প্রত্যাহার না করে, তাহলে তা স্থিত থাকবে। কথার দ্বারা ফিরে গেলে কিরা প্রত্যাহৃত হওয়ায় কোন প্রভাব রাখবে না।

জবাবে বলা যাবে, এটা জরুরী নয় এদিক দিয়ে যে, কিরা থেকে যাবে ও ঈলা বাতিল হবে তার সাথে তালাক সংশ্লিষ্ট হওয়ার দিক দিয়ে। কেননা স্বামী যদি স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, পরে বিয়ে অনুষ্ঠানের পর তার নিকট স্ত্রী ফিরে আসে, তাহলে কিরা অবশিষ্ট থাকবে। স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলে সে কিরা ভঙ্গকারী হবে। এ জন্যে তার সাথে তালাক মিলিত হবে না, সঙ্গম না করলেও। তেমনি কোন ব্যক্তি সম্পর্কহীন কোন মেয়েলোককে বলে ঃ আল্লাহ্‌র নামে কসম, আমি তোমার নিকটে যাব না, তাহলে তাতে ঈলা হবে না। যদি পরে সে তাকে বিয়ে করে, তাহলে তখন সেই কিরাটা থেকে যাবে। তাই সে যদি তার সাথে সঙ্গম করে তাহলে তাকে কাফফারা দিতে হবে। সে ঈলাকারী হবে না, যা তালাক ঘটাতে পারে। তাহলে কিরাও থাকবে না। আর সে কারণে তালাকও ঘটবে না। এরূপ অবস্থায় মুখের কথার দ্বারা তার নিকটে যাওয়া জায়েয হবে। তাহলে এই কিরার ফলে তালাক হওয়া নাকচ হয়ে যাবে। সঙ্গমের কারণে কিরা ভঙ্গের হুকুমটা অবশিষ্ট থাকবে।

হানাফী ফিকাহবিদগণ মুখের কথার দ্বারা স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়ার কাজটি সহীহ হওয়ার জন্যে সমস্ত মিয়াদকালে ওযর বর্তমান থাকার শর্ত আরোপ করেছেন। মিয়াদের মধ্যের কোন

এক সময়ে সঙ্গম সম্ভব হলে তখন স্ত্রীর নিকট যাওয়ার ব্যাপারটি সঙ্গমের মাধ্যমেই হতে হবে এ কারণে যে, কথার দ্বারা স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়ার কাজটি তাদের মতে সঙ্গমের স্থলাভিষিক্ত হিসেবেই হয়— যখন তা হয় না বা হতে পারে না। অন্যথায় মিয়াদ শেষ হলেই তালাক সঙ্ঘটিত হবে। কাজেই মিয়াদের মধ্যে যখনই সঙ্গম করার ক্ষমতা হবে, তখন কথার দ্বারা স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়া বাতিল হয়ে যাবে। যেমন তায়াম্মুমকারী যখন তার তায়াম্মুমকে পানির দ্বারা তাহারাতের স্থলাভিষিক্ত বানাবে নামায মুবাহ্ হওয়ার ব্যাপারে, অর্থাৎ তার নামায শেষ করার পূর্বেই যদি পানি পাওয়া যায়, তাহলে তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে ও তার আসল ফরয যে অযূ, সে দিকে ফিরে যেতে হবে, সে পানি নামাযের শুরুতে পাওয়া যাক, কি শেষে পাওয়া যাক। মিয়াদের মধ্যে সঙ্গমে সক্ষম হওয়াও এমনি ব্যাপার। মিয়াদের মধ্যে সঙ্গম সম্ভব হলে কথার দ্বারা ফিরে যাওয়া বাতিল হবে। মুহাম্মাদ বলেছেন, মেয়াদের মধ্যে ওযর থাকার দরুন কথার দ্বারা যদি ফিরে যায়, পরে মিয়াদ শেষ হয়ে যায়, ওযর বহাল থাকে, তাহলে ঈলার হুকুমটা বাতিল হয়ে যাবে। তখন তার অবস্থা সেই ব্যক্তির মত হবে, যে কোন সম্পর্কহীন মেয়েলোকের ব্যাপারে হলফ করল যে, তার নিকটে যাবে না। পরে সে তাকে বিয়ে করল, তখন তার কিরা অবশিষ্ট থাকবে। নিকটে ফিরে গেলে কিরা ভঙ্গ করা হবে। আর চার মাস পর্যন্ত সঙ্গম না করলে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে না।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ -

যদি তারা তালাক দিতে সংকল্পবদ্ধ হয়, তাহলে জানবে আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা।

আবূ বকর বলেছেন, স্ত্রীর নিকট ফিরে না গেলে সে অবস্থায় তালাকের সংকল্পবদ্ধতার অর্থ পর্যায়ে তিন ধরনের কথা পাওয়া গেছে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, তালাকের সংকল্প বাস্তবায়িত হবে চার মাস সময় শেষ হলে। ইবনে মাসউদ, জায়দ ইবনে সাবিত, উসমান ইবনে আফফান (রা)-ও এই কথাই বলেছেন। তাঁরা বলেছেন, স্ত্রী এক তালাক বায়েন হবে। আলী, ইবনে উমর ও আবুদ দারদা (রা) ভিন্ন কথা বলেছেন। তাঁদের থেকে বর্ণিত হয়েছে প্রাথমিক লোকদের মতই কথা। তাদের থেকে এ-ও বর্ণিত হয়েছে যে, মিয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর সে থেমে যাবে। তখন সে হয় তার স্ত্রীর নিকট ফিরে যাবে, না হয় তাকে তালাক দেবে। আয়েশা ও আবূদ দারদা (রা)-ও তা-ই বলেছেন। তৃতীয় কথা হচ্ছে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, সালিম ইবনে আবদুল্লাহ, আবূ বকর ইবনে আবদুর রহমান, জুহরী, আতা ও তায়ূসের কথা। তাঁরা বলেছেন, চার মাস যখন অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন স্ত্রী এক তালাক রিজয়ী হয়ে যাবে।

হানাফী ফিকাহবিদগণ ইবনে আব্বাস (রা) ও তাঁর অনুসারীদের মতকে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়ার পূর্বেই যদি চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে স্ত্রী এক তালাক বায়েন হয়ে যাবে। সওরী, আল-হাসান ইবনে সালিহও এই মত গ্রহণ করেছেন। মালিক, লাইস ও শাফেয়ী আবুদ দারদা ও আয়েশা (রা)-র বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। তা হল, মিয়াদ শেষ হওয়ার পর থেমে যাবে। অতঃপর হয় স্ত্রীর নিকট ফিরে যাবে, না হয় তালাক দেবে। তখন তালাক দিলে এক তালাক রিজয়ী হবে। মালিক বলেছেন, স্ত্রীকে তার ফিরিয়ে নেয়া সহীহ হবে কেবল তখন যদি সে তার সাথে মিয়াদের মধ্যে সঙ্গম করে। শাফেয়ী বলেছেন, মিয়াদ শেষ হওয়ার পর তা থেকে পবিত্র থাকলে তার পরে দাবি করা স্ত্রীর পক্ষে বৈধ হবে। সঙ্গমে একদিনের বেশি বিলম্ব করা যাবে না। আওজায়ী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব,

সালিম ও তাঁদের অনুসারীদের মত গ্রহণ করেছেন। সে মত হলো মিয়াদ শেষ হয়ে গেলে স্ত্রী এক তালাক রিজয়ী হয়ে যাবে।

হানাফী ফিকাহবিদগণ ইবনে আব্বাস (রা) ও তাঁর অনুসারীদের মতকে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়ার পূর্বেই যদি চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে স্ত্রী এক তালাক বায়েন হয়ে যাবে। সওরী, আল-হাসান ইবনে সালিহও এই মত গ্রহণ করেছেন। মালিক, লাইস ও শাফেয়ী আবুদ দারদা ও আয়েশা (রা)-র বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। তা হল, মিয়াদ শেষ হওয়ার পর থেমে যাবে। অতঃপর হয় স্ত্রীর নিকট ফিরে যাবে, না হয় তালাক দেবে। তখন তালাক দিলে এক তালাক বিজয়ী হবে। মালিক বলেছেন, স্ত্রীকে তার ফিরিয়ে নেয়া সহীহ্ হবে কেবল তখন যদি সে তার সাথে মিয়াদের মধ্যে সঙ্গম করে। শাফেয়ী বলেছেন, মিয়াদ শেষ হওয়ার পর তা থেকে পবিত্র থাকলে তার পরে দাবি করা স্ত্রীর পক্ষে বৈধ হবে। সঙ্গমে একদিনের বেশি বিলম্ব করা যাবে না। আওজায়ী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, সালিম ও তাঁদের অনুসারীদের মত গ্রহণ করেছেন। সে মত হল মিয়াদ শেষ হয়ে গেলে স্ত্রী এক তালাক রিজয়ী হয়ে যাবে।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তারা যদি তালাকের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে থাকে, তাহলে সর্বশ্রোতা-সর্বজ্ঞাত'-এর অর্থের কয়টি সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনার দিকগুলোই হচ্ছে আগের কালের ফিকাহবিদদের মতপার্থক্যের গোড়ার কথা। যদি সে সম্ভাবনা না থাকত, তাহলে তাঁরা আয়াতের সে রূপ ব্যাখ্যা দিতেন না। কেননা শব্দে মূলত যে সম্ভাবনা আদপেই নেই, সেই সম্ভাবনা ব্যাখ্যায় নিয়ে আসা জায়েয নয়। আগের কালের ফিকাহবিদগণ তো ভাষাবিদ ও আলিম— বিজ্ঞ মনীষী ছিলেন। প্রতিটি শব্দে নিহিত সম্ভাবনা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। শব্দের বিভিন্ন অর্থ জানতেন। যার সম্ভাবনা শব্দে নেই, তা-ও তাঁরা জানতেন। তা সত্ত্বেও এ বিষয়ে যখন তারা বিভিন্ন মত দিয়েছেন, এ থেকে বোঝা যায় যে, বাস্তবিকই শব্দের মধ্যে সে সম্ভাবনা রয়েছে। অন্য দিক দিয়েও বিবেচনা করতে হবে। এই মতপার্থক্য তাঁদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও সর্বজনপরিচিত ছিল। কেউ তার প্রতিবাদ করেন নি, বিপরীত কথা বলেন নি। তাহলে এটা ইজমা হয়ে গেল। এটা ইজতিহাদের ব্যাপক ও প্রশস্ত ক্ষেত্রের লক্ষণ। এর যে কোন একটি অর্থে শব্দটিকে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ যখন প্রমাণিত হল, তখন এসব ব্যাখ্যার মধ্যে প্রথমটির দিকে নজর দিতে আমরা বাধ্য হলাম। তাকেই আমরা প্রকৃত সত্যের সাথে অধিক সাদৃশ্য সম্পন্ন মনে করলাম। আমরা ইবনে আব্বাস (রা)-কে পেলাম। তিনি বলেছেন, তালাকের দৃঢ় সংকল্প বলতে স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়ার পূর্বে চার মাস নিঃশেষ হয়ে যাওয়া বোঝায়। মিয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর নিকট ফিরে না যাওয়াকে তালাকের দৃঢ় সংকল্প বুঝিয়েছে। ফলে এটাই তার নাম হয়ে দাঁড়াল। কেননা উক্ত কথাটি হয় শরীয়াতের দৃষ্টিতে বলা হয়েছে, না হয় ভাষাতত্ত্বের দিকে দিয়ে। দুটির যেটিই হোক, তা দলীল হিসেবে প্রমাণিত, প্রতিষ্ঠিত। তাই অর্থের সাধারণত্বকে গণ্য করা জরুরী। শরীয়াতের দেয়া নাম হলে তাকে توقيف মনে করতে হবে। অবস্থা যখন এই, অথচ আমরা জানি, ঈলাকারী সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কথা দুটি। হয় ফিরে যাওয়া, না হয় তালাকের সংকল্প হওয়া। ফিরে যাওয়ার ব্যাপারটি চার মাস মিয়াদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মিয়াদ শেষ হয়ে গেলে তা-ও নিঃশেষ হয়ে হারিয়ে যাবে। তখন স্ত্রীর তালাক হয়ে যাবে। কেননা তখনও ফিরে যাওয়ার সুযোগ অবশিষ্ট থাকলে মিয়াদ শেষ হয়ে গেলেই তালাকের সংকল্প প্রমাণিত হতে পারত না। অপর দিক দিয়ে জানা আছে যে, দৃঢ় সংকল্পের ব্যাপারটি মনের শক্ত নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ কোন্ বিষয়ে। লোকেরা বলে, আমি

এ বিষয়ে সংকল্প গ্রহণ করেছি। অর্থাৎ মনের দৃঢ় সিদ্ধান্ত হয়েছে তা করার। তা-ই যখন হল তখন মিয়াদ শেষ হওয়াটা উত্তমভাবে তালাকের সংকল্পের অর্থে গ্রহণ করা যাবে এবং তা থেমে থাকা অপেক্ষাও উত্তম। কেননা থেমে থাকার পরিণতি তালাক সংঘটিত হওয়া কথার দ্বারা। হয় তা স্বামী ঘটাবে কিংবা কোন আদালত তা ঘটিয়ে দেবে, যে লোক থেমে থাকার কথা বলে তার কথানুযায়ী। আর তা যখন এমনি হবে, তা হবে মিয়াদ গত হওয়ার কারণে। কেননা মিয়াদের মধ্যে সে স্ত্রীর নিকট ফিরে যায়নি। আয়াতের দৃষ্টিতে এটাই উত্তম। কেননা আল্লাহ নতুন করে ঘটানোর কথা উল্লেখ করেন নি। তিনি শুধু দৃঢ় সংকল্পের কথা বলেছেন। অতএব আয়াতে যা নেই, তা তার উপর বাড়িয়ে দেয়া তো জায়েয হতে পারে না।

আর একটা দিক হল আল্লাহ যখন বলেছেন ঃ যারা তাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে ঈলা করে তাদের জন্যে চার মাসের অপেক্ষার বিধান করেছেন। যদি এর মধ্যে তারা ফিরে আসে, তা হলে আল্লাহ মহা ক্ষমাকারী, অশেষ দয়াবান। আর তারা যদি তালাকেরই সংকল্প গ্রহণ করে থাকে, তা হলে আল্লাহ সর্বশ্রোতা— সর্বজ্ঞ। এই কথার দাবি দুটি জিনিসের যে কোন একটি। হয় স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়া হবে, না হয় তালাকের সংকল্প হবে। তৃতীয় কোন উপায় নেই। স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়ার কাজটি অবশ্যই ঘোষিত মিয়াদের মধ্যে হতে হবে। তার দলীল আল্লাহ্‌র কথা ঃ فَإِنْ فَاءُوا 'পরে যদি তারা ফিরে যায়।' 'ফা' অক্ষরটি পরবর্তী বোঝায়। আগের কথাটির পর-ই তা হতে হবে অর্থাৎ কিরা করার পরই স্ত্রীর নিকট ফিরে যেতে হবে। কেননা ফিরে যাওয়ার কথা কিরার পরই বলা হয়েছে। এই ফিরে যাওয়াটা তার জন্যে, যার জন্যে চার মাসের অপেক্ষা করার বিধান। ফিরে যাওয়াটা যখন মিয়াদের মধ্যে সীমাবদ্ধ পরে তা মিয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার কারণে শেষ হয়ে গেল, তাই তখনই তালাক ঘটে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। কেননা ফিরে যাওয়া বা তালাক ঘটে যাওয়া— এ দুটোকেই বন্ধ করা যেতে পারে না। এর একটা অবশ্যই ঘটতে হবে। ফিরে যাওয়াটা মিয়াদের মধ্যে হতে হবে, এ বিষয়ে সকলেরই ঐকমত্য রয়েছে। মিয়াদের মধ্যে হলেই ফিরে যাওয়াটা সহীহ হবে। মিয়াদের যে হতে হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই, মতপার্থক্যও নেই। তা অন্য কিছুতে সীমাবদ্ধ নয়। আর মিয়াদ শেষ হবে ফিরে যাওয়া না হলেও। অতএব মিয়াদ শেষ হওয়ায় ফিরে যাওয়ার ফলে সুযোগ নষ্ট হওয়ার পর তালাক কার্যকর হবে।

যদি বলা হয়, আল্লাহ যখন বলেছেন ঃ যারা নিজেদের স্ত্রীদের ক্ষেত্রে ঈলা করে, তাদের জন্যে চার মাসের অপেক্ষার মিয়াদ, যদি ফিরে আসে মিয়াদের মধ্যে অপেক্ষা শেষ। বোঝা গেল, ফিরে যাওয়া শর্ত অপেক্ষার পর ও মিয়াদ গত হওয়ার পর। তাই যখন ফিরে যাওয়া হল না, সে হককে ত্বরান্বিত করল, তাড়াহুড়া করা তার জন্যে নয়, যেমন মিয়াদী ঋণ দিতে তাড়াহুড়া করা।

জবাবে বলা যাবে, আল্লাহ্‌র বক্তব্য যদি ফিরে যাওয়া না হতো তা হলে সে মিয়াদের মধ্যে তা হওয়া সহীহ হতো না। এই ফিরে যাওয়ার পর ফিরে যাওয়ার অপেক্ষা থাকে তার গত হওয়ার পর পর্যন্ত। এই মিয়াদের মধ্যে ফিরে যাওয়া সহীহ হবে, বোঝা যাবে, আয়াতে আল্লাহ সেই কথাই বলেছেন। এই কারণে সেই সঙ্গে তালাকের সংকল্প বাতিল হয়ে গেল।

তার পরে তোমার কথা, ফিরে যাওয়ার অর্থ মিয়াদের পরে। সেই সাথে তোমার কথা যে, ফিরে যাওয়াটা মিয়াদের মধ্যে সহীহ হবে, যেমন মিয়াদের পরে। তার সাথে তালাকের সংকল্প বাতিল হয়ে যাবে। এটা শব্দের বৈপরীত্য। তোমার কথা, মিয়াদের মধ্যের কথা। আর তোমার

কথা ঃ তা মিয়াদী ঋণ যখন তাড়াহুড়া করা হবে, তা তোমার থেকে বেশি হবে না সেই বৈপরীত্য থেকে। কেননা মিয়াদী ঋণ তাড়াহুড়া করলে বাধ্যতার হুকুমের বাইরে যায় না। তা না হলে বাকী বা মিয়াদী মূল্যের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় কখনই সহীহ্ হতো না। কেননা মূল্যের উপর মালিকানা যদি ভবিষ্যতের সাথে সম্পর্কিত হয় তাহলে তার ভিত্তিতে বিক্রয়ের চুক্তি সহীহ্ হয় না। যদি বিক্রেতা বলে— আমি এই জিনিসটি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তোমার নিকট বিক্রয় করলাম, তা তোমার জন্যে চার মাস পরে বাধ্যতামূলক হবে, তা হলে এই বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। আর মিয়াদের উল্লেখ করায় মূল্যটা বিক্রেতার মালিকানাভুক্ত হওয়ার বাইরে যাবে না। আর যদি তরান্বিত করা হয় ও মিয়াদ প্রত্যাহার করে, তাহলে চুক্তিটা সঙ্ঘটিত হবে।

তবে ঈলায় স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়ার ব্যাপারটা এর বিপরীত এ দিক দিয়ে যে, স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়ার সুযোগ হারালে তালাক অবশ্যই সঙ্ঘটিত হবে। আর মিয়াদের মধ্যে স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়াই যখন লক্ষ্য, তখন তা সেই মিয়াদের মধ্যে হারালে তালাক হওয়া বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। এ বিষয়ে পূর্বে বলেছি। উপরন্তু যেহেতু আল্লাহ্র কথা 'তবে যদি তারা ফিরে যায়' বলে ঈলাকারীকেই বুঝিয়েছে, আয়াতের শুরুতেই যার কথা বলা হয়েছে। তার জন্যেই চারমাস কাল অপেক্ষা করার বিধান। বাহ্যত আয়াতে কিরা-কসমের পর-পরই স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়ার কথাই বলা হয়েছে। আর একটি দলীল হল, আল্লাহ্র কথাঃ 'চার মাসের অপেক্ষা' ঠিক এই কথার মত ঃ

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ -

তিন তালাক প্রাপ্তরা নিজেদেরকে তিন কুরু পর্যন্ত (ইদ্দত পালনে) রত রাখবে।

(সূরা বাকারা ঃ ২২৮)

এ আয়াত অনুযায়ী তিন কুরু অপেক্ষার মিয়াদ গত হওয়ার পর স্ত্রী বায়েন তালাক হয়ে যাবে। অতএব ঈলার ক্ষেত্রেও অপেক্ষার ব্যাপারটি এরূপই হওয়া উচিত। তার কয়েকটি কারণ। একটি— আমরা যদি ঈলাকারীকে থামিয়ে দিই তাহলে অপেক্ষাটা চার মাসের বেশি কালের হয়ে যাবে। আর সেটা কুরআনের বিধানের বিপরীত। ঈলাকারী যদি তার স্ত্রী থেকে এক বা দুই বছর কাল অনুপস্থিত থাকে, স্ত্রী এই ব্যাপারটি নিয়ে মামলা দায়ের না করে, তার নিজের হক-ও দাবি না করে, তাহলে অপেক্ষাটা অপরিমিত— অ-নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। কোন সময়ই নির্দিষ্ট হয়নি বলে বোঝা যাবে। কিন্তু তা কুরআনের বিপরীত। দ্বিতীয় কারণ, তালাকে তিন কুরু অপেক্ষায় মিয়াদ অতীত হয়ে গেলে যখন বায়েন তালাক ঘটে যাবে। ঈলাতেও সেরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই দুটিকে একত্রকারী তাৎপর্য হচ্ছে, দুই মিয়াদের প্রত্যেকটিতেই অপেক্ষার (تربص) উল্লেখ রয়েছে।

আর তৃতীয় দিক হচ্ছে, দুটি মিয়াদের প্রত্যেকটিই আল্লাহ্র কথার দিক দিয়ে অবশ্য পালনীয়। বায়েন তালাক ঘটে যাওয়ার হুকুমটি তার সাথে সম্পর্কিত হবে। মিয়াদ চলে যাওয়ার দরুন দুটির একটির সাথে যখন বায়েন তালাক হওয়া সম্পর্কিত হয়েছে, তখন দ্বিতীয়টিতেও অনুরূপ হওয়া আবশ্যক সে তাৎপর্যের কারণে, যা আমরা উল্লেখ করেছি।

যদি বলা হয়, 'ইন্নীন'কে এক বছরের সময় দান সর্বসম্মতভাবে এক বছর গত হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীকে ইখতিয়ার দেয়ার শামিল, যদি এক বছরে স্বামী তার নিকট না পৌছে। তাতে মিয়াদকাল

বৃদ্ধি করা জরুরী হবে না। ঈলার ক্ষেত্রে মিয়াদ শেষ হওয়ার পর থেকে থাকা জরুরী হলে তাতে মিয়াদকাল বৃদ্ধি করা জরুরী হয় না।

জবাবে বলা যাবে, কুরআন ও সুন্নাতে ইন্নীনের মিয়াদ নির্ধারণের কোন ব্যবস্থা নেই। তার হুকুমটা আগের লোকদের কথা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। যারা বলে এক বছরের মিয়াদ নির্দিষ্ট করা যাবে, তারা স্ত্রীকে ইখতিয়ার দিয়েছেন তার নিকট পৌঁছার পূর্বে মিয়াদ শেষ হয়ে গেলে। মিয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে তালাক ঘটে যাবে, সে মত তাঁদের নয়। ঈলার মিয়াদ কুরআন দ্বারা নির্ধারিত। সেই সাথে ইখতিয়ার দানের কোন কথা বলা হয়নি। তাই কুরআনের উপর কিছু বৃদ্ধি করা কুরআনের হুকুমেরই বিপরীত। উপরন্তু ইন্নীনের মিয়াদ শেষ হয়ে গেলে তার ইখতিয়ার দেয়া জরুরী, আর ঈলাকারীর মিয়াদ তোমার মতে স্ত্রীর ফিরে যাওয়াকে কর্তব্য করে দেয়। 'ইন্নীন' (নপুংসক) যদি বলে, আমি মিয়াদের পর স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করব, তাহলে তার কথার দিকে ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না। স্ত্রীর সম্মতি হলে সে দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়া হবে।

যদি বলা হয়, ঈলা যখন তালাকের কথা স্পষ্ট করে বলে না, সে বিষয়ে কোন ইঙ্গিত করে না। তাই বিপরীত মত অনুযায়ী বিচ্ছেদ না ঘটানোই বাঞ্ছনীয়, যতক্ষণ না সরকার বিচ্ছেদ ঘটায়। আর আমাদের মূলের দিক দিয়েও তা আমাদেরকে বাধ্য করে না। কেননা ঈলা হয়ত বিচ্ছেদের ইঙ্গিত করে, কেননা 'আমি তোমার নিকটেও যাব না' কথাটি ইঙ্গিতের তালাক-ই বোঝায়। তাছাড়া ব্যাপারটি যখন খুবই দুর্বল, অতএব ঈলার দ্বারা তালাক না ঘটানোই বাঞ্ছনীয়। তবে তার সাথে অপর কোন ব্যাপার সংযোগ করা হলে ভিন্ন কথা। আর তা হচ্ছে মিয়াদ চলে যাওয়া। কেননা এমন অনেক 'কেনায়া' ইঙ্গিত আছে, যাতে কেবল স্বামীর কথায় তালাক ঘটে না। অবশ্য অপর একটি তাৎপর্য তার সাথে যুক্ত করা হলে ভিন্ন কথা। আর তা হচ্ছে, স্বামী তার স্ত্রীকে বলবে, 'আমি তোমাকে ইখতিয়ার দিলাম।' আর 'তোমার ব্যাপার তোমার হাতে' এরূপ বললে তাতে তালাক হবে না। হ্যাঁ, স্ত্রী যদি তা গ্রহণ করে, তাহলে হবে। এমনভাবেই ঈলা সম্পর্কে একথা বলা যে, তা তালাকের 'কেনায়া', তাহলে নিষিদ্ধ হবে না। তবে সর্ব প্রকারের কেনায়ার তুলনায় এর অবস্থা অধিক দুর্বল। কাজেই তাতে শব্দ দ্বারা— তার সাথে অপর একটি তাৎপর্য সংযুক্ত করা ব্যতীতই তালাক ঘটে যাবে না। আর 'লেয়ান' (لعان) -এর কোন প্রমাণ নেই 'কেনায়া'র তাৎপর্য পেশ করার ব্যাপারে। কেননা স্ত্রীকে স্বামীর ব্যভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করা ও তাদের দুজনেরই পারস্পরিক লানত করা বায়েন তালাক বোঝাবার মত কোন কথা বোঝায় না কোন অবস্থাতেই। তাছাড়া লেয়ান ঈলার বিপরীত ব্যাপার। তা এভাবে যে, সে ব্যাপারে ফায়সালা কেবলমাত্র আদালতের মাধ্যমেই হতে পারে। কিন্তু ঈলার হুকুমটা আদালত ছাড়াই প্রমাণিত হতে পারে। যেসব ব্যাপার বিচ্ছেদকরণের সাথে সম্পর্কিত, সেই দিক দিয়েই 'ইন্নীন'কেও বিচ্ছিন্ন করা যাবে। কেননা মিয়াদ নির্ধারণের ব্যাপারটি আদালতের সাথে সম্পর্কিত। ঈলা আদালত ছাড়াই প্রমাণিত হয়।

যাঁরা থেমে থাকার কথা বলেন, তাঁদের দলীল হচ্ছে এই আয়াত ঃ

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

তারা তালাকের সংকল্প করে থাকলে ... নিশ্চিত জানবে, আল্লাহ্‌র সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

আয়াতে যখন বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা-সর্বজ্ঞ, তখন বোঝা গেল, এখানে একটা কথা আছে যা শ্রুত, আর তা হচ্ছে তালাক।

আবূ বকর বলেছেন, একথা যে বলেছে, তার মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয় এটা। কেননা আল্লাহ্র সর্বশ্রোতা বলে এখানে 'শ্রুত' কিছু থাকতে হবে— এমন কোন কথা নেই। কেননা আল্লাহ তো চিরকালই শ্রোতা। তখন-ও শ্রোতা যখন শ্রবণের কিছুই ছিল না বা থাকবে না। উপরন্তু আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَقَاتِلُوا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ -

এবং তোমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর এবং জেনে রাখ, আল্লাহ্ নিশ্চিত সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

অথচ সেখানে কোন কথা নেই শুনবার মত। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَاتَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاثْبُتُوْا وَعَلَيْكُمُ الصَّمْتِ -

তোমরা শত্রুর সাথে সাক্ষাত হওয়ার বাসনা পোষণ করো না। তবে যদি সাক্ষাত হয়েই যায়, তাহলে তোমরা দৃঢ়তা সহকারে স্থিত থাক। আর তোমাদের চুপ থাকা কর্তব্য।

এ-ও হতে পারে যে, এটা প্রাথমিক কথার দিকে ফিরে যাবে। আর তা হল 'যারা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি ঈলা করবে ....' আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, যা সে বলেছে তা আল্লাহ শুনেছেন, মণের মধ্যে যা গোপন রেখেছে, তা-ও তিনি জানেন। যার সংকল্প গ্রহণ করেছে তা-ও তাঁর অজানা নেই।

ঘোষিত মিয়াদ শেষ হলে বিচ্ছেদ সঙ্ঘটিত হবে, তার এ-ও একটি প্রমাণ যে, যাঁরা থেমে থাকার কথা বলেন, তাঁরা সেখানে অনন্য এমন তাৎপর্য প্রমাণ করেন যা আয়াতে উল্লিখিত হয়নি। কেননা আয়াতটি তো শুধু দুটি জিনিসের যে কোন একটি দাবি করে ঃ হয় স্বামী স্ত্রীর নিকট ফিরে যাবে, না হয় তালাক সঙ্ঘটিত হবে। এখানে স্ত্রীর দাবি করার উল্লেখ নেই, আদালতের পক্ষ থেকে স্বামীকে স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়া বা তালাক ঘটার উপর থামিয়ে দেয়ার কথাও তাতে নেই। কাজেই মূল আয়াতে যা নেই, তা তার সাথে জুড়ে দেয়া আমাদের জন্যে জায়েয হতে পারে না। যা তাতে নেই তা বাড়িয়ে দেয়ার অধিকারও আমাদের থাকতে পারে না। অথচ আমাদের বিপরীত মতের লোকদের কথাবার্তা আমাদেরকে তাই করতে বাধ্য করে। আয়াতের হুকুম যা জরুরী করে, তার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতেও আমাদেরকে বাধ্য করে না। কিন্তু আমাদের মত আয়াতের হুকুমের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে বলে কোন কিছু বৃদ্ধি করা ছাড়া। অতএব আমাদের মতই উত্তম।

এ-ও জানা যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঈলার ক্ষেত্রে এই হুকুমটিকে দৃঢ় করার নির্দেশ দিয়েছেন, যেন স্ত্রীকে তার প্রাপ্য সঙ্গম অথবা বিচ্ছেদ তাকে পাইয়ে দেয়া যায়। এটাই এ আয়াতেরও বক্তব্য ঃ 'হয় প্রচলিত ব্যবস্থা অনুযায়ী স্ত্রীকে রাখা, না হয় ভালোয়-ভালোয় ছেড়ে দেয়া— চলে যেতে দেয়া'।

যে থেমে থাকার কথা বলেছে, সে বলেছে, স্বামী যদি স্ত্রীর নিকট ফিরে না যায়, তাহলে উভয়ের মধ্যে তালাকের ফয়সালা দিতে হবে। তার যদি তালাক দেয়, তাহলে হয় তাকে বায়েন তালাক বানাতে হবে কিংবা রিজয়ী তালাক। যদি বায়েন তালাক বানানো হয়, কিন্তু সুস্পষ্ট তালাক তো কারোর মতেই বায়েন তালাক হয় না তিন-এর কমে। আর রিজয়ী বানালে সে ব্যাপারে স্ত্রীর কোন অংশ থাকে না। কেননা স্বামী যখনই চাইবে, স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে।

তাহলে স্ত্রী যেমন ছিল, তেমনি হয়ে যাবে। এ অবস্থায় তালাক বাধ্যতামূলক করার কোন তাৎপর্য থাকে না। তাতে স্ত্রী তার স্ত্রী-অঙ্গের মালিক বিবেচিত হয় না। তার বলে সে তার হক পর্যন্তও পৌছতে পারে না।

ইমাম মালিক-এর কথা হচ্ছে, ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রী-সঙ্গম করা না হলে তাকে ফিরিয়ে নেয়ার কাজটা সহীহ্ হবে না। এই কথাটি কয়েকটি কারণে কঠিন গণ্ডগোলের কথা। একটি কারণ, তিনি বলেছেন, সে যখন স্ত্রীকে রিজয়ী তালাক দেবে অথচ রিজয়ী তালাকে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়াটা সে ছাড়া অপর কোন তাৎপর্যের উপর নির্ভরশীল হয় না।

দ্বিতীয়— স্ত্রীর সাথে সঙ্গম হওয়ার পরই স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যাবে, তা ছাড়া ফিরিয়ে নেয়া নিষিদ্ধ যখন, তখন সে তালাক রিজয়ী হতে পারে না। স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলেও ফিরিয়ে নেয়ার কাজটা হবে না।

তৃতীয়— তার মতে তালাকের পর স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা নিষিদ্ধ। আর তাহলে শুধু সঙ্গমেই ফিরিয়ে নেয়া সঙ্ঘটিত হয় না। তাহলে তার জন্যে স্ত্রী-সঙ্গম কি করে মুবাহ্ হতে পারে?

যিনি বলেছেন, মুদ্দত শেষ হয়ে গেলে এক তালাক রিজয়ী সঙ্ঘটিত হবে— এ কথাটিও বাহ্যিকভাবেই বিপর্যয়পূর্ণ। তারও কয়েকটি কারণ। একটি, যেমন আগেই বলেছি আগের সেই আলোচনায়। আর দ্বিতীয়, কোনরূপ স্পষ্ট উক্তি ব্যতীত সঙ্ঘটিত সমস্ত বিচ্ছেদ বায়েন তালাক অনিবার্য করে তোলে। ইন্নীনকে বিচ্ছিন্নকরণ তার মধ্যে একটি। স্ত্রীর ইখতিয়ার ও স্বামীর মুর্তাদ হওয়া, দুজন অল্প বয়স্কের ইখতিয়ার। সেখানে তালাকের কথা যখন স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ নেই, তখন তা অবশ্যই বায়েন তালাক হবে।

যিম্মী ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের ঈলা সম্পর্কে মতপার্থক্য হয়েছে। হ"নাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, যখন কেউ দাসী মুক্ত করার বা তালাক দেয়ার হলফ করবে এই বলে যে, সে তার স্ত্রীর নিকট যাবে না, তাহলে সে ঈলাকারী হল। যদি সাদকাড্ডদেয়ার বা হজ্জ করার হলফ করে, তাহলে সে ঈলাকারী হচ্ছে না। যদি আল্লাহ্র নাম নিয়ে হলফ করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফার মতে সে ঈলাকারী হবে। কিন্তু আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে সে ঈলাকারী হবে না।

ইমাম মালিক বলেছেন, এর কোনটিতেই কেউ ঈলাকারী হবে না। আওজায়ী বলেছেন, যিম্মীর ঈলা সঠিক। এ ব্যাপারে তিনি কোন পার্থক্যের কথা বলেন নি। শাফেয়ী বলেছেন, ঈলা ধরনের কাজে যা-ই বাধ্যতামূলক হয়, তাতে মুসলিম ও যিম্মী নাগরিকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

আবূ বকর বলেছেন, যখন জানা আছে যে, ঈলার হুকুম প্রমাণিত হয় বাধ্যতামূলক হয় যে হক তার ভঙ্গের সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে। এই দিক দিয়ে যিম্মীর ঈলা সঠিক ও কার্যকর, যখন তা মুক্তকরণ ও তালাক সহকারের হবে। কেননা তা তার কর্তব্য হয়ে পড়ে, যেমন মুসলিম ব্যক্তির জন্যে কর্তব্য হয়। আর সাদকা, রোযা ও হজ্জ— কিরা ভঙ্গ করলে বাধ্যতামূলক হবে না। কেননা তা যদি তার নিজের উপর বাধ্যতামূলক করা হয়, তাহলে

তদ্দ্বারা তা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে না এবং এই নৈকট্য কার্যটি করাও তার পক্ষ থেকে সঠিক হবে না। কেননা তার নৈকট্য বলতে কিছু নেই। এই কারণে তার জন্যে যাকাত সাদাকাত— যা মুসলমানদের জন্যে তাদের ধন-মালে বাধ্যতামূলক— তাদের জন্যে বাধ্যতামূলক নয়। এগুলো দুনিয়ার পালনীয় হুকুম-আহ্কাম। এই কারণে যিম্মী হজ্জ, উমরা, সাদকা, সিয়াম প্রভৃতির হলফ করলেই যিম্মী ঈলাকারী হয়ে যাবে না। কেননা সঙ্গমের কারণে এর কোনটাই তার জন্যে বাধ্যতামূলক হয় না। তখন তার অবস্থা এমন হয়, যেন সে কোন হলফই করেনি।

আর আল্লাহ্র কথা ঃ 'যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি ঈলা করে' আল্লাহ্র এই কথাটি মুসলিম, কাফির— সকলকেই শামিল করে। কিন্তু আমরা তাকে বিশেষীকৃত করে নিয়েছি, তর কারণও পূর্বে বলেছি। আল্লাহ্র নাম করে হলফ করলে ইমাম আবূ হানীফার মতে সে ঈলাকারী হয়। যদিও কাফফারা দেয়া তার জন্যে বাধতামূলক হয় না দুনিয়ার আইনে। কেননা আল্লাহ্র নাম লওয়াটা যেমন কাফিরের ব্যাপারে প্রযোজ্য, মুসলমানের ব্যাপারেও তাই। এই দলীলের ভিত্তিতে যে, যবেহ্ করা জন্তুর উপর কাফিরের আল্লাহ্র নাম লওয়ার দরুন তা খাওয়া মুবাহ হয়ে যায়, যেমন মুসলমানদেরও অনুরূপ যবেহ করার দরুন হয়। কাফির যদি যীশু মসীহ্র নাম লয়, তাহলে তা খাওয়া যাবে না। ফলে আল্লাহ্র নাম লওয়ার গুরুত্বটা প্রমাণিত হয় এবং যবেহ্ করা জন্তু খাওয়ার ব্যাপারে মুসলমানের মতই হয়ে যায়। ঈলা-ও তেমনি। কেননা সাথে দুটি হুকুম সংশ্লিষ্ট হয়। একটি কাফফারার হুকুম আর দ্বিতীয়টি তালাকের। ফলে তালাকের ক্ষেত্রেও আল্লাহ্র নাম লওয়ার হুকুম প্রমাণিত হল। কেউ কেউ মনে করে, আল্লাহ্র নামে হলফ না করলে ঈলা হয় না। দাস মুক্তকরণ, তালাক দান এবং সাদকা ইত্যাদির ক্ষেত্রে আল্লাহ্র নামে হলফ করলেও ঈলা হয় না। কিন্তু এই কথাটি ভুল। কেননা ঈলা যখন হলফের ব্যাপার, আর কেউ যদি এসব বিষয়ে হলফ করে, স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে মিলিত না হয়,— শুধু মুক্তকরণ বা তালাকে বা সাদকায়— যা বাধাতামূলক হয়। তাতে সে ঈলাকারী হবে। আল্লাহ্র নামে হলফ করলে যেমন হয়। কেননা শব্দের সাধারণ তাৎপর্য এই সবকেই শামিল করে। অতএব যে কোন জিনিসের জন্যে হলফ করলেই সে ঈলাকারী হবে।

উদ্ধৃত আয়াতটি কতিপয় হুকুম জানিয়ে দেয়। তন্মধ্যে একটি বিষয়ের দলীল হিসেবে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান উক্ত আয়াত পেশ করেছেন। বিষয়টি হল— কিরা ভঙ্গ করার পূর্বেই কাফফারা দেয়া জায়েয না হওয়া। বলেছেন, আল্লাহ্ যখন ঈলাকারীকে স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়া বা তালাকের সংকল্প হওয়া-এর যে কোন একটি হুকুম গ্রহণের আদেশ দিয়েছেন, তখন কিরা ভঙ্গের আগেই যদি কাফফারা দেয়া জায়েয হয়, তা হলে ঈলাই প্রত্যাহৃত হয়ে যায়, স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়া ও তালাকের সংকল্প ছাড়াই। কেননা কিরা ভঙ্গ করলে সে কারণে কিছুই বাধ্যতামূলক হয় না। আর হলফকারীর জন্যে কিরা ভঙ্গের দরুন যখন কিছুই বাধ্যতামূলক হয় না, তখন কিরাকারী ঈলাকারী হতে পারে না। আর আগেই কাফফারা দেয়া জায়েয হলে ঈলার হুকুমটাই ফেলে দেয়া হয়— আল্লাহ যার উল্লেখ করেছেন তা ছাড়া-ই। কিন্তু তা আল্লাহ্র কিতাবের বিপরীত।

## কুরূ সম্পর্কে সমালোচনা

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ -

তালাক প্রাপ্তরা তিন কুরূ সময় ইদ্দত পালন করবে।

আগের কালের ফিকাহবিদগণ আয়াতে উল্লিখিত কুরূ (قروء) -এর তাৎপর্য কি সে বিষয়ে মত প্রকাশ করেছেন। হযরত আলী, উমর, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ, ইবনে আব্বাস (রা) ও আবূ মুসা আল-আশআরী বলেছেন, আয়াতের কুরূ অর্থ হায়য। তাঁরা বলেছেন, তৃতীয় হায়য থেকে পবিত্রতার গোসল না করা পর্যন্ত স্বামীই তার স্ত্রীর উপর সবচাইতে বেশি অধিকার সম্পন্ন। অকী ঈসা-আল হাফিয, শবী মুহাম্মাদ (স)-এর তের জন সাহাবীর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে আবূ বকর, উমর, ইবনে মাসঊদ ও ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসে তাঁরা বলেছেন ঃ

اَلرَّجُلُ اَحَقُّ بِامْرَاَتِهٖ مَالَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ -

স্বামী তার স্ত্রীর উপর বেশি অধিকার সম্পন্ন যতক্ষণ না স্ত্রী তৃতীয় হায়য থেকে গোসল করছে।

সাঈদ ইবনে যুবায়র ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবও এই মত গ্রহণ করেছেন। ইবনে উমর, জায়দ ইবনে সাবিত ও আয়েশা (রা) বলেছেন, স্ত্রী যখন তৃতীয় হায়যে প্রবেশ করে, তখন স্বামীর জন্যে তার নিকট যাওয়ার আর কোন পথ থাকে না। আয়েশা (রা) বলেছেন, الاقراء অর্থ الاطهار— তুহর। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অপর একটি বর্ণনা এসেছে, বলেছেন, স্ত্রী যখন তৃতীয় হায়যে প্রবেশ করে, তখন তার উপর স্বামীর স্বামীত্বের কোন পথ থাকে না। স্বামীর জন্যে সে হালালও হয় না, যতক্ষণ না গোসল করছে। হানাফী মাযহাবের সব ফিকাহবিদই একত্রিত হয়ে বলেছেন, কুরূ মানে হায়য। সওবী, আওজায়ী ও হাসান ইবনে সালিহ-ও এই মত গ্রহণ করেছেন। তবে হানাফী ফিকাহবিদগণ এ-ও বলেছেন যে, দশ দিনের কম তার মিয়াদ হলে তৃতীয় হায়য থেকে গোসল না করা পর্যন্ত তার ইদ্দত পূর্ণ হবে না। কিংবা নামাযের সময় গত হয়ে যাবে। এটা হাসান ইবনে সালিহর-ও কথা। তবে তিনি বলেছেন, এ ব্যাপারে ইয়াহূদী-খ্রীস্টান মুসলিম মেয়েদের মতই। কুরূ অর্থ হায়য যাঁরা বলেছেন, তাঁদের মধ্যে হাসান ইবনে সালিহ ব্যতীত উক্তরূপ কথা আর কেউ বলেন নি। হানাফীরা বলেছেন, যিম্মী মেয়েলোকের তৃতীয় হায়যের রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গেলেই তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে। তাকে গোসল করতে হবে না। এই কথাটি অর্থ এই যে, রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার পর যখনই গোসল করবে, তখন আমরা অন্য কোন জিনিসের অপেক্ষা করব না। ইবনে শাবরামাতা বলেছেন, তৃতীয় হায়যের রক্তস্রাব বন্ধ হলে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। গোসলকে তিনি কোন গুরুত্ব দেন নি।

মালিক, শাফেয়ী বলেছেন, কুরূ অর্থ তুহর। তৃতীয় হায়য কালে যদি স্ত্রী খোঁচা প্রাপ্ত হয় তা হলে সে বায়েন তালাক হয়ে যাবে, ফিরিয়ে নেয়ার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

আবূ বকর বলেছেন, আগের কালের ফিকাহবিদদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে জানা গেছে, 'কুরু'র শব্দের ব্যবহার দুটি অর্থে হতে পারে। একটি হায়য, অপরটি তুহর। তার দুটি কারণ। একটি, শব্দের মধ্যে এই তাৎপর্যের সম্ভাবনা না থাকলে আগেরকালের ফিকাহবিদগণ শব্দটির এই উভয় অর্থ বলতেন না। কেননা তাঁরা তো ভাষাবিদ, নামসমূহের তাৎপর্য সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত। আর কথার তাৎপর্য বলার ব্যাপারে তাদের দক্ষতা প্রশ্নাতীত। কাজেই তাদের এক ভাগ যখন হায়য অর্থ বলেছেন আর অপর ভাগ তুহর বলেছেন, তখন বোঝা গেল, শব্দটির এই দুটি অর্থই হতে পারে।

অন্যদিক দিয়ে এই পার্থক্যটা তাঁদের মধ্যে ব্যাপকভাবে পরিচিত ও সর্বজ্ঞাত ছিল। কোন পক্ষই অপর পক্ষের মতকে অগ্রাহ্য করেনি। সে পক্ষের কথার প্রতিবাদ করেনি। বরং এরূপ অর্থ বলাকে অনুমোদন দিয়েছে। এ থেকে বোঝা গেল, মূল শব্দটিই এ দুটি অর্থের ধারক। তাতে ইজতিহাদের অনুমতি রয়েছে। পরন্তু এই নামটির তাৎপর্য ঘোষিত অর্থে প্রকৃত হবে, কিংবা হবে পরোক্ষ। অথবা একটি অর্থ প্রকৃত আর অপরটি অ-প্রকৃত, পরোক্ষ। মোটকথা قروء শব্দের অর্থে ভাষাভাষীরা দুটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে বিভক্ত। এক পক্ষ বলেছে, তা সময়ের নাম। আবূ আমর (সালবের দাস) সালব সূত্রে এই কথার হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাকে القرء শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। জবাবে তিনি 'সময়' ছাড়া অতিরিক্ত কিছু বলেন নি।

আরবী ভাষায় বলা হয়ঃ قَرَيْتُ الْمَاءَ فِى الْحَوْضِ ভাণ্ডারে পানি জমা হলে এই কথা বলা হয়। قَرَوْتُ الْاَرْضَ একটি জিনিসকে অপর একটি জিনিসের সাথে একত্রিত করলে এই কথাটি বলা হয়। বলা হয়ঃ مَاقَرَأَتِ النَّاقَةُ سَلًى قَطُّ অর্থাৎ উষ্ট্রীর জরায়ুতে কখনই সন্তান একত্রিত হয়নি। اقرأت النجوم দিগন্তে তারকাসমূহ একত্রিত হলে তাই বলা হয়। বলা হয় اقرأت المرأة মেয়েলোকটির হায়য হয়েছে। সে কুরু সম্পন্না হয়েছে। আসমায়ী, ফরা ও কাসায়ী প্রমুখ প্রখ্যাত ভাষাবিদই এসব কথা বলেছেন। কারো কারো মত হচ্ছে, একটি জিনিস থেকে অপর একটি জিনিসের দিকে বের হয়ে আসাকেও কুরু বলা হয়। এই কথাটির কোন প্রমাণ ভাষা থেকে দেয়া হয়নি। নির্ভরযোগ্য ভাষাবিদদের থেকেও তা প্রমাণিত নয়। যেসব সাক্ষ্য-প্রমাণের উল্লেখ হয়েছে, তার কোনটিই এ অর্থের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। অতএব তা প্রত্যাহৃত, প্রত্যাখ্যাত। পরে বলেন, কুরুর প্রকৃত অর্থ যদি 'সময়' হয়, তাহলে হায়য অর্থ হওয়াই অধিক উত্তম। কেননা সময় সময় হয় তার মধ্যে কিছু ঘটে এই কারণে। হায়য-ও একটা ঘটনা। আর 'তুহর' তো শুধু এই যে, তখন হায়য হচ্ছে না। তা নতুন করে ঘটে যাওয়া কিছু নয়। অতএব নাম হিসেবে 'হায়য'-ই সর্বোত্তম। যদিও তা মূলত মেলানো ও সংযোজনকরণ। তাই 'হায়য'-ই এজন্যে উত্তম। কেননা হায়য-এর রক্ত সংযোজিত মিলিত হয়, 'হায়য' অবস্থায় দেহের সমগ্র অংশ থেকে তা একত্রিত হয়। অতএব হায়য নামটাই অধিক শোভন।

যদি বলা হয়, রক্ত পরস্পর মিলিত ও একত্রিত হয় তুহর এর দিনগুলোতে। পরে তা হায়য-এর দিনগুলোতে প্রবাহিত হয়।

জবাবে বলা হবে, ঠিকই বলেছ। ব্যাপারও আসলে তাই। তার দলীল-ও প্রতিষ্ঠিত, যেমন পূর্বে বলেছি। কুরু হল রক্তের নাম। তবে একথা সত্য যে, তুমি ধারণা করে নিয়েছ যে, তুহর

অবস্থায় তা রক্তের নাম। আমরা বলব, হায়য অবস্থায়ও রক্তের নাম তাই। কাজেই তুহর-এর নাম কুরু রাখার কোন যৌক্তিকতা থাকে না। কেননা তুহর তো রক্ত নয়। রক্ত না থাকলেও তুহর হয় কখনও কখনও, আর রক্ত থাকলেও তুহ্র নাম হয় কখনও কখনও। কুরু রক্তের নাম, তুহর-এর নাম নয়। কিন্তু এই নামে তার নামকরণ হয় শুধু তার প্রকাশিত হবার পর। কেননা এই অবস্থা ছাড়া তার উপর কোন হুকুম কার্যকর হয় না। তা সত্ত্বেও তুহর অবস্থায় রেহ্ম-এ তার অবস্থিতি নিশ্চিত হয় না। ফলে তুহর অবস্থায় সেগুলো গতিশীল হয় না। 'কুরু' নামে তাকে অভিহিত করা চলে না। কেননা 'কুরু' এমন জিনিসের নাম যার সাথে হুকুম সম্পর্কিত হয়। কিন্তু তার প্রবাহিত হওয়ার পূর্বে তার জন্যে কোন হুকুম নেই। তার অস্তিত্ব জানার পূর্বেও তা হয় না। তা ছাড়া 'তুহর' অবস্থায় রেহ্ম-এ রক্তের একত্রিত হওয়া সম্পর্কে তুমি কেমন করে জানতে পার ? সেখানে যে রক্ত বন্দী হয়েছে, তা-ই বা জানাবে কি করে ? হায়য-এর সময় তা প্রবাহিত হবে, তা জানার কি উপায় আছে ?.... এসব কথা কিন্তু প্রমাণকারী দলীল ছাড়াই বলা হয়েছে। কিন্তু কুরআনের বাহ্যিক কথা-ই তা রদ করে। আল্লাহ বলেছেন ঃ وَيَعْلَمُ مَافِى الْأَرْحَامِ মাতৃ জরায়ুতে কি আছে, তা কেবল আল্লাহই জানেন। উক্ত আয়াতের মাধ্যমে রেহ্ম-এ কি আছে তা জানার অগ্রাধিকারের নিজেই দাবি করেছেন। বান্দাদেরকে তিনি তা জানতে দেন নি। তাহলে তুহর অবস্থায় রক্ত জমা হওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত কথা বলার তোমার কি অধিকার আছে ? পরে হায়য-এর সময় তার প্রবাহিত হওয়া সম্পর্কে তুমি কি বলতে পার ? যাঁরা বলেছেন, রক্ত সমস্ত দেহ থেকে একত্রিত হয় এবং হায়য-এর সময় তা প্রবাহিত হয়, তার পূর্বে নয়, এই কথাও তুমি অস্বীকার করতে পার না। তোমার অপেক্ষা তারাই অধিক সত্যের নিকটবর্তী। কেননা আমরা নিশ্চিতভাবেই জানতে পেরেছি, তা এই সময় আছে। তার পূর্বের সময়ে তার থাকার বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না। তাই অগ্রবর্তী সময়ে সে ব্যাপারে কোন হুকুম দেয়া যেতে পারে না। আমরা নাম হিসেবে দুটোতেই এটার ব্যবহারের কথা বলেছি। আভিধানিকভাবে এই নামটি প্রকৃতই যা শামিল করে তাও আমরা করেছি। তাই বুঝতে হবে যে, তা হায়য-এর নাম। 'তুহর'-এর নয়। এটা প্রকৃত অবস্থা। তার তুহর' অর্থ প্রকৃত নয়, পরোক্ষ ও ইঙ্গিতমূলক; কিংবা ধার করা অর্থ (ইস্তায়ারা)। আমরা আভিধানিক অর্থের যেসব সাক্ষ্য-প্রমাণে উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি এবং শব্দের সম্ভাব্য প্রকৃত যে অর্থের উল্লেখ করেছি, তা যদি একথা প্রমাণে যথেষ্ট দলীল হয় যে, শব্দটির প্রকৃত অর্থ নির্দিষ্টভাবে হায়য, 'তুহর' নয়, তাহলে আমরা বলব, আমরা প্রকৃত মতের নাম পেয়েছি, যে জিনিসের নাম, তা থেকে তা কখনই বিচ্ছিন্ন হয় না, আমরা পরোক্ষ অর্থের নামও পেয়েছি, যা কখনও কখনও তার জিনিস থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে, আবার কোন কোন সময় তা বাধ্যতামূলক হয়। আমরা কুরুর নাম পেলাম। তা হায়য থেকে কখনই বিচ্ছিন্ন হয় না। কখনও কখনও তুহর থেকে বিচ্ছিন্ন পেয়েছি। কেননা হায়য-নিরাশ হয়ে যাওয়া বৃদ্ধার তো তুহরই রয়েছে, না-বালেগার 'তুহর' ছাড়া আর কি ? অথচ এ দুজন 'কুরু' সম্পন্না নয়। এ থেকে আমরা জানলাম যে, দুই হায়য-এর মাঝখানের সময়ে যে 'তুহর' হয়, তাকে কুরু বলা হয় পরোক্ষ অর্থে। প্রকৃত অর্থে নয়। তুহর-কে হায়য বলা হয় তা হায়য-এর সন্নিহিত বলে। যেমন একটা জিনিসের নাম তার প্রতিবেশীর বা সন্নিহিত জিনিসের নামে রাখা হয়। এর একটা কারণ অবশ্যই আছে। যখন তা হায়য-এর সন্নিহিত তখন সেই নাম হবে। আর যখন তার সন্নিহিত নয়, তখন তা দিয়ে তার নাম রাখা

হবে না। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, কুরু তুহর-এর পরোক্ষ নাম, আর হায়য-এর জন্যে প্রকৃত নাম।

কুরু শব্দের অর্থ হায়য, তুহর নয়— একথা প্রমাণ করে যে, শব্দটির দুই অর্থ-ই সম্ভবপর। মুসলিম একমত এই বিষয়ে যে, এ দুটির একটিই বোঝাবে। সম্ভাব্যতার দিক দিয়ে দুটি অর্থই যদি সমান হয়, তাহলে হায়য অর্থ গ্রহণ অধিক উত্তম। কেননা নবী করীম (স)-এর ভাষায়ও হায়য অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে, তুহর অর্থ নয়। তিনি বলেছেন ঃ

اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ مَ اَيَّامِ اَقْرَائِهَا -

হায়য-রোগে আক্রান্ত নারী তার কুরুর দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দেবে— পড়বে না।

ফাতিমা বিনতে আবূ হুবায়শকে তিনি বলেছিলেন ঃ

فَاذَا اَقْبَلَ قُرْؤُكَ فَدَعِيْ الصَّلَاةَ، وَاِذَا اَدْبَرَ فَاغْتَسِلِيْ وَصَلِّى مَا بَيْنَ الْقُرْءِ اِلَى الْقُرْءِ -

তোমার কুরু (হায়য) যখন এগিয়ে আসবে, তখন তুমি নামায ছেড়ে দেবে। আবার যখন পেছনে চলে যাবে, তখন গোসল করে এক কুরু থেকে পরবর্তী কুরু পর্যন্ত নামায পড়বে।

নবী করীম (স) ব্যবহৃত ভাষা থেকেই প্রমাণিত হল যে, কুরু অর্থ হায়য। এই প্রসঙ্গের আয়াতটির তাৎপর্যও এই অনুযায়ী গ্রহণ করতে হবে। কেননা কুরআন তো রাসূলে করীম (স)-এর ভাষায়ই অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি-ই তো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শব্দসমূহের— যার বহু অর্থ হওয়া সম্ভব— ব্যাখ্যাকারী। তাঁর ব্যবহৃত ভাষায় কুরুর অর্থ 'তুহর' হয়নি। অতএব শব্দটির অর্থ 'হায়য' বলা 'তুহর' বলার তুলনায় অনেক বেশি উত্তম। মুহাম্মাদ ইবনে বকর আল-বসরী বর্ণিত হাদীস তার প্রমাণ। তিনি আবূ দাউদ— মুহাম্মাদ ইবনে মাসউদ, আবূ আসিম, ইবনে জুরায়য, মুজাহিদ ইবনে আসলাম, কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

طَلَاقُ الْاَمَةِ ثِنْتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ -

ক্রীতদাসীর জন্যে মাত্র দুই তালাক। আর তার কুরু হচ্ছে দুই হায়য।

আবূ আসিম বলেছেন, মুজাহির, আল-কাসিম, আয়েশাতা (রা) সূত্রে আমাদের নিকট অনুরূপ মর্মের হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, তার ইদ্দত দুই হায়য। আবদুল বাকী ইবনে কানে মুহাম্মাদ ইবনে শাযান মুয়াল্লা, উমর ইবনে শবীব, আবদুল্লাহ ইবনে ঈসা, আতীয়াতা ইবেন উমর সূত্রে নবী করীম (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

تَطْلِقُ الْاَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ -

ক্রীতদাসীকে দুই তালাক দিতে হয়। আর তার ইদ্দত হচ্ছে দুই হায়য কাল।

ক্রীতদাসীর ইদ্দত দুই হায়য হওয়ার এটা অকাট্য দলীল। আর এটা আমাদের বিপরীত মতের লোকদের বিপরীত কথা। কেননা তারা মনে করে, ক্রীতদাসীর ইদ্দত তুহর, তারা তার জন্যে দুই হায়য সর্বাত্মকভাবে শামিল করে না। দাসীর ইদ্দত দুই হায়য, একথা যখন প্রমাণিত, তখন স্বাধীনা নারীর ইদ্দত অবশ্যই তিন হায়য হবে। আর এই দুটি হাদীস যদিও 'খবরে

ওয়াহিদ' ভাবেই বর্ণিত হয়েছে, মনীষিগণ এ দুটি হাদীসকেই কাজে লাগাবার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, স্বাধীনা রমণীর ইদ্দতের অর্ধেক দাসীর ইদ্দত। অতএব এর সঠিকত্ব অপরিহার্য।

আবূ সাঈদুল খুদরী (রা) নবী করীম (স) থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা-ও এই কথাই প্রমাণ করে। তাতে তিনি আওতাস যুদ্ধের বন্দিনীদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ

لَاتُوطَا حَامِلٌ حَتّٰى تَضَعَ وَلَا حَامِلٌ حَتّٰى تَسْتَبْرِئَ بِحَيْضَةٍ -

গর্ভবতী নারী সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত এবং হায়যধারী নারী এক হায়য দেখে স্বীয় পবিত্রতা প্রমাণ না করা পর্যন্ত তার সাথে সঙ্গম করা যাবে না।

আর একথা জানা-ই আছে যে, ইদ্দতের ব্যবস্থাটা মূলত গর্ভের শূন্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যেই রাখা হয়েছে। নবী করীম (স) যখন দাসীর গর্ভশূন্যতা প্রমাণের জন্যে হায়য ঠিক করেছেন, তুহর নয়, বুঝতে হবে যে, ইদ্দত হায়য দ্বারাই পালিত হতে হবে, তুহর দ্বারা নয়। কেননা এ দুটির প্রত্যেকটিই মূলত গর্ভশূন্যতা— জরায়ুতে সন্তান নেই প্রমাণের উদ্দেশ্যেই গৃহীত হয়েছে। যদিও নাবালেগা ও অতিবৃদ্ধার জন্যেও ইদ্দত জরুরী। আসলে গর্ভশূন্যতা প্রমাণ উদ্দেশ্য হলেও যে নারীর গর্ভ হওয়ার আদৌ সম্ভাবনা নেই— সেই অতিবৃদ্ধা ও অল্প বয়সের জন্যেও ইদ্দতের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যেন বালেগা হওয়ার নিকটে পৌঁছা ও বেশি বয়সের নারী— যার হায়য হওয়া অসম্ভব নয়— ও ইদ্দত থেকে বাদ পড়ে না যায়। এই সকলের জন্যেই ইদ্দতের বিধান সতর্কতা অবলম্বন স্বরূপ যেন গর্ভের ব্যাপারে একবিন্দু সন্দেহের অবকাশ না থাকে।

আল্লাহ্‌র এই কথাটিও তা-ই প্রমাণ করে ঃ

وَالّٰئِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ -

তোমাদের মেয়েলোকদের মধ্য থেকে যেসব মেয়েলোক হায়য হওয়া থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ কর, তা হলে তিন মাস কাল তাদের ইদ্দত পালনে বাধ্য কর। (সূরা তালাক ঃ ৪)

এ আয়াতে যে মেয়েলোকের হায়য হয় না, তাদের ক্ষেত্রে হায়য-এর স্থানে মাস দাঁড় করানো হয়েছে। এ থেকে বোঝা গেল যে, আসল হচ্ছে হায়য। যেমন فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا 'পানি না পেলে তায়াম্মুম কর।' অর্থাৎ পানির অযূর পরিবর্তে তায়াম্মুম। জানা গেল, এখানে পানির বদলে পবিত্র মাটিকে মূল করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তা'আলা কুরুকে সংখ্যায় সীমিত করেছেন, ইদ্দতের জন্যে এই সংখ্যা পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র কথা ঃ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ তিন কুরু। এ ক্ষেত্রে তুহর গণ্য করা হলে তা পূর্ণ করা কঠিন তার ক্ষেত্রে যাকে সুন্নাত নিয়মে তালাক দেয়া হয়েছে। সুন্নাতের নিয়মে তালাকের ইদ্দত সেই তুহর দিয়ে শুরু করতে হয় যে তুহর-এ স্ত্রী-সঙ্গম করা হয়নি। কাজেই এই যার অবস্থা, তার তালাক হবে এমন সময় যখন তুহর-এর কিছু সময় অতীত হয়ে গেছে। তার পরই সে ইদ্দত পালন করবে দুই তুহর কাল। এই দুই তুহ্‌র কাল তৃতীয় তুহর-এর কিছু অংশ নিয়েই তার ইদ্দত কাল হবে। তাতে তৃতীয় তুহর পূর্ণ হওয়া সম্ভব হবে না, যদি সুন্নাত মুতাবিক তালাক দেয়া হয়। তাই আমরা জানলাম যে, এখানে হায়যই অনুসরণ করতে হবে, তাতে আয়াতে

নির্দিষ্ট করা সংখ্যা পূর্ণ করা সম্ভব। এই ব্যাপারটি আল্লাহ্র এই কথার মতো নয়, যাতে বলা হয়েছে ঃ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ 'হজ্জের সময় জানা কয়েকটি মাস'। এ থেকে দুই মাস ও তৃতীয় মাসের কিছু সময় বোঝানো হয়েছে। কেননা সংখ্যার দ্বারা তা সীমিত করা হয়নি। তা বহু বচনের শব্দে বলা হয়েছে। অথচ কুরু সংখ্যা দ্বারা সীমিত। তার কম সম্ভব নয়। যেমন তুমি বলবে, আমি তিন ব্যক্তিকে দেখেছি। আর তুমি মনে করে নেবে দুই ব্যক্তি। এটা সঙ্গত যে, তুমি বলবে ঃ আমি কয়েক জন লোককে দেখেছি, আর তোমার লক্ষ্য হবে দুই ব্যক্তি। উপরন্তু আল্লাহ্র কথা ঃ 'হজ্জ জানা কয়েক মাসে।' তার অর্থ, হজ্জ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ জানা কয়েক মাসে সম্পন্ন করতে হবে। অথচ তোমার লক্ষ্য হবে তার কিছু অংশ। কেননা হজ্জ সংক্রান্ত কাজে মাসসমূহ গ্রাস করে না, তার কিছু অংশকে গ্রাস করে। তাতে সংখ্যা পূর্ণ হওয়ার প্রমাণ হয় না। কিন্তু কুরুর সংখ্যা ইদ্দতের জন্যে পূর্ণ হওয়া একান্তই জরুরী। কাজেই কুরু যদি 'তুহর' হয়, তাহলেও আয়াতে উল্লিখিত সংখ্যা পূরণ করতে হবে। যেমন গোটা সময়কেই গ্রাস করে। তাতে তুহর-এর সমস্ত সময়ই ইদ্দত হবে তার সংখ্যা শেষ হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু আয়াতে বলা সংখ্যার কমকে গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু তা হয় না। তাই হায়যই বুঝতে হবে। সুন্নাত তরীকার তালাকের ইদ্দত এ ভাবেই পূর্ণ করা সম্ভব। হায়যে নিরাশ ও অল্প বয়স্কা-নাবালেগার ইদ্দত দুই মাস ও তৃতীয় মাসের কিছু অংশ দ্বারা সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ — তাদের ইদ্দত হল তিন মাস। তেমনি তিন কুরুর কথা যখন বলা হয়েছে, তখন দুটি পূর্ণ ও তৃতীয়টির কিছু অংশ দিয়ে ইদ্দত পূর্ণ করা জায়েয হবে না।

যদি বলা হয়, কেউ যদি তার স্ত্রীকে তুহরে তালাক দেয়, তাহলে তার জন্যে পরবর্তী কুরু পূর্ণাঙ্গ থাকে।

জবাবে বলা হবে, তাতে তৃতীয় তুহর-এর কিছু অংশ দিয়ে তার ইদ্দত পূরণ হতে হয়, যখন তার একটা অংশ পূর্ণ কুরু হয়।

যদি বলা হয়, কুরু হচ্ছে হায়য থেকে বের হয়ে যাওয়া কিংবা তুহর থেকে হায়যে চলে আসা। তবে ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, স্ত্রীর হায়য অবস্থায় যদি তাকে তালাক দেয়, তা হলে তার হায়য থেকে তুহ্র-এর দিকে কুরুর হিসেবে ইদ্দত পালনকারিণী হিসেবে বের হয়ে আসা সম্ভব হবে না। তাতে প্রমাণিত হল যে, তার হায়য থেকে তুহর-এর দিকে বের হয়ে আসাটা আসল লক্ষ্য নয়, তখন বাকী থাকে দ্বিতীয় দিকটি। আর তা হল তুহর থেকে হায়য-এর দিকে বের হয়ে আসা। এতে তিন কুরু পূর্ণভাবে ইদ্দত পালন সম্ভব, যদি তালাক হায়যে দেয়া হয়।

এর জবাবে বলা যাবে, যার কথা, কুরু হচ্ছে তুহর থেকে হায়য-এর দিকে বের হয়ে আসা, কিংবা হায়য থেকে তুহর-এর দিকে বের হয়ে আসা, তার এই কথা কয়েকটি কারণে অগ্রহণযোগ্য। একটি হল আল্লাহ্র কথা ঃ 'তারা নিজেদেরকে তিন কুরু পর্যন্ত ইদ্দত পালনের রত রাখাবে'-এর তাৎপর্য আগের কালের ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, কুরু হচ্ছে হায়য, অন্যরা বলেছেন, কুরু হচ্ছে তুহর। হায়য থেকে তুহর কিংবা তুহর থেকে হায়য-এর দিকে বের হয়ে আসা' তার অর্থ, এমন কথা কেউ বলেন নি। কাজেই এই কথাটি আগেরকালের ফিকাহবিদদের ইজমা বহির্ভূত। তাঁদের ইজমা এর বিপরীত কথায়

অনুষ্ঠিত হয়েছে। অতএব তা প্রত্যাখ্যাত— প্রত্যাহৃত। অন্যদিক দিয়ে আসল অভিধানের দিক দিয়ে শব্দটির প্রকৃত অর্থেও মতপার্থক্য রয়েছে। তাঁদের সে সব কথার উল্লেখ ইতিপূর্বে আমরা করেছি। তাঁদের কেউই শব্দটির হাকীকত বলেন নি, যা হায়য থেকে বের হওয়ার সম্ভাব্যতাকে জরুরী করে দেয়। ফলে এ দিক দিয়েও তা অগ্রহণযোগ্য। এ বিবেচনায়ও তা অগ্রহণযোগ্য যে, ভাষা বা অভিধানের দিক দিয়ে কোন একটি নামের যে অর্থ হওয়ার দাবি যে-ই করবে, তার কর্তব্য হবে সেই দাবির সমর্থনে সাক্ষ্য-প্রমাণ করা। অথবা ভাষাভাষীদের কোন বর্ণনা। কিন্তু সে কথাটির সমর্থনে যদি অভিধান ও বর্ণনা কোন কিছুই পেশ করা না হয়, তাহলে তা প্রত্যাহৃত হবে। তা ছাড়া কুরু যদি তুমি যেমন বলেছ, স্থানান্তরিত হওয়ার নাম হয়, তাহলে বুঝতে হবে, প্রকৃতপক্ষে তার নাম ভিন্নভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, পরে তা আবার স্থানান্তরিত হয়েছে তুহর থেকে হায়য-এর দিকে। কেননা এ কথা তো জানাই আছে যে, সেটি আসলে মূল অভিধানে রাখা নাম নয়, তা অন্য থেকে নকল করা হয়েছে মাত্র। কোন প্রকারের স্থানান্তরকে যখন এই নামে চিহ্নিত করা হয়নি, বোঝা গেল, তা সেটির নাম নয়। তা-ই যদি হয়, তাহলে তার তুহর থেকে হায়য-এর দিকে স্থানান্তর গ্রহণই কুরু হবে, তার পরে হায়য থেকে তুহরে তার স্থানান্তর দ্বিতীয় কুরু হবে। পরে দ্বিতীয় তুহর থেকে হায়য-এর দিকে স্থানান্তর তৃতীয় কুরু হবে। এভাবে দ্বিতীয় হায়য-এ প্রবেশ করায় তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা হায়য কুরুর আসল নাম হায়য থেকে তুহর-এর দিকে স্থানান্তরের নয় তুহর থেকে হায়য-এর দিকে স্থানান্তর ছাড়া।

যদি বলা হয়, বাহ্যত তাই দাবি। তবে ইজমার দলীল তা নিষেধ করে। তাহলে জবাবে বলা যাবে, হায়য থেকে তুহর-এর দিকে স্থানান্তরই লক্ষ্য, একথা যে তোমাকে বলেছে, তা তো তুমি অস্বীকার করনি। তবে স্ত্রীকে যদি হায়যের মধ্যে তালাক দেয়া হয়, তাহলে হায়য থেকে তুহরে স্থানান্তর করে ইদ্দত পালন হবে না ইজমার দলীলের কারণে আর শব্দের হুকুমটা তার পরও হায়য থেকে তুহরে যাবতীয় স্থানান্তরে অবশিষ্ট থাকবে। তাই আমাদের আলোচনা থেকে বিচ্ছিন্নতা যখন সম্ভব হচ্ছে না, তখন দুটির মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দেবে। ফলে দুটোই বাতিল হয়ে যাবে, অতএব তাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।

যদি বলা হয়, তুহর থেকে হায়যে বের হয়ে আসাকে গণ্য করা হায়য থেকে তুহরে বের হয়ে আসাকে গণ্য করা অপেক্ষা অধিক উত্তম। কেননা তুহর থেকে হায়যে স্থানান্তর গর্ভ না থাকার প্রমাণ। কিন্তু হায়য থেকে তুহরে বের হয়ে আসা তার প্রমাণ নয়। কেননা স্ত্রীটির পক্ষে তার হায়যের শেষভাগে গর্ভবতী হওয়া অসম্ভব নয় বরং বৈধ। তাই তাকে তোমার কথাই বলা হবে যে, তার অবশিষ্ট হায়যকালে তার গর্ভবতী হওয়াটা বৈধ— এই কথাটাই ভুল। কেননা গর্ভবতী নারীর হায়য হয় না। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ 'বন্দিনী গর্ভবতীর সাথে সন্তান প্রসবের পূর্বে সঙ্গম করা যাবে না ও গর্ভহীনা নারী এক হায়য দ্বারা গর্ভের শূন্য প্রমাণ করার পূর্বেও তার সাথে সঙ্গম করা নিষিদ্ধ।' অর্থাৎ হায়য তার গর্ভশূন্যের প্রমাণ। বোঝা গেল, হায়য ও গর্ভ দুটি একসাথে হতে পারে না— গর্ভ হলে হায়য হবে না। হায়য হলে প্রমাণ হবে যে, তার গর্ভ নেই। হায়য অবস্থায় কোন নারী গর্ভবতী হয়ে পড়লে হায়য অনতিবিলম্বে বন্ধ হয়ে যাবে। গর্ভের কারণে যদি রক্তের প্রবাহ হয়, তবে সেটা হায়য নয়। সেটাকে 'ইস্তিহাযা'র রক্ত বলা যেতে পারে। অবস্থা যখন তাই হবে, তখন হায়য থেকে তুহরের দিকে বের হয়ে আসাটা গর্ভহীনতার

প্রমাণ নয় বলে তুমি যা বলেছ, তা একটা ভুল কথা হবে। আল্লাহ বলেছেন ঃ وَيَعْلَمُ مَافِي الاَرْحَامِ। এবং তিনিই জানেন, জরায়ূতে কি আছে। বলেছেন ঃ عَالِمُ الْغَيْبِ 'গায়ব জানেন।' অর্থাৎ এ বিষয়ে তিনিই জানেন, অন্য কেউ কিছু জানে না। অন্যরা শুধু ততটুকুই জানে, যতটা আল্লাহ তাদেরকে জানতে দেন, জানিয়ে দেন। সেই সাথে এই পর্যায়ে রাসূলে করীম (স)-এর কথাও রয়েছে, হায়য ও গর্ভ এক সময় হওয়াকে তিনি অসম্ভব বলেছেন। উপরে যে কথাটির উল্লেখ হয়েছে, তাতে বরং আমাদের কথার সঠিকত্বই প্রমাণ করে। কেননা ইদ্দত যদি কুরু দ্বারা পালিত হয়, তাহলে তাতে গর্ভশূন্যতা— পেটে গর্ভ নেই— প্রমাণিত হবে, তুহর তা প্রমাণ করে না। কেননা গর্ভই তুহ্‌র— হায়যহীনতা করে দেয়। কাজেই ইদ্দতের হিসাবে হায়যের হিসেবে হওয়া উচিত। তবে গর্ভশূন্যতা প্রমাণিত হবে। তুহ্‌র তা প্রমাণ করতে পারে না। কুরুতে ইদ্দতের হিসেব হলে গর্ভহীনতা প্রমাণিত হয়। আর রক্তস্রাব দেখতে পাওয়ার পর যদি গর্ভের সঞ্চার হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে ইদ্দত পালন হবে গর্ভ প্রসবের দ্বারা। বোঝা গেল, যেসব মেয়েলোকের হায়য হয়, তাদের ইদ্দত পালিত হবে গর্ভহীনতার দ্বারা। আর গর্ভশূন্যতা প্রমাণিত হবে, হায়য দ্বারা, তুহর দ্বারা নয়। তার দুটি কারণ। একটি হচ্ছে, অল্প বয়সের ও বয়োবৃদ্ধার ইদ্দত সঠিক তুহর। গর্ভহীনতার দ্বারা নয়। আর দ্বিতীয় কারণ, তুহর গর্ভের সহচর। কাজেই গর্ভহীনতার প্রমাণ তার সহচর দ্বারা হতে পারে না। তা হতে পারে তার বিপরীত অবস্থার দ্বারা। আর তা হচ্ছে হায়য। আর তার দ্বারাই গর্ভহীনতা প্রমাণিত হবে। কাজেই ইদ্দত হায়য-এর হিসেবে পালিত হতে হবে। তুহর-এর হিসেবে নয়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ 'অতএব তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও তাদের ইদ্দত পালনের সুবিধার্থে।' তুহরকে যারা গণ্য করেছেন, তাঁরা এই আয়াতাংশকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন।

হযরত উমর (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহ তাঁর স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। তখন নবী করীম (স) হযরত উমর (রা)-কে বলেছিলেন ঃ

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَدَعْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا اِنْ شَاءَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي اَمَرَ اللّٰهُ اَنْ تَطَلَّقَ بِهَا النِّسَاءُ -

তুমি তোমার পুত্রকে আদেশ কর, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়। পরে তাকে রেখে দেবে তার তুহর হওয়ার সময় পর্যন্ত। আর সেই সময় ইচ্ছা করলে তাকে তালাক দেবে। এই হচ্ছে সেই ইদ্দত, যা সামনে নিয়ে স্ত্রীদের তালাক দেয়ার জন্যে আল্লাহ্‌ নির্দেশ দিয়েছেন।

তা তুহরের ভিত্তিতে হবে, এ কথা দুভাবে প্রমাণিত হয়। একটি, তুহরের তালাক দেয়ার উল্লেখের পর তাঁর বলা কথা। কথাটি হল ঃ এ-ই হচ্ছে সেই ইদ্দত, যাকে সামনে রেখে স্ত্রীদের তালাক দেয়ার জন্যে আল্লাহ আদেশ করেছেন। এটা তুহরের দিকে ইঙ্গিত, হায়যের দিকে নয়। বোঝা গেল, ইদ্দত তুহর হিসেবে পালিত হবে, হায়য হিসেবে নয়।

আর দ্বিতীয় আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ 'এবং তোমরা ইদ্দত গণনা কর।' তুহরে তালাক দেয়ার আদেশের পরই এই কথা বলা হয়েছে। বোঝা গেল অবশিষ্ট তুহরই গণনার বিষয়, যা

তালাকের পরে হবে। ফলে তাকে বলা যাবে, 'এটা সেই ইদ্দত যাকে সামনে রেখে স্ত্রীদের তালাক দেয়ার জন্যে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন' তোমার এই কথা— এতে 'লাম' অক্ষরটি ব্যবহৃত হয় অতীতকাল সম্পর্কে যেমন, ভবিষ্যতের জন্যেও তেমন।

যেমন রাসূলের কথা ঃ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ 'তোমরা রোযা রেখো তা (চাঁদ) দেখে।' অর্থাৎ অতীত দর্শন— চাঁদ দেখার কাজটা অতীতে হয়, রোযা রাখা হয় পরে, ভবিষ্যতে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَنْ اَرَدَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا –

যে লোক পরকাল চেয়েছে ও তার জন্যে তার উপযোগী চেষ্টা-সাধনা করেছে ....।

(সূরা বনী-ইসরাঈল ঃ ১৯)

অর্থাৎ পরকাল। এখানে 'লাম' অক্ষরটি ভবিষ্যতের জন্যে ব্যবহৃত, যা বিলম্বে হবে। আরবরা বলে ঃ تَاَهَّبْ لِلشِّتَاءِ 'শীতের জন্যে প্রস্তুতি নাও।' শীত আসেনি, ভবিষ্যতে আসবে। তা এক ভবিষ্যতের সময় প্রস্তুতির সময় থেকে বিলম্বিত। শব্দটি অতীত ও ভবিষ্যৎ— উভয়ের ধারক। তা যখন ভবিষ্যৎ শামিল করবে, তখন তার অস্তিত্ব উল্লেখের পর পরই কোন পার্থক্য ছাড়াই হতে হবে, এমন দাবি নেই। আর তা যখন হবে, ইবনে উমরের জন্যে রাসূলের বলা যে কথায় অতীত হায়যের উল্লেখ রয়েছে এবং ভবিষ্যৎ হায়যও জানা আছে,' যদিও তা উল্লিখিত নয়— সামনে পাচ্ছি। তখন বুঝতে হবে, তাতে অতীত হায়যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বোঝা গেল, ইদ্দত হায়য হিসেব হবে। ভবিষ্যতের হায়য বুঝিয়েছেন, তারও সম্ভাবনা আছে। কেননা তা নারীর অভ্যাস অনুযায়ী হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় তুহরের হিসেব হায়যের তুলনায় উত্তম হতে পারে না। কেননা হায়য তো ভবিষ্যতে হবে, যদিও তা উল্লিখিত নয়। তবু তা বোঝাতে চাওয়া জায়েয, যখন তা জানা। যেমন তালাকের পর তুহর-এর উল্লেখ হয়নি। তার পূর্বের তুহর-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তুহরে তালাক দেয়া হয়ে থাকলে তালাকের পর তুহর হওয়ার কথা জানা-ই আছে। এটাই তো সাধারণ নিয়ম। তোমার মতে কথা ফিরিয়ে নেয়া জায়েয এবং শব্দ দ্বারা তা বোঝাতে চাওয়াও বৈধ। তা সত্ত্বেও তালাকের পরই হায়য হওয়া অসম্ভব নয় মাঝখানে কোন ব্যবধান ছাড়াই। এক্ষণে শব্দে এমন প্রমাণ নেই, যদ্দারা বোঝাবে যে, হায়য দ্বারা নয়, তুহর দ্বারাই ইদ্দতের হিসেব করতে হবে। তা সত্ত্বেও একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, স্ত্রীকে যদি তুহরের শেষের দিকে তালাক দেয়, পরে তালাকের পর-পরই হায়য হয়ে যায় কোন পার্থক্য ছাড়া-ই, তাহলে তার ইদ্দত পালন হায়যের হিসেবে হবে, তুহরের হিসেবে নয়। নবী করীম (স) ব্যবহৃত শব্দের এটাই দাবি। কেননা মূলে তালাকের পর হায়যের শাব্দিক উল্লেখ নেই। তুহরেরও নয়। তাই তালাকের পরই হায়য হলে সেই অনুযায়ীই ইদ্দত পালিত হবে। তালাকের পরও তা থেকে বিলম্বে তার হওয়ার মধ্যে কেউ কোন পার্থক্য করেনি। তাই হায়য অনুযায়ী ইদ্দত হওয়াই কর্তব্য, যাকে কুরু বলা হয়। তুহর দ্বারা নয়।

যদি বলা হয়, হাদীসে অতীতের হায়যের কথা বলা হয়েছে, এটা হতে পারে না। কেননা তালাকের পূর্বের হায়য ইদ্দতে গোণা যায় না।

এর জবাবে বলা যাবে, তালাকের পর যখন হায়য অনুযায়ী ইদ্দত পালন হবে, তখন তাকে

ইদ্দত বলা— ইদ্দতে গণনা করা জায়েয, যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ 'যতক্ষণ না সে তাকে ছাড়া অন্য স্বামী গ্রহণ করছে।' বিয়ে হওয়ার আগেই তাকে স্বামী বলা হয়েছে। এতে আমাদের বিপরীত মতের লোক বাধ্যতায় পড়ে যা আমাদেরকেও বাধ্য করে। কেননা নবী করীম (স) তো তুহর-এর উল্লেখ করেছেন। তুহরেই তালাক দেয়ার আদেশ করেছেন। কিন্তু তালাকের পরবর্তী তুহরের উল্লেখ করেন নি। তালাকের পূর্বের তুহরকে ইদ্দত বলেছেন। কেননা তোমার মতে তো সেই তুহরেই ইদ্দত পালিত হবে। তাহলে তালাকের পূর্বের হায়যকে ইদ্দত নামকরণকে তুমি অস্বীকার করনি। কেননা ইদ্দত সেই হায়য অনুযায়ীই পালিত হবে।

আল্লাহ্র কথা ঃ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ 'এবং ইদ্দত গণনা কর।' এই গণনা কেবল তুহরের হবে, হায়যের হবে না—তা নয়। কেননা সংখ্যা মাত্রের সাথে গণনা জড়িত।

যদি বলা হয়, তালাকের সাথে মিলিত হয় তুহর। ওদিকে আমাদের গণনা করতে আদেশ করা হয়েছে। কাজেই গণনার এই আদেশ সেই তুহর-এর দিকেই ফিরে যাবে। কেননা তুহর-এর পর পরই তাৎক্ষণিকভাবে গণনা করতে বলা হয়েছে।

জবাবে বলা যাবে, এ কথা ভুল। কেননা গণনার আদেশ সংখ্যা বিশিষ্ট কতিপয় জিনিসের দিকে ফিরতে পারে। একটি জিনিস— তার সাথে অন্য জিনিসের যুক্ত হওয়ার পূর্বে— তার গণনার কোন গুরুত্ব নেই। গণনা বাধতামূলক হওয়া ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে এমন জিনিসের সাথে সম্পর্কিত হবে। তা হচ্ছে কুরু। তালাকের সময়ে পরে বিলম্বে তা আসবে। তার পরে আসবে তুহর। তা হায়য থেকে উত্তম হবে না, যখন গণনার লক্ষ্য উভয়কেই শামিল করে ও একই ভাবে উভয়কেই জড়িত করে। এ কারণে একথা বলতে তুমি বাধ্য যে, তালাকের পরই স্ত্রীলোকটির হায়য হলে তার ইদ্দত হায়য অনুযায়ী হবে, সেই হায়যের গণনা তালাকের পরই হতে হবে। আর এ অবস্থায় তার সাথে হায়যই মিলিত হয়। অতএব তা-ই ইদ্দত হবে।

কোন কোন বিপরীত মতের লোক— যাঁরা কুরআনের বিধান বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন— বলেছেন আল্লাহ্র কথা ঃ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ 'তাদের তালাক দাও তাদের ইদ্দতের জন্যে'— এর অর্থ তাদের ইদ্দতের মধ্যে।

কিন্তু একথা ঠিক নয়। কেননা 'লাম' অক্ষরটি 'পাত্র' বা 'ক্ষেত্র' বোঝাবার জন্যে ব্যবহৃত। তা কয়েকটি অর্থে ব্যহৃত হতে পারে। তার পাত্র বা ক্ষেত্র বোঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হওয়ার-ও সম্ভাবনা আছে কিন্তু সম্পর্ক বোঝাবার জন্যে ব্যবহৃত 'লাম' পাঁচটি অর্থে বিভক্ত। তন্মধ্যে একটি মালিকত্ব বোঝায়। যেমন বলা হয় له مال তার মাল। আর একটি কাজের 'লাম'। যেমন বলা হয় لَهٗ كَلَامٌ তার কাথা, وله حركة তার চলাফেরা, গতিবিধি। আর একটি لام العلة কারণের 'লাম'। যেমন বলা হয় ঃ قَامَ الانَّ زَيْدًا جَاءَ সে দাঁড়িয়েছে। কেননা জায়দ এসেছে عطاه لانه 'সে তাকে দিয়েছে, কেননা সে তার নিকট চেয়েছে; আর একটি لام النسبة— সম্পর্ক বোঝাবার জন্যে 'লাম'— যেমন বলা হয় ঃ لَهٗ اَبٌ তার পিতা له اخ তার ভাই। আর একটি হচ্ছে لام الا ختصاص বিশেষ রূপে চিহ্নিত করার 'লাম'। যেমন لَهٗ عِلْمٌ তার জ্ঞান, له ارادة তার ইচ্ছা। আর একটি হল لام الاستغاثه ফরিয়াদ করার 'লাম'। যেমন বলা হয়ঃ يَالَبَكْرٍ আর একটি لام كَيْ কারণ বলার 'লাম'। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا 'তারা তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে

এবং তারা যেসব গুনাহ্ করতে ইচ্ছুক, তা করার সুযোগ তারা লাভ করবে।' আর একটি হল ঃ لام العاقبة—পরিণতির লাম। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا পরিণামে যেন সে তাদের শত্রু ও দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এই 'লাম' এভাবে বিভিন্ন প্রকারের অর্থ দেয় এবং এই বিভিন্ন প্রকারের অর্থ বোঝাবার জন্যে তা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু 'পাত্র' বা ক্ষেত্র বোঝাবার জন্যে 'লাম'-এর ব্যবহার যা এই মতের লোকটি বলেছে, তা কোথাও নেই। তা এমনিতেও একটা বিপর্যয়কর কথা। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ তাদেরকে তাদের ইদ্দতের জন্যে তালাক দাও। এই অর্থ তাদের ইদ্দতের মধ্যে হলে ইদ্দত চলতে থাকা অবস্থায় তাতে তালাক দেয়ার প্রশ্ন উঠে। যেমন কেউ বলল ঃ 'তাকে রজব মাসের মধ্যে তালাক দাও' রজব মাসের কিছুদিন হওয়ার আগে তালাক দিলে এই হুকুম মতো কাজ হবে না। এ থেকেই উক্ত কথাটির অর্থহীনতা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। বরং একথার বৈপরীত্য বোঝায়। 'ইদ্দত গণনা কর'— আল্লাহ্‌র এই কথা দ্বারা বোঝায় না যে, তা তুহ্‌র-এর হতে হবে। সুন্নাত নিয়মের তালাকটা তুহরেই দিতে হয়। তুহরে স্ত্রী-সঙ্গমের পর তালাক দিলে তা সুন্নাতের বিপরীত হবে। ইদ্দত পালন হয় হায়যের ভিত্তিতে হবে, না হয় তুহরের ভিত্তিতে, এ ব্যাপারে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। কাজেই তুহর কালে সুন্নাত তালাক ঘটালে সে ইদ্দত গণনা করা হবে। আর স্ত্রীর হায়য অবস্থায় তালাক দিলে তালাকের পরই ইদ্দত পালন শুরু করতে হবে। আর আমাদের তো ইদ্দত গণনা করারই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব গণনা করার বাধ্যবাধকতা ও সুন্নাত তালাকের সময়ের সাথে এ দিক দিয়ে কোন সম্পর্ক নেই যে, সেই অনুযায়ী তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে, অন্যটি অনুযায়ী করতে হবে না। ইরাকবাসীরা কুরুকে বাদ দিয়ে ভিন্নতর তাৎপর্য হিসেবে বলেছেন— গোসল করা কিংবা নামাযের সময় অতিবাহিত হওয়া, অথচ আল্লাহ্ কুরু হিসেবে ইদ্দত পালন কর্তব্য করে দিয়েছেন, গোসল করা বা নামাযের সময় চলে যাওয়ার কথা কিছুই বলেন নি। বলতে হবে, আমরা কুরুকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুকে গণ্য করব কেন, অথচ আমাদের নিকট কুরুই হল ভিত্তি। কিন্তু আমরা হায়য নিঃশেষ হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে পারিনি। তার গত হওয়ার হুকুমও দিতে পরি না দুটি তাৎপর্যের একটি ছাড়া— তার জন্যে যার অভ্যস্ত দিন দশের কম। তা হল গোসল করা ও নামায মুবাহ্ হওয়া। তাহলে সে পাক হয়ে যাবে সর্বসম্মতভাবে। হযরত উমর, আলী, আবদুল্লাহ্ ও আগের দিনের বড় বড় মনীষীদের থেকে বর্ণনা পাওয়া গেছে এই মর্মে যে, গোসল করা বা নামাযের সময় অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ অবশিষ্ট থাকবে। তখন তার ফরয তার জন্যে বাধ্যতামূলক হবে। কিন্তু নামাযের ফরযের হুকুম বাধ্যতামূলক হওয়া হায়যের হুকুম বহাল থাকার পরিপন্থী। এটা তৃতীয় হায়য গত হওয়া এবং তা থেকে তুহর হওয়া পর্যায়ের কথা। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে তার কোন সংশ্রব নেই। আমরা বলেছি, স্ত্রীর অভ্যস্ত দিন যদি দশ হয়, তাহলে এই দশ দিন অতীত হওয়ার দরুনই তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। গোসল করুক আর না-ই করুক— হায়য শেষ হওয়া সম্পর্কে নিঃসন্দেহ জ্ঞান-লাভের জন্যে। কেননা আমাদের মতে তার হায়য দশের বেশি দিনের হবে না। কাজেই আমাদের উপর হায়যকে গণ্য করাকে যারা বাধ্যতামূলক করছে, তারা এ ব্যাপারে নিতান্তই অসতর্ক। কুরুকে তারা তার জন্যে নির্দিষ্ট স্থান বাদ দিয়ে অন্যত্র স্থাপন করছে।

আবূ বকর বলেছেন, এই বিষয়ে আমরা স্বতন্ত্র একখানি কিতাব লিখেছি। তাতে ও বিষয়ে অনেক বেশি কথা লিখেছি। এখানে যতটকু বলছি, তা-ই যথেষ্ট, আল্লাহ্ তা'আলা ইদ্দতের ব্যাপারে তিন কুরুর কথা বলেছেন। তা সীমাবদ্ধ কেবলমাত্র স্বাধীনা মেয়েলোকের ব্যাপারে, দাসীর জন্যে তা নয়, কেননা দাসীর ইদ্দত স্বাধীনা নারীর ইদ্দতের অর্ধেক, এ বিষয়ে আগের কালের ফিকাহবিদদের কোন মতপার্থক্য নেই। আমরা আলী, উমর, উসমান, ইবনে উমর, জায়দ ইবনে সাবিত (রা) ও তাঁদের মধ্যের অন্যান্যদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছি এই মর্মে যে, দাসীর ইদ্দত স্বাধীনা রমণীর ইদ্দতের অর্ধেক। নবী করীম (স) থেকেও হাদীসের বর্ণনা উদ্ধৃত করেছি যে, দাসীর জন্যে দুই তালাক এবং তার ইদ্দত দুই হায়য। হাদীস ও ইজমা বুঝিয়েছে যে, ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ তিন কুরু বলে আল্লাহ যা বলেছেন, তা স্বাধীনা মহিলাদের জন্যে, দাসীদের জন্যে নয়।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَاخَلَقَ اللّٰهُ فِىْ اَرْحَامِهِنَّ -

তাদের জন্যে হালাল হবে না— আল্লাহ্ তাদের জরায়ুতে যা সৃষ্টি করেছেন তা তারা গোপন করবে।

আমাশ আবদ্-দোহা, মসরূক, উবাই ইবনে কাব সূত্রে বর্ণনা করেছেন, উবাই বলেছেন, এটা ছিল আমানতের ব্যাপার, স্ত্রীলোককে তার স্ত্রী-অঙ্গের আমানতদার বানানো হয়েছিল। নাফে ইবনে উমর থেকে উক্ত আয়াত পর্যায়ে বর্ণনা করেছেন, 'স্ত্রীদের জরায়ুতে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন' বলে হায়য ও গর্ভ বুঝিয়েছেন। ইকরামা বলেছেন, তা হায়য। আল-হিকাম মুজাহিদ ও ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন, দুটি জিনিস বুঝিয়েছেন, তার একটি গর্ভ আর অপরটি হায়য। আলী থেকে বর্ণিত, তিনি একটি মেয়েলোককে এজন্যে হলফ করতে বলেছিলেন যে, তার হায়য পূর্ণ হয়নি। হযরত উসমানও এরই উপর ফায়সালা দিয়েছিলেন। আবূ বকর বলেছেন, 'গোপন করাকে ত্যাগ করা নসীহত করেছেন' থেকে বোঝা গেল, হায়য আছে কি নেই, এ ব্যাপারে নারীর নিজের কথাই চূড়ান্ত ধরতে হবে। গর্ভ সম্পর্কেও তাই। কেননা এসব-ই তার গর্ভে আল্লাহ্র সৃষ্টি। এ ব্যাপারে তার কথা-ই চূড়ান্ত মনে না করলে তা গোপন করা ত্যাগ করার জন্যে তাকে কখনই নসীহত করা হতো না। অতএব প্রমাণিত হল যে, মেয়েলোক যখন বলবে, আমার হায়য চলছে, তখন তার স্বামীর জন্যে তার সাথে সঙ্গম করা জায়েয হবে না। আবার সে-ই যখন বলবে যে, সে পাক হয়েছে, তখনই স্বামীর জন্যে সে হালাল হবে।

হানাফী ফিকাহবিদগণও তাই বলেছেন, স্বামী যখন স্ত্রীকে বলবে, তুমি তালাক যদি তোমার হায়য হয়। জবাবে স্ত্রী বলল, আমার হায়য, তাহলে সে তালাক হয়ে যাবে। স্ত্রীর কথাই এখানে দলীল। এর ও অন্যান্য যাবতীয় শর্তের মধ্যে— যদি তার সাথে তালাককে সম্পর্কিত করা হয়, হানাফী ফিকাহবিদগণ পার্থক্য করেছেন। যেমন, স্বামী বলল, যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর, কিংবা বলল, যদি তুমি অমুকের সাথে কথা বল, তাহলে তুমি তালাক। ফিকাহবিদদের মতে স্ত্রীর কথা গ্রহণ করা যাবে না, যদি স্বামী তার সত্যতা স্বীকার না করে। তবে যদি কোন প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে গ্রহণ করা যাবে। হায়য ও তুহরে তার কথা সত্য মনে করতে হবে।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা হায়য ও গর্ভ পর্যায়ে স্ত্রীর কথা কবুল করা আমাদের কর্তব্য করে দিয়েছেন। ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়া বিষয়েও। এ ব্যাপারটিই এমন যে, এতে স্ত্রীর বিশেষত্ব অগ্রগণ্য। কেননা সে নিজে ছাড়া অন্যরা এ বিষয়ে কিছুই জানতে পারে না। অতএব তার কথাকেই দলীল গণ্য করা হয়েছে। হায়য পর্যায়ের সব হুকুম-আহকামের ব্যাপারই এইরূপ । তার কথাই গ্রহণীয়। তাঁরা এ-ও বলেছেন, স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, তোমার হায়য হতে থাকলে আমার গোলাম মুক্ত। তখন স্ত্রী বলল, আমার হায়য চলছে। তাহলে তাকে সত্যবাদী মনে করা যাবে না। কেননা এখানে ব্যাপারটি স্ত্রী ছাড়া অন্য এক জনের সাথে সম্পর্কিত। তা হল দাসমুক্তির ব্যাপার। আল্লাহ্ তার কথাকে দলীল বানিয়েছেন হায়য-এর ব্যাপারে, যা কেবল তার-ই ব্যাপার, তা-ই ইদ্দত শেষ হওয়ার ব্যাপার, তার সাথে সঙ্গম করা জায়েয বা না-জায়েয— নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপার। কিন্তু যে ব্যাপারটি একান্তভাবে তার-ই সাথে সম্পর্কিত নয়, সেখানে তার ব্যাপার অন্যান্য শর্তের মতই। তাই সেখানে তার সত্যতা স্বীকৃতব্য নয়— দলীল ছাড়া।

তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আলোচ্য আয়াতটি। যাকে যে বিষয়ের আমানতদার বানানো হয়েছে, তাকে তাকে সত্যবাদী স্বীকার করা। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا -

যার উপর হক ধার্য হচ্ছে সে বক্তব্য লেখার এবং তার রব্ব আল্লাহকে ভয় করবে, তাতে এক বিন্দু জিনিসও কম করবে না। (সূরা বাকারা ঃ ২৮২)

কম করা ত্যাগ করার উপদেশ দেয়া হয়েছে। এ থেকে বোঝা গেল এ ব্যাপারে তার নিজের কথাই গ্রহণীয় হবে। এ ব্যাপারে তার কথাই গ্রহণীয় না হলে তাকে কম না করতে উপদেশ দেয়া হত না। আর সে-ই যদি কম করে, তাহলে সে বিষয়ে তাকে সত্য বলে মানা যাবে না। আল্লাহ্র এ কথাটিও এই পর্যায়ের ঃ

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ -

এবং তোমরা সাক্ষ্য গোপন করবে না। যে লোক তা গোপন করবে, তার অন্তরটা পাপী। (সূরা বাকারা ২৮৩)

বোঝাগেল, সাক্ষী যদি সাক্ষ্য গোপন করে, কিংবা সত্য প্রকাশ করে, তাহলে যা সে গোপন করেছে কিংবা প্রকাশ করেছে, তাতে তার নিকটই ফিরে যেতে হবে। কেননা উপদেশটা তো তাকেই দেয়া হয়েছে সাক্ষ্য গোপন না করার। এ ব্যাপারে তার কথাই গ্রহণীয় হবে। এ ব্যাপারে মৌলনীতি হল, যাকেই কোন বিষয়ে আমানতদার বানানো হয়েছে, সে ব্যাপারে তার কথাই গ্রহণীয়। যেমন যার নিকট কোন জিনিস গচ্ছিত রাখা হয়েছে, সে যদি বলে যে, আমানত রাখা জিনিস বিনষ্ট হয়ে গেছে; কিংবা বলে, আমি তো তা ফিরিয়ে দিয়েছি, তাহলে তার কথা গ্রহণীয় হবে। অথবা মুদারিবা ব্যবসায়ী, ইজারা তলবকারী, আর যত লোকই বিভিন্ন হক-হুকুকে আমানতদার বানানো হয়েছে। তাদের সকলের ব্যাপারেই এই কথা।

এজন্যেই আমরা বলেছি, আল্লাহ্র কথা ঃ فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ — 'হস্তগত করা রেহন'— এর পরই যোগ করে বলা হয়েছে ঃ

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ -

যদি তোমাদের কিছু লোক অপর কিছু লোককে বিশ্বাস করে, তাহলে যার নিকট আমানত রাখা হয়েছে তার উচিত তার আমানতটা ফিরিয়ে দেয়া এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করা, যিনি তার রব্ব। (সূরা বাকারা ২৮৩)

এ থেকে বোঝা গেল, রেহন আমানত নয়। কেননা তা যদি আমানত হতো, তাহলে 'আমানত' শব্দটি তার সাথে যোগ করা হতো না। কোন একটি জিনিস তার নিজের সাথে যোগ করা যায় না। অপর একটা জিনিসকে তার সাথে যোগ করা যায়।

কোন কোন লোক বলে, আল্লাহ্‌র কথা ঃ তাদের জন্যে হালাল নয় তাদের জরায়ুতে আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন করা এই কথাটি নির্দিষ্ট গর্ভ বিষয়ে। হায়য গোপন করার কথা নয়। কেননা রক্তস্রাব। কেই হায়য বলা হয়। কিন্তু গর্ভে সন্তান থাকা অবস্থায় হায়য হতে পারে না। কেননা হায়য বের হওয়া রক্তকে বলা হয়, গর্ভের ভেতরে থাকা অবস্থায় তাকে হায়য বলা হয় না। তাকে গণ্য বা হিসাব করারও কোন প্রশ্ন উঠে না। স্ত্রীকে তার আমানতদার বানানোরও কোন তাৎপর্য নেই।

আবূ বকর বলেছেন, এই কথাই সহীহ। কেননা রক্ত জরায়ু থেকে বের না হওয়া ও প্রবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে হায়য বলা হয় না— একথা নিশ্চিত। রেহম থেকে বের হওয়ার পরই তাকে হায়য বলা হয়। কিন্তু আয়াতটি আমাদের কথারই দলীল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তা এই জন্যে যে, হায়য হওয়ার সময়টার ব্যাপার অবশ্যই তার কাছেই ফিরে যাবে। তার কথাকেই গ্রহণ করতে হবে। কেননা সব রক্তস্রাবই তো আর হায়য নয়। হায়য হওয়ার অন্য বহুবিধ কারণ রয়েছে। তার একটা সময় আছে, হায়য হওয়ার অভ্যাসের ব্যাপার আছে। জরায়ুতে গর্ভ নেই, একথা তার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। আর এ সব ব্যাপার তার কাছ থেকেই জানা যাবে। তাই সে নিজেই যখন বলবে, আমার তিনটি হায়য হয়ে গেছে, আয়াতের দৃষ্টিতে তখন তার কথাই গ্রহণ করতে হবে। অনুরূপভাবে, সে যখন বলবে, আমি রক্ত দেখিনি কিংবা বলবে, আমার ইদ্দত শেষ হয়নি, তখন তার কথাই মেনে নিতে হবে। তেমনি যদি বলে, আমার গর্ভ থেকে একটা ভ্রূণ পড়ে গেছে, সেটার সৃষ্টি স্পষ্ট ছিল, ফলে আমার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে, তখনও তার কথাই মেনে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, হায়য সংক্রান্ত ব্যাপারাদিতেই তাকে সত্যবাদী মানতে হবে। আর তা হল, হ্যাঁ, রক্ত প্রবাহিত হয়েছে।

উক্ত আয়াতে একথার দলীলও রয়েছে যে, হায়য-এর ব্যাপারে রক্তের বর্ণ সম্পর্কহীন। কেননা রক্তের বর্ণের গুরুত্ব থাকলে কেবলমাত্র তার কথাই মেনে নেয়ার কথা নয়। কেননা বর্ণের ব্যাপারে তার নিজের ও অন্যান্যদের অবস্থা সমান। বোঝা গেল— হায়যের রক্ত বর্ণ দিয়ে পার্থক্যকৃত হয় না। ইস্তাহাযার রক্ত তা থেকে খুব একটা ভিন্নতর হয় না। এই দুটির পরিচিতিও অভিন্ন। কাজেই যে লোক রক্তের বর্ণ দ্বারা হায়যকে বিচার করে, তার মত বাতিল প্রমাণিত হল আয়াতের দলীল দ্বারাই। রক্তের বর্ণের ব্যাপারটি বাদ দিলে হায়য সম্পর্কিত জ্ঞান তো কেবল তার কাছ থেকেই পেতে হবে, যেমন পূর্বে বলেছি। হায়যের সময়, অভ্যাস ও পরিমাণ ইত্যাদি তার কাছ থেকে জানা ছাড়া উপায় নেই। তুহরের সময়ও তার নিকট থেকেই জানা যেতে পারে। কেননা সব রক্তই তো আর হায়য নয়। তাছাড়া পেটে সন্তানের 'সঞ্চার'

হওয়া। হলে তখনও রক্ত বের হতে থাকলে তাকে হায়যের রক্তস্রাব বলা যাবে না। গর্ভপাত হওয়ার ব্যাপারটিও তার কাছ থেকেই জানা যাবে, সে ব্যাপারে তার কথাই গ্রহণ করতে হবে। কেননা সে বিষয়ে অন্যদের কিছুই জানা সম্ভব নয়। তার কাছ থেকে না শুনে এ বিষয়ে আমাদের কিছুই জানা থাকে না। এই কারণে এ বিষয়ে তার কথার এত গুরুত্ব।

হিশাম মুহাম্মাদের সূত্রে উল্লেখ করেছেন, হায়য সম্পর্কিত ব্যাপারে নারীর নিজের কথাই গ্রহণীয়। বালেগা হওয়ার খবর তার নিকট থেকেই জানতে হবে। কেননা তা কেবল বয়সের হিসেবে হয় না, রক্তস্রাব হতে শুরু করলে হয়। এই কারণেই 'আল্লাহ তাদের জরায়ুতে যা সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন করা তাদের জন্যে হালাল নয়' বলে আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন।

মুহাম্মাদ বলেছেন, কোন কিশোর বালক যদি বলে, আমার স্বপ্নদোষ হয়েছে, তাহলে তা সত্য বলে মেনে নেয়া যাবে না যতক্ষণ না সে জানবে ও বুঝবে যে, স্বপ্নদোষ কাকে বলে, মানুষ পূর্ণ বয়স্ক হয় কখন কিভাবে। এখানে হায়য ও স্বপ্নদোষের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। পার্থক্য এদিক দিয়ে যে, হায়য হওয়ার খবর তো মেয়ের কাছ থেকেই জানতে হবে, কেননা সে সময় ও অভ্যাসের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাতে এমন সব গোপন বিষয়ও থাকে, যা অন্য কারোর নিকট থেকে জানা যেতে পারে না। আয়াতটিও এ বিষয়ে মেয়েলোকটির কথা কবুল করার উপরই গুরুত্ব দেয়। কিন্তু 'ইহতিলাম' বা স্বপ্নদোষ এ পর্যায়ের জিনিস নয়। কেননা তাতে প্রচণ্ড বেগ ও যৌন উত্তেজনা সহকারে বীর্যপাতের প্রয়োজন হয় না অন্যান্য কারণে। শুধু স্খলনই প্রধান। তাতে সময় ও অভ্যাসের কোন প্রশ্ন নেই। এই কারণেই এ বিষয়ে কেবল কিশোরের কথাকেই সত্য বলে মেনে নেয়া যাবে না। তাই এ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় অর্জন করা ও সঠিকত্বকে নিঃসন্দেহে জানার প্রয়োজন রয়েছে। অন্য দিক দিয়ে হায়য ও ইস্তিহাযা— উভয়ের রক্তের বর্ণ যখন অভিন্ন, তখন যে লোক রক্ত পর্যবেক্ষণ করল তারই পক্ষে তাকে হায়য বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা জায়েয হবে না। কাজেই মেয়েলোকটির নিজের কথার দিকে ফিরে যেতে হবে। কেননা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সে-ই জানে, অন্যরা জানে না। পক্ষান্তরে 'ইহতিলাম' (স্বপ্নে বীর্যস্খলন) কোন পর্যবেক্ষকের চোখেই সন্দেহের সৃষ্টি করবে না। তা বোঝা যায়, জানা যায় কোনরূপ সন্দেহ ছাড়াই। এই কারণে কেবল কিশোরের কথার উপর নির্ভরশীল থাকি না।

আল্লাহ্র কথা ঃ

اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ –

যদি সে মেয়েলোকেরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকে।

এই কথাটি গোপন করা সংক্রান্ত নিষেধের শর্ত নয়। কথাটি পূর্ব কথার তাগিদ হিসেবেই বলা হয়েছে। এটা ঈমানের অন্যতম শর্ত। অতএব সে মেয়েলোকদের কর্তব্য যে, তারা তাদের জরায়ুতে আল্লাহ্র সৃষ্টিকে গোপন করবে না। এ ব্যাপারে ঈমানদার ও বেঈমান—উভয়ই এই নিষেধ পালনের ব্যাপারে সমান। এ কথাটি এ আয়াতটির মতই, বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ –

এবং সে দুজনের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র আইন কার্যকর করণে বাধাগ্রস্ত না করে যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকে।

(সূরা আন-নূর ঃ ২)

মরিয়ামের কথা ঃ

إِنِّىْ أَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا -

আমি দয়াময় আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করছি তোমার থেকে বাঁচার জন্যে, যদি তুমি আল্লাহ ভীরু হয়ে থাক। (সূরা মরিয়া ঃ ১৮)

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَبُعُوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِىْ ذٰلِكَ إِنْ أَرَادُوْا إِصْلَاحًا -

তাদের স্বামীরাই তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার বেশি অধিকার সম্পন্ন এই ব্যাপারে, যদি তারা 'সুলাহ' করার ইচ্ছুক হয়ে থাকে।

এ আয়াত কয়টি বিভিন্ন শরীয়াতি বিধান ধারণ করে আছে। তার একটি হচ্ছে, তিন তালাকের কম দিলে স্বামীত্ব-স্ত্রীত্ব শেষ হয়ে যায় না। তা সম্পূর্ণ বাতিলও হয় না। এ আয়াতসমূহে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এক বা দুই তালাক দেয়া হলেও স্বামীত্ব-স্ত্রীত্ব বজায় থাকে। কেননা এ ধরনের তালাক দেয়ার পর-ও তালাকদাতাকে স্বামী বলা হয়েছে। বোঝা গেল, এরূপ অবস্থায়ও মীরাসে অংশীদারিত্ব ও অন্যান্য বৈবাহিক আইন বিধান কার্যকর থাকবে। অবশ্য তা ইদ্দত পালন শেষ হওয়া পর্যন্ত। এ-ও বোঝা গেল যে, ইদ্দত পালন পর্যন্ত স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অবকাশ আছে। কেননা বলা হয়েছে فِىْ ذٰلِكَ — 'এই সময়ের মধ্যে'। অর্থাৎ পূর্বে যে তিন কুরুর কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে। এ-ও প্রমাণিত যে, স্বামীর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়াটা কেবলমাত্র তখনই জায়েয ও কার্যকর হবে, যদি এই ফিরিয়ে নেয়ার মূলে শুভ ও কল্যাণের ইচ্ছা থাকে, স্ত্রীর কোনরূপ ক্ষতি করার ইচ্ছা না থাকে। এটা এই রকমেরই কথা ঃ

وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا

এবং তোমরা তাদেরকে ক্ষতি স্বরূপ আটকে রাখবে না এ উদ্দেশ্যে যে, তোমরা বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ করবে।

যদি বলা হয়, 'স্বামীরা তাদেরকে কুরুর মধ্যে ফিরিয়ে নেয়ার অধিক অধিকার সম্পন্ন' এই কথার অর্থ কি স্বামীত্ব-স্ত্রীত্ব বজায় থাকা অবস্থায়? এ ধরনের কথা তো বলা হয় যেখানে সে অধিকার নিঃশেষ হয়ে গেছে সেখানে। যেখানে স্বামীত্ব বহাল আছে, সেখানে তার অধিকারে তাকে ফিরিয়ে নেয়ার তো কোন প্রশ্ন উঠে না। স্ত্রীর উপর স্বামীত্বের অধিকার এখনও তো বহাল রয়েছে?

জবাবে বলা যাবে, এখানে একটি কারণ ঘটেছে, যখন ইদ্দত শেষ হলেই বিয়ের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে, এই কারণে ফিরিয়ে নেয়ার কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক নয়। কথাটি বলা হয়েছে ইদ্দত শেষ হলেই স্বামীত্ব শেষ হয়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধক হিসেবে। এজন্যে তাকে 'ফিরিয়ে নেয়া' বলা হয়েছে। কর্তৃত্ব শেষ হয়ে যাওয়ার কারণটা দূর করার ব্যাপার এটি। এটা তো এরূপ কথা, যেমন বলা হয়েছে ঃ

فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ أَوْسَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ -

তাদের নির্দিষ্ট মিয়াদ পূর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তোমরা হয় তাদেরকে যথারীতি রেখে দাও, না হয় তাদের যথারীতি ছেড়ে দাও।

স্বামী স্ত্রীকে এ অবস্থায় রাখতে পারবে, কেননা সে তার স্ত্রী। বক্তব্য হচ্ছে ফিরিয়ে নেয়া, যা বিয়ে বহাল থাকার ব্যবস্থাকারী হায়য শেষ হয়ে যাওয়ার পর-ও। এই সময় যদি ফিরিয়ে নেয়া না হয়, তাহলে বিয়েকে নিঃশেষ করে দেবে।

এই ফিরিয়ে নেয়াটা যদিও মুবাহ, কিন্তু তা কল্যাণের ইচ্ছা শর্তাধীন। কেননা মনীষীদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই যে, ফিরিয়ে নিয়ে স্ত্রীর ক্ষতি সাধন করা ও দীর্ঘদিন ধরে ইদ্দত পালনে তাকে বাধ্য করারই যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে তার এই ফিরিয়ে নেয়াটা সহীহ হবে। এ আয়াতটিতে সেই কথাই বলা হয়েছে ঃ "তাদের মিয়াদ পূর্ণ হলে অতঃপর তাদেরকে ভালোভাবে রাখো কিংবা ভালোভাবে ছেড়ে দাও। কিন্তু তাদেরকে কষ্ট দানস্বরূপ ফিরিয়ে রেখো না তাদের উপর সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ করার উদ্দেশ্যে।"

এর পরই বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ -

যে লোক তা করবে, সে নিজের উপরই জুলুম করল।

তাই ফিরিয়ে নেয়াটা যদি সহীহ না হয়, কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে ফিরিয়ে নিলেও, তাহলে সে নিজের উপর জুলুমকারী হতে পারে না নিজের কাজের দরুন।

আয়াতটি আরও প্রমাণ করে যে, বিভিন্ন জিনিসের নামকরণে সাধারণ অর্থবোধক শব্দের ব্যবহার তার সাথে এমন হুকুম জুড়ে দেয়া, যার সাথে সাধারণ জিনিস থেকে কিছু তার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত হবে— জায়েয। সাধারণ অর্থের শব্দ যা যুক্ত করা জিনিস ছাড়া অন্য কিছুকে শামিল করে— নিষিদ্ধ নয়। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ -

তালাকপ্রাপ্ত মেয়েরা নিজেদের ইদ্দত পালন করবে তিন কুরু সময় ধরে।

এ আয়াতে সাধারণভাবেই তিন কুরুর কথা বলা হয়েছে। আর তার কমে কোন মতবৈষম্য নেই।

এরপর আল্লাহ্র কথা ঃ 'তাদের স্বামীরা তাদের ফিরিয়ে নেয়ার অধিক অধিকার সম্পন্ন।' এটা একটা বিশেষ হুকুম তাদের জন্যে, যাদের তালাক সংখ্যা তিন-এর কম। কোন হুকুমে সীমাবদ্ধকরণকে কর্তব্য করে দেয়নি আল্লাহ্র এই কথা ঃ 'তালাকপ্রাপ্তরা নিজেদেরকে তিন কুরু অপেক্ষমান বানিয়ে রাখবে'— তিন তালাকের কম-এর ক্ষেত্রে। কুরআন ও সুন্নাহতে এর বিপুল দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا -

এবং আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যাবহার গ্রহণের হুকুম দিয়েছি।

(সূরা আনকাবুত ঃ ৮)

এই কথা সাধারণ, মুসলিম ও কাফির— সব পিতা-মাতার ব্যাপারেই এই হুকুম কার্যকর। এর সাথে যোগ করা হয়েছে এই কথাটি ঃ

وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِىْ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا -

সেই পিতা-মাতাই যদি তোমাকে বাধ্য করে আমার সাথে শিরক করার জন্যে যে বিষয়ে তোমার জানা বলতে কিছুই নেই, তাহলে তুমি তাদেরকে মানবে না।

(সূরা আনকাবুত ঃ ৮)

এই কথাটি বিশেষভাবে মুশরিক পিতা-মাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কথার শুরুতে সাধারণ পর্যায়ের কথা মুসলিম-কাফির সকলকে শামিল করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কথার শেষ অংশে শুধু কাফিরদের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য কথা বলা হয়েছে, এটা অবাঞ্ছনীয় কিছু নয়।

## স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার—স্ত্রীর অধিকার স্বামীর উপর

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ -

স্ত্রীলোকদের জন্যে (স্বামীদের উপর) সেই সব কিছু যা তাদের উপর (তাদের স্বামীদের) জন্যে রয়েছে প্রচলিত ও মঙ্গলময় নিয়মে। তবে পুরুষদের জন্যে তাদের উপর একটা মাত্রার (প্রধান্য) আছে।

আবূ বকর বলেছেন, এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকের জন্যে তার সঙ্গী অপর পক্ষের উপর হক রয়েছে। তবে স্বামীর একটা বিশেষ অধিকার স্ত্রীর উপর রয়েছে, যা স্ত্রীর তার উপর সেই রকমের নেই। এই কথাটি আল্লাহ্ এ ভাষায় বলেছেন ঃ পুরুষদের জন্যে তাদের (স্ত্রীদের) উপর একটা মাত্রা রয়েছে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের জন্যে পরস্পরের উপর কি অধিকার আছে, তা এ আয়াতে বিস্তারিত বলা হয়নি। অপরাপর আয়াতে তা বলা হয়েছে। প্রকাশ করা হয়েছে রাসূলে করীম (স)-এর জবানীতে। স্ত্রীদের অধিকারের একটি দিকে আল্লাহ্ ইঙ্গিত করেছেন এ আয়াতে ঃ

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

এবং তোমরা স্বামীরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে প্রচলিত শুভ নিয়মে আচরণ ও পারস্পরিক বসবাস গ্রহণ কর। (সূরা আন-নিসা ঃ ১৯)

বলেছেন ঃ

فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْتَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ -

অতঃপর হয় ভালো ভাবে তাকে স্ত্রীত্বে রাখ, না হয় ভালোভাবে ছেড়ে চলে যেতে দাও।

বলেছেন ঃ

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

এবং সন্তানের পিতার উপর ধার্য হবে সন্তানের মাদের রিযিক দান ও পরিধেয় দেয়— প্রচলিত শুভ নিয়মে।

বলেছেন ঃ

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ -

স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের উপর কল্যাণকারী পৃষ্টপোষক— শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন— সেই নিয়ম অনুযায়ী যে নিয়মে আল্লাহ পরস্পরকে পরস্পরের উপর অধিক মর্যাদা দিয়েছেন এবং এই কারণে যে, স্বামীরা তাদের সম্পদ ব্যয় করে। (সূরা আন-নিসা ঃ ৩৪)

স্বামীদের এই সম্পদ ব্যয় স্ত্রীদের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً -

এবং স্ত্রীদেরকে দাও তাদের মহরানাসমূহ সন্তুষ্ট চিত্তে। (সূরা আন-নিসা ঃ ৪)

স্ত্রীদের মহরানা সন্তুষ্ট চিত্তে দিয়ে দেয়াকে তাদের হক বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا -

আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থানে আর এক স্ত্রী বদল করতে ইচ্ছা করে থাক এবং তাদের একজনকে যদি বিপুল পরিমাণ সম্পদ-ও দিয়ে থাক, তা হলে তার থেকে এক বিন্দু জিনিস ফিরিয়ে নেবে না। (সূরা আন-নিসা ঃ ২০)

স্ত্রীকে দেয়া সম্পদের কিছুই ফিরিয়ে না নেয়া স্ত্রীর অধিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে যদি তালাক দিয়ে বিদায় করে দেয়ার সিদ্ধান্তও হয়ে থাকে তবুও। তালাক দেয়ার ইচ্ছাটা প্রথমত স্বামীর দিক থেকেই হয়েছে, কেননা বদলাতে চাওয়াটা স্বামীর ব্যাপার হিসেবেই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ -

তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে পূর্ণ আদল রক্ষা করতে সমর্থ হবে না, যদি তোমরা আকাঙ্ক্ষীও হও। এমতাবস্থায় তোমরা অন্তত কোন একদিকে পুরা মাত্রায় ঝুঁকে পড়ো না, যার পরিণামে তোমরা তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দেবে। (সূরা আন-নিসা ঃ ১২৯)

কোন একজন স্ত্রীর প্রতি বেশি ঝুঁকে না পড়া স্ত্রীদের হক হিসেবে ঘোষিত, যার ফলে অন্য কোন স্ত্রীকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দেয়া হতে পারে। এ থেকে এ-ও বোঝা যায় যে, স্ত্রীদের মধ্যে সমান বণ্টন ব্যবস্থা কার্যকর হওয়া স্ত্রীর অধিকার। কেননা কোন একজনের প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়তে আয়াতে নিষেধ করা হয়েছে। স্ত্রীর এ-ও অধিকার রয়েছে যে, তাকে সঙ্গম করা

হবে, ঝুলন্ত অবস্থায় ফেলে রাখা হবে না। তাতে অবস্থা এই দাঁড়াবে যে, স্ত্রীর স্বামী আছে, কিন্তু কার্যত না থাকার মত। স্বামীর নিকট থেকে সঙ্গম পাওয়ার অধিকার; কিন্তু সে তা পাচ্ছে না। এও তার অধিকার যে, তার ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তাকে বিয়ের বন্ধনে আটকে রাখবে না। এ বিষয়ে আগেই বলা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা

فَلَا تَعْضُلُوْ هُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ -

তোমরা তাদের তাদের স্বামী গ্রহণে বাধাগ্রস্ত করো না, যখন তারা পারস্পরিকভাবে রাজী হয়ে যাবে শরীয়াতসম্মতভাবে।

এ আয়াতে স্বামীকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, স্ত্রীর প্রতি যখন তার আকর্ষণ নেই, তখন তাকে তালাক না দিয়ে অন্য কোন স্বামী গ্রহণে তুমি তাকে বাধা দিও না। এ সবই স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকারের কথা। উপরোদ্ধৃত আয়াতসমূহে এই কথাগুলাই বিধৃত।

স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার পর্যায়েও আল্লাহ্‌র কথা রয়েছে। বলেছেন ঃ

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ -

সতী নারীরা আনুগত্যপরায়ন হয়ে থাকে এবং পুরুষদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্‌র পর্যবেক্ষণের অধীন তাদের অধিকার রক্ষা করে। (সূরা আন-নিসা ঃ ৩৪)

নেককার বিনয়ী মেয়েলোক— অদৃশ্যের সংরক্ষণকারী আল্লাহ্‌র হেফাজত অনুযায়ী বলা হয়েছে, এ আয়াতের অর্থে স্বামীর বীর্য স্ত্রীদের জরায়ুতে সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তা ফেলে দেয়ার— অকেজো বা বিনষ্ট করার কোন কৌশল করবে না, স্বামীর শয্যা থেকে সে যা গ্রহণ করেছে তা রক্ষা করবে— এই কথাও এর মধ্যে শামিল রয়েছে। তা ছাড়া স্বামীর ঘরের মাল-সম্পদ ও তাদের নিজেদের সম্পদ রক্ষার কথাও বলা হয়েছে। বরং এক সাথে এই সব অর্থ গ্রহণের সম্ভাবনাই বেশি এবং অধিক বাঞ্ছনীয়। কেননা ব্যবহৃত শব্দ সেই সব কিছুরই ধারক।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব-অভিভাবকত্বের ধারক। এ জন্যে স্ত্রীদের কর্তব্য নিজ নিজ স্বামীর কথা মান্য করা, এটা বাধ্যতামূলক। কেননা আয়াতে স্বামীদের قَوَّامٌ বলা অর্থই হচ্ছে তাই।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ج

فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا -

আর যে স্ত্রীদের বিদ্রোহাত্মক আচরণের তোমরা ভয় পাও, তাদেরকে ওয়ায করে বুঝ দিতে থাক। (এক পর্যায়ে) শয্যায় তাদেরকে ত্যাগ কর। (আর চরম পর্যায়ে) তাদেরকে মারধোর কর। এরপর তারা যদি তোমাদের মেনে চলতে রাজী হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোন উপায় গ্রহণের সন্ধানে তোমরা যাবে না। (সূরা আন-নিসা ঃ ৩৪)

আয়াতটি থেকে বোঝা গেল, স্ত্রীদের নিজেদের ব্যাপারে তাদের স্বামীকে মেনে চলতে হবে, স্বামীর প্রতি বিদ্রোহাত্মক আচরণ গ্রহণ না করা কর্তব্য।

স্বামীর হক স্ত্রীর উপর ও স্ত্রীর হক স্বামীর উপর— এই পর্যায়ে নবী করীম (স) থেকে অংসখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যের কতক হাদীস তো কুরআনের সাথে পুরাপুরি সাম স্যশীল, কুরআনেরই প্রতিনিধি। আর কতক হাদীসে তার চাইতেও অনেক বেশি কথা বলা হয়েছে।

আমাদের নিকট মুহাম্মাদ ইবনে বকর আলা বসরী আবূ দাউদ, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আন-নুফাইলী প্রমুখ— হাতিম ইবনে ইসমাঈল, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ, তাঁর পিতা, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স) আরাফাতের ভাষণে বলেছিলেনঃ

اتَّقُوْا اللّٰهَ فِيْ النِّسَاءِ فَانَّكُمْ اَخَذْتُمُوْهُنَّ بِاَمَانَةِ اللّٰهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ، وَاِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ اَنْ، لَايُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ اَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ فَانْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করবে। তোমরা তো তাদেরকে আল্লাহ্‌র আমানত স্বরূপ গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহ্‌র বাণী দিয়েই তোমরা তাদের যৌনাঙ্গকে নিজেদের জন্যে হালাল করে নিয়েছ। তাদের উপর তোমাদের হক হচ্ছে, তারা তোমাদের শয্যায় এমন কাউকে নিয়ে আসবে না, যা তোমরা আদৌ পছন্দ কর না। তারা যদি সে কাজ করে, তাহলে তোমরা তাদেরকে মারবে, তবে নির্মমভাবে বীভৎস মার মারবে না। আর তোমাদের উপর তাদের রিযিক ও পরিধেয় যথারীতি পৌছানোর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে।

লাইস আবদুল মালিক, আতা, ইবনে উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি বলেছেন, এক জন মেয়েলোক নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল ঃ 'হে রাসূল! স্ত্রীর উপর স্বামীর কি হক রয়েছে ? জবাবে তিনি কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ করলেন। তার মধ্যে এ-ও বললেন, তুমি তোমার স্বামীর ঘর থেকে কোন জিনিস স্বামীর অনুমতি ব্যতীত দান করবে না। যদি করে, তাহলে তার সওয়াবটা তো স্বামী পাবে; কিন্তু স্ত্রীর উপর হবে তার গুনাহ।

তার পরে প্রশ্ন করল, হে রাসূল, স্বামীর কি হক রয়েছে স্ত্রীর উপর ? বললেন, স্ত্রী স্বামীর ঘর থেকে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বের হবে না, স্বামীর অনুমতি ছাড়া সে নফল রোযা রাখবে না।

মুসয়িব সাঈদুল মুকবেরী আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলে করীম (স) বলেছেন, স্ত্রীদের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে সেই মেয়েলোক যার দিকে তুমি তাকালে সে তোমাকে সন্তুষ্ট করে দেবে। আর তাকে কোন কাজের আদেশ করলে সে তোমার কথা পালন করবে। আর তুমি বাড়িতে অনুপস্থিত থাকলে তোমার ধন-মালের ও তার নিজের হেফাজত করবে। এর পর তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করলেন ঃ 'পুরুষরা স্ত্রীদের উপর দায়িত্বশীল— প্রাধান্য সম্পন্ন।'

আবূ বকর বলেছেন, এ আয়াতকে দলীল বানিয়ে কেউ কেউ বলেছেন, স্বামী যদি স্ত্রীর প্রয়োজনীয় খরচপত্র দিতে অক্ষম হয়, তাহলে দুই জুম'আর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়া অবশ্য কর্তব্য। কেননা আল্লাহ তো তাদের জন্যে স্বামীদের উপর ধার্য করেছেন, যা স্বামীদের রয়েছে তাদের উপর। অধিকারের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীকে সমান বানিয়েছেন। অতএব স্বামী স্ত্রীর প্রয়োজনীয় ভরণ-পোষণ না করে তার যৌনাঙ্গ নিজের জন্যে মুবাহ করে নেবে, এটা জায়েয হতে পারে না।

কিন্তু এই কথাটি কয়েকটি দিক দিয়েই ভুল। একটি— স্ত্রীর ভরণ-পোষণ স্ত্রীর যৌনাঙ্গ ব্যবহারের বদল বা বিনিময় নয়। অতএব একটির না হওয়ার দরুন তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর প্রশ্ন উঠে না। স্বামী স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দেয়ার বিনিময়ে স্ত্রীর যৌনাঙ্গ ভোগের অধিকার লাভ করে না। কেননা স্বামী তো বিয়ের আকদের কারণে স্ত্রীর যৌনাঙ্গ ভোগ করার অধিকার পায়। সেটা বিয়ের চুক্তির বিনিময় হতে পারে। আর তা হচ্ছে মহরানা।

আর দ্বিতীয় কারণ হল যদি তা-ই বদল বা বিনিময় হতো, তাহলে আয়াতের বলে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো যেত না। কেননা তার পরই বলা হয়েছে ঃ

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ -

পুরুষদের জন্যে তাদের উপর একটা মাত্রার প্রাধান্য আছে।

এতে স্ত্রী উপর স্বামীর কিছুটা বেশি মর্যাদার অধিকারী হওয়া, প্রমাণিত হয়। আর তা বিয়ের কারণে প্রতিষ্ঠিত হক বা অধিকারের ব্যাপার। আর এই কারণেরই স্বামী স্ত্রীর যৌনাঙ্গ ভোগ করার অধিকার পায়, তার জন্যে তা মুবাহ হয়। তা তার ভরণ-পোষণ দিতে না পারলেও।

উপরন্তু স্ত্রী স্বামীর ঘরে নিজেকে তার নিকট সমর্পণ করে, এই কারণে সে স্বামীর নিকট তার ভরণ-পোষণ পাওয়ার অধিকারিণী হয়। ফলে স্ত্রীর জন্যে স্বামীর উপর তা-ই ধার্য হয়, যা স্ত্রীর নিকট থেকে স্বামীর পাওনা মুবাহ সাব্যস্ত হয়। তা হল ভরণ-পোষণ নির্ধারণ এবং তা স্বামীর দায়িত্বে অর্পণ। এরূপ অবস্থায় স্বামীর উপর স্ত্রীর হক ধার্য না হয়ে পারে না, যেমন স্ত্রীর উপর স্বামীর হক ধার্য না হয়ে পারে না।

আল্লাহ্‌র কথা স্ত্রীদের জন্যে তেমনিই যা তাদের উপর হয় প্রচলিত শুভ নিয়মে। এ আয়াত দ্বারা কতিপয় বিধান প্রমাণিত হয়। তার মধ্যে একটি হল সমপরিমাণ মহরানা দান, যদি বিয়ের সময় মহরানা নির্ধারিত না হয়ে থাকে। কেননা বিয়ের আকদের বলেই স্বামী স্ত্রীর যৌনাঙ্গ ব্যবহারের অধিকার পেয়েছে। স্ত্রী নিজেকে স্বামীর নিকট সোপর্দ করবে, স্বামী স্ত্রীর উপর এই অধিকারও পেয়েছে। স্বামী যেমন স্ত্রীর উপর অধিকার পেয়েছে তেমনি স্ত্রীরও অধিকার স্বামীর উপর সাব্যস্ত হয়ে গেছে। স্ত্রী-অঙ্গও তেমনি। তা স্বামীর প্রাপ্য মূল্য মহরানার বিনিময়ে। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عْتَدٰى عَلَيْكُمْ -

যে লোক তোমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করবে, তোমরা তার উপর সীমালঙ্ঘন করবে, যেমন সে তোমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করেছে। (সূরা বাকারাহ ঃ ১৯৪)

এ থেকে সেই জিনিসের মূল্য দেয়া বোঝায়, যার মালিক সে হয়েছে, যার কোন প্রতীক সেই জাতীয় জিনিস থেকে নেই। স্ত্রীর যৌনাঙ্গের ব্যাপারও অনুরূপ। তার প্রতীক বিনিময় হল শহর আল-মিসল। আল্লাহ্‌র কথা ঃ بِالْمَعْرُوْفِ থেকে বোঝা গেল, তার বিনিময়ে ততটা দেয়া কর্তব্য, যাতে বাড়তি কিছু নেই, প্রাপ্য পরিমাণ থেকে কম কিছু নেই। নবী করীম (স) যেমন এক স্বামী মরা স্ত্রীকে— যার মহরানা নির্ধারিত হয়নি— তার সাথে যৌন সঙ্গম করা হয়নি— বলেছিলেন তার মতো মেয়েলোকের যে মহরানা হয়ে থাকে, সে সেই রকম মহরানা পাবে। বাড়তিও নয়, তার চাইতে কমও নয়। বলেছিলেন ঃ

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَاِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِ نِسَائِهَا وَلَا وَكَسَ وَلَا شَطَطَ-

যে মেয়েলোক তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করবে, তার বিয়ে বাতিল গণ্য হবে। তার সাথে স্বামী যদি যৌন সঙ্গম করে, তাহলে তার মেয়েলোকের সমান মহরানা পাবে, কমও নয়, বেশিও নয়।

আয়াতে যে 'মা'রূফ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, এটাই তার তাৎপর্য।

আয়াতটি থেকে এ-ও প্রমাণিত হয়েছে যে, যদি মেয়েলোক বিয়ে করে এই কথা বলে যে, তাকে মহরানা দিতে হবে না, তবু মহরানা দেয়া অবশ্য কর্তব্য হবে। কেননা বিয়ে মহরানার ব্যাপারে এ পার্থক্য করা হয়নি যে, মহরানা না দেয়ার কথা বললে দেয়া লাগবে না কিংবা দেয়ার কথা বললেই দেয়া লাগবে। আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ -

পুরুষদের জন্যে তাদের উপর একটা বিশেষ মর্যাদা আছে।

আবূ বকর বলেছেন, 'পুরুষরা মেয়েদের উপর পৃষ্ঠপোষক-সংরক্ষক-নেতৃত্বকারী সেই নীতি অনুযায়ী যা আল্লাহ পরস্পরকে পরস্পরের উপর অতিরিক্ত মর্যাদা দিয়েছেন। এই কথা বলে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, স্বামী স্ত্রীর উপর অধিক মর্যাদার অধিকারী। এজন্যেই আল্লাহ পুরুষকে তার উপর সংরক্ষক— চালক-পৃষ্ঠপোষক-নেতৃত্বকারী বানিয়েছেন। আল্লাহ্ আরও বলেছেন ঃ 'এবং এজন্যে যে, পুরুষরা তাদের ধন-মাল ব্যয় করে।' এই কারণেই স্ত্রীর উপর অধিক মর্যাদার অধিকারী হয়েছে স্বামী। আরও পুরুষের অধিক মর্যাদার কারণ হল, আল্লাহ স্ত্রীকে স্বামীর আনুগত্য করতে বলেছেন। আর অধিক মর্যাদার এ-ও একটি দিক যে, কোন এক পর্যায়ে আল্লাহ স্ত্রীকে মারধোর করার অধিকার দিয়েছেন স্ত্রীর অবাধ্যতার সময়। শয্যায় তাকে পরিত্যাগ করতেও বলেছেন। অধিক মর্যাদার এ-ও একটি দিক যে, স্বামীকে কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে তালাক দিয়ে স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার। কিন্তু স্ত্রী তার অধিকারী নয়। এটাও একটা দিক যে, এক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও স্বামীকে আরও তিনজন স্ত্রী-গ্রহণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে । কিন্তু স্ত্রীকে স্বামী বর্তমান থাকা অবস্থায় আর এক স্বামী গ্রহণের অধিকার দেয়া হয়নি। স্বামীর কারণে— তালাক কিংবা মৃত্যুর ইদ্দত পালন কালেও সে আর একজন স্বামী গ্রহণ করতে পারে না। মিরাস বন্টনেও নারীর তুলনায় পুরুষের অংশ বেশি। স্ত্রীর কর্তব্য স্বামী তাকে যেখানে ইচ্ছা

নিয়ে যাবে সেখানে তার চলে যাওয়া। কিন্তু স্থানান্তর গ্রহণে স্বামী স্ত্রীর পেছনে দৌড়াতে বাধ্য নয়। তাছাড়া স্বামীর অনুমতি না হলে স্ত্রী নফল রোযাও রাখতে পারে না।

নারীর তুলনায় পুরুষের অধিক মর্যাদা পর্যায়ে এ পর্যন্ত লিখেছি, রাসূলে করীম (স) এ ছাড়া আরও বহু দিকের উল্লেখ করেছেন এবং তা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ইসমাঈল ইবনে আবদুল মালিক আবুয যুবায়র— জাবির সূত্রে নবী করীম (স) থেকে এই পর্যায়ের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

لَايَنْبَغِى لِبَشَرٍ اَنْ يَّسْجُدَ لِبَشَرٍ ، وَلَوْكَانَ ذٰلِكَ كَانَ النِّسَاءُ الْاَزْوَاجِهِنَّ –

মানুষ মানুষকে সিজদা করবে, তা কিছুমাত্র বাঞ্ছনীয় নয়। যদি তা বাঞ্ছনীয় হতো তাহলে স্ত্রীরা অবশ্যই স্বামীদের সিজদা করতে পারত।

খালফ ইবনে খলীফা হিফস ইবনে আখী, আনাস বর্ণিত হাদীস হল, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَايَصْلُحُ لِبَشَرٍ اَنْ يَّسْجُدَ لِبَشَرٍ ، وَلَوْ صَلُحَ لِبَشَرٍ اَنْ يَّسْجُدَ لِبَشَرٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مَنْ عِظْمِ حَقِّهٖ عَلَيْهَا ، وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْكَانَ مِنْ قَدَمِهٖ اِلٰى مَفْرِقِ رَأْسِهٖ قَرْحَةٌ بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيْدِ ثُمَّ لَحَسَتْهُ لَمَّا اَدَّتْ حَقَّهٗ –

মানুষের পক্ষে উচিত হতে পারে না মানুষকে সিজদা করা। যদি তা উচিত হতো, তাহলে আমি স্ত্রীকে আদেশ করতাম তার স্বামীকে সিজদা করতে। কেননা স্ত্রীর উপর তার হক অতীব বিরাট। যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর নামে শপথ করে বলছি, স্বামীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত যদি যখম হয়, পুঁজ পড়তে থাকে, আর স্ত্রী যদি চাটে, তবু সে স্বামীর হক আদায় করতে পারল না।

আ'মাশ আবূ জাহিম আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهٗ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَاَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ –

স্বামী যদি স্ত্রীকে তার শয্যায় ডাকে আর স্ত্রী অস্বীকার করে এবং স্বামী তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে সে স্ত্রী লোকটির উপর ফেরেশতারা সকাল বেলা পর্যন্ত অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকে।

হুসায়ন ইবনে মুহসিন তার ফুফু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তখন নবী করীম (স) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার স্বামী আছে কি ? বললেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে তুমি তোমার স্বামীর সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে কি অবস্থায় আছ ? বললেন, আমি তো তার মনস্তুষ্টি সাধনে অক্ষম হয়ে পড়েছি। নবী করীম (স) বললেন, ভেবে দেখ, কিরূপ সম্পর্ক তুমি তার সাথে রাখছ। কেননা একথা জেনে নেবে, তোমার স্বামীই তোমার জান্নাত কিংবা জাহান্নাম।

সুফিয়ান আবূ যায়দ, আল-আরাজ, আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলের করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ স্বামী বাড়িতে থাকার সময় স্ত্রী যেন রমযান ছাড়া নফল রোযা স্বামীর অনুমতি ব্যতীত না রাখে।

আ'মাশ আবূ সালিহ, আবূ সাঈদুল খুদরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) স্ত্রীদেরকে তাদের স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল রোযা না রাখতে বলেছেন।

এই সমস্ত হাদীস কুরআনের ঘোষণার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। এর সবই অধিকারের ব্যাপারে স্ত্রীদের অপেক্ষা স্বামীর অধিক মর্যাদার অধিকারী হওয়ার কথা নিঃসন্দেহ প্রমাণ করে। আর তা-ই হচ্ছে বিয়ে-চুক্তির ঐকান্তিক দাবি।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তালাক প্রাপ্ত মহিলারা তিন কুরু সময়কাল নিজেদেরকে ইদ্দত পালনে রত রাখবে' এর মনসূখ হওয়ার ব্যাপারে কয়েকটি বর্ণনা এসেছে।

একটি, মুতরাফ আবূ উসমান আন-নহদী, উবাই ইবনে কা'ব (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, তালাক ও স্বামী মরা মেয়েলোকদের ইদ্দত পালনের আয়াত যখন নাযিল হল তখন আমরা বললাম ঃ হে রাসূল। এমন কিছু মেয়েলোক রয়েছে, যাদের ইদ্দত পালন সম্পর্কে কোন হুকুম নাযিল হয়নি। তারা হল ছোট বয়সের মেয়ে, বয়োবৃদ্ধ ও গর্ভবতী মেয়েলোক। তখন নাযিল হল ঃ

وَالّٰئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ -

আর সেই সব মেয়েলোক, তোমাদের মেয়েলোকদের মধ্যে যারা হায়য হওয়া থেকে নিরাশ হয়ে গেছে....। (সূরা আত-তালাক্ব ঃ ৪)

শেষের দিকে রয়েছে ঃ

وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ -

আর গর্ভবতী মেয়েলোকদের ইদ্দত হচ্ছে তাদের গর্ভস্থ সন্তান প্রসব করা।

(সূরা আত-তালাক্ব ঃ ৪)

আবদুল ওহাব সাঈদ কাতাদাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ 'তালাকপ্রাপ্ত নারীরা তিন কুরু পর্যন্ত নিজেদেরকে ইদ্দত পালনে রত রাখবে' আয়াতে তালাক প্রাপ্তাদের তিন হায়য কালের ইদ্দত নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরে পরিবর্তন করা হয়েছে সে মেয়ের ইদ্দতে, যার বিয়ে হলেও যৌন সঙ্গম হয়নি। আর দুই ধরনের মেয়েদের ইদ্দতও ভিন্নভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। তারা 'যারা হায়য হওয়ার থেকে নিরাশ হয়ে গেছে তোমাদের মেয়েলোকদের মধ্যে থেকে— যদি তোমরা সন্দেহে পড়ে যাও।' এ আয়াতে দুধরনের মেয়েলোকদের ইদ্দতের কথা বলা হয়েছে। এক হচ্ছে বয়োবৃদ্ধ যাদের হায়য হওয়া শেষ হয়েছে, এখন হচ্ছে না। আর যাদের এখনও হায়য হয়নি। আর 'বাকেরা' মেয়ে, ওদের ইদ্দত তিন মাস। তাদের ব্যাপারে হায়যের হিসেব গণ্য হবে না। আর যারা গর্ভবতী, তাদের ইদ্দত তিন কুরু থেকে ভিন্নতর করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ গর্ভবতী মেয়েলোকদের ইদ্দত শেষ হবে তাদের সন্তান প্রসব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে; এদের ক্ষেত্রেও কুরুর হিসেবে গণ্য নয়। সন্তান প্রসব হলেই তাদের ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে।

আবূ বকর বলেছেন, উবাই ইবনে কাব বর্ণিত হাদীস কোন কিছু মনসূখ হওয়ার কথা বলে

না। খুব বেশির পক্ষে তাতে এই কথাটুকু আছে যে, লোকেরা অল্প বয়স্কা, বয়োবৃদ্ধা ও গর্ভবতী মেয়েলোকদের ইদ্দত সম্পর্কে নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ফলে তাঁরা জানতে পেরেছিলেন যে, আয়াতটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। গর্ভবতীর ব্যাপারটি এর মধ্যে নেই, যদিও সেও বক্তব্যের মধ্যে শামিল হতে পারে। তেমনি অল্প বয়স্কা নাবালেগা মেয়ে। তার পূর্ণ বয়স্কতা হলে তো তার ইদ্দত তিন কুরু হতে পারে। কিন্তু ছোট-নাবালেগা অবস্থায় যদি তাকে তালাক দেয়, আর বয়োবৃদ্ধার ব্যাপার, আয়াত থেকে একথা বোঝা গিয়েছে যে, তাদের বিষয়ে এ আয়াতে কিছু বলা হয়নি। কেননা বয়োবৃদ্ধ— হায়য হওয়া থেকে নিরাশ— মেয়েলোক তার মধ্যে গণ্য হতে পারে না কোন ক্রমেই। তবে কাতাদাতা বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, আয়াতটি সাধারণ অর্থজ্ঞাপক। তার দাবি হচ্ছে, সঙ্গম কৃতা ও সঙ্গম করা হয়নি— এই উভয় ধরনের মেয়েলোকের ইদ্দত কুরু হিসেবেই হবে। এ থেকে আলাদা করা হয়েছে সেই মেয়েলোক, যার সাথে সঙ্গম করা হয়নি। এখানে যেমন বলা হয়েছে, তা হওয়া খুবই সম্ভব। তবে দুইজন মেয়েলোকের ইদ্দত তিন কুরু থেকে মনসূখ হয়ে গেছে, হায়য হওয়া থেকে নিরাশ মেয়েলোক এবং অল্প বয়স্কা মেয়ে। এদের ব্যাপারে 'মনসূখ' কথাটির প্রয়োগ হয়েছে, উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশেষীকরণ বোঝানো। ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য তাফসীর লেখকের বর্ণনা থেকে 'নূসখ' শব্দটির ব্যাপক উল্লেখ পাওয়া যায়। আসলে তাঁরা বিশেষীকরণকে বোঝাতে চেয়েছেন। আয়াতের প্রসঙ্গে 'নুসখ'-এর উল্লেখ করে কাতাদাতাও এই বিশেষীকরণই বোঝাতে চেয়েছেন, পারিভাষিক 'মনসূখ' হওয়া নয়। কেননা, আসলে তো মনসূখ নয়। মনসূখ হওয়ার কথা সেখানে বলা যেতে পারে, সেখানে হুকুমটা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আয়াতটি থেকে কুরুর ইদ্দত বুঝিয়েছে, একথা ঠিক নয়। কেননা তা হওয়া অসম্ভব। বোঝা গেল, তিনি বিশেষীকরণকেই বুঝিয়েছেন। আর একটা দূরতম সম্ভাবনাও আছে। তা হচ্ছে কাতাদাতার মাযহার। যার হায়য শেষ হয়ে গেছে, সে যুবতী হলেও তাকে এমন মেয়েলোক মনে করা যাবে যার হায়য হওয়ার আশা নেই। তা সত্ত্বেও তার ইদ্দত হবে কুরু হিসেবে, তাতে মিয়াদ দীর্ঘ হলেও।

হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত, যার হায়য হওয়া শেষ হয়ে গেছে সে সেই মেয়েলোকের মধ্যে গণ্য, যার হায়য হওয়ার আশা নেই। তার ইদ্দত হবে আয়েশার ইদ্দত যদিও সে যুবতীও হতে পারে— ইমাম মালিকেরও এই মাযহাব। আয়েশা— যার হায়য হওয়ার আশা নেই— তার ব্যাপারে তার এই মাযহাব হলে হতেও পারে। হতে পারে কুরু থেকে তিনি এই কথাই মনে করেছেন। কেননা কোন্ সময় তার কুরু— হায়য হতে পারে— এটার আশা করা যায়। তবে তাঁর কথা 'তিনজন থেকে গর্ভবতীর কুরু মনসূখ হয়ে গেছে' এটাও হতে পারে। কেননা এরূপ একটা ভাষা পাঠ্য হইতে পারে যে, গর্ভবতীর ইদ্দত তিন হায়য, তা পালিত হবে সন্তান প্রসবের পর, যদিও সে হায়য না হওয়া মেয়েলোকদের মধ্যের মেয়েলোক। আর তা এ জন্যে যে, সে গর্ভবতী। তার ইদ্দত গর্ভপ্রসবের পর তিন কুরু হতে পারে। তাহলে পরিবর্তন যা হল তা এই গর্ভের কারণে। তবে উবাই ইবনে কাব (রা) জানিয়েছেন যে, গর্ভবতীর ইদ্দত কুরু হিসেবে হওয়া সম্ভব হতে পারে না। সাহাবীরা তো রাসূল (স)-কে এই বিষয়েই জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন যে, পূর্বে গর্ভবতী, হায়য নিরাশ হওয়া ও ছোট বয়সের

মেয়েলোকের ইদ্দত সম্পর্কে কিছুই নাযিল হয়নি। পরে আল্লাহ্ এই আয়াতটি নাযিল করেছেন। প্রকৃত অর্থের দিক দিয়ে 'নূসখ' শব্দের প্রয়োগ এখানে হতে পারে না। শুধু সেখানেই হতে পারে, যেখানে একটা হুকুম প্রমাণিত ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর মনসূখকারী হুকুমটা তার পরে এসেছে। তবে 'নূসখ' বলে বিশেষীকরণ বোঝানোটা পরোক্ষ অর্থে অবশ্যই হতেই পারে। তাহলে ব্যাপারটি সংকীর্ণ হবে না। তবে বিশেষীকরণ অর্থে ব্যবহার করাই আমাদের মতে সবচেয়ে উত্তম কীর্তি। এ দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তালাকপ্রাপ্তা মেয়েরা নিজেদের ইদ্দত পালনে রত রাখবে' থেকে বিশেষভাবে কেবলমাত্র সেই মেয়েলোকদের বুঝতে হবে, যাদের হায়য হয় এবং যারা সঙ্গমকৃতা। কিন্তু হায়য হতে নিরাশ হওয়া ও অল্প বয়সের মেয়ে এবং গর্ভবতী মেয়েদের ইদ্দতের কথা এ আয়াতে বলা হয়নি। কেননা এসব হুকুম নাযিল হওয়ার পরম্পরা তারিখ তো আমাদের জানা নেই। প্রথমে এসবের হুকুম দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, পরে তা মনসূখ হয়েছে, এমন কথাও জানা যায়নি। তাই মনে করতে হবে যে, এসব আয়াত প্রায় একই সময়ে নাযিল হয়েছে। এক্ষণে তার প্রয়োগ ও ব্যবহারের দিক দিয়ে-ই তার বিন্যাস করতে হবে। প্রথমে সাধারণ হুকুম এবং তারপরে বিশেষ হুকুমকে সাজাতে হবে। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আর একটি দিকের বর্ণনা পাওয়া গেছে এই আয়াতে 'নূসখ' সম্পর্কে। সে বর্ণনাটি আল-হুসায়ন ইবনুল হাসান ইবনে আতীয়াতা তাঁর পিতা আতীয়াতা সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা তিন কুরূ সময় পর্যন্ত নিজেদেরকে ইদ্দত পালনে রত রাখবে— শেষ কথা ঃ 'তাদের স্বামীরাই এই মিয়াদের মধ্যে তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার বেশি অধিকার সম্পন্ন।

এর অর্থ হচ্ছে, পুরুষ যখন স্ত্রীকে তালাক দেয়, তখন সে তাকে আবার স্ত্রীত্বে ফিরিয়ে নেয়ার বেশি অধিকারী হতো, তিন তালাক দিলেও তাই করা যেত। উক্ত আয়াত নাযিল হয়ে তা মনসূখ করে দিয়েছে। নাযিল হয়েছে এই আয়াত ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا -

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যখন ঈমানদার মেয়েলোকদের বিয়ে করবে, তার পরে তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করার আগেই তালাক দিলে, তখন তাদের উপর কোন ইদ্দত পালনের বাধ্যবাধকতা নেই, যা তোমরা পালন করতে পার। তাই তোমরা তাদেরকে মাত'আ দাও এবং তাদেরকে তোমরা খুব ভালভাবেই ছেড়ে দেবে। (সূরা আহযাব ঃ ৪৯)

দহাক ইবনে মুজাহিম থেকে বর্ণিত, তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের ইদ্দত সাধারণভাবেই তিন মাস। পরে তা মনসূখ হয়েছে। পরে তা থেকে আলাদা করা হয়েছে যাদের সাথে সঙ্গম করা হয়নি সেই মেয়েলোকদেরকে।

এ পর্যায়ে আরও একটি দিক বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাটি মালিক, হিশাম, ইবনে উরওয়ারা, তাঁর পিতা সূত্রে পাওয়া গেছে। আগে এরূপ ছিল যে, একজন লোক তার স্ত্রীকে তালাক দিত,

দিত, পরে ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসত। এটা সে করতে পারত, স্ত্রীকে এক হাজার বার তালাক দিলেও। এই সময় এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিল। পরে তার ইদ্দত শেষ হয়ে এলে তার পূর্বক্ষণেই তাকে ফিরিয়ে নিল। পরে আবার তালাক দিল, বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমি তোমাকে আমার নিকট তো আশ্রয় দিব-ই না, আর তুমি আমার নিকট থেকে কখনই ছাড়া পেতে পারবে না। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْتَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ -

তালাক মাত্র দুই বারে। তৃতীয় বারে হয় মেয়েলোকটিকে সুষ্ঠুভাবে স্ত্রীত্বে আটকে রাখবে, না হয় ভালভাবে তাকে ছেড়ে দেবে— চলে যেতে দেবে।

তালাকের এই নবতর পদ্ধতি লোকেরা সাগ্রহে গ্রহণ করে নিল। যারা তালাক দিয়েছিল, তারাও এই নীতি অনুযায়ী কাজ করতে লাগল, আর যারা তালাক দেয়নি, তারাও এই নীতিকে মেনে নিল।

শায়বান কাতাদাতা থেকে বর্ণনা করেছেন, 'তাদের স্বামীরা তাদের ফিরিয়ে নেয়ার বেশি অধিকারী' এ আয়াতে তিন কুরু ইদ্দত পালনের কথা বলা হয়েছে। এর পরে বলেছেন ঃ তালাক মাত্র দুইবার। প্রত্যেক বারে এক কুরু, পরে এ আয়াত মনসূখ হয়ে যায়। পূর্বের সব প্রচলন বাতিল হয়ে গেল। আল্লাহ তিন তালাককে একটা সীমা বানিয়ে দিলেন। তৃতীয় তালাক দেয়ার পূর্বে স্বামীকে অধিকার দিয়েছেন তার এই স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার।

## তালাকের সংখ্যা

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন ঃ 'তালাক দুইবার। তৃতীয় বারে হয় ভালোভাবে রাখবে, না হয় ভালোভাবে চলে যেতে দেবে।'

আবূ বকর বলেছেন, এ আয়াতে কয়েকটি তাৎপর্য বলা হয়েছে। একটি, এ আয়াতে সে তালাকের কথা বলা হয়েছে, যার পরে স্বামীর ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ ও অধিকার থাকে। কথাটি উরওয়াতা ইবনুয যুবায়র ও কাতাদাতা থেকে বর্ণিত। দ্বিতীয়, এ আয়াতে সুন্নাত তরীকার তালাকের কথা বলা হয়েছে, যা অবশ্যই পছন্দনীয়। কথাটি ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। আর তৃতীয়, এ আয়াতে আদেশ করা হয়েছে যে, কেউ যদি স্ত্রীকে তিন তালাক দেবার ইচ্ছা করে, তার উচিত তালাক কয়টি আলাদা-আলাদা করে— এক-একটি করে দেয়া। এর মধ্যেই দুই তালাকের আদেশ শামিল রয়েছে। তার পরে তৃতীয় তালাকের কথা বলা হয়েছে।

আবূ বকর বলেছেন, যিনি বলেছেন যে, এটা সেই তালাক, যার পরে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অবকাশ থাকে, সে তালাকের পরই ফেরত নেয়ার কথাটি বলা হয়ে থাকলেও বাহ্যত এই মনে হয় যে, এতে মুবাহ হওয়ার কথাই বলতে চাওয়া হয়েছে। এর বিপরীত যা, তা নিষিদ্ধ। তা সত্ত্বেও তার হুকুমটা এই বলা হয়েছে যে, তালাক যদি ফিরিয়ে নেয়ার মত দিয়ে থাকে তাহলেই তা হতে পারে। আর এই আয়াতকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তালাক দেয়ার আদেশের দলীল বলা এবং তিনের কম তালাক দেয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে বলা— কেননা 'তালাক দুবার' বলার দাবিই হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন করে দেয়া, এটা হতে পারে না। কেননা যদি দুই তালাক একসঙ্গে দেয়, তাহলে

সে 'তালাক দুইবারে' দিয়েছে, একথা তো বলা যাবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি একসঙ্গে দুই দিরহাম দিয়ে ফেলে, তা সে দুইবার দিয়েছে, তা তো বলা যাবে না। এতে বার-কে আলাদা করা যায় না। এরূপ অবস্থায়ও আয়াতটিকে তার উপর প্রয়োগ করার প্রশ্ন। এটা যখন তা-ই হল, তখন ব্যবহৃত শব্দের উদ্দেশ্য যদি দুই তালাক হয়ে থাকে, যাতে ফিরিয়ে নেয়ার অবকাশ থাকে, তাহলে 'দুইবার' বলা তাৎপর্য বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়। যখন একবারে হুকুমটা প্রমাণিত হয়,— যখন দুই তালাক দেয়। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, 'দুইবার' বলার তাৎপর্য হচ্ছে তা দুইবারে দিতে হবে, এক সাথে দুইটি তালাক একসাথে দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

অন্য দিক দিয়ে শব্দটি যদি দুইটি ব্যাপারের ধারক হয়, তাহলে তাকে দুইটি ফায়দা গ্রহণে হুকুমকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে গ্রহণ করতে হবে। আর তা হচ্ছে, দুই তালাক দেয়ার ইচ্ছা হলে দুটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দিতে হবে। আর ফিরিয়ে নেয়ার হুকুমটাও সেই সাথে থাকবে। এর ফলে ব্যবহৃত শব্দ উভয় তাৎপর্যকে আয়ত্ত করে।

আল্লাহ্র কথা, 'তালাক দুইবার' বাহ্যত এটা একটা খবর বটে, কিন্তু তাৎপর্যের দিক দিয়ে এটা আদেশ। যেমন ঃ 'তালাকপ্রাপ্তা মেয়েরা নিজেদেরকে তিন কুরু সময় ইদ্দত পালনে রত রাখবে' কথাটি এবং 'সন্তান প্রসবকারী মায়েরা তাদের সন্তানদের দুধ খাওয়াবে' এই এবং এই ধরনের অন্যান্য কথা। এই কথাগুলো সংবাদ হিসেবে বলা হলেও তাৎপর্যগতভাবে এগুলো আদেশ। এগুলো যে আদেশ, খবর নয়; তার দলীল হচ্ছে; তা যদি নিছক খবর হতো, তাহলে এখবর কাকে দেয়া হয়েছে, তার সন্ধান দরকার, কেননা আল্লাহ্র খবরের জন্যে যে বিষয়ে সে খবর দেয়া হল তার উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক। খবর যে বিষয়ে দেয়া হল, তার অস্তিত্ব ছাড়া খবর হওয়ার কোন তাৎপর্য নেই। লোকদের অবস্থা তো আমরা এই দেখতে পাচ্ছিলাম যে, তারা এক তালাক দেয়, তিন তালাক দেয় একসঙ্গে। যদিও আল্লাহ্র খবর হচ্ছে 'তালাক দুইবার'। খবর নামের অধীন সবকিছুই এর আওতার মধ্যে আসা আবশ্যক। এমন লোকও পাচ্ছি, যারা আয়াতে বলে দেয়া পদ্ধতিতে তালাক দিচ্ছে না, তখন বোঝা গেল, এটা কোন খবর নয়। এর মধ্যে দুটির একটি তাৎপর্য অবশ্যই রয়েছে। একটি হল, তালাক দেয়ার ইচ্ছা হলে তা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দিতে হবে। এটা আদেশ। কিন্তু সুন্নাত তরীকা— পছন্দনীয় নিয়মের তালাকের পদ্ধতি জানিয়ে দেয়া হয়েছে। সবচেয়ে উত্তম নীতি হবে যদি কথাটিকে আদশে হিসেবে নেয়া হয়। কেননা এটাকে কোন বিষয়ের সংবাদ দান মনে করা যায় না। বরং এখন মনে করতে হবে, উক্ত আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ طَلِّقُوا مَرَّتَيْنِ 'তোমরা দুইবার তালাক দাও যখন তোমরা তালাক দেয়ার ইচ্ছা কর।' আর এটা ফরয পর্যায়ের হুকুম হয়ে যায়। তবে মুস্তাহাবও হতে পারে দলীলের ভিত্তিতে। তখন কথাটি দাঁড়াবে, যেমন নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى وَالتَّشَهُّدُ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَمَسْكُنٌ وَخُشُوعٌ -

নামায দুই রাক'আত করে। আর প্রতি দুই রাক'আত অন্তর তাশাহহুদ, স্থিতি নিয়ে বস এবং বিনয়-নম্রতা প্রকাশ।

এটা খবর ধরনের কথা হলেও এই পদ্ধতিতে নামায পড়ার জন্যে এটা মূলত আদেশ।

উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য যদি শুধু মসনূন তরীকার তালাকের কথা বলাই হতো, তাহলে দুই বা তিন তালাক একসঙ্গে দেয়া নিষিদ্ধ হওয়ার উপর দলীল দাঁড়িয়ে যাওয়া কর্তব্য ছিল। কেননা

আল্লাহ্র কথা ঃ 'তালাক দুইবার'-এর মধ্যে সকল প্রকারের তালাক-ই শামিল যা সুন্নাত তরীকা মুতাবিক। মসনূন তালাক যত রকমেরী হতে পারে, তা সবই এর অন্তর্ভুক্ত, এর বাইরে কোন মসনূন তালাক-ই নেই। এর বাইরে কোন তালাক হলে তা হবে সুন্নাত তরীকার বিপরীত। এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, যে লোক দুই বা তিন তালাক একটি বাক্যের মধ্যে একত্রিত করে দিল, তার এই তালাক দান সুন্নাত তরীকার খেলাফ হয়ে গেল।

বোঝা গেল, এ আয়াতটি কয়েকটি অর্থের ধারক। তার মধ্যে এটাও যে, তিনটি তালাককে ভিন্ন ভিন্ন করে দেয়া সুন্নাত তরীকার তালাকদান— অবশ্য যদি তিন তালাক দেয়ারই ইচ্ছা হয়। এটাও এই পর্যায়ের কথা যে, স্বামীর অধিকার আছে দুই তালাক দুইবারে দেয়ার। এটাও যে, তিনের কম তালাক দিলে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার স্বামীর থাকবে। এটাও যে, যদি হায়য অবস্থায় দুই তালাক দেয়, তাহলে তা কার্যকর হবে। কেননা আল্লাহ তা কার্যকর হওয়ারই হুকুম দিয়েছেন। এটাও যে, তিনের অধিক সংখ্যক তালাক দেয়ার রীতিটিকে এ আয়াতে মনসূখ ও নাকচ করে দিয়েছে— যেমন ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে। সেকালের লোকেরা যত ইচ্ছা তালাক দিত। পরে আবার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিত। আলোচ্য আয়াত সেই অসংখ্য তালাককে তিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। তিনের অতিরিক্তকে মনসূখ করে দিয়েছে।

এ আয়াতে এই দলীলও আছে যে, মসনূন তরীকার তালাকের সংখ্যা তিন। তবে তাতে মসনূন তরীকায় তালাক ঘটানোর বিবরণ উল্লেখ করা হয়নি। তা আল্লাহ্ অপর এক আয়াতে বলেছেন। সে আয়াতটি হল فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ 'অতএব তোমরা তাদেরকে তালাক দাও তাদের ইদ্দত অনুযায়ী'। নবী করীম (স) ইদ্দতের বিবরণটা বলে দিয়েছেন। ইবনে উমর (রা) যখন তাঁর স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দিলেন, তখন নবী করীম (স) বলেছিলেন ঃ আল্লাহ তোমাকে এভাবে তালাক দিতে বলেন নি তো! ইদ্দতের তালাক দিতে বলেছেন। আর তা হচ্ছে, তুমি তোমার স্ত্রীকে তুহর অবস্থায় তালাক দেবে। সে তুহরে তার সাথে সঙ্গম করবে না। অথবা তালাক দেবে গর্ভবতী হওয়া অবস্থায়। তার গর্ভ প্রকাশমান হয়েছে— এই অবস্থায় তালাক দিলে তার ইদ্দত পালনের বিধান আল্লাহ দিয়েছেন, তা অনুসরণেরও আদেশ দিয়েছেন। তাহলে তা সুন্নাত তরীকার তালাক হবে এবং তা দুটি পরিচিতিতে কার্যকর হবে। একটি সংখ্যার আর অপরটি সময়ের। সংখ্যার দিক দিয়ে এক তুহরে এক-এর বেশি তালাক হবে না। আর সময়ের দিক দিয়ে তালাক দিতে হবে তুহর সময়ে, যে তুহরে সঙ্গম হয়নি। অথবা গর্ভবতী অবস্থায় তালাক দেবে, যখন সে গর্ভ প্রকাশমান হয়ে গেছে।

কুরু বা হায়যওয়ালী মেয়েলোকদেরকে সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী তালাক দেয়ার ব্যাপারে মনীষীদের বিভিন্ন মত পাওয়া গেছে। হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, সর্বোত্তম তালাক হচ্ছে যখন স্ত্রীর তুহর হবে এবং সঙ্গম করা হয়নি, সেই সময় তালাক দেয়া। এক তালাক দিয়ে ছেড়ে দেবে, সে তার ইদ্দত পূরণ করবে। আর যদি তিন তালাক দেয়ারই ইচ্ছা হয়ে থাকে, তাহলে প্রতি তুহরে এক তালাক দেবে সঙ্গমের পূর্বে। ইমাম সওরীও এই মত প্রকাশ করেছেন। আবূ হানীফা বলেছেন, ইবরাহীম নখয়ী কর্তৃক রাসূলের সাহাবী থেকে বর্ণিত কথা এই জানতে পেরেছি যে, তারা এক তালাকের অধিক না দেয়া পছন্দ করতেন। এরপর ইদ্দত শেষ হয়ে

গেলে স্বতঃই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। এরূপ তালাক তাঁদের মতে প্রতি তুহরে এক-একটি করে তিন তালাক দেয়ার পরিবর্তে অতীব উত্তম। মালিক ও আবদুল আযীয ইবনে আবূ সালমাতা আল মাজেশুন, লাইস ইবনে সাদ, আল-হাসান ইবনে সালিহ ও আওজায়ী বলেছেন, সুন্নাত তালাক হচ্ছে প্রতি তুহরে সঙ্গমের পূর্বে এক তালাক করে দেয়া। তিন তুহরে তিন তালাক দেয়াকে তারা মাকরূহ মনে করতেন। কিন্তু তা তখন, যদি তাকে ফিরিয়ে নেয়ার ইচ্ছা না করে থাকে। তাকে ছেড়ে দেবে এবং সেই এক তালাকের ইদ্দত শেষ করে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। শাফেয়ী বলেছেন— আল মুজানী তাঁর মত বর্ণনা করেছেন— তিন তালাক দেয়া হারাম নয়, যদি বলে ঃ তুমি তিন তালাক সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী। যখন সে পাক থাকবে এবং সঙ্গম করা হয়নি তাকে এক সঙ্গেও তিন তালাক দেয়া যেতে পারে।

আবূ বকর বলেছেন, আমরা এ পর্যায়ে শাফেয়ীর কথা থেকেই আলোচনা শুরু করব। আমরা বলব, আমাদের তিলাওয়াত করা আয়াত স্পষ্টভাষী উক্ত কথাকে বাতিল ঘোষণার ব্যাপারে। কেননা দুইবারে দুই তালাক দেয়ার আদেশ উক্ত আয়াতে রয়েছে। এক্ষণে কেউ যদি একবারে দুই তালাক দিয়ে বসে, তাহলে সে আয়াতের হুকুমের পরিপন্থী কাজ করল। এই কথার আর একটি দলীল হচ্ছে আল্লাহ্‌র কথা ঃ

لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبٰتِ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ -

আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে যা হালাল করেছেন, তোমরা নিজেরাই তাকে হারাম করো না। (সূরা মায়িদা ঃ ৮৭)

বাহ্যত এই কথা তিন তালাক দেয়াকে হারাম করে। কেননা তাতে আল্লাহ্‌র হালাল করা জিনিসকে হারাম করার কাজ হবে। আয়াতের এই সাধারণ ও ব্যাপক অর্থ স্ত্রীদেরকেও শামিল করে, তার দলীল আল্লাহ্‌র এই কথা ঃ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ 'অতএব তোমরা বিয়ে কর, যে নারীই তোমাদের ভালো লাগে।' এই সাধারণ কথাই তালাককে নিষিদ্ধ করে। কেননা স্ত্রী হালাল, তালাক দিলে তাকে হারাম করে দেয়া হয়। সুন্নাত তরীকায় তিন তালাক দেয়া এবং সঙ্গম করা হয়নি— এমন স্ত্রীকে এক তালাক দেয়া মুবাহ হওয়ার দলীল পাওয়া না গেলে উক্ত আয়াতই তা নিষিদ্ধ করে দিত। অন্য দিক দিয়ে কিতাবের দলীল এই পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তা'আলা শুরুতে ইদ্দত পালন জরুরী হয় তাকে ফেরত নেয়ার কথা উল্লেখ ছাড়া তালাক দেয়াকে মুবাহ করেন নি। যেমন আল্লাহ্‌র কথা 'তালাক দুইবার, অতঃপর তাকে রাখা ..... আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তালাকপ্রাপ্তারা তিন কুরু কাল নিজেদেরকে ইদ্দত পালনে রত রাখবে'— আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দেবে, তারপরে ইদ্দত পূর্ণ হবে, তখন তাদেরকে ফিরিয়ে রাখ শুভ রীতিতে, না হয় ছেড়ে দাও শুভ রীতি অনুযায়ী। কিংবা তাদেরকে শুভ নিয়মে বিচ্ছিন্ন করে দাও।'

এই সব কয়টি আয়াতেই তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অবকাশের উল্লেখ রয়েছে। আর এ সব আয়াত থেকেই তালাকের বিধান গ্রহণ করা হয়েছে। এ সব আয়াত না থাকলে ইসলামী শরীয়াতে তালাক আদৌ বিধিবদ্ধ হতো না। কাজেই তাকে 'মসনূন' প্রমাণ করা শুধু এই সব আয়াতের আলোকেই সম্ভব। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ اَدْخَلَ فِىْ اَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَرَدٌّ –

আমার উপস্থাপিত শরীয়াতে যা নেই তাকে এর মধ্যে যে দাখিল করবে, সে-ই প্রত্যাহৃত হবে।

অবস্থার কম-সে-কম শব্দের বিবরণ হল— তা নিষিদ্ধ আয়াতের কথার পরিপন্থী। কেননা আয়াতে তালাকের উল্লেখই হয়েছে এমনভাবে, যাতে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অবকাশ রাখা হয়েছে।

এ পর্যায়ের হাদীসও উল্লেখ্য। মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, কানবী, মালিক, নাফে ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন যখন তার হায়য চলছিল। এটা রাসূলে করীম (স)-এর সময়ের কথা। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূলের করীম (স) কে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, তুমি তাকে আদেশ কর, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়। পরে রেখে দেবে তার তুহর হওয়া পর্যন্ত। তারপর সে হায়য অবস্থার হবে, তার পরে আবার তার তুহর হবে। তখন যদি সে ইচ্ছা করে তাহলে তাকে রেখে দেবে। আর ইচ্ছা করলে স্পর্শ করার আগেই তাকে তালাক দেবে। এর পর যে ইদ্দত পালন করতে হবে, সেই ইদ্দতের জন্যেই স্ত্রীদের তালাক দিতে আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, আহমদ ইবনে সালিহ আনবাসাতা, ইউনুস, ইবনে শিহাব, সালিম ইবনে আবদুল্লাহ, তাঁর পিতার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন যখন তার হায়য চলছিল। হযরত উমর (রা) এই বিষয়ের উল্লেখ করেন রাসূলে করীম (স)-এর নিকট। শুনে তিনি ক্রুদ্ধ হন। পরে বললেন, তাঁকে আদেশ কর, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়। পরে তাকে রেখে দেবে তুহর হওয়া পর্যন্ত। পরে হায়য হবে। তা থেকে তুহর হবে। তার পরে ইচ্ছা হলে রেখে দেবে। আর ইচ্ছা হলে তালাক দেবে।

আতাউল খুরাসানী আল-হাসান, ইবনে উমর সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইউনুস ও আনাস ইবনে সিরীন, সাঈদ ইবনে যুবায়র, জায়দ ইবনে আসলাম, ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) তাঁকে ফিরিয়ে নেয়ার আদেশ করেছিলেন পরবর্তী তুহর পর্যন্ত রাখতে বলেছিলেন। পরে বলেছিলেন, তখন ইচ্ছা হয় তালাক দেবে, ইচ্ছা হয় রেখে দেবে।

প্রথমোক্ত হাদীসসমূহ উত্তম। কেননা তাতে বিস্তারিত ও বাড়তি কথা আছে। অবশ্য একথা জানা আছে যে, এই সব হাদীসই একটি মাত্র ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। একটি ঘটনারই বহুবিধ বর্ণনা। বর্ণনাকারীদের কেউ কেউ নবী করীম (স)-এর নিজের কথা উদ্ধৃত করেছেন। আবার কেউ কেউ তা বাদ দিয়ে বাড়তি কথাটুকুর উল্লেখ করেছেন, হয় অসতর্কতার কারণে, কিংবা ভুলে যাওয়ার কারণে। এরূপ অবস্থায় তা ব্যবহার করা যেতে পারে বাড়তি কথা পাওয়ার জন্যে যাতে হায়যের উল্লেখ আছে। কেননা সেই বাড়তি কথা বাদ দিয়ে শরীয়াতদাতা তার উল্লেখ করেছেন, আবার কখনও সেই কথাসহ উল্লেখ করেছেন, এমন কথা প্রমাণিত নয়। কেননা তাতে দুই অবস্থার কথা বলে ধরে নিতে হয়। কিন্তু তা আমাদের জানা নেই। অতএব তাকে দুই অবস্থার কথা মনে করা ঠিক নয়। তাছাড়া শরীয়াতদাতা নবী করীম (স) সেই কথাটি দুই অবস্থায় বলেছিলেন— এ কথা যদি মনে করা হয়, তাহলে বেশি কথা সম্পন্ন হাদীস সর্বাগ্রে বলা হয়েছিল— বলে ধরতে হবে। আর অন্যান্য কথা শেষের। ফলে এই শেষের

কথা মনসূখ করে দিয়েছে আগে বলা কথাকে। অথবা যে হাদীসে বেশি বাড়তি কথা নেই, তা আগে বলা কথা হবে। পরে বাড়তি কথা সম্পন্ন হাদীসসমূহে বলা হয়েছে বলে ধরতে হবে। তাহলে এগুলো আগেরগুলোকে মনসূখ করে দিয়েছে বলে মনে করতে হবে। বেশি কথা সম্পন্ন হাদীসই প্রতিষ্ঠিত থাকল। কিন্তু এই দুটির কোন একটি খবরও জানাবার কোন উপায় আমাদের হাতে নেই। হাদীসসমূহের সব বর্ণনাকারী একই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। তার তারিখ যখন আমাদের জানা নেই, তখন বাড়তি কথার হাদীস গ্রহণ করাই কর্তব্য দুটি কারণে। একটি, যে কোন দুইটি জিনিসের তারিখ জানা না গেলে দুটিকেই এক সাথে গ্রহণ করা কর্তব্য। একটিকে অপরটির আগে বা পরে মনে না করাই বাঞ্ছনীয়।.... যেমন এক ব্যক্তির দুটি ক্রয়, যখন দুটিরই অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাবে এবং সে দুটির তারিখ জানা না যাবে, তখন সে দুটি এক সাথে ঘটেছে বলে ধরে নিতে হবে। এই দুই ধরনের হাদীসের ব্যাপারেও এই নীতি গ্রহণীয়। আমাদের বুঝতে হবে, উভয় ধরনের হাদীস একসাথেই প্রকাশিত হয়েছিল। কেননা দুটির তারিখ জানা যায়নি, তাই বাড়তি কথা সহ উভয়কে একত্রিত করে হুকুম প্রমাণ করতে হবে।

আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, বাড়তি কথা শরীয়াতদাতা নবী করীম (স) বলেছেন, তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং আমাদেরকেও আদেশ করেছেন তা গণ্য করার জন্যে। বলেছেন ঃ

مُرْهُ فَلْيَدَعْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا اِنْ شَاءَ -

তাকে হুকুম কর, সে তাকে রেখে দেবে তুহর হওয়া পর্যন্ত, তার পরে তার হায়য হবে, তার পরে তুহর হবে। তখন ইচ্ছা করলে সে যেন তালাক দেয়।

এই সব হাদীস সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। একথা যখন প্রমাণিত স্থিরকৃত হল যে, এই সহ হাদীস একই সময়ের, সেই এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, যেসব বর্ণনায় বাড়তি কথা নেই— তা মনসূখ হয়ে গেছে, সেই সাথে এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তা মনসূখ হয়নি, তখন এখানে মনসূখ হওয়ার কথাটাই বাদ দেয়া উচিত। কেননা সেটা নিছক সম্ভাব্যতার কথা। কাজেই বাড়তি কথা সম্পন্ন বর্ণনাসমূহের হুকুম বহাল আছে বলে মনে করতে হবে। একথা যখন প্রমাণিত হল, শরীয়তদাতা নবী করীম (স) হায়য অবস্থায় সজ্ঘটিত তালাক ও অন্যান্য তালাকের মধ্যে পার্থক্য করার আদেশ করেছেন, সেই হায়যের পরবর্তী তুহরেও তালাক দিতে নিষেধ করেছেন, তখন প্রত্যেক দুই তালাকের মাঝে এক হায়য কালের পার্থক্য করা ওয়াজিব হয়ে পড়েছে। একই তুহরে দুটোকে একত্রিত করা জায়েয নয়। কেননা নবী করীম (স) তুহরে তালাক দিতে হুকুম করেছেন, হায়যে তালাক দিতে নিষেধ করেছেন, সেই সাথে নিষেধ করেছেন সেই তুহরে তালাক দিতে, যা তালাক দেয়া হায়যের পরেই আসছে। অথচ এই দুই তুহরের মধ্যে আসলে কোনই পার্থক্য নেই।

যদি প্রশ্ন তোলা হয়, ইমাম আবূ হানীফা থেকে বর্ণিত, এক তুহরে তালাক দিলে, পরে সেই তুহরেই স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলে তার জন্যে সেই তুহরেই আর এক তালাক দেয়া জায়েয। তাতে বিরুদ্ধতা হয়ে গেল সেই জিনিসের যার তাগিদ করতে তুমি চেয়েছ হাদীসে বলা বাড়তি কথা সম্পর্কে।

জবাবে বলা যাবে, ফিকহর 'উসূলে' আমরা উল্লেখ করেছি, সেই তুহরেই দ্বিতীয়বার তালাক দেয়া নিষিদ্ধ। যদি স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনেও। যেন দুই তালাকের মাঝে এক হায়য দ্বারা পার্থক্য করা হয়। এটাই সহীহ কথা। অন্যান্য বর্ণনা অনুযায়ী কাজ করা হয় না।

নবী করীম (স) থেকে তিন তালাক একত্রিত করা নিষিদ্ধ হয়েছে এমনভাবে যে, তাতে কোন নতুন ব্যাখ্যা দেয়ার অবকাশ নেই। এই প্রসঙ্গের হাদীসটি নাফে মুহাম্মাদ ইবনে শাযান আল-জাওহারী, মুয়াল্লা ইবনে মনসূর, সাঈদ ইবনে জুরাইক, আতা-আল খুরাসানী, আল-হাসান আবদুল্লাহ ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) তার স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় এক তালাক দিয়েছিলেন, পরে অবশিষ্ট দুই কুরুতে দুই তালাক দেবার ইচ্ছা করেছিলেন, এই কথা রাসূলে করীম (স) জানতে পারেন। তখন তিনি বললেন ঃ হে ইবনে উমর, এরূপ করতে আল্লাহ তোমাকে আদেশ করেননি। তুমি তো সুন্নাত তরীকার খেলাফ করে বসেছ। সুন্নাত তরীকা হল, তুমি তুহর সামনে রাখবে। তারপরে প্রত্যেক কুরুতে এক তালাক দেবে। রাসূলে করীম (স) আমাদের আদেশ করলেন, আমি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলাম। বললেন, যখন তার তুহর হবে, তখন তুমি তাকে তালাক দাও কিংবা স্ত্রী হিসেবে রাখার সিদ্ধান্ত কর। আমি বললাম, হে রাসূল! আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমি যদি স্ত্রীকে তিন তালাক দিতাম, তাহলে তাকে ফিরিয়ে নেয়ার কোন পথই কি আমার জন্যে খোলা থাকত? বললেন, না। সে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। তখন ফিরিয়ে নেয়া গুনাহের কাজ হতো।

এই হাদীসে নবী করীম (স) একটি আইন প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর তা হচ্ছে, একত্রে তিন তালাক দেয়া গুনাহ।

যদি প্রশ্ন করা হয়, ইবনে উমর (রা) সংক্রান্ত সমস্ত হাদীসে তুহরকে সুন্নাত তালাক দেয়ার সময় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং বলেছেন, অতঃপর ইচ্ছা করলে তালাক দেবে। তাতে কম সংখ্যক তালাক থেকে তিন তালাককে বিশেষীকৃত করেন নি। ফলে তাকে দুই ও তিন তালাক একসঙ্গে দেয়া অবকাশ তো থেকে যায়।

জবাবে বলা যাবে, পূর্বে যা বলেছি, তাতে দুই তালাকের মাঝে এক হায়য দিয়ে ব্যবধান সৃষ্টি করা কর্তব্য প্রমাণিত হয়েছে। তার সাথে যোগ করা হয়েছে এই কথা ঃ 'অতঃপর ইচ্ছা করলে তালাক দেবে।' এ থেকে আমরা জানলাম যে, আসলে তিনি এক তালাকের কথাই বলেছেন, তার বেশী নয়। কেননা তিনি নিজেই শুরুতে দুই তালাকের মধ্যে পার্থক্য করার যে উক্তি করেছেন, তা নিজেই মনসূখ করে দিয়েছেন, এটা অসম্ভব কথা। তাছাড়া দুই তালাককে একত্রিত করার নিষেধ তো রয়েছেই। আর একই কথার কোন অংশ অপর অংশকে মনসূখ করে দেবে, তা সঙ্গত হতে পারে না। কেননা মনসূখ হওয়ার প্রশ্ন আসে তখন, যখন একটা হুকুম দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়, কাজে পরিণত হয়। এইভাবে কোন কথা বলা যে, 'আমি তোমাদের জন্যে দাঁতধারী হিংস্র জন্তু খাওয়া হালাল করে দিলাম। অথচ আমি তা তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ করেছি।'— কিছুমাত্র স্বাভাবিক নয়। কেননা এ ধরনের কথা নিতান্তই প্রলাপ, অর্থহীন। আল্লাহ্ এ থেকে পবিত্র।

এ কথা যখন প্রতিষ্ঠিত হল, আমরা জানলাম, রাসূলের কথা ঃ 'অতঃপর চাইলে তালাক দেবে' কথার শুরুতে যে হুকুমটি রয়েছে, তারই উপর ভিত্তিশীল। আর তা হল, এক তুহরে দুই

তালাক একত্রিত করবে না। উপরন্তু এক তুহরে দুই তালাক দেয়া নিষিদ্ধ হওয়া যদি ব্যবহৃত শব্দ দ্বারা প্রমাণিত না-ই হয়, তবু তা থেকে তা মুবাহ প্রমাণিত হয় না। যেহেতু তা নিঃশর্ত ও পূর্ব কথার উল্লেখশূন্য হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা রাসূলের কথা 'পরে চাইলে তালাক দেবে' এক তালাকের বেশি দেয়ার অবকাশ দেয় না। আদেশসমূহের অনেক দৃষ্টান্ত এই পর্যায়ে উল্লেখ করা যেতে পারে। আমরা বলতে পারি, শব্দ যা শামিল করে তার কম-সে-কম জিনিসই ধরতে হবে। অবশ্য কোন দলীল পাওয়া গেলে বেশি সংখ্যা ধরা যাবে। যেমন যদি কেউ অন্য এক ব্যক্তিকে বলে ঃ 'তুমি আমার স্ত্রীকে তালাক দাও', তাহলে এই আদেশ বলে তার মাত্র এক তালাক দেয়ারই অধিকার হবে, তার বেশি নয়। কেউ যদি তার ক্রীতদাসকে বলে ঃ 'বিয়ে কর', তাহলে একটি মেয়েলোক বিয়ে করারই তার অধিকার হবে— তখন যদি সে দুটি মেয়েলোক বিয়ে করে, তার একটি বিয়ে নাজায়েয হয়ে যাবে। হ্যাঁ, মনিব যদি বলে যে, আমি দুটি মেয়ে বিয়ে করার কথাই বলেছি, তাহলে তা জায়েয হবে। রাসূলের কথা ঃ 'সে চাইলে তালাক দেবে' এই ধরনেরই একটি কথা। এখানেও এক তালাকের বেশি হওয়ার অবকাশ নেই। তার বেশি হলে, তা কোন দলীলের ভিত্তিতেই প্রমাণিত হতে পারে। কুরআন ও সুন্নাত থেকে এখানে আমরা যেসব দলীলের কথা বললাম, তা সবই তিন ও দুই তালাক একত্র করে একবাক্যে দেয়া নিষেধ ঘোষণা করে। এ ব্যাপারে আগের কালের মনীষিগণও সম্পূর্ণ একমত।

এ পর্যায়ের একটি বর্ণনা উল্লেখ্য, যা আমাশ আবূ ইসহাক, আবূল আহওয়ায আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

طَلَاقُ السُّنَّةِ اَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيْقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ طَاهِرٌ فِيْ غَيْرِ جِمَاعٍ فَاِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا اُخْرٰى -

সুন্নাতকারীর তালাক হচ্ছে, স্ত্রীর তুহরে— যখন সঙ্গম হয়নি— এক তালাক দেবে। পরে হায়য হয়ে আবার তুহর হলে তখন আর এক তালাক দেবে।

ইবরাহীম নখয়ীও এই কথাই সমর্থন করেছেন। জুহায়র আবূ ইসহাক, আবূল আহওয়ায, আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ যে লোক প্রকৃতপক্ষেই তালাক দিতে ইচ্ছা করে. সে প্রত্যেক তুহরে— যখন সঙ্গম হয়নি— তালাক দেবে। পরে ইচ্ছা হলে তাকে ফিরিয়ে নেবে, সে কাজে দুজন সাক্ষী রাখবে। দ্বিতীয় তালাক দেবে পরবর্তী বারে। আল্লাহ্র কথা ঃ 'তালাক দুইবার-এর এটাই তাৎপর্য।

ইবনে সিরীন হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ লোকেরা যদি ঠিকভাবে একটি তালাক দিতে পারে, তাহলে তালাক দেয়া স্ত্রীর নিকট তাকে লজ্জিত হতে হবে না, যদি তার তুহর অবস্থায় ও সঙ্গম না করে তালাক দেয়। কিংবা যদি গর্ভবতী হয়, এমন যে, তার গর্ভ প্রকাশমান হয়ে পড়েছে। এরূপ তালাক দিলে ইচ্ছা হলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে পারে। আর ইচ্ছা হলে তার চলে যাওয়ার পথ ছেড়ে দেবে।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, হুমায়দ, ইবনে মুসয়িদাতা, ইসমাঈল, আয়ূব, আবদুল্লাহ ইবনে কাসীর মুজাহিদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ আমি ইবনে আব্বাসের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তার নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত হল। বলল, সে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। এই কথা শুনে ইবনে আব্বাস (রা) চুপ করে থাকলেন। তখন মনে হল, তিনি বুঝি

মেয়েলোকটিকে সেই ব্যক্তির নিকট ফিরিয়ে দেবেন। তার পরে বললেন, তোমার এক একজন তালাক দাও, তার পরে নির্বুদ্ধিতা ধরা পড়ে। তার পর এসে 'হে ইবনে আব্বাস— হে ইবনে আব্বাস বলে চিৎকার করে।' অথচ আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا –

যে লোক আল্লাহ্কে ভয় করবে, আল্লাহ্ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন।

আর তুমি যেহেতু আল্লাহ্কে ভয় করনি, এজন্যে আমি তোমার জন্যে কোন পথ পাচ্ছি না। তুমি তোমার রব্ব-এর নাফরমানী করেছ। ফলে তোমার স্ত্রী তোমার নিকট থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অথচ আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ –

হে নবী! তুমি যদি তোমার স্ত্রীদের তালাক দাও, তাহলে তালাক দেবে তাদের ইদ্দত পালনের ব্যাপারটি সামনে রেখে। (সূরা আত্-তালাক ঃ ১)

অর্থাৎ তালাক দেবে। আর তার পরে তাদের ইদ্দত পালন হবে, ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই তাদের ফিরিয়ে নেবে।

ইমরান ইবনে হুসায়ন থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁকে বলল ঃ আমি আমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছি। তখন তিনি বললেন ঃ তুমি পাপ করেছ এবং তোমার নিজের হালাল স্ত্রীকে নিজের জন্যে হারাম বানিয়েছ।

আবূ কালাবা বলেছেন, ইবনে উমর (রা)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে তার সাথে সঙ্গম করার পূর্বে। জবাবে তিনি বলেছিলেন, এই কাজ যে করেছে সে মহাক্ষতির কাজ করেছেন। ইবনে আওনা আল হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন, যে লোক একই বৈঠকে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে, লোকেরা তাকে ঘায়েল করত। ইবনে উমর থেকে বর্ণিত, তাঁর নিকট যখন এমন কোন ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হতো, যে তার স্ত্রীকে একই বৈঠকে তিন তালাক দিয়েছে, তাকে মারধোর করে ব্যথাগ্রস্ত করে দেয়া হতে এবং তাদের দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতেন।

এই সাহাবীগণ থেকে প্রমাণিত হল যে, তিন তালাক একত্রিত করা নিষিদ্ধ। একজন সাহাবীও এর বিপরীত মত দেন নি। অতএব এর উপর ইজমা হয়েছে বলে মনে করতে হবে।

যদি প্রশ্ন করা হয়, একথা বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) তাঁর স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিলেন রোগাক্রান্ত অবস্থায়। সেজন্যে তাঁকে কোন দোষ দেয়া হয়নি। একসঙ্গে তিন তালাক দেয়া যদি নিষিদ্ধই হতো, তাহলে তিনি তা নিশ্চয়ই করতেন না, তার এ কাজের প্রতিবাদ না করেও ছাড়া হতো না। এই কথা প্রমাণ করে যে, তাঁরা এ কাজ সঙ্গতই মনে করেছেন।

জবাবে বলা যাবে, যে হাদীসের তুমি উল্লেখ করেছ তাতে এবং অন্য কোথাও একথা নেই যে, তিনি একই বাক্যে তিন তালাক দিয়েছিলেন। তিনি শুধু ইচ্ছা করেছিলেন যে, তিনি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেবেন জায়েয পদ্ধতিতে। তাঁর সম্পর্কে এই কথা এক সমষ্টি বর্ণনাকারীদের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা তা বর্ণনা করেছেন জুহরী তালহা ইবনে আবদুল্লাহ

ইবনে আওফ সূত্রে যে, আবদুর রহমান ইবনে আওফ তার খিটখিটে মেজাজের স্ত্রীকে দুই তালাক দিয়েছেন। পরে তাকে তিনি রোগাক্রান্ত অবস্থায়ই বলেছেন, তুমি যদি তোমার তুহর হওয়ার খবর আমাকে দাও, তাহলে আমি তোমাকে অবশ্যই আরও তালাক দেব।

এ হাদীস স্পষ্ট করে বলছে যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দেন নি। ফাতিমা বিনতে কায়স সংক্রান্ত হাদীসেও এই ধরনের কথাই বর্ণিত হয়েছে। সে হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, মূসা ইবনে ইসমাঈল, আবান ইবনে ইয়াজীদুল আত্তার, ইয়াহইয়া ইবনে আবূ কাসীর, আবূ সালমা ইবনে আবদুর রহমান সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, ফাতিমা বিনতে কায়স তাঁকে বলেছেন যে, আবূ হাফস ইবনুল মুগীরা তাঁকে তালাক দিয়েছেন। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ও বনু মখজুমের কতিপয় ব্যক্তি নবী করীম (স)-এর নিকট এসে বলেছেন যে, হে আল্লাহ্‌র নবী। আবূ হাফস তাঁর স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছেন এবং তার জন্যে খুব সামান্য 'নফকা' রেখে গেছেন। জবাবে নবী করীম (স) বলেছেন, সে 'নফকা' পাবে না। এই হাদীসের দলীল নিয়ে লোকেরা বলেছেন যে, একসাথে তিন তালাক দেয়া জায়েয। কেননা সে লোকেরা নবী করীম (স)-কে তিন তালাক দেয়ার খবর দিয়েছেন; কিন্তু তিনি তা অগ্রাহ্য করেন নি।

এ হাদীসের কথাগুলো অ-বিস্তারিত। অন্যান্য বর্ণনায় বিস্তারিত কথা এসেছে। একটি হাদীস মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, ইয়াযীদ ইবনে খালিদ, আর-রমলী, লাইস, আকীল, ইবনে শিহাব, আবূ সালমা, ফাতিমা বিনতে কায়স সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, ফাতিমা তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি আবূ হাফস ইবনুল মুগীরার বিবাহিতা ছিলেন। আর আবূ হাফস ইবনুল মুগীরা তাঁকে তিন তালাকের শেষ তালাকটিও দিয়েছেন। পরে তিনি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হওয়ার সংকল্প করলেন। এভাবে হাদীসটির উল্লেখ রয়েছে। আবূ দাউদ তা বলেছেন। সালিহ ইবনে কায়সান, ইবনে জুরাইজ, শুয়ায়ব ইবনে আবূ হামযা— এরা সকলেই জুহরী থেকে এরূপ কথাই বর্ণনা করেছেন। পূর্বোদ্ধৃত হাদীসে যে কথা মোটামুটিভাবে বলা হয়েছে, এ হাদীসটিতে তা বিস্তারিত বলা হয়েছে। স্পষ্ট কথা হচ্ছে, তিনি তিন তালাকের শেষটি দিয়েছেন। এতে হাদীসের মধ্যে নিহিত প্রকৃত তত্ত্বই প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমত, তাতে তিন তালাকের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তা একসঙ্গে দিয়েছেন— এমন কথার উল্লেখ নেই। অতএব বুঝতে হবে, তিনিও তিন তালাকের মধ্যে পার্থক্য করেছেন, আলাদা আলাদাভাবে তিন তালাক দিয়েছেন। এই শেষোক্ত হাদীসের এটাই তাৎপর্য। এখানে কুরআন ও হাদীস থেকে যে সব দলীল উল্লেখ করা হল, তা থেকে এবং আগের কালের মনীষীদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত হল যে, তিন তালাক একত্রিত করে দেয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

যদি বলা হয়, উপরে আমরা দলীল হিসেবে আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তালাক দুইবার' উল্লেখ করেছি, যদ্দারা প্রমাণ করেছি যে, একটি বাক্যে একত্রিত করে দুই তালাক দেয়া নিষিদ্ধ। তা সেই কথাই প্রমাণ করে, যেমন করে তুমি উল্লেখ করেছ। তা-ই এই কথার-ও দলীল যে, এক তুহরে দুইবার তালাক দেয়া যেতে পারে। কেননা আয়াতটিতে দুই তুহরে আলাদা করে দুই তালাক দেয়ার কথা নেই। তাহলে দুইবারে দুই তালাক দেয়া যেতে পারে। তা-ই প্রমাণ করে যে, একই তুহরে দুই তালাক আলাদা করে দেয়া মুবাহ। একই তুহরে যখন তা জায়েয, তখন একটি শব্দে তা একত্রিত করাও অবশ্যই জায়েয হবে। এ দুটির মধ্যে তো কেউ-ই পার্থক্যের কথা বলেন নি।

জবাবে বলা যাবে, একথা ভুল এ হিসেবে যে, তা শব্দের হুকুমটি প্রত্যাহার করে, তাকে তুলে ফেলে। তার ফায়দা দূর করে দেয়। আর যে কথা শব্দের হুকুমকে উৎখাত করে, তা-ই প্রত্যাহৃত। শব্দের ফায়দা ফেলে দেয় এজন্যে যে, আল্লাহ্র কথা ঃ 'তালাক দুইবার' দাবি করে দুই তালাককে ভিন্ন ভিন্ন করে দেয়ার এবং একটি শব্দে দুইটিকে একত্রিত করা নিষিদ্ধ হওয়ার— পূর্বে যেমন বলেছি। আর একই তুহরে ভিন্ন ভিন্ন করে দুই তালাক দেয়া মুবাহ হলে একই কথায় সেদুটিকে একত্রিত করাও মুবাহ হয়ে দাঁড়ায়। আর তাতেই কুরআনে বলা কথার ব্যতিক্রম ঘটে। আর একই তুহরে দুটি তালাক ভিন্ন ভিন্ন করে দেয়া ও একত্রিত করে দেয়াকে নিষিদ্ধ করলে এবং দুই তুহরে তা দেয়া মুবাহ মনে করলে শব্দের দাবি অগ্রাহ্য করা হয় না। বরং তাকে কাজে লাগানো হয় বিশেষভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে। কাজেই দুই তুহরে দুই তালাক দিলে তার হুকুম অগ্রাহ্য করা হয় না। বরং তাকে বিশেষীকরণ কর্তব্য হয়। কেননা ব্যবহৃত শব্দই দুই তালাককে বিচ্ছিন্ন করতে বলে। সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, যখন বিচ্ছিন্ন করা কর্তব্য হয়, তখন দুই তুহরে দুই তালাককে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। তাই আমরা একই তুহরে দুই তালাককে বিচ্ছিন্নকরণকে বিশেষীকৃত করলাম। শব্দের হুকুম কাজে লাগানো সহকারে সকলেরই ঐকমত্যের ভিত্তিতে একই তুহরে ভিন্ন ভিন্ন করে দেয়াকে মুবাহ করা হলে তাতে শব্দের হুকুমটা সমূলে উৎপাটিত হয়ে যায়। ফলে তালাক দুইবার বলা না বলা সমান হয়ে যায়।

অথচ এই কথা গ্রহণযোগ্য নয়। তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

যাঁরা তাকে মুবাহ মনে করেছেন, তাঁরা একটি হাদীসকে দলীল বানিয়েছেন। হাদীসটি উয়াইমির আল-আজলানী বর্ণিত। নবী করীম (স) যখন তার ও তার স্ত্রীর 'লেয়ান' কার্যকর করে দিয়েছিলেন। পরে দুইজন 'লেয়ান' থেকে নিষ্কৃতি পেলে উয়াইমির বললেন, আমি তার ব্যাপারে মিথ্যা বলেছি যে, আমি যদি তাকে স্ত্রী বানিয়ে রাখি, তাহলে সে তিন তালাক। তাদের দুজনের মধ্যে নবী করীম (স) বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন, তার পূর্বেই উয়াইমির স্ত্রীকে আলাদা করে দিয়েছিলেন। শরীয়াতের বিধানদাতা নিজেই যখন একসাথে তিন তালাক দেয়াকে অগ্রাহ্য করেন নি, তখন বোঝা গেল, তা মুবাহ।

কিন্তু ইমাম শাফেয়ীর পক্ষে এই হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা সহীহ হতে পারে না। কেননা তাঁর মাযহাব হচ্ছে, স্বামীর 'লেয়ান'-এর কারণে সজ্ঘটিত বিচ্ছিন্নতা ঘটেছিল স্ত্রীর 'লেয়ান'-এর পূর্বেই। ফলে স্ত্রীর বায়েন তালাক হয়েছিল। তার সাথে অপর কোন তালাক মিলিত হয়নি। তাহলে যে তালাক দেয়া হয়নি, তার জন্যে প্রতিবাদ করার প্রশ্ন কিভাবে উঠতে পারে ? তার হুকুমও প্রমাণিত হয়নি ?

যদি প্রশ্ন করা হয়, তাহলে তোমার মাযহাবে তার কারণটা কি ? জবাবে বলা যাবে, এটা সম্ভব যে, তা ইদ্দতের জন্যে তালাক দেয়া বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্বেই তা হয়েছিল এবং একই তুহরে তালাকসমূহকে একত্রিত করা নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে তা ঘটেছিল। এই কারণে শরীয়াতদাতা নবী করীম (স) তা অগ্রাহ্য করেন নি। এ-ও হতে পারে যে, তালাক ছাড়া অন্য কারণে তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঘটেছিল। তাই তালাক দ্বারা তা ঘটানোকে অগ্রাহ্য করা হয়নি। তবে যিনি বলেছেন, সুন্নাত তালাক হচ্ছে শুধু এক তালাক দেয়া, তা আমরা মালিক ইবনে

আনাস, লাইস, আল হাসান ইবনে হাই ও আওজায়ীর মতরূপে উল্লেখ করেছি। ভিন্ন ভিন্ন তুহরে তিন তালাক দেয়া মুবাহ যে দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়, তা হচ্ছে ঃ

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ -

তালাক মাত্র দুইবার। তৃতীয়বারে হয় শুভভাবে তাকে রাখবে, না হয় সদয়ভাবে তাকে চলে যেতে দেবে।

এ আয়াতে দুই তালাক দেয়া মুবাহ প্রমাণিত হয়। আর আমরা যখন একমত হয়েছি এ জন্যে যে, একই তুহরে সে তালাক দুটি দেয়া হবে না, তখন তার দুইটি নাম দুই তুহরে ব্যবহার করা কর্তব্য।

اَوْتَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ 'অথবা সদয়ভাবে তাকে চলে যেতে দেবে'— আল্লাহ্র এই কথার প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, এটা তৃতীয় তালাকের কথা। স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার পরিবর্তে তিনটি তালাকই দিয়ে দেয়ার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে।

এই কথাটি আল্লাহ্র এই কথার দ্বারাও প্রমাণিত হয় ঃ

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ -

হে নবী! যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দেবে, তখন তোমরা তাদেরকে তালাক দেবে তাদের ইদ্দতের জন্যে। (সূরা আত্-তালাক ঃ ১)

ইদ্দতের জন্যে তিন তালাক ঘটানোর কথা এর মধ্যে রয়েছে। কেননা একথা জানা আছে যে, এর অর্থ হচ্ছে ইদ্দতের সময়কে লক্ষ্য করে তালাক দাও। শরীয়াতদাতা এই কথার ব্যাখ্যা দিয়েছেন নিজের এই কথার দ্বারা যে, স্ত্রীকে তালাক দেবে তার তুহর অবস্থায়, যখন সঙ্গম করা হয়নি, অথবা গর্ভবতী অবস্থায়, যখন তার গর্ভ প্রকাশমান হয়েছে। এই ইদ্দতের জন্যে স্ত্রীদেরকে তালাক দেয়ার আদেশ করেছেন আল্লাহ তা'আলা। আসলে তুহরের সময়ে তালাক দেয়ার কথাই বলা হয়েছে। তাই তিন তালাককেও শামিল করেছে। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ -

তোমরা নামায কায়েম কর সূর্যের পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার কারণে।

(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭৮)

এ থেকে বোঝা গেছে যে, যখন যখনই সূর্য মধ্যাকাশ থেকে পশ্চিমে ঢলে পড়বে, তখন তখনই নামায কায়েম করতে হবে। এটা প্রত্যেক দিন— সমস্ত দিনের জন্যে পালনীয় হুকুম। আল্লাহ্র এই কথাটিও এরূপ ঃ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ 'তালাক দাও ইদ্দতের জন্যে।' তুহরের সময়ের কথা বলাই এর উদ্দেশ্য। তাই যখনই তুহর হবে, তখনই তালাক দিতে হবে। উপরন্তু প্রথম তুহরে যখন তালাক দেয়া জায়েয— কেননা সেই তুহরে তার সাথে সঙ্গম করা হয়নি, তখন দ্বিতীয় তুহ্রে আর এক তালাক দেয়া জায়েয ঠিক এই কারণেই। সকলেই একমত এই বিষয়ে যে, যদি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া হয়, তাহলে দ্বিতীয় তুহরে আর একটি তালাক দেয়াও জায়েয যদি তাকে ফিরিয়ে নেয়ার ইচ্ছা না হয়। কেননা দ্বিতীয় তুহরে সেই তাৎপর্যই পাওয়া

গেছে, যার দরুন প্রথম তুহরে তালাক দেয়া জায়েয হয়েছিল। কেননা তালাক দেয়া মুবাহ্ হওয়ার সাথে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার কোন সম্পর্ক নেই। তা নিষিদ্ধও নয়। কেননা যদি স্ত্রীকে তখন ফিরিয়ে নেয়া হয়, তারপর তার সাথে সঙ্গম করা হয় সেই তুহরেই, তাহলে সেই তুহরেই আবার আর এক তালাক দেয়া জায়েয হবে না। তা মুবাহ হওয়ার উপর ফিরিয়ে নেয়ার কোন প্রভাব নেই। কাজেই দ্বিতীয় তুহরে তালাক দেয়াই কর্তব্য ফিরিয়ে নেয়ার পূর্বে। যেমন করে তা জায়েয হতো যদি তাকে ফিরিয়ে নেয়া না হয়।

যদি বলা হয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাকের কোন ফায়দা নেই। কেননা স্বামী যদি স্ত্রীকে 'বায়েন' করে দিতেই চায়, তাহলে সেই একটি তালাক দ্বারাই তা সম্ভব। সম্ভব এভাবে যে, এক তালাক দিয়ে রেখে দেবে, ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে সে স্বতঃই 'বায়েন' হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا تَتَّخِذُوٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا –

তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াতকে খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত কর না।

(সূরা বাকারাহ ঃ ২৩১)

দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক মুবাহ্ হওয়ায় স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিক, কি না-ই নিক, এর মধ্যে পার্থক্যের এটাই কারণ। ফিরিয়ে না নিলে পরের দুটি তালাক একেবারে বেহুদা হয়ে যায়।

জবাবে বলা যাবে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক দেয়ার বহু ফায়দা আছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক না দিলে তা লাভ করা যায় না। তৃতীয় তালাক দেয়ার দ্বারা ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই যদি স্ত্রী সম্পূর্ণ 'বায়েন' হয়ে যায়, তাহলে তার স্বামী এই সময়ে মরে গেলে তার মীরাস থেকে সে বঞ্চিত হবে। অথবা এই সময়ে যদি তার বোনকে বিয়ে করে কিংবা তাকে বাদ ধরে যদি আরও চারজনকে বিয়ে করে, তাহলে তার প্রাপ্য থেকে সে বঞ্চিত হয়ে যাবে। ইদ্দত পালনকালে ও শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই এসব ঘটলে তা-ই হবে বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁদের মতে এই কথা। তাহলে বোঝা গেল— এক তালাক দ্বারা বায়েন করার পরিবর্তে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক যথারীতি দেয়া হলে অনেক ফায়দা আছে তাতে। অনেক হক আছে যা স্বামী লাভ করতে পারে। কাজেই তা নিরর্থক ও ফায়দাশূন্য নয়। এই কারণেই অপর দুটি তালাক সুন্নাত সময়ে দেয়ার অবকাশ রাখা হয়েছে। স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলেও তা জায়েয।

## পুরুষদের দেয়া তালাকের ব্যাপারে মতপার্থক্য

আবূ বকর (র) বলেছেন, বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদদের আগের কালের ও পরবর্তী কালের লোকেরা একমত হয়েছেন এই বিষয়ে যে, ক্রীতদাস স্বামী স্ত্রী 'তালাক দুইবার, অতঃপর হয় শুভভাবে রাখা হবে, না হয় দয়াস্বরূপ চলে যেতে দেয়া হবে' আল্লাহ্‌র এই কথার মধ্যে শামিল নয়। অর্থাৎ এই কথা তাদের জন্যে প্রযোজ্য নয়। তাঁরা সব এ বিষয়ে একমত যে, দাসত্ব তালাক সংখ্যা হ্রাস করার জরুরী কারণ। হযরত আলী ও আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন ঃ 'মেয়েলোক যদি স্বাধীনা হয়, তাহলে তার তালাক সংখ্যা তিন, তার স্বামী স্বাধীন হোক; কি ক্রীতদাস হোক। আর সে যদি ক্রীতদাসী হয়, তাহলে তার জন্যে দুই তালাকই সম্পূর্ণ, তার

স্বামী স্বাধীন হোক, কি ক্রীতদাস।' ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, জুফর, মুহাম্মাদ, সওরী, আল-হাসান ইবনে সালিহর-ও এই মত। উসমান, জায়দ ইবনে সাবিত ও ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, পুরুষদের তালাক বলতে বোঝায়, স্বামী যদি দাস হয়, তাহলে তার প্রাপ্য তালাক সংখ্যা তিন, স্ত্রী স্বাধীনা কিংবা দাসী— যা-ই হোক। ইমাম মালিক ও শাফেয়ীর এই মত। ইবনে উমর (রা) বলেছেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে-ই দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্দী হবে, তার প্রাপ্য তালাক সংখ্যা কম হবে তার এই দাসত্বের কারণে। উসমান আল-বত্তীরও এই কথা। হুশায়ম মনসূর ইবনে জাহান, আতা ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তালাক দানের ব্যাপারটা মনিবের হাতে। দাস তার অনুমতি দিক আর না-ই দিক। এর দলীল হিসেবে তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَىْءٍ -

আল্লাহ মনিবের মালিকানাধীন দাসকে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেছেন, সে কোন কিছুই করতে সক্ষম নয়। (সূরা আন-নহল ঃ ৭৫)

হিশাম আবুয-যুবায়র, আবূ মাবাদ মাওলা ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ইবনে আব্বাসের একটি দাস ছিল। সে তার স্ত্রীকে দুই তালাক দিয়েছিল। ইবনে আব্বাস তাকে বললেন, তুমি তাকে ফিরিয়ে আন। তোমার কোন মা নেই। কেননা তোমার কিছুই করবার নেই। সে তা করতে অস্বীকার করে। তখন তিনি বললেন, 'সে তো তোমারই, অতএব তাকে গ্রহণ কর।' এই কথা প্রমাণ করে যে, তিনি মনে করেছেন, তার তালাক কার্যকর হবে। যদি তা না হবে, তাহলে তাকে 'তুমি তাকে ফিরিয়ে আন' বলতেন না। 'সে তোমারই' একথা প্রমাণ করে যে, সে ক্রীতদাসী ছিল। এ-ও হতে পারে যে, গোলাম স্বাধীন হবে। কেননা তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনই মনিবের মালিকানাধীন গোলাম হতো, তাহলে তাদের দাসত্ব তালাক সংখ্যা কমিয়ে দেবে, এতে কোন মতপার্থক্য নেই।

এই পর্যায়ে একটি হাদীস রয়েছে। তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, দাসের তালাকের কোন গুরুত্ব নেই। নবী করীম (স) থেকে হাদীসটি বর্ণিত। মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, জুহায়র ইবনে হরব, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, আলী ইবনুল মুবারক, ইয়াহইয়া ইবনে আবূ কাসীর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, উমর ইবনে মাতাব তাকে জানিয়েছেন, বনু নওফলের মুক্ত করা দাস আবূ হাসান তার অধীন এক দাস সম্পর্কে ইবনে আব্বাসের নিকট ফতোয়া চেয়েছিলেন। সে তার দাসীকে দুই তালাক দিয়েছে। পরে তিনি দুজনকেই মুক্ত করে দিয়েছেন। এক্ষণে এই ঘটনার পর তিনি তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিতে পারেন কিনা ? জবাবে বললেন, হ্যাঁ, রাসূলে করীম (স) এরূপ রায়ই দিয়েছেন। আবূ দাউদ বলেছেন, আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন বলে শুনেছি, আবদুর রাযযাক বলেছেন, ইবনুল মুবারক উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কোন আবূ হাসান ? সে তো এক বিরাট পাথর ধারণ করে বসেছে। আবূ দাউদ বলেছেন, এই আবূ হাসান সেই ব্যক্তি, যার নিকট থেকে জুহরী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বড় ফিকাহবিদদের একজন ছিলেন।

আবূ বকর বলেছেন, ইজমা এই হাদীসটিকে রদ করে দিয়েছে। কেননা ইসলামের প্রাথমিক কালের এবং তাঁদের পরবর্তী সময়ের ফিকাহবিদদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই

যে, স্বামী স্ত্রী দুজনই যদি কারোর মালিকানাধীন দাস-দাসী হয়, তাহলে তারা পরস্পরে দুই তালাকের মাধ্যমেই হারাম হয়ে যাবে। অপর এক স্বামী গ্রহণের পূর্বে তারা দুইজন পরস্পরের জন্যে হালাল হবে না।

তালাক যে স্ত্রীর অবস্থার দৃষ্টিতে দিতে হবে, এ কথা প্রমাণ করে নবী করীম (স) থেকে ইবনে উমর ও আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস। হাদীসটির কথা হল ঃ

طَلَاقُ الْاَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حِيْضَتَانِ -

দাসীর তালাক দুই আর তার ইদ্দত দুই হায়য।

এই হাদীসের সনদ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। মুসলিম উম্মাহ ইদ্দতের মিয়াদ কম হওয়ার ব্যাপারে এই দুটি হাদীসকে ব্যবহার করেছে, যদিও তার সূত্র খবরে ওয়াহিদের। কিন্তু তা মুতাওয়াতির পর্যায়ে উন্নীত। কেননা যে খবরে ওয়াহিদ উম্মতের ব্যাপক জনতা কবুল করে, হানাফী মাযহাব অনুযায়ী তা মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছে যায়, বিভিন্ন প্রসঙ্গে একথা আগেও বলেছি। দাসীর ইদ্দত দুই হায়য, তার স্বামী স্বাধীন হোক, কি দাস— এ ব্যাপারে শরীয়াতদাতা কোন পার্থক্যের কথা বলেন নি। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, তালাক হবে স্ত্রীর মর্যাদা অনুযায়ী, স্বামীর মর্যাদা অনুযায়ী নয়।

এর আর একটি দলীল হল, সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, দাসত্ব তালাকের সংখ্যা কম করে যেমন 'হদ্দ'কে মাত্রায় কম করে। 'হদ্দ' কার্যকর করার ব্যাপারে বিবেচিত হবে কার উপর কার্যকর করা হচ্ছে। সে যদি দাস বা দাসী হয়, তাহলেও তার মাত্রা কম হবে। সে ভাবেই দাসীর তালাকের সংখ্যা কম হবে যাকে তালাক দেয়া হচ্ছে সে যদি দাসী হয়। তার উপর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তিন তালাক কার্যকর করা যাবে না মসনূন তরীকায়। স্বামী স্বাধীন হলে আর তার স্ত্রী দাসী হলে এরূপ বিধানই হবে। কেননা বিভিন্ন তুহরে তার উপর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তিন তালাক দিতে গেলে তৃতীয় তালাকটি দেয়া যাবে না কোন ক্রমেই। স্বামী তিন তালাকেরই মালিক, এই কারণে মসনূন তরীকায় সে ভিন্ন ভিন্ন করে তা কার্যকরও করতে পারে, যেমন স্ত্রী যদি স্বাধীনা হয়, তাহলে তা হতে পারে। এতেই দলীল রয়েছে এই কথার যে, স্ত্রী দাসী হলে তার স্বামী তিন তালাকের মালিক নয়।

## এক সাথে তিন তালাক দেয়ার দলীল প্রমাণ

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্র কথা ঃ 'তালাক দুইবার, তৃতীয় বারে হয় স্ত্রীকে ভালোভাবে রাখা হবে, না হয় দয়া সহকারে চলে যেতে দেয়া হবে।

প্রমাণ করে যে, একসঙ্গে তিন তালাক দেয়া যেতে পারে, যদিও তা করতে নিষেধ করা হয়েছে। তা এইজন্যে যে, আল্লাহ্র কথা ঃ 'তালাক দুইবার' তার হুকুম স্পষ্ট করে দেয় যখন দুই তালাক দেয়া হয় এই হলে ঃ তুমি তালাক, তুমি তালাক এবং তা এক তুহরে বলা হয়। পূর্বেই বলেছি যে, এরূপ তালাক দেয়া সুন্নাতের খেলাফ। আয়াতের মূল বক্তব্যে যখন এক সাথে দুই তালাক দেয়া জায়েয হওয়ার অবকাশ রয়েছে ঠিক এই দলীলের ভিত্তিতে তখন এ দুটি তালাক একসঙ্গে দেয়াও সহীহ প্রমাণিত হবে। কেননা কেউ-ই এই দুইটির মধ্যে পার্থক্যের কথা বলেন নি।

অন্য দিক দিয়েও একথা প্রমাণিত হয়। তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَلَاتَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ -

সে স্ত্রী সে স্বামীর জন্যে অতঃপর হালাল থাকবে না, যতক্ষণ না সে তাকে বাদে অপর স্বামী গ্রহণ করছে।

অর্থাৎ স্ত্রী হারাম হয়ে গেল দুই তালাকের পর তৃতীয় তালাক দেয়ায়। তা একই তুহরে দেয়া হোক, কি বিভিন্ন তুহরে— তার মধ্যে কোন পার্থক্য হয়নি। তাহলে সব কয়টি তালাক দেয়া জায়েয হয়ে গেল যে ভাবেই দেয়া হোক। মসনূনভাবে দেয়া হোক কিংবা তার বিপরীত হোক। তা মুবাহ হোক, কি হোক নিষিদ্ধ।

যদি প্রশ্ন করা হয়, উপরোদ্ধৃত আয়াতের তাৎপর্য আগেই বলে এসেছ যে, এ আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে পছন্দনীয় ও নির্দেশিত তালাক পদ্ধতি। কিন্তু একসঙ্গে তিন তালাক দেয়া তো তোমার মতেই সুন্নাতের খেলাফ। তা হলে সেই আয়াতকেই দলীল বানিয়ে বলতে পার যে, মুবাহ তরীকার বিপরীতে তালাক দেয়া যায়। আয়াতে এই দিকটি তো সমন্বিত নয়।

জবাবে বলা যাবে, আয়াতে এই সব অর্থই সমন্বিত রয়েছে, সুন্নাতের বিপরীত পন্থায় দুই বা তিন তালাক দেয়ার অবকাশ আছে। পছন্দনীয় ও বিভিন্ন তুহরে তা ভিন্ন ভিন্ন করে দেয়া ইত্যাদি। সব-ই আয়াতের বক্তব্য হতে পারে। যেমন যদি কেউ বলে, 'তোমরা বিভিন্ন তুহরে তিন তালাক দাও।' তখন যদি তোমরা সব তালাক একসঙ্গে দিয়ে দাও, তাহলে তা কার্যকর হবে। তা জায়েয। যদিও দুটি অর্থ পরস্পর বিপরীত নয় এবং আয়াতেও এ দুটির অবকাশ রয়েছে। তাই সেইভাবেই তা গ্রহণ করা কর্তব্য।

যদি বলা হয়, এ আয়াতের তাৎপর্য সেইভাবেই গ্রহণীয় যেমন বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'অতএব তোমরা তাদেরকে তালাক দাও তাদের ইদ্দত সামনে নিয়ে। শরীয়াতদাতা বলেই দিয়েছেন যে, তালাক তো ইদ্দতের জন্যে। আর তা হল তিন তুহরে স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে যদি তিন তালাকই কার্যকর করার ইচ্ছা করে। তার বিপরীত করা হলে তার তালাক কার্যকর হবে না।

জবাবে বলা যাবে, দুটি আয়াত যে জিনিসের দাবি করে, যে হুকুম প্রকাশ করে, আমরা সে দৃষ্টিতেই আয়াতদ্বয়কে ব্যবহার করছি। আমরা বলব, পছন্দনীয় ও আদেশকৃত হচ্ছে ইদ্দতের জন্যে তালাক। যেমন এ আয়াতের প্রসঙ্গে আমরা বলেছি। তালাক যদি ইদ্দতের জন্যে না দেয়, দেয় তিনটিই একত্রিত করে, তাহলে তা কার্যকর হবে। অপর আয়াতটি আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তালাক দুইবার' এবং আল্লাহ্‌র কথা ঃ যদি অতঃপর-ও স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে অতঃপর সে তার জন্যে হালাল হবে না'— এ আয়াতদ্বয়ের দাবি তা নয়। কেননা এ সব আয়াতের যা দাবি, তা 'অতএব তোমরা তালাক দাও' আল্লাহ্‌র এই কথার বিপরীত কিছু নেই। তবে আয়াতের শুরুতে যে 'ইদ্দতের জন্যে তালাক'-এর উল্লেখ আছে, তাতে তা বাস্তবায়িত হওয়ার প্রমাণ রয়েছে যদি না ইদ্দতের জন্যে তালাক দেয়া হয়। তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র এই কথা ঃ

فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ..... وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ -

অতএব তোমরা তাদেরকে তালাক দাও তাদের ইদ্দতের জন্যে ........ এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। আর যে লোক আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমাসমূহ লঙ্ঘন করবে, সে নিজের উপরই নিজে জুলুম করল। (সূরা আত্-তালাক : ১)

কাজেই যদি না-ইদ্দতের জন্যে তালাক দেয়, তাহলে তা-ই ঘটবে, যা ঘটলে ব্যক্তি নিজের উপর নিজে জুলুমকারী হয়। তালাক দিলেই তার দরুন নিজের উপর নিজে জুলুম করা হবে না।

এই আয়াতেই প্রমাণ রয়েছে অ-ইদ্দতের জন্যে তালাক দিলে সে তালাক সংঘটিত ও কার্যকর হবে। আল্লাহ্‌র কথার ধারাবাহিকতা থেকেই তা প্রমাণিত হয়।

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا -

যে লোক আল্লাহ্‌কে ভয় করবে, আল্লাহ তার জন্যে মুক্তির পথ করে দেবেন।

অর্থাৎ যদি তালাক দেয় আল্লাহ যেভাবে তা দিতে বলেছেন, তা হলে সে মুক্তি পেতে পারবে সেই অবস্থা থেকে, যে অবস্থার সৃষ্টি হলে সে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হবে। আর তা হচ্ছে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া। ইবনে আব্বাস প্রশ্নকারীর জবাবে এই তাৎপর্যেরই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সে প্রশ্নকারী তো তিন তালাক দিয়েছিল। বলেছিল, আল্লাহ তো বলেছেন : 'যে লোক আল্লাহ্‌কে ভয় করবে, তিনি তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন।' আর তুমি যেহেতু আল্লাহ্‌কে ভয় করনি, এইজন্যে আমি তোমাকে মুক্তির কোন পথ দেখাতে পারছি না। তুমি তোমার রব্ব-এর নাফরমানী করেছ, ফলে তোমার স্ত্রী তোমা থেকে বায়েন— হারাম হয়ে গেছে। এই কারণেই হযরত আলী (রা) বলেছিলেন : 'লোকেরা যদি তালাকের সীমা ঠিক পায়, তাহলে নিজ স্ত্রীকে তালাক দিলে সে লজ্জিত হবে না।'

যদি বলা হয়, একসঙ্গে তিন তালাক দেয়ার লোকটি তো নাফরমান হয়েছে, তাই তা সংঘটিত ও কার্যকর হবে না। কেননা যেভাবে তালাক দেয়ার আদেশ করা হয়েছে সেভাবে সে তালাক দেয়নি। যেমন কেউ যদি অপর কাউকে দায়িত্ব দেয় তার স্ত্রীকে তিন তুহরে তিন তালাক দেয়ার, সে যদি একই তুহরে তিনটি তালাকই দিয়ে ফেলে তাহলে তা সংঘটিত ও কার্যকর হবে না।

জবাবে তাকে বলা যাবে, তালাক দেয়ায় গুনাহগার হলেও তা তালাক সংঘটিত ও কার্যকর হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। সে তালাকটা তো সহীহ হবে। তার দলীল তো পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি। তা সত্ত্বেও আল্লাহ 'জিহার'কে ঘৃণ্য মিথ্যা কথা বলে অভিহিত করেছেন। তা সত্ত্বেও যদি কেউ 'জিহার' করে, তাহলে তা সহীহভাবে সংঘটিত হবে। 'জিহার'কারীর গুনাহগার নাফরমান হওয়াটা 'জিহার' কার্যকর হওয়ার প্রতিবন্ধক হয় না। মানুষ যখন ইসলাম থেকে মুর্তাদ হয়ে যায়, তখন সে নাফরমান হয়। কিন্তু তার এই নাফরমান হওয়াটা তার মুর্তাদ হওয়ার প্রতিবন্ধক হয় না। তার হুকুমটা অনিবার্যভাবে কার্যকর হবে। আল্লাহ্ স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর তার ক্ষতি সাধন ও তাকে কষ্ট দানের উদ্দেশ্যে ফিরিয়ে নিতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন :

وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا -

শুধু কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকিয়ে রেখো না। কেননা তাতে বাড়াবাড়ি করা হবে।

তা সত্ত্বেও তালাকদাতা স্বামী যদি ফিরিয়ে নেয় এবং সে তাকে কষ্ট দিতে চায়, তা হলে ফিরিয়ে নেয়াটা কার্যকর হবে, তার হুকুম প্রমাণিত হবে। তবে তার ও তার উকিল বা ভারপ্রাপ্তের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, উকিল বা ভারপ্রাপ্ত তালাক দেয় অন্যের জন্যে অন্য কারোর পক্ষ থেকে। সে নিজের জন্যে বা নিজের স্ত্রীকে তালাক দেয় না। যা সে ঘটায়, তার মালিকও সে নয়। তালাকের কোন হক বা দায়-দায়িত্ব তার উপর বর্তায় না। সে যা ঘটায় তার সে মালিক নয়, তা সত্ত্বেও অন্যের পক্ষ থেকে তার ঘটানো কাজটি অবশ্যই কার্যকর হবে এবং সঠিক হবে। কেননা সে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছে। এই আদেশের সাথেই তার হুকুম-আহকাম সম্পর্কিত। তাই সে যদি প্রাপ্ত আদেশের বিপরীত বা অন্যথা করে, তাহলে তা সঙ্ঘটিত হবে না।

কিন্তু স্বামী নিজে তালাকের মালিক। সে তালাক দিলে তালাক সংক্রান্ত যাবতীয় হুকুম আহকাম তার সাথেই সংশ্লিষ্ট হয়। সে অন্য কারো তালাক দিচ্ছে না, নিজের তালাক দিচ্ছে। অতএব তার দেয়া তালাক সঙ্ঘটিত হবে মালিকের দেয়া তালাক হিসেবে। সে তিন তালাকের মালিক। তালাক দিতে গিয়ে সে যদি নিষিদ্ধ পন্থা অবলম্বন করে, তাহলে তা কার্যকর হওয়ার প্রতিবন্ধক হবে না। জিহার ও রিজয়াত— ফিরিয়ে নেয়া, মুর্তাদ হওয়া— আর যে সব কাজ করলে গুনাহগার হতে হয় সেই পর্যায়ে যেমন ইতিপূর্বে আমরা বলেছি।

যেমন, কেউ যদি সন্দেহের বশবতী হয়ে স্ত্রীর মার সাথে সঙ্গম করে, তাহলে তার স্ত্রী তার জন্যে হারাম হয়ে যাবে। এই তাৎপর্যটারই আমরা উল্লেখ করেছি স্বামীর হাতে তিন তালাকের মালিকত্বের কথা। তিন তালাক একসঙ্গে দিলে তা যে কার্যকর হবে, কেননা তা তিন তালাকের মালিকেরই দেয়া। হাদীসের দিক দিয়েও তা প্রমাণিত। হাদীসটি ইবনে উমর (রা) বর্ণিত। তার সনদ-ও আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তাতে তিনি বলেছেন ঃ আমি যদি তাকে তিন তালাক দিতাম, তারপরও কি আমি তাকে ফিরিয়ে নিতে পারতাম ? নবী করীম (স) জবাবে বললেন ঃ না, কেননা সে বায়েন হয়ে গেছে। অবশ্য সেই সাথে গুনাহ হয়েছে।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, সুলায়মান ইবুনে দাউদ, জরীর ইবনে হাজিম, যুবায়র ইবনে সাঈদ, আবদুল্লাহ ইবনে আলী, ইবনে ইয়াযীদ, ইবনে বুকানা, তাঁর পিতা তাঁর দাদা সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ সে তার স্ত্রীকে বায়েন-মুগাল্লাযা তালাক দিয়েছে। পরে সে রাসূলে করীম (স)-এর নিকট এসে বলে ঃ আমি তো চূড়ান্ত তালাক দেয়ার ইচ্ছা করিনি। জিজ্ঞাসা করলেন, কয় তালাক দেয়ার ইচ্ছা করেছিলে আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বল। সে আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলল, এক তালাক। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ তাহলে তুমি যা দিতে চেয়েছ সেই এক তালাকই হয়েছে। তিন তালাক দেয়ার নিয়ত হলে তা-ই সঙ্ঘটিত হতো। অন্যথায় নবী করীম (স) তার দ্বারা আল্লাহ্‌র নামে হলফ করাতেন না। বলতেন না যে, আমি মাত্র এক তালাক দেয়ারই ইচ্ছা করেছিলাম। এই পর্যায়ে আগের কালের ফিকাহবিদদের যেমন কথা-বার্তা আছে, তা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। সে তালাক ঘটবে, তবে তালাকদাতা গুনাহগার হবে। কুরআন, সুন্নাহ ও আগের কালের ফিকাহবিদদের 'ইজমা' একসঙ্গে দেয়া তিন তালাক সঙ্ঘটিত হওয়া প্রমাণ করছে, যদিও তাতে গুনাহ হবে।

বশর ইবনুল ওয়ালীদ আবূ ইউসূফ থেকে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেছেন, হাজ্জাজ ইবনে আরতাদ খুব রুক্ষ মেজাজের লোক ছিলেন। তিনি বলতেন, তিন তালাক কিছুই নয়। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বলেছেন, তিন তালাক দিলে তাকে এক তালাকে পরিণত করতে হবে। দাউদ ইবনুল হুসায়ন, ইকরামা ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণিত হাদীস এই কথার দলীল। বলেছেন, রুকানা ইবনে আবদ ইয়াযীদ তার স্ত্রীকে একই মজলিসে তিন তালাক দিয়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন খুব সাজ্ঘাতিকভাবে। তখন রাসূলে করীম (স) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কিভাবে তালাক দিয়েছ ? বললেন, তিন তালাক দিয়েছি। বললেন ঃ একই মজলিসে ? বললেন, হ্যাঁ। তখন নবী করীম (স) বললেন, ওটা এক তালাক। অতএব তুমি তোমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নাও যদি ইচ্ছা কর। বললেন, অতপর আমি তাকে ফিরিয়ে নিলাম।

আর একটি দলীল আবূ আসিম কর্তৃক ইবনে জুরায়য, ইবনে তায়ূস তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত হাদীস। আবূ সাহবা ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলেছেন ঃ আপনি কি জানেন না, তিন তালাককে রাসূলে করীম (স), আবূ বকর সিদ্দিকের সময়ে ও উমর (রা)-এর খিলাফতের প্রাথমিক কালে এক তালাকে পরিণত করা হতো ? বললেন, হ্যাঁ, জানি।

কিন্তু বলা হয়েছে, এই দুইটি হাদীসই মুনকার— অগ্রহণযোগ্য। সাঈদ ইবনে যুবায়র, মালিক ইবনুল হারিস, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াস ও নুমান ইবনে আবূ আইয়াশ— সকলেই ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, যে লোক তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিল, সে তার রব্ব-এর নাফরমানী করল ও তার স্ত্রী তার থেকে বায়েন হয়ে গেল।

আবূ সাহ্বা বর্ণিত হাদীস অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। তা হল, ইবনে আব্বস (রা) বলেছেন, রাসূলে করীম (স) ও আবূ বকর সিদ্দিক (রা)-এর সময়ে এবং উমর (রা)-এর খিলাফতের প্রাথমিক কালে তিন তালাক ছিল এক তালাক। পরে উমর (রা) বললেন ঃ 'আমরা যদি তা তাদের উপর কার্যকর করি।' এই কথার তাৎপর্য আমাদের নিকট এই যে, লোকেরা তিন তালাক দিত। তিনি তা-ই তাদের উপর কার্যকর করে দিতেন।

ইবনে অহব আইয়াশ ইবনে আবদুল্লাহ আল-ফহরী, ইবনে শিহাব সহল ইবনে সাদ সূত্রে খবর দিয়েছেন যে, উয়াইমারিল আজলানী ও তার স্ত্রীর মধ্যে নবী করীম (স) যখন 'লেয়ান' কার্যকর করে দিলেন, তখন উয়াইমার বললেন, হে রাসূল! আমি আমার স্ত্রীর প্রতি মিথ্যা কথা আরোপ করেছি। আমি যদি তাকে রেখে দিই তাহলে সে তিন তালাক। পরে তিনি তাকে রাসূলে করীম (স)-এর আদেশ দানের পূর্বেই তিন তালাক দিয়ে ফেললেন। পরে রাসূলে করীম (স) তার উপর তার ফরমান কার্যকর করেন।

পূর্বে কুরআনের আয়াত ও সুন্নাতে রাসূল এবং ঐকমত্যের দলীলের ভিত্তিতে আমরা প্রমাণ করেছি, হায়যেও তালাক কার্যকর হবে, যদিও তা গুনাহ। যাদের বিরোধী মত গণনার যোগ্য নয়— এমন কিছু জাহিল লোক মনে করে, হায়য অবস্থায় তালাক দিলে তা কার্যকর হবে না। একটি হাদীসকে তারা দলীল হিসেবে পেশ করে। হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, আহমদ ইবনে সালিহ, আবদুর রাযযাক, ইবনে জুরাইয, আবূয যুবায়র, আবদুর রহমান ইবনে আয়মন মাওলা উরওয়াতা ইবনে উমর ও আবূয যুবায়রকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি শুনছিলেন, বললেন ঃ যে লোক তার স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দিল, তার সম্পর্কে আপনি কি মনে

করেন ? বললেন, ইবনে উমরও তাঁর স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন রাসূলে করীম (স)-এর যুগে। উমর (রা) রাসূলে করীম (স)-কে বললেন ঃ আবদুল্লাহ তাঁর স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দিয়েছে। হযরত আলী (রা) তার প্রতিবাদ করলেন। এটাকে তিনি কোন গুরুত্ব দিলেন না। বললেন, যখন তার তুহর হবে, তখনই তাকে তালাক দেয়া উচিত অথবা তাকে রেখে দেয়া উচিত।

জবাবে তাকে বলা যাবে, এই কথাটি ভুল। ইবনে উমর থেকে বহু সংখ্যক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন, সেই তালাকের জন্যে তিনি ইদ্দত পালন করিয়েছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, আল-কানবী, ইয়াযীদ ইবনে ইবরাহীম, মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন, ইউনুস ইবনে যুবায়র সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ আমি ইবনে উমরকে জিজ্ঞাসা করলাম, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার হায়য অবস্থায় তালাক দিয়েছে। বললেন, তুমি আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে চেন ? বললাম, হ্যাঁ। বললেন, সে-ই তার স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দিয়েছিল। পরে হযরত উমর (রা) নবী করীম (স)-এর নিকট প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ তাকে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে বল। তারপরে যেন ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দেয়। বললেন, আমি বললাম, সে এই কারণে ইদ্দত পালন করবে। বললেন, থাম। চিন্তা করে দেখ, সে যদি অক্ষম হয় ও আহাম্মকী করে থাকে ?..... এ হাদীসে ইবনে উমর সংক্রান্ত এই খবর রয়েছে। সে এই তালাকের জন্যে ইদ্দত পালন করেছে। এই সংক্রান্ত সমস্ত হাদীসেই বলা হয়েছে যে, শরীয়াতদাতা-ই তাকে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে বলেছেন। যদি তালাক সঙ্ঘটিত না হতো, তাহলে ফিরিয়ে নেয়ার প্রশ্ন উঠতো না। তার ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারটিও সহীহ হতো না। কেননা তালাক দেয়নি, সে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়েছে— এরূপ কথা সঙ্গত নয়। কেননা ফিরিয়ে নেয়ার প্রশ্ন তো তালাক দেয়ার পরই উঠে, তার আগে নয়। 'তিনি এটাকে কিছু মনে করেন নি' কথাটি যদি সহীহ হয়ে থাকে, তাহলে তার অর্থ হবে, তিনি এটাতে তালাক হয়েছে মনে করেন নি। বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে তা মনে করেন নি।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'অতঃপর হয় ভালোভাবে রাখা হবে, না হয় ভালোভাবে চলে যেতে দেয়াও হবে'— আবূ বকর বলেছেন ঃ فَاِمْسَاكٌ -এর 'ফা' تَعْقِيْبٌ বোঝায়। অর্থাৎ পূর্বোল্লিখিত কাজের পর পরেরটি করতে হয়। আয়াতের অর্থ হবে, প্রথমে তালাক সঙ্ঘটিত হবে। তারপর তাকে রেখে দেয়ার, ফিরিয়ে নেয়ার কাজ করতে হবে। امساك অর্থ الرجعة। ফিরিয়ে নেয়া। কেননা তা তালাকের বিপরীত অর্থ দেয়। তালাকের পর পালিত ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা চূড়ান্ত হয়। এই কারণে امساك 'রেখে দেয়া' বলতে ফিরিয়ে নেয়াই বুঝিয়েছেন। কেননা তালাক সত্ত্বেও তখনও বিয়ে সম্পর্কটা বেঁচে আছে তিন হায়য অতিক্রম করার মুহূর্তেও। ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে স্ত্রীর বায়েন হারাম হওয়াকে শেষ করে দিয়েছেন। স্বামীর জন্যে মুবাহ করে দিয়েছেন এই সময় তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া। তা অবশ্য শুভ নিয়মে হতে হবে। সুন্দর-স্বচ্ছন্দভাবে হতে হবে। তা করে তাকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না। যেমন আল্লাহ তা করতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন ঃ وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوْا 'তাদেরকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে ফিরিয়ে রাখবে না, তাহলে সীমালঙ্ঘন করা হবে।' ফিরিয়ে নেয়ার কাজটা এই শর্তে জায়েয রাখা হয়েছে। অশুভ উদ্দেশ্যে ও পন্থায় স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলে গুনাহ হবে। তবু ফিরিয়ে নেয়াটা সহীহ হবে। কেননা আল্লাহ্‌র পুরা কথা হচ্ছে ঃ

তোমরা তাদের ক্ষতি করা— কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে ফিরিয়ে নিও না। তাহলে তোমরা বাড়াবাড়ি করে বসবে। যে তা করবে, সে নিজের উপরই জুলুম করল।

ফিরিয়ে নেয়া সহীহ্ না হলে সে নিজের উপর জুলুমকারী হতো না।

আল্লাহ্র কথা ঃ 'ভালো ভাবে ফিরিয়ে নেবে' প্রমাণ করে যে, যৌন সঙ্গম করে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে হবে। কেননা বিয়েতে ফিরিয়ে রাখার কাজটা সঙ্গম দ্বারাই হয়। আর তার আনুসঙ্গিক স্পর্শ চুম্বন ইত্যাদি দ্বারা। তার দলীল হল, যার সাথে সঙ্গম করা চিরদিনের জন্যে হারাম, তার সাথে বিয়েও সহীহ্ হয় না। বোঝা গেল, বিয়ে বহাল করে রাখা বিশেষভাবে সঙ্গম দ্বারা হতে হবে। এই সঙ্গমই স্ত্রীকে আটকে রাখে। স্পর্শ ও যৌনতাপূর্ণ চুম্বন, নারী-অঙ্গের উপর দৃষ্টিপাত যৌন উত্তেজনা সহকারে— এগুলোও সেই পর্যায়ের। কেননা বিবাহ-চুক্তি সহীহ্ হওয়া এসব জিনিসের মুবাহ হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই এ সবের কোন একটি কাজ যখন করা হবে, তখন তা স্ত্রীকে আটকে রাখার— ফিরিয়ে নেয়ার কাজ করবে। কেননা আল্লাহ্র কথা "فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ" সাধারণ তাৎপর্যের। আর আল্লাহ্র কথা ঃ اَوْتَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ বিষয়ে দুটি দিকের উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে, এর অর্থ তৃতীয় তালাক। নবী করীম (স) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, বর্ণনার সূত্রটি অপ্রমাণিত। বাহ্যতও তা প্রত্যাহারযোগ্য। তা আবদুল্লাহ ইবনে ইসহাক আল-মিরওয়াজী, আল-হাসান ইবনে আবূ রুবাই আল-জুরজানী, আবদুর রাযযাক, সওরী, ইসমাঈল ইবনে সামী, আবূ রুজাইন সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, হে রাসূল! শুনুন, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'তালাক দুইবার, অতঃপর ভালোভাবে ফিরিয়ে রাখা অথবা দয়া ভরে চলে যেতে দেয়া।' এখানে তৃতীয় বারের তালাক কোথায় গেল, রাসূল (স) বললেন ঃ এই 'ভালোভাবে চলে যেতে দেয়া'-ই তৃতীয় তালাক।

আগের কালের ফিকাহবিদদের মধ্য থেকে সুদ্দী, দহাক প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তালাকদাতা স্ত্রীকে রেখে দেবে, শেষ হতে হতেই তার ইদ্দতের শেষ হওয়ার সঙ্গেই সে হারাম হয়ে যাবে।

এটাই সঠিকতম ব্যাখ্যা। কেননা এ ব্যাপারে নবী করীম (স) থেকে কোন কথা প্রমাণিত নয়। তার কয়েকটি দিক রয়েছে। একটি, আল্লাহ্ তা'আলা যেসব আয়াতে তালাক-এর পরে امساك 'রেখে দেয়া'র কথা এবং চূড়ান্ত বিচ্ছেদের কথা বলেছেন, সেই সব আয়াতেই স্ত্রীকে ফিরিয়ে না নেয়ার কথাও বলেছেন, যেন ইদ্দত শেষ হতে হতে শেষে সে হারাম হয়ে যায়।

আল্লাহ্ কথা ঃ

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْسَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ -

তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দেবে, তারপরে তারা তাদের ইদ্দতের মেয়াদের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাবে, তখন তোমরা তাদেরকে ভালোভাবে রেখে দাও অথবা ভালোভাবে চলে যেতে দাও।

এ আয়াতে تسريح 'চলে যেতে দেয়া' অর্থ ফিরিয়ে না নেয়া, ফিরিয়ে নেয়ার কাজটা না

করা। কেননা একথা জানা যে, 'রেখে দাও ভালোভাবে, কিংবা চলে যেতে দাও' বলে একটি কথা বোঝাতে চাওয়া হয়নি। এই পর্যায়েরই আল্লাহ্র এই কথাটিও ঃ

فَاذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْفَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ -

যখন তারা তাদের ইদ্দতের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাবে, তখন তাদেরকে ভালোভাবে রেখে দাও কিংবা তাদেরকে ভালোভাবে বিচ্ছিন্ন করে দাও। (সূরা আত্-তালাক্ ঃ ২)

এ আয়াতে ভবিষ্যতে তালাক ঘটানোর কথা হয়নি। তাৎক্ষণিকভাবে তাদের ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার জন্যে ফেলে রাখতে বলা হয়েছে। আর অপর দিকটি হল, কথার ধারাবাহিকতায়ই তৃতীয় তালাক রয়েছে।

তা এই কথাটি রয়েছে ঃ

فَانْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ -

এর পর-ও তৃতীয় বারে যদি তালাক দেয়, তাহলে স্ত্রী তার জন্যে হালাল হবে না যতক্ষণ না সে অপর স্বামী গ্রহণ করবে সে ছাড়া।

কথার শুরুতেই যখন তৃতীয় তালাকের কথা বলা হয়েছে, তা চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নতা বোঝায়, তার ফলে স্ত্রী হারাম হয়ে যায় অপর স্বামী না গ্রহণ করা পর্যন্ত। তখন 'দয়া সহকারে চলে যেতে দেয়া' কথাটিকে নতুন ফায়দা রূপে গ্রহণ করা আবশ্যক। আর তা হচ্ছে, দুই তালাক দেয়ার পর ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়া— ফিরিয়ে না নেয়া।

উপরন্তু যখন জানা আছে যে, হারাম হয়ে যায় যত সংখ্যক তালাকে তা বলাই এখানে উদ্দেশ্য, অসংখ্য তালাক দেয়া চলতি প্রথাকে বাতিল ঘোষণা করা-ই লক্ষ্য, তখন অথবা 'দয়া সহকারে চলে যেতে দেয়া' কথাটি যদি তৃতীয় তালাকের কথা হয়ে যায়, তাহলে তিন তালাক দিয়ে সম্পূর্ণভাবে হারাম করে দেয়ার উদ্দেশ্যটা কখনই স্পষ্ট হতো না। শুধু এতটুকু কথা বলে দিলেই হারামকারী চূড়ান্ত বিচ্ছেদ কখনই বোঝাতো না। আল্লাহ্র এই কথাটি দ্বারা তাহরীম— চূড়ান্ত হারাম করে দেয়ার কথা জানা গেল আল্লাহ্র এই কথা দ্বারা ঃ

فَانْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ -

তারপরও (তৃতীয় বারে) যদি তালাক দেয়, তা হলে অতঃপর সে তার জন্যে হালাল হবে না, যতক্ষণ সে তার পরিবর্তে অন্য স্বামী গ্রহণ না করছে।

অতএব 'অথবা দয়া সহকারে চলে যেতে দেয়া' কথাটিকে তৃতীয় তালাক মনে করাই বাঞ্ছনীয়। তা ছাড়া تسريح باحسان কথাটি যদি তৃতীয় তালাক হয়, তাহলে তার পরে বলা 'অতঃপরও যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয়' চতুর্থ তালাক হয়ে যায়। কেননা আরবী ভাষায় ف পরবর্তী কাজ বোঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। তা ভবিষ্যতের তালাক বোঝায়, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ্র কথা ঃ 'দয়া সহকারে চলে যেতে দেয়া' কথাটি স্ত্রীকে ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার কথা বোঝায়।

আল্লাহ্র কথা ঃ পরেও যদি তাকে তালাক দেয়, তাহলে সে তার জন্যে হালাল হবে না, যতক্ষণ সে তাকে বাদে অন্য স্বামীকে গ্রহণ করছে— এতে কয়েকটি তাৎপর্য সমন্বিত রয়েছে।

একটি, স্ত্রীর তিন তালাকদাতার জন্যে হারাম হওয়া, যতক্ষণ না সে তাকে ব্যতীত অন্য স্বামী গ্রহণ করছে। তিন তালাক দিলে বিয়ে চুক্তিটা হারাম হয়ে যায়, তার সাথে সঙ্গম করাও হারাম হয়ে যায়। কেননা বিয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল যৌন সঙ্গম করা। 'স্বামী' শব্দটির উল্লেখে বোঝা যায় যে, দ্বিতীয় স্বামী রীতিমত গ্রহণ করতে হবে। এটা মোটামুটি ও সংক্ষিপ্ত কথা এবং এটা ইঙ্গিতমূলক কথা, যা যৌন সঙ্গমকেও শামিল করে। আর ইঙ্গিতমূলক কথা স্পষ্ট কথা বলার প্রয়োজন রাখে না। নবী করীম (স) থেকে প্রখ্যাত হাদীস বর্ণিত হয়েছে, প্রথম স্বামীর জন্যে স্ত্রীলোকটি হালাল হবে না, যতক্ষণ দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সঙ্গম না করবে। জুহরী উরওয়াতা— আয়েশাতা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাফায়াতা আল-কুরাযী তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিলেন। পরে সে স্ত্রী আবদুর রহমান ইবনুয যুবায়রকে বিয়ে করে। পরে রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল ঃ হে নবী! আমি তো রাফায়াতার স্ত্রী ছিলাম। সে শেষ তিন দিয়েছে আমাকে। পরে আবদুর রহমান ইবনুয যুবায়রকে বিয়ে করেছি। কিন্তু হে রাসূল, তার কাছে যা আছে তা কাপড়ের ফিতা বিশেষ। রাসূলে করীম (স) এই কথা শুনে হেসে দিলেন। বললেন, তুমি হয়ত রাফায়াতার কাছে আবার ফিরে যেতে চাইছ। কিন্তু তা হবে না, যতক্ষণ না তুমি তার স্বাদ আস্বাদন করবে এবং সেও তোমার স্বাদ আস্বাদন করবে। জনগণ এই হাদীসটিকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছে। সমস্ত ফিকাহবিদ এই হাদীসটিকে কাজে লাগিয়েছেন, এটিকে ভিত্তি করে ফতোয়া দিয়েছেন। হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিতেও এ হাদীসটি মুতাওয়াতির পর্যায়ে গণ্য। এ হাদীসের ব্যাপারে কারোরই কোন ভিন্ন মত নেই। তবে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের বর্ণিত একটি হাদীস এর বিপরীত। তিনি বলেছেন, সে স্ত্রী প্রথম স্বামীর জন্যে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে শুধু বিয়ে অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই হালাল হয়ে যাবে যৌন সঙ্গম ছাড়া-ই। কিন্তু এই ব্যাপারে তাঁর অনুসারী কেউ আছে বলে আমাদের জানা নেই। আসলে এটা এটা বিরল কথা।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ –

যতক্ষণ না সে তাকে ছাড়া অন্য স্বামী গ্রহণ করছে।

হারাম করার লক্ষ্য তিন তালাক সঙ্ঘটিত হওয়ার স্থান। দ্বিতীয় স্বামী যখন তার সাথে সঙ্গম করবে, তখন সেই হারামকরণটা দূর হয়ে যাবে। তখন একটি মাত্র বাধা অবশিষ্ট থাকবে। আর তা হল, তখন সে অপর এক ব্যক্তির স্ত্রী। যেমন দুনিয়ার অন্যান্য মেয়েলোক, যারা কারও স্ত্রী হয়েছে, তাদের মতই। পরে এই দ্বিতীয় স্বামী থেকে যখন সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে, তখন সে প্রথম স্বামীর জন্যে (বিবাহের মাধ্যমে) হালাল হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র কথা হচ্ছে ঃ

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَّتَرَاجَعَا –

এই দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিলে (বা সে মরে গেলে) তার ও প্রথম স্বামীর কোন গুনাহ হবে না, যদি তারা পুনরায় বিবাহিত হয়।

তবে সঙ্গমকৃতার জন্যে ইদ্দত পালনের শর্ত। তা এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আর তালাক প্রাপ্তরা নিজেদেরকে তিন কুরু পর্যন্ত নতুন স্বামী গ্রহণ থেকে বিরত রাখবে। এর পর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَاتَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ -

এবং তোমরা বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পাদনের সংকল্পবদ্ধ হবে না, যতক্ষণ না নির্দিষ্ট ইদ্দত শেষ হচ্ছে। (সূরা বাকারাহ ঃ ২৩৫)

ইদ্দত চলাকালে বিয়ে নিষেধ নিয়ে আরও আয়াত এসেছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিলে তারা দুজনে পুনর্বিবাহিত হলে তাদের কোন দোষ হবে না'— তালাকের ব্যাপারে অকাট্য দলীল। আর এই স্ত্রীর প্রথম স্বামীর জন্যে হালাল হওয়া কেবল মাত্র তালাকের উপর নির্ভরশীল নয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে-কোন ধরনের বিচ্ছেদ— মৃত্যু, মুর্তাদ হয়ে যাওয়া, কিন্তু তালাক পর্যায়ের কোন রূপ হারাম হওয়ার দরুন— হলেই এ দুজন পুনরায় বিবাহিত হতে পারে, যদিও আয়াতে কেবল তালাকের কথাই বলা হয়েছে। এ আয়াত এ-ও প্রমাণ করে যে, অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াও বিয়ে জায়েয, অন্তত এই ক্ষেত্রে। কেননা আয়াতে يتراجعا বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা দুজন পুনর্বিবাহিত হবে। এতে অভিভাবকের উল্লেখ নেই।

এ আয়াতে আরও অনেক বিধান রয়েছে, তা 'খুলা' সংক্রান্ত বিধান উল্লেখের সময়ে আমরা আলোচনায় নিয়ে আসব। তবে এখানে তৃতীয় তালাক সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কেননা দুই তালাকের আলোচনার সাথে তা সঙ্গতিসম্পন্ন। 'খুলা' তালাকের ব্যাপারটি অনেকটা স্বতন্ত্র।

## খুলা (خُلْعٌ)

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَايَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ -

তোমরা স্ত্রীদের যা দিয়েছ, তা থেকে কোন জিনিস ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্যে হালাল নয়। তবে যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ই আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ কায়েম রাখতে পারবে না বলে ভয় পায় ....।

এ আয়াতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে স্ত্রীকে দেয়া দ্রব্য-সামগ্রীর মধ্য থেকে কোন কিছুই ফিরিয়ে নিতে। তবে তা নেয়ার জন্যে একটি শর্তের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সে অবস্থা হলে ফেরত নিতে পারে। এ থেকে বোঝা যায় যে, যে জিনিস স্ত্রীকে দেয়, তা নেয়া জায়েয নয়। যদিও উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু সেই জিনিস না নেয়ার, যা তাকে স্বামী দিয়েছে। এর দৃষ্টান্ত এ আয়াতাংশ وَلَاتَقُلْ لَهُمَا, "এবং পিতা-মাতাকে 'উহ' বলো না"। এ থেকে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে 'উহ' বলার চাইতেও বেশি ও কঠিন কাজ পিতা-মাতার প্রতি করা, যেমন মারধোর ও গালাগাল।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَاللّٰهِ -

তবে যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ই ভয় পায় যে, তারা দুজন আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে .....।

তায়ূস বলেছেন, এর অর্থ, আল্লাহ্‌ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে মিল-মহব্বত ইত্যাদি রক্ষা করা ফরয করেছেন, পারস্পরিকভাবে তা রক্ষা করতে না-পারার ভয়। আল-কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ-ও এরূপ তাৎপর্য বলেছেন। আল-হাসান বলেছেন, এই সব-ও এর মধ্যে পড়ে যে, স্ত্রী বলবে, আল্লাহ্‌র কসম, আমি তোমার জন্যে না-পাকি থেকে গোসল করব না। ভাষাবিদগণ বলেছেন, الا ان يخافا 'তবে তারা দুইজন ভয় পাবে'-এর অর্থ, দুইজনই মনে করবে। কেননা ভয় পাওয়ার এক অর্থ মনে ধারণা করা।

আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ রক্ষা করতে না-পারার এই ভয়ের দুটি দিক রয়েছে। হয় দুজনের একজন খারাপ চরিত্রের লোক হবে অথবা উভয়ই, যার ফলে তারা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা রক্ষা না করার অবস্থায় পৌঁছে যাবে। বিশেষ করে আল্লাহ্‌ পরস্পরের উপর বিবাহের দরুন যে হক-হকুক ও দায়-দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তা পালন করতে না পারা যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ -

(স্বামীদের উপর) স্ত্রীদের সেই সব অধিকারই আছে, যা তাদের উপর (স্বামীদের) আছে ।

হয় একজন অপর জনের ক্রোধের কারণ হবে, যার ফলে ভালো সম্পর্ক রক্ষা করা কঠিন হবে। যার দরুন আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করতে বাধ্য হবে পারস্পরিক হক আদায় করার ক্ষেত্রে। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে আগ্রহ-আকর্ষণ ও প্রেম-ভালোবাসা প্রদর্শন জরুরী, তা যদি সে দেখাতে না পারে। অথবা সেই অবস্থার সৃষ্টি হবে, যা এ আয়াতে নিষেধ করা হয়েছে ঃ

فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ -

অতএব তোমরা ভিন্ন দিকে এমনভাবে ঝুঁকে পড়বে না, যার ফলে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দিতে বাধ্য হও। (সূরা নিসা ঃ ১২৯)

এর যে কোন অবস্থাই হোক এবং এর দরুন দুজনই ভয় পাবে যে, যারা এভাবে আল্লাহ্‌ নির্ধারিত পারস্পরিক সীমাসমূহ রক্ষা করতে পারবে না, তাদের জন্যে 'খুলা' خلع -করা জায়েয ও হালাল।

জাবির আল-জাফী আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াহইয়া, আলী কাররামাল্লাহু আজহাহু সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, এমন কিছু কথা আছে, যা স্ত্রী বললে স্বামীর জন্যে 'ফিদিয়া' গ্রহণ করা জায়েয। যেমন, স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে ঃ 'আমি তোমার কথা শুনব না, মানব না; আমি তোমার জন্যে সময় ভাগ করব না, আমি তোমার সাথে সঙ্গমের নাপাকি থেকে গোসল করব না ইত্যাদি।'

মুগীরা ইবরাহীম-এর কথা বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, স্বামীর পক্ষে জায়েয নয় স্ত্রীর নিকট থেকে ফিদিয়া গ্রহণ। তবে স্ত্রী যদি স্বামীর কথা না মানে; তার কথামত না চলে, তবে তা জায়েয। কেননা এসব অপরাধ স্ত্রীর, তাই তার নিকট থেকে ফিদিয়া গ্রহণ স্বামীর জন্যে হালাল। স্বামী যদি তার নিকট থেকে ফিদিয়া গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং স্ত্রীও তা দিতে অস্বীকার করে, তাহলে দুজন সালিস পাঠাতে হবে। একজন স্বামীর পক্ষ থেকে আর অপর জন স্ত্রীর পক্ষ থেকে।

আলী ইবনে আবূ তালহা ইবনে আব্বাসের এই কথা উদ্ধৃত করেছেন ঃ স্বামীর হককে

হালকা করে দেখলে, তার সাথে খারাপ ব্যবহার করলেই আল্লাহ্র ধার্যসীমা লঙ্ঘিত হয়ে যাবে। স্ত্রী যদি বলে ঃ আল্লাহ্র কসম, আমি তোমার ভাগ ঠিক করব না, তোমার জন্যে শুয়ে দীর্ঘ হব না, তোমার কোন কথা শুনব না। স্ত্রী যদি কার্যতও তা করে, তাহলে তার নিকট থেকে ফিদিয়া নেয়া স্বামীর জন্যে হালাল হবে। তবে যা দিয়েছে, তার চাইতে বেশি নেবে না একবিন্দু। অতঃপর তাকে চলে যেতে দেবে।

খারাপ আচরণ যদি স্ত্রীর দিক থেকে হয়, তাহলে আল্লাহ্র কথা ঃ

فَانْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا -

স্ত্রীরা যদি সন্তুষ্টচিত্তে কোন জিনিস দেয় (মহরানার কোন অংশ কমিয়ে দেয়) তাহলে তোমরা তা স্বচ্ছন্দে সুস্বাদু হিসেবে খাও। (সূরা আন-নিসা ঃ ৪)

বলেছেন, যে জিনিস ক্ষতিকর নয়, যাতে ধোঁকা-প্রতারণা নেই, তা-ই স্বচ্ছন্দ ও সুস্বাদু, যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ।

আলোচ্য আয়াতটি কি মনসূখ হয়েছে ? এ পর্যায়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করা হয়েছে। হাজ্জাজ উকবা ইবনে আবুস সাহ্বা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি বকর ইবনে আবদুল্লাহ্কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তার স্ত্রী তার নিকট থেকে 'খুলা' গ্রহণ করতে চায়। তিনি বললেন, স্ত্রীর নিকট তার কিছু গ্রহণ করা জায়েয হবে না। আমি তাকে বললাম, কেন, আল্লাহ তো তাঁর কিতাবে ইঙ্গিতে বলেছেন ঃ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَ افْتَدَتْ بِهِ -

তাহলে স্ত্রী যদি ফিদিয়া বাবদ কিছু দেয়, তাহলে তাদের কোন গুনাহ্ হবে না।

বললেন, এ আয়াতটি মনসূখ হয়ে গেছে এ আয়াত দ্বারা ঃ

وَاِنْ اَرَدْ تُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰا هُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْ خُذُوْا مِنْهُ شَيْاً -

যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থানে আর একজনকে নিয়ে আসার ইচ্ছা করে থাক, আর অবস্থা এই যে, তোমরা তাদের এক-একজনকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ দিয়েছ, তাহলে তা থেকে তোমরা কিছুই গ্রহণ করবে না। (সূরা আন-নিসা ঃ ২০)

আবূ আসিম ইবনে জুরায়য থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি আতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি মনে করেন, স্ত্রী যদি জালিম হয়, খারাপ চরিত্র ও আচরণের হয়, তখন স্বামী তাকে 'খুলা' করতে বলে, তাহলে তার জন্যে তা হালাল হবে ? জবাবে বললেন, না। স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হলে তাকে স্ত্রী বানিয়ে রাখবে। আর না হয় তাকে চলে যেতে দেবে।

আবূ বকর বলেছেন, উক্ত মতটি বিরল। কুরআন ও সুন্নাতের বাহ্যিক ঘোষণার দ্বারাই তা রদ হয়ে যায়। আগের কালে ফিকাহবিদদেরও সে ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে, তা সত্ত্বেও 'যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থানে অপর স্ত্রীর বদল করতে চাও...... ' আয়াতটিতে এমন কিছু নেই যার

দরুন 'যদি তারা আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমাসমূহ কায়েম রাখতে পারবে না বলে তোমরা ভয় পাও, তাহলে স্ত্রীর ফিদিয়া দানে তাদের দুজনের কোন গুনাহ হবে না'— আল্লাহ্র এই কথা মনসূখ হয়েছে বলে মনে করা যাবে বা অবশ্যই মনসূখ হয়ে গিয়ে থাকবে। কেননা প্রত্যেকটি আয়াতে একটা বিশেষ অবস্থার উল্লেখ আছে এবং সে আয়াতটির হুকুম সেই অবস্থার মধ্যেই কার্যকর হবে। এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, 'খুলা' করা নিষিদ্ধ যখন বাড়াবাড়িটা স্বামীর দিক থেকে হবে এবং স্বামীই এক স্ত্রীর স্থানে অপর স্ত্রী গ্রহণের ইচ্ছা করবে। কিন্তু তা মুবাহ ঘোষণা করা হয়েছে যখন উভয়ই আল্লাহ নির্ধারিত সীমাসমূহ রক্ষা করতে পারবে না বলে উভয়ই ভয় পাবে। যখন স্বামী স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট ক্রুদ্ধ হবে, স্ত্রী খারাপ চরিত্রের হবে। কিংবা স্বামীই হবে চরিত্রহীন। তা সত্ত্বেও সে যদি স্ত্রীকে ক্ষতি করতে বা কষ্ট দিতে ইচ্ছুক না হলেও তারা দুজন পারস্পরিক মধুর সম্পর্ক ও পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমা রক্ষা করতে পারবে না বলে ভয় পায়, তাহলে এই অবস্থা পূর্বোক্ত অবস্থা থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর। তাতে একজন অপরজনের উপর আপত্তি তুলবে, তেমন অবস্থা নেই। তাই এর কোন একটি আয়াতের মনসূখ হওয়ার প্রশ্ন উঠতে পারে না। বিশেষীকরণেরও প্রয়োজন নেই। কেননা প্রত্যেকটি আয়াতই তার নিজ ক্ষেত্রে ও পরিবেশে পুরাপুরি ব্যবহৃত। আল্লাহ্র এই কথাটিও এই ধরনেরই ঃ

وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ -

আর তাদের বাধাগ্রস্ত করবে না, যেন তোমরা যা দিয়েছ, তার একটি অংশ নিয়ে নিতে পারে। (সূরা আন-নিসা ঃ ১৯)

এতে স্বামীদের প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের উপরই নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে স্ত্রীদেরকে তাদের দেয়া জিনিসপত্র থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া। আর তা তখন, যখন বাড়াবাড়িটা স্বামীর দিক থেকে হবে। যার উদ্দেশ্য হবে স্ত্রীকে কষ্ট দেয়া, ক্ষতিগ্রস্ত করা। তবে সে যদি সুস্পষ্ট কোন নির্লজ্জতার কাজ করে, তাহলে ভিন্ন কথা। ইবনে সিরীন ও আবূ কালাবাতা বলেছেন, এর অর্থ, স্ত্রীর থেকে ব্যভিচারের অপরাধ ঘটে। আতা, জুহরী ও আমর ইবনে শুয়াইব বলেছেন, যার পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ি হবে, তার দিক থেকে 'খুলা' জায়েয নয়, হালাল নয়। অতএব এসব আয়াতের কোনটিই অপর কোনটির দ্বারা মনসূখ হয়নি। প্রত্যেকটি আয়াতই নিজ নিজ স্থানে কার্যকর ও বহাল।

## 'খুলা' ব্যবস্থায় কি গ্রহণ হালাল

## এ ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মতপার্থক্য

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি স্ত্রীকে দেয়া জিনিসের অধিক কিছু তার নিকট থেকে গ্রহণ করাকে মাকরূহ মনে করতেন, অপছন্দ করতেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, আল-হাসান, তায়ূস ও সাঈদ ইবনে যুবায়র-ও এই মত দিয়েছেন। হযরত উমর, উসমান, ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস (রা) এবং মুজাহিদ, ইবরাহীম এবং আল-হাসানের অপর এক বর্ণনা হচ্ছে, স্বামী স্ত্রীকে যা দিয়েছে, তার চাইতে বেশি গ্রহণ করে তার মহিলা 'খুলা' করতে পারে, তা তার জন্যে জায়েয। সেই বেশিটা একটা বেনুনি হলেও হতে পারে।

আবূ হানাফী, জুফর, আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদ বলেছেন, বাড়াবাড়িটা যদি স্ত্রীর দিক থেকে হয়, তাহলে স্বামীর জন্যে জায়েয যা সে দিয়েছে, তা-ই গ্রহণ করা, তাতে এক বিন্দু বেশি হবে না। আর বাড়াবাড়িটা যদি স্বামীর দিক থেকে হয়, তাহলে 'খুলা' তালাকের বিনিময়ে স্ত্রীর নিকট থেকে কিছুই গ্রহণ করা তার জন্যে জায়েয নয়। যদি নেয়, তাহলে মূল বিচারে তা জায়েয হবে।

ইবনে শাবরামাতা বলেছেন, স্বামীর যদি ক্ষতি করার বা কষ্ট দেয়ার ইচ্ছা না থাকে স্ত্রীকে, তাহলে পারস্পরিক সম্পর্কহীনতা ও বিচ্ছিন্নতা জায়েয হবে। আর যদি স্বামীর ইচ্ছা থাকে স্ত্রীর ক্ষতি করার, তাকে কষ্ট দেয়ার তাহলে তা জায়েয নয়। ইবনে অহব মালিকের এই কথা বর্ণনা করেছেন, যদি জানা যায় যে, স্বামী স্ত্রীকে কষ্ট দিয়েছে, তার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে এবং সে স্ত্রীর জন্যে জালিম, তাহলে স্ত্রীর পক্ষে তালাক ঘটিয়ে দেবে, তার মাল যা সে স্বামীকে দিয়েছে ফিরিয়ে দিতে হবে। ইবনুল কাসিম ইমাম মালিকের এই মতের উল্লেখ করেছেন, 'খুলা' তালাকে স্বামীর জন্যে সে যা দিয়েছে তার চাইতে বেশি স্ত্রীর নিকট থেকে নিতে পারে, তা তার জন্যে জায়েয। বাড়াবাড়িটা যদি স্বামীর দিক থেকে হয়, তাহলে স্ত্রী রাজী ও সন্তুষ্ট হয়ে স্বামীকে যা দেবে, তা গ্রহণ করা স্বামীর জন্যে হালাল হবে খুলা তালাক দেয়ার বিনিময়ে। এজন্যে স্বামীর দিক থেকে স্ত্রীর কোনরূপ ক্ষতির অবকাশ থাকতে পারবে না।

লাইস থেকেও অনুরূপ মত পাওয়া গিয়েছে। সওরী বলেছেন, 'খুলা' তালাকের দাবি যদি স্ত্রীর দিক থেকে হয়, তাহলে তার নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করা স্বামীর জন্যে দোষের হবে না। আর যদি স্বামীর দিক থেকে হয়, তাহলে স্ত্রীর নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করা স্বামীর জন্যে হালাল হবে না। আওজায়ী বলেছেন, যে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে 'খুলা' করে, এরূপ অবস্থায় যে, স্ত্রী রোগাক্রান্ত, আর সে-ই যদি বাড়াবাড়ি বিদ্রোহকারী হয়, তাহলে দেয়া জিনিসপত্রের এক-তৃতীয়াংশ গ্রহণের মধ্যে তাকে থাকতে হবে। আর স্ত্রী যদি বাড়াবাড়ি ও বিদ্রোহকারী না হয়ে থাকে, তাহলে স্ত্রীর সবকিছু তাকেই ফেরত দিয়ে দেয়া হবে। স্বামীর অধিকার হবে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার। স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে 'খুলা' করে তার সাথে সঙ্গম করার আগেই, তাহলে তাতে কোন দোষ আছে বলে আমি মনে করি না। যদি তার দেয়া সবকিছু ফিরিয়ে নেয়ার ভিত্তিতেও হয় এবং বিয়ে ভেঙ্গে ফেলার ব্যাপারে উভয়ই একমত হয়। আল-হাসান ইবনে হাই বলেছেন, খারাপ ব্যবহারটা যদি স্বামীর দিক থেকে হয়, তাহলে কম বা বেশির বিনিময়ে 'খুলা' করা স্বামীর জন্যে জায়েয হবে না। পক্ষান্তরে খারাপ আচরণটা স্ত্রীর দিক থেকে হলেও স্বামীর অধিকার আদায়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি করা হয়, তাহলে উভয় যে শর্তেই ইচ্ছা 'খুলা' করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। উসমানুল-বত্তীও তাই বলেছেন। শাফেয়ী বলেছেন, স্ত্রীর যে কর্তব্য স্বামীর প্রতি তাঁর পথে স্ত্রীই বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে স্বামীর পক্ষে ফিদিয়া-বিনিময়ে 'খুলা' করা জায়েয। আর স্ত্রী খুশীর সাথে স্বামীকে যা দেবে বিয়ে বিচ্ছিন্ন না করেও, তাহলে তা গ্রহণ করা স্বামীর জন্যে জায়েয। আর কিছু দিয়ে স্ত্রী যদি স্বামীর নিকট থেকে বিচ্ছেদ গ্রহণ করে, তাহলে স্ত্রী খুশীর সাথে যা দেবে, তা গ্রহণ করা তার জন্যে হালাল।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা 'খুলা' তালাক পর্যায়ে কতিপয় আয়াত নাযিল করেছেন। তন্মধ্যে একটি হল ঃ

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا ط اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا -

আর তোমরা যদি এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করার ইচ্ছা করেই থাক, তাহলে তাকে এক স্তূপ সম্পদ দিয়ে থাকলেও তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে নেবে না। তোমরা কি দোষারোপ করে ও সুস্পষ্ট জুলুম করে তা ফেরত নেবে? (সূরা আন্-নিসা ঃ ২০)

এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় স্ত্রীকে দেয়া সম্পদ থেকে কিছুই ফেরত নিতে নিষেধ করছে। এটা তখন, বাড়াবাড়িটা যদি স্বামীর দিক থেকে হয়। এই কারণে হানাফী ফিকাহ্বিদগণ বলেছেন, এই অবস্থায় স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর নিকট থেকে কিছুই ফেরত নেয়া জায়েয নয়।

অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ -

তোমরা স্ত্রীদের যা কিছু দিয়েছ, তা থেকে বিন্দু পরিমাণও ফেরত নেয়া তোমাদের জন্যে হালাল হবে না। তবে তারা দুজনই যদি আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমাসমূহ রক্ষা করতে পারবে না বলে ভয় পায়, তাহলে ...।

এ আয়াতে আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমাসমূহ কায়েম রাখতে না পারার উভয়ের ভয়ের কারণে স্বামীর জন্যে স্ত্রীর নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করা মুবাহ্ করে দিয়েছে। আর এর মধ্যে স্ত্রীর ক্রোধ স্বামীর প্রতি, তার সাথে খারাপ ব্যবহার ও তার খারাপ চরিত্র—একজনের, বা উভয়ের এগুলো শামিল রয়েছে। তখন স্ত্রী যা দিয়ে 'খুলা' নিতে চাইবে তা গ্রহণ করা স্বামীর জন্যে জায়েয, তবে বেশি নিতে বা চাইতে পারবে না। অবশ্য বাহ্যিকভাবে আয়াতের এই তাৎপর্য বোঝা যায় যে, সবকিছু গ্রহণ করাই স্বামীর জন্যে জায়েয। কিন্তু যা বেশি হবে, তা সুন্নাত দ্বারা বিশেষীকৃত।

অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ -

জোরপূর্বক স্ত্রীদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসা তোমাদের জন্যে মোটেই হালাল নয়। এবং যে মহরানা তোমরা তাদের দিয়েছ, তাদেরকে জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়ে তার একাংশ হস্তগত করতে চেষ্টা করাও তোমাদের জন্যে হালাল নয়। কিন্তু তারা যদি কোন সুস্পষ্ট ব্যভিচারে লিপ্ত হয় .....।

বলা হয়েছে, এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে স্বামীকে এবং স্ত্রীকে যা দিয়েছে তা ফেরত নেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে স্ত্রী যদি কোন প্রকাশ্য ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। কারোর কারোর মত, এই সুস্পষ্ট ব্যভিচার বলতে 'যিনা' বুঝিয়েছে, আবার কারোর মত, স্ত্রীর দিক থেকে বাড়াবাড়ি ও বিদ্রোহ। এই কথাটি আল্লাহ্র এই কথার দৃষ্টান্ত ঃ 'তোমরা যদি ভয় পাও— আশংকা বোধ কর যে, তারা দুইজন আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমাসমূহ রক্ষা করবে না, তাহলে স্ত্রী যে ফিদিয়া দিয়েছে, তা গ্রহণ করতে কারোর উপর দোষ হবে না।

অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا -

তোমরা যদি ভয় পাও— আশংকা বোধ কর— তাদের দুজনের মধ্যে ফাটল ও ভাঙ্গন সৃষ্টির, তাহলে স্বামীর পক্ষ থেকে একজন ও স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন সালিস পাঠাও— নিযুক্ত কর। (সূরা আন-নিসা ঃ ৩৫)

এ আয়াতের হুকুম আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব। আল্লাহ্ তা'আলা এ কয়টি আয়াত ছাড়া অন্যান্য আয়াতেও দেয়া মহরানা ফিরিয়ে নেয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু 'খুলা' তালাক পর্যায়ে তার উল্লেখ করা হয়নি এই আয়াতটিতে ঃ

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ط فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا -

এবং তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মহরানাসমূহ আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে দিয়ে দাও। পরে তারাই যদি তোমাদের জন্যে সন্তুষ্টচিত্তে তা থেকে কিছু কমিয়ে দেয়, তাহলে তা তোমরা স্বচ্ছন্দ ও সুস্বাদুরূপে খাও। (সূরা আন-নিসা ঃ ৪)

বলেছেন ঃ

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّا اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ -

তোমরা স্ত্রীদের স্পর্শ করার পূর্বেই যদি তাদেরকে তালাক দাও, অথচ তোমরা তাদের জন্যে মহরানা নির্দিষ্ট করে দিয়েছ, তবে এই অবস্থায় (তালাক দিলে) তাদেরকে অর্ধেক পরিমাণ মহরানা দিতে হবে। তবে স্ত্রীরা নিজেরাই যদি অনুগ্রহ দেখায় (মহরানা গ্রহণ না করে) কিংবা যে পুরুষটির হাতে বিবাহ-বন্ধনের সূত্রটি রয়েছে, সে যদি অনুগ্রহ করে ও পূর্ণ মহরানা দিয়ে দেয়, তবে তা অবশ্য ভিন্নতর অবস্থারূপে গণ্য ...। (সূরা বাকারাহ ২৩৭)

এই সবকয়টি আয়াতই তাদের থেকে গ্রহণীয় আইন-বিধান সহ কার্যকর। অতএব আমরা বলব, বাড়াবাড়িটা স্বামীর দিক থেকে হলে, তার জন্যে জায়েয নয় দেয়া মহরানা থেকে কিছু ফেরত লওয়া। কেননা আল্লাহ্ই বলেছেন ঃ এবং তাদেরকে আটক করো না, বাধাগ্রস্ত করো না এ জন্যে যে, তোমরা তাদেরকে যে মহরানা দিয়েছ তার কিয়দংশ তোমরা ফেরত নিয়ে নেবে।

আর বাড়াবাড়িটা যদি স্ত্রীর দিক থেকে হয় কিংবা স্ত্রীর খারাপ চরিত্রের কারণে উভয়ই ভয় পেয়ে যায়, অথবা তাদের উভয়ের প্রত্যেকের দ্বারা অপর প্রত্যেকের ভয় হয় যে, তারা আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমাসমূহ রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে স্বামী মহরানা বাবদ স্ত্রীকে যা দিয়েছে তা সে ফেরত নিতে পারে, তা তার জন্যে জায়েয। তবে বেশি নিতে পারবে না।

এমনিভাবে ঃ 'এবং তোমরা তাদেরকে বাধাগ্রস্ত করো না এজন্যে যে, তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তার একাংশ ফেরত নিয়ে নেবে, তবে তারা যদি সুস্পষ্ট কোন ব্যভিচারে লিপ্ত হয় ....এর

তাৎপর্য পর্যায়ে বলা হয়েছে, যদি স্ত্রী বাড়াবাড়ি করে, বিদ্রোহ করে, তাহলে স্বামী যা তাকে দিয়েছে, তা ফেরত নিতে পারে। তার জন্যে তা জায়েয।

তবে আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তারা যদি নিজেরাই সন্তুষ্টচিত্তে তোমাদেরকে মহরানার কিছু অংশ হ্রাস করে দেয়, তাহলে তোমরা তা স্বচ্ছন্দ সুস্বাদু রূপে খাও, কথাটি 'খুলা' প্রসঙ্গের নয়। খুলা ছাড়া সাধারণ অবস্থার জন্যেই এই বিধান। তখন স্ত্রী সন্তুষ্টচিত্তে ধার্যকৃত মহরানার পরিমাণ হ্রাস করে দিতে পারে। যারা বলে যে, 'খুলা' প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় স্ত্রীর কোন কিছু গ্রহণ করা স্বামীর জন্যে জায়েয নয়, এ আয়াত অনুযায়ী তা সম্পূর্ণ জায়েয, খুলা ছাড়া অন্য অবস্থাতেও। তা কেবল 'খুলা'তে জায়েয, তা ঠিক নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে দুইটি স্থানে কথা বলেছেন। তার একটিতে নিষেধ করেছেন, তা হল, 'তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থানে অপর স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও'..... এই আয়াত। আর অপরটি আল্লাহ্‌র কথা ঃ

> তোমরা যা স্ত্রীদের দিয়েছ, তা থেকে কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্যে জায়েয নয়, তবে তারা দুজন যদি আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমাসমূহ কায়েম রাখতে পারবে না বলে ভয় পায়।

আর অপর আয়াতে তা মুবাহ ঘোষিত হয়েছে। তা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র কথা ঃ

> যদি তারা সন্তুষ্টচিত্তে স্বতঃই নির্দিষ্ট মহরানা থেকে কিছু পরিমাণ কম করে দেয়, তা হলে তোমরা তা স্বচ্ছন্দ সুস্বাদু রূপে খাও।

বোঝা গেল, 'খুলা' ছাড়া অন্য অবস্থায় স্ত্রী যদি সন্তুষ্টচিত্তে নিজেদের থেকেই ধার্যকৃত মহরানার কিছু হ্রাস করে, এটা কেবল 'খুলা' অবস্থায় জায়েয, অন্য অবস্থায় নয়, এই কথা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিপন্থী।

নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত 'খুলা' পর্যায়ে এই হাদীস। মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, আল-কানবী মালিক, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ— উমরাতা বিনতে আবদুর রহমান ইবনে সাদ ইবনে জারারাতা, হুবায়বাতা বিনতে সহল আনসারী সূত্রে এটি এসেছে। হুবায়বা বিনতে সহল সাবিত ইবনে কায়স ইবনুশ শিমাসের বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন। রাসূলে করীম (স) সকাল বেলা ঘরের বাইরে এলেন। তিনি হুবায়বা বিনতে সহলকে দরজার সামনে অস্পষ্ট আলোতে দেখতে পেলেন। রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ কে ওখানে ? বললেন, আমি হুবায়বা বিনতে সহল। বললেন, তোমার অবস্থা কি ? বললেন, না আমি, না সাবিত ইবনে কায়স এক সাথে থাকতে পারছি। পরে সাবিত ইবনে কায়স তাঁর নিকট এলে বললেন, এ হচ্ছে হুবায়বা বিনতে সহল, সে যা বলার বলেছে। হুবায়বা বললেন, হে রাসূল। আমাকে ও যা দিয়েছে, তা সব-ই আমার নিকট রয়েছে। তখন রাসূলে করীম (স) সাবিত ইবনে কায়সকে বললেন ঃ তুমি ওর নিকট থেকে ওসব নিয়ে নাও। তিনি নিয়ে নিলেন। অতঃপর হুবায়বা তাঁর পরিবারবর্গের সাথে থাকতে লাগলেন।

এ হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় 'তার পথ খুলে দাও— ছেড়ে দাও' এসেছে, কোনটিতে 'তাকে বিচ্ছিন্ন করে দাও' ব্যবহৃত হয়েছে।

কিছু সংখ্যক ফিকাহবিদ বলেছেন, স্বামী যা দিয়েছে, তার বেশি নেয়া তার জন্যে জায়েয নয়। এ পর্যায়ের হাদীস আবদুল বাকী ইবনে কানে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বল,

মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে আবূ সামীমাতা, আল-অলীদ ইবনে মুসলিম, ইবনে রাইয, আতা, ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে রাসূলে করীম (স)-এর দরবারে মামলা দায়ের করল। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ তুমি স্বামীর নিকট থেকে যা যা গ্রহণ করেছিলে তা কি ফিরিয়ে দিতে চাও ? বলল, হ্যাঁ। তার চাইতে বেশিও দিতে চাই। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ না, বেশি নয়।

হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন ঃ দেয়া জিনিসের অতিরিক্ত নেয়া যাবে না এই হাদীসটির কারণে। আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই আলোকে বিশেষীকৃত করা হয়েছে। খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কুরআনের বাহ্যিক অর্থ বিশেষীকৃত করা জায়েয। তা এই আয়াতটির দিক দিয়ে; আল্লাহ বলেছেন ঃ

তোমরা যদি আশংকা বোধ কর যে, ওরা দুইজন আল্লাহ নির্ধারিত সীমা কায়েম করবে না, তাহলে স্ত্রী যদি স্বামীকে ফিদিয়া দেয়, তাহলে দুজনার কোন দোষ হবে না।

ব্যবহৃত শব্দ কয়েকটি অর্থের সমন্বিত। ইজতিহাদ তার অবকাশ দেয়। আগের কালে ফিকাহবিদদের থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি দিনের বর্ণনা হয়েছে। আল্লাহ্‌র কথা ঃ

তোমরা ওদেরকে বাধাগ্রস্ত করো না ওদের যা দিয়েছ তার অংশ কেড়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে। তবে তারা যদি সুস্পষ্ট নিলর্জ্জতার অপরাধ করে, তাহলে ভিন্ন কথা।

এ আয়াতটিও অনুরূপ কতিপয় অর্থের ধারক। অতএব তাকে বিশেষীকরণকৃত করা সঙ্গত। এই কথাটিও ঃ 'অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে পারস্পরিক স্পর্শ করেছ।' এবং 'তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দিয়ে দাও'— এসব কয়টি আয়াতেরই বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। এর একটা তাৎপর্য বলতে আগের কালের ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। এরূপ অবস্থায় এসব আয়াতের তাৎপর্য নির্ধারণে 'খবরে ওয়াহিদ'-এর সহায়তা নেয়া খুবই সঙ্গত।

হানাফী ফিকাহবিদরা বলেছেন, যে পরিমাণ দিয়েছে তার চাইতে বেশির ভিত্তিতে যদি 'খুলা' তালাক দেয়া সাব্যস্ত করে অথবা স্বামীর দিক থেকে বাড়াবাড়ি হওয়ার সে-ই স্ত্রীকে ধন-মালের ভিত্তিতে 'খুলা' তালাক দেয়, তা মোটামুটি জায়েয হবে। যদিও স্বামীও আল্লাহ্‌র মধ্যকার ব্যাপারের দিক থেকে তার অবকাশ নেই এই দিক দিয়ে যে, স্ত্রী তা কোনরূপ বাধ্যবাধকতা ছাড়াই নিজের সন্তুষ্টচিত্ততা সহকারে দিয়ে থাকে। নবী করীম (স) বলেই দিয়েছে ঃ

لَايَحِلُّ مَالُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ اِلَّا بِطِيْبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ -

নিজের মনে খুশীতে না দিলে কোন মুসলিমের মাল গ্রহণ হালাল হবে না।

এই নিষেধাত্মক কথাটি শুধু চুক্তির তাৎপর্যের সাথেই সম্পর্কিত নয়। তার বদলে তার সম্পর্ক যে তাৎপর্যের সাথে, তা হচ্ছে সে স্বামী স্ত্রীকে সেভাবে দেয়নি, যেমন সে তার নিকট থেকে গ্রহণ করেছে। স্বামী যদি স্ত্রীকে সেভাবে দেয়, তাহলে তা অপছন্দনীয় হবে না। নিষেধ যখন চুক্তি ছাড়া অন্য কিছুর সাথে সম্পর্কিত, তখন চুক্তির বৈধতা নিষিদ্ধ হবে না। যেমন জুম'আর আযান হওয়ার পর ক্রয়-বিক্রয়, বাইরের লোকদের বিক্রয় করার জন্যে উপস্থিত কিনে রাখা ও আরোহীদের নিকট অগ্রে গিয়ে মাল ক্রয় করা।

তাছাড়া দাস-মুক্তির চুক্তি যখন অল্প বা বেশি মালের ভিত্তিতে জায়েয হতে পারে, ইচ্ছামূলক হত্যার ব্যাপারে সুলাহ্ করা ইত্যাদি, তালাক-ও তেমনি, বিয়েও তেমনি। সমপরিমাণের মহ্রানার চাইতেও বেশি ধার্য করা যখন জায়েয— মহ্রানা তো স্ত্রী অঙ্গে ব্যবহারাধিকারের বিনিময়— এমনিভাবে সমপরিমাণ মহ্রানার অধিকের উপর স্ত্রী গ্রহণ জায়েয। কেননা তা উভয় অবস্থায়ই স্ত্রী-অঙ্গের বিনিময়।

যদি বলা হয় 'খুলা' তালাক যখন বিয়ের চুক্তি ভেঙ্গে দেয়, তখন বিয়ের চুক্তি যত পরিমাণের উপর হয়েছে তার অধিকের ভিত্তিতে জায়েয হওয়া উচিত নয়। যেমন পণ্যের সঠিক মূল্যের অধিককে কম করা জায়েয নয়।

জবাবে বলা যাবে, তোমার কথা— 'খুলা' বিয়ে চুক্তি ভেঙ্গে দেয়— ঠিক নয়। তা হচ্ছে তালাক, যা সূচিত, তাতে বিনিময়ের শর্ত না করা হলেও। তা সত্ত্বেও তা কম করার অবস্থার হওয়ার ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই। স্বামী যা দিয়েছে তার কমের বিনিময়ে 'খুলা' করা হলে তা জায়েয হবে সর্বসম্মতিক্রমে। কোন দ্রব্যের ধার্য মূল্যের কম করা জায়েয নয়। কোন বিনিময় ছাড়াই 'খুলা' করা হলে তা-ও জায়েয। বেসরকারীভাবে 'খুলা' করা সম্পর্কে আগের কালের ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। আল-হাসান ও ইবনে সিরীন থেকে বর্ণিত, বেসরকারীভাবে 'খুলা' জায়েয নয়। সাঈদ ইবনে জুয়াইর বলেছেন, খুলা জায়েজ নয় যতক্ষণ না তার পূর্বে স্ত্রীকে ভালো করে বোঝানো হবে। বুঝ গ্রহণ করলে তো ভালো, অন্যথায় বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়া হবে। বুঝ গ্রহণ না করলে তাকে মারধোর করা যাবে। তার পর-ও বুঝ গ্রহণ করলে ভালো। অন্যথায় ব্যাপারটি সরকারের গোচরে দিতে হবে। সেখানে স্বামীর একজন ও স্ত্রীর একজন সালিস দিতে হবে। তারা দুজন স্বামী-স্ত্রীর কথা সরকারের গোচরীভূত করবে। তারপর সরকার দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর প্রয়োজন বোধ করলে তাই করে দেবে, যদি দুজনকে একত্রিত রাখা ভালো বিবেচিত হয়, তাহলে তাই করবে। হযরত আলী, উমর, উসমান ও ইবনে উমর (রা) এবং শুরাইহ, তায়ূস, জুহরী ও অন্যান্যরা মত দিয়েছেন, 'খুলা' তালাক জায়েয সরকারের সংস্পর্শ ছাড়াই। সরকারের সংস্পর্শ ছাড়াই 'খুলা' জায়েয— এ বিষয়ে বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ সম্পূর্ণ একমত। কুরআন মজীদ-ও তা জায়েয ঘোষণা করেছে। বলা হয়েছে ঃ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ -

স্ত্রী যদি 'ফিদিয়া' দেয়, তাহলে তাদের দুজনার কোন গুনাহ হবে না।

'এবং তোমরা স্ত্রীদেরকে বাধাগ্রস্ত করো না এ উদ্দেশ্যে যে, তোমরা স্ত্রীদেরকে যা দিয়েছ, তার কিছু অংশ কেড়ে নেবে। তবে তারা যদি কোন স্পষ্ট নির্লজ্জতার অপরাধ করে, তাহলে ভিন্ন কথা।' এ আয়াত দুটিতেই স্বামী-স্ত্রী পরস্পর রাজী হয়ে যদি স্ত্রী ফিদিয়া দেয় ও স্বামী তা গ্রহণ করে 'খুলা' তালাক দিয়ে দেয় সরকারী ব্যবস্থাপনা ছাড়াই, তাহলে তা জায়েয হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। নবী করীম (স) সাবিত ইবনে কায়সের স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ 'তুমি কি তোমার স্বামীর বাগান তাকে ফিরিয়ে দিতে চাও? বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি স্বামীকে বললেন ঃ 'তুমি তা গ্রহণ কর এবং ওকে ছেড়ে দাও।' এই কথাটিও সেই কথাই প্রমাণ করে। কেননা 'খুলা' তালাক যদি বেসরকারীভাবে কার্যকর না হতো, সরকারের হস্তক্ষেপের উপর নির্ভরশীল

হতো, তাহলে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তা চাইত বা অস্বীকার করত যখন জানা যেত যে, তারা দুজন আল্লাহ নির্ধারিত সীমাসমূহ কায়েম করবে না। কিন্তু নবী করীম (স) সে দুজনকে কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না। স্বামীকেও বললেন না যে, ওকে 'খুলা' করে দাও। বরং স্বামী-ই তাকে 'খুলা' করে দিচ্ছিল এবং তার বাগান সে ফিরিয়ে দিচ্ছিল। তারা দুজন বা তাদের একজন যদি অস্বীকার করত, যেমন পরস্পর 'লেয়ান'কারী স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছিন্নতা শাসকের উপর নির্ভরশীল ছিল না। স্বামীকে বলেন নি— ওকে যেতে দাও। বরং দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলেন। যেমন সহল ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) দুই 'লেয়ান'কারী স্বামী-স্ত্রী মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। যেমন অপর হাদীসে বলা হয়েছে ঃ 'তোমার কোন পথ স্ত্রীর উপর— তাকে ফিরিয়ে নেয়ার। সেটি স্বামীর দিকে নিয়ে যাওয়া হয়নি। এ থেকেও 'খুলা' তালাক দেয়ার ব্যাপারটি বেসরকারীভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া জায়েয প্রমাণিত হয়।

নবী করীম (স)-এর এই কথাটিও তাই প্রমাণ করে— বলেছেন, 'কারোর মাল নেয়া হালাল নয়, তবে সে যদি সন্তুষ্টচিত্তে দেয় তবে জায়েয।'

'খুলা' সম্পর্কে প্রশ্ন হচ্ছে, তা কি তালাক কিংবা তালাক নয় ? এ বিষয়ে বিভিন্ন মত আছে উমর, আবদুল্লাহ, উসমান, আল-হাসান, আবূ সালমাতা, শুরাইহ, ইবরাহীম, শবী, মকহুল প্রমুখ বলেছেন, 'খুলা' হল এক তালাক বায়েন। বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণও তা-ই বলেছেন। এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। ইবনে আব্বাস (রা) মত দিয়েছেন, 'খুলা' তালাক নয়।

আবদুল বাকী ইবনে কানে আলী ইবনে মুহাম্মাদ, আহল, অলীদ শুবা, আবদুল মালিক ইবনে মায়সারাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি তায়ূসকে 'খুলা' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ 'তা কিছুই না। আমি বললাম ঃ আপনি প্রায়ই আমাদের নিকট এমন এমন কথা বলেন, যা আমরা জানি না, বুঝি না। তখন বললেন ঃ 'আল্লাহ্র কসম, ইবনে আব্বাস (রা) দুই তালাক ও 'খুলা'র পর স্বামী-স্ত্রীকে একত্রিত করেছেন।

বলা হয়, এ ব্যাপারে তায়ূস বড় ভুল করে বসেছেন। তিনি বড় ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা ও নেককারিতা সত্ত্বেও অনেক ভুল করেছেন। এ পর্যায়ের অনেক অপছন্দনীয় বিষয় তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ 'যে লোক তিন তালাক দেবে, তা এক তালাক হয়ে যাবে।' ইবনে আব্বাস থেকে অন্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ যে লোক তার স্ত্রীকে তারকাসমূহের সংখ্যক তালাক দেবে, তার তিন তালাক বায়েন হয়ে যাবে। লোকেরা বলেছেন, আইয়ূব তো তায়ূসের এই বিপুল ভুল দেখে বিস্মিত হয়েছেন। ইবনে আবূ নুজাইহ তায়ূস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ 'খুলা' তালাক নয়। পরে মক্কাবাসীরা তাঁর এই কথার প্রতিবাদ করেছেন। সেখানকার বহু লোককে একত্রিত করা হয়। ফলে তায়ূস তাদের সম্মুখে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করেন এবং বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে এই কথা বলতে শুনেছি।

অথচ আবদুল বাকী ইবনে কানে আহমদ ইবনুল হাসান ইবনে আবদুল জব্বার, আবূ হুমাম, আল-অলীদ, আবূ সাঈদ, রূহ ইবনে জিন্নাহ জাময়াতা ইবনে আবূ আবদুর রহমান, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছিলেন ঃ রাসূলে করীম (স) 'খুলা'-কে এক

তালাক বানিয়ে দিয়েছিলেন। সাবিত ইবনে কায়সের স্ত্রী যখন তার উপর বাড়াবাড়ি ও বিদ্রোহ করল, তখন নবী করীম (স) তাকে যা বলেছিলেন, তা-ও প্রমাণ করে যে, 'খুলা' তালাক। বলেছিলেন ঃ 'তুমি ওর পথ ছেড়ে দাও।' কোন কোন বর্ণনার ভাষা হল ঃ তুমি ওকে বিচ্ছিন্ন করে দাও। একথা বলেছিলেন স্ত্রীকে স্বামীর দেয়া বাগান ফেরত দিতে বলার পর। স্ত্রী তখন বলেছিল, আমি ফেরত দিয়েছি। আর একথা জানা যে, যে লোক তার স্ত্রীকে বলবে ঃ আমি বিচ্ছিন্ন করলাম বা আমি তোমার পথ ছেড়ে দিলাম, আর তার নিয়তও হবে তাকে বিচ্ছিন্ন করা, এতে তালাক হয়ে যাবে। প্রমাণিত হল যে, শরীয়াতদাতার আদেশ স্বামীর স্ত্রীকে 'খুলা' দেয়াটা মূলত তালাক-ই। তাছাড়া স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে ঃ 'মালের বিনিময়ে আমি তোমাকে তালাক দিলাম' অথবা 'তোমার ব্যাপার আমি তোমার হাতে সপে দিলাম মালের বিনিময়ে,' তাহলে তালাক হয়ে যাবে। এতে কোন মতপার্থক্য নেই। অনুরূপভাবে স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে ঃ 'আমি তোমাকে মাল ছাড়াই 'খুলা' করে দিলাম'— বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্য নিয়ে, তাহলে তালাক হয়ে যাবে। মালের বিনিময়ে 'খুলা করলেও তাই হবে।

যদি বলা হয়, 'খুলা' শব্দ ব্যবহার করে যদি বলে, তাহলে বিক্রয়ে কম করার মতই ব্যাপার হবে। তাহলে সে বিক্রয় ভেঙ্গে যাবে, নতুন সূচিত বিক্রয় হবে না।

জবাবে বলা যাবে, মাল ছাড়াও 'খুলা' হয়, এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই। মহরানা কম করার ভিত্তিতেও 'খুলা' হতে পারে। আর বিক্রয়ে মূল্য কম করার প্রশ্নটি চুক্তির ভেতরের ব্যাপার। 'খুলা' যদি বিয়ে ভঙ্গের ব্যাপার হতো, তাহলে তা বিয়ের সময়ে নির্ধারিত মহরানার ভিত্তিতেই হতো। তা ছাড়া অন্যভাবে হতে পারত না। অথচ কোন মালের বিনিময় ছাড়া-ই যে 'খুলা' হতে পারে, এ বিষয়ে সকলেই একমত। মহরানা কম করার ভিত্তিতে 'খুলা' হলে তা তো 'মালের বদলে তালাক' হয়ে গেল। সেটা বিয়ে ভেঙ্গে দেয়া হল না। তা এবং 'আমি তোমাকে এই মালের ভিত্তিতে তালাক দিলাম' এই দুটির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

'খুলা' তালাক নয়— এ কথা যাঁরা বলেন, তাঁদের একটি দলীল হল, আল্লাহ যখন বলেছেন ঃ 'তালাক দুইবার। অতঃপর হয় রেখে দেয়া শুভ ভাবে, না হয় দয়া সহকারে চলে যেতে দেয়া'— এর পর পরই আল্লাহ্ বললেন ঃ 'তোমরা স্ত্রীদের যা দিয়েছ, তা থেকে তোমরা কিছু ফেরত নেবে, তা তোমাদের জন্যে হালাল নয়।' .... কথার ধারাবাহিকতা বলে এ পর্যন্ত পৌঁছল; অতঃপর যদি তালাক দেয়, তাহলে সে স্ত্রীর জন্যে হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে তাকে বাদে অপর একজন স্বামী গ্রহণ করবে।' এ কথায় 'খুলা'র পরে তৃতীয় তালাক প্রমাণিত হল। এটা প্রমাণ করে যে, 'খুলা' তালাক নয়। কেননা যদি তালাক হতো, তাহলে এই কথাটি চতুর্থ তালাক পর্যায়ে হয়ে যেত। কেননা দুই তালাকের পর 'খুলা'র কথা হয়েছে। পরে 'খুলা'র পর তৃতীয় তালাকের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের নিকট এটা এভাবে নয়। কেননা আল্লাহ্‌র কথা 'তালাক দুইবার' দুই তালাকের কথা বোঝায় যদি তা 'খুলা' হিসেবে নয়, অন্যভাবে ঘটানো হয়। সেই সাথে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার কথাটিও প্রমাণিত এই কথার দ্বারা ঃ 'অতঃপর রেখে দেয়া ভালোভাবে।' পরে সে দুটির হুকুম উল্লেখ করা হয়েছে যখন সে দুটি 'খুলা' রূপে হবে এবং তাতে নিষেধ ও অনুমতির স্থান থেকে সরিয়ে নেবে। যে অবস্থায় মাল গ্রহণ জায়েয হবে কি হবে না, তারও উল্লেখ হয়েছে। এর পর যোগ করা হয়েছে ঃ 'অতঃপর যদি তালাক দেয় তাহলে অতঃপর সে তার জন্যে হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে তাকে বাদে অন্য স্বামী

গ্রহণ করছে।' এতে প্রথমে উল্লেখ করা দুই তালাক একবার 'খুলা' হিসেবে এবং আর একবার 'অ-'খুলা' হিসেবে এসেছে। তাতে এমন কোন প্রমাণ নেই যে, দুই তালাকের পর 'খুলা', 'খুলা'র পরে চতুর্থ তালাক।

এটা এমন কথা, যাকে দলীল বানিয়ে বলা হয় যে, 'খুলা' গ্রহণকারীর সাথে তালাক জড়িত হয়। কেননা বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে যখন একমত হয়েছে যে, আয়াতের নির্ধারণ ও তার আইন বিধানের বিন্যাস আমাদের বর্ণনানুযায়ী এবং 'খুলা'র পর তৃতীয় তালাক পাওয়া গেছে এবং তার সজ্ঘটিত হওয়া ও হারাম হওয়াটা একটা স্থায়ী ব্যাপার— অন্য স্বামী গ্রহণের পর যদিও হালাল হতে পারে— এ থেকে প্রমাণিত হল যে, 'খুলা' গ্রহণকারিণীর সাথে তালাক থাকে, যতক্ষণ সে ইদ্দতের মধ্যে থাকবে।

'খুলা'র পর তৃতীয় তালাক প্রমাণ করা ধারাবাহিকতার আয়াত ঃ 'যদি তার পর-ও তাকে সে তালাক দেয়, তাহলে তাদের দোষ হবে না যদি তারা পুনর্বিবাহিত হয়— যদি তারা ধারণা করে যে, তারা দুজন আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমাসমূহ রক্ষা করতে পারবে।' পূর্বোল্লিখিত কথার উপর এটা সংযোজন। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমাদের জন্যে হালাল হবে না যে, তোমরা স্ত্রীদের যা দিয়েছ তা থেকে কিছু ফেরত নিয়ে নেবে। তবে যদি তারা দুজনই ভয় পায় যে, তারা দুজন আল্লাহ নির্ধারিত সীমা রক্ষা করতে পারবে না' এ আয়াতে সে দুজনার জন্যেই পুনর্বিবাহিত হওয়াকে মুবাহ ঘোষণা করা হয়েছে তৃতীয় তালাকের পর আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমা রক্ষা করতে না পারার ভয় দূরীভূত হওয়ার শর্তে। কেননা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর হয়ত তারা লজ্জিত— অনুতপ্ত হয়ে গিয়ে থাকতে পারে এবং তাদের প্রত্যেকেই প্রীতি-ভালোবাসার দিকে ফিরে আসতে চাইতে পারে, তার খুব সম্ভাবনা রয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, এই তৃতীয় তালাক খুলার পরই উল্লিখিত হয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ -

যদি তারা ধারণা করে যে, তারা আল্লাহ নির্ধারিত সীমাসমূহ কায়েম করতে পারবে।

কথাটি ইজতিহাদ জায়েয প্রমাণ করে নিত্য নব ঘটিত ব্যাপারাদিতে। কেননা কুরআনে ظَنٌّ (অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ধারণা ও বিশ্বাস)-কে মুবাহ বলা হয়েছে।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্‌র কথা ঃ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ 'পরে সে তার জন্যে হালাল হবে না।'— কথাটি স্থাপিত তালাক দুইবার' আল্লাহ্‌র কথাটির উপর এবং তা পরে যে ফিদিয়ার উল্লেখ হয়েছে, তা ছাড়া-ই।

জবাবে বলা যাবে, এই কথাটি যে ঠিক নয়, তার কয়েকটি কারণ। একটি— 'এবং তোমাদের জন্যে হালাল হবে না যে, তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে এক বিন্দু জিনিস গ্রহণ করো' দুই তালাকের উল্লেখের পর নব সূচিত সম্বোধন। এটা সে দুই তালাকের উপর বিন্যস্ত নয়। কেননা এখানে واو অক্ষর বসিয়ে সংযোজন করা হয়েছে। অবস্থা যখন এই এবং ফিদিয়ার পরে-পরে বলা হয়েছে ঃ 'তার পরে যদি স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে অতঃপর সে তার জন্যে হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে তাকে ছেড়ে আর একজন স্বামী গ্রহণ করছে'— এই

কথাটি 'ফিদিয়ার উপর বিন্যাস্ত হওয়া আবশ্যক। কেননা পরে বলা কথাটি ঠিক না এবং শুরুতে বলা দুই তালাকের উপর তার বিন্যস্ত হওয়া জায়েয নয়। কোন দলীলের দাবি ছাড়া পরবর্তীর উপর তাকে যোগ-ত্যাগও ঠিক নয়। যেমন বিশেষীকরণের শব্দ দ্বারা ব্যতিক্রম দেখানোতে বলা হয় যে, তা পরবর্তীর উপরই চাপে। তাতে আগে যা বলা হয় তাকে কোন দলীল ছাড়া রদ করা যায় না। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآءِكُمُ الَّتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ......

এবং তোমাদের স্ত্রীদের মেয়েরা, যারা তোমাদের কোলে লালিতা-পালিতা হয়েছে—সে স্ত্রীদের থেকে যাদের সাথে তোমাদের যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু (যদি শুধু বিয়ে হয়ে থাকে) যৌন সম্পর্ক স্থাপিত না হয়ে থাকে তাহলে (তাদের বদলে তাদের মেয়েদের বিয়ে করায়) তোমাদের কোন দোষ হবে না .....। (সূরা আন-নিসা ঃ ২৩)

এ আয়াতে যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার শর্ত লালিতা-পালিতা কন্যাদের উপর আবর্তিত, স্ত্রীদের মাদের উপর নয়। কেননা واو অক্ষরের পর তাদের নিকটবর্তী হিসেবে স্ত্রীদের মা'দের উল্লেখ হয়নি, যদিও তা-ই অধিক নিকটবর্তী। 'তালাক দুইবার' কথাটির উপর সংযোজন করা হয়েছে 'পরে যদি তালাক দেয়' কথাটি। যে ফিদিয়া তার পরে তা নয়। কেননা তার পরে যে ফিদিয়ার কথা তার উপর عطف বানাও না। পূর্বে বলা কথার উপর عطف বানাচ্ছ। দুটির মাঝখানে যে 'ফিদিয়া' উল্লেখ তা বাদে।

উপরন্তু আমরা عطف বানাই সে সমস্তের উপর, পূর্বে যার উল্লেখ হয়েছে, যেমন ফিদিয়া, আর তার-ও আগে এসে দুই তালাকের উল্লেখ হয়েছে ফিদিয়া হিসেবে নয়। ফলে এতে দুটি ফায়দা নিহিত। একটি দুই তালাক দিয়ে 'খুলা' করার পর স্ত্রীকে তালাক দেয়া জায়েয এবং দ্বিতীয়, দুই তালাকের পর যখন সে দুটিকে ঘটানো হবে ফিদিয়া হিসেবে নয়।

## স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে ক্ষতি সাধন—কষ্টদান

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْسَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ -

আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দেবে, অতঃপর তাদের ইদ্দতের মিয়াদ শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, যখন তাদেরকে রেখে দেবে ভালোভাবে কিংবা চলে যেতে দেবে ভালোভাবে।

আবূ বকর বলেছেন ঃ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ 'পরে তারা পৌঁছে গেছে তাদের ইদ্দতের মিয়াদের শেষ পর্যন্ত-এর অর্থ পূর্ণ বয়স্কতার নিকটবর্তী হওয়া ও তা লাভ করা বলার পেছনে কোন সত্যতা নেই। কেননা মূলে যে اجل বা মিয়াদের উল্লেখ হয়েছে, তার অর্থ ইদ্দত। আর তার পূর্ণ মাত্রায় পৌঁছা অর্থ, ইদ্দতের শেষ হয়ে যাওয়া। ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পর স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার আর কোন অবকাশ থাকে না। কুরআনের বহু স্থানেই اجل 'ইদ্দত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তারই একটি আয়াত হচ্ছে ঃ

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْفَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ -

তাদের ইদ্দত যখন শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, তখন তাদের ভালোভাবে রাখো, না হয় ভালোভাবে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দাও।

এর অর্থ পূর্বের আয়াতের যা, তা-ই। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ -

আর গর্ভধারিণী স্ত্রীদের ইদ্দত হচ্ছে তাদের সন্তান প্রসব। (সূরা তালাক্ব ঃ ৪)

বলেছেন ঃ

اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ -

তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দেবে এবং পরে তারা তাদের ইদ্দতের শেষে পৌঁছে যাবে, তখন তোমরা তাদেরকে বাধাগ্রস্ত করবে না।

বলেছেন ঃ

وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهُ -

এবং তোমরা বিবাহ-বন্ধনের সিদ্ধান্ত কখনই করবে না, যতক্ষণ না ইদ্দত পূর্ণ হবে।

এই সব আয়াতেই اجل শব্দটি 'ইদ্দত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য ঃ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ এই আয়াতে ইদ্দত শেষ হওয়া নয়, শেষ হওয়ার কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া বুঝিয়েছেন। কুরআন ও অভিধানে এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ -

তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দেবে তখন তালাক দেবে তাদের ইদ্দতের জন্যে।

(সূরা আন-নিসা ঃ ১)

এর অর্থ, তোমরা যখন তালাক দিতে ইচ্ছা করবে এবং তালাক দেয়ার নিকটে পৌঁছে যাবে, তখন তালাক দেবে ইদ্দতের জন্যে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ -

যখন তোমরা কুরআন পড়বে, তখন আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাইবে। (সূরা আন-নহল ঃ ৯৮)

এর অর্থও যখন তোমরা কুরআন পড়ার ইচ্ছা করবে। বলেছেন ঃ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا 'তোমরা যখন কথা বলবে, তখন ন্যায়বিচার করবে।' কথা বলার পর ন্যায়বিচার করবে— এটা অর্থ নয়। বরং কথা বলার পূর্বেই এই সংকল্প করবে যে, বলবে না, বলবে কেবল ন্যায়পরতার কথা। এই প্রেক্ষিতেই اجل শব্দের উল্লেখ বুঝতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে, কথা বলার কাছাকাছি যাওয়া। কথা বলে শেষ করার পর ন্যায়পরতা করা নয়। আলোচ্য আয়াতে তার কাছাকাছি যাওয়া অর্থ ভালোভাবে তাকে রাখার কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া। যদি বিয়ে স্থিত থাকা সমস্ত সময়ই 'ভালোভাবে রাখা' স্বামীর কর্তব্য। কেননা তার-ই নিকটে রাখা হয়েছে تَسْرِيْحٌ অর্থাৎ ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার ব্যাপার। দুজনকে (ভালোভাবে রাখার) আদেশ ও চলে যেতে

দেয়া দুটোরই একই অবস্থা। তা স্থায়ী হয় না। 'মিয়াদ' পৌঁছে যাওয়া অবস্থাকে বিশেষীকরণকৃত হয়েছে, যেন দুটি ব্যাপারেই 'ভালোভাবে' হওয়া সমন্বিত হয়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ فَامْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ 'অতএব তাদেরকে ভালোভাবে রাখে।' এর অর্থ, ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া। ইবনে আব্বাস (রা) আল-হাসান, মুজাহিদ ও কাতাদাতা থেকে তা বর্ণিত।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ اَوْسَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ 'অথবা তাদেরকে চলে যেতে দাও ভালোভাবে।' এর অর্থ, স্ত্রীকে ফিরিয়ে না নেয়া, ফিরিয়ে নেয়ার কাজটা ত্যাগ করা বা না করা, ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত। আয়াতে 'ভালোভাবে রাখা' মুবাহ্ করা হয়েছে। আর তার বাস্তব রূপ হচ্ছে, স্ত্রীর হক যথাযথভাবে আদায় করা— এ বিষয়ে ব্যাখ্যা পূর্বে করা হয়েছে। সেই সাথে تَسْرِيْحٌ চলে যেতে দেয়াকেও মুবাহ করা হয়েছে। তা এমনভাবে হতে হবে যা 'ভালোভাবে' হয়েছে এই অভিধা পেতে পারে। তা এই যে, তাকে ক্ষতি করা বা কষ্ট দেয়ার কোন ইচ্ছাই করা হবে না। ফিরিয়ে নিয়ে তার ইদ্দতকে দীর্ঘ করা হবে না। এর পর-পরই বলা হয়েছে ঃ وَلَاتُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا 'তাদেরকে ক্ষতি করা বা কষ্ট দান স্বরূপ রেখে দেবে না।' ভালোভাবে বিচ্ছিন্নকরণের তাৎপর্য এ-ও হতে পারে যে, তাকে চলে যেতে দেয়ার সময়ে তাকে জীবনোপকরণ (মাত'আ) দেয়া হবে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'হয় তাদের রাখা হবে ভালোভাবে, না হয় দয়া সহকারে তাদের চলে যেতে দেয়া হবে' কে দলীল বানিয়ে কোন কোন লোক বলছে যে, ভরণ-পোষণ দিতে অক্ষম ও সামান্য আয়ে স্বামী ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়া কর্তব্য। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা স্বামীকে দুটি কাজের যে কোন একটি করার ইখতিয়ার দিয়েছেন। হয় রাখবে ভালোভাবে, না হয় চলে যেতে দেবে দয়া সহকারে। স্ত্রীর ভরণ-পোষণ না দেয়া বা দিতে না পারা 'ভালোভাবে রাখার' পর্যায়ে গণ্য হয় না। তাই ভরণ-পোষণ দিতে স্বামী অক্ষম হলেই তার নির্দিষ্ট কর্তব্য হয় 'স্ত্রীকে দয়া সহকারে চলে যেতে দেয়া'। এরূপ অবস্থায় সরকার তাদের দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবে।

আবূ বকর বলেছেন, এটা একটা চরম মূর্খতা। এই আয়াতটিকে দলীল বানিয়ে যে লোক একথা বলতে চাচ্ছে, তার কথা অগ্রহণযোগ্য। ভারণ-পোষণ দিতে অক্ষম স্বামীও স্ত্রীকে ভালোভাবে রাখতে পারে। কেননা এরূপ অবস্থায় স্ত্রীকে ভারণ-পোষণ দেয়ার দায়িত্ব নেই। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰهُ اللّٰهُ ط لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآاٰتٰهَا ط سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا -

যার রিযিকের পরিমাণ কমিয়ে দেয়া হয়েছে, সে তার পরিবারের জন্যে ব্যয় করবে তা থেকে, যা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন। আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেন না— দেন শুধু এতটা যা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন। অবশ্য আল্লাহ সংকীর্ণতা ও অভাবের পর সহজতা (সচ্ছলতা) এনে দেবেন। (সূরা আত্-তালাক্ব ঃ ৭)

অতএব অক্ষম-দরিদ্র স্বামী তার স্ত্রীকে ভালোভাবে রাখতেও অক্ষম, এমন কথা বলা জায়েয নয়। হ্যাঁ, ভালোভাবে না রাখা,— রাখা কিন্তু ভালোভাবে নয়, এটা নিন্দনীয়, কিন্তু যে অক্ষম, তার ভরণ-পোষণ করতে না পারা অ-নিন্দনীয়। যদি ভরণ-পোষণ অক্ষম স্বামী স্ত্রীকে ভালোভাবে রাখতে না পারে, তাহলে আসহাবে সুফফা ও দরিদ্র সাহাবীগণ নিজেদের ও পরিবারবর্গের খরচাদি যোগাড় করতে অক্ষম হয়ে তাদেরকে ভালোভাবে রাখেন নি, বলা যাবে না। আমরা জানি যে, ভরণ-পোষণে সক্ষম বহু স্বামী তাদের স্ত্রীদের ভালোভাবে রাখছে না। ভরণ-পোষণে অক্ষম স্বামী ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো যেতে পারে না। এ আয়াতের ভিত্তিতে তা ঘটানো কর্তব্য বলে ফতোয়া দেয়া জায়েয হতে পারে না। কেননা স্ত্রীদের ভালোভাবে না রাখার অপরাধী কেবল গরীব স্বামীরাই নয়, অনেক সচ্ছল ধনী স্বামীরাও সে অপরাধে অপরাধী। এটা কথার পার্থক্যের ব্যাপার মাত্র। আল্লাহ্‌র কথা হচ্ছে ঃ 'তোমরা স্ত্রীদেরকে ক্ষতি করার— কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে রেখে দেবে না, (এজন্যেও নয়) যেন তোমরা (তাদের প্রতি) বাড়াবড়ি করতে পার।

মসরুক, আল-হাসান, মুজাহিদ, কাতাদাতা ও ইবরাহীম থেকে বর্ণিত হয়েছে তালাক দেয়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে, তার ইদ্দত শেষের দিকে পৌঁছার সময় আবার তালাক দিয়ে নতুন করে ইদ্দত পালনে বাধ্য করা, আবার ইদ্দত শেষ হয়ে এলে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আবার তালাক দেয়া। এটা রীতিমত ক্ষতিকর ও কষ্টদান। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ –

যে লোক এরূপ কাজ করবে, সে আসলে নিজেরই উপর জুলুম করে।

এ থেকে বোঝা গেল, ক্ষতি করা ও কষ্টদানের উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলেও সে ফিরিয়ে নেয়াটা সহীহ হবে। তা না হলে আল্লাহ যে বললেন, সে নিজেরই উপর জুলুম করে, তা তো হতে পারে না। কেননা ফিরিয়ে নেয়াটা বেহুদা হয়েছে। তার কার্যকরতা কিছু নেই। অথচ আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا –

তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াত-বিধানসমূহকে খেলনার বস্তু বানিও না।

উমর, আল-হাসান ও আবুদ দারদা থেকে বর্ণিত, বলেছেন, এক ব্যক্তি এমন ছিল যে, সে তার স্ত্রীকে তালাক দিত, আবার ফিরিয়ে নিত। আর বলত ঃ 'আমি তো খেলা করছি মাত্র। এর পরই আল্লাহ্ এ আয়াতটি নাযিল করেন ঃ 'তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াত-বিধানকে খেলনার বস্তু বানিও না।' তখন রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ 'যে লোক তালাক দেবে বা আযাদ করবে কিংবা বিয়ে করবে আর বলবে, আমি খেলা করছিলাম, তাহলে সে মহা অন্যায়কারী। আবুদ-দারদা জানিয়েছেন, এটাই হচ্ছে আয়াতের ব্যাখ্যা। এই বিষয়েই আয়াতটি নাযিল হয়েছে। বোঝা গেল, তালাক নিয়ে খেলা করা, তা বারবার করা সমান অপরাধ! ফিরিয়ে নেয়াও অনুরূপ। কেননা তার উল্লেখ হয়েছে, রেখে দেয়া বা চলে যেতে দেয়ার আদেশের পর-পরই। অতএব এ দুজন সম্পর্কেও সেই কথা। নবী করীম (স) তাঁর উক্ত কথাটি দ্বারা বিষয়টিকে অত্যন্ত বলিষ্ঠ করে দিয়েছেন। আবদুর রহমান ইবনে হুবায়ব আতা, ইবনে মাহীক, আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ -

তিনটি কাজ এমন যা গুরুত্ব দিলে গুরুত্ব পাবে। আর তা নিয়ে তামাশা করলেও গুরুত্ব পাবে। তা হল, তালাক, বিয়ে ও তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

اَرْبَعٌ وَاجِبَاتٌ عَلَى كُلِّ مَنْ تَكَلَّمَ بِهِنَّ : الْعِتَاقُ وَالطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالنُّذُرُ -

চারটি বিষয় বাধ্যতামূলক যে-ই সে বিষয়ে কথা বলবে তার উপর। তা হল, দাস মুক্তকরণ, তালাক দেয়া, বিয়ে করা ও মানত মানা।

জাবির আবদুল্লাহ ইবনে লুহাই আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

ثَلَاثٌ لَايَلْعَبُ بِهِنَّ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالصَّدَقَةُ -

তিনটি জিনিস এমন, যা নিয়ে কখনও খেলা করতে নেই। তা হল— তালাক, বিয়ে সাদকা দেয়া।

আল-কাসিম ইবনে আবদুর রহমান আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

اِذَا تَكَلَّمْتَ بِالنِّكَاحِ فَاِنَّ النِّكَاحَ جَدُّهُ وَلَعْبُهُ سَوَاءٌ، كَمَا اَنَّ جِدُّ الطَّلَاقُ وَلَعْبُهُ سَوَاءٌ -

তুমি যখন বিয়ে-শাদীর কথা বলবে, মনে রাখবে, তা খাঁটিভাবে বলা এবং খেলার ছলে বলা সবই অভিন্ন ঠিক যেমন তালাকের কথা খাঁটি ভাবে বলা এবং তা নিয়ে খেলা করা সমান।

বহু সংখ্যাক তাবেয়ীন থেকেও এই বর্ণনাই পাওয়া গেছে। বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদদের মধ্যে এ নিয়ে কোন মতপার্থক্য আছে বলে আমরা জানি না। জোরপূর্বক তালাক লওয়ার ব্যাপারটি এই মৌল নীতির উপর ভিত্তিশীল। কেননা এ বিষয়ে খাঁটিভাবে কথা বলা ও তামাশা করে বলা সমান। অবশ্য ইচ্ছা ও নিয়তের দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকে। একজন মুখে যা বলে, তা-ই তার ইচ্ছাও, কিন্তু অপরজন হয়ত তালাক ঘটানোর ইচ্ছায় বলে না। কিন্তু নিয়ত এ ব্যাপারে মুখের কথার ক্রিয়াকে রোধ করতে পারে না। তালাক দেয়ার জন্যে যার উপর জোর প্রয়োগ করা হয়েছে, সে মুখে উচ্চারণ করলেও নিয়ত ও ইচ্ছা তার তা থাকে না, যা মুখে উচ্চারিত হয়। কিন্তু তাতে মুখের কথার মূল্য নষ্ট হয় না। বোঝা গেল, এ ব্যাপারে শর্ত হচ্ছে মুখে উচ্চারণ কিসের হচ্ছে, তার।

## অভিভাবক ছাড়াই বিয়ের অনুষ্ঠান

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ -

তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দেবে, পরে তাদের ইদ্দতের মিয়াদ শেষ হয়ে যাবে, তখন তোমরা তাদেরকে তাদের স্বামী গ্রহণে বাধাগ্রস্ত করবে না।

এর প্রকৃত পক্ষেই ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত পৌছে যাওয়া। عضل শব্দের দুটি অর্থ। একটি, নিষেধ করা। আর অপরটি সংকীর্ণতার সৃষ্টি করা। আরবী ভাষায় বলা হয় ঃ

عَضَلَ الْقَضَاءُ بِالْجَيْشِ -

বিচারকার্য সৈন্যদের দ্বারা বন্ধ বা বাধাগ্রস্ত করা।

الْأَمْرُ الْمُعْضَلُ 'প্রতিরুদ্ধ ব্যাপার'। আর সংকীর্ণতার অর্থে বলা হয় ঃ عَضَلْتُ عَلَيْهِمُ الْأَمْرَ 'আমি তাদের উপর ব্যাপারটি সংকীর্ণ বা কঠিন করে দিয়েছি।' عَضَلَتِ الْمَرْأَةُ بِوَلَدِهَا 'আমি মেয়েলোকটিকে তার সন্তানসহ বন্ধ করে দিয়েছি। আসলে দুটি অর্থই কাছাকাছি। কেননা নিষিদ্ধ কাজ কঠিন ও দুঃসাধ্য। সংকীর্ণ হয়ে যায় কাজের সুযোগ বরং তা শেষ হয়ে যায়। আর الضيق সংকীর্ণ করার অর্থও নিষিদ্ধ করা। বর্ণিত হয়েছে, শবীকে একটা কঠিন বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তখন তিনি বললেন ঃ

زَبَاءُ ذَاتِ وَبَرِ الاَ تُنْسَابَ وَلَاتنقاد، وَلَوْنَزَلَتْ بِاَصْحَابِ مُحَمَّدٍ لَاَعْضَلَتْ بِهِمْ -

আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَلَاتَعْضُلُوهُنَّ এবং তাদেরকে বাধাগ্রস্ত কর না। অর্থাৎ তাদেরকে নিষেধ কর না। বিয়ে করার কাজটিকে তাদের জন্যে সংকীর্ণ করে দিও না। এই আয়াতটির কতগুলো দিক রয়েছে। কোন মেয়ে যদি অভিভাবক বা তার অনুমতি ছাড়াই নিজে নিজে বিবাহিত হয়, তাহলে তা জায়েয হবে— এ কথা এই আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। একটি, আয়াতের বিয়ে কর্মটি সেই মেয়েলোকদের নিজেদের বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে অভিভাবকের অনুমতির কথাও বলা হয়নি। দ্বিতীয়, স্বামী-স্ত্রী বিয়েতে প্রস্তুত হয়ে গেলে তখন সে কাজে বাধা দিতে স্পষ্ট নিষেধ করা হয়েছে।

যদি প্রশ্ন তোলা হয়, অভিভাবক যদি তাদেরকে বিয়ে করতে নিষেধ করার অধিকারী না হয়, তাহলে সে তো কখনই তা করতে নিষেধ করতে পারবে না। যেমন নিঃসম্পর্কে কোন ব্যক্তির— যার অভিভাবকত্ব নেই— নিষেধ করার অধিকার নেই, তাহলে অভিভাবক ও সম্পর্কহীন ব্যক্তি অভিন্ন হয়ে গেল ?

জবাবে বলা যাবে, এ কথাটা ঠিক নয়। কেননা নিষেধ হক না থাকার কথা বলে যে কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে শুধু সেই কাজে। তাহলে তা হক প্রমাণের দলীল হতে পারে কিভাবে ? উপরন্তু অভিভাবকের অধিকার আছে মেয়েদেরকে ঘরের বাইরে যাওয়া থেকে নিষেধ করা এবং বিয়ে চুক্তিতে যোগাযোগ না করতে বলার। তাহলে নিষেধ করতে যে নিষেধ করা হল, তা শুধু এই বিয়ে করার ব্যাপারে প্রযোজ্য। অর্থাৎ বিয়ে করতে নিষেধ করতে পারবে না। এ আয়াতটি আরও প্রমাণ করে যে, মেয়েরা যখন কুফুতে নিজেদের বিবাহিত করবে, তখন তা করতে নিষেধ করতে অভিভাবককে নিষেধ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে নিষেধ করার অধিকার তার নেই। যেমন সুদী কারবার ও অনৈসলামী চুক্তি করতে যদি নিষেধ করা হয়, তাহলে যে-কাজ করতে যথারীতি নিষেধ করা হয়েছে, সে কাজে নিষেধ করার অভিভাবকের কোন হক থাকতে পারে না। অতএব তা ভেঙ্গে দেয়ারও তার কোন অধিকার নেই। তারা যদি বিচারকের নিকট মামলা নিয়ে যায়, তখন বিচারক যদি এই ধরনের চুক্তি করতে নিষেধ করে, তাহলে সে জালিম হবে, নিষেধকারী হবে সেই কাজ থেকে, যার নিষেধ করা তার জন্যে নিষিদ্ধ। তাতে

তার হক বাতিল হয়ে যায়, ভেঙ্গে দেয়া যায়। অতএব সে চুক্তি থাকবে। তা ভেঙ্গে দেয়ার অধিকার কারোর নেই। ফলে তা কার্যকর হবে, জায়েয হবে।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্ তা'আলা অভিভাবককে বাধা দিতে নিষেধ করেছেন, যখন তারা নিজেরা পারস্পরিকভাবে রাজী হয়ে যাবে শুভভাবে তখন। তাহলে বোঝা গেল, অ-অভিভাবক যদি তার আক্‌দ করে, তাহলে ভালোভাবে হচ্ছে না।

জবাবে বলা যাবে, আমরা জানলাম, কোন কাজ যখন ভালোভাবে হবে, তখন অভিভাবকের আক্‌দ জায়েয হবে না। তা এ জন্যে যে, আয়াতের অকাট্য দলীল হল, স্ত্রীর নিজের আক্‌দ জায়েয। অভিভাবককে নিষেধ করা হয়েছে, যেন সে তাকে নিষেধ না করে। তাহলে ভালোভাবে হওয়ার অর্থে স্ত্রীর আক্‌দ বৈধ না হওয়া গ্রহণ করা জায়েয হতে পারে না। কেননা তাতে আয়াতের আদেশ পালিত হবে না। তা হতে পারে যদি এ আয়তটি মনসূখ হয়ে গেছে বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু একটি ভাষণে মনসূখ ও মনসূখকারী উভয়ের অবস্থিতি জায়েয নয়। মনসূখ হওয়া কার্য হয় কোন হুকুম প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত হওয়ার পর, তার পূর্বে নয়। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, তাদের দুজনের রাজী হওয়ায় যে ভালোভাবে হওয়ার শর্ত তা অভিভাবক বা তার অনুমতি নয়। উপরন্তু বিয়ের বিকল্প বা বদল, যা মহরানার পরিমাণের দিকে ফিরে যায়। আর তা হচ্ছে সমপরিমাণ মহরানা। তাতে কোনরূপ কম হতে পারে না। এই কারণে আবূ হানীফা বলেছেন ঃ 'সেই স্ত্রী যদি সমপরিমাণ মহরানার কম ধার্য করে, তা হলে অভিভাবকের অধিকার আছে বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো।' অভিভাবক ছাড়াও যে বিয়ে হতে পারে, এ আয়াত ছাড়া অন্য আয়াতেও তার উল্লেখ আছে। যেমন বলা হয়েছেঃ

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ -

অতঃপর সে যদি তাকে তালাক দেয়, তাহলে অতঃপর সে তার জন্যে হালাল হবে না, যতক্ষণ না তাকে বাদে অপর স্বামী বিয়ে করবে।

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَّتَرَاجَعَا -

অতঃপর সে যদি তাকে তালাক দেয়, তাহলে তারা দুজন পুনর্বিবাহিত হলে তাদের কোন দোষ হবে না।

এই দলীলটিতে দুটি দিকের সমন্বয় ঘটেছে, যেমন পূর্বে বলেছি। তার একটি হল আয়াতে বিয়ের কাজটি স্ত্রীর বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর দ্বিতীয়, পুনর্বিবাহিত হওয়ার ব্যাপারটিও পুরুষ ও স্ত্রীটির কাজ বলা হয়েছে, দুটি আয়াতের কোথাও অভিভাবকের উল্লেখ হয়নি।

কুরআনে এ পর্যায়ের আরও অনেক দলীল রয়েছে। তার মধ্যে এ আয়াতটি উল্লেখ্য ঃ

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِىْ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

তারা যখন তাদের ইদ্দতের শেষে পৌছে যাবে, তখন তারা নিজেরা নিজেদের ব্যাপারে যথার্থ নিয়মে যে কার্যক্রম গ্রহণ করবে, তাতে তোমাদের উপর কোন দোষ চাপবে না।

এ আয়াত অনুযায়ী স্ত্রীদের নিজেদের ব্যাপারে কার্যক্রম গ্রহণ করার পূর্ণ ইখতিয়ার তাদের নিজেদের। তাতে অভিভাবকের কোন ভূমিকার একবিন্দু শর্ত নেই। বিয়ের আক্‌দ সহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে অভিভাবকের উপস্থিতির কোন আবশ্যকতা নেই বলে জানিয়েছে।

যদি বলা হয়, এরূপ বলে তাদের স্বামী গ্রহণের ইখতিয়ারের কথাই বলা হয়েছে। স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিয়ে তার উপর চাপানো যেতে পারে না। এতটুকুই মাত্র।

জবাবে বলা যাবে, এ কথা ভুল। তার দুটি কারণ। একটি হল ব্যবহৃত শব্দের সাধারণ তাৎপর্য স্বামী গ্রহণের ব্যাপারে ও অন্যান্য বিষয়ে। আর দ্বিতীয় হল, স্বামী বাছাই করার দ্বারা স্ত্রীর নিজের ব্যাপারে কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছুই লাভ হয় না। তা লাভ করা যায় বিয়ের আকদ ঘটানোর দ্বারা যার সাথে বিয়ের যাবতীয় আইন-কানুনের সম্পর্ক। আয়াতে স্বামী বাছাই ও আক্‌দ ঘটানো— দুটিরই ইখতিয়ার স্ত্রীকে দেয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ –

যখন তারা দুজন পারস্পরিকভাবে রাজী হয়ে যাবে সুষ্ঠু নিয়ম অনুযায়ী।

## এ ব্যাপারে মতপার্থক্য

অভিভাবক ছাড়া স্ত্রীলোকের নিজের বিয়ে নিজে নিজে সম্পাদনের ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, স্ত্রীর অধিকার রয়েছে, কুফুতে নিজে নিজেকে বিয়ে দিতে পারে। তাতে মহরানা পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করবে। তাহলে তাতে অভিভাবকের কিছুই বলবার বা আপত্তি করবার থাকতে পারে না। ইমাম জুফরও এই কথাই বলেছেন। যে যদি অ-কুফুতে নিজেকে বিয়ে দেয়, তাহলেও তার বিয়ে জায়েয হবে। তবে তখন তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর অধিকার অভিভাবকদের থাকবে।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি হাফসা বিনতে আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকরকে আল-মুনযির ইবনুয যুবায়রের নিকট বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু হাফসার পিতা আবদুর রহমান সেখানে অনুপস্থিত ছিল। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের মত হল অভিভাবক ছাড়াই বিয়ে সম্পূর্ণ জায়েয। মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন, শবী, জুহরী ও কাতাদাতারও এই মত। আবূ ইউসূফ বলেছেন, অভিভাবক ব্যতীত বিয়ে জায়েয হবে না। হ্যাঁ, অভিভাবক যদি মেনে নেয়, তাহলে সে বিয়ে জায়েয বিবেচিত হবে। আর অভিভাবক যদি তা মেনে নিতে অস্বীকার করে, অথচ স্বামী কুফু হয় তাহলে কাযী সে বিয়েকে জায়েয ঘোষণা করবে। বিয়েটা আসলে তখনই— কাযীর অনুমোদনক্রমেই— বৈধ হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মাদেরও এই মত। আবূ ইউসূফের ভিন্ন মত বর্ণিত হয়েছে। তবে তাঁর সর্বজনবিদিত মতটি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ইমাম আওজায়ী বলেছেন, স্ত্রী যদি নিজের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করে এবং কুফুতে কোন ব্যক্তিকে বিয়ে করে তাহলে তা জায়েয হবে। অভিভাবকের কোন অধিকার থাকবে না তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর। ইবনে আবূ লায়লা, সওরী, আল-হাসান ইবনে সালিহ ও শাফেয়ী বলেছেন, অভিভাবক ব্যতীত বিয়ে হতে পারে না। ইবনে শাবরামাতা বলেছেন, বিয়ে জায়েয হবে না, আর মা কন্যার অভিভাবক হতে পারে না। মেয়ে অপর কোন ব্যক্তিকেও নিজের অভিভাবক বানাতে পারে না। তবে মুসলিম কাযী অভিভাবক হতে পারে। ইবনুল কাসিম ইমাম মালিকের মত বর্ণনা করেছেন, মেয়ে যদি দাসত্বমুক্ত হয় কিংবা হয় মিসকীন, অথবা নীচ বংশের যে, তার কোন বিপদাশংকা নেই, তাহলে যে-কোন ব্যক্তিকে নিজের প্রতিনিধি বানাতে পারে, যে তাকে বিয়ে দেবে। তাহলে জায়েয হবে। মালিক এ-ও বলেছেন,

যে মেয়ের ধন-মাল আছে, যে ধনী ও মান-মর্যাদা সম্পন্না, তার বিয়ে অভিভাবক ছাড়া হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় কিংবা তার বিয়ের দায়িত্ব সরকার বহন করবে। মালিক এটাকে জায়েয বলেছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি মেয়েলোকটির রক্ত সম্পর্কের হয়— যদিও অপর কেউ তার চাইতেও নিকটবর্তী, তবু সে সেই মেয়েকে বিয়ে দিতে পারে। যে মেয়ে অভিভাবক ছাড়া বিবাহিত হবে, তার চাইতে উত্তম ব্যক্তি যদি অন্য কেউ হয়, তাহলে ব্যাপারটি সরকারের গোচরীভূত হতে হবে। যদি সে বিয়ে কুফুতে হয়ে থাকে, তাহলে সরকার সে বিয়েকে বৈধ করে দেবে; কিন্তু সে বিয়েকে ভেঙ্গে দিতে পারবে না। এটা ইমাম লাইসের কথা।

তবে এসব কথাই কিন্তু পূর্ণ বয়স্কের বিয়ের ব্যাপারে। সাওদা অভিভাবক ছাড়াই বিয়ে করেছিল। লাইস বলেছেন, তা জায়েয। অপূর্ণ বয়স্ক বা কুমার-কুমারীকে অভিভাবক নয়— এমন ব্যক্তি যদি বিয়ে দেয়, আর তার অভিভাবক কাছাকাছিও উপস্থিত থাকে, তাহলে ব্যাপারটি অভিভাবকের উপর ন্যস্ত থাকবে। কোন কারণ দেখাতে পারলে সরকার সে বিয়েকে ভেঙ্গে দেবে। তবে তাকে যে লোক বিয়ে দিয়েছে, তার তুলনায় অভিভাবকই সেজন্যে উত্তম ব্যক্তি।

আবূ বকর বলেছেন, এ পর্যন্ত কুরআনের আয়াতসমূহ দ্বারা মেয়ের বিয়ে জায়েয হওয়ার পর্যায়ে মত প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছে, তা সবই এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফার মতের সত্যতা ও সঠিকত্ব প্রমাণ করে। সুন্নাতের দিক দিয়ে উল্লেখ— ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীস। মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবঝ দাউদ, আল-হাসান ইবনে আলী, আবদুর রাযযাক, মামার, সালিহ ইবনে কায়মান, নাফে ইবনে যুবায়র ই}নে মুতয়িম, ইবনে আব্বাস সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ –

পূর্ণ বয়স্কের বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবকের কিছুই করার নেই।

আবূ দাউদ বলেছেন, আহমাদ ইবনে ইউনুস ও আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিমা উভয়ই মালিক, আবদুল্লাহ ইবনুল ফযল, নাফে ইবনে যুবায়র ইবনে আব্বাস সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا –

পূর্ণ বয়স্ক ছেলেমেয়েরা তাদের নিজেদের ব্যাপারে তাদের অভিভাবক অপেক্ষা বেশী অধিকার সম্পন্ন।

রাসূলের কথা ঃ 'পূর্ণ বয়স্কের ব্যাপারে অভিভাবকের কিছুই করণীয় নেই' বিয়ে সম্পাদনে অভিভাবকের ভূমিকাকে প্রত্যাহার করেছে। আর তাঁর 'পূর্ণ বয়স্ক ছেলেমেয়ে নিজেদের ব্যাপার তাদের অভিভাবকদের অপেক্ষা বেশি অধিকার সম্পন্ন' কথাটি তাদের নিজেদের সিদ্ধান্তের বিয়েতে বাধা দানের অধিকার হরণ করেছে। যেমন নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ –

প্রতিবেশী তার নিজের ঘর-সংসারের ব্যাপারে বেশি অধিকার সম্পন্ন।

রাসূলে করীম (স) এক অল্প বয়স্কের মাকে বলেছিলেন ঃ

اَنْتَ اَحَقُّ بِهٖ مَا لَمْ تَنْكَحِىْ -

তুমি নিজে যতদিন স্বামী গ্রহণ না করছ, ততদিন এই বালক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তুমিই বেশি অধিকার সম্পন্না।

পুত্রের ব্যাপারে মার হক চিরস্থায়ী নয়। সে মা অন্যত্র বিয়ে না বসা পর্যন্ত সেই অধিকার থাকবে। অতঃপর থাকবে না। জুহরী কর্তৃক সহল ইবনে সাদ থেকে বর্ণিত হাদীস-ও তাই প্রমাণ করে। একটি মেয়েলোক নিজেকে রাসূলে করীমের জন্যে উৎসর্গ করে। তিনি বলেছিলেন, আমার মেয়েলোকের কোন প্রয়োজন নেই। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল ঃ 'হে রাসূল, ওকে আমার সাথে বিয়ে দিয়ে দিন। তখন নবী করীম (স) মেয়েলোকটিকে সেই ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিলেন। তখন তিনি মেয়েলোকটিকে তার কোন অভিভাবক আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেন নি। তার বিয়ে সঠিকত্বের জন্যে অভিভাবকের উপস্থিতিরও কোন শর্ত করেন নি। নবী করীম (স) নিজে উম্মে সালমার নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। উম্মে সালমা (রা) বলে পাঠালেন, আমার কোন অভিভাবক নেই যে সাক্ষী হবে। নবী করীম (স) বললেন ঃ তোমার অভিভাবকদের মধ্য থেকে কেউ উপস্থিত নেই, কেউ অনুপস্থিত-ও নেই, যে আমাকে বাধ্য করবে। তখন উম্মে সালমা তার অল্প বয়স্ক পুত্রকে বললেন ঃ 'উঠ, তোমার মাকে তুমি রাসূলে করীম (স)-এর সাথে বিয়ে দিয়ে দাও।' তখন সে উম্মে সালমা (রা)-কে রাসূলে করীম (স) -এর সাথে কোন ওলী—অভিভাবকের উপস্থিতি ছাড়াই বিয়ে দিল।

যদি বলা হয়, নবী করীম (স) নিজেই যেহেতু উম্মে সালমার অভিভাবক ছিলেন। বস্তুত যে মেয়ে নিজেকে রাসূলের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার অভিভাবক তিনিই। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ -

নবী মুমিনদের তাদের নিজেদের তুলনায় অনেক বেশি অধিকার সম্পন্ন।

জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, মুমিনদের ব্যাপারে তাদের নিজেদের অপেক্ষাও অনেক বেশি অধিকার সম্পন্ন বিশেষ করে সেই সব ব্যাপারে, যে সব ব্যাপারে তাঁর অনুসরণ বাধ্যতামূলক। তাঁর আদেশের আনুগত্যের ব্যাপারে তিনি অনন্য। কিন্তু মুমিনদের নিজস্ব কাজ-কর্মে ও ধন-মালের ব্যাপারে রাসূল (স) তাদের নিজেদের অপেক্ষা বেশি অধিকার সম্পন্ন নয়। লক্ষণীয়, উম্মে সালমা (রা) যখন বলে পাঠালেন, আমার কোন অভিভাবক নেই যে সাক্ষী হতে পারে, আপনার-ও অভিভবাক কেউ নেই, তখন রাসূলে করীম (স) তাঁকে বলেন নিঃ আমি তোমার ব্যাপারে তাদের অপেক্ষা বেশী অধিকার সম্পন্ন। বরং বলেছেন, অভিভাবকদের মধ্যে কেউ নেই যে আমাকে বাধ্য করতে পারে। এতে প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (স) মেয়েদের বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে তাদের অভিভাবক নন। একটু চিন্তা-বিবেচনা করলে এটাও প্রমাণিত হবে যে, ব্যক্তি যখন তার ধন-মাল বৈধভাবে আচরণ করবে, তখন তার নিজের বিয়েটাও নিজে করতে পারবে, তা সম্পূর্ণ জায়েয। এ ব্যাপারে সকলেরই ঐকমত্য রয়েছে। মেয়েদের ব্যাপারও তেমনি, যেমন পুরুষদের ব্যাপারে এই মাত্র বললাম। পুরুষ মানুষ যদি পাগল হয়, তাহলে তার ধন-মালে সে বৈধ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তখন তার বিয়েও সে নিজে করতে পারে না, জায়েয হবে না। কাজেই আমাদের বক্তব্যের সঠিকত্ব প্রমাণিত হল।

এই ব্যাপারে যাঁরা বিপরীত মত পোষণ করেন, তাঁরা একটি হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। হাদীসটি শরীফ সামাক, আবূ আখি মাকাল ইবনে ইয়াসার, মাকাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মাকালের বোন একজনের নিকট বিবাহিতা ছিলেন। সে তাঁকে তালাক দেয়। পরে সেই ব্যক্তি তাঁকে ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছা করে। তখন মাকাল তাতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ -

তোমরা তোমাদেরকে তাদের স্বামীদের বিয়ে করতে নিষেধ করো না, বাধা দিও না।

আল-হাসান থেকেও এই ঘটনার বর্ণনা এসেছে। আয়াতটি কথিত উপলক্ষেই নাযিল হয়েছিল। নবী করীম (স) মাকাল (রা)-কে ডেকে তার বোনকে বিয়ে করতে দেবার আদেশ করেছিলেন। কিন্তু হাদীস বর্ণনাশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞদের নিকট এই হাদীসটি প্রমাণিত নয়। কেননা সনদে সামাক যার নিকট থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, সেই ব্যক্তি অজ্ঞাত পরিচয় (مجهول)। আর আল-সানা বর্ণিত হাদীসটি মুরসাল, আর যদি তা প্রমাণিত হয়, তবু কুরআনের আয়াত যে বিয়েকে জায়েয বলেছে, তাকে 'না' করতে পারত না। মাকাল এই কাজ করেছিলেন, পূর্ণবয়স্কা বোনের ইচ্ছামত বিয়েতে বাধা দিয়েছিলেন, তখন আল্লাহ্‌ই তাঁকে সে কাজ করতে নিষেধ করেছিলেন। ফলে বাধা দানের তার অধিকার রহিত হয়ে গেছে। অতএব আয়াতের বাহ্যিক অর্থই দাবি করছে যে, মূলত আয়াতটির সম্বোধন হচ্ছে স্বামীদের প্রতি। কেননা আল্লাহ্‌র কথাটি হচ্ছে ঃ

তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দেবে, তারপর তারা ইদ্দত পালন শেষ করবে, তখন তাদেরকে বাধাগ্রস্ত করো না।

'তোমরা বাধাগ্রস্ত করো না' কথাটি তো তালাকদাতা স্বামীদেরকে লক্ষ্য করে বলা। এই যখন প্রকৃত অবস্থা তখন তার অর্থ হবে, তাদের ইদ্দতকে দীর্ঘ করে দিয়ে তাদের স্বামী গ্রহণের পথে বাধার সৃষ্টি করো না। যেমন অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا -

তোমরা তাদেরকে ক্ষতি করা ও কষ্টদানস্বরূপ আটকে রেখো না বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্য।

অবশ্য 'তোমরা বাধাগ্রস্ত করোনা'র সম্বোধন অভিভাবকদের প্রতিও হতে পারে। হতে পারে আগের স্বামীদের প্রতি, সর্বসাধারণ মানুষের প্রতিও হতে পারে। আয়াতে কথটি সাধারণভাবেই এসেছে বলে এই সকলের প্রতিই সম্বোধন হতে পারে।

অপর একটি বর্ণনাকেও তাঁরা দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَيُّمَا امْرَاَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -

যে মেয়ে-ই অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে নিজে বিয়ে করবে, তার বিয়ে বাতিল— অকার্যকর।

অপর একটি বর্ণনাও রয়েছে ঃ لَانِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ -

অভিভাবক ছাড়া বিয়ে নেই, হতে পারে না।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (স)-এর এই কথা বর্ণনা করেছেঃ

لَاتُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَانَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِى تُزَوِّجُ نَفْسَهَا -

কোন স্ত্রীলোক অপর স্ত্রীলোককে বিয়ে দেবে না, কোন স্ত্রীলোক নিজেকেও বিয়ে দেবে না। কেননা ব্যভিচারিণী নিজেকে বিয়েই দিয়ে থাকে।

প্রথমোক্ত হাদীসটি প্রমাণিত হয়। তাহাভী গ্রন্থের শরহে আমি তার কারণসমূহ বিস্তারিত বলেছি। অন্য শব্দেও বর্ণনাটি এসেছে। যেমনঃ

اَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهَا -

যে মেয়েলোক তার অভিভাবক ছাড়াই বিয়ে বসবে ......।

এটা আমাদের মত এবং আমাদের এই মত সেই দাসী সম্পর্কেও, যে তার মনিবের অনুমতি ব্যতীত নিজেই নিজের বিয়ে দেবে। রাসূলের কথাঃ "অভিভাবক ছাড়া বিয়ে নেই' কথাটি মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে বাধা হতে পারে না। কেননা এটি আমাদের মতে অভিভাবকের উপস্থিতিতে বিয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের অভিভাবক। ঠিক যেমন পুরুষ মানুষ নিজেরাই নিজেদের অভিভাবক। কেননা পরিভাষায় 'ওলী' ولى তো সে, যে তার অধীনস্থ লোকের উপর অভিভাবকত্ব লাভ করে। মেয়েরাও এই অভিভাবকত্ব লাভ করতে পারে। নিজেদের কাজে-কর্মে হস্তক্ষেপ ও কর্তৃত্ব করতে পারে, পারে তার ধন-মালে। তার কোন আংশিক ব্যাপারেও পারে। তবে আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি 'অপছন্দনীয়' অর্থে ব্যবহৃত হবে। কেননা বিয়ের মজলিসে মেয়েদের উপস্থিতি পছন্দনীয় নয়। কেননা বিয়েটা তো প্রকাশ্যভাবে হতে হবে। এই কারণে লোকেরাই মজলিসে মেয়েদের উপস্থিতির ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা-বিবেচনা করবে। আর আবূ হুরায়রার নিজের কথা হিসাবে 'ব্যভিচারিণী নিজেকে বিয়ে দেয়' বলা হয়েছে। আবূ হুরায়রা বর্ণিত অপর হাদীসে বলা হয়েছেঃ আবূ হুরায়রা নিজে বলেছেনঃ বলা হয়, 'ব্যভিচারিণী নিজে নিজেকে বিয়ে দেয়।' কিন্তু এই কথাটি ভুল এ প্রসঙ্গে। কেননা উক্ত মতে মুসলিম উম্মতের 'ইজমা' রয়েছে। কেননা কোন মেয়ের নিজেকে বিয়ে দেয়া নিশ্চয়ই যিনা নয়। কেবল মুসলমানই তাকে যিনা বলে না। তাতে সঙ্গম কাজের উল্লেখ হয়নি। যদি বলা হয়, মেয়ে নিজেকে বিয়ে দিয়েছে, স্বামী তার সাথে সঙ্গম করেছে, তবে তা-ও যে যিনা নয়, এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই। কেননা অভিভাবক ছাড়া বিয়েকে যে লোক জায়েয বলে না, সে বড়জোর বলবে, সে বিয়ে ফাসিক— ভালোভাবে হয়নি। তাতে মহরানা ধার্য হবে, ইদ্দত পালিত হবে, স্বামী সঙ্গম করলে ও সন্তান হলে তার বংশধারা প্রমাণিত ও স্বীকৃত হবে। তাহাভীর শরহে এই বিষয়টি আমি সবিস্তারে আলোচনা করেছি।

আল্লাহ্র কথাঃ

ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ اَطْهَرُ -

তোমাদের জন্যে এই কাজ অত্যন্ত পরিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা সম্পন্ন।

অর্থাৎ মেয়েদের বিয়েতে বাধা না দেয়া কাজটি। কেননা এ কাজ করতে বাধা দিলে বড়

নিষিদ্ধ কাজ করতে মানুষকে বাধ্য করা যেতে পারে। বিয়ের আক্‌দ না করেই সঙ্গমে লিপ্ত হতে পারে। তাই বক্তব্য হচ্ছে নবী করীম (স)-এর এই হাদীসের।

তিনি বলেছেন ঃ

اِذَا اَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ، اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ -

তোমাদের নিকট এমন ব্যক্তির বিয়ের প্রস্তাব যদি আসে, যার দ্বীন পালন ও চরিত্র তোমরা পছন্দ কর, তা হলে মেয়েকে তার নিকট বিয়ে দাও। যদি তা না কর, তাহলে দুনিয়ায় ফিতনা হবে, হবে বিরাট বিপর্যয়।

আবদুল বাকী ইবনে কানে মুহাম্মাদ ইবনে শাযান— মুয়াল্লা— হাতিম ইবনে ইসমাইল, আবদুল্লাহ ইবনে হরমুজ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَاَنْكِحُوْهُ، اِلَّا تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ -

তোমাদের নিকট যদি এমন লোক আসে, যার দ্বীন পালন ও চরিত্রকে তোমরা পছন্দ কর, তাহলে তার বিয়ে দাও। যদি তা তোমরা না কর, তাহলে দুনিয়ায় ফিতনা ও ব্যাপক বিপর্যয় দেখা দেবে।

## দুধ সেবন

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ -

সন্তান প্রসবকারী মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছরকাল দুধ খাওয়াবে।

আবূ বকর বলেছেন, বাহ্যত আয়াতটির কথা যেন একটি খবর। কিন্তু কথার ধরন দেখেই বোঝা যায়, এ কথার দ্বারা কোন খবর দেয়াই উদ্দেশ্য নয়। কেননা খবর হলে সে খবর কাকে দেয়া হল তা স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। সন্তান প্রসবকারিণীদের মধ্যে এমন মায়েরা রয়েছে, যারা তাদের সন্তানদেরকে দুধ খাওয়ায় না। তাই বোঝা গেল, এটা নিছক কোন খবর নয়। এটা যে একটা খবর মাত্র নয়, সে বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই। যে শব্দ খবর বহন করে এনেছে, তা প্রকৃত লক্ষ্য নয়, তখন এটা মার প্রতি দুধ সেবন করানোর একটি হুকুম না হয়ে যায় না। আর আরবী ভাষায় খবর দানের ভঙ্গীতে আদেশ দেয়ার রীতি চালু রয়েছে। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ -

তালাক প্রাপ্তারা তিন কুরু সময় পর্যন্ত নিজেদেরকে ইদ্দত পালনে অপেক্ষা রত রাখবে।

প্রথমোক্ত আয়াতে মার জন্যে দুধ খাওয়ানোর হক প্রমাণ করাই আসল উদ্দেশ্য। পিতা যদি তা অস্বীকারও করে কিংবা দুধ খাওয়ানো বাবদ ব্যয় নির্ধারণ করতে যদি প্রস্তুতও না হয়, তবু মার হক রয়েছে তার সন্তানকে দুধ খাওয়ানোর। অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ -

যদি মায়েরা তোমাদের জন্যে দুধ খাওয়ায়, তাহলে তোমরা তাদের মজুরী দিয়ে দাও।
(সূরা আত্-তালাক্ব ঃ ৬)

অন্য আয়াতে বলেছেন ঃ

وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ -

আর তোমরা (পারিশ্রমিক ঠিক করার ব্যাপারে) যদি পরস্পরকে অসুবিধায় ফেলতে চাও, তাহলে বাচ্চাকে অপর কোন স্ত্রীলোক স্তন দেবে। (সূরা আত্-তালাক্ব ঃ ৬)

এ থেকে বোঝা গেল, মা চাক আর অস্বীকার করুক, তবু তাকেই দুধ খাওয়াতে বাধ্য করতে হবে। দুধ খাওয়ানো বা না-খাওয়ানোর ব্যাপারে তার পূর্ণ ইখতিয়ার রয়েছে। এমতাবস্থায় অন্য দুটি দিক থাকে। তা হচ্ছে, পিতা যদি মার দুধ খাওয়াতে অস্বীকার করে, তাহলে পিতাকে বাধ্য করতে হবে। দুই বছর কাল ধরে খাওয়ানোর বাধ্যতামূলক খরচ বহন যদি বেশীও হয়, তবুও। দুধ খাওয়ানোর ব্যয় বেশি পরিমাণে বহন করতে পিতা যদি অস্বীকার করে তাহলে তাকে সেজন্যে বাধ্য করা যায় না। এর পর একটি মাত্র উপায় থাকে। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে দুধ খাওয়াবে।' এটা সব মার জন্যে সাধারণ কথা। তারা তালাকপ্রাপ্তা হতে পারে, না-তালাক প্রাপ্তাও হতে পারে। অথবা এই কথার পূর্বে যে তালাক প্রাপ্তাদের উল্লেখ হয়েছে, তার সাথে যোগ করা কথাও এটা হতে পারে। যদি এর লক্ষ্য হয় সমস্ত মায়েরা— তালাক প্রাপ্তা ও বিবাহিতারা। বিবাহিতাদের জন্যে জরুরী ব্যয় হচ্ছে স্ত্রীত্বের ভরণ-পোষণ ও বস্ত্র দান। এটা দুধ খাওয়ানোর জন্যে নয়। কেননা স্ত্রী হওয়ার কারণে সে দুধ খাওয়ানোর জন্যে স্বতন্ত্র কিছু পাওয়ার অধিকারী নয়। ফলে তার জন্যে দুটি ব্যয় একত্রিত হবে। একটি সন্তানের পিতার স্ত্রী হওয়ার কারণে। আর অপরটি দুধ খাওয়ানোর জন্যে। যদি সে তালাকপ্রাপ্তা হয়, তাহলে সে দুধ খাওয়ানোর ব্যয়টা অবশ্য পেতে পারে আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে। কেননা তাকে দুধ খাওয়াতে বাধ্য করা হয়েছে। এ অবস্থায় সে সন্তানের পিতার স্ত্রী নয়। তার থেকে তালাক প্রাপ্তির কারণে ইদ্দত পালন রতও নয়। কেননা এই কথাটিতে যোগ করা হয়েছে এই কথার উপর ঃ 'আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দেবে, পরে তারা পৌঁছে যাবে তাদের ইদ্দতের শেষ মিয়াদে, তখন তোমরা তাদেরকে তাদের স্বামীদের বিয়ে করতে বাধা দিও না।' তাই তখন সে যথারীতি ইদ্দত পালন শেষ করে ফেলেছে সন্তান প্রসব দ্বারা, তখন দুধ খাওয়ানোর মজুরী হিসেবে সে ব্যয় পাওয়ার অধিকারী হবে। এ-ও হতে পারে যে, তালাক দেয়া হয়েছে সন্তান প্রসবের পর। তখন হায়য হিসেবে তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে।

দুধ খাওয়ানোর খরচ ও ইদ্দতকালীন খরচ একসাথে দিতে হলে কি করা হবে— এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। এ পর্যায়ের দুটি বর্ণনায় একটিতে বলা হয়েছে, সে দুটিই একসাথে পাবে। আর অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে, ইদ্দত পালনকালীন খরচা পাওয়ার সাথে সাথে দুধ খাওয়ানো বাবদ কিছুই পাবে না। অবশ্য উদ্ধৃত আয়াত এই দুটি অর্থেরই ধারক। একটি হল, মা তার সন্তানকে দুই বছর কাল ধরে দুধ খাওয়ানোর বেশি অধিকারী। পিতার অধিকার নেই সন্তানকে দুধ খাওয়ানোর জন্যে তার পরিবর্তে অন্য কাউকে

নিযুক্ত করার। অবশ্য যদি সে দুধ খাওয়াতে রাজী হয়। আর দ্বিতীয়, দুধ খাওয়ানোর খরচা বাবদ পিতার উপর যা বাধ্যতামূলকভাবে ধার্য হয় তা হচ্ছে মাত্র দুই বছর। আয়াতের দলীলের স্পষ্ট যে, পিতা দুধ খাওয়ানোর খরচায় শরীক নয়। কেননা আল্লাহ— এই খরচ বাধ্যতামূলক করেছেন পিতার উপর সন্তানের মা'র জন্যে। এ সময় সে এবং সন্তান উভয়ই সন্তানের পিতার উত্তরাধিকারী। দুজন মীরাসে শরীক হলেও মা'র তুলনায় পিতাকেই অধিক বাধ্য করেছেন দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করার জন্যে। খরচ বহনের জন্যে বিশেষভাবে পিতাকে বাধ্য করার মূল কথাই হচ্ছে এই। অন্য কাউকে সেজন্যে দায়ী করা হয়নি। ছোট বয়সের ও বড় বয়সের অপ্রতিষ্ঠিত সন্তানের খরচের যাবতীয় ব্যাপারে পিতা-ই দায়িত্বশীল। এ কাজে তার সাথে অন্য কেউ শরীক নয়— উদ্ধৃত আয়াতই তার দলীল।

আল্লাহ্র কথা ঃ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ 'তাদের রিযিক এবং পরিধেয় যথারীতি দেয়ার দায়িত্ব'— স্ত্রী থাকা পর্যন্ত তার এই সবই স্বামীকে বহন করতে হবে। এটাই এই আয়াতের বক্তব্য। কেননা আয়াত তো স্ত্রীও তালাক প্রাপ্তা, সব সন্তান প্রসবকারী মাকেই এর মধ্যে শামিল করেছে। আর আল্লাহ্ কথা ঃ بِالْمَعْرُوْفِ 'যথারীতি' কথাটি বোঝায় ব্যক্তি অবস্থানুপাতে তাকে এই খরচা ও পোশাক দেয়ার দায়িত্ব পালন করতে হবে। যদি আর্থিক অনটনে থাকে, তাহলে যতটা সম্ভব, আর সচ্ছলতার সময়ে সাধ্যানুসারে। কেননা এই অভাবগ্রস্ত পুরুষকে তার সাধ্যের বেশি দিতে বাধ্য করে না। আর সচ্ছল ব্যক্তিকেও বাধ্য করে না পার্থক্য করতে। অবশ্য তা 'যথেষ্ট পরিমাণে' হওয়া আবশ্যক, এটাও আয়াতের দাবি— স্বামীর অবস্থানুযায়ী। আল্লাহ্ নিজেই তার পরে পরেই সে কথাটি বলে দিয়েছেন ঃ لَاتُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا 'সাধ্যের অতীত কিছু করার কোন দায়িত্ব কাউকেই দেয়া হয় না।' সাধারণ প্রচলিত ও অভ্যাসগত মাত্রার চাইতে বেশি খচর করা যদি স্ত্রীর চাহিদা হয়, তবে তা দেয়া হবে না। অনুরূপভাবে তারই মতে স্ত্রীর প্রয়োজন মাত্রার কম যদি দেয় স্বামী, তাহলে তা তার জন্যে হালাল হবে না, বরং সেই মান অনুযায়ী ব্যয় করতে স্বামীকে বাধ্য করা হবে। এ আয়াতে এ কথারও দলীল রয়েছে যে, খোরাক-পোশক দেয়ার ভিত্তিতে সন্তানের লালন-পালনের জন্যে ধাত্রী নিযুক্ত করাও জায়েয। কেননা উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ যার ব্যবস্থা করেছেন, তা হল দুধ খাওয়ানোর মজুরী দান। আল্লাহ একথা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন এ আয়াতে ঃ

فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْ هُنَّ اُجُوْرَهُنَّ -

যদি তারা (তালাক দেয়া স্ত্রীরা) তোমাদের জন্যে সন্তানকে দুধ খাওয়ায়, তাহলে তোমরা তাদের মজুরী দাও।

এ আয়াত একথারও প্রমাণ যে, নিত্যনব ঘটিত ব্যাপারাদিতে ইজতিহাদ করা অত্যন্ত জরুরী। কেননা যে মেয়েলোক সন্তানকে দুধ খাওয়াবে, তার জন্যে প্রচলিত বাজার দর হিসেবে ব্যয় পরিমাণ নির্ধারণ করা যাবে না, তা করার জন্যে চিন্তা-বিবেচনা করতে হবে এবং ন্যায়পরতার ভিত্তিতে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে। আর এটাই ইজতিহাদ। বিশেষত এ প্রয়োজন এজন্যেও যে, তা সাধারণ অভ্যাস ও প্রচলনের উপর অধিকাংশ লোকের মতের ভিত্তিতে করতে হয়। আর যা যা সাধারণ অভ্যাসের উপর ভিত্তিশীল, তা নির্ধারণের উপায় হচ্ছে ইজতিহাদ ও প্রবলতর ধারণা। কেননা অভ্যাসটা একটি মাত্র পরিমাণের উপর দাঁড়ায় যা এমন

যে, তার বেশিও হতে পারবে না, কম-ও হতে পারবে না। অন্য দিক দিয়ে তা ইজতিহাদের উপর ভিত্তিশীল। আর তা হচ্ছে স্বামীর সচ্ছলতা ও অ-সচ্ছলতায় তার অবস্থার বিবেচনা, সেই 'কিফায়াত' পরিমাণ নির্ধারণ। সম্ভবতার দিকটিও সামনে রাখা। কেননা আল্লাহ তো বলে-ই দিয়েছেন যে, 'সাধ্যের অতীত কারোর উপরই দায়িত্ব চাপানো হয় না।' আর সচ্ছলতার ব্যাপারটিও সাধারণ অভ্যাসের উপর ভিত্তিশীল।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'সাধ্যের অতীত কাউকে দায়িত্ব দেয়া হয় না' যারা মনে করে যে, স্বামীকে বাধ্য করতে হবে, তাদের ধারণাকে বাতিল প্রমাণ করে। তাদের ধারণা, আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে এমন এমন কাজের দায়িত্ব দেন, যা করার সাধ্য তাদের নেই। আসলে এটা আল্লাহ্‌ সম্পর্কে একটা চরম মিথ্যা কথা অথচ আল্লাহ্‌ এদের কথার হীনতা ও নির্বুদ্ধিতার অনেক ঊর্ধ্বে, পরম পবিত্র।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ -

কোন মাতার ক্ষতি করা হবে না তার সন্তানের কারণে এবং কোন পিতারও ক্ষতি করা হবে না তার সন্তানের কারণে।

আল-হাসান, মুজাহিদ ও কাতাদাতা বলেছেন ঃ এ আয়াতে দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে পারস্পরিক ক্ষতি সাধনের কথা বলা হয়েছে। সাঈদ ইবনে যুবায়র ও ইবরাহীম বলেছেনঃ দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারটি কোন ব্যবস্থার উপর দাঁড়িয়ে গেলে মাকে ইখতিয়ার দিতে হবে।

আবূ বকর বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে, মাকে তার সন্তানের জন্যে ক্ষতির মধ্যে ফেলা হবে না এভাবে যে, সম্পর্কহীন মেয়েলোক সে সন্তানকে যেমন করে দুধ খাওয়াবে, সে যদি রাজী হয় তাহলে সে-ও ঠিক সেইভাবে দুধ খাওয়াবে, আর সেই রকমই তাকেও মজুরী দেয়া হবে, তা ঠিক নয়, বরং সে অনেক উচ্চতর মর্যাদা পাবে, যেমন এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَنْ لَا دَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِلَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

সন্তান প্রসবকারিণী মায়েরা তাদের সন্তানকে দুধ খাওয়াবে পূর্ণ দুই বছর— তার জন্যে যে, দুধ পান করাটাকে পূর্ণ করতে চায়। আর পিতার উপর দায়িত্ব হবে সেই মাদের খোরপোশ দেয়া শুভ নিয়মে।

এ আয়াতে গর্ভধারিণী মাকে তার সন্তানকে দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে অধিক অধিকার সম্পন্ন বানিয়ে দেয়া হয়েছে এই দুই বছর কাল ধরে। পরে আল্লাহ তাঁর কথার দ্বারা সে কথার উপর তাগিদ করেছেন, বলেছেন, 'মার ক্ষতি করা হবে না তার সন্তানের দ্বারা। অর্থাৎ মা যদি দুধ খাওয়াতে রাজী হয়, যেমন করে সে ছাড়া অন্য কেউ তাকে দুধ খাওয়াবে, তাহলে সন্তানের পিতার কোন অধিকার থাকবে না মার কোনরূপ ক্ষতি করার। এবং সন্তানকে তাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে দুধ খাওয়াবার জন্যে দিতে পারবে না। একথাটি তেমনই, যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَانْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ -

মা'রাই যদি সন্তানকে তোমাদের জন্যে দুধ খাওয়ায়, তাহলে তাদের প্রাপ্য মজুরী তাদেরকে দাও।

এ আয়াতেও মাকেই দুধ খাওয়ানোর জন্যে উত্তম সাব্যস্ত করা হয়েছে। এরপর বলেছেন ঃ

وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰى -

যদি তোমরা পরস্পর কষ্ট দিতে ইচ্ছা কর, তাহলে অবশ্যই অন্য কেউ দুধ খাওয়াবে।

অর্থাৎ দুধ খাওয়ার ব্যাপার মার অধিকার প্রত্যাহার করা হয়নি। হ্যাঁ, যদি কষ্ট দেয়ার ইচ্ছা হয়, তাহলে অন্যকে দুধ খাওয়ানোর জন্যে নিযুক্ত করা যাবে। এ কথাটির তাৎপর্য এ-ও হতে পারে যে, মা যদি সন্তানকে দুধ খাওয়ানোর দায়িত্ব গ্রহণ না-ই করে, তাহলেও তার সন্তানের কারণে তার ক্ষতি সাধন করা হবে না। তা হতে পারে এভাবে যে, তার কোল থেকে তার সন্তান কেড়ে নেয়া হবে। এরূপ অবস্থায় নিযুক্ত ধাত্রীকে মার নিকট থেকে তাকে দুধ দিবার জন্যে প্রস্তুত করতে স্বামীকে আদেশ করা হবে। হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ তা-ই বলেছেন। মার নিকট থেকে তার সন্তানকে কেড়ে নিয়ে তার ক্ষতি করার— তাকে কষ্ট দেয়ার কথাটিও আয়াতে সমন্বিত রয়েছে এবং অন্যকে তাকে দুধ খাওয়ানোর জন্যে নিযুক্তও করা যেতে পারে— যাতে মার মানসিক কষ্ট দান হবে। এই কারণে আয়াতটির কথাটির উভয় অর্থই করতে হবে। তাহলে অন্য মেয়েলোক দুধ খাওয়ানোর কাজে নিযুক্ত করা থেকে স্বামীকে বিরত রাখা যাবে, যদি মা-ই তাকে দুধ খাওয়াতে রাজী হয়ে যায় যথার্থ মজুরীর বিনিময়ে। আর তা হল খোরাক-পোশাক প্রচলিত নিয়মে ভালোভাবে। আর সে যদি দুধ খাওয়াতে রাজী না হয়, তাহলে ধাত্রী— দুধ দায়িনী মেয়েলোক— মা'র বাড়িতে থেকে শিশুকে দুধ খাওয়াবার জন্যে নিযুক্ত করতে স্বামীকে বাধ্য করা হবে। যেন মাকে তার সন্তানের কারণে কষ্ট দেয়ার ক্ষতিকর পথ বন্ধ হয়ে যায়।

এ আয়াতে এ দলীলও রয়েছে যে, মা অধিক অধিকার রাখে তার সন্তানকে ধরে রাখার, যতদিন সে ছোট থাকবে। দুধ খাওয়ার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেও। কেননা তারপরে-ও শিশুর লালন-পালনে মারই অধিক প্রয়োজন। আর দুধ না খেলেও শিশুর জন্যে মার বর্তমানতা একান্তই আবশ্যক, যেমন পূর্বে ছিল। দুধ খাওয়ানোর সময় মা যেমন সন্তানের উপর বেশি অধিকার রাখে, দুধদায়িনী অন্য কেউ হলেও। জানা গেল, মার নিকট শিশু সন্তানের অবস্থানের ব্যাপারে মার অনস্বীকার্য হক রয়েছে। সন্তানেরও হক তাই। মা-ই তো শিশু সন্তানের প্রতি অধিক দয়ার্দ্র হৃদয়। মার টানও সন্তানের প্রতি অন্যদের অপেক্ষা অনেক বেশি। শিশুর ক্ষেত্রে আমাদের মতে ব্যাপারটি এইরূপ যে, শিশু-পুত্রের মনের দাবি হল, সে একা খাবে, একা পান করবে। সে একাই অযূ করবে। আর কন্যা সন্তানের জন্যে এই ব্যবস্থা তার পূর্ণ বয়স্কা হওয়া পর্যন্ত চলতে হবে। কেননা শিশু পুত্র যদি এতটা বড় হয় যে, এখন তার আদব-কায়দা ও লেখা-পড়া শেখা প্রয়োজন, তার প্রাথমিক বুদ্ধির উদয় হয়েছে, তখন পিতার পরিবর্তে তার মার কাছে থাকা বাচ্চারই ক্ষতির কারণ। পিতার জন্যেও তা কষ্টকর। তদুপরি তার শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন অধিক তীব্র। এরূপ অবস্থাকে সামনে রেখেই নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مُرُوْهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِيْ الْمَضَاجِعِ -

তোমাদের সন্তান সাত বছর বয়সের হলে তাকে নামায পড়তে আদেশ কর। দশ বছর বয়সে প্রয়োজন হলে মারপিট কর। আর তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন শয্যায় শোবার ব্যবস্থা করে দাও।

অর্থাৎ সাত বছর হলেই তাকে নামায শেখাতে ও আদব-কায়দা জানাতে হবে। কেননা এ সময় সে এসব বুঝতে পারে। এভাবে অন্যান্য জরুরী বিষয়ের শিক্ষা দান এই সময় থেকেই শুরু করতে হবে। এই অবস্থায় বাচ্চার তার তালাকপ্রাপ্তা মার নিকট থেকে যাওয়া তার নিজের জন্যে ক্ষতিকর। যেসব কারণে বাচ্চার ক্ষতি হয় তাতে তার উপর কারোর অভিভাবকত্ব থাকে না। কন্যা সন্তানের অবস্থা ভিন্নতর। উক্ত অবস্থায় তার মার নিকট থাকাটা তার জন্যে ক্ষতিকর নয়। অবশ্য তার হায়য হওয়া অর্থাৎ পূর্ণ বয়স্কা হওয়া পর্যন্ত বরং সেটা তার জন্যে উপকারী ও কল্যাণকরই হয়। কেননা এই বয়সে তার নারী চরিত্র ও নারী জীবনের নিয়ম-কানুন, দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষা লাভ জরুরী এবং তা মার নিকট থেকেই উত্তমভাবে শিখতে পারে। তার উপর এই অভিভাবকত্ব চলতেই থাকে। তার পূর্ণ বয়স্কতা লাভ করার পর-ই তা নিঃশেষ হয়ে যায়। আর মা যেহেতু তার গর্ভধারিণী ও তাকে প্রসবকারিণী, এজন্যে মা তার উপর এই অভিভাবকত্বটুকু লাভ করে থাকে। কাজেই এই সময় তার মার নিকট অবস্থান করায় কোন ক্ষতির আশংকা করা যায় না। কাজেই পূর্ণ বয়স্কতা লাভ পর্যন্ত তার মা'র নিকট থাকা খুবই উত্তম। তার পূর্ণ বয়স্কতা লাভের পর তার জন্যে সর্বাধিক প্রয়োজন তার সংরক্ষণ। এই সংরক্ষণ কাজ পিতাই উত্তমভাবে করতে সক্ষম। এই কারণে এই সময় তার পিতার আশ্রয়ে থাকা আবশ্যক। এই কথা আমাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী কুরআন থেকেই প্রমাণিত। এ বিষয়ে রাসূলে করীম (স) থেকেও কথা বর্ণিত হয়েছে। কথাটি আলী ও ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে এসেছে। হযরত হামযা (রা)-এর কন্যাকে নিয়ে হযরত আলী, জায়দ ইবনে হারিসা ও জাফর ইবনে আবূ তালিব (রা) ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছিলেন। সে কন্যার খালা ছিলেন হযরত জাফর (রা)-এর স্ত্রী। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ মেয়েটিকে তার খালার নিকট রেখে দাও। কেননা খালা মার সমতুল্য। এই ঘটনা থেকে বোঝা গেল, মার অবর্তমানে খালা 'আসাবা' হওয়ার বেশি অধিকারী। যেমন কুরআনের আয়াত হুকুম দিয়েছে যে, পিতার তুলনায় মা সন্তানকে নিজের নিকট রাখার বেশি অধিকারী। এটা একটা মৌলনীতি এ বিষয়ে যে, মুহাররম রেহেম সম্পন্না মেয়েরা শিশুকে রাখার বেশি অধিকারী। পুরুষদের নিকটতর হতেও নিকটতর পুরুষের আমরা লালন-পালন অপেক্ষা অধিক অগ্রাধিকার পাওয়ার অধিকারী।

এই হাদীসটি কয়েকটি তাৎপর্য সমন্বিত। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, খালারও লালন-পালন করার অধিকার আছে। আসাবার তুলনায় তার অধিকার বেশি। এই কারণে হাদীসে তাকে মা বলা হয়েছে। তা প্রমাণ করে যে, শিশুর মুহরিম রেহেম সম্পন্ন যে-ই হবে, তার হক রয়েছে এবং তা নিকটতর তারপর নিকটতর হিসেবে কার্যকর হবে। কেননা এই হকটা কেবল জন্মসূত্রেই হয় না। উমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতা থেকে— আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, একজন মেয়েলোক তার সন্তানসহ নবী করীম (স)-এর নিকট আসে। বলে, হে রাসূল! আমার পেট এই শিশুর জন্মক্ষেত্র, আমার স্তনদ্বয় এর পান পাত্র, আমার কোল তাকে পরিবেষ্টন করে

রেখেছিল। এর পিতা তাকে আমার নিকট থেকে কেড়ে নিতে চাচ্ছে। এর জবাবে রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ তুমি যদ্দিন বিয়ে না বসছ, তদ্দিন এর ব্যাপারে তোমার অধিকার অগ্রগণ্য। হযরত আলী, আবূ বকর, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও মুগীরা ইবনে শুবা প্রমুখ বড় বড় সাহাবী এবং কিছু সংখ্যক তাবেয়ী থেকে উক্তরূপ কথা জানা গেছে। শাফেয়ী বলেছেন, বালক নিজে নিজেই যদি পানাহার করতে সক্ষম হয়, তাহলে তাকে ইখতিয়ার দিতে হবে। যদি সে পিতার নিকট থাকা পছন্দ করে, তাহলে তা-ই তার জন্যে ভালো। অনুরূপভাবে যদি মাকে গ্রহণ করে, তাহলে সে তার নিকটই থাকবে।

এই পর্যায়ে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে রাসূলে করীমের একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তা হল, রাসূলে করীম (স) একটি বালককে তার পিতা-মাতার মধ্যে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, দুজনার একজনকে বাছাই করে নাও— যাকে তুমি চাও। আবদুর রহমান ইবনে গনম বলেছেন, আমি উপস্থিত থেকে দেখেছি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) একটি বালককে তার পিতা-মাতার মধ্যে একজনকে গ্রহণ করার ইখতিয়ার দিয়েছিলেন। নবী করীম (স) থেকে যা বর্ণিত, তা হতে পারে, যদি বালক বালেগ হয়ে থাকে। পূর্ণ বয়স্ক হওয়ার পর-ও আরবী ভাষায় তাকে 'গুলাম' বলা হয়ে থাকে। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনিও একটি বালককে এমনিই ইখতিয়ার দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, তার ছোট ভাইও যদি বালেগ হতো, তাহলে তাকেও আমি এরূপ ইখতিয়ার দিতাম। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রথম জন বালেগ— পূর্ণ বয়স্ক হয়েছিল। আবূ হুরায়রা বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে— একটি মেয়েলোক রাসূলে করীম (স)-এর নিকট তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। বলল, সে আমাকে তালাক দিয়েছে এবং সে আমার পুত্রকে আমার নিকট থেকে কেড়ে নিতে চায়। অথচ আমার পুত্র আমাকে অনেক কল্যাণ দিয়েছে, আমাকে আবূ আমবাতার কূপ থেকে পানি পান করিয়েছে। তখন রাসূলে করীম (স) বললেন, তোমার পুত্রের উপর তোমরা দুইজন অংশ ভাগাভাগি করে নাও। তখন স্বামী বলল, আমার পুত্রের ব্যাপারে আমার পক্ষে কে কথা বলবে? নবী করীম (স) বললেন ঃ হে পুত্র! এই তোমার মা, আর এই তোমার পিতা। এখন এ দুজনার মধ্যে তুমি যাকে চাও, পছন্দ করে নাও। তখন পুত্র মা'র হাত ধরল।

মা'র কথা ঃ 'আমার পুত্র আমাকে আবূ আমবাতার কূপ থেকে পানি পান করিয়েছে' বোঝায় যে, সে ছেলে বড় ছিল। সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, ছোট বয়সের বালাকের সর্ব ব্যাপারে ইখতিয়ার থাকে না— দেয়া যায় না। পিতা-মাতার ব্যাপারও তাই। মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বলেছেন, না, পুত্রকে ইখতিয়ার দেয়া যাবে না, কেননা সে দুটি জিনিসের মধ্যে সব চাইতে খারাপটি বেছে চিহ্নিত করতে পারে না।

আবূ বকর বলেছেন, কথাটি ঠিক। কেননা বালকরা সাধারণত খেল-তামাশাকে বাছাই করে, শিক্ষা-দীক্ষার দিকে লক্ষ্য দেয় না, সে দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অথচ আল্লাহ বলেছেন ঃ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا 'তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবারবর্গকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও।' আর একথা জানাই আছে যে, পিতা সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে অধিক সক্ষম হয়ে থাকে। এ কারণে সন্তানের মা'র নিকট অবস্থান তার জন্যে ক্ষতিকর হয়। মার নিকট থাকলে নারী স্বভাব তার উপর প্রবল হয়ে দেখা দেবে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ 'না পিতার ক্ষতি করা হবে তার সন্তানের দ্বারা (বা কারণে)। স্বামী তার স্ত্রীকে তার সন্তান দ্বারা ক্ষতি করবে তা থেকে তাকে নিষেধ করা হয়েছে। তেমনি স্ত্রীকেও নিষেধ করা হয়েছে, তার সন্তান দ্বারা পুরুষটিকে ক্ষতি করা থেকে। স্ত্রীর দিক থেকে এই ক্ষতিটা খরচ ইত্যাদির দ্বারা হতে পারে। খরচার ব্যাপারে ক্ষতিটা হতে পারে এভাবে যে, সে তার প্রকৃত পাওনার চাইতে অনেক বেশি দাবি করতে ও স্বামীকে তা দিতে বাধ্য করতে পারে। আর খরচাদি ছাড়া এই ক্ষতিটা এভাবে হতে পারে যে, সন্তানের পিতাকে নিষেধ করতে পারে তার সন্তানকে দেখা ও তার সাথে সাক্ষাৎ করা থেকে। সন্তানকে পিতার সাথে অপরিচিত বানিয়েও রাখতে পারে। পিতা যে শহরে বা গ্রামে বাস করে, সেখান থেকে তাকে অন্যত্র নিয়ে যেতে পারে, যেন পিতা তার সন্তানকে দেখতে না পায়। তাতে সন্তানের কারণেই পিতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এটাও অসম্ভব নয় যে, মা সন্তানকে এমন বানিয়ে দিল যে, সে পিতার কথা শুনতে প্রস্তুত হয় না। তাকে পিতার নিকট ছেড়ে দিতেও সে নিষেধ করতে পারে। এই সমস্ত দিকই সম্ভাব্যতার পর্যায়ে গণ্য। আর এইসব সম্পর্কেই আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'সন্তানের পিতাকে সন্তানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না'। অতএব আয়াতটিকে এই সব অর্থে গ্রহণ করা কর্তব্য।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ 'এবং উত্তরাধিকারীদের উপরও অনুরূপ হবে'। 'এবং পিতার উপর ধার্য হবে তাদের খোরাক-পোশাক দেয়া ভালোভাবে' থেকে যত কথা এরপূর্বে রয়েছে, সেই কথার সাথে এই কথাটুকু সংযোজন। কেননা সব কথাই واو দ্বারা একটার পর একটা সাজিয়ে বলা হয়েছে। واو হল সংযোজন অক্ষর। ফলে পূর্বে উল্লিখিত সব কথাই একই খোরাক-পোশাকের অবস্থার উপর বলা। এবং প্রত্যেককে অপরকে ক্ষতি করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এই সব তাৎপর্যের কথাই ইতিপূর্বে আমরা ব্যাখ্যা করেছি। এরপর আল্লাহ বলেছেন ঃ 'এবং উত্তরাধিকারীদের উপরও অনুরূপ হবে।' অর্থাৎ খোরাক-পোশাক দেয়ার দায়িত্ব। আর তার ক্ষতি করতে পারবে না স্বামী, পারবে না স্ত্রীও। কেননা ক্ষতির কাজটি যেমন খোরাক-পোশাক ইত্যাদির ক্ষেত্রে হতে পারে, তেমনি অন্যান্য ক্ষেত্রেও। তার সাথে সংযোজিত করে যখন উক্ত কথাটুকু বলা হয়েছে, তখন উপরে উল্লেখকৃত সব কাজ উত্তরাধিকারীর উপরও বর্তাবে। এদিকে হযরত উমর ও জায়দ ইবনে সাবিত (রা) থেকে আল-হাসান, কুবায়বাতা ইবনে যুবায়র, আতা ও কাতাদাতা থেকেও বর্ণিত এই কথাটুকু পর্যায়ে। তাঁরা সকলেই বলেছেন, এটা খোরাক-পোশাক বাবদ খরচাদির ব্যাপারে উত্তরাধিকারীদের দায়িত্বের কথা। ইবনে আব্বাস ও শাবীর কথা হল, পারস্পরিক ক্ষতি হতে পারবে না। আবূ বকর বলেছেন, তাদের দুজনের কথাই তার উপর এই যে, ক্ষতিকর কাজ করা যাবে না। এতে এমন প্রমাণ নেই যে, তাঁরা দুজন উত্তরাধিকারীদের উপর 'নফকা' দেয়ার দায়িত্ব নেই বলে মত দিয়েছেন। কেননা ক্ষতিটা তো 'নফ্‌কা'কে কেন্দ্র করেই হয়। অন্যান্য ব্যাপারেও হতে পারে যদিও। অতএব তার উপর পারস্পরিক ক্ষতির ব্যাপারটি চাপলেও 'নফকা' দেয়ার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। 'নফকা' দেয়ার দায়িত্ব তার উপর না বর্তিলে তাকে বিশেষভাবে পারস্পরিক ক্ষতি করার থেকে নিষধ করা কোন ফায়দা হয় না। কেননা এ ব্যাপারে সে সম্পর্কহীন ব্যক্তির মতই।

এ-ও বোঝা যায় যে, তাৎপর্য হচ্ছে, 'নফ্কায়' পারস্পরিক ক্ষতিসাধন। অন্যান্য ক্ষেত্রেও। তারপরই আল্লাহ্র এই কথাটি তার প্রমাণ ঃ

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ -

তোমরা যদি অন্য কারোর দ্বারা তোমাদের সন্তানদেরকে দুধ খাওয়াতে চাও, তাহলে তোমাদের কোন গুনাহ্ হবে না।

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, পারস্পরিক ক্ষতিকরণ, দুধ খাওয়ানো ও নফ্আ দেয়া— এর দুটো ক্ষেত্রেই হতে পারে।

আগের কালের ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে এ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে যে, ছোট বয়সের বাচ্চার খরচাদি দেয়ার দায়িত্ব কার উপর ? উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, তার পিতা না থাকলে আসাবাদের দায়িত্ব হচ্ছে বাচ্চার পালন-পালনের খরচাদি বহন করা। তাতে তিনি এ পর্যন্ত বলে গেছেন যে, বাচ্চার খরচাদি দেয়ার দায়িত্ব পিতার উপর, মার উপর নয়। কেননা পিতা 'আসাবা'। অতএব এই কাজটির দায়িত্ব 'আসাবা'দের উপরই পড়বে। তারা 'আকিলা' পর্যায়ের। জায়দ ইবনে সাবিত (রা) বলেছেন ঃ 'বাচ্চার খরচাদি বহনের দায়িত্ব পুরুষ ও মেয়েলোক— সকলেরই উপর তাদের প্রাপ্য মীরাসের অংশানুপাতে হবে। হানাফী মাযহাবের ফিকাহ্‌বিদদেরও এই কথা। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত— যেমন পূর্বে বলেছি— উত্তরাধিকারীদেরও দায়িত্ব বাচ্চার মাকে কষ্ট না দেয়া। এ-ও আমরা বলেছি যে, এটা প্রমাণ করে যে, তিনি মনে করেন, 'নফ্কা' দেয়ার দায়িত্ব উত্তরাধিকারীর উপর বর্তিবে, কেননা তা না দিলেই তো বাচ্চার মাকে কষ্ট দেয়া হবে, তার ক্ষতি করা হবে। ইমাম মালিক বলেছেন, বিশেষভাবে পিতা ছাড়া 'নফ্কা' দেয়ার দায়িত্ব অন্য কারোর উপর বর্তে না। এমনকি দাদার উপর-ও নয়। দাদার পুত্রের পুত্রের উপর-ও নয়। তবে পিতার পুত্রের জন্যে তা কর্তব্য হবে। শাফেয়ী বলেছেন, ছোট্ট শিশুর 'নফ্কা' তার কোন নিকটাত্মীয়ের উপর কর্তব্য হয় না। হয় শুধু পিতা, সন্তান, দাদা ও পিতার সন্তানের উপর।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্র কথা ঃ 'এবং উত্তরাধিকারীদের উপরও অনুরূপ' থেকে বাহ্যিকভাবে বোঝা যায়, আগেরকালের ফিকাহ্‌বিদরাও এ বিষয়ে একমত যে, নফ্কা সংক্রান্ত দায়িত্ব এই দুটি কথার খারাবীর ফয়সালা দেয়। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ 'উত্তরাধিকারীদের উপরও অনুরূপ' নফ্কা ও ক্ষতিকরণ সংক্রান্ত পূর্বে যা কিছু উল্লিখিত হয়েছে, তা সবকেই শামিল করে এবং উত্তরাধিকারীদের উপর বর্তায়। কোন দলীল ছাড়া তা বিশেষভাবে কারোর উপর ধার্য করা জায়েয হতে পারে না। উত্তরাধিকারীদের উপর তা ওয়াজিব হয়, তা আমরা ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করেছি। তাদের কেউ-ই বলেননি যে, ভাই ও চাচার উপর নফ্কা ওয়াজিব হবে না। মালিক ও শাফেয়ীর কথা অন্যান্য সকলের কথা থেকে বাইরে। পিতা মুহরিম রেহমওয়ালা বলে যে কারণে তার উপর তা কর্তব্য হয়, নিকটবর্তী যে লোকই এই গুণের হবে, সেই কারণে তারও কর্তব্য হবে। আল্লাহ্র এই কথাটি থেকেও তা-ই বোঝা যায় ঃ

وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ -

এবং তোমাদের নিজের উপরও কোন দোষ হবে না, যদি তোমরা তোমাদের ঘর থেকে আহার কর।

اَوْمَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ اَوْ صَدِيْقِكُمْ -

কিংবা যেসব ঘরের চাবি তোমাদের হাতে আছে, কিংবা তোমাদের বন্ধুগণ।

(সূরা আন-নূর ঃ ৬১)

এ আয়াতে রেহ্‌মওয়ালা মুহরিমের উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের জন্যে এই অধিকার ঘোষণা করা হয়েছে যে, তারা তাদের ঘর থেকে খাবার খেতে পারে। বোঝা গেল, তারা অধিকার সম্পন্ন। তা না হলে তাদের জন্যে তা মুবাহ্ করা হতো না।

যদি বলা হয়, আয়াতে বলা হয়েছে ঃ তোমরা যে সব ঘরের চাবির মালিক হয়েছ কিংবা তোমাদের বন্ধুগণ ..... অথচ এরা দুজন 'নফকা' পাওয়ার অধিকারী নয়।

জবাবে বলা যাবে, তা এদের থেকে মনসূখ হয়ে গেছে, এটা সকলের মত। কিন্তু রেহ্‌মওয়ালা মুহ্‌রিমের মনসূখ হওয়া প্রমাণিত হয়নি।

যদি বলা হয়, চাচার পুত্রের উপর 'নফ্‌কা' দেয়ার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, যদি সে উত্তরাধিকারী হয়।

জবাবে বলা যাবে, বাহ্যত তা-ই আয়াতের দাবি। দলীলের ভিত্তিতেই তাকে বিশেষীকরণকৃত করা হয়েছে।

যদি বলা হয় এবং উত্তরাধিকারীদের উপরও তেমনি, আল্লাহ্‌র এই কথাটি প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর উপর 'নফ্‌কা' ওয়াজিব করে দিয়েছে, তাহলে পিতা ও মার উপরও নফ্‌কা ওয়াজিব করা উচিত তাদের দুজনের মীরাসের পরিমাণ অনুযায়ী।

জবাবে বলা যাবে, 'এবং উত্তরাধিকারীদের উপর ....' বলতে পিতা ছাড়া অন্যদের বোঝানো হয়েছে। তাই এই কারণে যে, কথার শুরুতেই পিতার কথা বলা হয়েছে যে, তার উপরই সমস্ত নফকা বর্তিবে। মা'র উপর কোন দায়িত্ব বর্তিবে না। এর পর সংযোজন করে বলা হয়েছে এই কথাটি ঃ 'এবং উত্তরাধিকারীর উপর অনুরূপ' এর মধ্যে সমস্ত উত্তরাধিকারীর সাথে পিতাকে শামিল করা জায়েয হবে না, কেননা তাতে পূর্বে বলা কথার মনসূখ হয়ে যেতে হয়। কিন্তু একই কথার মধ্যে মনসূখ ও মনসূখকারী উভয়ের একত্রিত হওয়া জায়েয নয়। তা ছাড়া কোন হুকুমের দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর হওয়ার আগেই তা মনসূখ হয়ে যেতে পারে না।

ইসমাঈল ইবনে ইসহাক উল্লেখ করেছেন, যখন কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে তার পিতা মরে গেছে, অথবা নিঃশেষ নিখোঁজ হয়ে গেছে, তখন তার মার কর্তব্য সেই সন্তানকে দুধ খাওয়ানো। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'এবং প্রসবকারিণী মায়েরা তাদের সন্তানদের দুধ খাওয়াবে।' এই পিতার উপর যে কর্তব্য ছিল তা না থাকলে ও মার উপর কর্তব্য প্রত্যাহৃত হবে না। কোন রোগের কারণে কিংবা অন্য কোন কারণে মার বুকের দুধ যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে অবশ্য দুধ খাওয়ানোর কোন দায়িত্ব তার উপর বর্তিবে না। আর যদি তার পক্ষে কারোর দুধ খাওয়ানো সম্ভব না হয় এবং না করে, আর তাতে বাচ্চার মরে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তাহলেও অন্য কারোর দ্বারা দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা মার কর্তব্য। সে কর্তব্য বাবার উপর কর্তব্যের দিক দিয়ে নয়। বরং এ কর্তব্য সাধারণভাবে সকলেরই উপর, যখন দেখা যাবে, কেউ মৃত্যুর সম্মুখীন, তার সাধ্যমত সাহায্য করা প্রত্যেক মানুষেরই কর্তব্য।

উক্ত কথার এই অংশে বহু প্রকারের ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে। একটি— তিনি মার উপর কর্তব্য চাপিয়েছেন দুধ খাওয়ানোর। দলীল দিয়েছেন আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'এবং প্রসবকারী মায়েরা তাদের সন্তানদের দুধ খাওয়াবে।' কিন্তু তিনি তারই সাথে মিলিত কথাটির দিকে লক্ষ্য দেন নি। তা হচ্ছে ঃ 'এবং পিতার কর্তব্য তাদের খোরপোশ প্রচলিত নিয়মে দেয়া।' তার জন্যে যে খোরপোশের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তারই মুকাবিলায় দুধ খাওয়ানোর দায়িত্ব চাপিয়েছেন। কিন্তু বিনিময় না পেলে মার পক্ষে সে দায়িত্ব পালন করা কি করে সম্ভব হতে পারে ? পিতার উপর খোরপোশ দেয়ার যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তা সে এই দুধ খাওয়ানোর বদলে তা তো সকলেরই জানা। পিতা দুধ খাওয়ানোর বিনিময় দিয়েই মার কাছ থেকে সে সব সুবিধা লাভের অধিকারী হতে পারে, তা ছাড়া নয়। অতএব বিনিময় না দিয়ে তার উপর দুধ খাওয়ানোর কর্তব্য চাপানো কঠিন ব্যাপার। আল্লাহ তা'আলা পিতার উপর 'নফ্‌কা' দেয়ার কর্তব্য চাপিয়েছেন তার বদলে 'নফ্‌কা' দেয়ার দায়িত্ব পালনের ফলে।

দ্বিতীয়ত, 'দুধ খাওয়াবে তাদের সন্তানদের' কথাটি দ্বারা মায়েদের উপর দুধ খাওয়ানো ওয়াজিব করে দেয়া হয়নি। দুধ খাওয়ানো তো তাদের হক। কেননা দুধ খাওয়াতে তাদেরকে বাধ্য করা যাবে না, এ বিষয়ে সকলেই একমত। সে অস্বীকার-ও করতে পারে। অবশ্য যদি সন্তানের পিতা জীবিত থাকে। আল্লাহ এ বিষয়ে আইন করে দিয়েছেন এই বলে ঃ 'তোমরা দুজন যদি পরস্পরকে অসুবিধায় ফেলতে চাও, তাহলে দুধ খাওয়াবে অপর একজন।' অতএব এ আয়াত দ্বারা মার উপর সর্বাবস্থায় দুধ খাওয়ানো ওয়াজিব প্রমাণ করা যাবে না। বিশেষ করে পিতা যখন নিখোঁজ হয়ে যাবে। তার জীবদ্দশায়ও তার উপর তা ওয়াজিব করার ফায়সালা এ আয়াত দিচ্ছে না।

তার পর বলা হয়েছে, রোগ বা অন্য কোন কারণে মার দুধ না থাকলে তার উপর কোন দায়িত্ব নেই, যদি অন্য কারোর দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা তার পক্ষে সম্ভব হয়, তবুও। এই কথাটিও ত্রুটিপূর্ণ। কেননা দুধ খাওয়ানোর ফায়দা যদি তার প্রাপ্য হতো সন্তানের কারণে পিতার অবর্তমানে, তাহলে তার মার ধন-মাল দ্বারা তা সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল, যদি সে অক্ষম হয়ে গিয়ে থাকে। যেমন পিতার উপর কর্তব্য চেপে আছে বাচ্চার দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা। যদি দুধ খাওয়ানোর ফায়দাটা তার মাল দ্বারা লাভ করা সম্ভব না হয়, তাহলে দুধ খাওয়ানোর বাধ্যবাধকতা তার উপর চাপানো জায়েয নয়। দুধের ফায়দা মার উপর বাধ্যতামূলক হওয়া এবং তার মালের উপর সে বাধ্যবাধকতা চাপানোর মধ্যে— যখন তার নিজের পক্ষে দুধ খাওয়ানো সম্ভব নয়, পার্থক্যটা কোথায় ?

পরে অন্য একটি দিক দিয়েও উক্ত কথাকে খণ্ডন করা হয়েছে। তা হল— দুধ খাওয়ানো শেষ হওয়ার পর তার খরচাদি যোগাড় করার দায়িত্ব মার উপর পড়ে না। দুধ খাওয়ানোর পর দুধ খাওয়ানো ও খরচাদি যোগাড়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। আসলে এ দুটিই অল্প বয়সের বালকের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যয়। তাহলে এ দুটির মধ্যে পার্থক্য করা যায় কেমন করে ? এ দিক দিয়ে পার্থক্য করা গেলে পিতার ক্ষেত্রেও অনুরূপ পার্থক্য করা জায়েয হতো। এতদূর বলা যেত যে, পিতার উপর বাধ্যতামূলক হচ্ছে দুধ খাওয়ানোর খরচার ব্যবস্থা করা। পরে দুধ খাওয়ানোর মিয়াদ যখন শেষ হয়ে গেছে, তখন ঐ বালকের জন্যে কিছু ব্যয় করা পিতার কর্তব্য নয়। কেননা আল্লাহ সেই স্ত্রীলোকটির খোরপোশ দেয়ার দায়িত্ব পিতার উপর চাপিয়েছেন দুধ

খাওয়ানোর জন্যে মাত্র। পরে ধারণা করেছে যে, অন্য কারো দ্বারা দুধ খাওয়ানো মার পক্ষে সম্ভব হলে এবং বাচ্চার মৃত্যুর আশংকা হলে মারও কর্তব্য সে দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করবে, যেমন তার নিজের উপর বাধ্যতামূলক— বাচ্চার মৃত্যুর আশংকা হলে। তা যদি এই অর্থে হয়ে থাকে, তাহলে তা তার পড়শির বা সর্ব মানুষের উপর না চাপিয়ে তার উপর বিশেষভাবে চাপানো যাবে কেমন করে ......? এই সব কিছুই অস্পষ্ট কথাবার্তা, দলীল যুক্তিবিহীন মত ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইমাম মালিক থেকেও এরূপ কথা এসেছে। তিনি এই খরচের দায়িত্ব পুত্রের জন্যে পিতার এবং পিতার জন্যে পুত্রের উপর চাপিয়েছেন। দাদার জন্যে পুত্রের পুত্রের উপর তা জরুরী মনে করেন না। কিন্তু এই কথা আগের কালের ফিকাহবিদদের এবং একালের মনীষীদের কথার সম্পূর্ণ বরখেলাপ। এই কথার সমর্থক কেউ আছে বলে আমাদের জানা নেই। তা সত্ত্বেও কুরআন এ কথাকে প্রত্যাখ্যান করে। সে আয়াতটি হচ্ছে ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ ........ وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا -

এবং মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি লক্ষ্য দেয়ার জন্যে হুকুম দিয়েছি। তার মা তাকে এক দুর্বলতার পর আর এক দুর্বলতার উপর বহন করেছে .... এই পিতামাতা যদি তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে— বিষয়ে তুমি কিছুই জান না— বাধ্য করে, তাহলে তাদেরকে তুমি মানবে না। অবশ্য দুনিয়ায় তাদের সাথে ভাল সাহচর্য রক্ষা করবে।

(সূরা লোকমান ঃ ১৪ ও ১৫)

দাদাও এর মধ্যে শামিল। কেননা সে-ও পিতা পর্যায়ে গণ্য। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ 'তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত'। পূর্বোক্ত আয়াতে দাদাকেও পিতা গণ্য করে তার সাথে ভালো আচরণ গ্রহণের আদেশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কোনই মতপার্থক্য নেই। দাদাকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ফেলে— তার ক্ষুধা বন্ধ করার— সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রাখলে তার সাথে ভালো সাহচর্য রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে না। আল্লাহ্‌র এই কথাটিও তা-ই প্রমাণ করে ঃ

وَلَا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَائِكُمْ -

তোমাদের নিজেদের ঘর থেকে এবং তোমাদের বাপ-দাদার ঘর থেকে খাবার খাওয়া তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ নয়। (সূরা আন-নূর ঃ ৬১)

এ আয়াতে সেসব নিকটাত্মীয়দের উল্লেখ করা হয়েছে, পুত্রের ঘর বা পুত্রের পুত্রের ঘরের উল্লেখ করা হয়নি। কেননা আল্লাহ্‌র কথা مِنْ بُيُوْتِكُمْ 'তোমাদের ঘর থেকে' তা-ই বোঝায়। যেমন বলা হয়, 'তুমি ও তোমার ধন-মাল তোমার পিতার।' এই কথাটিতে পুত্রকে পিতার মালিকানা বলা হয়েছে। যেমন 'পুত্রের ঘর' বলা হয়। এতে ঘরসমূহকে বাপ-দাদার বলে কথা শেষ করা হয়েছে।

'পুত্রের ও পুত্রের ঘর' বোঝানো হয়েছে, তার দলীল এই যে, একথা পূর্বেই জানা ছিল যে, কোন লোকের নিজের মাল নিজের উপর নিষিদ্ধ নয়। তাই 'তোমার মাল তুমি খাবে তাতে কোন দোষ নেই' এরূপ কথা বলার কোন প্রয়োজন-ই হয় না। কাজেই 'তোমরা তোমাদের ঘরসমূহ থেকে খাবে' এই কথা দ্বারা পুত্রের, পুত্রের পুত্রদের ঘর বোঝানো হয়েছে, বুঝতে হবে। এই কারণে তাদের সকলের উল্লেখের প্রয়োজন মনে করা হয়নি, যেমন সমস্ত নিকটাত্মীয়দের উল্লেখ করা হয়েছে।

উত্তরাধিকারীদের তাদের মীরাসের অংশানুপাতে ব্যয় করা জরুরী হওয়ার কারণ কি? .... এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত প্রকাশিত হয়েছে। হানাফী আলিমগণ বলেছেন, তা হচ্ছে, প্রত্যেক মীরাসের অংশধারীর উপর তাদের অংশের অনুপাতে, যা তারা পাবে বালকের সম্পদ থেকে, তার রেহম মুহরিমওয়ালা হওয়ার কারণে। বালকের যারা রেহম-মুহরিমওয়ালা নয়, খরচা যোগানোর কোন দায়িত্ব তাদের উপর নয়, যদিও তারা উত্তরাধিকারীই। এই কারণে খালার উপর বাচ্চার খরচাদি দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, আর মীরাসের অংশ দেয়া হয়েছে চাচার পুত্রকে। কেননা চাচাতো ভাই রেহম-মুহরিম নয়। আর খালা এই অবস্থায় যদিও উত্তরাধিকারী নয়, তবে সে রেহম-মুহরিমওয়ালা মীরাস পাওয়ার লোকদের মধ্যের। তা এজন্যে যে, জানাই আছে, সে জীবদ্দশায় উত্তরাধিকারী হবে না। কেননা মালিকের বেঁচে থাকা অবস্থায় মীরাস-ই হয় না। আর তার মৃত্যুর পর কে ওয়ারিস হবে তা কেউ জানে না। এটা অসম্ভব নয় যে, আজকের এই বালক তার উত্তরাধিকারী হয়ে পড়বে, যার উপর তার জন্যে ব্যয় করার দায়িত্ব পড়েছে। তার পূর্বে তার মৃত্যুর পর। এ-ও হতে পারে যে, তার ওয়ারিস এমন ব্যক্তি হবে, যে আড়াল করে রেখেছে তাকে যার উপর এই খরচা বহন ধার্য হয়েছে। অবস্থা যখন এরূপই, তখন জানলাম যে, মীরাস পেয়ে যাওয়াটাই আসল বক্তব্য নয়। আসল অর্থ হচ্ছে, রেহম-মুহরিমওয়ালাই মীরাস পাওয়া লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

ইবনে আবূ লায়লা বলেছেন, প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর উপরই খরচাদি বহন কর্তব্য, সে রেহম-মুহরিমওয়ালা হোক, আর না-ই হোক। অতএব তা চাচার পুত্রের উপরও ওয়াজিব, কিন্তু খালার উপর নয়।

আমরা যা বলেছি, তা সহীহ্। তার প্রথম দলীল, সকলেই একমত একথায় যে, দাসমুক্তির মনিবের উপর খরচাদি বহন ওয়াজিব নয়, যদিও সে উত্তরাধিকারী। তেমনি মেয়েলোকের জন্যেও বাধ্যতামূলক নয় তার ছোট বয়সের স্বামীর খরচ বহনের। অথচ সে মেয়েলোক তার উত্তরাধিকারী।

এ থেকে প্রমাণ হল যে, খরচাদি বহন ওয়াজিব হওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে তার রেহম-মুহরিমওয়ালা হওয়া।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ -

যে লোক দুধ পান করানোটাকে পূর্ণ করতে চায়, তার জন্যে পূর্ণ দুই বছর ......।

এই দুই বছর হয় আল্লাহ্‌র দিক থেকে নির্ধারিত, দুটি অর্থের একটি এই। অথবা হারাম হওয়া অনিবার্য হওয়ার দুধ পানের এটা মিয়াদ নির্ধারণ কিংবা দুধ পানের খরচ বহন পিতার

উপর এই সময়ের জন্যে কর্তব্য। 'দুই বছর'-এর উল্লেখের পর আয়াতের ধারাবাহিকতা চলেছে। বলা হয়েছে ঃ

فَانْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا –

স্বামী-স্ত্রী দুজনই যদি পারস্পরিক সন্তুষ্টি ও পরামর্শের ভিত্তিতে দুধ ছাড়ানোর ইচ্ছা করে, তাহলে তাদের দুজনের কোন দোষ হবে না।

এ আয়াত থেকে বোঝা গেল, 'দুই বছর' যে সময়কালে দুধ খেলে মুহাররম হয়, তার পরিমাণ নির্ধারণ নয় এটা। কেননা , অক্ষরটি تَعْقِيبْ বোঝায়— বোঝায় প্রথমোক্ত কথার পর-পরই এই কথা। অতএব তাদের ইচ্ছার সাথে সংশ্লিষ্ট দুধ ছাড়ানোর ব্যাপারটি দুই বছর পর হবে। আর দুজনের পারস্পরিক সন্তুষ্টি ও পরামর্শভিত্তিক দুধ ছাড়ানোটা দুই বছর পর হবে। বোঝা গেল, আয়াতে দুই বছরের উল্লেখ যে দুধ খেলে মুহাররম হয় সেই দুধ খাওয়ানের শেষ সময় নির্ধারণস্বরূপ বলা হয়নি। অন্য কথায় দুই বছর পর-ও দুধ খাওয়ানো জায়েয হবে।

মুআবিয়া ইবনে সালিহ্ আলী ইবনে আবূ তালহা, ইবনে আব্বাস সূত্রে 'সন্তান প্রসবকারী মায়েরাই দুধ খাওয়াবে তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর, তার জন্যে যে দুধ সেবনটাকে পূর্ণ করতে চায়' এই আয়াত পর্যায়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন। পরে বলেছেন, অতঃপর পারস্পরিক সন্তুষ্টি ও পরামর্শের ভিত্তিতে দুধ ছাড়ানোর ইচ্ছা করলে কোন দোষ হবে না, দুই বছর পূর্ণ হওয়ার আগেও ছাড়ানো যেতে পারে; কিংবা তার পরে। ইবনে আব্বাস (রা) এই হাদীস সম্পর্কে জানিয়েছেন যে, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যদি তারা দুজন দুধ ছাড়াতে চায় .... দুই বছর পূর্ণ হওয়ার আগের জন্যে যেমন, পরের জন্যেও তেমন।

আল্লাহ্‌র এই কথাটিও তা-ই প্রমাণ করে ঃ

وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ –

যদি তোমরা ইচ্ছা কর যে, তোমাদের সন্তানদেরকে দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করবে, তাহলে তোমাদের কোন দোষ হবে না .... ।

এই দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থাটা বাহ্যত দুই বছর পরে। কেননা এই কথাটি পারস্পরিক সন্তুষ্টি ও পরামর্শ ভিত্তিক দুধ ছাড়ানোর উল্লেখের পর তার সাথে সংযোজন হিসেবে বলা হয়েছে। তা তাদের জন্যে মুবাহ করা হয়েছে এবং দুই বছর পরও বাচ্চার জন্যে দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা পিতার জন্যে মুবাহ্ করা হয়েছে, ঠিক যেমন তাদের জন্যে দুধ ছাড়ানো মুবাহ্ করা হয়েছে যদি তাতে বালকের কল্যাণ হবে বলে বিবেচিত হয়।

আমাদের এই বিশ্লেষণ এটাও প্রমাণ করে যে, দুই বছরের উল্লেখ সময় নির্ধারণ পিতার জন্যে, যে সময়ে দুধ খাওয়ানোর খরচাদি বহন তার জন্যে বাধ্যতামূলক। সরকার তাকে এজন্যে বাধ্যও করতে পারে।

## দুধ খাওয়ার মিয়াদ নিয়ে মতপার্থক্য ঃ

আবূ বকর বলেছেন, বড় হয়ে যাওয়া মানুষকে দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে আগের কালের ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মনে করেন, বয়স্ক

ব্যক্তিকে দুধ খাওয়ালে সে মুহাররম হবে, যেমন শিশু-বালককে খাওয়ালে হয়। এই পর্যায়ে তিনি আবূ হুযায়ফার মুক্ত দাস সালিমের প্রসঙ্গের ঘটনা বর্ণনা করতেন। নবী করীম (স) সাহ্লাতা বিনতে সুহায়লকে— সে ছিল আবূ হুযায়ফার স্ত্রী— বলেছিলেন, 'তুমি তাকে পাঁচবার দুধ খাওয়াও, পরে সে তোমার নিকট প্রবেশ করবে। হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট যখন কোন ব্যক্তি প্রবেশ করতে অনুমিত দিতে চাইতেন, তখন তার বোন উম্মে কুলসুমকে আদেশ করতেন যে, তাকে পাঁচবার দুধ খাওয়াও। তার পরে সে তার নিক্‌ট উপস্থিত হতো। কিন্তু নবী করীম (স)-এর অন্যান্য সকল বেগমই এই কাজের প্রতিবাদ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, সম্ভবত এটা একমাত্র সালিমের জন্যে রাসূলের নিকট থেকে পাওয়া রুখসত ছিল। এই বর্ণনাও এসেছে যে, সাহলাতা বিনতে সুহায়ল বলল, হে রাসূল! সালিম আমার নিকট আসে তা দেখে আবূ হুযায়ফার চেহারায় আপত্তি লক্ষ্য করি। তখন নবী করীম (স) বললেন, তুমি তাকে দুধ খাওয়াও। আবূ হুযায়ফার আপত্তি দূর হয়ে যাবে। মনে হয়, এটা বিশেষভাবে সালিমের জন্যে গৃহীত ব্যবস্থা। নবী করীমের বেগমগণ (রা) সকলেই উক্ত কাজের এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন আবূ যিয়াদ ইবনে দীনারকে ছোট বাচ্চা জন্তু কুরবানী করার জন্যে বিশেষভাবে অনুমতি দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, তারপর অন্য কারোর জন্যে এই কাজ জায়েয হবে না। হযরত আয়েশা (রা) নবী করীম (স) থেকে যা বর্ণনা করেছেন, তা প্রমাণ করে যে, বড় ব্যক্তিকে দুধ খাওয়ালে তাতে মুহাররম হবে না। আমাদের নিকট তা মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, মুহাম্মাদ ইবনে কাসীর, সুফিয়ান, আশযাস, ইবনে সুলায়ম, তাঁর পিতা, মসরুক আয়েশা (রা) সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। মূল কথা, রাসূলে করীম (স) হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। তখন হযরত আয়েশা (রা) বললেন ঃ হে রাসূল! এই লোকটি আমার দুধ ভাই। তখন নবী করীম (স) বললেন, তুমি তোমার দুধ ভাইদের সম্পর্কে চিন্তা কর। কেননা দুধ পান ক্ষুধার কারণেও হতে পারে।' এই কথা প্রমাণ করে যে, দুধ পানের হুকুমটা পানকারীর ছোট বয়সের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ সেই অবস্থা, যখন দুধ কারো ক্ষুধা বন্ধ করে এবং তা তার জন্যে খাদ্য হিসেবে যথেষ্ট।

আবূ মূসা থেকে বর্ণিত, তিনি মনে করতেন বড় বয়সের লোকদের দুধ খাওয়ানোকে গুরুত্ব দিতেন। অবশ্য পরে তিনি তাঁর এই মত প্রত্যাহার করেছেন, এই বর্ণনাও তাঁর নিকট থেকে পাওয়া গেছে। আর হুসায়ন আবূ আতীয়া থেকে বর্ণনা করেছেন, এই ব্যক্তি তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মদীনা থেকে এসে উপস্থিত হল। পথে তার স্ত্রী সন্তান প্রসব করে। তার দুই স্তন ফুলে উঠে। পুরুষটি তার উপর মুখের থুথু ফেলে মর্দন করছিল। তখন পুরুষটির পেটে এক চুমুক দুধ প্রবেশ করল। সে আবূ মূসাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, তোমার স্ত্রী তোমার থেকে বায়েন তালাক হয়ে গেছে। পরে ইবনে মাসউদ (রা)-কে এই ঘটনা জানাল। তিনি দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলেন। তখন আরব বেদুইনকে নিয়ে আবূ মূসা আল-আশআরী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হল। তিনি বললেন, এভাবে দুধ খাওয়ানোর ফলে কি মুহাররম হয় ? দুধ পানের দরুন মুহাররম হয়, যা পানকারীর দেহে গোশত ও অস্থি রচনা ও প্রবৃদ্ধি করে। তখন আশ'আরী বললেন, আমাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করো না। এই বর্ণনাটি তোমাদের সামনে রয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি তাঁর প্রথম মত ত্যাগ করে ইবনে মাসউদ (রা)-এর মত গ্রহণ করেছেন। অন্যথায় তিনি বলতেন না যে, আমাকে কিছুই জিজ্ঞাসা

করো না। এই কথাও সামনে রয়েছে। তা তার বিরুদ্ধতায় দাঁড়িয়ে আছে। তবে যে ফতোয়া তিনি দিয়েছেন, তা ঠিক। আলী, ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ্, উম্মে সালমা, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, বয়স্ক লোককে দুধ খাওয়ালে মুহাররম হয় না। বড় বয়সের লোককে দুধ খাওয়ালে কিছু হয় বলে মত দিয়েছেন এমন কোন ফিকাহ্‌বিদকে আমরা জানি না। তবে লাইস ইবনে সাদ থেকে একটি বর্ণনা এসেছে, তাঁর থেকে তা বর্ণনা করেছেন আবূ সালিহ। তাতে বলা হয়েছে, বড় বয়সের লোক দুধ খাওয়ালে মুহাররম হয়। কিন্তু এটি একটি অত্যন্ত বিরল কথা।

কেননা হযরত আয়েশা (রা) থেকে পাওয়া একটি বর্ণনা বলছে যে, বড় বয়সে কারোর দুধ খেলে তাতে মুহাররম হয় না। হাজ্জাজ হিকাম, আবুল শাসা, আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, সে রকম দুধ পান করলে মুহাররম হয়, যদ্দারা পানকারীর দেহে গোশত ও রক্ত জন্মে। হারাম ইবনে উসমান, জাবির-এর দুই পুত্র তাদের পিতার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ

لَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ وَلَا رِضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ -

বয়স্ক বুদ্ধিমান হওয়ার পর কেউ ইয়াতীম হয় না, শিশুকালের দুধ খাওয়া বন্ধ হওয়ার পর যে দুধ খাওয়া তা গণ্য নয়।

নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, আয়েশা (রা)-এর হাদীসে, যা উপরে উদ্ধৃত হয়েছে, বড় বয়সের লোককে দুধ খাওয়ানো পর্যায়ে। সেটি আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আয়েশা (রা) আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকরকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন যে, বালকদের দুধ খাওয়াবে, যেন তারা বড় হয়ে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে। বড় বয়সের লোককে দুধ খাওয়ালে মুহাররম হওয়ার কথাটি যখন বিরল, তখন এ বিষয়ে ঐকমত্য হয়ে গেল যে, বড় বয়সের লোককে দুধ খাওয়ালে মুহাররম হবে না।

মুহাররম হওয়ার দুধ খাওয়ানোর মিয়াদ সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদদের মধ্যে মত-পার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, দুই বছর এবং তার পর ছয় মাসের মধ্যে যে দুধ খাওয়ানো হবে, তাতে মুহারম হবে। এই মিয়াদের মধ্যে দুধ ছাড়ানো হোক আর না-ই হোক, মুহাররম হবে। তারপরে মুহাররম হবে না, দুধ ছাড়ানো হোক আর না-ই হোক। জুফর ইবনুল হুযায়ল বলেছেন, যতক্ষণ দুধ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং ছাড়ানো হবে না, তা-ই মুহাররম হওয়া দুধ খাওয়ানো। তা তিন বছর পর্যন্ত চলতে পারে। আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, সওরী, আল-হাসান ইবনে সালিহ ও শাফেয়ী বলেছেন দুই বছর মিয়াদের মধ্যে হলে মুহাররম হবে। তার পরে মুহাররম হবে না। দুধ ছাড়ানো গণ্য হবে না। গণ্য হবে সময়। ইবনে অহব মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন, দুধের পরিমাণ কম হোক, কি বেশি, মুহাররম হবে দুই বছরের মধ্যে হলে। দুই বছরের পর হলে দুধের পরিমাণ কম হোক বেশি হোক মুহাররম হবে না। ইবনুল কাসিম মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন, দুধ পানের ব্যাপরটি হুকুমধারী হয় দুই বছর এবং এক বা দুই মাস তার পর। এ ব্যাপারে কেবল মার দুধ পান করানোর দিকে নজর দেয়া হবে না, দেয়া হবে দুই বছর এবং এক কি দুই মাসের প্রতি। তিনি এ-ও বলেছেন যে, দুই বছরের পূর্বেই যদি বিচ্ছিন্ন করা হয় ও দুই বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দুধ খাওয়ায় তাহলে তাকে

'ফতীম' বলা হবে। অর্থাৎ সে মাতৃস্তন্য পান করা ত্যাগ করেছে। তখনকার দুধ খাওয়ানো মুহাররম বানাবে না, কেননা তার পূর্বেই সে দুধ খাওয়ার প্রয়োজন মুক্ত হয়েছে। অতএব তার পরে যে দুধ খাওয়া হয়েছে তাতে মুহাররম হবে না। আওজায়ী বলেছেন, এক বছর সময়ের মধ্যে যদি দুধ ছাড়ানো হয় এবং এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অতঃপর মুহাররম বানানোর দুধ পান হবে না। আর তিন বছরকাল ধরে যদি দুধ খাওয়ানো চলে, এর মধ্যে দুধ ছাড়ানো না হয়, তাহলে দুই বছর পর মুহাররম বানানোর দুধ পান হবে না। আগের কালের মনীষীদের থেকে বহু কথা বর্ণিত হয়েছে। হযরত আলী (রা)-এর কথা ঃ দুধ ছাড়ানোর পর দুধ খেলে তা মুহাররমকারী হবে না। উমর ও ইবনে উমর (রা)-এর কথা মুহাররমকারী দুধ খাওয়ানো কেবল তাই, যা ছোট বয়সে পান করা হবে। এ থেকে বোঝা যায়, এদের নিকট দুই বছরের তেমন গুরুত্ব নেই।

কেননা আলী (রা) দুধ পান সংক্রান্ত হুকুমের ভিত্তি বানিয়েছেন দুধ ছাড়ানোকে। হযরত উমর (রা) ও তাঁর পুত্র ছোট বয়সকে, কোন সময় নির্ধারণ ছাড়াই।

উম্মে সালমা (রা) বলেছেন, দুধ ছাড়ানোর আগে স্তনদ্বয়ে যে দুধ খাওয়া হবে, তা-ই মহাররম বানায়। আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, যে দুধপান নাড়ি-ভূড়িতে আলোড়িত হবে, কেবল তা-ই মুহাররম বানায়, যদি দুধ ছাড়ানোর পূর্বে দুই স্তনে থাকে। তিনি হুকুমটাকে দুধ ছাড়ানোর পূর্বে ও নাড়িভূড়িতে আলোড়নের পূর্বের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। তা ঠিক হযরত আয়েশা (রা) থেকে পাওয়া বর্ণনার মতই। তিনি বলেছেন, যে দুধ পানে পানকারীর দেহে গোশত ও রক্তের সৃষ্টি হয়, কেবল তাই মুহাররম বানায়। এই সব কথাই একথা বোঝায় যে, তারা কেউ-ই দুই বছরের কোন গুরুত্ব দেন নি। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, দুই বছর পরের দুধ পান মুহাররম বানায় না। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

اَلرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ –

ক্ষুধার তাড়নায় যে দুধ পান, তা-ই মুহাররম বানায়।

বোঝা গেল, এই কথাটিও দুই বছরের সাথে সম্পর্কিত নয়। কেননা দুই বছর যদি নির্দিষ্ট সময় মিয়াদ হতো, তাহলে রাসূলে করীম (স) এরূপ কথা বলতেন না। তিনি বলতেন ঃ দুই বছরের মধ্যে দুধ খাওয়া হলে তার হুকুম গণ্য হবে। তিনি যখন দুই বছরের উল্লেখ করেন নি, বরং বলেছেন ক্ষুধার কথা, তখন তার অর্থ হবে, যে সময় স্তনের দুধ শিশুর ক্ষুধা নিবৃত্ত করে শরীরে শক্তি দেয় কেবল সেটার দ্বারাই মুহাররম হবে। আর এটা দুই বছরের পর-ও হতে পারে। তাহলে বোঝা গেল, দুই বছর পর-ও দুধপান করা হলে তার দ্বারাও মুহাররম হতে পারে। হযরত জাবির বর্ণিত হাদীসে নবী করীম (স) বলেছেন ঃ لَارِضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ 'একবার দুধ ছাড়ানোর পর দুধ খেলে তা গণ্য হবে না।' প্রমাণিত হলো যে, দুই বছর পর দুধ ছাড়ালে তারপরে দুধ পানের হুকুম কার্যকর হবে না। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত আরও একটা হাদীসে তাই বলা হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

اَلرَّضَاعَةُ مَا اَنْبَتَ اللَّحْمَ وَاَنْشَزَ الْعَظْمَ –

যে দুধ পানে দেহে গোশত বাড়ে, অস্থি শক্ত হয়, কেবল তাই গণ্য।

এটাও প্রমাণ করে যে, দুই বছর দুধ পানের জন্যে সময় নির্ধারণ নয়। উপরোদ্ধৃত সব কয়টি হাদীস থেকেই তা প্রমাণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে যে কথা এসেছে, তার বর্ণনাধারা নির্ভরযোগ্য নয়। তা হল, এই পর্যায়ে গুরুত্ব বহন করে আল্লাহ্‌র এই কথা ঃ

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا –

সন্তান গর্ভে ধারণ এবং তার দুধ ছাড়ানোর মোট সময় ত্রিশ মাস। (সূরা আহক্বাফ ঃ ১)

মেয়েলোক যদি ছয় মাসে সন্তান প্রসব করে, তাহলে তাকে দুধ পান করানোর মিয়াদ দুই বছর। যদি নয় মাসে প্রসব করে, তাহলে দুধ পানের মিয়াদ একুশ মাস। যদি সাত মাসের প্রসব করে, তাহলে দুধ পানের মিয়াদ তেইশ মাস। এভাবে ত্রিশ মাস পূর্ণ হবে। এই সময়ের মধ্যে গর্ভ ধারণ ও দুধ ছাড়ানো সবই সম্পন্ন হতে হবে। কিন্তু আগের কালের ও তাদের পরবর্তী ফিকাহবিদদের কেউ এই দিকটির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই।

অথচ বাচ্চাদের দুধ পানের প্রয়োজনের সময় বিভিন্ন। কেউ দুই বছরের আগেই দুধ ছেড়ে দেয়, কেউ দুই বছর পূর্ণ হওয়ার পর-ও তা ছাড়ে না। আর বড় বয়সের লোককে দুধ খাওয়ালে তাতে মুহাররম না হওয়ার ব্যাপারে সকলেই সম্পূর্ণ একমত। কেবল ছোট বয়সে দুধ পান করলেই তা গণ্য হবে। আগের কালের মনীষীদের এই পর্যায়ে মতামত আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আর ছোট বয়সের মিয়াদ দুই বছরের মধ্যে সীমিত নয়। দুই বছর বয়স হলেও তাকে বলতে কেউ নিষেধ করতে পারে না। এ থেকে আমরা জানলাম যে, দুই বছর মুহাররম হওয়ার দুধ পানের কোন মিয়াদ নয়। লক্ষণীয়, নবী করীম (স) যখন বললেন, ক্ষুধার তাড়না নিবৃত্ত করার জন্যে যে দুধ পান তাই গণ্য। বলেছেন, যে দুধ পানে গোশত হয়, অস্থি শক্ত হয়, কেবল তা-ই গণ্য। তখন বোঝা গেল, ছোট বাচ্চার অবস্থাটা বিভিন্ন হওয়ার কথা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যদিও সাধারণত দুই বছর গত হলে বাচ্চার দুধ পানের প্রয়োজন হয় না, এই কারণে দুই বছরকে এ ব্যাপারে গণ্য করা হয়নি। এর পরের বৃদ্ধিটা ইজতিহাদের ব্যাপার। কেননা সেটা অবস্থানুপাতে নির্ধারণ। যখন যথেষ্ট খাদ্য হিসেবে মার দুধ গণ্য হয়, তাতে বাচ্চার দেহে গোশত বাড়ে এই সময় এবং যে সময় দুধ পান জরুরী থাকে না, সাধারণ খাবার খেয়েই বাচ্চা বাঁচে ও বাড়ে, এই দুইটি সময়ের মধ্যে পার্থক্য করা আবশ্যক। ইমাম আবূ হানীফার মতে এই সময়টা হচ্ছে দুই বছরের পর ছয় মাস। এটাই ইজতিহাদের পন্থা, ইজতিহাদের ফলশ্রুতি। যেখানে মত প্রকাশকারীর উপর কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না। যেমন ভোগ্য জিনিসের মূল্য নির্ধারণ, সেসব অপরাধের শাস্তি জরিমানা, যার পরিমাণ নির্ধারণে 'তওকীফ' অবতীর্ণ হয়নি এবং তালাক দেয়ার পর সে স্ত্রীকে মাত'আ— জীবনোপকরণ দেয়ার পরিমাণ নির্ধারণ এবং এই ধরনের অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে মনের প্রবল ধারণা অনুযায়ী কোন কিছুর দাবি করার কোন অধিকার কারোর নেই কোন দলীল পেশ করার যায় না বলে। এ পর্যায়ে এটা একটি সুষ্ঠু মৌল নীতি। এইসব একটি পদ্ধতিতেই চলবে। তার দৃষ্টান্ত পূর্ণ বয়স্কতা লাভের সীমা সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফার কথা, তা হচ্ছে, আঠার বছর। ইয়াতীমের মাল-সম্পদ তার নিকট হস্তান্তর করা যাবে না তার সুস্থ জ্ঞান-বুদ্ধির উদ্রেক না হওয়া পর্যন্ত। তার বিবেচনা চলবে পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত। এই বয়সে পৌঁছলে তা তার হাতে ন্যস্ত করতে হবে। এ সব বিষয়ের দৃষ্টান্তসমূহ এমন যে, কোন পরিমাণ নির্ধারণ কেবল ইজতিহাদের মাধ্যমেই সম্ভব।

কেউ যদি বলে যদিও এসব বিষয়ের নির্ধারণের পন্থাই হচ্ছে ইজতিহাদ, তবু একটি দিকের প্রয়োজন, যে বিষয়ে মনে একটা পরিমাণের প্রতি ধারণা প্রবল হয়ে উঠবে এবং তা সুনির্দিষ্ট হবে, অন্য কিছু নয়। তাহলে ইজতিহাদের পন্থায় দুই বছরের পর মাস গণ্য করা ও একটি পূর্ণ বছর গণ্য না করার কি কারণ থাকতে পারে? ইমাম জুফর তো এই কথাই বলেছেন।

এর জবাবে বলা যাবে, এ পর্যায়ে বলার একটি কথা হল এই যে, আল্লাহ যখন বলেছেন ঃ 'সন্তান গর্ভে ধারণ এবং দুধ ছাড়ানোর কাজের মিয়াদ ত্রিশ মাস।' তার পরে বলেছেন ঃ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ 'তার দুধ ছাড়ানোর কাজটা দুই বছরে হতে হবে।' এই দুই কথার তাৎপর্য থেকে বোঝা গেছে যে, গর্ভের মিয়াদ ধরা হয়েছে ছয় মাস। পরে তার উপর বৃদ্ধি ধরা হয়েছে পূর্ণ দুই বছর পর্যন্ত। কেননা কারোর কারোর গর্ভ দুই বছর পর্যন্ত চলতে পারে, এতে কোন মতপার্থক্য নেই। আর আমাদের মতে দুই বছরের অধিক কাল গর্ভ চলে না। তাহলে উল্লিখিত গর্ভ এই সমগ্রের মধ্যে দুই বছর থেকে বাইরে যায় না। অনুরূপভাবে দুধ ছাড়ানোর ব্যাপারে ত্রিশ মাসের বাইরে যায় না। কেননা এই দুটি কাজ মোটামুটিভাবে আল্লাহ্র এই কথার মধ্যে উল্লিখত হয়েছে ঃ

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً -

সন্তানের গর্ভ এবং তার দুধ ছাড়ানোর মোট মিয়াদ ত্রিশ মাস। (সূরা আহক্বাফ ঃ ১৫)

আবুল হাসান এ বিষয়ে বলতেন, দুই বছর যখন দুধ ছাড়াবার সাধারণ অভ্যাসগত সময়, এর বেশী হওয়াও অসম্ভব নয়— যেমন আগে বলেছি, অতএব খাদ্য হিসেবে দুধ যেসব দুই বছর পর সাধারণ খাদ্য গ্রহণকালে স্থানান্তর ছয় মাসের মধ্যে হতে হবে। যেমন মার গর্ভস্থ সন্তানের সাধারণ খাদ্যের দিকে চলে যাওয়া ভূমিষ্ট হওয়া সহ ছয় মাস লাগে। আর তা-ই হচ্ছে গর্ভ ধারণের কম-সে-কম মুদ্দাত।

কেউ যদি বলে, আল্লাহ্র কথা ঃ 'সন্তান প্রসবকারী মায়েরা তাদের সন্তানদের দুধ খাওয়াবে পূর্ণ দুই বছর তার জন্যে যে দুধ খাওয়ানোটাকে পূর্ণ করতে ইচ্ছুক' দুই বছরের উপর অকাট্য দলীল এবং চূড়ান্ত দুধ খাওয়ানোর জন্যে। অতএব তার পরে— মহাররম হওয়ার— দুধ খাওয়া তার পরে গণ্য হওয়া জায়েয নয়।

তাকে জবাবে বলা যাবে, 'সম্পূর্ণ করতে চাওয়া' কথাটি তার উপর বৃদ্ধির পরিপন্থী নয়। আল্লাহ নিজেই গর্ভের মিয়াদ ধরেছেন ছয় মাস। তা এই কথাটিতে বলা হয়েছে ঃ 'সন্তানের গর্ভ ও তার দুধ ছাড়ানো ত্রিশ মাসের মধ্যে হতে হবে।' অন্যত্র বলেছেন ঃ 'তার দুধ ছাড়ানো দুই বছরের মধ্যে।' এই গোটা কথা— যা দুটি আয়াতে বলা হয়েছে— এতে গর্ভের সময় ধরা হয়েছে ছয় মাস। তার উপর কিছু বেশি হওয়া নিষিদ্ধ নয়। দুধ খাওয়ানোর মিয়াদ স্বরূপ দুই বছরের উল্লেখ এ দুটির উপর বৃদ্ধি পাওয়াকেও নিষেধ করছে না। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ -

যে লোক তারিখ মত আরাফাতে উপস্থিত হতে পারল, সে হজ্জ পেয়ে গেল।

তার উপর ফরয বৃদ্ধি নিষিদ্ধ নয়। উপরন্তু তা এমন এক পরিমাণ নির্ধারণ, যা দুধ খাওয়ানোর মজুরী দানের দায়িত্ব পিতার উপর চাপায়। অথচ সে তার অধিক কালের দায়িত্ব

বহনে সাধ্য হতে পারে না। কেননা দুধ খাওয়ানোর কাজটা দুজনের সন্তুষ্টি ও রাজী হওয়ার ভিত্তিতে হবে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

যদি তারা দুজন রাজী হওয়া ও পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে দুধ ছাড়াতে ইচ্ছা করে, তাহলে তাদের কোন অপরাধ হবে না।

আল্লাহ একথাও বলেছেন ঃ 'যদি তোমরা ইচ্ছা কর যে, তোমাদের সন্তানদের দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করবে, তাহলে তোমাদের দোষ হবে না।

এতে দুই বছর পর-ও মুহাররম হওয়ার দুধ খাওয়ানো প্রমাণিত হল। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, মুহাররম হওয়ার হুকুমটা এই দুই বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

যদি বলা হয়, দুধ ছাড়ানোটার গুরুত্ব স্বীকার করা হল না কেন ? যেমন ইমাম মালিক গণ্য করেছেন দুই বছরের মধ্যে, যখন শিশু সাধারণ খাবার খেয়ে দুধ খাওয়ার প্রয়োজন মুক্ত হয়ে যাবে ? যার দলীল হল নবী করীম (স)-এর কথা। বলেছেন, 'দুধ ছাড়ানোর পর দুধের হুকুম হবে না।' এ বিষয়ে সাহাবীগণ থেকে বর্ণনা এসেছে, যেমন পূর্বে উল্লেখ করেছি। এই সবই প্রমাণ করে দুধ ছাড়ানোর গুরুত্ব।

জবাবে বলা যাবে, তা যদি আবশ্যিক হতো, তাহলে দুবছর পর শিশুর অবস্থা বিবেচনা করা আবশ্যক, তার দুধ খাওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা, সে তা না খেয়ে পারে কিনা ? কেননা অনেক শিশুর জন্যে দুই বছরের পরও বুকের দুধ খাওয়ার প্রয়োজন থাকে। কিন্তু দুই বছর পর তা গণ্য করা যখন সর্বসম্মতভাবে প্রত্যাহৃত, তখন দুই বছরের মধ্যে তা প্রত্যাহৃত হওয়াও প্রমাণিত হল এবং মুহাররম হওয়ার হুকুম নির্ভরশীল হবে সময়ের উপর, অন্য কিছুর উপর নয়।

যদি প্রশ্ন তোলা হয়, হযরত জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসে নবী করীম (স)-এর এই কথাটি এসেছে ঃ 'দুই বছর পর মুহাররম করার দুধ পান গণ্য হবে না।'

জবাবে বলা যাবে, রাসূলের কথা হিসেবে মশহুর হল, 'দুধ ছাড়ানের পর দুধ খেলে তাতে দুধ পানের হুকুম কার্যকর হবে না।' তাই এটাই হয়ত আসল হাদীস। আর দুই বছরের উল্লেখ ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করতে হবে। যদি এই শব্দটি প্রমাণিত হয়, তাহলে হয়ত তিনি বলতে চেয়েছেন, দুই বছর পর দুধ খাওয়ানোর দায়িত্বটা পিতার উপর থাকবে না। যেমন 'পূর্ণ দুই বছর— যে দুধ খাওয়ানোকে সম্পূর্ণ করতে চায় তার জন্যেও' এই কথাটির একটা ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এ সংক্রান্ত কথা আগে চলে গেছে। তাছাড়া দুই বছর যদি দুধ খাওয়ানোর মিয়াদ হয়, আর এই সময়ের মধ্যে ছাড়ানোও ঘটবে, তাহলে আল্লাহ নিশ্চয়ই বলতেন না ঃ 'তবে যদি তারা দুইজন দুধ ছাড়াতে ইচ্ছা করে।' এই কথাটি দুটি দিক দিয়ে প্রমাণ করে যে, 'দুই বছর' কথাটি দ্বারা 'সময় নির্ধারণ' করা হয়নি দুধ ছাড়ানোর জন্যে। সে দুটি দিকের একটি হল, আল্লাহ্‌র কথা فصالا 'ছাড়ানো' কথাটি অনির্দিষ্ট نكره হিসেবে এসেছে। যদি দুই বছরে ছাড়ানো হতো, তাহলে নির্দিষ্ট ভাবে الفصال বলা হতো। তাহলে এই ছাড়ানোর কথাটি 'দুই বছর'-এর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যেত। কেননা তা مُشَارٌ اِلَيْهِ - معهود সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ যখন نكره শব্দ ব্যবহার করেছেন, তখন বোঝা গেল, এর দ্বারা দুই বছর বোঝানো হয়নি।

আর দ্বিতীয় দিক হল, দুধ ছাড়ানোর ব্যাপারটিকে তাদের দুজনের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল বানানো হয়েছে। কিন্তু যা কোন সীমিত সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়, তা কখনও ইচ্ছা, রাজী হওয়া ও পারস্পরিক পরামর্শের উপর নির্ভরশীল হতে পারে না। এতেই দলীল রয়েছে আমাদের পূর্বে বলা কথার।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاِنْ اَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ وَتَشَاوُرٍ -

যদি তা দুজন ইচ্ছা করে দুধ ছাড়ানোর উভয় রাজী হয়ে পরস্পর পরামর্শ করে।

প্রমাণ করে যে, নিত্য নবঘটিত ঘটনাবলীতে শরীয়াতের বিধান জানার জন্যে ইজতিহাদ করা জায়েয। কেননা উক্ত আয়াতে পিতা-মাতাকে পারস্পরিক পরামর্শ করতে বলা হয়েছে শিশুর কল্যাণের বিষয় উদ্‌ঘাটনের জন্যে। আর তা নির্ভর করে তাদের মনের বিজয়ী ধারণা ও প্রবলতর চিন্তা-ভাবনার উপর। তবু তা দৃঢ় প্রত্যয় ও প্রকৃত ব্যাপারের সাথে সাক্ষাৎ ঘটায় না।

তাতে এ বিষয়ের-ও দলীল রয়েছে যে, দুধ খাওয়ার মিয়াদের মধ্যে দুধ ছাড়ানোর ব্যাপারটি তাদের দুজনার রাজী হওয়ার উপর নির্ভরশীল। কোন একজন অগ্রসর হয়ে দুধ ছাড়াতে পারে না। অন্যজনকে রাজী না করে। কেননা আল্লাহ্ তাঁর কথায় দুজনেরই রাজী হওয়ার ও পারস্পরিক পরামর্শের কথা বলেছেন। আল্লাহ্ তা করার অনুমতি দিয়েছেন স্বামী-স্ত্রী দুজনার রাজী ও পারস্পরিক পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত হলে। মুজাহিদ থেকে এই কথা বর্ণিত হয়েছে।

আগের কালের কোন কোন মনীষী এ আয়াতের মনসূখ হওয়ার কথা বলেছেন বলে বর্ণনা পাওয়া গেছে। শায়বান কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যারা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর দুধ খাওয়াবে' এই কথার পর ব্যাপারটা হালকা করার উদ্দেশ্যে বলেছেন ঃ 'তার জন্যে যে দুধ পানকে সম্পূর্ণ করতে ইচ্ছা করে।'

আবূ বকর বলেছেন, সম্ভবত তাঁর মতে দুই বছর কাল দুধ পান ওয়াজিব ছিল পরে তা হালকা করেছেন, এবং পরে দুধ পানের মিয়াদ কম-সে-কম করে দিয়েছেন। এই কথা বলে ঃ 'যে সম্পূর্ণ করতে চায় দুধ পানকে, তার জন্যে।'

আবূ জাফর আর-রাজী রুবাই ইবনে আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন কাতাদার মতই মত। আলী ইবনে আবূ তালহা ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌র কথাঃ 'যারা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর দুধ খাওয়াবে যে দুধ পানকে সম্পূর্ণ করতে চায় তার জন্যে।' এরপর বলেছেন ঃ 'যদি তারা উভয় রাজী হয়ে পরামর্শ করে দুধ ছাড়াতে চায়।

অতএব দুই বছরের পূর্বে বা পরে দুধ ছাড়াবার ইচ্ছা করলে তাদের কোন দোষ হবে না।

## স্বামী-মরে যাওয়া স্ত্রীলোকের ইদ্দত

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا -

তোমাদের মধ্য থেকে যারা মরে যায় এবং স্ত্রীদের রেখে যায়, তারা নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালনে রত রাখবে।

التَّرَبُّصُ بِالشَّيْءِ কোন জিনিস নিয়ে 'তারাব্বুস' করা অর্থ অপেক্ষা করা সেই জিনিস সহ। যেমন অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِيْنٍ -

অতএব তোমরা অপেক্ষা কর নির্দিষ্ট সময় যতক্ষণ না আসে। (সূরা মুমিনুন ঃ ২৫)

বলেছেন ঃ

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ -

এই মরু-বাসিন্দাদের মধ্যে এমন এমন লোক আছে, যারা আল্লাহ্‌র পথে কিছু ব্যয় করলে তাকে নিজেদের উপর জোরপূর্বক চাপানো খাজনা মনে করে। আর তোমাদের ব্যাপারে কালের আবর্তন অপেক্ষা করছে। (সূরা আত্-তওবা ঃ ৯৮)

এখানেও সেই অপেক্ষা করার অর্থই ব্যবহৃত।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُوْنِ -

ওরা কি বলে কবি। আমরা এ জন্যে কালের আবর্তনের অপেক্ষা করছি।

(সূরা আত্-তূর ঃ ৩০)

প্রথমোক্ত আয়াতে স্বামী মরে যাওয়া স্ত্রীদেরকে উল্লিখিত সময় পর্যন্ত নিজেদের স্বামী গ্রহণের জন্যে অপেক্ষায় রাখবার নির্দেশ দিয়েছেন। তার পরে-পরেই আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِىْ اَنْفُسِهِنَّ -

পরে তারা যখন তাদের নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে (ইদ্দত শেষ করবে). তখন তারা নিজেদের ব্যাপারে যা-ই করবে, তাতে তোমাদের উপর কোন দোষ চাপবে না।

আগের দিনে স্বামী-মরা স্ত্রীদের ইদ্দত ছিল এক বছর। আল্লাহ্‌র কথা ছিল ঃ

وَالَّذِيْنَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۚ وَصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ -

তোমাদের মধ্য থেকে যারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং পিছনে স্ত্রীদের রেখে যায়, তাদের স্ত্রীদের জন্যে এই অসীয়ত তাদের করে যাওয়া উচিত যে, এক বছর পর্যন্ত যেন তাদের জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করে দেয়া হয় এবং তাদেরকে যেন ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয়া না হয়।

এ আয়াতে কয়েকটি হুকুম রয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, ইদ্দতের সময় নির্ধারণ এক বছর কাল। আর একটি হল, স্ত্রীর খরচাদি ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা তার স্বামী রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে বহন করা, যতদিন তারা ইদ্দত পালনে রত থাকবে। কেননা আল্লাহ্ স্পষ্ট ভাষায়

বলেছেন ঃ 'অসীয়ত করতে হবে তাদের স্ত্রীদের জন্যে এক বছরকালের জীবনোপকরণের।' তার মধ্যে এটাও যে, স্ত্রী এই এক বছরকাল ঘর থেকে বের হতে পারবে না।

পরে কুরআনের আয়াতেই চার মাস দশ দিনের অতিরিক্ত সময়কে মিয়াদ থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। স্ত্রীর খরচাদি ও বাসস্থানের ব্যবস্থা মীরাসের রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে করাও মনসূখ হয়ে গেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কথা হল ঃ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا 'চার মাস দশ দিন'। এতে খরচাদি ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব করে দেয়া হয়নি। বের হওয়াটার মনসূখ হওয়া প্রমাণিত হয়নি। অতএব দ্বিতীয় ইদ্দত কালে ঘর থেকে বের হওয়া নিষিদ্ধই রয়ে গেছে, তা নিষিদ্ধ হওয়ার বাতিল প্রমাণিত হয়নি বলে। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল ওয়াসেতী— জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ইয়ামন, আবূ উবায়দ, হাজ্জাজ. ইবনে জুরাইয, উসমান ইবনে আতা, আতা, আল-খুরাসানী, ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে এ আয়াত পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, 'স্ত্রীদের জন্যে অসীয়ত এক বছরকালের জীবনোপকরণের, ঘর থেকে না বের করে' কথাটির অবস্থা এই যে, আগে স্বামী মরা স্ত্রীদের জন্যে খরচাদি ও বাসস্থানের ব্যবস্থা এক বছরের জন্যে করা হতো। পরে তা মনসূখ হয়ে যায় মীরাসের আয়াত দ্বারা। মীরাস বন্টনে তাদের জন্যে স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পদ-সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ কিংবা এক-অষ্টমাংশ নির্দিষ্ট হয়। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَاوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ اِلَّا اَنْ يَرْضَى الْوَرَثَةُ -

উত্তরাধিকারীর জন্যে কোন অসীয়ত নেই। তবে উত্তরাধিকারীরা যদি রাজী হয় .....।

আবূ উবায়দ ইয়াযীদ, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ, হুমায়দ, নাফে সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি জয়নব বিনতে আবূ সালমা উম্মে সালমা ও উম্মে হাবীবা থেকে এই কথা শুনতে পেয়েছেন যে, একজন মেয়েলোক নবী করীম (স)-এর নিকট এসে বলল, তার একটি মেয়ে আছে, সে মেয়ের স্বামী তাকে রেখে মরে গেছে, তার চোখে অসুখ দেখা দিয়েছে। এখন সে চোখে সুরমা ব্যবহার করতে চায়। তখন নবী করীম (স) বললেন, তোমাদের এক-একজন আগে বছরের মাথায় উটের গোবর দিয়ে চিহ্ন দিতে। এখন বছর নয়, মাত্র চার মাস দশ দিন সময়।

হুমায়দ বলেছেন, আমি জয়নবকে জিজ্ঞাসা করলাম, উঠের গোবর দিয়ে চিহ্ন দেয়ার অর্থ কি ? বললেন, জাহিলিয়াতের যুগে স্বামী-মরা স্ত্রীলোকেরা তার জন্যে দেয়া ঘর ক্রয় করার সংকল্প করত এবং সেই ঘরে এক বছরকাল ধরে বসে থাকত। যখন এক বছর অতিবাহিত হয়ে যেত, তখন সেখান থেকে বের হয়ে পড়ত। তখন উটের গোবর দিয়ে তার পেছনে চিহ্ন দিত। ইমাম মালিক এ হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে আবূ বকর ইবনে আমর, হুমায়দ, নাফে, জয়নব বিনতে আবূ সালমার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এরপর হাদীসটির উল্লেখ করেছেন। তাতে বলেছেন, জাহিলিয়াতের যুগে কোন মেয়েলোকের স্বামী মরে গেলে সে ঝুপড়িতে প্রবেশ করত, নিকৃষ্টতম কাপড় পরত। কোন সুগন্ধি ব্যবহার করত না— কোন কিছুই নয়, এভাবেই এক বছরকাল অতিবাহিত করে দিত। তখন তাকে একটি গাধা চলা-চলের জন্যে ও একটি ছাগী বা পাখী দেয়া হতো। এসব নিয়ে সে মরে যেত। যখন সে কোন জিনিস নিয়ে সরে যেত, সেটি মরে যেত। পরে সে বের হতো। তখন তাকে উটের গোবর দেয়া হতো, তা দিয়ে সে চিহ্নর

দিত। পরে সে সুগন্ধি ব্যবহারে দিকে ফিরে আসত। নবী করীম (স) জানিয়েছেন, এক বছরকালের ইদ্দত মনসূখ হয়ে গেছে, তদস্থলে চার মাস দশ দিন নির্দিষ্ট হয়েছে। তবে এই সময়ে সুগন্ধি ইত্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধই রয়েছে।

এক বছরকালের ইদ্দতের কথা যদি তিলাওয়াতে শেষে আসে, কিন্তু তা নাযিল হয়েছে আগে। আর চার মাস দশ দিনের ইদ্দতের কথা যদিও পাঠের দিক দিয়ে আগে; কিন্তু নাযিল হয়েছে পরে এবং তা-ই আগের মিয়াদকে মনসূখ করেছে। কেননা কুরআনের বর্তমান 'তরতীব' নাযিল হওয়ার অনুপাতে নেই। কুরআন বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, এক বছরের ইদ্দত মনসূখ হয়ে গেছে। তদস্থলে মাসভিত্তিক ইদ্দত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর স্বামী-মরা স্ত্রীদের জন্যে খরচাদি ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করার আগের রেওয়াজ মনসূখ হয়ে গেছে যদি সে গর্ভবতী না হয়। স্বামী-মরা গর্ভবতী স্ত্রীর ব্যাপারেও মতপার্থক্য রয়েছে। যথাস্থানে তা আলোচিত হবে। আলোচ্য আয়াতটি যে বিশেষভাবে স্বামী-মরে যাওয়া অ-গর্ভবতী স্ত্রীর প্রসঙ্গে সে বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই।

স্বামী-মরে যাওয়া গর্ভবতী স্ত্রীর ব্যাপারে তিন প্রকারের মতপার্থক্য রয়েছে। হযরত আলী (রা) বলেছেন, ইবনে আব্বাস (রা) থেকে তা দুটি বর্ণনার একটি— তার ইদ্দত মৃত্যুর ইদ্দত ও সন্তান প্রসবের মধ্যে যেটি তুলনামূলকভাবে বিলম্বে হবে, সেটিই তার ইদ্দত। উমর, আবদুল্লাহ্, জায়দ ইবনে সাবিত, ইবনে উমর ও অন্যান্যদের মধ্যে আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন ঃ সন্তান প্রসবই তার ইদ্দতকালের শেষ। আল-হাসান থেকে বর্ণিত, তার ইদ্দত সন্তান প্রসব এবং নিফাস থেকে তার পবিত্র হওয়া। এই সময়ের মধ্যে সে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না, যদ্দিন সে রক্তস্রাব দেখতে পাবে। হযরত আলী (রা) আল্লাহ্র কথা ঃ চার মাস দশ দিনকে গ্রহণ করেছেন। আর আল্লাহ্র কথা ঃ

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ -

গর্ভধারী মেয়েলোকদের ইদ্দত হচ্ছে তাদের সন্তান প্রসব হওয়া। (সূরা আত্-তালাক্ব ঃ ৪)

সন্তান প্রসব হলেই তাদের ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। স্বামী-মরা স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে দুটো আয়াতকে একত্রিত করার উপায় হিসেবে গর্ভধারিণী স্ত্রীদের ক্ষেত্রে সন্তান প্রসব ও মাস গত হওয়া—এ দুটির মধ্যে যেটি বিলম্বে ও পরে হবে সেটিকে ইদ্দতের শেষ ধার্য করা হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) ঘোষণা করেছেন, এই ব্যাপার যার সে তার সাথে 'মুবাহিলা' করতে পারে। বিষয়টি হচ্ছে, 'গর্ভধারিণীদের ইদ্দত হল তাদের গর্ভস্থ সন্তান প্রসব' কথাটি 'চার মাস দশ দিন' কথাটির পরে নাযিল হয়েছে। এর ফলে যেমন বললাম, সকলেরই ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ কথার উপর যে, 'গর্ভধারিণী স্ত্রীদের ইদ্দত'...... কথাটি সাধারণ ও শর্তহীন। আর স্বামী-মরা স্ত্রীদের কথা যদিও তালাকের পরই উল্লিখিত হয়েছে— কেননা সন্তান প্রসবকে ইদ্দতের শেষ গণ্য করায় সকলেই একমত। তাঁরা সকলেই বলেছেন, স্ত্রী গর্ভধারিণী হলে দশ মাস দশ দিন অতিক্রান্ত হলেই তার ইদ্দত শেষ হবে না, তা শেষ হবে সন্তান প্রসব হলে। কাজেই আল্লাহ্র কথা ঃ 'গর্ভধারিণীদের ইদ্দত তাদের সন্তান প্রসব' তার দাবি অনুযায়ী ব্যবহৃত হবে। সেই সঙ্গে মাসের হিসাব চলতে পারে না। এ-ও তার একটি প্রমাণ যে, মাসভিত্তিক ইদ্দত বিশেষভাবে অ-স্বামী মরা মেয়েলোকদের জন্যে। এ-ও প্রমাণ করে যে,

আল্লাহ্র কথা ঃ 'তালাক প্রাপ্তারা নিজেদেরকে তিন কুরু ইদ্দত পালনে রত রাখবে' ব্যবহৃত তালাক প্রাপ্তা অগর্ভধারিণীদের ক্ষেত্রে। গর্ভধারিণীর ক্ষেত্রে কুরু হিসাবের ইদ্দত অচল। বরং সাধারণভাবে গর্ভধারিণীরই ইদ্দত হল সন্তান প্রসব। তার সাথে কুরুর হিসাব চলতে পারে না। অবশ্য সন্তান প্রসব ও কুরু দুইটি ইদ্দতে একত্রিত হতে পারত এভাবে যে, তার ইদ্দত সন্তান প্রসবে শেষ হবে না, এবং তিন হায়য পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে। তেমনি স্বামী মরে যাওয়া গর্ভবতী স্ত্রীর ইদ্দত হবে সন্তান প্রসব, তার সাথে মাস মেলানো হবে না।

আমর ইবনে শুয়ায়ব— তাঁর পিতা— তাঁর দাদা থেকে বর্ণিত, বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল, এ আয়াতটি যখন নাযিল হয়েছে ঃ 'গর্ভধারিণীরা ইদ্দত পালন শেষ করবে সন্তান প্রসব দ্বারা' তালাকপ্রাপ্তা ও স্বামী-মরা স্ত্রী লোকদের ব্যাপারে। দুজনের জন্যেই তা হবে। উম্মে সালমা বর্ণনা করেছেন, মুবাইয়াতা বিনতিল হারিস তার স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর সন্তান প্রসব করে। তখন রাসূলে করীম (স) তাকে বিয়ে করার নির্দেশ দিলেন। মনসূর, ইবরাহীম, আল-আসওয়াদ, আবুল সানাবিল ইবনে বাকাক সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মুবাইয়াতা বিনতিল হারিস তার স্বামীর মৃত্যুর প্রায় বিশ দিন পর সন্তান প্রসব করে। তখন রাসূলে করীম (স) তাকে বিয়ে করার আদেশ দেন। এ হাদীসটি সহীহ্ বর্ণনা-ধারায় বর্ণিত হয়েছে। এর থেকে ব্যতিক্রম করার সুযোগ কারোর জন্যেই নেই। কুরআনের বাহ্যিক তাৎপর্যও এই মতকে শক্তিশালী করে।

এ আয়াত বিশেষভাবে মুক্ত স্বাধীন মেয়েলোকদের জন্যে প্রযোজ্য। ক্রীতদাসীর জন্যে নয়। কেননা আগের কালের ফিকাহবিদগণের মধ্যে— আমরা যতটা জানি— এবং বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদদের মধ্যে এই ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই যে, স্বামী-মরা দাসীর ইদ্দত হচ্ছে দুই মাস পাঁচ দিন। স্বাধীন মহিলার ইদ্দতের অর্ধেক। আসম থেকে বর্ণিত এ আয়াত দাসী ও স্বাধীনা— সব মেয়েদের ব্যাপারে সাধারণ। দাসীর তালাকের ইদ্দতেও তাই বলছিলেন যে, তা তিন হায়য। কিন্তু এটা অত্যন্ত বিরল কথা। আগের ও পরের ফিকাহবিদদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্ন। সুন্নাতেরও পরিপন্থী এই কথা। কেননা আগের কালের ফিকাহবিদগণ দাসীর ইদ্দত হায়য ও মাসের হিসেবে স্বাধীনার ইদ্দতের অর্ধেক হওয়ায় বিভিন্ন মত পোষণ করেন নি। নবী করীম (স) বলেছেন, দাসীর তালাক দুই, তার ইদ্দত দুই হায়য। এ হাদীসটিকে ফিকাহবিদগণ অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছেন। দাসীর ইদ্দত অর্ধেক করণে তাঁরা এ হাদীসকে কাজেও লাগিয়েছেন। ফলে তা 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের হয়ে গেছে। এর দ্বারা দৃঢ় জ্ঞান লাভ করা যায়।

স্বামী-মরা স্ত্রী যদি স্বামীর মৃত্যুর খবর জানতে না পারে, খবর তার নিকট পরে পৌঁছে যায়, তাহলে তার ইদ্দত কিভাবে পালিত হবে, এ বিষয়ে আগের কালের ফিকাহবিদদের মতপার্থক্য রয়েছে। ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর (রা) এবং আতা ও জাবির ইবনে জায়দ বলেছেন, তার স্বামীর মৃত্যুর দিন থেকে গুণতে হবে। তালাকেও তালাক দেয়ার দিন থেকে গুণতে হবে। আল আসওয়াদ ইবনে জায়দ এবং বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদদেরও এই কথা। আলী (রা), হাসানুল বসরী, খালাস ইবনে আমর বলেছেন, যে দিন মৃত্যুর খবরটা সে পাবে, সেদিন থেকে ইদ্দত পালন ও গণনা করবে, আর তালাকে যেদিন তালাক দেয়া হবে। রবীআতাও এই মত দিয়েছেন। শবী ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব বলেছেন, প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত

হলে মৃত্যুর দিন থেকেই ইদ্দত পালন করতে হবে। আর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত না হলে যে দিন স্ত্রী মৃত্যুর সংবাদ পাবে, সেদিন থেকেই ইদ্দত পালন শুরু করবে। এই তাৎপর্যের দিক হযরত আলী (রা)-র মত এই হতে পারে যে, স্ত্রীর নিকট তার স্বামীর মৃত্যুর সময় সংক্রান্ত খবর হয়ত প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এই কারণে মৃত্যুর খবর পাওয়ার দিন থেকে ইদ্দত পালনের জন্যে তিনি আদেশ দিয়েছেন সতর্কতা অবলম্বন স্বরূপ। আর তা এজন্যে যে, আল্লাহ তো মৃত্যু ও তালাকের দরুন ইদ্দত পালন করা ফরমান দিয়েছেন। বলেছেন ঃ 'তোমাদের মধ্য থেকে যারা মরে যায় এবং স্ত্রী রেখে যায়, তারা যেন নিজেদেরকে নতুন বিয়ে থেকে বিরত রাখে .....' এবং বলেছেন ঃ 'তালাক প্রাপ্তারা নিজেদেরকে তিন কুরু সময় অপেক্ষায় রাখবে।' এ দুটি আয়াতে স্বামীর মৃত্যু ও তালাক দানের দরুন স্ত্রীদেরকে ইদ্দত পালন করতে হবে বলে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিয়েছেন। অতএব এ আয়াত অনুযায়ী মৃত্যুর দিন ও তালাকের দিন থেকেই ইদ্দত পালন শুরু হতে হবে। আর সকল মনীষী যখন একমত হয়েছেন এই কথায় যে, তালাক প্রাপ্তা তালাকের দিন থেকে ইদ্দত পালন করবে, খবর পৌঁছার সময়কে গুরুত্ব দেন নি। মৃত্যু জনিত ইদ্দত-ও তেমনি হতে হবে। কেননা এ দুটিই ইদ্দত পালন কর্তব্য হওয়ার কারণ। উপরন্তু ইদ্দত পালন স্ত্রীর কোন কাজ নয়, এ কারণে তার শুধু খবর জানার গুরুত্ব। ইদ্দত তো হচ্ছে দিন অতিবাহন। এতে তার জানা ও না-জানার মাঝে তেমন কোন পার্থক্য নেই। আর মৃত্যুর কারণেও যখন ইদ্দত পালন করতে হবে— যেমন মীরাস, মীরাসে মৃত্যুর সময়ের গুরুত্ব। মৃত্যুর খবর পৌঁছার তেমন গুরুত্ব নেই। তাই ইদ্দতের বেলায়ও তাই হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাতে জানা ও না-জানার মধ্যে পার্থক্য হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। যেমন মীরাসের বেলায় হয় না। জানার ফায়দা বেশির পক্ষে তো এই যে, ইদ্দত পালনকারিণীকে ঘরের বাইরে যাওয়া ও অলঙ্কারাদির ব্যবহার পরিহার করে চলতে হয়, যখন খবর জানতে পারবে তখন থেকে। আর জানতে না পারার দরুন ইদ্দতে যেসব জিনিস পরিহার করতে হয় তা পরিহার না করা ইদ্দত পালন ও ইদ্দতের মিয়াদ শেষ হওয়ার প্রতিবন্ধক হবে না। কেননা সে যদি জানতে পারে, আর সেজন্যে ঘরের বাইরে যাওয়া ও অলঙ্কারাদির ব্যবহার পরিহার না করে, তাতে ইদ্দত শেষ হওয়ার উপর কোন প্রভাব পড়বে না। অনুরূপভাবে সে যদি জানতে পারে তাহলেও তাই।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'চার মাস দশ দিন'। সুলায়মান ইবনে শুয়াইব— তাঁর পিতা আবূ ইউসূফ, আবূ হানীফা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, স্বামী-মরা স্ত্রী ও তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ইদ্দত পালন করবে মাস হিসাবে। তা যদি চাঁদ দেখার সঙ্গে ওয়াজিব হয় তাহলে চান্দ্রমাস অনুযায়ী ইদ্দত পালন করবে। মাস অসম্পূর্ণ হোক, কি সম্পূর্ণ। ইদ্দত যদি মাসের অংশে ওয়াজিব হয় তাহলে চাঁদের হিসেবে ইদ্দত পালন করবে না, তালাকে নব্বই মাস আর মৃত্যুতে একশত ত্রিশ দিন ইদ্দত পালন করবে।

সুলায়মান ইবনে শুয়াইব, তাঁর পিতা মুহাম্মাদ, আবূ ইউসূফ, আবূ হানাফী সূত্রে উক্ত কথার বিপরীত কথাও বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, কোন মাসের অংশে যদি ইদ্দত ওয়াজিব হয়, তাহলে সেই ইদ্দত পালন করবে মাসের অবশিষ্ট দিনগুলো। পরে চাঁদের হিসেবে মাস অনুযায়ী ইদ্দত পালন চলবে, পরে প্রথম মাসে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে। আর ইদ্দত পালন যদি চাঁদ দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওয়াজিব হয়, তাহলে চাঁদ অনুযায়ী ইদ্দত পালন করবে। এটাই আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ ও শাফেয়ীর কথা। ইমাম মালিক থেকে 'ইজারা'র মাসলায়ও অনুরূপ কথাই বর্ণিত হয়েছে।

ইবনুল কাসিম বলেছেন, কিরা-কসম ও তালাকের ক্ষেত্রেও এইরূপ কথা। হানাফী ফিকাহবিদগণও ইজারার ব্যাপারে এরূপ কথাই বলেছেন। আমার ইবনে খালিদ ও জুফর মাসের অংশে ঈলা হলে এরূপ বলেছেন। সে ইদ্দত পালন করবে প্রতি মাসের হিসাবে, যা তার উপর অতিবাহিত হবে অংশ হিসাবে হোক, কি পূর্ণ হিসাবে হোক।

আবূ ইউসূফ বলেছেন, ইদ্দত পালন করবে দিন গুণতিতে। এভাবে একশত বিশ দিন পূরণ করবে। মাসের অংশ বা পূর্ণত্বের দিকে লক্ষ্য দেবে না।

আবূ বকর বলেছেন, এই সব কথা সুলায়মান ইবনে শুয়াইব, তাঁর পিতা আবূ ইউসূফ, আবূ হানীফা সূত্রে মাস হিসেবে ইদ্দত পালন পর্যায়ে বলেছেন, সেই অনুযায়ী। ইদ্দতের মিয়াদের ব্যাপারে, ঈলার মিয়াদে, এবং কিরা-কসম ইত্যাদির মিয়াদের ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই— চাঁদ দেখার ভিত্তিতে মাস অনুযায়ী চুক্তি হয়। তাতে সব মাসেই চাঁদকে অনুসরণ করা হবে। তা অসম্পূর্ণ হোক, কি সম্পূর্ণ। কোন মাসের অংশে যদি মিয়াদ শুরু হয়, তাহলে তা হবে আমাদের উল্লিখিত কথার বিপরীত।

তবে যিনি মনে করেন, এ ব্যাপারে প্রথম মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোকে সংখ্যার দিক দিয়ে ত্রিশ দিন ধরতে হবে। আর পরবর্তী মাসসমূহ চাঁদ হিসেবে, পরে শেষ মাসটি প্রথম মাসের অবশিষ্ট সহ দিন হিসাবে গুণতে হবে। তিনি নবী করীম (স)-এর কথার উপর নির্ভর করেছেন ঃ 'তোমরা রোযা থাক চাঁদ দেখে এবং রোযা থাকা বন্ধ কর চাঁদ দেখে। মাসের শেষ দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে (ও চাঁদ দেখতে না পারলে) শাবান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।' এই কথাটির দুটি অর্থ। একটি, প্রত্যেক মাসের শুরু ও শেষ চাঁদ অনুযায়ী হবে। আমরাও তা গণ্য করার প্রয়োজন বোধ করেছি। অতএব মাসকেই ধরতে হবে, তা অসম্পূর্ণ হোক, কি সম্পূর্ণ ঠিক। যেমন রাসূলে করীম (স) রমযানের রোযা ও শাবান মাসকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে প্রত্যেকটি মাসের শুরু ও শেষ চাঁদের হিসাবে হবে না, তখন তাতে ত্রিশ দিন গুণতে হবে। কেননা চাঁদেরও তো মাস অসম্পূর্ণ হয়। তাই প্রথম মাসের শুরু যখন নতুন চাঁদের হিসাবে হবে না, তখন মিয়াদের শেষের ত্রিশ দিন পূর্ণ করতে হবে। আর সব কয়টি মাস চাঁদের হিসাবে পূর্ণ করা যখন সম্ভব হবে না, তখন তাকেও এভাবেই গণ্য করতে হবে।

আর যিনি সব কয়টি মাস দিন হিসাবে পালন কর‍ার কথা বলেছেন, তিনি বলছেন, মিয়াদ পালন যখন চাঁদের হিসাবে শুরু করা যায়নি, তখন এই মাস ত্রিশ দিনে গণনা করাই বাঞ্ছনীয়। তাহলে তার পরবর্তী কোন মাসের অংশে তা শেষ হবে। পরে সব কয়টি মাসের হুকুম সেই রকমেরই হবে। তাঁরা বলেছেন, এই মাসটির অসম্পূর্ণতা অপর কোন মাস দ্বারা পূর্ণ করা সঙ্গত হবে না। সে দুটির মাঝের মাসকে চাঁদ অনুযায়ী বানিয়ে দেবে। কেননা মাসগুলোর ব্যাপার হল, তা দিনগুলো পর পর মিলিত— একটির পর আর একটি হয়ে থাকে। এই কারণে একটি মাসের পূর্ণতা পূর্ণ ত্রিশ দিন হবে প্রথম মিয়াদ থেকে শুরু করে পর-পর মিলিত। ফলে দ্বিতীয় মাসের শুরুটা দ্বিতীয় মাসে কোন অংশে পড়বে। তাহলেই মাসসমূহ এবং তার দিনগুলো পর পর মিলিত— সংযোজিত হবে।

পরবর্তী মাসগুলোকে প্রথম মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোর পর চাঁদের হিসাবে করার গুরুত্বের

কথা যাঁরা বলেন, তাঁদের দলীল আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তা হল পরবর্তী মাসটিকে নতুন চাঁদের হিসাবে নিতে হবে। তাহলে তার শেষটা নতুন চাঁদের হিসাবেই হওয়া উচিত। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ –

অতএব তোমরা জমিনে চার মাস ধরে ভ্রমণ করতে থাক। (সূরা তওবা ঃ ২)

মনীষিগণ এই বর্ণনায় একমত যে, সেই চারটি মাস ছিল যিলহজ্জ মাসের বিশ তারিখ, মুহাররম, সফর ও রবিউল আউয়াল এবং রবিউস্-সানী মাসের দশ দিন। এতে নতুন চাঁদ গণ্য হয়েছে পরে আসা মাসগুলোতে, দিনের সংখ্যা গণ্য হয়নি। অতএব এর মত মুদ্দতের সব ব্যাপারেই সেই রকম হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আল্লাহ্‌র কথা وَعَشْرًا 'এবং দশ— অর্থাৎ দশ দিন।' বাহ্যত এর অর্থ দশ রাত ও সেই সাথে দিনগুলোও। কিন্তু রাতগুলোর উপর বিজয়ী হয়েছে যখন তা তারিখে একত্রিত হয়েছে। কেননা নতুন চাঁদের হিসাবে মাসের শুরু চন্দ্রোদয়ের মুহূর্ত রাত থেকেই হয়। মাসগুলোর শুরুই যখন রাত, তখন রাত-ই অগ্রবর্তী থাকবে এবং বিশেষভাবে উল্লেখ করা হবে দিনগুলোর পরিবর্তে, যদিও তার বিপরীতে দিনগুলোই ফায়দা দেয়। আর যদি দিনগুলোর উল্লেখ একসাথে হয়, তাহলে তার বিপরীত রাতগুলো ফায়দা দেয়। এর প্রমাণ আল্লাহ্‌র কথা ঃ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا 'তিন দিন শুধু ইশারায় (কথা বলবে)'। অপর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا 'তিন রাত সমান।' ঘটনা একটিই। কখনও দিনের উল্লেখ দ্বারা রাতের উল্লেখের প্রয়োজন পূরণ করা হয়েছে, কখনও রাতের উল্লেখ করে দিনের উল্লেখের প্রয়োজন পূরণ করা হয়েছে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ –

মাস হচ্ছে উনত্রিশ দিনে।

অন্য কথায়, উনত্রিশ, বোঝা গেল, দুটি সংখ্যার প্রত্যেকটি যখন সাধারণভাবে উল্লেখ করা হবে, তখন তার বিপরীতে অবস্থিত সংখ্যাটিও বোঝা যাবে। লক্ষণীয়, রাতসমূহ ও দিনসমূহের দুটি সংখ্যা যখন ভিন্ন ভিন্ন হবে, তখন শব্দেই সে দুটির মধ্যে পার্থক্য করা হবে। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْمًا –

'সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত ক্রমাগত তাদের উপর চাপিয়ে রেখেছিলেন করা উল্লেখ করেছেন, আরবরা বলে صُمْنَا عَشْرًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ 'আমরা রমযানের দশটি রোযা রয়েছি।' তারা এই কথা বলে রাত্রের কথার দ্বারা দিনগুলোকে বোঝাতে চায়। কেননা দশ তো রাত্রের জন্যে হয়। দশ দিন বললে স্মরণ করিয়ে দেয়া ছাড়া তাতে আর কিছুই জায়েয হয় না। কবি শুধু 'তিন' বলেছেন। এ তিন হল রাত্রি। আর এর অর্থ হল দিন ও রাত্রি। এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'চার মাস ও দশ' চার মাস মিয়াদ বোঝাবার জন্যে যথেষ্ট। দশ দিন তার উপর বাড়তি, যদিও সংখ্যার শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গের শব্দে বলা হয়েছে।

## ইদ্দত পালনকারিণীর বাইরে বের হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন মত

হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, তিন তালাক বায়েন দেয়া স্ত্রী ও স্বামী-মরা স্ত্রী সেই ঘর থেকে বের হবে না যে ঘরে সে আগে থেকে বসবাস করে আসছে। তবে স্বামী-মরা স্ত্রী দিনের বেলা বের হতে পারবে। তার নিজের ঘর ছাড়া অন্য কোথাও রাত্রি যাপন করবে না। তালাক প্রাপ্তাও রাত্রিবেলা বের হবে না, দিনের বেলায়ও না। তবে ওযর হলে ভিন্ন কথা। আল-হাসানও এই কথাই বলেছেন। ইমাম মালিক বলেছেন, বায়েন বা রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা ও স্বামী-মরা স্ত্রী দিনের বেলায়ও ঘরের বাইরে যাবে না। তাদের নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যত্র রাত্রি যাপন করবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, বসবাসের ঘরসমূহে সাজ-সজ্জার উপকরণ থাকবে না, তাহলে স্বামী-মরা স্ত্রী যে কোন ঘরে অবস্থান করতে পারে। তা উত্তম ঘর হোক, কি নিকৃষ্ট ধরনের।

আবূ বকর বলেছেন, তালাকপ্রাপ্তার জন্যে এই হুকুমের কারণ— আল্লাহ্‌র কথা ঃ

لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ –

তোমরা তাদেরকে তাদের বসবাসের ঘর থেকে বহিষ্কৃত করবে না, তারা নিজেরাও বের হবে না। তবে যদি তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জতার কাজ করে বসে, তাহলে ভিন্ন কথা।
(সূরা আত্-তালাক্ব ঃ ১)

এ আয়াতে তাদের বাইরে বের হওয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বের করাকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই হুকুম অবশ্য ইদ্দত পালনকালের জন্যে। তবে তারা যদি কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জতার কাজ করে বসে। এটা একটা ওযরের ব্যাপার। তাই ওযরের দরুন বের হতে হলে বের হবে, তা মুবাহ্ করা হয়েছে।

এ আয়াতে যে সুস্পষ্ট নির্লজ্জতার কথা বলা হয়েছে, তার তাৎপর্য সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। তা যথাস্থানে আলোচিত হবে। তবে স্বামী-মরা স্ত্রীর ব্যাপারে যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম ইদ্দত প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ 'এক বছরের জীবনোপকরণ দিতে হবে, ঘর থেকে বের না করে।' পরে চার মাস দশ দিনের অতিরিক্ত সময়টা পরিত্যক্ত হয়েছে। ফলে এই দ্বিতীয়বারের বলা ইদ্দতের হুকুমটা বহাল রয়েছে। অবশ্য ঘরের বাইরে যাওয়ার নিষেধ যথাযথ রয়ে গেছে। কেননা তা মনসূখ হয়নি। ইদ্দতের বাড়তি সময়টাই শুধু মনসূখ হয়ে গেছে।

কুরআনের এই কথাই হাদীসেও এসেছে। মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিমাতাল কানবী, মালিক, সাদ ইবনে ইসহাক ইবনে কাব ইবনে আজরাতা, তাঁর ফুফু জয়নব বিনতে কাব ইবনে আজরাতা সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, ফরীয়াতা বিনতে মালিক ইবনে সিনান— তিনিই সাঈদুল খুদরীর বোন— তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তিনি বনু খুদরাতার আত্মীয়দের নিকট যেতে চান। কেননা তাঁর স্বামীকে তারই এক দাস হত্যা করেছে। তাই তিনি তাঁর পিতৃকুলের আত্মীয়দের নিকট চলে যেতে চান। কেননা লোকেরা আমাকে এমন ঘরে বাস করতে দেয়নি, যার সে মালিক। আর 'নফকা'র ব্যবস্থাও করা হয়নি। তখন রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ হ্যাঁ, যেতে পার। পরে আমি বের হয়ে গেলাম। পরে আমি হুজরায় কিংবা মসজিদে

ছিলাম, তখন নবী করীম (স) আমাকে ডাকলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি বললে ?..... আমি তখন ব্যাপারটি আবার বিবৃত করলাম। আমার স্বামী সংক্রান্ত ঘটনা খুলে বললাম। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ

أُمْكُثِىْ فِىْ بَيْتِكِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهُ -

তুমি তোমার ঘরে অবস্থান কর, যতক্ষণ না ইদ্দত শেষ হয়ে যায়।

বললেন, পরে আমি সেই ঘরেই দশ মাস দশ দিনের ইদ্দত পালন করলাম। পরে উসমান আমার নিকট লোক পাঠালেন, সেই বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি তাঁকে সব জানালাম। তিনি তা অনুসরণ করলেন ও ফায়সালা করে দিলেন।

ইবনে আব্বাস থেকে এর বিপরীত কথা বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, আহমদ ইবনে মুহাম্মাদুল মেরওয়াজী, মূসা ইবনে মাসউদ, শবল, ইবনে আবূ নুজাইহ্ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আতা বলেছেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ 'এই আয়াতটি তার ইদ্দত তার পরিবারের লোকদের নিকট পালন করাকে মনসূখ করে দিয়েছে। অতএব সে যেখানেই ইচ্ছা ইদ্দত পালন করতে পারে। তা হচ্ছে আল্লাহ্র কথা ঃ غَيْرَ اِخْرَاجٍ 'ঘরের বের না করে;' আতা বলেছেন, সে ইচ্ছা করলে তার পরিবারবর্গের নিকট ইদ্দত পালন করতে পারে এবং তার ঘরেও সে অবস্থান করতে পারে, চাইলে সে বাইরেও বেরুতে পারে। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ -

'তারা যদি ঘরের বাইরেও যায়, তাহলে তারা যা করবে, তাতে তোমাদের উপর কোন দোষ চাপবে না।

আতা বলেছেন, এর পর মীরাসের আয়াত নাযিল হল। তাতে বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব মনসূখ হয়ে গেল। এখন সে যেখানে ইচ্ছা ইদ্দত পালন করতে পরে।

আবূ বকর বলেছেন, মীরাসের বিধানে এমন কিছু নেই, যাতে ঘরে অবস্থান করার বিধান মনসূখ হয়ে গেছে বলে মনে করতে হবে। দুটোই একসাথে হতে পারে। একটি প্রমাণিত হলে অপরটি নিষিদ্ধ হবে, তার কোন কারণ নেই। রাসূলের সুন্নাতে বরং তা প্রমাণিত হয়েছে এক বছরের ইদ্দত মনসূখ হয়ে যাওয়ার ও মীরাসের আইন জারী হওয়ার পর। কেননা ফরিয়ার ইদ্দত চার মাস দশ দিনের ছিল। অথচ রাসূলে করীম (স) তাকে স্থানান্তরিত হতে নিষেধ করেছিলেন। এছাড়া ফরিয়ার কাহিনীতে আর যেসব কথা এসেছে, তা দুটি তাৎপর্য বোঝায়। একটি হল, স্বামীর মৃত্যুর দিন সে যে ঘরে বাস করত, সেই ঘরে বাধ্যতামূলকভাবে অবস্থান গ্রহণ এবং স্থানান্তরিত হতে নিষেধ করা। আর দ্বিতীয় হল, ঘরের বাইরে যাওয়া বৈধ হওয়া। নবী করীম (স) ঘরের বাইরে যাওয়াকে অস্বীকার করেন নি। যদি বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধই হতো, তাহলে তিনি অবশ্যই নিষেধ করতেন। আগের দিনের ফিকাহবিদদের বহু সংখ্যক থেকে এরূপ কথাই বর্ণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, উমর, জায়দ ইবনে সাবিত, উম্মে সালমা ও উসমান (রা) উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সকলেই বলেছেন, স্বামী-মরা স্ত্রী দিনের বেলায় ঘরের বাইরে যেতে পারে। তবে নিজের ঘর ছাড়া অন্য কোথাও রাত্রি যাপন করবে না।

আবদুর রাযযাক ইবনে কাসির, মুজাহিদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, ওহুদের যুদ্ধে কিছু সংখ্যক পুরুষ শহীদ হয়ে যান। তাঁদের স্ত্রীরা বিধবা ও স্বামীহারা হয়ে যান। তাঁরা একটি ঘরের পাড়া-প্রতিবেশী ছিলেন। তাঁরা রাসূলে করীম (স)-এর নিকট এসে বললেন, আমরা আমাদেই এক-একজনের নিকট রাত্রি যাপন করেছি। নবী করীম (স) বললেন, তোমরা দিনের বেলায় পরস্পরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ কর। কিন্তু রাত্র হলেই প্রত্যেকে নিজের ঘরে চলে আসবে।

আগের কালের মনীষীদের বহু সংখ্যক থেকে বর্ণিত হয়েছে, স্বামী-ম'রা স্ত্রীরা যেখানে ইচ্ছা তাদের ইদ্দত পালন করবে। এঁরা হচ্ছেন হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও আয়েশা (রা)। উপরে কুরআন ও সুন্নাতের যে দলীল আমরা পেশ করলাম, তাতে প্রথমোক্ত কথাটিরই সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।

যদি বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ - فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِىْ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ -

এক বছর কালের জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করার অসীয়ত করবে ঘর থেকে বহিষ্কার না করে। তারপর যদি তারা ঘরের বাইরে যায়, তাহলে তারা নিজেদের ব্যাপারে শরীয়াত সম্মত যা-ই করবে, সে জন্যে তোমাদের উপর কোন দোষ চাপবে না।

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, সে স্থানান্তরিত হতে পারে। বলা হয়েছে, এর অর্থ হল, ইদ্দত শেষ হওয়ার পর যদি তারা বের হয়, যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 'তারা যখন তাদের ইদ্দতের শেষে পৌঁছে গেল, তখন তারা নিজেদের ব্যাপারে যা-ই করুক, তোমাদের উপর কোন দোষ চাপবে না।'

এ আয়াত— যেমন আমরা বলেছি— প্রমাণ করে যে, ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই যদি তারা বের হয়ও, তবু বিয়ে করা তাদের জায়েয হবে না। এটা সর্বসম্মত মত। বোঝা গেল, এর অর্থ হচ্ছে, 'যদি তারা ইদ্দত শেষ হওয়ার পর বের হয়। আর ব্যাপার যখন এই, তখন স্বামী-মরা স্ত্রীদের জন্যে স্থানান্তরিত হওয়া নিষিদ্ধই থেকে গেল।

তাঁরা যে বলেছেন, তালাকপ্রাপ্তারা রাত্রে ও দিনে কখনই বের হবে না, তার কারণ হল আল্লাহ্‌র কথা ঃ

لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ -

এবং তোমরা তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বহিষ্কৃত করবে না এবং তারাও বের হবে না।
(সূরা আত্‌-তালাক্ব ঃ ১)

এ কথা তাদের সকলেরই ব্যাপারে সাধারণ ও নির্বিশেষ। তাদের ঘর থেকে বের হওয়া সাধারণভাবেই এবং সকল সময়ের জন্যেই নিষিদ্ধ। অবশ্য স্বামী-মরা স্ত্রীদের অবস্থা এদিক দিয়ে ভিন্ন যে, স্বামী-মরা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ তারা নিজেরাই করবে। আর তালাকপ্রাপ্তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তাদের স্বামীর উপর। ফলে তার ঘরের বাইরে যাওয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না।

## স্বামী-মরা স্ত্রীর সাজ-সজ্জা

সাহাবীগণের এক জামা'আত থেকে বর্ণনা এসেছে, স্বামী-মরা স্ত্রীদের সাজ-সজ্জা, অলঙ্কার ও সুগন্ধি ব্যবহার পরিহার করা কর্তব্য। তাঁদের মধ্যে হযরত আয়েশা, উম্মে সালমা ও ইবনে উমর (রা) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। আর সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার প্রমুখ তাবেয়ী ও মদীনার ফিকাহবিদদেরও এই মত। হানাফী ফিকাহবিদ এবং বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণও তাই বলেছেন। এ বিষয়ে এদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। নবী করীম (স) থেকেও তা-ই বর্ণিত হয়েছে। আমাদের নিকট মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ কানবী, মালিক, আবদুল্লাহ ইবনে আবূ বকর, হুমায়দ ইবনে নাফে, জয়নব বিনতে আবূ সালমা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁকে এসব হাদীসের কথা জানিয়েছেন। জয়নব বলেছেন, আমি উম্মে হাবীবার নিকট উপস্থিত হলাম যখন তাঁর পিতা আবূ সুফিয়ান মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। তিনি হরিৎ বর্ণের সুগন্ধি নিয়ে আসতে বললেন। পরে একটি ক্রীতদাসী তা মর্দন করল। পরে তা তার গাল মুখে মেখে দিল। পরে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমার সুগন্ধির কোন প্রয়োজন নেই। তবে আমি রাসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ

لَا يَحِلُّ لِاَمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تَحُدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ اِلَّا عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا -

আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার কোন মেয়েলোকের পক্ষে তিন দিনের অধিক সময় কোন মৃতের জন্যে শোক করা হালাল নয়। তবে স্বামীর জন্যে তা করতে হবে চার মাস দশ দিন।

জয়নব বললেন, আমার মা উম্মে সালমাকে বলতে শুনেছি, রাসূলের নিকট একটি মেয়েলোক উপস্থিত হল। বলল, হে রাসূল! আমার কন্যার স্বামী মরে গেছে। তার চোখে একটা রোগ দেখা দিয়েছে। এখন কি সে সুরমা লাগাতে পারে ? তখন নবী করীম (স) দুইজন বা তিনজন মহিলাকে বললেন, তাদের প্রত্যেকেই বলছিল— না। পরে রাসূলে করীম (স) বললেন, মূলত ইদ্দত চার মাস দশ দিন। জাহিলিয়াতের যুগে তোমাদের এক-একজন বছরের মাথায় উটের গোবর স্থাপন করে চিহ্ন দিতে।

হুমায়দ বলেছেন, আমি জয়নবকে জিজ্ঞাসা করলাম, বছরের মাথায় তোমরা উটের গোবর রেখে চিহ্ন দেয়ার কাজটা কি করতে ? জয়নব বললেন, স্ত্রী স্বামী মরে গেলে সে তাঁবুতে প্রবেশ করত এবং তার নিকৃষ্টতম কাপড়খানা পরত। কোন সুগন্ধি বা কোন জিনিস স্পর্শ করত না। এভাবে একটি বছর অতিবাহিত হয়ে যেত। পরে তাকে জন্তুযান স্বরূপ একটি গাধা দেয়া হতো বা একটি ছাগী বা একটি পাখী। তা নিয়ে সে সরে যেত। যে জিনিস নিয়েই সরে যেত, সেটা মরে যেত। পরে সে নিজে বের হয়ে যেত। তখন তাকে উটের গোবর দেয়া হতো, তা দিয়ে সে চিহ্ন দিত। পরে ফিরে আসত। ব্যবহার করতে শুরু করত, যা-ই সে চাইত— সুগন্ধি ইত্যাদি। তখন নবী করীম (স) তাকে ইদ্দতের মধ্যে সুরমা ব্যবহার করতে নিষেধ করলেন। পরে তিনি তাদেরকে আগেরকালের ইদ্দতের কথা এবং অলঙ্কার ও সুগন্ধি ইত্যাদি যা যা পরিহার করে চলত, জানিয়ে দিলেন। পরে বললেন, আসলে ইদ্দত হচ্ছে চার মাস দশ দিন।

এ থেকে বোঝা গেল, এখনকার এই ইদ্দত আগের দিনের এক বছরের শোকের বিকল্প, যখন অলঙ্কার ও সুগন্ধি ব্যবহার পরিহার করা হতো।

আমাদের নিকট মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, জুহায়র, ইয়াহইয়া ইবনে আবূ বুকাইর, ইবরাহীম ইবনে তহমান, বুদায়ল, আল-হাসান ইবনে মুসলিম, সফিয়াতা বিনতে শায়বা, রাসূলের বেগম উম্মে সালমা সূত্রে নবী করীম (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, স্বামী-মরা স্ত্রীরা হলুদ বর্ণের কাপড়, চিরুনী ও অলঙ্কারাদি ব্যবহার করবে না। খেজাব বা সুরমা ব্যবহার করবে না। উম্মে সালমা (রা) রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, স্বামী-মরা স্ত্রীরা হলুদ বর্ণের কাপড়, চিরুনী, অলঙ্কার ব্যবহার করবে না, খেজাব ও সুরমা লাগাবে না। উম্মে সালমা (রা) এ-ও বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) তাঁকে তাঁর স্বামীর মৃত্যুতে ইদ্দত পালনকালে বলেছিলেন, সুগন্ধি দিয়ে মাথা আচড়াবে না। হেনাও ব্যবহার করবে না। কেননা তা এক ধরনের খেজাব।

আল্লাহ্র কথা ঃ তোমাদের মধ্যে যারা মরে যায় এবং স্ত্রীদের রেখে যায়, তারা তাদের স্ত্রীদের জন্যে অসীয়ত করবে।

এই আয়াতে চারটি হুকুম রয়েছে। একটি হচ্ছে, বছর। এক্ষেত্রে চার মাস দশ দিনের অধিক যা তা মনসূখ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় স্বামীর সম্পদ থেকে তার খরচাদি ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। পরে মীরাসী আইন জারী হয়ে তা-ও মনসূখ করে দিয়েছে, যেমন ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা এসব অসীয়ত হিসেবে ওয়াজিব করেছেন তাদের স্ত্রীদের জন্যে। যেমন পূর্বে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে অসীয়ত করা ওয়াজিব ছিল। মীরাসী আইন দ্বারা তা মনসূখ হয়ে গেছে। সেই সাথে নবী করীম (স)-এর কথা ঃ 'ওয়ারিসদের জন্যে অসীয়ত নেই।' তৃতীয় 'সাজ-সজ্জা করার নিষেধ'। আয়াতই সে কথা প্রমাণ করে। রাসূলের সুন্নাত দ্বারাও সে হুকুমটি বহাল রয়েছে। স্বামীর ঘর থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার ব্যাপারও রয়েছে। তা নিষিদ্ধ, এ হুকুমটিও বহাল আছে। এ আয়াতের দুটি হুকুম মনসূখ হয়ে গেছে। এটি ছাড়া অন্য এমন কোন আয়াতের কথা আমরা জানি না, যার দুটি হুকুম মনসূখ হয়ে গেছে এবং অপর দুটি হুকুম বহাল রয়েছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ 'বের না করে'ও সম্ভবত মনসূখ হয়ে গেছে। কেননা তার অর্থ বাসস্থান দেয়া স্বামীর মাল থেকে। তা স্বামীর মাল থেকে হওয়াটা মনসূখ হয়ে গেছে। অতএব পরিষ্কার নিষেধ মনসূখ হয়ে গেছে। কিন্তু 'বের না করে' কথাটির দুটি অর্থ। একটি হল স্বামীর মাল থেকে বাসস্থান দেয়া ওয়াজিব হওয়া। আর দ্বিতীয় হল, বের হওয়ার নিষেধ এবং বের করে দেয়ার নিষেধ। কেননা লোকদেরকে যখন বের করতে নিষেধ করা হয়েছিল, তখন নিশ্চয়ই তাদের অবস্থান করার নির্দেশ ছিল। পরে স্বামীর মাল থেকে তার জন্যে বসবাসের ব্যবস্থা করার বাধ্যবাধকতা মনসূখ হয়ে যায়। তখন ঘরে অবস্থান করার বাধ্যবাধকতা অবশিষ্ট থেকে যায়।

স্বামী-মরা স্ত্রীদের খরচাদির ব্যাপার নিয়ে মনীষীদের মধ্যে বিভিন্ন মতের উদয় হয়েছে। ইবনে আব্বাস ও জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) বলেছেন, সে স্ত্রী গর্ভবতী হোক কি না-ই হোক, তার খরচাদি তাকে নিজেকেই বহন করতে হবে। আল-হাসান, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, আতা, কুবাইসাতা ইবনে যুয়াইব প্রমুখ তাবেয়ীও সেই মত প্রকাশ করেছেন। শবী

আলী ও আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা দুজন বলেছেন, তার স্বামী যখন মরে গেল তখন তার রেখে যাওয়া সমস্ত মাল থেকেই তার খরচাদি বহন করতে হবে। আল-হিকাম ইবরাহীমের এই মত বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ (রা)-এর সঙ্গী-সাথিগণ স্বামী-মরা গর্ভবতী মেয়েলোকদের ব্যাপারে ফায়সালা দিয়েছেন যে, মাল-সম্পদ প্রচুর হলে তার খরচাদি তার সন্তানদের অংশ থেকে বহন করতে হবে। আর কম বা সামান্য হলে সমস্ত রেখে যাওয়া মাল থেকে বহন করতে হবে। জুহরী সালিম ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তার জন্যে সমস্ত মাল-সম্পদ থেকে খরচাদি চালাতে হবে। সব হানাফী ফিকাহবিদই বলেছেন, সে গর্ভবতী হোক আর না-ই হোক, তার জন্যে নফকা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা মৃতের মাল থেকে করার প্রশ্ন নেই। ইবনে আবূ লায়লা বলেছেন, এই খরচাদি স্বামীর মালের রেখে যাওয়া ঋণের মতই, যদি সে গর্ভবতী হয়। মালিক ইবনে আনাস বলেছেন, তার নিজের খরচাদি তাকেই বহন করতে হবে, সে গর্ভবতী হলেও। তার থাকার জন্যে একটা ঘর হতে হবে, তা তার মৃত স্বামীরই হোক না কেন। যদি মৃত স্বামীর উপর ঋণ থাকে, তবুও স্ত্রী তার থাকার ঘর পাওয়ার বেশী অধিকারী তার ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত। ভাড়াটে ঘর হলে এবং তার লোকেরা সেখানে থেকে বের করে দিলে তার থাকার ঘর তার স্বামীর মাল থেকে হবে না, এটা ইবনে অহবের বর্ণনা। ইমাম মালিক থেকে ইবনুল কাসিম থেকে এই মত বর্ণনা করেছেন যে, মৃতের ধন-সম্পদ থেকে তার খরচাদি দেয়া হবে না। মৃতের ঘর-বাড়ি থাকলে তাকে থাকার ঘর দিতে হবে আর তার উপর ঋণের বোঝা চাপানো থাকলেও পাওনাদারদের মধ্যে তার অধিকার অগ্রগণ্য ঘর পাওয়ার ব্যাপারে। মৃতের মাল-পত্র ঋণ শোধের জন্যে বিক্রয় করা হলে ক্রেতাকে তার স্ত্রীকে থাকার ঘর দেয়ার শর্তে বাধ্য করতে হবে। সওরী বলেছেন, স্ত্রী গর্ভবতী হলে স্বামীর সম্পদ থেকেই তার জন্যে ব্যয় করতে হবে তার সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। সন্তান প্রসব হলে শিশুর জন্যে খরচ করতে হবে তার প্রাপ্য মীরাসের অংশ থেকে। এটা তাঁর থেকে আশজয়ীর বর্ণনা। তাঁর থেকে আল-মুয়াফী বর্ণনা করেছেন, স্ত্রীর খরচাদি তার প্রাপ্ত অংশ থেকে বহন করতে হবে। আওজায়ী বলেছেন, যে স্ত্রীর স্বামী মরে যায় আর সে হয় গর্ভবতী, তা হলে তার খরচাদি ভিন্নভাবে বহন করা হবে না। যদি সে 'উম্ম অলাদ'— দাসীর গর্ভে হওয়া সন্তানের মা হয়, তাহলে তার খরচাদি তার মৃতের সমস্ত ধন-মাল থেকে বহন করতে হবে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। লাইস ইবনে সাঈদ বলেছেন, 'উম্মে অলাদ' যখন মনিব থেকে গর্ভবতী হলে তার জন্যে সেই মনিবের মাল থেকেই ব্যয় করতে হবে। আর সন্তান প্রসব হয়ে গেলে সেটা তার সন্তানের অংশ থেকে যাবে। আর যদি সন্তান না হয় তা ঋণ স্বরূপ হবে এবং তা চালিয়ে নেয়া হবে। আল-হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, স্বামী মরা স্ত্রীর যাবতীয় খরচ তার স্বামীর সমস্ত মাল থেকে বহন করতে হবে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, স্বামী-মরা স্ত্রীর ব্যাপারে দুটি কথা। একটি হচ্ছে খরচাদি ও থাকার ঘর সে পাবে। আর দ্বিতীয়, সে না 'নফকা' পাবে, না থাকার ঘর।

আবূ বকর বলেছেন, গর্ভবতী স্ত্রীর খরচাদির তিনটি অবস্থান কোন একটি অবশ্য হবে। একটি— হয় তা ওয়াজিব হবে প্রথম সূচনা কালে যেমন ওয়াজিব ছিল যখন তার ইদ্দত ছিল এক বছর— এই আয়াত অনুযায়ী অসীয়ত করতে হবে তাদের স্ত্রীদের জন্যে এক বছরের জীবনোপকরণের জন্যে, ঘর থেকে বের না করে। অথবা তা ওয়াজিব হবে যেমন তিন তালাক বায়েন প্রাপ্তার জন্যে ওয়াজিব রয়েছে কিংবা কেবল গর্ভবতী স্ত্রীর জন্যে তা ওয়াজিব হবে, অন্যদের জন্যে নয়, হবে এই গর্ভের জন্যে।

প্রথম দিকটি বাতিল। কেননা তখন তা ওয়াজিব ছিল অসীয়ত হিসেবে। আর ওয়ারিসের জন্যে অসীয়ত মনসূখ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় দিক, সঠিক বা সহীহ্ নয় এই দিক দিয়ে যে, তার জীবদ্দশায় তার জন্যে আলাদা 'নফকা' ওয়াজিব ছিল না। ওয়াজিব হল এমন সময় অতিবাহন ও নিজেকে স্বামীর ঘরে সোপর্দ করে দেয়ার কারণে। তাই স্বামীর মৃত্যুর পর তা ওয়াজিব হবে না দুটি কারণে। একটি তার উপায় হচ্ছে সরকার স্বামীর উপর তা দেয়ার হুকুম জারী করবে। তার দায়িত্বে তা চাপিয়ে দেব এবং তার মাল থেকে তা নিয়ে নেয়া হবে। কিন্তু স্বামীর কোন দায়িত্ব এখানে নেই। ফলে তা তার দায়িত্বে চাপানো যাবে না। তারপর তার মাল থেকে তা নিয়ে নেয়াও যাবে না। কেননা এটা তার দায়িত্বে চাপেনি।

আর দ্বিতীয়, স্বামী— মালিকের মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পদ-সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন ও হস্তান্তরিত হয়ে গেছে, মৃত্যুকালে মৃতের কোন ঋণ ছিল না বলে। ফলে তা ওয়ারিসদের মালে চাপানো যেতে পারে না। স্বামীর মালেও তা ওয়াজিব হবে না। তাই তা থেকে নিয়ে নেয়ার প্রশ্ন উঠে না।

আর স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয়, তাহলে তার জন্যে স্বামীর মালে 'নফকা' ওয়াজিব করার ব্যাপারটির দুটির মধ্যে কোন একটি দিয়ে অবশ্যই হবে। হয় তা ওয়াজিব হবে এই সম্পর্কের দিক দিয়ে যে, সে ইদ্দত পালনে রত আছে। অথবা এজন্যে যে, সে গর্ভবতী। আমরা আগেই বলেছি যে, ইদ্দত পালন করে এজন্যে তার নফকার দায়িত্ব স্বামীর উপর চাপানো জায়েয হবে না। আর গর্ভের কারণেও তা জায়েয হবে না। কেননা নিছক গর্ভ ওয়ারিসদাতাকে তার খরচ বহনের দায়িত্বশীল বানানো যায় না, সে তাদের নিকট থেকে তার প্রাপক হতে পারে না। কেননা সে নিজে মীরাস পেয়ে অন্যান্য ওয়ারিসদের মতই সচ্ছল। যদি তার সন্তান প্রসব হয়, তাহলেও তার খরচ অন্যান্য ওয়ারিসের উপর বর্তাবে না। তাহলে গর্ভাবস্থায় তা তার উপর ওয়াজিব হবে কি করে ? .....তাহলে 'নফকা' পাওয়া তার কোন অধিকার নেই।

## ইদ্দতের মধ্যে বিয়ের প্রস্তাব

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ -

তোমরা যদি (স্বামীহীনা) স্ত্রীদের নিকট বিয়ের প্রস্তাব পেশ কর কিংবা তা তোমাদের মনে গোপন রাখ, তাহলে তোমাদের কোন দোষ হবে না।

আয়াতের الخطبة শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তা হচ্ছে এমন সব কথার উল্লেখ, যা বিয়ে সম্পর্ক স্থাপনের কারণ হয়। তার প্রস্তুতি সম্ভব হয়। আর الخطبة অর্থ, ওয়ায-নসীহত, মানুষের মনে বিভিন্ন উপায়ে নম্রতা সৃষ্টির চেষ্টা। এ-ও বলা হয়েছে, الخطبة এর কোন প্রথম নেই, শেষ-ও নেই। যেমন 'রিসালাত'। অবস্থার প্রেক্ষিতে 'খেতবা', যেমন জলসা, কাদাহ। বিয়ের প্রস্তাব ইশারায় পেশ করার তাৎপর্য হল, এমন কথা যা কোন জিনিস বোঝায় সেই আসল জিনিসের উল্লেখ ছাড়াই। যেমন কেউ বলে ঃ ماانا بزان، يعرض بغيره انه زان

এই কারণে উমর (রা) এই ধরনের কথার শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। তাকে স্পষ্ট কথার

বিকল্প মনে করেছেন। আর الكناية অর্থ স্পষ্টভাবে নামের উচ্চারণ করা থেকে এড়িয়ে যাওয়া। যার ফলে সেই আসল জিনিসটিই বোঝাবে। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ –

নিশ্চয়ই আমরা তা কদরের রাতে নাযিল করেছি।

এ আয়াতে কুরআন নাযিল করার কথাই বলা হয়েছে। انزلنا এর হচ্ছে কুরআনের ইঙ্গিত।

ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ 'খেতবা'— বিয়ের ইঙ্গিতমূলক প্রস্তাব এভাবে হতে পারে যে, একজন বলবে, আমি এমন একজন স্ত্রী গ্রহণ করতে চাই, যার এই গুণ পরিচিতি আছে।' এই বলে প্রস্তাবিত কনের গুণ-পরিচিতি উল্লেখ করবে। আল-হাসান বলেছেন, এভাবে বলবে, আমি তোমাকে দেখে মুগ্ধ, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট ও আগ্রহী বা তুমি আমাকে তোমার থেকে দূরে রেখো না। নবী করীম (স) ফাতিমা বিনতে কায়সকে তার ইদ্দত পালনকালে বলেছিলেন— 'তুমি আমাকে নিজের থেকে হারিও না' পরে ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে যথারীতি বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন উসামা ইবনে জায়দের মাধ্যমে। আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম তাঁর পিতার সূত্রে বলেছেন, ইদ্দত পালনে রত থাকা অবস্থায় বিয়ের ইঙ্গিতমূলক প্রস্তাব এভাবে হতে পারে ঃ পুরুষটি মেয়েলোকটিকে বলবে ঃ তুমি বড় ভালো, তুমি খুবই ভদ্র। আমি তোমার প্রতি আগ্রহী, আকৃষ্ট। আল্লাহ্ তোমার নিকট ভালো বন্ধন নিয়ে আসবেন ইত্যাদি ধরনের কথাবার্তা। আতা বলেছেন, ইঙ্গিতের প্রস্তাবের কথা এভাবে হতে পারে— বলবে ঃ তুমি বড় সুন্দরী। আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট, আগ্রহী। আল্লাহ ফায়সালা করলে হতে পারে ইত্যাদি। মোটকথা, ইঙ্গিতে বিয়ের প্রস্তাবে এমন ভাবে কথা বলা, যদ্দারা পুরুষটির আগ্রহ তার প্রতি প্রকাশ পাবে। তবে সুস্পষ্ট কথায় প্রস্তাব দেবে না। সাঈদ ইবনে যুবায়র বলেছেন, আল্লাহ্র কথা ঃ

اِلَّا اَنْ تَقُوْلُوا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا –

তবে তোমরা পরিচিত ভালো কথা বলবে।

বলবে, আমি তোমার প্রতি আগ্রহী, আকৃষ্ট। আমি আশা করি, আল্লাহ আমাদেরকে একত্রিত করবেন।

আল্লাহ্র কথা ঃ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِىْ اَنْفُسِكُمْ 'কিংবা তোমাদের মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখবে।' অর্থাৎ আসল বিয়ের কথা মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখে ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে বিয়ে করবে এই কথা মনে রেখে তোমরা কথা বলবে।

এভাবে ইঙ্গিতে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া শরীয়াতে মুবাহ। মনে বিয়ের কথা লুকিয়ে রেখে ও স্পষ্ট শব্দে বিয়ের কথা না বলে ইঙ্গিতে বলা জায়েয।

ইসমাঈল ইবনে ইসহাক কোন কোন লোক থেকে উল্লেখ করেছেন, ইঙ্গিতে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তাতে 'কযফ'-এর শাস্তি হবে না। কেননা আল্লাহ ইঙ্গিতে বিয়ের প্রস্তাব দানকে স্পষ্ট শব্দে ও ভাষায় বলা মত নিষিদ্ধ করেন নি। অনুরূপভাবে 'কযফ' এর ইঙ্গিতকেও স্পষ্ট কথার মতো করেন নি।

ইসমাঈল বলেছেন, দলীল এমন আনা হয়েছে যা তার বিপরীত কথা প্রমাণ করে। কেননা বিয়ের ইঙ্গিত, যদ্দারা কথকের বক্তব্য বোঝা যায়, তাই ইঙ্গিতমূলক প্রস্তাব যখন প্রকৃত বক্তব্য বোঝা যাবে, তখন তা 'কযফ' হবে এবং 'কযফকারীর উপর 'কযফ'-এর হুকুম কার্যকর হবে।

বলা হয়েছে, 'কযফ'-এর ইঙ্গিতকারীর উপর থেকে শাস্তি রহিত হয়ে যাবে। কে তা রহিত করবে ? কেননা তার ইঙ্গিতমূলক কথা দ্বারা জানা যায়নি যে, সে 'কযফ' করতে চয়েছে। কেননা তা না-ও হতে পারে।

বলেছেন, এই কথায় একথা মনে করা বাঞ্ছনীয় হয়। 'কযফ'-এর ইঙ্গিত করা জায়েয— মুবাহ্। যেমন বিয়ের প্রস্তাব দানের ইঙ্গিতমূলক কথা মুবাহ।

বিয়েতে ইঙ্গিতমূলক প্রস্তাব দানের পন্থাকে গ্রহণ করা হয়েছে, স্পষ্ট শব্দে ও ভাষায় বিয়ের প্রস্তাব দানকে মুবাহ করা হয়নি, কেননা বিয়ে তো উভয়ে সম্মতিতে হবে। বিয়ের প্রস্তাব দিলে কনের পক্ষ থেকে একটা জবাব অবশ্যই পেতে হয়। কিন্তু ইঙ্গিতের প্রস্তাব সাধারণত কোন জবাবের দাবি করতে পারে ন্যা। এই কারণেই দুটি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস হয়ে গেছে।

আবূ বকর বলেছেন, প্রথম কথা যা প্রতিপক্ষের দিক থেকে বলা হয়েছে, ইঙ্গিতমূলক প্রস্তাবের দরুন শাস্তি হবে না, কথাটি সহীহ্। তার বিপরীত কথা সুস্পষ্ট অগ্রহণীয়। দলীল পেশের দিকটি হল, ইঙ্গিতের প্রস্তাবে শাস্তি হবে না, তার বড় কারণ, সুস্পষ্ট ভাষায় বিয়ের প্রস্তাব দেয়া নিষিদ্ধ। এই কারণে ইঙ্গিতে বলাকে মুবাহ বলা হয়েছে। ইঙ্গিতমূলক প্রস্তাবের হুকুম এবং সুস্পষ্ট ভাষায় প্রস্তাব দেয়ার হুকুম দুটি এক নয়, পার্থক্যপূর্ণ। তার ভিত্তি হল 'কযফ'-এর ইঙ্গিত বিপরীত হচ্ছে সুস্পষ্ট ভাষায় বিয়ের কথা বলার হুকুমের। এ দুটিকে কোনক্রমেই অভিন্ন মনে করা যাবে না। আল্লাহও বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার ব্যাপারে এ দুটির হুকুমের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তা এজন্যে যে, শরীয়াত নির্ধারিত শাস্তি সন্দেহের কারণে প্রত্যাহৃত হয়। অতএব তা বিয়ের তুলনায় নিষেধে ও প্রত্যাহৃত হওয়ার দিক দিয়ে অধিক তাগিদপূর্ণ। ইঙ্গিতমূলক প্রস্তাব বিবাহের স্পষ্ট কথা বলার মতো নয়, স্পষ্ট ভাষায় বিয়ের প্রস্তাব শাস্তি প্রমাণে অধিক তাগিদপূর্ণ। কাজেই ইঙ্গিতমূলক বিয়ের কথায় শাস্তি অপ্রমাণিত হওয়াই অধিক উত্তম নীতি। তা প্রমাণ করে যে, ইদ্দত শেষ হওয়ার পর যদি ইশারা-ইঙ্গিতে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তাহলে দুজনের মধ্যে বিয়ে সজ্ঘটিত হবে না। কাজেই ইঙ্গিতমূলক প্রস্তাব স্পষ্ট ভাষায় দেয়া প্রস্তাবের পরিপন্থী। এই কারণে ইঙ্গিতমূলক প্রস্তাবে 'হদ্দ' প্রমাণিত না হওয়াই অধিক তাগিদপূর্ণ ব্যাপার। এ বিষয়ে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত দেন নি যে, চুক্তিসমূহে অঙ্গীকার ইশারা-ইঙ্গিতে প্রমাণিত হয় না, প্রমাণিত হয় স্পষ্ট কথায়। আল্লাহ্ও বিয়ের ক্ষেত্রে এ দুটির মধ্যে পার্থক্য করেছেন। অতএব 'হদ্দ' প্রমাণিত হবে না। এই পার্থক্যই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ও দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কথার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারেই তা হবে। তা আমাদের কথা প্রমাণের জন্যে সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলীল। আমরা যদি সেটিকে 'ইল্লাতে'র কারণে— যা উভয়কে একত্রিত করে— কিয়াসের দিকে ফিরাতে ইচ্ছা করি, তাহলেও যথেষ্ট হবে। তা এভাবে যে, বিবাহের হুকুমটি কথার সাথে সম্পর্কিত। যেমন 'কযফ'। কিন্তু ইঙ্গিতে প্রস্তাব দেয়া ও স্পষ্ট কথায় প্রস্তাব দেয়া যখন পার্থক্যপূর্ণ, তখন ইঙ্গিতের প্রস্তাব প্রতিষ্ঠিত হল, যদিও তার চূড়ান্ত কার্যকরতা স্পষ্ট ও প্রকাশ্য কথার দ্বারাই হয়।

'কযফ'-এর ইঙ্গিতের সুস্পষ্ট কথার মতই, কেননা তার দ্বারাও মূল উদ্দেশ্য বোঝা যায়, যেমন স্পষ্ট কথার দ্বারা বোঝা যায়, এই কথাটি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হল— আমার ধারণা, এই কথা বলার সময় আল্লাহ যে ইঙ্গিতের প্রস্তাব ও স্পষ্ট ভাষায় প্রস্তাবের মধ্যে পার্থক্য

করেছেন, তা তিনি ভুলে গেছেন। কেননা দুটির বক্তব্য বোঝা যায় পার্থক্য সহকারে। কেননা বক্তব্য বোঝার সাথে সম্পর্কিত হুকুম পুরাপুরিভাবে প্রস্তাবেই বর্তমান রয়েছে। কাজেই এ ব্যাপারে দুটিরই হুকুম অভিন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু নাযিল হওয়া দলীল যখন এ দুটির মধ্যে পার্থক্য করেছে, তখন এই অভিযোগ ভিত্তিহীন হয়ে গেল। আর আমাদের বক্তব্যের অনুকূলে দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

তার কথা ঃ 'কযফ'-এর ইঙ্গিতকারীর উপর থেকে শাস্তি দূর কক্ষর দিয়েছে, তা দূর করেছে এজন্যে যে, ইঙ্গিতের প্রস্তুস্থব দিয়ে 'কযফ' করতে চাওয়া হয়েছে, তা জানা যায়স্থি। কেননা কথার তাৎপর্য ভিন্নতর হওয়া সম্ভব। এ এমন তকটি চেষ্টা, যা বিপক্ষের বক্তব্যকে প্রমাণিত করতে পাম্বেনি। তাতে অনুপস্থিতির উপর কোন দলীল প্রমাণ ছাড়াই ফায়সালা চাপানো হয়েছে। কেননা কারোর মনের গোপন ইচ্ছার উপর 'কযফ'-এর শরীয়াতী শাস্তি জারী হতে পারে— তা কেউ-ই বলতে পারে না। তাছাড়া বিপরীত মতের লোকদের দৃষ্টিতেও তা স্পষ্ট কথার সাথে সম্পর্কিত হতে পারে, তাছাড়া অন্য অবস্থার সাথে সম্পর্কিত হয় না। বিরোধীরা একথা মানতে প্রস্তুত নয় যে, 'হদ্দ' দূর হয়ে গেছে এজন্যে যে, তার মনের ইচ্ছাটাই জানা যায়নি।

ইঙ্গিতে বিয়ে মুবাহ, অতএব ইঙ্গিতে 'কযফ'-ও করা যায়, বিরোধী পক্ষের এরূপ মত এমন এক ব্যক্তিরই হতে পারে, যার কথা সে প্রমাণ করতে পারে না। তার এই বাধ্যবাধকতা আরোপের পরিণতি কি, সে দিকেও তার কোন নজর নেই। আমরা বলব, বিপরীত মতের সমর্থনে যে দলীল দেয়া হয়েছে, তা মুবাহ্ প্রমাণের 'ইল্লাত' নয়। ফলে ইঙ্গিতে 'কযফ' হয়, এ কথাও প্রমাণিত হয়। আয়াতকে দলীল বানিয়ে ইঙ্গিতের প্রস্তাবও স্পষ্ট ভাষার প্রস্তাবের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। তার কারণ বিশেষ ও মুবাহ করা দুটিই ভিন্ন দলীলের উপর নির্ভর করে।

বিয়ের ইঙ্গিত করা জায়েয, স্পষ্ট ভাষায় বিয়ের কথা বলা জায়েয নয় এজন্যে যে, বিয়ে তো এ দুটির দ্বারাই হতে পারে। প্রস্তাবের একটা জবাব অবশ্যই পাওয়া দরকার। কিন্তু ইঙ্গিতের প্রস্তাব সাধারণত জবাবের দাবি করতে পারে না। কেননা তা শুধু কথা, তার ভেতরে কোন তাৎপর্য নেই। তা সত্ত্বেও তা চূর্ণ হওয়া। কেননা বিয়ের ইঙ্গিত এবং সুস্পষ্ট প্রস্তাব— এ দুটির একটি জবাবের দাবি করে না। ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পর ভবিষ্যতের কোন সময়ের জন্যে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার দিকেই নিষেধ প্রত্যাবর্তিত। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا –

কিন্তু সাবধান! তাদের সাথে কোন গোপন চুক্তি বা বাগদানের কাজ করবে না, কোন কথা যদি বলতেই হয়, তাহলে তা প্রচলিত সঠিক পন্থায়ই বলবে।

কাজেই ইঙ্গিতের প্রস্তাব কোন জবাবের দাবি করতে পারে না। যে 'আকদ' জবাব পাওয়ার দাবি রাখে, তা থেকে নিষেধ সম্পর্কিত প্রস্তাব জায়েয নয়। কাজেই ওদুটির মধ্যে পার্থক্যের প্রশ্ন উঠে না।

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, জবাবের দাবি না থাকায় ইঙ্গিত ও স্পষ্ট কথার মধ্যে পার্থক্য নেই। এই ক্ষেত্রেই আয়াত দুটি ব্যাপারের মধ্যে পার্থক্য করেছে। যে চুক্তি জবাবের দাবিদার, তা নিষিদ্ধ হয়েছে আল্লাহ্র এই কথার দ্বারা ঃ

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ -

তোমরা বিয়ের অনুষ্ঠানের সংকল্প গ্রহণ করবে না, যতক্ষণ ইদ্দত শেষ হয়ে না যাচ্ছে।

আমল 'আক্‌দ' করতে নিষেধ হওয়াটার দাবি হল স্পষ্ট ভাষায় বিয়ের প্রস্তাব দিতে নিষেধ করা দলীলের ভিত্তিতে। যেমন وَلَا تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ 'এবং তুমি তাদেরকে 'উহ' বল না' কথাটি স্পষ্ট বোঝায় পিতামাতাকে গালমন্দ ও মারধোর করার নিষেধ। আর কথার ত্রুটির কারণ এই যে, যেসব চুক্তি জবাবের দাবিদার, তা ইশারা-ইঙ্গিতে সঠিক হয় না। অঙ্গিকারগুলোর ব্যাপারও তাই। তা ইঙ্গিতে অনুষ্ঠিত হয় না। আর তার কথার জবাবের দাবি না হলে তাহলে তা যা জবাবে দাবি করে, আর যা জবাবের দাবি করে না, এ দুটির হুকুমে কোন পার্থক্য হয় না। তাতে জানা গেল যে, এ দিক দিয়েও দুটির পারস্পরিক পার্থক্য ও দুটির মধ্যের পার্থক্যকে আবশ্যকীয় করবে না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا -

কিন্তু তোমরা তাদেরকে গোপনে কোন পারস্পরিক ওয়াদা প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ করবে না।

মূল বক্তব্যের দিক দিয়ে এটা ভিন্নতর কথা। ইবনে আব্বাস (রা) সাঈদ ইবনে যুবায়র, শবী ও মুজাহিদ বলেছেন, গোপনে তাদের সাথে পারস্পরিক ওয়াদা করার অর্থ কোন চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি দেয়া বা আদায় করা। এই কথা বলা যে, সে যেন তার নিকট আটক হয়ে গেল, বাগদান করা, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে সে বিয়ে করবে না— এরূপ ওয়াদা করা।

আল-হাসান, ইবরাহীম, আবূ মজলয, মুহাম্মাদ ও জাবির ইবনে জায়দ বলেছেন, 'ওদের সাথে কোন গোপন ওয়াদায় আবদ্ধ হবে না' এ কথার অর্থ যিনায় লিপ্ত হবে না। জায়দ ইবনে আসলাম বলেছেন, আল্লাহ্‌র এই কথাটির অর্থ হচ্ছে, স্ত্রীলোকটির ইদ্দতের মধ্যে বিয়ে অনুষ্ঠান করবে না। আর বিয়ে করার পর বলা যে, 'আমি এই বিয়ে অবশ্যই গোপন রাখব, কেউ জানবে না। অথবা তার সঙ্গে যৌন সঙ্গম করবে, এবং বলবে, 'আমার এই সঙ্গমের কথা কেউ জানাবে না।' ইতিমধ্যে তোমার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে।

আবূ বকর বলেছেন, আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ এই সমস্ত অর্থই দিচ্ছে। কেননা 'গোপন' নাম হচ্ছে যিনার। আয়াতে 'গোপন' বলে এই যিনাকেই বুঝিয়েছে। বিয়ের চুক্তিকেও 'গোপন' নাম দেয়া হয়েছে। যেমন তার আর এক নাম যৌন সঙ্গম। যৌন সঙ্গম ও আক্‌দ প্রত্যেকটিকেই 'বিয়ে' বলা হয়েছে। এই কারণে আয়াতের অর্থ সঙ্গম ও বিয়ের আক্‌দ দুটির উপরই প্রযোজ্য। সুস্পষ্ট ভাষায় বিয়ের প্রস্তাব দেয়াও বোঝায়, যা ইদ্দত শেষ হওয়ার পর অনুষ্ঠিত হবে।

আয়াতটির এই সব অর্থ হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সবচেয়ে উত্তম ও সুস্পষ্ট দিক হচ্ছে ইবনে আব্বাস ও তাঁর অনুসারীদের এই ব্যাখ্যা যে, উক্ত আয়াতের সুস্পষ্ট ভাষায় বিয়ের প্রস্তাব দেয়া এবং তাকে নিজেকে তার সাথে বিয়ে সম্পন্ন করার চুক্তিতে আবদ্ধ করা ও আটক রাখতে বলা— যেন ইদ্দত শেষ হওয়ার পর বিয়েটা আনুষ্ঠানিকভাবে হতে পারে। কেননা মুবাহ ইঙ্গিতের প্রস্তাব কার্যকর ও বাস্তবায়িত হতে পারে ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পর। এই কারণেই সোজাসুজি স্পষ্ট ভাষার প্রস্তাব নিষিদ্ধ হয়েছে। অপর একটি দিকও রয়েছে। তা এমন একটা

তাৎপর্য, যা আমরা আয়াত থেকেই পাই। আয়াতের তাই বক্তব্য। ইদ্দতের মধ্যে বিয়ের আক্দ ঘটানো নিষেধ, তা তার নাম সহ কুরআন পাঠের ধারাবাহিকতায়ই রয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ -

ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা বিয়ের অনুষ্ঠান করার সংকল্প করবে না।

আয়াতে যখন তা স্পষ্ট ভাষায়ই উল্লিখিত, তাতে ইঙ্গিতের কথা নেই। কাজেই তাতে 'ইশারায় বিয়ের কথা বলা হয়েছে' এরূপ বলা অত্যন্ত দূরবর্তী কথা। পরে যে লোক যিনা বলে আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার কথাও স্বীকার্য নয়। কেননা যিনার ওয়াদা-প্রতিশ্রুতিও ইদ্দতের মধ্যে নিষিদ্ধ, যেমন অন্য সময়ও নিষিদ্ধ। কেননা আল্লাহ যিনা হারাম করেছেন নিঃশর্তভাবে, কোন শর্ত ছাড়াই। তা কোন বিশেষ সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তা যদি হতো, তাহলে বিশেষভাবে যিনার পারস্পরিক ওয়াদা করাকে নিষিদ্ধ করার কোন ফায়দাই পাওয়া যেত না। এই ওয়াদাটা ইদ্দতের দরুন নিষিদ্ধ বিশেষভাবে। বলা সব কয়টি কথাই তাৎপর্যের মধ্যে শামিল হতে পারে শব্দের মধ্যে এই সম্ভাব্যতা আছে বলে। তবে ইবনে আব্বাস প্রদত্ত যে ব্যাখ্যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি, তার থেকে তা বাইরে যায় না।

আল্লাহ্র কথা عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ 'আল্লাহ্ জেনে আছেন যে, তোমরা অবশ্যই তাদের কথা স্মরণ করবে।' অর্থাৎ আল্লাহ্র জানা আছে যে, তোমরা তাদের স্মরণ করবে বিয়ে করে। কেননা তাদের প্রতি তোমাদের আগ্রহ ও আকর্ষণ রয়েছে। সেই সাথে তোমাদের মনে এই ভয়ও রয়েছে যে, অন্যরা তোমাদের আগে তাদের নিকট পৌঁছে যাবে ও নিয়ে নেবে। এই কারণে ইশারা-ইঙ্গিতে তাঁদের নিকট পৌঁছা মুবাহ করেছেন, স্পষ্ট ভাষায় বিয়ের কথা বলাকে মুবাহ করেন নি। আমাদের হানাফী ফিকাহবিদগণ মুবাহ জিনিস মুবাহ পথে পাওয়া ও পেতে চেষ্টা করাকে জায়েয বলে ঘোষণা করেছেন, যদিও অন্য উপায়ে তা নিষিদ্ধ। এরূপ কথাই নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি হচ্ছে, হযরত বিলাল (রা) রাসূলের নিকট কিছু উত্তমমানের খেজুর নিয়ে এলেন। রাসূলে করীম (স) জিজ্ঞাসা করলেন, 'খায়বরের সব খেজুরই এই রকম উত্তম?' জবাবে তিনি বললেন, 'না, হে রাসূল। আমরা দুই সা' দিয়ে বিনিময়ে এক সা' গ্রহণ করি, আবার তিন সা' দিয়ে দুই সা' গ্রহণ করে থাকি।' এ কথা শুনে নবী করীম (স) বললেন, 'না, তোমরা এরূপ করবে না, বরং তোমরা তোমাদের খেজুর নগদ মূল্যে বিক্রয় করে দিয়ে তার দ্বারা এই উত্তম খেজুর ক্রয় করবে।' এই কথার দ্বারা রাসূলে করীম (স) উত্তম খেজুর পাওয়ার একটা মুবাহ পন্থা দেখিয়ে দিলেন।

এ পর্যায়ে আমরা আর এক প্রসঙ্গে আলোচনা করব।

আল্লাহ্র কথা ঃ

عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ -

আল্লাহ্ জেনে আছে যে, তোমরা অবশ্যই তাদেরকে স্মরণ করবে।

এই কথাটি এ কথার মতই ঃ

عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ -

আল্লাহ্ জেনে আছেন যে, তোমরা এ যাবত নিজেদের সাথে খিয়ানত করছিলে।

(সূরা বাকারা ঃ ১৮৭)

এই বলে রযমানের রাত্রিকালে পানাহার ও যৌন সঙ্গম মুবাহ করে দিয়েছেন। আমরা বুঝলাম, যদি তা মুবাহ করা না হতো, তাহলে এই নিষিদ্ধ কাজে তাদের অনেকেই হয়ত জড়িয়ে পড়ত। তাই আল্লাহ তা'আলা দয়া করে ব্যাপারটিকে হালকা করে দিয়েছেন। আল্লাহ্র এই কথাটি ঃ 'আল্লাহ জেনে আছেন যে, তোমরা অবশ্যই তাদের স্মরণ করবে।' এই অর্থের দিক দিয়ে এই কথাটিও বুঝতে হবে ঃ 'তোমরা ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে বিয়ের আক্দের সংকল্প করবে না।'

এ পর্যায়ে বলা হয়েছে العقدة-এর আভিধানিক অর্থ শক্ত করা। বলা হয় ঃ আমি রশিটিকে শক্ত করে বেঁধেছি।' আর রশি শক্ত করে বাঁধার সাদৃশ্য হচ্ছে সুদৃঢ় করার সাথে।

আল্লাহ্র কথাঃ 'তোমরা বিয়ের বন্ধনের সংকল্প করবে না'— এর অর্থ, বিয়ের আক্দ করে ফেলো না, বিয়ের আক্দ করার সংকল্প গ্রহণ করো না ইদ্দতের মধ্যে। মনে মনে ইচ্ছা গ্রহণ এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পর বিয়ের আক্দ করার সংকল্প করতে কিন্তু নিষেধ নেই। কেননা ইদ্দত শেষ হওয়ার পর করা হবে— এরূপ সংকল্প করাও নয় নিষিদ্ধ। কেননা আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন ঃ তোমাদের কোন দোষ হবে না স্ত্রীদের প্রতি বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার ইঙ্গিত করায় অথবা মনের মধ্যে গোপন রাখায়।

মনের মধ্যে ইচ্ছাকে গোপন রাখায় কোন দোষ হতে পারে না। এ থেকে জানা গেল যে, 'তোমরা বিয়ের আক্দের সংকল্প করো না'— আল্লাহ্র এ কথার অর্থ হচ্ছে বিয়েটা ঘটাবে না, করে ফেলবে না ইদ্দতের মধ্যে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ -

যতক্ষণ না মিয়াদ তার শেষ প্রান্তে পৌছে যায়।

এই আয়াতটুকুতে ইদ্দত শেষ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা সম্বোধনের তাৎপর্যের মধ্যেই রয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। লক্ষণীয়, ফরীয়াতা বিনতে মালিক যখন নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাঁকে জবাব দিয়েছিলেন, 'না, যতক্ষণ পর্যন্ত ইদ্দত শেষ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নয়। তাঁর এই কথার তাৎপর্যে তিনি ইদ্দতকাল শেষ হওয়ার কথাই বুঝিয়েছিলেন। এ ছাড়া আর কিছু বলার কোন প্রয়োজন মনে করা হয়নি। ফিকাহবিদদের মধ্যে এ নিয়ে কোন মতবৈষম্য নেই যে, যে লোক কোন মেয়েলোকের সাথে বিয়ের 'আকদ' করবে, এ অবস্থায় যে, সে অন্য পুরুষের থেকে তালাক পেয়ে ইদ্দত পালনে রত, তার এই 'আক্দ' ফাসিদ— অকার্যকর হবে।

আগের কালের ও পরবর্তীকালের ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে এই ব্যাপারে যে, অন্য ব্যক্তির থেকে তালাকের ইদ্দত পালনে রত স্ত্রীকে বিয়ে করলে তা কি হবে ? ইবনুল মুবারক বলেছেন, আসয়াস শবী মাসরূক সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, উমর (রা)-এর নিকট খবর পৌছল যে, কুরায়শ বংশের এক মেয়েলোককে তার ইদ্দত পালনের মধ্যে বনূ

সকীফ-এর এক ব্যক্তি বিয়ে করেছে। তাই তিনি তাদের দুজনের নিকট লোক পাঠিয়ে তাদের দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলেন। শুধু তা-ই নয়, বরং তাদেরকে শাস্তিও দিলেন এবং বললেন, সে তাকে কখনই বিয়ে করবে না। বায়তুলমাল থেকে মহরানা আদায় করিয়ে দিলেন। লোকদের মধ্যে খবর প্রচারিত হয়ে পড়ল। হযরত আলী (রা)-ও তা জানতে পারলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ আমীরুল মুমিনীনকে রহমত করুন, মহরানার টাকা বায়তুলমাল থেকে দেয়ার কি অবকাশ আছে? ঐ পুরুষ-নারী ভুল করেছে, এমতাবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য হল, তাদের দুজনকে সুন্নাত তরীকার দিকে ফিরিয়ে দেয়া। তাঁকে প্রশ্ন করা হল তাহলে আপনি এ বিষয়ে কি বলতে চান? বললেন, মেয়েলোকটি মহরানা পাবে পুরুষটির নিকট থেকে, কেননা সে-ই তার স্ত্রী-অঙ্গকে হালাল বানিয়েছিল। অতঃপর তাদের দুজনকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। তাদেরকে কোন শাস্তি দেয়া হবে না। মেয়েলোকটি তার প্রথম পালনীয় ইদ্দত সম্পূর্ণ করবে। তার পরে এই দ্বিতীয় বিয়ে-বিচ্ছেদের ইদ্দত পালন করবে। তার পরই তার বিয়ের প্রস্তাব আসতে পারে। পরে এই কথা হযরত উমর (রা) জানতে পারেন। তখন তিনি বললেন ঃ

يَاأَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوْا الْجِهَالَاتِ اِلَى السُّنَّةِ -

হে জনগণ, তোমরা সকল প্রকারের জিহালাতকে সুন্নাতের দিকে ফিরিয়ে দাও।

ইবনে আবূ জায়েদাও আশ'আস থেকে এরূপ বর্ণনাই করেছেন। তাতে বলেছেন, হযরত উমর (রা) হযরত আলী (রা)-এর কথাকেই মেনে নিলেন।

আবূ বকর বলেছেন, হযরত আলী ও উমর (রা) একই কথায় একমত হয়েছেন। কেননা হযরত উমর (রা) হযরত আলী (রা)-এর কথা মেনে নিয়েছেন বলে বর্ণনা এসেছে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ ও জুফর বলেছেন, এ রকমের বিয়ে হলে সে পুরুষ-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করতে হবে। মেয়েলোকটি 'মহরে মিসল' পাবে। তার প্রথম ইদ্দতটি পালন শেষ হয়ে গেলে দ্বিতীয়জনকে ইচ্ছা করলে বিয়ে করতে পারবে। এটা সওরী ও শাফেয়ীরও মত। মালিক, আওজায়ী, লাইস ইবনে সাদ বলেছেন, না, সেই মেয়েলোকটি দ্বিতীয় পুরুষটির জন্যে কখনই হালাল হবে না। মালিক, লাইস এ-ও বলেছেন, 'মিলকে ইয়াসীন' দাসত্ব প্রক্রিয়ায়ও সে পুরুষটি সে মেয়েলোকটিকে কি হালাল করতে পারবে না?

আবূ বকর বলেছেন, যেসব ফিকাহবিদের কথা উপরে উল্লেখ করেছি, তাদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন মতের ভিন্নতা নেই যে, কোন পুরুষ যদি একটি মেয়েলোকের সাথে যিনা করে, তাহলে সে তাকে বিয়েও করতে পারে, তা তার জন্যে জায়েয। ইদ্দতের মধ্যে যিনা তো বড় বিয়ে। যিনা যখন মেয়েলোকটিকে পুরুষটির বিয়ে করা চিরদিনের জন্যে হারাম করে দেয় না, তখন অন্য কাউকে মনে করে সন্দেহে সঙ্গম করা হলে সে-ও সে পুরুষটির জন্যে হারাম হয়ে যাবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি তার স্বাধীনা স্ত্রী বর্তমান থাকাকালে কোন দাসীকে বিয়ে করে কিংবা দুই বোনকে একসাথে স্ত্রী বানায় এবং উভয়ের সাথে সঙ্গম করে, তাহলে এই মেয়েলোকরা পুরুষটির জন্যে চিরস্থায়ীভাবে হারাম হয়ে যাবে না। ইদ্দতের মধ্যের বিয়েতেও সঙ্গম হলে হয় তাকে সন্দেহবশত সঙ্গম মনে করতে হবে, কিংবা সোজাসুজি যিনা বলতে হবে। দুটির যেটিই হোক, চিরদিনের জন্যে হারাম হওয়ার ব্যাপার হবে না।

যদি বলা হয়— যিনা ও সন্দেহের সঙ্গমে তোমাদের মতেই চিরস্থায়ী হারাম হওয়ার ব্যাপার হয়, যেমন যে লোক নিজ স্ত্রীর মার সাথে যিনা করল বা তার কন্যার সাথে যিনা করল সে স্ত্রী চিরদিনের জন্যে হারাম হয়ে যায়।

জবাবে বলা যাবে, আমরা কোনভাবেই এই আলোচনার মধ্যে নেই। কেননা আমাদের আলোচনা হচ্ছে সেই সঙ্গম সম্পর্কে যা সঙ্গমকৃতা মেয়েলোকটাকে পুরুষটির জন্যে হারাম করে দেয়। তবে যে সঙ্গম অন্য কাউকে হারাম করে, সে বিষয়ের হুকুম হল, এ ধরনের সব সঙ্গমই আমাদের যিনা। তা সন্দেহের সঙ্গম হোক কি মুবাহ্ যিনা হোক। মৌলনীতিতে তুমি এ বিষয়ে পাবে না, যা সঙ্গমকৃতা মেয়েলোকটিকেই হারাম করে। কাজেই তোমার কথা মৌলনীতির বাইরে। আগের কালের ফিকাহবিদদের মতেরও বিপরীত। কেননা উমর (রা) নিজেই হযরত আলী (রা)-এর এই বিষয়ের মতকে মেনে নিয়েছিলেন। তাছাড়া হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি মহরানা বায়তুলমাল থেকে আদায় করে দিয়েছেন। তা এইজন্যে যে, তিনি এই মত গ্রহণ করেছেন যে, এই মহরানা সে অর্জন করেছে একটা নিষিদ্ধ উপায়ে। অতএব তাকে তা সাদকাস্বরূপ দিয়ে দিতে হবে। আর এই কারণেই তিনি তা বায়তুলমাল থেকে আদায় করেছেন।পরে তিনি হযরত আলী (রা)-র মতের দিকে ফিরে এসেছেন। মেয়েলোকটির মহরানা বায়তুলমাল থেকে দেয়ার মত শুধু এজন্যে ছিল যে, সে তা অর্জন করেছে। একটি নিষিদ্ধ উপায়ে, তা রাসূল (স) থেকে পাওয়া একটি বর্ণনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। বর্ণনার কথা হল, একটি ছাগী তার মালিকের অনুমতি ব্যতীত ধরে আনা হয়েছিল। সেটি ভুনা করে রাসূলের সম্মুখে পেশ করা হয়েছিল। তিনি তা খেতে প্রায় শুরু করে দিয়েছিলেন। তখন তিনি বললেন, এই ছাগী আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, এটি তার মালিকের অনুমতি ছাড়া ধরে আনা হয়েছে নিতান্ত অন্যায়ভাবে। লোকেরা তাঁকে পরে প্রকৃত ঘটনার কথা জানাল। তখন তিনি বললেন, এটি বন্দীদের খাইয়ে দাও। আমাদের মতে তার কারণ এই ছিল যে, সেটির মূল্য দেয়া তাদের দায়িত্ব হয়েছিল। অতঃপর তিনি সেটি সাদ্কা করে দেয়ার আদেশ করলেন। কেননা সেটি আমাদের হাতে নিষিদ্ধ পন্থায় এসেছিল। তারা তখন পর্যন্ত সেটির মূল্য তার মালিকের নিকট আদায় করে দেয়নি।

সুলায়মান ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত, সে মেয়েলোকটির মহরানা বায়তুলমাল থেকেই দেয়া হয়েছিল। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, ইবরাহীম ও জুহরী বলেছেন, হ্যাঁ, মেয়েলোকটি মহরানা পেতে পারে, যেমন হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। হযরত উমর (রা) ও আলী (রা) সেই জন্যেই একমত হয়েছিলেন। আর তাঁদের দুজনার উপর সেজন্যে কোন দণ্ডও কার্যকর হবে না । তাতে বোঝা যায় যে, ইদ্দতের মধ্যে বিয়ে হলে কোন দণ্ড ধার্য হবে না। যদিও একথা জানা আছে যে, কাজটি ছিল হারাম। মেয়েলোকটিও জানত যে, সে ইদ্দত পালনে রত আছে। এই কারণে হযরত উমর (রা) তাকে দোররা মেরেছিলেন। আর তার মহরানা বায়তুলমাল থেকে দিয়েছিলেন। কোন সাহাবীই এ ব্যাপারে তাঁদের দুজনের সাথে মতপার্থক্য করেন নি। ফলে এটি একটি মৌলনীতি হয়ে দাঁড়াল এজন্যে যে, ফাসেদ বিয়েতে যে সঙ্গম হবে, তাতে শাস্তি ওয়াজিব হবে না। তারা সে কাজ হারাম জানুক, আর না-ই জানুক। এই ঘটনা ইমাম আবূ হানীফার মতের সাক্ষী এই ব্যাপারে যে, কেউ যদি কোন মুহাররম মেয়েলোকের সাথে বিয়ে করে সঙ্গম করে, তাহলে তার উপর 'হদ্দ' জারী হবে না।

দুই ব্যক্তির থেকে ইদ্দত পালন ওয়াজিব হলে তাকে কি করতে হবে— এ বিষয়ে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মদ, জুফর, মালিক (ইবনুল কাসিমের বর্ণনায়) সওরী ও আওজায়ী বলেছেন ঃ কোন মেয়েলোকের উপর দুইজন স্বামীর তরফ থেকে ইদ্দত পালন ওয়াজিব হলে সে ইদ্দত কার্যত একটি হবে সামনের দিকের জন্যে।

প্রথম কথাটির সত্যতার প্রমাণ হল আল্লাহ্ কথা ঃ 'তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা নিজেদেরকে ইদ্দত পালনে রত রাখবে তিন কুরু।'

এ কথা দাবি করে যে, এই স্ত্রীলোকের ইদ্দতের মিয়াদ তিন কুরু, যদি তার স্বামী তাকে তালাক দেয় এবং অপর কোন ব্যক্তি তার সাথে সন্দেহক্রমে সঙ্গম করে তাহলে। কেননা সে তালাকপ্রাপ্তা, ইদ্দত পালন তার কর্তব্য। তার উপর তিন কুরু'র বেশি সময়ের জন্যে ইদ্দত পালন কর্তব্য করে দিলে আয়াতে তা অতিরিক্ত চাপানোর অপরাধে অপরাধী হবে। কেননা আয়াতে সে অতিরিক্ত ইদ্দতের কথা নেই। কেননা কে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তালাকপ্রাপ্তাদের সাথে সঙ্গম করেছে, আর কে অন্যভাবে করেছে, তার মধ্যে আমরা কোন পার্থক্য করতে পারি না। আল্লাহ্র এই কথাটিও তা-ই প্রমাণ করে ঃ

وَالّٰئِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰئِىْ لَمْ يَحِضْنَ -

তোমাদের মধ্যের যেসব মেয়েলোক হায়য হওয়া থেকে নিরাশ হয়ে গেছে যদি তোমরা সন্দেহে পড়ে যাও, তাহলে তাদের ইদ্দতের মিয়াদ তিন মাস, আর যাদের এখনও হায়য হয়নি ......

যে তালাকপ্রাপ্তার সাথে কোন সম্পর্কহীন ব্যক্তি সন্দেহে সঙ্গম করেছে এবং কে তার সাথে সঙ্গম করে নি, এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য করা হয়নি। অতএব এ অবস্থার দাবি হচ্ছে, তার ইদ্দত হবে তিন মাস উভয় অবস্থাতেই। আল্লাহ্র এই কথাটির দ্বারাও তা-ই প্রমাণিত হয় ঃ

গর্ভধারিণী মেয়েলোকদের ইদ্দতের মিয়াদ হচ্ছে তাদের সন্তান প্রসব হওয়া।

তার উপর ইদ্দত একজন পুরুষ থেকে, কি দুইজন পুরুষ থেকে, তার মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি।

আল্লাহ্র এই কথাটিও তা-ই প্রমাণ করে ঃ

হে নবী! লোকেরা তোমাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বলে দাও, তা হচ্ছে সময় নির্ধারক লোকদের জন্যে এবং হজ্জের।

কেননা ইদ্দত হচ্ছে সময়ের অতিবাহিত হওয়া। আর নতুন চাঁদ ও মাসসমূহ তার দ্বারাই নির্দিষ্ট হয়। আল্লাহ্ তাকে সমস্ত মানুষের জন্যে সময় নির্ধারক বানিয়েছেন। অতএব মাস ও নতুন চাঁদসমূহ প্রত্যেকের জন্যে সময়ের নির্ধারক হতে হবে আয়াতটি সাধারণ অর্থ জ্ঞাপক বলে। আর সকলেই এই বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত, এটাও একটা দলীল এই কথার যে, প্রথম স্বামীর জন্যে সে স্ত্রীর সাথে বিয়ের আকদ করা জায়েয হবে না তার ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে।

এ থেকে আমরা জানলাম যে, সে স্ত্রীলোকটি দ্বিতীয় জন থেকেও ইদ্দত পালন করছে। কেননা তার থেকে ইদ্দত তাকে বিয়ে করতে নিষেধ করে না।

যদি বলা হয়, হ্যাঁ, তার সাথে বিয়ে করতে নিষেধ করে। কেননা প্রথম জনের থেকে ইদ্দত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় জন থেকেও ইদ্দত পালন শুরু হয়ে যাবে।

জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, তাকে বিয়ে করা জায়েয হবে। পরে দ্বিতীয় জন থেকে ইদ্দত পালনের স্থান পর্যন্ত পৌছার আগেই সে যদি মরে যায়, তা হলে তাকে দ্বিতীয় জন থেকে ইদ্দত পালন জরুরী হবে না। যদি তার এই অবস্থায় তার থেকে ইদ্দত পালনে রত না থাকে, তাহলে তার আক্দ হওয়া নিষিদ্ধ হবে না। কেননা ইদ্দত তো সামনের দিকে চলবে। তা পেছনের আক্দকে তুলে ফেলতে পারে না। তার দলীল এ-ও যে, হায়য জরায়ুতে গর্ভের অস্তিত্ব না থাকার প্রমাণ। প্রথম স্বামী যখন তাকে তালাক দিল এবং পরে দ্বিতীয় পুরুষ তার সাথে সন্দেহক্রমে সঙ্গম করল তার হায়য হওয়ার আগেই, পরে সে তিন হায়য অতিবাহিত করল, তাতে গর্ভ না থাকা প্রমাণিত হল। প্রথম গর্ভহীনতা দ্বিতীয় গর্ভহীনতা প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে প্রমাণিত হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই তাদের দুজনার থেকেই ইদ্দত শেষ হওয়া আবশ্যক। এটাও একটা প্রমাণ যে, যদি কেউ তার স্ত্রীকে তালাক দেয় বায়েন তালাক, পরে ইদ্দতের মধ্যে সন্দেহে তার সাথে সঙ্গম করে, তাকে দুটি ইদ্দত পালন করতে হবে। একটি ইদ্দত এই সঙ্গমের কারণে। আর প্রথম ইদ্দতের অবশিষ্ট দিনগুলোও ইদ্দত পালন করবে। এভাবে দুটি ইদ্দত-ই পালিত হয়ে যাবে। সে ইদ্দত একজন পুরুষ থেকে কি দুইজনের থেকে, তার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

যদি বলা হয়, আসলে এটা এক ব্যক্তির জন্যেই কর্তব্য। আর প্রথমটা ওয়াজিব দুই ব্যক্তির জন্যে।

জবাবে বলা যাবে, এক ব্যক্তি আর দুই ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য নেই। কেননা দুটি হক যদি এক ব্যক্তির দুরুন হয়, তাহলে দুটোকেই একসাথে আদায় করা ওয়াজিব। যেমন দুই ব্যক্তির জন্যে তা পূরণ করা কর্তব্য হয়। যেন ঋণসমূহের মিয়াদ, হজ্জের সময়ে, ইজারার ক্ষেত্রে, 'ঈলার' মিয়াদ একই সময় অতিবাহিত হওয়ায় প্রত্যেকটিরই হক আদায় হয়ে যায়। কাজেই এই মাসগুলো যে জন্যে, তা-ই অন্য কাজের জন্যেও হয়ে যায়।

আবুজ জিনাদ সুলায়মান ইবনে ইয়াসার উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যে মেয়েলোক ইদ্দতের মধ্যে বিয়ে করেছে, তাকে তিনি উভয় স্বামী থেকে ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, দুজনের দিক থেকে একই ইদ্দত পালিত হবে।

যদি বলা হয়, জুহরী সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, প্রথম স্বামী থেকে পালন করা ইদ্দতের অবশিষ্ট দিনগুলো ইদ্দত হিসেবে কাটিয়ে তার পরে দ্বিতীয় জন থেকে ইদ্দত পালন করবে।

জবাবে বলা যাবে, এর মধ্যে একথা নেই যে, প্রথম জনের ইদ্দত পালন শেষ হয়ে গেলে পরেই দ্বিতীয় জনের ইদ্দত সম্পূর্ণ নতুনভাবে পালন করা শুরু করবে। এর অর্থ আসলে এই যে, প্রথম ইদ্দতের অবশিষ্ট দিন-ও দ্বিতীয় ইদ্দতের মধ্যেই পালিত হয়ে যাবে। এভাবেই আবুজ জিনাক বর্ণিত হাদীসের সাথে সামঞ্জস্য হতে পারে।

## তালাকপ্রাপ্তার প্রাপ্য মাত্‌'আ

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً وَّمَتِّعُوْهُنَّ -

যদি তোমরা স্ত্রীদের স্পর্শ করার কিংবা তাদের মহরানা নির্দিষ্ট করার আগেই তালাক দাও এবং তাদেরকে মাত্‌'আ দাও, তাহলে তোমাদের উপর কোন দোষ চাপবে না।

অর্থাৎ স্পর্শ করা ও তাদের মহরানা নির্দিষ্ট করা এই দুটি মূল কথা। উক্ত কথার সাথে সংযোজিত করা হয়েছে ঃ

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَافَرَضْتُمْ -

তোমরা যদি স্ত্রীদের স্পর্শ করার আগেই তাদেরকে তালাক দাও এ অবস্থায় যে, তাদের জন্যে তোমরা মহরানা নির্দিষ্ট করেছ, তাহলে নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্ধেক দিতে হবে।

তাই প্রথমোক্ত আয়াতের অর্থ যদি হতো ঃ তোমরা স্পর্শ করনি, অথচ তাদের মহরানা নির্দিষ্ট করেছ, অথবা তা করনি, তাহলে তার সাথে এই শেষোক্ত আয়াত সংযোজন করা কখনই হতো না। او কখনও-কখনও واو অর্থ দিয়ে থাকে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْكَفُوْرًا -

এবং তোমরা আনুগত্য করবে না গুনাহগার নাফরমান ব্যক্তির কিংবা কাফিরের।

এবং অর্থাৎ কাফিরেরও আনুগত্য করবে না।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ -

তোমরা যদি রোগী হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে ফিরে আসল ...। (সূরা আন-নিসা ঃ ৪৩)

এর অর্থ, এবং পায়খানা থেকে আসল এবং তোমরা রোগাক্রান্ত হলে এবং মুসাফির হলে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَ اَرْسَلْنَاهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْيَزِيْدُوْنَ - (الصافات : ١٤٧)

এ আয়াতেও او (অথবা) অর্থ واو এবং। অভিধানে এর কমই ব্যবহৃত হয়। এবং তা 'না' তাতে واو অর্থ দাখিল হওয়ার দিক দিয়ে অধিক প্রকাশমান। যেমন 'তোমরা আনুগত্য করো না তাদের মধ্য থেকে পাপীকে অথবা কাফিরকে'— এর অর্থ এবং কাফিরকে। কেননা তাও প্রথম নিষেধের অধীন। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَآ اِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَآ اَوِ الْحَوَايَآ اَوْ مَااخْتَلَطَ بِعَظْمٍ-

হারাম করেছিলাম গাভী ও ছাগলের চর্বিও—যা ওদের পৃষ্ঠদেশ ও অন্ত্রের মধ্যে লেগে আছে কিংবা যা হাড়ের সাথে যুক্ত হয়েছে তা বাদে .... (সূরা আন'আম ঃ ১৪৬)

এ আয়াতেও أو। 'কিংবা' আসলে 'এবং' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব আল্লাহ্র কথাঃ 'তোমাদের স্পর্শ করা ও তাদের জন্যে মহরানা নির্ধারণের পূর্বে যদি তোমরা তালাক দাও, তাহলে তোমাদের কোন দোষ হবে না'.... 'না'র পরে أو এসেছে, এখানেও 'এবং' অর্থ হবে। তাতে মাতা ওয়াজিব হওয়ার দুটি তাৎপর্য এক সাথে বিবেচ্য হবে— একটি স্পর্শ না করা আর দ্বিতীয় মহরানা নির্ধারিত না হওয়া অবস্থায় তালাক দিলে মাত্'আ ওয়াজিব হবে। এ আয়াত প্রমাণ করে যে, সঙ্গম করার আগে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার অধিকার স্বামীর আছে। সে সঙ্গমকৃতার মত নয়। তার জন্যে তালাক দেয়া মুবাহ বিনা শর্তে। তাতে তুহর ও হায়যের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি।

আগের কালের ও বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ মাত্'আ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন মত দিয়েছেন। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ 'প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্যে মাত্'আ থাকতে হবে।' জুহরী থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া গেছে। ইবনে উমর (রা) বলেছেন ঃ

لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ اِلاَّ الَّتِىْ تَطْلُقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تَمَسَّ فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا -

প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তার জন্যেই মাত্'আ রয়েছে। তবে যার মহরানা নির্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু তাকে স্পর্শ করা হয়নি, তাকে অর্ধেক মহরানা দিতে হবে।

আল-কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। শুরাইহ, ইবরাহীম ও আল-হাসান বলেছেন, সঙ্গমের পূর্বেও মহরানা নির্ধারিত হয়নি— এমন স্ত্রীকে তালাক দেয়া হলে তাকে মাত্'আ গ্রহণের ইখতিয়ার দেয়া হবে। শুরাইহ আরও বলেছেন, তাকে মাত্'আ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমরা মুত্তাকীদের মধ্যের লোক, তা আমরা অস্বীকার করবো না। বললে, আমি অভাবগ্রস্ত। বললেন, আমরা মুহসিন— দয়াশীল, একথাও আমরা অস্বীকার করব না।

আল-হাসান ও আবুল আলীয়া থেকে বর্ণনা এসেছে ঃ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ 'প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তার জন্যে মাত্'আ জীবনোপকরণ রয়েছে।' সাঈদুবনে যুবায়রকে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ মাত্'আ কি সকল মানুষেরই দেয়া কর্তব্য ? বললেন, না। শুধু মুত্তাকীদের উপর কর্তব্য। ইবনে আবুজ জিনাদ তার পিতা থেকে كتاب البيعة-এ বর্ণনা এসেছে, লোকেরা তালাকপ্রাপ্তার জন্যে মাত্'আ ওয়াজিব মনে করত না। বরং তাকে মনে করত আল্লাহ্র তরফ থেকে এক বিশেষ ব্যবস্থা ও অনুগ্রহ। আতা ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, কোন

ব্যক্তি যখন মহরানা নির্দিষ্ট করবে ও স্পর্শ করার আগেই তালাক দেবে, তার মাত্‌'আ ছাড়া আর কিছুই প্রাপ্য নেই। মুহাম্মাদ ইবনে আলী বলেছেন, যার মহরানা নির্দিষ্ট হয়নি মাত্‌'আ কেবল তার জন্যে। আর যার মহরানা নির্দিষ্ট হয়েছে, তার মাত্‌'আ প্রাপ্য নয়। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক নাফে যে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, ইবনে উমর (রা) তালাকপ্রাপ্তার জন্যে মাত্‌'আ ওয়াজিব প্রাপ্য, তা মনে করতেন না। তবে যে মেয়েকে কোন বিনিময়ে বিয়ে দেয়া হয়েছে, পরে সঙ্গমের পূর্বেই তালাক দেয়া হয়েছে, তার জন্যে মাত্‌'আ ওয়াজিব। মা'মার জুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, মাত্‌'আ দুটি। একটি সরকার দেবে। আর অপরটি মুত্তাকীদের উপর ধার্য হক—যে মহরানা নির্দিষ্ট হওয়া ও সঙ্গম হওয়ার পূর্বে তালাক দিয়েছে, সে মাত্‌'আ গ্রহণ করবে। কেননা তার মহরানা দেয়া ওয়াজিব নয়, আর যে তালাক দেবে মহরানা নির্দিষ্ট হওয়া ও সঙ্গম হওয়ার পর, তার জন্যে মাত্‌'আ দেয়া স্বামীর কর্তব্য। মুজাহিদ থেকেও এরূপ কথা এসেছে। এ হচ্ছে মাত্‌'আ পর্যায়ে আগের কালের ফিকাহবিদদের মতামত। তবে বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদদের মধ্যে আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ ও জুফর বলেছেন, মাত্‌'আ ওয়াজিব তার জন্যে যা'র সাথে সঙ্গম হয়নি ও কোন মহরানাও ধার্য হয়নি এমতাবস্থায় তালাক দেয়া হয়েছে। যদি সঙ্গম হয়ে থাকে, তাহলে তাকে মাত্‌'আ দেবে, তবে তা নেয়ার জন্যে তার উপর জোর করা যাবে না। সওরী, আল-হাসান ইবনে সালিহ ও আওজায়ী এই মতই দিয়েছেন। তবে আওজায়ী মনে করেন, স্বামী স্ত্রী দুই জনের কোন একজন যদি ক্রীতদাস হয়, তাহলে মাতা'আ দেয়া ওয়াজিব নয়, তাথে সঙ্গম ও মহরানা নির্ধারণের আগে তালাক দিলেও ইবনে আবূ লায়লা ও আবুজ জিনাদ বলেছেন, মাত্‌'আ দেয়া ওয়াজিব নয়। ইচ্ছা হলে দিতে পারে, ইচ্ছা না হলে দেবে না। এজন্যে স্বামীকে জোরপূর্বক বাধ্য করা যাবে না। সঙ্গমকৃতা ও সঙ্গমকৃতা নয়—মহরানা নির্দিষ্ট হয়েছে আর হয়নি, এভাবে কোন পার্থক্য করা হয়নি। মালিক ও লাইস বলেছেন, কাউকে মাত্‌'আ দিতে বাধ্য করা যাবে না, তার মহরানা নির্দিষ্ট করা হোক কি না হোক, তার সাথে সঙ্গম করা হয়েছে কি হয়নি, তাতে কোন পার্থক্য করা হবে না। এটা একটা বাঞ্ছনীয় কাজ বটে, তবে সেজন্যে স্বামীকে বাধ্য করা যাবে না। মালিক এ-ও বলেছেন, লেয়ানকারিণীর জন্যে কোন অবস্থায়ই মাত্‌'আ প্রাপ্য নয়। শাফেয়ী বলেছেন, মাত্‌'আ প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তারই প্রাপ্য, প্রত্যেক স্ত্রীর জন্যে। তার সাথে সঙ্গম করা ও মহরানা ধার্য হওয়ার আগেই যদি বিচ্ছেদ ঘটে যায়। তবে যাঁর মহরানা নির্দিষ্ট হয়েছে ও সঙ্গমের পূর্বেই তালাক দেয়া হয়েছে, তার জন্যে ওয়াজিব নয়।

আবূ বকর বলেছেন, আমরা প্রথমে মাত্‌'আ, ওয়াজিব হওয়া পর্যায়ে কথা বলব। তার পরে কথা বলব প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তার জন্যে তা ওয়াজিব বলেছেন, তাদের সম্পর্কে।

মাত্‌'আ ওয়াজিব— তার দলীল হচ্ছে আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْتَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيْضَةً وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ -

তোমরা যদি স্ত্রীদের স্পর্শ করার বা তাদের জন্যে মহরানা নির্ধারণ করার পূর্বে তালাক দাও

এবং তাদেরকে মাতা'আ দাও তাহলে তোমাদের উপর কোন দোষ চাপবে না। মাত্‌'আ সচ্ছল লোকের উপর তার পরিমাণে এবং দরিদ্রের উপর তদনুপাতে দেয়া কর্তব্য। এ মাত্‌'আ সুষ্ঠু-সুন্দরভাবে দেয়া মুহসিন লোকদের উপর আরোপিত একটি হক বিশেষ।

অপর আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ج فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَا حًا جَمِيْلًا -

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা যখন ঈমানদার মহিলাদের বিয়ে করবে, তার পর তাদের স্পর্শ করার আগেই তাদেরকে তালাক দেবে, তাহলে তাদের উপর কোনই ইদ্দত ধার্য নেই, যা তারা পালন করতে পারে। এমতাবস্থায় তোমরা তাদেরকে মাতা'আ দাও এবং সুন্দর নির্ঝঞ্ঝাটভাবে তাদেরকে চলে যেতে দাও। (সূরা আহযাব ঃ ৪৯)

অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ-

তালাকপ্রাপ্তাদের জন্যে যথাযথভাবে মাত্‌'আ রয়েছে মুত্তাকী লোকদের উপর হক হিসেবে।

এসব আয়াত মাত্‌'আ দেয়া ওয়াজিব প্রমাণ করে কয়েকভাবে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ فَمَتِّعُوْهُنَّ 'অতএব তোমরা তাদেরকে মাত্‌'আ দাও' — এ একটি আদেশ। আর আল্লাহ্‌র আদেশ পালন ওয়াজিব-ফরয। তা মুস্তাহাব হওয়ারও দলীল। আর দ্বিতীয়, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'প্রচলিত শুভ নিয়মে মুহসিনদের উপর হক হিসেবে ধার্য।' তার উপর ধার্য 'হক' এই কথার তুলনায় অধিক তাগিদপূর্ণ ওয়াজিব করার শব্দ আর কিছু হতে পারে না। আর তৃতীয়, আল্লাহ্‌র কথা ঃ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ 'মুহসিন লোকদের উপর হক হিসেবে ধার্য।' এটা তার ওয়াজিব হওয়ার তাগিদ এবং এটা ইহসানের শর্ত। প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্তব্য মুহসিন হওয়া। আল্লাহ্‌র কথা ঃ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ 'মুত্তাকী লোকদের উপর ধার্য হক' এই কথাটিও অনুরূপভাবে ওয়াজিব প্রমাণ করে। এটা তার ওয়াজিব-ফরয হওয়ার তাগিদ-ও। 'অতএব তাদেরকে মাত্‌'আ দাও এবং উত্তমভাবে তাদেরকে চলে যেতে দাও' কথাটিও ওয়াজিব প্রমাণ করে একটি স্পষ্ট আদেশ হিসেবে। আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের জন্যে প্রচলিত শুভ নিয়মে মাত্‌'আ রয়েছে' ওয়াজিব-ফরয প্রমাণ করে। কেননা এ কথায় মাত্‌'আ তাদের প্রাপ্য বলা হয়েছে। আমার যা মানুষের জন্যে, মানুষ তার মালিক; দাবি করার পূর্ণ অধিকার তার রয়েছে। যেমন যদি বলা হয়, 'এই ঘরটি জায়দের জন্যে' তাহলে তার অর্থ হবে, ঘরটির সে মালিক।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্‌ যখন বিশেষভাবে 'মুত্তাকীন' ও 'মুহসিনীন' শব্দের উল্লেখ করেছেন মাত্‌'আ ওয়াজিব ঘোষণার সাথে যুক্ত করে, তখন বোঝা গেল যে, তা ওয়াজিব নয়, বড়জোর

মুস্তাহাব। কেননা যা ওয়াজিব কিংবা ফরয, তাতে মুত্তাকীন মুহসিনীন এবং যারা এই পরিচয়ের নয়, তাদের মধ্যে পার্থক্য হয় না, হয় নির্বিশেষে সকলেরই কর্তব্য।

জবাবে তাকে বলা হবে, আয়াতে মুত্তাকীন ও মুহসিনীন-এর উল্লেখ হয়েছে মাত্‌'আ ওয়াজিব-ফরয হওয়ার তাগিদস্বরূপ, বিশেষভাবে কেবল সেই পরিচিতির লোকদেরই উপর তা ফরয, একথা বোঝাবার জন্যে নয়। এই পরিচিতি ছাড়া অন্যদের জন্যে তা ওয়াজিব নয়, একথা বোঝাতে চাওয়া হয়নি। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ 'মুত্তাকী লোকদের জন্যে হেদায়েত'। কুরআন কেবল মাত্র মুত্তাকী লোকদের জন্যে হেদায়েত নয়, সকল মানুষের জন্যে হেদায়েত। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ -

রমযান মাস, এ মাসেই কুরআন নাযিল হয়েছে সকল মানুষের জন্যে হেদায়েতস্বরূপ।

'মুত্তাকীনের' জন্যে হেদায়েত বলায় এ গুণের অধিকারী যারা নয় তাদের জন্যে তা হেদায়েত নয়, তা হওয়া জরুরী হতে পারে না। অনুরূপভাবে 'মুত্তাকীদের উপর হক' মুহসিনদের উপর হক' এই কথা প্রমাণ করে না যে, এই মুত্তাকী ও মুহসিন ছাড়া অন্যদের উপর তা ধার্য হক নয়। তাছাড়া উদ্ধৃত আয়াতসমূহে যেমন মুত্তাকী ও মুহসিনদের উপর তা 'হক' বলা হয়েছে, তেমনি সাধারণভাবে হুকুম দেয়া হয়েছে ঃ

فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً -

অতএব তোমরা মাত্‌'আ দাও তাদেরকে এবং তাদেরকে ভালো ভাবে চলে যেতে দাও।
(সূরা আহযাব ঃ ৪৯)

এ তো সর্ব সাধারণের জন্যে ব্যাপক ও নির্বিশেষ আদেশ। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই। কেননা বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ যেসব কাজকে মুহসিন মুত্তাকীনদের উপর ফরয বলেছেন, তা অন্যদের উপরও ফরয বলেছেন। প্রশ্নকারীর একথা মনে করা উচিত নয় যে, মাত'আ দেয়া শুধু মুস্তাহাব। কেননা যা মুস্তাহাব, তা-ও তো মুত্তাকী-মুহসিন ও সাধারণ মানুষ সকলের জন্যেই মুস্তাহাব। মুস্তাহাব ব্যাপারেও যখন মুত্তাকী-মুহসিন ও সাধারণ মানুষ,সকলের জন্যেই মুস্তাহাব। মুস্তাহাব ব্যাপারেও যখন মুত্তাকী-মুহসিনকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়, তখন ওয়াজিব-ফরযে তা করা যাবে না কেন? অতএব বুঝতে হবে যে, মাত্‌'আ দেয়া ওয়াজিব-ফরয, এ ব্যাপারে মুত্তাকী-মুহসিন ও সর্বসাধারণ মানুষ সমান।

যদি বলা হয়, মহরানা ইত্যাদি সমস্ত 'দেয়ন' ও পারস্পরিক লেন-দেনের যাবতীয় চুক্তির ওয়াজিব ঘোষণায় মুত্তাকী মুহসিনদেরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়নি, অথচ শুধু মাত্‌'আর উল্লেখে বিশেষভাবে তাদের উল্লেখ করা হল কেন? জবাবে বলা যাবে, সর্বত্রই যখন ওয়াজিব ফরয হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তখন শব্দের দাবি অনুযায়ীই হুকুম গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য। তার পরই তাকওয়া-ইহসানের ধারক লোকদেরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ নির্ধারণ করতে হবে। আসলে বিশেষভাবে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে হুকুমের তাগিদস্বরূপ। তাগিদের কারণ বিভিন্ন হতে পারে। বিশেষভাবে তাকওয়া ও ইহ্‌সানের উপর জোর দেয়ার জন্যেও তা হতে পারে। আবার দেয়া হুকুমটাকে জোরদার করার কারণেও বিশেষভাবে উল্লেখ করা হতে পারে। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً -

এবং স্ত্রীদের মহরানা তাদেরকে দিয়ে দাও আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে। (সূরা আন-নিসা ঃ ৪)

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ -

অতএব তার নিকট রক্ষিত আমানত ফিরিয়ে দেয়া উচিত, যার নিকট তা রাখা হয়েছে এবং তার রব্ব আল্লাহ্কে তার ভয় করা উচিত।

কোন বিষয়ে সাক্ষী বানাবার জন্যে আদেশের উদ্দেশ্যেও বিশেষীকরণের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে রেহন রাখার কাজে। অতএব তাগিদের শব্দকে অন্যদের উপর ওয়াজিব-ফরয না হওয়ার দলীল কিভাবে বানানো যেতে পারে ? তাছাড়া বিয়ের আক্দকে আমরা এভাবে পাচ্ছি যে, তাতে বদলটা ওয়াজিব হয়। মহরানা নির্ধারিত হলে তা-ই দেয় হয়, আর নির্ধারিত না হলে 'মহ্রে মিসল' দেয় হয়। পরে তার অবস্থা এই হয় যে, মহরানা নির্দিষ্ট হলে স্ত্রী-সঙ্গমের পূর্বে তালাক পেয়ে গেলে তার বদলটা অবশ্যই পেয়ে যায়। বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটলেও তাই। আর সমস্ত চুক্তিই এরূপ হয়ে থাকে। কেননা বিক্রেতার মালিকানায় পণ্য ফেরত এলে সমস্ত মূল্য প্রত্যাহৃত হয়ে যায়। আর সঙ্গমের পূর্বে তালাক দিলে স্ত্রীর উপর স্বামীর হক প্রত্যাহৃত হলেও তার বদল (মহরানা) পাওয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ার প্রশ্ন উঠতে পারে না। সে বদল হচ্ছে নির্দিষ্ট মহরানার অর্ধেক। আর যদি মহরানা ধার্য না হয়ে থাকে, তাহলেও তার সেই হুকুমই হবে। এ দুটির মধ্যে সমন্বয়কারী তাৎপর্য হল সঙ্গমের পূর্বে তালাক হওয়া। উপরন্তু বিয়ের 'আক্দ' হলেই 'মহরে মিস্ল' প্রাপ্য হবে, মাত্'আও পাবে। আর তা 'মহরে মিসল'-এরই অংশ ধার্য মহরানার অর্ধেক অবশ্যই ফরয হবে যদি সঙ্গমের পূর্বেই তালাক দেয়।

যদি বলা হয়, 'মহরে মিস্ল' তো হয় টাকা-কড়ি। আর মাতা'আ হয় কাপড়-চোপড়। জবাবে বলা যাবে, মাত্'আও আমাদের মতে সেই টাকা-কড়িই। তা দিলে অন্য কিছু দিতে বাধ্য করা হবে না। এই বললাম যে, 'মাত্'আ 'মহরে মিস্লের' অংশ, তা ইমাম মুহাম্মাদের মাযহাবের সাথে সামঞ্জস্যশীল। কেননা তিনি বলেছেন, যদি স্ত্রীকে 'মহরে মিসল'-এর বন্ধনে রাখা হয়, পরে সঙ্গমের আগেই তাকে তালাক দেয়, তাহলে তাকে মাত্'আর বন্ধনে বন্দী করা হবে। তা ধ্বংস হলে সে-ও ধ্বংস হবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসূফ তাকে মাত্'আর সাথে রেহনবন্দী করেন না। যদি তা ধ্বংস হয় তাহলে কোন জিনিস না পেয়েই ধ্বংস হবে। কিন্তু মাত্'আ ওয়াজিব-ফরয হয়ে স্বামীর উপর বাকী থেকে যাবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি মাত্'আকে 'মহরে মিস্ল'-এর অংশ মনে করেন না। বরং তা ওয়াজিব ফরয মনে করেন কুরআনের হুকুমের বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়েই। তাঁর দলীল-ও রয়েছে। সেই সাথে এই মৌলনীতিও যে, স্ত্রীর বিয়ে বদল বিনিময় পাওয়ার অবশ্যই অধিকারী সঙ্গমের আগে তালাক হলে। 'আক্দ-এর সময় মহরানা ধার্য হোক বা না-ই হোক, তাতে কোন পার্থক্য করা যাবে না। কেননা বিয়ের মাধ্যমে যে স্ত্রী-অঙ্গ ভোগের অধিকার জন্যে স্বামীর জন্যে, তা কখনই বিনিময় ছাড়া হতে পারে না, জায়েয নয়। কাজেই বিয়ের আক্দ হওয়ার সময় মহরানা ধার্য না হলে মহরে মিস্ল অবশ্যই দিতে হবে ঠিক তেমনি, যেমন ধার্য হলে দিতে হয়। তাই সঙ্গমের আগেই তালাক দিলে 'বিনিময়' দেয়া ওয়াজিব-ফরয হওয়ায় উভয় অবস্থাই সমান, অভিন্ন এবং মাত্'আর মহরে মিস্ল-এর অংশের স্থলাভিষিক্ত হওয়ায় বহাল থাকবে।

ইবরাহীম নখ্‌য়ী সঙ্গমের পূর্বে তালাকপ্রাপ্তা সম্পর্কে বলেছেন, তার জন্যে মহরানা ধার্য হয়ে থাকলে অর্ধেক মহরানা তার প্রাপ্য হবে, আর তা-ই তার মাত্‌'আ। তাতে মাত্‌'আর নাম হয় সেই জিনিসের যা সঙ্গমের পূর্বে তালাক দিলে স্ত্রীর প্রাপ্য হয় স্বামীর নিকট থেকে। আর তা-ই হবে স্ত্রীর বিয়ের (স্ত্রী-অঙ্গের) বিনিময়।

যদি প্রশ্ন তোলা হয়, মাত্‌'আ যদি মহরে মিস্‌ল-এর অংশের স্থলাভিষিক্ত হয়, তাহলে তা মহরানারই বিনিময় হল। আর তালাকের পূর্বে মহরানার বদল পাওয়ার ওয়াজিব হয় না। তাই তার পরেও তা হবে না।

জবাবে বলা যাবে, আমরা বলিনি যে, তার বদল নয়। যদিও তা তার স্থলাভিষিক্ত যেমন আমরা বলি না যে, ব্যবহৃত জিনিসের মূল্য তার বদল। বরং বলি যে, তা যেন তার স্থানে দাঁড়িয়ে। যেমন ক্রয়কারীর জন্যে পণ্যের বদল গ্রহণ করা জায়েয হবে না ক্রয়ের মাধ্যমে তা হস্তগত করার পূর্বে। যদি তা কোন ব্যবহারকারী ব্যবহার করে ফেলে, তা হলে তার নিকট থেকে তার মূল্য গ্রহণ তার জন্যে জায়েয। কেননা তা তারই স্থানে অবস্থিত। যেন তা ঠিক তার বিনিময়ের অর্থে নয়। মাত্‌'আও তেমনি। তা 'মহরে মিস্‌ল'-এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে স্ত্রী-অঙ্গের বদল হবে। যেমন তালাক হলে নির্দিষ্ট মহরানার অর্ধেক স্ত্রী-অঙ্গের বদল হয়।

যদি বলা হয়, 'মাত্‌'আ যদি মহরে মিস্‌ল'-এর অংশের স্থলাভিষিক্ত হয় স্ত্রী-অঙ্গের বদলস্বরূপ; তাহলে তা স্ত্রীর অবস্থার সাথে মিলিয়ে অবশ্যই ওয়াজিব গণ্য করতে হবে। যেমন 'মহরে মিস্‌ল' নির্ধারিত হয় স্ত্রীর অবস্থা বিবেচনা করে, স্বামীর অবস্থা বিবেচনা করে নয়। আল্লাহ্ যখন মাত্‌'আ নির্ধারণ করতে বলেছেন স্বামীর অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁর এই কথায় ঃ

তাদেরকে মাত্‌'আ দাও সচ্ছল অবস্থার স্বামীর পরিমাণ অনুযায়ী এবং দরিদ্র স্বামীর অবস্থানুপাতে।

বোঝা গেল, মাত'আ স্ত্রী-অঙ্গের বদল নয় আর তা যখন স্ত্রী-অঙ্গের বদল নয়, তখন তা তালাকেও বদল হতে পারে না। কেননা স্ত্রী-অঙ্গ মাত্‌'আ পাওয়ার অধিকারী হয় তালাকের কারণে। অতএব স্ত্রীর যা প্রাপ্য হয়, তা বদল পাওয়ার অধিকারী হবে না। আর তা প্রমাণ করে যে, তা কোন জিনিসেরই বদল নয়। অবস্থা যখন এই তখন আমরা বুঝলাম যে, তা ওয়াজিবই নয়।

এর জবাবে বলা যাবে, স্ত্রী অবস্থা নয়, স্বামীর অবস্থাই বিবেচনা করতে হবে, তোমার এই কথাটি আমাদের মতে ও ভাবে নয়, যেভাবে তুমি বলছ। হানাফী মাযহাবের শেষদিকের ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত দিয়েছেন। আমাদের শায়খ আবুল হাসান (র) বলেছেন, সে ব্যাপারে স্ত্রীর অবস্থাও অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। একথা কিন্তু আয়াতের পরিপন্থী নয়, কেননা আয়াতের হুকুমটা আমরা স্বামীর অবস্থায় বিবেচনায়ও ব্যবহার করি। কিছু সংখ্যক ফিকাহবিদ কেবল স্বামীর অবস্থা বিবেচনার কথা বলেছেন, স্ত্রীর অবস্থা বিবেচনা না করার কথা বলেছেন। এত মত যাঁরা প্রকাশ করেছেন, এই প্রশ্নকারীর সওয়াল তাদের উপরই আরোপিত হয়। কেননা তারা বলেন, মহরে মিসল নির্ধারণে সেই অবস্থার বিবেচনা করতে হবে, যে অবস্থায় স্ত্রী-অঙ্গ স্বামীর ব্যবহারে আসে হয় সঙ্গমের মাধ্যমে অথবা মৃত্যুর মাধ্যমে, যা পূর্ণ মহরানা পাওয়ার অধিকারী হওয়ার ব্যাপারে সঙ্গমের স্থলাভিষিক্ত হয়। ফলে তা স্বতঃ বিবেচনায়

ব্যয় হয়ে যাওয়া জিনিসের মতই হয় যায়। তবে 'মাত্‌'আ আমাদের মতে ওয়াজিব হয় কেবল তখন, যখন স্ত্রী-অঙ্গের উপর স্বামীর হক প্রত্যাহৃত হয়। তার কারণ তার দিক থেকেই হয় সঙ্গমের পূর্বে কিংবা তার স্থলাভিষিক্ত যা হয় তার পূর্বে। তাহলে স্ত্রীর অবস্থা বিবেচনা করা ওয়াজিব হয় না। কেননা স্ত্রী-অঙ্গ স্বামী লাভ করতে পারে নি, বরং তা লাভ হয়েছে স্ত্রীর জন্য তার পূর্বের কোন কারণে সঙ্গমের হুকুম প্রমাণিত হয়নি বলে। এই কারণে স্বামীর অবস্থা বিবেচনা করতে হবে, স্ত্রীর নয়। উপরন্তু আমরা যদি তোমার কথা মেনেও নিই যে, তা কোন জিনিসের বদল নয়, তবুও তার ওয়াজিব হওয়া নিষিদ্ধ হয় না। কেননা 'নফকা' তো কোন জিনিসের বদল নয়। তার দলীল এই যে, স্ত্রী-অঙ্গের বদল হচ্ছে মহরানা। বিয়ের আক্‌দ করে স্বামী তার মালিক হয়েছে। আর সঙ্গম ও স্বাদ গ্রহণ হচ্ছে মালিকানায় হস্তক্ষেপের ফলশ্রুতি। মানুষ তার মালিকানায় হস্তক্ষেপ করলে তাতে কোন বদলের প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু তা মাত্‌'আ ওয়াজিব হওয়াকে নিষেধ করে না। এই কারণেই তার অল্প বয়সের পুত্র-কন্যার খরচাদি বহন তার কর্তব্য হয়ে পড়ে। তা কুরআনের আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত। তার এই ব্যয়টা কোন জিনিসের বদল বা বিনিময় নয়। তা মাত্‌'আ ওয়াজিব হওয়া নিষেধ করে না। যাকাত, কাফ্‌ফারাও কোন জিনিসের বিনিময় নয়। এগুলি আল্লাহ্ ঘোষিত ফরয বা ওয়াজিব। কাজেই তা কোন জিনিসের বদল নয় প্রমাণকারী মাতা' ওয়াজিব না হওয়ার কিছুই প্রমাণ করতে পারে না। আর স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের অবস্থা বিবেচনা করা সেই অনুপাতের কথা। আর অনুপাতের কথার সাথে ওয়াজিব হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। তা যদি ওয়াজিব না হয়, তাহলে তা স্বামীর অবস্থানুপাতে নির্দিষ্টও হতে পারে না। আল্লাহ্ যখন বলেছেন ঃ 'সচ্ছল স্বামীর অবস্থার অনুপাতে মাত্‌'আ আর দরিদ্র স্বামীর অবস্থানুপাতে মাত্‌'আ। তখন এতেই মাত্‌'আ ফরয প্রমাণিত হয়ে গেছে। কেননা যা ফরয নয়, তা স্বামীর অবস্থানুপাতে বিবেচিতও হতে পারে না। কেননা সচ্ছল অবস্থায় ও দারিদ্রাবস্থায় যা-ইচ্ছা করার সুযোগ তার আছে। তাই যখন মাত্‌'আর পরিমাণ নির্ধারিত হবে স্বামীর অবস্থানুপাতে এবং সে স্ত্রীকে তালাকও দেয়নি, তখন স্বামী এ ব্যাপারে ইখতিয়ার পাবে। এতে বোঝা যায় যে, মাত্‌'আ সচ্ছল স্বামীর অবস্থার অনুপাতে মাত্‌'আ আর দরিদ্র স্বামীর অবস্থানুপাতে মাত্‌'আ। এ কথার তাৎপর্য এই যে, যে দরিদ্র, যে কিছুর মালিক নয়, তার মাত্‌'আ দেয়া কর্তব্য নয়। আর তার জন্যে যখন তা কর্তব্য নয়, তখন সচ্ছল স্বামীর জন্যেও কর্তব্য নয়। দরিদ্রের জন্যেও তা কর্তব্য যে বলতে চায়, সে আয়াতের বাহ্যিক অর্থের সীমা থেকে বাইরে বেরিয়ে গেছে। কেননা যার মাল-সম্পদ নেই, আয়াত তার উপর মাত্‌'আ ফরয হওয়ার ফায়সালা দেয়নি। তার কারণ, তার মাল-সম্পদ বলতে কিছু নেই। অতএব স্বামীর আর্থিক অবস্থাই বিবেচ্য হবে। আর এই কারণে এটা তার উপর ঋণ হিসেবে চাপবে তা-ও জায়েয হতে পারে না। সে তার জন্যে আদিষ্ট-ও নয়।

আবূ বকর বলেছেন, এ পর্যন্ত যার কথাবার্তার উল্লেখ হল, এইসব তার অসতর্কতার প্রমাণ। মনে হয় সে আয়াতের অর্থই বুঝতে পারেনি। কেননা আল্লাহ্ এ কথা বলেন নি যে, সচ্ছল ব্যক্তিকে তার ধন-মালের পরিমাণ অনুযায়ী দিতে হবে এবং দরিদ্র ব্যক্তিকে দিতে হবে তার ধন-মাল অনুযায়ী। তিনি বলেছেন ঃ সচ্ছল ব্যক্তির জন্যে একটা পরিমাণ আছে আর দরিদ্র ব্যক্তির জন্যেও একটা পরিমাণ নির্দিষ্ট করতে হবে। তা তার দায়িত্বে প্রমাণিত হয়ে থাকবে। যখন সে তা দিতে পারবে, তা দেবে। যেমন আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন ঃ

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

আর যার সন্তান দুধ সেবন করানো স্ত্রীদের খোরপোশ দেয়ার দায়িত্ব তার শুভ প্রচলিত নিয়মে ও মানে।

তার উপর এই খোরপোশ ফরয হয়ে আছে প্রচলিত মান অনুযায়ী। যদি সে দরিদ্র হয় যে, সে কিছুরই মালিক না, সে আয়াতের হুকুমের বাইরে যেতে পারে না। কেননা এটা তার দায়িত্ব। প্রচলিত শুভ নিয়মে তা দেয়া তার প্রতিষ্ঠিত দায়িত্ব। তাই যখন সে তা পাবে, তাকে সে দিয়ে দেবে। দরিদ্র ব্যক্তি সম্পর্কেও সেই কথা মাত্'আর হুকুমে। অন্যান্য সব হক-হকুকের ক্ষেত্রেও তাই। তা দায়িত্বে চাপে। আর দায়িত্ব মূল জিনিসটির মতই হয়। যেমন দরিদ্র ব্যক্তি মূল্য দেয়ার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে একটা পণ্য (বাকী মূল্যে) ক্রয় করতে পারে। তার এই দায়িত্ব গ্রহণ মূল জিনিসের স্থলাভিষিক্ত হয় বদল প্রমাণিত হওয়ার দিক দিয়ে। দরিদ্র স্বামীর দায়িত্ব গ্রহণ ও সহীহ্ দায়িত্ব গ্রহণ। তাতেও মাত্'আ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যেমন সে দায়িত্বে 'নফকা' এবং অন্যান্য যাবতীয় ঋণ চাপতে পারে।

আবূ বকর বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে মহ্‌রানা নির্দিষ্ট না করলেও বিয়ে জায়েয হওয়ার দলীল রয়েছে, কেননা আল্লাহ মহ্‌রানা অনির্দিষ্ট থাকা অবস্থায় তালাক জায়েয করেছেন। আর তালাক তো সহীহ্ বিয়ে ছাড়া হতে পারে না। এটাও প্রমাণিত হয় যে, মহ্‌রানা নির্দিষ্ট না হলে বিয়ে নষ্ট হয়ে যাবে না। যেহেতু মহ্‌রানা নির্দিষ্ট করা ও মহ্‌রানা না থাকার শর্ত করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মহ্‌রানা তো উভয় অবস্থায়ই ফরয। ইমাম মালিক মনে করেছেন, মহ্‌রানা না দেয়ার শর্ত করলে বিয়েই সহীহ্ হবে না। তা সত্ত্বেও তার সাথে সঙ্গম করলে তখন বিয়ে সহীহ্ হয়ে যাবে এবং স্ত্রীর জন্যে 'মহরে মিস্‌ল' ফরয হয়ে যাবে। মহ্‌রানা না দেয়ার শর্ত করা হলেও বিয়ে সহীহ্ হবে— এ ফায়সালা কুরআনের আয়াতই দিয়েছে। তা মহ্‌রানা নির্ধারণ না করার থেকে বেশি কিছু ব্যাপার নয়। মহ্‌রানা নির্ধারণ না করা যখন বিয়ে সহীহ্ হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়, মহ্‌রানা দেয়া হবে না শর্ত করলেও বিয়ে সহীহ্ না হওয়ার কারণ ঘটবে না।

হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, সঙ্গমকৃতা স্ত্রীকে তালাক দিলে তার জন্যে মাত্'আ ফরয হবে না। কারণ আমরা আগেই বলেছি যে, 'মাত্'আ হচ্ছে স্ত্রী-অঙ্গের বদল। তাই দুটি বদল পাওয়ার অধিকার তার হতে পারে না। সঙ্গম হওয়ার পর তালাক দিলে নির্দিষ্ট মহ্‌রানা বা 'মহরে মিস্‌ল' পাওয়ার অধিকারী হবে স্ত্রী, তখন সেই সাথে মাত্'আ পাওয়ারও অধিকারী হওয়া জায়েয হবে না। বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদদের মধ্যে এ নিয়ে কোন মতপার্থক্য নেই যে, যৌন সঙ্গমের আগেই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ওয়াজিব হিসেবে 'মাত্'আ পাওয়ার অধিকারী হয় না। কেননা তখন তো সে অর্ধেক মহ্‌রানা পেয়ে যায়। এই কথাটি দুভাবে প্রমাণিত। যেমন পূর্বে উল্লেখ করেছি। একটি— মহ্‌রানার অংশ ওয়াজিব হওয়ার সাথে এক সাথে মাত্'আ পাওয়ারও অধিকার হয় না। অতএব সমস্ত মহ্‌রানা পাওয়ার অধিকারী হলে তখন তো আরও অধিক ভালোভাবে তা পাওয়ার অধিকারী হবে না। আর দ্বিতীয়, তার তাৎপর্য হল, সে মহ্‌রানার কিছু অংশ পাওয়ার তো সে অধিকারী হল, তা সঙ্গমকৃতার ক্ষেত্রে বর্তমান।

যদি বলা হয়, মহ্‌রানার কিছু পাওয়া যখন ওয়াজিব নয়, তখন তো মাত্'আ পাওয়া তার জন্যে ওয়াজিব হবে— মহ্‌রানা পাওয়ার অধিকার হবে আরও উত্তমভাবে। বলা হয়েছে, তাহলে

অর্ধেক মহরানা ওয়াজিব হওয়ার সময় তা পাওয়ার অধিকারী হওয়া বাঞ্ছনীয় হবে। কেননা কোন কিছু না পাওয়ার সময় মাত্‌'আ পাওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। তেমনি মহরানার কোন অংশ হারালে তখনও তা পাওয়ার অধিকার অবশ্যই হবে। তার কারণ এই যে, স্ত্রীর অংশ বিনিময় পাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে না। তাই যখন মহরানা ওয়াজিব নয়, তখন 'আত্‌'আ ওয়াজিব হবে।' আর যখন অন্য কোন বদল পাওয়ার অধিকারী হবে, তখন মাত্‌'আ পাওয়ার অধিকারী হওয়া ওয়াজিব নয়।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ -

তালাকপ্রাপ্তাদের জন্যে প্রচলিত শুভ নিয়মে মাত্‌'আ রয়েছে মুত্তাকীদের জন্যে হক হিসেবে।

এটা সব তালাকপ্রাপ্তার জন্যেই সমান। তবে কোন দলীল যদি কিছু বিশেষীকরণ করে, তাহলে ভিন্ন কথা।

জবাবে বলা যাবে, ব্যাপার তা-ই। তবে 'মাত্‌'আ তো নাম হচ্ছে সেই সব জিনিসের, যা দিয়ে কোন-না-কোন ফায়দা পাওয়া যায়। আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

وَفَاكِهَةً وَّاَبًّا مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ -

এবং ফল ও ঘাস তোমাদের জন্যে এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর জন্যে জীবনোপকরণ। (সূরা আবাসা ঃ ৩১-৩২)

তিনি বলেছেন ঃ

مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ -

খুব অল্প মাত্‌'আ— জীবনোপকরণ। পরে তাদের পরিণতি জাহান্নাম। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৯৭)

বলেছেন ঃ

اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ -

নিশ্চয়ই এই দুনিয়ার জীবন সামগ্রী মাত্র। (সূরা মুমিন ঃ ৩৯)

অতএব মাত্‌'আ الْمُتْعَةُ ও মাতা'আ مَتَاعٌ নাম, যেসব জিনিস দ্বারা কোন-না-কোন ফায়দা কল্যাণ বা উপকার পাওয়া যায়, তা বোঝাবার জন্যেই এই নাম ব্যবহৃত হয়। আর তালাকপ্রাপ্তাদের জন্যে যখন এমনি উপকারী কল্যাণদায়ক কোন জিনিস হওয়া ওয়াজিব মনে করি— যেমন মহরানা ও নফকা ইত্যাদি— তখন আমরা কুরআনের আয়াতে আরোপিত দায়িত্বের কথাই বলি। তাই যে মাত্‌'আয় নির্দিষ্ট মহরানার অর্ধেকও শামিল নেই এবং যা স্ত্রীর জন্যে স্বামী ও স্ত্রীর অবস্থা অনুপাতে নির্দিষ্ট হয়নি, আর সঙ্গমকৃতা স্ত্রীর জন্যে কখনও নির্দিষ্ট মহরানা, কখনও 'মহরে মিস্‌ল'— নির্দিষ্ট মহরানা যখন হয় না— এই সবই মাত্‌'আ। যখন আমরা কোন-না-কোন প্রকারের মাত্‌'আ ওয়াজিব বলব, তখন সকল প্রকারের মাত্‌'আ-ই তার জন্যে ওয়াজিব করে দেব, তা জরুরী নয়। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ তালাক প্রাপ্তাদের জন্যে সামগ্রীর দাবি পূরণ হয়ে যায় সে নামের সামান্য কোন জিনিসও পাওয়া গেলে।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্র কথা ঃ 'তালাকপ্রাপ্তাদের জন্যে সামগ্রী' তালাক হলেই তা পাওয়ার দাবি করে। কিন্তু পূর্বে যে মহরানা পাওয়ার অধিকারী হয়েছে, তা বোঝায় না।

জবাবে বলা যাবে, ব্যাপার তা নয়। কেননা একথা বলা সম্পূর্ণ জায়েয যে, তালাক প্রাপ্তার সেইসব মহরানাও রয়েছে যা পাওয়ার অধিকারী হয়েছে তালাকের আগেই। তাই তালাকের পর তা পাওয়ার উল্লেখ হলে তার পূর্বে তা ওয়াজিব হওয়ার পরিপন্থী কিছু নয়। কেননা তা যদি হতো, তাহলে তালাকের উল্লেখের সঙ্গম উভয় অবস্থায় তার ওয়াজিব হওয়ার কথা বলা কখনই জায়েয হতো না। তাই তালাকের পর তার ওয়াজিব হওয়ার ফায়দা হবে আমাদের কথা জানানো যে, তালাকের সঙ্গেই মাত্'আ ওয়াজিব। কেননা কোন লোক ধারণা করতে পারে যে, যা ওয়াজিব হয়েছে, তাকে তালাক বুঝি প্রত্যাহার করে দিয়েছে। তার তালাকের পর ওয়াজিব হওয়ায় তার পূর্বে ওয়াজিব হওয়ার মতই হয়ে গেল।

যদি লক্ষ্য হয় সেই মাত্'আ যা তালাকের দরুন ওয়াজিব হয়েছে, তাহলে তা তিনটি দিক দিয়ে হতে পারে। হয় তা সঙ্গমকৃতার জন্যে ইদ্দতের 'নফকা' হবে কিংবা হবে মাত্'আ অথবা নির্দিষ্ট মহরানার অর্ধেক সঙ্গমকৃতা নয় তার জন্যে। আর তা তালাকের সাথে সংশ্লিষ্ট। কেননা 'নফকা' মাত্'আরই নাম। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'তোমাদের মধ্য থেকে যারা মরে ও স্ত্রীদের রেখে যায়, তাদের কর্তব্য স্ত্রীদের জন্যে অসিয়ত করা এক বছরের জীবনোপকরণের জন্যে, তাদেরকে ঘর থেকে বের না করেই।'

আল্লাহ্র এই কথায় স্ত্রীর জন্যে ওয়াজিব নফকা ও বাসস্থানকে 'মাত্'আ বলা হয়েছে। আর মহরানা হলে তার সাথে মাত্'আ ওয়াজিব হয় না— এর প্রমাণ হচ্ছে, সকলেই এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, তালাকের পূর্বে মাত্'আ পাওয়ার দাবি করার অধিকার নেই। তালাকের পর মহরানার সাথে সাথে যদি মাত্'আও ওয়াজিব হতো, তাহলে তালাকের পূর্বে ওয়াজিব হতো, কেননা স্ত্রী-অঙ্গের বদল, তালাকের বদল নয়। তখন তা মহরানার মতই হয়ে যেত। এতেই দলীল রয়েছে এই কথার যে, মাত্'আ ও মহরানা— এ দুটিই ওয়াজিব হওয়া নিষিদ্ধ।

জবাবে বলা যাবে, 'মাত্'আ মহরে মিস্ল-এর অংশ। কেননা তা সেই অংশেরই স্থলাভিষিক্ত। অথচ তালাকের পূর্বে মহরানার দাবি করা স্ত্রীর জন্যে কর্তব্য ছিল। এই কারণে তালাকের পর তার কিছু অংশ সহীহ্ হয়েছে। কিন্তু তুমি তো মহরানার অংশকে মাত্'আ মনে কর না ? এখন মাত্'আ ওয়াজিব হওয়াটা হয় স্ত্রী-অঙ্গের বদল হবে অথবা তালাকের বদল হবে। যদি মহরে মিস্লসহ তা স্ত্রী-অঙ্গের বদল হয়, তাহলে তালাকের পূর্বেই তার হকদার হওয়া ওয়াজিব হবে। আর যদি তা স্ত্রী-অঙ্গের বদল না হয়, তাহলে স্ত্রী-অঙ্গ অর্জিত হওয়া অবস্থায় তালাকের কারণে মাত্'আর ওয়াজিব কঠিন।

## ওয়াজিব মাত্'আর পরিমাণ নির্ধারণ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ -

এবং সস্ত্রীদের মাত্'আ দাও। সচ্ছল ব্যক্তির জন্যে কর্তব্য তার পরিমাণ এবং দরিদ্র ব্যক্তির উপর কর্তব্য তার পরিমাণ। মাত্'আ— জীবনোপকরণ— প্রচলিত শুভ নিয়মে ও মানে।

সচ্ছল অবস্থা ও দরিদ্রাবস্থা বিবেচনায় মাত্'আর পরিমাণ নির্ধারণ ইজতিহাদের পন্থায়ই সম্ভব। তাতে বিজয়ী ধারণার ভিত্তিতে কাজ করতে হয়। কাল ও সময়ের পার্থক্যে তাতে পার্থক্য ঘটে। কেননা আল্লাহ্ তার পরিমাণ নির্ধারণে দুটি জিনিসের শর্ত করেছেন। একটি, তার পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে স্বামীর সচ্ছলতা ও দারিদ্র্যের অবস্থার প্রেক্ষিতে। আর দ্বিতীয়, তা হতে হবে মারুফ— প্রচলিত ও সুষ্ঠু মানে। ফলে এতে দুটি তাৎপর্য বিবেচনা করা আবশ্যক। অবস্থা যখন এবং উভয় অবস্থায় 'মা'রুফ'-এর বিবেচনা লোকদের অভ্যাসের ভিত্তিতে করতে হবে, আর সেই অভ্যাস বিভিন্ন হয়ে থাকে, পরিবর্তিত-ও হতে থাকে। কাজেই সময়, কাল ও যুগের অবস্থার যাঁচাই ও বিবেচনার ভিত্তিতে তার নির্ধারণ একান্তই আবশ্যক। নিত্যকার ঘটনাবলীতে শরীয়াতের হুকুম জানার জন্যে ইজতিহাদ জায়েয হওয়ার এটা একটা ভিত্তি। ইজতিহাদই শরীয়াতসম্মত হুকুম পাওয়ার একমাত্র উপায় হতে পারে, ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, আমাদের শায়খ আবুল হাসান বলতেন, সেই সাথে মেয়েলোকটির অবস্থা বিবেচনা করাও কর্তব্য। আলী ইবনে মূসা আল-কুমীও তাঁর গ্রন্থে এই কথার উল্লেখ করেছেন। তিনি দলীল দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা মাত্'আর পরিমাণ নির্ধারণ দুটি জিনিসের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। তাহল, স্বামীর স্চ্ছলতা ও দারিদ্রাবস্থার বিবেচনা 'মারুফ' অনুযায়ী নির্ধারণ করা। তিনি বলেছেন, আমরা যদি শুধু স্বামীর অবস্থা বিবেচনা করি, সেই সাথে স্ত্রীর অবস্থা বিবেচনা না করি, তা হলে একটা পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। যেমন কেউ যদি দুইজন মেয়েলোক বিয়ে করে তবে একজন শরীফ ভদ্র, শালীন আর অপর জন হয় হীন্ নীচ ক্রীতদাসী বা মুক্তিপ্রাপ্তা। পরে এ দুজনকে এক সঙ্গে তালাক দিয়ে দিল তাদের সাথে সঙ্গম করার পূর্বেই, তাদের মহরানাও নির্দিষ্ট করা হয়নি— এরূপ অবস্থায় উভয়ের জন্যে কি একই মানের ও মূল্যের মাত্'আ দেয়া হবে? হীন নীচ স্ত্রীকে যা দেয়া হবে, তা-ই দেয়া হবে শরীফ ভদ্রকে? কিন্তু এটা তো সামাজিক ব্যবস্থা, অভ্যাস ও নৈতিকতার দিক দিয়ে গ্রহণ অযোগ্য ও অচল। তিনি বলেছেন, উক্ত কথা— যারা বলে যে, কেবলমাত্র স্বামীর অবস্থার বিবেচনা হবে, স্ত্রীর নয়, এই কথা আরও একটি কারণে গ্রহণ-অযোগ্য। তা হল কোন ব্যক্তি যদি ধন-ঐশ্বর্যশালী হয়, হয় বিরাট মর্যাদার, আর সে বিয়ে করে কোন হীন নীচ মর্যাদার মেয়েকে যার মহরে মিস্ল হল এক টাকা, সে যদি তার সাথে সঙ্গম করে তাহলে 'মহরে মিস্ল তার প্রাপ্য হবে। কেননা তার মহরানা নির্ধারিত হয়নি এক টাকাও। আর তাকে যদি সে সঙ্গমের আগেই তালাক দেয়, তাহলে তাকে মাত্'আ দেয়া কর্তব্য হবে স্বামীর সামার্থানুযায়ী। তা কখনও মহলে মিস্ল-এরও দ্বিগুণ তিন গুণ হতে পারে। তাহলে সঙ্গমের পূর্বে দেয়া তালাকের দরুন সে অনেক বেশি পাওয়ার অধিকারী হবে সঙ্গমের পরে তালাক দিলে যা পাওয়ার অধিকারী হবে তার তুলনায়। আর এটা মূল কথার পরিপন্থী। কেননা আল্লাহ্ তো সঙ্গমের পূর্বে দেয়া তালাকের দরুন স্ত্রীর সঙ্গমের পরে দেয়া তালাকের দরুন প্রাপ্যের অর্ধেক পাওয়ার অধিকারী বানিয়েছেন। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীর নয়— কেবল স্বামীর অবস্থার বিবেচনা করেই মাত্'আর পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়, তাহলে কুরআনের বিরোধিতা করার মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। শুধু তা-ই নয়, প্রচলিত ও পরিচিত নিয়ম ও মানেরও বিপরীত হয়ে যাবে। এই কারণে স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর অবস্থাটার বিবেচনা হওয়াও একান্তই জরুরী হয়ে পড়ে।

উপরোক্ত মত আরও একটি কারণে বিপর্যয়কর। তা হল, দুজন সচ্ছল অবস্থার লোক যদি

দুই বোনকে বিয়ে করে, তাদের একজন তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করল, তাহলে তার মহরানার নির্দিষ্ট ছিল না বলে 'মহরে মিস্‌ল' হিসেবে তার প্রাপ্য হবে হাজার টাকা। আর অপর জন তার স্ত্রীকে সঙ্গমের আগেই তালাক দিল, মহরানা নির্দিষ্ট করা হয়নি বলে সে স্বামীর অবস্থানুপাতে মাত্‌'আ পাওয়ার অধিকারী হল। আর তার নিজের বোনের প্রাপ্য 'মহরে মিস্‌ল'-এর কয়েক গুণ বেশি পেয়ে যাওয়া তার পক্ষে খুবই সম্ভব হতে পারে। পরিণামে দেখা গেল, সঙ্গমকৃতা বোন কম পেল তালাকপ্রাপ্তা বোনের প্রাপ্তির তুলনায়। অথচ উভয় স্ত্রীর অঙ্গ অভিন্ন। আর তারা দুই বোন মহরানার ক্ষেত্রেও সমান মর্যাদার। তাহলে সঙ্গমই তো ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দিল সঙ্গমকৃতা বোনের জন্যে। কিন্তু এই অবস্থা অপরিচিত, অপ্রচলিত ও অগ্রহণযোগ্য। এই সব কারণই প্রমাণ করে যে, স্বামীর সাথে সাথে স্ত্রীর অবস্থাও বিবেচনা করতে হবে।

আমাদের হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ বলেছেন, স্বামী যদি সঙ্গমের আগেই স্ত্রীকে তালাক দেয়, আর তার মহরানা নির্দিষ্টও না হয়ে থাকে, তাহলে তার মাত্‌'আ অর্ধেক, মহরে মিস্‌ল-এর তুলনায়ও অনেক বেশি হয়ে যাবে। যদিও তার অর্ধেক 'মহরে মিস্‌ল'-এর এবং মাত্‌'আর অপেক্ষা কম প্রাপ্য হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা সঙ্গমের পূর্বে দেয়া তালাকে নির্দিষ্ট মহরানার অর্ধেকের বেশি দেয়ার ব্যবস্থা করেন নি। অতএব মহরানা নির্দিষ্ট না হওয়া অবস্থায় স্ত্রীকে মহরে মিস্‌লের অর্ধেকের বেশি দেয়া জায়েয হবে না। আর নির্দিষ্ট মহরানা যদি মহরে মিস্‌ল-এর অধিক হয়, তাহলে তালাকের পর অর্ধেকের বেশি পাওয়ার অধিকারী হবে না। তাহলে 'মহরে মিস্‌ল'ই উত্তম। আমাদের ফিকাহবিদগণ তার জন্যে কোন জ্ঞাত পরিমাণ নির্দিষ্ট করেন নি, যা অতিক্রম করা যাবে না বা যার কমও করা যাবে না। তাঁরা বলেছেন, তা প্রত্যেক সময়ের প্রচলিত পরিচিতি অভ্যস্ত পরিমাণ অনুযায়ী হতে হবে। তাদের পক্ষ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে, মাত্‌'আ হবে তিন প্রস্থ কাপড়— বক্ষ-পৃষ্ঠত্রাণ, মুখাবরণ, ইজার। এই ইজারই হচ্ছে বাইরে বের হওয়াকালীন লোকদের দৃষ্টি থেকে দেহ আবৃত রাখার বস্ত্র— আজকের 'বোরকা'! আগের কালের ফিকাহবিদদের থেকে মাত্‌'আর পরিমাণ হিসেবে জানা গেছে বিভিন্ন বর্ণনা, তাতে এক-একজন নিজ নিজ চিন্তা-বিবেচনায় যা অগ্রসর পেয়েছেন, তাই বলেছেন। ইসমাঈল ইবনে উমায়্যাতা ইকরামা ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মাত্‌'আর উচ্চতর মান হচ্ছে একজন খাদিম দেয়া, তারপরে কম মাত্‌'আ হচ্ছে 'নফকা'— প্রয়োজনীয় যাবতীয় খরচ বহন। তার চাইতে কম হল পোশাক-পরিচ্ছদ। ইয়াস ইবনে মুআবিয়া আবূ মজলষ থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি ইবনে উমর (রা)-কে বললাম, মাত্‌''আ সম্পর্কে আমাকে জানিয়ে দিন। তিনি বললেন, তোমার সামর্থ্যানুযায়ী যা করা সম্ভব তাই। আমি যদি সচ্ছল অবস্থার হই, তাহলে আমি এই এই পোশাক পরিয়ে দেব। আমি তা হিসেব করে দেখলাম, তার মূল্য ত্রিশ দিরহাম। আর আল-হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, 'মাত্‌'আয় এমন কোন জিনিস নেই যা খুব সহজেই পাওয়া যায়।' হাম্মাদ বলতেন, মাত্‌'আ দিতে হবে 'মহরে মিস্‌ল'-এর অর্ধেক। আতা বলেছেন, প্রশস্ততর মাত্‌'আ হচ্ছে একটি বক্ষ পৃষ্ঠত্রাণ, মুখাবরণ ও একটি লেপ। শবী বলেছেন, তার বাড়ির পোশক, বক্ষ, পৃষ্ঠত্রাণ, মুখাবরণ, লেপ, বড় চাদর। ইউনুস আল-হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন, অনেকে 'মাত্‌'আ স্বরূপ খাদেম ও যাবতীয় খরচ দিত। অনেকে পোশাক ও খরচাদি দিত। আর তার কম যারা দিত, তারা দিত তিন প্রস্থ কাপড়— বক্ষ-পৃষ্ঠত্রাণ, মুখাবরণ ও লেপ। এর চাইতেও কম মাত্‌'আ হচ্ছে একখানি

কাপড়। আমর ইবনে শুয়াইব সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, উত্তম মানের মাত'আ হচ্ছে মুখাবরণ বা সেই ধরনের কোন কাপড়। হাজ্জাজ আবূ ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফলকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, স্বামীর সম্পদ পরিমাণ অনুযায়ী স্ত্রীকে মাত্'আ দিতে হবে। এইসব পরিমাণই মনীষীদের ইজতিহাদ থেকে জানা গেছে। এতে পারস্পরিক যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও কোন বিরুদ্ধতা ছিল না। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, তাঁদের মতে এটা এমন বিষয়, যে সম্পর্কে ইজতিহাদের মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এটা ব্যবহার্য দ্রব্যাদির মূল্য নির্ধারণের পর্যায়ের কাজ। শরীয়াতের দলীলে তার পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়নি।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ -

যদি তোমরা স্ত্রীদের স্পর্শ করার আগেই তাদের তালাক দাও এ অবস্থায় যে, তোমরা তাদের জন্যে মহরানা নির্দিষ্ট করেছ, তাহলে নির্দিষ্ট মহরানার অর্ধেক তারা পাবে।

বলা হয়েছে, فرض শব্দের আসল অর্থ, পাত্রে খাঁজ কাটা, তার আলামত যদ্দারা তা পার্থক্যপূর্ণ হয়। আর الفرضة অর্থ, কাষ্ঠের উপর বা জিপসাম কিংবা পাথরের উপর পানি ভাগ করার নিদর্শন, যদ্দারা প্রত্যেকের পানির ভাগ স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত হতে পারে। কিনারাকেও الفرضة বলা হয়, যেখানে নৌকা জাহাজ ভিড়ে। কেননা সেখানে নৌকা জাহাজ উঠানামার চিহ্ন পড়ে যায়। শরীয়াতে فرض নাম হচ্ছে একটা পরিমাণের। বিন্যাসে তা কর্তব্যের উচ্চ পর্যায়ে অবস্থিত। আল্লাহ্র কথা ঃ اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ —নিশ্চয়ই তা, যা কুরআন তোমার প্রতি নির্দিষ্ট করে ধার্য করেছে।

এ আয়াতে فَرَضَ অর্থ নাযিল করেছে এবং তোমার প্রতি তার হুকুম-আহ্কাম বাধ্যতামূলক করেছে। তার তাবলীগ করারও দায়িত্ব দিয়েছে। মীরাসী আইন প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন ঃ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ আল্লাহ্র দিক থেকে কর্তব্যরূপে ঘোষিত। এই আয়াতটির দুটি অর্থ। তার একটি, মীরাস প্রাপকদের জন্যে অংশ নির্ধারণ । আল্লাহ্র কথা ঃ তোমরা যদি স্ত্রীদের তালাক দাও তাদেরকে স্পর্শ করার আগেই, অথচ তাদের জন্যে তোমরা মহরানা নির্দিষ্ট করেছ ....... এ আয়াতে فرض অর্থ মহরানা নির্ধারণ এবং বিয়ের আক্দে তার উল্লেখ ও ঘোষণা করা। উটের অংশগুলোও তাই। তার প্রস্তুতির দিক দিয়ে ও তার চুটের দিক দিয়ে তাতে যে অংশ ধার্য হয় তা। এভাবে পরিমাণ নির্ধারণকে ফরয বলা হয়েছে। পাত্রে যে খণ্ড থাকে পরস্পর থেকে পার্থক্যপূর্ণ হয়ে তার সাথে সাদৃশ্যের কারণে এই নামকরণ হয়েছে। একটি জিনিসের পরিমাণ নির্ধারণের এটাই উপায়। এর দ্বারা একটিকে অন্যটি থেকে পৃথক করা সম্ভব হয়।

আল্লাহ্র কথা ঃ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً অথচ তোমরা তাদের জন্যে অংশ নির্ধারিত করেছ-এর অর্থ বিয়ের আকদে মহরানার পরিমাণ নির্ধারণ করা। তার প্রমাণ এর পূর্বে মহরানার নির্ধারণ করা হয়নি এমন স্ত্রীকে তালাক দেয়ার কথা বলা হয়েছে। তোমরা যদি স্পর্শ

করনি ও মহরানা নির্ধারণ করনি-এমন স্ত্রীকে তালাক দাও, তাহলে তোমাদের কোন গুনাহ্ হবে না। এর পরই তাদের জন্যে মহরানা নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে এবং সঙ্গম করার পর স্ত্রীকে তালাক দেয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রথমোক্ত আয়াতে পরিমাণ নির্ধারণ না করার কথা বলা হয়ে থাকলে দ্বিতীয়োক্ত আয়াতে মহরানার পরিমাণ নির্ধারণের কথা হবে— এটাই স্বাভাবিক। এ তালাকের পর স্ত্রী নির্দিষ্ট মহরানার অর্ধেক পাবে বলে আল্লাহ্ই বলে দিয়েছেন।

বিয়ের আকদ হয়ে যাওয়ার পর যে স্ত্রীর মহরানা নির্দিষ্ট হয়েছে এবং সঙ্গমের আগেই তাকে তালাক দেয়া হয়েছে, তার প্রাপ্য মহরানা কত— এ বিষয়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন কথা রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, সে মহরে মিস্ল পাবে। ইমাম মুহাম্মাদেরও এই মত। ইমাম আবূ ইউসূফ বলতেন, সে নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্ধেক পাবে। পরে তিনি নিজের কথা বাদ দিয়ে প্রথমোক্ত দুজনের মতকেই গ্রহণ করেছেন। মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন, সে নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্ধেক পাবে।

সে মহরে মিস্ল পাবে— এ কথার দলীল হচ্ছে, এই আক্দ মহরে মিস্লই ওয়াজিব করেছে। আর আক্দই যেহেতু মহরে মিস্ল ওয়াজিব করেছে, এই কারণে সঙ্গমের পূর্বে তালাক হলে মাত্‘আ দেয়াও ওয়াজিব হবে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ই যদি মহরানা নির্দিষ্ট করতে রাজী হয়, তাহলে তা আক্দের কারণে মাত্‘আ ওয়াজিব হওয়ার প্রতিবন্ধক হবে না। তার প্রমাণ হল, এই মহরানা আক্দের সময়ই নির্দিষ্ট করা ওয়াজিব ছিল। পরে সঙ্গমের আগেই তালাক ঘটেছে। এই কারণে মহরে মিসল প্রত্যাহৃত হয়েছে তা ওয়াজিব হওয়ার পর। কেননা আক্দে তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। আক্দের পরেও তাই নির্দিষ্ট পরিমাণের সেই হুকুমই হবে।

যদি বলা হয়, আক্দ মহরে মিস্ল ওয়াজিব করে নি, তা ওয়াজিব হয়েছে সঙ্গম করার কারণে।

জবাবে বলা যাবে, একথা ভুল। কেননা বিনিময় ছাড়া স্ত্রী-অঙ্গ মুবাহ্ হওয়াই জায়েয নয়। তার প্রমাণ এই যে, আক্দকালে যদি শর্ত করা হতো যে, তাকে মহরানা দেয়া হবে না, তবুও তার জন্যে মহরানা ওয়াজিব হতো। মহরানার যখন স্ত্রী-অঙ্গ মুবাহ্ হওয়ার বদল, শর্ত করে তা না করার উপায় নেই, তখন স্ত্রী-অঙ্গ মুবাহ্ মনে করে নেওয়ার দারুন মহরানা বাধ্যতামূলক হয়ে গেল। এর আর একটা প্রমাণ হল, বিয়ের আক্দ সহীহ্ হওয়ার পর সঙ্গম নিজ মালিকানাধীন জিনিসে হস্তক্ষেপ ও তা ব্যবহার করা মাত্র। আর কারোর নিজ মালিকানায় হস্তক্ষেপ ও তার জন্যে তা ব্যবহার কোন বদল দিতে বাধ্য করে না। যেমন ক্রেতার পণ্যে হস্তক্ষেপ, এই হস্তক্ষেপই মূল্য দিতে তাকে বাধ্য করে না। বোঝা গেল স্ত্রীর মহরে মিসল পাওয়ার অধিকার হওয়া সম্ভব হয়েছে বিয়ের আক্দের বলে। আর এই বিষয়ে সকলেই একমত যে, স্ত্রী মহরে মিসল নিয়ে নিজেকে বিরত রাখবে, এই অধিকার তার আছে। সে যদি আক্দের কারণে তা পাওয়ার অধিকারী না হতো, তাহলে তার পক্ষে নিজেকে বিরত রাখা কি করে জায়েয হতে পারে, যা এখনও ওয়াজিব হয়নি তার বলে? তাছাড়া তার দাবি করার-ও তার অধিকার আছে। সে যদি মামলা দায়ের করে, তাহলে তার পক্ষে রায় হয়ে যাবে অনিবার্যভাবে। বিচারক নতুন করে মহরানা ওয়াজিব করবে না, যা পাওয়ার অধিকারী বানিয়ে দেবে না। এই সবই দলীল। তা প্রমাণ করে যে, যার মহরানা আক্দকালে নির্ধারিত হয়নি, সে আক্দের

কারণেই মহরে মিস্‌ল পাওয়ার অধিকারী হয়ে যাবে। স্বামীর উপর তার তা প্রাপ্য হবে, যেমন প্রাপ্য হয় নির্দিষ্ট মহরানা, বিয়ের আক্‌দে তা নির্দিষ্ট না হলেও।

যদি বলা হয়, মহরে মিসল যদি বিয়ের আকদের কারণেই ওয়াজিব হতো তাহলে সঙ্গমের পূর্বে তালাক দিলে তা সম্পূর্ণ প্রত্যাহৃত হয়ে যেত না, যেমন নির্দিষ্ট করা মহরানা সম্পূর্ণ প্রত্যাহৃত হয়ে যায় না।

জবাবে বলা যাবে, না, সম্পূর্ণ প্রত্যাহৃত হবে না। কেননা যে মাত্‌'আ দেয়া ওয়াজিব, তা তো সেই মহরানার-ই অংশ যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। এই মাত্‌'আ তো নির্দিষ্ট মহরানার অর্ধেক, তার জন্যে যাকে সঙ্গমের পূর্বে তালাক দেয়া হয়েছে।

ইসমাঈল ইবনে ইস্‌হাক মনে করেছেন, আক্‌দ হলেই 'মহরে মিস্‌ল' ওয়াজিব হয় না, যদিও আক্‌দ হলেই স্বামী-স্ত্রী সঙ্গমকে মুবাহ্ বানিয়ে নেয়। তিনি বলেছেন, স্বামী স্ত্রীর মুকাবিলা পণ্যের মুকাবিলা মূল্য সমতুল্য। তাই যেমন বলা হয়েছে, তেমন যদি হয়, তাহলে তো সঙ্গমের কারণে মহরানা দেয়া স্বামীর জন্যে বাধ্যতামূলক না হওয়াই কর্তব্য হয়ে পড়ে। কেননা সঙ্গম তো স্ত্রীর একটা হক্ স্বামীর উপর। যেমন স্বামীর হক স্ত্রীর উপর এই যে, সে স্বামীর নিকট নিজেকে সোপর্দ করে দেবে। কেননা একজন অপর জনের যা মুবাহ্ করে নিয়েছে, সেজন্যে তার সেই জিনিসকেই মুবাহ্ করে নিয়েছে। তা হলে স্বামী মহরানা ওয়াজিবকরণে কোত্থেকে বিশেষীকৃত হয়ে পড়ল, যখন সে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করল ? স্ত্রী নিজেকে মহরানার শৃঙ্খলে বন্দী করে রাখবে না, তা রাখা তার জন্যে বাঞ্ছনীয় নয়, যখন সে বিয়ের আক্‌দের দরুন তা পাওয়ার অধিকারী হল না। মহরানা নির্ধারণও সহীহ্ হবে না। কেননা স্বামীর দিক থেকে তার আকদ তো সহীহ হয়েছে, যেমন স্ত্রীর দিক থেকেও সহীহ হয়েছে। তাই স্বামীর উপর মহরানা বাধ্যতামূলক হবে না, যেমন স্ত্রীর উপরও স্বামীর জন্যে কিছুই বাধ্যতামূলক হবে না। এরূপ অবস্থায় স্ত্রী-অঙ্গ সঙ্গম ও সন্দেহের সঙ্গম দ্বারা তার উপর দাঁড়াবে না এবং তার কোন বদল গ্রহণ করাও সহীহ্ হবে না। কেননা তার অংশ থেকে তার হক প্রত্যাহৃত হয়েছে। এই সবই মুসলিম উম্মাহর বিবেকসম্মত। তা এই যে, স্বামীর উপর মহরানা ওয়াজিব হবে স্ত্রী-অঙ্গকে মুবাহ বানিয়ে নেয়ার কারণে। আর তা-ই প্রমাণ করে যে, উপরে যার কথা উদ্ধৃত হয়েছে তার কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

সহল ইবনে সায়েদী বর্ণিত হাদীসে রাসূলে করীম (স)-এর কথা এসেছে ঃ যে মহিলা নিজেকে রাসূলের জন্যে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন, সেই মহিলাকে অপর এক পুরুষের নিকট বিয়ে দেয়ার পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) বলেছিলেন ঃ قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ 'তোমার যতটুকু কুরআনী ইলম আছে, তার বিনিময়ে আমি এই মহিলাকে তোমার মালিকানায় দিয়ে দিলাম।' এই কথা প্রমাণ করে যে, স্বামী স্ত্রীর যৌন অঙ্গের মালিক পর্যায়ের। আক্‌দের পর যে মহরানার নির্দিষ্ট করা হয় তা সঙ্গমের আগে তালাক দিলে সে মহরানা প্রত্যাহৃত হয়ে যায়, তার দলীল হচ্ছে, ফরয— মহরানা ধার্যকরণ মহলে মিস্‌ল-এর স্থলাভিষিক্ত কেননা মহরে মিস্‌ল থাকলে ভিন্নভাবে মহরানা ধার্য করা জায়েয নয়। আর এ-ই যখন ব্যাপার, তখন সঙ্গমের পূর্বে তা প্রত্যাহৃত হওয়া অনিবার্য। যেমন মহরে মিস্‌ল প্রত্যাহৃত হয়।

অপর দিক দিয়েও বিবেচ্য এই যে, মহরানা হক হয়ে দাঁড়ায় বিয়ের আক্দ হলেই। কিন্তু তা তার মধ্যে নেই। তাই যে দিক দিয়ে বিয়ের আক্দ বাতিল হয়ে যাবে, সেই দিক থেকে হক-ও বাতিল হয়ে যাবে।

যদি বলা হয়, আক্দে নির্দিষ্ট মহরানা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় আক্দের দ্বারা। কাজেই আকদ বাতিল হলে তা বাতিল হতে পারে না।

জবাবে বলা যাবে, আবুল হাসান (র) বলতেন, নির্দিষ্ট পরিমাণ মহরানা বাতিল হয়ে যাবে। ওয়াজিব হবে অর্ধেক মহরানা। মাত্'আ ওয়াজিব হওয়ার মতই। ইবরাহীম নখয়ীও তাই বলেছেন, এটাই তার মাত্'আ।

কোন কোন লোক এই আয়াতটিকে দলীল বানিয়ে বলেছেন, মহরানা দশ দিরহামের কম-ও হতে পারে। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "তোমরা যদি স্ত্রীদের জন্যে মহরানা নির্ধারণ করার পর ও স্পর্শ করার আগেই তাদেরকে তালাক দাও, তাহলে নির্দিষ্ট করা মহরানার অর্ধেক মহরানা সে পাবে।"

এখন যদি দুই টাকা মহরানা ধার্য হয় বিয়ের আক্দে, তাহলে আয়াতের ফয়সালা অনুযায়ী তালাকের পর দুই টাকার বেশী পাওয়ার অধিকারী হবে না। কিন্তু এই কথা আমাদের মতে তাদের মতকে প্রমাণ করে না। তা এ জন্যে যে, আমাদের মতে দুই টাকা মহরানা ধার্য করা দশ টাকা নির্ধারণ সমতুল্য। কেননা দশ আক্দে অংশ বিভক্ত হয় না। আর কোন জিনিসের অংশ নির্ধারণ সম্পূর্ণটা নির্ধারণের শামিল। যেমন তালাক অংশে বিভক্ত হয় না। যদি অর্ধেক তালাক দেয়া হয়, তা সম্পূর্ণ তালাক দেয়া হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। আর দশের কম মহরানা ধার্য করা হলে আমাদের মতে দশ ধার্য করা হয়েছে বলে মনে করতে হবে। অতএব তালাকের পর তার অর্ধেক ওয়াজিব হবে। পরন্তু আয়াত মূলত নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্ধেক ওয়াজিব হওয়ার দাবিদার। আমরাও সেই অর্ধেকই ওয়াজিব মনে করি মোট পরিমাণের। পরে তার বাড়তি ওয়াজিব মনে করি পাঁচ টাকা পর্যন্ত ভিন্নতর এক দলীলের ভিত্তিতে।

## একান্তে মিলিত হওয়ার পর দেয়া তালাক

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমরা যদি স্ত্রীদের তালাক দাও তাদের স্পর্শ করার পূর্বে, অথচ তাদের জন্যে মহরানা তোমরা নির্দিষ্ট করেছ, তাহলে নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্ধেক....।

মনীষিগণ এ কথার তাৎপর্য নির্ধারণে মতদ্বৈততায় লিপ্ত হয়েছেন। প্রথমে স্পর্শ করা— المسيس। আয়াতের এ শব্দটির তাৎপর্য কি ? হযরত আলী, উমর, ইবনে উমর ও জায়দ ইবনে সাবিত (রা) বলেছেন, যখন দরজা বন্ধ করে দেবে ও পর্দা ঝুলিয়ে দেবে ..... তারপর তালাক দিলে স্ত্রী পূর্ণ মহরানা পাবে। সুফিয়ান সওরী, লায়স, তায়ূস, ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, তার প্রাপ্য পূর্ণ মহরানা। আলী ইবনুল হুসায়ন ও অন্যান্য তাবেয়ীদের মধ্য থেকে ইবরাহীম নখয়ীর-ও এই কথা। ফরাশ শবী, ইবনে মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, তার প্রাপ্য অর্ধেক মহরানা, যদি স্বামী স্ত্রীর দুই পা'র মাঝখানেও বসে। শ'বী ইবনে মাসউদ (রা) থেকে 'মুরসাল' বর্ণনা করেছেন। শুরাইহ থেকে ইবনে মাসউদের মতো কথাই বর্ণিত হয়েছে। সুফিয়ান সওরী, উমর, আতা, ইবনে আব্বাস (রা)

সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'স্বামী স্ত্রীকে স্পর্শ করার আগে মহরানা ধার্য করলে স্ত্রী মাত্'আ ছাড়া আর কিছুই পাবে না। কেউ কেউ ধারণা করেছেন, এই পর্যায়ে তাঁর কথা আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদের কথার মতই; উভয় কথার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু আসলে তা নয়। কেননা তাঁর কথার অর্থ হচ্ছে, সে স্ত্রীর মহরানা ধার্য করেনি। আল্লাহ্র কথা ঃ 'স্পর্শ করার আগে'-এর দ্বারা 'একান্তে মিলিত হওয়ার আগে' বোঝাতে চেয়েছেন। কেননা তাঁর থেকে তায়ূস বর্ণিত হাদীসে 'স্পর্শ করার আগে' এর অর্থ করা হয়েছে 'একান্তে নিরিবিলিতে মিলিত হওয়ার আগে।' এই একান্তে মিলিত হওয়ার আগে তালাক দিলে স্ত্রী শুধু মাত্'আ পাবে।

বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ এই বিষয়েও বিভিন্ন মত দিয়েছেন। আবূ হানীফা (র) আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ ও জুফর বলেছেন ঃ

الخلوة الصحيحة تمنع سقوط شيء مَنْ المهر بعد الطلاق وَطِيء ولم يَطأ –

সহীহ ও নিবিঘ্ন একান্ত নিরিবিলিতে স্বামী-স্ত্রীর একত্রিত হওয়ার পর তালাক দিলে মহরানার কোন অংশ প্রত্যাহৃত হওয়াকে নিষেধ করে, তারা সঙ্গম করুক আর না-ই করুক। আর দুজনের একজনও ইহ্রামকারী কিংবা রোগী, হায়যধারী, রমযানের রোযাদার অথবা রোগমুক্তি মুখী অবস্থায় হবে না। যদি এই সব ঠিক থাকে, তারপরে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে তার অর্ধেক মহরানা প্রাপ্য হবে। এই সব অবস্থার পরও সঙ্গম না করলেও তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে। সুফিয়ান সওরী বলেছেন, এই স্ত্রী পূর্ণ মহরানা পাবে। কেননা স্বামী তার সাথে একান্ত নিরিবিলিতে মিলিত হয়েছে। যৌন সঙ্গম করা না হলেও ক্ষতি নেই। উক্ত সব অবস্থা যদি স্বামীর দিকে থাকে, আর স্ত্রী হয় রোগমুক্তি মুখী, তাহলে সে অর্ধেক মহরানা পাবে। ইমাম মালিক বলেছেন, স্ত্রীর সাথে একান্তে মিলিত হলে, তাকে চুম্বন করলে ও তাকে ন্যাংটা করলে এবং তা যদি যৌন সঙ্গমের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়ে থাকে, তাহলেও আমি তার জন্যে অর্ধেক মহরানাই হতে পারে বলে মনে করি। আর যদি একান্তে মিলিত হওয়ার সময় দীর্ঘ হয়, তাহলে সে নির্দিষ্ট পরিমাণের মহরানা পাবে। তবে সে নিজেই যদি কিছু কম করে তাহলে ভিন্ন কথা।

আওজায়ী বলেছেন, কেউ একটি মেয়েলোক বিয়ে করল, পরে স্ত্রীর পরিবারবর্গের নিকট থাকা অবস্থায়ই তার সাথে একান্তে মিলিত হল, চুম্বন দিল, তাকে ধরল, তার পরে তাকে তালাক দিল এ অবস্থায় যে, তার সাথে সঙ্গম করেনি অথবা পর্দা ঝুলিয়ে দিল বা দরজা বন্ধ করল, তার পূর্ণ মহরানা প্রাপ্য হল। হাসান ইবনে সালিহ্ বলেছেন, স্ত্রীর সাথে একান্তে মিলিত হলেই অর্ধ মহরানা তার প্রাপ্য হবে, স্বামী যদি তার সাথে সঙ্গম নাও করে অথবা একান্তে মিলিত হওয়ার পর স্ত্রী যদি সঙ্গম হয়েছে বলে দাবিও করে, তবু। তখন স্ত্রীর কথাই গ্রহণীয়। কেননা একান্তে মিলিত হওয়ার কাজ হয়েছে।

লায়স বলেছেন, তাকে নিয়ে যদি আলাদা হয় ও পর্দা টানিয়ে দেয়, তাহলে মহরানা প্রাপ্য হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, একান্তে মিলিত হওয়ার পরও যদি সঙ্গম না করে, পরে তাকে তালাক দেয়, তাহলে অর্ধেক মহরানা পাবে। ইদ্দত পালন করতে হবে না।

আবূ বকর বলেছেন, এ পর্যায়ে কুরআনের আয়াতই হচ্ছে বড় প্রমাণ। আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً -

এবং তোমরা স্ত্রীদের মহ্‌রানা একনিষ্ঠভাবে দিয়ে দাও। (সূরা আন-নিসা ঃ ৪)

সম্পূর্ণ মহ্‌রানা দিয়ে দেয়ারই স্পষ্ট আদেশ। অতএব মহ্‌রানা থেকে কোন অংশের বাদ পড়ে যাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। অবশ্য কোন দলীলের ভিত্তিতে হলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ্‌র এই কথাও তা-ই প্রমাণ করে ঃ

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا ط اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا - وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ -

তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থানে অপর এক স্ত্রীকে নিয়ে আসতে চাও এবং তাদের একজনকে বিপুল পরিমাণ মহ্‌রানা দিয়ে দিয়েছ, তাহলেও তা থেকে একবিন্দু জিনিস ফিরিয়ে নেবে না। তোমরা কি তা নেবে দোষারোপ করে ও সুস্পষ্ট গুনাহ্‌ হিসেবে। আর তা কেমন করেই বা তোমরা ফিরিয়ে নিতে পার। তোমরা তো পরস্পর মিলিত হয়েছ।

(সূরা আন-নিসা ঃ ২০)

এ আয়াতের দুটি দিক লক্ষণীয়। দলীল হিসেবে তার একটি দিকের উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বেই করেছি। তা হল, 'তোমরা তা থেকে কিছুই নিয়ে নেবে না।' আর দ্বিতীয় দিক হল, তোমরা তা থেকে কেমন করে ফিরিয়ে নিতে পার, যখন তোমরা পরস্পরে মিলিত হয়েছ ?

ফরা বলেছেন ঃ আয়াতের افضى অর্থ একান্ত নিরিবিলিতে মিলিত হওয়া কোনরূপ বিঘ্নতা ছাড়াই— الخلوة الصحيحة —তাতে সঙ্গম করুক আর না-ই করুক। অভিধানের দিক দিয়ে এটা স্পষ্ট অকাট্য দলীল। এ-ও জানানো হয়েছে যে, الافضاء বলা হয় الخلوة —একান্ত নিরিবিলিতে মিলিত হওয়াকে। তা হওয়ার পর মহ্‌রানা থেকে কিছু কমাতে বা ফিরিয়ে নিতে আল্লাহ্‌ তা'আলা স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। এ-ও বোঝা গেল যে, আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে الخلوة الصحيحة 'একান্ত নিরিবিলিতে ও নির্বিঘ্নে মিলত হওয়া' বোঝানো, যাতে স্বাদ আস্বাদনের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। কেননা الافضاء শব্দটি فضاء থেকে গৃহীত, যা জমিনে হয়। তা এমন উন্মুক্ত পরিবেশ, যেখানে কোন ঘর-বাড়ি নেই, কোন প্রতিবন্ধকতা নেই, যা পরস্পরকে পূর্ণ রূপে পেতে বাধা হতে পারে। এতেই প্রমাণিত হল যে, দুজনের মিলিনের পথে কোনরূপ বাধা না থাকা অবস্থায় একত্রিত হওয়ার পর মহ্‌রানার প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। কেননা সেখানে স্ত্রীর স্বামীর নিকট নিজেকে পূর্ণ মাত্রায় সঁপে দিতে ও স্বামী তার স্বাদ গ্রহণ করতে কোন অসুবিধাই ছিল না। আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ افضى থেকে তা স্পষ্ট হয়।

আল্লাহ্‌র এই কথাও তা-ই প্রমাণ করে ঃ

فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

অতএব তোমরা তাদেরকে বিয়ে কর তাদের পরিবারবর্গের অনুমতিক্রমে এবং তাদেরকে তাদের প্রাপ্য মহ্‌রানা যথাযথভাবে দিয়ে দাও। (সূরা আন-নিসা ঃ ২৫)

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً –

পরে তোমরা তাদের থেকে যে স্বাদ আস্বাদন করেছ, অতএব তোমরা ফরয হিসেবেই তাদের মহরানা দিয়ে দাও। (সূরা আন-নিসা ঃ ২৪)

এ আয়াত স্পষ্ট দাবি করছে সর্বাবস্থায়ই স্ত্রীর সমস্ত মহরানা আদায় করে দেয়ার। কোন দলীল পাওয়া গেলে অন্যথা হতে পারে বটে।

আবূ বকর বলেছেন, হাদীস থেকেও তা-ই প্রমাণিত হয়। আবদুল বাকী ইবনে কানে, মুহাম্মাদ ইবনে শাযাল, মুয়াল্লা ইবনে মনসূর, ইবনে লাহইয়া, আবুল আসওয়াদ, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে সওবান সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَةٍ وَنَظَرَ اِلَيْهَا وَجَبَ الصَّدَاقُ دَخَلَ بِهَا اَوْلَمْ يَدْخُلْ –

যে লোক স্ত্রীর মুখাবরণ উত্তোলন করবে ও তার দিকে তাকাবে, তার মহরানা তার প্রাপ্য হয়ে যাবে। তার সাথে সঙ্গম করা হোক, আর না-ই হোক।

আমাদের মতে প্রাথমিক দিকের সমস্ত ফিকাহবিদই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। কেননা ফরাস-এর শ'বী— আবদুল্লাহ ইবনে মাসূউদ (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি অনেকের নিকট সপ্রমাণিত নয়। আবদুল বাকী ইবনে কানে বশর ইবনে মূসা— হাওযাতা ইবনে খলীফা, আউফ, জরারাতা ইবনে আওফা সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ

قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ الْمَهْدِيُوْنَ اَنَّهُ مَنْ اَغْلَقَ بَابًا وَاَرْخَى سَتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ واوَجَبَتِ الْعِدَّةُ –

খুলাফায়ে রাশেদুন আল-মাহদিউন (হেদায়েত প্রাপ্ত) চূড়ান্তভাবে ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, যে লোক (স্ত্রীকে নিয়ে) দরজা বন্ধ করবে ও পর্দা টানিয়ে দেবে, তার স্ত্রীর মহরানা ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং ইদ্দত পালনও আবশ্যকীয় হবে।

এ হাদীসে খুলাফায়ে রাশেদুনের আলোচ্য বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। আর নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ –

তোমাদের উপর বাধ্যতামূলক হচ্ছে আমার পরে আমার সুন্নাত পালন করা এবং খুলাফায়ে রাশেদুনের সুন্নাত পালন করা। তোমরা তা শক্ত করে ধারণ করবে।

বিচার-বিবেচনার দিক দিয়েও উক্ত কথা অবশ্যই স্বীকৃতব্য। কেননা স্ত্রীর দিক থেকে স্বামীর উপর যে চুক্তি রয়েছে, তাতে দুটির একটি অবশ্যই হবে। হয় সঙ্গম হবে, না হয় স্ত্রীর আত্মসমর্পণ হবে স্বামীর নিকট। নপুংসকের যৌন সম্ভোগের ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও তার বিয়ে জায়েয হওয়া যখন সর্বসম্মত, তখন বোঝা গেল যে, আক্‌দ সহীহ্ হওয়ার সাথে যৌন সম্ভোগ হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। কেননা তা-ই যদি হয়, তাহলে যৌন সম্ভোগ না হওয়া অবস্থায়

বিয়েই সহীহ্ হতে পারে না। বিবেচ্য বিষয় হল, বিয়ে সহীহ্ হওয়া যখন সম্পর্কিত হচ্ছে আত্মসমর্পণের সহীহ্ হওয়ার সাথে তখন যেসব মুহাররম মেয়েলোকের আত্মসমর্পণ সহীহ্ নয়, তাদের সাথে বিয়ের আকদও সহীহ্ হতে পারে না। আর বিয়ের আক্দ সহীহ্ হওয়া যখন আত্মসমর্পণ সহীহ্ হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট, তখন আত্মসমর্পণ সহীহ্ হওয়ার পরে পূর্ণ মহরানা প্রাপ্য হওয়া অবশ্যই সহীহ্ হবে। এই আত্মসমর্পণ সহীহ্ হয় স্বামীর সাথে বিয়ে সহীহ্ হওয়া সংক্রান্ত সব কিছু অর্জিত হলে। উপরন্তু স্বামীর স্ত্রীর নিকট প্রাপ্য হচ্ছে আত্মসমর্পণ এবং সঙ্গম সঙ্ঘটন তো স্বামীর কাজ। তার সে কাজের অক্ষমতা ও নিজ ইচ্ছায় বিরত থাকা প্রতিবন্ধক হতে পারে না স্ত্রীর মহরানা প্রাপ্তি সহীহ্ হওয়ার পথে; এই জন্যেই হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ

المخو بها : ولها المهر كاملا ما ذنبهن ان جاء العجز من قبلكم -

যে স্ত্রীকে নিয়ে একান্ত নিরিবিলিতে মিলিত হওয়া হবে, তারই পূর্ণ মহরানা প্রাপ্য হবে। তোমাদের দিক থেকে অক্ষমতা হলে স্ত্রীদের কোন দোষ হতে পারে না।

উপরন্তু স্বামী কোন ঘর ভাড়ায় নিল এবং দুজন সেখানে একান্তভাবে একত্রিত হল। তাহলে মহরানা পাওনা হয়ে গেল। কেননা স্ত্রী তো নিজেকে স্বামীর হাতে সম্পূর্ণ তুলে দিয়েছে। বিয়েতে একান্ত হওয়াও এই রকমই। ফিকাহবিদগণ বলেছেন, মেয়েলোক যদি মুহাররমা হয় বা হায়য সম্পন্না হয় কিংবা হয় রোগাক্রান্ত, তাহলে স্ত্রী পূর্ণ মাত্রার মহরানার পাওনাদার হবে না। তার কারণ এই যে, সেখানে অপর একটি সহীহ্ আত্মসমর্পণ রয়েছে, যার দরুন পূর্ণ মাত্রার মহরানা পাওয়ার দাবিদার হতে পারে। কেননা এই শেষেরটি পূর্ণ মাত্রার আত্মসমর্পণ ছিল না। আর বিয়ের দরুন যে আত্মসমর্পণ স্বামীর প্রাপ্য তা যখন পাওয়া যায়নি, তখন পূর্ণ মাত্রার মহরানা পাওয়ার অধিকারীও হতে পারে না।

যে লোক উক্ত মত অগ্রাহ্য করেছেন, তিনি এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন ঃ তোমরা যদি স্ত্রীদের তালাক দাও তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে, যদিও তোমরা তাদের মহরানা নির্দিষ্ট করেছ, তাহলে নির্দিষ্ট মহরানার অর্ধেক পাবে।

আল্লাহ্ অপর আয়াতে বলেছেন ঃ

وَإِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا -

তোমরা যখন ঈমানদার মহিলাদের বিয়ে করবে, পরে তাদেরকে স্পর্শ করার আগেই তাদেরকে তোমরা তালাক দেবে, তাহলে তাদের পালন করার মত কোন ইদ্দত তাদের উপর আরোপিত হবে না।

এ আয়াতে পূর্ণ মাত্রার মহরানা পাওয়ার অধিকার ও ইদ্দত পালন ওয়াজিব হওয়া স্পর্শ—অর্থাৎ যৌন সঙ্গম হওয়ার উপর নির্ভরশীল বানানো হয়েছে হাত দ্বারা স্পর্শ না হওয়ার কথা জানা থাকা সত্ত্বেও।

এর জবাব হল, আল্লাহ্র কথা ঃ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ 'তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে' এই কথাটির তাৎপর্য নির্ধারণে সাহাবীগণের বিভিন্ন কথা রয়েছে। হযরত আলী, উমর ইবনে

আব্বাস, জায়দ ও জায়দ ইবনে উমর (রা) একান্তে মিলিত হওয়া الخلوة -র তাৎপর্য অভিধান ও ভাষার দৃষ্টিতে বলেছেন; কিংবা এই দৃষ্টিতে বলেছেন যে, তা একটি শরীয়াতী পরিভাষা বিশেষ। কেননা শব্দের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য শরীয়াত ও অভিধান পরিপন্থীতে বলা জায়েয নয়। সেটি যদি অভিধানের দিক দিয়ে তাঁদের মতে কোন নাম হয়, তাহলে তাই তাকে অকাট্য প্রমাণ করবে। কেননা ভাষা অভিধান সম্পর্কে তারাই বেশি জ্ঞানী পরে আসা লোকদের অপেক্ষা। যদি তা শরীয়াতের দিক থেকে হয় তাহলেও তা তওকীফ রূপেই গ্রহণ করতে হবে। আর তা যখন তার একটা নাম, তখন আয়াতের তাৎপর্য হবে, তোমরা যদি একান্ত নির্বিঘ্ন নিরিবিলির আগেই স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও, তাহলে তোমাদের নির্ধারিত মহরানার অর্ধেক দিতে হবে। উপরন্তু স্পর্শ বলতে যে হাত দ্বারা শুধু ছোঁয়া বোঝায় না, বরং অনেকে তার অর্থ করেছেন যৌন সঙ্গম আবার অনেকে একান্ত নিরিবিলি নির্বিঘ্ন একত্রিত হওয়া বুঝিয়েছেন। যদি যৌন সঙ্গম অর্থ করা হয়, তা হলে স্পর্শের কথাটি ইঙ্গিতমূলক (كناية) বুঝতে হবে। তার হুকুম তাই হবে। আর যখন তার অর্থ হবে একান্ত নিরিবিলিতে একত্রিত হওয়া, তখন শব্দের বাহ্যিক অর্থ প্রত্যাহৃত হবে। কেননা স্পর্শ বলে যে নিছক স্পর্শই বোঝানো হয়নি— তাতে সকলেই একমত। অন্য দিক থেকে এই বিষয়ে দলীল চাওয়া জরুরী হয়ে পড়েছে। আমরা যে দলীলের কথা উল্লেখ করেছি, তাতে বলেছি, আয়াতটির অর্থই হচ্ছে الخلوة। একান্ত নিরিবিলিতে মিলিত হওয়া ও যৌন সম্ভোগ নয়। তার অবস্থাসমূহের মধ্যে কম-সে-কম অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমরা কুরআন ও সুন্নাতের যে বাহ্যিক দলীলাদির উল্লেখ করেছি, তা কেবল তারই সাথে জড়িত হবে না। তাছাড়া ব্যবহৃত শব্দের নিগূঢ় তত্ত্ব যদি গণ্য করি, তাহলে তার অর্থ হবে, স্বামী যদি স্ত্রীকে নিয়ে একান্তে মিলিত হয়, তাকে নিজ হাতে স্পর্শ করে, ধরে, তা হলেই পূর্ণ মহরানা স্ত্রীর প্রাপ্য হবে। কেননা কুরআনে বলা স্পর্শ যথার্থই পাওয়া গেছে— ঘটেছে। আর যদি স্ত্রীকে নিয়ে একান্ত ঘনিষ্ঠতায় মিলিত না হয়, নিজের হাতে তাকে না ছোঁয়, না ধরে, তা হলে মোট বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলতে হবে। উপরন্তু অর্থ যদি হয় যৌন সঙ্গম তাহলে তার যা স্থলাভিষিক্ত হতে পারে, যা তারই মত হতে পারে, তা হওয়া নিষিদ্ধ হবে না। সহীহভাবে আত্মসমর্পণ হওয়াও এই পর্যায়ে গণ্য। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَّتَرَا جَعَا -

স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে তারা উভয়ই পুনর্বিবাহিত হলে তাদের দুজনার কোন দোষ হবে না।

বিচ্ছিন্নতা পর্যায়ে আর যে যে কাজ হতে পারে, তাও এখানে গণ্য। তার হুকুম হল প্রথম স্বামীর জন্যে তার মুবাহ হওয়া।

ইমাম শাফেয়ী যৌন অঙ্গহীন পুরুষ সম্পর্কে বলেছেন যে, যদি তার স্ত্রীর সাথে একত্রিত হয় তাহলে যৌন সঙ্গম না করেই তালাক দিলে স্ত্রীর পূর্ণ মহরানা প্রাপ্য হবে। এ থেকে আমরা জানলাম যে, প্রকৃত হুকুমটা সঙ্গম হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তা সম্পর্কিত হচ্ছে স্ত্রীর সঠিক আত্মসমর্পণের সাথে।

যদি বলা হয়, স্ত্রীর আত্মসমর্পণ যদি সঙ্গমের বিকল্প হয়, তাহলে তার প্রথম স্বামীর জন্যে হালাল হয়ে যাওয়া অনিবার্য হয় সে আত্মসমর্পণটা হলেই। যেমন যৌন সঙ্গম দ্বারা তার প্রথম স্বামীর জন্যে তার হালাল হওয়া সম্ভব হয়।

জবাবে বলা যাবে, এ কথা ঠিক নয়। কেননা স্ত্রীর আত্মসমর্পণ, তা তো পূর্ণ মহরানা পাওয়ার অধিকারী হওয়ার একটি ইল্লাত বা কারণ মাত্র। তা তার প্রথম স্বামীর জন্যে হালাল হওয়ার ইল্লাত নয়। লক্ষণীয় যে, সঙ্গমের আগেই যদি স্বামী মরে যায়, তাহলে স্ত্রী পূর্ণ মহরানা পাওয়ার অধিকারী হবে। স্বামীর এই মৃত্যুটা সঙ্গমের স্থলাভিষিক্ত গণ্য হবে। কিন্তু তাতে প্রথম স্বামীর জন্যে তার হালাল হওয়ার ব্যাপার ঘটে না।

আল্লাহ্র কথা ঃ

إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ –

তবে যদি স্ত্রীরা কমিয়ে বা মাফ করে দেয় অথবা যার হাতে বিয়ের বন্ধন নিবদ্ধ, সে যদি কমিয়ে বা মাফ করে দেয়, তাহলে ভিন্ন কথা।

আল্লাহ্র কথা ঃ 'তবে যদি তারা মাফ করে দেয়' এর অর্থ, স্ত্রীগণ যদি মাফ করে দেয়। কেননা এর মূলে যদি স্বামীদের বোঝানো লক্ষ্য হতো, তাহলে বলা হতো, 'তবে যদি স্বামীরা মাফ করে দেয়।' এতে মতের কোন বিভিন্নতা নেই। ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও আগের মনীষীদের থেকে এই বর্ণনাও এসেছে। স্বামীর মাফ করা অর্থ, অবশিষ্ট প্রাপ্য মহরানা ছেড়ে দেয়া। আর তা হচ্ছে সেই অর্ধেক মহরানা, যা তালাকের পর তাদের প্রাপ্য হয়। আল্লাহ্র কথা ঃ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ অনুযায়ী।

যদি বলা হয়, মহরানা তো কখনও নগদ সম্পদ হয়, জমি-জায়গা হয়, তাতে ক্ষমা করা বা কম করার কোন সুযোগ থাকে না।

জবাবে বলা যাবে, এখানে 'ক্ষমা করার অর্থ এ নয় যে, বলে দিল, 'আমি ক্ষমা করে দিলাম।' এখানে ক্ষমা করার অর্থ সহজ করে দেয়া বা ছেড়ে দেয়া। তার অর্থ হবে, স্ত্রী স্বামীকে মালিক হওয়ার চুক্তিতে জায়েয পন্থায় ছেড়ে দেয়া। ফলে আয়াতটির তাৎপর্য হবে স্ত্রী সামীকেই মালিক বানিয়ে দেবে এবং কোন বিনিময় ছাড়াই স্বামীর নিকট পাওনা ছেড়ে দেবে।

এখানে কেউ যদি বলে যে, জমি-জায়গা হেবা করা জায়েয হওয়ার দলীল এ আয়াতেই পাওয়া যাচ্ছে। কেননা আল্লাহ্ স্ত্রীর জন্যে মুবাহ করে দিয়েছেন, স্বামীকে অর্ধেক মহরানার মালিক বানিয়ে দেবে তালাকের পর। এতে কোনটি নগদ সম্পদ, কোনটি ঋণ বা কোনটির বিভক্তি হয়, কোনটির হয় না, তার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয়নি। অতএব আয়াতের ফায়সালা ক্রমেই জমি-জায়গা হেবা করা জায়েয প্রমাণিত হল।

জবাবে তাকে বলা হবে, যেমন তুমি ধারণা করেছ, ব্যাপারটি তেমন নয়। ক্ষমা করার অর্থ এ নয় যে, বলবে আমি মাফ করে দিলাম। কেননা একজন ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তিকে বলে যে, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। আমার এই ঘর থেকে অথবা আমি আমার এই ঘর থেকে তোমাকে নিঃসম্পর্ক বা দায়িত্বমুক্ত করে দিলাম, তাতে তাকে মালিক বানিয়ে দেয়া হয় না। তাতে হেবা'র আক্দও সহীহ হয় না। ব্যাপার যখন এই, আর আয়াতে যে ক্ষমার কথা বলা হয়েছে তদ্দারা মালিক বানিয়ে দেয়ার চুক্তি বৈধ হয় না, তখন জানা গেল যে, স্ত্রী স্বামীকে সেভাবে মালিক বানিয়ে দেবে, যেভাবে হেবা ও মালিক বানিয়ে দেয়ার চুক্তি বৈধ হতে পারে। কেননা মালিক বানিয়ে দিতে হলে যে শব্দ দ্বারা তা সহীহ হয় সেই শব্দ ব্যবহার করতে হবে। অথচ তা আয়াতে ব্যবহৃত হয়নি। তাই এ বিষয়ের হুকুম দলীলের উপর নির্ভরশীল হবে। মৌল

নীতিতে যা জায়েয, তা-ই এ বিষয়ে জায়েয হবে। আর মৌলনীতিতে যা জায়েয হবে না হেবা'র চুক্তি করা, তা এতে জায়েয হবে না। এসব সত্ত্বেও সওয়ালকারী যদি শাফেয়ী মাযহাব অনুসারী হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্যে আবশ্যকীয় হচ্ছে অ-হস্তগত অবস্থায়ও হেবা জায়েয করে নেবে। কেননা হস্তগত করা ও অ-হস্তগত— এই দুই ধরনের মহরানার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা কোন পার্থক্য করেন নি। অতএব স্ত্রী যখন ক্ষমা করে দেবে, অথচ সে তা নিজ হাতে নিয়ে নিয়েছে, তাহলে তা স্বামীর নিকট সোপর্দ না করেও হেবা করা জায়েয করতে পারে। কিন্তু তা যখন জায়েয নয়, অথচ তা হেবার শর্তে আরোপিত, জমি-জায়গার ব্যাপারেও তাই।

আর যদি ইমাম মালিকের অনুসারী হয়, তাহলে তিনি এই দলীলটা পেশ করেছেন জমি-জায়গায় হেবা জায়েয হওয়া প্রমাণের জন্যে, তা হস্তগত করার পূর্বেও হতে পারে। তাহলে কথা সেই ভাবেই হবে যেভাবে আমরা বলেছি। আল্লাহ্র কথাঃ 'অথবা ক্ষমা করবে সে যার হাতে বিয়ের বন্ধন নিবদ্ধ।'

আগের ফিকাহবিদগণ এ কথার তাৎপর্য পর্যায়ে বিভিন্ন কথা বলেছেন। হযরত আলী, যুবায়র ইবনে মুতয়িম, নাফে ইবনে যুবায়র (রা) এবং সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, সাঈদ ইবনে যুবায়র, মুহাম্মাদ ইবনে কায়াফ, কাতাদাহ, নাফে বলেছেন ঃ স্বামীর হাতেই বিয়ের বন্ধন নিবদ্ধ। অনুরূপ বলেছেন আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, জুফর, সওরী, ইবনে শবরামাতা'আ, আওজায়ী ও শাফেয়ী। এঁরা সকলেই বলেছেন, স্বামীর ক্ষমা হচ্ছে, সে পূর্ণ মহারানা দেবে তালাক দেয়ার পর সঙ্গমের পূর্বে। তাঁরা বলেছেন, 'তবে যদি ক্ষমা স্ত্রীরা' এই কথায় পূর্বে বিবাহিতা ও নতুন বিবাহিতা— সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ পর্যায়ে দুটি বর্ণনা এসেছে। একটি হাম্মাদ ইবনে সালমাতা'আ, আলী ইবনে জায়দ, আম্মার ইবনে আবূ আম্মার, ইবনে আব্বাস সূত্রে। বলেছেন, সে স্বামী। ইবনে জুরাইয— আমর ইবনে দীনার, ইকরামা, ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে। এটি দ্বিতীয় বর্ণনা। তিনি বলেছেন, ক্ষমা করা অর্থ তার আদেশ দেয়া, আর স্ত্রী ক্ষমা করলে তা যেমন ক্ষমা করেছে, তেমনই। আর স্ত্রী যদি প্রত্যাহার করে, ফিরিয়ে নেয়, আর তার অভিভাবক ক্ষমা করে, তাহলেও জায়েয হবে— স্ত্রী অস্বীকার করলেও। আল-কামা, আল-হাসান, ইবরাহীম, আতা, ইকরামা ও আবুজ-জিনাদ বলেছেন, সে হচ্ছে স্ত্রীর অভিভাবক। মালিক ইবনে আনাস বলেছেন, স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দেয়, সঙ্গম করার পূর্বে— স্ত্রী পূর্বে বিয়ে না হওয়া, তাহলে তার পিতার ক্ষমা করা জায়েয ও কার্যকর হবে। অর্ধেক মহরানা মাফ হয়ে যাবে।

আল্লাহ্র কথা ঃ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ বলে সেই স্ত্রীদের ক্ষমা করার কথা বলা হয়েছে, যাদের সাথে সঙ্গম হয়েছে। বলেছেন, পিতা ছাড়া আর কারোর পক্ষেই একবিন্দু মহরানা মাফ করে দেয়ার অধিকার নেই। কোন অসী তা পরে না, না অন্য কেউ তা পারে। লায়স বলেছেন, পূর্বে অবিবাহিত স্ত্রীর পিতার পক্ষে জায়েয আছে সে তার কন্যার মহরানা বিয়ের আক্দের সময়ই মাফ করে দেবে। তা সেই স্ত্রীর উপর কার্যকর হবে। কিন্তু নিবয়ের আক্দ হয়ে যাওয়ার পর স্ত্রীর মহরানা থেকে কিছু কমানোর স্বামীর কোন অধিকার নেই। কিছু মাফ করারও অধিকার নেই, যদি সঙ্গমের পূর্বে তালাক হয়ে যায়। পিতার দৃষ্টি হলে ও স্ত্রী অস্বীকার অপছন্দ করলেও স্বামীর সাথে বিচ্ছিন্ন করা জায়েয। বিয়ের পর স্ত্রীর মহরানার কোন অংশ বাদ দেয়া পিতার জন্যে যেমন করে জায়েয নয়, তেমনি সঙ্গম-পূর্ব তালাক হলে স্ত্রীর অর্ধেক মহরানা মাফ করারও তার কোন অধিকার নেই।

ইবনে অহব মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন, স্বামীর সম্পর্কচ্ছেদন স্ত্রী থেকে পিতার জন্যে জায়েয।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ اَوْ يَعْفُوَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ মুতাশাবিহ, কেননা তাতে দুটি দিকের সম্ভাবনা আছে। আগের কালের ফিকাহবিদগণ তারই ভিত্তিতে আয়াতটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। অতএব আয়াতটিকে মুতাশাবিহ না বলে মুহকাম বলাই বাঞ্ছনীয়। তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ط فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا -

তোমরা স্ত্রীদের মহরানা নিষ্ঠা সহকারে আদায় করে দাও। তারা নিজেরাই যদি তার থেকে কিছু আন্তরিক সন্তুষ্টি সহকারে ফিরিয়ে বা কম করে দেয়, তাহলে তোমরা তা সুস্বাদু ও সুপেয় হিসেবেই আহার করবে। (সূরা আন-নিসা ঃ ৪)

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ 'যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থানে অপর স্ত্রীকে বদল করতে ইচ্ছা করে থাক, অথচ তাদের একজনকে তোমরা বিপুল সম্পদ দিয়ে ফেলেছ, তাহলেও তা থেকে একবিন্দু ফিরিয়ে নেবে না। বলেছেন ঃ 'এবং তোমাদের জন্যে হালাল নয় যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে দেয়া জিনিস থেকে একবিন্দু ফিরিয়ে নেবে, তবে তারা দুজন আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করতে পারবে না বলে ভয় করলে ভিন্ন কথা।

এসব কয়টি আয়াতই মুহকাম। এর স্পষ্ট অর্থের বিপরীত কোন অর্থ একটিরও গ্রহণ করা যেতে পারে না। অতএব মুতাশাবিহ আয়াতটিকে এসব 'মুহকাম' আয়াতের আলোকে গ্রহণ করতে হবে ও তার ব্যাখ্যা করতে হবে। মুতাশাবিহ বলা আয়াতটি হচ্ছেঃ 'অথবা ক্ষমা করবে সে যার হাতে বিয়ের বন্ধন নিবদ্ধ।' কেননা আল্লাহ নিজেই মুতাশাবিহ আয়াতকে মুহকাম আয়াতের দিক থেকে ফিরিয়ে দেয়ার— তারই আলোকে তার ব্যাখ্যা দেয়ার আদেশ করেছেন। তা না করে মুতাশাবিহ আয়াতের তত্ত্ব খুঁজে বেড়ানোর নিন্দা করেছেন। বলেছেন ঃ

فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ -

যেসব লোকের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, তারা কুরআনের মুতাশাবিহ্ আয়াতের পিছু চলে ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৭)

উপরন্তু ব্যবহৃত শব্দ যখন একাধিক অর্থ দিতে পারে, তখন সেটির অর্থ মৌলনীতির সাথে মিল রেখে করা আবশ্যক। আর কন্যার কোন মাল স্বামীকে হেবা করার ইখতিয়ার পিতার থাকতে পারে না, তাতে কারোর একবিন্দু মতবিরোধ নেই। অন্য কাউকেও পিতা দিতে পারে না নিজের কন্যার মাল। মহরানাও তেমনি। মহরানা সম্পূর্ণ স্ত্রীর সম্পদ, সে-ই তার মালিক। সে মাল অভিভাবক দিয়ে দিতে পারে— এই কথাও মৌলনীতির পরিপন্থী। কারোর মাল হেবা করার অভিভাবকত্ব অন্য কেউ অধিকার করতে পারে না। এই মত প্রকাশকদের কথা যেহেতু মৌলনীতির বিপরীত, তার পরিপন্থী, অতএব আয়াতটির অর্থ মৌলনীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল করে গ্রহণ করতে হবে। কেননা সেটি স্বতঃই কোন মৌলনীতি নয়। তার বহু কয়টি অর্থ হওয়া

সম্ভব হওয়ার কারণে। আর যা স্বতঃই কোন মৌলনীতি নয়, তাকে অপর মৌলনীতির আলোকে গ্রহণ করা ওয়াজিব। তার ব্যাখ্যাও সেই হিসেবেই করতে হবে। উপরন্তু দুটি অর্থ-ও যদি সম্ভাব্যতার আওতার মধ্যে হয় এবং মৌলনীতিতে তার নযীর পাওয়া যায়, তাহলে ব্যবহৃত শব্দের দাবি অনুযায়ী এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, স্বামীই বরং অভিভাবক অপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি সাব্যস্ত হবে শব্দের বাহ্যিক অর্থের দাবিরূপে। তা এজন্যে যে, আল্লাহ্ বলেছেন, 'অথবা ক্ষমা করবে সে, যার হাতে বিয়ের গ্রন্থি নিবদ্ধ।' এতে অভিভাবকের কোন ইখতিয়ারের কথাই বলা হয়নি, প্রকৃত ও প্রত্যক্ষভাবেও নয়, পরোক্ষভাবেও নয়। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ 'যার হাতে বিয়ের গ্রন্থি' এর দাবি হল বিয়ের সম্পর্ক বর্তমান আছে, তা তারই মুঠিতে, যার মুঠিতে তা থাকতে পারে। যে গ্রন্থি বর্তমান নেই, তার উপর এ শব্দের ব্যবহার হয়েছে, তা মনে করা জায়েয নয়। অতএব তা অন্য কারোর হাতে আছে, তা-ও মনে করা যায় না। বিয়ের গ্রন্থি যখন অভিভাবকের হাতে নেই— না আক্দের পূর্বে ছিল, না পরে হয়েছে, অথচ তালাক সঙ্ঘটিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা স্বামীর হাতেই নিবদ্ধ ছিল, অতএব ব্যবহৃত শব্দ সেই স্বামীকেই বোঝাবে, বিয়ের গ্রন্থি স্বামীর হাতে— যদিও তা সে এখানে তালাক দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে— নিবদ্ধ বলে মনে করতে হবে আভিভাবকের হাতে আছে মনে করার পরিবর্তে স্বামীর হাতে আছে (বা ছিল) মনে করাই উত্তম।

যদি বলা হয়, এ বিষয়ে আল্লাহ্র আলোচ্য কথাটি তো তালাকের পরবর্তী অবস্থা প্রসঙ্গে, তালাকের পর তো বিয়ের গ্রন্থি স্বামীর হাতে থাকেনি, সে তো তা ছেড়ে দিয়েছে?

জবাবে বলা যাবে, শব্দে এই সম্ভাবনা আছে যে, যার হাতে বিয়ের গ্রন্থি নিবদ্ধ তাকেই বুঝতে হবে। কিন্তু অলী বা অভিভাবকের হাতে বিয়ের গ্রন্থি অতীতেও যেমন ছিল না, বর্তমানেও নেই। অতএব স্বামীকে মনে করাই উত্তম আয়াতের অর্থ হিসেবে। অভিভাবককে নয়। আয়াতের ধারাবাহিকতায় আল্লাহ্র এই কথাও রয়েছে ঃ

وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ -

তোমাদের পরস্পরের মধ্যে অগ্রবর্তিতার কথা তোমরা ভুলে যেও না।

অগ্রবর্তিতার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاَنْ تَعْفُوْ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى -

আর তুমি ক্ষমা করে দাও, তা তাকওয়ার খুবই নিকটবর্তী।

অন্য কারো মাল হেবা করায় তার দিক থেকে সেই অন্য কারোর প্রতি অগ্রবর্তিতা আরোপ হয় না। কেননা স্ত্রীর দিক থেকে তো এই অগ্রবর্তিতা হয়নি। অভিভাবকের ক্ষমা করা জায়েয মনে করতে উক্ত আয়াতে বলা অগ্রবর্তিতার তাৎপর্য প্রত্যাহৃত হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ্ ক্ষমার পর তাকওয়ার নিকটবর্তিতার কথা বলেছেন। কিন্তু অন্য কারোর মাল হেবা করায় কোন তাকওয়া নেই। সেই অন্য ব্যক্তি ক্ষমার ইচ্ছা করেনি। ফলে সে তার দ্বারা তাকওয়ার অধিকারী হতে পারে না। তাই স্বামীই হতে পারে সেই ব্যক্তি, যার হাতে নিবদ্ধ বিয়ের গ্রন্থি। মহরানা পূর্ণ মাত্রায় দিয়ে দেয়া তারই কাজ। অতএব উক্ত শব্দ দ্বারা তাকেই বুঝতে হবে। আর স্বামীই যখন সেই ব্যক্তি যার হাতে বিয়ের গ্রন্থি নিবদ্ধ, তখন অভিভাবককে মনে করা কোন ক্রমেই সঙ্গত হবে না। কেননা আগের কালের ফিকাহবিদগণ দুইটির যে কোনটি অর্থ করেছেন। হয়

হবে স্বামী, না হয় হবে অভিভাবক। আর আমরা যখন দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণ করেছি যে, তাতে স্বামীকে বোঝানো হয়েছে, তখন অভিভাবককে মনে করা অবশ্যই নিষিদ্ধ হবে।

আমাদের কথার উপর কেউ যদি বলে, আয়াতে মুস্তাহাব থেকে অগ্রাধিকার পর্যন্ত কথা শামিল রয়েছে, যা তাকওয়ার নিকটবর্তী পর্যন্তও শামিল। আর সেটি যদি বিশেষ সম্বোধন হয়ে থাকে মালিকের প্রতি, তার প্রতি নয় যে অন্য লোকের মাল হেবা করে, মৌলনীতিতে এই নামটি অভিভাবকের জন্যে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হওয়ার মতো কিছুই নেই। সে যদি তার অভিভাবকত্বের অধীন কারোর মালে সে কাজ করে, তাহলে তা অবৈধ না হওয়াই তো উচিত। তার প্রমাণ এই যে, অপ্রাপ্ত বয়স্কের ধন-মাল থেকে যদি অভিভাবক সদকায়ে ফিত্‌র দিয়ে দেয় তার পক্ষ থেকে, তাহলে অভিভাবক নিশ্চয়ই সওয়াবের অধিকারী হবে। কুরবানী ও খাতনা করানো ইত্যাদিও এই পর্যায়েরই কাজ।

এর জবাবে বলা যাবে, আমাদের পেশ করা আলোচনার প্রেক্ষিতে যুক্তি প্রয়োগে চরম গাফলতির পরিচয় দেয়া হয়েছে। আমরা বলেছি, অন্য লোকের ধন-মাল থেকে দান করলে সওয়াব পাওয়ার অধিকারী হবে না। কিন্তু এর মুকাবিলায় পেশ করা হয়েছে সেই ব্যক্তি ও তার কাজকে, যার তার মালে হক রয়েছে ও অভিভাবক সেই হক-এর বলে তা বের ও ব্যয় করেছে— সে হচ্ছে পিতা। অথচ অসী ও অসী-নয় এমন ব্যক্তির পক্ষে এসব হক আদায় করা জায়েয বলে আমরা মনে করি। কিন্তু সেই পিতার পক্ষে জায়েয নয়, তার অভিভাবকত্বের অধীন ব্যক্তির হক ক্ষমা করে দেবে। তাহলে সদকায়ে ফিতর ও ওয়াজিব হক আদায় করার কাজ দান করে দেয়ার মত কাজ হতে পারে কিভাবে? তার মালে যে হক চাপেনি, তা সে কি করে দিয়ে দেবে?

কেউ কেউ মনে করেছে, স্বামীকে তা করার অধিকারী করার কথা বোঝাতে চাইলে কথাটি এভাবে বলা যেত ঃ 'তবে স্ত্রীরা যদি ক্ষমা করে, অথবা ক্ষমা করে স্বামী।' কেননা এর পূর্বে স্বামী-স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে। তাহলে কথাটি একত্রে উভয়ের দিকে নির্দেশিত হতো। কিন্তু কথাটি সেভাবে বলা হয়নি, বলা হয়েছে একটা পরিচিতি। বোঝা গেল, এই কথা দ্বারা স্বামীকে বোঝাতে চাওয়া হয়নি।

আবূ বকর বলেছেন, এই কথাগুলো অন্তঃসারশূন্য। এর কোন অর্থ হয় না। কেননা আল্লাহ তা'আলা কখনও আইন-আদেশ পালনীয় করেন অকাট্য দলীলের দ্বারা, কখনও দলীলের তাৎপর্যগত ভাবধারার দ্বারা। তাতে অকাট্য দলীল থাকে না। কখনও স্পষ্ট শব্দে, যার একাধিক অর্থ হতে পারে। তা কোথাও অধিক প্রকাশমান এবং তা উত্তম। কখনও বিভিন্ন অর্থের ধারক শব্দ ব্যবহার দ্বারা। তাতে আসল লক্ষ্য নির্ধারণে মৌলনীতির সহায়তা লওয়া আবশ্যক হয়। তাতে যুক্তি-প্রমাণ আসে অন্য দিক থেকে। কুরআনে এই সবই পাওয়া গেছে।

এই কথা ঃ আয়াতে স্বামীর কথা বলাই লক্ষ্য হলে বলা হতো ঃ অথবা ক্ষমা করবে স্বামী .... তাতে কথাটি স্পষ্ট স্বামীর দিকে যেত, অন্য কারোর দিকে নয়। কিন্তু তা না বলে কথার বিপরীত অর্থের ধারক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার কোন অর্থ হয় না। সেই সাথে এ-ও বলা যায়, আয়াতে যদি অভিভাবককেই বোঝাতে চাওয়া হতো, তাহলে অভিভাবক স্পষ্ট ভাষায় বলা হতো। এমন শব্দ ব্যবহৃত হতো না, যার অর্থে অভিভাবক ও অন্য লোকও শরীক মনে করা যায়।

এই কথা যার, সে বলেছে, ক্ষমাকারী বলে তাকে বোঝানো হয়েছে যে তার হক-প্রাপ্য ছেড়ে দেয়। স্ত্রী যদি তার প্রাপ্য অর্ধেক মহরানা ছেড়ে দেয়, তাহলে সে হবে ক্ষমাকারিনী। অনুরূপভাবে অভিভাবক-ও। কেননা স্বামী যদি স্ত্রীকে কোন জিনিস দেয়, যা দেয়া কর্তব্য নয়, তাতে তো ক্ষমাকারী বলা যাবে না। তাকে বলা যাবে হেবাকারী— দাতা। এই কথাও দুর্বল। কেননা যারা আয়াতের ব্যাখ্যায় স্বামীকে মনে করেছেন, তাঁরা বলেছেন, স্বামীর ক্ষমা হল মহরানা পরাপুরি দিয়ে দেয়া। এঁরা হচ্ছেন সাহাবী ও তাবেয়ীন। শব্দের তাৎপর্য তাঁরাই অধিক ভালো জানেন। ওদের তুলনায় এঁরা বুঝেন শব্দে কি কি অর্থের সম্ভাব্যতা রয়েছে।

তাছাড়া এক্ষেত্রে ক্ষমা সেই ক্ষমা নয়, যেমন বলা হয়, 'আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।' এখানে ক্ষমার অর্থ স্বামীর দিক থেকে মহরানা পুরাপুরি দিয়ে দেয়া। অথবা স্ত্রীর প্রাপ্য অবশিষ্ট অর্ধেক মহরানার মালিক স্বামীকে বানিয়ে দেয়া তালাকের পর। যেমন মহরানা যদি হতো দাস, তাহলে আয়াতের হুকুমটি তাতেই ব্যবহৃত হতো। তাতে উল্লিখিত মুস্তাহাবের ভাব যথাযথ কায়েম রয়েছে। স্ত্রীর ক্ষমা হতো এই যে, তার প্রাপ্য বাকী অর্ধেক মহরানাটা তালাকের পর স্বামীকে দিয়ে দেবে। এ নয় যে, সে বলবে, 'আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। বরং কোন কিছুর মালিক অন্যকে বানাবার জন্যে যেভাবে কথা বলতে হয়, তা-ই বলবে। তেমনি স্ত্রী যদি মহরানা হস্তগত করে থাকে ও তা ব্যবহার করে পুরা ব্যয় করে ফেলে থাকে, এরূপ অবস্থায় স্বামীর ক্ষমা হচ্ছে তার উপর কিছু পাওনা থাকলে তা থেকে স্ত্রীকে মুক্তিদান। আর মহরানা যদি স্বামীর যিম্মায় ঋণ হয়ে থাকে, তাহলে স্ত্রীর ক্ষমা হচ্ছে অবশিষ্ট থেকে স্বামীকে নিষ্কৃতি দান। দেখা গেল, সব ক্ষমাই স্ত্রীর সাথে সম্পর্কিত। পরে অনুরূপভাবে স্বামীর সাথে। বলা যায়, তাহলে অভিভাবকের ক্ষমার ব্যাপারে তুমি কি বলতে চাও ? তার পরিচয়টা কি ? আমরা স্বামীর ক্ষমার কথা বলি স্ত্রীর ক্ষমার মতই। অতএব ওসব কথায় ব্যস্ত হওয়ার কোন ফায়দা নেই। কেননা কথা হচ্ছে 'ক্ষমা' শব্দ নিয়ে । আর আলোচনা হচ্ছে অন্য বিষয়ে। তা-ও কথা যার, তার কথাই ক্রুটিপূর্ণ। তবে আমি বিরোধীদের কথার ক্রুটি এড়িয়ে চলেছি। তারা বাজে কথার আশ্রয় নিয়েছে, যার কোন প্রমাণই নেই।

আল্লাহ্‌র কথা إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ বাতিল করে দিয়েছে তার কথা যে বলে পূর্বে অবিবাহিত স্ত্রী তালাকের পর যদি অর্ধেক মহরানা ক্ষমা করে দেয়, তবে তা জায়েয হবে না। এই কথাটি ইমাম মালিকের। কেননা আল্লাহ্‌ তাঁর উক্ত কথার মধ্যে কে পূর্বে বিবাহিত ছিল (الثيب) আর কে ছিল না (البكر) তার মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। আল্লাহ্‌র কথার সূচনা-সম্বোধনে 'তোমরা যদি স্পর্শ করার আগে ও মহরানা নির্দিষ্ট করার পর স্ত্রীদের তালাক দাও, তাহলে তোমাদের ধার্য করা মহরানার অর্ধেক পাবে'— এতে পূর্বে বিয়ে হওয়া ও বিয়ে না-হওয়া স্ত্রীদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। এরই সাথে সংযোজিত করা হয়েছে। إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ 'তবে যদি স্ত্রীরা ক্ষমা করে।' এই কথা উভয় শ্রেণীব্যাপক। পূর্বে বিয়ে হওয়া স্ত্রীই শুধু ক্ষমা করতে পারে, আর পূর্বে বিয়ে না-হওয়া স্ত্রী ক্ষমা করতে পারবে না, এরূপ পার্থক্যপূর্ণ কোন কথার একবিন্দু প্রমাণ নেই এ আয়াতে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ —নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্ধেক— ওয়াজিব করে এক হাজার টাকার মহরানা ধার্য করে বিয়ে হলেও সম্পূর্ণ টাকা স্ত্রীকে দিয়ে থাকলে তারপর সঙ্গমের

আগেই যদি তালাক দেয়, স্ত্রী টাকা পেয়ে জিনিসপত্র ক্রয় করে থাকে, তাহালে স্ত্রীকে অর্ধ হাজার দেয়া স্বামীর কর্তব্য হবে। এই অর্ধ হাজারের জামিন হবে স্বামী।

ইমাম মালিক বলেছেন, স্ত্রী মহরানার টাকা পেয়ে যেসব মাল-সামান ক্রয় করেছে, তার অর্ধেক স্বামী নিয়ে নেবে। কেননা আল্লাহ্ তো তার প্রাপ্যই করেছেন নির্দিষ্ট পরিমাণের মাত্র অর্ধেক। স্ত্রীও তাই। তাহলে যা নির্দিষ্ট করা হয়নি, তা স্ত্রীর নিকট থেকে নিয়ে নেয়া জায়েয হবে কি করে ? তা তো তার মূল্যও নয়। এই কথাও মৌলনীতির পরিপন্থী। কেননা কোন ব্যক্তি যদি হাজার টাকা দিয়ে একটি দাস ক্রয় করে, বিক্রেতা তার নিকট থেকে সে হাজার টাকা নিয়ে নেয়, আর তা দিয়ে সে অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রী কিনে ফেলে, পরে দাস-ক্রেতা তার মধ্যে ক্রটি পায় ও ফিরিয়ে দেয়, তাহলে দাস-বিক্রেতা যেসব জিনিস কিনেছে, তার উপর তো দাস-ক্রেতার কোন অধিকার থাকে না। দ্রব্যগুলো তো দাস-বিক্রেতার মালিকানাধীন। তখন দাস-বিক্রেতার কর্তব্য হল—দাস-ক্রেতাকে হাজার টাকা ফেরত দেয়া। বিয়েতেও তা-ই। এ দুয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। বিশেষত বিয়েটা তো দ্রব্য-সামগ্রীর ভিত্তিতে হয়নি। বিক্রয়ের চুক্তিও তার ভিত্তিতে হয়নি। হয়েছে এক হাজার টাকার মহরানার ভিত্তিতে।

## সালাতুল উস্‌তা, নামাযে (সালাতে) কথা বলা

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى -

তোমরা সকলে নামাযসমূহের পূর্ণ সংরক্ষণ কর বিশেষভাবে মধ্যম নামায।

এ আয়াতে নামায কাজটি করার আদেশ করা হয়েছে। তা ফরয। অতএব সংরক্ষণের জন্যে তাগিদ করা হয়েছে। এ নামায হল পাঁচ ওয়াক্তের— পাঁচ বারের যা কুরআনে লিখিত এবং সর্বজনপরিচিত— একদিন ও একরাত্রির মধ্যে الصلات শব্দের উপর 'আলিফ' ও 'লাম' অক্ষরদ্বয় ব্যবহৃত হয়েছে, সেজন্যে পরিচিতি নামাযের দিকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বোঝায়। এ কথার মধ্যে শামিল রয়েছে নামাযে দাঁড়ানো, তার ফরযসমূহ যথাযথভাবে আদায় করা, পূর্ণ করা এবং তার সীমাসমূহ রক্ষা করার আদেশ, আর তার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে তা করা এবং তাতে কোনরূপ ক্রটির অবকাশ না রাখাও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা সংরক্ষণের আদেশ এই সবকিছু দাবি করে। এরপর 'সালাতিল উস্‌তা' আলাদাভাবে উল্লেখ করা অন্যান্য সব নামাযের সঙ্গে সঙ্গে— এটা সেই 'সালাতিল উস্‌তা'র উপর বিশেষ তাগিদ আরোপ। তা দুইটি তাৎপর্য বোঝায়। হয় তা নামাযসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বাগ্রগণ্য নামায, তার সংরক্ষণ বিশেষভাবে করার তাগিদ বোঝায়। এই কারণে মোট নামায থেকে আলাদা করে তার উল্লেখ হয়েছে। অথবা তার সংরক্ষণটা অন্যান্য নামায থেকে অধিক তাগিদপূর্ণ করার জন্যে এরূপ বলা হয়েছে।

এ পর্যায়ে বহু সংখ্যক বর্ণনা এসেছে। সে সবের সূত্র বিভিন্ন। তার কতক বর্ণনা প্রথমোক্ত দিকটি বোঝায়। আর অপর কতক বর্ণনা বোঝায় দ্বিতীয় দিকটি। একটি বর্ণনা হযরত জায়দ ইবনে সাবিত (রা) থেকে এসেছে। তিনি বলেছেন, 'সালাতুল উস্‌তা' বলে যুহর-এর নামায বুঝিয়েছেন। কেননা নবী করীম (স) দুপুরবেলা নামায পড়তেন। তখন তাঁর পেছনে এক কাতার কিংবা দুই কাতারের বেশি হতো না। এ সময় লোকেরা তাদের কাজে-কর্মে ও

ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্যস্ত হয়ে থাকত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ তোমরা সকলে নামাযসমূহের পূর্ণ সংরক্ষণ কর, বিশেষ করে মধ্যম নামায। হাদীসের কোন কোন বর্ণনায় শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

فَكَانَتْ اَثْقَلُ الصَّلٰوتِ عَلَى الصَّحَابَةِ -

তখন সাহাবীদের জন্যে খুবই দুষ্কর ও অধিক কষ্টসাধ্য ছিল এই নামায।

তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন।

জায়দ ইবনে সাবিত বলেছেন ঃ সে নামাযকে الوسطى। 'মধ্যম নামায' বলা হয়েছে এজন্যে যে, তার পূর্বে থাকে দুই ওয়াক্তের নামায আর পরে থাকে দুই ওয়াক্তের নামায। ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ اِنَّ الصَّلٰوةَ الْوُسْطٰى صَلٰوةُ الْعَصْرِ 'সালাতুল উস্‌তা বলে আসরের নামায বোঝানো হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে اِنَّهَا صَلٰوةُ الْفَجْرِ তা হচ্ছে ফজরের নাময। হযরত আয়েশা, হাফ্‌সা ও উম্মে কুলসুম (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁদের নিকট রক্ষিত কুরআনের সহীফায় حَافِظُوْا عَلَى الصَّلٰوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى صَلٰوةِ الْعَصْرِ 'তোমাদের নামাযসমূহের বিশেষ করে মধ্যম নামায অর্থাৎ আসরের নামাযের সংরক্ষণ কর' লেখা আছে। বরা ইবনে আজিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلٰوتِ وَالصَّلٰوةِ الْعَصْرِ -

তোমরা নামাযসমূহের সংরক্ষণ কর আর আসরের নামাযের।

উক্ত আয়াতটি এবং তার উক্ত পাঠ রাসূলে করীম (স)-এর সময়ে হয়েছিল। পরে حَافِظُوْا عَلَى الصَّلٰوتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى - 'তোমরা নামাযসমূহের সংরক্ষণ কর বিশেষ করে মধ্যম নামাযের'। বরা জানিয়েছেন যে, উক্ত মহিলাদের সহীফায় আয়াতটিতে যে 'সালাতুল আসর'-এর উল্লেখ আছে, সেটি মনসূখ হয়ে গেছে। আসিম জুর আলী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী (রা) বলেছেন, আমরা আহযাব যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত ছিলাম, ব্যস্ততার কারণেই আমরা আসরের নামায যথাসময়ে পড়তে পারিনি। সূর্য প্রায় অস্তোন্মুখ হয়ে গিয়েছিল। তখন নবী করীম (স) বদ্‌দো'আ স্বরূপ বললেন ঃ

اَللّٰهُمَّ امْلَأْ قُلُوْبَ الَّذِيْنَ شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى نَارًا -

হে আমাদের আল্লাহ্! যারা আমাদেরকে মধ্যম নামায পড়বার সুযোগ দেয়নি, তাদের হৃদয়সমূহ আগুন দিয়ে ভরে দাও।

এ থেকে বোঝা যায়, সালাতুল উস্‌তা বলতে আসরের নামায বোঝায়। হযরত আলী (রা) বলেছেন, আমরা মনে করতাম, তা হচ্ছে ফজরের নামায। ইকরামা সাঈদ ইবনে যুবায়র ও মাকসাম হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তা হল আসরের নামায। সামুরাতা ইবনে জুনদুব (রা) রাসূলে করীম (স) থেকে অনুরূপ কথাই বর্ণনা করেছেন। হযরত আলী (রা) থেকে তাঁর এই কথাটি বর্ণিত হয়েছে। তা হল আসরের নামায। উবাই ইবনে কাব, কুবাইসাতা ইবনে জুয়ায়ব আল-মাগরিব থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে।

বলা হয়েছে, আসরের নামাযকে 'সালাতুল উস্‌তা' 'মধ্যম নামায' বলার কারণ হল, তা হচ্ছে দিনের দুই নামায ও রাতের দুই নামাযের মাঝখানে অবস্থিত। বলা হয়েছে, প্রথম যে ফরয হয়, তা ছিল ফজরের নামায। আর সে নামাযসমূহের শেষ ওয়াক্তের নামায ছিল এশার নামায। ফলে আসর হল ফরয নামাযসমূহের মধ্যম। 'উস্‌তা' বলে যাঁরা যুহর-এর নামায মনে করেছেন, তাঁরা বলেছেন, কেননা তা দিনের তিন ওয়াক্ত ফজর ও আসরের মাঝখানে অবস্থিত। যাঁরা ফজর-এর নামায বুঝেছেন, তাঁরা ইবনে আব্বাসের কথা তুলেছেন যে, তা রাতের অন্ধকার ও দিনের ঔজ্জ্বল্যের মাঝখানে পড়া হয়। ফলে তা-ই সময়ের দিক দিয়ে মধ্যমে অবস্থিত।

কোন কোন লোক 'আস-সালাতুল উস্‌তা'-কে দলীল বানিয়ে বলেছেন যে, বিত্‌রের নামায ফরয নয়। কেননা তা যদি ফরয হয়, তাহলে তার কোন মধ্যম হতে পারে না। কেননা তখন তো পাঁচ-এর পরিবর্তে ছয় ওয়াক্ত নামায ফরয দাঁড়িয়ে যায়। তাই বলা যায়, আসরের নামায যদি 'সালাতুল উস্‌তা' হয় তাহলে তা—যেমন বলা হয়েছে ফরয নামাযসমূহের মধ্যম নামায হতে পারে। আর যদি যুহর ধরা হয়, তাহলেও তা হতে পারে এইজন্যে যে, তা দিনের দুই নামাযের মাঝখানে অবস্থিত। কিন্তু তাতে রাতের বিত্‌রের নামাযের ওয়াজিব না হওয়া প্রমাণিত হয় না। আয়াতের বক্তব্য হল; ফরয নামাযসমূহের মধ্যের মধ্যম নামায। কিন্তু বিতরের নামায ফরয নয়। তা ওয়াজিব মাত্র। আর ওয়াজিব মাত্রই ফরয হয় না। ফরয হল অবশ্য কর্তব্যসমূহের সর্বোচ্চ স্তরে প্রতিষ্ঠিত। ফরয নামাযের পর বিত্‌রের নামাযের স্থান। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ زَادَكُمْ اِلٰى صَلَاتِكُمْ صَلَاةً وَهِىَ الْوِتْرُ وَاِنَّمَا سُمِّيَتْ وُسْطٰى قَبْلَ وَجُوْبَ الْوِتْرُ -

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ফরয নামাযের সাথে আর একটি নামায বাড়িয়ে দিয়েছেন। তা হল বিত্‌রের নামায।

'মধ্যম নামায' নামকরণ হয়েছে বিত্‌রের নামায ওয়াজিব হওয়ার পূর্বে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ -

তোমরা আল্লাহ্‌র জন্যে নামাযে বিনয়াবনত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে যাও।

اَلْقُنُوْتُ শব্দের আসল আভিধানিক অর্থ বলা হয়েছে 'কোন জিনিসের উপর স্থিতিশীল হওয়া।' আগের কালের ফিকাহবিদদের বহু কথা এই পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) আল-হাসান, আতা ও শা'বী থেকে এর অর্থ বর্ণিত হয়েছে مُطِيْعِيْنَ 'অনুগত অবনত'। নাফে ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ اَلْقُنُوْتُ طُوْلُ الْقِيَامِ 'দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা-ই কুনূত'। এরপর দলীল স্বরূপ তিনি পড়েছেন ঃ اَمَّنْ هُوَقَانِتٌ اٰنَاءَ الَّيْلِ 'যে ব্যক্তি রাতের বেলা নামাযে দীর্ঘ সময় ধরে বিনয়াবনত হয়ে থাকে, সে কি ......? নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

أَفْضَلُ الصَّلٰوةِ طُوْلُ الْقُنُوْتِ -

সর্বোত্তম নামায হচ্ছে দীর্ঘ সময় ধরে বিনয়াবনত হয়ে দাঁড়ানো।

মুজাহিদ বলেছেন, الْقُنُوْتُ নীরব নিঃশব্দ থাকা এবং অবনত অনুগত। القنوت -এর আসল অর্থ যখন কোন জিনিসের উপর দীর্ঘ সময় অবস্থিতি গ্রহণ, তখন স্থায়ী অনুগত ব্যক্তিকে قَانِت বলা খুবই যুক্তিযুক্ত। অনুরূপভাবে যে লোক নামাযে দাঁড়ানো, কুরআন পাঠ ও দো'আ দীর্ঘ করল, নিরবতা ও বিনয়কে লম্বা করল, তারা সকলে 'কুনূত' কাজ করল। নবী করীম (স) থেকে এ-ও বর্ণিত, তিনি একটি মাস কাল ধরে চুপচাপ থাকলেন ও স্থিতি সহকারে এক মাস ব্যাপী আরব গোত্রসমূহের একটি গোত্রকে ডাকতে থাকলেন। এর অর্থ, ডাককে সুদীর্ঘ করলেন।

হারিস শিবল, আবূ উমর, শায়বানী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলের যামানায় নামাযের মধ্যে কথাবার্তা বলতাম। তখন নাযিল হল ঃ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ 'তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র জন্যে দীর্ঘ সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক।' রাসূলে করীম (স) আমাদেরকে নামাযে চুপচাপ থাকতে আদেশ করলেন। এর অর্থ, নামাযে কথা বলা নিষেধ। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেছেন ঃ নবী করীম (স) নামাযে থাকা অবস্থায় আমরা তাঁর প্রতি সালাম বলতাম। তখন তিনি সালামের জবাব দিতেন। হাবশায় হিজরত পর্যন্ত তা চলেছে। কিন্তু পরে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নামাযের সময় সালামকালে তিনি তার জবাব দিতেন না। আমি তাঁকে একথা বললে তিনি বললেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهٖ مَا يَشَاءُ وَإِنَّهٗ قَضٰى أَنْ لَّا تَتَكَلَّمُوْا فِي الصَّلٰوةِ -

আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী নতুন নতুন আদেশ দেন। তিনি ফরমান দিয়েছেন যে, তোমরা নামাযে কথা বলবে না।

আতা ইবনে ইয়াসার আবূ সাঈদুল খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-কে (নামাযে থাকা অবস্থায়) সালাম দিলে তিনি ইশারায় তার জবাব দিলেন। পরে তিনি সালাম ফিরিয়ে বললেন ঃ

كُنَّا نَرُدُّ السَّلَامَ فِي الصَّلٰوةِ فَنُهِيْنَا عَنْ ذٰلِكَ -

আমরা আগে নামাযে সালামের জবাব দিতাম। পরে আমাদেরকে তা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

ইবরাহীম আল-হিজরী, ইবনে ইয়ায, আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, সাহাবীরা নামাযে কথা বলতেন। তখন নাযিল হল ঃ

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَأَنْصِتُوْا -

যখন কুরআন পাঠ করা হবে, তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শুনবে ও চুপ-চাপ হয়ে থাকবে। (সূরা আ'রাফ ঃ ২০৪)

মুআবিয়াতা ইবনুল হিকাম আস্-সুলামী বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

إِنَّ صَلٰوتَنَا هٰذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ -

আমাদের এই নামাযসমূহে মানবীয় কথাবার্তা মাত্রই শোভন নয়। নামায হচ্ছে তাসবীহ— আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা, তাকবীর— আল্লাহ্র বড়ত্ব ঘোষণা করা ও কুরআন পাঠের অনুষ্ঠান।

এই সব হাদীসেই নামাযে কথা বলতে নিষেধ হয়েছে। এ পর্যায়েও বর্ণনাকারিগণ বিভিন্নতা দেখান নি যে, শুরুতে নামাযে কথা বলা হতো পরে তা নিষিদ্ধ হয়েছে। সব ফিকাহ্‌বিদই তা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপার সম্পূর্ণ একমত। তবে ইমাম মালিক বলেছেন, নামায সংশোধনের জন্যে কথা বলা জায়েয। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ভুলের কথা নামায নষ্ট করে না। হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণ এ ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য দেখতে পান নি। ভুল হিসেবে কথা বললেও তাতে নামায নষ্ট হয় বলে তাঁরা মত দিয়েছেন। নামাযের ভুল সংশোধনের জন্যে কথা বললেও তাতে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। তার প্রমাণ আমাদের উপরোদ্ধৃত আয়াত ঃ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ 'এবং তোমরা আল্লাহ্র জন্যে নামাযে চুপচাপ বিনয়াবনত হয়ে দাঁড়াও।' এছাড়া যে বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, উক্ত আয়াতটি নামাযে কথা বলতে নিষেধ করার উপলক্ষেই নাযিল হয়েছে। বর্ণনাটি আয়াতের শানে নুযুল পর্যায়ে না হলেও নামাযে কথা বলা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়, তা ভুলবশতই হোক বা ইচ্ছা করেই বলা হোক। তার মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। রাসূলে করীম (স) থেকে এ পর্যায়ে বর্ণিত সকল হাদীসেরই সেই একই কথা। তা হল নামাযে কথা বলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সকল নামায সম্পর্কেই এই কথা।

যদি বলা হয়, নামাযে নিষিদ্ধ শুধু ইচ্ছামূলকভাবে কথা বলা, ভুল করে বলা নিষিদ্ধ নয়। কেননা ভুলবশত কথা বলা বন্ধ করা সম্ভব নয়। জবাবে বলা যাবে, কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে, তা যেমন ভুল করে বলার উপর তেমনি ইচ্ছা করে বলার উপরও আরোপিত। এ দুটির মধ্যে পার্থক্য হতে পারে শুধু গুনাহের দিক দিয়ে— আযাব পাওয়ার যোগ্যতা হওয়ার দিক দিয়ে। কিন্তু নামায নষ্ট হওয়ার বিধানে এবং তা আবার পড়ার প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়ে উভয় অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্যই করা যায় না। কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে ভুলবশত কথা বললে যেমন নামায আবার পড়তে হবে, ইচ্ছা করে কথা বললেও তা করতে হবে। অতএব এ দিক দিয়ে দুটি অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য হতে পারে না। নামাযে অযূ নষ্ট হওয়া, যৌনক্রিয়া করা ইচ্ছামূলক ভাবে হলে নামায নষ্ট হবে, পুনরায় তা পড়তে হবে। যদিও গুনাহ ও আযাব পাওয়ার যোগ্য হওয়ার দিক দিয়ে এ দুটির মধ্যে পার্থক্য করা যায়। অবস্থা যখন এই— যেমন বলেছি, তখন ভুলবশত কথা বললেও যেমন নামায আবার পড়তে হবে, ইচ্ছা করে বললেও আবার পড়তে হবে। কোন পার্থক্য নেই, গুনাহ ও আযাব পাওয়ার যোগ্যতার দিক দিয়ে পার্থক্য করা গেলেও।

এসব হাদীস থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল যে, নামাযের ভুল সংশোধনের ইচ্ছায় কথা বললে নামায নষ্ট হবে না— এরূপ মত যাঁরা দিয়েছেন, তাঁদের মত ভুল। সে ইচ্ছা ও ইচ্ছা না হওয়ার মধ্যে এবং ভুলবশত ও ইচ্ছামূলকভাবে কথা বলার মধ্যে যাঁরা পার্থক্য করেছেন,

তাঁদের কথাও অযৌক্তিক। নবী করীম (স)-এর কথা ঃ 'আমাদের এই নামাযে মানুষের কথা বলার কোন অবকাশ নেই' মুআবিয়া ইবনুল হিকাম বর্ণিত হাদীসে তা উদ্ধৃত হয়েছে। এটি একটি প্রকৃত হাদীস। তার অর্থ সুস্পষ্ট ও বাস্তব। এ থেকে এই কথাই প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয়েছে যে, নামাযে কথা বলা যাবে না। নামাযে কথা বলার পরও যদি সে নামাযী থাকে, তাহলে বুঝতে হয় যে, নামাযে কথা বলা চলে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, যাতে মানুষের কথাবার্তা হবে, তা আর যা-ই হোক, তা নামায নয়। এই হাদীসটি সমস্ত হাদীসের মধ্যেই বিদ্যমান। আর একটি দিক হল, صلاح এর বিপরীত হচ্ছে فساد — প্রথমটির বিপরীত দ্বিতীয়টি। তাই নামাযে যখন কথাবার্তা صلاح পূর্ণ নয়, শোভন নয়— তাহলে তা ফাসাদপূর্ণ, সম্পূর্ণ অশোভন যদি নামাযে কথা হয়ে যায়। অন্যথায় বুঝতে হবে. নামাযে কথা বললে তাতে নামায বিনষ্ট হয় না। কিন্তু তা হাদীসের কথার স্পষ্ট বিপরীত।

আমাদের বিপরীত মতের দুই পক্ষই আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসকে দলীল বানিয়েছেন। দুই হাত-ওয়ালার কাহিনী প্রসঙ্গে সে হাদীসটি এসেছে, কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, বলেছেন ঃ নবী করীম (স) যুহ্‌র কিংবা আসর— বৈকালিক এই দুই নামাযের কোন একটি নামায আমাদের নিয়ে পড়লেন। পরে মসজিদের সম্মুখে রক্ষিত কাষ্ঠের পার্শ্বে দাঁড়ালেন। তর উপর তিনি তাঁর এক হাতের উপর অপর হাত রাখলেন। তখন তাঁর মুখাবয়বে ক্রোধ ফেটে উঠছিল, যা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তখন খুব দ্রুততা সহকারে তিনি বাইরে গেলেন। লোকেরা বলল ঃ আপনি কি নামায 'কসর' করলেন ? লোকদের মধ্যে ছিলেন হযরত আবূ বকর ও উমর (রা)। তখন তাঁরা দুজন তাঁর সাথে কথা বলতে ভয় পেলেন। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেল, তার হাত দুইখানি ছিল লম্বা। রাসূলে করীম (স) তাঁকে 'যুল-ইয়াদাইন' (দুই হাতওয়ালা) বলতেন। বললে— হে রাসূল! আপনি কি ভুলে গেছেন, না ইচ্ছা করেই কসর করেছেন ? জবাবে তিনি বললেন, না, আমি ভুলেও যাই নি, ইচ্ছা করে নামায কসরও করিনি। সেই লোকটি বললেন, আপনি ভুলে গেছেন। তখন নবী করীম (স) লোকদের সামনে এগিয়ে এলেন। বললেন, এই 'দুই হাতওয়ালা' ব্যক্তি কি সত্য বলেছে ? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, তারপর তিনি ফিরে এসে অবশিষ্ট দুই রাক'আত নামায পড়লেন। সালাম ফেরাবার পর সহুর দুটি সিজদা দিলেন। ....... এর পর আবূ হুরায়রা (রা) এই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। তার মধ্যে কথা বলার ব্যাপারটিও আছে .......।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) শেষের দিকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদুল কাতান বর্ণনা করেছেন, আমাদের নিকট ইসমাঈল ইবনে আবূ খালিদ কায়স ইবনে আবূ হাযিম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমরা আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। বললাম, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করুন। বললেন, আমি রাসূলে করীম (স)-এর সহবতে তিন বছর ছিলাম। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি যখন মদীনায় আসেন, তখন নবী করীম (স) খায়বর জয় করেছেন। হযরত আবূ হুরায়রার ইসলাম কবুল করার পরে এই ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়েছিল। আর জানা-ই আছে যে, কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপার মক্কাতে ঘটেছিল, কেননা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হাবশা থেকে ফিরে এসে জানলেন, নামাযে কথা বলা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তিনি তাঁকে নামাযে থাকা অবস্থায় সালাম করেছিলেন, তিনি তার জবাব দেননি। তাঁকে জানিয়েছেন যে, নামাযে কথা বলার রীতি মনসূখ হয়ে গেছে। এ থেকে স্পষ্ট হল যে, 'দুই-হাতওয়ালা' সংক্রান্ত ঘটনাটি নামাযে কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়ার পরে সঙ্ঘটিত হয়েছে।

ইমাম মালিকের সঙ্গী-সাথীগণ বলেছেন, কথা বললে নামায নষ্ট হবে না, যদি কথা নামায সংশোধনের জন্যে বলা হয়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ভুলবশত নামাযে কথা বলে ফেললে তাতে নামায নষ্ট হবে না। এদের জবাবে বলা যায়, দুই হাতওয়ালা সংক্রান্ত ঘটনা যদি নামাযে কথা নিষিদ্ধ হওয়ার পরে হয়ে থাকে, তাহলে নামাযে কথা বলা মুবাহ প্রমাণিত হয়। নিষেধকে মনসূখ করে দিয়েছে সে ঘটনা। কেননা তাতে জানানো হয়নি যে, নিষেধ কোন বিশেষ সময়ে, আবার কোন সময়ে নিষেধ নয়। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাতা আবূ হাযিম, সহল ইবনে সাফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ نَابَهُ فِيْ صَلَاتِهِ شَيْءٌ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ –

নামাযে কারোর কথা বলার প্রয়োজন হয়ে পড়লে সে যেন 'সুবহান-আল্লাহ্' বলে।

আর মেয়েরা হাত মেরে শব্দ করবে, আর এই সুবহান-আল্লাহ বলা পুরুষদের জন্যে ব্যবস্থা।

সুফিয়ান জুহরী আবূ সালমাতা, আবূ হুরায়রাতা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ –

এতে নবী করীম (স) নামাযে কারোর কথা বলার প্রয়োজন দেখা দিলে তাকে 'সুবহান আল্লাহ' বলার আদেশ করেছেন। কিন্তু দুই হাতওয়ালার ঘটনায় কাউকে 'সুবহান-আল্লাহ' বলতে দেখা যায়নি, তা না বলার দরুন নবী করীম (স) দোষ ধরেছেন বলেও উল্লেখ পাওয়া যায় না। বোঝা গেল দুই-হাতওয়ালার ঘটনা ছিল লোকদেরকে তাসবীহ্ বলার কথা জানানোর আগের। কেননা লোকদেরকে তাসবীহ্ বলার কথা শিক্ষা দেয়া হবে, পরে তা তারা বলবে না, তার বিরুদ্ধতা করবে, তা তো কল্পনাও করা যায় না। তাসবীহ্ বলতে আদেশ করার পর তাঁরা যদি এরূপ অবস্থায় তাঁর বিরুদ্ধতা করে থাকেন, তাহলে সে জন্যে রাসূলের পক্ষ থেকে তার তীব্র প্রতিবাদ এবং সেজন্যে অসন্তুষ্টি প্রকাশিত হওয়া ছিল একান্তই অপরিহার্য। কেননা তা হলে তো স্পষ্ট আদেশ অমান্য করা হয় ও নিষিদ্ধ কাজ করার দোষে সকলকেই দোষী হতে হয়। তাই বলতে হবে, এতে দলীল রয়েছে এই কথার যে, 'দুই হাতওয়ালার' ঘটনার দুটি দিক— হয় তা নামাযে কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়ার আগের ঘটনা অথবা নামাযে কথা বলা প্রথমত নিষিদ্ধ হয়েছে বলে, পরে তা মুবাহ্ করা হয়, পরে পুরুষদেরকে তাসবীহ ও মেয়েদেরকে হাতের শব্দ করার আদেশ দ্বারা তা চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। তবে নামাযে কথা বলা চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে মদীনায় হিজরতের পর। এতে কোন সন্দেহ হলেই তা প্রমাণিত হয় মা'মর, জুহরী, আবূ সালমাতা ইবনে আবদুর রহমান, আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস দ্বারা, যাতে বলা হয়েছে যে, নবী করীম (স) যুহর কিংবা আসরের নামায পড়লেন ........ যেমন পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে।

জুহরী বলেছেন, এই ঘটনা বদর যুদ্ধের পূর্বে ঘটেছিল। পরে বিষয়টি সুদৃঢ় হয়ে যায়। জায়দ ইবনে আরকাম (রা) বলেছেন, আমরা নামাযে কথাবার্তা বলতাম। পরে 'তোমরা আল্লাহ্‌র জন্যে চুপচাপ বিনয়াবনত হয়ে দাঁড়াও' আয়াতটি নাযিল হয়। এতে আমরা নামাযে চুপচাপ থাকতে আদিষ্ট হই। আবূ সাঈদুল খুদরী (রা) বলেছেন, নবী করীম (স) নামাযে থাকা অবস্থায় এক ব্যক্তি তাঁকে সালাম করে। তিনি ইশারায় তার জবাব দেন। বললেন, আমরা আগে

নামাযের মধ্যে করা সালামের জবাব দিতাম, কিন্তু পরে তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আবূ সাঈদুল খুদরী (রা) ছিলেন রাসূলে করীম (স)-এর অল্প বয়সের সাহাবীগণের একজন। হিশাম-তাঁর পিতা-হযরত আয়েশা সূত্রে প্রাপ্ত বর্ণনা দ্বারাও তা প্রমাণিত হয়। হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ আবূ সাঈদুল খুদরী ও আনাস ইবনে মালিক রাসূলের হাদীস খুব বেশি জানতে পারেন নি। কেননা তাঁরা দুজন ছোট বয়সের বালক ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হাবশা থেকে মদীনায় নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন।

জুহরী সাঈদুবনুল মুসাইয়্যিব, আবূ বকর ইবনে আবদুর রহমান উরওয়াতা ইবনুয যুবায়র সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও তাঁর সঙ্গীগণ হাবশায় ছিলেন। তাঁরা পরে মদীনায় এসে নবী করীম (স)-এর সাথে মিলিত হয়েছিলেন। জীবনেতিহাস রচয়িতাগণ বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) যখন বদর যুদ্ধে আবূ জহলকে হত্যা করেছিলেন, আফরার দুই পুত্র যখন তাকে দুর্বল করে ফেলেছিল। অবস্থা যখন এই, তখন বোঝা গেল, তিনি হাবশা থেকে মদীনায় উপস্থিত হয়ে নামাযে কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে অবহিত হয়েছিলেন। আর এই সময়ই নবী করীম (স) বদর যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন।

আবদুল্লাহ্ ইবনে অহব, আবদুল্লাহ ইবনুল উমরী-নাফে-ইবনে উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি দুই হাতওয়ালা সংক্রান্ত ঘটনার উল্লেখ করে বলেছেন, আবূ হুরায়রা (রা) ইসলাম কবুল করেছিলেন 'দুই হাতওয়ালা'র শাহাদত লাভের পর। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আবূ হুরায়রা (রা) যা বর্ণনা করেছেন, তা তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বের ঘটনা। কেননা তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন খায়বর জয়ের বছর। প্রমাণিত হল যে, আবূ হুরায়রা নিজে সেই ঘটনার প্রত্যক্ষ দর্শক ছিলেন না। যদিও তিনি এ বিষয়ের বর্ণনা করেছেন। যেমন বরা-ইবনে আজিব বলেছেন ঃ

مَاكُلُّ مَانُحَدِّ ثُكُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْنَاهُ، وَلٰكِنَّا سَمِعْنَا -

আমরা রাসূলে করীম (স) থেকে যা-ই বর্ণনা করি, তার সবটাই যে স্বয়ং রাসূলের মুখে আমরা শুনেছি, তা নয়। তবে তা আমরা শুনেছি নিশ্চয়ই।

আমাদের হাদীসবিদগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ ইবনে সালামাতা হুমায়দ আনাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ

وَاللّٰهُ مَا كُلُّ مَا نُحَدِّ ثُكُمْ بِهِ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلٰكِنْ كَانَ يُحَدِّثُ بَعْضُنَا بَعْضًا وَلَايَتَّهِمُ بَعْضُنَا بَعْضًا -

আল্লাহ্র নামে শপথ। আমরা রাসূলে করীম (স) থেকে যা কিছুই তোমাদের নিকট বর্ণনা করি, তার সবটাই আমরা সরাসরি তাঁর নিকট থেকে শুনিনি বরং আমাদের সাহাবীগণের পরস্পর পরস্পরের নিকট হাদীস বর্ণনা করতেন। আর আমরা একে অপর মিথ্যা বলার দোষে অভিযুক্ত করতাম না।

ইবনে যুরায়জ আমর-ইয়াহ্ইয়া ইবনে জাদাতা, আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ

لَاوَرَبِّ هٰذَا الْبَيْتِ مَا اَنَا قُلْتُ مَنْ اَدْرَكَ الصُّبْحَ وَهُوَ جُنُبٌ فَلْيَفْطُرْ وَلٰكِنْ مُحَمَّدٌ قَالَهُ وَرَبِّ هٰذَا الْبَيْتِ -

না, এই কাবা ঘরের রব্ব-এর কসম, আমি বলছি না যে, যে লোকের না-পাক অবস্থায় সকাল হয়ে যাবে, সে যেন রোযা না রাখে, বরং মুহাম্মাদ (স)-ই এ কথা বলেছেন, এই ঘরের রব্ব-এর কসম।

পরে তাঁকে হযরত আয়েশা ও উম্মে সালমাতা (রা)-এর এই বর্ণনার কথা জানানো হয় ঃ

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ اِحْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُوْمُ يَوْمَهُ ذٰلِكَ -

নবী করীম (স) স্বপ্ন ছাড়া অন্য কারণে নাপাক শরীরে সকাল হলে সেই দিনের রোযা রাখতেন।

এ কথা জানার পর হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বললেন ঃ 'এ বিষয়ে আমার কিছুই জানা নেই। আমি যে কথা বলেছি, তা আমাকে ফযল ইবনুল আব্বাস জানিয়েছেন।

বোঝা গেল, তিনি 'দুই হাতওয়ালা'র যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা তাঁর নিজস্ব শ্রবণ ও অবহিতি নয়।

যদি বলা হয়, তাঁর বর্ণিত কোন কোন হাসীসে এই ভাষা রয়েছে ঃ রাসূলে করীম (স) আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়েছেন। তা কি করে বললেন ?

জবাবে বলা যাবে, তার কথার মর্মার্থ এ হওয়া সম্ভব যে, রাসূলে করীম (স) মুসলমানদের নিয়ে নামায পড়েছেন। তিনি তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন। যেমন মুসয়িব ইবনে কুদাম আবদুল মালিক ইবনে মায়সারাতা, নাজাল ইবনে সাবুরাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ রাসূলে করীম (স) আমাদেরকে বললেন ঃ 'আমি ও তোমরা বনূ আবদে মনাফকে দাওয়াত দিচ্ছিলাম। আজকে তোমরা হচ্ছ বনূ আবদুল্লাহ আর আমরাও বনূ আবদুল্লাহ।

এর অর্থ, তিনি এ কথা তাঁর নিজের বংশের লোকদেরকে বলেছিলেন। যদি বলা হয়, নামাযে কথা বলা যদি বদর যুদ্ধের পূর্বেই নিষিদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে তখন জায়দ ইবনে আরকাম নিশ্চয়ই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। কেননা তিনি তখন ছিলেন খুব অল্প বয়স্ক। তিনি ইয়াতীম ছিলেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার ক্রোড়ে লালিত পালিত হচ্ছিলেন, যখন তিনি মূতা'র যুদ্ধে রওয়ানা হচ্ছিলেন। এই রকম অবস্থায় বদর যুদ্ধের পূর্বে ঘটিত ঘটনায় তিনি উপস্থিত থাকতে পারেন না।

জবাবে বলা যাবে, জায়দ ইবনে আরকাম যদি নামাযে কথা বলা মুবাহ দেখতে পেয়ে থাকেন, তা হতে পারে, নিষেধের পর তা মুবাহ করা হয়েছিল। পরে তা স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তাহলে তাঁর সর্বশেষ ব্যাপার তো নিষিদ্ধই হল। আর এটাও অসম্ভব নয় যে, আবূ

হুরায়রা (রা)-ও নামাযে কথা বলা মুবাহ্ দেখতে পেয়েছেন নিষেধের পরে যা করা হয়েছিল। তারপরে চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তবে একথা ঠিক যে, দুই হাতওয়ালার যে কাহিনী তিনি বর্ণনা করেছেন, তা তাঁর প্রত্যক্ষ পর্যাবেক্ষণ থেকে নয়। কেননা তিনি ইসলাম কবুল করেছেন তার পরে। সম্ভবত জায়দ ইবনে আরকাম নামাযে মুসলমানদের কথা বলাকালীন অবস্থা থেকে 'তোমরা আল্লাহ্‌র জন্যে চুপচাপ বিনয়ী হয়ে দাঁড়িয়ে যাও' হুকুমটি নাযিল হওয়া পর্যন্ত তাঁকে জানিয়েছেন। আর তাঁর কথা ঃ আমরা নামাযে কথা বলতাম' কথা বলে তিনি মুসলমানদের সম্পর্কেই বর্ণনা দিয়েছেন। তিনিও তাঁদেরই একজন। যেমন নজাল ইবনে সাবুরাতা পূর্বোদ্ধৃত বর্ণনায় বলেছেন ঃ রাসূলে করীম (স) আমাদেরকে বলেছিলেন এবং যেমন আল-হাসান বলেছেন ঃ 'ইবনে আব্বাস বসরায় আমাদেরকে ভাষণ দিয়েছেন। অথচ তিনি সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। সে কথা পরে তিনি জানতে পেরেছেন মাত্র।

দুই হাতওয়ালা সংক্রান্ত ঘটনা ছিল নামাযে কথা বলা মুবাহ্ থাকার সময়ের। তার আর একটি প্রমাণ এই যে, তাতে উল্লিখিত হয়েছে, নবী করীম (স) মসজিদে রক্ষিত কাষ্ঠের কাণ্ডের উপর ভর করে দাঁড়িয়েছিলেন। লোকদের দ্রুততা সহকারে বের হওয়ার পর তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, নামায 'কসর' করেছেন ? তখন নবী করীম (স) লোকদের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন, তখন তিনি লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করেন। লোকেরা বললেন, দুই হাতওয়ালা ঠিকই বলেছেন। এই কথাবার্তার কিছু অংশ ছিল ইচ্ছামূলক। এর একটা অংশ নামায সংশোধনের উদ্দেশ্যে ছিল না। বোঝা গেল, এই ব্যাপার ঘটেছিল নামাযে কথা বলা মুবাহ্ থাকার সময়ে। এর গোটা ঘটনাই নামাযে কথা বলা মুবাহ্ থাকার প্রাথমিক অবস্থার হয়ে থাকে, তা নিষিদ্ধ হওয়ার আগের, তাহলে বিপরীত মতের কোন সমর্থন তাতে নেই, তা তাদের দলীল হতে পারে না। আর যদি তা নামাযে কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়া পরের হয়ে থাকে, তা হলে বুঝতে হবে, তা নিষিদ্ধ হওয়ার পর আবার তা মুবাহ্ করা হয়েছিল। পরে আবার নিষিদ্ধ হয়েছে। ফলে শেষ ঘটনা হল, কথা বলা নিষিদ্ধ। আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে যা আছে, তা মনসূখ হয়ে গেছে। আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, রাসূলের কথা ঃ 'পুরুষের জন্যে তাসবীহ্ ও মেয়েদের জন্যে হাতের শব্দ' আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসের পরের ব্যাপার। কেননা তা যদি তার আগের ব্যাপার হতো, তাহলে রাসূলের আদেশের বিপরীত কাজ দেখে তিনি অবশ্যই প্রতিবাদ করতেন। আর জনগণও সে আদেশের বিরোধিতা নিশ্চয়ই করতেন না। কেননা তাঁরা তো জেনে গেছেন যে, নামাযে কথা বলা নিষিদ্ধ, তার পরিবর্তে সুবহান-আল্লাহ্ বলতে হবে।

তাতে প্রমাণিত হল যে, নামাযে প্রয়োজন হলে সুবহান-আল্লাহ্ বলার এ আদেশ মনসূখ করেছে কথা বলা দ্বিতীয়বারে নিষিদ্ধ হওয়াকে। কাজেই আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে যা আছে, তা ব্যবহারে ভিন্নতর কথা। তাই নিষেধ সম্পর্কে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তা-ই সে ব্যাপারে সিদ্ধান্তকারী হবে। কেননা এ ব্যাপারে মৌল নীতি হচ্ছে একটি বিষয়ে যদি দুটি হাদীস আসে, তার একটা খাস'— বিশেষ, আর অপরটি 'আম'— সাধারণ এবং বিশেষজ্ঞরা 'আম'কেই ব্যবহার করতে একমত হন, আর 'খাস' বিশেষকে ব্যবহার থাকে বিভিন্ন মত, তাহলে সর্বসম্মত হাদীসটি মতভেদপূর্ণ হাদীসটির উপর বিচারক হবে।

যদি বলা হয়, ভুলক্রমের কাজ ও ইচ্ছাপূর্বক কাজের মধ্যে তোমরা পার্থক্য করেছ, তাহলে তোমরা ভুলক্রমে কথা বলা ও ইচ্ছাপূর্বক কথা বলার মধ্যে পার্থক্য করবে না কেন ?

জবাবে বলা যাবে, এ একটা অপ্রাসঙ্গিক ও অর্থহীন প্রশ্ন। এর কোন জবাব দেয়া নিষ্প্রয়োজন। তবে দুটি বিষয়ের একটি যে অন্যটির দলীল, তার কারণটা স্পষ্ট হওয়া উচিত। তা সত্ত্বেও আমাদের মতে ভুল করে কিছু করা ও নামায নষ্ট করার ইচ্ছা করে কিছু করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা দুটিতেই কাজটা তো ঘটে যায়। পার্থক্য হতে পারে কাজ করার পূর্বাবস্থা ও কাজ না করার অবস্থার মধ্যে। তাই যদি কেউ ভুল করে যখমের স্থান ঘষে দেয় ও তা থেকে রক্ত বের হয় কিংবা বমি করে, তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। ভুল করে করলেও নামায নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা নেই।

যদি বলা হয়, ভুলকারীর সালাম ও ইচ্ছাকারী সালামের মধ্যেও তোমরা পার্থক্য কর। তাও নামাযে কথা বলার শামিল। তাহলে নামাযে সর্বপ্রকারের কথা বলা এ রকমেরই হবে।

জবাবে বলা যাবে, সালামও এক প্রকারের যিকির। তা বলে নামায শেষ করা সুন্নাতের বিধান। তাই কেউ যদি ইচ্ছা করে নামায শেষ হওয়ার আগেই সালাম দেয় তাহলে তাতে নামায নষ্ট হবে। যেমন নামাযের শেষে সালাম করে নামায থেকে বের হতে হয়। যদি সে ভুলকারী হয়, তাহলে তাকে যিকিরকারীর যিকির মনে করতে হবে। তাতে নামায শেষ করে বের হওয়া হবে না। সালাম যিকির এইজন্যে যে, তা ফেরেশতাদের প্রতি এবং উপস্থিত মুসল্লীদের প্রতি। তাতে যদি আল্লাহ্র ফেরেশতাগণ জিবরাঈল, মীকাইল কিংবা আল্লাহ্র নবীর প্রতি সালাম বলা হয়, তাহলে তাতে নামায নষ্ট হবে না। তা যখন এক ধরনের যিকির-আযকার, তখন তাহলে নামায থেকে বের হওয়ার কাজটাও হবে না। তবে ইচ্ছা করে যদি তা বলে, তা হলে ভিন্ন কথা। এ রকম ব্যাপার নামাযে তো আছে-ই, তাই তা নামায নষ্ট করবে না। যেমন আত্ তাহাইয়াতে বলা হয় ঃ 'আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবীউ ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়াবারাকাতুহু আসসালামু আলাইনা ওয়া-আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন' তো পড়াই হয়। এভাবে নামাযে বহু মসনূন যিকির রয়েছেই। তা তো নামাযকে নষ্ট করে না যদি তা ভুলবশতও করা হয়। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন, আমাদের এই নামাযে লোকদের কথাবার্তার কোন স্থান বা অবকাশ নেই, তা শোভন নয়। নামাযে যে কথাবার্তা মুবাহ করা হয়েছে, তা নামাযের মধ্যের জিনিস নয়। তা হলে তদ্দারা নামায নষ্ট হবে না। হাদীসেও তার কথা বলা হয়নি। হ্যাঁ, যদি ইচ্ছা করে কোন কথা বলা হয়, তাহলে তাতে নামায নষ্ট হবে। তবে তা এ হিসেবে নয় যে, তা নামাযে নিষিদ্ধ লোকদের কথা। বরং তা এ হিসেবে যে, নামায শেষ করে বের হওয়ার জন্যে তা মসনূন নিয়ম, তবে যদি ইচ্ছা করে তা বলে, তা হলে সে জন্যে মসনূন দিকটিরই ইচ্ছা করেছে। ফলে তাতে তার নামায ভেঙ্গে যাবে।

উপরন্তু শরীয়াতসম্মত নামাযের শর্ত হচ্ছে, নামাযে কথা না বলা। তাই তাতে ইচ্ছা করে কথা বললে কারো মতেই সে নামায হবে না, যদি নামায সংশোধন করার কোন ইচ্ছা বা চেষ্টা না থাকে, তাহলে তাতে কথা বলা হলে তা নামায থেকে বের করার কাজটা করে দেবে শরীয়াতসম্মত নামায হওয়ার দিক দিয়ে। যেমন তাহারাত। তা নামাযের শর্ত। তাই ভুলবশত তাহারাত ত্যাগ করা হোক কি ইচ্ছা করে ত্যাগ করা হোক, তার হুকুমটা ভিন্নতর কিছু হবে না। অথবা যেমন কুরআন পাঠ, রুকূ, সিজদা অন্যান্য যাবতীয় ফরয কাজ ইত্যাদি ভুল করে না করা বা ইচ্ছা করে না করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা নামায বা সালাত একটা শরীয়াতসম্মত কাজের নাম। এই নামের সঠিকথা কতিপয় শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট। সে শর্তসমূহ

পূর্ণ না হলে তাকে সেই নামে অভিহিত করা যাবে না। নামাযে কথা না-বলাও একটা শর্ত। তাই নামাযে কথা বলা হলেই তার শরীয়াতী নাম বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তখন সে কাজটা আর যা-ই হোক, নামায নামে অভিহিত হতে পারবে না। অতএব নামাযে কথা বলাকে আমরা জায়েয মনে করি না। বিপরীত মতের লোকেরা যদি আমাদের উপর এই অভিযোগ তোলে যে, সিয়ামের শর্ত হচ্ছে পানাহার ত্যাগ করা, শরীয়াতসম্মত নাম তারই সাথে সম্পর্কিত, পরে তাতে ভুল করে খাওয়া, পান করা ও ইচ্ছা করে খাওয়া-পান করার মধ্যে তো পার্থক্য করা হয়। তাহলে নামাযে কথা বলার ক্ষেত্রে সেরূপ পার্থক্য করা হবে না কেন? তাহলে আমরা বলব, এ দুটি অভিন্ন ধারণার কিয়াস তো ঠিক। এ কারণে হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, যদি স্পষ্ট হাদীস না থাকত, তাহলে ভুল করে খাওয়া ও ইচ্ছা করে খাওয়ার মাঝে সত্যই কোন পার্থক্য করা যেত না। আর কিয়াস ছেড়ে দিলে আসল ইল্লাতটা স্থায়ী হয়ে দাঁড়ায় এবং তা সহীহ হয়।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً اَوْرُكْبَانًا -

কিন্তু তোমরা যদি ভয় পাও, তাহলে দাঁড়ানো অবস্থায় কিংবা সওয়ার থাকা অবস্থায় (নামায পড়বে)।

আল্লাহ সম্বোধনের সূচনায় নামাযের আদেশ করেছেন ও তার সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন। তা প্রমাণ করে যে, নামায পূর্ণ করা, তার ফরযসমূহ যথাযথ আদায় করা বাধ্যতামূলক। নামাযের সীমাসমূহ পুরামাত্রায় রক্ষা করা কর্তব্য। কেননা যে সংরক্ষণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এটাই তার দাবি। তার পরে 'সালাতুল উস্তা' মধ্যম নামাযের তাগিদ করা হয়েছে স্বতন্ত্রভাবে। সে জন্যে আলাদা তাগিদ করার ফায়দাটা কি তা আমরা পূর্বেই বলেছি। তার পরে তার সাথে সংযোজন করা হয়েছে 'এবং তোমরা আল্লাহ্র জন্যে নীরব বিনয়াবনত হয়ে দাঁড়াও' কথাটি। এর মধ্যেই রয়েছে চুপচাপ থাকা ও নম্র বিনীত হয়ে থাকার আদেশ। চলাচল করতে নিষেধ ও অন্য কাজ করার নিষেধও এর মধ্যে শামিল। এসব হুকুম শান্তিপূর্ণ ও নিশ্চিন্ততার অবস্থায় পালনীয়। এর পরই সংযোজিত হয়েছে ভয়-ভীতিকালীন অবস্থা সংক্রান্ত আদেশ। এসব অবস্থায়ই নামায আদায় করার আদেশ অবশ্য পালনীয়। ভয়-ভীতির দরুন নামায তরক করার কোন রুখসত দেয়া হয়নি। এই প্রেক্ষিতেই আল্লাহ বলেছেন ঃ তোমরা যদি ভয় পাও, তাহলে দাঁড়ানো অবস্থায় অথবা সওয়ার থাকা অবস্থায় নামায পড়বে।' আল্লাহ্র কথা فَرِجَالاً বহু বচনে, এক বচনে رَاجِلٌ। এ দুটোরই ব্যবহার আছে— যেমন বলা হয় ঃ - قَائِم - قِيَام - تَاجِرٌ - وَتِجَارٌ صَاحِبٌ - صِحَابٌ ভয় কালে নামায পড়তে বলা হয়েছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। রুকূ-সিজদা ত্যাগ করায় কোন আযাব হবে না। যেমন রোগীকে দাঁড়িয়ে, বসে বা শয়নে যে কোন অবস্থায় নামায পড়তে বলা হয়েছে, এমন কি জন্তুযানে সওয়ার থাকা অবস্থায়ও নামায পড়ার আদেশ আছে। তা ভয়ের কারণে। ইশরায় নামায পড়াও মুবাহ। আরোহী অবস্থায় নামায ইশারা-ইঙ্গিতেই পড়া যেতে পারে। তাতে দাঁড়ানো ও রুকূ-সিজদা করা কঠিন। ইবন উমর (রা) থেকে ভয়কালীন নামাযের রীতি বর্ণিত হয়েছে। ভয় যদি আরও বেশি হয়, তাহলে পায়ের উপর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পড়তে বলা হয়েছে। সওয়ার হওয়া অবস্থায় কিবলামুখী হওয়া সম্ভব বা অসম্ভব হলেও নামায পড়তে

হবে। নাফে বলেছেন, ইবনে উমর (রা) উক্ত কথা রাসূল (স) থেকেই বর্ণনা করেছেন বলে মনে করি।

আলোচ্য আয়াতে যুদ্ধাবস্থা ছাড়া নিছক ভয়কালীন অবস্থায় ওভাবে নামায পড়ার কথা বলা হয়েছে। যদি ভয়কালীন অবস্থা হয় ও শত্রুকর্তৃক পরিবেশিষ্টত হয়, তাহলে সেভাবে নামায পড়া সম্পূর্ণ জায়েয। আর ভয়ের কারণে সওয়ার থাকা অবস্থায় ওভাবে নামায পড়া যখন মুবাহ করা হল, তখন কিবলামুখী হতে পারল কি পারল না, তার মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। তাতে কিবলামুখী হয়েও নামায পড়া জায়েয প্রমাণিত হল। কেননা আল্লাহ্ সর্বাবস্থায়ই নামায পড়ার আদেশ করেছেন। কার পক্ষে কিবলামুখী নামায পড়া সম্ভব, আর কার পক্ষে তা সম্ভব নয়, এ দুয়ের মাঝে কোন পার্থক্য করেন নি। তাই যার পক্ষে কিবলামুখী হওয়া সম্ভব নয়, তার জন্যেও সেই অবস্থায়ই— যে অবস্থায় সে পারে— নামাযে পড়তে হবে বলে আদেশ করেছেন। অন্যদিক দিয়ে এ কথাটিও প্রমাণিত হয় যে, নামাযে নামাযে কিয়াম, রুকূ ও সিজদা নামাযের ফরয হলেও দাঁড়িয়ে বা আরোহী অবস্থায় নামায পড়াকালে তা তরক করাও মুবাহ। আর কিবলামুখী না হওয়া আরও অধিকভাবে জায়েয। কেননা কিবলামুখী হওয়ার চাইতেও অধিক পূর্ণ কাজ হচ্ছে রুকূ সিজদা করা। তাই সেই রুকূ-সিজদা তরক করাও যখন জায়েয, তখন কিবলামূখী হতে না পারলে তা ছাড়াই নামায পড়া অধিক মাত্রায় জায়েয হবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

যদি বলা হয়, বলা হয়েছে, আল্লাহ কোন অবস্থায়ই নামায পড়া ত্যাগ করার অনুমতি দেননি, বরং সর্বাবস্থায়ই নামায পড়ার আদেশ করেছেন। অথচ নবী করীম (স) খন্দকের যুদ্ধের দিন চার ওয়াক্তের নামায ত্যাগ করেছেন। এমনকি রাত হয়ে গেলে বিন্যাস অনুযায়ী চার ওয়াক্তের নামায কাযা করেছিলেন। তাতে ভয়কালে নামায তরক করার দলীল রয়েছে।

জবাবে বলা যাবে, আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে, ভয়কালে নামায পড়ার আদেশ। এর পূর্বে তার ফরযসমূহের উপর তাগিদ করা হয়েছে। কেননা তার উপর সংযোজিত হয়েছে 'তোমরা নামাযসমূহের সংরক্ষণ কর, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামায।' তার পরে তার তাগিদ বৃদ্ধি করে বলা হয়েছে ঃ 'তোমরা আল্লাহ্র জন্যে নীরব-অবনত হয়ে দাঁড়াও।' এতে চিরন্তন বিনয়নম্রতা স্থিতি ও কিয়াম রক্ষা করার আদেশ হয়েছে। তাতে এক অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে নড়াচড়া করতেও নিষেধ করা হয়েছে। তবে নামাযের মধ্যের রুকূ-সিজদা করার জন্যে তা করার অনুমতি আছে। যদি শুধু তা-ই করে, তাহলে তা জায়েয হবে। যেন ধারণাকারী এই ধারণা করতে পারে যে, এভাবেও নামায পড়া যেতে পারে। এরপর ভয়কালে ফরয নামায আদায় কারার হুকুমস্বরূপ বলা হয়েছে ঃ 'যদি তোমরা ভয় পাও, তাহলে দাঁড়িয়ে থাকা বা আরোহী হওয়া অবস্থায় এভাবে নামায পড়বে।' শরীয়াত পালনে বাধ্য কোন লোকই তা তরক করতে ওযর পেশ করে নি। যুদ্ধের অবস্থায় কি করা হবে, তা কিন্তু এখানে বলা হয়নি। কেননা ভয়ের সব অবস্থাই যুদ্ধকালীন অবস্থা নয়। শত্রুদের উপস্থিতিও ভয়ের কারণ বটে, যদিও তা যুদ্ধাবস্থা নয়। কাজেই আলোচ্য আদেশ কেবলমাত্র এ অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এটা যুদ্ধচলাকালীন আদেশ নয়। আর নবী করীম (স) খন্দকের যুদ্ধের দিন নামায পড়েন নি, কেননা তিনি এই দীর্ঘ সময়ব্যাপী যুদ্ধকাজে এতই ব্যস্ত হয়েছিলেন যে, নামায পড়ার সুযোগই হয়নি। যুদ্ধাবস্থা মানুষকে নামায থেকে বিরত রাখে, তা সর্বজনস্বীকৃত। এই কারণেই তো নবী করীম

(স) অসন্তুষ্ট হয়ে বদদো'আ করে বলেছিলেন ঃ 'কাফিররা আমাদেরকে সর্বোত্তম নামায পড়তে দেয়নি, তাই তুমি ওদের কবর ও ঘর-বাড়ি আগুনে ভরে দাও।'

হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ তাই বলেছেন, যুদ্ধাবস্থা নামাযকে নষ্ট করে।

যদি বলা হয়, নবী করীম (স) যে খন্দকের দিন নামায পড়লেন, তুমি তা অস্বীকার করতে পারনি। কেননা তখনও ভয়কালীন নামাযের আয়াত নাযিল হয়নি।

জবাবে বলা যাবে, ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ও আল-ওয়াকিদী সকলেই উল্লেখ করেছেন যে, 'যাতুর রিকা' যুদ্ধটি খন্দকের যুদ্ধের আগে সঙ্ঘটিত হয়েছিল। নবী করীম (স) সেই যুদ্ধকালে ভয়কালীন অবস্থায় নামায পড়েছিলেন। তা থেকে বোঝা গেল যে, নবী করীম (স) ভয়ের নামাযও ত্যাগ করেছিলেন খন্দকের দিন কেবল যুদ্ধের জন্যে। কেননা যুদ্ধ নামাযের সঠিকতাকে নষ্ট করে। তা নামায পরিপন্থী অবস্থা। আলোচ্য আয়াতকে দলীল বানিয়েছে তারা, যারা বলে যে, ভীত ব্যক্তির পক্ষেও নামায পড়া জায়েয— চলতে থাকা অবস্থায়ও, সে যদি কিছুর সন্ধানী হয়, তা হলেও। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ 'যদি তোমরা ভীত হও, তাহলে দাঁড়ানো অবস্থায় বা সওয়ার হয়ে থাকা অবস্থায়।' এটা সে অবস্থা নয়। কেননা তাতে চলাচল করার উল্লেখ নেই। তা সত্ত্বেও সন্ধানকারী ভীত নয়। কেননা সে যখন ফিরে আসবে, তখন সে ভয় তার থাকবে না। আর আল্লাহ সুবহানাহু তা জায়েয কারেছেন ভয় পাওয়া লোকের জন্যে। যখন সে অন্য কারোর দ্বারা কাঙ্ক্ষিত হবে, তখন সওয়ার হয়ে থাকা বা চলতে থাকা অবস্থায় নামায পড়া তার জন্যে জায়েয হবে।

তবে আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَاذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوااللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ -

তোমরা যখন ভয়মুক্ত হবে, তখন তোমরা আল্লাহ্‌র যিকির করবে— নামায পড়বে— ঠিক যেমন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, তা তোমরা আগে জানতে না।

আল্লাহ যখন ভয়ের অবস্থা সংক্রান্ত কথা বলে দিলেন এবং দাঁড়িয়ে বা আরোহী যে অবস্থায়ই সম্ভব নামায পড়ার আদেশ করলেন, এরপর যোগ করলেন শান্তিকালীন অবস্থা সংক্রান্ত হুকুম। বললেন ঃ 'যখন তোমরা ভয়মুক্ত হবে, তখন আল্লাহ্‌র যিকির কর .... 'এ থেকে প্রমাণিত হল যে, পূর্বে ভয়কালীন অবস্থায় যে হুকুম দেয়া হয়েছে, তা নামায পড়া সংক্রান্ত হুকুম। এ থেকে নামাযে যিকির ফরয প্রমাণিত হল। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে আল্লাহ্‌র এ কথা ঃ

فَاذْكُرُوااللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا -

অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র যিকির কর দাঁড়িয়ে থেকে ও বসা অবস্থায়।

এ কথাটিও তা দৃষ্টান্ত ঃ

وَذَكَرَاسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى -

এবং তার রব্ব-এর নাম স্মরণ করেছে। অতঃপর নামায পড়েছে।

এ কথাটিও ঃ

وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا -

এবং ফজরের কুরআন পাঠ। ফজরের কুরআন পাঠে নিশ্চয়ই ফেরেশতাদের পর্যবেক্ষিত।
(সূরা বনী-ইসরাঈল ঃ ৭৮)

এসব কথাবার্তা আল্লাহ্র একথা থেকে সূচিত ঃ 'তোমরা সকলে নামাযসমূহের সংরক্ষণ কর এবং বিশেষভাবে মধ্যম নামায।' এতে নামায কার্যটি সম্পাদনের আদেশ করা হয়েছে। তার ফরযসমূহ পুরাপুরিভাবে আদায় করতে বলেছে। তার শর্তসমূহ আদায় করতে বলেছেন, তার সীমাসমূহ রক্ষা করতে বলেছে আর আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমরা সকলে নীরব বিনয়ী হয়ে আল্লাহ্র জন্যে দাঁড়াও' আদেশ থেকে নামাযে কিয়াম ফরয করা হয়েছে। আর 'কুনূত' বলতে আনুগত্যও বোঝায়। কাজেই নামাযের সব কাজেই আনুগত্যমূলক হতে হবে। কোন কিছুই যেন তাতে বিঘ্নের সৃষ্টি করতে না পারে। কেননা 'কুনূত' হচ্ছে কোন কিছুর উপর স্থির ও স্থায়ী হয়ে থাকা। অতএব নামাযে কথা বলাও এর দ্বারা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। চলাচল করা, শুয়ে পড়া, পানাহার করা আর যেসব কাজ আল্লাহ্র প্রত্যক্ষ আনুগত্যের মধ্যে আসে না, তা সবই নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। কেননা ব্যবহৃত শব্দ এসব কথাই শামিল করে এবং যা যা আনুগত্যমূলক নয়, তা সবই নিষেধ করে। নামায সম্পর্কিত সব করতে বলে এবং নামায থেকে মনোযোগ অন্যদিকে আকৃষ্ট হয় যে যে কাজে, তা করতে নিষেধ করে। কেননা তাতে 'কুনূত' বিনষ্ট হয়ে যায়। সব সময় নম্র বিনয়ী ও চুপচাপ স্থিতির দাবি করে। মূল আয়াতে শব্দ কম হলেও নামাযের যাবতীয় কাজকে সুষ্ঠুরূপে করার আদেশ এবং বিপরীতধর্মী সব কাজের নিষেধ এতে রয়েছে। যিকিরসমূহ, সুন্নাতসমূহ সবই আদায় করতে হবে, আল্লাহ্র আনুগত্য নয়— এমন সব কাজ করতে নিষেধ— এরই অন্তর্ভুক্ত।

## মহামারী থেকে পলায়ন

আল্লাহ বলেছেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ -

তুমি কি বিবেচনা করে দেখেছ সেই লোকদের অবস্থা, যারা নিজেদের ঘর-বাড়ি-এলাকা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল মৃত্যুর ভয়ে— সংখ্যায় তারা কয়েক হাজার ছিল ? পরে আল্লাহ তাদেরকে বললেন ঃ 'তোমরা মর' অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে জীবিত করেছিলেন।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, তারা ছিল চার হাজার। তারা মহামারীর ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারা রক্ষা পায়নি, সকলেই মরে গিয়েছিল। এ সময় তাদের নিকট আল্লাহ্র একজন নবী পৌঁছে গিয়েছিলেন। তিনি আল্লাহ্র নিকট তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্যে দো'আ করেছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর দো'আ কবুল করে তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন।

আল-হাসান থেকেও বর্ণনা এসেছে, তারা মহামারী থেকে বাঁচবার জন্যে নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। ইকরামা বলেছেন, তারা যুদ্ধ থেকে পালিয়েছিল।

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, মহামারী থেকে তাদের পালিয়ে যাওয়া আল্লাহ্র পছন্দ হয়নি। কথাটি আল্লাহ্ এভাবেও বলেছেন ঃ

اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ -

মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করবে তোমরা যেখানেই থাক না কেন, এমনকি যদি সুদৃঢ় দুর্ভেদ্য দুর্গ প্রাকারের অন্তরালেও অবস্থান নাও তবুও। (সূরা নিসা ঃ ৭৮)

এভাবেও বলেছেন ঃ

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ -

বল, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালিয়ে বেড়াও, তা তোমাদের সাথে অবশ্যই সাক্ষাৎ করবে। (সূরা জুম'আ ঃ ৮)

এ-ও আল্লাহ্‌র কথা ঃ

قُلْ لَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِالْقَتْلِ -

বল, তোমরা যদি মৃত্যু কিংবা হত্যা থেকে পালিয়েও বেড়াও তবু তোমাদের এ পলায়ন তোমাদেরকে কোন ফায়দা— কোন কল্যাণ দেবে না। (সূরা আহ্‌যাব ঃ ১৬)

তিনিই বলেছেন ঃ

فَاِذَاجَآءَ اَجَلُهُمْ لَايَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ -

যখন তাদের নির্দিষ্ট মৃত্যুক্ষণ এসে যাবে, তখন এক মিনিট আগেও আসবে না, এক মিনিট পরেও না। (সূরা আ'রাফ ঃ ৩৪)

মৃত্যুক্ষণসমূহ সুনির্দিষ্ট। সময় বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ। তাতে অগ্রবর্তীকথাও হতে পারে না, হতে পারে না পরবর্তীকথাও। এটা আল্লাহ্ নির্ধারণ— তার এদিক-ওদিক হওয়া সম্ভব নয়। এ প্রেক্ষিতে বলতে হয়, মহামারী ইত্যাদি থেকে পালিয়ে যাওয়া আল্লাহ্‌র নির্ধারণ থেকে বাঁচতে চাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। বদফাল গ্রহণ, পাখি তাড়ানো বা রাশিফলের সন্ধান এসব কিছুই আল্লাহ্‌র নির্ধারণ থেকে পালিয়ে বেড়ানোর চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তা আদৌ সম্ভব নয়, তা থেকে নিষ্কৃতি লাভ এক অসম্ভব ব্যাপার।

আমর ইবনে জাবির আল-হাজরমী জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلْفِرَارُمِنَ الطَّاعُوْنِ كَالْفِرَارِمِنَ الزَّحْفِ وَالصَّابِرُ فِيْهِ كَالصَّابِرِ فِىْ الزَّحْفِ -

মহামারী থেকে পলায়ন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের মতই ব্যাপার। পক্ষান্তরে তাতে যে ধৈর্য ধরে অবিচল থাকবে, সে যুদ্ধক্ষেত্রে অবিচল থাকার মতই।

ইয়াহইয়া ইবনে আবূ কাসীর সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব সাঈদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَاعَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ، وَاِنْ تَكُنِ الطِّيَرَةُ فِىْ شَىْءٍ فَهِىَ فِىْ الْفَرَسِ وَالْمَرْاَةِ وَالدَّارِ، وَاِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُوْنِ بِاَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَهْبِطُوْا عَلَيْهِ، وَاِذَا كَانَ وَاَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوْا فِرَارًا عَنْهُ -

সংক্রামকথা নেই, বদফালিও নেই। বদফালি বলতে যদি কিছু থাকতই, তা হলে তা হতো ঘোড়ায়, নারীতে, ঘর-বাড়িতে। তোমরা যখন কোন স্থানে মহামারীর খবর পাবে যেখানে তোমরা নেই, তাহলে তোমরা সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়বে না। আর যদি মহামারী হয় যেখানে তুমি রয়েছ, তাহলে সেখান থেকে পালিয়ে চলে যাবে না।

উসামাতা ইবনে জায়দ (রা) নবী করীম (স) থেকে এ রকমের কথাই বর্ণনা করেছেন মহামারী সম্পর্কে। জুহরী আবদুল হামীদ ইবনে আবদুর রহমান-আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নওফল, ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর (রা) সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হয়েছেন। তিনি সার্গ নামক স্থানে পৌঁছলেন। তখন কিছুসংখ্যক ব্যবসায়ীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তারা বললেন, স্থানটি রোগাক্রান্ত। তিনি সঙ্গী মুহাজির ও আনসারদের সাথে পরামর্শ করলেন, তাঁরা একমত হতে পারলেন না। তখন হযরত উমর (রা) প্রত্যাবর্তনের সংকল্প করেন। তখন হযরত আবূ উবায়দাতা (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কেন আল্লাহ্র নির্ধারণ থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন ? তখন হযরত উমর তাঁকে বললেন, তুমি ছাড়া কথাটি অন্য কেউ বললে ভালো হতো। তবু তোমাকে বলছি, হে আবূ উবায়দা, আমরা আল্লাহ্র এক নির্ধারণ থেকে আর এক নির্ধারণের দিকে পালিয়ে যাচ্ছি। তুমি বিবেচনা করে দেখ, তোমার একটা উট আছে। তুমি তাতে সওয়ার হয়ে একটি উপত্যকায় অবতীর্ণ হলে। সেখানে তোমার সম্মুখে দুইটি ক্ষেত্র দেখতে পেলে। তার একটি উর্বরতাপূর্ণ আর অরপটি শুষ্কতা মরুবৎ। তখন তুমি যদি উর্বরতার ক্ষেত্রটি গ্রহণ কর, তাহলে সেটা কি আল্লাহ্র নির্ধারণ গ্রহণ করা হবে না ? আর তুমি যদি শুষ্ক-মরুবৎ ক্ষেতটি গ্রহণ কর, তাহলেও কি সেই আল্লাহ্রই তকদীর গ্রহণ করলে না ?

তখন সেখানে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমার নিকট ইলম রয়েছে, আমি রাসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ

اِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِيْ اَرْضٍ فَلَا تَقْدِمُوْا عَلَيْهِ، وَاِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ وَاَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ -

তোমরা যদি কোন স্থানে মহামারীর কথা শুনতে পাও, তাহলে সেখানে এগিয়ে যাবে না। আর তোমার স্থানেই যদি তা হয়, তাহলে সেখান থেকে পালিয়ে বেরিয়ে যাবে না।

এ হাদীস শুনে হযরত উমর (রা) আল্লাহ্র শোকর আদায় করলেন এবং ফিরে চললেন।

এ হাদীসে মহামারী থেকে পালিয়ে অন্যত্র চলে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। আর কোথাও হতে থাকলে সেখানে এগিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেও নিষেধ করা হয়েছে।

এ প্রেক্ষিতে কেউ যদি বলে, মৃত্যু যখন সুনির্দিষ্ট সময় ও স্থানের মধ্যে সীমিত, যা আগেও হবে না, পরেও হবে না, তাহলে যেখানে মহামারী রয়েছে, সেখানে এগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে নবী করীম (স) নিষেধ করলেন কেন ? অথচ সেখান থেকে বেরিয়ে যেতেও নিষেধ করেছেন শুরুতেই। অথচ সেখানে বাইরে থেকে যাওয়া ও সেখানে অবস্থান করার মধ্যে পার্থক্য তো কিছুই নেই।

জবাবে বলা যাবে, সেখানে যেতে নিষেধ করার কারণ হল যদি মহামারীর স্থানে বাইরে থেকে গিয়ে কেউ প্রবেশ করে, তাহলে সেখানেই যদি তার মৃত্যু সংঘটিত হয়, তাহলে কেউ বলতে পারে— তার মনে জাগতে পারে যে, সেখানে না গেলে তার মৃত্যু হতো না। সেখানে তো যেতে নিষেধ করা হয়েছিল। যেন পরে এই ধরনের কথা বলার প্রয়োজন না হয়, এ কারণেই আল্লাহ ইরশাদ করেছেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِى الْاَرْضِ اَوْكَانُوْا غُزًّى لَّوْكَانُوْا عِنْدَنَا مَامَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ۚ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ -

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা সেই কাফিরদের মত হইও না, যারা তাদের ভাইদেরকে যখন তারা বিদেশ ভ্রমণে বের হয়েছে, কিংবা যুদ্ধে শরীক হয়েছে (এবং কোন দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে) বলেছে, ওরা যদি আমাদের নিকট থাকত, তাহলে ওরা মরতো না, নিহতও হতো না। একথা বলা হল এ জন্যে যে, আল্লাহ এ ধরনের কথা-বার্তাকে তাদের মনের দুঃখের কারণ বানিয়েছেন।

এ কারণে নবী করীম (স) মহামারীর স্থানে বাইরে থেকে প্রবেশ করাকে পছন্দ করেন নি। কেননা হতে পারে যে, সেখানেই তার মৃত্যু ঘনিয়ে এল এবং জাহিল লোকেরা বলতে শুরু করল যে, সেখানে না গেলে তো মরতো না।

এ তাৎপর্যই পাওয়া যায় রাসূল (স) থেকে বর্ণিত হাদীসে। হাদীসটি এই ঃ

لَا يُوْرِدَنَّ ذُوْعَاهَةٍ عَلٰى مُصِحٍّ -

ক্ষয়রোগ সম্পন্ন ব্যক্তি যেন সুস্থ ব্যক্তির নিকট না যায়।

অথচ তিনি এ-ও বলেছেন, সংক্রমণ নেই, বদফালি নেই। তবু উপরোক্ত কথাটি বলার কারণ হল, কোন সুস্থ নিরোগ ব্যক্তির নিকট ক্ষয়রোগধারী ব্যক্তি গেলে এবং পরে সেই সুস্থ ব্যক্তির তেমন রোগ হলে হয়ত বলতে পারে যে, এ রোগ তার নিকট থেকে সংক্রমিত হয়েছে। সে না এলে তার এ রোগ হতো না।

রাসূলে করীম (স)-কে বলা হল ঃ হে রাসূল! ছাগলের পার্শ্বের তীব্রতা থেকেও ক্ষত হতে পারে। পরে তা উটকেও পেয়ে যায়। তখন নবী করীম (স) বললেন, তাহলে বল, প্রথম যাকে রোগ পেয়েছে, সেটা কিসের সংক্রমণ, তা কোত্থেকে এল ? হিসাম ইবনে উরওয়াতা তাঁর পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, যুবয়র (রা) মিসর জয় করলেন। তাঁকে জানানো হল যে, সেখানে মহামারী রয়েছে। তা সত্ত্বেও তিনি সেখানে প্রবেশ করলেন। বললেন, আমরা এ মহামারীর কারণেই এখানে এসেছি। এ-ও বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবূ বকর (রা) যখন সিরিয়ার দিকে সৈন্য প্রেরণ করলেন, তাদেরকে বিভিন্ন বাহিনীতে বিভক্ত করলেন এবং তাদের জন্যে দো'আ করলেন। বললেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَفْنِهِمْ بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُوْنِ -

মনীষিগণ এ কথাটির তাৎপর্য নির্ধারণে বিভিন্ন কথা বলেছেন।

কিছু সংখ্যক লোক বলেছেন, হযরত আবূ বকর (রা) যখন বাহিনীর লোকদের দৃঢ় মনোবলের, নির্ভুল দৃষ্টিভঙ্গী এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহসী উদ্যমশীল দেখতে পেলেন, তখন তিনি তাদের উপর ফিতনার ভয় পেলেন। তখন সিরিয়ার গোটা এলাকা মহামারীতে আক্রান্ত ছিল এবং সকলেরই জানা ছিল। তাই তিনি এটাই পছন্দ করেছেন যে, তাদের মৃত্যু সেই অবস্থায়ই হোক, যে অবস্থায় তারা রওয়ানা হয়েছিল এবং তা দুনিয়ার চাকচিক্য ও আরাম-আয়েশে নিপতিত হওয়ার আগেই।

কিন্তু অন্যান্যরা বলেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ فَنَاءُ أُمَّتِيْ بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُوْنِ 'আমার উম্মতের সাহাবীগণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হবে আঘাতে ও মহামারীতে।' সেই সাথে তিনি এ-ও জানিয়েছিলেন যে, বিভিন্ন দেশ শীগগীরই জয় হবে যাদের এ গুণ আছে সেই লোকদের দ্বারা। এ প্রেক্ষিতে দেখলে বলা যায়, হযরত আবূ বকর (রা) উক্ত কথা দ্বারা নিজের এ বাসনা ব্যক্ত করেছেন যে, এ বাহিনীর লোকেরা ঠিক তা-ই হোক, নবী করীম (স) যাদের উল্লেখ করেছেন তাঁর উক্ত কথায়। তাদের অবস্থা সম্পর্কেই তিনি সংবাদ দিয়েছেন। এ কারণে আবূ উবায়দাতা (রা) সিরিয়া থেকে বাইরে চলে যাওয়ার আহ্বানে সাড়া দেন নি।

হযরত মুয়ায (রা) বলেছেন, সিরিয়ায় যখন মহামারী শুরু হয়ে গেল, তিনি তখন সেখানেই ছিলেন। তিনি দো'আ করেছিলেন এই বলে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَقْسِمْ لَنَا حَظًّا مِنْهُ -

হে আমাদের আল্লাহ! তার একটা ভাগ আমাদের দাও।

পরে তাঁর নিজের হাতে প্লেগ লেগে গেল, তিনি তা চুম্বন করতেন এবং বলতেন, এর কারণে আমার এই-এই সুবিধা হয়েছে। আরও বলেছেন, আমি যদি অল্প বয়সের হতাম, কেননা, আল্লাহ বহু অল্প বয়সের লোককে বরকত দিয়ে থাকেন। কিংবা অনুরূপ কোন কথা বলেছিলেন, যদ্দারা তিনি মহামারী রোগের কামনা করেছেন, যেন তিনি সেই গুণের অধিকারী হতে পারেন, যে গুণের জন্যে নাবী করীম (স) তাঁর উম্মতকে অভিহিত করেছেন, যাদের দ্বারা আল্লাহ্ দেশের পরে দেশ জয় করাবেন এবং ইসলামকে বিজয়ী ও প্রকাশমান বানিয়ে দেবেন।

উক্ত আয়াতে এ প্রমাণ রয়েছে যে, যারা কবর আযাব হবে না বলে দাবি করে, তাদের এ দাবি বাতিল। তাদের যুক্তি হচ্ছে কবর আযাব মানলে পূনর্জন্ম মানতে হয়। কেননা উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ এ খবর-ও দিয়েছেন যে, তিনি লোকদেরকে মৃত্যু দিয়েছিলেন, পরে আবার তাদেরকে জীবিত করেছিলেন। কবরেও তেমনি পুনর্জীবন দেবেন এবং তাদেরকে আযাব দেবেন যদি তা তাদের জন্যে সাব্যস্ত হয়। আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَقَاتِلُوْا سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ -

এবং তোমরা যুদ্ধ কর আল্লাহ্‌র পথে এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ সর্বশ্রোতা— সর্বজ্ঞ।

এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করার আদেশ। আয়াতটি অস্পষ্ট, ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কেননা, আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্‌র পথের কোন পরিচিতি বা বিবরণ দেয়া হয়নি। যদিও অপরাপর আয়াতে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সে আলোচনা যখন আসবে, তখন আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব।

আল্লাহ্র কথা ঃ

مَنْ ذَاالَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً -

যে লোকই আল্লাহ্কে করযে হাসানা দেবে, আল্লাহ তাঁকে বহু গুণ বেশি ফিরিয়ে দেবেন।

এ হচ্ছে পুণ্যশীলতা ও আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার আহ্বান। এতে অতীব মাধুর্যপূর্ণ কথা প্রয়োগ করা হয়েছে। এ ব্যয়কে 'ফরয' বলা হয়েছে সওয়াব পাওয়ার অধিকার প্রমাণের তাগিদ বোঝাবার জন্যে। কেননা 'ফরয' হলেই তার বিনিময় প্রয়োজন।

ইয়াহুদীরা ভুলে গিয়েছিল অথবা ভুলে যাওয়ার ভান করেছিল—কি কারণে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। ওরা তাই বলল, আল্লাহ আমাদের নিকট করয চান। কেননা আমরা ধনী লোক, তিনি দরিদ্র, আমাদের প্রতি মুখাপেক্ষী। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ -

যারা বলেছে যে, আল্লাহ্ দরিদ্র, আমরাই ধনশালী, তাদের কথা আল্লাহ্ শুনতে পেয়েছেন।

কিন্তু মুসলমানগণ আল্লাহ্র উপরোক্ত আয়াতের গভীর তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত সওয়াবের উপর দৃঢ় প্রত্যয়শীল হয়েছিলেন। তাই তাঁরা অবিলম্বে দান-সাদ্কার কাজ শুরু করেছিলেন। তাই বর্ণিত হয়েছে, আলোচ্য আয়াতটি যখন নাযিল হয়েছিল, তখন আবুদ্দাহ্দাহ (রা) নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। বললেন ঃ হে রাসূল! ভেবে দেখেছেন, আল্লাহ্ আমাদের নিজেদের ভোগ ব্যবহারের জন্যে যা দিয়েছেন, তা তিনি আবার আমাদের নিকট থেকে 'করয'; বাবদ চাচ্ছেন ? আমাদের দুই খণ্ড জমি আছে, তার এক খণ্ড উঁচুতে আর অপর খণ্ড নীচুতে। এক খণ্ডের মধ্যে যে যেটি সর্বোত্তম তা আমি সাদকা করে দিলাম।

আল্লাহ্র কথা ঃ

اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا قَالُوْٓا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا -

আল্লাহ্ নিশ্চিতভাবে তোমাদের জন্যে তালুতকে বাদশাহ রূপে পাঠিয়েছেন। লোকেরা বলল, আমাদের উপর বাদশাহী হবে কোত্থেকে কেমন করে ?

আয়াত থেকে বোঝা গেল, 'ইমামত' জনগণের উপর দ্বীনী নেতৃত্ব উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ জিনিস নয়। কেননা আল্লাহ অগ্রাহ্য করেছেন তা, যা তারা মানতে অস্বীকার করেছে। তা হল তাদের উপর মালিকত্ব বাদশাহী তো তার হতে পারে না যে নবী-বংশের লোক, না বাশাহ্র বংশধর। আল্লাহ বলে দিলেন যে, জনগণের উপর দ্বীনী নেতৃত্ব ইলম ও শক্তির দৌলতে হবে, বংশানুক্রমে হবে না। আয়াতটি থেকে এ-ও প্রমাণিত হয় যে, ইলম ও মানসিক গুণ বৈশিষ্ট্যের কোন সম্পর্ক বংশধারার সাথে নেই। তা তো আল্লাহ্র তরফ থেকে দেয়া হয়। কেননা আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি তালুতকে লোকদের উপর ইমাম বাছাই-পছন্দ করে নিয়োজিত করেছেন। তার ইল্ম ও শক্তির গুণের কারণে, যদিও লোকেরা বাংশের দিক দিয়ে তার তুলনায় অনেক উত্তম ও আশরাফ। তালুতের পরিচিতিস্বরূপ আল্লাহ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ 'ইলমে বিশালতা ব্যাপকতার সঙ্গে সঙ্গে وَالْجِسْمِ 'এবং দেহে'-ও বলে তার শক্তির বৈশিষ্ট্য ও অগ্রসরতার কথা

বুঝিয়েছেন। কেননা এটা সাধারণত স্বীকৃত যে, যে লোক দৈহিকভাবে বড়, সে শক্তিতে অধিক। তাতে শক্তিহীন দৈহিক বিরাটত্ব বোঝাতে চাওয়া হয়নি। কেননা যার শক্তি নেই, তার পক্ষে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা নেই। বরং সে বিরাট দেহ তার জন্যে এক দুর্বহ বোঝা বৈ আর কিছু নয়— তার বিপুল শক্তি নেই বলে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهُ مِنِّىْ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ -

যে নদী থেকে পান করছে সে আমার পক্ষের নয়। আর যে তা আস্বাদন করবে না— একটি হুকুম ছাড়া— সে আমার পক্ষের।

এ আয়াত থেকে বোঝা গেল, নদী থেকে পান করার অর্থ, নদীতে চুমুক দেয়া, তার উপর ওষ্ঠ নিবদ্ধ করা। কেননা এ পান করাটা ছিল নিষিদ্ধ, নিষিদ্ধ ছিল তার স্বাদ গ্রহণ। তবে কেউ যদি হাতে তুলে কিছুটা পান করে নেয় তা নিষিদ্ধ নয়। এ কথা ইমাম আবূ হানীফার কথার সঠিকত্ব প্রমাণ করে। তিনি বলেছিলেন, যদি কেউ বলে, তুমি যদি ফুরাত নদী থেকে পান কর, তা হলে আমার দাস মুক্ত। সে লোক তাতে চুমুক দিতে পারে যদি সে হাতে তুলে পান করে বা কোন পাত্রে তুলে পান করে, তাহলে সে কিরা ভঙ্গকারী হবে না। কেননা আল্লাহ্‌ তো নদী থেকে পান করতে নিষেধ করেছেন। আর সেই সাথে স্বাদ গ্রহণ করতেও নিষেধ করেছেন। তবে এক অঞ্জলী পরিমাণকে রুখসত দিয়েছেন। তাই পানি পান তেমনি নিষিদ্ধ থাকল, যেমন ছিল। বোঝা গেল, অঞ্জলীতে তুলে পান করলে তা নিষিদ্ধ পানের মধ্যে গণ্য হবে না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

لَااِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ -

দ্বীনে কোন জোর প্রয়োগ নেই। হেদায়েতের পথ গুমরাহী থেকে আলাদা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠেছে।

দহাক, সুদ্দী, সুলায়মান ইবনে মূসা বলেছেন, এই আয়াতটি মনসূখ হয়ে গেছে এ আয়াতটি দ্বারা ঃ

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَوَالْمُنَافِقِيْنَ -

হে নবী! তুমি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর। (সূরা তওবা ঃ ৭৩)

এবং এ আয়াতটি দ্বারা ঃ

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ -

অতএব তোমরা মুশরিকদের হত্যা কর। (সূরা আত্-তওবা ঃ ৫)

আল-হাসান ও কাতাদাতা বলেছেন, 'দ্বীনে জোর প্রয়োগ নেই' কথাটি বিশেষভাবে সেই আহ্‌লি কিতাব লোকদের বেলায়, যারা জিযিয়া দিতে প্রস্তুত হবে। আরবের সাধারণ মুশরিকদের বেলায় এ কথা নয়। কেননা তারা বশ্যতা স্বীকার করে জিযিয়া দিতে রাজী হয়নি। তাদের নিকট থেকে হয় ইসলাম কবুল নিতে হবে, না হয় তরবারির আঘাত তাদের উপর পড়বে।

কেউ কেউ বলেছেন, উক্ত আয়াতটি কোন কোন আনসার লোকের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল। তারা ইয়াহুদী ছিল। তাদের বাপ-চাচারা নিজেরা ইসলাম কবুল করার পর তাদের সে সব পুত্রদেরকে জোরপূর্বক মুসলিম বানাতে চেয়েছিলেন। একথা ইবনে আব্বাস ও সাঈদ ইবনে যুবায়র থেকে বর্ণিত। এ পর্যায়ে এ-ও বলা হয়েছে যে, উক্ত আয়াতের অর্থ হল, যুদ্ধের পরে যারা ইসলাম কবুল করেছে তাদের সম্পর্কে বল না যে, জোর-জবরদস্তির ফলে তারা ইসলাম কবুল করেছে। কেননা তারা ইসলাম কবুল করতে রাজী হয়েছিল। তার ফলেই তাদের ইসলাম গ্রহণ সঠিক হয়েছে। অতএব তারা জোর প্রয়োগের ফলে মুসলিম হওয়া লোক নয়।

আবূ বকর বলেছেন ঃ لَاإِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ 'দ্বীনে জোর প্রয়োগের অবকাশ নেই।' এটি সংবাদ দানরূপে বলা কথা। কিন্তু মূলত একটি আদেশ। এটা সম্ভব যে, আয়াতটি মুশরিকদের বিরুদ্ধে করার আদেশ নাযিল হওয়ার পূর্বে এ আয়াত নাযিল হয়েছিল। ফলে তখন সে কথা সব কাফির সম্পর্কেই প্রয়োগীয় ছিল। যেমন আল্লাহ্‌র এই কথাটি ঃ

اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ -

প্রতিরোধ কর সেই পন্থায় যা অতীব উত্তম। তাহলে তোমার ও যার মধ্যে শত্রুতা আছে, সে সহসাই অতীব উষ্ণ বন্ধুতে পরিণত হবে। (সূরা হা-মিম-আস সিজদা ঃ ৩৪)

যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ -

উত্তম প্রন্থা দ্বারা দোষ-খারাবীর প্রতিরোধ কর। (মুমিনুন ঃ ৯৬)

অন্যত্র তিনি বলেছেন ঃ

وَجَادِ لْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ -

এবং যা অতীব উত্তম পন্থা, তদ্দারা বিরোধীদের সাথে মুকাবিলা কর। (সূরা নহল ঃ ১২৫)

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا -

যখন তাদেরকে মূর্খ লোকেরা সম্বোধন করে, তখন তারা বলে সালাম।(সূরা ফুরকান ঃ ৬৩)

ইসলামের প্রথম দিকে যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল। শেষ পর্যন্ত কাফিরদের প্রতি ইসলাম পেশ করার কাজটি যখন সম্পূর্ণ হয়ে গেল, নবীর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হল, তারপরও যখন তারা শত্রুতা করতে থাকল, তখন মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হল তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে। তখন 'দ্বীনের জোর প্রয়োগ করার অবকাশ নেই' কথাটি আরবের মুশরিকদের বেলায় মনসূখ হয়ে গেল। আয়াত নাযিল হল ঃ

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ -

মুশরিকদের যেখানেই পাবে, হত্যা করবে। (সূরা আত্-তওবা ঃ ৫)

মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুম সম্বলিত আরও বহু আয়াত রয়েছে। তাই উক্ত আয়াতের প্রয়োগ কেবলমাত্র আহলি কিতাবের সাথে থেকে গেল অর্থাৎ দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে

তাদের উপর কোন জোর প্রয়োগ করা যাবে না। আর আহলি কিতাবদেরকেও নিষ্কৃতি দেয়া হবে তখন, যদি তারা বশ্যতা স্বীকার করে জিযিয়া দিতে রাজী হয়। তখন তারা মুসলমানদের যিম্মী হয়ে থাকবে। ইসলামের শাসনাধীন হবে।

এ কথার হাদীসী প্রমাণ হচ্ছে, নবী করীম (স) নিজে আরবের মুশরিকদের নিকট থেকে ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করতে প্রস্তুত হন নি। তা নাহলে তাদের উপর তরবারি চালিয়েছেন। আর উক্ত আয়াতটির হুকুম সমস্ত কাফিরের উপরও প্রয়োগযোগ্য হতে পারে। কেননা মুশরিক মাত্রই হয় ইয়াহুদী, না হয় খ্রীস্টান। ফলে তাদের উপর ইসলাম কবুল করার জন্যে জোর করা যাবে না। তারা নিজেদের ধর্মই পালন করতে থাকবে, তবে জিযিরা দিতে রাজী হয়ে। আর যে লোক-ই আহ্লি কিতাবের কোন দ্বীন পালনে স্থির থাকবে, তখন তাদের সম্পর্কে 'জোর করা যাবে না দ্বীনের ব্যাপারে' এ নীতির প্রয়োগ সম্ভব, তখন তাতে ইমাম শাফেয়ীর মত বাতিল প্রমাণিত হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, মজুসীদের যারা ইয়াহুদী হবে বা খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণ করবে, তাদেরকে তাদের আগের ধর্মে ফিরে যেতে অথবা ইসলাম কবুল করতে বাধ্য করতে হবে। কিন্তু কুরআনের আয়াত এ মত সমর্থন করে না। কেননা আগেই যেমন বলেছি, আমরা উক্ত আয়াতের প্রেক্ষিতে কাউকেই কোন ধর্ম গ্রহণ বা বর্জনে বাধ্য করতে পারি না। এটা একটা সাধারণ কথা। সব কাফিরকেই এর আওতায় গণ্য করা সম্ভব সেইভাবে, যা উপরে বলেছি।

কেউ যদি প্রশ্ন তোলেন, তাহলে আরবের যে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে রাসূলে করীম (স) আদেশ করেছেন এবং তাদের নিকট থেকে ইসলাম অথবা তরবারি ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করা হবে না বলে ঘোষণা করেছেন, তার অর্থ তো এই যে, তাদেরকে দ্বীন গ্রহণে ব্যাধ্য করাই হল। আর জানা-ই আছে যে, দ্বীন ইসলামে প্রবেশ করতে যে লোক বাধ্য হবে, সে প্রকৃত মুসলিম নয়। তাহলে আরবের মুশরিকদের সে জন্যে বাধ্য করার কারণটা কি ?

জবাবে বলা যাবে, তাদেরকে ইসলাম প্রকাশ করতে বাধ্য করা হবে, আকীদা হিসেবে ইসলামের প্রতি বিশ্বাসী বানানো নয়। কেননা জোর করে কারোর মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করা যায় না। এই জন্যে নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

أُمِرْتُ اَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوالَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَاِذَا قَالُوْهُ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَ هُمْ وَاَمْوَا لَهُمْ اِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَا بُهُمْ عَلَى اللّٰهِ -

আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলবে। তা যদি তারা বলে তা হলে তারা তাদের রক্ত ও ধন-মালকে আমাদের থেকে রক্ষা করতে পারল। তবে তার উপর কোন হক ধার্য হলে ভিন্ন কথা। তবে তাদের হিসাব আল্লাহ্র কাছে।

নবী করীম (স) জানিয়ে দিলেন যে, কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কেবলমাত্র ইসলামের প্রকাশের জন্যে। তারা অন্তঃমুখে জাহির করুক যে, তারা আল্লাহ্র প্রতি অনুগত। কিন্তু প্রকৃত হৃদয়গত বিশ্বাস, তা সৃষ্টি করা একমাত্র আল্লাহ্র পক্ষেই সম্ভব, তা তাঁরই নিকট সোপর্দ। নবী করীম (স) লোকদের সম্মুখে দ্বীন-ইসলামের অকাট্যতা প্রমাণ না করেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন নি। তার পূর্বে তিনি ইসলামকে পূর্ণভাবে যৌক্তিকথা সহকারে লোকদের

সামনে পেশ করতেন, তাঁর নবুয়তের সত্যতাকে স্পষ্ট প্রতিভাত করে তুলতেন। এসব দলীল-প্রমাণ এক সাথে আকীদা সৃষ্টি ও ইসলামের প্রকাশ ও বিজয় সাধারণের লক্ষ্যে নিবদ্ধ হতো। কেননা এসব দলীল-প্রমাণ, যা তাদের মনে ইসলামের প্রতি বিশ্বাস জাগাত, তার ফলে ইসলামের প্রকাশও হয়ে যেত। আর যুদ্ধ ছিল ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় সাধনের জন্যে। তাতে আরও বড় বড় কল্যাণও নিহিত ছিল। তন্মধ্যে এও একটি যে, তারা যদি বাহ্যিকভাবে ইসলামের প্রকাশ করত তার প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস না থাকা সত্ত্বেও, তাহলে মুসলমানদের সাথে তাদের উঠাবসা ও কুরআন শ্রবণ করা সম্ভব হতো। তারা রাসূলে করীম (স)-এর সত্যতার বাস্তব পর্যবেক্ষণও করতে পারত। সেই সাথে অব্যাহতভাবে চলছিল ইসলামের দিকে তাদেরকে দাওয়াত দেয়ার কাজ। তাতে তাদের আকীদার ভুল-ত্রুটি তাদের নিকটই স্পষ্ট হয়ে যেত। সেই সাথে এ-ও চলত যে, আল্লাহ্ তাদেরকে জানাতেন যে, তাদের বংশের মধ্যে এমন এমন লোক আছে, যারা তওহীদী আকীদার প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করে। ফলে তাদেরকে হত্যা করা জায়েয হতো না। কেননা একথা জানা ছিল যে, তাদের সন্তানদের মধ্যে তওহীদী ঈমান গ্রহণকারী হবে।

যিম্মীদের মধ্যে কাউকে ঈমান গ্রহণের জন্যে জোরপূর্বক বাধ্য করা হলে বাহ্যিকভাবে তারা মুসলিম হবে এবং তাদেরকে তাদের পূর্ব ধর্মে ফিরে যেতে দেয়া হবে না। তবে তারা যদি সে দিকে ফিরে যায়, তা হলে তাদেরকে হত্যা করা হবে না। হত্যা ছাড়াই তাদেরকে মুসলিম থাকতে বাধ্য করা হবে। কেননা তারা ইসলাম কবুল করলে জোর প্রয়োগের কারণে ইসলামের হুকুম তাদের থেকে দূর হবে না, যদিও তারা ইসলামে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছে বলে তাদের অন্তরে বিশ্বাস নেই বলে বোঝা যায়। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন, যুদ্ধের কারণে মুশরিকদের মধ্য থেকে যদি কেউ ইসলাম কবুল করে, তবে সে মুসলিম গণ্য হবে।

রাসূল (স)-এর উপরোদ্ধৃত হাদীসটিতে যুদ্ধকালে ইসলাম প্রকাশ করলে তাকে মোটামুটি ইসলাম ও মুসলিম মেনে নিয়েছেন। যিম্মীদের মধ্যে যাকে ইসলাম কবুল করতে বাধ্য করা হবে, তাকেও। সেও কার্যত মুসলিম হবে, সন্দেহের কারণে তাদেরকে হত্যা করা হবে না। যুধ্যমান লোকদের মধ্য থেকে কোন বন্দী যদি হত্যা করতে চাওয়া হয় এবং তখনই সে ইসলাম কবুল করে, সেও মুসলিম গণ্য হবে। সে ভয়ের কারণে ইসলাম কবুল করেছে এ কারণে ইসলামের হুকুমটা তার থেকে দূর করে দেবে না। এ ধরনের জোর প্রয়োগও যদি নিষিদ্ধ হয়, তাহলে তার মুসলিম না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। তার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক না হওয়ারই কথা। এক্ষেত্রে যিম্মীর অবস্থা যুধ্যমানের অবস্থার মত হবে না। কেননা যুধ্যমান ব্যক্তিকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা যেতে পারে। কেননা তার বাপ-চাচা যিম্মী হয়ে আছে। আর যে লোক যিম্মী হবে, তাকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে জোরপূর্বক বাধ্য করা যাবে না।

জবাবে বলা যায়, এ কথা যখন প্রমাণিত যে, জোর প্রয়োগ হলেও এবং বাধ্য করা হলেও— যার উপর জোর প্রয়োগ করা যায়, যাকে বাধ্য করা যায়— তার হুকুমটা ভিন্ন রকমের হবে না। এ দিক দিয়ে তার সাথে সাদৃশ্য সম্পন্ন ব্যাপার হচ্ছে দাস মুক্তকরণ ও তালাক দান। আর যে সব কাজে তার যথার্থতা ও অর্থহীনতার হুকুম ভিন্নতর হয় না সে সব ব্যাপার। তার পরে জোর প্রয়োগ আদিষ্ট ও মুবাহ হলেও তা ভিন্নতর হবে না— যেমন দাস মুক্তকরণ ও তালাক এ ব্যাপারে ভিন্নতর হয় না। কেননা কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির উপর যদি জোর প্রয়োগ করে তাকে

বাধ্য করে তালাক দিতে বা দাস মুক্ত করতে তাহলে এ দুটি কাজের হুকুম প্রমাণিত ও কার্যকর হবে। আর জোর প্রয়োগকারী যদি জালিম লোক হয়, তার এই জোর প্রয়োগে এবং এ কাজ করতে তাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও দাসমুক্তি ও তালাকের হুকুমটা বাতিল হয়ে যাবে না। এটা হানাফী মাযহাবের মত। ইসলাম গ্রহণের জন্যে জোর প্রয়োগের ব্যাপারটিও অনুরূপ।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اَلَمْ تَرَاِلَى الَّذِىْ حَاجَّ اِبْرَاهِيْمَ فِىْ رَبِّهٖ اَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ -

তুমি কি বিবেচনা করেছ সেই ব্যক্তির ব্যাপার, সে ইবরাহীমের সাথে তার রব্ব-এর বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করেছিল এ কারণে যে, আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন?

আবূ বকর বলেছেন, কোন কাফিরকে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে রাজত্ব দান কেবলমাত্র সম্পদের বিপুলতার কারণে ও অবস্থার প্রশস্ততা ও ব্যাপকথার কারণে। কাফিরদের প্রতি দুনিয়ায় এই রূপ-নিয়ামত দান আল্লাহ্‌র নীতি-বিরুদ্ধ নয়। এ ব্যাপারে মুমিন ও কাফিরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এখানে আল্লাহ্‌র এ কথাটিও বিবেচ্য, ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَانَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا -

যে লোক এ দুনিয়ায় তাৎক্ষণিক ফল পেতে চাবে, আমরা তাকে তাৎক্ষণিক ফল হিসেবে যা চাবো ও যাকে চাবো দেব। পরে তার জন্যে জাহান্নামও নিশ্চিত ও ত্বরান্বিত করব, সে সেখানে নিন্দিত ও ধিকৃত হয়ে প্রবেশ করবে। (সূরা বনী-ইসরাঈল ঃ ১৮)

এটা এক ধরনের রাজত্ব বা বাদশাহী দান। তা আল্লাহ কাফিরকেও দিতে পারেন, দিয়ে থাকেন। কিন্তু যে রাজত্ব বা বাদশাহীতে আদেশ-নিষেধ করার কর্তৃত্ব দান এবং লোকদের ব্যাপারাদির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিহিত, তা কাফির ও পথভ্রষ্ট ব্যক্তিকে দেয়া আল্লাহ্‌র নীতি-বিরুদ্ধ। কেননা আল্লাহ্‌র আদেশসমূহ ও শাস্তি-দণ্ডসমূহ তো সৃষ্টিকূলের কল্যাণ সাধনের জন্যে, তাই যে লোক নিজেই ফাসাদের উপর দাঁড়িয়ে, কল্যাণময় কাজ পরিহারকারী, তাকে আল্লাহ রাজত্ব ও কর্তৃত্ব দেবেন না। কেননা কাফির-গুমরাহ ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাঁর দ্বীনের নেতৃত্ব সাধারণত দেন না। যেমন অপর আয়াতে আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ لَايَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ — 'জালিম লোকেরা আমার প্রতিশ্রুত দায়িত্ব পেতে পারে না।' ইবরাহীম (আ)-এর সাথে যে লোক তর্কে লিপ্ত হয়েছিল, সে ছিল নমরূদ ইবনে কিন'আন। সে ইবরাহীম (আ)-কে তাঁর অধীনতা ও অনুসরণ গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছিল। তাঁকে সে এ যুক্তি দিয়েছিল যে, সে তো বাদশাহ, ক্ষতি করা বা উপকার করার নিরংকুশ ক্ষমতা তার আছে। ইবরাহীম (আ) বলেছিলেন ঃ 'আমার রব্ব তো বাঁচায় ও মারে। তুমি তা পার না। ইবরাহীম (আ)-এর এই যুক্তির যে মূল কথা, নমরূদ তার জবাব দিতে না পেরে ভিন্ন দিকে চলে গেল। কেননা ইবরাহীম (আ)-এর বক্তব্য ছিল, দ্বীন, মৃত্যু যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি-ই তাঁর রব্ব। তিনি তা সম্পূর্ণ নতুনভাবে পূর্ণ দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকেই করেন। নমরূদ দুজন ব্যক্তিকে ডেকে নিল। তাদের একজনকে সে হত্যা করল। আর বলল, আমি ওকে মৃত্যু দিলাম। আর অপর জনকে ছেড়ে দিল। বলল, আমি ওকে জীবন দিলাম। যদিও প্রকৃত মৃত্যুদান ও জীবন দানের কোন ক্ষমতাই

তার নেই। সেকথা তার নিজের অজানা ছিল না। তাই তার খোদায়ীর এ অর্থহীন প্রমাণ যখন প্রতিভাত হয়ে গেল এবং কাফির নমরূদ ইবরাহীম (আ)-এর উপস্থাপিত প্রমাণের অধিক শক্তিশালী প্রমাণ পেশ করে তার মুকাবিলা করতে অক্ষম হয়ে গেল। সে যা করল, তা দিয়ে উপস্থিত জনতাকে সম্মোহিতও করতে অক্ষম থেকে গেল। কাফির ব্যক্তি নিজেই বুঝেছিল যে, সে যা করেছে, তা ইবরাহীম (আ)-এর যুক্তির জবাব হয়নি। অবশ্য সে তার সঙ্গীদেরকে অভিভূত করতে চেয়েছিল মাত্র। যেমন ফিরাউন করেছিল। মূসা (আ) যষ্ঠি নিক্ষেপ করলে তা যাদুকরদের নিক্ষেপিত সব রশি-লাঠিকে গিলে ফেলল। লোকেরা জেনে গেল যে, সে যষ্ঠিতে কোন যাদু ছিল না। তা ছিল স্বয়ং আল্লাহ্‌র কাজ। তখন ফিরাউন উপস্থিত লোকদেরকে ভিন্নভাবে সম্মোহিত করতে চাইল। সে বলল, এটা একটা ষড়যন্ত্র। তোমরা এখানে এই ষড়যন্ত্র করেছ এখানকার অধিবাসীদেরকে এখান থেকে বহিষ্কৃত করার মতলবে। অন্য কথায়, তোমরা সব মূসার পক্ষে চলে গেছ। তার সঙ্গে জোট বেঁধেছ এর পূর্বে। তাই তোমরা মুকাবিলার ময়দানে এসে তার সাথে মুকাবিলা করার অক্ষমতা দেখাচ্ছ। তার প্রতি তোমরা ঈমান এনেছ। ফিরাউনের এ কথাগুলোও ছিল তার সঙ্গীদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করার উদ্দেশ্যে।

ইবরাহীম (আ)-এর সাথে ঝগড়াকারী কাফির নমরূদও তা-ই করেছিল। কিন্তু ইবরাহীম (আ) তাকে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। পরে তিনি এমন যুক্তি উপস্থাপিত করলেন যার মুকাবিলা করার কোন সাধ্যই নমরূদের ছিল না।

তিনি বললেন ঃ

فَانَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ -

আল্লাহ্ তা'আলা সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদয় করেন, তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদয় কর .....।

কিন্তু এর কোন জবাবী প্রমাণ পেশ করার কোন সাধ্য নমরূদের ছিল না। যুক্তি উপস্থাপনের পরম্পরা ছিন্ন হয়ে গেল। তার পক্ষে জবাব দেয়াই শুধু সম্ভব হল না তা-ই নয়, লোকদের মনে কোনরূপ সংশয় সৃষ্টি করারও কোন সাধ্য তার থাকল না।

ইবরাহীম (আ)-এর এই যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। স্পষ্ট ও অকাট্য দলীল। এর অন্তর্নিহিত গভীর তাৎপর্য বুঝতে হবে। তা এই যে, যে জনগোষ্ঠীর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে নবী করে পাঠিয়েছিলেন, ওরা ছিল সাবেয়ী ধর্মাবলম্বী, মূর্তিপূজারী, সে মূর্তিগুলো ছিল সাতটি নক্ষত্রের নামে নির্মিত। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র তাদের সম্পর্কে বলেছেন যে, ওরা দেবতাদের উপাসক ছিল। আল্লাহ্‌কে স্বীকার করত না। তারা মনে করত, এই বিশ্বলোকের যাবতীয় ঘটনা, সপ্ত নক্ষত্রের গতি-বিধি, তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় সূর্য— তার ও সমগ্র নক্ষত্রের তারা নামকরণ করেছিল 'ইলাহ'। সূর্য তার মধ্যে বড় 'ইলাহ'— তার উপর আর কোন ইলাহ নেই, মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌কে তারা স্বীকারই করত না। তারা এবং আর যারাই নক্ষত্রসমূহের গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত— এ ব্যাপারে একমত যে, সূর্য ও নক্ষত্রসমূহের দুটি গতি আছে বিপরীতমূখী। তার একটি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে। এই গতি সূর্য ও নক্ষত্রের একান্ত নিজস্ব। আর দ্বিতীয়টি হল, তার কক্ষসমূহকে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে চালিত করা। এই গতির ফলেই দুনিয়ায় রাত্র ও দিনে একবার আবর্তন ঘটে। অভিজ্ঞ মহলের নিকট এই ব্যাপারটি চূড়ান্ত।

ইবরাহীম (আ) তাকে বললেন, তুমি তো স্বীকার কর যে, তোমরা যে সূর্যের পূজা-উপাসনা কর, যাকে তোমরা ইলাহ বলছ, তার একটা গতি ও নড়-চড় আছে বাধ্যতামূলকভাবে। সেটা তার নিজের গতিশীলতা নয়, বরং অন্যান্য সবকিছুকে তা গতিশীল করে। তাই সেই সবকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে গতিশীল বানায়। আর আমি যার ইবাদত করার জন্যে তোমাকে আহ্বান করছি, তিনি সূর্যের এ গতি সৃষ্টি করেন। সূর্য যদি ইলাহ হতো, তা হলে অন্য কারোর দ্বারা চালিত হতো না। চলতে বাধ্যও হতো না।

কিন্তু এই যুক্তি ও প্রমাণের কোন জবাব দেয়া নমরূদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ ব্যাপারে জনমনে কোন সন্দেহ সৃষ্টি করাও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সম্ভব হয়নি এর প্রতিরোধ করা। তাই সে শুধু এ কথাই বলতে পারল ঃ

حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِيْنَ -

তোমরা যদি এখন কিছু করতেই যাও, তা হলে ইবরাহীমকে আগুনে জ্বালাও এবং তোমাদের ইলাহদের সাহায্যে এগিয়ে এস।

সূর্যের এই দুটি বিপরীতমুখী গতিশীলতা— সেই সাথে অন্যান্য নক্ষত্রের গতিবিধি ঠিক একই সময় পাওয়া যায় না। কেননা একই সময় একই অবয়বে হওয়া সম্ভব না। কিন্তু দুটির একটি অনিবার্যভাবে বিপর্যস্ত হতে হয়। ফলে একটা গতি যখন পাওয়া যায় তখন অন্যটা পাওয়া যায় না।

আবূ বকর বলেছেন, যদি প্রশ্ন তোলা হয় যে, ইবরাহীম (আ)-এর পক্ষে প্রথম যুক্তি পেশ করার পর অন্য যুক্তির দিকে চলে যাওয়া কি করে সম্ভব বা সমীচীন হল ? তাহলে বলা যাবে, না, তিনি অন্য যুক্তির দিকে চলে যান নি। বরং তিনি প্রথম যুক্তির উপরই দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বরং প্রথম যুক্তির পরে তারই সমর্থনে আরও একটি অনুরূপ যুক্তি দিলেন। যেমন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর তাওহীদ প্রমাণের জন্যে নানা দিক দিয়ে যুক্তি প্রমাণ পেশ করেছেন। মূলত আসমান ও জমিনের যা কিছুই আছে তা সবই আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও একত্বের অকাট্য প্রমাণ। তিনি তাঁর নবীকে বহু সংখ্যক মুজিজা দ্বারা বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী করে দিয়েছেন। তার যে-কোনটি এমন যে, তা স্বতন্ত্রভাবেই সে কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে। ইবরাহীম (আ) কাফিরদের সম্মুখে তা বাদে ভিন্নতর দলীল পেশ করেছেন। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَكَذٰلِكَ نُرِىْٓ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ -

এমনিভাবে আমরা ইবরাহীমকে আসমান-জমিনের খোদায়ী নিরংকুশতার এলাকা দেখিয়ে থাকি, যেন সে দৃঢ় প্রত্যয়শীলদের একজন হয়। (সূরা আন'আম ঃ ৭৫)

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا قَالَ هٰذَا رَبِّىْ -

পরে যখন রাত উপরে আচ্ছন্ন হয়ে এল, সে একটা তারকা দেখতে পেল। বলল, এটাই আমার রব্ব। (সূরা আন'আম ঃ ৭৬)

তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে, ইবরাহীম (আ) তাঁর জনগণকে তাঁর উপস্থাপিত দলীলের উপর

স্থিতিশীল বানাতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন তাদের কথার ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করতে। এজন্যে তিনি বলেছিলেন ঃ 'এটাই আমার রব্ব'।

فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ : لَا أُحِبُّ الْأَفِلِيْنَ –

'তারকাটি' যখন অদৃশ্য হয়ে গেল, বললে, আমি অদৃশ্য হয়ে যাওয়া জিনিস পছন্দ করি না।

ঘটনাটি ছিল কোন রাত্রিকালের। এ রাত্রিবেলায়ই সেখানকার জনগণ তাদের মন্দিরসমূহে একত্রিত হতো। তাদের নির্মিত মূর্তিগুলোর সম্মুখে অবনত হত। এটা ছিল তাদের উৎসব। এই সময়ই তিনি লোকদের সামনে স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিলেন যে, তোমরা যে তারকাকে 'ইলাহ' বানিয়েছ, তা একবার প্রকাশিত হয় আবার তা অদৃশ্য হয়েও যায়। তা গতিশীল, স্থিতিশীল নয়। তা স্থানান্তরিতও হয়। এ ধরনের বস্তু কখনই 'ইলাহ' হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হতে পারে না। কেননা তাতে পরিবর্তিত হওয়ার অবস্থা প্রকট। চন্দ্রের ব্যাপারেও তা-ই হল। সকাল বেলাতেও তিনি তার যুক্তি লোকদের সামনে পেশ করতে থাকেন সূর্যকে কেন্দ্র করে। এভাবে প্রকৃত দলীল-প্রমাণ জনগণের বিশ্বাসের বিপরীত কথাই প্রমাণ করল। তার পরে তিনি তাদের মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেললেন। এ সংক্রান্ত কাজের বর্ণনা আল্লাহ্ নিজেই দিয়েছেন।

এ আয়াতসমূহ প্রমাণ করে যে, দ্বীন ইসলামের সত্যতা-অকাট্যতা প্রমাণ করার জন্যে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত করা খুবই সহীহ্ কাজ। এ জন্যে বিবেকসম্মত যুক্তিসমূহ একের পর এক পেশ করা বাঞ্ছনীয়, যেমন করে আল্লাহ নিজে দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে তাঁর তওহীদ প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত করেছেন। এ পর্যায়ে আল্লাহ্‌র সর্বোত্তম গুণাবলী পেশ করতে হবে।

সেই সাথে একথাও প্রমাণিত হল যে, যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে যে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত-প্রমাণিত করা হবে তা অবশ্যই মেনে নেয়া আবশ্যক। আর তার মুকাবিলায় যুক্তি-প্রমাণহীন ধর্মমত পরিহার করা একান্তই কাম্য।

দ্বীনের সত্যতা প্রমাণে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও দলীলাদি পেশ করা অনুচিত বলে মনে করে, উক্ত ব্যাপার দিয়ে তার বাতুলতা প্রমাণিত হয়। কেননা যদি তা-ই হতো, তাহলে হযরত ইবরাহীম (আ) কোন যুক্তিই পেশ করতেন না। দলীল-প্রমাণ দ্বারা যে সত্য প্রতিষ্ঠিত হল তা মেনে নেয়া ও গ্রহণ করা এবং যা মিথ্যা প্রমাণিত হল তা পরিত্যাগ করা অবশ্যই কর্তব্য। কেননা তা কাটিয়ে উঠা সম্ভব নয় বলে তা মেনে নেয়াই বাধ্যতামূলক। এ থেকে এ-ও বোঝা যায় যে, প্রকৃত সত্য লাভ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে যুক্তি কবুল করা। হক ও বাতিল— সত্য ও মিথ্যা প্রমাণের একমাত্র পথ-ই হচ্ছে, সত্যের প্রমাণ হবে অকাট্য, অবশ্য স্বীকার্য। আর বাতিল বা মিথ্যার পক্ষের কোন প্রমাণ গ্রহণযোগ্যই হবে না। সত্য যদি যুক্তির ভিত্তিতে মিথ্যা থেকে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিভাত না হয়, তাহলে প্রকৃত সত্য কোন দিনই উদ্ঘাটিত হবে না। মিথ্যার দাবি ও প্রচার অবলীলাক্রমে চলতে থাকবে। হক ও বাতিলের মধ্যে যা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, তা জানবার কোন উপায় থাকবে না।

এ থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌র সদৃশ্য কিছু নেই। তাঁর পরিচিতি লাভের একমাত্র উপায়ই হচ্ছে, তাঁর তওহীদের অকাট্য দলীল। আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী-রাসূলগণ তো এই যুক্তি প্রমাণের বলেই কাফির-মুশরিকদের মুকাবিলা করেছেন। আল্লাহ্‌র এমন কোন গুণের উল্লেখ তাঁরা করেন নি, যার কোন সাদৃশ্য থাকতে পারে। আল্লাহ্‌র কাজ দ্বারাই আল্লাহ্‌র প্রমাণ দিয়েছেন। এ যুক্তি-প্রমাণ দিয়েই কাফির-মুশরিকদের পরাজিত করেছেন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْبَعْضَ يَوْمٍ - قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ -

বললেন, আমি একদিন বা একদিনের কিছু অংশ কাল অবস্থান করেছি। আল্লাহ্ বললেন, না, বরং তুমি একশ বছর অবস্থান করেছ।

প্রথম কথাটি যিনি বলেছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলেন নি। আল্লাহ্ তাঁকে মৃতাবস্থায় একশত বছর কাল পর্যন্ত রেখেছিলেন। তিনি তাদের সম্পর্কে খবর জানিয়েছেন। তিনি সব শুনে বললেন, আমার মনে হয়, আমি একদিন বা একদিনের কিছু সময় এখানে পড়েছিলাম। আল্লাহ্ 'আসহাবে কাহাফ' সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন, তা এ ঘটনার সত্যতার দৃষ্টান্ত।

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْبَعْضَ يَوْمٍ -

তাদের একজন বলল, কতদিন পর্যন্ত তোমরা এ অবস্থায় পড়ে আছ ? তারা বলল; একদিন কিংবা একদিনের কিছু সময়।

অথচ তাদের এ অবস্থায় পড়ে থাকার মিয়াদ তিনশ নব্বই বছর। কিন্তু তারা যে সময়টার কথা বলল, তা তারা মিথ্যা তো বলেনি। এটা ছিল তাদের ধারণা। তাদের এ কথার তাৎপর্য তো এই যে, 'আমাদের ধারণায় আমরা সম্ভবত পূর্ণ একদিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ কাল এরূপ অবস্থায় পড়ে রয়েছি।' নবী করীম (স)-এর এ কথাটিও তার দৃষ্টান্ত, যখন তিনি দুই রাক'আতা নামায পড়লেন কোন এক এশার নামাযের, তখন দুই হাতওয়ালা সাহাবী তাঁকে বললেন ঃ 'আপনি নামায 'কসর' করলেন না চার রাক'আত পড়াতে ভুলে গেলেন ?' তখন রাসূলে করীম (স) বললেন, না, 'কসরও করিনি, ভুলেও যাই নি।' কথাটি তিনি সত্যই বলেছিলেন। কেননা এটা ছিল তাঁর ধারণা এবং তাঁর ধারণা অনুযায়ী তিনি যা বলেছেন, তা সত্য। তিনি মনে করেছেন, তিনি এশার চার রাক'আতই পড়িয়েছেন। নামায যথারীতি সম্পূর্ণ করেছেন। এভাবে নিজের ধারণানুযায়ী বলার অবকাশ আছে, সেজন্যে তাঁকে কোনক্রমেই তিরস্কার করা যায় না। নিজের বিশ্বাস বা ধারণা অনুযায়ী বলা তো মিথ্যা হতে পারে না, যদিও তা প্রকৃত ব্যাপারের বিপরীত। তিনি তো সেই প্রকৃত ব্যাপারের বর্ণনা দেন নি।

এ কারণে বেহুদাভাবে যে লোক কিরা-কসম করে, আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দেন। সে বিষয়ের বর্ণনাটি এই যে, এক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করল, এই এই ঘটনা ঘটেছিল নাকি ? তখন সে তার নিজের ধারণা মতে বলল, না, আল্লাহ্‌র কসম। অথবা বলল, হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম। যদিও আসল ব্যাপার ছিল তার কথার বিপরীত। সে তো তার নিজের ধারণা মতো বলেছে। তার মতে সেটাই ছিল সত্য কথা।

## দানের অনুগ্রহ দেখানো

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَايُطْبِعُوْنَ مَاانْفَقُوْا مَنًّا وَّلَااَذًى -

যেসব লোক তাদের ধন-মাল আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, পরে তারা যা ব্যয় করেছে তার পেছনে অনুগ্রহ দেখানো বা পীড়া দান করে না।

আল্লাহ্ অপর এক আয়াতে বলেছেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَلَاذٰى كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَاءَ النَّاسِ -

হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের দানসমূহ অনুগ্রহ দেখিয়ে ও পীড়া দিয়ে নিষ্ফল করে দিও না সেই ব্যক্তির মতো, যে তার মাল ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَاقَةٍ يَّتْبَعُهَا اَذًى -

ভালো পরিচিত কথা এবং ক্ষমা অতীব উত্তম এমন দান থেকে, যার পেছনে আসে পীড়া।

বলেছেন ঃ

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَفِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ -

তোমরা যে সুদ দাও লোকদের ধন-মালের প্রবৃত্তি হওয়ার উদ্দেশ্য, তা আল্লাহ্র নিকট কিন্তু বৃদ্ধি পায় না। তবে তোমরা যে যাকাত দাও, যার দ্বারা তোমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করতে চাও, তাদের ধন-মালই প্রকৃতপক্ষে কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়ে যায়। (সূরা আর-রূম ঃ ৩৯)

এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জানিয়েছেন যে, দান-সদকা খালেসভাবে আল্লাহ্র জন্যে হতে হবে, তা অনুগ্রহ দেখানো ও পীড়াদান মুক্ত হতে হবে। অন্যথায় তা প্রকৃত সাদকা হবে না। তা বাতিল হয়ে যাবে। বাতিল হয়ে যাওয়া অর্থ নিষ্ফল হয়ে যাওয়া। তার সওয়াব না হওয়া ও না পাওয়া। পরিণামে তা এমন হওয়া যে, সে কোন সাদকাই করেনি। আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের লক্ষ্যে যত কাজই করা হবে, তার সব ও প্রত্যেকটি সম্পর্কেই এই কথা। সে কাজের সাথে রিয়াকারিতার একবিন্দু সম্পর্ক হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ্কে ছাড়া অন্য কারোরই নৈকট্য বা সন্তুষ্টি লাভ তার লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। কেননা তাহলে সে কাজ বাতিল গণ্য হবে, নিষ্ফল হয়ে যাবে। আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ

وَلَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ -

তোমরা তোমাদের আমলসমূহকে বাতিল— নিষ্ফল করে দিও না। (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৩৩)

বলেছেন ঃ

وَمَآ اُمِرُوْآ اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ -

তাদেরকে কিছুই আদেশ করা হয়নি, আদেশ করা হয়েছে মাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করার, কেবল তাঁরই জন্যে দ্বীন ও আনুগত্যকে খালেস করে এবং অন্য সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সম্পূর্ণরূপে একমুখী হয়ে। (সূরা বাইয়্যেনা ঃ ৫)

অতএব যে কাজ আল্লাহ্র জন্যে খালেস হবে না, কেবল আল্লাহ্রই নৈকট্য লাভ যে কাজের মূল লক্ষ্য হবে না— লক্ষ্য হবে অন্য কিছু, তা আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হবে না, তাতে সওয়াব পাওয়া যাবে না। আল্লাহ্র এ কথাটিও তার একটি নযীর ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْلَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَالَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ -

যে লোক পরকালের ফসল পেতে চায়, তার ফসল আমরা বাড়িয়ে দেব। আর যে লোক দুনিয়ার ফসল পেতে চায়, তাকে আমরা দুনিয়া থেকেই দেব। তবে পরকালে তার কোন অংশ প্রাপ্য থাকবে না। (সূরা শুরা ঃ ২০)

এ কারণে হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ বলেছেন, হজ্জের উপর ইজারাদারী জায়েয নয়। নামাযের ব্যাপারেও তাই। কুরআন শিক্ষার মজুরী নেয়াও তাই। এ ধরনের অন্যান্য যেসব কাজের শর্ত হচ্ছে যে, তা আমরা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে করব, তা-ও মজুরির বিনিময়ে করা যাবে না। কেননা সে সব কাজে মজুরি গ্রহণ করা হলে তার লক্ষ্য আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ থাকে না। পূর্বোদ্ধৃত আয়াতসমূহ এই কথাটির কথাই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। তার আরও বহু দলীল আছে। আমর আল-হাসান থেকে ঃ

لَاتُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى -

এ আয়াতের তাফসীর পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে ঃ 'সাদকা দানকারী যাকে সাদকা দিয়েছে, তার উপর যদি নিজের অনুগ্রহ দেখায়, বলে— আমি তোমার প্রতি এই এই অনুগ্রহ করেছি, আল্লাহ এই কাজকেই নিষিদ্ধ করেছেন। বলেছেন, তার বরং আল্লাহ্র শোকর আদায় করা উচিত এজন্যে যে, আল্লাহ তাকে সাদকা করার পথ দেখিয়েছেন এবং তার তওফীক দিয়েছেন।

আল-হাসান থেকে আল্লাহ্র এ কথারও তাফসীর বর্ণিত হয়েছে ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ -

যারা তাদের ধন-মাল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে ব্যয় করে এবং তাদের মনের স্থিতিস্বরূপ .....

বলেছেন, তারা নিজেরাই দৃঢ় মনোভাব পোষণ করে এ ব্যাপারে যে, তারা তাদের ধন-মাল কোথায়— কোন কাজে ব্যয় করবে। শবী বলেছেন, তাদের মনে সত্যতা ও দৃঢ় প্রত্যয় স্বরূপ নির্ধারণ করে। কাতাদাতা বলেছেন, তাদের মনের দৃঢ়তা স্বরূপ।

দান-সাদকায় অনুগ্রহ দেকানো এভাবেও হয় যে, দানকারী বলবে, আমি অমুকের প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছি। তাকে আমি বাঁচিয়েছি, তাকে আমি ধনী করে দিয়েছি। এভাবে দান গ্রহণকারী ব্যক্তির জীবনকে অনুগ্রহের কথা বলে বলে তিক্ত-বিরক্ত করে তোলা। তাকে মানসিক যন্ত্রণা ও পীড়া দেয়া, বলা যে, তুমি তো একটা গরীব মানুষ, তোমাকে সাহায্য করে করে আমি কত না বিপদে পড়েছি। আল্লাহ্ তোমার থেকে আমাকে নিস্তার দিন।

এরই মতো কথা তাও, যা একজনকে গরীব বলে তিরস্কার করবে, লজ্জা দেবে। এই জন্যে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'প্রচলিত ভালো কথাবার্তা এবং ক্ষমা করা এমন দানের তুলনায় অনেক উত্তম যার পেছনেই আসে তিক্ততা।'

অর্থাৎ— প্রকৃত কথা আল্লাহ্ই ভালো জানেন— কথার ভালো জবাব দেয়া, ভদ্র সৌজন্যমূলক

কথা বলা এবং মানুষের দোষ ক্ষমা করে দেয়া অনেক ভাল, অনুগ্রহ প্রকাশ করে কষ্ট দেয়ার তুলনায়। অন্য কথায়, প্রার্থীর দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনাকে লুকানো কর্তব্য। আর ক্ষমা সম্পর্কে বলা হয়েছে, যে জুলুম করেছে তা ক্ষমা করাও সেই দানের তুলনায় অনেক ভালো, যার পরে দান গ্রহীতাকে জ্বালা-যন্ত্রণা বা মানসিক কষ্ট দেয়া হয়। কেননা এরূপ করলে সে গুনাহ করবে। প্রার্থীকে যদি উক্ত ভাবে প্রার্থনার জবাবটা দেয়া হয়, তাহলে তাতে গুনাহ থেকে নিরাপত্তা পাওয়া যাবে। এ কারণে আল্লাহ্ জানিয়েছেন যে, সাহায্য প্রার্থীকে সাহায্য না দিয়ে ভালো সৌজন্যমূলক কথাবার্তাও বলা যায়, তাহলে তা দান করে কষ্ট দেয়ার তুলনায় অনেক উত্তম। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা এ কথাই বলেছেন ভিন্ন ভাষায় ঃ

وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوْرًا –

আর তোমরা যদি তাদেরকে এড়িয়ে যেতে চাও আল্লাহ্‌র প্রতি যে রহমত পাওয়ার আশা পোষণ কর তার প্রতীক্ষায়, তাহলে তোমরা তাদেরকে খুবই সহনীয় কথা বলবে।

(সূরা বনী-ইসরাঈল ঃ ২৮)

## আয়-উপার্জন করা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ –

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা নিজেরা যা উপার্জন কর এবং জমিন থেকে আমরা তোমাদের জন্যে যা উৎপাদন করি সেই পবিত্র উপার্জন থেকে ব্যয় কর।

এ আয়াতে কামাই-রোজগার ও আয়-উপার্জন করা মুবাহ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ উপার্জন পবিত্র, নির্দোষ। কামাই-রোজগার বা আয়-উপার্জনের দুটি দিক রয়েছে । একটি হল, মাল বা পণ্যের পারস্পরিক বিনিময়। তাতে মুনাফা লাভ আর দ্বিতীয় হল, মুনাফার বিনিময়। আল্লাহ্ তাঁর কুরআনের বহু স্থানেই তার মুবাহ হওয়ার কথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছেন। যেমন বলেছেন ঃ

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ –

এবং আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসায় হালাল করেছেন।

বলেছেন ঃ

وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ﻁ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ –

অন্যান্য কিছু লোক দুনিয়ায় পরিভ্রমণ করে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের সন্ধান করে এবং আরও অন্যান্য কিছু লোক আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে। (সূরা মুযযাম্মিল ঃ ২০)

বলেছেন ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ –

তোমরা তোমাদের রব্ব-এর নিকট থেকে তাঁর অনুগ্রহ পেতে চাবে, তাতে তোমাদের কোন দোষ হবে না। (সূরা বাকারাহ ঃ ১৯৮)

অর্থাৎ ব্যবসায় করা, ভাড়ায় দেয়া আর সেই সাথে হজ্জ-ও করা— এসবই জায়েয। মুনাফার বিনিময় করা পর্যায়ে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَانْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ -

আর তারা যদি তোমাদের জন্যে (তোমাদের বাচ্চাদের) দুধ খাওয়ায়, তাহলে তোমরা তাদের মজুরি দিয়ে দাও। (সূরা আত-তালাক ঃ ৬)

শুয়াইব (আ) বলেছিলেন ঃ

اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَىَّ هَاتَيْنِ عَلٰى اَنْ تَاْ جُرَنِىْ ثَمَانِىَ حِجَاجٍ -

আমি চাই, আমার এই দুটি কন্যার মধ্যে একজনের বিয়ে তোমার সাথে সম্পন্ন করব। তবে এ শর্তে যে, তুমি আট বছর পর্যন্ত আমার এখানে চাকরী করবে। (সূরা কাসাস ঃ ২৭)

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنِ اسْتَا جَرَا اَجِيْرًا فَلْيُعْلِمْهُ اَجْرَهُ -

যে লোক কোন মজুর নিয়োগ করবে, তাকে যেন তার মজুরি কত— তা জানিয়ে দেয়া হয়।

তিনি বলেছেন ঃ

لَاَنْ يَاْخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَحْتَطِبَ خَيْرٌلَّهُ مِنْ اَنْ يَّسْئَلَ النَّاسَ اَعْطُوهُ اَوْمَنَعُوهُ -

তোমাদের যে কোন ব্যক্তির পক্ষে একটি রশি লয়ে কাষ্ঠ সংগ্রহ করে বিক্রয় করে জীবিকা উপার্জন করা লোকদের নিকট ভিক্ষা চাওয়া অপেক্ষা অনেক ভাল। কেননা লোকেরা তাকে কিছু দিতেও পারে, না-ও দিতে পারে।

আল-আমাশ ইবরাহীম, আল-আসওয়াদ আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ اَطْيَبَ مَا اَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَاِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ -

মানুষ নিজের উপার্জন থেকে আহার করবে, এটাই হচ্ছে পবিত্রতম জীবিকা। জেনে রাখো, ব্যক্তির সন্তানও তার একটা উপার্জন।

আগের কালের এক জামা'আত ফিকাহবিদদের আল্লাহ্র কথা ঃ

اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ 'তোমাদের পবিত্র উপার্জন থেকে তোমরা ব্যয় কর'-এর তাফসীরে এই বর্ণিত হয়েছে যে, পবিত্র উপার্জন উপায়ের মধ্যে উল্লেখ্য হচ্ছে ব্যবসায়-বাণিজ্য। আল হাসান ও মুজাহিদ তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য।

এ সব আয়াতের সাধারণ ঘোষণাবলী সর্বপ্রকারের ধন-মাল থেকে সাদকা-দান ওয়াজিব করে দিয়েছে। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ مَاكَسَبْتُمْ 'তোমরা যা উপার্জন করেছ' এ সবকেই শামিল করে, যদিও তার পরিমাণ এককভাবে যথেষ্ট নাও হয়, তবুও। ধন-মালের যত প্রকার

আছে, উপার্জনের যত উপায় আছে, সবকিছু থেকেই সাদকা করতে হবে। তার মোট পরিমাণ যাই হোক। এ বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। নবী করীম (স) থেকে দেয় পরিমাণ কত, তার বর্ণনা পাওয়া গেছে। সর্বপ্রকারের মালের দেয় পরিমাণ সম্পর্কে অকট্য দলীল রয়েছে। অবশ্য দেয় পরিমাণ অভিন্ন নয়, বিভিন্ন মালের উপর ধার্য পরিমাণ বিভিন্ন। যেমন ব্যবসায়ের পণ্য সামগ্রী। কোন কোন লোক আয়াতটির বাহ্যিক অর্থকে দলীল বানিয়ে বলেছে যে, অস্থায়ী দ্রব্যাদির العروض। যাকাত ফরয নয়। উক্ত আয়াত আবার অনেকের মতে ঘোড়ার উপর যাকাত ধার্য হওয়ার দলীলও বটে। এছাড়া আরও অনেক মাল রয়েছে, যাতে যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন মত প্রকাশিত হয়েছে। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ اَنْفِقُوْا 'তোমরা ব্যয় কর'-এর অর্থ, সাদকা দাও, দান কর। আর সব মালের মধ্যে উত্তম মাল দিতে ও মন্দ মাল না দিতেও হুকুম দিয়েছেন আল্লাহ্ তা'আলা ঃ

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ -

এবং তোমরা মন্দ মালের দিক লক্ষ্য নিবদ্ধ রেখো না যে, কেবল তা থেকেই তোমরা দান করবে।

এ আয়াতে تُنْفِقُوْنَ অর্থ দান কর, সাদকা দাও, এ বিষয়ে আগের ও পরের মনীষীদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। কোন কোন মনীষী বলেছেন, এ হুকুমটি নফল সাদকা সম্পর্কিত। কেননা ফরয যাকাত থেকে রদ্দি মাল বের করা হলে উত্তম মালদাতার যিম্মায় থেকে যায় এবং তা তাকে আদায় করতে হবে। আমাদের মতে শব্দটিকে ওয়াজিব প্রমাণকারী না বলে নফল প্রমাণকারী বলার ব্যাপার মাত্র। তার কয়েকটি কারণ রয়েছে। একটি, اَنْفِقُوْا কথাটি আদেশ। আর আমাদের মতে আল্লাহ্‌র আদেশ পালনীয়— ফরয। তবে তা ফরয নয়, নফল, এ কথা প্রমাণের কোন দলীল পাওয়া গেলে ভিন্ন কথা।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা মন্দ মালের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করো না যে, শুধু তা থেকেই তোমরা ব্যয় করবে' থেকে বোঝা যায় না যে, এটা নফল বা মুস্তাহাব। কেননা নফল বা মুস্তাহাব ব্যয়েও রদ্দী মাল ব্যয় করা নিষিদ্ধ, শুধু বিশেষভাবে মুস্তাহাব ব্যয়-ই তো নিষিদ্ধ নয়। ফরয ব্যয়ও নিষিদ্ধ। বরং রদ্দি মাল বাদ দিয়ে উত্তম মাল-ই বের করা কর্তব্য। কেননা আয়াতে তার উল্লেখ নেই। তা অপর দলীল থেকে জানা যায়। আয়াতের দাবি হচ্ছে, সাদকা দান ফরয, তার পথে তা বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। তা সত্ত্বেও আয়াতের দলীল যদি প্রমাণ করে যে, রদ্দি মাল ছাড়া অ-রদ্দি মাল দান করা তার কর্তব্য নয়, তা হলে আয়াতের হুকুমটি ফরয থেকে মুস্তাহাবের দিকে ফিরে যাবে না। কেননা হতে পারে, আয়াতের শুরু অংশ পালন ফরয হবে। পরে কোন কোন সাধারণ ব্যয়কে বিশেষ হুকুমের আওতায় নিয়ে আসা হবে। তাতে সম্বোধনের শুরুটা বিশেষ হুকুমের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা ও সাধারণ থেকে তাকে অন্যদিকে ফিরিয়ে নেয়া কর্তব্য হয় না। এর বহু কয়টি নিদর্শনও রয়েছে। বিভিন্ন প্রসঙ্গে আমরা তা বলেছিও।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ -

এবং সেই ফসল থেকে, যা আমরা তোমাদের জন্যে জমিন থেকে উৎপাদন করেছি।

জমিনে যা-ই উৎপন্ন হয়, তার পরিমাণ কম হোক, জমিন থেকে উৎপন্ন সর্বপ্রকারের ফসলেই আল্লাহ্র হক ধার্য হয় এবং তা দেয়া কর্তব্য হয়। এই দলীলের ভিত্তিতেই ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, জমিনের ফসল কম হোক, কি বেশি হোক, সবটার উপর ওশর ধার্য হবে। জমিন থেকে মানুষ যা-ই উৎপন্ন করবে, তার সকল প্রকারের উপরই তা ফরয হবে। আয়াতের ধরন থেকেই প্রমাণিত হয় যে, এটা হল ফরয সাদকা। কেননা আয়াতের ধারাবাহিকথায়ই আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন ঃ

وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّاۤ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ -

তোমরা তো গ্রহণ করতে প্রস্তুত হও না, তবে তোমরা যদি তা উপেক্ষা কর, তাহলে ভিন্ন কথা।

এটা যদিও ঋণ ফেরত দেয়া পর্যায়ের কথা তার মালিক তা ফেরত নিতে চায়, সে সাধারণত কখনই ভালোটা রেখে মন্দটা নিতে রাজী হবে না। অবশ্য বেশি ভ্রুক্ষেপ না করলেও তেমন গুরুত্ব না দিলে ভিন্ন অবস্থা হতে পারে। বোঝা গেল, জমিনের ফসল থেকে ব্যয় করার হুকুমটা ফরয সাদকা সম্পর্কিত। তবে তা ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে ঋণ আদায়ে উপেক্ষা করার দিকে। যদি তা নফল দানের ব্যাপার হতো তাহলে তাতে ভ্রুক্ষেপ না করার উল্লেখ হতো না। কেননা সে ক্ষেত্রে তো কম হোক কি বেশি হোক ব্যয় করতেই হতো। তার দান না করারও ইখতিয়ার রয়েছে। এতেই এমন দলীল রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, এখানে যে ব্যয় করার নির্দেশ রয়েছে, তা ফরয সাদকা পর্যায়ের কাজ।

তবে আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমরা তাতে ব্যয় করার জন্যে মন্দ মালের দিকে লক্ষ্য দিও না', এ পর্যায়ে জুহরী আবূ আমামাতা ইবনে সহল ইবনে হানীফ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ 'নবী করীম (স) দুই প্রকারের খেজুর— জারুর ও লওনুল হুবায়ক— গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।' বলেছেন, লোকেরা ফরয সাদকায় নিকৃষ্ট ধরনের ফসল দিত। তখনই এই কথাটি নাযিল হয়েছিল ঃ তোমরা মন্দ জিনিস থেকে সাদকা দিতে মনকে স্থির করো না। বরা ইবনে আজিব (রা) থেকেও এরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমরা তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হও না, সে দিকে উপেক্ষা দেখালে অবশ্য ভিন্ন কথা!' এ পর্যায়ে হাদীসে বলা হয়েছে, তোমাদের কেউ যদি এ রকম হাদিয়া পায় বা কাউকে হাদীয়া দেয়া হয় যেমন দেয়া হয়েছে, তাহলে সে কখনই তা গ্রহণ করবে না। হ্যাঁ, কে কি দিল, সেদিকে লক্ষ্য না দিলে ভিন্ন কথা। অনেকে লজ্জা এড়ানোর জন্যেও খারাপ মাল দেখেও কিছু বলে না। উবায়দাতা বলেছেন, এ হুকুমটা যাকাতের প্রসঙ্গে। ফলের তুলনায় নকল দিরহাম-ও আমার অধিক পছন্দ। এ আয়াত পর্যায়ে ইবনে মাকাল বলেছেন, লোকদের কোন মালই মন্দ নয়। তবে জাল বা শক্ত দিরহাম খারাপ। তোমরা তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নও। বলেছেন, কোন লোকের নিকট তোমার যদি কোন হক বা পাওনা থাকে, তাহলে সে নিশ্চয়ই শক্ত ও জাল দিরহাম গ্রহণ করবে না। তোমরা ভালো খেজুর ছাড়া মন্দ খেজুরও গ্রহণ করবে না। এখানেও উপেক্ষা দেখালে ভিন্ন কথা হবে। তোমরা হয়ত তা ধরলে না, এগিয়ে গেলে। নবী করীম (স) থেকে এরূপ কথাই বর্ণিত হয়েছে। 'কিতাবুস্ সাদাকাত'-এ তা লিখিত আছে। তাতে তিনি বলেছেন ঃ

وَلَاتُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ -

জরাজীর্ণ ও এক চোখ কানা পশু যাকাত বাবদ গ্রহণ করা হবে না।

এ হাদীসটি জুহরী সালিম তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্র কথা ঃ 'তবে যদি তোমরা উপেক্ষা কর'-এর অর্থ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ তবে তোমরা যদি আসল দাম থেকে কমিয়ে দাও। আল-হাসান এবং কাতাদাতাও এরূপই বলেছেন। বরা ইবনে আজিব বলেছেন, 'তবে তোমরা যদি তা গায়ে না মাখ, গুরুত্ব না দাও।' বলা হয়েছে, তোমরা তা গ্রহণ করো না, তবে তোমরা যদি মূল্য কমিয়ে দাও। তাহলে তোমরা ফরয সাদকায় কি করে খারাপ মাল দিতে পার ? আল্লাহ্র বলা কথার এসব অর্থই হতে পারে। এ সবই আল্লাহ্র বক্তব্য মনে করাও অযৌক্তিক হবে না। তোমরা মন্দ মালের দান গ্রহণ করবে না। তবে তোমরা যদি তেমন গুরুত্ব না দাও, উপেক্ষা কর তাহলে ভিন্ন কথা। আর উত্তম-উৎকৃষ্ট জিনিস বাদ দিয়ে মন্দ জিনিস গ্রহণ কেবল উপেক্ষার কারণেই সম্ভব। তারা তা বিক্রয় বা ক্রয় করলেও কম মূল্যেই তা করতে পারে।

যদি কোন লোক পরিমাপের বা ওজনের জিনিসে প্রয়োজনীয় কম গুণের জিনিস দেয়, উত্তম জিনিস বাদ দিয়ে নিকৃষ্ট জিনিস দেয়, আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ বলেছেন, তার অতিরিক্ত দেয়া কর্তব্য নয়। মুহাম্মাদ বলেছেন, দুটির মধ্যে যা বাড়তি তা দেয়া তার কর্তব্য। ছাগল, গরু ও অন্যান্য যাকাতের পশু— যা ওজন করা হয় না, ফিতা দিয়ে মাপাও হয় না— বাড়তিটা দেয়া কর্তব্য বলে সকলেই মত দিয়েছেন। অতএব ইমাম মুহাম্মাদ আলোচ্য আয়াতকেই তাঁর মতের দলীল হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন।

আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমরা মন্দ মালের উপর মন নিবদ্ধ করো না এজন্যে যে, তা থেকে তোমরা সাদকা দেবে'-এর অর্থ রদ্দি মাল দেবে না। আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমরা নিজেরাই তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হও না, তবে তোমরা যদি লক্ষ্য না কর, তাহলে ভিন্ন কথা'— এ কথায় এ ভাবটিও রয়েছে যে, তোমরা— যাদের অন্যের নিকট কিছু পাওনা রয়েছে, তাদের উপেক্ষা না করারও অধিকার আছে। কোনরূপ ভ্রূক্ষেপহীনতা বাঞ্ছনীয় নয়। বরং উত্তম মাল থেকেই নিজের পাওনাটা নেয়া উচিত। এ থেকে এ-ও বোঝা যায় যে, দাতার উচিত অতিরিক্তটা দিয়ে দেয়া। যেন তাতে উপেক্ষা করার প্রয়োজন দেখা না দেয়। কেননা যে হক-এর কথা বলা হচ্ছে সেটা তো আল্লাহ্র হক। তাতে রদ্দি দিতে নিষেধ করা হয়েছে। যার ফলে সে ব্যাপারে উপেক্ষার প্রশ্নই দেখা দেবে।

তবে আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ বলেছেন, যেসব জিনিসে বেশি ও কম করা জায়েয নয়, তাতে উত্তম ও রদ্দি মালের মধ্যে পার্থক্য নেই এদিক দিয়ে যে, তাতে বেশি ও কম করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সে জাতীয় মূল্যে সমান হবে। লক্ষণীয়, কেউ যদি তার ঋণের তাগাদা করে এই বলে যে, তা উত্তম মাল হতে হবে, তা-ই সে দিল, কিন্তু পরে জানালেন যে, তা রদ্দি মাল ছিল, তা হলে সে পাওনাদারকে কিছুই ফিরিয়ে দেবে না। দুটি জিনিসের মধ্যে যা বাড়তি আছে, তাও নয়। এ বিষয়ে আবূ ইউসূফ বলেছেন, ঋণদাতার নিকট থেকে গ্রহীতা যা নিয়েছিল, সেই মতো জিনিসই সে দেবে। ঋণদাতার পাওনা ফিরিয়ে দেবে কিন্তু ফরয সাদকায় তা সম্ভব নয়। কেননা তাতে গরীব ব্যক্তিটি তো কিছুই দেয়নি। সে যদি কোন ঋণ দিয়ে থাকে, তাহলে ফরয সাদকা থেকে তার পাওয়ার কিছু নেই। সে উত্তম জিনিস ফিরিয়ে দেয়ারও দাবি করতে পারে না। এ কারণে বাড়তি দিতে সে বাধ্য নয়। ফরয সাদকাদাতাকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন, সে যেন রদ্দি

মাল দিতে সংকল্প গ্রহণ না করে। তার কর্তব্যই হচ্ছে বাছাই করা উত্তম মাল দেয়া। ফিকাহবিদগণ বলেছেন, রদ্দি মাল দিতে তাকে নিষেধ করা হয়েছে। তবে সে যা দিয়েছে, তা যদি উত্তমের পর্যায়ে গণ্য হয়, তাহলে তা-ই তার জন্যে যথেষ্ট হবে— যেমন ইতিপূর্বে বলেছি। তবে যে জিনিসে বাড়তি দেয়া জায়েয, সে বাড়তি দিতে আদিষ্ট। কেননা তার দেয়া জিনিসের মূল্য রদ্দি মালের তুলনায় বেশি হতে পারে। তার কতক কতকের বিনিময়ে বাড়তি সহকারে ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে।

আর ইমাম মুহাম্মাদ উত্তমকে বাদ দিয়ে নিকৃষ্ট জিনিস দেয়া জায়েয নয় বলেছেন। তবে তার মূল্যের পরিমাণ সহকারে দেয়া যেতে পারে বলে মত দিয়েছেন। ফলে বাড়তিটা দিয়ে দেয়া তার জন্যে ওয়াজিব বলেছেন, কেননা দাস ও তার মনিবের মধ্যে সূদের ব্যাপার নেই। এ আয়াতে এর দলীলও আছে যে, সর্বপ্রকারের ঋণের আদান-প্রদানে উত্তম মাল থেকে রদ্দি মাল গ্রহণ করাও জায়েয। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাতে উপেক্ষা প্রদর্শনকে জায়েয বলেছেন। এর কোন প্রকারের, অন্য প্রকারের পার্থক্যের কথা বলা হয়নি। এ কথা থেকে আরও কয়েকটি তাৎপর্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যের একটি হচ্ছে, ত্রুটিপূর্ণ মুদ্রার দাবি করা জায়েয, যাতে ধোঁকার মাত্রা কম, আর বেশির ভাগ উত্তম রৌপ্য বাকীতে দেয়া মালের মূলধনে। আর যে দুটি ছাড়া গ্রহণ করা জায়েয নয়, তার মুদ্রার মূল্য। এ-ও বোঝা যায় যে, এ ক্ষেত্রে রদ্দিটা উত্তমের পর্যায়ে গণ্য। উত্তম চাঁদি রদ্দি চাদির বিনিময়ে বিক্রয় করাও জায়েয বোঝায়। তবে ওজনে ঠিক থাকতে হবে। কেননা যার কতক থেকে কতকের দাবি করা জায়েয, সেখানে পরস্পর ক্রয় বিক্রয়ও জায়েয। এ-ও বোঝা যায় যে, নবী করীম (স)-এর কথা ঃ

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ -

স্বর্ণ স্বর্ণের বিনিময়ে সমান সমান গ্রহণ করা জায়েয।

এই সমান সমান অর্থ ওজনে সমান সমান। গুণের দিক দিয়ে নয়। ঋণদাতা রাজী থাকলে রদ্দি থেকে উত্তম তাগাদা করাও জায়েয। যেমন জায়েয উত্তম থেকে উত্তমের তাগাদা করা। কেননা এ দুটির গুণের দিক দিয়ে পার্থক্যের ব্যাপারে কোন হুকুম নেই। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, বলেছেন ঃ

خَيْرُكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً -

আদায় করে দেয়ার ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে যে উত্তম, সে-ই তোমাদের মধ্যে অতীব ভালো।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন ঃ

قَضَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم وَزَادَنِى -

রাসূলে করীম (স) আমার পাওনা দিয়ে দিয়েছেন। বেশিও দিয়েছেন।

ইবনে উমর (রা) আল-হাসান, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, ইবরাহীম ও শবী সকলেই বলেছেন ঃ

لَابَأْسَ اِذَا اَقْرَضَهٗ دَرَاهِمَ سُوْدًا اَنْ يَّقْبِضَهٗ بِيْضًا اِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ ذٰلِكَ عَلَيْهِ -

কালো দিরহাম করয দিয়ে সাদা দিরহাম ফেরত নিতে পারে, যদি ঋণ দেয়ার সময় তার শর্ত করা না হয়ে থাকে।

সুলায়মান আত-তীমী, আবূ উসমান নাহ্দী, ইবনে মাসউদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি দিরহাম করয দিয়ে তার চাইতে উত্তম ফেরত নেয়া অপছন্দ করতেন। একথা প্রমাণ করে না যে, করয গ্রহীতা রাজী হলেও তা মকরূহ। তবে দেয়া জিনিসের তুলনায় অনেক ভালো জিনিস গ্রহণ করা জায়েয নয়, যদি দাতা রাজী না হয়।

আল্লাহ্র কথা ঃ

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَاءَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ -

শয়তান তোমাদের দারিদ্য আসার ভয় দেখায় এবং তোমাদেরকে নির্লজ্জতার কাজ করার আদেশ করে।

বলা হয়েছে ঃ اَلْفَحْشَاءُ 'নির্লজ্জতা' কয়েকভাবে ঘটতে পারে। তবে এখানে এর অর্থ, কার্পণ্য, বখিলী। অরবরা বখীলকে 'ফাহেশ' বলে, আর বখিলীকে বলে 'ফাহাশ' ও 'ফাহ্শা'।

আলোচ্য আয়াতে বখিল ও বখিলী উভয়েরই নিন্দা করা হয়েছে ঃ

আল্লাহ্র কথা ঃ

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ -

তোমরা যদি দান-সাদকা প্রকাশ কর (প্রকাশ্যভাবে দাও বা দিয়ে প্রচার কর), তাহলে তা খুবই ভালো।

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্র এ কথাটি নফল দান-সাদকা সম্পর্কে। আর ফরয দান-সাদকার কথা তো প্রকাশ ও প্রচার করাই উত্তম। অন্যথায় তা না দেয়ার মিথ্যা দোষারোপ ও অভিযোগ উঠতে পারে। আল-হাসান, ইয়াযীদ ইবনে আবূ হুবায়ব ও কাতাদাতা বলেছেন, সকল প্রকারের দান-সাদকায় গোপনীয়তা অবলম্বন উত্তম। অথচ দান-সাদকা প্রকাশ ও প্রচার করাকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রশংসা করেছেন। অবশ্য তা প্রকাশ না করা গোপন রাখারও প্রশংসা করেছেন। বলেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ -

যারা তাদের ধন-মাল রাত্রে ও দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় (দান) করে, তাদের এ কাজের শুভ ফল তাদের রব্ব-এর নিকট রয়েছে।

আর ঃ

وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ -

তোমরা যদি দান-সাদকাকে গোপন করে রাখ— প্রকাশ-প্রচার না কর এবং তা দরিদ্র লোকদের দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে অতীব উত্তম।

আল্লাহ্র এ কথাটি সম্ভবত নফল দান-সাদকা সম্পর্কে বলা হয়েছে। ইবনে আব্বাস থেকে তো সেই রূপই বর্ণিত হয়েছে। আর এ-ও হতে পারে যে, এ কথাটি সকল প্রকারের দান-সাদকা সম্পর্কেই বলা হয়েছে, বিশেষ করে সেসব দান-সাদকা, যেগুলো সেসবের

পাওনাদারদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব দাতাদের উপর অর্পণ করা হয়েছে। তা নফল হোক কি ফরয, অবশ্য যা সরকারের ভাণ্ডারে জমা করার জন্যে নির্দেশিত তা ছাড়া। তবে আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ যেহেতু ব্যাপক অর্থবোধক, এজন্যে সর্ব প্রকারের দান-সাদকাই এর অন্তর্ভুক্ত মনে করা যেতে পারে। কেননা الصدقت শব্দের উপরে যে 'আলিফ' ও 'লাম' রয়েছে, তা জাতীয় বোঝায় অর্থাৎ দান-জাতীয় সব-ই এর মধ্যে শামিল।

এ থেকে বোঝা গেল যে, সর্ব প্রকারের দান-সাদকাই গরীবদেরকে দিতে হবে, তাদের জন্যেই ব্যয় করতে হবে। তারা তার প্রাপক তাদের দারিদ্র্যের কারণে। অন্য কোন কারণে নয়। তবে যাকাত ও ওশর ইত্যাদি ফরয যাকাত ব্যয়ের খাত আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন তাঁর এই কথার দ্বারা ঃ

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ -

ফরয সাদকা— যাকাত কেবল মাত্র ফকীর মিসকীনদের জন্যে— (সূরা আত্-তওবা ঃ ৬০)

এ আয়াতে ফরয সাদকা পাওয়ার অধিকার দারিদ্র্যের কারণেই হয় বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। অন্য কোন কারণে নয়। এর পর আরও কয়েক প্রকারের পাওনাদারদের উল্লেখ করা হয়েছে। তারাও দারিদ্র্যের কারণেই এ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত গণ্য হয়েছে। তবে কেউ কেউ আছে যারা দারিদ্র্যের কারণে তা গ্রহণ করে না। যেমন যাদের হৃদয় জয় করা লক্ষ্য, যাকাত সংগ্রহ বিভাগে নিয়োজিত কর্মচারী। এরা যা পায়, তা সাদকা বা যাকাত হিসেবে নয়। বরং যাকাত রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালে সংগৃহীত হয়। তার পরে সেখান থেকে এরা নিয়ে নেয়। তাদেরকে যা দেয়া হয়, তা যাকাত হিসেবে নয়। বরং তাদের কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে এবং মুসলিম জনগণকে তাদের জ্বালা-যন্ত্রণা ও উৎপাত-উপদ্রব থেকে রক্ষা করার জন্যে অথবা তাদের হৃদয়কে ঈমানের দিকে আকৃষ্ট করার জন্যে।

বিরোধী মতের লোকেরা এ কথাটিকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করে বলে, যাকাত-সাদকা বাবদ জমা হওয়া সমস্ত সম্পদ শুধু গরীবদেরকে দিয়ে দেয়া জায়েয, বায়তুলমালে জমা না করেই। লোকেরা যখন পশুর যাকাত গরীবদেরকে দিয়ে দেবে, তখন বায়তুলমালে জমা দেয়ার বা সরকারের প্রাপ্য কিছুই থাকবে না। তার প্রাপ্য প্রত্যাহৃত হয়ে যাবে, কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ 'তোমরা যদি যাকাত-সাদকা গোপন রাখ ও সরাসরি গরীবদেরকে দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে অতীব উত্তম। দান-সাদকা-যাকাত সকল বিষয়েই এ কথা প্রযোজ্য। কেননা 'সাদকাত' শব্দটি এখানে 'জাতীয়' বা সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু আমাদের মতে এ কথা এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় না। কেননা এ আয়াতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে কথা রয়েছে, তা হল, দাতার জন্যে তা ভালো। কিন্তু তাতে রাষ্ট্রের প্রাপ্য (বা বায়তুলমালে জমা দেয়ার দায়িত্ব) প্রত্যাহৃত হয় না। সরকারের তা গ্রহণাধিকারও বিলুপ্ত হয় না। আর দাতার জন্যে ভালো ও কল্যাণময় হলেই যে রাষ্ট্রীয় অধিকার অস্বীকৃত হবে, তারও কোন যুক্তি নেই। কেননা দাতার জন্যে তা ভালো ও অধিক কল্যাণকর হলেও রাষ্ট্র সরকারই তা গ্রহণ করবে। তাতে তো কল্যাণের দিকটি কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়ে যাবে দ্বিতীয়বার তা গ্রহণ করায়। এ কথাটি নফল দান-সাদকা সম্পর্কে, তা আমরা আগেও বলেছি। কোন কোন মনীষী বলেছেন, ফরয যাকাত ইত্যাদি প্রকাশ্যভাবে দেয়া তা গোপন করার তুলনায় অনেক ভালো—

এ কথার উপর ইজমা হয়েছে। ফরয নামায সম্পর্কেও তাঁরা এ কথাই বলেছেন। আর এ কারণে আযান ইকামত হলে নামাযের জামা'আতে হাজির হওয়ার জন্যে তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে। ফরয নামায প্রকাশ্যভাবে পড়া উচিত বলেই তাঁরা মত দিয়েছেন। শুধু নামাযই নয়, সকল ফরয সম্পর্কেই এ কথা। অন্যথায় যাকাত না দেয়ার মিথ্যা দোষে দোষী সাব্যস্ত হওয়া খুবই সম্ভব। বে-নামাযী বলেও চিহ্নিত হতে পারে। কাজেই আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যদি তোমরা তা গোপনে কর এবং সরাসরি গরীব লোকদেরকে দিয়ে দাও, তাহলে তা তোমাদের জন্যে অতীব ভালো' বিশেষভাবে নফল দানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা নফল ইবাদত গোপনে করা তার প্রকাশ করা অপেক্ষা অনেক উত্তম। তাতে রিয়াকারিতা থেকে অনেকটা রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّ عَرْشِهِ : اَحَدُهُمْ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ لَمْ تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا تَصَدَّقَتْ بِهِ يَمِيْنُهُ -

সাতজন লোককে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দেবেন, তাদের একজন হল সে, যে কোন দান দিয়ে দেবে; কিন্তু তার ডান হাত কি দিয়েছে, তার বাম হাত তা জানবে না।

এ কথাটি নিশ্চয়ই নফল দান-সাদকা সম্পর্কে। ফরয সম্পর্কে নয়। এ হাদীস যে নফল দান সম্পর্কে, তার প্রমাণ এই যে, পশুর যাকাত দেয়ার পূর্বে কর্মচারী যখন আসবে ও তা দেয়ার দাবি জানাবে, তখন তা দিয়ে দেয়া তার জন্যে ফরয। এ অবস্থায় দেয়াটা প্রকাশ্য করাও ফরয হয়ে যায়। এ থেকেই বোঝা গেল যে, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'আর যদি তোমরা তা গোপন রাখ ও সরাসরি গরীবকে দিয়ে দাও, তাহলে তা তোমাদের জন্যে খুবই ভালো, নফল দান-সাদকা সম্পর্কেই উচ্চারিত।

## যাকাতের অংশ মুশরিককে দেয়া

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ -

ওদেরকে হেদায়েত করে দেয়া তোমার দায়িত্ব নয়। বরং আল্লাহ্‌ই যাকে চান হেদায়েত করেন। আর তোমরা যে ধন-মাল ব্যয় (দান) কর, তার সওয়াব তোমাদের জন্যেই।

আবূ বকর বলেছেন, উপরোদ্ধৃত আয়াতের শুরু— সম্বোধন এবং পরে বলা কথা প্রমাণ করে যে, 'ওদেরকে হেদায়েত করার দায়িত্ব তোমার উপর নয়' কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে, ওদের উপর যাকাত-সাদকা ধার্য করা। কেননা এর শুরুর সম্বোধনে বলা হয়েছে ঃ 'তোমরা যদি দান-সাদকা প্রকাশ কর, তা হলে তা খুবই ভালো'— এর পর সংযোজিত হয়েছে,'তোমার দায়িত্ব নয় ওদেরকে হেদায়েত করা। তারপরে বলা হয়েছে ঃ 'আর তোমরা যে ধন-মাল ব্যয় (দান) কর, তা তোমাদের জন্যেই কল্যাণকর।' কথার শুরুতে যা বলা হয়েছে এবং যা শেষের দিকে বলা

হয়েছে সাদকা-দান পর্যায়ে, তার তাৎপর্য হল, ওদেরকে সাদকা-যাকাত দেয়া মুবাহ, যদিও ওরা দ্বীন-ইসলামে নেই। আগের কালের ফিকাহবিদদের বহু সংখ্যকের এই মত বলে বর্ণনা এসেছে। জাফর ইবনে আবুল মুগীরা সাঈদ ইবনে যুবায়র (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَاتَصَدَّقُوْا اِلَّاعَلٰى اَهْلِ دِيْنِكُمْ -

তোমরা তোমাদের যাকাত-সাদকা দেবে কেবল সেই লোকদেরকে, যারা তোমাদের দ্বীন বিশ্বাস করে।

তখনই এই আয়াত 'তাদের হেদায়েত করা তোমরা দায়িত্ব নয়' নাযিল হয়। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ تَصَدَّقُوْا اِلَّا عَلٰى اَهْلِ الْاَدْيَانِ 'বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদেরকে তোমরা সাদকা-যাকাত দাও।'

হাজ্জাজ সালেমুল মক্কী— ইবনুল হানফিয়ার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, মুশরিকদেরকে যাকাত-সাদকা দেয়া লোকেরা পছন্দ করেনি। এই প্রেক্ষিতেই আল্লাহ নাযিল করেছেন ঃ 'ওদেরকে হেদায়েত করা তোমার দায়িত্ব নয়' তখন লোকেরা অ-ফরয দান সাদকা ওদেরকে দিতে শুরু করল।

আবূ বকর বলেছেন, 'লোকেরা অ-ফরয সাদকা-যাকাত ওদেরকে দিতে শুরু করল' কথাটি কার, তা আমি জানি না। হতে পারে, যাকাত, পশুর সাদকা ছাড়া অন্যান্য দান দিতে শুরু করার কথা বলা হয়েছে— কিরা-কসমের কাফফারা ছাড়া। তেমনি 'অতঃপর লোকেরা অ-ফরয সাদকা দিতে লাগল' কথাটিও। আয়তটি কোন দানকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেনি। কেননা লোকদের কাজ তা করা ওয়াজিব প্রমাণ করে না। তা সত্ত্বেও লোকদের ইখতিয়ার রয়েছে তাদেরকে সাদকা দেবে কি দেবে না— তার মধ্যে।

আল-আমাশ জাফর ইবনে আয়াস, সাঈদ ইবনে যুবায়র, ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, কুরায়যা ও নযীর বংশের নিকটাত্মীয় মুসলমান ছিলেন। তাঁরা ওদেরকে সাদকা-যাকাত দেয়াকে এড়িয়ে যেতেন, দিতেন না। তাদেরকে ইসলাম কবুল করার আহ্বান জানাতেন, তখন এ কথাটি নাযিল হয়েছিল ঃ 'ওদের হেদায়েত করা তোমার দায়িত্ব নয়' আয়াতের শেষ পর্যন্ত। হিশাম ইবনে উরওয়াতা— তাঁর পিতা— তাঁর মা আসমা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ 'আমার মা মুশরিক ছিল কুরায়শ-আধিপত্যকালে সে আমার নিকট আসে। তখন আমি নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি তার সাথে সেলায়ে রেহমী করব কিনা ? জবাবে তিনি বলিলেন, হ্যাঁ।'

আবূ বকর বলেছেন, উক্ত আয়াতটি তাৎপর্যের দিক দিয়ে যে কথা বোঝায়, তা এ আয়াতটিরও বক্তব্য ঃ

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا -

এবং তারা আল্লাহ্‌র মুহাব্বতে মিসকীন ইয়াতীম, বন্দীদেরকে খাবার খাওয়ায়।

এ প্রেক্ষিতে আল-হাসান বলেছেন, আয়াতে বন্দী বলতে মুশরিক বন্দীকেই বুঝিয়েছেন। সাঈদ ইবনে যুবায়র ও আতা বলেছেন, ওরা আহ্‌লি কিবলা ও অন্যান্যরা।

আবূ বকর বলেছেন, প্রথম মতটি অধিক প্রকাশমান। কেননা ইসলামী রাষ্ট্রে কেবল মুশরিকরাই বন্দী হতে পারে। তার নযীর হচ্ছে, আল্লাহ্র কথা ঃ

لَايَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِىْ الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ -

যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কৃতও করেনি, তোমরা তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে ও ন্যায়বিচার তাদের প্রতি প্রয়োগ করবে, তা থেকে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না।

এ আয়াতে তাদের কল্যাণ করাকে আল্লাহ মুবাহ করেছেন, যদিও তারা মুশরিক। তবে শর্ত এই যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী হবে না। দান-সাদকা দেয়া তো কল্যাণময় কাজ। অতএব তাদেরকে যাকাত-সাদকাত দেয়া খুবই সঙ্গত এবং জায়েয। আর এসব আয়াত বাহ্যতই সর্ব প্রকারের দান-সাদকা তাদেরকে দেয়া জায়েয বলে। তবে নবী করীম (স) তার মধ্য থেকে যাকাত ও পশুর সাদকাকে ভিন্ন করে দিয়েছেন। আর সেই সাথে সেসব দানও, যা সরকার চালিত বায়তুলমালে দেয়া কর্তব্য রাসূলের এই কথার ভিত্তিতে ঃ

اُمِرْتُ اَنْ اٰخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ اَغْنِيَاءِكُمْ وَاَرُدُّهَا فِىْ فُقَرَاءِكُمْ -

আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, তোমাদের ধনীদের নিকট থেকে সাদকা-যাকাত গ্রহণ করব এবং তা তোমাদেরই গরীব লোকদের মধ্যে ফিরিয়ে দেব।

হযরত মুয়ায (রা)-কে বলেছিলেন ঃ

اَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ حَقًّا فِىْ اَمْوَالِهِمْ يُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَاءِ هِمْ وَيُرَدُّعَلَى فُقَرَائِهِمْ -

তাদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের উপর একটা হক আরোপ করেছেন তাদের ধন-মালে। তা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নিয়ে নেয়া হবে এবং তাদের গরীবদের মধ্যে তা ফিরিয়ে দেয়া হবে।

তাহলে যে সব সাদকা— যাকাত সরকার-কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবে, তা অন্যান্য সমস্ত দান সাদকা থেকে স্বতন্ত্র। এ কারণে ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন ঃ এমন সব সাদকা-যাকাত যা সরকারের গ্রহণ করা হবে না, তা যিম্মী (অমুসলিম) যাদেরকে দেয়া জায়েয। আর যা সরকারে গ্রহণ করা হবে, তা যিম্মীদের দেয়া জায়েয হবে না। তা হলে কাফফারা, মানত ও সাদকায়ে ফিতরা ইত্যাদি যিম্মীদেরকে দেয়া জায়েয হবে।

যদি বলা হয়, ধন-মালে যাকাত তো সরকারের গ্রহণ করা হয় না। কিন্তু তা যিম্মীদেরকে দেয়া জায়েয নয়।

জবাবে বলা যাবে, না আসলে তা সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে। নবী করীম (স) নিজেই সরকার চালক হিসেবে তা গ্রহণ করতেন। সেই ভাবে হযরত আবূ বকর ও উমর (রা)-ও তা

গ্রহণ করেছেন। হযরত উসমান (রা) লোকদেরকে বলেছিলেন, এটা যাকাত দেয়ার মাস। অতএব যার ঋণ আছে, তা আদায় করে দাও। পরে তার অবশিষ্ট মাল ছেড়ে দিক। এতে মালের মালিকদেরকেই তার যাকাত আদায় করার দায়িত্বশীল বানিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তা গ্রহণ করায় সরকারের হক প্রত্যাহৃত হয়নি।

ইমাম আবূ ইউসূফ বলেছেন, কোন ওয়াজিব সাদকাই কাফিরদেরকে দেয়া জায়েয নয়। যাকাত সম্পর্কিত হুকুমই কিয়াস করে তার উপর প্রয়োগ করতে হবে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ -

সে সব গরীবের জন্যে, যারা আল্লাহ্র পথে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে বলে দুনিয়ায় চলাফেরা করতে পারে না।

অর্থাৎ উপরে যে ব্যয় বা দানের কথা বলা হয়েছে, তা সাদকা-যাকাতকেই বুঝিয়েছে। মুজাহিদ ও সুদ্দী বলেছেন, এ আয়াতে 'গরীব লোক' বলে মুহাজিরদেরকে বুঝিয়েছেন।

আল্লাহ্র কথা ঃ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ 'আল্লাহ্র পথে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে' বলে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা কাফির-শত্রুদের ভয়ে ব্যবসায়-বাণিজ্যে বের হওয়া থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে নিয়েছে, বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। কাতাদাতা এ কথা বলেছেন। কেননা احصار অর্থ কোন রোগ বা প্রয়োজন কিংবা ভয়-ভীতির কারণে নিজেদেরকে সর্বপ্রকারের কাজ থেকে বিরত রাখা। শত্রুরা যখন কাউকে বাইরে যেতে দেয় না, তখন তাকে বলা যাবে اُحْصِرَ 'সে পরিবেষ্টিত হয়েছে।'

আল্লাহ্র কথা ঃ

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ -

তাদের নিজেদের ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বিরত থাকা ও পবিত্রতা গ্রহণের কারণে জাহিল ব্যক্তি তাদেরকে ধনী-সচ্ছল লোক বলে ধারণা করে।

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, সে লোকদের বাহ্যিক অবস্থা ও রূপ, ধরন-ধারণ ধনী লোকদের সাথে সাদৃশ্যশীল। তা না হলে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে ধনী লোক বলে ধারণা করত না। কেননা একটি লোকের দারিদ্র্যাবস্থা দুটি জিনিস দ্বারা বোঝা যায়। তার একটি হল, বাহ্যিক অবস্থার জরাজীর্ণতা ও আউল-বাউল দেখতে। আর দ্বিতীয়টি হল তার ভিক্ষা চাওয়া এজন্যে যে, সে একজন দরিদ্র। কিন্তু কোন লোকের বাহ্যিক চাল-চলন ও বেশ-ভূষা যদি ধনী লোকদের মত হয়, তাহলে সে যে গরীব, তা বোঝা খুবই দুষ্কর। যে কোন লোক খুব সহজেই তাকে ধনী ব্যক্তি মনে করবে।

এ আয়াত একথারও দলীল যে, একজন ব্যক্তির পোশাক-পরিচ্ছদ মূল্যবান ও শোভামণ্ডিত হলেও তাকে যাকাত না দেয়ার কারণ নেই। কেননা আল্লাহ তো আমাদেরকে যাকাত দিতে বলেছেন। যার বাহ্যিক অবস্থা ধনী সদৃশ, তাকেও দিতে বলেছেন। সুস্থ সবল স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিকেও যাকাত দেয়া যেতে পারে। কেননা আল্লাহ্ সেসব মুহাজিরকে যাকাত দিতে বলেছেন,

যারা নবী করীম (স)-এর সঙ্গে একত্রিত হয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। তারা রোগাক্রান্ত ছিলেন না, অন্ধও ছিলেন না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

سِيْمَا - تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ -

মানে আলামত; চিহ্ন। তাদের চিহ্ন দেখেই তোমরা তাদেরকে চিনতে পারবে।

মুজাহিদ এ আয়াতাংশের তাফসীরে বলেছেন, তোমরা তাদের تَخَشُّعْ শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখেই বুঝতে পারবে। সুদ্দী ও রুবাই ইবনে আনাস বলেছেন, سِيْمَاهُمْ বলে তাদের দারিদ্র্যের চিহ্ন ও লক্ষণ বুঝিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন ঃ

سِيْمَا هُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ -

তাদের মুখমণ্ডলে তাদের পরিচিত সিজদা চিহ্নরূপে। (সূরা ফাতেহ ঃ ২৯)

তাই প্রথমোক্ত আয়াতে سيما অর্থ, মানুষের মুখাবয়বে খারাপ অবস্থা ও চাকচিক্যহীনতা দেখেই তাদেরকে চিনতে পারবে, যদিও তাদের বেশ-ভূষা ও বাহ্যিক রূপ খুবই সৌন্দর্যমণ্ডিত। হতে পারে, আল্লাহ তাঁর নবীকে এমন কোন ইল্‌ম দিয়েছেন, যদ্দ্বারা তাদেরকে দেখলে তাদের দারিদ্র্যাবস্থা তিনি জানতে পারতেন। আমরা যদিও তা বুঝতে ও চিনতে না পারি। আমরা তো জানতে পারি তখন, যখন তারা ভিক্ষা চায় অথবা তাদের চরম দারিদ্র্যাবস্থা সম্পর্কে কোন না কোনভাবে জানতে পারি। এ থেকে এও প্রমাণিত হয় যে, বাহ্যিক লক্ষণ দেখেও অনেক সময় বোঝা যায় না যে, তার আসল অবস্থার দৃষ্টিতে তার প্রাপ্য কি ? হানাফী ফিকাহবিদগণ দারুল ইসলামে মরা ব্যক্তির মধ্যে যে লক্ষণ পাওয়া যায়, তাকেই গণ্য করেছেন। অথবা তার মৃত্যু কাফিরের দেশে হলে— যখন তার ব্যাপারটি তার পূর্বে কুফর বা ইসলামের দিক দিয়ে কিছুই জানা যায়নি, তখন তার লক্ষণসমূহ বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। তার উপর যদি কুফরের চিহ্ন পাওয়া যায়— যেমন পৈতা, খাতনা না করা অথবা খ্রীষ্টান পাদ্রী-পুরোহিতদের ন্যায় চুল-দাড়ি যথেষ্ট লম্বা করা ইত্যাদি পাওয়া গেলে তাকে কাফিরদের একজন মনে করতে হবে এবং মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফন করা যাবে না। তার জানাযার নামাযও পড়া হবে না। পক্ষান্তরে তার উপর যদি মুসলিম হওয়ার লক্ষণ পাওয়া যায়, তাহলে মুসলমানের মতই তার জানাযার নামায পড়া ও কাফন-দাফন মুসলমানের মতই করতে হবে। আর যদি বিশেষভাবে কোন আলামতই না পাওয়া যায়, তাহলে তার মৃত্যু মুসলমানের জনপদে হলে তাকে মুসলিম মনে করতে হবে। আর কাফির জনপদে মারা গেলে তাকে কাফির মনে করতে হবে, সে জনপদটি দারুল হরব-এ হলেও। এক্ষেত্রে তার নিজের অবস্থানের লক্ষণই হল বড় প্রমাণ। তাই কোন বিশেষ লক্ষণ পাওয়া অবস্থায় তাকে যে স্থানে মৃতাবস্থায় পাওয়া গেছে, সেই স্থানের দৃষ্টিতে তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

পড়ে পাওয়া বালক বা বালিকা সম্পর্কেও এ বিবেচনা কাজ করবে। বাস্তব অবস্থার দৃষ্টিতে অপরাধী নির্ধারণ ও চিহ্নিতকরণের একটা বড় প্রমাণ হচ্ছে হযরত ইউসূফ ও জুলায়খা সংক্রান্ত ঘটনায় আল্লাহ্‌র বলা ঃ

إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ - وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ -

তার জামা যদি সম্মুখের দিক দিয়ে ছেঁড়া হয়, তাহলে মেয়ে লোকটি সত্য বলেছে এবং পুরুষটি মিথ্যাবাদীদের একজন। পক্ষান্তরে তার জামা যদি পেছন দিক দিয়ে ছেঁড়া হয়, তাহলে মেয়েলোকটি মিথ্যা বলেছে, পুরুষটি সত্যবাদী। (সূরা ইউসূফ ঃ ২৭)

এ আয়াতে ঘটনার সত্যতা যাচাই করার একটা অকাট্য মানদণ্ড দেয়া হয়েছে এবং তা আলামত ভিত্তিক।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ -

এবং তুমি তাদেরকে অবশ্যই চিনবে তাদের কথার স্বর শুনে। (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৩০)

ইউসূফ (আ)-এর ভাইরা তাঁর জামায় মিথ্যামিথ্যি রক্ত মেখে দিয়েছিল এবং তাদের কথার সত্যতা প্রমাণের জন্যে এটাকে একটি আলামত বানিয়েছিল।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَجَاءُوْا عَلٰى قَمِيْصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ -

তারা তাঁর জামায় মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে নিয়ে এসেছিল। (সূরা ইউসূফ ঃ ১৮)

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا -

তারা লোকদেরকে জড়িয়ে ধরে ভিক্ষা চায় না।

الحاف এর অর্থ, স্থায়ীভাবে চাইতে থাকা। কেননা الحاف অর্থ সর্বব্যাপী হওয়া, স্থায়ীভাবে ধরা। বোঝা গেল, জড়িয়ে ধরে কেবল চাইতেই থাকা নিন্দনীয়।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, 'তারা লোকদেরকে জড়িয়ে লেপহে ধরে চায় না।' তার অর্থ, তিনি জড়িয়ে লেপটিয়ে ধরে৮ভিক্ষা চাইতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু মূলত ভিক্ষা চাইতে০তো নিষেধ করেন নি ?

জবাবে বলা যাবে, আয়াতের ধরন ও সম্বোধনে নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে, যা ভিক্ষা চাইতেই নিষেধ করে মূলগতভাবে। আর তা হল, 'মূর্খ লোক তাদের ভিক্ষা চাওয়া বিমুখতা দেখে তাদেরকে ধনী লোক বলে ধারণা করে।' তারা যদি প্রকাশ্যভাবে ভিক্ষা চাইতে এবং জড়িয়ে লেপটিয়ে ধরার কাজটি না-ও করত, তাহলে তো তাদেরকে কেউ ধনী মনে করতে পারত না। আল্লাহ্র কথা ঃ مِنَ التَّعَفُّفِ ও তা-ই প্রমাণ করে। কেননা এ শব্দটির তাৎপর্য হচ্ছে 'কানায়াত' যা নিজের আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্টির ভাবধারা। ভিক্ষা চাওয়া পরিহার করা। বোঝা গেল, ভিক্ষা না-চাওয়াই তাদের আসল পরিচিতি। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنِ اسْتَغْنٰى اَغْنَاهُ اللّٰهُ وَمَنِ اسْتَعَفَّ اَعَفَّهُ اللّٰهُ -

যে লোকে পরবিমুখ হল, আল্লাহ্ তাকে ধনী বানাবেন। আর যে লোক ভিক্ষা চাওয়া থেকে বিরত থাকল, আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

আমরা এই যা বললাম যে, আয়াত থেকেই প্রমাণিত হয়েছে যে, কারোর কাপড়-চোপড় পরা থাকলেই তাকে যাকাত দেয়া নিষেধ নয়। তার তা গ্রহণ করাও নিষেধ নয়। যদি তার অপ্রকাশমান অবস্থা এই হয় যে, সে দরিদ্র, আর তার ঘর-বাড়ি, মাল-সরঞ্জাম যানবাহন ও খাদেম-চাকরও থাকে তার নানা প্রয়োজন পূরণার্থে, তা হলেও। কেননা হয়তবা এগুলোর তার বাস্তবিকই প্রয়োজন রয়েছে। তাই এসব সত্ত্বেও সে অ-ধনী ব্যক্তি হতে পারে। কেননা ধনী তো তাকেই বলা যায়, যার প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ রয়েছে।

তাই কত পরিমাণ ধন-মাল থাকলে তাকে ধনী বলা যায়, এ বিষয়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন কথা এসেছে। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ ও জুফর বলেছেন, কোন ব্যক্তির ঘর, পোশাক, দ্রব্যাদি, খাদেম ও যানবাহনের পরও এতটা নগদ সম্পদ থাকবে যা দুইশত দিরহামের সমান, সে ধনী ব্যক্তি, তার পক্ষে যাকাত গ্রহণ করা জায়েয নয়। আর যদি দুইশত দিরহাম পরিমাণের কম থাকে, তাহলে ধনী নয়, যাকাত গ্রহণ তার জন্যে হালাল।

ইমাম মালিক আবুল কাসিমের বর্ণনানুযায়ী মত দিয়েছেন, যার চল্লিশ দিরহাম থাকবে, তাকেও যাকাত দেয়া যাবে। মালিকের অপর এক বর্ণনানুযায়ী আর একটি মত হল, যার চল্লিশ দিরহাম আছে, তাকে যাকাত দেয়া যাবে না। সওরী, আল-হাসান ইবনে সালিহ্ বলেছেন, যার পঞ্চাশ দিরহাম নগদ সম্পদ আছে, সে যাকাত গ্রহণ করবে না। উবায়দুল্লাহ্ ইবনুল হাসান বলেছেন, যার এক বছরের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা নেই, তাকে যাকাত সাদকা দেয়া যাবে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার প্রয়োজন পরিমাণ দেয়া যাবে, যার দ্বারা সে তার প্রয়োজন পূরণ করবে ও দারিদ্র্যের সীমা থেকে বাইরে গিয়ে সচ্ছলতা লাভ করবে। তাতে যাকাত ফরয হবে, কি হবে না, তার কোন সীমা নেই। আল মুজানী ও রুবাই তাঁর এ মতের উল্লেখ করেছেন। তাঁর এ কথারও বর্ণনা দিয়েছেন যে, শক্তিমান উপার্জনক্ষম ব্যক্তির জন্যে যাকাত হালাল নয়, যদি সে দরিদ্র ব্যক্তিও হয়।

মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ব্যবস্থার পরে নগদ সম্পদ হিসেবে অতিরিক্ত কারোর নিকট সঞ্চিত থাকলে সে গরীব নয়, ধনী, আমাদের পূর্বে বলা এই কথাটির সত্যতা প্রমাণকারী দলীল একটি হাদীস। হাদীসটি আবদুল হামীদ ইবনে জাফর তাঁর মুজীনা গোত্রের এক ব্যক্তি সূত্রে বর্ণিত। সেই ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-কে ভাষণ দিতে শুনেছেন। তিনি বলছিলেন ঃ

مَنِ اسْتَغْنَى اَغْنَاهُ اللّٰهُ وَمَنِ اسْتَعَفَّ اَعَفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ سَاَلَ النَّاسَ وَلَهُ عِدْلُ خَمْسِ اَوَاقٍ سَاَلَ اِلْحَافًا -

যে ব্যক্তি পরমুখাপেক্ষিতামুক্ত হতে চায়, আল্লাহ্ তাকে সচ্ছল করে দেবেন, পরমুখাপেক্ষিতামুক্ত বানিয়ে দেবেন। আর যে লোক স্বীয় আত্মমর্যাদা রক্ষা করতে ইচ্ছুক ও সচেষ্ট হবে, আল্লাহ্ তাকে মুক্ত করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি লোকদের নিকট ভিক্ষা চাবে, অথচ তার নিকট পাঁচ 'আউকিয়া' (দুইশত দিরহাম— সাড়ে পঞ্চাশ তোলা রৌপ্য) সমান সম্পদ রয়েছে, তাহলে সে (কুরআন নিষিদ্ধ) জড়িয়ে ধরে ভিক্ষা চাওয়ার কাজ করল।

হাদীসে যে পরিমাণের উল্লেখ রয়েছে, সেই পরিমাণ সম্পদ কারোর থাকলে সে দারিদ্রাবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে সচ্ছলতার পর্যায়ে পৌছে গেছে। তার ভিক্ষা চাওয়া সম্পূর্ণ হারাম। নবী করীম (স)-এর এ কথাটিও তা-ই প্রমাণ করে, যাতে তিনি বলেছেন ঃ

আমি আদিষ্ট হয়েছি, তোমাদের ধনী লোকদের নিকট থেকে সাদকা-যাকাত গ্রহণ করব এবং তা তোমাদেরই গরীবদের মধ্যে ফিরিয়ে দেব। তারপরে বলেছেন, দুইশত দিরহামে পাঁচ দিরহাম। তার কমে কিছু নেই।

এই কথাটিতে ধনীর ধন পরিমাণ বলা হয়েছে দুইশত দিরহাম। অতএব এটাকেই গণ্য করতে হবে, অন্য কিছু নয়। এ থেকে এ-ও বোঝা গেল যে, যার এ পরিমাণ সম্পদ নেই, তাকে যাকাত দেয়া যাবে। কেননা নবী করীম (স) তাঁর উক্ত কথায় মানুষকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন— ধনী ও গরীব। কথিত পরিমাণ সম্পদের মালিককে ধনী বলেছেন এবং তার নিকট থেকে যাকাত নিতে আদেশ করেছেন। আর যে দরিদ্র, তাকে ধনীর নিকট থেকে নেয়া সম্পদ দেয়া হবে, সে সেই ব্যক্তি যে উক্ত পরিমাণ সম্পদের মালিক নয়।

আবূ কারশাতাস সালুসী সহল ইবনুল হানযালিয়াতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি রাসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছি এ কথাটি ঃ

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ -

যে লোক ধন-সম্পদ নিজের থাকা সত্ত্বেও লোকদের নিকট ভিক্ষা চাবে, সে জাহান্নামের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে।

সাহাবী প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! مَاظَهْرُغِنًا؟ একজনের ধন-সম্পদের প্রকাশমানতা কি ? বললেন ঃ

اِنْ يَّعْلَمَ اَنَّ عِنْدَ اَهْلِهِ مَايُغَدِّيْهِمْ وَيُعَشِّيْهِمْ -

যদি জানা যায় যে, তার সকাল-দুপুরের এবং রাত্রের খাওয়ার ব্যবস্থা তার নিকট আছে।

জায়দ ইবনে আসলাম আতা ইবনে ইয়াসা, বনু আসাদের এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাকে বলতে শুনলাম, তিনি এক ব্যক্তিকে বলছেন ঃ

مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَعِنْدَهُ اُوْقِيَّةٌ اَوْعِدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ الْحَافًا -

তোমাদের মধ্যে যার নিকট এক আউকিয়া কিংবা তার সমমূল্যের সম্পদ আছে, সে যদি ভিক্ষা চায়, তাহলে সে (কুরআন নিষিদ্ধ) জড়িয়ে ধরে ভিক্ষা চাওয়ার কাজ করল।

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ তাঁর পিতা, ইবনে মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

لَايَسْئَلُ عَبْدٌ مَسْئَلَةً وَلَهُ مَايُغْنِيْهِ اِلَّا جَاءَتْ شَيْئًا اَوْكُدُوْحًا اَوْخُدُوْشًا فِيْ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

যে লোক একবারও ভিক্ষা চাবে, অথচ তার জন্যে যথেষ্ট সম্পদ তার নিকট রয়েছে সে

মর্যাদাহানিকর নির্লজ্জ কিংবা হীন উঞ্ছবৃত্তি অথবা কিয়ামতের দিন তার মুখে রক্তঝরা যখম হওয়ার কাজ করল।

জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! একজনের ধনাঢ্যতা কি? বললেন, পঞ্চাশ দিরহাম কিংবা সমপরিমাণ স্বর্ণ। এ কথাটি ভিক্ষাবৃত্তি মাকরূহ হওয়া পর্যায়ে বলা' কিন্তু তাতে সাদকা-যাকাত হারাম একথা কিন্তু এ থেকে প্রমাণিত হয় না। নবী করীম (স) খুবই পছন্দ করতেন যে, যার নিকট সকাল-সন্ধার খাওয়ার ব্যবস্থা আছে সে ভিক্ষা করবে না, ভিক্ষা করা ছেড়ে দেবে। কেননা তখনকার সময়ে মুসলমান গরীব ও সুফফাবাসী এমন ছিলেন, যাদের নিজের নিকট সকাল-সন্ধায় খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। এ কারণে নবী করীম (স) এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, যার নিকট এই পরিমাণ সম্পদ আছে, সে তা নিয়েই ভিক্ষা থেকে নিবৃত্ত থাকবে। ভিক্ষা ত্যাগ করে স্বীয় আত্মমর্যাদাকে ভিক্ষার কলুষতা থেকে পবিত্র রাখবে। যেন যাকাত বাবত বণ্টিত সম্পদ সে পায়, যার জন্যে তা অধিক প্রয়োজনীয়। তা গ্রহণ করা বা ভিক্ষা চাওয়া হারাম, সেজন্যে নয়। সকলেই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, যাকাত গ্রহণ মুবাহ হওয়ার পথ মৃত শব খাওয়ার প্রয়োজন হওয়ার পথ নয়। কেননা মৃত শব খাওয়া হালাল হয় কেবল সেই চরম অবস্থায়, যখন জীবন বাঁচানোর তা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। যাকাত গ্রহণ প্রত্যেক অভাবী ব্যক্তির জন্যেই মুবাহ। সে মৃত্যুর মুখে উপস্থিত হওয়ার মত অবস্থায় না পৌঁছলেও— যখন তার নিকট কিছুই থাকে না। এ ব্যাপারে মুসলমানদের ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দারিদ্র্যই তার জন্যে যাকাত গ্রহণ করাকে মুবাহ করে দিয়েছে। উপরোদ্ধৃত হাদীসসমূহের ব্যবহারিক হুকুম বিভিন্ন, হাদীসসমূহও মূলত বিভিন্ন। তবে উদ্ধৃত হাদীসসমূহে দুইশত দিরহামকে যে ধনাঢ্যতার মান নির্দিষ্ট করেছে এবং তা কারোর নিকট থাকলে তার পক্ষে যাকাত গ্রহণ হারাম, তা সর্বসম্মত মত। এটাই প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত। এছাড়া আর যা কিছু, তা হয়ত মাকরূহ পর্যায়ের কিংবা তা মনসূখ হয়ে গেছে অন্যান্য হাদীস দ্বারা, যদি তার অর্থ হয় যাকাত গ্রহণের হারাম হওয়া।

## সূদ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبَا لَايَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ -

যারা সূদ খায় তাদের অবস্থা হয় সেই ব্যক্তির মত, যাকে শয়তান স্বীয় স্পর্শ দ্বারা পাগল ও সুস্থ-জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে।

পরে বলেছেন ঃ

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا -

আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা-বাণিজ্য হালাল করেছেন এবং সূদ হারাম করে দিয়েছেন।

আবূ বকর বলেছেন ঃ الرِّبَا -এর আভিধানিক অর্থ হল— বৃদ্ধি, বাড়তি। এ থেকেই আরবী শব্দ الرَّابِيَةُ। তার চতুষ্পার্শ্বের জমিনের উর্বরতা বৃদ্ধি পায়, চমৎকার ফসল ফলে। এ থেকেই رَبْوَةٌ শব্দ, উঁচু ভূমি।

আরবদের কথা ঃ

أَرْبَى فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ فِيْ الْقَوْلِ أَوِالْفِعْلِ اِذَازَا دَعَلَيْهِ -

অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির উপর প্রবৃদ্ধি লাভ করেছে কথায় বা কাজে যখন সে তার চেয়ে বেড়ে যায়।

শরীয়াতী পরিভাষায় তার কয়েকটি অর্থ। যদিও আভিধানিক ভাবে এই শব্দটি নাম হিসেবে সে জন্যে তৈরী করা হয়নি। নবী করীম (স) একটি হাদীসে আগে পরে করাকে ربا বলেছেন। হাদীসটি উসামা ইবনে জায়দ (রা) বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ

اِنَّمَا الرِّبَا فِيْ النَّسِيْئَةِ -

সূদ আগে পরে করার মধ্যে রয়েছে।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন ঃ

اِنَّ مِنَ الرِّبَا اَبْوَابًا لَّاتَخْفِىْ مِنْهَا السَّلَمُ فِيْ السِّنِّ -

সূদের বহু কয়টি দুয়ার রয়েছে। তা কোন লোকের নিকটই প্রকৃত নয়।

উমর (রা) এ-ও বলেছেন যে, সূদের আয়াতটি কুরআনের সর্বশেষে নাযিল হওয়া আয়াত। নবী করীম (স) তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়ার আগেই দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। অতএব তোমরা সূদ পরিত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর সন্দেহমূলক লেন-দেন।

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, ربا একটি শরীয়াতভিত্তিক নাম হয়ে গেছে। কেননা তা যদি তার আসল আভিধানিক অর্থ নিয়েই অবশিষ্ট থেকে থাকে, তাহলে তা হযরত উমর (রা)-এর নিকট নিশ্চয়ই গোপন থাকত না। তিনি আভিধানিক নামের বড় বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর যোগ্যতারও অধিকারী ছিলেন। এ থেকে বোঝা যায়, আরবরা স্বর্ণকে স্বর্ণের, রৌপ্য রৌপ্যের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে জানত না। 'নাসা' হচ্ছে সূদ। ইসলামী শরীয়াতেও তা সূদ। অবস্থা যখন এই, তখন এ নামটিও অন্যান্য সব অস্পষ্ট নামগুলোর মত হয়ে গেছে, যা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। এই নামসমূহ আভিধানিক অর্থ থেকে সরে এসে শরীয়াতভিত্তিক নাম পরিগ্রহ করেছে। তা এমন সব অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে, যা বোঝাবার জন্যে এই শব্দটি তৈরী করা হয়নি অভিধানে। যেমন الصلاة، الصَّوْمُ، الزَّكٰوةُ —এ সব কয়টিরই শরীয়াতের আলোকে ব্যাখ্যা আবশ্যক, কাজেই তা সাধারণ অর্থবোধক শব্দ বলে কোন ধরনের চুক্তিকে হারাম করার দলীল হিসেবে এই শব্দটিকে ব্যবহার করা যায় না। কোন অর্থে ব্যবহারের দলীল থাকলে ভিন্ন কথা। তখন তা শরীয়াত নির্ধারিত নামে চিহ্নিত হবে। নবী করীম (স) কুরআনের আয়াত দলীল হিসেবে আল্লাহ্‌র কোন বক্তব্যকে প্রকাশ করে, তার ব্যাখ্যা করেছেন। কোন কোনটিকে দলীল হিসেবেও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেগুলোতে আল্লাহ্‌র বক্তব্য যে 'তওকীফ' তা মনীষীদের নিকট অজানা ছিল না। আরবরা যে ربا বা সূদের সাথে পরিচিত ছিল, যার সাথে তাদের বাস্তব সম্পর্কও ছিল, তা হল 'করয'। যদি কেউ কারোর নিকট থেকে 'করয' নিল নির্দিষ্ট মিয়াদে, সেই মিয়াদ অনুযায়ী যদি তা ফেরত দিতে না পারত, তাহলে সময় নিয়ে নিত এবং করয-এর পরিমাণও বাড়িয়ে দিত। এটা উভয়ের সম্মতিতেই হতো। নগদ ক্রয়-বিক্রয়ের সাথেও তা পরিচিত ছিল না। সাধারণত পণ্যের পারস্পরিক বিনিময় করা হতো। তাতে একই জাতীয় পণ্যে বেশি-কম হতো। তাদের মধ্যে এটাই বেশি পরিচিত ছিল, সকলেরই জানা ছিল।

এজন্যই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًالِّيَرْبُوَا فِىْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ۔

আর তোমরা যে সূদ দাও লোকদের ধন-মালে প্রবৃদ্ধি হবে— এ উদ্দেশ্যে, তা হলে জেনে রাখবে, আল্লাহ্‌র নিকট কিন্তু তা বৃদ্ধি পায় না। (সূরা রূম ঃ ৩৯)

জানিয়ে দিলেন যে শর্তাধীন সেই প্রবৃদ্ধি ছিল মূলধনে সূদ। কেননা করযদাতার দিক থেকে তার কোন বিনিময় নেই। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

لَاتَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً -

তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ খেয়ো না। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৩০)

এতে সেই অবস্থা সম্পর্কে খবর দেয়া হয়েছে, যার প্রেক্ষিতে এ কালাম এসেছে। তা হল চক্র বৃদ্ধি হারে প্রবৃদ্ধির শর্ত। তারা যে সূদের লেন-দেন করত, তাকে আল্লাহ্ বাতিল করেছেন। আরও বহু প্রকারের ক্রয়-বিক্রয়কেও বাতিল করেছেন এবং তার নাম দিয়েছেন 'সূদ'। আল্লাহ্‌র কথা وَحَرَّمَ الرِّبٰا 'এবং সূদ হারাম করেছেন' কথাটিতেই সেই সব শামিল রয়েছে। رِبًا বলতে যত প্রকারের কারবার হতে পারে, শরীয়াতের দৃষ্টিতে তার সব কিছুকেই হারাম করে দিয়েছেন। তাদের সূদী কারবার ঠিক সেই নিয়মেই হয়েছে, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তা হল দিরহাম বা দিনার বাড়তির শর্তে একটা মিয়াদ পর্যন্তকার জন্যে 'করয' দেয়া।

শরীয়াতের দৃষ্টিতে رِبًا বা সূদ কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি হল সেই সূদ, যা জাহিলিয়াতের আমলে আরবে ব্যাপকভাবে চালু ছিল। দ্বিতীয় হল, একই জাতীয় দ্রব্যাদির মধ্যে মাপে বা ওজনে বেশি-কম করা। এ হচ্ছে হানাফী আলিমগণের ব্যাখ্যা। আমালিক ইবনে আনাস একই জাতীয় ও সময়ের সাথে নির্দিষ্ট ও পুঞ্জীকৃত হওয়াকে গণ্য করেছেন। ইমাম শাফেয়ী একই জাতীয় পণ্য নেয়া। তা হলে একই জাতীয় হওয়াটা সকলেরই নিকট গুরুত্বপূর্ণ। অন্য জিনিসের সাথে সংযুক্ত করার ফলে কম-বেশি করা হয়েছে সেই দৃষ্টিতেই। তৃতীয় হল, 'নাসা'। তা কয়েক প্রকারের। প্রত্যেকটি জিনিসের একই জাতীয় হওয়া। তার কিছুকে অপর কিছুর বিনিময়ে বিক্রয় করা— আগে পরে করে, তা মাপের জিনিস হোক, কি ওজনের পণ্য অথবা অন্য কিছু। তাই আমাদের মতে একটি কাপড়ের বদলে অপর একটি বিক্রয় করা একই জাতীয় হওয়ার কারণে জায়েয নয়। কোনটি হয় কম-বেশি করা হারাম করার শর্তে, যেখানে একই জাতীয় হওয়ার তাৎপর্য প্রচ্ছন্ন। তা মাপা ও ওজন করা। দিরহাম ও দীনারের মূল্য ছাড়া অন্য কিছুতে। তাই যদি সব বিক্রয় করা হয় চুনার বদলে— আগে পরে করে, তা হলে জায়েয হবে না মাপের বর্তমান থাকার কারণে। যদি লোহা বিক্রয় করা হয় স্বর্ণের বিনিময়ে আগে পরে সময়ের ভিত্তিতে, তাহলে তা জাযেয হবে না ওজনের কারণে।

## শরীয়াতের দৃষ্টিতে সূদের কতিপয় দুয়ার

উমর ফারুক (রা) বলেছেন, সূদের বহু দুয়ার আছে, তা প্রচ্ছন্ন কিছু নয়। তার মধ্যে থেকে একটি হচ্ছে اَلسَّلَمُ فِى السِّنِّ —আরবরা তা জানতো ও চিনতো না। তাতে বোঝা গেল, তিনি কথাটি বলেছেন, 'তওকীফ' হিসেবে। যত প্রকারের সূদ হতে পারে তা সবই এই নামের

অন্তর্ভুক্ত শরীয়াতের দৃষ্টিতে। যেমন 'নাসা' ও বেশি-কমের করাবার শর্তের ভিত্তিতে হলেই তা সূদ। ফিকাহবিদদের নিকট এ পরিচিতিই স্থির হতো।

নবী করীম (স)-এর একটি কথা তার দলীল। তিনি বলেছেন ঃ

اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمَثَلٍ يَدًا بِيَدٍ وَالْفَضْلُ رِبًا ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ مِثْلًا بِمَثَلٍ يَدًا بِيَدٍ وَالْفَضْلُ رِبًا -

গম শস্য গমের বদলে ক্রয় বিক্রয় হতে পারে, শর্ত হচ্ছে তা একই রকমের হতে হবে, হাতে হাতে অর্থাৎ নগদা-নগদি হতে হবে। কোনটির বাড়তি হলেই সূদ হবে। বার্লির বদলে বার্লির ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে। তবে শর্ত এই যে, তার উভয়টা অভিন্ন প্রকারের হতে হবে, হাতে হাতে হতে হবে। কোনটির চাইতে কোনটি বেশি হলে সূদ হবে। খেজুর, নমক, স্বর্ণ, রৌপ্য— এ সবেরও তিনি উল্লেখ করেছেন। একই জাতীয় পণ্যে মাপে বা ওজনে কোনটির বাড়তি ধরা হলেই সূদ হয়ে যাবে। উসামাতা ইবনে জায়দ (রা) এ হাদীস তাঁর থেকে আবদুর রহমান ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّمَا الرِّبَا فِىْ النَّسِيَةِ -

মিয়াদ বাড়িয়ে দিয়ে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করার পদ্ধতি হল সূদের পদ্ধতি।

কোন কোন হাদীসের ভাষা হল ঃ

لَارِبَا اِلَّافِىْ النَّسِيْئَةِ -

সময় বৃদ্ধির সাথে সাথে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করাতেই সূদ। তাছাড়া অপর কোনটিই সূদ নয়।

প্রমাণিত হল যে, সূদ নামটি শরীয়াতের দৃষ্টিতে কখনও ব্যবহৃত হয় تفاضل পারস্পরিক বৃদ্ধি অর্থে, আবার কখনও নাসয়িয়া— সময় বৃদ্ধির সাথে সাথে মূলধন বৃদ্ধিকরণ অর্থে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন ঃ 'সূদ কেবল নাসয়িয়া পদ্ধতিতে হয়।' স্বর্ণ দ্বারা স্বর্ণ, রৌপ্য দ্বারা রৌপ্য পারস্পরিক পরিমাণ বৃদ্ধি সহকারে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয। আর এজন্যে তিনি হযরত উসামা ইবনে জায়দ (রা) বর্ণিত হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করতেন। পরে যখন তিনি সেই হাদীস সম্পর্কে জানতে পারলেন, যাতে পণ্যসমূহের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে পারস্পরিক বৃদ্ধিতে যে লেনদেন হয়, তা-ও হারাম, তখন তিনি স্বীয় পূর্বের মত প্রত্যাহার করেন।

জাবির ইবনে জায়দ বলেছেন, লেন-দেন সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস তাঁর পূর্বমত ত্যাগ করেছেন। মুত'আ বিয়ে সম্পর্কিত মত-ও তিনি পরিহার করেছিলেন। উসামা বর্ণিত হাদীসের অর্থ হচ্ছে দুই জাতীয় পণ্যে বাড়তি-কমতি সংক্রান্ত। যেমন উবাদাতা ইবনুস সামিত (রা) ও অন্যান্যদের নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে। তাতে কথা রয়েছে ঃ গম গমের বিনিময়ে একই রকমের, হাতে হাতে হলে জায়েয, এ পর্যায়ে হাদীসে ছয় প্রকারের দ্রব্যের উল্লেখ হয়েছে। পরে বলেছেন ঃ

بِيْعُوا الْحِنْطَةَ بِالشَّعِيْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ -

তোমরা গমকে বার্লির বদলে বেচা-কেনা কর যেমন তোমরা চাও, তবে তা হাতে হাতে হতে হবে।

কোন কোন হাদীসের ভাষা হল ঃ

وَاِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ -

পণ্যের প্রকার যদি পার্থক্যপূর্ণ হয়, এক না হয়, তাহলে তোমরা সেগুলোর বিনিময় কর যেমন তোমরা চাও। তবে তা হাতে হাতে— এক হাতে দেয়া অন্য হাতে নেয়া (নগদ) হতে হবে।

এতে দুই জাতীয় পণ্যে নাসয়িয়া পদ্ধতির কারবার নিষিদ্ধ হল তা পাত্র দ্বারা মাপের হোক, কি পাল্লার দ্বারা ওজনের হোক, তাতে বেশি কম করা মুবাহ্ করা হয়েছে। উসামা (রা) বর্ণিত হাদীস এই তাৎপর্যে ব্যবহৃত। আর আয়াতে ربا বা সূদ বলতে বোঝায় ঃ

شَرْىُ مَا يُبَاعُ بِاَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهِ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ -

যা বিক্রয় হয় তার মূল্য দিয়ে দেয়ার আগেই স্থিরকৃত মূল্যের কমে ক্রয় করা।

এ কাজ সূদ। তার দলীল হচ্ছে হাদীস, যা ইউনুস ইবনে ইসহাক তাঁর পিতা আবুল আলীয়া সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাতে বলেছেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-র নিকট উপস্থিত ছিলাম। একজন মেয়েলোক তাঁকে বলল— আমি জায়দ ইবনে আরকামের নিকট আমার একটি দাসী বিক্রয় করেছি সে আটশত দিরহাম দেবে এই শর্তে। পরে সে সেটি বিক্রয় করে দিতে চাচ্ছে। তখন আমি সেটি তার নিকট থেকে ছয়শত দিরহামে ক্রয় করে নিয়েছি। তখন হযরত আয়েশা (রা) বললেন— তুমি অত্যন্ত খারাপভাবে বিক্রয় করেছ এবং অত্যন্ত খারাপভাবে ক্রয় করেছ। তুমি জায়দ ইবনে আরকামকে আমার এ কথা পৌছিয়ে দাও যে, সে যদি এখন তওবা না করে, তাহলে রাসূলে করীম (স)-এর সাথে তার করা সব জিহাদ বরবাদ হয়ে যাবে। তখন সে মেয়েলোকটি বলল, হে উম্মুল মুমিনীন, আপনি কি বিবেচনা করে দেখেছেন, আমি যদি আমার মূলধনটাই শুধু ফিরিয়ে নিই, তাহলেও কি খারাপ হবে ? তখন তিনি বললেন ঃ

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ -

যার নিকট তাঁর রব্ব-এর উপদেশ পৌছল, ফলে সে খারাপ কাজ থেকে বিরত হল, তাহলে আগে যা হয়ে গেছে, তা তার জন্যে হবে।

আর তার চূড়ান্ত ফায়সালার ব্যাপার তো আল্লাহ্‌র নিকট সোপর্দ।

হযরত আয়েশা (রা)-এর এই সূদ সংক্রান্ত আয়াতটি এ পর্যায়ে পাঠ করা তাৎপর্যপূর্ণ, যখন মেয়েলোকটি বলেছিল, আমি যদি আমার শুধু মূলধনটাই গ্রহণ করি, তা হলেও কি খারাপ কারবার হবে ?.... হযরত আয়েশা (রা)-র দৃষ্টিতে সেটা ছিল সূদ। আর এভাবে তার নাম সূদ নির্ধারণ, এটা 'তওকীফ' পদ্ধতিতেই হয়েছে।

ইবনুল মুবারক হিকাম ইবনে জুরাইক-সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নিকট খাদ্য বিক্রয় করল বাকী মূল্যে নির্দিষ্ট মিয়াদে। যে সেই খাদ্য ক্রয় করেছিল, সে তা বিক্রয় করে দেয়ার ইচ্ছা করল নগদ মূল্যের বিনিময়ে যে তার নিকট

বিক্রয় করেছিল তার নিকট। তখন সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব বললেন, এটা সূদ। আর একথা জানা-ই আছে যে, সে প্রথম ধার্যকৃত মূল্যের কমে ক্রয় করতে চেয়েছিল। কেননা সমান মূল্যে ক্রয় করা বা বেশি মূল্যে ক্রয় করা জায়েয, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব এটাকে সূদ বলেছেন। এ কাজ করতে নিষেধ এসেছে ইবনে আব্বাস, আল-কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ, মুজাহিদ, ইবরাহীম, শবী— এই সকলের নিকট থেকে। আল-হাসান ও অন্যান্যদের মধ্যে ইবনে সিরীন বলেছেন, নগদ মূল্যে বিক্রয় করে থাকলে তা তার পুনরায় ক্রয় করা জায়েয। কিন্তু বাকী মূল্যে বিক্রয় করে থাকলে তার চাইতে কম মূল্যে ক্রয় করতে পারবে না। হ্যাঁ, নির্দিষ্ট মিয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তার ক্রয়-বিক্রয় চলবে।

ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, সে যখন বিক্রয় করে দিল, পরে সে তা তার পূর্ব নির্ধারিত মূল্যের কমে ক্রয় করল, তাহলে তা জায়েয হবে। অবশ্য মূল্য হাতে নেয়ার উল্লেখ করা হয়নি।

এ-ও হতে পারে যে, তার বক্তব্যে এটা আছে যে, মূল্য হাতে নিয়ে নেয়ার পর হলে জায়েয হবে। হযরত আয়েশা (রা) ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব-এর কথা থেকে প্রমাণিত হল যে, এ কাজটা সূদ। তাঁরা দুজন 'তওকীফ'-এর ভিত্তিতেই এটাকে 'সূদ' নামে অভিহিত করেছেন। কেননা অভিধানের দিক দিয়ে এটাকে তো ربا নাম দেয়া হয়নি। অতএব এ নামকরণটা নিশ্চয়ই শরীয়াতের দেয়া নাম হবে। আর শরীয়াত নির্ধারিত নামসমূহ নবী করীম (স) কর্তৃক নির্ধারিত— 'তওকীফ'।

## সূদের একটি দুয়ার—ঋণের বদলে ঋণ গ্রহণ

মূসা ইবনে উবায়দাতা আবদুল্লাহ ইবনে দীনার ইবনে উমর সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ঃ نَهَى عَنِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ - আর কোন কোন হাদীসের ভাষা হল ঃ

نَهَى عَنِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَهُمَا سَوَاءٌ -

মনের সাথে ঋণের বিনিময় করা যদি সে দুটিই সমান হয়, নিষেধ করেছেন।

উসামাতা ইবনে জায়দ বর্ণিত হাদীসে বলেছেন ঃ সূদ কেবল মাত্র 'নাসয়িয়া পদ্ধতিতে। তবে ঋণের বদলে ঋণের চুক্তিতেও সূদ রয়েছে। তবে তা মজলিস পরিমাণে হলে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। কেননা গম ক্রয়ে দিরহাম দিয়ে দেবে। এ দুটি ঋণের বদলে ঋণ হবে। তবে দিরহাম গ্রহণ ও করয করার পূর্বে যদি দুটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে বিক্রয় চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। দীনার দিয়ে দিরহাম ক্রয়-বিক্রয়ও জায়েয, যখন সে দুটিই ঋণ। আর পরস্পর 'করয' করার পূর্বেই যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে বাতিল হয়ে যাবে।

## আয়াতে হারাম ঘোষিত সূদ

এক ব্যক্তির উপর এক হাজার দিরহামের মিয়াদী ঋণ থাকলে সে যদি তা অবস্থার কারণে পাঁচশত দিরহাম দেয়ার ভিত্তিতে সন্ধি করে নেয়, তা হলে তা জায়েয হবে না। সুফিয়ান হামীদ— মায়সারা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি ইবনে উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা

করলাম, ধরুন, আমার একটা ঋণ কোন ব্যক্তির উপর রয়েছে নির্দিষ্ট মিয়াদে ফিরিয়ে দেয়ার শর্তে। তখন আমি তাকে বলি, তুমি যদি তাড়াতাড়ি করে আমার টাকা ফেরত দাও, তাহলে আমি তোমাকে কিছু টাকা হ্রাস করে দেব। জবাবে তিনি বললেন, এটা সূদ হবে। জায়দ ইবনে সাবিত (রা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে, এ কাজ নিষিদ্ধ। সাঈদ ইবনে যুবায়র, শবী ও আল হিকাম-ও তাই বলেছেন। হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদগণও এ মতই দিয়েছেন। সাধারণ ফিকাহবিদদেরও তা-ই মত। ইবনে আব্বাস ও ইবরাহীম নখয়ী বলেছেন, এ কাজে কোন দোষ নেই।

কিন্তু এ কথা যে বাতিল, তা দুইটি দিক দিয়ে প্রমাণিত হয়। একটি হল, ইবনে উমর (রা) এই কাজকে সূদ নামে অভিহিত করেছেন। আর শরীয়াতের দেয়া নামসমূহ যে 'তওকীফ' তা আমরা আগেই বলেছি। আর দ্বিতীয়, এ কথা জানা-ই আছে যে, জাহিলিয়াতের যুগে সূদ ছিল মিয়াদী 'করযে' শর্তভিত্তিক বাড়তি সহকারে। মূলধনের বৃদ্ধিটা বাড়ানো মিয়াদের বদল। আল্লাহ্ এটাকে হারাম ঘোষণা করেছেন, বাতিল করেছেন। বলেছেন ঃ

وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ اَمْوَالِكُمْ -

তোমরা যদি এ কারবার থেকে তওবা কর— বিরত থাক, তা হলে তোমাদের বিনিয়োগকৃত মূলধনটা তোমরা ফেরত নিতে পারবে।

বলেছেন ঃ

وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَا -

সূদের যতটা বাকী রয়ে গেছে, তা ছেড়ে দাও।

অর্থাৎ বাড়ানো মিয়াদের কোন বদল গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। একজনের উপর যদি এক হাজার দিরহাম পাওয়া থাকে মিয়াদের ভিত্তিতে তার এই দেয়ার পরিমাণ কমিয়ে দেয়া হবে, যদি তা মিয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ফেরত দেয়। তাহলে প্রাপ্য পরিমাণ কম করে দেয়া হল মিয়াদের মুকাবিলায়। অতএব তা সেই সূদের কাজ হল, যা হারাম ঘোষণা করায় আল্লাহ্ অকাট্য দলীল পেশ করেছে। আর যদি কারোর উপর হাজার হাজার দিরহাম প্রাপ্য হয়, আর বলে যে, তার ফেরত দেয়ার মিয়াদ বাড়িয়ে দাও, আমি একশত দিরহাম বাড়িয়ে দেব, তাহলে এটা যে জায়েয হবে না, তাতে কোন মতভেদ নেই। কেননা কথিত এক শত দিরহাম তো সময়ের বদল, বাড়ানো মিয়াদের মূল্য। আর সময়ের বদল হওয়ার কারণে মূলধনের পরিমাণ কমানোর অর্থই হল অপর দিক বাড়ানো। তাই তা জায়েয হবে না। মিয়াদের অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারণটাই মূলত জায়েয নয়।

যেমন কেউ যদি দর্জীকে একটা কাপড় দিয়ে বলে— তুমি যদি এটা আজকেই সেলাই করে দাও তাহলে এক টাকা পাবে। আর কাল দিলে পাবে অর্ধ টাকা। এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, এ দ্বিতীয় শর্তটা বাতিল। কাল-ও যদি সে সেলাই করে দেয় তাহলেও সেই এক টাকাই তার প্রাপ্য হবে। কেননা মিয়াদের কারণে মজুরি ঘাটতির কথা বলা হয়েছে। অথচ উভয় অবস্থায় মূল কাজটা তো সম্পূর্ণ। এক ও অভিন্ন। এ কারণে তা জায়েয হবে না। কেননা তাতে সময়ের মূল্য ধরা ও তাতে সময়কে বিক্রয় করা হয়।

আগের কালের যে সব ফিকাহবিদ ঋণের টাকা আগে দিলে মূল টাকা কম করা জায়েয বলে মত দিয়েছেন, তা সম্ভবত তখন, যদি তাকে শর্ত বানানো না হয়, তবেই জায়েয হবে। বিনা শর্তে হলে তাতে দোষ হবে না। অন্যান্যরা এ শর্ত ছাড়াই জায়েয বলতে সন্তুষ্ট।

আমরা বলেছি, পরিমাণে কম-বেশি হলে সূদ হবে, তার প্রমাণ হচ্ছে ছয়টি প্রকারের পণ্য সম্পর্কে রাসূলে করীম (স)-এর বলা কথা। আর ক্রয়-বিক্রয়ে 'নসয়িয়া' সূদ হবে রাসূলে করীম (স)-এর কথানুযায়ী। আর তা যদি দুই প্রকারের পার্থক্যপূর্ণ হয়, তাহলে তোমরা যেমন ইচ্ছা হাতে হাতে (নগদ) ক্রয়-বিক্রয় কর। রাসূলের কথা ঃ اِنَّمَا الرِّبَا فِى النَّسِيْئَةِ 'নাসয়িয়া' সূদ। আর পশু ক্রয়-বিক্রয় 'মূল্য অগ্রীম পণ্য বাকীতে' যে 'বায়য়ে সিলম' হয়, তা সূদ হয় সেই 'নাসয়িয়া' 'সূদ' কথাটির কারণেই। আর তার কথা ঃ 'প্রকারে যদি পার্থক্যপূর্ণ হয়, তাহলে কেনা-বেচা কর, যেমন চাও, হাতে-হাতে।' হযরত উমর (রা) সূদ বলেছেন বাকীতে বিক্রয় করা জিনিসকে তার মূল্য আদায় করার আগেই তা কম মূল্যে ক্রয় করাকে। এর ব্যাখ্যা আমরা পূর্বেই দিয়েছি। আর মিয়াদের আগে তাড়াতাড়ি ঋণের টাকা ফেরত দেয়ার শর্তে সেই টাকার পরিমাণ কম করাও সূদ। ফিকাহবিদগণ ছয় প্রকারের পণ্যের পরিমাণে কম-বেশি করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত হয়েছেন। এ পর্যায়ে নবী করীম (স)-এর হাদীস বহু কয়টি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের দৃষ্টিতে তাঁর বর্ণনাকারী বহু সংখ্যক এবং ফিকাহবিদগণ সে হাদীসকে ব্যবহার করতে সম্পূর্ণ একমত বলে সে হাদীসটি মুতাওয়াতির পর্যায়ে উন্নীত। ফিকাহবিদগণ এ বিষয়েও একমত যে, এই অকাট্য দলীলের তাৎপর্যের সাথে হুকুম সম্পর্কিত। যা অন্য বিষয়েও গণ্য করা যেতে পারে, করা উচিত। তবে এ ঐকমত্যের পর বর্গ (generic) বিবেচনায় মতপার্থক্য করেছেন। সে মতপার্থক্যের দিকগুলো এ আলোচনার শুরুতে আমরা উল্লেখ করেছি। তবে পরিমাণে বেশি ও কম করা হারাম হওয়াটা এই ছয়টি বিষয়েই সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের দৃষ্টিতে বিরল মতের কিছু লোক যে-ছয়টি বিষয়ে হারাম হওয়ার 'তওকীফ' এসেছে, অন্যগুলোকে হারামের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে, এ পর্যায়ের যে মতপার্থক্য আছে, তা তারা গণ্য করে না। হানাফী আলিমগণ যখন পাত্র দ্বারা মাপ ও পাল্লার ওজনকে গুরুত্ব দেন, তা হাদীস থেকে যেমন প্রমাণিত, তেমনি চিন্তা-বিবেচনায়ও যুক্তিসঙ্গত। বিভিন্ন স্থানে আমরা এটার উল্লেখ করেছি। হাদীসের কথার ধরন থেকেই তা প্রমাণিত এভাবে যে, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ كَيْلاً بِكَيْلٍ -

স্বর্ণের বদলে স্বর্ণ— সমগুণে, সম-পরিমাণে সম-ওজনে। গমের বদলে গম সমগুণে, সম-পরিমাণে।

এ হাদীসে পাল্লার ওজনে বিক্রয়ের জিনিস ওজনে সমান সমান হতে হবে। আর মাপে বিক্রয়ের জিনিসে সমান সমান ও পুরাপুরি হওয়া বাধ্যতামূলক। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, হারামকরণে মাপ ও ওজনটা বর্গের মিলিত হয়ে গণ্য হবে।

বিরোধী মতের লোকেরা আয়াতে ব্যবহৃত اَكَلَ। খাওয়া শব্দটির বলে দলীল দিয়েছেন যে ঃ

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبَا لَايَقُوْمُوْنَ اِلَّاكَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ -

যারা সূদ খায়, তারা কেবল সেই ব্যক্তির মতই দাঁড়ায় যাকে শয়তান তার স্পর্শ দিয়ে পাগল বানিয়ে দিয়েছে।

অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ لَاتَاْكُلُوا الرِّبَا 'তোমরা সূদ খেয়ো না।'

দুটি আয়াতেই সূদ খাওয়ার কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ সূদ শুধু খাদ্রদ্যব্যেই হবে। খাদদ্রেব্য ছাড়া অন্য কিছুতেই সূদের প্রশ্ন উঠে না।

কিন্তু তাদের এ কথা আমাদের মতে তাদের মত প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করে না, তার কয়েকটি দিক রয়েছে। তার একটি, পূর্ব যেমন বলেছি— শরীয়াতে 'রিবা' বা 'সূদ' শব্দটি 'মুজমাল'— অস্পষ্ট। তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আবশ্যক। তার এ সাধারণত্বের কারণে তাকে দলীল বা প্রমাণ হিসেবে পেশ করা সহীহ্ হতে পারে না। অপর একটি দলীল দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে যে, তা সূদ। তারপরই তাকে আয়াতটির ভিত্তিতে হারাম করা যেতে পারে এবং বলা যেতে পারে যে, তা খাওয়া যাবে না। দ্বিতীয়, খুব বেশি করা গেলেও খাদ্যে সূদ প্রমাণিত হতে পারে। তবে সর্ব প্রকারের খাদ্যে সূদ, একথা কিন্তু আয়াতে নেই। আমরা প্রমাণ করেছি যে, বহুসংখ্য খাদ্যদ্রব্যেই সূদ হতে পারে। আমরা যখন তা করেছি; তখন আয়াতের আরোপিত দায়িত্বই পালন করেছি মাত্র। আর এক হাজার টাকা এক হাজার একশত টাকার বিনিময়ে বিক্রয় হারাম। এই বিষয়ে যে 'তওকীফ' ও মতের ঐক্য রয়েছে, যেমন হাজার টাকা হাজার টাকার বিনিময়ে মিয়াদের ভিত্তিতে বিক্রয় করা বাতিল। আমরা তা প্রমাণ করেছি। এতে শর্তাধীন মিয়াদ মূলধনে কমতির স্থলাভিষিক্ত হল ঃ তা এক হাজার টাকা এক হাজার একশত টাকায় বিক্রয় করার সমান হল। অতএব 'করয'-এর ক্ষেত্রে মিয়াদ ভিত্তিতে বাড়তি কমতি করা সহীহ্ নয়। যেমন জায়েয নয় হাজার টাকার করয-এর বিনিময়ে হাজার একশত টাকা গ্রহণ। কেননা মিয়াদে কম করা ওজনে কম করার মতই। আর সূদ কখনও হয় ওজনে কম করার দিক দিয়ে, আর তা কখনও হয় মিয়াদে কম করার দিক দিয়ে। করয-এও সেই রকমই হওয়া উচিত।

কোন প্রশ্নকারী যদি বলে যে, এদিক দিয়ে 'করয' বিক্রয়ের মত ব্যাপার নয়। কেননা বদল বা বিনিময় করয করার পূর্বেই 'করয' পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা হতে পারে। তা জায়েয কিন্তু হাজার ঢাকা হাজার একশত টাকার বিক্রয় করাতে তা জায়েয হতে পারে না।

জবাবে বলা যাবে, মিয়াদে কম ধরা হয় যদি তা শর্তাধীন হয়। যদি তা শর্তাধীন না হয়, তাহলে 'করয' ছেড়ে দেয়ার দুইটি মালের কোন একটিতে কমতি হওয়া জরুরী হয় না। বিক্রয়টা অপর তাৎপর্যের কারণে বাতিল হয়। যাতে একটির অপরটি থেকে কম হয় না যেমন একই মজলিসে পারস্পরিক 'করয' ওয়াযিব হওয়ার দুই প্রকার বা একই প্রকারের কোন পার্থক্য ঘটে না। অর্থাৎ স্বর্ণ রৌপ্যের বিনিময়ে। এ দুটির মধ্যে বেশি ও কম হওয়া জায়েয। এ থেকে আমরা জানতে পারলাম, ও দুটির করয-এর কারণ এদিক দিয়ে নয় যে, করয তরক করা হলে কমতির কারণ ঘটবে করয করা হয়নি এমন জিনিসে। এক ব্যক্তি যদি অপর এক ব্যক্তির

নিকট হাজার দিরহামের বিনিময়ে একটি গোলাম বিক্রয় করে। তার মূল্য কয়েক বছর ধরে নিল না। তাহলে গোলাম— ক্রেতার পক্ষে হাজারের উপর মুনাফা নিয়ে সেটি বিক্রয় করে দেয়া। আর যদি একমাস মিয়াদের শর্তে হাজার টাকায় তা ক্রয় করে, মিয়াদ হয়ে গেলেও ক্রেতার জন্যে হাজারের উপর মুনাফা নিয়ে তা বিক্রয় করা জায়েয হবে না, যতক্ষণ না সে বলবে যে, সে তা বাকী মূল্যে ক্রয় করেছিল।

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, চুক্তিতে যে মিয়াদের শর্ত হয়, তা মূল্যে হ্রাস সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর তা ওজনে কম হওয়ার মতই হয়ে যায় কার্যত। ব্যাপার যখন এই তখন 'করয' ও বিক্রয়ের মধ্যে উপরোল্লিখিত দিক দিয়ে সাদৃশ্য হওয়া সহীহ। তার উপর এ প্রশ্ন আসতে পারে না। তাতে মিয়াদ বাড়িয়ে দেয়া বাতিল প্রমাণিত হয় নবী করীম (স)-এর এ কথার দ্বারা ঃ اِنَّمَا الرِّبَا فِى النَّسِيْئَةِ সূদ শুধু 'নাসয়িয়া'য়। এতে বিক্রয় ও 'করয'-এর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। এটা সর্বসম্মত। তা থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, 'করয' যখন শুধু অনুগ্রহস্বরূপ হয়, তা হাতে নিয়ে না নেয়া পর্যন্ত সহীহ্ হয় না, ঠিক 'হেবার' মত। অতএব তাতে কোন মিয়াদ নির্ধারণ সহীহ্ হবে না, যেমন 'হেবায়' সহীহ্ হয় না। নবী করীম (স) তাতে মিয়াদ নির্ধারণ বাতিল করে দিয়েছেন। বলেছেন ঃ যে লোক কোন প্রতিষ্ঠান বানালো, তা তার হবে এবং তার পরে তা হবে তার ওয়ারিশানদের। মালিকানার শর্ত হিসেবে সময় বা মিয়াদ নির্ধারণকে তিনি বাতিল করে দিয়েছেন।

উপরন্তু টাকা-পয়সার করয হল ধারে লওয়া। আর ধারে লওয়াটাই করয। কেননা তাতে উপকার গ্রহণের মালিক অন্যকে বানিয়ে দেয়া হয়। কেননা 'করয' বাদ নেয়া আসল মূলধনটা খরচ না করাতে সে তার কোন ফায়দাই পাবে না। এই কারণেই হানাফী মনীষীরা বলেছেন, কেউ যখন কাউকে টাকা-পয়সা ধারে দিল, সেটা 'করয' হল। এ কারণে নগদ-টাকা ভাড়ায় লাগানোকে তাঁরা জায়েয বলেন নি। কেননা তা একান্তই 'করয'। সে নগদ টাকা ধারে নিয়েছে এ শর্তে যে, সে তার চাইতে বেশি ফেরত দেবে। ধারের ক্ষেত্রে যখন মিয়াদ নির্ধারণ সহীহ নয়, তখন 'করয'-এও তা সহীহ্ হবে না।

নগদ টাকার 'করয' ধারে লওয়া, একথা একটি হাদীস থেকে প্রমাণিত। হাদীসটি ইবরাহীম-আল হিজরী আবুল আহ্ওয়াস— আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

تَدْرُوْنَ اَىُّ الصَّدَقَةِ خَيْرٌ قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ - قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ الْمِنْحَةُ اَنْ تَمْنَعَ اَخَاكَ الدَّرَاهِمَ اَوْظَهْرَالدَّابَّةِ اَوْلَبَنَ الشَّاةِ وَالْمِنْحَةُ هِىَ الْعَارِيَةُ -

কোন্ সাদকা সর্বোত্তম, তা কি তোমরা জান ? সাহাবীগণ বললেন, তা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল-ই ভালো জানেন। বললেন, সর্বোত্তম সাদকা হচ্ছে অনুগ্রহ। তুমি তোমার ভাইকে টাকা-পয়সা দিয়ে অনুগ্রহ করবে কিংবা উটের পিঠ দিয়ে বা ছাগলের দুধ দিয়ে। প্রকৃত অনুগ্রহ হল ধার দেয়া।

টাকা-পয়সা 'করয' দেয়াকে এ হাদীসে ধার দেয়া বলা হয়েছে। অপর হাদীসে রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْمِنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ -

অনুগ্রহ অবশ্যই ফিরিয়ে দিতে হবে।

ধার দেয়ার মিয়াদ নির্ধারণ যখন সঠিক নয়, তখন 'করয'-এও তা সহীহ্ হবে না। তবে ইমাম শাফেয়ী 'করয'-এর সময় নির্ধারণকে জায়েয বলেছেন।

## ক্রয়-বিক্রয়

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ -

এবং আল্লাহ্ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন।

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, সাধারণভাবে সর্বপ্রকারের ক্রয়-বিক্রয় মুবাহ এবং হালাল। কেননা بَيْعٌ শব্দটি আভিধানিকভাবে বোধগম্য ও যুক্তিসঙ্গত একটা অর্থ বোঝাবার জন্যে রচিত। আর তা হল ঃ

تَمْلِيْكُ الْمَالِ بِمَالٍ بِاِيْجَابٍ وَقَبُوْلٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا -

মালের বদলে একটা মালের মালিক বানিয়ে দেয়া উভয় পক্ষের রাজী বা সম্মত হওয়ার ভিত্তিতে প্রস্তাবনা ও কবুলের মাধ্যমে।

ভাষার দিক দিয়ে بَيْعٌ শব্দটির এ-ই হচ্ছে প্রকৃত তাৎপর্য। এ ক্রয়-বিক্রয়ের কিছু আছে জায়েয, কিছু কিছু 'ফাসেদ'— খারাপ। কিন্তু তা সাধারণ অর্থবোধক শব্দ بَيْعٌ-এর আওতার মধ্যেই রয়েছে এ পার্থক্য সত্ত্বেও যে, তার কোন কোনটি জায়েয আর কোন কোনটি জায়েয নয়। আলোচ্য আয়াতটি পটভূমি সাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ। তবে তার দ্বারা বিশেষ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় বোঝাতে চাওয়া হয়েছে। কেননা অনেক প্রকারের ক্রয়-বিক্রয় এমন, যা নিষিদ্ধ। যেমন হাতে নেয়া হয়নি এমন জিনিস বিক্রয় করা। মানুষের নিকট নেই, এমন জিনিস বিক্রয় করা। ধোঁকার (غرر) ক্রয়-বিক্রয়। অজানা জিনিসের ক্রয়-বিক্রয়। হারাম জিনিস ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করা। আয়াত পড়ে যদিও এ সব ও অন্যান্য সর্বপ্রকারের ক্রয়-বিক্রয় জায়েয মনে হয়; কিন্তু তার মধ্যে থেকে কিছু সংখ্যক ক্রয়-বিক্রয়কে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই বিশেষীকরণ যদিও আয়াতে ব্যবহৃত শব্দটি সাধারণ তাৎপর্য হরণ করে না। যে সব ক্রয়-বিক্রয় এই বিশেষীকরণের আওতায় আসেনি এবং তার কোন প্রমাণ বা দলীল-ও পাওয়া যায়নি, তা অবশ্যই সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে গণ্য থাকবে। আয়াতটি ওয়াকফ করা সম্পত্তিও বিক্রয় করা জায়েয প্রমাণ করে। কেননা আল্লাহ্ তো যে-কোন ধরনের ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ঘোষণা করেছেন। ক্রয়-বিক্রয় তো একজনের প্রস্তাবনা ও অন্য জনের গ্রহণের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। কিন্তু তার প্রকৃত তত্ত্ব হচ্ছে চুক্তিকারীর জন্যে মালিকানা সঙ্ঘটিত হয় না। যেমন উভয় পক্ষের ইখতিয়ারের শর্তে যে সব বিক্রয় চুক্তি গৃহীত হয়, তা মালিকানাকে জরুরী করে দেয় না। অথচ তা ক্রয় ও বিক্রয়। দুই পক্ষের দুই উকিল ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করে কিন্তু তারা কেউ বিক্রয়ের জিনিসের মালিক হয় না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَحَرَّمَ الرِّبَا 'এর সূদ হারাম করেছেন'। এ আয়াতটিও মোটামুটি কথা বলেছে। এ কারণে তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল। সূদের কোন কোন দিক ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত। ক্রয়-বিক্রয় নয়, এমন ব্যাপারেও সূদ থাকে। তা হচ্ছে জাহিলিয়াতের সূদ। যে 'করয' এ মিয়াদের শর্ত এবং 'করয' গ্রহীতাকে বাড়তি মাল ফেরত দিতে হয়, তাতেও সূদ হয়।

আয়াতের ধারাবাহিকতায় সাধারণ ক্রয়-বিক্রয় থেকে বিশেষীকৃত করে নেয়া হয়েছে সূদী ক্রয়-বিক্রয়কে। আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'এবং ক্রয়-বিক্রয় হালাল করেছেন।'

ইমাম শাফেয়ী মনে করেছেন الربا 'সূদ' কথাটি কখনই মোটামুটি কথা ছিল না। তা-ই জরুরী করেছে بيع শব্দের মোটামুটি অবস্থা। কিন্তু আমাদের মতে তা নয়। কেননা যেসব ক্রয়-বিক্রয়কে সূদ নাম দেয়া হয়নি, তাতে তার সাধারণত্বের দিকটি অব্যাহত রয়েছে। তবে যেটার সূদ হওয়ার বা না হওয়ার ব্যাপারে সংশয় আছে, যেখানে সিদ্ধান্তহীন থাকতে হবে। যেটা সম্পর্কে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে যে, তা সূদ নয়, সূদ হারাম হওয়ার আয়াতকে তার পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড় করা ঠিক নয়। উসূলিল ফিকাহ গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছি।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْاۤ اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا -

তা এজন্যে যে, তাঁরা বলেছে যে, ক্রয়-বিক্রয়ের কাজটি তো সূদের মতই।

কাফিররা সূদকে মুবাহ বলে বিশ্বাস করত। তাদের এ বিশ্বাসের কথাই এ আয়াতে বলা হয়েছে। তাদের ধারণা ছিল, সূদ হিসেবে বাড়তি যা লওয়া হয় এবং সর্বপ্রকারের ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে যে মুনাফা অর্জন করা হয়, এ দুইয়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নেই। এ ব্যপারে আল্লাহ তা'আলা শরীয়াতের দৃষ্টিতে দ্বীন ও দুনিয়ার যে মহা কল্যাণ সমূহ নিহিত রেখেছেন, তার কথা তারা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিল। তাদের এ ভুলে যাওয়া ও মূর্খতার নিন্দা করেছেন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে। কিয়ামতের দিন তাদের যে কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে এবং তাদের উপর যে মহা আযাব নাযিল হবে, সে বিষয়ে আগাম জানিয়ে দিয়েছেন।

'আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় হালাল করেছেন'— আল্লাহ্‌র এ কথাটিকে দলীল বানিয়ে বলা হয়েছে যে, ক্রয়কারী যে জিনিস দেখেনি তা তার নিকট বিক্রয় করা জায়েয। গম সমান পরিমাণের গমের সাথে বিনিময় পদ্ধতিতে ক্রয় করাও জায়েয বলা হয়েছে। তা হস্তগত করার পূর্বে ক্রেতা-বিক্রেতার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় তা বাতিল হয়ে যায় না। তা এ জন্যে যে, যে শব্দ আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে, তার ভিত্তিতেই ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত হুকুম-আহ্‌কাম ও কবজা করার, তার উপর হস্তক্ষেপ করার, তার মালিকানা লাভ করার এবং এ পর্যায়ে অন্যান্য যাবতীয় কাজ সবই গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। পারস্পরিক কবজা না করলেও এ সংক্রান্ত হুকুম আহ্‌কাম পেতে হবে। এ আয়াতটি ঠিক আল্লাহ্‌র এ কথাটির মতই ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ -

তোমাদের মা'দেরকে তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে। (সূরা আন-সিনা ঃ ২৩)

এর অর্থ মাদের সাথে যৌন সম্ভোগ সম্পর্ক স্থাপন হারাম করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্র এ কথাটিকেও সেই কথার দলীল হিসেবে পেশ করা হয় ঃ

لَاتَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ -

তোমরা তোমাদের ধন-মাল পারস্পরিকভাবে বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করো না। তবে তোমাদের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসায়িক পন্থায় পারস্পরিক বিনিময় হলে ভিন্ন কথা। (সূরা আন-নিসা ঃ ২৯)

তা দুটি দিক দিয়ে বিবেচ্য। একটি ক্রেতা-বিক্রেতার পণ্য হস্তগত করা ছাড়াই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আগে ও পরে খাওয়া মুবাহ হওয়াই এ আয়াতের দাবি। আর দ্বিতীয়, বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর অপর পক্ষের 'কবজা' করার পূর্বেই ক্রয়কারীর পক্ষে তা খাওয়া মুবাহ হওয়া।

আর আল্লাহ্র কথা ঃ

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ -

অতঃপর যার নিকট তার রব্ব-এর নিকট থেকে নসীহত-উপদেশ পৌঁছে গেছে এবং সে কাজ থেকে বিরত রয়েগেছে, তার জন্যে পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা জায়েয হবে। আর তার গোটা ব্যাপার আল্লাহ্র নিকট সোপর্দকৃত।

এর তাৎপর্য হচ্ছে, নিষেধের পর যে লোক নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকল, তার জন্যে তা হালাল হবে, সূদ হারাম হওয়ার পূর্বে যা তার দখলে চলে গেছে ও হস্তগত হয়েছে। আর যা তার দখলে যায় না, হস্তগত হয়নি তা সে পাবে না। কেননা আয়াতের ধারাবাহিকতায়ই বলে দেয়া হয়েছে যে, যা হস্তগত হয়নি— দখলে আসেনি, তা নিষিদ্ধ।

যা দখলে আসেনি— হস্তগত হয়নি তা আল্লাহ্র এ আয়াত দ্বারাও বাতিল ঘোষিত হয়েছে ঃ

يَـٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا - اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, আর যে সূদ এখনও অনাদায় রয়ে গেছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা ঈমানদার লোক হয়ে থাক।

এ আয়াত দ্বারা এখনও হস্তগত হয়নি— এমন যাবতীয় সূদকে বাতিল ঘোষণা করেছেন; সূদ হারাম ঘোষণা নাযিল হওয়ার পূর্বে তার চুক্তি চূড়ান্ত হয়ে যাওয়া থাকলেও তা গ্রহণ করা যাবে না। যা এর পূর্ব পর্যন্ত হস্তগত হয়েছে তার চুক্তি ভেঙ্গে ফেলার তাগিদ করা হয়নি—কেননা তার লেন-দেন সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে গেছে। এ কথাই আল্লাহ বলেছেন এ আয়াতটিতে ঃ 'যার নিকট তার রব্ব-এর নিকট থেকে উপদেশ-নসীহত এসেছে, পরে সূদ থেকে বিরত হয়েছে, তার পূর্বে যা লেন-দেন হয়ে গেছে, সেটা জায়েয।'

সুদ্দী প্রমুখ তাফসীরকারের এ মত-ই বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -

এবং ছেড়ে দাও যে সূদ এখনও অনাদায় রয়ে গেছে তা, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকে।

অর্থাৎ যা 'কবজা' করা হয়নি, নিয়ে নেয়া হয়নি, তাকে আল্লাহ্ বাতিল করে দিয়েছেন; যা হস্তগত হয়েছে, তা বাতিল করা হয়নি।

এরপর বলেছেন ঃ

وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ اَمْوَالِكُمْ -

যদি তোমরা এখন তওবা কর, তাহলে তোমাদের মূলধনটা ফিরিয়ে নিতে পারবে।

যা এখনও হস্তগত হয়নি সেই সূদ বাতিল করার এটা তাগিদী ঘোষণা। মূলধন ফেরত পাওয়ার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। কেননা তাতে তো সূদ নেই, কিছু পরিমাণ বাড়তিও তাতে নেই।

ইবনে উমর ও জাবির (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর বিদায় হজ্জ-এর ভাষণে মক্কায় বলেছিলেন— জাবির (রা) বলেছেন, আরাফাতের ময়দানে বলেছিলেনঃ

اِنَّ كُلَّ رِبَا كَانَ فِىْ الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مَوْضُوْعٌ وَاَوَّلُ رِبَا اَضَعُهُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ -

জাহিলিয়াতে প্রচলিত সর্বপ্রকারের সূদ— সূদী কারবার আজ স্থগিত। আর সর্বপ্রথম যে সূদকে আমি মওকূফ করে দিচ্ছি, তা হল আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সূদ।

নবী করীম (স)-এর এ কাজটি— হস্তগত না হওয়া সূদকে বাতিল করা এবং যা হস্তগত হয়েছে তা মেনে নেয়া— কুরআনের আয়াতের সাথে পুরাপুরি সঙ্গতিসম্পন্ন ছিল।

নবী করীম (স)-এর আলোচ্য ভাষণে বহু সংখ্যক আইন-বিধানের উল্লেখ হয়েছে। তার একটি, হস্তগত করার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির উপর এমন যা কিছুই ঘটেছে, যার কারণে তা হারাম হওয়া জরুরী, তা সংঘটিত হওয়া অবস্থায় মওজুদ থাকার মতই। আর যা হস্তগত করার পর ঘটেছে, যার দরুন সে চুক্তির হারাম হওয়া জরুরী হয়েছে, তা ভেঙ্গে দেয়া জরুরী নয়। এটা খ্রীস্টানদের কাজের মতো। তারা দুইজন যখন কোন দাস পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয় করবে মদের বিনিময়ে— মদ দিয়ে দাস ক্রয় করবে, আমাদের মতে এ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয। মূল্য বাবদ মদ হস্তগত করার আগেই যদি তাদের দুজনের একজন ইসলাম কবুল করে, তাহলে এ ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি কোন শিকার ক্রয় করে, পরে ক্রেতা বা বিক্রেতা ইহরাম বাঁধল, তাহলে শিকার ক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। কেননা তার উপর এমন কিছু ঘটেছে, যার দরুন হস্তগত করার পূর্বে চুক্তিটি হারাম হয়ে গেছে। যেমন আল্লাহ বাতিল করে দিয়েছেন সেই সূদ, যা তখনও হস্তগত হয়নি। কেননা তার উপর এমন কিছু ঘটেছে যার দরুন হস্তগত করার পূর্বেই তার হারাম হয়ে যাওয়া জরুরী হয়ে পড়েছে— তখন মদ্য হস্তগত করা হয়ে থাকলেও। অতঃপর তারা দুজন ইসলাম কবুল করেছে অথবা ইহরাম বেঁধেছে, যা ক্রয়-বিক্রয়কে বাতিল করেনি। যেমন হস্তগত হওয়া সূদকে আল্লাহ বাতিল করে দেননি যখন সূদ হারামের আয়াত নাযিল করেছেন। এটা জায়েয। এর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। তখন ক্রয় করা দাসকে হত্যা করা হস্তগত করার পূর্বে বাধ্যতামূলক হবে না। ক্রয়-বিক্রয়টাও বাতিল হয়ে যাবে না। ক্রেতার জন্যে অপরাধীর অনুসরণ জায়েয এ দিক দিয়ে

যে, ক্রয়-চুক্তির উপর চুক্তি হারাম হওয়ার কোন কারণ সঙ্ঘটিত হয়নি। কেননা চুক্তিটি স্বরূপে বহাল রয়েছে যেমন ছিল। আর মূল্যটা পণ্যের স্থলাভিষিক্ত রয়েছে। বিক্রেতা ও ক্রেতার জন্যে ইখতিয়ার থাকবে, এটাই যথেষ্ট।

এ আয়াত এ কথার একটা দলীল যে, বিক্রেতার হাতে পণ্যটির ধ্বংস হওয়া এবং তাতে 'কবজা' প্রত্যাহৃত হওয়া চুক্তি বাতিল হওয়াকে জরুরী করে দেবে। হানাফী ফিকাহবিদ ও ইমাম শাফেয়ী এ মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম মালিক বলেছেন, বাতিল হবে না, মূল্যটা দেয়া ক্রেতার জন্যে বাধ্যতামূলক কেননা তাকে নিষেধ করা হয়নি।

আয়াতটি স্পষ্ট করে বলে যে, পণ্য হস্তগত করাটা ক্রয় বিক্রয়ের সম্পূর্ণতা। আর 'কবজা' প্রত্যাহার চুক্তি বাতিলের কারণ। তা এজন্যে যে, আল্লাহ যখন সূদ হস্তগত করাকে প্রত্যাহার করেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতা যে চুক্তি করেছিল তাও বাতিল করে দিয়েছেন। তখন শুধু মূলধন ফেরত নিয়েই ক্ষান্ত থাকতে আদেশ করেছেন। তাতে বোঝা গেল যে, পণ্য হস্তগতকরণ চুক্তি সহীহ্ হওয়ার অন্যমত শর্ত। আর চুক্তির উপর যখনই এমন কিছু ঘটবে, যা তাকে প্রত্যাহৃত করে, তা সেটিকে অনিবার্যভাবে বাতিল করে দেবে।

তাতে এ প্রমাণ-ও রয়েছে যে, 'দারুল হরবে' যে সব চুক্তি হবে, সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হলে ও মুসলিম ইমামের বিজয় সাধিত হলে তা ভেঙ্গে দেয়ার প্রয়োজন হবে না, তা খারাপ ভিত্তির উপর চুক্তিকৃত হয়ে থাকলেও। কেননা একথা জানা-ই আছে যে, আয়াতটির নাযিল হওয়া ও নবী করীম (স)-এর আরাফাতে ভাষণ দান এবং সেখানে হস্তগত করা হয়নি এমন সূদ প্রত্যাহার করা— এ দুয়ের মাঝে মক্কায় বিজয় লাভের পূর্বে সূদের যে চুক্তি সঙ্ঘটিত হয়েছিল, সেগুলোকে পরে ভেঙ্গে দেয়া হয়নি। তাতে আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে কি ছিল এবং তা নাযিল হওয়ার পর কি হয়েছে, এ দুয়ের মাঝে কোন পার্থক্য বা তারমত্য করা হয়নি। এ থেকে বোঝা গেল, দারুল হরবে মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে যেসব চুক্তি সঙ্ঘটিত হবে, তন্মধ্যে যা হস্তগত করা হয়েছে তা ইসলামের বিজয় ও মুসলিম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তা ভেঙ্গে ফেলা হবে না। আর আল্লাহ্র কথা ঃ 'যার নিকট তার রব্ব-এর নিকট থেকে উপদেশ আসবে এবং সে বিরত হবে, তা হলে আগে যা হয়ে গেছে, তা তার হবে'-ও সেই কথাই প্রমাণ করে। কেননা যা করায়ত্ত হয়েছে, তাকে আল্লাহ 'ইসলাম-পূর্ব' বলে চিহ্নিত করেছেন।

فَلَهُ مَا سَلَفَ 'তার জন্যে তা যা আগে হয়ে গেছে' এ কথাটির একটি তাৎপর্য এ-ও বলা হয়েছে যে, যে সব গুনাহ আগে হয়ে গেছে তা আল্লাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু কথাটি সে পর্যায়ের নয়। কেননা এর পরই আল্লাহ বলেছেন ঃ 'তার গোটা ব্যাপারটাই আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ।' অর্থাৎ যে কাজে মানুষ সওয়াব বা আযাব পাওয়ার যোগ্য হবে, সেগুলোর হুকুম পরকালে কি হবে তা ইহকালে আমাদেরকে জানানো হয়নি। অপর দিক দিয়ে তা-ই যদি বক্তব্য হতো তা হলে আমরা উপরে যা উল্লেখ করেছি, তা অস্বীকৃত হতো না। তাহলে দুটি জিনিস এক সাথে হতো। কেননা এ দুটিই হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ আল্লাহ্ তার আগের সব গুনাহ মাফ করে দেবেন, আর ইসলামের পূর্বে যা সে কবজা করে নিয়েছে তাও তার জন্যে হয়ে যাবে। আর এ কথাটি প্রমাণ করে যে, যুধ্যমান কাফির লোকদের যাবতীয় ক্রয়-বিক্রয়— তারা যখন

ইসলাম কবুল করবে সব অতীত বলে গণ্য হবে। কেননা আল্লাহই বলে দিয়েছেন ঃ 'যা অতীত হয়ে গেছে, বা সব তার হয়ে গেছে।'

আল্লাহ্র কথা ঃ

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে আর যে সূদ অনাদায় রয়ে গেছে, তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মুমিন হও। যদি তোমরা তা না কর, তাহলে আল্লাহ এবং তার রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও।

আবূ বকর বলেছেন, এ আয়াতটির দুটি অর্থ হতে পারে। একটি তোমরা যদি আল্লাহ্র এ আদেশ মেনে না লও, এবং তাঁর অনুগত না হও, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিক থেকে যুদ্ধের কথা জেনে নাও। আর দ্বিতীয়— অবশিষ্ট সূদ যদি তোমরা ত্যাগ না কর, আল্লাহ্র হুকুম নাযিল হওয়ার পর-ও তা ত্যাগ না কর, তাহলে .... তা হারাম একথা বিশ্বাস করলেও কার্যত যদি তা ত্যাগ না কর, তাহলে তোমাদের পরিণতি হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

ইবনে আব্বাস (রা) কাতাদাতা ও রুবাই ইবনে আনাস থেকে বর্ণিত, যে লোক সূদী কারবার করল, ইমাম তাকে তওবা করতে বলবে। তওবা করলে ভালো, অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে। কেননা তখনও তার সূদী কারবার করার অর্থ হবে, সে তা হালাল মনে করে। আর হারামকে হালাল মনে করা ইসলামী মনীষীদের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী সুস্পষ্ট কুফরী।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَأْذَنُوْ بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ -

তোমরা আল্লাহ্র ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের অপেক্ষা কর।

সূদী কারবারীদেরকে কাফির বলতে বলে না। কেননা উক্ত কথাটি কুফরীর কম গুনাহ খাতার কারণেও এরূপ হুমকি দেয়ার আবশ্যক হতে পারে। জায়দ ইবনে আসলাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর (রা) হযরত মুযায় (রা)-কে কাঁদতে দেখলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ জিনিস তোমাকে কাঁদালো ? বললেন, আমি নবী করীম (স)-কে বলতে শুনেছিঃ

اَلْيَسِيْرُ مِنَ الرِّيَا ئِ شِرْكٌ وَمَنْ عَادَى اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ فَقَدْ بَارَزَ اللّٰهَ بِالْمَحَارِبَةِ -

খুবই হালকা ধরনের দেখানোপনাও শিরক। আর যে লোক আল্লাহ্র বন্ধুদের সাথে শত্রুতার আচরণ করল, সে আল্লাহ্র সাথে যুদ্ধ করার মতো অপরাধ করল।

এ হাদীসে পারস্পরিক যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, যদিও তাদেরকে কাফির বলা হয়নি। সূদ্দী-সুবাইহ (উম্মে সালমার মুক্ত দাস)— জায়দ ইবনে আরকাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) হযরত আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসায়ন (রা)-কে বলেছেন ঃ

اَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ -

আমার যুদ্ধ তার বিরুদ্ধে যার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করেছ। আমি শান্তি দেব, যাকে তোমরা শান্তি দেবে।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِنَّمَا جَزٰؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا -

যে সব লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা করে, তাদের এ দুষ্টকর্মের শাস্তি ..... (সূরা মায়িদা ঃ ৩৩)

ফিকাহবিদ মনীষিগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, এ হুকুমটি বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে এখনও কার্যকর হয়ে আছে। ডাকাতি-ছিনতাই কর্মে যারা লিপ্ত, তাদের ক্ষেত্রে এ ঘোষণাটি পুরাপুরি কার্যকর। যাদের গুনাহ বড় বড়, নাফরমানীর কাজে যারা চিরলিপ্ত, তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিত বিরাজ করছে— তা এ আয়াতটি থেকে বোঝা যায়। কেননা তাদের এ কাজ যুদ্ধের মতোই। তারা বিরত হলেও এ যুদ্ধ তাদের বিরুদ্ধে চলতে থাকবে। তাদের ও তাদের অনুসারীদের মধ্যে। যদিও তারা কাফির হয়ে যায়নি ও ইমাম দ্বারা বিরত হয়নি। যদি তারা ইমামের কথায়ও বিরত না হয়, তাহলে যতটা তাজীরী শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হবে, তা-ই তাদেরকে দিতে হবে। এমনিভাবে আল্লাহ্ যেসব গুনাহের জন্যে এবং তা পৌনপুনিকভাবে করার দরুন আল্লাহ্ আযাব দেয়ার ওয়াদা করেছেন, সেই সবগুলোর ব্যাপারও ঠিক তাই। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে, তাদের ও তাদের অনুসারীদের বিরুদ্ধে। তা সত্ত্বেও বিরত না হলে তাদেরকে হত্যা করা হবে। অন্য কথায় তারা বিরত না হলে তাদেরকে সে পরিমাণ আযাব দেয়া হবে, যতটা আযাব পাওয়ার তারা যোগ্য বিবেচিত হবে। যেসব কর্তৃত্বশালী জালিম লোক জনগণের ধন-মাল কেড়ে নেয়, অন্যায়ভাবে কর, শুল্ক ইত্যাদি আদায় করে, সব মুসলমানের কর্তব্য হল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, বিরত না হলে তাদেরকে হত্যা করা। এ সব লোক সূদখোরদের চাইতেও বড় অপরাধে অপরাধী। কেননা তারা আল্লাহ্র স্পষ্ট নিষেধের মর্যাদা নষ্ট করেছে, সমগ্র মুসলমানের মর্যাদাও নষ্ট করছে। সূদখোরও যেহেতু সূদখোরী করে আল্লাহ্র মর্যাদা নষ্ট করছে। যাকে সে সূদ দেয় তার মর্যাদা হয়ত সে নষ্ট করে না। কেননা তার প্রতি আন্তরিকতা সহকারেই তা দেয়। বিভিন্ন অন্যায় কর ও শল্ক গ্রহণকারীও মূলত ডাকাত ও ছিনতাইকারীর কাজই করে আল্লাহ্র নিষেধ অমান্য করে, মুসলিম জনগণের মর্যাদাও নষ্ট করে। কেননা তারা তা জোরজবরদস্তির মাধ্যমে গ্রহণ করে, কোন ব্যাখ্যা দানও করে না, এ কাজ কোন সন্দেহের বশবর্তী হয়েও তারা করে না। তাদের বারবার ও পৌনপুনিকতা সহকারে করা এ কাজ সম্পর্কে যখনই জানা যাবে, তখনই মুসলমানদের কর্তব্য হবে তাদেরকে হত্যা করা, সে হত্যা যেভাবেই ঘটানো সম্ভব হোক না কেন। তাদের অনুসারী সাহায্যকারী যারা, যারা জনগণের ধন-মাল লুণ্ঠনে তাদের সাথে একাত্ম হয়ে দাঁড়ায়, তাদেরকেও সেই অভিন্ন পরিণতির সম্মুখীন করতে হবে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের সাথে দুটি দিক দিয়ে মতের সামঞ্জস্য ছিল। একটি হল, তারা দ্বীন-ইসলাম ত্যাগ করে কুফর গ্রহণ করেছে। আর দ্বিতীয় হল, তারা ইসলামের ফরয যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে। তার অর্থ যাকাত ফরয— এ কথা তারা মেনে নিচ্ছে না, তা দিচ্ছেও না। ফলে দুটি তাৎপর্য একত্রিত হয়েছে এতে। একটি— আল্লাহ্র আদেশ মেনে নিতে অস্বীকার করা। আর তা কুফর। আর দ্বিতীয়, তাদের ধন-মালে রাষ্ট্রীয়ভাবে দেয় যে সব সাদকা ফরয, তা আদায় করছে না। আর

তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার মূলে এ দুইটি কারণই একত্রিত ছিল। এ কারণেই তিনি বলেছিলেন ঃ

لَوْ مَنَعُوْنِيْ عِقَالًا مِمَّا كَانُوا يُؤَدُّوْنَهُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ -

ওরা যদি একটি রশিও— যা রাসূলে করীম (স)-কে দিত— আমাকে দিতে অস্বীকার করে, তাহলে আমি ওদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব।

অপর একটি বর্ণনায় عقالا (রশির) পরিবর্তে عناقا (উট) উল্লেখ করা হয়েছে। তাই আমরা বলেছি যে, ওরা কাফির হয়ে গিয়েছিল, যাকাত দিতে অস্বীকার করে ওরা কাফিরই হয়ে গিয়েছিল। কেননা সাহাবীগণ ওদের নাম দিয়েছিলেন اَهْلُ الرِّدَّةِ 'মুর্তাদ হয়ে যাওয়া লোক।' তাঁদের দেয়া এ নাম আমাদের সময় পর্যন্ত-ও চলে এসেছে। তারা তাদের মেয়েলোক ও বাচ্চাদের বন্দী করত। তাদের মধ্যে প্রসার পাওয়া এ অপরাধের দরুনই কেবল মুর্তাদ ছিল না। এ এমন একটা ব্যাপার যা নিয়ে সেই প্রথম যুগ থেকে শুরু করে পরবতর্তীকালের মুসলমানদের মধ্যে কোন মতভেদের সৃষ্টি হয়নি। অর্থাৎ হযরত আবূ বকর (রা) যে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তারা মুর্তাদ হয়ে গিয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, যারা সূদ খায়, তাকে হালাল মনে করে, তারা কাফির। যদি গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করে, তাহলে ইসলামী রাষ্ট্র তাদের সাথে মুর্তাদ হিসেবেই আচরণ করবে। যদিও তারা এর পূর্বে মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর যদি তারা সূদকে হারাম মানে এবং তার কাজ করে তাকে হালাল মনে না করে, তাহলে রাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। যদি তারা বিরত হয় ও তওবা করে, তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু যদি বিরত না হয়, তাহলে রাষ্ট্র তাদেরকে মারধোর করে, আটক-বন্দী করে হলেও তাদেরকে সে কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে।

বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) নাজরানবাসীদেরকে লিখে পাঠিয়েছিলেন— তারা ছিল খ্রীস্টান যিম্মী— হয় তোমরা সূদ পরিহার কর, না হয় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও। আবূ উবায়দ আল-কাসিম ইবনে সালাম আয়ূব আদ-দিমাশকী— সাদান ইবনে ইয়াহইয়া— আবদুল্লাহ ইবনে আবূ হুমায়দ— আবূ সলীহ্ আল-হাযলী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) নাজরানবাসীদের সাথে সন্ধি করেছেন এবং তাদেরকে একটি সন্ধিপত্র লিখে দিয়েছেন। তার শেষে লিখেছেন ঃ

তোমাদের কর্তব্য হবে, তোমরা সূদ খাবে না। তোমাদের মধ্যে যে লোক সূদ খাবে, তার থেকে আমার যিম্মা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তা হলে আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমরা যদি এ নিষেধ না মান, তাহলে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিক থেকে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও, এবং এর পূর্বে বলা কথা ঃ 'হে ঈমানদার লোকগণ; তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং অবশিষ্ট সূদ তোমরা ছেড়ে দাও।' তাদের দুজনের উপরই আরোপিত। একটি হল ব্যাপারটিকে তার আসল অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া। আর দ্বিতীয়, সূদখোরের উপর শরীয়াতী শাসন পুরোমাত্রায় কার্যকর করা— আদেশ পালনে রাজী হওয়া সহ। তারপর যদি কেউ আদেশ প্রত্যাখ্যান করে, অমান্য করে, তার এই অমান্যতা বা মুর্তাদ হওয়ার কারণে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। আর যে

আদেশ কবুল করে নেবে, তা সত্ত্বেও সে কাজ করবে তা হারাম মানা সত্ত্বেও, তারা অরাজী হলে তাদেরকে তা ছাড়াবার ও ত্যাগ করাবার জন্যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। অবশ্য তাদেরকে মুর্তাদ গণ্য করা হবে না। তারা বিরত না হলে সরকার তাদের মারপিট বা আটক যা-ই বিবেচনা করবে, তাজীর হিসেবে তা-ই কার্যকর করতে হবে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ -

তা হলে তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিক থেকে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও।

এ আয়াতে জানান দেয়া হয়েছে যে, উক্ত আয়াতে যে আদেশ করা হয়েছে, তারা যদি তা পালন না করে, তাহলে তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী হয়ে পড়বে। তা থেকে এ-ও জানা গেল যে, আল্লাহ্র আদেশ পালন না করা এক মহা অপরাধ। অপরাধের বিরাটত্ব সম্পর্কে জানান দেয়া হয়েছে এ আয়াত। আর তারা এ যুদ্ধের সম্মুখীন হতে বাধ্য। তারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী-রূপে চিহ্নিত হয়েছে— এ নামে তারা অভিহিত হয়েছে। এ রূপ নামকরণের দুটি তাৎপর্য। একটি হচ্ছে কুফর, যদি সূদকে হালাল মনে করা হয়। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে হারাম, বিশ্বাস করেও তা খাওয়া হলে তার উপর শরীয়াতের বিধান কার্যকর করা। অনেকে আয়াতটিকে এ অর্থেও গ্রহণ করেন যে, এতে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দিয়ে দিয়েছেন তাঁর রাসূল ও মুমিনগণকে। তাদের জন্যে ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, যেন তারা না জানার ধোঁকায় পড়ে না থাকে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ -

যদি তোমরা কোন জনগোষ্ঠীর দিক থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা বোধ কর, তাহলে সন্ধি তাদের (মুখের) উপর নিক্ষেপ করে সমান সমান হয়ে যাও। কেননা বিশ্বাসঘাতকদেরকে আল্লাহ মোটেই পছন্দ করেন না। (সূরা আনফাল ঃ ৫৮)

এখানে কথার সম্বোধনকে যদিও এ দৃষ্টিকোণে মনে করা হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, এ কথাটি তাদেরকে বলা হয়েছে যদি তারা যাকাত দিতে অস্বীকারকারী হয়। আর যদি প্রথম দিকে ধরি, তা হলে বুঝতে হবে যারা এ কাজ করবে, তাদের সকলের জন্যেই এ কথা। উদ্ধৃত হুকুমটি সকলেরই পালনীয়। আর এটাই উত্তম ব্যাখ্যা।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ -

ঋণ গ্রহীতারা যদি দারিদ্র্য কষ্টে পড়া লোক হয়, তা হলে তাকে সহজতা সচ্ছলতা লাভ পর্যন্ত অবকাশ দিতে হবে।

এর দুটি তাৎপর্য রয়েছে। একটি তোমাদের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণকারী যদি দরিদ্র ও অর্থ কষ্টে পড়া লোক হয়, তা হলে তার সচ্ছলতা লাভ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর দ্বিতীয়

তার নামটাই তার অর্থ বোঝাবার জন্যে যথেষ্ট। এ আয়াতের তাৎপর্য বর্ণনায় বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। ইবনে আব্বাস, শুরাইহ্ ও ইবরাহীম বলেছেন, এ আয়াতের কথাটি বিশেষভাবে সূদের ব্যাপারে প্রযোজ্য। শুরাইহ্ ঋণ ফেরত দিতে অক্ষম ব্যক্তিকে আটক করার ফায়সালা দিতেন। ইবরাহীম আল-হাসান, রুবাই ইবনে খায়সম ও দহাক সকল প্রকারের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন, ইবনে আব্বাস থেকে অপর একটি বর্ণনা অনুরূপ এসেছে। অন্যান্যরা বলেছেন, আয়াতে ফেরত দিতে অক্ষম ব্যক্তিকে যে সময় দিতে বলা হয়েছে তা সূদের প্রসঙ্গে যেমন, তেমন সর্ব প্রকারের ঋণেই প্রযোজ্য তার উপর কিয়াস করে।

আবূ বকর বলেছেন ঃ আল্লাহ্র কথা ঃ 'যদি দরিদ্র হয়, তাহলে তার সচ্ছলতার অপেক্ষা করতে হবে'-এর মধ্যে সর্বপ্রকারের ঋণের ব্যাপার যখন গণ্য হতে পারে— তার সম্ভাব্যতার কথা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি— আগের কালের মনীষীরাও সেই রূপই ব্যাখ্যা করেছেন, তখন বুঝতে হবে যে, যে অর্থের ও ব্যাখ্যার সম্ভাবনা নেই, তা তাঁরা নিশ্চয়ই বলেন নি। তাই আয়াতটি সাধারণ তাৎপর্যেই ব্যবহার করতে হবে। কেবল 'সূদের ক্ষেত্রেই তা প্রয়োজ্য' তা বলা যাবে না। তবে তার কোন দলীল পাওয়া গেলে ভিন্ন কথা। কেননা সাধারণ ও ব্যাপক অর্থবোধক শব্দকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার হয়েছে বলেও মনে করার অবকাশ আছে। তবে তা দলীল ছাড়া হতে পারে না।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্র কথা ঃ 'ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি আর্থিক কষ্টের মধ্যে হলে তার সচ্ছলতার অপেক্ষা করতে হবে' কোন সিদ্ধান্ত দিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, তা থেকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে পূর্বের কথার সাথে সঙ্গতি রেখে, তখন এর সিদ্ধান্তটা সেই পূর্বে বলা কথার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল বলতে হবে।

জবাবে বলা যাবে— না, আল্লাহ্র উক্ত কথাটি নিশ্চয়ই স্বয়ংসম্পূর্ণ, তার শব্দ সমূহই তার বক্তব্য ও তাৎপর্য স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছে। কেননা আর্থিক সংকীর্ণতা কষ্ট ও অপেক্ষা করার কথা এমন ঋণের কথাই বোঝায়, যার দাবি করা অনিবার্য। আর অপেক্ষা করা বা সময় দেয়া প্রমাণিত হক প্রসঙ্গেই হতে পারে, যার দাবি করা সঠিক। হয় তাড়াতাড়ি ফেরত দেয়ার জন্যে তাগিদ হবে, নয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। আয়াতে ব্যবহৃত শব্দই যখন সেই ঋণ বোঝায়, যার সবই অপেক্ষা করার ব্যাপার জড়িত— যখন ঋণগ্রহীতা অর্থকষ্টে নিমজ্জিত হবে, তখন স্বীকার করতে হবে যে, আয়াতে শব্দসমূহ তাৎপর্য বোঝাতে স্বয়ং সম্পূর্ণ ও যথেষ্ট, তাই তার শব্দকে সাধারণ অর্থে গ্রহণ করা কর্তব্য। তাকে শুধু সূদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মনে করা ঠিক নয়।

কোন কোন লোক মনে করেছেন— তাঁরা অবশ্য আমাদের কথার সমর্থন করেছেন— উক্ত আয়াত কেবলমাত্র সূদের ব্যাপারে প্রযোজ্য মনে করা যাবে না। কেননা আল্লাহ্ তো সূদ বাতিল করে দিয়েছেন। তাই সে ব্যাপারে অপেক্ষা করার আর সময় দেয়ার প্রশ্ন উঠতে পারে কিভাবে? তাই আয়াতটিকে সর্বপ্রকারের ঋণের প্রসঙ্গে ধরে নিতে হবে।

কিন্তু এরূপ যুক্তি ঠিক নয়। কেননা আল্লাহ্ সূদ বাতিল করেছেন, তা হল শর্ত করা বাড়তি। কিন্তু মূলধন গ্রহণ করার অধিকার তো বাতিল করেন নি। কেননা আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন ঃ 'ছেড়ে দাও সূদের যা কিছু এখনও বাকী রয়েছে তা আর সূদ হল মূলধনের উপর বাড়তি।' তারপর বলেছেন ঃ 'তোমরা যদি তওবা কর, তাহলে তোমরা মূলধনটা ফেরত পেতে পারবে।'

তার পরে বলেছেন ঃ যদি ঋণগ্রহীতা আর্থিক কষ্টে থাকে' ..... অর্থাৎ সর্বপ্রকারের ঋণ প্রসঙ্গে এই কথা। যে ঋণ-ই দারিদ্রের কারণে ফেরত পাবে না, সেখানেই অপেক্ষা করার ও সময় দেয়ার প্রয়োজন। এ ঋণের মধ্যে মূলধন-ও রয়ে গেছে। অবশিষ্ট সূদ বাতিল করে দেয়ার মূলধন কিন্তু বাতিল হয়ে যায়নি। বরং তা ঋণ হিসেবেই ঋণ-গ্রহীতার উপর থেকে যাবে। তা তাকে অবশ্যই ফিরিয়ে দিতে হবে।

যদি বলা হয়, তাহলে এই মূলধন আদায়েও অপেক্ষা করা ও সময় দেয়ার আদেশ রয়েছে। তাই মূলধন ও অন্যান্য ঋণ সমান হয়ে গেল।

জবাবে বলা যাবে, আমাদের আলোচনা আয়াতের তাৎপর্যের ব্যাপকতা— তা কি কি শামিল করে— তাই নিয়ে। যদি তা কেবল সূদের মূলধনের ব্যাপার হয়, তাহলে তা দলীলের দিক দিয়ে অন্য কিছুকে শামিল করবে না। তাকে শামিল করবে অর্থ ও তাৎপর্যের সাধারণত্বের দিক দিয়ে। আর তখনই বাইরের কোন দলীলের প্রয়োজন দেখা দেবে অবশ্যম্ভাবীরূপে সিদ্ধান্ত প্রমাণের জন্যে। আর তা আয়াতে উল্লিখিত তাৎপর্য ফিরিয়ে নিতে হবে, যা সব কিছুকে শামিল করে। তোমার ও বিরোধীদের মধ্যে যে কথা-বার্তা, তা 'কিয়াস'-এর দিক দিয়ে নয়। তোমাদের পারস্পরিক মতপার্থক্যকে নিয়ে, আয়াতটি সাধারণ ও ব্যাপক অর্থবোধক; কিংবা বিশেষ অর্থবোধক। আর 'কিয়াস'-এর কথা এবং অনুল্লিখিতকে উল্লিখিতের উপর ফিরিয়ে নেয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার।

আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমরা তওবা করলে তোমাদের মালের আসলটা তোমাদের থাকবে'— এর দাবি হচ্ছে, ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার নিকট তার পাওনা পাওয়ার দাবি করতে পারবে। তার মূলধন সে নিজেই ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ফেরত নিতে পারবে, তার অসন্তুষ্টি হলেও। কেননা আল্লাহ নিজেই তার তাগাদা করার ও দাবি জানানোর অধিকার দিয়েছেন। তাতে ঋণগ্রহীতা সন্তুষ্ট থাকুক, কি অসন্তুষ্ট হোক, তার কোন শর্ত করা হয়নি।

এ থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, যারই অন্য কারোর নিকট কোন ঋণ আছে, তা সে অবশ্যই ফেরত চাবে, তা সে তার নিকট থেকে নিয়ে নেবে। সে দিতে চাক, আর না-ই চাক। এ পর্যায়েই রাসূলে করীম (স)-এর হাদীস এসেছে। আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা যখন নবী করীম (স)-কে বলল, আবূ সুফিয়ান একটা ভয়ানক কৃপণ ব্যক্তি। আমাকে এমন পরিমাণ দেয় না, যা আমার জন্যে যথেষ্ট হতে পারে, যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ হতে পারে। অথচ আমার সন্তানও রয়েছে। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ

خُذِىْ مِنْ مَالِ اَبِى سُفْيَانَ مَايَكْفِيْكِ وَوَلَدِكِ بِالْمَعْرُوْفِ -

তুমি আবূ সুফিয়ানের মাল থেকে ততটা নিয়ে নাও, যা প্রচলিত মানে তোমার ও তোমার সন্তানের জন্যে যথেষ্ট হয়।

তার অর্থ, আবূ সুফিয়ানের স্ত্রীর তার স্বামীর মাল থেকে যতটা পাওয়া ন্যায়সঙ্গত, তা সে নিয়ে নেবে। তাতে আবূ সুফিয়ান রাজী না থাকলেও কোন দোষ নেই।

আয়াতের দলীল এ-ও প্রমাণ করে যে, ঋণগ্রহীতা ঋণ ফেরত দেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি তা না দেয়, তাহলে সে হবে জালিম। তা দুটি দিক দিয়ে স্পষ্ট বোঝায়। একটি হল

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যদি তোমরা তওবা কর, তাহলে মূলধনটা তোমাদের প্রাপ্য।' এতে মূলধনটা ফেরত পাওয়ার জন্যে দাবি ও তাগাদা করার অধিকার স্বীকার করা হল। আর এতেই নিহিত রয়েছে এ কথা যে, ঋণগ্রহীতা তার উপর যে ঋণের বোঝা রয়েছে তা সে ফেরত দিতে বাধ্য। তা আদায় করে দিতে সে অস্বীকার করতে পারে না। কেননা সে যখনই তা ফেরত দিতে অস্বীকার করবে, তখনই সে হবে জালিম। তার এ কাজটা 'জুলুম' বলে অভিহিত হবে। আর তাহলে সে অবশ্যই আযাব পাওয়ার যোগ্য হবে। তা হল কয়েদ। আর দ্বিতীয় দিক হল, আয়াতের ধারাবাহিকতায়ই আল্লাহ্‌র এ কথাটি রয়েছে ঃ

لَاتَظْلِمُوْنَ وَلَاتُظْلَمُوْنَ -

তোমরাও জুলুম করবে না, তোমাদের উপর-ও জুলুম করা হবে না।

অর্থাৎ তোমরা মূলধনের অতিরিক্ত নিয়ে ঋণগ্রহীতার উপর জুলুম করতে পারবে না। আর মূলধনটাও হারিয়ে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে— তোমরা হবে মজলুম তা-ও হতে পারবে না। বোঝা গেল, ঋণগ্রহীতা যখনই মূলধনটা ফেরত দিতে অস্বীকার করবে— ফেরত দেবে না, সে হবে জালিম। তাকে শাস্তি দান করা আবশ্যক হবে।

সকল ফিকাহ্‌বিদ এ সম্পর্কে একমত যে, ঋণগ্রহীতা মূলধন না দিলে শাস্তিযোগ্য। এই শাস্তিটা নিশ্চয়ই মারপিট দিয়ে হবে না। তাহলে শাস্তির একমাত্র পথ থাকে জেলে আটক রাখা। কেননা এ জেলে বন্দী করার শাস্তি ছাড়া অন্য কোন প্রকারের শাস্তি দানের পথ খোলা নেই। নবী করীম (স) থেকে এ ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে, আয়াতটি ঠিক তা-ই বোঝায়। তা একটি হাদীস, মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ নফিলী— আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আমর ইবনে আবূ দলীলা, মুহাম্মাদ ইবনে মায়মুন, আমর ইবনুশ শরীদ— তাঁর পিতা সূত্রে রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) আমাকে বললেন ঃ পাওনাদার তার প্রাপ্য চাইতে ও সেজন্যে শাস্তিও দিতে পারে। ইবনুল মুবারক বলেন ঃ তার পাওনা চাওয়া তার জন্যে হালাল, সে সেজন্যে কঠোরতা করতে পারে, শাস্তি দিতে পারে, বন্দীও করতে পারে। ইবনে উমর, জাবির ও আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا اُحِيلَ اَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ -

ধনী বা সচ্ছল ব্যক্তির ঋণ ফেরত দিতে টাল-বাহানা করা জুলুম। তোমাদের কেউ যদি ভরপুর অবস্থার ব্যক্তির উপর কৌশল করে তাহলে সেটা করতে পারে।

মোটকথা, সচ্ছল ব্যক্তির ঋণ ফেরত দিতে টাল-বাহানা করা একটা জুলুম। যে তা করবে সে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হবে। আর তা হল কয়েদ, আটক। কেননা এ ছাড়া অন্য কোন শাস্তির কথা হাদীসে যে আসেনি, সে বিষয়ে সকলেই একমত।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, মুয়ায ইবনে আসাদ, নজর ইবনে শুমায়ল, হারামাস ইবনে হাবীব, একজন মরুবাসী, তাঁর পিতা, তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ আমি নবী করীম (স)-এর নিকট আমার খাতককে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলাম। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ ওর উপর তোমার দাবি পেশ করে ওকে আটকাও। তার পর বললেন ঃ

হে বনূ তামীমের লোকটি, তুমি তোমার বন্দীকে নিয়ে কি করতে চাও ?

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঋণগ্রস্তকে পাওনাদার আটক করতে পারে। কেননা বন্দী তো সে, যাকে আটকানো হয়েছে। তাকে বন্দী বলা হয়েছে, যখন বোঝা গেল যে, তাকে আটক করার অধিকার ঋণদাতার আছে। তার এ কথাটিও, যা তিনি আমাকে বলেছেন। পাওনাদারের অধিকার আছে তাকে (ঋণগ্রহীতাকে) ধরার ও শাস্তি দানের। আর শাস্তি দান অর্থ আটক করা। এ ছাড়া অন্য কিছু করার কারোর অধিকার নেই।

কোন অবস্থায় ঋণগ্রহীতাকে আটক করা যাবে, এ বিষয়ে ফিকাহবিদদের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে। হানাফী ফিকাহবিদরা বলেছেন, কারোর উপর ঋণ প্রমাণিত হলে— তা যে কোন ভাবেই প্রমাণিত হোক— তাকে দুই মাস কি তিন মাসের জন্যে আটক করা যেতে পারে। পরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যেতে পারে। তখন যদি সে ঋণ ফেরত দিতে সক্ষম হয়, তাহলে তাকে কারাগারে ফেলে রাখা যাবে, যতক্ষণ তার ঋণ শোধ না করবে। আর যদি সে দারিদ্র্যাবস্থার হয়, তাহলে তাকে ছেড়ে দিতে হবে।

ইবনে রুস্তম মুহাম্মাদ, আবূ হানীফা সূত্রে উল্লেখ করেছেন, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি বলে যে, আমি দরিদ্র অসচ্ছল ব্যক্তি এবং তার প্রমাণও সে পেশ করে কিংবা বলে যে, আমার বিষয়ে লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করে দেখুন, তখন কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে তাকে দুই বা তিন মাস বন্দী করে রাখতে হবে। তার পরে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে। তবে সে যদি সর্বজনপরিচিত গরীব মানুষ হয়ে থাকে, তাহলে তাকে আটক ও বন্দী করা যাবে না।

ইমাম তাহাভী আহ্মাদ ইবনে আবূ ইমরান সূত্রে উল্লেখ করেছেন, বলেছেন, আমাদের সঙ্গীদের শেষের দিকের লোক মুহাম্মাদ ইবনে শুজা বলতেন, প্রত্যেকটি ঋণেরই মূল হচ্ছে মাল, ঋণী ব্যক্তির হাতে তা এসেছে পণ্যদ্রব্যাদির মূল্যের মতো। সেজন্যে তাকে বন্দী করা যাবে। আর যার মূলে মাল নেই, তার হাতে তা পৌঁছে মহরানার মতো। আর খুলা করা বা সুলহ করা ইচ্ছা ও কাফালা পর্যায়ের ব্যাপার। কাজেই সেজন্যে তাকে বন্দী করা যাবে না, যতক্ষণ তার নিকট তার মওজুদ থাকা ও ভরপুর থাকা প্রামাণিত না হবে।

ইবনে আবূ লায়লা বলেছেন, ঋণের দরুন ঋণগ্রহীতাকে বন্দী করা যাবে, যখন জানা যাবে যে, তার নিকট মাল রয়েছে, কিন্তু সে দিচ্ছে না। ইমাম মালিক বলেছেন, ঋণের কারণে স্বাধীন বা ক্রীতদাস, কাউকে বন্দী করা যাবে না। তার ব্যাপারটি একেবারে ফেলেও দেয়া যাবে না। যদি অভিযোগ আসে যে, সে ধন-মাল লুকিয়ে রেখেছে, তাহলে তাকে বন্দী করা হবে। আর তার নিকট কিছু পাওয়া না গেলে তাকে আটক করা যাবে না। তাকে ছেড়ে দিতে হবে। আল-হাসান ইবনে হাই বলেছেন, ঋণী ব্যক্তি সচ্ছল হলে তাকে ঋণ ফেরত না দেয়ার জন্যে বন্দী করা যাবে। আর দরিদ্র হলে বন্দী করা যাবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, কারোর উপর ঋণ প্রমাণিত হলে তার প্রকাশমান মাল-মাত্তা বিক্রয় করে তা থেকে আদায় করা হবে, সেজন্যে ঋণী ব্যক্তিকে বন্দী করা যাবে না। যদি তেমন কিছু পাওয়া না যায় তাহলে বন্দী করা যাবে। আর তার সম্পদাদি বিক্রয় করে যতটা ঋণ আদায় করা যায়, করতে হবে। যদি সে নিজের দারিদ্রের কথা বলে, তাহলে তা অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে কবুল করা যাবে। আল্লাহ্র কথা ঃ 'ঋণী ব্যক্তি যদি দরিদ্র হয়, তাহলে তার সচ্ছলতা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে' তা-ই বলে। তার

পরও তাকে আল্লাহ্‌র নামে হলফ করতে বলা যাবে এবং তার পরে পাওনাদারদিগকে তাকে ধর-পাকড় করতে নিষেধ করতে হবে।

আবূ বকর বলেছেন, আমাদের ফিকাহবিদগণ বলেছেন, ঋণগ্রস্তকে বন্দী করা হবে প্রথমত যদি বিচারকের নিকট তার ঋণটা প্রমাণিত হয়। কেননা আয়াত থেকে তা-ই প্রমাণিত। তাছাড়া কুরআন-হাদীসে তাকে জালিম বলা হয়েছে তা ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করলে, যা তার ঋণ হিসেবে প্রমাণিত হয়। আর সে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হবে, যদি তা আদায় করতে অস্বীকার করে। কাজেই তার উপর শাস্তি বহাল থাকবে। যতদিন না তার দারিদ্র্য দূর হয়ে যায়।

যদি বলা হয়, সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও যদি ঋণ আদায় না করে, তাহলে সে জালিম হবে। কেননা আল্লাহ্ কারোর নিন্দা করেন না সেজন্যে যা করার কোন সাধ্য তার নেই। এ কারণে নবী করীম (স) শাস্তি পাওয়ার যোগ্যতা থাকার শর্ত করেছেন। যেমন আমাকে বলা হয়েছে যে, যে পাবে, সে তার দাবি পেশ করবে সেজন্যে শাস্তি দেবে। শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হওয়ার শর্ত হল সম্পদ থাকা, যা থেকে ঋণ আদায় করে দেয়া সম্ভব। তাহলে তাকে বন্দী করা ও শাস্তি দেয়া জায়েয হবে না। তবে যদি প্রমাণিত হয় যে, তারি নিকট ঋণ ফেরত দেয়ার টাকা আছে, কিন্তু সে দিতে প্রস্তুত নয়। ঋণ থাকার কথা কেবল জানলেই হবে না, স্থায়ীভাবে তার ঋণ ফেরত দেয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে। কেননা হতে পারে, ঋণ প্রমাণিত হওয়ার পর দারিদ্র্য সৃষ্টি হতে পারে।

জবাবে বলা যাবে, যেসব ঋণ বদলের ক্ষমতা তার হাতে থাকবে, সে যদি তা আদায় করে, তাহলে তার সচ্ছলতার কথা নিশ্চিতভাবে আমরা জানতে পারি। তার দারিদ্র্যের কথা আমরা জানতে পারি না। কাজেই তার সচ্ছলতার উপর অবশিষ্ট থাকা আবশ্যক হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না দারিদ্র্য প্রমাণিত হয়। আর যা তার জন্যে বাধ্যতামূলক কোন বিনিময় ছাড়া-ই, তা তার হাতে অর্জিত, তা আদায় করা তার পক্ষে সম্ভব। কেননা তার জন্যে বাধ্যতামূলক চুক্তিতে তার প্রবেশ তা আদায় করার বাধ্যবাধকতার স্বীকৃতি ও অঙ্গীকার। তা আদায় করার জন্যে তার বারবার দাবি করা এবং তার দারিদ্র্যের দাবি করা সচ্ছল ব্যক্তির মিয়াদভিত্তিক দাবির মতই। তা তার ব্যাপারে সত্য প্রমাণিত হয় না। এ কারণে হানাফী ফিকাহবিদগণ যেসব ঋণের বদল তার হাতে লাভ করার সংবাদ জানা যাবে, আর যা তার হাতে আসার কথা জানা যাবে না— এ দুইটিকে অভিন্ন মনে করেছেন। কেননা যে চুক্তি তার উপর সে ঋণটিকে বাধ্যতামূলক করেছে তাতে তার দাখিল হওয়াটা ঋণ আদায় করে দেয়ার বাধ্যবাধকতার স্বীকৃতি এবং দাবিদারের দাবি করার অধিকার মেনে নেয়ার শামিল। কেননা চুক্তির দুই পক্ষের প্রত্যেকেরই দখল রয়েছে চুক্তির মধ্যে। তাদের দুজনেরই তাতে দাখিল হওয়ার অর্থ দুজনেই স্বীকার করে— চুক্তির ভিত্তিতে যেসব অধিকার অনিবার্য হয়েছে তার বাধ্যবাধ্যকতা। তা দুজনের একজনও অস্বীকার করলে তাকে সত্য বলে মেনে নেয়া যাবে না। এ কারণে আমরা বলেছি, তার দাবি হল তার সঠিকত্ব সম্পর্কে উভয়েরই স্বীকৃতি। কেননা তাতে তার হকসমূহ পূরণের বাধ্যতা নিহিত রয়েছে। যা তার জন্যে বাধ্যতামূলক তা অস্বীকার করলে বিপর্যয় অনিবার্য। চুক্তির বাহ্যিক দাবি এটাই। দুজনের মধ্যে চুক্তি হলেও বাহ্যত তা সহীহ্ হলে তাতে বিপর্যয় সৃষ্টির দাবি অসত্য বলে স্বীকৃত। তখন কথা হিসেবে দুজনেরই সঠিকতার কথা মেনে নিতে হবে। এতেই দলীল রয়েছে আমরা যা বলেছি তার সত্যতার। তা এই যে, যে লোক নিজের উপর কোন ঋণ বাধ্যতামূলক

বানিয়ে নেবে কোন চুক্তির দ্বারা, তার পক্ষে সে চুক্তির বাধ্যবাধকতা আদায় করা কর্তব্য। তার সম্পর্কে হুকুম দিতে হবে যে, সে একজন সচ্ছল ব্যক্তি, তার এতটা দারিদ্র্য স্বীকার করা যাবে না, যার ফলে তার নিকট পাওয়ার দাবি করা যাবে না। যেমন তাৎক্ষণিকভাবে ঋণ প্রমাণিত হওয়ার পর কোন নতুন মিয়াদ নির্ধারণকে সত্য মানা যাবে না।

আমাদের ফিকাহবিদগণ যে বলেছেন, তাকে বন্দী করতে হবে প্রথম যখন ঋণের মামলা বিচারকের সম্মুখে পেশ করা হবে, ঋণদাতা যখন তার ঋণের দাবি করবে। তার নিকট ঋণ ফেরত দেয়ার দাবি করার পূর্বে তার অবস্থা সম্পর্কে কারোর নিকটই কিছু জানতে চাওয়া হবে না। তাকে ঋণ ফেরত দিতে সক্ষম মনে করেই তা করতে হবে। শুরুতে তার ব্যাপারটি দোষমুক্তই মনে করতে হবে, কেননা হতে পারে তার নিকট টাকা-পয়সা আছে, যা সে গোপন করে রেখেছে। অন্যরা তা জানে না। তখন তাকে অসচ্ছল মনে করা যাবে না। অতএব তাকে আটক করতে হবে। তার নিকট যা আছে তা প্রকাশ করতে হবে। কেননা এ-ও তো হতে পারে যে, তার নিকট অপর কোন জিনিস আছে, বন্দীদশা তাকে অসহ্য করে তুলবে। তার মান-মর্যাদা বোধ-ও তাকে তা বের করে আনতে বাধ্য করতে পারে। তাই কথিত মিয়াদে যখন তাকে আটক করা হবে, তখন আশা করা যায়, তার সে জিনিস বেরিয়ে পড়বে। তারপর তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কেননা এটা হতে পারে যে, সেখানে এমন লোক রয়েছে, যারা তার গোপন সচ্ছলতা সম্পর্কে জানে। পরে যখন তার দারিদ্র্য প্রমাণিত হবে, তখন তাকে কয়েদ থেকে মুক্তি দিতে হবে।

শুরাইহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি সূদ ছাড়া অন্যান্য ঋণের জন্যে দরিদ্র ব্যক্তিকেও আটক করতেন। তখন একজন দরিদ্র ব্যক্তি তাকে বলবে, তাকে বন্দী করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন ঃ 'যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দরিদ্র হয়, তাহলে তার সচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিতে হবে।' শুরাইহ বললেন, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا -

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ করছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ সেসবের মালিক— অধিকারীদের নিকট আদায় করে দাও। (সূরা আন-নিসা ঃ ৫৮)

কিন্তু আল্লাহ্ আমাদেরকে এমন জিনিসের আদেশ করছেন না, যে জন্যে তিনি আমাদের আযাবে নিক্ষেপ করবেন।

আয়াতটির ব্যাখ্যায় শুরাইহর মত পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। আর আল্লাহ্র কথা ঃ 'ঋণী ব্যক্তি যদি দরিদ্র হয় তাহলে তার সচ্ছলতা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে'— এটি কেবল সূদ প্রসঙ্গেই সীমাবদ্ধ থাকবে। অন্য কোন ক্ষেত্রে তা দলীল হবে না। সূদ ছাড়া অন্যান্য ঋণ দরিদ্র ও সচ্ছল ব্যক্তির মধ্যে আটকের ব্যাপারে কোন পার্থক্য করা যাবে না। হতে পারে, এ ব্যাপারে তিনি এমন একটা মাযহাব গ্রহণ করেছেন, যাতে প্রকৃত দারিদ্র্য সম্পর্কে জানবার আমাদের কোন উপায়ই নেই। কেননা হতে পারে, লোকটি নিজের দারিদ্র্য প্রকাশ করে, আর তার প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, সে সচ্ছল মানুষ। এ কারণে সূদের মূলধনটার জন্যেই শুধু অপেক্ষা করতে হবে। কুরআন এ ক্ষেত্রেই অপেক্ষা করার কথা বলেছে। তা ছাড়া অন্যান্য পারস্পরিক লেন-দেনের

চুক্তিতে ঋণ ফেরত দেয়ার বাধ্যবাধকতাই আরোপ করেছে এবং তা আদায় করার জন্যে দাবি করতে থাকার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ কথাটি যে ঠিক নয়, তার কারণ আমরা পূর্বেই ব্যাখ্যা করেছি। তাতে আমরা দলীল বানিয়েছি ব্যবহৃত শব্দের সাধারণ তাৎপর্যকে। সর্বপ্রকারের ঋণকে তাতে শামিল করেছি। তা সত্ত্বেও কুরআনের আয়াতটি যদি কেবলমাত্র সূদের ব্যাপারে ঋণী ব্যক্তিকে অবকাশ দেয়ার কথা নিয়েই নাযিল হয়ে থাকে, অন্যান্য ঋণ সম্পর্কে যদি তার বক্তব্য না থাকে, তাহলে অন্যান্য সর্বপ্রকারের ঋণকে তার উপর কিয়াস করতে হবে। কেননা ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে সচ্ছলতার অবস্থার দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই, দুজনেরই দাবি করার বাধ্যবাধকতার সঠিক হওয়ার ও তা আদায় করে দেয়া কর্তব্য হওয়া সম্পর্কে, তাই আদায় করে দেয়া হলে কয়েদ করার নিয়ম প্রত্যাহৃত হবে, এতেও দুজনের মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না।

তবে আল্লাহ্র কথা : 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন আমানতসমূহ সেসবের অধিকারীদের নিকট ফিরিয়ে দেবার জন্যে'।

শুরাইহ্ এ আয়াতকে দলীল বানিয়ে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, যার নিকট টাকা পাওনা, তাকে বন্দী করতে হবে। কেননা আয়াতটি অন্য লোকের যেসব জিনিস কারোর হাতে মওজুদ রয়েছে যে বিষয়ে কথা বলে। তার হাতে তা রয়েছে, তাই তা আদায় করে দেয়া তার কর্তব্য। কিন্তু তার যিম্মায় যেসব ঋণ আছে, তার জন্যে দাবি করার ব্যাপারটি সংশ্লিষ্টতা আদায় করার সম্ভাব্যতার সাথে। তাই যে নিজে দরিদ্র, তার উপর তো আল্লাহ তততুকু দায়িত্বই চাপিয়েছেন যতটুকু পালন করা তার পক্ষে সম্ভব। আল্লাহ্ বলেছেন :

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا اٰتٰهَا - سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا -

আল্লাহ কোন মানুষকে দায়িত্ব দেন না, দেন শুধু ততটুকুর, যা তিনি তাকে দিয়েছেন। আল্লাহ নিশ্চয়ই দারিদ্র্যর পর সচ্ছলতার সুবিধা দেবেন।

অতএব সে যখন তা দিতে অক্ষম, তখন সে তা দেয়ার দায়িত্বশীল নয়। ফলে তাকে আটক ও বন্দী করা জায়েয হতে পারে না।

যদি বলা হয়, ঋণ তো একটা আমানত বিশেষ। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন :

فَاِذَا اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهُ -

তোমরা কিছু লোক যদি অপর কিছু লোককে বিশ্বাস করো, তা হলে যার নিকট আমানত রাখা হয়েছে তার কর্তব্য হল তার আমানতটা ফিরিয়ে দেয়া।

এ আয়াতে ঋণের কথাই বলা ও বোঝানো হয়েছে। সে ঋণের কথাই বলা হয়েছে এ আয়াতে :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ -

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্ত কোন ঋণের লেন-দেন করবে, তখন তোমরা তা অবশ্যই লিখবে।

জবাবে বলা যাবে, 'আল্লাহ্র কথা ঃ 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে আমানতসমূহ সে সবের মালিকের নিকট ফিরিয়ে দাও'— এর অর্থ যদি হয় ঋণ ফেরত দেয়া, তাহলে এ আদেশ পালন সম্ভব হওয়া শর্তের উপর ভিত্তিশীল হবে। কেননা যেমন পূর্বে বলেছি— যা করার সাধ্য নেই তা করার কোন দায়িত্ব আল্লাহ্ কারোর উপর চাপান না। করার সাধ্য না থাকলে সে তা করবে কি ভাবে ? ঋণগ্রহীতার বাহ্যিক প্রকাশেই বোঝা যায়, সে তা আদায় করতে অক্ষম। শুরাইহ-এর আগের দিনের কোন মনীষীই এই বিষয়ে অনবহিত ছিলেন না যে, আল্লাহ্ সাধ্যের অতীত কোন কাজের দায়িত্ব কাউকে দেন না। তাঁরা এ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়শীল ছিলেন না। হয়ত তাঁরা মনে করতেন যে, সে ঋণের টাকা ফেরত দিতে সক্ষম, যদিও বাহ্যত তারা দরিদ্র। এ কারণেই ঋণীকে বন্দী করার ফায়সালা দিয়েছেন।

শাসকের নিকট যদি তার দারিদ্র প্রমাণিত হয় এবং তাকে বন্দীদশা থেকে খালাস করে দেয়, তাহলে সে ঋণ প্রাপকের দাবি ও তা ফেরত দেয়ার বাধ্যবাধকতার মাঝে সে কি প্রতিবন্ধক হবে ? ........ এ পর্যায়ে মনীষিগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, পাওনাদারের অধিকার আছে ঋণী ব্যক্তিকে ধরবে। ইবনে রুস্তম মুহাম্মাদ থেকে উল্লেখ করেছেন, বলেছেন, ঋণ যার নিকট পাওনা— অর্থাৎ ঋণী ব্যক্তিকে খাবারের জন্যে, পায়খানা-প্রেশাবের জন্যে তার নিজের ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করা যাবে না। হ্যাঁ, তাকে যদি তার খাবার এনে দেয়া হয় ও পায়খানা-পেশাবের স্থান করে দেয়া হয়, তাহলে তাকে তার নিজের ঘরে যাওয়া থেকে বিরত রাখা জায়েয হবে। অন্যান্যদের মধ্য থেকে ইমাম মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন, পাওনাদারের অধিকার নেই ঋণী ব্যক্তিকে ধরার। লায়স ইবনে সাদ বলেছেন, স্বাধীন দরিদ্র ব্যক্তিকে পারিশ্রমিক দিতে হবে এবং তা থেকে তার ঋণ শোধ করা হবে। এরকম কথা এক জুহ্রী ছাড়া আর কেউ বলেছেন বলে আমাদের জানা নেই। কেননা লায়স ইবনে সাদ জুহ্রীর এ মত বর্ণনা করেছেন। দারিদ্য প্রকাশিত হওয়া তার ঋণ ফেরত দেয়ার বাধ্যবাধকতাকে প্রত্যাহার করে না। তখনও তার নিকট পাওনা শোধের দাবি করা যাবে, তাগাদা করা যাবে। এর প্রমাণ হচ্ছে একটি হাদীস। হাদীসটি হিশাম ইবনে উরওয়াতা তাঁর পিতার সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, রাসূলে করীম (স) একজন আরব বেদুঈনের নিকট থেকে নির্দিষ্ট মিয়াদে মূল্য দেয়ার শর্তে একটি উট ক্রয় করেন। মিয়াদ শেষ হলে সেই বেদুঈন নবী করীম (স)-এর নিকট পাওনার তাগাদা করার জন্যে উপস্থিত হয়। তখন রাসূলে করীম (স) বললেন, তুমি তো পাওনাটা নেয়ার জন্যে আমার নিকট এসেছ, কিন্তু আমার নিকট দেয়ার মত কিছুই নেই। তাই তুমি বরং অপেক্ষা কর সাদকা আসা পর্যন্ত। তখন বেদুঈন ব্যক্তি একটি দুর্বোধ্য শব্দ করল, যার অর্থ হযরত উমর (রা) বুঝতে পেরেছিলেন। তখন নবী করীম (স) বললেন, ছাড়, পাওনাদারের কথা বলার অধিকার আছে।

নবী করীম (স) অকপটে জানালেন যে, তাঁর নিকট কিছু নেই। তাকে পাওনা তাগাদা করতে নিষেধ করলেন না। বরং বললেন, 'পাওনাদারের কথা বলার অধিকার আছে।' এ থেকে প্রমাণিত হল যে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির দারিদ্র্য তার নিকট পাওনার তাগাদা করার প্রতিবন্ধক নয়, ঋণ ফেরত দেয়ার দায়িত্ব থেকেও তাকে মুক্তি দেয় না।

রাসূলের কথা ঃ দাঁড়াও, সাদকা (যাকাত) আসুক (পাওনা দিয়ে দেব)। এ কথা প্রমাণ করে যে, নবী করীম (স) বাকীতে উট কিনেছিলেন নিজের জন্যে নয়; বরং সাদকার জন্যে। কেননা

তিনি যদি নিজের জন্যে খরিদ করে থাকতেন, তা হলে তিনি সে পাওনা নিশ্চয়ই সাদকার উট থেকে দিতেন না। কেননা তার নিজের জন্যে সাদকা জায়েয ছিল না। এ থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, কেউ যদি অন্য কারো জন্যে বাকীতে কিছু ক্রয় করে, তাহলে তার দামটা দেয়া যে তারই দায়িত্ব। কেননা চুক্তিটা তারই সাথে সঙ্ঘটিত হয়েছে, যার জন্যে কিনেছে, তার সঙ্গে হয়নি। তার প্রমাণ, নবী করীম (স) পাওনাদারকে তাগাদা করতে নিষেধ করেন নি, দাবি না করতেও বলেন নি। এ হাদীসটি আবূ রাফে বর্ণিত হাদীসের তাৎপর্যে অভিন্ন। সে হাদীসটি হল, নবী করীম (স) একটি যুবক বয়সের উট বাকীতে কিনেছিলেন। পরে তার মূল্য সাদকার উট থেকেই আদায় করেছিলেন। কেননা এ মূল্যটা সাদকার মালের উপর একটা ঋণ ছিল। অপর একটি বর্ণনায় নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, পাওনাদারের হাতও আছে, মুখও আছে। হাম্মাদ ইবনুল হাসান এই বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, হাতে আছে বাধ্য করা, আর মুখে আছে তাগাদা করার অধিকার।

হাদীসের বর্ণনাকারী হিসেবে অভিযুক্ত নন— এমন একজন বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া, ইবরাহীম ইবনে হামযা, আবদুল আযীয, ইবনে মুহাম্মাদ, আমর ইবনে আবূ উমর, ইকরামা, ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তির দশ দীনার পাওনা ছিল অপর ব্যক্তির নিকট। সে তাকে পাকড়াও করল। সে বলল, আল্লাহ্র কসম, আমার নিকট কিছু নেই, যা দিয়ে আজ আমি তোমার পাওনা দিতে পারি। পাওনাদার বলল, না, আমি তোমাকে ছাড়ব না যতক্ষণ না তুমি আমার পাওনা শোধ করবে। কিংবা তুমি আমার নিকট একজন বহনকারীকে নিয়ে আসবে, যে তোমার এই ঋণের বোঝা নিজের কাঁধে নিয়ে নেবে। সে বলল— আল্লাহ্র কসম, তোমার পাওনা দিয়ে দেয়ার মত কিছুই আমার নিকট নেই। আমার এ ঋণের যামিন হবে— এমন কোন লোককেও আমি আনতে পারব না। এরপর সে লোক রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হল, বলল, হে রাসূল, এই লোকটি আমাকে পাকড়াও করেছে। আমি তার নিকট এক মাসের সময় চাইলাম, কিন্তু সে সময় দিতে অস্বীকার করেছে। সে আমাকে তার পাওনা দিয়ে দিতে বলে, না হয় একজন যামিন আনতে বলে। তারপরে বলল, আল্লাহ্র কসম, আমার যামিন হবে— এমন কাউকে পাব না আর আজ তার পাওনাও আমি দিতে পারছি না। তখন রাসূলে করীম (স) পাওনাদারকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি ওকে এক মাসের সময় দেবে? সে বলল, না। তখন রাসূলে করীম (স) বললেন, ঠিক আছে, আমি-ই ওর যামিন হলাম। রাসূলে করীম (স) তার যামিন হলে লোকটি চলে গেল ও একটি 'ডেগ' তাঁর নিকট নিয়ে আসল, যার ওয়াদা সে করেছিল। রাসূলে করীম (স) লোকটিকে জিজ্ঞাসা কররেন, তুমি এই স্বর্ণ কোত্থেকে পেলে? বলল, খনি থেকে। তখন তিনি বললেন, তুমি এটি নিয়ে চলে যাও, এর কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। ওতে ভালো কিছু নেই। পরে তিনি নিজেই তার ঋণ শোধ করে দেন। এই হাদীসটি থেকে এ কথা বোঝা যায় যে, নবী করীম (স) লোকটিকে পাকড়াও করতে পাওনাদারকে নিষেধ করেন নি। যদিও সে আল্লাহ্র নামে কিরা করে বলছিল যে, তার নিকট ঋণ শোধ করার কিছু নেই।

হাদীস বর্ণনায় অভিযুক্ত নন— এমন একজন বর্ণনাকারী আমাদের নিকট আবদুল্লাহ ইবনে আলী ইবনুল জারুদ ইবরাহীম ইবনে আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা ইবনে আবূ উবায়দ উবাই আল আ'মাশ, আবূ সালিহ, আবূ সাঈদুল খুদরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, একজন

আরব বেদুঈন নবী করীম (স)-এর নিকট খেজুরের তাগাদা করতে এসেছিল, যা তার নিকট পাওনা ছিল। সে তার প্রতি কঠোরতা করে ও কড়াকড়িভাবে পাওনার দাবি করে। এতদূর বলল যে, আমার পাওনা না দিলে আমি তোমার বিপদ ঘটাব। সাহাবীগণ তাকে ভর্ৎসনা করলেন, ধমকালেন, তাঁরা বললেন ঃ তোমার ধ্বংস হোক, তুমি কার সাথে কথা বলছ ? তখন লোকটি বলল, আমি আমার হক আমার পাওনার দাবি করছি। তখন নবী করীম (স) সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা না পাওনাদারের পক্ষের লোক ছিলে ? পরে তিনি খাওলা বিনতে কায়স (রা)-এর নিকট বলে পাঠালেন, তোমার নিকট খেজুর থাকলে আমাকে ধার দাও। আমার নিকট খেজুর এসে গেলে তোমাকে দিয়ে দেব। তিনি বললেন, হ্যাঁ, হে রাসূল! তিনি তাঁকে করয দিলেন, তা দিয়ে তিনি তাঁর ঋণ শোধ করলেন। আরব বেদুঈনকে খাওয়ালেন ও পরে সে বলল, আপনি আমার পাওনা দিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহ্ আপনার পাওনা পূর্ণ মাত্রায় দেবেন। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ

أُولَٰئِكَ خِيَارُ النَّاسِ، إِنَّهَا لَاقُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ مِنْهَا حَقُّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ -

নবী করীম (স)-এর ঋণ শোধ করার কিছুই ছিল না। কিন্তু তিনি বেদুঈনের পাওনা দাবি করতে নিষেধ করেন নি, তার প্রতিবাদও করেন নি। তার তাগাদা করার অধিকারকে অস্বীকার করেন নি। তার রূঢ় ব্যবহারে ও কঠোর আচরণে সাহাবায়ে কিরাম (রা) তার প্রতি যে ব্যবহার করেছিলেন, তিনি তার প্রতিবাদ করেছিলেন এবং বলেছিলেনঃ 'তোমরা না হকদারের পক্ষের লোক ছিলে ?'

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, ঋণী ব্যক্তির দারিদ্র্যের কারণেই তাকে সময় দিতে হবে এমন কথা নয়। পাওনাদার নিজে সময় দিলেই সেই সময় পাবে। অন্যথায় নয়।

এ কথার প্রমাণ আর একটি হাদীস। হাদীসটি আবদুল বাকী ইবনে কানে' আহমদ ইবনে আব্বাস-আল-মুয়াদ্দিব, আফ্‌ফান ইবনে মুসলিম, আবদুল ওয়ারিস, মুহাম্মাদ ইবনে জাহদাতা, ইবনে বুরায়দাতা, তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি রাসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ صَدَقَةٌ وَمَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ -

যে লোক অর্থকষ্টে পড়া ব্যক্তিকে সময় দেবে, তার সাদকা হবে। আর যে ব্যক্তি অর্থ কষ্টে পড়া ব্যক্তিকে ঋণ শোধের সময় দেবে, তার জন্যে প্রত্যেকটি দিন সাদ্‌কা হবে।

তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনাকে বলতে শুনলাম, যে লোক অর্থ কষ্টে পড়া ব্যক্তিকে সময় দেবে, তার জন্যে সাদকা। তার পরে শুনলাম, আপনি বলছেন, যে লোক অর্থকষ্টে পড়া ব্যক্তিকে ঋণ শোধের অবসর দেবে, তার জন্যে প্রত্যেক দিনের সাদকা হবে—এর অর্থ কি ? তখন নবী করীম (স) বললেন, যে লোক অর্থকষ্টে পড়া ব্যক্তিকে ঋণের মিয়াদ শেষ হওয়ার আগে সময় দেবে, তার জন্যে সাদকা। আর যে ব্যক্তি তাকে সময় দেবে মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর, তার জন্যে প্রত্যেক দিন সাদকা হবে।

আবদুল বাকী মুহাম্মাদ ইবনে আলা ইবনে আবদুল মালিক ইবনুল মিরাজ,ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ আল-হারভী, ঈসা ইবনে ইউনুস— সাঈদ ইবনে হাজনাতা আল আসাদী, উবাদাতা ইবনুল অলীদ ইবনে উবাদাতা ইবনুস সামিত সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবুল ইউসরাকে বলতে শুনেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا اَوْوَضَعَ لَهُ اَظَلَّهُ اللّٰهُ يَوْمَ لاَظِلَّ اِلاَّ ظِلُّهُ -

যে লোক অর্থকষ্টে পড়া ব্যক্তিকে সময় দেবে কিংবা সময় বাড়াবে, আল্লাহ তাকে সে দিন ছায়া দেবেন, যে দিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া হবে না।

প্রথমোক্ত হাদীসে রাসূলের কথা ঃ যে অর্থকষ্টে পড়া ব্যক্তিকে সময় দেবে, তার জন্যে প্রত্যেক দিন সাদকা প্রমাণ করে যে, নিছক দারিদ্র্যের কারণেই কেউ আপনা-আপনি অবকাশ পেয়ে যায় না, যতক্ষণ পাওনাদার নিজে সময় না দেবে। কেননা তার সময় দেয়া ছাড়াই যদি সে সময় পেয়ে যেত, তাহলে রাসূলের উক্ত কথাটি সহীহ্ হয় না। তাহলে পাওনাদারের দেয়া সময়ের বদলে সাদকা হওয়ার প্রশ্ন উঠে না। কেননা কোন কাজ না করলে তার বদলে সওয়াব পাওয়ার অধিকারী হতে পারে না। তার সময় দেয়ার কাজটি ছাড়াই সময় পেয়ে গেলে পাওনাদারের সওয়াব পাওয়ার হকদার হওয়া সম্ভব নয়।

আর আবুল ইউসরা বর্ণিত হাদীসের কথাগুলোও সে কথাই বোঝায় দুই ভাবে। একটি, সময় দেয়ার বদলে সওয়াব পাওয়ার অধিকার হওয়া। আর দ্বিতীয়, সময় দেয়াকে পাওনা পরিমাণ হ্রাস করার স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছেন এবং একথা জানাই আছে যে, পাওনা-পরিমাণ হ্রাস করা কেবল পাওনাদারেরই কাজ। সময় দেয়াও তাই। এসবই এক সাথে প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্র কথা ঃ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ 'সচ্ছলতা পর্যন্ত সময় দিতে হবে' দুইটি দিকের যে-কোন একটি দিকে ফিরে যায়। একটি, সময় দান সঙ্ঘটিত হবে ঋণগ্রস্তকে কয়েদ না করার ও তাকে শাস্তি না দেয়ার দ্বারা। কেননা সে এর কোনটির যোগ্য নয়। কেননা নবী করীম (স) সচ্ছল ব্যক্তির ঋণ আদায় করে দিতে টাল-বাহানা করাকে জুলুম বলেছেন। কিন্তু তার দারিদ্র্য প্রমাণিত হওয়ায় সে ঋণ শোধ না করলে জালিম হবে না। এ কারণে আল্লাহ্ তাকে কয়েদ রেহাই দিয়ে সময় দিতে বলেছেন। অবশ্য তাকে পাকড়াও না করা জরুরী হয় না অথবা তা মুস্তাহাব হবে। তাকে সময় দিতে উপদেশ দেয়া হয়েছে তাকে পাকড়াও না করতে ও তার নিকট তাগাদা না করতে বলে। তা হলে পাওনাদারের দেয়া সময় পেলেই সে অবকাশ পেতে পারে। উপরোদ্ধৃত হাদীসসমূহই তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে।

কেউ যদি বলে যে, পাকড়াও করা তো কয়েদ করার মতোই। এ দুটির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কেননা উভয় অবস্থায়ই তার স্বাধীনতা তিরোহিত হয়।

জবাবে বলা যাবে, ব্যাপার তা নয়। কেননা তাকে শুধু ধরলেই তার স্বাধীনতা নষ্ট হয় না। তার অর্থ হচ্ছে, পাওনাদারের পক্ষ থেকে একজনকে লাগাতে হবে যে, তার কাজ কর্ম লক্ষ্য করবে, তার কামাই-রোজগার দেখবে। আর যে কৃতকাজ এজন্যে ফায়দা দেয়, তা করবে। তার খাওয়া-দাওয়ার পরিমাণ ছেড়ে দেবে। অবশিষ্টটা ঋণ শোধ বাবদ নিয়ে নেবে। তা ঠিক কয়েদ করার মতো নয়। এটা কোন শাস্তিও নয়।

মারওয়ান ইবনে মুয়াবিয়াতা, আবূ মালিক আল-আশজায়ী, রবয়ী ইবনে খরাজ, হুযায়ফাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তাঁর একজন বান্দাকে বলবেন ঃ তুমি কি আমল করেছ ? সে বলবে, আমি তোমার জন্যে কোন নেক আমল করিনি যদ্দারা আমি তোমাকেই পেতে আশা করতে পারি, না নামায, না রোযা। তবে তুমি আমাকে অনেক অর্থসম্পদ দিয়েছিলে। আমি লোকজনের সাথে মিশতাম। তখন সচ্ছল ব্যক্তিকে সচ্ছলতা দিতাম এবং অর্থকষ্টে অর্জরিত ব্যক্তিকে সময়-সুযোগ দিতাম। তখন আল্লাহ্ বলবেন, আমি এগুলো পাওয়ার তোমার অপেক্ষও বেশি অধিকারী। তোমরা আমার এই বান্দাকে ছেড়ে দাও। তখন তাকে মাফ করে দেয়া হবে।

তখন ইবনে মাসউদ (রা) বললেন— আমিও রাসূলে করীম (স) থেকে এরূপ কথাই শুনেছি।

এ হাদীসও প্রমাণ করে সে কথা, যা পূর্বোদ্ধৃত হাদীসসমূহ প্রমাণ করে। তা হল, অর্থকষ্টে পড়া ব্যক্তি শুধু তার দারিদ্র্যের কারণে ঋণ শোধে সময় পেয়ে যেতে পারে না। কেননা তা দরিদ্র ব্যক্তিকে সময় দেয়া ও সচ্ছল ব্যক্তির প্রতি সচ্ছলতা দানের সাথে সমন্বিত ও একত্রিত ব্যাপার। আর এসব তার নফল কাজ, ওয়াজিব-ফরয নয়।

কেউ কেউ মনে করে, কেউ যখন অর্থকষ্টে পড়ে এবং শুধু এ অর্থকষ্টের দরুন তার সময় পেয়ে যাওয়ার অধিকার আছে, তখন তাকে পাকড়াও করাও যাবে না। তার দলীল হল একটি হাদীস। হাদীসটি লায়স ইবনে সাদ বুকায়র, ইয়ায ইবনে আবদুল্লাহ, আবূ সাঈদুল খুদরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-এর সময়ে ফল ক্রয় করে বিপদে পড়েছিল। তাতে তার ঋণ বেড়ে গিয়েছিল। তখন নবী করীম (স) সাহাবায়ে কিরামকে বললেন, তোমরা এ লোকটিকে সাদকা দাও। লোকেরা আদেশ পেয়ে তাকে সাদকা দিল। কিন্তু তার ঋণ শোধের পরিমাণ পর্যন্ত পৌছল না। তখন রাসূলে করীম (স) পাওনাদারদের বললেন, যা পাও তা-ই তোমরা নিয়ে নাও। তাছাড়া তোমরা আর কিছু পাবে না। রাসূলে করীম (স)-এর কথার এ অংশ 'তা ছাড়া আর কিছু তোমরা পাবে না'-কে দলীল বানিয়ে বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে, তাকে পাকড়াও করা যাবে না।

এর জবাবে বলা যাবে, জানা আছে যে, তাদের প্রাপ্য খতম হয়ে গেছে, তা তিনি বোঝাতে চান নি। কেননা ঋণী ব্যক্তির নিকট যখনই মাল পাওয়া যাবে, তখনই তার মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত তার নিকট থেকে নিয়ে নেয়ার জন্যে পাওনাদাররা অধিক হকদার, এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই। ফলে ঋণী ব্যক্তির যিম্মায় পাওনাদারদের হক্ থেকে যাওয়ার কথাই প্রমাণিত হয়। তাদের হক শেষ হয়ে গেছে এমন কথা বলা হয়নি, যেন তারা তাদের পাওনাসমূহ পুরাপুরি পেয়ে যেতে পারে। অবশ্য তা তার উপার্জন থেকে নিতে হবে তার মৌলিক প্রয়োজন পুরা করার ব্যবস্থা রেখে। আর ঋণগ্রস্তকে পাকড়াও করার এটাই অর্থ। কেননা ঋণী ব্যক্তি ভবিষ্যতে যা উপার্জন করবে, তার উপর পাওনাদারদের হক প্রমাণিত, তা থেকে তারা তাদের হক নিয়ে নিতে পারে, তা নিয়ে আমাদের কোন মতপার্থক্য নেই। আর এ থেকেই পাওনাদারের তাকে পাকড়াও করার অধিকার প্রমাণিত হয়।

রাসূলে করীম (স) বলেছেন, 'তোমাদের এ ছাড়া কিছু নেয়ার নেই' তাতে পাওনাদারদের

হক যে এখনও আছে, তা অস্বীকৃত হয় না। আর পূর্বোদ্ধৃত হাদীসসমূহে অর্থকষ্টে পড়া ঋণীকে সময় দেয়া পর্যায়ে রাসূলে করীমের যে কথা এসেছে এবং পাওনাদারকে ঋণীকে সময় দেয়ার জন্যে যে উৎসাহব্যঞ্জক কথাবার্তা রয়েছে, তা প্রমাণ করে যে, ঋণ শোধে সময় দেয়া জায়েয, তা এমন অবস্থা যা ছিনতাই ও ক্রয়জনিত বাধ্যবাধকতার অবস্থা।

ইমাম শাফেয়ী মনে করেছেন, যখন মূল্যটা অবশিষ্ট থেকে যাবে, তখন সে জন্যে সময় দেয়া সহীহ নয়। কিন্তু এ মত আমাদের পূর্বোদ্ধৃত হাদীসসমূহের বিপরীত। কেননা এ সব হাদীসের দাবি হচ্ছে সময় দেয়া জায়েয। ইবনে বুরায়দাতা বর্ণিত হাদীস তার ব্যাখ্যা করেছে। তা সে লোকের ব্যাপারে যাকে মিয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই সময় দেয়া হয়েছে অথবা সময় দেয়া হয়েছে মিয়াদ শেষ হওয়ার পর। তার সনদ পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, সাঈদ ইবনে মনসূর, আবুল আহওয়াস, সাঈদ ইবনে মসরূক, শবী, সামআন, সামুরাতা ইবনে জুনদব সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, রাসূলে করীম (স) আমাদেরকে ভাষণ দিলেন। বললেন ঃ এখানে অমুক বংশের কোন লোক আছে কি ? ..... কিন্তু কোন লোক উত্তর দিল না। পরে আবার তাই বললেন। তখনও কেউ সাড়া দিল না। তার পর আবারও তাই বললেন। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়াল। বলল, আমি আছি হে আল্লাহ্র রাসূল। তখন রাসূলে করীম (স) বললেন, প্রথম দুইবারের ডাকে সাড়া দিতে তোমাকে কোন্ জিনিস নিষেধ করেছিল ? আমি শুধু এই শেষবারেই তোমার সাড়া পেলাম। ...... তোমাদের বংশের একজন লোক তার ঋণের জন্যে বন্দী হয়ে আছে। আমি তাকে দেখেছি, তুমি তার ঋণ শোধ করে দাও, যেন কোন লোক তার নিকট কিছু পাওনার দাবি করতে না পারে।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, সুলায়মান ইবনে দাউদ আল-সহরী, আন-নহদী, অহব, সাঈদ ইবনে আবূ আয়ূব, আবূ আবদুল্লাহ আল-কুরাশী, আবূ বুরদাতা ইবনে আবূ মূসা-আল-আশযারী তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ اَعْظَمَ الذُّنُوْبِ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ يَّلْقَاهُ عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِىْ نَهَاهُ اللّٰهُ عَنْهَا اَنْ يَمُوْتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً -

যেসব কবীরা গুনাহের কাজ করতে আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন, তা বাদে সবচেয়ে বড় গুনাহ্ যা নিয়ে বান্দা তার সাথে সাক্ষাৎ করবে, তা হল বান্দা ঋণ নিয়ে মরবে, অথচ ঋণ শোধের কোন ব্যবস্থা করে যাবে না।

এ দুটি হাদীস প্রমাণ করে যে, পাওনা দাবি করা ও ঋণীকে পাকড়াও করা থেকে অর্থ কষ্টে পড়া ঋণী ব্যক্তি রেহাই পাবে না। মরে গেলেও পাওনাদারের দাবি শেষ হবে না, যদি তার পাওনা দেয়ার ব্যবস্থা করে না যায়।

যদি বলা হয়, এ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি দারিদ্র্যাবস্থায় মরে যায়, তাহলে হয় সে তার ঋণ শোধে অক্ষম হবে তার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে, না হয় সে তা হবে না। যদি সে অক্ষম থেকে যায়, তাহলে তার এ অক্ষমতার কারণে সে আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য হবে, যেসব গুনাহ থেকে তওবা করেনি সেসব গুনাহের মতো। আর যদি অক্ষম না হয়ে থাকে, ঋণ শোধের

প্রতি উপেক্ষা না দেখিয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ্ সেজন্যে তাকে পাকড়াও করবেন না। কেননা আল্লাহ্ তো কাউকে পাকড়াও করেন তার গুনাহ হলে।

জবাবে বলা যাবে, এ কথা তার সম্পর্কে প্রযোজ্য, যে তার ঋণ শোধ করার ব্যাপারে উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে। পরে তার এ অপরাধের জন্যে সে তওবা করে নি। তওবা না করেই সে মরে গেছে দারিদ্র্যাবস্থায়। এ কারণে আল্লাহ্ তাকে পাকড়াও করবেন। যে লোক অন্যের নিকট ঋণী সে দরিদ্র হলে তার জন্যে এ হুকুম। কেননা সে তার অপরাধের জন্যে তওবা করেছে, তা আমরা জানি না। তাই দুনিয়াই তার নিকট পাওনার জন্যে অবশ্যই দাবি করতে হবে, যেমন সে পাকড়াও হবে আল্লাহ্র নিকটও।

যদি বলা হয়, একজন তার ঋণ শোধ করতে উপেক্ষা প্রদর্শন করে এবং তার এ অপরাধ সে পৌনপুনিকভাবে করে। আর একজন তার ঋণ শোধ করতে এলেই দায়িত্বহীনতা দেখায় না, কিংবা প্রথমে হয়ত দায়িত্বহীনতা দেখিয়েছে, পরে সে তার এ অপরাধ থেকে তওবা করেছে, এ দুইজনের মধ্যে পার্থক্য করা বাঞ্ছনীয়। তাই যে উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে, তওবা করেনি, তাকে পাকড়াও করা জরুরী মনে করবে। কিন্তু যে লোক উপেক্ষা প্রদর্শন করেনি অথবা শুরুতে করেছিল, পরে তওবা করেছে, তার জন্যে তা জরুরী মনে করবে না।

জবাবে বলা যাবে, তার গুনাহ থেকে তার তওবা করার নিগূঢ় তত্ত্ব যদি আমরা জানতে পারি কিংবা জানতে পারি যে, সে ঋণ শোধে উপেক্ষা প্রদর্শনকারী ছিল না, তাহলে তার বিষয় ও যার উপেক্ষা প্রকাশমান, পাকড়াও করার ব্যাপারে এ দুজনের মধ্যে আমরা অবশ্যই পার্থক্য করব। যেমন আল্লাহ্র নিকট ও-দুজন সংক্রান্ত হুকুম ভিন্ন ভিন্ন হবে। কিন্তু সে প্রকৃতপক্ষে উপেক্ষা প্রদর্শনকারী নয়, তা তো আমরা জানি না। কেননা হতে পারে, তার হাতে লুকিয়ে রাখা অনেক সম্পদ রয়েছে। অথচ সে বাহ্যত স্বীয় অর্থ কষ্টই দেখিয়েছে। তেমনিভাবে যে লোক তার দারিদ্র্য প্রকাশ করার সাথে সাথে তার উপেক্ষা-অক্ষমতার গুনাহ থেকে তওবা করার কথাও প্রকাশ করেছে। হতে পার, সে প্রকৃতপক্ষে সচ্ছল ব্যক্তি, তার ঋণ সে সহজেই আদায় করে দিতে পারে, সে যা প্রকাশ করেছে, প্রকৃতপক্ষে সে তা নাও তো হতে পারে। এ রকম যখন হবে, তখন ঋণীকে পাকড়াও করা ও তার নিকট পাওনা দাবি করা অবশ্যই চলতে থাকবে। যেমন তার মৃত্যুর পর-ও তাকে আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। আবূ কাতাদাতা বর্ণিত হাদীসটিও তা-ই প্রমাণ করে। সেটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, মুহাম্মাদ ইবনুল মুতাওয়াক্কিল, আল-আসকালানী, আবদুর রাযযাক, মামার, জুহরী, আবূ সালমাতা, জাবির সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ঋণ রেখে মরে যেত, রাসূলে করীম (স) তার জানাযা পড়াতেন না। একবার এক মাইয়্যেত নিয়ে আসা হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এই লোকটির উপর কোন ঋণ চাপানো আছে? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। দুই দীনারের ঋণ আছে। বললেন, তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযা পড়। তখন আবূ কাতাদাতা আল-আনসারী বললেন, সে দুই দীনারের ঋণ শোধ করার দায়িত্ব আমার উপর থাকল হে রাসূল! তখন রাসূলে করীম (স) তার জানাযা পড়লেন। পরে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বিজয় দান করলেন, তখন তিনি রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে ঘোষণা করলেন ঃ

أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ -

আমি প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির জন্যে তার নিজের চাইতে অনেক বেশি অধিকারী।

বোঝা গেল, মরার পর-ও ঋণের দাবি বহাল না থাকলে— যখন সে ঋণী দারিদ্র্যাবস্থায় মরে যায়, তখন সে হয়ত নামায কামাই দেয়ার গুনাহ্ নিয়ে যায় না; কিন্তু সে এমন হয় যে, যেন তার উপর কোন ঋণ চাপানো নেই।

এতে দলীল রয়েছে এ কথার, যে ঋণী ব্যক্তির অর্থ সংকট বা দারিদ্র্য তাকে পাকড়াও করা ও তার নিকট পাওনা দাবি করা থেকে নিষ্কৃতি দেয় না।

ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল, মুহাজির আবদুল মালিক ইবনে উমাইর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কোন লোক যদি হযরত আলী (রা)-এর নিকট তার পাওনাদারকে নিয়ে আসত, বলতেন, তোমার যে পাওনা তাকে আটক করেছে তার প্রমাণ পেশ কর। সে যদি বলত, তা হলে এখন আমি তাকে পাকড়াও করছি, তা হলে বলতেন, তাকে পাকড়াও করা থেকে তোমাকে কোন্ জিনিস বিরত রেখেছে?

তবে জুহরী ও লায়স ইবনে সাদের কথা সে দুজনের শাস্তি চালু করা ও তার প্রাপ্য মজুরি থেকে ঋণ আদায় করে নেয়ার প্রসঙ্গে— আয়াতের পরিপন্থী কাজ। রাসূলে করীম (স) থেকে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তারও বিরোধী। কুরআনের আয়াত হচ্ছে ঃ

وَإِنْ كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ -

যদি ঋণী ব্যক্তি অর্থকষ্টে নিপতিত হয়, তা হলে তা সচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবসর দিতে হবে।

এতে একথা বলা হয়নি যে, তার উপর যা প্রাপ্য আছে সে জন্যে তাকে মজুর বানিয়ে মজুরি দিতে হবে। এ ছাড়া নবী করীম (স) থেকে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাতেও তাকে মজুর খাটিয়ে তার মজুরি থেকে পাওনা আদায় করার কথা বলা হয়নি। তাতে বরং তাকে ছেড়ে দেয়ার কথাই আছে। আবূ সাঈদুল খুদরী বর্ণিত হাদীসের কথা ঃ 'তোমাদের জন্যে তা বাদে আর কিছু নেই' যা পাওয়া গেছে তার অধিক যখন পাওয়া যাবে না, সেই সময়ের প্রসঙ্গের কথা।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ -

আর তোমরা সাদকা করবে। তা তোমাদের জন্যে অতীব কল্যাণকর, যদি তোমরা জান।

অর্থাৎ ঋণগ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তিকে সাদকা করা তাকে ঋণ আদায়ের জন্যে সময় দেয়া অপেক্ষা অনেক উত্তম। এ কথা প্রমাণ করে যে, সাদকা 'করয' দেয়া অপেক্ষা ভালো। কেননা 'করয' হল কাউকে মাল দেয়া ও বিলম্বে তা ফেরত পাওয়ার আশা করা। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, দুই বার 'করয' দেয়া একবারের সাদকা দানের সমান। আল-কামা আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلسَّلَفُ يَجْرِىْ مَجْرَى شَطْرِ الصَّدَقَةِ -

ধারে দেয়া সাদকার ধারায় চলমান হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। ইবরাহীম ও কাতাদাতা বলেছেন, 'এবং তোমরা সাদকা করবে তা তোমাদের জন্যে অতীব কল্যাণময়' আয়াতের তাৎপর্য হল মূলধন। আল্লাহ্ ঋণ থেকে মুক্তকরণকে সাদকা নাম দিয়েছেন, বাহ্যত মনে হয়, তা যাকাত থেকে দেয়া জায়েয। কেননা যাকাতকে সাদকা নাম দেয়া হয়েছে। তা যেহেতু অর্থকষ্টে পড়া ঋণী ব্যক্তি সম্পর্কে কথা। আমরা উন্মুক্ত চোখে দেখলে বুঝব, যেসব মালে যাকাত ফরয হয়, সেসব মালের যাকাত থেকে তা দেয়া জায়েয। তা মূল জিনিস হিসেবে দেয়া এবং ঋণ শোধ করে দেয়া দুটিই চলে, তবে হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, যাকে ঋণমুক্ত করা হবে তার জন্যে দেয়া যাকাত প্রত্যাহৃত হবে, অন্যটা নয়। কেননা ঋণ একটি হক্— পাওনা। ঠিক যেটি নিয়েছে, সেটিই ফিরিয়ে দেয়া নয়। লোকদের হক-হকুক যাকাতের ধারায় চলে না। যেমন ঘরের অধিবাস, দাসের খিদমত প্রভৃতি। আর সেটিকেই সাদকা নামকরণ তা যাকাত থেকে আদায় করা জরুরী করে দেয় না সর্বাবস্থায়। আল্লাহ্ কিসাস মুক্তিরও নাম দিয়েছেন সাদকা। বলেছেন ঃ

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ .. فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ -

এবং তাদের উপর এক্ষেত্রে ফরয করে দিলাম জানের বদলে জান .... হ্যাঁ, যে লোক এটাকে সাদকা করে দেবে (কিসাসমুক্ত করে দেবে), তাহলে তা তার জন্যে কাফফারা হবে।
(সূরা মায়িদা ঃ ৪৫)

এর অর্থ, কিসাস মাফ করে দেয়া। কিসাস মাফ করে দেয়া কাফফারার মতই কাজ, এ ব্যাপারে মনীষীদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য আছে বলে আমরা জানি না। ইউসূফ (আ)-এর ভাইদের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا -

এবং আমরা সামান্য পণ্যদ্রব্য নিয়ে এসেছি। অতএব আমাদের জন্যে পাত্র পূর্ণ করে দিন এবং আমাদের প্রতি সাদকা করুন। (সূরা ইউসূফ ঃ ৮৮)

তারা তাঁর নিকট এ দাবি জানায় নি যে, তাঁর নিজের মাল থেকে তাদেরকে সাদকা দিক। তারা বলেছিল, তাদের নিকট বিক্রয় করুন এবং তাদের জন্যে মাপতে নিষেধ না করুন। কেননা শুরুতে তাদেরকে দিতে নিষেধ করা হয়েছিল। তারা এ-ও বলেছিল যে, আমাদের জন্যে পাত্র পূর্ণ করে দিন। তা-ই তারা চেয়েছিল, যা তারা তাদের সামান্য জিনিস দ্বারা ক্রয় করেছিল। এর উপর যখন 'সাদকা' শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারছে, তখন যাকাত বোঝাবার জন্যেও এ শব্দটির ব্যবহার হতে পারে। কিন্তু 'সাদকা' ঋণের জন্যে ব্যবহৃত হওয়ার ইল্লাত হতে পারে না তা যাকাত বোঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হওয়ার।

## পারস্পরিক লেনদেনের চুক্তি

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ -

হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন পারস্পরিক লেন-দেনের কোন নির্দিষ্ট মিয়াদের জন্যে চুক্তি করবে, তখন তোমরা তা লিপিবদ্ধ করবে।

আবূ বকর বলেছেন, কিছু লোক এ মত গ্রহণ করেছেন যে, মিয়াদ ভিত্তিক লেনদেনের চুক্তি লিপিবদ্ধ করা এবং তার জন্যে সাক্ষী রাখা ফরয। তা আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমরা লিখ' এ আদেশ দ্বারা প্রমাণিত। সেই সাথে এ কথাও ঃ

فَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ -

আর তোমরা দুজন সাক্ষী বানাও তোমাদের পুরুষদের থেকে।

পরে এ ফরযটা মনসূখ হয়ে গেছে আল্লাহ্র এ কথার দ্বারা ঃ

فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهُ -

তোমাদের পরস্পর যদি পরস্পরকে বিশ্বাস করে, তাহলে যার কাছে যে আমানতটা আছে তা যেন সে ফিরিয়ে দেয়।

এ কথা আবূ সাঈদুল খুদরী, শবী ও আল-হাসান থেকে বর্ণিত। অন্যান্যরা বলেছেন, না, প্রথমোক্ত আয়াতটি মুহকাম— দৃঢ় ও মনসূখ হয়ে যায়নি।

আমিমুল আহওয়াল ও দাউদ ইবনে আবূ হিন্দু ইকরামা থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ

لَاوَاللّٰهِ اِنَّ اٰيَةَ الدَّيْنِ مُحْكَمَةٌ وَمَا فِيْهَا نُسْخٌ -

না, আল্লাহ্র কসম! ঋণ সংক্রান্ত আয়াতটি মুহকাম, দৃঢ, স্থায়ী। তাতে মনসূখ হওয়ার কিছু নেই।

শুবা ফরাস-শ'বী আবূ বুরদাতা, আবূ মূসা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ

ثَلٰثَةٌ يَدْعُوْنَ اللّٰهَ فَلَا يَسْتَجِيْبُ لَهُمْ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا وَرَجُلٌ اَعْطٰى مَالَهُ سَفِيْهًا وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى - وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ - وَرَجُلٌ لَهُ عَلٰى رَجُلٍ دَيْنٌ وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ بِهِ -

তিন লোক আল্লাহ্কে ডাকে, কিন্তু কোন জবাব পায় না। এক ব্যক্তি, যার চরিত্রহীন স্ত্রী রয়েছে কিন্তু তাকে সে তালাক দেয়নি। দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি, যে তার মাল নির্বোধ ব্যক্তিকে দিয়েছে, অথচ আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'তোমরা নির্বোধ লোকদেরকে তোমাদের মাল দিও না।'

আর তৃতীয় সেই ব্যক্তি, যার অপর কাউকে দেয়া ঋণ আছে; কিন্তু তাতে কাউকে সাক্ষী বানায়নি।

আবূ বকর বলেছেন, উপরোক্ত হাদীসটি নবী করীম (স)-এর কথা হিসেবে 'মরফূ' বর্ণিত হয়েছে। জুয়ায়বির দহাক থেকে বর্ণনা করেছেন, যদি তার হক যায়, তাহলে সওয়াব-কর্মফল পাবে না, যদি তাঁকে ডাকে, জবাব পাবে না। কেননা সে নিজে আল্লাহ্‌র হক নষ্ট করেছে, আদায় করেনি, আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করেছে।

সাঈদ ইবনে যুবায়র বলেছেন; 'তোমরা যখন পারস্পরিক বেচা-কেনা কর, তখন তার সাক্ষী রাখ'— এর অর্থ, তোমাদের হক-হকুকে যদি কোন মিয়াদ থাকে, তাহলে তাতে সাক্ষী বানাও। মিয়াদ না থাকলেও সর্বাবস্থায়ই তোমার হক-এর উপর সাক্ষী রাখ। ইবনে জুরাইয বলেছেন, যদি অর্ধ দিরহামের কেনা-বেচা করে, তাহলেও কি সাক্ষী রাখতে হবে, আতাকে এ প্রশ্ন করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ, এই সবই হচ্ছে আল্লাহ্‌র 'তোমরা পারস্পরিক বেচা-কেনা করলে সাক্ষী রাখ' এ কথাটির ব্যাখ্যা।

মুগীরা ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, সাক্ষী রাখতে হবে সবজির পাতায় হলেও। আল-হাসান ও শবী থেকে বর্ণিত, ইচ্ছা হয় সাক্ষী রাখবে, না হয় রাখবে না। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ 'যদি তোমাদের কতক লোক অপর কতক লোককে বিশ্বাস করে।' অর্থাৎ পারস্পরিক বিশ্বাস থাকলে সাক্ষী না রাখলেও চলবে। লায়স মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবনে উমর (রা) যখন কিছু বিক্রয় করতেন, তার উপর সাক্ষী বানাতেন কিন্তু লিখতেন না। বোঝা যায়, তিনি লেখার আদেশকে মুস্তাহাব মনে করতেন। কেননা তা লেখা ওয়াজিব বা ফরয হলে সাক্ষী রাখার সাথে সাথে লেখার কাজও করতেন। কেননা আয়াতে এ দুটির হুকুম এক সাথেই দেয়া হয়েছে।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্‌র কথা, 'তাহলে লিখ.... তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুজনকে সাক্ষী বানাও' পর্যন্ত এবং 'তোমরা সাক্ষী রাখ যখন পরস্পরে বেচা-কেনা কর' এ থেকে মিয়াদ ভিত্তিক ঋণে সাক্ষী রাখা ও লেখা দুটিই হয় ফরয হবে আয়াত নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। আর এ হুকুমটি স্থায়ী ও প্রমাণিত ছিল। পরে তা আর ওয়াজিব ফরয থাকেনি 'যদি তোমরা কতক অপর কতককে বিশ্বাস কর' কথাটির দরুন। অথবা এ সবই এক সঙ্গে নাযিল হয়েছে। যদি তাই হয়, তাহলে লেখা ও সাক্ষী রাখা দুটিই ওয়াজিব ফরয হবে না। কেননা তাতে মনসূখ ও মনসূখকারীর একত্রে নাযিল হওয়া মানতে হয় একই আয়াতের মধ্যে। কেননা কোন হুকুম স্থিতি ও প্রতিষ্ঠা লাভের আগে তা মনসূখ হতে পারে না। কিন্তু এ দুটি হুকুমের এক সঙ্গে নাযিল হওয়ার তারিখ আমাদের নিকট প্রমাণিত হয়নি। তাই মানতে হবে যে, দুটি হুকুমই এক সাথে নাযিল হয়েছে। তাহলে লেখার ও সাক্ষী রাখার হুকুম পরস্পর মিলিত হয়ে নাযিল হয়েছে মানতে হবে। তাহলে এ থেকে প্রমাণিত হল যে, লেখার ও সাক্ষী রাখার আদেশ মুস্তাহাব, ওয়াজিব বা ফরয নয়। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা এসেছে, তিনি বলেছেন, ঋণ সংক্রান্ত আয়াত 'মুহকাম'— মনসূখ হয়নি, তা প্রমাণিত হয় না। কেননা তিনি সাক্ষী বানানোকে ওয়াজিব মনে করেছেন। তিনি হয়ত মনে করেছেন যে, সব কয়টি আদেশই একসাথে নাযিল হয়েছে। তাহলে আয়াতের ধারাবাহিকতায় সাক্ষী রাখার আদেশটা মুস্তাহাব

হয়। কেননা আল্লাহ্‌র এ কথাও তো রয়েছে 'যদি তোমাদের কতক অপর কতককে বিশ্বাস করে।' ইবনে উমর (রা) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, তিনি সাক্ষী বানাতেন। ইবরাহীম ও আতা সামান্য বেচা-কেনারও সাক্ষী বানাতেন। আমাদের মতে তাঁরা সকলেই মাত্র মুস্তাহাব হিসেবেই এ কাজ করতেন। ওয়াজিব-ফরয হিসেবে নয়। আর আবূ মূসা থেকে যে বর্ণিত হয়েছে তিনজন লোক আল্লাহকে ডাকে, কিন্তু জবাব পায় না, তাদের একজন হল সে, 'যার অপর ব্যক্তিকে দেয়া ঋণ আছে, কিন্তু তার সাক্ষী রাখেনি' থেকেও প্রমাণিত হয় না যে, তিনি সাক্ষী রাখাকে ওয়াজিব-ফরয মনে করতেন। লক্ষণীয়, তিনি এর সাথে চরিত্রহীন স্ত্রীকে তালাক দেয়নি— এমন ব্যক্তির কথাও বলেছেন। আর এ কথা সুস্পষ্ট যে, চরিত্রহীন স্ত্রীকে তালাক দেয়া ওয়াজিব বা ফরয তো নয়। এ কথাটি মূলত তাঁর নিজের। তাঁর এ কথার তাৎপর্য এতটুকু যে, যে লোক এরূপ কাজ করে সে সতর্কতা অবলম্বন করেনি। আল্লাহ্‌ মুক্তি ও নিষ্কৃতির যে পথ বানিয়েছেন, সে সে পথে চলেনি। আর বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদদের মধ্যে এ নিয়ে কোন মতপার্থক্য নেই যে, লেখার, সাক্ষী রাখার ও রেহন রাখার আদেশ, যা এ আয়াতটিতে এক সঙ্গে উল্লিখিত— পালন করা মুস্তাহাব মাত্র। যে কাজে আমাদের স্বার্থ, কল্যাণ ও দ্বীন-দুনিয়ার সতর্কতা নিহিত, তা করার উপদেশ দেয়া হয়েছে এ আয়াতে। এর একটিও ঠিক ওয়াজিব বা ফরয নয়। মুসলিম উম্মাহ্‌ শুরু থেকে এ পর্যন্ত এ কথা মেনে এসেছে যে, পারস্পরিক লেনদেন— ঋণের চুক্তি, ক্রয়-বিক্রয় ও নিজ নিজ দেশে কেনা-বেচায় কোন সাক্ষী বানাবার সাধারণ কোন প্রচলন নেই। সেসব দেশের ফিকাহবিদগণ তা জানতেন। কিন্তু তাঁরা তার প্রতিবাদ করেন নি। সাক্ষী রাখা ওয়াজিব বা ফরয হলে তা না হওয়ার প্রতিবাদ না করে তাঁরা কিছুতেই চুপ থাকতে পারতে না।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা সকলে এ কয়টি কাজকে মুস্তাহাব মনে করতেন। তা স্বয়ং নবী করীম (স)-এর সময় থেকেই চলে এসেছে আমাদের এ কাল পর্যন্ত। সাহাবা ও তাবেয়ীন যদি তাঁদের বেচা-কেনায় সাক্ষী বানিয়ে থাকতেন, তাহলে তা নিশ্চয়ই সকলের জানা থাকত এবং ধারাবাহিকভাবে একাল পর্যন্ত চলে আসত। আর সাক্ষী না বানানোর প্রতিবাদ তাঁরা অবশ্যই করতেন। কিন্তু তাঁদের সাক্ষী বানানোর কথা ধারাবাহিকতার সাথে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেনি এবং তা না হওয়ার জন্যে তার প্রতিবাদ করার কথাও জানা যায়নি। তাই প্রমাণিত হলো যে, লেনদেন, ধার-করয ও বেচা-কেনায় সাক্ষী রাখা ও লেখা নিশ্চয়ই ওয়াজিব-ফরয নয়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'অতএব তোমরা তা লিখ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে সেই লোকদেরকে, যাদের উল্লেখ করা হয়েছে আয়াতের শুরুতে। শুরুতে 'হে ঈমানদার লোকেরা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এ আদেশ অবশ্য সেসব লোকের জন্যে, যারা পারস্পরিক লেনদেন— ঋণ দেয়া-নেয়া করে, সামষ্টিক অর্থনৈতিক চুক্তি করে।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্‌ تَدَايَنْ 'পারস্পরিক ঋণ দেয়া-নেয়া' বলার পর আবার دَيْن 'ঋণ' শব্দটির উল্লেখ করেছেন কেন ? تَدَايَنْ পারস্পরিক যা হয়, সেটাই তো دَيْن ঋণ ?

জবাবে বলা যাবে, কেননা আল্লাহ্‌র কথা تَدَايَنْ শব্দটির বহু কয়টি অর্থ রয়েছে। তার دِيْنْ উচ্চারণে তার অর্থ হতে পারে প্রতিফল। যেমন مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ 'প্রতিফল দানের দিন।'

তাই تَدَا يَنْتُمْ -এর অর্থ হতে পারে পারস্পরিক প্রতিফল দান। তাই دَيْن শব্দের উল্লেখ করে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়া হল যে, এখানে পারস্পরিক ঋণদান-গ্রহণ বোঝানো হয়েছে। এটা পারস্পরিক লেনদেনের ব্যাপার। আর মূল কথাটির ওপর তাগিদ বোঝাবার জন্যেও তার উল্লেখ হয়ে থাকতে পারে। মনের কোঠায় প্রকৃত অর্থটি বসিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যেও হতে পারে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

اِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَى اَجَلٍ مُّسَمًّى -

যখন তোমরা পারস্পরিক ঋণ দেয়া-নেয়া কারবার করবে নির্দিষ্ট একটা মিয়াদের ভিত্তিতে।

এতে সর্বপ্রকারের পারস্পরিক লেনদেন শামিল হয়েছে, যাতে কোন মিয়াদ নির্দিষ্ট করা সহীহ্ হয়। তাই বলে এ থেকে সর্বপ্রকারের লেনদেনেই একটা সময় নির্ধারণ জায়েয, একথা প্রমাণিত হয় না। কেননা আয়াতে সর্বপ্রকারের কারবারের সময় নির্ধারণ জায়েয হওয়ার বর্ণনা নেই। বরং তাতে ঋণ মিয়াদভিত্তিক হলেই তাতে সাক্ষী রাখার আদেশ রয়েছে। তবে ঋণ দানের ব্যাপারে সময় নির্ধারণ যে জায়েয, তা অপর এক দলীলের দ্বারা প্রমাণিত হয়। কোনটাতে তা জায়েয নয়, তা-ও কোন দলীলের দ্বারাই জানা যায়। ঋণের বদলে ঋণ মিয়াদ জায়েয হওয়ার কোন ফায়সালা উক্ত আয়াতে দেয়া হয়নি। ফলে সর্বপ্রকারের পারস্পরিক লেনদেন মিয়াদভিত্তিক হতে পারা প্রমাণিত হয় না। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ اَسْلَمْ فَلْيُسْلِمْ فِىْ كَيْلٍ مَّعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُوْمٍ اِلَى اَجَلٍ مَّعْلُوْمٍ -

যে লোক 'সালম' (অগ্রিম মূল্য গ্রহণ পণ্য সরবরাহ পরে) প্রক্রিয়ায় বিক্রয় ও ক্রয় করবে, তার উচিত নির্দিষ্ট মাপের সাথে। তার ওজন জানা ও মিয়াদ নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক।

সর্বপ্রকারের মাপের, ওজনের ও জানা মিয়াদের 'সালম' জায়েয হওয়ার কোন প্রমাণ তাতে নেই। তার মাপ ওজন জ্ঞাত, বর্গ, প্রজাতি বা প্রকার ও গুণের কথা অন্য দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত হওয়া বাঞ্ছণীয়। যখন প্রমাণিত হবে যে, এটা 'সাল্ম', তাহলে পরে প্রয়োজন হবে একটা নির্দিষ্ট ও জানা মিয়াদ পর্যন্তকার জন্যে 'সাল্ম' করা। উক্ত আয়াত থেকে যখন পারস্পরিক লেনদেনের চুক্তি জায়েয হওয়া প্রমাণিত হয়, কিন্তু তার এ সাধারণ ও ব্যাপক তাৎপর্যের দ্বারা সর্বপ্রকারের চুক্তি জায়েয হওয়ার দলীল হতে পারে না। কেননা আয়াতে সাক্ষী বানাবার আদেশ রয়েছে, যদি পারস্পরিক লেনদেন সহীহ্ হয়, তবেই তা কার্যকর হবে। অনুরূপভাবে সর্বপ্রকারের লেনদেনে মিয়াদের শর্ত আরোপ করা জায়েয হওয়ারও কোন প্রমাণ নেই। যখন ঋণ ও তাতে মিয়াদ নির্ধারণ সহীহ্ হবে, তখনই সাক্ষী বানাবার আদেশ কার্যকর করার সময় উপস্থিত হবে।

কেউ কেউ 'করয' কাজে মিয়াদ নির্ধারণ জায়েয হওয়ার দলীল রূপে এ আয়াতকে পেশ করেছেন। কেননা 'করয' ও অন্যান্য সমস্ত লেনদেনের চুক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। অথচ আমরা জেনে গেছি যে, 'করয' যার নাম, তা আমাদের মতে সে রকম নয়, যেমন বলা হয়েছে। কেননা সর্বপ্রকারের ঋণ জায়েয হওয়ার যেমন তাতে কোন দলীল নেই, তেমনি সর্বপ্রকারের ঋণে সময় নির্ধারণ জায়েয হওয়ারও কোন প্রমাণ নেই। কেবলমাত্র সেরূপ ঋণের উপর সাক্ষী বানাবার আদেশ হয়েছে, যাতে সময় নির্ধারণ প্রমাণিত হয়েছে। কেননা সব ঋণ

প্রমাণিত নয়, তাতে সাক্ষী বানাবার কথা বলা হয়েছে— একথা মনে করা কঠিন। তাই তার তাৎপর্য এই হতে হবে যে, তোমরা যখন এমন ঋণের লেনদেনের চুক্তি করবে, যাতে সময় নির্ধারণ জায়েয, তখন তোমরা তা অবশ্যই লিখবে। তাই 'করয' মাত্রেই সময় নির্ধারণ জায়েয প্রমাণের জন্যে এ আয়াতকে যে লোক দলীল বানাবে, সে যথার্থভাবে প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেনি। 'করয' পারস্পরিক লেনদেনের চুক্তি নয়। 'তোমরা যখন কোন ঋণের পারস্পরিক চুক্তি করবে' 'করয' এ কথাটির আওতায় পড়ে না। কেননা কেবল চুক্তি হলেও 'করয' না হলে ঋণ হয় না। অতএব 'করয' তার আওতার বাইরে গণ্য হওয়া আবশ্যক।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা যখন নির্দিষ্ট মিয়াদের ভিত্তিতে ঋণের পারস্পরিক চুক্তি করবে' সর্বপ্রকারের সময়ভিত্তিক ঋণকে শামিল করে। তার বদলটা আসল সে জিনিস হোক; কিংবা হোক ঋণ, তা অভিন্ন। তাই যদি কেউ কোন ঘর বা দাস ক্রয় করে হাজার দিরহামে নির্দিষ্ট একটা মিয়াদে মূল্য দেয়ার শর্তে, তাহলে আয়াতের দাবি অনুযায়ী লেখা ও সাক্ষী রাখার আদেশ তখন পালন করতে হবে। অথচ আয়াতটি প্রমাণ করেছে যে, তা শুধু মিয়াদী ঋণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ— দুইটির যে কোন একটির বদলে, দুটিতেই এক সাথে নয়। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ যখন তোমরা পারস্পরিক কোন ঋণের চুক্তি করবে নির্দিষ্ট কোন মিয়াদ পর্যন্তকার জন্যে। আয়াতে দুইটি ঋণের কথা বলা হয়নি। তাতে দুইটির মাত্র একটি বদলে মিয়াদ প্রমাণ করা হয়েছে। তাই একসাথে দুটি বদলেই মিয়াদ নির্ধারণ জায়েয নয়। অথচ নবী করীম (স) ঋণের বদলেই ঋণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। যদি দুইটি ঋণে চুক্তি হয়, তাহলে তা জায়েয 'সাল্ম'-এ। কিন্তু তা সীমাবদ্ধ হবে একটি মজলিসে। আয়াত থেকে 'সাল্ম' বোঝাও নিষিদ্ধ নয়। কেননা দুই বদলের একটিতে মিয়াদ নির্ধারণ তো 'সাল্ম' প্রক্রিয়ার কাজে হয়। অথচ আল্লাহ্ আদেশ করেছেন সাক্ষী রাখার জন্যে এমন পারস্পরিক লেনদেনের চুক্তিতে, যা কেবল মিয়াদভিত্তিক ঋণেই হতে পারে। কাতাদাতা আবূ হিশাম ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মিয়াদভিত্তিক সাল্ম-এর কথাই আল্লাহ্‌র কিতাবে বলা হয়েছে। আর আল্লাহ্‌র কিতাবের দীর্ঘতম আয়াতে তা-ই নাযিল করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) জানিয়ে দিলেন যে, মিয়াদভিত্তিক 'সাল্ম' আয়াতের সাধারণ তাৎপর্যের অধীন শামিল রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, যে কোন মিয়াদী ঋণ প্রমাণিত, তার কথাই উক্ত আয়াতে বক্তব্য। তা মুনাফা বদল পর্যায়ের হোক, কিংবা মূল বস্তুর বদল পর্যায়ের। যেমন ইজারা চুক্তির মিয়াদী মজুরি দান, আর 'মহরে মুয়াজ্জাল।' খুলা, তালাক, ইচ্ছামূলক হত্যার সুলাহ্ও মিয়াদভিত্তিক দাস-মুক্তির চুক্তি লেখন। কেননা এগুলো মিয়াদী ঋণ বিশেষ, পারস্পরিক লেনদেনের চুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আমরা আগেই বলেছি, আয়াতটির প্রবণতা হচ্ছে, এই হুকুমটি কার্যকর হবে দুই বদলের কোন একটিতে যদি তা মিয়াদভিত্তিক হয়। এক সাথে দুটির মধ্যে নয়। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى -

যখন তোমরা পারস্পরিক লেনদেনের চুক্তি করবে কোন মিয়াদ পর্যন্তকার জন্যে।

অতএব সর্বপ্রকারের চুক্তিই এ আয়াতের মধ্যে শামিল। তা সেই চুক্তি, যার দ্বারা কোন মিয়াদী ঋণ প্রতিষ্ঠিত। সে ঋণে মুনাফার বদল হবে কিংবা মূল জিনিসের বদল— তার মধ্যে

কোন পার্থক্য নেই। তাহলে লেখা ও সাক্ষী বানানো সবই মুস্তাহাব পর্যায়ের হবে, তদ্দ্বারা এসব চুক্তির কথাই বলা উদ্দেশ্য। আর সাক্ষীর সংখ্যা ও সাক্ষ্যের গুণ পরিচিতি সে সবগুলোতেই গণ্য হবে। কেননা ব্যবহৃত শব্দে কিছুকে অপর কিছু থেকে বিশেষীকরণ করা হয়নি। তাই বিয়েতে একজন পুরুষ ও দুইজন মেয়েলোকের সাক্ষ্য যথেষ্ট হবে, যদি মহরানা মিয়াদী ঋণ পর্যায়ের হয়। আর খুলা তালাক, ইজারা ও ইচ্ছামূলক হত্যার সুলাহ্‌ এবং এ পর্যায়ের আর যা যা হয়, তাতেও। কোন কোন মিয়াদী ঋণে এসব বিধানকে সীমাবদ্ধ রাখা ও অন্যগুলোকে বাদ দেয়া জায়েয হবে না। কেননা আয়াত তো সবকিছুকেই শামিল করে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى অর্থাৎ নির্দিষ্ট ও জানা মিয়াদ পর্যন্তকার জন্যে চুক্তি হবে। আগের কালের ফিকাহবিদদের এক বিরাট সংখ্যকের এই মত। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ 'মূল্য নগদ ও পণ্য বাকীর (সাল্‌ম) কারবার যে-ই করবে, তার তা করা উচিত জানা মাপ, জানা ওজন ও জানা মিয়াদ পর্যন্তকার জন্যে।' আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ -

আর তোমাদের মধ্যকার এ চুক্তিনামা একজন লেখক পূর্ণ ন্যায়পরতা ও পক্ষপাতহীনতা সহকারে লিখবে।

যে ব্যক্তি লোকদের পারস্পরিক লেনদেনের দলীল-দস্তাবেজ লেখার দায়িত্ব গ্রহণ করবে, এটা তারই জন্যে নির্দেশ। সে তা পারস্পরিক পূর্ণ ইনসাফের ভিত্তিতে লিখবে। লেখাটা চূড়ান্ত না হলেও যখন তা লেখা হবে, তখন তা অবশ্যই পূর্ণমাত্রায় ইনসাফ ও সততা-ন্যায়পরতা সহকারে লিখতে হবে। এটাই তার একমাত্র পথ। তাকে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। প্রাসঙ্গিক বিষয়াদির পূর্ণ নিশ্চয়তা ও দৃঢ়তা অর্জন করতে হবে। যে উদ্দেশ্যে এ দলীল লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে, তার হক আদায় করতে হবে। তার শর্তসমূহ যথার্থ ও বৈধ হতে হবে। তা সব শরীয়াত সম্মতভাবে হতে হবে। বিভিন্ন অর্থ সম্পন্ন শব্দ ব্যবহার এড়িয়ে যেতে হবে। সুস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করতে হবে। যে সব শব্দের দরুন কোন-না কোন সংশয়ের সৃষ্টি হতে পারে তা বাদ দিতে হবে। ফিকাহবিদদের পারস্পরিক মতপার্থক্যকে অতিক্রম করতে হবে। যেন ঋণ চুক্তিকারী পক্ষদ্বয় একটি স্পষ্ট ও দৃঢ়-নির্ভরযোগ্য দলীল পেয়ে যেতে পারে। আয়াতে যেসব সতর্কতা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে, তা পুরামাত্রায় অবলম্বন করতে হবে। এ কারণে লেখার আদেশ করার পর-পরই আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ -

কোন লেখক তা আল্লাহ্‌র দেয়া জ্ঞান অনুযায়ী লিখতে অস্বীকার করবে না।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ সহীহ্‌ চুক্তির যেসব নিয়ম-বিধান ও জায়েয প্রতিষ্ঠিত পারস্পরিক লেন-দেনের পদ্ধতি জানিয়ে দিয়েছেন, সেই অনুযায়ী দস্তাবেজ লিখতে হবে। যার ফলে ঋণ চুক্তির প্রত্যেকটি পক্ষ সহীহ্‌ ঋণ-চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে, কেননা লেখক নিজেই যদি এসব নিয়ম-নীতি ও আইন-বিধান না জানে, তা হলে সে এমন দলীল লিখে ফেলতে পারে, যাতে পক্ষদ্বয়ের নির্দোষ উদ্দেশ্যই বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাদের পারস্পরিকভাবে করা চুক্তিই বরবাদ হয়ে যেতে পারে। দলীল লিখিতভাবে তৈরী করা যদিও মুস্তাহাব, তবু তা যদি লেখা-ই হয়, তাহলে তা

যেন পূর্ণ সতর্কতা সহকারে লেখা হয়। এসব শর্তের ভিত্তিতেই তা হতে হবে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ -

তোমরা যখন নামাযের জন্যে প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত তোমাদের হাতসমূহ ধৌত করবে। (সূরা মায়িদা ঃ ৬)

এ আয়াতে ফরয ও নফল— সর্ব প্রকারের নামাযই শামিল রয়েছে। আর একথা তো জানাই আছে যে, যে নামায নফল, তা ওয়াজিব বা ফরয নয়। কিন্তু যখন তার নিয়ত করা হবে, তখন যদি সে অযূ সহ না হয়, তাহলে তাকে তাহারাতের সর্ব শর্তই পূর্ণ করতে হবে। অদায় করতে হবে তার সব রুকন। আর নবী করীম (স) যেমন বলেছেন ঃ 'সাল্‌ম' ক্রয়-বিক্রয় করলে তা জানা মাপে, জানা ওজনে ও জানা মিয়াদের ভিত্তিতে করতে হবে।' 'সাল্‌ম' করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু সে কাজ করার ইচ্ছা ও সংকল্প করা হলে তাকে সংশ্লিষ্ট শর্তসমূহ পুরামাত্রায় আদায় সহকারে করতে হবে। ঋণ চুক্তি ও তাতে সাক্ষী বানানো ওয়াজিব ফরয কাজ নয়। কিন্তু তা যখন শেষ হবে, তখন তা অবশ্যই আল্লাহ্‌র নির্দেশ মত লিখতে হবে। তার সঠিকতার জন্যে জরুরী যাবতীয় শর্ত পুরামাত্রায় লিখতে হবে, যেন তা লেখার মূল লক্ষ্যটা অর্জিত হয়।

লেখকের লেখার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে আগের কালের ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে। শবী বলেছেন, তা ওয়াজিব-কিফায়া বা ফরয-কিফায়া। যেমন জিহাদ প্রভৃতি। সুদ্দী বলেছেন, লেখকের তা লেখা কর্তব্য বটে, তবে যদি তার অবসর থাকে। আতা ও মুজাহিদ বলেছেন, লেখা তার জন্যে ওয়াজিব। দহাক বলেছেন, লেখার এ আদেশকে মনসূখ করে দিয়েছে আল্লাহ্‌র এ কথা ঃ

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ -

তবে লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না।

আবূ বকর বলেছেন, আমরা আগেই বলেছি যে, লেখাটা মৌলিকভাবে ঋণ লেনদেনের পক্ষদ্বয়ের জন্যেই ওয়াজিব বা ফরয নয়। তাহলে একজন সম্পর্কহীন ব্যক্তির জন্যে তা লিখে দেয়া কি করে ওয়াজিব বা ফরয হতে পারে, যার এ চুক্তির সাথে কোন সম্পর্কই নেই। তার কোন কারণ তার সাথে সম্পর্কিত নয়। তবে যারা তা ওয়াজিব বা ফরয মনে করেন, তাঁরা হয়ত এ ধারণা নিয়েছেন যে, তা আসলে ফরয। তেমনি যে লোক তা সুন্দরভাবে লিখতে পারে, তার জন্যে কর্তব্য এই যে, যার জন্যে তা লেখা ফরয, সে তার সাহায্যের জন্যে লেখার কাজটা করে দেবে। কিন্তু আমাদের মতে মূলতই লিখিত দলীল তৈরী করা ফরয নয়। তবে ঋণ চুক্তির পক্ষদ্বয় যদি একটা নকল করতে ইচ্ছা করে— মজবুত দলীল তৈরী করার সংকল্প গ্রহণ করে থাকে, আর তারা দুজন সে বিষয়ে জ্ঞানী ও পারদর্শী না হয়ে থাকে, তাহলে যার এ বিষয়ে জ্ঞান ও পারদর্শিতা আছে তার কর্তব্য হল সে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি পক্ষদ্বয়কে ব্যাখ্যা করে বোঝাবে। কিন্তু দলীল লিখে দেয়া তার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। তবে বিষয়টি বুঝিয়ে দেয়া তার কর্তব্য, যেন তারা দুজন তা লিখে দলীল তৈরী করতে পারে কিংবা সে নিজেই তাদের দুজনের জন্যে দলীলটা মজুরি নিয়ে হোক বা সেবামূলক কাজ হিসেবে লিখে দেবে। অথবা অন্য যে লোক

লিখতে পারে, তার দ্বারা লিখিয়ে দেবে। যেমন কোন লোক যদি নফল রোযা রাখার বা নফল নামায পড়ার সংকল্প করে, কিন্তু সে তার নিয়মাদি জানে না, তখন যে তা জানে তার কর্তব্য হয়, তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করবে, যদিও এ রোযা বা নামায ফরয নয়। আলিমগণের তো নফল মুস্তাহাব কাজের জ্ঞান দান কর্তব্য, বিশেষভাবে সে বিষয়ে যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহলে। যেমন ফরায়েয সম্পর্কিত জ্ঞান। নবী করীম (স) নিজে নফল ও মুস্তাহব কাজেরও শিক্ষা দিতেন। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ -

হে রাসূল! তোমার প্রতি তোমার রব্ব-এর নিকট থেকে যা-ই নাযিল হয়েছে, তার তাবলীগ কর— লোকদের নিকট পৌঁছিয়ে দাও। (সূরা মায়িদা ঃ ৬৭)

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ -

যেন তুমি প্রকাশ ও ব্যাখ্যা করে দাও, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে।

(সূরা নহল ঃ ৪৪)

আর আল্লাহ্ তার রাসূলের প্রতি যেসব বিধান নাযিল করেছেন, নফল মুস্তাহাব কাজের বিধানও তাতে রয়েছে এবং তা তাঁর উম্মতের নিকট বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়া তাঁর কর্তব্য ছিল। মুসলিম উম্মাহ তার নবীর নিকট থেকে নফল মুস্তাহাব কাজের চিরন্তন ধারাবাহিকতার সাথে বর্ণনা করে ও প্রচার করে এসেছে, যেমন ফরয কাজসমূহের বিবরণও নিয়ে চলেছে। প্রকৃত ব্যাপার যখন এই, তখন ফরয, নফল বা মুস্তাহাব সম্পর্কে যার যতটা জানা আছে তা জানিয়ে দেয়া। সে বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা হলে প্রশ্নকারীকে সব কথা বুঝিয়ে দেয়া একান্তই কর্তব্য। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاِذَا خَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ -

স্মরণ কর, আল্লাহ্ যখন কিতাব প্রাপ্ত লোকদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন যে, তার কথা তারা লোকদের নিকট সবিস্তারে বর্ণনা করবে এবং তোমরা তা গোপন করে রাখবে না। কিন্তু পরে তারা সে অংশীদারকে তাদের পেছনের দিকে নিক্ষেপ করেছিল।

(সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৮৭)

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ -

যে লোক কোন ইলমের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে, পরে সে যদি তা গোপন রাখে, তাহলে কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেয়া হবে।

এভাবে দলীল-দস্তাবেজ সম্পর্কে যার জ্ঞান আছে এবং তার শর্তাবলীও জানা আছে, তার কর্তব্য হল তা জানিয়ে দেয়া তাকে, যার তা জানা দরকার এবং যতটা দরকার। অনুরূপভাবে দ্বীন ইসলাম ও শরীয়াত সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের প্রচার করা আলিমগণের কর্তব্য। এ একটা

ফরয— ফরযে কিফায়া, মানুষের কল্যাণের জন্যে তা পালিত হওয়া কর্তব্য, বাঞ্ছনীয়। এ কাজ কিছু লোক করলে অবশ্য অন্যদের দায়িত্ব মুক্তি সম্ভব হবে। তবে নিজ হাতে দলীল রচনা বা লেখার দায়িত্ব গ্রহণ করা কর্তব্য, এ বিষয়ে আমার কিছুই জানা নেই, কেউ তা কর্তব্য বলে, তা-ও আমার অজানা। তবে লেখা জানে— এমন কাউকে না পাওয়া গেলে তা লিখতে অস্বীকার করা তার উচিত নয় যে তা লিখতে জানে। তবে দলীল লেখা লেখকের উপর যদি ফরযই হতো, তাহলে লেখার জন্যে মজুরি গ্রহণ করা নিশ্চয়ই জায়েয হতো না। কেননা যা ফরয, তা করার জন্যে মজুরি গ্রহণ করা জায়েয হতে পারে না। অথচ ফিকাহবিদগণ লেখার মজুরি গ্রহণ জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোন মতভেদ করেন নি। তা থেকে বোঝা যায় যে, দলীল লেখাই আসলে ফরয নয়। ফরযে কিফায়াও নয়। না নির্দিষ্টভাবে তা ফরয। আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'লেখক— আল্লাহ তাকে যেরূপ জ্ঞান দিয়েছেন, সেরূপ লিখতে অস্বীকার করবে না' আল্লাহ্ যে ন্যায়পরতা সহকারে দলীল লিখতে বলেছেন, তার বিপরীতভাবে লিখতে তাকে নিষেধ করা হয়েছে। এ নিষেধটা অবশ্য পালনীয়, যদি শরীয়াতের বিধানের বিপরীত লেখা তৈরী করার ইচ্ছা করা হয়। যেমন বলা হয়, 'নফল নামায পড়বে না তাহারাত ব্যতিরেকে। 'লজ্জাস্থান আবৃত না করে নামায পড়বে না।' এর অর্থ, নফল নামায পড়ার আদেশ নয়। তা পড়তে নিষেধও করা হয়নি এ কথা দ্বারা। নিষেধ হচ্ছে যেভাবে তা করা উচিত তার বিপরীতভাবে করা। যেসব শর্তে নামায হয়, সেসব শর্ত পূর্ণ করে তা না করাই নিষিদ্ধ। আল্লাহ্‌র— 'এবং লেখক আল্লাহ্ যে জ্ঞান তাকে দিয়েছেন সে ভাবে লিখতে অস্বীকার করবে না, অতএব তা লেখবে'— কথাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ভাবে লেখা জায়েয তার বিপরীত লিখতে নিষেধ করা। কেননা লেখার কাজটা মূলতই ফরয নয়। তবু যদি লিখতেই হয়, তাহলে তা আল্লাহ্‌র শেখানো নিয়মে লিখতে হবে। যেমন কেউ যদি বলে ঃ 'তোমার নফল নামায পড়া উচিত তাহারাত ও লজ্জাস্থান আবৃত রাখা সহকারে।' এরূপ কথায় নফল নামায পড়তেও বলা হয়নি, না পড়তে নিষেধও করা হয়নি।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَالْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا –

এবং লেখবে সে যার উপর হক আরোপিত এবং অবশ্যই ভয় করবে আল্লাহ্‌কে যিনি তার রব্ব এবং তা থেকে একবিন্দু জিনিস কমাবে না।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে লোকই অন্য কারোর জন্যে কোন জিনিসের অঙ্গীকার করবে, সে ব্যাপারে তার কথাই অগ্রগণ্য হবে। কেননা بَخْسٌ শব্দের অর্থ, কম করা। আল্লাহ যখন কম করা ত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছেন, তখন তা থেকে বোঝা যায়, যদি কম করা হয়, তাহলে তার কথাই গ্রহণীয় হবে। আর তা আল্লাহ্‌র এ কথার মতই ঃ

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْٓ اَرْحَامِهِنَّ –

এবং তাদের রেহমে আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের জন্যে হালাল নয়।
(সূরা বাকারা ঃ ২২৮)

গোপন করার ব্যাপারে আল্লাহ যখন তাদেরকে উপদেশ দিলেন, বোঝা গেল যে, মূলত মিয়াদের কথাই সেখানে অগ্রাধিকার পাবে তাদের কথায়। আর যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ اٰثِمٌ قَلْبُهُ -

এবং তোমরা সাক্ষ্যকে গোপন করো না। যে তা গোপন করবে, তার অন্তরটা পাপী।

তা থেকে বোঝা যায়, তারা যখনই তা গোপন করবে, তখন তাদের কথাই গ্রহণীয় হবে। তেমনি কমানো ত্যাগ করার ব্যাপারে যার উপর হক তাকে উপদেশ দেয়াটা এটা প্রমাণ এ জন্যে যে, তাদের কথাই হবে রুজু করার কেন্দ্রভূমি। নবী করীম (স) থেকে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাতে ঠিক আয়াতের কথাই বলা হয়েছে। আর তা হল ঃ

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِیْ وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ -

প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব বাদী পক্ষের। আর বিবাদী পক্ষের করণীয় হচ্ছে কিরা-কসম করা।

এতেও কথা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে তার, যার উপর দাবি তোলা হয়েছে বাদীর কথার সে গুরুত্ব নেই। বিবাদীকে কিরা-কসম করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আর তা-ই হচ্ছে আল্লাহ্র এ কথাটির তাৎপর্য ঃ 'এবং তা থেকে একবিন্দু জিনিসও কম করবে না।' তাতে তার কথা গ্রহণ করাকে ওয়াজিব বলা হয়েছে।

কোন কোন লোক উক্ত আয়াতকে দলীল বানিয়ে বলেছেন যে, মিয়াদের ব্যাপারে কথা তাঁর গ্রহণ করতে হবে, যার নিকট টাকা পাওনা রয়েছে, পাওনা যার নিকট চাওয়া হচ্ছে। কেননা আল্লাহ্ লেখানোর দায়িত্ব তাকেই দিয়েছেন এবং কম না করার ওয়ায তাকেই করা হয়েছে, সে যেন মাল ফেরত দেয়ার ব্যাপারের পরিমাণে ও মিয়াদে অন্যথা না করে। বলা যাবে, কম না করতে উপদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু মিয়াদ কম করার ব্যাপারে ঋণী ব্যক্তিকে যার নিকট পাওনা চাওয়া হচ্ছে— উপদেশ দেয়া কঠিন। কেননা তার উপর দাবি প্রমাণিত হওয়ার পর সে যদি সমস্ত মিয়াদটিকেই প্রত্যাহার করে, তাহলে তা বাতিল হয়ে যাবে। যেমন দাবিকারীকে তার মালের পরিমাণ না কমানোর উপদেশ দেয়া যায় না। কেননা সে যদি তার দাবি থেকে ঋণী ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি দেয়, তাহলে তার এ নিষ্কৃতি দান সঠিক হবে। কার্যকর হবে।

এ আলোচনা থেকে আমরা জানলাম যে, এখানে যে কম করার কথা বলা হয়েছে তা আসলে ঋণের পরিমাণের কম করা। মিয়াদে কম করা নয়। কাজেই আয়াতে মিয়াদের ব্যাপারে ঋণী ব্যক্তির কথাই গ্রহণ করার পক্ষের কোন দলীল নেই।

যদি বলা হয়, মূল মালের ব্যাপারে মিয়াদ প্রমাণিত হওয়া তাতে কম করা অনিবার্য করে দেয়। তাই মালের পরিমাণ কম করার ব্যাপারে ঋণী ব্যক্তির কথাই যখন গ্রহণীয় হবে, তখন মিয়াদের ব্যাপারেও তারই কথা গ্রহণীয় হওয়া উচিত। কেননা তাতেই মাল কম হওয়ার কারণ নিহিত আছে। কেননা তার কম করণে তার কথাকেই সত্য বলে মেনে নিতে আয়াতে বলা হয়েছে। আর 'কম' কখনও হয় পরিমাণে কম হওয়ায়। আর কখনও মিয়াদের পরিচিতিতে কম হওয়ায়।

জবাবে বলা যাবে, আল্লাহ্ যখন বলেছেন ঃ 'যার উপর হক ধার্য হচ্ছে সে মুখে বলে দলীল লেখাবে, আল্লাহ্‌কে ভয় করবে, কেননা তিনিই তার রব্ব এবং তাতে একবিন্দু কম করবে না'— এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যার হক, সে তার নিজের হককে নিজেই কম করবে না। তাহলে মূল কথাটি এই দাঁড়ায় যে, 'ঋণের পরিমাণে একবিন্দু জিনিসও কম করবে না।' মিয়াদের দাবিদার ঋণের পরিমাণ কম করতে পারে না। কেননা ঋণের পরিমাণ কামানো অর্থ মালের পরিমাণ কমানো। আর মিয়াদটাই তো ঋণ নয়, তার অংশও নয়। তার ব্যাপার যখন এই, তখন মিয়াদের দাবিতে তার কথাকে সত্য বলে মেনে নেয়ার কোন দলীল আয়াতে নেই। আর মিয়াদ যে ঋণ নয়, তা তোমাকে জানিয়ে দেয় এ কথা যে, ঋণ কখনও প্রাপ্য হয়ে দাঁড়ায়, আর মিয়াদ বাতিল হয়ে যায় এবং সেই ঋণটাই তার স্থানে দাঁড়িয়ে যায়। আবার মিয়াদ প্রত্যাহৃত হয়, ঋণ আদায়ের ব্যাপারটি ত্বরান্বিত হয়। অতএব ত্বরান্বিত হল ঋণ, যার একটা মিয়াদ নির্দিষ্ট ছিল। এরপরই আল্লাহ্ বলেছেন, 'তা থেকে একবিন্দু কমাবে না' অর্থাৎ ঋণ থেকে এমন জিনিস কমাবে না, যা সে মিয়াদের আওতায় পড়ে না। অপর দিক দিয়ে বলা যায়, মিয়াদে কম করাটা হুকুমের দিক দিয়ে হয়। কেননা মিয়াদ শেষ হলেও শেষ হওয়ার পূর্বে হস্তগত জিনিস যদি একই অবস্থায় থাকে, তাহলে জানা যাবে যে, সে জিনিসে কোন ক্ষতি সাধিত হয়নি। তবে হুকুমের দিক দিয়ে তাতে কমতি হয়েছে, একথা পরোক্ষ অর্থে বলা যায়, প্রকৃতপক্ষে নয়। আর আয়াত শামিল করে সেই কমতি, যা প্রকৃত। আর তা হচ্ছে পরিমাণে কমতি। আর তার নিজের কমতির দিক হতে পারে তার বৃদ্ধি হওয়া বা তা আত্মসাৎ হওয়া প্রভৃতি দ্বারা। যেমন কালো দিরহামের অঙ্গিকার করা ও বৃদ্ধি গম দেয়ার কথা বলা। এসব হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে ক্ষতি বা কমতি। যা হস্তগত হয়েছে তার গুণাগুণে পার্থক্যের কারণে। তাই মিয়াদের কতকাংশ ধরে নেয়া জায়েয হবে না, যা তাতে প্রকৃত নয়, পরোক্ষ ব্যাপার। কেননা ব্যবহৃত শব্দের প্রকৃত অর্থ বোঝালে তাতে পরোক্ষ অর্থের প্রবেশ হতে পারে না।

এ আয়াতে এ কথার দলীল রয়েছে যে, মিয়াদের ব্যাপারে পাওনাদারের কথাই গ্রহণীয় হবে। কেননা আল্লাহ্‌র এ কথার সূচনায় তাকেই সম্বোধন করা হয়েছে ঃ

যখন তোমরা পারস্পরিক ঋণের লেনদেনের চুক্তি করবে নির্দিষ্ট মিয়াদের ভিত্তিতে, তাহলে তোমরা তা লিপিবদ্ধ করবে।

বলেছেন ঃ 'এবং তোমাদের পুরুষদের থেকে দুইজনকে সাক্ষী বানাবে।'

এতে ঋণ চুক্তির উভয় পক্ষকেই সাক্ষী বানাতে বলা হয়েছে, যখন মালটা মিয়াদ ভিত্তিক হবে। এ অবস্থায় মিয়াদের ব্যাপারে কথা যদি ঋণী ব্যক্তিরই গ্রহণীয় হয়, তাহলে পাওনাদারের পক্ষে সাক্ষী বানাবার কোন প্রয়োজনই পড়ে না। আর মিয়াদের ব্যাপারে পাওনাদারের সাক্ষী বানাবার প্রয়োজন প্রমাণ করে যে, সে ব্যাপারে তার কথাই গ্রহণীয় হবে। ঋণী ব্যক্তির কথা সেখানে অসত্য হবে। যদি সে ব্যাপারে তা সত্য হয়, তাহলে ঋণদাতা— পাওনাদারের সাক্ষী বানাবার কোন স্থান থাকে না। তার কোন অর্থও হয় না।

যদি কেউ প্রশ্ন তোলেন যে, সাক্ষী বানাবার হুকুমটা কেবলমাত্র ঋণী ব্যক্তির উপর আরোপিত, ঋণদাতা— পাওনাদারের উপর নয়?

তাহলে জবাবে বলা যাবে, একথা আয়াতটির বক্তব্যের পরিপন্থী। কেননা আয়াতে তো বলা হয়েছে ঃ 'তোমরা যখন কোন নির্দিষ্ট মিয়াদের ভিত্তিতে পারস্পরিক ঋণের লেন-দেন চুক্তিতে আবদ্ধ হবে, ....'-এর সাথে সংশোধিত করা হয়েছে এ কথা; 'তাহলে তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুজনকে সাক্ষী বানাও ?' এতে সম্বোধন করা হয়েছে ঋণদাতা, গ্রহীতা— উভয় পক্ষকে এবং উভয় পক্ষকেই সাক্ষী বানাতে বলা হয়েছে। এমতাবস্থায় যদি কেউ বলতে পারে যে, ঋণ গ্রহীতাকেই বিশেষভাবে এ আদেশ করা হয়েছে, তাহলে অপর একজন বলতে পারে যে, না, এখানে কেবল ঋণদাতা— পাওনাদারকেই সাক্ষী বানাবার জন্যে আদেশ করা হয়েছে, ঋণ গ্রহীতাকে বলা হয়নি। কিন্তু তা বলা কোন ক্রমেই সঙ্গত হতে পারে না। তাই আয়াতের বাহ্যিক তাৎপর্যের দৃষ্টিতে উভয় পক্ষকেই সাক্ষী বানাবার কাজটি করতে হবে। আদেশটি উভয়ের জন্যে ধরে নিতে হবে, একথা যখন প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন বলতে হবে যে, মিয়াদী ঋণদাতার জন্যে সাক্ষী বানাবার হুকুম নেই। কেননা তার অস্বীকৃতিতে তার কথাই গ্রহণীয় হবে। বোঝা গেল, মিয়াদের ব্যাপারে তার কথাকেই চূড়ান্ত মীমাংসাকারী মানতে হবে। ঋণ গ্রহীতাকে আল্লাহ্ দায়িত্ব দিয়েছেন চুক্তিনামার বিবরণ লেখাবার। তা তখনকার জন্যে কথা, যদি সে উত্তমভাবে লেখাতে সক্ষম হয়। অন্যথায় অন্য কেউ লেখাতে পারে, যদি সে তা স্বীকার করে নেয়। তাহলে তা জায়েয হবে। কেননা সে অঙ্গীকার করে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর সাক্ষীদেরও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যখন তারা স্মরণ করিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করবে। আর মুখে বলে লিখিয়ে দেয়াটা স্মরণ করার কারণ হবে। যেমন দুজন পুরুষের একজন পাওয়া গেলে একজন পুরুষের বদলে দুইজন মেয়েলোককে সাক্ষী বানাতে বলা হয়েছে, যেন একজন অপরজনকে সংশ্লিষ্ট বিষয় স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।

## নির্বোধের উপর প্রতিবন্ধকথা আরোপ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

فَانْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْضَعِيْفًا اَوْلَايَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ -

কিন্তু ঋণ গ্রহীতা যদি অজ্ঞ-নির্বোধ বা দুর্বল হয় অথবা সে যদি লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে, তাহলে তার অভিভাবক ইনসাফ সহকারে লিখিয়ে দেবে।

নির্বোধ ব্যক্তির উপর তার তৎপরতা বন্ধ কর্তব্য হওয়ার পক্ষপাতী প্রত্যেকটি গোষ্ঠীই এ আয়াতটিকে দলীল বানিয়েছে। এ আয়াতের ভিত্তিতে কোন কোন গোষ্ঠী আবার তা বাতিলও করে। যারা নির্বোধ ব্যক্তির উপর প্রতিবন্ধকথা আরোপের পক্ষপাতী, তারা বলে, তারা বলেছে যে, আল্লাহ নিজেই তার কথার দ্বারা এ প্রতিবন্ধকথা আরো জরুরী করে দিয়েছেন। এরূপ অবস্থায় নির্বোধ ব্যক্তির অভিভাবকই তার পক্ষ থেকে দলীলের বক্তব্য লিখিয়ে দেয়ার কাজটি করবে।

কিন্তু যারা এ মত সমর্থন করে না, তাদের বক্তব্য হল, আল্লাহ্ তার ঋণচুক্তি সংক্রান্ত আয়াতেই নির্বোধ ব্যক্তিকেও লেনদেনের চুক্তি করার অনুমতি দিয়েছেন এবং লেনদেনের

ব্যাপারে তার অঙ্গীকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এ দুই পক্ষের মাঝে মতপার্থক্যের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে শুধু বক্তব্য লিখিয়ে দেয়ার ব্যাপার। কেননা সে তার ও তার প্রতিপক্ষের দায়-দায়িত্বের কথা যথার্থভাবে ও পুরামাত্রায় লিখিয়ে দিতে অক্ষম। অথচ এ লিখিয়ে দেয়া দলীল-দস্তাবেজের জরুরী শর্ত। তাঁরা বলেছেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তার অভিভাবক ন্যায়পরতা সহকারে লিখিয়ে দেবে'— এর অর্থ ঋণের অভিভাবক। এ কথা আগের কালের মনীষীদের এক বিরাট সংখ্যক থেকে বর্ণিত হয়েছে। তারা বলেছেন, এর অর্থ এ নয় যে, নির্বোধের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তার অভিভাবক এ কাজ করবে এবং সে ঋণটা তার উপর চাপিয়ে দেবে ও বহাল করবে। কেননা যার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত তার অভিভাবকের প্রতিশ্রুতি তার উপর কার্যকর হবে না। কারোর মতেই নয়। তাহলে জানতে পারলাম যে, এর অর্থ হচ্ছে ঋণের অভিভাবক, তাকেই লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়ার দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছে, যেন সে তা যার উপর ঋণ চাপছে, তার নিকটবর্তী করে দেয়।

আবূ বকর বলেছেন, আয়াতে বলা 'সফীহ' কে, এ বিষয়ে আগের কালের মনীষীদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তাঁদের অনেকে বলেছেন, 'সফীহ' বলে 'বালক' বুঝিয়েছেন। এটা হাসান থেকে বর্ণিত। বলেছেন, বালক ও মেয়েলোক বোঝানো হয়েছে।

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ -

এবং তোমরা তোমাদের মাল সফীহদের দিও না। (সূরা আন-নিসা ঃ ৫)

এ আয়াতে মুজাহিদ বলেছেন, মেয়েলোক। শবী বলেছেন, দাসী। দাসী বা অল্প বয়স্ক মেয়েদের ধন-মাল দিতে নিষেধ করা হয়েছে, যদিও সে কুরআন পড়তে সক্ষম হয়েছে। আসলে এ কথার মূল ভিত্তি হল, যে ধন-মাল রক্ষা করতে সক্ষম নয়, সে। কেননা ধন-মাল কেবল তাকেই দেয়া যেতে পারে, যার নিজের ও নিজের ধন-মালের রক্ষণাবেক্ষণের যোগ্যতা আছে। এতে কারোরই কোন ভিন্ন মত নেই। পূর্ণ বয়স্ক হলে সে তার নিকট অর্পিত সব ধন-মালের হিফাজত ও ব্যয়-ভার সে করতে পারবে। উপরন্তু স্বামী তার সাথে যৌন সঙ্গমও করেছে।

হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যে স্ত্রী তার স্বামীর ঘরে এক বছরকাল অতিবাহিত করেনি কিংবা তার নিজের গর্ভে সন্তান জন্মেনি, তাকে কোন রাজত্ব দান করা জায়েয নয়। আল-হাসান থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। আবূ শামা বলেছেন, মেয়েলোক যতক্ষণ সন্তান প্রসব না করবে, ততক্ষণ কোন দান-ও তার জন্যে জায়েয নয়। অথবা সে যদি পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা অর্জন করে না থাকে, তাহলেও তাই। ইবরাহীমও তাই বলেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। এ সব কথার আসল তাৎপর্য হল স্ত্রীর পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা লাভ না করা। কেননা স্ত্রীর হাতে ধন-মাল দেয়ার এটা যে কোন সীমা নয়, এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। কেননা সে যদি স্বামীর ঘরে একটি বছরকাল অতিবাহিত করেও এবং সন্তানও প্রসব করে, তবু যদি সুস্থ বুদ্ধিমত্তা না পেয়ে থাকে এবং তার ব্যাপারাদি সামলাবার যোগ্যতা অর্জন করে না থাকে, তাহলে তার মাল-ও তার নিকট অর্পন করা যাবে না। এ থেকে আমরা জানলাম যে, তাঁরা সকলেই বুদ্ধিমত্তা না পাওয়া লোক সম্পর্কে এ মত দিয়েছেন।

কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে سَفَهٌ শব্দটি আল্লাহ তা'আলা ব্যবহার করেছেন। তন্মধ্যে একটি হল سَفَهٌ فِى الدِّيْنِ ঋণ লেনদেনের বুদ্ধিহীনতা। তা মূর্খতাও বটে। বলা হয়েছে ঃ

اَلَاۤ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاۤءُ -

জেনে রাখ, ওরাই হচ্ছে নির্বোধ— মূর্খ।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاۤءَ اَمْوَالَكُمُ -

এবং তোমরা তাদের ধন-মাল নির্বোধ— মূর্খদের দেবে না।

কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেছেন ঃ তাদের (পুরুষদের) ধন-মালের কর্ত্রী বানাবে না। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ -

এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না।

অর্থাৎ 'তোমাদের কিছু সংখ্যক অপর কিছু সংখ্যককে হত্যা করবে না।' আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَاقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ -

তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করবে না।

এর-ও অর্থ ঃ তোমরা একদল অপর দলকে হত্যা করো না।

এ সব কথা যিনি বলেছেন, তিনি শব্দের প্রকৃত তত্ত্ব থেকে দূরে সরে গেছেন। বাহ্যত এসব কথার সমর্থনে কোন দলীলই নেই। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاۤءَ اَمْوَالَكُمْ দুই শ্রেণীর লোক শামিল করে। প্রত্যেকটি শ্রেণী মূল শব্দে অন্য থেকে স্বতন্ত্র। এক শ্রেণীর লোককে সম্বোধন করা হয়েছে 'তোমরা তোমাদের ধন-মাল নির্বোধ— মূর্খদের দিও না' কথায়। আর অপর শ্রেণীর নির্বোধ— মূর্খ লোক তাদের সঙ্গেই উল্লিখিত হয়েছে, যখন আল্লাহ তোমাদের মাল' বললেন, তখন বুঝতে হবে, এ কথার অর্থ, যাদের সম্বোধন করে কথাটি বলা হয়েছে, তাদের ধন-মালের কথাই বলা হয়েছে। মূর্খ-নির্বোধদের ধন-মাল নয়। এখানে নির্বোধ-মূর্খদের মনে করা ঠিক হতে পারে না। কেননা সম্বোধন কোনভাবেই তাদেরকে লক্ষ্য করে হয়নি। সম্বোধন করা হয়েছে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির লোকদেরকে। তা 'অতএব তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর' কথাটির মত নয়। আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না' কথাটিও সে রকমের নয়। কেননা এতে হত্যাকারী ও নিহত হওয়া সব লোকই একই সম্বোধনের মধ্যে শামিল। দুই পক্ষের এক পক্ষকে অন্য পক্ষ থেকে সম্বোধনে পার্থক্য করা হয়নি। কাজেই তার অর্থ এ হতে পারে, তোমাদের কতক অপর কতককে যেন হত্যা করে।

বলা হয়েছে, السفه। শব্দের আসল অর্থ হালকাত্ব— গুরুত্বহীনতা। মূর্খকেও 'সফীহ' বলা হয়। কেননা সে হালকা বুদ্ধির লোক। অসম্পূর্ণ বুদ্ধি বা ত্রুটিপূর্ণ বুদ্ধির লোক। 'সফীহ' শব্দটির ব্যবহার যেখানে যেখানে হয়েছে, তার সবখানেই মূর্খতার তাৎপর্য রয়েছে। দ্বীনের ব্যাপারে 'সফীহ' অর্থ দ্বীনী বিষয়ে মূর্খ। ধন-সম্পদে সফীহ্ সে তার সংরক্ষণ ও প্রয়োগ-ব্যবহার পদ্ধতিতে মূর্খ। তার ব্যবস্থাপনা করতে অক্ষম। আর মেয়ে লোক ও বালক-বালিকাকেও 'সফীহ' বলা হয়েছে তাদের মূর্খতার কারণে। তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির স্বল্পতার দরুন ভালোয়-মন্দে পার্থক্য বোধ না থাকার দরুন। আর মতামত প্রকাশে 'সফীহ' বলা হয় তাকে, যে মূর্খ, আজে-বাজে কথা বলে— তাকেও 'সফীহ' বলা হয়। কেননা সে তার টাকা-পয়সা ভালো ভাবে

ব্যয় করতে পারে না। সে জাহিল লোকদের মধ্যেই গণ্য হয়। হালকা বুদ্ধি লোকও এ পর্যায়ে গণ্য। 'সফীহ্‌' শব্দটি এ সবকেই শামিল করে। এখন আমরা আলোচ্য আয়াতের প্রেক্ষিতে শব্দটির তাৎপর্য বের করতে পারি। আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا -

যার উপর হক আরোপিত হচ্ছে, সে যদি 'সফীহ্‌' হয়। ....

এ থেকে হয়ত এ কথা বুঝিয়েছেন যে, ঋণ-চুক্তির শর্তাবলী লেখানোর ব্যাপারে যদি সে মূর্খ হয়, যদিও সে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি, ঠিক-বেঠিকের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম, আজে-বাজে কথা বলে না। বিপর্যয়কারীও নয়। এ রূপ হলে তার অভিভাবককে তা লিখিয়ে দেবার কাজটি করবে। শেষে মুখে তার অঙ্গীকার করবে সেই 'সফীহ্‌' ব্যক্তি। কেননা 'হক'টা তো তারই উপর আরোপিত হচ্ছে। আলোচ্য তাৎপর্যের দিক দিয়ে এ কথা খুবই উত্তম। কেননা যার উপর 'হক'টা আরোপিত হচ্ছে, সে তো পারস্পরিক ঋণচুক্তি করার আয়াতের শুরুতেই উল্লিখিত হয়েছে। যদি তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়, তাহলে সে সেই কাজটাও করতে পারে না। অথচ সে সম্বোধনে সে শামিল রয়েছে।

অপর একটি দিক দিয়েও বিবেচনা করা যায়। নিষেধাজ্ঞা আরাপিত ব্যক্তির অভিভাবকের পক্ষে তার দ্বারা ঋণের অঙ্গীকার কখনো জায়েয নয়। হ্যাঁ, জায়েয হবে, সরকার (বা বিচারপতি) যদি ক্রয় বা বিক্রয়ের কাজে তার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে, তা হলে। কিন্তু অভিভাবক তার উপর তা আরোপ করতে পারে, তারা তাকে দিয়ে অঙ্গীকার করাতে পারে— এমন কথা কেউ বলেছেন বলে আমাদের জানা নেই। আর এতেই দলীল রয়েছে এ কথার যে, আয়াতে 'সফীহ্‌'র অভিভাবকের কথা বলা হয়নি। বোঝানো হয়েছে ঋণের অভিভাকের কথা। রুবাই ইবনে আনাসের এ মতই বর্ণিত হয়েছে। ফরা-ও তা-ই বলেছেন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ اَوْضَعِيْفًا এর অর্থ বলা হয়েছে, বিবেক-বুদ্ধিতে দুর্বল। কিংবা বালক— যাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে। কেননা আয়াতটির সূচনা বুঝিয়ে দেয় যে, যার উপর হক ধার্য হচ্ছে, তার পারস্পরিক ঋণচুক্তির পক্ষ হওয়া জায়েয। এদের সকলেরই কার্যতৎপরতা বিধিসঙ্গত। পরে যখন দলীলের লিখিতব্য বিষয়াদি লিখিয়ে দেয়ার কাজ সামনে আসবে, সাক্ষী রাখার প্রয়োজন হবে, সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে এমন ব্যক্তির, যে শর্ত সমূহ জানা না থাকা ও বুদ্ধির দুর্বলতার কারণে লিখিয়ে দেয়ার কাজটি ভালো ভাবে করতে পারে না। যদিও বুদ্ধির কমতির কারণে তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণ ঘটেনি। আর অল্প বয়স্কতা; কিন্তু বেশি বয়স হওয়ার ব্যাপার আল্লাহ্‌র ব্যবহৃত উপরোক্ত শব্দটির মধ্যে পড়ে। তা দুটি ব্যাপারকেই শামিল করে। সেই সাথে উল্লেখ করা হয়েছে তার কথাও, যে তা লিখিয়ে দিতে পারছেন। পারছে না হয় কোন রোগের কারণে কিংবা বেশী বয়সের লোক হওয়ার কারণে, তার বাকশক্তি রহিত হওয়া বা আউলিয়ে যাওয়ার কারণে। তোতলা হওয়ার কারণেও হতে পারে— এ সবই সম্ভব। হতে পারে, আল্লাহ এ সবই বোঝাতে চেয়েছেন। কেননা ব্যবহৃত শব্দের এ সবেরই সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এর কোনটিতেই এমন দলীল নেই, যা প্রমাণ করবে যে, 'সফীহ'র উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতেই হবে। কেই যদি 'সফীহ্‌'র উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ জরুরী মনে করেন, তা হলে তার দলীল হিসেবে এ আয়াতটি পেশ করা সঠিক হবে না। কেননা এ আয়াত

দ্বারা নিষেধাজ্ঞা আরোপ প্রমাণিত হয় না। তা এ জন্যে যে, السفه শব্দটির বহু কয়টি অর্থ রয়েছে। সেগুলো পরস্পর বিভিন্ন। তার কয়েকটির উল্লেখ ইতিপূর্বে আমরা করেছি। ঋণ চুক্তির ক্ষেত্রে سفه নির্বুদ্ধিতা, মূর্খতা। কিন্তু সেজন্যে তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হতে পারে না। কেননা অন্য অর্থের দিক দিয়ে কাফির ও মুনাফিকরাও 'সফীহ'। তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যেতে পারে না। যে লোক আজে-বাজে কথা-বার্তা বলে, সে-ও 'সহীফ' নামে অভিহিত। খুব তাড়াতাড়ি খারাপ-খারাপ শব্দ মুখে উচ্চারণ করে। এ ধরনের 'সফীহ' আবার নিজেদের ধন-মালের রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষ হতে পারে। অন্তত তা নষ্ট করে না, এমন আছে। বেহুদা খরচ করেও উড়ায় না। আল্লাহ বলেছেন ঃ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَه 'তবে যারা নিজেদেরকে 'সফীহ' বানিয়েছে।' এদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে। আবূ উবায়দাতা বলেছেন, এ আয়াতে তার কথা বলা হয়েছে, যে নিজেকে ধ্বংস করতে চায়, নিজেকে ক্ষয় করে দিতে প্রস্তুত। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (স)-কে বলেছিলেন ঃ

اِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ يَّكُوْنَ رَأْسِىْ دَهِيْنًا وَقَمِيْصِى غَسِيْلاً وَشِرَاكُ نَعْلِىْ جَدِيْداً اَفَمِنَ الْكِبْرِ هُوَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : لَا اِنَّمَا الْكِبْرُ مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ وَغَمَصَ النَّاسَ -

আমি পছন্দ করি—ভালোবাসি—যে, আমার মাথা তৈলযুক্ত হোক, আমার জামা ধৌত হোক, আমার জুতার ফিতা নতুন হোক। হে রাসূল! এটা কি অহংকারের কথা ? বললেন, না। অহংকার হচ্ছে তার, যে সত্যাকে জানলো না, যে লোকদেরকে দূরে ছুড়ে ফেলল-ডোবালো, সত্যকে না-জানা, না বোঝাই বোঝাতে চেয়েছেন। কেননা মূলত মুর্খতা-ই হচ্ছে 'সাফাহাত'।

## 'সফীহ'র উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপে মতদ্বৈততা

ইমাম আবূ হানীফা স্বাধীন— পূর্ণ বয়স্ক বিবেক-বুদ্ধি অধিকারী ব্যক্তির উপর তার নিজের ধন-মালসহ যাবতীয় ব্যাপারে তৎপরতার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ সঙ্গত মনে করতেন না। তার নির্বুদ্ধিতার জন্যে, না তার অপচয় ও বেহুদা খরচের কারণে, আর না তার ঋণ বা দারিদ্র্যের কারণে। সরকার (বিচারক) যদি কারোর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তারপর সে কোন ঋণের অঙ্গীকার করে কিংবা তার ধন-মালে ক্রয়-বিক্রয় বা হেবা অথবা অন্য কোনরূপ তৎপরতা করে, তাহলে তার এ তৎপরতা জায়েয হবে, তার বুদ্ধিমত্তা না থাকলে তা অধিক হবে এবং তার ও তার ধন-মালের মাঝে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হবে। তা সত্ত্বেও সে যদি অপর কারোর জন্যে অঙ্গীকার করে কিংবা তার জন্যে কিছু ক্রয় করে, তাহলে সে যা করেছে তা জায়েয হবে। তার ধনমালের উপর তৎপরতা চালানো নিষিদ্ধ হবে যতদিনে সে পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত না পৌঁছবে। পঁচিশ বছর বয়সের হয়ে গেলে তার ধন-মালের কর্তৃত্ব তার হাতেই ফিরিয়ে দিতে হবে, তার বুদ্ধিমত্তা দেখতে না পাওয়া গেলেও। উবায়দুল্লাহ ইবনুল হাসানও ঠিক এরূপ কথাই বলেছেন। শুবা ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, কোন স্বাধীন ব্যক্তির উপর প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা যাবে না। ইবনে আওন মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, কোন স্বাধীন ব্যক্তির উপর প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা যাবে না।

প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা যেতে পারে কেবল ক্রীতদাসের উপর। হাসানুল বসরীও অনুরূপ কথা বলেছেন।

ইমাম আবূ ইউসূফ বলেছেন, কোন লোক যদি বাস্তবিকই 'সফীহ' হয়, তাহলে তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যাবে। যখন তাকে দেউলিয়া ঘোষণা করবে ও তাকে বন্দী করবে, তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যাবে। তার কোন ক্রয় বা বিক্রয় বৈধ হবে না। কোন ঋণের জন্যে তার অঙ্গীকারও গ্রহণ করা যাবে না। তবে অকাট্য কোন প্রমাণ পাওয়া গেলে, যা এ ব্যাপারে স্পষ্ট সাক্ষ্য দেবে যে, তা নিষেধাজ্ঞা আরোপের পূর্বের ঘটনা, তাহলে ভিন্ন কথা।

তাহাভী ইবনে আবূ উমর ইবনে সুমায়াতা— মুহাম্মদ সূত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ পর্যায়ে আবূ ইউসূফের কথাকেই প্রকাশ করেছেন। তার উপর কিছু বাড়িয়ে বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি সেই অবস্থায় থাকে যখন তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হওয়া উচিত, তাহলে তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে মনে করতে হবে, বিচারক তার উপর কার্যত তা আরোপ করুক, আর না-ই করুক। আবূ ইউসূফ বলতেন, যদি তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত না হয়ে থাকে এসব ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কারণে, শেষ পর্যন্ত বিচারক যদি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, তাহলে তার উপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে। ইমাম মুহাম্মাদ বলেছেন, লোকটি পূর্ণবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও যদি বুদ্ধিমত্তা লাভ না করে থাকে, তাহলে তার ধন-মালের উপর কোন কর্তৃত্ব চালাবার অধিকার তাকে দেয়া যাবে না। তার বিক্রয় বা হেবা কোনটিই জায়েয হবে না। সে তখনও না-বালেগ গণ্য হবে। সে যদি কিছু বিক্রয় করে বা ক্রয় করে, শাসক তা বিবেচনা ও যাচাই করে দেখবে। যদি ভালো মনে হয়, তাহলে তার অনুমতি দেবে, তার জন্যেও তা জায়েয হবে। সে বুদ্ধিমান না হওয়া পর্যন্ত না-বালেগই বিবেচিত হবে। সে যেন একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, যে এখনও বালেগ হয়নি। তবে পিতার উপদেষ্টা অভিভাবকের পক্ষে না-বালেগের পক্ষে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয হবে। যে বালেগ হয়েছে, তার পক্ষে ক্রয়-বিক্রয় করা তার জন্যে জায়েয হবে না। তবে সরকারের আদেশে তা পারবে।

ইবনে আবদুল হিকাম ও ইবনুল কাসিম ইমাম মালিকের এ মত বর্ণনা করেছেন, যদি কেউ তার অভিভাবকত্বের অধীন কোন ব্যক্তির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে ইচ্ছা করে, তাহলে সরকারের নিকট নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা কর্তব্য। যেন সব লোককে জানানো যায়, সকলেই তা শুনতে পায় তার বৈঠকে, তার সাক্ষীও থাকে। তারপর সফীহ যা বিক্রয় করেছে, যা ঋণ করেছে, তা প্রত্যাহার করা হবে। পরে তার অবস্থা ভালো হয়ে গেলে তার সাথে তার সম্পর্ক হবে না। একথা ক্রীতদাসের বিপরীত। মুক্তদাস মরে গেলে আর সে যদি কিছু ঋণ করে থাকে, তাহলে তার দিক থেকে কার্যকর হবে না। সে মরে গিয়েও যেন জীবন্ত। তবে সেজন্যে যদি সে এক-তৃতীয়াংশ অসিয়ত করে গিয়ে থাকে তাহলে সে ঋণের বদল তা-ই হবে। পুত্র তখন পূর্ণ বয়স্ক হবে, যখন তার অধিকার হবে পিতার নিকট থেকে তা বের করে নেয়ার। তার পিতা থুর-থুরে বুড়ো হলেও। তবে পুত্র যদি মুক্ত হয়ে যাওয়া দাস হয় কিংবা সফীহ হয়, দুর্বল হয় তার বিবেক-বুদ্ধিতে, তাহলে তার জন্যে তা জায়েয হবে না। ফিরয়াবী সওরী থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ -

তোমরা ইয়াতীম-নাবালোকদের যাচাই পরীক্ষা চালাতে থাক। তারা যদি বিয়ের যোগ্যতা পর্যন্ত পৌঁছে থাকে, তার পরে তাদের মধ্যে বুদ্ধিমত্তার উন্মেষ লক্ষ্য কর, তাহলে তাদের ধন-মাল তাদের নিকট দিয়ে দাও। (সূরা আন-নিসা ঃ ৬)

এ পর্যায়ে সওরী বলেছেন, বিবেক-বুদ্ধি ও সংরক্ষণ যোগ্যতা তার ধন-মালের ব্যবস্থাপনার জন্যেই কাম্য। তিনি এ-ও বলতেন, তার যদি দুটি যোগ্যতা অর্জিত হয়ে থাকে, পূর্ণবয়স্কতা পেয়ে থাকে এবং তার ধন-মাল সংরক্ষণের যোগ্যতা লাভ করে থাকে— তাহলে তাকে তা থেকে দূরে রাখা যাবে না।

আল-মুজানী ইমাম শাফেয়ীর মত তার 'মুখাতাসার' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইয়াতীমদের ধন-মাল তাদেরকে দিয়ে দিতে বলেছেন দুটি কারণে। সে দুটি কারণ না হলে তা তাদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া যাবে না। তা হচ্ছে, পূর্ণ বয়স্কতা লাভ এবং বুদ্ধিমত্তা। বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে দ্বীনী যোগ্যতা, তার ধন-মালের কল্যাণ সাধনে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য ও বৈধ হবে। আর মেয়েলোকের মধ্যে যদি বুদ্ধিমত্তা জেগে উঠেছে বোঝা যায়, তাহলে তার ধন-মাল তাকেই দিয়ে দেয়া হবে। সে বিবাহিতা হোক, আর না-ই হোক। যেমন ছেলে সন্তান, বিয়ে করুক আর না-ই করুক। কেননা আল্লাহ এ দুজনকে অভিন্ন ও পার্থক্যহীন করেছেন। কারোর বেলায়ই বিয়ের কথা তোলা হয়নি, তার শর্ত করা হয়নি। কারোর নির্বুদ্ধিতার বা খারাপ কাজের কারণে সরকার যদি তার উপর প্রতিবন্ধকথা আরোপ করে, তার উপর সাক্ষী রাখা হবে। নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর যদি কিছু বিক্রয় করে, তাহলে সে তার মাল বিনষ্ট করছে বলে বোঝা যাবে। আর যখনই নিষেধাজ্ঞা তার উপর থেকে সরিয়ে নেয়া হবে, তারপরই নিষেধাজ্ঞা আরোপের অবস্থা আবার ফিরে এলে নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। আবার যদি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সময় আসে তাহলে তা আবার আরোপ করা হবে।

আবূ বকর বলেছেন, নিষেধাজ্ঞা আরোপের পক্ষপাতী ও বিরোধী পক্ষসমূহ যে দলীলের উপর নির্ভর করছে, আমরা তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছি। ঋণ সংক্রান্ত আয়াতটিতে কার দৃষ্টিতে কি প্রমাণ বিদ্যমান, তা-ও আমরা দেখিয়েছি। আমরা ব্যাখ্যা করেছি যে, আয়াতটিতে অধিক প্রকাশমান দলীল হল নিষেধাজ্ঞা আরোপ বাতিল ও তৎপরতা বিধিসম্মত হওয়ার দলীল রয়েছে। নিষেধাজ্ঞা আরোপের পক্ষের লোকেরা দলীল হিসেবে একটি হাদীসও পেশ করেছেন। হাদীসটি হিশাম ইবনে উরওয়াতা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর যুবায়র (রা)-এর নিকট এলেন। বললেন, আমি একটা বিক্রয়ের কাজ করেছি। এক্ষণে হযরত আলী (রা) আমার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার ইচ্ছা করছেন। তখন যুবায়র (রা) বললেন, আমি বিক্রয়ে তোমার সাথে শরীক রয়েছি। পরে হযরত আলী (রা) হযরত উসমান (রা)-এর নিকট এলেন এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর এর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে বললেন। তখন যুবায়র (রা) বললেন, আমি এ বিক্রয়ে তার সাথে শরীক রয়েছি। তখন হযরত উসমান (রা) বললেন ঃ 'আমি কেমন করে প্রতিবন্ধকতা আরোপ করব এমন ব্যক্তির উপর, যার সাথে শরীক রয়েছেন যুবায়র।' লোকেরা বলেছেন, এ থেকে বোঝা যায় যে, তাঁরা সকলেই নিষেধাজ্ঞা আরোপ জায়েয মনে করেছেন। তবে যুবায়রের শরীকদারীর কারণে তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এ ঘটনা সাহাবীদের উপস্থিতিতেই ঘটেছে, কেউ তার প্রতিবাদ করেন নি।

আবূ বকর বলেছেন, এ থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, যুবায়র (রা) নিষেধাজ্ঞা জারী করা জায়েয মনে করতেন। বরং শুধু এতটুকুই প্রমাণিত হয় যে, তিনি হযরত উসমান (রা)-এর প্রতিবন্ধকতা আরোপের অধিকার আছে বলে মনে করতেন। কিন্তু তার ব্যাপারে তার সাথে একমত হওয়ার কোন প্রমাণ এতে নেই। আর আসলে এ সবই পার্থক্যপূর্ণ ইজতিহাদী ব্যাপার। উপরন্তু প্রতিবন্ধকতা বা নিষেধাজ্ঞা দু'প্রকারের। একটি হচ্ছে, সাধারণ হস্তক্ষেপ, তৎপরতা চালানো ও অঙ্গীকার করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ। আর দ্বিতীয়টি হল, ধন-মালের ব্যাপারে কিছু করা থেকে নিষেধ। হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলী (রা) যে প্রতিবন্ধকথা আরোপ জায়েয মনে করেছেন, তা হলো ধন-মালের ব্যাপারে কিছু করা থেকে নিষেধাজ্ঞা জারী করা। কেননা হতে পারে সে সময় আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের বয়স পঁচিশ বছর পর্যন্ত পৌছায়নি। ইমাম আবূ হানীফাও তাই মনে করতেন, এ বয়স না হওয়া পর্যন্ত তার ধন-মাল তার নিকট ফিরিয়ে দেয়া যায় না। যদি বুদ্ধিমত্তা সে লাভ করে না থাকে। এই আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা)-ও একজন সাহাবী। তিনি নিষেধাজ্ঞা আরোপকে অস্বীকার করেছেন। তাহলে এ ব্যাপারে সাহাবীগণের ঐকমত্য আছে— একথা কি করে বলা যেতে পারে ? তাঁদের আরও একটি দলীল হচ্ছে জুহরীর বর্ণনা। তিনি উরওয়াত, আয়েশাতা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তাঁর নিকট খবর পৌছল যে, তিনি তাঁর জমির কিছু অংশ বিক্রয় করেছেন এ খবর পেয়ে যুবায়র (রা) বলেছেন যে, তিনি যেন এ থেকে বিরত থাকেন। অন্যথায় তিনি (যুবায়র) তার (আয়েশার) উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করাবেন। একথা তিনি (আয়েশা) জানতে পেরে বললেন ঃ 'আমি আল্লাহ্‌র নামে কিরা করে বলছি, আমি ওর সাথে কোনদিন কথা বলব না।'

লোকেরা বললেন, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যুবায়র (রা)-ও আয়েশা (রা) উভয়ই নিষেধাজ্ঞা আরোপ জায়েয মনে করতেন। তবে তিনি যুবায়রের কথার প্রতিবাদ করেছেন এজন্যে যে, যুবায়র (রা) তাঁকে নিষেধাজ্ঞা আরোপের উপযুক্ত পাত্রী মনে করেছেন। অন্যথায় তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলতে পারতেন যে, না, নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা আদপেই জায়েয নয় এবং তিনি তার কথাকে প্রত্যাখ্যান করতেন।

আবূ বকর বলেছেন, নিষেধাজ্ঞা আরোপ সম্পর্কেই হযরত আয়েশার প্রকাশ্য প্রতিবাদ রয়েছে। তা প্রমাণ করে যে, তিনি নিষেধাজ্ঞা আরোপকে জায়েযই মনে করতেন না। যদি তা না হতো, তাহলে তিনি তার প্রতিবাদই করতেন না, তা যদি এমন হতো যে, তাতে ইজতিহাদের অবকাশ রয়েছে। তাঁর থেকে যে প্রতিবাদটি এসেছে, তা প্রমাণ করে যে, নিষেধাজ্ঞা আরোপ জায়েয হওয়ার ব্যাপারে ইজতিহাদের কোন অবকাশ আছে তা তিনি আদৌ মনে করতেন না।

যদি বলা হয়, হযরত আয়েশা (রা)-এর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপে কোন ইজতিহাদের অবকাশ নেই। নিছক নিষেধাজ্ঞা আরোপের ব্যাপারটি সম্পর্কে তার এ মত নয়। নিষেধাজ্ঞা আরোপ জায়েয হওয়ায় যদি ইজতিহাদের অবকাশ না থাকত, তাহলে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলতেন যে, নিষেধাজ্ঞা আরোপ জায়েয নয়। ফলে তিনি শুধু তাঁর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপকে অস্বীকার করেছেন।

জবাবে বলা যাবে, তিনি নিছক নিষেধাজ্ঞা আরোপকেই অস্বীকার করেছেন। বলেছেন, আল্লাহ্র কসম, আমি ওর সাথে কখনই কথা বলব না। আর তুমি দাবি করছ যে, তিনি নিষেধাজ্ঞা আরোপকে অস্বীকার করেন নি, শুধু তাঁর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রতিবাদ করেছেন বিশেষভাবে। কিন্তু তা প্রমাণিত হয় না।

নিষেধাজ্ঞা আরোপ বাতিল প্রমাণিত হয় একটি হাদীস দ্বারা। মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, কানবী, মালিক, আবদুল্লাহ ইবনে দীনার ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উল্লেখ করলেন যে, বিক্রয় কাজে তিনি ধোঁকার শিকার হন। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ যখন তুমি কিছু বিক্রয় করবে, তখন বলবে ঃ لا خلابة 'কোন সংশয়ের অবকাশ নেই।' তাই পরে তিনি যখনই বিক্রয়ের কাজ করতেন তখনই এই শব্দটি উচ্চারণ করতেন।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আরজী ও ইবরাহীম ইবনে খালিদ আবূ সওর আল-কলবী, আবদুল ওহাব, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওহাব ইবনে আতা, সাঈদ কাতাদাতা, আনাস ইবনে মালিক সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স)-এর যুগে এক ব্যক্তি কেনা-বেচার কাজ করত। তার এ কাজের চুক্তিতে যথেষ্ট দুর্বলতা থাকত। তখন তার পরিবারের লোকেরা তাকে সঙ্গে নিয়ে নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হল। তারা বলল, হে আল্লাহ্র নবী! এ ব্যক্তির (ক্রয়-বিক্রয় কাজের) উপর আপনি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করুন। সে ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ করে। তার এ সবরে চুক্তিতে যথেষ্ট দুর্বলতা থাকে। নবী করীম (স) লোকটিকে নিজের নিকট ডাকলেন। তাকে ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ করতে নিষেধ করে দিলেন। লোকটি বলল, হে আল্লাহ্র নবী! আমি তো কেনা-বেচা না করে থাকতে পারি না। (তা থেকে বিরত থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়)। তখন রাসূল (স) বললেন, তুমি যদি তা ত্যাগ করতেই না পার, তাহলে বেচা-কেনার সময় তুমি বলবে, হা-আ-হা এবং কোন সংশয় নেই।

প্রথমোক্ত হাদীসে বলা হয়েছিল, সে নিজে বিক্রয়ে প্রতারিত হয়। তখন তাকে তৎপরতা চালাতে নিষেধ করেন নি। তার উপর নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করেন নি। নিষেধাজ্ঞা আরোপ যদি ওয়াজিব-ফরযই হতো, তাহলে নবী করীম (স) তা না করে থাকতে পারতেন না। আর বিক্রয় তো এমন যে, তা নিষিদ্ধ হওয়ার যোগ্য।

যদি কেউ বলে, রাসূলে করীম (স) লোকটিকে বলেছিলেন, বিক্রয় কালে তুমি বলবে ঃ কোন সংশয় নেই। তাকে বিক্রয়ের কাজ করার অনুমতিই দিয়েছেন। অবশ্য তার শর্ত ছিল, কোনরূপ ধোঁকাবাজি ছাড়াই বিনিময়টা পুরামাত্রায় আদায় করে নেয়া।

জবাবে বলা যাবে, তাহলে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পক্ষপাতীরা যেন রাজী হয়ে যায় তার উপর, যার উপর স্বয়ং নবী করীম (স) এ বিক্রয় কাজে প্রতারিত হওয়া 'সফীহ' ব্যক্তির ব্যাপারে রাজী হয়েছিলেন। কোন ফিকাহবিদই 'সফীহ' লোকদের ব্যাপারে সে শর্ত আরোপের কথা বলেন নি। যারা নিষেধাজ্ঞা আরোপের পক্ষপাতী তারাও নয়। যারা তা নিষেধ করে— বিপরীত মত পোষণ করে, তারাও নয়। কেননা যে লোক নিষেধাজ্ঞা আরোপ সঙ্গত মনে করে, সেও বলে যে, নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে সরকার। তাকে তৎপরতা চালাতে নিষেধ

করবে। তৎপরতা চালাবার সুযোগ দিয়ে অগ্রসর হয়ে বিক্রয় কালে 'কোন সংশয় নয়' বলার প্রস্তাবনা দেয়াও প্রয়োজনবোধ করে না। যারা নিষেধাজ্ঞা আরোপ বিরোধী, তারা তো সর্বাবস্থায়ই তৎপরতা চালানো জায়েয হওয়ার পক্ষপাতী।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হল, বিবেক-বুদ্ধিমান হওয়ার পর 'সফীহ্'র উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ বাতিল, সঙ্গত নয়। এ শর্ত সংহত হওয়ার নির্ভরতা সঙ্গত হলেও নয়। সর্বপ্রকারের পারস্পরিক বিক্রয় কালে তার উল্লেখ করা হলেও। তাহলেই পারস্পরিক বিক্রয়ের চুক্তিসমূহে দৃঢ়তা গ্রহণ সঙ্গত হবে। সর্বপ্রকারের দর কষাকষিকে অগ্রাহ্য করতে হবে।

এ হাদীসে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, বলা হয়েছে, যখন তুমি কিছু বিক্রয় করবে, বলবে কোন সংশয় নেই, তা ইমাম মুহাম্মদের মাযহাবের সাথে সামঞ্জস্যশীল। কেননা তিনি বলেন, 'সফীহ' যদি পূর্ণ বয়স্ক হয়, তখন তার ব্যাপারটি সরকারের নিকট তোলা হয়, তখন সরকার তার কৃত চুক্তিসমূহের অনুমোদন দেবে যতক্ষণ না তাতে কোনরূপ ধোঁকাবাজি হয়, কোনরূপ ক্ষতি সাধিত হয়। যারা নিষেধাজ্ঞা আরোপ সঙ্গত মনে করে তারা সকলেই তা অগ্রাহ্য করেছে, কেউ তা গণ্য করেনি।

আবূ বকর (র) বলেছেন, বলা সঙ্গত যে, ইমাম মুহাম্মাদের মতও হাদীসের পরিপন্থী। কেননা যার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত, তার বেচা-কেনাকে তিনি জায়েয মনে করেন নি। তবে বিচারকের নিকট ব্যাপারটি উত্থাপিত হলে তিনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে তার বিক্রয়কে স্থগিত করা হবে, যেমন সম্পর্কহীন ব্যক্তির বিক্রয়। সে যদি মালিকের অনুমতি ও আদেশ ছাড়াই বিক্রয় করে, তাহলে তাও স্থগিত হয়ে যাবে। নবী করীম (স) যে ব্যক্তিকে বলেছিলেন যে, তুমি যখন কিছু বিক্রয় করবে, তখন বলবে, কোন সংশয় নেই, তার বিক্রয়কেও স্থগিত করেন নি। বরং তাকে বৈধ বিক্রয় করতে বলেছেন। তা কার্যকর হবে— যখন বলবে, কোন সংশয় নেই। ফলে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পক্ষপাতীদের মত এ হাদীসের বক্তব্যের বিপরীত হল।

তবে আনাস বর্ণিত হাদীসকে উভয় মতের লোকেরাই দলীল বানিয়েছে। যারা নিষেধাজ্ঞা আরোপের পক্ষপাতী, তারা বলেছে, লোকটির পরিবারবর্গ রাসূলের নিকট উপস্থিত হয়ে লোকটির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে বলল। কেননা তার বিক্রয়ে দুর্বলতা প্রকট হয়ে পড়ে। তখন নবী করীম (স) তাদের দাবির প্রতিবাদ করেন নি। বরং লোকটিকে বিক্রয় চালাতে নিষেধ করলেন। যখন সে বলল, সে বিক্রয়ের কাজ না করে স্থির থাকতে পারে না, তখন বললেন, তাহলে বিক্রয় কালে তুমি বলবে— কোন সংশয় নেই। ফলে তিনি তাকে বিক্রয় কাজ চালাবার অনুমিত দিলেন একটা শর্তের ভিত্তিতে। আর সে শর্ত হচ্ছে তাতে দরকষাকষি থাকবে না ও ধোঁকাবাজি হবে না।

পক্ষান্তরে যারা নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিপক্ষে, তাদের দলীল বিশ্লেষণ এভাবে যে, লোকটি যখন বলল যে, আমি বেচার কাজ না করে থাকতে পারি না, তখন নবী করীম (স) তার তৎপরতাকে বাধামুক্ত করে দিলেন। তাকে বললেন, তুমি যখন বিক্রয় করবে, তখন বলবে— কোন সংশয় নেই। নিষেধাজ্ঞা আরোপ যদি ওয়াজিব হতো, তাহলে সে তার উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞাকে দূর করার উদ্দেশ্যে বলত না যে, আমি বেচার কাজ না করে থাকতে পারি না।

কেননা কেউ বিক্রয় থেকে বিরত থাকতে পারে না বলে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পক্ষপাতী কোন ব্যক্তিই তার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে প্রস্তুত হতে পারে না। যেমন অল্পবয়স্ক বালক ও পাগলের উপর এ নিষেধাজ্ঞা আরোপে সকলেই একমত। তারা দুজন যদি ঐরূপ বলে ও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করাতে চায়, তাদের দাবি কখনই মেনে নেয়া হবে না। তাদেরকে এ পরামর্শও দেয়া হবে না, আচ্ছা যখন না করে পারছ না তখন বিক্রয়কালে বলে দিও যে, কোন সংশয় নেই। নবী করীম (স) যে তাকে শর্তভিত্তিক অনুমতি দিয়েছেন, তা প্রমাণ করে যে, নিষেধাজ্ঞা আরোপ ওয়াজিব নয়। আর শুরুতে তিনি যে তাকে বিক্রয় কাজ করতে নিষেধ করলেন এবং তাকে 'কোন সংশয় নেই' বলার পরামর্শ দিলেন, তা তার জন্যে একটা সুষ্ঠু বিবেচনা মাত্র। তার ধন-মালের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের উপদেশ মাত্র। যেমন সমুদ্র পথে ব্যবসায় করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে বা ভয় সংকুল পথে চলাচলকারী লোককে বলা হয়, তোমার মাল-পত্র নিয়ে ঝুঁকিতে পড়ো না, তার সংরক্ষণ করা বা এ ধরনের কোন পরামর্শ, কিন্তু তা তো নিষেধাজ্ঞা আরোপ নয়। এ শুধু পরামর্শ, উপদেশ, সুস্থ চিন্তা-বিবেচনার উদ্বোধন।

নিষেধাজ্ঞা আরোপের মত যে বাতিল, তার আর একটি দলীল হল— এ বিষয়ে কোনই মতভেদ নেই যে, সফীহ এমন অঙ্গীকার বা স্বীকারোক্তি করতে পারে যার ফলে শরীয়াতের 'হদ্দ' বা কিসাস কার্যকর হতে পারে। এ ব্যাপারটি কিন্তু এ ব্যাপারে সকল সন্দেহ-সংশয়ের অপনোদন করে। তাহলে মানুষের অধিকার পর্যায়ে তার অঙ্গীকার বা স্বীকারোক্তি উত্তমভাবে গৃহীত হওয়া উচিত।

কেউ যদি বলে যে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে স্বীকারোক্তি করা জায়েয, যার ফলে 'হদ্দ' বা কিসাস কার্যকর হতে পারে। কিন্তু তার ধন-মাল পরিবেষ্টনকারী ঋণের স্বীকৃতি বা হেবা জায়েয নয়। তা 'হদ্দ' ও কিসাস কার্যকর হওয়ার স্বীকারোক্তি মৌলিকভাবে জায়েয হলেও ধন-মাল ও তাতে তৎপরতা চালানোর অঙ্গীকার জায়েয হতে পারে না।

জবাবে বলা যাবে, আমাদের মতে এ সব ব্যাপারেই রোগীর অঙ্গীকার বা স্বীকারোক্তি জায়েয। তবে আমরাই তা বাতিল করে দিই যদি তা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তের হয়, কেননা তখনকার সময়ের তৎপরতা মৃত্যুকালীন গণ্য হবে। সে মরে গেলে তার এ তৎপরতা সঙ্ঘটিত ও কার্যকর হবে অন্য লোকের পক্ষে, যারা এর বেশী অধিকারী। তারা হচ্ছে পাওনাদাররা— উত্তরাধিকারীরা। তবে মৃত্যু ঘনিয়ে আসার পূর্ব পর্যন্ত তার সব রকমের তৎপরতাই বৈধ ও কার্যকর হবে। যেমন তার হেবা দানকে আমরা বাতিল করি না। তার যে গোলামকে সে আযাদ করে দিয়েছে, তার উপর নতুন করে মুক্তি চেষ্টা চাপিয়ে দিই না, যতক্ষণ না মৃত্যু সঙ্ঘটিত হচ্ছে। আর মৃত্যুর পূর্বে তার 'হদ্দ' ও কিসাস সংক্রান্ত স্বীকারোক্তি ও ধন-মালের অঙ্গীকার তো সারা জীবনে ছড়িয়ে রয়েছে।

নিষেধাজ্ঞা আরোপ বৈধ প্রমাণকারীরা আর একটি দলীল পেশ করে। তা হল আল্লাহ্‌র কথাঃ

وَلَاتُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا -

এবং তোমরা বেহুদা খরচ করো না।

এবং আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ -

এবং তোমার হাত তোমার গর্দানের কাছে বেঁধে রেখো না।

এ ঘোষণানুযায়ী বেহুদা খরচ নিন্দিত, নিষিদ্ধ হয়েছে। অতএব সরকারের কর্তব্য তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা। আর তা এভাবে হবে যে, তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তাকে সে কাজ করতে নিষেধ করে দেবে।

এমনিভাবে স্বয়ং নবী করীম (স)-ও ধন-মাল বিনষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। তাই তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ধন-মাল বিনষ্ট করা থেকে বিরত রাখা বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু আসল কথা হল, এতে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পক্ষে কোন দলীল নেই। কেননা আমরাই বলি যে, বেহুদা খরচ করা নিষিদ্ধ। যে তা করবে, তাকে সে কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে। কিন্তু বেহুদা খরচ করতে নিষেধ করলে তাতেই কারোর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ফরয হয়ে যায় না। কেননা বেহুদা খরচ করতে নিষেধ করা তো সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু কারোর নিজের ধন-মালে তার হস্তক্ষেপ ও তৎপরতা চালানো, তার ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করে দেয়া, তার অঙ্গীকারকে অকেজো করা— এরূপে তার অন্যান্য সর্বপ্রকারের কাজকর্ম বন্ধ করা— এ এমন একটা ব্যাপার, যা নিয়ে আমাদের ও আমাদের বিরোধীদের মধ্যে গভীর মতপার্থক্য রয়েছে। অথচ আয়াতে এমন কিছুই নেই, যা এসব কাজ থেকে নিষেধ করা ওয়াজিব হতে পারে। কেননা তার নিজের বিষয়ে কোন অঙ্গীকার বা স্বীকৃতি তো কোন বেহুদা খরচের ব্যাপারে নয়। যদি তাতে বেহুদা খরচকারী হয়, তাহলে অঙ্গীকার দানকারী সকলকেই অঙ্গীকার করতে নিষেধ করতে হবে। পক্ষপাতিত্বের বিক্রয়ও তো কোন বেহুদা খরচ নয়। কেননা তা বেহুদা খরচ হলে তো সকল মানুষকেই তা করতে নিষেধ করতে হবে। 'হেবা', সাদকাও বেহুদা খরচের পর্যায়ে পড়ে না। তা হলে উদ্ধৃত আয়াত যে বেহুদা খরচ করতে নিষেধ করে, যে তা করে তার নিন্দা করা হয়েছে, এর বলে সেসব চুক্তি করার উপর নিষেধাজ্ঞা কি করে আরোপ করা যেতে পারে, যাতে বেহুদা খরচ বলতে কিছুই নেই ? তবে ইমাম মুহাম্মাদ এ আয়াতকে তাঁর মতের সমর্থনে পেশ করতে পারেন। কেননা তিনি তাঁর সে সমস্ত চুক্তিকে জায়েয মনে করেন, যাতে কোন পক্ষপাতিত্ব নেই— নেই তার ধন-মালের বিনষ্টকরণ। তবে আয়াতে যা আছে, তা হল বেহুদা খরচকারীদের নিন্দা এবং বেহুদা খরচ করার নিষেধ।

যারা নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিরুদ্ধে মত পোষণ করে, তারা বলে, হ্যাঁ, বেহুদা খরচ করা নিন্দিত এবং তা করা নিষিদ্ধ। কিন্তু কারোর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা, তার ধন-মাল নিয়ে কর্মতৎপরতা চালানো বন্ধ করে দেয়া এ আয়াত থেকে ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। বিবেচ্য— মানুষকে তার ধন-মাল নিয়ে সমুদ্রে বিপদে পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। ভয়-সংকুল পথে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু কোন সরকারই তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে না। কোন লোক যদি তার গাছপালা ও কৃষি ফসলকে ফেলে রাখে, তাতে পানি সেচ না করে, তার খোলা জমি পড়ে থাকে, তাতে নির্মাণের কাজ না করে, তাহলে তার ধন-মাল বিনষ্ট না হয়— এজন্যে সরকার তাকে অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য করতে পারে না। অনুরূপভাবে যে সব চুক্তিতে কারোর মাল বিনষ্ট হওয়ার আশংকা আছে, তা করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা যায় না। নবী

করীম (স)-ও ধন-মাল বিনষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু কারো উপর ধন-মালে হস্তক্ষেপ করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা যায় না। তার পক্ষের কোন দলীলও তাতে নেই। বেহুদা খরচের ব্যাপারেও আমাদের এ কথা।

নিষেধাজ্ঞা আরোপ বাতিল এবং যার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে, তার-ও নিজের ধন-মালে তৎপরতা চালানো জায়েয, এর আর একটা প্রমাণ হল— কোন বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী পূর্ণ বয়স্ক মানুষ থেকে যখন নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায়, বেহুদা খরচ করে তার জন্যে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পক্ষের পূর্বোল্লিখিত ফিকাহ্‌বিদগণ— মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বাদে— বলেন, সরকার যখন তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে তার কৃত চুক্তি ও দেয়া অঙ্গীকার— নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর যা হয়েছে— বাতিল হয়ে যাবে। সরকারের নিষেধাজ্ঞা আরোপের পূর্বে যা হয়েছে, তা যদি বৈধ হস্তক্ষেপ হয়, তাহলে তার অর্থ এই হয় যে, এখন সে যা করবে, তা আমি এখন বাতিল করে দিচ্ছি কিংবা ভবিষ্যতে যা করবে তা বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু এটা কোন সহীহ্ কথা নয়। কেননা তাতে সে চুক্তি ভেঙ্গে দেয়া হয়, যা এখনও অনুষ্ঠিতই হয়নি। যেমন কেউ যদি বলে— তুমি আমার নিকট যা বিক্রয় করেছ এবং যেসব চুক্তি তুমি আমার সাথে করেছ, আমি তা সবই ভেঙ্গে ফেললাম। কিংবা বিক্রয়ে আমার জন্যে ইখতিয়ারের যে শর্ত রয়েছে, আমি সব বাতিল করে দিলাম। অথবা কোন মেয়েলোক বলবে ঃ তুমি ভবিষ্যতে আমার দিকে যত ব্যাপার ফিরিয়ে দেবে, তা সব এখনই আমি বাতিল করে দিলাম। .... এ ধরনের সব কথাই বাতিল— অর্থহীন। যেসব চুক্তি ভবিষ্যতে হবে, তা এখনই বাতিল করা অর্থহীন।

এ ব্যাপারে আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদের উপর অভিযোগ উঠে। তা হল— তারা দুজনই নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হওয়ার পরও 'মহরে মিসল' দিয়ে বিয়ে করা জায়েয মনে করেন। অথচ তাতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ বাতিল হয়ে যায়। কেননা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যদি ওয়াজিব হয়ে থাকে এজন্যে ঃ যেন সে তার ধন-মল বিনষ্ট না করে, তাহলে সে তো বিয়ে করে তা ধ্বংস করতেই বসেছে। তা এভাবে হতে পারে যে, সে 'মহরে মিসল'-এর বিনিময়ে বিয়ে করল। পরে সে তার সাথে সঙ্গম করার পূর্বেই তালাক দিল, তখন তো স্ত্রীকে অর্ধেক মহরানা দিতে বাধ্য হবে। এ পর-ও সে এ রকমের অনেক কাজই করতে ও তাতে নিজের ধন-মাল ব্যয়ও করতে পারে। তাহলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেও তার ধন-মাল বিনষ্টকরণ বন্ধ করা গেল না।

তবে ইমাম শাফেয়ীর মতে শর্ত হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা লাভ ও তাকে তার ধন-মাল ফিরিয়ে দেয়া— তার ফিরে পাওয়ার যোগ্যতা হওয়া, তার সাক্ষ্য দান জায়েয হওয়া। এ এমন একটি কথা, যা তার আগে আর কেউ বলেন নি। এর ভিত্তিতে শাসকদের নিকট ফাসিক লোকদের নিজেদের বিরুদ্ধে অঙ্গীকার দান জায়েয না হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাদের বিক্রয় ও ক্রয়সমূহ-ও নাজায়েয ঘোষিত হওয়া উচিত। যে লোকের সততা-ন্যায়পরতা প্রমাণিত হয় নি, তা ক্রয়-বিক্রয়ের সাক্ষ্যদান করাও সাক্ষীদের উচিত নয়। এমন বাদীর মামলাও বিচারকের কবুল না করা উচিত, যতক্ষণ তার সততা-ন্যায়পরতা প্রমাণিত না হবে। কোন বিবাদীরও তার বিরুদ্ধে দাবি বা অভিযোগ কবুল করা যেতে পারে না, যতক্ষণ তার সাক্ষ্য দান তার নিকট সহীহ্ না হবে। যে লোক সততা-ন্যায়পরতার গুণধারী নয়, যার সাক্ষ্য জায়েয নয়, তার নিকট

তার অঙ্গীকার বা স্বীকারোক্তি জায়েয হতে পারে না। তার কৃত চুক্তিসমূহও কার্যকর হওয়া উচিত নয়। কেননা তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। কিন্তু এ সব কথাই ইজমার বিপরীত।

নবী করীম (স)-এর সময় থেকে আজ পর্যন্ত লোকেরা অধিকার নিয়ে বৎসা ও ঝগড়া-বিবাদ করে আসছে। কিন্তু নবী করীম (স) নিজে এবং আগের কালের শরীয়াতবিদ— কেউ-ই বলেন নি যে, তোমাদের এ সব দাবি-দাওয়া কবুল করা যাবে না। অন্য কারোর উপর কারোর দাবি পেশ কালে কেউ একথা বলেন নি যে, তোমার এ দাবি গৃহীত হবে কেবল তার সততা-ন্যায়পরতা প্রমাণিত হওয়ার পর, তার আগে নয়। আল-হাজরামী নবী করীম (স)-এর নিকট একজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিলেন এই বলে যে, সে লোকটি শরীয়াতের আইন ভঙ্গকারী, তাঁর সামনেই সে তা করেছে। কিন্তু নবী করীম (স) তাঁর মামলা বাতিল করে দেন নি। তার অবস্থা সম্পর্কে জানতেও চান নি। ব্যাপারটি একটি হাদীসের বর্ণনায় বর্ণিত। তা মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, হান্নাদ, আবুল আহ্ওয়ায, সামাক, আল-কামা ইবনে ওয়ায়েলিল হাজরামী তাঁর পিতার সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, হাজরামাউত থেকে এক ব্যক্তি উপস্থিত হল আর এক ব্যক্তি এলো কিন্দা থেকে। তারা দুজন নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হলে আল হাজরামী বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ ব্যক্তি আমাকে পরাজিত করেছে একটি জমির ব্যাপারে, যা আমার পিতার ছিল। আল-কিন্দী বললেন, সে জমি তো আমার দখলে, আমিই তার চাষাবাদ করি। তার উপর ওর তো কোন অধিকার নেই। তখন নবী করীম (স) আল-হাজরামীকে বললেন, তোমার নিকট কোন প্রমাণ আছে কি ? বললেন, না। নবী করীম (স) বললেন, তাহলে তোমাকে (বিবাদীকে) সেজেন্য হলপ করতে হবে। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূল। ও তো ফাজের— গুনাহগার ব্যক্তি । কি নিয়ে হলপ করছে, তার কোন পরোয়াই সে করে না। ও কোন কিছুতে ভয় পায় না। রাসূল (স) বললেন, সে ব্যাপারে তোমার কোন দায়িত্ব নেই। তাই ফিসক-ফজুরীই যদি নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণ হতো এবং সেজন্যে তা জরুরী হতো, তাহলে রাসূলে করীম (স) নিশ্চয়ই তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। অথবা তার মামলাটাই বাতিল করে দিলেন। কেননা বাদীই স্বীকার করেছে যে, সে লোকের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত। তার বিরুদ্ধে মামলা করা জায়েয নয়। ধন-মালে মালিকানা হস্তক্ষেপ এবং চুক্তিসমূহের ও অঙ্গীকারসমূহের কার্যকরতার দিক দিয়ে মুসলিম ও কাফিরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই— এ ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে কোন মত-দ্বৈততাই নেই। অথচ কুফর হল সবচেয়ে বড় ফাসিকী, ফাসিকীর চাইতেও অধিক বড়। তা-ই যখন নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণ নয়, তখন তার তুলনায় কম গুনাহ্ ফিস্ক-ফজুরী কি করে তার কারণ হতে পারে! আর মুসলিম ফিকাহবিদদের মধ্যে এ নিয়ে কোন মতপার্থক্য নেই যে, মুসলমান ও কাফির ধন-মালে হস্তক্ষেপ ও চুক্তিসমূহের কার্যকারিতায় সম্পূর্ণ অভিন্ন।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ -

এবং তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুইজন সাক্ষী বানিয়ে নাও।

আবূ বকর (র) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের সূচনায় ঈমানদার লোকদের সম্বোধন করা হয়েছে 'হে ঈমানদার লোকগণ' বলে। তার পরে উপরোক্ত আয়াতাংশ সংযোজিত হয়েছে। এ আয়াতাংশের দুটি অর্থ। তার একটি হল সাক্ষীর গুণ-পরিচিতি। কেননা তারাও ঈমানের গুণে সম্বোধিত। আর আয়াতের ধারবাহিকতায়ই বলা হয়েছে ঃ 'তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে'। তাই মুসলমানদের ব্যাপারে সাক্ষ্যদানের জন্যে সাক্ষীকে অবশ্যই ঈমানদার হতে হবে। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, স্বাধীনতা, ক্রীতদাস না হওয়া। সম্বোধনের মধ্যেই এ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। তা দুভাবে বোঝা যায়। একটি হল, "তোমরা যখন কোন প্রকারের পারস্পরিক ঋণের চুক্তিতে আবদ্ধ হবে .... যার উপর হক ধার্য হচ্ছে সে যেন দলীলের বিষয়-বস্তু লিখিয়ে দেয়" পর্যন্ত। আর এ কাজ তো স্বাধীন লোকদের পক্ষেই সম্ভব, ক্রীতদাসদের পক্ষে তা আদৌ করণীয় নয়। তার দলীল হল, ক্রীতদাস পারস্পরিক ঋণের কোন চুক্তি করতে পারে না। তার কোন অঙ্গীকারও কার্যকর হবে না। তবে তার মনিবের অনুমতিতে পারে। আয়াতের সম্বোধনে তা সেই লোক শামিল, যার পক্ষে স্বাধীনভাবে এ কাজ করা সম্ভব, করার অধিকার আছে। সেজন্যে অন্য কারোর অনুমতির অপেক্ষা থাকবে না। তাহলে প্রমাণিত হল যে, এ সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে সাক্ষীকে অবশ্যই স্বাধীন হতে হবে।

আর দ্বিতীয় তাৎপর্য হল, সম্বোধনের দলীল হিসেবে 'তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে' বলা হয়েছে। এ শব্দের বাহ্যিক তাৎপর্যের দাবি হচ্ছে মুক্ত স্বাধীন লোক হওয়া। যেমন ঃ

وَاَنْكِحُوا الْاَيَا مَى مِنْكُمْ -

এবং তোমাদের মেয়েদেরকে বিয়ে দাও।

অর্থাৎ 'যারা দাসী নয়, স্বাধীনা, তাদেরকে বিয়ে দাও।' কেননা এই আয়াতাংশ সংযোজিত হয়েছে এ আয়াতের পরে ঃ

وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاَمَا ئِكُمْ -

এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা নেককার।

উপরের আয়াতের مِنْكُمْ 'তোমাদের মধ্যে থেকে'-এর মধ্যে ক্রীতদাস শামিল নয়।

এতে দলীল রয়েছে এ কথার যে, আলোচ্য সাক্ষ্যদানের শর্ত হচ্ছে মুসলিম হওয়া এবং স্বাধীন মুক্ত মানুষ হওয়া। ক্রীতদাসের কোন সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। কেননা আল্লাহ্‌র আদেশসমূহ পালন করা ফরয। আর সাক্ষী বানাতে বলা হয়েছে স্বাধীন মানুষকে। স্বাধীন মানুষ ছাড়া অন্যদেরকে সাক্ষী বানানো যাবে না। উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে মুজাহিদ থেকে বর্ণনা এসেছে যে, এ সাক্ষী হতে হবে স্বাধীন পুরুষ মানুষ।

যদি বলা হয়, তুমি যে বললে যে, আয়াতে ক্রীতদাস গণ্য নয়। অথচ তাতে তাদের সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাওয়ার কোন প্রমাণ নেই।

জবাবে বলা যাবে, আয়াতের সম্বোধনের প্রকৃতি থেকেই প্রমাণিত হয়েছে যে, আয়াতে যে কাজের হুকুম দেয়া হয়েছে তা স্বাধীন লোকদের করণীয়। তার পরে দুজন সাক্ষী বানাবার কথা বলা হয়েছে। তা-ও অবশ্য পালনীয়। তখন কথাটি দাঁড়ায় এভাবে যে, 'এবং তোমরা দুজন স্বাধীন পুরুষকে সাক্ষী বানাও।' অতএব সাক্ষীর স্বাধীন হওয়ার শর্ত অগ্রাহ্য করার কারোর

অধিকার নেই। কেননা তা জায়েয হলে দুইজনের সংখ্যার শর্তটিও অগ্রাহ্য করা জায়েয হবে। আর তাতেই একথা নিহিত রয়েছে যে, ক্রীতদাসের সাক্ষ্য বাতিল, অগ্রহণযোগ্য।

ক্রীতদাসের সাক্ষ্য দান পর্যায়ে মনীষীদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কাতাদাতা আল-হাসান— আলী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

شَهَادَةُ الصَّبِى عَلَى الصَّبِى وَالْعَبْدِ عَلَى الْعَبْدِ جَائِزَةٌ -

বালকের ব্যাপারে বালকের সাক্ষ্য এবং দাসের ব্যাপারে দাসের সাক্ষ্য জায়েয।

আবদুর রহমান ইবনে সীমা আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ, উবাই, আবদুর রহমান ইবনে হুমাম, কাতাদাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি হাদীস বর্ণনা করছিলেন যে, আলী (রা) বলেছেন ঃ

يَسْتَثْبِتُ الصِّبْيَانَ فِىْ الشَّهَادَةِ -

বালকদেরকে সাক্ষ্যদান পর্যায়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন।[১]

এ থেকে প্রথমোক্ত হাদীসটি দুর্বল হয়ে পড়ে। হিফস ইবনে গিয়াস আল-মুখতার ইবনে ফুলফুল আনাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, ক্রীতদাসের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেছেন— এমন কাউকে আমি জানি না। উসমান আল-বত্তী বলেছেন, ক্রীতদাসের সাক্ষ্য তার মনিব ছাড়া অন্য কারোর জন্যে হতে পারে। তিনি উল্লেখ করেছেন, ইবনে শাবরামাতা তা জায়েয মনে করতেন শুরাইহ্ থেকে পাওয়া দলীলের ভিত্তিতে। ইবনে আবূ লায়লা ক্রীতদাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন না। খাওয়ারিজরা কূফা নগরী দখল করায় সেখানকার বিচার ব্যবস্থার কর্তৃত্ব লাভ করে এবং তারা ক্রীতদাসের সাক্ষ্য কবুল করার নির্দেশ দেয়। তাদের আরও কিছু কিছু মতের তিনি উল্লেখ করেছেন। তা বিপরীত ধরনের ছিল। তা পালন করতে আদেশ করে। তারপরই তারা তাঁকে বিচারক পদে বহাল রাখে। কিন্তু রাত্র হলে তিনি নিজের জন্তুযানে সওয়ার হয়ে মক্কায় চলে যান।

পরে হাশিমীরা প্রশাসন কায়েম করলে তাঁকে কুফার বিচারপতি পদে তারা পুনর্বহাল করে দেয়। জুহরী সাঈদুবনুল মুসাইয়্যিব থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, উসমান ইবনে আফফান (রা) ফায়সালা দিয়েছেন যে, ক্রীতদাসের সাক্ষ্য জায়েয, অবশ্য দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভের পর। তার পূর্বেও প্রত্যাখ্যান করা হতো না। শুবা মুগীরা থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, ইবরাহীম নখয়ী উট-চুরির ব্যাপারে ক্রীতদাসের সাক্ষ্য কবুল করতেন। সেই শুবাই ইউনুস, আল-হাসান সূত্রে অনুরূপ কথা বর্ণনা করেছেন। আল-হাসান থেকে বর্ণিত হয়েছে, না, তা জায়েয নয়, হিফ্স থেকে হাজ্জাজ, আতা, ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, ক্রীতদাসের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, জুফর ও ইবনে শাবরামাতার (দুইটি মতের একটি মত) এবং মালিক, আল শাম ইবনে সালিহ ও শাফেয়ী বলেছেন, ক্রীতদাসের সাক্ষ্য কোন কিছুতেই গ্রহণীয় নয়।

আবূ বকর (র) বলেছেন, আমরা ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করে বলেছি যে, আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত সাক্ষ্য বিশেষভাবে স্বাধীন মানুষের। ক্রীতদাসের সাক্ষ্যের কথা এখানে বলা

১. অর্থাৎ তাদের নিকট থেকে জানতে চেষ্টা করতেন। তার অর্থ এই নয় যে, তিনি তাদেরকে সাক্ষী হিসেবে মেনে নিতেন।

হয়নি। আয়াতের পরবর্তী অংশও প্রমাণ করে যে, এখানে ক্রীতদাসের সাক্ষ্যের কথা বলা হয়নি। তা হল ঃ

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوا -

সাক্ষীগণকে সাক্ষ্যদানের জন্যে ডাকা হলে তারা অস্বীকার করতে পারবে না।

কেউ কেউ বলেছেন, ডাকা হলে সাক্ষ্য দেবে। অপর কিছু লোক বলেছেন ঃ যখন সাক্ষী যথারীতি মানা হয়ে যায়। অপর লোকেরা বলেছেন, উভয় অবস্থায়ই সাক্ষ্যদান ওয়াজিব। কিন্তু ক্রীতদাস মানিবের হক আদায়ে ব্যস্ত থাকে বলে সে সাক্ষ্য দানের ডাকে সাড়া দিতে পারে না। অতএব সাক্ষ্যদানের কোন হুকুমই তার প্রতি নেই। সে তো তার মনিবের খিদমত বাদ দিয়ে অন্য কাজে মশগুল হতে পারে না। এমন কি কুরআন পাঠ, কুরআন লেখানো ও সাক্ষ্য দানও তার মধ্যে শামিল, হজ্জ ও জুম'আর নামাযের সম্বোধনেও তারা শামিল নয়। কেননা তাদের জন্যে তাদের মনিবের হক অবশ্যই পালনীয়। সাক্ষ্য দানও তাই। কেননা সাক্ষ্য দান তো কেবল সাক্ষীদের উপর সুনির্দিষ্ট নয়। তা ফরযে আইন নয়। তা ফরযে কিফায়া মাত্র। অথচ জুম'আ ও হজ্জ ফরযে আইন প্রত্যেকটি পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের উপর। কিন্তু ক্রীতদাসের জন্যে হজ্জ ও জুম'আ ফরযে আইন নয় মনিবের হক আদায়ের তাগিদের কারণে, তখন আরও অধিক উত্তমভাবে সে মনিবের হক-এর কারণেই সাক্ষ্যদান তার কর্তব্য হবে না।

আল্লাহ্‌র এ কথাটিও তা-ই প্রমাণ করে ঃ

وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ -

এবং তোমরা আল্লাহ্‌র জন্যে সাক্ষ্য কায়েম কর।

আল্লাহ্‌র এ কথাও ঃ

كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ -

তোমরা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী হও, আল্লাহ্‌র জন্যে সাক্ষ্যদাতা ....

وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوا -

তোমরা খাম-খেয়ালী— নফসের খাহেশের অনুসরণ করে সুবিচার থেকে ফিরে যাবে না।

এ আয়াতে শাসককে আল্লাহ্‌র সাক্ষী বলা হয়েছে। যেমন সমস্ত সাক্ষীকেই আল্লাহ্‌র জন্যে সাক্ষ্যদাতা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'তোমরা আল্লাহ্‌র জন্যে সাক্ষ্য কায়েম কর।' তাই ক্রীতদাস যখন শাসক হতে পারে না, তখন তারা সাক্ষীও হতে পারে না। কেননা শাসক ও সাক্ষী— উভয়ের দ্বারাই হুকুম— আইন— কার্যকর হয়।

ক্রীতদাসের সাক্ষ্য বাতিল, তা এ আয়াত থেকেও প্রমাণিত ঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ -

আল্লাহ্ ক্রীতদাসকে দৃষ্টান্ত বানিয়েছেন, সে কিছুই করতে সক্ষম নয়। (সূরা নহল ঃ ৭৫)

তা এজন্যে যে, এ কথা জানা আছে যে, শক্তি বা ক্ষমতা নেই এ জন্যে বলা হয়নি যে, তাদের বাস্তবিকই কর্মক্ষমতা বলতে কিছুই নেই। কেননা শক্তি— ক্ষমতার দিক দিয়ে স্বাধীন ও

ক্রীতদাসের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। বোঝা গেল, আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে, ক্রীতদাসের কথা। কৃতচুক্তি ও তার কর্মতৎপরতা হস্তক্ষেপ ও তার মালিকানা প্রভৃতি কার্যকর নয়। উক্ত আয়াতে ক্রীতদাসকে দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে কাফির-মুশরিকদের পূজ্য মূর্তিগুলোর। সেগুলোও কোন কিছুর মালিক হয় না, কোন কাজ করার ক্ষমতা ওদের থাকে না। আর যে সব ব্যাপারের সাথে বান্দাগণের হক— হুকুম জড়িত, সেসব ক্ষেত্রে ওদের হুকুম বাতিল হওয়া স্বাভাবিক। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি উক্ত আয়াতকে দলীল বানিয়ে বলেছেন, ক্রীতদাস নিজ স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে না। আয়াতের শব্দে এ তাৎপর্য নিহিত না থাকলে তিনি নিশ্চয়ই এরূপ ব্যাখ্যা দিতেন না। বোঝা গেল, ক্রীতদাসের সাক্ষ্য সাক্ষ্য না হওয়ার মতোই। তার চুক্তি, অঙ্গীকার ও তৎপরতা— যা কথার মধ্যে পড়ে— তা সবই এ রকম। তাই ক্রীতদাসের সাক্ষ্য অ-কার্যকর— আয়াতের বাহ্যিক তাৎপর্যের দিক দিয়েই ক্রীতদাসের সাক্ষ্য বাতিল, তার আরও প্রমাণ এই যে, সাক্ষ্য দান ফরযে কিফায়া, যেমন জিহাদ, কিন্তু জিহাদের হুকুম ক্রীতদাসদের প্রতি জারী করা হয়নি। সে যদি পরিবেষ্টিত হয় বা যুদ্ধও করে, তাহলে গনীমতের কোন অংশও সে পাবে না। অতএব সাক্ষ্যদানের আদেশও তার প্রতি ধ্বনিত হয়নি। যখন সাক্ষ্য দেবে, তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। শহীদদের জন্যে দেয়া কোন হুকুমই তাদের বেলা কার্যকর হবে না। যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও গনীমতের কোন অংশ সে পাবে না। ক্রীতদাস যদি সাক্ষ্যদানের যোগ্য হতো, তাহলে তার সাক্ষ্য কার্যকর হওয়া অবশ্য কর্তব্য ছিল। সে যে সাক্ষ্য দেবে পরে তা দিতে অস্বীকার করলে তাকে জরিমানা দিতে হবে। কেননা এটাই সাক্ষ্য সংক্রান্ত বিধান। শাসক যদি তার সাক্ষ্য অনুযায়ী কোন হুকুম কার্যকর করে, তবে তা কার্যকর হবে। কিন্তু ক্রীতদাস সাক্ষ্য দেয়া থেকে বিরত থাকলে তাকে জরিমানা দিতে বাধ্য করা যাবে না। তা থেকে বোঝা গেল যে, সে সাক্ষ্য দেয়ার অধিকার বা যোগ্যতাই রাখে না। তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কোন রায় দেয়া হলে তা নাজায়েয হবে।

মীরাস বন্টনের ক্ষেত্রে আমরা দেখি, মেয়েদের অংশ পুরুষদের অংশের অর্ধেক। এমনিভাবে দুইজন মেয়েলোকের সাক্ষ্যকে একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান বানানো হয়েছে। তার অর্থ একজন মেয়েলোকের সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক; যেমন একজন মেয়েলোকের মীরাস একজন পুরুষের অর্ধেক। তাই ক্রীতদাস যখন আসলেই মীরাস পাওয়ার অধিকারীই নয়, তাই তার সাক্ষ্যদানেরও অধিকারী হওয়া উচিত নয়। কেননা মীরাসের ক্ষেত্রের ঘাটতি সাক্ষ্যের ক্ষেত্রের ঘাটতিকে অনিবার্য করে দেয়। অতএব মীরাস না পাওয়া সাক্ষ্য দেয়ার অধিকার না পাওয়ার সমান। হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) থেকে ক্রীতদাসের সাক্ষ্য জায়েয হওয়ার পর্যায়ে যা বর্ণিত হয়েছে, তা বর্ণনা ধারার দিক দিয়ে সহীহ্ প্রমাণিত হয়নি। আর যদি সহীহ্ হয়ও, তাহলে বুঝতে হবে, তা একজন ক্রীতদাসের সাক্ষ্য অপর ক্রীতদাসের জন্যে এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সাক্ষ্যদান জায়েয হওয়ার ব্যাপারে স্বাধীন ও ক্রীতদাস সমান হওয়ার মাসলায় ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে কোন মতভেদ আমাদের জানা নেই।

যদি বলা হয়, ক্রীতদাসের দেয়া খবর গ্রহণ করা হয়। যেমন রাসূলে করীম (স) কোন হাদীস যদি বর্ণনা করে তাহলে তার দাসত্ব তার দেয়া খবর গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। অতএব তার সাক্ষ্য গ্রহণের পথেও কোন প্রতিবন্ধকতা হওয়া উচিত নয়।

জবাবে বলা যাবে, খবর সাক্ষ্যদানের মূল নয়। অতএব এ দুটিকে একইভাবে গ্রহণ করা যায় না। শরীয়াতের আহ্‌কামে 'খবরে ওয়াহিদ' গৃহীত হয়। কিন্তু এক ব্যক্তির সাক্ষ্য অকার্যকর। খবর বা হাদীসের বর্ণনাধারায় অমুক থেকে অমুকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সাক্ষ্য তো সাক্ষ্য হিসেবেই গৃহীত হবে। ক্রীতদাস যখন বলবে রাসূলে করীম (স) বলেছেন, তখন তার এই বর্ণনা গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু সাক্ষীর সাক্ষ্য সাক্ষ্যদানের শব্দ সহকারে দিতে হবে। নিজের কানে শোনার বা নিজের চোখে দেখার কথা বলতে হয়। যেমন পুরুষ ও নারী খবর বর্ণনায় সমান, কিন্তু সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে সমান নয়। কেননা দুজন মেয়েলোকের সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। অথচ পুরুষ ও নারী— উভয়ের দেয়া খবরে কোন পার্থক্য নেই। তাই ক্রীতদাসের দেয়া খবর গ্রহণকে তার সাক্ষ্য দানের অধিকার প্রতিষ্ঠার দলীল হতে পারে না।

আবূ বকর বলেছেন, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বলেছেন, কোন শাসক বা বিচারক ক্রীতদাসের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কোন হুকুম বা ফায়সালা দেয়, পরে তা যদি আমার নিকট পেশ করা হয়, তাহলে সে হুকুম বা রায়কে বাতিল করে দেব। কেননা তা বাতিল করার মতে ফিকাহবিদদের ঐকমত্য হয়েছে।

বালকদের সাক্ষ্য পর্যায়েও ফিকাহবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য হয়েছে। আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ ও জুফর বলেছেন, বালকদের সাক্ষ্যদান কোন বিষয়েই জায়েয নয়।

ইবনে শাবরামাতা, সওরী ও শাফেয়ীও তাই বলেছেন। ইবনে আবূ লায়লা বলেছেন, বলাকদের কিছু অংশের অপর কিছু অংশের ব্যাপারে সাক্ষ্যদান জায়েয। মালিক বলেছেন, বালকদের তাদের পারস্পরিক ব্যাপারে সাক্ষ্যদান জায়েয। অন্যদের ব্যাপারে নয়। তাদের পারস্পরিক ব্যাপারে কেবলমাত্র যখম সম্পর্কে সাক্ষ্যদান জায়েয হবে তাদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত। তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তারপর তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না। তবে তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আগের দেয়া সাক্ষ্যের উপর পুনরায় সাক্ষ্যদানের প্রয়োজন হলে দেবে। স্বাধীন পুরুষ ছেলেদের সাক্ষ্য জায়েয হবে, বালক বয়সের স্বাধীন মেয়েদের সাক্ষ্যদান জায়েয হবে না।

আবূ বকর বলেছেন, ইবনে আব্বাস, উসমান ও ইবনুয যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, বালকদের সাক্ষ্য বাতিল। আলী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, বালকদের পরস্পরের ব্যাপারে পরস্পরের সাক্ষ্যদান বাতিল। আতা-ও তা-ই বলেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে হুবায়ব ইবনে আবূ সাবিত বলেছে, শবীকে বলা হলো, ইয়াস ইবনে মুআবিয়া বালকদের সাক্ষ্যদানে কোন দোষ আছে বলে মনে করেন না। তখন শবী বললেন, মসরূক আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি হযরত আলী (রা)-এর নিকট ছিলেন। তখন পাঁচজন বালক তাঁর নিকট আসে। তারা বলে আমরা ছয়জন ছিলাম। আমরা পানিতে ডুব দিয়েছিলাম। তখন আমাদের মধ্য থেকে একটি বালক ডুবে গেল। তখন তিনজন অপর দুইজনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল যে, ওরা দুইজন তাকে ডুবিয়ে দিয়েছে। অভিযুক্ত দুইজন সাক্ষ্য দিল যে, আমরা নই ওরা তিনজনই তাকে ডুবিয়ে মেরেছে। তখন হযরত আলী (রা) দুইজনের উপর দিয়াতের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ ধার্য করলেন। আর তিনজনের উপর দিয়াতের এক-পঞ্চমাংশ ধার্য করলেন। তবে আবদুল্লাহ ইবনে হুবায়ব বর্ণিত হাদীস অগ্রহণযোগ্য। এটা হাদীসবিদদের মত। তা সত্ত্বেও হাদীসের তাৎপর্য

অবোধগম্য। হযরত আলী (রা)-র ক্ষেত্রে এরূপ কথা সত্য বলে মানা যায় না। কেননা ডুবে মরা বালকের অভিভাবকরা যদি দুই পক্ষের মধ্যের কোন এক পক্ষের উপর অভিযোগ দায়ের করে, তাহলে তাদের সাক্ষ্যকে তারা মিথ্যা বলবে, যা তারা অন্যদের বিরুদ্ধে দিয়েছে। আর যদি তারা সবকয়টি বালকের উপরই দাবি তোলে, তাহলে কার্যত তারা উভয় পক্ষকেই মিথ্যাবাদী প্রমাণ করবে। কিন্তু এ কথা হযরত আলী (রা) থেকে প্রমাণিত নয়।

বালকদের সাক্ষ্য বাতিল— এ কথা এ আয়াতটি প্রমাণ করে। বলা হয়েছে, হে ঈমানদার লোকগণ তোমরা যদি কোন ঋণের পারস্পরিক চুক্তি কর কোন নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্তকার জন্যে .....

এই সম্বোধন তো পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রতি। কেননা বালকরা পারস্পরিক লেনদেনের চুক্তি করার অধিকারী নয়। তেমনি যার উপর হক ধার্য হবে সে যেন লিখিয়ে দেয়ার কাজটা করে। এতেও বালকরা গণ্য নয়। কেননা তাদের অঙ্গীকারই বৈধ নয়। আল্লাহ্র কথা وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا এবং যেন তার রব্ব আল্লাহ্কে সে ভয় করে এবং তা থেকে একবিন্দু জিনিস কম না করে' কোন বালককে বলার মত কথা নয়। কেননা বালক তো শরীয়াত পালনে বাধ্য (مكلف) নয়। ফলে কোন শাস্তি বা ভয়ের কথা তাকে বলা যেতে পারে না। তারপর 'তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুইজনকে সাক্ষী বানাও' কথাটিও বলে যে, তা বালকদের বলা হয়নি। কেননা বালকরা এখনও আমাদের পুরুষদের মধ্যে গণ্য হয়নি। সম্বোধনের শুরুতে তো পূর্ণ বয়স্কদের কথা বলা হয়েছে। তাই 'তোমাদের পুরুষদের' বলতেও সেই পূর্ণবয়স্কদেরকেই বুঝতে হবে, বালকদের নয়। 'সাক্ষী হিসেবে তোমরা যাদেরকে মনোনীত কর' কথাটিও বালকের সাক্ষী হওয়ার বিপরীত কথা বলে। 'যখন ডাকা হবে, তখন সাক্ষীগণ অস্বীকার করবেন।' এ নিষেধও বালকদের জন্যে নয়, তারা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করতে পারে। বাদী তাদেরকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে হাযির করতে পারে না। 'এবং সাক্ষ্য গোপন করো না, যে তা গোপন করবে, সে পাপী মনের লোক।' এ কথা নিশ্চয়ই বালককে বলা যেতে পারে না। তারা সাক্ষ্য গোপন করলে তাদের পাপাত্মা হওয়া প্রমাণিত হবে না। আর সাক্ষ্যদান থেকে বিরত তাকলে তারা জরিমানা দিতে বাধ্য হবে না। এ কথাও প্রমাণ করে যে, তা সাক্ষ্য দেয়ার উপযুক্ত নয়। কেননা সাক্ষ্য দেয়ার উপযুক্ত হলে বা যার সাক্ষ্য দান সহীহ্ সে যদি সাক্ষ্য দান থেকে বিরত থাকে, তাহলে ক্ষতিপূরণ দিতে সে বাধ্য হবে। তবে যখমের ব্যাপারে বিশেষভাবে তাদের সাক্ষ্যদান ও তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পূর্বে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ এমন একটি কথা, যার কোন দলীল নেই। যাদের মধ্যে মূলত কোন পার্থক্য নেই, তাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির ব্যাপার। কেননা মৌল নীতি হল যখমের ব্যাপারে যার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য, সর্ব ব্যাপারেই তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পূর্বে সাক্ষ্য গ্রহণ, পরে নয়, একটি অর্থহীন কথা। কেননা এ সাক্ষ্যদাতারাই হয়ত অপরাধী হতে পরে। তাদেরকে পাকড়াও করা হবে, এ ভয়েতেই হয়ত তারা সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এটা যে বালকদের অভ্যাস, তা কারোর অজানা নেই। ওরা নিজেরা অপরাধী হলে অপরাধের বোঝা অন্যদের উপর চাপিয়ে দিতে তারা কসুর করে না। কেননা ওরাই অপরাধী হিসেবে পাকড়াও হতে পারে, এ ভয় তো ওদের আছে। উপরন্তু সাক্ষ্য দানে আল্লাহ যখন শর্ত করেছেন সততা-নিরপেক্ষতার, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাকে

কঠিন আযাবের ভয় দেখিয়েছেন, ফাসিকদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে যে লোক মিথ্যা বলা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করে না, তখন মিথ্যার জন্যে যাকে পাকড়াও করা যায় না তার সাক্ষ্য দান কি করে জায়েয হতে পারে। আর বালককে মিথ্যা বলা থেকে বিরত রাখা সম্ভবও নয়, কোন লজ্জা-শরমও তাকে ক্ষান্ত করতে পারে না, তাদের সাক্ষ্য কি করে গ্রহণযোগ্য হতে পারে, বালকদের মিথ্যা বলাকে তো লোকেরা দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করে। বলা হয় এ 'লোকটি তো বালকদের চাইতেও বেশি মিত্যাবাদী।' যাদের অবস্থা এই, তাদের সাক্ষ্য কেমন করে গ্রহণীয় হতে পারে! তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার এবং অন্যরা তাদেরকে শিখিয়ে দেয়ার সুযোগের পূর্বের অবস্থাকে গণ্য করা হলে— কেননা তারা সাধারণত অন্যের শেখানোর দরুনই মিথ্যা বলতে সংকল্পবদ্ধ হয়ে থাকে— তাহলে ব্যাপারটি সেরূপ হয় না, যেমন ধারণা করা হয়েছে। বালকরা মিথ্যাকে চিনে, যেমন চিনে সত্যকে। তবে যে বয়স পর্যন্ত পৌঁছলে সাক্ষ্যদানের তাৎপর্য ও গুরুত্ব বুঝতে পারে, সেই বয়স পর্যন্ত পৌঁছা আবশ্যক। ও তাৎক্ষণিক কোন কারণেও মিথ্যা বলতে প্রস্তুত হয়ে যেতে পারে। তাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হতে পারে, এ ভয়েও তারা চট করে কারোর পক্ষে ও কারোর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হয়ে যেতে পারে। এ রকম আরও অনেক ব্যাপার আছে, যা তাদের অবস্থা থেকে জানা যায়। অতএব বালকদের সাক্ষ্যকে তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পূর্বেও সত্য বলে হুকুম দেয়ার অধিকার কারোর নেই। যেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর-ও এরূপ হুকুম দেয়ার অধিকার কারোর নেই। যেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর-ও এরূপ হুকুম দেয়া সম্ভব নয়। অবস্থা যখন এই এবং এটাও জানা গেল যে, তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না ও দেবার সংকল্পও গ্রহণ করে না, তাহলে তো মেয়েলোকদের সাক্ষ্যও গ্রহণ করা কর্তব্য, যেমন পুরুষদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা উচিত যেমন একটি গোষ্ঠী বা বহু কয়জন লোকের সাক্ষ্য গৃহীত হয়ে থাকে। কিন্তু সাক্ষ্যের ব্যাপারে যখন সংখ্যার গুরুত্ব আছে, আর সাক্ষ্যে যার পুরুত্ব বিশেষভাবে পুরুষদের যখমে— মেয়েদের নয়— তখন সাক্ষ্যের সব কয়টি শর্তই পূর্ণ বয়স্কতা ও সততা— ন্যায়পরতা-পুরামাত্রায় পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। আর তাদের কতকের উপর অপর কতকের সাক্ষ্য যেমন করে জায়েয বলেছে, তেমনি পুরুষদের উপরও তা জায়েয হওয়া উচিত। কেননা তাদের পরস্পরের সাক্ষ্য পরস্পরের উপর পুরুষদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান অপেক্ষা অধিক তাগিদপূর্ণ নয়। কেননা এ মতের লোকটির মতে তারা মুসলমান রূপে গণ্য।

অন্ধের সাক্ষ্য দান পর্যায়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। আবূ হানীফা ও মুহাম্মাদ বলেছেন, অন্ধের সাক্ষ্য কোন অবস্থায়ই জায়েয হতে পারে না। আলী ইবনে আবূ তালিব (রা)-ও এরূপ মত দিয়েছেন। আমর ইবনে উবায়দ আল-হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, অন্ধের সাক্ষ্য কোন অবস্থায়ই জায়েয নয়। আশয়াস থেকেও এরূপ মত বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি বলেছেন, তার দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়ার পূর্বে যদি কিছু দেখে থাকে, তবে সে বিষয়ে তার সাক্ষ্য চলবে। ইবনে লাহইয়াতা আবূ তা'মাতা, সাঈদ ইবনে যুবায়র সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, অন্ধের সাক্ষ্য জায়েয নয়। আবদুর রহমান ইবনে সীমা, আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ, উবাই, হাজ্জাজ ইবনে যুবায়র ইবনে হাযিম কাতাদাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, একজন অন্ধ লোক আয়াস ইবনে মুআবিয়াতার নিকট সাক্ষ্য দিল। তখন আয়াস তাকে বললেন, তোমার সাক্ষ্যকে আমি প্রত্যাখ্যান করছি না। কিন্তু তুমি হয়ত

সততা-ন্যায়পরতাপূর্ণ না-ও হতে পার। বরং তুমি একজন অন্ধ ব্যক্তি, চক্ষে দেখতে পাও না। পরে তিনি তার সাক্ষ্য গ্রহণ করেন নি। ইমাম আবূ ইউসূফ ইবনে আবূ লায়লা ও শাফেয়ী বলেছেন, সে ব্যক্তি অন্ধ হওয়ার পূর্বে যদি কোন কথা জেনে থাকে, তাহলে সে বিষয়ে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে। অন্ধ অবস্থায় যা গেছে, সে বিষয়ে তার সাক্ষ্য জায়েয হবে না। শুরাইহ ও শবী অন্ধের সাক্ষ্য জায়েয বলেছেন। মালিক ও লায়স ইবনে সাদও অন্ধের সাক্ষ্য জায়েয বলেছেন। যদি সে অন্ধ অবস্থায়ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জেনে থাকে, তবুও। তবে সে যদি তালাকের ক্ষেত্রে আওয়াজ চিনতে পেরে থাকে ও অঙ্গীকার বুঝতে পেরে থাকে, তবে যদি সে যিনার সাক্ষ্য দেয় বা 'কযফ' দণ্ডের, তা হলে তা গ্রহণ করা যাবে না।

অন্ধের সাক্ষ্য বাতিল হওয়ার দলীল হচ্ছে একটি হাদীস। হাদীসটি আবদুল বাকী ইবনে কানে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মায়মুন আল বলখী আল-হাফিয, ইয়াহইয়া ইবনে মূসা (বখ্ত নামে পরিচিত) মুহাম্মাদ ইবনে সুলায়মান ইবনে মসমূল, আবদুল্লাহ্ ইবনে সালমাতা ইবনে অহরাম— তাঁর পিতা তায়ূস ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স)-কে সাক্ষ্য দান সম্পর্ক জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বললেন, তুমি কি সূর্য দেখতে পাও ? তাহলে সাক্ষ্য দিও। অন্যথায় সাক্ষ্য দেবে না। অর্থাৎ সূর্যকে স্বচক্ষে দেখাকে সাক্ষ্যদানের শর্ত বানিয়েছেন। অর্থাৎ সাক্ষ্যদাতা যদি সূর্যকে যেমন দেখে ঘটনাটি তেমনি দেখতে পেয়ে থাকে, তাহলেই তার সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা ও অধিকার হতে পারে, অন্যথায় নয়। অন্ধ ব্যক্তি যেহেতু কোন কিছুই দেখেতে পায় না, তাই তার সাক্ষ্য জায়েয নয়। অপর দিক দিয়ে অন্ধ ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে। এ জন্যেও তার সাক্ষ্য জায়েয নয়। কেননা আওয়াজ বা কণ্ঠস্বর অনেক সময় সাদৃশ্যপূর্ণ হতে পারে। যে কথা বলে সে কখনও কখনও অপরের কণ্ঠস্বরে কথা বলতে পারে। ফলে কণ্ঠস্বরের দিক দিয়ে মানুষে মানুষে পার্থক্য করা যায় না। আর বাক-কারী ও শ্রোতার মাঝে পর্দা থাকলে তো ব্যাপারটি আরও কঠিন হয়ে পড়ে। এ কারণে অপরের কণ্ঠস্বরের ব্যাপারে তার সাক্ষ্য গ্রহণ জায়েয হবে না। কেননা যে দৃঢ় প্রত্যয় আবশ্যক, তা এখানে পাওয়া যায় না। তার গোটা ব্যাপারই নিছক ধারণা-অনুমান ভিত্তিক হয়ে পড়ে।

তাছাড়া সাক্ষীকে সাক্ষ্যদানের শব্দে কথা বলতে হবে। যদি সে-সাক্ষ্যদানের শব্দ বাদ দিয়ে অন্য শব্দ ব্যবহার করে, যদি বলে, আমি জানি, বলে, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না। এ থেকে বোঝা গেল, সাক্ষ্য সাক্ষ্যদানের জন্যে ব্যবহার্য শব্দের সাথে সম্পর্কিত। আর সে সাক্ষ্যের ঐকান্তিক দাবি হচ্ছে প্রত্যক্ষ দর্শন, স্বচক্ষে ব্যাপারটি দেখতে পাওয়া। তাই যার সাক্ষ্যে এ মাত্রা পাওয়া যাবে না, তার সাক্ষ্য জায়েয হবে না। না দেখেও সাক্ষ্য দিলে তা অগ্রহণযোগ্য হবে।

কেউ যদি বলে যে, অন্ধ ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে তার সাথে সঙ্গম করতে যায়, তাহলে বুঝতে হবে যে, সে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে গেছে। তার নিজের স্ত্রী হওয়ার ব্যাপারে তার মনে কোন সন্দেহ ছিল না, মনে করা যায়। কেননা সন্দেহ পোষণ করে কোন স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করতে যাওয়া জায়েয নয়।

জবাবে বলা যাবে, অন্ধের পক্ষে নিজ স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করতে যাওয়া তার বিজয়ী ধারণা

ভিত্তিতে সম্ভব। এভাবে যে, তার স্ত্রীর সাথে ফুলশয্য হয়েছে, তাকে বলে দেয়া হয়েছে যে, এই তার স্ত্রী। যদিও সে নিজে তাকে চিনে না। তাহলেও তার সাথে তার সঙ্গম করা জায়েয। তেমনি কোন দাসী-কন্যার হাদিয়া কবুল করাও জায়েয। কেননা নবী করীম (স) তাই বলেছেন। তার স্ত্রী সাথে সঙ্গম করার জন্যে তার এগিয়ে যাওয়া জায়েয।

যদি কেউ তাকে জায়দ সম্পর্কে এই খবর দেয় যে, সে অঙ্গীকার করেছে বা বিক্রয় করেছে কিংবা 'কযফ' করেছে, তাহলে যার বিষয়ে তাকে খবর দেয়া হয়েছে, তার বিষয়ে তার সাক্ষ্যদান জায়েয নয়। কেননা সাক্ষ্যদানের একমাত্র নিয়ম হল দৃঢ় প্রত্যয় ও প্রত্যক্ষ দর্শন। আর অন্যান্য যত বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে তাতে বিজয়ী ধারণাকে ভিত্তি করা জায়েয। একজনের কথা কবুল করাও জায়েয। কিন্তু সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে তা ভিত্তি হতে পারে না।

তবে যদি সাক্ষী হতে বলা হয় তার দৃষ্টিমান থাকা অবস্থায় এবং পরে সে অন্ধ হয়ে যায়, তাহলে সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব গ্রহণকাল কার্যত সাক্ষ্যদানের সময়কালীন অবস্থার তুলনায় অধিক দুর্বল হওয়ার কারণে তার সাক্ষ্য কবুল করা যাবে না। তার প্রমাণ হল সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব কাফির বা ক্রীতদাস কিংবা বালক অবস্থায় গ্রহণ করা হলে, পরে স্বাধীন, মুসলিম, পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় কার্যত সাক্ষ্য দিলে তা-ও জায়েয হবে না। যদিও এ শেষোক্ত অবস্থার লোকের সাক্ষ্য সাধারণত গ্রহণ করা যায়। আর যদি সে বালক বা ক্রীতদাস; কিংবা কাফির অবস্থায় সাক্ষ্যদানের কাজ করে, তাহলে তা জায়েয হবে না। বোঝা গেল, দায়িত্ব গ্রহণ কাল দায়িত্ব পালন কালটির উপর বেশি গুরুত্ব আরোপিত। অন্ধের পক্ষে সাক্ষ্য দানের দায়িত্ব গ্রহণ করাই সঠিক নয়। তার অন্ধত্বই তার এ দায়িত্ব গ্রহণের পথে বড় বাধা। তাই সে সাক্ষ্যদান সহীহ্ হওয়াও অবশ্যই নিষিদ্ধ হবে। যদি কাউকে সাক্ষী বানানো হয়, তার ও তার মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তার সাক্ষ্যদান কথাই সহীহ হতে পারে না। অনুরূপভাবে কার্যত সাক্ষ্য দানের পথে কোন প্রতিবন্ধক হলেও তার সাক্ষ্যদান জায়েয হবে না। আর অন্ধত্ব হচ্ছে এ প্রতিবন্ধক তারও যে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে তার মাঝে। অতএব সাক্ষ্য দান জায়েয হবে না। ইমাম আবূ ইউসূফ এ দুটির মাঝে পার্থক্য করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রত্যক্ষ দর্শন হলে সেই ভিত্তিতে সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব গ্রহণ সহীহ হবে। পরে সে বিষয়ে সাক্ষ্য দানকালে সে হয়ত অনুপস্থিত বা মরে গেছে, তাহলে তার সাক্ষ্য দান জায়েয হওয়ার পথে তা বাধা হবে না। তেমনি সাক্ষীর অন্ধত্ব যে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে, তার মৃত্যু বা অনুপস্থিতির সমান। তাই তার সাক্ষ্য কবুল হওয়া নিষিদ্ধ হবে না।

এর জবাব দুই ভাবে দেয়া যায়। একটি এই যে, সাক্ষীকে তার নিজ সত্তার দিক দিয়ে গণ্য করা। সে যদি সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা সম্পন্ন হয়, তাহলে তার সাক্ষ্য কবুল করা হবে। আর যদি সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা সম্পন্ন না হয়, তাহলে তার সাক্ষ্য কবুল করা হবে না। আর অন্ধ ব্যক্তির অন্ধত্ব তার সাক্ষ্যদানের যোগ্য হওয়ার পথে বাধা। তাই অন্য কারোর প্রেক্ষিত গণ্য করা হবে না। আর অনুপস্থিত ও মৃত— এ দুজনের ব্যাপারে সাক্ষীর সাক্ষ্যদান সহীহ, যদি তাকে সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া থেকে বহিষ্কৃত করার মত কিছু সম্মুখে এসে না পড়ে। যে বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়, তার অনুপস্থিতি বা মৃত্যু সাক্ষীর সাক্ষ্যদানের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করবে না। অতএব তার সাক্ষ্য জায়েয হবে।

আর দ্বিতীয় দিক হল, মৃত ও অনুপস্থিতের ব্যাপারে সাক্ষ্যদানকে আমরা জায়েয মনে করি না। তবে তার পক্ষ থেকে বাদীই যদি তাকে হাজির করে, তাহলে তার ব্যাপারে সাক্ষ্যদান হবে। তখন তার উপস্থিতি অনুপস্থিতি ও মৃতের উপস্থিতির স্থলাভিষিক্ত হবে। আর অন্ধ উপস্থিত বাদী ছাড়া অন্যের ব্যাপারে সাক্ষ্যদানের অর্থে। তাহলে তার সাক্ষ্যদান সহীহ্ হবে না। তারা যদি আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমরা যখন কোন পারস্পরিক ঋণের চুক্তিতে আবদ্ধ হবে'-কে দলীল হিসেবে পেশ করে, সেই সাথে আল্লাহ্র কথা ঃ 'তাহলে তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুজনকে সাক্ষ্য বানাবে' এবং 'যাদেরকে সাক্ষী বানানো তোমরা পছন্দ কর তাদের থেকে' অন্ধ ব্যক্তিও অনেক সময় পছন্দনীয় ব্যক্তি হয়ে থাকে, সে তো আমাদের স্বাধীন পুরুষদের মধ্যেরই লোক, তাহলে বাহ্যিক বিবেচনায়ই তার সাক্ষ্য কবুল হওয়া উচিত।

এর জবাবে আমরা বলব, আয়াতটি বাহ্যত প্রমাণ করে যে, অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্য কবুল না হওয়া উচিত। কেননা আয়াতের শব্দ হল ।وَاسْتَشْهِدُوا 'এবং তোমরা সাক্ষ্য চাও' কিন্তু অন্ধ ব্যক্তির নিকট সাক্ষ্য চাওয়া যায় না। কেননা তার নিকট সাক্ষ্য চাওয়ার অর্থ, যে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে সেটিকে তার সম্মুখে উপস্থিত করতে হবে, তার দ্বারা সেটিকে প্রত্যক্ষ দর্শন করাতে হবে। কিন্তু তা সম্ভব নয়, কাম্যও নয়, যা উপস্থিত, তা প্রত্যক্ষ করা যাবে কি করে? কেননা অন্ধত্ব তার ও সেই জিনিসের মাঝে প্রতিবন্ধক। যেমন প্রাচীর। যদি উক্ত দুটি জিনিসের মাঝে একটা দেয়াল থাকে, তাহলে তার এক পাশ থেকে অপর পাশ দেখা যেতে পারে না। আর 'শাহাদত' (প্রত্যক্ষ দর্শন) যে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে, তা প্রত্যক্ষ দর্শনের উপর নির্ভরশীল, সাক্ষ্য দিয়ে যে জিনিসের উপর কারোর হক প্রতিষ্ঠিত করা লক্ষ্য, সেই অবস্থায়ই তার প্রত্যক্ষ দর্শন জরুরী। কিন্তু অন্ধের বেলায় তা অসম্ভব। কাজেই তার সাক্ষ্য বাতিল হওয়া অনিবার্য। এ হচ্ছে আয়াতের বক্তব্য, আয়াতের প্রমাণ। আয়াতটিই দলীল হচ্ছে তার সাক্ষ্য বাতিল হওয়ার। তা জায়েয প্রমাণের অপেক্ষা নাজায়েয প্রমাণ করে অধিক বলিষ্ঠভাবে।

ইমাম জুফর বলেছেন, অন্ধের সাক্ষ্য জায়েয নয়, তা অন্ধ হওয়ার আগের কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিক বা পরের কোন বিষয়ে। তবে বংশের ব্যাপারে তার সাক্ষ্য চলবে। তা এভাবে যে, সে বলবে, অমুকে অমুকের পুত্র, সে অমুকের পুত্র, সে অমুকের পুত্র।

আবূ বকর বলেছেন, ইমাম জুফর বংশের ব্যাপারে অন্ধের সাক্ষ্যদান সহীহ বলেছেন সম্ভবত একটি প্রসিদ্ধ হাদীসের ভিত্তিতে। তা সাক্ষী প্রত্যক্ষ না দেখলেও দিতে পারে। তাই কারোর বংশের ধারাবাহিকতার খবর যখন অন্ধের কানে বারবার নানাভাবে পৌঁছায়, তখন সে বিচারকের সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে। এটা সহীহ্ হওয়ার ভিত্তিতে যুক্তি দেখানো হয় যে, রাসূলে করীম (স) থেকে যার হুকুম মুতাওয়াতির বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত, সে বিষয়ের খবর দানের অন্ধ ও দৃষ্টিমান অভিন্ন। যদিও তারা দুজনই তা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পায়নি। তারা লোকদের দেয়া খবর শুধু শুনতেই পেয়েছে, তবুও। অনুরূপভাবেই 'মুতাওয়াতির' পদ্ধতিতে কোন বংশ তালিকার শুদ্ধতার জ্ঞান লাভ করেছে, তা বর্ণনা করা তার জন্যে জায়েয। যদিও তারা তার প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করে নি। তখন তার বলে সাক্ষ্য কায়েম করা সহীহ্ হবে। আর এ বিষয়ে তার দেয়া সাক্ষ্যও কবুল করা যাবে। এ সব ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়ার বিষয়টির প্রত্যক্ষ দর্শন কোন শর্ত নয়।

মরুবাসীর নগরবাসী সম্পর্কে সাক্ষ্যদান বিষয়েও বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফর, লায়স, আওজায়ী ও শাফেয়ী বলেছেন, তা জায়েয, যদি সততা ও ন্যায়পরতা সম্পন্ন হয়। জুহরীরও এরূপ মত বর্ণিত হয়েছে। ইবনে অহব মালিকের এ মত বর্ণনা করেছেন যে, নগরবাসীর বিষয়ে মরুবাসীর সাক্ষ্যদান জায়েয নয়। তবে যখমের বিষয়ে জায়েয আছে। ইবনুল কাসিম তাঁর এ মত বর্ণনা করেছেন, নগরবাসীর ব্যাপারে মরুবাসীর সাক্ষ্য শহরাঞ্চলে জায়েয হবে না। তবে সফরে গিয়ে নগরবাসী যদি অসিয়ত করে থাকে তাহলে সে বিষয়ে অথবা ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে জায়েয হবে। তবে তা জায়েয হওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে মরুবাসীর সততা ন্যায়পরতা সম্পন্ন হওয়া।

আবূ বকর (র) বলেছেন, আয়াতের দলীলসমূহের আলোকে এ পর্যন্ত স্বাধীন পূর্ণ বয়স্কের সাক্ষ্য কবুল হওয়া পর্যায়ে যা কিছু বলেছি, তাতে মরুবাসী ও নগরবাসীর অভিন্নতাই স্পষ্ট হয়ে উঠে। কেননা সম্বোধনে ঈমানকে ভিত্তি করা হয়েছে, যারা ঈমানদার তাদের সকলের জন্যেই সে হুকুমটি পালনীয়। কেননা 'হে ঈমানদার লোকেরা' বলা হয়েছে, আর ওরা সকলেই তো ঈমানদার। পরে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুজন সাক্ষ্য বানাও'-এর অর্থ মুমিন স্বাধীন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে। এ পরিচিতিও ওদের সকলেরই, পরে বলেছেন ঃ 'সাক্ষী হিসেবে তোমরা যাদের পছন্দ কর' তাদের মধ্য থেকে তারা যদি সততা ন্যায়পরতা সম্পন্ন হয় তবে তারাও তা-ই হতে পারে। তালাক দেয়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া বা বিচ্ছেদ ঘটানো পর্যায়ে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاسْتَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ -

এবং তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে সততা-ন্যায়পরতা সম্পন্ন লোককে সাক্ষী বানাও।

এই পরিচিতিটাও তাদের সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ ক্ষেত্রে নগরবাসী ও মরুবাসীর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হলে আয়াতসমূহের সাধারণ ও নির্বিশেষ প্রয়োগ হতে পারে না। না হওয়ার সমর্থনে কোন দলীলও নেই। আর তারা সকলেই যে এসব সম্বোধনে শরীক, সে বিষয়ে কোন মতভেদও নেই।

কেননা তাঁরা এক মরুবাসীর জন্যে অপর মরুবাসীর সাক্ষ্যকে জায়েয মনে করেন আয়াতটির আরোপিত শর্তের ভিত্তিতে। আর তারা যখন আয়াতের বক্তব্যের মধ্যে শামিল তখন নগরবাসীর ব্যাপারেও তাদের সাক্ষ্য জায়েয হওয়ারই দাবি করছে আয়াতটি। কেননা তাদের পরস্পরের বিষয়ে পরস্পরের সাক্ষ্যদান জায়েয হওয়াই আয়াতটির দাবি আর এ হিসেবেই আয়াতটির দাবি হচ্ছে নগরবাসীর সাক্ষ্যদান মরুবাসীর ব্যাপারে জায়েয।

তারা যদি একটি হাদীসকে দলীল বানাতে পারে। হাদীসটি আবদুল বাকী ইবনে কানে সায়ন ইবনে ইসহাক, আত-তস্তরী, হারমালাতা, ইবনে ইয়াহইয়া, ইবনে অহব, নাফে ইবনে ইয়াযীদ ইবনুল হাদী, মুহাম্মাদ ইবনে আমর, আতা ইবনে ইয়াসার, আবূ হুরায়রাতা (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি রাসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ

لَاتَجُوْزُ شَهَادَةُ بَدَوِىْ عَلٰى صَاحِبِ قَرْيَةٍ -

মরুবাসীর নগরবাসীর ব্যাপারে সাক্ষ্য দান জায়েয নয়।

কিন্তু এ ধরনের হাদীসের কুরআনের বাহ্যিক তাৎপর্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো বাঞ্ছনীয় নয়। সেই সঙ্গে একথাও যে, তাতে যখম ও অ-যখমের মধ্যে পার্থক্যের উল্লেখ নেই। মরুবাসী সফরে থাকুক, কি নিজ ঘরে উপস্থিত থাকুক, এর-মধ্যেও পার্থক্য নেই। উক্ত হাদীসকে দলীল বানালে তার সাধারণ তাৎপর্যের বিরুদ্ধতা করা হবে।

অথচ সামাক ইবনে হরব ইকরামা— ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, একজন মরুবাসী রাসূলে করীম (স)-এর নিকট নতুন চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিল। তখন নবী করীম (স) হযরত বিলাল (রা)-কে কাল থেকে যেন সকলে রোযা রাখে জনগণের মধ্যে এ ঘোষণা দেয়ার আদেশ করলেন অর্থাৎ রাসূলে করীম (স) মরুবাসীর চাঁদ দেখার সাক্ষ্যকে কবুল করে নিলেন এবং লোকদেরকে রোযা রাখতে শুরু করার ঘোষণা দেওয়ায়ে দিলেন। হতে পারে, মরুবাসীর রাসূলের নিকট সাক্ষ্যদানের এ হাদীসটি, যা আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, তিনি তার বিপরীত কথা জানতে পেরেছেন। ফলে তার সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যায়। অথচ আবূ হুরায়রা (রা) তারই খবর দিয়েছেন। পরবর্তী বর্ণনাকারীরা কারণ উল্লেখ না করেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ-ও সম্ভব যে, মরুবাসী ব্যক্তি সেই সময়ে কথাটি বলেছিল, যখন শিরক ও মুনাফিকী দুটিই তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ -

আর মরুবাসীদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা তারা যা খরচ করে তাকে জরিমানারূপে মনে করে এবং তোমাদের উপর বিপদ-আপদের আবর্তনের অপেক্ষা করছে।

(সূরা তওবা ঃ ৯৮)

যে সব মরুবাসীর এ পরিচিতি তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। মরুবাসীদের অন্যান্য লোকদের পরিচয়স্বরূপ এর পরে আর একটি আয়াতে তাদের প্রশংসা করেছেন। বলেছেন ঃ

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُوْلِ -

এ মরুবাসীদের মধ্যে এমনও লোক আছে, যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার। আর যা কিছু ব্যয় করে তাকে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের এবং রাসূলের দো'আ লাভের মাধ্যম রূপে গ্রহণ করে। (সূরা তওবা ঃ ৯৯)

মরুবাসীদের পরিচিতি যাদের, তারা নিশ্চিয়ই আল্লাহ্র পছন্দনীয় ও মুসলমানদের নিকট গ্রহণীয়। তাদের সাক্ষ্য অবশ্যই গ্রহণীয় হবে।

তাই এ পরিচিতি যাদের, তারা নিশ্চিয়ই আল্লাহ্র পছন্দনীয় ও মুসলমানদের নিকট গ্রহণীয়। তাদের সাক্ষ্য অবশ্যই গ্রহণীয় হবে।

মরুবাসীদের সাক্ষ্য নগরবাসীদের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হবে না— হয় তাদের দ্বীনি দোষ-ক্রটির কারণে, অথবা তারা সাক্ষ্যদানের বিধি-বিধান ও কিভাবে সাক্ষ্য দিতে হয়, তার নিয়ম-পদ্ধতি জানে না এ কারণে। যদি তাদের দ্বীনী দোষ-ক্রটির কারণে হয়ে থাকে, তাহলে

তাদের সাক্ষ্য বাতিল হওয়ার ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই। আর এ দিক দিয়ে নগরবাসী ও মরুবাসীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আর যদি সাক্ষ্য সংক্রান্ত শরীয়াতী হুকুম-আহকাম তাদের না-জানার কারণে হয়ে থাকে, তাহলে মরুবাসীদের ব্যাপারেও নগরবাসীদের সাক্ষ্য গৃহীত না হওয়াই উচিত, যেমন মরুবাসীদের সাক্ষ্য গৃহীত হয় না নগরবাসীদের ব্যাপারে।

যদি মরুবাসীর সাক্ষ্য যখমের ব্যাপারে গৃহীত না হয়, আর সফরে নগরবাসীর ব্যাপারেও গৃহীত না হয়, যেমন নরবাসীর সাক্ষ্য গৃহীত হয় না উক্ত পরিচিতির অধিকারী হয়েও। আর মরুবাসী সততা-ন্যায়পরতা সম্পন্ন হলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ জরুরী হয়; সেই সাথে সাক্ষ্যদানের হুকুম-আহকাম, ওজনে— নগরবাসীর ব্যাপারে, আর অন্যদের ব্যাপারেও— সাক্ষ্য কবুল না হওয়ার কারণ দূর হওয়ার দরুন। তখন তাকে মরুবাসী নামে অভিহিত না করাই উচিত। তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যানের কারণ তার মধ্যে আছে, একথা না বলাই বাঞ্ছনীয়। যেমন নগরবাসীর নগরবাসী হওয়ার কারণে তার সাক্ষ্য জায়েয হওয়ার কথা বলা উচিত নয়। যদি তারা সাক্ষ্য জায়েয হওয়ার শর্তের গুনাবলীহীন হয়ে পড়ে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَانِ –

যদি সাক্ষী হিসেবে দুজন পুরুষ মানুষ না পাওয়া যায়, তাহলে একজন পুরুষ ও দুজন মেয়েলোককে বানাতে হবে।

আবূ বকর (র) বলেছেন, প্রাথমিকভাবে দুজন সাক্ষী বানাতে বলা হয়েছে। আর তার দুজনই হল সাক্ষী! কেননা আরবী শব্দ 'শাহেদ' ও 'শহীদ' একই অর্থবোধক। যেমন 'আলীমুন' ও 'আলেমুন' 'কাদেরুন' ও কাদিরুন' একই অর্থ দেয়। এরপর সংযোজিত হয়েছে এ কথা ঃ 'তবে তারা দুজন যদি দুজন পুরুষ না হয়' অর্থাৎ সাক্ষীদ্বয় যদি দুজন পুরুষ না হয়, 'তাহলে একজন পুরুষ ও দুজন মেয়ে লোক।' প্রথম বাক্যাংশ 'ওরা দুজন যদি দুজন পুরুষ না হয়' বলে হয় একথা বোঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, দুজন পুরুষ যদি না পাওয়া যায়, তাহলে একজন পুরুষ ও দুজন মেয়েলোক হতে হবে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا –

তোমরা যদি পানি না পাও তাহলে মাটির দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ কর।

অথবা যেমন বলেছেন ঃ

فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا –

তাহলে দুজন পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাস মুক্তকরণ। (সূরা মুজাদিলা ঃ ৩)

তারপর বলেছেন ঃ

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ –

যদি না পায়, তাহলে দুই মাস রোযা। (সূরা মুজাদিলা ঃ ৪)

......... শেষে ঃ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا –

যে লোক সামর্থ্যবান হবে না, সে ষাট জন মিসকীন খাওয়াবে। (সূরা মজাদিলা ঃ ৪)

এভাবে আরও যেখানে যেখানে আসল ফরযের অনুপস্থিতি কালে তার বদলে— তদস্থলে অন্য কিছু করতে বলা হয়েছে, তা সবই এ ধরনের কথা।

অথবা তা থেকে বলতে চাওয়া হয়েছে ঃ 'সাক্ষী দুজন যদি দুজন পুরুষ না হয়, তাহলে সাক্ষী দুজন হবে একজন পুরুষ ও দুজন মেয়েলোক।' তার অর্থ, 'সাক্ষী' নামটি একজন পুরুষ ও দুজন মেয়েলোকের উপর কার্যকর হল। ফলে তার সাধারণ তাৎপর্যের দিক দিয়ে সমস্ত হক্-হুকুকের ব্যাপারে একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সাথে দুজন মেয়েলোকের সাক্ষ্য গণ্য হয়ে গেল। তবে অপর কোন দলীলের ভিত্তিতে ভিন্ন কথা প্রমাণিত হলে আলাদা কথা। বোঝা গেল, দুজন পুরুষের স্থলাভিষিক্ত হল একজন পুরুষ ও দুজন মেয়েলোকের সাক্ষ্য যখন দুজন পুরুষ হবে না, তখন। এ থেকে দ্বিতীয় দিকটি প্রমাণিত হল। আর তা হল, একজন পুরুষ ও দুজন মেয়েলোককে দুজন সাক্ষীর নাম দেয়া হল। ফলে এটা শরীয়াত মুতাবিক নাম হয়ে গেল। তাই যেখানেই দুজন সাক্ষী বানাবার আদেশ করা হয়েছে, সেখানেই এরূপ করা ফরয হয়ে গেল। দলীল ভিন্ন কিছু প্রমাণ করলে অন্য কথা। এর সাধারণ তাৎপর্যের কারণে দলীলরূপে পেশ করা জায়েয হবে রাসূলের এ কথায়, তিনি বলেছেন ঃ

لَانِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ -

অভিভাবক ও দুজন সাক্ষী ছাড়া বিয়ে হতে পারে না।

বিয়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্যে একজন পুরুষ ও দুজন মেয়েলোকের সাক্ষ্যের হুকুম দেয়া হল। কেননা এ তিনের সমষ্টিকেই 'দুজন সাক্ষী' নাম দেয়া হয়েছে। আর নবী করীম (স) দুই সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিয়ে হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

ধন-মালের ব্যাপার ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে পুরুষদের সাথে মেয়েলোকদের সাক্ষ্য পর্যায়ে মনীষিগণের বিভিন্ন মত প্রকাশিত হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফর ও উসমানুল-বত্তী বলেছেন পুরুষদের সাথে মেয়েলোকদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না, শরীয়তী হদ্দ ও কিসাসে। তা ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় হক-হুকুকের ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে। আমাদের নিকট আবদুল বাকী ইবনে কানে, বশর ইবনে মূসা, ইয়াহ্ইয়া ইবনে উবাদ, শুবা, আল-হাজ্জাজ ইবনে আরতাত, আতা ইবনে আবূ রিবাহ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর (রা) বিয়েতে একজন পুরুষ ও দুইজন মেয়ে লোকের সাক্ষ্যকে জায়েয বলেছেন, জরীর ইবনে হাজিম, যুবায়র ইবনুল খরীত, আবূ লবীদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, উমর (রা) তালাকে মেয়েলোকের সাক্ষ্যকে জায়েয বলেছেন। ইস্রাইল, আবদুল আলা, মুহাম্মাদ ইবনুল হানফিয়া আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, চুক্তিতে মেয়েলোকদের সাক্ষ্য জায়েয হবে। হাজ্জাজ আতা থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবনে উমর (রা) বিয়েতে পুরুষের সঙ্গে মেয়েলোকদের সাক্ষ্য জায়েয মনে করতেন। আতা থেকে বর্ণিত তিনি তালাকের ব্যাপারে মেয়েলোকদের সাক্ষ্য জায়েয মনে করতেন। আওন শবী শুরাইহ্ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, দাসমুক্তির ব্যাপারে একজন পুরুষ ও দুজন মেয়েলোকের সাক্ষ্য জায়েয মনে করতেন। শবী তালাক পর্যায়েও এ কথা বলেছেন। আল-হাসান ও দহাক দুজনই বলেছেন, মেয়েলোকদের সাক্ষ্য কেবলমাত্র সন্তান প্রসব ও ঋণের ব্যাপারে জায়েয, গ্রহণীয়। ইমাম মালিক বলেছেন, 'হদ্দ' ও কিসাসের মামলায় পুরুষদের সাথে মেয়েদের সাক্ষ্য জায়েয নয়, তালাকেও নয়, বিবাহেও নয়, বংশ তালিকা

নির্ধারণেও নয়, বংশীয় আনুগত্য সম্পর্কেও নয়, নারীর ইযযত সংরক্ষণ সম্পর্কেও নয়। অবশ্য ওকালত ও অসিয়তের ব্যাপারে গ্রহণ করা যাবে, যদি তাতে দাসমুক্তির ব্যাপার না থাকে। সওরী বলেছেন, হদ্দ ছাড়া অন্যান্য সর্বব্যাপারেই নারীদের সাক্ষ্য জায়েয হবে। তাঁর থেকে এ বর্ণনাও রয়েছে যে, কিসাসে তাদের সাক্ষ্য জায়েয হবে না। আল-হাসান ইবনে হাই বলেছেন, 'হদ্দ'-এর ব্যাপারে মেয়েদের সাক্ষ্য জায়েয হবে না। আল-আওজায়ী বলেছেন, বিবাহে একজন পুরুষ ও দুজন মেয়েলোকের সাক্ষ্য জায়েয হবে না। লায়স বলেছেন, অসিয়তে ও দাসমুক্তিতে নারীদের সাক্ষ্য জায়েয। কিন্তু বিয়ে তালাক, হদ্দে জায়েয নয়। সেই ইচ্ছামূলক হত্যায়ও জায়েয নয়, যাতে হত্যাকারীকে দণ্ড দেয়া হবে। শাফেয়ী বলেছেন, ধন-মাল ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে পুরুষদের সাথে মেয়েদের সাক্ষ্য জায়েয হবে না। অসিয়তেও জায়েয হবে না পুরুষ ছাড়া। অসিয়তে ধন-মালের ব্যাপারে জায়েয হবে।

আবূ বকর (র) বলেছেন, আয়াতের প্রকাশ্য অর্থের দাবি হল পুরুষের সাথে মেয়েদের সাক্ষ্য সমস্ত পারস্পরিক ঋণ চুক্তিতে জায়েয হওয়ার দাবি করে। আর তা হলো ঋণের ব্যাপারে গৃহীত যে কোন চুক্তি। তার বদলে ধন-মাল কিংবা কোন দ্রব্য হোক, কি মুনাফা হোক বা ইচ্ছামূলক হত্যাকাণ্ড হোক। কেননা এর প্রত্যেকটিই এমন চুক্তি, যাতে ঋণ রয়েছে। কেননা একথা জানা আছে যে, তোমরা যখন কোন নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্তকার জন্যে ঋণের পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হবে আল্লাহ্র এ কথানুযায়ী যে দুটি জিনিসের উপর চুক্তি হয়, সে দুটি দুইটি ঋণ হবে তা আয়াতের লক্ষ্য নয়। কেননা তা একটি নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্তকার জন্যে জায়েয হবে না, তাতে প্রমাণিত হল যে, এর তাৎপর্য হচ্ছে ঋণটা কোন বদলের ঋণের অস্তিত্বের উপর ভিত্তিশীল হবে, সে যে কোন ঋণই হোক না কেন। আর তার দাবি হল, মহরে মুয়াজ্জল (মিয়াদী মহরানা) ভিত্তিক বিয়ের চুক্তির ব্যাপারে একজন পুরুষের সাথে মেয়েদের সাক্ষ্য জায়েয হওয়া, যদি তা পারস্পরিক লেনদেনের চুক্তি হয়। ইচ্ছামূলক হত্যার ব্যাপারে, খুলা মালের বিনিময়ে, খুলা তালাক ও ইজারাসমূহেও জায়েয হবে। কেউ যদি দাবি করেন যে, এসব চুক্তির বিষয়টা আয়াতের বাহ্যিক তাৎপর্যের বাইরে গণ্য, তা মেনে নেয়া যাবে না। অবশ্য কোন দলীল দিতে পারলে অন্য কথা। কেননা কথা বা নীতির সাধারণত্ব সর্ববিষয়ে তার জায়েয হওয়ার দাবিদার।

ধন-মালের ব্যাপারাদি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও মেয়েদের সাক্ষ্য জায়েয হওয়ার দলীল হচ্ছে একটি হাদীস। হাদীসটি আবদুল বাকী ইবনে কানে ও আহমাদ ইবনুল কাসিম আল জাওহারী, মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আবূ মামার-এর ভাই মুহালাফ ইবনুল হাসান ইবনে আবূ ইয়াযীদ, আল আমাশ, আবূ অয়েল, হুযায়ফা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) কবুলকারিণী ও জন্মগ্রহণ (মালের বিনিময় ছাড়া) সাক্ষ্য জায়েয বলেছেন। এ বিষয়ে মেয়েদের সাক্ষ্য জায়েয বলেছেন। এ থেকে বোঝা গেল, মেয়েদের সাক্ষ্য কেবলমাত্র ধন-মালের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে চলবে, তা নয়। সন্তান জন্মগ্রহণ সম্পর্কেও মেয়েদের সাক্ষ্য জায়েয। মতপার্থক্য হচ্ছে শুধু সংখ্যার ব্যাপারে। উপরন্তু যখন 'শাহীদাইনে— দুজন সাক্ষী' কথাটি শরীয়াত অনুযায়ী একজন পুরুষ ও দুজন মেয়েলোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আর দুজন সাক্ষীকেই بينة। 'অকাট্য প্রমাণ' বলা হয়েছে, তখন অকাট্য প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব বাদীর, আর কিরা করার দায়িত্ব বিবাদীর' কথাটির সাধারণ তাৎপর্য অনুযায়ী সর্বপ্রকারের মামলাতেই একজন পুরুষ ও দুজন মেয়েলোকের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফায়সালা করা— রায় দেয়া— অবশ্য কর্তব্য। কেননা بينة।

কথাটি তাকে সম্পূর্ণরূপে শামিল করে। তা ধন-মালে অকাট্য প্রমাণ হতে পারে। এ শব্দটি যখন তার উপর ব্যবহৃত হতে পারে, তখন সাধারণ তাৎপর্যের দাবিতে তা সর্বপ্রকারের বাদীর জন্যেই প্রযোজ্য— তার থেকে কোন কিছু বিশেষীকরণে দলীল পাওয়া গেলে তা ভিন্ন কথা। 'হদ্দ' ও কিসাসকে আমরা বিশেষীকরণকৃত করে নিয়েছি একটি হাদীসের কারণে। হাদীসটি জুহরী থেকে বর্ণিত। বলেছেন, রাসূলে করীম (স) এবং তাঁর পর দুই খলীফার আমলে এ সুন্নাত জারি রয়েছে যে ঃ

أَنْ لَّا تَجُوْزَشَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيْ الْحُدُوْدِ وَلَا فِيْ الْقِصَاصِ -

'হদ্দ' ও কিসাসে মেয়েদের সাক্ষ্য জায়েয হবে না।

আর ঋণের ক্ষেত্রে একজন পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের সাক্ষ্য কবুল করার ব্যাপারে সকলেই একমত হয়েছেন। তাই সকল প্রকারের হক-এর দাবিতে তা কবুল করা জরুরী হয়ে পড়েছে। কোনরূপ সন্দেহ এ জিনিসকে বিনষ্ট করতে পারে না। কেননা ঋণ তো একটা হক্-এর ব্যাপার। তা সন্দেহের কারণে প্রত্যাহৃত হতে পারে না।

ধন-মাল ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারেও তা জায়েয— একথা প্রমাণ করে একথা যে, আল্লাহ্ তা'আলা তা মিয়াদের ব্যাপারেও জায়েয রেখেছেন, যখন বলেছেন ঃ 'তোমরা যখন কোন মিয়াদের জন্যে পারস্পরিক ঋণ চুক্তিতে আবদ্ধ হবে, তখন তা লিখে রেখো'। তারপরে বলেছেন ঃ 'তারা দুজন পুরুষ না হলে একজন পুরুষ ও দুজন মেয়েলোক।' এতে মিয়াদের উপর পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের সাক্ষ্য জায়েয করা হয়েছে। অথচ তা ধন-মালের ব্যাপারে নয়। যেমন— তা জায়েয করেছেন ধন-মালের ব্যাপারেও।

যদি বলা হয়, মিয়াদ তো ধন-মালের ব্যাপারেই প্রযোজ্য হয়।

তাহলে জবাবে বলা হবে, একথা ভুল। কেননা মিয়াদ কিফালতের ব্যাপারেও হয়ে থাকে। সে কিফালত ব্যক্তির হোক, কি স্বাধীন লোকদের অর্জিত মুনাফার ক্ষেত্রে হোক— যা ঠিক ধন-মাল নয়। অনেক সময় শাসক-বিচারক খুনের ব্যাপারে বা তা থেকে ক্ষমা পাওয়ার দাবির ব্যাপারে 'অকাট্য প্রমাণ' পেশ করার ব্যাপারে একটা মিয়াদ নির্দিষ্ট করা হয়। কাজেই একথা বলা যে, মিয়াদ কেবল ধন-মালের লেনদেনের ক্ষেত্রেই নির্ধারণ করা হয়, কথাটি ঠিক নয়। তা সত্ত্বেও দ্রব্য-সামগ্রী মাল ছাড়া পাওয়া যায় না। বিয়েও সঙ্ঘটিত হয় না মাল ছাড়া। অতএব তাতে মেয়েদের সাক্ষ্য গৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আল্লাহ্র কথা ঃ

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ -

সাক্ষীদের মধ্যে তোমরা যাদেরকে পছন্দ কর, তাদের থেকে।

আবূ বকর (র) বলেছেন, লোকদের দিয়ানতদারী আমানতদারী ও সততা-ন্যায়পরতা চিনতে ও জানতে পারা কেবলমাত্র বাহ্যিকভাবেই সম্ভব, প্রকৃতপক্ষে তার বাস্তবতা কতখানি, তা জানা সম্ভব নয়। কেননা তাদের হৃদয়-মনের গোপন মণিকোঠায় কি লুক্কায়িত রয়েছে, তা জানা যায় না। জানতে পারেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তার পরেও আল্লাহ সাক্ষীর ব্যাপারে তা গণ্য করতে আমাদেরকে আদেশ করেছেন এ আয়াতাংশের মাধ্যমে। বোঝাগেল, সাক্ষীদের

সততা-ন্যায়পরতা নির্ধারণের ব্যাপারে, তাদের কর্মনীতির সুস্থতা ও সুসংবদ্ধতার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা-বিবেচনা করার পর বিজয়ী ধারণার ভিত্তিতে রায় ঠিক করতে হবে। হতে পারে কতক লোকের ধারণা কোন সাক্ষীর সততা-ন্যায়পরতার ব্যাপার প্রবল হবে। ফলে তারা তাকে পছন্দ করবে। সে সময়ই অপর কিছু লোকের হয়ত সে ধারণা হবে না। তাহলে 'সাক্ষী হিসেবে তোমরা যাদের পছন্দ করবে' কথাটি বিজয়ী ধারণার ভিত্তিতে কার্যকর হবে। তাতে অধিকাংশ লোকের রায়কেই অগ্রগণ্য মনে করতে হবে। আসলে তিনটি জিনিসের সমন্বয়ে সাক্ষ্যের ব্যাপারটি গড়ে উঠে।

তার একটি হল العدالة সততা-ন্যায়পরতা, দ্বিতীয় হল কোনরূপ খারাপ কাজের অভিযোগ তার উপর না থাকা, সততা— ন্যায়পরতা থাকা সত্ত্বেও। আর তৃতীয় হল জাগৃতি, স্মরণশক্তি ও অসাবধানতার স্বল্পতা। প্রথমটি العدالة —তার মূল হল ঈমান, কবীরা গুনাহ্ পরিহার ও ওয়াজিব-সুন্নাতে আল্লাহ্‌র হক যথাযথ আদায় করতে থাকা। কথার সত্যতা ও আমানতদারী। আর যিনার মিথ্যা অভিযোগ করায় দণ্ডিত না হওয়া।

আর কোনরূপ খারাপ কাজের অভিযোগ অভিযুক্ত না হওয়ার ব্যাপারটি এ জন্যে গুরুত্বপূর্ণ যে, যার জন্যে সাক্ষ্যদান সে যদি পিতা বা সন্তান কিংবা স্বামী বা স্ত্রী না হয়, আর এ সাক্ষ্য সে আর কখনও দিয়েছে ও তার সে সাক্ষ্য তুহমাতের কারণে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, এমন না হয়— হলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তার কারণ উপরে বলে এসেছি। আর তারা যদি সততা-ন্যায়পরতা সম্পন্ন ও পছন্দনীয় হয় .......।

আর জাগৃতি, স্মরণশক্তি ও অসাবধানতার স্বল্পতার শর্ত এ জন্যে যে, যদি তারা অসতর্ক না হয়, ব্যাপারাদি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ না হয়, তাহলে তার মতো লোককে কিছু কথা শেখালে তারা শিখতে পারে। অনেক সময় তার উপর মিথ্যাকে জোরদার বানানো হয়, ফলে সে তারই সাক্ষ্য দেয়।

ইবনে রুস্তম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান থেকে একজন অনারব রোযাদার তাহাজ্জুদগুজার কিন্তু অসতর্ক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন, তার ব্যাপারে ভয় হচ্ছে, তাকে কোন বুঝ দিলে সে তা গ্রহণ করবে— এ ব্যক্তি সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে ফাসিকের চাইতেও অধিক খারাপ।

আবদুর রহমান ইবনে সামা আল-মুহবির আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমাদ তাঁর পিতা, আসওয়াদ ইবনে আমের, ইবনে হিলাল, আশয়াস আল-হাদালী সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি আল-হাসানকে বলেছেন, হে আবূ সাঈদ, আয়াস তো আমার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। তখন তিনি উঠে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আয়াসের নিকট গেলেন। বললেন ঃ হে মালকায়ান! তুমি এর সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেছ কেন ? তোমার নিকট কি রাসূলে করীম (স)-এর এ কথা পৌঁছেনি, তিনি বলেছেন ঃ

مَنِ اسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَاَكَلَ مِنْ ذَبِيْحَتِنَا فَذٰلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِىْ لَهٗ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهٖ -

যে লোক আমাদের কিবলার দিকে মুখ করবে এবং আমাদের যবেহ্‌কৃত জন্তুর গোশ্‌ত আহার করবে সে-ই সেই মুসলিম, যার জন্যে আল্লাহ্‌র যিম্মা ও তাঁর রাসূলের যিম্মা রয়েছে।

তারপরে তিনি বললেন, হে শায়খ! আপনি কি শুনেছেন, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ -

সাক্ষীদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর, তাদের মধ্য থেকে।

আর তোমার এ সঙ্গী সেই পছন্দনীয় লোক নয়।

আবদুল বাকী ইবনে কানে, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওহহাব, সরী ইবনে আসেম সূত্রে সনদ সহকারে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, আয়াস ইবনে মুআবিয়ার নিকট আল-হাসানের সঙ্গীদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল। আয়াস তার সাক্ষ্যকে প্রত্যাখ্যান করলেন। এই কথা আল-হাসানের নিকট পৌছল। বললেন, তোমরা আমাকে তাঁর নিকট নিয়ে চল। পরে তিনি আয়াসের নিকট এলেন। বললেন, হে ইয়ালকা', তুমি তো একজন মুসলিম ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেছ। তিনি বললেন, হ্যাঁ করেছি! বললেন, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'সাক্ষী হিসেবে তোমরা যাকে পছন্দ কর, তাকে সাক্ষী বানাও।' কিন্তু ও লোকটি পছন্দনীয় লোকদের মধ্যে গণ্য নয়। এরপর আল-হাসান চুপ হয়ে যান। শায়খের প্রতিপক্ষ বললেন, সাক্ষ্যের জন্যে পছন্দের ও সন্তুষ্টির শর্ত হচ্ছে, সাক্ষীকে অবশ্যই জাগ্রতমনা, সচেতন, যা শুনবে তা স্মরণ রাখতে সক্ষম, সতর্কতার সাথে সাক্ষ্যদানকারী হতে হবে। বশর ইবনুল ওয়ালীদ আবূ ইউসূফ থেকে العدل -এর পরিচিতিতে কয়েকটি জিনিসের উল্লেখ করেছেন। একটি হল, যে সব নির্লজ্জ কাজের দরুন 'হদ্দ' জারী হওয়া ওয়াজিব এবং অনুরূপ অন্যান্য কাজ থেকে তাকে বিরত থাকতে হবে। ফরযসমূহ যথারীতি আদায়কারী হতে হবে। পবিত্র ও নেককারীর চরিত্র হতে হবে। অধিকাংশ সগীরা গুনাহ্ও ত্যাগকারী হতে হবে। তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করব। কেননা একেবারে বেগুনাহ হওয়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যদি তার গুনাহ পবিত্র চরিত্রতার অধিক হয়, তাহলে তার সাক্ষ্য আমরা প্রত্যাখ্যান করব। যে লোক শতরঞ্চ ও দাবা খেলে, তাতে জুয়া ধরে বা যে লোক কবুতর খেলায় রত থাকে, তাকে উড়ায়, তার সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হবে না। অনুরূপভাবে যে লোক খুব বেশি মিথ্যা কিরা-কসম করে, তার সাক্ষ্য জায়েয নয়। যে লোক জামা'আতের সাথে পাঁচ ওয়াক্তের নামায তরক করে, জামা'আতে শরীক হওয়াকে হলকা করে বা ঠাট্টা করে, কিংবা অপরাধ হিসেবে বা শরীয়াতের সীমালংঘন হিসেবে, তার সাক্ষ্যও জায়েয হবে না। কোন ব্যাখ্যাকার যদি জামা'আত ত্যাগ করে এবং তা ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে সততা-ন্যায়পরতা সম্পন্ন হয়, তাহলে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। যদি কেউ স্থায়ীভাবে ফজর নামাযের দুই রাক'আত ত্যাগ করে, তার সাক্ষ্যও গৃহীত হবে না। যদি কেউ নির্লজ্জ মিথ্যা বলায় খ্যাতিমান হয়, তার সাক্ষ্য কবুল করা যাবে না। যদি সে ভাবে সে পরিচিত নাও-হয়। অনেক সময় মানুষ এমন ব্যাপারে জড়িত হয়ে পড়ে, যাতে মন্দের বদলে ভালো ও কল্যাণের মাত্রা অধিক, তাহলে তার সাক্ষ্য কবুল করা হবে। গুনাহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত তো কেউ হয় না।

ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ ও ইবনে আবূ লায়লা বলেছেন, নফসের খাহেশের পেছনে চলা লোকদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে। তবে তাদেরকে সততা, ন্যায়পরতা সম্পন্ন হতে হবে। তবে রাফেযী— যাদেরকে 'কিতাবীয়া' বলা হয়— শুনেছি তাদের কতক লোক তাদের পরস্পর যখন হলপ করে তখন তারা কতক অন্য কতককে সত্যবাদী বলে দাবি করে, তাই আমি তাদের সাক্ষ্যকে বাতিল করি।

আবূ ইউসূফ বলেছেন, যে ব্যক্তি নবী করীম (স)-এর সাহাবীগণকে প্রকাশ্যে গালাগাল করে, আমি তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করি না। কেননা যে ব্যক্তি লোকদেরকে গালাগাল করে, প্রতিবেশিকে গালমন্দ করে, তার সাক্ষ্য আমি কবুল করব না। অথচ রাসূলের সাহাবীগণ তো সর্বাধিক সম্মান পাওয়ার যোগ্য।

আবূ ইউসূফ বলেছেন, রাসূলের সাহাবীগণ পরস্পরে মতপার্থক্য করেছেন, মারামারি, যুদ্ধ বিগ্রহ-ও করেছেন। তা সত্ত্বেও উভয় পক্ষের লোকদের সাক্ষ্য নিশ্চয়ই জায়েয হবে। কেননা তাঁরা পারস্পরিক যুদ্ধ করেছেন একটা ব্যাখ্যার পার্থক্যের কারণে। বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারী খাহেশের অনুসারীরাও তেমনি।

আবূ ইউসূফ বলেছেন, তার বিষয়ে আর কাকে জিজ্ঞাসা করেছ? তখন তারা বলল, আমরা তাকে রাসূলের সাহাবীদেরকে গাল দেয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করছি। অতএব আমি গ্রহণ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা না বলবে যে, গালাগাল দিতে আমরা শুনেছি।

যদি বলে যে, আমরা যদি তাকে ফিসক ফুজুরীর দোষে দোষী করি এবং তার সম্পর্কে সেই ধারণাই করি, কিন্তু দেখিনি কখনও, তাহলে আমি তার সাক্ষ্য গ্রহণ করব না। এ দুজনার মধ্যে পাথ্যর্ক হল, যারা বলে যে, আমরা তাকে গালাগাল দেয়ার দোষে দোষী করছি, তার জন্যে তারা কল্যাণ সাব্যস্ত করেছে এবং বলেছেন, আমরা তাকে গাল দেয়ার দোষে দোষী করছি। কিন্তু একথা না শুনতে পাওয়া পর্যন্ত তা কবুল করা যাবে না। যারা বলে যে, আমরা তাকে ফিস্‌ক-ফুজুরী দোষে দোষী করছি। আর তার প্রতি আমরা ধারণাও তাই করি। তবে আমরা তাকে দেখিনি। আমি তা কবুল করব, তার সাক্ষ্যদানকে আমি জায়েয বলব না। তারাও তার জন্যে কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করেছে। তার সততা-ন্যায়পরতা প্রমাণ করেছে।

ইবনে রুস্তম মুহাম্মাদ থেকে উল্লেখ করেছেন, বলেছেন, আমি খাওয়ারিযমদের সাক্ষ্য গ্রহণ করি না। কেননা ওরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই বিদ্রোহ করেছিল।

বললেন, তাদের সাক্ষ্য কেন জায়েয মনে করেন না, অথচ আপনি হারুরিয়ার ঘটনায় জড়িত লোকদের সাক্ষ্য— শাহাদাত— জায়েয মনে করেন? বললেন, তা এ কারণে যে, তারাও আমাদের ধন-মাল হালাল মনে করেনি যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বিদ্রোহ করেনি। যখন তারা বিদ্রোহ করেছে, অমনি আমাদের ধন-মালকেও হালাল মনে করতে শুরু করেছে। অতএব বিদ্রোহ না করা পর্যন্ত তাদের সাক্ষ্যও জায়েয।

আমাদের নিকট আবূ বকর মুকররম ইবনে আহমাদ, আহমাদ ইবনে আতীয়াতা আল-কুফী বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মাদ ইবনে সামায়াতাকে বলতে শুনেছি, আবূ ইউসূফকে বলতে শুনেছি যে, ইমাম আবূ হানীফাকে বলতে শুনেছি ঃ বখিল বা কৃপণের সাক্ষ্য গ্রহণ বিচারক শাসকের পক্ষে জরুরী নয়। কেননা কৃপণ ব্যক্তিকে তার কার্পণ্য অনেক দূরে নিয়ে যায়। তখন সে তার হক্-এর উপরে নিয়ে যায় ধোঁকাবাজির ভয়কে। আর যে ব্যক্তি এরূপ হবে সে সততা-ন্যায়পরতা সম্পন্ন (عدل) হতে পারে না। আমি হাম্মাদ ইবনে আবূ সুলায়মানকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন, আমি ইবরাহীমকে বলতে শুনেছি ঃ আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ كُوْنُوا وَسَطًا لَّاتَكُوْنُوا بُخَلَاءَ وَلَاسَقَلَةً فَانَّ الْبَخِيْلَ وَالسَّقَلَةَ الَّذِيْنَ اِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ حَقٌّ لَمْ يُؤَدُّوْهُ وَاِنْ كَانَ لَهُمْ حَقٌّ اِسْتَقْصَوْهُ -

হে জনগণ! তোমরা মধ্যম নীতির অনুসারী হও এবং কৃপণ হবে না, পাতলা কোমরওয়ালা হবে না। কেননা কৃপণ ও পাতলা কোমর লোকেরা এমন হয় যে, তাদের উপর কারোর হক ধার্য হলে তারা তা আদায় করে না। আর তাদের হক যদি অন্যদের উপর ধার্য হয়, তাহলে তারা তা জোর করে হলেও আদায় করে নেয়।

তিনি আরও বলেছেন, দূরে সরে থাকা মুমিনের প্রকৃতি নয়। দানশীল ব্যক্তি কখনই দূরে সরে থাকা (কার্পণ্যের) নীতি গ্রহণ করে না।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

عَرَّفَ بَعْضَهُ وَاَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ -

(নবী তার স্ত্রীকে) এই বিষয়ে কতকটা সতর্ক করেছিল, আর কতকটা বাদ দিয়েছিল।

আমাদের নিকট মুকররম ইবনে আরমাদ, আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল মুসলিম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আল-হামানীকে বরতে শুনেছি, আমি ইবনুল মুকাররমকে বলতে শুনেছি, আমি আবূ হানীফাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন, যার কার্পণ্য থাকবে, তার সাক্ষ্য জায়েয হবে না। কার্পণ্য তাকে দূরে নিক্ষেপ করে। সে তার দূরবর্তীর তীব্রতায় ধোঁকার ভয় পায়। ফলে সে তার হক-এর উর্ধ্বে স্থান দেয় ধোঁকার ভয়কে। ফলে সে সততা-ন্যায়পরতার ধারক হতে পারে না।

আয়াস ইবনে মুআবিয়া থেকে এ রকম আরও অনেক বর্ণনার দৃষ্টান্ত আছে। ইবনে লাহইয়াতা আবুল আসওয়াদ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি আয়াস ইবনে মুআবিয়াকে বললাম, আপনি জানিয়েছেন যে, আপনি ইরাকের উচ্চমানের লোকদের কৃপণদের এবং সমুদ্রগামী ব্যবসায়ীদের সাক্ষ্য জায়েয মনে করেন না। বললেন, হ্যাঁ, তাই। তবে যারা ভারতের দিকে সমুদ্র যাত্রা করে, তারা তাদের দিয়ত নিয়ে ধোঁকাবাজি করে, আর দুনিয়ার স্বার্থের লালসায় পড়ে তাদের শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি করে, তাই আমি বুঝেছিলাম যে, আমি যদি কোন সাক্ষ্যে তাদের একজনকে দুই দিরহাম দিই, তাহলে সে তার ঋণে ধোঁকাবাজি করতে কুণ্ঠা বোধ করবে না। আর যারা ফারেস (পারস্যের) গ্রাম নগরে ব্যবসায় করে, তারা সূদে তাদেরকে লালায়িত বানায় জেনে শুনে। এ কারণে আমি সূদখোরদের সাক্ষ্যদানকে জায়েয ঘোষণা করতে অস্বীকার করেছি। আর ইরাকের শরীফদের অবস্থা এই যে, কোন দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা যখন তাদের কারোর উপর আসে, তখন তাদের সরদারের নিকট আসে ও তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, সুপারিশ করে। তখন আমি আবদুল আ'লা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর-এর নিকট বলে পাঠালাম যে, সে যেন আমার নিকট কোন সাক্ষ্য নিয়ে না আসে।

আগের কালের ফিকাহবিদদের থেকে বর্ণনা এসেছে, তাঁরা এমন লোকদের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেছেন, যাদের থেকে এমন সব ব্যাপারাদি প্রকাশিত হতো, যাতে তার কর্তার ফাসিকী তা কাটাতে পারত না। তবে তা তাদের দুর্বলতা কিংবা ভাঁড়ামি প্রমাণ করত। এ কারণে তাদের ও

তাদের মতো লোকদের সাক্ষ্যকে প্রত্যাখ্যান করা জরুরী মনে করেছেন। এ পর্যায়ের একটি বর্ণনা, যা আবদুর রহমান ইবনে সীমা আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ, মাহমুদ ইবনে খান্দাশ, জায়দ ইবনুল হুবাব, দাউদ ইবনে হাতিমুল বসরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, বসরায় নিযুক্ত বিলাল ইবনে আবূ বুরদাতা সে লোকের সাক্ষ্য জায়েয বলতেন না, যে মাটি খায় ও দাড়ি উৎপাটিত করে। আমাদের নিকট আবদুল বাকী ইবনে কানে হাম্মাদ ইবনে মুহাম্মদ, শুরাইহ, ইয়াহইয়া ইবনে সুলায়মান, ইবনে জুরাইয সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি মক্কার অধিবাসী ছিল। সে উমর ইবনে আবদুল আজীজের নিকট সাক্ষ্য দিল। সে লোকটি তার বাচ্চার দাড়ি উৎপাটিত করত এবং তার দাড়ি ও তার গোঁফের চারপাশের দাড়ি রেখে দিত। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি ? বলল, অমুক। বললেন, তুমি তোমার নামের উৎপাটনকারী। এই বলে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করলেন।

আবদুল বাকী আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে সাদ, ইসহাক ইবনে ইবরাহীম, আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ, আল-জায়দ ইবনে যকওয়ান সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি তার সাক্ষীকে বিচারপতি শুরাইহর নিকট ডাকলো। তার নাম ছিল রবীআতা। বললেন, হে রবীআতা! হে রবীআতা! সে কোন জবাব দিল না। পরে ডাক দিলেন, হে রবীআতাল কুয়াইফির বলে। তখন সে ডাকের সাড়া দিল। বললেন, আমি তোমার নাম ধরে ডাকলাম, কিন্তু তুমি তার কোন জবাব দিলে না। যখন তোমাকে 'কুফর' মিলিয়ে ডাকলাম, তখন তুমি ডাকে সাড়া দিলে, এর কারণ কি ? তখন সে বলল, আল্লাহ্ আপনার কল্যাণ করুন। রবীআতা হল আমার উপনাম— লকব। তখন বললেন, উঠ, দাঁড়াও। তার পক্ষকে বললেন, অন্যদেরও নিয়ে আস।

আবদুল বাকী আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমাদ, তাঁর পিতা ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম, সাঈদ ইবনে আবূ আরুবাতা, কাতাদাতা, জাবির ইবনে জায়দ, ইবন আব্বাস সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, নির্জলা মিথ্যাবাদীর সাক্ষ্য জায়েয নয়। হাম্মাদ ইবনে আবূ সালমা, আবুল মুহজিম, আবূ হুরায়রাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, দাস প্রথার ব্যবসায়ীদের সাক্ষ্য জায়েয নয়। শুরাইহ্ থেকে বর্ণিত হয়েছে, ঘুঘু, কবুতর শিকারীর সাক্ষ্য জায়েয মনে করতেন না। মুসমির বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি শুরাইহ্র নিকট সাক্ষ্য দিল তার লম্বা জামার আস্তিন ছিল সংকীর্ণ। পরে তিনি তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেন। বললেন, ও লোকটি অযূ করে কিভাবে এরূপ পোশাক পরা অবস্থায় থাকে ?

আবদুল বাকী ইবনে কানে মুয়ায ইবনুল মুসান্না, সুলায়মান ইবনে হরব, জরীর ইবনে হাজিম, আল-আ'মাশ, তমীম ইবনে সালামাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি শুরাইহ্র নিকট সাক্ষ্য দিল। সে বলল, আমি আল্লাহ্র সাক্ষ্যে সাক্ষ্য দিচ্ছি। আর আমি আজ তোমার কোন সাক্ষ্যই জায়েয ধরে নেব না।

আবূ বকর (র) বলেছেন, শুরাইহ্ যখন লোকটির মধ্যে বাড়াবাড়ি কৃত্রিমতা দেখলেন, যা তার কর্তব্যভুক্ত নয়, তখন তার সাক্ষ্য কবুলের মানদণ্ডে তাকে উত্তীর্ণ মনে করতে পারলেন না। আমরা এখানে যে বিষয়গুলোর উল্লেখ করলাম, তা আগের কালের মনীষীদের সম্পর্কে। তাঁরা উল্লিখিত কারণসমূহের দরুন তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা জরুরী মনে করেছেন। তবে

এগুলোর কর্তাদের ফাসিকী সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা হয়নি। তাদের সততা-ন্যায়পরতাও প্রত্যাখ্যাত হয়নি। এসব ঘটনা তাদের ভাঁড়ামি প্রমাণ করেছে মাত্র। এরই কারণে তারা তাদের সাক্ষ্যকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেননা এসব লোক উদ্ধৃত কার্যকলাপের দরুন এ আয়াতের আলোকে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। তা হল ঃ

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ -

সাক্ষী হিসেবে তোমরা যাদেরকে পছন্দ কর, তাদের মধ্য থেকে—

আর তাঁরা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেছেন তাঁদের মুজতিহাদ অনুযায়ী। যে সাক্ষীর ভাঁড়ামি তাঁর মতে প্রবল ও প্রকট হয়ে উঠেছে, হালকা বোধ হয়েছে বা দ্বীনি ব্যাপারকে গুরুত্ব দেয় না বলে মনে হয়েছে, তার সাক্ষ্য তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ ادب القاضى গ্রন্থে লিখেছেন ঃ যার ভাঁড়ামি চরিত্র প্রকট হয়ে দেখা দেবে, আমি তার সাক্ষ্য গ্রহণ করব না। বলেছেন, মুখান্নাস বা নপুংসকের সাক্ষ্য জায়েয হবে না। যে ঘুঘু বা কবুতর উড়ায় বা খেলায়, তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে না। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাতা থেকে কথিত, এক ব্যক্তি ইবনে আবূ লায়লার নিকট সাক্ষ্য দিয়েছিল। তিনি তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন আমি ইবনে আবূ লায়লাকে বললাম, অমুক ব্যক্তির ন্যায় .... তার অবস্থা এই, তখন তা শুনে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন বললেন, সে তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ? সে তো এক দরিদ্র ব্যক্তি ? .... তা থেকে বোঝা গেল, তাঁর নীতি হল, দারিদ্র্য সাক্ষ্য কবুলের প্রতিবন্ধক। কেননা তার উপর নির্ভর করা যায় না। তাকে ধন-মালের লোভ বিভ্রান্ত করতে পারে। সে এমন বিষয়ে সাক্ষ্য দাঁড় করাতে পারে, যা জায়েয নয়।

ইমাম মালিক ইবনে আনাস বলেছেন, বিপুল পরিমাণ জিনিসের সওয়ালের সাক্ষ্য জায়েয নয়। অল্প জিনিসের তা জায়েয, যদি তারা সততা-ন্যায়পরতা সম্পন্ন হয়। মালিক দরিদ্রের সাথে প্রার্থনা করার ব্যাপারটিকে শর্ত করেছেন। বেশি পরিমাণ জিনিসে তুহ্মাতের কারণে সাক্ষ্য কবুল করেন নি। হালকা অল্প-স্বল্প জিনিসের বেলায় সাক্ষ্য কবুল করেছেন। কেননা তাতে তুহ্মাত থাকে না। ইমাম শাফেয়ীর মতো আল-মুজানী ও রুবাই বর্ণনা করেছেন, এ ব্যক্তির উপর যদি বিজয়ী ও অধিক প্রকাশমান হয় আল্লাহ্র আনুগত্য ও মানবিকতা, তার সাক্ষ্য কবুল করা যাবে। পক্ষান্তরে তার উপর বিজয়ী ও প্রধান হয়ে উঠে গুনাহ, নাফরমানী ও অ-মানবিকতা, তাহলে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে।

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল হিকাম ইমাম শাফেয়ী থেকে বর্ণনা করেছেন, একটি লোকের বেশির ভাগ কাজ যদি আল্লাহ্র আনুগত্যমূলক হয়, কোন কবীরা গুনাহের দিকে অগ্রগতি না থাকে, তাহলে সে عدل সততা-ন্যায়পরতা সম্পন্ন লোক। সাহসিকতা নির্ভীকতার অর্থ যদি সংরক্ষণশীলতা, উত্তম নির্বাকতা, মর্যাদা রক্ষা, ভাঁড়ামি পরিহার বোঝায়, তাহলে তা ঠিক কথা। আর তা বলে যদি পোশাক-পরিচ্ছদের পবিত্র-পরিচ্ছন্নতা, যানবাহনের সচলতা ও হাতিয়ার যন্ত্রপাতির নতুনত্ব ও উত্তম কারুকার্যতা বুঝিয়ে থাকে, তাহলে তা অনেক দূরবর্তী কথা। বরং তা সত্যের ব্যতিক্রম। কেননা এসব ব্যাপার ও বিষয়াদি কোন মুসলিমের নিকটই সাক্ষ্য গৃহীত হওয়ার শর্ত হতে পারে না।

আবূ বকর (র) বলেছেন, আগের কালের মনীষীদের যেসব কথা-উক্তির আমরা উল্লেখ করেছি, বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদদের যে মতামত আমরা তুলে ধরেছি, সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে তাঁরা যে সব ব্যাপার-বিষয়ের গুরুত্ব প্রদান করতেন বলেছি, এ কথা স্পষ্ট যে, এ সবই সাক্ষ্য

কবুলের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রবল ধারণা অনুমান ভিত্তিক ইজতিহাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁদের মতে এ সবের গুরুত্ব ছিল বলেই তাঁরা তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সাক্ষ্যদানের জন্যে পছন্দনীয় ব্যক্তিকে, কার উপর আস্থা স্থাপন করা যায়, তা তাঁরা এভাবেই নির্ধারণ করেছেন।

যার ব্যাপারে কোন সংশয় জাগেনি, বিচারক সাক্ষ্যদানের সময়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে কি করবে না, এ বিষয়ে তাদের বিভিন্ন মত রয়েছে। হযরত উমর (রা) হযরত আবূ মূসা (রা)-এর প্রতি বিচার কার্য সম্পর্কে যে পত্র লিখেছিলেন, তাতে তিনি লিখেছিলেন ঃ

اَلْمُسْلِمُوْنَ عَدُوْلٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اِلاَّ مَجْلُوْدٌ فِىْ حَدٍّ اَوْمُجَرَّبًا عَلَيْهِ شَهَادَةَ زُوْرٍ اَوْظَنِيْنًا فِىْ وَلاَءٍ اَوْقَرَابَةٍ -

সব মুসলমানই পরস্পরের ব্যাপারে عدول —সততা-ন্যায়পরতা সম্পন্ন। তবে কোন শরীয়াতী দণ্ডে যে লোক দণ্ডিত হয়েছে; কিংবা যে লোক সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়েছে অথবা বন্ধুত্ব বা নিকটাত্মীয়তার ব্যাপারে সন্দেহযুক্ত, সে عدول গুণের বাইরে।

মনসূর বলেছেন, আমি ইবরাহীমকে বললাম, মুসলমানদের মধ্যে عدل কি ? বললেন যার ব্যাপারে কোনরূপ সংশয়-সন্দেহ দেখা যায় না, প্রকাশ পায়নি, সেই عدل সততা-ন্যায়পরতা সম্পন্ন। হাসানুল বসরী ও শবী থেকেও এরূপই বর্ণিত হয়েছে। মামার তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'আল-হাসানুল বসরী যখন বিচারপতি নিযুক্ত হলেন, তিনি সাধারণভাবে মুসলমানদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন। তবে প্রতিপক্ষ সাক্ষীকে 'জেরা' করত। হুশাইম উল্লেখ করেছেন, আমি ইবনে শাবরামাতাকে বলতে শুনেছি, তিনিটি কাজ যা আমার পূর্বে কেউ করেনি এবং আমার পরে তা কেউ ত্যাগও করবে না কখনই। তা হল সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা, জেরা করা। পক্ষদ্বয়ের দলীলাদি প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠিত করা এবং সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদে মিষ্ট কথা বলা।

ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, আমি সাক্ষীদের ব্যাপারে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করি না। তবে যে পক্ষের বিরুদ্ধে সে সাক্ষ্য দেয়, তারা যদি তাদের আঘাত দেয় বা ঘায়েল করে তাহলে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করি। তারা যদি তাদেরকে আঘাত করে, তাহলে আমি তাদের বিষয়ে গোপনে ও প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করি এবং প্রকাশ্যভাবে তাদের পরিচ্ছন্নতা প্রমাণ করি। তবে 'হদ্দ' ও কিসাসের সাক্ষীদের ক্ষেত্রে আমি এ নীতি অনুসরণ করি না। আমি তাদের সম্পর্কে গোপনে জিজ্ঞাসাবাদ করি এবং প্রকাশ্যে তাদের নির্মলতা প্রকাশ করি। ইমাম মুহাম্মাদ সাক্ষীদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন তাদেরকে আঘাত করা না হলেও।

ইউসূফ ইবনে মূসা আল-কাতান আলী ইবনে আমের ইবনে শাবরামাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, গোপনে সর্বপ্রথম যে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, সে হলাম আমি। লোকদেরকে যখন বলা হতো, তোমাকে অম্লান প্রমাণ করবে এমন কেউ আছে কি ? থাকলে তাকে উপস্থিত কর। তখন এক-একজন বলত, আমার জনগণই আমার অম্লানতার কথা বলবে। তখন লোকেরা লজ্জাবোধ করত ও তারাই তার অম্লানতার কথা বলত। আমি যখন এ ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, তখন গোপনে আমি জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলাম। পরে তাদের সাক্ষ্য সহীহ প্রমাণিত হলে তখন বলতাম, তোমার অম্লানতা প্রকাশ্যভাবে কে প্রমাণ করবে, তাকে উপস্থিত কর।

আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদ সাক্ষীদের সম্পর্কে গোপনে ও প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করতেন এবং

তাদের অম্লানতাও প্রকাশ্যে প্রমাণ করতেন— প্রতিপক্ষ তাদের দোষ না ধরলেও। মালিক ইবনে আনাস বলেছেন, সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় দেয়া যাবে না, যতক্ষণ তাদের সম্পর্কে গোপনে খবরাখবর নেয়া না হবে। লায়স বলেছেন, আমি তো লোকদেরকে পেয়েছি কিন্তু সাক্ষীদের থেকে তাদের অম্লানতা প্রমাণ করার দাবি জানাই নি। বিচারক পক্ষকে বলতেন, তোমাদের নিকট এমন কোন লোক থাকলে নিয়ে আস, যে ওদের সাক্ষ্যের উপর জেরা করবে। অন্যথায় আমি ওদের সাক্ষ্য অনুযায়ী তোমার উপর রায় জারি করে দেব। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সাক্ষীদের ব্যাপারে গোপনে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে। যদি ফিরে যায়, তাহলে তার এ ফিরে যাওয়ার কারণ প্রকাশ্যভাবে জিজ্ঞাসা করা হবে, যেন লোকেরা জানতে পারে যে, এ ব্যক্তিই তার সাক্ষ্য থেকে ফিরে গেছে। যেন এক নামের সাথে অন্য নাম মিলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয়।

আবূ বকর (র) বলেছেন, আগের কালের মনীষীদের মধ্যে যিনি সেই ব্যক্তির সাক্ষ্য থেকে ফিরে যাওয়ার কথা বলেছে, যে তার মুসলিম হওয়ার কথা প্রকাশ করেছে, তিনি ভিত্তি করেছেন লোকদের সাধারণ অবস্থার প্রেক্ষিতকে, সাধারণ্যে সাক্ষীর সততা-ন্যায়পরতা প্রমাণের ব্যাপারে। তখন তো ফাসিক লোকের সংখ্যাও ছিল কম। আর নবী করীম (স) নিজে তার পরবর্তী প্রথম যুগ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগের মঙ্গল ও কল্যাণময়তার ঘোষণা দিয়ে গেছেন। আমাদের নিকট আবদুর রহমান ইবনে মাহদী, সুফিয়ান, মনসুর, ইবরাহীম উবায়দাতা, আবদুল্লাহ সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ -

সর্বোত্তম লোক আমার সময়ের, তার পরে তারা যারা এদের পরে আসবে, তার পরে তারা যারা তাদের পরে আসবে।

—এই তিন বা চারটি যুগ সম্পর্কে এ কথা। তার পরে এমন লোকদের আগমন হবে, যখন তাদের একজনের সাক্ষ্য ছাড়িয়ে যাবে তার কিরা-কসমকে। আর তার কিরা-কসম ছাড়িয়ে যাবে তার সাক্ষ্যকে। বলেছেন, আমাদের সময়ের লোকেরা সাক্ষ্যদান ও ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির জন্যে আমাদেরকে মারত। আমরা তখন অল্প বয়সের বালক ছিলাম। আগের দিনের মনীষী ও বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ তাদের সময়ের মুসলমানদেরকে সততা-ন্যায়পরতার মানদণ্ডে উন্নীত মনে করতেন। আর এ সততা-ন্যায়পরতার প্রকাশের কারণে সাক্ষ্যকে জায়েয ধরে নিতেন। তাদের মধ্যে সন্দেহজনক লোক ছিল না, তা নয়। ফিস্‌ক-ফুজুরীও শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ধ্বনিত হতো। ফলে তাদের ব্যাপারটা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে যেত। ইমাম আবূ হানীফা ছিলেন হাদীসে উক্ত তৃতীয় যুগের লোক, যার মঙ্গলময়তা ও কল্যাণশীলতার সাক্ষ্য স্বয়ং নবী করীম (স) দিয়েছেন। ফলে তিনি যে অবস্থার মধ্যে ছিলেন, সেই প্রেক্ষিতেই কথা বলেছেন। তিনি যদি পরবর্তীকালে লোকদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে পারতেন, তাহলে সাক্ষীদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে তা-ই বলতেন, যা অন্যান্যরা বলেছেন। আর জিজ্ঞাসাবাদ না করে কোন সাক্ষীরই সততা-ন্যায়পরতার উপর ভিত্তি করে রায় দিতেন না।

নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি এক আরব বেদুঈনকে— যে নতুন চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিয়েছিল, বলেছিলেন— তুমি কি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাক্ষ্য দাও?

বলল, হ্যাঁ, তারপরে তিনি লোকদেরকে রোযা রাখার হুকুম দিলেন তার দেয়া খবরের ভিত্তিতে। তার মুসলমান হওয়া প্রকাশিত হওয়ার পর তার সততা-ন্যায়পরতা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই তুলেননি। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, সাক্ষীদের সততা ন্যায়পরতা ও অম্লানতার এবং তাদের পছন্দনীয় হওয়ার ব্যাপারটি তাদের ইজতিহাদ ও বিজয়ী ধারণার ভিত্তিতে মীমাংসিত হতো। বিশেষ করে এ জন্যে যে, মানুষের ব্যাপারাদি অজানা— গায়েব লোকে নিহিত। আমাদের জ্ঞান তা আয়ত্ত করতে পারে না। আবার আল্লাহ্‌ও আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন লোকদের বাহ্যিক অবস্থা দেখে প্রতারিত না হতে এবং তারা নিজেদের সম্পর্কে বিশ্বস্ততা ও কল্যাণকামিতার যে সব দাবি করে তাতে ভুলে না যেতে। আল্লাহ্‌র কথা হলো ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا -

এমন লোক-ও আছে , যার কথা দুনিয়ার জীবনে তোমাকে সন্তুষ্ট বিস্মিত করে দেয়। (সূরা বাকারা ঃ ২০৪)

কিন্তু পরে তাদের আসল ব্যাপার ও অবস্থা সম্পর্কে জানিয়েছেন এই বলে ঃ

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا -

যখন সে দুর সরে যায়, তখন সে দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য চেষ্টা চালায়।
(সূরা-বাকারা ঃ ২০৫)

অর্থাৎ আল্লাহ যার বাহ্যিক কথা আমাদেরকে মুগ্ধ করে তাদের ভেতরকার আসল কি তা জানিয়ে দিলেন।

অন্য লোকদের অবস্থা বর্ণনা পর্যায়ে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ -

তুমি যখন তাদেরকে দেখবে, তাদের অবয়বসমূহ তোমাকে মুগ্ধ-বিস্মিত করে দেবে। (সূরা মুনাফিকুন ঃ ৪)

মোটকথা, আল্লাহ লোকদের বাহ্যিক অবস্থা ও কথাবার্তায় প্রতারিত হতে নিষেধ করেছেন। আর সেই রাসূল (স)-কেই অনুসরণ করতে বলেছেন আমাদেরকে। বলেছেনঃ وَاتَّبِعُوْهُ এবং তোমরা তাকে অনুসরণ কর।

বলেছেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ -

তোমাদের জন্যে আল্লাহ্‌র রাসূলে উত্তম আদর্শ রয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।
(সূরা আহযাব ঃ ২১)

তাই ব্যাপার যদি মানুষের বাহ্যিক প্রকাশের উপর নির্ভর করতে হয়, তার সাক্ষ্যে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টির ব্যবস্থা না হয় এবং তার বিষয়ে জানা-শুনার পন্থা গ্রহণ করা না যায়, আর তা সত্ত্বেও তার সততা-ন্যায়পরতার উপর বিজয়ী ধারণা জন্মে তাহলে তার সাক্ষ্য অবশ্যই গ্রহণ করতে

হবে। যে সব সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায়, তাদের দুটি গুণের কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। তার একটি হলো العدالة সততা-ন্যায়পরতা । বলেছেন ঃ

اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ -

তোমাদের মধ্য থেকে সততা-ন্যায়পরতা সম্পন্ন দুইজন। (সূরা মায়িদা ঃ ১০৬)

বলেছেন ঃ

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ -

তোমাদের মধ্য থেকে সততা-ন্যায়পরতা সম্পন্ন লোককে সাক্ষী বানাও।

(সূরা আত্-তালাক ঃ ২)

আর দ্বিতীয় গুণ হল সাক্ষীর পছন্দনীয় মনোনীত হওয়া। বলেছেন ঃ

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ -

সাক্ষী হিসেবে তারা তোমাদের পছন্দনীয়-মনোনীত, তাদের থেকে—

আর পছন্দনীয় মনোনীত তো তারাই হবে যারা সততা-ন্যায়পরতা সম্পন্ন।

হ্যাঁ, সততা-ন্যায়পরায়ণতা সম্পন্ন হওয়ার পরও সাক্ষী হিসেবে অপছন্দনীয়-অমনোনীত হতে পারে। হতে পারে সে মানসিক যন্ত্রণাগ্রস্ত, অসতর্ক ব্যক্তি। তাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করা বা তাকে সম্মোহিত করা অসম্ভব নয়। কাজেই আল্লাহ্‌র কথাঃ 'তোমাদের পছন্দনীয় মনোনীত সাক্ষী' কথাটিতে দুটি গুণ সমন্বিত। একটি ন্যায়পরতা-সততা আর অপরটি জাগৃতি স্মরণশক্তির তীব্রতা ও বুঝ-সমঝের তীক্ষ্ণতা।

যিনার ক্ষেত্রে সাক্ষীর জন্যে শুধু সততা-ন্যায়পরায়ণতা থাকার কথা আল্লাহ বলেননি। তাতে সততা-ন্যায়পরতা ও পছন্দনীয় হওয়ার সব কয়টিরই শর্ত রয়েছে। তা আল্লাহ্‌র এ কথার আলোকে বলা হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا -

তোমাদের নিকট কোন ফাসিক ব্যক্তি কোন খবর নিয়ে এলে তোমরা তার সততা-যথার্থতা যাচাই কর। (সূরা হুযরাত ঃ ৩)

ফাসিকদের দেয়া সর্বপ্রকারের খবরাখবরের বেলায় সততা-যথার্থতা যাচাই করার এ আদেশ অনিবার্যভাবে কার্যকর হতে হবে। আর সাক্ষ্যদানও এক প্রকারের সংবাদ দান। অতএব তাতে প্রমাণের দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তা অর্জিত হওয়া আবশ্যক, বিশেষ করে সাক্ষী যদি 'ফাসিক' ব্যক্তি হয়। ফাসিক ব্যক্তির দেয়া সংবাদে প্রমাণ-দৃঢ়তার উপর আল্লাহ নিজেই যখন অকাট্য দলীল এনেছেন এবং আমাদের জন্যে সততা ও ন্যায়পরতা সম্পন্ন পছন্দনীয় সাক্ষীর সাক্ষ্য কবুল করা বাধ্যতামূলক করেছেন। একজনের ফিস্‌ক-ফুজুরীর ব্যাপারটি তো দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে জানা যায়। কিন্তু সততা-ন্যায়পরতার কথা বাহ্যিক অবস্থা ছাড়া দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে জানা যেতে পারে না। এ থেকে জানা গেল যে, তা বিজয়ী ধারণার উপর ভিত্তিশীল। সাক্ষীর কল্যাণময়তা, তার উচ্চারণের সত্যতা ও আমানতদারী যদিও বেশীর ভাগ ধারণার উপর ভিত্তিশীল তবুও তা এক প্রকারের ইলম। যেমন মহিলা হিজরতকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ -

যদি তোমরা তাদেরকে মুমিন বলে জানতে পার, তাহলে তাদেরকে কাফিরদের দিকে ফিরিয়ে দেবে না। (সূরা মুমতাহিনা ঃ ১০)

এ আয়াতের যে 'ইলম' বা জানার কথা বলা হয়েছে, তা বাহ্যিকভাবে জানার ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার কিনা তা জানার কথা বলা হয়নি। সাক্ষীর সততা-ন্যায়পরতা জানার ব্যাপারটিও বাহ্যিক উপায়ে জানা। গায়বীভাবে জানার বিষয় নয়। কেননা গায়বী জানা তো কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র পক্ষেই সম্ভব। নিত্য নবঘটিত ব্যাপারাদিতে শরীয়াতের হুকুমই জিহাদের পন্থায় জানা এবং সাক্ষীর কথার সত্যতা প্রমাণের ব্যাপারে এটাই হচ্ছে একটা মৌলিক নীতি। সাক্ষ্যসমূহ বস্তুত দুনিয়া ও দ্বীনী ব্যাপারসমূহের নিদর্শনাবলীর মধ্যে গণ্য। জনগণের অধিকার প্রমাণ ও দলীল-দস্তাবেজে সৃষ্টিকুলের কল্যাণ তার দ্বারাই সঙ্ঘটিত হয়। জনগণের বিষয়-সম্পত্তির মালিকানা, নসব, বংশধারা এবং রক্তের বংশানুক্রমিকতা প্রমাণেরও এটাই উপায়। বিজয়ী ধারণা ও অধিকাংশ রায়ের উপরই তা ভিত্তিশীল। কেননা সাক্ষীগণের দেয়া সাক্ষ্য ও যে বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া হল তার সত্যতা যথার্থতা সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কোন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব নয়। প্রত্যেক যুগের মাসুম ইমামের কথা যারা বলেন, তাদের কথার বাতুলতা উক্ত কথার আলোকে স্পষ্ট হয়ে উঠে। যারা এরূপ যুক্তি দেখায় যে, সমস্ত দ্বীনী ব্যাপার বিজয়ী ধারণা নয়— প্রকৃত ইল্‌মের উপর নির্ভরশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়, আর তা যুগ-ইমামের নিকট থেকেই পাওয়া যায়। যুগ-ইমাম ছাড়া ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়, কেননা মানুষের রায়-অভিমত-ভুলও হতে পারে, ঠিকও হতে পারে। এ রূপ যুক্তি প্রদর্শন সত্যভিত্তিক নয়। কেননা তাদের এ ধারণা যদি সত্য হয়, তাহলে কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের প্রশ্ন উঠে না। হ্যাঁ, কেবলমাত্র মাসুম ইমামের সাক্ষ্যই গ্রহণীয় হতে পারে। যাদের ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে থাকা চরমভাবে বিশ্বাস্য।

তাই আল্লাহই যখন সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে আদেশ করেছেন যদি তারা তাদের বাহ্যিক অবস্থার দিক দিয়ে পছন্দনীয় হয়, প্রকৃত জ্ঞান যদি লাভ না-হয়, গায়বী বিষয়াদি যদি নাও জানা যায়— সেই সাথে মিথ্যা ও ভুল বলার সম্ভাবনাও থাকে, তবু তা গ্রহণ করতে হবে।

এ থেকেও তাদের নির্মিত আসল ভিত্তিটিই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। তারা যদি বলে, ইমাম সাক্ষীদের সত্যতা ও অসত্যতা জানতে পারেন, তাহলে জবাবে বলা যাবে, তাহলে মামলা মুকদ্দমার শুনানী ও সাক্ষ্য গ্রহণ ইত্যাদিতে কেবল মাসুম ইমামেরই করণীয় হবে। সেই ইমামকে বিচারক— বিচারপতি হতে হবে, ইমামের ন্যায় মাসুম না হলে এবং সাক্ষীদের ব্যাপারদি গায়েবীভাবে না জানলে তার বিচারক হওয়া উচিত নয়, সে আমানতদারও তো হতে পারে না। ইমামের সাহায্যকারীদেরও তো মাসুম ও ভুল-ভ্রান্তি পদস্খলন মুক্ত হতে হবে। কেননা দ্বীনের হুকুম-আহকাম তাদের সাথেও তো জড়িত। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তো তা নয়। এ সব গুণ ছাড়াও লোকেরা শাসক-বিচারক হতে পারে, হতে পারে সাক্ষী ও সাহায্যকারী। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, দ্বীনের অধিকাংশ ব্যাপারই ইজতিহাদী রায় ও বিজয়ী ধারণার উপর ভিত্তিশীল।

আলোচনায় আমারা দেখিয়েছি যে, উক্ত আয়াত দ্বারা সাক্ষীদের সততা-ন্যায়পরতার ব্যাপারে ইজতিহাদী রায় ও বিজয়ী ধারণার উপর নির্ভর করতে বাধ্য করেছেন, এ থেকেই যে সব

ব্যাপারে শরীয়াতের অকাট্য দলীল নেই, কোন ইজমাও অনুষ্ঠিত হয়নি, সে সব ক্ষেত্রে কিয়াস ও ইজতিহাদ করাকে যারা অগ্রাহ্য করে, তাদের কথার বাতুলতাও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। কেননা রক্তধারা, বংশধারা ও ধন-মালের সাথে দুনিয়া ও দ্বীনী কল্যাণের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। এ সব ব্যাপরেই আল্লাহ্ তা'আলা সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করার আদেশ করেছেন। যদিও আমরা তাদের গায়বী অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানি না। তাদের সাক্ষ্য সম্পর্কে আমরা শুধু তাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখেই ধারণা করতে ও তার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধিন্ত গ্রহণ করতে পারি। যদিও তাদের মিথ্যা ও ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে থেকে মুক্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। তাদের ইজতিহাদ জায়েয প্রমাণিত হয়। বিজয়ী ধারণা ও মতের ভিত্তিতে কাজ করা সম্ভব প্রমাণিত হয় বিশেষ করে যে সব বিষয়ে শরীয়াতের কোন হুকুম পাওয়া যায়নি, আগের লোকদের কোন ঐকমত্যও কোন ব্যাপারে হয়নি।

নবী করীম (স) থেকে দ্বীনী ব্যাপারাদি পর্যায়ে বহু খবরাখবর বর্ণিত হয়েছে, যা ঠিক নির্ভরযোগ্য কোন ইলম দেয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা কবুল করা উপরোদ্ধৃত আলোচনার আলোকে জায়েয প্রমাণিত হয়। যেমন সাক্ষীদের দেয়া সাক্ষ্য গ্রহণ, যদিও যে বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে তা নিঃসন্দেহে সত্য— এমন কথা বলা যায় না। অথচ তা গ্রহণ করতে আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে। যদিও বাহ্যিক ইলমের ভেতরে নিহিত প্রকৃত অবস্থা গায়েবী এবং তা বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত। তাই যারা বলে যে, খবর দ্বীনী বিষয়ে নিশ্চিত ও সন্দেহমুক্ত ইলম দেয় না তা কবুল করা জায়েয নয়, পূর্বোক্ত আলোচনার আলোকে তা বাতিল প্রমাণিত হয়। 'খবরে ওয়াহিদ' গ্রহণ করা যাবে না বলে যারা দলীল পেশ করে, তাদের দলীল ও কথাও উক্ত আলোচনায় ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়। তাদের কথা হল, আমরা যদি 'খবরে ওয়াহিদ' কবুল করি, তাহলে খবরদাতাকে আমরা রসূলে করীম (স)-এর মর্যাদা থেকেও অনেক বেশি মর্যাদা দেয়ার অপরাধ করি। কেননা আসলে খোদ রাসূলে করীম (স)-এর দেয়া খবর আমরা মানতে বাধ্য হই তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণকারী মুজিযা জাহির হওয়ার পর। অথচ আল্লাহ আমাদেরকে সাক্ষীদের সাক্ষ্য কবুল করতে বলেছেন তাদের বাহ্যিক সততা-ন্যায়পরতার ভিত্তিতে, তাদের সত্যতা প্রমাণকারী কোন মুজিযা জাহির না হওয়া সত্ত্বেও। কিন্তু খবরে ওয়াহিদ কবুল করা সম্পর্কে তাদের এ কল্পনা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

আমরা উল্লেখ করেছি, সাক্ষী সততা-ন্যায়পরতা সম্পন্ন হলেও তার দেয়া সাক্ষ্যকে তুহমত মুক্ত হতে হবে। তা এজন্যে যে, ফিকাহবিদগণ তার কোন-কোনটির ব্যাপারে একমত আর কোন-কোনটির ব্যাপারে বিভিন্ন মত। ভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, সাক্ষীর সাক্ষ্য তার সন্তানের জন্যে, তার পিতার জন্যে বাতিল। তবে উসমানুলবত্তী বলেছেন, সন্তানের সাক্ষ্য পিতার জন্যে, পিতার সাক্ষ্য পুত্রের জন্যে, তার স্ত্রীর জন্যে জায়েয হবে, যদি তারা সততা-ন্যায়পরতা, পবিত্র-পরিচ্ছন্ন চরিত্রের এবং উচ্চ মর্যাদায় সুবিখ্যাত হয়। তবে এতে সব মানুষ কখনই সমান হয় না। এ কারণে পিতা ও অনাত্মীয় ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য হবে। তবে হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদ মালিক, লায়স, শাফেয়ী ও আওজায়ী প্রমুখ মনীষী তাদের একজনের সাক্ষ্য অন্যজনের জন্যে জায়েয মনে করেন না। আবদুর রহমান ইবনে সীমা আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল, তাঁর পিতা, অকী', সুফিয়ান, জাবির, শবী, শুরাইহ্ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, পুত্রের সাক্ষ্য পিতার জন্যে ও পিতার সাক্ষ্য পুত্রের, স্ত্রীর সাক্ষ্য স্বামীর জন্যে, স্বামীর সাক্ষ্য তার স্ত্রীর জন্যে জায়েয হবে না। আয়াস ইবনে মুআবিয়াতা জায়েয মনে করেন ব্যক্তির সাক্ষ্য তার নিজের পুত্রের জন্যে। আবদুর রহমান ইবনে সীমা আবদুল্লাহ ইবনে আহ্মাদ

তাঁর পিতা— আফফান, হাম্মাদ ইবনে জায়দ, খালিদুল হাযা, আয়াস, ইবনে মুআবিয়া সূত্রেও এরূপ বর্ণনা এসেছে ঃ

পিতার সাক্ষ্য পুত্রের জন্যে বাতিল, তা প্রমাণ করে এ আয়াত ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْ بُيُوْتِكُمْ اَوْبُيُوْتِ اٰبَائِكُمْ -

তোমরা তোমাদের নিজেদের ঘর কিংবা তোমাদের পিতার ঘর থেকে আহার করবে, তাতে কোন দোষ নেই।

এতে সন্তান বা 'পুত্রদের ঘর' কথাটির স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ নেই। কেননা তা এর মধ্যেই শামিল রয়েছে। কেননা পুত্ররা তো পিতার সাথেই সম্পর্কিত। তাই 'তাদের ঘর' বলেই 'তাদের পুত্রদের ঘর' বলা যথেষ্ট মনে করেছেন। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

তুমি এবং তোমার ধন-মাল তোমার পিতার জন্যে।

পুত্রের ধন-মাল পিতার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বলেছেন ঃ

اِنَّ اَطْيَبَ مَا اَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسَبِهِ وَاِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسَبِهِ فَكُلُوْا مِنْ كَسَبِ اَوْلَادِكُمْ -

ব্যক্তির নিজ উপার্জন থেকে আহার করা অতীব উত্তম। তার সন্তান-ও তারই উপার্জন। অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে আহার কর।

এ কথায় পুত্রের মালিকানাকে পিতার মালিকানা বলা হয়েছে এবং তা খাওয়া মুবাহ্‌ বলা হয়েছে। তাকে তারই উপার্জন বলে অভিহিত করা হয়েছে। কাজেই তার পুত্রের জন্যে তার সাক্ষ্য পাওয়ার হক প্রমাণিত হয়েছে, যেন তা নিজের জন্যেই প্রমাণিত। আর নিজের জন্যে নিজের সাক্ষ্য যে বাতিল, তা জানা-ই আছে। কাজেই তার পুত্রের জন্যেও তার সাক্ষ্য বাতিল হবে। পুত্রের ব্যাপারে যখন তা প্রমাণিত হল, সেই হুকুমই প্রমাণিত হবে পিতার জন্যে তার পুত্রের সাক্ষ্য। কেননা এ দুজনের মধ্যে কেউ কোন পার্থক্য করে না।

যদি বলা হয়, সাক্ষী সততা-ন্যায়পরতা সম্পন্ন হলে এদের সকলেরই সাক্ষ্য কবুল হওয়া উচিত। যেমন তা সম্পর্কহীন ব্যক্তির জন্য গৃহীত হয়। তার সাক্ষ্য তুহমাতের কারণে এদের সকলের জন্যে কবুল করা না হলে, তাহলে সম্পর্কহীন ব্যক্তির জন্যেও তা কবুল করা জায়েয হবে না। কেননা যে লোক তার পুত্রের জন্যে সাক্ষ্যে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হবে, যা তার জন্যে হক হবে না, তাই অপরিচিত সম্পর্কহীন ব্যক্তির জন্যে এ ধরনের তুহমাত তার উপর-ও হওয়া অসম্ভব নয়।

জবাবে বলা যায়, পুত্রের জন্যে পিতার সাক্ষ্য কবুল করার তুহমাত প্রতিবন্ধক নয়। আর তার পিতার জন্যে তুহমাত ফাসিকী এবং মিথ্যা নয়। তুহমাত তাতে এ দিক দিয়ে যে, সে হবে তার নিজের জন্যে বাদী। লোকদের কোন একজন— তার আমানতদারী প্রমাণিত হলে এবং তার সততা-ন্যায়পরতা যদি সহীহ্‌ও হয়, তাহলে সে নিজের জন্যে যা সে দাবি করে তাতে তার তাসদীককারী হওয়া জায়েয নয়, সে যে তাকযীব করে তার ভিত্তিতে নয়, বরং এ দিক দিয়ে যে, নিজের জন্যে প্রত্যক দাবিকারীর দাবি প্রমাণিত নয়। প্রমাণিত হয় অকাট্য দলীলের

ভিত্তিতে, যা তার জন্যে সে জিনিসের সাক্ষ্য দিচ্ছে। ফলে নিজের পুত্রের জন্যে সাক্ষ্যদাতা নিজের জন্যে দাবিকারীর মতই।

আমাদের হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, যে সাক্ষী তার সাক্ষ্যকে নিজের দিকে টানবে গনীমতের মাল হিসেবে; কিংবা সে তদ্দ্বারা নিজের থেকে জরিমানা হিসেবে দূর করে, তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা এ সময় সে দাবিকারীর স্থলাভিষিক্ত হবে। আর দাবিকারী— বাদী নিজের মামলার সাক্ষী হতে পারে না। আর নবী করীম (স) অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কেউ হতে পারে না। প্রকাশ্য মুজিযা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে যে, তিনি সত্য কথা বলেছেন, সত্য ছাড়া কখনই কিছু বলেন নি। তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা— তিনি কখনও মিথ্যা বলেছেন বলা সম্পূর্ণ নাজায়েয। আমরা নিঃসন্দেহে জানি, তিনি ভেতরে তা-ই ছিলেন, যা ছিলেন প্রকাশ্যে। তাঁর ভেতরটা বাইরের সাথে পুরামাত্রায় সামঞ্জস্যশীল ছিল। তিনি যে দাবি করেছেন নিজের ব্যাপারে, তিনি শুধু তা করেই ক্ষান্ত থাকেন নি। তার সত্যতা অন্যের সাক্ষ্য দ্বারাও প্রমাণ করেছেন যখনই প্রতিপক্ষ তার দাবি করেছে। তা খুজায়মা ইবনে সাবিতের একটি ঘটনা। আবদুর রহমান ইবনে সীমা আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ তাঁর পিতা, আবুল ইয়ামান, শুয়ায়ব, জুহরী, আমারাতা ইবনে খুজায়মাতাল আনসারী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তার চাচা রাসূলে করীম (স)-এর একজন সাহাবী, তিনি তাঁকে বলেছেন, নবী করীম (স) একজন বেদুঈনের নিকট থেকে একটা ঘোড়া ক্রয় করেছিলেন। তখন বেদুঈন বলতে লাগল, একজন সাক্ষী রাখুন, যে সাক্ষ্য দেবে যে, আমি আপনার নিকট ঘোড়াটি বিক্রয় করেছি। তখন খুজায়মা বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ঘোড়াটি কিনেছেন আর সে আপনার নিকট বিক্রয় করেছে। তখন নবী করীম (স) তাঁর দিকে ফিরে তাকালেন, জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের সাক্ষ্য দেবে? বললেন, হে রাসূল! আপনার সত্যতার সাক্ষ্য দেব। তখন নবী করীম (স) খুজায়মাতার সাক্ষ্যকে দুজন সাক্ষীর সমতুল্য বানালেন। বোঝা গেল, নবী করীম (স) যে দাবি করেছেন তার সত্যতা প্রমাণের জন্যে নিজের দাবিকেই যথেষ্ট মনে করেন নি। বরং অকাট্য দলীল ও নিদর্শনাদির দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি সত্য ছাড়া কিছু বলতেন না। বেদুঈন যখন তাঁকে সাক্ষ্য আনতে বলল, তখন বলেন নি যে, না, তার কোন প্রমাণ নেই। সব বাদী— দাবিকারীর ব্যাপারই এরূপ। অতএব লোকদের অকাট্য প্রমাণ পেশ করা আবশ্যক। কিন্তু তদ্দ্বারা নিজের দিকে গনীমত টানতে পারবে না। আর তার দ্বারা নিজের থেকে জরিমানাও রোধ করবে না। আর পুত্রের জন্যে পিতার সাক্ষ্য যদ্দ্বারা নিজের বিরাট পরিমাণের গনীমত টেনে নেবে, তা নিজের জন্যে দেয়া সাক্ষ্যের মতই।

## স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের জন্যে সাক্ষ্যদান

এ বিষয়ে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, জুফর, মালিক, আওজায়ী ও লায়স প্রমুখ বলেছেন, স্বামী-স্ত্রীর একজনের পক্ষে অন্যজনের সাক্ষ্যদান জায়েয নয়। সওরী বলেছেন, স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর সাক্ষ্যদান জায়েয। আল-হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর সাক্ষ্যদান জায়েয নয়। শাফেয়ী বলেছেন, স্বামী-স্ত্রীর একজনের পক্ষে অপরজনের সাক্ষ্যদান জায়েয।

আবূ বকর বলেছেন, এ ব্যাপারটি সন্তানের জন্যে পিতার এবং পিতার জন্যে সাক্ষ্যদানের মতই। এর কয়েকটি দিক রয়েছে।

একটি— এদের একজনের অপরজনের ধন-মাল দ্বারা প্রশস্ততা লাভ করার ব্যাপার স্বাভাবিকভাবেই রয়েছে এরূপ সাক্ষ্যদানে এবং তা মুবাহ্ যার জন্যে কারোরই কারোর নিকট থেকে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। তাই স্বামী তার স্ত্রীর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে যা প্রমাণ করবে, তা তো ঠিক নিজের জন্যে প্রমাণ করার মতই। অনুরূপভাবে স্ত্রী তার স্বামীর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে যা প্রমাণ করবে, তাও তার নিজের জন্যে প্রমাণ করার মতই। বস্তুত স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ধন-মাল থেকে সুবিধা লাভ পিতা-পুত্রের ধন-মালের পারস্পরিক সুবিধা লাভ থেকে ভিন্নতর কিছু নয়। আর ব্যাপার যখন এই, আর পিতা ও পুত্রের পরস্পরের জন্যে সাক্ষ্যদান যখন জায়েয ও গ্রহণযোগ্য নয়, স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের জন্যে সাক্ষ্যদান অনুরূপভাবে অগ্রহণযোগ্য হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কেননা স্ত্রীর মালের ব্যাপারে স্বামী সাক্ষ্যদান স্বামীর মালিকানাধীন জিনিসের মূল্য বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। কেননা স্ত্রীর মহরে মিসল বৃদ্ধির পায় স্ত্রীর মাল বৃদ্ধি দ্বারা। ফলে নিজের জন্যে সাক্ষ্যদাতা সেই জিনিসের মূল্য বাড়ায় যার সে-ই মালিক। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আমর আল-হাজরামী (রা)-কে বলেছিলেন— যখন তাঁকে বলা হয়েছিল যে, তাঁর দাস তাঁর স্ত্রীর আয়না চুরি করেছে— দাস তোমার, মালও চুরি করেছে তোমার। অতএব তার উপর হাত কাটার আইন কার্যকর করা যাবে না।

এ কথা দ্বারা তিনি স্বামী-স্ত্রী দুজনার একজনের মালকেই দুজনের যৌথ মালিকানার মাল বলেছেন। কেননা তাদের দুজনের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। তাই তাদের প্রত্যেকে অপর জনের জন্যে যা প্রমাণ করবে, তা তার নিজের জন্যে প্রমাণিত হয়ে যাবে।

অপর একটি দিক দিয়ে বলা যায়, স্বামীর ধন-মালের পরিমাণ যখনই বৃদ্ধি পাবে, তখন স্ত্রীর স্বামীর নিকট থেকে খরচ বাবদ যা পাওয়ার তার পরিমাণও বেড়ে যাবে। ফলে স্ত্রী যেন নিজের জন্যেই সাক্ষ্য দিল— ব্যাপারটা এরূপ হয়ে যাবে। কেননা স্বামীর অভাব ও সচ্ছলতা উভয় অবস্থায়ই স্ত্রী হওয়ার কারণেই খরচা পেয়ে থাকে, পাওয়ার অধিকারিণী হয়।

কেউ যদি বলে, দরিদ্র বোন ও চিররোগী ভাই দুজনই তাদের ভাইর নিকট থেকে 'খরচা' পাওয়ার অধিকারী হয়ে থাকে, যদি সে ভাই সচ্ছল ও অর্থশালী হয়। কিন্তু তাই বলে তাদের সাক্ষ্য ভাইর জন্যে নিষিদ্ধ হয়নি তো?

জবাবে বলা যাবে, ভ্রাতৃত্ব খরচা পাওয়ার অধিকার হওয়ার কারণ নয়। কেননা যে সচ্ছল বা অর্থশালী, সে তো তার ভাইর নিকট খরচা পাওয়ার অধিকারী নয়, যদিও সে তার ভাই, একই বাপ-মায়ের সন্তান। আর ভ্রাতৃত্ব ও স্ত্রীত্ব থাকা সত্ত্বেও দরিদ্র ব্যক্তির নিকট থেকে কিছুই পেতে পারে না, স্বামী গরীব হোক; কিংবা হোক ধনী। তাই একথা প্রমাণিত হল যে, মেয়েলোক তার সাক্ষ্য দ্বারা নিজের জন্যেই খরচা বেশি প্রমাণ করে, যদিও সে স্বামীর নিকট থেকে স্ত্রী হিসেবেই তা পেতে পারে। কিন্তু বংশ সম্পর্কে সেরূপ নয়। কেননা সে সম্পর্কের দরুন 'খরচ' পাওয়ার অধিকার জন্মে না যার সাথে সে সম্পর্ক আছে তার নিকট থেকে। এ কারণে এ দুটি এক নয়, ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপার।

## চাকর বেতনভূক কর্মচারীর সাক্ষ্য

ইমাম তাহাভী মুহাম্মাদ ইবনে সিনান, ঈসা, মুহাম্মাদ, আবূ ইউসূফ, আবূ হানীফা সূত্রে

উল্লেখ করেছেন, চাকর— বেতনভূক কর্মচারীর সাক্ষ্য তার মনিবের জন্যে জায়েয নয়, কোন বিষয়েই, যদিও সে সততা-ন্যায়পরতা সম্পন্ন হোক না কেন।

আবূ বকর (র) বলেছেন, হিশাম ও ইবনে রুস্তম মুহাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেছেন, বিশেষ চাকর— কর্মচারীর সাক্ষ্য তার মনিবের জন্যে জায়েয নয়। কোন কর্মচারী যদি মিলিতভাবে কয়েক জনের মালিকানাধীন হয় এবং তাদের কোনজনের বিরুদ্ধে কিছু না বলে, তাহলে তার সাক্ষ্য জায়েয। উবায়দুল্লাহ ইবনুল হাসান একথা সমর্থন করেছেন। ইমাম মালিক বলেছেন, চাকর-কর্মচারী নিযুক্ত শ্রমিকের সাক্ষ্য তার নিয়োগকারীর জন্যে জায়েয নয়। তবে সে যদি সততা-ন্যায়পরতায় প্রসিদ্ধ হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু সে যদি ঘরের পরিবারের কর্মচারী হয়, তাহলে তার সাক্ষ্য জায়েয হবে না। আল-আওজায়ী বলেছেন, কর্মচারীর সাক্ষ্য তার মনিবের জন্যে জায়েয নয়। সওরী বলেছেন, কর্মচারীর সাক্ষ্য তার মনিবের জন্যে জায়েয; যদি সে নিজের দিকে না টানে।

আবদুল বাকী ইবনে কানে' মুয়ায ইবনুল মুসান্না, আবূ উমর আল হাওযী, মুহাম্মাদ ইবনে রাশিদ, সুলায়মান ইবনে মূসা, আমর ইবনে শুয়াইব, তাঁর পিতা তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) খিয়ানতকারী পুরুষ বা স্ত্রীর সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রত্যাখ্যান করেছেন মানসিক যন্ত্রণাগ্রস্ত ব্যক্তির তার ভাইর বিরুদ্ধে এবং পরিতৃপ্তের সাক্ষ্য ঘরের লোকদের জন্যে জায়েয নয়। অন্যদের জন্যে তা জায়েয।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর (র) আবূ দাউদ, হিফ্স ইবনে উমার, মুহাম্মাদ ইবনে রাশিদ তার সনদে অনুরূপ কথাই বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, তিনি পরিতৃপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য ঘরের লোকদের জন্যে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আবূ বকর (র) বলেছেন, ঘরের লোকদের জন্যে 'পরিতৃপ্ত' কথাটির মধ্যে বিশেষ কর্মচারী শামিল ও গণ্য। কেননা তার অর্থ, সে তাদের অধীন। বিশেষ কর্মচারী হওয়া তার পরিচিতি। তবে মিলিতভাবে কয়েকজনের কর্মচারী হলে সে এবং অন্যান্য সব মানুষ তার ধন-মালে অভিন্ন অবস্থায়। তাই তাদের এ অবস্থা তাদের সাক্ষ্য সহীহ্ হওয়ার প্রতিবন্ধক হবে না। 'শরীকুল ইনান'( شريك العنان —দুই সমান ক্ষমতাশীলদের শরীকদারীর ব্যবসায়) তার সাক্ষ্য শরীকদারীর মাল ছাড়া অন্য বিষয়ে জায়েয।

হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, যে সাক্ষ্য অভিযোগের দরুন প্রত্যাখ্যাত হবে, তা কখনই কবুল করা হবে না। যেমন ফাসিক ব্যক্তির সাক্ষ্য তার ফাসিকীর কারণে যদি প্রত্যাখ্যাত হয়, পরে সে তওবা করে সংশোধিত হয়, আর তখন সে সেই সাক্ষ্যই দেয়, তা কখনই গৃহীত হবে না। স্বামী-স্ত্রীর দুইজনের একজনের সাক্ষ্য অপরজনের জন্যে যদি প্রত্যাখ্যাত হয়, পরে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর যদি সেই সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তা কস্মিনকালেও গ্রহণ করা হবে না। তাঁরা এ-ও বলেছেন, কোন দাস যদি কোন সাক্ষ্য দেয় বা কাফির কিংবা বালক সাক্ষ্য দেয় ও তা প্রত্যাখ্যাত হয়, পরে সে দাস মুক্ত ও আযাদ হয়, কাফির ইসলাম কবুল করে বা বালক পূর্ণবয়স্ক হয় এবং সেই সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তা গ্রহণ করা যাবে না। যদি তা পূর্বে প্রত্যাখ্যাত না হয়ে থাকে, তাহলে তা জায়েয হবে।

হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রা) থেকে ইমাম মালিকের মতই বর্ণিত হয়েছে। হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, অভিযোগ ও দোষারোপের কারণে কোন সাক্ষ্য যদি প্রত্যাখ্যাত হয়,

তাহলে তা কখনই কবুল হবে না। অবশ্য সরকারের তা বাতিল করার সিদ্ধান্তের পূর্বে। সরকারের হুকুম ভঙ্গ করা জায়েয হবে না, হুকুম হলে হবে। আর হুকুম অনুযায়ী প্রমাণিত না হলে তা ভঙ্গ করাও জায়েয নয়। দোষারোপ-অভিযোগ নিশ্চিহ্ন হওয়ার সরকারী হুকুম— যার কারণে একমাত্র সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল— না হলে সে সাক্ষ্য বাতিলকরণের সরকারী হুকুম কার্যকর হবে, তা ভঙ্গ করা কখনই জায়েয হবে না। দাসত্ব, কুফর, অল্পবয়স্কতা— এর কোন কারণে প্রত্যাখ্যাত হলে সরকারের সে অভিযোগ বাতিল হওয়ার হুকুম তার দূরীভূত হওয়ার হুকুমের অধীন। কেননা স্বাধীন হওয়া, মুসলিম হওয়া ও পূর্ণ বয়স্কতা হওয়া— এ সবই সরকারী সিদ্ধান্তের অধীন ব্যাপার। তাই যে সব কারণে তাদের সাক্ষ্য বাতিল হয়ে গিয়েছিল সে সব দূর হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে যখন সরকারী সিদ্ধান্ত সহীহ্ হবে, তখন তাদের সাক্ষ্য অবশ্যই গৃহীত হবে। আর যখন অভিযোগ দূর হওয়ার ব্যাপারে সরকারী সিদ্ধান্ত সহীহ্ হবে না— কেননা সে ব্যাপারে কোন অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে না, আর সে ব্যাপারে সরকারী সিদ্ধান্তও হবে না, তাহলে তা বাতিল হওয়ার ব্যাপারে সরকারী সিদ্ধান্তই কার্যকর হবে। কেননা যা সরকারী সিদ্ধান্তক্রমে সাব্যস্ত হয়েছে, তা অনুরূপ সিদ্ধান্ত ব্যতীত বাতিল হতে পারে না। অতএব সততা-ন্যায়পরতা, অভিযোগ না হওয়া ও অসতর্কতা কম হওয়া— এ তিনটি বিষয়ের আমরা যে উল্লেখ করলাম, তা সাক্ষ্যের শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত। আর এ কথাগুলোই শামিল রয়েছে আল্লাহ্র এ কথায় ঃ

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ -

—সাক্ষী হিসেবে তোমরা যাদের পছন্দ কর (সাক্ষী বানাতে রাজী হও) তাদের মধ্য থেকে।

এই ছোট্ট আয়াতাংশে যে বিপুল তাৎপর্য, তত্ত্ব ও আইন-বিধানের প্রমাণাদি নিহিত রয়েছে, তা অবশ্যই লক্ষণীয়। অথচ আয়াত বিরাট দীর্ঘ নয়, শব্দ ও অক্ষরও তাতে খুব বেশি ব্যবহৃত হয়নি। খুবই সংক্ষিপ্ত কথার মধ্যে এ বিরাট তাৎপর্য নিহিত হওয়া খুবই বিস্ময়কর। আর এ শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য পর্যায়ে আগেকালের মনীষিগণের যেসব কথা ও উক্তি— মন্তব্য আমরা উল্লেখ করেছি, তা থেকে শরীয়াতের হুকুম বের করার যে নিয়ম-পদ্ধতি উল্লেখ করেছি, তার যে সব তত্ত্ব আমরা বিশ্লেষণ করেছি— আয়াতে এ সব কিছুরই সম্ভাবনা বিদ্যমান এবং তা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, এটা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র কালাম। আল্লাহ্র নিকট থেকেই তা নাযিল হয়েছে এবং সর্বতোভাবে পবিত্র— অমলিন। কেননা সৃষ্টি— মানুষ-এর পক্ষে এমন শব্দ ব্যবহার করা কখনই সম্ভব হতে পারে না, যাতে বিরাট-ব্যাপক-বিশাল তাৎপর্য নিহিত থাকতে পারে, সংক্ষিপ্ত কথার এত বিস্তৃত ব্যাখ্যা হতে পারে, যার মধ্য থেকে এত সব হুকুম-আহ্কাম বের করা যেতে পারে। ভবিষ্যতে এর চাইতে আরও কত বেশি তাৎপর্য যে এ থেকে বের হওয়া সম্ভব হবে তা আজ আমরা ভাবতেও পারি না, আমাদের কল্পনায়ও আজ তা আসতে পারে না, আমাদের আজকের ভাবনা-চিন্তা তা আয়ত্তও করতে পারে না।

আল্লাহ্র কথা ঃ

اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى -

দুজনের একজন যদি ভুলে যায়— বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দেবে।

تُذَكِّرَ ও تُذْكِرَ —এ দুভাবেই শব্দটি পাঠ করা হয়েছে এবং পাঠ করা যায়। বলা হয়েছে, দুটিরই অর্থ এক ও অভিন্ন। ذَكَّرْتُهُ ও ذَكَرْتُهُ দুটোই একই কথা বোঝাবার জন্যে বলা হয়ে থাকে। একথা রুবাই ইবনে আনাস, সূদ্দী, দহাক থেকে বর্ণিত।

আমাদের নিকট আবদুল বাকী ইবনে কানে, আবূ উবায়দ, মুমিনলমায়রাফী, আবূ ইয়ালী আল-বসরী, আল-আসমায়ী, ইবনে আবূ আমার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, যে فَتُذَكِّرَ পাঠ করবে, সে বোঝাতে চাইবে তাদের দুজনের সাক্ষ্য উল্লেখ করা— স্মরণ করানোর পর্যায়ের কাজ। আর যে فَتُذْكِرَ পড়বে, তার ইচ্ছা হল এ কথা বোঝানো যে, তার সাক্ষ্য উপদেশ দান বা নসীহতকরণ পর্যায়ের কাজ। এ কথা সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না থেকে বর্ণিত।

আবূ বকর (র) বলেছেন, দুটি তাৎপর্যই যখন সম্ভাব্যতার মধ্যে, তখন দুটি পাঠের প্রত্যেকটি থেকে ভিন্নতর ও নবতর তাৎপর্য গ্রহণ করা উত্তম। তাই فَتُذْكِرَ পাঠ দুজন সাক্ষীকেই সাক্ষ্য বিধির ভিত্তিতে ও তার নির্ভুলতা-নিখুঁততার দৃষ্টিতে একজন পুরুষের সাক্ষ্যদান পর্যায়ের বানিয়ে দেবে। আর فَتُذَكِّرَ পাঠের তাৎপর্য হবে, একজনের ভুলে যাওয়া অবস্থায় অন্যজনের স্মরণ করিয়ে দেয়ার অর্থে। এর প্রত্যেকটি পাঠ থেকে তার অনিবার্য অর্থ গ্রহণ করাই তার যে-কোন একটি অনিবার্য অর্থ গ্রহণের তুলনায় অনেক উত্তম।

নবী করীম (স)-এর এ কথাটি থেকেও তা-ই বোঝা যায়। তিনি বলেছেন ঃ

مَارَأَيْتُ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ اَغْلَبُ لِعُقُوْلِ ذَوِي الْأَلْبَابِ مِنْهُنَّ -

আমি তাদের তুলনায় বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে দ্বীন ও বিবেক-বুদ্ধির দিক দিয়ে কমতির বেশি অধিকারী আর দেখিনি।

লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, হে রাসূল! ওদের বিবেক-বুদ্ধির কমতির ব্যাপারটা কি? বললেন, ওদের দুইজন মেয়েলোকের সাক্ষ্যকে একজন পুরুষের সাক্ষ্য সমতুল্য বানিয়েছেন, এটাই তাদের বিবেক-বুদ্ধির অধিক কমতির প্রমাণ। এ কথাটি তাঁর ব্যাখ্যার সাথে সামঞ্জস্যশীল, যিনি বলেছেন ঃ 'তাদের একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেবে' এর অর্থ, তারা দুজন সাক্ষ্যদানের নিয়মানুবর্তিতায় ও তার মর্যাদা রক্ষায় একজন পুরুষ সদৃশ হবে।

এ আয়াতে এ বিষয়ের দলীলও রয়েছে যে, মেয়েদের দুজনের বদলে একজনের সাক্ষ্য দান জায়েয হবে না, তার মর্যাদাযত পরিচিতই হোক-না-কেন। তার কাজ শুরু অপর মেয়েলোককে স্মরণ করিয়ে দেয়া। লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্‌র দলীল লেখা ও তাতে সাক্ষী বানানোর কথা বলার পর বলেছেন ঃ দুজন মেয়ে সাক্ষীর একজন যদি ভুলে যায়, তাহলে তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দেবে। অর্থাৎ শুধু দলীল লেখা ও সাক্ষী বানানোর উপরই নির্ভর করা হয়নি, একজন মেয়ে সাক্ষী মূল কথা ভুলে গেলে অপর মেয়ে সাক্ষী তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেবে, এ ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

তেমনি আল্লাহ্‌র এ কথাটিও ঃ

ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰى اَنْ لَّاتَرْتَابُوْا -

আল্লাহ্‌র নিকট এটাই অধিক ন্যায়বিচার পূর্ণ ব্যবস্থা, সাক্ষ্যের জন্যে অধিক শক্ত নীতি এবং তোমাদের সন্দেহ কম-সে-কম করার পদ্ধতি।

এ আয়াত প্রমাণ করল যে, দলীল লিখতে বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেন তার মাধ্যমে সাক্ষ্যদানের অবস্থা ও পদ্ধতিটা স্মরণ করা যায়। আর সাক্ষ্য হতে পারে না যদি তা স্মরণ— সংরক্ষিত রাখা না যায়। এ থেকে এ-ও প্রমাণিত হয় যে, সাক্ষী যদি বলে যে, 'এ ব্যাপারে আমার নিকট কোন সাক্ষ্য নেই' এবং পরে বলে যে, 'আমার নিকট সাক্ষ্য আছে,' তাহলে তা কবুল করা হবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ 'যদি দুজনের একজন ভুলে যায়, বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, তাহলে একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দেবে।' অর্থাৎ ভুলে যাওয়ার পর যদি তা স্মরণ করে তাহলে তার সাক্ষ্যদান জায়েয হবে।

ইবনে রুস্তম মুহাম্মাদ (র) থেকে উল্লেখ করেছেন, এক ব্যক্তিকে কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে বলা হয়েছিল, যা সে জানত। তখন সে প্রথমে বলল, আমার নিকট কোন সাক্ষ্য নেই। পরে সে ব্যক্তি সে বিষয়ে বিচারকের নিকট সাক্ষ্য দিল। বলেছেন, তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে যদি সে সততা-ন্যায়পরতা সম্পন্ন হয়। কেননা সে বলেছে, আমি তা ভুলে গিয়েছিলাম। পরে তা আমি স্মরণ করেছি। কেননা মূল হকটা তো আর তার নিজের নয়। কাজেই তার পক্ষে তার কথা অবশ্যই জায়েয হবে। এখানে 'হক' হচ্ছে অন্য লোকের। এভাবেই তার সাক্ষ্য কবুল করা যাবে।

আবূ বকর (র) বলেছেন, এটা এ রকম বলা কথা নয় যে বাদী বলবে, আমার তার নিকট এই 'হক' নেই। পরে সে তার দাবি তোলে, তাহলে তার দাবি কবুল করা যাবে না, এ 'হক' তার হবে না। কেননা সে নিজেই স্বীয় অঙ্গীকার দ্বারা তা বাতিল করে দিয়েছে। আর সাক্ষ্য, তা 'হক' অপরের জন্যে— কাজেই 'আমার নিকট কোন সাক্ষ্য নেই' কথাটি দ্বারা সে 'হক' বাতিল হয়ে যেতে পারে না।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তাদের দুজনের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দেবে' উপরোক্ত কথার সঠিকত্ব প্রমাণ করে। লিখিত জিনিসের উপর সাক্ষ্যদান পর্যায়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ বলেছেন, লিখিত জিনিসের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া যাবে না। তবে তার দ্বারা স্মরণ করা যাবে। তাদের এ কথাই প্রখ্যাত। ইবনে রুস্তম বলেছেন, আমি মুহাম্মাদকে বললাম, এক ব্যক্তি সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য দিত। সাক্ষ্যের লেখার উপরও সাক্ষ্য দিত। তাতে মোহর মারা হতো কি হতো না— তাতে কোন পার্থক্য করা হতো না। তার লেখা পরিচিত ছিল। বলেছেন, তার লেখা পরিচিত হলে সে বিষয়ে সাক্ষ্যদান তার পক্ষে সম্ভব হতো। তার উপর 'মোহর' সিল মারা হতো আর না-ই হতো তাতে কোন পার্থক্য হতো না। জবাবে বললাম, যদি লোক উম্মী হয়, পড়তে না পারে, ফলে অন্য লোক তা লিখবে তার হয়ে। সে বিষয়ে সে সাক্ষ্য দেবে না। তবে যদি স্মরণ করতে পারে ও সংরক্ষিত থাকে, তাহলে পারবে। আবূ হানীফা বলেছেন, বিচারক তার দেওয়ানে যা-ই লিখিত পাবে, তাতেই বিচারের রায় দেবে না। যদি সে তা স্মরণ করতে পারে তবে পারবে। আবূ ইউসূফ বলেছেন, সে তাতে বিচারকার্য করবে, রায় দেবে যদি তার দস্তাবিজে জমা করা অবস্থায় পায়। পায় তার মোহরের অধীন। কেননা তখন তা করলে তাতে জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এটা মুহাম্মাদের কথা। তা তার মোহরের অধীন না হলে তার দ্বারা যে কোন জিনিস ঘটানো যাবে না, সে বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই। অন্য বিচারক থেকে পাওয়া ফাইলে— নথিপত্রের ভিত্তিতে বিচারক কোন রায় দেবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তা তার পূর্বের বিচারকের হুকুম হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষীগণ সাক্ষ্য না দেবে। ইবনে আবূ লায়লা আবূ ইউসূফের সাথে একমত হয়েছেন, তার নথিপত্রে পাওয়া জিনিস

সম্পর্কিত মতের ব্যাপারে। আবূ ইউসূফও একথা ইবনে আবূ লায়লার সূত্রে বলেছেন যে, কোন লোক যদি বিচারকের নিকট তার বিপক্ষের জন্যে কোন কিছুর অঙ্গীকার করে, কিন্তু তা তার নথিপত্রে প্রতিষ্ঠিত না করে এবং তার ভিত্তিতে সে বিষয়ে বিচার কার্য না করে, পরে সে অঙ্গীকারকারী— তার পক্ষে ও তার বিপক্ষের বিরুদ্ধে রায় দিতে বলে তাহলে সে তদনুযায়ী বিচার কার্য করবে না— রায় দেবে না। ইবনে আবূ লায়লা তাই বলেছেন। আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ বলেছেন, সে বিষয়ে সে বিচার করবে। মালিক বলেছেন, যার হাতের লেখা চেনা— পরিচিত, সাক্ষ্যের কথা স্মরণ করতে পারে না, সে লেখা জিনিসের বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে না। তবে তার নিজের জানা অনুযায়ী সে বিচারকের নিকট সাক্ষ্য দেবে। কিন্তু বিচারক সে সাক্ষ্যকে জায়েয ধরে নেবে না। তবে তার নিজের জানা অনুযায়ী সে বিচারকের নিকট সাক্ষ্য দেবে। কিন্তু বিচারক সে সাক্ষ্যকে জায়েয ধরে নেবে না। তবে তার উপর 'হক' ধার্য, সে যদি তার সাক্ষ্য তার নিজের উপর লিখে থাকে 'হক-এর কথা উল্লেখ সহকারে, আর সাক্ষীগণ মরে গিয়ে থাকে, পরে সে অস্বীকার করে, তার পরে দুইজন লোক সাক্ষ্য দেয় যে, এটা তার নিজেরই লেখা, তাহলে মাল সম্পর্কে সে ফয়সালা দেবে। তবে মালের মালিককে কিরা-কসম করতে বলা যাবে না। আশহুব উল্লেখ করেছেন, যার হাতের লেখা পরিচিত, কিন্তু সে সাক্ষী হওয়ার কথা স্মরণ করতে পারে না, তাহলে সে তা সরকারের নিকট জমা করে দেবে এবং তাকে তা জানিয়ে দেবে, যেন সে সে বিষয়ে তার রায় জানতে পারে। সওরী বলেছেন, যখন সে বারণ করে যে, সে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং সে সেই সাক্ষ্য লিখেছে, তা হলে সে লিখিত বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে। লায়স বলেছেন, সে যদি চিনতে পারে যে, তা তার নিজের হাতের লেখা, আর সে লোক যদি সত্য সাক্ষ্যদাতা হওয়ার দিক দিয়ে জানা-শুনা খ্যাতিমান হয়, তাহলে সে সাক্ষ্য দেবে। শাফেয়ী বলেছেন, অঙ্গীকারকারী অঙ্গীকারের কথা যদি স্মরণ করে, তাহলে তার ভিত্তিতে রায় দেবে। তার নথিপত্রে তা শামিল হোক, আর না-ই হোক। কেননা নথিপত্রের কাজ হচ্ছে শুধু স্মরণ করিয়ে দেয়া। আল-মুজানীর গ্রন্থে বলা হয়েছে, সে স্মরণ করতে না পারা পর্যন্ত সাক্ষ্য দেবে না।

আবূ বকর (র) বলেছেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ দুজনের একজন ভুলে গেলে— বিভ্রান্ত হলে তাদের অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে' এর তাৎপর্য আমরা বিশদভাবে উল্লেখ করেছি। আর দলীল লেখার উল্লেখের পর আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'তা আল্লাহ্‌র নিকট অধিক ন্যায়বিচার বিধায়ক, সাক্ষ্যের জন্যে দৃঢ় নীতি নির্ধারক এবং সন্দেহ থেকে রক্ষা পাওয়ার নিকটতর ব্যবস্থা।' এর তাৎপর্য হল, সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত করা জায়েয হওয়ার একটি শর্ত হল সাক্ষী তা স্মরণ করবে। শুধু লেখার উপর নির্ভর করা জায়েয হবে না। কেননা লেখা ও দস্তাবেজ তৈয়ার করার আদেশ হয়েছে, তদ্দ্বারা সাক্ষ্যের কথা স্মরণ করা হবে, কেবল এই উদ্দেশ্যে। এ কথা আল্লাহ্‌র এ কথা দ্বারাও প্রমাণিত হয় ঃ

إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ -

তবে যে লোকরা 'হক' সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে জেনে-শুনে। ..... (সূরা যুখরুফ ঃ ৮৬)

তাই যদি সেই সে সাক্ষ্যদানের কথা স্মরণ করতে না পারে, তাহলে সে বিষয়ে জানে না বলতে হবে। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَاتَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ -

যে বিষয়ে তোমার কিছুই জানা নেই, সে বিষয়ে তুমি দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করবে না। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৬)

আয়াতটি উপরোক্ত কথাকেই প্রমাণ করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীস থেকেও তা-ই প্রমাণিত হয়। হাদীসটি হল, নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

اِذَا رَاَيْتَ مِثْلَ الشَّمْسِ فَاشْهَدْ وَاِلَّا فَدَعْ -

তুমি যখন ঘটনাটি ঠিক সূর্যকে দেখতে পাওয়ার মতই দেখে থাক, তাহলেই সাক্ষ্য দেবে। অন্যথায় সাক্ষ্য দেয়া ত্যাগ করবে।

এ হাদীসের সনদ ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে হাতের লেখার উপরও তো মিথ্যার অভিযোগ উঠতে পারে এবং সাক্ষীর উপর সন্দেহ হওয়াও অস্বাভাবিক কিছু নয়। মনে করা হতে পারে যে, এটা তারই হাতের লেখা, অথচ প্রকৃত পক্ষে তার লেখা নয়। কিন্তু সাক্ষ্য যখন একটি জিনিসের বাস্তব পর্যবেক্ষণের ব্যাপার, সাক্ষ্যের বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান বা জানা থাকার ব্যাপার। তাই যে লোক সাক্ষ্যের কথা স্মরণ রাখতে পারে না, সে তো এ গুণের বিপরীত অবস্থায় রয়েছে। তাই তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়া জায়েয হতে পারে না। বস্তুত সাক্ষ্যের ব্যাপারটির উপর খুব বেশি তাগিদ আরোপ করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, স্পষ্ট উচ্চারিত শব্দে সাক্ষ্য না দেয়া হলে তা গ্রহণ করা যাবে না। স্থলাভিষিক্ত শব্দ বললেও গ্রহণ করা যাবে না। তাই যে হাতের লেখায় মিথ্যা আরোপিত হতে পারে, পরিবর্তন করা যেতে পারে, তার উপর ভিত্তি করে কাজ করা যেতে পারে কিভাবে? আবূ মুআবিয়া আন-নখয়ী শবী থেকে বর্ণনা করেছেন, যার হাতের লেখা ও মহর চেনা যাবে; কিন্তু সাক্ষী হওয়ার কথা মনে করতে পারে না, সে সাক্ষ্য দেবে না, সে তা স্মরণ করতে না পারা পর্যন্ত সাক্ষ্য দেবে না।

আল্লাহ্‌র কথা 'যদি দুজনের একজন বিভ্রান্ত হয়' অর্থ ভুলে যায়। কেননা বিভ্রান্তি হয় কোন কথা মন থেকে সরে গেলে। যে কোন জিনিস ভুলে গেছে, সে সেই জিনিস থেকে সরে গেছে, চলে গেছে। আয়াতে বলা হয় ঃ ضَلَّتْ عَنْهُ الشَّهَادَةُ 'সাক্ষ্য তার থেকে হারিয়ে গেছে' এবং ضَلَّ عَنْهَا 'সে সাক্ষ্য থেকে হারিয়ে গেছে। এর অর্থ একই।

## সাক্ষী ও কিরা-কসম

সাক্ষী একজন। তখন তার সাক্ষ্য নেয়া এবং বাদীর দ্বারা কিরা-কসম করিয়ে কোন রায় দেয়া জায়েয কিনা, এ বিষয়ে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফর ও ইবনে শাবরামাতা বলেছেন, দুজন সাক্ষী দ্বারা বিচারকার্য হবে না। একজন সাক্ষী ও অপর পক্ষের কিরা-কসমের ভিত্তিতে কোন রায় দেয়া যাবে না। মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন, এ দুটির ভিত্তিতে বিশেষ ধন-মালের ব্যাপারে ফায়সালা করা যাবে।

আবূ বকর (র) বলেছেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ - فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَانِ -

এবং তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুজন সাক্ষী বানাও। দুজন পুরুষ পাওয়া না গেলে একজন পুরুষ ও দুজন মেয়েলোক ......

এ আয়াত স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছে যে, যাঁরা একজন সাক্ষী ও বাদীর কিরা-কসমের ভিত্তিতে বিচার কার্য করা যেতে পারে বলে মত দিয়েছেন, তাঁদের মত বাতিল। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'সাক্ষী বানাও' আদেশে আয়াতের সূচনায় যে পারস্পরিক লেনদেনের চুক্তির কথা বলা হয়েছে তাতে সাক্ষী বানাবার নির্দেশ রয়েছে। তা বিচারকের নিকট পেশ করা এবং বিচারকের পক্ষে তা গ্রহণ করার বাধ্যবাধকথা শামিল রয়েছে। কেননা ব্যবহৃত শব্দে উভয় অবস্থারই সম্ভাবনা রয়েছে। আর কোন চুক্তিতে সাক্ষী বানানোর উদ্দেশ্যই হল কোন পক্ষে অস্বীকৃতির সময়ে তা অকাট্যভাবে প্রমাণ করা। অতএব তাতে দুজন সাক্ষী বানানোর নির্দেশ অবশ্য পালনীয় হয়ে আছে। অথবা একজন পুরুষ ও দুজন মেয়েলোক— এ তো হতেই হবে। সে সাক্ষী বানাতে হবে চুক্তির ব্যাপারে বিচারকের নিকট ফায়সালার জন্যে পেশ করার উদ্দেশ্যে। বিচারক সে সাক্ষ্য গ্রহণে বাধ্য। ব্যাপার যখন এই, তখন বাহ্যত তা আদেশ এবং পালন করা ফরয। এটা আল্লাহ্‌র আদেশ, আর আল্লাহ্‌র আদেশসমূহ— প্রত্যেকটি আদেশই পালন করা ফরয। আল্লাহ উক্ত সংখ্যক সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচার করা বিচারকের জন্যে বাধ্যতামূলক করেছেন। যেমন আল্লাহ্‌র আদেশ ঃ

فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً -

অতএব তোমরা তাদেরকে আশিটা দোররা মার। (সূরা নূর ঃ ৪)

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ -

অতএব তোমরা তাদের দুজনার প্রত্যেককে একশটি দোর্‌রা মার। (সূরা আন-নূর ঃ ২)

এ আয়াতদ্বয়ে যে সংখ্যার উল্লেখ হয়েছে, সেই সংখ্যার কম সংখ্যক দোর্‌রা কখনই জায়েয হতে পারে। সাক্ষ্যের জন্যে যে সংখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে আয়াতে, তাও বাধ্যতামূলক। সেই সংখ্যার কম সাক্ষীর সাক্ষ্যে বিচার করা জায়েয নয়। বরং তা কুরআনের বিরুদ্ধতা। যথা কেউ যদি 'কযফ' অপরাধের শাস্তি হিসেবে সত্তর দোররা কিংবা যিনার দণ্ডে নব্বই দোররা জায়েয বলে, তাহলে সে কুরআনের স্পষ্ট আদেশের বিরুদ্ধতা করে। উপরন্তু সাক্ষ্যের আয়াতে সাক্ষীদের ব্যাপারে দুটি জিনিস শামিল রয়েছে। একটি হচ্ছে সংখ্যা আর অপরটি গুণ-পরিচিতি। তা হল, সাক্ষীরা হবে স্বাধীন, পছন্দনীয়। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে' এবং বলেছেন ঃ 'সাক্ষী হিসেবে তোমরা পছন্দ কর এমন লোকদের থেকে।' সাক্ষীদের জন্যে এ দুটি গুণ বর্তমান থাকা শর্ত। এর কোন একটি গুণকে বাদ দেয়া জায়েয নয়, দুটি গুণের থেকে একটি গুণ পাওয়া গেলেই তার ভিত্তিতে বিচারের কাজ চালানো যাবে না। অনুরূপভাবে উদ্ধৃত সংখ্যা হ্রাস করাও জায়েয হবে না। কেননা বিচার কার্য করার জন্যে উদ্ধৃত দুটি গুণ পূর্ণমাত্রায় বর্তমান থাকাই আয়াতের দাবি। সে দুটির একটি হল সংখ্যা আর অপরটি সততা-ন্যায়পরতা পছন্দ হওয়া। এর কোন একটি বাদ দেয়া জায়েয হতে পারে না। সততা-ন্যায়পরতা অপেক্ষা সংখ্যাটা রক্ষা করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। পছন্দ হওয়ার ব্যাপার-ও। কেননা সংখ্যাটা তো দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে জানা, বোঝা ও দেখা যায়। কিন্তু সততা-ন্যায়পরতার ব্যাপারটি বাহ্যিকভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হয়, প্রকৃত পক্ষে জানা সম্ভব হয়

না। তাই বাহ্যিকভাবে প্রামাণ্য সততা-ন্যায়পরতার শর্ত বাদ দেয়া যেমন জায়েয নয়, ঠিক তেমনি প্রকৃত ব্যাপারের দিক দিয়ে সংখ্যার শর্তটি বাদ দেয়াও জায়েয নয়। উপরন্তু আল্লাহ যখন মেয়েদের সাক্ষ্যদানকে জায়েয করার ইচ্ছা করেছেন সতর্কতা রক্ষার শর্তের ভিত্তিতে, তখন দুজন মেয়েলোকের সাক্ষ্য— একজন পুরুষের স্থলে— হওয়া অবশ্যই জরুরী হবে। সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্র কথা হল ঃ 'তাদের দুজনের একজন ভুলে গেলে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে।' তারপরে বলেছেন,'এ ব্যবস্থা আল্লাহ্র নিকট অধিক সুবিচারপূর্ণ, সাক্ষ্যের ব্যাপারে অধিক দৃঢ়তা বিধায়ক এবং সন্দেহ থেকে অনেক দূরে থাকার উপায়।'

এ ব্যবস্থার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তুহমাত, সন্দেহ ও ভুলভ্রান্তি প্রতিরোধ করার কার্যকর পন্থা অবলম্বন করেছেন। আর তাতেই নিহিত রয়েছে বাদীর কিরা-কসম গ্রহণ না করা এবং একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচার না করার বিধান। কেননা তাহলে আল্লাহ্ যে সতর্কতা ও বাহ্যিক দিক রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, তাকে বাদ দিয়ে তা ছাড়াই বিচারকার্য করা হবে। সন্দেহ-সংশয় থেকে দূরে থাকার জন্যে যে পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাকে অগ্রাহ্য করা হবে। বাদী পক্ষের কিরা-কসম গ্রহণ করায় বিরাট সন্দেহ-সংশয় দেখা দেয়ার সম্ভাবনা, তার উপর প্রচণ্ড 'তুহ্মাত' হওয়াও অসম্ভব নয়। আর তা আয়াতের লক্ষ্যের পরিপন্থী ব্যাপার। আর একজন সাক্ষী ও বাদীর কিরা-কসম গ্রহণ করা বাতিল— এ আয়াতটুকুও তা প্রমাণ করে ঃ 'সাক্ষী হিসেবে তোমাদের পছন্দনীয় লোকদের মধ্যে থেকে'। একজন সাক্ষী, যে অগ্রহণযোগ্য তা তো জানা-ই আছে। আয়াত-ও সেকথা বলে না। বাদীর কিরা-কসমকে তো আর সাক্ষী বলা যায় না। আর যে লোক নিজের জন্যে এটা দাবি করে, তাতে সে পছন্দনীয় ব্যক্তিও হতে পারে না। অতএব একজন সাক্ষী ও বাদীর কিরা-কসমের ভিত্তিতে বিচার করা কুরআনের আয়াতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী— এ সব দিক দিয়ে। আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে যে সতর্কতা গ্রহণ করাতে চেয়েছেন এবং যে দৃঢ়তা নিশ্চিন্ততাকে বিচারকার্যে নিশ্চিত করা জরুরী মনে করেছেন, তাতে তা সবই সুদূরপরাহত ব্যাপার হয়ে যায়। নবী করীম (স)-এর একটি কথা থেকেও তা প্রমাণিত হয়। তিনি বলেছেন ঃ

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ -

অকাট্য প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব বাদীর উপর এবং কিরা-কসম করার কাজ বিবাদীর করণীয়।

এ হাদীসে 'অকাট্য প্রমাণ' ও কিরা-কসমের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। কাজেই কিরা-কসম 'অকাট্য দলীল' পর্যায়ে গণ্য হওয়া সম্পূর্ণ নাজায়েয। কেননা কিরা-কসমকে অকাট্য দলীল বানানো জায়েয হলে রাসূলের কথাটি এ ধরনের রূপ নেয় ঃ 'বাদীর উপর অকাট্য প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব, বিবাদীর উপর অকাট্য প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব।'

এ اَلْبَيِّنَة 'অকাট্য প্রমাণ' কথাটি একটি বর্ণনাম, এ পর্যায়ের সবই এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই অকাট্য প্রমাণ যা কিছু তা পেশ করার দায়িত্ব বাদীর উপর। তার উপর কিরা-কসমের কোন দায়িত্ব নেই। উপরন্তু اَلْبَيِّنَة 'অকাট্য প্রমাণ' কথাটি অস্পষ্ট— ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। তা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফিকাহবিদগণ একমত হয়ে বলেছেন, হাদীসের 'অকাট্য প্রমাণ' বলতে বোঝায় দুজন পুরুষ সাক্ষী অথবা একজন পুরুষ ও দুজন মেয়ে সাক্ষী। এ জিনিসের উপরই 'অকাট্য প্রমাণ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাৎপর্যগতভাবে কথাটি দাঁড়ায় ঃ 'দুজন পুরুষ সাক্ষী

অথবা এজন পুরুষ ও দুজন মেয়ে সাক্ষী পেশ করার দায়িত্ব বাদীর উপর অর্পিত।' অতএব তার কমে 'অকাট্য প্রমাণ' কথাটি বাস্তবায়িত হতে পারে না। উপরোক্ত হাদীসটি 'খবরে ওয়াহিদ' পর্যায়ের হলেও মুসলিম উম্মাহ তাকে পূর্ণ গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছে ও আইনের ধারা হিসেবে ব্যবহারও করেছে। ফলে তা 'মুতাওয়াতির মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। রাসূলে করীম (স)-এর এ কথাটিও তা-ই প্রমাণ করে ঃ

لَوْ أُعْطِيَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ -

মানুষকে যদি তার দাবি অনুযায়ী-ই দেয়া হতো, তাহলে এক-এক জনগোষ্ঠী অপর জনগোষ্ঠীর রক্ত ও ধন-মাল পেতে চাইত।

এ হাদীসটির কথার ধরন দুভাবে সাক্ষী ও কিরা-কসম বাতিল হওয়া সম্পর্কে প্রমাণ পেশ করছে ঃ একটি এই যে, বাদীর কিরা-কসম বাদীর দাবি বিশেষ। কেননা কিরা-কসম করে তার দাবিকেই জানিয়ে দেয় মাত্র এবং এ দুটি অভিন্ন। তাই সে যদি তার কিরা-কসম দ্বারা কিছু পাওয়ার যোগ্য হয়, তাহলে তা তার শুধু দাবির দ্বারাই পাওয়ার যোগ্য হওয়া উচিত। কিন্তু নবী করীম (স) শুধু দাবির বলে কিছু পাওয়া নিষিদ্ধ করেছেন। আর দ্বিতীয়, বাদীর শুধু দাবির ভিত্তিতে পাওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। অতএব কিরা-কসমের বলেও কিছু পাওয়া নিষিদ্ধ হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়। কেননা বাদীর কিরা-কসম তার নিজের শুধু মৌখিক কথা ছাড়া আর তো কিছুই নয়। আল-কামা ইবনে অয়েল ইবনে হাজার— তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত হাদীস-ও তাই প্রমাণ করে। হাদীসটি হাজরামী প্রসঙ্গে। তিনি আল কিন্দীর সাথে একটি জমির ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিলেন। জমিটি তাঁর দখলে ছিল এবং তিনি সেটি তাঁর জমি বলে দাবি করেছিলেন। কিন্তু আল-কিন্দী তা অস্বীকার করছিলেন। তখন নবী করীম (স) আল-হাজরামীকে বলেছিলেন ঃ তোমার দুজন সাক্ষী অথবা প্রতিপক্ষের কিরা-কসম তোমার জন্যে কিছুই প্রমাণ করে না। করে তা-ই'— এ কথার তাৎপর্য হল, দুজন সাক্ষী পেশ না করা পর্যন্ত কোন দাবিই স্বীকৃতি পেতে পারে না। এর অর্থ, তার জন্যে কিছুই প্রমাণ করে না।

যদি বলা হয়, বিবাদীর স্বীকারোক্তির দ্বারা পাওয়ার যোগ্য হওয়াকে নিষিদ্ধ করা হয় নি। অনুরূপভাবে একজন সাক্ষী ও কিরা-কসমের দ্বারা দাবি পাওয়ার যোগ্য হওয়াকেও নিষিদ্ধ করা হয়নি।

জবাবে বলা যাবে, বিবাদী তো বাদীর দাবিকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করেছে। এ অস্বীকৃতিকালে বাদীর দাবির সত্যতা প্রমাণকারী সিদ্ধান্তের কথাই নবী করীম (স) বলেছেন। কিন্তু বিবাদী যদি দাবি স্বীকার করে, তাহলে তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তা প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। উপরন্তু বাহ্যত তা কিছুই না-পাওয়ার দাবি করে। তবে যা হাদীসে বলা হয়েছে, শুধু তা। যদি বিবাদী স্বীকার করে, তাহলে তার এ স্বীকৃতিতেই বাদী তার দাবি পেয়ে যাওয়ার যোগ্য হবে— এটা সর্বসম্মত মত। এ জন্যেই আমরা সেই হুকুম দেব, একজন সাক্ষী ও কিরা-কসমের ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। তাই রাসূলের কথা ঃ তোমার দুজন সাক্ষী অথবা তার কিরা-কসম তোমার জন্যে কিছু নয়, তা বাতিল হওয়াই প্রমাণ করে।

যাঁরা এ মতে দিয়েছেন যে, একজন সাক্ষী ও সেই সাথে বাদীর কিরা-এর ভিত্তিতে বিচার করা যাবে, তাঁরা প্রমাণ হিসেবে কতিপয় অস্পষ্ট হাদীস পেশ করেছেন, সে সব বর্ণনায় নবী

করীম (স)-এর কতিপয় বিচারের উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আমরা তার উল্লেখ করব এবং সে কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করব।

একটি হাদীস আবদুর রহমান ইবনে সীমা বর্ণিত। বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ তাঁর পিতা আহমাদ—আবূ সাঈদ, সুলায়মান, রবীআতা ইবনে আবূ আবদুর রহমান, সহল ইবনে আবূ সালিহ, আবূ হুরারাতা সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ -

রাসূলে করীম (স) একজন সাক্ষী ও কিরা-কসমের ভিত্তিতে বিচার কার্য করেছেন।

উসমান ইবনুল হিকাম, জুহাইর ইবনে মুহাম্মাদ, সুহায়ল ইবনে আবূ সালিহ— তাঁর পিতা— জায়দ ইবনে সাবিত সূত্রে অনুরূপ কথা নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন।

অপর হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, উসমান ইবনে আবূ শায়বা ও আল-হাসান ইবনে আলী সূত্রে। জায়দ ইবনুল হুবাব তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, সায়ফ— অর্থাৎ ইবনে সুলায়মান আল-মক্কী, কায়স ইবনে সাঈদ, আমর ইবনে দীনার, ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ 'রাসূলে করীম (স) কিরা-কসম ও একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফায়সালা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া ও সালমাতা ইবনে শুবাইব, আবদুর রায্‌যাক, মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম, আমর ইবনে দীনার সূত্রে উক্ত অর্থেরই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবদুর রহমান ইবনে সীমা আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ— তাঁর পিতা— আবদুল্লাহ ইবনুল হরস, সায়ফ ইবনে সুলায়মান, কায়স ইবনে সাঈদ, আমর ইবনে দীনার, ইবনে আনাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ 'নবী করীম (স) কিরা-কসম ও একজন সাক্ষীর ভিত্তিতে বিচার করেছেন। আমর বলেছেন, এটা ধন-মালের ব্যাপারে ফায়সালা ছিল। আবদুর রহমান ইবনে সীমা, আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ— তাঁর পিতা আহমাদ, অকী, খালেদ ইবনে আবূ করীমা, আবূ জাফর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجَزَشَهَادَةَ رَجُلٍ مَعَ يَمِيْنِ الْمُدَّعِىْ فِىْ الْحُقُوْقِ -

রাসূলে করীম (স) বাদীর একজন সাক্ষী ও কিরা-কসমের ভিত্তিতে হক্-হুকুকের মামলার বিচার করার অনুমতি দিয়েছেন।

এ হাদীসটি মালিক ও সুফিয়ান জাফর ইবনে মুহাম্মাদ-তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, নবী করীম (স) এক ব্যক্তির ও বাদীর কিরা-কসমের ভিত্তিতে বিচার ফায়সালা করেছেন।

আবূ বকর (র) বলেছেন, এ সব হাদীস গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক রয়েছে। তাতে যে একজন সাক্ষী ও বাদীর কিরা-কসমের ভিত্তিতে বিচারকার্য সম্পন্ন করা জায়েয প্রমাণিত হয়, তা-ও কয়েকটি কারণে গ্রহণযোগ্য হবে না। একটি কারণ, সাক্ষ্য গ্রহণের গোটা ব্যবস্থা ও বিচার পদ্ধতি এর ফলে বিনষ্ট হয়ে যাবে। দ্বিতীয়— যাঁদের থেকে উক্ত হাদীসসমূহ বর্ণিত হওয়ার কথা

বলা হয়েছে, তাঁরা তা অস্বীকার করেছেন। তৃতীয়— তাতে কুরআনের অকাট্য দলীলকে 'রদ' করা হয়। চতুর্থ— এসব হাদীস যদি আঘাত ও বিনষ্ট থেকে সুরক্ষিত মেনেও নেয়া হয়, তবুও বিপরীত মতটি প্রমাণিত হয় না। পঞ্চম— এ সব হাদীস কুরআনের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ প্রমাণিত হতে পারে, তার সম্ভাবনা আছে।

এ সব হাদীসের বর্ণনাধারায় বিপর্যয় থাকার ব্যাপারটি সম্পর্কে বলা হল, সায়ফ ইবনে সুলায়মান বর্ণিত হাদীসটি প্রমাণিত হয়। কেননা এ সায়ফ ইবনে সুলায়মান দুর্বল বর্ণনাকারী। আর আমর ইবনে দীনার ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট হাদীস শুনেছেন, এ কথা সহীহ্ প্রমাণিত হয়নি। অতএব তা বিপরীত মতের লোকদের দলীল হতে পারে না।

আবদুর রহমান ইবনে সীমা আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমাদ, আহমাদ, আবূ সালমাতা আল-খুজায়ী, সুলায়মান ইবনে বিলাল, রবীআতা ইবনে আবূ আবদুর রহমান, ইসমাইল ইবনে আমর ইবনে কায়স ইবনে সাদ ইবনে উবাদাতা— তাঁর পিতা আমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা সাদ ইবনে উবাদাতা লিখিত কিতাবে এ কথা লিখিত পেয়েছেন যে, নবী করীম (স) একজন সাক্ষী ও কিরা-কসমের ভিত্তিতে বিচারকার্য করেছেন। যদি তার নিকট আমর ইবনে দীনার, ইবনে আব্বাস সূত্রের সনদ থাকত, তাহলে সে তা অবশ্যই উল্লেখ করত। তারা নিশ্চয়ই সাদ ইবনে উবাদা লিখিত কিতাবে কিছু লিখিত পাওয়ার কথা বলত না। সুহায়ল বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে কথা হল, মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, আহমাদ ইবনে আবূ বকর আবূ মুসয়িব আজ-জুহরী দারাওয়ার্দী, রবীআতা ইবনে আবূ আবদুর রহমান, সুহায়ল ইবনে আবূ সালিহ, আবূ সালিহ, আবূ হুরায়রাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) একজন সাক্ষী ও কিরা-কসমের ভিত্তিতে বিচারকার্য করেছেন। আবূ দাউদ বলেছেন, রুবাই ইবনে সুলায়মান আল-মুয়ায্যিন এ হাদীসের কথা আরও বাড়িয়ে বলেছেন। বলেছেন, শাফেয়ী আবদুল আজীজ সূত্রে বলেছেন। পরে এ কথা আমি সুহায়লকে বলেছি। তখন তিনি বললেন, রবীআতা আমাকে খবর দিয়েছে। আমার মতে রবীআতা 'সিকাহ' বর্ণনাকারী। আমি তাকে হাদীস শুনিয়েছি। তবে আমি তা মুখস্থ করে রাখিনি। আবদুল আজীজ বলেছেন, সুহায়লকে কোন 'ইল্লাত' পেয়ে বসেছিল, যা তার বিবেক-বুদ্ধি দূর করে দিয়েছে। আর তার বর্ণিত হাদীসের কিছু অংশ সে ভুলে গেছে। পরে সুহায়ল রবীআতা— তাঁর পিতা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতে থাকেন।

মুহাম্মদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, মুহাম্মাদ ইবনে দাউদ আল-ইসকান্দারাসী, যিয়াদ ইবনে ইউনুস, সুলায়মান ইবনে বিলাল, রবীআতা আবূ মুসয়িব-এর সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুলায়মান বলেছেন, আমি সুহায়লকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। বললেন, আমি তো তা জানি না, চিনি না। আমি তাঁকে বললাম, রবীআতা আমাকে আপনার নামে এ হাদীস শুনিয়েছেন। রবীআতা যদি তোমাকে আমার নামে এ হাদীস শুনিয়ে থাকে, তাহলে তুমি তা রবীআতার নামেই বর্ণনা কর। এ ধরনের বর্ণনার হাদীস দ্বারা শরীয়াত প্রমাণিত হতে পারে না, যখন যার নামে তা বর্ণিত, তিনিই তা অস্বীকার করেন। তিনি তা চিনতেও পারেন না।

যদি কেউ বলেন, হতে পারে, এক সময় তা তিনি বর্ণনা করেছেন, পরে তিনি তা ভুলে গেছেন।

জবাবে বলা যাবে, এ-ও তো হতে পারে যে, শুরুতেই তাঁর এ বিষয়ে সংশয় ঘটেছে এবং যা শুনেন নি, তা-ই তিনি বর্ণনা করেছেন। আমরা জানি যে, এ অস্বীকৃতি তাঁর জীবনের শেষ দিকের ব্যাপার ছিল। তিনি এ সম্পর্কিত জ্ঞান-ই হারিয়ে ফেলেছিলেন।

আর জাফর ইবনে মুহাম্মাদ বর্ণিত হাদীসটি 'মুরসাল'। আবদুল ওহাব আস্-সকফী সেটিকে 'মুত্তাসিল (متصل) বানিয়েছেন। এ-ও বলা হয়েছে যে, তিনি তাতে ভুল করেছেন। পরে তিনি তা জাবিরকে শুনিয়েছেন। সেটি আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইবনে আলী, নবী করীম (স) সূত্রে।

আবূ বকর (র) বলেছেন, আমরা এই যে সব কথার উল্লেখ করলাম, তা যেসব কারণ এসব হাদীস গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক, তার মাত্র একটি কারণ। এসব কারণে এসব হাদীসের ভিত্তিতে শরীয়াতের কোন হুকুমই প্রমাণিত হতে পারে না।

অপর একটি দিক দিয়ে বলা যায়, আবদুর রহমান ইবনে সীমা, আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ, আহমাদ, ইসমাঈল, সওয়ার ইবনে আবদুল্লাহ্ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি রবীআতার রায়কে বললাম ঃ তোমাদের কথা হচ্ছে, সাক্ষীর সাক্ষ্য, আর দাবিদারের কিরা-কসম তা কোথায় পেলে ? বললেন, সাদ লিখিত কিতাবে পেয়েছি। তাই বলতে হয়, সুহায়ল বর্ণিত হাদীস যদি রবীআতার নিকট সহীহ্ হতো, তাহলে তার উল্লেখ অবশ্যই করতেন। সাদ লিখিত কিতাবের উপর নির্ভরতা গ্রহণ করতেন না।

আবদুর রহমান ইবনে সীমা আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ, তাঁর পিতা আহমাদ, আবদুর রাযযাক, মামার, জুহরী সূত্রে সাক্ষী ও কিরা-কসম পর্যায়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, আমি এই হাদীস লোকদের নিকট বর্ণনা করি; কিন্তু তা দুজন সাক্ষী ছাড়া নয়।

হাম্মাদ ইবনে খালিদ আল-খায়ত হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন, আমি ইবনে আবূ যিবকে জিজ্ঞাসা করেছি, একজন সাক্ষী ও কিরা-কসম সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে জুহরীর কি বক্তব্য ছিল ? বললেন, তিনি বলতেন, এটা বিদআত। এই ব্যবস্থার অনুমতি প্রথম দিয়েছেন মুআবিয়া (রা) মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনে আবূ যিব থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, আমি জুহরীর নিকট একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও বাদী দাবিকারীর কিরা-কসম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছেন ঃ

مَا أَعْرِفُهُ وَإِنَّهَا بِدْعَةٌ وَأَوَّلُ قَضَى بِهِ مُعَاوِيَةُ -

আমি তা জানি না। তা নিঃসন্দেহে বিদআত। মুআবিয়াই সর্বপ্রথম এর ভিত্তিতে বিচার কার্য সম্পন্ন করেছেন।

ইমাম জুহরী তাঁর সময়ে ইলমে হাদীস তথা ইলমে শরীয়াতের সর্বাধিক ইলমের অধিকারী ছিলেন। তাই বলা যায়, এ হাদীসটি যদি প্রমাণিত হতো তাহলে তাঁর নিকট তা অজানা অপরিচিত থাকতে পারত না। ইলমে শরীয়াতে এটা একটা বিরাট মৌলনীতি। তাছাড়া কথা সকলেরই জানা যে, মুআবিয়াই সর্বপ্রথম এই ভিত্তিতে বিচারকার্য করেছেন এবং তা বিদআত।

মুআবিয়া থেকেই বর্ণিত, তিনি ধন-মালের মামলায় বাদীর কিরা-কসম ছাড়াই একজন মাত্র মেয়ে সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফায়সালা দিয়েছেন।

আবদুর রহমান ইবনে সীমা, আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমাদ, আহমাদ, আবদুর রাযযাক ও রুহ ও মুহাম্মাদ ইবনে বকর প্রমুখ বলেছেন, ইবনে জুরাইয, আবদুল্লাহ ইবনে আবূ মুলায়কাতা, আল-কামা ইবনে আবূ ওয়াক্কাস সূত্রে বর্ণিত, তিনি জানিয়েছে, উম্মে সালমাতা, রাসূলে করীম (স)-এর স্ত্রী, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জুহাইর ও তাঁর ভাইদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, রবীআতা ইবনে আবূ উমাইয়্যা তাঁর ভাই জুহাইর ইবনে আবূ উমায়্যাতাকে তাঁর জমির

অংশ দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এজন্যে উম্মে সালমাতা ছাড়া আর কাউকে সাক্ষী বানান নি। পরে মুআরিয়া (রা) কেবল তাঁর সাক্ষ্যকেই জায়েয ধরে ফায়সালা দিয়েছিলেন। আল-কামা উপস্থিত থেকে মুআবিয়ার এ ফয়সালা দিতে দেখেছিলেন। অতএব মুআবিয়ার একজন সাক্ষী ও কিরা-কসমের ভিত্তিতে এ বিচার ফায়সালা দান জায়েয হলে কোন কিরা-কসম ব্যতীতই শুধু একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় দেয়া অবশ্যই জায়েয হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতএব তোমরা সে রকমই বিচার কর। আর কুরআন সুন্নাহ্র নির্দেশকে অগ্রাহ্য করতে থাক।

আবদুর রহমান ইবনে সীমা আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ, আহমাদ, আবদুর রাযযাক, ইবনে জুরাইয সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আতা বলতেন, ঋণ ইত্যাদির বেলায় দুজন সাক্ষী ছাড়া সাক্ষ্য জায়েয হবে না। কিন্তু আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান ক্ষমতাসীন হয়ে একজন পুরুষের সাক্ষ্য ও বাদীর কিরা-কসমের ভিত্তিতে বিচার করতে শুরু করলেন। মুতরাফ ইবনে মাজেন, ইয়ামানবাসীদের বিচারক, ইবনে জুরাইয, আতা ইবনে আবূ রিবাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আতা বলেছেন, আমি এ মক্কা নগরকে এমন পেয়েছি যে, লোকদের হক-হুকুকের ব্যাপারে দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্য ছাড়া কোন রায় দেয়া হতো না। কিন্তু পরবর্তীতে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান ক্ষমতাসীন হয়ে একজন সাক্ষী ও বাদীর কিরা-কসমের ভিত্তিতে বিচার চালাতে লাগলেন।

লায়স ইবনে সাদ জুরাইক ইবনে হুকায়ম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি উমর ইবনে আবদুল আজীজ (জুরাইক তাঁর গভর্নর ছিলেন) কে লিখে পাঠালেন, আপনি মদীনায় একজন সাক্ষী ও পাওনাদারের কিরা-কসমের ভিত্তিতে ফায়সালা করতেন। জবাবে উমর লিখেছিলেন, হ্যাঁ, আমি সেভাবেই বিচারকার্য করতাম। যদিও লোকদেরকে আমি ভিন্নভাবে বিচার করতে দেখেছি। আজ আমি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি, তুমি দুজন পুরুষ সাক্ষী অথবা একজন পুরুষ ও দুজন নারীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারকার্য সম্পন্ন করবে। এভাবে আগের কালের শরীয়াতবিদগণ জানিয়ে দিয়েছেন যে, কিরা-কসমের ভিত্তিতে বিচারকার্য করা মুআবিয়ার (রা) ও আবদুল মালিকের রীতি বা সুন্নাত। তা রাসূলে করীমের সুন্নাত নয়। তা যদি রাসূলে করীম (স)-এর সুন্নাত হতো, তাহলে তাবেয়ী আলিমগণের নিকট তা অজানা থাকতে পারত না।

আমরা এই যে দুই কারণের উল্লেখ করলাম,— তার একটি সনদ বেঠিক হওয়া ও তার উল্টা-পাল্টা হওয়া। আর দ্বিতীয়, সুহায়লের অস্বীকৃতি— যে, তিনি তা বর্ণনা করেন নি, অথচ তিনি উত্তম বর্ণনাকারী এবং রবীআতার এই সংবাদ দান যে, এই বর্ণনার মূল হল সাদের লিখিত কিতাব। সেই সাথে তাবেয়ী আলিমগণের অস্বীকৃতি এবং তাদের এ সংবাদ দান যে, তা বিদআত, মুআবিয়া ও আবদুল মালিকই সর্বপ্রথম এ পদ্ধতিতে বিচারকার্য করেছেন। আর তৃতীয় কারণ হল, এসব হাদীস যদি সুদৃঢ় বর্ণনা সূত্রে বর্ণিত হতো, তাহলে এ ধরনের 'খবরে ওয়াহিদ অবশ্যই গৃহীত হতো, আগের কালের মনীষীদের অস্বীকৃতি ও তা বিদাআত অভিধায় অভিহিত হওয়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতো। তাই এসব হাদীস কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণার পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে না। কেননা খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কুরআনের হুকুম মনসূখ হতে পারে না। মনসূখ হওয়ার দিকটি হল, আয়াতটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভাষাবিদগণ যে তাৎপর্য বুঝতে পারেন, যাতে কারোর মনে একবিন্দু সন্দেহের উদ্রেক হয় না, তা হল, দুজন পুরুষ সাক্ষী কিংবা একজন পুরুষ ও দুজন মেয়ে সাক্ষী ছাড়া বিচারকার্য সম্পন্ন হতে পারে না। উদ্ধৃত হাদীসসমূহ গ্রহণ করা হলে আয়াতে উল্লেখ করা সংখ্যার কমে বিচার করা জায়েয হয়ে পড়ে। কেননা আয়াতের

উল্লিখিত সংখ্যায় একজন সাক্ষী ও কিরা-কসম কখনই শামিল গণ্য করা যায় না। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ 'ওদেরকে আশি দোররা মার' এবং 'ওদের দুজনের প্রত্যেককে একশটি দোররা মার'— এতে লিখিত সংখ্যার কম করা হলে শরীয়াতসম্মত শাস্তি 'হদ্দ' কার্যকর হবে না।

যদি কেউ প্রশ্ন তোলে যে, 'কযফ'-এর 'হদ্দ' আশি দোররার কমে হতে পারে— জায়েয, আর ব্যভিচারীর শাস্তিও একশ' দোররার কমে হতে পারে— আয়াতের বিপরীত। তেমনি যে একজন সাক্ষী গ্রহণ করল, সেও আল্লাহ্র আদেশ লঙ্ঘন করল— আল্লাহ্র বলা দুজন সাক্ষীর বদলে একজন সাক্ষী গ্রহণ করে আয়াতের অর্থের বিরুদ্ধতা করল। তেমনি অপর দিক দিয়ে সে কুরআনের কথার মূলে নিহিত আল্লাহ্র উদ্দেশ্যকেই সে নস্যাৎ করে দিল। সাক্ষী বানাতে বলার লক্ষ্যকেই ব্যর্থ করে দিল। সে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তো আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন ঃ 'এ বিধান আল্লাহ্র নিকট অধিকতর ন্যায় বিচারের ধারক, সাক্ষ্যের জন্যে অধিক নির্ভরযোগ্য এবং সন্দেহ-সংশয় থেকে অনেক দূরে থাকার ব্যবস্থা।'

এবং আল্লাহ্র কথা ঃ 'সাক্ষী হিসেবে তোমরা যাদের পছন্দ কর, তাদের থেকেও একজন ভুলে গেলে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে।'

এসব ঘোষণার দ্বারা জানিয়ে দিয়েছেন যে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সতর্কতা অবলম্বন, পাওনাদারের হক পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান এবং কুরআনী বিধানের বিজয় সাধন, সাক্ষীদের প্রতি সন্দেহ না হওয়া ও সব মিথ্যা দোষারোপ থেকে মুক্তি লাভ।

একজন সাক্ষী ও কিরা-কসমের ভিত্তিতে বিচার করা হলে উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহের কোনটিই কার্যকর থাকে না। সেসবের গুরুত্বই অস্বীকৃত হয়ে যায়। আমরা এই যা বললাম, এ থেকে প্রমাণিত হল যে, ওভাবে বিচার কার্য করা হলে কুরআনের পরিপন্থী কাজ হবে। উপরোক্ত দুটি দিকের বিশ্লেষণে এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, একজন সাক্ষী ও কিরা-কসমের ভিত্তিতে বিচার করা হলে আয়াতের স্পষ্ট বিরুদ্ধতা করা হবে। কুরআনের হুকুম তো দুজন পুরুষ সাক্ষী অথবা একজন পুরুষ ও দুজন মেয়ে সাক্ষীর দ্বারা বিচার করাই ছিল চিরকালের প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর ব্যবস্থা। একজন সাক্ষী ও কিরা-কসম কুরআন পরিপন্থী বলে চিহ্নিত। অতএব একজন সাক্ষী ও কিরা-কসমের ভিত্তিতে বিচার পদ্ধতি কুরআন দ্বারাই মনসূখ হয়ে গেল। কেননা তা যদি প্রমাণিত হতো, তাহলে তা লোকদের দ্বারা ব্যবহৃতও হতো, যেমন কুরআনের বিধান অনুযায়ী কাজ চালু ছিল।

আর চতুর্থ দিক হচ্ছে, একজন সাক্ষী ও কিরা-কসম যদি কুরআন-বিরোধী নয় বলে ধরেও নেয়া হয়, এবং তা দৃঢ়-শক্ত সূত্রে বর্ণিত-ও হতো, তবুও তাকে দলীল হিসেবে পেশ করা সহীহ্ হতে পারে না। কেননা একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও বাদীর কিরা-কসম দ্বারা তা প্রমাণিত হয় না। তাতে খুব বেশি ধরলেও শুধু এতটুকুই বলা যায় যে, স্বয়ং নবী করীম (স) একজন সাক্ষী ও কিরা-কসমের ভিত্তিতে বিচার করেছেন, নবী করীম (স)-এর বিচারকার্যের এ বর্ণনায় এমন সাধারণ অর্থবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়নি, যাতে একজন সাক্ষী ও কিরা-কসমের ভিত্তিতে বিচার করা ওয়াজিব-ফরয প্রমাণিত হতে পারে এবং অন্য লোকদের জন্যে তা অবশ্যই পালনীয় হতে পারে। হাদীসে তার অবস্থাটাও পূর্ণ মাত্রায় বিবৃত নয়।

আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (স) একজন সাক্ষী ও কিরা-কসমের ভিত্তিতে বিচার করেছেন। এরূপ কথার অর্থ এ-ও তো হতে পারে যে, একজন সাক্ষীর উপস্থিতি বিবাদীকে কিরা-কসম করতে বলার প্রতিবন্ধক নয়। যদি একজন সাক্ষীর

সাক্ষ্য লওয়ার পর বিবাদীকে কিরা-কসম করতে বলা হয়। বোঝা গেল, একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য হলে তাতে বিবাদীর কিরা-কসম করা নিষিদ্ধ হয়ে যায় না। তার হওয়া না হওয়া বা থাকা-না থাকা অভিন্ন। কেউ ধারণা করতে পারে যে, কিরা-কসম করা বিবাদীর জন্যে কর্তব্য। কেননা বাদীর একজন সাক্ষী হিসেবে ধর্তব্য নয় আসলেই। বর্ণনাকারী তার বিচারের বর্ণনাকে বাতিল করে দিয়েছেন। এ একটা ধারণা মাত্র। তা ছাড়া 'সাক্ষী' শব্দটি বর্ণনাম-ও হতে পারে। হতে পারে, বর্ণনাকারী বলতে চেয়েছেন, কিরা-কসমের ভিত্তিতে বিচার এক অবস্থায় একভাবে হয়, অন্য অবস্থায় অন্য রকমের হয়। কাজেই 'সাক্ষী' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বলে তা 'একজন সাক্ষী বোঝাবে,' এমন প্রমাণ নেই। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا -

পুরুষ চোর ও মেয়ে চোর— উভয়েরই হাতসমূহ কেটে ফেল। (সূরা মায়িদা ঃ ৩৮)

এ আয়াতে 'চোর' একটা বর্ণনাম। তার অর্থ একজন চোর হতেই হবে, এমন কথা নয়। হতে পারে, নবী করীম (স) একজন মাত্র সাক্ষী— খুজায়মা ইবনে সাবিত, যার একার সাক্ষ্যকে দুই ব্যক্তির সাক্ষ্যের সমান বানানো হয়েছে— সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচার করেছেন। তার পরেও বাদীর দ্বারা কিরা-কসম করানো হয়েছে। কেননা বিবাদী তো নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছেন।

পঞ্চম কারণ হচ্ছে, বিষয়টি হানাফী মাযহাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ারও পূর্ব সম্ভাবনা রয়েছে। তার এভাবে যে, বিচারের ব্যাপারটি ছিল এই— এক ব্যক্তি একটি দাসী ক্রয় করল এবং সেখানেই তার মধ্যে ত্রুটি বা খুঁত ধরে ফেলল। কোন ওযর ছাড়া সেদিকে নজর দেয়া যাবে না। ত্রুটি বা খুঁত প্রমাণে একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য কবুল করা যাবে, আর সে সাথে ক্রয়কারীর কিরা-কসম গ্রহণ করা হবে। তা হবে আল্লাহ্‌র নামে। এক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় হবে, বিক্রয়কারীর নিকট দাসীকে ফেরত দেয়া হবে, একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যই যথেষ্ট হবে। সেই সাথে বাদীকে কিরা-কসম করতে বলা হবে। এ বাদী তো সেখানে দাসী ক্রয়কারী। এখানে সাক্ষী ও কিরা-কসম আমাদের বিবৃত কথাসমূহের ধারক। সেই অর্থেই তা গ্রহণ করা কর্তব্য। তার সাথে একটি প্রতিষ্ঠিত হুকুম সব সময়ই থাকবে কুরআনের দলীল হিসেবে। কেননা নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ

مَااَتَاكُمْ عَنِّىْ فَاعْرِضُوْهُ عَلَى كِتٰبَ اللّٰهِ، فَمَا وَافَقَ كِتٰبَ اللّٰهِ فَهُوَمِنِّىْ، وَمَا خَالَفَهُ فَلَيْسَ مِنِّىْ -

আমার বিষয়ে তোমাদের নিকট যা-ই আসে, তোমরা তা আল্লাহ্‌র কিতাবের উপর ফেলে যাচাই কর। যা কুরআনের সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে, তা আমার থেকে মনে করবে। আর যা তার বিপরীত প্রমাণিত হবে, তা আমার থেকে নয় মনে করবে।

উপরন্তু একজন সাক্ষী ও কিরার ব্যাপারে যে বিচারকার্য বর্ণিত হয়েছে, তাতে এ প্রমাণ নেই যে, তা ধন-মাল ইত্যাদি সংক্রান্ত ছিল। আর ফিকাহবিদগণ ধন-মাল ছাড়া অন্য ব্যাপারে তা বাতিল বলে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। ধন-মালেও তা বাতিল গণ্য হবে অনুরূপভাবে।

যদি বলা হয়, আমর ইবনে দীনার তো তা ধন-মালের ব্যাপার বলে দাবি করেছেন।

জবাবে বলা যাবে, তা আমর ইবনে দীনারের নিজের কথা। আর এটাই তাঁর মাযহাব। নবী করীম (স) ওভাবে ধন-মালের ক্ষেত্রে বিচারকার্য করেছেন— এমন কথা কিন্তু বলেন নি।

ধন-মাল ছাড়া অন্যবারে অন্য ব্যাপারে এরূপ বিচার করা যাবে না, এ যখন সঙ্গত, যদিও বিচার সংক্রান্ত কথা অস্পষ্ট, তাতে ধন-মালের বা অন্য কিছুর উল্লেখ নেই। অতএব ধন-মাল সংক্রান্ত ব্যাপারেও ওভাবে বিচার করা যাবে না, যখন সে বিচারের অবস্থাটারই কোন বর্ণনা পাওয়া যায়নি। ধন-মালে যখন সেরূপ বিচার নেই, তখন আরও সঠিকভাবে অন্য বিষয়েও তা হবে না।

যদি বলা হয়, সেভাবে বিচার করা যাবে সেসব ব্যাপার, যাতে একজন পুরুষ ও দুজন মেয়েলোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। আর তা হচ্ছে ধন-মালের ব্যাপার। তাহলে বাদীর কিরা-কসম একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য অপর একটির সাক্ষ্যের স্থলাভিষিক্ত করা হবে।

জবাবে বলা যাবে, এ একটি দাবিমাত্র। এর দলীল-প্রমাণ কিছু নেই। তা সত্ত্বেও বাদীর কিরা-কসম অপর পুরুষ সাক্ষীর স্থলাভিষিক্ত হল কি করে, একজন মেয়ে সাক্ষীর স্থলাভিষিক্ত না হয়ে। এ-ও বলা যায়, বাদী যদি একজন মেয়েলোক হয়, তাহলে তার কিরা-কসম কি কোন পুরুষ সাক্ষীর স্থলাভিষিক্ত হবে ? জবাবে যদি হ্যাঁ বলে, তাহলে বলা যাবে, কিরা-কসম সাক্ষ্যের অপেক্ষাও অধিক তাগিদপূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা হক্-হুকুকের মামলায় একজন মেয়েলোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায় না। অবশ্য তার কিরা-কসম গ্রহণ করা যাবে। আর তা এক ব্যক্তির সাক্ষ্যের স্থলাভিষিক্ত হবে। আল্লাহ তো আমাদেরকে তার সাক্ষ্য গ্রহণের আদেশ করেছেন, যাকে সাক্ষী হিসেবে আমরা পছন্দ করব। কিন্তু এই মেয়েলোকটি যদি একজন সাক্ষী হিসেবে গৃহীত হয়, অথবা তার হলপ একজন পুরুষের সাক্ষ্যের স্থলাভিষিক্ত গণ্য হয়, তাহলে কুরআনের বিরুদ্ধতা করা হবে। কেননা একটি লোক নিজের জন্যে যে দাবি করে, তাতে সে পছন্দনীয় ব্যক্তি রূপে গণ্য হবে না। তাদের কথার পারস্পরিক বিরুদ্ধতা বোঝা যায় এ দিক দিয়ে যে, অর্থনৈতিক ঋণ চুক্তিতে মুসলমানের বিরুদ্ধে একজন কাফিরের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না, কাফির ব্যক্তির সাক্ষ্যও গ্রহণীয় নয়, এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই। পরন্তু বাদী যদি হয় কাফির বা ফাসিক, আর সাক্ষ্য দিল মাত্র একজন সাক্ষী, তারা তাকে হলপ করতে বলল এবং সে যা দাবি করে তা সে তার কিরা-কসম দ্বারা পেয়ে যায়, সে যদি এ ধরনের কোন সাক্ষ্য অপর একজনের জন্যে দেয়, আর সে তাতে পঞ্চাশবার কিরা-কসম করে, তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না— গ্রহণ করা যাবে না তার কিরা-কসম। যদি সে নিজের জন্যে দাবি করে— অর্থাৎ মামলার বাদী নিজে হয়েও কিরা-কসম করে, সে যার দাবি করেছিল, তা সে পেয়ে যাবে তার কথার দ্বারাই। যদিও সে সাক্ষী হিসেবে অপছন্দনীয় ব্যক্তির সংরক্ষিতও সে নয়, না তার সাক্ষ্যে, না কিরা-কসমে। এ থেকেই প্রমাণিত হল যে, তাদের কথা বাতিল, তাদের মাযহাব চূর্ণকারী।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا –

সাক্ষীগণকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে ডাকা হলে তারা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করবে না।

সাঈদ ইবনে যুবায়র, আতা, মুজাহিদ, শবী ও তায়ূস থেকে বর্ণিত, সাক্ষীগণকে সাক্ষ্যদানের জন্যে ডাকা হলে (তাহলে যেতে অস্বীকার করতে পারবে না)। আর কাতাদাতা ও রুবাই ইবনে আনাস থেকে উক্ত আয়াতের অর্থ হিসেবে বর্ণিত, লিখিত সাক্ষ্যের সত্যতা যথার্থতা প্রতিষ্ঠার জন্যে যখন ডাকা হবে, তখন উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে। ইবনে আব্বাস (রা) ও আল-হাসান থেকে বর্ণিত, উক্ত আয়াতটি এক সাথে দুটি কথা বলেছে। একটি হল— লিখিত

দলীলে সাক্ষী হিসেবে দেয়া সাক্ষ্যের সত্যতা প্রমাণ করা এবং দ্বিতীয়— বিচারকের নিকট বিষয়বস্তুর সত্যতা প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করা।

আবূ বকর (রা) বলেছেন, আয়াতটি বাহ্যত উক্ত দুটি বিষয়েই বলা হয়েছে, একথা ঠিক। কেননা ব্যবহৃত শব্দ সাধারণ তাৎপর্য সম্পন্ন। তা শুরুতে সাক্ষ্য প্রমাণিত করার ব্যাপার। যেন বলা হয়েছে, দলীলে তাদের লিখিত সাক্ষ্যসমূহের প্রমাণ করার জন্যে যদি ডাকা হয়, তাহলে .... চুক্তিকারী পক্ষদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হওয়া সাক্ষীগণ সম্পর্কে একথা নয়। চুক্তির পক্ষদ্বয়ের উপর কর্তব্য হচ্ছে, সাক্ষ্যদ্বয়কে সাক্ষ্যদানের জন্যে উপস্থিত করা। যখন তারা দুজনই উপস্থিত হলে। এবং তাদেরকে দলীলে তাদের লিখিত সাক্ষ্যের সত্যতা প্রমাণ করতে বলা হবে, ঠিক এ অবস্থাই বক্তব্যের মধ্যে শামিল আল্লাহ্র এই اذامادعوا 'যখন তাদের ডাকা হবে' কথায়। অর্থাৎ ডাকা হবে সাক্ষ্যকে প্রমাণ করার জন্যে। তবে তারা দুজন তাদের সাক্ষ্যদ্বয়কে প্রমাণিত করল, পরে তা বিচারকের নিকট প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তাদেরকে ডাকা হল, আয়াতে এ ডাকার কথাই বলা হয়েছে এবং তা হল, বিচারকের নিকট হাজির হওয়া। কেননা বিচারক নিজে তো আর সাক্ষীদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হবে না এজন্যে যে, তারা তার নিকট সাক্ষ্য দেবে। বরং সাক্ষীদেরই কর্তব্য হচ্ছে বিচারকের নিকট উপস্থিত হওয়া । অতএব প্রথম ডাকা হল, দলীলের সাক্ষ্য প্রমাণের জন্যে। আর দ্বিতীয় ডাকা হল, বিচারকের নিকট হাজির হয়ে, তার নিকট তাদের দেয়া সাক্ষ্যের সত্যতা-যথার্থতা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করা।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ -

এবং তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুজন সাক্ষী বানিয়ে নাও।

এর দুটি অবস্থা হতে পারে। শুরু থেকে একটা অবস্থা এবং বিচারকের নিকট সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করা। আর আল্লাহ্র কথা ঃ 'একজন ভুলে গেলে অপর জন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে' থেকে সাক্ষ্যদানের শুরুতেই তা হওয়া জরুরী নয়। কেননা তাতে শব্দ যত শামিল করে তার কিছু অংশের উল্লেখ হয়েছে তাতে। অতএব তাতে কোন বিশেষ প্রমাণ নেই।

যদি কেউ বলেন, আল্লাহ্ যখন 'সাক্ষীগণ অস্বীকার করবে না যখন তাদের ডাকা হবে' বলেছেন, এতে 'সাক্ষীগণ' নামে তাদেরকে অভিহিত করেছেন। বোঝা গেল, এটা সে অবস্থার কথা যখন সাক্ষ্য বিচারকের সামনে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। কেননা তারা দলীলের সাক্ষ্য দেয়ার পূর্বে 'সাক্ষী' নামে অভিহিত হতে পারে না।

জবাবে বলা যাবে, একথা ঠিক নয়। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'এবং তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুই জন সাক্ষী বানাও।' এতে আল্লাহ্ই তাদেরকে 'দুইজন সাক্ষী' বলেছেন। তাদেরকে সাক্ষী বানাতে— সাক্ষ্য দিতে আদেশ করেছেন। অথচ এখন পর্যন্ত সাক্ষ্য দেয়ার কোন কাজ-ই করেনি। কেননা একথার অর্থ যে শুরু অবস্থা বোঝানো, তাতে কোন মতপার্থক্য নেই। তা আল্লাহ্র এ কথাটির মতই ঃ

فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ -

সে স্ত্রী তার জন্যে হালাল হবে না, যতক্ষণ সে তাকে বাদে আর একজন স্বামী গ্রহণ না করবে।

এতে বিয়ের আগেই তাকে (যাকে পরে বিয়ে করবে) 'স্বামী' বলা হয়েছে। সাক্ষীর পক্ষে শুরুতেই সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব রয়েছে। ফরয হিসেবেই সে কাজ তাকে করতে হবে, যখন তাকে ছাড়া সাক্ষ্যদানের জন্যে অন্য কাউকে পাওয়া যাবে না। তা ফরযে কিফায়া— যেমন জিহাদ, জানাযার নামায, মৃতের গোসল দান, তার কাফন-দাফন। কিছু লোক যখন তা পালন করবে, অন্যদের পক্ষ থেকেও তা আদায় হয়ে যাবে। সাক্ষ্যের ব্যাপারটিও অনুরূপ। তা করা ও যথাযথ পালন করাও ফরযে কিফায়া। কিছু লোক সে দায়িত্ব পালন করলেই তা আদায় হয়ে যাবে। তা যে ফরযে কিফায়া— সকলের জন্যে ফরয নয়, তার প্রমাণ হল, সকলকেই তার বোঝা বহন করতে হবে— এমন কথা নয়। যদি প্রত্যেকের জন্যে জায়েয হতো যে, তার বোঝা বহন করা থেকে বিরত থাকবে, তাহলে সমাজে দলীল-দস্তাবেজ তৈরীই হতে পারত না। সাক্ষী বানাবার কাজটি অচল হয়ে যেত। আর তাতে আল্লাহ্‌র দেয়া বিধানটাও অকেজো হয়ে যেত। অথচ লোকদের জন্যে দলীল রচনা করার ও সাক্ষী বানানোর কাজটি খুবই পছন্দ করা হয়েছে। এ থেকে মোটামুটিভাবে সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত করার ফরয বাধ্যতামূলক হওয়া প্রমাণিত হয়।

এ ফরয অনির্দিষ্ট, প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তা নির্দিষ্টভাবে ধার্য হয়নি, তার প্রমাণ এই যে, তার বোঝা বহন করা যে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি মুসলমানের জন্যেই ফরয নয়, সে বিষয়ে সব মুসলমান সম্পূর্ণ একমত। তা আল্লাহ্‌র এ কথাটি দ্বারাও প্রমাণিত হয়, বলেছেন ঃ

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ -

দলীলের লেখক ও সাক্ষী— কাউকেই ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না।

সাক্ষী হওয়ার বোঝা বহন যখন ফরযে কিফায়া প্রমাণিত হল, বিচারকের নিকট উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব পালনও ফরযে কিফায়াই। কিছু সংখ্যক লোক তা করলেই অন্যদের পক্ষ থেকেও তা আদায় হয়ে যাবে। আর কুরআনে যখন মাত্র দুজন সাক্ষী বানাবার কথা বলা হয়েছে, তখন সে দুজনের উপরই তা 'ফরযে আইন' হয়ে যাবে, যখন তাদেরকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে ডাকা হবে। এর দলীল, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'সাক্ষীদেরকে যখন ডাকা হবে, তখন তারা তা অস্বীকার করবে না।' এবং তাঁরই কথা ঃ

وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ - وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهُ اٰثِمٌ قَلْبُهُ -

এবং তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে তা গোপন করবে, তার অন্তর পাপী।

বলেছেন ঃ

وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ -

এবং তোমরা সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত কর আল্লাহ্‌র জন্যে।

বলেছেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْعَلٰى اَنْفُسِكُمْ -

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও, আল্লাহ্‌র জন্যে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে— তা যদি তোমাদের বিরুদ্ধেও হয়।

যদিও সাক্ষীদ্বয় স্বাধীন, তাদের দুজন ছাড়া অন্যরা তা কায়েম করার জন্যে এগিয়ে আসতে পারত। তা করলে তাদের উপর ফরয দাঁড়িয়ে থাকত না।— যেমন এর পূর্বে বলেছি।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَاتَسْـاَمُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْكَبِيْرًا اِلٰى اَجَلِهِ -

এবং তোমরা ছোট বা বড় বিষয়ে তার মিয়াদের উল্লেখ সহ লিখতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করো না।

মানব সমাজে সাধারণত অল্প মিয়াদের যে চুক্তি হয় কিংবা হয় বড় ও দীর্ঘ মিয়াদের— বা অল্প মালের চুক্তি হোক কি বড় মালের চুক্তি, তা লিখতে তোমরা ক্লান্তি বোধ করো না। লিখবে এবং তাতে সাক্ষীও বানাবে। একথা জানা আছে, ক্ষুদ্র পরিমাণের বা মূল্যের মুদ্রা তদানীন্তন মদীনায় সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল না। তাহলেও তাতে মিয়াদ নির্দিষ্ট হতো না। কিন্তু আয়াতের হুকুম হল, অল্প পরিমাণের লেনদেনের সময় নির্ধারণ বড় পরিমাণের লেনদেনে সময় নির্ধারণে কোন পার্থক্য নেই। দুটিতে দলীল লেখা ও সাক্ষী বানানোর আদেশ অবশ্য পলনীয়। তবে খুব সামান্য মাত্র পরিমাণের লেনদেন ও দলীল লিখতে হবে, সাক্ষী বানাতে হবে, এ কথা বলা আয়াতের উদ্দেশ্য নয়। সে সামান্য ব্যাপারে দলীল লেখা বড় জোর মুস্তাহাব হবে। সাধারণ প্রচলন হিসেবে যা চালু আছে, তা ইজতিহাদের পন্থায় চালু হয়েছে লোকদের বিজয়ী ধারণার ফলে। আর তাতে নিত্য নব ঘটনায় ইজতিহাদ করাই জায়েয প্রমাণিত হয়। কেননা সে বিষয়ে 'তাওকীফ' বিধানদাতার নিকট থেকে বিধান নাযিল হয়নি বলেই তাতে ইজতিহাদ করা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ اِلٰى اَجَلِهِ । অর্থাৎ মিয়াদের শেষ হওয়ার সময়ের উল্লেখ সহ। দলীলে এই মিয়াদ শেষ হওয়ার সময়কালের উল্লেখ থাকতে হবে মূল ঋণের উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে। এর অর্থ এ-ও যে, সাক্ষীদ্বয়ের কর্তব্য, তারা দলীলে ঋণের বিবরণ তার নগদ, পরিমাণ ইত্যাদিও লিখাবে। মিয়াদ হলো তার একটি বিষয় মাত্র। ঋণ সংক্রান্ত সব ব্যাপারে গুরুত্ব অভিন্ন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ -

এই পদ্ধতিটা আল্লাহ্‌র নিকট অতীব ন্যায়পরতাপূর্ণ এবং সাক্ষ্যদান ব্যবস্থার দৃঢ়তা বিধানকারী।

এ আয়াতে বলা হয়েছে, দলীল লিখতে ও সাক্ষী বানাতে বলার উদ্দেশ্য লেনদেনে দৃঢ়তা বিধান করা, ঋণ-চুক্তির পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সতর্কতা কার্যকর করা, অস্বীকৃতি প্রতিরোধ করা ও পারস্পরিক বিরোধ-পার্থক্য বিদূরণের নিশ্চয়তা বিধান করা। লিখতে বলার তাৎপর্যও বলা হয়েছে। জানানো হয়েছে যে, এটা আল্লাহ্‌র নিকট ন্যায়পরায়ণতাপূর্ণ ব্যবস্থা। অর্থাৎ এ ব্যবস্থার মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তাদের পরস্পরের জুলুম শোষণ হতে না পারে, তার নিশ্চয়তা দান। সেই সাথে তা সাক্ষ্যদান ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকারী। একথা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, লেনদেনের দলীল লিখিত না হলে কঠিন অবস্থা দেখা দেয়া অসম্ভব নয়। সেই সাথে পারস্পরিক শোবাহ-সন্দেহ দূর করার এটাই হচ্ছে নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা। আল্লাহ্ আমাদের জন্যে একথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। সে সতর্কতা আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে যেমন, আমাদের দুনিয়ার ব্যাপারেও তেমনি। সমাজের লোকদের মধ্যে এক ব্যাপক নিয়ম-শৃঙ্খলা কার্যকর করাও এর

একটা উদ্দেশ্য। এ সবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন যে, দলীল লিখে নেয়ার মধ্যে সাক্ষ্যের ব্যাপারেও সতর্কতার ব্যবস্থা রয়েছে। যার ফলে শোবাহ্ সন্দেহ দূর হয়ে যাবে। দলীল লিখিত না হওয়ার তুলনায় লিখিত হওয়া আল্লাহ্‌র নিকটও অধিক সুবিচারপূর্ণ পন্থা। যদি দলীল লিখিত না হয়, তাহলে সাক্ষীর মনেও সংশয় ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব জাগতে পারে। পরে এ সন্দেহ সংশয়ের কারণে সুষ্ঠুভাবে সাক্ষ্য দাঁড় করা তার পক্ষে আর কখনই সম্ভব হবে না। তখন সে একটি নিষিদ্ধ কাজের দিকে অগ্রসর হয়ে পড়তে পারে কিংবা সাক্ষ্যদানকেই পরিহাস করতে পারে। আর তার ফলে পাওনাদারের হক বিনষ্ট হয়ে যাতে পারে।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাক্ষ্য সহীহ্ হবে যদি তার দ্বারা সন্দেহ সংশয় দূরীভূত হয়। সাক্ষীর পক্ষে সাক্ষদান তখনই জায়েয হবে, যদি সে সাক্ষী হওয়ার কথা স্মরণ করতে পারে এবং তার নিজের লেখা সে নিজে চিনতে পারে, অন্যথায় জায়েয হবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, সাক্ষ্যদানের ব্যাপারটি সন্দেহ মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই তিনি দলীল লেখার নির্দেশ দিয়েছেন। বোঝা গেল, সন্দেহ সহকারে সাক্ষ্য দেয়া জায়েয নয়। তাতে সন্দেহ উদ্রেক হলে সাক্ষ্য দেয়া নিষিদ্ধ হবে। অতএব স্মরণ ও জানা না হলে সাক্ষ্যদান সহীহ হবে না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا -

যে সব ব্যবসায় তোমরা নগদ ও হাতে-হাতে কর, তা না লিখলে তোমাদের কোন দোষ হবে না।

অর্থাৎ যে সব ক্রয়-বিক্রয় তোমাদের প্রত্যেকেই পণ্য ও তার মূল্য নগদ ও হাতে-হাতে দেয়া-নেয়া সম্পন্ন কর, তা না লেখা মুবাহ। এটা আল্লাহ্‌র দেয়া সুবিধা। তিনি তাঁর বান্দাগণকে এর দ্বারা সম্মানিত করেছেন। এটা তাঁর একটা রহমতও। অন্যথায় দৈনন্দিন যেসব ক্রয়-বিক্রয় নগদা-নগদি হয়, তা লেখা বাধ্যতামূলক ও ফরয হলে লোকদের জীবন যাত্রা কঠিন ও সংকীর্ণ হয়ে পড়ত। এ সব বেচা-কেনা সাধারণ খাদ্য-পানীয়ের ব্যপারে প্রতি মুহূর্তের প্রয়োজন পূরণের জন্যে হয়ে থাকে। এ কথারই ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ -

আর তোমরা যখন পারস্পরিক কেনা-বেচা কর, তখন তোমরা সাক্ষী বানাও।

এ একটি সাধারণ হুকুম। তা সকল প্রকারের ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির ব্যাপারে প্রযোজ্য, যা নগদ মূল্যে হোক, কি বাকী মূল্যে। মিয়াদহীন উপস্থিত ও নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে লেখার কাজ না করলেও কোন দোষ হবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এ সব ক্ষেত্রে সাক্ষী বানানো মুস্তাহাব মাত্র। তবে খুব অল্প-স্বল্প মূল্যের নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে নিশ্চয়তা-নিরাপত্তা খুব বেশি। প্রয়োজন নেই বলে তাতে সাক্ষী বানানোর প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। যেমন রুটি, শাক-সবজি, পানি ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়।

আগের কালের ফিকাহবিদদের বহু সংখ্যক লোকদের মত হচ্ছে শাক-সব্জি ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়েও সাক্ষী রাখার প্রয়োজন। কিন্তু তা যদি খুব পছন্দনীয় কাজ হতো, তাহলে নবী

করীম (স), সাহাবী, আগের দিনের ফিকাহ্‌বিদ প্রমুখ থেকে তার বর্ণনা অবশ্যই পাওয়া যেত। সর্বসাধারণ লোকের সাধারণ প্রয়োজন পূরণার্থে তা ব্যবহৃতও হয়ত হতো। আমরা জানি, তারা খাদ্য-পানীয় দ্রব্যাদি পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয় করত, এমন বহু জিনিসই রয়েছে, যা ক্রয় না করলে মানুষের জীবন চলে না। তাতেও সাক্ষী বানাবার আদেশ তা মুস্তাহাব হলেও তা আসলে চুক্তি ভিত্তিক ক্রয়-বিক্রয়েই প্রযোজ্য। কেননা তাতে বিরাট মূল্য ও উত্তম পণ্যের চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি অস্বীকার করার মত অবস্থা দেখা দিতে পারে। তাতে বহু মানুষের হক-হুকুক বিনষ্ট হতে পারে, একজন অপর জনের উপর দোষ চাপাতে পারে। ত্রুটি বের করা যেতে পারে, সমস্ত বা কতক পাওনাদারের ক্রয়-বিক্রয়ে মাল ফেরত দেয়ার প্রশ্নও দেখা দিতে পারে। এ জন্যে বানাবার আদেশ হয়েছে, যদিও তা মুস্তাহাব। মিয়াদী মূল্যের চুক্তিতে অনুষ্ঠিত ক্রয়-বিক্রয়ের উপর সাক্ষী রাখা ও দলীল লেখা এবং উপস্থিত ও নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে দলীল না লেখা ও শুধু সাক্ষী রাখা এ দুটি ব্যবস্থার কথাই আয়াতে বলা হয়েছে।

লায়স মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ 'এবং সাক্ষী বানাও যখন তোমরা পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় কর' আল্লাহ্‌র এ কথার ব্যাখ্যা হল, বাকী মূল্যে হলে লিখে রাখতে হবে এবং নগদ মূল্যে হলে শুধু সাক্ষী রাখবে। আল-হাসান বলেছেন, নগদ মূল্যের ক্রয়-বিক্রয়ে সাক্ষীও রাখা হলে নিশ্চয়তা— নিশ্চিন্ততা দৃঢ়তা আসে। আর সাক্ষী রাখা না হলেও কোন দোষ হবে না। শবীও এরূপ মতই দিয়েছেন। কিছুসংখ্যক লোক বলেছেন, সাক্ষী বানাবার আদেশ মনসূখ হয়ে গেছে আল্লাহ্‌র এ কথার দ্বারা ঃ

فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا -

তোমাদের কতক লোক অপর কতককে যদি বিশ্বাস করে ......।

এর সঠিক তাৎপর্য ইতিপূর্বে আমরা ব্যাখ্যা করেছি।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ -

এবং লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না।

ইয়াযীদ ইবনে আবূ জিয়াদ মাকসাম, ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তা এভাবে যে, একজন লোক লেখক বা সাক্ষীর নিকট উপস্থিত হয়ে বলবে, আমার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। পরে বলবে, তুমি আদেশ করেছ যে, তুমি জবাব দেবে। অতএব ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। তায়ূস ও মুজাহিদ-ও সে কথা বলেছেন। আল-হাসান ও কাতাদাতা বলেছেন, লোককে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। অতএব সে লিখবে না যা লেখার আদেশ করা হয়নি। সাক্ষীকেও ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না, অতএব সে তার সাক্ষ্যে বাড়াবাড়ি করবে না। আল-হাসান কাতাদাতা ও আতা وَلَا يُضَارِرْ كَاتِبٌ পাঠরীতি অনুসরণ করেছেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও মুজাহিদ وَلَا يُضَارَرْ পাঠক্রম গ্রহণ করেছেন। একটি পাঠে দাবিদারকে নিষেধ করা হয়েছে লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতি করা থেকে। আর অপর পাঠে লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে নিষেধ করা হয়েছে বাদী পাওনাদারকে। এ দুটোই সহীহ কাজে ব্যবহৃত। পাওনাদারকে নিষেধ করা হয়েছে লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে। তা এভাবে হতে পারে যে, তাদের দুজনের প্রয়োজনীয় কাজ থেকে অন্যদিকে মশগুল রাখা হল এবং তাদের দুজনকে কেবল দলীল লেখার ও সাক্ষ্য দেয়ার কাজে মশগুল করে রাখা হল। আর লেখক ও সাক্ষী উভয়কে নিষেধ করা হয়েছে

পাওনাদারকে ক্ষতিগ্রস্ত করা থেকে। সে ক্ষতি হতে পারে যদি লেখক তাই লিখে যা লিখতে তাকে বলা হয়নি, সাক্ষী এমন সাক্ষ্য দেবে, যা তার নিকট জানতে চাওয়া হয়নি। সাক্ষী পাওনাদারের ক্ষতি করতে পারে সাক্ষী না দিয়ে অথচ সাক্ষী দুজনের উপরই ফরয আদায় করার কর্তব্য চেপেছে। সাক্ষ্য না দিয়ে বাদীর ক্ষতিকে পরিহার করা। অনুরূপভাবে লেখকের কর্তব্য দলীল লেখা, যদি তাকে ছাড়া আর কোন লেখক না পাওয়া যায়।

যদি বলা হয়, ব্যবসায় সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا -

তোমরা যদি তার উপর দলীল না লিখ, তাহলে তোমাদের কোন দোষ হবে না।

এতে ব্যবসায় ও মিয়াদী ঋণের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। তা প্রমাণ করে যে, মিয়াদী ঋণের দলীল লিপিবদ্ধ করা ও তাতে সাক্ষী রাখা তাদের কর্তব্য।

জবাবে বলা যাবে, ব্যাপার তা নয়। কেননা সাক্ষী বানাতে আদেশ করা হয়েছে মিয়াদী ঋণের লেনদেন চুক্তিতে। এটা মুস্তাহাব। তা না করলে ধন-মালের ব্যাপারে সতর্কতার জন্যে যা মুস্তাহাব করা হয়েছিল, তাই তরক করা হবে। তারই পরে সংযোজিত হয়েছে একথা ঃ

اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا -

তবে যদি উপস্থিত ব্যবসায় হয় যা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে আবর্তিত কর, তাহলে তা না লিখলে তোমাদের কোন দোষ হবে না।

অর্থাৎ তোমরা তরক করবে না— না লিখে, যা তোমাদের জন্যে মুস্তাহাব করে দেয়া হয়েছিল, যেমন তোমরা মিয়াদী ঋণের দলীল না লিখে ও তাতে সাক্ষী না বানিয়ে মুস্তাহাব ও সতর্কতার ব্যবস্থা তরক করবে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমাদের উপর দোষ হবে না' অর্থাৎ, ধন-মাল সংরক্ষণে সতর্কতার ব্যাপারে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না— এ অর্থও হতে পারে। কেননা তাদের প্রত্যেকেই অপরের নিকট যা মাল দেয়া দরকার তা যদি সঁপে দেয়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ بِكُمْ -

যদি তোমরা তা না কর, তাহলে তোমাদের গুনাহ্ হবে।

পারস্পরিক ক্ষতি করা প্রসঙ্গের কথার সাথে একটা সংযোজন। এ থেকে বোঝা যায়, বাদী— পাওনাদারের দ্বারা লেখক ও সাক্ষীর ক্ষতি হওয়া এবং এই দুইজনের পারস্পরিক ক্ষতি গুনাহ, কেননা এদের প্রত্যেকেই অপরের ক্ষতি সাধনের সংকল্পকারী— আল্লাহ্‌র নিষেধের পর— এজন্যে তা গুনাহ।

## রিহন

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ -

তোমরা যদি বিদেশ সফরে থাক এবং তখন দলীল লেখক না পাও, তাহলে তোমাদেন পারস্পরিক ঋণের কাজ হবে রিহনের মাধ্যমে, যা ঋণদাতার হস্তগত হবে।

অর্থাৎ তোমরা যখন দলীল লিখে ও সাক্ষী বানিয়ে লেনদেনের চুক্তিকে নির্ভরযোগ্য বানাতে অসমর্থ হবে, তখন ঋণদাতার দখলে রিহন জমা দিয়ে তোমরা ঋণের লেনদেন করতে পার। রিহন তাৎক্ষণিকভাবে নির্ভরতার মাধ্যম হবে। আর তা তখনকার জন্যে ব্যবস্থা, যখন দলীল লিখে ও সাক্ষী বানিয়ে নির্ভরতা অর্জনের সুযোগ থাকবে না। আয়াতে সফর অবস্থার উল্লেখ হয়েছে স্পষ্ট ভাষায়। কেননা দলীল লিখানো ও সাক্ষী বানানোর কাজটা সাধারণত সফর কালেই কঠিন হয়ে পড়তে পারে। মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি সফরকাল ছাড়া অন্য সময়ে রিহন-ভিত্তিক লেনদেন করা মাকরূহ মনে করেন। আতা নিজ বাড়িতে থাকা অবস্থায়ও তা করায় কোন দোষ মনে করেন নি। ফলে মুজাহিদের মাযহাব হল, 'রিহন'-এর ব্যবস্থা আয়াতে মুবাহ করা হয়েছে কেবলমাত্র সফরকালের জন্যে। অন্য সময়ে তা করা আয়াত দ্বারা প্রমাণিত নয়। কিন্তু সকল শরীয়াতবিজ্ঞ লোকের এ মত নয়। নিজ বাড়িতে থাকা অবস্থায়ও রিহন ভিত্তিক লেনদেন করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের ও আগের কালের সর্বসাধারণ ফিকাহবিদদের দৃষ্টিতে কোন দ্বিমত নেই।

ইবরাহীম আল-আসওয়াদ আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) নিজে এক ইয়াহুদীর নিকট বাকী মূল্যে মিয়াদ নির্দিষ্ট করে খাদ্য ক্রয় করেছিলেন এবং সে জন্যে তাঁর নিজের বর্ম 'রিহন' (বন্দক) রেখেছিলেন।

কাতাদাতা আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, রাসূলে করীম (স) তার বর্ম মদীনার এক ইয়াহুদীর নিকট বন্ধক রেখেছিলেন এবং তার ভিত্তিতে তাঁর পরিবারবর্গের জন্যে গম নিয়েছিলেন।

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, বিদেশ সফরে নয়, নিজ বাড়িতে থেকেও রিহন-এর ভিত্তিতে ঋণের লেনদেন সম্পূর্ণ জায়েয। কেননা নবী করীম (স) নিজে তা করেছেন। আর আল্লাহ তো فَاتَّبِعُوهُ 'তোমরা তাঁকে অনুসরণ কর' বলেছেন।

বলেছেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ -

তোমাদের জন্যে আল্লাহ্র রাসূলে উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে।

বোঝা গেল, আল্লাহ কুরআনের আয়াতে রিহন ভিত্তিক লেনদেন করতে বলার প্রসঙ্গে সফরকালের উল্লেখ করেছেন এজন্যে যে, সেই সময়েই সাধারণত ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দলীল লেখা ও সাক্ষী বানানো অসম্ভব হয়ে থাকে। তাই তখনকার জন্যে এ ব্যবস্থা। কিন্তু অন্য সময় সে ব্যবস্থানুযায়ী লেনদেন করা যাবে না, তা বলা হয়নি। কুরআনের এ কথাটি রাসূলের এ কথার মত ঃ 'পঁচিশটি উটে— একটি بنت مخاض এবং ছত্রিশটিতে একটি بنت لبون এই কথার অর্থ المخاض। ও بنت বোঝানো হয়নি। এটা সাধারণ ও বেশির ভাগ অবস্থার কথা। যদিও তার মা'র সঙ্গে مخاض ও لبن না হওয়াও অসম্ভব নয়।

এ ভাবেই উক্ত আয়াতে 'সফর' শব্দের উল্লেখ হয়েছে। নবী করীম (স)-এর এ কথাটিও তেমনি ঃ

لاَقطعَ فِىْ ثَمَرٍ حَتّٰى يُؤْوِيْهِ الْجَرِيْنِ –

এ হাদীসেও جرين -এর উল্লেখ, বেশির ভাগ অবস্থার দৃষ্টিতেই হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে তার দৃঢ়তা বিধান। আলোচ্য আয়াতে সফরের উল্লেখও ঠিক সে ভাবেই হয়েছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَرِهَانٌ مَّقْبُوْضَةٌ –

এমন রিহন যা ঋণদাতার হস্তগত হয়েছে।

বোঝা যায়, 'রিহন' ভিত্তিক লেনদেন জায়েয তখন, যদি তা ঋণদাতার হস্তগত হয়। অন্যথায় সহীহ হবে না। তা দুটি দিক দিয়ে প্রামাণ্য। একটি, এর পূর্বে বলা হয়েছে ঃ 'এবং তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুজন সাক্ষী বানাও। দুজন পুরুষ না হলে একজন পুরুষ ও দুজন মেয়েলোক, যাদেরকে তোমরা সাক্ষী হিসেবে পছন্দ কর'।

এ আয়াতের সাক্ষীদের যে সংখ্যা বলা হয়েছে এবং গুণের উল্লেখ হয়েছে, তা যথাযথ ও পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। অতএব 'রিহন' সম্পর্কিত কথায় যে শর্ত ও গুণের উল্লেখ হয়েছে, তা-ও যথাযথ ও পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। তা না হলে 'রিহন' ভিত্তিক লেনদেন জায়েয হবে না। যেমন সাক্ষ্যদানের কাজ যেভাবে করতে বলা হয়েছে, সে ভাবে না হলে অন্যভাবে সহীহ্ হবে না। কেননা আয়াতের প্রথম শব্দটি হল আদেশবাচক, যা করা ফরয হয়ে যায়।

আর দ্বিতীয়, রিহন-সংক্রান্ত হুকুম যে আয়াতে পাওয়া গেছে, সে আয়াতে এ কাজের অনুমতি দেয়া হয়েছে যেভাবে ও যে শর্তে, তা ঠিক সেভাবে ও সে শর্তে করাই জায়েয হতে পারে, অন্যভাবে হতে পারে না। কেননা রিহন জায়েয হওয়ার এখানে অন্য কোন ভিত্তি তো নেই এ আয়াত ছাড়া।

এ আয়াতই প্রমাণ করে যে, রিহন ঋণদাতার করায়ত্ত না হলে তার ভিত্তিতে ঋণের লেনদেন জায়েয হবে না। কেননা তা ঋণদাতার দেয়া ঋণের নির্ভরতা । তাই বন্ধকী বস্তু তার হস্তগত না হলে সে নির্ভরতা অর্জিত হয় না। তখন তা অন্যান্য হাজারো ধন-মালের মত হয়ে যায়, যা থেকে সে কোন নির্ভরতা লাভ করতে পারে না। আর তা যখন তার নির্ভরতা, তখন তা তার দখলে থাকতে হবে তার দেয়া ঋণের বদলে। ঋণগ্রহীতার মৃত্যু বা দারিদ্র্য কালে সে তার দ্বারা নিজের পাওনা আদায় করে নেয়ার ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় বেশি অধিকার সম্পন্ন হতে পারবে ও তার দ্বারা আদায় করে নিতে পারবে। কিন্তু বন্ধকী জিনিস তার করায়ত্ত না থাকলে 'রিহন' পদ্ধতিটাই অকেজো ও অর্থহীন হয়ে যাবে। তখন সে অন্যান্য পাওনাদারদের সমান অবস্থায় পৌঁছে যাবে। লক্ষণীয়, পণ্য—বিক্রয়ের বস্তুটা বিক্রেতার হাতে থাকা পর্যন্ত তার মূল্য পেয়ে যাওয়া নিশ্চিত থাকে। সে যদি তা ক্রেতার হাতে তুলে দেয় মূল্য না নিয়ে তাহলে তখন তার প্রাপ্য বিপন্ন হয়ে পড়ে। সে অন্যান্য সব পাওনাদারের সমান হয়ে যায়।

ঋণ কার্য সম্পাদনের পক্ষদ্বয়ের বন্ধকী বস্তুর করতলগত হওয়া অঙ্গীকার হলে তা জায়েয হবে কিনা, এ বিষয়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। হানাফী আলিমগণ এবং শাফেয়ী বলেছেন, ঋণ গ্রহীতা ও বন্ধক দাতার 'কবজ'-এর অঙ্গীকারের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেলেও ঋণদাতা— বন্ধকী গ্রহীতা যদি তার দাবি করে, তাহলে তাতে সাক্ষ্যদান জায়েয হবে। রিহন সহীহ হবে। ইমাম মালিকের মতে 'কবজ'-এর সত্যতা স্বীকারকারীর অঙ্গীকারের বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেলে 'কবজ' দেখার সাক্ষ্য দিলেও তা গ্রহণযোগ্য নয়। বলা হয়েছে,

'রিহন' পর্যায়ে কিয়াস বলে, তার কথা গৃহীত হবে রিহন বস্তুর কবজ সম্পর্কে উভয়ের স্বীকৃতির সাক্ষ্যদান জায়েয হওয়ার দলীল হচ্ছে, সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, বিক্রয়ের, অপহরণের ও হত্যার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি যখন জায়েয, তখন 'রিহন' 'কবজ' সম্পর্কেও তা জায়েয।

## জমি রিহন রাখা সম্পর্কে ফিকাহ্‌বিদদের বিভিন্ন মত

ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ ও জুফর বলেছেন, জমি রিহন রাখা জায়েয নয়। যা ভাগ-বাঁটোয়ারা হয় তা-ও নয়, যা হয় না তাও নয়। মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন, উভয় প্রকারের জমিই রিহন রাখা জায়েয। ইবনুল মুবারক সওরী থেকে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি একটা 'রিহন' বন্ধক রাখে, সে তার মাত্র কতকাংশ পাওয়ার অধিকারী, বলেছেন, তা 'রিহন'-এর বাইরে চলে যাবে। কিন্তু সে তা রিহন রেখে তার ক্ষতিপূরণ করতে পারে। তা 'রিহন' বানাবার পূর্বেই যদি সে মরে যায়, তাহলে তা তার ও পাওনাদারদের মধ্যের জিনিস গণ্য হবে। আল-হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, ভাগ-বাঁটোয়ারা হয় না এমন জমি রিহন রাখা জায়েয। যা ভাগ-বাঁটোয়ারা হবে, তা রিহন রাখা জায়েয নয়।

আবূ বকর (র) বলেছেন, আয়াতের প্রমাণে যখন বন্ধকী বস্তু ঋণদাতার করায়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত যখন 'রহন' জায়েয নয়,— কেননা তা ঋণদাতার নির্ভরতা, আর 'কবজ' না হলে যখন 'রিহন'-এর তাৎপর্যই বাস্তবায়িত হয় না,— কেননা তার নির্ভরতাই কিছু থাকে না, তখন জমি 'রিহন' রাখা জায়েয না হওয়াই উচিত, যে জমি ভাগ-বাঁটোয়ারা হবে তা। যা হবে না তাও। কেননা 'কবজ'-এর অধিকার হওয়ার কারণ ও নির্ভরতা বাতিল হওয়া চুক্তির সাথে জড়িত। কেননা অংশীদারিত্ব 'কবজ'-এর প্রতিরোধক। অতএব প্রতিরোধক বহাল রেখে— যদ্দারা রিহন বাতিল হতে পারে— রিহন ভিত্তিক লেনদেনই সহীহ্ হবে না। কেননা 'রিহন' হিসেবে প্রস্তুত করা জমি দখল বা 'কবজ' করতে গেলে শরীকের হাত যদি ফিরে আসে, তাহলে নির্ভরতার তাৎপর্যই বাতিল হয়ে যাবে। তখন তা হবে এমন রিহন-বন্ধকী, যা দখল করা হয়নি। তা 'রিহন'-এ ধারের মতও হবে না, যা দখল করার পর রিহনদাতা ঋণ গ্রহীতার নিকট ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। তা করা হলে 'রিহন' বাতিল হবে না। তার জন্যে তা তার হাতে ফিরিয়ে দেয়া জায়েয এ হিসেবে যে, এ দখলটা পাওয়ার অধিকারী সে নয়। রিহন রক্ষক— ঋণদাতার অধিকার আছে তার নিকট থেকে তা নিয়ে নেয়ার যখনই ইচ্ছা হবে। এ হচ্ছে সূচনা, সে দখল পাওনার অধিকার এখনও জন্মেনি এ অর্থে, যা চুক্তির কাছাকাছি সময়ে হয়। এটা জমি 'হেবা' করার মত-ও নয়, যা বন্টন করা যায় না। তাহলে আমাদের মতে তা জায়েয, যদিও 'হেবা'র শর্ত হচ্ছে দখল ও 'কবজ'— ঠিক রিহন-এর মতই। এদিক দিয়ে যে, 'হেবা'য় যে 'কবজ'-এর প্রয়োজন মালিকানা সহীহ্ হওয়ার জন্যে মালিকত্বের স্থিতির জন্যে স্থায়ীভাবে দখলিভুক্ত থাকা শর্ত নয়। শুরুতেই যখন 'কবজ' সহীহ্ হল, তখন মালিকত্ব শেষ হওয়ার ব্যাপারে দখলের অধিকারের কোন প্রভাব নেই। রিহন গ্রহণকারীর পাওয়ার অধিকার হওয়ায় নির্ভরতার তাৎপর্য শেষ হয়ে যায়, তখন তা সহীহ্ হবে না, তা বাতিল করে ও তার পরিপন্থী তা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও।

যদি বলা হয়, শরীকানা জমি রিহন রাখা জায়েয মনে করছ না কেন? যখন তাতে দ্বিতীয়বারে তার হাতের অধিকার হয় না। কেননা তার দখল তো অবশিষ্ট থাকবে ভাগ হওর পর্যন্ত।

জবাবে বলা যাবে, শরীকের অধিকার আছে দাসের খিদমত লওয়ার, যদি তার দাস হয়ে থাকে— তার মালিকানা অধিকারের দরুন। আর যে তা করবে, তাতে তার হাত 'রিহন'-এর হাত হবে না। রিহন-এর হাত তা পাওয়ার অধিকারী হয়েছে দ্বিতীয় দিনে। ফলে শরীক ও নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য থাকল না। কেননা এখানে 'রিহন' 'কবজ' করার অধিকার হয়েছে চুক্তির পাশাপাশি।

ঋণের রিহন পর্যায়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। সকল ফিকাহবিদ বলেছেন, ঋণের রিহন কোন অবস্থায়ই সহীহ্ নয়। ইবনুল কাসিম মালিকের মত উদ্ধৃত করেছেন, একজন ব্যক্তির যদি অপর ব্যক্তির উপর ঋণ থাকে, তখন সে বলে ঃ আমি তা বিক্রয় করলাম বিক্রয় করার মতই এবং তার নিকট থেকে সেই ঋণ 'রিহন' রাখলাম যা আমার উপর তার আছে। তাহলে তা জায়েয হবে। অন্য ব্যক্তির উপর যে ঋণ চাপা আছে, তা 'রিহন' রাখার তুলনায় এটা অধিক শক্তিশালী। কেননা তার নিজের উপর যা আছে, এটা সে ক্ষেত্রে জায়েয়। ইমাম মালিকের কথায় এক ব্যক্তির উপর যে ঋণ আছে অপর ব্যক্তির উপর সে ব্যক্তির পক্ষে সেই ঋণটা রিহন রাখা জায়েয এবং কারোর নিকট থেকে তা ক্রয় করতে পারে। তার নিকট থেকে সেই ঋণটা রিহন রাখতে পারে, যা তার জন্যে সে ব্যক্তির উপর রয়েছে। তার সে হক্‌টি সে 'কবজ' করতে পারে। তার জন্যে সাক্ষ্য দিতে পারে। কিন্তু এটা এমন একটা কথা, যা শরীয়ত-জ্ঞানী কোন একজন ব্যক্তিও বলেন নি তিনি ছাড়া।

তা সহীহ্ নয়। কেননা আল্লাহ্র কথা হল 'রিহন যা কবজ করা হয়েছে।' কিন্তু ঋণ 'কবজ' করা সহীহ্ হয় না যতক্ষণ তা ঋণ থাকবে। না যখন তা তার উপর থাকবে, না যখন তা অন্য কারোর থাকবে। কেননা ঋণ একটা হক্। তাতে 'কবজ' সহীহ্ হয় না। 'কবজ' হয় বস্তুগত জিনিসের উপর। তা সত্ত্বেও সে ঋণ হয় প্রথম ضمان দায়িত্ব গ্রহণের হুকুম মতো হবে। অথবা তা সরে যাবে— স্থানান্তরিত হবে 'রিহন' এর দায়িত্ব গ্রহণে। যদি তা রিহন-এর ضمان এ সরে যায়, তাহলে বাড়তি থেকে সম্পর্কহীন হওয়া কর্তব্য। যখন ঋণ যার সাথে রিহন রয়েছে— রিহন-এর কম হবে। আর যদি তা প্রথম দায়িত্ব গ্রহণের হুকুমে অবশিষ্ট থেকে থাকে, তা হলে তা 'রিহন' নয়। কেননা তা তো যে অবস্থায় ছিল, সে অবস্থায়ই রয়ে গেছে। যে ঋণ অন্য ব্যক্তির উপর চাপানো, তা জায়েয হওয়া তো সুদূরপরাহত ব্যাপার। কেননা তাতে তো কোন ইখতিয়ার চলে না। তা 'কবজ'-ও করা যায় না কোন অবস্থায়।

'রিহন' যদি সালিসের (মধ্যস্থতাকারীর) হাতে রেখে দেয়া হয়, তা জায়েয কিনা এ বিষয়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফর ও সওরী বলেছেন, রিহন সহীহ্ হবে, যদি দুপক্ষই একত্রিত হয়ে তা মধ্যস্থতাকারীর হাতে রেখে দেয়া হয়। তা 'রিহন' গ্রহীতার নিশ্চয়তা-নির্ভরতার মাধ্যম হবে। আল-হাসান, আতা ও শা'বী এ মত দিয়েছেন। ইবনে আবূ লায়লা, ইবনে শাবরামাতা ও আওজায়ী বলেছেন, ঋণদাতা— রিহন গ্রহীতা যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের দখলে না নেবে, ততক্ষণ সে 'রিহন' জায়েয হবে না। মালিক বলেছেন, পক্ষদ্বয় মিলিত হয়ে যদি তা মধ্যস্থতাকারীর নিকট রাখে, আর তখন তা বিনষ্ট হয়ে যায়, তা যাবে রিহনদাতা— ঋণ গ্রহীতার।

তরবারির অংশ রিহন রাখা সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, তা 'কবজ' আবর্তিত হবে, রিহনদাতা ও গ্রহীতা উভয়ই তা মধ্যস্থতাকারীর হাতে রাখবে অথবা রাখবে শরীকের নিকট।

আবূ বকর (র) বলেছেন, আল্লাহ্র কথা فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ-এর দাবি হল, তা জায়েয হবে

যদি তা মধ্যস্থতাকারী নিজ হাতে নিয়ে নেয়। কেননা তাতে ঋণদাতা ও রিহন গ্রহীতা এবং মধ্যস্থতাকারীর মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য হয় না। আয়াতের সাধারণ তাৎপর্যের আলোকে বলা যায়, দুজনের যে কেউ 'রিহন' 'কবজ' করতে পারে। উপরন্তু মধ্যস্থতাকারী রিহন করার কাজে রিহন গ্রহীতার উকীল— প্রতিনিধি। হেবায় যেমন ওকালতি চলে, এতেও 'কবজ' করা চলে মধ্যস্থতাকারীর। 'কবজ' করার সমস্ত ব্যাপারই এরূপ। যাকে 'কবজ' করতে হবে, সে না করে উকীল দ্বারা 'কবজ' করালেও কোন অসুবিধা হয় না।

যদি বলা হয়, মধ্যস্থতাকারী যদি উকীল হয় রিহন গ্রহীতার, তাহলে তা তার পক্ষ থেকে কবজ করা খুবই সঙ্গত। তাহলে মধ্যস্থতাকারীর কোন ইখতিয়ার থাকে না তা না করার।

জবাবে বলা যাবে, তাতে মধ্যস্থকারীর উকীল হওয়া থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার প্রয়োজন হয় না। সে তার পক্ষ থেকে অবশ্যই 'রিহন' 'কবজ' করতে পারে। রিহনদাতা তার হাতে রিহন দিতে রাজী না হওয়ার দরুন তার 'কবজ' করার অধিকার না হলে রিহন গ্রহীতা তো তা উকীলের মাধ্যমে গ্রহণ করতে রাজী হয়েছে। কোন জিনিস ক্রয়ের যে উকীল হয়, সে মুয়াক্কিলের পক্ষ থেকে পণ্য 'কবজ' করতে পারে। মূল্যের বিনিময়ে— মূল্য দেয়ার শর্তে সে পণ্য আটক করেও রাখতে পারে। আটক করার পূর্বে সে পণ্য ধ্বংস হয়ে গেলে মুয়াক্কিলের মাল হিসেবেই তা ধ্বংস হবে। উকীল 'রিহন'-কে রিহন গ্রহীতার পক্ষ থেকে আটক করে রাখতে পারে না যদি তাকে উকীল বানানো না হয়। তার পক্ষ থেকে 'কবজ' কারী হিসেবেও নয়। এ থেকে বোঝা যায়, মধ্যস্থতাকারীর হাত 'রিহন' গ্রহীতারই হাত। রিহন' 'কবজ' করার জন্যে সে তার উকিল। রিহন গ্রহীতার ইখতিয়ার আছে, সে যখন ইচ্ছা 'রিহন' চুক্তি ভঙ্গ করে দিতে পারে। মধ্যস্থতাকারীর অধিকারকেও বাতিল করে দিতে পারে এবং একটি রিহনদাতাকে ফেরত দিতে পারে। কিন্তু রিহদাতার ইখতিয়ার নেই মধ্যস্থতাকারীর হাতকে বাতিল করা। বোঝা গেল, মধ্যস্থতাকারী ও উকীল— উভয়ই রিহন গ্রহীতার জন্যে।

যদি বলা হয়, ক্রেতা-বিক্রেতা দুজনই একসাথে পণ্য দ্রব্যাদি মধ্যস্থতাকারীর হাতে সোপর্দ করে, তাতে বিক্রেতার ঝুঁকি ও দায়িত্ব নিঃশেষ হয়ে যায় না। মধ্যস্থতাকারী ক্রেতার উকীল হওয়া জায়েয নয় পণ্য 'কবজ' করার ব্যাপারে। রিহন গ্রহীতা সম্পর্কেও সেই কথা।

জবাবে বলা যাবে, দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বিক্রয়ে মধ্যস্থতাকারী যদি ক্রেতার উকীল হয়, তাহলে বিক্রেতার ঝুঁকি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর তার বিক্রেতার ঝুঁকি থেকে বের হয়ে যাওয়ার তার উপর তার হক শেষ হয়ে যায়। সে যদি তা 'কবজ' করার অনুমতি দেয়, তাহলে তার হক বাতিল হয়ে যায়। তা ফিরিয়ে চাওয়ার তার অধিকার হয় না। কেননা পণ্য তো একবারই 'কবজ' হতে পারে। তাই যখনই সে 'কবজ' হবে, বিক্রেতার হক প্রত্যাহৃত হয়ে যাবে। তা তার হাতে ফিরিয়ে দেয়া তার জন্যে জায়েয হবে না। অনুরূপভাবে তা যদি তারই নিকট গচ্ছিত রাখা হয় তাহলেও তাই হবে। এ কারণে মধ্যস্থতাকারী ক্রেতার উকীল হতে পারে না। কেননা সে যদি তার উকীল হয়, তাহলে তার পক্ষ থেকে 'কবজ'কারীও হবে বিক্রয়ের কবজ। তখন ক্রেতাকে তা থেকে বিরত রাখা যাবে না। তখন অবস্থা হবে এই যে, মধ্যস্থতাকারীর 'কবজ' হবে অর্থহীন। বরং ক্রেতারই তা 'কবজ' করার মত অবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু বিক্রেতা তাতে রাজী হবে না। ফলে তা প্রমাণিত হবে না। মধ্যস্থতাকারীর ক্রেতার জন্যে

উকীলও হতে পারবে না। অপরদিক দিয়ে কথা হল, সে যদি তা ক্রেতার জন্যে 'কবজ' করে, তাহলে তাতেই বিক্রয় সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। আর বিক্রয় সম্পূর্ণ হয়ে গেলে বিক্রেতার 'হক' নষ্ট হয়ে যাবে। তখন তার মধ্যস্থতাকারীর হাতে থেকে যাওয়ার কোন অর্থ হবে না, বরং তা ক্রেতার জন্যে গ্রহণ করা কর্তব্য হবে; কিন্তু বিক্রেতা তাতে রাজী হবে না। রিহন-এর ব্যাপার সে রকমের নয়। কেননা তাতে মধ্যস্থতাকারীর রিহন গ্রহীতার উকীল হওয়ায় রিহনদাতার 'হক' বাতিল হওয়ার কোন কারণ ঘটবে না। বুঝতে হবে, রিহন গ্রহীতা রিহন 'কবজ' করার পরও রিহনদাতার 'হক' অবশিষ্ট থাকে। মধ্যস্থতাকারীর 'কবজ' হওয়ার পরও তাই। ফলে মধ্যস্থতাকারীর 'কবজ' ও রিহন গ্রহীতার 'কবজ'-এর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। কিন্তু মধ্যস্থতাকারীর ক্রেতার উকীল হওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে ক্রয়ে মধ্যস্থতাকারী বিভন্ন রকম হয়ে যায়। যখন সে ক্রেতার 'কবজ'-এর তাৎপর্যে বিক্রেতার দায়িত্ব থেকে বের হয়ে যাওয়া ও তার দায়িত্বে প্রবেশ করা হয়ে যায়। আর তাতে বিক্রয় সম্পূর্ণ হওয়ার ও তা থেকে বিক্রেতার 'হক' প্রত্যাহৃত হওয়া বিক্রেতার তাতে রাজী না হওয়া সত্ত্বেও একাকার হয়ে যায়। বিক্রেতার জন্যে তার মধ্যস্থতাকারী হওয়া জায়েয হবে না। এ দিক দিয়ে যে, চুক্তির কারণে তার আটক করে রাখার অধিকার জন্মে। তা প্রত্যাহৃত হবে না। অথবা তা ক্রেতার নিকট সোপর্দ করতে রাজী হবে অথবা মূল্য নিয়ে নেবে।

## 'রিহন' এর দায়-দায়িত্ব

আল্লাহ্‌র তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

فَرِهٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ - فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهُ ـ

তাহলে 'রিহন' হস্তান্তরিত করে কাজ করতে হবে। তোমাদের কেউ যদি অপর কারোর উপর বিশ্বাস করে লেনদেনের কাজ করে, তার কর্তব্য আমানতের হক যথাযথ আদায় করে দেয়া।

এ আয়াতটি 'রিহন'-এর উল্লেখ সহ পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সংযোজন। তা প্রমাণ করে যে, 'রিহন' আমানতের ব্যাপার নয়। আর যখন তা আমানত নয়, তখন তার দায়-দায়িত্ব অবশ্যই গৃহীত হবে। কেননা 'রিহন' যদি আমানত হতো, তাহলে তার উপর আমানতকে সংযোজিত করা হতো না। যেহেতু একটি জিনিস তার নিজের সাথে সংযোজিত হয় না, হয় অন্য জিনিসের সাথে।

'রিহন' সম্পর্কে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন কথা রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফর, ইবনে আবূ লায়লা ও আল-হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, 'রিহন'-এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তার কম-সে-কম মূল্যে এবং ঋণেরও। সকফী উসমানুলবত্তী থেকে উদ্ধৃত করেছেন, 'রিহন' যা-ই হোক— স্বর্ণ, রৌপ্য কিংবা কাপড়, তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, যা বারবার আবর্তিত হয়। 'রিহন' যদি জমি কিংবা জন্তু হয় এবং তা ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তা রিহনদাতার মাল থেকে যাবে। রিহন গ্রহীতা তার হক পেয়ে যাবে। কিন্তু রিহনদাতা যদি ক্ষতিপূরণের শর্ত ধার্য করে থাকে, তাহলে শর্তানুযায়ীই কাজ হবে।

ইবনে অহব ইমাম মালিকের মত উদ্ধৃত করেছেন, তা ধ্বংস হওয়ার খবর জানা গেলে তা

রিহনদাতার মাল থেকে যাবে, রিহন গ্রহীতার হক কিছু মাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারবে না। তার ধ্বংস হওয়ার খবর জানা না গেলে, তা রিহন গ্রহীতার মাল থেকে যাবে, সে তার মূল্য দিতে বাধ্য হবে। তাকে বলতে হবে, বিবরণ দাও। বিবরণ দিলে তার এ বর্ণনা ও তাতে তার মালের নাম করা মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে তাকে হলপ করতে হবে। পরে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা তা নিয়ে বসবে। তার নির্ধারিত মূল্যের অধিক হলে রিহনদাতা তা নিয়ে নেবে। আর রিহনদাতার নির্ধারিত মূল্যের কম হলে তার নির্ধারণের উপর হলপ করতে হবে এবং বাড়তিটা তা থেকে বাদ পড়বে। রিহনদাতা যদি হলপ করতে অস্বীকার করে, রিহন গ্রহীতাকে 'রিহন'-এর মূল্যের পরে যা অতিরিক্ত প্রমাণিত হবে, তা দিয়ে দেয়া হবে।

ইবনুল কাসিমও তাঁর এ মত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলেছেন, রিহনগ্রহীতা সাদকাকারী হবে তা ধ্বংস হলে এবং তাতে তার কোন দায়-দায়িত্ব নেই, তাহলে তার এ শর্ত বাতিল। তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আওজায়ী বলেছেন, 'রিহন' বাবদ দেয়া ক্রীতদাস যদি মরে যায়, তাহলে তার বাবদ ঋণটা অবশিষ্ট থাকবে। কেননা 'রিহন' বন্ধ হয়ে যায়নি, কথাটি যখন মৃত্যুর খবর জানা যাবে, সে সময়ে হবে না, বরং তার ধ্বংসের খবর জানা গেলে তা বারবার আসবে। আওজায়ী বলেছেন ঃ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ -এর অর্থ হচ্ছে, ছাগলের মূল্য বাড়তি হলে তা তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে এবং তার কমতি হলে তা পূরণ করে দিতে হবে। লায়স বলেছেন, 'রিহন' যা-ই হোক, তা ধ্বংস হলে এবং সে ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া না গেলেও তা গণ্য হবে, তার মূল্য নিয়ে মতপার্থক্য হলেও। তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেলে বাড়তিটা আবর্তিত হবে। শাফেয়ী বলেছেন, 'রিহন' আমানত, সেজন্যে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না কোন অবস্থায়ই, যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তার এই ধ্বংস বাহ্যিকভাবে হোক, কি গোপনে।

আবূ বকর (র) বলেছেন, সাহাবী ও'তাবেয়ীন সকলেই একমত হয়ে বলেছেন, রিহন-এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনরূপ ভিন্নমত থাকার কথা আমরা জানি না। তবে ক্ষতিপূরণ দেয়ার পদ্ধতিতে তাঁদের ভিন্নমত রয়েছে। এ পর্যায়ে হযরত আলী (রা) থেকে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া গেছে। ইসরাঈল আবদুল আলা মুহাম্মদ ইবনে আলী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী (রা) বলেছেন, যে মূল্যের 'রিহন' রাখা হয়েছে ঋণ যদি তার বেশী হয়, তখন 'রিহন' ধ্বংস হয়ে যায়, তা যেভাবে ছিল, সেই ভাবেই হবে। কেননা সে অতিরিক্তের জন্যে আমানতদার। আর যদি রক্ষিত 'রিহন' ঋণের অপেক্ষা কম মূল্যের হয়, তারপর 'রিহন' ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে রিহন-দাতা অতিরিক্তকে ফেরত দেবে। আতা উবাইদ ইবনে উমাইর উমর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। ইবরাহীম নখয়ীও তাই বলেছেন। শবী, হরস, আলী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'রিহন' যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে অতিরিক্তটা আবর্তিত হবে। কাতাদাহ খালাস ইবনে আমর, আলী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'রিহন' মূল্যে অতিরিক্ত আর সে রিহনে যদি কোন যখম লাগে, তাহলেও তা তা-ই থাকবে। আর যদি কোন যখম না-ও লাগে, তার দোষারোপ হয়, তাহলেও অতিরিক্ত মূল্য ফেরত দেবে।

হযরত আলী (রা) থেকে এ তিনটি বর্ণনা পাওয়া গেছে এবং তিনটিতেই 'রিহন'-এর ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা বলা হয়েছে, তবে ক্ষতিপূরণ দানের স্বরূপ ও অবস্থার ব্যাপারে বিভিন্ন মত প্রকাশিত হয়েছে।

ইবনে উমর (রা) থেকেও অতিরিক্ত মূল্যের আবর্তিত হওয়ার বর্ণনা পাওয়া গেছে। শুরাইহ, আল-হাসান, তায়ূস, শবী ও ইবনে শাবরামাতা বলেছেন, 'রিহন' যে বিষয়ে, তাতেই তা থাকবে। শুরাইহ্ বলেছেন, একশত দিরহাম মূল্যের একটি লোহার আংটি হলেও তাই হবে। আগের কালের মনীষীবৃন্দ যদি তার ক্ষতিপূরণে একমত হয়, আর মতপার্থক্য শুধু তার রূপ ও অবস্থা সম্পর্কে, কেউ বলতেন, তা আমানত, তার ক্ষতিপূরণ করার দায়িত্ব নেই। কিন্তু এ কথা সকলেরই মতের বিপরীত। তাদের মতপার্থক্য ইজমা পরিপন্থী। তাঁরা সকলেই যখন রিহন-এর ক্ষতিপূরণ দানের কথা বলেছেন, তখন তাদের এ কথাই ক্ষতিপূরণ না দেয়ার কথার বিপরীত। ক্ষতিপূরণ দানের পদ্ধতি পর্যায়ের মতপার্থক্য এবং একটি পন্থায় তাদের ঐকমত্যের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কিছু নেই। কেননা তাদের ঐকমত্য প্রমাণ করে যে, তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এ ঐকমত্য চূড়ান্তভাবে ফায়সালা করে দিয়েছে যে, তাকে যারা আমানত বলেছে, তাদের কথা ঠিক নয়। উদ্ধৃত আয়াত যে ক্ষতিপূরণদানের কথা বলে, সে বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীস থেকেও তা প্রমাণিত হয়। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক মুসয়িব ইবনে সাবতি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, আমি আতাকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি— এক ব্যক্তি একটা ঘোড়া রিহন রাখল, তার হাত আহত হল। তখন নবী করীম (স) রিহন গ্রহীতাকে বললেন, তোমার পাওনা হারিয়ে গেছে। অপর বর্ণনার শব্দ হল ঃ 'তোমার জন্যে কিছুই নেই। রিহন গ্রহীতাকে যে নবী করীম (স) বললেন, 'তোমার হক চলে গেছে— এর অর্থ তার দেয়া ঋণ প্রত্যাহৃত হয়েছে। কেননা ঋণ গ্রহীতার হক্ হচ্ছে তার দেয়া ঋণ।

আবদুল বাকী ইবনে কানে আল-হাসান ইবনে আলী আল-গনভী ও আবদুল ওয়ারিস ইবনে ইবরাহীম সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁরা দুজনই বলেছেন, আমাদের নিকট ইসমাঈল ইবনে আবূ উমাইয়্যাতা আজ-জ্জারে হাম্মাদ ইবনে সালামাতা, কাতাদাতা, আনাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন, 'রিহন যা নিয়ে তাই নিয়েই থাকবে।' আবদুল বাকী আল-হুসায়ন ইবনে ইসহাক, আল-মুসাইয়্যিব ইবনে ওয়াযিহ, ইবনুল মুবারক, মুসয়িব ইবনে সাবিত, আল-কামাতা ইবনে মারসাদ, মুহারিব ইবনে দিসর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, রাসূলে করীম (স) ফায়সালা করে দিয়েছে, 'রিহন যেমন, তেমনই থাকবে' এর অর্থ, তার ক্ষতিপূরণ তাতে যে ঋণ রয়েছে, তা। শুরাইহ্ বলেছেন, 'রিহন যে জন্যে, তাতেই তা নিয়োজিত, তা যদি একটা লোহার আংটিও হয়, তবু। মুহারিক ইবনে দিসারের কথাও তাই। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, ঋণের রিহন বাবদ দেয়া আংটি যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তা যাতে ছিল, তা-ই হবে। এর বাহ্যিক অর্থ, তা ঋণ বাবদ ফেরত হয়ে যাবে, ঋণ কম হোক, কি বেশি। তবে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, তার অর্থ হল— ঋণ যদি রিহন পরিমাণ হয় কিংবা হয় তার কম, তাহলে তার দ্বারাই ঋণ আদায় হয়ে যাবে। আর ঋণ যদি বেশি হয়, তাহলে সেই বেশিটা ফেরত দিতে হবে। তা এ-ও প্রমাণ করে যে, তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সকলেই একমত যে, ঋণদাতা-রিহন গ্রহীতা ঋণ গ্রহীতার মৃত্যুর পর বেশি অধিকারী সব পাওনাদারের তুলনায়। তা বিক্রয় করা হবে ও তার দ্বারা ঋণ আদায় হয়ে যাবে। বোঝা গেল, তা 'কবজ' করা হবে ঋণ আদায়ের জন্যে। অতএব তার দ্বারা ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে পুরা মাত্রায়। কেননা যে জিনিস যে উদ্দেশ্যে 'কবজ' করা হবে, তা ধ্বংস হলে সেই জিনিস আদায় হবে যাবে যে

জন্যে 'কবজ' করা হয়েছে। যেমন অনুদ্ধৃত জিনিস। যখনই তা ধ্বংস হয়ে যাবে, তা ধ্বংস হবে অপহরণের ক্ষতিপূরণের ভিত্তিতে। ফলে বিক্রয়ের পর পণ্য 'কবজ করার ব্যাপারটিও তাই। তা ধ্বংস হলে যেভাবে তা 'কবজ' করা হয়েছে, ধ্বংসের ফলে তার যথারীতি আদায় হয়ে যাবে। 'রিহন' 'কবজ' করা হয় ঋণ পুরা মাত্রায় আদায় করার নিশ্চয়তার জন্যে। তার দলীল পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি, তখন তার ধ্বংসটার দ্বারাও তাই হওয়া উচিত। অর্থাৎ তা ধ্বংস হলে তার দ্বারা ঋণ সম্পূর্ণ আদায় হয়ে যাবে। আর এভাবেই ঋণ পূর্ণমাত্রায় আদায় হওয়া সম্ভব। 'রিহন' যদি ঋণের কম মূল্যের হয়, তা হলে এ পরিমাণের 'রিহন' দ্বারা ঋণ পূর্ণমাত্রায় আদায় হয়ে যাওয়া জায়েয হবে না। যদি তার মূল্য ঋণের পরিমাণের বেশি হয়, তা হলে তার সবটাই নিয়ে নেয়া জায়েয নয়। কেননা তা পাওয়ার অতিরিক্ত। তাই অতিরিক্তটা তার নিকট আমানত হবে এবং সে হবে তার আমানতদার। সকলেই রিহন দ্বারা ঋণের ক্ষতিপূরণ হওয়ার ব্যাপারে একমত। ফলে গচ্ছিত রাখা জিনিস, মুদারিবা ও অংশীদারিত্ব ইত্যাদিকে রিহন রাখা জায়েয নয়। কেননা তা নষ্ট হয়ে গেলে তার দ্বারা ঋণ আদায় হওয়া নিশ্চিত হবে না। তবে জামানত দেয়া ঋণের রিহন হতে পারে। তা এ-ও প্রমাণ করে যে, রিহন দ্বারা ঋণের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। ফলে তা ধংস হলে রিহন গ্রহীতা তার ঋণ পূর্ণমাত্রায় ফেরত পেয়ে গেল বলে ধরে নিতে হবে।

তা এ-ও প্রমাণ করে যে, মৌলনীতি হিসেবে অপরের মালিকানা কোন হক-এর জন্যে আটক করার নির্দেশ পাইনি, যার সাথে ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত নয়। কেননা পণ্য বিক্রেতার ক্ষতিপূরণের জিনিস যতক্ষণ না তা ক্রেতার নিকট সোপর্দ করা হবে। তা মূল্যের বদলে আটকে রাখা যাবে না। ভাড়ায় লওয়া জিনিসের অবস্থাও তাই। তা ভাড়ায় গ্রহণকারীর হাতে আটকে থাকবে, সে যে মুনাফা বা ফায়দা পাবে তার দ্বারা ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে, ব্যবহার করুক আর নাই করুক— তা আটকে রাখার দরুন ভাড়া বা মজুরীর ক্ষতিপূরণ দেয়া তার জন্যে বাধ্যতামূলক হবে। আর তা-ই মুনাফার বিকল্প। প্রমাণিত হল যে, অন্যের মালিকানা আটকে রাখা ক্ষতিপূরণের সম্পর্কশূন্য নয়।

ইমাম শাফেয়ী যুক্তি দিয়েছেন যে, তা একটি আমানত। হাদীসের দলীল হচ্ছে, ইবনে আবূ যুয়াইব জুহরি— সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ রিহন যে রেখেছে, তার নিকট থেকে তা আটকানো যাবে না। তার ক্ষতি তার এবং তার ক্ষতিপূরণ তাকেই করতে হবে। শাফেয়ী বলেছেন, ইবনুল মুসাইয়্যিব হাদীসটির সনদ আবূ হুরায়রা— নবী করীম (স) সূত্রে মুত্তাসিল বানিয়েছেন।

আবূ বকর (র) বলেছেন, এ সনদকে মুত্তাসিল বানিয়েছেন ইয়াহইয়া ইবনে আবূ উনায়সা। আর তাঁর কথা ঃ 'তার ক্ষতি তার, তার ক্ষতিপূরণ তাকেই দিতে হবে কথাটি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের। যেমন মালিক, ইউনুস ও ইবনে আবূ যুয়াইব ইবনে শিহাব— ইবনুল মুসাইয়্যিব সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন, রিহন আটকানো যাবে না। ইউনুস ইবনে জায়দ বলেছেন, ইবনে শিহাব বলেছেন। ইবনুল মুসাইয়্যিব বলতেন, রিহন তার, যে তা রেখেছে। তার ক্ষতি তার, তার ক্ষতিপূরণও তাকেই করতে হবে। ইবনে শিহাব জানিয়েছেন, এটা ইবনুল মুসাইয়্যিবের কথা, নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত নয়। ইবনুল মুসাইয়্যিব যদি তা

নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই বলতেন না ঃ 'ইবনুল মুসাইয়্যিব বলতেন।' কথাটি ইবনুল মুসাইয়্যিবই বলতেন, কিন্তু তিনি নবী করীম (স) পর্যন্ত সূত্র স্থাপন করতেন। তাই শাফেয়ী তাঁর কথা ঃ 'ক্ষতি তার, জরিমানাও তাকে দিতে হবে' কে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। এ কথার দ্বারা রিহনওয়ালার জন্যে তার বৃদ্ধি ওয়াজিব করেছেন, তার ক্ষতিটাও তারই উপর চাপিয়েছেন। আর ঋণটা তো তার আসল অবস্থায়ই রয়েছে।

আবূ বকর (র) বলেছেন, তাঁর কথা ঃ 'রিহন আটকানো যাবে না' ইবরাহীম ও তায়ূস দুজনই এটার উল্লেখ করেছেন। তাঁরা রিহন রাখতেন, বলতেন ঃ আমি তোমার নিকট মাল নিয়ে এসেছি আমুক সময় পর্যন্তকার জন্যে। অন্যথায় তা তোমার হয়ে যাবে।' নবী করীম (স) বলেছেন, 'রিহন' আটকানো যাবে না। ইমাম মালিক ও সুফিয়ানও এর এ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। আবূ উবায়দ বলেছেন, রিহন বিনষ্ট হলে আরবী ভাষায় বলা হয় না ঃ قَدْغَلَقَ الرهْنُ 'রিহন আটকে দেয়া হয়েছে।' বরং রিহন গ্রহীতা যখন তা পাওয়ার যোগ্য তখন বলা হয় ঃ আটকে দেয়া হয়েছে। তখন সে তা নিয়ে যেত।

এটা ছিল জাহিলিয়াতের যুগের কথা। নবী করীম (স) তা বাতিল করে দিয়েছেন এ কথা বলে ঃ 'রিহন বন্ধ করা যাবে না, আটকানো যাবে না।' ভাষাভাষীরা বলত ঃ غَلَقَ الرَّهْنُ যখন তা অর্থহীন ও বিনিময়হীন ভাবে চলে যেত, তখন এ কথা বলত। .....।

'রিহন' আটকনো যায় না' কথাটির দুটি তাৎপর্য হতে পারে। একটি তা যদি যথাযথ কায়েম থাকে, তা হলে 'রিহন' গ্রহীতা তা পাবে না মিয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর। আর দ্বিতীয়— তা ধ্বংস হলে বিনা বিনিময়ে যাবে না। আর لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ কথাটি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের। কোন কোন বর্ণনাকারী তা বর্ণনার কথার মধ্যে শামিল করে দিয়েছেন। কেউ কেউ সেটি আলাদা করেছেন এবং বলেছেন, কথাটি রাসূলে করীম (স)-এর নয়। ইমাম শাফেয়ী তার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন— তার উপর বৃদ্ধি তার হবে, আর কমতিও তার হবে। এ ব্যাখ্যা ফিকাহবিদদের কথার বাইরের ভাষার ভুল বিশেষ। তা এজন্যে যে, غرم শব্দের আসল আভিধানিক অর্থ হল অনিবার্যতা, অবিচ্ছিন্নতা। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا -

জাহান্নামের আযাব অনিবার্য— অবিচ্ছিন্ন হয়ে দাঁড়াবে।

অর্থাৎ তা বাধ্যতামূলক হবে, চিমটি কেটে লেগে থাকবে, কোন ক্রমেই ছেড়ে দেবে না। আর غريم হচ্ছে সে, যার দেয়া ঋণ পাওনা রয়েছে, তা তাকে অবশ্যই ফেরত পেতে হবে। এ-ও বলা হয় ঃ لَهُ الدَّيْنُ 'ঋণ তার দেয়া।' কেননা তাকে তা ফেরত পেতে হবে, তা পাওয়ার জন্যে তাকে দাবি করতে হবে। নবী করীম (স) المائم والمغرم থেকে পানাহ চাইতেন। এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন ঃ 'এক ব্যক্তি যখন ঋণগ্রস্ত হয়, তখন সে কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে খেলাফ করে'। এভাবে غرم শব্দটি অনিবার্য, নাছোড়বান্দা অর্থে ব্যবহৃত হয়। ঋণ যে দিয়েছে সে তা ফেরত পাওয়ার জন্যে অবশ্যই দাবি করবে। কুরাইসাতা ইবনুল মুখারিক বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

إِنَّ الْمَسْئَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ فَقْرٌ مُدْقِعٌ أَوْ غُرْمٌ مُفْظِعٌ أَوْ دَمٌ مُوْجِعٌ -

লোকদের নিকট চাওয়া তিনটি কারণে হালাল হতে পারে। অতীব দুর্দশাগ্রস্ততার দারিদ্র্য, অপমানকর ঋণগ্রস্ততা ও বেদনাদায়ক রক্ত।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ -

দান-সাদকা-যাকাত ফকীরদের জন্যে।

তার এক পর্যায়ে বলা হয়েছে ঃ وَالْغَارِمِيْنَ 'ঋণগ্রস্ত লোকগণ'। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ إِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ অর্থাৎ বাধ্যতাকারী, ঋণসমূহের দাবিকারী। এ-ই হচ্ছে غرم শব্দের আসল অর্থ। আবূ উমর সালবের গোলাম, সালব—ইবনুল ই'রাবী সূত্রে বলেছেন غرم শব্দের অর্থ আবূ উমর বলেছেন, মাল নষ্ট বা ধ্বংস হওয়া ও তার ক্ষতি হওয়াকে غرم বলা হয়। এ কথা যারা বলে তারা ভুল করে। কেননা যার মাল চলে গেছে তাকে বলা হয় ফকীর। কিন্তু তাকে غريم বলা হয় না। কেননা غريم সে, যার উপর লোকদের জন্যে দাবি নিবদ্ধ হয়েছে। এ-ই যখন ব্যাপার, তখন وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ -এর অর্থ যে বলেছে 'তার ক্ষতি', সে ভুল করেছে। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব এ হাদীসের বর্ণনাকারী। আগেই প্রমাণ করেছি যে, لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ কথাটি আসলে তাঁরই। শাফেয়ী যা বলেছেন, সে ব্যাখ্যা তিনি করেন নি। কিন্তু তাঁর মাযহাব হল 'রিহন'-এর ক্ষতিপূরণ দান। আবদুর রহমান ইবনে আবূ জিনাদ তাঁর পিতা সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, উরওয়াতা, আল-কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ ও আবূ বকর ইবনে আবদুর রহমান, খারিজা ইবনে জায়দ উবায়দুল্লাহ ইবনে উবায়দুল্লাহ প্রমুখ বলেছেন, 'রিহন' তার সাথে যাতে তা দেয়া হয়েছে যখন তা ধ্বংস হবে ও তার মূল্য দিয়ে দেয়া হবে।' তাদের থেকে সিকাহ্ নবী করীম (স) পর্যন্ত উঠে যায়। অথচ একথা প্রমাণিত যে, সাঈদ ইবনুল মূসাইয়্যিবের মাযহাব হল, 'রিহন'-এর ক্ষতিপূরণ করা (ضمان الرهان) তাহলে (عليه غرمه) কথাটির অর্থ কি করে হতে পারে যে, ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না?

তা যদি রাসূলে করীম (স) বর্ণিত হয়ে থাকে, তা হলে নবী করীম (স)-এর উপর যে ব্যাখ্যা বর্ণনাকারী দিয়েছেন তা-ই হওয়া উচিত শাফেয়ী মাযহাবের ঘোষণা। কেননা তিনি কিরা-কসম ও সাক্ষীর বিষয়ে আমর ইবনে দীনারের কথাকে ধন-মালের ব্যাপারে অকাট্য দলীল মনে করে নিয়েছে। বলেছেন, ধন-মাল ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে তার ভিত্তিতে ফায়সালা করা যাবে না। 'কুল্লাতাইন'-এর হাদীসে ইবনে কুরাইজের কথার ভিত্তিতে ফায়সালা করেছেন। আর ক্রয়-বিক্রয়ের দুই পক্ষের খেয়ার-ইখতিয়ারের ক্ষেত্রে ইবনে উমরের মাযহাবকেই নবী করীম (স)-এর কথার তাৎপর্য ধরে নিয়েছেন। ক্রয়-বিক্রয়ের পক্ষদ্বয়ের পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত এ ইখতিয়ার থাকে। এ বিচ্ছিন্নতা শারীরিকভাবে হতে হবে। তাহলেই নবী করীম (স)-এর বক্তব্যানুরূপ ফায়সালা করা হবে। এ কারণে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের কথাকেই রাসূলে করীম (স)-এর কথার চূড়ান্ত তাৎপর্য মনে করাই তার কর্তব্য। অবশ্য 'তারই উপর ধার্য তার ক্ষতিপূরণ' কথাটি নবী করীম (স)-এরই প্রমাণিত হয়। আর لَهُ غُنْمُهُ কথাটির অর্থ হল, রিহনদাতা বাড়তিটা পাবে, আর 'রিহন' যে ঋণের কারণে তা তারই উপর বহাল

থাকবে। আর তাই হচ্ছে নবী করীম (স)-এর لَايَغْلَقُ الرَّهْنُ কথাটির তাফসীর বা ব্যাখ্যা। কেননা তারা মনে করত যে, 'রিহন' গ্রহীতা রিহন-এর মালিক হয়ে যায় ঋণ ফেরত দেয়ার পূর্বেই যদি নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রম করে যায় তখন। তাই নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَايَغْلَقُ الرَّهْنُ -

অর্থাৎ ঋণদাতা রিহন গ্রহীতা নির্দিষ্ট মিয়াদ শেষ হয়ে গেলেই 'রিহন' এর মালিক হয়ে যাবে না।

পরে এ কথার তাফসীর করা হয়েছে, রিহনদাতা তার অতিরিক্তটা পাবে। বলা হল—রিহন গ্রহীতা মূল রিহন-এর সম্পদটুকুই পাবে, তার উপর বাড়তিটা পাবে না। তার দেয়া ঋণ ঋণ গ্রহীতার উপর চাপানো থাকবে যেমন ছিল। আর তা-ই হচ্ছে তাঁর কথা وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ কথার তাৎপর্য। যেন বলাই হল, তার উপর ঋণটা থেকে যাবে। এ হাদীসেও রিহন-এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এমন কোন কথাই নেই। বরং এ হাদীসই প্রমাণ করে যে, তার ক্ষতিপূরণ অবশ্যই দিতে হবে যেমন পূর্বে বলেছি।

আবূ বকর (র) বলেছেন, নবী করীম (স)-এর لَايَغْلَقُ الرَّهْنُ কথাটি তো তখনকার জন্যে যখন দায়মুক্তির সময়ে ঋণ বাকী থাকার অবস্থার কথা বলতে চাওয়া হবে। আর নবী করীম (স)-এর বাতিলকরণ হল মিয়াদ শেষ হয়ে গেলেই তার মালিকানা শর্তকে। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। তন্মধ্যে একটি হল ফাসিদ শর্তসমূহ 'রিহন'কে নষ্ট করে না; বরং শর্তকেই বাতিল করে। এ-ও হতে পারে যে, নবী করীম (স) তাদের আরোপিত শর্তকে বাতিল করার জন্যেই এ কথাটি বলেছেন এবং রিহনকে জায়েয করেছেন। আর এ কথাও, 'রিহন' সহীহ হওয়ার শর্ত হচ্ছে 'কবজ' হওয়া। যেমন হেবা ও সাদকা। বিভিন্ন শর্ত আরোপিত হলেও তা বিনষ্ট হয় না। তেমনি 'কবজ' ছাড়া যা সহীহ হয় না— যেমন হেবা ও সাদকা, তার হুকুমও এরূপ হওয়া উচিত যে, আরোপিত শর্তসমূহ তাকে নষ্ট করে না— দুটিরই সহীহ্ হওয়ার জন্যে 'কবজ' শর্ত হওয়ার কারণে।

এ হাদীস একথাও প্রমাণ করে যে, মালিক বানাবার চুক্তিসমূহে ঝুকি আরোপিত হয় না। কেননা মিয়াদ শেষে রিহন-এর মালিক হওয়ার জন্যে তাদের আরোপিত শর্ত ছিল ঝুঁকির উপর ঝোলানো মালিক বানাবার ব্যাপার এবং ভাবিষ্যতের সময় আসার উপর। এভাবে মালিক বানিয়ে দেয়ার রীতিকে নবী করীম (স) বাতিল করে দিয়েছেন। ফলে তা মালিক বানানোর সব চুক্তিতেই মৌলনীতি হয়ে দাঁড়ালো এবং ঝুঁকির উপর তার ঝুলে থাকা নিষিদ্ধ হওয়ার সম্পর্কহীনতার।

হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, যে লোক বলে, আগামীকাল যখনই আসবে তখনই আমি তোমাকে ক্রীতদাস দান করে দিয়েছি। অথবা বলে তখন তা তোমার নিকট বিক্রয় করে দিয়েছি। এ ধরনের কথা বাতিল। এ ধরনের কথার দ্বারা মালিকানা হয় না। তেমনি, যদি বলে, যখন আগামীকাল এসে গেল, বুঝবে, তোমার উপর আমার যে ঋণ আছে তা থেকে তোমাকে মুক্ত করে দিয়েছি— এ কথাও বাতিল, অর্থহীন। তবে দাসমুক্তি দান ও তালাক ভিন্নতর ব্যাপার। কেননা এ দুটির ঝুকির উপর ঝুলে থাকা জায়েয। কেননা এ দুটির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত

গ্রহণের মৌল ভিন্ন ভিন্ন তর— অন্য আর একটি। তা হল, দাসমুক্তি দান পর্যায়ে আল্লাহ্ চুক্তি লেখার অনুমতি দিয়েছেন এই বলে ঃ

وَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا -

এবং তাদের সাথে মুক্তির চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ কর যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণ জানতে পার।

তা এভাবে হয়, দাস মালিক বলে ঃ 'এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে মুক্তি দানের চুক্তিনামা আমি তোমাকে লিখে দিলাম। এক হাজার টাকা দিলেই তুমি মুক্ত। যদি তা দিতে অক্ষম হও, তাহলে তুমি ক্রীতদাসই থাকলে। এটা ঝুঁকির উপর ঝুলন্ত দাসমুক্তি এবং তা ভবিষ্যতের জন্যে। তালাক পর্যায়ে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ -

অতঃপর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দাও তাদের ইদ্দতকে সামনে রেখে।

এ তালাক তাৎক্ষণিকভাবে দেয়া ও সুন্নাত অনুযায়ী তালাক দেয়ার মধ্যে আয়াতে তো কোন পার্থক্য করা হয়নি। এ চুক্তি অর্থাৎ দাসমুক্তির চুক্তি যদি অর্থভিত্তিক হয়, এবং 'খুলা' তালাক হয় স্বামীকে মাল দেয়ার শর্তে, তাহলে প্রথম প্রস্তাব থেকে ফিরে যাওয়া যাবে না ক্রীতদাস ও স্ত্রীর তা কবুল করার পূর্বে। তাহলে দাসমুক্তিটাও একটা শর্তভিত্তিক কথা হয়ে দাঁড়াল। যেমন কিরা-কসমের শর্ত তা থেকে ফিরে যাওয়ার কোন পথ নেই।

আর এতেই রয়েছে বিভিন্ন শর্তের উপর ও দুটিকে ঝুলিয়ে দেয়া জায়েয হওয়ার দলীল। ভবিষ্যতে হওয়ার সময় নির্ধারণ করার। এ দুটির ক্ষেত্রে তার অর্থ হল, সে দুটি ঘটে যাওয়ার পর তা ভঙ্গ করা যাবে না। আর মালিক বানানো পর্যায়ের যত চুক্তির কথা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, সেসব সঙ্ঘটিত হওয়ার পর তা ভঙ্গ হতে পারে। এ কারণে এসবকে ঝুঁকির উপর ঝুলিয়ে দেয়া সহীহ্ নয়। রাসূল করীম (স)-এর কথা 'রিহন' বন্ধ করা যায় না' এর দৃষ্টান্তমূলক দলীল হচ্ছে আর একটা হাদীস। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'মুনাবিযা' ও 'মুলামিসা' ধরনের বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। بيع الحصاة করতেও নিষেধ করেছেন। এ সব ধরনের ক্রয়-বিক্রয় জাহিলিয়াতের যামানায় ব্যাপকভাবে চালু ছিল। কেউ যদি পণ্যদ্রব্য স্পর্শ করত অথবা তার মালিকের দিকে কাপড় নিক্ষেপ করত কিংবা তার পাথর-খণ্ড রেখে দিত, তাহলে তা বিক্রয় করা বাধ্যতামূলক হতো। ফলে মালিকানা লাভ হতো এমন উপায়ে যা কিছুমাত্র সঙ্গত ছিল না। ইজাব-কবুল ছাড়াই অপর একজন একটা কাজ করত। আর তাতেই তা কর্তব্য হয়ে দাঁড়াত। নবী করীম (স) এসব ক্রয়-বিক্রয়ের বাতিল করে দিয়েছেন। প্রমাণিত হল— মালিক বানাবার চুক্তি ঝুঁকির উপর ঝুলতে পারে না।

হানাফী ফিকাহবিদগণ রিহনকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার জিনিস বানিয়েছেন তার কম-সে কম মূল্যে এবং ঋণেরও। অথচ পূর্বে তা কবজ করা হয়েছিল তা থেকে ঋণটা পুরা মাত্রায় আদায় করে নেয়ার উদ্দেশ্যে। অতএব যতটা দ্বারা সেই ঋণ পুরামাত্রায় আদায় হয়ে যায়, ততটাকেই সহীহ্ মনে করা বাঞ্ছনীয়। তার কম বা বেশি আদায় করে নেয়া জায়েয হতে পারে না। কাজেই বাড়তিটার জন্যে তাকে আমানতদার হতে হবে। আর ঋণ পরিমাণের কম হলে তা পূরণ করে

দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। যেমন মনে করেছে, কম হোক বেশি হোক তা-ই ঋণের সম্পূর্ণ আদায়ের বিকল্প সে তাকে সেই বিক্রীত দ্রব্যের মত মনে করেছে, যা বিক্রেতার হাতে ধ্বংস হয়ে গেলে মূল্যের বিনিময়েই ধ্বংস হবে, কম হোক, কি বেশি হোক।

এ দুটির মধ্যে সমন্বয়কারী অর্থ হল, প্রত্যেকেই তার ঋণে বন্দী কিন্তু আমাদের মতে ব্যাপার তা নয়। কেননা পণ্য তো তার মূল্য দ্বারাই পরিপূরিত হয়— তা কম হোক, কি বেশী। কেননা পণ্য ধ্বংস হয়ে গেলে বিক্রয় ভঙ্গ হয়। তার মূল্যও থাকে না। কেননা বিক্রয় ভঙ্গ হওয়ার পর মূল্য অবশিষ্ট থাকা না-জায়েয। কিন্তু 'রিহন' বাবদ গচ্ছিত বস্তু ধ্বংস হয়ে গেলে তা সম্পূর্ণতা পায়, ভঙ্গ হয় না। তার দ্বারা ঋণ পুরাপুরি আদায় হয়ে যায়। অতএব তার ক্ষতিপূরণকে অবশ্যই গণ্য করতে হবে।

যদি বলা হয়, ঋণের অতিরিক্ত যদি হয় 'রিহন বস্তুর মূল্য, তাহলে সেই অতিরিক্তটা আমানত হয়ে যায়। তাহলে গোটা 'রিহান'টাকেই 'আমানত' মনে করে নিতে পারছ না কেন? তখন তা ঋণের বিনিময়ে আটকে রাখা ঋণ আদায় করে নেয়ার জন্যে হবে না, তার ক্ষতিপূরণ দেয়াও ওয়াজিব হবে না। আমরা এ তাৎপর্য পাচ্ছি ঋণের অতিরিক্ত হওয়ার মধ্যে। তখনও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। রিহন বাবদ দেয়া দাসীর গর্ভজাত সন্তান যেমন, যদি তা রিহন হিসেবে দেয়ার পর প্রসূত হয়ে থাকে, তখন তা রিহন গ্রহীতার হাতে মার সঙ্গে সঙ্গে আটক থাকবে। আর তা ধ্বংস হয়ে গেলে কিছুই দিতে হবে না। রিহন গ্রহীতার হাতে তার আটক থাকাটা তার ক্ষতিপূরণ দেয়ার 'ইল্লাত' হবে না।

জবাবে বলা যাবে, 'হিরন'-এর মূল্য পরিমাণের তুলনায় ঋণ বেশি হয় ও রিহন বাবদ দেয়া দাসীর সন্তান হওয়া— দুটোই একটি মূল্যের অধীন। মূলকে বাদ দিয়ে সে দুটোকে আলাদা-আলাদা করা জায়েয নয়। যখন দুটোই অধীন হিসেবে চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে। আর অবস্থা যখন তাই হবে, তখন ক্ষতিপূরণের দাবিতে সে দুটোকে আলাদা করা জায়েয হবে না। কেননা সন্তান প্রসবের ঘটনা সঙ্ঘটিত হওয়ার পূর্বে পূর্ববর্তী চুক্তির সাহায্যে তাদের দুজনকে আলাদা করা নিষিদ্ধ। আর চুক্তিতে অনুসঙ্গ হিসেবে যে শামিল নয়, তার দ্বারা ওদের দুজনকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করা জায়েয হতে পারে না। লক্ষণীয়, 'উম্মে ওয়ালাদ' (যে দাসী মনিবের সন্তান প্রসব করে)-এর সন্তান মার হুকুমের মধ্যে শামিল হয়। তার জন্যে অনুসঙ্গ হিসেবে সন্তান প্রসবের অধিকার হয়। আর তাকে মূল থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না এ অধিকারের ভিত্তিতে। অনুসঙ্গ হিসেবেও নয়। তেমনি যে দাসীর মুক্তির জন্যে লিখিত চুক্তি হয়েছে তার সন্তানও সে চুক্তিতে শামিল ও গণ্য হবে। তা সে অবস্থায় চুক্তির বলে বিচ্ছিন্ন করা কঠিন হওয়ার কারণে। রিহন পরিমাণে বাড়তি ও রিহন বাবদ রাখা দাসীর সন্তান-ও অনুরূপ, অনুসঙ্গত হিসেবে চুক্তির মধ্যে তারা গণ্য হবে না। এ কারণে তার হুকুমটা মূলের হুকুম বানানো বাধ্যতামূলক নয়। প্রথমে যে দুজনের উপর চুক্তি সূচিত হয়েছিল সেইভাবে সে দুজনকে জড়িতও করা যাবে না। কেউ যদি একটি ছাগী 'হাদিয়া' হিসেবে দেয়, পরে তার দেহ প্রবৃদ্ধি পায় কিংবা বাচ্চা প্রসব করে, তখন তা সেই বাচ্চাসহ 'হাদিয়া' দেয়া কর্তব্য। কেননা সেটা সেই 'হাদিয়ারই বাড়তি, সেটিরই সন্তান।' যদি বাড়তিটা চলে যায়, সন্তান ধ্বংস হয়, তাহলে এজন্যে তাকে কিছুই দিতে হবে না। শুধু তা-ই দিতে হবে, যা দেয়ার সে সিদ্ধান্ত করেছিল। তেমনি যদি মাঝারি ধরনের ছাগী দেয়া কর্তব্য হয়, আর সে দেয়া তার চাইতে উত্তম উঁচু ছাগী, এই বাড়তিটার

হুকুম প্রমাণিত— প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতক্ষণ মূল থাকবে। তা যবেহ করার আগেই যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে বাড়তির হুকুম বাতিল হয়ে যাবে, তার যিম্মায় যা ছিল, তা-ই থেকে যাবে। তেমনি, বাড়তির বদল যদি সন্তান হয়, যা দাসী প্রসব করেছে, তা-ও এ অবস্থায় গণ্য হবে। রিহন রাখা দাসীর সন্তান-ও তেমনি, রিহন-এর মূল্যের বাড়তিটাও তা-ই। দুটো যতদিন থাকবে, ততদিনই সে দুটোর হুকুম এ-ই থাকবে। আর দুটোই যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে দুটোর হুকুমই প্রত্যাহৃত হবে।

## 'রিহন' দ্বারা উপকৃত হওয়া পর্যায়ে বিভিন্ন মত

ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, আল-হাসান ইবনে যিয়াদ ও জুফর বলেছেন, রিহন গ্রহীতা ও রিহনদাতা দুজনার কোন একজনের পক্ষেও রিহন বাবদ দেয়া জিনিস ব্যবহার করা বা তার দ্বারা কোনরূপ উপকৃত হওয়া জায়েয নয়। তাঁরা বলেছেন, রিহন গ্রহীতা যদি রিহনদাতার অনুমতিক্রমে 'রিহনকে' (রিহন বাবাদ রাখা জিনিসকে) ভাড়ায় দেয় কিংবা দেয় রিহনদাতা রিহন গ্রহীতার অনুমতি নিয়ে, তাহলে তা রিহন থাকবে না, তা ফিরিয়েও নেয়া যাবে না।

ইবনে আবূ লায়লা বলেছেন, রিহন গ্রহীতা যদি রিহনদাতার অনুমতি নিয়ে ভাড়ায় লাগায় তাহলে তা তার রিহন অবস্থায়ই থাকবে। আর আয়টা রিহন গ্রহীতার পাওনা আদায়ে কাটা যাবে। ইবনুল কাসিম বলেছেন, ইমাম মালিকের মত হল, রিহন গ্রহীতা যদি রিহন ও রিহনদাতার মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তখন সে রিহন ভাড়ায় দিতে পারে; কিংবা নিজে তাতে বাস করতে পারে, অথবা তা ধার দিতে পারে— যা-ই করুক, তখন তা 'রিহন' থাকবে না। রিহন গ্রহীতা যদি তা রিহনদাতার অনুমতিক্রমে ভাড়ায় লাগায়, তাহলে তা 'রিহন' থেকে যাবে। তেমনি রিহন গ্রহীতা যদি রিহনদাতার অনুমতিক্রমে ধারে দেয়, তাহলে তা রিহন অবস্থাই থাকবে। তবে রিহন গ্রহীতা যদি রিহনদাতার অনুমতিক্রমে ভাড়ায় দেয়, তাহলে ভাড়াটা রিহন-এর মালিক (যদি তা জমি হয়) পাবে। ভাড়াটা রিহন-হিসেবে তার 'হক' হয়ে যাবে না। তবে রিহন গ্রহীতা আগেই যদি তার শর্ত করে থাকে তবে ভিন্ন কথা। কেননা বিক্রয়ে যদি শর্ত করা হয় যে, বিক্রেতা তা রিহন দেবে এবং ভাড়া থেকে তা, 'হক' আদায় করে নেবে। ইমাম মালিক এটাকে মাকরূহ মনে করেছেন। বিক্রয়ে যদি তার শর্ত করা না হয় এবং রিহনদাতা বিক্রয়ের পর তা দান করে, তাহলে তাতে কোন দোষ নেই। আর বিক্রয় যদি এ শর্তে একটা জানা মিয়াদ পর্যন্তকার জন্যে হয় অথবা বিক্রেতা যদি তাতে রিহন বিক্রয়ের শর্ত করে যে, সে তার 'হক' এভাবে আদায় করে নেবে, ইমাম মালিকের মতে তা জায়েয হবে। ঘর-বাড়ি ও জমি-জায়গা ক্ষেত্রেই তা সমান। তবে জন্তু-জানোয়ারের বেলায় তা মাকরূহ বলেছেন। মুয়াফী সওরীর মত উদ্ধৃত করেছেন। তিনি 'রিহন' থেকে কোনরূপ উপকৃত হওয়াকে মাকরূহ মনে করেছেন। কোন গ্রন্থ রিহন বাবদ রাখা হলে তা পড়াও যাবে না। আওজায়ী বলেছেন, রিহন-এর আয় তার মালিকের প্রাপ্য। তা থেকে তারই জন্যে ব্যয় করতে হবে। বাড়তিটা তার হবে। যদি মুনাফা না হয় এবং সে তার খিদমত গ্রহণ করছিল, তাহলে তার খাবারটা হবে তার খিদমতের বিনিময়ে। আর যদি তার খিদমত না নেয়, তাহলে তার ব্যয়টা তার মালিককে বহন করতে হবে। আল-হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, 'রিহন' ব্যবহার

করা যাবে না, তদ্দারা উপকার গ্রহণ করা যাবে না। তবে রিহ্‌ন যদি এমন ঘর হয় যা খারাপ হয়ে যেতে পারে, এ জন্যে রিহ্‌ন গ্রহীতা তাতে বসবাস করে, তা থেকে ফায়দা সে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়, সে চায় ঘরটাকে ভালোভাবে রক্ষনাবেক্ষণ করতে, তাহলে জায়েয হবে।

ইবনে আবূ লায়লা বলেছেন, 'রিহ্‌ন' বাবদ দেয়া আংটি যদি রিহ্‌ন গ্রহীতা নিজের সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যদি তা শুধু দখলে রাখার নিয়তে পরে, তাহলে কিছুই দিতে হবে না। লায়স ইবনে সাদ বলেছেন, রিহ্‌ন বাবদ দেয়া গোলামের খিদমত লওয়া হয় তাকে খাবার খাওয়ানোর বিনিময়ে,— ব্যয় যদি তার কাজের সমান হয় তাহলে দোষ হবে না। তবে কাজের মূল্য যদি খাওয়ার খরচের অধিক হয়, তাহলে রিহ্‌ন গ্রহীতার নিকট থেকে সেই অতিরিক্তটা নিয়ে নিতে হবে।

আল-মুজানী শাফেয়ীর এ মত রাসূলে করীম (স)-এর হাদীস ঃ

الرَّهْنُ مَحْلُوْبٌ وَمَرْكُوْبٌ -

রিহ্‌ন বাবদ রাখা জন্তুর দুধ দোহানো হবে, তার পিঠে সওয়ারও হওয়ার যাবে—

এর অর্থ সম্পর্কে এই যে, রিহ্‌ন যদি যান হিসেবে ব্যবহার্য হয় ও হয় ঘর-বাড়ি, তাহলে তার পিঠ ও ঘর থেকে বিরত রাখা যাবে না। রিহ্‌নদাতার জন্যে দাসের খিদমত নেয়া, জন্তুর পিঠে সওয়ার হওয়া জায়েয। তার দুধও দোহন করা যাবে। পশম কাটা যাবে। রাত্রি বেলায় তা রিহ্‌ন গ্রহীতার নিকট সোপর্দ করা যাবে।

আবূ বকর (র) বলেছেন, আল্লাহ যখন বলেছেন ঃ فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ তাহলে এমন রিহ্‌ন-এর বিনিময়ে ঋণ নেয়া যাবে, যা ঋণদাতা নিজের দখলে নেবে। ঋণদাতার রিহ্‌ন-এর মালটা 'কবজ' করবে এটা রিহ্‌ন-এর পরিচিতি— শর্ত। এ 'কবজ'-এর 'হক' হওয়া রিহ্‌ন বাতিল করার কারণ হতে পারে। তাই দুজনার কোন একজন যদি অপরজনের অনুমতিক্রমে রিহ্‌ন ভাড়ায় লাগায়, তাহলে রিহ্‌ন থেকে বাইরে চলে যাবে। কেননা ভাড়ায় গ্রহণকারী সেই 'কবজ' করার অধিকারী হয়েছে যদ্দারা রিহ্‌ন সহীহ্ হয়। আমাদের মতে তা ধারের মত নয়। কেননা ধার 'কবজ'-এর অধিকার হওয়ার কারণ হয় না। কেননা ধারদাতা তার ধারে দেয়া জিনিস যে কোন সময় নিজ হাতে ফেরত নিতে পারে, যখনই সে ইচ্ছা করবে।

যে লোক 'রিহ্‌ন' বাবদ গচ্ছিত জিনিসি ব্যবহার করা ও তা থেকে ফায়দা লাভ করা জায়েয বলেছেন, তাঁরা দলীল হিসেবে একটি হাদীস পেশ করেছেন। হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, হাম্মাদ, ইবনুল মুবারক যাকারিয়া, আবূ হুরায়রাতা (রা) সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

لَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفْقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَالظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفْقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا -

দুধ তার খরচেই তাকে দোহন করতে হবে যদি তা রিহ্‌ন বাবদ রাখা হয়ে থাকে। পিঠ অবশ্যই তার উপর আরোহন করা হবে— তারই ব্যয় যদি তা 'রিহ্‌ন' হয়ে থাকে। যে লোক যানবাহন হিসেবে তা ব্যবহার করবে বা দুধ দোহাবে, খরচ তাকেই বহন করতে হবে।

এ হাদীসের বক্তব্য হল, খরচ বহন করার দায়িত্ব আসবে তাকে যানবাহন হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে তার দুধ পান করার জন্যে। আর একথা জানাই আছে যে, রিহনদাতাকে তার খরচ বহন করতে হয় এজন্যে যে, সে-ই তার মালিক। তার পিঠে সওয়ার হওয়ার কারণে নয়, তার দুধ পান করার জন্যে নয়। কেননা 'রিহন' বস্তু যদি এমন না হতো যা পিঠে সওয়ার হওয়া যায় বা তার দুধ পান না করা যায়, তা হলেও তাকেই তার খরচ বহন করতে হতো। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, হাদীসটির বক্তব্য হচ্ছে দুধ ও পিঠ রিহন গ্রহীতার জন্যে সেই খরচের বিনিময়ে যা সে 'রিহন'-এর জন্যে করে। একথা হুশাইম তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেছেন। হাদীসটি তিনি যাকারিয়া ইবনে আবূ জায়েদা, শবী, আবূ হুরায়রাতা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اذا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُوْنَةً فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ نَفْقَتُهَا، وَيَرْكَبُ -

কোন জন্তু রিহন রাখা হলে রিহন গ্রহীতার কর্তব্য তাকে ঘাস খাওয়ানো; জন্তুর দুধ দোহন ও পান করা যাবে। যে পান করবে, সে-ই তার বাবদ খরচও বহন করবে ও সওয়ার হবে।

এ হাদীসে স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে যে, 'রিহন গ্রহীতাই খরচ বহন করতে বাধ্য'। সে-ই তার উপর সওয়ার হতে পারবে, তার দুধও খেতে পারবে।

শাফেয়ী বলেছেন, 'রিহন'-এর খরচ রিহনদাতা বহন করবে, রিহন গ্রহীতা নয়। উক্ত হাদীসটি তাঁর মতের বিপরীত কথা প্রমাণ করে। এটি তার পক্ষে দলীল নয়।

আল-হাসান ইবনে সালিহ ইসমাইল ইবনে আবূ খালিদ-শবী সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ

لَايُنْتَفَعُ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ -

রিহন থেকে কোন ফায়দাই গ্রহণ করা যাবে না।

শবী তাঁর বর্ণিত হাদীসে এ কথাটুকু বাদ দিয়েছেন। অথচ তা আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে দুটি অর্থের যে কোন একটি বুঝতে হবে। হয় হাদীসটি মূলতই প্রমাণিত নয়। অথবা হাদীসটি প্রমাণিত; কিন্তু তা তাঁর মতে মনসূখ; আমাদের মত-ও তাই। কেননা সে রকমের রিহন সূদ হারাম হওয়ার পূর্বে জায়েয ছিল। পরে সূদ যখন হারাম হয়ে গেল, জিনিসসমূহ তার যথার্থ পরিমাণের উপর স্থিত হল, তখন তা মনসূখ হয়ে গেল। পরবর্তীতে খরচকে দুধের বদল ধরা হয়েছে, তা কম হোক, কি বেশী। তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে المصراة-এর হাদীস। জন্তু ফেরত দেবে আর সেই সাথে একশ' খেজুরও দেবে। দুধের পরিমাণ কত, তার গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য দেয়া হয়নি। আমাদের মতে তা-ও মনসূখ হয়ে গেছে সূদ হারাম হওয়ার কারণে। রিহনদাতার জন্যে জন্তুর পিঠে সওয়ার হওয়া ও দুধ নেয়া ওয়াজিব বলে যাঁরা মত দিয়েছেন, উপরোক্ত দলীল সে মতকে বাতিল প্রমাণ করেছে। কেননা আল্লাহ্ রিহন-এর একটা বড় পরিচয় দিয়েছেন, তা রিহন গ্রহীতা কর্তৃক 'কবজ' হতে হবে। যেমন সাক্ষ্যের একটা বড় পরিচয় হচ্ছে— সততা-ন্যায়পরায়ণতা সম্পন্ন হওয়া। এক আয়াতে বলেছেন ঃ

اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ -

তোমাদের মধ্য থেকে দুজন সততা-ন্যায়পরায়ণতা সম্পন্ন ব্যক্তি।

বলেছেন ঃ 'তোমাদের মধ্য থেকে সাক্ষী' হিসেবে যাদের পছন্দ কর তাদের থেকে।' একথা জানাই আছে যে, সাক্ষীর পরিচিতি না থাকলে তার সাক্ষী হওয়ার যোগ্যতাই হয় না, তার সাক্ষ্য গৃহীতই হবে না। তেমনি 'রিহন'-এর পরিচিতিই হল, তা রিহন গ্রহীতা কর্তৃক 'কবজ' হতে হবে কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণানুযায়ী। তাই সে পরিচিতি যখন অনুপস্থিত হবে, তখন তা রিহন হবে না।— সে পরিচিতিটি হবে 'কবজ' করার অধিকার হওয়া। রিহনদাতা যদি তা 'কবজ' করার অধিকারী হয়— যার দ্বারা রিহন সহীহ্ হয়, তাহলে তা শুরুতে সহীহ্ হতে পারে না। কেননা নিকটে হয়েছে তা, যা তাকে বাতিল করে। আর শুরুতে তা সহীহ্ হলেও তা বাতিল হওয়া জরুরী হবে তার কবজ করার অধিকার হওয়ার কারণে। তাই তা তার হাতে ফিরিয়ে দেয়াই কর্তব্য।

উপরন্তু সকলেই একমত এ ব্যাপারে যে, রিহনদাতার জন্যে রিহন বাবদ দেয়া দাসীর সাথে সঙ্গম করা নিষিদ্ধ। আর সঙ্গম হল রিহন থেকে পাওয়া ফায়দা। অতএব সব প্রকারের ফায়দার ব্যাপারেই এ হুকুম কার্যকর হওয়া জরুরী। অর্থ রিহন-এর উপর রিহন দাতার কোন হক থাকবে না। অন্যদিক দিয়ে কথা হল, রিহনদাতা রিহন-এর দাসীর সাথে সঙ্গম করতে পারবে না এজন্যে যে, রিহন গ্রহীতার অধিকার রয়েছে তার উপর তার 'কবজ' প্রতিষ্ঠিত করার। খিদমত লওয়ারও।

মিয়াদ শেষে রিহন-এর মালিক হবে রিহন গ্রহীতা— রিহন দেয়ার সময় এরূপ শর্ত করা সম্পর্কে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, যুবায়র ও আল-হাসান ইবনে যিয়াদ বলেছেন, যখন কোন কিছু 'রিহন' বাবদ রাখবে, বলবে, এক মাসের মধ্যে আমি যদি ঋণ ফেরত দিই তাহলে তো ভালই, অন্যথায় 'রিহন'টা তোমার হয়ে যাবে। তাহলে রিহন জায়েয হবে। শর্তটি বাতিল গণ্য হবে।

মালিক (র) বলেছেন, 'রিহন' বিনষ্ট হয়ে যাবে, ভেঙ্গে যাবে। যদি ভেঙ্গে না যায়, আর মিয়াদ শেষ হয়ে যায়, তাহলে সে শর্তের কারণে রিহন গ্রহীতার পক্ষে রিহন আটক করে রাখার অধিকারী হবে না। যদিও সে অন্যান্য পাওনাদারদের তুলনায় সে জিনিসটির উপর বেশি অধিকারী। তার হাতে যদি তাতে কোন বিকৃতি ঘটে তাহলে সে তা ফেরত দিতে পারবে না। তার মূল্য দিতে সে বাধ্য হবে মিয়াদ শেষ হওয়ার দিন। একথা পণ্যদ্রব্য ও জন্তু-জানোয়ার সম্পর্কে। কিন্তু রিহন যদি ঘর-বাড়ি বা জমি হয়, তাহলে সে তা রিহনদাতার নিকট ফেরত দেবে তা তুলে ধরা হলেও। অন্যথায় তা ভেঙ্গে ফেলা হবে, যা সেখানে নতুন নির্মাণ করা হবে বা জমিতে বৃক্ষ রোপণ করা হবে। এ সব ধ্বংস বা হারানোর পর্যায়ের কাজ। মূল্যটা দিতে হবে। যেমন বেঠিক বিক্রয় কাজে হয়ে থাকে।

মুয়াফী সওরীর বক্তব্য বলেছেন, যে লোক তার সঙ্গীর নিকট কিছু রিহন রাখে এবং বলে, আমি যদি তোমার পাওনা না দিই তা হলে এ মাল তোমার— বলেছেন, এই রিহন বন্ধ রাখা যাবে না। আল-হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, তাঁর একথা গ্রহণযোগ্য নয়। রুবাই শাফেয়ীর মত বলেছেন, যদি কেউ কিছু রিহন রাখে এবং বলে, অমুক তারিখ পর্যন্ত তোমার পাওনা না

দিলেই এটা তোমার হয়ে যাবে, তাহলে এ রিহনটা বিক্রয় পর্যায়ের হয়ে যাবে, রিহন সহীহ্ হবে না। রিহন-এর জিনিস তার হয়ে যাবে, যে তা রেখেছে।

আবূ বকর (র) বলেছেন, ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, মিয়াদ শেষ হয়ে গেলেই রিহন গ্রহীতা স্বতই রিহন-এর মালিক হয়ে যাবে না। রিহন কিভাবে জায়েয হয় এবং কিভাবে কেন নষ্ট হয়, এ বিষয়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। পূর্বে আমরা ব্যাখ্যা করেছি, রাসূলে করীম (স)-এর কথা ঃ 'রিহন বন্ধ করা যাবে না' এর অর্থ, মিয়াদ শেষ হলেই শর্ত থাকা সত্ত্বেও রিহন গ্রহীতা রিহন-এর মালিক হয়ে যাবে না। নবী করীম (স) 'তা বন্ধ করা যাবে না' বলে এই কথাটিই বলেছেন। তাকে আরোপিত শর্তের ভিত্তিতে 'রিহন' সহীহ্ হওয়াকে তিনি অস্বীকার করেন নি। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, 'রিহন' তো সহীহ্ হবে, কিন্তু শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। কিয়াস-ও তাই বলে। এজন্যেই নবী করীম (স) সহীহ্ হবে, কিন্তু শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। কিয়াস-ও তাই বলে। এজন্যেই নবী করীম (স) শর্ত বাতিল করেছেন, আর 'হেবা'কে সহীহ্ বলেছেন। এ দুটির মধ্যে সমন্বয়কারী তাৎপর্য হল, এ দুটির কোনটিই শুধু চুক্তির বলে সহীহ্ হয়ে যাবে না 'কবজ' না হওয়া পর্যন্ত।

ঋণের পরিমাণ নিয়ে রিহনদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে মতপার্থক্য হলে কি করা হবে, এ বিষয়েও ফিকাহবিদদের বিভিন্ন কথা রয়েছে। আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফর ও আল-হাসান ইবনে যিয়াদ বলেছেন, রিহন ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর রিহনদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে ঋণের পরিমাণ নিয়ে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হলে রিহনদাতার কথাই গ্রহণ করতে হবে ঋণের পরিমাণ সম্পর্কে। তবে সেই সাথে তাকে কিরা-কসমও করতে হবে। আল-হাসান ইবনে সালিহ, শাফেয়ী, ইবরাহীম নখয়ী ও উসমানুলবত্তীরও এ মত। তায়ূস বলেছেন, রিহন-এর মূল্য সম্পর্কে রিহন গ্রহীতার কথাকে সত্য মেনে নিতে হবে। সেই সাথে তাকে হলপ করতে হবে। আল-হাসান, কাতাদাতা, আল-হিকামের কথাও তাই। আয়াস ইবনে মুআবিয়া বলেছেন এই দুটি কথার মধ্যবর্তী একটি কথা। কথাটি হল, রিহনদাতার নিকট যদি অকাট্য প্রমাণ থাকে রিহন গ্রহীতাকে রিহন দেয়ার, তাহলে রিহনদাতার কথাই মানতে হবে। আর যদি কোন অকাট্য প্রমাণ তার নিকট না থাকে, তাহলে রিহন গ্রহীতার কথা মেনে নিতে হবে। কেননা সে ইচ্ছা করলে রিহন পাওয়ার কথাটাকেই অস্বীকার করতে পারে। আর যখন সে কিছুটা পাওয়ার কথা স্বীকার করছে, তার বিপরীতে কোন প্রমাণও পাওয়া যায় নি, এমতাবস্থায় তার কথা মেনে না নিয়ে কোন পথ পাওয়া যায় না।

ইবনে অহব ইমাম মালিকের এ মত প্রকাশ করেছেন যে, ঋণ ও রিহন-এর ব্যাপারে রিহনদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে মতপার্থক্য হলে রিহন যদি রিহন গ্রহীতার পাওনা পরিমাণ হয়, তাহলে রিহন গ্রহীতা তা নিয়ে নেবে। এটাই উত্তম তার জন্যে। অবশ্য তাকে হলপ করতে হবে। তবে রিহনদাতা অন্য কিছু চাইলে ভিন্ন কথা। তখন তার প্রাপ্য তার উপর চাপানো হবে এবং সে তার রিহন নিয়ে নেবে।

ইবনুল কাসিম মালিকের এ মতের উল্লেখ করেছেন যে, রিহন-এর মূল্য ও তার ঋণের ব্যাপারে রিহন গ্রহীতার কথাকেই মেনে নিতে হবে। তবে ঋণের পরিমাণের অতিরিক্ত দাবি সত্য মানা যাবে না।

আবূ বকর (র) বলেছেন, আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا –

যার উপর প্রাপ্য ধার্য হচ্ছে, সে দলীল লেখাবে। তার উচিত তার রব্ব আল্লাহ্‌কে ভয় করা, এবং তা থেকে এক বিন্দু জিনিস কম করবে না।

এ আয়াত প্রমাণ করছে যে, যার উপর ঋণ ধার্য হচ্ছে, কথা তারই গ্রহণ করতে হবে। কেননা মূল ঋণ পরিমাণে কম যা করার নসীহত তাকেই করা হয়েছে। বোঝা গেল, তার কথা গ্রহণ করার উপরই আয়াতটি গুরুত্বরোপ করেছে। নবী করীম (স)-এর কথাও তা-ই প্রমাণ করে ঃ

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ –

বাদীর কর্তব্য অকাট্য প্রমাণ পেশ করা। আর বিবাদীর কর্তব্য কিরা করা।

আলোচ্য সমস্যায় রিহন গ্রহীতা হল বাদী। কেননা সে তার দেয়া ঋণ ফেরত পেতে চায়। আর রিহনদাতা হল বিবাদী, ঋণের মামলার আসামী। কাজেই তার কথাই গ্রহণ করতে হবে নবী করীম (স)-এর ফরমান অনুযায়ী। উপরন্তু এখানে 'রিহন' যদি দেয়া না-ও হতো, তাহলেও যার উপর ঋণ ঋণের পরিমাণ সম্পর্কে তার কথাই গ্রহণ করতে হতো। এটা সর্বসম্মত কথা। আর ঋণের বদলে যদি রিহন রাখা হয়, তাহলেও তা-ই হবে। কেননা রিহন দিলেই যে সে ঋণের মামলার আসামী হতে পারবে না— এমন কোন কথা নেই।

আবূ বকর (র) বলেছেন, ইমাম মালিকের মত সমর্থন করে কেউ কেউ যুক্তি পেশ করেছেন যে, তাঁর কথাই কুরআনের বাহ্যিক কথার সাথে সামঞ্জস্যশীল। কেননা কুরআনের কথা হল ঃ فَرِهَانٌ مَّقْبُوْضَةٌ 'এমন রিহন যা 'কবজ' করা হয়েছে।' এতে রিহন সাক্ষ্যের স্থানে দাঁড় করানো হয়েছে। যেমন যে ঋণ নিয়েছে সে ঋণ লওয়ার সময়ে কোন নির্ভরতার ব্যবস্থা করেনি। তার পরিমাণেরও কোন প্রমাণ রাখেনি, যার উপর ভিত্তি করে সাক্ষী দিতে পারে। সাক্ষী ও লিখিত দস্তাবেজ থেকেই তো ঋণের পরিমাণ নিশ্চিতরূপে জানা যেতে পারে। এমতাবস্থায় রিহনদাতার কথাকে সত্য মানা যাবে না। রিহনটাই সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে, যেন তার মূল্য দিয়ে ঋণটা আদায় হয়ে যায়। ঋণ যদি রিহনের মূল্য ছাড়িয়ে যায়, তার তো নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। রিহন গ্রহীতা এখানে বাদী। আর রিহনদাতা হল বিবাদী।

আবূ বকর (র) বলেছেন— এ এক আশ্চর্যজনক যুক্তি প্রদর্শন। সে ধারণা করেছে সে যখন নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করেনি, রিহন গ্রহণ করেছে, তখন রিহনটাই প্রমাণকারী সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে। আর তাকেই কুরআনের কথার বাহ্যিক অর্থের সাথে সঙ্গতি সম্পন্ন বলে মনে করে নিয়েছে। অথচ আল্লাহ্‌ তো স্পষ্ট ঘোষণা দ্বারা ঋণ গ্রহীতা-রিহনাদাতার কথাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। যে সময় সাক্ষী বানাতে ও দস্তাবেজ লিখতে আদেশ করেছেন, তখনই তো রিহনদাতার কথা গ্রহণ করার কথা বলে দিয়েছেন। বাদী যদি বিবাদীর জন্যে কোন নিশ্চয়তার ব্যবস্থা না-ও করে থাকে, তবু বিবাদীর কথা গ্রহণীয় হওয়ার প্রতিবন্ধক কিছুই নেই। তাহলে নির্ভরতার না হলেও রিহন-এর উপর দৃঢ়তা স্থাপন করা হলে বিবাদীর কথা গ্রহণীয় হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক কি করে হতে পারে ? আর বাদী যা দাবি করবে তা-ই সত্য মেনে নিতে হবে, তারই বা কি কারণ

থাকতে পারে? বিরোধী মতের লোক যে দাবি করেছেন, কুরআনের বাহ্যিক অর্থ তার কথা সমর্থন করে এবং রিহ্‌ন গ্রহীতার নির্ভরতা গ্রহণ না করা সত্ত্বেও তার কথা সত্য বলে মেনে নেয়ার এই দাবি বরং কুরআনের অকাট্য দলীলের পরিপন্থী। এতদ্দসত্ত্বেও তার মত কুরআনের সাথে সামঞ্জস্যশীল বলে দাবি করা এক বিস্ময় উদ্রেককারী দাবি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। কেননা যে অবস্থায় নির্ভরতা গ্রহণ করা হয়নি, তখন কুরআনেই লিখিত দলীল ও সাক্ষী গ্রহণ দ্বারা তাকে বলিষ্ঠ ও নিশ্চিত করার আদেশ করা হয়েছে। তাতেই বলা হয়েছে যে, মতপার্থক্য হলে বিবাদী— অর্থাৎ ঋণ গ্রহীতার কথাই গ্রহণ করতে হবে। বিপরীত মতের লোক ধারণা করেছে যে, রিহ্‌ন গ্রহণকালে যখন নির্ভরতা গ্রহণ করা হয়নি, তখন বাদী— অর্থাৎ ঋণদাতার কথাই গ্রহণ করতে হবে কিন্তু তা ঠিক নয়। তার এই মত কুরআনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মনে করাই ঠিক নয়। তাতে কথার ভিত্তি এরূপ বানানো হয়েছে যে, নির্ভরতা গৃহীত না হলেও রিহ্‌ন সেটাকে দৃঢ়তর করেছে। যেমন সাদকা দৃঢ়তর করে দেয়। ফলে রিহ্‌ন সাক্ষ্যের স্থানে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু তা কুরআনের কথা নয়। আমরা প্রমাণ দিয়েছি যে, তাদের কথা কুরআনের পরিপন্থী। তা একটি ধারণা, একটি কিয়াস। তাতে রিহ্‌ন-এর ব্যাপারকে সাক্ষ্যের ব্যাপার বানিয়ে দেয়া হয়েছে ইল্লাতের দরুন। ঋণ গ্রহীতার উপর যে ঋণ রয়েছে, দুটি অবস্থায়ই তার কোন নির্ভরতা গ্রহণ করা হয়নি। কয়েকটি কারণেই তা একটি বাতিল কিয়াস হয়ে যায়। তার একটি— কুরআনে বাহ্যতই তা বাতিল করে দেয়। এ বিষয়ে পূর্বেই বলেছি। দ্বিতীয়— সকল ফিকাহবিদের ঐকমত্যের দ্বারা তা নস্যাৎ হয়ে গেছে। কেননা ব্যক্তির নিকট যদি কারো ঋণ বাবদ দেয়া টাকা পাওনা থাকে, সে তার নিকট থেকে কোন দায়িত্বশীল গ্রহণ করে, পরে দাতা গ্রহীতা— উভয়ের মধ্যে ঋণের পরিমাণ নিয়ে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়, তাহলে বিবাদীর কথাই চূড়ান্ত হবে তার উপর যা বাধ্যতামূলক হয় সেই বিষয়ে। দায়িত্বশীল গ্রহণ করে নির্ভরতা গ্রহণ করে না থাকলে ইল্লাতের দরুন বাদী— ঋণদাতার কথাকেই সত্য মানতে হবে, তা কিছুমাত্র জরুরী নয়। ফলে তার ইল্লাতটা কিফালতের দ্বারা নস্যাৎ হয়ে গেল। তৃতীয় বাদীর কথাকেই সত্য না মানার মূলে যে তাৎপর্য নিহিত, তা হল, সাক্ষীদের সাক্ষ্য অবশ্যই গৃহীত হবে, এর উপর যদি অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে তাদের সত্যতার ভিত্তিতে ফায়সালা করা হবে। তারা তার উল্লেখের চেয়েও বেশি পরিমাণের স্বীকারোক্তির উপর সাক্ষ্য দিয়েছে। তা বাদীর দাবির তুলনায়ও পরিমাণে বেশি। ফলে তা বুদ্ধি সহকারে বিচারকের নিকট স্বীকারোক্তি করার মতই হয়ে গেল। রিহ্‌ন এর মূল্য দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, ঋণ বুঝি সেই পরিমাণের। কেননা বেশি ঋণের জন্যে কম মূল্যের রিহ্‌ন দেয়া কিংবা কম পরিমাণের ঋণের জন্যে বেশি মূল্যের রিহ্‌ন দেয়া যে জায়েয এবং তা হয়েও থাকে, এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই। অন্য কথায় রিহ্‌ন-এর মূল্য দ্বারা ঋণের পরিমাণ বোঝা যেতে পারে না। তাতে তার কোন প্রমাণও থাকে না। তাহলে রিহ্‌ন সক্ষ্যের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে কি করে? তাদের এই কিয়াস যে ঠিক নয়, তা-ও প্রমাণিত হয়ে গেল। ঋণদাতা গ্রহীতা উভয়ই যদি একমত হয়ে বলে যে, ঋণ রিহ্‌ন-এর মূল্যের চেয়ে কম, তাতে রিহ্‌ন বাতিল হওয়ার কোন কারণ হতে পারে না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ -

এবং তোমরা সাক্ষ্য গোপন কর না। যে লোকই সাক্ষ্য গোপন করবে, তার হৃদয় অত্যন্ত পাপী।

আবূ বকর (র) বলেছেন, 'তোমরা সাক্ষ্য গোপন কর না' এ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্য। যদিও কথাটি পূর্ববর্তী কথার সাথে সংযোজিত। পূর্ববর্তী কথা সাক্ষী বানাবার আদেশ হয়েছে পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয় করায় সময়। তা হলঃ 'তোমরা সাক্ষী বানাও যখন তোমরা পরস্পর কেনা-বেচা করবে।' এ আদেশ সর্বপ্রকারে সাক্ষ্যদানের বেলায়। সাক্ষী তার সাক্ষ্য দিতে সর্বাবস্থায় বাধ্য। এ দায়িত্ব তাকে অবশ্যই পালন করতে হবে। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ –

এবং তোমরা সাক্ষ্য কায়েম কর আল্লাহ্‌র জন্যে।

আর একটি আয়াত হচ্ছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ –

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী হও, সাক্ষ্যদাতা হও আল্লাহ্‌র জন্যে তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে হলেও। (সূরা আন-নিসা ঃ ১৩৫)

এসব আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সাক্ষীদেরকে সাক্ষ্য গোপন করতে নিষেধ করেছেন। সাক্ষ্যদানের কাজ না করলে মানুষের অধিকার বিনষ্ট হওয়া অনিবার্য। তা যেমন বলেছি লিখিত দস্তাবেজে সাক্ষী হতে হবে যেমন, তেমনি তা প্রয়োজনের সময় যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিতও করতে হবে। এটা সব মুসলমানের জন্যে ফরযে কিফায়া। এই দুইজন সাক্ষী ছাড়া সাক্ষ্য দেয়ার আর কোন লোক না থাকলে— না পাওয়া গেলে এ ফরয আদায় করা এ দুইজন সাক্ষীর জন্যে 'ফরযে আইন'— সুনির্দিষ্ট ফরয হয়ে যাবে। অন্যথায় আয়াতে যে কঠোর বাণী ঘোষিত হয়েছে, তা কার্যকর হবে এ দুজনের উপর সাক্ষ্য গোপন করতে নিষেধ করার অপর অর্থ, সাক্ষ্য দেয়া অবশ্য কর্তব্য। বরং আল্লাহ্ এই ফরযকে অধিকতর তাগিদপূর্ণ করে তুলেছেন এই বলে ঃ

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهُ اٰثِمٌ –

যে লোক সাক্ষ্য গোপন করবে, তার হৃদয় অত্যন্ত পাপী।

আয়াতটি পাপ বা গুনাহ হৃদয় হবে বলে ঘোষণা করেছে। যদিও প্রকৃতপক্ষে গুনাহ্‌টা হবে তার, যে তা গোপন করবে। কিন্তু এই গুনাহটা হয় হৃদয়ের প্রবণতার কারণে। আর সাক্ষ্য গোপন করা নিয়তের ফলশ্রুতি। মুখে তা উচ্চারণ না করার সংকল্প গ্রহণ করলেই তা গোপন করা হয়। আর নিয়ত বা সংকল্প গ্রহণ তো হৃদয়ের কাজ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। সাক্ষ্য গোপনকারী দুটি দিক দিয়ে গুনাহ করে। একটি হচ্ছে, তার সংকল্প গ্রহণ, সে সাক্ষ্য দেবে না এই ব্যাপারে। আর দ্বিতীয়, মুখে সাক্ষ্য না দেয়া। 'তার হৃদয়টা অত্যন্ত পাপী' কথাটি প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। বরং কথাটি অতিশয় তাগিদপূর্ণ। প্রত্যক্ষ কথার তুলনায় তা অত্যন্ত বলিষ্ঠ। যদি বলা হতো, 'যে সাক্ষ্য গোপন করে সে পাপী' তাহলে কথাটি ততটা বলিষ্ঠ হতো না। আল্লাহ্‌র কঠোরতা এ ভাষায়ই অধিক মাত্রায় স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে ফুটে উঠেছে। এটা কুরআনের অতি উচ্চ— উন্নতমানের বাচনভঙ্গী।

আবূ বকর (র) বলেছেন, ঋণ সংক্রান্ত আয়াত সমৃদ্ধ হয়েছে দস্তাবেজ লেখা, পছন্দ অনুযায়ী ব্যক্তিদ্বয়কে সাক্ষী বানানো ও রিহন রাখার ব্যবস্থার দ্বারা। এ ব্যবস্থা ঈমানদার লোকদের দ্বীন ও

দুনিয়ার সামগ্রিক কল্যাণময়। দুনিয়ায় এর কল্যাণ হচ্ছে লোকদের পারস্পরিক কল্যাণের বিধান হিসেবে। ঝগড়া-বিবাদ ও ফাসাদের পথ বন্ধ করার ব্যবস্থা হিসেবে। মূলত এটা পারস্পরিক কারবারের ক্ষেত্রে অতীব কার্যকর সতর্কতার ব্যবস্থা। অন্যথায় পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ ও মারাত্মক ধরনের বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। আর তার ফলে দীনদারী নষ্ট হতে পারে যেমন, তেমনি দুনিয়া— অর্থাৎ বৈষয়িক জীবন হতে পারে বিপর্যস্ত, সংকটাপন্ন। এজন্যেই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَاتَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ -

তোমরা পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে না। যদি হও, তাহলে তোমরা শৌর্যবীর্য হারিয়ে ফেলবে ও তোমাদের সাথে হিম্মত-বীরত্ব শক্তি-সামর্থ্য নিঃশেষ হয়ে যাবে।

তা এভাবে বিবাদী ঋণ গ্রহীতা যখন জানবে যে, তার উপর ঋণ চাপানো আছে, তার সাক্ষী রয়েছে কিংবা দলীল-দস্তাবেজ লিখিত রয়েছে অথবা ঋণের বদলে রিহন রয়েছে— তা ঋণদাতার নিকট অকাট্য ও বস্তুগত প্রমাণ, যা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যাবে না। তা হলে সে বিরুদ্ধতা বা ঋণ-অস্বীকার করার সাহস পাবে না। অন্তত তার মাত্রা অনেকখানি কম হয়ে দাঁড়াবে। সে জানবে, তার বিরোধ ও পাওনাদারের পাওনার পরিমাণ কম বলে তার কোন ফায়দা হবে না। বরং সাক্ষীদের সাক্ষ্য, লিখিত দস্তাবেজ ও অন্যান্য সতর্কতার ব্যবস্থা তার মিথ্যাবাদিতাকে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দেবে। কাজেই এ লিখিত দস্তাবেজ, সাক্ষী বানানো ও অন্যান্য ব্যবস্থা সবই ঋণদাতা, গ্রহীতা— উভয়ের জন্যেই কল্যাণের ব্যবস্থা— দুনিয়ার দিক দিয়েও, দ্বীন ও পরকালের দিক দিয়েও। কেননা তা না করলে ঋণ দাতার পাওনার পরিমাণ কম হয়ে যেতে পারে। তা কম না হলে ঋণ গ্রহীতার দ্বীনের দিক দিয়ে কল্যাণ। আর অস্বীকার করলে বা পরিমাণে কম করলে তার দ্বীনের দিক দিয়ে ক্ষতি। কেননা যা সে নিয়েছে, তাই ফেরত দেয়া তার কর্তব্য। তেমনি ঋণদাতার হাতে যখন অকাট্য প্রমাণ থাকবে, তার সাক্ষী থাকবে, তা সবই তার দেয়া ঋণের পরিমাণ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দেবে। আর না হলে, পাওনাদার ঋণ গ্রহীতার কথিত পরিমাণ না মানলে মুকাবিলা প্রচণ্ড হয়ে দাঁড়াবে। ষড়যন্ত্র চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছে যাবে। অনেক সময় সে তার পাওনার পরিমাণ বাড়িয়ে দ্বিগুণ-তিনগুণ বেশি দাবি করতে পারে। দুনিয়ায় এ রকমটা হওয়া অসম্ভব বা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এ সব কারণেই নবী করীম (স)-এর ঘোষণায় 'অজ্ঞাত পরিমাণ' অনির্দিষ্ট মিয়াদের বেচা-কেনা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। রাসূলের আগমনের পূর্বে সাধারণ যে নিয়মে বেচা-কেনা হয় তা পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদেরই সৃষ্টি করত। ফলে পারস্পরিক বিরুদ্ধতা ও শত্রুতা তীব্র, ব্যাপক ও মারাত্মক হয়ে দেখা দিত। হিংসা-প্রতিহিংসা ভয়ংকর হয়ে যেত। আর এই কারণে জুয়া খেলা ও মাদক দ্রব্য পান নিষিদ্ধ হয়েছে। কেননা এ সবের ফলেই পারস্পরিক শত্রুতা ও হিংসা-প্রতিহিংসা এবং মারামারি খুনাখুনি হওয়া একান্তই অবধারিত। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُونَ -

শয়তান তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক ও সচেষ্ট এ মদ্যপান ও জুয়ার মাধ্যমে এবং তোমাদেরকে বিরত রাখতে চায় আল্লাহ্র যিক্র ও নামায থেকে। এক্ষণে প্রশ্ন হল তোমরা কি (মাদক ব্যবহার ও জুয়া খেলা থেকে) বিরত থাকবে? (সূরা মায়িদা ঃ ৯১)

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি যে এসব কাজ করতে তোমাদেরকে নিষেধ করছেন, তা এজন্যে, যেন তোমাদের পারস্পরিক মতপার্থক্য, শত্রুতা ও দলাদলি না কর। তা ছাড়া ও কাজ করলে আল্লাহ্র যিক্র ও নামায থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হবে এ কারণে। এক্ষণে যে লোক আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী চলবে, তাঁর আদেশসমূহ যথারীতি পালন করবে ও নিষিদ্ধ কার্যাবলী থেকে বিরত থাকবে, সে দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হবে। অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا - وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰـهُمْ مِّنْ لَّدُنَّآ اَجْرًا عَظِيْمًا - وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا -

আর তারা যদি কার্যত করে সেসব কাজ, যা করার জন্যে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে, তা হলে তাদের অতীব কল্যাণ হবে এবং দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব হবে। আর তখন আমরা আমাদের নিকট থেকে তাদেরকে বিরাট শুভ ফলদান করব এবং তাদেরকে সিরাতুল মুস্তাকীমে পরিচালিত করব। (সূরা আন-নিসা ঃ ৬৬-৬৮)

যেসব আয়াতে আল্লাহ্ মিয়াদি লেনদেনে দলীল-দস্তাবেজ লিখতে এবং ঋণ, চুক্তি এবং কখনো সাক্ষী বানাতে ও কখনো রিহ্ন ভিত্তিক লেনদেন করতে আদেশ করেছেন, তার উদ্দেশ্য ধন-সম্পদের সংরক্ষণ ও তা বিনষ্ট করা থেকে বাঁচানো। এ উদ্দেশ্যে এই নির্দেশটিও দেয়া হয়েছে ঃ

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا -

তোমরা নির্বোধ ও দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকদেরকে তোমাদের ধন-মাল দিও না, যাকে আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিষ্ঠার মাধ্যম বানিয়েছেন। (সূরা আন-নিসা ঃ ৫)

বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا -

এবং যারা ধন-সম্পদ ব্যয় কালে সীমালঙ্ঘন করে না, কার্পণ্যও করে না। বরং এই দুই প্রান্তিক অবস্থার মধ্যবর্তী নীতি অনুসরণ করে। (সূরা ফুরকান ঃ ৬৭)

বলেছেন ঃ

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا -

এবং তোমরা কোনরূপ বেহুদা খরচ করো না।

এসব আয়াতই প্রমাণ করে যে, ধন-মালের হেফাজত একান্তই কর্তব্য। তা বেহুদা ব্যয় করা ও বিনষ্ট করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নবী করীম (স) থেকেও এ মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীস

বর্ণনায় কোন দোষে অভিযুক্ত নন এমন লোক মুয়ায ইবনুল মুসান্না মুসাদ্দাদ, বশর ইবনুল ফযল, আবদুল রহমান ইবনে ইসহাক, সাঈদুল মুকবেরী, আবূ হুরায়রাতা (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

لَايُحِبُّ اللّٰهُ اِضَاعَةَ الْمَالِ وَلَا قِيْلَ وَلَا قَالَ -

আল্লাহ্ ধন-মালের বিনষ্টি ও ধ্বংস পছন্দ করেন না, না কথা কাটাকাটি।

অনুরূপ আর একজন নির্দোষ বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক, মূসা ইবনে আবদুর রহমান, আল-মসরূক, হাসানুল জাফী, মুহাম্মাদ ইবনে সূকা, আরবাদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, মুআবিয়া মুগীরা ইবনে শুবাকে লিখেছিলেন ঃ

اُكْتُبْ اِلَيَّ بِشَتَىْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ اَحَدٌ -

তুমি আমার নিকট এমন কিছু লিখে পাঠাও, যা তুমি রাসূলে করীম (স) থেকে সরাসরি কোন মাধ্যম ছাড়াই শুনেছিলে।

তিনি বলেন, পরে আমি তাকে লিখে পাঠালাম ঃ

اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهٰى عَنْ ثَلَاثٍ فَاَمَّا الثَّلَاثُ الَّتِيْ حَرَّمَ فَعُقُوْقُ الْاُمَّهَاتِ وَوَادُ الْبَنَاتِ وَلَاوَهَاتِ وَالثَّلَاثُ الَّتِيْ نَهٰى عَنْهُنَّ فَقِيْلَ وَقَالَ وَاِلْحَافُ السُّؤَالِ وَاِضَاعَةُ الْمَالِ -

আমি রাসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তিনটি জিনিস হারাম করেছেন এবং তিনটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। যে তিনটি হারাম করেছেন, তা হল— মাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদন করা, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত হত্যা করা এবং যা দেয়া দায়িত্ব তা না দেয়া। আর যে তিনটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তা হল — তর্ক বিতর্ক করা, জড়িয়ে ধরে ভিক্ষা চাওয়া এবং ধন-মাল বিনষ্ট করা।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْتُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ -

তোমাদের মনের কথা তোমরা প্রকাশ কর কিংবা গোপন রাখ, আল্লাহ্ সে বিষয়ে তোমাদের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করবেন।

আবূ বকর (র) বলেছেন, এই আয়াতটি মনসূখ হয়ে গেছে এ আয়াত দ্বারা।

لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا -

আল্লাহ্ মানুষকে তার সাধ্যের অতীত কোন কাজের দায়িত্ব দেন না (যে কাজেরই দায়িত্ব দেন, তা করার সাধ্য তার আছে)।

আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকুল মিরওয়াজি আল-হাসান ইবনে আবূ রুবাই আল-জুরজানী, আবদুর রাযযাক, মামার কাতাদাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ

তোমাদের মনের কথা প্রকাশ কর আর গোপন রাখো, আল্লাহ সে বিষয়ে তোমাদের নিকট থেকে হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করবেন— আয়তটিকে মনসূখ করেছে এই আয়াত ঃ আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতীত কোন কাজের দায়িত্ব দেন না।

আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আল-হাসান ইবনে আবূ রুবাই, আবদুর রাযযাক, মামার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন আমি জুহরীকে বলেত শুনেছি , আয়াতটি ইবনে উমর (রা) পাঠ করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন। বলেছেন ঃ

وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْتُخْفُوْهُ -

আমাদের মন আমাদেরকে যা বলেছে সে বিষয়েও আমাদেরকে পাকড়াও করা হবে।

এই বলে তিনি কাঁদতে থাকলেন। তাঁর কান্নার ধ্বনি শোনা গেল। তাঁর নিকট থেকে এক ব্যক্তি উঠে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হল। সে তাঁর নিকট এই ঘটনার বিবরণ পেশ করল। তিনি সব শুনে বললেন, আল্লাহ ইবনে উমরের প্রতি রহমত করুন। এ আয়াতটি পড়ে সে যেমন কাতর হয়ে পড়েছে, অন্যান্য মুসলমানরাও তেমনি কাতর হয়ে পড়েছিলেন। তাই পরে নাযিল হল, 'আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যের অতীত কাজের দায়িত্ব দেন না।'

শবী, আবূ উবায়দাতা, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, উক্ত আয়াতের পর-পরই যে আয়াত রয়েছে তার দ্বারা উক্ত আয়াতটি মনসূখ হয়ে গেল। আয়াতটি হল ঃ

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ -

তার জন্যে তা-ই হবে যা সে উপার্জন করেছে। তার বিপক্ষেও তা-ই লিখিত ও ধার্য হবে, যা সে উপার্জন করেছে।

মুআবিয়া ইবনে সালিহ আলী ইবনে আবূ তালহা ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'তোমাদের মনে যা আছে, তা যদি তোমরা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ, তা হলেও আল্লাহ তোমাদের নিকট তার হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করবেন'— মর্মের আয়াতটি মনসূখ হয়ে যায়নি। তবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন যখন সমগ্র সৃষ্টিকুলকে একত্রিত করবেন, তখন তিনি বলবেন ঃ 'আমি তোমাদেরকে তোমাদের মনের যে সব গোপন কথা যা আমার ফেরেশতারাও জানে না— জানিয়ে দেব। পরে তিনি মুমিন লোকদেরকে তাদের মনের কথা জানিয়ে দেবেন এবং তাদের সে সব মনের কথা তিনি মাফ করে দেবেন। এ কথাই বলা হয়েছে এ আয়াতে ঃ

يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ - فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ -

আল্লাহ তোমাদের নিকট থেকে হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করবেন। অতপর যাকে চাইবেন তিনি ক্ষমা করে দেবেন, আর যাকে চাইবেন আযাবে নিক্ষেপ করবেন।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ -

বরং তিনি পাকড়াও করবেন সেসবের জন্যে যা তোমাদের হৃদয়সমূহ উপার্জন করেছে। হৃদয় উপার্জন হচ্ছে, শোবাহ্-সন্দেহ ও মুনাফিকী।

রুবাই ইবনে আনাস থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া গেছে। আমর ইবনে উবাইদ বলেছেন, আল-হাসান বলতেন, আয়াতটি দৃঢ় ভিত্তিক, মনসূখ নয়। মুজাহিদ থেকে বর্ণিত সন্দেহ ও দৃঢ় প্রত্যায়ের দিক দিয়ে আয়াতটি দৃঢ় ভিত্তিক, মনসূখ নয়।

আবূ বকর (র) বলেছেন, দুটি তাৎপর্যের কারণে আয়াতটি মনসূখ হতে পারে না। একটি আয়াতে যে বিষয়ে খবর দেয়া হয়েছে তা তখনই মনসূখ হতে পারে না। কেননা দেয়া খবরের মনসূখ হওয়া প্রাথমিক ও সূচনাকালীন ব্যাপার বোঝায়, কিন্তু আল্লাহ তো সর্ব জিনিসের চরম পরিণতি সম্পর্কে সুবিজ্ঞ। সূচনাকালীন অবস্থায় কিছু মনসূখ হওয়া জায়েয নয়। আর দ্বিতীয়, মানুষের সাধ্যের অতীত কোন কাজের দায়িত্ব তার উপর চাপানো কোন ক্রমেই সঙ্গত হতে পারে না। কেননা তা নির্বুদ্ধিতা, নিরর্থক। আর আল্লাহ্ নির্বুদ্ধিতা ও নিরর্থক কাজ করার অনেক উর্ধ্বে মুক্ত ও পবিত্র। 'তা মনসূখ'— এ কথা যে লোক বর্ণনা করেছে সে মস্তবড় ভুল করেছে। বর্ণনাকারীর এ ভুল শব্দের বর্ণনায় ঘটেছে। এ হাদীসটির তাৎপর্য বর্ণনা করাই তার উদ্দেশ্য ছিল। তার লক্ষ্য থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয়ার সংশয় দূর করাই উদ্দেশ্য। মাকসাম ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, উপরোদ্ধৃত আয়াতটি সাক্ষ্য গোপন করা সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। ইকরামা থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া গেছে। এ দুজন ছাড়া অন্যরা বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত সর্ব ব্যাপারে প্রযোজ্য। এটা উত্তম কথা কেননা তা সাধারণত্বের দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সাক্ষ্য ও সাক্ষ্য-বহির্ভূত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই তা সাধারণভাবে প্রযোজ্য। হৃদয়ের উপার্জন পর্যায়ে অপর একটি আয়াত হচ্ছে ঃ

وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ -

বরং তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন তোমাদের হৃদয়ের উপার্জনের কারণে। (সূরা বাকারা ঃ ২২৫)

বলেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

যারা ঈমানদার লোকদের মধ্যে নির্লজ্জতা-চরিত্রহীনতা, যিনা-ব্যভিচার ব্যাপক হয়ে উঠুক, এটা পছন্দ করে—ভালোবাসে, তাদের জন্যে পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে। ( আন-নূর ঃ ১৯)

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ -

তাদের হৃদয়সমূহে রোগ রয়েছে। এ রোগ হল সংশয়-সন্দেহের রোগ, দৃঢ় প্রত্যয়ের অভাবের রোগ।

যদি বলা হয়, নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ عَفَا الْأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَالَمْ يَتَكَلَّمُوا بِهِ أَوْيَعْمَلُوْا بِهِ –

আমার উম্মতের লোকদের মনে যেসব খারাপ কথার উদয় হয়; তা যতক্ষণ মুখে উচ্চারণ না করবে বা যতক্ষণ তদনুযায়ী কাজ না করবে, আল্লাহ্ তা মাফ করে দেবেন।

জবাবে বলা যাবে, এসব হচ্ছে সে সব হুকুম-আহকাম সম্পর্কিত কথা, যা পালন করা বাধ্যতামূলক। এমতাবস্থায় দাসমুক্তি, স্ত্রী তালাক, বিক্রয়, সাদকা, হেবা ইত্যাদি কাজ শুধু নিয়ত দ্বারা সম্পন্ন হবে না। মুখে উচ্চারণ করতে হবে— অন্যথায় কার্যকর হবে না। আর আয়াতে যা বলা হয়েছে আল্লাহ্র পাকড়াও করার কথা, তা নিতান্ত আল্লাহ্ ও বান্দার পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপার। আল-হাসান ইবনে আতীয়াতা— তাঁর পিতা আতীয়াতা— ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত, 'তোমরা তোমাদের মনের কথা প্রকাশ কর আর গোপন রাখো, আল্লাহ্ তার হিসাব-নিকাশ করবেন'-এর তাৎপর্য হল, মানুষের গোপন কাজ ও প্রকাশ্য কাজ সব কিছুরই হিসাব-নিকাশ লওয়া হবে। ঈমানদার ব্যক্তির মনের ভালো কথা গোপন রাখবে তা কার্যত ভালোর জন্যে। সে যদি তা কাজে পরিণত করে, তাহলে তার জন্যে দশ নেকী লেখা হবে। আর যদি সে কার্যত করতে সক্ষম না-ও হয় তাহলেও তার জন্যে একটি নেকী লেখা হবে। কেননা সে ঈমানদার ব্যক্তি। আর আল্লাহ্ মুমিনদের গোপন ও প্রকাশ্য উভয় প্রকার কাজেই সন্তুষ্ট। তা যদি খারাপও হয়, আর তার মনে জেগে থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তা জানেন। তিনি তা জানিয়ে দেবেন, যেদিন সকল গোপন তত্ত্ব প্রকাশিত হয়ে পড়বে। সে যদি কার্যত তা না করে থাকে, তাহলে আল্লাহ্ সে জন্যে তাকে পাকড়াও করবেন না। হ্যাঁ, কাজে পরিণত করলে তবেই তাতে তিনি বান্দাকে অবশ্যই পাকড়াও করবেন। তবে মাফও করে দেবেন। যেমন তিনি নিজেই বলেছেন ঃ

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاٰتِهِمْ –

এরাই হচ্ছে সেই লোক, যাদের উত্তম কাজসমূহ আমরা কবুল করব এবং তাদের খারাপ কার্যাবলীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করব। (সূরা আল-আহকাফ ঃ ১৬)

এ আয়াতটিরই ব্যাখ্যা হচ্ছে রাসূলে করীম (স)-এর পূর্বোদ্ধৃত কথা, যাতে বলেছেন যে, মনে উদয় হওয়া খারাপ কথা মুখে কথিত ও উচ্চারিত না হওয়া বা তদনুযায়ী কাজ না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেবেন।

আল্লাহ্র কথা ঃ

لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّاوُسْعَهَا –

আল্লাহ্ কাউকে এমন কাজের দায়িত্ব দেন না, যা করার সাধ্য তার নেই।

যে কাজ করার সাধ্য বান্দার নেই, সে কাজ করতে আল্লাহ্ হুকুম দেন না— দায়িত্ব চাপান না। যে কাজ করার সাধ্য বা শক্তি কিংবা ক্ষমতা বান্দার নেই, তিনি যদি সে কাজ করার হুকুম বা দায়িত্ব দেন, আর সে তা করতে কার্যত অক্ষম থেকে যায়, তাহলে সাধ্যাতীত কাজের

দায়িত্ব চাপানো হয়। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মত সম্পূর্ণ একমত যে, অক্ষম-চলা শক্তিহীন ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌ চলার হুকুম দেন না, অন্ধকে দেখবার হুকুম দেন না। দুই হাত কর্তিত ব্যক্তিকে শক্ত করে ধরার আদেশ করেন না। দেন না এই জন্যে যে, তা করার সাধ্য নেই তার। এ বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। রাসূলে করীম (স) থেকে এ পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّ مَنْ لَّمْ يَسْتَطِعِ الصَّلٰوةَ قَائِمًا فَغَيْرُ مُكَلَّفٍ لِلْقِيَامِ فِيْهَا، وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْهَا قَاعِدًا فَغَيْرُ مُكَلَّفٍ لِلْقُعُوْدِ بَلْ يُصَلِّيْهَا عَلٰى جَنْبٍ يُوْمِيْ اِيْمَاءً، لِاَنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَيْهَا اِلَّا عَلٰى هٰذَا الْوَجْهِ -

যে লোক দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে অক্ষম, সে নামাযে দাঁড়াতে বাধ্য নয়। যে বসে নামায আদায় করতে পারে না, সে বসে নামায আদায় করতে আদিষ্ট নয়। সে পার্শ্ব শুয়ে থেকে ইশারায় নামায আদায় করবে, কেননা সে এরূপ ছাড়া অন্য ভাবে নামায আদায় করতে সক্ষম নয়।

যে লোক কার্যত কোন কাজ করতে পারে না, সে তা করতে শরীয়াত দ্বারাই আদিষ্ট নয়। অথচ কিছু সংখ্যক মুর্খ লোক এরূপ কাজের আদেশ আল্লাহ্‌ দিয়েছেন বলে চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে। তারা ধারণা করে নিয়েছে. আল্লাহ্‌ যে কাজ যে ভাবে করতে আদেশ করেছেন সে কাজ তাকে সে ভাবেই করতে হবে, তা করবার ক্ষমতা তার থাক আর না-ই থাক। কিংবা যা করতে নিষেধ করেছেন, তা ত্যাগ করতে সে বাধ্য, তা ত্যাগ করা তার পক্ষে সম্ভব হোক, আর না-ই হোক। এরূপ কথা বলে তারা আল্লাহ্‌র প্রতি সম্পূর্ণ মিথ্যা আরোপ করেছে। অথচ আল্লাহ্‌ নিজেই অত্যন্ত বলিষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, যে কাজ করার সাধ্য কারুর নেই, তা করার দায়িত্ব আল্লাহ তার উপর চাপান না। তাছাড়া সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিও বুঝে যে, এটা অত্যন্ত খারাপ যে, যা করার সাধ্যই নেই, তা করার নির্দেশ দেয়া হবে। যে লোক খারাপ-বীভৎস কাজ চিনে ও জানে, সে তা করার মুখাপেক্ষী নয়, সে তা করবে না। যে কাজ করার সাধ্য নেই, তা করা ফরয হলেও সে ফরয প্রত্যাহৃত হবে। কোন ফরয আদায় করতে নিজের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য নিংড়িয়ে, তার শেষ বিন্দুও ব্যয় করে দেবে, তা তার কর্তব্য নয়। যেমন থুরথুরে বৃদ্ধ, রোযা পালন তার সাধ্যের অতীত। করতে গেলে তার দেহের অপুরণীয় ক্ষতি সাধিত হতে পারে। যদিও সে মরে যাবে এমন আশাংকা না-ও দেখা দেয়, তবু তার রোযা রাখা জরুরী নয়। কেননা সাধ্য-সামর্থের বাইরের কোন কাজের হুকুম আল্লাহ কাউকেই দেন নি। যে রোগীর রোযা রাখলে রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার ভয়, সে রোযা রাখবে না। কেননা পানি ব্যবহার করলে ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকলে সে পানি ব্যবহার করবে না। কেননা তা সাধ্যের আয়াতের মধ্যে পড়ে না। আর যা সাধারণত নয়, তা করার দায়িত্ব আল্লাহ দেননি। যা করলে অসহনীয় কষ্ট হতে পারে, জীবন সংকীর্ণ হয়ে পড়তে পারে, তা-ও করতে আল্লাহ বলেন নি। আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ -

আল্লাহ্‌ যদি চাইতেন তাহলে তিনি তোমাদের কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করতেন।

নবী করীম (স)-এর গুণ-বেশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ -

যে কাজে তোমাদের খুবই কষ্ট করতে হয়, তা তার নিকট দুঃসহ।

আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ ও আইন-বিধানে তা হচ্ছে স্থায়ী নিয়ম ও নীতি। তা চিরন্তন ও শাশ্বত। এই কথা বান্দার দো'আ হিসেবেও ঘোষিত হয়েছে ঃ

رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْاَخْطَانَا -

হে আমাদের রব্ব! আমরা যদি বিস্মৃত হই বা ভুল করে বসি, তাহলে তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করো না।

আবূ বকর (র) বলেছেন, বিস্মৃতি দুই প্রকারের। একটি মানুষের কাজের ব্যাপারে আসে, যার কারণে সে কাজটি করা হয় না। এ অবস্থায় তার ওযর অগ্রহণীয় নয়। যদি তার দ্বারা কোন অপরাধ ঘটে যায় বিভ্রান্তির কারণে। আর দ্বিতীয় হল— আদেশ পালন না করা। এও এক প্রকারের বিস্মৃতি। তা সন্দেহের উদ্রেক হওয়ার কারণে হতে পারে কিংবা ভুল বাখ্যা মনে বাসা বাধার কারণে হতে পারে, যদিও মূল কাজটি বাস্তবে সঙ্ঘটিত হয়নি ভুলবশত। এমতাবস্থায় আল্লাহ্র নিকট এই অবস্থায় কাজ ঘটে যাওয়ার জন্যে মাগফিরাত চাওয়ার অবকাশ রয়েছে। نسيان শব্দের একটি অর্থ ত্যাগ করা, ছেড়ে দেয়া। অভিধানেও এর অর্থ সুপরিচিত ও ব্যাপক ব্যবহৃত। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ -

তারা আল্লাহ্কে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহ্ও তাদের ভুলে গেছেন।

অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র আদেশ পালন করেনি। ফলে তার সওয়াব পাওয়ার অধিকারী তারা হয়নি। আল্লাহ্র ভুলে যাওয়ার কথাটি এ আয়াতে প্রথম কথার প্রতিকূলে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَجَزَاءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا -

মন্দের প্রতিফল তার-ই মত মন্দ।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدٰى عَلَيْكُمْ -

যে লোক তোমাদের প্রতি সীমালঙ্ঘনমূলক আচরণ করবে, তোমরাও তার প্রতি সীমালঙ্ঘনমূলক আচরণ কর, যেমন সীমালঙ্ঘনমূলক আচরণ সে তোমাদের প্রতি করেছে।

আবূ বকর (র) বলেছেন, نسيان বিস্মৃতি স্মরণ বা স্মৃতির বিপরীত অর্থজ্ঞাপক। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যকার ব্যাপার শাস্তি পাওয়ার দিক দিয়ে। এরূপ ক্ষেত্রে শরীয়াত পালনের দায়িত্ব অর্পণ ব্যাহত। পরকালে তা নিয়ে পাকড়াও অসঙ্গত। এজন্যে নয় যে, তাতে ইবাদতের কোন হুকুম দেয়া হয়নি। কেননা নবী করীম (স) এ পর্যায়ের বহু ব্যাপারেই বাধ্যতামূলক হওয়ার হুকুম দৃঢ়ভাবে দিয়েছেন ভুল ও বিস্মৃতি সত্ত্বেও। মুসলিম উম্মাহ্ এ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। রাসূলের এ কথাটি এ পর্যায়েরই, বলেছেন ঃ

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ اَوْنَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا -

যে লোক নামাযের সময় ঘুমিয়ে ছিল অথবা নামায পড়তে ভুলে গেছে, সে যেন তা আদায় করে যখন সে তার কথা স্মরণ করবে।

এর পরই তিনি এ আয়াত পাঠ করেন ঃ

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ -

এবং তোমরা নামায কায়েম কর আমার স্মরণের জন্যে।

বোঝা গেল, 'আমার স্মরণের জন্যে নামায কায়েম কর' কথাটি বলে আল্লাহ্ বলতে চেয়েছেন, ভুলে যাওয়া কাজটা স্মরণকালে করার কথা।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ -

তুমি যখন ভুলে যাও তখন তোমার রব্বকে স্মরণ কর।

সব ভুলে যাওয়া ফরয কাযা করার ব্যাপারে এ একটা ব্যাপক ও সাধারণ হুকুম। রোযা রাখতে যে ভুলে যাওয়া, যাকাত দিতে ও অন্যান্য যাবতীয় ফরয কাজ করতে ভুলে যাওয়া নামায পড়তে ভুলে যাওয়ার মতই ব্যাপার। তার কথা স্মরণ হতেই তা আদায় করা বাধ্যতামূলক কর্তব্য।

হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ বলেছেন, যে লোক নামাযে ভুল করে কথা বলবে, সে যেন ইচ্ছা করেই কথা বলেছে। কেননা আসল কথা হল, ফরয পালনের ব্যাপারে ভুল করে না করা ও ইচ্ছা করে না করা দুটোই সমান। তার কোনটি প্রত্যাহার করার ব্যাপারে ভুল যাওয়ার কোন প্রভাব নেই। তবে যে বিষয়ে توقيف শরীয়াতী ফায়সালা নাযিল হয়েছে তার কথা ভিন্ন। যে ভুল করে তাহারাত করেনি, আর যে ইচ্ছা করে করেনি, এ দুজনের মধ্যে কোন তফাত নেই। উভয় অবস্থায় নামায পড়লে তা বাতিল হয়ে যাবে। রমযান মাসের দিনের বেলা ভুল করে খাওয়ার ব্যাপারে তাঁরা বলেছেন, সে রোযাকে অবশ্যই কাযা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তাঁরা কিয়াসকে বাদ দিয়েছেন। এ পর্যায়ে হাদীস রয়েছে বলে তাঁরা কিয়াসের পরিবর্তে হাদীস গ্রহণ করেছেন। যে ভুলে গেছে, সে তার ফরয আদায় করবে, যেভাবেই তা করতে পারে। যদিও ঠিক সেই অবস্থায় আল্লাহ্ তা করার দায়িত্ব চাপিয়ে দেন নি। 'কাযা' করাও একটা ফরয। আল্লাহ্র দলীল দ্বারা তা বাধ্যতামূলক করেছেন। সে দলীল আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। ভুলে যাওয়ার কোন প্রভাব শুধু গুনাহ না হওয়ার ক্ষেত্রে মাত্র। ফরয বাধ্যতামূলক হওয়ার ব্যাপারে ভুলে যাওয়ার কোন প্রভাব নেই। নবী করীম (স)-এর কথা ঃ رُفِعَ عَنْ اُمَّتِى الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ 'আমার উম্মতের উপর থেকে ভুল ও বিস্মৃতি তুলে নেয়া হয়েছে' কথাটি শুধু গুনাহ না হওয়া পর্যন্তই সীমিত। মূল আদেশটা কিন্তু প্রত্যাহার করা হয়নি। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রে দিয়াত ও কাফফারা দেয়ার হুকুম দিয়েছেন, তা বাধ্যতামূলক। এ কারণেই নবী করীম (স) نسيان ভুলে যাওয়া ও خطا ভুল করাকে এক সাথে উল্লেখ করেছেন— এ অর্থেই বুঝতে হবে।

কেউ যদি বলেন, তোমাদের মৌল নীতি হল জন্তু যবেহ্ করা কালে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা ফরয। যদি কেউ ইচ্ছা করে নাম উচ্চারণ না কর তা হলে জন্তুটা মৃত গণ্য হবে, খাওয়া হারাম হবে। আর যদি ভুলের কারণে নাম উচ্চারণ না করে, উচ্চারণ করতে ভুলে যায়, তা হলে জন্তু হালাল হবে— সেটা যবেহ হয়েছে বলা যাবে। তোমরাই এ ব্যক্তিকে তার মত মনে করো না যে ভুলবশত তাহারাত গ্রহণ না করেও নামায পড়ে ফেলেছে। তখন তার প্রতি আদেশ হচ্ছে তাহারাত সহকারে পুনরায় নামায পড়া এবং এটা চূড়ান্ত নিশ্চিত। নামাযে ভুল করে কথা বলার ব্যাপারটিও এমনি।

এ কথার জবাবে বলা যাবে, যে মুহূর্তে কেউ ভুলবশত একটি কাজ করেছে সেই অবস্থায় তাকে অন্য কোন কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়নি। স্মরণ হওয়ার পর তার জন্যে সেই ফরয পালনই কর্তব্য। এ একটা নতুন সূচনা। এ রূপই ব্যাপার যখন ভুলে যাওয়ার কারণে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করেনি। এজন্যে তার যবেহ সহীহ্ হবে। যবেহ করার এখানে অন্য কোন যবেহকৃত জন্তু আনা হয়নি। ফলে তার জন্যে তা বাধ্যতামূলক নয়, যেমন নামায, রোযা ইত্যাদি পুনরায় করার জন্যে আদিষ্ট।

আল্লাহ্র কথা ঃ

لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ -

সে যা ভালো উপার্জন করেছে তা তার, যা মন্দ উপার্জন করেছে তা-ও তারই উপর চাপবে।

এটিও তেমনি কথা ঃ

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا -

প্রত্যেকটি মানুষ যাই উপার্জন করে, তা তারই উপর বর্তিবে। (সূরা আন'আম ঃ ১৬৪)

এটিও তেমনি ঃ

وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَاسَعٰى وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى

মানুষের জন্যে নিশ্চিতভাবেই তা, যার জন্যে সে চেষ্টা করেছে। আর তার চেষ্টা নিশ্চয়ই বিবেচিত হবে। (সূরা আন-নাজম ঃ ৩৯)

এসব আয়াতে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির কথাই বলা হয়েছে, যে শরীয়াত পালনে বাধ্য। তার যাবতীয় কাজ তার সাথেই সংশ্লিষ্ট। অন্য কারোর সঙ্গে নয়। কেউ নিজে নিজে করে অন্যের উপর চাপাতে পারে না, জায়েয নয়। তার অপরাধের জন্যে তাকেই পাকড়াও করা হবে, অন্য কাউকে নয়। নবী করীম (স) আবূ রমযাকে তার পুত্রের সঙ্গে দেখতে পেয়ে বললেন ঃ এ তোমার পুত্র ? বললেন, হ্যাঁ। বললেন, তুমি তোমার কোন অপরাধ তার উপর চাপাতে পারবে না, সেও পারবে না তার কোন অপরাধ তোমার উপর চাপাতে। এ পর্যায়ে তাঁর ঘোষণা হল ঃ

لَايُؤَاخَذُ اَحَدٌ بِجَرِيْرَةِ اَبِيْهِ وَلَا بِجَرِيْرَةِ اَخِيْهِ -

কোন লোক তার পিতার অপরাধে পাকড়াও হবে না, তার ভাইয়ের অপরাধেও নয়।

বস্তুত এ এমন ন্যায়বিচার, যার বিপরীত কিছু কল্পনা করা যায় না, বিবেক-বুদ্ধি গ্রহণ করে না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তার জন্যে তা যা সে উপার্জন করে, তার উপর তা চাপবে যা সে উপার্জন করেছে।' এ আয়াতের ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে, কারোর কাজকর্মের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যাবে না কোন বিচারকের সিদ্ধান্তক্রমে বা অন্য কারুর। তার মাল বিক্রয় করতে বা না করতে বাধ্য করা যাবে না। হ্যাঁ, কোন বিশেষ ব্যাপারে যদি দলীল পাওয়া যায়, তাহ্‌লে অন্য কথা।

ইমাম মালিকের একটি মত এই আয়াতের ভিত্তিতে বাতিল মনে করা যায়। বিষয়টি হল— যদি কেউ অন্য কারোর ঋণ তার আদেশ ছাড়া-ই আদায় করে দেয়, তার অধিকার আছে, তা সেই ব্যক্তির নিকট দাবি করতে পারে। এ মত বাতিল এ জন্যে যে, আল্লাহ্ তার অর্জনকে তার নিজের জন্যে নির্দিষ্ট করেছেন। ভাল করলেও তার, মন্দ করলেও তার। অন্য কারোর উপর তা চাপানো যাবে না, অন্য কারোর জন্যে বাধ্যতামূলক করা যাবে না। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا -

হে আমাদের রব্ব! তুমি আমাদের উপর দুর্বহ বোঝা চাপিও না, যেমন তা তুমি চাপিয়েছিলে আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর।

আয়াতের اصر শব্দের অর্থ বলা হয়েছে ভার, বোঝা। অভিধানে তার মূল হল, তার অর্থ হল inclination —স্নেহ, হৃদয়াবেগ। তা থেকেই হয় اواصرالرحم রিহ্‌ম-এর বন্ধন, সম্পর্ক। কেননা মা' যার রিহম, সে স্নেহ বোধ করে। এর এক বচন اٰصِرَةٌ ও اَلْـاٰصِرُ বলা হয়, তার অর্থ রশি, যা রাস্তার উপর দীর্ঘ করে ছাড়া হয়, বা কোন খালের উপর রাখা হয়, তার দ্বারা চলাচলকারীকে বাঁধা হয়। প্রবেশ করা থেকে ভিন্ন দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়—তাদের নিকট থেকে শুল্ক বা কর ইত্যাদি আদায় করার জন্যে। لَاتَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا-এর অর্থ চুক্তি, ওয়াদা, স্বীকৃতি। তা ব্যক্তির উপর ভারী ও দুর্বহ হয়ে দাঁড়ায়। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাতা থেকে এ অর্থ বর্ণিত হয়েছে। এ দিক দিয়ে আয়াতটির তাৎপর্য তাই, যা এ আয়াতের তাৎপর্য ঃ

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَاجٍ -

আল্লাহ তোমাদের উপর দ্বীন পালনে কোন অসুবিধা চাপিয়ে দেন নি। (সূরা হজ্জ ঃ ৭৮)

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

جِئْتُكُمْ بِالْحَنْفِيَةِ السُّمْحَةِ -

আমি তোমাদের নিকট একমুখী সৌজন্যমূলক ও ক্ষমাশীলতার আদর্শ নিয়ে এসেছি।

তাঁর থেকেই বর্ণিত, বনী ইসরাঈলের লোকেরা নিজেদের উপর কঠোর আচরণ করেছে। ফলে আল্লাহ-ও তাদের উপর কঠোর নীতি চালু করেছেন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'আমাদের উপর اصر চাপিয়ে দিও না'-এর অর্থ ভারী দুর্বহ দুঃসাধ্য কাজের আদেশ বা নিষেধ দিও না। যেমন আমাদের আগের লোকদের উপর তুমি চাপিয়ে দিয়েছিলে। এ কথা অন্য আয়াতে বলা হয়েছে এ ভাষায় ঃ

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ -

নবী তাদের উপর থেকে দুর্বহ কাজের বোঝা ও বাধা-বন্ধন-শৃঙ্খল নামিয়ে দেয়, যা তাদের উপর চাপানো ছিল। (সূরা আরাফ ঃ ১৫৭)

এ সব ও এ ধরনের অপরাপর আয়াতকে দলীল বানিয়ে বলা হয়, কোন ব্যাপারেই লোকদের উপর বাধা, অসুবিধা, সংকীর্ণতা ও দুর্বহ বোঝা চাপানো যাবে না। অবশ্য এ বিষয়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। তাঁরা এ নিয়ে যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা ও ইজতিহাদ করেছেন। আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হল যে, দ্বীন ইসলামে দুর্বহ বোঝা, সংকীর্ণতা ও বাধা-প্রতিবন্ধকতা নেই, চাপানোও যাবে না। যেমন তাহারাতে নিয়ত করাকে ওয়াজিব বা ফরয বলা, তাতে পরম্পরাকে ওয়াজিব বা ফরয মনে করা। এ ধারনের আরও যে সব কাজে মানুষকে কঠিন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, ইসলামে তার কোন অবকাশ নেই। উপরোদ্ধৃত আয়াতসমূহের বাহ্যিক অর্থের দৃষ্টিতেই এ কথা বলা যায়।

আল্লাহ্র কথা ঃ

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ -

হে আমাদের রব্ব, তুমি আমাদের উপর এমন কাজের দায়িত্ব চাপিও না, যা করার সাধ্য আমাদের নেই।

এ আয়াতের দুটি দিক আছে। একটি হল কঠিন ও দুর্বহ কাজের আদেশ করা। যেমন বনী ইসরাঈলীদের উপর চাপানো হয়েছিল। তাদেরকে নিজেদেরকেই হত্যা করতে বলা হয়েছিল। আর দ্বিতীয় এমন কাজের আদেশ যা করা কঠিন, দুঃসাধ্য। যেমন, তুমি বলবে, আমি তার সাথে কথা বলতে পারি না, তাকে দেখতে পারি না। এ ধরনের কথায় বোঝা যায় না যে, কথা বলার বা দেখার আদপেই কোন ক্ষমতা নেই। এর অর্থ, তার পক্ষে তা করা কষ্টসাধ্য, ভারী বোঝাস্বরূপ। তা যদি হয়, তাহলে সে তারই মত হবে, যার কথা বলা বা দেখার সাধ্য নেই দূরত্বের কারণে। তার হৃদয় থেকে তাকে দেখা পছন্দ নয় বলে। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا -

ওরা শুনতে সক্ষম হচ্ছিল না। (সূরা কাহাফ ঃ ১০১)

অথচ ওদের সুস্থ দৃষ্টিশক্তি ছিল। তাই অর্থ হল, ওরা শুনাটাকে ভারী মনে করছিল। ফলে তারা অন্যদিকে ফিরে গেল। ফলে তারা শুনতে পায় না— এমন হয়ে গেল। আর দ্বিতীয় দিকটি হল, হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে আযাব দিও না, যা সহ্য করার সাধ্য আমাদের নেই। আর এ দুটো অর্থ এক সঙ্গেই বক্তব্য হতে পারে। প্রকৃত কথা আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

بسم الله الرحمن الرحيم

# সূরা আল-ইমরান

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

هُوَ الَّذِيْنَ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ -

সেই মহান আল্লাহ্ই তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তন্মধ্য থেকে বহু আয়াত মুহকাম— সুদৃঢ় স্পষ্ট— এগুলোই কিতাবের মূল। আর অন্যান্য আয়াত মুতাশাবিহ— সাদৃশ্যপূর্ণ-অস্পষ্ট।

শায়খ আবূ বকর বলেন ঃ 'মুহকাম' ও 'মুতাশাবিহ্' শব্দের তাৎপর্য আমরা এ কিতাবের শুরুতে ব্যাখ্যা করেছি। এ দুটির প্রত্যেকটি দুটি অর্থে বিভক্ত। সে দুটিরও একটি সমগ্র কুরআনের গুণ বোঝায় আর অপরটি কুরআনের কতক অংশকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে অপর কিছু অংশ বাইরে থেকে যায়। আল্লাহ বলেছেন ঃ

الٓرٰ - كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ -

কিতাব, তার আয়াতসমূহ সুদৃঢ়-পরিপক্ক করা হয়েছে। (সূরা হূদ ঃ ১)

বলেছেন ঃ

الٓرٰ - تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ -

এসব আয়াত সুদৃঢ় জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্ন কিতাবের। (সূরা ইউনুস ঃ ১)

এ আয়াত দুটিতে সমগ্র কুরআনের পরিচিতি বলা হয়েছে— তা সুদৃঢ়।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ -

আল্লাহ্ তা'আলা অতীব উত্তম কথা একখানি সাদৃশ্যপূর্ণ ও বারবার আবৃত্তি হওয়া কিতাবরূপে নাযিল করেছেন। (সূরা জুমার ঃ ২৩)

এ আয়াতে সমগ্র কুরআনকে 'মুতাশাবিহ'— 'সাদৃশ্যপূর্ণ' বলা হয়েছে। এরপর অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ -

এ আয়াত কুরআনের কতকাংশকে 'মুহকাম' ও অপর কতক অংশকে 'মুতাশাবিহ' বলা হয়েছে। সমগ্র কুরআনের মুহকাম হওয়াই ঠিক এবং তা পরিপূর্ণও। এ দুটি গুণের কারণে কুরআন সর্বপ্রকারের কথার তুলনায় অধিক মর্যাদাবান। তবে তা থেকে বহু আয়াত মুহকাম এবং তা-ই কিতাবের মূল— এর অর্থ এমন শব্দ যাতে কোন শরীকদারী নেই। তা শুনে শ্রোতা একটি অর্থই বুঝতে পারে। এ বিষয়ে যে মতবৈষম্য রয়েছে, তা আমরা উল্লেখ করেছি। তবে এ আয়াতের 'মুহকাম' শব্দটি এ তাৎপর্য অবশ্যই ধারণ করে, তা হয় তার দিকে প্রত্যাবর্তিত 'মুতাশাবিহ' বোঝায় এবং তাৎপর্য তার উপর ধারণ করে অথবা তা সেই মুতাশাবিহ বোঝায় যাতে সমগ্র কুরআনকে শামিল করা হয়েছে 'মুতাশাবিহ' কিতাব বলে। এ 'মুতাশাবিহ'-এর অর্থ একই ধরনের বা সাদৃশ্যপূর্ণ কথা। পারস্পরিক পার্থক্য না থাকা, কথাসমূহের সাংঘর্ষিক না হওয়া— একটির অপরটির বিপরীত না হওয়া। কুরআনের কিছু অংশ 'মুতাশাবিহ' বলে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, এ পর্যায়ে আগেরকালের মনীষীদের যেসব কথা-বার্তা তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ 'মুহকাম' হল মনসূখকারী আর 'মুতাশাবিহ' হল নাকচ হওয়া আয়াত, আমাদের মতে তা 'মুহকাম' ও 'মুতাশাবিহ'-র একটি প্রকার। কেননা মুহকাম ও মুতাশাবিহর উক্ত দুটি ছাড়া আরও বহু দিক থাকাটা নিষিদ্ধ হয়নি। তাই মনসূখকারী আয়াতকে 'মুহকাম' নাম দেয়া খুবই সঙ্গত। কেননা তার অর্থ বা হুকুমটাও সুপ্রতিষ্ঠিত। আরবরা সুদৃঢ় নির্মাণকে 'মুহকাম' নামে অভিহিত করে। যে দৃঢ় গিঁট খোলা সম্ভব হয় না উহাকে 'মুহকাম' বলা হয়। তাই মনসূখকারী আয়াতকে 'মুহকাম' বলা খুবই সঙ্গত। কেননা স্থিতি ও স্থায়িত্বই এ আয়াতের গুণ। আর মনসূখ হওয়া আয়াতকে 'মুতাশাবিহ' বলা যেতে পারে। কেননা তিলাওয়াতে তা মুহকাম আয়াতের মতই । তবে হুকুম প্রমাণ করার ব্যাপারে তা তার বিপরীত। ফলে তিলাওয়াতকারীর নিকট তার হুকুমটা সংশয়পূর্ণ হয়। এদিক দিয়ে মনসূখ আয়াতকে মুতাশাবিহ্ বলাও সঙ্গত। যাঁরা বলেছেন, মুহকাম হচ্ছে সেই আয়াত, যার শব্দগুলো বারবার আবর্তিত হয়নি আর 'মুতাশাবিহ' হচ্ছে বারবার আগত শব্দের আয়াত, কেননা তার যুক্তি শ্রোতার নিকট সংশয়পূর্ণ হয়ে থাকে— এটা তো এমন সব ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে বর্তমান, যাতে কারণটা সংশয়পূর্ণ হয়ে থাকে। তাতে তার কারণ শ্রোতার নিকট বর্ণনাও স্পষ্ট করা কর্তব্য। এ পর্যায়েও 'মুতাশাবিহ' শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে। আর যার মধ্যে নিহিত কারণ শ্রোতার নিকট অস্পষ্ট নয়, তা-ই মুহকাম, তাতে কোনরূপ সংশয়ের স্থান নেই— যেমন উপরোক্ত কথকের কথা থেকে স্পষ্ট হয়। এ-ও মুহকাম ও মুতাশাবিহ্‌র একটি প্রকার। এ নাম তাতে ব্যবহার করা বৈধ ও সঙ্গত।

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, মুহকাম হচ্ছে সেই আয়াত, যার মর্মার্থ সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়। আর মুতাশাবিহ সেই আয়াত যার মর্মার্থ জানান যায় না। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

يَسْـئَلُوْنَـكَ عَنِ السَّـاعَـةِ اَيَّـانَ مُرْسَاهَا -

লোকেরা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যে, তা কবে ঘটবে?

(সূরা আরাফ ঃ ১৮৭)

এবং এ পর্যায়ের অন্যান্য আয়াত। এ আয়াতটিকে 'মুহকাম' বলা যায়, বলা যায় মুতাশাবিহ্— উভয়-ই। কেননা যার অর্থ ও সময় জানা যায়, তাতে তাশাবুহ্— অস্পষ্টতা কিছু নেই। তার তাৎপর্য সুদৃঢ় করা হয়েছে। আর যার মর্মার্থ, তাৎপর্য ও সময় জানা যায় না, তা শ্রোতার নিকট অস্পষ্ট। তাকেও এ নামে অভিহিত করা সঙ্গত। ব্যবহৃত শব্দ এ সব দিকই আত্মস্থ করে। বর্ণনাটি থেকে তা-ই বোঝা যায়। শব্দ-ই যদি তা ধারণ না করত, তাহলে তারা যে মর্মার্থ গ্রহণ করেছেন, তার উল্লেখ তাঁরা কখনই করতেন না। আমরা একটি কথার উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি, তা হল 'মুহ্‌কাম' তা যার একটি মাত্র অর্থ ধারণ করে, আর মুতাশাবিহ্ তা যা দুইটি অর্থ ধারণ করে, এ নাম যেসব দিক ধারণ করে, এটা তার একটি। কেননা এ প্রকারের মুহতাশাবিহ্‌কে 'মুহকাম' বলা হয়। কেননা তা যা বোঝায়, তা সুদৃঢ়, তার অর্থ সুস্পষ্ট। তার মুতাশাবিহ্‌কে 'মুতাশাবিহ্' নাম দেয়া হয়েছে এজন্যে যে, তা একদিক দিয়ে মুহকামের মতই, তার অর্থ গ্রহণও সম্ভব। আর তা বাদে তা অন্য কিছুর মত-ও, যার অর্থ মুহকামের বিপরীত। আর এ দিক দিয়েই তাকে মুতাশাবিহ্ বলা হয়েছে। মুহ্‌কাম ও মুতাশাবিহ— উভয়কেই আমাদের বলা তাৎপর্য শামিল করে, তার উদ্দেশ্য বোঝা ও জানার জন্যে আমরা আল্লাহ্‌র এ কথাকে দলীল বানিয়েছি। তিনি বলেছেন ঃ

'তার কিছু আয়াত মুহকাম— এগুলোই মূল কিতাব। আর অন্যান্য আয়াত মুতাশাবিহ।' ফলে যাদের মনে বক্রতার ভাবধারা বিদ্যমান, তারা মুতাশাবিহ আয়াত অনুসরণ করে ফিতনা সৃষ্টি করার ও তার মর্ম উদ্ঘাটনের জন্যে। এ আয়াতের বিস্তারিত তাৎপর্য তো আমাদের জানা-ই আছে। অতএব মুতাশাবিহ্ আয়াতকে মুহকাম আয়াতের আলোকে বুঝতে হবে। তার বিপরীত অর্থ তা থেকে কখনই গ্রহণ করা যাবে না। কেননা আল্লাহ্ 'মুহকাম' আয়াতের পরিচিতিতে নিজেই বলেছেন ঃ 'এ মুহকাম আয়াত-ই মূল কিতাব।' اُلْاُمُّ —'মা'। 'মা' তাই যা থেকে তার উৎপত্তি ও প্রকাশ এবং সেদিকেই তার প্রত্যাবর্তন নয়। এই কারণে 'মুহকাম' আয়াতকে 'মা' বলা হয়েছে। অতএব মুতাশাবিহ আয়াতসমূহ মুহকাম আয়াতের ভিত্তিতে বুঝতে হবে, তার দিকেই ফিরিয়ে দিতে হবে। এ কথাকে অধিক তাগিদপূর্ণ করা হয়েছে এ কথা দ্বারা ঃ 'যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, তারা মুতাশাবিহ (যার তাৎপর্য স্পষ্ট নয়) আয়াতের পিছনে লেগে পড়ে ফিত্‌না সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ও তার একটা ব্যাখ্যা (যে কোন ভাবে) পেয়ে যাওয়ার জন্যে। মুহ্‌কাম আয়াতের ভিত্তিতে মুতাশাবিহ্ আয়াতের তাৎপর্য গ্রহণ না করাকে মনে বক্রতার রোগ বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, সে ফিত্‌নার সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক। 'ফিত্‌না' বলতে এখানে কুফর ও গুমরাহী বুঝিয়েছেন। যেমন আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলেছেন ঃ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ। —'ফিত্‌না হত্যাকাণ্ড থেকে অধিক শক্ত গুনাহের কাজ।' (সূরা বাকারা ঃ ১৯১) বলা হয়েছে মুতাশাবিহ আয়াতের পেছনে লাগা এবং তা থেকে মুহকাম আয়াতের বিপরীত তাৎপর্য গ্রহণ সত্যের বিপরীত মানসিকতা। লোকেরা তা থেকে গুমরাহী ও কুফর পেতে চায়। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, এ আয়াতের 'মুতাশাবিহ' শব্দটি বলতে সেই শব্দ বুঝিয়েছে যার তাৎপর্য কেবলমাত্র মুহকাম আয়াতের ভিত্তিতে গ্রহণ করা কর্তব্য। পরে এই শব্দে নিহিত থাকা তাৎপর্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। পূর্বে মুতাশাবিহ্‌র কয়েক প্রকারের কথা আমরা বলেছি। শব্দের ধারণ ও সম্ভাব্যতা সত্ত্বেও তা বিভিন্ন। আমরা দেখলাম, যিনি বলেছেন এই

মুহকাম ও মুতাশাবিহ্ অর্থ মনসূখকারী ও মনসূখ হয়ে যাওয়া আয়াত। দুটি আয়াতের নাযিল হওয়ার তারিখ জানা গেলে যিনি জানেন তার নিকট কোন অস্পষ্টতা বা সংশয় থাকে না। তিনি জানতে পারেন যে, এটা মনসূখ ও তার হুকুম পরিত্যক্ত। আর মনসূখকারী আয়াতটির হুকুম প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর, তাহলে তাতে শ্রোতার মনে সংশয় সৃষ্টির কিছু থাকে না। কেননা তিনি দুটি আয়াতের হুকুম জানেন যে, এ হুকুম দুটির মধ্যে একটি মনসূখ হয়েছে। আর শ্রোতা নাযিল হওয়ার তারিখ জানে না বলেই তার মনে সংশয় থেকে যায়। এর ফলে একটি শব্দের মুহকাম হওয়ার কারণ তা অন্যটি অপেক্ষা উত্তম বিবেচিত হয় না। আর তার ফলে দুটোই মুতাশাবিহ্ হয়ে যায় না। কেননা এ দুটির প্রতিটিই মনসূখকারী হতে পারে, হতে পারে মনসূখ হয়ে যাওয়া। ফলে আল্লাহ্‌র এ কথায় এর কোন প্রবেশ নেই ঃ 'তার কিছু আয়াত মুহকাম— তা-ই কিতাবের মূল এবং অন্যগুলো মুতাশাবিহ্।

'মুহ্‌কাম' তা-ই, যার শব্দ বারবার আসে না, এ কথাটিও আলোচ্য আয়াতের ক্ষেত্রে বলা যায় না। কেননা তার অর্থ মুহকাম আয়াতের ভিত্তিতে নেয়ার প্রয়োজন হয় না। তা বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে অনুধাবন করতে হয়। অভিধানের আলোকে যে অর্থ হতে পারে, তা-ই গ্রহণ করতে হয়।

'যার সময় ও নির্দিষ্ট অর্থ জানা যায় তা মুহ্‌কাম' আর 'যার মর্মার্থ সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না তা মুতাশাবিহ্'— যেমন কিয়ামতের ব্যাপার, আর যেসব ছোট ছোট গুনাহ আল্লাহ এই দুনিয়ায় আমাদের অবগতির বাইরে রেখেছেন, এ প্রকারের আয়াতও আলোচ্য আয়াতের হুকুমের বাইরে অবস্থিত। কেননা মুতাশাবিহ্‌র তত্ত্ব জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তা মুহ্‌কাম আয়াতের আলোকেও বোঝা যায় না। আমরা ইতিপূর্বে মুহকাম ও মুতাশাবিহ আয়াতের বিভিন্ন প্রকারের উল্লেখ করেছি, তা এর মধ্যেও গণ্য নয়। তার একটিকে অন্যটির ভিত্তিতে বোঝার প্রশ্ন নেই। তবে এই শেষে উল্লেখ করা দিকটির ভিত্তিতেই তার অর্থ জানতে হবে। তা হল মুতাশাবিহ্ শব্দ বহু অর্থের ধারক, তাকে মুহকামের আলোকে বুঝতে হবে, যার মধ্যে সেই বিভিন্নতার অর্থের অবকাশ নেই। এর শব্দে বহু অর্থের অবকাশ নেই কিতাবের শুরুতে পেশ করা দৃষ্টান্তসমূহের ন্যায়। আমরা বলেছি, তা দুটি প্রকারের বিভক্ত— তাঁর কিছু বিবেক-বুদ্ধিগত এবং কিছু শুনার মাধ্যমে পাওয়া। আগের কালের লোকদের থেকে এসব দিকের সন্ধান পাওয়া নিষিদ্ধ কিছু নয়। তা বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এ নাম তা শামিল করে। আগের কালের লোকদের থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। মুহকাম আয়াতের আলোকে এ শেষোক্ত দিকটিই সাব্যস্ত হওয়া উচিত। কেননা মুতাশাবিহ্ আয়াতের সমস্ত দিকই মুহকাম আয়াতের আলোকে নির্ধারিত হওয়া অসম্ভব। একথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে ঃ

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ اِلَّا اللّٰهُ -

উহার তত্ত্ব আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

এর অর্থ— সমস্ত মুতাশাবিহ্‌র আয়াতের তাৎপর্য। এর ইলম অন্য কারোর আয়ত্ত নয়। সমস্ত মুতাশাবিহ্ আয়াতের তাৎপর্য আমাদের জ্ঞানে আয়ত্ত করাকে এ আয়াতে অস্বীকার করা

হয়েছে। তবে কোন কোন মুতাশাবিহ্ আয়াতের তাৎপর্য দলীলের ভিত্তিতে বলাকে অস্বীকার করা হয়নি। যেমন ইল্‌ম আয়ত্ত করা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ -

আল্লাহ্‌র কোন ইল্‌মই মানুষেরা আয়ত্ত করতে পারে না। তবে আল্লাহ যা বলে, তা পারে। (সূরা বাকারা ঃ ২৫৫)

আয়াতটির ধরনই প্রমাণ করে যে, কোন কোন মুতাশাবিহ্‌র অর্থ আমরাও জানতে পারি। জানতে পারি মুহকাম আয়াতের আলোকে, মুহকাম আয়াতের অর্থ ধারণ করে। তবে তাকে মুহ্‌কাম আয়াতের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা ওয়াজিব হওয়া তা থেকে প্রমাণিত হয় না। সেই সাথে এ-ও বোঝায় যে, আল্লাহ্‌র ইলম ও জ্ঞান-তত্ত্ব আমরা লাভ করতে পারি না। এরূপ অবস্থায় আল্লাহ্‌র কথা 'তার তত্ত্ব আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না' সম্পূর্ণ নিষেধকারী হয় না। কেননা কোন কোন মুতাশাবিহ্ আয়াতের তাৎপর্য জানা সম্ভব হয়েছে। যেসব বিষয়ের ইল্‌ম আমাদের আয়ত্তাধীন হতে পারে না— কিয়ামতের সময়ও সগীরা গুনাহ— সেই পর্যায়ে গণ্য। যেসব শব্দ 'মুজমাল' যার ব্যাখ্য হওয়া দরকার; কিন্তু তার ব্যাখ্যা বলা হয় না, এরূপ শব্দও 'মুতাশাবিহ্' গণ্য হতে পারে বলে অনেকে মনে করেছে। তার ইল্‌ম আমরা লাভ করতে পারি না।

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ -

তার তত্ত্ব আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না আর ইল্‌মে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত লোকগণ।

আলিমগণ এ আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কেউ কেউ মনে করেছেন, আয়াতটি رَاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ পর্যন্ত শেষ হয়েছে। 'ওয়াও' (و) অক্ষর দ্বারা পূর্ব ও পরবর্তী কথাকে যুক্ত করা হয়েছে। যেমন বলা হয় ঃ আমি জায়দ ও উমরের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। 'ও' অক্ষর দিয়ে জায়দ ও উমরকে এ বাক্যে যুক্ত করা হয়েছে। এ ধরনের আরও দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। আবার কেউ কেউ মনে করেছেন ঃ 'তার ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না' এ পর্যন্ত এসে আয়াতটি শেষ হয়ে গেছে। 'ওয়াও' (و) অক্ষরটি পরবর্তী কথার সূচনাকারী মাত্র, তা পূর্ববর্তী কথাকে একত্রিত করেনি।

প্রথমোক্ত মত যাঁদের, তাঁরা মনে করেন, ইলমে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত লোকেরা কোন কোন মুতাশাবিহ্ আয়াতের তাৎপর্য জানেন, যদিও সমস্ত মুতাশাবিহ্ আয়াতের ব্যাখ্যা জানেন না। হযরত আয়েশা (রা)-এর হাসান বসরী থেকে পাওয়া বর্ণনা উক্ত ব্যাখ্যা সমর্থন করে। যাদের হৃদয়ে সংশয় রয়েছে, তারা সংশয় সৃষ্টি করতে চায়। এ কারণে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। 'কিন্তু ইলমে যারা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, তাঁরা তার তত্ত্ব জানেন এবং বলেন— 'আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি।' ইবনে নজীহ্‌র বর্ণনানুযায়ী এ কথাটি মুজাহিদের। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, উমর ইবনে আবদুল আজীজ থেকেও এ কথাই জানা গেছে। তাঁরা বলেছেন ঃ মুতাশাবিহ্ আয়াতের তত্ত্ব আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না, ইলমে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত লোকেরা অবশ্য তা জানেন! তাঁরাই বলেন যে, আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি। রুবাই ইবনে আনাস থেকেও এরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে। কুরআনের আয়াতে ব্যবহৃত শব্দও এ অর্থ ধারণ করে। কথাটি এভাবে দাঁড়ায় ঃ

সমস্ত মুতাশাবিহ্ আয়াতের তাৎপর্য আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। ইলমে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত লোকেরা তার কিছু কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা জানেন এবং তাঁরা এ ঈমানের কথা বলেন যে, এ সব-ই আমাদের রব্ব-এর নিকট থেকে আসা। অর্থাৎ তা মুহ্কাম আয়াতের আলোকে বুঝাবার মত দলীল তাদের নিকট রয়েছে। যা তাঁরা জানেন না, তার ইলম পাওয়ার কোন পথ তাদের আয়ত্তে নেই। তাঁরা কতক মুতাশাবিহ্ আয়াতের তত্ত্ব জানেন আর কতক আয়াতের তত্ত্ব জানেন না বলে আমরা এ সমস্তের প্রতিই ঈমান রাখি, সবই আমাদের রব্ব-এর নিকট থেকে নাযিল হয়েছে— এ কথা তাঁরা বলেন। যে বিষয়ের ইলম আমাদের নেই, তা আমাদের না জানার মধ্যে আমাদের জন্যে কল্যাণ নিহিত। তা আমাদের দ্বীন ও দুনিয়া উভয় দিক দিয়েই আমাদের জন্যে কল্যাণময়— একথা আল্লাহ ভালো করেই জানেন। তিনি আমাদেরকে তা-ই জানান, যা আমাদের জন্যে কল্যাণকর। তাই সবকিছুর বিশুদ্ধতার কথা তাঁরা স্বীকার করেন, যা জানেন আর যা জানেন না, তা সবই সত্য হওয়ার সাক্ষ্য দেন।

অনেকে মনে করেন, 'তার তত্ত্ব আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না' এ পর্যন্ত এসেই বাক্য শেষ হয়ে গেছে। এছাড়া অন্য কোন মত সহীহ্ নয় وَالرَّاسِخُوْنَ এবং واو (ওয়াও) পরবর্তী কথার সূচনা করেছে, তার পূর্ব ও পরবর্তী কথাকে একত্রিত বা যুক্ত করেনি— যদি দুটি কথা যুক্ত হতো, তাহলে কথাটি এবং বলেন ঃ 'আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি।' একথা সূচিত হওয়ার জন্যে আবার 'ওয়াও' (و) লেখা হতো। বলেছেন, যারা প্রথম কথাটি গ্রহণ করেছেন, তা-ও ভাষার দিক দিয়ে সঠিক হতে পারে। কুরআনে এ রকমের কথা বলার দৃষ্টান্ত আছে। 'ফাই' বণ্টন বিষয়ে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

مَآ اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ ..... شَدِيْدُ الْعِقَابِ -

জনপদবাসীদের নিকট আল্লাহ যা তাঁর রাসূলকে যুদ্ধ ছাড়াই দান করেছেন, তা আল্লাহ ও রাসূলের জন্যে ..... কঠিন আযাব— পর্যন্ত। (সূরা হাশর ঃ ৭)

পরে পার্থক্য সৃষ্টি করে 'ফাই' যারা পাবে তাদের উল্লেখ করেছেন এই বলে ঃ

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا -

তা সেসব দরিদ্র মুহাজিরদের জন্যে, যারা তাদের ঘর-বাড়ি-দেশ থেকে বহিষ্কৃত-বিতাড়িত হয়েছে, চায় আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি। (সূরা হাশর ঃ ৮)

এরপর রয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ -

আর যারা তাদের পরে এসেছে (ও আসবে), তাদের জন্যেও। (সূরা হাশর ঃ ১০)

এরাও নিঃসন্দেহে প্রথমোক্ত লোকদেরই অংশ পাওয়ার যোগ্য। এখানে 'ওয়াও' অক্ষরটি পূর্ব ও পরবর্তীকে একত্রিত ও যুক্ত করার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

এরপর বলেছেন ঃ

يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ –

এর অর্থ, তারা বলে ঃ হে আমাদের রব্ব, তুমি আমাদের ও আমাদের পূর্বে চলে যাওয়া লোকদেরকে ক্ষমা কর। (সূরা হাশর ঃ ১০)

আর 'ইলমে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত লোকেরা' বাক্যটিও অনুরূপ। তার অর্থ ঃ

'যাঁরা ইলমে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত তাঁরা তার তাৎপর্য জানেন'— 'মুতাশাবিহ' আয়াতের অর্থ বোঝার জন্যে যে দলীল রয়েছে তার সাহায্যে। তারাই বলে ঃ আমরা তার প্রতি ঈমান আনলাম। এরা পূর্ববর্তীর সাথে যুক্ত। তার আওতার মধ্যে শামিল।

আরবী সাহিত্যেও এরূপ বলা যখন চলে, তখন মুহকাম আয়াতের আলোকে মুতাশাবিহ্ আয়াতের তাৎপর্য গ্রহণ করা ওয়াজিব। আয়াত থেকেই তা বোঝা যায়। তাহলে কথা দাঁড়াল, ইলমে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত লোকেরা মুতাশাবিহ্ আয়াতের তাৎপর্য জানতে পারবেন, যদি তাঁরা মুহ্‌কাম আয়াতকে তার দলীল বানান।

অপর একটি দিক দিয়েও বিচেনা করা যায়। 'ওয়াও' অক্ষরটি যখন প্রকৃতপক্ষেই পূর্ব ও পরবর্তী কথাকে একত্রিত করারও অর্থ দেয়, তখন উহার সে অর্থই এখানেও গ্রহণ করা দরকার। তা-ই এই অক্ষরটির আসল তাগিদ। কোন দলীল না থাকলে সেটিকে নতুন কথার সূচনা অর্থে গ্রহণ করা সঠিক হবে না। আর এখানে তার আসল অর্থ না গ্রহণ করে অন্য কোন অর্থে গ্রহণ করার কোন দলীল এখানে নেই। কাজেই এখানে সেই একত্রকরণ অর্থই গ্রহণ করতে হবে।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, মুহ্‌কাম আয়াত যদি নিজ বিবেক-বুদ্ধি মত কয়েদযুক্ত ভাবে ব্যবহার করা হয় আর প্রত্যেক বাতিল পন্থীই যদি নিজের জন্যে সেই দাবি করে, তাহলে মুহকাম আয়াতকে দলীল বানানো অর্থহীন হয়ে যাবে।

তাহলে জবাবে বলা যাবে, মুহকাম আয়াত কয়েদযুক্ত হবে বিবেক-বুদ্ধির পরিচিতিতে যা আছে তার সাথে। তখন শব্দটিও ভাষাভাষীদের বিবেক-বুদ্ধির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। বিবেক-বুদ্ধির হুকুম বা ফয়সালা প্রয়োগে কতিপয় প্রাথমিক কথার প্রয়োজন দেখা দেবে না। বরং শ্রোতা তার তাৎপর্য সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী বাস্তবভাবেই হবে, সেই নিয়মে যা বুদ্ধিমান লোকদের বিবেক-বুদ্ধিতে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। খারাপ অভ্যাস অনুযায়ী হবে না, যাতে তারা অভ্যস্ত হয়েছে। যা এরূপ হবে তা-ই মুহ্‌কাম। তার অর্থ তাতে ব্যবহৃত শব্দ অনুযায়ী প্রকৃতভাবেই হবে। তাতে খারাপ অভ্যাসের কোন স্বীকৃতি নেই।

যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, যার মনে বক্রতা আছে সে মুতাশাবিহ্ আয়াতের পেছনে লেগে পড়ে। সে তো মুহ্‌কাম আয়াতের প্রতি লক্ষ্য দেয় না?

তার জবাবে বলা হবে, রুবাই ইবনে আনাস থেকে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াতটি নাজরানের খ্রীস্টান প্রতিনিধিদল সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। তারা ঈসা-মসীহ্ (আ) সম্পর্কে নবী করীম

(স)-এর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল। তারা প্রশ্ন করেছিল, তিনি কি আল্লাহ্র কলেমা ও তাঁর থেকে আসা রূহ্ ছিলেন না? রাসূলে করীম (স) বলেছিলেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি তাই ছিলেন। তারা বলেছিল, আমাদের জন্যে এটাই যথেষ্ট। তখন আল্লাহ্ এ আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

যাদের হৃদয়ে বক্রতা রয়েছে তারা মুতাশাবিহ্ আয়াতের পেছনে লেগে থাকে। তারপর নাযিল করেন ঃ

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنَ -

আল্লাহ্র নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মত যেন। তাকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর বলেছেন হও, তখন হয়ে গেল। (আল-ইমরান ঃ ৫৯)

পরে খ্রীস্টানরা আল্লাহ্র কলেমাকে তাদের কথার দিকে বিকৃত করে ফিরিয়ে নিল। তারা তাঁকে আল্লাহ্র মতই 'চিরন্তন সত্তা'র রূপ দিল। আর 'আল্লাহ্ থেকে আসা রূহ' কথাটিকে তারা বদলিয়ে বলতে লাগল, তিনি আল্লাহ্র অংশ। তাঁরই মত শাশ্বত— যেমন মানুষের রূহ। অথচ আল্লাহ 'কলেমা' শব্দ দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন, আগের নবীগণের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবে তার সম্পর্কে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। এ জন্যে তাকে 'কলেমা' বলেছেন এ হিসেবে যে, আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছেন। তাকে তাঁর রূহ নাম দিয়েছেন। কেননা আল্লাহ তাকে কোন পুরুষের ঐরসজাত বানান নি। বরং তিনি জিবরাঈল (আ)-কে আদেশ করলেন, তিনি মরিয়ম (আ)-এর গর্ভে ফুঁকে দিলেন। আল্লাহ্ এ কাজটিকে নিজের কৃত বলে দাবি করলেন তাঁকে সম্মানিত করার উদ্দেশ্যে। যেমন বলা হয় 'আল্লাহ্র ঘর' আল্লাহ্র আকাশ, আল্লাহ্র জমিন। এ-ও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ঈসা (আ)-কে 'রূহ' বলেছেন, যেমন কুরআনকে রূহ বলা হয়েছে এ আয়াতটিতে ঃ

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا -

এবং এমনিভাবে আমরা তোমার প্রতি রূহ ওহীরূপে নাযিল করলাম আমার একান্ত আদেশে। (সূরা শূরা ঃ ৫২)

ওহী বা কুরআনকে এ আয়াতে 'রূহ' বলা হয়েছে এ হিসেবে যে, 'রূহ' যেমন মানুষের বৈষয়িক জীবনের উৎস, কুরআন তেমনি মানুষের দ্বীনী জীবনের উৎস। বাঁকা মতের লোকেরা এ কথাটিকে নিজেদের ভুল মত সমর্থনে ব্যবহার করেছে। তাদের আকীদায় যে কুফর ও গুমরাহী রয়েছে, তারই প্রকাশ ঘটিয়েছে এই কথাটিকে কেন্দ্র করে। কাতাদাহ বলেছেন, চিন্তার বক্রতার ধারক ও মুতাশাবিহ আয়াতের পেছনে লেগে যাওয়া লোক (সে কালের) হারুরীয়া ও সাবায়ীয়া ফিরকার লোক।

আল্লাহ্র কথা ঃ

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ -

কাফিরদের বল, তোমরা নিশ্চিতই পরাজিত হবে, এবং জাহান্নামে একত্রিত হবে।

ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ ও ইবনে ইস্হাক থেকে বর্ণিত, বদর যুদ্ধের দিন কাফির কুরায়শরা যখন ধ্বংস হল, তখন নবী করীম (স) মদীনার ইয়াহূদীদেরকে 'কাউনকা' বাজারে একত্রিত করে দ্বীন ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কুরায়শদের উপর যেরূপ বিপদ এসেছে, তাদের উপরও অনুরূপ বিপদ আসার ভয় দেখালেন ও হুঁশিয়ার করে দিলেন। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাল। তারা বলল, আমরা কুরায়শদের মতনই। ওরা যুদ্ধ জানে না। আপনি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে জানতে পারবেন যুদ্ধ কাকে বলে। জানতে পারবেন, আমরা ভিন্ন মানুষ। তখন আল্লাহ্ নাযিল করলেন ঃ 'কাফিরদের বল, তোমরা অবশ্যই পরাজিত হবে এবং জাহান্নামে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে আর জাহান্নাম অত্যন্ত খারাপ স্থান।

এ আয়াতে বলা কথা রাসূলে করীম (স) নবুয়তের সত্যতা প্রমাণ করে। কেননা তাতে মুমিনদের যে বিজয় লাভের ও মুশরিকদের পরাজিত হওয়ার যে আগাম খবর দেয়া হয়েছে, তা অল্প দিনের মধ্যেই দিনের মধ্যেই দিনের ন্যায় সত্য প্রমাণিত হয়েছে। খবর অনুযায়ী বাস্তবে ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়েছে। ভবিষ্যতের ব্যাপারে যেসব গায়বী খবর দেয়া রয়েছে এ-ও তেমনি। এটা হঠাৎ ঘটে যওয়া কোন ঘটনা নয়। সংবাদদাতার দেয়া খবর ঘটনার বিপরীত হয়নি। তা সম্ভব হয়েছিল এ জন্যে যে, তা ছিল আল্লাহ্র দেয়া সংবাদ। এক মাত্র তিনিই গায়ব জানেন। তিনি ছাড়া সৃষ্টির আর কেউ-ই ভবিষ্যৎ বলতে পারে না। এমনভাবে যে পরবর্তী সময়ে হুবহু তাই ঘটবে যা আগেভাগে বলা হয়েছিল। তাতে একবিন্দু এদিক-ওদিক হবে না।

আল্লাহ্র কথা ঃ

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

দুইটি জনবসতি পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। তার একটি বাহির। যুদ্ধ করছে আল্লাহ্র পথে— এ ব্যাপারে তোমাদের জন্যে বড় নিদর্শন রয়েছে।

ইবনে মাসউদ (রা) কর্তৃক আল-হাসান থেকে বর্ণিত হয়েছে, উক্ত আয়াতে মুসলমানদের সম্বোধন করা হয়েছে। মুমিন বাহিনীই মুশরিকদের জন্যে দ্বিগুণ প্রদর্শিত হয়েছিল প্রত্যক্ষভাবে। আর তারা নিজেরা তাদের তুলনায় তিন ভাগের এক ভাগ ছিল। কেননা মুশরিকদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার আর মুসলিমরা ছিল মাত্র তিন শ' এবং আরও কিছু (তেরজন)। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের অন্তরকে সাহসী ও শক্তিশালী বানাবার জন্যে তারা খুব স্বল্প সংখ্যক মনে হচ্ছিল।

অন্যরা বলেছেন, আল্লাহ্র কথা ঃ قَدْ كَانَ لَكُمْ 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য ছিল' ..... আয়াতটুকুতে কাফিরদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছিল, যাদের কথা 'কাফিরদের বল, তোমরা পরাজিত হবে ও জাহান্নামে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে' এতে বলা হয়েছে। এর সাথে যোগ করেই বলা হয়েছে ঃ নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য ছিল .... এর সম্পূর্ণ কথা এ দাঁড়ায় যে, কাফিরা মুমিনদেরকে তাদের তুলনায় দ্বিগুণ দেখতে পেয়েছিল। আর আল্লাহ তাদেরকে চর্ম চক্ষে তাই দেখিয়েছিলেন, যেন তাদের অন্তরে ভয় জাগ্রত হয়, যেন তা মুমিনদের জন্যে তাদের উপর অধিফ শক্তিশালী হয়ে উঠে। এ ব্যাপারটি মুসলমানদের সাহায্যের একটি দুয়ার ছিল। আর কাফিরদের জন্য ছিল বড় লজ্জার কারণ।

ঐ আয়াতটিতে নবী করীম (স)-এর নবুয়তের সত্যতার দুটি প্রমাণ নিহিত রয়েছে। একটি হল— অল্প সংখ্যক বাহিনীটির বিজয় সাধিত হওয়া বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ বাহনীর উপর। সাজ-সরঞ্জামের দিক দিয়েও মুসলমানরা কম, কাফিররা অনেক অগ্রসর। এটা ছিল এক অস্বাভাবিক ব্যাপার। আর তা সম্ভব হয়েছিল এ কারণে যে, আল্লাহ ফেরেশতা দিয়ে মুসলমানদের সাহায্য করেছিলেন আর দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের নিকট ওয়াদা করেছিলেন যে, তাদেরকে সিরিয়া প্রত্যাগত ব্যবসায়ী কাফেলা ও মক্কা থেকে যুদ্ধের জন্যে আগত কুরায়শ বাহিনী— এ দু'টির একটি অবশ্যই পাইয়ে দেবেন। আর নবী করীম (স) মুসলমানদেরকে আগে-ভাগেই বিজয়ের খবর জানিয়ে দিয়েছিলেন। এক-একটি স্থান দেখিয়ে বলেছিলেন, এখানে অমুক ব্যক্তি মরে পড়ে থাকবে, এখানে অমুক ব্যক্তি। যুদ্ধশেষে ঠিক তা-ই দেখা গিয়েছিল। একদিকে আল্লাহ্র ওয়াদা এবং অপর দিকে রাসূল (স)-এর আগাম খবর সবই সত্য হয়ে উঠেছিল।

আল্লাহ্র কথা ঃ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ -

লোকদের নিকট কামনা-বাসনার প্রেম চাকচিক্যপূর্ণ বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

আল-হাসান বলেছেন, চাকচিক্যময় বানিয়ে দিয়েছে শয়তান। কেননা শয়তানের স্রষ্টা যত কঠিনভাবে শয়তানের নিন্দা করেছেন, তত আর কেউ নয়। অন্য কিছু লোক বলেছেন, আল্লাহ্ই চাকচিক্যময় বানিয়েছেন। সে দিকে মানুষের অন্তরের টান তো মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। যেমন অপর আয়াতে তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا -

পৃথিবীর বুকে যা কিছু আছে তাকে আমিই পৃথবীর জন্যে সৌন্দর্য বা অলংকার বানিয়ে দিয়েছি। (সূরা কাহাফ ঃ ৭)

অন্যরা বলেছেন ঃ যা ভালো তাকে চাকচাক্যিময় বানিয়েছেন আল্লাহ। আর যা মন্দ তাকে চাকচিক্যময় বানিয়েছে শয়তান।

আল্লাহ্র কথা ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّ يَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ -

যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করে ও অন্যায়-অকারণে হত্যা করে নবীগণকে এবং হত্যা করে তাদেরকেও যারা সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে উঠে ন্যায়পরতার আদেশ করে ..

হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি বললাম ঃ হে রাসূল! কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি কঠিন শাস্তি পাবে কোন সব লোক? জবাবে বললেন ঃ সেই ব্যক্তি, যে কোন নবীকে হত্যা করেছে কিংবা সেই ব্যক্তি, যে ভালো

কাজের আদেশ করে ও মন্দ কাজ করতে লোকদেরকে নিষেধ করে। এ কথা বলে তিনি এ পূর্ণ আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ

এবং নবীগণকে হত্যা করে অন্যায়ভাবে-অকারণে এবং হত্যা করে সেই লোকদেরকে যারা সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে উঠে লোকদের ন্যায়পরতা ইনসাফের আদেশ করে। অতএব তাদেরকে পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।

এবং পরে বললেন ঃ হে আবূ উবায়দা! বনী ইসরাঈলীরা দিনের প্রথম ভাগে একঘন্টা সময়ের মধ্যে ৪৩ জন নবীকে হত্যা করেছিল। তখন বনী ইসরাঈলীদের দাসদের মধ্য থেকে একশ বার জন লোক দাঁড়িয়ে গেল এবং নবীগণের হত্যাকারীদিগকে ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করতে শুরু করেছিল। পরিণামে বনী ইসরাঈলীরা সেই দিনের শেষ ভাগে এই শেষোক্ত লোকদিগকে হত্যা করল। উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কেই কথা বলেছেন।

এ আয়াতটি প্রমাণ করে যে, হত্যার ভয় থাকা সত্ত্বেও অন্যায় করতে অস্বীকার করা ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করা সম্পূর্ণ জায়েয। বরং তা একটি অত্যন্ত কল্যাণময় মর্যাদা। তা করলে বিরাট বিপুল সওয়াব পাওয়ার অধিকারী হওয়া যাবে। কেননা উক্ত আয়াতে 'আমর বিল মারূফ ও নিহী আনিল মুনকার' করার অপরাধে নিহত ব্যক্তিবর্গের প্রশংসা করেছেন।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) ও অন্যান্যরা নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ -

অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে সত্য কথা স্পষ্ট করে বলা উত্তম জিহাদ।

কোন কোন বর্ণনায় এ কাজের দরুন নিহত হওয়ার কথা আছে বলে বলা হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা ইকরামা ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন শহীদ (হযরত) হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) এবং সে, যে অত্যাচারী শাসকের নিকট সত্য কথা স্পষ্ট করে বলার অপরাধে নিহত হয়েছে। আমর ইবনে উবায়দ বলেছেন ঃ ন্যায় ও ইনসাফের আওয়াজ তোলার কারণে নিহত হওয়া নেক আমলের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কাজ। এর তুলনায় অধিক উত্তম নেক আমল আর কিছু আছে বলে আমরা জানি না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ 'অতএব ওদেরকে পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।' এ কথাটি যদি ওদের আগের কালের— পূর্ববর্তী বংশীয় লোকদের সম্পর্কে জানানো খবর হয় এভাবে যে, যাদেরকে সম্বোধন করে এক্ষণে এ কথাটি বলা হল, তারা তাদের পূর্বের লোকদের ওসব অন্যায় কার্যকলাপে রাজি ছিল, তাহলে পূর্বের ও বর্তমানে লোকদের প্রতি একসাথে এ আযাবের দুঃসংবাদ দেয়া হয়েছে মনে করতে হবে। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَاءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ -

বল ঃ তাহলে তোমরা আগে আল্লাহ্র নবীগণকে হত্যা করতে কেন ?

আল্লাহ্‌র এ কথাটিও ঃ

اَلَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَا اَ لَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ط قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِى بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِىْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -

যারা বলেছে যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে তাগিদ করেছেন যে, আমরা কোন রাসূলের প্রতি ঈমান আনব না যতক্ষণ না তিনি আমাদের নিকট এমন একটি কুরবানী না আনবেন, যাকে আগুন খেয়ে ফেলবে। তুমি বল ঃ আমার পূর্বে বহু রাসূল তোমাদের নিকট অকাট্য দলীল-প্রমাণ নিয়ে এসেছিলেন। আর তোমরা যা বলছ তা-ও। তাহলে এতদ্‌সত্ত্বেও তোমরা তদেরকে হত্যা করেছিলে কেন, তোমরা সত্যবাদী হলে এ কথার জবাব দাও।

(সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৮৩)

এ আয়াতে হত্যা কার্যটি তাদের কৃত বলা হয়েছে, যাদের সাথে এখন কথা বলা হচ্ছে। অথচ প্রকৃত পক্ষে এরা নিজেরা সেই হত্যাকার্য করেনি। তবে এরা আগের লোকদের দ্বারা নবী হত্যার কাজ হয়েছিল তার প্রতি এরা রাজি ছিল, তা সমর্থন করেছিল। এর ফলে নবী হত্যা অপরাধের আযাবে এরাও শরীফ হবে। কেননা এরা তাদের নবী হত্যাকে সমর্থন করছিল। ফলে এরাও সে কাজে অন্ততঃ মনে-মনে শরীক হয়ে গিয়েছিল।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اَلَمْ تَرَاِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ -

যাদেরকে কিতাবের একটা অংশ দেয়া হয়েছে— আহ্‌লি কিতাব নামে পরিচিত হয়েছে— তাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাব কিতাবীদের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে .... তুমি কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ?

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, উক্ত আয়াতে ইয়াহুদীদের কথা বলা হয়েছে, যখন ওদেরকে তওরাতের দিকে আহ্বান জানানো হয়েছিল। কেননা তওরাত তো আল্লাহ্‌র-ই কিতাব। তা ছাড়া অন্যান্য সব কিতাব বোঝায়, যাতে নবী করীম (স) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী দেয়া হয়েছে। এ সব কিতাবে নবী করীম (স)-এর নবুয়তের সত্যতার যে কথা আছে তার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করতে— তা সমর্থন করতে বলা হয়েছিল। যেমন অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰةِ فَاتْلُوْهَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -

বল ঃ তোমরা তওরাত নিয়ে আস এবং তা পাঠ কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

(সূরা আলে-ইমরান ঃ ৯৩)

তখন আহ্‌লি কিতাবের একটা দল পিছনে সরে গেল, তওরাত নিয়ে মুকাবিলায় এল না। কেননা তারা জানত যে, তাদের কিতাবেই নবী করীম (স)-এর কথা বলা হয়েছে এবং তিনি

সত্য নবী। তারা যদি তা না-ই জানত, তাহলে এ আহ্বান পাওয়া সত্ত্বেও তারা পিছনে সরে যেত না। অবশ্য তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক ঈমান এনেছিল। তারা জানত যে, তাদের কিতাবে তাঁর নবুয়তের সত্যতার ঘোষণা রয়েছে, তারা ঈমান এনে তার-ই সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। তওরাত ও অন্যসব আসমানী কিতাবে শেষ নবীর যে গুণ-পরিচিতির উল্লেখ আছে, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মধ্যে তা সবই সত্য ও বাস্তব দেখতে পেয়েছিল।

এ আয়াতটিতেও নবী করীম (স)-এর নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ রয়েছে। কেননা তাদের নিকট রক্ষিত আসমানী কিতাবসমূহে নবী করীম (স)-এর নবুয়তের সত্যতার যেসব প্রমাণ রয়েছে, সে বিষয়ে যদি তারা পূর্ণভাবে অবহিত না হতো, তাহলে তারা নিশ্চয়ই পিছনে ফিরে যেত না। বরং তারা দ্রুততার সাথে এগিয়ে এসে দেখাত যে— না, তাদের কিতাবে তেমন কিছু নেই। এভাবে তারা মুহাম্মাদ (স)-এর দাবিকে বাতিল প্রমাণ করতে পারত। তাই যখন তারা পশ্চাদপসরণ করল, রাসূলের দাবিকে চ্যালেঞ্জ করল না, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে. তাদের কিতাবে কি আছে, তা তারা খুব ভালো ভাবেই জানত। এ ব্যাপারটিরই দৃষ্টান্ত হচ্ছে আরবদের প্রতি আল্লাহ্‌র দেয়া চ্যালেঞ্জ। বারবার বলা হয়েছে, কুরআন যদি হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নিজের রচিত বলে ধারণা করে থাক, তাহলে তোমরা তো সেই আরবীরই বড় বড় কবি, সাহিত্যিক, তোমরাও অনুরূপ কালাম রচনা করে পেশ কর। কিন্তু তারা সে চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করেনি। তার পরিবর্তে তারা মারামারি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে শুরু করল। কেননা তারা ভালো করেই জানে যে, কুরআনের মত কালাম রচনা করতে তারা কখনই সক্ষম হবে না। আল্লাহ্ নাজরানের খ্রীস্টানদেরকে মুকাবিলা করার জন্যে ডেকেছিলেন। বলেছিলেন ঃ

فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ -

বল, আস, আমরা আমাদের পুত্র ও তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের স্ত্রীদের ডাকি ..... (সূরা আলে ইমরান ঃ ৬১)

এর শেষে বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ -

অতঃপর আমরা কাতর কণ্ঠে কাঁদব এবং তারপর আমাদের মধ্যে মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্ লানত হওয়ার দো'আ করব। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৬১)

তখন নবী করীম (স) বলেছিলেন, ওরা যদি উপস্থিত হয় এবং মুবাহিলা করে, তাহলে আল্লাহ্ উপাত্যকাকে নিশ্চয়ই আগুনে ভরে দিতেন এবং তারা তাদের পরিবারবর্গের নিকট ফিরে যেতে পারত না।

এসব ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে নবী করীম (স)-এর নবুয়তের সত্যতাই প্রমাণিত হয়। নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল ছিলেন।

হাসান ও কাতাদাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ 'আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতিও আহুত হচ্ছে এ কথায় যে কিতাব রয়েছে, তা কুরআন বোঝায়। কেননা দ্বীনের মৌলনীতি, শরীয়াতের বিধান এবং আগে কিতাবসমূহে রাসূলের গুণ-সিফাত যা-ই উল্লিখিত রয়েছে, তাতে তওরাত কুরআনের

মধ্যে পূর্ণ সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ্‌র কিতাবের দিকে ডাকার আরও অনেক তাৎপর্য হতে পারে। রাসূলে করীম (স)-এর নবুয়ত-ও হতে পারে— যেমন এইমাত্র বললাম। ইবরাহীম (আ)-এর ব্যাপারও হতে পারে। কেননা তিনিও ইসলামের নবী ছিলেন, ইসলাম-ই ছিল তাঁর দ্বীন। শরীয়াতের 'হদ্দ' ইত্যাদি দণ্ডও তার অর্থ হতে পারে। যেমন নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি আহ্‌লি কিতাবের কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গমন করেছিলেন এবং তাদেরকে যিনাকারের দণ্ড কি, জিজ্ঞাসা করেছিলেন। জবাবে তারা বলেছিল, শাস্তি হচ্ছে জুতা মারা, উত্তপ্ত করা। প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা 'রজম'-এর কথা গোপন রেখেছিল। তারা কিতাব পড়তে পড়তে 'রজম'-এর আয়াতটির স্থানে এলে নবী করীম (স) থামিয়ে দিলেন। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম উপস্থিত ছিলেন। কাজেই উক্ত 'কিতাব' শব্দটির অর্থ এ সবই হতে পারে। এ সবের প্রত্যেকটির দিকেই তাদেরকে ডাকার কথা এখানে বলা হয়ে থাকতে পারে। এ আয়াতে এ প্রমাণও রয়েছে যে, যে লোক তার প্রতিপক্ষকে শরীয়াতের হুকুম পালনের জন্যে ডাকলে সেই ডাকে সাড়া দেয়া তার কর্তব্য। কেননা এ ডাক তো আল্লাহ্‌র কিতাবের দিকে আসার ডাক। এ আয়াতটিও এ পর্যায়ের ঃ

وَاِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ –

যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় জনগণের পরস্পরের মধ্যে বিচার করা ও হুকুম জারি করার জন্যে তখন তাদের মধ্যের কিছু লোক পাশ কাটিয়ে থাকে।

(সূরা নূর ঃ ৪৮)

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ –

বল ঃ হে আমাদের আল্লাহ ! তুমি-ই দেশ ও রাজ্যের মালিক। তুমি যাকে চাও শাসনকর্তৃত্ব দান কর আর যার হাত থেকে তুমি চাও সে কর্তৃত্ব কেড়ে নাও। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ২৬)

'মূল্‌ক-এর মালিক' এমন একটা গুণগত ব্যাপার, যা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ-ই পাওয়ার অধিকারী নয়। আর তিনিই সমগ্র মালিক— দেশ ও রাজ্যের উপর কর্তৃত্ব সার্বভৌমত্বের নিরংকুশ মালিক। কেউ কেউ বলেছেন ঃ দুনিয়া-আখিরাতের সমস্ত কর্তৃত্বের তিনি মালিক। আবার বান্দাগণের মালিক-ও বলেছেন কেউ কেউ। তারা যে সব জিনিসেরই মালিক হয়েছে, তারও মালিক তিনি। মুজাহিদ বলেছেন, মূল্‌ক' বলতে এখানে নবুয়ত বুঝিয়েছেন। "তুমিই 'মূল্‌ক' দাও যাকে তুমি চাও"-এর দুটি অর্থ হতে পারে। একটি, ধন-মাল ও জনগণের উপর মালিকানা। আল্লাহ্ তা মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সবাইকে দিতে পারেন, দিয়ে থাকেন। আর দ্বিতীয় হল ব্যবস্থাপনা ও শাসন-প্রশাসনিক কর্তৃত্ব। এ ব্যাপারটি কেবল মাত্র মুসলমানদের জন্যে নির্দিষ্ট, সে মুসলিম, যে পূর্ণাঙ্গ ন্যায় বিচারবাদী। কাফির ও ফাসিক লোকেরা তো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কোনক্রমে পেতে পারে না। মুসলিম উম্মাকে শাসন করা ও তাদের সামষ্টিক ব্যবস্থা পরিচালনার কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ সম্বলিত বিধানের সাথে সম্পর্কিত ব্যাপার। তাই তা কাফির ও ফাসিকের উপর ছেড়ে দেয়া যায় না। এরূপ পরিচিতি যার, সে কখনই মুসলমানদের উপর শাসন কর্তৃত্ব লাভ করতে পারে না। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ

لَايَنَالُ عَهْدِ الظّٰلِمِيْنَ -

আমার দেয়া কর্তত্ব জালিম লোকেরা পেতে পারে না। (সূরা বাকারা ঃ ১২৪)

যদি প্রশ্ন করা হয়, আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْ حَاۤجَّ اِبْرَاهِمَ فِىْ رَبِّهٖۤ اَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ -

তুমি কি বিবেচনা করে দেখেছ সেই ব্যক্তি সম্পর্কে, যে ইবরাহীমের সাথে তার রব্ব-এর ব্যাপার নিয়ে বিতর্ক করেছিল শুধু এ কারণে যে, আল্লাহ্ তাকে 'মূল্‌ক' দান করেছেন? (সূরা বাকারা ঃ ২৫৮)

এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্ নিজেই নমরুদ কাফিরকে রাজ্য শাসনের কর্তৃত্ব দিয়েছেন। তাহলে দুই ধরনের কথা হল— এর মধ্যে সঙ্গতি সাধন কিভাবে সম্ভব? এর একটা জবাব এই দেয়া হয়েছে যে, হতে পারে, এ আয়াতে 'মূলক' বলতে কাফিরকে ধন-মাল দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এ জবাবও দেয়া হয়েছে যে, এ আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে নবুয়ত দেয়ার কথা বলা হয়েছে এবং তা-ই হচ্ছে ইবরাহীম (আ) ও নমরুদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের কারণ। কেননা ইবরাহীম (আ) শরীয়াতের বিধান অনুযায়ী আদেশ-নিষেধের কাজ করতেন।[১]

আল্লাহ্র কথা ঃ

لَايَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ -

মুমিন লোকেরা কাফিরদিগকে মুমিনদের পরিবর্তে— বন্ধু বা পৃষ্ঠপোষক বা নেতা ও কর্তারূপে কখনই গ্রহণ করবে না।

এ আয়াতে কাফিরদিগকে অলী, বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক, কর্তারূপে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা অলী-ই কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। এ দৃষ্টিতে এ কথাটি নিষেধ বাণী, কোন সংবাদ প্রদান নয়। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আল্লাহ্ এ আয়াতের মাধ্যমে মুমিনদিগকে কাফিরদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসতে নিষেধ করেছেন। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এ আয়াত ঃ

لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَأْلُوْنَكُمْ خَبَالاً -

মুমিনরা! তোমরা তোমাদের নিজেদের ছাড়া অন্যদেরকে গোপন সম্পর্কশীল বানাবে না, তারা তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত করতে কসুর করবে না। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১১৮)

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

لَاتَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْاۤ اٰبَاءَ هُمْ اَوْ اَبْنَاۤءَ هُمْ -

---

১. এ অর্থও হতে পারে যে, কাফির-ফাসিক ব্যক্তি মুসলিম উম্মত শাসন করার সুযোগ পেলেও তাতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি থাকতে পারে না। তার এ ক্ষমতা আল্লাহ্র বিশ্ব-ব্যবস্থা পরিচালনার মাশিয়্যাত অনুযায়ী মাত্র। আল্লাহ্র রিজা (رضا) অনুযায়ী নয়।

—৩/৪

তোমরা এমন জনগোষ্ঠী পাবে না, যারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে সেই লোকদের সাথে বন্ধুত্ব পোষণ করে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে শত্রুতামূলক মুকাবিলা করছে, তারা তাদের পিতা-দাদা-চাচা কিংবা তাদের পুত্র, পৌত্র, বংশধর হলেও।
(সূরা মুযাদালা ঃ ২২)

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ -

উপদেশ নসীহত সমাপ্ত হওয়ার পর জালিম লোকদের সাথে একত্রিত ও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসো না। (সূরা আন'আম ঃ ৬৮)

বলেছেন ঃ

فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖٓ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ -

তোমরা তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসবে না যতক্ষণ তারা অন্য কথায় মশগুল বা ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে থাকবে। যদি বসো, তাহলে তোমরাও তখন তাদের মতই হয়ে যাবে।
(সূরা নিসা ঃ ১৪০)

আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ -

তোমরা জালিম লোকদের প্রতি আন্তরিকভাবে আকৃষ্ট হবে না, ঝুঁকে পড়বে না। অন্যথায় আগুন তোমাদেরকে গ্রাস করবে। (সূরা হুদ ঃ ১১৩)

বলেছেন ঃ

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا -

যারা আমার দ্বীন থেকে ভিন্নমুখী হয়েছে— ফিরে গেছে এবং বৈষয়িক জীবন ছাড়া আর কিছু তাদের লক্ষভূত নয়, তুমি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। (সূরা নজম ঃ ২৯)

বলেছেন ঃ

وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ -

এবং মূর্খ— দ্বীন জানে না— এমন লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।
(সূরা 'আরাফ ঃ ১৯৯)

বলেছেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ -

হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর এবং তাদের উপর রূঢ় ও কঠোর হও।
(সূরা তওবা ঃ ৭৩)

বলেছেন ঃ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ -

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা ইয়াহূদী ও খ্রীস্টানদিগকে অলী, বন্ধু, পৃষ্ঠপোষকরূপে গ্রহণ করবে না। আসলে ওরাই পরস্পরের বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক। (সূরা মায়িদা ঃ ৫১)

বলেছেন ঃ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَامَتَّعْنَابِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ -

আর চোখ তুলেও তাকাবে না সে সব জাকজমকপূর্ণ দ্রব্যসামগ্রীর দিকে, যা আমরা ওদের মধ্যের বিভিন্ন লোকদের দিয়েছি শুধু তাদের পরীক্ষায় ফেলে যাচাই করার উদ্দেশ্যে।
(সূরা ত্ব-হা ঃ ১৩১)

এসব আয়াতে ইসলাম বিরোধীদের সাথে উঠাবসা ও ঘনিষ্ঠতা করতে নিষেধ করার পর তাদের বিপুল ধন-মাল ও দুনিয়ার জাঁকজঁমকপূর্ণ জীবনধারার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতেও নিষেধ করা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) বনুল-মুস্তালিক গোত্রের উটগুলো নিয়ে গেলেন। চর্বির কারণে উটগুলোর চানা শুকিয়ে গিয়েছিল। তিনি তা তাঁর কাপড় দিয়ে মুছে ফেলে ছিলেন এবং চলে গেলেন উপরোক্ত আয়াতের কারণে।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ -

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু-পৃষ্ঠপোষকরূপে গ্রহণ করো না যে, তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুতাই দিতে থাকবে। (সূরা মুমতাহানা ঃ ১)

নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

اَنَا بَرِئٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ -

আমি মুশরিকের সাথে অবস্থানকারী প্রত্যেক মুসলিমের সাথে নিঃসম্পর্ক ও দায়িত্বমুক্ত।

একথা শুনে প্রশ্ন করা হল, তা কেন হে রাসূল ? বললেন ঃ

لَا تَرَاءَ نَارُهُمَا -

ওদের দুজনাকে আগুন গ্রাস করবে।[১]

১. অর্থাৎ মুশরিককে জ্বালাবার আগুন মুসলিমকেও গ্রাস করবে। এ কারণে মুশরিকের পাশের ঘরে মুসলিমের থাকা উচিত নয়। দুজনার বসত ঘর দূরে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয় এবং সেখানে মুসলিমের অবস্থান করা উচিত নয়, যেখানে মুশরিক আগুন জ্বালাতেন, তা মুসলমানের ঘর পেয়ে যায়। বরং মুসলমান মুসলমানের সাথে বাস করবে। মুশরিকের প্রতিবেশি হওয়া পছন্দনীয় নয়। কেননা ওদের বিশ্বাস নেই, ওদের জন্যে কোন নিরাপত্তাও নেই (النهاية)

অপর হাদীসে রাসূল (স)-এর কথা ঃ

أَنَا بَرِئٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ أَقَامَ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِيْنَ -

মুশরিকদের সঙ্গে মিলে-মিশে বাস করা মুসলমানের কারোর দায়িত্ব আমি গ্রহণ করছি না। আমি তার সম্পর্কে দায়িত্বমুক্ত।

এ আয়াত ও হাদীসসমূহ প্রমাণ করে যে, কাফিরদের সাথে মুসলমানদের কঠোর ও নির্মম ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। বন্ধুতা-আন্তরিকতা-ঘনিষ্ঠতা করা উচিত নয়। এ নীতি ততদিন যতদিন তার দ্বারা জীবন বিনষ্ট হওয়ার বা অঙ্গহানি হওয়ার বা বড় কোন ক্ষতি সাধিত হওয়ার ভয় মনে জাগ্রত থাকবে। সে ভয় না থাকলে তাদের সাথে উঠা-বসা, চলাফেরা বা বসবাস করা জায়েয— আকীদা তাদের শুদ্ধ না হলেও।

আনুগত্য ও আন্তরিক সম্পর্কে দু'টি দিক। একটি— যে লোক এমন লোকের দায়িত্ব নেয় যারা তার কাজে সন্তুষ্ট, তার সাহায্য-সহযোগিতা ও সুপরিচিতি রক্ষা করা। এ জিনিসকে বলা হয় সাহায্য-সহযোগিতার বন্ধুত্ব আনুগত্য। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا -

আল্লাহ্ ঈমানদার লোকদের অলী-বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক। (সূরা বাকারা ঃ ২৫৭)

অর্থাৎ তিনিই তাদের সাহায্যের জন্যে দায়িত্বশীল। আর 'মুমিনরা আল্লাহ্র অলী' অর্থ তারা আল্লাহ্র সাহায্যপ্রাপ্ত, আল্লাহ্র কাজে এগিয়ে আসা লোক।

আল্লাহ বলেছেন ঃ

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ -

জেনে রাখ, আল্লাহ্র অলী, পৃষ্ঠপোষক, সাহায্যকারীদের কোন ভয় নেই, নেই দুঃখ-দুশ্চিন্তার কোন কারণ। (সূরা ইউনুস ঃ ৬২)

আল্লাহ্র কথা ঃ

اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰةً -

তবে তোমরা যদি ওদের ব্যাপারে ভয় পাও এবং কিছুটা আত্মরক্ষা করতে চাও।

এখানে যে ভয়-এর কথা বলা হয়েছে, তা হল প্রাণ বিনষ্ট হওয়ার ভয় বা কোন অঙ্গ নষ্ট হওয়ার ভয়। তখন ওদের প্রতি বন্ধুত্ব প্রকাশ করে বাঁচতে চাও ওদের আকীদা গ্রহণ না করেই। আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের ভিত্তিতেই এ তাৎপর্য বলা হল। ইসলামে বিশেষজ্ঞ জমহুর এ তাৎপর্যই বলেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আল-মরওয়াজী আমাদের নিকট আল-হাসান ইবনে আবূ রুবাই, আল-জুরজানী, আবদুর রাযযাক, মামার, কাতাদাহ সূত্রে আল্লাহ্র এ কথাটির তাৎপর্যে বলেছেন ঃ

لَايَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ -

মুমিন তার দ্বীনের ব্যাপারে কাফিরকে বন্ধু পৃষ্ঠপোষক বানাতে পারবে না, তা নিষিদ্ধ।

(আর এর পরবর্তী কথার তাৎপর্য হিসেবে বলেছেন) তবে এ দুজনের মধ্যে যদি কোনরূপ নৈকট্য থেকে থাকে, তাহলে তাকে তার সাথে সম্পর্কে পৌছিয়ে দেবে। কাফিরের নৈকট্যের এটাই একমাত্র যোগসূত্র এবং তার সাহায্যে আত্মরক্ষা করা যেতে পারে। আত্মরক্ষার জন্যে প্রয়োজন হলে কুফর প্রকাশ করা জায়েয, একথা এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়।

এর দৃষ্টান্তের আর একটি আয়াত হল ঃ

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ -

অর্থাৎ ঈমান গ্রহণের পর হৃদয় যদি ঈমানের উপর অবিচল ও দৃঢ় স্থিতিশীল থাকে, তখন কুফরি প্রকাশ করতে মজবুর ও বাধ্য হলেও এবং তা প্রকাশ করলেও কোন দোষ হবে না, যদি শুধু নিজেকে মৃত্যু ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যেই তা করা হয়। এরূপ অবস্থায় কুফর প্রকাশ করার সুযোগ আল্লাহ্‌র দেয়া একটা রুখসত মাত্র। তা করা কিন্তু মোটেই ওয়াজিব নয় শরীয়াতের দিক দিয়ে। বরং 'তাকীয়া'র এ নীতি গ্রহণ না করাই ঈমানদার ব্যক্তির জন্যে উত্তম মর্যাদার কাজ।

কুফর প্রকাশ করতে বাধ্য লোক সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ বলেছেন, সে যদি তা করতে রাজি না হয় এবং এর ফলে নিহত হয়, তাহলে সে উত্তম মর্যাদাভিষিক্ত হবে সে ব্যক্তির তুলনায় যে তা করেছে। কেননা সে ঈমানের দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে।

হযরত যুবায়র ইবনে আজী (রা)-কে মুশরিকরা পাকড়াও করলে তিনি তাকীয়ার এ পথ অবলম্বন করেননি। ফলে তিনি নিহত ও শহীদ হন। এজন্যে তিনি মুসলমানদের নিকট অধিক মর্যাদাবান বিবেচিত হয়েছিলেন। কিন্তু আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা) এরূপ অবস্থায় পড়ে কুফর প্রকাশ করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলে তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তখন তোমার মনে অবস্থা কি ছিল ? বললেন, ঈমানের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ ওরা যদি আবার সেরূপ করে তাহলে তুমিও তাই করবে। মোট কথা, শরীয়াতে এরূপ করার অনুমতি— রুখসত— আছে।

বর্ণিত হয়েছে; মুসায়লিমাতাল কায্যাব নবী করীম (স)-এর দুজন সাহাবীকে পাকড়াও করে। তাঁদের একজনকে জিজ্ঞাসা করে, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্‌র রাসূল! তুমি কি এ সাক্ষ্য দাও ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবার জিজ্ঞাসা করল, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল, এ সাক্ষ্য কি তুমি দাও ? বললেন, হ্যাঁ। তখন তাকে ছেড়ে দেয়। পরে অন্য জনকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করে ঃ মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্‌র রাসূল, তুমি কি এ সাক্ষ্য দাও ? বললেন ঃ হ্যাঁ। পরে জিজ্ঞাসা করল ঃ আমি আল্লাহ্‌র রাসূল, তুমি কি তার সাক্ষ্য দাও ? তিনি বললেন, আমি বধির। তিনি তিনবার এ কথাটি বললেন। তখন সে তার গর্দার কেটে দেয়, হত্যা করে। এ সংবাদ রাসূলে করীম (স)-কে বললে তিনি বললেন ঃ 'এ নিহত ব্যক্তি নিজের ঈমানী সত্যতা ও প্রত্যয়ের দৃঢ়তা নিয়ে চলে গেছে এবং একটা মর্যাদার অধিকারী হয়েছে। এ জন্যে তিনি তাকে মুবারকবাদ দিলেন।

আর অপর জন আল্লাহ্‌র দেয়া রুখসত কবুল করেছে। কাজেই তার সম্পর্কে কিছুই বলার নেই।

এ বর্ণনায় প্রমাণিত হল, এরূপ অবস্থায় 'তাকীয়া' করার অনুমতি আছে। তবে তাকীয়া না করা-ই উত্তম। যে যে ব্যাপারে দ্বীন ইসলামে ইয্‌যত বৃদ্ধি পায়, তা করা এবং সে জন্যে নিহত হতেও রাজি হওয়াকে হানাফী ফিকাহবিদগণ উত্তম বলেছেন রুখসতের নীতি গ্রহণের পরিবর্তে। কেননা তাতে ঈমানের পরিপন্থী কাজের আশ্রয় লওয়া হয়। লক্ষণীয়, যে লোক দ্বীনের দুশমনের সঙ্গে জিহাদ করে নিজের জীবন নিঃশেষ করে দিল, সে তো জিহাদ থেকে সরে থাকা ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম বিবেচিত হবেই, এভাবে নিহত হয়ে যারা শহীদ হয়, আল্লাহ্‌ তাদের উচ্চ প্রশংসা করেছেন, তাদের উন্নত অবস্থার কথা বলেছেন। তারা জীবিত, আল্লাহ্‌র নিকট রিযিকপ্রাপ্ত হচ্ছে। কুরআনেই বলা হয়েছেঃ দ্বীন ইসলাম প্রচার ও বিজয়ীকরণ সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া ও কুফর প্রচার ও বিজয়ের পথ পরিহার করা অতীব উত্তম কাজ— 'তাকীয়া' নীতি গ্রহণের তুলনায়।

আলোচ্য আয়াত এবং এ পর্যায়ের অন্যান্য আয়াত প্রমাণ করে যে, মুসলমানের উপর কাফিরের কোন ব্যাপারেই কর্তৃত্ব থাকতে পারে না। কোন মুসলমানের অল্প বয়স্ক পুত্র তার মা'র ইসলাম গ্রহণের দরুন ইয়াতীম-ও হয়, তাহলেও কোন কাফির তার 'অলী' বা অভিভাবক হতে পারবে না, কাজকর্ম ও বিষয়ে দেয়া ও অন্যান্য কোন ব্যাপারে। এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, যিম্মী একজন মুসলমানের হত্যাপরাধের 'আকিলা' দেবে না, মুসলমানও 'আকিলা' দেবে না যিম্মীর হত্যাপরাধের কারণে। কেননা এটাও অভিভাবকত্বের কাজ।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاٰلَ اِبْـرَاهِـيْـمَ وَاٰلَ عِـمْـرَانَ -

ইবনে আব্বাস (রা) ও আল-হাসান থেকে বর্ণিত, আল-ইবরাহীম হচ্ছে সে সব মুমিন যারা তাঁর দ্বীনের প্রতি ঈমানদার। আল-হাসান বলেছেন, আল-ইমরান ঈসা-মসীহ্‌। কেননা তিনি ইমরান-কন্যা মরিয়মের পুত্র। অবশ্য এ-ও বলা হয়েছে যে, আল-ইমরানই আল ইবরাহীম। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ —ওরা পরস্পরের সন্তান। তাঁরা হচ্ছেন, মূসা ও হারুন (আ)— ইমরানের দুই পুত্র। হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, আল-আ-ল ও আহ্‌লি বায়ত একই অর্থবোধক। যেমন কেউ যদি 'অমুকের আল-এর জন্যে অসিয়ত করে, তাহলে তার অর্থ হবে 'অমুকের আহলি বায়ত। দাদার দিক দিয়ে একই বংশের লোকেরা তাতে গণ্য হবে পিতৃবংশের দিক দিয়ে। যেমন বলা হয় ঃ আল-নবী (স) আহলি বায়ত। এ দু'টি কথা একই তাৎপর্য প্রকাশ করে। তাঁরা বলেছেন, 'আল' যার সাথে সম্পর্কিত, সে এর মধ্যে নয়। যেমন আমরা বলি ঃ আল-আব্বাস বা আল-আলী। এর অর্থ আব্বাসের সন্তানগণ, আলীর সন্তানগণ, যারা বংশের দিক দিয়ে পৈতৃক সূত্রে এ দুজনের সাথে সম্পর্কিত। এটাই প্রচলিত ও পরিচিত।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ -

পরস্পরের কাচ্চা-বাচ্চা।

হাসান ও কাতাদাহ্ থেকে বর্ণিত, ওরা দ্বীনের সাহায্য কাজে পরস্পর সহযোগী। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ -

মুনাফিকরা গুমরাহীতে একত্রিত ও পরস্পরের সহযোগী। (সূরা তওবা ঃ ৬৭)

وَالْمُؤْمِنُوْنَ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ -

মুমিনরা হেদায়েতের পথে একত্রিত, ঐক্যবদ্ধ, পরস্পরের সহযোগী। (সূরা তওবা ঃ ৭১)

বলেছেন, পরস্পরের বাচ্চা-কাচ্চা অর্থ, বংশধারায় সম্পর্কযুক্ত। কেননা তারা সকলেই আদম সন্তান। পরে নূহ-এর সন্তান, তারপর ইবরাহীমের সন্তান।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اِذْ قَالَتِ امْرَاَةُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا -

হে রব্ব! আমার গর্ভে যা আছে তাকে তোমার জন্যে মানতস্বরূপ পেশ করেছি মুক্ত স্বাধীন অবস্থায়।

শ'বী থেকে বর্ণিত, তিনি উক্ত কথাটি খালিস ইবাদতের জন্যে উৎসর্গ করার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন। মুজাহিদ বলেছেন ঃ ইবাদতখানার খাদিম বানাবার মানত করেছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে জাফর ইবনুল জুরাইর বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র ইবাদত আনুগত্যের উদ্দেশ্যে দুনিয়ার ঝামেলা থেকে তাকে মুক্ত রাখার মানত করেছিলেন।

'মুহর্‌রব' বা তাহরীর শব্দটি দুটি দিককে শামিল করে। একটি মুক্ত ও আযাদ করা। আর দ্বিতীয়টি ফাসাদ উত্থান-পতন-অস্থিরতা থেকে তাকে খালাস করার কথা বলেছিলেন। 'আমি তোমার জন্যে আমার গর্ভস্থ সন্তানকে মুক্ত ও স্বাধীন করে ইবাদতের জন্যে খালেস করে ছেড়ে দেয়ার' কথা বলা হয়েছে। এ ভাবেই তাকে লালন-পালন ও বর্ধিতকরণের ওয়াদা করেছেন। তাকে কেবল সেই কাজে মশগুল করা ও অন্য কোন কাজে ব্যস্ত না করার কথা বলেছেন। তাকে যখন ইবাদতখানার খাদিম বানাতে ও আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল করার কথা বলেছেন। মূলত এসব কথা একই তাৎপর্য প্রকাশ করে। 'আমি মানত করেছি, বলে তিনি তাঁর দিক থেকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্যে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন ঃ

فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

অতএব তুমি তা আমার নিকট থেকে কবুল কর। নিঃসন্দেহে তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।

আমাদের শরীয়াতে এরূপ মানত ও উৎসর্গকরণ সহীহ্। পিতা মানত করে তার ছোট পুত্র সন্তানকে আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে পারে। ইবাদত-বন্দেগী ছাড়া তাকে অন্য কোন কাজে লাগাবে না। তাকে কুরআন শিক্ষা দেবে, ইসলামী শরীয়াত ও দ্বীনী জ্ঞান শিক্ষা দেবে। এ ধরনের মানতে কোন দোষ নেই। কেননা এর দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ সম্ভব।

'মানত করেছি তোমার জন্য' কথাটি নিজের দিক থেকে উপস্থাপন। আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যে লোক এরূপ মানত করবে, সে মানত পুরা করা তার অবশ্য কর্তব্য। এ-ও বোঝা যায় যে, মানত আসন্ন বিপদের সাথে সম্পর্কিত এবং ভবিষ্যতে করণীয়। কেননা একথা জানা যে, ইমরান-স্ত্রী সন্তান উৎসর্গ করার যে মানত করেছিলেন তা সন্তান প্রসবের পর পুরা হতে পারে, যা একান্তই ভবিষ্যতের ব্যাপার। সময় পূর্ণ হলেই মানত অনুযায়ী সন্তানকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্যে খালেস করে দেয়া সম্ভব। এ থেকে জানা যায় যে, অজ্ঞাত জিনিসের উপরও মানত করা যেতে পারে। কেননা আলোচ্য মানতটি গর্ভস্থ সন্তান— পুরুষ কি মেয়ে তা না জেনেই করা হয়েছিল। এ-ও প্রমাণিত হয় যে, সন্তানের উপর তার শিক্ষা-দীক্ষার, তার সংরক্ষণ ও প্রশিক্ষণের উপর মায়ের-ও এক ধরনের অভিভাবকত্ব আছে। তা না থাকলে ইমরানের স্ত্রীর পক্ষে এ মানত করা সম্ভব হতো না, যা তিনি তাঁর গর্ভস্থ সন্তানের বিষয়ে করেছিলেন। এ-ও প্রমাণিত হয় যে, মার অধিকার আছে তার সন্তানের নাম নির্দিষ্ট করার। মা নাম ঠিক করলে তা অবশ্যই সহীহ্ হবে— অবশ্য পিতা যদি সে নাম ঠিক করে। কেননা আলোচ্য ঘটনায় দেখা যায়, ইমরান-স্ত্রী বলেছেন ঃ

وَاِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ -

আমি তার নাম রাখলাম মরিয়ম।

আল্লাহ্ তাঁর রাখা এ নামটি মেনে নিয়েছিলেন এবং তা বহাল রেখেছিলেন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ -

তার রব্ব তা খুবই সুন্দরভাবে কবুল করলেন।

আল্লাহ্ই ভালো জানেন— ইমরান স্ত্রী তাঁর সন্তানকে বায়তুল মাকদিসে ইবাদতের জন্যে খালিস করে দেয়ার যে মানত করেছিলেন, তা আল্লাহ খুব সুন্দরভাবে কবুল করেছিলেন। অবশ্য এর পূর্বে কোন মেয়েকে এ কাজের জন্যে কখনই গ্রহণ করা হয়নি।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا -

যাকারিয়া তার (মরিয়মের) দায়িত্ব গ্রহণ করল।

অর্থাৎ মরিয়মের সাহায্য-সহযোগিতার দায়িত্ব নিয়ে নিলেন। নবী করীম (স) থেকেও এ ধরনের কথা বর্ণিত হয়েছে। বলেছেন ঃ

اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِىْ الْجَنَّةِ كَهَا تَيْنِ -

আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবকত্ব গ্রহণকারী জান্নাতে এ রকম হব।

এই বলে তিনি পাশাপাশি দুটি অঙ্গুলি দেখালেন। এর অর্থ ঃ যে লোক ইয়াতীমের সাহায্য সহযোগিতায় দায়িত্বশীল হবে, সে জান্নাতে পাশাপাশি স্থান ও মর্যাদা পাবে। শব্দটি كَفَّلَ পড়া

হলে তার অর্থ হবে, আল্লাহ্‌ই তাঁকে এ দায়িত্ব দিলেন। তিনিই মরিয়মের দেখাশুনা ও প্রয়োজনাদি পূরণ করতে নির্দেশ দিলেন। كَفَلَ ও كَفَّلَ এ দুভাবেই শব্দটি পড়া সহীহ্‌। অর্থের দিক দিয়ে কথাটি দাঁড়াবে; তিনি নিজেই এ অভিভাবকত্ব গ্রহণ করলেন। অথবা স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাঁকে এর দায়িত্বশীল বানালেন। আল্লাহ্‌র কথা ঃ

قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً -

বললেন ঃ হে রব্ব! তুমি তোমার নিকট থেকে আমার জন্যে একটি পবিত্র বাচ্চা দান কর।

এ আয়াতে 'হেবা' শব্দটির অর্থ ঃ 'মূল্য না নিয়ে কোন জিনিসের মালিক বানানো'। সাধারণ কথায় বলা হয় ঃ ওরা নিজেদের পরস্পরের মধ্যে দেয়া নেয়া করল। পুত্র দান কথাটি বোঝাবার জন্যে কালামে 'হেবা' শব্দটি পরোক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যদিও মূলত এটা 'হেবার' কোন ব্যাপার ছিল না। কেননা এখানে তাঁকে পুত্রের মালিক বানিয়ে দেয়ার দো'আ করা হয়নি। সন্তান জন্মিলে সে হয় মুক্ত, স্বাধীন। কারোর মালিকানা সম্পদে পরিণত হয় না। কিন্তু এখানে তিনি চাইলেন যে, তাঁকে একটি সন্তান খালেসভাবে দেয়া হোক, যাকে তিনি আল্লাহ্‌র ইবাদতে তাঁর নবুয়তের ও ইলমের উত্তরাধিকার হিসেবে উৎসর্গ করবেন। এ কারণে তিনি 'হেবা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন আল্লাহ জিহাদে আত্মদানকে আল্লাহ্‌র নিকট নিজকে বিক্রয় করা বলেছেন। বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ -

আল্লাহ্‌ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন তাদেরকে জান্নাত দেয়ার বিনিময়ে। (সূরা তওবা ঃ ১১১)

মুমিনদের জিহাদ করার আগে ও পরে আল্লাহই তাদের জান-মাল সবকিছুরই মালিক। তা সত্ত্বেও তিনি জিহাদে তাদের আত্মদানকে ক্রয় করা বলেছেন। তার বিনিময়ে তাদেরকে বিপুল সওয়াব দানের ওয়াদা করেছেন বলে। লোকেরা বলে ঃ অমুকের অপরাধটা আমাকে দান কর। এখানেও কোন জিনিসের মালিক বানিয়ে দেয়ার ব্যাপার নেই। ও কথার অর্থ হচ্ছে, অপরাধের শাস্তিটা বাতিল করা।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ -

সেই সন্তান হবে সাইয়্যেদ— সরদার, নারীর বিমুখ ও নেককারদের মধ্যে থেকে নবী। ....

'সাইয়্যেদ' শব্দের অর্থ সরদার বা শ্রেষ্ঠ। বোঝা যায়, এ শব্দটি আল্লাহ্‌ ছাড়া মানুষ সম্পর্কেও ব্যবহার করা যায়, কেননা আল্লাহ্‌ নিজেই হযরত ইয়াহইয়া (আ) সম্পর্কে এ শব্দটির ব্যবহার করেছেন। অথচ 'সাইয়্যেদ' তো তাকেই বলে যার আনুগত্য করা কর্তব্য। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, সাহাবী হযরত সাদ ইবনে মুয়ায (রা) যখন তাঁর ও বনী কুরায়শ গোত্রের মধ্যে সালিসী করার জন্যে এসেছিলেন, তখন নবী করীম (স) বলেছিলেন ঃ

قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ -

তোমরা তোমাদের সাইয়্যেদ বা নেতার সম্মানে দাঁড়িয়ে যাও।

নবী করীম (স) হযরত হাসান (রা) সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ

اِنَّ ابْنِيْ هٰذَا سَيِّدٌ -

আমার পৌত্র-দৌহিত্র সাইয়্যেদ।

বনু সালমা গোত্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমাদের সাইয়্যেদ— নেতা— কে, হে বনু সালমা ? জবাবে তারা বলেছিল, হুর ইবনে কায়স আমাদের সাইয়্যেদ। তিনি বলেন, না, বরং তোমাদের সাইয়্যেদ সাদা-কোকড়া চুল বিশিষ্ট আমর ইবনে জুমূহ। এসব থেকেই প্রমাণিত হয় যে, যার আনুগত্য করা হয়— করা বাধ্যতামূলক হয়, সে-ই সাইয়্যেদ বা নেতা। যে শুধু মালিক বা বাদশাহ, সে-ই সাইয়্যেদ নয়। কেননা তা যদি হতো, তাহলে 'গরুর সাইয়্যেদ' বা 'কাপড়ের' সাইয়্যেদ, বলা হতো, কিন্তু তা বলা হয় না, বলা ঠিকও নয়। যদি বান্দার 'সাইয়্যেদ' বলা হয়।

এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, বনু আমের গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়েছিল। তারা এসে বলল ঃ 'আপনি আমাদের 'সাইয়্যেদ' এবং আপনি আমাদের প্রতিদানশীল। জবাবে নবী করীম (স) বললেন ঃ সাইয়্যেদ তো মহান আল্লাহ। তোমরা তোমাদের ভাষায় ওধরনে কথা বল, শয়তান যেন তোমাদেরকে প্ররোচিত না করে অথবা নবী করীম (স) সমস্ত বনী আদমের সর্বোত্তম সাইয়্যেদ ছিলেন। কিন্তু ওদেরকে দেখলেন, ওরা কৃত্রিমতা করছে, সেই কারণে তিনি উক্তরূপ কথা বলেছিলেন। এবং ওদের কথাকে অগ্রাহ্য করেছিলেন। একটি হাদীসে রাসূলে করীম (স)-এর এ পর্যায়ের কথা উদ্ধৃত হয়েছে। হাদীসটি এই ঃ

اِنَّ اَبْغَضَكُمْ اِلَىَّ الثَّرْثَارُوْنَ الْمُتَشَدِّقُوْنَ الْمُتَفَيْهِقُوْنَ -

যারা দ্রুত আবোল-তাবোল কথা বলে, মুখের মধ্যে রেখে কথা বলে, যা ঠিকভাবে উচ্চারিত হয় না, কৃত্রিমভাবে বাড়াবাড়ি করে কথা বলে, তারা আমার নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত ব্যক্তি।

এ কারণে বনু আমরের লোকদেরকে ঐরূপ বলেছিলেন। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ তোমরা মুনাফিককে সাইয়্যেদ বলবে না। কেননা সে যদি সাইয়্যেদ হয়, তাহলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি মুনাফিককে সাইয়্যেদ বলতে এ কারণে নিষেধ করেছেন। কেননা মুনাফিক নেতা হলে তার আনুগত্য করা ওয়াজিব হবে না।

যদি প্রশ্ন করা হয়, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا -

হে আমাদের রব্ব! আমরা তো আমাদের সরদার নেতাদের ও আমাদের মধ্যে বড় লোকদের আনুগত্য ও অনুসরণ করেছি ....। (সূরা আহযাব ঃ ৬৭)

এ আয়াতে গুমরাহ লোকদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা সরদার বা সাইয়্যেদ বলেছেন। তা কি করে বলা হল ?

জবাবে বলা যাবে, আল্লাহ তাদেরকে সাইয়্যেদ বলেছেন এজন্যে যে, ওরা নিজেরাই গুমরাহ্কারী লোকদিগকে উচ্চ মর্যাদায় বসিয়েছিল এবং কর্তব্য হিসেবে তাদের আনুগত্য করেছিল, যদিও প্রকৃতপক্ষে তারা নেতা— সরদার হওয়ার ও আনুগত্য পাওয়ার যোগ্য ছিল না, তার অধিকারীও ছিল না। অথচ ওদের ধারণায় তারাই ছিল ওদের সরদার— নেতা। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَمَآ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ -

ওরা যাদেরকে ইলাহ্ বানিয়েছিল, তারা ওদেরকে রক্ষা করতে পারেনি। (সূরা হুদ ঃ ১০১)

এ আয়াতে ওদের বানানো ইলাহ্কে আল্লাহ্-ও ইলাহ্ বলেছেন, যদিও ওরা প্রকৃতপক্ষে ইলাহ্ নয়। আল্লাহ্ ওদের বলা কথাকেই হুবহু উদ্ধৃত করেছেন। তিনি নিজে ওদেরকে 'ইলাহ' বলেন নি।

আল্লাহ্র কথা ঃ

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ اٰيَةً قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا -

বলল ঃ হে রব্ব! তুমি আমার জন্যে একটি চিহ্ন ঠিক করে দাও। বললেন, তোমার চিহ্ন হল, তুমি লোকদের সাথে তিন দিন পর্যন্ত কেবল ইশারা-ইঙ্গিতে কথা বলবে।

বলা হয়, হযরত যাকারিয়া তার স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চার হওয়ার একটা আলামত চেয়েছিলেন, যেন সেই আলামত দেখে তিনি আনন্দ ও সুখ লাভ করতে পারেন। তখন তাঁর মুখের উপর বন্ধন চাপিয়ে দেন। তিনি লোকদের সাথে কেবল ইশারায় কথা বলতে পারতেন। হাসান, রবী ইবনে আনাস ও কাতাদাহ থেকে এ বর্ণনাটি বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে ইঙ্গিতে কথা বলার মিয়াদ স্বরূপ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ তিন দিনের উল্লেখ আছে। সূরা মরিয়মের আয়াতে এ ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গেও ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا সমান তিনটি রাতির উল্লেখ করা হয়েছে। একটি আয়াতে দিনের সংখ্যা বলা হয়েছে। আর অপর আয়াতে রাতের সংখ্যা বলা হয়েছে। এতে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, দুটি সংখ্যার কোন একটি— সমস্ত থেকে— ব্যবহারের সময় তার পরিমাণটা শেষ সময়ে বোঝা যায়। অর্থাৎ শেষ সময়টিও তার মধ্যে মনে করতে হবে। এ কারণে তিনদিন বললে তার সাথে তিন রাতও বুঝতে হবে। অনুরূপভাবে তিন রাত বললে তার সাথে তিন দিন-ও শামিল করতে হবে। লক্ষণীয়, এ দুটির মধ্যে পার্থক্য করার ইচ্ছা হলে প্রত্যেকটিকে আলাদা করে উল্লেখ করা হয়। যেমন বলা হয়েছে ঃ

سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْمًا -

সাত রাত ও আট দিন লাগাতার। (সূরা হাক্কাহ ঃ ৭)

যদি শুধু প্রথম সংখ্যাটাই বলা হতো, তা থেকে তার শেষ পর্যন্ত সাত দিনও বুঝতেই হতো।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ –

ফেরেশতা যখন বলল ঃ হে মরিয়ম! আল্লাহ তোমাকে পছন্দ করেছেন এবং তোমাকে পবিত্র করেছেন। আর সমকালীন বিশ্ব নারীকুলের উপর তোমাকে অধিক মর্যাদাবান বানিয়েছেন।

اصطفك। অর্থ, তাঁর সময়-কালের নারীকুলের উপর তাঁকে অধিক মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। এ কথা হাসান ও ইবনে জুরাইয থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাঁকে ছাড়া এর অর্থ বলেছেন, বিশ্ব নারীকুলের উপর তাঁকে অধিক মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন ঈসা মসীহ্ (আ)-এর তাঁর গর্ভে জন্ম হওয়ার কারণে। হাসান ও মুজাহিদ বলেছেন ঃ তোমাকে পবিত্র করেছেন ঈমান অস্বীকার করার গুনাহ থেকে।

আবূ বকর (র) বলেছেন, এটা সমর্থনযোগ্য। কাফিরকে ময়লা অপবিত্র বলে অভিহিত করা যেমন সমর্থনযোগ্য তাদের কুফর-এর কারণে। মুশরিকদেরও নাপাক বলা হয়েছে ঃ

اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ –

মুশরিকরা না-পাক, ময়লা। (সূরা তওবা ঃ ২৮)

কুফর-এর ময়লা-ই বোঝানো হয়েছে। 'তোমাকে পবিত্র করেছেন' কথাটিতেও সেই অর্থ হবে; কুফর-এর ময়লা থেকে পবিত্র করে ঈমানের পবিত্রতায় ভূষিত করেছেন।

নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِنَجَسٍ –

মুমিনরা ময়লা বা অপবিত্র নয়।

অর্থাৎ কুফরির ময়লা তাদের মধ্যে নেই। এ আয়াতটিতেও এ কথা-ই বলা হয়েছে ঃ

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا –

হে ঘরের লোকজন! আল্লাহ তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করে দিতে এবং তোমাদের সার্থকভাবে পবিত্র করতে চান। (আল-আহযাব ঃ ৩৩)

এ আয়াতে যে পবিত্রতার কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে ঈমান ও ইবাদত-বন্দেগীর পবিত্রতা। এ-ও বলা হয়েছে যে, উক্ত কথার অর্থ হল, তোমাকে হায়য-নিফাস ইত্যাদির সমস্ত মলিনতা থেকে পবিত্র করেছেন। ফেরেশতারা মরিয়মকে পবিত্র করা প্রসঙ্গে যা বলেছেন, তার তাৎপর্য সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি তো নবী ছিলেন না। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ –

হে মুহাম্মাদ! আপনার পূর্বে কেবলমাত্র পুরুষদেরকেই রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি, যাদের প্রতি আমরা অহী নাযিল করতাম। (সূরা ইউসুফ ঃ ১০৯)

একজন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, ও গোটা ব্যাপারই যাকারিয়া নবী (আ)-এর মুজিযা ছিল। অন্যরা বলেছেন ঃ হযরত মসীহ্ (আ)-এর নবুয়ত স্ফুলিঙ্গের ন্যায় প্রমাণ করা ও মেঘের ছায়া ফেলার জন্যে এরূপ কথা বলা হয়েছে। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে নবুয়ত দানের পূর্বের ব্যাপার নিয়ে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ -

হে মরিয়ম। তোমার রব্ব-এর জন্যে বিনয়-অবনত হও, সিজদা কর এবং রুকূকারীদের সাথে একত্রিত হয়ে রুকূ কর।

সাঈদ বলেছেন, এর অর্থ তোমার রব্ব-এর জন্যে খালেস— একনিষ্ঠ হও। কাতাদাহ বলেছেন, এ কথার অর্থ ঃ ইবাদতকে চিরস্থায়ী ও সার্বক্ষণিক বানাও। মুজাহিদ বলেছেন, নামাযে দাঁড়ানোকে দীর্ঘ কর। قُنُوتٌ শব্দের অর্থ, কোন কাজে স্থায়ী হওয়া। দীর্ঘক্ষণ নামাযে দাঁড়ানোর কথা এর সাথে সামঞ্জস্যশীল। এর পরে 'সিজদা কর রুকূ কর' কথা থেকেও তা-ই বোঝা যায়। মোটামুটি এ আয়াতে দাঁড়াতে, রুকূ করতে ও সিজদা দিতে হুকুম করা হয়েছে। এ কয়টি নামাযের রুকন। রাসূল (স) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ طُولُ الْقُنُوتِ -

দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে যে নামায পড়া হয়, তা-ই উত্তম নামায।

এখানে যে সিজদা করার আদেশ দেয়া হয়েছে, তা পড়লেই সিজদা করা জরুরী নয়। কুরআনী জ্ঞানের অধিকারী সকলেরই এ মত। অন্যান্য কয়েকটি আয়াতে 'সিজদা' শব্দের উল্লেখ থাকায় সেখানে অবশ্য পাঠকারীকে সিজদা করতে হবে। এখানে তা করতে হবে না এজন্য যে, এখানে শুধু সিজদার কথাই বলা হয়নি, সেই কিয়াম ও রুকূর কথাও বলা হয়েছে। তাতে নামাযের আদেশ করা হয়েছে বোঝা গেল, শুধু সিজদা করতে বলা হয়নি। এ আয়াতে যে, (واو) 'ওয়াও' অক্ষরটি আছে, তা পরম্পরা বোঝাবার জন্যে নয়, তাও বোঝা গেল, কেননা রুকূ তো সিজদার আগে করতে হয়। অথচ এ আয়াতে সিজদার পরে উল্লিখিত হয়েছে। সিজদার কথা আগে এসেছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ -

মরিয়মের অভিভাবককে হবে তার সিদ্ধান্তের জন্যে লোকেরা যখন তাদের কলম নিক্ষেপ করেছিল, তখন— হে নবী তুমি তাদের নিকট উপস্থিত ছিলে না।

আবূ বকর (র) বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক হাসান ইবনে আবূ রুবাই আল-জুরজানী আবদুর রাযযাক— মামার— কাতাদাহ সূত্রে আল্লাহ্‌র কথা 'যখন তাদের

কলম নিক্ষেপ করেছিল' এ পর্যায়ে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, মরিয়মের অভিভাবক কে হবে তা ঠিক করার জন্যে লোকেরা দাবি উত্থাপন করেছিল। তখন যাকারিয়া (আ) 'কুরয়া' ফেলেছিলেন। বলা হয়, এখানে যে কলমের কথা বলা হয়েছে, মূলত তা তীর, যা দিয়ে বাজি ধরা হয়। তারা তা প্রবহমান পানির উপর ফেলেছিল। তাতে যাকারিয়া (আ)-এর 'কলম' সর্বাগ্রে পৌছে গিয়েছিল এবং অন্যদের কলম পিছনে পড়ে গিয়েছিল। এটা ছিল হযরত যাকারিয়ার মুজিযা। রুবাই ইবনে আনাস থেকে এ বর্ণনাটি পাওয়া গেছে। এ ব্যাখ্যার দৃষ্টিতে বলা যায়, মরিয়মের অভিভাবক হওয়ার ইচ্ছায় সকলেই বাজি ধরেছিল।

অনেকে বলেছেন, সেই সময়ে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, মানুষের জীবন যাপন তখন খুব কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। এ কারণে মরিয়মের নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রশ্ন নিয়ে লোকেরা পরস্পরের প্রতিরোধে লেগে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত যাকারিয়া (আ)-ই উত্তমভাবে তাঁর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর কালামে যাকারিয়া (আ)-কে এ দায়িত্ব দেয়ার কথা বলেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি নিজেও এ দায়িত্ব পাওয়ার প্রার্থী ছিলেন। অনেকে এ ঘটনাকে দলীল বানিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে, ক্রিতদাস রোগাক্রান্ত হলে ও তার পরে মরে গেলে তার মনিব মালিকদের সে ছাড়া আর কোন সম্পদ থাকা না থাকা অবস্থায় তারা 'কুরয়া' ফেলতে পারে, তা করা জায়েয। কিন্তু আসলে এটা দাসমুক্তির কোন ব্যাপার নয়। কেননা মালিকদের একজনের দায়িত্ব গ্রহণে রাজি হওয়া অনুরূপ ঘটনার জায়েয হওয়াই প্রমাণ করে। যে মুক্ত স্বাধীন তাকে দাস বানাতে পারস্পরিক রাজি হওয়া জায়েয নেই। ক্রীতদাস মরে গেলে সে স্বতঃই মুক্ত হয়ে যায়। তা সকল ক্ষেত্রেই কার্যকর। তাই মরে যাওয়া ক্রীতদাসের মালিকানা 'কুরয়া'র মাধ্যমে হস্তান্তর করা জায়েয নয়। যে স্বাধীন মুক্ত হয়ে গেছে, তার সেই আযাদী হস্তান্তরিত করাও জায়েয নয়।

কলম নিক্ষেপ করা বন্টনের ব্যাপারে 'কুরয়া' করার সাথে সাদৃশ্য সম্পন্ন। প্রতিপক্ষকে বিচারকের নিকট পেশ করাতেও তাই। এ ব্যাপারটি রাসূল (স) থেকে বর্ণিত হাদীসের কথার দৃষ্টান্ত। তিনি যখন সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন তাঁর বেগমগণের মধ্যে কে সঙ্গে যাবেন, তা ঠিক করার জন্য 'কুরয়া' ব্যবহার করতেন। 'কুরয়ার' ফলে রাজী হওয়া কুরয়া ছাড়াই জায়েয। মরিয়মের (আ) অভিভাবকত্বের ব্যাপারটিও সেই রূপ ছিল। যার মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, তাকে হস্তান্তর করার ব্যাপারে পারস্পরিক রাজী হওয়া জায়েয নয়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يَامَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ -

ফেরেশতা যখন বললে, হে মরিয়ম, আল্লাহ তোমাকে একটি বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম মসীহ্।

'সুসংবাদ' হচ্ছে গুণগত কোন খবর। মূলত যে ভালো ও খুশীর সংবাদ জানলে মুখমণ্ডলে খুশীর আলো ফুটে উঠে, তা-ই হচ্ছে 'বাশারত'। এ সুসংবাদ যদিও ফেরেশতা-ই শোনাল; কিন্তু বলল যে, আল্লাহ সুসংবাদ দিচ্ছেন। কেননা মূলত আল্লাহ্ই হচ্ছেন সুসংবাদদাতা, যদিও তা উচ্চারিত হয়েছে ফেরেশতা কর্তৃক।

হানাফী ফিক্‌হবিদগণ এ কথা বোঝাবার জন্যে একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তা হলো ঃ তুমি যদি অমুক ব্যক্তির আগমনের সুসংবাদ অমুক ব্যক্তিকে দাও, তা হলে আমার দাস মুক্ত। এরপর যদি সে আসে এবং তার আসার খবর দেয়ার জন্যে কাউকে পাঠিয়ে দেয়, প্রেরিত ব্যক্তি গিয়ে তাকে বলে ঃ অমুকে তোমাকে বলছে, সে এসেছে। তা হলে তার কসম ভঙ্গ করার অপরাধ হবে। কেননা প্রেরিত ব্যক্তি সুসংবাদদাতা। যে সুসংবাদের দায়িত্ব নিয়েছিল সে-ই আনন্দ সৃষ্টি করেছে।

হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, প্রথম খবরদাতাই সুসংবাদদাতা, দ্বিতীয় সংবাদদাতা সুসংবাদদাতা নয়। কেননা তার দেয়া খবরে আনন্দ হয়নি। 'বাশারত' শব্দটি বলে অনেক ক্ষেত্রে শুধু খবর অর্থ করা হয়। যেমন কুরআনের কথা ঃ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ -

ওদেরকে পীড়াদায়ক আযাবের খবর দাও। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ২১)

আল্লাহ্‌র কথা ঃ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ এ কথাটুকুর তিনটি অর্থ হতে পারে। একটি, জন্মদাতা—পিতা-ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন।

যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ -

তাকে মাটির উপাদানে সৃষ্টি করেছেন (মৌলিকভাবে)। পরে তাকে বললেন ঃ হও, অমনি হতে থাকল।

এ কারণে পিতা ছাড়া 'হও' শব্দ বলার পর তিনি হলেন বলে তাঁকে কালেমা— 'কথা বা আদেশ' অভিহিত করেছেন। এটা পরোক্ষভাবে বলা কথা। অপর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ -

তিনি তাঁর কালেমা যা তিনি মরিয়মের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন। (সূরা নিসা ঃ ১৭১)

দ্বিতীয় দিক হল, প্রাচীন আসমানী কিতাবে আগেই তাঁর আগমনের সংবাদ দেয়া হয়েছিল। এই দৃষ্টিতে তাঁকে 'কালেমা' বলা হয়েছে। আর তৃতীয় দিক হল, আল্লাহ তাঁর দ্বারা লোকদের হেদায়েত দান করিয়েছেন, যেমন করে তাঁর কালামের দ্বারা মানুষকে হেদায়েত করেন ঃ এ কারণে তাঁকে কালাম বা 'বাণী' বলা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ -

অতএব আপনি বলুন, তোমরা আস, আমরা ডাকব আমাদের পুত্রদেরকে ও তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের মেয়েলোকদেরকে এবং তোমাদের মেয়েলোকদেরকে। আর আমরা আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদেরকে।

এর পূর্বে খ্রীস্টানদের কথা ঃ 'মুসীহ্ আল্লাহ্‌র পুত্র'-এর প্রতিবাদে একের পর এক যুক্তি পেশ করা হয়েছে। এটা ছিল নাজরান থেকে আগত খ্রীস্টান-প্রতিনিধি দলের কথা। ওদের নেতা এবং অনুসারী তার মধ্যে ছিল। দুজনই নবী করীম (স)-কে বলল, কোন পুরুষের ঔরস ছাড়া সন্তান জন্ম হতে পারে একথা কি বিশ্বাস করেন ? এর জবাবে এ আয়াত নাযিল হয় ঃ 'আল্লাহ্‌র নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মত। ইবনে আব্বাস (রা) হাসান ও কাতাদাহ থেকে উক্ত কথা বর্ণিত হয়েছে।

এর পূর্বে হযরত ঈসা (আ)-এর এই উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ -

এবং আমি এমন কিছু কিছু জিনিস হালাল ঘোষণা করাব, যা তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে।

শেষের দিকে রয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ -

নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমার রব্ব এবং তোমাদেরও রব্ব। অতএব তোমরা সকলেই তাঁরই বান্দা হও— ইবাদত কর।

ইনজীলেও একথা উদ্ধৃত রয়েছে। কেননা তাতে রয়েছে ঃ 'আমি আমার পিতার ও তোমাদের পিতার নিকট যাইতেছি, তিনি আমার ইলাহ্। তোমাদেরও ইলাহ। ইনজীল যে ভাষায় লিখিত, তাতে 'পিতা' বলা হয় সাইয়্যেদ (সরদার বা নেতা)-কে। আমরাও দেখছি, আমার পিতা ও তোমাদের পিতা বলা হয়েছে। বোঝা যায়, এখানে সেই পিতৃত্ব বোঝায় না। যার ঔরসে পুত্র সন্তান জন্মে। প্রমাণ যখন তাদের বিপরীতে গেল, যা তারা জানে, তারা তা স্বীকার করে নেয়। তিনি আদমের ন্যায় কোন পিতা ছাড়াই যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এ ব্যাপারে তাদের সব শোবাহ সন্দেহ ভিত্তিহীন প্রমাণ করা হয়। এ সময় তাদেরকে মুবাহিলা করার আহ্বান জানন্দানো হয় আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী।

এ পর্যায়ে আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ -

তোমার প্রকৃত ইলম অর্জিত হওয়ার পর এ বিষয়ে যদি তোমার সাথে ঝাগড়া করতে আসে, তাহলে তুমি বল, ঠিক আছে, আমাদের ও তোমাদের ঘরের সব লোক একত্রিত হয়ে মুবাহিলা করি ....

নবী করীম (স) হাসান ও হুসায়ন (রা) এবং হযরত আলী (রা) ও ফাতিমা (রা)-এর হাত ধরে উপস্থিত হলেন এবং যে খ্রীস্টানরা তাঁর সাথে তর্ক করেছিল, তাদেরকে মুবাহিলা করার জন্যে ডাকলেন। কিন্তু তারা পশ্চাদপসরণ করে। তারা পরস্পর বলাবলি করে, তোমরা যদি তাঁর সাথে মুবাহিলা কর, তাহলে উপত্যকা তোমাদের জন্যে আগুনভর্তি হয়ে উঠবে। ফলে খ্রীস্টান ও খৃস্টান মত কিয়ামত পর্যন্তকার জন্যে খতম হয়ে যাবে।

খ্রীস্টানরা যে মনে করে, হযরত ঈসা (আ) হয় ইলাহ, না হয় ইলাহর পুত্র— উপরোক্ত আয়াতে তা খণ্ডন ও অস্বীকার করা হয়েছে। সেই সাথে তা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবুয়তের সত্যতা প্রমাণকারীও। কেননা তিনি প্রকৃতই নবী, একথা তারা যদি বুঝতে না-ই পারত, তাহলে 'মুবাহিলা' থেকে কোন্ জিনিস তাদেরকে বিরত রাখল ? তারা নিজেরাই পশ্চাদপসরণ করে গেল এবং মুবাহিলা করা থেকে বিরত থাকল, এ থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে, তারা নিজেরাই মুজিযার দলীলসমূহের ভিত্তিতে নিঃসন্দেহেই বুঝতে পেরেছির যে, তিনি প্রকৃতই সত্য নবী। পূর্ববর্তী নবীগণের পেশ করা কিতাবাদিতে যে তাঁর প্রশংসা ও গুণ-পরিচিতি উল্লিখত ছিল, তা তো তাদের পড়া ছিলই।

এ কাহিনী থেকে এ-ও প্রমাণিত হয় যে, হযরত হাসান ও হুসায়ন (রা) রাসূলে করীম (স)-এর বংশধর ছিলেন। কেননা রাসূল (স) যখন 'মুবাহিলা' করার জন্যে যাওয়ার সময় তাঁদের দুজনার হাত ধরে রওয়ানা হলেন ও বললেন ঃ আস, আমরা আমাদের পুত্রদের ও তোমাদের পুত্রদের ডাকি, অথচ এ দুজন ছাড়া তাঁর বংশধারায় পুত্র তো আর কেউ ছিল না।

নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত হাসান (রা) সম্পর্কে বলেছেন ঃ

اِنَّ ابْنِىْ هٰذَا سَيِّدٌ –

নিশ্চয়ই আমার (বংশের) এ পুত্রটি 'সাইয়্যেদ' (হবে)।

তাঁদের দুই ভাইয়ের কোন একজন শিশু অবস্থায় তাঁর গাত্রে প্রস্রাব করেছিল। তখন তিনি বলেছিলেন ঃ لَا تُزْرِمُوا ابْنِىْ-তোমরা আমার এ পুত্রকে লজ্জা দিও না, মন্দ ভেবো না। তাঁরা দুই ভাই রাসূল (স)-এর বাচ্চা-কাচ্চাদের মধ্যে শামিল, যেমন ঈসা (আ)-কে আল্লাহ নিজেই ইবরাহীম (আ)-এর বাচ্চা-কাচ্চা— বংশধর বলেছেন। বলেছেন ঃ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ (আন আম ঃ ৮৪) ইবরাহীমের বংশধর থেকেই দাউদ ও সুলায়মান এবং পরবর্তীতে وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى (আন'আমঃ ৮৫) এবং যাকারিয়া ও ঈসা। হযরত ঈসা (আ)-কে ইবরাহীম (আ)-এর বংশের পুত্র বলা হয়েছে তার মার দিক দিয়ে। কেননা তাঁর পিতা তো কেউ নেই।

অনেক আলিম এ মত দিয়েছেন, নবী করীম (স) দুই ভাইকে নিজের পুত্র বলেছেন, এটা বিশেষ তাৎপর্যবহ। এদের দুজন ছাড়া আর কারোর সম্পর্কে তিনি এরূপ বলেন নি। এ পর্যায়ে নবী করীম (স) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা এঁদের দুজনকে আমার পুত্র, বিশেষ অর্থে বলেছেন বলে প্রমাণ করে। তাই একথা অন্য কারোর জন্যে বলা সহীহ হবে না। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন ঃ সব কার্যকারণ ও বংশীয় সম্পর্ক কিয়ামতের দিন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু কেবলমাত্র আমার কার্যকারণ ও বংশীয় সম্পর্ক অক্ষুণ্ন থাকবে।

ইমাম মুহাম্মাদ বলেছেন ঃ কেউ যদি অপর কারোর সন্তানের নামে কিছু অসিয়ত করে, যদিও তার নিজ ঔরসজাত কোন সন্তান না থাকে, থাকে তার পুত্র ও কন্যার সন্তান, তাহলে সে অসিয়ত পুত্রের সন্তানের জন্যে কার্যকর হবে, কন্যার সন্তানের জন্যে হবে না। হাসান ইবনে যিয়াদ ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ কন্যার সন্তানও সে অসিয়তের আওতার মধ্যে পড়বে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র কথা ও নবী করীম (স)-এর এ

পর্যায়ের কথা কেবলমাত্র হাসান ও হুসায়ন (র) সম্পর্কিত হতে পারে, পুত্র নামে অভিহিত হতে পারেন; অন্য কোন লোক-ই নয়। কেননা সাহাবীর কথাও এ পর্যায়ে বর্ণিত ও উদ্ধৃত হয়েছে। সাধারণভাবে দুনিয়ার মানুষেরা নিজেদের পিতৃপুরুষের সাথেই সম্পর্ক দেখায়, নিজেদের গোত্র ও জাতির নামে পরিচয় প্রকাশ করে, মাতার পূর্বপুরুষের সাথে সম্পর্ক প্রকাশ করে না। হাশিমী বংশের কোন লোক যদি রোমান বা হাবশী কন্যার গর্ভে সন্তান জন্ম দেয়, তাহলে সে নিজেকে হাশিমী বলে পরিচয় দেবে। কেননা সে সন্তানের পিতা হাশিমী বংশের লোক। তার মার দিক দিয়ে কোন পরিচয় সাধারণত দেবে না। আরব কবিও তাই বলেছেন ঃ

بَنُونَا بَنُو اَبْنَا ئِنَا وَ بَنَاتِنَا - بَنُو هُنَّ اَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْاَبَاعِدِ -

আমাদের পুত্র, ও আমাদের পুত্র ও আমাদের কন্যারা আমাদের, তাদের বংশের পুত্ররা দূরবর্তী ব্যক্তিদের পুত্র।

এই প্রেক্ষিতেই বলতে হয়, হাসান ও হুসায়ন (রা)-এর নবী করীম (স)-এর পুত্র হিসেবে পরিচয় দান শুধু তাঁদের বেলাতেই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ। এরূপ পরিচয়দানের আর কেউ-ই শামিল নয়। এ দুইজন বাদে অন্যদের সম্পর্কে লোকদের কথোপকথন থেকে তা-ই জানা যায়, বোঝা যায় বাহ্যিকভাবে প্রকাশ্যভাবে। কেননা অন্য সব লোকই পিতা ও পিতার পূর্ব বংশের সাথে সম্পর্ক দেখায়, মার পৈতৃক বংশের সাথে সম্পর্কের পরিচয় দেয় না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ -

বল ঃ হে আহ্‌লি কিতাব লোকেরা! তোমরা এমন একটি বাণীর দিকে এসো, যা আমাদের ও তোমাদের নিকট সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। তা হচ্ছে, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারোর দাসত্ব স্বীকার করব না। .....

كَلِمَةٍ سَوَاءٍ এর অর্থ আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন— ন্যায়পর-নিরপেক্ষ বাণী, তা তোমাদের ও আমাদের সকলের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ, তোমরা-আমরা অভিন্ন হয়ে যাই যদি আমরা তোমরা সকলেই আল্লাহ্‌র বান্দা হই। আয়াতের পরবর্তী অংশ ঃ

اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ -

আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারোর বান্দা হব না, তাঁর সাথে কোন জিনিস শরীক মানব না এবং আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আমাদের কতক অন্য কতক লোককে রব্ব বানিয়ে নেব না।

এ গোটা কথাটিই সেই বাণী। এর সত্যতা পুরোপুরি বিবেকসম্মত, যুক্তিসঙ্গত। কেননা সব মানুষই তো আল্লাহ্‌র বান্দা, দাসানুদাস। তারা পরস্পরের দাসত্বের অধিকারী হতে পারে না। তাদের কোন লোক অপর কোন ব্যক্তির অধীনতা ও আনুগত্য স্বীকার করতে বা মেনে নিতে পারে না। তবে যে অধীনতা ও আনুগত্যে ফলত আল্লাহ্‌র অধীনতা ও আনুগত্য হবে, তা অবশ্যই করা যাবে। আল্লাহ্‌ তাঁর নবীর আনুগত্য করার নির্দেশ নিজেই দিয়েছেন, তা সত্ত্বেও সে

আনুগত্যের জন্যে কাজটির معروف বিবেক-বুদ্ধি ও শরীয়াত উভয় দিক দিয়ে সৌন্দর্যমন্ডিত ও কল্যাণময় হওয়ার শর্ত তিনিই আরোপ করেছেন। অথচ আল্লাহ্ নিশ্চিতভাবেই জানতেন যে, নবী কখনই معروف -এর বিপরীত কাজের আদেশ দেবেন না। নবীর আনুগত্যের জন্যে এরূপ শর্ত আরোপের কারণ হল, অন্য কোন লোক-ই যেন বিনা শর্তে নিজের আদেশ-নির্দেশ মেনে নিতে বাধ্য করতে সাহস না পায়, তার সুযোগ গ্রহণ করার দুঃসাহস না করে। মানুষ যেন মানুষকে কেবল আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ভিত্তিতেই তার আনুগত্য করতে বলে ও বাধ্য করে। লোকদের নিকট থেকে আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ পর্যায়ে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ -

তারা মারূফ কাজে তোমার নাফরমানী বা অনানুগত্য করবে না, এর উপর তুমি তাদের নিকট থেকে বায়'আত গ্রহণ কর। (সূরা মুমতাহানা ঃ ১২)

মারূপ কাজে রাসূল (স)-এর অনানুগত্য পরিহার করার শর্ত এ আয়াতে আরোপিত হয়েছে। এ কথায় এ বিষয়ে তাগিদ ধ্বনিত হয়েছে যে, তারা যেন কাউকেই আল্লাহ্‌র আদেশ পালন ছাড়া অন্য কিছুতে আনুগত্য করতে বাধ্য না করে। এমন আনুগত্যই লোকদের জন্য বাধ্যতামূলক, যা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ ভিত্তিক হবে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَايَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ -

অর্থাৎ কোন জিনিস হালালকরণে ও হারামকরণে অনুসরণ করবে শুধু মাত্র তাতে, যা আল্লাহ নিজে হালাল বা হারাম করেছেন।

এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এ আয়াতটি ঃ

اِتَّخَذُوْاۤ اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ -

ওরা ওদের বুদ্ধিমান লোক ও পাদ্রী-পুরোহিতদেরকে আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে রব্ব বানিয়ে নিয়েছে। (সূরা তওবা ঃ ৩১)

আবদুস সালাম ইবনে হারব আতীক ইবনে আইয়ূন— মুসয়িব ইবনে সাদ আদী ইবনে হাতিম-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আদী ইবনে হাতিম বলেন, আমি নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন আমার গলায় স্বর্ণ নির্মিত ক্রুশ লাগানো ছিল। নবী করীম (স) বললেনঃ

اَلْقِ هٰذَا الْوَثَنَ عَنْكَ -

তুমি এ মূর্তিটি তোমার থেকে দূরে নিক্ষেপ করে দাও।

এরপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন। তখন আমি বললাম ঃ হে রাসূল! আমরা তো তাদের ইবাদত করতাম না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তারা কি সে জিনিস তোমাদের জন্যে হালাল করেনি, যা আল্লাহ্ হারাম করেছেন ? তখন তোমরাও কি সে জিনিসকে হালাল মেনে

নাও নি ? আল্লাহ্র হালাল করা জিনিস তারা কি তোমাদের জন্যে হারাম করে দেয়নি ও তোমরা তা মেনে নাও নি ? বললেন ঃ এ-ই তো ইবাদত। এভাবেই তোমরা তাদের ইবাদত করেছ। আর এ জিনিসকেই আল্লাহ বলেছেন তাদেরকে রব্ব বানানো, রব্ব রূপে গ্রহণ করা। কেননা তারা তাদের ঠিক সেই মর্যাদা দিয়েছে, যা হতে পারে তাদের রব্ব-এর, তাদের সৃষ্টিকর্তার। কেননা সৃষ্টিকর্তারই এ অধিকার মানতে হয় যে, তিনি যা হালাল ঘোষণা করবেন, তা-ই হালাল হবে, আর যা-ই হারাম করেছেন তা-ই হারাম রূপে পরিগণিত হবে। তিনি যা হারাম করেন নি তা কেউ হারাম করতে পারে না, তিনি যা হালাল করেন নি, তা-ও কেউ হালাল করতে পারে না, এ হালাল বা হারামকরণে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোরই আনুগত্য করা যেতে পারে না, কেননা তিনিই সকলের সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহ্র ইবাদতের বাধ্যবাধকতায় সব মানুষই সর্বতোভাবে সমান। সকলেই তাঁর আদেশ মানতে বাধ্য। ইবাদত কেবল তার-ই জন্যে— তাঁরই উদ্দেশ্যে হতে পারে, অন্য কারোর জন্যে নয়।

আল্লাহ্র কথা ঃ

يَا أَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيْ اِبْرَاهِيْمَ -

হে আহ্লি কিতাব লোকেরা! তোমরা ইবরাহীমের বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করছ কেন ?

শেষে— أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ তোমরা কি বুঝ না, বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগাও না ?

ইবনে আব্বাস, হাসান ও সুদ্দী থেকে বর্ণিত হয়েছে, নাজরান এলাকার ইয়াহূদী ও খ্রীস্টানরা নবী করীম (স)-এর নিকট একত্রিত হয়েছিল। তারা ইবরাহীম (আ)-এর বিষয়টি নিয়ে পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করেছিল। ইয়াহূদীরা বলেছিল, ইবরাহীম (আ) ইয়াহূদী ছিলেন। আর খ্রীস্টানরা বলেছিল, তিনি ছিলেন খ্রীস্টান। আল্লাহ তা'আলা এদের দুটি গোষ্ঠীর দাবিই অস্বীকার করেছেন ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁর কথার মধ্যবর্তী বাণী হল ঃ

وَمَا اُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَلَا نْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهِ -

ইয়াহূদীদের কিতাব তওরাত ও খ্রীস্টানদের ইন্জীল নাযিল হয়েছে ইবরাহীমের (দুনিয়া থেকে) চলে যাওয়ার পর।

তাহলে ইয়াহূদীরা খ্রীস্টান হওয়া ঐতিহাসিকভাবেই সম্ভব নয়। এটা তো সহজেই বুঝতে পারা যায়। ইয়াহূদীবাদ খৃস্টবাদ— দুটোই ইবরাহীম (আ)-এর পরবর্তী ব্যাপার। তাই তাঁর ইয়াহূদী বা খ্রীস্টান হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এ-ও বলা হয়েছে যে, ইয়াহূদীবাদ হযরত মূসা (আ)-এর মিল্লাত থেকে বিকৃত হয়ে তৈরী হয়েছে। আর হযরত ঈসা (আ)-এর শরীয়াত থেকে বিকৃত হয়ে খ্রীস্টবাদ গড়ে উঠেছে। তাঁর জীবনকালে তওরাত ও ইনজীল নাযিল হয়নি। তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে গড়ে উঠা মিল্লাতের সাথে তাঁর কোনরূপ সম্পর্ক থাকা কিরূপে সম্ভব হতে পারে ?

যদি প্রশ্ন তোলা হয় ঃ ওকথা সত্য হলে হযরত ইবরাহীমের 'হানীফ-মুসলিম' হওয়াও অসম্ভব হবে। কেননা কুরআন-ও তো তাঁর অনেক অনেক পরে নাযিল হয়েছে। অথচ কুরআনেই তাঁকে 'হানীফ-মুসলিম' অভিধায় অভিহিত করা হয়েছে। তা কি করে সম্ভব হবে ?

জবাবে বলা যাবে 'হানীফ' অর্থ সুদৃঢ় ঋজু দ্বীন। الحنيف-এর আভিধানিক অর্থ হল সুদৃঢ়তা। আর মুসলিম হচ্ছে আল্লাহ্‌র আনুগত্য, আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণকারী, আল্লাহ্‌র আইন পালনকারী। সত্যপন্থী যে কোন ব্যক্তিকেই উক্ত অভিধায় অভিহিত করা যায়। আমরা জানি, ইবরাহীম (আ) প্রাচীনকালীন নবীগণের একজন। ইবরাহীম (আ)-এর পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ-ই উক্ত পরিচিতিতে পরিচিত হয়েছিলেন। তাই ইবরাহীম (আ)-কে 'হানীফ' 'মুসলিম' বলা খুবই যুক্তিযুক্ত। যদিও কুরআন তাঁর অনেক পরে নাযিল হয়েছে। উক্ত পরিচিতি কুরআনের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। তা কুরআনের অনুসারী ছাড়া অন্যদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য হতে পারে। সব মুমিনই এ পরিচিতিতে পরিচিত হতে পারে। কিন্তু ইয়াহূদীবাদ খ্রীস্টবাদ তওরাত ও ইনজীলের শরীয়াত থেকে বিকৃত হয়ে নাম ধারণ করেছে। কাজেই সে দুটির পূর্বে কোন লোক সে নামে অভিহিত হতে পারে না।

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, দ্বীনের ব্যাপারে কর্ত-বিতর্ক করা সম্পূর্ণ জায়েয বরং কর্তব্য। কর্তব্য বাতিল পন্থীদের ধর্মমতের বাতুলতা প্রমাণ করা ও তা নস্যাৎ করে দেয়া। যেমন করে আল্লাহ্‌ স্বয়ং ইয়াহূদী ও খ্রীস্টানদের ধর্মমতের বিরুদ্ধে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন। বিশেষত হযরত ঈসা (আ)-এর ব্যাপারে তাদের ভুল ধারণা ও মিথ্যা অভিযোগ বাতিল করে দিয়েছেন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

هَا أَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ -

হে ঐ সব লোকেরা! যারা পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করেছ সে বিষয়ে, যে বিষয়ের ইলম তোমাদের আছে, তাহলে যে বিষয়ে তোমাদের কোন ইলম নেই, সে বিষয়ে তোমরা তর্ক-বিতর্ক করছ কেন ?

সত্য উদ্ঘাটনের ও সত্যের সত্যতা প্রমাণের পক্ষে এ আয়াত সুস্পষ্টতম দলীল। কেননা দ্বীনের ব্যাপারে কোনরূপ যুক্তিভিত্তিক তর্ক করা যদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধই হতো, তাহলে জ্ঞানভিত্তিক তর্ক ও মূর্খতাভিত্তিক তর্কের মধ্যে পার্থক্য করা হতো না, যেমন আলোচ্য আয়াতে করা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ حَاجَجْتُمْ فِيمَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, এখানে সে বিষয়ের কথা বলা হয়েছে, যা তাদের কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর যে বিষয়ে ইলম নেই বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অবস্থার দিকে। কেননা তাঁর সম্পর্কে তারা জানত না বলেই তিনি ইয়াহূদী ছিলেন কিংবা খ্রীস্টান ছিলেন বলে তারা দাবি তুলেছিল।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ -

আহলি কিতাব লোকদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে যাদের নিকট এর অর্থ, তুমি বিপুল

সম্পদেও তাকে বিশ্বাস করতে পার। এখানে ب অক্ষর ও على একটার পর একটা ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বলা হয় مَرَرْتُ بِفُلَانٍ ও وَمَرَرْتُ عَلَيْهِ শব্দটি সম্পর্কে হাসান বলেছেন, তার এক হাজার ও দুইশ মিসকাল। আবূ নযরা বলেছেন, এক পাত্র ভর্তি স্বর্ণ। আর মুজাহিদ বলেছেন, সত্তর হাজার। আবূ সালিহ্ বলেছেন, একশ রতল। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে আহলি কিতাবের কোন কোন লোকের আমানতদারী গুণের কথা বলেছেন। বলা যেতে পারে, তিনি খ্রীস্টানদের বোঝাতে চেয়েছেন। অনেকে এ আয়াতে তাদের পরস্পরের সাক্ষ্য গ্রহণ করার দলীল বলে মনে করেছেন। কেননা সাক্ষ্যদান একটা আমানতদারী কাজ বটে। যেমন মুসলমান আমানতদার হলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায়। কিতাবী লোকও তাই। বিশেষভাবে এজন্যে যে, কুরআনেই তাদেরকে আমানতদারী গুণে ভূষিত করা হয়েছে। তাই কাফিরদের বিরুদ্ধে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

যদি বলা হয়— এ আয়াত অনুযায়ী মুসলমানদের বিরুদ্ধেও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা জায়েয। কেননা এ আয়াতে বলা হয়েছে, মুসলমানরা তাদের নিকট আমানত রাখলে তা তারা অবশ্যই রক্ষা করবে ও ফেরত দেবে।

জবাবে বলা যাবে, বাহ্যত আয়াতটির তা-ই বক্তব্য বলে মনে হয়। কিন্তু আমরা উক্ত কথাকে সর্বসম্মতভাবে বিশেষ অর্থে নির্দিষ্ট করেছি। তাছাড়া আয়াতটি মুসলমানদের পক্ষে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা জায়েয বলেছেন। কেননা তাদের আমানত আদায় তাদের হক। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ জায়েয, তা বোঝায় না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا -

ওদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যাকে একটি দীনারের আমানত দিলেও সে তা তোমার নিকট ফিরিয়ে দেবে না। হ্যাঁ, যদি তার উপর সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে ভিন্ন কথা।

মুজাহিদ ও কাতাদাহ্ বলেছে ঃ এর অর্থ, তুমি যদি নিরবচ্ছিন্নভাবে তার নিকট তাগাদা করতে পার, তাহলে হয়ত ফেরত দেবে। সুদ্দী বলেছেন ঃ তুমি যদি বাধ্যতামূলকভাবে তার মাথার উপর সওয়ার হয়ে থাকতে পারে, তাহলে...... আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ এ দুটি অর্থই দেয়। একটা তাগাদা করতে আর একটি একেবারে লেগে থাকা। আর এক সাথেও এ অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে তা থেকে। তবে مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا বাধ্যতামূলকভাবে লেগে থাকার তুলনায় বারবার তাকাদা করতে থাকার অর্থটা-ই উত্তম মনে হয়। এ আয়াত এ কথারও দলীল যে, যার নিকট পাওনা রয়েছে তা পাওয়ার জন্যে তার সাথে থাকার অধিকার আছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ -

তা এ কারণে যে, তারা বলেছে, উম্মী লোকদের মধ্যে আমাদের উপর কোন পথ নেই।

কাতাদাহ্ ও সুদ্দী থেকে বর্ণিত হয়েছে, ইয়াহূদীরা বলেছে, আরবদের যেসব ধন-সম্পদ

আমরা পেয়ে গেছি, সে ব্যাপারে আমাদের উপর দাবি করার কোন উপায় নেই। কেননা ওরা তো মুশরিক। তাদের ধারণা, তারা একথাটি তাদের কিতাবে পেয়েছে।

এ-ও বলা হয়েছে যে, তারা উক্ত কথাটি বলেছিল তাদের ধর্মমতের সমস্ত বিরোধী লোকদের সম্পর্কে। তারা তাদের ধন-মালকে নিজেদের জন্যে হালাল মনে করত। কেননা তারা মনে করে, সব মানুষেরই উচিত তাদের বিরুদ্ধতা করা। আর আল্লাহ্ সম্পর্কে তারা দাবি করত যে, উক্ত কথা আল্লাহ্ই তাদের প্রতি নাযিল করেছেন। আলোচ্য আয়াতে তাদের এ দাবির মিথ্যা হওয়ার কথা বলা হয়েছে। বলেছেন ঃ

وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ -

ওরা আল্লাহ্ সম্পর্কে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা জেনে শুনেই বলে।

অর্থাৎ তাদের উক্ত কথা সত্য নয়।

আল্লাহ্র কথা ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً -

যেসব লোক আল্লাহ্র চুক্তি ও তাদের কিরা-কসম স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে।.....

আ'মাশ সুফিয়ান আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ 'যে লোক কিরা-কসম করে কোন মুসলিম ব্যক্তির ধন-মাল আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে, সে ভয়ানক অপরাধী হবে। সে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় তিনি তার প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ।'

আশ্আস ইবনে কায়স বলেছেন, আমার ও অপর এক ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ ও ঝগড়া ছিল। আমি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাসূল (স)-এর নিকট মামলা দায়ের করলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার দাবির পক্ষে কোন প্রমাণ আছে কি ? আমি বললাম, কোন প্রমাণ নেই। তখন বললেন ঃ তাহলে বিশ্বাসীকে কিরা-কসম করতে হবে। আমি বললাম ঃ এখন-ই কি তাকে কিরা-কসম করতে হবে ? পরে আবদুল্লাহ্র কথাটার অনুরূপ কথার উল্লেখ করলেন। এ সময় উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

মালিক আল-উলা ইবনে আবদুর রহমান, মা'বাদ ইবনে কা'ব তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালিক, আবূ আমামাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ নবী করীম (স) বলেছেন, যে লোক তার কিরা-কসম দ্বারা কোন মুসলমানের হক আত্মসাৎ করবে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং জাহান্নাম তার জন্যে আবশ্যিক করে দেবেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করল, যদি খুব সামান্য জিনিস হয়, হে রাসূল! তাহলেও কি তাই হবে ? বললেন ঃ ইরাক গাছের একটি ডাল নিলেও তাই হবে।

শ'বী আল-কামা, আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ 'যে ব্যক্তি তার ভাইর ধন-মাল আত্মসাতের উদ্দেশ্যে দৃঢ়ভাবে কিরা-কসম করবে, সে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে, তিনি তাঁর প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ থাকবেন।

উপরোদ্ধৃত আয়াত ও পরে উল্লেখ করা হাদীসসমূহে প্রমাণ করে যে, যে মাল বাহ্যত অন্য কারোর, শুধু কিরা-কসম করেই তা কেউ পেতে পারে না। যার নিকট যে মাল আছে, সে দাবি করে যে, সে মাল তার, কিরা করে তাও কেউ নেয়ার অধিকারী হতে পারে না। বাহ্যত সে মাল তারই। তা অন্য কেউ পেয়ে যেতে পারে না। উপরোদ্ধৃত আয়াত ও হাদীসসমূহের বাহ্যিক অর্থ হল, যে মাল বাহ্যত অন্য কারোর, তা কেউ তার কিরা-কসম করে পাবে না, তা নিষিদ্ধ। কিরা-কসম দ্বারাই তা পাওয়া যেতে পারে না। কেননা এখানে সে মালের কথা বলা হয়নি, যা তার মালিকানা বলে আল্লাহ্‌র নিকটও স্বীকৃত। বরং সেই মালের কথা বলা হয়েছে, যা আমাদের নিকট রয়েছে— যা বাহ্যত আমাদের মালিকানা। কেননা আমাদের মতে মালিকানাটা বাহ্যিক অবস্থার দৃষ্টিতেই প্রমাণিত হতে পারে, প্রকৃত তা কার, সে বিচার মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

যাঁরা বলেন যে, কিরা-কসম রদ্দ করা হবে, তাঁদের এ কথা যে বাতিল, তার দলীল এ আয়াতে রয়েছে। কেননা বাহ্যত যে মালিকানা অন্য কারোর, তার নিকট থেকে তা ফিরে পাওয়া সম্ভব এ কিরা-কসমের দ্বারাই। উক্ত ব্যাপারটিও প্রমাণ করে যে, মূলত কিরা-কসম সম্পদ পাওয়ার অধিকার সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই বানানো হয়নি। তার অবকাশ রাখা হয়েছে শুধু উপস্থিত ঝগড়া মেটাবার জন্যে।

আল-আওয়াম ইবনে হাওশব ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবনে আবূ আওফাকে বলতে শুনেছেন ঃ এক ব্যক্তি পণ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে সেই আল্লাহ্‌র নামে, যিনি ছাড়া কেউ মাবুদ নেই, কিরা করে বলেছে যে, আমি এর মূল্য আদায় করে দিয়েছি, অথচ সে তা দেয়নি। .... এ সময় উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়। আল-হাসান ও ইকরামা থেকে বর্ণিত— এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে সেই লোকদের ব্যাপারে, যারা ছিল ইয়াহূদী আহবার আলিম-পণ্ডিত-বুদ্ধিমান। তারা নিজেদের একটি কিতাব লিখে কিরা করে দাবি করেছিল যে, এ কিতাব আল্লাহ্‌র নিকট থেকে নাযিল হয়েছে। এভাবেই তারা এ দাবিও করেছিল যে, উম্মীদের কোন পথ বা উপায় আমাদের উপর নেই।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ ...... وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ –

তাদের মধ্যে এক গোষ্ঠী লোক এমন আছে যারা তাদের জিহ্বাকে কিতাব পাঠের সময় নানাভাবে ঘুরায়-ফিরায় .... অথচ তা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আসেনি।

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, গুনাহ-নাফরমানী আল্লাহ্‌র নিকট থেকে হয় না। তা আল্লাহ্‌র কাজ থেকেও নয়। কেননা তা যদি আল্লাহ্‌র কাজ থেকে হতো, তাহলে তা নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট থেকেই হতো। অথচ উক্ত আয়াতে গুনাহ্ নাফরমানী আল্লাহ্‌র নিকট থেকে হওয়ার কথা সাধারণভাবেই অস্বীকার করেছেন। তাঁর কাজ থেকে হলেও তা তাঁর নিকট থেকেই হতো আরও জরুরীভাবে। তাহলে তা সাধারণভাবে অস্বীকার করা জায়েয হতো না এই বলে যে, তা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে নয়।

যদি বলা হয়, কিরা-কসম আল্লাহ্‌র নিকট থেকে, এ কথা তো সাধারণভাবে বলা হয়; কিন্তু সর্বতোভাবে তা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে, তা বলা যেতে পারে না। কুফর ও নাফরমানীর কাজগুলো এমনি-ই।

জবাবে বলা যাবে, নিরংকুশ অস্বীকৃতি সাধারণ ও ব্যাপক ভাবধারা-সম্পন্ন। কিন্তু নিরংকুশ ইতিবাচক কথা সে 'রকম' হয় না। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে মনে কর, যদি বল ঃ জায়দের নিকট কোন খাবার নেই। এ কথাটির তাৎপর্য হল কম বা বেশি-খাবার বলতে কিছুই নেই। পক্ষান্তরে যদি বল ঃ তার নিকট খাবার আছে, তাহলে তার নিকট সমস্ত খাবার থাকার সাধারণ অর্থ মনে করা যাবে না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوْنَ -

তোমরা যা ভালোবাস— তা তোমাদের প্রিয় জিনিস— তা (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় না করা পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ তোমরা লাভ করতে পারবে না।

اَلْبِرُّ শব্দের অর্থ এখানে দুটি বলা হয়েছে। একটি জান্নাত। তা আমর ইবনে মায়মুন ও সুদ্দী থেকে বর্ণিত।

অপর অর্থ, পরম কল্যাণময় কাজ, যার বদলে লোকেরা সওয়াব পাওয়ার অধিকারী হয়।

আর نَفَقَة অর্থ, ব্যক্তির প্রিয় জিনিস আল্লাহ্‌র পথে দিয়ে দেয়া যেমন দান, সাদকা ইত্যাদি।

ইয়াযীদ ইবনে হারুন হুমাইদ, আনাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'তোমরা যা ভালোবাস তা ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ পাবে না' কথাটি যখন নাযিল হল, আর 'কে আছে, আল্লাহ্‌কে করযে হাসান দেবে' নাযিল হল, তখন আবূ তালহা (রা) বললেন, হে রাসূল! অমুক অমুক স্থানে প্রাচীর বেষ্টিত আমার জমি-বাগান রয়েছে, তা আল্লাহ্‌র পথে দান করে দিলাম। আমি যদি এ দানকে গোপন রাখতে পারতাম, তাহলে প্রকাশ করতাম না। তখন রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ তুমি এ সব তোমার নিকটবর্তী বা নিকটাত্মীয়দের জন্যে নির্দিষ্ট কর।

ইয়াযীদ ইবনে হারুন মুহাম্মাদ ইবনে আমর, আবূ আমর ইবনে হুমাস, হামজাতা ইবনে আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ 'তোমাদের প্রিয় জিনিস ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত কল্যাণ ও পূর্ণাঙ্গ সওয়াব কখনই পাবে না' আয়াতটি খুবই ভারী হয়ে দাঁড়ালো আমার নিকট। আমাকে আল্লাহ কি কি নিয়ামত দিয়েছেন, আমি তা মনে মনে স্মরণ ও হিসাব করলাম। তখন আমার ক্রীতদাসী আমীমা অপেক্ষা অধিক প্রিয় জিনিস আর কোনটিই পেলাম না। তাই আমি বললাম, সে মুক্ত স্বাধীন কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে। আল্লাহ্‌র জন্যে আমার কৃত কাজ পুনরায় না করা যদি আমার অভ্যাস না হতো, তাহলে আমি তাকে অবশ্যই বিয়ে করতাম। তাই আমি নিজে তাকে বিয়ে না করে আমি তাকে নাফের নিকট বিয়ে দিলাম। এখন সে তার সন্তানের মা।

আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক, আল-হাসান ইবনে আবূ রুবাই, আবদুর রাযযাক, মামর, আইয়ূব প্রমুখ সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ উক্ত আয়াত যখন নাযিল

হল, জায়দ ইবনে হারিসা তার ঘোড়াটি নিয়ে উপস্থিত হল— সে ঘোড়াটিকে খুবই ভালোবাসতো। সে বলল, হে রাসূল! এ ঘোড়াটি আল্লাহ্র পথে দিয়ে দিলাম। পরে নবী করীম (স) উসামা ইবনে জায়দকে তার উপর সওয়ার করে দিলেন। দেখা গেল, তা দেখে জায়দ খুব সুখ বোধ করছেন। নবী করীম (স) যখন তার এ অবস্থা লক্ষ্য করলেন, তখন বললেন, আল্লাহ এ দান কবুল করেছেন।

হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এটা ছিল ফরয যাকাত সম্পর্কে আয়াত। আল্লাহ্ ধন-মালে তা ফরয করেছেন এ হুকুম ও ঘোষণার মাধ্যমে।

আবূ বকর (র) বলেছেন ঃ আয়াতটির ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে উমরের দাসীর মুক্তি প্রমাণ করে যে, তিনি মনে করেন, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যা-ই ব্যয় করা হবে, তাতেই সে ব্যয়টা হবে, যা উক্ত আয়াতে করতে বলা হয়েছে। এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, তাঁর মতে ফরয নফল সর্ব প্রকারের ব্যয়ই এর মধ্যে সাধারণভাবে শামিল। অনুরূপভাবে আবূ তালহা ও জায়দ ইবনে হারিসার কাজ প্রমাণ করে যে, উক্ত হুকুমটি কেবল ফরয দানের সীমাবদ্ধ— নফল শামিল নয়, এ কথা তাঁরা মনে করতেন না। এ প্রেক্ষিতে 'তোমরা কখনই পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ বা সওয়াব পাবে না' কথাটির অর্থ হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ্র নৈকট্যের সেই উচ্চতর মনযিল কখনই পাবে না যতক্ষণ না তোমরা ব্যয় করবে সেই জিনিস, যা তোমরা ভালোবাস।' আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার জন্যে এ আয়াতে চূড়ান্ত ও সর্বাধিকভাবে উৎসাহ দান করা হয়েছে। কেননা প্রিয়তম জিনিস আল্লাহ্র জন্যে ব্যয় করা নিয়তের সত্যতা যথার্থতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা প্রমাণ করে। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ -

কুরবানীর গোশ্ত ও রক্ত কখনই আল্লাহ্কে পাবে না। এবং আল্লাহ্কে পাবে তাকওয়া। (সূরা হজ্জ ঃ ৩৭)

ভাষার অভিধানে এরূপ ব্যবহার সঙ্গত, যদিও এ কথায় আসলকে অস্বীকার করতে চাওয়া হয়নি। পূর্ণত্ব অস্বীকার বুঝিয়েছে। যেমন নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ لَايَجِدُ مَا يُنْفِقُ وَلَا يَفْطِنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ -

তোমরা যাকে এক মুঠি বা দুই মুঠি খাবার বা একটি খেজুর বা দুটি খেজুর দাও, সে প্রকৃত মিসকীন ব্যক্তি নয়। বরং প্রকৃত মিসকীন হচ্ছে সে, যে পায় না কি খরচ করবে, তারা চিন্তাও করতে পারে না যে তা দান করবে'।

এ হাদীসে অত্যাধিক বেশি করে মিসকীনের মিসকিনী বা দারিদ্র্যকে প্রকাশ করা হয়েছে। অন্যের ব্যাপারে মিসকিনীতে পুরাপুরি অস্বীকার করা হয়নি।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ -

সর্ব প্রকারের খানা-ই বনী ইসরাঈলীদের জন্যে হালাল ছিল, শুধু তা বাদে যা ইসরাঈল নিজে নিজের জন্যে হারাম করে নিয়েছিল।

আবূ বকর (র) বলেছেন, এ স্পষ্ট অর্থ, সর্বপ্রকারের খাদ্য বনী ইসরাঈলীদের জন্যে মুবাহ ছিল। তবে ইসরাঈল নিজের জন্যে কিছু কিছু খাদ্য হারাম করে নিয়েছিল।

ইবনে আব্বাস ও আল-হাসান থেকে বর্ণিত, ইসরাঈল অস্থি ব্যথায় আক্রান্ত হলে তার সবচাইতে প্রিয় খাদ্য নিজের জন্যে হারাম করে, তা হল উটের গোশ্‌ত, যদি আল্লাহ শেফা দান করেন। এটা ছিল মানতস্বরূপ কাজ। কাতাদা বলেছেন, উটের রগ খাওয়া হারাম করেছিল। এ-ও বর্ণিত হয়েছে যে, 'ইসরাঈল' হচ্ছে হযরত ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (আ)-এর নাম। তিনি মানত করেছিলেন, তিনি যদি তার কঠিন রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেন তাহলে তিনি তাঁর প্রিয়তম খাদ্য পানীয় নিজের জন্যে হারাম করে নেবেনে আর তা ছিল উটের গোশ্‌ত ও দুগ্ধ।

আলোচ্য আয়াতটির নাযিল হওয়ার উপলক্ষ্য ছিল, নবী করীম (স) উটের গোশত হালাল ঘোষণা করেছিলেন, তা তারা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল। কেননা পূর্ববর্তী নবীর ফয়সালাকে মনসূখ করা তারা জায়েয মনে করতে পারেনি। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন। এ আয়াতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, উঠের গোশত ও দুগ্ধ হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর বংশংধরদের জন্যে সম্পূর্ণ হালাল ছিল। ইসরাঈল নিজের জন্যে তা হারাম করেছিলেন, এটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। তখন নবী করীম (স) তাদের চ্যালেঞ্জ দেন তওরাত কিতাবে তা লেখা আছে বলে। কিন্তু তারা সে চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে সাহস পায়নি। তারা তওরাত নিয়ে আসেনি এ ভয়ে যে, তাতে নবী করীম (স)-এর কথাই সত্য প্রমাণিত হয়ে পড়বে। মন্‌সূখ না হওয়া সম্পর্কে তাদের কথা বাতিল হয়ে গেল। কেননা কোন জিনিস কখনও মুবাহ্ থাকলে তা নিষিদ্ধ হলে পুনরায় তা মুবাহ হতে পারে।

এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, নবী করীম (স)-এর নবুয়ত সত্য। কেননা তিনি তো উম্মী ছিলেন। কোন কিতাব কখনও পড়েন নি। আহলি কিতাব লোকদের সাথে বৈঠকে কখনও বসেনও নি। ফলে আগের নবীগণের কিতাবের তত্ত্ব তাঁর পক্ষে জানা অসম্ভব ছিল। তা সম্ভব হয়েছিল আল্লাহ তাঁকে বিশেষভাবে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন। ইসরাঈল যে খাবার নিজের জন্যে হারাম করেছিলেন, তা তাঁর নিজের জন্যেই হারাম ছিল, সমগ্র বনী ইসরাঈলীদের জন্যেও হারাম ছিল। তা আল্লাহ্‌র উক্ত কথা ঃ 'বনী ইসরাঈলের জন্যে সব খাদ্যই হালাল ছিল। তবে যা ইসরাঈল নিজের জন্যে হারাম করেছিল, তা এর বাইরে।' আল্লাহ বনী ইসরাঈলের জন্যে যা হালাল করেছিলেন তা থেকে বাদ পড়ে গেল তা যা ইসরাঈল নিজের জন্যে নিষিদ্ধ করে নিয়েছিলেন, তা সব বনী ইসরাঈলের জন্যেও হারাম হয়ে গিয়েছিল।

প্রশ্ন তোলা যায়, মানুষের পক্ষে নিজের উপর কোন কিছু হারাম করা কি করে জায়েয হতে

পারে, হারামকরণ বা মুবাহ্‌করণে যে সার্বিক কল্যাণ নিহিত থাকে তা তো মানুষের জানা নেই। বিশেষ করে ইবাদতে নিহিত কল্যাণ সংক্রান্ত ইলম একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোর জানা থাকার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

জবাবে বলা যেতে পারে, আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তা করা সম্পূর্ণ জায়েয। আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে যেমন ইজতিহাদ করা জায়েয শরীয়াতের হুকুম আহ্‌কামে। ইজতিহাদের ফলে লব্ধ শরীয়াতের হুকুম এভাবেই আল্লাহ্‌র বিধানে পরিণত হয়। ব্যক্তির জন্যে নিজের হালাল স্ত্রীকে তালাক দিয়ে নিজের জন্যে হারাম করে নেয়া-ও তো জায়েয। অনুরূপভাবে নিজের ক্রীতদাসীকে মুক্তি দিলেই সে তার জন্যে হারাম হয়ে যায়। এমনিভাবে আল্লাহ্‌র দেয়া অনুমতিক্রমে নিজের জন্যে কোন হালাল খাদ্য হারাম করে নিতে পারে। এ অনুমতি হয় শরীয়াতের অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে পাওয়া যাবে কিংবা পাওয়া যাবে ইজতিহাদের মাধ্যমে। ইসরাইল নিজের জন্য যে খাদ্য হারাম করে নিয়েছিলেন, তা হয় তা নিজের ইজতিহাদের ফলশ্রুতি ছিল, যা তিনি এ ব্যাপারে করেছিলেন অথবা তা ছিল আল্লাহ্‌র দিক দিয়ে বিশেষভাবে তাঁর জন্যে 'তাওকীফ'— যার দরুন হারামকরণ তাঁর জন্যে মুবাহ হয়েছিল। আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুক্রমেই তা হয়েছিল। আয়াত থেকে বাহ্যত এটাই মনে হয় যে, এ হারামকরণটা তাঁর ইজতিহাদী সিদ্ধান্তের ব্যাপার ছিল। কেননা হারামকরণ কাজটি তাঁর দ্বারাই সঙ্ঘটিত হওয়ার কথা স্বয়ং আল্লাহ্‌ই বলেছেন। তা যদি তাওকীফ-এর ফলে হতো তাহলে আল্লাহ্‌র কথাটি হতোঃ 'তবে আল্লাহ বনী ইসরাঈলের প্রতি যা হারাম করেছেন .....।" কিন্তু আয়াতে বলা হয়েছে, হারামকরণের কাজটি ইসরাঈল করেছেন। এ থেকে বোঝা গেল, হারামকরণকে ইজতিহাদের পন্থায় ইতিবাচক করার অধিকার তাঁকে দান করা হয়েছিল। আর এ কথাই প্রমাণ করে যে, নবী করীম (স)-কে শরীয়াতের বিধানে ইজতিহাদ করার অধিকার দেয়া হয়েছিল। অন্যান্য নবী ও বিশেষজ্ঞের জন্যেও। তবে নবী করীম (স) এ ব্যাপারে অন্য সকলের অপেক্ষা অধিকারী এবং উপযুক্ত। কেননা কিয়াস-এর দিক সমূহ ও ইজতিহাদ করে একটা প্রকাশ করার ইলম ও যোগ্যতা তাঁর ছিল অনেক বেশি। উসূলুফিকহ্ গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত লেখা হয়েছে।

আবূ বকর (র) বলেছেন, উক্ত আয়াত প্রমাণ করে যে, ইসরাঈল নিজের জন্যে যে খাদ্য হারাম করেছিলেন তা একটি সঙ্ঘটিত ঘটনা। ব্যবহৃত শব্দ থেকে হারামকরণ ছাড়া আর কিছুই প্রমাণ করে না। কিন্তু এ গোটা ব্যাপারটিই আমাদের নবী করীম (স) উপস্থাপিত শরীয়াতে সম্পূর্ণ মনসূখ হয়ে গেছে। তার প্রমাণ এই যে, নবী করীম (স) মারিয়াকিবতিয়া— অন্য বর্ণনায় মধু নিজের জন্যে হারাম করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র সে দুটিকে তাঁর জন্যে হারাম করেন নি। তিনি যে কিরা করেছিলেন তা ভাঙ্গিয়ে তার কাফফারা দেয়ার বিধান দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর প্রতি আয়াত নাযিল হয়েছিল, তা এইঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَٰجِكَ .... قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَٰنِكُمْ -

হে নবী! আল্লাহ তোমার জন্যে যা হালাল করেছেন তুমি তা হারাম করছ কেন ? তুমি কি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্ট করতে চাও ..... তোমাদের কিরা ভঙ্গ করা আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে ফরয করেছেন। (সূরা তাহরীম ঃ ১-২)

অর্থাৎ কিরা করে হালালকে হারামকরণের ক্ষেত্রে কিরার কাফফারা দেয়া ফরয করা হল। হারামকরণকে মেনে নেয়া হল না।

হানাফী ফিকাহবিদগণ মত দিয়েছেন, যদি কোন ব্যক্তি নিজের ক্রীতদাসী বা নিজ মালিকানার কোন জিনিস কিরা করে হারাম করে, তাহলে তাতে তা তার উপর হারাম হয়ে যায় না। হারামকরণের পর-ও সে তা মুবাহ মনে করবে, তবে কিরার কাফফারা দিতে হবে—যেমন কেউ যদি কিরা করে যে, সে এ খাদ্য খাবে না। তবে হলফ ও কিরার মধ্যে একটা দিক দিয়ে তাঁরা পার্থক্য করেছেন। যেমন যদি বলে ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমি এ খাবার খাব না, তাহলে সমস্ত খাবার খেয়েই তাকে এ কসম ভাঙতে হবে। আর যদি শুধু বলে ঃ এ খাবারটা আমার নিজের উপর হারাম করে নিয়েছি, সে সেই খাবারের একটা অংশ খেয়েই সে হারাম করণকে ভেঙ্গে ফেলবে। কেননা কিরাকারী যখন হারাম করে নিয়েছি বলে হলফ করবে, তখন সে খাদ্যের একটি অংশ খেয়ে সেই হলফ ভঙ্গ করার ইচ্ছা করেছে। এ কথটি সেরূপই দাঁড়াবে, যেমন বলবে আল্লাহ্‌র কসম, আমি এ খাবার থেকে কিছুই খাব না। এ জন্যে যে, আল্লাহ্ তার উপর এসব জিনিস থেকে কোনটি হারাম করেন নি। কাজেই তার হারামকরণে কম ও বেশি— সবই শামিল হবে। আর যে লোক নিজের উপর কোন জিনিস হারাম করেছে, সমস্ত খাদ্য থেকে কিছুই খাবে না বলে কিরা করেছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ -

মানুষের জন্যে সর্বপ্রথম যে ঘর নির্মিত হয়েছে, তা মক্কায় অবস্থিত। তা অতীব বরকত সম্পন্ন এবং সারে জাহানের লোকদের হেদায়েত কেন্দ্র।

মুজাহিদ ও কাতাদাহ বলেছেন, কাবা ঘরের পূর্বে পৃথিবীতে আর কোন ঘরই নির্মিত হয়নি। হযরত আলী ও হাসান বলেছেন, কাবাই প্রথম ইবাদতের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে।

بَكَّةَ 'বাক্কাতা' সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন মত রয়েছে। জুহ্‌রী বলেছেন, 'বাক্কা' হচ্ছে মসজিদ ও মক্কা হল সমস্ত হারাম। মুজাহিদ বলেছেন, 'বাক্কা'ই মক্কা। এ কথাটি যিনি বলেছেন, তাঁর কথা হল, শব্দের ب পরে ميم এ বদল হয়ে গেছে। যেমন মস্তক মুণ্ডন করা হলে আরবীতে سَبَدَ ও سَمَدَ দুটি দুইটি শব্দই বলা হয়। আবূ উবায়দা বলেছেন, 'বাক্কা' হচ্ছে মক্কার অভ্যন্তর। এ-ও বলা হয়েছে, بَكٌّ অর্থ ভীড়। যেমন ভীড় হলে আরবী ভাষায় বলা হয়— بَكَّهٗ تَبَاكَ النَّاسَ ও بَكًّ —লোকদের ভীড়ের স্থান সম্পর্কে এরূপ বলা হয়। কাজেই আল্লাহ্‌র ঘরকেও بكه নামে অভিহিত করা যায়। কেননা লোকেরা সেখানে নামাযে বরকতের জন্যে ভীড় করে। আর মসজিদের চতুষ্পার্শ্বকেও 'বাক্কা' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকতে পারে এ কারণে যে, লোকেরা তওয়াফ করার জন্যে সেখানে ভীড় করে।

আল্লাহ্‌র কথা هُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ 'সমগ্র জাহানের লোকদের হেদায়েতের কেন্দ্র। কেননা এ ঘরে আল্লাহ্‌র কথা বলে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ করে। কেননা এখানে যেসব নিদর্শন রয়েছে, তা আল্লাহ ছাড়া কারোর পক্ষে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এখানে সর্বপ্রকারের বর্বরতা থেকে নিরাপত্তা লাভ করা যায়। হারাম শরীফে হরিণ ও কুকুর-ও এক সাথে থাকতে পারে। কুকুর হরিণের উপর উত্তেজিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে না, আর হরিণও ভয় পেয়ে পালাতে চেষ্টা করবে না।

এ ঘর আল্লাহ্‌র তওহীদের ও কুদরতের অকাট্য প্রমাণ। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, 'ঘর' বলতে এখানে কাবা ঘর ও তার চতুষ্পার্শ্বস্থ গোটা হারাম বুঝিয়েছেন। কেননা উক্ত অবস্থা সমস্ত হারাম এলাকায়ই বিরাজমান।

আল্লাহ্‌র কথা مُبَارَكًا অর্থাৎ সে ঘর বিপুল কল্যাণময় প্রতিষ্ঠান। 'বরকত' বলতে বিপুল কল্যাণের বিরাজমানতা বোঝায়। তার ক্রমবৃদ্ধি ও ক্রম উৎকর্ষ বোঝায়। البرك অর্থ প্রমাণিত হওয়া, স্থিতিশীল হওয়া। কোন জিনিস নিজ অবস্থায় স্থিতিশীল হলে আরবী ভাষায় বলা হয় ঃ

بَرَكَ بَرْكًا وَبُرُكًا-

এ আয়াতটিতে বায়তুল হারামে হজ্জ করতে উৎসাহ নিহিত আছে। কেননা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাতে বিপুল কল্যাণ ও বরকত, কল্যাণের ক্রমবিকাশ ও বৃদ্ধি রয়েছে। সে সাথে তওহীদ ও দ্বীন-ইসলামের দিকে হেদায়েত প্রাপ্তির সূক্ষ্মতাও রয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ -

সেখানে সুস্পষ্ট অকাট্য নিদর্শনসমূহ ও মাকামে ইবরাহীম অবস্থিত।

আবূ বকর বলেছেন, আয়াতের কথা ঃ مَقَامَ اِبْرٰهِيْمَ বুঝিয়েছে যে, কাবা ঘর নির্মাণ কালে যে শক্ত পাথরখন্ডের উপর হযরত ইবরাহীম (আ) দাঁড়িয়ে থেকে পাথর গাথার কাজ করেছিলেন, তার উপর আল্লাহ্‌র কুদরতে তাঁর দুই পা বসে গিয়েছিল, যেন তা প্রমাণ হয়ে থাকে এবং তওহীদ ও ইবরাহীম (আ)-এর নবুয়তের সত্যতার অকাট্য নিদর্শন হয়ে থাকে। তার আরও নিদর্শন রয়েছে। যেমন জন্তু-জানোয়ার-প্রাণী মাত্রেরই সেখানে নিরাপত্তা রয়েছে। এক সময় সেখানে বহু হিংস্র জীব-জন্তু থাকত, যা শিকারী ও আক্রমণকারী। জাহিলিয়াতের সময় প্রাণের ভয়ে মানুষ সেখানে পূর্ণ মাত্রার নিরাপত্তা পেতে পারত। অথচ হারামের বাইরে মানুষের ছিনতাই হতো অবাধে। ইবরাহীম (আ)-এর সময় থেকে বর্তমান বছর পর্যন্ত প্রতি বছর হজ্জের সময় কত কোটি কোটি পাথর-কংকর আহরিত ও নিক্ষিপ্ত হয়ে আসছে তার কোন শেষ বা হিসাব-নিকাশ নেই। প্রস্তর ভিন্ন স্থান থেকে আহরণ করে নির্দিষ্ট স্থানে নিক্ষেপ করা হয়। এ ঘরের উপর দিয়ে সরাসরিভাবে পাখীর উড্ডয়ন নিষিদ্ধ। রোগী সেখানে আরোগ্য লাভ করে। তার মহান মর্যাদা ক্ষুণ্নকারী অতি শিগগীরই প্রতিশোধমূলক শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হয়। এ অবস্থাই অক্ষুণ্ন-অব্যাহত হয়ে রয়েছে আবহমানকাল ধরে। 'আসহাবুল ফীল'— হস্তীওয়ালা বাহিনী এ ঘর ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে আসতে শুরু করলে পথিমধ্যেই ধ্বংস হয়ে যায় আবাবীল

পাখীর নিক্ষিপ্ত কংকর দ্বারা। এ সব হারাম শরীফের মহানত্ব ও পবিত্রতার অকাট্য নিদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়। ইবরাহীম (আ)-এর পায়ের চিহ্ন ধরা পাথরখন্ড কাবা ঘরের ভেতরে নয়, ঘরের বাইরে সংরক্ষিত।

## অপরাধীর হারামে প্রবেশ কিংবা হারামে অপরাধ করা

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا –

যে লোকই এখানে প্রবেশ করবে, সে-ই পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করবে।

আবূ বকর বলেছেন, প্রথমে বলা হয়েছে (পৃথিবীতে) সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছে লোকদের জন্যে তার পর বলা হয়েছে ঃ 'যে লোকই সেখানে প্রবেশ করবে।' এরপর আয়াত ও নিদর্শনসমূহের উল্লেখ হয়েছে, যা সমগ্র হারাম এলাকায় মওজুদ রয়েছে। এরপর ঃ 'যে-ই সেখানে প্রবেশ করবে' এর অর্থ সেই সমগ্র হারাম এলাকা-ই বুঝতে হবে। 'যে লোকই সেখানে প্রবেশ করবে সে-ই নিরাপদ হবে' বলে মানুষের জান-প্রাণের পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ বোঝায়। সে প্রবেশের পূর্বে নিজে অপরাধী হলেও সেখানে প্রবেশের পর অপরাধ করলেও। তবে ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, হারাম-এর মধ্যে প্রাণ বধের অপরাধ করলে তাকে অবশ্যই পাকড়াও করা হবে। প্রাণ বধের তুলনায় ছোট অপরাধ করলেও তাই; আর একথা জানা-ই আছে যে, 'আল্লাহ্র যে লোক-ই সেখানে প্রবেশ করবে, সেই নিরাপদ হবে' কথাটি মূলত একটি আদেশ, যদিও তা বলা হয়েছে সংবাদ দান হিসেবে। যেন বলা হয়েছে ঃ 'আল্লাহ্র হুকুমেই সে নিরাপদ (অর্থাৎ আল্লাহ তাকে নিরাপত্তা দিতে আদেশ করেছেন)। যেমন বলা হয় ঃ 'এটা মুবাহ, এটা নিষিদ্ধ।' এরূপ কথার অর্থ হয়, এটা আল্লাহ্র হুকুমে মুবাহ, এটা আল্লাহ্র হুকুমে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে এই করতে আদেশ করেছেন। তবে তার অর্থ এই নয় যে, কোন লোক নিজেই তা মুবাহ বানিয়ে নেবে বা নিষিদ্ধ করে নেবে। 'মুবাহ্'র কথার অর্থ হবে ঃ তুমি এ কাজটা করতে পার। এটা করলে তোমার কোন সওয়াব নেই যেমন, তেমনি কোন আযাবও ভোগ করতে হবে না। আর যা নিষিদ্ধ, তাতে কথাটি হবে ঃ তুমি এ কাজ করো না, করলে তোমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ্র 'যে লোকই সেখানে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ হবে' কথাটিও এমনি আমাদের জন্যে একটি আদেশ। আর রক্তপাত সেখানে নিষিদ্ধ। এই দৃষ্টিতে একথাটি আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قَاتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ –

তোমরা মসজিদে হারাম-এর নিকট ওদের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করবে না, যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে। তারা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ বাধায়, তাহলে তোমরা তাদের হত্যা কর। (সূরা বাকারা ঃ ১৯১)

এ আয়াতে জানানো হয়েছে, হারামে প্রাণহত্যা ঘটা জায়েয হবে, সেখানে মুশরিকদিগকে হত্যা করতে আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যদি তারা আমাদের বিরুদ্ধে সেখানে যুদ্ধ শুরু করে।' যে লোক সেখানে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ হবে' কথাটি নিছক খবর হলে খবরদাতার উহ্য থাকা কখনই জায়েয হতো না। তাই বলতে হবে, এটি আমাদের জন্যে আদেশ বিশেষ এবং তাকে হত্যা করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। সে সাথে তার উপর জুলুম করা ও তাকে হত্যা থেকে নিরাপত্তা দানেরও আদেশ দেয়া হয়েছে। সে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে না। সে যদি এমন অপরাধ করে থাকে, যার দণ্ড হত্যা, তা থেকেও নিরাপত্তা পেয়ে যাবে। যে হত্যা দণ্ড পাওয়ার যে যোগ্য নয়, তা থেকেও সে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা পাবে। জুলুম হিসেবে হত্যা থেকেও সে রক্ষা পাবে। অন্যথায় হারাম-এর কথিত বিশেষত্ব ক্ষুণ্ন হবে। কেননা হারাম ও হারামের বাইরে—এ ব্যাপারে সমান। কেননা প্রত্যেকটি মানুষকে জুলুম থেকে নিরাপদ রাখা আমাদের কর্তব্য— তা আমাদের পক্ষ থেকে হোক কিংবা আমাদের ছাড়া অন্যদের পক্ষ থেকে। আমরা যদি তা করতে সমর্থ হই, তাহলে আমরা জানবো যে, আয়াতটির তাৎপর্য হচ্ছে, দণ্ডপদ, যার অধিকারীর দিক থেকে নিরাপত্তা দেয়ার এ আদেশ। এর বাহ্যিক অর্থের দাবি হচ্ছে, তার হারামে কৃত বা হারামের বাইরে কৃত অপরাধের দরুন দাণ্ডের দাবিদার থেকে তাকে আমরা নিরাপত্তা দেব। তবে শরীয়াত বিশেষজ্ঞদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে এ কথার প্রমাণ দাঁড়িয়ে গেছে যে, হারামে যদি কেউ হত্যাকাণ্ড ঘটায় তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। আল্লাহ বলেছেন ঃ তোমরা ওদের বিরুদ্ধে মসজিদে হারামের নিকট যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ না ওরা তোমাদের বিরুদ্ধে সেখানে যুদ্ধ করে। তারা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাহলে তোমরা তাদেরকে হত্যা কর।' এ কথায় হারামের ভেতরে কৃত অপরাধও হারাম ছাড়া অন্যত্র কৃত অপরাধ এবং অপরাধীর মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে— যখন সে এসে হারামে আশ্রয় গ্রহণ করবে।

হারামের বাইরে অপরাধ করে হারামে এসে আশ্রয় নিলে শরীয়াতের হুকুম কি হবে, এ ব্যাপারে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফর, হাসান ইবনে যিয়াদ বলেছেন, বাইরে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে হারামে আশ্রয় নিলে সে যতক্ষণ হারামে অবস্থান করবে, তার কিসাস করা যাবে না। কিন্তু সে অবস্থায় তার কাছে কিছু বিক্রয় করা যাবে না, তাকে খাবার দেয়া যাবে না— যেন সে হারাম থেকে বের হতে বাধ্য হয়। বের হলেই তাকে কিসাস করতে হবে। আর যদি হারামের মধ্যেই হত্যাকাণ্ড ঘটায়, তাহলে তাকেও সেখানেই হত্যা করা যাবে। তার অপরাধ যদি নরহত্যার কম হয় হারামের বাইরে, পরে সে হারামে প্রবেশ করে, তাহলে তখন তার বিচার করা যাবে।

ইমাম মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন, হারামের মধ্যেই উভয় ধরনের অপরাধের বিচার করা যাবে।

আবূ বকর বলেছেন, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, উবায়দুল্লাহ ইবনে উমায়র, সাঈদ ইবনে জুরাইর, আতা, তায়ূস ও শবী বলেছেন, বাইরে হত্যাকার্য করে হারামে আশ্রয় নিলে তাকে হত্যা করা যাবে না। ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ তবে তার সঙ্গে বসা যাবে না, তাকে সহযোগিতা দেয়া যাবে না, তার নিকট কিছু বিক্রয় করা যাবে না, যেন সে হারাম থেকে

বাইরে আসতে বাধ্য হয়। আর বের হলেই তাকে হত্যা করা হবে। যদি সে হারামের মধ্যে অপরাধ করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে। কাতাদাহ ও হাসান থেকে বর্ণিত, হারামের ভেতরে অপরাধ করুক, কি অন্যত্র, তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হারাম নিষেধ করে না। হাসান বলতেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যে লোক-ই সেখানে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হবে' জাহিলিয়াতের অবস্থার বর্ণনা মাত্র। তখন সর্ব প্রকারের অপরাধ করেও যে হারামে প্রবেশ করতে পারবে তার উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হতো না হারাম থেকে বাইরে না আসা পর্যন্ত। ইসলাম এসে এ নীতিকে আরও শক্ত ও তীব্র করেছে। যে লোক দণ্ডের যোগ্য সে হারামে আশ্রয় নিলে তার উপর দণ্ড কার্যকর করা হবে।

হিশাম হাসান ও আতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা দুজনই বলেছেন, হারামের বাইরে দণ্ডযোগ্য অপরাধ করে হারামে আশ্রয় নিলে তাকে হারাম থেকে বহিষ্কৃত করা হবে এবং তার বিচার করা হবে। মুজাহিদও এরূপ মত প্রকাশ করেছেন। সম্ভবত তার সাথে উঠা-বসা না করা, কেনা-বেচা না করার দ্বারা তাকে বের হতে বাধ্য করার কথাই তিনি বলতে চেয়েছেন। উক্ত আয়াতাংশের তাফসীর হিসেবে আতা থেকেও তা-ই বর্ণিত হয়েছে। তাঁর ও হাসান থেকে অপরাধীকে বাইরে বের করা পর্যায়ে এ একই তাৎপর্য সকলের নিকট গ্রহণীয় বলে মনে হয়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা ওদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ মসজিদে হারামের নিকট করবে না, যতক্ষণ তারা তা করতে শুরু না করবে'-এর তাৎপর্য 'এবং যে লোক তথায় প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হবে' এর সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে যথাস্থানে আমরা ব্যাখ্যা করেছি। আমরা তার কারণস্বরূপ বলেছি যে, 'হারামে প্রবেশই তাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করে যখন সে তথায় আশ্রয় নেবে যদি তার অপরাধ হারামে না হয়ে থাকে। এ পর্যায়ে আগের কালের ফিকাহবিদদের মন্তব্য ও বক্তব্য ইতিপূর্বে আমরা উদ্ধৃত করেছি। তার প্রমাণ করে যে, হারামের বাইরে নরহত্যা করে হারামে আশ্রয় নিলে তাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে সকলেই একমত। কেননা হাসান থেকে এ পর্যায়ে দুটি কথা বর্ণিত হয়েছে। কথা দুটি পরস্পর বিরোধী। তার একটি কাতাদাহ্‌র বর্ণনা ঃ তাকে হত্যা করা যাবে। আর অপরটি হিশাম ইবনুল হাস্‌সানের বর্ণনা ঃ তাকে হারামে হত্যা করা যাবে না; বরং তাকে হারাম থেকে বহিষ্কৃত করতে হবে, তার পরে হত্যা করা যাবে। আমরা এ-ও বলেছি যে, বহিষ্কৃত করার কাজটি সম্ভবত তার পক্ষে হারামকে সংকীর্ণ করে, তার সাথে ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ না করেই করতে হবে। তাতে সে হারামের বাইরে যেতে বাধ্য হবে। ফলে এতে দুটি বর্ণনার মাঝে বিরোধিতার কোন কথা হাসান-এর পক্ষে পাওয়া গেল না। থাকল অপর দুটি কথা, যা সাহাবা ও তাবেয়ীনের মত। তা হল, হারামের বাইরে করা অপরাধের কিসাস হারামের মধ্যে করা নিষিদ্ধ। তবে হারামের মধ্যে কৃত অপরাধের জন্যে তাকে পাকড়াও করা এবং মামলার মাধ্যমে তাকে হত্যা বা যে দণ্ডই সে পেতে পারে দেয়া যাবে। এ পর্যায়ে আগেরকালের ও পরবর্তী কালের ফিকাহবিদদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্‌র কথা ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى -

হত্যার কিসাস করা তোমাদের প্রতি ফরয করা হয়েছে। (সূরা বাকারা ঃ ১৭৮)

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا -

যে লোক অকারণ নিহত হবে, তার অভিভাবকের জন্যে একটা কর্তৃত্ব বানিয়ে দিয়েছি ....
(সূরা বনী ইসরাইল ঃ ৩৩)

এ আয়াতদ্বয় সাধারণভাবেই কিসাস বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে, তা হারামের মধ্যে হোক বা বাইরে।

জবাবে বলা যাবে, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যে-ই সেখানে প্রবেশ করবে, সে নিরাপত্তা পাবে' দাবি করে যে, হারামের বাইরে কৃত অপরাধে অপরাধী হত্যা থেকে রক্ষা পাবে। আর 'কিসাস ফরয করা হয়েছে' ও এ পর্যায়ের যেসব আয়াত কিসাস বাধ্যতামূলক করে, তা— যেমন পূর্বে বলেছি— হারামে প্রবেশ করার দরুন নিরাপত্তার উপর বিন্যস্ত। এসব আয়াত কিসাস সংক্রান্ত সাধারণ আয়াত থেকে বিশেষীকৃত— স্বতন্ত্র অবস্থায় প্রযোজ্য। উপরন্তু 'তোমাদের প্রতি কিসাস ফরয করা হয়েছে' আল্লাহ্‌র এ কথাটি কিসাস বাধ্যতামূলক করার জন্য অবতীর্ণ। হারাম সম্পর্কে তাতে কিছুই নেই। পক্ষান্তরে 'যে লোক সেখানে প্রবেশ করবে নিরাপদ হবে' কথাটি হারাম সম্পর্কে বিশেষভাবে উদ্ধৃত।' যে সেখানে আশ্রয় নেবে তার সম্পর্কে এ কথা। এমতাবস্থায় একটি কথা নিজ নিজ কৃত সম্পর্কে যে নির্দেশ করবে এবং নিজের অবতীর্ণ হওয়ার প্রসঙ্গেই ব্যবহৃত হবে অবিসংবাদিতভাবে। আর কিসাস সংক্রান্ত আয়াত হারাম প্রসঙ্গে আসতে পারবে না।

অপর দিক থেকে বলা যায়, কিসাস বাধ্যতামূলক হওয়ার ব্যাপারটি হারামে নিরাপদ হওয়ার অগ্রবর্তী ব্যাপার। কেননা কিসাস বাধ্যতামূলক না হলে এবং তা অগ্রবর্তী ব্যাপার না হলে হারামে তার নিরাপত্তা লাভের কোন প্রশ্নই উঠে না, তার উপর কোন হক্-এর দাবিও উঠতে পারত না। অতএব হারামে প্রবেশ করার পর নিরাপত্তা লাভের ব্যাপারটির প্রশ্ন তার পরে আসবে। আর হাদীসের দিক দিয়ে ইবনে আব্বাস ও আবূ শুরাইহ আশ শবী বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা মক্কাকে হারাম বানিয়েছেন। আমার পূর্বে অন্য কারোর জন্যে সেখানে রক্তপাত হালাল করেন নি। আমার পরেও তা কারোর জন্যে হালাল হবে না। আমার জন্যেও শুধু দিনের বেলা ঘন্টাখানিক সময়ের জন্যে মাত্র হালাল করা হয়েছিল।

এ হাদীস-ই প্রমাণ করে যে, সেখানে আশ্রয় গ্রহণকারীর অপরাধের এবং তার মধ্যে কৃত অপরাধের জন্যে কাউকে হত্যা করা অবশ্যই নিষিদ্ধ হবে। তবে তার মধ্যে কৃত অপরাধের জন্যে অপরাধীকে অবশ্যই গ্রেফতার করা হবে— এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই। এক্ষণে বাইরে অপরাধ করে সেখানে আশ্রয় গ্রহণকারীর ব্যাপারটি বিবেচ্য। হাম্মাদ ইবনে সালামাতা হাবীব মুয়াল্লিম-আমর ইবনে শুয়াইব— তাঁর পিতা— তাঁর দাদা সূত্রে নবী করীম (স) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ লোকদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকটই সর্বাধিক খারাপ ও দুষ্ট প্রকৃতির সে, যে হত্যাকারীর পরিবর্তে অপর জনকে হত্যা করল কিংবা হারামে হত্যা করল অথবা হত্যা করল জাহিলিয়তের প্রতিশোধ স্বরূপ।

এ হাদীস-ও সাধারণভাবে হারামে অবস্থানকারী যে-কাউকে হত্যা করাকেই নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। অতএব এ থেকে বিশেষীকরণ সম্ভব হতে পারে কেবলমাত্র দলীলের ভিত্তিতে। তবে হত্যার কম মানের অপরাধের জন্যে অপরাধীকে অবশ্যই পাকড়াও করা হবে। কেননা হতে পারে, কোন ঋণী ব্যক্তি ঋণ থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে হারামে আশ্রয় নিয়ে বসেছে। তাকে আটক করা হবে। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন ঃ 'ঋণগ্রস্তকে পাওয়া গেলে তাকে ধরা ও শাস্তি দেয়ার অধিকার আছে।' ঋণের জন্যে আটক করা-ই তার শাস্তি। এ হচ্ছে হত্যার কম মানের অপরাধের ব্যাপার। অতএব হত্যার কম মানের যে হক তার প্রত্যেকটার জন্যেই পাকড়াও করা হবে, হারামে আশ্রয় নিলেও। ঋণের ব্যাপারে আটক করার সঙ্গে তুলনা (কিয়াস) করেই এ মত দেয়া হয়েছে। হত্যার কম মানের অপরাধে— কোন কিছু পাওনা থাকলে তাকে পাকড়াও করা জায়েয হওয়া ফিকাহবিদদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। অনুরূপভাবে হারামে করা অপরাধে অপরাধকারীকেও তার অপরাধে জন্যে পাকড়াও করা হবে হত্যার অপরাধে এবং তার কম মানের অপরাধেও। হারামের বাইরে অপরাধ করে তারপর হারামে প্রবেশ করলে হারামে তাকে হত্যা করা জরুরী নয়। বরং তার সাথে ক্রয়-বিক্রয় না করা, তাকে কোনরূপ সহযোগিতা না দেয়া কর্তব্য হবে, যেন সে হারামের বাইরে যেতে বাধ্য হয়। হত্যাপরাধীকে হারামে হত্যা না করাই আমাদের নিকট প্রমাণিত মত, তাই অপর হুকুমটি তার উপর কার্যকর করতে হবে। আর তা হচ্ছে, তার সাথে ক্রয়-বিক্রয় না করা, তাকে কোনরূপ সহযোগিতা না দেয়া। এ সমস্ত বিষয়ে ফিকাহবিদদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। তবে হারামের বাইরে অপরাধ করে লোক হারামে আশ্রয় নিয়েছে তার সম্পর্কে কি করা হবে তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। আমরা ইতিপূর্বের আলোচনায় এ বিষয়ের দলীল পেশ করেছি। এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও। তা একটা ঐকমত্যের ধারায় ফেলতে হবে।

আবদুল বাকী ইবনে কানে আমাদের নিকট মুহাম্মাদ ইবনে আবদুস ইবনে কামিল, ইয়াকুব ইবনে হুমায়দ, আবদুল্লাহ্ ইবনুল অলীদ, সুফিয়ান সওরী, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির— জাবির সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَا يَسْكُنُ مَكَّةَ سَافِكُ دَمٍ وَلَا اٰكِلُ رِبًا وَلَا مَشَّاءٌ بِنَمِيْمَةٍ -

মক্কায় কোন রক্তপাতকারী, সূদখোর ব্যক্তি, চোগলখোর ব্যক্তি বাস করতে পারবে না।

এ হাদীস-ও প্রমাণ করে যে, হত্যাকারী হারামে প্রবেশ করলে তাকে আশ্রয় দেয়া যাবে না, তার সাথে উঠাবসা, ক্রয়-বিক্রয় ও পানাহারের সুযোগ করে দেয়া যাবে না, তা চলবে যদ্দিনে সে সেখান থেকে বাধ্য হয়ে বাইরে না আসছে। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন ঃ কোন রক্তপাতকারী মক্কায় বাস করতে পারবে না।

আবদুল বাকী আহমদ ইবনুল হাসান ইবনে আবদুল জব্বার, দাউদ ইবনে আমর, মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম, ইবরাহীম ইবনে মায়সারাতা, তায়ূস, ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ হত্যাকারী হারামে প্রবেশ করলে তার সাথে উঠা-বসা, ক্রয়-বিক্রয় ও আশ্রয়দানের কাজ করা যাবে না। তার সন্ধানকারী যখন তার পেছনে পেছনে এসে বলবে ঃ অমুকের রক্তপাতের দরুন তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর এবং শেষ পর্যন্ত তাকে হারামের বাইরে নিয়ে যাবে।

'যে লোক হারামে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হবে' আল্লাহ্‌র এ কথাটির দৃষ্টান্ত আল্লাহ্‌র এ কথাটি ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ -

লোকেরা কি দেখেনি, আমরা হারামকে নিরাপদ— শান্তিপূর্ণ বানিয়েছি। অথচ তার চারদিকে মানুষকে ছিনতাই করে নেয়া হচ্ছে। (সূরা আনকাবুত ঃ ৬৭)

এ কথাও ঃ

أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا -

আমরা কি তাদের জন্যে একটি নিরাপত্তাপূর্ণ হারাম প্রতিষ্ঠিত করিনি ?(সূরা কাসাস ঃ ৫৭)

এ কথাও ঃ

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا -

আমরা যখন আল্লাহ্‌র ঘরকে লোকদের জন্যে আবর্তন কেন্দ্র ও নিরাপত্তা পূর্ণ বানিয়েছি। (সূরা বাকারা ঃ ১২৫)

এ আয়াত কয়টি প্রায় একই অর্থ জ্ঞাপন করে। প্রমাণ করে, হত্যাপরাধ করে হারামে আশ্রয় গ্রহণকারীকে হত্যা করা নিষিদ্ধ যদিও হারামে প্রবেশের পূর্বে সে হত্যার শাস্তিতে হত্যার যোগ্য ছিল। এ আয়াতসমূহে কখনও 'আল-বায়ত' (ঘর) বলা হয়েছে, কখনও বলা হয়েছে 'হারাম'। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শান্তি— নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এবং সেখানে আশ্রয় গ্রহণকারীকে হত্যা করা নিষিদ্ধ হওয়ায় সমগ্র হারাম আল্লাহ্‌র ঘরের অন্তর্ভুক্ত। এ ঘরে আশ্রয় গ্রহণকারীকে হত্যা করা যাবে না— এ বিষয়ে কোন মতভেদও নেই। কেননা আল্লাহ্ এ ঘরের পরিচয় দিয়েছেন শান্তি ও নিরাপত্তা কেন্দ্র হিসেবে। তাই সমগ্র হারাম সম্পর্কেও এ আইন কার্যকর হবে সেখানে আশ্রয় গ্রহণকারীর ব্যাপারে।

যদি বলা হয়, যে লোক আল্লাহ্‌র ঘরের মধ্যে হত্যাকাণ্ড ঘটাল, তাকে সেখানে হত্যা করা যাবে না। কিন্তু যে লোক হারামের মধ্যে হত্যা করল, তাকে হত্যা করা যাবে। এ পার্থক্যের কারণে আল্লাহ্‌র ঘর ও হারাম তো এক ও অভিন্ন হল না।

জবাবে বলা যাবে, বিরাট মর্যাদার দিক দিয়ে ঘরের হুকুমই হারামের হুকুম আল্লাহ্ এক করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর কালামে কখনও ঘর এবং কখনও হারাম উল্লেখ করেছেন। এজন্যে উভয় সমান ও অভিন্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে যে বিষয়ে বিশেষ দলীল পাওয়া যাবে, সে দলীল অনুযায়ী সে বিশেষ কাজটি করা যাবে। ঘরের মধ্যে হত্যাকারীর ব্যাপারে বিশেষ দলীল পাওয়া গেছে। তাই তার বিশেষীকরণ বাঞ্ছনীয়। থেকে গেল হারাম সংক্রান্ত হুকুম। কুরআনের আয়াতের বাহ্যিক দাবি হল উভয়ের সমান হওয়ার। আসল ও প্রকৃত ব্যাপার তো আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

## হজ্জ ফরয

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً -

আল্লাহ্‌র ঘর পর্যন্ত যাতায়াতে সামর্থ্যবান লোকদের উপর আল্লাহ্‌র ঘরের হজ্জ করা ফরয।

আবূ বকর বলেছেন, আয়াতটির বাহ্যিক অর্থ হল, আল্লাহ্‌র ঘর পর্যন্ত যাতায়াতের পথের উপর সামর্থ্য থাকার শর্তের ভিত্তিতে হজ্জ করা লোকদের জন্যে বাধ্যতামূলক ফরয। পথ সংক্রান্ত হুকুমের তাৎপর্য হল, যার-ই ইচ্ছে পৌঁছা সামর্থ্যভুক্ত, তারই জন্যে তা বাধ্যতামূলক, যখন সে পর্যন্ত পৌঁছার সাধ্য ও সামর্থ্য হবে। আর তা হচ্ছে— সে পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব হওয়া। যেমন আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলেছেন ঃ

فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ -

বের হওয়ার কোন পথ খোলা আছে কি ? অর্থাৎ মনযিলে পৌঁছার পথ ? (সূরা মুমিন ঃ ১১)

বলেছেন ঃ

هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ -

ফেরত দেয়ার কোন পথ আছে কি ? (সূরা শূরা ঃ ৪৪)

এখানেও পৌঁছে যাওয়ার অর্থ নবী করীম (স) এ শর্তও আরোপ করেছেন যে, আল্লাহ্‌র ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থের মধ্যে পাথেয় ও যানবাহনের ব্যবস্থাও শর্তের মধ্যে শামিল।

আবূ ইসহাক, হারিস, আলী নবী করীম (স) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً يُبْلِغُهُ بَيْتَ اللّٰهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوْتَ يَهُوْدِيًّا أَوْنَصْرَانِيًّا -

যে লোক পাথেয় ও যানবাহনের মালিক হল যা তাকে আল্লাহ্‌র ঘরে পৌঁছে দেবে, তার পরও সে হজ্জ করল না, এ ব্যক্তি ইয়াহূদী কিংবা খৃস্টান হয়ে মরবে, তার কোন পার্থক্য নেই।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ যে লোক সে পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্যবান— আল্লাহ্‌র জন্যে আল্লাহ্‌র ঘরের হজ্জ করা সে লোকদের বাধ্যতামূলক ফরয।...... এতেও সে কথাই বলা হয়েছে। ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ আল-জাওজী মুহাম্মাদ ইবনে উব্বাদ, ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ রাসূলে করীম (স)-কে আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যাতায়াত পথে সামর্থ্যবান ব্যক্তিরই আল্লাহ্‌র জন্যে হজ্জ করা বাধ্যতামূলক ফরয' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ 'হজ্জের দিকে পথ' বলতে পাথেয় ও যানবাহন বোঝানো হয়েছে। ইউনুস হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ এ আয়াতটি যখন নাযিল হল, তখন এক ব্যক্তি বলল ঃ হে রাসূল سَبِيْل 'পথ' বলে এখানে কি বোঝাতে চাওয়া হয়েছে? জবাবে বললেন ঃ পাথেয় ও যানবাহন। আতা আল-খুরাসানী ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ السبيل অর্থ পাথেয় ও যানবাহন এবং তার ও ঘরের মধ্যে কারোর প্রতিবন্ধক না হওয়া। সাঈদ ইবনে যুবায়র বলেছেন ঃ আয়াতে হজ্জের জন্যে পাথেয় ও যানবাহনের কথাই বলা হয়েছে।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্ যে পথের সামর্থ্যের কথা বলেছেন, তার অর্থ পাথেয় ও যানবাহন থাকা ও পাওয়া যাওয়া। হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তাবলীর মধ্যে এ দুটি জিনিস পাওয়ার মধ্যেই সামর্থ্য সীমাবদ্ধ নয়। কোন জীনের ভয়ে কাতর রোগী, যানবাহনে চলতে সামর্থ্যহীন বৃদ্ধ, দুর্বল স্বাস্থ্য, আর যার যার পক্ষে সেখানে পৌঁছা সম্ভব নয়, তারাও আল্লাহ্র ঘর পর্যন্ত পৌঁছতে অক্ষম বলে মনে করতে হবে এবং তাদের উপরও হজ্জ ফরয নয়। কেননা তাদের পাথেয় ও যানবাহন থাকলেও তারা হজ্জে যেতে সমর্থ হয় না। এ থেকে প্রমাণিত হল, নবী করীম (স) যে পাথেয় ও যানবাহনের শর্ত করেছেন তা-ই সামর্থ্যের সকল শর্ত নয়। তা থেকে বোঝা গেল, যার পক্ষে পায়ে হেঁটে বায়তুল্লাহ পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব, যে যদি পাথেয় ও যানবাহন না-ও পায়, তবু তার উপর হজ্জ ফরয, এ মতটি উপরোক্ত কথার ভিত্তিতে বাতিল প্রমাণিত হল। নবী করীম (স) স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, হজ্জ ফরয হওয়া বিশেষিত হয়েছে সওয়ার হওয়ার সাথে, পায়ে চলার সাথে নয়। যার পায়ে হেটে চলা ছাড়া— যা অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর— কাবা পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়, তার উপর হজ্জ ফরয নয়।

যদি বলা হয়, পাথেয় ও যানবাহন না পাওয়া অবস্থায় পায়ে হেটে যাওয়া সম্ভব হলে মক্কা ও ব্যক্তির মধ্যে মাত্র ঘন্টাখানিকের দূরত্ব হওয়া হজ্জ ফরয হওয়ার বাধ্যতামূলক না হওয়া বাঞ্ছনীয়।

জবাবে বলা যাবে, পায়ে চলে মক্কা যাওয়া যার জন্যে খুব কঠিন ও দুঃসহ কষ্টকর নয়, তার পক্ষে সহজ ব্যাপার হবে তার তুলনায়, যে পাথেয় ও যানবাহন পেল তার ঘর-বাড়ি মক্কা থেকে দূরবর্তী হওয়া অবস্থায়। একথা জানা যে, পাথেয় ও যানবাহনের শর্ত তো এজন্যে যে, পৌঁছতে যেন কষ্ট না হয়। চললে ক্ষতিকর কোন কিছু দেখা না দেয়। লোক যদি হয় মক্কার অধিবাসী ও মক্কার নিকটবর্তী এলাকার, তার পক্ষে দিনের বেলা ঘন্টাখানিক সময়ে পায়ে হেটে পৌঁছা সম্ভব। সে-ও কোনরূপ কষ্ট ছাড়া পৌঁছতে সক্ষম। আর কঠিন দুঃসহ কষ্ট ছাড়া যদি কাবা পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব না হয়, আল্লাহ তার বেলায় আদেশকে হালকা করে দিয়েছেন। তার জন্যে হজ্জ বাধ্যতামূলক ফরয নয়। তবে রাসূল (স) বর্ণিত শর্ত পাওয়া গেলে হজ্জ বাধ্যতামূলক ফরয হবে।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ -

দ্বীন পালনে তোমাদের উপর আল্লাহ কোন কষ্ট বা অসুবিধা চাপিয়ে দেন নি।

(সূরা হজ্জ ঃ ৭৮)

আমাদের মাযহাব অনুযায়ী মেয়েলোকের হজ্জ পালনে একটি বড় শর্ত হচ্ছে মুহরম ব্যক্তিকে সঙ্গে পাওয়া। কেননা নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا فَوْقَ ثَلَاثٍ اِلَّا مَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ اَوْ زَوْجٍ -

তিন দিনের দূরত্বের পথে মুহরম পুরুষ বা স্বামীর সঙ্গ ছাড়া আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার মেয়েলোকের পক্ষে সফর করা হালাল নয়।

আমর ইবনে দীনার আবূ মাবদ, ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, নবী করীম (স) ভাষণ দিয়ে বলেছেন ঃ 'কোন মেয়েলোক মুহরম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া সফর করবে না।' এক ব্যক্তি বলে উঠল ঃ হে রাসূল! আমি অমুক যুদ্ধে ব্যস্ত থাকাকালে আমার স্ত্রী হজ্জ করার ইচ্ছা করেছিল। সে কি হজ্জ করতে যাবে? রাসূল (স) বললেন ঃ 'তুমি তোমার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে হজ্জ করতে যাও।'

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, রাসূলের কথা ঃ 'মুহরম সঙ্গী ছাড়া মেয়েলোক সফর করবে না' কথাটি হজ্জ করতে ইচ্ছুক মহিলাকেও শামিল করে। এর তিনটি কারণ। একটি, প্রশ্নকারী উক্ত কথা থেকে তা-ই বুঝতে পেরেছে। এ কারণে তার হজ্জের নিয়তকারী স্ত্রী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। নবী করীম (স) তা অস্বীকার বা প্রতিবাদ করেন নি। বোঝা গেল, নবী করীম (স) তাঁর নিষেধাত্মক কথাটি হজ্জ ও অন্যান্য সাধারণ সব রকমের সফরই শামিল করে। দ্বিতীয় রাসূল (স)-এর কথা ঃ 'তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ কর' এতেই 'মুহরম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া মেয়ে লোক সফরে যাবে না।' কথাটিও শামিল। আর তৃতীয়, সেই পুরুষকে যুদ্ধ ত্যাগ করে তার স্ত্রীর সাথে হজ্জ করতে যাওয়ার হুকুম করলেন। মুহরম পুরুষ বা স্বামী সঙ্গী ছাড়া স্ত্রীর পক্ষে হজ্জ করতে যাওয়া যদি জায়েয-ই হতো, তাহলে তাকে যুদ্ধ ত্যাগ করে যাওয়ার অনুমতি নিশ্চয়ই দিতেন না। যুদ্ধ ছিল তার জন্যে ফরযে কিফায়া। এ কথায় এ মসলারও দলীল রয়েছে যে, স্ত্রীর হজ্জ ছিল ফরয, নফল নয়। কেননা তার হজ্জ যদি নফল হতো, তাহলে স্বামীকে যুদ্ধ ত্যাগ করে যেতে বলতেন না। তা স্ত্রীর হজ্জের তুলনায় নফল ফরয ছিল বলেই এরূপ বলেছিলেন।

আরও একটি দিক দিয়ে বিবেচনা করা যায়। নবী করীম (স) প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞাসা করেন নি যে, তার স্ত্রীর হজ্জ ফরয ছিল, না নফল। এতে এ দলীল রয়েছে যে, মুহরম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া স্ত্রীর ঘরের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে ফরয হজ্জ ও নফল হজ্জের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, স্ত্রীর জন্যে মুহরম পুরুষ সঙ্গী থাকা সামর্থ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি শর্ত। স্ত্রীর ইদ্দত পালন না হওয়াও সামর্থ্যের শর্তভুক্ত। এ ব্যাপারেও কোন মতভেদ নেই। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ -

তোমরা ইদ্দত পালনে রত মেয়েলোকদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের করো না, তারাও বাইরে যাবে না। তবে তারা যদি কোন নির্লজ্জতার কাজ করে তাহলে অন্য কথা।

(সূরা তালাক্ ঃ ১)

ইদ্দত পালনে রত না হওয়া যখন হজ্জের সামর্থ্যের শর্তভুক্ত, তখন মুহ্রম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া স্ত্রীর সফর নিষিদ্ধ হওয়ার মধ্যেও তা শামিল হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

যানবাহনে চড়ে স্থির হয়ে থাকতে পারাও সামর্থের একটি শর্ত। তা এজন্যে যে, আবদুল

বাকী ইবনে কানে মূসা ইবনুল হাসান ইবনে আবূ উব্বাদ মুহাম্মদ ইবনে মুসয়িব আওযায়ী আ-যুহরী সুলায়মান ইবনে ইয়াসার ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, খাশয়াম বংশের একটি মেয়েলোক বিদায় হজ্জের সময়ে নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করেছিল, বলেছিল, হে রাসূল! আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহ্‌গণের উপর যে হজ্জ ফরয করেছেন, আমার পিতা তা বৃদ্ধাবস্থায় জানতে পারেন। তিনি যানবাহনে নিজেকে ধরে রাখতে পারেন না। এমতাবস্থায় আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি ? জবাবে রাসূল (স) বললেন— হ্যাঁ, তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পার। এ হাদীসে নবী করীম (স) মেয়েলোকটিকে তার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করার অনুমতি দিলেন। সেই বৃদ্ধ ব্যক্তিকেই বাধ্যতামূলকভাবে হজ্জ করতে বলেন নি। এ থেকে বোঝা গেল, হজ্জে পৌঁছতে পারাটাও হজ্জের জন্য প্রয়োজনীয় সামর্থ্যের অন্তর্ভুক্ত শর্ত। এ পর্যায়ের লোকদের জন্যে পাথেয় ও যানবাহন পাওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগতভাবে হজ্জ করা বাধ্যতামূলক না হলেও অন্যরা তাদের পক্ষ থেকে হজ্জ করবে, এটা অত্যন্ত জরুরী। স্থায়ী রোগী, দুর্বল স্বাস্থ্যহারা ও মেয়েলোক— যারা হজ্জ করতে পারেনি, তাদের উপর হজ্জ ফরয হলে মৃত্যুকালে হজ্জ করার জন্যে তাদের অসিয়ত করে যাওয়া উচিত। তা এ জন্যে যে, হজ্জে পৌঁছার জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণের ধন-মাল তাদের মালিকানায় এসে গেলে তাদের সে ধন-মালের উপর হজ্জের ফরজিয়ত ধার্য হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও কার্যত তারা যদি তা করতে না পারে, তাহলে অসিয়ত করে যাওয়া কর্তব্য। কেননা হজ্জ ফরয হওয়ার দুটি তাৎপর্য। একটি, পাথেয় যোগাড় হওয়া ও যানবাহন পাওয়া বা ব্যবহার করতে পারা এবং কার্যত তা নিয়ে হজ্জে চলে যেতে পারা। যার এরূপ অবস্থা হবে, তাকে হজ্জের জন্যে বের হয়ে পড়তে হবে। আর দ্বিতীয় দিক হল, তা ব্যক্তিগতভাবে নিজের পক্ষে করতে না পারা কোন রোগের কারণে বা বেশি বয়স হওয়ার কারণে, অথবা শারীরিক অক্ষমতার কারণে অথবা এ কারণে যে, সেই মেয়েলোক. তার পক্ষে মুহরম পুরুষ বা স্বামীকে সঙ্গীরূপে পাওয়া সম্ভব হয়নি। এ সব লোকের জন্যে তাদের ধম-মাল দ্বারা হজ্জ করার ব্যবস্থা করা কর্তব্য যখন তার কোন দিন সামর্থ্য হওয়ার আশাটুকুও থাকবে না। নিজে সে কাজ করতে অক্ষম হয়ে যাবে। রোগী কিংবা মেয়েলোক যদি তাদের পক্ষ থেকে অন্য লোক দ্বারা হজ্জ করায়, অতঃপর রোগী কোন দিন ভাল হল না এবং মেয়েলোকও মুহরম পুরুষ সঙ্গী পেলো না, এমন কি দুজনই মৃত্যুমুখে পতিত হল, তাহলে এ দুজনার হজ্জের ফরয আদায় হয়ে যাবে। পরে যদি রোগী ভালো ও সুস্থ হয় এবং মেয়েলোক মুহরম সঙ্গী পেয়ে যায়, তাহলে তাদেরকে তখন নিজেদেরকেই হজ্জ করতে হবে। খাশয়াম বংশের মেয়েলোকটি যে নবী করীম (স) -কে বলেছিল যে, আমার পিতা হজ্জ ফরয হওয়ার কথা এমন সময় জানতে পেয়েছেন বা তার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে এমন সময় যখন তিনি খুব-ই বৃদ্ধ, যানবাহনে নিজেকে ধরে রাখতে পারেন না এবং নবী করীম (স) তাকে তার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে বলেছেন, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তার মাল-সম্পদের উপর হজ্জ ফরয হয়েছিল, যদিও সে নিজে যানবাহনে চলে গিয়ে হজ্জ করতে সক্ষম নয়। কেননা মেয়েলোকটির কথা ছিল হজ্জের ফরজিয়াত তাকে এমন সময় পেয়েছে যখন সে বয়োবৃদ্ধ। নবী করীম (স) তার কথার প্রতিবাদ করেন নি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তার ধন-মালের উপর হজ্জ ফরয হয়েছিল। নবী করীম (স) হজ্জ করতে আদেশ করলেন তাকেই, যে এ খরচ দিয়েছিল যে, তার জন্যে হজ্জ ফরয। তাই তার হজ্জ ফরয হওয়াই প্রমাণিত হয়।

গরীব ব্যক্তির হজ্জ করার ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। হানাফী মায্হাবের ফিকাহ্‌বিদ ও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, তার উপর হজ্জ ফরয নয়। যদি করে, তাহলে ইসলামের হজ্জ হিসেবেই তা আদায় হবে! ইমাম মালিকের মত বর্ণিত হয়েছে, সে যদি পায়ে হেঁটে কাবায় পৌঁছতে পারে, তাহলে তার উপর-ও হজ্জ ফরয। ইবনুল যুবায়র ও হাসান থেকে বর্ণিত, সামর্থ্য তাকে যতদূর পৌঁছায়, তা যেভাবেই হোক-না কেন। নবী করীম (স)-এর কথাঃ 'পাথেয় ও যানবাহন ব্যবহার করতে পারাই হচ্ছে সামর্থ্য। এ কথাই প্রমাণ করে যে, গরীব লোকের উপর হজ্জ ফরয নয়। তবু সে যদি কাবা পর্যন্ত পৌঁছে যায় পায়ে চলে, তাহলে সেখানেই সে সামর্থ্যবান হয়ে গেল, যেমন মক্কার অধিবাসীদের ব্যাপার। কেননা এ তো জানা কথা যে, পাথেয় ও যানবাহনের প্রশ্ন কেবল দূরের লোকদের বেলায়। গরীব ব্যক্তি যখন কোন-না-কোন ভাবে মক্কায় পৌঁছে গেছে, তখন পাথেয় ও যানবাহনের কোন প্রশ্ন থাকে না। নতুন করে সেখানে পৌঁছার কথা উঠবে না। তাই তার জন্যে হজ্জ বাধ্যতামূলক হবে তাৎক্ষণিকভাবে। তাই সে যখন হজ্জ করবে তখন সে তা করবে তার উপর ধার্য হওয়া ফরয হিসেবেই।

ক্রীতদাস সম্পর্কেও মতের বিভিন্নতা রয়েছে। সে যদি হজ্জ করে, তাহলে তা কি ইসলামের বিধান মুতাবিক হজ্জ হবে! হানাফী মাযহাবের ফিকাহ্‌বিদদের মত হল, তার হজ্জ হবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, তার হজ্জ আদায় হবে। হানাফী মাযহাবের মতের যথার্থতার প্রমাণ হচ্ছে সেই হাদীস, যা আবদুল বাকী ইবনে কানে' ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ, মুসলিম ইবনে ইবরাহীম, হিলাল ইবনে আবদুল্লাহ রবীআতা ইবনে সুলায়মের মুক্ত দাস, আবু ইসহাক, হারিস, আলী (রা) সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ যে লোক পাথেয় ও যানবাহনের মালিক হল, যা তাকে আল্লাহ্র ঘর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, তা সত্ত্বেও যদি সে হজ্জ না করে তাহলে সে ইয়াহূদী হিসেবে মরুক কি খ্রীস্টান হিসেবে তার কোন হিসেব নেই। রাসূল (স)-এর এ কথাটি আল্লাহ্র এ কথারই ভাবগত অর্থ ঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ -

আল্লাহ্র জন্যে কাবা ঘরের হজ্জ করা ফরয সেই লোকের, যে সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য লাভ করবে। আর যে হজ্জ ফরয হওয়াকে অমান্য করবে, আল্লাহ সারে জাহানের উপর অ-নির্ভরশীল।

এ প্রেক্ষিতেই নবী করীম (স) জানিয়েছেন যে, হজ্জ বাধ্যতামূলক হওয়ার শর্ত হচ্ছে পাথেয় ও যানবাহন পাওয়া। আর ক্রীতদাস যেহেতু কোন কিছুর মালিক হয় না। এ কারণে হজ্জ ফরয হয়েছে যাদের জন্যে, সে তাদের মধ্যে গণ্য নয়। সামর্থ্য পর্যায়ে নবী করীম (স) থেকে যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার সবটাতেই পাথেয় ও যানবাহন ব্যবহারের অধিকারী বা মালিক হওয়াকে সামর্থের শর্ত বলা হয়েছে। হযরত আলী (রা) বর্ণিত হাদীসেও তাই বলা হয়েছে। এ-ও জানা যে, পাথেয় ও যানবাহনের শর্তের তাৎপর্য নবী করীম (স)-এর নিকট সামর্থ্যবানের নিজের ওদুটির মালিক হওয়া। অন্য লোকের মালিকানাভুক্ত পাথেয় ও যানবাহনের কথা

নিশ্চয়ই বলা হয়নি। ক্রীতদাস যখন কোন অবস্থায়ই কোন কিছুর মালিক হয় না, তখন তার উপর হজ্জ ফরয হওয়ার কথা বলাও হয়নি। অতএব সে হজ্জ করলেও তা হবে না।

যদি বলা হয়, গরীব ব্যক্তির উপর-ও হজ্জ ফরয করা হয়নি। কেননা পাথেয় ও যানবাহনের সে মালিক বা অধিকারী নয়। তা সত্ত্বেও সে কোন-না-কোন ভাবে হজ্জ করলে তা হয়ে যাবে, ক্রীতদাসেরও তাই হওয়া উচিত।

জবাবে বলা যাবে, দরিদ্র ব্যক্তি ও তাদের মধ্যে যাদের উপর হজ্জ ফরয। কেননা সে তো মালিক হতে পারে। কিন্তু ক্রীতদাস সেরূপ নয়। তবু গরীবের উপর এখন হজ্জ ফরয নয় এ জন্যে যে, সে এ মুহূর্তে ওদুটি জিনিস পাচ্ছে না। তা এজন্য নয় যে, সে তার মালিক হওয়ার অধিকারী নয়। তাই সে যখন মক্কায় পৌঁছে যাবে, তখন পাথেয় ও যানবাহনের মুখাপেক্ষী থাকবে না। তখন সে সেই লোকদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাবে, যারা ওদুটি পেয়েছে এবং মক্কায় পৌঁছেছে সেই পাথেয় খরচ করে ও যানবাহনে সওয়ার হয়ে। হজ্জ ফরয হওয়ার ফরমানটি ক্রীতদাসদের প্রতি নয়, তার কারণ এ নয় যে, সে পাথেয় ও যানবাহন পাচ্ছে না। তা এজন্যে যে, সে তার মালিক হতে পারে না। মালিক হলেও সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে না যাদের উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে। এ কারণে সে হজ্জ করলেও তা হবে না। এক্ষেত্রে সে অল্প বয়স্ক বালকের পর্যায়ে গণ্য। বালকের উপর হজ্জ ফরয নয়। তার কারণ এ নয় যে, সে পাথেয় ও যানবাহন পায় না। বরং এ জন্যে যে, তার উপর হজ্জের ফরমান জারি-ই হয়নি। কেননা তার প্রতি এ ফরমান জারি হওয়ার শর্ত হচ্ছে পাথেয় ও যানবাহনের মালিক হওয়া। যেমন তার একটি শর্ত হল এই যে, তার প্রতি ফরমান জারি হওয়া সহীহ্ হবে। তাছাড়া ক্রীতদাস তো ধন-মালের ফায়দা পেতে পারে না। তার মনিবের অধিকার আছে হজ্জে যেতে তাকে নিষেধ করার। এটা সর্ববাদীসম্মত কথা। ক্রীতদাসের যা কিছু ফায়দা তা তার মনিবের মালিকানা। সে যদি হজ্জ করে তাহলে তা তার মনিবের করা হজ্জ হয়ে যাবে। অতএব তার হজ্জ ইসলামসম্মত হজ্জ হবে না। সে কথার এ-ও একটি প্রমাণ যে, ক্রীতদাস সংগৃহীত পাথেয়র ফায়দা ব্যবহারে মালিক হতে পারে না। মনিব তার পাথেয় মাল ভোগ করার অধিকারী। তাছাড়া মনিবের খিদমত করাই তার কাজ, সে তাকে হজ্জে যেতে নিষেধ করতে পারে। মনিব যদি অনুমতি দেয়ও তবুও সে যেন ফায়দার মালিকত্ব তাকে ধার দিল। এতে মনিবের মালিকানা বিনষ্ট করা হবে। এ কারণে ক্রীতদাসের হজ্জ হবে না। গরীব মানুষ সেরূপ নয়। কেননা সে তার মুনাফার নিজেই মালিক। তার দ্বারা যদি সে হজ্জ করে, তাহলে তার হজ্জ আদায় হবে। কেননা এক্ষণে সে সামর্থ্যবান লোকদের একজন।

যদি বলা হয়, মনিব দাসকে জুম'আর নামায পড়া থেকেও বিরত রাখতে পারে। আর জুম'আর নামায যাদেরকে পড়তে বলা হয়েছে, ক্রীতদাস তাদের মধ্যেও গণ্য নয়। তার উপর তা ফরয নয়। তা সত্ত্বেও যদি সে জুম'আর নামাযে যায় ও তা আদায় করে, তাহলে তার জুম'আ আদায় হবে। তাহলে হজ্জ কি সে রকম হতে পারে না?

জবাবে বলা যাবে, যুহর নামায তার উপর ফরয। তা পড়তে নিষেধ করার—তা পড়া থেকে বিরত রাখার মনিবের কোনই অধিকার নেই। তাই সে জুম'আ পড়লে তার উপর থেকে যুহরের ফরয পড়ে যাবে যা পড়ার সে অধিকারী ছিল এবং সে জন্যে মনিব-মালিকের অনুমতিরও কোন

প্রশ্ন থাকতে পারে না। ফলে সে জুম'আর নামায পড়ে যেন যুহরের ফরযটাই আদায় করল। এ কারণে তা হবে। দসের উপর অপর এমন কোন ফরয ধার্য নয়, যা করার সে অধিকারী। ফলে হজ্জ আদায় করে সে কোন ফরয আদায়ের কাজ করল না। তাই তা হওয়ার রায়ও আমরা দিতে পারি না। তা করলে সে এমন কাজ করেছে যা করার সে মালিক ছিল, তা আমরা বলতে পারি না। এ কারণে দাস ও গরীব ব্যক্তির হজ্জ পালন এক জিনিস নয়। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত ক্রীতদাসের হজ্জ পালন সম্পর্কে এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে। হাদীসটি আবদুল বাকী ইবনে কানে বশর ইবনে মূসা, ইয়াহইয়া ইবনে ইসহাক, ইয়াহয়া ইবনে আয়ূব, হরা ইবনে উসমান, জাবিরের দুই পুত্র, তাদের পিতার সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ কোন বালক যদি দশটি হজ্জও করে, পরে সে পূর্ণ বয়স্কতা পায়, তবুও তার মক্কা পৌঁছার সামর্থ্য হলে তাকে আবার হজ্জ করতে হবে। কোন আরব বদ্দু যদি দশবারও হজ্জ করে এবং পরে সে হিজরত করে তাহলেও তাকে আবার হজ্জ করতে হবে, যদি সে সামর্থ্য লাভ করে। যদি কোন মনিবের মালিকানাভুক্ত— ক্রীতদাস দশটি হজ্জও করে, পরে সে দাসত্ব শৃঙ্খল মুক্ত হতে সামর্থ্য লাভ করে, তাহলে তাকে আবার হজ্জ করতে হবে।

আবদুল বাকী মূসা ইবনুল হাসান ইবনে আবূ উবাদ, মুহাম্মাদ ইবনুল মিনহাল, ইয়াযীদ ইবনে জুরাই, শবাতা, আমাশ, আবূ যুবইয়ান, ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ 'যে বালকই হজ্জ করবে, পরে সে পূর্ণ বয়স্ক হলে আর একটি হজ্জ তাকে করতে হবে। যে আরব বেদুঈন-ই হজ্জ করবে; সে হিজরত করে, তাহলে তাকে আর একটি হজ্জ করতে হবে। আর যে ক্রীতদাস হজ্জ করবে, পরে সে মুক্তি পেলে তার কর্তব্য হবে আর একবার হজ্জ করা।' এ হাদীসে নবী করীম (স) ক্রীতদাসকে আর একটি হজ্জ করা কর্তব্য করে দিয়েছেন। পূর্বে দাসত্বাবস্থায় কৃত হজ্জকে তিনি হজ্জ গণ্য করেন নি। তার সে হজ্জকে নাবালকের হজ্জের মত মনে করেছেন।

যদি বলা হয়, রাসূলে করীম (স) অনুরূপ কথা আরব বেদুঈন সম্পর্কেও বলেছেন। তা সত্ত্বেও হিজরতের পূর্বে করা তার হজ্জকে হজ্জ গণ্য করেছেন।

জবাবে বলা যাবে, হিজরত ফরয হওয়ার পূর্বে মরু-বেদুঈন সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে হিজরত ফরয না থাকা অবস্থায় সে কথা বলা যায় না। নবী করীম (স) মক্কা বিজয়ের পর বলেছেন ঃ 'মক্কা জয়ের পর হিজরত ফরয নয়।' হিজরতের পর পুনরায় হজ্জ করার কর্তব্যটা অতঃপর অবশিষ্ট থাকল না। তখন আবার হজ্জ করা ফরয নয়।

ক্রীতদাসের হজ্জ সম্পর্কে আমরা যা বলেছি, সে কথাই ইবনে আব্বাস, হাসান ও আতা থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্র কথাঃ 'আল্লাহ্র লোকদের কর্তব্য বায়তুল্লাহ হজ্জ করা' এর বাহ্যিক অর্থ একটি হজ্জ করারই দাবি করে। কেননা তাতে বারবার হজ্জ করার কথা বা তার ইশারাও কোথাও নেই। তাই যখনই কেউ হজ্জ করল, আয়াত অনুযায়ী তার কর্তব্য পালিত হয়ে গেছে মনে করতে হবে। নবী করীম (স) সে বিষয়ে তাগিদ করে বলেছেন যা ইয়াযীদ ইবনে হারুন, সুফিয়ান ইবনে হুসেইন, জুহরী, আবূ সিনান, আবূ দাউদ, দুয়ালী, ইবনে আব্বাস

সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। আক্‌রা ইবনে হাবিস (রা) নবী করীম (স)-এর নিকট প্রশ্ন করে বললেন, হে রাসূল! হজ্জ কি প্রত্যেক বছরই করতে হবে কিংবা একবার মাত্র ?জবাবে তিনি বললেন, না বরং মাত্র একবার। যদি কেউ এর বেশি বার করে তাহলে তা হবে নফল।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ -

যে লোক হজ্জের ফরয হওয়াকে অমান্য করবে, আল্লাহ তো সারাজাহান থেকে অমুখাপেক্ষী।

অকী ফতর ইবনে খলীফা, নুকাই আবূ দাউদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-কে 'যে লোক অমান্য করল' এ আয়াতাংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। জবাবে বলেছিলেন ঃ কাফির যদি হজ্জ করে তবে সে সওয়াব পাওয়ার আশা করতে পারে না। আর যদি সে আটক হয়, তাহলে তার পরিণতিকে ভয় করবে না। মুজাহিদ-ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হাসান বলেছেন ঃ তার অর্থ, যে লোক হজ্জ করতে অস্বীকার ও হজ্জের হুকুম অমান্য করবে ...। এর আয়াতটি জবরিয়া ফিরকার মতকে বাতিল প্রমাণ করে। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ যে লোক পাথেয় ও যানবাহন পাবে, সে হজ্জ করার সামর্থ্যবান হবে। তা কার্যত করার পূর্বেই। কিন্তু ওদের মত হল— যে হজ্জ কার্যত করেনি সে সামর্থ্যবান কখনই হয়নি। তাই ওদের মাযহাব মাযুর— অক্ষম গণ্য হবে, বাধ্যবাধকতা মুক্ত হবে কার্যত হজ্জ না করা পর্যন্ত। কেননা আল্লাহ হজ্জকে বাধ্যতামূলক করেছেন তার জন্যে যে তা করতে সামর্থবান্য হয়েছে। আর হজ্জ না করা পর্যন্ত সে সামর্থবানও হয় নি। তাই কুরআনের আয়াত ও মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐকমত্য হয়েছে এ কথায় যে, হজ্জের ফরয বাধ্যতামূলক তার জন্যে, যার সেই সামর্থ্য আছে। অর্থাৎ শারীরিক সুস্থতা ও পাথেয় যানবাহন প্রাপ্তি। ফলে ওদের মত বাতিল প্রমাণিত হল।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَاءُ -

হে আহলি কিতাব লোকেরা! তোমরা কেন আল্লাহ্‌র পথে চলতে বাধা দাও সেই ব্যক্তিকে যে ঈমান গ্রহণ করেছে ? তোমরা সেই পথকে বাঁকা করতে চাও, এ অবস্থায় যে তোমরা সব প্রত্যক্ষদর্শী।

জায়দ ইবনে আসলাম বলেছেন, একদল ইয়াহূদীদের সম্পর্কে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। তারা আওস ও খাজরাজ বংশের লোকদেরকে পারস্পরিক ঝগড়ার উস্কানি দিতেছিল। তাদের মধ্যকার প্রাচীনকালের যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ফলে গোত্রীয় প্রতিহিংসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা দ্বীন-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়ছিল। এটা ছিল জাহিলিয়াতের আত্ম-অহংকারের ব্যাপার।

হাসান থেকে বর্ণিত, এ আয়াতটি ইয়াহূদী ও খ্রীস্টান সকলের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল। কেননা তারা সকলেই তাদের কিতাবে লিখিত রাসূল (স)-এর গুণ-পরিচিতি গোপন করেছিল।

যদি বলা হয়, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কাফির লোকদেরকে 'শহীদ' বলেছেন। অথচ তারা অন্য লোকদের জন্যে অকাট্য প্রমাণ নয়। তাই لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ 'তোমরা লোকদের জন্যে শহীদ— অকাট্য দলীল বা পথ-প্রদর্শক হবে' এ দলীলের ভিত্তিতে 'ইজমায়ে উম্মত' ও অকাট্য দলীলের প্রমাণ বলে আখ্যায়িত কর, তা সহীহ্ হতে পারে না।

এর জবাবে বলা যাবে, মহান আল্লাহ্ আহলি কিতাব লোকদেরকে বলেন নি যে, তোমাদের অন্যদের জন্যে শহীদ বা পথ-প্রদর্শক— অকাট্য দলীল। কিন্তু মুসলিম উম্মাকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ তোমরা সকল মানুষের জন্যে শহীদ— সাক্ষ্যদাতা, পথ প্রদর্শক। যেমন তার পরে বলেছেন ঃ

وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا –

এবং রাসূল হচ্ছে তোমার জন্যে শহীদ, পথ-প্রদর্শক, নেতা (সূরা বাকারা ঃ ১৪৩)

ফলে এ আয়াত দ্বারা মুসলিম উম্মতের সত্যতা এবং তাদের ইজ্‌মার যথার্থতা আল্লাহ নিজেই সপ্রমাণিত করেছেন।

আলোচ্য আয়াতের অংশ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ এর অর্থ এবং شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ এর অর্থ ও তাৎপর্য এক এবং অভিন্ন নয়। এর অর্থে দুটি দিকের উল্লেখ করা হয়েছে। একটি 'তোমরা শহীদ' অর্থ ঃ তোমরা অবহিত, জান শুন যে, তোমাদের কথা বাতিল যা তোমরা আল্লাহ্‌র দ্বীন থেকে লোকদেরকে বিরত রাখার জন্যে বল। আর এ ধরনের লোক আহলি কিতাবের মধ্যে রয়েছে। আর দ্বিতীয়, شُهَدَاءُ অর্থ عُقَلَاءُ বুদ্ধিমান, বিবেকবান। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ –

অথবা যে খুব লক্ষ্য দিয়ে কান পেতে কথা শুনে প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে। (সূরা ক্বাফ ঃ ৩৭)

অর্থাৎ সে সমঝদার। কেননা সে অকাট্য প্রমাণ প্রত্যক্ষ করে, যার দ্বারা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ –

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর যেমন ভয় তাঁকে করা উচিত।

আবদুল্লাহ্, হাসান ও কাতাদাহ থেকে حَقَّ تُقَاتِهِ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তা হল, তাঁর আনুগত্য করা হবে এমনভাবে যে, তাঁর নাফরমানী করার কোন প্রশ্নই উঠবে না। তাঁর শোকর করবে, না-শোকরি বা কুফরি কখনই করবে না। তাঁকে স্মরণে রাখবে এমনভাবে যে, কখনই ভুলে যাবে না। এ-ও বলা হয়েছে যে, এর অর্থ সর্ব প্রকারের নাফরমানী থেকে দূরে থাকবে।

এ আয়াত মনসূখ হওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন কথা এসেছে। ইবনে আব্বাস ও তায়ূস থেকে

বর্ণিত, এ আয়াত মুহকাম, সুদৃঢ়, প্রতিষ্ঠিত, কখনই মনসূখ হয়নি। আর কাতাদাহ, রুবাই ইবনে আনাস ও সুদ্দী থেকে বর্ণিত, তাঁদের মতে এ আয়াতটি মনসূখ হয়েছে এ আয়াত দ্বারা ঃ

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ -

অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর যতটা সামর্থ্যবান হও। (সূরা তাগাবুন ঃ ১৬)

কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, এ আয়াত কখনই মনসূখ হতে পারে না। কেননা তার অর্থ হল, সর্বপ্রকারের গুনাহ নাফরমানীর কাজকে ভয় করে পরিহার করা। শরীয়াত পালনে বাধ্য সকল মানুষেরই কর্তব্য সর্বপ্রকারের গুনাহ্ নাফরমানী থেকে দূরে সরে থাকা। এ আয়াত যদি মনসূখ হয়ে গিয়ে থাকত, তাহলে কোন কোন গুনাহ্ নাফরমানীর কাজ করা মুবাহ হয়ে যেত। কিন্তু তা কখনই জায়েয হতে পারে না।

বলা হয়েছে, তা মনসূখ মনে করা যেতে পারে যদি তার অর্থ এই করা হয় যে, ভয় ও শান্তির অবস্থায় আল্লাহ্র হক আদায় করা এবং তাতে 'তাকীয়া' তরক করা। পরে এ 'তাকীয়া' করার অবস্থায় ও জোরজবরদস্তির মুখে তা মনসূখ মনে করা। আর দ্বিতীয়োক্ত আয়াতে مَا اسْتَطَعْتُمْ 'যতটা সক্ষম হবে তোমরা' কথাটির প্রয়োগ হবে সেসব ক্ষেত্রে, যেখানে তোমরা নিজেদের উপর বিপদের আশংকা বোধ কর না। বোঝাতে চাওয়া হয়েছে সেসব অবস্থা যাতে মার-পিট ও হত্যাকাণ্ডের আশংকা হবে না। কেননা যেসব কাজ করা মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য বা কষ্টকর, তাতে সামর্থ্য না হওয়ার কথা বলা হয়। যেমন আল্লাহ্ অপর আয়াতে বলেছেন ঃ

وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا -

তারা শুনতে সক্ষম হচ্ছিল না। (সূরা কাহাফ ঃ ১০১)

তার অর্থ, শ্রবণ কাজটি তাদের জন্যে খুবই কষ্টদায়ক ছিল।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا -

তোমরা সকলে সম্মিলিত ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ্র রজ্জু শক্ত করে ধর।

নবী করীম (স) থেকে حبل শব্দের অর্থ বর্ণিত হয়েছে ঃ এখানে এ শব্দের অর্থ কুরআন। আবদুল্লাহ, কাতাদাহ ও সুদ্দী থেকে একথা বর্ণিত হয়েছে। এ-ও বলা হয়েছে যে, এ শব্দটি দ্বারা দ্বীন-ইসলাম বুঝিয়েছেন। বলা হয়েছে, এর অর্থ, আল্লাহ্র সাথে কৃত চুক্তি। কেননা তা মুক্তি ও নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায়। যেমন নিমজ্জমান ব্যক্তি একটা রজ্জু পেয়ে তা ধরে নিজেকে উপকূলে তুলতে পারে, এ-ও তেমনি। নিরাপত্তাদান حبل বা রজ্জু বলা হয়। কেননা নিরাপত্তা ও মুক্তিলাভের একটা উপায়। যেমন আল্লাহ্র কথায় সে অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ -

ওরা লাঞ্ছিত দারিদ্র্য পীড়িত। তবে যদি তারা আল্লাহ্র রজ্জু ও মানুষের রজ্জু পায় তবে ....।

এ আয়াতে শব্দটি 'নিরাপত্তা' অর্থেই ব্যবহৃত। তবে তোমরা সকলে সম্মিলিত—ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জু শক্ত করে ধারণ কর। এ আয়াতে ঈমানদার লোকদিগকে ঐক্যবদ্ধ হতে আদেশ করা হয়েছে এবং ছিন্ন-ভিন্ন হতে নিষেধ করেছেন وَلَا تَفَرَّقُوا 'এবং তোমরা ছিন্নভিন্ন হয়ো না' বলে। এর অর্থ, আল্লাহ্‌র দ্বীন থেকে ছিন্নভিন্ন হওয়া, যে দ্বীনকে বাধ্যতামূলকভাবে একত্রিত হয়ে ধারণ করতে আদেশ করা হয়েছে, তারই ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে বলা হয়েছে। সে দ্বীন থেকে ছিন্নভিন্ন হতে নিষেধ করা হয়েছে। আবদুল্লাহ্ ও কাতাদাহ থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে, হাসান বলেছেন, এর অর্থ, তোমরা ছিন্নভিন্ন হবে না রাসূলে করীম (স) থেকে। দুই গোষ্ঠীর লোকেরা একথাকে দলীল বানিয়েছে। এক গোষ্ঠী হচ্ছে তারা যারা 'কিয়াস' ও 'ইজতিহাদ'কে আইনের সূত্র মাত্র মানতে অস্বীকার করেছে। সে সঙ্গে তাঁরা বলেন যে, ইজতিহাদী বিষয়ে বলা বিভিন্ন ও বহু সংখ্যক কথার মধ্যে মাত্র একটি কথা-ই সহীহ্ ও সত্য হতে পারে। যাদের সিদ্ধান্ত সত্যের সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন হবে না, তারা ভুল-ভ্রান্তিতে লিপ্ত হবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ তোমরা ছিন্নভিন্ন হয়ো না। কাজেই পরস্পর মতদ্বৈততা ও বিচ্ছিন্নতা কখনও আল্লাহ্‌র দ্বীন হতে পারে না। কেননা আল্লাহ তো ছিন্নভিন্ন হতে নিষেধ করেছেন।

তাদের এ কথায় আমরা একমত নই। কেননা শরীয়াতের বিধান মূলত বহু দিক সম্পন্ন। তাতে কিছুদিক এমন, যার বিরুদ্ধতা করা জায়েয নয়; সর্বাবস্থায় তার নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে বিবেক-বুদ্ধি স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয়; অথবা সর্বাবস্থায় তার ইতিবাচকতাই প্রমাণিত হয়। তবে যা কখনও ওয়াজিব হয়, কখনও হয় মুবাহ, কখনও হয় নিষিদ্ধ। এ সব বিষয়ে মতের বিভিন্নতার অবকাশ রয়েছে। সেই মতপার্থক্য সহ-ই আল্লাহ্‌র ইবাদত সম্ভব। যেমন নামায-রোযার তুহুর-ওয়ালী ও হায়যওয়ালী মেয়েলোক। নিজ বাড়িতে উপস্থিত ও সফরে রত ব্যক্তির নামায 'কসর' করা বা পূর্ণ নামায পড়া এবং এ ধরনের আরও অন্যান্য বিষয়, এ বিভিন্ন অবস্থার লোকদের জন্যে শরীয়াতের হুকুম বিভিন্ন হওয়া খুবই সম্ভব এবং তা অসঙ্গত নয়; ফলে এসব ক্ষেত্রে একজন একভাবে ইবাদতকারী হবে, অন্যজন অন্যভাবে ইবাদত পালন করবে। তাই জায়েয সীমার মধ্যে বিভিন্ন মত সৃষ্টিকারী ইজতিহাদের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে, তা কোনক্রমেই নিষিদ্ধ হতে পারে না। এভাবে দলীলও নাযিল হতে পারে। সর্বপ্রকারে মতভেদই যদি মন্দ ও নিষিদ্ধ হবে তাহলে 'নস' ও 'তওকীফ'-এর দিক দিয়ে শরীয়াতের বিধানে বিভিন্ন তত্ত্ব আসা কখনই জায়েয ও সঙ্গত হতে পারত না। তাই নস্-এর ক্ষেত্রে যা জায়েয, তা ইজতিহাদেরও জায়েয হবে বৈকি। স্ত্রীদের দেয় নফকায়, বিভিন্ন জিনিসের মূল্যে গুরুত্বে ও বিপুল সংখ্যক অপরাধের ধরনে-ধারণে দুইজন মুজতাহিদ দুই রকমের ও ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করতে পারেন। তাতে কেউ-ই নিন্দনীয় বা তিরস্কৃত হবেন না। এ হচ্ছে ইজতিহাদী বিষয়াদি সম্পর্কিত কথা। এতটুকু মতপার্থক্যও যদি নিন্দনীয় হয়, তাহলে সাহাবায়ে কিরাম তার বিরাট অংশের ভাগীদার হবেন, সন্দেহ নেই। বিভিন্ন ঘটনা ও ব্যাপারে তাঁদের নিকট থেকে বিভিন্ন মত আমরা কখনই শুনতে পেতাম না। এ মতপার্থক্য সত্ত্বেও তাঁরা পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কশীল, ওতপ্রোত, ঐক্যবদ্ধ। প্রত্যেকেই অপর সাহাবীর ভিন্ন মত কোনরূপ তিরস্কার নিন্দা-ছাড়াই সহজভাবে শুনেন, মেনেও নেন। তাঁদের মতপার্থক্য মতবিরোধ সৃষ্টি করেনি, এ মতপার্থক্য সত্ত্বেও তাঁরা একই পথের সহযাত্রী। তাঁদের ইজমা বা ঐকমত্যকে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাও তাঁর কিতাবের

বহু আয়াতে প্রশংসনীয়ভাবে উল্লেখ করেছেন। ইজমার সত্যতা যথার্থতা স্বীকার করে নিয়েছেন। বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اِخْتِلَافُ أُمَّتِىْ رَحْمَةٌ -

আমার উম্মতের মতের বিভিন্নতা রহমত বিশেষ।

বলেছেন ঃ

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِىْ عَلَى الضَّلَالِ -

আমার উম্মত কখনই গুমরাহীর উপর একমত হবে না।

এ থেকে প্রমাণিত হল, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কথা 'তোমরা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ও না' বলে উক্ত ধরনের মতপার্থক্য করতেও নিষেধ করেন নি। এ আয়াতটুকুতে যা করতে নিষেধ করা হয়েছে, তা হল দুটির যে কোন একটি। হয় 'নস' (نص মূল ও অকাট্য দলীল) সমূহ, অথবা যার উপর বিবেক-বুদ্ধিগত বা পূর্বশ্রুত দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার একটি মাত্র অর্থ হতে পারে এবং কুরআনের আয়াতের বক্তব্য— যা প্রমাণ করে যে, এর তৎপর্য হচ্ছে দ্বীন ইসলামের মৌলনীতিতে মতপার্থক্য ও বিভিন্নতা— খুটিনাটি ব্যাপারে নয়— যাতে মতপার্থক্য হওয়া অসম্ভব নয়। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ -

আর তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামতের কথা, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। পরে তিনি তোমাদের হৃদয়সমূহে প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে দিলেন।

অর্থাৎ ইসলাম দ্বারা এ কাজ করেছিলেন। এতে এ বিষয়ের দলীল যে, নিন্দিত-তিরস্কৃত বিভিন্নতা-বিচ্ছিন্নতা হচ্ছে যা আয়াতে নিষিদ্ধ হয়েছে তা হল দ্বীন-ইসলামের মৌলনীতিসমূহে, তাঁর খুঁটিনাটি ব্যাপারে মতপার্থক্য নিষিদ্ধ নয়। আল্লাহই প্রকৃত ব্যাপার ভালো জানেন।

## 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার' ফরয

আল্লাহ্‌র তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -

তোমাদের মধ্য থেকে এমন এক জনগোষ্ঠী অবশ্যই গড়ে উঠতে হবে, যারা সর্বোচ্চ ও সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের দিকে লোকদেরকে আহ্বান জানাতে থাকবে এবং নিষেধ করতে বিরত রাখতে— চেষ্টিত থাকবে মুনকার (শরীয়াত পরিপন্থী কাজ থেকে)।

গ্রন্থকার আবূ বকর বলেছেন ঃ এ আয়াত দুটি তাৎপর্য ধারণ করে আছে। একটি হচ্ছে, ভালো শরীয়াতসম্মত কার্যাবলীর আদেশ করা— সেদিকে দিক নির্দেশনা দেয়া এবং মন্দ ও

শরীয়াত পরিপন্থী কাজ করতে নিষেধ করা— বিরত রাখতে চেষ্টায় রত থাকা আর দ্বিতীয় তাৎপর্য হচ্ছে, তা একটি ফরযে কিফায়ার কাজ, মূলত এক-ব্যক্তির জন্যে তা ফরয নয়, যখন অন্যরা সে কাজটি করতে থাকবে, তখন তার কর্তব্য পালিত হবে। কেননা আল্লাহ্র কথা হল ঃ তোমাদের মধ্যে থেকে একটি জনগোষ্ঠী হতে হবে— সকলকে এবং প্রত্যেককে নয়। এর প্রকৃততায় কিছু লোক তা করলে এবং অপর কিছু লোক ব্যক্তিগতভাবে তা না করলেও কর্তব্য পালিত হয়ে যাবে।

এ থেকে বোঝা গেল যে, এ কাজটি ফরয বটে, তবে তা ফরযে কিফায়া, ফরযে আইন নয়। কিছু সংখ্যক লোক এ কাজে নিযুক্ত থাকলে অবশিষ্টদের কর্তব্য পালন হয়ে যাবে। কোন কোন লোক অবশ্য বলেন যে, এ কাজ প্রত্যেকটি ঈমানদার ব্যক্তির জন্যে ব্যক্তিগতভাবেই ফরয। তাঁরা কথাটির মূল তাৎপর্যকে একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করেন। 'তোমাদের মধ্য থেকে একটি জনগোষ্ঠী অবশ্যই হতে হবে'— একটি বিশেষ অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেমন আল্লাহ্র কথা يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ তিনি ক্ষমা করবেন তোমাদের কোন কোন গুনাহ। কিন্তু আসলে এর অর্থ তোমাদের সব গুনাহ। এ কথা যে সহীহ তার প্রমাণ হল, কিছু লোক এ কাজটা করলে অন্যদেরও কর্তব্য পালিত হয়ে যাবে। যেমন জিহাদ, মৃতের গোসল, কাফন পরানোর কাজ এবং জানাযার নামায পড়া ও দাফন করার কাজ। এসব যদি ফরযে কিফায়া না হতো, তাহলে কিছু লোকের তা করার ফলে অন্যদের কর্তব্য পালিত হয়ে যেত না।

'আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার'- এর কথা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবের বহু সংখ্যক আয়াতে বলেছেন। একটি আয়াত হল ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -

তোমরাই হচ্ছো সর্বোত্তম জনগোষ্ঠী। কেননা তোমরা ভালো শরীয়াতসম্মত কাজের আদেশ কর ও মন্দ শরীয়াত বিরোধী কাজ বন্ধ কর— করতে নিষেধ কর ও বিরত রাখ। (আলে-ইমরান ঃ ১১০)

লুকমানের উপদেশ হিসেবে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

يَابُنَيَّ أَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا أَصَابَكَ ط
إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ -

হে প্রিয় পুত্র! তুমি নামায কায়েম করো এবং মা'রূফের আদেশ করো ও মুনকার-এর নিষেধ করো এবং এক্ষেত্রে তোমার উপর যে বিপদই আসুক তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ করো। মনে রাখবে, এটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উঁচু সাহসিকতার ও দৃঢ় সংকল্পবদ্ধতার কাজ। সূরা লোকমান ঃ ১৭)

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ -

ঈমানদার লোকদের মধ্য থেকে দুটি দল যদি পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহ্‌লে তাদের মধ্যে সন্ধি করে দাও। পরে তাদের মধ্য থেকে একটি দল যদি অন্য দলের প্রতি বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনমূলক আচরণ করে, তাহ্‌লে সীমালঙ্ঘনকারী দলটির বিরুদ্ধে লড়াই কর। (সূরা হুজরাত ঃ ৯)

বলেছেন ঃ

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ - كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ -

বনী ইসরাঈলীদের মধ্য থেকে যারা কুফরি নীতি গ্রহণ করেছে তাদের উপর দাউদ ও মরিয়ম পুত্র ঈসার জবানীতে অভিসম্পাত করা হয়েছে। তা এজন্য যে, তারা নাফরমানীর নীতি গ্রহণ করেছে। আর তারা তো সীমালঙ্ঘন করেই চলেছিল। তারা যে অন্যায় কাজ করত তা থেকে পরস্পর নিষেধ ও বিরত রাখতে চেষ্টা করত না। তারা সব সময় খারাপ কাজেই লিপ্ত থাকত। (সূরা মায়িদা ঃ ৭৮,৭৯)

এ কয়টি আয়াত এবং এ অর্থের অন্যান্য আয়াতের বক্তব্য 'আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার'-এর কাজ ইতিবাচকভাবে চলতে থাকুক। এর বহু মনযিল বা পর্যায় রয়েছে। তার প্রথম পর্যায়ে হাত বা শক্তি দ্বারা অন্যায় কাজের প্রতিরোধ বা মূলোৎপাটন— যদি তা করা সম্ভব হয়। যদি সম্ভব না হয়, তা হাত বা শক্তি দিয়ে বন্ধ করতে গিয়ে জীবনের উপর হুমকি আসার আশংকা হয়, তাহলে মুখের কথা ও ভাষার দ্বারা তার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করতে হবে। আর তা করাও যদি কঠিন হয়, তাহলে অন্তর দিয়ে তার প্রতি অস্বীকৃতি জানাতে হবে।

হাদীসে একথা-ই বলা হয়েছে। আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর ইবনে আহমদ ইবনে ফারিস ইউনুস ইবনে হাবীব, আবূ দাউদ, তায়ালিসী, শু'বা, কায়স ইবনে মুসলিম, তারিক ইবনে শিহাব সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ মারওয়ান নামাযের আগে খুতবা দিতে এগিয়ে এলেন। এ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করল ঃ তুমি সুন্নাতের বিরুদ্ধতা করেছ; (ঈদের দিনের খুতবা তো) নামাযের পরে দেয়ার নিয়ম। সে বলল ঃ হে অমুকের বাপ, তা পরিত্যক্ত হয়েছে। শু'বা বলেছেন, সে (মারওয়ান) বড়ই বাকপটু ছিল। এ সময় সাহাবী আবূ সাঈদুল খুদরী (রা) দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন ঃ এ লোকটি— যে এইমাত্র কথা বলল— তার কর্তব্য আদায় করেছে। কেননা আমাদেরকে রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُنْكِرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُنْكِرْهُ بِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُنْكِرْهُ بِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ -

তোমাদের মধ্যে যে লোক কোন অন্যায়— শরীয়াত পরিপন্থী কাজ দেখতে পাবে, সে যেন তার হাত বা শক্তি দিয়ে তা অস্বীকার করে। যদি তার সামর্থ্য না পায়, তাহলে মুখে— ভাষার দ্বারা— তার প্রতিবাদ করবে। আর তার সামর্থ্যও না-থাকলে অন্তর দিয়ে তা ঘৃণা করবে। তবে এটা দুর্বলতম ঈমানের কাজ।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আল-বসরী আবূ দাঊদ, মুহাম্মদ ইবনুল-উলা, আবূ মুআবিয়া, আ'মাশ, ইসমাইল ইবনে রজা তার পিতা-আবূ সাঈদ এবং কায়স ইবনে মুসলিম, তারিক ইবনে শিহাব, আবূ সাঈদুল খুদরী সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন— রাসূলে করীম (স)-কে আমি বলতে শুনেছি ঃ

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ -

তোমাদের মধ্য থেকে যে লোক অন্যায়— শরীয়াত বিরোধী কাজ হতে দেখতে পাবে, সে যদি তা নিজ হাতে বা শক্তি দ্বারা পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়, তাহলে সে তার হাত বা শক্তি দ্বারাই তা পরিবর্তন করে দেবে। যদি তা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে তার মুখ ও ভাষা দ্বারা তার পরিবর্তন করবে। আর যদি তা-ও তার ক্ষমতায় না কুলায় তাহলে তার অন্তর দ্বারা তার পরিবর্তন কামনা করবে। তবে এটা দুর্বলতম ঈমানের কাজ।

এসব হাদীসের মাধ্যমে নবী করীম (স) বর্ণিত তিনটি উপয়ে অন্যায় ও শরীয়াত বিরোধী কাজকে অস্বীকার করার কর্তব্যের কথা অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে বলেছেন এবং আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন নিজ নিজ পার্থক্যপূর্ণ সাধ্য অনুযায়ী। বোঝা গেল, হাত দ্বারা বা শক্তি দ্বারা তা পরিবর্তন করতে না পারলে তার কর্তব্য হল মুখের কথা বা ভাষা দ্বারা তার পরিবর্তন সাধন করা। যদি তারও সাধ্য না হয়, তাহলে অন্তর দিয়ে তাকে অস্বীকার করা, তাকে ঘৃণা করা ও মেনে নিতে কোন ক্রমেই রাজি না হওয়ার অধিক কিছু করা তার কর্তব্য নয়।

আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইউনুস ইবনে হাবীব, আবূ দাঊদ, শু'বা, আবূ ইসহাক, আবদুল্লাহ্ ইবনে জরীর আলবজলী, তাঁর পিতার সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন; নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ بَيْنَهُمْ بِالْمَعَاصِيْ هُمْ أَكْثَرُ وَأَعَزُّ مِمَّنْ يَعْمَلُهُ ثُمَّ لَمْ يُغَيِّرُوا إِلَّا عَمَّهُمُ اللّٰهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ -

যে জনগোষ্ঠীর মধ্যেই আল্লাহ্‌র নাফরমানীর কাজ করা হবে অথচ তার নাফরমানীর কাজ যারা করে তাদের চেয়ে অধিক ও অধিক শক্তিশালী তা সত্ত্বেও তারা তা পরিবর্তন করে না, বন্ধ করে না, আল্লাহ্ তাদের উপর সাধারণ ও ব্যাপক আযাব নাযিল করেন।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, আবদুল্লাহ-ই-মুহাম্মাদুন্নফাইলী, ইউনুস ইবনে রাশিদ, আলী ইবনে বুযায়মাতা, আবূ উবায়দাতা, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ اَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَىْ الرَّجُلَ فَيَقُوْلُ يَاهٰذَا اتَّقِ اللّٰهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَانَّهُ لَايَحِلُّ لَكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلَا يَمْنَعُهُ ذٰلِكَ اَنْ يَّكُوْنَ اَكِيْلَهُ وَشَرِيْبَهُ وَقَعِيْدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوْا ذٰلِكَ ضَرَبَ اللّٰهُ تَعَالٰى قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ قَالَ لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ط ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ...... فٰسِقُوْنَ -

বনী ইসরাঈলীদের মধ্যে সর্ব প্রথম ত্রুটি দেখা দিল এভাবে যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে উপদেশ দিল, বলতো ঃ হে ব্যক্তি, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তুমি যা করছ তা ত্যাগ কর। কেননা ও কাজ করা তোমার জন্যে হালাল নয়। পরের দিন তার সাথে সাক্ষাৎ হলে তাকে সেই পরিত্যাজ্য কাজ করতে নিষেধ করে না। বরং তার পানাহারে ও উঠাবসায় তার সাথে একাত্ম হয়ে যায়। এরূপ যখন তারা করতে থাকে তখন আল্লাহ্ তাদের পরস্পরের দ্বারা প্রভাবান্বিত করে দেন। এর পর উপরে উদ্ধৃত আয়াত পাঠ করেন ঃ বনী ইসরাঈলীদের মধ্য থেকে কুফরি নীতি অনুসারীদের উপর দাউদ ও মরিয়ম পুত্র ঈসার জবানীতে অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে। তা এ জন্যে যে, তারা নাফরমানীর কাজে লিপ্ত হয়ে ছিল এবং সীমালঙ্ঘন করেই চলেছিল। ..... ফাসিক পর্যন্ত। (সূরা মায়িদা ঃ ৭৮)

তারপর বললেন ঃ

كَلَّا وَاللّٰهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلٰى يَدَىِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا -

না, কখনও নয়! তোমরা অবশ্য-অবশ্যই ভালো কাজের আদেশ করবে, মন্দ কাজ করতে নিষেধ করবে, তোমরা জালিমের হাত শক্তভাবে ধরে রাখবে, তাকে সত্য নীতির উপরে বলিষ্ঠভাবে স্থাপিত রাখবে, সত্যের সীমার মধ্যে তাকে শক্ত করে বেঁধে রাখবে।

আবূ দাউদ বলেছেন, খালফ ইবনে হিশাম আবূ শিহাব আল-হুনাত, আলউলা ইবনুল মুসাররাব, আমর ইবনে মুররা, সালিম, আবূ উবায়দা, ইবনে মাসউদ সূত্রে নবী করীম (স) থেকে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেছেন। সে বর্ণনায় একথাটুকু অতিরিক্ত রয়েছে ঃ

اَوْلَيَضْرِبَنَّ اللّٰهُ بِقُلُوْبِ بَعْضِكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ -

অথবা তোমাদের পরস্পরের অন্তর দ্বারা আল্লাহ্ পরস্পরের অন্তর প্রভাবিত করে দেবেন। পরে তোমাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করবে যেমন তাদেরকে অভিশপ্ত করেছে।

এ হাদীসের মাধ্যমে নবী করীম (স) জানিয়ে দিয়েছেন যে, 'নাহী আনিল মুনকার'-এর শর্ত হচ্ছে, একবার অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করে পরে সে নাফরমানীর কাজে লিপ্ত থাকা ব্যক্তির সাথে উঠাবসা বা একসাথে পানাহার করা যাবে না। এ পর্যায়ে নবী করীম (স) যা বলেছেন, তা এ আয়াতটির ব্যাখ্যাস্বরূপ বলেছেন ঃ

تَرَا كَثِيْرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا -

তুমি ওদের বহু লোককেই কাফিরদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে, তাদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব করতে দেখতে পাবে। (সূরা মায়িদা ঃ ৮০)

যারা পাপ কাজে লিপ্তদের সাথে একসাথে উঠাবসা ও পানাহার অব্যাহত রেখেছে, তারা কার্যত 'নাহী আনিল মুনকার'কে অগ্রাহ্য করেছে, সে দায়িত্ব পালন করেনি। এ পর্যায়ে আল্লাহ্র কথা ঃ 'লোকেরা যেসব পাপ কাজ করছিল, তা থেকে তারা পরস্পরকে বিরত রাখেনি, রাখতে চেষ্টা করেনি। সে সাথে রাসূল (স)-এর কথা ঃ অন্তত, মুখের কথা ও ভাষার সাহায্যে অন্যায়ের প্রতিবাদ ও পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে— তা পালন করেনি। তা মুখে করে থাকলেও কার্যত তাদের সাথে উঠাবসা ও পানাহার করায় তা কোন ফায়দা দেয়নি।

এ পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, অহব ইবনে বকীয়া, খালিদ, ইসমাঈল, কায়স সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, হযরত আবূ বকর (রা) হাম্‌দ ও সানা বলার পর বলেছেন ঃ তোমরা কুরআনের একটি আয়াত পাঠ কর কিন্তু তার প্রয়োগ কর এমন বিষয়ে যা তার আসল প্রয়োগক্ষেত্র নয়। আয়াতটি হল ঃ

عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ -

তোমাদের নিজেদের ব্যাপারেই তোমাদের দায়িত্ব পালন কর্তব্য। তোমরা যদি হেদায়েত প্রাপ্ত হও, তাহলে যে গুমরাহ হল, সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।
(সূরা মায়িদা ঃ ১০৫)

এরপর তিনি বললেন ঃ আমরা নবী করীম (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ

اِنَّ النَّاسَ اِذَا رَاَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَاْ خُذُوْا عَلَى يَدَيْهِ يُوْشِكُ اَنْ يَعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ -

লোকেরা যখন জালিমকে জুলুম করতে দেখতে পায়, তখন যদি তারা তার দুই হাত শক্ত করে ধরে জুলুম থেকে বিরত রাখতে চেষ্টিত না হয়, তাহলে আল্লাহ্ তাদেরকে সাধারণ ও ব্যাপক আযাবে পরিবেষ্টিত করবেন, তার আশংকা রয়েছে।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ আবূর রুবাই সুলায়মান ইবনে দাউদ আল-আতকী ইবনুল মুবারক, উতবা ইবনে আবূ হুকাইম, আমর ইবনে জারিয়াতাল, লুখামী, আবূ উমাইয়্যাতাশ—

শাবানী সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, আমি আবূ সালাবাতা আল খুশানীকে একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। বললাম, হে আবূ সালাবাতা عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ আয়াত সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি ? বললেন, আল্লাহ্‌র নামে বলছি, আমি এ বিষয়ে একজন অবহিত লোককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, যিনি নিজে এ বিষয়ে রাসূলে করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ বরং তোমরা মারূফ কাজের আদেশদান নীতি অবলম্বন কর এবং পরস্পরকে অন্যায় পাপ কাজ থেকে বিরত রাখ। এমন কি তোমরা যখন একজন লোভী-স্বার্থপর, ইন্দ্রিয়ানুসারী, নফসের কামনা-লালসার অনুসারী, প্রভাবশালী হীনমানসিকতা সম্পন্ন ও প্রত্যেক মতের লোক কেবল নিজের মতের উপর আত্মপ্রসাদ লাভে মগ্ন দেখতে পাবে, তখন তোমার নিজেকে ঠিক রাখতে সচেষ্ট হবে, অন্য লোকদেরকে নিজ থেকে ছেড়ে দেবে। কেননা তোমাদের সম্মুখে ধৈর্য রক্ষার দিনগুলো রয়েছে। তখন ধৈর্য ধারণ জ্বলন্ত অঙ্গার মুঠ করে ধরার ন্যায় কঠিন হবে। এরূপ অবস্থায়ও শরীয়াত পালনকারীর জন্য পঞ্চাশ ব্যক্তির আমলের সমান সওয়াব পাবে, যারা তার মতই আমল করছে। বলেছেন, অন্য বর্ণনাকারী বাড়তি কিছু কথা বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ তিনি প্রশ্ন করলেন, হে রাসূল! আপনি কি পঞ্চাশজন আমলকারীর কথা বলেছেন ওদের মধ্য থেকে ? জবাবে বললেন, না, তোমাদের মধ্য থেকে পঞ্চাশজন।

এ দীর্ঘ হাদীস প্রমাণ করে যে, 'আমর বিল মা'রূপ ওয়া নাহী আনিল মুনকার'-এর দুটি অবস্থা রয়েছে। একটি অবস্থা যখন অন্যায়কে বদলে দেয়া ও তা দূর করা সম্ভব হয়। কাজেই যার নিজ হাতে তা বন্ধ ও দূর করা সম্ভব সে তাই করবে। নিজের হাতে বা শক্তি দিয়ে তা দূর করার কয়েকটি দিক রয়েছে। একটি, তা দূর করা যাবে তরবারি ব্যবহার করে— শক্তি প্রয়োগ করে।[১] অন্যায়কারী যদি তার উপর আক্রমণ করে, তাহলে তারও কর্তব্য তা-ই করা। যেমন এক ব্যক্তি তাকে বা তার সম্মুখে অন্য আর একজনকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে, দেখতে পেল। কিংবা তার ধন-মাল নিয়ে যাচ্ছে কিংবা কোন নারীর উপর ধর্ষণ চালাতে প্রস্তুত হয়েছে, এ ধরনের আরও অনেক হতে পারে। তখন যদি জানা বা বোঝা যায় যে, সে মুখের কথায় বিরত হবে না কিংবা ধারালো অস্ত্র ছাড়া-ই সে তাকে হত্যা করবে, তাহলে তখন তাকে হত্যা করা তার কর্তব্য। উপরোদ্ধৃত হাদীসের ভিত্তিতে যে অন্যায় পাপ হতে দেখবে, সে যেন তা নিজ হাত বা শক্তির দ্বারা দূর করে। হাত দ্বারা এ অন্যায় কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে সেই অন্যায় থেকে বিরত রাখা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করাই তার কর্তব্য। এটা তার জন্যে ফরয। যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে, তার হাত বা শক্তি দিয়ে সে কাজ বন্ধ করতে চাইলে, তাকে তা থেকে অস্ত্র ছাড়া বিরত রাখতে চাইলে তার নিজের তা থেকে বিরত হয়ে যাওয়া উচিত, তাকে হত্যার জন্যে অগ্রসর হওয়া জায়েয নয়। আর যদি হাত দ্বারা তাকে বিরত রাখতে চায় কিংবা কথার দ্বারা তাকে বিরত রাখা সম্ভব বলে প্রবল ধারণা হয়, পরে তাকে তা থেকে ফিরিয়ে রাখা সম্ভব না হয়, সে অন্যায়ও দূর করা না যায় তাকে ভয় প্রদর্শন ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করতে চাওয়া ছাড়া, তাহলে তাকে হত্যা করাই কর্তব্য।

১. বর্তমানে আফগান মুজাহিদরা তা-ই করছে— অনুবাদক

ইবনে রুস্তম মুহাম্মাদের সূত্রে উল্লেখ করেছেন, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির ধন-মাল কেড়ে নিয়েছে এবং তাকে হত্যা করে লুণ্ঠিত মাল উদ্ধার করা ও তার মালিককে ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব মনে হয়, তাহলে তোমাকে তাই করতে হবে। ইমাম আবূ হানীফা এরূপ কথাই বলেছেন চোর সম্পর্কে। সে মাল চুরি করে নিয়েছে, মাল ফেরত না দিলে তাকে হত্যা করা যাবে। ইমাম মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন, ইমাম আবূ হানীফা সিঁদ কাটা চোর সম্পর্কেও একথা বলেছেন, প্রয়োজন হলে তুমি তাকে হত্যা করতে পার। যে ব্যক্তি তোমার দাঁত উপড়ে বা ভেঙ্গে দিতে চায়, তাকে হত্যা করতে পার বলে মত দিয়েছেন। তবে তা সেখানেই করা জায়েয হবে যেখানে তোমার সাহায্যে এগিয়ে আসার কেউ নেই।

আমরা এই যা বললাম, তা এ আয়াতটিতে বলা হয়েছে ঃ

فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِىْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ -

তোমরা যুদ্ধ কর সেই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে, যারা বিদ্রোহ করে, যেন তারা আল্লাহ্‌র বিধানের দিকে ফিরে আসে। (সূরা হুজরাত ঃ ৯)

এ আয়াতে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন। সে যুদ্ধ ততক্ষণ বন্ধ হবে না, যতক্ষণ তারা আল্লাহ্‌র বিধানের দিকে ফিরে না আসছে এবং যে অন্যায় কাজে তারা লিপ্ত ও বিদ্রোহ করেছে তা থেকে বিরত না হয়। নবী করীম (স)-এর কথা ঃ 'তোমাদের মধ্যে যে লোক অন্যায়-শরীয়াত বিরোধী কাজ হতে দেখতে পাবে, সে যেন তা তার হাত বা শক্তি দ্বারা পরিবর্তন করে' ও তা-ই কর্তব্য বানিয়ে দেয়। কেননা তা নিজের হাতে বদলে দেবার আদেশ করেছেন যে ভাবে ও যে উপায়েই তা করা সম্ভব হবে তা-ই তাকে করতে হবে। কিন্তু তা যখন হত্যা করা ছাড়া সম্ভব নয়, তখন তা-ই করতে হবে, যেন শেষ পর্যন্ত তা বন্ধ হয়ে যায়। শাসকরা অন্যায়ভাবে যে কর বা শুল্ক জনগণের পণ্যদ্রব্য থেকে অন্যায়ভাবে আদায় করে (আজকের ভাষায় যা ঘুষ ও দুর্নীতি লুটপাট), তাদের রক্তপাত মুবাহ। মুসলমানদের কর্তব্য তাদের হত্যা করা। যার পক্ষেই তাদের হত্যা করা সম্ভব তার জন্যেই তা করা ফরয। এজন্যে আগে থেকে কোন ভয়-ভীতি দেখাবারও প্রয়োজন নেই। প্রথমে কথার দ্বারা এ অন্যায় থেকে ফেরাবার চেষ্টা করাও জরুরী নয়। কেননা তাদের অবস্থা জানাই আছে, তারা এ কাজে অগ্রসর হলে তারই যে কোন কথাও মানবে না তা তো জানাই আছে। কেননা সে কাজ নিষিদ্ধ জানা সত্ত্বেও তারা এ কাজ করতে যাচ্ছে। তাই তাদেরকে বিরত রাখার জন্যে ভয়-ভীতি দেখানোও নিষ্ফল, তারা তা থেকে বিরত হবে না। ফলে তারা যে অন্যায় ও পাপ কাজ করছে তা বন্ধ করা অসম্ভব হয়ে যাবে। অতএব যে লোক এ কাজে লিপ্ত তাকে হত্যা করা সম্পূর্ণ জায়েয। আর তাদের হত্যা করতে অগ্রসর হলে যদি ভয় হয় যে, তারাই পূর্বাহ্নে আক্রমণ ও হত্যা করবে, তাহলে তাদেরকে ত্যাগ করাও জায়েয । তবে তখনও তাদের দূরে রাখতে ও তাদের উপর কঠোরতা করা যা দিয়েই সম্ভব এবং তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করাও জায়েয। এমনিভাবে যারাই এ ধরনের নাফরমানীর কাজে লিপ্ত তাদের ধ্বংস করার জন্যে যে কোন পন্থা অবলম্বন করা প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে এবং পৌনপুনিকতা সহকারে করা কর্তব্য। তার জন্যে সিদ্ধান্ত তাই যা আমরা উল্লেখ করেছি— যেভাবেই সম্ভব সে অন্যায় বন্ধ করা নিজ হাতে বা

শক্তির বলে অবশ্য কর্তব্য। যদি হাত বা শক্তি দ্বার সম্ভব না হয়, তাহলে মুখের কথা ও ভাষা প্রয়োগ করে তা করতে হবে। তা করতে হবে যখন এই আশা করা যাবে যে মুখের কথার ভাষায় প্রতিবাদ করা হলে তা দূর বা বন্ধ করা সম্ভব হবে। তারা সে কাজ বন্ধ করবে ও সে কাজ থেকে তারা বিরত থাকবে। যদি সে আশা করা না যায়, যখন প্রবল ধারণা হবে যে, তা একটি অন্যায় ও পাপ কাজ জানা সত্ত্বেও তারা মুখের কথায় তা থেকে বিরত হবে না, তখন তার সে বিষয়ে চুপ হয়ে যাওয়া জায়েয হবে। তবে তখন তাদেরকে এড়িয়ে চলতে হবে, তাদের সাথে সম্পর্কহীনতা স্পষ্ট করে তুলতে হবে। কেননা এরূপ অবস্থা সম্পর্কেই রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ -

তাহলে তা বন্ধ করতে হবে মুখের কথার দ্বারা। আর তা সম্ভব না হলে অন্তর দিয়ে তার বন্ধ হওয়া কামনা করতে হবে।

রাসূল (স)-এর কথা فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ -এর এ করা হয়েছে যে, তাদেরকে সে অন্যায় পাপ কাজ থেকে বিরত রাখা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে তাকে তার প্রতিবাদ করতে হবে অন্তর দ্বারা— মনে মনে। তা তাকীয়ার মাধ্যমে করা হোক কিংবা তাকীয়া ছাড়াই। কেননা তাঁর কথা إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ-এর অর্থ হল মুখের কথার দ্বারা তা দূর করা যদি সম্ভবপর না হয়, তাহলে চুপ থাকা তার জন্যে মুবাহ অবস্থায়। যদিও হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ (মায়িদা ঃ ১০৫) আয়াতের তাৎপর্য হিসেবে বর্ণিত হয়েছে ঃ তুমি মা'রূফ কাজের আদেশ কর এবং মুনকার কাজ করতে নিষেধ কর, যতটা তোমার থেকে গ্রহণ করা হয়। যদি গ্রহণ করানো হয়, তাহলে তুমি নিজেকে তা থেকে বাঁচাতে যত্নবান হও। পূর্বোদ্ধৃত আবূ সালাবাতা আল-খুশানীর হাদীস এ কথাই প্রমাণ করে। কেননা তাতে নবী করীম (স) বলেছেন ঃ তোমরা মা'রূপ কাজ করতে আদেশ করা নীতি গ্রহণ কর এবং অন্যায় কাজ থেকে পরস্পরকে বিরত রাখতে চেষ্টা কর। এমনকি, তোমরা যখন সকল লোককে লোভী স্বার্থপর ইন্দ্রিয়ানুসারী ও কামনা-লালসা চরিতার্থতাকারী প্রভাবশালী নীচ স্বভাবের এবং নিজের মতে আত্মশ্লাঘা বোধকারী ব্যক্তিকে দেখতে পাবে, তখন তুমি নিজেকে রক্ষা করতে যত্নবান হও। অন্যান্য সাধারণ লোককে তোমার থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা কর। অর্থাৎ প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন— লোকেরা যখন তোমার কথা মানতে রাজিই হয় না, তারা নিজেদের কামনা-বাসনা-লালসার পেছনেই চলতে থাকে, তাদের নিজেদের মতকেই চূড়ান্ত রায় হিসেবে গ্রহণ করে বসবে, তখন তুমি তাদেরকে ত্যাগ করতে পার। তখন তোমার নিজেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হওয়াই বরং তোমার কর্তব্য। তখন জনগণের ব্যাপারাদি পরিহার করতে পার। মুখের কথার প্রতিবাদ না করাও তখন মুবাহ। যার অবস্থা এরূপ, এটা তার জন্যে কর্ম বিধান।

ইকরামা থেকে বর্ণিত, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) তাঁকে বলেছেন ঃ শনিবারওয়ালা (ইয়াহূদী)-দের মধ্যে যারা লোকদেরকে ওয়ায ও নসীহত করা থেকে বিরত হয়েছিল তাদের পরিণতি কি হয়েছিল, তা জানবার জন্যে আমি খুবই আগ্রহী। তখন আমি তাঁকে বললাম, আমি সে বিষয়ে আপনাকে জানাব। আপনি এ দ্বিতীয় আয়াতটি পাঠ করুন ঃ

أَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ -

যারা নিজেরা পাপ কাজ থেকে বিরত থাকল, আমরা তাদেরকে নাজাত দিলাম।
(সূরা আরাফ ঃ ১৬৫)

তখন বললেন, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। তখন তিনি আমাকে একটি বিশেষ পোশাক পরিয়ে দিলেন। ইবনে আব্বাস (রা) এ থেকে এ বিশেষ প্রমাণ গ্রহণ করলেন যে, যারা নিজেরা পাপ কাজ করেছে এবং বলা সত্ত্বেও তা থেকে বিরত থাকেনি, আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। আর যারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করা থেকে বিরত রয়েছিল, তাদেরকে আযাব দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের মতই বানালো, যারা সেই অন্যায়ে লিপ্ত রয়েছে।

আমরাও তা-ই মনে করি। কেননা তারা অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করেনি, বরং সে পাকা কাজে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল, এমন কি, অন্তর দিয়েও তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করেনি। আল্লাহ্ নিজেই তাঁর কালামে প্রাচীন কালের নবীগণকে হত্যা করার অপরাধে নবী করীম (স)-এর সময়ের ইয়াহূদীদেরকে অভিযুক্ত করেছেন। কেননা তারা তাদের পূর্বপুরুষদের নবী হত্যার সমর্থক ছিল। তিনি বলেছেন ঃ

قَدْجَاءَ كُمْ رَسُلٌ مِّنْ قَبْلِى بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِىْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ -

আমার পূর্বে বহু সংখ্যক নবী-রাসূল অকাট্য দলীল প্রমাণ সহ এসেছে এবং তোমরা যা বলছো তা নিয়ে, তাহলে তোমরা তাদের হত্যা করেছ কেন ? (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৮৩)

এ আয়াত ঃ

فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَاءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -

তাহলে তোমরা আল্লাহ্র পূর্ববর্তী নবীগণকে হত্যা করতে কেন, যদি তোমরা ঈমানদারই ছিলে ? (সূরা বাকারা ঃ ৯১)

এ আয়াতদ্বয়ে নবী হত্যার অপরাধ তখনকার সময়ের ইয়াহূদীদের কৃত বলেছেন। অথচ তখনকার ইয়াহূদীরা নিজেদের প্রত্যক্ষভাবে নবী হত্যার অপরাধে অপরাধী ছিল না। তারা নিজেরা তো হত্যা করেনি। তবে হ্যাঁ, তারা খুব রাজি ও খুশী ছিল এজন্য যে, তাদের পূর্ব পুরুষরা নবীগণের হত্যাকারী ছিল। অনুরূপভাবে যারা শনিবারওয়ালাদের দুষ্কর্ম বন্ধ করতে ও তাদেরকে তা থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেনি, তাদেরকে যুক্ত করা হয়েছে তাদের সাথে যারা প্রত্যক্ষ ভাবে এ কাজ করত। এ ভাবে উভয় শ্রেণীর লোককে আযাবে নিক্ষেপ করা হবে।

আমাদের এটাই মত এবং তার কারণ এই যে, তারা প্রত্যক্ষভাবে নবী-হত্যায় শরীক না থাকলেও এ কাজকে সমর্থন করেছে এবং তাদের বর্তমান কাজ দ্বারা প্রমাণ করেছে যে, এরা অন্তর দিয়েও সে কাজকে অন্যায় মনে করছে না।

তাই পাপ কাজকে অন্তর দ্বারা যে লোক অপছন্দ ও অস্বীকার করবে, সে যদি তা দূর ও বন্ধ করতে কার্যতও সক্ষম না হয়, তবু সে কাজ যে লোক কার্যত করে তাকে দেয়া আযাবে সে

পড়বে না। বরং সে তো সেই লোকদের মধ্যে শামিল হবে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'তোমরা নিজেদের সামলাও, তোমরা নিজেরা হেদায়েতপ্রাপ্ত লোক হলে কেউ যদি গুমরাহ হয়ে যায়, তাহলে তার গুমরাহী তোমাদের কোন ক্ষতি করবে না।

মুকররম ইবনে আহমাদুল কাযী, আহমাদ ইবনে আতায়তুল কুফী, আল-হুমলী সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি ইবনুল মুবারককে বলতে শুনেছি, ইবরাহীম আসসায়েগ-এর নিহত হওয়ার খবর যখন ইমাম আবূ হানীফার নিকট পৌঁছল, তখন তিনি কাঁদলেন এমনভাবে যে, আমরা মনে করলাম, তিনি মরে যাবেন। তখন আমি তাঁর নিকট একাকীত্বে জানতে চাইলাম, এর কারণ কি! জবাবে বললেন ঃ আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, লোকটি বড়ই বুদ্ধিমান ছিলেন। আর আমি এ বিষয়ে তাঁর সম্পর্কে খুবই ভয় পোষণ করতাম। বললাম, এ কান্নার কারণটা কি? বললেন, লোকটি আমাকে প্রশ্ন করতেন এবং আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগীতে নিজে খুবই কষ্ট ও ত্যাগ তিতিক্ষার নীতি গ্রহণ করতেন। খুব বেশি তাকওয়া-পরহেযগারী সম্পন্ন ছিলেন। আমি যখনই তাঁর নিকট কোন জিনিস পেশ করতাম, সেই বিষয়ে আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করতেন। তা গ্রহণ করতে রাজি হতেন না, তার প্রতি কোন আগ্রহ বোধ করতেন না। কখনও কিছু পছন্দ হলে অবশ্য তিনি গ্রহণ করতেন, আহার করতেন। তিনি একদা আমার 'আমর বিল মারূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার' বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত আমরা এ বিষয়ে একমত হলাম যে, তা আল্লাহ্র তরফ থেকে ধার্যকৃত ফরয— অবশ্য কর্তব্য। তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন, আপনি আপনার হাত বাড়িয়ে দিন, আমি আপনার হাতে বায়'আত করব। পরে দুনিয়া তার ও আমার মধ্যে অন্ধকার দাঁড় করে দিল। তখন আমি বললাম, তা কিভাবে, কেন ? বললেন, তিনি আমাকে আল্লাহ্র একটি হক আদায়ের দিকে আহ্বান করেছিলেন; কিন্তু আমি সেদিকে যাওয়া থেকে বিরত থাকলাম এবং তাঁকে বললাম ঃ সে কাজ যদি এক ব্যক্তি করে, তাহলে সে নিহত হবে, এবং মানুষের কোন কল্যাণ সাধন করতে সক্ষম হবে না। কিন্তু সে কাজে সে যদি সাহায্য সহযোগিতাকারী লোক পায় যারা নেককার এবং একজন তাদের প্রধান নেতা হয় যে আল্লাহ্র দ্বীনের উপর অবিচল ও নিরাপত্তাপূর্ণ, এদিক ওদিক হবে না, তাহলে লোকদের বিরাট কল্যাণ সাধনে সক্ষম হতে পারে। বললেন, তিনি সেই দাবিই করছিলেন। যখন যখনই আমানত দাতা তাগাদা করত, যখন যখনই আমার তাগাদায় অগ্রসর হয়ে আসতেন, আমি তাঁকে বলতাম ঃ এ বিরাট কাজ একজন লোকের পক্ষে করা সম্ভব নয়, যা নবীগণ করতে পারতেন। কেননা তাঁরা আসমান থেকে নিয়োগ ও সাহায্য-সহযোগিতা পেতেন। এ কাজ ফরয, কিন্তু অন্যান্য সব ফরযের মত নয়। কেননা অন্যান্য ফরয তো ব্যক্তি এককভাবে আদায় করে। আর এ ফরয যদি কেউ একাকী করতে শুরু করে, তা হলে সে তার রক্ত ও জীবন দিতে বাধ্য হয়। ফলে আমার ভয় হয়, এ কাজ করে সে নিজেকে হত্যা করতেই সাহায্য করে বসবে হয়ত। আর এ পথে একজন ব্যক্তি যদি একবার নিহত হয়, তাহলে অন্য কোন ব্যক্তি নিজেকে এ অবস্থার সম্মুখীন করতে সাহস পাবে না। বরং সে তখন অপেক্ষায় রত হবে। ফেরেশতাগণ তো এ দিকে লক্ষ্য করেই বলেছিল ঃ হে আল্লাহ্! তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে বানাবে, যে সেখানে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত করবে ? তোমার হামদ সহকারে তসবীহ তো আমরাই

পড়ছি এবং তোমার পবিত্রতা আমরাই বর্ণনা করছি! আল্লাহ্ বললেন ঃ 'আমি যা জানি তোমরা তা জান না।'

পরে সে মরো চলে যায়। সেখানে ছিল আবূ মুসলিম। সে তার সাথে অত্যন্ত রূঢ় কঠোর ভাষায় কথা বলে। তখন খুরাসানের ফিকাহ্‌বিদগণ তার ব্যাপারে নিয়ে একত্রিত হন। সেখানে সেখানকার আবিদ-জাহিদগণও উপস্থিত থাকেন। পরে তারা তাকে ছেড়ে দেয়। পরে তারা আবার তাকে পাকড়াও করে। তখন তারা তাকে খুব ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করে। পরে আবার তারা তাকে ধরে। এ সময় সে বলে ঃ আল্লাহ্‌র জন্যে তোমার জিহাদ অপেক্ষা উত্তম কোন জিনিস আমি পাচ্ছি না। আমি নিশ্চয়ই তোমার বিরুদ্ধে আমার মুখ দ্বারা জিহাদ করব, আমার হাত দ্বারা কিছু করার শক্তি আমার নেই। কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে দেখিয়েছেন, আমি এ ব্যাপারে তোমাকে ঘৃণা করি। পরে তাকে তারা হত্যা করে।

আবূ বকর আল-জাস্‌সাস বলেছেন, এইমাত্র কুরআন ও নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে আমরা যা কিছু উল্লেখ করলাম, তাতে প্রমাণিত হয় যে, 'আমর বিল মারূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার' করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফরয। আমরা এ-ও বলেছি যে, তা এমন ফরয যা কিছু লোক আঞ্জাম দিলে অন্যদের কর্তব্যও পালিত হয়ে যাবে, এটা তাদের উপর ফরয থাকবে না। এ ফরযের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে নেক্‌কার-অনেককার কেউ-ই কোন মতভেদ করে না। কেননা কোন কোন ফরয যদি কিছু লোক ত্যাগও করে তবু অন্য লোকের ফরয তো থেকেই যায়। যেমন কিছু লোক নামায না পড়লে অন্য লোকদের উপর সে ফরয যথারীতি দাঁড়িয়েই থাকে। আর নামায তরক করলেও রোযা ও অন্যান্য যাবতীয় ফরয কিছুতেই রহিত হয় না। অনুরূপভাবে যদি কেউ সমস্ত মারূফ কাজ না করে ও সমস্ত 'মুনকার' কাজ থেকে বিরত না-ও থাকে, তবুও 'আম্‌র বিল মারূফ ওয়া নাহী আনিল মুন্‌কার'-এর কর্তব্যটা রহিত হবে না।

তাল্‌হা ইবনে আমর আতা ইবনে আবূ রিবাহ, আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, নবী করীম (স)-এর কিছু সংখ্যক সাহাবী তাঁর নিকট একত্রিত হয়ে তাঁকে বললেন ঃ হে রাসূল! আমরা যদি মারূফ-এর কাজ করি এমন ভাবে যে, কোন মারূফই অবশিষ্ট থাকল না যা আমরা করিনি, এবং সব মুনকার থেকেই আমরা বিরত থাকলাম এমনভাবে যে, কোন মুন্‌কারই আর বেঁচে থাকল না যা থেকে আমরা বিরত থাকিনি, তার পরও আমাদের জন্যে এ সুবিধাটুকু হবে না যে আমরা ' আমর বিল মারূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার'-এর কাজ করব না ? জবাবে তিনি বললেন ঃ

مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ كُلِّهِ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا عَنْهُ كُلِّهِ -

না, তোমরা মারূফ কাজের আদেশ করতেই থাক, যদিও তোমরা নিজেরা তার সমস্তটা কর না এবং মুনকার থেকে নিষেধ করার কাজ করো, যদিও তোমরা তার সবটা থেকে বিরত থাক না।

এ হাদীসে নবী করীম (স) 'আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার'-এর কর্তব্য

অন্যান্য ফরয কাজের মতই প্রতিষ্টিত করেছেন, তা অবশ্য পালনীয় হিসেবে, তার কোন কোন দিকে যতই ত্রুটি-বিচ্যুতি থাক না-কেন।

মুসলিম উম্মতের আলিম এবং আগের ও পরের সমস্ত ফিকাহবিদ এ কাজের ফরজিয়াতকে অগ্রাহ্য করেন নি। তবে খড়কুটা তুল্য কিছু লোক এবং জাহিল আহলি হাদীসগণ ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তারা বিদ্রোহী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও 'আমর বিল-মা'রূফ ওয়া নাহী আনিল মুন্‌কার' কাজ অস্ত্র সহকারে করাকে অস্বীকার করেছে। বরং তারা আম্‌র বিল মা'রূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার' কাজটিকেই একটা ফিতনা' নামে অভিহিত করেছেন। সে কাজে যখন অস্ত্র ধারণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তখনও তা করতে তারা রাজি নয়। বিদ্রোহীদের মুকাবিলা সশস্ত্রভাবে করতেও তারা প্রস্তুত নয়। অথচ তারা আল্লাহ্‌র আদেশ শুনতে ও জানতে পেরেছে ঃ

فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِىْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ -

> তোমরা বিদ্রোহী লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাক যতক্ষণে তারা আল্লাহ্‌র ফরমান মেনে নিতে প্রস্তুত না হয়। (সূরা হুজরাত ঃ ৯)

আয়াতের শব্দে স্পষ্ট ভাষায়ই তাদের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ ও অস্ত্র প্রয়োগ করার আদেশ রয়েছে। তারা এ-ও ধারণা করে নিয়েছে যে, শাসক যে-ই হোক, তার জুলুম ও নিপীড়নের প্রতিবাদ করা যাবে না। আর নরহত্যা তো স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃকই নিষিদ্ধ। যে শাসক নয়, তার বিরুদ্ধে শুধু কথা বলা যাবে। আর হাত-ও ব্যবহার করা যাবে শূন্য হাতে, অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়া। এর ফলে বিদ্রোহীরা গোটা উম্মতের উপর ভয়াবহ বিরোধী শত্রু হয়ে দাঁড়াল। কেননা তারা লোকদেরকে বিদ্রোহী দলের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত ও নিরস্ত করে রেখেছে। শাসকের জুলুম-নিপীড়ন মুখ বুঁঝে সহ্য করতে বাধ্য করেছে। শেষ পর্যন্ত এর পরিণতি এই হল যে, ফাসিক-ফাযির লোকেরা প্রভাবশালী ও বিজয়ী হয়ে দাঁড়াল গোটা উম্মাহ্‌র উপর। অগ্নিপূজারী ও ইসলামের দুশমনরা আশকারা পেয়ে গেল। এমন কি শান্তি নিরাপত্তা শেষ হয়ে গেল, জুলুম প্রকাশমান ও ব্যাপক হয়ে পড়ল। শহর-নগর-জনপদ ধ্বংস ও বিরান হয়ে গেল। দ্বীন-ও গেল, দুনিয়াও গেল। নাস্তিকতা ও বাড়াবাড়ি বৃদ্ধি পেল। দ্বৈতবাদী, অগ্নিপূজা[১] ও সুদক ধর্মের প্রসার হয়ে পড়ল। আর এসব মতবাদই 'আমর বিল মারূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার' এবং শাসকের জুলুম-পীড়নের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা থেকে বিরত থাকতে অনুপ্রাণিত করেছে।

মুহাম্মদ ইবনে বকর আবূ দাঊদ, মুহাম্মাদ ইবনে উবাদুল ওয়াসিতী, ইয়াযীদ ইবনে হারুন, ইসরাঈল, মুহাম্মাদ ইবনে জাহাদাতা, আতীয়াতাল আওফা, আবূ সাঈদুল খুদরী (রা) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

---

১. মূলে الخرمية। বলা হয়েছে। এ শব্দটি নিয়েছে মজুসীদের একটি শাখা দল, যারা জন্মান্তরবাদ ও সবকিছু করা বৈধ এ মতবাদে বিশ্বাসী। 'খারসাতুন' নামে প্রাচীন পারস্যের একটি গ্রাম। এই দল সেই গ্রামের লোক ছিল।

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيْرٍ جَائِرٍ -

অত্যাচারী শাসক বা আমীরের নিকট স্পষ্ট সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।

মুহাম্মাদ ইবনে উমর আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে মুসয়্যিব আল-মরওজী আবূ উমারাতা, আল-হাসান ইবনে রশীদ সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি ইমাম আবূ হানীফাকে বলতে শুনেছি ঃ আমি ইবরাহীম আস্-সায়েগকে ইকরামা-ইবনে আব্বাস সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছি, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ আবদুল মুত্তালিব পুত্র হামযা শহীদদের শ্রেষ্ঠ সরদার। যে লোক অত্যাচারী নেতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাকে ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করে; আর তার ফলে সে নিহত হয়, সে-ও।'

আল্লাহ কথা ঃ

وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ -

আর আল্লাহ্ বান্দাদের জন্যে জুলুম চান না।

এ আয়াত দাবি করে, সর্বপ্রকারে জুলুম-ই আল্লাহ্র ইচ্ছার বিপরীত। অতএব কেউ যেন কারোর উপর জুলুম করতে ইচ্ছুক না হয়। আল্লাহ্ নিজেও লোকদের উপর জুলুম করতে চান না, লোকদের পরস্পরে জুলুম হোক, তা-ও তিনি চান না। কেননা খারাপ ও মন্দ হওয়ার দিক দিয়ে এ দুটি সম্পূর্ণ সমান। আল্লাহ্ যদি লোকদের পরস্পরে জুলুম চাইতেন, তাহলে তিনি নিজেও লোকদের উপর জুলুম করতে চাইতেন, চাওয়া সঙ্গত হতো। বিবেচ্য, যে লোক নিজে অন্যের উপর জুলুম করতে ইচ্ছুক হয় আর যে মানুষদের পরস্পরে জুলুম হোক তা চায়— এ দুজনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অন্যায়, মন্দ ও পাপ হওয়ার দিক দিয়ে এ দুটি অবস্থা-ই অভিন্ন। তেমনিভাবে তার জুলুমের ইচ্ছা তাঁর ও অন্যান্য সকলের দিক থেকেই নিষিদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আল্লাহ্র কথা ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -

তোমরা সর্বোত্তম জাতি! তোমরা ভালো কাজের আদেশ কর ও মন্দ কাজ করতে নিষেধ কর।

আয়াতে كُنْتُمْ -এর কয়েকটি তাৎপর্য বলা হয়েছে।

আল-হাসান থেকে বর্ণিত, এর অর্থ সুসংবাদ। আগের কালের আসমানী কিতাবে যে জাতিসমূহের উল্লেখ হয়েছে তাদের সম্পর্কিত খবর। আল-হাসান বলেছেন, সে সব জাতির মধ্যে আমরা সর্বশেষ, যারা আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানার্হ।

আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক, আল-হাসান ইবনে আবূ রুব্বাই, আবদুর রাযযাক, মামর, বহজ ইবনে হাকীম, তাঁর পিতা, তাঁর দাদা সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী করীম (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ 'তোমরা সর্বোত্তম জনগোষ্ঠী, জনগণের কল্যাণে

তোমাদেরকে অস্তিত্ব দেয়া হয়েছে।' এ পর্যায়ে বলেছেন ঃ তোমরা সত্তরটি উম্মতের বাসনা পোষণ কর। তন্মধ্যে তোমরা সর্বোত্তম ও সর্বাপেক্ষা সম্মানার্হ আল্লাহ্র নিকট। ফলে এর অর্থ হল, তোমরাই সর্বোত্তম জনগোষ্ঠী। এ বিষয়ে আল্লাহ তাঁর নবীগণকে অবহিত করেছেন, যেসব কিতাব তাঁদের নিকট নাযিল হয়েছে সেই সবের মাধ্যমে।

এ-ও বলা হয়েছে, كان শব্দটির প্রবেশ ও নির্গমন একটি পর্যায়ে, তবে তা তার প্রবেশ পরিমাণ অনুযায়ী। তা অনিবার্যভাবে আদেশ সঙ্ঘটিত হওয়ার তাগিদের জন্যে। কেননা তা সেই পর্যায়ের যা প্রকৃত পক্ষেই ছিল। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

আর আল্লাহ্ তো অতীব ক্ষমাকারী ও অতিশয় দয়াবান ছিলেন। (সূরা নিসা ঃ ৯৬)

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا -

আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞানী ও সুবিজ্ঞানী ছিলেন। (সূরা নিসা ঃ ১৭)

এর অর্থ প্রকৃত পক্ষেই তা সঙ্ঘটিত।

বলা হয়েছে ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ -

এর অর্থ ঃ তোমরা সর্বোত্তম জনগোষ্ঠী হয়ে পড়েছ।

তার অর্থ বর্তমান অবস্থায় তোমরা সর্বোত্তম জাতি— জনগোষ্ঠী। এ অর্থও বলা হয়েছে যে, লওহে মাহফুজে তোমরা সর্বোত্তম জনগোষ্ঠী ছিলে। বলা হয়েছে, যদ্দিন তোমরা আছ! তা প্রমাণ করে, প্রথম দিন থেকেই তোমরা এরূপ।

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, মুসলিম উম্মাহ্র ইজমা সহীহ্। তার কতিপয় দিক রয়েছে। একটি, তোমরা সর্বোত্তম জনগোষ্ঠী ছিলে। তবে তারা আল্লাহ্র নিকট থেকে এ গুণবাচক প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে যতক্ষণ তারা আল্লাহ্র হক আদায়ে রত থাকবে ও গুমরাহ হবে না। দ্বিতীয়ত তাদের সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেসব কাজ করতে আদিষ্ট তাতে তারা মারূফ কাজের আদেশ করে। সে আদেশ আসলে আল্লাহ্র। কেননা 'মা'রূফ' মাত্রই আল্লাহ্র আদেশ। তৃতীয়, তারা মুনকারকে অস্বীকার করে। আর মুনকার হচ্ছে তা যা করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। আর তারা এ প্রশংসনীয় মর্যাদার অধিকারী হবে তখন, যখন তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভে মগ্ন থাকবে। এ থেকে প্রমাণিত হল, উম্মত যা-ই অস্বীকার-অগ্রাহ্য-অপছন্দ করবে, তা-ই 'মুনকার'। আর যারই আদেশ করবে, তা-ই মা'রূফ। তা-ই আল্লাহ্র হুকুম। এ তাৎপর্য উম্মতের গুমরাহীর উপর একমত হওয়াকে নিষিদ্ধ করে, তা ঘটতে পারে না বলে দাবি জানায়। এবং যার উপর তারা একমত হবে, তা-ই হবে আল্লাহ্র হুকুম।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّآ اَذًى -

ওরা তোমাদের কখনই কোন ক্ষতি করতে পারবে না, তবে দেহে-প্রাণে পীড়ন করতে পারে।

এ আয়াতে প্রমাণ রয়েছে নবী করীম (স)-এর নবুয়ত সহীহ্ হওয়ার। কেননা তাতে খবর দেয়া হয়েছে সেসব ইয়াহূদী সম্পর্কে যারা মুমিনদের শত্রু ছিল। তারা মদীনার উপকণ্ঠের অধিবাসী ছিল, বনী নজীর, বনী কুরায়জা ও বনী কাউনকা এবং যযবরের ইয়াহূদী। আল্লাহ্ জানিয়েছেন যে, এরা কেউ-ই তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, যদিও কথা-বার্তার দ্বারা কষ্ট দিতে পারে। আর ওরা যখনই তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তখনই তারা পশ্চাদপসরণে ও পৃষ্ঠ-প্রদর্শনে বাধ্য হবে। এই যা খবর দেয়াও হয়েছিল, বাস্তবে তা-ই ঘটেছিল। এ খবর দান গায়বী ইলম পর্যায়ের।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ -

তোমাদের উপর লাঞ্ছনা নিক্ষিপ্ত হয়েছে যেখানেই তারা থাকুক। তবে রক্ষা পবে আল্লাহ্‌র রজ্জু ও মানুষের রজ্জু ধারণ করে।

এ কথা ইয়াহূদীদের সম্পর্কে— পূর্বে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ কথায়ও নবী করীম (স)-এর নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ রয়েছে। কেননা ওসব ইয়াহুদী লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য নিগৃহীত হয়েছে চিরকাল। তবে মুসলমানরা যখন তাদের জন্যে আল্লাহ্‌র ওয়াদা ও দায়িত্ব গ্রহণ সম্ভব করেছেন, কেবল তখনই তা থেকে রক্ষা পেয়েছে। এখানে الحبل শব্দের অর্থ চুক্তি ও নিরাপত্তা দান।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

لَيْسُوْا سَوَآءً مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ -

ওরা সব সমান নয়। আহলি কিতাবের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা সক্রিয়, ইবাদতে নিরত, রাত্রিকালে আল্লাহ্‌র আয়াত তিলাওয়াত করে ও সিজদায় পড়ে থাকে।

ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদাহ ও ইবনে জুরাইয বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তাঁর সঙ্গে আরও বহু সংখ্যক লোক, তখন ইয়াহুদীরা বলল ঃ মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি ঈমান এনেছে আমাদের মধ্যে থেকে খারাপ লোকেরা। তখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে। হাসান বলেছেন ঃ قَائِمَةٌ অর্থঃ عَادِلَةٌ ন্যায়বাদী। ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ ও রুবাই ইবনে আনাস বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্‌র বিধানের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত আর সুদ্দী বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগীর কাজে দৃঢ়, কার্যকর। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ পর্যায়ে বলা

হয়েছে ঃ সিজদা নামাযে যা দেয়া হয়, তা-ই পরিচিত। কেউ কেউ এর অর্থ বলেছেন, তারা নামায কায়েম করে— নামায পড়ে। কেননা সিজদায় কুরআন পাঠ করা হয় না, রুকূতেও নয়। শুরুর واو (ওয়াও) অক্ষরটি অবস্থা বোঝায়। এটা ফররার কথা। প্রাথমিক লোকেরা বলেছেন, واو এখানে একত্রকারী, যেন বলা হয়েছে, তারা রাত্রিকালে আল্লাহ্‌র আয়াত তিলাওয়াত করে, সে সঙ্গে তারা সিজদাও করে। আল্লাহ্‌র কথা ঃ তারা আল্লাহ্‌র প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে এবং 'আমর বিল মারূফ' ও 'নাহী আনিল মুন্‌কার' করে। এটা তাদের গুণের বর্ণনা, যারা আহলি কিতাবের মধ্যে থেকে ঈমান এনেছে। কেননা তারা আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং লোকদেরকে দাওয়াত দিয়েছে নবী করীম (স)-কে সত্য নবী মেনে নিতে ও তাঁর বিরোধীদের অমান্য ও অস্বীকার করতে। ফলে তারা সেই লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে গেলেন, যাদের লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ 'তোমরাই সর্বোত্তম জনগোষ্ঠী, যাদেরকে মানবতার কল্যাণের জন্যে গড়ে তোলা হয়েছে।' পূর্ববর্তী আয়াতে এ কথা বলা হয়েছে। আর কুরআন যে 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার' কর্তব্য হওয়ার কথা বলেছে, তা পূর্বেই আমরা ব্যাখ্যা করেছি।

যদি পশ্ন করা হয়, ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যেসব বাতিল ধর্মীয় মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে ও তাতে যে 'মুনকার' রয়েছে, তা দূর করা কি ওয়াজিব, যেমন সমস্ত মুন্‌কার কাজের প্রতিবাদ করা কর্তব্য ?

জবাবে বলা যাবে, এর দুটি দিক রয়েছে। ওদের মধ্যে যারা নিজেদের ভুল মতবাদের প্রতি লোকদেরকে দাওয়াত দেয় ও লোকদের মনে শোবাহ-সন্দেহের সৃষ্টি করে গুম্‌রাহ করে, তার প্রতিবাদ ও বিদূরণ অবশ্যই কর্তব্য, যতটা সম্ভব করতে হবে। আর যারা শুধু নিজেরা মনে আকীদা পোষণ করে, তা গ্রহণের জন্যে লোকদেরকে আহ্বান জানায় না, তাদের সম্মুখে সত্য কথা যুক্তি প্রমাণ সহকারে পেশ করে সত্য দ্বীন ও আকীদা কবুলের আহ্বান জানাতে হবে। তাদের আকীদার ও শোবাহ্-সন্দেহের ভিত্তিহীনতা স্পষ্ট করে তুলতে হবে। যদি তারা সত্য দ্বীন পন্থীদের তরবারী নিয়ে আক্রমণ করতে না আসে এবং তাদের সঙ্গী সাথীদের নিয়ে রাষ্ট্র—সরকার প্রধানের আনুগত্য থেকে বিরত না থাকে। তারা যদি তাদের আকীদা প্রচারে ও সেজন্য যুদ্ধংদেহী বের হয়, তাহলে তারা রাষ্ট্রদ্রোহী, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে আল্লাহ্‌ই আদেশ দিয়েছেন। সে যুদ্ধ চালাতে হবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র বিধানের নিকট নতি স্বীকার করছে। হযরত আলী কাররামাল্লাহ (রা) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি কূফা নগরের মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন খারিজীরা মসজিদের এক কোণ থেকে বলে উঠল ঃ

لَاحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ -

হুকুম আল্লাহ ছাড়া আর কারোর চলতে পারে না।

তখন তিনি তাঁর খুতবা বন্ধ করে বললেন ঃ

كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا الْبَاطِلُ -

হ্যাঁ, কথাটি সত্য, তবে ভুল উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করা হচ্ছে (ভুল অর্থ গ্রহণ করা হচ্ছে)।

এরূপ অবস্থায় আমাদের নিকট তাদের জন্যে তিনটি পন্থা আছে। তাদের হাত যতক্ষণ আমাদের হাতে মিলিত থাকবে, 'ফাই' সম্পদ থেকে তাদের হক দেয়া বন্ধ করব না। আর তাদেরকে আমাদের মসজিদসমূহে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করতেও নিষেধ করব না। এবং তাদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করব না, যতক্ষণ তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করছে।

এ কথার দ্বারা তিনি জানালেন যে, ওরা যুদ্ধ শুরু না করা পর্যন্ত ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব নয়। আর ওরা যখন 'হারুরা'য় অবতরণ করল, তখন হযরত আলী (রা) ওদেরকে ডাকা শুরু করলেন এবং ওদের মতের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করলেন। ফলে তাদের কিছু লোক ফিরে এলো। বিভিন্ন বাতিল মতবাদ সম্পন্ন লোকদের ব্যাখ্যাগত ভিত্তি হচ্ছে এ ঘটনা যে, ওরা যতক্ষণ নিজেদের মত প্রচার করে সে দিক লোকদেরকে দাওয়াত দিতে শুরু না করবে ততক্ষণ ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না এবং ওদের মত যতক্ষণ কুফর না হবে, ততক্ষণ তার উপর ওদেরকে প্রতিষ্ঠিত থাকতে দেয়া হবে। কেননা কুফরি মতের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে হলে ইসলামী রাষ্ট্রে জিযিয়া দিতে হবে। আর ব্যাখ্যার ভুলের দরুন কুফর স্বীকারকারীকে জিযিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখাও জায়েয নয়। কেননা তওহীদ ও রাসূলের প্রতি ঈমান ত্যাগকারী বলে তারা মুরতাদের মতো। অনেকে তাদেরকে আহলি কিতাবের মতো মনে করেছেন। আবুল হাসান তা-ই বলতেন। তাঁর মতে ওদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন জায়েয। তবে তাদের নিকট মুসলিম মেয়ে বিয়ে দেয়া জায়েয নয়। ওদের যবেহ্ কৃত জন্তু খাওয়া যাবে। কেননা ওরা কুরআনের হুকুম মানার দাবি করে, যদিও তা ধারণকারী তারা নয়। যেমন খ্রীস্টান ও ইয়াহুদী মত গ্রহণকারী লোক। তাই এদের সাথে যে রূপ ব্যবহার ওদের সাথেও সেইরূপ ব্যবহারই করতে হবে, যদিও তারা তাদের সমগ্র শরীয়াতের ধারক, অনুসারী নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ -

আর ওদেরকে যে লোক বন্ধু রূপে গ্রহণ করবে সে ওদেরই একজন হবে।

(সূরা মায়িদা ঃ ৫১)

ইমাম মুহাম্মাদ الزيادات গ্রন্থে লিখেছেন, কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন চিন্তা-বিশ্বাস গ্রহণ করে, যার প্রতি বিশ্বাসী কাফির হয়ে যায়। তারা মুসলমানদের ওসী হতে পারে, মুসলমানদের ওসী'দের ব্যাপারে যা যা জায়েয, তাদের ব্যাপারেও তা জায়েয হবে। যা বাতিল, তা ওদের ব্যাপারেও বাতিল হবে। একথা আবুল হাসান প্রচারিত মতের সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন। অনেকে আবার ওদেরকে মুনাফিক পর্যায়ে মনে করেছেন, সেই মুনাফিক যারা রাসূল (স)-এর সময়ে ছিল। তাদেরকে মুনাফিকীর উপর থাকতে দেয়া হয়েছে, যদিও তাদের কুফরি ও মুনাফিকী সম্পর্কে জানা ছিল। অনেকে তাদেরকে যিম্মীর ন্যায় মনে করেছেন। তারা অস্বীকার করেছে, তারা ওদের ও এদের মধ্যে পার্থক্য করেছে এই বলে যে, মুনাফিকদিগকে— যদি তাদের মুনাফিকী সম্পর্কে জানতে পারি, তাহলে তাদেরকে তার উপর স্থির থাকতে দেব না, আর ইসলাম ছাড়া তাদের নিকট থেকে আর কিছুই গ্রহণ করব না। নতুবা তাদের সাথে যুদ্ধ অনিবার্য হবে। যিম্মীদেরকে তাদের আকীদা নিয়ে থাকতে দেয়া হয় জিযিয়া দেয়ার কারণে।

আর ইসলামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী ও ব্যাখ্যার কারণে কুফরি মত গ্রহণকারীদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা জায়েয নয়। অথচ এদেরকে তাদের মতে স্থির থাকতে দেয়া জিযিয়া গ্রহণ ব্যতিরেকে জায়েয নয়। কাজেই এ ব্যাপারে তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হচ্ছে, তাদের কুফরি আকীদাকে একটি ধর্মমতরূপে জানতে পারলে তার উপর তাদেরকে স্থির থাকতে দেয়া জায়েয হবে না। তাদেরকে মুরতাদ বলেই মনে করতে হবে। শুধু শাব্দিকভাবে তাদেরকে কাফির বলাই যথেষ্ট নয়। তাদের ভুলটা আকীদাগত না-ও হতে পারে, তাদের অন্তর থেকে প্রকাশিত না-ও হতে পারে। তাদের আকীদায় এমন জিনিস থাকাও অসম্ভব নয়, যার দরুন তাদেরকে কাফির বলা যেতে পারে। সেই সময় মুরতাদ হয়ে যাওয়া লোকদের মতই তাদেরকে মনে করতে হবে। তাদেরকে তওবা করতে বলতে হবে। তওবা করলে ভাল-ই। অন্যথায় তাদেরকে হত্যা করতে হবে। আল্লাহ্‌ই প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত।

## যিম্মীদের নিকট সাহায্য চাওয়া

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِنْ دُوْنِكُمْ -

হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদের ছাড়া অন্য কোন লোককে আন্তরিক ও গোপন তথ্যের অবহিত বন্ধু রূপে গ্রহণ করবে না।

আবূ বকর আল-জাস্‌সাস বলেছেন ঃ এক ব্যক্তির بطانة হচ্ছে তার বিশেষ লোকগণ. যারা তার ব্যাপারাদিকে গোপন করে রাখে এবং সে তার ব্যাপারে তাদের প্রতি দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস পোষণ করে। এ কারণে আল্লাহ্ মুমিনদেরকে মুমিনদের পরিবর্তে কাফিরদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ও গোপন প্রীতি স্থাপন করতে নিষেধ করেছেন। তাদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদিতে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। কাফিররা মুমিনদের প্রতি যে ক্ষতিকর মনোভাব পোষণ করে, তা-ও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন ঃ لَايَأْلُوْنَكُمْ خَبَالًا 'তারা তাদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদি বিনষ্ট করে দিতে যে-কোন উপায় অবলম্বন করতে একটুও ত্রুটি করবে না। আয়াতের خَبَالًا শব্দের অর্থ, বিপর্যয়, বিনষ্টকরণ ও ক্ষতি সাধন। এরপর বলেছেন ঃ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ 'যা তোমাদেরকে কষ্ট দেবে, তা-ই তারা অন্তর দিয়ে কামনা করে।' সুদ্দী বলেছেন, ওরা তোমাদের দ্বীন থেকে তোমাদের গুমরাহ হওয়াকে অন্তর দিয়ে চায়। ইবনে জুরাইয বলেছেন ঃ ওরা চায়, তোমরা তোমাদের দ্বীন পালনে বিব্রত হও, বিপদে জড়িয়ে পড়, পরিণামে কঠিন কষ্টের মধ্যে পড়ে যাও। কেননা العنت -এর আসল অর্থ হল, কষ্ট। এ আয়াতে যেন জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ওরা ভালোবাসে— পছন্দ করে যে, তোমরা খুব কষ্টের মধ্যে পড়ে যাও।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ -

আল্লাহ্ চাইলে তিনি তোমাদেরকে নিশ্চয়ই কষ্টের মধ্যে ফেলতন। (সূরা বাকারা ঃ ২২০)

এ আয়াতাংশ প্রমাণ করে যে, মুসলমানদের সরকারী কার্যক্রম— আমলা-লেখক-কেরানী পর্যায়ের কাজে যিম্মীদের সাহায্য গ্রহণ জায়েয নয়। হযরত উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি খবর পেলেন যে, তাঁর নিয়োজিত গভর্নর হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) একজন যিম্মী ব্যক্তিকে লেখক— কেরানী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। তখন তিনি তাঁকে ভর্ৎসনা করে তীব্র ভাষায় চিঠি লিখলেন। তাতে তিনি কুরআনের আলোচ্য আয়াতাংশ লিখে বললেন ঃ 'মুসলমানদের ছাড়া তোমাদের গোপন বিষয়ে অন্য কাউকে বিশ্বাসভাজনরূপে গ্রহণ করবে না। আর আল্লাহ তাদেরকে হীন করেছেন যখন, তখন তুমি তাকে ইযযতের মর্যাদায় ফিরিয়ে আনতে পার না।' আবূ হায়ান আত্-তায়মী ফরকাদ ইবনে সালিহ্ আবূ দহ্কানাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বললাম, এখানে একজন 'হীরা' অধিবাসী লোক রয়েছে। সে খুবই সংরক্ষক। তার চাইতে অধিক সংরক্ষক কাউকে দেখিনি— সবই তার স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকে। তা আমি লিখেও রাখতে পারি না, যা তার মুখস্থ থাকে। আপনি মঞ্জুর করলে আমি তাকে কেরানী হিসেবে নিযুক্ত করতে পারি। জবাবে তিনি বললেন ঃ 'তাহলে তুমি মুমিন ছাড়া অন্য এক ব্যক্তিকে তোমার গোপনীয়তার সংরক্ষক বানাবে' ? হিলাল আত-তায়ী অস্‌ক রুমী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ আমি উমর (রা)-এর দাস ছিলাম। তিনি আমাকে প্রায়ই বলতেন ঃ 'তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। কেননা তুমি ইসলাম গ্রহণ করলে মুসলমানদের গোপনীয় আমানতের সংরক্ষণ কাজে তোমার সাহায্য গ্রহণ করতে পারি। কেননা মুসলমানদের আমানতের ব্যাপারে তাদের ছাড়া অন্য কারোর সাহায্য গ্রহণ আমার জন্যে বাঞ্ছনীয় নয়।' আমি তখন ইসলাম কবুল করতে অস্বীকার করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ 'লা-ইকরাহা ফিদ্দীন' দ্বীন কবুলের জন্যে কোন জবরদস্তির অবকাশ নেই। তিনি মুমূর্ষাবস্থায় আমাকে মুক্ত করে দিলেন। বললেন ঃ তোমার যেখানে ইচ্ছা চলে যাও।

আল্লাহ্র কথা ঃ

لَا تَاْكُلُوا الرِّبَا اَضْعَافًا مُضَاعَفَةً -

তোমরা সূদ খেয়ো না চক্রবৃদ্ধি হারে।

اَضْعَافًا مُضَاعَفَةً-এর অর্থে দুটি দিকের উল্লেখ করা হয়েছে। একটি, اَلْمُضَاعَفَةُ একটি মিয়াদের পর আর একটি মিয়াদ বিলম্বিত করে নির্ধারণ করে সূদ খাওয়া। প্রত্যেক মিয়াদে মূলধনে এক-একটি কিস্তি বৃদ্ধি করা। আর দ্বিতীয় মূলধনের উপর যা-ই বাড়িয়ে চড়িয়ে ধরা হবে, তা। একথা প্রমাণ করে যে, উল্লেখ বিশেষীকরণ প্রমাণ করে না যে, এর বিপরীত যা তা এর পরিপন্থী। কেননা তা যদি হতো, তা হলে 'রিবা' চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ, হারামকরণের উল্লেখ তার মুবাহ হওয়া প্রমাণিত হতো আবশ্যিকভাবে— যখন তা চক্রবৃদ্ধি হারে হতো না। অথচ মূলতই 'রিবা' হারাম, তা চক্রবৃদ্ধি হারে হোক, আর না-ই হোক। এ বিষয়ে যারা মত প্রকাশ করেছে, তাদের মত ঠিক নয়, তা উক্ত কথা-ই প্রমাণ করে। আল্লাহ্ وَحَرَّمَ الرِّبَا 'রিবা' হারাম করেছেন'। কথাটিই অকাট্য ও নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণ করে যে, তাদের সে মতটি মনঃসূখ। এক্ষণে উক্ত কথার ব্যবহারিক প্রমাণিত কথা অবশিষ্ট নেই।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -

এবং জান্নাত— যার প্রস্থ আসমান-জমিন সমান।

এর অর্থে বলা হয়েছে, অপর আয়াতে আছে ঃ

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ -

এবং জান্নাত, যার প্রস্থ আসমান-জমিনের প্রস্থের সমান। (সূরা হাদীদ ঃ ২১)

এ কথাটি ঠিক এ কথাটির মতই ঃ

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ -

তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও তোমাদের সকলের পুনরুত্থান কর্ম একটি মাত্র প্রাণীর মত। (সূরা লুকমান ঃ ২৮)

অর্থাৎ একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থান যেমন সহজ, সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থানও তেমনি সহজ ও সম্ভব। বলা হয়, উক্ত আয়াতে عَرْضٌ শব্দটির বিশেষ উল্লেখ এবং দৈর্ঘ্যের উল্লেখ না করার কারণ হল এ কথা বোঝানো যে, দৈর্ঘ্য অতিশয় বিরাট ও বিশাল। তার উল্লেখ করা হলে তাতে তার ঠিক বোঝানোর জন্যে কোন দৃষ্টান্ত দেয়া সম্ভব হতো না।

হাদীসে এরূপ কথার দৃষ্টান্ত হল নবী করীম (স)-এর কথা ঃ

ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ اُمِّهِ -

ভ্রূণের যবেহ তার মার যবেহ। এর অর্থ, মাকে যবেহ করার মত।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِىْ السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ -

যারা সচ্ছল ও কষ্ট— উভয় অবস্থায় (আল্লাহ্‌র জন্যে অর্থ) ব্যয় করে ও যারা ক্রোধ দমনকারী এবং যারা জনগণের ক্ষমাদানকারী .....।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ

فِىْ السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ -

এর অর্থ, কষ্ট ও সুবিধা সচ্ছলতার অবস্থা

অর্থাৎ অর্থ ব্যয় সম্পদের স্বল্পতা ও বিপুলতার অবস্থা। কেউ বলেছেন এর অর্থ, আনন্দ ও দুঃখ-কষ্টের সময়। আল্লাহ্‌র পথে করণীয় সর্বোচ্চ নেক কাজে অর্থ খরচ করা থেকে উক্ত দুইটি অবস্থার কোন একটিও মুমিনদেরকে বিরত রাখতে পারে না। এ উভয় অবস্থায় যারা আল্লাহ্‌র জন্যে অর্থ ব্যয় করে, তাদের প্রশংসা করা হয়েছে এ আয়াতে। পরে তার সাথে একত্র করা হয়েছে ক্রোধ দমনকারীদের এবং লোকদেরকে ক্ষমদানকারীদের প্রশংসা। যে লোক নিজের

ক্রোধ হজম করে, সে প্রশংসনীয় কাজ করে। যে লোকের সাথে কোন অপরাধমূলক আচরণ কেউ করল, আর সে তাকে ক্ষমা করে দিল, সে-ও প্রশংসনীয় কাজ করে। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন ঃ

مَنْ خَافَ اللّٰهَ لَمْ يَشْفِ غَيْظَهُ وَمَنِ اتَّقَى اللّٰهَ لَمْ يَصْنَعْ مَايُرِيْدُ وَلَوْلَا يَوْمُ الْقِيٰمَةِ لَكَانَ غَيْرُ مَاتَرَوْنَ -

যে লোক আল্লাহ্কে ভয় করেছে, তার ক্রোধ প্রকাশ পাবে না। যে লোক আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন করেছে, সে যা-ই ইচ্ছা হয় তা করে না। যদি কিয়ামতের দিন না হতো তাহলে যা দেখছ, তার বিপরীত।

বস্তুত ক্রোধ দমন ও ক্ষমাদান দুটোই পছন্দনীয়, প্রশংসনীয়। দুটো কাজেরই সওয়াব হওয়ার ওয়াদা করা হয়েছে মহান আল্লাহ্র নিকট থেকে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا -

কোন প্রাণী-ই আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত মরতে পারে না। প্রত্যেকের জীবনের মিয়াদ লিখিত— সুনির্দিষ্ট।

এ আয়াতে জিহাদে যাওয়ার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে কেউ মরতে পারে না। নবী করীম (স)-এর ইন্তিকালে মানসিক কষ্ট পাওয়া লোকদের জন্যে এ আয়াতে সান্ত্বনা রয়েছে। কেননা তা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমেই সঙ্ঘটিত হয়েছে। আর মুহাম্মাদ (স)-ও যে মরবেন, তা আগেই এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ -

মুহাম্মাদ একজন রাসূল, তার পূর্বেও বহু সংখ্যক রাসূল এসে চলে গেছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا -

যে লোক দুনিয়ার সওয়াব পেতে চায়, আমরা তাকে তা-ই দিই।

এর তাৎপর্য বলা হয়েছে, যে লোক দুনিয়ার স্বার্থ-সুখ লাভের লক্ষ্যে কাজ করবে, তার জন্যে ভাগ করা দুনিয়ার অংশটুকুই সে পেতে পারবে; কিন্তু পরকালে তার প্রাপ্য কিছুই থাকবে না। এ তাৎপর্য ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত। এ-ও বলা হয়েছে যে, তার অর্থঃ যে লোক তার জিহাদ কার্যের দ্বারা দুনিয়ার সওয়াব লাভ করতে চাইবে, তাকে গনীমতের অংশ পাওয়া থেকে বঞ্চিত করা হবে না। এ অর্থ-ও বলা হয়েছে যে, যে লোক তার নফল আমল দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করতে চাইবে এবং সে তার কুফরির কারণে পরকালে জান্নাত লাভের উপযোগী লোকদের মধ্যে গণ্য নয় অথবা তার আমল বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে সে তা পাওয়ার

অধিকারী হবে না, তার সে নফল আমলের প্রতিফল দুনিয়ায়ই তাকে দিয়ে দেয়া হবে, পরকালে তার কিছুই প্রাপ্য হবে না। এ আয়াতের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এ আয়াত ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيْهَا مَانَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا -

যে লোক তার ক্ষণিক সুফল পেতে ইচ্ছা করবে, তাকে আমরা এ দুনিয়ায়ই তাৎক্ষণিক সওয়াব দেব যতটা চাইব এবং যতটা দিতে ইচ্ছা করব। পরে তার জন্যে জাহান্নামকে চূড়ান্তভাবে নির্দিষ্ট করে দেব। তাতে সে পৌঁছবে নিন্দিত ও ধিকৃত অবস্থায়।

(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৮)

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَكَأَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ -

বহু সংখ্যক নবী-ই এমন এসেছে যাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বহু সংখ্যক রিব্বী যুদ্ধ করেছে।

ইবনে আব্বাস (রা) ও হাসান প্রমুখ বলেছেন, 'রিব্বী' বলতে আলিম ও ফিকাহবিদদের বুঝিয়েছেন। আর মুজাহিদ ও কাতাদাহ্ বলেছেন ঃ বহু সংখ্য জনগোষ্ঠী।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَمَا وَهَنُوْا لِمَا اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا -

তারা কিছু মাত্র নিঃসাহস হয়ে পড়েনি আল্লাহ্‌র পথে তাদের উপর আসা বিপদ মুসীবতের দরুন এবং কিছু মাত্র দুর্বল হয়ে পড়েনি ও অক্ষমতা দেখায়নি।

বলা হয়েছে ঃ الوهن। অর্থ দেহ ভেঙ্গে পড়া, দৈহিক ও অন্যান্য দিকের অক্ষমতা। আর الضعف। অর্থ শক্তিহীনতা। আর الْاسْتِكَانَةُ অর্থ দুর্বলতা প্রদর্শন। এ-ও বলা হয়েছে যে, তার অর্থ বিনয়-নম্রতা, নরম পড়ে যাওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ্ স্পষ্ট করে বলে দিলেন যে, তারা (রিব্বীগণ) ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েনি, শক্তিহীনতার কারণে তারা দুর্বলতাও দেখায়নি আর নরম হয়েও পড়েনি। ইবনে ইসহাক বলেছেন ঃ তাদের নবী নিহত হলেও তারা সাহস হারিয়ে ফেলেনি, শত্রুদের সম্মুখে তারা কিছু মাত্র দুর্বল হয়েও পড়েনি। এবং জিহাদে যত বিপদই তাদের উপর আসুক না-কেন, তারা তাতে তাদের দ্বীন থেকে দূরে সরে যায়নি। মূলত এ আয়াতে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, নবীগণের সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে যারা আলিম-মনীষী ছিলেন, তাঁদের জীবনাচরণ অবলম্বন ও অনুসরণের জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে চাওয়া হয়েছে উক্ত কথা বলে এবং তাদের অনুসরণ করে জিহাদে ধৈর্য ধারণ করতে বলা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا -

তাদের কথা ছিল শুধু এতটুকু ঃ 'হে আমাদের রব্ব। তুমি আমাদের গুনাহ্‌র মায়াফী দান কর।

এ আয়াতাংশ আগেরকালের নবীগণের অনুসারী রিব্বীগণের দো'আ উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদেরকে শিক্ষাদান করা হয়েছে, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে আমরা যেন তাদের মতই কথা বলি। তাই শত্রুর সম্মুখীন হলে মুসলমানদের উচিত অনুরূপ দো'আ করা। বিশেষ করে আল্লাহ্ যখন উক্ত কথা তাঁদের প্রশংসাস্বরূপ বলেছেন, তাদের উক্ত কথায় আল্লাহ্ খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন, আমরাও যেন তাঁদের মতই কাজ করি, তাঁদের মতই কথা বলি এবং তাঁরা যেমন প্রশংসা পেয়েছেন, আমরাও যেন তেমনি প্রশংসা পাওয়ার অধিকারী হই।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَاٰتٰهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ -

অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ায় সওয়াব দিলেন এবং দিলেন পরকালীন উত্তম সওয়াব।

কাতাদাহ, রবী ইবনে আনাস ও ইবনে জুরাইয বলেছেন ঃ দুনিয়ার সওয়াব হল, যা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল তা হল, তাদের শত্রুর উপর তাদের বিজয়, শেষ পর্যন্ত তারা শত্রুর উপর প্রবল পরাক্রান্ত হয়েছিলেন এবং সাফল্য লাভ করেছিলেন। আর পরকালের সওয়াব হল জান্নাত। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, একজনের জন্যে ইহকাল ও পরকাল একত্রিত ও সমন্বিত হতে পারে। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ عَمِلَ لِدُنْيَاهُ اَضَرَّ بِاٰخِرَتِهِ وَمَنْ عَمِلَ لِاٰخِرَتِهِ، اَضَرَّ بِدُنْيَاهُ، وَقَدْ يَجْمَعُهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى لِاَقْوَامٍ -

যে লোক তার দুনিয়ার জন্যে কাজ করবে, সে তার পরকালের দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর যে লোক তার পরকালের জন্যে আমল করবে, সে তার দুনিয়ার দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর আল্লাহ্ বহু জাতির জন্যে দুনিয়া ও আখিরাতকে একত্রিত ও সমন্বিত করে দেন।

আল্লাহ্র কথা ঃ

سَنُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرُّعْبَ بِمَا اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطَانًا -

আমরা কুফরি নীতি অবলম্বনকারীদের অন্তরসমূহে ভয়-ভীতির উদ্রেক করে দেব এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্র সাথে শিরক করেছে, যার স্বপক্ষে তিনি কোন ভিত্তি বা যৌক্তিকতা নাযিল করেন নি।

এ আয়াতটি তাক্লীদ— অন্য লোকের অন্ধ অনুসরণের শৃঙ্খল গলায় পরার নীতির বাতিল হওয়ার অকাট্য দলীল। আয়াতের سلطان শব্দের অর্থ অকাট্য দলীল। কাফিরদের আকীদা-বিশ্বাসের পক্ষে কোন দলীল বা প্রমাণ নেই। আর প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন কথা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। দলীলবিহীন কথা মেনে নেয়াকেই তাকলীদ বা অন্ধ অনুসরণ বলা হয়। কথায় বলা হয়, শাসকের শক্তিই সর্বাধিক পথভ্রষ্ট। আর বাদশাহ্র আধিপত্যের উৎস-ই হচ্ছে শক্তি। আর অকাট্য যুক্তি-প্রমাণকেও 'সুলতান' বলা হয়। কেননা তা বাতিলের

মুলোৎপাটনে সক্ষম। বাতিল পন্থী তার দ্বারাই পরাজিত হয়। কোন কিছুর উপর কর্তৃত্ব স্থাপিত হওয়াকে তার উপর শক্তি কার্যকর হওয়া বলা হয়। সেই সাথে থাকে মন্দ কাজের প্ররোচনা দান। এর দ্বারাই নবী করীম (স)-এর নবুয়তের সত্যতা প্রমাণিত হয়। কেননা আয়াতে মুশরিকদের অন্তরসমূহে ভীতির সঞ্চার করার কথা বলা হয়েছে। এ আগাম দেয়া সংবাদ বাস্তবায়িত হয়েছে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ حَتّٰى اِنَّ الْعَدُوَّ لَيَرْعَبُ مِنِّىْ وَهُوَ عَلٰى مَسِيْرَةِ شَهْرٍ –

ভয়-ভীতি দ্বারা আমাকে সাহায্যদান করা হয়েছে। এমনকি শত্রু আমার কারণে খুবই ভয় পায়। এক মাসের অতিক্রম্য দূরত্বে থেকেও।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ –

আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তোমরা যখন ওদেরকে হত্যা কর, তখন আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদাকে সত্য প্রমাণ করেন।

আল্লাহ্র মুসলমানদেরকে তাদের শত্রুর উপর সাহায্য ও বিজয় দানের আগাম খবর দেয়া হয়েছে এ আয়াতে। অথচ তখনও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়নি ও মতদ্বৈততা প্রবল হয়ে দেখা দেয়নি। ওহুদ যুদ্ধের যেমন আগম খবর দেয়া হয়েছিল, তাদের পরাজিত হওয়ার কথা বলা হয়েছিল এবং তাদের মধ্য থেকে অনেককে হত্যা করা হয়েছিল, এ-ও তেমনি আগাম সংবাদদান। এমন কি এক স্থানে নবী করীম (স) তীরন্দাজ বাহিনী দাঁড় করিয়েছিলেন। নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা সেখান থেকে কোনক্রমেই যেন হটে না যায়। কিন্তু তারা সে কথা অমান্য করে, দাঁড়ানোর স্থান থেকে তারা সরে যায় যখন তারা মুশরিকদের পরাজয় প্রত্যক্ষ করে এবং ধারণা করে যে, তাদের সব নিঃশেষ হয়ে গেছে, কেউই বেঁচে নেই। তখন এ সরে যাওয়ার ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয় এবং পারস্পরিক দ্বন্দে লিপ্ত হয়। এ সময় পেছনের দিক দিয়ে খালিদ বিন ওয়ালীদ তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মুসলমানদের বহু লোককে হত্যা করে। এর একমাত্র কারণ ছিল, তারা রাসূল (স)-এর নির্দেশ অমান্য করেছিলেন। তাঁর নাফরমানী হয়েছিল।

এ ঘটনাও রাসূল (স)-এর নবুয়ত সহীহ্ হওয়ার কথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। কেননা তারা নবীর মাধ্যমে করা ওয়াদার বাস্তবতা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পেয়েছিলেন। নাফরমানীর ঘটনা সঙ্ঘটিত হওয়ার আগেই তিনি একথা বলে দিয়েছিলেন; কার্যত নাফরমানী তারা যখন করেই বসলেন, তখন তাদের রক্ষার দায়িত্ব তাদের উপরই ছেড়ে দেয়া হল। দ্বীনের দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদে আল্লাহ্র নিকট থেকে সাহায্য পাওয়ার এটা একটা দলীল। রাসূলের আক্ষরিক মান্যতা ও অনুসরণের কথাও এর মাধ্যমে বলে দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ্র ও রাসূলের আনুগত্যে কঠোরভাবে কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত হওয়ার কথাও এখানে বলা হয়েছে। মুসলমানদিগকে তাদের শত্রুদের উপর বিজয় দানের ব্যাপারে আল্লাহ্র যে নিয়মটা কার্যকর, তার কথা এখানে বলে দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলমানরা

দ্বীন-ইসলামের জন্যে মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন, তাদের উপর বিজয়ী হওয়ার জন্যে আশাবাদী থাকতেন। তা তাঁদের সংখ্যাধিক্যের কারণে নয়। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا -

দুই সশস্ত্র বাহিনীর মুখোমুখী হওয়ার দিন তোমাদের মধ্য থেকে যারা পিছু হটে যাবে, তাদের নিজেদেরই কোন কোন উপার্জনের দরুন শয়তান তাদেরকে প্ররোচিত ও বিভ্রান্ত করেছে।

আল্লাহ্ এ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের এ পরাজয় বরণ রাসূল (স)-এর আদেশ অমান্য করার কারণে হয়েছিল, তিনি যেখানে তাদেরকে দাঁড় করিয়েছিলেন, সেখান থেকে হটে যাওয়াই ছিল রাসূলের নাফরমানী।

আল্লাহ্ বলেছেন :

مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ -

তোমাদের মধ্যের কিছু লোক দুনিয়া চায়, আবার কিছু লোক পরকাল চায়। অথচ পূর্বেই দিয়ে দেয়া হয়েছে সে লোকদেরকে যারা দুনিয়া পেতে চেয়েছিল।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন : নবী করীম (স)-এর সঙ্গী হয়ে যাঁরা যুদ্ধে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যের কোন লোক দুনিয়া চায় বলে আমি মনে করতে পারি না। তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাঁর কালামে বলেছেন : 'তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা দুনিয়া চায়।'

এ তাৎপর্যের দৃষ্টিতেই আল্লাহ্ তা'আলা বিশ জনের উপর ফরয করেছিলেন যে, তারা দু'শ কাফিরের মুকাবিলা থেকেও পালিয়ে যাবে না। তিনি বলেছিলেন :

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَبِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ -

তোমাদের মধ্যের পরম ধৈর্যশীল বিশজন দু'শ জনের উপর বিজয়ী হবে।

(সূরা আনফাল : ৬৫)

কেননা ইসলামের সূচনা পর্বে রাসূল (স)-এর সঙ্গী-সাথীরা আল্লাহ্‌র জন্যে জিহাদের নিয়তে অত্যন্ত মুখলিস ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দুনিয়া চাওয়ার লোক ছিল না। বদর যুদ্ধে তিনশত দশ জনের অধিক লোক ছিলেন, অস্ত্র-শস্ত্র ও সংখ্যার দিক দিয়ে অত্যন্ত লঘিষ্ঠ। আর তাদের শত্রুদের মধ্যে এক হাজার লোক ছিল অশ্বারোহী এবং অস্ত্র পরিচালনে সক্ষম। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ তাঁদেরকে কাফিরদের উপর বিজয়ী করেছিলেন। তারা শত্রুদেরকে ইচ্ছামত হত্যা করেছিলেন, তাঁরা যেমন চেয়েছিলেন। তেমনই ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁদের সাথে এমন লোক সংমিশ্রিত হয়, যারা তাঁদের মত দৃষ্টি ও নিষ্ঠাবান ছিল না। এজন্যে তাদের বিজয়ের ব্যাপারে সংখ্যাগত চাপ হালকা করে দিয়েছিলেন।

আল্লাহ্‌র বলেছেন ঃ

اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ط فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ج وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ -

এক্ষণে আল্লাহ্ তোমাদের উপর সংখ্যাগত চাপ হালকা করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ জানতে পেরেছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে। কাজেই এক্ষণে তোমাদের মধ্যে পরম ধৈর্যশীল একশজন হলে তারা দু'শ জনের উপর জয়ী হতে পারবে, আর এক হাজার জন হলে আল্লাহ্‌র অনুমতিতে দুই হাজার জনকে পরাজিত করতে পারবে।

(সূরা আনফাল ঃ ৬৬)

জানা-ই আছে, আয়াতে যে দুর্বলতার কথা বলা হয়েছে, তা দৈহিক দুর্বলতা নয়, অস্ত্র-শস্ত্র না থাকার কথাও নয়। কেননা তাদের দৈহিক শক্তি তো যথাযথ অক্ষুণ্ন ছিল। তাদের সংখ্যাও বিপুল ছিল, অস্ত্র-শস্ত্রও প্রচুর ছিল। কথাটির তাৎপর্য হল, তাদের সাথে এমন লোক সংমিশ্রিত হয়েছে, যাদের বিবেক-শক্তি আগের লোকদের মত ছিল না। তাই 'দুর্বলতা' বলতে এখানে নিয়ত— মন-মানসিকতার দুর্বলতার কথাই বলা হয়েছে এবং সংখ্যাগত চাপ হালকাকরণে সকলকে একই পর্যায়ে ধরে নেয়া হয়েছে, কেননা তাদের মধ্যে যারা বিবেকবান দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোক ছিলেন, তাদেরকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা ও দুর্বল মন-মানসিক শক্তির লোকদের ও দূরদৃষ্টির স্বল্পতা সম্পন্নদের নাম বলে দেয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করা হয়নি। এ কারণে ইয়ামামার যুদ্ধে লোকেরা যখন পরাজয় বরণ করল, তখন রাসূল (স)-এর সাহাবীগণ বললেন ঃ اَخْلِصُوْنَا اَخْلِصُوْنَا 'আমাদেরকে খালিস কর, আমাদেরকে খালিস কর।' এ কথা বলে তারা মুহাজির ও আনসারদেরকেই বুঝিয়েছেন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَائِفَةً مِّنْكُمْ -

পরে দুঃখ-কষ্টের পর তোমাদের উপর তন্দ্রার শান্তি নাযিল করলেন, যা তোমাদের কিছু লোককে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

তাল্‌হা, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা) এবং কাতাদাহ ও রুবাই ইবনে আনাস বলেছেন, এ কথাটি ওহুদ যুদ্ধের দিন সম্পর্কে বলা। তাতে মুসলমানদের পরাজিত হওয়ার পর এ ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়েছিল। মুশরিকরা চলে গিয়ে আবার ফিরে এসেছিল। তখন মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা দৃঢ় ও অটল ছিলেন, তাঁরা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণে মুশগুল ছিলেন। এ সময় আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের উপর তন্দ্রা চাপিয়ে দেন। তাঁরা সকলে ঘুমিয়ে পড়েন। তাদের মধ্যের মুশরিকদের অবস্থা ছিল এ থেকে ভিন্নতর। তারা ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। কেননা তাদের মন-মানসিকতা ও ধারণা বিশ্বাস ছিল অত্যন্ত খারাপ। নবী করীম (স)-এর সাহাবীগণ বলেছেন, অতঃপর আমরা খুব করে ঘুমালাম। এমনকি নিদ্রাচ্ছন্নতার নাসাধ্বনি উচ্চ হয়ে উঠেছিল। মুনাফিকরা কিন্তু এ অবস্থা পায়নি বরং

তারা নিজেদের হিসাব-নিকাশে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। জনৈক সাহাবী বলেছেন ঃ আমি নিদ্রা-জাগরণের মধ্যবর্তী অবস্থায় ছিলাম। তখন শুনতে পেলাম, মুতব ইবনে কুশায়র ও কয়েক জন মুনাফিক পরস্পরে বলছিল, মূল ব্যাপারে আমাদের কোন অংশ হবে কি? এটা মুমিনদের প্রতি আল্লাহ্র একটি বড় অনুগ্রহের ব্যাপার ছিল। এ অবস্থার মধ্যে দিয়ে নবুয়তের নির্দশন প্রকাশমান হয়ে পড়েছিল, যখন শত্রু তাদের উপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছিল। তাদের সঙ্গী-সহকারীদের অনেকে সাহস-হিম্মত হারিয়ে ফেলেছিল। মুসলমানদেরও অনেকেই শহীদ হয়েছিলেন। তারপরই তাঁরা নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন শত্রুর মুখোমুখী অবস্থায় থেকে, আর এ সময়ই নিদ্রা-তন্দ্রা উড়ে গিয়েছিল অনেকের। তারা অবস্থা প্রত্যক্ষ করছিলেন। অনেকে তো যুদ্ধ থেকে বিরত ছিল। যাঁরা যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তাঁদের অবস্থা তখন কিরূপ ছিল, তা বর্ণনাতীত। এ সময় শত্রুরা এক বছর পর আবার তাদের উপর আক্রমন চালাবার ঘোষণা দিয়েছিল। তাদেরকে হত্যা করার ও তাদের মূলোৎপাটনের জন্যে এ সময়ে তারা তাদের তরবারি শানিত করেছিল।

এ ঘটনায় রাসূলে করীম (স) যে সত্য নবী ছিলেন, তা কয়েকটি দিক দিয়ে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছিল। একটি— শত্রুর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের মনে পরম প্রশান্তি বিরাজ করছিল। শত্রুদের কোন অগ্রগতি ছিল না। তাদের থেকে অন্য দিকে তারা মুখ ফিরিয়েও নেয়নি, তাদের সংখ্যাও কম ছিল না। এ সময় আল্লাহ্ তাদের অন্তরে পরম প্রশান্তি আচ্ছন্ন করে দিয়েছিলেন। এ অবস্থা বিশেষভাবে দৃঢ় ঈমানের অধিকারী লোকদের ছিল।

দ্বিতীয় হচ্ছে, সেই ধরনের অবস্থার মধ্যে তাদের উপর তন্দ্রা চেপে বসা— যে ধরনের অবস্থায় নিদ্রা-তন্দ্রা সবই উড়ে যাওয়ার কথা— যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসার পর, যারা তা প্রত্যক্ষ করেছে তাদের থেকে আলাদাভাবে তাহলে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও তাদেরকে উচ্ছেদ করার ও হত্যা করার উদ্দেশ্যে শত্রুদের সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করার অবস্থায় কি পরিণতি দাঁড়াতে পারে! তৃতীয়, মুমিনদিগকে মুনাফিকদের থেকে পৃথকীকরণ, সে প্রশান্তির বিশেষভাবে মুসলমানদের উপর আসা, কেবল তাদেরই নিদ্রা কাতর হওয়া— মুনাফিকদের তা স্পর্শ-ও না করা। ফলে মুসলমান চরম পর্যায়ের শান্তি ও স্বস্তির মধ্যে ছিলেন, আর মুনাফিকরা ছিল ভয় সন্ত্রাস ও অস্থিরতার মধ্যে নিমজ্জিত। এতএব মহান সেই আল্লাহ্ যিনি সর্ববিজয়ী, সর্ব শক্তির অধিকারী সর্বজ্ঞ, যিনি নেক আমলকারীদের আমল কখনই নিষ্ফল করে দেন না।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ -

আল্লাহ্র অতি বড় রহমত যে, তুমি— হে নবী লোকদের জন্যে বড়ই নম্র।

বলা হয়েছে, আয়াতের ما একটি صلة অর্থ, আল্লাহ্র অনুগ্রহে। এ কথা কাতাদাহ থেকে বর্ণিত। যেমন বলেছেন ঃ

عَمَّا قَلِيْلٍ لَيُصْبِحُنَّ نٰدِمِيْنَ -

সে সময় নিকটে, যখন এরা নিজেদের কৃতকর্মের দরুন অনুতপ্ত হবে। (সূরা মুমিনুন ঃ ৪০)

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ -

তাদের চুক্তি ভঙ্গ করার কারণে .... ভাষা-ভাষী সকলেই এ বিষয়ে একমত।

(সূরা নিসা ঃ ১৫৫)

তাঁরা বলেছেন ঃ এর অর্থ, তাগিদ করা ও সুন্দর শৃঙ্খলা স্থাপন করা। এ আয়াত দলীল হয়ে প্রমাণ করেছে যে, যে লোক বলে যে, কুরআনে مجاز পরোক্ষ বর্ণনা নেই, তাদের কথা বাতিল। কেননা উক্ত আয়াতাংশে বলা কথা পরোক্ষ তাৎপর্যপূর্ণ। তা বাদ দিলেও প্রকৃত অর্থ বদলে যায় না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ -

তুমি যদি কঠোর-নির্মম হৃদয়ের লোক হতে, তাহলে লোকেরা তোমার চারপাশ থেকে সরে পালিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।

এতে বলা হয়েছে যে, নম্রতা দয়া অবলম্বন এবং কঠোরতা-নির্মমতা, রুঢ়ভাষিতা এবং আল্লাহ্‌র দিকে আহ্‌বান জানানোর কড়াকড়ি বা কর্কশতা পরিহার করা একান্তই কর্তব্য। যেমন অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ -

তুমি তোমার রব্ব-এর পথের দিকে বুদ্ধিমত্তা ও উত্তম মর্মস্পর্শী উপদেশ-নসীহতের সাহায্যে আহ্‌বান জানাও এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক-ও কর। (সূরা নহল ঃ ১২৫)

যেমন আল্লাহ্ মূসা ও হারুন (আ)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْيَخْشٰى -

ফিরাউনের নিকট গিয়ে তোমরা দুজন তাকে নম্র কথা বলবে ; সে হয়ত উপদেশ কবুল করবে অথবা ভয় পেয়ে যাবে। (সূরা ত্ব-হা ঃ ৪৪)

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَشَاوِرْهُمْ فِىْ الْاَمْرِ -

তুমি লোকদের সাথে সামষ্টিক-রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে পরামর্শ কর।

এ আয়াতে الامر শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য কি, সে বিষয়ে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে— যে বিষয়ে পারস্পরিক পরামর্শ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথচ তাঁর নিকট ওহী নাযিল হতো বলে সঠিক মত সাহাবীদের নিকট থেকে জেনে নেয়ার মুখাপেক্ষিতা আদৌ ছিল না। এ পর্যায়ে

কাতাদাহ্ রুবাই ইবনে আনাস ও মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বলেছেন ঃ আল্লাহ রাসূল (স)-কে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দিয়েছেন তাঁদের হৃদয়কে সন্তুষ্ট পবিত্রকরণ এবং তাদের প্রতি উচ্চতর মর্যাদা প্রদানের লক্ষ্যে। কেননা তাঁরা রাসূলের কথাকে শক্ত করে ধারণ করতেন। তাঁর মতকেই মেনে নিতেন। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাতা বলেছেন ঃ তাঁদের সাথে পারস্পরিক পরামর্শ করার এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে এজন্যে, যেন তাঁর উম্মত এ নীতির অনুসরণ করে। এ কাজকে ক্ষতিকর বা মানহানিকর মনে করে না যেন। অপর আয়াতে আল্লাহ তাঁদের প্রশংসা করেছেন এই বলে ঃ

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ –

তাদের ব্যাপারাদির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে।

আল-হাসান ও দহাক বলেছেন ঃ পরামর্শ করার এ নির্দেশে এক সাথে দুটি দিকেই লক্ষ্য রাখা হয়েছে, একদিকে তাতে সাহাবাদের মান-মর্যাদা বড় ও বিরাট হয়। অপর দিকে মুসলিম উম্মত যেন পরামর্শ করার রাসূলে (স)-এর এ নীতি অনুসরণ করে। কোন কোন মনীষী বলেছেন ঃ পরামর্শ করার এ আদেশ সেক্ষেত্রে কার্যকর হবে, যে বিষয়ে কোন 'নস' অকাট্য দলীল নেই, যার দ্বারা সুনির্দিষ্ট জিনিস সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। এ মতের লোকেরাই বলেছেনঃ পরামর্শ গ্রহণের এ আদেশ বৈষয়িক বিষয়াদিতে সীমাবদ্ধ। কেননা দুনিয়ার ব্যাপারাদিতে নবী করীম (স) নিছক ইজতিহাদের ভিত্তিতে কথা বলবেন ও মত প্রকাশ করবেন, তা তারা মানতে রাজী নয়। এজন্যে বলতে হবে, পরামর্শ করার এ নির্দেশ কেবলমাত্র বৈষয়িক বিষয়াদিতেই হতে পারে। এক্ষেত্রে নবী করীম (স) সাহাবীগণের মতের সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন, তা খুবই সঙ্গত। বাস্তব ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের বিষয়াদিতে তিনি এ পরামর্শ গ্রহণ পদ্ধতির মাধ্যমে অনেক কিছুই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং পারস্পরিক পরামর্শ, ইশারা-ইঙ্গিত লাভ এবং সাহাবীগণের মত না নিয়ে সে ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ জায়েয না-ও হতে পারে। বদর যুদ্ধের দিন হযরত হুবাব ইবনুল মুনযির (রা) নবী করীম (স)-কে পানির নিকট অবস্থান নেয়ার কথা বললে তা সঙ্গে সঙ্গেই গ্রহণ ও তদানুযায়ী কাজ করা হয়। আর খন্দক যুদ্ধের দিন হযরত সাদ ইবনে মুয়ায ও সাদ ইবনে উবাদা (রা) মদীনার কিছু ফল-ফসলের ভিত্তিতে গাতফান গোত্রের সাথে সন্ধি না করার ইঙ্গিত করলে তা-ও গৃহীত হয় এবং সন্ধিপত্র ছিড়ে ফেলা হয়। এ ধরনের বৈষয়িক ব্যাপারাদিতে পরামর্শ গ্রহণের দৃষ্টান্ত ইসলামের ইতিহাসে অসংখ্য রয়েছে। অন্যান্য মনীষীরা বলেছেন, দ্বীনি বিষয়াদি ও যেসব ঘটনায় আল্লাহ্র নিকট থেকে কোন 'তওকীফ' থাকে না, সেই সব বিষয়েও সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করার জন্যে নবী করীম (স) আর্দিষ্ট ছিলেন। আর বৈষয়িক ব্যাপারাদি যা সাধারণত চিন্তা ও প্রধান ধারণার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তাতেও পরামর্শ করতে তাঁকে বলা হয়েছে। বদর যুদ্ধের বন্দীদের বিষয়ে কি করা যাবে, সে ব্যাপারও রাসূল (স) সাহাবীগণের নিকট পরামর্শ চেয়েছিলেন। তাতে সাহাবীগণ নিজ নিজ মত প্রকাশ করেছিলেন বন্দীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের পক্ষে। পরে তিনি তাঁর ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করেছিলেন। আর তাতে কয়েক প্রকারের ফায়দা লাভ হয়েছিল। একটি, লোকদের জানিয়ে দেয়া হল যে, যেসব ঘটনা ও ব্যাপারাদি সম্পর্কে অকাট্য দলীল পাওয়া না যাবে সেসব বিষয়ে শরীয়াতের হুকুম জানবার একমাত্র উপায় হচ্ছে ইজতিহাদ ও সর্বাধিক

মাত্রার ধারণা। দ্বিতীয়, সাহাবীগণকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, তাঁরা ইজতিহাদের যোগ্যতা সম্পন্ন। তাঁদের রায় মেনে নেয়া ও অনুসরণ করা সঙ্গত। কেননা আল্লাহ্ তাঁদের মর্যাদাকে অনেক উন্নত করে দিয়েছেন। নবী করীম (স) নিজে তাঁদের সাথে পরামর্শ করতেন, তাঁদের ইজতিহাদ তিনি সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতেন। আল্লাহ্‌র হুকুম জানার জন্যে তাঁরা যে 'নস্'-এর আনুকূল্য করতেন, তালাস-অনুসন্ধান করতেন তা-ও সন্তুষ্টির বিষয়। তৃতীয়, সাহাবীদের গোপন মন-মানসিকতাও আল্লাহ্‌র নিকট পছন্দনীয় ছিল। তা না হলে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবীকে তাঁদের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দিতেন না। এ সবই সাহাবীগণের দৃঢ় প্রত্যয় ও ঈমানী সত্যতা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে। তাঁদের উচ্চতর মর্যাদার ব্যাপারেও কোনরূপ সন্দেহ থাকে না। আর সেই সাথে তাঁদের ইলম এবং নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনাবলীতে যে অকাট্য 'নস্' থাকে না, তাতে ইজতিহাদ করার যোগ্যতা অনস্বীকার্য। গোটা জাতি নবী করীম (স)-এর পর তাঁদেরই অনুসরণ করবে স্বাভাবিকভাবেই। তাঁদের মানসিক সন্তুষ্টি সাধনের উদ্দেশ্যেই তাঁদের সাথে পরামর্শ করার আদেশ করা হয়েছে, এটা আল্লাহ সম্পর্কে অকল্পনীয়। কেবল এজন্যেই তাঁদের মর্যাদা উচ্চ করা হয়েছে এবং গোটা উম্মতকে তাঁদের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে, তা বলার-ও কোন ভিত্তি নেই। কেননা তাঁরা যদি জানতে পারতেন যে, তাঁদের নিকট পরামর্শ চাওয়া হলে, সে বিষয়ে শরীয়াতের হুকুম জানাবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা-সাধনা করা হলে এবং যথার্থ নির্ভুল মত দেয়া হলেও তদনুযায়ী আমল করা হবে না, তা কবুলও করা হবে না, তাহলে তাতে তাঁদের মন সন্তুষ্ট হতে পারত না। তাতে তাঁদের মর্যাদাও বৃদ্ধি পেত না। বরং তার ফলে তাঁদের মনকে বিদ্রোহী বানিয়ে দেয়া হতো, জানিয়ে দেয়া হতো যে, তাঁদের মত যতই নির্ভুল হোক, তদনুযায়ী আমল করা হবে না, তা গৃহীতও হবে না। আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণ অযোগ্য। এর কোন অর্থ হয় না। এ মত প্রকাশকারী যেমন বলেছেন, তাঁদের দেয়া পরামর্শ অনুযায়ী কাজ হবে না, তা কোন ফায়দাও দেবে না, একথা জানা সত্ত্বেও উম্মত কি করে তাঁদের অনুসরণ করতে পারে? তা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে উম্মতকে যদি তাঁদের অনুসরণ করতেই হয়, তাহলে উম্মতের লোকদেরও এ পদ্ধতিতে পরামর্শ করা এবং তা সহীহ্ হলেও তা কোন শুভ ফল দেবে না, তদনুযায়ী কাজ-ও করা হবে না। কেননা এ মত প্রকাশকারীদের দৃষ্টিতে তাদের সাথে পরামর্শ শুধু এজন্যেই করা হতো। কিন্তু উম্মতের লোকদের পারস্পরিক পরামর্শ যদি সহীহ্ রায় ও কার্যোপযোগী কথা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়, তাহলে তাতে নবী করীম (স)-এর সাহাবীদের সাথে তাঁর পরামর্শ করার মত হবে না। কেননা তা বাতিল হয়ে গেছে। তাই রাসূল (স) যে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন, তার একটা কার্যকর ফায়দা অবশ্যই হতে হবে, তাঁদের সাথে নবী করীম (স)-এর একটা নীতিগত সম্পর্ক ছিল বলে এবং তাদের ইজতিহাদ কার্যকর ও গ্রহণীয় বলে মেনে নিতে হবে। আর তখন তাঁদের মত নবী করীম (স)-এর মতের সাথে সঙ্গতি সম্পন্ন হবে এবং সাহাবীদের পারস্পরিক মতের মধ্যেও সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য হবে, এটাই স্বাভাবিক। অবশ্য নবী করীম (স) নিজে তাঁদের সকলের মতের বিরুদ্ধতাও করতে পারেন এবং তখন কেবল নিজের মত অনুযায়ী কাজ করার-ও তাঁর অধিকার রয়েছে, তা-ও অনস্বীকার্য। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা তাঁদের ইজতিহাদের নিজেদের গর্দান বেঁধে ফেলবেন না, বরং তাঁদেরকে যা করতে বলা হয়েছে তা তাঁরা করেছেন বলে তাঁরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র নিকট থেকে সওয়াবের অধিকারী হবেন। এ সময় তাদের নিজেদের মতকে পরিহার

করতে হবে এবং নবী করীম (স)-এর মতেরই অনুসরণ করতে হবে। নবী করীম (স)-এর তাঁদের সাথে পরামর্শ হবে কেবল মাত্র সেই বিষয়ে, যে বিষয়ে কোন 'নস' বা অকাট্য দলীল নেই। কেননা 'নস' পাওয়া যায় যে যে বিষয়ে, সেসব বিষয়ে পরামর্শ করার কোন অবকাশ নেই। তাই যুহর ও আসর-এর নামায এবং যাকাত, রমযানের সিয়াম প্রভৃতি বিষয়ে তোমাদের মত কি, তা কখনই বলা চলবে না। নবী করীম (স)-এর পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্র হিসেবে দুনিয়ার ব্যাপারাদি বাদ দিয়ে কেবলমাত্র দ্বীনি ব্যাপারকেই চিহ্নিত করা হয়নি, আল্লাহ্ তা করেন নি, তাই এ উভয় ব্যাপারেই তিনি পরামর্শ চাইতে পারেন। এ কথা তো জানা-ই আছে যে, নবী করীম (স) প্রধান কাফিরদের সাথে যুদ্ধ ও শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বৈষয়ীক ব্যাপারেই সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করেছেন। নবী করীম (স)-এর বৈষয়ীক ও জীবিকা সংক্রান্ত বিষয়ে অন্য কারোর সাথে পরামর্শ করার কিছুই ছিল না, কেননা শুধু খাদ্য-খোরাক ও বাড়াবাড়িহীন জীবন ছাড়া তাঁর তো দুনিয়ার কোন ব্যাপারও ছিল না। আর শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা ও তাদের ষড়যন্ত্রের মুকাবিলা করাই ছিল সাহাবীগণের সাথে তাঁর পরামর্শ করার প্রধান বিষয়, আর তা তো দ্বীনি ব্যাপার, কোন নিছক বৈষয়িক ব্যাপার তো তা নয়। কাজেই এ বিষয়ে ইজতিহাদ করে কোন মত ঠিক করা ও 'নস' আসে নি এমন সব ঘটনার হুকুম জানতে চাওয়ার ইজতিহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এই কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনাবলীতে ইজতিহাদের সাহায্যে শরীয়তী মত নির্ধারণ সম্পূর্ণ সহীহ্ কাজ এবং প্রত্যেক মুজতাহিদই সঠিক (كل مجتهد مصيب)। নবী করীম (স) নিজেও ইজতিহাদ করে বিভিন্ন বিষয়ে রায় ঠিক করতেন যে সব বিষয়ে 'নস' নেই সেই বিষয়ে।

তা থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (স) সাহাবীদের সাথে একত্রিত হয়েও ইজতিহাদ করতেন। যে মতটিকে অধিক বলিষ্ঠ ও প্রবল পেতেন, সেই অনুযায়ী-ই কাজ করতেন। অবশ্য যে বিষয়ে 'নস' নেই সেই বিষয়ে। পরামর্শ কর আদেশ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ নবী করীম (স)-কে বলেছেন ঃ

فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ -

পরামর্শের আলোকে তুমি যে মতে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত ও সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা করে (কাজ করতে শুরু কর)।

যে বিষয়ে তিনি পরামর্শ করেছেন তাতে 'নস্' থাকত এবং আল্লাহ্র নিকট থেকে 'তাওকীফ' এসে থাকত, তাহলে উপরোক্ত আয়াতে পরামর্শের পূর্বেই সংকল্প গ্রহণের উল্লেখ করা হতো। কেননা 'নস' থাকাটাই তদনুযায়ী আমল করার সিদ্ধান্ত ও সংকল্প গ্রহণ সহীহ্ হতো। পরামর্শ করার প্রশ্ন উঠত না। কিন্তু পরামর্শ করার আদেশের পর সংকল্প গ্রহণের কথা বলার দরুন বোঝাই যায় যে, এ সংকল্পটা পরামর্শের ভিত্তিতে হতে হবে। কেননা পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন 'নস' ছিল না, আগে পাওয়া যায়নি।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ -

গনীমতের মালে কোনরূপ খিয়ানত করা নবীর কাজ নয়।

শব্দটি يُغَلَّ -ও পড়া হয়। তার অর্থ খিয়ানতকৃত হওয়া। একথা বিশেষভাবে নবী করীম (স) সম্পর্কে বলা। যদিও সমস্ত মানুষের বেলায়ই খিয়ানত নিষিদ্ধ। তবে অন্যের আমানতে খিয়ানত করা তো অতিশয় বড় কঠিন গুনাহ। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ -

অতএব মূর্তিসমূহের মলিনতা তোমরা পরিহার কর, পরিহার কর মিথ্যা কথা।

(সূরা হজ্জ ঃ ৩০)

যদিও رجس বা মলিনতা সবই নিষিদ্ধ এবং আমরা তা পরিহার করতে আদিষ্ট, হাসান থেকে এ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস ও সাঈদ ইবনে যুবায়র يُغَلَّ -এর অর্থ বলেছেন, খিয়ানত করার অপরাধ আরোপিত হওয়া। বলেছেন, আয়াতটি কুতায়ফা হামরা লাল মখমল প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল, যা বদর যুদ্ধের দিন হারিয়ে গিয়েছিল। তখন কোন কোন লোক বলে উঠল, হয়ত নবী করীম (স) নিজেই তা নিয়ে নিয়েছেন। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়।

আর যে يَغُلُّ পড়েছে, সে এর অর্থ করেছে ঃ খিয়ানত করে। الغلول অর্থ সর্বপ্রকারের বিশ্বাসঘাতকতা— খিয়ানত। তবে এখানে তা বিশেষভাবে গনীমতের মালে খিয়ানত বোঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। নবী করীম (স) এ খিয়ানতের ব্যাপারটি খুব কঠিনভাবে ধরেছিলেন এবং এটাকে কবীরা গুনাহ্ বলেছেন। কাতাদাহ্ মালিক ইবনে আবুল যায়দ, মাদান ইবনে আবূ তালহা, সওবান, রাসূল (স)-এর মুক্ত দাস এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলতেন ঃ

مَنْ فَارَقَتْ الرُّوْحُ جَسَدَهُ وَهُوَ بَرِئٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ الْكِبَرِ وَالْغُلُولِ وَالدَّيْنِ -

যে লোকের রূহ তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, সে তিনটি জিনিস থেকে নিঃসম্পর্ক হয়ে গেল— জান্নাতে দাখিল হওয়ার, অহংকার, ধোঁকা-বিশ্বাসঘাতকতা ও ঋণ।

আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলে করীম (স)-এর সময় এক ব্যক্তি ছিল, তাকে করকরা বলে ডাকা হতো। সে মরে গেলে নবী করীম (স) বললেন ঃ هُوَفِي النَّارِ সে জাহান্নামী। এ কথা শুনে লোকেরা গিয়ে দেখলেন ঃ তার উপর চাদর ও আবাবড় কোর্তা, যা সে কেড়ে নিয়েছে। নবী করীম (স) বললেন ঃ সুতা ও সুঁচ দিয়ে দাও। কেননা এটা লজ্জা, আগুন ও অপমান কিয়ামতের দিন। ধোঁকা-খিয়ানত যে অতি বড় গুনাহ, তা নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত বহু সংখ্যক হাদীসে বলা হয়েছে। সর্বপ্রকারের খাদ্য মুবাহ হওয়া এবং এমনকি চতুষ্পদ জন্তুর ঘাস গ্রহণের কথাও বর্ণিত হয়েছে নবী করীম (স) থেকে। সাহাবা ও তাবেয়ীন থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় বহু প্রসিদ্ধ হাদীসের মাধ্যমে। আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ আওফা (রা) বলেছেন ঃ খায়বর যুদ্ধকালে আমাদের খাদ্যাভাব ঘটে ; তখন আমাদের এক ব্যক্তি এসে তার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ নিয়ে নিত ও ফিরে যেত। সুলায়মান থেকে বর্ণিত, মাদায়েন যুদ্ধে খাদ্যাভাব দেখা দিলে রুটি, পনির ও চাকু পাওয়া গেলে এক-একজন পনিরের টুকরা কেটে

নিত এবং বলতঃ বিসমিল্লাহ্ বলে খাও। রুয়াইফা ইবনে সাবিতুল আনসারী (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার কোন ব্যক্তির জন্যে মুসলিম জনগণের অধিকারের 'ফাই' সম্পদের কোন জন্তুর পিঠে সওয়ার হওয়া হালাল নয়। এমনিভাবে যে তার উপর সওয়ার হয়ে হয়ে সেটিকে দুর্বল করে ফিরিয়ে দেবে। আবার যে লোক আল্লাহ্র ও পরকালের প্রতি ঈমানদার, মুসলমানদের সামষ্টিক 'ফাই' সম্পদ থেকে কাপড় নিয়ে পরিধান করা তার জন্যে হালাল নয় যে, পরে পুরাতন করে ফিরিয়ে দেবে। এসব কথা সেই অবস্থায় ও সেই ব্যক্তির জন্যে প্রযোজ্য যে লোক 'ফাই' সম্পদের প্রতি অ-মুখাপেক্ষী। তবে যদি তার মুখাপেক্ষী হয় তাহলে ফিকাহবিদদের মতে তাতে কোন দোষ নেই। বরা ইবনে মালিক (রা) বর্ণিত— তিনি ইয়ামামার যুদ্ধের দিন এক মুশরিক ব্যক্তিকে আঘাত হানলেন। আঘাতটা লোকটি ঘাড়ের পেছনের দিকে লেগেছিল। পরে তরবারি দিয়ে তাকে হত্যা করলেন।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوِادْفَعُوْا -

যারা মুনাফিকী করেছে তাদের জেনে রাখা উচিত, তাদেরকে বলা হয়েছে ঃ তোমরা আস, আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর, অথবা দফা কর।

সুদ্দী ও ইবনে জুরাইয او ادفعوا সম্পর্কে বলেছেন যে, এর অর্থ হল, তোমরা আমাদের সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধ না করলেও আমাদের সাথে মিলিত থেকে আমাদের বাহিনীকে বিরাট করে তোল। আবূ আওনুল আনসারী বলেছেন, তার অর্থ ঃ তোমরা যুদ্ধ না করলেও ঘোড়ার উপর আরোহী হয়ে থেকে পাহারাদারী কর। আবূ বকর বলেছেন ঃ যার উপস্থিতিতে ফায়দা আছে, যার দরুন বাহিনীর বিপুলতা হয় তার উপস্থিত থাকাটা ফরয, একথাই এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়। দফা ও ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে দাড়িয়ে থাকা যখন জরুরী হবে, তখন তা-ই করতে হবে ফরয হিসেবে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

يَقُوْلُوْنَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ -

ওরা মুখে কথা বলে যা ওদের অন্তরে নেই।

বলা হয়েছে ঃ এ কথার দুইটি তাৎপর্য আছে। তার একটি হল— এতে তাগিদ রয়েছে কথাটি তাদের হওয়ার উপর। কেননা অনেক সময় এমন হয় যে, কাজ যে করেনি কাজটি তার বলে প্রচার করা হয় যদি সে তাতে রাজী থাকে ও সমর্থন করে। এটা প্রত্যক্ষভাবে করা হয় না, করা হয় পরোক্ষভাবে। যেমন আল্লাহ্ কুরআন নাযিল হওয়াকালীন ইয়াহুদীদেরকে বলা হয়েছে ঃ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ أَنْبِيَاءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ (বাকারা ঃ ৯১) তাহলে তোমরা পূর্বে আল্লাহ্র নবীগণকে হত্যা করতে কেন ? (তখনকার ইয়াহুদীরা এ কাজ না করলেও এবং তাদের পূর্বপুরুষরা তা করলে এরা তাতে রাজী ছিল এবং তা সমর্থন করত) ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় হল, মুখ কথাটি বলে মুখের কথাও কিতাবের কথার মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ -

যেসব লোক আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না; বরং তারা জীবিত, তাদের রব্ব-এর নিকট তারা রিযিকপ্রাপ্ত হচ্ছে!

অনেক লোক মনে করেছেন যে, আল্লাহ্‌র পথে মৃত লোকেরা জান্নাতে জীবিত হবে। তারা বলেছে, কেননা তাদের মৃত্যুর পর তাদের রূহ তাদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া যদি সঙ্গত হয়, তাহলে সেটা তো পুনর্জন্ম গ্রহণের আকীদা হয়ে যাবে।

আবূ বকর বলেছেন, জমহুর আলিমগণের কথা হল, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মৃত্যু ও জান কবজের পর তাদেরকে জীবিত করবেন এবং তাদের পাওনা অনুযায়ী আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহ তাদেরকে দেবেন। শেষ পর্যন্ত সমগ্র সৃষ্টির ধ্বংসের সময়ে তাদেরকেও আল্লাহ্ ধ্বংস করবেন। পরে কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে তাদেরকে নিয়ে আসবেন এবং তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করে দেবেন। কেননা আল্লাহ্ তো তাদেরকে জীবিত বলেছেন। তার অর্থ তো এই হয় যে, তারা এ সময় এ দুনিয়ায়ই জীবিত হবে। কেননা তারা জান্নাতে জীবিত হবে— এ ব্যাখ্যা করা হলে এ কথাটি বলার কোন তাৎপর্যই থাকে না। যেহেতু সমস্ত জান্নাতী লোকদের সঙ্গে তারাও জীবিত হবে একথা তো সব মুসলমানই নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে। কেননা জান্নাতে তো কোন মৃত থাকতে পারে না। আল্লাহ্ তাদের প্রশংসা প্রসঙ্গে বলেছেন, তারা নিজেদের অবস্থার দরুন উৎফুল্ল ও আনন্দিত হবে। বলেছেন ঃ

فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ -

আল্লাহ্ তার যে অনুগ্রহ তাঁদেরকে দেবেন, তা পেয়ে তারা খুবই আনন্দিত ও উৎফুল্ল হবে।

এ আয়াতটি থেকেও তা-ই প্রমাণিত হয় ঃ

وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ -

তারা খুশীতে ফেটে পড়বে তাদের সাথে যারা তাদের পেছন থেকে তাদের সাথে মিলিত হয়নি।

পরকালে তারা এসে তাদের সাথে মিলিত হবে। ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসঊদ ও জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, ওহুদ যুদ্ধের দিন তোমাদের ভাইদের উপর যখন বিপদ ঘনীভূত হল— তারা শহীদ হল— আল্লাহ্ তাদের 'রূহ'গুলোকে আরশের নীচে সবুজ পাখির পাকস্থলীর মধ্যে ভরে দিলেন। তা জান্নাতের ঝর্ণাধারার তীরে বসঁতে ও তার ফলমূল খেতে শুরু করল এবং আরশের নীচে ঝোলানো ঝাড়বাতিসমূহের আশ্রয় নিতে লাগল। হাসান, আমর ইবনে উবায়দ, আবূ হুযায়ফা ও ওয়াসিল ইবনে আতা এ মত প্রকাশ করেছেন। আর এ মত পুনর্জন্মে বিশ্বাসীদের মতের সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন নয়, এ দুয়ের

মধ্যে কোন মিল নেই। কেননা পুনর্জন্ম ধারণার মূল কথা হল— মৃত্যুর পর এ দুনিয়ায়ই বিভিন্ন সৃষ্টির রূপ ধারণ করে ফিরে আসা। আর আল্লাহ তো অনেক জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে মেরেছেন এবং পুনরায় জীবিত-ও করেছেন। যেমন এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ -

তুমি কি তাদের দিকে তাকাওনি, যারা হাজারে হাজারে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে মৃত্যুর ভয়ে বের হয়ে পড়েছিল? তখন আল্লাহ্ তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা মর। পরে তিনি নিজেই তাদেরকে জীবিত করলেন। (সূরা বাকারা ঃ ২৪৩)

কিন্তু এ তো পুনর্জন্ম নয়। আল্লাহ্ এ-ও জানিয়েছেন যে, মৃতকে জীবিত করা ছিল হযরত ঈসা (আ)-এর একটি মুজিযা। অনুরূপভাবেই আল্লাহ মৃত্যুর পর শহীদদেরকে জীবিত করবেন এবং তিনি যেখানে চান রেখে দেবেন।

আল্লাহ্র কথা ঃ

عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ -

তারা তোমাদের রব্ব-এর নিকট রিযিক প্রাপ্ত হচ্ছে।

এর অর্থ, তারা এমন অবস্থায় থাকবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ-ই তাদের একবিন্দু ক্ষতিও কেউ করতে পারবে না, পারবে না একবিন্দু ফায়দা দিতে। 'আল্লাহ্র নিকট' কথাটি স্থানগত নৈকট্য ও অবস্থানের দূরত্বহীনতা বোঝায় না। কেননা আল্লাহ্র ব্যাপারে স্থানগত নৈকট্য বা দূরত্ব কল্পনা করা জায়েয নয়। কেননা এ কথা দেহ সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ বলেছেন ঃ 'তাদের রব্ব-এর নিকট'-এর অর্থ, আল্লাহ্র জানা মত, তারা কোথায় আছে, তা কোন মানুষ জানতে পারে না, জানেন একমাত্র আল্লাহ্।

আল্লাহ্র কথা ঃ

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ -

তারা— যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের জন্যে বহু লোক একত্রিত হয়েছে।

ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ ও ইবনে ইসহাক বলেছেন ঃ সে সব লোক যারা বলেছে, তারা আরোহী অবস্থায় ছিল, তাদের মধ্যে আবূ সুফিয়ান-ও ছিল। ওহুদ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে তাদেরকে আটক করার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়েছিল— যখন তারা তাদের দিকে ফিরে আসছিল। সুদ্দী বলেছেন, আসলে সে ছিল জনৈক মরুচারী, তাকে কেন্দ্র করেই উক্ত কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তাঁর কালামে এক ব্যক্তিকে 'লোকগণ' বলে অভিহিত করেছেন। একথা তার ব্যাখ্যানুযায়ী বলা হল, যিনি বলেছেন যে, মূলত লোক একজন ছিল। এটা সাধারণ ও ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ বলে বিশেষ অর্থ গ্রহণ করার নীতি অনুযায়ী বলা হয়েছে। আবূ বকর বলেছেন ঃ 'লোকগণ' কথাটি

জাতিগত। একথা জানা ছিল যে, সমস্ত মানুষই একাত্রিত হয়ে উক্ত কথা বলেনি। তাই তার সর্বাধিক কম সংখ্যাটি ধরতে হবে। আর তা হল এক। কেননা الناس 'মানব জাতি' বোঝায়। এর ভিত্তিতে আমাদের হানাফী মাযহাবের লোকেরা বলেছেন, কেউ যদি বলে ঃ 'আমি যদি লোকদের সাথে কথা বলি, তাহলে আমাদের দাস মুক্ত হবে', তাহলে একজনের সাথে কথা বললেও তা হয়ে যাবে। কেননা 'লোকগণ' কথাটি জাতি পর্যায়ের। আর একথা জানা-ই আছে যে, গোটা 'জাতি'কে শামিল করাই এর উদ্দেশ্য নয়। তাই তার মধ্য থেকে অন্তত একজনকে ধরতে হবে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا -

অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় কর।

এ কথায় তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পেয়ে গেল।

এ কথা প্রমাণ করে যে, ভয় ও শ্রম বৃদ্ধির ফলে তাদের ঈমানী প্রত্যয়ও বৃদ্ধি পেয়ে যায়। কেননা তখন তারা প্রথমাবস্থায় পড়ে থাকে না, বরং তখন ইয়াকীন এবং দ্বীনের দূরদর্শিতা বৃদ্ধি পেয়ে যায়। কথাটি তেমনই যেমন সূরা আল-আহযাব-এ বলা হয়েছে ঃ

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا -

আর মুমিনরা যখন শত্রুবাহিনী দেখতে পেল, তখন তারা বলল ঃ এ তো তাই যার ওয়াদা আমাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও রাসূল সে ওয়াদাকে সত্য প্রমাণ করেছেন। ফলে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণ ভাবধারা অধিক বৃদ্ধি পেয়ে গেল। (সূরা ঃ আহযাব ঃ ২২)

অর্থাৎ শত্রুকে প্রত্যক্ষ করার ফলে ঈমান ও আল্লাহ্‌র আইন-বিধান মেনে নেয়া এবং জিহাদে ধৈর্য ধারণের মাত্রা অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়ে গেল। এ কথায় সাহাবীগণের পূর্ণ মাত্রার গুণ বর্ণনা সম্পাদিত হয়েছে, তাঁদের পূর্ণাঙ্গ ফযীলতের কথাও বলে দেয়া হয়েছে। আর আমাদের জন্যে এতে এই শিক্ষা নিহিত রয়েছে যে, আমরা যেন সর্বাবস্থায় তাঁদের অনুসরণ করি এবং আল্লাহ্‌র দিকে বারবার ফিরে যাই। বিপদে যেন আমরা ধৈর্য ধারণ করি, ভরসা নির্ভরতা যেন আমরা আল্লাহ্‌র উপরই করি। আর আমরা যেন বলি ঃ 'আল্লাহ-ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট, তিনি-ই উত্তম দায়িত্বশীল। আমরা এ কাজ যখন করব, তখন তার ফলে আমরা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা অবশ্যই লাভ করব। তিনি শত্রুর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেবেন, তাদের দুষ্কৃতি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবেন। সেই সাথে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও শুভ ফল আমরা লাভ করতে পারব। যেমন আল্লাহ্ নিজে বলেছেন ঃ

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ -

তারা আল্লাহ্‌র নিয়ামত ও অনুগ্রহ পেয়ে ফিরে গেল, কোন মন্দ তাদের স্পর্শ করল না, তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে অনুসরণ করে চলল।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَخَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَشَرٌّلَّهُمْ - سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْابِهٖ -

আল্লাহ্‌র দেয়া তার অনুগ্রহের ধন-সম্পদ নিয়ে যারা কৃপণতা করবে, তারা যেন ধারণা না করে যে, .... অবশ্যই যা নিয়ে তারা কার্পণ্য করে তা তাদের গলার বেষ্টনী হয়ে ঝুলবে।

সুদ্দী বলেছেন ঃ ওরা কৃপণতা করেছে, ওরা আল্লাহ্‌র পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করেনি এবং যাকাতও দেয়নি। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, ওরা আহলি কিতাব লোক, ওরা তার কথা বলতে কৃপণতা করেছে। বিশেষ করে যাকাত দেয়ার ফরজিয়াতের কথা। যেমন তাঁর কথা ঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ -

আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঁজি করে রাখে। ..... (সূরা তওবা ঃ ৩৪)

يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ -

যে দিন তার উপর তাপ দেয়া হবে জাহান্নামে, পরে তা দিয়ে তাদের দেহের পার্শ্বস্থলে ও মুখমণ্ডলে দাগ দেয়া হবে। .... (সূরা তওবা ঃ ৩৫)

আর 'তারা যা নিয়ে বখিলী করেছে তা তাদের গলায় বেষ্টনী হয়ে দাঁড়াবে' কথাটিও তাই বোঝায়। সহল ইবনে আবূ সালিহ তাঁর পিতা হযরত আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَامِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّىْ زَكَاةَ كَنْزِهٖ اِلَّا جِىْءَ بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَبِكَنْزِهٖ فَيُحْمٰى بِهَا جَبِيْنُهُ وَجُبْهَتُهُ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَ عِبَادِهٖ -

যে ধন-সম্পদ স্তুপের মালিক তার সঞ্চিত সম্পদের যাকাত দেয় না, তাকে ও তার সঞ্চিত ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন উপস্থিত করা হবে। পরে তা গরম করে তার দ্বারা তার কপাল ও মুখমণ্ডলে দাগ দেয়া হবে। এভাবে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাগণের বিচার চূড়ান্ত করবেন।

মসরূক বলেছেন, সে যার হক দেয়নি সেই হককে একটা অজগর বানানো হবে, সেই সর্প গলায় বেষ্টন করবে। সে বলবে, এই আমার মাল ও তোমার মাল। সাপ বলবে, 'আমি-ই তোমার মাল।' আবদুল্লাহ বলেছেন ঃ সে অজগরটি তার গলায় বেষ্টন করে থাকবে। তার দুইটি বিষাক্ত দাত থাকবে, বলবে ঃ আমি তোমার সেই মাল, যা তুমি কৃপণতা করে জমা করেছিলে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاِذَا أَخَذَا اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ -

যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট থেকে আল্লাহ্ সে চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন যে, তোমরা অবশ্যই এই কিতাবকে লোকদের নিকট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবে, তা স্মরণ কর।

সূরা আল-বাকারায়ও এ ধরনের আয়াত উদ্ধৃত হয়েছে। এ পর্যায়ে ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে যুবায়র ও সুদ্দী থেকে বর্ণিত হয়েছে, এ আয়াতে ইয়াহুদীদের কথা বলা হয়েছে। অন্যরা বলেছেন, এ আয়াতে ইয়াহুদী ও খ্রীস্টান— উভয়ের কথা বলা হয়েছে। আল-হাসান ও কাতাদাহ বলেছেন, এ আয়াতে সেই সব লোকের কথাই বলা হয়েছে, যাদের আল্লাহ্র নিকট থেকে ইলম দেয়া হয়েছে কিন্তু তারা সে ইলম গোপন করে রেখেছে, প্রকাশ করেনি। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন ঃ কুরআনে যদি ইলম গোপন করতে নিষেধ করার আয়াত না আসত, তাহলে আমি কক্ষণই তোমাদেরকে এ হাদীস বলতাম না। এরপর তিনি উক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন। তাই বলতে হবে যে, لَتُبَيِّنُنَّهٗ বলে প্রথমকালীন মুফাস্সিরদের কথানুযায়ী নবী করীম (স)-কেই সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা তারা তাঁর গুণ সিফাত— যা আগের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে— তা গোপন করেছিল, তাঁর কথা প্রকাশ করেনি।

অন্যান্য মনীষীর কথানুযায়ী উক্ত আয়াতে নবী করীম (স) সম্পর্কিত কথা এবং আল্লাহ্র যা কিছুই আছে, সব কিছু বর্ণনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে প্রকাশ করার কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ -

আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের পার্থক্য একটার পর আর এক আসায় বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে বিরাট-বিপুল নিদর্শন রয়েছে।

এতে যে 'আয়াত'— নিদর্শন রয়েছে, তার কয়েকটি দিক রয়েছে। একটি— বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী জিনিসের একটার পর একটা আসা। এ সবের এক সাথে অস্তিত্ব থাকাই অসম্ভব ব্যাপার। এ জিনিসগুলো নতুন সৃষ্ট। নতুন সৃষ্ট তা-ই যার অস্তিত্ব পূর্বে ছিল না। আয়াতটি একথাও প্রমাণ করে যে, দেহসত্তা সম্পন্ন জিনিসসমূহের স্রষ্টা সে সবের সদৃশ হতে পারে না। কেননা কর্তা ও ক্রিয়া একই জিনিস নয়। তাতে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, সৃষ্টির স্রষ্টা মহাশক্তিধর। কোন সৃষ্টই স্রষ্টাকে অক্ষম করতে পারে না। কেননা এসব জিনিসের স্রষ্টা এবং সে সবের মধ্যে নিহিত জিনিসের স্রষ্টা সেসবের বিপরীত জিনিস সৃষ্টি করতে সক্ষম। কেননা যে ক্ষমতাবান শক্তিধর নয়, তারা দ্বারা কোন কাজ হওয়া সম্ভব নয়। একথাও প্রমাণিত হয় যে, সর্ব সৃষ্টির স্রষ্টা প্রাচীন— সবকিছুর পূর্বে অবস্থিত। সে চিরন্তন, শাশ্বত। কেননা সৃষ্টিকুলের অস্তিত্ব সংশ্লিষ্ট হচ্ছে সর্বাধিক প্রাচীন স্রষ্টার সাথে। অন্যথায় কর্তা আর এক কর্তার মুখাপেক্ষী হবে। আর এ ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে, যার শেষ কিছু নেই। আর তা এক অসম্ভব অকল্পনীয় ব্যাপার। এ-ও প্রমাণিত হয় যে, সৃষ্টির নির্মাতা অশেষ জ্ঞানের অধিকারী। কেননা কোন সূক্ষ্ম সুদৃঢ় কাজ ঘটতে পারে কেবলমাত্র তার দ্বারা, যার ইলম সেই নির্মাণ কাজের পূর্ব থেকেই বিদ্যমান। স্রষ্টা-নির্মাতা মহাবিজ্ঞানী, একথাও প্রমাণিত হয়। তিনি ন্যায়পর, সুবিচারক, তাও প্রমাণিত। কেননা তিনি যে জিনিসের মন্দত্ব সম্পর্কে অবহিত, তিনি মন্দ জিনিসের সৃষ্টিকর্মে

আগ্রহী নন, তিনি অ-মুখাপেক্ষী। ফলে তার কার্যাবলী অবশ্যই ন্যায়পরতাপূর্ণ হবে। হবে নির্ভুল, তা তার সদৃশ হবে না— একথাও প্রমাণিত হয়। কেননা সদৃশ হলে সে সাদৃশ্য সব জিনিসের সাথে হওয়া সম্ভব । হওয়া সম্ভব তার কতক জিনিসের সদৃশ হওয়া। যদি সর্বদিক দিয়ে তার সদৃশ হয়, তাহলে স্রষ্টা ও তার সৃষ্টির মতই নতুন। আর কতক জিনিসের সদৃশ হলে, তাহলে স্রষ্টাকেও তদ্রূপই হতে হবে। কেননা দুই সদৃশ এক ও অভিন্ন হয়ে থাকে— যে দিক দিয়েই এ সাদৃশ্য হোক-না কেন। তাই নতুনত্বে সৃষ্টি ও স্রষ্টার সমান হওয়া অনিবার্য। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর স্তম্ভ বা খুঁটিবিহীন অবস্থায় থাকাটা প্রমাণ করে যে, তা কেউ ধারণ করে আছে এবং সেই ধারক ও আকশ-পৃথিবী পরস্পর সদৃশ নয়। কেননা কোন খুঁটি ছাড়াই তার স্থিতি তারই মত একটা দেহ দ্বারা হতে পারে না। .... উক্ত আয়াতে এ সব দলীল প্রমাণ নিহিত রয়েছে।

রাত ও দিন আল্লাহ্র অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে। তা এভাবে যে, রাত ও দিন নব সৃষ্ট। এর কোনটিই ছিল না, পরে অস্তিত্ব লাভ করেছে। আর একথা জানা-ই আছে যে, কোন দেহসত্তা নিজেকে অস্তিত্ব দিতে পারে না। বাড়াতেও পারে না, কমাতেও পারে না। তাই এ দুটি নতুন অস্তিত্ব পাওয়া জিনিসের অস্তিত্ব দানকারী সত্তা থাকা অপরিহার্য। কেননা নতুন অস্তিত্ব পাওয়া জিনিসকে অস্তিত্ব দানকারী না থাকা অসম্ভব। অতএব এ দুটির অস্তিত্ব দানকারী কোন দেহ হবে না, দেহসমূহের সদৃশও হবে না। তার দুটি কারণ। একটি— দেহসমূহ তার মত দেহ বানাতে সক্ষম হতে পারে না। দ্বিতীয়, দেহের সদৃশ যা, তার সম্পর্কেও এ নীতি অবশ্যম্ভাবী যে, তা-ও নতুন। 'অতএব তার কর্তা যদি 'নতুন' অস্তিত্ব লাভকারী হয়, তাহলে তাকে অস্তিত্ব দানকারী— নতুন সৃষ্টিকারী একজন হতে হবে। পরে আর একজন নতুন সৃষ্টিকারী হতে হবে। পরে তৃতীয় একজন অস্তিত্ব দানকারী হতে হবে, এভাবে চলতে থাকবে, যার কোন শেষই নেই। আর এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব নির্মাতা বা স্রষ্টাকে চিরন্তন ও শাশ্বত হতে হবে অবশ্যম্ভাবী রূপে, যার সাথে কোন জিনিসেরই একবিন্দু সাদৃশ্য থাকবে না।

## আল্লাহ্র পথে পাহারাদারীর ফযীলত

আল্লাহ বলেছেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا -

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, ধৈর্য ধারণে অবিচল থাক এবং তোমরা পাহারাদারী ও পর্যাবেক্ষণে রত থাক।

আল-হাসান, কাতাদাহ, ইবনে জুরাইয ও দহাক বলেছেন ঃ তোমরা ধৈর্য ধারণ করে থাক আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগীতে এবং অবিচল হয়ে থাক তোমাদের দ্বীনের উপর এবং আল্লাহ্র দুশমনদের মুকাবিলায় অবিচল থাক ও আল্লাহ্র পথে অতন্দ্র প্রহরী হয়ে থাক। মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল-কুরাতী বলেছেন ঃ ধৈর্য ধারণ কর তোমাদের দ্বীন পালনে, অবিচল থাক আমার ওয়াদার উপর যা বিশেষভাবে তোমাদের প্রতি করেছি এবং তোমাদের শত্রুদের উপর অতন্দ্র প্রহরী পর্যাবেক্ষক হয়ে থাক। যায়দ ইবনে আসলাম বলেছেন ঃ জিহাদে অবিচল হয়ে থাক। শত্রুদের মুকাবিলা কর অবিচল ধৈর্য সহকারে এবং সে কাজে অশ্ব ও যানবাহন প্রস্তুত করে

রাখ। আবূ মুসলিমা ইবনে আবদুর রহমান বলেছেন ঃ এক নামাযের পর আর এক নামাযের জন্যে অপেক্ষমান থাক।

নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

فِىْ انْتِظَارِ الصَّلٰوةِ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطِ -

কুরআনের যে অতন্দ্র প্রহরী ও পর্যাবেক্ষক হয়ে থাকতে বলা হয়েছে, তা হচ্ছে এক নামাযের পর আর এ নামাযের জন্যে অপেক্ষা করা।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ -

এবং অশ্ব ও যানবাহন প্রস্তুত রাখার কাজ, যদ্দ্বারা তোমরা আল্লাহ্‌র দুশমন ও তোমাদের দুশমনকে ভীত-সন্ত্রস্ত রাখবে। (সূরা আনফাল ঃ ৬০)

সুলায়মান নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেছেন ঃ

رِبَاطُ يَوْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَمِنْ قِيَامِهٖ وَمَنْ مَاتَ فِيْهِ وُقِىَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَنَمَا لَهُ عَمَلُهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ -

আল্লাহ্‌র পথে একদিনের পাহারাদারী-পর্যবেক্ষণের কাজ এক মাসকাল ধরে রোযা রাখা ও রাত্রে নফল নামাযে দাঁড়ানো অপেক্ষা অতীব উত্তম। যে লোক এ কাজে করবে, সে কবরের আযাব ও কঠিন অবস্থা থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। আর তার আমল কিয়ামত পর্যন্ত ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

হযরত উসমান (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

حَرْسُ لَيْلَةٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ لَيْلَةٍ قِيَامَ لَيْلِهَا وَصِيَامُ نَهَارُهَا -

আল্লাহ্‌র পথে একরাত্রি পাহারাদারীর কাজ করা এক হাজার রাত্রির রাত্রকালীন ইবাদত করা ও দিবসকালীন রোযা রাখা অপেক্ষাও অতীব উত্তম কাজ।

# সূরা আন-নিসা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ -

এবং তোমরা ভয় কর সেই আল্লাহ্কে, যাঁর নাম করে তোমরা পরস্পরের নিকট কিছু চাও এবং (ভয় কর) রিহ্মকে।

আল-হাসান, মুজাহিদ ও ইবরাহীম নখয়ী বলেছেন ঃ পারস্পরিক জিনিসাদি চাওয়ায় আল্লাহ্র নাম করা হয় এভাবে যেমন একজন বলে আমি তোমার নিকট আল্লাহ্র ও রিহম-এর নামে প্রার্থনা করছি। ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদাহ, সুদ্দী ও দহাক বলেছেন ঃ তোমরা রিহ্মকে ভয় কর, যেন তা ছিন্ন না কর। এ আয়াত প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্র নাম করে পরস্পরের নিকট কিছু চাওয়া সম্পূর্ণ জায়েয। লায়স মুজাহিদ ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ سَالَكُمْ بِاللّٰهِ فَاعْطُوْهُ -

আল্লাহ্র নাম করে কিছু চাইলে তোমরা তাকে অবশ্যই তা দেবে।

এবং মুআবিয়া ইবনে সুয়াইদ ইবনে মকরান বরা ইবনে আজিব সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, নবী করীম (স) আমাদেরকে সাতটি বিষয়ের আদেশ করেছেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, কিরা-কসমকে পবিত্র-পরিচ্ছন্নকরণ। এ কথাটি যা প্রমাণ করে, তা এই কথাটি দ্বারাও প্রমাণিত হয়— রাসূল (স) বলেছেন ঃ যে লোক তোমাদের নিকট আল্লাহ্র নামে চাইবে, তাকে তোমরা অবশ্যই দেবে।

আল্লাহ্র কথা وَالْاَرْحَامَ এতে 'রিহম' বা রক্ত সম্পর্কের দিক দিয়ে যে হক ধার্য হয়, তাকে অতি বড় করে পেশ করা হয়েছে, তা ছিন্ন করতে নিষেধ করা হয়েছে। অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ -

তোমরা যদি ফিরে যাও, তাহলে তোমরা কি পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের রিহম সম্পর্ক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করবে? (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ২২)

এ আয়াত 'রিহম' সম্পর্ক ছিন্নকরণকে দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টির সঙ্গে মিলিয়ে ও কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন ঃ

لَايَرْقُبُوْنَ فِىْ مُؤْمِنٍ اِلاًّ وَّلَاذِمَّةً -

কোন ঈমানদার ব্যক্তির এরা না নিকটাত্মীয়তার কোন কোন খেয়াল করে, না কোন ওয়াদা-চুক্তির দায়িত্ব পালন করে। (সূরা তওবা ঃ ১০)

আয়াতে الا শব্দের অর্থ বলা হয়েছে নিকটাত্মীয়তা। অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَبِالْوَلِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِذِى الْقُرْبٰى -

এবং পিতা-মাতার সাথে দয়াপূর্ণ ভালো ব্যবহার করতে হবে, করতে হবে নিকটাত্মীয়দের ইয়াতীমদের, মিসকীনদের ও নিকটাত্মীয় প্রতিবেশীদের সাথে। (সূরা নিসা ঃ ৩৬)

'রিহম' সম্পর্কের মর্যাদা রক্ষা ও তা ছিন্ন করা হারাম হওয়ার এবং তার বড় গুনাহ হওয়ার পর্যায়ে নবী করীম (স) থেকে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার পরিমাণ কুরআনে বলা আয়াতের কিছুমাত্র কম হবে না।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা জুহরী— আবূ সালমাতা ইবনে আবদুর রহমান, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

يَقُوْلُ اللّٰهُ : اَنَا رَحْمٰنُ وَهِىَ الرَّحِمُ شَقَقْتُ لَهَا اِسْمًا مِنِ اسْمِىْ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ -

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ আমিই রহমান— পরম ব্যাপক দয়াবান, তা থেকে 'রিহম'। আমি আমার নাম থেকে তার জন্যে একটা নাম বের করেছি। কাজেই যে লোক 'রিহম' সম্পর্ক রক্ষা করবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করব। আর যে লোক তা ছিন্ন করবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব।

আবদুল বাকী ইবনে কানে বশর ইবনে মূসা তার মামা হায়ান ইবনে বশর মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আবূ হানীফা নাসেহ, ইয়াহইয়া ইবনে আবূ কাসীর আবূ সালমাতা আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম (স) থেকে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

مَا مِنْ شَىْءٍ اُطِيْعَ اللّٰهُ فِيْهِ اَعْجَلُ ثَوَابًا مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ وَمَا مِنْ عَمَلٍ عُصِىَ اللّٰهُ بِهِ اَعْجَلُ عُقُوْبَةً مِنَ الْبَغْىِ وَالْيَمِيْنِ الْفَاجِرَةِ -

যে কাজেই আল্লাহ্র আনুগত্য করা হবে ও তাতে খুব শীঘ্র সওয়াব পাওয়া যাবে এমন কাজ সেলায়ে রিহমী ছাড়া আর কিছু নয়। যে কাজে আল্লাহ্র নাফরমানী হয় ও অবিলম্বে আযাব আসে, তা আল্লাহ্দ্রোহিতা ও পাপপূর্ণ কিরা-কসম ছাড়া আর কিছু নয়।

আবদুল বাকী বশর ইবনে মূসা, খালিদ ইবনে খদাশ, সালিহুলমরী, ইয়াযীদুর রাকাশী, আনাস ইবনে মালিক সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ الصَّدَقَةَ وَصِلَةَ الرَّحِمِ يَزِيْدُ اللّٰهُ بِهِمَا فِى الْعُمُرِ وَيَدْفَعُ بِهِمَا مِيْتَةَ السُّوْءِ وَيَدْفَعُ اللّٰهُ بِهِمَا الْمَحْذُوْرَ وَالْمَكْرُوْهَ -

সাদকা-দান-খয়রাত ও সেলায়ে রিহ্মী— এ দুটির কারণে আল্লাহ আয়ু বৃদ্ধি করেন, এ দুটি দ্বারা খারাপ মৃত্যু প্রতিরোধ করেন এবং ভয়পূর্ণ ও অপছন্দনীয়— ঘৃণ্য অবস্থা থেকে এ দুটির কারণে আল্লাহ্ রক্ষা করেন।

আবদুল বাকী বশর ইবনে মূসা, আল হুমায়দী, সুফিয়ান, জুহ্রী, হুমায়দ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ, তাঁর মা উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন। আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِى الرَّحِمِ الْكَاشِحِ -

রিহ্ম সম্পর্ক সম্পন্ন শত্রুর প্রতি দান-সাদকা করা অতীব উত্তম।

এ হাদীসটি সুফিয়ান ও জুহ্রী, আইয়ুব ইবনে বশীর, হাকীম ইবনে হাজাম সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ 'সবচেয়ে উত্তম দান-খয়রাত হচ্ছে নিকটাত্মীয় শত্রুর প্রতি। হাফসা বিনতে শীরীন রবাব, সালমান ইবনে আমর সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ

اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِى الرَّحِمِ اِثْنَتَانِ لِاَنَّهَا صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ -

সাধারণ মুসলমানদেরকে দান একটা দান বটে; তবে রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়ের প্রতি সাদ্কা এক সাথে দুটি— একটি দান এবং আর একটি রক্ত সম্পর্ক রক্ষা।

আবূ বকর বলেছেন ঃ উপরোদ্ধৃত আয়াত ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হল যে, সেলায়ে রিহ্মী রক্ষা করা ও তার দরুন সওয়াব পাওয়ার অধিকার হওয়া নিশ্চিত, অনিবার্য এবং নবী করীম (স) রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়ের প্রতি দান-সাদকাকে এক সাথে সাদকা ও রক্ত সম্পর্ক রক্ষা বলে ঘোষণা করেছেন। এ রক্ত সম্পর্কের দরুন সওয়াবের অধিকার হওয়ার কথাও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, দানের ফলে পাওয়া সওয়াব থেকে তা আলাদা। এতে প্রমাণিত হল যে, রক্ত সম্পর্ক সম্পন্ন মুহরম আত্মীয়কে কোন কিছু 'হিবা' করা হলে তা ফিরিয়ে নেয়া সহীহ্ কজ নয়। সেই হিবা-চুক্তি ভঙ্গ করাও জায়েয নয়। হিবাকারী পিতা হোক কিংবা অন্য কেউ। কেননা তা তো সাদকা পর্যায়ে পড়ে গেছে এ দিক দিয়ে যে, নিকটাত্মীয়তাই তার লক্ষ্য। আর তার দরুন সওয়াব পাওয়ার অধিকার হওয়া সাদকার মতই অনিবার্য। কেননা তার লক্ষ্য নিকটাত্মীয়তা রক্ষা। আর সওয়াব পেতে চাওয়া থেকে ফিরে যাওয়া কখনই সহীহ্ কাজ হতে পারে না। 'হিবা'ও ঠিক তেমনি যদি তা রক্ত সম্পর্কের মুহ্রম আত্মীয়ের জন্যে করা হয়। এ দলীলের কারণেই পিতার জন্যে সহীহ্ নয় পুত্রের জন্যে করা 'হিবা' ফিরিয়ে নেয়া। পুত্র ছাড়া রক্ত সম্পর্কের অন্যান্য মুহরম আত্মীয়ের জন্যে করা 'হিবা' ফিরিয়ে নেয়াও অনুরূপভাবে সহীহ্ নয়।

কেননা এ 'হিবা'ও সাদকার মতই। তবে 'হিবা'কারী পিতা যদি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তার জন্যে তা নিয়ে নেয়া জায়েয, ঠিক যেমন পুত্রের সব ধন-মাল।

যদি বলা হয়, কুরআন ও সুন্নাহ সেলায়ে রিহমী ওয়াজিব করে মুহ্‌রম রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় ও অন্যদের মধ্যে কোন পার্থক্য করেনি। তাই রক্ত সম্পর্কের সকল আত্মীয়ের জন্যে করা 'হিবা' ফিরিয়ে নেয়া জায়েয না হওয়া উচিত, এ রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় মুহরম না হলেও। যেমন চাচার পুত্রও রক্ত সম্পর্কের দূরবর্তী আত্মীয়।

জবাবে বলা যাবে, 'হিবা'কারী ও যার জন্যে 'হিবা'— এদের মধ্যে যদি বংশীয় সম্পর্কের দিকটি গুরুত্বপূর্ণ করে ধরা হয়, তাহলে তাতে আদম (আ)-এর সব সন্তানই শরীক মনে করা বাঞ্ছনীয় হবে। কেননা তারা বংশের দিক দিয়ে তো অভিন্ন, সব একই বংশোদ্ভূত লোক, হযরত নূহ (আ) এবং তাঁর পূর্বে আদম (আ) তাদের সকলকে একই বংশোদ্ভূত করেছে। তাই উক্ত কথা ঠিক নয়। অতএব যে রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়ের ব্যাপারে এ হুকুমটা প্রযোজ্য তা হল, যে দুজনার মধ্যে বিবাহ হারাম, তাদের মধ্যে, অবশ্য যদি দুজনার একজন পুরুষ ও অপর জন মেয়ে হয়। কেননা তাদের ছাড়া আর কারো ক্ষেত্রে মুহরম হওয়ার শর্ত খাটে না। তখন তারা অনাত্মীয় লোক বিশেষ। জিয়াদ ইবনে আলাফাতা উসামা ইবনে শরীক সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ আমি নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি 'মিনা'য় ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন ঃ 'তোমর মা, তোমার পিতা, তোমার বোন, তোমার ভাই, এরপর যারা নিকটবর্তী, তারপর যারা নিকটবর্তী তোমার নিকট। এ ভাষণে তিনি রক্ত সম্পর্কের মুহরম আত্মীয়দের কথা উল্লেখ করেছেন। তাই বলতে হবে, আমাদের কথাই সহীহ্। তা সত্ত্বেও রক্ত সম্পর্কের দূরবর্তী আত্মীয়ের সাথেও সিলায়ে রিহমী রক্ষা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। নিকটাত্মীয়দের ব্যাপারে যে তাগিদ এসেছে, তা প্রতিবেশীর প্রতি ভাল আচারণ করতে বলার মতই হুকুম। তার সাথে মুহরম আত্মীয় সংক্রান্ত হুকুমের কোন সম্পর্ক নেই। 'হিবা' ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারেও তাই। যে সব রক্ত সম্পর্কে আত্মীয় মুহরম নয়, তাদের প্রতি ভালো আচরণ গ্রহণ অবশ্যই পছন্দনীয় মুস্তাহাব। কিন্তু তাদের সাথে মুহরম সংক্রান্ত হুকুম নেই। তারা তো অনাত্মীয় ও সম্পর্কহীন লোকদের মতই।

## ইয়াতীমের মাল-সম্পদ তাদের নিকট ফেরত দান

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ -

এবং তোমরা ইয়াতীমদিগকে তাদের ধন-মাল ফিরিয়ে দাও এবং ভালো মালের পরিবর্তে খারাপ মাল দিও না।

আল-হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ এ আয়াতটি যখন নাযিল হয়েছিল ইয়াতীমদের ধন-মাল তাদের নিকট ফিরিয়ে দেয়ার আদেশ নিয়ে, তখন মুসলমান অভিভাবকরা ইয়াতীমদের মালের সাথে নিজেদের মাল মিশ্রিত করা অপছন্দ করতে লাগলেন, ইয়াতীমের অভিভাবক তার

নিজের মাল থেকে ইয়াতীমের মাল আলাদা করে ফেলতে শুরু করলেন। পরে এজন্যে নবী করীম (স)-এর নিকট অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَّاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ -

লোকেরা— হে নবী! তোমাকে ইয়াতীমদের মাল কিভাবে রাখতে হবে সে বিষয়ে প্রশ্ন করে। তুমি বলে দাও, তাদের সঠিক কল্যাণ করাই মঙ্গলময়। তোমরা যদি তাদের মালের সাথে তোমাদের মাল মিলিয়ে রাখ, তাহলে ওরা তো তোমাদেরই দ্বীনি ভাই।

(সূরা বাকারা ঃ ২০)

আবূ বকর আল জাসসাস বলেছেন, আমি মনে করি, উক্ত কথাটি বর্ণনাকারীর একটা ভুল। কেননা উক্ত আয়াতটির তাৎপর্য ইয়াতীমদের পূর্ণ বয়স্কতা লাভের পর তাদের মাল তাদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া। কেননা ইয়াতীমদের পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির পূর্বে তার মাল তার নিকট ফেরত দেয়া ওয়াজিব নয়, এ বিষয়ে শরীয়াতের ইলমধারীদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। হাদীসের বর্ণনাকারী,অপর একটি আয়াত সম্পর্কে ভুল বর্ণনা দিয়েছেন। তা হল, মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, উসমান ইবনে আবূ শায়বা, জরীর, আতা, সাঈদ ইবনে যুবায়র, ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ যখন —

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ -

তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া অন্য কোনভাবে ইয়াতীমের মালের নিকটেও যাবে না।

(সূরা আন'আম ঃ ১৫২)

আয়াতটি এবং —

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا -

যারা ইয়াতীমদের মাল জুলুম করে ভক্ষণ করে .... (সূরা নিসা ঃ ২০)

এ আয়াতটি নাযিল করলেন তখন যার যার নিকট ইয়াতীমের মাল ছিল, তারা ঘরে গিয়ে ইয়াতীমের পানাহার নিজেদের পানাহার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দিলেন। তখন তার খাবার বাড়তি হতে লাগল এবং তা তার জন্যে রেখে দিত, সে তা খেত কিংবা নষ্ট হয়ে যেত। ফলে এ ব্যাপারটি তার জন্যে খুবই কঠিন ও কষ্টদায়ক হয়ে পড়ে। তখন তারা রাসূল (স)-এর নিকট ব্যাপাটির উল্লেখ করে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ হে নবী! লোকেরা তোমাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বলে দাও, তাদের সার্বিক কল্যাণই সর্বোত্তম। তোমরা যদি তাদের মালের সাথে তোমাদের মাল সংমিশ্রিত কর, তবে তারা তো তোমাদের-ই ভাই। তখন তারা তাদের ও ইয়াতীমদের পানাহার সংমিশ্রিত করে। এ পর্যায়ে এ বর্ণনাটিই সহীহ।

তবে আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰى اَمْوَالَهُمْ -

এবং দিয়ে দাও ইয়াতীমদেরকে তাদের মাল।

এ কথাটি সে পর্যায়ের নয়। কেননা এ কথা জানা-ই আছে যে, এ আয়াতে ইয়াতীমদেরকে ইয়াতীম থাকা অবস্থায় তাদের মাল ফিরিয়ে দিতে বলা হয়নি, তাদের পূর্ণ বয়স্কতা লাভের পর-ই তা প্রত্যর্পণ করা ওয়াজিব, তার পূর্বে নয়। শুধু তা-ই নয়, তাদের পূর্ণবয়স্কতা লাভে সঙ্গে তাদের বুদ্ধি-সুদ্ধির উদয় হওয়াও আবশ্যক। তা সত্ত্বেও এ অবস্থায় কুরআনে তাদেরকে 'ইয়াতীম' বলা হয়েছে এ জন্যে যে, তাদের ইয়াতিমী অবস্থা এইমাত্র— পূর্ণবয়স্কতা লাভের পর-ই নিঃশেষ হয়েছে মাত্র। যেমন মেয়েদের ইদ্দত শেষ হওয়ার কাছাকাছি সময় হলেও মিয়াদ পূর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে আল্লাহ্র এ কথাটিতে ঃ

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ -

ইদ্দত পালনরতা মেয়েরা তাদের মিয়াদ পর্যন্ত পৌঁছে গেলে তখন তাদেরকে প্রচলিত নিয়মে আটকে রাখ। (সূরা তালাক ঃ ২)

তাহলে তাদের পূর্ণবয়স্কতা নিকটবর্তী হওয়াটাই লক্ষ্য। আয়াতের ধারাবাহিকতায় বলা পরবর্তী কথাই তার প্রমাণ। বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ -

তোমরা যখন তাদের মাল তাদের নিকট ফেরত দেবে, তখন তাদের উপর সাক্ষী রাখ।

ইয়াতীমের উপর সাক্ষী রাখা পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির পূর্বে সহীহ্ হয় না। তাই এ থেকে জানা গেল যে, তা তাদের পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির পরই করণীয়। এ অবস্থায়ও তাদেরকে 'ইয়াতীম' বলা হয়েছে দুটির যে-কোন একটি কারণে। হয় তাদের পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির সময় নিকটবর্তী হওয়ার কারণে অথবা তাদের পিতা থেকে বিচ্ছিন্নতার কারণে— এ সত্ত্বেও যে, এ সময় তাদের ধন-মাল নিজেদের জন্যে ব্যয়-ব্যবহার করায় এবং তাদের কার্যাবলী ও ব্যবস্থাপনাসমূহ দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে— সাংসারিক দায়িত্ব পালনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোকের ন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিপক্কতা না হওয়া।

ইয়াযীদ ইবনে হরমুজ বর্ণনা করেছেন, নাজদা হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে প্রশ্ন লিখে পাঠিয়েছিলেন, ইয়াতীমের ইয়াতিমী কখন শেষ হয়? তিনি জবাবে লিখেছিলেন ঃ যখন তার বুদ্ধিসুদ্ধির পরিপক্কতা লাভের নিদর্শন পাওয়া যাবে, তখন তার ইয়াতিমী শেষ হয়ে যাবে। কোন কোন কথায় এরূপও এসেছে, যে 'ব্যক্তির একমুঠি শ্মশ্রু হয়ে গেছে; কিন্তু তার ইয়াতিমী এখনও যায়নি।' হযরত ইবনে আব্বাস (রা) জানিয়ে দিয়েছেন যে, 'ইয়াতীম' নামটা পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির পর-ও ব্যবহৃত হয়, যদি তার বুদ্ধি-বিবেচনা দৃঢ় না হয় এবং তার বুদ্ধির উন্মেষ হওয়ার পরিচয় পাওয়া না যায়। মত নির্ধারণের দুর্বলতা থাকলেই তার ইয়াতিমীও

থাকে, তাকে 'ইয়াতীম' বলা যায়। পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকেই 'ইয়াতীম' বলা যেতে পারে। স্বামী বিচ্ছিন্না মেয়েলোককেও তা বলা যায়। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيْمَةُ فِىْ نَفْسِهَا -

স্বামীহীনা নারীর নিকট তার নিজের ব্যাপারে আদেশ চাওয়া হবে।

অথচ পূর্ণবয়স্কা না হলে নারীর নিকট তার নিজের ব্যাপারে আদেশ চাওয়া যায় না। তবে হ্যাঁ, এ কথা জানা-ই আছে যে, কোন বৃদ্ধ বা থুরথুরে বুড়োকে কখনই ইয়াতীম বলা যাবে না। সে বিবেক-বুদ্ধির দিক দিয়ে যতই দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ মতের অধিকারী হোক-না কেন। অতএব বালকত্বের কাছাকাছি সময়টাই গণ্য করতে হবে। আর বেশি বয়সের মেয়েলোককে 'ইয়াতীম' বলা যায় যদি সে স্বামী বিচ্ছিন্না হয়ে পড়ে। কিন্তু কোন পুরুষ তার পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তার একাকীত্বের কারণে তাকে ইয়াতীম বলা যাবে না। তা এজন্যে যে, পিতা তো বালক পুত্রের অভিভাবক হয়। সে তার বিষয়াদির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। এ সময় বালক তার পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই তাকে 'ইয়াতীম' বলা হয়। কাজেই সেই বালক বিবেক-বুদ্ধির দুর্বলতা ও পরিপক্ক মতের অভাব হলেই তাকে 'ইয়াতীম' বলা যাবে পূর্ণবয়স্কতা পাওয়ার পর-ও। তবে নারীকে 'ইয়াতীম' বলা হয় এ জন্যে যে, তার জন্যে স্বামীই হচ্ছে আশ্রয়। সে স্বামীর বন্ধনে ও আশ্রয়ে নিরাপদে থাকে, সে এই স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই তখন তাকে 'ইয়াতীম' বলা হয়। কেননা নারীর জন্যে স্বামী সেরূপ, অল্প বয়স্ক বালকের জন্যে যেমন পিতা। তখন পিতাই তার অভিভাবক, তার সমস্ত কাজের ব্যবস্থাপক ও দায়িত্বশীল, তার লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পিতাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নারী যখন এরূপ স্বামী হারায় তখন তাকে ইয়াতীম বলা হয়, এরূপ বালক যখন তার পিতা হারায় তখনও তাকে ইয়াতীম বলা হয়। এ কারণেই আল্লাহ বলেছেন ঃ

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ -

পুরুষরা হচ্ছে মেয়েলোকদের ব্যবস্থাপক— পরিচালক— কর্মাধ্যক্ষ। (সূরা নিসা ঃ ৩৪)

যেমন বলেছেন ঃ

وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ -

অভিভাবকরা, তোমরা ইয়াতীমদের জন্যে সর্বক্ষণ ইনসাফ ও সুবিচার সহকারে কর্ম সম্পাদনে যত্নবান থাক। (সূরা নিসা ঃ ১২৭)

প্রথমোক্ত আয়াতাংশে পুরুষদেরকে মেয়েদের কর্মাধ্যক্ষ বানানো হয়েছে এবং দ্বিতীয়োক্ত আয়াতাংশে অভিভাবককে ইয়াতীমের কর্মাধ্যক্ষ বানানো হয়েছে। আলী ইবনে আবূ তালিব ও জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

لَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ -

পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির পর কেউ ইয়াতীম হয় না।

পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির পর কাউকে ইয়াতীম বলা হলেও তা পরোক্ষ অর্থে বলা হয়। তার কারণ পূর্বেই আমরা বলে এসেছি। দুর্বলকে 'ইয়াতীম' বলা হয় একটি বর্ণনার ভিত্তিতে। বর্ণনাটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এসেছে। তাতে প্রমাণিত হয় যে, কেউ 'অমুক বংশের ইয়াতীমদের জন্যে' বলে কোন অসিয়ত করে, তাহলে তা সাধারণ ইয়াতীম দরিদ্রদের জন্যে জায়েয হবে না বলে আমাদের ফিকাহবিদগণ যে ফতোয়া দিয়েছেন, তা সহীহ্। তার প্রমাণ এ হাদীস, যা আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইস্‌হাক আল-হাসান আবুর রবী-আবদুর রাযযাক, মামার আল হাসান সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন এ আয়াত প্রসঙ্গে ঃ

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا -

তোমাদের যে ধন-মালকে আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে স্থিতি স্থাপন করেছেন তা নির্বোধ লোকদেরকে দিও না।

এ পর্যায়ে বলেছেন, سُفَهَاءَ 'নির্বোধ' বলতে তোমার নির্বোধ পুত্র ও বুদ্ধিহীনা স্ত্রী বুঝিয়েছেন। আর তাঁর কথা قِيَامًا -এর অর্থ, তোমার জীবনের পরিপোষক— স্থিতিস্থাপক উল্লেখ করা হয়েছে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اتَّقُوا اللَّهَ فِي الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ -

ইয়াতীম ও নারী— এ দুটি দুর্বল শ্রেণীর লোকদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর।

এ হাদীসে 'ইয়াতীমকে' দুর্বল বলা হয়েছে। মাল-সম্পদ ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে ইয়াতীমের বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ হওয়ার কোন শর্ত এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়নি। এর বাহ্যিক তাৎপর্য দাবি করে যে, তার পূর্ণবয়স্কতা অর্জিত হলেই তার ধন-মাল তার নিকটই ফিরিয়ে দিতে হবে। তার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ ঘটুক আর না-ই ঘটুক। তবে সে শর্তের উল্লেখ করা হয়েছে এ আয়াতঃ

حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ -

তারা যখন পূর্ণবয়স্কতা লাভ করবে, তার পরে যদি তাদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ লক্ষ্য কর, তাহলে তাদের ধন-মাল তাদের নিকট ফিরিয়ে দাও।

ইমাম আবূ হানীফার (র) মতে এ আয়াত অনুযায়ীই কাজ করতে হবে এবং তা বয়সের দিক দিয়ে পঁচিশ বছর হলে তার পরও তার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ লক্ষ্য করা না গেলেও তার ধনমাল তাকেই ফিরিয়ে দিতে হবে। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-মাল দিয়ে দাও।' এ আয়াত অনুযায়ী ইয়াতীমের পঁচিশ বছর বয়স হলেই প্রত্যর্পণের কাজ করতে হবে। এ আয়াতের বাহ্যিক তাৎপর্যের দৃষ্টিতে বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ লক্ষ্য করা না গেলে তার মাল তাকে দেয়া যাবে না। কেননা শরীয়াত বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, এ বয়সে পৌঁছার পূর্বে বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ লক্ষ্যভূত হওয়া ধন-মাল ফেরত দেয়ার জন্যে জরুরী শর্ত। উদ্ধৃত আয়াত দুটির প্রত্যেকটিকে সে দুটির বাহ্যিক ফায়দার দাবি অনুযায়ী ব্যবহার করার দিক দিয়ে একটি হচ্ছে সমর্থনযোগ্য কারণ। সর্বাবস্থায় বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষকেই একমাত্র ভিত্তি গণনা করা হলে অপর আয়াতটি অনুযায়ী আদৌ আমল করা হয় না। তাতে বলা হয়েছে ঃ

'ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-মাল দিয়ে দাও'। এতে বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ হওয়ার কোন শর্ত আরোপিত হয়নি। কেননা আল্লাহ তা'আলা সাধারণ ভাবে ও নিঃশর্তেই বলেছেন মাল দিয়ে দিতে, তা ওয়াজিব কোন নিদর্শন পাওয়া ছাড়া-ই। আর কোন বিষয়ে পাশাপাশি দুটি আয়াত এলে তার একটি বিশষভাবে লক্ষণ সমন্বিত হলে আদেশটি পালন ওয়াজিব হয়ে যায়, আর অপরটি যদি হয় সাধারণ কোন লক্ষণবিহীন, তখন এ দুটিরই কার্যকরতা যদি এক সাথে সম্ভব হয়, তাহলে তার একটির নির্দেশ পালন ও অপরটির নির্দেশ উপেক্ষাকরণ আমাদের জন্যে জায়েয নয়।

এখানে যা কিছু বলা হল, তা থেকে প্রমাণিত হল যে, 'এবং ইয়াতীমদেরকে তাদের মাল দিয়ে দাও'— আল্লাহ্‌র এ কথানুযায়ী ইয়াতীমের মাল প্রত্যর্পণ করাই ওয়াজিব। এ আয়াতের ধারাবাহিকতায়ই বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ -

তোমরা যখন তাদের ধন-মাল তাদের নিকট প্রত্যর্পণ করবে, তখন তাদের উপর সাক্ষী বানাও।

বোঝা গেল, ধন-মাল ফেরত পাওয়ার পর তারা স্বীকারোক্তি করবে যে, আমাদের ধন-মাল আমাদের হস্তগত হয়েছে, কেননা আল্লাহ তাদের উপর সাক্ষী বানাতে বলেছেন। একথা প্রমাণ করে যে, তারা ধন-মাল ফেরত পেয়ে যে প্রাপ্তি স্বীকার করবে তার উপর সাক্ষী বানাতে হবে। আর এতে দলীল রয়েছে এ কথার যে, প্রতিবন্ধকতা চাপানো যাবে না, তাদের ধন-মালে কর্তৃত্ব করা সম্পূর্ণ জায়েয। কেননা যার উপর এ কাজের প্রতিবন্ধকতা চাপানো হয় তার তা প্রাপ্তির স্বীকৃতি দেয়া জায়েয নয়। আর যার উপর সাক্ষী রাখা জায়েয, তার স্বীকারোক্তিও জায়েয।

তবে আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ -

তোমরা ভালো ও উত্তমের বদলে খারাপ ও নিকৃষ্ট দেবে না।

এ পর্যায়ে মুজাহিদ ও আবূ সালিহ্ থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ হালাল মালের বদলে হারাম মাল দিও না। অর্থাৎ তোমার হালাল রিযিকের বদলকে হারাম বানিও না। তা এভাবে যে, তুমি ইয়াতীমের মাল ব্যয়-ব্যবহারে খুব তাড়াহুড়া করবে, তা খরচ করে ফেলবে অথবা তা দিয়ে তোমার নিজের ব্যবসায় চালাবে। অথবা তুমি তা আটকে রাখবে এবং তাকে অন্যটা দেবে। তাতে তুমি ইয়াতীমের যে মাল নিয়ে নেবে, তা হবে 'খবীস' ও 'হারাম'। আর তাকে তুমি দিয়ে দেবে সেই হালাল মাল যা আল্লাহ তোমাকে রিযিক হিসাবে দিয়েছেন। এবং তাদেরকে তাদের আসল দেবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইয়াতীমের অভিভাবকের পক্ষে ইয়াতীমের মাল নিজ থেকেই করয লওয়া জায়েয নয়। তা অদল-বদলও করতে পারবে না, নিজের জন্যে তা আটকে রেখে অন্যটা তাকে দিয়ে দেয়া জায়েয নয়। তবে ইয়াতীমের ধন-মাল তারই স্বার্থে ক্রয়-বিক্রয় করা অভিভাবকের জন্যে জায়েয নয়, একথা কোন ক্রমেই প্রমাণিত হয় না। শুধু নিজের জন্যে গ্রহণ করা ও অন্যটা তাকে দিয়ে দেয়াই নিষিদ্ধ। অবশ্য এ থেকে একথা প্রমাণিত

হয় যে, ইয়াতীমের মাল সমপরিমাণ মূল্য দিয়েও নিজের জন্যে ক্রয় করা জায়েয নয়। কেননা ইয়াতীমের মাল নিজের জন্যে বদল করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, তা সর্বপ্রকারের অদল-বদলেই প্রযোজ্য। তবে যে কাজের দলীল পাওয়া যায়, তা হল, যা গ্রহণ করবে, তার মূল্য বাবদ সমমানের তুলনায় অধিক দিয়ে দেবে। এটা ইমাম আবূ হানীফার মত। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ তোমরা ইয়াতীমের মালের নিকটেও যাবে না। তবে উত্তম পন্থায় (যেতে পার)। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, জুহরী, সুদ্দী ও দহাক 'খারাপকে ভালোর সাথে অদল-বদল করো না' আল্লাহ্ এ কথার পর্যায়ে বলেছেন ঃ নিকৃষ্ট পচা জিনিস দিয়ে ভালো উত্তম-উৎকৃষ্ট জিনিস নিয়ে নেবে না। অতিশয় কৃশ ও ক্ষয়প্রাপ্ত জিনিস দিয়ে মোটা-তাজা জিনিস নেবে না।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ -

তোমরা তাদের মাল তোমাদের মালের সাথে মিলিয়ে খেয়ে ফেলো না।

এ পর্যায়ে মুজাহিদ ও সুদ্দী থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ তোমরা তাদের মাল তোমাদের মালের সাথে মিলিয়ে তোমাদের মালের পরিমাণ তাদের মাল দিয়ে বৃদ্ধি সাধন করে খেয়ো না। ফলে ঋণ বাবদ গ্রহণ উপায়ে তাদের মাল সংমিশ্রিতকরণকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা এর ফলে ইয়াতীমের নামে ঋণ চেপে বসবে, তখন তাদের জন্যে তা খাওয়া ও তার মুনাফা খাওয়া জায়েয হয়ে পড়বে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا -

নিশ্চয়ই তা অতি বড় গুনাহ।

ইবনে আব্বাস (রা), আল-হাসান, মুজাহিদ ও কাতাদাহ্ বলেছেন ঃ বড় গুনাহ। এ আয়াতে একথার দলীল রয়েছে যে, ইয়াতীমের পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তি ও তাদের বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষের লক্ষণ দেখতে পাওয়ার পর তার মাল তার নিকট ফেরত দিয়ে দেয়া ওয়াজিব। তারা নিজে থেকে দাবি না করলেও তা দিয়ে দিতে হবে। কেননা তা ফিরিয়ে দেয়ার আদেশ নিঃশর্ত। ইয়াতীমদের দাবি হওয়া শর্ত ছাড়াই তা তরক করা কর্তব্য, অন্যথায় তাতে বড় গুনাহ হওয়ার হুমকি দেয়া হয়েছে। এ থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, যার অন্যদের নিকট মাল বা টাকা-পয়সা রয়েছে, সে যদি তাকে তা দিয়ে দিতে ইচ্ছা করে, তাহলে সে কাজের সাক্ষী রাখা মুস্তাহাব; কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ 'তোমরা যখন তাদের নিকট তাদের ধন-মাল প্রত্যর্পণ করবে, তখন তাদের উপর সাক্ষী রাখবে।'

## অল্প বয়স্কদের বিয়ে দেয়া

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ -

তোমরা ইয়াতীমদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে পারবে না বলে যদি ভয় পাও, তাহ্লে তোমরা দুজন দুজন, তিনজন তিনজন, চারজন চারজন করে যা খুশি বিয়ে কর।

জুহ্রী উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি হযরত আয়েশা (রা) কে বললাম ঃ আল্লাহ্র কথা ঃ 'ইয়াতীমদের প্রতি তোমরা ন্যায়বিচার করতে পারব না, এই ভয় যদি তোমরা পাও' .... এর তাৎপর্য কি? তিনি জবাবে বললেন ঃ হে বোন পুত্র! আয়াতে সেই ইয়াতীমের কথা বলা হয়েছে, যে তার অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে লালিত হয়। তখন সে তার ধন-মাল ও রূপ-সৌন্দর্যে তার প্রতি আকৃষ্ট ও আগ্রহী হয়ে পড়ে এবং খুব সামান্য মহরানার বিনিময়ে তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক ও চেষ্টিত হয়। আল্লাহ এ আয়াতে অভিভাবককে নিষেধ করেছেন এভাবে ইয়াতীম মেয়ে বিয়ে করতে। তাকে যদি বিয়েই করতে হয়, তাহ্লে তা সুবিচার ও ন্যায়পরতা সহকারেই করতে হবে। বরং তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে অন্যান্য মেয়েলোক বিয়ে করতে। হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, এ আয়াতের পর-ও মেয়েদের ব্যাপারে রাসূল (স)-এর নিকট লোকেরা ফতোয়া চেয়েছে। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ - قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ .... وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ -

হে নবী! লোকেরা মেয়েদের ব্যাপারে তোমার নিকট ফতোয়া চায়। তুমি বল হ্যাঁ, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে ফতোয়া দেন আর কিতাবে যা তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করা হয় .... এবং তোমরা তাদেরকে বিয়ে করতে আগ্রহী হও। (সূরা নিসা ঃ ১২৭)

হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, 'কিতাবে তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করা হয়' বলে সেই প্রথমোক্ত আয়াতটি বোঝানো হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে ঃ 'তোমরা ইয়াতীমদের প্রতি সুবিচার ও ন্যায়পরতা রক্ষা করতে পারবে না বলে যদি ভয় পাও' ..... আর শেষোক্ত আয়াতে যে বলা হয়েছে ঃ 'এবং তোমরা তাদেরকে বিয়ে করতে আগ্রহী হও' বলে সেই আগ্রহের কথা বলা হয়েছে, যা তোমাদের কেউ তোমাদের ক্রোড়ে লালিত ইয়াতীম কন্যার প্রতি পোষণ করে থাক। কিন্তু সে কন্যার ধন-মাল ও রূপ-সৌন্দর্য সামান্য হলে তা তোমরা পোষণ করো না। ইয়াতীম মেয়ের ধন-মাল ও রূপ-সৌন্দর্যে আগ্রহীদেরকে তাদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। বরং তাদের প্রতি আগ্রহ না হওয়ার ন্যায়পরতা ও সুবিচার করতে পার না। যদি তা করতে পার, তাহ্লে তাদের বিয়ে করায় দোষ নেই।

আবূ বকর আল জাস্সাস বলেছেন ঃ হযরত আয়েশা (রা) 'তোমরা ইয়াতীম কন্যাদের প্রতি সুবিচার ও ন্যায়পরতা করতে পারবে না বলে যদি ভয় পাও' আয়াতাংশের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। সাঈদ ইবনে যুবায়র, দহাক ও রুবাই থেকে তা থেকে ভিন্নতর ব্যাখ্যার বর্ণনা এসেছে। তা সেই হাদীসে বর্ণিত, যা আবদুল্লাহ ইবনে

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আল-হাসান ইবনে আবুর-রুবাই আল-জুরজানী আবদুর রায্‌যাক, মামার, আইয়ুব, সাঈদ ইবনে যুবায়র সূত্রে— 'তোমরা যদি ভয় পাও যে, তোমরা ইয়াতীমদের ব্যাপারে সুবিচার-ন্যায়পরতা করতে পারবে না, তাহলে অন্যান্য মেয়েদের থেকে যা মন চায় তোমরা বিয়ে কর'-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন ঃ 'যে সব মেয়েলোক তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে দুই-দুই, তিন-তিন, চার-চার' এবং ইয়াতীম মেয়েদের ব্যাপারে তারা যেমন ভয় পেয়েছে, তেমনি অন্যান্য মেয়েদের ব্যাপারেও তাদের প্রতি সুবিচার, ন্যায়পরতা করতে পারবে না বলে ভয় পেয়েছে। মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, এর তাৎপর্য হল, 'তোমরা যদি সুবিচার ন্যায়পরতা করতে পারবে না বলে ভয় পাও এবং তাদের ধন-মাল আহার করতে দ্বিধাবোধ কর।' এবং অনুরূপভাবে তোমরা যিনায় লিপ্ত হতেও ভয় পাও, তাহলে তোমরা অন্যান্য মেয়েলোকদের বিয়ে করে, মনের খুশীর সাথে দুইজন, তিনজন, চারজন করে। এ পর্যায়ে তৃতীয় একটি কথাও বর্ণিত হয়েছে। তা শুবা সামাক-ইকরামা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, কুরায়শদের এক ব্যক্তির নিকট বহু সংখ্যক মেয়েলোক থাকত। তার নিকট ইয়াতীম মেয়েও ছিল। তখন তার মাল খরচ হতো। ফলে সে ইয়াতীমদের মালের প্রতি আকৃষ্ট হতো। তখন নাযিল হল ঃ 'তোমরা ইয়াতীমদের প্রতি সুবিচার-ন্যায়পরতা করতে পারবে না বলে যদি ভীত হয়ে পড়।'

দুই নাবালেগ ছেলেমেয়েকে বাপ-দাদা ছাড়া অন্যদের বিয়ে দেয়া সম্পর্কে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেছেন ঃ মীরাসের অংশ পায় এমন প্রত্যেক নিকটাত্মীয়ের পক্ষেই নিকটবর্তী ও তারপর নিকটবর্তীকে বিয়ে দেয়ার অধিকার ব্যবহার করা জায়েয। বিবাহদাতা যদি পিতা বা দাদা হয়, তাহলে পূর্ণবয়স্কতা লাভের পর তাদের সে বিয়ে রাখা-না রাখার ইখতিয়ার থাকবে না, তা মেনে নিতেই হবে। যদি পিতা বা দাদা ছাড়া বিয়েদাতা অন্য কেউ হয়, তাহলে পূর্ণ বয়স্কতা লাভের পর সে বিয়ে রক্ষা করা না-করার ইখতিয়ার থাকবে। ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদ বলেছেন, নাবালেগ ছেলে-মেয়েকে বিয়ে দিতে পারবে কেবল নিকটবর্তী বংশীয় লোকেরা। তাতে যে অধিক নিকটবর্তী সে আগে তারপরে অন্য অধিক নিকটবর্তী ব্যক্তি পারবে। আবূ ইউসুফ এ-ও বলেছেন, এরূপ বিয়ে হয়ে গেলে পূর্ণবয়স্কতা লাভের পর তা রাখা না-রাখার কোন ইখতিয়ার তাদের থাকবে না। ইমাম মুহাম্মাদ বলেছেন, পিতা ও দাদা ছাড়া আর যে-ই বিয়ে দিক, এই ইখতিয়ার তাদের অবশ্যই থাকবে। ইবনে অহব ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন, কোন ব্যক্তি তার নিকট পালিত ইয়াতীম ছেলে বা মেয়ের বিয়ে দিতে পারবে যদি সে সেই বিয়েতে তার কল্যাণ ও মঙ্গল মনে করে। নির্ভুল সুষ্ঠু বিবেচনায় তা হতে হবে। তবেই তা জায়েয হবে। ইবনুল কাসিম ইমাম মালিকের এ মত বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি তার ছোট বয়সের বোনকে বিয়ে দিলে তা জায়েয হবে না। অভিভাবক বিয়ে দিতে পারে, অভিভাবকরা বিয়ে দিতে জোরও প্রয়োগ করতে পারে। কেননা অভিভাবক ভিন্ন অভিভাবকের তুলনায় অধিক অধিকার সম্পন্ন। তা সত্ত্বেও পূর্বে স্বামীপ্রাপ্তা মেয়েলোকের সম্মতি ছাড়া তাকে কেউ বিয়ে দিতে পারে না। আর আল্লাহ্ তাকে তার নিজের ব্যাপারে যে ইখতিয়ার দিয়েছেন, তা থেকে তাকে বঞ্চিত করাও বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। অসী তার ছোট বয়সের ছেলে-মেয়ে বিয়ে দিতে পারে, কিন্তু বড় বয়সের মেয়েকে

তার সম্মতি ছাড়া বিয়ে দিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে ইমাম লায়স ইমাম মালিকের মতই গ্রহণ করেছেন। এমনিভাবে ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ ও রবীআ বলেছেন, অসী অধিক অধিকার সম্পন্ন। সওরী বলেছেন, চাচা বা ভাই ছোট বয়সের মেয়েকে বিয়ে দেবে না। অসীদের নিকট মাল এবং অভিভাবকের নিকট বিয়ে সোপর্দ হবে না। ইমাম আওয়াজী বলেছেন, ছোট বয়সের মেয়েকে পিতা ছাড়া আর কেউ বিয়ে দেবে না। হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, অসী অভিভাবক না হলে বিয়ে দেয়ার কাজ করবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ছোট বয়সের ছেলে বা মেয়েকে কেবল পিতা কিংবা দাদাই বিয়ে দিতে পারে, যদি পিতা না থাকে। ছোট বয়সের মেয়ের উপর অসীর কোন অভিভাবকত্ব নেই।

আবূ বকর আল-জাস্সাস বলেছেন, জরীর মুগীরা, ইবরাহীম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, উমর (রা) বলেছেন ঃ যার ক্রোড়ে পরিত্যক্ত সম্পত্তি আছে, তার উপর ঋণ থাকলে সে তা দিয়ে ঋণ শোধ করবে। তার নিকট বিবাহযোগ্য মেয়ে থাকলে তাকে অন্যের নিকট বিয়ে দেয়া তার কর্তব্য। আলী, ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর, জায়দ ইবনে সাবিত ও উম্মে সালমাতা (রা) এবং আল-হাসান, তায়ূস, আতা সর্বশেষ কথা হিসেবে বলেছেন ঃ ছোট বয়সের মেয়েকে বাপ-দাদা ছাড়া অন্যদের পক্ষে বিয়ে দেয়া জায়েয। হযরত ইবনে আব্বাস ও আয়েশা (রা) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় যা বর্ণিত হয়েছে, তা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। ইয়াতীম মেয়ে সম্পর্কেও এ কথা। যদি কোন ইয়াতীম মেয়ে তার অভিভাবকের ক্রোড়ে থাকে এবং সে তার ধন-মাল ও রূপ-সৌন্দর্য দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তার মহরানা দেয়ায় সুবিচার না করে, তাহলে এ মেয়েকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন অথবা মহরানার ব্যাপারে তাদের প্রচলনে পৌঁছতে বাধ্য হতে বলেছেন। তাঁদের দুজনের নিকট আয়াতের ব্যাখ্যা যখন এই, তাহলে তাঁদের দুজনের মত অনুযায়ী সে কাজ জায়েয হওয়াই প্রমাণিত হয়। আগেকালের কোন মনীষী তা করতে নিষেধ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আয়েশা (রা) আয়াতের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা আয়াতটি থেকেই প্রমাণিত হয়। কেননা তাঁরা দুজন বলেছেন, এ আয়াত ইয়াতীম মেয়ে সম্পর্কে, যে তার অভিভাবকের আশ্রয়ে লালিতা-পালিতা হয়। পরে সে অভিভাবকই সে মেয়ের ধন-মাল ও রূপ সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে বিয়ে করতে ইচ্ছুক হয়, কিন্তু তাকে মহরানা দেয়ার ব্যাপারে সুবিচার ও ন্যায়পরতা রক্ষা করে না। তাই তাদেরকে সেই মেয়েকে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর বিয়ে করলে তাকে মহরানা দেয়ায় সুবিচার ও ন্যায়পরতা রক্ষা করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। যে অভিভাবকের আশ্রয়ে ইয়াতীম মেয়ে লালিতা-পালিতা হয়, সেই হচ্ছে তার অধিক নিকটবর্তী অভিভাবক। চাচাতো ভাই-ও তাকে বিয়ে করতে পারে— তা জায়েয। তাহলে আয়াতে এ কথা শামিল রয়েছে যে, চাচাতো ভাইর আশ্রয়ে যে ইয়াতীম মেয়ে লালিতা-পালিতা হয়, সেই ভাইর পক্ষে সে মেয়েকে (চাচাতো বোনকে) বিয়ে করা জায়েয।

যদি প্রশ্ন তোলা হয়, আয়াতের এ ব্যাখ্যাকে সাঈদ ইবনে যুবায়র প্রমুখের ব্যাখ্যা অপেক্ষা উত্তম মনে করা হল কেন? অথচ আয়াতটির বহু কয়টি ব্যাখ্যার মধ্যে সেটিও একটি ব্যাখ্যা।

জবাবে বলা যাবে, দুটি ব্যাখ্যা একসাথে গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক কিছু নেই। কেননা আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ দুটিরই ধারক হতে পারে। এ ব্যাখ্যা দুটি পরস্পর বিরোধীও নয়। দুটি

এক বিন্দুতে একত্রিত হতে পারে। তা সত্ত্বেও হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, আয়াতটি এ বিষয়েই নাযিল হয়েছে। একথা শুধু চিন্তা করে মত নির্ধারণ করে বলা যায় না। তা বলা যায় 'তওকীফ'— শরীয়াতের নাযিল হওয়া পন্থায়। অতএব এ ব্যাপারটি সর্বোত্তম। কেননা তাঁরা দুজন আয়াতটির নাযিল হওয়ার কারণও বলেছেন। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে তা নাযিল হয়েছিল, তা-ও তাঁরা বলেছেন। অতএব তাঁদের ব্যাখ্যাই উত্তম হবে, তাতে আর সন্দেহ কি?

যদি বলা হয়, হতে পারে, এখানে দাদার কথা বলা হয়েছে, তাহলে জবাবে বলা হবে, তাঁরা দুজন বলেছেন, আয়াতটি নাযিল হয়েছে অভিভাবকের ক্রোড়ে লালিতা ইয়াতীম কন্যা সম্পর্কে, যাকে বিয়ে করার আগ্রহ অভিভাবকের মনে জেগেছে। আর দাদা সম্পর্কে একথা চিন্তাও করা যায় না। দাদা কি করে নাতনীকে বিয়ে করতে বা তার চিন্তা করতে পারে? ফলে আমরা জানতে বাধ্য হলাম যে, এ আয়াতে চাচার পুত্র— চাচাতো ভাই সম্পর্কেই বলা হয়েছে, সমস্ত অভিভাবকের মধ্যে যে অধিক দূরবর্তী, তার সম্পর্কে।

যদি বলা হয়, আয়াতটি বেশি বয়সের মেয়েলোক সম্পর্কে কথা বলছে। কেননা হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ লোকেরা এসে রাসূল (স)-এর নিকট ফতোয়া চেয়েছিল তাদের সম্পর্কে এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর। সেই ফতোয়া চাওয়ার জবাবে আল্লাহ্‌র তা'আলা নাযিল করলেন ঃ 'হে নবী! লোকেরা তোমার নিকট মেয়েলোকদের সম্পর্কে ফতোয়া জানতে চায়। তুমি বল, হ্যাঁ, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ ফতোয়া দিচ্ছেন, আর যা ইয়াতীম মেয়েদের সম্পর্কে কিতাবে পাঠ করা হয় .....।' অর্থাৎ 'তোমরা যদি ইয়াতীমদের প্রতি ন্যায়পরতা সুবিচার করতে পারবে না বলে ভীত হয়ে থাক ....' বলেছেন, যখন বলা হল ঃ 'মেয়ে ইয়াতীমদের ব্যাপারে' তখনই বোঝা গেল যে, এখানে বড় বয়সের মেয়েদের সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে, ছোট বয়সের মেয়েদের সম্পর্কে নয়। কেননা ছোট বয়সের বাচ্চা মেয়েদেরকে النساء 'মেয়েলোক' বলা হয় না।

জবাবে বলা যাবে, এরূপ বলা দুটি কারণে ভুল। একটি এই যে,, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'ইয়াতীমদের প্রতি তোমরা সুবিচার ন্যায়পরতা রক্ষা করতে পারবে না মনে করে যদি ভীত হয়ে থাক'— এর নিগূঢ় ও আসল তাৎপর্য দাবি করে সেই সব মেয়ে, যারা এখনও পূর্ণবয়স্কতা পায়নি। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন ঃ পূর্ণবয়স্কতা পাওয়ার পর কেউ ইয়াতীম থাকে না। কাজেই এ আসল ও প্রত্যেক্ষ তাৎপর্য বাদ দিয়ে পরোক্ষ তাৎপর্য গ্রহণ সঙ্গত হতে পারে না। অবশ্য তা করার কোন দলীল পাওয়া গেলে তা করা যেতে পারে, অন্যায় নয়। আর বেশি বয়সের মেয়েকে ইয়াতীম বলা হলে তা প্রকৃত ও আসল অর্থে নয় পরোক্ষ অর্থেই বলা চলে।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فِىْ يَتٰمَى النِّسَاءِ -

মেয়েলোক ইয়াতীমদের সম্পর্কে।

আয়াতে বড় বয়সের মেয়েদের সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে, তার কোন দলীল এ আয়াতাংশে

নেই। কেননা ইয়াতীম মেয়ে জাতির লোক হয়, তাহলে 'মেয়েলোক ইয়াতীম' সহজেই বলা যেতে পারে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ـ

তাহলে তোমরা বিয়ে কর যত সংখ্যক মেয়ে বিয়ে করতে তোমাদের মন ইচ্ছা করে। এতে ছোট বয়সের ও বড় বয়সের সব বয়সের মেয়েই শামিল।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ اٰبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ـ

তোমাদের পিতারা যেসব মেয়েলোক বিয়ে করেছে তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো না।
(সূরা নিসা ঃ ২২)

এখানেও ছোট বয়সের বা বড় বয়সের মেয়েদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। সবই সমানভাবে এর মধ্যে শামিল।

বলেছেন ঃ

وَاُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ـ

এবং তোমাদের স্ত্রীদের মারা। (সূরা নিসা ঃ ২৩)

এখানেও তাই। যদি ছোট বয়সের মেয়ে কেউ বিয়ে করে, তাহলে তার মা-ও বিয়ে করা চিরদিনের জন্যে হারাম হবে। কাজেই কোন আয়াতে যদি 'মেয়েলোকদের ইয়াতীম' বলা হয়ে থাকে, তাহলে তাতে এ প্রমাণ পাওয়া যাবে না যে, উক্ত আয়াতে কেবল বড় বয়সের ইয়াতীম মেয়েদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, ছোট বয়সের মেয়েদের সম্পর্কে বলা হয়নি।

আর দ্বিতীয় কারণ হল— হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আয়েশা (রা) আয়াতটির যে ব্যাখ্যা বলেছেন, তা বড় বয়সের মেয়েদের সম্পর্কে প্রয়োগযোগ্য নয়। কেননা বড় বয়সের মেয়েলোক যদি সমপরিমাণ মহারানার কম পরিমাণের মহারানায় বিয়ে করতে রাজী হয়, তাহলে সে বিয়ে সম্পূর্ণ জায়েয হবে। তার এ বিয়ের উপর কারোর আপত্তি করার বা বাধা দেয়ার কোন অধিকার নেই। অতএব মানতেই হবে যে, আলোচ্য আয়াতে ছোট বয়সের ইয়াতীম মেয়েদের সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। কেননা যার আশ্রয়ে সে লালিতা পালিতা সে তার বিয়েতেই হস্তক্ষেপ করতে পারে। একথা হাদীস থেকে প্রমাণিত, যা মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আবদুল্লাহ ইবনে আবূ বকর ইবনে হজম, আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস, আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ রাসূল (স) উম্মে সালমা (রা)-এর পুত্র সালমার নিকট হামযা (রা)-এর কন্যাকে বিয়ে দিয়েছিলেন, দুজনই ছোট বয়সের বালক-বালিকা ছিল। কিন্তু এ দুজন সারা জীবনেও একত্রিত হতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত দুজনই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ 'আমি কি সালমার মাকে বিয়ে করে সালমার প্রতিকার করতে পারলাম ?

আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে এ ঘটনায় দুটি দিক দিয়ে কারণ রয়েছে। একটি এই যে, নবী করীম (স) সে দুই বালক-বালিকাকে বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এ দুজনের কারোর পিতাও ছিলেন না, দাদাও ছিলেন না। বোঝা গেল, বাপ বা দাদা ছাড়া অন্য কারোর পক্ষে ছোট বালক বালিকাকে বিয়ে দেয়ার কাজ করা সম্পূর্ণ জায়েয। আর দ্বিতীয় এই যে, নবী করীম (স) এই কাজ যখন করেছিলেন, অথচ আল্লাহ্ বলেছেন ঃ اتَّبِعُوهُ। 'তোমরা তাঁকে অনুসরণ কর।' অতএব তাঁর অনুসরণ করা আমাদের কর্তব্য। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিচার কর্তার পক্ষে ছোট বয়সের ছেলেমেয়েকে বিয়ে দেয়া সম্পূর্ণ জায়েয। আর কাযী— বিচার কর্তার পক্ষে তা যখন জায়েয, তখন সব অভিভাবকের পক্ষেও তা জায়েয। কেননা অভিভাবকদের মধ্যে কোন পার্থক্য করার বা থাকার কথা কেউ-ই বলেন নি। নবী করীম (স)-এর কথা থেকেও তা প্রমাণিত হয়। তিনি বলেছেন ঃ لَانِكَاحَ اِلَّا بِوَلِىٍّ —'অভিভাবক ছাড়া বিয়ে শুদ্ধ হয় না।' তাই বিয়ে যদি 'ওলী'— অভিভাবকের মাধ্যমে হয় তাহলে বিয়ে প্রমাণিত— প্রতিষ্ঠিত হবে। আর ভাই ও চাচার পুত্র— চাচাতো ভাই-ও অভিভাবক। তার দলীল এই যে, মেয়ে যদি বেশি বয়সের হয় তাহলে বিয়েতে এরা অবশ্যই অভিভাবক হতে পারে। চিন্তা-বিবেচনার দিক দিয়েও তা ঠিক মনে হয়। কেননা সব শরীয়াতবিদ-ই এ ব্যাপারে একমত যে, পিতা ও দাদা যদি মীরাস প্রাপক না হয় কিংবা দুজনই কাফির বা ক্রীতদাস হয়, তাহলে তারা কেউ বিয়ে দেয়ার অভিভাবক হতে পারে না। বোঝা গেল— এ অীভভাবকত্ব মীরাস পাওয়ার অধিকারের ভিত্তিতে অর্জিত হয়। অতএব যে-ই মীরাস পাওয়ার অধিকারী, সে-ই বিয়ে দেয়ারও অধিকারী। তবে তাতে সর্বাধিক নিকটবর্তী তারমত্য হবে। এ কারণেই ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেনঃ মা ও সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন মনিব (مولى الموالاة) বিয়ে দিতে পারে, যদি তাদের অপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী অভিভাবক কেউ না থাকে। কেননা ওরাও মীরাস পায়।

যদি বলা হয়, বিয়েতে তো ধন-মালের ব্যাপার রয়েছে। তখন ধন-মালে যে লোক হস্তক্ষেপ করতে পারে না, তার বিয়ের আকদ করানো জায়েয হয় না।

জবাবে বলা যাবে, বিয়েতে মহরানার কথা না বললেও তার পরিমাণ নির্দিষ্ট না হলেও তা স্বতঃই নির্ধারিত হয়ে যায়। কাজেই ধন-মালেও হস্তক্ষেপ করার অধিকারের ভিত্তিতে বিয়ে দেয়ার অভিভাবকত্ব প্রমাণিত হতে পারে না। দেখ না, যাঁর মত হলো অভিভাবক ছাড়া বিয়ে জায়েয হয় না, সেখানেও অভিভাবকদের জন্যেই বিয়ে দেয়া জায়েয— এর অধিকার তাদের আছে। কিন্তু বড় বয়সের মেয়ের ধন-মালে তাদের কোন কর্তৃত্ব (ولاية) থাকে না। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ীর জন্যে কর্তব্য হয় যে, তাঁরা দুজন বড় বয়সের কুমারী কন্যাকে পিতার বিয়ে দেয়াকে জায়েয মনে করবেন না। কেননা সে মেয়ের ধন-মালে তার কোন অভিভাবকত্ব চলে না। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ীর মতেও যখন পিতার পক্ষে তার বড় বয়সের মেয়েকে বিয়ে দেয়া জায়েয, তার সম্মতি বা অনুমতি ছাড়াই অথচ ধন-মালের দিক দিয়ে তার উপর পিতার অভিভাবকত্ব মোটেই চলে না। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, বিয়ে অনুষ্ঠানের অভিভাবকত্ব লাভে ধন-মালে হস্তক্ষেপের জায়েয হওয়ার প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবাস্তব।

আমরা এখানে যা বললাম আয়াতের প্রমাণ হিসেবে যে, ছোট বয়সের মেয়েকে নিজ থেকেই বিয়ে দেয়া অভিভাবকের পক্ষে জায়েয, তা প্রমাণ করে যে, বড় বয়সের মেয়ের অভিভাবকের

জন্যে সে মেয়ের সম্মতি অনুমতিতে নিজ থেকে বিয়ে দেয়া অবশ্যই জায়েয হবে। এ থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, স্বামী ও স্ত্রীর বিয়ের আকদকারী এক ব্যক্তিও হতে পারে। পারে এ ভাবে যে, সেই এক ব্যক্তি উভয়ের উকীল হবে, যেমন ছোট বয়সের মেয়ের অভিভাবক নিজ থেকেই তাকে বিয়ে দেবে— সে হবে বিয়ের প্রস্তাবক, পরে সে নিজেই ছেলের উকীল হিসেবে তা কবুল করে নেবে বা সেই একজনই প্রস্তাবক ও প্রস্তাব গ্রহণকারী হবে। এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, দুইজন ছোট বয়সের ছেলে-মেয়ের অভিভাবক নিজেই উভয়কে পরস্পরের সাথে বিয়ে দিয়ে দেবে। আলোচ্য আয়াতটি এই সব দিক দিয়েই প্রমাণ করে যে, ইমাম শাফেয়ীর এ মত বাতিল যে, ছোট বয়সের মেয়েকে তার বাবা বা দাদা-ই বিয়ে দেবে, তাদের ছাড়া অন্য কেউ বিয়ে দিতে পারে না। তিনি যে বলেছেন, বড় বয়সের মেয়ের অভিভাবক মেয়ের সম্মতিক্রমে তার অনুপস্থিতিতে বিয়ে দিতে পারে না, একথাও সহীহ্ নয়। একই ব্যক্তি উভয়ের উকীল হয়ে উভয়ের পারস্পরিক বিয়ে সম্পন্ন করবে, তা জায়েয নয় বলে যে মত প্রকাশ করেছেন, তাও বাতিল।

আমাদের হানাফী মাযহাবের ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, ছোট বয়সের মেয়েকে 'অসী'র বিয়ে দেয়া জায়েয নয়, তা রাসূল (স)-এর হাদীস থেকে প্রমাণিত। কেননা তিনি বলেছেন ঃ অভিভাবক ছাড়া বিয়ে হয় না। আর 'অসী' অভিভাবক (ওলী) নয়।

আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰنًا -

যে লোক জুলুমে নিহত হবে, তার অভিভাবকের জন্যে আমরা কর্তৃত্ব বানিয়ে দিয়েছি।
(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৩)

এখন এ হত্যার বদলে যদি শাস্তি প্রদান করারই সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে 'অসী' তার অভিভাবক হতে পারবে না। সে অভিভাবকত্ব পাওয়ার অধিকারীও হবে না। বোঝা গেল—'অসী' কে অভিভাবক কখনই বলা যাবে না। অতএব 'অসী'র পক্ষে ছোট বয়সের মেয়েকে বিয়ে দেয়া জায়েয নয়। কেননা সে তার অভিভাবক নয়।

যদি বলা হয়, এরূপ অবস্থায় ভাই বা চাচার পুত্রের-ও ছোট বয়সের মেয়ের অভিভাবক হওয়ার অধিকারী হওয়া উচিত নয়। কেননা তারা দুজন কিসাসের ক্ষেত্রে অভিভাবকত্ব পায় না।

জবাবে বলা যাবে, কিসাসে অভিভাবকত্ব না পাওয়াকে আমরা 'ইল্লাত' বা কারণ বানাই নাই। ফলে উক্ত কথা আমাদের ব্যাপারে খাটে না। আমরা বলেছি, 'অভিভাবক' নামটি 'অসী'র জন্যে ব্যবহার করা যায় না। তার উপর তা খাটেও না। এ কারণে সে ধনমালে হস্তক্ষেপ করার অধিকারী হয়। তবে ভাই ও চাচার পুত্র— তারা দুজন অভিভাবক। কেননা তারা আসাবা— বংশীয় লোক হিসেবে এক। তার আসাবার ক্ষেত্রে 'অভিভাবক' শব্দের ব্যবহার নিষিদ্ধ নয়।

আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَّرَائِى -

আমার পরে আমার ভাই-বন্ধুদের দুষ্কৃতির ভয় আমি করি। (সূরা মারিয়াম ঃ ৫)

জবাবে বলা যাবে, কথাটি বলে তাঁর চাচার বংশ ও 'আসাবা' গণকে বুঝিয়েছেন। বোঝা গেল, 'আসাবাদের প্রসঙ্গে 'অভিভাবক' নামটি ব্যবহার করা চলে। কিন্তু 'অসী'র জন্যে তা ব্যবহার করা যায় না। তাই নবী করীম (স) যখন বললেন ঃ 'অভিভাবক ছাড়া বিয়ে হয় না,' তখন এই কথার দ্বারাই অসীর পক্ষে ছোট বয়সের মেয়ে বিয়ে দেয়া না-জায়েয ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা সে অভিভাবক নয়।

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا (وَفِىْ لفظ اخر) بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -

যে মেয়েলোক তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত (অপর হাদীসের ভাষায়) তার মাওয়ালীর অনুমতি ব্যতীত বিয়ে করবে, তার বিয়ে বাতিল গণ্য হবে।

ফলে পাগলিনী ও বড় বয়সের কুমারী কন্যাকে যদি 'অসী' বিয়ে দেয় কিংবা তার অসীর অনুমতিক্রমে অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত— বিয়ে করে, তাহলে তার বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে। কেননা নবী করীম (স) অভিভাবকের অভিমত ব্যতীত বিয়ে করলে সে বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত করেছেন।

তাছাড়া বিয়েতে এই অভিভাবকত্ব লাভের অধিকারী হয় মীরাসের কারণে। এর দলীল আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। আর অসী তো মীরাস পায় না। তাই তার অভিভাবকত্ব হতে পারে না।

উপরন্তু যে কারণে বিয়েতে অভিভাবকত্ব পাওয়া যায়, তা হল বংশীয় সম্পর্ক। তাতে তো কোন হস্তান্তর যোগ্যতা নেই। অসী তা পেতে পারে না। কেননা যে কারণে অভিভাবকত্ব পাওয়া যায়, তা এখানে অনুপস্থিত। মৃত্যুর পর ধন-মালে হস্তক্ষেপ বিয়েতে হস্তক্ষেপ ও ক্ষমতা চালানোর মত নয়। কেননা ধন-মালে হস্তান্তর স্বাভাবিক ও সহীহ, কিন্তু বিয়েতে স্বামী স্ত্রী ছাড়া অন্য কারুর দিকে হস্তান্তর সহীহ্ নয়। এই কারণেও অসী বিয়েতে অভিভাবকত্ব পেতে পারে না। অসী পিতার জীবদ্দশায় উকীলের মতও নয়। কেননা উকীল হস্তক্ষেপ করে মুয়াক্কিলের আদেশে। আর তার আদেশ তো অবশিষ্ট থাকে। কেননা তার হস্তক্ষেপ বৈধ। আর যাতে হস্তান্তর সহীহ্ নয়, মৃতের আদেশ তাতে নিঃশেষ হয়ে যায়। হস্তান্তর সহীহ্ হয় না বিবাহে। তাই উকীল ও 'অসী' এক নয়, ভিন্ন ভিন্ন।

যদি বলা হয়, তোমাদের মতে শাসকও দুই অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়ের বিয়ে দেয়ার কাজ সম্পন্ন করতে পারে। অথচ সে মীরাস পায় না। আর অভিভাবকত্ব পাওয়া যায় বংশীয় নৈকট্যের কারণে।

জবাবে বলা যাবে, শাসক মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী, যাতে সে হস্তক্ষেপ করতে পারে। আর মুসলিম সমাজ তো এই ছোট বয়সের ছেলেমেয়ের মীরাসের অধিকারী। আর তা অবশিষ্ট থেকেই যায়। অতএব তা অভিভাবকত্ব পেতে পারে, যেন তা তাদের জন্যে উকীল। আর তারা তার মীরাস পাওয়া লোকদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তাতে কেউ মরে গেলে এবং বংশের দিক দিয়ে তার উত্তরাধিকারী কেউ না থাকলে মুসলমানরাই তার মীরাস পাবে।

আলোচ্য আয়াতে এ কথারও প্রমাণ রয়েছে যে, পিতার জন্যে তার ছোট বয়সের কন্যাকে বিয়ে দেয়ার অধিকার আছে এ হিসেবে যে, সমস্ত অভিভাবকের জন্যেই তা জায়েয। আর পিতা তাদের সকলের তুলনায় অতি নিকটবর্তী অভিভাবক। আর বিভিন্ন দেশের আগের ও পরবর্তীকালের ফিকাহবিদদের মধ্যে তার জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য আছে বলে আমরা জানি না। তবে বশর ইবনুল অলীদ শিবরামাতা থেকে বর্ণনা প্রচার করেছেন যে, ছোট বয়সের ছেলেমেয়েকে বিয়ে দেয়া পিতার জন্যেও জায়েয নয়। এটা আল-আস্সাম-এর মাযহাব। এ মাযহাব যে বাতিল, তা আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি। তাছাড়া এ আয়াতটিও এ মাযহাবের বাতুলতা প্রমাণ করে ঃ

وَالّٰئِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآءِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰئِى لَمْ يَحِضْنَ -

তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা হায়য হওয়া থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে তোমরা সন্দিহান হয়ে পড়লে, তাহলে তাদের ইদ্দত তিন মাসকাল ধরবে। এ নিয়ম তাদের জন্যেও, যাদের এখনও হায়য আসতে শুরু করেনি। (সূরা তালাক ঃ ৪)

অতএব হায়য হয়নি— এমন অল্প বয়সী মেয়েকে তালাক দেয়া সহীহ্ হবে। আর তালাক তো সহীহ্ বিয়ের ক্ষেত্রেই হতে পারে। তাই আয়াতের এ তাৎপর্য রয়েছে যে, অল্প বয়সী মেয়েকে বিয়ে দেয়া সম্পূর্ণ জায়েয। তাছাড়া বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে, রাসূলে করীম (স) হযরত আয়েশা (রা)-কে বিয়ে করেছিলেন যখন তাঁর বয়স মাত্র ছয় বছর। তাঁর পিতা হযরত আবূ বকর (রা)-ই তাঁকে বিয়ে দিয়েছিলেন। এ ঘটনার দুটি তাৎপর্য। একটি, ছোট বয়সের মেয়েকে তার পিতা বিয়ে দিতে পারে— সম্পূর্ণ জায়েয। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, এই ছোট বয়সের মেয়ে পূর্ণবয়স্কা হয়ে সে বিয়ে রাখা-না-রাখার অধিকারিণী হবে না। তা বাধ্যতামূলক। কেননা নবী করীম (স) পূর্ণবয়স্কতা লাভের পর তাঁকে সে ইখতিয়ার দেন নি।

আল্লাহ্র কথা ঃ

مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ -

যত সংখ্যক মেয়ে তোমাদের ইচ্ছা হয় .....

মুজাহিদ এর অর্থ বলেছেন ঃ তোমরা বিয়ে কর পবিত্র-পরিশুদ্ধ বিয়ে। আর হযরত আয়েশা (রা), আল-হাসান ও আবূ মালিক এর অর্থ বলেছেন ঃ যা তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে। ফরা বলেছেন ঃ مَاطَابَ বলে আল্লাহ যেন বলেছেন ঃ তোমরা পবিত্র পরিশুদ্ধ অর্থাৎ

হালাল মেয়েলোক বিয়ে কর। বলেছেন, এ কারণেই এখানে ما 'যা' বলা হয়েছে مَنْ 'যাকে' বলা হয়নি।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ দুই দুই, তিন তিন, চার চার। অর্থাৎ দুইজনকে বা তিনজনকে অথবা চারজনকে— যা-ই চাও এক সঙ্গে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে পার। যে এ সংখ্যক স্ত্রী একসাথে রাখতে চাইবে, সে তা রাখতে পারবে। বলেছেন, যদি সুবিচার ও ন্যায়পরতা রক্ষা করতে না-পারার আশংকা হয়, তাহলে চারজনের কম তিনজন, তবু ভয় হলে দুইজন আর তা-ও একসঙ্গে রাখতে ও ন্যায়বিচার না করার ভয় পেলে একজনেই সীমিত রাখবে।

বলা হয়েছে, আয়াতে واو 'ওয়াও' অক্ষরটি او বা অর্থ দিচ্ছে। যেন বলা হয়েছে ঃ হয় দুজন, না হয় তিনজন আর না হয় চারজন। অবশ্য এ কথাও বলা হয়েছে যে, 'ওয়াও' অক্ষরটি এখানে তার আসল অর্থ 'এবং'ই দিচ্ছে; কিন্তু তা বিকল্প হিসেবে। যেন বলা হয়েছে ঃ তিনজন দুজনের বদলে, চারজন তিনজনের বদলে। এ সংখ্যাগুলোর যোগফল— অর্থাৎ নয়জন— এর অর্থ নয়। যার এই মত তিনি বলেছেন, এখানে যদি واو -এর পরিবর্তে او "আও' বলা হতো, তাহলে দুজন স্ত্রীর স্বামীর জন্যে তিনজন এবং চারজন বিয়ে করা নাজায়েয হতো। তাই واو ওয়াও ব্যবহারে একজন স্বামীর পক্ষে চারজন স্ত্রী গ্রহণ জায়েয হয়ে গেল। এরা তারাই, যাদের লক্ষ্য করে এই কথাটি বলা হয়েছে। উপরন্তু দুই তিনের এবং তিন চারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। ফলে এ অর্থ হতে পারল না যে, প্রত্যেকের জন্যে এ সংখ্যা সমষ্টি একত্রিত করা জায়েয। কেননা তাহলে স্ত্রীদের জায়েয মোট সংখ্যা হয়ে দাঁড়াত নয়। কথার এই ধরনটি ঠিক এরূপ, যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ لْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ۗ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ - وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا ........ وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا فِىْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ -

বল তোমরা কি এ মনোভাব পোষণ কর যে, তোমরা কুফরী করবে সেই মহান সত্তার প্রতি, যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে, আর তোমরা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বানাবে? অথচ সারেজাহানের রব্ব তো তিনি-ই আর তিনিই পৃথিবীর উপরিভাগে উচুঁ উচুঁ পর্বতমালা দাঁড় করে দিয়েছেন এবং তিনিই পৃথিবীতে চারদিনে তার খাদ্য খোরাক পরিমিত করে রেখেছেন? (সূরা হা-মীম-সাজদাহ ঃ ৯-১০)

আয়াত শেষে যে চারদিনের উল্লেখ করা হয়েছে তারই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে শুরুতে উল্লেখ করা দুই দিন। পরে বলেছেন ঃ

فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ -

পরে তা পূর্ণ পরিণত করেছেন সপ্ত আকাশে দুই দিন সময়ে।(সূরা হা-মীম-সাজদাহ ঃ ১২)

এরূপ তাৎপর্য গ্রহণ করা না হলেও আলাদা আলাদাভাবে দিন গুণলে মোট আট দিন হয়ে যায়। কিন্তু এ তো জানা কথা যে, মোট আট দিন নয়; বরং মাত্র ছয় দিন। যেমন আল্লাহ্ স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন ঃ

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ -

আল্লাহ্ আসমান ও জমিনকে মাত্র ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা 'আরাফ ঃ ৫৪)

অনুরূপভাবে مثنى দুই ثلث তিনের মধ্যে এবং ثلاث তিন رباع চার-এর মধ্যে গণ্য। ফলে এ আয়াত মাত্র চারজন স্ত্রী একসাথে মুবাহ করেছেন, এর অধিক নয়। এ সংখ্যার স্ত্রী কেবল মুক্ত-স্বাধীন লোকদের জন্যে একসাথে মুবাহ, ক্রীতদাসদের জন্যে নয়। হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদ এবং সওরী, লায়স ও ইমাম শাফেয়ীর এ মত। ইমাম মালিক বলেছেন— ক্রীতদাস ও চারজন স্ত্রী এক সাথে রাখতে পারে। কিন্তু আমাদের মতের দলীল হল, আলোচ্য আয়াত স্বাধীন মুক্ত মানুষের জন্যে নাযিল হয়েছে, ক্রীতদাসদের জন্যে নয়। কেননা শুরুতে রয়েছে ঃ فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ 'অতএব তোমরা বিয়ে কর তোমাদের মনে খুশি অনুযায়ী। এ কথা তো বিশেষভাবে স্বাধীন-মুক্ত মানুষদের জন্যেই হতে পারে— ক্রীতদাসদের জন্যে নয়। তারা নিজেরা বিয়ের আকদ করতে পারে না— এ ব্যাপারে সব ফিকাহবিদ-ই সম্পূর্ণ একমত। ক্রীতদাসরা মনিবের অনুমতি ছাড়া বিয়েই করতে পারে না, মনিব-ই তাদের বিয়ের আক্‌দ করার মালিক হতে পারে নিজ থেকেই। কেননা মনিব যদি তাদেরকে বিয়ে দেয়, তাতে তারা রাজী না হলেও বিয়ে জায়েয হয়ে যাবে। আর তারা মানিবের অনুমতি ছাড়াই বিয়ে করলে সে বিয়ে জায়েয হবে না।

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَاهِرٌ -

যে ক্রীতদাস-ই তার মনিবের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে করবে, সে হবে ব্যভিচারী।

আর আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ -

আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেছেন এ কথা যে, একজন ক্রীতদাস, সে কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না। (সূরা নহল ঃ ৭৫)

কাজেই ক্রীতদাস যখন বিয়ে করার নিজেই অধিকারী নয়, তখন উক্ত আয়াতে তাদেরকে সম্বোধন করেও তাদের জন্যে কথা বলা হয়নি, তা নিঃসন্দেহ। অতএব আয়াতটি কেবলমাত্র স্বাধীন-মুক্ত লোকদের জন্যেই প্রয়োগীয়। ক্রীতদাসদের বিয়ে করার অধিকার ত্রুটিপূর্ণ। যেমন তালাক ও ইদ্দতও ত্রুটিপূর্ণ। বিয়ে করার তাদের অধিকার অর্ধেক, তখন স্বাধীন লোকদের জন্যে জায়েয সংখ্যার অর্ধেক তাদের জন্যে জায়েয হতে পারে— ছয়জন সাহাবী থেকে এ কথা বর্ণিত যে, ক্রীতদাস খুব বেশির পক্ষে মাত্র দুইজন স্ত্রী একসঙ্গে রাখতে পারে, তার অধিক নয়। তাঁদের মত লোকদের কারুর দিক থেকে এর বিপরীত মত বর্ণিত হয়নি— যতটা আমরা

জানি। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার আবদুল্লাহ্ ইবনে উতবা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন ঃ

يَنْكِحُ الْعَبْدُ اِثْنَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ اِثْنَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ الْاَمَةُ حَيْضَتَيْنِ ، فَاِنْ لَمْ تَحِضْ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ -

ক্রীতদাস দুজন স্ত্রী একসঙ্গে রাখতে পারে, তালাক দিতে পারে মাত্র দুইবার এবং ইদ্দত পালন করবে মাত্র দুই হায়য কাল। যদি হায়য না হয়, তাহলে তার ইদ্দতের মিয়াদ মাত্র দেড় মাস।

আল-হাসান ও ইবনে সিরীন উমর ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ ক্রীতদাসের জন্যে একসাথে দুজনের অধিক স্ত্রী রাখা জায়েয নয়। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী (রা) বলেছেন ঃ 'ক্রীতদাসের পক্ষে দুজনের অধিক স্ত্রী একসাথে রাখা জায়েয নয়।' হাম্মাদ ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন, উমর ও আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন ঃ 'ক্রীতদাস একসাথে দুজনের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করবে না।' শুবা আল-হিকাম, আল-ফযল ইবনে আব্বাস সূত্রে বলেছেন ঃ ক্রীতদাস মাত্র দুজন স্ত্রী রাখবে। ইবনে সীরীন বলেছেন— হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে জানে ক্রীতদাসের জন্যে কয়জন স্ত্রী একসাথে রাখা জায়েয ? আনসার বংশের একজন বললেন ঃ 'আমি জানি'। উমর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'কয়জন ?' লোকটি বলল ঃ দুজন। এ কথা শুনে তিনি চুপ হয়ে গেলেন। উমর (রা) যার সাথে পরামর্শ করতেন, তার কথা শুনে তিনি সন্তুষ্ট হলেন। বাহ্যিকভাবে মনে হয়— তিনি একজন সাহাবী ছিলেন। লায়স আল-হিকাম থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ নবী করীম (স)-এর সাহাবীগণ এ বিষয়ে একমত যে, ক্রীতদাস দুজনের বেশি স্ত্রী একত্র করবে না। ফলে আমাদের মতের সত্যতা সাহাবী-ইমামগণের ঐকমত্যে প্রমাণিত হল। কাজেই এর বিপরীত মত যিনিই গ্রহণ করবেন, তিনি সাহাবীদের ইজমার বিপরীত মত গ্রহণ করেছেন বলে আখ্যায়িত হবেন। আল হাসান, ইবরাহীম, ইবনে সীরীন, আতা, শবী প্রমুখ প্রখ্যাত ফিকাহবিদও আমাদের সিদ্ধান্তই বর্ণনা ও গ্রহণ করেছেন।

যদি বলা হয়, ইয়াহ্ইয়া ইবনে হামজাহ আবূ অহব আবূদ দারদা সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ ক্রীতদাস চারজন স্ত্রী এক সময়ে রাখতে পারে। মুজাহিদ, আল-কাসিম, সালিম, রবীআতা-আররায়ও এই মতই প্রকাশ করেছেন।

এর জবাবে বলা যাবে, আবুদ্দারদা বর্ণিত হাদীসের সনদে অজ্ঞাত পরিচয় একজন ব্যক্তি রয়েছে, সে হল আবূ অহব। এ হাদীস যদি সহীহ্ প্রমাণিত হয়ও, তা সত্ত্বেও বলব, কিফাহ্র যে ইমামগণের নাম আমরা উপরে উল্লেখ করেছি, তাদের বিপরীত মত গ্রহণ না করাই বাঞ্ছনীয়। তাঁদের সে মত সর্বজনজ্ঞাত ও সর্বপরিচিত। তাবেয়ী ফিকাহবিদদের মধ্যের অতীব সম্মানার্হ আল-হিকাম রাসূলের সাহাবিগণের ইজমা হওয়ার কথার উল্লেখ করেছেন এই মতের উপর যে, ক্রীতদাস দুজনের অধিক স্ত্রী এক সময়ে রাখতে পারবে না।

আল্লাহ্ কথা ঃ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً —'আর তোমরা যদি ভীত হও এজন্যে যে, তোমরা সুবিচার, ন্যায়পরতা, নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে মাত্র একজন স্ত্রী গ্রহণ করবে।' এর অর্থ হল জীবনোপকরণ ও দিন-সময় বন্টনে তাদের মধ্যে যদি নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে না পার। কেননা অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ -

তোমরা একাধিক স্ত্রীর মধ্যে ন্যায়পরতা নিরপেক্ষতা বহাল রাখতে পারবে না সে জন্যে খুব আগ্রহী হলেও। তাই নির্দেশ হল, কোন একজনের প্রতি পূর্ণ মাত্রায় ঝুঁকে পড়বে না।

'ঝুঁকে পড়া' বলতে মনে ঝুঁকে পড়া বুঝিয়েছেন। আর ন্যায়পরতা-নিরপেক্ষতা বলতে তা যতটা সম্ভব— যতটা সাধ্যে কুলায়, ততটাই বোঝানো হয়েছে। আর যে ভয়ের কথা বলা হয়েছে, তা হল— কার্যত ঝোঁক প্রকাশ। এ কারণে আল্লাহ্ একজন স্ত্রী গ্রহণে সীমিত থাকতে আদেশ করেছেন, যখন ভয় হবে ঝোঁক প্রকাশের ও পক্ষপাতিত্বের জুলুম করার এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে না পারার।

পূর্বে বিয়ের আকদ্ করার মুবাহ সংখ্যার উল্লেখের পর বলা হয়েছে ঃ

اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -

অথবা যার তোমাদের দক্ষিণ হস্ত মালিক হয়েছে .....

এখানে সরাসরি ও প্রত্যক্ষ কথা বলা হয়েছে। তার বাহ্যিক তাৎপর্য হল, চার জনের দেয়া ইখতিয়ারকে স্বাধীনা নারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ। এ ছাড়াও চারজন দাসী বিয়ে করা। তাতে স্বাধীনা ও দাসী বিয়ে করার মধ্যে ইখতিয়ারকে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। কেনন আল্লাহ্র কথা اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ কথাটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্য নয়; বরং তা পূর্ব কথার জের। তাতে যে উপমা (ضمير) রয়েছে, তা গুরুত্বহীন নয়, মূল বাণীর সম্বোধনের মধ্যেই তা শামিল। স্বতন্ত্রভাবে কোন দলীল না পাওয়া গেলে পূর্বের দিকে ইঙ্গিতবহ কোন উপনাম আছে বলে ধরে নিতে পারি না। তাহলে এ আয়াতাংশের অর্থ আমরা এই করতে পারি না যে, চারজন বিয়ে করার পর দাসীদের যৌন সম্ভোগের কথা বলা হয়েছে শুধু। তাই এর তাৎপর্য এ ধরা যাবে না যে, তোমাদের জন্যে ক্রীতদাসীদের সাথে যৌন সম্ভোগের উল্লেখ পর্যন্ত নেই। বরং সেখানে বিয়ের আক্দ করার কথা বলা আছে। যেহেতু 'তোমরা বিয়ে কর যা তোমাদের মন চায়' আয়াতের শুরুর এ কথার অর্থ যে বিয়ের আকদ করা, সে বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। অতএব 'অথবা তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যার মালিক হয়েছে' এর পূর্ব কথার সাথে ধারাবাহিকতাপূর্ণ অর্থ হল ঃ 'অথবা তোমরা বিয়ে কর যা তোমাদের দক্ষিণ হস্ত মালিক হয়েছে'— অর্থাৎ দাসী। এ বিয়েও আকদ-এর মাধ্যমে হবে। উপনামও সেই আকদ-এর দিকে ইঙ্গিতকারী, যৌন সম্ভোগ নয়।

যদি বলা হয় 'নিকাহ' শব্দের অর্থ 'যৌন-সম্ভোগ' যখন সহীহ্ হতে পারে, এর পর বলা 'অথবা যার তোমাদের দক্ষিণ হস্ত মালিক হয়েছে'-এর অর্থ দাঁড়াবে ঃ 'পরন্তু তোমরা বিয়ে কর

যার মালিক হয়েছে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত'। এখানেই তার অর্থ যৌন সম্ভোগ হতে পারে, যদিও আয়াতের শুরুতে তার অর্থ 'বিয়ের আকদ'।

এর জবাবে বলা যাবে, একথা সঙ্গত নয়। কেননা আয়াতের প্রাথমিক সম্বোধনে উপনামের উল্লেখ রয়েছে, তাই তা-ই এখানেও হওয়া আবশ্যক। এর অর্থ হবে, পূর্বে উল্লিখিত বিয়ে বলতে যদি আকদ ধরা হয়, তাহলে যেন বলা হয়েছে ঃ অতএব তোমরা বিয়ের আক্দ কর, যা তোমাদের মন চায় .... দক্ষিণ হস্তের মালিকানায় উপনাম ধরা হলে তার ইঙ্গিত হবে আক্দ-এর দিকে। কেননা এখানে তাৎপর্যের দিক দিয়ে যৌন-সম্ভোগ মনে করা সঙ্গত হবে না। শব্দের দিক দিয়েও নয়। অতএব এখানে যৌন-সম্ভোগ উহ্য মনে করার কোন বৈধতা নেই, যদিও 'নিকাহ্' কথাটির মধ্যেই তা রয়েছে। অপর দিক দিয়ে বলা যায়, শুরুতে 'নিকাহ্' শব্দের উল্লেখের পর আর তার উল্লেখ নেই, আর এটাও প্রমাণিত যে, এর অর্থ 'আকদ', তাই সে শব্দের ইঙ্গিত সরাসরি হওয়া উচিত নয় যৌন সম্ভোগের দিকে। কেননা একটি শব্দের প্রত্যক্ষ ও প্রকৃত অর্থ যেমন হতে পারে, তেমনি হতে পারে পরোক্ষ অর্থ-ও। দুটির যে কোন একটি অর্থকে শব্দ অবশ্যই ধারণ করবে, একটি পরোক্ষ আর অপরটি প্রকৃত। আর একটি শব্দ এই দুটিকেই ধারণ করেব— তা সঙ্গত নয়। তাই আয়াতের শুরুতে যে আক্দে নিকাহর কথা বলা হয়েছে, তা-ই লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক।

যদি বলা হয়, আয়াতে যাদের প্রতি সম্বোধন, তাদের সাথে দক্ষিণ হস্তের মালিকানা যুক্ত করা ও আক্দ ছাড়া শুধু যৌন-সম্ভোগ বোঝানো, যখন জানাই আছে যে, দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্তদের সাথে বিয়ে সম্পাদন অসম্ভব, তখন আমরা জানতে পারি, এখানে যৌন সম্ভোগের কথাই বলা হয়েছে, বিয়ের আক্দ-এর কথা নয়।

জবাবে বলা যাবে, দক্ষিণ হস্তের মালিকানাকে সমষ্টির সাথে যুক্ত করা হয়েছে, তখন তার অর্থ হবে, দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্তদেরকে অন্যের নিকট বিয়ে দেয়ার কথা বলাই লক্ষ্য।

যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ -

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার— সংরক্ষিতা মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য অর্জনের অসমর্থ হবে, তাহলে তোমাদের দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্ত ঈমানদার যুবতীদের মধ্যে থেকে (বিয়ে করবে) (সূরা নিসা ঃ ২৫)

এ আয়াতে দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্তদের সাথে বিয়ের আকদ করার কথা বলা হয়েছে। আয়াতের সম্বোধন সকলের দিকে, অপরের মালিকানাভুক্তকে বিয়ে করা মুবাহ হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্র এই কথা ঃ অথবা যার মালিক হয়েছে তোমাদের দক্ষিণ হস্তটিও তেমনি উক্ত অর্থেরই ধারক। তাই মূল সম্বোধনে যার উল্লেখ নেই,তা মনে করানোর দলীল যখন নেই, তাই পূর্বে যার উল্লেখ রয়েছে, তা-ই মনে করতে হবে পরবর্তীতেও। আর তা হচ্ছে বিয়ের 'আকদ'। আমরা এই যা বললাম, তাতে স্বাধীনা নারী ও ক্রীতদাসী বিয়ে করার ইখতিয়ার দেয়ার

দলীলই স্পষ্ট হয়ে উঠে— তার জন্যে, যে স্বাধীনা নারী বিয়ে করার সামর্থ্যের অধিকারী নয়। কেননা ইখতিয়ার তো দেয়া হয় দুটি সম্ভাব্য কাজের মধ্যে কোন একটি গ্রহণের। তাই আলোচ্য আয়াত স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ক্রীতদাসী বিয়ে করা জায়েয হওয়ার প্রমাণ হয়ে দাঁড়াল দুটি দিক দিয়ে। একটি সাধারণভাবে বলা ঃ 'যে মেয়েলোকই তোমাদের মন চায় তাই বিয়ে কর, এ কথা স্বাধীন ও ক্রীতদাসী সবাইকে শামিল করে। কেননা এখানে النساء। মেয়েলোক বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয়, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'অথবা যার মালিক হয়েছে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত'। এ কথায় ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে, স্বাধীনা নারী ও ক্রীতদাসী বিয়ে করার মধ্যে।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ -

এবং নিশ্চয়ই ঈমানদার ক্রীতদাসী মুশরিক মেয়ে অপেক্ষা অতীব কল্যাণবহ।
(সূরা বাকারাহ ঃ ২২১)

এর তাৎপর্য আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি সূরা আল-বাকারার ব্যাখ্যায়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكَ اَنْ تَبْتَغُوا بِاَمْوَالِكُمْ -

তাদের বাইরে যারা আছে, তোমরা তোমাদের ধন-মাল দিয়ে তাদের পেতে চাইবে, তা তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে। (সূরা নিসা ঃ ২৪)

এ কথাও তা-ই প্রমাণ করে। এ উভয় আয়াতই স্বাধীনা ও ক্রীতদাসী সবাইকেই শামিল করে সাধারণভাবে। এসব কথাকে বিশেষ অর্থে কারোর জন্যে নির্দিষ্ট করা জায়েয হতে পারে না— যতক্ষণ না তার কোন দলীল পাওয়া যায়।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعُولُوا -

তোমরা কোন একদিকে ঝুঁকে পড়বে না, এটা তার অতীব নিকটবর্তী।

ইবনে আব্বাস, আল-হাসান, মুজাহিদ, আবূ রুজাইন, শবী, আবূ মালিক, ইসমাঈল, ইকরামা ও কাতাদা প্রমুখ বলেছেন ঃ এর অর্থ তোমরা প্রকৃত সত্য থেকে এক দিকে ঝুঁকে পড়বে না। ইসমাঈল ইবনে আবূ খালিদ আবূ মালিকিল গিফারী থেকে বর্ণনা করেছেন, এর অর্থ ঃ তোমরা 'ঘায়েল' হয়ে পড়ো না— একদিকে ঝুঁকে পড়ো না। এরপর ইকরামা আবূ তালিবের কবিতার একটা ছত্র আবৃত্তি করেছেন ঃ

بِمِيزَانِ صِدْقٍ لَايَخِسُّ شَعِيرَةً - وَوَزَّانِ قِسْطٍ وَزْنُهُ غَيْرُ عَائِلٍ -

সত্যের মানদণ্ডে একটি দানাও কম হয় না। ন্যায়পরতার ওজনদাতার ওজন এক দিকে ঝুঁকে পড়ে না।

—৩/১৮

ভাষাবিদগণ বলেছেন ঃ العول। অর্থ সীমা অতিক্রম করে যাওয়া। বন্টনে عول অর্থ নির্দিষ্ট চিহ্নিত অংশের সীমা অতিক্রম করে যাওয়া। আর العـول। অর্থ الـمـيل। ঝুঁকে পড়া। তা ন্যায়পরতা-সুবিচারের বিপরীত। কেননা তা ন্যায়পরতা সুবিচারের সীমা লঙ্ঘন করে বাইরে চলে যায়। আর عال يعـيل বলা হয় যখন জুলুম করা হয়। আর عال يعـيل বলা হয় যখন অহংকারে ফেটে পড়ে। আর عال يعـيل বলা হয় যখন মানুষ দরিদ্র হয়ে পড়ে। আবূ উমর গোলাম সালাব আমাকে এ কথা বলেছেন। 'তা খুব নিকটবর্তী যে, তোমরা ঝুকে পড়বে না।' এর অর্থ ইমাম শাফেয়ী বলেছেন ঃ তোমরা যারা ঝুকে পড়, তারা সংখ্যায় বেশি হবে না। বলেছেন, এ কথা প্রমাণ করে যে, স্ত্রীর প্রয়োজনীয় খরচাদি স্বামীকেই বহন করতে হবে। এ কথাটিকে লোকেরা তিনটি দিক দিয়ে ভুল বলে আখ্যায়িত করেছেন। একটি দিক— আগেরকালের মনীষী এবং এ আয়াতে তাফসীর যার যার নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ 'তোমরা কোন দিকে ঝুঁকে পড়বে না। তোমরা জুলুম-পীড়ন চালাবে না।'এই ঝোঁকাটা ন্যায়পরতা-নিরপেক্ষতার পরিপন্থী। একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে যে ইনসাফপূর্ণ বন্টন নীতি কার্যকর করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন, এই ঝুঁকে পড়াটা তার পরপন্থী। দ্বিতীয় ভুলটা ভাষাগত। কেননা সন্তান ও পরিবারের লোকদের সংখ্যা বেশি হলে عال يعـول যে বলা হয় না, এ বিষয়ে ভাষাবিদদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। এ কথা মুবরাদ প্রমুখ ভাষাবিদ উল্লেখ করেছেন। আবূ উবায়দা মামার ইবনুল মুসান্না বলেছেন ঃ ان الاتعولوا। অর্থ لاتـجـور তোমরা জুলুম-পীড়ন করো না। বলা হয় علت على অর্থাৎ আমার উপর জুলুম করেছে। আর তৃতীয় আয়াতে একজন স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে, অথবা দক্ষিণ হস্তের মালিকানাধীন দাসীর কথা। পরিবারে ক্রীতদাসীরা নারীর মর্যাদাভিষিক্ত। তাই যদি কেউ দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্তদেরকে মোট সংখ্যার মধ্যে একত্রিত করে তাহলে করা যায়, এতে কোন মতপার্থক্য নেই। এ থেকে আমরা জানলাম যে, উক্ত আয়াতে সংসারের লোকদের বিপুলতা বোঝায় না; বরং জুলুম-পীড়ন না করা একজন স্ত্রী গ্রহণ করেও। কেননা একজন স্ত্রীর সাথে বন্টন নীতি কার্যকর করার কোন প্রশ্ন উঠে না। দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্ত মেয়েরা স্ত্রী হিসেবে থাকলেও তাদের জন্যে বন্টন নীতির কোন অংশ নেই।

## স্ত্রীর মহরানা স্বামীকে হিবা করা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْـًٔا مَّرِيْـًٔا -

এবং তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মহরানা খালিস দিলে ও সাগ্রহে দিয়ে দাও। তারা যদি খুশী মনে তোমাদেরকে তা থেকে কিছু পরিমাণ কম করে দেয়, তাহলে তোমরা তা সুস্বাদু সুপেয় হিসেবে ভক্ষণ কর।

কাতাদাহ্ ও ইবনে জুরাইয থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ 'এবং তোমরা তাদের মহরানা খালিস দিলে সাগ্রহে দিয়ে দাও' কথাটির ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ ফরয মনে করে মহরানা আদায় করে দাও। তাঁরা দুজন যেন ঋণের সন্তুষ্টচিত্ততার দিকে গেছেন। কেননা ঋণের বেলায় তা ফরয। আবূ সালিহ্ থেকে এ আয়াতাংশের অর্থ বর্ণিত হয়েছে ঃ এক ব্যক্তি যখন তার মুক্তি দেয়া দাসীকে বিয়ে করে তখন সে তার মহরানা নিয়ে নেয়। এ আয়াতে তা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ সম্বোধনটা যেন অভিভাবকদের প্রতি নিবদ্ধ অর্থাৎ তারা যখন মহরানা হস্তগত করবে তখন তা যেন নিজের সম্পদ মনে না করে। তবে نِحۡلَةً শব্দের অর্থ কাতাদাহ্ যা বলেছেন আসলে তা-ই— অর্থাৎ তা ফরয। আল্লাহ্‌র তরফ থেকে মীরাস বণ্টন নীতির ঘোষণার পর বলা কথার আলোকে এর তাৎপর্য গ্রহণ করতে হবে।

কোন কোন মনীষী বলেছেন— মহরানাকে نِحۡلَةً বলা হয়েছে। আর نِحۡلَةً -এর আসল অর্থ দান, হিবা— কোন কোন দিক দিয়ে। কেননা স্বামী তার বদলে কিছুই পায় না। কেননা বিয়ের পর স্ত্রী-অঙ্গ স্বীয় মালিকানায় থাকে যেমন পূর্বে ছিল। যেমন কোন মেয়েলোকের সাথে স্ত্রী সন্দেহে যৌন সম্ভোগ ঘটলে মহরানা তার প্রাপ্য হবে, স্বামীর নয়। মহরানাকে نِحۡلَةً নাম দেয়া হয়েছে এজন্যে যে, তার বিনিময়ে স্ত্রীর পক্ষ থেকে এমন কিছু দেয়া হয়নি, স্বামী যার মালিক হবে। তাই যে نِحۡلَةً -এর কোন বিনিময় নেই, সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে মনে করতে হবে। বিয়ের পর স্বামী স্ত্রীর নিকট থেকে যা পায়, তা শুধু স্ত্রী অঙ্গের মুবাহ্ নয়। আবূ উবায়দা, মামার ইবনুল মুসান্না বলেছেন ঃ نِحۡلَةً অর্থ সন্তুষ্টচিত্তে। যেমন বলা হয় ঃ তোমরা স্ত্রীদের মহরানা এরূপ মানসিকতা নিয়ে দিও না যে, তোমরা তা দিতে অনিচ্ছুক; বরং তা তাদেরকে দাও এমন অবস্থায় যে, তোমাদের মন সন্তুষ্ট, যদিও মহরানা তাদের প্রাপ্য, তোমাদের নয়।"

আবূ বকর বলেছেন ঃ এ তাৎপর্যের আলোকে এটা সঙ্গত যে, তার নাম রাখা হয়েছে نِحۡلَةً কেননা نِحۡلَةً অর্থ দান। আর দাতা তা দেয় মনের সন্তুষ্টি ও পূণ্য কাজ করার উৎসাহ নিয়ে। এ কারণে তা স্ত্রীদেরকে দিতে আদেশ করা হয়েছে মনের আনন্দ ও সন্তুষ্টি সহকারে। যেমন দানশীল ব্যক্তি মনের খুশীতে দান কার্য সম্পাদন করে।

'এবং তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মহরানা সন্তুষ্টচিত্তে দিয়ে দাও' আল্লাহ্‌র এ কথাকে দলীল বানিয়ে বলা হয়েছে ঃ যে স্ত্রীর সাথে নিবিড় নিভৃতে অবস্থান গ্রহণ করা হয়েছে তাকে পূর্ণ মহরানা দিয়ে দেয়া ওয়াজিব। বাহ্যত তা-ই কর্তব্য হয়ে পড়ে। 'তারা তোমাদের জন্যে সন্তুষ্টচিত্তে কিছু কম করে দিলে তোমরা তা সুস্বাদু-সুপেয়রূপ ভক্ষণ কর'— আল্লাহ্‌র এ কথাটির মহরানা সম্পর্কেই বলা হয়েছে। আল্লাহ্ কর্তৃক তাদেরকে তাদের প্রাপ্য মহরানা দিয়ে দেবার আদেশের পর-ই বলা হয়েছে, স্ত্রীর হিবা ও কম করে দেয়া জায়েয হওয়ার কথা, যেন এ ধারণা না হয় যে, স্ত্রীরা সন্তুষ্টচিত্তে তা পরিহার করলেও স্বামীকে বুঝি তা অবশ্যই দিয়ে দিতে হবে।

কাতাদাহ্ এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ কোনরূপ জোর-জবরদস্তি ছাড়া-ই তাদের নিজেদের থেকে সন্তুষ্টচিত্তে কম বা মাফ করে দেয়াই এর অর্থ। তাহলে তা নিয়ে নেয়া হালাল। আল-কামা তাঁর স্ত্রীকে বললেন ঃ আমাকে সুস্বাদু-সুপেয় খাওয়াও। এতে বোঝা গেল, আয়াতটির কয়েকটি অর্থ। একটি— মহরানা স্ত্রীর সম্পদ। সে তা স্বামীর নিকট থেকে পাওয়ার

অধিকারী। তাতে অভিভাবকের কোন অধিকার বা অংশ নেই। দ্বিতীয়— স্বামীর কর্তব্য তা সন্তুষ্টচিত্তে সাগ্রহে স্ত্রীকে আদায় করে দেয়া। তৃতীয়— স্ত্রীর জন্যে জায়েয মহ্রানা স্বামীকে 'হিবা' করে দেয়া এবং স্বামীর পক্ষে তা গ্রহণ করা মুবাহ। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'তোমরা তা খাও সুস্বাদু পবিত্র সুখকর মনে করে।' চতুর্থ— স্ত্রী মহ্রানা নিজের হাতে নিয়ে থাকুক কি তা না-ই হস্তগত করে থাকুক— উভয় অবস্থায়ই সে মহ্রানা স্বামীকে 'হিবা' করতে পারে— এ উভয় অবস্থাই তার জন্যে সমান। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ 'অতএব তোমরা তা খাও সুখকর পবিত্র সুস্বাদু মনে করে'— উভয় অবস্থাকেই বোঝায়। এও বোঝায় যে, স্ত্রী তা নিজের হাতে পাওয়ার পূর্বেও সে তা 'হিবা' করতে পারে। কেননা আল্লাহ্ তাঁর উক্ত কথায় নিজ হাতে পাওয়া ও না-পাওয়া— এ অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি।

যদি বলা হয়, 'অতএব তোমরা তা খাও সুখকর পবিত্র সুস্বাদু মনে করে' আল্লাহ্র একথা বোঝায় যে, মহ্রানা নির্দিষ্ট হওয়ার পরই তা করা যাবে। হয় তা নির্দিষ্টভাবে স্ত্রীর হস্তগত হবে অথবা হবে না। হয় তা নগদ অর্থ হবে, যা সে নিজের হাতে পেয়ে গেছে অথবা কারোর যিম্মায় ঋণ হিসেবে নেয়া হয়েছে, তাহলে তা হিবা করা জায়েয হওয়ার কোন প্রমাণ তো এ আয়াতে নেই। কেননা যা কেউ নিজ যিম্মায় নিয়েছে, সে সম্পর্কে তো বলা যায় না যে, তা সুস্বাদু পবিত্র সুখকর হিসেবে খাও।

জবাবে বলা যাবে, এখানে যা খাদ্য হিসেবে আসে কেবল মাত্র তার কথা-ই এখানে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি যা খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় না বাদ দিয়ে। কেননা তা-ই যদি হতো, তাহলে কোন খাদ্যদ্রব্যই কেবল মহ্রানা হিসেবে দেয়া ওয়াজিব হতো। কথার ধরন থেকে বোঝা-ই যায় যে, মহ্রানা কেবল খাদ্যদ্রব্যই হয় না, যা খাদ্যদ্রব্য নয়, তা-ও মহ্রানা হতে পারে। কেননা আল্লাহ্র আদেশ ঃ 'এবং স্ত্রীদেরকে তাদের মহ্রানা খালিস আন্তরিকভাবে দিয়ে দাও' সর্ব প্রকারের মহ্রানাকেই শামিল করে— তা খাদ্য জিনিস হোক, অথবা হোক অন্য কোন জিনিস। আর 'অতএব তোমরা তা খাও সুখকর পবিত্র সুস্বাদু মনে করে' সর্ব প্রকারের মহ্রানাকে শামিল করে— যা দেওয়ার জন্যে আদেশ করা হয়েছে। তবে বোঝা গেল যে, এখানে 'খাও' কথাটির বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই। কথার উদ্দেশ্য হল— অন্তরের সন্তুষ্টি সহকারে স্ত্রী হৃদয়ে তা অন্তরের সেই সন্তুষ্টি সহকারে গ্রহণ করা মুবাহ, একথা বোঝানো।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا -

যেসব লোক জুলুম করে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে। (সূরা আন-নিসা ঃ ১০)

বলেছেন ঃ

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ -

এবং তোমরা তোমাদের ধন-মাল বাতিল পন্থায় পারস্পরিক ভক্ষণ করো না।

(সূরা বাকারাহ ঃ ১৮৮)

এসব কথায় ইয়াতীমের মালে সর্বপ্রকারের হস্তক্ষেপ— তা ঋণের ব্যাপার হোক, খাদ্য জিনিস হোক, কি অ-খাদ্য জিনিস— এ সব-ই নিষেধের আওতার্ভুক্ত এবং লোকদের ধন-মাল গ্রহণও তার অন্তর্ভুক্ত। শুধু একটি পন্থায় গ্রহণ এ নিষেধের আওতাবহির্ভূত। তা হল সন্তুষ্টি-সম্মতি সহকারে ব্যবসায় ও ক্রয়-বিক্রয়। তা আয়াতের তাৎপর্যের দৃষ্টিতে কেবল খাদ্যদ্রব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তা সত্ত্বেও সর্বত্র 'খাওয়া' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে শুধু এ কথাটি বোঝাবার জন্যে যে, মানুষ মানুষের ধন-মাল যে জন্যে নেয়, খাওয়া তার মধ্যে সর্বাধিক লক্ষ্য। কেননা খাওয়া দ্বারাই দেহ রক্ষা পায়, সুস্থ থাকে, বলশালী হয়। এ শব্দ খাদ্যদ্রব্য ছাড়াও অন্য জিনিস বোঝায়। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ -

জুম'আর দিন যখন নামাযের জন্যে আহ্বান করা হবে, তখন তোমরা আল্লাহ্‌র যিকির এর দিকে দৌড়াও এবং ক্রয়-বিক্রয় পরিহার কর। (সূরা জুম'আ ঃ ৯)

আয়াতে 'ক্রয়-বিক্রয়' বিশেষ অর্থবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যদিও তার-ই মত অন্যান্য সর্বপ্রকারের ব্যস্ততাই পরিহার করার আদেশের অন্তর্ভুক্ত। বিশেষভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলার উদ্দেশ্য হল একথা বোঝানো যে, মানুষ যত প্রকারের কাজে ব্যস্ত থাকে, ক্রয়-বিক্রয় তার মধ্যে অধিক ব্যস্তকারী কাজ। কেনড়া জীবিকার সন্ধানে নগরবাসী মানুষ এ ক্রয়-বিক্রয় কাজে ঢ়র্বাধিক ব্যস্ততার মধ্যে মশগুল হয়ে পড়ে। তাই বোঝা যায় যে, এই শব্দটি বলে কেবল সেই কাজ-ই বোঝায় না, তাছাড়া অন্যান্য কাজও বোঝায়। বরং তা-ও নিষিদ্ধ হওয়া অড়রও অধিক মাত্রায় আবশ্যক। কেননা যে যে কাজ অধিক জরুরী ও যে যে কাজের প্রয়োজন অধিকতর তীব্র, তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ -

তোমাদের প্রতি মৃত, রক্ত ও শুকর মাংস হারাম করা হয়েছে। (সূরা মায়িদা ঃ ৩)

কি কি হারাম করা হয়েছে, সেই পর্যায়ে গোশতের এবং তা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত অংশের উল্লেখ করা হয়েছে বিশেষভাবে। কেননা এসব জিনিসের মধ্যে গোশত অধিক গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ তা থেকেই বেশি উপকৃত হয়ে থাকে। তা অন্যান্য জিনিস-ও বোঝায়। এমনিভাবে আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তাই তা খাও সুস্বাদু পবিত্র সুখকর মনে করে' কথাটিও অনুরূপ। তা থেকে মহরানা হিবা করা জায়েয প্রমাণিত হয়, তা যে-কোন জাতীয় জিনিস হোক, তা কোন বস্তু হোক, কি ঋণ হোক, করজ করা হোক, আর না-ই হোক, কোন পার্থক্য নেই।

অন্যদিক দিয়ে বলা যায়, মহরানা হিবা করা যখন জায়েয তখন তা নির্দিষ্টভাবে স্ত্রীর দখলে থাকবে, তেমনি তা ঋণ হলেও তা থেকে হিবা করা জায়েয। কেননা স্ত্রী নিজের ধন-মালে তার হস্তক্ষেপ করা তার জন্যে সম্পূর্ণ জায়েয। তাই তা জিনিস হোক বা হোক ঋণ— এর মধ্যে কোন পার্থক্য হয় না। কেউ-ই এসবের মধ্যে পার্থক্য করেনি। আলোচ্য আয়াত ঋণ হিবা করা ও তা থেকে পরিত্রাণ দেয়া স্ত্রীর জন্যে জায়েয ঘোষণা করেছে, যেমন মহরানা 'হিবা' করা তার

জন্যে জায়েয, তা ঋণ হলেও। এ-ও প্রমাণিত হয় যে, কেউ যদি কারোর ঋণ 'হিবা' করে যা তার নিকট পাওনা ছিল, তাহলে তা মূলত 'হিবা'ই গণ্য হবে। কেননা আল্লাহ্ সে কাজকে সহীহ্ বলেছেন এবং তা তার যিম্মা থেকে হ্রাস করে দিয়েছেন। এ-ও বোঝা যায় যে, কেউ যদি অন্য কাউকে কোন মাল দেয় এবং সে তা হস্তগত করে ও হাতে হস্তক্ষেপ করে, তবে তা তার জন্যে জায়েয হবে মুখে তা না বললেও যে, আমি তা কবুল করলাম। কেননা আল্লাহ্ স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিনা শর্তে সে যা-ই হিবা করবে তা খাওয়া স্বামীর জন্যে জায়েয বলে ঘোষণা করেছেন। তার হিবা করার পর তার উপস্থিতিতে তাতে হস্তক্ষেপ করা হলেই তা কবুল করা হয়েছে বলে মনে করা হবে। অনুরূপভাবে স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে ঃ আমি নিজে মনে খুশি সহকারে আমার প্রাপ্য মহরানা থেকে একটা কমিয়ে দিলাম কিংবা হিবা করা ও নিষ্কৃতি দেয়ার ইচ্ছা করে, তবে তা জায়েয হবে। কেননা আল্লাহ্ তো বলেই দিয়েছেন ঃ 'স্ত্রীরা যদি নিজেদের খুশিমনে মহরানা থেকে কমিয়ে দেয়, তাহলে তোমরা তা সুখকর সুখাদ্য হিসেবে ভক্ষণ কর।'

স্ত্রী নিজ থেকে স্বামীর নিকট প্রাপ্য মহরানা হিবা করা পর্যায়ে ফিকাহবিদগণের ভিন্ন মত উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফর, হাসান ইবনে যিয়াদ ও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন ঃ স্ত্রী যদি পূর্ণবয়স্ক হয় এবং তার বুদ্ধি-বিবেচনা সুসংহত হয়, তাহলে তার নিজের ধন-মালে তার হিবা ও অন্যান্যভাবে হস্তক্ষেপ করা সম্পূর্ণ জায়েয। সে কুমারী ছিল কি পূর্বে স্বামীপ্রাপ্ত, তাতে কোন পার্থক্য হবে না। ইমাম মালিক (র) বলেছেন, কুমারী স্ত্রীর তার মালে হস্তক্ষেপ করা জায়েয নয়। স্বামীর নিকট থেকে পাওয়া মহরানায়ও তার পরিমাণ হ্রাস করার ইখতিয়ার নেই। তা ক্ষমা করা বা কমানোর ইখতিয়ার তার পিতার থাকবে। পিতা ছাড়া অপর কোন অভিভাবকের জন্যেই তা করা জায়েয হবে না। স্বামীওয়ালী স্ত্রীর তার নিজের ঘর-বাড়ি ও নিজের দাস-খাদেম বিক্রয় করা অবশ্য জায়েয বলেছেন। বিক্রয়ের যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকলে স্বামীর অরাজীতেও তা সে করতে পারবে। তা যদি পক্ষপাতিত্বমূলকও হয়, তবে তা তার ধন-মালের এক-তৃতীয়াংশ থেকে যাবে। এক-তৃতীয়াংশের অধিক পরিমাণে সাদকা বা হিবা করলে তা জায়েয হবে না, তার পরিমাণ কম হোক কি বেশি। ইমাম মালিক (র) বলেছেন ঃ স্ত্রীর স্বামী না থাকলে তার ধন-মালে তার অবস্থানটা ব্যক্তির নিজের ধন-মালের যে অবস্থান ঠিক তেমনি— সম্পূর্ণ সমান। ইমাম আওজায়ী বলেন, স্ত্রীর সন্তান না হওয়া পর্যন্ত তার দান করা জায়েয নয়— যদি সে তার স্বামীর ঘরে এক বছরকাল অবস্থান করে। লায়স বলেছেন, স্বামীওয়ালী স্ত্রীর নিজের দাস মুক্ত করা জায়েয নয়। তবে ছোট-খাটো ও সামান্য জিনিস— যা সেলায়ে রেহমী কিংবা অন্যভাবে করা একান্ত দরকার হয়ে পড়ে— তা করা তার জন্যে অবশ্যই জায়েয। কেননা এসব কাজ করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ হওয়ার আশা করা হয়।

আবূ বকর আল-জাসসাস বলেছেন— এসব কথা যে ঠিক নয়, আলোচ্য আয়াতটিই সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দিয়েছে। বরং আয়াতটি থেকে হানাফী মাযহাবের মতে সত্যতাই প্রমাণিত হয়। হানাফী মাযহাবের মত তো আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কেননা আল্লাহ্‌র কথাঃ 'স্ত্রীরা যদি খুশি মনে কোন জিনিস তোমাদেরকে দেয় নিজের ইচ্ছানুক্রমে, তবে তোমরা তা খাও সুখকর সুস্বাদু-খাদ্য হিসেবে'— এতে কুমারী-অকুমারী, স্বামীর ঘরে এক বছর অবস্থান করেছে কি করেনি বা তার সন্তান হয়েছে কি হয়নি— তার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্যই

করা হয়নি। বরং এ ক্ষেত্রে কুমারী অ-কুমারীর মধ্যে পার্থক্য করাই জায়েয নয়। তবে সেই পার্থক্য করা কোন দলীল পাওয়া গেলে এবং আলোচ্য আয়াতে কুমারীদের সম্পর্কে নয়, কেবল অ-কুমারী স্ত্রীদের সম্পর্কে হুকুম বলা হয়েছে, তা থেকে তা প্রমাণিত হলে ভিন্ন কথা। ইমাম মালিক স্ত্রীর পিতার তার কন্যার মহরানা থেকে হিবা করা জায়েয বলেছেন। অথচ আল্লাহ্ আমাদেরকে সমস্ত মহরানা স্ত্রীকে দিয়ে দেয়ার আদেশ করেছেন, তবে স্ত্রী নিজে তা থেকে কিছু পরিমাণ স্বামীকে হিবা করলে তা গ্রহণ করা স্বামীর জন্যে সম্পূর্ণ জায়েয। ফলে পিতার হিবা করার ব্যাপারটি এ আয়াতটিই নাকচ করে দিয়েছে। কেননা স্বামী সম্পূর্ণ মহরানা প্রত্যর্পণ করার জন্য আদিষ্ট। তবে স্ত্রী খুশিমনে নিজ থেকে কিছু কম করলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ এ আয়াতে পিতার খুশিমনে পরিমাণ হ্রাস বা হিবা করার কথা বলেন নি। কাজেই আল্লাহ স্ত্রীর খুশিমনে তার মহরানার কোন অংশ কম করা যে মুবাহ করেছেন তা নিষিদ্ধ করা এবং পিতার পক্ষে নিজ কন্যার মহরানা সেই কন্যার সন্তুষ্টচিত্তে হিবা করার পরিবর্তে হ্রাস করা আল্লাহ্-ই নিষিদ্ধ করেছেন, তা করা কখনই বৈধ হতে পারে না। তা করা হলে দুটি দিক দিয়ে আলোচ্য আয়াতের বিরোধিতা করা হবে কোন দলীল ছাড়া-ই। একটি দিক— স্ত্রীকে হিবা করার ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা। আয়াতটি তার বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়েই স্ত্রীকে এ অধিকার দেয়। আর দ্বিতীয়, কন্যার মহরানা তার পিতার হিবা করার অধিকার স্বীকার করে নেয়া। অথচ আল্লাহ স্বামীকে সম্পূর্ণ মহরানা স্ত্রীকে দিয়ে দেয়ার আদেশ করেছেন, শুধু স্ত্রীর খুশিমনে কিছু হ্রাস করার কথা বাদ দিয়ে। অপর একটি আয়াত একথার সত্যতা প্রমাণ করে। তাতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ -

তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের যা দিয়ে দিয়েছ, তা থেকে একবিন্দু জিনিস ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্যে হালাল হবে না। তবে স্বামী ও স্ত্রী— দুজনই যদি আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমাসমূহ কায়েম রাখতে পারবে না— এ ভয়ে ভীত হয়, তাহলে ফিরিয়ে নেয়া যায়। তাই তোমরা যদি ভীত হও এ কথা মনে করে যে, তারা দুজন আল্লাহ্র নির্দষ্ট সীমা কায়েম রাখবে না, তা হলে স্ত্রী যা নিজের মুক্তির জন্যে ফেরত দেবে তা গ্রহণ করায় সে দুজনার কোন দোষ হবে না। (সূরা বাকারাহ ঃ ২২৯)

এ আয়াতে স্বামী স্ত্রীকে যা দিয়েছে তা থেকে একবিন্দু পরিমাণ ফেরত নিষেধ করা হয়েছে। তবে স্ত্রী নিজের মুক্তির বিনিময় হিসেবে যা দেবে, তা নিতে নিষেধ করা হয়নি। তাতে স্ত্রীর সম্মত থাকা শর্ত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও কুমারী অ-কুমারীর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র স্ত্রী জয়নব বর্ণিত হাদীসও এই কথা-ই বলে। হাদীসটি হল নবী করীম (স) মেয়েলোকদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ -

তোমরা দান-সাদকা কর, তা তোমাদের অলংকারাদি থেকে হলেও।

ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসেও তাই বলা হয়েছে। নবী করীম (স) ঈদুল ফিতর-এর দিন নামাযের জন্যে বের হলেন। তিনি নামায আদায়ের পর ভাষণ দিয়েছেন। পরে মেয়েলোকদের সমাবেশ স্থানে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে দান-সাদকা করতে আদেশ করলেন। এ ভাষণে তিনি কুমারী অ-কুমারীর মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। তা ছাড়া এটা একটা প্রতিবন্ধকতা বিশেষ। আর যার পরিচিত এরূপ তার উপর কোন প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা সহীহ্ নয়।

## বোকা লোকদের হাতে ধন-মাল দেয়া

আল্লাহ্‌র তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا -

এবং তোমাদের ধন-মাল বোকা লোকদেরকে দিও না, যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে স্থিতিস্থাপক বানিয়েছেন।

আবূ বকর আল-জাসসাস বলেছেন ঃ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন কথা বলেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ ব্যক্তি যেন তার ধন-মাল তার সন্তানদের মধ্যে বণ্টন করে না দেয়। দিলে সে তাদের উপর বোঝা হয়ে পড়বে— তারা তার উপর বোঝা থাকার পর। আর মেয়েলোক হচ্ছে বোকাদের মধ্যে অধিক বোকা। এ ভাবে ইবনে আব্বাস (রা) আয়াতটির ব্যাখ্যা করেছেন তার বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে। আয়াতটির নিগূঢ় তাৎপর্যও তাই। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ اموالكم তোমাদের ধন-মাল। এর দাবি হচ্ছে বোকাদের হাতে ধন-মাল ছেড়ে দেয়া প্রত্যেকের জন্যেই এ নিষেধাজ্ঞা। কেননা তাতে ধন-মাল বিনষ্ট হওয়ার— তারা তা বিনষ্ট করে দেবে এবং তারা তার সংরক্ষণে অক্ষমতার পরিচয় দেবে, তার দ্বারা কোন সুফল ফলাতে পারবে না, এ আশংকা তীব্র হয়ে আছে। এই 'বোকা লোক' বলতে বালক ও মেয়েলোক বোঝানো হয়েছে। কেননা তারা ধন-মাল সংরক্ষণ ও যথার্থ প্রয়োজনে ব্যয় বিনিয়োগ করতে পূর্ণভাবে দক্ষ নয়। এ কথা থেকে এ-ও প্রমাণিত হয় যে, ধন-মালের মালিকের উচিত নয় তাদেরকে তার জীবনকালে তার ধন-মালের ভারপ্রাপ্ত বানানো। এ পরিচিতির লোকের হাতে ধন-মাল অসিয়ত করা সমীচীন নয়। এও প্রমাণিত হয় যে, তার উত্তরাধিকারী যদি অল্পবয়স্কা হয়, তবে তাদের জন্যে কোন ধন-মাল অসিয়ত করা বাঞ্ছনীয় নয়। বরং তার অসিয়ত করা উচিত একজন বিশ্বস্ত আমানতদার ও রক্ষণাবেক্ষণে সজাগ ও সতর্ক ব্যক্তির নামে।

ধন-মাল কোনরূপ বিনষ্ট করাও এ আয়াত দ্বারা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়েছে। তার পূর্ণ সংরক্ষণ, হিফাজত, যথার্থ ব্যবস্থাপনা এবং তার দ্বারা প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদনের আদেশও এ আয়াতে নিহিত রয়েছে।

কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اَلَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامً -

যে ধন-মালকে আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে স্থিতিস্থাপক ও সংরক্ষক বানিয়েছেন।

এতে আমাদের দেহ-সত্তার সংরক্ষণ যে ধন-মাল দ্বারা সম্ভব হয়, তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। তাই আল্লাহ যাকে তা রিযিক হিসেবে দিয়েছেন, তার কর্তব্য হল তা থেকে আল্লাহ্র হক আদায় করা, তাঁর নির্দিষ্ট অংশ তা থেকে বের করা। পরে যা অবশিষ্ট থাকবে তার পূর্ণ সংরক্ষণ করা। তা বিনষ্টকরণকে সর্ব প্রযত্নে এড়িয়ে যাওয়া, তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাগণকে সুষ্ঠু জীবিকার ব্যবস্থা করার জন্যে উৎসাহ প্রদান করেছেন। তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করার উপদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁর পবিত্র কিতাবের বিভিন্ন আয়াতে এ পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত দিয়েছেন। একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا - اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْآ اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنَ -

তোমরা সাংঘাতিকভাবে বেহুদা খরচ করবে না। যারা বেহুদা খরচ করে, তারা শয়তানের ভাই। (সূরা বনী-ইসরাইল ঃ ২৬-২৭)

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا -

এবং তোমাদের হাত তোমার গলার সাথে বাঁধা অবস্থায় রাখবে না এবং তাকে সম্পূর্ণরূপে খুলেও দেবে না। তা যদি কর, তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও অনুতপ্ত দুঃখিত অবস্থায় বসে থাকতে বাধ্য হবে। (সূরা বনী-ইসরাইল ঃ ২৯)

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا -

আর যারা যখন ব্যয় করে তখন বেহুদা খরচ করে না, কৃপণতাও করে না। (তারাই আল্লাহ্র নেক বান্দা) (সূরা ফুরক্বান ঃ ৬৭)

এভাবে বহু আয়াতে ধন-মাল সংরক্ষণ ও ঋণসমূহের যথাযথ সাক্ষ্যের ব্যবস্থাকরণ, দলীল লিপিবদ্ধকরণ ও রিহন রাখার ব্যবস্থা কার্যকর করার তাগিদ করেছেন আল্লাহ্ তা'আলা। এ বিষয়ে পূর্বে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

اَلَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا -

যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে স্থিতিস্থাপক বানিয়েছেন।

এ পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হল আল্লাহ্ তোমাদেরকে তার উপর সংরক্ষক বানিয়েছেন। অতএব তোমরা তা এমন লোকের হাতে কখনই দেবে না, যে তা ধ্বংস ও বিনষ্ট করবে।

আর ব্যাখ্যার দ্বিতীয় দিক হল, সাঈদ ইবনে যুবায়র থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ তোমরা বোকা লোকদের হাতে তাদের ধন-মাল ছেড়ে দিও না। এ ধন-মাল সেই বোকা লোকদের বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ -

এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। (সূরা নিসা ঃ ২৯)

এর অর্থ, তোমরা পরস্পরকে হত্যা করো না।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ -

অতএব তোমরা নিজদিগকে হত্যা কর। (সূরা বাকারা ঃ ৫৪)

এবং আল্লাহ্র কথা ঃ

فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ -

তোমরা যখন ঘরসমূহে প্রবেশ করবে, তখন তোমরা নিজেদের প্রতি সালাম কর।
(সূরা নূর ঃ ৬১)

এর অর্থ, যারা ঘরে আছে তাদের প্রতি 'আসসালামু আলাইকুম' বলা। এরূপ ব্যাখ্যার আলোকেই বোকা লোকদের উপর ধন-মাল ব্যবহারে প্রতিবন্ধকতা আরোপ করতে হবে। তখন তাদের এ বোকামী দূর না হওয়া পর্যন্ত তাদের ধন-মাল ব্যয়-ব্যাবহারের উপর প্রতিবন্ধকতা আরোপিত হবে।

এখানকার سُفَهَاءَ -এর বিভিন্ন অর্থ বলা হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ السفيه বলতে 'তোমার সন্তান ও পরিবারের লোকদেরকে' বোঝানো হয়েছে। বলেছেন ঃ মেয়েলোক হচ্ছে সবচাইতে বেশি মাত্রায় সফীহ্— নির্বোধ। সাঈদ ইবনে যুবায়র, আল-হাসান, আস-সুদ্দী, আদ-দহাক ও কাতাদাহ বলেছেন ঃ মেয়েলোক ও বালক-বালিকারা সফীহ। কোন কোন মনীষী বলেছেন ঃ এখানে তাদের সকলের কথা বলা হয়েছে, যারা ধন-মাল ব্যয়-ব্যবহার বিনিয়োগে মূর্খতার পরিচয় দেয়। তাদের ধন-মাল ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হতে হবে। শবী, আবূ বুরদাতা, আবূ মূসা আল-আশ'আরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ তিনি জন আছে, যারা আল্লাহ্কে ডাকে, কিন্তু তাদের জবাব দেয়া হয় না (দো'আ কবুল হয় না)। এক ব্যক্তি, যার স্ত্রী খারাপ চরিত্রের মেয়েলোক হওয়া সত্ত্বেও সে তাকে তালাক দেয় না। আর এক ব্যক্তি, যে তার ধন-মাল নির্বোধ-বোকা লোককে দিয়েছে। অথচ আল্লাহ বলেছেন ঃ 'তোমরা তোমাদের ধন-মাল বোকা লোকদের দিও না'। আর তৃতীয় সেই ব্যক্তি, যে অন্য এক ব্যক্তিকে ঋণ দেয়; কিন্তু সেজন্যে সাক্ষী রাখে না।

মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, 'সুফাহা' হচ্ছে মেয়েলোকেরা। এ-ও বলা হয়েছে যে, السفه -এর আসল অর্থ হল বুদ্ধির স্বল্পতা, হালকাপনা। এ কারণে ফাসিক ব্যক্তিকে 'সফীহ' বলা হয়েছে। কেননা দ্বীনদার ও জ্ঞানবান ব্যক্তিদের নিকট তার কোন মূল্য নেই। কম বুদ্ধির লোককেও 'সফীহ' বলা হয় তার বুদ্ধি-বিবেচনার স্বল্পতা ও হালকাপনার কারণে। তবে এদের নির্বুদ্ধিতা বা কম বুদ্ধির এ পরিচিতি নিন্দাসূচক নয়। এটা আল্লাহ্‌র নাফরমানীরও কোন ব্যাপার নয়। তাদের বুদ্ধি-বিবেচনার স্বল্পতা ও হালকাপনার জন্যেই তাদেরকে 'সফীহ' বলা হয়েছে। ধন-মাল রক্ষায় ভালো মন্দ বিচার করতে তারা অক্ষম, কেবল এ কারণেই তাদেরকে 'সফীহ' বলা হয়েছে।

যদি বলা হয়, মেয়েলোক ও বালকদেরকে ধন-মাল 'হিবা' করা যে নিষিদ্ধ নয়, এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈততা নেই। বশীর তার পুত্র নুমানকে তার মাল হিবা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে নবী করীম (স) তাঁকে তা করতে নিষেধ করেন নি। কিন্তু যেহেতু তিনি তাঁর সব কয়জন ছেলেকে সমান পরিমাণে 'হিবা' করেন নি, কেবল মাত্র এ কারণে নিষেধ করেছিলেন। তাহলে এ আয়াতে আমাদের ধন-মাল 'সফীহ'দের দিতে নিষেধ করা হয়েছে, একথা কি করে বলা যেতে পারে?

জবাবে বলা যাবে, এ আয়াতে মালিক করে দেয়ার ও ধন-মাল 'হিবা' করার ব্যাপরে কিছু বলা হয়নি। এ আয়াতের আসল বক্তব্য হল— যারা ধন-মাল সংরক্ষণ করতে অপারগ, তার নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাদের হাতে ধন-মাল সঁপে দেয়া আমাদের জন্যে নিষিদ্ধ। তাই ছোট বয়সের লোকের ও মেয়েদের নামে ধন-সম্পদ হিবা করা নিষিদ্ধ নয়, তা জায়েয। যেমন বেশি বয়সের বুদ্ধিমান লোক হিবা করে। কিন্তু তা তার পক্ষ হয়ে হস্তগত করে বড় বয়সের লোক— ছোট বয়সের লোক ও মেয়েলোকদের পক্ষ থেকে এবং তার সে মাল সংরক্ষণ করে তা নষ্ট করে না, নষ্ট হতে দেয় না। আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে আমাদের ধন-মাল সে সব ছোট বয়সের ও মেয়েলোকদের হাতে দিতে নিষেধ করেছেন, যারা সে ধন-মাল সংরক্ষণ করতে পারে না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ -

এবং তা থেকে তাদের রিযিক ও পোশাক-আশাক দেয়ার ব্যবস্থা কর।

অর্থাৎ তাদেরকেই সেই ধন-মাল থেকে রিযিক দাও। আয়াতে فيها এর অর্থ منها তা থেকে। কেননা গুণবাচক অক্ষর একটার পর একটা আসে এবং তার কোন কোনটি অপর কোনটির স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ -

এবং তোমরা তাদের ধন-মাল তোমাদের ধন-মালের সাথে মিশিয়ে খেয়ো না।

এ আয়াতে الى -এর অর্থ مَعَ ।

আলোচ্য আয়াতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে ধন-মাল সে সব লোককে দিতে, যারা তার সংরক্ষণ করতে সক্ষম নয়। সেই সাথে আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে সে ধন-মাল থেকে তাদেরকে রিযিক দিতে, পোশাক পরিচ্ছদ দিতে।

আয়াতটির তাৎপর্য যদি এই হয় যে, আমাদের মাল তাদেরকে দিতে নিষেধ করা হয়েছে— যেমন বাহ্যত— তো থেকে বোঝা যায়, তাহলে তাতেই নির্বোধ সন্তান ও স্ত্রীদের প্রয়োজনীয় খরচাদি বহনে ওয়াজিব হওয়ার দলীলও তাতেই রয়েছে। কেননা আমাদেরকে সেজন্য ধন সম্পদ ব্যয় করার আদেশ করা হয়েছে। আর তার অর্থ যদি এই হয় যে, নির্বোধ লোকদের ধন-মাল তাদের হাতে আমরা সঁপে দেব না— যেমন অনেক ব্যাখ্যাকারই তাই বলেছেন, তাহলে তাতেই তাদের মাল থেকে তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে ব্যয় করার আদেশও দেয়া হয়েছে। আর এ কথাই দুটি দিক দিয়ে প্রতিবন্ধকতা আরোপ করার দলীল হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি হল, তাদের ধন-মাল থেকে তাদেরকে বিরত রাখা, তাদেরকে না দেয়া। আর দ্বিতীয় তাদের জন্যে সেই ধন-মাল থেকে ব্যয় করার জন্যে আমাদেরকে অনুমতি দান। তাদের খোরাক-পোশাক তা থেকে ক্রয়করণ।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا -

এবং তাদেরকে ভালো ভালো কথা বল।

মুজাহিদ ও ইবনে জুরাইন বলেছেন ঃ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ জায়েয পন্থায় তাদের কল্যাণ সাধন, সেলায়ে রিহমীকরণ ও তাদেরকে ভালোভাবে প্রস্তুতকরণ ও তাদের প্রতি দয়া করা। তাদেরকে ভালো-ভালো ও সন্দুর সুন্দর কথা শেখানো, তাদের সাথে নম্র ভাষায় কথাবার্তা বলা। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَأَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ -

আর ইয়াতীমকে রুঢ় কর্কশ কথা বল না ও ব্যবহার করো না। (সূরা দোহা ঃ ৯)

যেমন বলেছেন ঃ

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوْرًا -

আর তুমি যদি তাদের (অর্থাৎ অভাবগ্রস্ত আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও সম্বলহীন পথিকদের) থেকে পাশ কাটিয়ে থাকতে চাও এ কারণে যে, তুমি তোমার রব্ব-এর যে রহমত পাওয়ার আকাঙ্ক্ষী তা কামনা এখানো পোষণ করছ, তাহলে তুমি তাদেরকে বিনয়সূচক জবাব দাও। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৮)

বলা হয়েছে, এখানে 'ভালো কথা বলা'র অর্থ তাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও আদব-কায়দা শিক্ষাদান, তাদের বিবেক-বুদ্ধির উন্মেষ সাধন ও উন্নত উত্তম চরিত্র শিক্ষাদান। এ-ও সম্ভব যে বলা হয়েছে, তোমরা যখন তাদেরকে রিযিক ও পোশাক দেবে তোমাদের ধন-মাল থেকে তখন

তাদের সাথে ভালো দরদপূর্ণ কথা বলবে, তাদের প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া দেখিয়ে তাদেরকে কষ্ট দেবে না, তাদের অপমান করবে না। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا -

মীরাস বন্টনের সময়ে নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীনরা— যারা মীরাস পাবে না— উপস্থিত হলে তা থেকে তাদেরকে রিযিক দাও এবং তাদের জন্যে ভালো কথা বল।

'আল্লাহই ভালো জানেন'— এর অর্থ হল কথার শব্দ সুন্দর ও মিষ্ট করবে, হুমকি ধমকি করবে না, তাদের প্রতি অনুগ্রহ দেখিয়ে তাদের মনে কষ্ট দেবে না। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

لاَ تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى -

তোমরা তোমাদের দানসমূহকে অনুগ্রহ দেখিয়ে ও কষ্ট দিয়ে নিষ্ফল করে দেবে না।
(সূরা বাকারা ঃ ২৬৪)

হতে পারে এ সব অর্থই একসাথে এখানে গ্রহণীয়। আর তার সারকথা হল আল্লাহ্র কথা ঃ তাদেরকে ভালো-সুন্দর-নম্র-নির্দোষ কথা বল।

## ইয়াতীমের মাল তাকে দেয়া

আল্লাহ্র তা'আলা বলেছেন ঃ

وَابْتَلُوا الْيَتَامٰى حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ -

ইয়াতীমদের পরীক্ষা ও যাচাই করতে থাক। শেষ পর্যন্ত যখন তারা বিয়ের বয়স পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এবং তাদের মধ্যে বুদ্ধিমত্তার উন্মেষ লক্ষ্য করবে, তখন তাদের নিকট ধন-মাল ফিরিয়ে দাও।

আল-হাসান, মুজাহিদ, কাতাদাহ ও আস-সুদ্দী বলেছেন ঃ অর্থাৎ তাদের বিবেক-বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও তাদের দ্বীনদারীর পরীক্ষা নিতে থাক, যাচাই করতে থাক।

আবূ বকর বলেছেন, তাদের পূর্ণ বয়স্কতা লাভের পূর্বে তাদের নিরবচ্ছিন্ন পরীক্ষা ও যাচাই করার জন্যে আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে। কেননা বলা হয়েছে ঃ বিয়ের বয়স পর্যন্ত তাদের পরীক্ষা ও যাচাই করতে থাক। অর্থাৎ তাঁদের ইয়াতীম থাকা অবস্থায় তাদের পরীক্ষা করতে বলা হয়েছে। তার পরে বলেছেন ঃ 'যতক্ষণ না তারা বিয়ের (বয়স) পর্যন্ত পৌঁছে যায়'। এতে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের বিয়ে পর্যন্ত পৌঁছা হবে পরীক্ষা যাচাইর পড়। কেননা حتى শব্দটি শেষ সময় বোঝায়, যা পরীক্ষার পর উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে আয়াতটি দুটি দিক দিয়ে একথা বোঝাচ্ছে যে, এ পরীক্ষাটা পূর্ণ বয়স্কতা লাভের আগে হতে হবে। আর তাতেই দলীল

রয়েছে এ কথার যে, যে ছোট বয়সের ছেলেমেয়ে সম্পত্তির মালিক, ব্যবসায় বুঝে— ব্যবসায়ের কাজে তার অনুমতি লাওয়া জায়েয। কেননা তার পরীক্ষা সম্পন্ন হতে পারে ধন-সম্পদের বিলি-ব্যবস্থা সংক্রান্ত ব্যাপারাদি সম্পর্কে সুস্থ নির্ভুল জ্ঞান দ্বারা, ধন-মালের সংরক্ষণ দ্বারা। যখন সে সেই বিষয়ে আদেশ করবে, তখন ব্যবসায়ে অনুমতি পাওয়া গেল— বুঝতে হবে।

ব্যবসায়ের কাজে বালকের অনুমতি গ্রহণের ব্যাপারে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফর, হাসান ইবনে যিয়াদ ও হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, পিতা তার ছোট বয়সের পুত্রকে ব্যবসায়ের অনুমতি দিতে পারে— তা জায়েয। তবে তা তখন, যখন সে ক্রয়-বিক্রয় বুঝতে সক্ষম হবে। পিতা বা দাদার অসীও— পিতার অসী না থাকলে দাদার অসী তা দিতে পারে। তখন তার অবস্থা হবে অনুমতি প্রাপ্ত ক্রীতদাসের ন্যায়। ইবনুল কাসিম ইমাম মালিক থেকে বলেছেন ঃ ব্যবসায়ে পিতা এবং অসীর অনুমতি দান সঙ্গত মনে করি না। তাতে যদি কোন ঋণ চেপে পড়ার ব্যাপার ঘটে। তবে তার কোন কিছুই সে বালকের উপর বাধ্যতামূলক হবে না। রুবাই ইমাম শাফেয়ী থেকে তাঁর الاقرار গ্রন্থে বলেছেন ঃ যে বালক আল্লাহ্‌র হক বা কোন লোকের বা অপর কারোর হক অন্য কারোর মালে আছে স্বীকারোক্তি করে, তা হলে তার এই স্বীকারোক্তি প্রত্যাহৃত হবে, সে বালক ব্যবসায়ে অনুমতি প্রাপ্ত হোক, তার পিতা বা তাঁর অভিভাবক— যে-ই হোক, কিংবা শাসকের কাছ থেকেই হোক। শাসকের জন্যে তাকে অনুমতি দেয়া জায়েয নয়। যদি দেয়, তাহলে তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহৃত হবে তার উপর থেকে। সে বালকের ক্রয় ও বিক্রয়ও ভেঙ্গে দেয়া হবে।

আবূ বকর বলেছেন, আয়াতটির বাহ্যিক অর্থ প্রমাণ করে যে, ব্যবসায়ে বালকদের অনুমতি দান জায়েয। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ ইয়াতীমদের পরীক্ষা কর। তাদের বিবেক-বুদ্ধি, ধর্ম পালন এবং যে সব ব্যাপারে তারা হস্তক্ষেপ করে, তাতে তাদের বিচক্ষণতা, সতর্কতা ইত্যাদির পরীক্ষা করতে বলা হয়েছে। এ আদেশ এ সব ব্যাপারে পরিব্যাপ্ত। কাজেই কোন এক ব্যাপারে পরীক্ষা করা যাবে, অন্য ব্যাপারে পরীক্ষা করা যাবে না— এরূপ বলার কারোর অধিকার নেই। কেননা ব্যবহৃত শব্দ এসবকেই ধারণ করে। এই পরীক্ষা করা যাবে না— এরূপ বলার কারোর অধিকার নেই। কেননা ব্যবহৃত শব্দ এসবকেই ধারণ করে। এই পরীক্ষা করা হবে ক্রয়-বিক্রয়, ব্যাপারাদি নিয়ন্ত্রণ আয়ত্তকরণ ও তার ধন-মাল সংরক্ষণে তার অযোগ্যতা, বিচক্ষণতা ও সতর্কতার। আর সে কাজ ব্যবসায়ে বা সাংসারিক কাজ-কর্মে তাতে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি না দিলে তো সম্ভব হতে পারে না। যদি কেউ মনে করে— কথার দ্বারা শুধু তার বিবেক-বুদ্ধির পরীক্ষা করা হবে, ব্যবসায়ের— সংসারের কাজে হস্তক্ষেপ ও বাস্তব ভাবে ধান-মাল সংরক্ষণ করতে পারার পরীক্ষা হবে না, তাহলে সে একটা কোন দলীল ছাড়া সাধারণ অর্থবোধক শব্দকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করার কাজ করল।

যদি বলা হয়, আয়াতটি বলে যে, ছোট বয়সে ধন-মালে কার্যত হস্তক্ষেপের অনুমতি দেয়ার কথা বলা এখানে উদ্দেশ্য নয়। কথাটি তো এ ধারাবাহিকতায় বলা হয়েছে ঃ 'যদি তোমরা তাদের থেকে বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ পাও, তাহলে তাদের মাল তাদের নিকট ফিরিয়ে দাও।' পূর্ণবয়স্কতা লাভ ও বুদ্ধির লক্ষণ পাওয়ার পর তাদের হাতে ধন-মাল ফিরিয়ে দেয়ার আদেশ হয়েছে মাত্র। তার ছোট বয়সে তাকে ব্যবসায় ইত্যাদিতে অনুমতি দান যদি জায়েযই হত,

তাহলে ধন-মাল দিয়ে দেয়ারই আদেশ করা হত, পরীক্ষার প্রশ্ন থাকত না। আর আল্লাহ্ তো পূর্ণবয়স্কতা লাভ ও বুদ্ধির লক্ষণ দেখার পর ধন-মাল তাকে দিয়ে দিতে বলেছেন।

জবাবে বলা যাবে, ব্যবসায়ের— সংসারের কাজের— অনুমতিদান আর ধন-মাল তার হাতে দিয়ে দেয়া এক কথা নয়। কেননা অনুমতিটা হল— ক্রয়-বিক্রয় ও লেন-দেন করার আদেশ দেয়া। আর তা তাদের মাল দেয়া ছাড়াও হতে পারে। যেমন ক্রীতদাসকে মাল তাকে না দিয়েই ব্যবসায় বা সংসারে কাজ করার অনুমতি দেয়া হয়। তাই আমরা বলব, আলোচ্য আয়াতটির বক্তব্য হচ্ছে, তার পরীক্ষা করার আদেশ করা। আর এ পরীক্ষা কাজের জন্যেই ব্যবসায়ে— সাংসারিক কাজে— তাকে অনুমতি দান অপরিহার্য। যদিও ধন-মাল তার হাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে না। তার পরে যখন সে পূর্ণবয়স্কতা পাবে ও তার বুদ্ধি-বিচক্ষণতারও লক্ষণ দেখা যাবে, তখন তার নিকট ধন-মাল হস্তান্তর করা হবে। যাচাই ও পরীক্ষা যদি— তাকে ক্রয়-বিক্রয়ে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দিয়ে— করা না হয়, তাহলে তা হবে শুধু তার বিবেক-বুদ্ধির পরীক্ষা, কার্যত কায়কারবারে হস্তক্ষেপ, সে বিষয়ে জ্ঞান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বাস্তব পরীক্ষা লওয়া সম্ভব হবে না। আর তাহলে পূর্ণবয়স্কতা পাওয়ার পূর্বে তার পরীক্ষার কোন কারণ বা তাৎপর্য থাকে না। তাই পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির পূর্বেই যখন তা করার আদেশ করা হয়েছে, তখন আমরা জানলাম যে, কার্যত হস্তক্ষেপের মাধ্যমেই তার পরীক্ষার কাজটি করতে হবে। তাছাড়া তার বিবেক-বুদ্ধির সুস্থতা যাচাই করা হলে কার্যত ব্যাপারাদি সম্পাদন ও ধন-মাল সংরক্ষণে তার যোগ্যতা কতখানি হয়েছে— তা জানা যাবে না। সে ক্রয়-বিক্রয়ে সক্ষম ও বিচক্ষণ কিনা— তাও বোঝা যাবে না। আর এক কথা তো জানা-ই আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার ধন-মাল সংরক্ষণ ও কায়-কারবার পরিচালনের দক্ষতা যাচাই করারই আদেশ করেছেন। তাই পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির পূর্বে যে পরীক্ষা করার আদেশ, তা তার শুধু বুদ্ধি বিবেচনারই পরীক্ষা নয়। উপরন্তু পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির পূর্বে যদি কায়-কারবার করতে তাকে অনুমতি দেয়া জায়েয না হয় তার উপর প্রতিবন্ধকতা আরোপিত হওয়ার কারণে, তাহলে এদিকের পরীক্ষা নিষ্প্রয়োজন। তার পরে একটা কাজ-ই শুধু থাকবে এবং তা পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির পর যখন তার বুদ্ধিমত্তার উন্মেষের লক্ষণ পাওয়ার জন্যে তাকে কায়-কারবার করবার অনুমতি দিয়ে তাকে পরীক্ষা করা হবে। অথবা তাকে আদৌ যাচাই-ই করা হবে না। আর পরীক্ষা ওয়াজিব হলে তাকে কায়-কারবারে হস্তক্ষেপেরও অনুমতি দিতে হবে অপরিহার্যভাবে। অথচ তা-ই তার উপর বুদ্ধি উন্মেষের লক্ষণ পাওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়ে আছে তোমার মতো। আর পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির পরও তার প্রতিবন্ধকতা আরোপিত থাকা অবস্থায় তাকে কায়-কারবার করার অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে তার উপর থেকে প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে নেয়া হয়েছে, বলতে হবে। অথচ সে সময়ে তার উপর থেকে প্রতিবন্ধকতা সরানো যেতে পারে না। তার পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির পর-ও সে তার ধন-মাল ব্যবহার করার অধিকার থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। অথচ— এ সময় তার অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়ারই কথা। ..... তাহলে পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির পূর্বে কেন কায়-কারবারে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি তাকে দেবে না ? .... তার অবস্থার নির্ভুলতা প্রমাণের জন্যে ? যেমন পূর্ণবয়স্কতা লাভের পর বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ হওয়া পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকা সত্ত্বেও তাকে কায়-কারবারে হস্তক্ষেপের অনুমতি দিয়ে তার অবস্থার নির্ভুলতা প্রমাণ করা হবে।

আর পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির পরও তার অবস্থার নির্ভুলতা প্রমাণিত হবে না। তা হলে তার বুদ্ধির উন্মেষ হওয়ার কথা কিভাবে জানা যাবে ?

এই প্রেক্ষিতেই বলা যায়, বিপরীত লোকের কথা মানলে হয় পরীক্ষা করাই ত্যাগ করতে হবে, না হয় বুদ্ধির উন্মেষের লক্ষণ পাওয়ার আগেই তার ধন-মাল তার নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে।

ব্যবসায় ও কায়-কারবারে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি ছোট বয়সের লোককে দেয়া যে জায়েয, তা কয়েকটি হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয়। তা হল নবী করীম (স) উমর ইবনে আবূ সালমাকে— যখন তিনি ছোট বয়সের ছিলেন— উম্মে সালমা (রা)-কে তাঁর নিকট বিয়ে দেয়ার আদেশ করেছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ থেকে বর্ণিত— তিনি সালমা ইবনে আবূ সালমাকে সেই কাজের জন্যে আদেশ করেছিলেন, অথচ তিনি তখন ছোট বয়সের ছিলেন। এতে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ক্রয়-বিক্রয়ের যে কাজ অন্যরা করেছে তাকে সেরূপ কায়-কারবারে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেয়া সম্পূর্ণ জায়েয। পিতা তার ছোট বয়সের পুত্রকে উকীল বানায় ক্রীতদাস ক্রয়ের বা তাকে বিক্রয় করার জন্যে। এটাই তো অর্থ হচ্ছে ব্যবসায়ে ও কায়-কারবারে তাকে অনুমতি দানের। আল্লাহ্র কথা ঃ 'ইয়াতীমদের যাচাই করতে থাক' এর অর্থ যারা গ্রহণ করেছে শুধু তাদের বুদ্ধি ও দ্বীন পালনের দিকটির যাচাই করা, তাদের এ ব্যাখ্যা সম্পর্কে কথা হচ্ছে মালিকের নিকট তার ধন-মাল প্রত্যর্পণে দ্বীন পালনের ব্যাপারটির পরীক্ষা কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, ফিকাহবিদদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে তা ওয়াজিব-ও নয়। কেননা কোনব্যক্তি যদি ফাসিক হয়, তবুও সে তার ব্যাপারাদির নিয়ন্ত্রণক্ষম ও ব্যবসায়— কায়-কারবারে হস্তক্ষেপ করতে জ্ঞানবান হয়, তাহলে শুধু তার ফাসিকীর কারণে তার ধন-মাল ব্যবহার তাকে নিষেধ করা বা তার উপর প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা কোনক্রমেই সঙ্গত হতে পারে না। এ থেকে বোঝা গেল যে, এ ব্যাপারে দ্বীন-পালনের ব্যাপারটির গুরুত্ব স্বীকার করা কর্তব্য নয়। ব্যক্তি যদি দ্বীনদার হয়, নেক আমলকারী হয়; কিন্তু তার ধন-মাল সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রণে হয় অক্ষম, সে যদি তার এক্ষেত্রে হস্তক্ষেপে ধোঁকাবাজির আশ্রয় লয়, তাহলে তার ধন-মাল তার নিকট থেকে কেড়ে নেয়া হবে, তাতে তাকে হস্তক্ষেপ করতে দেয়া হবে না। বিশেষ করে তাদের মত অনুযায়ী যারা বলে যে, বুদ্ধির দুর্বলতা ও ধন-মাল সংরক্ষণে অক্ষমতা থাকলে তার উপর প্রতিবন্ধকতা অবশ্যই আরোপ করতে হবে। কিন্তু আমরা কুরআন ও হাদীসের আলোকে জানতে পারলাম যে, দ্বীন পালনের দিকটি এক্ষেত্রে বিবেচ্য হওয়ার কোন দলীল নেই— কোন অর্থ নেই।

আর আল্লাহ্র কথা ঃ

حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ -

শেষ পর্যন্ত যখন তারা বিয়ে পর্যন্ত পৌঁছে যাবে ......

ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও আস্-সুদ্দী বলেছেন, এ আয়াতাংশে পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির কথা— অর্থাৎ বিয়ে করার বয়স পর্যন্ত পৌঁছার কথা বলা হয়েছে। শব্দটি থেকে احتلام শব্দ গঠিত, যার অর্থ স্বপ্নে বীর্যস্খলন।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا -

যদি তোমরা তার বুদ্ধিমত্তা বিচেনার লক্ষণ দেখ .....

ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ তোমরা যদি জানতে পার যে, তারা এ বুদ্ধিমত্তা লাভ করেছে— তাদের মধ্যে বুদ্ধি-ব্যবস্থার যোগ্যতার স্ফূরণ ঘটেছে। এ-ও বলা হয়েছে যে, الايناس শব্দের অর্থ— অনুভব করতে পারা, বুঝতে পারা। খলীল থেকে একথা বর্ণিত। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ اِنِّىْ اٰنَسْتُ نَارًا —আমি আগুন লক্ষ্য করতে পেরেছি। অর্থাৎ আমি আগুন অনুভব করেছি ও তা দেখেছি, এখানে ব্যবহৃত رشد শব্দের তাৎপর্যে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। ইবনে আব্বাস ও আস্-সুদ্দী বলেছেন ঃ জ্ঞান-বুদ্ধির সুস্থতা-পরিপক্কতা। ধন-মাল সংরক্ষণের যোগ্যতা। আল-হাসান ও কাতাদাহ্ বলেছেন ঃ বিবেক-বুদ্ধি ও দ্বীন পালনের সুস্থতা পরিপক্কতা। ইবরাহীম নখয়ী মুজাহিদ বলেছেন— জ্ঞান-বুদ্ধি। সামাক ইকরামা ইবনে আব্বাস সূত্রে বলেছেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যদি তোমরা তাদের থেকে বিবেক-বুদ্ধির পরিচয় পাও'-এর অর্থ, তাদের পূর্ণবয়স্কতা, বিবেক-বুদ্ধি ও মান-মর্যাদাবোধ লক্ষ্য কর।

আবূ বকর বলেছেন ঃ الرشد নামটি বিবেক-বুদ্ধি পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়— যেমন এরূপ ব্যাখ্যা ব্যাখ্যাদাতা দিয়েছেন, আর জানা-ই আছে যে, আল্লাহ্ এই رشد-এর শর্ত আরোপ করেছেন— অবশ্য সর্বপ্রকারের رشد-এর শর্ত করেন নি, তখন এর বাহ্যিক অর্থের দাবি হল, তাকে এই গুণের অধিকারী হতে হবে বুদ্ধি-বিবেচনা সহকারে, তাহলে তা তার নিকট তার ধন-মাল প্রত্যর্পণের কারণ হবে এবং তার উপর প্রতিবন্ধকতা আরোপের নিরোধ হবে। এদিক দিয়েই পূর্ণ বয়স্ক বুদ্ধিমান ব্যক্তির উপর তার ধন-মাল ব্যবহারে প্রতিবন্ধকতা আরোপিত হওয়ার মত বাতিল হওয়া প্রমাণিত হবে। আর এ মত হচ্ছে ইবরাহীম, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন ও আবূ হানীফার। সূরা আল-বাকারায় আমরা এ পর্যায়ে বিস্তারিত কথা বলে এসেছি।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ -

তখন তাদের ধন-মাল তাদের নিকট প্রত্যর্পণ কর।

এ কথার দাবি হচ্ছে, পূর্ণবয়স্কতা লাভ ও তাদের বুদ্ধি-বিবেচনার স্ফূরণ হওয়ার পর তাদের ধন-মাল তাদের হাতে ফিরিয়ে দেয়া ওয়াজিব— যেমন পূর্বে বলে এসেছি।

এ কথার দৃষ্টান্ত এ আয়াতটি ঃ

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰى اَمْوَالَهُمْ -

এবং ইয়াতীমদের মাল তাদের দিয়ে দাও।

এখানেও উপরোক্ত শর্ত মনে রাখতে হবে। এর তাৎপর্য হল ঃ 'এবং ইয়াতীমদিগকে তাদের ধন-মাল দিয়ে দাও যখন তারা পূর্ণবয়স্কতা পাবে ও তাদের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনার উন্মেষ লক্ষ্য করবে।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَا تَأْكُلُوْهَا اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا -

এবং তারা বড় হয়ে পড়বে— এ ভয়ে বেহুদা খরচ ও তাড়াহুড়া করে তা তোমরা খেয়ে ফেলো না।

আয়াতের اسراف বা سرف অর্থ মুবাহ্‌র সীমালঙ্ঘন করে নিষিদ্ধের আওতায় চলে যাওয়া। তাই কখনও তা হয় কমের দিকে সীমালঙ্ঘন, আবার কখনও হয় বেশির দিকে সীমালঙ্ঘন। উভয় অবস্থায়ই বৈধ সীমালঙ্ঘন করা হয়।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ وبدارا ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ, আল হাসান ও আস-সুদ্দী বলেছেনঃ তাড়াহুড়া করা, কোন ব্যাপারে দ্রুততা অবলম্বন করা। আয়াতের কথা হল, ওরা বড় হয়ে ওদের ধন-মাল ওরা ফেরত চাইবে, এই ভয়ে তাদের ধন-মাল তাড়াহুড়া করে খেয়ে ফেলতে নিষেধ করা হয়েছে। এতেই এ দলীল রয়েছে যে, ওরা যখন বড়ত্বের সীমায় পৌঁছে যাবে, তখন ওরা ওদের ধন-মাল ফেরত পাওয়ার অধিকারী হবে যখন তারা বিবেক-বুদ্ধিমান হবে, ওদের মধ্যে সৎবুদ্ধির উন্মেষের লক্ষণ দেখার শর্ত ছাড়াই। কেননা বুদ্ধির উন্মেষের শর্ত করা হয়েছে পূর্ণবয়স্কতা লাভের পর। আর 'ওরা বড় হবে— এ ভয়ে ওদের ধন-মাল বেহুদা খরচ করে ও তাড়াহুড়া করে খেয়ে ফেলো না' আল্লাহ্‌র একথা দ্বারা বোঝা গেল যে, ওরা বড়ত্বের সীমায় পৌঁছে গেলে তখন ওদের ধন-মাল আটকে রাখা জায়েয নয়। অন্যথায় এখানে বড় হওয়ার কথাটি বলার কোন মানে হয় না। কেননা তার অভিভাবকই তার বড় হওয়ার আগে ও পরে ধন-মাল পাওয়ার অধিকারী। এ কথা থেকে প্রমাণিত হল যে, সে যখন বড়ত্বের সীমায় পৌঁছে যাবে, তখন তার মাল ফেরত পাওয়ার সে অধিকারী হবে। ইমাম আবূ হানীফা এ বড়ত্ব লাভের সীমা নির্দিষ্ট করেছেন পঁচিশ বছর। কেননা এ বয়সেই সে পরিপক্ক হতে পারে। আর পরিপক্ক হবে অথচ সে বড়ত্বের সীমায় পৌঁছবে না— তা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

## ইয়াতীমের মাল থেকে তার অভিভাবকের খোরাক-পোশাক দান

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ -

যে লোক ধনী— সচ্ছল হবে, সে পবিত্রতার নীতি অবলম্বন করবে। আর যে হবে দরিদ্র, সে প্রচলিত শুভ নিয়মে আহার করবে।

আবূ বকর আল-জাস্‌সাস বলেছেন— এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আগেরকালের মনীষিগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। মামার জুহরী আল-কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন— এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাসের নিকট এলো, বলল— আমার ক্রোড়ে কয়েকজন ইয়াতীম লালিত হচ্ছে, তাদের ধন-মাল আছে। লোকটি সেই ধন-মাল থেকে কিছু গ্রহণের অনুমতি তাঁর নিকট চাচ্ছিল। তখন ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, তুমি না তাদের অভাব মোচন কর? বলল, হ্যাঁ। বললেন, তুমি না তাদের হারিয়ে যাওয়া পশু খোঁজ কর? বলল হ্যাঁ। বললেন ঃ তুমি না

ওদের শূন্য পাত্র ভরপুর কর ? বলল— হ্যাঁ। বললেন ঃ তার ফিরে আসার দিন তুমি না সন্তুষ্ট হও ? বলল ঃ হ্যাঁ। তখন বললেন ঃ তুমি তার দুগ্ধ পানি কর দুধ দোহনে বাড়াবড়ি না করে এবং বংশধারার ক্ষতিকারী না হয়।

শায়বানী ইকরামা ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ

الوصى اذا احتاج وَضَعَ يده مع أيديهم ولا يكتسى عمامة -

অসী যখন ঠেকে যাবে, তখন তাদের হাতসমূহের সাথে তার নিজের হাতও রাখবে। তবে পাগড়ী পড়বে না।

প্রথমোক্ত হাদীসে ইয়াতীমের মাল-সম্পদ নিয়ে কাজ করাকে শর্ত করা হয়েছে তা থেকে খাদ্য গ্রহণ মুবাহ হওয়ার। অবশ্য ইকরামা বর্ণিত হাদীসে সে শর্তের উল্লেখ হয়নি।

ইবনে লাহ্ইয়াতা ইয়াযীদ ইবনে আবূ হাবীব আবুল খায়ের মারসাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-ইয়াজানী সূত্রে বর্ণনা করেছেন— রাসূলে করীম (স)-এর সাহাবী কিছু সংখ্যক আনসার লোককে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহ্‌র "যে ধনী সচ্ছল হবে, সে যেন পবিত্রতা গ্রহণ করে আর যে ফকীর হবে সে প্রচলিত নিয়মে খাবার খায়" কথাটির তাৎপর্য কি ? জবাবে তাঁরা বললেন— আয়াতটি আমাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে অসী যদি ইয়াতীমের বাগানে কাজ করে, তাহলে তার হাত তাদের হাতের সাথে মিলিত হবে।

এই হাদীসটির সনদে ত্রুটি আছে বলে অভিযোগ উঠেছে। হাদীসটির সনদ এদিক দিয়েও নষ্ট যে, অসীর শ্রমের বদলে ইয়াতীমের মাল থেকে খাওয়া যদি মুবাহ হয় তাহলে সেদিক দিয়ে ধনী ও গরীবের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হতো না। এ থেকে বুঝলাম যে, উক্ত ব্যাখ্যা প্রত্যাহারযোগ্য। ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীসের মর্মানুযায়ী খাওয়া মুবাহ, তা থেকে পাগড়ী ব্যবহার করা ছাড়া। খাওয়ার অধিকার যদি শ্রমের কারণে হয়ে থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রে খাদ্য ও পরিধেয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হতো না। আলোচ্য আয়াতটির এ হচ্ছে এক ধরনের ব্যাখ্যা। তা হল তা থেকে কেবল খাদ্য গ্রহণ করবে যদি সে ইয়াতীমের জন্যে কাজ করে। অন্যরা বলেছেন— ইয়াতীমের মাল থেকে করয নেবে, পরে তা শোধ করে দেবে।

শরীফ আবূ ইসহাক হারিসা ইবনে মদরার উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন— তিনি বলেছেন ঃ

اِنِّىْ اَنْزَلْتُ مَالَ اللّٰهِ تَعَالٰى مِنِّىْ بِمُنْزِلَةِ مَالَ الْيَتِيْمِ اِنِ اسْتَغْنَيْتُ اِسْتَعْفَفْتُ وَاِنْ افْتَقَرْتُ اَكَلْتُ بِالْمَعْرُوْفِ وَقَضَيْتُ -

আমি আল্লাহ্‌র ধন-মালকে আমার দিক থেকে ইয়াতীমের পর্যায়ে ধরে নিয়েছি। আমি যদি সচ্ছল হই, তাহলে তা থেকে কিছু গ্রহণ করা থেকে আমি পবিত্র থাকব। আর যদি দরিদ্র হই, তাহলে শুভ প্রচলন অনুযায়ী খাব।

উবায়দাতুস সালমানী সাঈদ ইবনে যুবাইর আবুল আলীয়া আবূ অয়েল ও মুজাহিদও অনুরূপ কথা বর্ণনা করেছেন। হযরত উমর (রা) করয নিতেন পরে তা শোধ করে দিতেন যখন

পারতেন আর তৃতীয় কথা আল-হাসান ইবরাহীম আতা ইবনে আবূ রিবাহ ও মকহুল থেকে বর্ণিত। তিনি বায়তুলমাল থেকে সেই পরিমাণ গ্রহণ করতেন, যার দ্বারা ক্ষুধা মিটে এবং লজ্জাস্থান আবৃত করা যায়। পরে সামর্থ্য পেলে তিনি তা ফেরত দিতেন না। আর চতুর্থ কথা শবী থেকে বর্ণিত। তা হল তা মরা লাশের পর্যায়ে গণ্য। কঠিনভাবে ঠেকে গেলে তা থেকে গ্রহণ করতেন। পরে যখন সম্ভব হতো ফিরিয়ে দিতেন। আর সচ্ছলতা না হলে সে গ্রহণ হালালের মধ্যে। পঞ্চম কথা মাকসাম ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত ঃ فَلْيَسْتَعْفِفْ অর্থ ابغناء। সচ্ছলতা। আর যে দরিদ্র হতো, সে যেন শুভ প্রচলিত নিয়মে আহার করে— এর অর্থ বলেছেন সে যেন নিজের জন্যে সে ধন-মাল থেকে খরচ করে এমনভাবে যে ইয়াতীমের মাল কিছুই না পৌঁছে।

আবদুল বাকী ইবনে কানে মুহাম্মাদ ইবনে উসমান ইবনে আবূ সাইবাতা মিনজাব ইবনুল হারিস আবূ আমিরুল আসাদী সুফিয়ান আমাশ আল-হিকাম মাকসাম ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে অনুরূপ অর্থের কথা বর্ণনা করেছেন। ইকরাম তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি পরে শোধ করে দিতেন। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ-ও বর্ণিত হয়েছে যে, উক্ত আয়াত মনসূখ হয়ে গেছে। মুজাহিদ অপর একটি বর্ণনায় বলেছেন, এর অর্থ সে যেন নিজের ধন-মাল থেকেই আহার করে শুভ প্রচলিত নিয়মে। ইয়াতীমের মাল থেকে কিছু নেয়ার সুযোগ নেই— এ কথাটি আল-হিকাম বলেছেন।

আবূ বকর বলেছেন, আগেরকালের মনীষীদের এ পর্যায়ে এ সব-ই হচ্ছে বিভিন্ন মত। ইবনে আব্বাস থেকে চারটি বর্ণনা এসেছে— যেমন পূর্বে উল্লেখ করেছি। একটি— সে যদি ইয়াতীমের পশু পালনে কাজ করে তাহলে তার দুধ সে সেবন করবে। দ্বিতীয়— যা নেবে তা সে পরে ফিরিয়ে দেবে। তৃতীয়— ইয়াতীমের ধন-মাল থেকে সে কিছুই নিজের জন্য ব্যয় করবে না। তবে তার নিজের মাল থেকে সে খাবার খাবে, যতক্ষণ না ইয়াতীমের মাল থেকে খাওয়ার মুহতাজ হয়ে পড়ে। আর চতুর্থ কথা হচ্ছে— আয়াতটি মনসূখ। হানাফী ফিকাহবিদদের যে মত আমরা জানি, তা হল, তা থেকে করয বাবদ কিছুই গ্রহণ করবে না, অন্যভাবেও নয়, সে ধনী হোক, কি গরীব। তা থেকে অন্য কেউ ঋণ দেবে না।

ইসমাঈল ইবনে সালিম মুহাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ তবে অসী ইয়াতীমের মাল থেকে ঋণ বা অন্যভাবে কিছু গ্রহণ করুক, তা আমরা একটুও পছন্দ করি না। তিনি এ পর্যায়ে কোন মতপার্থক্য থাকার কথা উল্লেখ করেন নি।

ইমাম মুহাম্মাদ কিতাবুল আ-সার-এ আবূ হানীফা— এক ব্যক্তি— ইবনে মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

لَايَأْكُلُ الْوَصِىُّ مِنْ مَالِ الْيَتِيْمِ قَرْضًا وَلَا غَيْرَهُ -

অসী ইয়াতীমের ধন-মাল থেকে ঋণ বা অন্য কোনভাবে কিছুই নেবে না।

ইমাম আবূ হানীফার-ও এ মত। তাহাভী উল্লেখ করেছেন, আবূ হানীফার মাযহাব হল, ঠেকায় পড়লে ঋণ বাবদ নেয়া যাবে, তবে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। উমর (রা) ও তাঁর তাবেয়ী

থেকেও এরূপ মত-ই বর্ণিত হয়েছে। বশর ইবনুল অলীদ আবূ ইউসূফ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, নিজ বাড়িতে উপস্থিত থাকা অবস্থায় ইয়াতীমের মাল থেকে কিছুই খাবে না। সেই ইয়াতীমদের ঋণ আদায়ের কাজে কিংবা বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে তাদের এমন কোন কিছু রক্ষার জন্যে ঘরের বাইরে গেলে সে ইয়াতীমের মাল থেকে খরচাদি, পোশাক ও যানবাহনের ব্যবস্থা করতে পারে। বাহির থেকে ফিরে এসে তাকে পোশাক ও যানবাহন (যদি ক্রয় করা হয়) ইয়াতীমের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে।

ইমাম আবূ ইউসূফ বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র কথা ঃ সে যেন খায় শুভ প্রচলন অনুযায়ী— এ কথাটি মনসূখ হয়ে থাকতে পারে এ আয়াত দ্বারা ঃ

لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ -

আবূ বকর বলেছেন, এ অবস্থায় অসীকে ইমাম আবূ ইউসূফ অংশীদারিত্বের ব্যবসায়ীর মতো ধরে নিয়েছেন। সে সফরে মিলিত ব্যবসায়ের মাল থেকে খরচাদি নির্বাহ করতে পারে। ইবনে আবদুল হিকাম মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ যার লালনাধীন ইয়াতীম রয়েছে, সে তার খরচাদি তার মাল দ্বারা সংমিশ্রিত করে চালায়। তাতে ইয়াতীম পায় তার খরচ থেকে তার অভিভাবক যা পায়, তার চাইতে বেশি। তাহলে তাতে দোষ হবে না। খরচ ইয়াতীমের বাড়তি হলে তা সংমিশ্রিত করবে না। এখানে ধনী ও গরীবের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি।

আল-মুয়াফী সওরী থেকে বলেছেন, ইয়াতীমের অভিভাবকের পক্ষে ইয়াতীমের খাবার খাওয়া জায়েয হবে। তবে তা তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সে তার ধন-মাল থেকে করয দিতে পারে। সওরী বলেছেন, অসী ইয়াতীমের মাল থেকে কোন্ জিনিসে উপকৃত হবে, তা আমার জন্যে আশ্চর্যের বিষয় নয়। অবশ্য যদি তাতে ইয়াতীমের কোন ক্ষতি না হয়। যেমন স্লেট— যাতে লেখা হয়। আল-হাসান ইবনে হাই বলেছেন ঃ ঠেকে গেলে অসী ইয়াতীমের মাল থেকে করয নিতে পারে। তবে পরে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। অবশ্য অসী ইয়াতীমের মাল থেকে তার কাজ ও শ্রম পরিমাণ খেতে পারে, যদি তাতে বালক ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا -

এবং তোমরা ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-মাল দিয়ে দাও, ভালোর বদলে খারাপ দিও না এবং তাদের মাল তোমাদের মালের সাথে সংমিশ্রিত করে খেয়ে ফেলো না। এটা অত্যন্ত বড় গুনাহ।

আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

فَانْ اٰنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَاْكُلُوْهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا -

তোমরা যদি তাদের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনার উন্মেষ লক্ষ্য কর, তাহলে তাদের মাল তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। আর তা খুব বেশি বেহুদা খরচ করেও ওরা বড় হয়ে পড়বে— এ ভয়ে তাড়াহুড়া করে খেয়ে ফেলো না।

এবং

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ -

তোমরা ইয়াতীমের মালের কাছেও যাবে না, তবে উত্তম পন্থায় যেতে পার। এই নীতি বহাল থাকবে যতক্ষণ না তারা পরিপক্কতায় পৌঁছায়। (সূরা আ'আম ঃ ১৫২)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا -

যারা ইয়াতীমের মাল জুলুম করে ভক্ষণ করে ..... (সূরা নিসা ঃ ১০)

বলেছেন ঃ

وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتَامٰى بِالْقِسْطِ -

এবং ইয়াতীমের জন্যে তোমরা ন্যায়পরতা সহকারে দাঁড়াবে। (সূরা নিসা ঃ ১২৭)

এবং

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ -

তোমরা তোমাদের ধন-মাল পারস্পরিক বাতিল উপায়ে ভক্ষণ করো না, তবে তোমাদের সম্মতিক্রমে যদি ব্যবসায় হয়, তবে ..... (সূরা নিসা ঃ ২৯)

এ সব কয়টি আয়াত 'মুহ্‌কাম'— সুদৃঢ়, প্রতিষ্ঠিত। এ সব কয়টি আয়াতে ইয়াতীমের মাল তার অভিভাবকের জন্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সে ধনী হোক, কি গরীব।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ -

আর যে লোক গরীব হবে, সে যেন প্রচলিত শুভ নিয়মে ভক্ষণ করে।

এ আয়াতটি মুতাশাবিহ্‌, বহু ব্যাখ্যার সম্ভাব্যতাপূর্ণ— যার উল্লেখ ইতিপূর্বে আমরা করেছি। কাজেই এ আয়াতটির ব্যাখ্যা মুহকাম আয়াতসমূহের আলোকে করাই উত্তম। আর তা হচ্ছে, যে লোক নিজের প্রচলিত শুভ নিয়মে খাবে, যেন ইয়াতীমের মালের প্রতি মুখাপেক্ষী না হয়,

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা মুতাশাবিহ্ আয়াতকে 'মুহকাম' আয়াতের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করার আদেশ করেছেন। এবং মুহকামের আলোকে ব্যাখ্যা না করে মুতাশাবিহ্র পেছনে দৌড়াতে নিষেধ করেছেন সূরা আলে-ইমরানের আয়াতে বলেছেন ঃ তার শতক আয়াত মুহ্কাম— তাই কিতাবের মূল। আর অন্যান্য আয়াত মুতাশাবিহ। ফলে যাদের মনে বক্রতা রয়েছে তারা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহ আয়াতের পিছনে ধাওয়া করে তার ব্যাখ্যা তালাস করে বেড়ায়।

যারা ইয়াতীমের মাল করয বা করয ছাড়া-ই গ্রহণ করা জায়েয বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাদের এ ব্যাখ্যা মুহ্কাম আয়াতের পরিপন্থী। আর যিনি ভিন্ন অর্থ বলেছেন, তিনি তার মুহকাম আয়াত ভিত্তিক ব্যাখ্যা পেশ করেছেন ও তার যথার্থ তাৎপর্য বলেছেন। বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্র কথা ঃ 'সে যেন প্রচলিত শুভ নিয়মে আহার করে' এটুকু মনসূখ হয়ে গেছে। আল-হাসান ইবনে আবুল হাসান ইবনে আতীয়াতা— আতীয়াতা— তাঁর পিতা— ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ 'যে লোক হবে দরিদ্র, সে যেন শুভ প্রচলন অনুযায়ী খায়' কথাটিকে মনসূখ করেছে তার পরবর্তী কথা ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا -

যারা ইয়াতীমের মাল জুলুম করে খায় ......

উসমান ইবনে আতা তাঁর পিতা— ইবনে আব্বাস সূত্রে অনুরূপ কথা বর্ণনা করেছেন। ঈসা ইবনে উবায়দুল কুন্দী উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে মুসলিম— দহাক ইবনে মুজাহিদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্র 'যে দরিদ্র হবে, সে যেন শুভ প্রচলিত নিয়মে খায়' কথাটি মনসূখ হয়েছে 'যারা ইয়াতীমের মাল জুলুম করে খায়' দ্বারা।

যদি বলা হয়, আমর ইবনে শুয়ায়ব—তাঁর পিতা—তাঁর দাদা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, বললেন ঃ 'আমার তো ধন-মাল নেই, অথচ আমার নিকট একজন ইয়াতীম রয়েছে।' জবাবে তিনি বললেন ঃ

كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيْمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ مَالَكَ بِمَالِهِ -

তুমি তোমার লালিত ইয়াতীমের মাল থেকে আহার কর কোনরূপ বেহুদা ব্যয়কারী না হয়ে, তার মালের সাথে তোমার মাল মিশ্রণকারী না হয়ে।

আমর ইবনে দীনার আল-হাসানুল আওফী সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

يَأْكُلُ وَلِيُّ الْيَتِيْمِ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوْفِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مِنْهُ مَالًا -

ইয়াতীমের অভিভাবক তার মাল থেকে প্রচলিত শুভ নিয়মে খাবে তার মালের সাথে সংমিশ্রণকারী না হয়ে।

জবাবে বলা যাবে, এ দুটি হাদীসের ভিত্তিতে উপরোক্ত মতের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা সঙ্গত হতে পারে। যেসব আয়াত ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেছে, তা পূর্বে আমরা উদ্ধৃত

করেছি। তা যদি সহীহ হয়, তাহলে তার ব্যাখ্যা সঙ্গতভাবেই করতে হবে। আর তা হচ্ছে, অভিভাবক ইয়াতীমের ধন-মালে অংশীদার ব্যবসায়ী হিসেবে কাজ করবে। পরে তার অংশের প্রাপ্য মুনাফা সে গ্রহণ করবে। আমাদের মতে এ পন্থা জায়েয। আগেরকালের মনীষীদের বহুসংখ্যক এরূপ মত বর্ণিত হয়েছে।

যদি বলা হয়, ইয়াতীমের মাল নিয়ে মুজারিবাতের নীতিতে ব্যবসায় করে যদি মুনাফা গ্রহণ জায়েয হয়, তাহলে ইয়াতীমের মালে—সংসারে কায়কারবারে কাজ করে তার মাল থেকে আহার করা জায়েয হবে না কেন ? যেমন ইবনে আব্বাস বর্ণিত বহু কয়টি বর্ণনার একটিতে বলা হয়েছে—তাতে বলা হয়েছে, সে যখন উটের পাল তাড়িয়ে নেয়, হারিয়ে যাওয়া উট খোঁজ করে আনে, তার জন্যে পানির পাত্র কানায় কানায় ভর্তি করে রাখে, তখন তার দুগ্ধ পান করা তার জন্যে জায়েয, তার বংশের কোনরূপ ক্ষতি না করে, দুধের ওলান নিঃশেষ ও শূন্য না করে। আরও যেমন হাসান থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, অসী যদি ইয়াতীমের খেজুর বাগানে কাজ করে, তাহলে তার হাত তাদের হাতের সাথে মিলিত হবে।

জবাবে বলা যাবে, যেহেতু অসী হয় ইয়াতীমের উট পালনে সাহায্য অথবা তার বাগানের কাজ— এ দুটির যে কোন একটি করবে, সেহেতু তখন হয় সে তার কাজের জন্য মজুরি বাবদ গ্রহণ করবে অথবা মজুরি হিসেব ছাড়াই গ্রহণ করবে— কাজের বিনিময়রূপে। যদি সে তা পারিশ্রমিক বা মজুরি হিসেবে নেয়, তাহলে তা চারটি কারণে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। একটি— যাঁরা এ মজুরি গ্রহণ মুবাহ বলেছেন, তাঁরা মুবাহ বলেছেন অসী যদি দরিদ্র হয়, তাহলে। কেননা ধনীর জন্যে তা যে জায়েয নয়, তা সর্ববাদীসম্মত। আর কুরআনের অকাট্য দলীল থেকেও তা-ই প্রমাণিত। তাতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে ঃ 'যে লোক হবে ধনী-সচ্ছল, সে যেন পবিত্রতার নীতি গ্রহণ করে'— অর্থাৎ কিছুই গ্রহণ না করে। কিন্তু শ্রমের মজুরির ক্ষেত্রে ধনী ও গরীবের মধ্যে কোন পার্থক্য করা যায় না। তাই মজুরি হিসেবে কিছু গ্রহণ করার প্রশ্ন অবান্তর। দ্বিতীয় দিক হচ্ছে— অসী নিজে থেকে ইয়াতীমের কাজের মজুর হবে ও মজুরি নেবে, তা-ও জায়েয নয়। তৃতীয়— যারা মজুরি গ্রহণ মুবাহ্ বলেছেন তাঁরা তাতে কোন সুনির্দিষ্ট পরিমাণ গ্রহণের শর্ত করেন নি। আর নির্দিষ্ট পরিমাণ মজুরি ছাড়া ইজারা সহীহ্ হতে পারে না। আর চতুর্থ দিক হচ্ছে যাঁরা তা মুবাহ্ বলেছেন, তাঁরা তাকে মজুরি বলেন নি। তাই তার মজুরি হওয়া বাতিল। আর তা অংশীদারিত্বের 'মুজারিবা' ব্যবসায়ের মত কাজ-ও নয়। তাই ইয়াতীমের দায়িত্ব পালনে মুনাফার— যা ইয়াতীমের মাল থেকে পাওয়ার অধিকারী হবে— তা কখনই ইয়াতীমের মাল নয়। যেমন মূলধন— মালিক ব্যবসায়ের কাজ যে করে তার সাথে মুনাফা দেয়ার যে শর্ত করে, তা তো সেই মূলধন-মালিকের মাল নয়। মূলধন-মালিকের মাল দেয়া যদি মুজারিব ব্যবসায়ীর জন্যে শর্ত করা হয়, তার ব্যবসায় কাজ লব্ধ থেকে দেয়ার শর্ত না হয়, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ করার দায়িত্ব তার উপর বর্তিবে, যেমন সেই মজুরি যা মূলধন-মালিকের মাল থেকে মজুরের কাজের বিনিময়ে দেয়া হয়, তা ক্ষতিপূরণ করার দায়িত্ব মূলধন-মালিক— যে মজুর রাখে— এর উপর বর্তায়। আলোচ্য ক্ষেত্রে মুজারিবের জন্যে যে মুনাফা দেয়া শর্ত, তার ক্ষতিপূরণ মূলধন-মালিকের দেয়, তখন প্রমাণিত হল যে, মুনাফাটা মূলধন-মালিকের মালিকানা নয়। তা মুজারিবের মালিকানায় বৃদ্ধি পাওয়া ও

উৎপন্ন সম্পদ মাত্র। এর আর একটা প্রমাণ হল, রোগী ব্যক্তি যদি তার মাল মুজারিবকে মূলধন দেয়, আর তার জন্যে মুনাফার দশ ভাগের নয় ভাগ দেয়ার শর্ত করে, তা সমপরিমাণ মুনাফার অনেক বেশি— তাহলে তা জায়েয হবে। মুজারিবকে যা দেয়ার শর্ত করা হয়েছে তা তো সেই মূলধন-মালিক রোগী ব্যক্তির মাল থেকে দেয়া হয় না, যদি সে তার এ রোগে মারা যায়। তা এ রকমেরও নয় যে, সমপরিমাণ মজুরির অনেক বেশী দেয়ার শর্তে তাকে মজুর নিয়োগ করা হয়েছে। তাহলে তা এক-তৃতীয়াংশ থেকে হবে। প্রমাণিত হল যে, তা ব্যবসায়ের মুনাফা গ্রহণ ইয়াতীমের মাল থেকে হল না।

যদি বলা হয়, অসী এ ব্যাপারে অন্যান্য সব কর্মচারীর মত হতে পারে না কেন? যেমন বিচার করা ? যারা কাজ করে ও মুসলামনদের জন্যে করা তাদের কাজের বিনিময়ে রিযিক—বেতন-ভাতা পেয়ে থাকে ? অসী-ও তেমনি ইয়াতীমের জন্য কাজ করবে ও তার কাজ অনুপাতে সে তার মাল থেকে বেতন-ভাতা গ্রহণ করবে? তা জায়েয হবে না কেন ?

জবাবে বলা যাবে, অসী যদি ধনী-সচ্ছল হল, তাহলে ইয়াতীমের জন্যে কাজ করে তার মাল থেকে কিছু গ্রহণ করা যে জায়েয নয়, এ বিষয়ে সমস্ত ফিকাহবিদ একমত। এতে কোন মতদ্বৈততা নেই। কুরআনের আয়াতই তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। বলা হয়েছে ঃ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ 'যে লোক ধনী— সচ্ছল হবে, সে কিছুই গ্রহণ করবে না।' তা সত্ত্বেও বিচারক ও কর্মচারীদের জন্যে তাদের প্রয়োজনীয় রিযিক গ্রহণ— ধনী হওয়া সত্ত্বেও— জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোন মতদ্বৈততা নেই। এক্ষণে ইয়াতীমের অভিভাবক যদি তার মাল থেকে যা গ্রহণ করবে তা বিচারক ও কর্মচারীদের রিযিক গ্রহণের মত হয়, তাহলে তা তার জন্যে গ্রহণ করা জায়েয, ধনী হলেও। এ থেকে প্রমাণিত হল— ইয়াতীমের অভিভাবক তার মাল থেকে কিছু পাওয়ার অধিকারী নয়, বিচারকের পক্ষেও ইয়াতীমের মাল থেকে কিছু গ্রহণ জায়েয নয়— অথচ ইয়াতীমের ব্যাপারাদির দায়িত্ব পালন তারই নিকট অর্পিত। এ থেকে প্রমাণিত হল, যে সব লোকের অভিভাবকত্ব রয়েছে ইয়াতীমের উপর, তাদের পক্ষে ইয়াতীমের মাল থেকে কিছু গ্রহণ জায়েয হবে না— না করয হিসেবে, না অন্যভাবে। যেমন বিচারক ধনী হোক বা গরীব— তা গ্রহণ করতে পারে না।

যদি বলা হয়, বিচারক ও কর্মচারীর রিযিক গ্রহণ এবং ইয়াতীমের অভিভাবকের ইয়াতীমের মাল থেকে যথেষ্ট হয়— এমন পরিমাণ গ্রহণের মধ্যে কি পার্থক্য হতে পারে ?

জবাবে বলা যাবে, রিযিক তো কোন মজুরি নয়। তা এমন জিনিস, যা আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য নির্ধারণ করেছেন। মুসলমানদের সামষ্টিক কাজের দায়িত্ব যে-ই পালন করবে, তাদের প্রত্যেকের জন্যে এ রিযিক প্রাপ্তির অধিকার স্বীকার করেছেন। ফিকাহবিদগণের জন্যে রিযিক গ্রহণও জায়েয। মজুরি গ্রহণ জায়েয— এমন কোন কাজ-ই তাঁরা করেন নি। কেননা তাঁদের ফতোয়া দানে মশ্‌গুল থাকা ও লোকদেরকে ফিকাহ-অবহিত বানানো দ্বীনি ফরয। আর ফরয পালনের বিনিময়ে কোন মজুরি গ্রহণ করা কখনই জায়েয হতে পারে না। যোদ্ধারা এবং তাদের সন্তানরা যে রিযিক পায়, তা কোন মজুরি নয়। খলীফা— রাষ্ট্র পরিচালকের জন্যেও এ নিয়ম। [একটা হল কাজ অনুপাতে মজুরি। আর একটা হল Subsistance জীবিকা নির্বাহ বা

অস্তিত্ব রক্ষা ও বেঁচে থাকার উপকরণ— অনুবাদক] নবী করীম (স)-এর জন্য খুমুস ও ফাই থেকে এবং গনীমত থেকে— যখন যুদ্ধ হতো— অংশ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছিল। তিনি কোন কাজের মজুরি গ্রহণ করতেন— তিনি যে দ্বীনি দায়িত্ব পালন করতেন তার বিনিময় নিতেন, এমন কথা বলা কারোর জন্যই জায়েয হতে পারে না। আর তা কি করেই বা জায়েয হতে পারে ? আল্লাহ্ তো বলে-ই দিয়েছেন ঃ

قُلْ مَآ اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ -

এ কাজের জন্যে আমি তোমাদের নিকট কোন মজুরির প্রার্থী নই। আর আমি তো কৃত্রিমতাকারী নই। (সূরা সায়াদ ঃ ৮৬)

وَقُلْ لَّا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى -

আর বল, আমি তোমাদের নিকট এ কাজের জন্য কোন মজুরি দাবি করি না, আমি চাই শুধু নিকটাত্মীয়দের ভালোবাসা। (সূরা শুরা ঃ ২৩)

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, রিযিক কোনক্রমেই মজুরি নয় (Subsistance কখনও wages নয়) এ কথার আরও একটি প্রমাণ হল— ফকীর-মিসকীন ও ইয়াতীমের অধিকার রয়েছে বায়তুল মালে। কিন্তু তা তারা কোন কাজের— কোন কিছুরই বিনিময়ে— গ্রহণ করে না। কাজেই বিচারক ও সরকারী কর্মচারী এবং দ্বীনি ব্যাপারাদিতে কাজ করে মজুরি গ্রহণ আদৌ জায়েয নয়। শুধু তা-ই নয়, বিচারক— কাযী, সরকারী কর্মচারীদের হাদিয়া-তোহ্ফা গ্রহণও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)-কে اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ 'ঘুষখোর' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ওরা শুধু কি ঘুষখোর ? জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ না, ওটা সম্পূর্ণ কুফরী। আর তা হচ্ছে সরকারী কর্মচারীদের হাদিয়া-তোহ্ফা গ্রহণ। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

هَدَايَا الْاُمَرَاءِ غُلُوْلٌ -

(সরকারী) কর্মচারীদের দেয়া হাদিয়া-তোহ্ফা সোজাসুজি বিশ্বাসঘাতকতা।

বস্তুত বিচারক বিচার কার্যের কোন কিছুর জন্যে কোন মজুরি গ্রহণ করতে পারবে না, তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। হাদীয়া-তোহ্ফা গ্রহণও তার জন্যে সম্পূর্ণ হারাম। আগের মনীষীরা কুরআনের اَلسُّحْتَ বলতে এ জিনিসই বুঝেছেন। ইয়াতীমের অভিভাবক ইয়াতীমের ধন-মাল থেকে যা-ই গ্রহণ করবে, তা হয় মজুরি হবে অথবা তা হবে বিচারক ও কর্মচারীদের ন্যায় রিযিক (Subsistance) গ্রহণ করবে। আর জানা-ই আছে যে, মজুরি হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট কাজের নির্দিষ্ট মিয়াদের নির্দিষ্ট পরিমাণের। সে জন্যে পূর্ব থেকেই একটা চুক্তি ও কথা-বার্তা স্থিরীকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সে ক্ষেত্রে ধনী-গরীব সম্পূর্ণ সমান। আর ইয়াতীমের মাল থেকে করয হিসেবে গ্রহণ যে জায়েয বলে অথবা করয ছাড়া অন্য কোনভাবে, তা কখনই মজুরি হয় না। তার কারণ আমরা আগেই বলেছি। আর কুরআনের ঘোষণায় ধনী ও গরীবের মধ্যে পার্থক্যের কথা সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, তাদের নিকট সে কথাও স্পষ্ট। অতএব প্রমাণিত হল যে, তা

মজুরি নয়। আর বিচারক যেমন রিযিক গ্রহণ করে, সে রকম গ্রহণ করাও জায়েয নয়। কেননা বিচারকদের মধ্যেও ধনী গরীবের অবস্থা এক ও অভিন্ন। যে রিযিক তারা গ্রহণ করে সে ক্ষেত্রে। যারা তা গ্রহণ করা জায়েয বলে ইয়াতীমের মাল থেকে, তাতে ধনী-গরীবের পার্থক্য বিদ্যমান। আর রিযিক যেহেতু মুসলমানদের বায়তুলমাল থেকে দেয়া বাধ্যতামূলক, ঢ়নগণের মধ্যে থেকে কোন একজনের ধন-মাল থেকে তা দেয়া হয় না। তাই ইয়াতীমের অভিভাবক যা ইয়াতীমের মাল থেকে গ্রহণ করে তা বিচারক ও শ্রমিক-কর্মচারী যা গন্দহণ করে— এ দুটি যারা এক ও অভিন্ন মনে করে তারা খর্তব্য সম্পর্কে অনবহিত।

খায়বরের যুদ্ধের গনীমতের মাল সম্পর্কে রাসূলে করীম (স) যা বলেছিলেন, তা-ও আমাদের উপরোক্ত কথার একটা দলীল। তিনি বলেছিলেন ঃ

لَايُحِلُّ لِى مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ مِثْلُ هٰذِهٖ يَعْنِىْ وَبَرَةً اَخَذَهَا مِنْ بَعِيْرِهٖ اِلَّا الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُوْدٌ فِيْكُمْ -

আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে 'ফাই' সম্পদ দেন— যেমন একটা উটের চুল যদি আমি এর উট থেকে নেই— আমার জন্য হালাল নয়। তবে এক-পঞ্চমাংশ। আর এক-পঞ্চমাংশ তোমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া হবে। তাই নবী করীম (স) যেমন মুসলমানদের নেতা ও ধন-মালের মুতাওয়াল্লী ছিলেন অসী— ইয়াতীমের অভিভাবকও ইয়াতীমের ধন-মালের মুতাওয়াল্লী, তাকেও সেরূপ হতে হবে আরও অধিকভাবে।

উপরন্তু অসী মৃতের অসীয়তে নেক কাজ হিসেবে কোনরূপ মজুরি ছাড়াই নিযুক্ত হয়, তাই তাকে কোন মজুরি দেয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। আর করয হিসেবে কিছু নেয়া-ও তার জন্যে জায়েয নয়, অন্য কোনভাবেও নয়।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ -

অতঃপর তোমরা যখন তাদের মাল তাদের নিকট ফিরিয়ে দেবে, তখন তাদের উপর তোমরা সাক্ষী রাখ।

আবূ বকর বলেছেন, ইয়াতীমের পর্যায়ে যেসব আয়াত ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা সবই এক সাথে প্রমাণ করে যে, ইয়াতীমদের জন্যে এই ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক যে, অন্য কেউ তাদের মুতাওয়াল্লী বা অভিভাবক হবে তাদের ধন-মাল রক্ষণাবেক্ষণ ও তার ব্যবস্থাপনা পরিচালনের জন্যে, যার ফায়দা ও কল্যাণ তারা লাভ করবে। তারাই হচ্ছে মৃত পিতার অসী, অথবা পিতার না থাকা অবস্থায় দাদার অসী। কিংবা একজন আমানতদার, ন্যায়পরায়ণ শাসক ও সুবিচারক। অসীগণকেও তা-ই হতে হবে— এ শর্ত আরোপিত হয়েছে। আর দাদা বা বাবা, আর অন্য যে-ই ছোট বয়সের লোকের ধন-মালের ব্যবস্থাপনা করবে, সে ন্যায়পরায়ণ সুবিচারক আমানতদার হবে, তার উপর অভিভাবকত্ব কেউ পেতে পারবে না এরূপ গুণের অধিকারী হওয়া ছাড়া। যারা ফাসিক, খারাপ কাজের দোষে দোষী, অভিযুক্ত, ঘুষখোর শাসক এবং অ-বিশ্বস্ত ও

অ-নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি— এদের কেউই ছোট বয়সের লোকের ধন-মালের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বশীল অসী বা মুতাওয়াল্লী অথবা অভিভাবক হতে পারে না। এ ব্যাপারে কেউ ভিন্ন মত পোষণ করেন বলে আমাদের জানা নেই। যেমন বিচারক যদি ফাসিক হয়, ঘুষখোর হয়, লালসার দাসানুদাস হয় এবং আইন-বিধান অমান্যকারী হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই পদচ্যুত হতে হবে, তার বিচারকার্য করা একেবারেই নাজায়েয। অনুরূপভাবে যে বিচারক বা অসী কিংবা আমানতদার অথবা শাসক যে-ই ইয়াতীমদের ধন-মালের আমানতদার হবে তাঁর অভিভাবকত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে কেবলমাত্র এই শর্তের ভিত্তিতে যে, সে নিরপেক্ষ, ন্যায়পরায়ণ, সহীহ আমানতদার লোক। অন্যথায় তার অভিভাবকত্ব চলবে না, কার্যকরও হবে না। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা ইয়াতীমদের অভিভাবকদেরকে আদেশ করেছেন পূর্ণবয়স্কতা লাভের পর ইয়াতীমদের ধন-মাল তাদের হাতে ফেরত দেয়ার সময় সাক্ষী রাখতে। এ পর্যায়ে কয়েক ধরনের নির্দেশ রয়েছে। একটি হচ্ছে, ইয়াতীম ও তার অভিভাবক— প্রত্যেকেরই পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। কেননা সে মাল হস্তগত করেছে— এর অকাট্য প্রমাণ দাঁড়িয়ে থাকলে অতঃপর আর সে যা তার নয় তা পাওয়ার জন্য কোন দাবি করতে পারবে না— তা থেকে অনেক দূরে সরে থাকতে বাধ্য হবে। আর অসীর নিরাপত্তাও তাতে নিহিত। কেননা সাক্ষী থাকলে সে ইয়াতীমের মাল ফেরত দেয়নি এরূপ দাবি তার উপর দায়ের হতে পারবে না। যেমন ক্রয়-বিক্রয়ে আল্লাহ সাক্ষী রাখতে আদেশ করেছেন, এ-ও তেমনি। তা ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সন্দেহ নেই। সাক্ষী রাখতে বলার আর একটি কারণ হল, তা তার আমানতদারীর প্রমাণ হবে, সে ইয়াতীমদের মাল আত্মসাত করেনি— তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে। যেমন নবী করীম (স) পড়ে পাওয়া মাল দেয়ার সময়ে তার সাক্ষী রাখতে বলেছেন আয়ায ইবনে হাম্মাদ আল-মুজাশেয়ী বর্ণিত হাদীসে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَىْ عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ -

যে লোক কোন পড়া মাল পাবে, সে যেন ন্যায়পর সাক্ষী রাখে এবং তা গোপনও না করে, গায়েব করেও না ফেলে।

এ সাক্ষী রাখতে বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে তার নিজের বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী প্রকাশ করার জন্যে এবং তার উপর কোনরূপ দোষারোপের সম্ভাবনাকে খতম করার উদ্দেশ্যে মাত্র।

## ইয়াতীমের মাল তার নিকট ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে অসীকে সত্য মানা

ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফর ও আল-হাসান ইবনে জিয়াদ বলেছেন ঃ অসী যদি ইয়াতীমদের পূর্ণবয়স্কতা প্রাপ্তির পর দাবি করে যে, সে ইয়াতীমের ধন-মাল— যা তার হাতে ছিল— সব তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে, তাহলে তাকে সত্য মানতে হবে, তাকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করতে হবে। অনুরূপভাবে অসী যদি বলে যে, আমি ইয়াতীমের ছোট বয়স কালে তার ধন-সম্পদ যা ছিল তা তার জন্যে ব্যয় করেছি, তাহলে এ ধরনের ব্যয়ের কথা সত্য বলেই মানতে হবে। তেমনি যদি বলে— ধন-মাল যা ছিল সব ধ্বংস হয়ে গেছে, তবুও

বিশ্বাস করতে হবে। সুফিয়ান সওরী বলেছেন— ইমাম মালিক বলেছেন, অসী ইয়াতীমের সব মাল তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে— তার এ কথা সত্য বলে মানা যাবে না। ইমাম শাফেয়ীও এ মত দিয়েছেন।

এর কারণ স্বরূপ বলেছেন, কেননা যে লোক ধারণা করেছে যে, সে ইয়াতীমের মাল তাকে দিয়েছে, সে সেই ব্যক্তি নয় যার নিকট তা আমানত রাখা হয়েছিল। যেমন অন্য লোকের নিকট মাল দিয়ে দেয়ার জন্যে নিযুক্ত উকীল। তাই তার কথা অকাট্য প্রমাণ ছাড়া সত্য বলে মেনে নেয়া যাবে না, যেহেতু আল্লাহ আগেই বলে দিয়েছেন ঃ

فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَا لَهُمْ فَاشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ -

তোমরা যখন তাদের নিকট তাদের মাল ফিরিয়ে দেবে, তখন তোমরা তাদের উপর সাক্ষী রাখ।

আবূ বকর বলেছেন, সাক্ষী রাখতে বলার অর্থ এই নয় যে, সে আমানতদার ও বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং সে যা বলছে তাতে সে সত্যবাদী নয়। কেননা আমানতের ব্যাপারটাই এমন যে, তার লেন-দেনে সাক্ষী রাখা খুবই পছন্দনীয় কাজ। ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যাপারাদিতে যেমন সে। যে কোন ধরনের গচ্ছিত রাখার ক্ষেত্রে আমানতের জিনিস ফেরত দেয়া কালে সাক্ষী রাখা খুবই সহীহ্ কাজ।

যদি বলা হয়— ধন-মাল ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে অসীর কথাকে যদি সত্য মেনে নিতে হয়, তাহলে সাক্ষী রাখার প্রয়োজন থাকে কোথায়, যখন কোনরূপ প্রমাণ ছাড়াই তার কথাকে মেনে নিতে হবে ?

জবাবে বলা যাবে, আমরা পূর্বেই বলেছি, অসীর আমানতদারী প্রকাশ করা এবং তার উপর কোন দোষারোপ থেকে নিজেকে রক্ষা করার সতর্কতাবলম্বন সম্ভব হয় সাক্ষী রাখার মাধ্যমে। সাক্ষী থাকলে তার উপর এ দাবি কখনই দায়ের হতে পারবে না যে, সে ইয়াতীমের ধন-মাল ফেরত দেয়নি। কেননা ফেরত দেয়ার পরও কোন দাবি বা অভিযোগ উঠলে সাক্ষী দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যাবে যে, দাবি বা অভিযোগ ঠিক নয়। স্বয়ং ইয়াতীমের জন্যেও তাতে সতর্কতার কারণ ঘটবে, সে তেমন কোন দাবি উত্থাপন করতে কখনই দুঃসাহসী হবে না। তা ছাড়া কখনও তেমন দাবি উঠলে অসীর কথার সত্যতা প্রমাণের জন্যে তাকে 'কসম' করতে হবে না, সে সহজেই সাক্ষী পেশ করে দিতে পারবে। যদি সাক্ষী রাখা না হয়, আর ইয়াতীম দাবি তুলল যে, তার মাল ফেরত দেয়া হয়নি, তখন অসীর কথা মেনে নেয়া হবে যদি সে 'কসম' করে বলে। কিন্তু সাক্ষী রাখা হলে তার সত্যতা প্রমাণের জন্যে 'কসম' খেতে হবে না তাকে। বস্তুত সাক্ষী রাখায় এ সব তাৎপর্যই নিহিত রয়েছে, যদি তার হাতে আমানত থেকেও থাকে।

সাক্ষী ছাড়াই অসীর কথা সত্য মানা হবে— তার প্রমাণ হল সকল ফিকাহবিদের ঐকমত্য। অসী যে তার নিকট রক্ষিত আমানত সংরক্ষণে আদিষ্ট, আমানত হিসেবেই সে তার সংরক্ষণ

করবে এবং শেষ কালে যথাসময়ে সে ইয়াতীমের নিকট ফিরিয়ে দেবে, এটাই তার দায়িত্ব। এই অবস্থা সাধারণ আমানতদারী ও অংশীদারী ব্যবসায়ের মতই। এগুলো যেভাবে সম্পাদিত হয়, এটাও তেমনি হবে।

এই কারণে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে অসীর কথাকেই সত্য মানতে হবে— আমানত ফিরিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে যেমন করে আমানতদারের কথাকেই সত্য মানা হয়। এটাও যে একটি আমানত, তার প্রমাণ এই যে, অসী যদি বলে যে, ইয়াতীমের সব ধন-মাল ধ্বংস হয়ে গেছে এবং স্বয়ং ইয়াতীম তার সত্যতা স্বীকার করে, তাহলে ক্ষতিপূরণ দিতে তাকে বাধ্য করা হবে না। যেমন আমানত রক্ষক আমানতের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা বললে তা-ই মানতে হয় এবং তাকেও ক্ষতিপূরণ দিতে বলা যাবে না।

ইমাম শাফেয়ী অবশ্য বলেছেন— ইয়াতীমরা তাদের নিকট আমানত রাখেনি বলে তাদের কথাকে সত্য মানা যাবে না। কিন্তু এই কথাটি বাহ্যতই বিপর্যয়কর। তার মধ্যে শরীয়াত বুঝের তাৎপর্য নিহিত নেই। বরং একথা ত্রুটিপূর্ণ— অসংলগ্ন। কেননা অসীকে সত্য না মানার যে কারণ বলা হয়েছে তা যদি বাস্তবিকই কারণ বলে ধরা হয়, তাহলে তো বিচারককেও সত্য মানা যায় না, যদি সে ইয়াতীমকে বলে যে— আমি তোমার মাল ফেরত দিয়েছি। কেননা তার নিকট তো আমানত রাখা হয়নি। এই রূপ কথা পিতা সম্পর্কেও বলা যেতে পারে যদি ছোট বয়সের পুত্রের পূর্নবয়স্ক হওয়ার পর পিতা তাকে বলে যে, তোমার মাল তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছি। তখন পিতাকেও সত্য মানা যায় না। কেননা পুত্র তার নিকট আমানত রাখেনি। পুত্রের পূর্ণবয়স্কতা পাওয়ার পর তার ধন-মাল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর পিতা পুত্র উভয় পরস্পকে সত্য মানে, তবুও পিতাকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করতে হয়। কেননা তার নিকট আমানত না রাখা সত্ত্বেও সে তার মালকে আটকে রেখেছে। অন্য কারুর নিকট মাল দেয়াকে উকীলের সাথে সাদৃশ্য দেখানো এখানে খাটে না। কেননা একটি অপরটি থেকে অনেক দূরে অবস্থিত।

তবে আমরা যে দিক দিয়ে অসীকে সত্য মানি, সে দিক দিয়ে দুটি অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। কেননা উকীলকে তার নিজের নির্দোষিতায় সত্য মানতে হয়। তার উপরও ক্ষতিপূরণ চাপানো যায় না। যে লোক ইয়াতীমের নিকট মাল ফিরিয়ে দিতে সরাসরি আদিষ্ট, তার নির্দোষিতার ব্যাপারে তার কথা কবুল করা হয় না। অথচ তাকে সত্য মানতে হয়। যেমন ইয়াতীমের পূর্ণবয়স্কতা পাওয়ার পর তাকে মাল ফেরত দেয়া সম্পর্কে আমরা অসীকে সত্য মেনে নিয়েছি।

উপরন্তু অসী বলা হয় সেই ব্যক্তিকে, যে তার অনুমতিক্রমে তার উপর হস্তক্ষেপ ও কর্ম পরিচালনা করে। ক্রয়-বিক্রয়ে তার এ পরিচালনা কার্যকর হয়। যেমন তার পিতার হস্তক্ষেপ জায়েয হয়। পিতা তার নিকট ধন-মাল আমানত রাখার ফলে অসী তা আটক ও সংরক্ষণ করে। পিতার এ অনুমতি ছোট বয়সের পুত্রের উপর পুরোপুরি কার্যকর হবে। তা তার অনুমতিক্রমে পূর্ণবয়স্কতা লাভের পরও সে তার ধারক হয়ে থাকে। ফলে সাধারণ আমানত ও এ আমানতের কোন মৌলিক পার্থক্য থাকে না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ -

পুরুষদের জন্যে অংশ রয়েছে সে সম্পদ-সম্পত্তিতে, যা পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়রা রেখে যায়।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্‌র এ কথাটি সাধারণ নিয়ম ও মোটামুটি ধরনের। সাধারণ ও ব্যাপক এ দিক দিয়ে যে, পুরুষ ও নারী সব-ই এর মধ্যে শামিল— এ কথাটি সকলের জন্যে। আর আল্লাহ্‌র কথা পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়রাও সাধারণ ও ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ। তা পুরুষ ও নারী সকলের জন্যে মীরাস ওয়াজিব করে দেয়। তা পিতামাতা ও নিকটাত্মীয় সকলের সম্পত্তিতে কার্যকর। আর তা এদিক দিয়ে যবীল আরহাম— রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়দের মীরাস প্রমাণ করে। কেননা ফুফু, খালা, মামা ও কন্যাদের সন্তান— এরাও যে নিকটাত্মীয় তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না! ফলে বাহ্যত এ সকলের মীরাসের অংশে থাকার কথা প্রমাণিত হয়। কিন্তু যখন বলা হল نَصِيْبٌ অংশ এটা মোটামুটি অর্থ জ্ঞাপক শব্দ। কোন বিশেষ পরিমাণ বোঝায় না। বোঝা গেল আয়াতে মোটামুটিভাবে মীরাসের কথা বলা হয়েছে। এখন এ কথাটির কার্যকরতা এর বিস্তারিত বর্ণনা না আসা পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। এর দ্বারা আয়াতটির বাহ্যিক অর্থের দৃষ্টিতে শুধু মীরাস প্রমাণিত হয়, যা যবীল আরহাম রক্ত সম্পর্কে আত্মীয়দেরও শামিল করে। এ কথাটি এ রকমেরই একটি কথা যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً -

তাদের ধন-মাল থেকে সাদকা যাকাত গ্রহণ কর। (সূরা তওবা ১০৩)

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اَنْفِقُوْا مِنع طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ -

তোমরা তোমাদের পবিত্র উপার্জন এবং আমরা যা জমিন থেকে তোমাদের জন্যে উৎপাদন করেছি, তা থেকে ব্যয় কর। (সূরা বাহারাহ ঃ ২৬৭)

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاٰتُوْا حَقَّه يَوْمَ حَصَادِه -

এবং তোমরা তার হক তা কাটাই-মাড়াইর দিনই আদায় করে দাও।

(সূরা আন'আম ঃ ১৪১)

পূর্ববর্তী আয়াতে যে ফল-ফসলের কথা বলা হয়েছে, তার সাথে যোগ করে এই কথাটি বলা হয়েছে। বস্তুত এ কতগুলো শব্দ, যা সাধারণ ও ব্যাপক অর্থপূর্ণ এবং সেই সাথে মোটামুটি ধরনের। কাজেই তাতে যে মোটামুটি ধরনের কথা আছে তা তার সাধারণ কথার দিক দিয়ে দলীল হওয়াকে নিষেধ করে না। যখন সাধারণ অর্থবোধক শব্দের ব্যাপকতা নিয়ে আমরা বিভিন্ন মত গ্রহণ করব। এ হল বিভিন্ন প্রকারের ধন-মাল। তা আবশ্যিকভাবে থাকে। অনিবার্য

পরিমাণে বিভিন্ন মত গ্রহণকালে মোটামুটি ধরনের কথাকে যুক্তি ও দলীল হিসেবে ধরা যদি সহীহ্ না-হয়। অনুরূপভাবে মীরাস পাওনাদার ওয়ারিসদের ব্যাপারে বিভিন্ন মত হলে পুরুষদের জন্যে অংশ রয়েছে যা পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়রা রেখে যাবে তা থেকে— এই কথার সাধারণত্ব ও ব্যাপকতাকে প্রমাণ হিসেবে ধরা যাবে। আবার প্রত্যেকের জন্যে আবশ্যিক পরিমাণে যখন বিভিন্ন মত হবে, তখন তা প্রমাণের জন্যে আমরা ভিন্ন এক বিশ্লেষণকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করব।

যদি বলা হয়, যখন বলেছেন : نَصِيبًا مَّفْرُوضًا নির্দিষ্ট করা অংশ, অথচ যবীল আরহাম— রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়দের জন্যে নির্দিষ্ট করা অংশ নেই, তখন আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, আলোচ্য আয়াতে তাদের সম্পর্কে কিছু বলারই উদ্দেশ্য ছিল না।

এর জবাবে বলা যাবে, তুমি যার উল্লেখ করেছ, তা তাদেরকে এর হুকুম ও কার্যকরতা থেকে বাইরে ঠেলে দেয় না এবং তাদের বিষয়েও যে বলা হয়েছে, তা মনে করতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা 'যবীল আরহাম'কে মীরাস দেয়ার কারণ বা অবস্থা উপস্থিত হলে তাদেরকে যা দেয়া হবে, তা তাদের মধ্যে প্রত্যেকের জন্যেই সুনির্দিষ্ট অংশ-ই বটে। এ যেমন জানা, তেমনি তার পরিমাণও নির্দিষ্ট অংশধারী লোকদের অংশের মতই। এ দিক দিয়ে তাদের দু-শ্রেণীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আসলে আল্লাহ্ উক্ত আয়াতে যে কথাটি স্পষ্ট করে বলেছেন, তা হল— পুরুষ ও নারী প্রত্যেকের জন্যে সুনির্দিষ্ট অংশ রয়েছে। অবশ্য আয়াতের সে অংশের পরিমাণ বলা হয়নি। কেননা তা একটি বর্ণনার দ্বারা অনুমতিপ্রাপ্ত এবং তার জন্যে একটি পরিমাণ-ও জানা, যা পরবর্তীতে বলা হয়েছে। তা পিতামাতা, সন্তান ও অংশীদারদের কতকের অংশ কুরআনে বলে দেয়া হয়েছে, কতক বলা হয়েছে হাদীসে এবং আরও কতক বলা হয়েছে ইজমায়ে উম্মত দ্বারা, আরও কতক বলা হয়েছে কিয়াস ও শুভ বিবেচনার দ্বারা। এমনিভাবে যবীল-আরহামের অংশগুলোও কতক বলা হয়েছে সুন্নাত বা হাদীস দ্বারা, কতক কুরআনের মূল দলীল দ্বারা আর কতক উম্মতের ঐকমত্যের দ্বারা ঠিক যেমন 'যবীল আরহামে'র অংশ নির্দিষ্ট করেছে কুরআনের আয়াত। কাজেই এতে যে সাধারণত্ব আছে, তা প্রত্যাহার করা জায়েয হবে না, তা দ্বারাই তাদেরকে মীরাস দেয়া আবশ্যক হবে। পরে এর দ্বারা যখন তারা মীরাস পাওয়ার অধিকারী হল, তখন সুনির্দিষ্ট অংশ পাওয়ারও অধিকারী হল। তাদের মধ্যে 'যবীল আরহামে'র মীরাস পাওয়ার কথা যাঁরা বলেন, এটা তাঁদেরই মত। তাই তাঁরা কতকে ভিন্ন ভিন্ন হলেও আবার কতকে তাঁরা একত্রিত ও একমত সম্পন্ন। আর যে বিষয়ে তাঁরা বিভিন্ন মত গ্রহণ করেছেন, তাতেও দলীল পেশ করা হয়েছে, যদ্দারা সে বিষয়ে আল্লাহ্‌র হুকুমটা জানা যায়।

যদি বলা হয়— কাতাদাহ্ ও ইবনে জুরাইয থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আয়াতটি একটি কারণে নাযিল হয়েছিল। আর তা ছিল এই জাহিলিয়াতের সময়ের লোকেরা কেবল পুরুষদেরকে মীরাস দিত, মেয়েদেরকে দিত না। তখন সে প্রেক্ষিতেই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। অন্যরা বলেছেন— আরবদের মধ্যে এটাই প্রচলন ছিল যে, তারা মীরাস দিত কেবল সেই ব্যক্তিকেই যে তীর নিক্ষেপণে দক্ষতা দেখাতে ও বেশি বেশি সংগ্রহ করতে পারত। তখন

আল্লাহ এ আয়াতটি নাযিল করে তাদের নীতিকে বাতিল করে দিলেন। কাজেই আয়াতে নিহিত সাধারণত্বকে যে বিষয়ে তা নাযিল হয়নি সেই বিষয়ে গণ্য করা সহীহ্ হবে না।

জবাবে বলা যাবে— এ কথাটি কয়েকটি দিক দিয়ে ভুল। একটি হল— তুমি যে কারণটির উল্লেখ করেছ, তা কেবল সন্তান ও আল্লাহ্ যেসব নিকটাত্মীয়ের কথা অন্যত্র বলেছেন তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আসল কারণ এই ছিল যে, তারা কেবল পুরুষ ছেলেদেরই মীরাস দিত, মেয়ে-নারীদের মীরাস দিত না। এ-ও হতে পারে যে, তারা কেবল পুরুষ 'যবীল-আরহাম'কে মীরাস দিত, মেয়ে 'যবীল-আরহাম'কে দিত না। অতএব তুমি যা বলেছ, তাতে এ কথার কোন দলীল নেই যে, কেবল সন্তানদের মীরাস দান এবং মীরাসের আয়াতের আর যে সব অংশীদারদের উল্লেখ করেছেন কেবল তাদেরকে মীরাস দান-ই আয়াতটির নাযিল হওয়ার একমাত্র কারণ।

অন্য একটি দিক দিয়েও বিবেচনা করা যায়। আয়াতটি যদি বিশেষ কোন কারণে নাযিল হয়ে থাকে, তাহলে তদ্দরুন ব্যবহৃত শব্দের সাধারণত্বকে বিশেষীকরণ কর্তব্য করে দেয় না। বরং আমাদের মতে কোন কারণ ছাড়া-ই এর হুকুমটা সাধারণ ও ব্যাপক। তাই কোন্ কারণে আয়াতটির নাযিল হওয়া এবং কোন কারণ ছাড়াই তার নাযিল হওয়া সম্পূর্ণ সমান ব্যাপার। উপরন্তু আল্লাহ সন্তানদের সঙ্গে অন্যান্য নিকটাত্মীয়দেরও উল্লেখ করেছেন। যেমন বলেছেন ঃ

مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ -

তা থেকে, যা রেখে গেছে পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়গণ।

এ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, এ আয়াতে নিকটাত্মীয়দের বাদ দিয়ে কেবল সন্তানদের মীরাসের কথাই বলা হয়নি। এ আয়াতের দলীল এ কথাও প্রমাণ করে যে, দাদার জীবিত থাকা অবস্থায় ভাই ও বোনেরাও অংশ পাবে। যেমন সেটি দলীল হয়ে প্রমাণ করে 'যবীল-আরহামে'র মীরাস পাওয়ার কথা।

আর আল্লাহ্র কথা نَصِيبًا مَّفْرُوضًا 'সুনির্দিষ্ট অংশ'। অর্থাৎ (প্রকৃত তাৎপর্য আল্লাহ্ ভাল জানেন) জানা অংশ, যার পরিমাণ নির্দিষ্ট। বলা হয় فرض শব্দের অর্থ اَلْحزُّ খাঁজ কাটা। তা বিভিন্ন খণ্ডে ভাগ করার চিহ্ন। الفرضة অর্থ পানি বন্টনের চিহ্ন দেয়া, যার দ্বারা প্রত্যেকেই তার পানীয় অংশ সুবিধামত লাভ করতে ও চিনতে পারে। فرض শব্দের এটাই যখন আসল অর্থ, তখন শরীয়াতে জানা কর্তব্যের পরিমাণ কিংবা যে সব ব্যাপার প্রমাণিত ও বাধ্যতামূলক, তা নির্ধারণ অর্থে ব্যবহৃত হতে লাগল।

এ-ও বলা হয়েছে যে, الفرض -এর আসল অর্থ হল প্রমাণিত হওয়া। এ কারণে দুই বন্ধনীর মাঝের টুকরাকে فرض বলা হয়, কেননা তা প্রমাণিত। শরীয়াতের দৃষ্টিতে 'ফরয' শব্দের অর্থ এ দুটি ভাগে বিভক্ত। তাই বলে যদি কর্তব্য ও বাধ্যতামূলক তা বোঝাতে চাওয়া হয়, তাহলে তা হবে উঁচু পর্যায়ে অবশ্য কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। শরীয়াতে ব্যবহৃত 'ফরয' ও 'ওয়াজিব'-এ অর্থ সম্পর্কে কোন কোন দিক দিয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করা হয়েছে , যদিও 'ফরয' হিসেবে প্রত্যেকটি 'ফরয'-ই অবশ্য কর্তব্য, যা একজনের জন্যে অবশ্য করণীয় হয়ে যাবে। তবে

'ওয়াজিব' ঠিক সে রকমের নয়। কেননা তা কোন ওয়াজিবকারীর ওয়াজিব করা ছাড়াও ওয়াজিব হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়, আনুগত্যকারী লোকদেরকে সওয়াব দান আল্লাহ্র জন্যে কর্তব্য। এটা আল্লাহ্র বিশেষ কৌশল। তাই বলে তা আল্লাহ্র জন্যে 'ফরয'— এ কথা বলা যাবে না। কেননা 'ফরয' করার জন্যে একজন 'ফরযকারীর প্রয়োজন। আর আল্লাহ্র জন্যে ফরযকারী কেউ হতে পারে না। অথচ ওয়াজিব হতে পারে কৌশলগতভাবে কোন ওয়াজিব ফয়সালাকারী ছাড়া-ই। 'ওয়াজিব' শব্দের আসল আভিধানিক অর্থ হল, পড়ে যাওয়া। যেমন সূর্য পড়ে গেলে বলা হয় ঃ وَجَبَتِ الشَّمْسُ প্রাচীর পড়ে গেলে বলা হয় ঃ وَجَبَتِ الْحَائِطَ আর سَمِعْتُ وَجْبَةً আমি একটা পতন শব্দ শুনলাম। আল্লাহ্র কালামে এসেছে ঃ فَاذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا 'যখন তার পার্শ্ব নিচে পড়ে যাবে'। 'ফরয' শব্দটি মূলত ওয়াজিব-এর তুলনায় অধিক প্রতিক্রিয়াসম্পন্ন। শরীয়াতের হুকুমের দিক দিয়েও তা খুব শক্ত— যখন খাঁজ সঙ্ঘটিত ও প্রতিষ্ঠিত ও প্রভাবশালী হয়, 'ওয়াজিব' সে রকমের নয়।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى -

মীরাস বন্টনকালে যখন নিকটাত্মীয় ও ইয়াতীমরা— যারা মীরাসে অংশ পায়নি— উপস্থিত হয় ....

সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, আবূ মালিক ও আবূ সালিহ্ বলেছেন ঃ মীরাসের আয়াত দ্বারা এ আয়াতটি মনসূখ হয়ে গেছে। ইবনে আব্বাস, আতা, আল-হাসান, শবী, ইবরাহীম, মুজাহিদ ও জুহরী বলেছেন—না, আয়াতটি মুহকাম, মনসূখ হয়নি। আর আতীয়াতা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, উক্ত আয়াতটির প্রয়োগ মীরাস বন্টনকালে হবে। আর তা ছিল মীরাস সম্পর্কে কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্ববর্তী অবস্থা। পরে আল্লাহ তা'আলা মীরাসী আইন-ফারায়েয— নাযিল করেন। তাতে হককারী প্রত্যেককে তার প্রাপ্য হক দিয়ে দেয়া হয়েছে, ঘোষণা করা হয়েছে নির্দিষ্টভাবে। অতঃপর আছে শুধু দান-সাদকা, যা মৃত ব্যক্তি নির্দিষ্ট করে গেছে। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত এ বর্ণনাটিতে বলা হয়েছে যে, পূর্বে মীরাস বন্টনকালের জন্যে এটা কর্তব্য ছিল। পরে মীরাসী আইন দ্বারা তা মনসূখ হয়ে গেছে। অতঃপর তা মৃতের অসিয়তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যা সে এদের জন্যে বলে গেছে, তারা তাই পাবে। ইকরামা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, এ আয়াত মনসূখ হয়নি। তা মীরাস বন্টনের সে সবের জন্যে অর্পিত। পরিত্যক্ত ধন-মালের স্বল্পতা থাকলে তাদের নিকট ওযরখাহী করতে হবে তাদের কিছু দেয়া গেল না বলে। এ আয়াতে সেই কথা-ই আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَقُوْلُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا -

এবং তাদেরকে ভালো শুভ পরিচিত কথা বল।

হাজ্জাজ আবূ ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন, আবূ মূসা আল-আশ্'আরী ও আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর মীরাস বন্টনকালে ওদের যারা উপস্থিত থাকত, তাদের কিছু না-কিছু দিতেন। কাতাদাহ আল-হাসান সূত্রে বলেছেন, এ আয়াতটি 'মুহকাম'। আশ্আস ইবনে সীরীন হুমায়দ

ইবনে আবদুর রহমান সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ আমার পিতা একটা মীরাসের অভিভাবকত্ব পেয়েছিলেন। তখন তিনি একটি ছাগী যবেহ্ করতে ও তাদেরকে খাওয়াতে আদেশ করেছিলেন। সে মীরাসটি যখন বন্টন করা হল, তখন তাদেরকে খাওয়ানো হল। পরে তিনি এ আয়াতাংশ পাঠ করেন ঃ

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى -

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন উবায়দা সূত্রেও অনুরূপ কথা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন ঃ এই আয়াতটি না হলে এই ছাগীটি যবেহ্ করা হতো না। আমার ভাগে থেকে যেত।[১] তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তা এক ইয়াতীমের মাল ছিল, তিনি তার অভিভিবক হয়েছিলেন।

হুসায়ম আবূ বশর সাঈদ ইবনে যুবায়র সূত্রে এ আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ এ আয়াতটিকে লোকেরা খুব সহজভাবে গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন— ওরা দুজন। একজন মীরাস পায় আর একজন মীরাস পায় না। যে মীরাস পেয়েছে, তাকে ঐ লোকদেরকে রিযিক ও দান দিতে আদেশ করা হয়েছে। আর যে মীরাস পায়নি, তাকে বলা হয়েছে— ওদেরকে ভালো মিষ্টি কথা বলে বিদায় দাও। সে বলে— এই মাল অনুপস্থিত লোকের প্রাপ্য কিংবা ছোট ছোট ইয়াতীমের। তাতে তোমাদের হক রয়েছে। আর আমরা নিজেরা তার মালিক নই বলে তা থেকে কোন কিছু দিতে পারি না। এটাই হচ্ছে قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ ভাল-ভাল কথা। বলেছেন, এ আয়াতটি 'মুহকাম' মনসূখ নয়। আল্লাহ্‌র কথা فَارْزُقُوْهُمْ এর অর্থ সাঈদ ইবনে যুবায়র মনে করেছেন যে, তাদেরকে মীরাস থেকে তাদের অংশ দিতেন। আর অন্যদেরকে ভালো ভালো কথা বলতেন। তাঁর মতে আলোচ্য আয়াতটির তাৎপর্য হল— কোন কোন ওয়ারিস যদি মীরাস বন্টনকালে উপস্থিত থাকে আর তাদের কিছু লোক অনুপস্থিত, আর কিছু ওয়ারিস থাকে ছোট বয়সের, তাহলে উপস্থিতদের মীরাসের অংশ তাদের দিতে দেয়া হবে। আর অনুপস্থিত ও ছোটদের মীরাসের অংশ আলাদা করে আটকে রাখতে হবে।

এ ব্যাখ্যা যদি সহীহ্ হয়, তাহলে তা দলীল হবে তার জন্যে , যা দুই ব্যক্তির রাখা আমানত সম্পর্কে সে বলে যে, তাদের একজন অনুপস্থিত থাকলেও যে উপস্থিত থাকবে, সে তার অংশ নিয়ে নেবে। আর আমানতদার-ই অনুপস্থিত ব্যক্তির অংশকে আটকে রেখে দেবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ ও আবূ হানীফাও এই মত দিয়েছেন যে, আমানতে দুজন শরীক থাকেল দুজন-ই এক সাথে উপস্থিত না হলে উপস্থিত একজনকে তার ভাগেরটা দেয়া হবে না। আতা সাঈদ ইবনে যুবায়রের এ ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন যে, قُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا جَمِيْلًا আয়াত অনুযায়ী উত্তরাধিকারীরা ছোট বয়সের হলে তাদের অভিভাবকরা সেই লোকদিগকে, যারা মৃতের নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন লোক মীরাস পাচ্ছে না, তাদেরকে বলবে যে, ওরা ওয়ারিস হলে বয়সে ওরা ছোট। ওরা বড় হলে ওদেরকে বল, যেন ওরা তোমাদের হক্ চিনে এবং তাদের রব্ব এ পর্যায়ে তাদেরকে যে অসিয়ত করতে বলেছেন, তা যেন তারা পালন করে।

---

১. এখানে 'আমার ভাগে' অর্থ ইয়াতীমের মাল হিসেবে আমার হাতে'। 'আমার ভাগে' কথাটি পরোক্ষ অর্থজ্ঞাপক, প্রত্যক্ষ বা প্রকৃত অর্থজ্ঞাপক নয়। কেননা তিনি ইয়াতীমের অভিভাবক ছিলেন মাত্র, তার প্রকৃত মালিক ছিলেন না।

এ আলোচনা স্পষ্ট করে দিল যে, আলোচ্য বিষয়ে আগেরকালের ফিকাহ্‌বিদদের চার প্রকারের মত রয়েছে। একটি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, আবূ মালিক, আবূ সালিহ প্রমুখ বলেছেন— এ আয়াত মনসূখ। মীরাসের আয়াত দ্বারা তা মনসূখ হয়েছে। দ্বিতীয়, ইবনে আব্বাস থেকে ইকরামার বর্ণনা এবং আতা, আল-হাসান, শবী, ইবরাহীম ও মুজাহিদের কথা ঃ আয়াতটি সুপ্রতিষ্ঠিত— এর হুকুম চিরন্তন, কার্যকর। তা মন্‌সূখ হয়নি, এবং তা মীরাস পর্যায়ে গণ্য। তৃতীয়— ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত তৃতীয় কথা। তা হল— এ আয়াতটি মৃতের অসিয়তে কার্যকর হবে। মীরাস থেকে তাদেরকে দেয়া হবে না বলে সে দিক দিয়ে আয়াতটি মনসূখ। জায়দ ইবনে আসলাম থেকে তা-ই বর্ণিত। জায়দ ইবনে আসলাম বলেছেন ঃ এ এমন একটা জিনিস যা অসিয়তকারী যখন আসিয়ত করবে তখন তা করার জন্যে আদেশ করা হয়েছে। এ কথার পক্ষে দলীল হিসেবে এ আয়াতটির উল্লেখ করা হয় ঃ

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا -

যারা পেছনে দুর্বল-অক্ষম সন্তান রেখে যায় তাদের এ ব্যাপারেও ভয় করা উচিত।

বলেছেন— যারা মীরাস বন্টনকালে উপস্থিত হবে, তাদের বলবে ঃ তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। ওদের সাথে সেলায়ে রেহমী কর এবং তাদেরকেও কিছু দাও। আর চতুর্থ হচ্ছে সাঈদ ইবনে যুবায়র থেকে আবূ বশর-এর বর্ণনার কথা। তা হল— 'মীরাস থেকে ওদের রিযিক দাও' আল্লাহ্‌র এ কথায় মূল মীরাস থেকে দিতে বলা হয়েছে। আর 'ওদেরকে ভালো ভালো কথা বল'— যারা মীরাস পায়নি তাদেরকে বলার নির্দেশ। তাই যারা বলেছেন— আয়াতটি মনসূখ, তাঁদের মতে মীরাসের আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে উক্ত হুকুম অবশ্য পালনীয় ছিল। পরে যখন মীরাসের আয়াত নাযিল হল, তাতে প্রত্যেক ওয়ারিসকে নির্দিষ্ট পরিমাণের অংশ দেয়ার হুকুম হল, তখন উক্ত আয়াতটি মনসূখ হয়ে গেছে।

আর যারা বলেছে— উক্ত আয়াত কখনই মনসূখ হয়নি, দৃঢ় কার্যকর হয়ে আছে— আমাদের মতে তাদের এ কথার তাৎপর্য হল— তাঁরা এটাকে মুস্তাহাব মনে করেন, বাধ্যতামূলক নয়, তবে খুবই পছন্দনীয় কাজ, তা ওয়াজিব নয়। কেননা ওয়াজিব হলে রাসূল (স)-এর জীবদ্দশায় বিপুলভাবে মীরাস বন্টনেরকাজ সম্পন্ন হওয়াকালে সাহাবী ও তাবেয়ীদের জমানায় তদনুযায়ী অবশ্যই আমল করা হতো এবং তা কর্তব্য বলে মত পাওয়া যেত। তা সেই লোকদের হক বলে প্রচারিত হত। যেমন সাধারণ প্রয়োজনেই মীরাসী আইনের ব্যাপক প্রচার ও কার্যকরতা সম্পন্ন হয়েছে। তাই নবী করীম (স) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা) থেকে যখন তা প্রমাণিত হয়নি, তখন বুঝতে হবে, তা একটি মুস্তাহাব— অত্যন্ত পছন্দনীয় কাজ, ওয়াজিব ও বাধ্যতামূলক কর্তব্য নয়।

আর আবদুর রহমান, উবায়দাতা ও আবূ মূসা (রা) থেকে এ পর্যায়ে যা বর্ণিত হয়েছে, তার কারণ এই হতে পারে যে, ওয়ারিসগণ বড় বয়সের ছিল এবং তাদের সকলের অনুমতি নিয়ে ও সকলের পক্ষ থেকে সম্মিলিত মালিকানার কোন ছাগী যবেহ্ হয়ে থাকতে পারে। আর হাদীসে যে বলা হয়েছে যে, উবায়দাতা ইয়াতীমদের মীরাস বণ্টন করে একটি ছাগী যবেহ করেছেন, তা এভাবে হয়ে থাকতে পারে যে, প্রথমে তারা ইয়াতীম ছিল, পরে তারা বড় হয়ে এ কাজ করেছে

যখন তারা আর ইয়াতীম থাকেনি। কেননা তারা ছোট বয়সের হয়ে থাকলে তাদের অংশ পারস্পরিকভাবে বণ্টন হওয়া সহীহ্ হতো না। এ-ও বোঝা যায় যে, তা মুস্তাহাব মাত্র— সাঈদ ইবনে যুবায়র সূত্রে আতা বর্ণিত হাদীস থেকে। হাদীস হল, অসী নিকটাত্মীয়দের মধ্যে যারা উপস্থিত তাদেরকে বলবে ঃ ওরাই ওয়ারিস, কিন্তু ওরা ছোট বয়সের এবং সেই লোকদেরকে কিছু দিতে না পারার দরুন ওযরখাহী করবে। ওরা যদি আবশ্যিকভাবে প্রাপক হতো, তাহলে ওদেরকে দেয়া অবশ্যই কর্তব্য হতো— ওয়ারিসরা ছোট বয়সের হোক, কি বড় বয়সের। উপরন্তু আল্লাহ্ তো ওয়ারিসদের মধ্যেই মীরাস বণ্টন করে দিয়েছেন, প্রত্যেকের জন্যে অংশ স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন মীরাসের আয়াতে। কিন্তু তাতে ওদের জন্যে তো কিছুই বলা হয়নি। আর যা অন্য লোকের মালিকানা, তা অন্যদেরকে দিয়ে দেয়া তো জায়েয হতে পারে না। হ্যাঁ, যেভাবে আল্লাহ্ দিতে বলেছেন, কেবল সেভাবেই দেয়া যেতে পারে। কেননা আল্লাহ্ মৌল নীতি হিসেবে ঘোষণা করে দিয়েছেন ঃ

وَلَا تَأْكُلُوٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ -

তোমরা তোমাদের ধন-মাল পারস্পরিকভাবে বাতিল উপায়ে ভক্ষণ করো না। তবে যদি তোমাদের সম্মতিক্রমে ব্যবসায় হয় ....। (সূরা নিসা ঃ ২৯)

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

دِمَاؤُكُمْ وَاَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ -

তোমাদের রক্ত ও তোমাদের ধন-মাল তোমাদের পরস্পরের জন্যে হারাম।

বলেছেন ঃ

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ اِلَّا بِطِيْبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ -

কোন মুসলমানের মাল তাঁর নিজের থেকে খুশী মনে না দিলে তা অন্য ব্যক্তির জন্যে হালাল হবে না।

এসব হাদীসই প্রমাণ করে যে, মীরাস বণ্টনকালে উপস্থিত নিকটাত্মীয় ও ইয়াতীমদেরকে কিছু দেয়া ওয়াজিব নয়। মুস্তাহাব মাত্র।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوْفًا -

এবং তাদেরকে ভালো ভালো কথা বল।

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত— মীরাসের সম্পদে যখন স্বল্পতা থাকবে, তখন এই লোকদের নিকট ওযরখাহী করতে হবে। আর সাঈদ ইবনে যুবায়র বলেছেন ঃ মীরাস ওয়ারিসদেরকেই দেয়া হবে। আর তাই হচ্ছে ঃ 'তা থেকে ওদেরকে রিযিক দাও' আল্লাহ্‌র এ কথাটুকুর তাৎপর্য। যারা মীরাস পাচ্ছে না, তাদেরকে বলা হবে ঃ এ মাল যাদের, তারা এখন অনুপস্থিত কিংবা ছোট ছোট ইয়াতীমদের, তাতে তোমাদের 'হক' রয়েছে, কিন্তু আমরা তা থেকে কোন জিনিস

দিতে পারি না। তার মতে এটা ওযরখাহী— অক্ষমতা প্রকাশ। কোন কোন মনীষী বলেছেন, মীরাস বন্টনের সময় তাদেরকে কিছু দেয়া হলে তাদের উপর যেন নিজেদের অনুগ্রহ দেখানো (Obligation) না হয়। তাদেরকে যেন ভর্ৎসনা করা না হয়। তাদের সাথে কথাবার্তা বলায় যেন অপমানকর, অপ্রীতিকর শব্দ ব্যবহার করা হয় না। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى -

ভালো কথা বলা ও ক্ষমা করা এমন দানের তুলনায় অতীব উত্তম যার পর-পরই মানসিকভাবে কষ্ট দেয়া হয়। (সূরা বাকারাহ ঃ ২৬৩)

বলেছেন ঃ

فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ -

তবে ইয়াতীমের প্রতি তোমরা কঠোর, রূঢ় ব্যবহার করবে না এবং প্রার্থনাকারীকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে তাড়িয়ে দেবে না। (সূরা দোহা ঃ ৯, ১০)

বরং হুঁশিয়ার করে বলেছেন ঃ 'যারা মৃত্যুকালে দুর্বল অক্ষম সন্তানাদি রেখে যাওয়ার সময় যেমন ভয় করে, এ ক্ষেত্রেও তাদের ভয় করা উচিত।

আগের কালের মনীষিগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন কথা বলেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ পর্যায়ে একটি বর্ণনা এসেছে। সাঈদ ইবনে যুবায়র, আল-হাসান, মুজাহিদ, কাতাদাহ, দহাক ও আস-সুদ্দী বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি মুমূর্ষাবস্থায় পড়েছে, তখন তার নিকট উপস্থিত লোকেরা যেন তাকে বলে ঃ তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তুমি ওদেরকে কিছু দিয়ে যাও, ওদের সাথে সেলায়ে রেহমী রক্ষা কর। ওদের কল্যাণের ব্যবস্থা করে যাও। তারা যদি এরূপ অসিয়ত করার লোক হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই ওরা তাদের সন্তানদের জন্যে সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে যাবে।

হুবায়ব ইবনে আবূ সাবিত বলেছেন, এ বিষয়ে আমি মাকসামকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ না সে তো এক মুমূর্ষ ব্যক্তি, যার মৃত্যু উপস্থিত। তার নিকট উপস্থিত থাকা লোক তাকে বলবে, তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তোমার ধন-মাল বিলিয়ে দিয়ে যেয়ো না। তার রক্ষা কর। তার বাস্তবিকই কেউ নিকটাত্মীয় হলে তাদের জন্যে তার কিছু অসিয়ত করে যাওয়া তারা অবশ্যই পছন্দ করবে। প্রথমোল্লেখিতরা আয়াতটির ব্যাখ্যা করেছেন অসিয়ত করার উৎসাহ দান থেকে উপস্থিত লোকদিগকে নিষেধ করার অর্থে। আর মাকসাম তার ব্যাখ্যা করেছেন, যে লোক অসিয়ত না করতে বলবে তাকে সেই বলা থেকে বিরত রাখার অর্থে। আল-হাসান অপর একটি বর্ণনায় বলেছেন, এখানে সেই ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, যে মৃতের নিকট উপস্থিত। এবং বলে ঃ তোমার ধন-মালের এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক তুমি অসিয়ত করে যাও। আর ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত অপর একটি বর্ণনায় তিনি ইয়াতীমের মালের অভিভাবকত্ব ও তার সংরক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তাদের কর্তব্য হল, তারা তা নিয়ে কাজ করবে এবং যা করা পছন্দ করে তা করতে বলবে। তাদের ইয়াতীমদের ও দুর্বল-অক্ষম ছোট বাচ্চাদের ধন-মাল সম্পর্কে তাদের মৃত্যুর পর এ কথা বলবে। আগের কালের মনীষীরা এ আয়াতের তাৎপর্য বিশ্লেষণে যা যা বলেছেন, হতে পারে তা সব-ই এখানকার বক্তব্য ভুক্ত।

তবে অসিয়ত করার আদেশ করতে নিষেধ পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, এই বিষয়ের পরামর্শদাতা যদি ওয়ারিসদের ক্ষতি করতে কিংবা তাদের অসীকে বিভ্রান্ত করতে ইচ্ছা করে— যা সে নিজের জন্যে পছন্দ করে না— যদি সে ওদের স্থানে হয়, তাহলে সে কথা স্বতন্ত্র। তা এ ভাবে যে, মৃত্যু পথযাত্রী খুব ধন-মালের মালিক, তার রয়েছে অক্ষম-দুর্বল বাচ্চা-কাচ্চা, তখন সেখানে উপস্থিত ব্যক্তি পুরো এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ অসিয়ত করে যেতে বলবে। সে নিজে যদি এই অবস্থায় পড়ে, তাহলে সে তার উত্তরাধিকারীদের কথা মনে করে নিশ্চয়ই সে রূপ অসিয়ত করতে রাজী হবে না। এ কথা প্রমাণ করে যে, সে যদি কম সম্পদের মালিক হয় এবং তার দুর্বল-অক্ষম বাচ্চা-কাচ্চা থাকে তাহলে তার কোন অসিয়ত না করাই বরং ভালো, বরং সে সন্তানদের জন্যে সম্পত্তি রেখে যাবে, এটাই উত্তম। অথবা অসিয়ত করলেও এক-তৃতীয়াংশের কম পরিমাণের করবে। নবী করীম (স) সায়াদ (রা)-কে বলেছিলেন, যখন তিনি বলেছিলেন ঃ আমি আমার সমস্ত ধন-মালের উপর অসিয়ত করে যাচ্ছি, তখন রাসূল (স) বলেছিলেন, না, শেষ পর্যন্ত এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ঠেকালেন। বললেন, হ্যাঁ, এক-তৃতীয়াংশ। আর এক-তৃতীয়াংশই বেশি। তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদের সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাবে। তা তাদেরকে নিঃস্ব, অন্যদের দ্বারে ভিক্ষা চায়-এর তুলনায় অনেক উত্তম।

এ হাদীসের মাধ্যমে নবী করীম (স) জানিয়ে দিলেন যে, উত্তরাধিকারীরা দরিদ্র হলে অসিয়ত না করা— যেন তারা উত্তরাধিকার নিয়ে সচ্ছল হয়ে যায়— তা করা অপেক্ষা অনেক গুণ ভাল ও উত্তম। আল-হাসান ইবনে জিয়াদ ইমাম আবূ হানীফা থেকে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলছিলেন, যার বিপুল সম্পদ আছে তার যতটা ইচ্ছা অসিয়ত করা উত্তম। আর তা বেশির পক্ষে সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের উপর হবে। আর যার বিপুল সম্পদ নেই, তার তা থেকে কোন অসিয়ত না করা এবং যা কিছু আছে, তা সবই উত্তরাধিকারীদের জন্যে যথাযথ রেখে যাওয়াই অতীব উত্তম। তাতে যে নিষেধ করার কথা আছে, তার প্রয়োগ হবে মৃতের নিকট উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে যে তাকে এক-তৃতীয়াংশের অধিক অসিয়ত করতে আদেশ করবে তার প্রতি— যেমন আল-হাসান থেকে বর্ণনা এসেছে। কেননা তা করাই উচিত নয় নবী করীম (স)-এর এ কথানুযায়ী ঃ 'এক-তৃতীয়াংশই অধিক।' এবং হযরত সায়াদকে এক-তৃতীয়াংশের অধিক অসিয়ত করা থেকে বিরত রাখার দলীলের ভিত্তিতে। মাকসাম যা বলেছেন, তার অর্থ এ হতে পারে যে, উপস্থিত লোকেরা বলবে ঃ না, তুমি কোন কিছুর অসিয়ত করবে না। অথচ সে যদি তার নিকটাত্মীয় কেউ হয়, তা হলে বরং তাকে অসিয়ত করতে বলবে। তার নিজের জন্যে সে যা পছন্দ করে না, সেদিকে ইশারা করবে।

নবী করীম (স) থেকে এ কথার তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে। আবদুল বাকী ইবনে কানে ইবরাহীম ইবনে হাশিম, হুদবাতা-হুম্মাম-কাতাদাতাহ্ আনাস (রা) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ -

নিজের জন্যে মানুষ যে কল্যাণ পছন্দ করে, তা যতক্ষণ তার ভাইর জন্যেও পছন্দ না করবে, ততক্ষণ কোন বান্দা-ই ঈমানদার হতে পারবে না।

আবদুল বাকী, আল-হাসান ইবনুল আব্বাস, আর-রাযী, সহল ইবনে উসমান, যিয়াদ ইবনে আবদুল্লাহ লায়স, তালহা, খায়সামাতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর নবী করীম (স) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَيُحِبُّ أَنْ يَأْتِيَ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ -

যে লোক জাহান্নাম থেকে দূরে থাকা ও জান্নাতে প্রবেশ করার আনন্দ লাভ করতে চায়, তার মৃত্যু যেন এমন অবস্থায় আসে যখন সে সাক্ষী দেবে ঃ আল্লাহ্ ছাড়া মাবুদ কেউ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তার নিকট যে জিনিসের আসা পছন্দ করে তা লোকদের নিকট-ও আসুক বলে যেন সে পছন্দ করে।

আবূ বকর বলেছেন, এ হাদীস-ই আল্লাহ্‌র কথা ঃ যারা অক্ষম-দুর্বল বাচ্চাদের রেখে যাওয়াকে ভয় পায়, তারা যেন এ অবস্থায় অবশ্যই ভয় পায়। অতএব তাদের উচিত আল্লাহ্‌কে ভয় করা এবং সহজ-সরল-সোজা কথা বলা।

মহান আল্লাহ্ অন্যদেরকে ইশারা করতে এবং নিজের জন্যে ও নিজের লোকদের জন্যে যা পছন্দ করে না তা করার আদেশ করতে উপরোক্ত আয়াতে নিষেধ করেছেন। বরং সরল-সোজা-ভালো কথা বলবার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করেছেন। তা হল ন্যায়পরতা, ইনসাফ ও নির্ভেজাল সত্য কথা। কোন উত্তরাধিকারীকে বাদ দেয়ার বা নিকটাত্মীয়কে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কথা যেন বলা না হয়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا -

যারা ইয়াতীমদের ধন-মাল জুলুম সহকারে ভক্ষণ করে।

ইবনে আব্বাস সাঈদ ইবনে যুবায়র ও মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, এ আয়াতটি যখন নাযিল হয়েছিল, তখন যাদের লালন-পালনাধীন ইয়াতীম ছিল, তার পানাহার সম্পূর্ণ আলাদা করে দিল। শেষ পর্যন্ত একটা বিপর্যকর অবস্থার সৃষ্টি হল। তখন আল্লাহ্ নাযিল করলেন ঃ

وَإِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ -

তোমরা যদি ইয়াতীমদের খানা-পিনা সংমিশ্রিত কর, তাহলে করতে পার, ওরা তো তোমাদের ভাই-ই। আর আল্লাহ্ বিপর্যয়কর থেকে কল্যাণকরকে আলাদা করে জানেন। (সূরা বাকারাহ ঃ ২২০)

এ আয়াতের মাধ্যমে কল্যাণের লক্ষ্যে সংমিশ্রণের সুযোগ দিলেন।

আবূ বকর আল-জাস্সাস বলেছেন ঃ আয়াতে শুধু খাওয়ার কথাটাই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। খাদ্য নয়— এমন সব জিনিসকেই ইয়াতীমদের মাল থেকে আলাদা রাখতে বলেছেন, তা ধ্বংস হতে দেয়া তা থেকে খাওয়ার মতই নিষিদ্ধ। তবু খাওয়ার ব্যাপারাটির উল্লেখ বিশেষভাবে করেছেন। কেননা যাবতীয় ধন-মালের আসল লক্ষ্যই তো খাওয়া। এ সম্পর্কে আমরা আগেই কথা বলেছি। পূর্বে এর দৃষ্টান্তও পেশ করা হয়েছে। আল্লাহ্র কথা ঃ

انَّمَا يَاكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا -

তারা তাদের পেটে আগুন ভক্ষণ করে .....।

সুদ্দী থেকে বর্ণিত— কিয়ামতের দিন আগুনের লেলিহান শিখা তাদের মুখ থেকে বের হবে, বের হবে তাদের শ্রবণেন্দ্রিয়, নাসারন্ধ্র ও দুই চোখ থেকে। যে-ই তাকে দেখবে, সে বুঝবে যে, এ লোক ইয়াতীমদের মাল খেয়েছে।

বলা হয়েছে, এটা রূপক কথা। কেননা আসলে তারা জাহান্নামের দিকে পরিণতি লাভ করবে। ফলে তাদের পেটসমূহ আগুনে ভর্তি হয়ে যাবে।

কিছু জাহিল ও হাদীসের দোহাই দেয়া লোক মনে করে যে, 'যারা ইয়াতীমের মাল জুলুম করে খায়' আল্লাহ্র এ কথাটি মনসূখ হয়েছে 'তোমরা যদি ওদের সাথে পারস্পরিক সংমিশ্রণ কর, তাহলে ওরা তো তোমাদেরই ভাই' আল্লাহ্র এ কথাটির দ্বারা। কেউ কেউ আবার এ পর্যায়ে আলোচনা 'নাসেখ-মনসূখের' মধ্যে শামিল করেছেন। কেননা উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর লোকেরা ইয়াতীমের খানাপিনা নিজেদের থেকে আলাদা করে দিল। তার পরে এ শেষোক্ত কথাটির আয়াত নাযিল হয়, তোমরা যদি ওদের সাথে পারস্পরিক (খানা-পিনা) সংমিশ্রিত কর, তাহলে ওরা তোমাদের ভাই-ই। উক্তরূপ কথা যে বলেছে তারা চরম মূর্খতারই প্রমাণিত করেছে। আয়াতে মনসূখ হওয়া সম্পর্কে তাদের প্রকৃত কোন জ্ঞান নেই। কোন্টা মনসূখ হওয়া জায়েয, কোন্টা নয়, তাও তাদের জানা নেই। ইয়াতীমের মাল জুলুম করে খাওয়া যে হারাম, এ বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। আয়াতে যে চরম পরিণতির কথা বলা হয়েছে, তা-ও শাশ্বত। অবশ্যই এ খারাপ পরিণতির ধমক কালে অনিবার্য হবে, না ক্ষমাও পাওয়া যাবে, এ বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। আর এ ধরনের কথার আয়াত কখনো মনসূখ হয় না। কোন বুদ্ধিমান লোক-ই তা মনসূখ হয়েছে বলে মেনে নেবে না। এই ব্যক্তির মূর্খতা অনস্বীকার্য। যা জুলুম, তা কোন অবস্থায়ই মুবাহ হতে পারে না। অতএব এ নিষেধের আয়াত মনসূখ হতে পারে না। যে সাহাবীর লালনাধীন ইয়াতীম ছিল, তিনি ইয়াতীমের খাবার-দাবার নিজের থেকে আলাদা করেছিলেন শুধু এই কারণে যে, তিনি ইয়াতীমের মাল খেয়ে ফেলেন নাকি তার ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিলেন। কেননা তা খাওয়ার কোন অধিকারই তাঁর নেই। অথচ তা খেলে তাঁর জুলুমের অপরাধ হয়ে পড়বে এবং পরিণতিতে জাহান্নাম অবধারিত হবে। এ কারণে তাঁরা এ জন্যে সাংঘাতিকভাবে সতর্কতা অবলম্বন করেন। পরে যখন নাযিল হল ঃ তোমরা যদি তাদের সাথে খানাপিনা সংমিশ্রণ কর, তো তারা তো তোমাদের ভাই', তখন এ সংমিশ্রণের পরিণতি সম্পর্কিত ভয় দূর হয়ে যায়,

যখন তাঁরা তাদের কল্যাণই চেয়েছিলেন। ইয়াতীমের মাল খাওয়া কিছু মাত্র মুবাহ নয়, কেননা তা জুলুমের কাজ। বরং এ আয়াত দ্বারাই 'যারা জুলুম করে ইয়াতীমের মাল খায়' এ আয়াতটি মনসূখ হয়ে যায়। অর্থাৎ একত্রে পানাহার করা নিষিদ্ধ নয়।

## ফারায়েয

আবূ বকর বলেছেন, জাহিলিয়াতের জামানার লোকেরা দুটি জিনিসের ভিত্তিতে পরস্পর মীরাস দেয়া-নেয়া করত। একটি হচ্ছে বংশ। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে কারণ। আর বংশের দিক দিয়ে যে মীরাস দেয়া-নেয়া হতো, তাতে ছোট বয়সের লোক ও মেয়েলোকদেরকে মীরাস দেয়া হতো না। মীরাস দিত সে সব পুরুষ সন্তানকে, যারা অশ্বের পিঠে সওয়ার হয়ে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করেছে ও গনীমতের মাল লুট করেছে। একথা ইবনে আব্বাস ও সাঈদ ইবনে যুবায়র থেকে বর্ণিত। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

يَسْتَفْتُونَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ -

হে নবী! লোকেরা তোমার নিকট মেয়েলোকদের ব্যাপারে ফতোয়া চায়। আপনি বলুন আল্লাহ্ তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে ফতোয়া দিচ্ছেন ....। (সূরা নিসা ঃ ১২৭)

শেষে

وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ - (انساء : ١٢٧)

'সন্তানদের মধ্যে যারা দুর্বল অক্ষম'— পর্যন্ত।

এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এই কথাটিও নাযিল করেন ঃ

يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِى اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ -

আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদেরকে বিধান দিচ্ছেন ঃ একজন পুরুষের জন্যে দুজন মেয়ের অংশ প্রাপ্য।

জাহিলিয়াতের সময়ে তাদের বিবাহ, তালাক ও মীরাস বণ্টন হতো, রাসূলে করীম (স) প্রেরিত হওয়ার পর-ও সেই অবস্থা-ই অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত ইসলামী শরীয়াতের দিকে তাদেরকে নিয়ে আসা হয়। ইবনে জুরাইয বলেছেন— আমি আতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি এ কথা জানেন যে, নবী করীম (স) রাসূল হওয়ার পর-ও লোকদের বিয়ে, তালাক ও মীরাসের কার্যাদি পূর্ববত-ই চলছিল ? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, এতটকু কথা তো আমারও জানা। হাম্মাদ ইবনে জায়দ ইবনে আওন— ইবনে সীরীন সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ মুহাজির আনসাররা জাহিলিয়াতের সময়ের নিয়মে বংশের ভিত্তিতে মীরাস বণ্টন করতেন। ইবনে জুরাইয আমর ইবনে শুয়ায়ব সূত্রে বলেছেন, জাহিলিয়াতের যুগে বিবাহ কিংবা তালাক বলতে কিছু ছিল না। রাসূলে করীম (স)-ই তাদেরকে এসব জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অবশ্য সুদের ব্যাপারটি ভিন্ন। ইসলাম কোন সুদ চালু রাখেনি। তখন যে সুদী

কারবারের কাজ বিস্তৃত ছিল, তা প্রত্যাখ্যান করেছি। লগ্নিকারীকে তার মূলধন ফিরিয়ে দিয়েছে সুদকে খতম করেছে।

হাম্মাদ ইবনে জায়দ আইয়ূব— সাঈদ ইবনে যুবায়র সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) যখন রাসূল হিসেবে প্রেরিত হন, তখন জনগণ জাহিলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। তিনি এসে তাদেরকে কিছু করতে আদেশ করলেন এবং কিছু করতে নিষেধ করলেন। এ ছাড়া তাদের সমস্ত ব্যাপারই জাহিলিয়াতের ধারায় চলমান ছিল। এ কথাটি ইবনে আব্বাস থেকে পাওয়া বর্ণনার উপর ভিত্তিশীল। তিনি বলেছেন ঃ

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ تَعَالٰى وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ -

আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন তা হালাল, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হারাম। আর যে বিষয়ে চুপ রয়েছেন, তা ক্ষমার্হ।

রাসূল (স)-এর প্রেরিত হওয়ার পর লোকেরা যে নীতিতে চলত, তাতে বিবেক-বুদ্ধি যে কাজ নিষিদ্ধ বুঝেনি, তা চালু ছিল। কেননা তদানীন্তন আরব ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর শরীয়াতের কোন কোন বিধান পালন করত। অবশ্য তারা নিজেরাও অনেক কিছু নতুনভাবে নিজেদের পক্ষ থেকে চালু করেছিল। তন্মধ্যে এমন জিনিসও ছিল, যা বিবেক-বুদ্ধি খারাপ মনে করত। যেমন শিরক, মূর্তিপূজা, কন্যা সন্তান জীবন্ত সমাধিস্থকরণ— এমনি আরও অনেক খারাপ কাজ, যা সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিও অত্যন্ত খারাপ মনে করত। এতসব সত্ত্বেও তাদের কিছু কিছু ভালো নৈতিকতা ছিল। এমন কিছু-কিছু পারস্পরিক ভালো কাজ ছিল, যা বিবেক-বুদ্ধির দৃষ্টিতেও খারাপ বা অন্যায় ছিল না। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ নবী করীম (স)-কে তওহীদের আকীদার প্রচারক-আহ্‌বায়ক করে পাঠালেন। মূর্তিপূজা, কন্যা জীবন্ত সমাধিস্ত করণ, সায়েবা, অসিলা ও আল-হামীও যে সব কাজ করে তারা তাদের দেবতাদের নৈকট্য লাভ করতে চাইত— যা বিবেক-বুদ্ধি অত্যন্ত খারাপ মনে করত, তা পরিহার করার জন্যে তিনি আহ্বান জানালেন। তাদের পারস্পরিক কাজ-কর্ম, ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি, বিবাহ্, তালাক, মীরাস বণ্টনের নীতি ও কার্যকলাপ বিবেক-বুদ্ধি খারাপ বিবেচনা করত না— তা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছিল। কেননা বিবেক-বুদ্ধির বিচারে তা খারাপ ছিল না, তার হারাম হওয়ার কথা কোনখান থেকে শোনাও যায়নি। এ সময় তাদের মীরাস বণ্টনের নিয়ম এই ছিল যে, তারা তাদের মধ্যে যোদ্ধা ধরনের যুবকদেরকে মীরাস দিত। ছোট বয়সের ছেলেমেয়ে ও মেয়েলোকদেরকে মীরাসের অংশ দিত না।

এই অবস্থায় আল্লাহ্ মীরাসের আয়াত নাযিল করলেন।

আর তাৎক্ষণিক কারণের দিক দিয়ে দুটি কারণে তারা পরস্পরকে মীরাসের অংশ দিত। একটি হচ্ছে শপথ ও পারস্পরিক চুক্তি। আর দ্বিতীয় হচ্ছে পালকপুত্র গ্রহণ। এরপর ইসলামের আগমনের পর কালের স্রোতধারার সাথে সংযোগ রক্ষা করে তারা অনেক কিছুই ত্যাগ করেছে। অনেক কিছু মনসূখ ও বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।

অনেক লোক বলে যে, তারা কুরআনেরই বিধান অনুযায়ী শপথ ও পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে মীরাস দেয়া-নেয়া করত প্রথম দিকে। পরে তা বাতিল হয়ে গেছে। শায়বান কাদাতাহ্ থেকে—

وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ -

যে সব লোক তোমাদের শপথ পরস্পর চুক্তিবদ্ধ করে নিয়েছে, তাদেরকে তাদের অংশ দান কর। (সূরা নিসা ঃ ৩৩)

জাহিলিয়াতের যুগে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হতো। তখন বলত ঃ আমার রক্ত তোমার রক্ত ও আমার ধ্বংস তোমার ধ্বংস। তুমি আমার ওয়ারিস হবে, আমি তোমার মীরাস পাব। তুমি আমার জন্যে দাবি তুলবে, আমি তোমার জন্যে দাবি তুলব। তারা সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ ইসলামেও নির্ধারিত হয়েছিল। পরে ওয়ারিসরাই তাদের মীরাস গ্রহণ করতে থাকল। পরে আল্লাহ্ এটাকে মনসূখ করে দিলেন। তখন আল্লাহ্ বললেন ঃ

وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ -

যবীল আরহাম লোকেরা আল্লাহ্র কিতাবে পরস্পর থেকে পরস্পর উত্তম নিকটবর্তী। (সূরা আল-আনফাল ঃ ৭৫)

আল-হাসান ইবনে আতীয়াতা তার পিতার— ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ -

এবং প্রত্যেকের জন্যেই 'আসাবা' বানিয়ে দিয়েছি, যা পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়রা রেখে যায় তা থেকে এবং তাদের শপথ যেসব চুক্তিতে আবদ্ধ করে তা থেকে। (সূরা আন-নিসা ঃ ৩৩)

অতএব তোমরা তাদের অংশ তাদেরকে দাও।

জাহিলিয়াতের জামানায় এক ব্যক্তির জন্যে আর এক ব্যক্তি শপথ করত। ফলে সে তার অধীন হয়ে যেত। সে যখন মরে যেত, তখন তার মীরাস তার পরিবারবর্গ ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে হতো। আর এমন অধীন লোকও থেকে যেত, যারা কিছুই পেতো না। তখন আল্লাহ্ নাযিল করলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ -

আর তোমাদের শপথ যাদেরকে চুক্তিবদ্ধ করত। তাদের অংশও তাদেরকে দাও। তখন তাকে তার মীরাস থেকে দেয়া হতে থাকে। (সূরা আন-নিসা ঃ ৩৩)

আতা সাঈদ ইবনে যুবায়র থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তোমাদের শপথ যাদেরকে পারস্পরিক

চুক্তিবদ্ধ করেছে তাদেরকেও তাদের অংশ দিয়ে দাও। আর তা এভাবে হতো যে, এক ব্যক্তি জাহিলিয়াতে এবং ইসলামেও আর এক ব্যক্তির বন্ধুত্বের অভিলাষী হতো, তখন তারা দুজন পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হতো। তখন একজন অপর জনকে বলত ঃ 'তুমি আমার ওয়ারিস হবে, আমি তোমার ওয়ারিস হব। যে লোক-ই অপর জনের আগে মৃত্যুমুখে পতিত হবে, তখন জীবিত জনের জন্যে মৃত ব্যক্তির যে মাল দেয়ার শর্ত করা হতো, তাই তাকে দেয়া হতো। পরে যখন মীরাস বন্টনের আয়াত নাযিল হল, কিন্তু তাতে এই চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিদেরকে কোন অংশ দেয়ার উল্লেখ দেখতে পেলো না, তখন এক ব্যক্তি নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল ঃ হে আল্লাহ্র নবী "মীরাস বন্টনের বিধান তো নাযিল হয়েছে ; কিন্তু তাতে চুক্তিবদ্ধ লোকদের সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। অথচ আমি এক ব্যক্তির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে আছি। পরে সে মরে গেছে।" তখন এই আয়াতাংশ নাযিল হল, যাতে বলা হয়েছে ঃ 'যে সব লোকের শপথ পরস্পরকে চুক্তিবদ্ধ করেছে, তোমরা তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের উপর প্রত্যক্ষদর্শী।'

আগে কালের সেই ফিকাহবিদগণ জানিয়েছেন যে, শপথকারীর মীরাস ইসলামের ঐতিহ্য অনুযায়ী চালু ছিল, জাহিলিয়াতের প্রথানুযায়ী তারা যে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতো সে হিসেবে নয়। তাঁদের কিছু লোক এ-ও বলেছেন। এই প্রথা শরীয়াতের বিধান অনুযায়ী চালু ছিল না; বরং তারা জাহিলিয়াতের প্রথানুযায়ী অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল, এ জন্যে। আর তা চলছিল মীরাস সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হওয়া পর্যন্ত। পরে সে প্রথা রদ হয়ে যায়।

জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ওয়াসেতী জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ইয়ামান— আবূ উবায়দ, আবদুর রহমান, সুফিয়ান, মনসুর, মুজাহিদ সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্র কথা ঃ 'যারা পারস্পরিক শপথে চুক্তিবদ্ধ, তোমরা তাদের অংশ দিয়ে দাও' ব্যাপারটি ছিল এই যে, জাহিলিয়াতের যুগে বহু লোক পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দিতে বলা হল পরামর্শ, বিবেচনা ও বিবেক-বুদ্ধির দৃষ্টিতে। মীরাসের কোন অংশ তাদেরকে দেয়া হয়নি।

আবূ উবায়দ মুয়ায ইবনে আওন ঈসা ইবনুল হারিস, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ -

যবীল-আরহাম লোকেরা পরস্পর থেকে উত্তম ও অধিক নিকটবর্তী - (সূরা আনফাল ঃ ৭৫)

এ আয়াতটি 'আসাবাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। আগে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে চুক্তিবদ্ধ হতো। বলত ঃ 'তুমি আমার ওয়ারিস হবে, আমি তোমার ওয়ারিস হব।' তারপরে নাযিল হল উপরোক্ত আয়াতাংশ।

আবূ উবায়দ আবদুল্লাহ ইবনে সালিহ— মুয়াবিয়াতা ইবনে ইবরাহীম, আলী ইবনে আবূ তাল্হা— ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন ঃ 'তোমাদের শপথ কর্তৃক যারা পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হয়েছে, তাদের অংশ তাদেরকে দিয়ে দাও' আয়াতটির প্রেক্ষিত

হল, একজন আর একজনকে বলত ঃ তুমি আমার ওয়ারিস হবে, আমি তোমার ওয়ারিস হব। কিন্তু পরে 'যবীল আরহাম লোকেরা পরস্পর থেকে উত্তম ও অধিক নিকটবর্তী' কথাটি দ্বারা তা মনসূখ হয়ে গেছে। এ পূর্ণাঙ্গ আয়াতটি এই ঃ

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا -

> এবং রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়রা আল্লাহ্‌র কিতাবে কতক থেকে অন্য কতক উত্তম ও অধিক নিকটবর্তী মুমিন মুহাজির থেকে। তবে তোমরা যদি তোমাদের পৃষ্ঠপোষক বন্ধুদের জন্যে কোন কল্যাণকর কিছু কর, তবে .......। (সূরা আনফাল ঃ ৭৫)

এর অর্থ, তবে পরস্পর চুক্তিবদ্ধ লোকেরা তাদের পৃষ্ঠপোষকদের জন্যে কোন অসিয়ত করে ওদের জানিয়ে দেয়া হল, তাতে জাহিলিয়াতের নিয়মে যা করা হতো তা নাকচ হয়ে গেছে 'রক্ত সম্পর্কে আত্মীয়রা' কথাটির দ্বারা। আর 'ওদেরকে ওদের অংশ দাও'— একথা বলে অসিয়ত বুঝিয়েছেন কিংবা পরামর্শ ও সাহায্যকরণ নীতিতে কিছু করা— তা আলাদা ব্যাপার কিন্তু তা মীরাস বহির্ভূত। আর اولى বলে আয়াতে শপথের দ্বারা মীরাস দান— অর্থ বলা হয়েছে। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যাদের শপথ পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ করেছে, তাদেরকে তাদের অংশ দাও' একটি নির্দিষ্ট অংশ বোঝায়, যা তাদের জন্যে চিহ্নিত হবে। কিন্তু পরামর্শ বিচার-বিবেচনা ও অসিয়ত কোন নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠিত অংশ নয়। একথটি এ কথার মতই পুরুষদের জন্যে অংশ রয়েছে পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পদ-সম্পত্তি থেকে।

এর বাহ্যিক অর্থই হচ্ছে মীরাস থেকে অংশ নির্ধারণ করা। আল্লাহ্‌র এ কথাটিও অনুরূপ ঃ 'যাদের শপথ পারস্পরিক চুক্তিবদ্ধ করেছে তাদের অংশ তাদেরকে দিয়ে দাও।' এ কথার-ও বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে তাদের জন্যে একটা অংশ নির্ধারণ করা, যার অধিকারী তারা হয়েছে পারস্পরিক চুক্তি ও পরামর্শের ভিত্তিতে। এতে সব মানুষই সমান। কিন্তু এক্ষণে কোন অংশ নির্দিষ্ট নেই। বিচার-বিবেচনায় শপথকারীদের জন্যে তা ওয়াজিব করে বটে, কিন্তু তা তার জন্যে কোন নির্দিষ্ট অংশ নয়। আর অসিয়ত যদি বাধ্যতামূলক কিছু না-ও হয়, তবু তা কোন অংশ নয়। অতএব আয়াতের ব্যাখ্যায় পারস্পরিক শপথের চুক্তির ভিত্তিতে কোন নির্দিষ্ট অংশ ঠিক করাই উত্তম, বক্তব্যের তাৎপর্যের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। অন্যান্য ফিকাহবিদদের এটাই বক্তব্য। আমাদের মতে এ আয়াত মনসূখ নয়। এর ফলে শুধু আর একজন ওয়ারিস পয়দা হল মাত্র, যে অন্যদের থেকে উত্তম ও অধিক নিকটবর্তী। যেমন যার ভাই আছে তার একজন পুত্র জন্ম হওয়া, তা ভাইকে মীরাসধারী হওয়ার আওতা থেকে বাইরে নিক্ষেপ করে না। অবশ্য এই পুত্র ভাই থেকে উত্তম, অধিক নিকটবর্তী। 'যবীল-আরহাম' আত্মীয়রাও এমনিভাবে শপথকারী অপেক্ষা উত্তম ও নিকটবর্তী। যখন যবীল আরহাম বা আসাবা কেউ থাকবে না, তখন এই চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিই ওয়ারিস হবে।

হানাফী ফিকাহবিদগণ সমস্ত মালের অসিয়ত করাকে জায়েয বলেছেন, যার কোন ওয়ারিস নেই সে তা-ই করবে, এটাই স্বাভাবিক।

মুখের দাবি ও পালক পুত্র গ্রহণের মাধ্যমে মীরাসের অংশ দেয়ার ব্যাপারটি এরূপ যে, সেকালে অন্য একজনের পুত্রকে নিজের পুত্র বানাত, তার জন্মদাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে পালকের বাংশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করত। নিজেকে সে বংশের অধঃস্তন প্রমাণ করত। আর সে-ই হতো তার উত্তরাধিকারী। ইসলামের আগমনের পরও তা চালু ছিল। নবী করীম (স) জায়দ ইবনে হারিসাকে নিজের পুত্র বানিয়ে নিয়েছিলেন। এজন্যে তাঁকে বলা হতো জায়দ ইবনে মুহাম্মাদ। পরে আল্লাহ্ আয়াত নাযিল করলেন ঃ

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ -

মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের কারোরই পিতা নয়। (সূরা আহযাব ঃ ৪০)

আল্লাহ্ আরও বলেছেন ঃ

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَا كَهَا لِكَيْ لَايَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ -

যায়দ যখন জয়নব বিনতে জহশ থেকে যৌন প্রয়োজন পূরণ করে নিল, তখন তোমার নিকট তাকে বিয়ে দিলাম, যেন মুমিনদের জন্যে তাদের মুখ-ডাকা পুত্রদের স্ত্রীদের বিয়ে করার ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধক— দ্বিধাদ্বন্দ্ব অবশিষ্ট না থাকে। (সূরা আহযাব ঃ ৩৭)

বললেন ঃ

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ -

তোমরা তাদের জন্মদাতা পিতার পুত্র হিসেবে ডাক। আল্লাহ্‌র নিকট তা-ই ন্যায়পর নীতি। তোমরা তাদের পিতাকে, যদি না-জান, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই তো বটে এবং তোমাদের বন্ধু— পৃষ্ঠপোষক। (সূরা আহযাব ঃ ৫)

আবূ হুযায়ফা ইবনে উতবা সালিমকে পালক পুত্র বানিয়েছিলেন। তাই তাকে বলা হতো সালিম ইবনে আবূ হুযায়ফা। পরে আল্লাহ্ নাযিল করলেন ঃ 'ওদেরকে ওদের জন্মদাতা পিতাদের নামে ডাক।' জুহরী উরওয়া— আয়েশা (রা) সূত্রে একথা বর্ণনা করেছেন। এর ফলে পালক পুত্রকে পুত্র ডাকার নিয়ম বাতিল করে দিলেন। এ কারণে তাকে মীরাস দেয়ার যে রীতি চালু তা-ও বন্ধ করে দিলেন।

জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল্লাহ্ ওয়াসেতী জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ইয়ামান আল-মুয়াদ্দিব, আবূ উবায়দ, আবদুল্লাহ্ ইবনে সালিহ্, লায়স, উকাইল ইবনে শিহাব সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, সাঈদ ইবনে যুবায়র আমাকে বলেছেন ঃ 'তোমাদের শপথ পারস্পরিক চুক্তিতে যাদের আবদ্ধ করেছে, তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দাও'— এ আয়াতটি আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে নাযিল করেছেন, যারা লোকদেরকে পালক পুত্র বানাত এবং তাদেরকে

মীরাস দিত। তখন তাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ্ এ ফরমান নাযিল করলেন যে, তাদের নামে অসিয়ত করে কিছু অংশ তাদেরকে দাও। আর মীরাসের অংশ যবীল আরহাম ও আসাবাদের দিকে ফিরিয়ে দিলেন। মুখ-ডাকা পুত্রদেরকে মীরাস দেয়াকে আল্লাহ অগ্রাহ্য করলেন। তবে অসিয়তের মাধ্যমে তাদেরকে কিছু দেয়ার সুযোগ রাখলেন। এভাবে পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে যে মীরাস দেয়া হতো, তা রদ করা হল।

আবূ বকর আল-জাস্সাস বলেছেন ঃ 'তোমাদের শপথ যাদেরকে পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ করেছে, তাদেরকে তাদের অংশ দাও 'আল্লাহ্র এ কথা শপথ ও পালক পুত্র সকলকেই শামিল করে। কেননা এর প্রত্যেকটাই আসলে চুক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। চুক্তির ভিত্তিতেই কিছু একটা চালু হয়। এই যা কিছু বললাম, এটা ছিল জাহিলিয়াতের যুগের মীরাস বণ্টনরীতি। ইসলামে এর কিছুটা বা কোন-কোনটিকে চালু রাখা হয় এবং তা অঙ্গীকারের মাধ্যমে মাত্র। তার কিছুটা স্থানান্তরিত হয়, কোনটা অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে রদ করা হয়, কোনটা শরীয়াতের দলীল দ্বারাই চালু রাখা হয়। শেষ পর্যন্ত যা চালু রাখার প্রয়োজন ছিল তা চালু রাখা হয়।

তবে ইসলামের মিরাসী আইন দুটি জিনিস দ্বারা চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। একটি বংশীয় সম্পর্ক আর দ্বিতীয়টি 'কারণ', বংশীয় সম্পর্ক নয়। বংশীয় সম্পর্কের দরুন যে মীরাস পাওনা হয়, তা শুধু তা-ই যা আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে বিধিবদ্ধ করেছেন এবং যার কোন-কোনটা রাসূল (স) বলেছেন। কোন-কোনটির উপর উম্মতের ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোনটির পক্ষে দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আর ইসলামে যে 'কারণ'-এর জন্যে মীরাস হয়, তার কতক প্রমাণিত, কতক মনসূখ হয়ে গেছে। ইসলামের যে কারণসমূহের দরুন মীরাস হয়, তার কিছুর উল্লেখ করেছি পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে ও মুখ-ডাকা লোকের মীরাস। এ পর্যায়ের হুকুম আমরা উল্লেখ করেছি। আর যার যার মনসূখ হয়ে যাওয়া বর্ণিত হয়েছে তা। অবশ্য আমাদের মতে তা মনসূখ নয়। কোন কোন ওয়ারিস অপর কোন কোন ওয়ারিসের তুলনায় উত্তম।

যেসব কারণে আল্লাহ মীরাসের ব্যবস্থা করেছিলেন, তন্মধ্যে 'হিজরত' একটি। জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ওয়াসেতী, জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ইয়ামন, আবূ উবায়দ, হাজ্জাজ ইবনে জুরাইয ও উসমান ইবনে আতা আল-খুরাসানী, ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ আল্লাহ কথা ঃ

انَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْآ اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ
يُهَاجِرُوْا مَالَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا -

যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও নিজেদের ধন-মাল ও জান-প্রাণ নিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, তারা পরস্পর বন্ধু-পৃষ্ঠপোষক।

আর যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু হিজরত করেনি, তাদের কোন পৃষ্ঠপোষকতা একবিন্দু তোমাদের জন্যে নেই, যতক্ষণ না তারা হিজরত করবে। (সূরা আনফাল ঃ ৭২)

বলেছেন, মুহাজিররা আরব-বেদুঈনদের পৃষ্ঠপোষকতা করত না, তাকে উত্তরাধিকারীও বানাতো না। অথচ সে মুমিন। আর মরুবাসী ও মুহাজিরকে ওয়ারিস বানাতো না। তাই সেই প্রথাটি মনসূখ হয়ে যায় এ আয়াত দ্বারা ঃ

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ - (النمل : ٧٥)

কেউ কেউ বলেছেন ঃ এ আয়াতটি সেটিকে মনসূখ করেছে ঃ

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ -

তারা রাসূলে করীম (স)-এর কায়েম করা পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতেও মীরাস দেয়া নেয়া করতেন। (সূরা নিসা ঃ ৩৩)

হিশাম ইবনে উরওয়া তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) যুবায়র ইবনুল আওয়াম ও কাব ইবনে মালিক (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন। ওহুদ যুদ্ধে কাব আহত হলেন। যুবায়র এসে তার বাহনের লাগাম ধরে চালাতে লাগলেন। কাব (রা) যদি বিপুল ধন-সম্পদ রেখে মরে থাকেন, তাহলে যুবায়র তাঁর উত্তরাধিকারী হবেন। ইতিমধ্যেই নাযিল হল ঃ

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ -

যবীল আরহাম পরস্পরের আসাবা। (সূরা আনফাল ঃ ৭৫)

ইবনে জুরাইয সাঈদ ইবনে যুবায়র, ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ মুহাজির ও আনসাররা রাসূলে করীম (স)-এর কায়েম করা ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে পরস্পরের ওয়ারিস হতেন তাঁর আপন রক্তের ভাইয়ের পরিবর্তে। কিন্তু এ আয়াতাংশ যখন নাযিল হল ঃ

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ -

এবং প্রত্যেকের জন্যে আসাবা বানালাম সেই ধন-সম্পদে, যা পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়রা রেখে গেছে এবং তা আগের ব্যবস্থাকে মনসূখ করে দিল। (সূরা নিসা ঃ ৩৩)

তারপরে আল্লাহ্‌ বললেন ঃ

وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ -

এবং তোমাদের শপথ! তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যে চুক্তিবদ্ধতার সৃষ্টি করেছে, তাদের অংশ তাদেরকে দিয়ে দাও। (সূরা নিসা ঃ ৩৩)

এ পারস্পরিক চুক্তিটা সম্পন্ন হয়েছে সাহায্যের কারণে। হযরত ইবনে আব্বাস এই হাদীসের মাধ্যমে উল্লেখ করলেন যে, 'তোমাদের শপথভিত্তিক পারস্পরিক চুক্তিবদ্ধতা বলতে সেই ভ্রাতৃত্ব বোঝানো হয়েছে, যা নবী করীম (স) তাদের মধ্যে স্থাপন করেছিলেন।

মামার কাতাদাতা থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমাদের তাদের পৃষ্ঠপোষকতার একবিন্দুও নেই'- এর অর্থ, মুসলমানরা হিজরত ও ইসলামের কারণে পরস্পরের উত্তরাধিকারী হতেন, তখন একজন ইসলাম কবুল করত, কিন্তু হিজরত করত না, সে তার দ্বীনি ভাইর মীরাস পেত না। তখন আল্লাহ সেই ব্যবস্থাকে মনসূখ করে দিলেন। বললেন ঃ 'যবীল আরহাম পরস্পর থেকে পরস্পর উত্তম আল্লাহ্‌র কিতাবে মুমনি মুহাজিরদের মধ্যে থেকে।'

জাফর ইবনে সুলায়মান আল-হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ একজন মুসলিম আরব একজন মুহাজির থেকে একবিন্দু মীরাস পেত না। যদিও তাঁরা নিকটবর্তী ও নৈকট্য সম্পন্ন ছিলেন। তাদেরকে হিজরত করার জন্যে উৎসাহ দেয়াই ছিল তার কারণ। শেষে মুসলমানদের সংখ্যা যখন বিপুল হয়ে গেল, তখন আল্লাহ নাযিল করলেন ঃ যবীল আরহাম মুমিন মুহাজিরদের মধ্য থেকে পরস্পরের তুলনায় উত্তম ও নিকটবর্তী। এই আয়াতটি পূর্ব ব্যবস্থাকে মনসূখ করে দিল। সেই সাথে বলে দিলেন ঃ

তবে তোমরা যদি তোমাদের পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি কোন কল্যাণ কর (তবে তা ভিন্ন কথা)।

এ কথার মাধ্যমে আল্লাহ মুসলিম ব্যক্তিকে ইয়াহুদী, খৃস্টান, মজুসীদের মধ্য থেকে নৈকট্য সম্পন্ন ব্যক্তির জন্যে এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি থেকে অসিয়ত করার সুযোগ দিলেন। বলেছেন ঃ

كَانَ ذٰلِكَ فِىْ الْكِتَابِ مَسْطُوْرًا -

তা কুরআনে লিপিবদ্ধ আছে। (সূরা আহযাব ঃ ৬)

ইসলামের প্রাথমিক যুগে ঠিক যে কয়টি কারণে মীরাস দেয়া-নেয়া হতো, তা হল পালক পুত্র গ্রহণ, শপথ, হিজরত, রাসূলের করীম (স)-এর কায়েম করা আনসার-মুহাজিরের মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক। পরে পালিত পুত্রকে মীরাস দেয়া, হিজরতের কারণে মীরাস দেয়া ও ভ্রতৃ সম্পর্কের কারণে মীরাস দেয়ার রীতি মনসূখ হয়ে যায়। তার শপথের ব্যাপারে, এ বিষয়ে আমরা আগেই বলেছি যে, নিকটাত্মীয়তাকে তার চাইতেও উত্তম ঘোষণা করা হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ মনসূখ করা হয়নি। তা কার্যকর হচ্ছিল, যখন নিকটাত্মীয়তা অনুপস্থিত হতো। তার জন্যে সমস্ত ধন-মাল কিংবা তার কিছুটা দিয়ে দেয়া জায়েয ছিল। ইসলামে আরও একটি কারণে পারস্পরিক মীরাস দেয়া নেয়া হতো। তা হল দাসত্ব মুক্তির চুক্তি, বৈবাহিক চুক্তি ও বন্ধুত্বের চুক্তি। আমাদের মতে এগুলো শপথভিত্তিক মীরাস দান। যখন যবীল আরহাম বা আসাবা ওয়ারিস একজনও থাকবে না, তখন সেই হুকুমটি কার্যকর হবে। এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলামের মীরাসের আইন কার্যকর হতো দুটি মৌলিক ভিত্তি উপর ঃ একটি বংশীয় সম্পর্ক, আর দ্বিতীয় সঙ্ঘটিত কারণ। এই কারণ ছিল বিভিন্ন ধরনের ও প্রকারের। যথা শপথভিত্তিক চুক্তি, পালক পুত্র বানানো, ভ্রাতৃত্ব— যা রাসূল (স) আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে কায়েম করেছিলেন; হিজরত, বৈবাহিক, মুক্তিদান চুক্তি, বন্ধুত্বের চুক্তি। শপথ, পালক পুত্র গ্রহণ ও রাসূল (স)-এর কায়েম করা ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক মনসূখ হয়ে গেল আসাবা, যবীল আরহাম, দাসমুক্তির চুক্তি, বন্ধুত্বের চুক্তি ও বৈবাহিক চুক্তির বর্তমানতায়— এইগুলো প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর থাকল, পরম্পরা শর্তানুযায়ী এগুলোর ভিত্তিতে মীরাস দেয়া-নেয়া চলতে থাকল।

আর বংশের ভিত্তিতে মীরাস দেয়া-নেয়া তিন ভাগে বিভক্ত। সুনির্দিষ্ট অংশীদারী, আসাবা ও যবীল আরহাম। এ কয়টি বিষয়ের বর্ণনা যথাস্থানে দেয়া হবে। বংশ সম্পর্কের দিক দিয়ে মীরাস দেয়া-নেয়া হয় নির্দিষ্ট অংশধারী— আসাবা ও যবীল-আ-রহামকে। আল্লাহ্র কথা ঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَ قْرَبُوْنَ -

পুরুষদের জন্যে নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে এবং মেয়েদের জন্যেও নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে।

আর আল্লাহ্র কথা ঃ

وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِىْ الْكِتٰبِ فِىْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِىْ لَاتُؤْتُوْنَهُنَّ مَاكُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ -

আর যা তোমাদের সম্মুখে কিতাবে পাঠ করা হয় মেয়েদের, ইয়াতীমদের সম্পর্কে, যাদেরকে তোমরা তা দাও না যা তাদের জন্যে লিখে দেয়া হয়েছে, অথচ তোমরা তাদেরকে বিয়ে করতে আগ্রহী আর দুর্বল অক্ষম সন্তানাদি .... (সূরা আন-নিসা ঃ ১২৭)

এ দুটি আয়াত দ্বারা মনসূখ হয়ে গেছে ইবনে আব্বাস ও আগের কালের অন্যান্য ফিকাহবিদদের থেকে পাওয়া বর্ণনা অনুযায়ী— আগে যে রেওয়াজ ছিল— যোদ্ধা ব্যক্তিদের মীরাস দেয়া এবং অন্যান্য পুরুষ, মেয়েলোক ও ছোটদের মীরাস না দেয়ায়, তা বাতিল হয়ে গেল।

আর আল্লাহ্র কথা ঃ

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ -

আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে বিধান দিচ্ছেন।

এতে সুনির্দিষ্ট অংশ দেয়ার বর্ণনা রয়েছে, যা বলা হয়েছে ঃ পুরুষের জন্যে অংশ نَصِيْبًا مَفْرُوْضًا সুনির্দিষ্ট অংশ পর্যন্ত। 'আর তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বিধান দিচ্ছেন' কথার মাধ্যমে সেই নির্দিষ্ট অংশের পরিমাণটা বলে দেয়া হয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত— তিনি পড়লেন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا نِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَلْاَقْرَبُوْنَ -

তোমাদের কারোর মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার সময় ধন-মাল রেখে যেতে থাকলে তোমাদের উপর পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে অসিয়ত করা ফরয করে দেয়া হয়েছে।

এর পর তিনি বললেন ঃ এ আয়াতটিকে মনসূখ করেছে এ আয়াত ঃ 'পুরুষদের জন্যে নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে পিতা-মাতা নিকটাত্মীয়ের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে'; মুজাহিদ বলেছেন, শুরুতে মীরাস দেয়া হতো সন্তানদেরকে। আর পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে অসিয়ত করা হতো। পরে আল্লাহ্ তা মনসূখ করে যা তিনি পছন্দ করেছেন, তাই চালু করেছেন। তখন পুরুষ সন্তানকে দুই কন্যা সন্তানের অংশ দেয়ার ব্যবস্থা কার্যকর করলেন এবং পিতা ও মাতা দুজনের প্রত্যেকের জন্যে সন্তান থাকা অবস্থায় এক-ষষ্ঠাংশ নির্দিষ্ট করে দিলেন।

ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ অবস্থা এই ছিল যে, কেউ মরে গেলে এবং পেছনে তার স্ত্রী রেখে গেলে সেই স্ত্রী স্বামীর ঘরে পূর্ণ একটি বছর কাল 'ইদ্দত' পালন করত। তখন স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পদ-সম্পত্তি থেকেই তার ভরণ-ভোষণ চালানো হতো। এর কথাই বলা হয়েছে এ আয়াতে ঃ

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ -

তোমাদের মধ্য থেকে যারা মরে যায় এবং স্ত্রী রেখে যায়, তাদের স্ত্রীদের জন্যে এক বছরের জীবনোপকরণ দেয়ার অসিয়ত করতে হবে, ঘর থেকে বহিষ্কৃত করা ছাড়া।

(সূরা বাকারা ঃ ২৪০)

পরে এ হুকুমও মনসূখ হয়ে যায় এবং তদস্থলে মোট পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ কিংবা এক-অষ্টমাংশ দেয়ার ব্যবস্থা চালু হয়।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যবীল আরহাম কতকের তুলনায় কতক উত্তম— অধিক নিকটবর্তী' এর দ্বারা শপথ, হিজরত ও পালক গ্রহণের ভিত্তিতে মীরাস পাওয়া দেয়া— যেমন পূর্বেই বলেছিল-রীতি মনসূখ হয়ে যায়।

এমনিভাবে আল্লাহ্‌র কথা ঃ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ 'আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে অসিয়ত করছেন' আয়াত 'মুহকাম'। এটি মনসূখ হয়নি। এবং এটি কারণ হয়েছে মীরাসের কারণগত ভিত্তি— যা পূর্বে বলা হয়েছে— মনসূখ হওয়ার। কেননা এতে মীরাসটা কেবল মুসলমানদের মধ্যে সীমিত রাখা হয়েছে। ফলে ওসব কারণের দরুন মীরাসের কিছু দেয়ার সুযোগ অবশিষ্ট থাকল না। এরূপ অবস্থায় তাদের হক প্রত্যাহার করার কারণ ঘটে গেল।

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উকায়ল জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ আনসার বংশের একজন মহিলা তার দুই কন্যা সহ উপস্থিত হলেন। বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সাবিত ইবনে কায়সের এ দুইটি কন্যা। সাবিত ওহোদ যুদ্ধে আপনার সাথে গিয়ে শহীদ হয়েছে। ওদের চাচা ওদের জন্যে রক্ষিত সব ধন-মালই নিয়ে নিয়েছে। এক্ষণে আপনি কি মনে করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ? এ অবস্থায় এ মেয়ে দুটির বিয়েও হবে না, কেননা ধন-মাল না থাকলে মেয়ে বিয়ে দেয়া যায় না।

তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ আল্লাহ্ই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়সালা করবেন। তখন সূরা আন-নিসার এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ -

আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে ফায়সালা করে দিচ্ছেন ঃ একজন পুরুষ সন্তানের অংশ হবে দুই জন মেয়ে সন্তানের অংশ।

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর নবী করীম (স) বললেন ঃ মেয়েলোকটিকে এবং তার সঙ্গীকে আমার নিকট ডেকে আন। তারা উপস্থিত হলে তিনি মেয়ে দুটির চাচাকে বললেন ঃ

أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَلَكَ -

এ মেয়ে দুটিকে মোট সম্পত্তির তিন ভাগের দু'ভাগ দাও, তাদের মাকে দাও আট ভাগের এক ভাগ। আর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা তোমার জন্যে।

আবূ বকর বলেছেন ঃ এ হাদীসটির তাৎপর্য ব্যাপক। এক-জাহিলিয়াতের জামানার নিয়মানুযায়ী মেয়ে দুটি কিছুই পায় না, সব মীরাস পায় চাচা। কেননা তখনকার নিয়ম ছিল যোদ্ধাকে মীরাস দেয়া, মেয়েলোককেও নয়, বালক-বালিকাদেরকেও নয়। তাই মেয়েলোকটি যখন নবী করীম (স)-কে অবস্থার বিবরণ দিয়েছিল ও জিজ্ঞাসা করেছিল, তখন তার কথাকে তিনি অগ্রাহ্য করেন নি। প্রচলিত যে নিয়ম ছিল, তাকে তিনি অপরিবর্তিতই রেখেছিলেন এবং বলেছিলেন, এর ফায়সালা আল্লাহ্ই করবেন। পরে এ আয়াত নাযিল হলে চাচাকে মেয়ে দুটির ও তাদের মার প্রাপ্য অংশ দিয়ে দিতে আদেশ করলেন।

এ কথা প্রমাণ করে যে, চাচা প্রথমেই মীরাস নিয়ে নিতে তওকীফ-এর দিক দিয়ে পারত না, সে সেদিক থেকে তা নেয়ওনি; বরং নিয়েছে জাহিলিয়াতের নিয়ম রীতি অনুযায়ী। তখন যে নিয়মে মীরাস বণ্টন হতো সেই নিয়মে। কেননা যদি তা-ই হতো, তাহলে আয়াতটির নাযিল হওয়ার পরই মীরাস নেয়ার কাজ হতো। পূর্ববর্তী আইনের হুকুমে যা হবার তাই হয়েছে। মনসূখ হওয়ার কথা বলে তার উপর আপত্তি জানানো যায় না। বোঝা গেল, চাচা জাহিলিয়াতের নিয়মানুযায়ীই সব মাল নিয়ে নিয়েছে, তা থেকে তারা সরে দাঁড়ায়নি।

সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ আমি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি। তখন রাসূলে করীম (স) আমাকে দেখার জন্যে আসেন। তখন আমার বেহুঁশ অবস্থা। রাসূলে করীম (স) এসে অযূ করলেন, তাঁর অযূর পানি আমার উপর ছিটিয়ে দিলেন। ফলে আমার হুঁশ হল। আমি বললাম, হে রাসূল! আমার ধন-মাল সম্পর্কে আমি কিভাবে ফায়সালা করব? কিন্তু তিনি আমাকে কোন উত্তর দিলেন না। এরপর মীরাসের আয়াত নাযিল হয়, 'আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে তোমাদেরকে বিধান দিচ্ছেন, 'একজন পুরুষ সন্তানকে দুই মেয়ের সমান অংশ দিতে হবে।'

আবূ বকর বলেছেন ঃ প্রথমোক্ত হাদীসটিতে স্ত্রী ও কন্যাদ্বয়ের কিস্‌সা উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ হাদীসে বলা হয়েছে, জাবির তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন। এ-দুটি কথাই ঠিক

হতে পারে। মেয়েলোকটি রাসূল (স)-কে প্রশ্ন করলে তিনি তাকে কোন জবাব দেননি, হয়ত তিনি ওহী নাযিল হওয়ার অপেক্ষা করছিলেন। পরে যখন হযরত জাবির (রা) তাঁর রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাঁকে ধন-মাল কি করা হবে, এই প্রশ্ন করেছিলেন। আর ঠিক তখন আয়াতটি নাযিল হয়। তাতে এ দুজনেরই জিজ্ঞাসার জবাব বিবৃত।

আয়াতটি প্রতিষ্ঠিত হুকুম কার্যকর, শাশ্বত। নির্দিষ্ট অংশ বলে দেয়, যার ঘোষণা দেয়া হয়েছিল এই বলে ঃ "পুরুষদের জন্যে অংশ রয়েছে, যা পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়রা রেখে যাবে, তা থেকে। মেয়েদের জন্যেও নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে, যা পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়রা রেখে যাবে তা থেকে।" আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে "আল্লাহ্ হুকুম দিচ্ছেন" বলে নিজ ঔরসজাত সন্তানদেরকেই বোঝানো হয়েছে। সন্তানের সন্তান নিজ ঔরসজাত সন্তানের সঙ্গে একত্রে শামিল গণ্য হবে না। আর যখন নিজ ঔরসজাত সন্তান থাকবে না, তখন সন্তান বলতে বোঝাবে পুত্রদের সন্তান, কন্যাদের সন্তান নয়। বোঝা গেল, 'সন্তান' বলতে নিজ ঔরসজাত সন্তান, আর তা কেউ না থাকলে পুত্রদের সন্তানদের বোঝাবে ব্যবহৃত শব্দ থেকেই।

এ কথা থেকে হানাফী ফিকাহবিদদের মতের সত্যতা প্রমাণিত হয়। যদি কেউ অসিয়ত করে বলে, 'অমুকের সন্তানের জন্যে অসিয়ত' তাহলে তা নিজ ঔরসজাত সন্তানদেরকেই শামিল করবে। আর নিজ ঔরসজাত সন্তান না থাকলে তার নিজ ঔরসজাত পুত্রের ঔরসজাত সন্তান বোঝাবে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ -

একজন পুরুষ সন্তানের জন্যে দুজন মেয়ের অংশের সমান পরিমাণ হবে।

অর্থাৎ একজন পুরুষ সন্তান যা পাবে, তার অর্ধেক পাবে একজন কন্যা সন্তান। অথবা একজন কন্যা সন্তান যা পাবে, তার দ্বিগুণ পাবে একজন পুরুষ সন্তান।

উক্ত আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে, কারোর যদি ছেলে ও মেয়ে— উভয় ধরনের সন্তান থাকে তাহলে পুরুষ ছেলে পাবে দুটি অংশ, আর মেয়ে পাবে একটি অংশ। এ-ও বোঝা যায় যে, সন্তান যদি ছেলেতে-মেয়েতে মিলে অনেক সংখ্যক হয়, তা হলে প্রত্যেক ছেলে-সন্তান দুইটি অংশ পাবে। আর প্রত্যেক কন্যা সন্তান একটি অংশ পাবে। এ থেকে একথাও জানা গেল যে, নির্দিষ্ট অংশ প্রাপকদের সাথে যদি সন্তান থাকে যেমন পিতা-মাতা ও স্বামী-স্ত্রী নির্দিষ্ট অংশ পাওয়ার অধিকারীরা তাদের নিজ নিজ অংশ নিয়ে নেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা একজন পুরুষ সন্তানের জন্যে দুই জন কন্যার অংশ হিসেবে বন্টন করা হবে। তা এজন্যে যে, আল্লাহ্ একজন পুরুষ সন্তানের জন্যে দুই কন্যা সন্তানের অংশ কথাটি নীতিগত কম বা বেশি উভয় পরিমাণই তাতে শামিল। তাই নির্দিষ্ট অংশদারীদের অংশ নিয়ে নেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা পুরুষ-মেয়ে সন্তানের মধ্যে উক্ত নীতির ভিত্তিতে ভাগ করে দেয়া হবে— যেন নির্দিষ্ট অংশের প্রাপক কেউ নেই।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ -

মৃতের যদি কেবল মেয়ে সন্তানই থাকে এবং তারা দুই বা ততোধিক হয়, তাহলে তারা দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আর একজন হলে সে সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে।

দুজনার বেশি কন্যা সন্তান হলে কিংবা মাত্র একজন হলে তারা কি পাবে, তা স্পষ্ট ভাষায় আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে; কিন্তু মাত্র দুজন হলে তারা কি পাবে, তা স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়নি। তার কারণ, বলার ধরন থেকেই দুজনার অংশ কত তা বোঝা যায়। তা এজন্যে যে, একজন পুত্র সন্তানের সাথে একজন কন্যা সন্তান থাকলে সে এক-তৃতীয়াংশ পাবে। দুজনার অধিক থাকলে কি পাবে, তার দলীল তো আমরা কুরআনের ভাষায়ই পেয়েছি। এই কারণে দুজন সন্তানের প্রাপ্য অংশের কথা আপনা-আপনি জানা যায়।

উপরন্তু আল্লাহ্ যখন বললেন ঃ পুরুষ সন্তানের জন্যে দুই কন্যার অংশ, এর পর যদি একজন পুত্র ও একজন কন্যা থাকে, তাহলে পুত্র সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ থেকে দুইটি অংশ পারে। আর তাই-ই হচ্ছে দুই-তৃতীয়াংশ। তাই এ থেকে বোঝা গেল যে, দুইজন কন্যা-সন্তান থাকলে তারা দুইজন মিলিত ভাবে দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। কেননা আল্লাহ্ পুত্রের অংশ নির্দিষ্ট করেছেন দুই কন্যার অংশের সমান। আর তা হচ্ছে দুই তৃতীয়াংশ। এ থেকে বোঝা যায়, দুই কন্যার জন্যেও দুই-তৃতীয়াংশ, এভাবে যে, আল্লাহ্ ভাই ও বোনদেরকে কন্যাদের পর্যায়ে ধরেছেন। আর একজন বোনকে একজন কন্যার পর্যায়ে। এ কথা বলেছেন এ আয়াতে ঃ

إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ -

মৃত ব্যক্তির যদি সন্তান না থাকে— থাকে একজন বোন, তা হলে সে রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। (সূরা নিসা ঃ ১৭৬)

এরপর বলেছেন ঃ

فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ -

বোন যদি দুজন হয় তাহলে তারা মিলিতভাবে রেখে যায়া সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আর ভাই-বোন-পুরুষ, মেয়ে লোক উভয় থাকে, তাহলে একজন পুরুষের (ভাইর) জন্যে দুইজন মেয়ের অংশ হবে। (সূরা নিসা ঃ ১৭৬)

এ আয়াতে দুই বোনের অংশ বানানো হয়েছে দুই জনের অধিক সংখ্যকের অংশের সমান। আর তা হচ্ছে দুই-তৃতীয়াংশ। যেমন এক বোনের অংশ নির্দিষ্ট হয়েছে একজন কন্যার অংশের সমান এবং তাদের জন্যে এই বিধান দিয়েছেন যে, তারা পুরুষ ও মেয়েলোক উভয় হলে দুইজন মেয়ের অংশের সমান পাবে একজন পুরুষ। তাই দুই-তৃতীয়াংশ প্রাপ্তিতে দুই কন্যা দুই বোনের

সমান হয়ে দাঁড়াল। কেননা অন্য কেউ না থাকলে দুই মেয়ের অংশের সমান একজন পুরুষের অংশ— এই নিয়মানুযায়ী সম্পত্তি প্রাপ্তিতে তারা সমান। যেমন এক বোন এক কন্যার সমান— যখন তাদের সাথে অন্য কেউ হবে না— নির্দিষ্টভাবে অর্ধেক পাওয়ার অধিকারে। সেই সাথে দুই কন্যাতো আরো উত্তমভাবে তা পাবে, যখন তারা দুই বোনের তুলনায় মৃতের অধিক নিকটে। আর বোন যখন কন্যার মত, তাহলে দুই কন্যাও দুই-তৃতীয়াংশ পাওয়ার ব্যাপারে সমান হবে। হযরত জাবির (রা) বর্ণিত হাদীস-ও তা প্রমাণ করে। সেই মেয়েলোকটির কাহিনীতে নবী করীম (স) দুই কন্যাকে দুই-তৃতীয়াংশ দেয়ার হুকুম দিয়েছিলেন এবং সে স্ত্রী লোকটিকে এক-অষ্টমাংশ এবং চাচাকে অবশিষ্ট যা থাকবে তা সম্পূর্ণ।

এই ব্যাপারে বিপরীত মত কেউ প্রকাশ করেনি। তবে একটি বর্ণনা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এসেছে এই মর্মে যে, তিনি দুই কন্যাকে এক কন্যার মতই অর্ধেক সম্পত্তি দেয়ার কথা বলেছেন। এ পর্যায়ে দলীল হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন আল্লাহ্‌র এই কথা ঃ 'মেয়েরা দুজনের অধিক হলে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে।'

কিন্তু দুই কন্যার জন্যে অর্ধেক সম্পত্তি দেয়ার কোন দলীল একথায় নেই। তাতে আছে দুই কন্যার অধিক সংখ্যক হলে তারা দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। এখন কেউ যদি বলেন যে, দুই কন্যার জন্যে দুই তৃতীয়াংশ, তাহলে আয়াতের বিপরীত মত গ্রহণ করা হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা এক কন্যার জন্যে অর্ধেক ঘোষণা করেছেন— যখন সে একজন হবে। আর আপনি দুই কন্যার জন্যে দিলেন অর্ধেক। তা যে আয়াতের বিপরীত তা স্পষ্ট। দুই কন্যার জন্যে অর্ধেক সম্পত্তি দিলে যদি আয়াতে বিরোধিতা না হয়— যদিও আল্লাহ্ মাত্র একজন কন্যার জন্যে অর্ধেক নির্দিষ্ট করেছেন, তাহলে দুইজন কন্যার জন্যে দুই-তৃতীয়াংশ ঘোষণা করা হলে তাতে আয়াতের বিরুদ্ধতা হবে না। কেননা 'তারা দুজনের অধিক হলে তারা মিলিতভাবে রেখে যাওয়া সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে' আল্লাহ্‌র এই কথার দ্বারা দুই কন্যা থাকলে তাদেরকে দুই-তৃতীয়াংশ দেয়াকে অস্বীকার করেন নি, তার বিরুদ্ধেও বলেন নি। স্পষ্ট কথা বলা হয়েছে শুধু দুইজনের অধিক সংখ্যা সম্পর্কে। আর আমরা যেভাবে বিশ্লেষণ দিয়েছি, তাতে সে দুইজন সংক্রান্ত হুকুম স্বতই জানা যায় মূল কালাম থেকেই। আরও উল্লেখ করেছি, দুই বোন সংক্রান্ত হুকুম যে দলীল থেকে পাওা গেছে, সেই দলীল থেকেই দুই কন্যা সম্পর্কিত হুকুম সহজেই জানা যায়। একথাও বলা হয়েছে যে, 'তারা দুইজনের অধিক মেয়েলোক হলে' আল্লাহ্‌র এই কথায় فوق শব্দটি যদি কালামের صله হয়— যেমন فاضربوا فوق الاعناق ও وَلَا بَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ এবং পিতা-মাতার প্রত্যেকের জন্যে এক-ষষ্ঠাংশ হবে পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে, যদি তার সন্তান থাকে বাহ্যত মনে হয় যে, এ কথার ফলে পিতা-মাতার প্রত্যেকের জন্যে এক ষষ্ঠাংশ হবে সন্তান থাকলে, তা পুরুষ হোক বা মেয়ে। কেননা الولد —সন্তান বলতে ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই শামিল করে। তবে সন্তান যদি একজন কন্যা হয়, তাহলে সে কখনই অর্ধেক সম্পত্তির বেশি পাবে না। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ -

মেয়ে যদি একজন হয় তবে সে অর্ধেক পাবে, তার বেশি নয়।

আর পিতামাতার প্রত্যেকে পাবে এক-ষষ্ঠাংশ। তা-ও আয়াতের অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে। অবশিষ্ট এক-ষষ্ঠাংশ পিতা পাবে 'আসাবা' হয়ে। এ ক্ষেত্রে পিতা অংশ নির্ধারণের আওতায় নির্দিষ্টভাবে অংশ পাওয়া এবং অনির্দিষ্টভাবে আসাবা হিসেবে পিতার ক্ষেত্রে এ দুটি একত্রিত হল। আর সন্তান যদি পুরুষ হয়, তাহলে পিতা-মাতা দুজনের জন্যে দুই এক-ষষ্ঠাংশ হবে কুরআনের ঘোষণানুযায়ী। আর অবশিষ্ট যা তাও পুত্র পাবে, কেননা পিতার দিক দিয়ে 'আসাবা' হিসেবে সে অতীব নিকটবর্তী।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَّوَرِثَهُ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ -

মৃতের যদি কোন সন্তান না থাকে, আর তার ওয়ারিস হয় শুধু তার পিতা-মাতা, তাহলে তা মা পাবে এক-তৃতীয়াংশ।

এ আয়াতে সাধারণ অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করে পিতামাতার মীরাসের কথা বলা হল, পরে আলাদা করে মার অংশের কথা এবং তার পরিমাণ বলে দেয়া হয়েছে ঃ 'তার মার জন্যে এক-তৃতীয়াংশ' বলে। কিন্তু পিতার কোন নির্দিষ্ট অংশের কথা বলা হয়নি। বাহ্যত মনে হয়, পিতার জন্যে দুই-তৃতীয়াংশ হবে। কেননা এখানে সে ছাড়া মীরাস পাওয়ার আর কেউ নেই। অথচ শুরুতেই পিতা-মাতার মীরাসের কথা বলে দেয়া হয়েছে। তাতে ব্যবহৃত শব্দের বাহ্যিক দাবি হচ্ছে সমতার— সমান সমান পাওয়ার। যদি শুধু বলা হতো ঃ وَّوَرِثَهُ اَبَوٰهُ —'তার পিতা-মাতা-ই তার ওয়ারিস হবে', মার অংশের কথা আলাদাভাবে যদি বলা না হতো তাহলে তা-ই হতো। কিন্তু 'মার অংশ এক-তৃতীয়াংশ' বলে যখন নির্দিষ্ট করা হল, তখন জানা গেল যে, এখানে পিতার প্রাপ্য হচ্ছে দুই-তৃতীয়াংশ।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَاِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ -

মৃতের একাধিক ভাই থাকলে তার মা পাবে এক-তৃতীয়াংশ।

হযরত আলী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, উমর ইবনুল খাত্তাব, উসমান ইবনে আফ্ফান, জায়দ ইবনে সাবিত এবং অন্যান্য সব মনীষী বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তি যদি দুই ভাই ও পিতা-মাতা রেখে যায়, তাহলে তার মা ষষ্ঠাংশ পাবে। আর অবশিষ্ট যা থাকবে তা পাবে তার পিতা। মার অংশ তখন এক-তৃতীয়াংশ আড়াল-কৃত হয়ে তা এক-ষষ্ঠাংশে এসে দাঁড়াবে, যেমন তিন ভাই থাকার দরুন তারা মার অংশকে আড়ালবর্তী করেছেন। ইবনে আব্বাস বলেছেন, মার মীরাস হচ্ছে এক-তৃতীয়াংশ । তাকে ভাই ও বোনদের তিন জন না হলে সে আড়ালবর্তী হয় না। মামার ইবনে তায়ূস তাঁর পিতা ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ মৃত ব্যক্তি যদি পিতা-মাতা ও তিন ভাই রেখে যায়, তাহলে মা পাবে এক-ষষ্ঠাংশ, আর ভাইরা পাবে সেই এক-ষষ্ঠাংশ যা থেকে মা আড়ালবর্তী হয়েছে। আর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা সব-ই পিতার। তাঁরই থেকে বর্ণিত। তার দিক দিয়ে যদি একাধিক ভাই থাকে, তাহলে বিশেষভাবে তাদের প্রাপ্য হবে এক-ষষ্ঠাংশ। আর তারা পিতা-মাতা উভয় দিক থেকে হয় কিংবা হয় শুধু

পিতার দিক থেকে, তা হলে তারা কিছুই পাবে না। এক-ষষ্ঠাংশ বাদে যা থাকবে তা পিতা পাবে।

প্রথম কথাটির দলীল হল ঃ اخوة। 'ভাই গণ' বলতে দুইজন ভাই-ও বোঝায়।

যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمْ -

তোমরা দুইজন যদি আল্লাহ্র নিকট তওবা করে ফিরে যাও— তাহলে তোমাদের দুজনার হৃদয় তো ঝুঁকেই আছে। (সূরা তাহরীম ঃ ৪)

এখানে দুই জনের দুই হৃদয় বলা ও বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَهَلْ اَتَاكَ نَبَاُ الْخَصْمِ اِذْتَسَوَّرُوْا الْمِحْرَابِ -

এবং তোমার নিকট কি ঝগড়াকারী পক্ষের খবর পৌঁছেছে যখন তারা প্রাচীর টপকিয়ে মেহরাবে ঢুকে পড়ল ? (সূরা সোয়াদ ঃ ২১

পরে বলেছেন ঃ

خَصْمَانِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ -

দুই বিবদমান পক্ষ— আমাদের কতক অপর কতকের উপর বিদ্রোহ করল। (সূরা সোয়াদ ঃ ২২)

এ আয়াতে দুইজন বোঝাবার জন্যে বহু বচনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاِنْ كَانُوْا اِخْوَةً رِجَالًا وَّنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ -

আর তারা যদি ভাই পুরুষ ও নারী হয়, তাহলে তাদের মধ্যে একজন পুরুষের দুই জন মেয়ের অংশ এই নীতিতে মীরাস বণ্টন করা হবে।

যদি এক ভাই ও এক বোন হয়, তাহলেও আয়াতের হুকুম কার্যকর হবে সেই দুজনের মধ্যেই। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

اِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ -

দুইজন ও দুইজনের অধিক হলেই জামা'আত হয়।

আর দুই থেকে তিন পর্যন্ত জামা'আত গণ্য। দুইজন থেকে একজনের তুলনায় অধিক নিকটবর্তী, কেননা 'বহুত্ব' ভাবটি দুজনের মধ্যে নিহিত রয়েছে। যেমন তুমি বললে ঃ 'তারা দুজন দাঁড়াল এবং তারা বসল ও দাঁড়াল— দুইজন সম্পর্কে এরূপ বলা সমীচীন, তিনজন সম্পর্কেও। কিন্তু একজন সম্পর্কে তা বলা যায় না। অতএব দুইজন যখন শব্দের হুকুমে তিনজনের অতি নিকটে— একজন অপেক্ষাও তাই দুইজনকে তিনজনের পর্যায়ে ধরা—

একজন অপেক্ষা— খুবই সমীচীন। আবদুর রহমান ইবনে আবুজজিনাদ— তাঁর পিতা— খারে জাতা ইবনে জায়দ— তার পিতা থেকে বর্ণিত, দুই ভাই থাকলে মা আড়ালে আবৃত হবে, তখন তাঁরা বললেন ঃ হে আবূ সাঈদ! আল্লাহ বলেছেন ঃ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ যদি তার একাধিক ভাই থাকে। (তাহলে তার মীরাস হবে); কিন্তু তুমি বলছ ঃ দুই ভাইর দ্বারা মা আড়ালবর্তী হয়ে যাবে? তখন তিনি বললেন ঃ আরবরা দুই ভাই থাকলেও إخوة (ভাইগণ) বলে। এ কথা যখন প্রমাণিত যে, আরবরা দুই ভাই হলে إخوة (ভাইগণ) বলে, তা থেকে প্রমাণিত হল যে, এখানে দুই ভাইকেও إخوة বলা হয়েছে। অতএব ব্যবহৃত শব্দ তাদের দুজনকেই শামিল করবে। উপরন্তু একথাও প্রমাণিত যে, দুই বোনের জন্যে যা বলা হয়েছে, তা দুই-তৃতীয়াংশ পাওয়ার ক্ষেত্রে তিন বোনের জন্যেও প্রযোজ্য ঃ

কুরআনের আয়াত ঃ

وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ -

যদি তারা দুজন হয়, তাহলে তারা দুই-তৃতীয়াংশ পাবে রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। মার দিক থেকে দুই বোনও এক-তৃতীয়াংশ পাওয়ার অধিকারের দিক দিয়ে তিনজনার পর্যায়ভুক্ত— একজনের অপেক্ষা। তাই তাদের দুজনের অবস্থান তিনজনের সমান হবে মার অংশ এক-তৃতীয়াংশ থেকে এক-ষষ্ঠাংশে নামিয়ে আনার ব্যাপারে। কেননা তার একজনের জন্যে বিধান সমস্তের সংক্রান্ত বিধান হয়ে যাবে। ফলে এতে দুইজন ও তিনজনের জন্যে নিয়ম সমান হবে।

কাতাদাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ ভাইগণ পিতার সঙ্গে থাকার কারণে ওয়ারিস না হয়েও মাকে আড়ালবর্তী করবে। কেননা তাদের বিয়ে-শাদীর ব্যবস্থা ও খায়-খরচা বহন করে পিতা, মা করে না। এই করণটাই সীমিতভাবে কার্যকর পিতা-মাতা— উভয় দিকের আপন ভাইদের মধ্যেও। কেবল পিতার দিকের ভাই হলেও তাই হবে। কিন্তু শুধু মার পেটের ভাই হলে তাদের কোন ব্যাপার পিতাকে প্রভাবিত করবে না। আর তারা নিজেরা আড়ালবর্তী হয়ে যাবে বাপ-মা উভয়ের দিকে ভাইদের দ্বারা। তিন ভাই ও পিতা-মাতার বর্তমান থাকায় মা পাবে এক-ষষ্ঠাংশ ও অবশিষ্ট যা থাকবে, তা পাবে পিতা, এ বিষয়ে সাহাবীগণের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। তবে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত একটা কথা সামান্য মত-পার্থক্যের সৃষ্টি করে। আর আবদুর রাযযাক মামার ইবনে তায়ুস তাঁর পিতা ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ মার জন্যে এক ষষ্ঠাংশ আর ভাইদের জন্যে এক-ষষ্ঠাংশ— যা থেকে ওরা মাকে আড়াল করেছে। আর অবশিষ্ঠ যা থাকবে, তা পিতার জন্যে। যে নিজে ওয়ারিস নয়, সে কাউকে আড়াল করতে পারে না। তাই মা ভাইদের দ্বারা আড়ালবর্তী হলে তখন তারা উত্তরাধিকারী হবে। এই মতটি অত্যন্ত বিরল। কুরআনের বাহ্যিক তাৎপর্য এর বিপরীত। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ -

এবং তার ওয়ারিস হবে তার পিতামাতা, আর তার মা পাবে এক-তৃতীয়াংশ।

এরপর আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَاِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ -

· যদি কয়েকজন ভাই থাকে তাহলে মৃতের মা পাবে এক-ষষ্ঠাংশ।

একথা বলেছেন ووزثه ابواه এবং তার পিতা-মাতা তার ওয়ারিস হবে। এই কথা বলার পর, এ আয়াতের আসল তাৎপর্য হল ঃ আর তার উত্তরাধিকারী হবে তার পিতামাতা আর তার রয়েছে কয়জন ভাই। এরূপ অবস্থায় ভাইরা কিছু পেতে পারে না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

مِنْ بَعْضِ وَصِيَّةٍ يُوْصِى بِهَا اَوْدَيْنٍ -

যে অসিয়ত করে তা এবং ঋণ থাকলে তা পূরণের পর।

ঋণের কথাটা শেষ পর্যায়ে বলা হয়েছে। কিন্তু মূলত ঋণ শোধ করার কাজ অসিয়ত পূরণের আগেই করতে হবে। কেননা কাজের একটা বিন্যাস ও পরম্পরা অনিবার্য। আর দুইটি জিনিসের যে-কোন একটির জন্যে। যেমন বলা হয়েছে ঃ এই দুইটির যে কোন একটির পর। হযরত আলী কাররামাল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ অসিয়তের ঋণের পূর্বে উল্লেখ করেছেন। আসলে তা ঋণের পরে পূরণ করতে হয়। অন্য কথায় তা আগে হলেও কাজে ও অর্থের দিক দিয়ে তা পরে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ -

এবং তোমাদের জন্যে তোমাদের জুড়ির রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক।

এ এক অকাট্য দলীল। এর ব্যাখ্যা সর্বসম্মত, যেমন সর্বসম্মত তার নাযিল হওয়ার ব্যাপারটি। আর পুরুষ সন্তান ও মেয়ে সন্তান এক্ষেত্রে সমান। সন্তান যদি মীরাসধারী হয় তাহলে স্বামীর অংশ অর্ধেক থেকে এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত নেমে যাবে, এবং স্ত্রীর অংশ এক-চতুর্থাংশ থেকে এক-অষ্টমাংশে মেনে যাবে। এই বিষয়েও কোন মতপার্থক্য হয়নি যে, পুত্রের সন্তান ঔরসজাত-সন্তানের পর্যায়ে হবে স্বামী ও স্ত্রীকে আড়াল করার ক্ষেত্রে, তাদের অংশ বেশি থেকে কমে নিয়ে আসবে যখন মৃতের নিজ ঔরসজাত সন্তান থাকবে না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةً مِنَ اللّٰهِ -

তোমাদের পিতা-দাদা এবং তোমাদের পুত্র— পুত্রের পুত্র— এদের মধ্যে ফায়দার দিক দিয়ে অধিক নিকটবর্তীকে তা তোমরা জান না— আল্লাহ্‌র নিকট থেকে ধার্য করা অংশ দানের ব্যাপারে!

বলা হয়েছে, এর অর্থ হল দ্বীন ও দুনিয়ার দিক দিয়ে এদের মধ্যে অধিকতর কল্যাণদায়ী কে— তা তোমরা জান না। কিন্তু আল্লাহ তা জানেন। আল্লাহ্ যে ভাবে অংশ বণ্টন করেছেন, সেইভাবেই অংশ দিয়ে দাও। কেননা প্রকৃত কল্যাণ সম্পর্কে তিনিই অবহিত।

বলা হয়েছে, এর অর্থ হল, তোমাদের বাপ-দাদা-চাচা ও তোমাদের পুত্রগণ ফায়দা ও কল্যাণের দিক দিয়ে পরস্পর খুবই কাছা-কাছি। ফায়দার দিক দিয়ে এদের মধ্যে অধিক নিকটবর্তী কে, তা তোমরা জান না। কেননা তোমরা ছোট বয়সের থাকাকালে তোমাদের পিতা-দাদার কাছ থেকেই অধিক ফায়দা লাভ করে থাকে। আর বার্ধক্যে তোমাদের পুত্ররাই হয় তোমাদের অধিক কল্যাণকারী। এই কারণেই তোমাদের ধন-মালে পিতা-দাদার জন্যে যেমন অংশ নির্ধারণ করেছে তেমনি তোমাদের পুত্ররাও তা থেকে পেয়ে থাকে। কেননা আল্লাহ জানেন এই সকলেই কল্যাণ রয়েছে তোমাদের প্রতি।

এ-ও বলা হয়েছে, তোমাদের কাছাকাছি সময়ে কে মরবে এবং তার মৃত্যুর পর তার ধন-মাল দ্বারা তার সন্তানরা উপকৃত হবে, কিংবা সন্তান কাছাকাছি সময়ে মরবে, তার সম্পদ দ্বারা পিতা-মাত উপকৃত হবে, একথাও তোমাদের কারুরই জানা নেই। তাই আল্লাহ্ তোমাদের সকলের জন্যে মীরাস বণ্টনের যে বিধান করেছেন তা আল্লাহ জেনেশুনেই করেছেন ও স্পষ্ট হুকুম দিয়েছেন। যে লোক নিজে ওয়ারিস হয় না, সে অন্য কারুর মীরাস পাওয়ার প্রতিবন্ধক হতে পারে কিনা— এ বিষয়ে আগের কালের ফিকাহবিদদের মধ্যে মত-পার্থক্য রয়েছে। তা এভাবে, যেমন একজন স্বাধীন মুসলিম পুত্র দুই মুসলিম-স্বাধীন পিতা-মাতার ও দুই কাফির ভাই কিংবা দুইজন ক্রীতদাস অথবা দুইজন হত্যাকারীর অধঃস্তন হবে। হযরত আলী, উমর ও জায়দ (রা) বলেছেন ঃ মা পাবে এক-তৃতীয়াংশ আর অবশিষ্ট যা তা হবে পিতার। অনুরূপভাবে একজন মুসলিম মেয়ে যদি স্বামী ও এক কাফির পুত্র বা ক্রীতদাস অথবা হত্যাকারী রেখে মরে যায় অথবা কোন ব্যক্তি স্ত্রী ও এক পুত্র রেখে যায়, তাহলে স্বামী ও মেয়েলোক কেউ তাদের জন্যে নির্দিষ্ট অংশ বেশি থেকে কমের দিক থেকে আড়ালকৃত হবে না। এটা আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, মালিক, সওরী ও শাফেয়ীর মত। আবদুল্লাহ ইবনে মাস্‌উদ (রা) বলেছেন ঃ তারা নিজেরা ওয়ারিস না হলেও তারা আড়াল করবে। ইমাম আল-আওজায়ী আল-হাসান ইবনে সালিহ্ বলেছেন ঃ ক্রীতদাস ও কাফির মীরাস পাবে না। অন্য কাউকে আড়ালকৃতও করবে না। হত্যাকারী নিজে ওয়ারিস হয় না কিন্তু অন্যকে আড়াল করে। আবূ বকর আল জাসসাস বলেছেন ঃ কাফির পিতা তার পুত্রকে তার দাদার মীরাস পাওয়া থেকে আড়াল করবে না। সে ঠিক মরে যাওয়া লোকের মত। মা স্বামী ও স্ত্রীকে আড়ালকৃত করার ব্যাপারেও সেই কথা। আল্লাহ্‌র কথা ঃ মৃতের সন্তান থাকলে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে পিতা ও মাতা দুজনের প্রত্যেকের জন্যে এক-ষষ্টাংশ এর বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে আড়ালকৃত হয় বলে মত দিয়েছেন। তিনি কাফির ও মুসলিমের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। তাকে প্রশ্ন করা যেতে পারে, তার দ্বারা মা কেন আড়ালকৃত হবে অথচ পিতা হবে না ? আল্লাহ তো এ দুজনকেই আড়ালকৃত করেছেন সন্তান দ্বারা, এই কথার মাধ্যমে সন্তান থাকলে পিতামাতা প্রত্যেকেই এক ষষ্ঠাংশ পাবে। পিতার আড়ালকৃত না হওয়া যদি জায়েয হয়,

আর তুমি আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যদি তার সন্তান থাকে' সত্ত্বেও সন্তানের জন্যে মীরাস জায়েয করেছ ? মার ব্যাপারেও সেই হুকুম হওয়া উচিত।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ —'এবং তাদের মেয়েদের জন্যে এক-চতুর্থাংশ হবে তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে ....... فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ —'তাদের মেয়েদের জন্যে তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে এক-তৃতীয়াংশ হবে' এ থেকে প্রমাণিত হল যে, তারা যদি চারজন হয়, তাহলেও তারা সেই এক-অষ্টমাংশের সমান অংশীদার হবে। এই বিষয়ে দ্বীনের মনীষীদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই।

স্বামী বা স্ত্রী থাকা অবস্থায় পিতামাতা থাকলে তাদের মীরাস কত, তা নিয়েও আগেরকালের ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। হযরত আলী, উমর, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, উসমান ও জায়দ (রা) বলেছেন ঃ স্ত্রী পাবে এক-চতুর্থাংশ ও মা পাবে অবশিষ্টের এক-তৃতীয়াংশ। এরপর যা থাকবে তা পাবে পিতা। আর স্বামী পাবে অর্ধেক। আর মার জন্যে অবশিষ্টের এক-তৃতীয়াংশ। এরপর যা থাকবে, তা পাবে পিতা।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ স্বামী ও স্ত্রী যার যার মীরাস সে পেয়ে যাবে। আর মা পাবে পূর্ণ এক-তৃতীয়াংশ। এরপর যা থাকবে তা পিতা পাবে। তিনি এ-ও বলেছেন, 'অবশিষ্টের এক তৃতীয়াংশ' কথাটি আমরা আল্লাহ্‌র কিতাবে পাচ্ছি না। ইবনে সীরীন ও ইবনে আব্বাসের মতই বলেছেন এবং বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি স্ত্রী ও পিতা-মাতার ব্যাপারে ইবনে আব্বাসের অনুসরণ করেছেন, একই মত গ্রহণ করেছেন, আর স্বামী ও পিতা-মাতার ব্যাপারে ভিন্নমত গ্রহণ করেছেন। কেননা তিনি মাকে পিতার উপর অগ্রাধিকার ও অধিক মর্যাদা দিয়েছেন। সাহাবায়ে কিরাম ও তাঁদের পরে তাবেয়ীন এবং বিভিন্ন এলাকার ফিকাহবিদগণ প্রথমোক্ত মত গ্রহণ করেছেন, তবে ইবনে আব্বাস ও ইবনে সীরীন সম্পর্কে যা বলেছি, তা ভিন্ন মত। কুরআনের বাহ্যিক অর্থ সে কথা প্রমাণ করে। কেননা তিনি বলেছেন ঃ

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ -

যদি মৃতের সন্তান না থাকে, পিতা-মাতাই তার ওয়ারিস হয়, তা হলে তার মা পাবে এক-তৃতীয়াংশ।

এতে তাদের দুজনার মধ্যে মীরাস ভাগ করা হয়েছে এক-তৃতীয়াংশ করে, যেমন এক-তৃতীয়াংশ করে ভাগ করেছেন পুত্র ও কন্যার মধ্যে আল্লাহ্‌র এই কথায় ঃ প্রত্যেক পুরুষ পাবে দুজন মেয়ের প্রাপ্যের সমান। ভাই ও বোনের মধ্যেও এক-তৃতীয়াংশ করে ভাগ করেছেন এই বলে ঃ

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ -

যদি ভাইরা পুরুষ ও নারী হয়, তাহলে প্রত্যেক পুরুষ পাবে দুই মেয়ের অংশের সমান।

পরে যখন স্বামী স্ত্রীর জন্যে অংশ যা নির্ধারণ করার তা করেছেন এবং দুজনার অংশকেই বানিয়েছেন এক পুত্র ও দুই কন্যার মধ্যে বন্টনের পর অবশিষ্ট— তাদের দুজনের শামিল

হওয়ার পূর্বে যেমন ছিল। এমনিভাবে ভাই ও বোনের মধ্যে, স্বামী ও স্ত্রী এ দুজনের অংশ গ্রহণ পিতা ও মাতার মধ্যে অবশিষ্ট— যেমন তাদের দুজনের শামিল হওয়ার পূর্বে পিতামাতা এক-তৃতীয়াংশ করে পাওয়ার অধিকারী হয়েছিল। তারা দুজন যেন পরস্পর দুই শরীক এদের মাঝে মাল-সম্পদ। একজন যখন তা থেকে অংশ পেয়ে যাবে, অবশিষ্ট যা থাকবে, তা দুজনের মধ্যে বণ্টন হবে প্রথম পাওয়ার অধিকারী হিসেবে।

## পুত্রের সন্তানদের মীরাস

হযরত আবূ বকর (আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রাযী থাকুন) বলেছেন , আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, আল্লাহ্‌র কথা ঃ

يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ -

আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদেরকে অসিয়ত করছেন।

এই কথায় নিজ ঔরসজাত সন্তানদের এবং পুত্রের সন্তানদের— যদি নিজ ঔরসজাত সন্তান না থাকে— কথাই বলতে চাওয়া হয়েছে। কেননা যে লোক পুত্রের পুত্র ও পুত্রের কন্যাদের রেখে মরবে, তার সম্পত্তি তাদের মধ্যে বণ্টন হবে— পুরুষের জন্যে দুই মেয়ের অংশের সমান— এই নীতির ভিত্তিতে, আয়াতে এই কথাই বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই।

এমনিভাবে যদি পুত্রের কন্যা রেখে মারা যায়, তবে সে সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। তারা বহু কয়জন হলে তাদের সকলের জন্যে দুই-তৃতীয়াংশ নির্দিষ্ট হবে নিজ ঔরসজাত সন্তানের মধ্যে মীরাস বণ্টনের নিয়মে। এ থেকে প্রমাণিত হল, আয়াতে কেবল পুরুষ সন্তান-সন্ততিদের কথাই বলা হয়েছে। আর الولد 'সন্তান' বললে পুত্রের সব সন্তানই বোঝায়। যেমন নিজ ঔরসজাত সন্তান। আল্লাহ বলেছেন ঃ يابنى ادم হে আদম বংশধর! কিন্তু তাতে নবী-করীম (স)-এর বনী হাশিম— হাশিম বংশধর ও আবদুল মুত্তালিব বংশধর হওয়ার কোন বাঁধা আসতে পারে না। বোঝা গেল, 'আল-আওলাদ' নামটি পুত্রের সন্তান ও নিজের ঔরসজাত সন্তান উভয়কে শামিল করে। তবে নিজ ঔরসজাত সন্তান সম্পর্কে এই নামটি প্রত্যক্ষ ও প্রকৃতভাবে ব্যবহৃত হবে, আর পুত্রের সন্তানদের পর্যায়ে তার ব্যবহার পরোক্ষভাবে। এই জন্যে নিজ ঔরসজাত সন্তান বর্তমান থাকা অবস্থায় পুত্রের সন্তানদেরকে 'সন্তান' শব্দ শামিল করবে না এবং তারা তাদের (ঔরসজাত সন্তানদের) অংশ প্রাপ্তিতে শরীক গণ্য হবে না। তা পাওয়ার অধিকারী হবে দুটি অবস্থার যে কোন একটিতে। হয় নিজ ঔরসজাত সন্তান সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যাবে। তখন পুত্রের সন্তানেরাই তার সন্তানের স্থলাভিষিক্ত হবে অথবা ঔরসজাত সন্তান থাকা সত্ত্বেও কোন না কোন কারণে তারা মীরাস পেতে পারবে না, হয়ত তখন কোন বা সম্পূর্ণ অনুগ্রহ পাওয়ার অধিকারী হবে। সন্তানের সন্তানরা ঔরসজাত সন্তানের সাথে শরীক হয়ে মীরাস পাওয়ার অধিকারী হবে, যেমন ঔরসজাত সন্তানরা পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে তা পাওয়ার অধিকারী হয়ে থাকে— সেরূপ নয়।

যদি বলা হয় 'সন্তান' বললে প্রকৃতভাবে ঔরসজাত সন্তান এবং পুত্রের সন্তানরা পরোক্ষভাবে শামিল হয়, তখন একটি শব্দ দ্বারা তাদের সকলকে বোঝানো সমীচীন নয়। কেননা একই শব্দ একই সময় প্রকৃত অর্থদাতা ও পরোক্ষ অর্থদাতা হতে পারে না।

জবাবে বলা যাবে, একই অবস্থায় একই শব্দ দ্বারা তাদের সকলকে বোঝানো হচ্ছে তা নয়। নিজ ঔরসজাত সন্তান থাকা অবস্থায় পরোক্ষ অর্থের পুত্রের সন্তানদেরকে 'সন্তান' শব্দ দ্বারা বোঝানো হয় না। কেননা ঔরসজাত সন্তান থাকলে পুত্রের সন্তানরা মীরাস পাবে না কুরআনের এ আয়াত অনুযায়ী । তাই সেই শব্দ দ্বারা ঔরসজাত সন্তানদের বোঝানো— তাদের বর্তমান থাকা অবস্থায় এবং তাদের বর্তমান না থাকা অবস্থায় পুত্রের সন্তানদের বোঝানো নিষিদ্ধ কিছু নয়। তাহলে একটি শব্দ 'সন্তান' দুই অবস্থায় দুই অর্থে ব্যবহৃত হওয়া— একটি প্রকৃত অর্থে, আর অপরটি পরোক্ষ অর্থে এটা কোন আপত্তির বিষয় নয়। কোন লোক যদি বলে ঃ 'আমি আমার মালের এক-তৃতীয়াংশ অমুক-অমুকের নামে অসিয়ত করেছি।' আর সে অমুক-অমুকের মধ্যে একজনের সন্তান হবে নিজ ঔরসজাত, আর অপরজনের সন্তান হবে পুত্রের সন্তান— আপন ঔরসজাত সন্তান কেউ থাকবে না, তাহলে যার ঔরসজাত সন্তান আছে, আর যার পুত্রের সন্তান আছে তাদের সকলের জন্যেই সে অসিয়ত কার্যকর হবে। সেই অসিয়তে এক জনের ঔরসজাত সন্তানের ও অপরজনের পুত্রের সন্তানের শরীক ও শামিল হওয়া নিষিদ্ধ হবে না। তবে এই দুজনের দুই ধরনের সন্তান একত্রিতভাবে গণ্য হওয়া নিষিদ্ধ হবে। অপর দিক থেকে পুত্রের সন্তানদের পক্ষে অন্য জনের আপন ঔরসজাত সন্তানের সাথে শামিল হওয়া নিষিদ্ধ হবে না। এই প্রেক্ষিতেই আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদেরকে অসিয়ত করছেন— আল্লাহ্‌র এই কথাটুকুর তাৎপর্য বুঝতে হবে। এই কথায় উপরোক্ত সন্তানের প্রত্যেকেরই ঔরসজাত সন্তান গণ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়, যদি থাকে। পুত্রের সন্তানরা তার মধ্যে শামিল হবে না। আর যার ঔরসজাত সন্তান নেই, তার যদি পুত্রের সন্তান থেকে থাকে, তাহলে তার সেই সন্তানরা গণ্য হবে। তা সমীচীন এজন্য যে, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে অসিয়ত করেছেন— সব মানুষের জন্যেই বলা কথা। এই কথার সম্বোধন সকল মানুষের প্রতি, যার যা অবস্থা, সেই অনুপাতে। তাই যার নিজ ঔরসজাত সন্তান রয়েছে, এ শব্দটি তাদেরকে শামিল করবে প্রকৃত অর্থের দিক দিয়ে। তাতে পুত্রের সন্তানরা শামিল হবে না। তবে যার নিজ ঔরসজাত সন্তান নেই, আছে পুত্রের সন্তান, তাকেও উক্ত কথা বলা হয়েছে তার অবস্থা অনুযায়ী। এরূপ অবস্থায় উক্ত শব্দ পুত্রের সন্তানকে শামিল করবে।

যদি বলা হয়, 'সন্তান' শব্দটি প্রত্যেকের নিজ ঔরসজাত সন্তান ও পুত্রের সন্তান সকলকেই প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ অর্থেই শামিল করে, তাহলে তা অসম্ভব বা অসমীচীন মনে করা যায় না। কেননা আসলে সকলেই তার থেকে উৎসারিত, তার সাথে-ই সম্পর্কিত। তার জন্মের ও বংশের দিক দিয়ে নিজ সন্তান ও পুত্রের সন্তান— সকলেই এই দিক দিয়ে তার সাথে মিলিত। সে কারণে 'সন্তান' শব্দ বললে সকলেরই শামিল হওয়া সম্ভব। যেমন— 'ভাই' শব্দটি দুইজনের বংশীয় সম্পর্ক এক হওয়ার কারণে হতে পারে, হতে পারে পিতা বা মা— এই দুইজনের কোন একজনের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে। আপন সহোদর ভাই, বৈমাত্রের ভাই, বৈপিত্রেয়

ভাই সবই এর অন্তর্ভুক্ত। আর সকলেই 'ভাই' সমানভাবে। আল্লাহ্‌র এই কথাটিও তা-ই প্রমাণ করে ঃ

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ -

এবং তোমাদের সেই পুত্রদের স্ত্রীরা, যারা তোমাদের পৃষ্ঠপ্রসূত। (সূরা নিসা ঃ ২৩)

এতে পুত্রের পুত্রদের স্ত্রীদেরও শামিল হওয়া সুবিবেচিত, যেমন নিজ ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীর গণ্য হওয়া বোধগম্য। তাই কেউ যদি একটি কন্যা ও পুত্রের কন্যা রেখে মরে যায়, তাহলে নিজের কন্যা পাবে অর্ধেক নির্দিষ্টভাবে, আর পুত্রের কন্যা পাবে এক-ষষ্টাংশ। আর অবশিষ্ট যা তা পাবে আসাবারা। যদি দুইজন কন্যা রেখে যায়, সেই সাথে পুত্রের কন্যা ও পুত্রের পুত্র রেখে যায়, তাহলে দুইজন কন্যা পাবে দুই-তৃতীয়াংশ। আর অবশিষ্ট যা থাকবে, তা পুত্রের পুত্র ও পুত্রের কন্যা এদের মধ্যে বণ্টন হবে একজন পুরুষের জন্য দুইজন মেয়ের অংশের সমান'— এই নীতি অনুযায়ী। এমনিভাবে মৃতের যদি দুই কন্যা ও পুত্রের কয়েকজন কন্যা এবং পুত্রের পুত্র থাকে (নীচের দিকে) তাহলে নিজ কন্যারা পাবে দুই-তৃতীয়াংশ। আর যা অবশিষ্ট থাকবে তা পুত্রের কন্যা ও তাদের মধ্যে নিম্নে যারা তাদের মধ্যে বণ্টন হবে সেই 'একজন পুরুষের জন্যে দুইজন মেয়ের প্রাপ্য অংশের সমান' নিয়মে।

এই কথা সব সাহাবী ও তাবেয়ীনের মধ্যে যারা শরীয়াত পারদর্শী তাঁদের সকলের। তবে আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে ব্যতিক্রমধর্মী মত বর্ণিত হয়েছে। তিনি অবশিষ্ট সম্পত্তি পুত্রের পুত্রকে— তা যত নিম্নেই হোক— দেয়ার পক্ষপাতী,পুত্রের কন্যাদেরকে কিছুই দেয়ার পক্ষপাতী তিনি নন। যদি ঔরসজাত কন্যারা পূর্ণ দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ে নেয়। তিনি পুত্রের কন্যাদেরকে অংশ দিতেন দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ করার জন্যে মাত্র। যেমন— মৃত ব্যক্তি যদি তার এক কন্যা ও পুত্রের কয়েকজন কন্যা রেখে যায়, তাহলে নিজ কন্যা পাবে অর্ধেক আর পুত্রের কন্যারা পাবে এক-ষষ্ঠাংশ— দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ করণ স্বরূপ। তাদের সাথে যদি পুত্রের পুত্র থাকে তাহলে পুত্রের কন্যাদেরকে এক-ষষ্ঠাংশের অধিক দেবেন না। বৈমাত্রেয়ী বোন আপন সহোদর বোনদের সঙ্গে এক সময়ে থাকলেও তাঁর সেই কথা। এ ব্যাপারে তিনি এই মত প্রকাশ করেছেন যে, পুত্রের মেয়ে সন্তানেরা যদি একাকী থাকে, তাহলে মেয়েদের দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ করে নেয়ার পর তারা কিছুই পাবেনা। অনুরূপ হবে যদি তাদের ভাই থাকে, তাহলে বোনরা কিছু পাবে না। তাদের কোন একজনের সাথে চাচার পুত্র থাকে, তাহলে মেয়েরা কিছু পাবে না।

কিন্তু আহলিস্ সুন্নাতুল জামা'আতের মতে ব্যাপারটি এরূপ নয়। কেননা পুত্রের কন্যারা একবার নির্দিষ্ট অংশ নেবে, আসাবা হয়েও নেবে, আর তাদের ভাইরা এবং তাদের নিম্নের দিকে যারা তারা হবে আসাবা— ঔরসজাত কন্যাদের মত একবার নির্দিষ্ট অংশ নেবে আর একবার আসাবা হয়ে নিবে, তা ভাবা যায় না। শুধু মেয়েরা যদি থাকে, তাহলে তারা দুই তৃতীয়াংশের অধিক নেবে না। তারা সংখ্যায় যতই বেশি হোক। আর তাদের সাথে যদি তাদের এক ভাই থাকে এবং তারা নিজেরা হয় দশজন, তাহলে তারা গোটা সম্পত্তির পাঁচ-ষষ্ঠাংশ-পাবে। তাদের সঙ্গে একজন ভাই থাকায় তারা নেবে আলাদাভাবে তাদের থাকা অবস্থায় যা নেবে তার চাইতে

বেশি। পুত্রের কন্যাদের সম্পর্কেও সেই হুকুম। যখন ঔরসজাত কন্যারা দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ে নেবে, তখন তাদের জন্য কোন নির্দিষ্ট থাকবে না। যদি তাদের সঙ্গে একজন ভাই থাকে, তাহলে তারা ভাইর সাথে 'আসাবা' হবে। আর অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ তাদের মধ্যে অনিবার্যভাবে ভাগ করা হবে 'একজন পুরুষের জন্যে দুই মেয়ের অংশের সমান'— এই নীতি অনুযায়ী।

দুইজন কন্যা ও পুত্রের কন্যা এবং একজন বোন থাকলে দুই কন্যা পাবে দুই-তৃতীয়াংশ। আর অবশিষ্ট যা থাকবে তা বোন পেয়ে যাবে, পুত্রের কন্যা কিছুই পাবে না। কেননা এই অবস্থায় যখন তার সাথে কোন পুরুষ নেই— কিছু নেয়, তাহলে কন্যাদের অংশ থেকেই নেবে। আর কন্যারা তো দুই-তৃতীয়াংশ সম্পূর্ণ নিয়ে নিয়েছে। কন্যাদের অংশ থেকে কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি যা সে গ্রহণ করতে পারে। তাহলে একজন বোন অবশ্যই পাবে। কেননা সে আসাবা কন্যাদের সঙ্গে। এরূপ অবস্থায় বোন কি পেতে পারে? সে তো পেতে পারে কেবল আসাবা হয়েই। পুত্রের কন্যার সাথে যদি সে কন্যার একজন ভাই-ও থাকে, তাহলে দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ে নেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা 'একজন পুরুষের জন্যে দুই মেয়ের অংশ সমান' নীতি অনুযায়ী বন্টন হবে। বোন কিছুই পাবে না।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে জরাতা, আলী ইবনে মস্‌হর, আমাস, আবূ কায়সুল আওয়াদী, হুজ্জাই ইবনে শারাহবীলুল আওয়াদী সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি হযরত আবূ মূসা আল-আশআরী ও সালমান ইবনে রবীয়াতা (র)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে দুজনকেই জিজ্ঞাসা করল ঃ কন্যা, পুত্রের কন্যা ও আপন সহোদরা বোন একসাথে থাকলে কে কত পাবে? তাঁরা দুজনই জবাবে বললেন ঃ কন্যা পাবে অর্ধেক, বোন পাবে অর্ধেক। তাদের দুজনের মতে পুত্রের কন্যা কিছুই পাবে না। পরে সেই লোক হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)-এর নিকট এসে সে জনের মত তাঁকে বলল এবং এ বিষয়ে তাঁর মত জানতে চাইল। জবাবে তিনি বললেন ঃ এক্ষণে আমি বিভ্রান্ত, এখন আমি হেদায়েত প্রাপ্তদের মধ্যে নই। তবে জিজ্ঞাসিত বিষয়ে আমি সেই রায় দেব যা রাসূলে করীম (স) দিয়েছেন। তাহল, মৃত্যের কন্যা পাবে অর্ধেক আর পুত্রের কন্যা পাবে এক ষষ্ঠাংশ— দুই-তৃতীয়াংশের পূর্ণত্বের জন্যে। আর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা আপন সহোদর— বাপ মা উভয় দিক দিয়ে— বোন পাবে।

তাই এক-ষষ্ঠাংশ পুত্রের কন্যা গ্রহণ করবে নির্দিষ্ট অংশ হিসেবে, আসাবা হয়ে নয়। এ বিষয়ে মনীষিগণের কোন ভিন্নতর মত নেই। তবে যা বর্ণিত হয়েছে, আবূ মূসা আল-আশআরী ও সালমান ইবনে রবীয়াতা থেকে। পরবর্তীতে তিনিও ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন, আবদুল্লাহ্ উপরোক্ত মনীষীদের বিপরীত মত প্রকাশ করেন নি। যদি সে কন্যার সাথে এক ভাই থাকে, তখন কন্যা অর্ধেক পাবে। আর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা পুত্রের কন্যা ও পুত্রের পুত্রের মধ্যে বন্টন হবে ' একজন পুরুষের জন্যে মেয়ের অংশ'— এই মৌল নীতি অনুযায়ী। এই পুত্রের— কন্যাকে এক-ষষ্ঠাংশ দেয়া হবে না। যেমন তার সাথে একজন ভাই থাকলে দেয়া হয়।

এ বিশ্লেষণে এ বিষয়ের দলীল রয়েছে যে, পুত্রের কন্যা একবার পাবে নির্দিষ্ট অংশ হিসেবে আর একবার পাবে আসাবা হয়ে— তার বোনদের সঙ্গে মিলিত হয়ে। যেমন ঔরসজাত

কন্যাদের জন্যে নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর এ কথা ঃ নিজ কন্যা ও পুত্রের কন্যাগণ এবং পুত্রের পুত্র থাকলে নিজ কন্যা অর্ধেক পাবে। যা অবশিষ্ট থাকবে পুত্রের কন্যাদের ও পুত্রের পুত্রের মধ্যে একজন পুরুষের জন্যে দুই মেয়ের অংশের সমান এই নীতিতে বিভক্ত হবে— এই কথার কার্যকরতা তখন হবে যদি পুত্রের কন্যাদের অংশ এক-ষষ্ঠাংশের অধিক না হয়। অধিক হলে তাদেরকে এক-ষষ্ঠাংশের বেশী দেয়া যাবে না। এই অবস্থায় আলাদা করে কোন অংশ নির্ধারণ হয়নি। আলাদাভাবে সে আসাবাও হবে না। তবে এক-ষষ্ঠাংশের অধিক দেয়া নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে নির্ধারণ অবশ্যই গণ্য হবে। আর কম হলে মুকাসিনা (পারস্পরিক বিভক্তি) গণ্য হবে। কিন্তু তা কিয়াসের বিপরীত।

## কালালা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلَا لَةً اَوِامْرَاَةٌ وَّلَهُ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ -

যদি কোন পুরুষ ব্যক্তি কালালার ওয়ারিস হয় কিংবা কোন মেয়েলোক ওয়ারিস হয় এবং মৃতের ভাই বা বোন-ও আছে তা হলে তাদের দুজনার প্রত্যেকের জন্যে এক-ষষ্ঠাংশ হবে।

আবূ বকর বলেছেন, মৃত ব্যক্তি নিজে 'কালালা' নামে অভিহিত এবং তার কোন কোন ওয়ারিসকেও কালালা বলা হয়।[১]

আর আল্লাহ্র কথা ঃ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلَالَةً বোঝায় যে, 'কালালা' বলতে এখানে মৃত ব্যক্তিকে বুঝিয়েছে। 'কালালা' তার অবস্থার পরিচিতি। আস-সমীম ইবনে উমায়র বলেছেন, উমর (রা) বলেছেন ঃ আমার উপর এমন একটা সময় এসেছে যখন 'কালালা' জানতাম না।

---

১. উর্দু লুগাতুল কুরআন 'কালালা' শব্দের ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে ঃ রাসূলে করীম (স)-কে 'কালালা' শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ 'কালালা' সেই মৃত ব্যক্তি, যার কোন সন্তান নেই, বাপও নেই (রাগেব)। কোন কোন অভিধান লেখক লিখেছেন ঃ 'কালালা' সেই ওয়ারিসকে বলা হয়, যে মৃতের পিতাও নয় সন্তানও নয়। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ সন্তান ছাড়া আর যারা মৃতের সম্পত্তির অংশ পায় তাদেরকে 'কালালা' বলা হয়, ইমাম রাগেব বলেছেন ঃ হাদীস ও অভিধানের মধ্যে এ শব্দের ব্যাখ্যায় বাহ্যত পার্থক্য মনে হয় যদিও উভয়ের কথাই সহীহ্। কেননা যে মৃতের সরাসরি কোন ওয়রিস না থাকে অর্থাৎ পিতা না থাকে, সন্তান-ও না থাকে, অন্য লোকেরা তার ওয়ারিস হয়, তাহলে সেই অন্যদের সাথে মৃতের আত্মীয়তার সম্পর্ক দুর্বল হবে। কেননা তারা কেউ প্রত্যক্ষ আত্মীয় নয়, পরোক্ষ আত্মীয়। অনুরূপভাবে মৃতের সাথে এ ওয়ারিসদের আত্মীয়তাও দুর্বল হবে এজন্যে যে, তারা কেউ মৃতের সন্তানদের মধ্যে থেকে নয়, পিতাও নয়। ইমাম রাগেবের বক্তব্য হল 'কালালা' শব্দের অর্থ দুর্বলতা ও পরোক্ষ আত্মীয়তা। আর তা সরাসরি আত্মীয়তার তুলনায় দুর্বল হয়। এ কারণে 'কালালা' শব্দেটি মৃত ও ওয়ারিস উভয়ের জন্যে ব্যবহৃত হতে পারে এ দিক দিয়ে। ব্যাপক ব্যবহারে প্রচলিত কথায় 'কালালা' বলে সেই লোকদের বোঝানো হয়, যারা উভয় দিক দিয়ে আত্মীয়হীন— না তাদের পিতা মাতা আছে, না নিজ ঔরসজাত সন্তান। (মুজিমুল কুরআন) ......'কালালা' সেই আসাবাদেরকেও বলা হয় যারা বর্তমান থাকলে বৈপিত্রেয়— মা এক, পিতা দুই— ভাই ও ওয়ারিস হয়ে পড়ে। অধ্যাপক আবদুর রউফ মজিমুল কুরআনে লিখেছেন আগেরকালের মনীষীদের ইজমায় রয়েছে এ কথায় যে, আলোচ্য আয়াতে সেই বৈপিত্রেয় ভাইদের বোঝনো হয়েছে। আল্লামা যমাখশারী ও সূরা নিসার উদ্ধৃত আয়াতের তফসীরে এ কথা-ই লিখেছেন। —অনুবাদক

'কালালা' হচ্ছে, সন্তান ও পিতা ছাড়া অন্যান্য ওয়ারিস। আসেমুল আহ্ওয়াল শবী থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ হযরত আবূ বকর (রা) বলেছেন ঃ সন্তান ও পিতাহীন ছাড়া অন্যান্য উত্তরাধিকারী। ফলে উমর (রা) যখন নিজে বুঝলেন তখন তিনি (উমর) বললেন ঃ আমি মনে করি 'কালালা' সে, যার সন্তান নেই, পিতা-ও নেই। আর আমি আল্লাহ্‌র নিকট লজ্জিত বোধ করছি এ জন্যে যে, আমি আবূ বকর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করতাম। 'কালালা' পিতা ও সন্তান ছাড়া অন্যান্য ওয়ারিস।[১] তায়ূস ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ সময়ের দিক দিয়ে উমর ইবনুল খাত্তাবের শেষ সঙ্গী আমরাই ছিলাম, তখন আমরা তাঁকে সে কথা বলতে শুনেছি যা আমরা বলতাম। তোমরা কি বলতে জিজ্ঞাসা করায় ইবনে আব্বাস বললেন ঃ 'কালালা' হচ্ছে সে ব্যক্তি, যার (মৃত্যুকালে) সন্তান নেই। সুফিয়ান ইবনে উয়ায়নাতা, আমর ইবনে দীনার, আল-হাসান ইবনে মুহাম্মাদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে 'কালালা' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ 'যে মৃত ব্যক্তির সন্তান নেই, পিতাও নেই।' বললেন, আমি বললাম ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি মরে গেল, তার সন্তান নেই, আছে তার এক বোন।' একথা শুনে তিনি ক্রুদ্ধ হলেন ও আমাকে ধমকালেন।

আয়াতটির বাহ্যিক অর্থ ও সাহাবীদের মধ্যে যাদের মত আমরা উল্লেখ করলাম, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তি নিজেই 'কালালা' নামে অভিহিত। কেননা তাঁরা বলেছেন ঃ 'কালালা' সে ব্যক্তি, যার সন্তান নেই, পিতাও নেই। অন্যান্য কিছু লোক বলেছেন ঃ 'কালালা' সে যার সন্তান সেই। যে মৃত ব্যক্তির মীরাস বণ্টন হয়, 'কালালা' তারই পরিচিতি। কেননা একথা জানা আছে যে, তাঁরা একথা বলতে ইচ্ছা করেন নি যে, 'কালালা' সেই উত্তরাধিকারীকে বলা হয়, যার সন্তান নেই, পিতাও নেই। কেননা ওয়ারিসের সন্তান ও পিতার বর্তমান থাকায় যার মীরাস ভাগ হয় তার উত্তরাধিকারী সম্পর্কিত হুকুম পরিবর্তিত হয় না। মৃতের এ অবস্থা হলেই মীরাস সম্পর্কিত বিধানে পার্থক্য সূচিত হয়। আর যে বোঝা যায় যে, 'কালালা' নামটি কোন কোন ওয়ারিস সম্পর্কেও ব্যবহৃত হয়— যেমন শুবা মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্‌র সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ রাসূলে করীম (স) আমাকে দেখতে এলেন, আমি রোগাক্রান্ত ছিলাম। আমি বললাম, হে রাসূল! মীরাস কিরূপ হবে, আমার ওয়ারিস তো কালালা? তখন ফরায়েয সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হল। শুবার মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদিরের এ কথা স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর কথা। জাবির বলেছেন, 'কালালা' তাঁর ওয়ারিসরা। নবী করীম (স) তা অগ্রাহ্য করেন নি। ইবনে আওন, আমর ইবনে সাঈদ, হুমায়দ ইবনে আবদুর রহমান, বনু সাদের এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ সায়াত মক্কায় রোগাক্রান্ত হলে বললেন ঃ হে রাসূল! 'কালালা' ছাড়া আমার কোন ওয়ারিস নেই। এ হাদীসেও ওয়ারিসদেরকেই 'কালালা' বলা হয়েছে। সাদ সংক্রান্ত হাদীস জাবির সংক্রান্ত হাদীসের আগের ব্যাপার। কেননা তিনি রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন মক্কায়। আর তাতে আয়াতের উল্লেখ নেই। কিছু লোক বলেছেন,

১. অর্থাৎ আবূ বকর (রা) মনে করেন 'কালালা' নাম হচ্ছে পিতা ও সন্তান ছাড়া অন্যান্য ওয়ারিসের। আর উমর (রা) মনে করতেন, যে ব্যক্তি পিতা ও সন্তানহীন হয়ে মরে গেছে, সে ব্যক্তিকে 'কালালা' বলা হয়। পরে তিনি নিজের মত ত্যাগ করে হযরত আবূ বকর (রা)-এর মত গ্রহণ করেন।

এ ব্যাপারটি বিদায় হজ্জকালীন। অপর কিছু লোক বলেছেন, এ ঘটনাটি মক্কা বিজয়কালীন। বলা যায়, তা মক্কা বিজয়ের বছরই হবে। আর জাবির সংক্রান্ত ঘটনা মদীনায় নবী করীম (স)-এর শেষ দিনগুলোতে সঙ্ঘটিত ঘটনা। তার শুবা আবূ ইসহাস, বরা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ সর্বশেষ আয়াত যা নাযিল হয়েছে, তা হল ঃ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ (সূরা আন নিসা ঃ ১৭৬) আর সর্বশেষ সূরা নাযিল হয়েছে সূরা তওবা। ইয়াহয়া ইবনে আদম বলেছেন, রাসূল (স) থেকে আমাদের নিকট এ খবর পৌঁছে যে, তিনি 'কালালা' সম্পর্কে প্রশ্নকারীকে বলেছেন ঃ يَكْفِيْكَ اٰيَةُ الصَّيْفِ —'সয়ফ সংক্রান্ত আয়াতই তোমার জন্যে যথেষ্ট। আর তা-ই হচ্ছে এ আয়াতটি। কেননা তা গ্রীষ্মকালে নাযিল হয়েছিল। রাসূলে করীম (স) তখন মক্কা যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তখন তাঁর প্রতি 'হজ্জ' সংক্রান্ত আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ....

এবং আল্লাহ্র জন্যে লোকদের কর্তব্য হচ্ছে বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করা .....
(সূরা আলে-ইমরান ঃ ৯৭)

মদীনায় নাযিল হওয়া এটাই শেষ আয়াত। পরে তিনি মক্কায় উপনীত হলে আরাফাতে আরফার দিনে নাযিল হয় ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

আজকের দিন তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন পূর্ণ করে দিলাম। (সূরা মায়িদা ঃ ৩)

পরদিন কুরবানীর দিন নাযিল হয় ঃ

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ –

এবং তোমরা ভয় কর সেই দিনকে, যে দিন তোমরা আল্লাহ্র নিকট ফিয়ে যাবে।
(সূরা বাকারাহ ঃ ২৮১)

এরপর রাসূলে করীম (স)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত তাঁর প্রতি আর কোন আয়াত নাযিল হয়নি। এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর তিনি দুনিয়া থেকে চলে যান। আমরা এ কথাই শুনেছি। ইয়াহ্য়া বলেছেন, অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর নিকট 'কালালা' সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন ঃ

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَّلَاوَالِدٌ فَوَرَثَهُ كَلَالَةٌ –

যে লোক মরে গেল, তার সন্তান নেই, পিতাও নেই, কালালা তার ওয়ারিস হল।

আবূ বকর বলেছেন ঃ এসব আয়াত ও হাদীসের উৎপত্তির তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। অথচ তারিখের পার্থক্যের ভিত্তিতে আয়াত ও হাদীসের হুকুমেও পার্থক্য ঘটে! কিন্তু আয়াতের ও হাদীসের উল্লেখ যখনই করা হবে, তার উৎপত্তি বা নাযিল হওয়ার তারিখ সেই দিনের সাথে জড়িত হয়ে গেছে। আমরা এ কথা দ্বারা বোঝাতে চাচ্ছি, আমরা বর্ণনা করব যে, 'কালালা' নামটি কখনও মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে, কখনও কোন কোন ওয়ারিস সম্পর্কে।

'কালালা' বলতে কি বোঝায়, এ বিষয়ে আগেরকালের ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। জরীর, আবূ ইস্‌হাক আশ-শায়বানী, আমর ইবনে মুররা, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব সূত্রে বর্ণনা করেছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূল (স)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কালালা'র ওয়ারিস কি করে হয় ? জবাবে বললেন ঃ এ বিষয়ে কি আল্লাহ্ তা'আলা বলে দেন নি ? এরপর তিনি উক্ত আয়াতটি ঃ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِامْرَاَةٌ শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। তখন আল্লাহ্ এ আয়াতটি নাযিল করলেন ঃ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ শেষ পর্যন্ত। বললেন ঃ কিন্তু উমর (রা) তবুও 'কালালা' বুঝলেন না। পরে তিনি হাফসা (রা)-কে বললেন ঃ তুমি যখন রাসূলে করীম (স)-কে হাসি-খুশি মনের দেখবে, তখন তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবে। তাই তিনি তাকে হাসি-খুশি মনের দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। জবাবে তিনি বললেন ঃ তোমার পিতা তোমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে বলেছেন? আমি দেখছি, তোমার পিতা এ বিষয়টি যেন বুঝতেই পারছেন না। এরপর থেকে হযরত উমর (রা) প্রায়ই বলতেন ঃ মনে করি, আমি এ বিষয়ে কখনই জানব না! অথচ রাসূলে করীম (স) তো এ বিষয়ে বলেই গেছেন যা বলার।

সুফিয়ান আমর ইবনে মুররা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ তিনটি কথার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আমার নিকট— কারোর বর্ণনা করা আমার নিকট— দুনিয়া ও দুনিয়ায় যা কিছু আছে তার অপক্ষো অধিক প্রিয়। তা হল— কালালা, খিলাফত ও সূদ। কাতাদাহ সালিম ইবনে আবুল জায়দ, মিদান ইবনে আবূ তালহা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন— হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ আমি রাসূলে করীম (স)-কে 'কালালা' বিষয়ে যত বেশি প্রশ্ন করেছি তার অধিক প্রশ্ন করা কোন বিষয়েই করিনি। এমনকি এত অধিক প্রশ্ন করায় তাঁর অঙ্গুলি দিয়ে আমার বুকে তিনি খোঁচাও দিয়েছেন। পরে বলেছেন ঃ এ ব্যাপারে তোমার জন্য গ্রীষ্মকালে অবতীর্ণ আয়াতই যথেষ্ট। হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর মৃত্যকালে বলেছেন ঃ 'তোমরা জেনে রাখো, আমি 'কালালা' সম্পর্কে কোন কথাই বলিনি।'

উল্লিখিত হাদীসসমূহ প্রমাণ করে যে, তিনি নিজে এ বিষয়ে কোন চূড়ান্ত কথা বলে যান নি। এর তাৎপর্য হল, বিষয়টি তাঁর নিকট অস্পষ্ট ছিল, তিনি কখনই সুস্পষ্টভাবে তা বলতে পারে নি।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব বলেছেন, হযরত উমর (রা) 'কালালা' সম্পর্কে একখানা দলীল লিপিবদ্ধ করেছিলেন। পরে তাঁর মৃত্যু মুহূর্ত উপস্থিত হলে সেই লিখিত জিনিস মুছে ফেলেন এবং বলেন ঃ তোমরা এ বিষয়ে তোমাদের নিজেদের মত-ই পোষণ কর। উমর (রা) থেকে বর্ণিত এ-ও একটি বর্ণনা অন্যান্য বহু কয়টি বর্ণনা থেকে। তাঁর নিকট এ বর্ণনাটিও এসেছে, তিনি বলেছেন ঃ 'কালালা' সে— যার সন্তান নেই, পিতাও নেই। তাঁর থেকে এ বর্ণনাটিও এসেছে, কালালা সে যার সন্তান নেই। আবূ বকর সিদ্দীক, আলী, ইবনে আব্বাস (রা) থেকে পাওয়া দুটি বর্ণনার একটিতে বলা হয়েছে ঃ 'কালালা' পিতা ও সন্তান ছাড়া অন্যান্য ওয়ারিসান। মুহাম্মাদ ইবনে সালিম, শবী ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, পিতা ও সন্তান ছাড়া অন্যান্য ওয়ারিসান হচ্ছে 'কালালা'। জায়দ ইবনে সাবিত (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে।

ইবনে আব্বাস থেকে পাওয়া অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ পিতা ছাড়া অন্যান্য ওয়ারিসান হচ্ছে কালালা।

আবূ বকর বলেছেন, সাহাবাগণ এ বিষয়ে এক মত যে, সন্তান 'কালালার' মধ্যে গণ্য নয়। পিতা শামিল কিনা, সে বিষয়ে তাঁদের মত বিভিন্ন। জমহুর ফিকাহবিদরা বলেছেন ঃ পিতা কালালা'র বাইরে। ইবনে আব্বাসও দুটি বর্ণনার একটিতে অনুরূপ কথা বলেছেন। অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, সন্তান ছাড়া অন্যান্যরা কালালা।

আগেরকালের মনীষীরাই যখন কালালা'র ব্যাপারে বিভিন্ন মতের ছিলেন বর্ণিতভাবে এবং উমর (রা) নবী (স)-কে এর তাৎপর্য সম্পর্কে বারবার জিজ্ঞাসা করেছেন, তিনি তাঁকে আয়াতে বলা কথার উপর নির্ভর করতে বলেছেন। সে আয়াতের কথা হল লোকেরা তোমাকে কালালা সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করে, আল্লাহ তোমাকে সেই ফতোয়া দিচ্ছেন ..... অথচ হযরত উমর (রা) একজন আরবী ভাষাভাষী বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তার তাৎপর্য জানার পন্থাও তার নিকট অস্পষ্ট ছিল না। এ থেকে বোঝা গেল যে, কেবল ভাষাতত্ত্ব জ্ঞান দ্বারাই 'কালালা'র তাৎপর্য বোঝা সম্ভব নয়। মূলত এটি 'মুতাশাবিহ' আয়াতসমূহের একটি। তার তাৎপর্য বোঝার জন্যে আল্লাহ আমাদেরকে 'মুহকাম' আয়াতের সাহায্য গ্রহণ করতে বলেছেন, তার-ই উপর নির্ভর করতে বলেছেন। এ কারণেই নবী করীম (স) হযরত উমরের কালালা সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার সরাসরি কোন জবাব দেন নি। বরং তা আয়াত থেকে অনুধাবন, ইস্তিনবাত ও দলীল-প্রয়োগ করতে বলেছেন। এ কথায়ই কয়েক প্রকারের দলীল নিহিত রয়েছে, যা এর তাৎপর্য স্পষ্ট করে তোলে। একটি— এ বিষয়ে প্রশ্ন করলেই অকাট্য দলীল নাযিল করে তওকীফী পদ্ধতিতে তার তাৎপর্য বলে দেয়া হবে— তা বাধ্যতামূলক নয়। কেননা তার তাৎপর্য 'তওকীফী' উপায়ে চূড়ান্তভাবে বলে দেয়াই যদি বাধ্যতামূলক হতো তা হলে নবী করীম (স) নিজে তার বর্ণনা দেয়া এড়িয়ে যেতেন না। আর তা এ জন্যে যে, 'কালালা'র ব্যাপারটি সম্পর্কে যে অবস্থার প্রেক্ষিতে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন এ বিষয়ে কোন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি, তাৎক্ষণিকভাবে তার হুকুম কার্যকর করার কোন প্রশ্ন ছিল না। অন্যাথায় তিনি নিজে এ বিষয়ে বলতে বাকী রাখতেন না। আসলে তিনি তাঁকে যে প্রশ্ন করেছিলেন, জানতে চেয়েছিলেন, 'নস'-এর মাধ্যমে আয়াতের তাৎপর্য জানতে চেয়েছিলেন, আইন-বিধানের সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লোকদেরকে 'তাওকীফ' করার কোন দায়িত্ব রাসূলে করীম (স)-এর ছিল না। কেননা সে বিষয়টির নাম, পরিচিতির ব্যাপার রয়েছে। তাতে এমন জিনিস-ও আছে যা তত্ত্ব বোঝাবার দলীল হয়ে দাঁড়ায়, তাতে কোন সংশয় নেই। তার একটি দিক ইজতিহাদ দ্বারা মীমাংসা করা জরুরী। এ জন্যে নবী করীম (স) হযরত উমর (রা)-কে ইজতিহাদ করার দিকেই আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। এ কথা প্রমাণ করে যে, তিনি এ বিষয়টিকে ইজতিহাদী বিষয় মনে করতেন এবং হযরত উমর (রা)-কে ইজতিহাদ করার যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ মনে করতেন। তাদের বিষয়েই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ -

তাঁদের মধ্যে যারা তা উদ্ভাবন করে তারা তা অবশ্যই জানবে ..... (সূরা নিসা ঃ ৮৩)

শরীয়াতের হুকুম-আহকামের ব্যাপারে ইজতিহাদী কার্যক্রম পরিচালনার উপর গুরুত্বারোপের প্রমাণ-ও তাতে রয়েছে। তা একটি মৌলনীতি, তার মাধ্যমে শরীয়াতের অনেক হুকুম-আহকামই জানা যেতে পারে। নিত্য নব ঘটিত ঘটনাবলীতে পথ-নির্দেশ তার মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব। মুতাশাবিহ আয়াতের তাৎপর্য বোঝার জন্যে মুহকাম আয়াতের ভিত্তিতে বিচার-বিশ্লেষণ চালানো সে উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। 'কালালা'র তাৎপর্য জানবার জন্যে সাহাবায়ে কিরামের ইজতিহাদী চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং ঐকমত্য নিঃসন্দেহে জানা যায়। পূর্বোদ্ধৃত বিস্তারিত আলোচনা থেকে তা অকাট্য ও নিঃসন্দেহভাবে জানা যায়। লক্ষ্যণীয়, কোন কোন সাহাবী বলেছেন ঃ 'কালালা' হল যার সন্তান ও পিতা নেই। কোন কোন লোক বলেছেন ঃ তার সন্তান নেই। হযরত উমর (রা) এ সংক্রান্ত প্রশ্নের বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন। কোন কোন অবস্থায় তিনি জবাব দেন নি। যারা যারা এ বিষয়ে কথা বলেছেন, তারা পরস্পরের কথাকে অগ্রাহ্য করেন নি। কেননা প্রত্যেকে নিজ নিজ ইজতিহাদ অনুযায়ী কথা বলেছেন। আর তা থেকে বোঝা যায় যে, শরীয়াতের হুকুম-আহকাম ইজতিহাদ করার উপর তাঁরা সকলেই বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ-ও বোঝা যায় যে, আবূ ইমরান-আল জুয়ানী জুনদুব (রা) থেকে যা বর্ণনা করেছেন, তা হল, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَايِهِ فَاَصَابَ فَقَدْ اَخْطَاَ -

যে লোক কুরআনে নিজ চিন্তা-বিবেচনার ভিত্তিতে কথা বলে, তা যদি যথার্থ-ও হয়, তবু সে মারাত্মক ভুল করে।

এ কথাটি নিশ্চয়ই সেই লোক সম্পর্কে, যে নিজের অমূলক ধারণা ও নিছক কল্পনার ভিত্তিতে— মৌলনীতির কোন দলীল ছাড়া-ই কুরআন সম্পর্কিত কোন কথা বলবে। তার থেকে নিজ ইচ্ছামত কোন হুকুম বের করবে ও তার তাৎপর্য উদ্ভাবন করবে। তাই প্রত্যেক বিষয়ে মুহ্কাম, তাৎপর্যে ঐকমত্য সম্পন্ন হলে তা অবশ্যই প্রশংসিত ও সে জন্যে আল্লাহ্ কর্তৃক সওয়াব প্রাপ্ত হবে। কেননা আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ

لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ -

তাদের মধ্যে যারা 'ইস্তিনবাত করে' তারা তা অবশ্যই জেনে যাবে।[১]

আরবী ভাষা পারদর্শিগণ الكلالة পর্যায়ে অনেক কথা বলেছেন। আবূ উবায়দাতা মামার ইবনুল মুসান্না বলেছেন ঃ 'কালালা' হচ্ছে এমন ব্যক্তি, যার পিতা ও পুত্র তার ওয়ারিস হয়নি। আরবদের নিকট এমন ব্যক্তি 'কালালা'। শব্দটি مَنْ تَكَلَّلَهُ النَّسَبُ اَىْ تَعَطَّفَ النَّسَبُ عَلَيْهِ যার পর্যন্ত এসে বংশধারা থেমে গেছে, বাঁকা হয়ে পড়েছে— থেকে উদ্ভূত। আবূ উবায়দাতা বলেছেনঃ যে তা পড়বে يُوْرَثُ অর্থ হবে, সেই ব্যক্তি যার পুত্র ও পিতা নেই।

১. يَسْتَنْبِطُوْنَهُ - اِسْتِنْبَاطٌ। থ্যানুসন্ধান করা نبطة - نَبَطٌ বলা হয় খনন কূপে নির্গত প্রথম পানিকে। কূপ জমিন থেকে পানি বের হওয়া انبه। কূপ খননকারীর পানি পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া। পানি বের হওয়া, কোন জিনিসের উপর প্রভাব ফেলা, কূপ খননের পর পানি বের হওয়া, কোন জিনিস বহু পরিশ্রমের পর বের করা। ফকীহ ইস্তিনবাত' করেছে, এর অর্থ ঃ ইজতিহাদ করে কোন তত্ত্ব উদঘাটন ও উদ্ভাবন করা।— অনুবাদক।

আবূ বকর বলেছেন ঃ আল-হাসান ও আবূ রজা আল-আতাবিদী يُوْرِثُ পড়েছেন।

আবূ বকর বলেছেন ঃ বলা হয়েছে যে, اَلْكَلَالَةُ -এর আসল আভিধানিক অর্থ হল الاحاطة। 'পরিবেষ্টন'। এ থেকে হয় اَلْاِكْلِيْلُ শব্দ। কেননা اِكْلِيْلُ টুপি মাথাকে পরিবেষ্টিত রাখে। তা থেকে الكل যা তাতে প্রবেশ করে তা তাকে পরিবেষ্টিত করে ফেলে। অতএব বংশের দিক দিয়ে الكلالة হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে পরিবেষ্টিত হয়েছে সন্তান, পিতা ও ভাই-বোন দ্বারা। তাদের দুজনকে পরিবেষ্টিত করেছে। আর সন্তান ও পিতা 'কালালা' নয়। কেননা বংশের মূল ও তার মেরুদণ্ড সে পর্যন্ত এসে-ই শেষ হয়েছে। তারা হল সন্তান ও পিতা। এ দুজন ছাড়া আর যারা, তারা এ দুজনের বাইরে। তারা বংশে শামিল হয় জন্ম সূত্রের মাধ্যমে নয় অন্যভাবে। যেমন টুপি যা গোটা মাথাকে শামিল করে। এ বিশেষণ প্রমাণ করে যে, যিনি কালালা'র ব্যাখ্যা করেছেন সন্তান ও পিতা ছাড়া অন্যরা, তাঁর কথাই সহীহ্। সন্তান যদি 'কালালা' না হয়, তাহলে পিতা-ও নয়। কেননা এ দুজনের প্রত্যেকেই মৃতের সাথে সম্পর্ক জন্মসূত্রে। ভাই ও বোনেরা সেরূপ নয়। কেননা এদের কারোই সম্পর্ক মৃত ব্যক্তির সাথে জন্ম সূত্রের মাধ্যমে নয়। আর তিনি তার ব্যাখ্যায় বলেছেন, পিতা ছাড়া অন্যরা কালালা এবং কেবল সন্তানকে কালালা'র বাইরে ধরেছেন, তাদের ব্যাখ্যাও অনুরূপ। কেননা সন্তান তো পিতা থেকেই। যেন তারই অংশ। কিন্তু পিতা— জন্মদাতা— সন্তান থেকে নয়। যেমন ভাই ও বোন— ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক যার সাথে, তার সাথে জন্মসূত্রের সম্পর্ক নেই। তাই তিনি বলেছেন, 'কালালা' সে যে তার থেকে আসেনি। তার অংশ সে নয়। মৃতের সাথে যার সম্পর্ক সেদিক থেকে, যেদিক থেকে এসেছে, সে-ও কালালা নয়। জাহিলিয়াতের যুগে 'কালালা' ব্যাপকভাবে পরিচিত ও ব্যবহৃত শব্দ।

আরব কবিরাও দাদাকে 'কালালা'র মধ্যে গণ্য করেছে। সেই সাথে জানিয়েছে যে, তার প্রাধান্য বংশ সূত্রে নয়। বরং সে নিজেই প্রধান ও মাথা হয়ে বসেছে। কেউ কেউ বলেছেন ঃ كلت الرحم بين فلاق অমুক অমুকের মধ্যে রেহম দূর হয়ে পড়েছে। একটি অপরটি থেকে দূরে সরে গেছে। একজন অপরজনের উপর আক্রমণ করেছে, পরে পরস্পর দূরত্বে সরে যায়। কবির কবিতা থেকে বোঝা যায়, লোকেরা পিতা, দাদা থেকে মীরাস পায়, ভ্রাতৃত্ব ও চাচাত্ব থেকে দূরে পড়ে থাকে।

কুরআনের দুটি আয়াতে আল্লাহ الكلالة শব্দটির উল্লেখ করেছেন। একটি আয়াতে ঃ

قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ اِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ -

বল, আল্লাহ্ কালালা সম্পর্কে তোমাদিগকে ফতোয়া দিচ্ছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি মরে যায়, তার সন্তান কেউ নেই, তবে আছে একটি বোন, তাহলে রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে বোন পাবে অর্ধেক। (সূরা আন-নিসা ঃ ১৭৬)

সন্তান না থাকা অবস্থায় ভাই-বোন জীবিত থাকলে তাদের মীরাসের প্রাপ্য অংশের কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে। এদেরকেই 'কালালা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। অবশ্য তাতে পিতা

জীবিত না থাকা জরুরী শর্ত হিসেবে রয়েছে, যদিও তা বলা হয়নি। কেননা সূরার শুরুতেই বলা হয়েছে ঃ

وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ -

এবং তার ওয়ারিস হবে তার পিতামাতা। তাহলে তার মার জন্যে এক-তৃতীয়াংশ আর তার কয়েকজন ভাই থাকলে তার মা পাবে এক-ষষ্ঠাংশ।

পিতা থাকলে ভাইরা মীরাস পাবে না। ফলে পিতা 'কালালা'র বাইরে পড়ে গেল, যেমন সন্তানরাও বাইরে রয়ে গেল। কেননা পিতা বর্তমান থাকলে ভাইরা মীরাস পাবে না। যেমন পুত্র ও কন্যা থাকলে তারা মীরাস পায় না। এ কন্যাও 'কালালা'র মধ্যে গণ্য নয়। যদি মৃত ব্যক্তি একজন বা দুইজন কন্যা রেখে যায়, ভাই ও বোনরাও থাকে আপন সহোদর কিংবা বৈমাত্রেয়। তাহলে কন্যারা কালালা হবে না। আর এ দুজনরা সাথে মিলে যারা ওয়ারিস হবে, তারা 'কালালা'।

সূরার শুরুতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ - فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ -

যদি কোন ব্যক্তি কালালাকে বা কোন মেয়েলোককে ওয়ারিস বানায়, আর তার ভাই কিংবা বোন থাকে, তাহলে তাদের প্রত্যেকের জন্যে এক-ষষ্ঠাংশ। আর তারা যদি তার চেয়ে সংখ্যায় বেশি হয়, তাহলে তারা সকলে এক-তৃতীয়াংশে শরীক হবে।

এ আয়াত অনুযায়ী কালালা হচ্ছে মার দিকের বোন ও ভাই। মৃতের পিতা ও সন্তান থাকলে তারা দুজন ওয়ারিস হবে না— তারা পুরুষ হোক, কি মেয়েলোক। বর্ণিত হয়েছে— হযরত সাদ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা) আয়াতটির পাঠ এভাবে করেছেন ঃ

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ لِأُمٍّ

কোন ব্যক্তি যদি কালালা বা কোন মেয়েলোককে ওয়ারিস বানায়, আর তার মার দিক দিয়ে ভাই ও বোন থাকে .....

এতদসত্ত্বেও এখানে ভাই ও বোন বলতে মায়ের দিক দিয়ে ভাই-বোন বোঝানো হয়েছে, সে দুজন ছাড়া যদি আপন সহোদর ভাই ও বোন কিংবা শুধু পিতার দিকের ভাই ও বোন হয় তবে..... তায়ূস ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, কালালা হচ্ছে সন্তান ছাড়া অন্যরা— মার দিক ভাইরা ওয়ারিস হবে পিতা-মাতার বর্তমান থাকা অবস্থায়। তারা পাবে এক-ষষ্ঠাংশ। এ সেই এক-ষষ্ঠাংশ যা পাওয়া থেকে মা আড়ালাচ্ছন্ন হয়েছে । এ কথাটি বিরল। এ পর্যায়ে আরও যে বর্ণনা এসেছে তার উল্লেখ আমরা করেছি। তা হল, পিতা ও সন্তান ছাড়া যারা ওয়ারিস হয়, তারা। মার দিকের ভাই ও বোনেরা যে এক-তৃতীয়াংশে শরীক হবে এবং তাতে

পুরুষ মেয়েদের থেকে কোন অগ্রাধিকার পাবে না— পরিমাণে বেশি পাবে না, এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই।

দাদার ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে, সে কি 'কালালা' হিসেবে মীরাস পাবে ? অনেকে বলেছেন ঃ দাদা 'কালালা'কে ওয়ারিস বানায় না। অন্যরা বলেছেন, সে নিজেই একজন 'কালালা'। দাদার সঙ্গে ভাই-বোনেরা মীরাস পায়— এ মত যাদের উক্ত মত তাদেরই। উত্তম কথা হল, দাদা 'কালালা'র বাইরে। তার তিনটি কারণ ঃ একটি— বিশেষজ্ঞরা সকলেই একমত হয়ে— কোন মতপার্থক্য না করেই বলেছেন, পুত্রের পুত্র 'কালালা'র বাইরে গণ্য, কেননা মৃতের সাথে তার সম্পর্ক জন্মসূত্রে। এ কারণে দাদার তার বাইরে থাকাই অনিবার্য। কেননা সে মৃতের দাদা, সে দাদা তার জন্মদাতা নয়। অন্য দিক দিয়ে বিবেচনা করলে বোঝা যায়, দাদা-ই যেহেতু বংশের মূল, যেমন পিতা। তাই সে 'কালালা'র বাইরে নয়। অতএব দাদাকে কালালার বাইরেই ধরতে হবে। কেননা 'কালালা' হচ্ছে তা যা বংশের উপর বেষ্টক হয়ে আছে, যার সাথে বংশের মূল সম্পর্কিত নয়। তৃতীয়, আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِامْرَاَةٌ وَّلَهٗ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ -

যদি কোন ব্যক্তি মরে গিয়ে কালালাকে বা কোন মেয়েলোককে উত্তরাধিকারী বানায় এবং তার ভাই কিংবা বোন থাকে ......

এ আয়াত যে দাদাকে 'কালালা'র মধ্যে গণ্য করেনি, সে তার বাইরে, তার বর্তমান থাকা অবস্থায় মায়ের দিকের ভাইরা ওয়ারিস হতে পারে না, যেমন তারা ওয়ারিস হয় না নিজের পুত্র কন্যা থাকলে। এ বিষয়ে তাঁরা কোন মতপার্থ্যকে লিপ্ত নন।

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, দাদা পিতার মতই 'কালালা'র বাইরে গণ্য। এ থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, দাদা ঠিক পিতার পর্যায়ে গণ্য— তাদের বর্তমান থাকা অবস্থায় ভাই ও বোনদের মতের ওয়ারিস না হওয়ার মধ্যে সমান শরীক।

যদি বলা হয়, তুমি পূর্বে যে বলেছ, কন্যা 'কালালা' নয় এবং কন্যা থাকলে মায়ের দিকের ভাই ও বোনেরা ওয়ারিস হয় না, আপন সহোদর ভাই-বোনেরা ওয়ারিস হয়, তুমি যা বলেছ তার দ্বারা এ একথা প্রমাণিত হয় না। দাদাও তেমনি।

জবাবে বলা হবে, আমরা যা বলেছি, আমরা তাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 'ইল্লাত' বা কারণ বানাইনি। তাই তুমি যা বললে তা আমাদের উপর খাটে না। আমরা যা বলেছি তা হল, 'কালালা' নামটি যখন দাদাকে শামিল করে না— যেমন পিতা ও পুত্র, তখন আয়াতের বাহ্যিক অর্থ দাবি করে যে, পিতা ও পুত্র বর্তমান না থাকলেই ভাই ও বোনদের মীরাস হবে। তবে এরূপ অবস্থায়ও তাদেরকে ওয়ারিস বানাবার কোন দলীল থাকলে ভিন্ন কথা হবে। আর কন্যা 'কালালা' না হলেও তার বর্তমান থাকা অবস্থায় পিতার দিকের ভাই-বোনদের মীরাস পাওয়ার দলীল পাওয়া গেছে। এ কারণে আমরা আয়াতের বাহ্যিক তাৎপর্য থেকে আলাদা করেছি। আর তা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে 'কালালা' নাম যাদেরকে শামিল করে তাদের সম্পর্কে আয়াতের বাহ্যিক বা শাব্দিক হুকুম অবশ্যই কার্যকর হবে।

## আল-আওল

জুহরী উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবাতা, ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ ফরায়েযে সর্ব প্রথম 'আওল' করেছেন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)। ফরায়েয যখন তাঁর নিকট পেঁচিয়ে গেল, একাংশ অপর অংশের সাথে সাংঘর্ষিক হল তখন তিনি বললেনঃ আল্লাহ্র শপথ, আমি জানি না— তোমাদের কোন্ লোক সর্বাগ্রে আল্লাহ্র নিকট উপস্থিত হবে, আর কোন্ লোক পরে। তিনি বড় তাক্ওয়া পরহেযগারীর লোক ছিলেন। বললেন, আমার জন্যে অধিক সহজ ও প্রশস্থ জিনিস এই পাচ্ছি যে, আমি তোমাদের মধ্যে ধন-মাল অংশ অংশ করে বন্টন করব এবং ফরায়েযের 'আওল' যা যার মধ্যে দাখিল করে, আমি তার মধ্যে তা দাখিল করে দেব।

আবূ ইসহাক আল-হারিস আলী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ দুই কন্যা, পিতামাতা ও স্ত্রী আছে। তাদের মোট অংশ হল নয়। আল-হিকাম ইবনে উতায়বাতাও তাঁর থেকে এ কথারই বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ও জায়দ ইবনে সাবিতেরও এ মত। এ-ও বর্ণনা করা হয়েছে যে, আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব-ই সর্বপ্রথম হযরত উমরকে 'আওল' সম্পর্কে ইঙ্গিত করেন। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন, ইবনে আব্বাস বলেছেন, ফরায়েযে 'আওল' সর্বপ্রথম চালু করেন হযরত উমর (রা)। আল্লাহ্র শপথ, আল্লাহ যাকে অগ্রবর্তী করেছেন তাকেই যদি অগ্রবর্তী করা হতো, তাহলে ফরায়েযে কখনই 'আওল' আসতে পারত না। তখন তাঁকে বলা হল, আল্লাহ কাকে অগ্রবর্তী করেছেন, কাকে আল্লাহ পশ্চাদবর্তী করেছেন? জবাবে বললেন ঃ প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট অংশই রয়েছে। আল্লাহ্ তাকেই অগ্রবর্তী করেছেন। আর প্রত্যেকটি অংশ যদি তার অংশত্ব থেকে সরে যায়, তাহলে তার জন্যে শুধু তা-ই হয়, যা অবশিষ্ট থাকে। আল্লাহ তাকেই পশ্চাদবর্তী করেছেন। আল্লাহ যে অংশটিকে অগ্রবর্তী করেছেন, তা হল স্বামী স্ত্রী ও মার অংশ। কেননা তারা সব সময়ই নির্দিষ্ট অংশের অধিকারী। আর কন্যা ও বোনরা নির্দিষ্ট অংশ না পেলে তারা আসাবা হয় দুই কন্যা ও কয়েক ভাই থাকলে। তখন তারা পুরুষদের সঙ্গে মিলে অবশিষ্ট যা থাকে, তা-ই পায়। তাই আমরা শুরু করি নির্দিষ্ট অংশধারীদের অংশ দেয়া। তখন অবশিষ্টদের উপর ক্ষতি চাপে। কেননা তারা আসাবা হয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তা-ই পায়।

উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন ঃ আমরা তাঁকে বললাম ঃ এ বিষয়ে আপনি হযরত উমরকে জানান না কেন ? তিনি বললেন ঃ তিনি তো এক ভয়াবহ ব্যক্তি এবং অত্যন্ত পরহেজগার। ইবনে আব্বাস বললেন ঃ আমি যদি এ বিষয়ে তাঁকে বলি, তাহলে তিনি অবশ্যই ফিরে আসবেন— তাঁর বর্তমান মত পরিত্যাগ করবেন। জুহরী বলেছেন ঃ ইবনে আব্বাস যদি নিরপেক্ষ বিচার ও ইনসাফের সম্মুখে না দাঁড়াতেন, ব্যাপারটি হতে দিতেন, তাহলে যা চলছিল, তা-ই চলতে থাকত। তিনি যেহেতু নেককার ব্যক্তি ছিলেন, তাই ইবনে আব্বাসের সাথে মত পার্থক্যে লিপ্ত হন নি।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক, ইবনে আবূ নুজাইহ্, আতা ইবনে আবূ রিবাহ্ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ আমি ইবনে আব্বাসের নিকট শুনেছি, তিনি ফরায়েযের উল্লেখ করেছেন

এবং তাতে 'আওল' করেছেন। পরে বলেছেন ঃ তোমরা কি মনে কর, যে লোক বালুকণা গুণল, সে সংখ্যা সমস্যার সমাধান করল। কারোর ধন-মাল অর্ধেক অর্ধেক ও এক-তৃতীয়াংশ করে ভাগ করল। এখানে অর্ধেক, ওখানে অর্ধেক। তাহলে এক-তৃতীয়াংশ আর থাকল কোথায় ? আতা বললেন ঃ আমি ইবনে আব্বাসকে বললাম ঃ হে আবুল আব্বাস! এটা আপনার জন্যে যথেষ্ট হবে না। ....... আমি যদি মরে যাই কিংবা আপনি মরে যান, আমাদের মীরাস বন্টন হবে জনগণের গৃহীত নীতির ভিত্তিতে— আপনার ও আমার মতের বিরুদ্ধে। তখন তিনি বললেনঃ লোকেরা যদি চায় তাহলে আমার বংশধরদের ও তাদের বংশধরদের, আমাদের মেয়েলোকদের ও তাদের মেয়েলোকদের এবং আমাদের নিজেদেরকে ও তাদের নিজেদেরকে ডাকব এবং তারপর 'মুবাহিলা' করব, আল্লাহ্‌র লা'নত মিথ্যাবাদীদের উপর বর্ষিত হওয়ার দো'আ করব। আল্লাহ মীরাসে শুধু অর্ধেক অর্ধেক ও এক-তৃতীয়াংশই বানান নি।

প্রথমোক্ত কথাটির দলীল হল, আল্লাহ্ স্বামীর জন্যে স্ত্রী রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক নির্দিষ্ট করেছেন। আর আপন সহোদর— বাপ-মা উভয়ের দিক দিয়ে— বোনের জন্যেও অর্ধেক নির্দিষ্ট করেছেন। আর মায়ের দিকের ভাইদের জন্যে এক-তৃতীয়াংশ নির্দিষ্ট করেছেন। এরা একসাথে থাকবে বা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় থাকবে, তার মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। তাই কুরআনের আয়াতের 'নস'কে অবশ্যই কার্যকর করতে হবে প্রতিটি ক্ষেত্রে সাধ্যানুযায়ী, সম্ভাব্যতা সামনে রেখে। তারা যখন ভিন্ন ভিন্নভাবে অবস্থান করবে ও রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে সংকুলান হবে, তখন তা উক্ত নীতি অনুযায়ী বন্টন করে দেয়া হবে। আর যখন এরা সকলে একসাথে থাকবে, তখন আয়াতের হুকুম কার্যকর করা ওয়াজিব হবে তাকে পারস্পরিক কম-বেশি করে। কতকের অংশ কমিয়ে ও কতককে প্রত্যাহার করে কিংবা কতকের অংশ লাঘব করে এবং অন্যদেরকে তাদের পূর্ণ অংশ দিয়ে কাজ সম্পন্ন করা হবে। কতকের ক্ষতি অপর কতকের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে— নির্ধারণে অন্যদের জন্যে সমতা রক্ষা করে। ইবনে আব্বাস আল্লাহ যাকে অগ্রবর্তী করেছেন তাকে অগ্রবর্তী করার এবং যাকে পশ্চাদবর্তী করেছেন তাকে পশ্চাদবর্তী করা পর্যায়ে যা বলেছেন, তার অর্থ হল, তিনি কতককে অগ্রবর্তী ও কতককে পশ্চাদবর্তী করেছেন। আর তাকে আসাবা ধরে অবশিষ্ট যা তাকে দিয়েছেন।

তবে যেসব নির্দিষ্ট অংশ ঘোষিত হয়েছে, সেখানে আসাবা বানাবার প্রশ্ন উঠে না। তাদের মধ্যে থেকে একজন ও অপরজন অপেক্ষা অগ্রবর্তী হওয়ার অধিকারী নয়। লক্ষণীয়, বোন সম্পর্কে কুরআনের আয়াতেই নির্দিষ্ট অংশ ঘোষিত হয়েছে। বলেছে ঃ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ 'এবং তার বোন রয়েছে, তাহলে রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক তার হবে।' স্বামীর অংশও কুরআন দ্বারা নির্দিষ্ট। মা ও মায়ের দিকের ভাইদের জন্যেও কুরআনে নির্দিষ্ট অংশ ঘোষিত হয়েছে। এরূপ অবস্থায় এ লোকদেরকে বোনের উপর অগ্রাধিকার দেয়ার বাধ্যবাধকতা আসবে কোত্থেকে ? এ অবস্থায় আল্লাহ্ তার অংশ নির্ধারণে 'নস' নাযিল করেছেন, যেমন তার সঙ্গীদের অংশ নির্ধারণেও 'নস' নাযিল করেছেন। কিন্তু তা ওয়াজিব নয়, কেননা আল্লাহ্ তার নির্দিষ্ট অংশ অনির্দিষ্ট অবস্থায় নামিয়ে দিয়েছেন, যে-অবস্থায় আল্লাহ তার অংশের জন্যে 'নস' নাযিল করেছেন, সেই অবস্থায়ই তা নামিয়ে দিয়েছেন, এরূপ কথা কুরআনের আয়াতের বিরুদ্ধতায় অত্যন্ত জঘন্য, যে সব আয়াতে মীরাসের অংশসমূহ ঘোষিত হয়েছে। তা জঘন্য

কথা 'মুজারিবা' পদ্ধতিতে অর্ধেক অর্ধেক ও এক-তৃতীয়াংশ প্রতিষ্ঠিত করার কথার তুলনায়। তার নযীর হচ্ছে মীরাসের মৌল নীতিসমূহে।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْ بِهَا اَوْ دَيْنٍ -

যে অসিয়ত মৃত ব্যক্তি করেছে তা এবং ঋণ শোধ হওয়ার পর।

মৃত ব্যক্তি যদি এক হাজার টাকা রেখে যায়, আর তার উপর ঋণ ধার্য থাকে এক হাজার টাকা কারোর পাওনা হিসেবে, আর অপরজনের পাওনা পাঁচশত টাকা এবং আর একজনের পাওনা ধার্য থাকে হাজার টাকা, তাহলে রেখে যাওয়া হাজার টাকা এ পাওনাদারদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হবে প্রত্যেকের পাওনার পরিমাণ অনুরূপ। একথা বলা জায়েয হবে না যে, যেহেতু মোট ঋণ ১০০০ + ৫০০ + ১০০০ = ২,৫০০ টাকা, এক হাজার টাকা থেকে শোধ করা যায় না, এ কারণে তার কিছুই দেয়া হবে না। এমনিভাবে কেউ যদি তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ কারোর নামে অসিয়ত করে, আর তার এক-ষষ্ঠাংশের অসিয়ত করে অপর একজনের নামে, তাহলে তার উত্তরাধিকারীর জন্যে অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশকে ক্ষতিগ্রস্ত করা জায়েয হবে না অসিয়তের পরিমাণ দেয়ার মাধ্যমে। তাই একজনকে দেয়া হবে এক-ষষ্ঠাংশ, আর অপর জনকে দেয়া হবে এক-তৃতীয়াংশ, যদিও এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা অর্ধেক পূরণ করা সম্ভব। অনুরূপভাবে পুত্র একা থাকলে মৃতের সমস্ত সম্পত্তি পাবে। মেয়ে একাকী থাকলে সে অর্ধেক পাবে। যদি এ ছেলে ও মেয়ে দুজনই থাকে, তাহলে পুত্রের সমস্ত প্রাপ্য মীরাস থেকে এবং কন্যার প্রাপ্য অর্ধেক থেকে কমিয়ে দিতে হবে। তখন এ দজুনের মধ্যে সমস্ত সম্পত্তি এক-তৃতীয়াংশ এক-তৃতীয়াংশ করে দেয়া হবে। ফরায়েযে এটাই হচ্ছে 'আওল'-এর নিয়ম— যখন নির্দিষ্ট অংশসমূহ পরস্পরের সাথে সাংঘর্ষিক হয়।

## মীরাসের অংশে শরীকানা

রাসূলে করীম (স)-এর সাহাবীগণ মীরাসের অংশে শরীকানার ব্যাপারে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তা এভাবে যে, একজন মেয়েলোক তার স্বামী, তার মা, তার মায়ের দিক দিয়ে কয়েক ভাই, আর পিতা-মাতা উভয় দিক দিয়ে কয়েক ভাই রেখে মরে গেল। এরূপ অবস্থায় আলী ইবনে আবূ তালিব, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, উবাই ইবনে কাব ও আবূ মূসা আল-আশআরী বলেছেন, আর স্বামী পাবে অর্ধেক, মা এক-ষষ্ঠাংশ এবং মার দিকের ভাইরা পাবে এক-তৃতীয়াংশ। আর আপন সহোদর— মা-বাবা উভয় দিকের ভাই বোনরা কিছুই পাবে না। সুফিয়ান সওরী আমর ইবনে মুররা, আবদুল্লাহ ইবনে সালামাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, মায়ের দিকের ভাইদের মীরাস সম্পর্কে হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমরা যদি একশ জন হতে তাহলে তোমরা কি তাদের অংশ এক তৃতীয়াংশ থেকে বৃদ্ধি করতে ? তারা বলল ঃ না। তিনি বললেন ঃ আমিও তাদের অংশ থেকে কিছুই কমাইনি। মা-বাপ উভয়ের দিকের ভাই-বোনদেরকে এ অংশ নির্ধারণে আসাবা বানিয়েছেন। নির্দিষ্ট অংশসমূহ তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। উমর ইবনে

খাত্তাব, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও জায়দ ইবনে সাবিত বলেছেন, স্বামী পাবে অর্ধেক, মা এক-ষষ্ঠাংশ আর মার দিকের ভাইদের জন্যে এক-তৃতীয়াংশ। পরে বাপ-মা উভয় দিকের ভাইরা মার দিকের ভাইদের সাথে শরীক হবে। ফলে তারা যে এক-তৃতীয়াংশ পাবে তাতে তারা সমান অংশীদার হবে। মামার সামাক ইবনুল ফযল, অহব ইবনে মুকাব্বাহ, আল-হিকাম ইবনে মাসউদ আস-সাকাফী বর্ণনা করে বলেছেন ঃ উমর ইবনুল খাত্তাবকে দেখেছি, তিনি সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশে বাপ-মা— উভয় দিকের ভাইদেরকে মার দিকের ভাইদের সাথে শরীক বানিয়েছেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বলনে ঃ প্রথম বছর আপনি এর বিপরীত ফায়সালা দিয়েছিলেন। বললেন, কিভাবে ফায়সালা দিলাম ? বললে, আপনি মার দিকের ভাইগণকে অংশ দিয়েছিলেন, মা-বাপ উভয় দিকের ভাইদেরকে আপনি কিছুই দেন নি। বললেন, হ্যাঁ, ওটাও আমারই বিচার ছিল। আর এটাও আমারই বিচার। বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমর (রা) তাদেরকে শরীক করতেন না। তাই তখন মা-বাপ উভয় দিকের ভাইরা আপত্তি জানায় ও তার প্রতিবাদ করে। তারা বলে ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! আমাদের পিতা আছে, ওদের তো পিতা নেই! তবে আমাদের মা আছে, যেমন ওদের আছে। আমাদের পিতা থাকা সত্ত্বেও আপনি যদি আমাদেরকে বঞ্চিত করেন, তাহলে আমাদের মার সাথে আমাদের ওয়ারিস বানান, যেমন করে ওদেরকে ওদের মার সাথে উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। আর ধরে নিন যে, আমদের পিতা গাধা ছিল। আপনি কি একই মার গর্ভে আমাদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে ফেলে দিচ্ছেন না ? তখন হযরত উমর (রা) বললেন ঃ হ্যাঁ, তোমরা সত্য বলেছ। তখন তিনি সেই এক-তৃতীয়াংশ মীরাসে তাদেরকে ও মার দিকের ভাইদেরকে এক-তৃতীয়াংশ শরীক বানিয়ে দিলেন।

ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফার ও আল-হাসান ইবনে যিয়াদ হযরত আলী ইবনে আবূ তালিবের মত গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের অনুসারীরাও তাই করেছেন। তাঁরা সকলে এক-তৃতীয়াংশ সকলকে শরীক বানানো পরিহার করেছেন।

প্রথম কথাটির সহীহ্ হওয়ার দলীল হল আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلاَ لَةً اَوِامْرَاَةٌ وَّلَهُ اَخٌ اَوْاُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ -

কোন ব্যক্তি যদি কালালা বা কোন মেয়েলোককে ওয়ারিস বানায়, আর তার ভাই কিংবা বোন থাকে, তাহলে তাদের প্রত্যেকের জন্যে এক-ষষ্ঠাংশ। আর তারা যদি তার থেকে সংখ্যায় বেশী হয়, তাহলে তারা সকলে এক-তৃতীয়াংশেই শরীক হবে।

এ আয়াতে মার দিকের ভাইদের মীরাসী অংশের নস পাওয়া গেল, আর তা হল এক-তৃতীয়াংশ। আর বাপ মা উভয় দিকের ভাইদের সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে আল্লাহ্‌র এ কথাটিতে ঃ

يَسْتَفْتُوْنَكَ - قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ ....... وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالاً وَّنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ -

লোকেরা তোমার নিকট ফতোয়া চায়, বল, আল্লাহ্ তোমাদেরকে 'কালালা' সম্পর্কে ফতোয়া দিচ্ছেন .... যদি তারা পুরুষ-নারী মিলিয়ে ভাই বোন হয়, তাহলে একজন পুরুষের অংশ হবে দুইজন মেয়েলোকের অংশের সমান। (সূরা আন-নিসা ঃ ১৭৬)

এদের জন্যে কোন নির্দিষ্ট অংশ ঘোষণা করা হয়নি, তাদের জন্যে আসাবা হিসেবে মীরাস পাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, 'একজন পুরুষের জন্য দুইজন মেয়েলোকের অংশের সমান।' আর সে যদি স্বামী, মা, মার দিকের ভাই ও বাপ-মা উভয় দিকের ভাই ও বোন কয়েকজন রেখে যায়, তাহলে স্বামী পাবে অর্ধেক, মা এক-ষষ্ঠাংশ আর অবশিষ্ট যে এক-ষষ্ঠাংশ তা বাপ-মা উভয় দিকের ভাই বোনদের মধ্যে 'একজন পুরুষের জন্যে দুইজন মেয়েলোকের অংশ' এই নিয়মে বিভক্ত করা হবে। তারা মার দিকের ভাইর জন্যে নির্দিষ্ট অংশে শরীক হবে না। এভাবে তারা নির্দিষ্ট অংশের অধিকারীদের সঙ্গে থাকবে, তখন তারা আসাবা হয়ে অবশিষ্ট সম্পত্তি পাবে। নির্দিষ্ট অংশ হিসেবে নয়। তাদেরকে মার দিকের ভাইদের জন্যে নির্দিষ্ট অংশ শরীক হবে না। কেননা আয়াতটির বাহ্যিক অর্থই তা করতে নিষেধ করে, কেননা আয়াতটি তাদের জন্যে ঘোষণা করেছে তা যা তারা আসাবা হিসেবে 'একজন পুরুষের জন্যে দুইজন মেয়েলোকের অংশ' নিয়মে পাবে ও গ্রহণ করবে। নির্দিষ্ট অংশ হিসেবে নয়। এমতাবস্থায় তাদেরকে নির্দিষ্ট অংশ দিতে চাইলে আয়াত থেকে প্রমাণিত কথার পরিপন্থী কাজ হবে। নবী করীম (স)-এর কথা থেকেও তা-ই প্রমাণিত হয়। তিনি বলেছেন ঃ

اَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا فَمَا اَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلَاوْلٰى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ -

তোমরা নির্দিষ্ট অংশসমূহ তাঁর প্রাপককে দাও। এই অংশসমূহ যা অবশিষ্ট রাখবে তা আসাবাদের জন্যে।

আসাবাদের জন্যে নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণের পর অবশিষ্ট সম্পত্তি ঘোষণা করা হয়েছে। এক্ষণে যদি কেউ তাদেরকে নির্দিষ্ট অংশ প্রাপকদের সাথে শরীক গণ্য করে— তাদের আসাবা হওয়া সত্ত্বেও-তা হলে সে এ হাদীসেরও বিরুদ্ধতা করে।

যদি বলা হয়, তারা যখন মার বংশধারায় শরীক, তখন বাপের বর্তমানতায় তাদের মাহরূম না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

জবাবে বলা হবে, একথা ভুল। কেননা মেয়েলোক যদি স্বামী, মা, মার দিকের ভাই এবং বাপ-মা উভয় দিকের ভাই-বোনদের রেখে মরে যায়, তাহলে ভাই মা'র ষষ্ঠাংশ পূর্ণ নিয়ে নেবে, আর মা-বাপ উভয় দিকের সহোদর ভাই-বোনরা নিজে অবশিষ্ট এক-ষষ্ঠাংশ পারস্পরিক ভাগ করে। আর সম্ভবত তাদের প্রত্যেকেই এক-দশমাংশের কম পাবে এবং তাদের কারোর পক্ষে একথা বলার সুযোগ হবে না যে, পিতার কারণে তোমরা আমাকে বঞ্চিত করেছ, যদিও আমরা মার সাথে শরীক (অর্থাৎ আমাদের মা এক) বরং মার তুলনায় ভাইর অংশ তাদের প্রত্যেকের তুলনায় অধিক পূর্ণ মাত্রার হবে।

এ কথাটি দুটি তাৎপর্য প্রকাশ করে। একটি— মা'তে শরীক হওয়ার দরুন ইল্লাত (কারণ) ক্ষুণ্ন হবে। আর দ্বিতীয়— তারা কোন নির্দিষ্ট অংশ পায়নি, তারা যা পেয়েছে তা আসাবা

হিসেবে। অপর একটি দৃষ্টান্তে উক্ত কথার অযথার্থতা প্রমাণ করে। যদি মেয়েলোক স্বামী, মা-বাপ উভয় দিকের বোন এবং শুধু পিতার দিকের ভাই ও বোন রেখে যায়, তাহলে স্বামীর জন্যে অর্ধেক এবং মা-বাপ উভয় দিকের বোন পাবে অর্ধেক। আর পিতার দিকের ভাই ও বোন কিছুই পাবে না। কেননা তারা দুজনই আসাবা। অতএব তারা নির্দিষ্ট অংশ প্রাপকদের মধ্যে দাখিল হবে না। আর পিতার দিকের ভাইকে না থাকার মতো বানান নি। ফলে পিতার দিকের বোন তার জন্যে সেই নির্দিষ্ট অংশ পেয়ে যাবে, যা সে ভাই থেকে আলাদা হয়ে একাকী থাকলে নিতে পারত। আর আসাবা হওয়া তাকে সেই এক-ষষ্ঠাংশ থেকে বাইরে নিয়ে এসেছে যা সে পেত। অনুরূপভাবে আসাবা হওয়া মা পিতার দিকের ভাইদেরকে এক-তৃতীয়াংশ প্রাপ্তি থেকে বাইরে এনেছে, যা মার দিকের ভাইরা পেত।

## কন্যার সাথে বোনের মীরাস

এক ব্যক্তি তার এক কন্যা ও মা-বাপ উভয় দিকের এক বোন রেখে মরে গেল। আর থাকল আসাবা একজন এ অবস্থায় কন্যা পাবে তার মোট সম্পত্তির অর্ধেক। আর যা অবশিষ্ট থাকবে তা পাবে বোন। এ মত দিয়েছেন হযরত আলী, উমর, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, জায়দ ইবনে সাবিত ও মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)। এই ব্যাপারে তাঁদের বিপরীত মত কেউ পেশ করেনি, এতে বোনকে সকলেই আসাবা বানিয়েছেন— কন্যাদের সঙ্গে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও ইবনুয যুবায়র (রা) বলেছেন, কন্যা পাবে অর্ধেক, আর যা অবশিষ্ট থাকবে তা আসাবার জন্যে— তার বংশীয় সম্পর্ক যতই দূরের হোক। কন্যার সঙ্গে বোন থাকলে মীরাসে তার কোন অংশ নেই।

ইবনুয যুবায়র সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি তাঁর উক্ত মত অনুযায়ী একটা রায় ও ফায়সালা দেয়ার পর তাঁর মত ত্যাগ করেছেন। এ-ও বর্ণিত হয়েছে যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসকে বলা হয়েছিল, হযরত আলী, আবদুল্লাহ ও জায়দ (রা) কন্যাদের সাথের বোনদেরকে আসাবা গণ্য করতেন এবং এভাবে তাদেরকে অতিরিক্ত মালের উত্তরাধিকারী বানাতেন। তখন তিনি বললেন : তোমরা বেশি জান, না আল্লাহ্ বেশি জানেন ? আল্লাহ তো বলছেন :

إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَّلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ -

কোন ব্যক্তি যদি মরে যায়, যার সন্তান নেই, আছে তার বোন, তখন এই বোনের জন্যে রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক প্রাপ্য হবে। (সূরা নিসা : ১৭৬)

আর তোমরা সন্তানের সঙ্গে থাকলে অর্ধেক দিচ্ছ :

আবূ বকর বলেছেন : প্রথম কথার প্রমাণ হিসেবে আল্লাহ্র এই কথাটি পেশ করা হয়।

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ - وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا -

পুরুষদের জন্যে নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে তা থেকে যা পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়রা রেখে গেছে এবং মেয়েলোকদের জন্যেও নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে তা থেকে যা পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়রা রেখে গেছে, তা কম হোক, কি বেশি— সুনির্দিষ্ট অংশ হিসাবে।

এ আয়াত বাহ্যতই দাবি করে, কন্যার সাথে বোন থাকলে সে মীরাস পাবে। কেননা এ বোনের মৃত ভাই তার নিকটাত্মীয়দের মধ্যের লোক। আর আল্লাহ্ নিশ্চিতভাবেই নিকটাত্মীয়দের মীরাস পুরুষ ও মেয়েলোকদের জন্যে নির্দিষ্ট করেছেন।

এ পর্যায়ে দলীল হিসেবে যে হাদীস পেশ করা হয়, তা আবূ কায়স আল-আওয়াদী হুযয়ল ইবনে শারাহবীল, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স) কন্যা, পুত্রের কন্যা ও পিতামাতা উভয় দিকের সহোদর বোন থাকা অবস্থায় ফায়সালা দিয়েছেন যে, কন্যা অর্ধেক পাবে, পুত্রের কথা এক-ষষ্ঠাংশ পাবে— দুই-তৃতীয়াংশ সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে। আর যা অবশিষ্ট থাকবে তা বোন পাবে। বোনকে নির্দিষ্ট অংশসমূহ দিয়ে দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি দিয়েছেন। কন্যার সঙ্গে তাকে আসাবা বানিয়েছেন।

এ পর্যায়ে দলীল হিসেবে এই যে বলা হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলাই তার জন্যে অর্ধেক দেয়া নির্দিষ্ট করেছেন সন্তান না থাকলে, সন্তানের সঙ্গে থাকলে তার জন্যে অর্ধেক সম্পত্তি নির্দিষ্ট করা জায়েয নয়, এরূপ দলীল এদিক দিয়ে অ-বাধ্যতামূলক যে, আল্লাহ তা'আলা সন্তান না থাকা অবস্থায় তার অংশ নির্দিষ্ট করেছেন, সন্তান থাকা অবস্থায় তার মীরাসকে অস্বীকার করেন নি। আর সন্তান না থাকা অবস্থায় তার জন্যে অর্ধেক নির্দিষ্ট করাকেও অগ্রাহ্য করেন নি, তা তার অধিকার নিঃশেষ হওয়ার কোন প্রমাণ হবে না যখন সেখানে সন্তান থাকবে। কেননা এ অবস্থায় মীরাস না হওয়া কিংবা হওয়ার উল্লেখ করা হয়নি, তা তার দলীলের উপর নির্ভরশীল। তা সত্ত্বেও তার অর্থ হচ্ছে, কোন ব্যক্তি মরে গেলে ও তার সন্তান না থাকলে আল্লাহ্‌র কথার দলীল অনুযায়ী যা আয়াতের ধারাবাহিকতায় রয়েছে ঃ وَهُوَ يَرِثُهَا 'সে তার ওয়ারিস হবে' অর্থাৎ ভাই বোনের মীরাস পাবে। اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ —'যদি তার সন্তান না থাকে'-এর অর্থ সকলের নিকট যদি তার পুরুষ সন্তান না থাকে। কেননা মেয়েলোক যদি মেয়ে সন্তান ও ভাই রেখে যায় তাহলে কন্যা অর্ধেক পাবে, আর ভাই পাবে অবশিষ্ট থাকা সম্পত্তি। এ বিষয়ে সাহাবীদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। এখানে যে সন্তানের উল্লেখ আছে সে-ই আয়াতের শুরুতে উল্লিখিত।

উপরন্তু আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ -

এবং তার বাপ-মা প্রত্যেকের জন্যে এক-ষষ্ঠাংশ রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে যদি তার সন্তান থাকে।

সকলেরই নিকট এর অর্থ ঃ যদি তার পুরুষ সন্তান থাকে। কেননা সে যদি একটি কন্যা ও পিতামাতা রেখে যায়, তাহলে কন্যা পাবে অর্ধেক ও পিতামাতা দুই-এক-ষষ্ঠাংশ করে। আর অবশিষ্ট যা থাকবে তা পিতার জন্যে। ফলে পিতা মৃতের মেয়ে সন্তানের সঙ্গে এক-ষষ্ঠাংশের বেশী গ্রহণ করবে, এ বিষয়েও সাহাবীদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই।

আর আল্লাহ্র কথা ঃ 'মৃতের সন্তান থাকলে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্যে এক-ষষ্ঠাংশ' এতেও পুরুষ সন্তান থাকার কথা-ই বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে যদি সে পিতা ও একটি কন্যা রেখে যায়, তাহলে কন্যা পাবে অর্ধেক, আর পিতাও অর্ধেক পাবে। এ দুইটি ক্ষেত্রে সন্তান থাকা অবস্থায় পিতা এক-ষষ্ঠাংশের বেশি পাবে।

আবূ বকর বলেছেন, কিছু লোক সমগ্র মুসলিম উম্মত থেকে ভিন্নতর মত গ্রহণ করেছেন। তারা এ ধারণা পোষণ করে যে, যদি একটি মেয়ে ও একটি বোন রেখে যায়, তাহলে সমস্ত সম্পত্তিই মেয়ে পেয়ে যাবে। কন্যা ও ভাইও তেমনি। কিন্তু এ মত কুরআনের বাহ্যিক অর্থেরই বিপরীত। গোটা মুসলিম উম্মাহর মতের সাথেও তা সাংঘর্ষিক।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ -

আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের বিষয়ে অসিয়ত করছেন ঃ একজন পুরুষের জন্যে দুইজন মেয়ের অংশের সমান হবে। মেয়েদের সংখ্যা দুইজনের অধিক হলে তারা রেখে যাওয়া সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি একজন মাত্র হয়, তবে সে অর্ধেক পাবে।

এতে কন্যার অংশের প্রমাণ অকাট্যভাবে পাওয়া যাচ্ছে। দুই-তৃতীয়াংশের উপরের অংশের কথাও বলা হয়েছে। যখন সে একাকী হবে, তখন সে অর্ধেক পাবে। যদি তাকে ছাড়া অপর কেউ দুই-তৃতীয়াংশ তাদের সঙ্গে মিলায়, তাহলে তার অধিক দেয়া জায়েয নয়, জায়েয হতে পারে কোন দলীলের ভিত্তিতে।

যদি বলা হয়, যদি অর্ধেক ও দুই-তৃতীয়াংশের উল্লেখ হয়, যার দ্বারা সে দুই-তৃতীয়াংশের উপরে যা তার অস্বীকৃতির কোন প্রমাণ ছাড়াই। তাহলে এক্ষণে অতিরিক্তকে বাহ্যত অস্বীকার করা হয়নি। অতিরিক্ত পাওয়ার অধিকার প্রমাণকারী দলীল প্রতিপক্ষের নিকট দাবি করার প্রয়োজন হতে পারে।

জবাবে বলা যাবে, আল্লাহ্র কথা, 'আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদেরকে অসিয়ত করেছেন; একটি আদেশ, উল্লিখিত অংশগুলো সম্পর্কিত। কেননা অসিয়ত একটি আদেশ, আয়াতে নির্ধারিত প্রত্যেকটি অংশ গণ্য করা ওয়াজিব— যেমন তা আছে, তেমনিভাবে। তার উপর বৃদ্ধি করা কিংবা তা থেকে কামানো নিষিদ্ধ। তাই যার জন্যে যে পরিমাণের উল্লেখ হয়েছে, সেইটা যথাযথ রাখা কর্তব্য। তাতে না বৃদ্ধি করা যাবে, না কম করা যাবে। পূর্বে যা বলা হয়েছে তা বাদে বিশেষভাবে যার উল্লেখ হয়েছে। সম্বোধনের শুরুতে তাকে গণ্য করা সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। এ কারণে দলীল ছাড়া তার উপর বৃদ্ধি করাকে আমরা নিষিদ্ধ করেছি।

আল্লাহ্র কথা ঃ 'পুরুষদের জন্যে নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে'— প্রমাণ করে যে, কন্যাদের সঙ্গে ভাইকেও অংশ দিতে হবে। নবী করীম

(স) থেকে ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীস থেকেও তা-ই প্রমাণিত হয়। হাদীসটি হল ঃ নির্দিষ্ট অংশসমূহ সে সবের প্রাপককে দিয়ে দাও। যা অবশিষ্ট থাকবে তা পুরুষ আসাবাদের প্রাপ্য'। আয়াত ও হাদীসের সামষ্টিক অর্থ হল ঃ কন্যাকে আমরা যদি অর্ধেক সম্পত্তি দেই, তাহলে অবশিষ্ট যা থাকবে তা ভাইকে দেব— এটাই ওয়াজিব। কেননা ভাই পুরুষ আসাবা।

চাচার দুইজন পুত্র, একজন মার দিকের ভাই— এখন মীরাস বণ্টন কিভাবে হবে, সে বিষয়ে, আগেরকালের ফিকাহ্‌বিদগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন; আলী ও জায়দ (রা) বলেছেন, মার দিকের ভাইকে এক-ষষ্ঠাংশ দিতে হবে। আর যা বাকী থাকবে তা দুজনের মধ্যে অর্ধেক-অর্ধেক। বিভিন্ন দেশের ফিকাহ্‌বিদদেরও এ মত। হযরত উমর ও আবদুল্লাহ্ (রা) বলেছেন, মার দিকের ভাই সব মাল-সম্পত্তি পাবে। তারা দুজন এ-ও বলেছেন ঃ যার নির্দিষ্ট অংশ নেই, তার তুলনায় নির্দিষ্ট অংশধারীরা বেশি অধিকার সম্পন্ন। শুরাইহ্ ও আল-হাসান এ মত পোষণ করতেন। মার দিকের দুই ভাই— একজন চাচার পুত্র— এ দুইজন এক-তৃতীয়াংশ পাবে— মার সম্পর্কের কারণে। আর যা অবশিষ্ট থাকবে তা বিশেষভাবে চাচার পুত্র পাবে। এ বিষয়ে ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। চাচার পুত্রকে সমস্ত মীরাসের অধিকারী তাঁরা বানান নি। কেননা এখানে একটি নির্দিষ্ট অংশ আর অপরটি অনির্দিষ্ট। চাচার দুই পুত্র, তাদের একজন মার দিকের ভাই, তার জন্যে নির্দিষ্ট অংশ-ও আসাবা হওয়ার বিশেষত্বের কারণে তাকে মীরাস পাওয়ার অধিক যোগ্য বানানো জায়েয নয়। উমর ও আবদুল্লাহ্ (রা) এ ব্যাপারটিকে তুল্য করেছেন। আপন সহোদর ভাইর সঙ্গে এ হিসেবে যে, সে মীরাস পাওয়ার অধিক অধিকারী! কিন্তু অন্যদের নিকট তা এ ব্যাপারের সাথে তুলনীয় নয় এ কারণে যে, তার বংশীয় সম্পর্ক মাত্র একটি দিক দিয়ে। আর তা হচ্ছে ভাই হওয়া। এ কারণে সে দুজনের মধ্যে তার দিকে অধিক নিকটবর্তীকে তাতে গণ্য করেছেন। সে বাপ-মা— উভয়ের নৈকট্য সেখানে একত্রিত হয়েছে। আর শুধু মার দিকের নৈকট্য দ্বারা মার দিকের ভাইর অংশ পাওয়ার অধিকারী হয় না। বরং তা ভাই হওয়ার ব্যাপারটির উপর অধিক তাগিদ আসে। চাচার দুই পুত্র— তার একজন মার দিকের ভাই— সেরূপ নয়। কেননা তুমি তো মার দিকের ভাই হওয়া দ্বার যা ভাই নয় তাকে তাগিদপূর্ণ করতে চাও। তাহলে ওটা বাদে আর একটি কারণ। কাজেই তার দ্বারা তাকে তাগিদপূর্ণ করা জায়েয নয়।

এ কথা প্রমাণ করে যে, সে চাচার পুত্র— এই হিসেবে তার সম্পর্ক তার অংশকে অগ্রাহ্য বানায় না এ দিক দিয়ে যে সে মার দিকের ভাই। বরং সে ওয়ারিস হবে সে মার দিকের ভাই বলে মার দিকের ভাইর অংশ থেকে। যদিও সে চাচার পুত্র।

বিবেচ্য এই যে, মৃত ব্যক্তি যদি মা-বাপ উভয় দিকের দুই বোনকে রেখে যায়, আর থাকে তার মা ও স্বামী এবং মার দিকের ভাই— যে কিনা চাচার পুত্র। তখন দুই বোন পাবে দুই-তৃতীয়াংশ, স্বামী পাবে অর্ধেক। আর মার দিকের ভাই পাবে এক-ষষ্ঠাংশ। তার অংশ পড়ে যাবে না সে চাচার পুত্র হওয়ার কারণে। যদি স্বামী, মা, মার দিকের বোন এবং মা-বাপ উভয় দিকের কয়েক ভাই রেখে যায়, তাহলে স্বামী অর্ধেক পাবে, মা এক-ষষ্ঠাংশ, মার দিকের বোন পাবে এক-ষষ্ঠাংশ। আর যা অবশিষ্ট থাকবে তা মা-বাপ উভয় দিকের ভাইদের জন্যে। বাবা ও মার দিকের ভাইরা শুধু মার দিকের ভাইদের অংশ থেকে কিছু পাবে না। কেননা তারা মার

বংশ সম্পর্কে মার দিকের ভাইর সাথে শরীক। তারা পাবে শুধু আসাবা হিসেবে। তাদের আসাবা হওয়ায় বাবা ও মার নৈকট্য তাগিদপূর্ণ হবে। অতএব তারা নির্দিষ্ট অংশধারী হওয়ার অধিকারী হবে না। আর মার দিকের বংশ সম্পর্কের কারণে চাচার পুত্রের নৈকট্য তাদেরকে নির্দিষ্ট অংশের ধারক হওয়া থেকে বহিষ্কৃত করবে না। যেখানে তারা মার দিকের ভাইর অংশ পাওয়ার অধিকারী হবে। আসাবা হওয়ার ব্যাপারে তাগিদ হওয়ায় এর কোন প্রভাব পড়বে না। কেননা যদি তা হতো, তাহলে কখনই পাওয়ার অধিকারী হতো না আসাবা হওয়া ছাড়া। যেমন বাবা-মার দিকের ভাইরা আসাবা হওয়া ছাড়া কিছুই নিতে পারে না। মার দিকের তাদের নৈকট্যের কারণেও তারা মার দিকের ভাইদের অংশ নিতে পারবে না।

## মৃত ব্যক্তির ঋণ ও অসিয়ত

আল্লাহ বলেছেন ঃ

بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصٰى بِهَا اَوْدَيْنٍ -

যে অসিয়ত করে তা পূরণ ও ঋণ শোধের পর .....

আল-হারীস আলী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ তোমরা আয়াতে ঋণের আগেই অসিয়তের কথা পড়। অথচ মুহাম্মাদ (স) অসিয়ত পূরণের পূর্বেই ঋণের ব্যাপারটির ফায়সালা করিয়েছেন।

আবূ বকর বলেছেন, এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কোন মত-বৈষম্য নেই। কেননা 'যে অসিয়ত করে তা পূরণ ও ঋণের পর' আল্লাহ্‌র এ কথাটির অর্থ হল, মীরাস বণ্টন করা হবে এ দুটি কাজ সম্পূর্ণ করার পর। এখানে তা সমষ্টিগতভাবে উল্লিখিত হয়েছে, কোন্‌টি আগে কোন্‌টি পরে, তা বলা হয় নি। কেননা যে অসিয়ত করে বা ঋণের পর বাক্যটি মীরাস বণ্টন সংক্রান্ত বাক্যটি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও বিচ্ছিন্ন। এখানে ব্যবহৃত اَوْ (আও) অক্ষরটি নৈতিবাচক হওয়ার পর তা একত্রিকরণ বোঝায়। যেমন এ আয়াতটিতে ঃ

وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْكَفُوْرًا -

এবং তাদের মধ্য থেকে পাপী-গুনাহগার কিংবা বড় শক্ত কাফির— কারোরই আনুগত্য করবে না।

এ আয়াতে اَوْ - واو অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং

حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَا اِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَا اَوِالْحَوَايَا اَوْمَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ -

আমরা সে দুটি জন্তুর চর্বিসমূহ তাদের উপর হারাম করে দিয়েছি। তবে যা তাদের পৃষ্ঠদেশ বহন করে কিংবা আতুড়ি, অথবা যা অস্থিত সাথে মিশ্রিত— তা বাদে........

(সূরা আন'আম ঃ ১৪৬)

এসব আয়াতে او - او অর্থে ব্যবহৃত واو অর্থে ব্যবহৃত مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِىْ بِهَا اَوْدَيْنٍ কথাতে واو - او অর্থে ব্যবহৃত। আর এ অব্যাহৃতি প্রাপ্তির অর্থে যেন বলা হয়েছে ঃ 'তবে যদি সেখানে কোন অসিয়ত বা ঋণ থাকে, তাহলে বর্ণিত মীরাস বন্টনের কাজটা এ দুটি কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরে করতে হবে। আর এ দুটির মধ্যে অসিয়তের কথা ঋণের আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে আগেই অসিয়ত পূরণের কাজ করতে হবে— এমন কথা নেই। কেননা তরতীব বা পরস্পরা অথবা আগে-পরে নির্ধারণ বাধ্যতামূলক করে না। আল্লাহ্ এ গোটা কথাটাই মীরাস বন্টনের পর বলেছেন। আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মীরাসের অংশ পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে কার্যকর হবে ঋণ আদায় করার ও অসিয়ত পূরণের পর। কেউ যদি তার ধন-মালের এক-তৃতীয়াংশের অসিয়ত করে, তাহলে সেই এক-তৃতীয়াংশ দিয়ে দেয়ার পর ওয়ারিসদের মীরাসের অংশ প্রদানের ব্যাপারটি কার্যকর হবে। তাতে স্ত্রী পাবে এক-চতুর্থাংশ কিংবা দুই-তৃতীয়াংশে এক-অষ্টমাংশ। এমনিভাবে মীরাস প্রাপকদের সকলের অংশই দিয়ে দিতে হবে অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ থেকে। যে এক তৃতীয়াংশের উপর অসিয়ত, তা বাদ দিতে হবে। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা ঋণের কথা ও অসিয়তের কথা একত্রিত করে বলে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মীরাস বন্টনটা হবে অসিয়ত পূরণ করার পর। তেমনি তা কার্যকর হবে ঋণ শোধের পর যদিও অসিয়ত ও ঋণ পরস্পর বিপরীত, তবু দুটিই দিয়ে দেয়ার ব্যাপার। কেননা ধন-মাল থেকে যদি কিছু ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তা অসিয়তের অংশ থেকেও যাবে, যেমন যাবে মীরাস বন্টনের অংশ থেকেও। ঋণ সে রকমের নয়। কেননা রেখে যাওয়া সম্পত্তির কোন অংশ যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে অসিয়ত ও মীরাসের ব্যাপারটি অকার্যকর হয়ে গেলেও ঋণ শোধের বাধ্য-বাধকতা যথাযথ থাকবে। যার জন্যে অসিয়ত করা হয়েছে, সে এক দিক দিয়ে ওয়ারিসদের সমান পর্যায়ে গণ্য। অবশ্য অপর একদিক দিয়ে পাওনাদারকেও ওয়ারিসদের কাতারে দাঁড় করানো হয়। তা এভাবে যে, অসিয়ত পূরণের পর মীরাসের অংশ দেয়া হবে, যেমন মীরাসের অংশ হস্তান্তর করা হবে ঋণ শোধের পর। আল্লাহ্ কথা ঃ 'অসিয়ত যা করার হয় এবং 'ঋণের পর-এর অর্থ এ নয় যে, যার নামে অসিয়ত তাকে মীরাসের অংশ দেয়ার আগেই দিয়ে বিদায় করা হবে। বরং তা সকলের সঙ্গে এক সাথে আদায় করা হবে। এদিক দিয়ে যার জন্যে অসিয়ত সে-ও অংশীদার একজন। আর বন্টনের পূর্বে যা ধ্বংস হবে, তা এ সকলের প্রাপ্য থেকেই বাদ পড়বে।

## বৈধ অসিয়তের পরিমাণ

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِىْ بِهَا اَوْدَيْنٍ এতে মনে হয়, অসিয়ত অল্প সম্পদ-সম্পত্তির উপর কি বেশির উপর, তা জায়েয হবে। কেননা কথাটি সাধারণভাবে বলা হয়েছে, কিছু বাদ দিয়ে কিছু সম্পর্কে অসিয়ত করার কথা মূল আয়াতে বলা হয়নি। তবে এ আয়াত ছাড়া অন্য দলীলের ভিত্তিতে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, এখানে সমস্ত সম্পত্তির উপর অসিয়তের কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে তার কতক অংশের উপর অসিয়তের কথা। আর তা হল ঃ 'পুরুষদের জন্যে অংশ রয়েছে তা থেকে যা পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়রা রেখে গেছে। মেয়েদের জন্যও অংশ রয়েছে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়র যা রেখে গেছে তা থেকেও— তা

কম হোক কি বেশি।' এ কথায় অসিয়তের উল্লেখ না করেই মীরাস পাওয়ার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। এক্ষণে ঃ 'যে অসিয়ত করা হয় তা এবং ঋণের পর' কথাটিতে অসিয়ত যদি সমগ্র মালের জায়েয মনে করা হয়, তাহলে 'পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়ের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে পুরুষ ও নারীর মীরাস' হওয়ার কথা মনসূখ ও বাতিল মনে করতে হয়। কেননা সব মালের উপর অসিয়ত জায়েয হলে মীরাস বন্টনের হুকুম কেমন করে পালন করা হবে ? তাই এ কথাটি যখন মীরাস বন্টনের বাধ্যবাধকতা প্রমাণ করে, তাহলে তা অসিয়তের হুকুমের সাথে মিলিয়ে পালন করতে হবে। আর ফল এই দাঁড়াবে যে, অসিয়ত কতক মালের উপরই করা ও ধরা যাবে, যেন অবশিষ্ট মাল ওয়ারিসরা পেতে পারে। এভাবেই দুটো আয়াত অনুযায়ী একসাতে আমল করা সম্ভব হতে পারে।

আল্লাহ্র এ কথাটিও সেই কথাই প্রমাণ করে ঃ

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْتَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوْا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا -

যেসব লোক পেছনে দুর্বল-অক্ষম বাচ্চা-কাচ্চা রেখে যেতে ভয় পায়, তাদের উচিত এ পরিস্থিতিতে ভয় করা। অতএব আল্লাহ্কে ভয় করা উচিত, উচিত যথাযথ কথা বলা।

অর্থাৎ পূর্বে অসিয়তের আয়াতের যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে সেই আলোকে মৃতের সব মালের উপর অসিয়ত করতে নিষেধ করা সম্পর্কে যথাযথ কথা বলা ও আল্লাহ্কে ভয় করা উচিত। তাহলে মৃতের মালের একটি অংশের উপর অসিয়ত করা জায়েয প্রমাণিত হচ্ছে। কেননা আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ এ দুটি অর্থই জ্ঞাপন করে।

এ পর্যায়ে নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, মুসলিম উম্মত তা গ্রহণ করেছেন এবং সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের উপর অসিয়ত করা জায়েয হওয়া পর্যায়ে এ সব হাদীসকে দলীল হিসেবে ব্যবহার করেছে। তার একটি হাদীস মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, উসমান ইবনে আবূ শায়বা, ইবনে আবূ খালফ, সুফিয়ান জুহরী, আমের ইবনে সাদ— তাঁর পিতা সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেছেন ঃ আমার পিতা ভয়ানকভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ইবনে আবূ খালফ বলেছেন— মক্কায় এমন একটি রোগে যা থেকে তিনি নিরাময় হয়েছিলন। তাঁকে দেখার জন্যে রাসূলে করীম (স) উপস্থিত হলেন। তখন আমার পিতা বললেন ঃ হে রাসূলুল্লাহ, আমার নিকট বিপুল ধন-সম্পদ রয়েছে, কিন্তু আমার একটি কন্যা ছাড়া ওয়ারিস হওয়ার আর কেউ নেই। এরূপ অবস্থায় আমি কি তিন ভাগের দুই ভাগ সাদ্কা করে দেব? রাসূল (স) বললেন, না। বললেন, তাহলে অর্ধেক করি? বললেন না। বললেন, তা হলে এক-তৃতীয়াংশ করি? বললেন হ্যাঁ, এক-তৃতীয়াংশ। আর এক-তৃতীয়াংশই তো অনেক । আর তুমি তোমার ওয়ারিসদিগকে ধনশালী রেখে যাবে, এটা তারা অনেক ভালো এ অবস্থা থেকে যে, তুমি তাদেরকে অভাগ্রস্ত রেখে যাবে, তারা লোকদের জড়িয়ে ধরে ভিক্ষা চাইবে। জেনে রাখ, তুমি যে ব্যয়টাই আল্লাহ্র

ওয়াস্তে করবে, তার সওয়াব অবশ্যই তুমি পাবে। এমন কি, যে-খাবার মুষ্ঠি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও তার-ও।

আমি বললাম ঃ হে রাসূলুল্লাহ! আমার হিজরতের পর কি আপনি এখানে থেকে যাবেন? বললেন ঃ তুমি যদি আমার চলে যাওয়ার পরও এখানে থেকে যাও এবং এমন কাজ কর যার দ্বারা তুমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পেতে চাইবে, তাহলে তোমার মর্যাদার উচ্চতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। সম্ভবত তুমি পেছনে থাকবে, যেন তোমার দ্বারা জনগণ উপকৃত হয়, আর অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর তিনি দো'আ করলেন ঃ হে আমাদের আল্লাহ্! আমার সাহাবীগণের হিজরতকে কার্যকর কর, তাদেরকে পেছনে ফিরিয়ে দিও না। কিন্তু দুঃখের বিষয় সায়াদ ইবনে খাওলা মক্কায়ই ইন্তেকাল করেছেন বলে নবী করীম (স) দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

আবূ বকর বলেছেন ঃ এই বর্ণনাটি থেকে শরীয়াতের কয়েক প্রকারের বিধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে— এক-তৃতীয়াংশের অধিক ধন-মালের অসিয়ত জায়েয নয়। দ্বিতীয় এক-তৃতীয়াংশের কমের অসিয়ত হওয়া ভালো, পছন্দনীয়— মুস্তাহাব। এই কারণে কোন কোন ফিকাহবিদ বলেছেন, এক-তৃতীয়াংশের কমে অসিয়ত হওয়া মুস্তাহাব। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন ঃ এক-তৃতীয়াংশই অনেক। তৃতীয়, মোট মালের পরিমাণ যদি কম ও সামান্য হয় এবং তার ওয়ারিসরা হয় দরিদ্র, তাহলে কোন মালের অসিয়ত না করাই উত্তম। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন ঃ তোমার ওয়ারিসদিগকে সচ্ছল রেখে যাওয়া তাদেরকে দরিদ্র ভিক্ষুক বানিয়ে রেখে যাওয়া অপেক্ষা অনেক কল্যাণময়। আর এতে এ কথারও দলীল আছে যে, সমস্ত মালের অসিয়ত করাও জায়েয, যদি মালের মালিকের কোন ওয়ারিস না থাকে। কেননা জানানো হয়েছে যে, এক-তৃতীয়াংশের অধিকের অসিয়ত করা নিষিদ্ধ ওয়ারিসদের কারণে। তা থেকে বোঝা যায় যে, রোগাক্রান্ত অবস্থায় দান-সাদকা করা অসিয়ত, যা এক-তৃতীয়াংশের অধিক জায়েয নয়। কেনন হযরত সাদ (রা) বলেছিলেন ঃ আমি কি আমার সমস্ত ধন-মাল সাদ্‌কা করব? তিনি বললেন— না। শেষ পর্যন্ত তাঁকে এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত এনে দিলেন।

জরীর আতা ইবনুস সায়ের, আবূ আবদুর রহমান আস্-সুলামী সাদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রোগাক্রান্ত ছিলাম, আমাকে দেখার জন্যে রাসূলের করীম (স) এলেন। বললেন ঃ তুমি কি অসিয়ত করেছ? বললাম, হ্যাঁ। বললেন, কতটা? বললাম— আমার সব ধন-মাল আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গিত। বললেন ঃ তা হলে তোমার সন্তানের জন্যে কি রেখেছ? বললেন, ওরা তো সকলে ধনী লোক। বললেন, এক-দশমাংশের অসিয়ত কর। আমি হার কমাতে চেষ্টা করতে থাকলাম। তিনিও আমাকে কম করতে সাহায্য করলেন। শেষ পর্যন্ত বললেন ঃ এক-তৃতীয়াংশের অসিয়ত কর, এক-তৃতীয়াংশ তো অনেক।

আবূ আবদুর রহমান বলেছেন, এরপর থেকেই আমরা এক-তৃতীয়াংশের কমের অসিয়ত করাকে মুস্তাহাব মনে করতে থাকলাম। কেননা নবী করীম (স) এক-তৃতীয়াংশকে অনেক বলেছেন। উক্ত হাদীসে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি আমার সব ধন-মালের অসিয়ত করেছি। রোগাক্রান্ত অবস্থায় সাদকা করার যে কথা প্রথমোক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, তা এ বর্ণনার বিরোধী নয়। কেননা হতে পারে, তাঁকে এক-তৃতীয়াংশের অধিকের উপর অসিয়ত করতে নিষেধ করলে তিনি মনে করেছিলেন যে, রোগাক্রান্ত অবস্থায় সাদ্‌কা করা সম্ভবত

জায়েয হবে। তখন তিনি এই বিষয়ে রাসূলে করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি জানালেন যে, এক-তৃতীয়াংশের কমে অসিয়ত ও দানের ব্যাপার অভিন্ন। এর দৃষ্টান্ত ইমরান ইবনে হুসায়ন বর্ণিত হাদীস। এক ব্যক্তি তার মৃত্যুকালে তার ছয়জন ক্রীতদাস মুক্ত করে দিল। এতে এ কথাও আছে যে, নিজের পরিজনের জন্যে ব্যয় করলেও সওয়াব পাওয়া যায়। তাতে প্রমাণিত হয় যে, কেউ যদি তার স্ত্রীকে কিছু 'হেবা' করে, তাহলে তা ফিরিয়ে নেয়া জায়েয নয়। কেননা তা-ও দান। তার দরুন আল্লাহ সওয়াব দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। এ পর্যায়ের আর একটি হাদীস নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عَطِيَّةً فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ -

কোন লোক যদি তার স্ত্রীকে কোন কিছু দেয়, তাহলে তা-ও তার সাদ্‌কা হিসেবেই গণ্য হবে।

হযরত সাদের কথা ঃ আপনি কি আমার হিজরতের পরে এখানে থাকবেন ? এ থেকে বোঝা গেছে যে, তিনি মক্কায়ই মৃত্যুবরণ করবেন। অথচ মক্কার এই ঘর থেকেই তিনি হিজরত করে মদীনায় গিয়েছিলেন। নবী করীম (স) যাত্রার পর তিন দিনের অধিক এখানে অবস্থান করতে নিষেধ করেছিলেন। তখন নবী করীম (স) তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি পরেও এখানে থাকবেন, যেন তাঁর দ্বারা জনগণের উপকার সাধিত হয় এবং অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাস্তবে তা-ই ঘটেছিল। তিনি নবী করীম (স)-এর পরও মক্কায় থাকলেন। তাঁর হাতে বহু অনারব অঞ্চল বিজিত হয়েছিল। কায়সার— পারস্য সম্রাটের রাজত্বও তাঁরই নিকট পরাজিত ও অধিকৃত হয়। এসব ছিল গায়বী ইলমের ব্যাপার, যা আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না।

আবদুল বাকি ইবনে কানে আবূ আবদুল্লাহ উবায়দুল্লাহ ইবনে হাতিম-আল আজলী আবদুল 'আলা ইবনে ওয়াসিল— ইসমাঈল ইবনে সবীহ মুবারক ইবনে হাসান, নাফে ইবনে উমর (রা) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স) আল্লাহ্‌র কথার বর্ণনাকারী হিসেবে বলেছেন ঃ

يَا ابْنَ آدَمَ اثْنَتَانِ لَيْسَتْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا: جَعَلْتُ لَكَ نَصِيبًا فِيْ مَالِكَ حِيْنَ أَخَذْتُ بِكَظْمِكَ لأُطَهِّرَكَ وَأُزَكِّيكَ، وَصَلاَةُ عِبَادِيْ عَلَيْكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِكَ -

হে আদম পুত্র! দুটি জিনিস, তার একটি তোমার জন্যে নেই। আমি তোমার জন্যে তোমার ধন-মালের একটা অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছি যখন তুমি তোমার ক্রোধ দমনের সাহায্যে তোমার উচ্চ পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতার জন্যে গ্রহণ করবে এবং আমার বান্দাগণের তোমার জন্যে দো'আ তোমার মৃত্যু ঘটার পর।

এ হাদীসেও বলা হয়েছে, মৃত্যুকালে একজনের জন্যে তার কতক মাল, সমস্ত মাল নয়। আবদুল বাকী মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ ইবনে শায়বা, মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ, ইবনে তিতাহ—

হযরত উসমান সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, উসমান বলেছেন, আমি তাল্‌হা ইবনে আমরকে বলতে শুনেছি, বলেছেন, আমাদের নিকট আতা আবূ হুরায়রা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ أَعْطٰيكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ فِىْ اٰخِرِ أَعْمَارِكُمْ زِيَادَةً فِىْ أَعْمَالِكُمْ -

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের ধন-মালের এক-তৃতীয়াংশ তোমাদের জীবনের শেষভাগে তোমাদের আমল বৃদ্ধির দরুন।

আবূ বকর বলেছেন ঃ এসব হাদীস অসিয়তকে এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে সীমিত রাখার বাধ্যবাধকতা আরোপ করছে। আমাদের মতে সন্দেহমুক্ত জ্ঞানদানকারী মুতাওয়াতির বর্ণনা। সমস্ত মানুষই তা অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছে। কুরআনে যে অসিয়তের কথা উল্লিখিত হয়েছে, সে বিষয়ে আল্লাহ্‌র মর্জী ও বক্তব্যকে প্রকাশ করছে। নিঃসন্দেহে নির্ধারিত হয়েছে যে, অসিয়ত এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِىْ بِهَا أَوْدَيْنٍ -

প্রমাণ করে যে, যার কারুর নিকট কোন ঋণ নেই এবং কোন কিছুর অসিয়তও করেনি, তার সমস্ত রেখে যাওয়া মাল তার ওয়ারিসরা পাবে। যদি তার হজ্জ না-করা হয়ে থাকে, যাকাত না-দেয়া থেকে, তার মৃত্যুর পর হজ্জ করা বা যাকাত দিয়ে দেয়া ওয়াজিব নয়। তবে মৃত ব্যক্তি সে জন্যে অসিয়ত করে গেলে ভিন্ন কথা। কাফফারা ও মানতসমূহ সম্পর্কেও এ কথা।

যদি বলা হয়, না-করা হজ্জ-ও একটা ঋণ। আর ধন-মালের নৈকট্য হওয়ায় আর যা যা ব্যক্তির জন্যে বাধ্যতামূলক হয়, তাও তেমনি। কেননা নবী করীম (স) খাস অসিয়তের তার পিতার না করা হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসার জবাবে বলেছিলেন ঃ

أَرَأَيْتَ لَوْكَانَ عَلٰى أَبِيْكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيْهِ أَكَانَ يُجْزِىْ قَالَتْ نَعَمْ -

তুমি কি ভেবে দেখেছ, তোমার পিতার যদি ঋণ থাকত, তাহলে তুমি তা অবশ্যই শোধ করতে। তাতে কি ঋণ শোধ হয়ে যেত না? বললেন, হ্যাঁ।

এরপর নবী করীম (স) বললেন ঃ

فَدَيْنُ اللّٰهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ -

তাহলে আল্লাহ্‌র নিকট ঋণটা তো আরও অধিক হক্‌দার পূরণ হওয়ার জন্যে।

জবাবে বলা যাবে, নবী করীম (স) না-করা হজ্জকে আল্লাহ্‌র ঋণ— আল্লাহ্‌র পাওনা বলেছেন। এই নামে তা বিশেষভাবে চিহ্নিত করেই অভিহিত করেছেন। কাজেই তাকে সাধারণ অর্থে গ্রহণ করা যায় না। আর 'করা অসিয়তও ঋণের পর' আল্লাহ্‌র এই কথাটির দাবি হল, যাকে ঋণ বলেছেন, তা সাধারণ ঋণ হিসেবেই গণ্য। কাজেই এর অধীন তা আসতে পারে না যা শর্তাধীন ছাড়া অন্যভাবে নির্ধারিত হয়নি। কেননা অভিধানে ও শরীয়াতে নামগুলো সাধারণ,

নিঃশর্ত যেমন আছে, তেমনি শর্তযুক্তও আছে। কাজেই যা সাধারণ ও নিঃশর্ত তাতে গণ্য হবে শুধু তা যার নাম সাধারণ ও নিঃশর্তভাবে প্রবর্তিত হয়। তাই আয়াত আল্লাহ্‌র হক হিসাবে কোন ঋণ যখন শামিল করা হয় না যেমন বলেছি, 'যে অসিয়ত না করা হয় এবং ঋণের পর'— আল্লাহ্‌র এ কথার দাবি হল যদি অসিয়ত না করে থাকে এবং তার উপর কারোর পাওনার ঋণ না থাকে, তাহলে উত্তরাধিকারীরা তার পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তি পেয়ে যাবে। হযরত সা'দ সংক্রান্ত হাদীসও তাই প্রমাণ করে। কেননা তিনি বলেছিলেন ঃ 'আমি কি আমার মাল সাদ্‌কা করে দেব ? আর অপর বর্ণনার ভাষা হল 'আমি আমার মালের অসিয়ত করব।' জবাবে রাসূল (স) বলেছেন ঃ 'মাত্র এক-তৃতীয়াংশ এবং তা-ই অনেক।' হজ্জ ও যাকাত সম্পর্কে তিনি অব্যাহতির কোন কথা বলেন নি। এই ধরনের আল্লাহ্‌র আরও যে হক-হুকুমের কথা আছে, তার মধ্য থেকেও কোন বিষয়ের উল্লেখ করেন নি। এবং এক-তৃতীয়াংশ ছাড়া দান বা সাদকা করতে নিষেধ করেছেন।

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, সে যদি এসব হক-হুকুকের অসিয়ত করে, তাহলে তা সেই এক-তৃতীয়াংশ থেকে যাবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীসও সে কথাই প্রমাণ করে। তা হল ঃ তোমাদের বাড়তি আমল হিসেবে তোমাদের জীবনের শেষভাগে তোমাদের ধন-মালের এক-তৃতীয়াংশ তোমাদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীসও তাই। নবী করীম (স) আল্লাহ্‌র কথা ব্যক্ত স্বরূপ বলেছেন ঃ আমি তোমার মালে তোমার জন্যে একটা অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, যখন তুমি তোমার ক্রোধ দমন করে তা গ্রহণ করবে।

এসব হাদীসই প্রমাণ করে যে, মৃতের যাকাত, মানত ও অন্যান্য সব নৈকট্য লাভের কাজ যদি বাধ্যতামূলক হয়ই, তাহলে তা এক-তৃতীয়াংশ থেকেই হতে হবে। তার বাইরের মাল থেকে তা করা জায়েয হবে না।

## উত্তরাধিকারীর জন্যে অসিয়ত

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, আবদুল ওহাব ইবনে নজদাতা ইবনে আয়ায, শারাহবীল ইবনে মুসলিম সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি বলেছেন ঃ আমি আবূ আমামাতাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ

اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطٰى كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهٗ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ -

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক হক্‌ধারীকে তার হক্ দেয়ার নীতি বলে দিয়েছেন। অতএব ওয়ারিসের জন্যে কোন অসিয়ত করা যাবে না।

আমর ইবনে খারেজাতা নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ اِلَّا اَنْ تُجِيْزَهَا الْوَرَثَةُ -

কোন ওয়ারিসের জন্যে অসিয়ত করা যাবে না। তবে সেই ওয়ারিসরাই যদি তার অনুমতি দেয়, তাহলে ভিন্ন কথা।

সীরাত গ্রন্থ প্রণেতাগণ নবী করীম (স) প্রদত্ত বিদায় হজ্জের ভাষণ উদ্ধৃত করেছেন। আর তাতেই বলা হয়েছে ঃ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ —যে কোন উত্তরাধিকারীর জন্যে অসিয়ত করা যাবে না। বোঝা গেল, কোনরূপ বেশী করা ছাড়াই মাত্র এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তির মধ্যে অসিয়ত সীমাবদ্ধ রাখা সংক্রান্ত হাদীস যেমন ব্যাপক পরিচিতি সহকারে উদ্ধৃত হয়েছে, ওয়ারিসের জন্যে অসিয়ত নিষেধ সংক্রান্ত হাদীসমূহও ব্যাপক প্রসিদ্ধি সহকারে বর্ণিত ও উদ্ধৃত হয়েছে এবং ফিকাহবিদগণ সে সব হাদীস আন্তরিকভাবে গ্রহণ করার মাধ্যমে সে সব হাদীসের ব্যাপক ব্যবহারও করেছেন। তাই আমাদের নিকট তা মুতাওয়াতির পর্যায়ের নিশ্চিত নিঃসন্দেহ জ্ঞানদানকারী হাদীস হিসেবে গণ্য এবং সর্বপ্রকারের মুবাহ সন্দেহ বিদূরণকারীরূপে গৃহীত। আমর ইবনে খারেজাতা বর্ণিত হাদীসে নবী করীম (স)-এর কথা ঃ 'তবে ওয়ারিসগণই যদি তা করতে অনুমতি দেয় তাহলে তা ভিন্ন কথা' থেকে প্রমাণিত হয় যে, অন্যান্য উত্তরাধিকারী যদি কোন বিশেষ উত্তরাধিকারীর পক্ষে কিছু অসিয়ত (প্রাপ্ত মীরাসের অতিরিক্ত দেয়ার) অনুমতি দেয়, তাহলে তা করা অবশ্যই জায়েয হবে। সে অসিয়ত অসিয়তকারীর পক্ষ থেকে হবে, উত্তরাধিকারীদের দেয়া 'হেবা' হবে না। কেননা উত্তরাধিকারীদের পক্ষ থেকে 'হেবা' যার উত্তরাধিকার, তার অনুমতিতে হয় না।

আবদুল বাকী আবদুল্লাহ ইবনে আবদুস সামাদ— মুহাম্মাদ ইবনে আমা ইউনুস ইবনে রাশেদ আতা আল-খুরাসানী ইকরামা ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لاَوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ اِلاَّ اَنْ تَشَاءَ الْوَرَثَةُ -

উত্তরাধিকারীর জন্যে কোন অসিয়ত করা যাবে না। তবে অন্যান্য উত্তরাধিকারী চাইলে ভিন্ন কথা।

আবূ বকর বলেছেন, যে লোক এক-তৃতীয়াংশের অধিক সম্পত্তির অসিয়ত করেছে এবং অন্যান্য উত্তরাধিকারী তার জীবদ্দশায়ই তাকে তা করার অনুমতি দিয়ে থাকে কিংবা কতক উত্তরাধিকারীর জন্যে অসিয়ত করেছে এবং অবশিষ্টরা তার জীবদ্দশায়ই তার অনুমতি দিয়ে দেয়, তাহলে তা জায়েয হবে কিনা, সে বিষয়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, জুফার, আল-হাসান ইবনে যিয়াদ, আল-হাসান ইবনে সালিহ উবায়দুল্লাহ ইবনুল হাসান ও ইমাম শাফেয়ী মত দিয়েছেন যে, তা জায়েয হবে না মৃত্যুর পরও তার অনুমতি না দিলে। ইবনে আবূ লায়লা ও উসমানুলবত্তী বলেছেন, অসিয়তকারীর জীবদ্দশায় ওরূপ করার অনুমতি দিয়ে থাকলে তার মৃত্যুর পর তা থেকে ফিরে যাওয়ার কোন অধিকার তাদের নেই। তা অবশ্যই কার্যকর হবে এবং অসিয়ত সম্পূর্ণ জায়েয হবে। ইবনুল কাসেম ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, যখন উত্তরাধিকারীদের নিকট অসিয়তের অনুমতি চাওয়া হবে, তখন প্রত্যেক উত্তরাধিকারীই মৃত থেকে সম্পর্কহীন হয়ে যায়। যেমন সন্তান যে তার পিতা, ভাই ও চাচার পুত্র যারা তার পরিবারভুক্ত নয়— তাদের ফিরে যাওয়ার কোন অধিকার নেই। তবে তার স্ত্রী ও কন্যা যারা বিচ্ছিন্ন হয়নি এবং আর যারা তার পরিবারের লোক— যদিও তারা পরে পূর্ণ বয়স্কতা পেয়েছে— তাদের অবশ্য পূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার অধিকার রয়েছে। চাচা, চাচার পুত্র এবং যারা ভয় পেয়েছে এ জন্যে যে, তারা তার অধিকারের

অনুমতি না দিলে তাদের ক্ষতি হবে, খরচাদি বন্ধ করে দেয়া হবে যদি সহীহ্ হয়, তবে তারা পূর্ব সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে পারে। এ বিষয়ে লায়স-এর মত ইমাম মালিকের অনুরূপ।

আবূ বকর বলেছেন, মূল মালিকের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীরা যদি অসিয়তের অনুমতি দেয়, তাহলে সকল ফিকাহবিদই তা জায়েয মনে করেন।

আবূ বকর বলেছেন ঃ সম্পত্তি মালিকের জীবদ্দশায় যখন তারা তা ভেঙ্গে দেয় নি, তখন পরে তাদের অনুমতিও কোন কাজ করবে না। কেননা পারে তারা কিছু করার অধিকারী নয়।

## উত্তরাধিকারী না থাকায় সব মালের অসিয়ত

আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ মুহাম্মাদ, জুফার, আল-হাসান ইবনে যিয়াদ বলেছেন, সম্পত্তি মালিকের কোন উত্তরাধিকারী না থাকা তার সমস্ত সম্পত্তির অসিয়ত করলে তা জায়েয হবে। শরীফ ইবনে আবদুল্লাহ এমত দিয়েছেন। আর মালিক, আওজায়ী ও হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন— তখন-ও এক-তৃতীয়াংশের অধিকের উপর তার অসিয়ত করা জায়েয হবে না।

আবূ বকর বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ -

আর তোমাদের কসম তাদের চুক্তিবদ্ধ করেছে, তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দাও।

(সূরা আন-নিসা ঃ ৩৩)

এর তাৎপর্য আমরা ব্যাখ্যা করেছি। তারা কিরা-কসমের ভিত্তিতে পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হয়ে মীরাস দেয়া-নেয়া করত। সে কসম এভাবে হতো যে, একজন কিরা করত এই বলে যে, আমি মরে গেলে আমার মীরাস থেকে তুমি অংশ পাবে। এই অংশ নির্ধারণ করা হতো কখনও এক-তৃতীয়াংশ থেকে, কখনও তার বেশি থেকে। ইসলামের শুরু যামানায়ও এরূপ মিরাস দানের নিয়ম চালু ও কার্যকর ছিল। উপরোদ্ধৃত আয়াত ঃ 'তোমাদের কসম যাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে তাদের অংশ তাদেরকে দিয়ে দাও' দ্বারাই সে অংশ দান ফরয করেছিল। তারপর আয়াত ঃ পুরুষদের জন্যে অংশ রয়েছে পিতামাতা নিকটাত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে— নাযিল হয়। আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে অসিয়ত করেছেন ঃ 'প্রত্যেক পুরুষের জন্যে দুইজন মেয়েলোকের অংশের সমান' এবং যবীল আরহাম আল্লাহ্‌র কিতাবে পরস্পর উত্তম' আয়াতদ্বয়ও নাযিল হয়। এর ফলে যবীল আরহাম কসমভিত্তিক অংশ-প্রাপকদের তুলনায় মীরাস পাওয়ার অধিক অধিকারী সাব্যস্ত হয়। তবে তাতে কসমভিত্তিক মীরাস পাওনাদারদের মীরাস বাতিল হয়ে যায় না। বরং যবীল আরহামকে তাদের তুলনায় উত্তম গণ্য করা হতে থাকে। যেমন পুত্র ভাইর অপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী। তাই যখন বংশভিত্তিক ওয়ারিস বর্তমান না থাকলে সম্পত্তির মালিক তার সম্পত্তি তার আসল অবস্থার উপর নিয়ে আসতে পারে কসমভিত্তিক মিরাস দেয়ার নীতির উপর। উপরন্তু আল্লাহ তা'আলা যেহেতু মীরাস বণ্টনের কাজটি রেখেছেন অসিয়ত পূরণের পর— আল্লাহ্‌র নিজের কথা ঃ 'যে অসিয়ত করা হয় ঋণ-এর পর' আর বলেছেন ঃ 'পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে পুরুষ এবং

নারীর অংশ রয়েছে।' আমরা ইতিপূর্বে বলেছি ঃ 'যে অসিয়ত করা হয় তা এবং ঋণ এর পর'-এর বাহ্যিক অর্থ দাবি করে যে, সমস্ত মাল-সম্পদের অসিয়ত জায়েয হবে। তবে ইজমা ও সুন্নাহ্ যদি নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল পাওয়া যায় এবং এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে অসিয়তকে সীমাবদ্ধ রাখা বাধ্যতামূলক প্রমাণিত হয়, তাহলে তা ভিন্ন কথা। তাই মালের কিছু অংশ অসিয়ত বিশেষীকরণ যদি বাধ্যতামূলক না হয়, তাহলে অসিয়ত শব্দটি বাহ্য সমস্ত মালের উপর প্রয়োগ হওয়া ওয়াজিব হতে পারে। হযরত সা'দ বর্ণিত রাসূল (স)-এর কথা ঃ 'তুমি তোমার ওয়ারিসদেরকে ধনী বানিয়ে রেখে যাবে তা তাদেরকে দরিদ্র বা ভিক্ষা করতে বাধ্য অবস্থায় রেখে যাওয়ার তুলনায় অনেক উত্তম' ও তা-ই প্রমাণ করে। এ হাদীসেও জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এক-তৃতীয়াংশের অধিকের অসিয়ত নিষিদ্ধ। কেননা তা ওয়ারিসদের প্রাপ্য। শবী প্রমুখ বর্ণিত হাদীসও তাই প্রমাণ করে। আমর ইবনে শারাহ্বীল বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ বলেছেন ঃ 'যে আরব গোত্রের একজন লোক মরে যাবে এবং গোত্রের কোন লোক হামাদন থেকে তার ওয়ারিস হবে না, তা হতে পারে না। অবস্থা যখন এই তখন সম্পত্তির মালিক তার সম্পত্তি যেখানে রেখে যেতে বা দিয়ে যেতে চায়, তা সে রাখতে বা দিতে পারে। সাহাবাদের কেউ এর বিপরীত মত দিয়েছেন বলে জানা যায় নি।

উপরন্তু যার কোন ওয়ারিস নেই, সে যখন মরে যাবে, তখন সাধারণ মুসলমানরাই তো তা পাওয়ার অধিকারী হবে, হয় মীরাস হিসেবে, নতুবা এ হিসেবে যে, সে মালের মালিক কেউ নেই। তখন মুসলমানদের ইমাম— নেতা বা রাষ্ট্র প্রধান— তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। যদি কোন ব্যক্তি তার পুত্র, তার পিতা বা দূরবর্তী ব্যক্তি নিকটবর্তী ব্যক্তির সঙ্গে মিলে তা পাওয়ার হক্দার হওয়া জায়েয হয়, তাহলে আমরা জানব যে, সে মীরাস হিসেবে তা পাওয়ার অধিকারী নয়। কেননা পিতা ও দাদা পিতৃত্বের দিকদিয়ে একই মিরাস পাওয়ার অধিকারে একত্রিত হতে পারে না। উপরন্তু যদি মীরাস হয়ই, তাহলে তাদের কোন একজনের মাহরুম হওয়া জায়েয হবে না। কেননা মীরাসের পথ হচ্ছে, তা কতক ওয়ারিস পাবে আর কতক পাবে না তা হতে পারে না। শুধু তা-ই নয়, যদি মীরাস হয়-ই তাহলে ব্যক্তি যদি হয় হামাদানের, আর তার মীরাস পেতে পারে এমন কোন ব্যক্তিকেই পাওয়া না যায় তার নিজের গোত্র থেকে,— কেননা তারাই অন্যদের অপেক্ষা তার অতি নিকটবর্তী— তবে তা-ও হতে পারে। আর সে অবস্থা হলে মুসলমানদের বায়তুলমাল-ই তা পাওয়ার অধিকার হবে। মুসলমানদের ইমাম লোকদের মধ্যে যেমন-ইচ্ছা বিলি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তার উপযুক্ত লোকদেরকে কাজে লাগাবে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, সে সম্পত্তি মুসলমানরা মীরাস হিসাবে নেবে না। আর তারা যখন মীরাস হিসাবে নেবে না, তখন মুসলমানদের ইমাম তার বিবেচনা অনুযায়ী তার ব্যবস্থা করবে। কেননা তখন সে-ই হবে তার জন্যে দায়িত্বশীল। দায়িত্বশীল-ই ব্যবস্থাপনা গ্রহণের বেশি অধিকারী। অন্যদিক দিয়ে, মুসলমানরা যখন তা মীরাস হিসেবে নিল না, তখন যে এক-তৃতীয়াংশের উপর মৃতের অসিয়ত চলে, তাতেও কোন মীরাস থাকবে না। তার-ও ব্যবস্থাপনা ইমাম-ই করবে, যেমন অন্যান্য ধন-মালের। তারও যখন কেউ ওয়ারিস নেই, তখন তার ব্যবস্থাপনাও যে চাইবে করবে। একটি হাদীস থেকেও তা প্রমাণিত।

আবদুল বাকী ইবনে কানে' বশর ইবনে মূসা, আল-হুমায়দী, সুফিয়ান, আইয়ুব-নাফে ইবনে উমর সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন :

مَاحَقُّ امْرِءٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَالٌ يُوْصِىْ فِيْهِ تَمُرُّ عَلَيْهِ اللَّيْلَتَانِ اِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوْبَةٌ -

যে মুসলিম ব্যক্তিরই ধন-মাল আছে, যাতে সে অসিয়ত করতে পারে, নিজের নিকট অসিয়ত লিখিত না রেখে দুটি রাত কাটানোরও তার অধিকার নেই।

এতে কতক মাল ও সম্পূর্ণ মালের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি অসিয়ত করার প্রয়োজনের ব্যাপারে। কাজেই বাহ্যত এ-ই মনে হয় যে, সমস্ত মালের উপর অসিয়ত করা জায়েয। যদিও তার কতকাংশের মধ্যে অসিয়ত সীমিত রাখাই কর্তব্য ছিল দলীলের দিক দিয়ে, যদি তার ওয়ারিস থাকত। ওয়ারিস যখন কেউ নেই, তখন তার বাহ্যিক প্রকাশ এই যে, মালিকের সমস্ত মালের অসিয়ত করে যাওয়া সম্পূর্ণ জায়েয।

## অসিয়তে ক্ষতি করা

আল্লাহ্‌ বলেছেন :

غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ -

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন অসিয়ত হবে, যা কোন দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

আবূ বকর বলেছেন, অসিয়তে কয়েক প্রকারে ক্ষতি সাধিত হতে পারে। যেমন অসিয়ত লিপির মধ্যে তার সম্পূর্ণ মালে কিংবা তার অংশে অপরিচিত সম্পর্কহীন ব্যক্তিকে শামিল করা কিংবা নিজের উপর কোন ঋণ মিথ্যা-মিথ্যা চাপিয়ে নেয়া, যার কোন বস্তুবতা নেই— শুধু ওয়ারিস ও অন্যান্য পাওনাদারকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে। অসিয়তনামায় এমন স্বীকারোক্তি করানো যে, তার উপর অন্যের প্রাপ্য ঋণ সে তার রোগাক্রান্ত অবস্থায় আদায় করেছে— যেন তার ওয়ারিসদের উপর বোঝা না চাপে। এই স্বীকারোক্তিও লেখা হতে পারে যে, সে তার রোগাক্রান্ত কালে অন্যের নিকট তার অমুক মালটা বিক্রয় করে দিয়েছে অথবা বাকী মূল্যে ক্রয় করা দ্রব্যের মূল্য সে আদায় করে দিয়েছে। এ-ও একটি যে, তার মাল সে অমুককে 'হেবা' করে দিয়েছে রোগে পড়ে। অথবা এক-তৃতীয়াংশ মালের অধিক সে তার রোগের মধ্যেই দান করে দিয়েছে তার ওয়ারিসদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে। অসিয়তে বাড়াবাড়ি করাও জায়েয পরিমাণের অধিকের অসিয়ত করা— এক-তৃতীয়াংশের অধিক— এই সবই হল অসিয়তে ক্ষতিকরণ। নবী করীম (স)-এর হযরত সাদ (রা)-কে বলা কথার মধ্যে একথার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন : এক-তৃতীয়াংশ এবং এক-তৃতীয়াংশই অধিক। তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদের ধনী বানিয়ে রেখে যাওয়া দরিদ্র ভিক্ষুক রেখে যাওয়া অপেক্ষা অনেক কল্যাণময়।

আবদুল বাকী ইবনে নাফে আহমাদ ইবনুল হাসান, আল মিসরী, আবদুস সামাদ ইবনে হাসান, সুফিয়ান সওরী, দাউদ ইবনে আবূ হিন্দু, ইকরামা— ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ 'অসিয়তে ক্ষতি সাধন করা একটি কবীরা গুনাহ।' তার পর তিনি আয়াত পাঠ করলেন ঃ

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ......

এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমাসমূহ। যে লোক আল্লাহ্ ও তার রাসূলের আনুগত্য করবে....

অসিয়ত পর্যায়ে বলেছেন ঃ

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ -

যে লোক আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য অনুসরণ করবে ...... এটাও অসিয়ত পর্যয়ের কথা।

আবদুল বাকী, আল-কাসেম ইবনে যাকারিয়া ও মুহাম্মাদ ইবনুল লায়স, হুমায়দ ইবনে জনন্জু ইয়াতা, আবদুল্লাহ ইবনে ইউসূফ, উমর ইবনুল মুগীরতা, দাউদ ইবনে আবূ হিন্দ, ইকরামাতা ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস বলেছেন— রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْاِضْرَارُ فِى الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ -

অসিয়তে ক্ষতি সাধন কবীরা গুনাহ পর্যায়ে অপরাধ।

আবদুল বাকী, তাহির ইবনে আবদুর রহমান, ইবনে ইসহাক আল-কাযী, ইয়াহইয়া, ইবনে মুঈন, আবদুর রায্‌যাক, মামার আশআস, শহর ইবনে হাওশব, আবূ হুরায়রাতা (রা) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ سَبْعِيْنَ سَنَةً فَاِذَا اَوْصَى حَافَ فِىْ وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ سَبْعِيْنَ سَنَةً فَيَعْدِلُ فِىْ وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ -

এক ব্যক্তি জান্নাতী হওয়ার উপযোগী আমল সত্তর বছর পর্যন্ত করে। কিন্তু শেষ জীবনে যখন সে তার অসিয়তে সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন সে তার অত্যন্ত খারাপ আমল দ্বারা জীবন শেষ করে। ফলে সে জাহান্নামে চলে যায়। আর এক ব্যক্তি জাহান্নামে যাওয়ার যোগ্য আমল করে সত্তর বছর পর্যন্ত; জীবনের শেষ ভাগে সে তার অসিয়তে ন্যায়পরতা রক্ষা করে। ফলে সে সর্বোত্তম কাজ দ্বারা জীবন শেষ করে এবং পরিণামে সে জান্নাতে চালে যায়।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্‌র কিতাবে এই হাদীসের সত্যতা স্বীকার করা হয়েছে; যেমন ইবনে আব্বাস (রা) আল্লাহ্‌র এই কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

এগুলো আল্লাহ্ ঘোষিত সীমাসমূহ। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ করে ....

এবং যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে ..... এই নাফরমানী অসিয়তের ক্ষেত্রে .....

## বংশীয় সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও মীরাস থেকে বঞ্চিত হওয়া

আবূ বকর বলেছেন— আল্লাহ্র কথা ঃ

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ -

আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদেরকে অসিয়ত করছেন ......'

কথা এবং এর সঙ্গে যোগ করে উল্লিখিত কতক লোকের মধ্যে মীরাস বন্টন ও কতক লোককে বাদ দেয়ার কথা— এ বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। তবে এই মীরাস প্রাপক হিসেবে যাদের বাদ দেয়া হয়েছে, তার কতক সর্বসম্মত এবং কতকের সম্পর্কে ভিন্ন মত রয়েছে। যাদের সম্পর্কে পূর্ণ ঐকমত্য আছে, তার মধ্যে একটি, কাফির মুসলিম ব্যক্তির মীরাস পাবে না, আর ক্রীতদাস মীরাস পায় না, ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারী ওয়ারিস হয় না। সূরা আল-বাকারা'র আলোচনায় সর্বসম্মতভাবে যারা মীরাস পায় ও যাদের মীরাস পাওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন মত আছে, এই পর্যায়ে বিশ্লেষণ পেশ করা হয়েছে।

মুসলিম ব্যক্তি কাফির ব্যক্তির মীরাস এবং মুরতাদ মীরাস পাবে কিনা— এ বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। মুসলিম ব্যক্তির কাফির ব্যক্তির মীরাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম সম্পূর্ণ একমত হয়ে বলেছেন ঃ মুসলিম-কাফিরের মধ্যে মীরাস পাওয়া-দেওয়া চলতে পারে না। সর্বসাধারণ তাবেয়ীন ও বিভিন্ন দেশের অঞ্চলের ফিকাহবিদগণও এই মতই প্রকাশ করেছেন। শুবা আমর ইবনে আবূ হুকাইম ইবনে বাবাহ[১] —ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়ামার— আবুল আস্ওয়াদ আদ-দুয়ালী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মুয়ায ইবনে জাবাল ইয়ামনে অবস্থান করছিলেন। এই সময় একজন ইয়াহুদী ব্যক্তির মৃত্যু হয় এবং সে তার এক মুসলিম ভাই রেখে যায়। এ ব্যক্তি মীরাস পাবে কিনা, এ বিষয়ে তাঁর নিকট মামলা দায়ের হয়। তখন তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ اَلْاِسْلَامُ يَزِيْدُ وَلَا يَنْقُصُ 'ইসলাম বৃদ্ধিশীল, হ্রাস প্রাপ্তি নয়।

ইবনে শিহাব দাউদ ইবনে হিন্দ্ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, মস্রূক বলেছেন ঃ

مَا اُحْدِثَ فِى الْاِسْلَامِ قَضِيَّةٌ اَعْجَبُ مِنْ قَضِيَّةٍ قَضَاهَا مُعَاوِيَةُ -

মুয়াবিয়া একটি মামলার বিচার করেছিলেন, তার মত আশ্চর্যজনক মামলা ইসলামে আর কখনও সংঘটিত হয়নি।

১. ইবনে বাবাহ, তার নাম আবদুল্লাহ এবং তার পিতার নাম বাবাহ। 'খুলাসাতু তাহযীবেল চোমাল' গ্রন্থে এরূপ বলা হয়েছে।

তখন ইয়ামনে মুসলিম ব্যক্তি ইয়াহূদী ও খ্রীস্টানদের থেকে মীরাস নিত। কিন্তু ইয়াহূদী খ্রীস্টানরা মুসলিমের কাছ থেকে মীরাস পেত না। তখন সিরিয়াবাসীরা এই মামলার বিচার করে।

দাউদ বলেছেন, উমর ইবনে আবদুল আজীজ যখন অগ্রসর হয়ে এলেন, তখন তিনি তাদেরকে প্রথম নীতির দিকে ফিরিয়ে নিলেন।

হুশাইম মুজালিদ শবী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মুয়াবিয়া (রা) যিয়াদের নিকট লিখলেন মুসলিমের কাফির ব্যক্তির নিকট থেকে মীরাস নেয়ার ব্যাপার। যিয়াদ এই বিষয়ে শুরাইহ্-এর নিকট জানতে চাইলেন। তিনি তা করার আদেশ করলেন। কিন্তু শুরাইহ্ এর পূর্বে মুসলিম ব্যক্তিকে কাফিরের মীরাস পাওয়ার অধিকার দেন নি। এই আদেশ যখন যিয়াদ মুয়াবিয়া (রা)-কে জানালেন, তিনি এই কথার ভিত্তিতে মামলার রায় দিলেন। শুরাইহ্ যখন এই ফায়সালা দিয়েছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন ঃ

هٰذَا قَضَاءُ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ -

এটা আমীরুল মুমিনিনেরই সিদ্ধান্ত।

জুহরী, আলী ইবনুল হুসায়ন, আমর ইবনে উসমান, উসামাতা ইবনে জায়দ সূত্রে বর্ণনা করেছেন— রাসূলে করীম (রা) বলেছেন ঃ

لَا يَتَوَارِثُ اَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتّٰى -

দুই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসীরা পরস্পর মীরাস দেয়া-নেয়া করতে পারে না।

অপর একটি বর্ণনার ভাষায় হল ঃ

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ -

মুসলমান কাফিরের মীরাস পাবে না এবং কাফিরও মুসলমানের মীরাস পাবে না।

আমর ইবনে শুয়ায়ব তাঁর পিতা— তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ দুই ভিন্ন ধর্মের লোকেরা পরস্পর মীরাস পাবে না।

এই সব হাদীস কাফিরের মীরাস মুসলিম ব্যক্তির পাওয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করছে এবং মুসলিমের মীরাসও কাফির পেতে পারে না বলছে। নবী করীম (স) থেকে এর বিপরীত কোন কথা বর্ণিত হয়নি। অতএব তা-ই প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত কাফির-মুসলিমের পারস্পরিক মীরাস পাওয়া-দেয়া সম্পর্কে। হযরত মুয়ায সংক্রান্ত হাদীস এ পর্যায়ে গণ্য নয়। ইসলাম বা ঈমান বাড়ে, কমে না— এটা একটা ব্যাখ্যা। আর ব্যাখ্যায় বলা কথা নস্-এর বিপরীত কিছু প্রমাণ করতে পারে না। এ একটা তওকীফ— আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ঠেকিয়ে দেয়া ব্যাপার। তাই এতে নড়চড় হতে পারে না। ব্যাখ্যায় বলা কথাকেও নস দ্বারা প্রমাণিত কথার ভিত্তিতেই গ্রহণ করা যেতে পারে। সঙ্গতিসম্পন্ন হলে তা গৃহীত হবে, বিপরীত হলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।

আর নবী করীম (স)-এর কথা الْإِيْمَانُ يَزِيْدُ وَلَا يَنْقُصُ —'ঈমান বৃদ্ধি পায়, হ্রাস পায় না।' সম্ভবত একথার দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, যে লোক ইসলাম গ্রহণ করল, সে তার ইসলামের জন্যে বিপরীত সব কিছুই ত্যাগ করে, ইসলামের পথেই অগ্রসর হয়ে যায়। আর যে লোক ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেল, তাকে সে দিকেই চালিয়ে দেয়া হবে। এ যখন সম্ভব, তখন হযরত মুয়ায (রা)-এর ব্যাখ্যাও সম্ভাব্যতার মধ্যে। তা হযরত উসামা (রা) বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতেই ধারণ করতে হবে অর্থাৎ পারস্পরিক এই মীরাস দেয়া-পাওয়া নিষিদ্ধ। কেননা নস্ কোন ব্যাখ্যা বা শুধু সম্ভাব্যতার দ্বারা রদ্ করা জায়েয নয়। তা ছাড়া একটা সম্ভাব্যতা কখনও অকাট্য দলীল হতে পারে না। কেননা তা কখনই সন্দেহমুক্ত হয় না। তা প্রমাণিত হওয়ার জন্যে তার ছাড়া অন্য দলীলের মুখাপেক্ষী। অতএব তাকে দলীল হিসেবে পেশ করা যাবে না। মসরুকের কথা— "মুয়াবিয়ার বিচার করা মামলার চেয়ে আশ্চর্যজনক মামলা ইসলামে কখনই ঘটে না" কাফিরের মীরাস মুসলমানের পাওয়া সংক্রান্ত এই মতটিরই বাতুলতা প্রমাণ করে। কেননা বর্ণনায়ই বলা হয়েছে যে, এটা একটা অভিনব ও বিস্ময়কর রায় ছিল। এই বর্ণনাটিই আবশ্যিক করে দেয় যে, মুয়াবিয়ার বিচারের পূর্বে মুসলমান কাফিরের মীরাস পেত না।

মুয়াবিয়ারও তার বিপরীত কোন রায় দেয়ার অধিকার থাকতে পারে না। বরং এটা একটা বাতিল কথা। দাউদ ইবনে আবূ হিন্দ-এর এ কথা ঃ উমর উবনে আবদুল আজীজ খলীফা হয়ে প্রথম ব্যবস্থা-ই পুনরায় কার্যকর করেন।

## মুরতাদ হওয়া ব্যক্তির মীরাস

যে ব্যক্তি মুসলিম থাকা অবস্থায় ও মুরতাদ হওয়ার পূর্বে ধন-সম্পদ উপার্জন করেছে, তার মীরাস সম্পর্কে আগের দিনের ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। এই তিন পর্যায়ের— হযরত আলী, আবদুল্লাহ, জায়দ ইবনে সাবিত, হাসানুল বসরী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, ইবরাহীম নখয়ী, জাবির, জায়দ, উমর ইবনে আবদুল আজীজ, হাম্মাদ ইবনুল হিকাম এবং আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফার ইবনে শাবরামাতা, সওরী, আওজায়ী ও শুরাইক বলেছেন— তার ওয়ারিস হওয়া যাবে এবং মুসলমানরাই তার ওয়ারিস হবে, যখন সে মরে যাবে বা মুরতাদ হওয়ার দরুন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

রবীআতা ইবনে আবদুল আজীজ, ইবনে আবূ লায়লা, মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন— তার মীরাস বায়তুলমালে জমা হবে। কাতাদাতা ও সাঈদ ইবনে আবূ আরুবাতা বলেছেন, তার যদি নতুন গ্রহণ করা ধর্মমতের কোন উত্তরাধিকারী থাকে, তবে তার মীরাস সে পাবে, তার মুসলিম ওয়ারিস থাকলে তারা পাবে না। কাতাদাতা, উমর ইবনে আবদুল আজীজ থেকে এ মত বর্ণনা করেছেন। উমর ইবনে আবদুল আজীজের সহীহ্ মত হল, তার মীরাস তারা মুসলিম ওয়ারিসরাই পাবে।

আবূ বকর বলেছেন, 'আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদেরকে অসিয়ত করেছেন' আল্লাহ্র এই কথার বাহ্যিক দাবি হল— মুসলিমরা মুরতাদের মীরাস পাবে। কেননা মৃত ব্যক্তি মুসলিম না মুরতাদ— এর মধ্যে আয়াতে কোন পার্থক্য করা হয়নি।

যদি বলা হয়, উসামা ইবনে জায়দ (রা) বর্ণিত হাদীস 'মুসলিম কাফিরের মীরাস পাবে না' আয়াতের সাধারণ তাৎপর্যকে বিশিষ্ট করেছে, যেমন বিশিষ্ট করেছে মুসলিমের মীরাস কাফিরের পাওয়ার ব্যাপারে। এ হাদীসটি খবরে ওয়াহিদ হলেও জনতা তা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছে এবং মুসলমানের মীরাস কাফিরের জন্যে নিষিদ্ধকরণে তা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে তা 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ে হয়ে গেছে। তাছাড়া মীরাসের আয়াত সর্বসম্মতভাবে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আর 'খবরে ওয়াহিদ' এই ধরনের আয়াতকে বিশেষীকরণেই ব্যবহৃত।

জবাবে বলা যাবে, উসামা বর্ণিত হাদীসের কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ দুই ভিন্ন ভিন্ন মিল্লাতের লোকদের মধ্যে মীরাস দেয়া-পাওয়া হবে না। মুসলিম কাফিরের মীরাস পাবে না। জানা গেল দুই ভিন্ন ভিন্ন মিল্লাতের লোকদের মধ্যে পারস্পরিক মীরাস দেয়া-পাওয়া পরিত্যক্ত। কিন্তু মুরতাদ হওয়া কোন স্থায়ী মিল্লাত গ্রহণ নয়। কেননা সে যদি খ্রীস্টান বা ইয়াহূদী ধর্মে দীক্ষিত হয়ে থাকে, তাহলে তা তার উপর অ-স্থিতিশীল। কাজেই তাকে ভিন্ন মিল্লাতের বলে চিহ্নিত করা যায় না, যে মিল্লাতে সে এখন গেছে। লক্ষণীয়, যদি সে কোন আসমানী কিতাবের মিল্লাতেও চলে যায়, তাহলে তার যবেহ করা জন্তু খাওয়া যাবে না, মেয়ে হলে তাকে বিয়ে করা যাবে না। তাতে প্রমাণিত হয় যে, মুরতাদ হওয়াটা কোন ভিন্নতর মিল্লাত গ্রহণ হয় না। অথচ উসামা বর্ণিত হাদীস দুই মিল্লাতের লোকদের পারস্পরিক মীরাস দেয়া-পাওয়া নিষিদ্ধকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এর ব্যখ্যাকারী একটি হাদীসে এই কথার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। হাদীসটি হুশাইম কর্তৃক জুহরী থেকে বর্ণিত। বলেছেন, আলী ইবনুল হুসায়ন আমর ইবনে উসমান, উসামা ইবনে জায়দ সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ দুই ভিন্ন ভিন্ন মিল্লাতের লোকদের মধ্যে মীরাস দেয়া-পাওয়া হবে না। মুসলমান কাফিরের মীরাস পাবে না, কাফির মুসলমানের মীরাস পাবে না।

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, নবী করীম (স)-এর লক্ষ্যই হল দুই মিল্লাতের লোকদের মধ্যে পারস্পরিক মীরাস দেয়া-পাওয়া নিষিদ্ধ করা। ইমাম আবূ হানীফার আসল মত হল— মুরতাদ ব্যক্তির সম্পত্তির মালিকানা মুরতাদ হওয়ার দরুন নিঃশেষ হয়ে গেছে। পরে সে নিহত হোক বা মরে যাক, তার সে মালিকানা উত্তরাধিকারীর দিকেই চলে যাবে। এই কারণেই মুরতাদ হওয়ার পূর্বে মুসলিম অবস্থায় অর্জিত ধন-সম্পদের উপর কর্তৃত্বই ছিন্ন হয়ে যাবে। এ-ই যখন তাঁর আসল মত, তখন তিনি মুসলিমকে কাফিরের ওয়ারিস বানাতে পারেন না। কেননা মুরতাদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলিম থাকার শেষ মুহূর্তে তার মালিকানা খতম হয়ে গেছে। এক্ষণে একজন মুসলিম থেকেই অপর এক মুসলিম মীরাস গ্রহণ করছে।

যদি বলা হয়, তার অর্থ কি এই যে, সে জীবিত থাকতেই লোকেরা তার মীরাস পেয়ে গেছে ? জবাবে বলা যাবে, জীবিতাবস্থায় মীরাস বন্টন নিষিদ্ধ নয়। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ -

এবং তাদের জমিন, ঘর-বাড়ি, ধন-মালের উত্তরাধিকারী তোমাদেরকে বানিয়েছেন।
(সূরা আহযাব ঃ ২৭)

এ আয়াতে যাদেরকে উত্তরাধিকারী বানাবার কথা বলা হয়েছে, তারা তো জীবিতই ছিল। তা হলে জীবিতাবস্থায় সম্পত্তির মালিক কেন ওয়ারিস বানাতে পারবে না? তা ছাড়া উত্তরাধিকারীদের নিকটে ধন-মালের মীরাস হস্তান্তরিত করা হয় মালিকের মৃত্যুর পর। তাতে জীবিত ব্যক্তির মীরাস বণ্টনের প্রশ্ন উঠে না। এ পর্যায়ে প্রশ্নকারীকে বলা যেতে পারে— তুমি যখন তার মাল বায়তুলমালে পৌঁছে দেবে, তখন কার্যত তো মুসলিম জনসমষ্টিকে ওয়ারিস বানালে। অথচ সে কাফির, সে জীবিত আছে, আর এ সময়ই তার মীরাস হস্তান্তরিত হয়ে গেল, যদিও সে মুরতাদ হয়ে দারুল ইসলাম ত্যাগ করে দারুল হরবে চলে গেছে।

উপরন্তু মুসলমানরা তার ধন-মাল পাওয়ার অধিকারী হয় ইসলামের কারণে। ওয়ারিসরা যে যেমন নিকটাত্মীয়, তেমনি মুসলিম, তাহলে তারা তার মাল পাওয়ার অধিক মাত্রার অধিকারী হবে দুটি কারণ তাদের মধ্যে একত্রিত হওয়ার দরুন। আর মুসলিম জনগণ দুটি কারণের একটির দিক দিয়ে হকদার, অন্যটির দিক দিয়ে নয়। কিন্তু ওয়ারিসদের ক্ষেত্রে দুটি কারণ এক সাথে উপস্থিত। তা হল— মুসলিম হওয়া ও নিকটাত্মীয় হওয়া— বংশীয় নৈকট্য। মুসলমানদের মধ্যে যারাই মরে যায়, তাদের মতোই অবস্থা। মুসলিম জনগণ যদি কেবল মাত্র ইসলামের কারণে তার মাল পাওয়ার অধিকারী হতে পারে, তাহলে যারা মুসলিম হওয়ার পর বংশীয় সম্পর্কের দিক দিয়েও নিকটবর্তী, তারা আরও অধিক যোগ্যতার সাথে তা পাওয়ার অধিকারী হবে— অন্ততঃ তাদের তুলনায়, যারা বংশের দিক দিয়ে নিকটাত্মীয় নয়, যদিও তারা মুসলিম।

যদি কেউ বলে, এই ইল্লাত'টা যিম্মীর মাল পাওয়ার অধিকারী বানাতে পারে, কিন্তু তা বানানো হয় না কেন? তাকে বলা যাবে— না, তা কর্তব্য নয়। কেননা যিম্মীর মাল তার মৃত্যুর পর মুসলিম হওয়ার দরুন প্রাপ্য হতে পারে না। কেননা তার উত্তরাধিকারীরাও যিম্মী, তারা মুসলমানের তুলনায় তার মাল পাওয়ার বেশি অধিকারী। এ বিষয়ে সকল ফিকহবিদই একমত। সর্ব দেশের ফিক্‌হবিদগণ এ বিষয়েও একমত যে, মুরতাদের মাল ইসলামের কারণে পাওয়ার অধিকার আছে। কেউ বলতে পারে, মুসলিম সমষ্টি তা পাওয়ার অধিকারী। আর অন্যরা বলেছেন, তার মুসলিম ওয়ারিসরা তা পাবে। তাই ইসলামের দরুন যখন তার মাল পাওয়ার অধিকারী হতে পারে, তখন মুসলিম মৃত ব্যক্তির মাল পাওয়ারও অধিকারী হতে পারে— তাদের যারা ইসলাম ও নিকটাত্মীয়তার দিক দিয়ে মুসলিম সমষ্টির তুলনায় অধিক নিকটবর্তী।

যদি বলা হয়, যিম্মী মরে গেলেও মাল-সম্পদ রেখে গেলে তার নিজের ধর্মের কোন ওয়ারিস তার না থাকলে মুসলিম নিকটাত্মীয় থাকলে তার মাল-ও মুসলিম সমষ্টির জন্যে হওয়া উচিত। তার নিকটাত্মীয় মুসলিমদের বেশি অধিকারী না হওয়াই উচিত ইসলাম ও বংশীয় আত্মীয়তার এই দুটি কারণ থাকা সত্ত্বেও।

জবাবে তাকে বলা যাবে, ইসলামের দিক দিয়ে যিম্মীর মাল পাওয়ার অধিকার হতে পারে না। তার প্রমাণ এই যে, সেই যিম্মীদের মধ্য থেকেই যদি তার ওয়ারিস থাকে, তাহলে মুসলমানরা তা পাওয়ার অধিকারী হবে না। আর ইসলামের কারণে যিম্মীর মাল পাওয়ার অধিকারী হতে পারে না। তাই তার যিম্মী উত্তরাধিকারীরা মুসলমানদের অপেক্ষা বেশি অধিকারী হবে না, বরং তারা অধিক অধিকারী হবে মুসলমানদের মীরাসের মতই। বোঝা

গেল, যিম্মীর মাল যদি বায়তুলমালে জমা করা হয় তার কেউ ওয়ারিস নেই বলে, তাহলে মুসলমানরা ইসলামের কারণেও তা পেতে পারে না। তখন তা এমন মাল গণ্য হবে, যার কেউ মালিক নেই। তখন তা মুসলমানদের ইমাম পেয়ে যাবে দারুল ইসলামে। তখন তা যেন পড়ে পাওয়া মাললুকতা, যার প্রাপক কে তা জানা নেই। তখন তা আল্লাহ্‌র নৈকট্যমূলক কার্যাদিতে ব্যয়িত হবে।

যদি বলা হয়, ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেছেন, মুরতাদ ব্যক্তি মুরতাদ হওয়ার পর যা কিছু উপার্জন করেছে তা 'ফাই' হিসেবে বায়তুলমালে জমা হবে। এর ফলে মীরাসের 'ইল্লাতটাই চূর্ণ হয়ে যায় এবং মূল বিষয়টি বিরোধী মতের পক্ষে চলে যায়।

জবাবে বলা যাবে— না, তা বাধ্যতামূলক নয়। তাতে বিপরীত মতের সমর্থনে কোন দলীলই পাওয়া যাবে না। তা এ কারণে যে, মুরতাদ হয়ে যাওয়ার পর সে যা উপার্জন করেছে, তা একজন যুধ্যমান ব্যক্তির মালের মতই। সে তার সঠিক-সহীহ্ মালিক নয়। তার মৃত্যুর পর বা আগেই আমরা যখন তা বায়তুলমালে দাখিল করে দেব, তখন সে মাল গনীমতের পর্যায়ে পড়ে যাবে। যুধ্যমান ব্যক্তিগণের মাল এমনিই হয়ে থাকে, যখন মুসলমানরা বিজয় লাভ করে। আর যা গনীমত হিসেবে নিয়ে নেয়া হবে, বায়তুলমাল তা ইসলামের কারণে পাওয়ার অধিকারী হয় না। কেননা গনীমতের মাল পাওয়ার অধিকার ইসলামের কারণে হয় না। এর প্রমাণ এই যে, যিম্মী যখন যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছে, তখনই সে তার ধন-মাল গনীমত হওয়ার জন্যে উৎসর্গিত হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, যুধ্যমান ব্যক্তি ও মুরতাদ ব্যক্তি— যা মুরতাদ অবস্থায় উপার্জন করেছে, গনীমতের মধ্যে গণ্য বটে, কিন্তু তা ইসলামের কারণে নয়। অতএব তা পাওয়ার ব্যাপারে বংশীয় নৈকট্য ও ইসলামের কোন গুরুত্ব নেই। যেমন তার মুসলিম থাকা অবস্থায় উপার্জিত ধন-মালে আমরা গণ্য করে থাকি। কেননা তার মুরতাদ হওয়া পর্যন্ত তো সে তার ধন-মালের যথার্থ মালিক ছিল। কিন্তু পরে মুরতাদ হওয়ার কারণে সে মালিকানা খতম হয়ে গেছে। এক্ষণে যারা তা পাওয়ার অধিকারী হবে, তা হবে মীরাস হিসেবে। আর মীরাসে মুসলমান হওয়ারও বংশীয় নৈকট্য গণ্য হয়ে থাকে। কেননা মুলমানের মালিকানা যথার্থ, মুরতাদ হওয়ার দরুন সে মালিকানা বিলীন হয়ে গেছে, যেমন মৃত্যুর কারণে মালিকানা খতম হয়ে যায়। অতএব তাকে তার মুরতাদ অবস্থায় তার মালের মালিক বলা যাবে না। কেননা সে যখন তা উপার্জন করছিল, তখন সে ছিল আইনের দৃষ্টিতে হত্যাযোগ্য, তার রক্তপাত ছিল মুবাহ্। ফলে তার মাল যখন মুসলমানদের হাতে পড়ল, তখন গনীমতের মাল হয়ে গেল। যেমন কোন যুধ্যমান ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের নিকট নিরাপত্তার সনদ লাভ না করেই যদি রাষ্ট্রের সীমায় প্রবেশ করে এবং তার মালসহ তাকে পাকড়াও করা হয়, তাহলে তার মাল গনীমত হয়ে যাবে। মুরতাদ থাকা অবস্থায় যে যা উপার্জন করেছে, তা-ও ঠিক তা-ই হবে।

এই প্রেক্ষিতে বরা ইবনে আজিব বর্ণিত হাদীসটি বিবেচ্য। তিনি বলেছেন, আমার মামা আবূ বুরদাতা হাতে পতাকা নিয়ে আমার নিকট উপস্থিত হল। আমি বললাম, আপনি কোথায় যাবেন? বললেন : আমাকে রাসূল (স) পাঠিয়েছেন এমন এক ব্যক্তির নিকট যে তার পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করেছে, তাকে আমি হত্যা করব এবং তার নিকট যে মাল পাওয়া যাবে তা নিয়ে নেব।

এই হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করে যদি কেউ বলে যে, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুরতাদ হওয়ার ব্যক্তির মাল 'ফাই' সম্পদ হয়।

জবাবে তাকে বলা যাবে, সে কাজও এজন্যে করা হয়েছিল যে, সে ব্যক্তি ছিল শত্রুপক্ষের যুধ্যমান-হরবী। আর সেজন্যে সে হত্যাযোগ্য ছিল। আর সেইজন্যেই তার মাল গনীমত হয়ে গিয়েছিল। কেননা পতাকা ছিল যুধ্যমানতার নিদর্শন। মুয়াবিয়া ইবনে কুররা তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) মুয়াবিয়ার দাদাকে এমন এক ব্যক্তির নিকট পাঠিয়ে ছিলেন, যা তার পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করেছিল। রাসূল (স) তার গর্দান মারা ও তার মালের 'খুমুস' এক-পঞ্চমাংশ নিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যেই তাঁকে পাঠিয়েছিলেন।

এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, সেই ব্যক্তির মাল গনীমত ছিল যুধ্যমানতার কারণে। আর এ কারণেই তার মালের এক-পঞ্চমাংশ নিয়ে নেয়া হয়েছিল।

যদি বলা হয়, মুরতাদ ব্যক্তির মাল যে গনীমত ছিল, তা আমি অস্বীকার করিনি।

জবাবে বলা যাবে, কিন্তু মুরতাদ অবস্থায় সে যা উপার্জন করেছে, তা-ও তো সেই রকমের। তবে যা মুসলিম থাকা অবস্থায় উপার্জন করেছিল, তাকে গনীমত মনে করা জায়েয হতে পারে না এদিক দিয়ে যে, যে মাল গনীমত হয়েছে তার পথ তো এই যে, তার মালিকানাটাই সহীহ নয় গনীমত হওয়ার পূর্বে। যেমন যুধ্যমান ব্যক্তির মাল ও মুরতাদ হওয়া ব্যক্তির মাল তার মুরতাদ হওয়ার পূর্বের মালিকানা। তাতে তার মালিকত্ব সহীহ্ ছিল। তাই সে মালকে গনীমত বানানো জায়েয হবে না। যেমন সমস্ত মুসলমানের মালকে গনীমত বলা যায় না। কেননা তাতে তাদের মালিকানা সহীহ— যথার্থ। মুরতাদ হওয়ার এই মালিকানা খতম হওয়াটা তেমনি, যেমন কেউ মরে গেলে তার মালিকানাও খতম হয়ে যায়। তাকে হত্যা করা কিংবা তার মৃত্যু সঙ্ঘটিত হওয়া অথবা দারুল হরবে চলে যাওয়ার কারণে তার মাল থেকে তার হক ছিন্ন হয়ে গেল, তখন তা পাওয়ার হক্‌দার হবে তার ওয়ারিসান। সব মুসলমান তার ওয়ারিস নয়। আর মুসলমান সমষ্টি যখন ইসলামের কারণে সে মাল পাওয়ার হকদার হবে— গনীমত হিসেবে নয়, তখন তার ওয়ারিসান আরও বেশি করে তা পাওয়ার অধিকারী হবে। কেননা তারা মুসলমান, সেই সাথে তার নিকটাত্মীয়ও। তাকে গনীমত মনে করে মুসলমানদের তা পাওয়ার অধিকারী হওয়া সহীহ্ নয়। কেননা আমরা আগেই বিশ্লেষণ করে বলেছি যে, কারোর মাল গনীমত হওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে তার মালিকত্ব মূলতই সহীহ্ না হওয়া।

মীরাস বন্টন হওয়ার পূর্বেই যে লোক ইসলাম কবুল করল, তার বিষয়ে আগেরকালের ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) বলেছেন, যে মুসলিম ব্যক্তি মরে গেলে, তখন তার মীরাস বন্টন হওয়ার আগেই তার পুত্র—. যে সে পর্যন্ত অমুসলিম ছিল— ইসলাম কবুল করল কিংবা ক্রীতদাস ছিল, পিতার মীরাস বন্টনের পূর্বেই স্বাধীন— মুক্ত হয়ে গেল, সে তার পিতার মীরাস থেকে কিছুই পাবে না। আতা, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, সুলায়মান ইবনুল ইয়াসার, জুহরী, আবুজ জিনাদ, আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফার, মালিক, আওজায়ী, শাফেয়ীও উক্ত মত গ্রহণ করেছেন।

উমর ইবনুল খাত্তাব ও উসমান ইবনে আফফান (রা) বলেছেন ঃ মীরাসের কোন অধিকারী মীরাস বন্টনের পূর্বে ইসলাম কবুল করলে সে তাতে শরীক হবে— সেও অংশ পাবে। আল-হাসান ও আবূশ শামারও এই মত। তাদের মতে তা জাহিলিয়াতের মীরাসের মতই, যার উপর ইসলাম দাঁড়িয়েছে ইসলামের বিধান অনুযায়ী মীরাস বণ্টনের পূর্বে। তাতে মৃত্যুর সময় কখন, তা কোন গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু প্রথমোক্ত দুইজন তা মনে করেন না। কেননা মীরাসের বিধান জ্ঞাত কারণসমূহের উপর স্থিতি লাভ করেছে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ -

তোমাদের জুড়িরা যা রেখে গেছে, তার অর্ধেক তোমাদের জন্যে।

বলেছেন ঃ

اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ -

যদি কোন ব্যক্তি মরে যায়, তার সন্তান নেই, আছে তার এক বোন, সে বোন রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক পাবে।

দুটি আয়াতেই মৃত্যুর পর-ই মীরাস সাব্যস্ত হয়েছে। বোনের জন্যে অর্ধেক সম্পত্তি ধার্য হয়েছে। আর জুড়ির (স্বামী বা স্ত্রী) জন্যে অর্ধেক সাব্যস্ত হয়েছে অপর অংশের মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার কারণে। তাতে সম্পত্তির বণ্টন হওয়া-না-হওয়ার কোন শর্ত করা হয়নি। আর বণ্টন তো বাধ্যতামূলক হয় সেই সম্পত্তিতে, যাতে লোকেরা মালিকানা লাভ করেছে। তাই যখনই মীরাস বণ্টন হবে তখন তার প্রাপ্ত ওয়ারিসরা নিজ নিজ অংশ পেয়ে যাবে। কেননা মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার পরই সম্পত্তির বণ্টনের প্রশ্ন দেখা দেয়। ব্যাপার যখন এই, তখন পুত্রের ইসলাম গ্রহণের কারণে বোনের মালিকত্ব খতম হয়ে যায় না। যেমন তার মালিকানা খতম হয় না সম্পত্তির বণ্টন হয়ে যাওয়ার পর-ও। আর জাহিলিয়তের সময়ের মীরাস তো ইসলামী শরীয়াতের ভিত্তিতে বণ্টন হতো না। তাই যখন ইসলাম গ্রহণ সঙ্ঘটিত হল, তখন শরীয়াতের হুকুম অনযায়ী সব কাজ সম্পাদিত হবে। কেননা যা ঘটেছে, তা শরীয়াতের বিধান স্থিতিশীল হওয়ার পূর্বে সঙ্ঘটিত হয়নি। তাই লোকেরা যা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করেছে তা থেকে তাদেরকে মার্জিত করা হল। আর যা এখনও বণ্টন হয়েনি, তাতে শরীয়াতের হুকুম কার্যকর হবে। যেমন যে সুদ যথারীতি হস্তগত হয়ে গেছে, তা থেকে হস্তগতকারীদেরকে মার্জনা করা হয়েছে। আর সুদ হারাম ঘোষিত হওয়ার পর যা অবশিষ্ট আছে, তার উপর সে আইন কার্যকর হবে, যা শরীয়াতের হুকুম অনুযায়ী হস্তগত হয়নি। তাই তা বাতিল ঘোষিত হয়েছে এবং মূলধন ফিরিয়ে দেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

ইসলামে মীরাসের বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার নীতি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। তাই তার মনসূখ হওয়ার প্রশ্ন উঠতে পারে না। তাই সম্পত্তির বণ্টন হওয়া ও না-হওয়ার কোন গুরুত্ব নেই। যেমন সুদের চুক্তিসমূহ যদি সুদ হারাম হওয়ার পর ইসলামে ঘটানো হয় অথচ তার হুকুম স্থিতিশীল হয়ে গেছে, তার যে অংশ হাতে এসেছে আর যা হাতে আসেনি— এই সবই বাতিল হওয়ার দিক দিয়ে ও দুটি অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য হয় না। উপরন্তু যে লোক

কোন মীরাস পেয়ে গেল, পরে সে মরে গেল মীরাস বণ্টন হওয়ার আগেই। তার অংশ মীরাসে অবশ্যই থাকবে এবং তা তার ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন হবে। এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কোন মতপার্থক্যের কথা আমাদের জানা নেই। অনুরূপভাবে যদি মীরাস বণ্টন হওয়ার পূর্বে মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে সে মীরাসের যে অংশ পেল তা বাতিল হয়ে যাবে না। এবং সম্পত্তি-মালিকের মৃত্যুকালে তাকে মুরতাদ ধরা হবে না। তেমনি যে লোক মীরাস বণ্টন হওয়ার পূর্বে ইসলাম কবুল করল কিংবা দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেল, মীরাসে তার কোন অংশ হবে না।

## ব্যভিচারীর শাস্তি

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ .... سَبِيلًا -

তোমাদের মেয়েলোকদের মধ্যের যারা নির্লজ্জতার— যিনার কাজ করে, তাদের সম্পর্কে তোমাদের থেকে চারজন সাক্ষী দাঁড় করাও।

আবূ বকর বলেছেন, ইসলামের প্রাথমিক কালে যিনা-ব্যভিচারীর এ-ই শাস্তি ঘোষিত হয়েছিল। এক্ষণে তা মনসূখ হয়ে গেছে, হুকুমটা টিকে নি। এ বিষয়ে আগের কালের ফিকাহবিদদের কোন মতপার্থক্য নেই।

জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ওয়াসেতী, জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ইয়ামান, আবূ উবায়দ, হাজ্জাজ, ইবনে জুরাইয ও উসমান ইবনে আতা আল-খুরাসানী ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন এই আয়াত পর্যায়ে ঃ 'তোমাদের মেয়েলোকদের মধ্যের যারা নির্লজ্জতার— যিনার কাজ করে, তাদের সম্পর্কে তোমাদের থেকে চারজন সাক্ষী দাঁড় করাও .... পথ'।

এবং তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কথা ঃ

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ -

তাদের ঘর থেকে বহিষ্কৃত করো না, তারাও বের হবে না .....তবে যদি তারা প্রকাশ্য-স্পষ্ট নির্লজ্জতার— যিনার কাজ করে বসে ..... । (সূরা তালাক ঃ ১)

বলেছেন ঃ এসব আয়াত সূরা আন-নূর-এর দোররা মারা সংক্রান্ত আয়াতের পূর্বে নাযিল হওয়া। তাই সূরা আন-নূর-এর এ আয়াত ঃ

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ -

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী— এ দুইজনার প্রত্যেককে একশটি করে দোররা মারো ... ।

—৩/৩১

পূর্ববর্তী এই সংক্রান্ত আয়াতসমূহকে মনসূখ করেছে। আর প্রথমোক্ত আয়াতে যে পথ বা উপায়-এর কথা বলা হয়েছে, তা হল— দোররা ও সঙ্গেসার— প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা।

বলেছেন, যদি তারা কোনদিন এই সুস্পষ্ট নির্লজ্জতার ঘটনা ঘটায়, তাহলে তারা বহিষ্কৃতও হবে ঘর থেকে এবং 'রজম'— প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করাও হবে।

আবূ উবায়দ, আবদুল্লাহ ইবনে সালিহ, মুয়াবিয়াতা ইবনে সালিহ, আলী ইবনে আবূ তালহ। ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট উপরোক্ত আয়াত এবং وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمْ 'তোমাদের মধ্য থেকে দুজন এই নির্লজ্জতার কাজ করবে, তাদেরকে পীড়ন দাও' আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, পূর্বে কোন মেয়েলোক যিনা করলে তাকে ঘরে আটক করে রাখা হতো। এ আটকাবস্থায়ই সে মরে যেত। তেমনি কোন পুরুষ যখন যিনার অপরাধ করত, তাকে লজ্জা দিয়ে পীড়ন করা হতো এবং জুতা দিয়ে মারা হতো। বলেছেন— এ সময় আয়াত নাযিল হয় ঃ

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ -

যিনাকারী নারী ও পুরুষ— এদের দু'জনার প্রত্যেককে একশটি করে দোররা মার।

(সূরা নূর ঃ ২)

আর যদি তারা বিবাহিত হতো, তাহলে রাসূলে করীম (স)-এর সুন্নাত অনুযায়ী 'রজম' (প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা) করা হতো। আল্লাহ্ তাদের জন্যে এটাকেই পথ রূপে নির্দিষ্ট করেছেন। এ পথেরই ইঙ্গিত ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছিল এ আয়াতে ঃ

حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا -

তাকে ঘরে বন্দী করে রাখবে 'যতক্ষণ না মৃত্যু তাদের খতম করে দেয় কিংবা আল্লাহ্-ই তাদের জন্যে কোন পথ বা উপায় নির্ধারণ করেন।

আবূ বকর বলেছেন, ইসলামের সূচনাকালে ব্যভিচারিণীর বাধ্যতামূলক দণ্ড ছিল আটক রাখা তাদের মৃত্যুর সময় পর্যন্ত। অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্যে পথ করে দেন। কিন্তু তখন তাদের জন্যে এ ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা দেয়া হয়নি। তা ছাড়া এ আয়াতে কুমারী ও অকুমারী নারীর মধ্যে কোন পার্থক্যও করা হয়নি। এ থেকে বোঝা যায়— তা ছিল একটি সাধারণ বিধান, কুমারী অ-কুমারী সকলের জন্যে একই ব্যবস্থা।

আর আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا -

এবং তোমাদের মধ্যে যেই দুজন এ কাজ করবে, সেই দুজনকে পীড়ন দাও।

আল-হাসান ও আতা থেকে বর্ণিত, এই দুজন বলতে যিনাকারী পুরুষ ও নারী। সুদ্দী বলেছেন, অবিবাহিত পুরুষ ও নারী। মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, এখানে ব্যভিচারী দুজন পুরুষের কথা বলা হয়েছে। এ শেষোক্ত ব্যাখ্যাটা সহীহ নয়, বলা যায়। কেননা তা বলতে হলে দ্বিবচন শব্দের ব্যবহার অর্থহীন। কেননা ওয়াদা ও হুমকির কথা দুটোই সাধারণত বহুবচনের শব্দে বলা

হয়। কেননা তা তাদের সকলের প্রতি প্রয়োগীয় অথবা এক বচনের শব্দে বলা হবে। তা সমস্তকেই পরিব্যাপ্ত জাতীয় পর্যায়ের কথা হবে। এ বিষয়ে আল-হাসান-এর কথাই সহীহ্। সুদ্দীর ব্যাখ্যাও সম্ভাব্যতার মধ্যে। ফলে দুটি আয়াতের সামষ্টিক অর্থ হচ্ছে নারীর শাস্তি ছিল দৈহিক পীড়ন ও আটক— দুটো-ই মৃত্যু পর্যন্ত। আর পুরুষের শাস্তি ছিল লজ্জাদান ও জুতা দিয়ে মারা। কেননা প্রথমোক্ত আয়াতে নারীর কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, তাকে আটক করে রাখতে হবে। আর দ্বিতীয়োক্ত আয়াতে পুরুষের সঙ্গে একসাথে পীড়ন দেয়ার কথা বলা হয়েছে। ফলে মেয়েলোকের জন্যে দুটি হুকুম একত্রিত হল। আর পুরুষের জন্যে শুধুমাত্র পীড়নের কথাই বলা হয়েছে।

অবশ্য এ-ও সম্ভব যে, দুটো আয়াতই একসঙ্গে নাযিল হয়েছে। পরে নারীর জন্যে একক ব্যবস্থা হল আটক করা, আর পীড়নে দুজন-ই শামিল হল। নারীর উল্লেখ আলাদা ও একক হওয়ার ফায়দা হল, কেবল তার জন্যেই মৃত্যু পর্যন্ত আটক ব্যবস্থা। এ হুকুমে পুরুষ শরীক নেই, আটকের শাস্তি পুরুষের জন্যে নয়। আর নারীকে পুরুষের সঙ্গে একত্রিত করা হল পীড়নে। কেননা মূল পাপকার্যে দুজনই শরীক। এ-ও হতে পারে যে, নারীকে পীড়নের পূর্বেই আটক করতে হবে। পরে তার শাস্তি বৃদ্ধি করা হল এবং পুরুষের জন্যে পীড়ন সাব্যস্ত হল। ফলে নারীর জন্যে দুটো শাস্তি একত্রিত হল। আর পুরুষের জন্যে এককভাবে পীড়ন সাব্যস্ত হল নারী ছাড়া-ই। যদি তা-ই হয়ে থাকে, কেননা মৃত্যু পর্যন্ত ঘরে আটক রাখা অথবা অন্য কোন উপায়— তাই ছিল তার শাস্তি। তার সঙ্গে পীড়ন যোগ হলে তা মনসূখ হয়ে গেল। কেননা 'নস্'-এর হুকুম স্থিতিলাভ করলে পর তাতে বৃদ্ধি ঘটলে পূর্বেরটা মনসূখ হয়ে যায়। কেননা তখন আটক-ই ছিল তার সমগ্র শাস্তি। পরে যখন বৃদ্ধি ঘটল, তখন সেটা হল শাস্তির অংশ। এ কারণেই আটক রাখার শাস্তি একটা মনসূখ শাস্তিতে পরিণত হল। আর এ-ও হতে পারে যে, শুরুতে দুজনের জন্যই শুধু পীড়ন শাস্তি ছিল। পরে নারীর শাস্তিকে মৃত্যু পর্যন্ত আটককে বৃদ্ধি করা হল অথবা আল্লাহ্ তার জন্যে যে পথ-ই করে দেন। ফলে নারীর ক্ষেত্রে পীড়ন শাস্তি হিসেবে মনসূখ হয়ে গেল। কেননা আটক শাস্তির হুকুম নাযিল হওয়ার পর তা শাস্তির অংশে পরিণত হল। ....... মোটকথা, এই সবই সম্ভব।

যদি বলা হয়, আটকের হুকুমটা প্রত্যাহৃত হওয়ার কারণে তা মনসূখ হয়েছে— বলা যায় কি ? পরে 'পীড়ন' নাযিল হলে তা-ই হল একমাত্র শাস্তি ?

জবাবে বলা যায়, সে হুকুমটা মূলতই উঠে গেছে, এ কারণে তা মনসূখ হয়েছে, বলা জায়েয হবে না। কেননা পীড়নের দণ্ড কার্যকর হলে তা আটক শাস্তির পরিপন্থী কিছু হয় না। যেহেতু দুটোই একসাথে কার্যকর হতে পারে। তবু তা এদিক দিয়ে মনসূখ হতে পারে যে, তা সমগ্র শাস্তি থাকার পর শাস্তির অংশে পরিণত হয়েছে। আর মনসূখ হওয়ার এ-ও একটা ধরন।

আয়াত দুটির পরম্পরা পর্যায়ে দুটি কারণের উল্লেখ করা হয়েছে। তার একটি আল-হাসানের বর্ণনা ঃ আল্লাহ্র কথা ঃ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا নাযিল হয়েছিল وَالَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ -এর পূর্বে। পরে পাঠক্রমে তা ওটির পূর্বে বসানোর নির্দেশ হয়েছে। ফলে পীড়ন উভয়ের জন্যে সমগ্র শাস্তি হয়ে দাঁড়াল। পরে নারীদের জন্যে আটক সাব্যস্ত হল পীড়নের সঙ্গে।

কিন্তু এ কথাটি দূরবর্তী মনে হয়। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَالَّذَانِ يَاْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا -এর هَا ইঙ্গিতমূলক, পূর্বে উল্লেখ করা একটা শব্দের প্রয়োজন, যার দিকে এই ইঙ্গিত বলা যাবে এবং যাকে সম্বোধন করা হয়েছে, তার মনে তা স্পষ্ট উপস্থিত থাকতে হবে। কিন্তু এই আয়াতটিতে الفاحشة ها যিনাকেই ইঙ্গিত করে— তার কোন স্পষ্ট প্রমাণ নেই। তা সত্ত্বেও এ ইঙ্গিতটা যে পূর্বে আয়াতের শুরুতে উল্লেখ الفاحشة -এর দিকে, তা নিশ্চিত। কেননা সেদিকে ইঙ্গিত না করলে বাক্যটিই অর্থপূর্ণ হয় না। বক্তব্য জানা যায় না, বোঝা যায় না। এ আয়াতটি এ দুটি আয়াতের মত নয়। একটি ঃ

مَاتَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ -

তার পিঠের ওপর কোন জীবন্ত প্রাণী রেখে দেয়নি। (সূরা ফাতির ঃ ৪৫)

দ্বিতীয়টি ঃ

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ -

আমরা নিশ্চয়ই তাকে কদর রাত্রে নাযিল করেছি। (সূরা কাদ্‌র ঃ ১)

কেননা এ আয়াতের বক্তব্য কুরআন নাযিল করা সম্পর্ক। আর পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্য পৃথিবী সম্পর্কে। এই অবস্থাগত নিদর্শনের জন্যেই উভয় আয়াতে 'পূর্বে' শব্দের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন ছিল। যার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা যে-কোন শ্রোতাই নিঃসন্দেহে বোঝাতে পারে। তাই সম্বোধনের বাহ্যিক দাবি হচ্ছে যে, আয়াত দুটির বিন্যাস শব্দের বিন্যাস অনুযায়ী হবে। এক্ষণে হয় দুটোই এক সাথে নাযিল হয়েছে বলতে হবে, না হয় পীড়নের আয়াতটি আটক সংক্রান্ত আয়াতের পরে নাযিল হয়েছে— যদি পীড়ন সেই নারীর জন্যে নির্দেশিত হয়, যাকে আটক করা হয়েছে।

আর দ্বিতীয় কারণ সুদ্দী থেকে বর্ণিত ঃ وَاللَّذَانِ يَاْتِيَانِهَا مِنْكُمْ, আল্লাহ্‌র এই কথাটি বিশেষভাবে দুজন কুমারী নারীর ব্যাপারে হুকুম ছিল। আর প্রথমটি অ-কুমারীদের জন্যে। কুমারীদের জন্যে নয়। তবে এ কথাটি একটি শব্দকে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে বলতে হবে কোন দলীল ছাড়াই। কিন্তু শব্দ দুটিকে তার আসল তাৎপর্যে ব্যবহৃত মনে করা সম্ভব হলে তা না করা কারোর জন্যেই শোভন নয়। আয়াত দুটির হুকুমে ও বিন্যাসে সম্ভাব্য যত দিকই থাক, ব্যভিচারীদের সম্পর্কে এ দুটি আয়াত যে মনসূখ হয়ে গেছে, এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই।

এ আয়াতটিতে উল্লিখিত السبيل -এর তাৎপর্য কি, এ বিষয়ে আগেরকালের ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাদের জন্যে আল্লাহ্ যে পথ বা উপায় ঘোষণা করেছেন, তা হল দোররা অবিবাহিতের জন্যে আর 'রজম' বিবাহিতের জন্যে।

কাতাদাতা থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। মুজাহিদ থেকে কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ

اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً -

'কিংবা আল্লাহ্ তাদের জন্যে কোন পথ করে দেবেন'— এর অর্থ, তারা তাদের গর্ভের ফসল প্রসব করবে।

কিন্তু এটা তাৎপর্যহীন। কেননা আয়াতটি গর্ভবতী ও অগর্ভবতী নির্বিশেষে সকলের জন্যে সাধারণ। কাজেই যে পথই বলা হবে, তা সকলের জন্যে সমানভাবে প্রযোজ্য হতে হবে।

এ হুকুম দুটির মনসূখ হওয়ার ব্যাপারেও বিভিন্ন মত রয়েছে। কিছু লোক বলেছেন, তা মনসূখ হয়েছে —

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ -

ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ প্রত্যেককে একশটি করে দোররা মার—এই আয়াত দ্বারা।
(সূরা নূর ঃ ২)

আর وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا আয়াতটি ছিল দুই কুমারী সম্পর্কে। পরে এ আয়াতটি মনসূখ হয়ে যায় উক্ত দোররা মারা সংক্রান্ত আয়াত দ্বারা।

পরে অবশিষ্ট থেকে গেলে অ-কুমারী মেয়েদের জন্যে আটকের আদেশ। সে আদেশ মনসূখ হয়ে যায় 'রজম' করার বিধান দ্বারা।

অন্যরা বলেছেন, তা মনসূখ হয়েছে উবাদাতা ইবনুস সামেত বর্ণিত হাদীস দ্বারা।

সে হাদীসটি জাফর ইবনে মুহাম্মাদ, জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল-ইয়ামান, আবূ উবায়দ আবুন-নসর, শুবা, কাতাদাতা, আল-হাসান, হাত্তান ইবনে আবদুল্লাহ আর রুকাশী, উবাদাতা ইবনুস-সামেত সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তাতে উবাদাতা বলেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

خُذُوْا عَنِّىْ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، اَلْبِكْرُ تُجْلَدُ وَتُنْفَى وَالثَّيِّبُ تُجْلَدُ وَتَرْجَمُ -

তোমরা আমার নিকট থেকে গ্রহণ কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের জন্যে পথ জানিয়ে দিয়েছেন। কুমারী কুমারীর সঙ্গে, অ-কুমারী অ-কুমারীর সঙ্গে। কুমারীকে দোররা ও নির্বাসন, আর অ-কুমারীকে দোররা রজম।

এ কথাটি সহীহ্। কেননা রাসূল (স)-এর 'তোমরা আমার নিকট থেকে গ্রহণ কর, আল্লাহ তাদের জন্যে পথ করে দিয়েছেন' কথাটি আয়াতে উল্লিখিত পথ-এর ব্যাখ্যা। আর জানা-ই আছে যে, নবী করীম (স)-এর কথা এবং আটক ও পীড়ন— এ দুটির মাঝে কোন হুকুমের মধ্যস্থতা ছিল না। আর সূরা আন্-নূর-এ যে 'দোররা' মারার হুকুমের আয়াত রয়েছে, তা তখন পর্যন্ত নাযিল হয়নি। কেননা তা নাযিল হয়ে থাকলে 'তোমরা আমার নিকট থেকে গ্রহণ কর, আল্লাহ তাদের জন্যে পথ করে দিয়েছেন' কথাটির আগেই তা হতো। আর তা হলে এরূপ কথার কোন সুযোগ ছিল না। তাই বলতে হবে, এ কথা প্রমাণিত যে, আটক ও পীড়নের বিধান

মন্‌সূখ হওয়ার কারণ হচ্ছে নবী করীম (স)-এর এ কথাটি, যা তিনি উবাদাতা ইব্‌নুস সামেত বর্ণিত হাদীসে বলেছেন এবং দোররা মারা সংক্রান্ত হুকুমের আয়াত তার পরে নাযিল হয়েছে।

এ থেকে সুন্নত দ্বারা কুরআনের হুকুম মনসূখ হওয়ার জায়েয প্রমাণিত হয়। কেননা এ আলোচনায়ই আমরা দেখলাম, 'তোমরা আমাদের নিকট থেকে গ্রহণ কর, আল্লাহ্ তাদের জন্যে পথ করে দিয়েছেন' দ্বারা কুরআনের আটক রাখা ও 'দোররা মারার হুকুম মনসূখ হয়েছে কুমারীদের ক্ষেত্রে এবং অ-কুমারীদের ক্ষেত্রে রজম-এর হুকুম নতুনভাবে কার্যকর হয়েছে।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ —'যারা তোমাদের মধ্য থেকে তা করে' এবং আটক ও পীড়ন-এর কথা যে দুটি আয়াতে এসেছে, তা ছিল দুই কুমারী সম্পর্কে; অ-কুমারীদের সম্পর্কে নয়।

জবাবে বলা যাবে, অ-কুমারী মেয়েদের জন্যে যিনার শাস্তি ছিল আটক রাখা, এ বিষয়ে আগের কালের ফিকাহবিদদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। সুদ্দী যে বলেছেন পীড়ন ছিল বিশেষভাবে দুই কুমারীর জন্যে, অথচ নবী করীম (স) আটক-সংক্রান্ত আয়াতে উল্লিখিত পথ সম্পর্কে যা জানিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে অ-কুমারীদের সম্পর্কে। অতএব তা রাসূলে করীম (স)-এর ঃ - الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ الْجَلْدُ وَالرَّجْمُ অ-কুমারীর অ-কুমারীর সাথে— এর জন্যে দোররা ও 'রজম' এ কথা দ্বারাই তা মনসূখ হয়েছে। তাহলে আটক-আদেশ উভয় স্থান থেকেই মন্‌সূখ হয়ে গেছে অ-কুরআন দ্বারা অর্থাৎ যার দ্বারা মনসূখ হয়েছে, তা কুরআন নয়, তা রাসূলের সুন্নাত। আর তা হচ্ছে সেই হাদীস যাতে বিবাহিতের জন্যে 'রজম' বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ পর্যায়ে একটি হাদীস এবাদাতা বর্ণিত, যা আমরা উপরে উদ্ধৃত করেছি। আর আবদুল্লাহ, আয়েশা ও উসমান (রা) বর্ণিত হাদীস যখন কার্যকর ছিল, নবী করীম (স)-এর এ সাহাবীগণ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَايَحِلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ اِلَّا بِاِحْدَى ثَلَاثٍ : كُفْرٍ بَعْدَ اِيْمَانٍ وَزِنًا بَعْدَ اِحْصَانٍ وَقَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ -

কোন মুসলিম ব্যক্তির রক্তপাত তিনটির কোন একটি কারণ ছাড়া হালাল নয়। সে তিনটি কারণ ঃ ঈমানের পর কুফর গ্রহণ— মুরতাদ হওয়া, বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যিনা করা এবং নর হত্যার দণ্ড ছাড়া বিনা কারণে নরহত্যা।

মায়েয ও গামেদীয়াকে নবী করীম (স) কর্তৃক হত্যা করার ঘটনার বিবরণ মুসলিম উম্মত এমনভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তাতে কারোর কোন সন্দেহ থাকতেই পারে না।

যদি বলা হয়, খাওয়ারিজ গোষ্ঠীর সব লোক-ই 'রজম'কে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করে। রজম যদি সর্বজনমান্য সূত্রে বর্ণিত হতো, যার ফলে সন্দেহমুক্ত ইলম লাভ হয়, খাওয়ারিজরা তা নিশ্চয়ই ভুলে যেত না।

জবাবে বলা যাবে, এসব হাদীস বর্ণনা সূত্রে বর্ণিত এবং বর্ণনাকারীর নিকট থেকে শুনতে পাওয়ার মাধ্যমে এসেছে। আর সব হাদীসই তো এমনিভাবেই বর্ণিত হয়ে এসেছে। আর

খাওয়ারিজরা কখনই মুসলিম সর্বজনমান্য ফিকাহবিদদের মজলিসে বসেনি, হাদীস বর্ণনাকারীদের নিকট হাদীস শুনতেও প্রস্তুত হয়েনি। তারা তাঁদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্ক-যোগাযোগবিহীন রয়েছে। তারা হাদীস গ্রহণ করতেও প্রস্তুত হয়নি। এ কারণে তারা এসব হাদীস সম্পর্কে সংশয়ের গভীর তলায় ডুবে গেছে। তারা এ বিষয়ে স্থিতিশীলও হয়নি। তাদেরই প্রাথমিক কালের বহু সংখ্যক মনীষী যে এসব হাদীস নির্ভরযোগ্য সূত্রেই জানতে পেরেছিলেন, তা কোনক্রমেই অসম্ভব বা নিষিদ্ধ হতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এসব হাদীসকে মেনে নিতে প্রস্তুত হয়নি। কেননা তাদের কথার সঙ্গে যারা একমত নয় তাদের দেয়া কোন খবরই প্রত্যাখ্যান করতে কুণ্ঠিত হয়নি। তাদের লোকেরা এ রোগে আক্রান্ত ছিল, আর শেষদিকের লোকেরাও তাদেরই অন্ধ অনুসরণে পড়ে এসব হাদীস সংগ্রহ করেছে। অন্যদের নিকট থেকে কিছু শুনতে বা জানতে তারা প্রস্তুত হয়নি। এ কারণে তারা এসব হাদীস সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনি কিংবা যারাও বা তা জানতে পেরেছিল, তারা সংখ্যায় ছিল খুবই নগণ্য। সেই নগণ্য সংখ্যক লোকদের পক্ষে এসব হাদীস গোপন রাখা অসম্ভব কিছু নয়। ফলে তারা তা অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করেছে। সর্বোপরি, তারা তো রাসূল (স)-এর সাহাবী ছিলেন না। তা যদি হতো তা হলে তারা এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষদর্শীর জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পেত অথবা প্রত্যক্ষদর্শীদের নিকট থেকে সরাসরি শুনতে ও জানতে পারত। এসব কিছুর বাইরে থাকার কারণে তারা যদি তা না জেনে থাকে, তাহলে তা কোন বিচিত্র ব্যাপারে নয়।

দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, গৃহপালিত পশুর যাকাত ফরয হওয়ার কথা নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত হাদীসের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। সে সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা দুই শ্রেণীর লোকেরাই জানে। হয় ফিকাহবিদগণ, যাঁরা তা শুনেছেন এবং সে বিষয়ে তাঁদের নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়েছে হাদীস বর্ণনাকারীর লোকদের মাধ্যমে অথবা যারা নিজেরা সেই সময়ে এসব জন্তু পালতেন বেশি সংখ্যায়। ফলে তাদেরকে সেগুলোর যাকাত দিতে হতো। এ কারণে এ যাকাতের ফরয হওয়া সংক্রান্ত নিশ্চিত জ্ঞান সরাসরি লাভ করা সম্ভব হয়েছে তাঁদের পক্ষে।

এর আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে খবরে ওয়াহিদ। তা বহু লোক-ই শুনতে পেয়েছেন, তাঁরা প্রত্যক্ষ জ্ঞান পেয়েছেন, যদিও তা তাঁরা শুনেছেন একক ব্যক্তির সূত্রে। খাওয়ারিজদের অবস্থাও এরূপ। এ কারণেই তারা 'রজম' শাস্তিকে অস্বীকার করেছে। ফুফু ও ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং খালা ও বোনঝিকে একসাথে একজন পুরুষের যে বিয়ে করা হারাম, তাও তারা অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করেছে। এভাবে আরও অনেক বিষয়ে তারা অজ্ঞ থাকার কারণে অস্বীকার করেছে। অথচ তা ন্যায়পন্থী লোকেরা বর্ণনা করেছেন। তবে খাওয়ারিজ ও শরীয়ত বিদ্রোহীরা তা গ্রহণ করেনি।

উপরোক্ত দুটি আয়াত থেকে বহুসংখ্যক আইন উৎসারিত হয়েছে। তার একটি যিনার প্রমাণের জন্যে কম-সে-কম চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন। দ্বিতীয়, যিনাকারী মেয়েলোককে আটক করতে হবে এবং পুরুষ ও নারী উভয়কেই পীড়ন করতে হবে। অবশ্য পীড়ন ও লজ্জাদান দুটিই প্রত্যাহার করা যাবে তওবা করলে। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَانْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا -

তারা দুজন যদি তওবা করে ও নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তাহলে তোমরা তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও।

এ তওবা কার্যকর হয় পীড়ন প্রত্যাহারের জন্যে। তবে আটক নয়। এ আটকের ব্যাপারটি কুরআন ঘোষিত পথ-এর আসার ওপর নির্ভরশীল ছিল। পরে রাসূলে করীম (স) সে 'পথ' ঘোষণা করেন। সে 'পথ' হচ্ছে ঃ দোররা ও রজম। আয়াতে যা কিছু উল্লেখ হয়েছিল তা সবই মনসূখ হয়ে গেছে। শুধু দাঁড়িয়ে চারজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী দাঁড় করানোর কথাটি। কেননা শরীয়াত প্রস্তাবিত শাস্তির حد -এর ক্ষেত্রে সাক্ষীদের এ সংখ্যা অবশিষ্ট রয়েছে। ফলে পূর্বের ঘোষিত দুটি 'হদ্দ' মনসূখ হয়ে গেছে। তা হল দোররা ও রজম।

আল্লাহ তা'আলা এ কথাটি এ আয়াতে বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً -

যারা পবিত্র সতী নারীদের ওপর যিনার তুহ্‌মাত— মিথ্যা অভিযোগ তোলে, কিন্তু পরে তা চারজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীকে দাঁড় করে না, তাদেরকে আশিটি দোররা মারো।

(সূরা নূর ঃ ৪)

আল্লাহ্ আরও বলেছেন ঃ

لَوْلَا جَاءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ج فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَاءِ فَاُولٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ -

যদি না তারা চারজন প্রত্যক্ষদর্শী নিয়ে আসে, যখন তারা এ সাক্ষী নিয়ে না এলো, তখন তারা আল্লাহ্র নিকট মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হল। (সূরা নূর ঃ ১৩)

এখানেও সাক্ষীদের সংখ্যাটির গুরুত্ব মনসূখ হয়নি আর সাক্ষী উপস্থাপনের বাধ্যবাধকতাও মনসূখ হয়ে যায়নি। বরং এ আয়াত সাক্ষী উপস্থিত করাকে বাধ্যতামূলক করেছে এবং ব্যভিচারকারীদের প্রতি নজর দেয়া সে দুজনের ওপর 'হদ্দ' কায়েমের জন্যে গুরুত্ব পেয়েছে। কেননা আল্লাহ যিনার ঘটনার ওপর সাক্ষী আনবার আদেশ করেছেন। আর তা গুরুত্ব আরোপ ব্যতীত হয়নি। প্রমাণিত হল, ব্যভিচারীদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধকরণ সে দুজনার ওপর 'হদ্দ' কায়েমের উদ্দেশ্যে তার সাক্ষ্যকে প্রত্যাহার করে না। হযরত আবূ বকর (রা) শবল ইবনে মাবদ, নাফে ইবনুল হারিস জিয়াদের সঙ্গে মুগীরা ইবনে শুবা (রা)-এর ঘটনায় তা-ই করেছেন। তার সেই কাজ আয়াতের বাহ্যিক অর্থের সাথে পূর্ণ সঙ্গতিসম্পন্ন।

আল্লাহ্র কথা ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ -

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা মেয়েলোকের ওয়ারিস হবে জোর করে, তা তোমাদের হালাল নয় এবং তাদেরকে তোমরা আটক করে রেখো না।

শায়বানী ইকরামা ইবনে আব্বাস সূত্রে এ আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আগে এমন রীতি ছিল যে, কোন ব্যক্তি মরে গেলে তার অভিভাবকগণই তার স্ত্রীর ওপর বড় হকদার হয়ে দাঁড়াতো তার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। কতক লোক চাইত তাকে বিয়ে করতে, আবার কতক লোক চাইত তাকে বিয়ে দিতে। কতক লোক চাইত তাকে বিয়ে না দিতে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়েছিল। আল-হাসান ও মুজাহিদ বলেছেন, এরূপ অবস্থা ছিল যে, এক ব্যক্তি যখন মরে যেত ও তার স্ত্রীকে রেখে যেত, তখন মৃতের অভিভাবক বলত ঃ আমি তার স্ত্রীকেও মীরাস হিসেবে পেয়েছি, যেমন তার ধন-মাল পেয়েছি। তখন সে চাইলে তাকে পূর্বে দেয়া মহরানার ভিত্তিতেই বিয়ে করত, আর চাইলে সে তাকে বিয়ে করত এবং মহরানা নিয়ে নিত।

মুজাহিদ বলেছেন, তা হতো যদি মৃতের পুত্র সন্তান না থাকত। আবূ মজলজ বলেছেন, যে লোক তার অভিভাবক হয়ে দাঁড়াত, সে-ই মীরাস হিসেবেই তাকে নিয়ে নিত। জুয়াইবর দহাক ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, ইসলামের প্রাথমিককালে এ নিয়ম ছিল যে, ব্যক্তি মরে গেলে তার কোন নিকটবর্তী ব্যক্তি দাঁড়িয়ে যেত এবং তার স্ত্রীর ওপর একটা কাপড় ফেলে দিত। তাতে সে মেয়েলোকটির বিয়ের ওয়ারিস বা অধিকারী হয়ে যেত। কাবশা বিনতে ময়সের স্বামী আবূ আমের মরে গেলে আমেরে অপর স্ত্রী থেকে পুত্র এসে তার উপর একটা কাপড় ফেলে দিল। পরে তার নিকটেও যায়নি, তার খরচাদিও দেয়নি। তখন সে মেয়েলোকটি নবী করীম (স)-এর নিকট অভিযোগ দায়ের করে। তখন আল্লাহ উপরোদ্ধৃত আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

'তোমরা মেয়েলোকদের জবরদস্তিভাবে ওয়ারিস হয়ে দাঁড়াবে— তা তোমাদের জন্যে হালাল নয় এবং তোমরা তাকে আটকেও রাখবে না।' এভাবে যে, তোমরা তাদেরকে প্রথম মহরানা দেবে। জুহরী বলেছেন ঃ মেয়েলোকটিকে লোকেরা আটক করে রাখত, অথচ তার প্রতি তাদের কোন প্রয়োজনই ছিল না। এভাবে আটক থাকা অবস্থায়ই মেয়েলোকটি মরে যেত। তখন সে তার ওয়ারিস হতো। এ ধরনের অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতেই বলা হয়েছে এ আয়াতটিতে। এ পর্যায়ে আরও বলেছেন ঃ

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ -

এবং তোমরা তাদেরকে আটকিয়ে রাখবে না এ উদ্দেশ্যে যে, তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তার কিছু অংশ নিয়ে নেবে।

ইবনে আব্বাস, কাতাদাতা, সুদ্দী ও দহাক বলেছেন ঃ এ আয়াতে স্বামীদেরকে আদেশ করা হয়েছে, তাদের স্ত্রীদের পথ মুক্ত করে দিতে যদি তাদের নিকট তাদের কোন প্রয়োজন না থাকে। তাদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকে রাখবে না। যেমন শেষকালে তার মালের একটা অংশ তোমরা নিতে পার এ উদ্দেশ্যে।

আল-হাসান বলেছেন, এ আয়াতে মৃত স্বামীর অভিভাবককে নিষেধ করা হয়েছে তাকে অন্য

স্বামী গ্রহণ করতে নিষেধ করে বা তার পথে বাধা সৃষ্টি করে। জাহিলিয়াতের সময়ে এ-ই ছিল সামাজিক রীতি।

মুজাহিদ বলেছেন ঃ স্ত্রীলোকটির অভিভাবককে নিষেধ করা হয়েছে তার পথে বাধা দিতে, তাকে আটকাতে।

আবূ বকর বলেছেন, বাহ্যত মনে হয়, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এ আয়তটির যে ব্যাখ্যা বলেছেন, তা-ই যথার্থ ব্যাখ্যা। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ এ উদ্দেশ্যে যে, তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তার কিছু অংশ যেন ফিরিয়ে নিতে পার। এবং এরপর যা বলা হয়েছে তা সেই কথা-ই প্রমাণ করে। কেননা 'যেন যা দিয়েছ তার কিছু অংশ ফিরিয়ে নিতে পার' কথাটির দ্বারা মহরানাই বুঝিয়েছে। যার পরিণাম এ-ই দাঁড়াত যে, তাকে কার্যত আটকই রাখা হতো কিংবা তার প্রতি খুব খারাপ ব্যবহার করা হতো দেয়া মহরানার কিছু অংশ ফিরিয়ে নেয়ার হীন উদ্দেশ্যে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ -

তবে যদি সুস্পষ্ট নির্লজ্জতার-যিনার কাজ তারা করে (তাহলে ভিন্ন কথা)।

আল-হাসান, আবূ কালাবা ও সুদ্দী বলেছেন, এ আয়াতাংশে যিনার কথা বলা হয়েছে। কেননা স্ত্রীলোকের ওপর সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার খবর যদি জানতে পারে, তা হলে বিনিময় গ্রহণ তার জন্যে হালাল হবে। ইবনে আব্বাস, দহাক ও কাতাদাতা বলেছেন, এ আয়াতে 'নুশুজ' স্ত্রীর বিদ্রোহের কথা বলা হয়েছে। স্ত্রী যদি স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাহলে স্বামীর জন্যে তার নিকট থেকে ফিরিয়া (বিনিময়) নেয়া হালাল হবে। সূরা আল-বাকারায় আমরা খুলা তালাক ও তৎসংক্রান্ত বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা দিয়েছি।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ -

এবং তাদের সাথে খুব ভালোভাবে জীবন যাপন কর।

স্বামীদেরকে এ আয়াতে হুকুম দেয়া হয়েছে— তারা যেন তাদের স্ত্রীদের সাথে খুব ভালো ও ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তিতে একত্রে জীবন যাপন করে। সে ভালো ব্যবহারের একটা হল— স্ত্রীর প্রাপ্য হক মহরানা, খরচাদি, দিন বণ্টন, রুঢ় কর্কশ কথার দ্বারা তাদেরকে কষ্ট দান পরিহার, তার দিকে অনাকৃষ্ট ও তাকে বাদ দিয়ে অন্য কারোর প্রতি ঝুকে পড়া এবং কোন অপরাধ— গুণাহ ছাড়াই মুখ বিকৃতি ও ভ্যাংচি-ঝামটা দিয়ে কথা বলা ও এ ধরনের আরও যা আছে বা হতে পারে, তা সবই পরিহার করতে হবে। এ আয়াতটিতেও এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ

فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ -

হয় ভালোভাবে রাখো, না হয় অনুগ্রহপূর্বক সদ্ব্যবহারের সাথে ছেড়ে দেবে।
(সূরা বাকারা ঃ ২২৯)

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَانْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا -

যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দই কর, তাহলে জানবে, হয়ত তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করবে অথচ আল্লাহ্ তাতে বিপুল কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।

এ আয়াত প্রমাণ করে— স্বামী যদি স্ত্রীকে অপছন্দও করে, তবু তাকে রেখে দেয়াই পছন্দনীয় কাজ। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীসে এ তাৎপর্যেরই সমর্থন রয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, মুহাম্মাদ ইবনে খালিদ, মারূফ ইবনে ওয়াসিল, মুহারিব ইবনে দিসার, ইবনে উমর নবী করীম (স) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ -

আল্লাহ্‌র নিকট তালাক হচ্ছে সর্বাধিক ক্রোধ উদ্রেককারী হালাল কাজ।

আবদুল বাকী ইবনে কানে' মুহাম্মাদ ইবনে খালিদ, ইবনে উয়াজীদুন নীলি, সহলব ইবনুল উলা, গুয়ায়ব ইবনে বয়ান, ইমরাসুল কাতান, কাতাদাতা, আবূ তমীমাতা আল-হুজাইমী, আবূ মূসা আল-আশ্‌আরী সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

تَزَوَّجُوْا وَلَا تُطَلِّقُوْا فَانَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِيْنَ وَالذَّوَّاقَاتِ -

তোমরা বিয়ে কর; কিন্তু তালাক দিও না। কেননা স্বাদ আস্বাদন করে বেড়ানো পুরুষ ও নারীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না, ভালোবাসেন না।

এ হাদীসে উল্লিখিত নবী করীম (স)-এর কথাটি আয়াতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আয়াতে তালাক দেয়ার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে এবং ভালোভাবে স্ত্রীকে রাখাকে পছন্দ করা হয়েছে— তাকে যত অপছন্দই করা হোক-না-কেন। আল্লাহ্ আয়াতটিতে এ-ও জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমরা যা অপছন্দ করি, তা দিয়েই ধৈর্য সহকারে জীবন যাপন করায় বিপুল কল্যাণ নিহিত আছে। আয়াতটি আগেই উদ্ধৃত হয়েছে, যার অর্থ ঃ তোমরা হয়ত কোন জিনিস অপছন্দ কর, কিন্তু আল্লাহ্ তাতেই বিপুল কল্যাণ রেখেছেন।

অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ -

এটা সম্ভব যে, তোমরা একটি জিনিসকে অপছন্দ করবে অথচ আল্লাহ্ তাতেই তোমাদের জন্যে বিপুল কল্যাণ রেখে দিয়েছেন এবং তোমরা কোন জিনিস পছন্দ করবে, অথচ তা-ই তোমাদের জন্যে অত্যন্ত মন্দ ও ক্ষতিকর। (সূরা বাকারাহ ঃ ২১৬)

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا -

তোমরা হয়ত একজন স্ত্রীর স্থানে আর একজন স্ত্রীকে বদলাতে ইচ্ছা করবে অথচ তোমরা তাদের কোন একজনকে বিপুল সম্পদ দিয়ে দিয়েছ।

এ আয়াতের দাবি হচ্ছে— মহ্‌রানা স্ত্রীকে সহীহ্‌ভাবে মালিক বানিয়ে দেয়া ওয়াজিব এবং স্বামীকে তার স্ত্রীকে দেয়া কোন জিনিস-ই ফিরিয়ে নেয়া স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ এবং জানিয়ে দিয়েছে যে, স্ত্রীর জন্যে তা নিশ্চিত, তাকে বদলিয়ে দেয়া হোক কিংবা রেখেই দেয়া হোক। স্বামীর জন্যে স্ত্রীকে দেয়া জিনিস ফেরত নেয়ার কোন অনুমতি নেই। তবে আল্লাহ্‌ অন্যের যে মাল যেভাবে নেয়া জায়েয করেছেন সেভাবে নেয়া যেতে পারে। যেমন বলেছেন ঃ

اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ -

তবে যদি ব্যবসায় হয় তোমাদের দুই পক্ষে সম্মতির ভিত্তিতে হবে ....

অবশ্য আয়াতের এটাও দাবি যে, স্ত্রীর সাথে নিবিড় নিভৃতে মিলিত হওয়ার পর তাকে দেয়া কোন জিনিসই তার কাছ থেকে ফেরত নেয়া যাবে না। এটাই এমন দলীল যদ্দারা প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীর সাথে নিবিড় নিভৃতে মিলিত হওয়ার পর তালাক দিলে পূর্ণ মহ্‌রানা দিয়ে দিতে হবে। কেননা কোন দলীলের ভিত্তিতে বিশেষীকরণ করা না হওয়া পর্যন্ত সর্বাবস্থায়ই স্ত্রীকে দেয়া জিনিস ফিরিয়ে নেয়া নিষিদ্ধ থাকবে। আর সেই দলীলের বিশেষীকরণ হয়েছে আল্লাহ্‌র এ কথাটির দ্বারা ঃ

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ -

আর তোমরা যদি স্ত্রীদের তালাক দাও তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই, অথচ তোমরা তাদের জন্যে মহ্‌রানা সুনির্দিষ্টরূপে ধার্য করেছ, তাহলে তোমাদের নির্ধারিত পরিমাণের অর্ধেক দিতে হবে। (সূরা বাকারাহ ঃ ২৩৭)

এ আয়াতটি বলছে, নিবিড় একাকীত্বে মিলিত হওয়ার পূর্বে তালাক দিলে অর্ধেক মহ্‌রানা বাদ পড়ে যায়। কেননা নিবিড় নিভৃতে মিলিত হওয়ার পূর্বে তালাক দেয়ার অর্থই তাই।

এই নিবিড় একাকীত্বে (الخلوة) বলতে কি বোঝায়, সে বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। তার অর্থ কি শুধু স্পর্শ করা যেমন কুরআনে ব্যবহৃত শব্দ দ্বারা বাহ্যত মনে হয় কিংবা এই স্পর্শ বলতে যৌন সম্ভোগও বুঝিয়েছে? ব্যবহৃত শব্দ অবশ্য দুটি অর্থ-ই দেয়। কেননা হযরত আলী, উমর (রা) প্রমুখ সাহাবী আয়াতটির এ ব্যাখ্যাই করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এ স্পর্শ বলতে যৌন ক্রিয়া সম্পাদন বুঝেছেন। অতএব فَلَا تَأْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا তাহলে তোমরা তার কাছ থেকে কিছুই ফেরত নিও না— এ সাধারণ তাৎপর্যের কথাটির কোন বিশেষ অর্থ হবে না।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا -

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, যদি কেউ তার মহল তার স্ত্রীকে হেবা করে দেয়, তাও ফিরিয়ে নেয়ার কোন অধিকার তার নেই। কেননা তা তো সে তাকে দিয়ে দিয়েছে। আর কুরআনের আয়াত সাধারণভাবেই দেয়া কোন জিনিসই ফেরত নিতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছে, সেই দেয়া জিনিস মহরানাই হোক, কি অন্য কিছু। যে লোক তার স্ত্রীকে 'খুলা' তালাক দিয়েছে কোন মালের বিনিময়ে, অথচ সে তাকে তার মহ্‌রানা পূর্বেই আদায় করে দিয়েছে, সে তার মহরানা থেকে কিছুই ফিরিয়ে দেবে না। কেননা তা তো সে দিয়েই দিয়েছে সুনিশ্চিতভাবে। তা যে মাল-ই হোক-না-কেন, কোন বস্তুগত জিনিসই হোক, কি ব্যবহার্য কোন জিনিস। ইমাম আবূ হানীফা (রা) এ পর্যায়ে এ কথাই বলেছেন ।

যদি কেউ তার স্ত্রীর খরচাদি একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে আগে-ভাগেই দিয়ে দেয়, পরে সে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই স্ত্রীলোকটি যদি মরে যায়, তাহলে তাকে দেয়া কোন জিনিসই স্ত্রীর মীরাসে ফিরিয়ে নিয়ে ধরবে না। কেননা ফিরিয়ে না নেয়ার কথাটি ব্যাপক ও সাধারণ। কেননা হতে পারে, মরে যাওয়া স্ত্রীর জায়গায় সে আর একজন স্ত্রী গ্রহণ করবে সেই ফিরে পাওয়া জিনিস দ্বারা। আয়াতের বাহ্যিক অর্থে এ ব্যাপারটিও শামিল হয়েছে।

যদি বলা হয়, উক্ত কথার পর-ই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهُ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ -

আর কেমন করে তোমরা তা ফিরিয়ে নেবে, অথচ তোমরা পরস্পর গভীরভাবে ও (স্বামী-স্ত্রী হিসেবে) মিলিত হয়েছ।

তা প্রমাণ করে যে, শুরু সম্বোধনে যা দেয়ার কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে মহরানা। অন্য কিছু নয়। কেননা এ ধরনের কথা বিশেষভাবে মহরানা সম্পর্কেই বলা যেতে পারে।

জবাবে বলা যাবে, এটা হওয়া নিষিদ্ধ নয় যে, সম্বোধনের প্রথম দিকে সাধারণ ও ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ নামটি যতটা শামিল করে, তা সবই তার মধ্যে গণ্য। আর তার ওপর যা সংযোজিত হয়েছে, তা বিশেষ অর্থ জ্ঞাপক হবে। তাতে প্রথম ব্যবহৃত শব্দের বিশেষ অর্থবোধক হওয়া জরুরী হয় না। বিভিন্ন স্থানে আমরা এর দৃষ্টান্ত দেখিয়ে এসেছি। এ আয়াতটিও প্রমাণ করে যে, স্ত্রীর সাথে যৌন সম্ভোগ যদি হয়ে থাকে এবং তারপর তালাক সেই স্ত্রীর দিক থেকেই ঘটে কোন অপরাধের কারণে কিংবা কোন অপরাধ ছাড়া, তার প্রাপ্য মহরানা তাকে অবশ্যই দিতে হবে, তা বাতিল হয়ে যাবে না স্ত্রীর দিক দিয়ে তালাক সঙ্ঘটিত হলেও। আর আল্লাহ্ যে বিশেষভাবে স্ত্রী বদলের অবস্থার উল্লেখ করে স্ত্রীকে দেয়া জিনিস থেকে কোন কিছুই ফেরত নিতে নিষেধ করেছেন, তা সর্বাবস্থায়ই নিষিদ্ধ হওয়াকে শামিল করে। তার ফায়দা হল, লোকদের এ ধারণা দূর করা যে, তা জায়েয হবে যদি স্ত্রীর যৌনাঙ্গ হাসিল করার পর তালাকের কারণে স্বামীর হক্ প্রত্যাহৃত হয়। দ্বিতীয়টি প্রথমটির স্থানে দাড়িয়ে গেছে! অতএব স্ত্রীকে যে

মহরানা দিয়ে দেয়া হয়েছে, তা তো অবশ্যই। তাই এ অবস্থায়ও ফিরিয়ে নেয়ার নিষেধ কার্যকর থাকবে এবং তা সর্বাবস্থায়ই সাধারণভাবে পরিব্যাপ্ত হবে। কেননা স্ত্রীকে যা দিয়েছে তার কোন জিনিসই ফিরিয়ে নেয়া মুবাহ হতে পারে না, স্ত্রীর যৌনাঙ্গের ওপর স্বামীর হক্ শেষ হয়ে গেলেও নয়। তখন তো আরও বেশি করে তা ফেরত না নেয়া বাঞ্ছনীয়, স্ত্রীর যৌনাঙ্গ মুবাহ হওয়া স্বামীর হক অবশিষ্ট থাকা এবং তার ওপর তার নিজের তুলনায় স্বামীর মালিকত্ব অধিক হওয়া সত্ত্বেও।

স্বামীর স্ত্রীকে দেয়া কোন জিনিস ফেরত নেয়া নিষিদ্ধ হওয়াকে আল্লাহ্ তা'আলা অধিক তাগিদ করেছেন এভাবে যে, তিনি এ ফেরত নেয়াকে জুলুম বলেছেন। যেমন 'বুহ্তান'— মিথ্যা দোষারোপ। তা এমন মিথ্যা যা তার খবরদাতার ওপর আরোপিত হয়। যাকে তা বলা হবে, সে তদ্দ্বারা বড়ত্বের ভান করবে। এটা বরং মিথ্যার চাইতেও অধিক জঘন্য ও সাংঘাতিক লজ্জাকর। তাই স্বামী স্ত্রীকে যা দিয়েছে, তা ফেরত নেয়াকে 'বুহ্তান' সদৃশ বলা হয়েছে জঘন্যতার দিক দিয়ে। সেই কারণে কুরআনে তাকে বলা হয়েছে 'বুহ্তান' ও ইস্ম— মিথ্যা দোষারোপ ও পাপ।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا -

এবং তোমরা তা কেমন করে ফিরিয়ে নিতে পার, অথচ তোমাদের পরস্পর যৌন মিলন সঙ্ঘটিত হয়েছে এবং তার দরুন স্ত্রীরা তোমাদের নিকট থেকে শক্ত-দুশ্ছেদ্য চুক্তি নিয়ে নিয়েছে।

আবূ বকর বলেছেন ঃ ফরা উল্লেখ করেছেন الْإِفْضَاءُ শব্দটি ব্যবহৃত হয় নিবিড় নিভৃতে স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়াকে, যদিও ঠিক যৌন মিলন ও সম্ভোগ না-ও হয়। আভিধানিক অর্থহানির জন্যে ফরার কথাই অকাট্য দলীল। الْإِفْضَاءُ বলতে যখন নিবিড়-নিভৃতে স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া বোঝায়, তখন বোঝা গেল, এ নিবিড় নিভৃতে স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া ও তার পরে তালাক সঙ্ঘটিত হওয়ার পর স্ত্রীকে দেয়া জিনিস ফেরত নেয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে এ আয়াত। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ 'যদি তোমরা স্ত্রী বদল করতে— একজনকে তালাক দিয়ে আর একজনকে গ্রহণ করার ইচ্ছা করে থাক' বিচ্ছেদ ও তালাক বুঝিয়েছে। আর الْإِفْضَاءُ - الْفَضَاءُ থেকে গৃহীত। তা বোঝায় এমন স্থান, যেখানে তাতে অবস্থিত কোন জিনিস ধরার পথে প্রতিবন্ধক নেই। স্ত্রীর সাথে নিবিড় একাকীত্বে মিলিত হওয়াকে এজন্যেই إفْضَاءُ বলা হয়েছে। কেননা সেখানে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম ঘটানোর পথে কোন বাধা নেই। কেউ কেউ বলেছেন, الْفَضَاءُ অর্থ প্রশস্ততা, আর এই প্রশস্ততার মধ্যে অবস্থান গ্রহণকে বলা হয় أَفْضَى —যা চাইবে তা করাই সেখানে সম্ভব। শব্দের এ সংগঠনের দরুন নিবিড়-নিভৃতে স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়াকেও إفْضَاءُ বলা খুবই সঙ্গত। কেননা সেখানে স্বামী স্ত্রীর সাথে যৌন-সঙ্গমের নির্বিঘ্ন সুযোগ ও প্রশস্ততা পেয়ে থাকে। অথচ স্ত্রীর নিকট পৌঁছাই এর

পূর্বে অনেক কষ্টসাধ্য ছিল পরিবেশ অনুকূল না হওয়ার কারণে। এ কারণে নিবিড় নিভৃতে স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া الخلوة কে افضاء বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন যে, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক নিবিড় নির্ভৃতে মিলিত হওয়ার পর স্ত্রীকে দেয়া কোন জিনিসই ফেরত নেয়া কোন ক্রমেই জায়েয নয়। এ নিভৃতে মিলিত হওয়ার অর্থ স্ত্রী-সঙ্গম হওয়ার অবস্থায় পৌছা, যেখানে স্ত্রী নিজেকে স্বামীর নিকট সমর্পিত করতে এবং স্বামীর জন্যে তার নিকট পৌছার সুযোগ করে দিতে পারে। তাই বাহ্যিক অর্থেই আয়াতটি স্ত্রীকে স্বামীর দেয়া কোন জিনিস ফেরত নিতে নিষেধ করেছে— বিশেষ করে বিদ্রোহটা যদি স্বামীর দিক থেকে হয়। কেননা আল্লাহ্র কথা 'তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থানে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করার ইচ্ছা করে থাক' প্রমাণ করে যে, স্বামী-ই এখানে বিচ্ছেদ ঘটানোর উদ্যোক্তা, স্ত্রী নয়। এ কারণে হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন ঃ বিদ্রোহটা যদি স্বামীর দিক থেকে হয়, তাহলে স্ত্রীকে দেয়া মহরানা থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া মাক্রূহ— অপছন্দনীয় কাজ। আর যদি বিদ্রোহটা স্ত্রীর দিক থেকে হয়, তাহলে তা স্বামীর জন্যে জায়েয। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ -

এবং তোমরা স্ত্রীদের দেয়া জিনিস থেকে কিছু অংশ নিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটক করে রাখবে না। তবে স্ত্রীরাই যদি কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জতার কাজ করে বসে তাহলে ভিন্ন কথা .....।

ইবনে আব্বাসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আয়াতে الفاحشة অর্থ বিদ্রোহ। অন্যরা বলেছেন, এর অর্থ 'যিনা'। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ.... فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ -

তোমরা যদি ভয় পাও এজন্যে যে, তারা দুজন— স্বমী-স্ত্রী— আল্লাহ্-নির্ধারিত সীমা রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে তাদের দুজনার কোন দোষ হবে না স্ত্রী যে বিনিময় দিয়ে নিজেকে মুক্ত করবে তাতে। (সূরা বাকারাহ ঃ ২২৯)

কোন কোন লোক আবার বলেছেন, এ আয়াতটি মনসূখ হয়েছে এ আয়াত দ্বারা ঃ যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থানে অপর স্ত্রী গ্রহণ করতে ইচ্ছা করে থাক, তাহলে .....

কিন্তু এ কথা ভুল। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমরা যদি একজন স্ত্রীর স্থানে বদল করে আর একজন স্ত্রী নিয়ে নিবার ইচ্ছা করে থাক' থেকে স্বামীর দিক থেকে বিদ্রোহ হওয়া বোঝায়। আর আল্লাহ্র কথা ঃ 'তারা দুজন আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা রক্ষা করবে না বলে যদি তোমরা ভয় বোধ কর' অপর একটি অবস্থার কথা বোঝায়, প্রথম অবস্থায় বোঝায় না। আর সে অবস্থাটা হচ্ছে স্ত্রীর দিক থেকে বিদ্রোহ হওয়ার অবস্থা। এজন্যেই স্ত্রীর বিনিময় মূল্য দেয়ার কথা এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এ অবস্থাটা ওটা থেকে ভিন্ন। আর এ দুটি অবস্থার প্রত্যেকটিই এক-একটা হুকুমের সাথে বিশেষভাবে জড়িত। অন্যটি সেখানে নেই।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيْثَاقًا غَلِيْظًا -

এবং স্ত্রীরা তোমাদের নিকট থেকে অত্যন্ত শক্ত ও দৃঢ় চুক্তি নিয়ে নিয়েছে।

আল-হাসান, ইবনে সীরীন, কাতাদাতা, দহাক ও সুদ্দী বলেছেন, তা হচ্ছে ঃ

فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْتَسْرِيْعٌ بِاحْسَانٍ -

অতঃপর হয় ভালোভাবে রেখে দেবে, না হয় দয়া সহকারে ছেড়ে দেবে।

(সূরা বাকারাহ ঃ ২২৯)

কাতাদাহ বলেছেন, ইসলামের শুরুতে বিবাহকারীকে বলা হতো ঃ আল্লাহ তোমার ওপর এই কর্তব্য চাপিয়ে দিয়েছেন যে, 'হয় ভালভাবে রাখবে, না হয় দয়া সহকারে ছেড়ে দেবে।' মুজাহিদ বলেছেন, বিয়ের যে বাক্য দ্বারা স্বামীর জন্যে স্ত্রী-অঙ্গ হালাল হয়, তার কথাই বলা হয়েছে, অন্যরা বলেছেন তা হচ্ছে নবী করীম (স) এর কথা ঃ

اِنَّمَا اَخَذْتُمُوْهُنَّ بِاَمَانَةِ اللّٰهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى -

বিয়ে আর কিছু নয়, তা হল– তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্র আমানত স্বরূপ গ্রহণ করে থাক এবং আল্লাহ তা'আলার কালেমার দ্বারাই তোমরা স্ত্রীদের যৌন-অঙ্গ হালাল করে নিয়ে থাক।

## মুহাররম মেয়েলোক

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ -

তোমাদের পিতা-দাদার বিয়ে করা মেয়েলোকদেরকে তোমরা বিয়ে করবে না।

আবূ বকর বলেছেন, আবূ উমর– সালবের গোলাম– আমাদেরকে জানিয়েছেন, বলেছেন সালবের সূত্রে কুফীদের থেকে এবং আল-মুবরাদের মাধ্যমে বসরাবাসীদের থেকে আমরা যেন জ্ঞান লাভ করেছি, তা হল, النكاح বিবাহ-এর আভিধানিক অর্থে দুটি জিনিসকে একত্রিতকরণ বোঝায়। আরবরা বলে ঃ

اَنْكَحْنَا الْفَرَا فَسَنَرٰى هُوَ مِثْلَ ضَرَبُوْهُ لِلْاَمْرِ يَتَشَاوَرُوْ فِيْهِ -

ফরা আমাদেরকে বিবাহ করিয়েছে। ফলে আমরা শীঘ্রই এমন দৃষ্টান্ত দেখব, যার দৃষ্টান্ত তারা এমন ব্যাপারে জন্যে দিয়েছে, যার জন্যে তারা পরস্পর পরামর্শ করে এবং যে জন্যে তারা একত্রিত হয়। পরে দেখে, কোন জিনিস থেকে তার তাৎপর্য উৎসারিত হয়, আমরা পুরুষ গাধা ও স্ত্রী গাধাকে একত্রিত করে দিয়েছি।

আবূ বকর বলেছেন, প্রকৃত অভিধানে বিয়ের নামটি দুটি জিনিসকে একত্রিতকরণ বুঝবার জন্যে তৈরী হয়েছে। পরে আমরা তার ব্যবহার এরূপ পেয়েছি যে, লোকেরা মূল যৌন-সঙ্গমকেই 'নিকাহ' নামে অভিহিত করেছে, যাতে আকদ্ নেই। আল-আশা বলেছেন ঃ

বিবাহিতা, কিন্তু মহরানা দেয়া এবং অন্য একটি, তাকে বলা হয় ফাদেহ।

অর্থাৎ মহরানা না দিয়ে যার সাথে সঙ্গম করা হয়, সেই দাসীকে, বহু স্বামীহীনা মেয়েলোককে আমার তীরগুলো বিবাহিতা করেছে। আর অপর মেয়েলোক, চাচা মামার ওপর দুঃখ প্রকাশ করে।

অপর একজনের কথা ঃ

তারা বিয়ে করেছে পূর্বে অবিবাহিত যুবককে। অথচ ওরা নিয়ামত প্রাপ্ত। ওরা খুব তাড়াহুড়া করেছে, অথচ ওরা-আন্‌কোরা, ওদের খতনা হয়নি।

এ সব কথায়ও যৌন সঙ্গমের কথাই বলা হয়েছে। 'নিকাহ' শব্দের অর্থে যৌন সঙ্গম হওয়ায় কারোর দিক থেকে কোন নিষেধ নেই। অবশ্য তাতে আক্‌দও শামিল রয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلُ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ -

তোমরা যখন ঈমানদার মেয়েলোককে বিবাহ কর। পরে তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করার আগেই তালাক দিয়ে দাও ...... (সূরা বাকারাহ ঃ ২৩৭)

এখানে 'নিকাহ' অর্থ বিয়ের আক্‌দ করা, স্ত্রী সঙ্গম নয়। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَنَا مِنْ نِكَاحٍ وَلَسْتُ مِنْ سِفَاحٍ -

আমি একজন বিবাহকারী, স্বেচ্ছাচারী যিনাকার নই।

এ কথাটি দ্বারা দুটি তাৎপর্য জানা যায়। একটি নিকাহ্ এমন বিয়ের নাম, যা আক্‌দ-এর ভিত্তিতে সজ্ঘটিত হয়। আর দ্বিতীয় তাৎপর্য, এ শব্দটি আক্‌দ ছাড়া যৌন সঙ্গমকেও শামিল করে। তা যদি না হতো, তা হলে রাসূলের কথা শুধু 'আমি বিবাহকারী' বলাই যথেষ্ট ছিল। কেননা 'উচ্ছৃঙ্খল যিনা' নিকাহ অর্থ শামিল করে না কোন অবস্থায়ই। বোঝা গেল, প্রথমে বিবাহের কথা বলে তার পরে উচ্ছৃঙ্খল যিনাকারী না হওয়ার কথা বলায় প্রমাণিত হয়েছে যে, বিবাহ— নিকাহ— শব্দটি দুটি ব্যাপারকেই বোঝায়। এ কারণে রাসূলের উক্ত কথাটির তাৎপর্য দাঁড়াল, তিনি 'হালাল আক্‌দকারী' সেই বিবাহে তিনি নেই, যাতে সিফাহ্ বা উচ্ছৃঙ্খল যিনা রয়েছে। এখানে যা বলা হল, তা থেকে প্রমাণিত হল যে, নিকাহ্ নামটি 'আক্দ' ও যৌন সঙ্গম— দুটি ব্যাপারই বোঝায়। আর যে আভিধানিক তাৎপর্যের উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বে করেছি, তা হল, তা দুটি জিনিসকে একত্রিতকরণের নাম। এ একত্রিতকরণ যৌন সঙ্গম দ্বারাই হতে পারে বিয়ের আক্‌দ ছাড়াও। কেননা 'আক্‌দ' হলেই কার্যত দুটি জিনিস একত্রিত হয়ে যায় না। কেননা এ কথাটি একসাথে দুজনের থেকেই হয়ে থাকে, যা শুধু কথার মধ্যে সীমিত, কার্যত ও প্রকৃত একত্রিতকরণ হয় না। বোঝা গেল, নিকাহ্-এর প্রত্যক্ষ ও প্রকৃত অর্থ যৌন

সঙ্গম, আর পরোক্ষ অর্থ, আক্‌দ। তবে শুধু আকদকেও 'নিকাহ' বলা হয়, কেননা তা এমন কারণ, যার দরুন যৌন সঙ্গম পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব হয়। এটাকে বলা হয়, অন্য একটির নামে কোন জিনিসের নামকরণ, যা কোন কারণে হয় অথবা হয় তার পার্শ্ববর্তী হওয়ার দরুন। যেমন সদ্যপ্রসূত বাচ্চা মাথায় করে যে চুল নিয়ে আসে, তাকেই আকীকা বলা হয়। পরে তা কামিয়ে ফেলার সময় যে ছাগী যবেহ করা হয়, তার নাম রাখা হয়েছে 'আকীকা'। যেমন الراوية নাম হচ্ছে সেই উটের, যা পাথেয় বহন করে। পরে সেই পাথেয়কেই الراوية বলা হতে থাকে উট বাহিত পাথেয়কে। কেননা তা ওরই সাথে মিলিত ও জড়িত, তা তারই নিকটবর্তী। আবুন-নজম বলেছেন ঃ

تَمْشِى مِنَ الرِّدَّةِ مَشْىَ الْحُفَّلِ - مَشْىَ الرَّوَايَا بِالْمَزَادِ الْاَثْقَلِ -

এর আর একটি উপমা যেমন الغائط শব্দটি। এটি নাম হল জমিনের নিশ্চিন্ততাপূর্ণ স্থানের। পরে পরোক্ষ অর্থে মানুষের ত্যাগ করা মল ও প্রস্রাবকে বোঝাতে থাকে।

প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে— হাজত পূরণের জন্যে লোকেরা উক্ত ধরনে স্থানে যায়। এভাবে এরূপ নামকরণের অনেক দৃষ্টান্ত আরবী ভাষায় রয়েছে। 'নিকাহ' শব্দটিও প্রকৃতপক্ষে ও প্রত্যক্ষভাবে যৌন সঙ্গম অর্থ দেয়। মূল অভিধানে শব্দটি এজন্যেই গঠিত। আর পরোক্ষ অর্থে তা 'আক্‌দ' এর নাম। কেননা এ 'আক্‌দ' দ্বারাই তো যৌন সঙ্গম কাজটি সম্ভব হয়। 'আক্‌দ' হল যৌন সঙ্গমের কারণ। 'আকদ'-এর এ পরোক্ষ নামকরণে বোঝা যায় ক্রয়-বিক্রয়, হেবা ইত্যাদি যাবতীয় কাজকে বোঝাবার জন্যে কখনই নিকাহ শব্দের ব্যবহার হয় না। যদিও এ আক্‌দই মাধ্যম হয় দাসীর সাথে যৌন সঙ্গম মুবাহ্ হওয়ার জন্যে। কেননা যৌন সঙ্গম মুবাহ হওয়ার জন্যে এ 'আক্‌দ' বিশেষ অর্থজ্ঞাপক নয়। কেননা এসব চুক্তি তার ব্যাপারেও হতে পারে, যার সাথে যৌন সঙ্গম হারাম। যেমন দুই বোন, বংশের বোন, স্ত্রীর মা প্রভৃতি। যে আক্‌দ যৌন সঙ্গম মুবাহ হওয়ার সাথে বিশেষভাবে যুক্ত, তার নাম নিকাহ। কেননা যার সাথে যৌন সঙ্গম হালাল নয়, তার সাথে 'নিকাহ' সহীহ্ নয়। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, 'নিকাহ' প্রকৃত যৌন সঙ্গমের নাম আর পরোক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয় আক্‌দ বোঝাবার জন্যে। আমরা এই যে ব্যাখ্যা দিলাম, এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَلَاتَنْكِحُوْا مَانَكَحَ اٰبَاءُ كُمْ مِنَ النِّسَاءِ 'তোমার বাপ-দাদা যে মেয়েলোককে বিবাহ করেছে, তোমরা তাকে বিবাহ্ করবে না— কে যৌন সঙ্গম অর্থে ব্যবহার করতে হবে। তার ফলে পিতা যে মেয়েলোকের সাথে সঙ্গম করেছে, তার সাথে যৌন সঙ্গম করা হারাম প্রমাণিত হল। কেননা যখন প্রমাণিত হল যে, 'নিকাহ্' যৌন সঙ্গমকে বলা হয়, তখন তার মধ্যে যা মুবাহ তাই বিশেষভাবে বোঝায় না, নিষিদ্ধ যৌন সঙ্গমও বোঝায়। যেমন মারা— আঘাত করা, হত্যা করা, স্বয়ং যৌন সঙ্গম ব্যবহারকালে তা কেবল মুবাহ আঘাত, মুবাহ হত্যা ও মুবাহ যৌন সঙ্গমই বোঝাবে না। বরং তা দুটো ব্যাপারকেই বোঝাবে, যতক্ষণ কোন দলীল দ্বারা তার বিশেষীকরণ প্রমাণিত না হবে।

আবুল হাসান বলতেন, আল্লাহ্‌র কথা مانكح اباءكم যা নিকাহ করেছে তোমাদের বাপ-দাদা'— এর অর্থ যৌন সঙ্গম করা আক্‌দ নয়। এটা শব্দের প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ অর্থ ও শব্দ বলে 'আকদ' বোঝাতে চাওয়া হয়নি। কেননা একটি শব্দের একটা অর্থ প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ—

একই অবস্থায় সেই শব্দের পরোক্ষ ও অপ্রকৃত অর্থ হওয়া সম্ভব নয়। তবে পিতার সঙ্গমকৃতা মেয়েলোকের সাথে বিয়ের আক্‌দ করাও হারাম এ আয়াত ভিন্ন অপর একটি আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।

মা ও মেয়ে যৌন সঙ্গমে একত্রিত করা হারাম হওয়া সম্পর্কে মনীষিগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। সাঈদ ইবনে আবূ আরুবা, কাতাদাতা, আল-হাসান ইমরান ইবনে হুসায়ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর মার সাথে যিনা করে, তাহলে তার স্ত্রী তার প্রতি হারাম হয়ে যাবে। আল-হাসান ও কাতাদাতাও এমত প্রকাশ করেছেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, সালিম ইবনে আবদুল্লাহ, মুজাহিদ, আতা, ইবরাহীম, আমের, হাম্মাদ, আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, জুফার, সওরী ও আওজায়ী প্রমুখেরও এ মত। কন্যার হারাম হওয়ার ব্যাপারে— তার মার সাথে যৌন সঙ্গম তার কন্যার সাথে বিবাহ হওয়ার আগে হয়েছে কি পরে হয়েছের তার মধ্যে তাঁরা কোন পার্থক্য করেন নি।

ইকরামা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর মা'র সাথে যিনা করল নিজ স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম সঙ্ঘটিত হওয়ার পর, সে দুটি হারাম কাজ একসাথে করেছে।[১] তাতে তার নিজের বিবাহিতা স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে না তার জন্যে। তাঁর থেকে পাওয়া অপর একটি বর্ণনায় তিনি বলেছেন ঃ

لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ -

হারাম কাজ হালালকে হারাম করে না।

ইমাম আল-আওজায়ী উল্লেখ করেছেন আতা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাসের এ হারাম কাজ 'হালালকে হারাম করে না' কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন এ ভাবে ঃ এক ব্যক্তি যদি কোন মেয়েলোকের সাথে যিনা করে, তাহলে এ যিনার কারণে সে মেয়েলোকটি পুরুষটির জন্যে হারাম হয়ে যাবে না।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইবনে আব্বাসের এই যে কথাটি ইকরামা বর্ণনা করেছেন, যাতে বলা হয়েছে ঃ 'মা'র সাথে যিনা তার কন্যাকে হারাম করে না'— তা আতার মত-সম্মত ছিল না। কেননা তা যদি তার নিকট প্রমাণিত কথা হতো, তাহলে তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিত না। জুহরী, রবীআতা, মালিক, লায়স ও শাফেয়ী বলেছেন ঃ যিনার কারণে মেয়েটি এবং তার মা কেউ-ই হারাম হয়ে যাবে না। উসমান আলবত্তী বলেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর মার সাথে যিনা করল, সে পর্যায়ের কথা হল হারাম হালালকে হারাম করে না। কিন্তু যদি মার সাথে যিনা করে তার কন্যাকে বিয়ে করার পূর্বে কিংবা কন্যার সাথে যিনা করল তার মাকে বিয়ে করার পূর্বে তাহলে সে হারাম হয়ে যাবে। এই মতে বিয়ের পূর্বে ও পরে স্ত্রীর মার সাথে যিনার হুকুমের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে।

এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে লাওয়াতাত করল। তাতে কোন একজনের মা অপর জনের জন্যে হারাম হয়ে যাবে? ..... এ বিষয়ে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। হানাফী

১. একটি হারাম কাজ— যিনা। আর অন্যটি নিজ স্ত্রীর মার সাথে যিনা।

ফিকাহবিদগণ বলেছেন, না, তা হারাম হয়ে যাবে না। আবদুল্লাহ ইবনুল হুসায়ন বলেছেন, এটাও একটি মেয়েলোকের সাথে যিনা করার মতই তার মা ও কন্যার হারাম হওয়ার দিক দিয়ে। বলেছেন, যিনার কারণে যে মেয়েলোক হারাম হল, লাওয়াতাতের দ্বারাও সে মেয়েলোক হারাম হবে। ইবরাহীম ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি সুফিয়ান সওরীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এক ব্যক্তি কোন এক বালকের সাথে খেলা করে— সে কি তার মাকে বিয়ে করতে পারে ? তিনি জাবাবে বললেন, না এবং বলেছেন, আল-হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, এ ব্যক্তির এমন একটি মেয়েলোককে বিয়ে করা মকরুহ, যার পুত্রের সাথে সে খেলা করেছে। দুইজন বালক— যারা একজন অপরজনের সাথে লাওয়াতাত করেছে— তাদের একজনের— যার সাথে লওয়াতাত করেছে তার কন্যা সন্তান জন্মিলে ক্রিয়াকারী তাকে বিবাহ করতে পারবে না— ইমাম আওজায়ী মত দিয়েছেন।

আবূ বকর বলেছেন আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমাদের পিতা যে মেয়েলোককে বিয়ে করেছে, তোমরা তাকে বিয়ে করবে না' সেই স্ত্রীলোক বিয়ে করা হারাম করে দিয়েছে তার জন্যে যার পিতা সেই মেয়েলোকটির সাথে যিনার সঙ্গম করেছে। কেননা 'নিকাহ' শব্দটি তার প্রকৃত অর্থেই এ তাৎপর্য বহন করে। অতএব তার এ অর্থ গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। পিতার সঙ্গম সম্পর্কে যখন এ কথা প্রতিষ্ঠিত হল, তখন স্ত্রীর মা কিংবা তার কন্যার সাথে যিনার সঙ্গম হলেও স্ত্রী অনুরূপভাবে হারাম হয়ে যাবে। কেননা এ দুটি অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য কেউ করেনি।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ -

তোমাদের ক্রোড়ে পালিতা তোমাদের সঙ্গমকৃতা স্ত্রীদের কন্যাও হারাম।

উক্ত কথাকেই সত্য প্রমাণ করে। আয়াতে الدخول শব্দটি যৌন সঙ্গম বোঝায়। তা সর্ব প্রকারের যৌন সঙ্গম পরিব্যাপ্ত, তা মুবাহ হোক কি নিষিদ্ধ। নিকাহ হোক কি সিফাহ-উচ্ছৃঙ্খল যিনা। অতএব কন্যা হারাম হওয়া অবশ্যম্ভাবী, তা তার মাকে বিয়ে করার আগে হোক— কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ اللاتى دخلتم যাদের সাথে তোমরা যৌন সঙ্গম করেছ। এ থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, এই دخول অর্থ যৌন সঙ্গম। আর আয়াতের তা-ই মূল বক্তব্য। دخول নামটি বিয়ে করার পরে করা সঙ্গমই কেবল বোঝায় না বিশেষভাবে, অন্য ধরনের সঙ্গম থেকে আলাদা করে। যেমন কেউ যদি কারোর মার সাথে সঙ্গম করে সে তার ক্রীতদাসী বলে, তা হলেও এই মার কন্যা তার জন্যে চিরন্তনভাবে হারাম হয়ে যাবে। আয়াতের এটাই সিদ্ধান্ত। তেমনি যদি কোন মেয়ের সাথে অসহীহ্ বিবাহের (نكاح فاسد) ভিত্তিতে সঙ্গম করে, তাহলেও সে কারণে তার কন্যা তার জন্যে হারাম হবে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, الدخول বলতে যৌন সঙ্গম বোঝায় তা কোনরূপ বিয়ের পরে হোক কিংবা অন্য কোনভাবে, সর্বক্ষেত্রেই এ হুকুম কার্যকর হবে, কোন প্রকারের সঙ্গমকে তা বিশেষভাবে বোঝায় না।

একটু চিন্তা করলে এ কথাও প্রমাণিত মনে হবে যে, সঙ্গমই হারামকরণে আক্‌দ অপেক্ষাও অধিক তাগিদকারী। কেননা কোন মুবাহ সঙ্গমও এমন নেই, যা এ হারামকরণের কারণ হয়ে

না দাঁড়াবে। অথচ সহীহ্ আক্দ কোন মেয়েলোকের সাথে হলে এবং সঙ্গম না হয়ে থাকলে তার মেয়ে শুধু এ আকদ-এর কারণেই হারাম হয়ে যাবে না। কিন্তু যদি সঙ্গম হয়, তাহলে অবশ্য হারাম হবে। ফলে আমরা জানলাম যে, এ হারামকরণে সঙ্গম সজ্ঘটিত হওয়াই মূল 'ইল্লাত' কারণ। তাই তা যে ভাবেই ঘটুক, তা অবশ্যই হারাম করবে। তা মুবাহ্ হিসেবে হোক, কি নিষিদ্ধভাবে। কেননা হারামকরণ যথার্থভাবে সঙ্গম হওয়া ছাড়া অন্য কোন কারণে হয় না। তাই 'নিকাহ' শব্দে এ অর্থ দুটি শরীক। তাছাড়া অবশ্যই হারাম হবে। উপরন্তু সন্দেহক্রমে সঙ্গম হলে বা দাসী হওয়ার কারণে সঙ্গম হোক, দুটোতেই তার কন্যা হারাম হবে, যদি বিয়ের আকদ ছাড়াও তা হয়। মোটকথা, যে ভাবেই ঘটুক, সঙ্গম হলেই হারাম হবে। তাই আরও অধিকভাবে হারাম হবে যদি সঙ্গমটা হারাম যিনা হয়। কেননা সঙ্গমটা যথার্থভাবে ঘটেছে।

যদি বলা হয়, দাসী হওয়ার কারণে ও সন্দেহক্রমে সঙ্গম হয়, তাও হারাম করবে। কেননা এ উভয় দিক দিয়ে সন্তান জন্মিলে বংশধারা প্রমাণিত হবে। কিন্তু যিনার ফলে সন্তান জন্মিলে বংশধারা প্রমাণিত হবে না। অতএব তদ্দরুন কারোরই হারাম হওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

জবাবে বলা যাবে, এ ব্যাপারে বংশধারা প্রমাণিত হোক না হোক, হারাম হওয়ার ব্যাপারে তার কোন প্রভাব নেই। কেননা ছোট বয়সের বালক যে যথার্থভাবে সঙ্গম কার্যে সক্ষম নয়, যদি কোন মেয়েলোকের সাথে সঙ্গম করে, তাহলে সেই মেয়েলোকটির মা ও কন্যা তার জন্যে হারাম হয়ে যাবে। তার সাথে বংশধারা প্রমাণিত হওয়ার তো সম্পর্ক নেই। যদি কেউ কোন মেয়েলোকের সাথে নিকাহ্র আকদ করে, তাহলে যৌন সঙ্গমের আগেও বংশধারা প্রমাণিত হবে। এমন কি স্ত্রী যদি কোন সন্তান কোলে করে নিয়ে আসে অথচ স্বামীর সাথে তার সঙ্গম হয়নি, তবুও। আকদ-এর ছয় মাস পরে হলেও বংশধারা প্রমাণিত হবে। কন্যার হারাম হওয়ার সাথে নিছক আকদ-এর কোন সম্পর্ক নেই। আমরা যখন এ অবস্থাও দেখতে পাচ্ছি যে, সঙ্গম হয়েছে, কিন্তু বংশধারা তা রক্ষা পায়নি, সেই সঙ্গমেও কন্যা হরাম হয়ে যাবে। আকদ হবে, বংশধারা প্রমাণিত হবে; কিন্তু তা সত্ত্বেও কন্যা হারাম হবে না। এ থেকে আমরা জানলাম যে, এ ক্ষেত্রে বংশ প্রমাণিত হওয়ার কোন ভূমিকা নেই। এ ব্যাপারে গণ্য করার মত একটা জিনিস-ই আছে। তা হল শুধু সঙ্গম কার্যটি, অন্য কিছুর নয়।

উপরন্তু তাদের ও আমাদের মাঝে এ বিষয়েও কোন মতপার্থক্য নেই যে, কেউ যদি তার দাসীকে যৌন কামনা সহকারে শুধু স্পর্শ করে, তবে তার জন্যে সেই দাসীর মা ও কন্যা হারাম হয়ে যাবে। অথচ শুধু স্পর্শ করার কোন ভূমিকা নেই বংশধারা প্রমাণের জন্যে। এ কথা প্রমাণ করে যে, হারাম হওয়ার হুকুমটা বংশধারা প্রমাণিত হওয়ার ওপর কিছুমাত্র নির্ভরশীল নয়। হারাম হওয়ার ব্যাপার ঘটবেই বংশধারা প্রমাণিত হলেও। আর তা সম্ভব হবে বংশধারা প্রমাণিত না হলেও।

এ আলোচনার দ্বারা হানাফী ফিকাহবিদদের মত সহীহ্ প্রমাণিত হয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি, আল্লাহ্ কখনও যিনার ব্যাপারটির ওপর কঠোর আক্রোশ প্রকাশ করছেন, সেজন্যে রজমের শাস্তি সাব্যস্ত করে। আবার কখনও দেখছি, সেজন্যে দোররা বাধ্যতামূলক করেছেন এবং সেজন্যে জাহান্নামের অশুভ পরিণতির ভীতি প্রদর্শন করছেন এবং তার সাথে বংশধারা সংযুক্ত

করছেন। এসব তাঁর হুকুমের কঠোরতাই প্রমাণ করে। অতএব হারাম হওয়ার আবশ্যিক হয়ে পড়বে অধিক উত্তম ভাবে, কেননা হারামকে বাধ্যতামূলক করণও এক প্রকারের কঠোরতা।

যে ব্যক্তি আরাফায় অবস্থান গ্রহণের পূর্বে নিজ স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করল, তার হজ্জ বাতিল হয়ে গেল বলে আল্লাহ্ হুকুম দিয়েছেন, এ যখন সত্য, তখন যিনাকারের হজ্জ যে বাতিল হবে, তা তো আরও অধিক নিশ্চিত। হজ্জ বাতিল হয়ে যাওয়ার ব্যাপার প্রমাণ করে হজ্জের সময় স্ত্রী-সঙ্গম হারাম। অনুরূপভাবে আল্লাহ যখন হুকুম দিয়েছেন, হালাল সঙ্গমের দ্বারা তার (যার সাথে সঙ্গম হয়েছে) মা ও কন্যা হারাম হওয়া একান্তই অনিবার্য, তাই যিনার কারণে এ হারাম হওয়াটা তাঁর হুকুমের কঠোরতাই প্রমাণ করে। ইমাম শাফেয়ী মনে করেছেন, ভুলবশত যে হত্যা করল তার ওপর যখন আল্লাহ্ কাফ্ফারা ওয়াজিব করেছেন, তখন ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারীর কাফ্ফারা দেয়া আরও বেশিভাবে বাধ্যতামূলক হবে, এটাই স্বাভাবিক। কেননা ইচ্ছাপূর্বক মানুষ হত্যা ভুলবশত হত্যার তুলনায় অধিক মারাত্মক কাজ। এটা অবশ্যই বিবেচ্য। এমনিভাবে এটাও বিবেচ্য যে, যৌন সঙ্গম যিনা হিসেবে হোক, কি অন্যভাবে, হজ্জ, রোযা বিনষ্ট হওয়া ও গোসল ওয়াজিব হওয়ার দিক দিয়ে মূল হুকুমে কোনই পার্থক্য হয় না। তাই তার দরুন, সেই মেয়েলোকটির মা ও কন্যার তার জন্যে হারাম হওয়ার ব্যাপার পার্থক্যহীন।

যদি বলা হয়, জায়েয সঙ্গম হলে মহরানা দেয়া বাধ্যতামূলক হয়; কিন্তু যিনার সাথে মহরানার কোন সম্পর্ক নেই।

জবাবে বলা যাবে, যিনা হলে রজম কিংবা দোররা বাধ্যতামূলক, তা টাকা-পয়সা দেয়া ওয়াজিব হওয়ার তুলনায় অনেক বেশি কঠোর। আর মাল— টাকা-পয়সা ও দণ্ড দুটিই সঙ্গমের পরেই উপস্থিত হয়। কেননা যখনই দণ্ড ওয়াজিব হবে, তখন আর মহরানার প্রশ্ন উঠবে না। আর যখনই মহরানা দেয়া বাধ্যতামূলক হবে, তখন দণ্ডের কারণ থাকবে না। বোঝা গেল, দুটিই বিকল্প হিসেবে উপস্থিত, একটি অপরটির স্থান দখল করে। দণ্ড যখন বাধ্যতামূলক হবে, তা-ই স্থলাভিষিক্ত হবে টাকা-পয়সার, যা সঙ্গমের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই এদিক দিয়ে দুটির মধ্যে পার্থক্য নেই। এ পর্যায়ে কেউ একটি হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করতে পারে। হাদীসটি আবদুল বাকী মুহাম্মাদ ইবনুল লায়সুজজরী, ইসহাক ইবনে বহ্লুল, আবদুল্লাহ ইবনে নাফে' আল-মাদানী আল মুগলীরা ইবনে ইসমাইল ইবনে আইয়ূব ইবনে সালমাতাজ্ জুহরী— ইবনে শিহাবুজ জুহরী-উরওয়াতা, আয়েশাতা (রা) সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা বলেছেন, রাসূলে করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ এক ব্যক্তি কোন মেয়েলোকের পেছনে হারাম ভাবে চলে। সে কি সেই মেয়েটির মাকে বিয়ে করতে পারে ? কিংবা মার পিছু বলে, সেই ব্যক্তি কি তার কন্যাকে বিয়ে করতে পারে? জবাবে রাসূলে করীম (স) বলেছিলেন ঃ

لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ اِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ -

হারাম হালালকে হারাম করে না। হারাম করে তা, যা বিয়ের মাধ্যমে হয়।

এ হাদীসটিও দলীল হিসেবে কেউ পেশ করতে পারে, যা ইসহাক ইবনে মুহাম্মাদুল ফুরুভী

আবদুল্লাহ ইবনে উমর নাফে ইবনে উমর সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ -

হারাম হালালকে হারাম করে না।

উমর ইবনে হিফ্স উসমান ইবনে আবদুর রহমান, জুহরী, উরওয়াতা, আয়েশাতা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَايُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ -

হারাম হালালকে বিনষ্ট করে না।

কিন্তু হাদীস সম্পর্কে জ্ঞানীদের নিকট এসব বর্ণনাই সম্পূর্ণ বাতিল, গ্রহণ-অযোগ্য। এসব হাদীসের বর্ণনাকারীরা বিশ্বাসযোগ্য নয়। মুগীরা ইবনে ইসমাঈলের নাম বর্ণনাকারীদের মধ্যে শামিল। কিন্তু সে অজ্ঞাত পরিচয় (مجهول) ব্যক্তি। সে কারুরই পরিচিত নয়। তার বর্ণনার ভিত্তিতে শরীয়াতের হুকুম প্রমাণিত হতে পারে না। তেমনি উমর ইবনে হাফসও অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি। এদের বর্ণনা যদি সহীহ্ প্রমাণিত হয়, তবু তদ্দ্বারা বিরোধী পক্ষের মত প্রমাণিত হতে পারে না। কেননা প্রথমোক্ত হাদীসটিতে বলা হয়েছে, এ ব্যক্তি একটি মেয়েলোকের পেছনে চলে। কিন্তু তার সাথে তার সঙ্গম হওয়ার উল্লেখ নেই। তাই রাসূলে করীম (স)-এর কথা ঃ لَايُحَرِّمُ الا مَاكَانَ بِنِكَاحٍ বিয়ের দরুন যা হয়, তা ছাড়া হালালকে কেউ হারাম করে নাই— নারীর পেছনে চলা সংক্রান্ত সব প্রশ্নেরই সুস্পষ্ট জবাবে। তা এভাবে হয় যে, পুরুষটি নিজে থেকে মেয়েলোকটির পেছনে চলে। তাতে বড়জোর তাকে সে দেখে কিংবা তাকে সে সঙ্গমের দিকে আকৃষ্ট করতে চাইতে পারে। কিন্তু তাতে সঙ্গম হয়েছে এমন প্রমাণ তো কিছুই নেই। তাই নবী করীম (স) জানিয়েছেন যে, এ ধরনের কাজের ফলে কারুর হারাম হওয়ার প্রশ্ন উঠে না। তাই যতক্ষণ বিয়ের আকদ না হচ্ছে, ততক্ষণ মেয়লোকটির মা বা কন্যার হারাম হওয়ার ঘটনা ঘটতে পারে না। আর তাতে সঙ্গম হওয়ারও উল্লেখ নেই। রাসূল (স)-এর কথাঃ 'হারাম হালালকে হারাম করে না' প্রযোজ্য কেবল মাত্র নারীর পিছু লওয়া— অথচ কোন সঙ্গম সঙ্ঘটিত না হওয়া সংক্রান্ত জবাবের ক্ষেত্রে। ইবনে আমর বর্ণিত হাদীস 'হারাম হালালকে হারাম করে না' সহীহ হলে তা ঠিক উক্ত ঘটনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য অন্যত্র নয়। নারীর ওপর নজর দেয়া এবং তাকে সঙ্গমে রাজী করানোর চেষ্টা— অথচ সঙ্গম না হওয়া সংক্রান্ত প্রশ্নেরই জবাব মাত্র। আর তা শুধু সন্দেহ দূরকরণ। নারীকে শুধু দেখলেই তার কারণে কেউ হারাম হয় কিনা এ সন্দেহ দূর করা হয়েছে সে জবাব দিয়ে যে, না, তাতে হারাম হয় না। যেমন রাসূল (স)-এর কথা ঃ

زِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَاالرِّجْلَيْنِ الْمَشْىُ -

দুই চোখের যিনা নারীর ওপর নজর দেয়া এবং দুই পা'র যিনা হচ্ছে নারীর দিকে চলা।

এ হাদীসের আলোকে কেউ ধারণা করতে পারে যে, শুধু দেখা-ই কাউকে হারাম করে, যেমন হারাম করে সঙ্গম কার্য। কেননা রাসূলে করীম (স) শুধু দেখাকেও যিনা বলেছেন। এ

সন্দেহের অপনোদনের জন্যে রাসূল (স) উক্ত হাদীসে জানিয়েছেন যে— না, তা কোন কিছুকে হারাম করে না। যদি ছোঁয়া ছুয়ি— ধরা-ধরি না হয়, তাহলে হারামকরণ সম্পর্কিত হবে বিয়ের আক্দকরণের সাথে। হাদীসের এই প্রয়োগের সম্ভাবনা যখন আছে, তখন তার দ্বারা প্রশ্ন দূর হয়ে গেল। সেই সাথে ফিকাহবিদগণ একমত এই ব্যাপারে যে, হারামকরণটা কেবল 'নিকাহ' হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সীমাবদ্ধ নয় কেবল জায়েয সঙ্গমের মধ্যেও। কেননা কেউ যদি তার দাসীর সাথে সঙ্গম করে তার হায়য অবস্থায়, এ সঙ্গম বিয়ে ছাড়াও হারাম। তাতেও কেউ হারাম হতে পারে। তাই হারামকরণ কেবল 'নিকাহ' হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়াটা বাতিল হয়ে গেল। মুবাহ সঙ্গমের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়াও বাতিল হয়ে গেল। এ-ও সর্বসম্মত কথা। অনুরূপভাবে কেউ যদি কোন দাসীর সাথে সঙ্গম করে এবং সে বা অপর কেউ বলে যে, সে একজন মজুসী— অগ্নিপূজক, এ সঙ্গম বিবাহ ছাড়া-ই হয়েছে এবং হারাম হয়েছে, তাও তার মা কিংবা কন্যাকে সঙ্গমকারীর জন্যে হারাম করে দেবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হাদীস যদি সহীহ্-ও হয়, তাহলে তা সঙ্গম করে এবং সে বা অপর কেউ বলে যে, সে একজন মজুসী-অগ্নিপূজক, এ সঙ্গম বিবাহ ছাড়া-ই হয়েছে এবং হারাম হয়েছে, তাও মার মা কিংবা কন্যাকে সঙ্গমকারীর জন্যে হারাম করে দেবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হাদীস যদি সহীহ্-ও হয়, তাহলে তা সঙ্গম দ্বারা হারাম না হওয়ার ব্যাপারে সাধারণ ও ব্যাপক নয়। যে লোক তার স্ত্রীর সাথে জিহার (ظهار) করবে, এ জিহার দ্বারা তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গমকে আল্লাহ হারাম ঘোষণা করেছেন। অথচ আল্লাহ্ তাকে অপছন্দনীয় ও মিথ্যা কথা বলে অভিহিত করেছেন। আর এ কথাও তার সাথে সঙ্গম হারাম হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। কেননা রাসূলের 'হারাম হালালকে হারাম করে না' কথাটিকে দলীল হিসেবে পেশ করা এখানে সহীহ্ হয় না। কেননা তা সহীহ্র দিক দিয়ে সাধারণত নিঃশর্ত উল্লিখিত হয়েছে। কেননা। কোন দলীল ব্যতীত হারামকরণ বা হালালকরণ বাধ্যতামূলক হওয়ার সাথে সম্পর্কিত নয়। তার দুটি দিক। একটি হারাম ও হালাল আল্লাহ্র হুকুমে কার্যকর। তিনি যা হারাম করেছেন, তা হারাম এবং যা হালাল করেছেন তা হালাল। আমরা প্রকৃত ভাবেই জানি যে, কোন জিনিসের হারাম হওয়া সংক্রান্ত হুকুম এবং অপর কোন জিনিসকে হালালকরণের হুকুম অপর কোন হুকুমের সাথে সম্পর্কিত নয় হারাম বা হালাল বাধ্যতামূলককরণে। তাই এ শব্দটির প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা হলে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে তার কোন সম্পর্ক প্রমাণিত হবে না। কেননা আমরা অনুরূপভাবে বলব, আল্লাহ্র হারামকরণের হুকুম শুধু হুকুমটার কারণে কোন মুবাহকে হারামকরণের কারণ হয়ে দাঁড়াবে না। তবে অন্য কিছুকে হারামকরণের দলীল স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া গেলে সেই দিক দিয়ে শুধু তা হারাম হতে পারে। এর ফায়দা হল আল্লাহ নিজে 'নস' দ্বারা যে জিনিসকে হালাল করেছেন, তা সেই হালালের ওপরই স্থিতিশীল হয়ে থাকবে। আর যখন অপর কোন জিনিসকে হারামকরণের হুকুম হবে, তখন 'কিয়াস' উপায়ে অপর কোন জিনিস দ্বারা হারামকরণের কারণে প্রাথমিক অবস্থায় তাকে হালালকরণের ওপর কোন আপত্তি তোলা যেতে পারে না। কাজেই কোন মুবাহ কাজকে 'কিয়াস' দ্বার হারামকরণ নিষিদ্ধ হবে— এ কথার দ্বারা এ তত্ত্বও প্রমাণিত হল যে, শুধু 'কিয়াস' দ্বারা কোন হুকুমের মনসূখ হওয়াকে জায়েয মনে করা একটি বাতিল কথা। শব্দ সহীহ্ হলে তার হাকীকত এ জিনিসেরই দাবি করে। আমরা পূর্বে যে দুটি কারণের উল্লেখ করেছি, এ হল তার একটি। আর দ্বিতীয় কারণটি

হল — 'হারাম হালালকে হারাম করে না'— এ কথাটির তাৎপর্য হল, হারাম কাজ হালালকে হারাম করে না। এ কথাটি বলাই যদি লক্ষ্য হয়ে থাকে, তাহলে শব্দের মধ্যে অবশ্যই একটি সর্বনাম উহ্য ধরতে হবে, শব্দের প্রকৃত অর্থ গণ্য করা যাবে না। অতএব এ কথাটিকে দলীল হিসেবে পেশ করা যেতে পারে না। তার দুটি কারণ রয়েছে। একটি সর্বনাম উল্লিখিত নয়, তার সাধারণত্ব ও ব্যাপকতাকে গণ্য করতে হবে। তাই তার সাধারণত্ব ও ব্যাপকতাকে যুক্তি বা প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যাবে না। কেননা সর্বনাম উল্লিখিত নয়। ফলে শব্দটির সাধারণত্বের নিচে যেসব নামের জিনিস রয়েছে, সেই ক্ষেত্রে কার্যকর হবে। তাই অনুল্লিখিত সর্বনামের সাধারণত্ব দ্বারা কোন জিনিস প্রমাণ করতে চাওয়া কারুর জন্যেই সহীহ্ হতে পারে না। আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, এ ধরনের ক্ষেত্রে সাধারণত্বকে গণ্য করা সহীহ্ হয় না। কেননা মুসলমানরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, হারাম হালালকে হারাম করে অনিবার্যভাবে। তা হল, অ-সহীহ্ ফিকাহ্র দরুন সঙ্গম এবং হায়য হচ্ছে— এমন দাসীর সাথে সঙ্গম, হয়য ও জিহার অবস্থায় তিন তালাক দেয়া এবং মদ্য যখন পানির সাথে মিশ্রিত হয়, আর মুরতাদ হলে বিয়ে বাতিল হয়ে যায়, তখন স্ত্রী স্বামীর জন্যে হারাম— প্রভৃতি ধরনের কাজ, যা হালালকে হারাম করে দেয়। অতএব নবী করীম (স)-এর 'হারাম হালালকে হারাম করে না' কথাটিতে সাধারণ অর্থবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বলে তাতেও সাধারণত্বের ভাবধারা কার্যকর মনে করা সহীহ্ নয়। কথাটি যে ভাবে বলা হয়েছে তাতে বোঝা যায় যে, তার অর্থ কোন কোন হারাম কাজ হালালকে হারাম করে না, এ কথা বলাই উদ্দেশ্য। তাই তার হুকুম প্রমাণের জন্যে একটি দলীলের প্রয়োজন, যেমন সব মুজমাল শব্দের একটি অর্থ গ্রহণে দলীলের প্রয়োজন। উপরন্তু, নবী করীম (স) যদি কোন 'নস' নিয়ে এসে থাকেন— যেমন তুমি তার একটা সর্বনাম থাকার দাবি করেছ এবং তারপর বলে থাকেন ঃ হারাম কাজ হালালকে হারাম করে না, তাহলে তুমি যা বলেছ, তা-ই প্রমাণিত হবে। কেননা অনুরূপভাবে আমরা বলে থাকি যে, হারাম কাজ হালালকে হারাম করে না। তখন তা তার প্রকৃত অর্থে ধরা যাবে। অথচ তার কোন প্রমাণ নেই এ কথার যে, হারাম কাজ সঙ্ঘটিত হওয়া কালে আল্লাহ্ হালালকে হারাম করেন না।

যদি বলা হয়, এর অর্থ হচ্ছে— আল্লাহ্র হারাম কাজের দ্বারা হালালকে হারাম করে না।

জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, তা হতে পরে তখন, যখন রাসূল (স)-এর কথা 'হারাম হালালকে হারাম করে না'-এর পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করা হবে। প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। তাই তখন তার হুকুমটা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে একটা দলীলের প্রয়োজন দেখা দেবে। কেননা কিছুর প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ অর্থ গ্রহণের পরিবর্তে পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ দলীল ছাড়া জায়েয হতে পারে না।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেছেন, আমাকে একজন লোক বলে ঃ তুমি কেন বল যে, হারাম হালালকে হারাম করে না? আমি তাকে বললাম, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ তোমরা নিকাহ করবে না যাকে তোমার বাবা নিকাহ করেছে এবং বলেছেন ঃ এবং তোমাদের নিজদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীগণও হারাম। আরও বলেছেন ঃ 'তোমাদের স্ত্রীদের মারাও হারাম— যাদের সাথে তোমরা সঙ্গম করেছ' এ আয়াতে নিকাহ দ্বারা যা চিহ্নিত কিংবা যার সাথে সঙ্গম হয়েছে বা নিকাহ হয়েছে তা অন্যকে হারাম করেছে, তা কি তুমি দেখতে পাও না? লোকটি

বলল ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই। তখন বললাম, তাহলে আল্লাহ হালাল দ্বারা কোন জিনিস হারাম করেছেন— এ কি সম্ভব ? এবং হালালকে হারাম দ্বারা হারাম করেছেন ? অথচ হারাম হচ্ছে হালাল-এর বিপরীত। আর 'নিকাহ' আল্লাহ্‌র নিকট পছন্দীয় এবং তার ওপর আদেশ হয়েছে এবং যিনা হারাম করেছেন। বলেছেন ঃ

وَلَاتَقْرَبُوا الزِّنٰى - اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاۤءَ سَبِيْلًا -

তোমরা যিনার নিকটেও যাবে না, তা অত্যন্ত নির্লজ্জতার কাজ এবং খুবই খারাপ পন্থা (যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার)। (সূরা নবী ইসরাইল ঃ ৩২)

আবূ বকর বলেছেন ইমাম শাফেয়ী নিকাহ-সঙ্গম দ্বারা হারামকরণ সংক্রান্ত আয়াত এবং যিনা হারামকরণের আয়াত পাঠ করেছেন। এ দুটি হুকুম ওদুটির ভিন্নতাপূর্ণ নয়। অর্থাৎ নিকাহ্ ও সঙ্গম মুবাহ হওয়া ও যিনা হারাম হওয়া কোন ভিন্ন ভিন্ন জিনিস নয়— একটি অপরটির এ-পিঠ ও-পিঠ। মূল আলোচ্য বিষয়ে বিভিন্নতা প্রমাণকারী কোন দলীলও এখানে নেই। কেননা নিকাহ্ ও সঙ্গম মুবাহ হওয়া এবং এ দুটির দ্বারা অন্য কিছুর হারাম হওয়া এ দুটির মধ্যে এমন কোন প্রমাণ নেই যে, এ দুটি ছাড়া অন্যভাবে 'তাহরীম' 'হারাম'করণ হয় না। যেমন দাসীর সাথে সঙ্গমের কারণে তাহ্‌রীম বাধ্যতামূলক হওয়াও নিষিদ্ধ হয় না। আর আল্লাহ্ যিনা হারাম করেছেন, একথা বোঝায় না তাছাড়া অন্য কিছু দ্বারা তাহ্‌রীম হয় না। তাই যিনার সঙ্গমের নিকাহ্ হারাম না হওয়ার কোন কথাই আয়াত দুটির বাহ্যিক পাঠে পাওয়া যায় না। কেননা যিনা সংক্রান্ত আয়াতে যিনাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আর যিনা হারামকরণ বোঝায় না যে, নিকাহ হারামকরণে কোন ভূমিকা পালন করে না। নিকাহ্ ও সঙ্গম হারামকরণের দ্বারা সে দুটি ছাড়া অন্য কিছুকে হারাম না করার কথাও বোঝায় না— বিতর্কে পাঠ করা আয়াত দুটিতে তার কোন দলীলও পাওয়া যায় না। তার কথার সত্যতা প্রমাণকারী দলীল সম্পর্কে প্রশ্নকারী জবাব হিসেবেও নয়।

তারপরে বলেছেন, হারাম হালাল-এর বিপরীত। প্রশ্নকারী এ কথা বলার সময় এ দুটির মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমি বললাম, আল্লাহ্ই এ দুটির মধ্যে পার্থক্য করেছেন। কেননা আল্লাহ 'নিকাহ' পছন্দ করেছেন ও যিনা হারাম করেছেন ফলে আল্লাহ ও-দুটির মধ্যে পার্থক্য করেছেন হালালকরণে ও হারামকরণেও। তা প্রশ্নকারীর বিপরীতের দলীল, অথচ প্রশ্নকারীর জন্যে নিকাহ মুবাহ হওয়া ও যিনা হারাম হওয়া কোন মুশকিল ব্যাপার ছিল না। তার প্রশ্ন ছিল, সে যে কথা বলেছে তার ওপর আয়াতের দলীল সম্পর্কে। কিন্তু তিনি দলীলের কারণ বলেন নি, বরং তিনি মশগুল হয়ে পড়েছেন একথা বলায় যে, এটা হারাম, ওটা হালাল। এ প্রশ্নকারী যদি হৃদয়ের অন্ধ হয়ে থাকে, নিকাহ ও যিনার মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা বুঝতে অক্ষম হয়ে থাকে, তাহলে এ ধরনের প্রশ্নকারীর প্রশ্নের কোন জবাব না দেয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা সে বিবেক-বুদ্ধিহীন ব্যক্তি। কেননা প্রশ্নকারী বুদ্ধিমান হলে সে নিজেকে মূর্খতার এ স্তরে ঠেলে দিতে পারে না। সে যদি এ দুটির মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে পারে এ হিসেবে যে, দুটির একটি নিষিদ্ধ, আর অন্যটি মুবাহ। তার প্রশ্ন ছিল এ দুটির মধ্যে পার্থক্যকরণে নিকাহ হারাম হওয়া বাধ্যতামূলক হওয়ার ক্ষেত্রে এ দুটির একত্রিত হওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে। ইমাম

শাফেয়ী প্রশ্নকারীকে সে বিষয়ে জবাব দেন নি। মুবাহ্ ও নিষিদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত আয়াত দুটি তিলাওয়াত করা ছাড়া অতিরিক্ত কিছুই করেন নি। আর হালাল হারামের বিপরীত। কেননা হালালের হারাম বিপরীত হওয়ার এমন কিছু নেই, যা হারামকরণ বাধ্যতামূলক করণে সে দুটির একত্রিত হওয়ার প্রতিবন্ধক হতে পারে। লক্ষণীয়, ফাসেদ— অ-সহীহ্ বিবি দ্বারা সঙ্গম করা হারাম, হায়যধারী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম হারাম, কুরআনের আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত। দুনিয়ার মুসলমান এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। তা হালাল সঙ্গমেরও পরিপন্থী। হারামকরণে এ দুটি সমান ও অভিন্ন। হায়য অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয়া হারাম নিষিদ্ধ। তুহ্‌রে তালাক দিলে সঙ্গমের পূর্বে দেয়া মুবাহ। হারামকরণ বাধ্যতামূলককরণে এ দুটির সম্পর্ক সমান। এক্ষণে ইমাম শাফেয়ীর মত যদি এই হয় যে, দুই বিপরীতের মধ্যে 'কিয়াস' নিষিদ্ধ, তাহলে একই হুকুমে এ দুটির একত্রিত না হওয়া চিরদিনের জন্যেই বাধ্যতামূলক।

এ কথা তো জানা-ই আছে, শরীয়াতের একই হুকুমে দুই বিপরীতের একত্রিত হওয়া বিধান আছে। এ দুটির পরস্পর বিপরীত হওয়া বহু সংখ্যক হুকুমে সে দুটির একত্রিত হওয়া নিষিদ্ধ হয়ে যায়নি। সে ধরনের 'নস' আসাও সম্ভব। আর যে বিষয়ে 'নস' আসা সম্ভব, তখন দলীল পাওয়া গেলে 'কিয়াস'-এর সম্ভাব্যতাও অস্বীকার করা যায় না। বিবেক-বুদ্ধিতে যখন তা নিষিদ্ধ নয়, একই হুকুমে দুই বিপরীতের একত্রিত হওয়া শরীয়াতেও নিষিদ্ধ নয়। তাই তাঁর কথা ঃ 'হালাল হারামের বিপরীত' কথাটি এ দুটির মধ্যে পার্থক্য করার কারণ হয়নি— যেমন প্রশ্নকারীর প্রশ্ন ছিল। তা একথাও প্রমাণ করে যে, তা অ-নিষিদ্ধ, অর্থাৎ নিষিদ্ধ নয়। আল্লাহ্ নামাযীকে নামাযে চলাচল করতে এবং তাতে বিনা কারণে শুয়ে পড়তে নিষেধ করেছেন। চলাচল ও শয়ন এক জিনিস নয়, দুটি ভিন্ন ভিন্ন কাজ। অথচ নিষেধে দুটি একত্রিত হয়েছে। তাতে বহুকরণেরও প্রয়োজন নেই। কেননা কেউ তা জায়েয মনে করতে পারে— তা নিষিদ্ধ নয়। তাহলে শাফেয়ীর কথা 'এ দুটি পরস্পর বিপরীত' থেকে এমন কোন তাৎপর্য পাওয়া গেল না, যা দুটির মধ্যে পার্থক্য অনিবার্য করতে পারে। পরে প্রশ্নকারীর এ কথাও উদ্ধৃত করেছেন যে, সে বলেছে ঃ আমি বহু সঙ্গমকারী ও বহু সঙ্গমকারী পাই। তখন একটিকে অপরটির ওপর 'কিয়াস' করি। বলেছেন, আমি বললাম ঃ আমি বহু সঙ্গমকারী পাই যারা হালাল সঙ্গম করে বলে সে জন্যে তারা প্রশংসিত এবং বহু সঙ্গমকারী পাই হারাম পথে। সেজন্যে তারা রজমে নিহত হয়েছে। তুমি কি লক্ষ্য করেছ সে কিভাবে সাদৃশ্য দেখায়? বললে ঃ যার সাথে সাদৃশ্য দেখায়, তাকে এর চেয়েও অধিক স্পষ্ট করে তোলে?

আবূ বকর বলেছেন, প্রশ্নকারী তার জন্যে শাস্তিই নিয়ে এসেছে। সে যে সাদৃশ্য দেখায়, তার বক্তব্য যদি এই হয় যে, সে দুটি বিচ্ছিন্ন ও ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়, তাহলে সে বিষয়ে ঝগড়ার কিছু নেই। আর যদি তার বক্তব্য এ হয় যে, তা সাদৃশপূর্ণ নয় এ হিসেবে যে, তাহ্‌রীম বাধ্যতামূলককরণের দিক দিয়ে দুটিকে একত্রিত করতেই সে চেয়েছে, তাহলে সে এমন কোন দলীল পেশ করেনি, যা সে দুটির মধ্যে এদিক দিয়ে সাদৃশ্যকে অস্বীকার করে। দুনিয়ায় প্রচলিত কিয়াস তো একটি জিনিসের সাথে অপর একটি জিনিসের সাদৃশ্য দেখানো। সে সাদৃশ্য কোন কোন দিক দিয়ে হতে পারে এবং অপর কোন কোন দিক দিয়ে না-ও হতে পারে। যদি দুটি জিনিসের বিচ্ছিন্ন হওয়া এমন দিক দিয়ে হয়, যা দুটির মধ্যে পার্থক্যকে

আবশ্যিক করে— সর্বদিক দিয়ে, তাহলে মৌলিকভাবেই কিয়াস বাতিল প্রমাণিত হয়। কেননা সর্বদিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ কোন জিনিস 'কিয়াস' হওয়া জায়েয নয়। এতে স্পষ্ট হল যে, শাফেয়ী যা প্রশ্নকারীকে বলেছেন এবং প্রশ্নকারী যা মেনে নিয়েছে, তা সর্বশেষ কথা। যে বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে তার অধীন কোন হুকুমে তার কোন অর্থ নেই। পরে প্রশ্নকারী তাঁকে বলেছে, আপনি কি এর চাইতেও বেশি কিছু ব্যাখ্যা দেবেন, আরও স্পষ্ট করবেন? বলল, হ্যাঁ, যে হালাল একটি নিয়ামত, তাকে তুমি সেই হারামের ওপর কিয়াস করবে, যা নিয়ামত নয়, বরং কঠিন অসন্তুষ্টি ও আযাব? .... এ কথাটি প্রথম তাৎপর্যের পুনরাবৃত্তি মাত্র। ..... এতে নিয়ামত ও অসন্তুষ্টি বা আযাবের কথা (نقمة) অতিরিক্ত। অথচ প্রশ্নটি তখনও দাঁড়িয়ে আছে, প্রশ্নকারীর চাহিদানুযায়ী যেরূপ জবাবে দেয়া আবশ্যক, তা দেয়া হয়নি। এ কিয়াস নিষিদ্ধ হওয়ার দলীলের বিশ্লেষণ করা হয়নি। এ কিয়াস-ই তো এ হারামকে আযাব বানিয়েছে, তা হল হায়য অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম, মজুসী দাসীর সাথে সঙ্গম ও অ-সহীহ্ বিবাহের ফলে সঙ্গম।— এগুলো হালাল পর্যায়ের কাজ— নিয়ামত ছিল। তা তাহ্‌রীম ওয়াজিব করে। ফলে যা বলা হয়েছে তা চূর্ণ হল এবং তার প্রমাণে কোন দলীলও পেশ করা হয়নি। প্রশ্নকারীর এ কথাও বলা হয়েছে, সে বলেছিল, আমাদের সঙ্গী বলেছেন, 'হারাম হালালকে হারাম করে' এ কথা তোমাদেরকে পেয়ে বসবে। বলেছে, আমি বললাম ঃ আমরা যে মেয়েলোকদের সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করি, সে ক্ষেত্রে? বললেন, না, অন্য ক্ষেত্রে, যেমন নামায, পানীয় ও মেয়েলোককে তার ওপর কিয়াস করা। বলল, আমি বললাম ঃ আপনি কি অন্য কারোর জন্যে জায়েয মনে করেন যে, সে সালাতকে কিয়াস বানাবে মেয়েলোকদের উপর? বললেন, না, কোন জিনিসেই নয়।

আবূ বকর বলেছেন, হারাম হালালকে হারাম করে— এ কথাকে কিয়াস করতে নিষেধ করেছেন মেয়েলোকের ওপর মেয়েলোক ছাড়া অন্যত্র। অথচ শুরুতে তিনি কথাটিকে নিঃশর্ত বলেছিলেন। তিনি যিনাকে মুবাহ্ সঙ্গমের ওপর কিয়াস করা জায়েয বলেন নি। কেননা তা হারাম ও তা হালালের বিপরীত। আর হালাল একটা নিয়ামত। আর হারাম একটা আযাব। এতে কোন কয়দ নেই, যা বলবে যে, এ গোটা ব্যাপারটি কিয়াস নিষিদ্ধকরণে কেবল মেয়েদের ব্যাপারে সীমাবদ্ধ। তাদের ছাড়া অন্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আর তাকে নিঃশর্ত পেশ করা উল্লিখিত পার্থক্যের কারণ। যাতেই সে কারণ পাওয়া যাবে, সেখানেই তা কার্যকর ও চালু হতে পারবে। কিন্তু তা যখন করেনি, তখন কথাটিকে চূর্ণ করল। পরে তাকে বলা যাবে, মেয়েলোক ছাড়া অন্যত্র যখন হারাম হালালকে হারাম করতে পারে, তাহলে তা মেয়েলোকদের ক্ষেত্রে কেন করতে পারবে না? যদিও তার একটি অপরটির বিপরীত এবং তার একটি নিয়ামত ও অপরটি আযাব, সমুচিত প্রতিশোধ। যেমন দাসী হওয়ার কারণে তার সাথে সঙ্গম বিবাহভিত্তিক সঙ্গমের মতই তাহ্‌রীম বাধ্যতামূলক হওয়ার দিক দিয়ে। অথচ দক্ষিণ হস্তের মালিকত্ব (দাসত্ব) নিকাহ্‌র বিপরীত। লক্ষণীয়, দক্ষিণ হস্তের মালিকত্ব ও নিকাহ্ এক ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত হতে পারে না।

প্রশ্নকারীর এ কথারও বর্ণনা করা হয়েছে যে, সে তাঁকে বলেছে, নামায হালাল, তার মধ্যে কথা বলা হারাম— নিষিদ্ধ। যদি কেউ নামাযের মধ্যে কথা বলে, তাহলে তার নামায বিনষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে হালাল হারাম দ্বারা বিনষ্ট হল। বললেন, আমি তাকে বলেছি, তুমি ধারণা

করেছ, যে নামায নামাযের বিনষ্টকারী, সে নামায বিনষ্ট হতে পারে না। কিন্তু আসল ব্যাপার হল, বিনষ্ট হয়েছে তার কাজটা, নামায নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমার নামায আদায় হল না। কেননা তা তুমি সেভাবে আদায় করনি, যেভাবে নামায আদায় করতে আদেশ করা হয়েছে।

আবূ বকর বলেছেন, আমি মনে করি না, বিপরীত মতের লোকদের সাথে যারা 'মুনাযিরা' বা বিতর্ক করতে অভ্যস্ত, তাঁরা প্রমাণ পেশ করতে এতটা অপদার্থতার পরিচয় দিতে পারেন যে, শেষ পর্যন্ত এ ধরনের কথার আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। অথচ প্রশ্নকারী ছিল বিবেক-বুদ্ধির দিক দিয়ে অত্যন্ত দুর্বল। সে ছিল এক নির্বোধ ব্যক্তি। তা এ কারণে যে, নামাযে এমন জিনিস যা তাকে বাতিল করে— এসে গেলে তা বাতিল হয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ নয়। তেমনি নিষিদ্ধ নয় বিয়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া, যদি তাতে এমন জিনিস এসে যায় যা তাকে বাতিল করে দেয়। এ দুটির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী জিনিস যদি হয়, তাহলে বিনষ্ট হওয়ার কথাটি নামাযের ওপর আরোপ করা যাবে না, যদিও তা তার কারণেই বাতিল হয়ে যায়। অবশ্য লোকেরা সকলেই সেরূপ বলে। কেননা বিপরীত পক্ষ নিকাহ্ সম্পর্কেও এরূপ কথা বলতে কুণ্ঠিত হবে না যে, আমি বলি না তার বিয়েটা নষ্ট ও অ-সহীহ্ হয়ে গেছে। বিবাহ বিনষ্ট হয় না। শুধু তার যিনার কাজটি— তাই বিনষ্টকারী। নিকাহ বিনষ্ট হল না, কিন্তু স্ত্রীটি তার থেকে 'বায়ন' হয়ে গেল। তার স্ত্রীত্বের রজ্জু থেকে বাইরে চলে গেল, বন্ধন মুক্ত হল। এদিক দিয়ে এ দুটি কাজই সমান।

তাকে আরও বলা যাবে, আমি মেনে নিয়েছি তুমি যা দাবি করেছ যে, কথা বলার দরুন যে নামায বাতিল হয়ে গেছে তার উপর ফাসেদ বা বিনষ্ট হওয়া বলা যাবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমার প্রতি আমার প্রশ্ন তো দাঁড়িয়েই থাকল, তার তো কোন জবাব দেয়া হয়নি এভাবে যে, আমি তোমার নামটা মেনে নিলাম, তা সত্ত্বেও তুমি যা মেনে নিতে অস্বীকার করেছ, তা-ই তোমাকে বলা হবে। তা এই যে, নামাযের মধ্যে যে লোক কথা বলল, সে নামাযের বাইরে চলে গেছে। সে নামায তার হয়নি একথা বলার কারণে। কেননা নামাযের মধ্যে থাকা অবস্থায় কথা বললে তার নামায হয় না। মেয়েলোকটির অবস্থাও তা-ই হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই তার 'নিকাহ' অবশিষ্ট থাকবে না তার মার সাথে যিনা করা হলে। যেমন নামায অবশিষ্ট থাকবে না তার মধ্যে কথা বললে। তাই তার স্ত্রী তার থেকে 'বায়ন'— বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং তার বিবাহ-বন্ধন থেকে ফসকে বের হয়ে যাবে। যেমন কথা বলার দরুন লোকটি নামায থেকে বাইরে চলে গেছে। এ অবস্থায় ইমাম শাফেয়ীর কর্তব্য হয় যে, তিনি ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি কোন কিছুকে ফাসেদ হয়ে গেছে (বা ভেঙ্গে গেছে) বলতে পারবেন না। অন্যান্য চুক্তি সম্পর্কেও এই কথা। তাতে বলা যাবে যে, তা হয়নি, তার দরুন কেউ মালিকত্ব পেতে পারবে না। এ-ই হচ্ছে ভাষা বা বর্ণনাগত নিষেধ। অথচ আমাদের কথা মূলত তাৎপর্য পর্যায়ের, ভাষা বা বর্ণনাগত নয়। শুধু নাম নিয়েও আমাদের বলার কিছুই নেই।

শাফেয়ী তাঁর প্রশ্নকারী সম্পর্কে এ-ও উল্লেখ করেছেন যে, সে বলেছিল, আমাদের সঙ্গী বলেছে ঃ পানি হালাল, মদ্য হারাম। এ পানি যখন মদের সঙ্গে মেশানো হবে, তখন পানিও হারাম হয়ে যাবে। বোঝা গেল, হারাম হালালকে হারাম করে দিল।

বলেছেন, আমি তাকে বলেছিলাম, তুমিই বিবেচনা কর, তুমি যখন মদের ওপর পানি

ঢাললে, তখন হয় সেই হালাল পানি হারামের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। সে বলেছিল, হ্যাঁ। তখন আমি বললাম, তুমি কি সেই মেয়েলোকটিকে সকল পুরুষের জন্যেই হারাম মনে কর ? যেমন সেই মদ্য সকলের জন্যেই হারাম হয়ে গেছে ? সে বলল, না। আমি বললাম, তুমি কি সেই মেয়েলোকটি ও তার কন্যাকে পরস্পর সংমিশ্রিত পাও, যেমন পানি ও মদ্য পরস্পর সংমিশ্রিত হয়ে গেছে ? বলল, না। বললাম, অল্প পরিমাণ মদ্য যদি বেশি পরিমাণ পানির মধ্যে ফেলা হয়, তখন কি তা 'নাজাস'— নাপাক হয়ে যায় ? বলল, না। বললাম, অল্প মাত্রার যিনা, চুম্বন, লালসার স্পর্শ ইত্যাদি কি তাহরীমের কারণ হয় না, তার বেশি মাত্রা তাহ্রীমের কারণ হয়। বলল, না। যদি তাই হয়, তাহলে মেয়েলোকের ব্যাপারেও পানি মদের ব্যাপার এক রকমের হতে পারে না।

আবূ বকর বলেছেন, এ-ও এক ধরনের পার্থক্য। মদ্য পানিকে হারাম করে এ পর্যায়ে যা বলা হয়েছে বলে ইমাম শাফেয়ী থেকে জানা গেছে, ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুয়ীনের বিরুদ্ধেও এ যুক্তিটি পেশ করা হয়েছিল, যখন তিনি বলেছিলেন ঃ হারাম হালালকে হারাম করে না। এ হারামকরণকে যারা অস্বীকার করে, উক্ত যুক্তি তাদের ওপরই সহীহ্ হয়— এই ইল্লাতের কারণে। কেননা এখানেও সেই ইল্লাতটি রয়েছে। কিন্তু হারাম হালালকে হারাম না করণে ইল্লাতটিও থাকবে না। কেননা সে দুটি অ-সংমিশ্রিত। যদি বলা হয়— যিনা হারাম করে, তা হলে তার 'ইল্লাত' হচ্ছে হারাম হালালের বিপরীত। আর হালাল নিয়ামত, হারাম প্রতিশোধ। প্রশ্নকারীর সমস্ত মুনাযিরা বা বিতর্কের মধ্যে সে এ কথাটি ছাড়া অন্য কিছুর যুক্তি পেশ করেনি। সে যে পার্থক্যসমূহের উল্লেখ করেছে, সে পার্থক্যসমূহ অন্যান্য দিক দিয়ে তার ইল্লাত তাতে অধিকভাবে বিচূর্ণ। কেননা ইল্লাতটি পাওয়া গেছে, হুকুম পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া 'তাহ্রীম' যদি শুধু সংমিশ্রণের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয় এবং মুবাহকে নিষিদ্ধ থেকে আলাদা করা অসম্ভব বা কঠিন হয়, তাহলে তো মুবাহ সঙ্গমকে হারাম করাই বাঞ্ছনীয়। কেননা এখানে সংমিশ্রণ নেই। ফাসেদ (বাতিল) নিকাহ্র সঙ্গম এবং অন্যান্য যত প্রকারের সঙ্গম যার সাথে তাহরীম জড়িত, সবই তেমনি। কেননা মেয়েলোক তার মা থেকে স্বতন্ত্র, পৃথক। ওরা দুজন অ-সংমিশ্রিত, একাকার নয়। এ দিকগুলো থেকে যখন তাহরীম হতে পারে সংমিশ্রণ না হওয়ার কারণে, তা হলে যিনার ক্ষেত্রে তা অস্বীকার করা হবে কোন কারণে ?

অথচ আমরা আলোচনার শুরুতেই আয়াতটিকে দলীল হিসেবে পেশ করেছি ঃ 'তোমাদের বাপ যে মেয়েলোককে নিকাহ্ করেছে, তোমরা তাকে নিকাহ করবে না।' আর আল্লাহ্র কথা ঃ 'যাদের সাথে তোমরা সঙ্গম করেছ।'. এসব আয়াত যিনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু ইমাম শাফেয়ীর কথা থেকে এ বিষয়ের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তার নিকট যে প্রশ্ন করা হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পরে ইমাম শাফেয়ী তাঁর এ প্রশ্নকারী সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, পানি ও মদ্য এবং মেয়েলোকের মধ্যকার কথা কেন বলা হল, অথচ মেয়েলোকের ব্যাপার ও মদ্য ও পানির ব্যাপারের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই। শাফেয়ী বলেন, আমি তাকে বললাম, তুমি তার কাছ থেকে একথা কবুল করে নিলে কি ভাবে ? বলল, আমাদের নিকট একজন যা বলেছে, তা-ই আমাদের জন্যে তোমার কথা। আমাদের সঙ্গী যদি জানতে পারে তা হলে আমি মনে করি, সে

তার কথার ওপর অবচিল হয়ে থাকতে পারবে না। কিন্তু সে গাফিল হয়ে রয়েছে, দুর্বল হয়ে পড়েছে তার কথায়।

বলেছেন— পরে সে তার কথা থেকে ফিরে যায় এবং বলে আমার মতে তোমাদের কথাই সত্য। আমাদের সঙ্গী কোন কিছুই বানায়নি, আমরা জানতেও পারিনি, এ প্রশ্নকারী কে ছিল। জানতে পারিনি, তাদের সঙ্গী বলে তারা কাকে বুঝিয়েছে। যার সম্পর্কে তারা বলেছে আমাদের সঙ্গী যদি এ পার্থক্যগুলো জানতে পারে, তাহলে আমাদের ধারণা সে নিজের কথার ওপর অটল হয়ে থাকতে পারবে না।

মূলত এ প্রশ্নকারীর হৃদয়ের অন্ধত্ব স্পষ্ট হয়ে গেছে। শাফেয়ী যা কিছু বলেছেন, তা সে সবই মেনে নিয়েছে, বিষয়ের ওপর কোন দলীল দেয়ার দাবি করেনি। হতে পারে, সে একজন সাধারণ মানুষ, ফিকাহ্র ইল্‌ম সে কিছুই জানে না। তবে এতদসত্ত্বেও তার মধ্যে দুটি জিনিস একসঙ্গে একত্রিত ছিল। তার একটি মূর্খতা ও বোকামী। তার মুনাযিরা বা বিতর্কের ধরন দেখেই আমরা তার আন্দাজ করতে পারি, যা মেনে নেয়া উচিত নয়। তাই মেনে নেয়া এবং যার নিকট প্রশ্ন করেছিল তার নিকট পার্থক্যসমূহের দাবি করছিল— যা ইল্লাত ও কিয়াসের বিষয়াদির তাৎপর্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে না এবং পরে তার ফিরে যাওয়া তার সেই মতের দিকে, যা সে ধারণা করে রেখেছিল এবং তার সঙ্গীদের কথা ত্যাগ করাই তার নির্বুদ্ধিতা ও বোকামীর বাস্তব প্রমাণ। আর দ্বিতীয় হচ্ছে বোধশক্তির স্বল্পতা। সে এই ধারণা করে বসেছিল যে, সে যদি এসব কথা শুনতে পায়, তা হলে সে নিজের মত ত্যাগ করে এ মত গ্রহণ করবে। নিছক ধারণার ভিত্তিতেই অপর একজন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া। অথচ সে এর নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে কিছুই জানে না।

এ ধরনের মুনাযিরা বা বিতর্কে শাফেয়ীর আনন্দ লাভ এবং তার মতের দিকে চলে যাওয়া প্রমাণ করে যে, এরা দুজনই মুনাযিরার খুব কাছাকাছি ছিল। অন্যথায় তাঁর যদি প্রাথমিক শোধ-বোধও থাকত, তা হলে তিনি তাঁর কিতাবে এ হাস্যকর মুনাযিরার বিবরণ লিপিবদ্ধ কখনই করতেন না। আমাদের মাযহাবের নব্য ও প্রাথমিক পর্যায়ের লোকেরাও যদি এ পর্যায়ে কথা বলত, তাহলে এসব যুক্তির অন্তসারশূন্যতা এবং প্রশ্নকারী ও প্রশ্নিত ব্যক্তির দুর্বলতা তাদের নিকট প্রচ্ছন্ন থাকত না।

ইমাম শাফেয়ী উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর সাথে মুনাযিরাকারীকে বলেছেন যে, তুমি মেয়েলোকটির ওপর বিচ্ছেদ টেনে আনছ শুধু এই অপরাধে যে, সে তার পুত্রকে চুম্বন করেছে। অথচ আল্লাহ্ এজন্যে তার ওপর বিচ্ছেদ চাপান না। সে বলল— তাহলে আপনি মনে করেন যে, সে মেয়েলোকটি তার স্বামীর জন্যে হারাম হয়ে যাবে, যদি সে মুরতাদ হয়ে যায়? বলেছেন, আমি বললাম, যদি যে মেয়েলোকটি ইদ্দত পালন অবস্থায় ফিরে আসে, তাহলে তাদের দুজনের বিয়ে বহাল থাকবে। সে মেয়েলোকটি তার স্বামীর পুত্রকে চুম্বন দিল, তার সম্পর্কেও এরূপ মনে করেন? বললেন, না।

আবূ বকর বললেন, তিনি তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষের নিকট স্ত্রীর দিক থেকে তাহরীম সঙ্ঘটিত হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। পরে বলেছেন, স্বামী তারই থাকবে। মেয়েলোকটির ফিরে আসা

বাধ্যতামূলক করেছেন, যেমন 'তাহ্রীম'ও তারই কাজ বলেছেন। পরে শাফেয়ী বলেছেন, আমি বলি, ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পর যদি মেয়েলোকটি ইসলামে ফিরে আসে, তাহ্লে তার স্বামী তাকে 'নিকাহ্' করতে পারবে। যে মেয়েলোকটি তার স্বামীর পুত্রকে চুম্বন করেছে, তার সম্পর্কেও কি তুমি তাই মনে কর? বলল ঃ মুরতাদ হওয়া মেয়েলোক সব মুসলমানের জন্যেই হারাম, যতক্ষণ না সে ইসলাম কবুল করছে। স্বামীর পুত্রকে চুম্বন করা সে রকমের ব্যাপার নয়।

আবূ বকর বলেছেন, তার প্রতিপক্ষের নিকট সে যা অস্বীকার করেছিল, সেই মূল জিনিসকেই চূর্ণ করে দিল।

এরপর পার্থক্যসমূহের উল্লেখ করা শুরু করেন, যেমন পূর্বে তাঁর কথোপকথন উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আমি তার পুনরাবৃত্তি করব না। কেননা এ ধরনের ব্যাপারে যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়। তবে আমাদের ফিকাহ্ বিপরীত মতধারীদের জ্ঞানের পরিমাণ এবং চিন্তার দিক দিয়ে তাদের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা দিতে অবশ্যই চেষ্টা করবে।

উসমানুলবত্তী বিয়ের পর স্ত্রীর মার সঙ্গে যিনা এবং বিয়ের পূর্বের যিনার মধ্যে যে পার্থক্য করেছেন, আমাদের মতে তার কোন অর্থ হয় না। কেননা যা চিরস্থায়ী তাহরীমের কারণ, তা বিয়ের পূর্বে হোক বা পরে হোক, তার হুকুম কখনই ভিন্নতর হতে পারে না। তার দলীল এই যে, দুগ্ধপান, স্থায়ী তাহরীমের কারণ। সে তারহীম কার্যকর হওয়ায় বিয়ে দেয়ার পূর্বে ও পরের মধ্যে কোন পার্থক্য হতে পারে না। আমাদের ফিকাহ্বিদগণ বলেছেন, সেই কাজটি যদি কোন পুরুষের সাথে হয় তাহলে তার মা তার জন্যে বিয়ে করা হারাম হবে না, তার কন্যাকে বিয়ে করাও নয়। তা এদিক দিয়ে যে, এ হারাম হওয়াটা সম্পর্কিত তার সঙ্গে, যার সাথে নিকাহ্র আক্দ সহীহ্ হয়। এ নিকাহ্ দ্বারা সে মেয়েলোকটি স্বামীর অধিকারী হতে পারে। ফলে হারাম সঙ্গম হালাল সঙ্গমের মতই হবে তাহরীম বাধ্যতামূলককরণে। কিন্তু ব্যক্তির মধ্যে তার অস্তিত্ব যখন মুবাহরূপে পাওয়া যায়নি এবং তা তার সাথে আক্দ করে তার মালিক হওয়া যায় না, তখন তার সাথে তাহ্রীমের হুকুম সম্পর্কিত হল না। যেমন যদি কেউ যৌন কামনা সহকারে মেয়েলোককে স্পর্শ করে, তাহলে তার সাথে তার মা কিংবা কন্যার তার জন্যে হারাম হওয়ার হুকুম সম্পর্কিত হবে না। অথচ স্পর্শ নারীর ক্ষেত্রে সকলের মতে সঙ্গম পর্যায়ের কাজ। তাহ্রীম তার সাথে সম্পর্কিত হওয়ার দিক দিয়ে। কিন্তু সকলেই যখন এ বিষয়ে একমত যে, শুধু স্পর্শ হলে তাতে নারীর মা বা কন্যার হারাম হওয়ার কারণ হবে না, তখন তা সঙ্গম হল না, হলে অন্য কিছু। এ কথা দ্বারা দুটি দিক দিয়ে আমাদের মতের সত্যতা প্রমাণিত হয়। একটি হল একজন পুরুষের অপর একজন পুরুষকে যৌন কামনা সহকারে স্পর্শ করায় সে জিনিস হল না, যা নিকাহ্র আকদ-এর দ্বারা হয়, তাই সে কারণে তাহ্রীম হবে না অর্থাৎ তাতে সেই পুরুষের মা বা কন্যা সে পুরুষটির জন্যে হারাম হয়ে যাবে না। সঙ্গমের হুকুম-ও তাই হবে। কেননা নিকাহ্র আকদ তার মালিক হওয়া সহীহ্ হয় না। আর দ্বিতীয় নারীকে স্পর্শ করা সকলের মতেই সঙ্গমের মতো। সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, স্ত্রীকে স্পর্শ করলে তার কন্যা হারাম হবে, যেমন হারাম হবে সঙ্গম হলে দক্ষিণ হস্তের মালিকানার বলে দাসীকে। স্পর্শ করলেও তার মা ও কন্যা হারাম হবে, যেমন সঙ্গমের কারণে হারাম হয়। তেমনি যে

মেয়েলোক হারাম হবে যিনার সঙ্গমের কারণে, সে স্পর্শের কারণেও হারাম হবে। কিন্তু পুরুষকে স্পর্শ করলে তা তাহ্‌রীমের কারণ হবে না, তেমনি তার সাথে সঙ্গম হলেও হারাম হবে না। কেননা মেয়েলোকের ক্ষেত্রে স্পর্শ ও সঙ্গম উভয়ই সমান— কোন পার্থক্য নেই দুটির মধ্যে।

আবূ বকর বলেছেন, হানাফী ফিকাহবিদগণ, সওরী, মালিক, আওজায়ী, লায়স ও শাফেয়ী এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, যৌন কামনাসহ স্পর্শ সঙ্গমের সমান— সেই নারী ও তার কন্যা হারাম হওয়ার ব্যাপারে। তাই হারাম সঙ্গমের দ্বারা যে যে-ই হারাম হবে, স্পর্শ দ্বারাও সে সে-ই হারাম হবে যদি তা যৌন কামনা সহকারে হয়। আর হারাম সঙ্গম দ্বারা যা হারাম হবে না, যৌন কামনার স্পর্শেও তা হারাম হবে না। স্ত্রীর ক্ষেত্রে মুবাহ্ স্পর্শ ও দক্ষিণ হস্তের মালিকানার সুযোগের স্পর্শে মা ও কন্যা উভয়ই হারাম হওয়ার কারণ হবে। তবে শাবরামাতা থেকে ভিন্ন মত বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, স্পর্শের কারণে কেউ হারাম হবে না। হারাম হবে যৌন সঙ্গম দ্বারা, যার কারণে 'হদ্দ' অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এ এক বিরল মত, এর পূর্বেই এ মতের বিপরীত মতের ওপর ইজমা হয়ে গেছে।

নারীর ওপর নযর দেয়া— তাতে কি কেউ হারাম হবে, কি হবে না, এ পর্যায়ে ফিকাহ্‌বিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। আমাদের হানাফী মাযহাবের সব ফিকাহবিদ বলেছেন, কেউ যদি কোন নারীর স্ত্রী-অঙ্গের ওপর যৌন কামনা সহকারে নযর দেয়, তাহলে তা স্পর্শ তুল্য, তার দরুন তাহ্‌রীম হবে। কিন্তু স্ত্রী-অঙ্গ ছাড়া দেহের অন্যত্র নযর দিলে তাতে হারাম হবে না। সওরী বলেছেন, নারীর যৌন অঙ্গের ওপর ইচ্ছাপূর্বক নযর দিলে তাতে সে নারীর মা ও কন্যা তার জন্যে হারাম হয়ে যাবে। তা যৌন কামনা সহকারে হওয়ার কোন শর্ত তিনি আরোপ করেন নি।

ইমাম মালিক বলেছেন, কেউ যদি তার দাসীর চুলের ওপর নযর দেয়, স্বাদ আস্বাদন করে; কিংবা তার বুকের ওপর বা উরি অথবা পার গোড়ালি কিংবা তার দেহের রূপময় অঙ্গসমূহের ওপর নযর দেয় ও স্বাদ পায়, তাহলে তার মা ও কন্যা তার জন্যে হারাম হয়ে যাবে। ইবনে আবূ লায়লা ও শাফেয়ী বলেছেন, শুধু নযর কোন জিনিস হারাম করে না যদি স্পর্শ না করে। আবূ বকর বলেছেন, জরীর ইবনে আবদুল হামীদ হাজ্জাজ আবূ হানী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ যে লোক কোন মেয়েলোকের যৌন অঙ্গের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করল, তার মা ও কন্যা তার জন্যে হারাম হয়ে গেল। হাম্মাদ ইবরাহীম আল-কামা আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ

لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى رَجُلٍ نَظَرَ اِلٰى فَرْجِ امْرَاَةٍ وَابْنَتِهَا –

যে লোক কোন মেয়েলোক ও তার কন্যার যৌন অঙ্গের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, আল্লাহ্‌র তার প্রতি তাকাবেন না।

আওজায়ী মকহুল থেকে বর্ণনা করেছেন, উমর (রা) তাঁর দাসীকে একাকী ডেকে তাকে তার কোন কোন সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তখন তিনি বললেন, সে তোমার জন্যে

হালাল হবে না। হাজ্জাজ আমর ইবনে শুয়ায়ব তাঁর পিতা— তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর এক দাসীকে একাকীত্বে তার কোন কোন সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। তারপরে বলেছেন, সে তোমার জন্যে হালাল নয়। আল-মুসান্না আমর ইবনে শুয়ায়ব ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

اَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ فَنَظَرَ اِلَيْهِ مِنْهَا يُرِيْدُ ذٰلِكَ الْاَمْرَ فَاِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ -

যে ব্যক্তি তার কোন ক্রীতদাসীকে আলাদা করে নেবে ও তার সেই 'জিনিসের' দিকে নযর দেবে— সেই কাজটি করার ইচ্ছা করবে, সেই ক্রীতদাসী তার পুত্রের জন্যে সে দাসী হালাল হবে না।

শবী থেকে বর্ণিত, বলেছেন, মসরূক তার পরিবারের লোকদেরকে লিখে পাঠিয়েছিলেন ঃ তোমরা আমার অমুক দাসীকে দেখ, তাকে বিক্রয় করে দাও। আমি তার থেকে যা পেয়েছি, তাতে আমার সন্তানদের জন্যে তাকে হারাম করে দিয়েছে, যেমন স্পর্শ ও দৃষ্টিদান। আল-হাসান, আল-কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ, মুজাহিদ ও ইবরাহীম প্রমুখের মত-ও তাই। দেখা যাচ্ছে আগের দিনের এসব ফিকাহবিদ এ বিষয়ে একমত যে, শুধু দৃষ্টি ও স্পর্শের কারণে তাহ্‌রীম অনিবার্য হয়। আমাদের ফিকাহবিদগণ 'তাহরীম' হওয়ার জন্যে স্ত্রীর যৌন অঙ্গের প্রতি নযর দেয়াকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সারা দেহের প্রতি নযর দেয়ার শর্ত করেন নি। কেননা নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ نَظَرَ اِلٰى فَرْجِ امْرَاَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ اُمُّهَا وَلَا بِنْتُهَا -

যে ব্যক্তি কোন মেয়েলোকের স্ত্রী-অঙ্গের ওপর দৃষ্টি দিল, তার জন্যে সেই মেয়েলোকের মা ও কন্যা হালাল হবে না।

এতে নারী-অঙ্গের ওপর নযর দেয়াকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তাহরীম কার্যকর হওয়ার জন্যে, সমগ্র দেহের প্রতি নযর দেয়ার কথা বলা হয়নি। এমনিভাবে ইবনে মাসউদ ও ইবনে উমর (রা) থেকেও একই কথা বর্ণিত হয়েছে। আগের দিনের মনীষিগণের এ দুজনের মতের বিপরীত কিছু বর্ণিত হয়নি। এ থেকে প্রমাণিত হল নারীর যৌন অঙ্গের ওপর নযর দেয়া তাহরীম কার্যকর হওয়ার জন্যে বিশেষ শর্ত। তাছাড়া অন্য কিছুর শর্ত নেই। অথচ 'কিয়াস' বলে যে, স্ত্রী-অঙ্গের ওপর নযরে তাহরীম হবে না। যেমন তাছাড়া দেহের অন্যান্য অংশের ওপর নযর দিলে তাহরীম হয় না। কিন্তু উক্ত মনীষিগণ এক্ষেত্রে কিয়াস পরিহার করেছেন, হাদীসকে গ্রহণ করেছেন, আর তাতেই আগের মনীষীদের ঐকমত্য হয়েছে। যৌন অঙ্গ ছাড়া দেহের অন্যান্য অংশের ওপর নযর দেয়া তাহরীম-এর কারণ বানান নি। তা যৌন স্পৃহা ও কামনা সহকারে হলেও। কিয়াস তো তারই দাবি করে। লক্ষণীয় যে, দৃষ্টিদানের সাথে হুকুম সংশ্লিষ্ট নয় সমস্ত মৌলিক ব্যাপারে। কেননা ইহ্‌রাম বাধা থাকা অবস্থায় যদি দেখে কিংবা রোযাদার অবস্থায় দেখে, তাতে তার মনে কামনা জাগ্রত হয়, তাতে তার রোযা বিনষ্ট হবে না। তবে স্পর্শের ফলে যদি বীর্যস্খলন ঘটে, তাহলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং ইহরাম বাধা অবস্থায় হলে একটা জন্তু কুরবানী দিতে হবে। এ থেকে জানা গেল, স্পর্শ ছাড়া শুধু দেখার সাথে কোন হুকুম

সম্পর্কিত হয় না। এ কারণে আমরা বলেছিলাম যে, কিয়াস বলে শুধু দৃষ্টিপাত— শুধু দেখায় কিছু হারাম হয়ে যায় না। তাই ফিকাহ্‌বিদগণ কিয়াস ত্যাগ করে হাদীস অনুযায়ী নারী অঙ্গের ওপর নযরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনে শাবরামাতার দলীল হল ঃ

فَاِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ -

তোমরা যদি তাদের সাথে সঙ্গম কার্য না কর, তালে তোমাদের কোন দোষ হবে না ।

আল্লাহ্‌র এ কথাটি। শুধু স্পর্শ তো সঙ্গম নয়। অতএব স্পর্শের কারণে কোন কিছুই হারাম হবে না।

এ কথা ও যুক্তির জবাব হল, আয়াতে সঙ্গম কিংবা তার স্থলাভিষিক্ত যা হয়, তাই বোঝাতে চাওয়া হয়েছে— এটা নিষিদ্ধ নয়। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَّتَرَا جَعَا -

সে যদি স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে পরে দুজনই ফিরে এলে— একত্রিত হলে— তাদের দুজনার কোন দোষ হবে না। (সূরা বাকারাহ ঃ ২৩০)

এ আয়াতে তালাকের উল্লেখ হয়েছে শুধু। তবে তার অর্থ, তালাক কিংবা তার যা স্থলাভিষিক্ত হয় তা। তার প্রমাণ হল আগের কালের ফিকাহ্‌বিদদের কথা এবং তাদের ঐকমত্য, কোন বিপরীত মত ছাড়াই— এ কথায় যে শুধু স্পর্শ ও তাহ্‌রীম বাধ্যতামূলক হবে।

এ ব্যাপারেও মনীষীদের মতপার্থক্য নেই যে, কোন মেয়েলোকের সাথে 'নিকাহ'র আক্‌দ হলে সে মেয়েলোক সেই পুরুষের পুত্রের জন্যে হারাম হবে। এ মত আল-হাসান, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন, ইবরাহীম, আতা ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকেও বর্ণিত।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ 'তবে যা আগে ঘটে গেছে' ..... এর তাৎপর্য পর্যায়ে আতা থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ তবে যা ইসলাম পূর্বকালে জাহিলিয়াতের জামানায় ঘটে গেছে, তা।

আবূ বকর বলেছেন, এটা সম্ভব যে, বোঝাতে চাওয়া হয়েছে, যা জাহিলিয়াতের সময়ে ঘটে গেছে, সে বিষয়ে তোমাদের পাকড়াও করা হবে না। আর এ-ও হতে পারে যে, বলতে চাওয়া হয়েছে ঃ যা আগে ঘটেছে, তার ওপর তোমরা স্থিতিশীল হয়ে রয়েছ। কেউ কেউ এর ব্যাখ্যায় এ কথাই বলেছেন। কিন্তু তা ভুল। কেননা নবী করীম (স) পিতার স্ত্রীকে কেউ বিয়ে করে থাকলে তা রক্ষা করেন নি। তা জাহিলিয়াতের সময়ে হয়ে থাকলেও বরা ইবনে আযিব (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) আবূ বুরদাতা ইবনে নায়ারকে এক ব্যক্তির নিকট পাঠিয়েছিলেন, সে তার পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করেছিল। কোন কোন বর্ণনার ভাষায় এরূপ আছে ঃ সে তার পিতার স্ত্রীকে নিকাহ করেছিল— আবূ বুরদাকে— সেই লোকটি হত্যা করা ও তার ধন-মাল নিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে। অথচ জাহিলিয়াতের যুগে পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করা ছিল ব্যাপক, সর্বপরিচিত ও সাধারণ ব্যাপার। নবী করীম (স) যদি কাউকে এ অবস্থার ওপর টিকিয়ে রাখতেন, তাহলে তা নিশ্চয়ই বর্ণনার মাধ্যমে জানা যেত, জনগণের নিকট কিছু মাত্র

অজানা থাকত না। কিন্তু কোন বর্ণনার মাধ্যমেই তা জানা যায়নি— এ রকমের কোন বর্ণনাও পাওয়া যায়নি। এ থেকে বোঝা গেল, إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ বলে আল্লাহ্ বলতে চেয়েছেন, আগে যা হয়ে গেছে, সেজন্য কাউকে পাকড়াও করা হবে না— কোন শাস্তি দেয়া হবে না। কেননা তা ইসলামের শরীয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা। কিন্তু এ সময় যারা সেই অবস্থায় স্থিতিশীল ছিল, তাদেরকে আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ কাজ যে হারাম তা শুনতে ও জানতে না পারা পর্যন্ত যা হবে, তার দরুন তাদেরকে পাকড়াও করা হবে না। ফলে এ ক্ষেত্রে إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ -এর অর্থ যে তা-ই যা আমরা বলেছি, তাতে কোন সংশয় থাকতে পারে না। আল্লাহ্র কথা إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ দুই বোনকে একত্রে স্ত্রী বানিয়ে রাখা সম্পর্কে ভিন্ন হওয়ার সম্ভাব্যতা অস্বীকার করা যায় না। আলোচনা সে পর্যন্ত পৌঁছলে আমরা সে বিষয়টির উল্লেখ ও আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ্। إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ 'তবে আগে যা হয়ে গেছে' কথাটি এখানে এর পূর্ববর্তী কথা থেকে অব্যাহতি দেয়ার ইঙ্গিত বহন করে। যেমন বলা হয় ঃ তুমি অমুককে দেখতে পাবে, তবে যার সাক্ষাত পেয়ে গেছ অর্থাৎ যাকে দেখবে, সেজন্যে তোমাকে ভর্ৎসনা করা হবে না। আল্লাহ্র কথা ঃ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً তা ছিল নির্লজ্জতা। এ ها ইঙ্গিতে পূর্বোল্লিখিত বিয়ে বা নিকাহ বোঝায়। এতে দুটি দিকের উল্লেখ করা হয়েছে। একটি নিষেধের পর নিকাহ অত্যন্ত লজ্জাকর অর্থাৎ এ বিয়ে লজ্জাকর। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে জ্ঞানবান ও মহাবিজ্ঞানী। সম্ভবত এ কথাটি বলে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, জাহিলিয়াতের সময়ে এ ধরনের যে কাজ-ই হয়েছে তাই লজ্জাকর। অতএব এ কাজ তোমরা আর করবে না। এ কথার বাস্তবতা হতে পারে তা যে হারাম এ কথা শ্রবণের পর, কেননা দলীল কায়েম হয়ে গেছে। যাঁরা এ তাৎপর্য বলেছেন, তারা إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ কথাটিকে আগের কথা থেকে ভিন্ন করার তাৎপর্যের বাহক বলেছেন এবং তা থেকে তওবা করা বুঝিয়েছেন।

আবূ বকর বলেছেন, উত্তম কথা এই যে, সে কাজ হারাম, এ কথা নাযিল হওয়ার পরই তা অত্যন্ত নির্লজ্জতার কাজরূপে চিহ্নিত হয়েছে। কেননা সকলের মতে তা-ই নিশ্চিত বক্তব্য, সন্দেহ নেই। আগের কালের নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে এ কাজের হারাম হওয়ার সপ্রমাণিত বলে সকলেই শুনতে পেয়েছে, এর কোন দলীল পাওয়া যায়নি। তাই এ কাজের দরুন তাদেরকে তিরস্কার করা যায় না। এ থেকে إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ-এর তাৎপর্য বোঝা গেল। তার বাহ্যিক অর্থের দাবি হল, আগের কাজের দরুন পাকড়াও না হওয়া।

যদি বলা হয়, এ কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কেউ যদি পিতার স্ত্রীর সাথে নিকাহ্র আকদ করে এবং পরে তার সাথে সঙ্গম করে, তাহলে তার এ সঙ্গম যিনা হবে। সেজন্যে তার ওপর 'হদ্দ' জারী হবে। কেননা আল্লাহ্ সে কাজকে فَاحِشَةً চরম লজ্জাকর বলেছেন। এ শব্দটি বহু প্রকারের নিষিদ্ধ কাজ বোঝায়।

আল্লাহ্র কথা ঃ

إِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ -

তবে যদি তারা সুস্পষ্ট চরম নির্লজ্জতার কাজ করে ....

অর্থাৎ তাদের ঘর থেকে বাইরে যাওয়া চরম নির্লজ্জতার কাজ— এ কথা বর্ণিত হয়েছে। এ-ও বর্ণিত যে, الفاحشة এখানে স্বামীর পরিবারের লোকদের সাথে জবান দরাজ করা— তিক্ত কথা বলা, গালাগাল করা বোঝায়। এর অর্থ হিসেবে এ-ও বলা হয়েছে যে, তার অর্থ যিনা الفاحشة নাম হচ্ছে যাবতীয় নিষিদ্ধতম কাজসমূহ করা, কেবল যিনা-ই নয়, অন্যান্য বহু কিছু তার মধ্যে শামিল। এমন কি الفاحشة শব্দ ব্যবহৃত হলেই যিনা বোঝাবে। অসহীহ্ বিয়ের মাধ্যমে যে সঙ্গম হয়, তা-ও এর অর্থ। তাকে হয়ত যিনা বলা হয় না। কেননা অগ্নিপূজারী সমস্ত মুশরিক— যারা ইসলামে সহীহ্ নয় এমন সব বিয়ের ফসল হিসেবে তারা প্রসূত, তাদের 'অবৈধ সন্তান' বলা হয় না। আর যিনা অনধিকারভাবে যৌন সঙ্গমকে বলা হয়। তা বিনা বিবাহে হতে পারে, দক্ষিণ হস্তের মালিকত্ব ছাড়াও হতে পারে। এবং দুজনের কারোর দিক থেকেই কোন সন্দেহ থাকবে না। যদি আক্দ-এর ফলে হয়, তাহলেও তাকে যিনা বলা হয় না। সে আক্দ অ-সহীহ্ কিংবা সহীহ্ যা-ই হোক।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا -

এবং ক্রোধ উদ্রেককারীও অত্যন্ত খারাপ পথ।

অর্থাৎ এ এমন কাজ, যাতে আল্লাহ্র ক্রোধ জাগে এবং মুসলিম জনগণও ক্রুদ্ধ-অসন্তুষ্ট হয়ে উঠে। এ কথা সে কাজের হারাম, অত্যন্ত জঘন্য এবং যে তা করে তার ঘৃণ্য হওয়া বোঝায়। সেই সঙ্গে এটা যে যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার অত্যন্ত খারাপ পথ ও উপায়, তা-ও বলা হয়েছে। কেননা এ কাজের পরিণাম জাহান্নাম।

আল্লাহ্র কথা ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ -

তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা ও কন্যাগণকে। —আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

আবদুল বাকী ইবনে কানে' মুহাম্মাদ ইবনে সালামাতা, সুনায়দ ইবনে দাউদ, অকীই, আলী ইবনে সালিহ, সামাক, ইকরামা, ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্র কথা ঃ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ —'তোমাদের প্রতি তোমাদের মাগণকে হারাম করা হয়েছে, .... بَنَاتُ الأخْتِ —'বোনের কন্যাগণ পর্যন্ত। বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বংশের দিক দিয়ে সাতজনকে এবং বৈবাহিক সম্পর্কের দিক দিয়ে সাতজনকে হারাম করেছেন। তারপর বলেছেন, তা তোমাদের জন্যে আল্লাহ্র লিখে দেয়া জিনিস ঃ

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ -

তোমাদের এ কয়জন বাদে আর যারা আছে, সকলকে তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে।

অর্থাৎ এ বংশের বাইরে যারা আছে। তারপর বলেছেন ঃ

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ -

এবং তোমাদের সে সব মা-ও (হারাম) যারা তোমাদেরকে দুগ্ধ পান করিয়েছেন এবং তোমাদের দুধ ভাইরা (হারাম)।

শেষেঃ

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ -

এবং যেসব মেয়েলোক পর স্ত্রী হিসেবে সংরক্ষিত। তবে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যে মেয়েলোকদের মালিকত্ব পেয়েছে, তারা নয়।

দক্ষিণ হস্তের মালিকত্বের অধীন যারা, তারা ক্রীতদাসী।

আবূ বকর বলেছেন আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে' সাধারণ ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। উল্লিখিত নাম প্রকৃতপক্ষে যাদের বোঝায়, তারা সকলেই এর মধ্যে শামিল। দাদী— দূরবর্তী হলেও হারাম, এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। শুধু امهات মা'গণ বলাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কেননা 'মা' নামটি এ পর্যায়ের সব মেয়েলোককেই শামিল করে। যেমন ابا ء 'বাপগণ' বললে দাদাও গণ্য হয়, তা যত দূরেরই হোক। এবং তোমাদের বাপগণ যে মেয়েলোকদেরকে নিকাহ্‌ করেছে, তোমরা তাদেরকে নিকাহ্‌ করবে না' এ কথা দ্বারা আল্লাহ্‌ দাদার বিবাহিতাদেরকে বুঝিয়েছেন। যদি-ও 'দাদা' একটা স্বতন্ত্র নাম, তার মধ্যে বাবা কখনই শামিল হয় না। কেননা ابو একটা সাধারণ নাম। এর মধ্যে সকলেই শামিল। এমনিভাবে আল্লাহ্‌র কথা ঃ وبناتكم 'এবং তোমাদের কন্যাগণ।' এর মধ্যে সন্তানের কন্যারাও শামিল, তা যত নিম্নের দিকের হোক। কেননা এ নামটি তাদেরকেও শামিল করে, যেমন 'বাপ' নামটি দাদাগণকেও শামিল করে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ -

এবং তোমাদের বোনগণ, তোমাদের ফুফুগণ, তোমাদের খালাগণ, ভাইর কন্যাগণ ও বোনের কন্যাগণ।

এ আয়াতে ভাইর কন্যা ও বোনের কন্যাদের আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা 'ভাই' ও 'বোন' নাম কন্যা নাম— সন্তানের কন্যাগণকে শামিল করে না। এ সাতজন মেয়েলোক হারাম কুরআনের দলীল দ্বারা এবং বংশের দিক দিয়ে। এরপর বলা হয়েছে ঃ তোমাদের যে সব মা'রা তোমাদেরকে দুধ খাইয়েছেন, তোমাদের দুধ-বোন, তোমাদের সঙ্গমকৃতা স্ত্রীদের কোলে করে নিয়ে আসা ও তোমাদের লালিতা-পালিতা কন্যাগণ। যদি তোমরা তাদের সাথে সঙ্গম না করে থাক, তাহলে সেই মেয়েলোকদের কন্যা হারাম হবে না— বিয়ে করলে গুনাহ হবে না এবং তোমাদের পুত্রদের স্ত্রীরা— যেসব পুত্র তোমাদের নিজের ঔরসজাত এবং এ-ও হারাম যে, তোমরা দুই বোনকে স্ত্রীত্বে একত্রিত করবে। তবে পূর্বে যা হয়ে গেছে তার কথা আলাদা।' এর পূর্বে বলা হয়েছে ঃ 'তোমাদের বাপ-দাদারা যেসব

মেয়েলোককে বিবাহ করেছে, তোমরা তাদেরকে নিকাহ্ করবে না। এই সাতজন মেয়েলোক বৈবাহিকতার কারণে হারাম এবং 'ভাইর কন্যা ও বোনের কন্যা' আল্লাহ্র এ কথায় তাদের নিম্নের দিকের মেয়েলোকদেরও শামিল করা হয়েছে। যেমন 'তোমাদের মা-গণ বলে উপরের দিকের মেয়েলোকদের বুঝিয়েছে। আর 'তোমাদের কন্যাগণ' বলে নিম্নের দিকের মেয়েলোক বুঝেয়েছে। 'এবং তোমাদের ফুফুগণ' বলে বাবার ফুফু ও মার ফুফুও বুঝয়েছে। এমনিভাবে 'তোমাদের খালাগণ' বলে মা'র খালা ও বাবার খালাও বুঝিয়েছেন। যেমন পিতার মা-গণের হারাম হওয়াও বুঝিয়েছেন উপরের দিকে সব সহ।

আল্লাহ্ ফুফুগণ ও খালাগণকে বিশেষভাবে হারাম ঘোষণা করেছেন। তাদের সন্তানগণ কিন্তু হারাম নয়। ফুফুর কন্যা ও খালার কন্যা বিয়ে করা জায়েয হওয়ায় কোনই মতভেদ নেই। আল্লাহ বলেছেন ঃ 'তোমাদের সেসব মা'রা যারা তোমাদেরকে দুধ খাইয়েছে এবং তোমাদের দুধ বোনগণ'— জানা আছে, এ মা ও বোন নামকরণ দুধ সেবন করানোর দরুন লাভ করেছে। দুধ সেবন কার্যের সাথে এ নাম দুটি সংশ্লিষ্ট বলেই যার দুধ পান করা হয়েছে সে 'মা' এবং তার কন্যা (কিংবা একত্রে অন্য যে কন্যা পান করেছে সে) 'বোন' নাম পেয়েছে। আর তার ফলে তারা অবশ্যই হারাম হবে মা ও বোন নাম লাভ করার কারণে, সে দুধের পরিমাণ খুব অল্প হলেও।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমাদের সে মা'রা যারা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছে' এ কথাটির মতই, যেমন কেউ বলে ঃ তোমাদের সেসব মা, যারা তোমাদের দিয়েছে, তোমাদের সে সব মা যারা তোমাদেরকে পরিয়েছে। কাজেই তারা এ কারণে মা, এ কথা স্পষ্ট করে বলার প্রয়োজন ছিল। তাই দুধ সম্পর্ক প্রমাণিত হয় এভাবেই। কথাটি এরূপ বলা হয়নি ঃ 'যারা তোমাদের দুধ পান করিয়েছে তারা তোমাদের মা।'

এর জবাবে বলা যাবে, এরূপ কথা সহীহ্ নয়। কেননা দুধ পান করানো হচ্ছে সেই কাজ যার দরুন মা নামটি অর্জন করা হয়। এ নামটি যখন দুধ পানের কারণে অর্জিত, তখন তার সাথে হুকুম সম্পর্কিত হবে। আর অভিধানে ও শরীয়াতে 'দুধ পান' নামটি অল্প পরিমাণ ও বেশি পরিমাণ উভয়কেই শামিল করে। 'দুধ পান' বললে কম পরিমাণেও এ নাম হয়, বেশি পরিমাণেও হয়। তাই দুধ পান হলেই 'মা' হবে। এ কথাই আল্লাহ বলেছেন ঃ 'তোমাদের সে সব মা যারা তোমাদের দুধ পান করিয়েছে।' এ কথাটি সে রকমের নয়, যেমন তুমি বলেছ ঃ তোমাদের সেই মা যে তোমাদেরকে দিয়েছে, তোমাদের সেই মা যে তোমাদের পরিয়েছে।' কেননা মা নাম কি পরানোর কাজের সাথে সম্পর্কিত নয়, যেমন তার সম্পর্ক রয়েছে দুধ পানের সাথে। এ কারণে আমরা নাম ও তার সাথে সম্পর্কিত কাজ দুটোরই পাওয়ার প্রয়োজন। 'তোমাদের দুধ পানের বোন' আল্লাহ্র এই কথাটিও তাঁর বোন হওয়া আবশ্যিক হয় দুধ পানের কারণে। কেননা 'বোন' নামটি দুধ পানের দরুন অর্জিত হয়েছে। তাছাড়া অন্য কোন কাজের দরুন নয়। আয়াতের সম্বোধন-ও এ তাৎপর্যই প্রমাণ করে। কথাটির দাবিও তাই; যা আবদুল ওহাব আবূ রুবাই— আমর ইবনে দীনার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, এক ব্যক্তি ইবনে উমর (রা)-এর নিকট এলো। বলল ঃ ইবনে নুয যুবায়র বলেছেন, একবার-দুবারের দুধ পানে

কোন দোষ নেই। ইবনে উমর (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র ফয়সালা ইবনুয যুবায়রের ফয়সালার তুলনায় অনেক ভালো। আল্লাহ তো বলেছেন ঃ

وَاَخَوٰتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ -

এবং তোমাদের দুধ পানের বোন।

আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের বাহ্যিক অর্থই ইবনে উমর (রা) এ বুঝেছেন যে, অল্প পরিমাণ দুধ পানেও বোন হারাম হবে।

অল্প পরিমাণের দুধ পানে হারাম হওয়ার ব্যাপারে আগের ও পরবর্তী ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। উমর, আলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর (রা) এবং আল-হাসান, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, তায়ূস, ইবরাহীম, জুহ্‌রী ও শবী বলেছেন, পান করা দুধের পরিমাণ কম হোক, কি বেশি— দুধ পানের দুই বছরের মধ্যে পান করা হলে তাতে তাহ্‌রীম হবে— তা সে দুধ-মা ও দুধ-বোন বিয়ে করা হারাম হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, জুফার, মালিক, সওরী, আওজায়ী প্রমুখ ফিকাহ্‌বিদেরও এ কথা এবং সমস্ত মুসলমান এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, দুধ অল্প হোক বেশি হোক— পান করা হলে তাতে মা ও বোন হারাম হবে— অবশ্য এমন পরিমাণ যদি হয়, যদ্দারা রোযাদারের ইফতার হয়ে যায়।

ইবনুয যুবায়র, আল-মুগীরা ইবনে শুবা ও জায়দ ইবনে সাবিত (রা) বলেছেন ঃ

একবার কি দুইবার— (এক চুমুক বা দুই চুমুক) দুধ পান করলে কেউ হারাম হবে না। শাফেয়ী বলেছেন ঃ বিচ্ছিন্নভাবে পাঁচবার দুধ পান না হলে কেউ হারাম হবে না। আবূ বকর বলেছেন, দুধ পানের মিয়াদ সম্পর্কে আমরা সূরা আল-বাকারার আলোচনায় বলে এসেছি। এ বিষয়ে যে মতের ভিন্নতা আছে, তারও উল্লেখ করেছি। আয়াতটি যে অল্প পরিমাণও তাহ্‌রীম হয় বলে প্রমাণ করে, পূর্বে এ বিষয়েও কথা বলেছি। কুরআন ও সুন্নাত থেকে পাওয়া ইল্‌ম ব্যতীত অন্য কোন ভাবে দুধের পরিমাণ নির্ধারণ করার কাজের অধিকার থাকতে পারে না— কারুর জন্যেই তা জায়েয হতে পারে না। সুন্নাহও এমন হতে হবে, যা মুতাওয়াতির সনদে বর্ণিত। এ বিষয়ে 'খবরে ওয়াহিদ' গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের মতে আয়াতটির হুকুম হচ্ছে বিশেষভাবে সেই 'কারণ নির্ধারণ' যা অল্প পরিমাণেও তাহ্‌রীম প্রমাণিত করে। কেননা আয়াতটি মুহকাম। এর অর্থ প্রকাশমান— স্পষ্ট প্রতিভাত। এর কোন বিশেষ অর্থ সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণিত হয়নি। যার এ পরিচিতি, তাকে খবরে ওয়াহিদ দ্বারা বিশেষ অর্থে গ্রহণ জায়েয নয়, জায়েয নয় কিয়াস দ্বারাও তা করা। সুন্নাত দ্বারা তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। নবী করীম (স)-এর কথা ঃ

اِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ -

এ দুধ পানটা ক্ষুধার দরুন হতে হবে।

মসরূক আয়েশা (রা) নবী করীম (স)-এর সূত্রে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এতে অল্প পরিমাণ ও বেশি পরিমাণের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। এ উভয় পরিমাণেই দুধ পান

ব্যবহৃত। নবী করীম (স) থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত অপর একটি হাদীসও তা প্রমাণ করে। তিনি বলেছেন ঃ

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ -

বংশের দিক দিয়ে যে যে হারাম হয়, দুধ পানেও সে সে হারাম হয়।

এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আলী, ইবনে আব্বাস, আয়েশা ও হাফসা সরাসরি নবী করীম (স) থেকে এবং ইলমওয়ালা সব লোকই এ হাদীসটি আন্তরিকভাবে সহীহ্‌রূপে গ্রহণ করেছেন এবং মাস্‌লার হুকুম জানায় ব্যাপাকভাবে ব্যবহার করেছেন। নবী করীম (স) নিজেই যখন দুধ পানে তা হারাম করেছেন যা বংশের কারণে হারাম আর জানা-ই আছে যে, বংশ সম্পর্ক যে দিক দিয়েই প্রমাণিত হোক, তা তাহ্‌রীম অনিবার্য করে। অন্য কোন দিক দিয়ে তা প্রমাণিত না হলেও ক্ষতি নেই। দুধ পানের ব্যাপারটিও অনুরূপ। তারও হুকুম হচ্ছে একবার দুধ পান হলেই তাহরীম প্রমাণিত হবে। কেননা নবী করীম (স) এ দুটিকে সমান করে দিয়েছেন। উভয় অবস্থার সাথেই 'তাহরীম' সম্পর্কিত।

যিনি পাঁচবার দুধ পান হওয়া দরকার বলেছেন, হাদীস থেকে তাঁর দলীল হল আয়েশা ইবনুয যুবায়র ও উম্মুল ফযল (রা) বর্ণিত হাদীস। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَاتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ -

একবার চোষণ হারাম করে না, দুইবার চোষণও নয়।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ কুরআনে প্রথমে দশবার জানাশুনাভাবে দুধ পানের কথা বলা হয়েছিল। পরে তা মনসূখ হয়ে যায়। তদস্থলে জানা-শুনা পাঁচবারের কথা এসেছে। তার পরে নবী করীম (স) ইন্তেকাল করেন। তখন এ কথাই কুরআনে পড়া হচ্ছিল।

আবূ বকর বলেছেন, এ হাদীসকে দলীল হিসেবে ধরে কুরআনের স্পষ্ট আয়াত— 'তোমাদের মা-রা যারা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছে এবং দুধ পানের বোনেরা' এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো জায়েয হতে পারে না। কেননা আমরা বলেছি যে, কুরআন থেকে তা প্রমাণিত নয়। আয়াতের বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে কুরআনের সাধারণ তাৎপর্যকে খবরে ওয়াহিদ দ্বারা বিশেষীকরণ জায়েয নয়। এ হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করার মর্যাদা নষ্ট হওয়ার কারণসমূহের মধ্যে এ হচ্ছে একটি কারণ।

আর দ্বিতীয় কারণ আবুল হাসান আল-কারখী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আল-হাজরমী আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ আবূ খালিদ হাজ্জাজ হুবায়ব ইবনে আবূ সাবিত তায়ূস, ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি দুগ্ধ পান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন। তখন আমি বললাম, লোকেরা তো বলে, একবার দুধ পান করলে তা কিছু হারাম করে না দুইবার করলেও না। বললেন হ্যাঁ, আগে তাই ছিল। কিন্তু আজকের দিনে একবার দুধ পানই হারাম করে।

মুহাম্মাদ ইবনে শুজা বর্ণনা করেছেন, ইসহাক ইবনে সুলায়মান, হানজালা, তায়ূস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, দশবার দুধ পানের শর্ত ছিল। কিন্তু পরে বলা হয়েছে, একবারের দুধ পানেই তাহ্‌রীম করে। বোঝা গেল, ইবনে আব্বাস ও তায়ূস উভয়ই দুধ পানের বার-সংখ্যা জানেন। তবে একবার দুধ পানের দ্বারাই তাহ্‌রীম হওয়ার সে সংখ্যা মনসূখ হয়ে গেছে। এ-ও হতে পারে যে, এ সংখ্যা নির্ধারণ বয়স্কদের দুধ পানে শর্ত করা হয়েছিল। আর তা নবী করীম (স) থেকে বড়দের দুধ পানের ব্যাপারে বর্ণিতও হয়েছিল। কিন্তু তা বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদদের নিকট মনসূখ হয়ে গেছে। আর বড়দের দুধ পানের ক্ষেত্রে এ সংখ্যা নির্ধারণ যখন মনসূখ হয়ে গেল, তখন এ সংখ্যা বা বার নির্ধারণই মনসূখ হয়ে গেল। কেননা তা শর্তযুক্ত ছিল। উপরন্তু ইমাম শাফেয়ী তিনবার দুধ পানেই তাহ্‌রীম অনিবার্য বলেছেন। তার এ কথা থেকেই তা প্রমাণিত হয়, একবার বা দুইবারের পানের তাহ্‌রীম হয় না। এটা আমলের ওপর বৃদ্ধি বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস— যেভাবে তা এসেছে— সহীহ্ বলে বিশ্বাস করা জায়েয নয়। তা এজন্যে যে, তিনি উল্লেখ করেছেন, কুরআনে দশবারের দুধ পানের কথা নাযিল হয়েছিল, পরে তা মনসূখ হয়ে পাঁচবার স্থির হয়েছে। অতএব রাসূল (স) ইন্তিকালের করে গেছেন, তখনও তা-ই তিলাওয়াত করা হচ্ছিল। অথচ নবী করীম (স)-এর ইন্তিকালের পর কুরআনের কোন কিছু মনসূখ হওয়ার কথা বলা কোন মুসলমানের জন্যেই জায়েয নয়। যদি তা প্রতিষ্ঠিত হতো, তাহলে তা এখনও কুরআনে তিলাওয়াত হওয়া অনিবার্য ছিল। কিন্তু কুরআন পাঠে এ কথা কক্ষণই পাওয়া যায় না। আর নবী করীম (স)-এর ইন্তিকালের পর তার মনসূখ হওয়ার বা বাদ পড়ে যাওয়ার তো কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। হাদীসে এরূপ কথা আসার দুটি কারণ থাকতে পারে। হয় হাদীসটি মূলের মধ্যে প্রবিষ্ট, এর কোন হুকুম প্রমাণিত নয়। অথবা যদি তা প্রমাণিত হয়, তাহলে তা রাসূল (স)-এর জীবদ্দশায়ই মনসূখ হয়ে গেছে। আর যা মনসূখ হয়ে গেছে, তদনুযায়ী আমল করার কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। আর এ হওয়াও অসম্ভব নয় যে, বয়স্কের দুগ্ধ পান সম্পর্কেই বার-এর এ নির্ধারণ। আর হযরত আয়েশা (রা) বয়স্কের দুগ্ধ পানেও তাহ্‌রীম কার্য করার মত পোষণ করতেন। তবে রাসূল (স)-এর সব বেগম এ মতই রাখতেন না। আমাদেরও শাফেয়ীর নিকট বয়স্কের দুগ্ধ পানের হুকুম মনসূখ হয়ে গেছে। কাজেই হযরত আয়েশা (রা) হাদীসে যে বার-সংখ্যার নির্ধারণ রয়েছে, তা-ও মনসূখ হয়ে গেছে। এই যে সব ব্যাখ্যা ও তাৎপর্যের আমরা উল্লেখ করলাম এসব যদি অসম্ভব মনে করা হয়, তাহলেও কুরআনের সহজ অর্থে যা প্রমাণিত হয়, তার বিপরীত কথা তোলা-ই জায়েয হতে পারে না। কেননা এসব হচ্ছে খবরে ওয়াহিদ।

আমরা এই যে উল্লেখ করলাম— দুধ পানের কোন পরিমাণ বা বার নির্ধারণ বাতিল হয়েছে, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দুধ পান চিরস্থায়ী তাহ্‌রীম বাধ্যতামূলক করে। ফলে তা সেই সঙ্গম সমতুল্য, যা স্ত্রীলোকটির মা ও কন্যাকে চিরদিনের জন্যে হারাম করে দেয়। এর কোন একজনের সঙ্গে শুধু আক্‌দ হওয়াটাও তাহ্‌রীমের কারণ হবে অবশ্যম্ভাবীরূপে। যেমন পুত্রদের স্ত্রীরা এবং বাবার বিবাহিতারা। সে দুধের স্বল্প পরিমাণ ও বেশি পরিমাণের মতোই, যার ফলে তাহ্‌রীমের হুকুম কার্যকর হবে। অল্প পান করলে যেমন, বেশি পরিমাণ পান করলেও তেমন।

শুষ্ক স্তনের দুগ্ধ পান করলে দুগ্ধ পানের হুকুম কি হবে, এ বিষয়ে ইলমওয়ালাদের বিভিন্ন মত রয়েছে। তার রূপ এই যে, এক ব্যক্তি একজন মেয়েলোক বিয়ে করল। সে মেয়েলোকটি এ পুরুষটি থেকে একটি সন্তান প্রসব করল। আর তার স্তনে দুধ এসে গেল সন্তান প্রসবের পরে। তখন সে একটি শিশুকে দুগ্ধ পান করায়। কেউ বলেছেন, সে এ শুষ্ক স্তনের দুগ্ধ পান করলেও এ শিশুটি সেই পুরুষটির অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের জন্যে হারাম হবে। যদিও তারা সেই মেয়েলোকটির গর্ভজাত সন্তান নয়। এ মত দিয়েছেন ইবনে আব্বাস (রা) জুহরী, আমর ইবনুস সরীদ, ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল এমন এক ব্যক্তির সম্পর্কে, যার দুজন স্ত্রী আছে। একজন দুধ খাওয়ালো একটি ছেলে শিশুকে আর অপরজন দুধ খাওয়ালো একটি কন্যা শিশুকে। এমতাবস্থায় এই ছেলে কি সেই মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে ? তিনি জওয়াবে বললেন, না। কেননা উভয় স্ত্রীলোকের দুধের উৎস অভিন্ন। আল-কাসেম, সালিম, আতা ও তায়ূস প্রমুখ ফিকাহবিদও এই মতই প্রকাশ করেছেন। খিফাফ সাঈদ ইবনে সীরান সূত্রে উল্লেখ করেছেন, বলেছেন ঃ কিছু লোক এ দুটি ছেলে-মেয়ের পারস্পরিক বিয়েকে মকরূহ মনে করেছেন, অপছন্দ করেছেন আর কিছু লোক তাতে দোষ মনে করেন নি। তবে যাঁরা অপছন্দ করেছেন, তাঁরা তাদের তুলনায় অধিক সমঝদার যাঁরা তাতে কোন দোষ দেখেন নি।

উবাদ ইবনে মনসুর উল্লেখ করেছেন, বলেছেন ঃ আমি কাসেম ইবনে মুহাম্মাদকে বললাম, আমার পিতার স্ত্রীলোকদের থেকে একটি কন্যা নিয়ে আমার বাপের দিকের বোনের দুধ খাইয়ে লালন করে। সে কি আমার জন্যে হালাল, আমি তাকে বিয়ে করতে পারি ? জবাবে বললেন, না। কেননা তোমার পিতা-ই তো তার পিতা। পরে আমি তায়ূস ও আল হাসানকেও এ প্রশ্ন করি। তাঁরা দুজনও অনুরূপ জবাবই দিলেন। মুজাহিদকেও আমি এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তিনি বললেন, এ বিষয়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। আমি নিজে এ বিষয়ে কিছুই বলছি না। পরে মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনকে এ প্রশ্ন করি। তিনি মুজাহিদ যা বলেছেন, তাই বললেন। ইউসুফ ইবনে মাহিককে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আবূ কুয়ায়স বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করলেন। আর আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, জুফার, মালিক, সওরী, আওজায়ী, লায়স ও শাফেয়ী বলেছেন, لبن الفحل হারাম করে। সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যিব ইবরাহীম নখয়ী, আবূ সালামাতা ইবনে আবদুর রহমান, আতা ইবনে আবদুর রহমান, আতা ইবনে ইয়াসার ও সুলায়মান ইবনে ইয়াসার বলেছেন, لبن الفحل পুরুষের দিক দিয়ে কাউকে হারাম করে না। রাফে' ইবনে খাদীজ থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমোক্ত কথা সহীহ্। তার দলীল হচ্ছে জুহ্‌রী ও হিশাম ইবনে উরওয়াতা, উরওয়াতা আয়েশাতা (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস। আবূল কুয়ায়সের ভাই আফলাহ্ এসে হযরত আয়েশার নিকট সাক্ষাতের অনুমতি চাইলেন। তিনি হযরত আয়েশার দুধ চাচা। এটা পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পরের ঘটনা। হযরত আয়েশা বলেন, আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে ও তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকর করি। পরে নবী করীম (স) ঘরে পৌঁছলে তাকে এ বিষয়ে জানাই। তিনি বললেন, হ্যাঁ সে তোমার নিকট আসতে পারে। কেননা সে তোমার চাচা। আমি বললাম— আমাকে তার স্ত্রী দুধ খাইয়েছে, সে তো নয়। তবু নবী করীম (স) বললেন, সে

তোমার ঘরে আসতে পারে। কেননা সে তোমার চাচা। আবূল কুয়ায়স ছিল সেই মহিলার স্বামী। তিনি হযরত আয়েশাকে দুধ খাইয়েছিল।

একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়— মেয়েলোকের স্তনে যে দুধ আসে, তা পুরুষ ও মেয়েলোক উভয়েরই। কেননা নারীর গর্ভ সঞ্চারের কারণেও দুজনই শরীক। কাজেই মেয়েলোকের বুকের দুধ পান করলে তার কারণে দুজনের সাথে দুধ সম্পর্ক স্থাপিত হবে। যেমন সন্তান স্বামী স্ত্রী উভয়েরই, তার কারণ যত বিভিন্নই হোক-না-কেন।

যদি বলা হয়, মালিক আবদুর রহমান ইবনুল কাসেম— তাঁর পিতা— আয়েশা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আয়েশার নিকট সে-ই আসত, যার বোন তাঁকে দুধ খাইয়েছে এবং তার বোনের কন্যারাও। তবে তার ভাইর যে স্ত্রীরা তাঁকে দুধ খাইয়েছে, তারা যেতে পারত না।

জবাবে বলা যাবে, এ কথা لبن الفحل পর্যায়ে বলা হয়েছে তার বিপরীত কিছু নয়। কেননা তাঁর মুহররমদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি দেখা করার অনুমতি দিতে পারতেন। আর যার সাথে ইচ্ছা পর্দা করতেন। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, কন্যা দাদার মুহররম, যদিও সে তার ঔরসজাত নয়। বরং তার জন্ম যে পিতার ঔরসে, সেই পিতা তো দাদারই সন্তান। তেমনি পুরুষটি স্ত্রীর বুকের দুধ আসার কারণ। অতএব সে তার জন্যে হারাম, তবে অনিবার্যভাবে। যদিও সে যে দুধ পান করেছে তা সেই পুরুষটির বুকের নয়। বরং সে তার পান করা দুধের সঞ্চারিত হওয়ার আসল কারণ। যার বুকের দুধ পান করা হয়েছে তার সাথে যেমন মাতৃত্বের সম্পর্ক হয়, সেই মেয়েলোকটির বুকে দুধের সঞ্চার হওয়ার কারণ যে পুরুষটির, তার সাথে দুধের পিতৃ-সম্পর্ক স্থাপিত হবে— এ-ই স্বাভাবিক। কুরআন মজীদের দুধ-মা, দুধ-বোন ইত্যাদির কথা 'নস' হিসেবে নাযিল হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, এ পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) থেকে সর্বজনবিদিত হাদীসও বর্ণিত হয়েছে, যা নির্ভুল জ্ঞান দান করে। তিনি বলেছেন ঃ 'দুধ পানে তা-ই হারাম হয়, যা বংশ-সম্পর্কের কারণে হারাম হয়।' ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত।

## স্ত্রীদের মা ও পালিতা কন্যা

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَأُمَّهَاتُ نِسَاءِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَاءِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ -

তোমাদের স্ত্রীদের মারা এবং তোমরা যে সব স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম করেছ, তাদের সঙ্গে নিয়ে আসা যেসব কন্যা তোমাদের ক্রোড়ে পালিতা— হারাম।

যে স্ত্রীরা অন্য ঘর থেকে যেসব ছেলেমেয়ে কোলে করে নিয়ে আসে, সেই স্ত্রীদের সাথে তোমাদের সঙ্গম না হওয়া পর্যন্ত সেই ছেলে-মেয়েরা তোমাদের জন্যে হারাম হয় না। এ স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম হলে অথবা স্পর্শ ও দর্শন— যেমন পূর্বে বলেছি— হলেও লালিতা কন্যার হারাম হওয়ার কারণ ঘটে। এ কথা 'নস' হিসেবেই কুরআন মজীদে নাযিল হয়েছে ঃ

فَإِنْ لَّمْ تَكُوْنُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ -

তোমরা সেই স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম কার্য না করে থাকলে সেজন্য তোমাদের উপর কোন দোষ চাপবে না।

স্ত্রীদের মাদের ব্যাপারে আগের কালের ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। স্ত্রীদের মা কি শুধু বিয়ের আক্‌দ হলেই এবং সঙ্গম না হলেও হারাম হয়ে যায় ?

হাম্মাদ ইবনে সালমাতা কাতাদাতা— খালাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী (রা) বলেছেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার সাথে সঙ্গম হওয়ার আগেই তালাক দিয়ে দিল। এ ব্যক্তি সে স্ত্রীর মাকে বিয়ে করতে পারে। যদি বিয়ে করে এবং সঙ্গম হওয়ার আগেই তাকে তালাক দেয়, তাহলে তার কন্যাকে সে বিয়ে করতে পারে। এ দুটি একই ধারায় প্রবাহিত। অবশ্য হাদীস পারদর্শীগণ হযরত আলী সূত্রে খালাস বর্ণিত হাদীসকে জয়ীফ বলেছেন। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকেও অনুরূপ কথা জানা যায়। এ হল মুজাহিদ ও ইবনুয যুবায়রের মত। এ পর্যায়ে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে দুটি বর্ণনা এসেছে। তার একটি ইবনে জুরাইয আবূ বকর ইবনে হাফস, আমার ইবনে মুসলিম ইবনে উয়াইমার ইবনুল আজদা' সূত্রে বর্ণিত। তা হল ঃ স্ত্রীর মা হারাম হয় না সেই স্ত্রীর সাথে সঙ্গম না হলে। অপর হাদীসটি ইকরামা তাঁর থেকেই বর্ণনা করেছেন যে, কোন মেয়েলোকের সাথে বিয়ের আকদ হলেই সেই মেয়ের মা হারাম হয়ে যাবে। উমর, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, ইমরান ইবনে হুসায়ন, মাসরুক, আতা, আল-হাসান ও ইকরামা বলেছেন ঃ শুধু আক্‌দ হলেই স্ত্রীর মা হারাম হয়ে যাবে, তার সাথে সঙ্গম হোক কি না-ই হোক।

আবূ উসামাতা সুফিয়ান— আবূ ফরওয়াতা-আবূ আমর আশ-শায়বানী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ একজন মেয়েলোক— তাকে এক ব্যক্তি বিয়ে করে তালাক দিয়েছে তার সাথে সঙ্গম করার পূর্বেই, তালাক দিয়েছে অথবা সে মরে গেছে, তার মাকে বিয়ে করা কি সেই ব্যক্তির জন্যে জায়েয ? বললেন, না, তার মাকে বিয়ে করলে তার কোন দোষ হবে না। পরে তিনি মদীনায় এলেন। তখন তিনি ফতোয়া দিয়ে তা করতে নিষেধ করলেন, অথচ ইতিমধ্যে সেই লোকটি সন্তান জন্ম দিয়েছে। ইবরাহীম শুরাইহ্‌ থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হযরত আলী (রা)-এর কথার উপরই ফতোয়া দিতেন অর্থাৎ স্ত্রীদের মা'দের সম্পর্কে। পরে রাসূল (স)-এর সাহাবীগণ হজ্জ করার পর একত্রিত হয়ে এ বিষয়ে পরস্পর আলোচনা করলেন। তারপরে তাঁরা সেই মেয়েলোকটিকে বিয়ে করার ব্যাপারে অসম্মতি প্রকাশ করলেন, তাঁরা তা পছন্দ করলেন না। পরে ইবনে মাসউদ (রা) যখন ফিরে এলেন, তখন তিনি যাকে ফতোয়া দিয়েছিলেন তাকে তা করতে নিষেধ করলেন। তারা ছিল বনু জুফারাতা গোত্রের উপগোত্র। তাদেরকেই তিনি পূর্বোল্লিখিত ফতোয়া দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, আমি আমার সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাঁরা এ কাজটিকে অপছন্দ করেছেন। কাতাদাতা সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকে বর্ণনা করেছেন, জায়দ ইবনে সাবিত বলেছেন, যে ব্যক্তি সঙ্গমের পূর্বেই স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, সে সেই তালাক দেয়া স্ত্রীর মাকে বিয়ে করার ইচ্ছা করেছে। সে যদি বাস্তবিক সঙ্গম করার পূর্বেই তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে থাকে, তাহলে সে

সেই তালাক দেয়া স্ত্রীর মাকে বিয়ে করতে পারে। কিন্তু সে স্ত্রী যদি মরে গিয়ে থাকে, তাহলে সে তার মাকে বিয়ে করতে পারবে না। হাদীস পারদর্শীগণ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব— জায়দ সূত্রে কাতাদাতা বর্ণিত এ হাদীসকে জয়ীফ বলেছেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকে কাতাদাতা যতটুকু বর্ণনা করেছেন, তাঁরা তার চাইতে অনেক বেশি বলেন। কেননা এ দুই জনের মাঝে বহু কয়জন বর্ণনাকারী রয়েছেন। সাঈদ থেকে তার বর্ণনাকারী সাঈদের অধিকাংশ সিকাহ সঙ্গীদের বিরোধী। আবদুর রহমান ইবন মাহদী মালিক সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব সূত্রটি কাতাদাতাই সাঈদ সূত্রের তুলনায় অধিক প্রিয় বলেছেন। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদুল আনসারী— সাদ ইবনে সাবিত সূত্রে কাতাদাহর বর্ণনার বিপরীত কথা বলেছেন ও বর্ণনা করেছেন। বলা হয়, ইয়াহ্‌ইয়া বর্ণিত হাদীস যদিও 'মুরসাল' তবু তা কাতাদাতা— সাঈদ সূত্রের হাদীস অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী।

আবূ বকর বলেছেন, আমরা এই যা বললাম, হাদীস পারদর্শী ও ফকীহবৃন্দের এটাই নিয়ম। হাদীস কবুল করার বা রদ করার ব্যাপারে তাঁরা একে গণ্য করেন না। তবু আমরা তার উল্লেখ করলাম, যেন লোকদের মত সকলে জানতে পারেন যে, তারা তাকে গণ্য না করেও সেটি অনুযায়ী আমল করেন। এই সন্দেহ রয়েছে যে, জায়দ ইবনে সাবিত মৃত্যু ও তালাকের মধ্যে তাহ্‌রীমের ব্যাপারে পার্থক্য করেছেন— মরে গেলে তার মা'কে বিয়ে করা জায়েয নয়, আর তালাক দিলে তাকে বিয়ে করা জায়েয। কেননা সঙ্গমের পূর্বে তালাক হলে সঙ্গম হওয়া সংক্রান্ত কোন হুকুমই উহার সাথে সম্পর্কিত হয় না। এরূপ অবস্থায় অর্ধ মহরানা দেয়া ওয়াজিব হয়। তার ইদ্দত পালনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সে যদি মরে যায়— সঙ্গম হলে যেমন পূর্ণ মহরানা পাওয়া অধিকার জন্মে এবং ইদ্দতও পালন করতে হয়— তাহরীমে সেই হুকুম কার্যকর করেছেন। শুধু আক্‌দ হলেই স্ত্রীদের মা'রা যে হারাম হয়ে যায় তার দলীল হলো وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ এবং তোমাদের স্ত্রীদের মারা (হারাম)। এ কথাটি وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ এবং তোমাদের পুত্রদের স্ত্রী'রা (ও হারাম) এই কথার মতো-ই অতি সাধারণ ও ব্যাপক অর্থবোধক। 'এবং তোমাদের পিতারা যে সব মেয়েলোক বিয়ে করেছে, তোমরা তাদের বিয়ে করবে না' কথাটিও তেমনি। অতএব এ সাধারণ ব্যাপক কথাকে বিশেষীকরণ করা যায় না। অবশ্য বিশেষীকরণের কোন দলীল পাওয়া গেলে ভিন্ন কথা।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ -

এবং তোমাদের স্ত্রীদের কন্যা, যারা তোমাদের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হয়েছে, সে স্ত্রীদের কন্যারা যাদের সাথে তোমাদের সঙ্গম হয়েছে।

এ হুকুমটা বয়ে নিয়ে আসা ও লালিতা-পালিতা কন্যাদের সম্পর্কেই সীমিত। স্ত্রীদের মা'রা এর মধ্যে শামিল নয়। এর কয়েকটি কারণ আছে। একটি— এখানকার প্রত্যেকটি বাক্যই স্বয়ংসম্পূর্ণ। এতে উল্লিখিত হুকুমটি বাধ্যতামূলক হওয়ার দিক দিয়ে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমাদের স্ত্রীদের মা'রা এবং তাঁর কথা ঃ তোমাদের লালিতা পালিতা সেসব কন্যা, যারা তোমাদের সেসব স্ত্রীদের থেকে যাদের সাথে তোমাদের সঙ্গম হয়েছে' এর প্রতিটি কথাই

স্বয়ংসম্পূর্ণ, অন্য কোন কথার উপর নির্ভরশীল নয়। এ শব্দের দাবি অনুযায়ীই তা কার্যকর হবে। অন্য কারুর সাথে তাকে সম্পর্কিত করা ছাড়া-ই। তাই আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমাদের স্ত্রীর মা'রা' স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য, তখন স্ত্রীদের মা'রাও সাধারণভাবেই হারাম হবে, সঙ্গম হওয়া সহকারে হোক, কি সঙ্গম ছাড়া-ই। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ তোমাদের ক্রোড়ে লালিতা-পালিতা তোমাদের স্ত্রীদের সেসব কন্যারা, যাদের সাথে তোমাদের সঙ্গম ঘটেছে'-ও একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্য সম্বলিত কথা। অবশ্য এ কথাটিতে সঙ্গমের শর্ত করা হয়েছে। তাই একটি বাক্যকে অপর বাক্যের উপর ভিত্তিশীল মনে করা আমাদের জন্যে সঙ্গত নয়। বরং যেমন নিঃশর্ত ও সাধারণ বাক্য, তেমনি রাখা আবশ্যক। আর যেটি শর্তযুক্ত, সেটিকে শর্তযুক্ত রাখা-ই বাঞ্ছনীয়। তবে একটির অপরটির উপর হওয়ার ও তার শর্ত সাপেক্ষ হওয়ার দলীল পাওয়া গেলে তা-ই করতে হবে।

আর দ্বিতীয় হল, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'এবং তোমাদের ক্রোড়ে লালিতা-পালিতা তোমাদের সঙ্গমকৃতা স্ত্রীদের বয়ে নিয়ে আসা কন্যারা সঙ্গমকৃতা না হলে তোমাদের কোন দোষ নেই।' এখানে শর্তের উল্লেখ হয়েছে। এ শর্তটি অব্যাহতি দানের পর্যায়ে গণ্য। এর উহ্য শব্দের দিক দিয়ে এর অর্থ হবে ঃ 'তোমাদের স্ত্রীদের নিয়ে আসা তোমাদের কোলে লালিতা-পালিতা কন্যারাও তোমাদের জন্যে হারাম। তবে যেসব স্ত্রীদের সঙ্গে সঙ্গম করনি, তাদের কথা আলাদা। কেননা সাধারণ ও ব্যাপক অর্থবোধক কথার মধ্যে যা শামিল হয়, তা থেকে কতক বাদ দেয়া হয়েছে এ কথা বলে। অর্থাৎ বাক্যের শেষাংশটুকু স্বতন্ত্র অর্থ দেয় পূর্ববর্তী কথা থেকে। আর 'ইস্তিসনা' (Exception)-র হুকুম হচ্ছে পরবর্তীর প্রতি ফিরে আসা যদি কোন দলীল থাকে পূর্ববর্তী কথার দিকে ফিরে যাওয়ার। আর তৃতীয়টি হচ্ছে সঙ্গমের শর্ত করে বাক্যের সাধারণ অর্থবোধক শব্দ থেকে বিশেষীকরণ। তা অবশ্যই মেয়েদের ক্ষেত্রে কার্যকর এবং স্ত্রীদের মা'দের প্রতি প্রত্যাবর্তনের ব্যাপার সম্পর্কে সংশয়। আর সংশয় দ্বারা সাধারণ তাৎপর্যকে বিশেষীকরণ অসঙ্গত। তাই তাহ্‌রীমের সাধারণত্ব স্ত্রীদের মা'দের ক্ষেত্রে তার পথে স্থিতিশীল। আর পরবর্তী হল, স্ত্রীদের মা'দের ব্যাপারে প্রকাশমান সঙ্গমকে প্রচ্ছন্ন করা। কেননা কথাটি এরূপ বলা ঃ 'তোমাদের স্ত্রীদের মা— সেই স্ত্রীদের যাদের সাথে তোমরা সঙ্গম করেছ' খুব একটা ভাল হয় না। কেননা আমাদের স্ত্রীদের মারা তো আমাদের স্ত্রীদের মধ্যে নয়। আর আমাদের স্ত্রীদের কন্যারাও আমাদের স্ত্রীদের মধ্যে নয়। কেননা কন্যা তো তার মা থেকে, মা কন্যা থেকে নয়। স্ত্রীদের মা'দেরকে শর্ত দ্বারা প্রকাশমান করে কথা বলা যথার্থ কাজ হয় না। সহীহ্ হয় না তাকে প্রচ্ছন্ন বা উহ্য রাখা। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ্‌র কথার অংশ ঃ مِنْ نِّسَائِكُمْ 'তোমাদের স্ত্রীদের থেকে .....' এটা কন্যাদের পরিচিতিমূলক কথা, স্ত্রীদের মা'দের পরিচিতি এটা নয়। উপরন্তু তোমাদের সেসব স্ত্রীদের থেকে যাদের সাথে তোমরা সঙ্গম করেছ' কথাটিকে যদি স্ত্রীদের মা'দের পরিচিতি ধরি, আর বাক্যটি এভাবে দাঁড় করি ঃ 'এবং তোমাদের স্ত্রীদের মা'রা— সেসব স্ত্রীদের থেকে যাদের সাথে তোমরা সঙ্গম করেছ, তাহলে লালিতা-পালিতা কন্যারা এর বাইরে পড়ে যাবে, তাদেরকে বাদ দিয়ে শর্তের হুকুমটা স্ত্রীদের মা'দের ব্যাপারে দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু তা নাযিল হওয়া 'নস'-এর পরিপন্থী হবে। প্রমাণিত হল যে, স্ত্রীদের মা'দের ব্যাপারে নয়, লালিতা-পালিতা কন্যাদের ব্যাপারে এ সঙ্গমের শর্তটা

আরোপিত, অর্থাৎ সঙ্গম হয়েছে যে স্ত্রীদের সাথে তাদের বাহিত ও তোমাদের লালিতা-পালিতা কন্যারা।

আবদুল বাকী ইবনে কানে' ইসমাঈল ইবনুল ফযল-কুতায়বাতা ইবনে সাঈদ ইবনে লহ্ইয়াতা, আমর ইবনে শুয়ায়ব, তাঁর— তাঁর দাদা, নবী করীম (স) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَايَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا -

যে ব্যক্তি কোন মেয়েলোক বিয়ে করল, তার সাথে সঙ্গম করল, তার কন্যা নিকাহ্ করা সেই ব্যক্তির জন্যে হালাল নয়। যদি সঙ্গম না করে থাকে, তাহলে সেই মেয়েলোকের কন্যাকে বিয়ে করতে পারে। আর যে ব্যক্তি কোন মেয়েলোক নিকাহ্ করল, তার সাথে সঙ্গম করেছে বা করেনি, উভয় অবস্থায়ই সেই ময়েলোকটির মা'কে সে নিকাহ করতে পারবে না।

আগের দিনের ফিকাহবিদদের লালিতা-পালিতা সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। ইবনে জুরাইয বলেছেন, ইবরাহীম ইবনে উবায়দ, ইবনে রাফায়াতা, সালিম ইবনে আওস, আলী ইবনে আবূ তালিব কার্রামাল্লাহু আজহাহু (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ লালিতা-পালিতা কন্যা যদি স্বামীর ক্রোড়ে না থাকে, ভিন্ন কোন শহরে বা জনপদে থাকে, পরে তার মা সঙ্গম হওয়ার স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে সেই পালিতা কন্যাকে সে লোকটির বিয়ে করা জায়েয হবে। আবদুর রাজ্জাক ইবরাহীম এ কথা সম্পর্ক বলেছেন। ইবরাহীম ইবনে উবায়দ এই হাদীসটি ছাড়া অন্যত্র বলেছেন— সে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির বর্ণনা। এ ধরনের কথা প্রমাণিত হয় না। তা সত্ত্বেও ইলমে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ এ হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। একে কেউ-ই কবুল করেন নি। কাতাদাতা খালাস আলী (রা) সূত্রে বলেছেন ঃ লালিতা-পালিতা কন্যা ও তার মা একই ধারায় চলবে অথবা তা এ হাদীসের বিপরীত। কেননা মার সাথে কোন পুরুষের সঙ্গম হলে তার কন্যাকে সে সেই ব্যক্তির জন্যে অবশ্যই হারাম করে দেবে। লালিতা-পালিতা কন্যাকেও তদ্রূপ বানিয়েছে। অতএব মা'র সাথে সঙ্গম হলে তার মেয়ে অবশ্যই হারমা হবে। অতএব এ মা তার ক্রোড়ে থাকুক কি না-ই থাকুক, তা সমান কথা। ইবরাহীম বর্ণিত এই হাদীসটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আলী (রা) এ ব্যাপারে দলীল রূপে পেশ করেছেন আল্লাহ্র এ কথা ঃ এবং তোমাদের লালিতা-পালিতা কন্যা, যা তোমাদের ক্রোড়ে রয়েছে, যদি ক্রোড়ে না থাকে তাহলে সেই কন্যা হারাম হবে না। এ দলীলের উল্লেখ করায় প্রমাণিত হয় যে, হাদীসটি দুর্বল ও হালকা। কেননা হযরত আলীর মতো লোক এ ধরনের হাদীসকে দলীলরূপে গ্রহণ করতে পারেন না। আর তা এজন্যে যে, আমরা নিশ্চিত জানি যে, وَرَبَائِبُكُمْ কথাটির দাবি এ নয় যে, মেয়েটির মা'র স্বামীর নিকটই লালিত পালিত হতে হবে। তাহ্রীম-এর জন্যে তা একটি শর্ত। যদি স্বামীর নিকট লালিতা-পালিতা না হয়, তাহলে বুঝি সে হারাম হবে না। স্ত্রীর কন্যাকে رَبِيبَةٌ 'লালিতা-পালিতা' বলা হয়েছে। কেননা সাধারণত এবং অধিকাংশই এ রকম

হয় যে, মা'র স্বামীই তাকে পালন-পালন করে। এ-ও জানা যে, এ অর্থের নামটা হওয়ার জন্যে বিশেষভাবে স্বামীরই নিকট তার লালন শর্ত হবে তার হারাম হওয়ার জন্যে। তেমনি 'তোমাদের ক্রোড়ে' আল্লাহ্‌র এ কথাটিও একটি সাধারণ ও প্রায়ই প্রচলিত হিসেবে বলা হয়েছে। কেননা মার স্বামীর কোলে এ ধরনের মেয়ের লালিতা-পালিতা হওয়াই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু হারাম হওয়ার এটা কোন শর্ত নয়, যেমন সে মেয়ের স্বামীর কোলেই লালিতা-পালিতা হওয়া শর্ত নয়। এই কথাটি রাসূল (স)-এর এই কথার মতোই, যেমন তিনি বলেছেন ঃ

فِىْ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الْاِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ وَفِىْ سِتٍّ وَثَلٰثِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنَ –

পঁচিশটি উট হলে একটি এক বছরের উষ্ট্রী এবং ছত্রিশটি উট হলে একটি তিন বছরের উষ্ট্র দিতে হবে।

এতে সেই এক বছরের বাচ্চারও দুই বছরের বাচ্চাকে মা'র সঙ্গে নিয়ে নেয়া শর্ত নয়। এটা একটা সাধারণ প্রচলিত ধরনের উপর বলা কথা। কেননা বাচ্চা দুই বছরে পড়লে সাধারণত মা'র সঙ্গেই থাকে, তিন বছরে পড়লেও মা'র সঙ্গ ছাড়ে না বেশির ভাগ বলা নিয়মের উপর ভিত্তি করে বলা এ কথা। 'তোমাদের ক্রোড়ে' কথাটিও ঠিক তেমনি। আবূ বকর বলেছেন ঃ যে পুরুষ দক্ষিণ হস্তের মালিকানা দ্বারা দাসত্বমুক্ত হয় তার হারাম হওয়ার ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। আর দুধ পানের দিক দিয়ে মা ও বোনের দক্ষিণ হস্তের মালিকানার কারণে হারাম হওয়া নিশ্চিত। যেমন বিয়ের কারণে হারাম হয়। স্ত্রীর মা ও কন্যাও— যদি মা'র সাথে সঙ্গম হয়— হারাম হবে। সে দুজনার প্রত্যেকেই সেই পুরুষের জন্যে চিরদিনের তরে হারাম হয়ে যাবে, যদি তার যে কোন একজনের সাথে সে পুরুষটির সঙ্গম হয়। তেমনি এ মা ও মেয়েকে তার দক্ষিণ হস্তের মালিকানা দ্বারা একত্রিত করাও কখনও জায়েয হবে না। উমর, আয়েশা ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ কথা বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়েও কোন মতপার্থক্য নেই যে, নিকাহ্‌র দরুন সঙ্গমের কারণে যে তাহ্‌রীম হয়, তাও চিরদিনের জন্যে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَحَلَا ئِلُ اَبْنَا ئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَا بِكُمْ –

এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীরা 'হারাম'।

আতা ইবনে আবূ রিবাহ্‌ বলেছেন, এ আয়াতটি নবী করীম (স) সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল, যখন তিনি জায়দের স্ত্রীকে (তালাক দেয়ার পর) বিয়ে করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে এই আয়াতটিও নাযিল হয়েছিল ঃ

وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ –

তোমাদের মুখে-ডাকা পুত্রকে আল্লাহ্‌ ঔরসজাত পুত্র বানিয়ে দেন নি। (সূরা আহযাব ঃ ৪)

এবং

وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ -

মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের কোন একজনেরও পিতা নয়। (সূরা আহযাব ঃ ৪০)

রেওয়াজ অনুযায়ী বলা হতো জায়দ ইবনে মুহাম্মাদ— মুহাম্মাদ (স)-এর পুত্র জায়দ।

আবূ বকর বলেছেন حَلِيْلَةُ الْاِبْنِ 'পুত্রের স্ত্রী'। এ-ও বলা হয়েছে যে, তাকে حليه বলা হয় এজন্যে যে, সে তার পুত্রের সাথে শয্যায় একাকার হয়ে যায়। এ-ও বলা হয়েছে যে, যেহেতু পুত্র তার সাথে সঙ্গমে মিলিত হয় বিবাহের মাধ্যমে, এজন্যে তাকে এ নাম দেয়া হয়েছে। দাসীর যৌন অঙ্গ মালিকত্বের মাধ্যমে মুবাহ্ হলেও তাকে حليله বলা হয় না এবং তার সাথে পুত্রের সঙ্গম না হওয়া পর্যন্ত পিতার জন্যে সে হারাম হয় না। তার সাথে পুত্রের নিকাহ্র আকদ হলে অবশ্য সে তার পিতার জন্যে হারাম হবে চিরদিনের জন্যে। এ থেকে বোঝা যায়, حليله বিবাহিতা স্ত্রীর জন্যে একটি বিশেষ নাম। দক্ষিণ হস্তের মালিকত্বের সাথে এই নাম যুক্ত নয়। আর সঙ্গম ছাড়া শুধু নামের সাথেই তাহরীমের হুকুম সম্পর্কিত হয় না। কিন্তু পুত্রের স্ত্রীরা শুধু আক্‌দের কারণেই পিতার জন্যে হারাম হবে, সেখানে সঙ্গম হওয়ার শর্ত নেই। কেননা সঙ্গমকে শর্ত বানালে মূল কুরআনের 'নস'-এর উপর বাড়তি জিনিস ধার্য করা হবে।

এ ধরনের কাজে মনসূখ হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। তাতে আয়াত যা নিষিদ্ধ করেছে, তাকে মুবাহ্ বানানো হয়। এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্র কথা ঃ اَلَّذِيْنَ مِنْ اَصْلاَبِكُمْ —'যারা তোমাদের পৃষ্ঠদেশ থেকে উৎসারিত।' দাদার জন্যে সন্তানের সন্তানের স্ত্রীকেও হারাম করে। আর তা প্রমাণ করে যে, সন্তানের সন্তানকে 'দাদার পৃষ্ঠপ্রসূত' বলা যায়। আয়াতের বক্তব্য সকলেরই মতে তাই। এতেই এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, সন্তানের সন্তান দাদার সাথে বংশের দিক দিয়ে সম্পর্কিত জন্মগতভাবে। এ আয়াতে পুত্রের স্ত্রীকে বিশেষভাবে 'পৃষ্ঠদেশ থেকে উৎসারিত' বলা হয়েছে এ অর্থে; যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىْ اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا -

জায়দ যখন তার স্ত্রীর থেকে প্রয়োজন পূর্ণ করে নিল, তখন আমরা তাকে তোমার নিকট বিয়ে দিলাম, যেন মুমিনদের জন্যে তাদের মুখে-ডাকা পুত্রদের ব্যাপারে— যখন তারা তাদের প্রয়োজন পুরা করে নেবে— কোনরূপ সংকট দেখা না দেয়। (সূরা আহযাব ঃ ৩৭)

এতে পালক পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা মুবাহ প্রমাণিত হয়েছে।

আর আল্লাহ্র কথা ঃ فِىْ اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ 'তাদের মুখে-ডাকা পুত্রদের স্ত্রীদের ব্যাপারে প্রমাণ করে যে, পুত্রের حلية হচ্ছে পুত্রের স্ত্রী। কেননা উক্ত আয়াতে সেই حليه কেই স্ত্রী বলা হয়েছে। আর পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে حليه।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ -

এবং দুই সহোদর বোনকে স্ত্রীত্বে একত্রিত করবে (তা-ও হারাম) তবে আগে যা হয়েছে তা ভিন্ন কথা।

আবূ বকর বলেছেন, এ আয়াতের দাবি হল, যে কোন দিক দিয়ে বোন হোক, দুই বোনকে একত্রে একজন পুরুষের স্ত্রীত্বে একত্রিত করা হারাম। ব্যবহৃত শব্দের বাহ্যিক অর্থ এ-ই দাঁড়ায়। একত্রিত করার কয়েকটি রকম আছে দু'জনের উপরই আক্‌দ করা এক সাথে। তা করা হলে দুজনের একজনেরও বিবাহ সহীহ্ হবে না। কেননা এই আক্‌দ দ্বারা দুজনকে একত্রিত করা হয়েছে। সে দুজনার কোন একজনের বিয়ে জায়েয হবে, অন্য জনের বিয়ে জায়েয হবে না, তা-ও হতে পারে না। কেননা একজন অপরজন থেকে কোন দিক দিয়ে উত্তম নয়। আর আল্লাহ্ যখন সে দুজনকে একসাথে স্ত্রী বানানো হারাম করেছেন, তখন তাদের দুজনের একসাথে বিয়ে সহীহ্ হতে পারে না। দুই বোনকে একত্রিত করার এ-ও একটি পন্থা যে, প্রথমে একটিকে বিয়ে করবে, পরে অন্যটিকে। এরূপ অবস্থায় দ্বিতীয়টির বিয়ে সহীহ্ হবে না। কেননা এ দ্বিতীয়টির বিয়ের কারণে দুই বোনকে একত্রিত করা হয় এবং দ্বিতীয়টির আক্‌দ নিষিদ্ধ অবস্থায় হয়। অবশ্য প্রথমটির আক্‌দ মুবাহ ও সহীহ্‌ভাবে সম্পন্ন হয়। তাই দ্বিতীয়টির বিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। এ-ও এক প্রকারের একত্রিকরণ যে, দক্ষিণ হস্তের মালিকানার ভিত্তিতে সঙ্গমে দুবোনকে একত্রিত করা। তাতে প্রথমে একজনের সাথে সঙ্গম করা হবে, পরে করা হবে দ্বিতীয়জনের সাথে। তাতে তার মালিকত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত ও বহিষ্কৃত করার আগেই। এ-ও এক প্রকারের একত্রিকরণ। এ ব্যাপারে আগের দিনের ফিক্‌হবিদদের বিভিন্ন মত ছিল। পরে সে মতদ্বৈততা দূর হয় এবং দক্ষিণ হস্তের মালিকানার ভিত্তিতেও দুই বোনকে একত্রিতকরণ হারাম হওয়ার ব্যাপারে 'ইজমা' সংঘটিত হয়।

উসমান ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা দুজনই এ কাজকে মুবাহ্ বলেছেন এবং তাঁরা বলেছেন যে, একটি আয়াত তাদের দুজনকে হালাল প্রমাণ করেছে। অপর আয়াত তাদের দুজনকেই হারাম ঘোষণা করেছে। উমর, আলী, ইবনে মাসউদ, যুবায়র, ইবনে উমর আম্মার ও জায়দ ইবনে সাবিত (রা) বলেছেন ঃ দক্ষিণ হস্তের মালিকানায়ও দুই বোনকে একত্রিত করা জায়েয নয়। শবী বলেছেন, এ বিষয়ে হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন জবাবে তিনি বলেছিলেন, একটি আয়াত তাদের দুজনকে হালাল করেছে, অপর আয়াত তাদের দুজনকে হারাম করেছে। তাই হারাম হওয়াই অধিক গ্রহণীয়। আবদুর রহমান আল-সুক্‌রী, মূসা ইবনে আইয়ুবুল গাফেকী, তাঁর চাচা আয়াস ইবনে আমের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি আলী ইবনে আবূ তালিব (রা)-কে দক্ষিণ হস্তের মালিকানায় দুই বোনকে একত্রিত করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাদের একজনকে সেই সূত্রে সঙ্গম করেছে, অপর জনকেও সঙ্গম করা যাবে? জবাবে তিনি বলেছিলেন, সঙ্গমকৃতাকে মুক্ত করে নেয়ার পর দ্বিতীয় জনের সাথে সঙ্গম করতে পারবে। আরও বলেছেন, স্বাধীন মুক্ত মেয়েলোকদের মধ্যে

যাকে হারাম ঘোষণা করেছেন, দক্ষিণ হস্তের মালিকত্বের দিক দিয়েও তাকে হারাম করেছেন। তবে চারজন স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারটি স্বতন্ত্র। আম্মার থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া গেছে।

আবূ বকর বলেছেন, একটি আয়াত দুই বোনকে দক্ষিণ হস্তের মালিকানায় একত্রিত করা হালাল করেছেন বলে যে আয়াতটির ইঙ্গিত করেছেন, তা হল ঃ

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -

এবং সেই সব নারীও তোমাদের জন্যে হারাম, যারা অন্য কারোর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ, অবশ্য সেই সব নারী এর মধ্যে গণ্য নয়, যারা তোমাদের দক্ষিণ হস্তের মালিকানার অধীন হয়েছে।

আর অপর আয়াত তাদেরকে হারাম করেছে বলে যে আয়াতের কথা বোঝাতে চেয়েছেন, তা হল ঃ

وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ -

এবং দুই বোনকে তোমরা একত্রিত করবে তা-ও হারাম।

উসমান (রা) থেকে মুবাহ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। তার থেকে এ-ও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাহ্‌রীম ও তাহলীল— দুটোর কথাই বলেছেন। এ-ও বলেছেন যে, 'আমি এ কাজের আদেশও করছি না, নিষেধও করছি না।' তাঁর এ কথা প্রমাণ করে যে, তিনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ হারাম হওয়াও চূড়ান্ত মনে করতেন না, হারাম হওয়াও চূড়ান্ত ভাবতেন না। তাই হতে পারে, তিনি তা মুবাহ্ মনে করতেন হয়ত; কিন্তু পরে তিনি এ ব্যাপারে স্থিতি গ্রহণ করেন, হ্যাঁ বা না কোন মত-ই প্রকাশ করতেন না। তবে হযরত আলী (রা) তাকে হারাম মনে করতেন চূড়ান্ত ও নিশ্চিতভাবে— এ কথার ভিত্তি এই যে, তিনি এই মত পোষণ করতেন যে, নিষিদ্ধ ও মুবাহ দুটি যেখানে একত্রিত হবে, দুটিরই কারণ সমান-সমান হবে, তখন নিষেধই অগ্রাধিকার পাবে। এরূপ মত তখনই হতে পারে, যদি দুটি হুকুম নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়। আর আমাদের হানাফী মায্‌হাবও তাদের কথাকেই প্রমাণিত করে। আমরা 'উসূলুল ফিকাহ্' গ্রন্থে এ বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

আয়াস ইবনে আমের বর্ণনা করেছেন, তিনি আলী (রা)-কে বললেন, লোকেরা বলে, আপনি বলেন, একটি আয়াত তাদের হালাল বলে, অপর একটি আয়াত তাদেরকে হারাম করে ? তিনি বললেন, ওরা মিথ্যা কথা বলে। এ থেকে এই সম্ভবনা পাওয়া যায় যে, তিনি হয়ত আয়াত দুটির বক্তব্যে সমতাকে অস্বীকার করেছেন এবং এ ব্যাপারে যে লোক স্থিতি গ্রহণ করেছে— হ্যাঁ বা না কিছুই বলেন না, তার মত বাতিল হওয়ার কথাও বলেছেন, যেমন উসমান (রা)-এর বর্ণনা থেকে জানা যায়। কেননা তিনি শা'বীর বর্ণনায় বলেছেন ঃ একটি আয়াত তাদের দুজনকে হারাম করে, অপর একটি বর্ণনা তাদেরকে হালাল বলে এবং তাহরীম-ই অগ্রাধিকার পাবে। তিনি তা অস্বীকার করেছেন। একটি আয়াত তাদেরকে হালাল বলে, অপর একটি আয়াত তাদেরকে হারাম করে— এ কথা কেবল এ দিক দিয়ে যে, তাহলীল ও তাহরীমের আয়াত সেই দুটির বক্তব্য অসমতাপূর্ণ। বরং তাহরীম তাহলীল অপেক্ষা অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

আর অপর একটি দিক দিয়ে 'একটি আয়াত দুজনকে হালাল করে ও অপর একটি আয়াত দুজনকে হারাম করে'— কোনরূপ শর্ত কয়েদ ছাড়া সাধারণভাবে বলা একটা অপছন্দনীয় কথা। কেননা তার আসল দাবি হচ্ছে, একই অবস্থায় একটি কাজ মুবাহ্ হবে ও নিষিদ্ধও হবে। তাই হযরত আলী (রা) সম্ভবত এরূপ নিঃশর্ত কথাকে অস্বীকার করেছিলেন। আর যখন তা দুই দিকের কোন একটি দিক দিয়ে কয়েদযুক্ত ও চূড়ান্ত হবে, তাহলে অপর এক হাদীসের বর্ণনানুযায়ী জায়েয হতে পারে। দুইটি আয়াতেরই হুকুম যদি সমান সমান হয়, তাহলে তন্মধ্যে তাহরীম উত্তম ও গ্রহণীয় হবে এ দিক দিয়ে যে, নিষিদ্ধ কাজটির দরুন আযাব ভোগ করতে হবে। আর মুবাহ্ কাজ না করলে তো আযাব পাওয়ার কারণ ঘটে না। আর সতর্কতার দিক হল আযাব অনিবার্য হওয়ার কাজটি থেকে বিরত থাকা। এ ব্যাপারটি বিবেক-বুদ্ধির দিক দিয়ে অবশ্য বিবেচ্য। উপরন্তু দুটি আয়াতই তাহ্রীম ও তাহ্লীল অনিবার্য কারণে সমান নয়। কাজেই তার একটির ভিত্তিতে অপরটি সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করা জায়েয হবে না। কেননা এ দুটির প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন কারণে উপস্থিত হয়েছে। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ -

তোমরা দুই বোনকে একত্রিত করবে— তা হারাম।

সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণার জন্যে এসেছে।

যেমন ঃ

وَحَلَائِلُ اَبْنَائِكُمْ -

তোমাদের পুত্রদের স্ত্রী হারাম।

এবং

وَاُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ -

এবং তোমাদের স্ত্রীদের মা'রা-ও হারাম।

এই কথাটি তিনটি সুস্পষ্ট হারাম নির্দেশক। অন্যান্য যেসব আয়াত তাহ্রীম ঘোষণা করছে, তা-ও এই ধরনের কথা। আর-

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -

এবং অন্যান্য লোকদের বিবাহ বন্ধনে বন্দী, তবে যাদের মালিক হয়েছে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত।

আয়াতটি এমন হাদীসকে মুবাহ্ করে, যার দারুল হরবে স্বামী রয়েছে। এ দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটবে এবং এ দুজনের মধ্যে ইসমাত নিশ্চিত হবে। অতএব এ আয়াতটি যে জন্যে নাযিল হয়েছে, তাতেই তা ব্যবহৃত হবে। তা হল যুদ্ধবন্দী দাসী এবং তার স্বামীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো এবং তাকে তার মালিক-মনিবের জন্যে হালাল করা। অতএব দুই বোনের মধ্যে একত্রিত করণ হারাম হওয়ার ব্যাপারে উক্ত কথার ভিত্তিতে আপত্তি তোলা জায়েয হবে না। কেননা এ দুটির প্রতিটি আয়াত এক-একটি কারণে এসেছে, যা অপর আয়াতের কারণ থেকে

স্বতন্ত্র। অতএব যে কারণে নাযিল হয়েছে সেই একটি কারণের হুকুম দেয়ার ব্যাপারেই সেটি ব্যবহৃত হবে।

আর একটি কথা থেকেও তা প্রমাণিত হয়। তা হল সে আয়াতটি পুত্রদের স্ত্রীদের ও স্ত্রীদের মা'দের এবং অন্যান্য যাকে যাকে সে আয়াত হারাম করে তার পথে তা প্রতিবন্ধক হয় না। এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। এ-ও সর্বসম্মত যে, দক্ষিণ হস্তের মালিকানার দৌলতেও পুত্রের স্ত্রী ও স্ত্রীর মা'র সাথে সঙ্গম করা জায়েয নয়। আর আল্লাহ্‌র কথা إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ। 'তবে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়েছে, তাদের কথা আলাদা'— তাদেরকে বিশেষীকরণের কারণ হয়নি। কেননা তা এসেছে যে কারণে, অপর আয়াতটি সে কারণে অবতীর্ণ হয়নি। দুই বোন একত্রিতকরণ হারাম হওয়ার উপর প্রতিবন্ধক হওয়ার এবং হযরত আলী (রা) ও তাঁর অনুসারী সাহাবীদের 'যাদের মালিক হয়েছে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত' কথাটি দ্বারা দুই বোন একত্রিকরণ হারাম হওয়ার পথ প্রতিবন্ধক হওয়া প্রমাণ করে যে, আয়াত দুটি যখন দুটি ভিন্ন ভিন্ন কারণে নাযিল হয়েছে— একটি নাযিল হালালকরণের জন্যে, অপরটি হারামকরণের জন্যে— প্রত্যেকটি তার সেই বিশেষীকরণে তার হুকুমের উপর কার্যকর হবে। সেটির দ্বারা অন্যটির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না। দুটি হাদীসে যখন রাসূল (স) থেকে পাওয়া হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, তাহলে সে দুটির হুকুমও অনুরূপ হবে। আমরা 'উসুলুল ফিকাহ' কিতাবে এ বিষয়ে বিস্তারিত বলেছি। তাছাড়া দুই বোন একত্রিতকরণ— একটিকে বিবাহ করে ও অপরটিকে দক্ষিণ হস্তের মালিকত্বের মাধ্যমে— নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারেও মুসলমানদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। তা এভাবে যে, একজন পুরুষের এক হবে বিবাহিতা স্ত্রী, পরে তার বোনকে ক্রয় করবে দাসী হিসেবে, সেই পুরুষটির পক্ষে এই বোনকে একসাথে সঙ্গমে শরীক করা জায়েয নয়। এ থেকে বোঝা গেল যে, দক্ষিণ হস্তের মালিকানার ক্ষেত্রেও দুই বোনকে একত্রিত করা সাধারণভাবে বিয়ের মাধ্যমে একত্রিত করার মতোই হারাম। এ জন্যে যে, আল্লাহর কথা ঃ 'তোমরা দুই বোনকে একত্রিত করবে— তা হারাম' কথাটি সাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ ও ব্যাপক অর্থবোধক। সর্ব ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। একজন পুরুষের বৈবাহিক বন্ধনের দুই বোনের একসাথে আবদ্ধ হওয়া এভাবে যে, একজনকে তালাক দেয়া হল, তার তালাক ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই তার বোনকে বিয়ে করাও সম্পূর্ণ হারাম। কেননা তাতেও সেই নিষিদ্ধ কাজটি হয়। এই ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রাপ্তার সন্তান জন্মিলে সেই ব্যক্তির সন্তানও বংশধর হওয়া প্রমাণিত হবে। বিয়ের কারণে স্ত্রী যে খরচাদি ও থাকার স্থান পাওয়ার অধিকারী হয়, ইদ্দত পালনকালেও অধিকার বহাল থাকবে। আসলে এসবই হচ্ছে দুই বোনকে একত্রিত করার বিভিন্ন পন্থা এবং তা নিষিদ্ধ দুই বোনকে একত্রিতকরণ নিষিদ্ধ বলে যে ঘোষণা হয়েছে, তার কারণে।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্‌র কথা ঃ তোমরা দুই বোনকে একত্রিত করবে— তা নিষিদ্ধ, হারাম, বিবাহের মাধ্যমে একত্রিত করাকে নিষিদ্ধ করেছে। অন্য কোন উপায়ে একত্রিত করা হলে তা নিষিদ্ধ হবে না।

জবাবে তাকে বলা যাবে, তোমার একথা ভুল। কেননা দক্ষিণ হস্তের মালিকত্বের দ্বারাও দুই বোনকে একত্রিত করা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে সব ফিকহ্‌বিদই সম্পূর্ণ একমত। এ কথা

ইতিপূর্বে আমরা বলে এসেছি। আর দক্ষিণ হস্তের মালিকত্ব তো বিবাহ নয়। এ থেকে আমরা জানলাম যে, কেবল বিবাহ দ্বারা দুই বোনকে একত্রিত করাই নিষিদ্ধ নয়, অন্য যে কোন ভাবেই করা হোক, তা নিষিদ্ধ। কেননা দুই বোনকে একত্রিত করার যত পন্থা আছে, তন্মধ্যে খাস করে কেবল বিবাহের মাধ্যমে একত্রিত করা হারাম বললে বহু কারণের মধ্যে একটিকে বহু উপায় ও পন্থার মধ্যে মাত্র একটিকে চিহ্নিত করা হবে কোন দলীল ছাড়া-ই। কিন্তু তা কারোরই করা জায়েয নয়। অবশ্য এ বিষয়ে আগের আলিম ও বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, জায়দ ইবনে সাবিত (রা) ও উবায়দা সালমানী, আতা, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন ও মুজাহিদ প্রমুখ তাবেয়ী সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা সকলে বলেছেন, এক বোনের ইদ্দত পালনকালে তারই অন্য বোনকে বিয়ে করা সেই একই পুরুষের পক্ষে জায়েয নয়। তেমনি চারজন স্ত্রীর একজনের ইদ্দত পালন কালে পঞ্চম স্ত্রী গ্রহণ জায়েয নয়। অনেকে ইদ্দতকে শর্তহীন ব্যবহার করেছেন। আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ, জুফার, সওরী, হাসান ইবনে সালিহ্ যে কোন ইদ্দত কালের কথা বলেছেন। আর উরওয়া ইবনুয যুবায়র, আল-কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ ও খালাস মত দিয়েছেন যে, বায়িন তালাকের ইদ্দত পালনকালে অপর বোন এবং পঞ্চম স্ত্রী বিয়ে করা জায়েয হবে। মালিক, আওজায়ী, লায়স ও শাফেয়ীও এ মত দিয়েছেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, আল-হাসান আতা থেকে— তাঁদের মত ভিন্ন। এঁদের প্রত্যেকের থেকে দুটি বর্ণনা পাওয়া গেছে। একটি বিয়ে করতে পারবে। আর অপরটি— বিয়ে করতে পারবে না। কাতাদাতা বলেছেন, আল-হাসান তাঁর এ মত প্রর্ত্যাহার করেছেন। এক বোনের ইদ্দত পালনকালে তারই অপর বোনকে বিয়ে করতে পারবে, এ মত তিনি পরে অগ্রাহ্য করেছেন। আয়াতে প্রমাণ ও একত্রিতকরণ সাধারণভাবে হারাম হওয়া পর্যায়ে আমরা ইতিপূর্বে যে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, এ পর্যায়ে তা-ই যথেষ্ট। এক বোন যত দিন পর্যন্ত ইদ্দত পালনে রত থাকবে ততদিন অপর বোনকে বিয়ে করা হারাম। একটু চিন্তা করলেই এ সিদ্ধান্তের যথার্থতা বোঝা যায়। দক্ষিণ হস্তের মালিকত্বের ভিত্তিতেও দুই বোনকে একত্রিত করা সম্পূর্ণ হারাম। এ বিষয়ে সকলেই একমত। এতে এ তাৎপর্যও নিহিত আছে যে, সঙ্গম মুবাহ হওয়া বিবাহের একটা রূপ। যদি বিয়ে ও আক্দ দুটির কিছু না-ও হয়, তবুও দুই বোনকে একত্রিত করা বিবাহেরই একটি রূপ। কেননা বংশীয় সম্পর্ক প্রমাণিত হওয়া এবং খরচাদি ও বাসস্থানের ব্যবস্থাকরণ ওয়াজিব হওয়া এক ধরনের বিবাহেরই অবস্থা। এ ভাবেও দুই বোনকে একত্রিতকরণ নিষিদ্ধ হওয়া বাধ্যতামূলক।

যদি বলা হয়, একজনের স্ত্রীত্ব খতম হয়ে যাওয়ার পর-ও দুই বোনকে একত্রিত করণ কিভাবে হল ? কেননা তালাকের পরই সে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক নারী হয়ে গেছে। তিন তালাক দেয়ার পরও যদি তার সাথে সঙ্গম করে এই তালাকের ইদ্দত পালনের মধ্যে, তাহলে তার উপর 'হদ্দ' কার্যকর হওয়া বাধ্যতামূলক হবে। এতে প্রমাণিত হয় যে, তালাক প্রাপ্তা ভিন্ন এক মেয়েলোক হয়ে গেছে, স্ত্রী থাকেনি। অতএব তখন তার বোন বিয়ে করা হারাম হবে কেন ?

জবাবে বলা যাবে, 'হদ্দ' ওয়াজিব হওয়ায় মূল অবস্থায় কোন পার্থক্য সৃষ্টি হয়নি। ইদ্দতকালে সঙ্গম হলে পুরুষটির উপর যেমন 'হদ্দ' কার্যকর হবে তেমনি মেয়েলোকটির উপর-ও 'হদ্দ' হবে। কেননা সঙ্গম তো তার-ই সাথে করেছে। আর তা সত্ত্বেও তার বোন বিয়ে

করা জায়েয হবে না। প্রথম বিয়ে সঞ্জাত অধিকারে আর একজন স্ত্রীকে শামিল করা জায়েয হবে না। এ তালাকপ্রাপ্তা তালাকদাতা স্বামীর সাথে মুবাহ্ সঙ্গমে সম্মত হওয়ার দরুন তার উপর 'হদ্দ' কার্যকর হওয়া সত্ত্বেও আর একজন স্ত্রীকে বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ করা জায়েয হবে না। দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার অর্থ, সেই মেয়েলোকটি তার বিবাহের রজ্জুতে এখনও আবদ্ধ আছে। এরূপ অবস্থায় সে স্বামীর পক্ষে এ স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করে দুই বোনকে একত্রিত করা জায়েয হবে না। কেননা বিয়ে সঞ্জাত অধিকার এখনও অবশিষ্ট আছে, যদিও এ অবস্থায় তার সাথে সঙ্গম হলে 'হদ্দ' জারী হওয়া অনিবার্য হবে।

এর আর একটি দলীল হল দুই বোনকে একত্রিকরণ বিয়ের উপায়ে হারাম। আর একত্রিতকরণের প্রক্রিয়া হিসেবে একজন স্বামীর নিকট থাকলে অপর স্বামী গ্রহণ করা হারাম। এ-ও দেখলাম যে, ইদ্দকাল চলার সময়ও একত্রিত করা নিষিদ্ধ, যা মূল বিয়ে দ্বারাও নিষিদ্ধ। তখন স্বামীর জন্যে সে-স্ত্রীর বোনকে তার ইদ্দতকালে বিয়ে করে একত্রিত করাও নিষিদ্ধ হবে। তার বিবাহ অক্ষুণ্ন থাকা অবস্থায় যেমন নিষিদ্ধ ছিল। কেননা ইদ্দতও তা একত্রিত করা নিষিদ্ধ করে, যা বিবাহ নিষিদ্ধ করে। কেননা ইদ্দতকালে বিয়ের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। তাই সেই সময় সে স্ত্রীর পক্ষে আর একজন স্বামীর সাথে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। ইদ্দত সম্পূর্ণ শেষ না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এ অবস্থা বহাল থাকবে। কেননা ইদ্দত-ও সেই একত্রিতকরণকে নিষিদ্ধ করে যা শুধু নিকাহ্ নিষিদ্ধ করে। যেমন করে ইদ্দত বিয়ের পর্যায়কে রক্ষা করে, ইদ্দত পালনকারীর জন্যে অপর স্বামী গ্রহণ যেমন নিষিদ্ধ করে ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত।

যদি বলা হয়, এতে ব্যক্তিরও ইদ্দতের মধ্যে থাকা বাধ্যতামূলক করে, কেননা এ ইদ্দত-ই সে স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করতে নিষেধ করে সে ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার সময় পর্যন্ত।

জবাবে বলা যাবে, বোনকে বিয়ে করা হারাম হওয়া কেবল ইদ্দতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, কেবল এজন্যেই আমরা স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করতে নিষেধ করছি না; বরং এই নিষেধটাকে আমরা ইদ্দতকালীন সময়ের মধ্যে রেখেছি। বরং স্ত্রী যদি রিজয়ী তালাকের ইদ্দত পালনেও রত থাকে, তবুও এ সময়ে তার বোনকে বিয়ে করা সেই স্বামীর জন্যে নিষিদ্ধ হবে। তাতে তো স্বামীকে ইদ্দত পালনের মধ্যে থাকতে হয় না, তালাকের পূর্বেও বোনের উপর অপর বোনের নিকাহ্‌র আক্‌দ করা এবং সেই অপর স্বামী গ্রহণ করা— এর প্রত্যেকটিই নিষিদ্ধ। তখন তাদের দুজনের একজন ইদ্দতের মধ্যে নয়। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ الا ماقدسلف 'তবে আগে যা হয়েছে, তার কথা আলাদা'— আবূ বকর বলেছেন, এ আয়াতাংশের তাৎপর্য আমরা বিশদভাবে আগে বলে এসেছি, যখন আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা সে সব মেয়েলোক নিকাহ কর না, যাদের নিকাহ করেছে তোমাদের পিতারা, তবে আগে যা হয়ে গেছে, তার কথা আলাদা— এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছি। এর ব্যাখ্যায় যে বিভিন্ন মত রয়েছে এবং তাতে তর্কবিতর্ক রয়েছে, তা সবই উল্লেখ করেছি। দুই বোনকে একত্রিতকরণ হারাম ঘোষণা কালেও আল্লাহ এ কথাটি বলেছেন। তাই এ বাক্যাংশ সেখানে যে তাৎপর্য দিয়েছে, এখানেও ঠিক সেই তাৎপর্যই দেয়। অবশ্য এখানে অপর একটি তাৎপর্য-ও সম্ভব, যা পূর্বে উল্লিখিত বাক্যাংশে ছিল না। তা হল, দুই বোনের উপর অগ্রবর্তী আক্‌দ ভেঙ্গে যাবে না। শুধু এই করতে হবে যে, দুই বোনের মধ্যে থেকে একজনকে বাছাই করে নিতে হবে, অপরজনকে বাদ দিতে হবে। এর দলীল সেই

হাদীস, যা আবূ অহব আল-জিশানী দহাক ইবনে ফীরোজ দায়লামী, তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন— আমি যখন ইসলাম কবুল করেছিলাম, তখন দুই বোন আমার স্ত্রী হিসেবে একত্রিত ছিল। আমি নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ কথা বললাম। তখন তিনি আমাকে বললেন ঃ দুই জনের একজনকে তালাক দাও। অপর কোন বর্ণনায় রাসূলের কথা উদ্ধৃত হয়েছে ঃ দুই জনের যাকে তুমি চাও, তালাক দিয়ে দাও। তখন তিনি দুজনের বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা তাকে বলেন নি— 'যদি দুজনের আক্দ এক সঙ্গে সম্পন্ন হয়ে থাকে।' আর দুইজনকে দুই আকদে বিয়ে করা হয়ে থাকলে শেষের জনের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কথাও বলেন নি। এ বিষয়ে তিনি জিজ্ঞাসও করেন নি কিছু। এতে বোঝা যায় যে, দুজনের সাথেই তার নিকাহ্ অবশিষ্ট ছিল। এ জন্যেই তাদের মধ্যে থেকে সে যাকে চায়, তাকে তালাক দিতে বলেছেন। এ কথাও বোঝা যায় যে, দুজনের সাথেই তার আক্দ সহীহ্ ছিল, তাহরীম নাযিল হওয়ার পূর্বে। তাদের বিয়ে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে যে আক্দ-এর উপর তারা ছিল, তার উপর তারা স্থিতিশীলও ছিল।

যে কাফির লোক ইসলাম কবুল করে যখন তার স্ত্রী হিসেবে দুই বোন রয়েছে; কিংবা অনাত্মীয় পাঁচজন স্ত্রী রয়েছে, এমতাবস্থায় তার করণীয় কি, এ বিষয়ে শরীয়তবিদগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, সওরী বলেছেন, এদের মধ্যে থেকে প্রথম বিবাহিতা একজন ও পাঁচজন স্ত্রী হলে চারজন বাছাই করে নেবে, দুই বোনকে বা এই পাঁচজনকে একই আক্দে গ্রহণ করা হয়ে থাকলে এদের বিবাহ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হবে। মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, মালিক, লায়স, আওজায়ী ও শাফেয়ী বলেছেন, পাঁচজনের মধ্য থেকে যে চারজনকে ইচ্ছা বাছাই করে নেবে। আর দুই বোনের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা হবে বাছাই করে নেবে। তবে ইমাম আওজায়ী থেকে একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, দুই বোনের মধ্যে প্রথমজনকে রাখবে আর অপর জনকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। আল-হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, প্রথম বিবাহিতা চারজনকে রেখে দেবে। তাদের কোন্ চারজন প্রথম, তা স্মরণ না থাকলে প্রত্যেককে তালাক দিয়ে দেবে, তাদের ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে তখন তাদের মধ্য চারজনকে নতুন করে বিয়ে করবে।

প্রথমোক্ত কথাটি সহীহ্। তার দলীল হচ্ছে আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমরা দুই বোনকে একত্রিত করবে— তা হারাম।' এতে শরীয়ত পালনে বাধ্য সব লোককেই সম্বোধন করা হয়েছে— নির্দেশটা তাদের সকলেরই প্রতি। কাফির ব্যক্তির স্ত্রী হিসেবে দুই বোনের নিকাহের আক্দ তাহরীমের উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর একজন মুসলিম ব্যক্তির আকদের মতোই ছিল বিপর্যস্ত ও বিনষ্ট হওয়ার দিক দিয়ে। তাই তার ও অপরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো ছিল কর্তব্য। কেননা তার আক্দ আয়াত অনুযায়ী ভেঙে গেছে। যেমন দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে যদি ইসলামের পর সেই বিয়ে থাকে। দলীল আল্লাহ্র সেই কথা ঃ 'এবং তোমরা দুই বোনকে স্ত্রীতে একত্রিত করবে— তা হারাম।' দ্বিতীয় জনের সাথে বিয়ে হওয়ার কারণেই দুই বোনের একত্রিত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তা একই আকদের হয়ে থাকলেও, তা সবই ফাসাদপূর্ণ। কেননা সে কাজটাই নিষিদ্ধ কুরআনের আয়াতের স্পষ্ট ঘোষণার কারণে। এতে আমাদের কথা দুদিক দিয়ে সত্য প্রমাণিত হয়। একটি আক্দটা নিষিদ্ধ হিসেবেই সংঘটিত হয়েছে। আর

নিষেধ অমান্য করাই ফাসাদ। আর দ্বিতীয়, সর্বাবস্থায়ই দুই বোনকে স্ত্রীতে একত্রিত করা নিষিদ্ধ। তাই ইসলাম গ্রহণের পরও তা তার এ আক্‌দকে টিকিয়ে রাখা হলে আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ কাজকে জায়েযকারী হবো আমরা। তাই যে আক্‌দের কারণে দুই বোনের একজন পুরুষের স্ত্রীতে একত্রিত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে, তা বাতিল প্রমাণিত হবে। চিন্তা-বিবেচনার দিক দিয়েও কোন মুসলিম ব্যক্তির পক্ষে দুই বোনকে একত্রে স্ত্রীত্বে বরণ করা কখনই জায়েয হতে পরে না। দুই বোনের উপর তার কোন আক্‌দকে বহাল রাখাও জায়েয নয়। আক্‌দের সময় দুজন পরস্পর বোন না হলেও পরে দুই বোন হলেও তা হারাম হবে। পরে দুই বোন এভাবে হতে পারে যে, এক ব্যক্তি দুই দুগ্ধপোষ্যকে বিয়ে করল, পরে কোন একজন সেই দুইজনকেই দুধ খাওয়াল। তাহলে এটা শুরুতেই দুই বোনকে বিয়ে করার মত ব্যাপার হয়ে গেল। এ দুজনকে একত্রিত করার নিষেধের মধ্যে তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখা হলে যবীল হরমকে বিয়ে করার মত হবে। পূর্বে হওয়া বিয়ে টিকিয়ে রাখা ও শুরুতেই দুই বোনকে বিয়ে করার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না, তা কাফির অবস্থায় হোক, কি ইসলাম গ্রহণের পর হোক। যখনই কাফির ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করল, তখনই তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা কর্তব্য হয়ে পড়বে। তখন এ ব্যাপারটি ইসলামে প্রথম আক্‌দ হওয়ার মতই হবে। তাই এ বিচ্ছেদ ঘটানো দুই বোনের ক্ষেত্রেও কর্তব্য হবে, কর্তব্য হবে চার-এর অধিক স্ত্রী গ্রহণের ক্ষেত্রেও। শুরুতেই এ কাজ করা কিংবা পূর্বে হওয়া এ কাজকে টিকিয়ে রাখার মধ্যে যেমন কোন পার্থক্য হবে না, তেমনি যবীল আরহামকে বিয়ে করাও তার থেকে ভিন্ন কিছু হবে না। ইসলামে তা সবই বিপর্যস্ত ও ভেঙ্গে দেয়ার হুকুম অনিবার্য। যেমন যবীল আরহাম পর্যায়ে আমরা বলেছি।

ইসলাম গ্রহণের পর যে লোক তা করেছে, সে পূর্বোল্লিখিত ফীরোজ দায়লামী বর্ণিত হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেছে। ইবনে আবূ লায়লা কর্তৃক হুমায়যাতা ইবনে শিমর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিও তার দলীল। সে হারিস ইবনে কায়স থেকে বর্ণনা করেছে। সে বলেছে, আমি ইসলাম কবুল করার সময় আমার আটজন স্ত্রী ছিল। তাই তখন রাসূল (স) আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি যেন তাদের থেকে চারজনকে বাছাই করে নেই। মা'মার জুহ্‌রী সালিম ইবনে উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, গায়লান ইবনে সালামাতা যখন ইসলাম গ্রহণ করে, তখন তার দশজন স্ত্রী ছিল। রাসূলে করীম (স) তাকে বললেন— এদের মধ্য থেকে চারজনকে নিয়ে নাও। ফীরোজ বর্ণিত হাদীসটির শব্দগুলি প্রমাণ করে যে, আক্‌দ সহীহ ছিল এবং তা ছিল চার-এর অধিক হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বের ব্যাপার। কেননা তিনি বলেছিলেন ঃ 'এদের মধ্যে থেকে যে চারজনকে তুমি চাও।' এ থেকেই বোঝা যায় যে, ইসলামের পরও তাদের আক্‌দ বহাল ছিল। হারিস ইবনে কায়স বর্ণিত হাদীসটি থেকে মনে হয়, সম্ভবত আক্‌দ হয়েছিল তাহ্‌রীম নাযিল হওয়ার পূর্বে। ফলে তাহ্‌রীম নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা সহীহ্‌ ছিল। এ কারণেই তাদের মধ্যে থেকে চারজনকে বাছাই করার প্রয়োজন দেখা দেয় অপর সকলকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার। যেমন এক ব্যক্তির দুই স্ত্রী। তাদের একজনকে তিন তালাক দিল। তাকে বলা যাবে, এদের মধ্যে থেকে যাকে চাও বাছাই করে নাও। কেননা আকদ তো সহীহ্‌ ছিল তাহরীম সম্মুখে আসার সময় পর্যন্ত।

যদি বলা হয়, যদি তা বিভিন্ন ব্যাপার হয়ে থাকত, তাহলে রাসূল করীম (স) নিশ্চয়ই তাকে আক্দের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন।

জবাবে বলা যাবে, হতে পারে, খোদ নবী করীম (স) তা জানতেন, এ কারণে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। তবে মামার কর্তৃক জুহরী, সালিম, তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত গায়লান সংক্রান্ত কাহিনীর হাদীস সম্পর্কে বর্ণনাবিশারদগণ এ ব্যাপারে কোনই সংশয়ের মধ্যে নেই যে, তিনি এ বর্ণনায় ভুল করেছেন। এ হাদীসটির মূল জুহরীর হাদীস— যা মালিক জুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন— থেকে বিচ্ছিন্ন করা অংশ। জুহরী বলেছেন, আমাদের নিকট এ কথা পৌঁছেছে যে, নবী করীম (স) সকীফ গোত্রের এক ব্যক্তিকে— যে ইসলাম কবুল করেছিল এমন সময়, যখন তার দশজন স্ত্রী ছিল— বলেছিলেন ঃ তুমি এদের মধ্য থেকে মাত্র চারজন বাছাই করে নাও। এ হাদীসটি উকাউল (বা আকীল) ইবনে খালিদ, ইবনে শিহাব জুহ্রী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমাদের নিকট উসমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবূ সুয়াইদ সূত্রে এ কথা পৌঁছে যে, নবী করীম (স) গায়লান ইবনে সালমাতাকে বলেছিলেন ..... তাই এ হাদীস তার নিকট সালিম— তাঁর পিতা সূত্রে আসতে পারে ? তার পরে তা উসমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সুয়ায়দ সূত্রে পৌঁছা বানিয়ে দিল কিভাবে ? বলা যায়, ভুলটা এসেছে এদিক থেকে যে, মা'মার-এর নিকট জুহরী থেকে পাওয়া দুটি হাদীস ছিল গায়লানের কাহিনী সম্বলিত। একটি এ হাদীস এবং তা উসমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবূ সুয়ায়দ থেকে পৌঁছা বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি সালিম তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত হাদীস, যাতে বলা হয়েছে যে, গায়লান ইবনে সালমাতা তার স্ত্রীদের তালাক দিয়েছে হযরত উমর (রা)-এর সময়ে এবং তার ধান-মাল তার ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছে। তখন হযরত উমর (রা) তাকে বললেন ঃ তুমি যদি তোমার স্ত্রীদের ফিরিয়ে না নাও, আর না এনেই তুমি মরে যাও, তাহলে আমি তাদেরকে তোমার ওয়ারিস বানিয়ে দেব এবং তার পরে তোমার কবরের উপর 'রজম' করব নিশ্চিত জানবে, যেমন আবূ রিগালের কবরকে রজম করা হয়েছে।

এভাবে মা'মার ভুল করেছেন এবং এ হাদীসের সনদকে তার ইসলাম গ্রহণ সংক্রান্ত হাদীসের সনদ বানিয়ে দিয়েছেন, যাতে দশজন স্ত্রী সহ তার ইসলাম কবুলের কথা বলা হয়েছে।

আবূ বকর বলেছেন, কুরআনের হারাম হওয়ার ব্যাপারে যে 'নস' এসেছে, তা হল দুই বোনকে স্ত্রীত্বে একত্রিত করা সম্পর্কে। বহু মুতাওয়াতির হাদীসে স্ত্রীর সাথে তার ফুফু ও খালাকে একত্রে স্ত্রী বানানোর ব্যাপারেও স্পষ্ট-অকাট্য নিষেধ এসেছে। এ হাদীস হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, জাবির, ইবনে উমর, আবূ মূসা, আবূ সায়ীদুল খুদরী, আবূ হুরায়রা, আয়েশা ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর প্রমুখ সাহাবী (রা) বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا عَلَى بِنْتِ أَخِيْهَا وَلَا عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا - وَفِيْ بَعْضُهَا لَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى -

১. মামার-তিনি মা'মার ইবনে রাশেদ আল-বসরী, পরে ইয়ামানী।

কোন মেয়েলোককে বিয়ে করা যাবে না তার ফুফু, তার খালা, তার ভাই-কন্যা ও বোনের কন্যা স্ত্রী থাকা অবস্থায়।

কোন কোন বর্ণনায় এ কথাও পাওয়া যায় যে, ছোট মেয়েকে বড়'র উপর, বড়কে ছোট মেয়েরে উপরও বিয়ে করা যাবে না।

এ সব বর্ণিত হাদীসের ভাষায় ও শব্দে পার্থক্য থাকলেও মূল বক্তব্যে পূর্ণ অভিন্নতা রয়েছে। জনগণ এসব হাদীস অন্তর দিয়ে কবুল করেছে, তা মুতাওয়াতির বর্ণনার মাধ্যমে যেমন এসেছে, তেমনি তা জনগণের মধ্যে ব্যাপক পরিচিতিও পেয়েছে। এ সব হাদীস থেকে নিশ্চিত ও সংশয়মুক্ত ইল্ম পাওয়া যায় এবং তদনুযায়ী আমল করা একান্ত কর্তব্য হয়ে দেখা দেয়। তাই কুরআনের আয়াতের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এসব হাদীসের হুকুমকে কার্যকর করা আবশ্যক। অবশ্য খারেজী মতের লোকেরা সর্বসাধারণ মুসলমান থেকে ভিন্নতর মত গ্রহণ করেছে। তারা দুই বোনকে ছাড়া অন্যান্য সব ধরনের মেয়েদেরকে স্ত্রীত্বে একত্রিত করাকে মুবাহ মনে করেছে। তাদের দলীল হল দুই বোনকে স্ত্রীত্বে একত্রিত করার নিষেধের পর আল্লাহ্‌র বলা এ কথা ঃ

وَاُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ -

এসব ছাড়া (বা এর বাইরে) আর যারা যারা আছে, তাদের সকলকে একত্রিত করা তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে।

কিন্তু তারা এ মত গ্রহণ মারাত্মক ভুল করেছে এবং পরিণামে ইসলামের সরল সহজ পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। কেননা আল্লাহ্ যেমন বলেছে ঃ 'এর বাইরে সব মেয়েলোককে একত্রিত করা তোমাদের জন্যে হালাল। তেমনি এ-ও তো বলেছেন ঃ

مَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ -

রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছে— যা নিয়ে এসেছে তোমাদের নিকট, তা তোমারা গ্রহণ কর। (সূরা হাশর ঃ ৭)

আর সেই রাসূল (স) থেকে উপরোল্লিখিত মেয়েদেরকে স্ত্রীত্বে একত্রিত করতে স্পষ্ট নিষেধবানী এসেছে। তাই বুঝতে হবে, রাসূল (স)-এর নিষিদ্ধ কাজ কুরআনের উক্ত নিষেধের মধ্যে নিহিত আছে। তাই আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'এদের বাইরে যারা, তাদেরকে একত্রিত করা তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে' দুই বোন সংক্রান্ত কুরআনী নিষেধের সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করতে হবে। রাসূল (স) যে সব মেয়েকে স্ত্রীত্বে একত্রিত করতে নিষেধ করেছেন তা-ও নিষিদ্ধই মনে করতে হবে। আর কুরআনের এ আয়াতটি যে রাসূল (স)-এর নিষেধ সংক্রান্ত হাদীসের আগেই নাযিল হয়েছে, তা না বললেও চলে। আল্লাহ্‌র এ কথা রাসূলের কথার পরে নাযিল হয়েছে, তা কিছুতেই মনে করা যেতে পারে না। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'এবং এর বাইরে যা তা তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে' যেমন মেয়েলোককে একত্রিত

করতে কুরআনে নিষেধ করা হয়েছে তাদের উল্লেখের শেষে বলা হয়েছে। কেননা 'যা এর বাইরে' এর অর্থ তো এ-ই হতে পারে যে, যাদেরকে একত্রিত করতে নিষেধ করা হয়েছে তাদের ছাড়া অন্যরা সবই হালাল। দুই বোনকে স্ত্রীত্বে একত্রিত করা হারাম ঘোষণা নাযিল হওয়ার পূর্বে সে সবই মুবাহ্ ছিল। এ থেকে আমরা জানলাম, যাদেরকে হারাম করা হয়েছে, তাদেরকে একত্রিত করতে হাদীসেও নিষেধ করা হয়েছে। তা দুই বোনকে একত্রিত করতে নিষেধ করার পূর্বে তা হারাম ছিল না। হাদীস আয়াতের পূর্বের হতে পারে না বলে যখন নিশ্চিত হওয়া গেল, তখন তা অবশ্যই কুরআনী নিষেধের সঙ্গে সঙ্গে হবে, না হয় হবে পরে পরে। যদি সঙ্গে সঙ্গে হয়ে থাকে, তাহলে আয়াতটি বিশেষভাবে তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে বলে মনে করতে হবে, যারা হাদীসে উল্লিখিতদের বাইরে রয়েছে। হাদীসে যাদেরকে স্ত্রীত্বে একত্রিত করতে নিষেধ করা হয়েছে, আয়াতে তাদেরকে বাদ দিয়ে অন্যদের সম্পর্কে নিষেধ এসেছে। আর আমরা জানি নবী করীম (স) তাঁর উক্ত কথা নিশ্চয়ই আয়াতটি পাঠ করার পরই বলেছেন। তার অর্থ, তিনি উক্ত আয়াতের বিস্তারিত তাৎপর্য হিসেবেই তাঁর এ কথা বলেছেন। তাহলে আয়াতের শ্রোতৃমণ্ডলী একটি বিশেষ হুকুম হিসেবেই তা শ্রবণ করেছেন। আয়াতটির হুকুম যদি তার শব্দসমূহের সাধারণ তাৎপর্যের উপর স্থির হয়ে থাকে, আর তার পরে উক্ত হাদীস শ্রুত হয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, হাদীসটি আয়াতের বিশেষ তাৎপর্যকে মনসূখ করেছে। আর এ ধরনের মুতাওয়াতির সর্বজন পরিচিত হাদীস দ্বারা কুরআনের আয়াতে বিশেষ হুকুম মনসূখ হতেই পারে। উপরন্তু তা নিশ্চিত ইলম দানকারী ও তদনুযায়ী আমল ওয়াজিবকারী হাদীসের আওতা ও পর্যায়ভুক্ত। এক্ষণে আমরা যদি আয়াতটির নাযিল হওয়ার হাদীসটি বলার দিন তারিখ না জানতে পারি আর হাদীসটি সম্পর্কে দৃঢ়প্রত্যয় সহকারে জানতে পারি যে, তা আয়াত দ্বারা মনসূখ হয়নি। কেননা আয়াত হাদীসের পূর্বে নাযিল হয়নি যেমন একটু আগেই বলেছি। তাই এ হাদীসকে আয়াতের সঙ্গে মিলিয়ে একসাথে আমল করাই কর্তব্য। আর সর্বোত্তম মত হল আয়াত ও হাদীস এক সাথেই লোকদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। যেহেতু আমরা নিশ্চিতভাবে এ দুটির সম্মুখে আসার ইতিহাস জানি না, তাই আমরা নিজেরা কোন্‌টির আগে আসার ও কোন্‌টির পরে আসার কথা বলতে পারি না। আয়াতের কোন হুকুম তার দ্বারা মনসূখ হওয়ার কথাও আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কেননা তার হুকুম স্থিতিশীল হওয়ার পরবর্তী ব্যাপারই হতে পারে। আর আয়াতটি তার হুকুমের সাধারণত্বের ও ব্যাপকতার উপর কখন স্থিতিশীল হয়েছে, সে বিষয়ে আমাদের জানা নেই, পরে হাদীস দ্বারা তার মনসূখ হওয়ার ব্যাপারটিই বা কখন ঘটল, তা-ও নিশ্চিত বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে এই কথায় যে, এ দুটি এক সাথেই অবতীর্ণ হয়েছে। আর আয়াত ও হাদীসের অবতরণের তারীখ না জানার কারণে দুটির হুকুম এক সাথেই কার্যকর হওয়ার কথা মেনে নিতে হবে। যেমন ডুবে মরা লোক ও ঘর পড়ে গিয়ে মৃত লোকদের সম্পর্কে কার মৃত্যু আগে হয়েছে, তা যখন নিশ্চিত জানা যায় না, তখন বিশ্বাস করতে হবে যে, তাদের সকলের মৃত্যু এক সাথেই সংঘটিত হয়েছে।

## স্বামীধারী মেয়েলোকদের বিবাহ করা হারাম

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ -

আর সেসব মেয়েলোক, যারা অন্য পুরুষের বিবাহ দুর্গে আটক ও সংরক্ষিত (তাদের বিয়ে করা হারাম), তবে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়েছে (তারা হারাম নয়)।

এ আয়াতাংশ অন্যান্য নিষিদ্ধ মেয়েদের উল্লেখের পর সংযোজিত। এর পূর্ববর্তী আয়াত হচ্ছে ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ -

তোমাদের প্রতি তোমাদের মা'দেরকে হারাম করা হয়েছে .....

এরপরও এ কথার সাথে সংযোজিত হয়েছে ঃ 'যারা অন্য পুরুষের বিবাহ-দুর্গে সংরক্ষিত তারাও হারাম।'

সুফিয়ান হাম্মাদ, ইবরাহীম, আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত ঃ এবং যেসব মেয়েলোক বিবাহ-দুর্গে সংরক্ষিত— দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্ত মেয়েলোক ছাড়া— তারাও হারাম— তারা এর তাৎপর্যে বলেছেন। যেসব মুসলিম ও মুশরিক মেয়েলোক স্বামীধারী (অর্থাৎ যাদের স্বামী আছে) তাদের হারাম হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) বলেছেন, যেসব মুশরিক মেয়েলোকের স্বামী আছে, তারাও নিষিদ্ধ— হারাম। সাঈদ ইবনে যুবায়র ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, স্বামীওয়ালী যে-কোন নারীকে বিয়ে করা যিনার পর্যায়ভুক্ত। তবে যারা দাসী হয়েছে, তারা এর মধ্যে নয়।

আবূ বকর বলেছেন, সাহাবী-তাবেয়ীন সকলেই একমত যে, আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ -

স্বামী আছে এমন মেয়েলোকদের কথা বলা হয়েছে।

এসব মেয়েলোক বিয়ে করা হারাম, যত দিন তাদের স্বামী এবং তারা তাদের স্ত্রী হয়ে থাকবে।

'তবে যারা তোমাদের দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্ত হয়েছে'— তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যেসব মেয়েলোকের মালিক হয়ে রয়েছে— এ কথার ব্যাখ্যায় মনীষিগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। আলী ইবনে আব্বাস (রা) একটি বর্ণনায় এবং উমর আবদুর রহমান ইবনে আওফ ও ইবনে উমর (রা) বলেছে ঃ উক্ত আয়াতটি এসেছে এ কথা বলতে যে, যেসব যুদ্ধ-বন্দিনীর স্বামী আছে, দক্ষিণ হস্তের মালিকানার বলে তাদের সাথে সঙ্গম করা মুবাহ। তবে তা যুদ্ধবন্ধী মেয়েলোক হতে হবে, তাদের স্বামী না হয়েও তাদের সাথে সঙ্গম করা যাবে। তাদের স্বামী থাকলে তাদের বিবাহ বিচ্ছিন্ন মনে করতে হবে। মনীষীদের এ মত-ও ছিল যে, দাসীকে বিক্রয় করে দিলে তাতে তালাক হয় না, তার বিয়েও বাতিল হয়ে যায় না। ইবনে মাসউদ উবাই ইবনে

কাব, আনাস ইবনে মালিক, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও ইকরামার বর্ণনায় ইবনে আব্বাস এ আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই বলে যে, এ আয়াত সেই সমস্ত মেয়েলোকদের সম্পর্কে, যাদের স্বামী রয়েছে, তারা বন্দিনী হোক কি অন্য কোন মেয়েলোক। তারা এ-ও বলতেন যে, দাসীকে অন্য কারোর নিকট বিক্রয় করে দিলে তা-ই তার জন্যে তালাক। আর মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে মায়সারাতা, ইয়াযীদ ইবনে জুরাই, সাঈদ, কাতাদাহ, আবুল খলীল, আবূ আল কামাতাল হাশিমী, আবূ সাঈদুল খুদরী সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (স) একদল সৈন্য আওতাস নামক স্থানে পাঠালেন। সেখানে তারা শত্রুর সম্মুখীন হল, ঘোরতর যুদ্ধ হল, শত্রুর উপর তারা বিজয়ী হল, তাদের হাতে এমন সব মেয়েলোক বন্দী হল যাদের স্বামী আছে, তবে তারা মুশরিক। এ সময় মুসলমানগণ তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন। তখন আল্লাহ্ এ আয়াতাংশ নাযিল করেন ঃ

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -

'হ্যাঁ, বিবাহ-দুর্গে সংরক্ষিত মেয়েরা (হারাম), তবে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যেসব মেয়েলোকের মালিক হয়েছে .....।

অর্থাৎ তারা তোমাদের জন্যে হালাল— ইদ্দত শেষ হওয়ার পর। অর্থাৎ এ বন্দিনীদের ইদ্দত পালন করতে হবে। তারপর-ই তাদের সাথে সঙ্গম করা হালাল হবে। উল্লিখিত হয়েছে, হাদীস বর্ণনাকারী এই আল-কামা একজন মহান পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন ইয়ালা ইবনে আতা। তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবূ সাঈদ থেকে। আবূ হুরায়রা থেকে তাঁর বর্ণনা করা বহু সংখ্যক হাদীস রয়েছে। এ হাদীসটির সনদ সহীহ্। এতে আয়াতটির নাযিল হওয়ার কারণ ও উপলক্ষ বিবৃত হয়েছে। আর এ আয়াতটি বন্দী নারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ।

ইবনে মাসউদও তাঁর সাথে একমত। লোকেরা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ আয়াত— স্বামী আছে— এমন সব মেয়েদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য। এদের মালিকত্ব লাভ হলে মালিকদের জন্যে এদের সাথে সঙ্গম করা হালাল। বন্দীত্বের কারণে তাদের ও তাদের স্বামীদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গেছে।

যদি বলা হয়, তোমরা কারণটিকে গুরুত্ব দিচ্ছ না। তোমরা শুধু ব্যবহৃত শব্দের হুকুমকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছ। যদি তা সাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ ও ব্যাপক অর্থবোধক হয়, তা হলে তা সেই সাধারণত্বের উপরই থাকবে, যদি বিশেষীকরণের কোন দলীল পাওয়া যায়, তা হলে সেই বিশেষীকরণই হবে। তাই এ আয়াতে সে দিকটি বিবেচিত হবে না কেন? অথচ তুমি সে সব মেয়েলোককে-ই এর মধ্যে শামিল করছ, তাদের উপর দক্ষিণ হস্তের মালিকত্ব স্থাপিত হয়েছে, অথচ তাদের স্বামী আছে। এতে বন্দিনী ও অ-বন্দিনী সকলেই গণ্য হচ্ছে?

এর জবাবে বলা যাবে, আয়াতটি যে বিশেষভাবে বন্দিনীদের সম্পর্কে— তার প্রমাণ আয়াতটির বাহ্যিকতায়ই আছে। তা এজন্যে যে, আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

'এবং বিবাহ-দুর্গে রক্ষিত মেয়েলোক—তবে যাদের মালিক হয়েছে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত।'

এ মালিকত্বের কারণে যদি বিয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকে, তাহলে সে বিচ্ছিন্নতা নিশ্চিয়ই এ বন্দিনী মেয়েলোক ও তাদের স্বামীদের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। এমনকি তাকে যদি কোন মেয়েলোক ক্রয় করে কিংবা তার দুই ভাই-ও ক্রয় করে, তবুও সে সম্পর্ক ছিন্নই হয়ে গেছে মনে করতে হবে। কেননা এখানে মালিকত্ব এসে গেছে।

যদি বলা হয়— হ্যাঁ, যেসব মেয়েদের উপর মালিকত্ব কায়েম হয়েছে, সে সব মেয়েদের সম্পর্কেই ওকথা বলা যাবে। সে মালিকত্বের দরুন সঙ্গম মুবাহ হোক কিংবা না হোক, মুবাহ না হওয়ার অবস্থা এই হতে পারে যে, তার মালিক হবে কোন মেয়েলোক অথবা মালিক হবে এমন পুরুষ, যার তার সাথে সঙ্গম মূলতই হালাল নয়।

জবাবে বলা যাবে, আয়াতটি কিন্তু সে সব লোকদের জন্যে, যাদের দক্ষিণ হস্ত মালিক হবে। ফলে তার সাথে সঙ্গম হালাল হবে। কেননা কথাটি বিবাহ বন্ধনে সংরক্ষিতা মেয়েদের— যাদের সাথে সঙ্গম বৈধ নয় তাদের থেকে অব্যাহতি দিয়ে বলা। এ কারণে যাদের সাথে দক্ষিণ হস্তের মালিকত্বের সুযোগেও মালিকের পক্ষে সঙ্গম বৈধ নয়, তার কারণ এই হতে পারে যে, তাদের ও তাদের স্বামীদের মধ্যকার স্ত্রীত্ব-স্বামীত্বের সম্পর্ক পূর্ববৎ কায়েম রয়েছে আয়াতের হুকুম অনুযায়ী। আয়াতের হুকুম অনুযায়ী তা-ই যখন ওয়াজিব, তখন 'এবং বিবাহ-দুর্গে সংরক্ষিত মেয়েলোক— তবে যাদের মালিক হয়েছে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত— তাদের ছাড়া' কথাটি কেবলমাত্র বন্দী মেয়েদের সম্পর্কেই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হবে। আর তাদের ও তাদের স্বামীদের মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়ার কারণ দুই দেশের পার্থক্য হতে পারে, মালিকত্ব হওয়া নয়। এ-ও প্রমাণিত হয় যে, মালিকত্ব হওয়াটা বিচ্ছেদ ঘটার কারণ হয়নি। যেমন হাম্মাদ ইবরাহীম আল আসওয়াদ আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) বুরায়রাতাকে ক্রয় করে তাকে মুক্ত করে দেন এবং তার পরিবারবর্গের সাথে ولا বন্ধুত্বের সম্পর্ক রক্ষার শর্ত করলেন। পরে তিনি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট এই ব্যাপারের উল্লেখ করলেন। শুনে রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ الولاء لمن اعتق 'বন্ধুত্ব তো তার জন্যে যে দাস মুক্তি দিয়েছে।'

এবং বুরায়রা তাকে বললেন ঃ 'এখন তুমি তোমার পথ ধর। গোটা ব্যাপার এখন তোমার নিজের নিকট।' সামাক আবদুর রহমান ইবনুল কাসেম তাঁর পিতা— আয়েশা (রা) সূত্রেও অনুরূপ কথা বর্ণনা করেছেন। আর কাতাদাতা ইকরামা ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বুরায়রা তার স্বামী ছিল কৃষ্ণাঙ্গ দাস। তার নাম ছিল মুগীস। পরে রাসূলে করীম (স) এ বিষয়ে ফয়সালা দিলেন যে, الولاء 'বন্ধুত্ব— শত্রুতাহীনতার— সম্পর্ক হবে তার সাথে যে দাসমুক্তির মূল্য দিয়েছে ও তাকে ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা দিয়েছে।'

যদি বলা হয়, বুরায়রাতার প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, যা তিনি বর্ণনা করেছেন। তারপর তিনি বলেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ بيع الامة طلاقها দাসী বিক্রয়ই তাকে তালাক দান তুল্য কাজ। অতএব তাঁর ফয়সালা ঠিক তাই হবে, যার বর্ণনা করা

হয়েছে। কেননা নবী করীম (স) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, তার বিরুদ্ধতা করা বর্ণনাকারীর পক্ষে জায়েয নয়।

জবাবে বলা যাবে, ইবনে আব্বাস থেকেই বর্ণিত হয়েছে যে, আয়াতটি বন্দী মেয়েলোকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে এবং দাসী বিক্রয় তার ও তার স্বামীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয় না। তাই তাঁর থেকে যে কথার তিনি উল্লিখ করেছেন ঃ 'দাসী বিক্রয়ই তার তালাক', সম্ভবত তিনি তা বলেছিলেন তাঁর নিকট বুরায়রাতার ব্যাপারটি স্পষ্ট হওয়ার পূর্বে এবং বিশেষ করে নবী করীম (স) তাকে যে ইখতিয়ার দেয়ার কথা বলেছিলেন, তারও পূর্বে ক্রয় করার পর। পরে তিনি যখন বুরায়রার ব্যাপারটি শুনতে পেলেন, তাঁর কথা ফিরিয়ে নিলেন। 'দাসী বিক্রয়ই তার তালাক' কথাটি বলে হয়ত তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, স্বামী যখন তাকে ক্রয় করবে। কেননা মালিকত্ব হলে বিয়ের সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকে না।

চিন্তা-বিবেচনার সাহায্যেও প্রমাণিত হয় যে, দাসীকে বিক্রয় করলেই তার তালাক হয়ে যায় না। বিয়ে সম্পর্কও ভেঙ্গে যায় না। তা এজন্যে যে, তালাক তো স্বামী ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। তার নিজের তালাক দেয়া ছাড়া কিংবা তার দিক থেকে ঘটানো কোন কারণ ছাড়া তালাক সংঘটিত হয় না। তাই স্বামীর দিক থেকে যখন এ ব্যাপারে কোন কারণ ঘটেনি, তখন তালাক না হওয়াই সম্ভব। এর আর একটি প্রমাণ এই যে, দক্ষিণ হস্তের মালিকত্ব নিকাহ-পরিপন্থী নয়। কেননা বিক্রয়ের পূর্বেই মালিকত্ব ছিল, অতএব তা নিকাহ্‌কে নিষেধ করে না। ক্রয়কারীর মালিকত্বও তার পরিপন্থী নয়।

যদি বলা হয়, ক্রয়কারীর মালিকত্ব যখন কায়েম হল, তার সাথে নিকাহ্ করতে সম্মতি ছিল না, তখন তো সে সম্পর্ক ভঙ্গ হয়ে যাওয়াই আবশ্যকীয় ছিল।

জবাবে বলা যাবে, তা ঠিক নয়। কেননা একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, মালিকত্ব নিকাহ পরিপন্থী নয়। আর তুমি যে তাৎপর্যের উল্লেখ করেছ, তা যদি গণ্য করতেই হয়, তাহলে নিকাহ ভঙ্গ করায় ক্রয়কারীর ইখতিয়ার থাকবে। কিন্তু তা কারোরই কথা নয়। কেননা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং তাঁর অনুসারীরা মালিকত্বের উদ্ভব হওয়ার সাথে সাথে নিকাহ ভঙ্গ হওয়ার পক্ষপাতী, তা-ই তাদের পছন্দ!

স্বামী-স্ত্রী— দুজনই এক সঙ্গে বন্দী হলে কি অবস্থা হবে, সে বিষয়ে ফিকহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ ও জুফার বলেছেন, দুইজন যুধ্যমান ব্যক্তি একসঙ্গে বন্দী হলে এবং তারা দুইজন স্বামী-স্ত্রী হলে তারা তাদের বিবাহ সম্পর্কের উপর স্থিতিশীল থাকবে। আর তাদের একজন যদি অন্যজনের আগে বন্দী হয় এবং সে দারুল ইসলামে নীতি হয়, তাহলে তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঘটে যাবে— বিয়ে ভেঙ্গে যাবে। সওরীরও এই মত। আওজায়ী বলেছেন, দুজন একসঙ্গে বন্দী হলে এবং বন্দী বন্টনেও তারা দুজন একজন মালিকের মালিকানায় এসে গেলে তাদের বিবাহ সম্পর্ক বহাল থাকবে। কোন একজন যদি দুজনকেই একসঙ্গে ক্রয় করে নেয়, তাহলে সে ক্রয়কারী মালিক ইচ্ছা করলে তাদেরকে একত্রিত রাখতে পারে এবং চাইলে দুজনকে বিচ্ছিন্ন ও বিয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতে পারে। আর দাসীকে সে নিজের জন্যে নির্দিষ্ট করে নিতেও পারে অথবা তাকে অপর একজনের

নিকট বিবাহও দিতে পারে। অবশ্য এক হায়যকাল অপেক্ষার মাধ্যমে তার গর্ভের পরিচ্ছন্নতা প্রমাণিত হওয়ার পর। লায়স ইবনে সা'দও এই মত দিয়েছেন। আল হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, কোন স্বামীওয়ালী মেয়েলোক বন্দী হলে দুই হায়য পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করাতে ও তার গর্ভের পরিচ্ছন্নতা প্রমাণ করতে হবে। কেননা তার স্বামী-ই তাকে পাওয়ার বেশি অধিকারী, যখন সে তার তালাকজনিত ইদ্দত পালনে রত থাকা অবস্থায় আসবে। আর যাদের স্বামী নেই, তাদেরকে এক হায়যের ইদ্দত পালন করতে হবে।

ইমাম মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন, মেয়েলোক যখনই শত্রুপক্ষের নিকট বন্দী হয়, তখনই সে তার স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার স্বামী তার সঙ্গে থাকুক আর না-ই থাকুক।

আবূ বকর বলেছেন, প্রমাণিত হয়েছে, মালিকত্ব উদ্ভূত হওয়া বিচ্ছিন্নতার কারণ হতে পারে না। তার প্রকাশ ক্রীত ও মীরাসে প্রাপ্ত দাসী। অতএব শুধু বন্দী হওয়াটাই বিয়ে ভঙ্গের কারণ হবে না। কেননা সেখানে মালিকত্বের উদ্ভব হওয়ার অধিক তো কিছুই ঘটেনি। আর তার দ্বিতীয় প্রমাণ, সে নারীর উপর দাসত্ব চেপে বসা নতুনভাবে আক্‌দকে নিষিদ্ধ করে না! তাই সে আক্‌দ বহাল থাকাই উত্তম। কেননা নতুন করে তার সাথে আক্‌দ করা অপেক্ষা পূর্বের বিবাহ স্থায়ী থাকাই অধিক তাগিদপূর্ণ। লক্ষণীয়, অনেক কাজ এমন যা নতুন করে করা নিষিদ্ধ হতে পারে, যদিও আগে করাকে স্থায়ী ও বহাল রাখা নিষিদ্ধ করে না। যেমন সন্দেহক্রমে করা সঙ্গমের দরুন ইদ্দত পালনে উদ্যত হওয়া নতুন করে আক্‌দ করাকে নিষিদ্ধ করে। কিন্তু আগের আক্‌দকে বহাল রাখা নিষিদ্ধ করে না।

অবশ্য বিভিন্ন মতের লোকেরা একটি হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করতে পারে। হাদীসটি আওতাস যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে আবূ সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত। তাতে এ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ আয়াতের নাযিল হওয়ার কারণও বলা হয়েছে। তা হল 'এবং বিয়ের দুর্গে সংরক্ষিত মেয়েরা (হারাম), তবে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়েছে, তাদের ব্যাপার আলাদা।'

এ আয়াতে যেসব মেয়েলোক তাদের স্বামীসহ বন্দী হয়েছে এবং যারা একাই বন্দী হয়েছে, এদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয়নি।

এই হাদীসকে তাদের মতের সমর্থনে দলীল হিসেবে পেশ করার জবাবে বলা যাবে, হাম্মাদ আল-হাজ্জাজ খাদেমুল মক্কী মুহাম্মাদ ইবনে আলী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আওতাস যুদ্ধের দিন পুরুষরা সকলে পাহাড়ে পালিয়ে যায় আর মেয়েরা সব বন্দী হয়। তখন মুসলিম বিজয়ীরা বলতে লাগলেন, 'আমরা কি করব, ওদের তো স্বামী রয়েছে ? তখন আল্লাহ নাযিল করলেন ঃ বিবাহের দুর্গে সংরক্ষিতারা (হারাম), তবে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়েছে, তারা নয়।'

আল্লাহ্ এ আয়াতাংশের দ্বারা জানিয়ে দিলেন যে, বন্দী মেয়েলোকদের স্বামীরা পাহাড়ে পালিয়ে গেছে এবং মেয়েলোকেরা একলারা— স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তোমাদের হাতে বন্দী হয়েছে। আয়াত তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। তা ছাড়া হুনায়নের যুদ্ধে নবী করীম (স) কোন পুরুষকে বন্দী করেন নি। যুদ্ধের ইতিহাস লেখকদের ইতিহাস তার প্রমাণ। পুরুষদের অনেকেই নিহত হয়েছিল কিংবা পরাজিত হয়ে পালিয়েছিল। বন্দী করেছিলেন কেবল

মেয়েলোকদেরকে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পুরুষরা সব ফিরে এসে রাসূলে করীম (স)-এর নিকট প্রার্থনা করল তাদের স্ত্রী বন্দীদের ছেড়ে দেয়ার জন্যে। তখন নবী করীম (স) বললেন, যেসব মেয়ে বন্দী আমার ও আবদুল মুত্তালিবের বংশের লোকদের ভাগে পড়বে, তাদেরকে তোমরা ফেরত পাবে। তিনি অন্যদেরকেও মেয়েদেরকে ছেড়ে দিতে বললেন। কিন্তু তাদের অনেকেই অস্বীকার করলেন। এ-ই ছিল ঘটনা। যারা মেয়েদের আটক করেছিলেন, তাদের মাথাপিছু পাঁচ ভাগ পড়েছিল। লোকেরা বন্দী মেয়েদেরকে পরে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, সেই মেয়েদের সাথে তাদের স্বামীরা বন্দী হয়নি। এর পর-ও 'এবং বিবাহ-দুর্গে সংরক্ষিতা মেয়েরা (হারাম), তবে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়েছে, তারা নিষিদ্ধ নয়' কথাটির সাধারণত্বকে যদি যুক্তি হিসেবে পেশ করে-যে এতে কাদের সঙ্গে স্বামী আছে, আর কারা স্বামীহীন অবস্থার তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি, তারা সকলেই হারাম আওতা থেকে বাইরে। তাহলে জবাবে বলা হবে, আমরা এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌছেছি যে, মালিকত্বের কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটার জন্যে কোন হুকুম আসে নাই। কেননা যদি তা-ই হতো, তাহলে ক্রীতদাসী ক্রয়েও বিচ্ছেদ ঘটা অবশ্যম্ভাবী হতো। দাবি 'হেবা' করলেও তা-ই হতো। মীরাসে প্রাপ্তিতেও তা হতো। কেননা উদ্ভূত মালিকত্বের এই সব হচ্ছে বড় বড় কারণ। তাই, তা যখন হয় না, তেমনি আমরা জানতে পেরেছি যে, মালিকত্ব উদ্ভূত হওয়ার কারণের সাথে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে বিচ্ছেদ ঘটার কোন সম্পর্ক নেই। এভাবেই আমরা আয়াতটির আসল বক্তব্য জানতে পারি। তা এজন্যে যে, বন্দীনীর বিয়ের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কারণ ঘটা দুটির কোন একটি দিক দিয়েও আল্লাহ্‌র লক্ষ্য নয়,— সে দুটি হচ্ছে— হয়, স্বামী-স্ত্রীর দুই দেশী হওয়ার কারণ ঘটবে কিংবা মালিকত্বের উদ্ভব ঘটবে। এর পর সুন্নাতের দলীল পাওয়া গেছে। মালিকত্ব উদ্ভূত হওয়ার কারণে বিচ্ছেদ ঘটা অনিবার্য না হওয়ার ব্যাপারে প্রতিপক্ষও আমাদের সাথে একমত হয়েছে। এ থেকেই আয়াতের বক্তব্যটা চূড়ান্ত হয়ে দাঁড়াল। তা হল, দুই দেশ হওয়ার পার্থক্য, আয়াতটি বিশেষভাবে বন্দী মেয়েদের ক্ষেত্রেই তা ঘটেছে, তাদের স্বামীদের ব্যাপারে নয়।

এ থেকে বোঝা যায়, আমরা যে দুই দেশের পার্থক্যের কথা বলেছি, তা-ই হচ্ছে আসল তাৎপর্য। সে দুজন স্বামী ও স্ত্রী যদি মুসলিম বা যিম্মী হয়ে আসে, তাহলে তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটবে না। কেননা তারা দুইজন দুই দেশের অধিবাসী নয়, একদেশেরই অধিবাসী। এ থেকে বোঝা গেল, বন্দী মেয়ে ও তার স্বামীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটবে যদি সে মেয়েরা একক ও স্বামীহীন অবস্থায় আসে তবে। কেননা তখন দুই কথা হওয়ার পার্থক্য ঘটে গেছে। তার আর একটি প্রমাণ এই যে, শত্রুপক্ষের মেয়ে যদি মুসলিম হয়ে বা যিম্মী হয়ে আমাদের নিকট আসে, তার স্বামী যদি তার সঙ্গে না আসে, তাহলে সর্বসম্মতভাবে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। হিজরতকারী মেয়েদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এই হুকুম-ই জারী করেছেন তাঁর এ কথাটির মাধ্যমে ঃ

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ –

তোমরা যদি সে মেয়েদেরকে তাদের মহরানা দিয়ে বিবাহ কর, তাহলে তাতে তোমাদের কোন দোষ হবে না। (সূরা মুমতাহানা ঃ ১০)

এরপর বলেছেন ঃ

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ -

আর তোমরা নিজেরাও কাফির মেয়েদেরকে নিজেদের বিবাহে আটকে রেখো না।
(সূরা মুমতাহানা ঃ ১০)

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্র কথা ঃ

اِلَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -

তবে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যেসব মেয়েদের উপর মালিকত্ব পেয়েছে, তাদের কথা আলাদা।

এর দাবি হল, দক্ষিণ হস্তের মালিকত্বের কারণে দাসীদের সাথে সঙ্গম করা মুবাহ্ হবে। তবে নবী করীম (স) থেকে একটি হাদীস মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, আমর ইবনে আওন সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, বলেছেন— শরীক কায়স ইবনে অহব আবুল অদাক, আবূ সাঈদুল খুদরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) আওতাস যুদ্ধের নারী বন্দীদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ গর্ভবতীদের সাথে সঙ্গম করা যাবে না, যতদিন না সে সন্তান প্রসব করছে। আর যে গর্ভবতী নয়, তার সাথেও সঙ্গম করা যাবে না এক হায়য অতিক্রম করা ব্যতীত।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, সাঈদ ইবনে মনসূর-আবূ মুআবিয়া, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক, ইয়াযীদ ইবনে আবূ হুবায়ব, আবূ মারজুক হনশান আলী রুয়ায়ফা' ইবনে সাবিতুল আনসারী সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, একদা আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দানরত থেকে বলেছেন ঃ 'আমি তোমাদেরকে ঠিক সে কথাটাই শোনাব, যা আমি নিজে রাসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছি। হুনায়ন যুদ্ধের দিন ঃ আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার কোন লোকের পক্ষে তার বীর্যকে অপরের চাষকার্যে ফেলে নষ্ট করা— যতক্ষণ এক হায়য দ্বারা তার গর্ভের পরিচ্ছন্নতা প্রমাণ না করা হবে— কখনই হালাল হতে পারে না।' আবূ দাউদ বলেছেন, এখানে ।لاستقبر। শব্দটি ব্যবহার করা— আবূ মুআবিয়া বর্ণনাকারীর একটা বিভ্রান্তি। আবূ সাঈদ বর্ণিত হাদীসে তা সহীহ্ভাবে উদ্ধৃত হয়েছে।

হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, নুফাইলী, মিসকীন, শুবা, ইয়াযীদ ইবনে খুমায়র, আবদুর রহমান ইবনে হুবায়ব ইবনে নুফাইর তাঁর পিতা আবুদ দারদা সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন— রাসূলে করীম (স) একটি যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একটি মেয়েলোককে দেখলেন— তার সন্তান প্রসবের সময় সমুপস্থিত। নবী করীম (স) বললেন, সম্ভবত এই মেয়েলোকটির মালিক-মনিব তাকে খুবই পীড়ন করেছে। লোকেরা বলল হ্যাঁ, তাই হবে। তিনি বললেন, আমি সংকল্প গ্রহণ করেছি যে, আমি তার উপর এমন লা'নৎ করব, যা তার সাথে তার কবরে প্রবেশ করবে। কেমন করে তার ওয়ারিস বানাবে, সে তো তার জন্যে হালাল হয় না, সে কি করে তার খেদমত করবে, সে তার জন্যে হালাল নয়।

এসব হাদীস থেকে জানা যায় যে, যে লোক কোন দাসীর মালিকত্ব নতুন করে লাভ করল, সে গর্ভবতী হলে তার গর্ভ প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে সে সঙ্গম করা নিষিদ্ধ, গর্ভের

পরিচ্ছন্নতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত ও তার সাথে সে সঙ্গম করা নিষিদ্ধ, গর্ভের পরিচ্ছন্নতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্তও তার সাথে সে সঙ্গম করতে পারে না। এই যেমন বললাম, বন্দী মেয়ে লোকের গর্ভের পরিচ্ছন্নতার প্রমাণ পাওয়া একান্ত আবশ্যক ও জরুরী হওয়ার ব্যাপারে দেশ-বিদেশের ফিকাহবিদদের কোনই মতপার্থক্য নেই। তবে আল-হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, সেই মেয়েলোকের দুই হায়য পর্যন্ত ইদ্দত পালন করা কর্তব্য যদি তার স্বামী দারুল হরবে থাকে। আমরা আবূ সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত যে হাদীস একটু আগেই উদ্ধৃত করেছি, তা থেকে এক হায়যের অপেক্ষা পালনের মাধ্যমে গর্ভের পরিচ্ছন্নতা প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক হয়। আর গর্ভের পরিচ্ছন্নতা প্রমাণ করা কোন ইদ্দত নয়। কেননা তা যদি ইদ্দত হতো, তা হলে নবী করীম (স)— তাদের মধ্যে যার স্বামী আছে ও যার স্বামী নেই এদের মধ্যে— তিনি অবশ্যই পার্থক্য করতেন। ইদ্দত তো স্বামীর তালাক বা মৃত্যুর কারণে পালন করতে হয়। যার স্বামী শয্যা নেই, তার এই এক হায়য অপেক্ষা করা কোন ইদ্দত হতে পারে না, তাকে ইদ্দত বলে না।

যদি বলা হয়, পূর্বে উল্লিখিত আবূ সাঈদের হাদীসে বলা হয়েছে, 'তাদের ইদ্দত সম্পূর্ণ ও নিঃশেষ হলে ....' এই অপেক্ষাকে এ হাদীসে ইদ্দতই তো বলা হয়েছে।

জবাবে বলা যাবে, হয়ত এ শব্দটি হাদীসের বর্ণনাকারীর নিজের জুড়ে দেয়া এবং তা কথার ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা। গর্ভের শূন্যতা ও পরিচ্ছন্নতা প্রমাণের জন্যে এক হায়য অপেক্ষা করাকে বর্ণনাকারী নিজ থেকে শব্দটি যোগ করে বোঝাতে চেয়েছেন। আর এভাবেও 'ইদ্দত' বলা হয়ে থাকতে পারে যে, তার মূল উদ্দেশ্য তো গর্ভের শূন্যতা ও পরিচ্ছন্নতা প্রমাণ করা। এ জন্যে তার উপর 'ইদ্দত' নামটা চাপিয়ে দিয়েছেন এবং তা পরোক্ষ অর্থে মাত্র।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্র কথা ঃ

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -এর আর একটি ব্যাখ্যা বলা হয়েছে। জম্‌য়া জুহরী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন المحصنت। শব্দের অর্থ ذوا الازواج। স্বামীধারী মেয়েলোক। আর তা 'আল্লাহ্র যিনা হারাম করেছেন' এই কথা পর্যন্ত পৌছে গেছে। মা'মর ইবনে তায়ূস তাঁর পিতা সূত্রে উক্ত আয়াত পর্যায়ে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ 'আমি তোমার নিকট বিবাহ দিলাম তোমার দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্ত মেয়েকে। বলেন, 'আল্লাহ্ যিনা হারাম করেছেন'। তুমি তোমার দক্ষিণ হস্তের মালিকত্বভুক্ত মেয়েলোক ছাড়া আর কোন মেয়েলোকের সাথে সঙ্গম করবে— তা তোমার জন্যে হালাল নয়। ইবনে আবূ নুজাইহ্ মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন, والمحصنت من النساء الاماملكت ايمانكم এ আয়াতাংশে যিনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আতা ইবনুস সায়েব বলেছেন, প্রত্যেক 'মুহসিনা'— 'বিবাহ দুর্গে সংরক্ষিতা মেয়েলোক' তোমার জন্যে হারাম, তবে যে মেয়েলোক বিয়ের মাধ্যমে তোমার মালিকানাভুক্ত হবে, তার সাথে তোমার সঙ্গম হারাম নয়।

আবূ বকর বলেছেন, এই সব লোকের মতেই এ আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে, স্বামীধারী মেয়েলোক হারাম, তাদের স্বামীদের জন্যে হারাম নয়। আল্লাহ্ তাঁর এ আয়াতটি দ্বারা এই বক্তব্য বলতে চেয়েছেন, তা অসম্ভব নয়। কেননা ব্যবহৃত শব্দে এরূপ ব্যাখ্যার সম্ভাবনা ও সুযোগ রয়েছে। তবে সাহাবীগণ এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা এ আয়াতের লক্ষ্য হওয়াও নিষিদ্ধ

নয়। আর তা হচ্ছে, যে সব বন্দী মেয়েলোকের স্বামীরা যুদ্ধরত শত্রুপক্ষের লোক তাদের সাথে সঙ্গম করা মুবাহ। তাহলে দুটো ব্যাপারে তা প্রযোজ্য। আর সবচাইতে প্রকাশমান কথা, দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্ত বলে দাসীদের বোঝানো হয়েছে, স্ত্রীদের নয়। কেননা আল্লাহ্-ই স্বামীহীনা ও স্বামীওয়ালীদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ- اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ -

মুমিন লোকদের আর একটি পরিচিতি হচ্ছে, তারা তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযতকারী। তবে তাদের স্ত্রীদের ক্ষেত্রে কিংবা তাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়েছে (দাসী), তাদের থেকে নয়। (সূরা মুমিনুন ঃ ৫-৬)

এ আয়াতে দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্ত মেয়েদেরকে স্ত্রীদের আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে, আর এই প্রয়োগ মালিকানাভুক্ত স্বামীহীনাদের শামিল করেছে, স্ত্রীরা শামিল নয়, আর প্রকৃতপক্ষেও তাই। কেননা স্বামী তার স্ত্রীর কোন কিছুর মালিক হয় না। তার সাথে সঙ্গম করতে পারে শুধু, তা তার জন্যে মুবাহ। স্ত্রীর মালিকানায় যে যৌনাঙ্গ রয়েছে, তার স্বাদ আস্বাদন করতে পারে শুধু। কিন্তু সেই অঙ্গের মালিকত্ব তার হয় না। লক্ষণীয়— যদি কোন মেয়ে কোন স্বামীর স্ত্রী থাকা অবস্থায় কারুর দ্বারা সন্দেহক্রমে সঙ্গমকৃতা হয়, তাহলে মহরানা সে পাবে, স্বামী নয়, এ থেকে প্রমাণিত হল যে, স্বামী স্ত্রীর কোন কিছুর মালিক হয় না, তাই আল্লাহ্‌র কথা ঃ- اِلَّا مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ —তার উপর ব্যবহৃত হবে, যে প্রকৃতই তার মালিক হয়, আর সে হচ্ছে বন্দী মেয়ে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ كِتَابَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ —'আল্লাহ্‌র কিতাব তোমাদের উপর'। উবায়দাতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, চারজন। আল্লাহ্‌র কিতাব এই নিসাব নির্দিষ্ট করে দিয়েছে কেননা ফিকহবিদগণ বলেন, কিতাবুল্লাহ্ আলায়কুম' অর্থ আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে তা লিখে দিয়েছেন, এ-ও বলা হয়েছে যে, তা হারাম করেছে তোমাদের প্রতি লিখিতভাবে। তা যে ওয়াজিব, তা-ই তাগীদ হচ্ছে এই কথাটুকু এবং তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে তা ফরয করা সম্পর্কে সংবাদ দান। কেননা 'কিতাব' অর্থই হচ্ছে ফরয করা।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ -

তোমাদের এ সবের বাইরে যা আছে, তা তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে।

উবায়দাতা আস্-সালমানী ও সুদ্দী থেকে বর্ণিত হয়েছে, এর অর্থ ঃ 'পাঁচজনের কম তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে এ ভাবে যে, তোমরা তোমাদের ধন-মালের ব্যয়-বিনিয়োগের মাধ্যমে বিবাহের পন্থায় তা পেতে চাইবে। আতা বলেছেন ঃ তোমাদের নিকটবর্তীদের মধ্য থেকে যবীল আরহাম মেয়েলোক বাদে যারা আছে, তাদেরকে তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে। আর কাতাদাতা বলেছেন ঃ 'তোমাদের এসবের বাইরে (বা এদের ছাড়া) যারা বলে তাদের বুঝিয়েছেন, দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়েছেন। এ-ও বলা হয়েছে,

যবীল আরহাম মেয়েলোক ছাড়া যারা। আর যা চারজনের বেশি, তাদেরকে ধন-মাল দিয়ে বিয়ের মাধ্যমে পেতে চাইবে অথবা দক্ষিণ হস্তের মালিকানা হিসেবে।

আবূ বকর বলেছেন, আয়াতে এবং সুন্নাতে রাসূলে যে মুহাররম মেয়েদের উল্লেখ হয়েছে তাদের ছাড়া অন্যান্য সব মেয়েই এর অন্তর্ভুক্ত।

## মহরানা

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ -

এ আয়াতে মুবাহ হওয়ার শর্ত করা হয়েছে স্ত্রীর যৌনাঙ্গের বিনিময় দানের। তা হচ্ছে ধন-মাল-টাকা-পয়সা। এর দুটি অর্থ হতে পারে। একটি স্ত্রীর যৌনাঙ্গের বিনিময়। যে জিনিস দিয়ে তা পাওয়ার অধিকার জন্মে, তা হল মাল দেয়া। আর দ্বিতীয় হচ্ছে মহরানা, যা নির্দিষ্ট পরিমাণের ধন-মালের নামকরণ করা হয়। যেমন 'তোমাদের প্রতি তোমাদের মা ও তোমাদের কন্যাদের হারাম করা হয়েছে'— আল্লাহ্‌র এ কথাটি প্রত্যেকটি মানুষের জন্যে বলা যে, তার মা ও কন্যা তার জন্যে হারাম। এতে এই কথার দলীলও আছে যে, 'মহরানা' এমন কিছু হতে পারে না, যাকে 'মাল' বা 'সম্পদ' বলা হয় না।

মহরানার পরিমাণ সম্পর্কে ফিকহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ —'ছয় দিরহামের কমে কোন মহরানা হতে পারে না।' তাবেয়ীনের মধ্য থেকে শবী ও ইবরাহীমও এ কথা বলেছেন। আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, জুফার ও হাসান ইবনে জিয়াদও এই কথাই বলেছেন। আবূ সাঈদুল খুদরী, আল-হাসান, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব ও আতা বলেছেন, বিয়ে কম মহরানাতেও হয়, বেশি পরিমাণের মহরানায়ও হয়। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) এক দানা পরিমাণ ওজনের স্বর্ণের মহরানা দিয়ে বিবাহ করেছিলেন। এই বর্ণনায় কোন কোন বর্ণনাকারী বলেছেন, সে এক দানা পরিমাণ স্বর্ণের মূল্য তিন দিরহাম ও এক-তৃতীয়াংশ দিরহাম ছিল। অন্যান্যরা বলেছেন, এক দানা স্বর্ণ দশ কিংবা পাঁচ দিরহাম মূল্য হয়।

ইমাম মালিক বলেছেন, স্বল্পতম পরিমাণের মহরানা হচ্ছে এক দিনারের চার ভাগের এক ভাগ। ইবনে আবূ লায়লা, লায়স, সওরী, আল-হাসান ইবনে সালিহ ও শাফেয়ী বলেছেন, কম সম্পদেও বিবাহের মহারানা হয়, বেশিতেও হয়। যদি এক দিরহাম হয়, তবুও বিবাহ হবে।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'ওদের বাইরে যারা তাদেরকে তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে এ ভাবে যে, তোমরা তোমাদের ধন-মালের বিনিময়ে ওদেরকে পেতে চাইবে' প্রমাণ করে যে, যে পরিমাণ বা যে জিনিসকে মাল বলা হয় না, তা মহরানা হতে পারে না। তার শর্তই হচ্ছে এই যে, সে জিনিসকে 'মাল' হতে হবে, যেন তাকে 'মাল' বলা যায়। আয়াতের দাবি-ই হচ্ছে এই। তার বাহ্যিক ও প্রকাশমান বক্তব্যও তাই। যার নিকট এক

দিরহাম বা দুই দিরহাম রয়েছে, বলা যায় না যে, তার নিকট 'মাল' আছে। অতএব তার মহরানা হওয়া সহীহ্ হয় না আয়াতের বাহ্যিকতার দাবি অনুযায়ী।

যদি বলা হয়, যার নিকট দশটি দিরহাম আছে, বলা যায় না যে, তার নিকট 'মাল' আছে। অথচ মহরানা হওয়ার জন্যে তা যথেষ্ট।

জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, বাহ্যত তা-ই মনে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা সর্বসম্মতভাবে ধরে নিয়েছি যে, এই পরিমাণটা মহরানা হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। আর আয়াতের সাধারণ কথার বিশেষ অর্থ গ্রহণ সর্বসম্মতভাবে জায়েয। তাছাড়া হারাম ইবনে উসমান জাবিরের দুই পুত্র— তাঁদের পিতার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَامَهْرَ اَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ -

দশ দিরহামের কমে মহরানা হয় না।

আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) বলেছেন ঃ দশ দিরহামের কমে মহরানা হয় না। আর এ ভাবে পরিমাণ নির্ধারণ— যা আল্লাহ্‌র হক্— ইজতিহাদের মাধ্যমে জানতে পারা সম্ভব নয়। এর উপর কোন 'রায়' বা মত খাটে না। এর উপায় হচ্ছে 'তাওকীফ'— ওহীর মাধ্যমে নির্ধারণ। কিংবা সর্বসম্মতভাবে ও ঐকমত্যের ভিত্তিতেও তা করা যেতে পারে। দশ দিরহামের পরিমাণ মহরানা নির্ধারণ— তার কম পরিমাণ নয়— প্রমাণ করে যে, তা তাওকীফের মাধ্যমেই করা হয়েছিল। তার দৃষ্টান্ত, আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, হায়য-এর কম-সে কম মেয়াদ তিন দিন এবং বেশির দিকের মেয়াদ দশ দিন। উসমান ইবনে আবুল আস্-সাকাফী নেফাসের বেশির দিকের মেয়াদ চল্লিশ দিন বলা হয়েছে। এসবই মূলত তাওকীফ। কেননা চিন্তা-ভাবনা করে এই ধরনের কথা বলা সম্ভব নয়। হযরত আলী (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, যে লোক তার নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠ পরিমাণ সময় বসবে, তার নামায সম্পূর্ণ হয়ে গেল। বোঝা গেল, তাশাহ্হুদ পরিমাণ সময় বসা ফরয। এই পরিমাণ নির্ধারণও তাওকীফ-এর মাধ্যমেই সম্ভব।

আমাদের কোন কোন ফিকহবিদ দশ-এর পরিমাণ ধার্য করার প্রমাণ বা যুক্তি হিসেবে বলেছেন, স্ত্রীর যৌন অঙ্গ দেহের একটি অঙ্গ বটে। তা ধন-মাল ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে মুবাহ বানানো যায় না। ফলে তা চুরির অপরাধে হাত কাটার মতোই ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। হাত যখন একটা অঙ্গ, তার কর্তন মুবাহ হতে পারে কোন মাল চুরির কারণে। আর যে পরিমাণ মাল চুরি করলে হাত কর্তন করা মুবাহ্ হয়ে পারে, তা হল দশ। এটাই ফিকহবিদদের আসল কথা। মহরানাও তেমনি। এই দশ-ই তাতেও গণ্য হতে হবে। আর সকলেই যখন এ ব্যাপারে একমত যে, স্ত্রী যৌন অঙ্গ বিনিময় ছাড়া মুবাহ হতে পারে না। তবে কত পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে তা মুবাহ হবে, সেই বিষয়ে ফিকহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। এমতাবস্থায় যে পরিমাণ জায়েয হওয়ার দলীল পাওয়া গেছে সেই পরিমাণ না হলে তা মুবাহ হবে না, নিষেধ স্থায়ী হয়ে থাকবে। আর সেই পরিমাণটা হয়েছে 'দশ'— সর্বসম্মতভাবে। এর কম পরিমাণে মতপার্থক্য রয়েছে। তাই যৌনাঙ্গ নিষেধের আওতার মধ্যেই থেকে যাবে— সে পরিমাণের মহরানা না হওয়া পর্যন্ত।

উপরন্তু বিনিময় ছাড়া যখন তা মুবাহ্ হবে না, তখন বিনিময়টা এমন হওয়া দরকার, যা যৌনাঙ্গের মূল্য হতে পারে। আর তা হল সমপরিমাণের মহরানা। তার চাইতে কম পরিমাণ হতে পারে না যদি না তার দলীল পাওয়া যায়। দলীল পাওয়া গেলে অবশ্যই কমেও হতে পারে। যেমন যদি মহরানার উল্লেখ বা তার পরিমাণ নির্ধারণ ছাড়াও বিয়ে হয় তা হলে তার জন্যে সমপরিমাণের মহরানা ওয়াজিব হবে। এ দলীলের ভিত্তিতে একথাও প্রমাণিত হয় যে, নিকাহ্র আক্দ হলেই সমপরিমাণের মহরানা দেয়া ওয়াজিব। যে পরিমাণটা ওয়াজিব, তার থেকে কিছু মাত্র ঘাটতি করা দলীল ছাড়া জায়েয নয়। দশ-এর অধিক হলে তা হ্রাস করা জায়েয হওয়া সম্পর্কে ইজমার দলীল রয়েছে। বিয়ের আক্দ হলে যে পরিমাণ মহরানা দেয়, তার কম করার ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। কেননা দশ থেকে কম করার কোন দলীল পাওয়া যায়নি।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ -

তোমরা যদি স্ত্রীদের স্পর্শ করার আগেই তালাক দাও এমতাবস্থায় যে, তোমরা তাদের জন্যে মহরানা ধার্য করেছ, তা হলে ধার্যকৃত মহরানার অর্ধেক দিয়ে দিতে হবে।
(সূরা বাকারাহ ঃ ২৩৭)

এ আয়াত দাবি করছে যে, মহরানার পরিমাণ কম হোক কি বেশি, উক্ত অবস্থায় অর্ধ মহরানা অবশ্যই দিতে হবে।

এর জবাবে বলা যাবে, উপরে আমরা যা বলেছি, তা থেকে প্রমাণিত হল যে, মহরানা দশ দিরহামের কম পরিমাণে হতে পারে না। এক্ষণে দশ-এর কিছু অংশকে যদি মহরানা নাম দেয়া হয়, তাহলেও তা মহরানা হবে। যেমন অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে যার কোন অংশ করা যায় না— তার কতককে সমগ্রটার নাম দেয়া হয়। যেমন তালাক ও নিকাহ্ এবং এ দুটির মতো আর যা যা আছে। আর আক্দে দশকে যখন অংশে ভাগ করা যায় না, তখন তার অংশকেই সমগ্রটার নাম দিতে হবে। তাই সঙ্গমের পূর্বেই যদি স্ত্রীকে তালাক দেয়া হয়, তাহলে স্ত্রীকে দশ-এর অর্ধেক দেয়া ওয়াজিব হবে। কেননা দশ দেয়াই নির্ধারিত পরিমাণ। যেমন যদি কেউ তার স্ত্রীকে অর্ধ তালাক দেয়, তাহলেও স্বামী তার স্ত্রীকে পূর্ণ তালাক দিয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। অর্ধেক তালাক দেয়া সত্ত্বেও তার তালাকের গোটা নামটাই ব্যবহৃত হবে। তেমনি ইচ্ছামূলক হত্যার বিনিময় যদি অর্ধেক মাফ করা হয়, তাহলে সমগ্রটাই যেন মাফ করে দিয়েছে, মনে হবে। অবস্থা যখন এই, তখন দশ-এর অর্ধেক পাঁচকেও দশ-ই নাম দিতে হবে। কেননা নিকাহ্র আকদে দশকে অংশে ভাগ করা যায় না— এটার দলীল রয়েছে। তাই আমরা— ফিকাহ্বিদগণ— যখন তালাকের পর পাঁচ দেয়া ওয়াজিব মনে করেছি, তাহলে তা-ই অর্ধেক মহরানা হয়ে যাবে। উপরন্তু আমরা যখন নির্দিষ্ট মহরানার অর্ধেক দেয়া ওয়াজিব বলি, তখন আমরা আয়াতের হুকুমের বিরুদ্ধতাকারী হই না। আর যদি পাঁচ সম্পূর্ণ করার জন্যে বেশি দেয়া

ওয়াজিব মনে করি, অপর কোন দলীলের ভিত্তিতে তবুও। হ্যাঁ, আমাদের মাযহাব আয়াতের পরিপন্থী হয়ে যাবে, যদি আমরা নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্ধেক ওয়াজিব মনে না করি। আমরা যখন তাও ওয়াজিব মনে করি, অপর এক দলীলের ভিত্তিতে অধিক দেয়া ওয়াজিব করি, তাহলেও তাতে আয়াতের বিরুদ্ধতা হবে না।

যাঁরা মনে করেন, দশ-এর কম পরিমাণের মহরানাও ধার্য করা জায়েয, তাঁদের দলীল হচ্ছে আমের ইবনে রবিআতা বর্ণিত হাদীস। একটি মেয়েলোককে নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত করা হয়। সে এক ব্যক্তিকে বিয়ে করেছে দুইটি জুতা মহরানা নির্দিষ্ট করে। রাসূল (স) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি নিজে থেকেই দুই জুতার বিনিময়ে বিয়ে করতে রাযি হয়েছ ? সে বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূল (স) তাকে এই বিয়েতে অনুমতি দিলেন। আবূ যুবায়র কর্তৃক জাবির থেকেও একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (স) বলেছেন ঃ বিবাহে যে লোক স্ত্রীকে অঞ্জলি পরিমাণ ছাতু বা ময়দা অথবা খাদ্য মহরানা হিসেবে দিল, সে তার যৌনাঙ্গকে নিজের জন্যে হালাল করে নিল। হাজ্জাজ ইবনে আরতাত আবদুল মালিক ইবনুল মুগীরা আততায়েফী, আবদুর রহমান ইবনুল সালমানী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, নবী করীম (স) ভাষণ দান প্রসঙ্গে বললেন ঃ 'তোমরা তোমাদের মধ্যের স্বামীহীনা মেয়েদের বিয়ে দাও।' সাহাবীগণ বললেন ঃ হে রাসূল! ছেলে-মেয়ের মধ্যের সম্পর্ক কিসের ভিত্তিতে হবে ? বললেন ঃ উভয় পরিবার যে পরিমাণে রাযি হবে। নবী করীম (স) থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, বলেছেন ঃ যে লোক দুই দিরহামের বিনিময়ে হালাল করবে, সে-ও হালাল করে নিল। আর আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বিয়ে করেছিলেন এক দানা পরিমাণ স্বর্ণের মহরানা দিয়ে। নবী করীম (স) জানিয়েছেন, বলেছেন ঃ 'তুমি ওলীমা কর, একটি ছাগী দ্বারা হলেও।' এবং এর কোন প্রতিবাদ করা হয়নি। এ পর্যায়ের আরও একটি হাদীস আবূ হাজিম— সহল ইবনে সা'দ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একটি মেয়েলোক নবী করীম (স)-কে বললেন ঃ 'আমি নিজকে আপনার জন্যে হেবা করে দিয়েছি।' তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ মেয়েলোকের কোন প্রয়োজন নেই আমার। তখন এক ব্যক্তি বললেন, হে রাসূল! আপনি ওকে আমার নিকট বিয়ে দিয়ে দিন। বললেন, তোমার নিকট মহরানা বাবদ দেয়ার মতো কোন জিনিস আছে কি ? সে বলল, আমার পরিধেয় বস্ত্র আছে। সেটি এই। নবী করীম (স) বললেন, তুমি যদি তোমার পরিধেয় এই বস্ত্রটি ওকে দিয়ে দাও, তাহলে তুমি (বা সে) যদি ওর উপর বসে তাহলে তোমার পরিধান করার কিছুই থাকবে না। শেষ পর্যন্ত বললেন, তালাশ করে দেখ, একটি লৌহ অঙ্গুরীয় পেলেও চলবে।

এ হাদীস অনুযায়ী নবী করীম (স) একটি লোহার আঙুটিকে মহরানা বানানো যায় বলে স্বয়ং অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু লোহার একটি আঙটি তো দশ দিরহামের সমান হতে পারে না।

এর জবাবে বক্তব্য হল, নবী করীম (স) দুই খন্ড জুতার বিনিময়ে বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলেন এজন্য যে, সম্ভবত এই দুই জুতা দশ দিরহাম কিংবা তার অধিকের সমপরিমাণ হবে বলে মনে করা হয়েছে। তাহলে মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে এটাকে বিপরীত মতের সমর্থনে পেশ করা যায় না। তাছাড়া দুই জুতার বিনিময়ে বিয়ে সম্পন্ন করার পর সে বিষয়ে নবী করীম (স)-কে সংবাদ জানানো হয়েছিল মাত্র। হতে পারে— তার মূল্য দশ কি তার অধিক দিরহাম

হবে বলে মনে করা হয়েছে। তাই দুই জুতার বিনিময়ে বিয়ে জায়েয হওয়ার এই ঘটনা বিপরীত মতকে প্রমাণিত করে না। উপরন্তু, হাদীসের সংবাদটা হল নবী করীম (স) বিয়েটাকে জায়েয বলেছিলেন মাত্র। আর তার ভিত্তিতে বিয়ে জায়েয হলেও তার দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, তা-ই যথার্থ মহরানা । তার ছাড়া অন্য কিছু নয়। মহরানা ছাড়াও যদি কেউ বিয়ে করে, তবে বিয়েটা তো জায়েয হবে। কিন্তু তা প্রমাণ করে না যে, স্ত্রী মহরানা বাবদ কিছুই পাবে না। তেমনি যে দুই জুতার মূল্য দশ দিরহামের কম, তার বিনিময়ে বিয়ে জায়েয হলেও তা প্রমাণ করে না যে, তা ছাড়া স্ত্রীর আর কিছুই প্রাধান্য নেই। তার এই কথা যে, দুই দিরহাম দারা যে স্ত্রী অঙ্গ হালাল করে কিংবা অঞ্জলী ভর্তি আটা-ময়দার বিনিময়ে তা করে, সে তার দ্বারাই হালাল করে নিতে পারে বটে। এ হল যৌন অঙ্গ হালাল হওয়ার কথা। কিন্তু তা প্রমাণ করে না যে, সে স্বামী আর কিছু স্ত্রীকে দিতে বাধ্য হবে না।

আবদুর রহমান বর্ণিত হাদীসটিও তেমনি। তিনি এক দানা পরিমাণ স্বর্ণের মহরানা দিয়ে বিয়ে করেছিলেন। সংবাদে এ কথাও ছিল যে, তার মূল্য পাঁচ কিংবা দশ দিরহাম।

রাসূল (স)-এর কথা— পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে যার উপর উভয় দিকের পরিবারবর্গ যে পরিমাণে রাযি হয়, তাই। এর অর্থও এই যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে এভাবে বিবাহ করা হলে তা জায়েয হবে। এমনকি, তারা যদি কিছু পরিমাণ মদ্য কিংবা শূকর মাংসের উপরও বিবাহ দিতে বা করতে রাযি হয়, তবে তা কখনই জায়েয হবে না, তাদের রাযি হওয়ার ফলেও নয়। তেমনি নামকরণের ব্যাপার শরীয়ত প্রমাণিত হুকুমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। দশ হল তেমনি এক নামকরণ।

সহল ইবন সাদ বর্ণিত হাদীস, নবী করীম (স) তাকে অবিলম্বে কিছু একটা ব্যবস্থা করার আদেশ করেছিলেন। কথাটি সেই প্রেক্ষিতেই বিবেচ্য। কেননা তিনি ইচ্ছা করলে শুধু নাম করণের দ্বারা আকদ সহীহ্ হতো না। বরং নামকরণ তার যিম্মায় প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট হয়। যার দ্বারা আকদ জায়েয হয়, তা-ই জলদি করে ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছিল। তা থেকে বোঝা যায় যে, এর দ্বারা আসল মহরানা-ই সহীহ্ হবে, তা তিনি প্রমাণ করতে চান নি। এমনকি যখন কোন জিনিসই পাওয়া গেল না, তখন নবী করীম (স) বললেন যে, আমি ওকে তোমার নিকট বিবাহ্ দিলাম তোমার নিকট কুরআনের যতটা ইল্‌ম আছে তার বিনিময়ে। অথচ তার নিকট কুরআনের যে ইল্‌ম ছিল, তা তো মহরানা হতে পারে না। এ থেকে বোঝা গেল যে, তার দ্বারা বিয়েটাই শুধু সহীহ্ হয়, কিন্তু তা মহারানা হয় না।

এক বছর স্বামীর খেদমত করার শর্তে যে লোক বিয়ে করবে, সে সম্পর্কে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ বলেছেন, কোন লোক তার এক বছর কাল খেদমত করার শর্তে যদি কেউ বিয়ে করে, সে স্বাধীন হলে স্ত্রী সমপরিমাণ মহরানা পাবে। আর দাসী বা গোলাম হলে, সে স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর এক বছর কাল খেদমত করা জরুরী হবে।

ইমাম মুহাম্মাদ বলেছেন, স্ত্রী স্বামীর খেদমতের মূল্য বা বেতন পাবে, যদি সে পুরুষটি স্বাধীন ব্যক্তি হয়। ইমাম মালিক বলেছেন, যদি মেয়েলোকটিকে এই শর্তে বিয়ে করে যে, সে নিজেকে তার ইজারায় এক বছর কালের জন্যে ছেড়ে দেবে কিংবা তার অধিক কি কম সময়ের

জন্যে এবং তা-ই হবে তার মহরানা, তা হলে নিকাহ ভঙ্গ হয়ে যাবে তার সাথে সঙ্গম না করা হলে। সঙ্গম করা হলে নিকাহ্ প্রমাণিত হবে। আওজায়ী বলেছেন, পুরুষ যদি মেয়েলোকটিকে বিয়ে করে এই শর্তে যে, সে তাকে হজ্জ করাবে, কিন্তু পরে সে তাকে সঙ্গম করার পূর্বেই তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে সে তার অর্ধেক হজ্জের খরচ দেয়ার জন্যে দায়ী হবে। তাতে পোশাক ও খরচাদি শামিল রয়েছে।

আল-হাসান ইবনে সালিহ ও শাফেয়ী বলেছেন, স্বামীর খেদমতের বিনিময়ে নিকাহ জায়েয হবে, যদি সময় নির্দিষ্ট থাকে। আর আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ বলেছেন, কুরআনের একটা সূরা শিক্ষাদানের বিনিময়ে বিয়ে করলে বিয়ে জায়েয হলেও তা তো আর মহরানা হতে পারে না। সে কারণে তাকে সমপরিমাণের মহরানা দিতে হবে। মালিক ও লায়স-ও এই মত প্রকাশ করেছেন। শাফেয়ী বলেছেন, তা-ই হবে তার মহরানা। সঙ্গমের পূর্বে তাকে তালাক দিলে তাকে ফিরিয়ে নিতে হবে শিক্ষাদানের মজুরীর অর্ধেকের বিনিময়ে যদি তাকে শিক্ষা দিয়ে থাকে। এটা আল-মুজানীর বর্ণনা। তাঁর থেকে আর রুবাই বর্ণনা করেছেন, তাকে ফিরিয়ে নিতে হবে সমরিমাণ মহরানার অর্ধেক দিয়ে।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তার বাইরে যেসব মেয়ে আছে তাদেরকে তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে এ ভাবে যে, তোমরা তোমাদের মালের বিনিময়ে তাদেরকে পেতে চাইবে।'

এ আয়াতের দাবি হল, স্ত্রীর যৌনাঙ্গের বিনিময় হবে তা, যা মাল হিসেবে হস্তান্তর করা যায়। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা পেতে চাইবে তোমাদের মালের বিনিময়ে'— এর দুটি অর্থ হতে পারে। একটি— স্ত্রীর যৌনাঙ্গের বদলে স্ত্রীকে মালের মালিক বানিয়ে দেয়া আর দ্বিতীয় অর্থ, তা স্বামীর তা হস্তান্তরিত করা তার ফায়দা— মুনাফা পুরামাত্রায় আদায় করে নেয়ার জন্যে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, যে মহরানার বদলে স্ত্রী অঙ্গ সম্ভোগ করার অধিকার হয়, তা হয় মাল হবে অথবা হবে কোন মালের ফায়দা, যা স্বামী স্ত্রীকে দেবে। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমাদের মালের বিনিময়ে তোমরা পেতে চাইবে'— এই উভয় অর্থই শামিল করে, দুটোকেই বোঝায়। এও প্রমাণিত হয় যে, মহরানা অবশ্যই মাল হতে হবে। আর আল্লাহ কথাঃ

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْـًٔا مَّرِيْـًٔا -

এবং তোমারা স্ত্রীদেরকে তাদের প্রাপ্য মহরানা দিয়ে দাও আন্তরিকতা সহকারে। তারা নিজেরা তা থেকে নিজেদের খুশীমনে যদি কিছু তোমাদের জন্যে দেয় তবে তোমরা তা সুখাদ্য সুস্বাদু হিসেবে গ্রহণ কর। (সূরা আন-নিসা ঃ ৪)

তা এই জন্যে যে, 'তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মহরানা দিয়ে দাও আন্তরিকতা সহকারে'— এ একটি আদেশ। এ আদেশ পালন করা ওয়াজিব। কথার ধরণ থেকে এ-ও প্রমাণিত হয় যে, মহরানা অবশ্যই মাল হতে হবে দুটি দিক দিয়ে। একটি اتـوا 'দিয়ে দাও' আর দিয় দেয়া কাজটি কোন বস্তুকে কেন্দ্র করেই হতে পারে। মুনাফা বা ফায়দা ধরনের জিনিস হতে পারে

না। মুনাফা বা কল্যাণ অথবা ফায়দা কথাটি বস্তুর ক্ষেত্রে বলা যায় না। এ দেয়া প্রকৃতই দেয়া, হতে পারে হাতে দেয়া। আর দ্বিতীয় হচ্ছে ঃ আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তারা নিজেরাই খুশী মনে তা থেকে কিছু যদি তোমাদেরকে দেয় তাহলে তোমরা তা খাও'— এ কথাও মুনাফা বা ফায়দা কি কল্যাণের ক্ষেত্রে বলা হয় না। তা খাদ্যবস্তু কিংবা দেয়ার পর যা খাদ্য বস্তুতে পরিবর্তিত করা যায়, সেই ক্ষেত্রেই বলা যায়। অতএব এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হল, মুনাফা— অর্থাৎ কোন ফায়দা— উপকারিতা বা কল্যাণ মহরানা হতে পারে না।

যদি বলা হয়, এ কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, দাস বা গোলামের খেদমত মহরানা হতে পারে না।

জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, আয়াতের বাহ্যিক দাবি তো তাই। তাই কোন দলীল ছাড়া তো জায়েয হতে পারে না। নবী করীম (স) বদল বিয়ে নিষিদ্ধ করেছেন, তা থেকেও উক্ত কথা প্রমাণিত হয়। বদল বিয়ে হল, এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ যে, একজন অপর জনের বোনকে বিয়ে করবে এই শর্তে যে, সে অপরের বোনকে বিয়ে করবে— অথবা সে অপরের দাসীকে বিয়ে করবে এই শর্তে যে, তার নিজের দাসীকে অপর জন বিয়ে করবে। আর এদের কোন বিয়েতেই মহরানা দেয়া-নেয়া হবে না। এ হল শিগাড় বিয়ে। এটা একটা ভিত্তি এ কথার যে, মহরানা শুধু তা-ই হতে পারে, যা মাল হিসেবে হস্তান্তরিত করা সম্ভব। স্ত্রীর যৌনাঙ্গ ব্যবহার মহরানা হওয়াকে নবী করীম (স) বাতিল করে দিয়েছেন। কেননা তা কোন মাল নয়। কেননা যৌনাঙ্গের বদল হিসেবে যা যা শর্ত করা হয়েছে, তা যদি হস্তান্তরযোগ্য মাল না হয়, তাহলে তা মহরানা হতে পারে না। আমাদের হানাফী ফিকহবিদগণ তাই বলেছেন, ইচ্ছামূলক হত্যার রক্ত-বিনিময় ক্ষমা করে দেয়ার বিনিময়ে যদি কেউ বিয়ে করে কিংবা কোন স্ত্রীকে তালাক দেয়ার বিনিময়ে বিয়ে করে, তাহলে তা মহরানা হবে না। যেমন যৌনাঙ্গের সুখ ভোগ মহরানা হয় না। তাকে মহরানা বানানোও যেতে পারে না।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, বদল বিয়েতে কোন এক জনের জন্যে মহরানা নির্ধারণ করা হলে নিকাহ জায়েয হবে এবং দুজনের প্রত্যেকের জন্যে সমপরিমাণ মহরানা ওয়াজিব হবে। ঠিক যে অবস্থায় নিকাহ্‌কে জায়েয বলা হয়েছে সেই অবস্থায়। নবী করীম (স) বদল বিয়ে তো নিষিদ্ধ করেই দিয়েছেন। তার দুটি তাৎপর্য বোঝা যায়। একটি এই যে, বদল যদি হয় দুই দাসীর মধ্যে তাহলে অবশ্য যৌনাঙ্গের স্বাদ-আস্বাদন ও মহরানা হতে পারে। কেননা দাসীর মহরানাটা তার মনিব পাবে। তাই নবী করীম (স) বিয়েতে যৌনাঙ্গের স্বাদ আস্বাদনের বিনিময় হওয়াকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। আর দ্বিতীয় হল, দুইজন স্বাধীনা মেয়েলোকের অদল-বদল হলে একজন অপর জনকে বলবে ঃ 'আমি তোমার নিকট আমার বোনকে বিয়ে দেব এই শর্তে যে, তুমি তোমার বোনকে আমার নিকট বিয়ে দেবে'— অথবা আমি আমার কন্যা তোমার নিকট বিয়ে দেব এই শর্তে যে, তুমি তোমার কন্যা আমার নিকট বিয়ে দেবে'— এ ধরনের বিয়েতে কারোর জন্যেই মহরানার উল্লেখ হয় না। কেননা এতে যাকে বিয়ে দেয়া হচ্ছে, তার বদলে অন্য এক জনের জন্যে ফায়দা হওয়ার শর্ত করা হয়েছে, আর সে হচ্ছে কন্যার— যাকে বিয়ে দেয়া হচ্ছে— তার পিতা বা ভাই। দুইটির মধ্যে যে ধরনেরই বদল বিয়ে হোক, সে বিষয়ের

আক্‌দটা বিবাহিতার জন্যে কিছু বদল নির্ধারণ ছাড়াই হয়ে যায়। আর অপর অবস্থাটিতে যৌনাঙ্গের বিনিময় হয় অপর জনের স্ত্রীর যৌনাঙ্গের আস্বাদন।

এ কারণে নবী করীম (স) বদল বিয়ে বাতিল ঘোষণা করেছেন। তাই আসল কথা হল যৌনাঙ্গের বদল বা বিনিময় হবে তা যা মাল হিসেবে স্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করা সম্ভব হবে।

যদি বলা হয়, দাসীর যৌনাঙ্গের স্বাদ আস্বাদন ধন-মালে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে তাহলে তা দাসের খিদমতের বিনিময়ে বিয়ে দেয়ার মত হবে না কেন ? জবাবে বলা যাবে, দাসের খিদমত ধন-মাল হস্তান্তর করার অধিকার সৃষ্টি করে। আর তা হল দাসের দাসত্ব। যেমন ইজারাদার— যার জন্যে ইজারা তার নিকট দাসকে হস্তান্তর করার অধিকার জানায়— খিদমতের জন্যে। আর দাসীর স্বামী নিকাহ্‌র আক্‌দের কারণে দাসীকে তার নিকট হস্তান্তর করার অধিকার সৃষ্টি করে না। কেননা মনিব তার জন্য একখানি স্বতন্ত্র ঘর বানিয়ে দিতে বাধ্য নয়। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা তোমাদের ধন-মালের বিনিময়ে স্ত্রী সন্ধান করে নেবে' দাবি করে যে, নিকাহ্‌র আক্‌দ হওয়ার দরুন তার নিকট মাল হস্তান্তর করার অধিকার জন্মায় স্ত্রীর যৌনাঙ্গের বিনিময় হিসেবে। কিন্তু কুরআনের সূরা শিক্ষাদানের বিনিময়ে বিবাহ দিলে তা দুটি কারণে মহরানা হিসেবে সহীহ্‌ হবে না। একটি— পূর্বে যেমন বলেছি, তা মাল হস্তান্তর করার অধিকার জন্মায় না— যেমন স্বাধীন ব্যক্তির খিদমত। আর দ্বিতীয় কারণ হল, কুরআনের শিক্ষাদান ফরযে কিফায়া। তাই যে কেউ কুরআনের কোন কিছু কাউকে শিক্ষা দেবে, সে তো ফরয আদায় করল। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন, আমার নিকট থেকে একটি আয়াত হলেও তা লোকদের নিকট পৌঁছিয়ে দাও। তাহলে তা স্ত্রীর যৌনাঙ্গের বদল বা বিনিময় কি করে হতে পারে! তা যদি জায়েয হয়, তাহলে ইসলামে শিক্ষাদানের বিনিময়েও বিয়ে দেয়া জায়েয হবে। কিন্তু এ কথা বাতিল। কেননা আল্লাহ্‌ মানুষের উপর যা ফরয করেন, তা হল তার কাজ, যা কর্তব্য এবং যখনই তা সে করবে ফরয হিসেবেই করবে। তার বিনিময়ে দুনিয়ার কোন স্বার্থলাভ করার কোন অধিকার তার হতে পারে না। তা যদি জায়েয হয়, তাহলে শাসকদের জন্যে শাসনকার্যের বিনিময়ে ঘুষ লওয়াও জায়েয হবে। অথচ আল্লাহ্‌ তাকে সম্পূর্ণ হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এক্ষণে কেউ যদি যুক্তি স্বরূপ সহল ইবনে সা'দের কাহিনী সম্বলিত হাদীস পেশ করে, যাতে একটি মেয়ের নিজেকে রাসূল (স)-এর জন্যে হেবা করার কথার উল্লেখ আছে, রাসূল (স) আমার মেয়েলোকের কোন প্রয়োজন নেই বলায়সেখানে উপস্থিত এক ব্যক্তি সেই মেয়েটিকে তার নিকট বিয়ে দেয়ার জন্যে রাসূল করীম (স)-কে অনুরোধ জানিয়েছিল। তখন তিনি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ তুমি কুরআনের কোন ইল্‌ম রাখো কিনা। সে অমুক সূরাটি জানার কথা বললে তিনি বলেছিলেন আমি এই মেয়েটিকে তোমার নিকট কুরআনের এ সূরা জানার বিনিময়ে বিয়ে দিলাম— সে আরও একটি হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করতে পারে, যেটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, আহমাদ ইবনে হাফস ইবনে আবদুল্লাহ, উবাই, ইবরাহীম ইবনে তহমান হাজ্জাজ আল বাহেলী আশআলা, আতা ইবনে আবূ রিবাহ, আবূ হুরায়রাতা সূত্রে সহল ইবনে সা'দের মত ঘটনাই আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তাতে রাসূল (স) লোকটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি কুরআনের কোন অংশ মুখস্থ করেছ কি ? সে জবাবে সূরা আল-বাকারা

কিংবা তার পরবর্তী সূরাটি মুখস্থ করার কথা বলে। তখন নবী করীম (স) তাকে বললেন : যাও তুমি ওকে বিশটি আয়াত শিক্ষা দিও। সে তোমার স্ত্রী। এর জবাবে বলা যাবে, এর অর্থ হচ্ছে, তোমার নিকট কুরআনের যা আছে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন :

ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ -

তোমাদের এই সব হচ্ছে তা, যার বলে তোমরা দুনিয়ায় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠ এবং যে সব পেয়ে তোমরা অহংকারে মেতে যাও। (সূরা মুমিন : ৭৫)

এর তাৎপর্য হল, এ সবের কারণেই তোমরা আনন্দ ও আত্মম্ভরিতায় নাচতে থাক। তা ছাড়া কারুর নিকট কুরআন থাকার অর্থ এই নয় যে, তা বিনিময় হতে পারে। এ হাদীসে শিক্ষাদানের কথার উল্লেখ নেই। ফলে আমরা জানতে পারলাম, রাসূল (স)-এর কথার তাৎপর্য হল, আমি তোমার নিকট মেয়েটিকে বিয়ে দিলাম কুরআনের মহানত্ব প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে। আর তোমার নিকট কুরআনের যা আছে, তার কারণে।

এটা ঠিক সে রকমই ব্যাপার, যেমন আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে তালহা আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, আবূ তালহা উম্মে সুলাইমের বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। তখন উম্মে সুলাইম বললেন, আমি এই ব্যক্তির প্রতি ঈমান এনেছি এবং সাক্ষ্য দিয়েছি যে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল। এখন তুমি যদি আমার অনুসরণ কর— ঈমান আন— তাহলে আমি তোমাকে বিবাহ করব। জবাবে আবূ তালহা বললেন, আমিও সেই পথে, যে পথে তুমি চলেছ। পরে উম্মে সুলাইম আবূ তালহাকে বিয়ে করলেন। তখন তার মহরানা হল ইসলাম।

এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, উম্মে সুলাইম আবূ তালহার দ্বারা ইসলাম গ্রহণ করাবার উদ্দেশ্যেই তাকে বিয়ে করেছিলেন। ইসলাম তো আর মহরানা হতে পারে না কারোর জন্যেই এবং প্রকৃতপক্ষে।

ইবরাহীম ইবনে তাহমানের হাদীস সনদের দিক দিয়ে যয়ীফ। এই কাহিনীই ইমাম মালিক আবূ হাজিম-সহল ইবনে সা'দ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে রাসূল (স) তাকে বলেছেন যে, 'তুমি কুরআনের সেই সূরা ওকে শিক্ষা দাও' এই কথার উল্লেখ নেই। আর ইবরাহীম ইবনে তাহমানের হাদীস কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না। তা সহীহ্ হলেও তাতে এমন কোন প্রমাণ নেই যে, রাসূল (স) কুরআন শিক্ষাদানকে মহরানা বানিয়েছেন। কেননা হতে পারে, তিনি তাকে— মেয়েটিকে কুরআনের তালীম দিতে আদেশ করেছেন। তা সত্ত্বেও তার যিম্মায় মহরানা প্রমাণিত হয়ে থাকল। কেননা রাসূলে করীম (স) বলেন নি যে, কুরআনের শিক্ষাদানই মেয়েটির জন্যে মহরানা।

যদি বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَىَّ هَاتَيْنِ عَلٰى اَنْ تَاْجُرَنِىْ ثَمٰنِىَ حِجَجٍ -

আমি চাই আমার এই দুই কন্যার কোন একটিকে তোমার নিকট বিবাহ দেব এই শর্তে যে, তুমি আট বছর পর্যন্ত আমার মজুরী খাটবে। (সূরা কাসাস : ২৭)

এ আয়াতে একজন স্বাধীন মুক্ত (গোলাম বা দাস নয়) মানুষের কল্যাণ বা খেদমতকে স্ত্রীর যৌনাঙ্গের বদল বা বিনিময় বানানো হয়েছে।

জবাবে বলা যাবে, যে শর্তটির উল্লেখ হয়েছে আয়াতে, তা প্রস্তাবিতা বিয়ের কনের কোন কল্যাণ বা ফায়দা নয়। সে শর্তটি শুয়াইব নবী (আ) করেছিলেন নিজের জন্যে। আর পিতার জন্য যে শর্ত তা তো বিয়ের মহরানা হতে পারে না। অতএব এ আয়াত হক দলীল হিসেবে পেশ করা চলে না, তা অর্থহীন, আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। উপরন্তু তা যদি কনের জন্যে শর্ত হওয়া সহীহ্‌ও হয়, তবু নবী করীম (স) তা নিজের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। কেননা তিনিই ছিলেন বিয়ের আক্‌দের অভিভাবক অথবা এজন্যে যে, সন্তানের মাল তো পিতার মালই। যেমন রাসূল (স) বলেছেন ঃ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ 'তুমি এবং তোমার ধন-মাল তো তোমার পিতার। 'কিন্তু মহরানা ছাড়া বিয়ে তো মনসূখ হয়ে গেছে শিঘার বদল বিয়ে নিষিদ্ধ হওয়ার দ্বারা'। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা তোমাদের ধন-মালের বিনিময়ে পেতে চাইবে' প্রমাণ করে যে, দাসীর দাসমুক্তি মহরানা হতে পারে না। কেননা মহরানা সংক্রান্ত আয়াত দাবি করে যে, স্ত্রীর যৌনাঙ্গের বিনিময় হবে তা, যা স্ত্রীর নিকট মাল হিসেবে হস্তান্তর করা যায়। দাসীকে মুক্তিদানে তো কোন মাল হস্তান্তরিত হয় না। তাতে শুধু এক ব্যক্তির মালিকত্ব প্রত্যাহৃত হয়, কোন ধন-মালের হস্তান্তরের কোন ব্যাপার তাতে নেই। লক্ষণীয় যে, দাসের মালিক ছিল তার মনিব, সে তো স্ত্রীর দিকে হস্তান্তরিত হয় না। তাতে তার মালিকত্ব বিলুপ্ত হয়। এর ফলে স্ত্রীর কোন মাল হয় না বলে কিংবা তার নিকট কোন মাল হস্তান্তরিত হওয়ার কোন অধিকার তার জন্মে না। অতএব তা তার বিয়ের মহরানা হতে পারে না। নবী করীম (স) থেকে আরও যে বর্ণনাটি এসেছে তিনি সফিয়াকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং তার এই মুক্তি প্রাপ্তিটাকেই তিনি তার মহরানা বানিয়েছিলেন, তা এইজন্যে যে, তার অধিকার ছিল কিনা মহরানায় বিয়ে করার। এটা রাসূল (স)-এর একটা বিশেষ অধিকার। এ অধিকার অন্য কারুর নেই। আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ -

কোন মুমিন মেয়েলোক যদি নিজেকে নবীর জন্যে হেবা করে, নবী যদি তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছা করে, তাহলে খালেস তোমার জন্যে জায়েয হবে, মুমিনদের জন্যে নয়।

(সূরা আহযাব ঃ ৫০)

এ আয়াত অনুযায়ী নবী করীম (স) কোনরূপ মহরানা বা বিনিময় না দিয়েই কোন মেয়েলোককে বিয়ে করতে পারতেন। এইরূপ বিশেষ অধিকার হিসেবেই একসাথে নয়জন স্ত্রী রাখারও অনুমতি তাঁর জন্যে ছিল, অন্য কারুরই এই অধিকার নেই।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'এবং তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মহরানা দিয়ে দাও খালেস দিলে। 'তারা যদি নিজের থেকেই খুশি মনে মহরানার কোন জিনিস দিয়ে দেয় তাহলে তোমরা তা সুখাদ্য সুস্বাদু হিসেবেই ভক্ষণ কর' প্রমাণ করে যে, দাসত্বমুক্তি কখনও মহরানা হতে পারে না। তার

কয়েকটি কারণ আছে। একটি— আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'তাদেরকে দাও।' এটা পালন করা— কার্যত দেয়া ওয়াজিব হয়ে পড়েছে। দাসত্ব থেকে মুক্তিদান ক্ষেত্রে দিয়ে দেয়ার কিছু হয় না। দ্বিতীয়— আল্লাহ্‌র কথা ঃ তারা যদি নিজেদের থেকেই খুশি মনে কিছু (পরিমাণে) করে। দাসমুক্তি দাসের ইচ্ছায় তার কোন অংশ ভেঙ্গে দেয়ার কোন সুযোগ নেই এবং তৃতীয়— আল্লাহ্‌র কথা ঃ তোমরা তা খাও সুস্বাদু-সুখাদ্য হিসেবে। দাসমুক্তিতে তা সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌র কথা ঃ

مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ -

বিবাহ-দুর্গে সংরক্ষিত হয়ে, স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী যৌন-লালসা চরিতার্থকারী না হয়ে।

আবূ বকর বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্‌র কথা 'বিবাহ-দুর্গে সংরক্ষিত হয়ে স্বাধীন-স্বেচ্ছাচারী যৌন লালসা চরিতার্থকারী না হয়ে'— এর দুটি দিক হতে পারে। তার একটি, এতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংরক্ষিত হওয়ার জন্যে। লোকেরা যখন বিয়ে করবে তখন তাদের অবস্থার এটা বর্ণনা। আর দ্বিতীয়, যৌনাঙ্গ মুবাহ হওয়ার জন্যে সংরক্ষণশীলতা একটা শর্ত— যেখানে আল্লাহ্‌র মুহাররম মেয়েদের বাদে অন্যান্য সব মেয়েদের বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

যদি প্রথম দিকটিই লক্ষ্যভূত হয়ে থাকে, তাহলে মুবাহ্ হওয়ার ব্যাপার সাধারণ, যারাই এর আওতার মধ্যে আসে, তাদের সকলের ক্ষেত্রে তা সহীহ। তবে কোনটির ব্যাপারে ভিন্ন দলীল পাওয়া গেলে তা বাদ পড়বে।

আর যদি দ্বিতীয় কথাটি লক্ষ্য হয়ে থাকে, তাহলে মুবাহ করার ব্যাপারটি হবে অস্পষ্ট, ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কেননা সংরক্ষণ অর্জনের শর্তেই তা আক্‌দবদ্ধ হয়েছে। আর সংরক্ষণ শব্দটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। অতএব তাকে যুক্তি হিসেবে পেশ করা এরূপ অবস্থায় সহীহ্ হতে পারে না। তাই উত্তম পন্থা হচ্ছে, এর অর্থ গ্রহণ করা হবে 'বিবাহ দ্বারা সংরক্ষণ অর্জন সম্পর্কে সংবাদ দান।' কেননা এই অর্থে তা ব্যবহার করা সম্ভব। কেননা যখনই শব্দটি ব্যবহৃত হবে, তখন তা সাধারণ অর্থবোধক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তার বাহ্যিক দিকটা ব্যবহার করাই আমাদের পক্ষে সম্ভব। এ সম্ভাবনাও আছে যে, তার হুকুমটা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল। তা হলে তার সাধারণ ও ব্যাপক অর্থ গ্রহণই কর্তব্য। তাকে মোটামুটি ধরনের কথার মধ্যে ফেলে রাখা ঠিক হবে না। তাহলে সে শব্দটি যখনই ব্যবহৃত হবে, তার হুকুমটা আমরা কাজে লাগাতে পারব। তাই এ দিতে যাওয়াই আমাদের কর্তব্য। তাকে এমন ভাবে রেখে দেয়া উচিত নয়, যার ফলে তার ব্যবহার অন্য কারুর নিকট থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পাওয়ার উপর নির্ভরশীল হবে। পাঠের ধারাবাহিকতা আয়াতটির ভঙ্গীতে এমন কিছু আছে যা احصان। সংরক্ষণ তার উল্লেখ হলেই বিবাহের দ্বারা সরক্ষিত হওয়ার সংবাদ বোঝাবে। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন, বিবাহটা করতে হবে সংরক্ষিত হয়ে, উচ্ছৃঙ্খলভাবে যৌন লালসা চরিতার্থকারী হিসেবে নয়— এই অবস্থায়।

কুরআনের ভাষায় سفاح -এর অর্থ যিনা। এ আয়াত জানিয়েছে যে, এতে উল্লিখিত احصان। সংরক্ষণ যিনার বিপরীত। আর তা হচ্ছে সতীত্ব-পবিত্রতা। احصان। শব্দের তাৎপর্য এখানে যখন

নৈতিক পবিত্রতা-পরিশুদ্ধতা, তখন আর তা ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল থেকে যায়নি। কেননা এখন বক্তব্যটা দাঁড়াল এই ঃ মুহররম মেয়েদের ছাড়া আর যারা আছে তাদেরকে তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে এভাবে যে, তোমরা তোমাদের মালের বিনিময়ে পেতে চাইবে পাক-পবিত্র চরিত্রশীলতা সহকারে, যিনার মাধ্যমে নয়। এ তাৎপর্য খুবই প্রকাশমান, আসল বক্তব্যটা এতে স্পষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে এর দুটো তাৎপর্য অনিবার্য। একটি 'হালাল' বা মুবাহ শব্দটির ব্যবহার এবং তার সাধারণতা ব্যাপকতা।

আর দ্বিতীয়টি হল এই সংবাদ দান যে, তারা যখন তা করবে, তখন তারা বিয়ের সংরক্ষণে সংরক্ষিত পবিত্র চরিত্রশীল হবে, উচ্ছৃঙ্খল যৌন লালসা চরিতার্থকারী নয়। এখান الْإِحْصَانُ ব্যাপক অর্থবোধক, তার মধ্যে কয়েকটি অর্থ হলেও তা যখন ব্যবহৃত হবে, তখন অন্যান্য বিপুল সংখ্যক অর্থসম্পন্ন শব্দের মতো সাধারণ অর্থবোধক হবে না। কেননা তা একটি নাম, বিভিন্ন অর্থের ধারক হলেও তার আসল অর্থ নিষেধ, প্রতিরোধ। এ থেকেই الحِصْنُ মানে দুর্গ। তা শত্রুকে প্রতিরোধ করে, তাকে সেখানে প্রবেশ করতে নিষেধ করে। আর এ থেকেই বানানো হয় الدِّرْعُ الحَصِيْنَةُ —প্রতিরোধক বর্ম।' আর الحِصَانُ —পুরুষ অশ্ব। কেননা তা তার উপর আরোহীকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করে। আর الحَصَانُ অর্থ চরিত্রবতী পবিত্রা নারী। কেননা সে স্বীয় যৌন অঙ্গকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে। হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে কবি হাসসান (রা) বলেছেন ঃ

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيْبَةٍ - وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُوْمِ الْغَوَافِلِ -

আল্লাহ্‌র তা'আলা বলেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ -

যারা মিথ্যা সন্দেহে অভিযুক্ত করে সংরক্ষিতা অসতর্ক মেয়েদেরকে .... অর্থাৎ পবিত্রতা সতিত্ব সম্পন্না। (সূরা নূর ঃ ২৩)

শরীয়তের পরিভাষায় الاحْصَانُ একটা নাম, বিভিন্ন অর্থে তা ব্যবহৃত হয়। আভিধানিকভাবে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তার থেকে ভিন্নতর একটি অর্থ, ইসলাম। আল্লাহ বলেছেন ঃ فَاِذَا اُحْصِنَّ -এর অর্থ ঃ যখন তারা ইসলাম কবুল করল। বিবাহ দেয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে, এর অর্থ ঃ যখন তারা বিবাহ করল। আর আল্লাহ বলেছেন ঃ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ 'যেসব মেয়েলোক বিবাহ-দুর্গের মধ্যে সংরক্ষিত।' এর অর্থ যাদের স্বামী আছে, তারা। পবিত্রতা ও নৈতিকতাও এর অর্থ। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ - (النور : ٢٣)

পবিত্র চরিত্রের মেয়েদের উপর যারা সন্দেহে মিথ্যা অভিযোগ তোলে— সহীহ্ বিয়ের পর সঙ্গম অর্থেও তা ব্যবহৃত হয়। কেননা তখন রজম থেকে তারা রক্ষা পায়।

শরীয়তের اِحْصَانُ -এর সাথে দুটি হুকুম সম্পর্কিত। একটি হল— তার উপর মিথ্যা

অভিযোগ উত্থাপনকারীর 'হদ্দ' বাধ্যতামূলক। তাতে তার পবিত্র চরিত্রশীলতা স্বাধীনতা—দাসত্বহীনতা, ইসলাম, বিবেক-বুদ্ধি ও পূর্ণ বয়স্কতা তার মধ্যে গণ্য। যা এই গুণ সম্পন্ন নয়, তার উপর মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপনকারীর 'হদ্দ' জরুরী নয়। কেননা পাগল, বালক, ব্যভিচারী, কাফির ও দাস-এর চরিত্র দোষারোপকারীর উপর 'হদ্দ' হওয়া ওয়াজিব নয়। احْصَانْ –এর এই দিকগুলি মিথ্যা দোষারোপকারীর উপর 'হদ্দ' ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে অবশ্যই গণ্য হবে।

আর একটি হুকুম হচ্ছে, তা এমন احصان। যার সাথে রজমের হুকুম জড়িত। যদি কেউ যিনা করে। বোঝা গেল, এই احْصَانْ -এ শামিল রয়েছে ইসলাম, বিবেক-বুদ্ধি, পূর্ণ বয়স্কতা, স্বাধীনতা-গোলামীহীনতা ও সহীহ্ নিকাহ্র মাধ্যমে সঙ্গম। দুজনই এই গুণে ভূষিত হবে। এর মধ্য থেকে কোন একটি জিনিসের যিনা হলেও রজম হবে না। 'সিফাহ' অর্থ যিনা। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ আমি বিবাহের পক্ষে, যিনার পক্ষে আমি নই। মুজাহিদ ও সুদ্দী غَيْرَمُسَافِحِيْنَ আল্লাহ্র এই কথাটুকুর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ 'যিনাকারী নয়।' বলা যায়, এই শব্দের আসল অর্থ ঃ পানি ঢালা। বলা হয় ঃ অমুকের অশ্রু ঢালা হয়েছে, অমুকের রক্ত প্রবাহিত হয়েছে। বলা হয় গর্বিত তার নিম্ন ভাগ প্রবাহিত হয়েছে। কেননা এটাই হচ্ছে পানি পড়ার স্থান। কেউ যিনা করলে বলা হয় سَافَحَ الرَّجُلُ কেননা সে তার বীর্যপাত ঘটিয়েছে এমন পথে, যেখানে তার বীর্যপাতে বংশ সম্পর্ক প্রমাণিত হয় না। ইদ্দত পালনও কর্তব্য হয় না। বিবাহ সংক্রান্ত যাবতীয় হুকুম কার্যকর হয় না। এজন্যে যিনাকারীকে مسافح বলা হয়। কেননা লোকটি তার এই কাজ দ্বারা পানি না ঢালা লোক হয়নি। এতে তার বীর্য দ্বারা যে বাচ্চা সৃষ্টি হল, তার সাথে তার বংশ সম্পর্ক প্রমাণিত হল না। সে বাচ্চা তার সাথে সম্পর্কিতও হল না। এর ফলে মেয়েলোকটির ইদ্দত পালন ওয়াজিব হল না। সে মেয়েটি পুরুষটির শয্যাও পেল না। মহরানা দেয়াও তার জন্যে ওয়াজিব হল না। এই সঙ্গম দ্বারা বিবাহের কোন হুকুমের সাথে সম্পর্কও হল না। এই শব্দটির তাৎপর্যে এ সব কথাই শামিল ও নিহিত রয়েছে।

## মাত্‌য়া বা মুত্‌য়া বিয়ে

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً –

অতঃপর দাম্পত্য জীবনের যে স্বাদ তোমরা তাদের দ্বারা লাভ কর তার বিনিময়ে মহরানা ফরয হিসেবে আদায় করে দাও।

আবূ বকর বলেছেন, পূর্বে মুহররম মেয়েলোক ছাড়া অন্যান্য যে কোন মেয়েলোক বিবাহ করা মুবাহ হওয়ার কথার সাথে সংযোজন করে এই আয়াতটি বলা হয়েছে ঃ اِسْتَمْتَعْتُمْ। অর্থ তোমরা যৌন স্বাদ আস্বাদন করেছ সেই বিবাহিতা স্ত্রীদের সাথে। তাই তাদেরকে তাদের প্রাপ্য পুরাপুরিভাবে দিয়ে দাও। এই কথাটি ঃ 'এবং স্ত্রীদের মহরানাসমূহ আন্তরিকভাবে দিয়ে দাও' আল্লাহ্র এই কথার মতই।

আর আল্লাহ্র কথা ঃ

فَلَا تَاخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا -

তোমরা তা থেকে কিছুই নিয়ে নিও না। (সূরা নিসা ঃ ২০)

اِسْتِمْتَاعٌ অর্থ, শান্তি সুখ স্বাদ গ্রহণ। এখানে কথাটি ইঙ্গিতমূলক, এরূপ বলে সঙ্গম বুঝিয়েছেন।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِىْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا -

তোমরা তোমাদের অংশের নিয়ামতসমূহ নিজেদের পার্থিব জীবনেই নিঃশেষ করেছ। তার স্বাদ তোমরা আস্বাদন করেছ। (সূরা আহকাফ ঃ ২০)

অর্থাৎ তোমরা সুখ ভোগের কাজটা আগেই সম্পন্ন করেছ। বলেছেন ঃ

فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ -

তোমরা তোমাদের ভাগ তো পেয়ে গেছ, ভোগ করেছ দুনিয়ায় যা কিছু তোমাদের প্রাপ্য ছিল। (তওবা ঃ ৬৯)

পরে আল্লাহ্ যখন যা হারাম করার তা হারাম ঘোষণা করলেন, বললেন ঃ

وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ -

তোমাদের প্রতি তাদেরকে হারাম করেছেন, অর্থাৎ মা'দের বিয়ে করা হারাম করে দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে অন্যান্য মুহররমদেরও উল্লেখ করা হল। তারপরে বলা হল ঃ এদের ছাড়া আর যারা তাদেরকে তোমাদের জন্যে হালাল করে দেয়া হয়েছে। এর অর্থ— মুহররমাত যাদের উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের ছাড়া অন্যান্য মেয়েদের বিবাহ করা মুবাহ। তার পরে বলেছেন ঃ তোমরা পেতে চাইবে তোমাদের ধন-মালের বিনিময়ে বিবাহ-দুর্গে সংরক্ষিত হয়ে অর্থাৎ বিবাহ করে তোমরা সংরক্ষিত হবে, পবিত্র হবে, উচ্ছৃঙ্খল যিনাকার হবে না। এরপর এর সাথে সংযোজিত হয়েছে বিবাহের হুকুম, যখন তাতে সঙ্গম অন্তর্ভুক্ত হবে। বলা হয়েছে ঃ 'তোমরা তাদের থেকে যে সুখ ভোগ করেছ তার দরুন তাদের হক— মহরানা— তাদেরকে দিয়ে দাও।'

এ আয়াতে 'মহরানা'কে 'মজুরী' বলা হয়েছে। এ আয়াতে বহুবচনে যে اُجُوْرٌ বলা হয়েছে, তার অর্থও মহরানা। মহরানাকে اجر বা 'তুল্য বিনিময়' নাম দেয়ার কারণ হল, তা সুখভোগ ও স্বাদ আস্বাদনের বিনিময়। তা বস্তুত বিনিময় নয়, বস্তুগত জিনিসেরও বদল নয়। যেমন ঘর-বাড়ি ও যানবাহনের সুবিধা সুখের বিনিময়কে, 'তুল্য বিনিময়' নাম দেয়া হয়েছে। আর 'মহরানা'র নাম 'তুল্য বিনিময়' দেয়ায় প্রমাণিত হয় যে, ইমাম আবূ হানীফার কথা সহীহ্। কোন মেয়েলোককে মজুর রাখলে ও তার সাথে যিনা করলে তার উপর 'হদ্দ' জারী হবে না। কেননা আল্লাহ মহরানার নাম দিয়েছেন মজুরী। ফলে তা এরূপ হয়েছে যে, কেউ বলল ঃ আমি

তোমাকে এতটা মহরানা দিলাম। উমর উবনুল খাত্তাব (রা) থেকে এরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা 'ফসেদ নিকাহ্' সংঘটিত হয়। কেননা বিয়ের জরুরী শর্ত সাক্ষী এখানে নেই।

আল্লাহ্ অপর আয়াতে বলেছেন ঃ

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ -

যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মহরানা দিয়ে তাদের বিবাহ কর তাহলে তোমাদের উপর কোন দোষ চাপবে না। (সূরা মুমতাহানা ঃ ১০)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন— আল্লাহ্র কথা ঃ

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ -

এর ব্যাখ্যা করেছেন স্ত্রীদেরকে 'মাত্য়া' দেয়া বলে। এ পর্যায়ে তাঁর থেকে কয়েকটি কথা বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে, তিনি এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'মাত্য়া' বিয়ে মুবাহ। এ-ও বর্ণিত হয়েছে, উবাই ইবনে কাবের এ আয়াতটির পাঠ এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

فَمَا سْتُمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ -

তোমরা তাদের থেকে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত যে সুখ-ভোগ ও স্বাধ আস্বাদন করেছ, তার মজুরী তুল্য বিনিময় তোমরা তাদেরকে দাও।

তার থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁকে যখন বলা হল, এ বিষয়ে কবিতা বলা হয়েছে, তখন তিনি বললেন ঃ মাত্য়া বিয়ে মৃত লাশ আহার করতে একান্ত বাধ্য এবং রক্ত ও শুকর মাংস ঠেকায় পড়ে যে খায় তার মতো অবস্থায় পড়া— প্রয়োজনকালে এই মাত্য়া বিয়েকে আল্লাহ হালাল করেছেন।

জাবির ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) তাঁর মাত্য়া বিয়ে সম্পর্কে তার এই মতকে তিনি প্রত্যাহার করেছেন।

আমাদের নিকট জাফর ইবনে মুহাম্মদ আল-ওয়াসেতী, জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ইয়ামান, আবু উবায়দ, ইবনে বুকাইর, লায়স, বুকাইর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল আশাজ্জ, সরীদের মুক্ত দাস আম্মার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঃ 'মাত্য়া' বিয়ে কি যিনা না যথার্থ বিয়ে ? জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ তা যিনাও নয়, বিয়েও নয়। জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে তা কি ? জবাবে তিনি বললেন ঃ 'মাত্য়া' তেমনি যেমন আল্লাহ বলেছেন। তাঁকে বললাম, এরপর কি মেয়েটিকে ইদ্দত পালন করতে হবে ? বললেন, হ্যাঁ, তার ইদ্দত হল এক হায়য। বললাম, তাতে সন্তানের মধ্যে মীরাস চালু হবে ? বললেন, না।

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ হাজ্জাজ, ইবনে জুরাইয ও উসমান ইবনে আতা, আতা আল-খুরাসীনী ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্র কথা ঃ

يَـٰأَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ -আয়াতটিকে আল্লাহ্‌র কথা ঃ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ - (الطلاق : ١)-হে নবী! তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে, তখন তাদেরকে তালাক দেবে তাদের ইদ্দতের জন্যে— মনসূখ করেছে।

এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মাত্‌য়া বিয়ে সম্পর্কিত তাঁর আগের মুবাহ্ হওয়ার মত তিনি প্রত্যাহার করেছেন, সে মত থেকে তিনি ফিরে গিয়েছেন।

আগের আলিমদের এক জামা'আত থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'মাত্‌য়া' যিনা ছাড়া আর কিছু নায়। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ, জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ইয়ামান, আবূ উবায়দ, আবদুল্লাহ ইবনে সালিহ, লায়স, আকীল, ইউনুস, ইবনে শিহাব, ইবনে আবদুল মালিক, মুগীরাতা ইবনে নওফিল, ইবনে উমর সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে উমর (রা)-কে মাত্‌য়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি জবাবে বলেছিলন ঃ ذالك السفاح —'তা নিঃসন্দেহে যিনা।'

হিশাম ইবনে উরওয়া-তার পিতা সূত্রে বর্ণিত, বলেছেন ঃ

كَانَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ بِمَنْزِلَةِ الزِّنَا -

মাত্‌য়া বিয়ে যিনার পর্যায়ে গণ্য।

যদি বলা হয়— না, মাত্‌য়া বিয়ে যিনার সমতুল্য হতে পারে না। কেননা হাদীস বর্ণনাকারীগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, 'মাত্‌য়া' বিয়ে কোন কোন সময় মুবাহ ছিল। রাসূল করীম (স) তা মুবাহ ঘোষণা করেছে। কিন্তু যিনা তো কোন সময়ই আল্লাহ মুবাহ করেন নি।

জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, যিনা কোন সময়ই মুবাহ ছিল না। কিন্তু পরে আল্লাহ্ যখন তা হারাম করেছেন, তখন তা যিনা পর্যায়ে কাজ হয়ে গেছে। তার উপর যিনা নাম প্রয়োগ খুবই যথার্থ। যেমন নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

اَلزَّانِيَةُ هِيَ الَّتِىْ تُنْكِحُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَاَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوْلاَهُ فَهُوَ عَاهِرٌ -

যিনাকারী সেই মেয়ে, যে নিজেকে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই বিয়ে দেয়। আর যে দাস-ই তার মনিবের অনুমতি ব্যতিরেকে বিয়ে করবে, সে যিনাকার— এর অর্থ, তা হারাম করা হয়েছে, প্রকৃত যিনা নয়।

নবী করীম (স) আরও বলেছেন ঃ

اَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالرِّجْلاَنِ تَزْنِيَانِ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا الرِّجْلَيْنِ الْمَشْىُ، وَيُصَدِّقُ ذٰلِكَ كُلَّهُ الْفَرْجُ اَوْ يُكَذِّبُهُ -

দুই চোখ যিনা করে, দুই পা-ও যিনা করে। চক্ষুর যিনা হচ্ছে দেখা। আর দুই পার যিনা হচ্ছে চলা। পরে যৌনাঙ্গ তাকে সত্য প্রমাণ করে কিংবা মিথ্যা করে দেয়।

এ হাদীসে এই সব কাজকেই যিনা নাম দেয়া হয়েছে। এটা পরোক্ষ ব্যবহার। কেননা তা হারাম। মাত্‌য়া বিয়েরও নাম দেয়া হয়েছে যিনা। এই নামকরণ পরোক্ষভাবে এবং হারামকরণকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে।

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ, জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ইয়ামান, আবূ উবায়দ, হাজ্জাজ, শুবা, কাতাদাতা সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। কাতাদাতা বলেছেন, আমি আবূ নজরাকে বলতে শুনেছি, ইবনে আব্বাস মাত্‌য়া বিয়ের আদেশ দিতেন। আর ইবনুয যুবায়র তা করতে নিষেধ করতেন। আমি এ কথা জাবির ইবনে আবদুল্লাহর নিকট উল্লেখ করলাম। তখন তিনি দারুল হাদীসকে হাতে নিয়ে বললেন, আমরা রাসূল (স)-এর সঙ্গে থেকে মাত্‌য়া বিয়ে করেছি। পরে হযরত উমর (রা) দাঁড়িয়ে গেলেন, বললেন ঃ আল্লাহ তো তাঁর রাসূলের জন্যে যা-ইচ্ছা হালাল করতেন। অতএব তোমরা হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর, যেমন আল্লাহ করার আদেশ করেছেন এবং এ সব মেয়েদেরকে বিয়ে করা থেকে বিরত থাক। মেয়াদী বিয়ে করা যে পুরুষকেই আমার নিকট আনা হবে, আমি অবশ্যই তাকে রজম করব। এ ভাবে হযরত উমর (রা) মাত্‌য়া বিয়ের দণ্ডস্বরূপ রজম দেয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। হতে পারে তাঁর এই কথা ভীতকরণ ও বিতাড়িতকরণের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, যেন লোকেরা এ কাজ থেকে দূরে সরে থাকে।

আবূ উবায়দ, হাজ্জাজ, ইবনে জুরাইয সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, আমাকে আতা জানিয়েছেন যে, তিনি ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছেন ঃ

رَحِمَ اللّٰهُ عُمَرَ، مَاكَانَتِ الْمَتْعَةُ اِلَّا رَحْمَةً مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى رَحِمَ اللّٰهُ بِهَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ لَا نَهْيُهُ لِمَا احْتَاجَ اِلَى الزِّنَا اِلَّا شَفًا -

আল্লাহ উমরকে রহম করুন। মাত্‌য়া বিয়ে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মতের প্রতি বিরাট রহমতস্বরূপ ছিল। যদি তা নিষিদ্ধ করা না হতো, তা হলে খুব অল্প লোক ছাড়া যিনার মুখাপেক্ষী কেউ হতো না।

ইবনে আব্বাসের এ সব কথা থেকে যেকথাটি স্পষ্ট হয়ে আসে তা হল তিনি মাতয়া বিয়েকে মুবাহ মনে করতেন— কোন কোন বর্ণনা মতে কোনরূপ প্রয়োজনের ঠেকায় এবং তা ছাড়াও।

দ্বিতীয়— তা মৃত লাশ-এর মতো। যা খাওয়া কঠিন প্রয়োজনে হালাল হয়।

তৃতীয়— তা হারাম, সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে আমরা আগেই কথা বলেছি আর সেই কথাও যে, তা পরে মনসূখ হয়ে গেছে।

হযরত ইবনে আব্বাস তাঁর মাত্‌য়া বিয়ে মুবাহ হওয়া সংক্রান্ত মত প্রত্যাহার করা প্রমাণিত হয় আবদুল্লাহ ইবনে অহব বর্ণিত বর্ণনা থেকে। তিনি বলেছেন, আমাকে আমর ইবনুল হারস,

বুকাইর ইবনুল আশাজ্জ আবূ ইসহাক (বনু হাশিমের মুক্ত গোলাম) সূত্রে জানিয়েছেন যে, এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, আমি একটি বিদেশ সফরে ছিলাম। আমার সঙ্গে আমার দাসী ছিল। আর-ও সঙ্গী সাথীও ছিল। আমি আমার দাসীকে আমার সঙ্গীদের জন্যে হালাল করে দিলাম। তারা তাকে ভোগ করতে থাকল। তখন তিনি বললেন, এ তো উচ্ছৃঙ্খল— ব্যভিচার।

এ কথাটিও প্রমাণ করে যে, তিনি তাঁর পূর্ব মত প্রত্যাহার করেছেন। তবে যারা আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاٰتُوا هُنَّ اُجُورَ هُنَّ -

এ আয়াতে উবাই ইবনে কা'বের পাঠ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى 'একটি নির্দিষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্তের জন্য' কথাটি রয়েছে। কিন্তু কোন মুসলমানের নিকট-ই তা কুরআনের পাঠ বর্তমান নেই। তাই এ আয়াতে মেয়াদী বিয়ের কোন উল্লেখ-ই নাই বলতে হবে। আর তাতে যদি 'মেয়াদ পর্যন্তকার জন্যে' কথাটি থাকেও। তবু তা মেয়েদের মাত্‌য়া বিয়ে করার কোন দলীল হতে পারে না। কেননা সে 'মেয়াদ' কথাটি মহরানার ক্ষেত্রেও হতে পারে। তখন তার পূর্ণ কথাটি এরূপ দাঁড়াবে ঃ

فَمَا دَخَلْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ بِمَهْرٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاٰتُوْ هُنَّ مَهُوْرَ هُنَّ عِنْدَ حُلُوْلِ الْاَ جَلِ -

যদি তোমরা বিয়ের সাহায্যে তাদের সাথে সঙ্গম কর একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে মহরানা দেয়ার শর্তে, তাহলে তোমরা মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই তাদের মহরানা দিয়ে দাও।

আয়াতটির ধরনেই এই দলীল রয়েছে যে, এখানে বিয়ের কথা বলা হয়েছে, মাত্‌য়া (বিয়ের) কথা নয়। এর তিনটি কারণ রয়েছে। একটি— কথাটি 'ওদের ছাড়া আর যারা তাদেরকে তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে' এই কথার সাথে সংযোজিত করেও পরে-পরেই বলা হয়েছে। আর এ হচ্ছে মুহররম মেয়েলোকদের ছাড়া অন্যান্য মেয়েলোকদের বিয়ে করা সংক্রান্ত কথা সুনিশ্চিতভাবে। এর মানে বিবাহ করার কথাই যে বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে কুরআন বিশারদদের মধ্যে কোন মতপার্থক্যই নেই। অতএব সুখ ভোগ ও স্বাদ আস্বাদন اِسْتِمْتَاعْ। বিয়ের মাধ্যমে সঙ্গম করাই বুঝিয়েছে, যার কারণে সম্পূর্ণ মহরানা পাওয়ার অধিকার জন্মেছে।

দ্বিতীয়— আল্লাহ্‌র مُحْصِنِيْنَ কথাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা احصان। নৈতিক সংরক্ষণ তো কেবলমাত্র সহীহ্‌ বিবাহের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। 'মাত্‌য়া' বিয়ের সঙ্গম কখনও مُحْصِنٌ হয় না, আর তা এই নামের আওতার মধ্যেও আসে না। তাই আমরা জানলাম যে, এখানে নিকাহ্‌র কথা-ই বলতে চাওয়া হয়েছে।

আর তৃতীয়— আল্লাহ্‌র কথা غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ এতে 'যিনাকে সিফাহ' নাম দেয়া হয়েছে। কেননা তা বিয়ে সংক্রান্ত সমস্ত নিয়ম-কানুনের পরিপন্থী। তাতে বংশধারা রক্ষিত হয় না, ইদ্দত

পালন ওয়াজিব হয় না, স্বামীর শয্যা স্থায়ীভাবে লাভ করা হয় না। বরং বিচ্ছিন্নতা নিশ্চিত হয়। 'মাত্‌য়া' বিয়েতে যখন এই সব-ই উপস্থিত, তখন তা যিনা ছাড়া আর কোন তাৎপর্য পেতে পারে না। যারা-ই 'মাত্‌য়া'কে যিনা বলেছেন, তাঁরা এই সব কিছুকে সামনে রেখেই বলেছেন। আর এই কারণেই যিনাকারীকে 'মুসাফিহ مسافح বলেছেন। কেননা এর সুযোগে মেয়েলোকটির সাথে সঙ্গম বাতিল পন্থায় বীর্যপাত ঘটানো ছাড়া আর কিছুই নয় না। এতে বংশধারাও সংরক্ষিত বা স্থাপিত হয় না। তাই আল্লাহ্ এর যদি হালাল করেও থাকেন, তবে তা সবই নিষেধ করে দিয়েছেন। আর সিফাহ্-র স্থানে احصان প্রতিস্থাপন করেছেন। অর্থাৎ যিনার পরিবর্তে নিকাহ চালু করেছেন। তাই আয়াতের استمتاع শব্দের 'মাত্‌য়া'য় যিনার তাৎপর্য থাকার কারণে এর অর্থ হবে বিবাহ। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ غَيْرَ مُسَافِحِينَ যিনাকার হিসেবে নয়। একটি শর্ত হিসেবে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ যা মুবাহ করেছেন, তার ক্ষেত্রে। আর এতেই মাত্‌য়া বিয়ের নিষেধ রয়েছে। কেননা 'মাত্‌য়া' যিনার নামান্তর হিসেবেই ব্যবহৃত। তা কোন্ দিক দিয়ে, তার ব্যাখ্যা আমরা দিয়েছি।

আবূ বকর বলেছেন, সাহাবীদের মধ্য থেকে 'মাত্‌য়া' মুবাহ মনে করার ব্যাপারে যার নাম বেশি খ্যাতি লাভ করেছে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা)। তবু তার নিকট থেকে বিভিন্ন বর্ণনা এ পর্যায়ে পাওয়া গেছে। তিনি উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাকে মুবাহ বলেছেন। অথচ আমরা ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছি যে, আয়াতে তা মুবাহ হওয়ার কোন দলীল-ই নেই বরং আয়াতের দলীলসমূহ প্রমাণ করে যে, মাত্‌য়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, সম্পূর্ণ হারাম। এর বহু কয়টি দিকেরও ব্যাখ্যা আমরা দিয়েছি। এ ছাড়া তার থেকে এই বর্ণনাও পাওয়া গেছে যে, তিনি 'মাত্‌য়া' বিয়েকে ঠেকার সময় মৃত খাওয়া, শুকর মাংস ও রক্ত— যা সম্পূর্ণ হারাম— খাওয়ার সমতুল্য মনে করেছেন। এগুলি যেহেতু মহাঠেকায় পড়া ব্যক্তির জন্যে মুবাহ, তাই 'মাত্‌য়া' বিয়েও অনুরূপ অবস্থায় মুবাহ। কিন্তু তা এক অসম্ভব কথা। কেননা الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْرَمَات প্রয়োজন হারামসমূহকে মুবাহ করে দেয়। কিন্তু 'মাত্‌য়া' বিয়েতে এই রূপ প্রয়োজন কখনই দেখা দেয় না। কেননা যে প্রয়োজন মৃত ও রক্ত ইত্যাদি হারাম জিনিস খাওয়া অপরিহার্য হয়, তা হল জীবন ধ্বংস হয়ে যাওয়ার অবস্থা। তখন তা না খেলে মানুষ মরে যেতে পারে, এই আশংকা তীব্র হয়ে দেখা দেয়। আর এ তো জানা যে, সঙ্গম না করলে মানুষ কখনই নিজের জীবন ধ্বংস হওয়ার বা তার কোন অঙ্গহানি হওয়ার বিন্দুমাত্র ভয় সৃষ্টি হয় না। আর সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের অবস্থায়ও সব নিষিদ্ধ জিনিস খাওয়া যখন মুবাহ বা হালাল হয় না, তখন যিনা করাও হালাল হতে পারে না।

যদি কেউ বলে যে, মরা ও রক্ত— ওগুলি খাওয়া হালাল হয় প্রয়োজনে— অতএব প্রয়োজনে মাত্‌য়াও হালাল হবে— তাহলে বলব— এটা নিতান্তই স্ববিরোধী ও অপ্রাসঙ্গিক কথা। এই ধরনের কথা হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে —তা কল্পনাও করা যায় না। ও দুজন বর্ণনাকারী তা বর্ণনা করতে পারেন— তা-ও অভাবিত। কেননা হযরত ইবনে আব্বাস অতি বড় ফিকাহবিদ ছিলেন। এ ধরনের কথার অন্তঃসারশূন্যতা তাঁর নিকট কখনই অস্পষ্ট থাকতে পারে না।

—৩/৪২

তাই সহীহ্ কথা হল তিনিও তা নিষিদ্ধই মেনে নিয়েছে। তাঁর মতেও মাত্‌য়া হারাম। আর পূর্বে তিনি তা মুবাহ মনে করে থাকলেও সেই মত তিনিই প্রত্যাহার করেছেন— এ বর্ণনাও তো রয়েছে।

মাত্‌য়া হারাম হওয়ার দলীল হচ্ছে আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ - اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ - فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ -

মুমিন তারা যারা তাদের লজ্জাস্থানের সংরক্ষণকারী। তবে তাদের স্ত্রীদের নিকট থেকে নয় কিংবা তাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়েছে তাদের থেকেও নয়। (যদি স্ত্রী ও দাসীদের থেকে নিজেদের যৌনাঙ্গ সংরক্ষণ না করে) তাহলে তারা তিরস্কৃত নয়। তবে এর বাইরে যারা তার সন্ধান করবে, তারা নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারী। (সূরা মুমিনুর ঃ ৫-৭)

এ আয়াতে সঙ্গম কার্যকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এই দুইটি (স্ত্রী বা দাসী)-এর মধ্যে আর এ দুটির বাইরে সঙ্গমের সুযোগ চাওয়া নিষিদ্ধ। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ এর বাইরে যারা সঙ্গমের সুযোগ তালাস করবে তারা সীমালংঘনকারী। মাত্‌য়া নিশ্চয়ই এ দুটির বাইরে। অতএব তা হারাম।

যদি বলা হয়, যে মেয়ের সুখ-সম্ভোগ ও স্বাদ-আস্বাদন করা হবে, সে স্ত্রীর কথা তুমি অস্বীকার করনি। তাহলে যে দুটির মধ্যে মুবাহ সঙ্গম সীমাবদ্ধ করা হয়েছে, মাত্‌য়া তার বাইরে পড়ে না।

জবাবে বলা যাবে, একথা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা 'স্ত্রী' নামটি সেই মেয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যে বিবাহিতা সহীহ্ আকদের মাধ্যমে। আর মাত্‌য়া যখন বিয়ে-ই নয়, তখন মেয়েটি নিশ্চয়ই 'স্ত্রী' নামে অভিহিতা হতে পারে না।

যদি বলা হয়, মাত্‌য়া বিবাহ নয়, একথার প্রমাণ কি ?

জবাবে বলা হবে, তার দলীল এই যে, বিবাহ এমন একটা নাম, যা দুটির যে কোন একটি অর্থ অবশ্যই দেবে। তা হল সঙ্গম ও আক্‌দ। ইতিপূর্বে আমরা বলে এসেছি, বিবাহ বলতে আসলে সঙ্গম বোঝায় আর পরোক্ষ অর্থে আক্‌দ। শব্দটির ব্যবহার যখন এই দুইটি অর্থের যে কোন একটিতে সীমাবদ্ধ এবং পরোক্ষ অর্থে আক্‌দ বোঝাবে যেমন পূর্বে বলেছি এবং আগের মনীষীরা যখন এই নামটি নিঃশর্ত বিবাহদানে ব্যবহার করেছেন তখন তা বিবাহ। কিন্তু তারা মাত্‌য়ার উপর 'নিকাহ' শব্দের প্রয়োগ করেন নি। কেউ যখন কোন মেয়ের সাথে শুধু সুখ-সম্ভোগ ও স্বাদ-অস্বাদনে মিলিত হয়, তখন তারা বলে না যে, অমুক ব্যক্তি অমুক মেয়েটিকে বিয়ে করেছে। এই কারণে আমাদের জন্যেও মাত্‌য়াকে নিকাহ নামে অভিহিত করা জায়েয হতে পারে না। কেননা কোন শব্দকে তার পরোক্ষ অর্থে ব্যবহার করা সঙ্গত কেবল তখন, যদি সেরূপ ব্যবহার আরবদের নিকট থেকে শুনতে পাওয়া যায়। অথবা শরীয়তে সেরূপ ব্যবহার হতে দেখা যায়। তাই মাত্‌য়া শব্দ অভিধান ও শরীয়ত— কোন একটিতেও বিবাহ

অর্থে ব্যবহৃত হতে আমরা দেখতে পাই না, তখন মাত্য়াকে আল্লাহ্ মুবাহ্ ঘোষিত কাজের বাইরের একটি কাজ মনে করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় থাকে না। আর যে লোক সে কাজ করবে তাকে সীমালঙ্ঘনকারী ও জালিম গণ্য করতে আমরা বাধ্য হই। আমরা অবশ্যই বলব, এই ব্যক্তি নিজের উপর জুলুম করছে, আল্লাহ্র হারাম করা কাজ সে (হালাল মনে করে) করছে। উপরন্তু নিকাহর বহু শর্ত রয়েছে। এই শর্তসমূহ পূরণ হওয়া বিবাহের জন্যে বিশেষ জরুরী।যখন সে শর্ত অপূরণ থাকবে, তখন তা আর নিকাহ্ বা বিবাহ গণ্য হবে না। তার একটি, সময় অতিবাহিত হওয়ার কোন প্রভাব বিবাহের উপর পড়বে না। নির্দিষ্ট সময় অতীত হয়ে গেলেই তা শেষ হয়ে যাবে না। কিন্তু 'মাত্য়া' একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে হয়, সময় শেষ হয়ে গেলে তার চুক্তিও নিঃশেষ হয়ে যায়, সম্পর্ক ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। বিবাহ স্বামীর শয্যা স্ত্রীর জন্যে নিশ্চিত করে, সন্তান জন্মিলে পুরুষটির সাথে তার বংশীয় সম্পর্ক স্থাপিত ও প্রমাণিত হয়— এ সন্তান সেই পুরুষটির হয় নিঃসন্দেহে। সে জন্যে প্রসূতিকে কোন দাবি উত্থাপন করতে হয় না। বরং পুরুষটির ঔরসে সেই স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নেয়া কোন সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকৃত হতে পারে না। কিন্তু মাত্য়ার সমর্থন করা তাতে কোন বংশীয় সম্পর্ক প্রমাণিত ও স্থাপিত হয় বলে কখনই মনে করে না। এ থেকে আমরা নিঃসেন্দেহে জানলাম যে, 'মাত্য়া' আর যা-ই হোক, বিবাহ নয় কখনই। স্বামীর স্থায়ী শয্যাও নয়। আর একটি কথা হল, বিবাহ হওয়ার পর স্ত্রীর সাথে সঙ্গম তালাকের পর ইদ্দত অনিবার্য করে। স্বামী মরে গেলেও স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হয়। তার সাথে সঙ্গম হোক আর নাই হোক। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا -

তোমাদের যারা মরে এবং স্ত্রী রেখে যায়, এই স্ত্রীরা চার মাস দশদিন নিজেদেরকে (পরবর্তী স্বামী গ্রহণ থেকে) বিরত ও অপেক্ষমান বানিয়ে রাখবে। (সূরা বাকারাহ ঃ ২৩৪)

কিন্তু 'মাত্য়া'য় স্বামী মৃত্যুর কোন ইদ্দত বাধ্যতামূলক নয়। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ -

তোমাদের স্বামী যা রেখে গেছে তার অর্ধেক তোমাদের জন্যে। (সূরা নিসা ঃ ১২)

কিন্তু 'মাত্য়া'য় মীরাস প্রাপ্তির কোন প্রশ্নই নেই। এটা 'মাত্য়া'র সমর্থকদেরই মত। এই যা বলা হল, এগুলি বিশেষভাবে বিবাহের সাথে জড়িত হুকুম-আহকাম। অবশ্য দাসত্ব ও কুফর হলে তা মীরাসের পথে প্রতিবন্ধক হয়। কিন্তু 'মাত্য়া'য় দুজনের একজনের দিক থেকেও মীরাস প্রতিবন্ধক কুফর বা দাসত্ব নেই, দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটারও কোন কারণ নেই, বংশ সম্পর্ক স্থাপিত হতেও কোন বাধা নেই— অথচ পুরুষটি এমনই যে, তার স্থায়ী শয্যা রয়েছে, বংশ সম্পর্কও তার সাথে স্থাপিত হচ্ছে। এতদসত্ত্বেও পূর্বোদ্ধৃত কোন কিছুই হয় না, তখন এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, 'মাত্য়া' বিয়ে নয়। তাই বিয়ে যখন নয়, বিয়ের আওতার সম্পূর্ণ বাইরে তা অবস্থিত, দক্ষিণ হস্তের মালিকানাও নয়। তখন এই 'মাত্য়া' আল্লাহ্র হারাম

ঘোষণার ফলে সম্পূর্ণ হারাম রূপে চিহ্নিত হবে। এই কথাই আল্লাহ বলেছেন ঃ ও দুটির বাইরে যারা (যৌন-লালসার সুযোগ) সন্ধান করবে, তারা সীমালঙ্ঘনকারী লোক।

যদি বলা হয়, মাত্‌য়ার নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে যে বিচ্ছিন্নতা, তা-ই তালাক।

জবাবে বলা হবে, তালাক তো স্পষ্ট শব্দের দ্বারা সংঘটিত হয় অথবা ইঙ্গিত দ্বারা। কিন্তু এখানে— মাত্‌য়ার— দুটির একটিও নেই। তাহলে এই বিচ্ছিন্নতা তালাক হতে পারে কিভাবে? তদুপরি 'মাত্‌য়ার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে এবং তখন তার হায়য আসতে থাকলে কোন কথাই তো বলার থাকে না। কেননা 'যারা 'মাত্‌য়া' জায়েয বলে, তারা কিন্তু হায়য অবস্থায় তালাক দেয়া জায়েয মনে করে না।' তাই 'মাত্‌য়া'র মেয়াদ শেষের বিচ্ছিন্নতা যদি তালাক হয়, তাহলে হায়য অবস্থায় সে বিচ্ছিন্নতা নিশ্চয়ই হওয়া উচিত নয়। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে যদি মেয়েলোকটির হায়য অবস্থা হয়, তবুও বিচ্ছিন্নতা অনিবার্যভাবে সংঘটিত হবে। এ কথাই প্রমাণ করে যে, এই বিচ্ছিন্নতা তালাক নয়— যা সহীহ্ নিকাহ্‌র ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তালাক দেয়া ছাড়াই যদি মেয়েলোকটি পুরুষটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং বিচ্ছিন্নতার কোন কারণ পুরুষটির দিক থেকে না ঘটানো হয়, তাহলেও প্রমাণিত হয় যে, 'মাত্‌য়া' বিয়ে নয়।

যদি বলা হয়, বংশধারা না চলা, ইদ্দত পালন না হওয়া, মীরাস না হওয়া 'মাত্‌য়া' কে বিয়ে মনে করার প্রতিবন্ধক হতে পারে না। কেননা ছোট বয়সের পুরুষের কোন বংশধারা চলে না। অথচ তার নিকাহ্ সহীহ্ হয়ে থাকে। দাস তো মীরাস পায় না, আর মুসলমানও তো কাফিরের মীরাস পায় না। এই সব না হওয়ার দরুন যদি এদের নিকাহ সহীহ্ হয়ে থাকে সহীহ্ হওয়ার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা না আসে, তা হলে 'মাত্‌য়া' কেন বিয়ে নামে অভিহিত হবে না?

জবাবে বলা যাবে, ছোট বয়সের বংশ সম্পর্ক স্থাপিত হবে যদি সে সঙ্গম হয়। স্ত্রীর স্বাদ আস্বাদন করতে সমর্থ হয়। অথচ সে মেয়েলোকটির সন্তানের বংশ সম্পর্ক সেই পুরুষটির সাথে স্বীকারকরণ— যদিও সেখানে বিয়ের মাধ্যমে সঙ্গম কার্য সম্পন্ন হলে বংশ-সম্পর্ক স্বীকৃত হয়। দাস ও কাফির দাসত্ব ও কুফর-এর কারণে মীরাস পায় না। এ দুজনের পারস্পরিক মীরাস দেওয়া-পাওয়া হয় না। কিন্তু মাত্‌য়া'র ক্ষেত্রে তো তা নেই। তাদের দুজনই তো পরস্পর থেকে মীরাস পাওয়া লোক। কিন্তু মীরাস না পাওয়ার কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও যদি পাওয়া দেওয়া না হয়, তাহলে বুঝতে হবে মাত্‌য়ায় তা হয় না বলেই তা বিয়ে নয়। কেননা তা 'নিকাহ' হলে নিশ্চয়ই মীরাস দেওয়া-পাওয়া হতো। মীরাস পাওয়ার কারণ উপস্থিত, তাদের দুজনের দিক থেকে মীরাস না পাওয়ার কোন কারণ নেই। বিশেষ করে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ 'মাতয়া বিয়েও নয়, যিনাও নয়।' এতে তিনি মাত্‌য়ার বিয়ে হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। কাজেই তা বিয়ে নয়— এটাকেই সত্য মেনে নেয়া কর্তব্য। কেননা ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট শরীয়ত ও ভাষাগত নামসমূহ নিশ্চয় অস্পষ্ট থাকতে পারে না। অথচ সাহাবীদের মধ্যে একমাত্র তিনি-ই এর পক্ষপাতী। কিন্তু তিনিও মাত্‌য়াকে বিয়ে মনে করেন নি। বরং এ নামে অভিহিত করাকেই তিনি অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। অতএব প্রমাণিত হল যে, তা বিয়ে নয়।

হাদীসের দলীলেও মাত্‌য়া নিষিদ্ধ। আবদুল বাকী— মুয়ায ইবনুল মুসান্না— কা'নবী মালিক— ইবনে শিহাব— আবদুল্লাহ আল-হাসান— মুহাম্মাদ ইবনে আলীর দুই পুত্র— তাঁদের পিতা আলী (রা) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم نَهٰى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ اَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاِنْسِيَّةِ -

রাসূল (স) মেয়েলোকের সাথে মাত্‌য়ার সম্পর্ক স্থাপন ও লোকালয়ের গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম মলিক ছাড়া অন্যরা এই পর্যায়ে বলেছেন, আলী (রা) ইবনে আব্বাসকে বলেছিলেনঃ

اِنَّكَ امْرُؤٌ تَيَّاهٌ، اِنَّمَا الْمُتْعَةُ اِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً فِىْ اَوَّلِ الْاِسْلَامِ نَهٰى عَنْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاِنْسِيَّةِ -

তুমি একজন দিশেহারা লোক। মাত্‌য়া ছিল ইসলামের প্রাথমিককালীন একটি অনুমতি মাত্র। পরে রাসূলে করীম (স) খায়বর যুদ্ধের সময়ে এবং লোকালয়ের গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন।

এই হাদীসটি জুহরী সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে, সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না ও অন্যান্যদের মধ্যে উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইকরামা ইবনে আম্মার সাঈদুল মুকবেরী আবূ হুরায়রাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) তাবুক যুদ্ধের সময় বলেছিলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى حَرَّمَ الْمُتْعَةَ بِالطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْعِدَّةِ وَالْمِيْرَاثِ -

আল্লাহ্ তা'আলা মাত্‌য়াকে হারাম করেছেন বিয়ে, তালাক, ইদ্দত ও মীরাস দ্বারা।

আবদুল ওয়াহিদ ইবনে যিয়াদ আবূ উমাইস— ইয়াস ইবনে সালামাতা ইবনুল আক্‌ওয়া তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলে করীম (স) মেয়েলোকদের সাথে মাত্‌য়া করার অনুমতি দিয়েছিলেন আওতাস যুদ্ধের বছর। পরে তা নিষিদ্ধ করেছেন।

আবদুল বাকী ইবনে কানে' ইসমাঈল ইবনুল ফযল আল-বলখী— মুহাম্মাদ ইবনে জাফর ইবনে মূসা, মুহাম্মাদ— ইবনুল হাসান, আবূ হানীফা, নাফে ইবনে উমর সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ 'রাসূল (স) খায়বরের দিন মেয়েলোকদের সাথে মাত্‌য়া সম্পর্ক স্থাপন করতে নিষেধ করেছেন। আর আমরা উচ্ছৃঙ্খল যিনাকার ছিলাম না।'

আবূ বকর বলেছেন ঃ ইবনে উমর (রা)-এর কথা ঃ 'আমরা তো উচ্ছৃঙ্খল যিনাকার ছিলাম না'-এর কয়েকটি দিক থাকতে পারে। একটি এই— তাঁদের জন্যে মাত্‌য়া যখন মুবাহ্ ছিল, তখন তাঁরা তা করে যিনাকার হয়ে যাননি। অর্থাৎ তা যদি মুবাহ করা না হতো তা হলে তাঁরা যিনাকারী হয়ে যেতেন। এই কথাটির দ্বারা সেই কথার প্রতিবাদ ও অস্বীকৃতি হয়ে গেছে, যারা বলেন যে, মাত্‌য়া প্রয়োজনে মুবাহ করা হয়েছিল, যেমন মৃত লাশ ও রক্ত খাওয়া অনুরূপ

অবস্থায় মুবাহ্ করা হয়েছিল। পরে তা করতে নিষেধ করা হয়েছে। দ্বিতীয়, নিষেধ করার পর-ও তাঁরা তা করতে কখনই প্রস্তুত হয় নি। করলে যিনাকার হয়ে যেতেন। এ-ও সম্ভব যে, মাত্য়া যখন মুবাহ্ ছিল তখন তাঁরা মাত্য়া করে যিনাকারে পরিণত হন নি। কেননা তা মুবাহ্ ছিল।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ মুসাদ্দাস আবদুল ওয়ারিস ইসমাঈল ইবনে উমায়্যাতা— জুহরী সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ বলেছেন, আমরা উমর ইবনে আবদুল আযীযের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন আমরা মেয়েলোকদের সাথে মাত্য়া সম্পর্ক স্থাপন নিয়ে পারস্পরিক আলোচনা করলাম। তখন এক ব্যক্তি তাকে বলল— তাঁর নাম রুবাই ইবনে সাবুরাতা— আমি উবাই সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বিদায় হজ্জে মাত্য়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

আবদুল আযীয ইবনে রুবাই ইবনে সাবুরাতা— তাঁর পিতা— তার দাদা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আসলে এই নিষেধ করা হয়েছিল মক্কা বিজয়ের দিন। ইসমাঈল ইবনে আয়াশ আবদুল আযীয ইবনে উমর ইবনে আবদুল আযীয রুবাই' ইবনে সাবুরাতা তাঁর পিতা সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, এটা ছিল মক্কা জয়ের দিনের ব্যাপার। আনাস ইবনে আয়াজ আল-লায়সী— আবদুল আযীয ইবনে উমর আবদুল আযীয রুবাই ইবনে সাবুরাতা তাঁর পিতা সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এ ঘটনা বিদায় হজ্জের দিনের।

কোন্ দিন মাত্য়া হারাম করা হয়েছে সে বিষয়ে মতভেদ থাকলেও তা নিষিদ্ধ ও হারাম— এ বিষয়ে হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। তাই তারীখ দিন নিয়ে বিতর্কের প্রয়োজন নেই, তার গুরুত্বও নেই। সব বর্ণনাকারীর বর্ণনায় তার হারাম হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ ঐকমত্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা জুহরী, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ সাবুরাতাল জুহানী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) মেয়েদের সাথে মাত্য়া সম্পর্ক স্থাপন করতে নিষেধ করেছেন মক্কা বিজয়ের দিন।

আবদুল বাকী ইবনে কানে' ইবনে নাহিয়াতা মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম আর-রাযী আমর ইবনে আবূ সালমাতা সাদকাতুন উবায়দুল্লাহ ইবনে আলী ইসমাঈল ইবনে উমাইয়্যাত মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির জাবির ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ যে সব মেয়েলোক যাদের সাথে আমরা মাত্য়া করতাম, আমাদের সঙ্গে রওয়ানা হল, তখন রাসূল (স) বললেন ঃ هُنَّ حَرَامٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ —ওরা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত হারাম।

যদি বলা হয় এই হাদীসসমূহ পরস্পর বিরোধী। কেননা সাবুরাতা আল-জুহানী বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (স) বিদায় হজ্জকালে মাত্য়া তাঁদের জন্যে মুবাহ করেছিলেন। অন্যান্যরা বলেছেন, মক্কা বিজয়ের দিন। আলী ও ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূল (স) তা খায়বরের দিন হারাম করেছেন। আর খায়বর বিজয় তো মক্কা বিজয়ের বেশ আগের ব্যাপার এবং বিদায় হজ্জেরও পূর্বের। তাহলে মক্কা বিজয়ের দিন বা বিদায় হজ্জের দিন সেই নিষিদ্ধ কাজ আবার কি করে মুবাহ্ করা হল, যখন তা খায়বরের দিন হারাম ঘোষিত হয়েছিল ?

এর জবাবে দুটি দিক দিয়ে কথা বলা যাবে। একটি হল, সাবুরা বর্ণিত হাদীসেই তারিখের বিভিন্নতা রয়েছে। কেউ বলেছেন, মক্কা বিজয়ের দিন, আবার কেউ বলেছেন বিদায় হজ্জের দিন। আর এই দুটি হাদীসেই এ কথা রয়েছে যে, নবী করীম (স) সে সফরে মাত্‌য়া মুবাহ ঘোষণা করেছিলেন এবং পরে তা হারাম ঘোষণা করেছেন। দেখা যাচ্ছে, বর্ণনাকারীদেরই মাত্‌য়া হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার দিন-তারিখ বর্ণনায় পার্থক্য হয়েছে। তাই দিন তারিখের ব্যাপারটা বাদ দেয়া গেল। শুধু আসল খবরটা থেকে গেল, তারিখ তার যা-ই হোক-না কেন। এমতাবস্থায় হযরত আলী ও ইবনে উমর বর্ণিত হাদীস তো তার নিষিদ্ধ হওয়ার অভিন্ন তারিখের কথা বলেছে এবং তা হচ্ছে তা হারাম করেছেন খায়বর দিবসে। আর দ্বিতীয় দিকটি হল এটা সম্ভব যে, তা প্রথমে খায়বর দিবসই হারাম হয়েছিল। পরে বিদায় হজ্জে তা মুবাহ্ করা হয়। অথবা মুবাহ্ করা হয় মক্কা বিজয়ের দিন। তারপর তা হারাম ঘোষিত হয়েছে। এতে আলী ও ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি মনসূখ হয়েছে সাবুরাতাল জুহানী বর্ণিত হাদীস দ্বারা। পরে এই মুবাহ মনসূখ হয়ে গেছে সাবুরা বর্ণিত হাদীস দ্বারা। কেননা এরূপ হওয়া কিছু মাত্র অসম্ভব নয়, নিষিদ্ধও নয়।

যদি বলা হয়— ইসমাঈল ইবনে আবূ খালিদ কায়স ইবনে আবূ হাজিম ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূল (স)-এর সঙ্গে যুদ্ধ গিয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে মেয়েলোক ছিল না। তখন আমরা বললাম— হে রাসূল আমরা কি বন্ধ্যাত্বকরণ করব না? জবাবে তিনি আমাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করলেন। বরং আমাদেরকে কাপড়ের বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট মিয়াদের জন্যে বিয়ে করার অনুমিত দিয়েছেন। পরে বলেছেন ঃ

لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبٰتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ -

আল্লাহ্ যে পবিত্র জিনিসসমূহ তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন, তোমরা তা হারাম করো না। (সূরা মায়িদা ঃ ৮৭)

জবাবে বলা যাবে এই মাত্‌য়াই তো তা, যা রাসূলে করীম (স) সমস্ত হাদীসে হারাম করেছেন। আমরা অস্বীকার করি না যে, তা কোন এক সময় মুবাহ্ করা হয়েছিল, পরে তা হারাম করা হয়েছিল। ইবনে মাসউদ বর্ণিত হাদীসেও কোন তারিখের উল্লেখ নেই। অতএব নিষেধকারী হাদীসসমূহই ফয়সালাকারী হবে। কেননা তাতে মুবাহ্ করার পর নিষিদ্ধ ঘোষণার উল্লেখ হয়েছে । আর দুটি যদি সমান হয় তবু নিষেধের হাদীসই অগ্রাধিকার পাবে— যেমন বিভিন্ন স্থানে আমরা বলে এসেছি।

নবী করীম (স) মাত্‌য়া মুবাহ ঘোষণাকালে যে আয়াত পাঠ করেছেন, তাতে বলা হয়েছে, আল্লাহ যে পবিত্র দ্রব্যাদি তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন তোমরা তা হারাম করো না। সম্ভবত, বন্ধ্যাকরণ নিষেধকরণই এর উদ্দেশ্য। সেই সাথে মুবাহ বিবাহকে হারাম মনে করাও আল্লাহ্‌র করা জিনিসকে হারামকরণ পর্যায়ে গণ্য। আর এ-ও হতে পারে যে, কোন একটা অবস্থায় মাত্‌য়া মুবাহ্ ছিল। আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তা তালাক, ইদ্দত মীরাস ব্যবস্থার দ্বারা মনসূখ করা হয়েছে।

এর আর একটি দলীল হল, একথা জানা গেছে, মাত্‌য়া কোন এক সময় মুবাহ ছিল। এই মুবাহ হওয়াটা যদি স্থায়ী ও অবশিষ্ট থাকত তাহলে সে সংক্রান্ত হাদীস সর্বজন পরিচিত ও মুতাওয়াতির হতো। কেননা সে তো সাধারণভাবে সকলের জন্যেই প্রয়োজনীয় কাজ। সকল মানুষই তা জানত যেমন প্রাথমিক অবস্থায় সকলেই জেনেছিল। সাহাবীগণের ইজমা হয়েছে তার হারাম হওয়ার উপর। তা মুবাহ থাকলে এই ইজমা নিশ্চয়ই অনুষ্ঠিত হতো না। আমরা সমস্ত সাহাবীকেই তার মুবাহ হওয়াকে অস্বীকার করতে দেখছি, তাই তার নিষিদ্ধ হওয়া নিশ্চিত। অথচ শুরুতে সকলেরই জানা ছিল তা মুবাহ। তাতে বোঝা যায়, তা মুবাহ থাকার পর নিষিদ্ধ হয়েছে। লক্ষণীয়, বিবাহ যখন মুবাহ, তখন তার মুবাহ হওয়ার ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই। তাই মাত্‌য়াও যদি সাধারণ ব্যাপার হতো, যেমন বিবাহ সাধারণ তাহলে এ পর্যায়ের হাদীস বিপুল সংখ্যায় বর্ণিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু কোন সাহাবী একান্তভাবে মাত্‌য়া মুবাহ্ হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি না ইবনে আব্বাস (রা) ছাড়া। আর ইবনে আব্বাসও তাঁর সেই মত প্রত্যাহার করেছিলেন। কেননা পরে মুতাওয়াতির বর্ণনার মাধ্যমে তাঁর নিকটও স্থির সিদ্ধান্ত হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিল যে, মাত্‌য়া হারাম। এক দিরহাম দিয়ে নগদ দুই দিরহাম নেয়া তাঁর মতে প্রথমে মুবাহ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি জানাতে পারলেন যে, নবী করীম (স) তা হারাম করে দিয়েছেন এবং এ পর্যায়ের মুতাওয়াতির হাদীস চতুর্দিক থেকে তাঁর নিকট পৌঁছল, তখন তিনি তাঁর পূর্বমত প্রত্যাহার করলেন। আর মুসলমানদের সামষ্টিক মতকেই নিজের মত হিসেবে গ্রহণ করলেন। মাত্‌য়ার ব্যাপারটিও ঠিক সেই রকমের।

হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত একটি বর্ণনার মাধ্যমেও জানা গেছে যে, 'মাত্‌য়া'র মুবাহ হওয়া মনসূখ হয়ে গেছে। তা হল, তিনি তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন ঃ রাসূলের জামানায় দুইটি 'মাত্‌য়া' চালু ছিল। কিন্তু আমি সে দুইটি নিষেধ করছি। সে দুটি কেউ করলে আমি তাকে শাস্তি দেব।' অপর একটি বর্ণনার ভাষা হল, সে কাজে কেউ অগ্রসর হলে আমি তাকে রজম করব। তাঁর এই কথাকে কোন একজন লোক-ও প্রতিবাদ বা অগ্রাহ্য করেনি। আর লোকেরা ভালোভাবেই জানতেন যে, সে দুটি রাসূল (স)-এর সময়ে মুবাহ ছিল। তাই এতে দুটির কোন একটি দিক অবশ্যই থাকবে। হয় তারা সকলেই জানতেন যে, 'মাত্‌য়া' মুবাহ ছিল। পরে তারা সকলেই তার নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে একমত হয়েছেন এবং তা সকলেই পরিহার করেছেন। অন্যথায় তারা তো রাসূল (স)-এর বিরুদ্ধপন্থী হওয়ার অপরাধে অপরাধী হয়ে পড়বে। অথচ আল্লাহ্ তাদেরকে সর্বোত্তম জনগোষ্ঠি মানুষের কল্যাণের জন্যে উদ্ভাবিত বলেছেন। বলেছেন, তারা মা'রূফ কাজের আদেশ করে ও মুনকার কাজ নিষেধ করে। তাই তাঁদের কেউ রাসূল (স)-এর বিরুদ্ধতা করেছেন, এমন কথা হতেই পারে না। তাছাড়া রাসূলের বিরুদ্ধতা তো সুস্পষ্ট কুফর। ইসলামের বাইরে চলে যাওয়া। কেননা যে জানবে যে, নবী করীম (স) 'মাত্‌য়া মুবাহ করেছেন আর তখনই কেউ বলে যে, তা হারাম ও নিষিদ্ধ অথচ তা মনসুখ-ও হয়ে যায়নি, তাহলে সে লোক মুসলিম মিল্লাত থেকে বহির্ভূত। তাই এ কাজ যখন জায়েয নয়, তখন আমরা নিঃসন্দেহে জানলাম যে, তাঁরা সকলেই জানতেন যে, 'মাত্‌য়া' শুরুতে মুবাহ থাকার পর নিষিদ্ধ হয়েছে। এ কারণে হযরত উমর (রা)-এর ঘোষণায় প্রতিবাদ

করেন নি। হযরত উমরের কথা যদি অগ্রহণযোগ্য হতো এবং তার মনসূখ হওয়া তাদের নিকট প্রমাণিত প্রতিষ্ঠিত না হতো তাহলে কোন লোকই হযরত উমরের ঘোষণার প্রতিবাদ না করে থাকতে পারতেন না। আর এটাই একটা বড় দলীল এই কথার 'মাত্য়া' মুবাহ্ নয়, তা সুস্পষ্ট হারাম। কেননা রাসূলে করীম (স) যা মুবাহ্ করেছেন, তার মুবাহ্ হওয়াটা মনসূখ না হয়ে থাকলে তাকে নিষিদ্ধ মনে করা সম্পূর্ণ নাজায়েয।

একটু চিন্তা-বিবেচনা করে দেখলেও বোঝা যাবে যে, 'মাত্য়া' হারাম। আমরা জানি— বিবাহ বস্তুগত মালিকানাধীন জিনিসের উপর কোন চুক্তি সম্পাদনের মতোই ব্যাপার। বস্তুগত জিনিসের কল্যাণের ইজারায় যে চুক্তি হয়, তার বিপরীত। বিবাহের আক্দ সাধারণ ও নিঃশর্ত ভাবেই সহীহ্ হয়। তাতে কোন মুদ্দাতের উল্লেখ থাকে না। কিন্তু ইজারা প্রভৃতি পর্যায়ের চুক্তি একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। অথবা তা হয় কোন নির্দিষ্ট কাজের চুক্তি। চুক্তির হুকুম যখন এই, তখন তা স্ত্রী-অঙ্গের সুখ-সম্ভোগের উপর হলে তা ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির মতোই হয়ে যায়। আর সেই ধরনের চুক্তি যদি কোন বস্তুগত জিনিসের উপর হয়, তাহলে তা সহীহ্ হতে পারে না। কেননা তা নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে হয়। আর মালিকানাধীন বস্তুগত জিনিসের মালিকানা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে অন্য কাউকে দেয়া সহীহ্ হয় না। তাই বিবাহও যদি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে হয়, তাহলে স্ত্রী-অঙ্গ মুবাহ্ হওয়া জায়েয হবে না। যেমন ক্রয়-বিক্রয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে মালিকানা হস্তান্তর করা হলে তাও সহীহ্ হবে না। হেবা ও সদকার কাজও তেমনি। এসব চুক্তি দ্বারা কোন জিনিসের মালিকত্ব পাওয়া যায় না। স্ত্রী-অঙ্গের সুখ-সম্ভোগও তেমনি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে হয় না।

'মাত্য়া' মুবাহ্ হওয়ার পক্ষের লোকেরা একটা যুক্তি এই পেশ করে যে, তা কোন এক সময় মুবাহ্ ছিল এবং তাতে সকলেরই ঐকমত্য অর্জিত ছিল। পরে তা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন মতের উদ্ভব হয়েছে। তাই যেখানে সকলের ঐকমত্য ছিল, আমরা শুধু সেটাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। যে বিষয়ে বিভিন্ন মত, সে বিষয়ে আমাদের কোন বক্তব্য নেই।

এ কথার জবাবে বলা যায়, যেসব হাদীস দ্বারা 'মাত্য়া' মুবাহ্ প্রমাণিত, সেসব হাদীস থেকেই প্রমাণিত যে, তা নিষিদ্ধ।

যেসব হাদীসে মাত্য়ার মুবাহ্ হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে, সে সব হাদীসেই উল্লেখ আছে তার নিষিদ্ধ হওয়ার কথা। তাই যেদিক দিয়েই তা মুবাহ্ প্রমাণিত হয়, সে দিক দিয়েই প্রমাণিত হয় তা নিষিদ্ধ হওয়ার কথা। আর তার নিষিদ্ধ হওয়া যদি প্রমাণিত না হয়, তাহলে তার মুবাহ্ হওয়াও প্রমাণিত নয়। আর আমরা একটা মতের উপর একমত হয়েছিলাম, পরে তাতে মত-পার্থক্যে লিপ্ত হয়েছি, মতপার্থক্যে আমরা ইজ্মা ত্যাগ করিনি— এই রূপ কথা একটি নেহায়েত বাজে কথা। কেননা যে ক্ষেত্রে মতপার্থক্য, সে ক্ষেত্রে তো ঐকমত্য নেই। আর যদি ঐকমত্যই না হল, তা হলে এমন একটা দলীল হওয়া আবশ্যক, যা তাদের দাবির সত্যতা প্রমাণ করবে। তা ছাড়া কোন জিনিসের এক সময়ে মুবাহ্ থাকা প্রমাণ করে না যে, তা চিরদিনই মুবাহ্ থাকবে। কেননা মনসূখ হওয়ার একটা নিয়ম তো কার্যকর আছে। আর ইতিপূর্বে আমরা কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ও আগের ফিকাহ্‌বিদদের ইজমার ভিত্তিতে প্রমাণ করেছি যে, একটা জিনিস মুবাহ্ থাকার পর তা নিষিদ্ধ হয়েছে।

আবূ বকর বলেছেন, মাত্‌য়া পর্যায়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। যে-লোক নসীহত কবুল করতে প্রস্তুত, তার জন্যে এতে চূড়ান্ত মাত্রার মাল-মসলা রয়েছে। প্রথম দিকের সমাজে তা নিয়ে কোন মত-পার্থক্য দেখা দেয়নি— যেমন পূর্বে আমরা সবিস্তারে বলেছি। সেই সাথে স্মরণীয়, সমস্ত দেশের ফিকাহবিদগণ মাত্‌য়া হারাম হওয়া বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে একবিন্দু মত-পার্থক্য নেই।

যে লোক নির্দিষ্ট দিনের জন্যে কোন মেয়েলোক বিবাহ করল, সে বিষয়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, মালিক ইবনে আনাস, সওরী আওজায়ী ও শাফেয়ী বলেছেন, কেউ যদি কোন মেয়েকে দশ দিনের জন্যে বিয়ে করে তবে সে বিয়ে সম্পূর্ণ বাতিল। তাদের দুজনের মধ্যে কার্যত কোন বিয়েই হয়নি। জুফার বলেছেন, নিকাহ তো জায়েয, কিন্তু তাতে (সময়ের) যে শর্ত করা হয়েছে, তা বাতিল। আওজায়ী বলেছেন, যদি কেউ কোন মেয়ে বিয়ে করে আর তা নিয়ম থাকে যে, সে তাকে তালাক দেবে, তাহলে তাতে কোন শর্তই গ্রহণযোগ্য হবে না। এ বিয়ে নয়, মাত্‌য়া, এতে কোন কল্যাণ নেই।

আবূ বকর বলেছেন, তাদের ও জুফর-এর মধ্যে আসলে কোন মত-পার্থক্য নেই এ ক্ষেত্রে যে, 'মাত্‌য়া' শব্দ দ্বারা নিকাহ সহীহ্ হয় না। কেউ যদি বলে আমি তোমাকে দশ দিন মাত্‌য়া দেব, তাহলে সেটা কোন বিয়ে হবে না। 'নিকাহ্' শব্দ দ্বারা এই আকদ করা হলে তাতেই মত-পার্থক্য। যদি বলে ঃ আমি তোমাকে দশ দিনের জন্যে বিয়ে করছি, তাহলে জুফার-এর মতে তা সহীহ্ নিকাহ হবে। তবে দশ দিনের শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। কেননা বাজে শর্ত আরোপ করা হলে তার দ্বারা নিকাহ নষ্ট হতে পারে না। যেমন, যদি কেউ বলে ঃ আমি তোমাকে বিয়ে করছি এই শর্তে যে, আমি তোমাকে দশ দিন পর তালাক দেব, তাহলে বিয়েটা জায়েয হবে, শর্তটা বাতিল হয়ে যাবে, জুফর ও অন্যদের মধ্যে মতের পার্থক্যটা হচ্ছে— এটা নিকাহ্ না মাত্‌য়া— এই নিয়ে। জমহুর ফিকাহ্‌বিদরা বলেছেন, এটা মাত্‌য়া, নিকাহ নয়। এ কথাটি যে সহীহ্ তার প্রমাণ এই যে, নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে যে বিবাহ তাকেই মাত্‌য়া বলে। তাতে 'মাত্‌য়া' শব্দ ব্যবহৃত না হলেও তা মাত্‌য়া হবে।

আবদুল বাকী ইবনে কানে' ইসহাক ইবনুল হাসান ইবনুল মায়মূন, আবূ নয়ীম, আবদুল আযীয ইবনে উমর ইবনে আবদুল আযীয, রুবাই ইবনে সাবুরাতাল জুহানী, তাঁর পিতা সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ সাবুরাতা বলেছেন, তাঁরা রাসূল (স)-এর সঙ্গে বিদায় হজ্জের সফরে রওয়ানা হয়েছেন। সকলে তাঁরা আসফান-এ অবস্থান নিয়েছেন। এখানে যাদের সঙ্গে কুরবানীর জন্তু ছিল না, তাদেরকে তওয়াফ করে হালাল হওয়ার জন্যে রাসূল (স) যে আদেশ করেছিলেন, সেই কাহিনী বললেন। বললেন, আমরা যখন হালাল হলাম তখন নবী করীম (স) বললেন, তোমরা এসব মেয়ের সাথে মাত্‌য়া করে স্বাদ সম্ভোগ কর। আমাদের নিকট একথার অর্থ ছিল, বিয়ে করা। আমরা সে কথা মেয়েদেরকে বললে তারা অস্বীকৃতি জানাল। তবে তাদের ও আমাদের মাঝে একটা সময় নির্ধারণের শর্ত আরোপ করে। আমরা একথা রাসূল (স)-কে জানালাম। তখন তিনি বললেন— তোমরা তাই কর। তখন আমি ও আমার চাচার পুত্র (চাচাতো ভাই) বের হলাম। আমি তার চাইতে বেশি যুবক ছিলাম। আমার নিকট একটি চাদর ছিল, তার নিকট-ও একটি চাদর ছিল। আমরা একটি মেয়েলোকের নিকট

উপস্থিত হলাম। সে আমার চাচাতো ভাইয়ের চাদর পছন্দ করল এবং পছন্দ করল আমার যৌবন। মেয়েটি বলল, চাদর দুটি প্রায় সমান। তবে এ অধিক যুবক। পরে তার সাথে আমার দশ দিনের মাত্‌য়া সাব্যস্ত হয়। আমি তার নিকট একটি রাত যাপন করলাম। পরের দিন সকাল বেলা আমি মসজিদে হারামে চলে গেলাম। রাসূল (স) তখন রুক্‌ন ইয়ামনী ও মাকামে ইব্‌রাহীমের মাঝে অবস্থান করছিলেন এবং বলছিলেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ كُنْتُ اَذِنْتَ لَكُمْ فِىْ الْاِسْتِمْتَاعِ مِنْ هٰذِهِ النِّسَاءِ، اَلَا وَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ ذٰلِكَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ، فَمَنْ بَقِىَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَىْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيْلَهَا وَلَا تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا -

হে জনগণ, আমি তোমাদেরকে এ সব মেয়েদের সাথে মাত্‌য়ার সম্পর্ক স্থাপন করে যৌন সুখ সম্ভোগের অনুমতি দিয়েছিলাম। কিন্তু এক্ষণে জানবে, আল্লাহ্ এ কাজকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত হারাম করে দিয়েছেন। তাই এখনও যার নিকট এ ধরনের কোন মেয়ে রয়েছে, সে যেন তার পথকে হালাল করে নেয় এবং তাদেরকে যে যা দিয়েছে, তার থেকে তার কিছুই ফিরিয়ে নেবে না।

হযরত সাবুরাতা (রা) এই হাদীস থেকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মাত্‌য়া বা স্ত্রী সুখ-সম্ভোগ বলতে মূলত বিবাহই বুঝেছিলেন। নবী করীম (স) লোকদেরকে এ বিবাহের মেয়াদ নির্দিষ্ট করার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তা করতে নিষেধ করেছেন মুবাহ থাকার পর। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, একটি মেয়াদ পর্যন্তকার জন্যে বিবাহ মূলত মাত্‌য়া। একটি হাদীস-ও তার প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ্য। ইসমাঈল ইবনে আবূ খালিদ কায়স ইবনে আবূ হাজিম আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ

আমরা একটি যুদ্ধে রাসূল (স)-এর সঙ্গে ছিলাম, আমাদের সঙ্গে মেয়েলোক ছিল না। আমরা বললাম, হে রাসূল আমরা কি নিজেদেরকে 'খাসী' বানাব ? তিনি আমাদেরকে তা করতে নিষেধ করলেন এবং রুখসত দিলেন একটি মেয়াদ পর্যন্তকার জন্যে বস্ত্রের বিনিময়ে বিয়ে করার। শেষে রাসূল (স) আয়াত পাঠ করেন ঃ তোমরা হারাম করো না সে সব পবিত্র জিনিস, যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন।

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) জানিয়ে দিয়েছেন যে, 'মাত্‌য়া' ছিল মেয়াদী বিবাহ। হযরত জাবির কর্তৃক উমর উবনুল খাত্তাব থেকে বর্ণিত হাদীসও তাই প্রমাণ করে। হাদীসটি আমরা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করেছি মাত্‌য়া সম্পর্কিত আলোচনায়। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাঁর রাসূলের জন্যে যা তিনি চান হালাল করেন। তোমরা হজ্জ ও উমরা সম্পূর্ণ কর যেমন আল্লাহ্ আদেশ করেছেন। আর এ সব মেয়েলোক বিয়ে করা থেকে দূরে থাক। যে ব্যক্তি মেয়াদী বিয়ে করেছে, তাকে আমার নিকট নিয়ে আসা হলে আমি তাকে 'রজম' করব। হযরত উমর (রা) জানিয়ে দিলেন যে, নির্দিষ্ট মেয়াদের বিয়ে মাত্‌য়া, কোন বিয়ে যদি সে রকমের হয়। অথচ নবী করীম (স) তা করতে নিষেধ করেছেন। তা মাত্‌য়া নামে অভিহিত হবে। এতে মেয়াদী বিয়েও শামিল এই নাম তার উপরও ব্যবহৃত হতে পারে বলে। কেননা মাত্‌য়া তো অল্প সময়ের

সুখ-সম্ভোগের ব্যাপার। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ —'এই দুনিয়ার জীবন তো ভোগ উপকরণ মাত্র' অর্থাৎ খুবই সামান্য সুখ ভোগের ব্যাপার। অবশ্য তালাক দেয়ার পর স্ত্রীকে দেয় দ্রব্যাদিকেও মাত্‌য়া বলা হয়। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে ঃ فَمَتِّعُوْهُنَّ —'তালাক দেয়া স্ত্রীদের জীবনোপকরণ দাও।' অন্য আয়াতে বলেছেন ঃ

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ -

তালাকপ্রাপ্তাদের জন্যে প্রচলিত নিয়মে জীবনোপকরণ দিতে হবে। (সূরা বাকারাহ ঃ ২৪১)

কেননা তা কম-সে-কম পরিমাণের মহরানা। এ থেকে জানতে পারলাম— যার উপরই মাত্‌য়া শব্দের প্রয়োগ হয়, কিংবা তা হয় জীবনোপকরণ তার লক্ষ্যই হল সামান্য পরিমাণ। বিয়ের আক্‌দ যা দাবি করে, তার তুলনায় এটার পরিমাণ খুবই সামান্য। তাই তালাকের পর যা দেয়া হয়— যা শুধু আক্‌দের কারণে ওয়াজিব হয় না— তা সামান্য জীবনোপকরণ। বিয়ের আকদের কারণে যে মহরানা প্রাপ্য হয়, তার তুলনায়ও মাত্‌য়া খুবই সামান্য। আর নির্দিষ্ট সময়ের বিয়েকেও মাত্‌য়া (বা মাত্‌য়া) বলা হয় এজন্যে যে, তার মেয়াদ খুবই কম। তার সুযোগে সুখ-সম্ভোগের পরিমাণ ও বিয়ের আকদ হলে তার স্থিতিশীলতার তুলনায় খুবই সামান্য। কেননা তা হয় মৃত্যু পর্যন্তকার জন্যে। অথবা বিচ্ছেদ ঘটার কোন কারণ সৃষ্টি হওয়ার সময় পর্যন্তকার জন্যে। তাই 'মাত্‌য়া' শব্দের ব্যবহার নিয়ে কোন মতপার্থক্য হওয়া কাম্য নয়। সম্পর্কটা মাত্‌য়া শব্দ দ্বারা হোক, কি নিকাহ শব্দ দ্বারা, যদি তা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে হয়, তাহলে তা হারাম হবে। কেননা তার উপর 'মাত্‌য়া' বা 'মুতয়া' নামের প্রয়োগ হতে পারে সেই দিক দিয়ে, যা আমরা বলেছি।

উপরন্তু দশ দিনের জন্যে বিবাহের আক্‌দকারী বিবাহটিকে মেয়াদী বানাবে কোন-না-কোন শর্তের ভিত্তিতে অথবা শর্ত বাতিল করে দেবে এবং তাকে চিরস্থায়ী বানাবে। যদি তাকে নির্দিষ্ট সময়ের বানায়, তাহলে 'মাত্‌য়া' হবে। তাতে কোন দ্বিমতের অস্তিত্ব নেই। আর যদি তাকে চিরস্থায়ী বানায়, তাহলে তা সহীহ্‌ হবে না। এ কারণে যে, পরে যে সময় বাড়ানো হয়েছে, স্থায়ী করা হয়েছে, মূল আক্‌দটা সেই ভিত্তিতে হয়নি। তাই মেয়েলোকটির যৌনাঙ্গ মুবাহ মনে করা চিরস্থায়ীভাবে জায়েয হবে না। কেননা এটা আক্‌দ ছাড়াই হচ্ছে। যেমন কেউ যদি এক স্তুপ খাদ্যশস্য ক্রয় করে এই বলে যে, তা দশ কে. জি. অথবা বলল— আমি তোমার স্তুপ থেকে দশ কে. জি'র কিনলাম, বিক্রেতা তা-ই বিক্রয় করতে রাযী হয় তাহলে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিটা দশ কে. জি'র উপরই হল। অন্য কোন পরিমাণের উপর নয়। অনুরূপভাবে নিকাহ্‌টা যদি হয় দশ দিনের জন্যে সেই দশ দিন পরও সে নিকাহ স্থায়ী হলে বাড়তি দিনগুলো তো এমন যে, তার উপর কোন আক্‌দই হয়নি। তাই এই সময়ের জন্যে স্ত্রীলোকটির যৌনাঙ্গ তার জন্যে মুবাহ হবে না। মূলত নিকাহ্‌কে সময়ভিত্তিক বানানোই জায়েয নয়। বানালে তা সুস্পষ্ট 'মাতয়া' হবে এবং তার ফলে মূল আক্‌দটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। এই ব্যাপারটা এ রকমের নয় যে, যদি বলে ঃ আমি তোমাকে বিবাহ করছি এই শর্তে যে, দশ দিন পর তোমাকে তালাক দেব। কেননা এ ধরনের বিয়ে জায়েয হবে আর দশ দিন পর তালাক দেয়ার শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। কেননা সে বিবাহের আক্‌দটা করেছে চিরদিনের জন্যে। আর তাতে তালাক দিয়ে তা

বিচ্ছিন্ন করার শর্ত করেছে। যেমন যদি দশ দিন পর তালাক না দেয়, তাহলে বিয়ে টিকে যাবে। এ থেকে জানতে পারলাম সে বিয়েটা স্থায়িত্বের নিয়মেই হয়েছে— তবে তালাক দ্বারা তা ছিন্ন করার শর্ত করেছে। এই শর্ত অ-সহীহ্। এ ধরনের শর্ত বিবাহকে নষ্ট করে না। অতএব শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। আক্দ সহীহ্ ও জায়েয হবে। দশ দিনের জন্যে বিয়ে করলে তা সে রকমের হবে না। কেননা দশ দিনের পরও তা টিকিয়ে রাখা হলে এই দিনগুলোর জন্যে কোন আক্দ নেই। যেমন কেউ যদি দশ দিনের জন্যে ঘর ভাড়া করে তাহলে চুক্তিটা সেই দশ দিনেরই হবে। তারপরও থাকলে তার জন্যে কোন চুক্তি নেই বলে সে অনধিকার চর্চাকারী হয়ে যাবে। বে-আইনীভাবে দখলকার বলে অভিহিত হবে। কোনরূপ চুক্তি না করেই অবস্থানকারী বলে পরিচিত হবে। সেজন্য সে ভাড়াও দেবে না চুক্তি নেই বলে। যদি বলে— আমি তোমাকে এই ঘর ভাড়া দিলাম এই শর্তে যে, দশ দিন পর এই চুক্তি আমি ভেঙ্গে দেব, তাহলে সে চুক্তিটা সহীহ্ হবে না। অবশ্য ভাড়াটের সেখানে স্থায়ীভাবে থাকার অধিকার হবে দশ দিন এবং তারপরও। তবে পরবর্তী সময়ের জন্যে তাকে সমপরিমাণের ভাড়া দিতে হবে। বিয়েও তেমনি। যদি তা দশ দিনের জন্যে হয়, তাহলে দশ দিনের পরের জন্যে কোন আক্দ নেই বলে সেও অনধিকার চর্চাকারী হবে।

যদি বলা হয়, কথাটি যদি এরূপ বলে যে, আমি তোমাকে বিয়ে করলাম এই শর্তে যে, দশ দিন পর তুমি তালাক হয়ে যাবে, তাহলে তা নির্দিষ্ট সময়ের বিয়ে হবে। কেননা দশ দিন পর সে বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে।

জবাবে বলা যাবে, এটা নির্দিষ্ট সময়ের বিয়ে নয়। বরং চিরস্থায়ী বিয়ে। তা কেটে দেবে তালাক। আক্দের সঙ্গেই তালাকের উল্লেখ করা হোক, তার মেয়াদ গত হওয়ায় সে তালাক ঘটানো হোক— এর মধ্যে কোন পার্থক্য হয় না। কেননা বিয়েটা শুরুতেই স্থায়ী বিয়ে হয়েছে, তালাকটাকে ভবিষ্যতের জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তাই তা আক্দকে সময়ের মধ্যে সীমিত করা হয়নি।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَـاٰتُـوْهُنَّ اُجُـوْرَهُـنَّ فَـرِيْـضَـةً -

অতঃপর তোমরা তাদের মহরানা ফরয হিসেবেই দিয়ে দাও।

এ আয়াতে মহরানা দেয়ার আদেশ করা হয়েছে। সেইজন্যে মহরানাকে মজুরী বলা হয়েছে। কেননা তা স্ত্রীর যৌনাঙ্গের সুখ-ভোগের বিনিময়। আর তা-ই মহর বলে প্রমাণিত। এই কথা বলা হয়েছে তাদেরকে, যারা বিয়ে করে নৈতিক সংরক্ষণে নিজেদেরকে আটক করেছে, যা কথা বলা হয়েছে এভাবে ঃ 'মুহররম' মেয়েদের ছাড়া বাইরের সব মেয়েই তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে এভাবে যে, 'তোমরা তাদেরকে তোমাদের ধন-মালের বিনিময়ে পেতে চাইবে বিয়ের সংরক্ষণে সংরক্ষিত অবস্থায়, উচ্ছৃঙ্খল যিনাকার হয়ে নয়।'

অথবা যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'অতএব তোমরা তাদেরকে তাদের পরিবারের অনুমতিক্রমে বিয়ে কর এবং তাদেরকে প্রচলিত নিয়মে তাদের মহরানা দিয়ে দাও, তখন তারা বিয়ের দুর্গে সংরক্ষিত, উচ্ছৃঙ্খল যিনাকার নয়।'

এসব কথায় সংরক্ষণশীলতা-নৈতিক পবিত্রতার উল্লেখ হয়েছে নিকাহ্র উল্লেখের পর-পরই এবং মহরানাকে 'কেরায়া' বা 'মজুরী' বলা হয়েছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ فَرِيضَةً সে মহরানা দেয়ার বাধ্যবাধকতার তাগিদ স্বরূপ বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে অমূলক ধারণা-কল্পনা বা ব্যাখ্যার বিভ্রান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে। কেননা ফরয তো তাকেই বলে যা কর্তব্যের দিক দিয়ে উচ্চতর গুরুত্বপূর্ণ।

## মহরানায় বৃদ্ধি

আল্লাহ তা'আলা মহরানার উল্লেখ করার পর বলেছেন ঃ

وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ -

মহরানা ধার্য ও নির্দিষ্ট করার পর তোমরা পরস্পর রাজি হয়ে যদি কিছু কর, তাহলে তোমাদের কোন দোষ হবে না।

মহরানার প্রস্তাব হওয়ার পর পারস্পরিক সন্তুষ্টি সহকারে কোন পরিমাণে সমঝোতা হলে কোন দোষ না হওয়ার কথা আল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন।

এ আয়াতে فَرِيضَةً অর্থ— নির্ধারণ, পরিমাণ ঠিক করা, যেমন মীরাসের ফরায়েয, যাকাতের অংশ ইত্যাদি। পূর্বে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করে এসেছি। আল-হাসান থেকে এ আয়াতটি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, মহরানার কোন অংশ যদি হ্রাস করতে পরস্পর রাযি হও বা তার বিলম্বিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর বা সবটাই হেবা করার ফয়সালা কর, তাহলে তাতে গুনাহ্ হবে না।

এ আয়াতটি মহরানার পরিমাণ বৃদ্ধি করা জায়েয হওয়ার-ও একটা দলীল। আল্লাহ্র কথাঃ পরিমাণ নির্ধারণের পর পারস্পরিক রাযি হয়ে যে সিদ্ধান্তে তোমরা পৌঁছবে, তা সহীহ্ হবে। তা বৃদ্ধি করা হোক, কি হ্রাস করা হোক— করতে কোন দোষ নেই। বিলম্বে দেয়ার সিদ্ধান্তও হতে পারে, সম্পূর্ণ মাফ করে দেয়াও সিদ্ধান্ত হতে পারে। তবে এ আয়াতে প্রধানত বৃদ্ধি করা কথাটা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা তা সম্পর্কিত হয়েছে উভয় পক্ষের রাযি হওয়ার সাথে। সম্পূর্ণ ক্ষমা করা, হ্রাস করা, বিলম্বিত করার ক্ষেত্রে পুরুষটির রাযি হওয়া গুরুত্বপূর্ণ নয়, শুধু স্ত্রীই তা করতে পারে একান্ত নিজের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে। কিন্তু পরিমাণ বৃদ্ধি উভয়ের কবুল ছাড়া সহীহ্ হবে না। এই ব্যাপারটি যখন উভয় পক্ষের রাযি হওয়ার সাথে যুক্ত করা হয়েছে, তাতে প্রমাণিত হয় যে, এখানে বৃদ্ধির ব্যাপারটিই তোলা হয়েছে। কেবল মাফ করে দেওয়া, হ্রাস করা বা বিলম্বিত করার ব্যাপারই নয় বিশেষভাবে। কেননা ব্যবহৃত শব্দ সাধারণ ও ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক। তাই সবকিছুই এর আওতায় আসবে। যদি নির্দিষ্টভাবে কোন একটি বোঝাতে হয়, তাহলে সে জন্যে আলাদা দলীলের প্রয়োজন হবে। তাছাড়া শুধু উল্লিখিত কয়টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দিলে

উভয় পক্ষের রাযি হওয়ার কথাটা বলার কোন ফায়দাই থাকে না, কাজটি উভয় পক্ষের সাথে সংশ্লিষ্ট করার অর্থই হচ্ছে— তারা উভয়ে রাযি হয়ে পরিমাণে বৃদ্ধিও করতে পারবে। ব্যবহৃত শব্দের এই দাবি অগ্রাহ্য করা জায়েয হবে না। আর সম্ভাব্যতা কোন একটির মধ্যে সীমিত করলেও সে শব্দের থাকা না থাকা উভয়ই সমান হয়ে যায়।

মহরানার নির্দিষ্ট পরিমাণের উপর বৃদ্ধিকরণ পর্যায়ে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ বলেছেন— বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর নির্দিষ্ট পরিমাণের মহরানায় বৃদ্ধি করা জায়েয। তা কার্যকর হবে যদি স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম হয় কিংবা স্বামী মরে যায়। আর সঙ্গমের আগেই তালাক দিলে বৃদ্ধিটা বাতিল হয়ে যাবে। তখন স্ত্রী পাবে আক্‌দের সময়ে নির্দিষ্ট করা পরিমাণের অর্ধেক। জফর ইবনুল হুযাইল ও শাফেয়ী বলেছেন, বৃদ্ধিটা হচ্ছে ভবিষ্যতের জন্যে হেবা। যদি স্ত্রী তা নিজ হাতে নিয়ে নেয়, তাহলে এ দু'জনের মতে তা জায়েয হবে। আর নিজ হাতে যদি না পেয়ে থাকে, তাহলে তা বাতিল হয়ে যাবে। মালিক ইবন আনাস বলেছেন, বৃদ্ধি করা সহীহ হবে। সঙ্গমের পূর্বেই তালাক দিলে বৃদ্ধির পরিমাণের অর্ধেক ফিরিয়ে নেবে। তা হবে হেবা করা মালের মতো, স্বামী তা নিয়ে দাঁড়াবে। আর স্ত্রীর তা নিজ হাতে নেওয়ার আগেই স্বামী মরে গেলে স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে এই বৃদ্ধির কিছুই পাবে না। কেননা তা ছিল একটা দান, যা নিজ হাতে নেয়নি।

আবূ বকর বলেছেন, উপরোল্লিখিত আয়াত যে বৃদ্ধি করা জায়েয বলে তার কারণ উপরে বলে এসেছি। বৃদ্ধি জায়েয হওয়ার আর একটি প্রমাণ হল, বিয়ের আক্‌দ স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই মালিকানায় অবস্থিত। তার প্রমাণ এই যে, স্ত্রীর যৌনাঙ্গের উপর স্বামী 'খুলা' তালাক দিতে পারে। তখন সে তার নিকট থেকে বিনিময় নেবে। বোঝা গেল— স্ত্রীর যৌনাঙ্গের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার উভয়েরই মালিকানাভুক্ত। আর আক্‌দ যখন উভয়েরই মালিকানাভুক্ত, তখন মহরানার পরিমাণ বৃদ্ধি করা জায়েয হবে, যেমন বিবাহের আক্‌দের শুরুতে তা জায়েয ছিল। জায়েয ছিল এ হিসেবে যে, উভয়ই আক্‌দের মালিক ছিল। কেননা মালিকানার অর্থ ব্যবহার ও দেয়া-না দেয়ার কর্তৃত্ব করা। আর উভয়েরই এই অধিকার সম্পূর্ণ বিধিসম্মত। তার আর একটি প্রমাণ, এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, যে যখন তা হস্তগত করবে তা জায়েয হবে, এই হস্তগত করার পর হয় তা হেবা হবে ভবিষ্যতের জন্যে— জুফর ও শাফেয়ী যেমন বলেছেন। কিংবা তা মহরানার পরিমাণ বৃদ্ধি হবে, তার নিজের হক্ নেই আক্‌দের উপর, যেমন পূর্বে আমরা বলে এসেছি। ভবিষ্যতের হেবা হওয়া তার জায়েয নয়। কেননা তাকে হেবা মনে করার উভয় চুক্তিতে দাখিল হয়নি। শুধু বাধ্যতামূলক করে নিয়েছে এই কথার ভিত্তিতে যে, তা যৌনাঙ্গের বিনিময়, যা আক্‌দের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর তারা দুজন নিজেদের উপর যে চুক্তি চাপিয়ে নেয়নি, আমরা আক্‌দ হিসেবে তাদের জন্যে তা বাধ্যতামূলক করে দেব, আমাদের জন্যে তা জায়েয হবে না। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ —'তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর।

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ -

মুসলমানরা তাদের নিজেদের করা শর্ত পূরণে বাধ্য।

অতএব তারা দুজন— স্বামী-স্ত্রী— নিজেদের উপর যদি কোন চুক্তি চাপিয়ে লয়, তাহলে আয়াতটি বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে অপর কারোর চুক্তি তাদের জন্যে বাধ্যতামূলক করে দেয়া আমাদের জন্যে জায়েয হতে পারে না। হাদীস-ও তা-ই প্রমাণ করে। কেননা আয়াতের দাবি হচ্ছে মূল চুক্তি পূর্ণ করা, যে চুক্তি সে করেছে, অন্য চুক্তি পূরণ তার দায়িত্ব নয়। কেননা অন্য কোন চুক্তি পূরণ তার জন্যে বাধ্যতামূলক করা হলে যে চুক্তি সে করেছে তা অপূরণ থেকে যাবে। নবী করীম (স) মুসলমানদের করা শর্তসমূহ সম্পর্কে যা বলেছেন, তাতেও শর্ত পূরণ অনিবার্য। শর্ত প্রত্যাহার এবং দুজনকে তার জন্যে বাধ্য করার কোন অর্থ নেই শর্ত পূরণের বাধ্য করা ছাড়া। তাহলে আয়াত ও হাদীস এক সাথেই প্রমাণ করে বিপরীত মতের বাতুলতা। তার দুটি কারণ। একটি শর্ত ও চুক্তি সাধারণ ভাবেই চুক্তি ও শর্ত পূরণে বাধ্যতামূলক করে। আর দ্বিতীয়, আকদ বা চুক্তি কিংবা শর্ত যা নিজেরা করেনি, তা পূরণ বাধ্যতামূলক নিষিদ্ধ। হস্তগত করার পর হেবা দুজনার জন্যে বাধ্যতামূলক করা যখন বাতিল হয়ে গেল, মালিক বানিয়ে দেয়া সহীহ্ হল তখন প্রমাণিত হল যে, স্ত্রী তার মালিক হয়েছে বৃদ্ধির দিক দিয়ে।

একথা প্রমাণিত হয় যে, বৃদ্ধিটাকে 'হেবা' বানানো-ও সম্ভব নয়। কেননা যখনই বৃদ্ধি পাবে, স্ত্রীর তা হস্তগত করা নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক। কেননা তা যৌনাঙ্গের বিনিময়, যদি তা হেবা হয়, তাহলে তার জামানত হবে না। আর বৃদ্ধি হলে এবং সঙ্গমের পূর্বে তালাক দিলে সে বৃদ্ধি প্রত্যাহৃত হবে। আর যখন 'হেবা' হবে, তাতে তালাকের কোন প্রভাব পড়বে না। যখন দুজনই কোন চুক্তির ভিত্তিতে তাতে প্রবেশ করবে, তখন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। তাতে জামানত দেয়ার চুক্তিতে তাদের দুজনের জন্যে বাধ্যতামূলক করা আমাদের জন্যে জায়েয হবে না। যেমন তারা দুজনই চুক্তিবদ্ধ হবে বিক্রয়ের চুক্তিতে তখন তাদের দুজনের জন্যে 'হেবা'র চুক্তি বাধ্যতামূলক করা জায়েয হবে না। যদি তারা দুজন স্বত্ব করার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে তাদের দুজনের জন্যে ভবিষ্যতে বিক্রয়ের কোন চুক্তি বাধ্যতামূলক করা যাবে না। এতেই এ প্রমাণ রয়েছে যে, বৃদ্ধির চুক্তি হলে 'হেবা'র চুক্তি প্রমাণ করা জায়েয হবে না। যদি 'হেবা' না থাকে আর অন্যকে মালিক বানানো সহীহ্ হয়, তাহলে স্ত্রীর যৌনাঙ্গের বদল হিসেবে বৃদ্ধি সুনির্দিষ্টতা সহকারে আক্‌দের সাথে সংযুক্ত হবে। সেটাকে স্ত্রীর জন্যে 'হেবা' বানানোর ব্যাপারে ইমাম মালিকের কথা, তার পরে তাঁর কথা ঃ সঙ্গমের পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দিলে বৃদ্ধির অর্ধেক স্বামীর দিকে ফিরে যাবে— এমন পর্যায়ের কথা, যা সুসংবাদ ও সামঞ্জস্যশীল নয়। কেননা তা যদি 'হেবা' হয়, তাহলে বিবাহের আক্‌দ-এর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই, মহরানার সাথেও নয়। বৃদ্ধি থেকে কোন কিছু স্বামীর দিকে ফেরত হওয়ায় তালাকের কোন প্রভাব নেই। যদি মহরানায় বৃদ্ধি হয়, তাহলে স্বামীর মৃত্যুর কারণে তার বাতিল হয়ে যাওয়া অসঙ্গত।

হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, সঙ্গমের পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দিলে সমস্ত বৃদ্ধিটাই বাতিল হয়ে যাবে। বাতিল হবে এই কারণে যে, মূল আক্‌দের বৃদ্ধিটা ছিল না, পরে তার সাথে যুক্ত করা হয়েছিল মাত্র। তাই তার স্থিতিটা আক্‌দ রক্ষা পাওয়ার উপর নির্ভরশীল হবে। অথবা নির্ভরশীল হবে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম হওয়ার উপর। যেমন বিক্রয়ে বৃদ্ধি তার সাথে যুক্ত হবে চুক্তি

রক্ষা পাওয়ার শর্তে। চুক্তি যখনই বাতিল হয়ে যাবে বৃদ্ধিটাও বাতিল হয়ে যাবে। মহরানায় বৃদ্ধিটাও তেমনি।

যদি বলা হয়, আক্‌দে মহরানা তো নির্ধারিত আছে, তার উপর সঙ্গমের পূর্বে তালাক সংঘটিত হলে তার কিছু অংশ বাতিল হয়ে যায় মাত্র। তাহলে বৃদ্ধিটাও তেমন হবে না কেন, যদি বৃদ্ধিটা সহীহ্ হয়ে থাকে ও তার সাথে যুক্ত হয়ে থাকে, তা তাতে রয়েছে বলেই মনে করতে হবে। তাহলে তারও নির্দিষ্ট পরিমাণ মহরানার মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না।

জবাবে বলা যাবে, আমাদের মতে আক্‌দে নির্ধারিত পরিমাণ সেই সবকে বাতিল করে দেয়, যদি সঙ্গমের পূর্বে তালাক দিয়ে দেয়। কেননা মহরানা নির্ধারিত আক্‌দটাই বাতিল হয়ে গেছে। যেমন বিক্রয়ের বস্তুটি হস্তগত করার পূর্বে ধ্বংস বা নষ্ট হয়ে গেলে হয়। ভবিষ্যতের মাত্‌য়া হিসেবে অর্ধেক দেয়া তো ওয়াজিব হবে। ইবরাহীম নখয়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে, সঙ্গমের পূর্বে তালাকদাতা ব্যক্তি— তার স্ত্রীর জন্যে নির্দিষ্ট মহরানা অর্ধেক দেবে— তা-ই তার মাত্‌য়া। আবুল হাসান আল-কারখীও তা-ই বলতেন। এই প্রেক্ষিতেই তাঁরা বলেছেন, দুইজন সাক্ষী কোন ব্যক্তির তার স্ত্রীকে সঙ্গমের পূর্বে তালাক দেয়ার সাক্ষ্য দিল, কিন্তু সেই ব্যক্তি— স্বামী— তা অস্বীকার করে, পরে সে সাক্ষী দুজন স্বামীর জন্যে অর্ধেক মহরানার জামিন হল, যা তার উপর চেপেছে। কেননা সঙ্গমের পূর্বেই তালাক দিলে সমস্ত মহরানা-ই পড়ে যাবে। আর পরিমাণ নির্ধারণে যে অর্ধেক স্বামী দিতে বাধ্য হবে, তা যেন নতুন করে চেপে বসা একটা ঋণ, ওদের দুজনের সাক্ষ্যের কারণে তা তার উপর বাধ্যতামূলক হয়েছে। এরূপ অবস্থায় সঙ্গম পূর্ব তালাকের কারণে বৃদ্ধি ও প্রথমের নির্ধারণ উভয়ের পড়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোন পার্থক্য থাকে না।

যদি বলা হয়, এই ব্যাখ্যা তো আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা যদি স্ত্রীদের স্পর্শ করার (সঙ্গমের) পূর্বেই তালাক দিয়ে দাও এমন অবস্থায় যে, তোমরা তাদের জন্যে মহরানা নির্দিষ্ট করেছে, তা হলে নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্ধেক দিতে হবে'— এর বিরুদ্ধে পড়ে যায়। কেননা তুমি বলেছ যে, সব মহরানাই পড়ে যাবে এবং নতুন করে অর্ধেক তার উপর চেপে বসবে।

জবাবে বলা যাবে, আয়াতে তালাক অস্বীকৃত হয়নি, কেননা এই তালাকের পর-ও নতুন করে অর্ধেক মহরানা তো দিতে হচ্ছে। তাতে নির্ধারিত পরিমাণের অর্ধেক দেয়ার অপরিহার্যতার কথাই বলা হয়েছে কোন পরিচিতি ছাড়া-ই, কোন শর্ত ব্যতিরেকেই। আমরাও তো অর্ধেক মহরানা দিতে হবে বলছি। তাহলে শুরু থেকেও নতুন করে অর্ধেক মহরানা 'মাত্‌য়া' হিসেবে দেয়া বাধ্যতামূলক বললে তাতে আয়াতের বিরুদ্ধতা হওয়ার কোন কারণই নেই। এ-ও প্রমাণিত হয় যে, সঙ্গমের পূর্বে তালাক দিলে সমস্ত বৃদ্ধিটাই বাদ পড়ে যায়। আমরা নিশ্চিত জানি যে, বিয়ের আক্‌দ যদি মহরানা নির্ধারণ ব্যতীতই সম্পাদিত হয়, তা হলে সমপরিমাণ মহরানা দেয়া ওয়াজিব হবে। কেননা কোন বদল বা বিনিময় ছাড়া স্ত্রী যৌনাঙ্গ ব্যবহারের অধিকার জন্মে না। পরে সঙ্গমের পূর্বে যখন তালাক সংঘটিত হল, তখন তা পড়ে গেল। কেননা আক্‌দে তা নির্দিষ্ট করা ছিল না। বৃদ্ধিটাও তেমনি, কেননা তা মূল আক্‌দে ধার্য ছিল না। তাই সঙ্গম-পূর্ব তালাক তা প্রত্যাহার করবে, যদিও তা মূল আক্‌দের সাথে যুক্ত করা হয়েছিল।

## ক্রীতদাসীদের বিবাহ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ -

আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত বংশের মুসলিম পাত্রীদের বিয়ে করতে সমর্থ হয় না, সে যেন তোমাদের মালিকানাভুক্ত ক্রীতদাসীদের মধ্য থেকে এমন নারীকে বিয়ে করে, যে মুমিন।

আবূ বকর বলেছেন, এ আয়াতের তাৎপর্য হল স্বাধীনা-স্ববংশজাত মহিলা বিয়ে করতে অসমর্থ হলে ঈমানদার ক্রীতদাসী বিয়ে করা মুবাহ্। কেননা এখানে ব্যবহৃত الْمُحْصَنٰتُ শব্দের অর্থ হল স্বাধীনা স্ববংশজাত মেয়ে। এ কথায় এদের ছাড়া অন্যদের বিয়ে করার নিষেধ বর্তমান নেই। কেননা আলোচ্য অবস্থায় ক্রীতদাসী বিয়ে করা মুবাহ হওয়ায় তাদের ছাড়া অন্যদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ নেই। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ وَلَاتَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ 'দারিদ্রের— অভাব-অনটনের ভয়ে তোমাদের সন্তান হত্যা করো না' কথায় এ প্রমাণ নেই যে, উক্ত অবস্থা দূর হলে সন্তান হত্যা বুঝি মুবাহ হবে। তেমনি আল্লাহ্র কথা ঃ لَاتَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً —'তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ খেয়ো না— এ কথায় প্রমাণিত হয় না যে, চক্রবৃদ্ধি হারে না হলে সূদ খাওয়া বুঝি মুবাহ হবে। আল্লাহ্র কথা ঃ وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَلَابُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ আর যে লোক আল্লাহ্র সাথে অন্য একজন ইলাহ্ ডাকবে— বিশ্বাস ও ইবাদত করবে— তার সে কাজের কোন দলীল নেই (মুমিনুন ঃ ১৭)। এ কথা প্রমাণ করে না যে, আল্লাহ্র সাথে অন্য ইলাহ আছে— এই কথার যুক্তি প্রমাণ পেশ করা বুঝি সঙ্গত। আল্লাহ তা থেকে অতীব উর্ধ্বে ও মহান।

এ বিষয়ে আমরা 'উসুলিল ফিকাহ' গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই প্রেক্ষিতেই বলতে হবে, তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ্য নেই .... আয়াতটিতে যে লোক স্বাধীনা ভদ্র বংশজাত মুসলিম মহিলা বিয়ে করার সামর্থ্য থাকলে তার পক্ষে ক্রীতদাসী বিয়ে করা বুঝি জায়েয নয়— এমন কোন দলীল নেই।

ব্যবহৃত শব্দ طول -এর অর্থ পর্যায়ে আগের দিনের ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে যুবায়র, মুজাহিদ, কাতাদাতা ও সুদ্দী প্রমুখ বলেছেন, তার অর্থ ঃ সচ্ছলতা, ঐশ্বর্যশীলতা।

আর আতা, জাবির ইবনে জায়দ ও ইবরাহীম বর্ণিত, তাঁরা বলেছেন, পছন্দ হলে দাসী বিয়ে করা সম্পূর্ণ জায়েয, যদিও সে সচ্ছল অবস্থার লোকও হয়। যখন তার সাথে যিনায় লিপ্ত হওয়ার আশংকা দেখা দেবে। তাই এঁদের মতে طول শব্দের এ স্থানে অর্থ হচ্ছে, তার হৃদয় যেন বিয়ে করা দাসীর দিক থেকে ফিরে না যায় স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার কারণে, তার প্রতি ঝোঁক ও

আকর্ষণ প্রবল হওয়ার দরুন, তার জন্যে মনে ভালোবাসা প্রবল হওয়ার জন্যে। এই অবস্থায়ও দাসী বিয়ে করা তার জন্যে মুবাহ্। আর طول শব্দের অর্থ যেমন সচ্ছলতা, ঐশ্বর্যশীলতা শক্তি-সামর্থ্য হতে পারে তেমনি বিপুল অনুগ্রহও অর অর্থ হতে পারে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেনঃ

شَدِيْدُ الْعِقَابِ ذِىْ الطَّوْلِ -

প্রচণ্ড আযাবদাতা, মেহেরবান অনুগ্রহশীল। (সূরা মুমিন ঃ ৩)

বলা হয়েছে, ذِى الطَّوْلِ অর্থ, ذول لفضل অনুগ্রহশীল। 'শক্তি সম্পন্ন'-ও তার অর্থ বলা হয়েছে। অনুগ্রহ ও ঐশ্বর্যশীলতা খুব কাছাকাছি অর্থবোধক। তাই আয়াতে বলা শব্দ ذِىْ الطَّوْلِ -এর অর্থ ধনশীলতা, শক্তি-ক্ষমতা। আর অনুগ্রহ ধনের প্রশস্ততাও বোঝায়। তার অর্থ যখন ঐশ্বর্যশীলতা তখন তাতে দুটি দিকের সম্ভাব্যতা রয়েছে। একটি ধন-ঐশ্বর্য অর্জন তার স্বাধীনা স্ত্রী থাকার কারণে। আর দ্বিতীয় ধন-মালের সচ্ছলতা, শক্তির আতিশয্য স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার। আর তার অর্থ যখন طول অনুগ্রহ, তখন তাতে ঐশ্বর্যশীলতা ইচ্ছা থাকা সম্ভব। কেননা অনুগ্রহ তা অনিবার্য করে দেয়। আর দ্বিতীয় হল, অন্তরের প্রশস্ততা, হৃদয়ের উন্মুক্ততা স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার জন্যে এবং দাসী থেকে মন ভিন্ন দিকে ফিরে যাওয়া। তার অন্তরে যদি তার জন্যে প্রশস্ততা না থাকে, বরং তার নিজের দিক কোন নিষিদ্ধ কাজের দিকে অগ্রসর হওয়া আশংকা দেখা দেয়, তাহলে তাকে বিয়ে করা তার জন্যে জায়েয, যদি সে ঐশ্বর্যশীলও হয়। যেমন আতা, জাবির ইবনে যায়দ ও ইবরাহীম থেকে বর্ণিত হয়েছে। আয়াতে এই সব কয়টি তাৎপর্যেরই অবকাশ রয়েছে। তবু এই বিষয়ে আগের ফিকহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। ইবনে আব্বাস, জাবির, সায়ীদুবনে যুবায়র, শা'বী ও মকহুল থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেছেন, দাসী বিয়ে করা যাবে না, যাবে কেবল তখন, যদি স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য না হয়। মাসরুক ও শা'বীও বলেছেন ঃ দাসী বিয়ে করা মৃত রক্ত ও শূকর মাংস খাওয়ার মতো। তা হালাল হয় কেবলমাত্র তার জন্যে, যার বাঁচা সম্ভব নয় এগুলি থেকে কিছু না খেলে। আলী, আবূ জাফর, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে যুবায়র ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব-এর একটি বর্ণনা এবং ইবরাহীম আল-হাসান— জুহরীর বর্ণনা— এরা বলেছেন ঃ পুরুষ দাসী বিয়ে করতে পারে, সে সচ্ছল অবস্থার হলেও। আর আতা ও জাবির ইবনে যায়দ বলেছেন, দাসীর সাথে যিনার আশংকা হলে সে তাকে বিবাহ করবে। আতা থেকে বর্ণিত, স্বাধীনা মেয়ে স্ত্রী থাকলে তার উপর দাসী বিয়ে করা যাবে না। অবশ্য নিজের মালিকানাধীন মেয়ের কথা আলাদা। হযরত উমর, আলী (রা) ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব ও মকহুল অন্যান্যদের মধ্যে স্বাধীনা স্ত্রীর উপর দাসী বিয়ে করবে না। ইবরাহীম বলেছেন, স্বাধীনা স্ত্রীর উপর দাসী বিয়ে করা যাবে যদি সে দাসীর গর্ভে তার সন্তান জন্মে থাকে। বলেছেন, স্বাধীনা ও দাসীকে একই আকদে বিয়ে করা হলে দুজনের সকলেরই বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে। ইবনে আব্বাস ও মাসরুক বলেছেন, স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করলে তাতেই দাসী স্ত্রীর তালাক হয়ে যাবে। ইবরাহীমের একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, স্বামী ও দাসী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে। তবে এ দুজনার সন্তান থাকলে ভিন্ন কথা। শা'বী বলেছেন, স্বাধীনা স্ত্রী গ্রহণের সামর্থ্য থাকলে দাসীর বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে। মালিক ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব সূত্রে বলেছেন, স্বাধীনা স্ত্রীর উপর দাসী বিয়ে করবে না। তবে

স্বাধীনা স্ত্রী-ই যদি তা চায়, তাহলে জায়েয হবে। তখন স্বাধীনার জন্যে দুইদিন ও দাসীর জন্যে একদিন নির্দিষ্ট করে ভাগ করবে। আবূ বকর বলেছেন, একথা প্রমাণ করে যে, ইমাম মালিক স্বাধীনার উপর দাসী বিয়ে করা জায়েয মনে করতেন না যদি স্বাধীন স্ত্রী রাজি না হয়।

দাসী বিয়ে করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারেই বিভিন্ন মত রয়েছে ফিকাহবিদদের। ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, একজন দাসীর অধিক সংখ্যক বিয়ে করা জায়েয নয়। ইবরাহীম, মুজাহিদ ও জুহরী বলেছেন, চারজন দাসী বিয়ে করা জায়েয হবে যদি ইচ্ছা করে। আগের ফিকাহবিদগণ দাসী বিয়ে করা পর্যায়ে এভাবে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ এ পর্যায়েও নানা.মত ব্যক্ত করেছেন। আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, আল-হাসান ইবনে যিয়াদ বলেছেন, যে-কোন পুরুষের পক্ষে দাসী বিয়ে করা জায়েয, যদি কোন স্বাধীনা মেয়ে তার স্ত্রী না থেকে থাকে এবং আর স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য থেকে থাকলে। আর একজন স্বাধীনা মেয়ে স্ত্রী থাকলেও দাসী বিয়ে করবে না। সুফিয়ান সওরী বলেছেন, মালিকানাধীন দাসীর ব্যাপারে নিজের সম্পর্কে ভয় থাকলে সে দাসীকে বিয়ে করায় কোন দোষ নেই, সে সচ্ছল অবস্থার লোক হলেও। মালিক, লায়স, আওজায়ী ও শাফেয়ী বলেছেন, طول অর্থ, ধন-মাল। তাই স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার মতো ধন-মাল পেলে দাসী বিয়ে করবে না। আর সামর্থ্য না পেলেও তাকে বিয়ে করবে না। তবে নিজ সম্পর্কে চরিত্রহীনতার ভয় হলে ভিন্ন কথা।

হানাফী ফিকাহবিদগণ ও সওরী, আওজায়ী, শাফেয়ী বলেছেন, একজন স্বাধীনা মেয়ে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও দাসী বিয়ে করা জায়েয হবে না। আর এ ব্যাপারে স্বাধীনা স্ত্রীর অনুমতি বা অনুমতিহীনতার মধ্যে তাঁদের মতে কোন পার্থক্য করা যায় না। ইবনে আহব মালিক থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, স্বাধীনা স্ত্রীর উপর দাসী বিয়ে করার কোন দোষ নেই। বিয়ে করলে স্বাধীনা ইখতিয়ার পাবে তার স্ত্রী হয়ে থাকা-না থাকার। ইবনুল কাসিম বলেছেন, দাসী স্বাধীনার উপর বিয়ে করা যাবে; এর অর্থ এই যে, এদের দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে এবং তারপর ফিরিয়ে নেবে। বলেছেন, স্বাধীনা ইখতিয়ার পাবে, ইচ্ছা করলে স্ত্রী হয়ে থাকবে, আর ইচ্ছা করলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারবে। তিনি বলেছেন, অথচ সে স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্যের অধিকারী, বলেছেন, আমি মনে করি, এদের দুজনের বিয়ে ভেঙ্গে দিতে হবে। পরে তাকে বলা যাবে, সে যিনার ভয় পাচ্ছে। বলেছেন, চাবুক দিয়ে তাকে মারা হবে। পরে তা হালকা করা হবে। মালিক বলেছেন, দাস যদি স্বাধীনা স্ত্রীর উপর দাসী বিয়ে করে, তাহলে স্বাধীনাকে ইখতিয়ার দেয়া যাবে না। কেননা দাসীও তো তার স্ত্রী। উসমান আলবত্তী বলেছেন, কোন ব্যক্তি স্বাধীনা স্ত্রীর উপর দাসী বিয়ে করবে, তাতে কোন দোষ নেই।

দাসী বিয়ে করা জায়েয, স্বাধীনা স্ত্রী গ্রহণের শক্তি ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও, যদি স্বাধীনা স্ত্রী তার থেকে না থাকে। এর দলীল হচ্ছে আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلٰثَ وَرُبَاعَ - فَانْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -

তাহলে তোমরা তোমাদের মন যে মেয়েদের পছন্দ করে তাদের মধ্য থেকে দুই-দুই তিন-তিন ও চার-চার বিয়ে কর আর যদি নিরপেক্ষতা-ন্যায়পরতা রক্ষা করতে পারবে না বলে তোমরা ভয় পাও তাহলে মাত্র একজন অথবা তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়েছে। (সূরা সিনা ঃ ৩)

এ আয়াত দুটি দিক দিয়ে প্রমাণ করছে যে, স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য থাকলেও দাসী বিয়ে করা জায়েয। একটি হল উল্লিখিত সংখ্যক মেয়েলোক সাধারণভাবেই তারা যারাই হোক— বিয়ে করা মুবাহ্। তারা স্বাধীনা হোক কি দাসী হোক আর দ্বিতীয় সম্বোধনের ধারাবাহিকতায়ই আল্লাহ্ বলেছেন অথবা তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়েছে আর একথা জানাই আছে তারা তোমাদের দক্ষিণ হস্তের মালিকানাধীন কথাটি স্বতঃই অ-স্বয়ংসম্পূর্ণ হুকুম প্রকাশ করার ক্ষেত্রে। এখানে একটি সর্বনাম আছে মনে করতে হবে। আর তাহলো তাই যার কথা মূল সম্বোধনে প্রকাশ্যভাবে উল্লিখিত হয়েছে। তা হচ্ছে নিকাহ্র আক্দ। এক্ষণে পূর্ণ কথা এ দাঁড়ায়, তোমরা নিকাহ্র আক্দ কর "মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের তোমাদের মন চায় অথবা তোমাদের দক্ষিণ হস্তের মালিকানাধীন মেয়ে।" এখানে সঙ্গম উহ্য মনে করা ঠিক হবে না। কেননা পূর্বে তার উল্লেখ হয়নি। তাই এ আয়াতের দলীলেই প্রমাণিত হল যে, প্রত্যেক পুরুষের ইখতিয়ার রয়েছে দাসী বিয়ে করার অথবা স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্র কথা ঃ অতএব তোমরা বিয়ে কর যে মেয়েলোকই তোমাদের মন চাইবে। তা মুবাহ বিয়ের আক্দ হওয়ার শর্তে। অবশ্য তা মনের খুশী ও চাহিদা পূরণে যোগ্য হতে হবে। প্রমাণিত হল, যে মেয়েই মন চাইবে, তার সাথেই বিয়ের আক্দ জায়েয হবে। তা যখন এরূপ তখন তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ একটি মুজমাল কথা।

জবাবে বলা যাবে, 'যা তোমাদের খুশী ও চাহিদা অনুযায়ী' আল্লাহ্র এ কথাটির দুটি দিক। একটি— তার অর্থ, যা পেয়ে তোমরা সন্তুষ্ট হবে, যা পাওয়ার জন্যে তোমরা আগ্রহী হবে। তবেই দেয়া ইখতিয়ারের ফায়দা পাওয়া সম্ভব হবে। যেমন কেউ বলে তুমি এ ঘরে বস যতক্ষণ তোমার মন বসতে ইচ্ছা করে— চায়। 'খাও তুমি এ খাবার থেকে' যা তোমার মন চায়— এভাবে কথা হলে ইখতিয়ার দেয়ার ফায়দা পাওয়া সম্ভব। কেননা যা মন চায় তা-ই করা তখন সম্ভব হয়। আর দ্বিতীয় দিকটি হল যা তোমাদের জন্যে হালাল হয়— প্রথমটির বক্তব্য হল যাকে চায় তাকে বিয়ে করার ইখতিয়ার দেয়ার অর্থ হবে। আর তা স্বাধীনা মেয়ে ও দাসী মেয়ে সবই সামিল করে। আর তার অর্থ যদি হয়, যা তোমাদের জন্যে হালাল, এরপরই বলে দেয়া হয়েছে মেয়েদের মধ্য থেকে তোমাদের যা খুশী হয় এমন যে কাউকে বিয়ে কর। তা হল সংখ্যার দিক দিয়ে তা দুই-দুই, তিন-তিন বা চার চার। আর নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে না পারার ভয় হলে একজন অথবা দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্ত যে মেয়ে। এভাবে মূল কথাটি অস্পষ্টতা বা সংক্ষিপ্ততার পর্যায়ে অতিক্রম করে ব্যাপকতার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এ সাধারণত্ব ও ব্যাপকতাকে কাজে লাগানো ওয়াজিব, অবস্থার পরিবর্তন যা-ই হোক না কেন। তাছাড়া কথাটি অস্পষ্ট সংক্ষিপ্ত বা স্পষ্ট বিস্তারিত যা-ই হোক, তাকে সাধারণ ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করাই উত্তম। কেননা সেরূপ ব্যবহার করা সম্ভব। যেখানেই এবং যেভাবেই তা কাজে লাগানো সম্ভব, লাগাতে হবে। আল্লাহ্র কথা এবং তোমাদের জন্যে এদের বাইরের সব মেয়েকেই হালাল করা

হয়েছে এভাবে যে, তোমরা তাদের পেতে চাইবে তোমাদের ধন-মালের বিনিময়ে। এ কথা স্বাধীনা ও দাসী— উভয়কেই শামিল করে। এর আর একটি প্রমাণ হল আল্লাহ্‌র কথাঃ

اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ - وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ -

আজ তোমাদের জন্যে সকল পবিত্র জিনিসই হালাল করা হয়েছে। আহলি কিতাবের খাদ্য খাওয়া তোমাদের জন্যে হালাল, তোমাদের খানা তাদের জন্যে (হালাল) এবং সুরক্ষিতা নারীরাও তোমাদের জন্যে হালাল তারা মুমিন সমাজ থেকে হোক, কি তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে থেকে হোক। (সূরা মায়িদা ঃ ৫)

الاحصان নামটি ইসলাম বোঝায়। আর আক্‌দ বোঝায় আল্লাহ্ কথা فَاِذَا اُحْصِنَّ দ্বারা। আগের কালের কোন ফিকাহবিদ থেকে বর্ণিত ঃ 'যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করবে।' কেউ কেউ বলেছেন ঃ 'যখন তারা বিবাহিতা হবে।' আর জানা-ই আছে যে, এখানে এ কথাটি দ্বারা বিবাহ বোঝানো হয়নি। প্রমাণিত হল যে, এখানে সতীত্ব-যৌন পবিত্রতা বোঝাতে চাওয়া হয়েছে। আর তা স্বাধীনা মেয়েলোক ও দাসী সকলের মধ্যেই কাম্য। আর 'তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রাপ্তদের সতীত্ব সম্পন্না মেয়ে' বলতে কিতাবী ক্রীতদাসী বিয়ে করার ব্যাপারে সাধারণ ও ব্যাপক তাৎপর্যের কথা। আর

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ -

এবং বিয়ে দাও তোমাদের অবিবাহিতা-স্বামীহীনা মেয়েদেরকে এবং তোমাদের গোলাম দাসীদের মধ্য থেকে নেক চরিত্রবানদেরকে। (সূরা নূর ঃ ৩২)

এ-ও সাধারণ হুকুম দাসীদের বিয়ে দেয়া এ হুকুম অনুযায়ী ওয়াজিব। যেমন স্বাধীনা মেয়েদের বিয়ে দেয়। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ -

আর ঈমানদার ক্রীতদাসী মুশরিক মেয়ের তুলনায়— সে তোমাদেরকে অধিক সন্তুষ্ট করলেও— অতীব উত্তম। (সূরা বাকারাহ ঃ ২২১)

এরূপ কথা তো স্বাধীনা মুশরিক মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য সম্পন্ন লোকদেরকেই বলা যায়। আর যে লোক স্বাধীনা মুশরিকা মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য পেয়েছে, সে মুসলিম স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্যবান অবশ্যই হবে। বোঝা গেল, আয়াতটি বলতে চেয়েছে যে, মুসলিম স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তার পক্ষে দাসী বিয়ে করা জায়েয। মুশরিক স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা জায়েয।

এ পর্যায়ে গভীর দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে এ কথারও প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, একজন মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য অন্য একজন মেয়ে বিয়ে করা হারাম করে দেয় না। যেমন কন্যা বিয়ে দেয়ার সামর্থ্য মাকে বিয়ে দেয়া হারাম করে দেয় না। একটি মেয়েলোক বিয়ে করার ক্ষমতা তার বোন বিয়ে দেয়াকে হারাম করে না। এ নীতি অনুযায়ী কারোর স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার ক্ষমতা দাসী বিয়ে করাকে নিষিদ্ধ করে না। বরং এ ব্যাপারে দাসী বিয়ে দেয়া অধিক সহজ দুই বোন, মা ও কন্যা বিয়ে দেয়া অপেক্ষা। আর তা-ই স্বাধীনা মেয়ে দাসীকে একত্রিত করা জায়েয হওয়ার দলীল। বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। মা ও কন্যা ও দুই বোন বিয়ের অধীন একত্রিত করা নিষিদ্ধ সকলের মতে। স্বাধীনা মা ও দাসীর তুলনায় মা ও কন্যা একত্রিত করা অধিক কঠোরভাবে নিষিদ্ধ বলে স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার সম্ভবতার কোন প্রভাব নেই দাসী বিয়ের নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে।

এ ক্ষেত্রে বিপরীত মতের লোকেরা প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছে ঃ

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ -

আর তোমাদের মধ্য থেকে যে সচ্চরিত্রবর্তী-সংরক্ষিতা-সতী ঈমানদার মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্যশীল নয়, তার জন্যে তোমাদের দক্ষিণ হস্তের মালিকানাধীন মুমিন যুবতীরা রয়েছে।

এ প্রসঙ্গের শেষ কথা ঃ

ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ -

এ ব্যবস্থা তার জন্যে যে চরিত্রহীনতার ভয় করে তোমাদের মধ্য থেকে।

আর তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ কর, তাহলে তা তোমাদের জন্যে অতীব উত্তম।

এ আয়াত স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করতে অক্ষম হওয়াকে— সামর্থ্য না হওয়াকে— এবং যিনার ভয় হওয়াকেও শর্ত করা হয়েছে দাসী বিয়ে করা মুবাহ হওয়ার জন্যে। তাই এই শর্ত দুইটি একত্রিত না হলে দাসী বিয়ে করা জায়েয হতে পারে না। এ আয়াতটিই ফয়সালাকারী তোমার পাঠ করা আয়াতটি সম্পর্কে, যাতে দাসী বিয়ে করার হুকুম রয়েছে।

এর জবাবে বলা যাবে, স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য থাকা অবস্থায় দাসী বিয়ে করার ব্যাপারে এ আয়াতে কোন নিষেধ পাওয়া যায় না। এতে শুধু এতটুকু কথাই আছে যে, স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকা অবস্থায় দাসী বিয়ে করা মুবাহ। আর আমি এ ছাড়া অন্যান্য যে সব আয়াত পাঠ করেছি, তার সব কয়টি আয়াতেই দাসী বিয়ে করা মুবাহ হওয়ার কথা-ই আছে। তাই এ দুইটির কোন একটিতে এমন কিছুই নেই, যা একটাকে অপরটি বাদ দিয়ে বিশেষ ভাবে গ্রহণ করা কর্তব্য করে দেবে। কেননা এর দুটোর সবটাই দাসী বিয়ে মুবাহ পর্যায়েই এসেছে। তার কোনটার ব্যাপারেই নিষেধ আসেনি। কাজেই এ কথা বলা সঙ্গত হবে না যে, এ আয়াতটি অপর আয়াতটিকে— এ মেয়ে অপর মেয়েকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে। এসবই একই হুকুম নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

যদি বলা হয়, এটা আল্লাহ্‌র এ কথাটির মতই, যেখানে বলেছেন ঃ

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا - فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا -

তবে যদি তা না পায়, তাহলে ধারাবাহিক ও পর পর দুই মাসের রোযা থাকবে পারস্পরিক স্পর্শ হওয়ার আগে। আর তা-ও যদি কেউ না পারে, তাহলে সত্তর জন মিস্‌কীনকে খাবার খাওয়াতে হবে। (সূরা মুজাদিলাত ঃ ৪)

ফলে এ সবের সম্যক দাবি হল, তা জায়েয হওয়া নিষিদ্ধ হবে তার পূর্ববর্তীটা পাওয়া গেলে।

এর জবাবে বলা যাবে, যেহেতু শুরুতেই দাসমুক্তিকে পার্থক্যপূর্ণ বানানো হয়েছে, অতএব তার দাবি হবে, দাসমুক্তি দানই ফরয, অন্য কিছু নয়। আর দাসমুক্তি সম্ভবপর না হলে রোযা রাখার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। তখন তা ছাড়া অন্য কিছু জায়েয হবে না দাসমুক্তি সম্ভব নয় বলে। তারপর বলেছেন, 'যে রোযা রাখতে সক্ষম হবে না, তাকে ষাট জন মিস্‌কীন খাওয়াতে হবে।' আয়াতে উল্লিখিত এ কাজগুলো একের পর এক সুনির্দিষ্টভাবে হতে হবে, যেটা সম্ভব হবে, কাফফারা কেবল সেটার দ্বারা-ই কার্যকর হবে কুরআনের উল্লেখের বিন্যাস ও পরম্পরা অনুযায়ী। এ ছাড়া দাসী বিয়ে করা নিষেধকারী আর কোন আয়াত তোমার নিকট নেই, যার উল্লেখ তুমি করতে পার যে, শর্ত পাওয়া গেলে তাদের বিয়ে করা মুবাহ হবে, আর শর্ত পাওয়া না গেলে তা মুবাহ হবে না। বরং সব কয়টি আয়াত-ই নিকাহ্‌ মুবাহ হওয়ার কথাই বলছে। তাতে স্বাধীনা নারী ও দাসীদের মধ্যে কোনই পার্থক্য করা হয়নি। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমাদের মধ্যে যে লোক মুহ্‌সিন মুমিন মেয়ে বিয়ে করতে সক্ষম হবে না' এতে স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য থাকা অবস্থায় দাসী বিয়ে করা মুবাহ না হওয়ার কোন দলীল নেই।

ইসমাঈল ইবনে ইসহাক উক্ত আয়াতটির উল্লেখ করে তার ব্যাখ্যায় আগের দিনের মনীষীবৃন্দের যে বিভিন্ন মত রয়েছে তার-ও উল্লেখ করেছেন। তার পরে হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন যে, যে স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দাসী বিয়ে করা মুবাহ হওয়ার মত প্রকাশ করেছেন, তার-ও উল্লেখ করেছেন। তার পরে বলেছেন, এ মত তার মধ্যকার ফাসাদকে অতিক্রম করে গেছে এবং তাতে ভিন্নতর কোন ব্যাখ্যা দেয়ার সম্ভবতা নেই। কেননা আল্লাহ্‌র কিতাবে নিষিদ্ধ। তার ব্যাখ্যা কেবল সেই দিক দিয়েই দেয়া সম্ভব যা মুবাহ করা হয়েছে। আবূ বকর বলেছেন, 'ইজমার বিপরীত কোন ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়' তাঁর এ কথা। এ জন্যে যে, সাহাবায়ে কিরাম তাতে নানা কথা বলেছেন এবং আমরা সে সব কথার উল্লেখ করেছি। দীর্ঘ আলোচনার ভয় না থাকলে আমরা এখানে সেসব কথার সনদসমূহ একের পর এক এখানে উল্লেখ করতাম। ব্যাখ্যার সম্ভাবনা না থাকলে আগের দিনের মনীষিগণ যে যা বলেছেন, তার উল্লেখ করা হতো না। কেননা আয়াতটিতে যা সম্ভাবনা নেই এমন পথে আয়াতটির ব্যাখ্যা দেয়া কারোর জন্যেই জায়েয হতে পারে না। হ্যাঁ, আগের দিনের মনীষীদের

মধ্যে এ বিভিন্ন মত প্রকাশিত হয়েছে। তাঁদের কেউ অপর কারোর কথার প্রতিবাদ করেন নি। কেননা মতের ভিন্নতা রয়েছে তা তো অস্বীকার করা যাবে না। এরূপ বিভিন্ন কথা বলার অবকাশ না থাকলে ও ব্যাখ্যা দেয়ার সুযোগ না থাকলে প্রত্যেক মতের লোক বিপরীত মতের লোকের কথার অবশ্যই প্রতিবাদ করতেন। প্রত্যেকের মতের প্রতিবাদ না করার রীতি তাঁদের মধ্যে ব্যাপকভাবে পরিচিত ও চালু ছিল। তা সত্ত্বেও তা না করার কারণে মনে করতে হবে, তাতে ইজতিহাদের সুযোগ আছে এবং তাঁদের মধ্যে একটা ইজ্মা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁরা আয়াতের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেটার সম্ভাবনা পূর্ণ মাত্রায় রয়েছে। আমরা এই যা বললাম, তাতে একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ব্যাখ্যার বিভিন্নতার সম্ভাব্যতা অস্বীকার করা সহীহ্ নয়। আর 'আল্লাহ্র কিতাবে কেবল ব্যাখ্যা দেয়া ছাড়া— যা মুবাহ্ করা হয়েছে— কোন ব্যাখ্যা দেয়া নিষিদ্ধ' তার এ কথা দ্বারা হয় এ কথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, তা 'নস' দ্বারা নিষিদ্ধ কিংবা কোন দলীল দ্বারা। যদি 'নস' থাকার দাবি করা হয়, তাহলে তা পাঠ করতে বলা হবে, তা প্রকাশ করার দাবি জানানো হবে— কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার কোন পথ নেই। আর যদি কোন দলীল থাকার দাবি করা হয়, তা হলে তা পেশ করতে বলা হবে। কিন্তু না, তেমন কোন দলীল-ই পেশ করার মত নেই। ফলে বলতে হবে, তাঁর এ দাবি একান্ত নিজস্ব জিনিস। আর বিপরীত পক্ষের কথায় বিস্মিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই এজন্যে যে, একটি বিশেষ অবস্থায় এবং একটি শর্তের ভিত্তিতে তা মুবাহ্ বলা-ই হয়ত একটি দলীল তার বিপরীতটা নিষিদ্ধ হওয়ার। যদি এ দিকেই গিয়ে থাকেন, তাহলে এই দলীলটার প্রমাণ হিসেবে আর একটি দলীলের প্রয়োজন দেখা দেবে। আর ইমাম শাফেয়ীর পূর্বে এরূপ কথার দ্বারা কেউ দলীল পেশ করেছেন বলে আমরা জানি না। তা যদি একটা দলীল হয়, তা হয় সাহাবায়ে কিরাম এ বিষয়ে এ দলীল সম্পর্কে উপস্থাপনে সকলের চেয়ে বেশি অধিকারী ছিলেন। বহু সংখ্যক ঘটনায় সাহাবীগণ পারস্পরিক মত পার্থকের ক্ষেত্রে এ ধরনের দলীল উপস্থাপনের বহু সম্ভাবনা ও সুযোগ এসেছে, তাতে তাঁরা কিয়াস-এর সাহায্যেও অনেক যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, ইজতিহাদও করেছেন। সর্ব প্রকারের দলীল পেশ করা সত্ত্বেও এ ধরনের ঘটনায় দলীল পেশ না করা প্রমাণ করে যে, এ ক্ষেত্রে পেশ করার মত কোন দলীল-ই তাঁদের নিকট ছিল না বা উক্ত কথাকে তাঁরা দলীল হিসেবে গ্রহণই করেন নি। তাই ইসমাঈল কিতাবে নিষিদ্ধ হওয়ার কোন দলীল তিনি পেতে পারেন নি।

দাউদ আল-ইসফাহানী বর্ণনা করেছেন যে, ইসমাঈলের নিকট প্রশ্ন করা হয়েছিল ঃ নস্ কি? তিনি জবাবে বলেছিলেন, নস্ হচ্ছে তা, যার সম্পর্কে সকলেই একমত। তাঁকে বলা হল কুরআনের কোন আয়াতের ব্যাখ্যায় মতপার্থক্য হলে তা কি নস্ হবে না? জবাবে বলেছিলেন, কুরআনের সবটাই নস্। বলা হল কুরআনের সব-ই যদি নস্ হবে, তাহলে মুহাম্মাদ (স)-এর সাহাবীগণ মতভেদ করলেন কেন? দাউদ বললেন— এটা প্রশ্নকারীর জুলুম, এ ধরনের প্রশ্ন নিশ্চয়ই করা বা প্রশ্নে এ ধরনের কথা বলা উচিত নয়। এখানে প্রয়োজনীয় জ্ঞান তাঁর অনেক কম আছে। ইসমাঈল সম্পর্কে দাউদের এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দাসী বিয়ে করা মুবাহ্ বলে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁদের সে কথা অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করা শোভা পায় না। কেননা তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে— তিনি বলেছেন,

যে বিষয়ে সকলেই একমত, তা-ই নস্‌। আবার বলেছেন, কুরআনের সবটাই নস্‌। আর কুরআনে আমাদের কথার বিপরীত কিছুই নেই। মুসলিম উম্মাহ্ আমাদের কথার বিপরীত কোন ঐকমত্যেও আসেনি। ইসমাল সম্পর্কিত দাউদের এ কথা দুর্বল। তিনি আমানতদার নন, আর যা বলেন, তাতে তিনি বিশ্বাসযোগ্যও নন। বিশেষ করে ইসমাঈলের তাকে সত্যবাদী মনে করা যায় না। কেননা সে তাকে বাগদাদ থেকে বহিষ্কৃত করেছিল এবং তার বিরুদ্ধে বড় বড় অভিযোগ তুলেছিলেন। আমাদের কথায় ইসমাঈলের বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। তবে একটা দিক দিয়ে হতে পারে। তা হচ্ছে, সে বিশ্বাস করত যে, যা কুরআনে বলা হয়নি, তা সবই নিষিদ্ধ। অথচ আমরা ব্যাখ্যা করে বলেছি যে, ওটা কোন দলীলই নয়। 'উসুলুল ফিকাহ' গ্রন্থে এতদসংক্রান্ত সব কথাই আমরা লিখেছি।

আমাদের কথা যে সত্য তা একটা বড় কারণ হল, যিনার ভয় ও অসামর্থ্য প্রয়োজনীয় নয়। কেননা সত্যিকার প্রয়োজন বলতে বোঝায়, যা হলে প্রাণ ধ্বংস হওয়ার আশংকা থাকে। আর সঙ্গম করতে না পারাটায় প্রাণ ধ্বংসের কোন আশংকা থাকতে পারে না। অথচ তার জন্য দাসী বিয়ে করা মুবাহ্ করা হয়েছে। চরম মাত্রার ঠেকায় পড়া ছাড়াও যখন দাসী বিয়ে করা মুবাহ্, তখন সামর্থ্য থাকা ও না-থাকার মধ্যে কোন পার্থক্য করা যায় না। কেননা এ বিয়েতে অসামর্থ্য হওয়া জরুরী নয়। কেননা বিয়ের ব্যাপারে 'চরম মাত্রায় প্রয়োজনের' কথা বলা যেতে পারে কেবল তখন, যখন প্রাণ বিনষ্ট হওয়ার মতো কঠিন অবস্থা দেখা দেয়ার আশংকা হয় কিংবা ভয় হয় কোন অঙ্গ বিনষ্ট হওয়ার।

আয়াতে বিয়ে মুবাহ্ হওয়ার যে-কথা বলা হয়েছে কথার ধারাবাহিকতায় বলা 'তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ কর, তাহলে তোমাদের বিপুল কল্যাণ হবে' কথাটি প্রয়োজনভিত্তিক নয়। কেননা মানুষ যে অবস্থায় পড়লে মৃত কিংবা শূকর মাংস খেতে বাধ্য হয়, তখন ধৈর্য ধারণ বা 'সবর' করা (অর্থাৎ তা না খাওয়া) তার জন্য নিশ্চয়ই কল্যাণকর নয়। কেননা তখন 'সবর' করে তা না খেলেও তার দরুন মরে গেলে সে আল্লাহ্‌র নাফরমান ও গুনাহগার হবে। তা হলে তো বিবাহ-ও ফরয হবে না অনুরূপ ঠেকায় না পড়লে। আসল কথা হল, আচরণ বিধি শিক্ষা দান। ব্যাপার যখন এই, সে ধরনের প্রয়োজন ছাড়াও বিয়ে করা যখন জায়েয তখন সামর্থ্য থাকলেও বিয়ে জায়েয, যেমন জায়েয সামর্থ্য না থাকলে, আল্লাহ্‌র কথা ঃ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ 'তোমরা পরস্পর থেকে' কথার ধারাবাহিকতায় বলা কথা। এর তাৎপর্য হিসেবে বলা হয়েছে, 'তোমরা সকলেই আদম থেকে— আদমের বংশধর।' এ-ও বলা হয়েছে, তোমরা সকলেই মুমিন। এই কথাটুকু প্রমাণ করে যে, এই কথাটুকু বলা হয়েছে বিবাহ সকলেরই সমান হওয়ার কথা বোঝাবার উদ্দেশ্য। আর তার দরুন স্বাধীনা মেয়ে ও দাসীর সম্পূর্ণ সমান মর্যাদার হওয়া কথা অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য যে-যে দিক দিয়ে মর্যাদা পার্থক্যের দলীল পাওয়া যাবে, তাতে সে পার্থক্য অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

তবে যিনি বলেছেন, স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করলে দাসী-স্ত্রী স্বতঃই তালাক হয়ে যাবে, তার এই কথা অত্যন্ত দুর্বল। একটু বিবেচনা করলেই এই কথার যৌক্তিকতা অপ্রমাণিত হবে। কেননা যেমন বলেছে, প্রকৃত পক্ষেই যদি তা হয়, তা হলে স্বাধীনা বিয়ে করার সামর্থ্য দাসীর বিয়ে ভঙ্গকারী হবে অনিবার্যভাবে। যেমন শা'বী বলেছেন, তায়াম্মুমকারী পানি পেলেই তার

তায়াম্মুম ভেঙ্গে যায়, ওযু করুক আর না-ই করুক। অথচ ইমাম আবূ ইউসুফ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি 'যে লোক সামর্থ্যবান হয় না...'আল্লাহ্র এই কথার ব্যাখ্যা করেছেন 'তার মালিকানায় স্বাধীনা মেয়ে তার মালিকানায় না থাকা বা না হওয়া' আর সামর্থ্য থাকা অর্থ, তার বিবাহাধীন স্বাধীনা মেয়ে থাকা বলে। এই ব্যাখ্যা খুবই সঙ্গত। কেননা স্বাধীনা মেয়ে যার স্ত্রী নয়, সে স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্যবান নয়। কেননা সে তা লাভ করতে পারেনি। তাকে সঙ্গম করতে সে সক্ষম নয়, ফলে তাঁর মতে সামর্থ্য থাকার অর্থ, স্বাধীনা মেয়ে সঙ্গম করার মালিকানা থাকা। এই ব্যাখ্যা উত্তম সেই ব্যাখ্যার তুলনায়, যাতে বলা হয়েছে স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য বলে। কেননা ধন-সম্পদের ক্ষমতাই সঙ্গমের মালিকানা হওয়া নিশ্চিত করে না। তা নিশ্চিত হয় তাকে বিয়ে করার পর। তাই সামর্থ্য হওয়া সঙ্গমের মালিকানা থাকা অবস্থায় একটি বিশেষ অবস্থা সেই মাল-সম্পদ পাওয়ার তুলনায় যার দ্বারা তাকে বিয়ে করতে পারে। তার প্রমাণ হল, স্ত্রী সঙ্গমের মালিকানার একটা প্রভাব পাওয়া যায় অপর মেয়ে বিয়ে করা নিষিদ্ধ হওয়ায়। অথচ ধন-মাল থাকায় আমরা সেই বিশেষত্ব দেখতে পাই না। তাই দাসী বিয়ে করা নিষিদ্ধ হওয়ায় ধন-মাল থাকার গুরুত্ব যখন লক্ষণীয়, তখন ইমাম ইউসুফের ব্যাখ্যা স্বাধীনা মেয়ে সঙ্গমের সামর্থ্য বলে ধন-মালের মালিকানা হওয়ার ব্যাখ্যার তুলনায় অনেক বেশি সহীহ্।

যদি বলা হয়, যিহারের মুকাবিলার মূল্য থাকা যিহারের মালিকানা হওয়ার সমান হয়ে থাকে। তাহলে স্বাধীনা মেয়ের মহরানা দেয়ার মাল মওজুদ থাকা তাকে বিয়ে করার সম্ভব হওয়ার সমতুল্য হবে না কেন?

জবাবে বলা যাবে, এটা ঠিক নয়। কয়েকটি কারণেই তা গ্রহণযোগ্য। তার একটি হচ্ছে তুমি তার এমন অর্থ মনে কর না, যা স্বাধীনা ও দাসী মেয়ে স্ত্রীরূপে একত্রিত করা অনিবার্য করে দেবে। আর যে দলীল দ্বারা অর্থ বা তাৎপর্যের সহীহ্ হওয়া প্রমাণ করে— তাছাড়া বিপরীত মতের আর যে দাবি আছে, তা অগ্রাহ্য হওয়ার যোগ্য। আর দ্বিতীয়, সে অর্থ গ্রহণ করা হলে কোন মেয়ের মহরানা হাতে থাকলেই তার মা বা বোন বিয়ে করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে তাকে বিয়ে করার মতই হয়ে যাবে। কিন্তু সেটা সে রকম হয় না। আর হয় না বলেই তোমার কথার অযৌক্তিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠে। তাছাড়া 'গলা' বিবাহের দৃষ্টান্ত নয়। কেননা رقبه তার গলাকে ফরয করে। তার পাওয়ার পর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া জায়েয নয়। অথচ পুরুষটির নিকট তার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সে বিয়ে না-ও করতে পারে। অবস্থা যখন এই, তখন গলার মূল্য মালিকানায় থাকা তার বর্তমান হওয়ার সমান হবে যখন তা ফরয হবে। সম্ভাব্যতা অনুযায়ী তাকে মুক্ত করা ফরয হবে। আর বিয়ে ফরয নয় বলে সে পর্যন্ত পৌঁছা মহরানা থাকার কারণে তার জন্যে বাধ্যতামূলকও নয়। এক্ষণে মালিকানায় মহরানা থাকার কোন প্রভাব হতে পারে না দাসী বিয়ে করা নিষিদ্ধ হওয়ায়। বরং যার নিকট তা আছে, তার নিকট তা না-থাকারই সমান। আমাদের ফিকাহবিদগণ শুধু বলেছেন স্বাধীনা মেয়ে স্ত্রী থাকা অবস্থায় দাসী বিয়ে করবে না। কেননা আল-হাসান ও মুজাহিদ নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন,তিনি বলেছেনঃ لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ স্বাধীনা মেয়ে স্ত্রী থাকলে তার উপর দাসী মেয়ে বিয়ে করা যাবে না। এ হাদীস যদি বর্ণিত না হতো, তাহলে স্বাধীন স্ত্রীর উপর দাসী বিয়ে করা

নিষিদ্ধ হতো না। কেননা কুরআনে তা নিষিদ্ধ হওয়ার কোন দলীল নেই। কিয়াস বরং তা মুবাহ প্রমাণ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা হাদীসকেই মেনে নিয়েছেন।

## আহ্‌লি কিতাব দাসী বিয়ে করা

আবূ বকর বলেছেন, উক্ত বিষয়ে মনীষিগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। আল-হাসান, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে আবদুল আযীয ও আবূ বকর ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ মরিয়াম থেকে আহ্‌লি কিতাব দাসী বিয়ে করা মকরূহ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। সওরীও সেই মত দিয়েছেন। অন্যান্যদের মধ্যে আবূ মায়সারাতা বলেছেন, আহ্‌লি কিতাব দাসী বিয়ে করা জায়েয। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ ও জুফারও এমত প্রকাশ করেছেন। আবূ ইউসুফ থেকে আর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি কিতাবী দাসী বিয়ে করা মকরূহ মনে করেন, যদি তার মনিব কাফির হয়। অবশ্য বিয়েটা জায়েয। সম্ভবত তিনি একথাই মনে করেছেন যে, তার সন্তান তো সেই কাফির মনিবেরই দাস হবে। অথচ সে সন্তান পিতা মুসলিম হওয়ার কারণে মুসলিম হবে। মুসলিম ক্রীতদাস কোন কাফির ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করা যেমন মকরূহ, এ-ও ঠিক তেমনি। ইমাম মালিক, আওজায়ী, শাফেয়ী ও লায়স ইবনে সা'দ বলেছেন— না, এ বিয়ে জায়েয নয়।

তবে তা জায়েয হওয়ার দলীল হচ্ছে সেই সব কিছুই, যা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি। পূর্ব অলোচনায় যে আয়াতের উল্লেখ করা হয়েছে, তা তো সাধারণ তাৎপর্য পেশ করে এবং স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দাসী বিয়ে করা জায়েয প্রমাণ করে। কিতাবী দাসী বিয়ে করা জায়েয, একথাও সেই আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত। তা যে-কোন মুসলিম মেয়ে বিয়ে করার মতই ব্যাপার। তবে বিশেষভাবে এখানকার আলোচ্য বিষয়ের দলীল হিসেবে উল্লেখ হচ্ছে এ আয়াত ঃ

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوالْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ -

এবং তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রাপ্ত লোকদের সংরক্ষিতা মেয়েরাও ...... (সূরা মায়িদা ঃ ৫)

জারীর, লায়স, মুজাহিদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ 'তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রাপ্ত লোকদের সংরক্ষিতা মেয়েরা ....' আল্লাহ্‌র এ কথার অর্থ হল তাদের পাক-পবিত্র সতীত্ব-সম্পন্ন মেয়েরা। হুশাইম মতরফ শ'বী সূত্রে এ আয়াতাংশের তাৎপর্য বর্ণনা করে বলেছেন ঃ সে মেয়েদের পবিত্রতা-সতীত্ব হচ্ছে দৈহিক না-পাকি থেকে তাদের গোসল করা এবং তাদের যৌনাঙ্গকে যিনা থেকে রক্ষা করা। এতে প্রমাণিত হল, احصان নামটি কিতাবী মেয়েদেরকেও বোঝায়। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -

এবং পরস্ত্রীরা, তবে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যে মেয়েদের মালিক হয়েছে।

এ আয়াতে দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্ত মেয়েদেরকে محصنت থেকে বাইরে গণ্য করা

হয়েছে। বোঝা গেল, محصنت শব্দ তাদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য। অন্যথায় তাদেরকে এ আয়াতে আলাদা করা হতো না। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ -

যখন তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হল, তার পর যদি তারা কোন নির্লজ্জতার কাজ— যিনা— করে ......'

এ আয়াতে احصان শব্দটি দাসীদের জন্যেও ব্যবহৃত হয়েছে। আর যখন জানা গেল যে, محصنت নাম স্বাধীনা ও দাসী কিতাবী মেয়েদেরকেও শামিল করে এবং আল্লাহ্ কিতাবী সংরক্ষিতা মেয়েদের বিবাহকে মুক্ত রেখেছেন এবং 'তোমাদের পূর্বে কিতাবপ্রাপ্ত লোকদের সংরক্ষিতা মেয়েরা ....' বলে, তখন সে হুকুমটি তাদের মধ্যকার স্বাধীনা ও দাসী সব মেয়েই সাধারণভাবে তাতে গণ্য মনে করতে হবে।

এর জাবাবে ওরা যদি আল্লাহ্র এ কথাটি ঃ وَلَا تَنْكِحُوْا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ -'এবং মুশরিক মেয়েরা ঈমান গ্রহণ না করা পর্যন্ত তোমরা বিয়ে করো না' দলীল হিসেবে পেশ করে এবং এ কিতাবী মেয়েকেও মুশরিক মনে করা হয়, তাহলে এবং অপর আয়াতে যে বলা হয়েছে ঃ 'মুমিন সংরক্ষিতা মেয়েদের বিয়ে করার সামর্থ্য যারা পায় না, তাহলে তোমাদের মুমিন যুবতীদের মধ্যে যারা তোমাদের দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্ত হবে তাদের বিয়ে কর'— এতে কেবলমাত্র মুসলিম ক্রীতদাসীদের বিয়ে করাই চূড়ান্ত কথা হয়ে দাঁড়ায়। কিতাবীরা তার মধ্যে শামিল হয় না। তাহলে কিতাবী ক্রীতদাসীদের বিবাহ করা নিষিদ্ধ থেকে যায়।

জবাবে বলা যাবে, 'মুশরিক' শব্দটি কিতাবীদের শামিল করে না। তা শুধু মূর্তি-পূজারীদেরই শামিল করে— বোঝায়। তাদের ছাড়া অন্যদের বোঝায় না। কেননা আল্লাহ্ নিজেই তাদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। বলেছেন ঃ

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ -

আহ্লি কিতাবদের মধ্যে যারা কাফির হয়ে গিয়েছিল এবং মুশরিকরা নিজেদের কুফর ও শির্ক থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিরত হতে প্রস্তুত ছিল না। (অথবা এর অনুবাদ হবে ঃ আহলি কিতাব ও মুশরিকদের কাফির হওয়া লোকেরা ...) (সূরা বাইয়্যেনাত ঃ ১)

এ আয়াতে 'মুশরিক' শব্দ সংযোজিত হয়েছে আহলি কিতাব-এর উপর। এতে মুশরিক শব্দ মূর্তিপূজারীদের বুঝিয়েছে, অন্য কাউকে নয়। তাই কিতাবী মেয়ে বলতে মুশরিক মেয়েরা বোঝায় না। তাই এ আয়াতটি কিতাবী দাসীদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল হিসেবে পেশ করা জায়েয নয়। তাছাড়া বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদদের এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই যে, 'এবং তোমাদের পূর্বে কিতাবপ্রাপ্তদের সংরক্ষিতা মেয়েরা' এ কথাটি 'এবং তোমরা মুশরিক মেয়েদের বিয়ে করো না' কথাটিকে কেটে দিয়েছে। কেননা কিতাবী মুক্ত স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। অতএব হয় 'মুশরিক মেয়েদের বিয়ে করো না' কথাটি কিতাবী মূর্তি-পূজারীদেরও শামিল করবে অথবা তা

কেবলমাত্র মূর্তিপূজারী মেয়েদেরকেই বোঝায়, কিতাবী মেয়েদের শামিল করবে না যদি তা কেবল মূর্তিপূজারী মেয়েদেরকেই বোঝায়, কিতাবী মেয়েদেরকে তাতে শামিল না করে, তাহলে প্রশ্ন দাঁড়াবে সেখান থেকে নেমে এসে। তখন তাও ব্যবহৃত হবে অথবা মুশরিক মেয়েদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ হবে মুবাহ হওয়ার পরবর্তী ব্যাপার এবং পরিত্যক্ত বিষয়। কেননা তাতে কিতাবী মেয়েদের বিয়ে করা নিষেধকারী তাতে কিছু নেই। আর এ প্রয়োগ যদি উভয় ধরনের মেয়েদেরকে একত্রিত ও শামিল করে, বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করলে তা-ই হয়— তাহলে তাঁরা সকলে এ ব্যাপারে একমত যে, সে কথাটি 'এবং তোমাদের পূর্বে কিতাবপ্রাপ্ত লোকদের সংরক্ষিতা-পবিত্রা মেয়েরা' কথার উপর বিন্যস্ত। কেননা তাদের মধ্যকার স্বাধীনা মেয়েদের সম্পর্কেও সে শব্দটির ব্যবহারে সকলেই একমত। অবস্থা যখন এই, তখন হয় দুটি আয়াতই একসঙ্গে নাযিল হয়ে থাকবে অথবা কিতাবী দাসীদের বিয়ে করা মুবাহ্ হওয়ার কথা মুশরিক দাসীদের বিয়ে নিষিদ্ধ করার পরবর্তী পর্যায়ের ব্যাপার হবে। অথবা মুশরিক মেয়ে বিয়ের নিষেধ পরবর্তী ব্যাপার হবে কিতাবী মেয়ে বিয়ে করার মুবাহ্ হওয়া থেকে।

যদি দুটি আয়াতই একসাথে নাযিল হয়ে থাকে, তাহলে সে দুটিই একত্রে ব্যবহৃত হবে— মুশরিক মেয়ে বিয়ে করা নিষেধ। কিতাবী মেয়ে বিয়ে মুবাহ হওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। অথবা কিতাবী মেয়ে বিয়ে করার উপর কিতাবী মেয়ে বিয়ে করা প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি তাই হয় তাহলে তা কিতাবী মেয়ের বিয়ে মুবাহ্ হওয়ার উপর স্থাপিত হবে। তাহলে সমস্ত অবস্থায়ই মুবাহ হওয়া ব্যবহৃত অবস্থা যেমনই পরিবর্তিত হোক-না-কেন। আর 'তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রাপ্তদের সংরক্ষিতা মেয়েরা' আয়াতটি মুশরিক মেয়ে বিয়ে করা হারাম হওয়ার পরে নাযিল হয়েছে। কেননা মুশরিক মেয়ে বিয়ে করা নিষেধের আয়াত সূরা আল-বাকারায় রয়েছে এবং কিতাবী মেয়ে বিয়ে করা মুবাহ হওয়ার আয়াত সূরা আল-মায়েদায় বিধৃত। আর তা সূরা আল-বাকারার পরে নাযিল হয়েছে। অতএব তা মুশরিক মেয়ে বিয়ে করা হারাম করণের ফয়সালাকারী হবে— যদি 'মুশরিকাত' নাম কিতাবী মেয়েদেরও শামিল করে। পরে কিতাবী মেয়ে বিয়ে মুবাহ্ প্রমাণকারী আয়াত যখন তাদের স্বাধীনা মেয়ে ও দাসী মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য করেনি, তখন এ সাধারণ কথা তাদের উভয় শ্রেণীর শামিল করে। অতএব উভয় ক্ষেত্রেই তার প্রয়োগ একত্রে এ একসাথে হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং কিতাবী স্বাধীনা মেয়ের উপর মুশরিক মেয়ে বিয়ে করা হারাম হওয়া নিয়ে কোন আপত্তি তোলা যেতে পারে না। যেমন তা নিয়ে কোন আপত্তি তোলা যেতে পারে না তাদের মধ্য থেকে স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করার উপর।

তবে আল্লাহ্ 'তোমাদের মুমিন যুবতীদের থেকে' কথাটিতে মুমিন ক্রীতদাসীদের বিশেষ ও আলাদা করে নিয়েছেন। আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় বিস্তারিত বলে এসেছি, কোন কিছু বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলে তা একথা প্রমাণ করে না যে, যা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় নি তার হুকুম বুঝি বিশেষভাবে উল্লেখকৃত থেকে ভিন্নতর কিছু । না, তা নয়।

যদি বলা হয়, 'তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রাপ্তদের সংরক্ষিতা মেয়েরা' আল্লাহ্র এ কথাটি নিকাহ মুবাহ প্রমাণকারী দলীলরূপে পেশ করা সহীহ নয়। তা এই জন্যে যে, احصان একটা এজমালী ও সার্বজনীন শব্দ। তাতে বিভিন্ন অর্থ শামিল রয়েছে। তা সাধারণত্ব সম্বলিত নয় যে, তার শব্দের দাবির উপরই তা কার্যকর হবে। বরং তা এজমালী, তার হুকুমটা

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল। তাই তার যে ব্যাখ্যা 'তওকীফ' সূত্রে বা ঐকমত্যের ভিত্তিতে পাওয়া যাবে, সেদিকেই আমরা চলে যাব। আর আয়াতটির হুকুম তারই মধ্যে সীমিত। যে বিষয়ে ব্যাখ্যা আসেনি, তা এজমালীই রয়ে গেছে। অতএব তার সাধারণত্বকে কোন দলীল বানানো সহীহ্ হবে না। আর সকলেই যখন এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, কিতাবী স্বাধীনা মেয়েই তার তাৎপর্য, তখন আয়াতটিকে সেই তাৎপর্যেই ব্যবহার করা আমাদের কর্তব্য। আর কিতাবী দাসীদের বোঝানোর কোন প্রমাণ যখন পাওয়া যায়নি, তখন তা প্রমাণের জন্য ভিন্ন এক দলীল দাঁড় করা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।

জবাবে বলা যাবে, আগেরকালের মনীষীদের এক জামা'আত 'কিতাব প্রাপ্তদের সংরক্ষিতা মেয়ারা' এ কথাটির তাৎপর্যে বলেছেন, এখানে তাদের মধ্য থেকে পবিত্রসতী মেয়েদের বুঝিয়েছেন। কেননা احصان -এর অর্থ পবিত্রতা— সতীত্বও হয়, তখন শব্দের সাধারণ তাৎপর্য হিসেবে সকল সতী-পবিত্র চরিত্রের মেয়েদের গণ্য করতে হবে। কেননা এই احصان শব্দ দ্বারা নৈতিক পবিত্রতা ও পবিত্রতাই প্রমাণিত হয়েছে। এ ছাড়াও আরও যত প্রকারের সংরক্ষণতা রয়েছে, একথার দলীল পাওয়া যায়নি যে, তাও এর তাৎপর্যের মধ্যে শামিল। মনীষীরা এ বিষয়ে একমত যে, এই احصان -এর শর্তে তার সমস্ত শর্ত পূর্ণ হওয়া জরুরী নয়। তাই এ নামটি যেখানে যেখানে ব্যবহৃত হয় এবং তা-ই বোঝানো হয়েছে বলে সকলেই একমত হবেন, আমরা তাকেই প্রতিষ্ঠিত করব। তা ছাড়া যা, মুবাহ্ হওয়ার শর্তে তা প্রমাণিত হওয়ার জন্যে একটি দলীলের অবশ্যই প্রয়োজন হবে।

যদি বলা হয়, احصان শব্দে কেবল স্বাধীনা মেয়ে বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়, তাহলে 'তোমাদের পূর্বে কিতাব পাওয়া লোকদের সংরক্ষিতা মেয়েরা' আল্লাহ্র এ কথা কেবল স্বাধীন কিতাবীদের বুঝিয়েছে তা তুমি অস্বীকার করছ কেন?

জবাবে বলা যাবে, এখানে ব্যবহৃত الاحصان শব্দ তার সমস্ত শর্ত পূরণ হওয়া বোঝায় নি, একথা যখন জানাই আছে, তখন الاحصان শব্দটির তাৎপর্য সীমাবদ্ধ করা— কতকে তা ব্যবহৃত হয় আর কতকে ব্যবহৃত হয় না বলে পার্থক্য করা কারোর জন্যেই জায়েয হবে না। বরং এ নামটি যখন কোন একটি দিক দিয়েও তা শামিল করে, তখন তাতে তার সাধারণত্বকে গণ্য করাই কর্তব্য। 'দাসী'কেও احصان শব্দটি যখন শামিল করে সাধারণভাবে কোন কোন দিক দিয়ে তা সতীত্ব ও নৈতিক পবিত্রতার ও অন্যান্য দিক দিয়ে, তখন শব্দের সাধারণত্ব ও ব্যাপকতা তাতে গণ্য করা অবশ্যই জায়েয হবে। আর احصان শব্দ যদি কেবলমাত্র স্বাধীনা মেয়ের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হয়, অন্যদের শামিল না করে, তাহলে তুমি ব্যতীত অন্য লোকদের জন্যে কেবল নৈতিক পবিত্রতা বোঝাতে সীমাবদ্ধ করা ও অন্য কিছু তাতে গণ্য না করা অবশ্যই জায়েয হবে। আর কোন শব্দের হুকুম যদি সাধারণভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়, তাহলে সে হুকুমকে এজমালী বানানো জায়েয হবে না। অথচ আল্লাহ্ احصان নামটি দাসীর উপরও ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ্ বলেছেন:

فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ -

তারা বিবাহ-দুর্গে সুরক্ষিতা হওয়ার পর যদি কোন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে তাদের জন্যে নির্দিষ্ট শাস্তির মাত্রা সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুক্ত নারীদের জন্যে নির্দিষ্ট শাস্তির অর্ধেক।

মনীষীদের কেউ কেউ বলেছেন ঃ এখানে احصن। অর্থ, তারা যখন ইসলাম কবুল করবে। অন্যরা বলেছেন ঃ তারা যখন বিবাহিতা হবে। অতএব তাদের জন্যে শাস্তি নির্ধারণের এ সাধারণত্বকে অবশ্যই গণ্য করতে হবে। আর মুমিনদের সংরক্ষিতা মেয়েরা আয়াতের তাৎপর্য احصان-এর সমস্ত শর্ত পূরণ হওয়ার কথা বলতে চাওয়া হয়নি। বরং নৈতিক ও যৌনাঙ্গের পবিত্রতা ও সতীত্ব বোঝাতে চাওয়া হয়েছে। আর যে সব মেয়ের স্বামী আছে, তারা হারাম হয়েছে এবং বিবাহ-দুর্গে সংরক্ষিতা মেয়ে বা তোমাদের দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্তদের ছাড়া। কথাটি দ্বারা অর্থাৎ যেসব মেয়েলোকের স্বামী আছে, সাধারণভাবে তারা সকলেই হারাম। তবে তাদের থেকে যাদেরকে আলাদা করা হয়েছে, তাদের কথা আলাদা। 'তোমাদের পূর্বে যারা কিতাব পেয়েছে তাদের সংরক্ষিতা মেয়েরা' এ কথাটিও তেমনি। এখানে احصان। শব্দের উল্লেখ তার সাধারণত্বকে গণ্য করতে নিষেধ করে না। তাদের ক্ষেত্রে যাদের উপর এই নামটি নৈতিক পবিত্রতার দিক দিয়ে ব্যবহৃত হতে পারে। এ কথাই আগেরকালের মনীষীদের থেকে বর্ণিত হয়েছে।

চিন্তা-বিবেচনার দিকদিয়ে বলা যায়, দক্ষিণ হস্তের মালিকানাসূত্রে কিতাবী দাসীদের সাথে সঙ্গম করা মুবাহ হওয়ার ফিকাহবিদদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। আর দক্ষিণ হস্তের মালিকানা সূত্রে যার যার সাথে সঙ্গম জায়েয, বিবাহের মাধ্যমেও তার তার সাথে সঙ্গম করা জায়েয। যেমন করে স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীনা মুক্ত মেয়ে বিয়ে করা জায়েয। মুসলিম মেয়ের সাথে সঙ্গম করা যখন দক্ষিণ হস্তের মালিকানা সূত্রে জায়েয, তখন তাকে বিয়ে করা ও সঙ্গম করাও জায়েয। আর দুধ-বোন, স্ত্রীর মা, পুত্রের স্ত্রী এবং পিতার বিবাহিতা মেয়ে— এদের কারোর সাথে দক্ষিণ হস্তের মালিকানা সূত্রেও সঙ্গম করা জায়েয নয়, যেমন তাদেরকে বিয়ে করে সঙ্গম করা হারাম। তাই কিতাবী দাসীর সাথে সঙ্গম করা দক্ষিণ হস্তের মালিকানাসূত্রে যখন জায়েয হওয়া সম্পর্কে সকলেই একমত, তখন বিবাহের মাধ্যমে তার সাথে সঙ্গম করা অবশ্যই জায়েয হবে।— যেমন করে স্বতন্ত্র স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করে তার সাথে সঙ্গম করা জয়েয।

যদি বলা হয়, দক্ষিণ হস্তের মালিকানা সূত্রে কিতাবী দাসীর সাথে সঙ্গম তো জায়েয কিন্তু বিয়ের মাধ্যমে তা করা জায়েয নয় যেমন তার অধীন স্বাধীনা মেয়ে স্ত্রী হিসেবে থাকলে কিতাবী দাসী বিয়ে করা জায়েয নয়।

জবাবে বলা যাবে, আমরা যা বলেছি তাকে সর্বাবস্থায় বিবাহ করা জায়েয হওয়া 'ইল্লাত' বানাচ্ছি না। আমরা তাকে 'ইল্লাত' বানিয়েছি, তাকে স্বতন্ত্রভাবে বিয়ে করা জায়েয হওয়ার— অন্যদের সাথে একত্রিত করে নয়। যেমন মুসলিম দাসীর সাথে দক্ষিণ হস্তের মালিকানা সূত্রে তার সাথে সঙ্গম করা জায়েয, তাকে এককভাবে বিয়ে করাও জায়েয। তার অধীন স্বাধীনা স্ত্রী থাকলেও তাকে (দাসীকে) বিয়ে করা জায়েয। কেননা তাকে বিয়ে করলে স্বাধীনা স্ত্রীর সাথে বিয়ের মাধ্যমে তাকে একত্রিত করা জায়েয নয়, যেমন স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করে একত্রিত করা জায়েয নয়, যদি তার বোন দাসী হয় তবুও। আমরা কারণ নির্ধারণে এক সহীহ্, স্থায়ী ও

চলমান নীতি গ্রহণ করেছি। তুমি যা বলেছ তা তার জন্যে বাধ্যতামূলক নয়। তাকে স্বতন্ত্রভাবে— অন্য কারোর সাথে একত্রিত না করে বিয়ে করা জায়েয হওয়া লক্ষ্যবস্তু হিসেবে সুনির্দিষ্ট।

## দাসীকে তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করা

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ -

তোমরা তাদেরকে বিয়ে কর তাদের মালিকদের অনুমতিক্রমে।

আবূ বকর বলেছেন, এ কথার দাবি হচ্ছে, দাসীকে তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করলে সে বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা তাদের আহ্‌ল'-এর অনুমতিক্রমে বিয়ে কর' প্রমাণ করে যে, তাদের বিয়ে জায়েয হওয়ার শর্ত হচ্ছে অনুমতি লাভ। যদিও বিয়ে ওয়াজিব নয়। একথাটি ঠিক একথাটির মতই, যেমন নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ اَسْلَمَ فَلْيُسْلِمْ فِىْ كَيْلٍ مَّعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُوْمٍ اِلٰى اَجَلٍ مَّعْلُوْمٍ -

যে বাকী মূল্যে পণ্য ক্রয় করল সে যেন তা জানা মাপে ও জানা ওজনে ও জানা মেয়াদ পর্যন্তের জন্যে ক্রয় করে।

'সিল্‌ম' ওয়াজিব নয়। কিন্তু যখন তা করা হবে, তখন হাদীসে উল্লিখিত এসব শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে। বিয়েটাও তদ্রূপ। যদিও তা অনিবার্য ও বাধ্যতামূলক নয়; কিন্তু যখন দাসী বিয়ে করার ইচ্ছা করবে, তখন দাসীর মনিব ও মালিকের অনুমতি না নিয়ে করবে না। নবী করীম (স) থেকে এ তাৎপর্যই বর্ণিত হয়েছে দাসের বিয়ে পর্যায়ে। আবদুল বাকী ইবনে কানে', মুহাম্মদ ইবনে শাযান, মুয়াল্লা, আবদুল ওয়ারিস, আল-কাসিম ইবনে আবদুল ওয়াহিদ, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ, ইবনে আকীল, জাবির সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন ঃ 'দাস যদি তার মনিবের অনুমতি না নিয়ে বিয়ে করে, তাহলে সে যিনাকার।'

আবদুল বাকী মুহাম্মাদ ইবনুল খাত্তাবী, আবূ নয়ীম আল ফযল ইবনে দকীন, আল-হাসান ইবনে সালিহ, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আকীল সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্‌কে বলতে শুনেছি, রাসূল (স) বলেছেন ঃ যে দাস তার মনিবের অনুমতি ছাড়াই বিয়ে করবে, সে ব্যভিচারী। উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর নাফে'— ইবনে উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ ক্রীতদাসের তার মনিবের অনুমতি ব্যতিরেকে বিয়ে করা সুস্পষ্ট যিনা। হুশাইম ইউনুস নাফে' সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ইবনে উমর (রা)-এর একজন দাস তাঁর অনুমতি না নিয়ে বিয়ে করলে পুরুষ-নারী উভয়কেই খুব করে পিটিয়ে ছিলেন এবং দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিলেন এবং দাসটি দাসীকে যা দিয়েছিল তা সবই কেড়ে নিয়েছিলেন।

আল-হাসান, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, ইবারাহীম ও শ'বী বলেছেন, দাস যদি মনিবের অনুমতি ব্যতিরেকে বিয়ে করে, তাহলে ব্যাপারটি তার মনিবের ইখতিয়ারে চলে যাবে। ইচ্ছা করলে অনুমতি দেবে, ইচ্ছা করলে তা প্রত্যাখ্যান করবে। আতা বলেছেন, মনিবের অনুমতি ব্যতীত দাসের বিয়ে করা যিনা নয়। তবে সুন্নাহ পরিপন্থী। কাতাদাহ খালাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা)-এর একটি গোলাম তার মনিবের অনুমতি না নিয়ে বিয়ে করেছিল। পরে ব্যাপারটি হযরত উসামন (রা)-এর সমূখে পেশ হয়। তিনি উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দেন এবং দাসীকে পঞ্চাশ দিলেন ও তিন পঞ্চমাংশ নিয়ে নিলেন।

আবূ বকর বলেছেন, আমরা এখানে যা বললাম, তাতে আগের মনীষীদের ঐকমত্য রয়েছে। এদের দুজনের উপর কোন দণ্ড কার্যকর করা হবে না। যদিও ইবনে উমর (রা) থেকে 'হদ্দ' আরোপের কথা বর্ণিত হয়েছে। হতে পারে, তিনি তা'জীর হিসেবে দুজনকে দোররা মেরেছেন, 'হদ্দ' হিসেবে নয়। বর্ণনাকারী তাকে 'হদ্দ' মনে করেছেন। আলী ও উমর (রা) ইদ্দতের মধ্যে বিবাহিতা সম্পর্কে এবং তার উপর 'হদ্দ' না হওয়া সম্পর্কে একমত হয়েছেন। সাহাবীদের মধ্যে কেউ তাদের থেকে ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। যে দাস তার মনিবের অনুমতি ব্যতীতই বিয়ে করেছে, তার ব্যাপার ইদ্দত পালনে রত মেয়ের বিবাহ করার তুলনায় অনেকটা হালকা। কেননা তার বিবাহ সাধারণ তাবেয়ীন ও বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদদের অনুমতিপ্রাপ্ত। আর ইদ্দত পালনে রত মেয়েলোকটির বিবাহ কারোর নিকটই অনুমতি প্রাপ্ত নয়। ইদ্দত পালনেরও মেয়েলোকের বিবাহ সম্পূর্ণ হারাম। কুরআন মজীদের অকাট্য দলীল রয়েছে এ বিষয়ে।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ -

নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পৌছার আগে— না-পৌছা পর্যন্ত বিয়ের আক্‌দ করার সংকল্প করো না। (সূরা বাকারার ঃ ২৩৫)

আর দাসের বিয়ে (মনিবের অনুমতি ছাড়া) হারাম খবরে ওয়াহিদের মাধ্যমে প্রাপ্ত হাদীসের ভিত্তিতে। চিন্তা-বিবেচনায়ও তা যুক্তিসঙ্গত।

যদি বলা হয়, মনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহকারী ক্রীতদাসকে নবী করীম (স) যিনাকার বলেছেন। অথচ তিনি অপর হাদীসে বলেছেন ঃ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ 'যিনাকারের শাস্তি প্রস্তরের আঘাত।'

জবাবে তাকে বলা যাবে, 'যিনাকারের জন্যে প্রস্তর' রাসূল (স)-এর এ কথাটি দাসের ব্যাপারে নয়। কেননা দাস যিনা করলে সঙ্গেসার তার শাস্তি কখনই নয়। তাকে যিনাকার বলা হয়েছে পরোক্ষ অর্থে, যিনাকারের সাথে সাদৃশ্য প্রদর্শন স্বরূপ। কেননা সে এক নিষিদ্ধ সঙ্গমের দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নবী করীম (স) এক হাদীসে 'দুই চক্ষু যিনা করে' ও তো বলেছেন । কিন্তু এ তো প্রকৃত অর্থে নয়, পরোক্ষ অর্থে। দাস সম্পর্কে তাঁর উক্ত কথাও তেমনি। তিনি এ-ও তো বলেছেন ঃ যে গোলাম তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করবে সে

عاهر যিনাকার। কিন্তু সঙ্গম করার কথা বলা হয়নি। শুধু বিয়ে করলেই যে যিনাকারী হয় না, তাতো সর্বসম্মত কথা। তাই বোঝা গেল, উক্তরূপ কথা পরোক্ষ অর্থে ও যিনাকারের সাথে সাদৃশ্য স্পষ্টকরণ হিসেবে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَانْكِحُوْهُنَّ بِإِذْنِ اَهْلِهِنَّ -

দাসীদের বিয়ে কর তাদের মালিক-মনিবের অনুমতি নিয়ে।

এ কথা প্রমাণ করে যে, মেয়েলোকের জন্যে জায়েয আছে তার দাসীকে সে বিয়ে দেবে। কেননা اَهْلِهِنَّ শব্দের অর্থ তাদের মালিক-মনিব। আর হাদীসের মনিব-মালিকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে করা জায়েয নয়— এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই। আর মনিব-মালিকের ছাড়া অন্য কারোর অনুমতি কোন কাজে আসে না, তা গণ্যই হয় না। অবশ্য মালিক-মনিবের পূর্ণ বয়স্ক ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে। তার নিজের ধন-মালে হস্তক্ষেপ-ব্যয় ব্যবহার পূর্ণ জায়েয। এরূপ অবস্থায় কোন দাসের মালিক-মনিব যদি মেয়েলোক হয়, তাহলে তার-ই অনুমতি লওয়া প্রয়োজন হবে।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, মেয়েলোকের পক্ষে তার নিজের ক্রীতদাসীকে বিয়ে দিতে পারে না, তা জায়েয নয়। সে আর একজনকে এ কাজের জন্যে উকীল বানাবে। কিন্তু এ মত কুরআনের বাহ্যিক অর্থ প্রত্যাখ্যান করে। কেননা আল্লাহ্ মেয়েলোকের নিজের বিয়ে দেয়ার আক্দ করানো এবং তার পক্ষ থেকে অন্য কারোর করানোর মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। আর-ও প্রমাণ এই যে, মেয়েলোক যদি তার দাসীকে বিয়ে দেয়ার অনুমতি অন্য কাউকে দেয়, তবে তা-ও জায়েয হবে। কেননা এতে কার্যত সেই মেয়েলোকটিরই বিয়ে দেয়া হল। আর আয়াতের বাহ্যিক অর্থই দাবি করে যে, দাসীর বিয়ে তার মালিক-মুনিবের অনুমতিতে হতে হবে। তাই তার মনিব-মালিক যদি— সে পুরুষ হোক বা হোক মেয়েলোক— অন্য কাউকে উকীল বানায় তাকে বিয়ে দেয়ার জন্যে তবে তা-ও অবশ্যই জায়েয হবে। আয়াতের বাহ্যিক অর্থই তার অনুমতি দেয়, তা জায়েয ঘোষণা করে। যদি কেউ তা না-জায়েয বলে, তবে কোনরূপ দলীল ছাড়াই আয়াতের সাধারণ তাৎপর্যকে বিশেষ অর্থে গ্রহণ করা হবে, একটি অর্থে খাস করা হবে। উপরন্তু মেয়েলোক যদি তার দাসীর বিয়ের আকদ ঘটানোর অধিকারী না হয়, তাহলে তার পক্ষে কাউকে উকীল বানানো-ও জায়েয হবে না অন্য একজনকে বিয়ে দেয়ার জন্যে। কেননা কাউকে উকীল বানানো জায়েয হয় যে বিষয়ে তার মালিকত্ব আছে সেই বিষয়ে। তাহলে সে সব চুক্তিতে সে কাউকে উকীল বানাতে পারে না যার হুকুম-আহকাম মুয়াক্কিলের সাথে সংশ্লিষ্ট, উকীলের সঙ্গে নয়। আমাদের মতে তাকেও উকীল বানানো সহীহ যখন সে সেসব চুক্তিতে ভূমিকা পালন করবে যার হুকুম-আহ্কাম উকীলের সাথে সংশ্লিষ্ট, মুয়াক্কিলের সাথে নয়। যেমন ক্রয়-বিক্রয় ও ইজারা ইত্যাদির চুক্তি। তবে বিয়ের আক্দ করার জন্যে যদি কাউকে উকীল বানানো হয়, তাহলে তার হুকুমটা মুয়াক্কিলের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে, উকীলের সাথে নয়। যেমন বিয়ের উকীল মহরানা দিতে নিজে বাধ্য হয় না। স্বামীর নিকট স্ত্রীর যৌনাঙ্গ হস্তান্তর করারও কোন দায়িত্ব তার নয়। তাই মেয়েলোক যদি বিয়ের আক্দ করার

অধিকারী না হয়, তাহলে তার অপর কাউকে বিয়ে দেয়ার জন্যে কাউকে উকীল বানানো-ও জায়েয হবে না। কেননা বিয়ের চুক্তির হুকুমসমূহ উকীলের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তাই তার পক্ষে উকীল বানানো যখন জায়েয— এমতবস্থায় যে, তার হুকুম-আহ্‌কাম তার সাথে সশ্লিষ্ট, উকীলের সাথে নয়। তখন প্রমাণিত হল যে, সে নিজেই আক্‌দ করার অধিকারী। এটাও একটা দলীল এ বিষয়ের যে, স্বাধীনা মেয়ে নিজের বিয়ের আক্‌দ নিজেই করতে পারে, যেমন তার পক্ষে কাউকে সেজন্য উকীল বানানো-ও জায়েয। সে নিজে অভিভাবক হয়ে অন্য কাউকে তার দাসীকে বিয়ে দেয়ার জন্যে উকীল বানাতে পারে।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

এবং তাদের মহরানা যথা নিয়মে তাদেরকে দিয়ে দাও।

একথা প্রমাণ করে যে, দাসীকে যখন বিয়ে দেয়া হবে, তখন তার প্রাপ্য মহরানাও তাকে দিতে হবে। সে মহরানা নির্দিষ্ট করা হোক, কি না-ই হোক। কেননা মহরানা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে তার নির্ধারণ ও অনির্ধারণের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। আর একথাও বোঝা যায় যে, মহরানা নির্ধারিত করা না হলে সমপরিমাণ মহরানা ওয়াজিব হবে। আল্লাহ্‌র কথা بِالْمَعْرُوْفِ যথারীতি, ভালোভাবে। এ শব্দটি সাধারণত ইজতিহাদী বিষয় বোঝায়। বিজয়ী ধারণা, অভ্যাস ও সুপরিচিত রীতিও বোঝায়। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

এবং সন্তান যার তার কর্তব্য তাদের রিয্‌ক ও পরিধেয় দেয়া যথানিয়মে।

(সূরা বাকারাহ ঃ ২৩৩)

আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ 'এবং দাও তাদেরকে তাদের প্রাপ্য মহরানা'-এর বাহ্যিক দাবি হচ্ছে, মহরানা স্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করা ওয়াজিব। দাসীর ক্ষেত্রে মহরানা মনিবের প্রাপ্য। তার নিজের নিকট যাবে না। কেননা মনিব-ই তো তার মালিক, তার সাথে সঙ্গম করার নিরংকুশ অধিকারী, সে তা দাসীকে অন্য এক জনের নিকট বিয়ে দিয়ে তার সাথে সঙ্গম করার অধিকার তাকে দিয়েছে। অতএব মহরানা তারই প্রাপ্য হবে সেই অধিকার অন্যেকে দিয়ে দেয়ার বদল স্বরূপ। যেমন মালিক যদি দাসীকে অন্য কোন খেদমতের জন্য মজুরীর বিনিময়ে দেয়, তাহলে সে মজুরীটা মালিক-ই পাবে, দাসী নয়। বিয়ের মহরানাও তাই। তার কারণ, দাসী কোন কিছুর মালিক হতে পারে না। অতএব মহরানাও নিজের হস্তগত করার তার কোন অধিকার হবে না।

উদ্ধৃত আয়াতটির তাৎপর্য দুটি দিক দিয়ে বুঝতে হবে। হয় তার অর্থ দাসীদেরকেই মহরানা দিয়ে দেয়া মনিবের অনুমতিক্রমে। তাহলে তাকে মহরানা দেয়ার শুরুতেই সে অনুমতি আছে বলে মনে করতে হবে। যেমন বিয়ে দেয়া তা শর্তভুক্ত ছিল। তাহলে কথাটি এরূপ নেবে ঃ তোমরা দাসীদের বিয়ে কর তাদের মালিক-মনিবের অনুমতিক্রমে এবং তাদের মহরানা

তাদেরকেই দাও তাদের মনিবের অনুমতিক্রমে। একথা প্রমাণ করে যে, মনিবের অনুমতি ছাড়া তাদেরকে মহারানা দেয়া জায়েয নয়। কথাটি আল্লাহ্‌র এ কথাটির মতই ঃ

وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ –

এবং তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণকারী ও সংরক্ষণকারিণী। (সূরা আহযাব ঃ ৩৫)

এর অর্থ, মেয়েরা সংরক্ষণকারী তাদের নিজেদের লজ্জাস্থান যৌনাঙ্গের। এবং আল্লাহ্‌র কথাঃ

وَالذَّاكِرِيْنَ وَالذَّكِرَاتِ –

এবং যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারী মেয়েরা। (সূরা আহযাব ঃ ৩৫)

এর অর্থ, আল্লাহ্‌র যিকরকারী মেয়েরা। আয়াতের যে সর্বনাম রয়েছে তা প্রমাণ করছে যে, তারা নিজেরাই নিজেদেরকে বিয়ে দেয়ার মালিক নয়। মনিব-ই তাদের নিজেদের অপেক্ষা বড় মালিক তাদেরকে বিয়ে দেয়ার। আল্লাহ্‌র কথা ঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّايَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ –

আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত হিসেবে একজন ক্রীতদাসের উল্লেখ করেছেন যে মনিবের মালিকানাধীন, সে নিজে কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না। (সূরা নহল ঃ ৭৫)

এ আয়াতে দাসের মালিকানা সাধারণভাবেই অস্বীকার করা হয়েছে। আর এতেই দলীল রয়েছে এ কথার যে, দাসী তার মহরানা পাওয়ার অধিকারী নয়। সে তার মালিকও হতে পারে না।

আর দ্বিতীয় দিকটি হল, মহরানা দেয়ার কাজটি তাদের প্রতি হবে, এটাই কুরআনের আয়াতের বাহ্যিক অর্থ। কিন্তু আসল লক্ষ্য মনিবের নিকট দেয়া। যেমন ছোট বয়সের মেয়ে বা দাসীকে পিতা ও মনিবের অনুমতিক্রমে বিয়ে দিলে একথা বলা খুবই সঙ্গত হবে যে, এ দুজনের মহরানা দাও অর্থাৎ কন্যার পিতা বা মনিবকে দিয়ে দাও। কোন ইয়াতীমের যদি ঋণ থাকে কারোর উপর, ইয়াতীম তা হস্তগত করার অধিকারী হয় না বলে তার অভিভাবককে তা দিতে হবে। বলা যাবে ঃ ইয়াতীমকে তার হক দিয়ে দাও। আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ –

এবং দাও নিকটাত্মীয়কে তার হক্ এবং মিসকীন ও নিঃস্ব পথিককে (তার হক)।
(সূরা বনী ইসরাইল ঃ ২৬)

এতে এ পর্যায়সমূহের ছোট ও বড় বয়সের সব লোকই এর মধ্যে শামিল। তাই ছোটদের অভিভাবককে দিলে তাদেরকে দেয়া হবে। এরূপ واتوهن ‘এবং দাও তাদেরকে’ বলে তাদের মনিবকে দেয়ার কথা বুঝিয়েছেন। কেননা সে-ই তার পাওনাদার।

ইমাম মালিকের কোন কোন সঙ্গী বা ছাত্র ধারণা করেছেন যে, দাসী-ই তার মহরানা হস্তগত করার অধিকারী। মনিব যদি তাকে কোন খিদমতের কাজের মজুরীর বিনিময়ে দিয়ে

দেয়, তাহলে মজুরীটা সে-ই পাওয়ার অধিকারী, দাসী নয়। আর মহ্‌রানার ক্ষেত্রে তাদের দলীল হল আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'এবং তাদেরকে দাও তাদের মজুরী।' এ আয়াতের তাৎপর্য আমরা পূর্বে বলে এসেছি। বিশেষ করে এ জন্যে যে, মহ্‌রানা তো তার জন্যেই ওয়াজিব হয়। কেননা তা তার নিজের যৌনাঙ্গের বিনিময়। অতএব তার প্রাপ্য মজুরীও তারই প্রাপ্য, তাকেই দিতে হবে। কেননা সে যে কল্যাণ করেছে, মজুরী তারই বিনিময়। তার এ হিসেবে যে, তার মনিব তার কল্যাণময় কাজের মালিক, যেমন তার যৌনাঙ্গের মালিক সে-ই। তাই সে যে মজুরী পাওয়ার অধিকারী হবে— অর্থাৎ তার মনিব— সেই-ই তার মহ্‌রানা হস্তগত করার অধিকারী হবে, দাসী নয়। কেননা তা মনিবের মালিকানার বিনিময়, তার নিজের মালিকানার বিনিময় নয়। তার নিজের যৌনাঙ্গের সুখ-স্বাদ ভোগের অধিকারী সে— মনিব। তার দেহে শ্রমের যে মুনাফা ও অর্জন, তাও মনিবের প্রাপ্য। উভয় ক্ষেত্রেই আসল চুক্তি সম্পাদনকারী হচ্ছে মনিব। তার দ্বারাই ইজারা ও নিকাহ দুটোই সম্পন্ন হয়, সম্পূর্ণতা পায়। অতএব এ দুটির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

এই মনের লোক বলেছেন, কোন কোন ইরাকী ফিকাহবিদ মনিব নিজে তার দাসীকে তার দাসের নিকট মহ্‌রানা ছাড়াই বিয়ে দিতে পারে, তা জায়েয বলে মত দিয়েছেন। কিন্তু এ মত কুরআন মজীদের ঘোষণার সম্পূর্ণ বিপরীত। আবূ বকর বলেছেন, আমাদের বিপরীত মতের লোকদের কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত মতের উপর কতই না দৃষ্টতা ! তারা কথার উপর জোর দিয়েছে, কিন্তু শব্দ হারিয়ে ফেলেছে। আমি বলব, তাদের দাবি এমন যে, তা প্রমাণ করার কোন পথ নেই। এ মতের লোক যদি মনে করে থাকে যে, মনিব মহ্‌রানা নির্ধারণ না করেই তার দাসীকে তার দাসের নিকট বিয়ে দিলে তা জায়েয হবে, তাহলে বলব, আল্লাহ্‌র কিতাবই তা জায়েয হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। বলেছে ঃ

لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْتَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً -

তোমরা যদি স্ত্রীদের স্পর্শ করা কিংবা তাদের জন্যে মহ্‌রানা নির্ধারণ করার পূর্বেই তাদেরকে তালাক দাও তাহলে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ হবে না। (সূরা বাহারাহ ঃ ২৩৬)

এতে মহ্‌রানা নির্ধারণ না করা বিয়েতে তালাক হওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। কাজেই তার কথা কুরআনের খিলাফ হওয়ার দাবিকে স্বয়ং কুরআন-ই মিথ্যা প্রমাণিত করেছে। যদি তাদের কথা এই হয় যে, সে মহ্‌রানার কথা বলেই না এবং কোনরূপ বিনিময় ছাড়া-ই বিয়ে মুবাহ মনে করে তাহলে বলব, কোন ইরাকী এরূপ কথা বলেছেন বলে আমাদের জানা নেই। হলে এ কথার বর্ণনাকারী দুইটি বাতিল কথা পেশ করেছে। একটি কুরআনের উপর দাবি। আর তার কথা যে কুরআনের খেলাফ তা আমরা আগেই বলেছি। আর দ্বিতীয়, তাদের কথা কোন কোন ইরাকী সম্পর্কে কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ-ই এ ধরনের কথা বলেন নি। বরং তাদের কথা হল, মনিব যদি তার দাসীকে তার দাসের নিকট বিয়ে দেয়, তাহলে মহ্‌রানা সে দাসীর প্রাপ্য হবে বিয়ের আক্‌দ হওয়ার কারণেই। কেননা কোনরূপ বিনিময় ছাড়া স্ত্রীর যৌনাঙ্গ মুবাহ হওয়া

সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। দ্বিতীয় পর্যায়ে তা পরিত্যক্ত হবে যখন তা পাওয়ার অধিকারী হবে স্বয়ং মনিবই। কেননা দাসী তা পেতে পারে না। মনিব-ই তার ধন-মালের একমাত্র মালিক। আর মনিবের জন্যে তার দাসের নিকট কোন ঋণ প্রাপ্য হতে পারে না। তাই এখানে দুটি অবস্থা। একটি— আক্দ করার অবস্থা। তখন দাসের উপর মহ্রানা দেয়া কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে। আর দ্বিতীয় অবস্থা, সে প্রাপ্যটা মনিবের দিকে চলে যাবে, মনিব হবে তার প্রাপক। আক্দ হয়ে যাওয়ার পর তখন তা পরিত্যক্ত হবে। যেমন কোন ব্যক্তির যদি অপর কোন ব্যক্তির নিকট টাকা পাওনা হয়, তখন সে তাকেই তা আদায় করে দিল। তখন এ মালের দুটি অবস্থা, তা হস্তগত করার অবস্থা। তখন সে তার মালিক হবে অনুরূপ মালের জামানত পেয়ে। পরে তা যার উপর পাওনা তার সমান সমান হয়ে যাবে। যেমন কোন ক্রয় কাজে নিয়োজিত উকীল সম্পর্কে আমরা বলি— ক্রয়কারীর দিকে তা চলে যাবে ক্রয়-চুক্তি হওয়ার দ্বারা। কিন্তু সে তার মালিক হবে না। তাই পরবর্তীতে তার মালিকানা মুয়াক্কিলের দিকে চলে যাবে। এ পর্যায়ে বহু দৃষ্টান্তই রয়েছে উল্লেখ করার মত।

অবশ্য তা বুঝতে সমর্থ হয় সে, যার ফিক্হী তাৎপর্য ও নিয়মাদি জানা আছে এবং ফিক্হবিদের নিকট শিক্ষা লাভ করেছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ -

বিবাহ-দুর্গে সংরক্ষিত, যিনাকার নয় এবং গোপন বন্ধুতাকারীও নয়।

অর্থাৎ— প্রকৃত অর্থ আল্লাহ-ই ভালো জানেন— তোমরা বিয়ে কর পবিত্রতা-নৈতিক সতীত্ব সম্পন্না ও যিনাকার নয় এমন মেয়েদেরকে। আল্লাহ আদেশ করেছেন, এ ধরনের মেয়েদের সাথে সহীহ্ আক্দ সহকারে বিবাহ হতে হবে। তাদের সাথে সঙ্গম যেন যিনায় পরিণত না হয়। কেননা এখানে احصان শব্দটি বিবাহ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর 'সিফাহ' মানে হচ্ছে যিনা।

ولامتخذات اخدان অর্থাৎ তাদের সাথে সঙ্গম যেন জাহিলিয়াতের লোকদের অভ্যাস অনুযায়ী গোপন বন্ধুতার মাধ্যমে না হয়। ইবনে আব্বাস বলেছেন, লোকদের মধ্যে অনেকেই বাহ্যত যা যিনা, তাকে হারামই মনে করত। তবে গোপনে তা করা হলে তাকে হালাল মনে করত। الخدن অর্থ মেয়েলোকের বন্ধু, যে তার সাথে গোপনে যিনা করে। আল্লাহ্ এ প্রকাশমান ও গোপন— উভয় প্রকারের নির্লজ্জতার কাজকে সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছেন এবং সহীহ্ শুদ্ধ বিবাহ ছাড়া অন্য উপায়ে সঙ্গম ত্যাগ করতে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। অবশ্য বিয়ের বাইরে দক্ষিণ হস্তের মালিকানাসূত্রে ক্রীতদাসীর সাথে সঙ্গম বৈধ ঘোষণা করেছেন। তাঁর কথা ঃ তোমাদের মুমিন 'যুবতী'তে তাদেরকে দাসী বলেছেন। الفتاة অর্থ যুবতী। স্বাধীনা বৃদ্ধাদেরকে فتاة বলা হয় না। আর যুবতী, দাসী ও বৃদ্ধা— এই সকলকে فتاة -ও বলা হয়। বৃদ্ধাদেরকে فتاة বলা হয় এজন্য যে, দাসী হলে তাকে বড়ত্বের মর্যাদা দেয়া হয় না। আর যৌবন কাল হল মেয়েদের লালিত্য ও নতুনত্বের জাগরণের অবস্থা।

## দাসী ও দাসের দণ্ড

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَاِذَا اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ -

**যখন এ দাসীরা বিবাহ দুর্গে সংরক্ষিতা হবে, তার পরে যদি কোনরূপ যিনার অপরাধ করে তাহলে তাদের উপর সবংশীয়া বিবাহিতাদের অর্ধেক শাস্তি কার্যকর হবে।**

আবূ বকর বলেছেন اُحْصِنَّ শব্দটি اَحْصَنَّ -ও পড়া হয়েছে। ইবনে আব্বাস সাঈদ ইবনে যুবায়র, মুজাহিদ ও কাতাদাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ اُحْصِنَّ -এর অর্থ 'বিবাহিতা হওয়া'। আর ইবনে উমর, ইবনে মাসউদ, শ'বী ও ইবরাহীম (রা) থেকে বর্ণিত ঃ اَحْصَنَّ -এর অর্থ বলেছেন اَسْلَمْنَ বা 'তারা ইসলাম গ্রহণ করলে'। আল হাসান বলেছেন, স্বামী যেমন তাকে সংরক্ষিত করে, তেমনি ইসলাম-ও তাকে সর্ব প্রকারের নির্লজ্জতার কাজ থেকে বিরত রাখে।

দাসীর উপর দণ্ড কার্যকর করতে হলে তা কি— এ বিষয়ে আগের কালের মনীষীদের বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ فَاِذَا اُحْصِنَّ কথার ব্যাখ্যা করেছে বিবাহ বলে। অর্থাৎ তারা যখন বিবাহিতা হবে। এ দাসীর উপর কোন 'হদ্দ' কার্যকর হবে না যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে— বিবাহিতা না হওয়া পর্যন্ত। এটা ইবনে আব্বাসের মত। আর যারা اَحْصَنَّ -এর অর্থ 'ইসলাম গ্রহণ করেছে' করেছেন, তাদের মতে ইসলাম গ্রহণের পর যিনা করলে তার উপর 'হদ্দ' কার্যকর হবে। আর বিবাহিতা না হলেও 'হদ্দ' জারী হবে। ইবনে মাসউদ (রা) এ মত দিয়েছেন। তবে যারা اَحْصَنَّ-এর অর্থ اَسْلَمْنَ বা 'ইসলাম গ্রহণ করেছে' বলেছেন, তাদের কথা সত্য থেকে অনেকটা দূরবর্তী। কেননা তাদের মুমিন হওয়ার কথা তো আগেই বলা হয়েছে। 'পরে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে' বলা অবান্তর। তাই সে অর্থ হলে পূর্বেই مِنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ বলা নিষ্প্রয়োজন। কেননা এ কথাটি তো বিবাহের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছে। অথচ শুরুতে অন্য একটি কথা বলা হয়েছে। আর তা হচ্ছে 'হদ্দ'। তাই শুরুতে ইসলামের কথা উল্লেখ করাই সঙ্গত ছিল। ফলে কথাটি দাঁড়াল ঃ 'ওরা যখন মুসলিম হল, তারপর যদি কোন নির্লজ্জতার— যিনার কাজ করে, তাহলে তাদের উপর ......। এই তাৎপর্যকে কেউ ঠেকাতে পারে না। যা যদি যথার্থ না হতো, তাহলে উমর ও ইবনে মাসউদ (রা) এবং পূর্বোল্লিখিত মনীষিগণ কথাটির ওরূপ ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই দিতেন না। অবশ্য ইসলাম গ্রহণ ও নিকাহ করা— দুটোই এক সঙ্গে ব্যবহৃত শব্দের তাৎপর্য হতে পারে। ব্যবহৃত শব্দ সে তাৎপর্য বহন করে। আগের দিনের মনীষিগণ আয়াতটির এ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। তবে 'হদ্দ' কার্যকর হওয়ার জন্যে দাসীর ইসলাম গ্রহণ ও বিবাহিতা হওয়া শর্ত নয়— যদি বিবাহিতা না হয়, তাহলে 'হদ্দ' বাধ্যতামূলক ও অনিবার্য হবে না। কেননা মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিমা, মালিক-ইবনে শিহাব, উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা, আবূ হুরায়রাতা ও যায়দ ইবনে খালিদ জুহানী সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স)-কে

প্রশ্ন করা হয়েছিল, দাসী বিবাহিতা না হয়ে যদি যিনা করে তাহলে তার শাস্তি কি হবে? জবাবে তিনি বলেছিলেন, সে যিনা করলে তাকে দোর্‌রা মার। আবার করলে তোমরা তাকে আবার দোর্‌রা মার। তার পরে আবার যিনা করলে তাকে দোর্‌রা মার। তারপর-ও যিনা করলে তাকে বিক্রয় কর। সে বিক্রয় যদি একটি রশির বিনিময়ে হয় তবুও।

সাঈদুল মুকবেরী তার পিতা, আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (স) বলেছেন, প্রত্যেক বার-ই তাঁর সম্মুখে আল্লাহ্‌র কিতাব নিয়ে দাঁড়িয়ে যাও।

অর্থাৎ নবী করীম (স) জানিয়ে দিয়েছেন যে, দাসী বিবাহিতা না হলেও সে যিনা করলে তার উপর 'হদ্দ' কার্যকর করতে হবে।

যদি বলা হয়, তাহলে আল্লাহ তাঁর কথা فَاِذَا اُحْصِنَّ বলে احصان। অর্থাৎ বিবাহ-দুর্গে সংরক্ষিতা হওয়ার শর্ত করলেন কেন? দাসী বিবাহিতা হোক আর না-ই হোক যিনা করলে উভয় অবস্থায়ই তার উপর 'হদ্দ' কার্যকর হবে?

জবাবে বলা যাবে, স্বাধীনা নারীকে রজম করা যায় না, যদি সে মুসলিম ও বিবাহিতা না হয়। তখন এই দাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা ইসলাম ও বিবাহ দ্বারা সংরক্ষিতা হলেও যিনার অপরাধে স্বাধীনা নারীর এ অপরাধের জন্যে ধার্য শাস্তির অর্ধেকের বেশি কখনই কার্যকর করা যাবে না। যদি তা-ই হতো, তাহলে احصان। থাকার ও না-থাকার পার্থক্যের দরুন অনেক কিছু ধারণা করে নেয়া সম্ভব হতো। তাই ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, محصنة বিবাহিতা হলেই যিনার অপরাধে তাকে 'রজম' করা হবে। আর যদি محصنة বিবাহ-দুর্গে সংরক্ষিতা না হয়, তাহলে অর্ধেক 'হদ্দ' কার্যকর হবে। এ কারণে কল্পনা-ধারণা-অনুমানকে আল্লাহ্ দূর করলেন এবং জানিয়ে দিলেন যে, তার উপর সর্বাবস্থায়ই অর্ধেক শাস্তি ছাড়া আর কিছু কার্যকর করা যাবে না। তার 'হদ্দ' সম্পর্কে বলতে গিয়ে احصان-এর শর্ত করা এটাই ফায়দা। আর احصان। থাকা অবস্থায় স্বাধীনা মেয়ের 'হদ্দ'-এর অর্ধেক যখন তার উপর কার্যকর করার কথা বলা হল, আমরা জানতে পারলাম যে, এখানে দোররার কথা বলতে চাওয়া হয়েছে। কেননা রজম দণ্ডের অর্ধেক হয় না। আর আল্লাহ্‌র কথা :

فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ -

তাদের উপর 'মুহসেনা' মেয়েদের জন্যে ধার্য শাস্তির অর্ধেক শাস্তি কার্যকর হবে।

এ কথায় احصان। বলে মেয়ের স্বাধীনতা— সম্ভ্রান্ততা বুঝিয়েছেন। সেই احصان। বিবাহ দুর্গে-সংরক্ষিতা হওয়া'— যার দরুন 'রজম' বাধ্যতামূলক হয়, তা বোঝানো হয়নি। কেননা তা বোঝাতে চাওয়া হলে 'তাদের উপর অর্ধেক রজম' বলতে হতো, কিন্তু তা বলা সহীহ্ হতে পারে না। 'রজম'কে ভাগ করা যায় না। আর দাসীর জন্যে স্বাধীনা মেয়ের শাস্তির অর্ধেক বিশেষভাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে, যদি তারা যিনার অপরাধ করে এবং বোঝা গেল যে, দাস এক্ষেত্রে দাসীদের অবস্থার সম্মুখীন হবে। কেননা 'হদ্দ' কম হওয়ার তাৎপর্য হল দাসত্ব। দাস-ও দাসীর মতই দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ -

আর যারা মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করে পবিত্র চরিত্রের মেয়েদের। (সূরা নূর ঃ ৪)

এখানে পবিত্র চরিত্রের মেয়েদেরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ আয়াতে দাসীদের সম্পর্কেও সচ্চরিত্র মেয়েদের সংক্রান্ত হুকুমের আওতায় আনা হয়েছে যদি তাদের সম্পর্কেও লোকেরা চরিত্রহীনতার মিথ্যা অভিযোগ তোলে। কেননা المحصنة। অর্থনৈতিক পবিত্রতা, সতীত্ব, স্বাধীনতা ও ইসলাম। এখানে তাৎপর্যগতভাবে নারীদের সম্পর্কিত হুকুম পুরুষদের জন্যেও নির্ধারিত করা হয়েছে।

তা একথাও প্রমাণ করে যে, কোন হুকুমের যদি বহু কয়টি তাৎপর্য হয়, তাহলে যেখানেই তা পাওয়া যাবে, সেখানে হুকুম কার্যকর ও প্রতিষ্ঠিত হবে। হ্যাঁ, যদি কোথাও কোন একটি বা বহু কয়টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখার দলীল পাওয়া যায়, তাহলে ভিন্ন কথা।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ -

তাহলে তোমরা তাদেরকে বিয়ে কর তাদের মনিবদের অনুমতিক্রমে এবং তাদের মহরানা তাদেরকে দিয়ে দাও।

একথা প্রমাণ করে যে, কোন মুস্তাহাব কাজের হুকুমের সাথে ওয়াজিব কাজকে সংযোজন করা জায়েয। কেননা আয়াতের প্রথমে যে বিবাহ করতে বলা হয়েছে, তা কাজ হিসেবে মুস্তাহাব, ফরয নয়। এর পরই মহরানা দিয়ে দেবার হুকুম করা হয়েছে। তা দেয়া ওয়াজিব বা ফরয। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ - (النساء : ٣)

এবং এরপর বলা হয়েছে ঃ

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً -

এবং স্ত্রীদেরকে তাদের মহরানা খালেসভাবে দিয়ে দাও। (সূরা নিসা ঃ ৪)

এ আয়াতেও মুস্তাহাব কাজের সাথে সংযোজন করা হয়েছে ওয়াজিব কাজ।

এমনিভাবে ওয়াজিব-ফরয কাজের সাথে মুস্তাহাব কাজকেও সংযোজিত করা জায়েয। যেমন আল্লাহ্ অপর এক আয়াতে বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى -

এ আয়াতে বলা ন্যায়পরতা ওয়াজিব; কিন্তু ইহসান— ভালো আচার-আচরণ করা মুস্তাহাব। প্রথম কথাটির সাথে সংযোজন করা হয়েছে দ্বিতীয় কথাটি।

আল্লাহ্র কথা ঃ

ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ -

একথা তার জন্যে, যে তোমাদের মধ্য থেকে যিনার আশংকা বোধ করবে।

ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে যুবায়র, দহাক ও আতীয়াতুল আওফা বলেছেন, আয়াতের الْعَنَتَ শব্দের অর্থ হচ্ছে যিনা। অন্যান্যরা বলেছেন الْعَنَتَ অর্থ হচ্ছে, দ্বীন ও দুনিয়ার দিক দিয়ে বিরাট ও সাংঘাতিক ক্ষতি। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ 'তোমাদের সাংঘাতিক ক্ষতি যাতে, তা-ই ওরা কামনা করে।' আর আল্লাহ্র لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ কথাটি প্রত্যাবর্তিত فَمِنْمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ -এর দিকে। এটা শর্ত, দাসী বিয়ে করা যে তরক করবে এবং স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করাকে গ্রহণ করবে, তার জন্যে এটা পছন্দনীয়, দাসীর পরিবর্তে স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করাকে একমাত্র পন্থা হিসেবে যে গ্রহণ করবে এ জন্যে যে, তার সন্তান যেন অন্য কারোর গোলাম না হয়। সে লোক যদি যিনার আশংকায় পড়ে যে, অবিলম্বে বিয়ে না করলে তার দ্বারা যিনা হয়ে যেতে পারে, নিষিদ্ধ কাজ করে ফেলতে পারে বলে যদি ভয় হয়, তাহলে তার জন্যে দাসী বিয়ে করা মুবাহ। এতে ঘৃণা বা অপছন্দের কোন কারণ নেই। তা করলেও কোন দোষ নেই, না করলেও নেই। তারপরে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, তাহলে তোমাদের মহাকল্যাণ হবে।' একথা বলে স্পষ্ট করা হয়েছে মূলতই দাসী বিয়ে না করাই ভালো। এ আয়াতটুকু যিনার ভয় না থাকলেও যিনা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারলে দাসী বিয়ে করা পছন্দনীয় নয়। আর যদি একান্তই যিনা হয়ে যাওয়ার ভয় তীব্র হয়ে পড়ে, তাহলে দাসী বিয়ে করা মুবাহ— যদি তার অধীন স্ত্রী হিসেবে কোন স্বাধীনা মেয়ে না থেকে থাকে। এরূপ অবস্থায়ও দাসী বিয়ে না করাই ভালো। আর যিনার ভয় হলে তখন ধৈর্য ধারণ করাই কল্যাণবহ। আসলে যিনা ভয় হলেও দাসী বিয়ে না করাই আল্লাহ্র পছন্দনীয়। কেননা দাসী বিয়ে করলে তার গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে তো দাসীর মনিবের দাস হয়ে যাবে। আর দক্ষিণ হস্তের মালিকানায় দাসীর সন্তান হওয়া অপছন্দনীয় নয়। কেননা স্বাধীন পুরুষের ঔরসে দাসীর গর্ভে সন্তান হলে সে-ও স্বাধীনই হবে। নবী করীম (স) থেকে এ পর্যায়ে যে বর্ণনা পাওয়া গেছে, তা আয়াতের অর্থের সাথে সঙ্গতি সম্পন্ন। তা হল, দাসী বিয়ে করা মকরুহ।

আবদুল বাকী ইবনে কানে' মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল ইবনে জাবির আস্-সকতী মুহাম্মাদ ইবনে উকাবাতা ইবনে হরম আস্-সেদুসী, আবূ উমাইয়্যাতা ইবনে ইয়ালা, হিশাম ইবনে উরওয়াতা, তাঁর পিতা আয়েশাতা (রা) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

اَنْكِحُوا الْاَكْفَاءَ وَانْكِحُوْهُنَّ وَاخْتَارُوْا لِنُطَفِكُمْ وَاِيَّاكُمْ وَالزَّنْجَ فَاِنَّهُ خَلْقٌ مُشَوَّهٌ -

তোমরা কুফুতে বিয়ে কর এবং তোমাদের কন্যাদেরকেও কুফুতে বিয়ে দাও এবং তোমাদের বিয়ের জন্যে উত্তম মেয়ে বাছাই কর। কালো থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখ। কেননা তাদের দেহাকৃতি বিকৃতিপূণ।

রাসূল (স)-এর কথা ঃ তোমরা কুফুতে বিয়ে কর— প্রমাণ করে যে, দাসী বিয়ে করা অপছন্দনীয়। কেননা দাসী স্বাধীন পুরুষের জন্যে কুফু নয়। আর তাঁর কথা ঃ 'তোমাদের বীর্যের জন্যে উত্তম মেয়ে বাছাই কর'— কথা তো তা-ই প্রমাণ করে। যেন তাঁর সন্তান অন্য কারোর মালিকানাভুক্ত দাস হয়ে না যায়, অথচ তার বীর্য তো স্বাধীন মানুষের বীর্য। সে যদি দাসী বিয়ে করে, তাহলে তার বীর্য দাসত্বে পরিণত হবে। অপর এক হাদীসে নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

تَخَيَّرُوْا لِنُطَفِكُمْ فَاِنَّ عِرْقَ السُّوْءِ يُدْرِكُ وَلَوْ بَعْدَ حِيْنٍ -

তোমরা তোমাদের বীর্যপাত ঘটাবার জন্যে উত্তম মেয়ে বাছাই কর। কেননা খারাপ মূল অবশ্যই জাগ্রত হয়ে ধরা পড়বে কিছুকাল পরে হলেও।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ -

আল্লাহ তোমাদের জন্যে স্পষ্ট কথা বলে দিতে চান এবং তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তীদের নিয়ম-নীতি জানিয়ে দিতে চান ও তোমাদের নিকটবর্তী হতে— তোমাদের তওবা কবুল করতে চান।

এর প্রকৃত তাৎপর্য আল্লাহ্-ই ভালো জানেন। আমাদের পক্ষে যা যা জানা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যে সব তত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান থাকা জরুরী, আল্লাহ সেই সব-ই আমাদের জন্যে বলে দিতে চান বলেই এসব কথা বলছেন তিনি। বলছেন দুটি উপায়ে, একটি হল 'নস' আর দ্বিতীয় হল দলীল প্রমাণ— 'নস' যা বোঝায়, যা প্রমাণিত করে। আর ছোট বড় সব ব্যাপারেই আল্লাহ্ আমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। দিয়েছেন হয় প্রত্যক্ষ 'নস'-এর মাধ্যমে, না হয় দলীলের মাধ্যমে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ - (القيامه : ١٩)

অতঃপর তা প্রকাশ করে বলা আমাদের কাজ।

অন্যত্র বলেছেন ঃ

هٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ -

এ হচ্ছে জনগণের জন্যে সুস্পষ্ট কথন, প্রকাশ ও বিশ্লেষণ। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৩৮)

বলেছেন ঃ

مَافَرَّطْنَا فِىْ الْكِتَابِ مِنْ شَىْءٍ -

কুরআনে কোন কথা বলা-ই আমরা ছেড়ে দিইনি। (সূরা আল-আন'আম ঃ ৩৮)

বলেছেন ঃ

وَيَهْدِ يَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ -

এবং তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের নিয়ম-নীতি জানিয়ে দিচ্ছেন।

কোন কোন লোক বলেছেন, আল্লাহ্র এসব কথা প্রমাণ করে যে, আমাদের জন্যে যা হারাম, তা তিনি হারাম করেছেন। যে সব মেয়েলোক আমাদের জন্যে মুহররম, তা-ও বলে দিয়েছেন আলোচ্য আয়াতের পূর্বের দুটি আয়াতে। তা আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের জন্যেও হারাম ছিল, আগের নবীগণের উম্মতদের জন্যেও হারাম ছিল।

অন্যরা বলেছেন, এ থেকে বোঝায় না যে, সব নবী-রাসূলের প্রতি নাযিল হওয়া শরীয়ত বুঝি এক ও অভিন্ন। বরং তার অর্থ হল — আগের উম্মতগণের নিয়ম-নীতি তিনিই বলতে পারেন, তাঁরই অধিকার আছে তা বলার। আমাদের জন্যে যা কল্যাণকর, তা তাদেরকে তিনিই বলে দিয়েছেন।

বিভিন্ন নবী-রাসূলের শরীয়তে ইবাদত ইত্যাদি বিভিন্ন ছিল মোটামুটিভাবে। কিন্তু মানবীয় কল্যাণের দিক দিয়ে তা সবই অভিন্ন।

অন্যান্য মনীষী বলেছেন, এর অর্থ ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তী হক পন্থী লোকদের নিয়ম-নীতি বলে দিচ্ছেন। যেন তোমরা বাতিল ও অকল্যাণকর নিয়ম-নীতি থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে পার এবং প্রকৃত হক যা তোমরা পছন্দ করতে ও ভালোবাসতে পার। আল্লাহ্র কথা وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ এবং 'তোমাদের উপর তওবা করবেন' এ কথাটুকু প্রমাণ করে যে, হাদীসবিদদের মাযহাব বাতিল। কেননা এ কথা দ্বারা আল্লাহ্ জানিয়েছেন যে, তিনি আমাদের উপর তওবা করতে চান আর ওরা ধারণা করে বসেছেন যে, পাপ কাজে পৌনপুনিকতাই চান, তাদের নিকট থেকে তওবা ও ইস্তিগফার পেতে চান না।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ -

এবং আল্লাহ্ চান যারা মনের কামনা-লালসার অনুসরণ করে .....

কোন কোন লোক বলেছে, বাতিলপন্থী সব লোকের কথাই বলেছেন এ কথাটুকুর মাধ্যমে। কেননা তারা নিজের নফসের কামনা-বাসনা ও লালসাকে অনুসরণ করে। তাতে সত্য দ্বীনের সাথে সঙ্গতি রক্ষিত হল, কি তা বিরুদ্ধতা করা হল, তার এক বিন্দু পরোয়া করে না। লালসা-কামনার সাথে হক-এর সংঘর্ষ হলে, বা বৈপরীত্য দেখা দিলে তারা সত্যকে গ্রহণ না করে বরং লালসা চরিতার্থ করার দিকেই ঢলে পড়ে।

মুজাহিদ বলেছেন, এ থেকে যিনার কথা বলতে চেয়েছেন। আর সুদ্দী বলেছেন, এতে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا -

তোমরা বিরাট ভাবে ঝুকে পড়বে।

অর্থাৎ সত্য ও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত হয়ে খুব বেশি বেশি গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বে। এ ঝুঁকে পড়ার জন্যে তাদের ইচ্ছা হওয়ার দুটি কারণ থাকতে পারে। একটি— তাদের শত্রুতা পোষণের দরুন অথবা তাদের প্রীতি ও ভালোবাসার আকর্ষণে। এবং আল্লাহ্‌র নাফরমানীর কাজে তাদের প্রতি প্রশান্তি ও স্বস্তি লাভের দরুন। তাই আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমাদের ব্যাপারে তাদের ইচ্ছা ওসব লোকের ইচ্ছার পরিপন্থী।

আয়াতটি প্রমাণ করে যে, লালসা-কামনার অনুসরণের ইচ্ছা ও সংকল্প নিন্দিত ব্যাপার। তবে তা যদি সত্য দ্বীনের সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন হয়, তবে ভিন্ন কথা। তখন তা নিন্দিত হবে না। তখন মনের ইচ্ছার অনুসরণ বরং প্রশংসার্হ এবং কল্যাণময়। কেননা তার লক্ষ্য হয় পরম সত্যের অনুসরণ। কিন্তু এরূপ ব্যক্তিকে নফসের কামনা-লালসার অনুসরণকারী বলা হয় না। বরং সে আসলে সত্যেরই অনুসারী— নফসের খাহেশের অনুকূল হোক, কি প্রতিকূল।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا -

আল্লাহ চান, তিনি তোমাদের বোঝা হালকা করে দেবেন। আর মানুষ তো সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল।

আয়াতের تخفيف -এর অর্থ দায়িত্বভার হালকা ও বহনযোগ্য করা। বোঝা চাপানোর বিপরীত। যেমন অপর আয়াতে রাসূল (স) সম্পর্কে আল্লাহ নিজেই বলেছেন ঃ

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ -

নবী-রাসূল তাদের উপর থেকে তাদের বোঝা ও শৃঙ্খল— যা তাদের উপর চেপে বসেছিল— নামিয়ে দেয়।

(সূরা আরাফ ঃ ১৫৭)

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ -

আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সহজতা বিধান করতে চান, তিনি তোমাদের প্রতি কঠিনতা ও কঠোরতা করতে চান না। (সূরা বাকারাহ ঃ ১৮৫)

বলেছেন ঃ

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ -

এবং তিনি তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে কোন অসুবিধার সৃষ্টি করেন নি। (সূরা হজ্জ ঃ ৭৮)

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ -

আল্লাহ তোমাদের উপর কোন অসুবিধা বা কষ্টের কারণ সৃষ্টি করতে চান না; বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান। (সূরা মায়িদা ঃ ৬)

এ সব আয়াতে আল্লাহ্ মুসলমানদের পথে সংকীর্ণতা, দুর্বহ বোঝা ও অসুবিধা সৃষ্টি করতে চান না বলে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন। এ কথা-ই নবী করীম (স) নিজের ভাষায় বলেছেন এভাবে ঃ

جِئْتُكُمْ بِالْحَنَفِيَّةِ السَّمْحَةِ -

আমি তোমাদের নিকট একমুখিতা, একাগ্রতা-ক্ষমা-সহিষ্ণুতা-সহজতা নিয়ে এসেছি।

তার ব্যাখ্যা হল, আল্লাহ্ একদিকে যেমন কোন কোন মেয়েলোক আমাদের জন্যে হারাম করেছেন, তেমনি অপর দিকে সেই মুহররম মেয়েলোক বাদে অন্যান্য মেয়েলোককে আমাদের জন্যে হালাল করে দিয়েছেন। তা কখনও বিয়ের মাধ্যমে হালাল করেছেন, কখনও করেছেন দক্ষিণ হস্তের মালিকানাসূত্রে। অন্যান্য হারাম জিনিস পর্যায়েও একথা। সেখানে আমাদের জন্যে যা হারাম করেছেন, সেই জাতীয় দ্বিগুণ-তিনগুণ জিনিস আমাদের জন্যে হালাল করেছেন। হারাম জিনিস থেকে আমাদেরকে বিপুলভাবে মুক্তি ও স্বাধীনতা দিয়েছেন বহু জিনিস হালাল করে।

এ পর্যায়ের হাদীস আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ -

আল্লাহ্ তোমাদের সে সব জিনিস হারাম করেছেন, তাতে তোমাদের রোগের নিরাময়তা রাখেন নি।

অর্থাৎ কেবলমাত্র হারাম জিনিসেই তোমাদের রোগের আরোগ্য রেখে দেন নি। বরং হারাম জিনিসসমূহ থেকে তিনি আমাদের জন্যে মুক্তি ও স্বাধীনতা ব্যবস্থা করে দেন আমাদের জন্যে বহু প্রকারের খাদ্য ও ঔষধাদি হালাল করে দিয়ে। এর উদ্দেশ্য হল, আমরা যেন ক্ষতি ও অসুবিধার মধ্যে না পড়ি দুনিয়ার ব্যাপারাদিতে, যা আমাদের জন্যে হারাম করেছেন তার কারণে। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি দুইটি জিনিসের মধ্যে যেটা অধিক সহজ সেটাই গ্রহণ করেছেন।

ফিকাহবিদগণ যেসব বিষয়ে মতপার্থক্য করেছেন এবং তাতে ইজতিহাদকে কার্যকর করেছেন, তাতে হালকার দিকে পরিণতি গ্রহণেরই দলীল হচ্ছে এসব আয়াত। যারা জবরদস্তির

মত গ্রহণ করেছে, তাদের মত যে বাতিল, তা এসব আয়াত থেকেই প্রমাণিত। ওরা বলেছে যে, আল্লাহ্ বান্দাকে এমন কাজে দায়িত্ব দেন যা করার সাধ্য বান্দার নেই। অথচ আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি আমাদের বোঝা হালকা করতে চান ও চরম মাত্রার দুর্বহ বোঝা কখনই আমাদের উপর চাপান না।

## ব্যবসায়-বাণিজ্য ও বিক্রয়ের ইখতিয়ার

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ -

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা তোমাদের ধন-মাল পারস্পরিকভাবে বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করো না। তবে যদি তোমাদের সম্মতিভিত্তিক ব্যবসায় হয় (তাহলে খেতে দোষ নেই)।

আবূ বকর বলেছেন, অন্য লোকের মাল বাতিল পন্থায় খাওয়া এবং নিজের মাল বাতিল উপায়ে খাওয়া সাধারণভাবেই নিষিদ্ধ হয়েছে এ আয়াতে। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ أَمْوَالَكُمْ 'তোমাদের মাল' কথাটি অন্য লোকের মাল ও নিজের মাল— এ সবই শামিল করে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ وَلَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ 'এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না' এতে নিজের ও অন্যের— সকলকেই হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ্র এ কথাটিও 'তোমাদের ধন-মাল পারস্পরিকভাবে বাতিল পন্থায় খেয়ো না।' এতে নিজের ও অপরের— সকলেরই মাল বাতিল পন্থায় খাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। নিজের মাল বাতিল পন্থায় অন্য লোকের মাল খাওয়া পর্যায়ে দুটি দিকের উল্লেখ করা হয়েছে। একটি, যেমন সুদ্দী বলেছেন, তা হল সূদ খাওয়া, জুয়া খেলা, মালে কম দেয়া— নিকৃষ্ট মাল দিয়ে উৎকৃষ্ট মালের মূল্য গ্রহণ এবং জুলুম করে পরের ধন নিয়ে নেয়া। এই আয়াতটি যখন নাযিল হল, তখন সাহাবায়ে কিরাম কারোর ঘরে কিছু খাওয়ার ব্যাপারেও কুণ্ঠা বোধ করছিলেন। পরে সূরা আন-নূর-এর আয়াত নাযিল হয়ে তা দূর করে দেয়। সে আয়াতটি হল ঃ

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوْا مِنْ بُيُوْتِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ اٰبَائِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيْقِكُمْ -

অন্ধ, খঞ্জ, রোগী ও তোমাদের নিজেদের জন্যে কোন দোষ হবে না যদি তোমরা তোমাদের নিজেদের, তোমাদের পিতা-দাদার, তোমাদের মা, তোমাদের ভাই-বেরাদর, তোমাদের বোন, তোমাদের চাচা, তোমাদের ফুফু, তোমাদের মামা, তোমাদের খালাদের ঘর; কিংবা

যে সব ঘরের চাবি তোমাদের দখলে আছে কিংবা তোমাদের বন্ধুর ঘর থেকে তোমরা যদি খাও। (সূরা নূর ঃ ৬১)

আবূ বকর বলেছেন, সম্ভবত ইবনে আব্বাস ও আল-হাসানের কথার তাৎপর্য হল— প্রথমোক্ত আয়াতটি নাযিল হলে লোকেরা কারোর ঘরে কিছু খাওয়ায়ও কুণ্ঠাবোধ করতেন। এ জন্যে নয় যে, আয়াতটি খেতে নিষেধ করেছে। কেননা হেবা ও সাদকা তো কোন সময়ই নিষিদ্ধ হয়নি এ আয়াতটির দ্বারা। অন্যদের নিকট থেকে খাওয়াকেও হারাম করা হয়নি। তবে অন্যদের ঘরে থেকে তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে খাওয়াকে অপছন্দ করেন। এই শেষে উদ্ধৃত আয়াতটি তা দূর করে দেয়। শ'বী, আল-কামা, আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আয়াতটি মুহ্‌কাম, মন্‌সূখ হয়ে যায়নি। কিয়ামত পর্যন্ত তা মনসূখ হবে না। রুবাই' আল-হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, কুরআনের কোন আয়াতই তা মন্‌সূখ করেনি।

অন্য লোকের মাল খাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণার আর একটি আয়াত হল ঃ

وَلَا تَاكُلُوٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ -

তোমরা তোমাদের ধন-মাল বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করো না এ ভাবে যে, তোমরা তা শাসকদের নিকট সোপর্দ করে দেবে। (সূরা বাকারা ঃ ২৮৮)

নবী করীম (স)-এর কথা হল ঃ

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرَئٍ مُسْلِمٍ اِلَّا بِطِيْبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ -

কোন মুসলিম ব্যক্তির মাল তার নিজের মনের খুশীতে না দেয়া পর্যন্ত হালাল হবে না।

অন্য লোকের মাল খাওয়ার নিষেধ একটি বিশেষ পরিচিতির বন্ধনে আবদ্ধ তা বাতিল পন্থায় খাওয়া। অ-সহীহ্‌ চুক্তির মাধ্যমে মাল ও দল বদল বা হস্তান্তর করে খাওয়া এর মধ্যেই গণ্য। যেমন সহীহ্‌ নয় এমন ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্য গ্রহণ। যেমন কোন খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করা এবং সে জিনিসটি খারাপ বা পঁচা পাওয়া, যা ব্যবহার করা যায় না। যেমন পঁচা ডিম বা ফল। তার মূল্য খাওয়ার বাতিল পন্থায় মাল খাওয়া হবে। তেমনি যে জিনিসের কোন মূল্য হয় না, তার মূল্য গ্রহণ করা। যা ব্যবহার করা যায় না, তার মূল্য নেয়া, যেমন, বানর, শূকর, মাছি— এ ভাবে আরও যে সব জিনিস ব্যবহারযোগ্য নয়, তার মূল্য নেয়া। এই সবের মূল্য গ্রহণ ও তা থেকে ফায়দা লাভ বাতিল পন্থায় মাল খাওয়া পর্যায়ে গণ্য। তেমনি মরণোত্তর কান্নাকাটি বা সঙ্গীত গাওয়ার বদলে মজুরী গ্রহণ। তেমনি মৃতের, মদের, শূকরের মূল্য নেয়া। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, অ-সহীহ্‌ বিক্রয় কার্য করে মূল্য গ্রহণ নিষিদ্ধ। বিক্রেতার উচিত গৃহীত মূল্য ক্রয়কারীকে ফেরত দেয়া।

আমাদের হানাফী ফিকাহবিশারদগণ বলেছেন, এসব জিনিসের ব্যবসায়ে মুনাফা হলে এবং সুনির্দিষ্টভাবে তার উপর চুক্তি হলে এবং সেই মুনাফা হস্তগত করা হয়ে থাকলে তা সাদকা করে দেয়া তার কর্তব্য। কেননা সেই মুনাফা নিষিদ্ধ উপায়ে অর্জিত হয়েছে। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা তোমাদের ধন-মাল পারস্পরিক বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করো না'— এই সবই স্বীয় আওতার মধ্যে শামিল করেছে। হারাম চুক্তিসমূহও এই পর্যায়ে গণ্য।

যদি বলা হয়, আয়াতের বাহ্যিক অর্থ কি হেবা ও সাদকা গ্রহণ ও ভক্ষণ হারাম করে এবং সঙ্গী-সাথীর নিকট থেকে মাল গ্রহণ কি মুবাহ্ করে ?

জবাবে বলা যাবে, আল্লাহ সেসব চুক্তি হালাল করেছেন এবং অন্য লোকের মাল গ্রহণ মুবাহ করেছেন, তা সবই উক্ত আয়াতটির আওতা-বহির্ভূত। কেননা মাল ভক্ষণের নিষেধটা শর্তযুক্ত। আর তা হচ্ছে বাতিল উপায়ে মাল ভক্ষণ। তাই আল্লাহ যা মুবাহ ও হালাল করেছেন, তা বাতিল উপায় নয়। বরং তা হক্ উপায়ে। অতএব এই মাল মুবাহ হয় কি কারণে, সে দিকে আমাদেরকে অবশ্যই দৃষ্টি দিতে হবে। মুবাহ হলে তাকে কোনক্রমেই বাতিল বলা যাবে না। তা উক্ত আয়াতের আওতায় পড়বে না। আর যদি নিষিদ্ধ ও হারাম হয়, তা হলে তা অবশ্যই আয়াতের দাবি অনুযায়ী বাতিল গণ্য হবে।

তবে আল্লাহ্র কথা ঃ

اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ -

তবে যদি ব্যবসায় হয় তোমাদের পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে .....

এর দাবি হচ্ছে সর্বপ্রকারের ব্যবসায়— যা দুই পক্ষের সম্মতি ও সন্তুষ্টির ভিত্তিতে সম্পন্ন হবে।

ব্যবসায় একটা নাম। পারস্পরিক বিনিময়ের চুক্তি হিসেবে তা সংঘটিত হয়। তার মাধ্যমে মুনাফা লাভ-ই হয় লক্ষ্য। আল্লাহ্ অপর আয়াতে বলেছেন ঃ

هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ - تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ -

আমি কি তোমাদেরকে একটা ব্যবসায়ের পথ দেখাব, যা তোমাদেরকে পীড়াদায়ক আযাব থেকে মুক্তি দান করবে ? .... তা হল তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহ্ এবং তার রাসূলের প্রতি ....। (সূরা সফ ঃ ১০-১১)

এ আয়াতে ঈমানকে ব্যবসায় বলা হয়েছে পরোক্ষ অর্থে। মুনাফা লাভের ব্যবসায়ের সাথে তার সাদৃশ্য স্থাপনের লক্ষ্যে। অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

يَرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ -

তোমরা আশা করছ এমন একটি ব্যবসায় যা কক্ষণই ধ্বংস হবে না। (সূরা ফাতির ঃ ২৯)

যেমন আল্লাহ্র দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদে আত্মহননকে ক্রয়-বিক্রয় বলা হয়েছে এ আয়াতেঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ......

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্রয় করেছেন মুমিনদের নিকট থেকে তাদের নিজেদের সত্তা ও তাদের ধন-মালকে এ উদ্দেশ্যে যে, তাদের জন্যে জান্নাত হবে। (সূরা তওবা ঃ ১১১)

এ আয়াতেও আত্মদানকে ক্রয় বা বিক্রয় বলা পরোক্ষভাবে। সরাসরি ও প্রত্যক্ষ অর্থে নয়। আল্লাহ্‌র বলেছেন ঃ

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ - وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ -

আর তারা নিশ্চয়ই জেনেছে কে তাকে ক্রয় করেছেন, পরকালে তার প্রাপ্য কোন অংশই নেই। তারা যার বিনিময়ে তা খরীদ করেছে তা অত্যন্ত খারাপ জিনিস, যদি তারা জানত, তবে কতই না ভালো হতো। (সূরা বাকারাহ ঃ ১০২)

এ আয়াতেও যে ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলা হয়েছে তা প্রত্যক্ষ ও প্রকৃত অর্থে নয়, পরোক্ষ অর্থে। যেসব ক্রয়-বিক্রয়ে বিনিময় লাভ হয়, সেই সবের চুক্তির সাথে এসব ক্রয়-বিক্রয়ের সাদৃশ্য দেখানোই এর উদ্দেশ্য। আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমানকেও ব্যবসায় বলা হয়েছে সে ভাবেই। কেননা এর বিনিময়ে বিপুল সওয়াব ও বস্তুগত বিনিময় পাওয়া যাবে। তাই তাতে 'তবে তোমাদের সম্মতিক্রমে যদি ব্যবসায় হয়' কথার অন্তর্গত ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা দেয়া ও হেবা ইত্যাদির চুক্তিও এরূপই হয়ে থাকে। তাতে বিনিময়ের শর্ত থাকে বলে। কেননা জনগণের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী এ সব কিছুতে বিনিময় দেয়া ও নেয়া হয়।

বিবাহকে প্রচলিত নীতি অনুযায়ী ব্যবসায় বলা হয় না। কেননা তাতে সাধারণ নিয়ম ও অভ্যাস অনুযায়ী তাতে বিনিময় লক্ষ্যভূত নয়। সে বিনিময় হচ্ছে মহরানা। মহরানা পাওয়াই বিবাহের মূল লক্ষ্য নয়। তাতে মূল লক্ষ্য থাকে স্বামী-স্ত্রীর সার্বিক কল্যাণ, সুখ, বিবেক-বুদ্ধি ও দ্বীন অনুযায়ী জীবন যাপন এবং মর্যাদা ও সম্মান সহ কালাতিবাহন এবং এ ধরনের আরও অনেক কিছু। এ কারণে এ অর্থে তাকে ব্যবসায় বলা যায় না। আরও এ জন্যে যেমন বলেছি— যাতে বিনিময় হয়, কেবল তাকেই ব্যবসায় বলা যায়।

ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মাদ বলেছেন, ব্যবসায়ে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার দাসী কিংবা দাসকে বিয়ে দেয় না, সে মুকাতি বা চুক্তি করে না এবং মালের বিনিময়েও তাকে মুক্ত করে না। সে নিজেও বিয়ে করে না। আর সে যদি দাসী হয়, তাহলে সে নিজেকেও বিয়ে দেয় না। কেননা তার যাবতীয় কাজ ব্যবসায়ের মধ্যে সীমিত। এসব চুক্তিও ব্যবসায় পর্যায়ের নয়। তাঁরা এ-ও বলেছেন, সে নিজেকে মজুরীর বিনিময়ে লাগাতে পারে, তার নিজের গোলামকেও নিয়োগ করতে পারে। অথচ তার হাতে ব্যবসায়ের পণ্য নেই। কেননা ইজারার কারবারও ব্যবসায়েই গণ্য। মুজারিবা ও শিরকাতে ইমাম পর্যায়েও তাঁরা এই কথা বলেছেন। কেননা তাদের দুজনার কার্যক্রম ব্যবসায়ের মধ্যে সীমিত, অন্য কিছুতে নয়। আর ক্রয়-বিক্রয় যে ব্যবসায় পর্যায়েরই কাজ সে বিষয়ে লোকদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই।

বিশেষজ্ঞগণ البيع। 'বিক্রয়' শব্দের তাৎপর্য পর্যায়ে বিভিন্ন কথা বলেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, কি করে তা হয় ? হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, কেউ যদি অপর একজনকে বলে ঃ 'তোমার এই গোলামটি আমার নিকট এক হাজার টাকায় বিক্রয় করে।' জবাবে সেই লোক যদি বলে,

১. শরীকানা ব্যবসায় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অনুবাদকের গ্রন্থ 'ইসলামের অর্থনীতি' গ্রন্থে লিখিত হয়েছে।

'হ্যাঁ, তোমার নিকট বিক্রয় করলাম,' তাহলে প্রথম ব্যক্তির সে কথা গ্রহণ না করা পর্যন্ত বিক্রয় সম্পন্ন হবে না। তাঁদের মতে বিক্রয়ের প্রস্তাব ও তা কবুল করার কথা অতীত বোঝায় এমন শব্দ দ্বারা বলতে হবে। ভবিষ্যৎ বোঝায় এমন শব্দে বললে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সংঘটিত হবে না। কেননা 'আমার নিকট বিক্রয় কর' প্রস্তাবনা মাত্র। বিক্রয় করার আদেশ মাত্র। বিক্রয় চুক্তিটি সম্পন্ন হওয়ার কথা এটা নয়। আর বিক্রয়ের আদেশটা বিক্রয় হয়েছে বোঝায় না। তেমনি কেউ যদি বলে ঃ 'আমি তোমার নিকট থেকে ক্রয় করছি,' তবে তাতে ক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাবে না। কথাটি তো ক্রয়ের আগাম সংবাদ দান— 'ক্রয় করব' বোঝায়। শব্দটি ভবিষ্যৎ সূচক। অনুরূপভাবে বিক্রেতার কথা ঃ তুমি আমার নিকট থেকে ক্রয় কর' এবং 'আমি তোমার নিকট বিক্রয় করব'— প্রভৃতি চুক্তি নিষ্পন্ন হওয়ার কথা বোঝায় না। তা শুধু খবরদান— ভবিষ্যতে সংঘটিত হওয়ার। ফিকাহবিদগণ বলেছেন, কিয়াস বলে, বিবাহও তেমনই ব্যাপার। তবে তাঁরা ভালো মনে করে বলেছেন, যদি কেউ বলে ঃ 'আমার নিকট তোমার কন্যা বিয়ে দাও.' জবাবে লোকটি বলে ঃ 'হ্যাঁ, তোমার নিকট বিয়ে দিয়েছি'— এতে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। পরবর্তীতে স্বামীর তা কবুল করে নেয়ার প্রয়োজন পড়বে না। তার দলীল হচ্ছে সহল ইবনে সা'দ বর্ণিত হাদীস। যে মেয়েটি নিজেকে রাসূলের জন্য উৎসর্গ করেছিল, রাসূল (স) তা কবুল করেন নি। তখন অপর এক ব্যক্তি বলেছিল ঃ 'ও মেয়েটিকে আপনি আমার নিকট বিয়ে দিন'। পরে নবী করীম (স) লোকটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন, সে মেয়েটিকে কি দেবে সেই বিষয়ে। শেষ পর্যন্ত তিনি বলেছিলেন ঃ 'হ্যাঁ, তোমার নিকট মেয়েটিকে আমি বিবাহ দিলাম তোমার নিকট কুরআনের যে ইল্‌ম আছে তার বিনিময়ে।' লোকটির কথা 'আমার নিকট বিবাহ দিন' এবং তার জবাবে রাসূলের কথা ঃ 'তোমার নিকট মেয়েটিকে বিবাহ দিয়েছি'— তিনি এ কথাটির দ্বারা বিবাহ চুক্তি সম্পাদিত করে দিলেন। এ পর্যায়ে আরও একটি হাদীস উল্লেখ্য। সেটিও এ বিষয়েই বর্ণিত। যেহেতু বিবাহে প্রস্তাবনা ও তারই মত— অভ্যাসে প্রবেশ করাই আসল লক্ষ্য নয়, লোকেরা 'আমাকে বিবাহ দিন' ও 'তোমাকে বিবাহ দিয়েছি' এই দুটি কথার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য করে না। বিবাহে এটাই প্রচলিত অভ্যাস। তাই 'তোমাকে বিবাহ করলাম' এবং 'আমার নিকট তোমাকে নিজেকে বিবাহ দাও' এ দুটি কথা অভিন্ন।

বিক্রয়ে অভ্যাস হচ্ছে— শুরুতেই প্রস্তাবনা হিসেবে তাতে প্রবেশ করা। তাই তা প্রস্তাবই হবে মাত্র। চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে না। তাই লোকেরা কিয়াসের সাহায্যেই তা গ্রহণ করেছে। হানাফী ফিকাহবিদগণ প্রচলিত আদত-অভ্যাস সম্পর্কে বলেছেন, লোকেরা তার দ্বারা মালিক বানিয়ে দেয়ার উপস্থাপন ও চুক্তি সংঘটনই বুঝে। তাই তাতেই চুক্তি সংঘটিত হবে। আর তা হল কোন বিষয়ের প্রস্তাব উত্থাপন, পরে তার জন্যে অর্থ পরিমাণ নির্ধারণ এবং পণ্যটা গ্রহণ করা— একেই তারা চুক্তি বানিয়েছে তাতে উভয় পক্ষের সম্মতি থাকা ও একজনের অপর জনের নিকট কাঙ্ক্ষিত বস্তু সমর্পণ করা হয় বলে। তা এজন্যে যে, কোন কিছুর অভ্যাস চলতে থাকা সেই বিষয়ে মুখে বলার মতই গ্রহণীয়। কেননা 'কথা'র উদ্দেশ্য হল মনের ভাবটা জানিয়ে দেয়া। অন্তরের বিশ্বাসকে ভাষা দেয়া। আর তা অভ্যাস থেকেই যখন জানা যায় যার উপর চুক্তি হয়েছে তা হস্তান্তর করা সহ, তখন তারা সেটাকেই চুক্তি বলে ধরে নিয়েছে। যেমন কেউ অন্য কাউকে কোন কিছু হাদিয়া দেয়, সে তা হস্তগত করে। তখন তা 'হেবা' হিসেবে

কবুল হয়ে যায়। নবী করীম (স) কয়েকটি ছাগল যবেহ্ করে বললেন ঃ যার ইচ্ছা এ থেকে গোশ্‌ত কেটে নিতে পারে। তখন এই কেটে নেয়াটা 'হেবা' কবুলের স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেল মালিক বানানোর প্রস্তাবনায়। এই যেসব দিকের আমরা উল্লেখ করলাম, তা-ই হচ্ছে পারস্পরিক সম্মতি, যার শর্ত করা হয়েছে ঃ 'তবে যদি তোমাদের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসায় হয়' কথাটিতে।

ইমাম মালিক ইবনে আনাস বলেছেন, তখন কেউ বলে ঃ আমার নিকট এ জিনিসটি এত'র বিনিময়ে বিক্রয় কর, জবাবে সে বলে ঃ হ্যাঁ, তোমার নিকট বিক্রয় করেছি' — এতেই বিক্রয় কার্য সম্পন্ন হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, হ্যাঁ, 'তোমার নিকট তাকে বিবাহ দিয়েছি' না বলা পর্যন্ত বিবাহ্ সহীহ্ হবে না। অথবা অপর জন বলবে ঃ আমি তাকে বিয়ে দেয়াকে কবুল করেছি। কিংবা প্রস্তাবকারী বলবে ঃ 'আমার নিকট তাকে বিয়ে দাও,' আর কনের অভিভাবক বলবে ঃ হ্যাঁ, তাঁকে আমি তোমার নিকট বিবাহ্ দিয়েছি।'। তাহলে স্বামীর 'আমি কবুল করেছি' বলার প্রয়োজন পড়বে না।

আমাদের ফিকাহবিদদের কথা হিসেবে যা উল্লেখ করেছি, তার প্রেক্ষিতে যদি বলা হয়, দুইজন প্রস্তাবক যদি কোন পণ্যের উপর প্রস্তাব দেয়, পরে ক্রয়কারী মূল্য পরিমাণ বলে এবং তা বিক্রেতার নিকট দিয়ে দেয় এবং বিক্রেতাও পণ্যটি তার নিকট হস্তান্তর করে, তবে এটা বিক্রয়। তবে তা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসায় হিসেবে বিক্রয় জায়েয হবে না। কেননা বিক্রয় চুক্তির একটা বিশেষ ধরনের ও শব্দের কথা রয়েছে। তা হল প্রস্তাবনা ও মুখের কথার দ্বারা কবুল করা কিন্তু এখানে যা বলা হল, তাতে তা নেই। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি 'মুনাবিযা', 'মুলামিসা' ও প্রস্তর খণ্ড দ্বারা বিক্রয়[১] নিষিদ্ধ করেছেন। আর তুমি এ পর্যায়ের যে সব বিক্রয়ের উল্লেখ করেছ, নবী করীম (স) তা সবই বাতিল করে দিয়েছেন। কেননা তাতে 'বিক্রয়' শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি।

জবাবে বলা যাবে, তুমি যা ধারণা করেছ, ব্যাপার তা নয়। আর নবী করীম (স) যা নিষিদ্ধ করেছেন, আমাদের ফিকাহবিদগণ তার অনুমতি দেন নি, তা জায়েয বলেন নি। তা এ জন্যে যে, 'মুলামিসা' বিক্রয়ে চুক্তিটা সম্পন্ন হয় স্পর্শ করার মাধ্যমে। আর যার নিকট যা আছে তা অপর পক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করার মাধ্যমে 'মুনাবিযা' বিক্রয় সম্পন্ন হয়। আর প্রস্তর খন্ড রেখে দেয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয় 'হাসাত' বিক্রয়। এ সব কার্যকলাপ দ্বারা বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার কারণের সৃষ্টি হয় মাত্র। এসব বিক্রয় চুক্তিকৃত হয় বাজি ধরার মাধ্যমে। অথচ যে সব কারণের সাথে বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হওয়াকে সম্পর্কিত করেছেন তার সাথে এর কোনই সম্পর্ক নেই। তবে আমাদের ফিকাহবিদগণ যার অনুমতি দিয়েছেন তা হল, একটা মূল্যের উভয়ই প্রস্তাব করবে, যার উপর বিক্রয়টা ঠেকবে। পরে তার ক্রেতা মূল্য নির্ধারণ করবে এবং বিক্রেতা

---

১. একজন অপরজনকে বলবে ঃ তোমার নিকট যা আছে তা আমার দিকে নিপেক্ষ কর, আমি আমার নিকট যা আছে তা তোমার দিকে নিক্ষেপ করব— এ কথার দ্বারা যে ক্রয়-বিক্রয় হয়, হাদীসের পরিভাষায়, তা 'মুনাবিযা'। একজন অপরজনকে বলবে ঃ আমি তোমার নিকট আমার বস্ত্র বিক্রয় করব তোমার বস্ত্রের বিনিময়ে; কিন্তু কেউ কারোর বস্ত্রের দিকে দেখবে না, শুধু স্পর্শ করবে, হাদীসের পরিভাষায় তা 'মুলামিসা— অনুবাদক।

ক্রেতার নিকট পণ্য হস্তান্তর করবে, পণ্য তার নিকট দিয়ে দেবে। মূল্য বিক্রয়ের প্রাপ্য হক্। তা দেয়া তার বিধান। বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ই যখন চুক্তির কারণ সৃষ্টি করল, একে অপরের প্রাপ্ত হস্তান্তর ও হস্তগত করল, তখন উভয়ের সম্মতি সুসম্পন্ন হল, যার উপর এসে চুক্তিটা ঠেকল প্রস্তাবনা, কাপড় ছোয়া, কংকর নিক্ষেপ ও রাখা থেকে। এগুলো চুক্তির আসল কারণ নয়। তার নিয়ম-বিধানও নয়। ফলে চুক্তিটা বাজির সাথে সম্পর্কিত হয়ে পড়ল। অতএব তা জায়েয হবে না। আর বাজির ভিত্তিতে বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ার এটাই হল মূল কথা। যেমন যদি কেউ বলে ঃ 'আমি ও জিনিসটি তোমার নিকট বিক্রয় করেছি যখন যায়দ এসে যাবে।' এবং কাল যখন সে আসবে প্রভৃতি। আল্লাহ্র কথা ঃ 'তবে যদি তোমাদের পারস্পরিক সম্মতি ভিত্তিক ব্যবসায় হয়' সর্বপ্রকারের ব্যবসায়ে তা সাধরণ ও ব্যাপক এবং তা মুবাহ। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ 'আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয় (ব্যবসায়) হালাল করেছেন'। এ আয়াতও সাধারণভাবে সকল প্রকারের বিক্রয় মুবাহ করেছে। তবে অপর কোন দলীলের দ্বারা কোন বিক্রয় হারাম করা হয়ে থাকলে তা ভিন্ন কথা। কেননা 'ব্যবসায়' নামটি সাধারণ, ব্যাপক 'বিক্রয়'-এর তুলনায়। এ জন্যে যে, 'ব্যবসায়' বলতে ইজারা হেবা— যা বিনিময়ের ভিত্তিতে হয় এবং সর্বপ্রকারের বিক্রয় শামিল করে। তাই আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমরা তোমাদের মাল পারস্পরিক বাতিল পন্থায় খেয়ো না'-তে দুটি তাৎপর্য নিহিত আছে। একটি, যে চুক্তি এমন শর্ত ভিত্তিক যার হুকুম বের করার জন্যে ব্যবসায় বিশ্লেষণ আবশ্যক— তা নিষিদ্ধ। আর তা হচ্ছে ঃ 'তোমরা বাতিল পন্থায় পারস্পরিকভাবে তোমাদের মাল খেয়ো না।' এ কথাটি কোন মাল খাওয়াকে বাতিল পন্থায় খাওয়া প্রমাণ করার প্রয়োজন করে দেয়, যার উপর ব্যবহৃত শব্দের হুকুম প্রযোজ্য হতে পারে। আর দ্বিতীয় তাৎপর্য হচ্ছে, সাধারণভাবে সর্বপ্রকারের ব্যবসায়। তাতে সবই সাধারণভাবে শামিল। তাতে অস্পষ্টতা বা ব্যাখ্যা সাপেক্ষতা কিছু নেই। কোন শর্তও তাতে নেই। আমরা সোজাসুজিভাবে তার বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়েই বুঝতে পারি যে, ব্যবসায় বলতে যা বোঝায়, তা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য আল্লাহ্ কুরআনে 'নস্' দ্বারা কিছু জিনিস এবং রাসূল (স)-এর সুন্নাহ দ্বারা আরও কিছু জিনিস এর বাইরে রেখেছেন। তাই মদ্য, মৃত লাশ, রক্ত, শূকর মাংস ও কুরআনে উল্লিখিত সব হারাম জিনিসই এ পর্যায়ে গণ্য। তার বিক্রয় জায়েয় নয়, কেননা 'তাহ্রীম' শব্দের ব্যবহার এসব জিনিসকেই শামিল করে। ফায়দা লাভের সব দিক-ই এর মধ্যে রয়েছে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدُ حُرِمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَبَاعُوْهَا وَاَكَلُوْا اَثْمَا نَهَا -

আল্লাহ্ ইয়াহূদীর উপর লানত করেছেন। কেননা তাদেরই উপর চর্বি হারাম করা হয়েছিল। কিন্তু ফাঁকির পথ গ্রহণ করে তা বিক্রয় করেছে ও তার মূল্য খেয়েছে।

মদ্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْ حَرَّمَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا وَاَكْلَ ثَمَنِهَا وَلَعَنَ بَائِعَهَا وَمُشْتَرِيْهَا -

যিনি মদ্য হারাম করেছেন, তিনিই তা বিক্রয় করাও হারাম করেছেন, তার মূল্য খাওয়াও হারাম করেছেন এবং তার বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন।

وَنَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الْعَبْدِ الْاٰبِقِ وَبَيْعِ مَالَمْ يُقْبَضْ وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْاِنْسَانِ -

রাসূলে করীম (স) ধোঁকাবাজির বিক্রয়, পালিয়ে যাওয়া দাস বিক্রয়, যা হস্তগত করা হয়নি তা বিক্রয় এবং হাতে নেই তা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করেছেন।

এ ভাবে অজানা জিনিস বিক্রয় এবং ধোঁকার চুক্তির মাধ্যমে বিক্রয় হারাম করেছেন। এই সব ক্রয়-বিক্রয় 'তবে যদি তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে ব্যবসায় হয়'-এর আওতার বাইরে বিশেষীকৃত।

اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ -

আয়াতাংশ দুভাবে পাঠ করা হয়েছে। এক ধরনের পাঠের ফল হল কথার এই রূপ ঃ 'যদি সে মাল ব্যবসায় হয় পারস্পরিক সম্মতিক্রমে।' ব্যবসায় পারস্পরিক সম্মতিক্রমে সংঘটিত হলে সে মাল খাওয়া নিষেধের আওতা-বাহির্ভূত হবে। কেননা বাতিল পন্থায় মাল ভক্ষণ কখনও ব্যবসায় পথে হয়, ব্যবসায় পথ ছাড়া অন্য পথেও হয়। এতে সমস্ত কথা থেকে ব্যবসায়টাকে আলাদা করা হয়েছে। বলেছেন যে, তা বাতিল পন্থায় মাল খাওয়া নয়।

অন্য ধরনের পাঠের ফল হবে ঃ তবে যদি ব্যবসায় সংঘটিত হয় .... এ পর্যায়ে বাতিল পন্থায় মাল খাওয়ার নিষেধ ব্যাপক অর্থে হবে, তার আওতার বাইরে কিছুই থাকবে না। তাকে বলা হয় "اِسْتِثْنَاء مُنْقَطِع"। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নকারী বাদ দেয়া। কিন্তু ব্যবসায় যদি পারস্পরিক সম্মতিক্রমে হয়, তবে তা মুবাহ্ হবে।

যারা বলেছেন উপার্জন হারাম, তাদের কথা যে বাতিল, তা এ আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত। কেননা পারস্পরিক সম্মতিক্রমে হওয়া ব্যবসায় আল্লাহ মুবাহ করেছেন। 'আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয় হালাল করেছেন'— আল্লাহ্র এই কথাটি তা-ই প্রমাণ করে। আল্লাহ্র কথা ঃ

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ -

যখন নামায শেষ হয়ে যাবে, তখন তোমরা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে দুনিয়ায় ছড়িয়ে পর এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধান কর। (সূরা জুম'আ ঃ ১০)

আর আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

এবং অন্যান্য লোকেরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দুনিয়ায় চলাফেরা করছে এবং আরও অন্যান্যরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করছে। (সূরা মুজাম্মিল ঃ ২০)

এ আয়াতে ব্যবসায় ও জীবিকার সন্ধানে দুনিয়ায় চলাফেরা করার কথা আল্লাহ্র পথে

জিহাদ ও যুদ্ধ করার সঙ্গে একত্রে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র নিকট এই দুটিই পছন্দনীয়।

## ক্রেতা-বিক্রেতার ইচ্ছা-স্বাধীনতা

ক্রেতা-বিক্রেতার ইচ্ছা-স্বাধীনতা পর্যায়ে মনীষিগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, জুফার, আল-হাসান ইবনে জিয়াদ ও মালিক ইবনে আনাস বলেছেন, কথার মাধ্যমে বিক্রয় চুক্তি হয়ে গেলে পরে দুজনের— ক্রেতা ও বিক্রেতার— কোন ইচ্ছা-স্বাধীনতা থাকে না মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে না গেলেও। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকেও এইরূপ মত বর্ণিত হয়েছে। সওরী, লায়স, উবায়দুল্লাহ ইবনুল হাসান ও শাফেয়ী বলেছেন, দুই পক্ষ যখন কোন চুক্তি করে তখন তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের ইচ্ছা-স্বাধীনতা থাকে। আল-আওজায়ী বলেছেন, দুজনের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ইচ্ছা-স্বাধীনতা থাকে— তবে তিন প্রকারের বিক্রয়ে থাকে না। তা হল গনীমতের প্রবৃদ্ধিমূলক বিক্রয়, মীরাসে অংশীদারিত্ব ও ব্যবসায়ে শরীকানা। যখন তারা ভেতরে পৌঁছে যাবে, তখন তা বাধ্যতামূলক হবে। তখন তাদের আর কোন ইচ্ছা-স্বাধীনতা থাকবে না।

দুজনের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সময়টা হয় তখন, যখন তাদের দুজনের প্রত্যেকেই অপর জনের আড়ালে চলে যাবে। লায়স বলেছেন, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অর্থ কথা শেষ করে দুজনের কোন একজনের দাঁড়িয়ে যাওয়া।

যারা এই ইচ্ছা-স্বাধীনতাকে অনিবার্য বলেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই বলেছেন, মজলিসের কথার মধ্যে যদি ইখতিয়ার দেয়া হয় এবং তার পরে ওরা গ্রহণ করে, তাহলে বিক্রয় বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে।

ইবনে উমর থেকে মজলিসের মধ্যেই ইখতিয়ার থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে। আবূ বকর বলেছেন ঃ আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমরা তোমাদের ধন-মাল পারস্পরিক ভাবে বাতিল পন্থায় খেয়ো না, তবে যদি তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে ব্যবসায় হয়, তাহলে ভিন্ন কথা'— দাবি করে যে, দুজনের বিচ্ছিন্ন হওয়া ও একত্রিত হওয়ার কোন গুরুত্ব নেই। শরীয়ত ও অভিধানের দৃষ্টিতে তার নাম ব্যবসায় নয়। পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসায় সংঘটিত হওয়ার ফলে ক্রয় করা জিনিস ভক্ষণকে আল্লাহ মুবাহ করেছেন। তাতে ইখতিয়ার অনিবার্য করা হলে তা প্রতিবন্ধক হবে এবং তা আয়াতের বাহ্যিক অর্থের বাইরে কোন দলীল ছাড়া এক বিশেষীকরণ মাত্র। আল্লাহ্র এই কথাটিও তা-ই প্রমাণ করে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ -

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ (কার্যকর) কর। (সূরা মায়িদা ঃ ১)

এ আয়াত প্রত্যেক চুক্তিকারীর উপর তার চুক্তি পূরণ ও কার্যকরকরণে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। মূলত তা একটি চুক্তি, দুজনের প্রত্যেকেই তা পূরণ করাকে নিজের জন্যে বাধ্যতামূলক করে নিয়েছে। অতএব তা পূরণ করা তার কর্তব্য। এর মধ্যে ইচ্ছা স্বাধীনতা

প্রয়োগের অধিকার প্রমাণ করা হলে সে চুক্তি পূরণ বাধ্যবাধকতার অস্বীকৃতি হবে। আর তা আয়াতের দাবির পরিপন্থী। আল্লাহ্‌র এই কথাটিও তা প্রমাণ করে ঃ

اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ -

তোমরা যখন কোন ঋণের লেন-দেন করবে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্তকার জন্যে তখন তোমরা তা লিপিবদ্ধ কর। (সূরা বাকারাহ ঃ ২৮২)

শেষে বলা হয়েছে ঃ

اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا وَاَشْهِدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ -

তবে যদি উপস্থিত ব্যবসায় হয় যা তোমাদের মধ্যে আবর্তিত হয়, তা না লিখলে তোমাদের কোন গুনাহ্ হবে না। তবে যখন তোমরা পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় করবে, তখন সাক্ষী রাখবে। (সূরা বাকারাহ ঃ ২৮২)

পরে সাক্ষী রাখা না হলে মূল্যের নিশ্চয়তা সহকারে রিহন গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর তা বিক্রয়চুক্তি সম্পাদনের সময় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই করণীয় রূপে আদিষ্ট। কেননা আল্লাহ্‌র কথা হচ্ছে ঃ 'পরস্পর ঋণের লেন-দেন চুক্তি যখন করবে, তখন লিখবে।' পারস্পরিক লেন-দেন চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার সময়ই তা লিখতে এবং লেখার ব্যাপারে পরম নিরপেক্ষতা রক্ষার আদেশ দেয়া হয়েছে। যার উপর ঋণটা চাপছে, তাকে বলা হয়েছে বর্ণনা বলে দিতে। আর এতেই দলীল রয়েছে একথার যে, পারস্পরিক ঋণ লেন-দেনের চুক্তিই তার উপর ঋণ চাপিয়ে দিয়েছে আল্লাহ্‌র এই কথাটি দ্বারা ঃ

وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا -

যার উপর হক্‌টা ধার্য হচ্ছে, সে-ই যেন বর্ণনা লেখায় এবং সে যেন তার রব্ব আল্লাহ্‌কে ভয় করে ও তাতে একবিন্দু কম করে না লেখায়। (সূরা বাকারাহ ঃ ২৮২)

পারস্পরিক ঋণের লেন-দেনের চুক্তি যদি বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই তার হক ধার্য হওয়ার কারণ না হতো, তাহলে 'যার উপর হক ধার্য হয়, সেই যেন বর্ণনা লেখায়' একথা কখনই বলা হতো না এবং তাতে কম না করতেও বলা হতো না। কেননা তার জন্যে তা কিছুই নয়। কেননা ইচ্ছা-স্বাধীনতা প্রমাণিত হওয়া বিক্রেতার যিম্মায় ঋণ প্রমাণিত হওয়ার পরিপন্থী। আর পারস্পরিক ঋণের লেন-দেনে তার উপর হক চাপিয়ে দেয়া প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র কথা 'যার উপর হক ধার্য হয় সে যেন বর্ণনা লেখায়' প্রমাণ করে যে, কোন ইচ্ছা-স্বাধীনতা নেই এবং যে চুক্তি হয়েছে, তা চূড়ান্ত, অবশ্য পূরণীয়। পরে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ -

এবং তোমরা দুইজন সাক্ষী বানাও তোমাদের পুরুষদের থেকে ......(সূরা বাকারাহ ঃ ২৮২)

ঋণ বাবদ দেয়া ধন-মালের সংরক্ষণ এবং গ্রহীতার অস্বীকৃতি থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যেই ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ অথবা সে যদি ফেরত না দিয়েই মরে যায়, তাহলেও দেয়া ঋণ উদ্ধার করা এভাবেই সম্ভব হতে পারে। পরে বলেছেন ঃ

وَلَاتَسْئَمُوٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰى اَجَلِهٖ ط ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰى اَلَّا تَرْتَابُوْا .....

তা ছোট হোক কি বড় মেয়াদ পর্যন্তকার দলীল লিখতে তোমরা ক্লান্তি বোধ ও উপেক্ষা প্রদর্শন করো না। আল্লাহ্‌র নিকট তা অত্যন্ত ন্যায় বিচারমূলক সাক্ষ্যের জন্যে শক্তিপ্রদ এবং তোমরা সংশয়ে পড়বে না— তার অতি নিকটবর্তী ব্যবস্থা। (সূরা বাকারাহ ঃ ২৮২)

যদি সেই দুজনার ইচ্ছা-স্বাধীনতা থাকত দুজনার কথাবার্তা চূড়ান্ত করার পর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পূর্বে, তাহলে সাক্ষী বানানোটা কোন সতর্কতার ব্যাপার হতে পারতো না এবং সাক্ষ্যের জন্যেও তা শক্তিপ্রদ হতো না। কেননা তখন পাওনা বা ঋণ প্রমাণের জন্যে সাক্ষীর সাক্ষ্যের পক্ষে কিছুই করার থাকে না। তারপর বলেছেন ঃ

وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ -

তোমরা যখন ক্রয়-বিক্রয় কর, তখনও সাক্ষী বানাও। (সূরা বাকারাহ ঃ ২৮২)

কেননা এ সাক্ষ্য সময়ের জন্যে। ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার সময় সাক্ষী বানানোর এই আদেশ দুজনের পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার উল্লেখ নেই। পরে সফরকালে ঋণের লেন-দেন রিহ্‌ন রাখার আদেশ করা হয়েছে নিজ বাড়ীতে উপস্থিতিকালীন লেন-দেনে সাক্ষী বানানোর বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে। এ ক্ষেত্রেও যদি ইচ্ছা-স্বাধীনতার অবকাশ থাকে, তা হলে রিহ্‌ন রাখার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে যায়। কেননা যে ঋণ ফেরতযোগ্য নয়, যা ধার্যই হয়নি, তাতে রিহন রাখার কোন প্রশ্নই উঠে না। তাই এ আয়াত প্রমাণ করল যে, এই যে ঋণ দেয়া-নেয়ার চুক্তি কালে ও ক্রয়-বিক্রয়ে সাক্ষী রাখা এবং মালের সংরক্ষণে কখনও সাক্ষী বানানো ও কখনও রিহ্‌ন রাখার হুকুম, তাতে চুক্তি পণ্যের মালিকানা ক্রয়কারীর জন্যে এবং মূলের মালিকত্ব বিক্রেতার জন্যে অনিবার্য করে দিয়েছে— তাদের জন্যে কোনরূপ ইচ্ছা-স্বাধীনতা ছাড়াই। কেননা ইচ্ছা-স্বাধীনতা থাকা সাক্ষী বানানো ও রিহ্‌ন-এর অস্বীকৃতি এবং ঋণের অঙ্গীকারের পরিপন্থী ব্যাপার।

যদি বলা হয়, সাক্ষী-বানানো ও রিহন রাখার আদেশ দুটির যে কোন একটি তাৎপর্যে পরিণতি পাবে। হয় সাক্ষীদ্বয় মূল চুক্তি কালে উপস্থিত থাকবে এবং তাদের দুজনের উপস্থিতিতেই তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তখন তাদের সাক্ষ্য বিক্রয়ের শুদ্ধতা প্রমাণ করবে ও মূল্য সুনিশ্চিত ও অনিবার্য করবে। অথবা তারা দুজন পরস্পরের মধ্যে পারস্পরিক ঋণের লেন-দেনের চুক্তি করবে, পরে দুজন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং পরে সাক্ষীদ্বয়ের নিকট তার অঙ্গীকার ঘোষণা করবে। পরে প্রয়োজনের সময় সাক্ষীদ্বয় তাদের এই অঙ্গীকার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে এই বলে যে, তারা নিজেদের মধ্যকার লেন-দেন সম্পর্কে আমাদের নিকট অঙ্গীকার

করেছে। অথবা ঋণের বিনিময়ে রিহন রাখবে যা তাদের ঋণের লেন-দেনের প্রমাণ করবে। তা হলেও ব্যাপারটি সহীহ্ হবে।

জবাবে বলা যাবে, প্রথম কথা, যে-দুটি দিকের উল্লেখ করেছ, তার দুটিই আয়াতের পরিপন্থী। তাতে সাক্ষী ও রিহন রাখার মূলে নিহিত সতর্কতা সম্পূর্ণ বাতিল ও অর্থহীন প্রমাণিত হয়। কেননা আল্লাহ তো বলেছেন ঃ

اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ -

তোমরা যখন পারস্পরিক ঋণের লেন-দেন করবে কোন নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত কার জন্যে, তখন-ই লিপিবদ্ধ কর। (সূরা বাকারাহ ঃ ২৮২)

পরে বলেছেন ঃ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ 'দুইজন সাক্ষী রাখো'— এই সাক্ষী বানাবার হুকুম লেন-দেন-এর উপর যখন তা ঘটবে তখন, কোন বিলম্ব ছাড়া-ই সতর্কতাস্বরূপ। আর তুমি ধারণা করেছ যে, সাক্ষী বানাবে দুজনের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরে। দুজনের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পূর্বে পণ্যটা ধ্বংস-ও তো হয়ে যেতে পারে, তা ঋণটাই বাতিল হয়ে যাবে অথবা গ্রহীতা তা অস্বীকার করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে, তার পরে সাক্ষী বানাবে। মরেও তো যেতে পারে। তা হলে বিক্রেতা সাক্ষী বানিয়ে তার মালের সংরক্ষণ পর্যন্ত পৌঁছতেই পারবে না। অথচ আল্লাহ বলেছেন ঃ 'এবং সাক্ষী বানাও যখন তোমরা পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় করবে।' এ কারণে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার সময়ই সাক্ষী বানানোর কাজটি হতে হবে। এটাই উত্তম। আল্লাহ্ তো ক্রয়-বিক্রয় করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর সাক্ষী বানাতে বলেন নি। ইচ্ছা-স্বাধীনতা থাকার অবকাশ কুরআনে এমন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াকে প্রমাণ করবে যা কুরআনে বলা-ই হয়নি। আর আয়াতে যে হুকুম মূলতই নেই তা বাড়িয়ে দেয়া কখনই জায়েয হতে পাবে না।

বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর সাক্ষী বানানোর কাজটি তারা দুজন যদি না করে, তাহলে আল্লাহ সাক্ষী বানিয়ে যে সতর্কতার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন, তা পরিত্যক্ত হয়ে যাবে। ক্রেতা সাক্ষী বানাবার পূর্বে মরেও যেতে পারে। অথবা সে ঋণের ব্যাপারটাই অস্বীকার করে বসবে। তাতে ইচ্ছা-স্বাধীনতা এই সতর্কতার মূল তাৎপর্যটাই প্রত্যাখ্যাত বানিয়ে দেবে। স্বাক্ষী বানিয়ে মালের সংরক্ষণ ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যাবে।

এ থেকে প্রামাণিত হয় যে, প্রস্তাবনা ও কবুলের দ্বারাই বিক্রয় সংঘটিত হবে, তাতে দুজনে কারোরই কোন ইচ্ছা-স্বাধীনতা থাকবে না।

যদি বলা হয়, বিক্রয় কালেই যদি তিনদিনের ইচ্ছা-স্বাধীনতার শর্ত উভয়েই করে, তাহলে তো তার উপর সাক্ষী বানানো সহীহ হবে এই ইচ্ছা-স্বাধীনতার শর্তসহ। আর তাতে পাঠ করা আয়াত, লিখিত দলীল, সাক্ষী বানানো ও রিহন রাখা— কোন কিছুরই প্রতিবন্ধক হবে না তা ইচ্ছা-স্বাধীনতার শর্তের উপরই হয়েছে বলে। তার উপর সাক্ষী বানানোও সহীহ্ হবে। অনুরূপভাবে মজলিসের ইখতিয়ারও সাক্ষ্য ও রিহন কোনটিরই বিপরিত হবে না।

জবাবে বলা যাবে, যে আয়াত সাক্ষী রাখার কথা বলা হয়েছে তা এমন বিক্রয়কে শামিলই

করে না যাতে ইখতিয়ারের শর্ত থাকবে। তাতে কেবলমাত্র চূড়ান্ত বিক্রয়ের কথা-ই বলা হয়েছে।

তবে ইচ্ছা-স্বাধীনতার শর্ত জায়েয মনে করেছি একটি দলীলের ভিত্তিতে, তার দ্বারা আয়াতের আওতাভুক্ত পারস্পরিক ঋণমূলক লেন-দেন থেকে আলাদা করে নিয়েছি এবং তা আমরা ব্যবহার করেছি ইখতিয়ারের শর্ত নেই— এমন সব বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। তাই আমাদের জায়েয মনে করা ইখতিয়ারের শর্তে চুক্তিকৃত বিক্রয়ে এমন কিছুই নেই যা আয়াতের হুকুমের ব্যবহার নিষেধ করে। কেননা তাতে সাক্ষী বানিয়েও রিহন রেখে সতর্কতাবলম্বনের কথা রয়েছে। যে সব বিক্রয়ে ইখতিয়ারের শর্ত রাখা হয়নি তার চুক্তিকারীর অঙ্গীকার এবং ইখতিয়ারের শর্তে চুক্তিকৃত বিক্রয় আয়াতের হুকুম বহির্ভূত। আয়াতে সে বিষয়ে কোন বক্তব্য নেই। পূর্বেই আমরা বলে এসেছি। ফলে ইখতিয়ার থাকবে না। বিক্রয় সম্পূর্ণতা পাবে। অতপর দুজনের জন্যে পছন্দনীয় হবে অঙ্গীকারের উপর সাক্ষী বানানো, ক্রয়-বিক্রয়ের উপর নয়। প্রত্যেক বিক্রয়েই ইখতিয়ার আছে বলে যদি আমরা মনে করি, তাহলে বিক্রয়টা সম্পূর্ণ হবে আমাদের বিরোধীদের মতানুযায়ী। তাহলে আয়াতে এমন সুযোগ অবশিষ্ট থাকবে না যেখানে তার দাবি অনুযায়ী তার হুকুম ব্যবহৃত হতে পারে। উপরন্তু বিক্রয়ে সম্মতি না থাকলেও ইখতিয়ার প্রমাণ করা বিক্রয়ের পরিপক্কতা বিরোধী; কিংবা তা ভঙ্গকারী। তারা দুজন যদি বিক্রয়ের চুক্তি সম্পন্ন করে ইখতিয়ারের শর্ত ছাড়া-ই, তাহলে তাদের দুজনের প্রত্যেকে চুক্তি অনুযায়ী প্রতিপক্ষকে পণ্যের মালিক বানিয়ে দেবে। তাহলে তাতে ইখতিয়ার আছে বলে প্রমাণ করার কোন অর্থ থাকতে পারে না তার প্রতি সম্মতি থাকা সত্ত্বেও এবং সম্মতি থাকা তো ইখতিয়ার থাকার পরিপন্থী। লক্ষ্যণীয়, যারা বলেছেন, মজলিসে ইখতিয়ার আছে, যখন সে তার প্রতিপক্ষকে বলে তুমি গ্রহণ কর, তারপর সে তা গ্রহণ করল এবং তাতে সম্মত হল, এই ব্যাপারটিই তো তাদের ইখতিয়ার থাকার বিপরীত, এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। অথচ তাতে বিক্রয় কার্যকর রাখার ব্যাপারে তাদের দুইজনের সম্মতির অধিক তো কিছুই নেই। তারা দুইজন মিলে যে চুক্তিটা করল সেই মূল কাজেই তো তাদের সম্মতি রয়েছে, এটা প্রমাণিত। তাই দ্বিতীয়বার সম্মতির কোন প্রয়োজন পড়ে না। কেননা শুরুতে তাদের চুক্তি করার সম্মতি থাকার পর অপর এক সম্মতির শর্ত করা জায়েয হলে তাহলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার সম্মতি হওয়ার শর্ত করা জায়েয হতো। আর তৃতীয় ও চতুর্থ বারের ইখতিয়ার চালু করতে তাদের সম্মতি প্রতিবন্ধক হয় না।

তাই এ সব যখন বাতিল হয়ে গেল তখন বিক্রয়ে দুজনের সম্মত হওয়াই সহীহ্ প্রমাণিত হল। আর তা-ই ইখতিয়ারকে বাতিল করে এবং বিক্রয়কে সম্পূর্ণতা দেয়। বিক্রয়ে শর্ত করার ইখতিয়ার সহীহ্ এজন্যে যে, ইখতিয়ারের শর্ত করায় তার মালিকানা থেকে তার জিনিস বের করার সম্মতি পাওয়া যায়নি। কেননা সে নিজের জন্য ইখতিয়ারের শর্ত করেছে। আর সেই কারণেই তাতে ইখতিয়ার প্রমাণ করা জায়েয হয়েছে।

যদি বলা হয়, তাহলে তুমি তো দেখার ইখতিয়ার ও পণ্যের ত্রুটি পেলে ফেরত দেয়ার ইখতিয়ার প্রমাণ করছ মূল বিক্রয়ে সম্মতি থাকা সত্ত্বেও। এ দিক দিয়ে তাদের সম্মতি

ইখতিয়ার প্রমাণিত হওয়ার প্রতিবন্ধক হয়নি। তেমনি মজলিসের ইখতিয়ারেরও প্রতিবন্ধক হবে না তাদের দুজনের সম্মতি।

জবাবে বলা যাবে, দেখার ইখতিয়ার ও ত্রুটি পেলে পণ্য ফেরত দেয়ার ইখতিয়ার মজলিসের ইখতিয়ার নয় কোন দিক দিয়ে। কেননা দেখার ইখতিয়ার দুজনের প্রত্যেকের জন্যে মালিকানা হওয়া নিষিদ্ধ করে না যে বিষয়ে প্রতিপক্ষের সাথে তার চুক্তি হয়েছে তাদের প্রত্যেকের তাতে সম্মতি থাকার কারণে। তাই মালিকানা অস্বীকৃতিতে এ ইখতিয়ারের কোন প্রভাব নেই। বরং ইখতিয়ার থাকা সত্ত্বেও মালিকানা রয়েছে এজন্যে যে, তাদের প্রত্যেকের তাতে সম্মতি রয়েছে। অথচ মজলিসের ইখতিয়ার থাকার পক্ষপাতীদের কথা অনুযায়ী— তাদের প্রত্যেকের জন্যে মালিকানা হওয়ার প্রতিবন্ধক, যাতে সে তার প্রতিপক্ষকে মালিক বানিয়েছে তাকে মালিক বানাতে তাদের প্রত্যেকের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও। শুরুতেই আক্দ করার সময় সম্মতি এবং বলেছিল আমি রাযি, তুমি গ্রহণ কর— তার প্রতিপক্ষও রাযি হয়ে গেল— এ দুয়ের মাঝে কোন পার্থক্য করা যায় না। তাই দেখার ইখতিয়ার ও ত্রুটির সময় ফেরতের ইখতিয়ার থাকা এবং এ দুটি ইখতিয়ারের কোন একটিও না-থাকার মধ্যেও কোন পার্থক্য নেই তাতে মালিকত্ব হওয়ার ব্যাপারে। তার পরে দুটি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় ইখতিয়ারের দিক দিয়ে এবং তা মালিকত্বের প্রতিবন্ধক হয় না। তা হয় শুধু পণ্যের অবস্থা না জানার কারণে, অথবা তার কোন অংশ হারিয়ে যাওয়ার কারণে যা এই আক্দ হওয়ার কারণ।

এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, আক্দ করতে সম্মত হওয়াই মালিকানার মূল কারণ— তাদের দুজনের প্রত্যেকেরই মালিকানা হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর এবং তদ্দরুন ইখতিয়ার বাতিল হওয়ার পর। আমরা জানলাম যে, বিচ্ছিন্ন হওয়াটায় সম্মতির কোন প্রমাণ নেই। সম্মতি না থাকারও কোন প্রমাণ নেই। কেননা মজলিসে বিচ্ছিন্ন হওয়া ও স্থিত থাকা সমান, তার কোনটাই সম্মতি না থাকা প্রমাণ করে না। তাই এ-ও জানলাম যে, মালিকানা সংঘটিত হয়েছে শুরুতেই আক্দ করতে সম্মত হওয়ার। বিচ্ছিন্নতার দ্বারা নয়। কেননা মূলগতভাবে বিচ্ছিন্নতার সাথে মালিক বানানো সম্পর্কিত নয়, আক্দ সহীহ্ করাও নয়। বরং মৌলনীতিতে এ কথা রয়েছে যে, বিচ্ছিন্নতার প্রভাব রয়েছে বহু সংখ্যক চুক্তি ভঙ্গ হওয়ার উপর। যেমন হস্তগত করার পূর্বেই বিক্রয়ের চুক্তি করা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, সিল্ম বিক্রয়ে মূলধন হস্তগত করার পূর্বে বিচ্ছিন্ন হওয়া। ঋণ দ্বারা ঋণ করা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া তার কোন একটি নির্ধারণ করার পূর্বে। বিচ্ছিন্নতা যখন মৌলিকভাবে বহু সংখ্যক চুক্তিতে প্রভাবশালী দেখতে পাচ্ছি, তখন তার প্রভাব চুক্তি বাতিল করাতেও রয়েছে তাকে জায়েয প্রমাণ না করে। মৌলিকভাবে চুক্তি সহীহ্করণে বিচ্ছিন্নতাকে প্রভাবশালী পাবে না। তা জায়েয করণেও নয়। প্রমাণিত হল যে, মজলিসে ইখতিয়ার গণ্য করা এবং চুক্তি সহীহ্করণে বিচ্ছিন্নতা সংঘটিত হওয়ার ব্যাপার মৌলনীতি বহির্ভূত। তা ছাড়া তাতে কুরআনের বিরুদ্ধতাও রয়েছে। সুন্নাহ থেকে ও মুসলিম উম্মাহ্ ঐকমত্য থেকে প্রমাণিত যে, একটি চুক্তির সহীহ্ হওয়ার শর্ত হচ্ছে চুক্তির মজলিস থেকে দুই পক্ষের বিচ্ছিন্ন হওয়া সহীহ্ হস্তগতকরণে না করেই। তাই কারবারের চুক্তিতে যদি মজলিসের ইচ্ছা-স্বাধীনতা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় পারস্পরিক হস্তগতকরণ ও চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও, তাহলে অবশিষ্ট ইখতিয়ার সম্পূর্ণ হবে না। তাই যখন তারা

দুজন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তাহলে এই বিচ্ছিন্নতার দ্বারা বিচ্ছিন্নতার বাতিল হওয়া সহীহ্ হবে না তার সহীহ্ হওয়ার পূর্বে। তাই তারা দুজন যখন মুসলিম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল— অথচ চুক্তি এখনও সহীহ্ হয়নি— তাহলে এ বিচ্ছিন্নতার দ্বারা তা সহীহ্ হওয়া জায়েয হবে না। তাই তার সহীহ্ হওয়ার যা কারণ তা-ই তার বাতিল হওয়ারও কারণ হবে। মজলিসের ইখতিয়ার না-থাকার প্রমাণ হচ্ছে রাসূলে করীম (স)-এর কথা। তিনি বলেছেন ঃ

لَايَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ اِلَّا بِطِيْبَةِ نَفْسِهِ -

কোন মুসলিম ব্যক্তির মাল হালাল হবে না। হালাল হবে শুধু তার নিজ মনের খুশীতে দিলে।

এতে মুসলিম ব্যক্তি নিজ মনের খুশীতে কোন কিছু দিলে তাহা অপর মুসলমানের জন্যে জায়েয হবে— অন্যথায় জায়েয হবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর সেই মনের খুশী তো পাওয়া গেছে তার বিক্রয়ের চুক্তিকরণের মাধ্যমে। তাই হাদীসের দাবি অনুযায়ী তা গ্রহণ করা হালাল হবে। হাদীসটি যেমন একথা প্রমাণ করছে তেমনি কুরআনের আয়াত-ও তা প্রমাণ করছে। তা হল ঃ

اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ -

তবে যদি তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসায় হয় (তাহলে বাতিল পন্থায় মাল খাওয়া হবে না)।

তার আর একটি প্রমাণ হল, নবী করীম (স) খাদ্য বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ না তাতে দুটি সা' (صاع) প্রচলিত না হবে। একটি صاع বিক্রেতার ও অপরটি ক্রেতার। নবী করীম (স) এ হাদীসের মাধ্যমে খাদ্য বিক্রয় মুবাহ্ ঘোষণা করেছেন, যদি তাতে দুটি صاع প্রচলিত হয়। তাতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোন শর্ত আরোপ করা হয়নি। তাই এর ভিত্তিতে তার বিক্রয় জায়েয হওয়া অনিবার্য হল, যদি তার পরিমাপ বিক্রেতা সেই মজলিসেই করে যেখানে দুজনে বসে বিক্রয়ের চুক্তি করেছে। নবী করীম (স) আর-ও বলেছেন ঃ

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتّٰى يَقْبِضَهُ -

যে ব্যক্তি কোন খাদ্য ক্রয় করল, তার এই ক্রয় সম্পন্ন হবে না তা হস্তগত না করা পর্যন্ত।

হস্তগত করার পর তার বিক্রয় জায়েয হল বলে ঘোষণা করেছেন। এতে দুই পক্ষের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোন শর্তের উল্লেখ নেই। তাই হাদীসের এ ফয়সালার কারণেই চুক্তি গ্রহণের মজলিসে তা হস্তগত হলেই তার বিক্রয়টা জায়েয হবে। আর তা বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকাকে অস্বীকার করে। কেননা যে কাজে বিক্রেতার ইখতিয়ার নেই, তাতে ক্রেতার হস্তক্ষেপ জায়েয হবে না।

এ কথা নবী করীম (স)-এর এ কথাটিও প্রমাণ করে। তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ اِلَّا اَنْ يَّشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا وَلَهُ ثَمَرَةٌ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ اِلَّا اَنْ يَّشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ -

যে ব্যক্তি কোন গোলাম বিক্রয় করল, সে গোলামের মাল থাকলে তা বিক্রেতার হবে। তবে ক্রেতা তার শর্ত করে থাকলে ভিন্ন কথা। তেমনি যে ব্যক্তি খেজুর বাগান (বা গাছ) বিক্রয় করল, তাতে ফল রয়েছে, তাহলে এই ফল-ও বিক্রেতারই হবে। অবশ্য ক্রেতা তার শর্ত করে থাকলে ভিন্ন কথা।

এ হাদীসে ফল ও গোলামের মাল ক্রেতা পাবে বলা হয়েছে যদি ক্রেতা তা পাওয়ার শর্ত করে থাকে। এতেও বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারটি অনুল্লেখিতই রয়েছে। মূল— যার উপর চুক্তি হয়েছে, তার মালিকানা না হলে ক্রয়কারী তার মালিক কোনক্রমেই হতে পারে না। তাই কেবল চুক্তির কারণেই ক্রয়কারী মালিকানা প্রমাণিত হয়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসও তা-ই প্রমাণ করে। হাদীসটি হল, রাসূল (স) বলেছেন ঃ

لَنْ يَجْزِىْ وَلَدٌ وَالِدَهُ اِلَّا اَنْ يَّجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيْهُ فَيُعْتِقَهُ -

সন্তান পিতার কোন কাজেই আসে না। অবশ্য সন্তান যদি পিতাকে অপর কারোর মালিকানাধীন পায়, তাহলে সে তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিতে পারে।

ফিকাহ্‌বিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, ক্রয় করার পর নতুন করে ও ঘটা করে পিতাকে মুক্ত করার কোন প্রয়োজন পড়ে না। যখনই সন্তানের মালিকানা সহীহ্ রূপে প্রতিষ্ঠিত হবে, সে স্বতঃই মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে যাবে। এ হাদীস অনুযায়ী নবী করীম (স) পিতার মুক্তিকে ক্রয়ের পর-ই অনিবার্য করে দিয়েছেন বিচ্ছিন্নতার কোন শর্ত ছাড়া-ই।

একটু বিবেচনা করলেই প্রমাণিত হবে, মজলিস তো দীর্ঘও হয়, হয় সংক্ষিপ্তও। তাই মজলিসের ইখতিয়ারের ভিত্তিতে মালিকানা হওয়ার কথা বললে তা বাতিল হওয়াই অনিবার্য করে দেবে। কেননা যে মজলিসের ইখতিয়ারের সাথে তাকে ও মালিকানা হওয়াকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তার মেয়াদ তো অজানা-ই রয়ে গেছে। যেমন যদি তা সে চূড়ান্তভাবে বিক্রয় করে দেয় এবং দুজনেরই ইখতিয়ার থাকার শর্ত করা হয় মজলিসে অমুকের বসা থাকা পর্যন্ত, তাহলে বিক্রয়টা বাতিল হয়ে যাবে। কেননা যে মজলিসের ইখতিয়ারের সাথে চুক্তি সহীহ্ হওয়াকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তার মেয়াদ তো জানা নেই।

মজলিসে ইখতিয়ার থাকার পক্ষপাতী লোকেরা দলীল হিসেবে আর একটি হাদীসের উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি ইবনে উমর, আবূ বুরজাহ ও হুকাইম ইবনে হাজাম (রা) থেকে বর্ণিত নবী করীম (স) থেকে; তিনি বলেছেন ঃ

اَلْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا -

ক্রেতা-বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকে যতক্ষণ তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়।

নাফে' ইবনে উমর (রা) সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

اِذْ اتَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَائِعِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا اَوْ يَكُوْنُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَاِذَا كَانَ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ -

দুই ক্রেতা-বিক্রেতা যখন কোন বিক্রয়ে একত্রিত হয়, তখন তাদের দুজনার প্রত্যেকেরই ইখতিয়ার থাকে তার বিক্রেতার নিকট থেকে— যতক্ষণ তারা দুজন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়, অথবা তাদের বিক্রয়টাই ইখতিয়ার ভিত্তিক। যদি ইখতিয়ার ভিত্তিক হয়, তাহলে তা অনিবার্য হবে।

যখন কোন ব্যক্তি কোন জিনিস কারোর নিকট বিক্রয় করতে সে তাকে ইখতিয়ার দিত না এবং তা কম না করার-ই ইচ্ছা করত— এ কথা জানতে পারলে উবনে উমর (রা) উঠে দাঁড়াতেন, কিছুক্ষণ চলতেন, আবার ফিরে আসতেন।

এ কথার পক্ষপাতি লোকেরা এ কথার দ্বারা দলীল পেশ করতেন যে, বিক্রেতা ক্রেতা দুজনেরই ইখতিয়ার আছে, যতক্ষণ তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়। ইবনে উমরই এ হাদীসটির বর্ণনাকারী। তিনি রাসূলের কথার মর্ম বুঝেছেন দৈহিকভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া।

আবূ বকর বলেছেন, ইবনে উমর (রা)-এর যে কাজের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তা একথা প্রমাণ করে না যে, তা-ই বুঝি তার মায্হাব— অর মত। কেননা তিনি হয়ত বিক্রেতার সম্পর্কে ভয় পোষণ করতেন যে, সে হয়ত মজলিসের ইখতিয়ার থাকার পক্ষপাতী হবে। তাই সে কাজটি করে সে বিষয়ে সতর্কতার ব্যবস্থা করতেন তার সাথে দোষত্রুটি থেকে সম্পর্কহীনতা দেখাবার জন্যে। এ ব্যাপারে হযরত উসমানের নিকট একটি মামলা দায়ের হয়েছিল। তিনি সে মামলায় তার মতের বিপরীত রায় দেন, তিনি সম্পর্কহীনতা জায়েয করেন নি। তবে ক্রেতাকে যদি সে বলে দেয়, তাহলে ভিন্ন কথা হবে।

ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে সেই বর্ণনা যা তাঁর মতের সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন। সেই বর্ণনাটি ইবনে শিহাব হামজা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ

مَا اَدْرَكَتْ الصَّفْقَةُ حَيًّا فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ -

আমি যে চুক্তি-ই জীবন্ত পেয়েছি, তাই ক্রেতার মাল।

এ কথা প্রমাণ করে যে, তিনি মনে করতেন, পণ্যটা ক্রেতার মালিকানায় চুক্তির বলেই চলে যেত এবং ক্রেতার মালিকানা থেকে বের হয়ে যেত। আর তাতে ইখতিয়ার নিঃশেষ হয়ে যেত।

নবী করীম (স)-এর কথা ঃ 'বিক্রেতা-ক্রেতা দুজনের ইখতিয়ার থাকে তাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত। কোন কোন বর্ণনার ভাষা এইরূপ ঃ

اَلْبَائِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا -

ক্রেতা-বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত।

এর নিগূঢ় তাৎপর্য দাবি করে পারস্পরিক বিক্রয়ের অবস্থা। আর তা হচ্ছে বাজির অবস্থা। তাই তারা দুজন বিক্রয়কে চূড়ান্ত করে এবং পরস্পর সম্মত থাকে, তাহলে বিক্রয়টা হয়েছে বলতে হবে। তাহলে তারা দুজন প্রকৃতপক্ষে ক্রেতা-বিক্রেতার অবস্থায় দাঁড়িয়ে নেই। যেমন দুইজন অনুমানকারী এই নাম লাভ করে অনুমান করার অবস্থায়। কিন্তু কাজটা শেষ হয়ে গেলে সাধারণভাবে এ নামে তারা দুইজন অভিহিত হয় না। ..... এইজন্যে দুই অনুমানকারীর কথা বলা হল, শব্দের যথার্থ অর্থ— যেমন বলেছি— যদি হতো, তাহলে মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে দলীল পেশ করা সহীহ্ হবে না।

যদি বলা হয়, এরূপ ব্যাখ্যা হাদীসের সুবিধাটুকুই প্রত্যাহৃত হয়ে যায়। কেননা চুক্তিতে সম্মতি প্রাপ্তির পূর্বে দুই বাজিধারীর কারোর চুক্তি সংঘটনে ইখতিয়ার থাকা ও তা পরিত্যক্ত হওয়া স্পষ্ট হয় না।

জবাবে বলা যাবে, বরং তাতে বড় ফায়দা রয়েছে। এরূপ অবস্থায় কেউ ধারণা করতে পারে যে, বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে বলে যে, আমি তোমার নিকট বিক্রয় করলাম, তার পক্ষে ক্রেতার কবুলের পূর্বে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয় না। যেমন মালের বদলে দাস মুক্তি দান। মালের বদলে খুলা' তালাক দেয়া। এখানে মনিবও স্বামীর পক্ষে দাস ও স্ত্রীর পক্ষে তা গৃহীত হওয়ার পূর্বে মত ফেরানো সম্ভব হয় না। এ দিয়ে নবী করীম (স) স্পষ্ট করে তুললেন যে, বিক্রয়ের হুকুম হচ্ছে অপর জনের কবুল করার পূর্বে দুজনের প্রত্যেকেরই অধিকার থাকে মত ফেরানোর এবং তা দাসমুক্তি ও স্ত্রীকে খুলা তালাক দেয়ার মধ্যে পার্থক্যকারী।

যদি বলা হয়, দুজনের মধ্যে চুক্তি সংঘটিত হওয়ার পূর্বে দুজন প্রস্তাবককে দুই ক্রেতা বিক্রেতা বলা যায় কি করে ?

জবাবে বলা যাবে, তা সঙ্গত বিক্রয়ের সংকল্প করলেই তাতে বিক্রয়ের প্রস্তাবনা প্রকাশ করলেই। যেমন হত্যার সংকল্পকারী দুই ব্যক্তিকে আমরা দুই যুদ্ধকারী— একে অপরকে হত্যাকারী বলি, যদিও তখন পর্যন্ত তাদের কারোর দ্বারা হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়নি। যেমন ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র— যাকে যবেহ্ করার হুকুম হয়েছিল— যবীহ্ (যবেহ্কৃত) বলা হয়। অথচ শেষ পর্যন্ত তাকে যবেহ্ করা হয়নি। তবু তা বলা হয় এজন্যে যে, তাকে যবেহ্ করার সংকল্প করে যবেহ্র প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করা হয়েছিল। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْفَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ -

তারা— এক তালাক দেয়া স্ত্রীরা— যখন তাদের শেষ মেয়াদে পৌঁছবে, তখন হয় তাদেরকে ভালো ভাবে রেখে দাও, নতুবা ভালোভাবে বিচ্ছিন্ন করে দাও।

(সূরা তালাক ঃ ২)

এর অর্থ, মেয়াদ কাছাকাছি পৌঁছা। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ -

তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দেবে, পরে তারা তাদের মেয়াদ প্রান্তে পৌঁছবে তখন তোমরা তাদেরকে বাধাগ্রস্ত করো না। (সূরা বাকারাহ ঃ ২৩২)

এখানে প্রকৃতই মেয়াদ শেষে পৌঁছা বোঝানো হয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, দুই প্রস্তাবকারীকে দুই ক্রেতা-বিক্রেতা বলা খুবই সঙ্গত, যখন তারা চুক্তি বর্ণিত ভাবে ঘটাবার সংকল্প করে। আর বিক্রয় কাজ যা সুসম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর তাদের দুজনকে বাস্তবতার দৃষ্টিতে ক্রেতা-বিক্রেতা বলা হবে না। সমস্ত ব্যাপারেই তেমনটা হয়ে থাকে। কাজটা শেষ হয়ে গেলে তাদেরকে সেই নামে অভিহিত করা হয় না, সেই কাজের দরুন তাদেরকে যে নাম দেয়া হয়েছিল। তবে প্রশংসাসূচক বা নিন্দাসূচক নামের কথা আলাদা, যেমন পূর্বে এই গ্রন্থের শুরুতে বলা হয়েছে। এই দৃষ্টিতেই বলা হয় তারা দুজন ক্রেতা-বিক্রেতা, তারা দুজন ক্রয়-বিক্রয় বাতিলকারী এবং তারা দুজন চুক্তিকারী।

এই নাম যে সে দুজনের জন্যে প্রকৃতই কোন নাম নয়— চুক্তিটা হয়ে যাওয়ার পর এ নাম আর থাকে না, তার আর একটি প্রমাণ এই যে, তাদের দুজনারই বিক্রয় চুক্তি হয়ে যাওয়া পণ্য তা নষ্ট ও ভঙ্গ করে দেয়ার অধিকার আছে এবং তা সহীহ্। আর তারা যখনই তা করবে তখন তারা ক্রেতা-বিক্রেতা নয়, বিক্রয় চুক্তি ভঙ্গকারী। কিন্তু একই সময় তারা দুজন ক্রেতা-বিক্রেতা হবে ও সেই সাথে তা ভঙ্গকারী ও বিনষ্টকারীও হবে তা কোনক্রমেই জায়েয হতে পারে না। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, সে দুজনার জন্যে ক্রেতা-বিক্রেতা নাম ব্যবহার প্রথম প্রস্তাবনা ও আসল চুক্তি সংঘটিত হওয়ার মুহূর্তেই হয়। আর চুক্তি হয়ে যাওয়ার পর তাদের জন্যে এ নাম এ অর্থে ব্যবহৃত হয় যে, তারা তাই ছিল, যদিও এই মুহূর্তে তারা সে কাজে লিপ্ত নয়। এখনকার এই নাম ব্যবহার তাই প্রকৃত নয়, বরং পরোক্ষ ব্যবহার। ব্যাপার যখন এই, তখন তার বিবেচনা আসল অবস্থার দৃষ্টিতেই হবে। আর তা হচ্ছে বিক্রয় কাজে দুজনারই লিপ্ত থাকা। বিক্রেতা বলবে যে, আমি তোমার নিকট বিক্রয় করলাম। তাতে সে অপর পক্ষের কবুল করার আগেই নিজের পক্ষ থেকে বিক্রয় শব্দটি ব্যবহার করেছে। আর এ-ই হচ্ছে সেই অবস্থা, যখন তাদেরকে مُتَبَائِعَانِ দুই 'ক্রেতা-বিক্রতা' বলা হয়। আর ঠিক তখনই তাদের জন্য ইখতিয়ার থাকে— তাদের প্রত্যেক জনের জন্যে। বিক্রেতার ইখতিয়ার হল, সে বিক্রয় করবে না, বিক্রয়ের কথা ভেঙ্গে দেবে অপর জনের কবুল করার আগেই। আর ক্রেতার জন্যে ইখতিয়ার আছে কবুল করা না-করার— বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পূর্বে المتبائعان। 'ক্রেতা-বিক্রেতা' কথাটি যে এই অবস্থাকেই বোঝায়, তা তোমার নিকট অবশ্যই প্রমাণিত হবে এই প্রেক্ষিতে। দুজনের একজন বিক্রেতা, সে-ই পণ্যের মালিক সে বিক্রেতা হয় যখন সে অপর জনকে বলে ঃ আমি বিক্রয় করেছি। এভাবে দুজনের বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা রাখা বা ভাঙ্গার ইখতিয়ার রয়েছে কেননা একথা জানা-ই আছে যে, ক্রেতা বিক্রেতা নয়। বোঝা গেল, ক্রেতার কবুল করার আগেই সে বিক্রেতা হয়ে আছে।

নবী করীম (স)-এর কথা ঃ اَلْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا। এর ব্যাখ্যা পর্যায়ে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এ কথার অর্থ ঃ বিক্রেতা যখন বলবে আমি তোমার নিকট বিক্রয় করেছি, তখন ক্রেতার 'আমি গ্রহণ করেছি' বলার পূর্বেই বিক্রেতা ফিরে যেতে পারে তার উক্ত কথা থেকে। আর ইমাম আবূ হানীফারও এই মত। আবূ ইউসুফ থেকে বর্ণিত, ওরা দুজনই প্রস্তাবকারী মাত্র। একজন যখন বলল ঃ আমি তোমার নিকট দশ টাকায় বিক্রয় করলাম তখন ক্রেতা তা কবুল করতে ও না-করতে— উভয়ই পারে সেই একই মজলিসে থাকা কালে আর বিক্রেতারও তার নিজ কথা থেকে ফিরে যাওয়ার ইখতিয়ার রয়েছে ক্রেতার তা কবুল করার পূর্বেই। আর বিক্রয় কবুল হওয়ার আগেই দুজনার যে-কোন একজন দাঁড়িয়ে গেলে তাদের জন্যে ইখতিয়ার ছিল তা বাতিল হয়ে যাবে। তা প্রয়োগের কোন অধিকার একজনেরও থাকবে না। ইমাম মুহাম্মাদ কথার মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতার তাৎপর্য বলেছেন। আর তা যথার্থও। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ -

কিতাব প্রাপ্ত লোকেরা বিচ্ছিন্ন হয়েছে অকাট্য প্রমাণ তাদের নিকট পৌঁছার পরে।

(সূরা বাইয়্যেনাত ঃ ৪)

বলা হয়, জনতা অমুক বিষয়ে পরামর্শ করেছে। পরে তারা অমুক কথা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এর অর্থ কোন মতে একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ হওয়া, তাতে সম্মত হওয়ার পরে তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া— ভিন্ন ভিন্ন মতের হয়ে যাওয়া, যদিও তারা সেই মজলিসেই একত্রিত ছিল।

কথায় বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারটি একটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ও সমর্থিত। মুহাম্মাদ ইবনে বকর আল বস্‌রী আবূ দাউদ, কুতায়বা, লায়স, মুহাম্মাদ ইবনে আজলাম, আমর ইবনে শুয়ায়ব, তাঁর পিতা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ صَفْقَةُ خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ اَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ اَنْ يَسْتَقِيْلَهُ -

ক্রেতা-বিক্রেতার ইখতিয়ার আছে যতক্ষণ তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়। তবে কারবারটাই যদি ইখতিয়ারের হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু তার জন্যে তার সঙ্গী থেকে সে তা কবুল করতে পারে— এ ভয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া হালাল নয়।

ক্রেতা-বিক্রেতা ইখতিয়ার সম্পন্ন যতক্ষণ তারা দুজন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়— এতে কথার দ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়া বোঝায়। লক্ষণীয়, রাসূল (স) বলেছেন ঃ তার সঙ্গী তা কবুল করতে পারে এই ভয়ে তাকে ছেড়ে যাওয়া তার জন্যে হালাল নয়'— এ হচ্ছে দৈহিকভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা কথার দ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার এবং কথার দ্বারা চুক্তি সংঘটন সহীহ্ হওয়ার পর। আর সেই চুক্তি ভেঙ্গে দেয়া। সে তো ভেঙ্গে দেয়ার ব্যাপার।

এ ব্যাপারটি দুটি দিক দিয়ে প্রমাণ করে যে, চুক্তি সংঘটিত হওয়ার পর আর ইখতিয়ার থাকে না। তার একটি হল, তার মজলিসের ইখতিয়ার থাকলে তা ভেঙ্গে দেয়ার জন্যে বলার কোন প্রয়োজন হতো না। বরং সে স্বীয় ইখতিয়ার বলেই— যার এর মধ্যে তার আছে— ভেঙ্গে দিতে পারত। আর দ্বিতীয় হল, الاقالة —চুক্তি ভেঙ্গে দেয়া সহীহ্ হওয়ার পর-ই এবং দুজনের প্রত্যেকেরই মালিকানা লাভ হওয়ার পর-ই তা বলা যেতে পারে। এ থেকেও ইখতিয়ার না থাকা-ই প্রমাণিত হয় এবং বিক্রয়টা সহীহ্ হওয়া প্রমাণিত-প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাসূলের কথা 'তার জন্য সঙ্গী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া হালাল নয়' প্রমাণ করে যে, তারা দুজন মজলিসে আসীন যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ চুক্তি ভঙ্গ করার দাবি করলে তা ভেঙ্গে দেয়াই পছন্দনীয় এবং তার দাবির জবাবে এগিয়ে না আসা-ই মকরূহ— অপছন্দনীয়। কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর এই হুকুম উল্টে যাবে। বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর চুক্তি ভঙ্গের দাবির জবাব না দেয়া তার জন্যে মকরূহ— অপছন্দনীয় হবে না। বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে সে দাবি প্রত্যাখ্যান করা মকরূহ হবে।

তার আর একটি প্রমাণ হল আবদুল বাকী ইবনে কানে' বর্ণিত হাদীস, যা তিনি আলী ইবনে আহমাদুল আজদী, ইসমাঈল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জারারাতা, হুশায়ম, ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ নাফে ইবনে উমর (রা) সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْبَيِّعَانِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا اِلَّا اَنْ يَّفْتَرِقَا اِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ -

দুটি বিক্রয় এমন যে, তাদের মধ্যে কোন বিক্রয় নেই। আছে শুধু এই যে, তারা দুজন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবে ইখতিয়ারের বিক্রয় আলাদা।

আবদুল বাকী মুয়ায ইবনুল মুসান্না, আল-কানবী, আবদুল আযীয ইবনে মুসলিমুল কাসলামী, আবদুল্লাহ ইবনে দীনার, ইবনে উমর (রা) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتّٰى يَفْتَرِقَا -

প্রত্যেক দুটি বিক্রয়ে কোন বিক্রয় নেই সে দুটির মধ্যে, শেষ পর্যন্ত তারা দুজন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

এ হাদীসের মাধ্যমে নবী করীম (স) জানিয়ে দিলেন যে, প্রত্যেক দুটি বিক্রয় সে দুটিতে কোন বিক্রয় হয় না, হয় বিচ্ছিন্নতার পর। এ কথা প্রমাণ করে যে, তিনি প্রস্তাবনার অবস্থায় দুই বিক্রয়ের মধ্যে কোন বিক্রয় হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। তা এ জন্যে যে, সে দুটিতে যদি তারা বিক্রয়-ক্রয় করত, তাহলে নবী করীম (স) তাদের এ বিক্রয়-ক্রয়কে অস্বীকার করতেন না চুক্তি সহীহ্ ও তাদের দুজনার মধ্যে তা সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও। কেননা নবী করীম (স) অস্বীকার করতেন না যা সংঘটিত ও প্রমাণিত হতো। তাই আমরা জানতে পারলাম যে, দুই প্রস্তাবনাকারী বলতে সে দুজনকে বুঝিয়েছেন, যারা ক্রয়-বিক্রয়ের সংকল্প গ্রহণ করেছে এবং বিক্রেতা ক্রেতার জন্যে বিক্রয়কে অনিবার্য করেছে এবং ক্রেতা তা ক্রয়ের সংকল্প গ্রহণ করেছে। সে বিক্রেতাকে বলেছে ঃ আমার নিকট বিক্রয় কর। তা সত্ত্বেও তাদের দুজনার মধ্যে

কোন বিক্রয় হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। শেষ পর্যন্ত তারা দুজন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে কথা ও কবুলের মাধ্যমে। কেননা তার কথা ঃ 'আমার নিকট বিক্রয় কর' কথাটি চুক্তি কবুল ছিল না, তা বিক্রয় সংক্রান্ত কোন শব্দও ছিল না। তা ছিল একট আদেশ মাত্র। পরে যখন বলল ঃ আমি কবুল করেছি। তখনই বিক্রয় সংঘটিত হল। আর এই হচ্ছে সেই বিচ্ছিন্নতা, যা নবী করীম (স) বোঝাতে চেয়েছেন পূর্বে উল্লেখ করা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে।

যদি বলা হয়, প্রস্তাব ও প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে বিক্রয় ঘটানোর অবস্থায় বিক্রয়কে অস্বীকার করাই যে নবী করীম (স)-এর লক্ষ্য, তা আমি অস্বীকার করিনি। বরং তিনি শুধু অস্বীকার করেছেন তাদের দুজনের মালের বিক্রয় তাদের দুজনের মাঝে হওয়াকে মজলিসের ইখতিয়ার অবস্থায়।

এর জবাবে বলা যাবে, এটা ভুল কথা এদিক দিয়ে যে, ইখতিয়ার প্রমাণ করালে তা থেকে বিক্রয় নামটি অস্বীকার করা অনিবার্য হয় না। দেখা-ই যায়, বিচ্ছিন্নতার পর তারা দুজন যে ইখতিয়ারের শর্ত করেছে, তাতেও নবী করীম (স) তাদের মধ্যে বিক্রয় সংঘটিত হয়েছে বলে স্বীকার করেছেন। আর তাতে ইখতিয়ার প্রমাণ করা তা থেকে বিক্রয় নামটি অস্বীকার করার কারণ ছিল না। কেননা তিনি বলেছেন ঃ প্রতি দুটি বিক্রয়ে পক্ষদ্বয়ের মাঝে কোন বিক্রয় হয় না তাদের দুজনের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত, তবে ইখতিয়ারের বিক্রয় ভিন্নতর। এতে ইখতিয়ারের বিক্রয়কে বিক্রয়ই বলেছেন। এমতাবস্থায় 'প্রতি দুইটি বিক্রয়ে তাদের মধ্যে বিক্রয় নেই যতক্ষণ না তারা দুজন বিচ্ছিন্ন হচ্ছে' কথাটি দ্বারা তিনি যদি প্রস্তাব ও প্রস্তাব গ্রহণকালীন অবস্থা বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি তাদের দুজনার মাঝে বিক্রয় সংঘটিত হওয়াকে কখনই অস্বীকার করতেন না মজলিস কেন্দ্রিয় ইখতিয়ারের কারণে। যেমন তিনি ইখতিয়ার শর্ত ভুক্ত হওয়া কালেও তা অস্বীকার করেন নি। বরং তা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তাকে 'বিক্রয়' বানিয়েছেন। একথা প্রমাণ করে যে, 'প্রতি দুটি বিক্রয়ে দুজনের বিচ্ছিন্ন হওয়া পর্যন্ত কোন বিক্রয় হয় না' একথাটির দ্বারা বিক্রয়ের প্রস্তাবনাকারীদ্বয়কে বুঝিয়েছেন। এর ফায়দা এই পাওয়া গেছে যে, 'তুমি আমার নিকট থেকে ক্রয় কর' এ কথা কিংবা ক্রেতার 'আমার নিকট বিক্রয় কর' কথা-ই বিক্রয় নয়, যতক্ষণ না তারা দুজন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে বিক্রেতা এই বলে যে, আমি বিক্রয় করেছি এবং ক্রেতা বলবে ঃ আমি কিনে ফেলেছি। তা হলে তাদের দুজনের বিচ্ছিন্ন হওয়াটা বিক্রয় কার্য সম্পূর্ণ হওয়ার পর এবং তাতে শর্তাধীন কোন ইখতিয়ার না-থাকাই স্বাভাবিক। অবশ্য তা বিক্রয় হবে প্রস্তাবনা ও কবুলের পর কথা-বার্তায় দুজন বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর দৈহিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে না গেলেও। রাসূলের কথা 'ক্রেতা-বিক্রেতা বিচ্ছিন্ন হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের ইখতিয়ার থাকে' কথাটি অধিকভাবে এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়, যেমন পূর্বে আমরা বলেছি। আর কুরআনের বাহ্যিক স্পষ্ট কথার বিরুদ্ধে সম্ভাব্যতা তুলে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা কখনই জায়েয হতে পারে না। বরং হাদীসের তাৎপর্য কুরআনের আনুকূল্যে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়, তার বিপরীত অর্থে প্রয়োগ সঙ্গত হতে পারে না।

একটু চিন্তা-বিবেচনা করলেই যেমন বলেছি প্রমাণিত হবে যে, সকলের ঐকমত্য হচ্ছে এ কথায় যে, বিবাহ, খুলা তালাক ও দাসমুক্তি— যা মালের বিনিময়ে হয় এবং ইচ্ছামূলক হত্যার

সন্ধি-সমঝোতা দুই পক্ষের চুক্তিতে যখন সাব্যস্ত হয় তখন প্রস্তাবনা ও তা কবুলের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয় এবং তাতে এমন ইখতিয়ার থাকে না দুজনের এক জনের পক্ষেও। অর্থাৎ এতে যে প্রস্তাবনাও হয়, যার দ্বারা চুক্তি সহীহ্ হয়, তা শর্তাধীন ইখতিয়ার ছাড়া-ই হয়।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ -

এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না।

এ পর্যায়ে আতা ও সুদ্দী বলেছেন; পরস্পরকে হত্যা করো না।

আবূ বকর বলেছেন, এ ধরনেরই আর একটি আয়াত হচ্ছে ঃ

وَلَا تُقَتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ -

তোমরা তাদেরকে মসজিদে হারাম-এর নিকট হত্যা করো না, যতক্ষণে তারা তোমাদেরকে সেখানে হত্যা না করবে। (সূরা বাকারাহ ঃ ১৯১)

এর-ও অর্থ, তোমরা পরস্পরকে হত্যা করো না। আরবরা বলে ঃ 'কাবার রব্ব-এর কসম, আমরা হত্যা করেছি।' একথা তারা বলে যখন তাদের কেউ হত্যার কাজ করে। বলা হয়েছে, এ কথার সৌন্দর্য এখানে যে, মুসলমানরা যেহেতু একই দ্বীনের অনুসারী, এজন্যে তারা একই অভিন্ন ব্যক্তি সত্তার মত। এই দিকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না।' আর একথার লক্ষ্য হল এই বলা যে, তোমরা পরস্পরকে হত্যা করো না। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ كَالنَّفْسِ الْوَاحِدَةِ اِذَا اَلِمَ بَعْضُهُ تَدَاعٰى سَائِرُهُ بِالْحُمّٰى وَالسَّهَرِ -

মুমিন লোকরা একটি অভিন্ন ব্যক্তিসত্তার মতই। তার কোন অংশ বেদনা যন্ত্রণায় আক্রান্ত হলে তার সমগ্র দেহই জ্বরাক্রান্ত ও অনিদ্রায় জর্জরিত হয়ে পড়ে।

তিনি আরও বলেছেন ঃ

اَلْمُؤْمِنُوْنَ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا -

মুমিনরা একটি প্রাচীরের মত। তার একাংশ অপর অংশকে শক্ত ও দৃঢ় করে।

এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র কথাটির তাৎপর্য হল বাতিল উপায়ে তোমাদের ধন-মাল খেয়ে পরস্পরকে হত্যা করবে না। অন্যান্য হারাম করা জিনিসও খাবে না। কথাটি এ রকমেরই, যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ -

তোমরা যখন ঘরসমূহে প্রবেশ করবে, তখন নিজেদের প্রতি সালাম করবে।

(সূরা নূর ঃ ৬১)

কথাটির অর্থ এ-ও হতে পারে যে, তোমরা মাল চাইতে গিয়ে বা তা লাভ করতে গিয়ে নিজেদেরকে হত্যা করবে না। তা এ ভাবেও হতে পারে যে, নিজেকে ধোঁকায় ফেলে দিল, যার পরিণামে ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ল। এ-ও হতে পারে যে, তোমরা ক্রোধের অবস্থায় নিজেদেরকে হত্যা করো না বা বিশ্রামহীনতার কারণে নিজেদেরকে মেরে ফেলো না। আর আসলে এই সব অর্থই এ আয়াতের বক্তব্য হতে পারে। কেননা ব্যবহৃত শব্দে সেই সম্ভাবনা পুরোপুরি বিদ্যমান। আল্লাহ্র কথা ঃ

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا -

আর যে লোক সীমালংঘন করে ও জুলুমমূলকভাবে কাজ করবে, তাকে আমরা অবশ্য জাহান্নামে পৌঁছে দেব।

এ আয়াতে সীমালংঘনকারী সম্পর্কে এই কঠোর কথা বলা হয়েছে। তার কয়েকটি কারণ রয়েছে। একটি সে বাতিলপন্থায় মাল খাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। প্রাণী হত্যা করেছে বিনা কারণে। তার ফলেই এইরূপ কঠোর হুকমকি (وعيد) তাদের জন্যে নাযিল হয়েছে— এই দুটি খাসলাতের কারণেই। আতা বলেছেন, এই কথাটি বিশেষভাবে আত্মহত্যার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে এবং তা সম্পূর্ণ হারাম; কেউ কেউ বলেছেন, সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত যত নিষিদ্ধ কাজের উল্লেখ হয়েছে সেই সব কাজকে সামনে রেখেই এই কথাটি বলা হয়েছে। কারুর কারুর মতে কথাটি এ কথার প্রসঙ্গে ঃ

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা জোরপূর্বক মেয়েলোকদের উত্তরাধিকারী হবে— তা তোমাদের জন্যে হালাল নয়।

কেননা এ কথার পূর্ববর্তী কথা এইরূপ কঠোর হুমকির কাছাকাছি। কিন্তু প্রকাশ্য দিক হচ্ছে তা বাতিল পন্থায় মাল ভক্ষণ ও হারাম আত্মহত্যার দিকে ফিরে যায়। উক্ত কঠোর হুমকির বাণীর সাথে দুটি গুণবাচক শব্দের উল্লেখ হয়েছে— একটি সীমালংন আর দ্বিতীয়টি জুলুম। ফলে ভুলবশত করা ও বিভ্রান্তিতে পড়ে করা কাজ এবং শরীয়তের বিধানে ইজতিহাদ করতে গিয়ে ইচ্ছামূলক ও নাফরমানী স্বরূপ যা করা হয়, তা এর বাইরে পড়েছে। জুলুম ও সীমালংঘন দুটি আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও অর্থের দিক দিয়ে দুটি খুবই কাছাকাছি, তার কারণ একই কথা বিভিন্ন শব্দ দ্বারা প্রকাশ পেলে তা খুবই উত্তম ও সুন্দর হয়।

## কামনা-লালসা নিষিদ্ধ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ -

আল্লাহ্ তোমাদের কতককে অপর কতকের উপর যে যে অতিরিক্ত অনুগ্রহ দান করেছেন, তোমরা তার কামনা ও লালসা করো না (তা পাওয়ার জন্যে তোমরা লালায়িত হবে না)।

সুফিয়ান ইবনে আবূ নুজাইহ্ মুজাহিদ, উম্মে সালমা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন—

আমি বললাম ঃ 'হে রাসূল! পুরুষরা লড়াই করে, মেয়েরা লড়াই করে না। আর সে জন্যেই পুরুষদেরই উল্লেখ করা হয়, মেয়েদের কোন উল্লেখ নেই।'

এর পরই আল্লাহ্ নাযিল করলেন ঃ তোমরা পাওয়ার লিপ্সা করো না সে জিনিস, যা আল্লাহ তোমাদের কতকের উপর অপর কতকের অপেক্ষা অধিক অনুগ্রহ দান করেছেন।

আরও নাযিল হয়েছে ঃ ...... اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ 'মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান মেয়েরা .......।

কাতাদাতা আল-হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন; বলেছেন ঃ

لَا يَتَمَنَّ اَحَدٌ الْمَالَ وَمَا يُدْرِيْهِ لَعَلَّ هَلَاكُهُ فِىْ ذٰلِكَ الْمَالِ -

তোমাদের কেউ যেন ধন-মালের কামনা না করে, তাকে কোন জিনিস জানিয়ে দেবে, তার ধ্বংসই হয়ত সেই ধন-মালে নিহিত রয়েছে।

সাঈদ কাতাদাতা সূত্রে وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ আল্লাহ্‌র এই কথা প্রসঙ্গে বলেছেন, জাহিলিয়াতের সময়ের লোকেরা মেয়েদেরকে মীরাসের কোন অংশ দিত না। বাচ্চাদেরও দিত না। তারা মীরাস দিয়ে যেত তাদের ভালোভাসার লোকদেরকে। কিন্তু ইসলামের যুগে যখন মেয়েলোককে তার অংশ ও বাচ্চাকে তার অংশ দেয়া হল এবং একজন পুরুষকে দুইজন মেয়েলোকের অংশের সমান দেয়া হতে লাগল; তখন মেয়েরা বলতে শুরু করল, মীরাসে আমাদের অংশ যদি পুরুষদের অংশের সমান হতো, তাহলে কতই না ভালো হতো। আর পুরুষরা বলতে লাগল, আমরা নিশ্চয়ই আশা পোষণ করি যে, পরকালেও আমাদেরকে মেয়েদের তুলনায় অগ্রাধিকার দেয়া হবে, যেমন মীরাসে আমাদেরকে অতিরিক্ত দেয়া হয়েছে, তখন আল্লাহ্ নাযিল করলেন ঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ -

পুরুষদের জন্যে অংশ রয়েছে তাদের উপার্জন থেকে এবং মেয়েদের জন্যেও অংশ রয়েছে তাদের উপার্জন থেকে।

মেয়েরা বলতে লাগল, মেয়েদের জন্যে তাদের নেক আমলের অনুরূপ দশগুণ পাওয়া যথেষ্ট, যেমন করে পুরুষদের দেয়া হয়। আল্লাহ বললেন ঃ

وَاسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ - اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا -

তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞানী।

আল্লাহ আমাদের কতককে কতককের উপর যে অতিরিক্ত অনুগ্রহ দিয়েছেন, তার লোভ করতে ও পেতে চাইতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। কেননা আল্লাহ যদি জানতেন যে, একজনকে তিনি যা দিয়েছেন তা অপরজনকে দেয়াই কল্যাণকর তাহলে তিনি তা অবশ্য দিতেন। কেননা যে কার্পণ্য করেছে তিনি তাকে দিতে অস্বীকার করেন না, বরং তিনি যা দিয়েছেন তার অধিক দিতে অস্বীকার করেন।

আয়াতে যে নিষেধ এসেছে, আসলে তা হচ্ছে হিংসা থেকে নিষেধ। আর হিংসা হল, একজনের প্রতি প্রদত্ত নিয়ামত তার থেকে বিলীন হয়ে তার নিজের দিকে আসার কামনা করা। যেমন আবূ হুরায়রাতা (রা) বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا يَخْطِبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيْهِ وَلَا يَسُوْمُ عَلَى سَوْمِ اَخِيْهِ وَلَا تَسْئَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ اُخْتِهَا لِتَكْتَفِيَ مَافِيْ صَحْفَتِهَا فَاِنَّ اللّٰهِ هُوَ رَازِقُهَا -

একজন যেন তার ভাইর দেয়া বিয়ে-প্রস্তাবের উপর নিজের বিয়ে-প্রস্তাব না দেয় এবং কেউ যেন নিজের ভাইর পণ্য মূল্য বলার উপর আর একটা মূল্যের কথা পেশ না করে। কোন মেয়েলোক যেন তার বোনের তালাক দাবি না করে— এই উদ্দেশ্যে যে, তার পাত্রে যা আছে, তা সে নিজে পুরোপুরি কাছিয়ে-গুটিয়ে নিয়ে নেবে। কেননা আল্লাহ্-ই হচ্ছেন তার রিযিকদাতা।

এ হাদীসে নবী করীম (স) বলেছেন, এক বিয়ে প্রস্তাব সম্পর্ক চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যাওয়ার পূর্বে নিজের বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে না বসে, যখন কনে তার প্রতি আস্থাবান ও বিয়েতে সম্মত হয়েছে। এবং একজনের দরাদরির উপর আর একজ দরাদরি শুরু না করে তেমনি ভাবে।

এই প্রেক্ষিতে বিচার্য, একজনের যা হয়েছে, যে জিনিসের মালিক হয়েছে ঠিক সেই জিনিসের মালিক হওয়ার জন্যে কামনা-লালসাকারী সম্পর্কে তোমার কি মনে হয়? রাসূল (স) বলেছেন, কোন মেয়ে যেন তারই অপর এক বোনের তালাকের দাবি না করে তার হক দূরে নিক্ষেপ করে তা নিজের জন্যে লাভ করার উদ্দেশ্য।

সুফিয়ান জুহরী সালেম তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَاحَسَدَ اِلَّا فِيْ اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوْ يَقُوْمُ بِهٖ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ -

দুই জিনিসের কামনায় হিংসা হয় না। একটি— আল্লাহ্ তাকে ধন-মাল দিয়েছেন। সে দিন-রাত তা থেকে ব্যয় করছে। আর এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ কুরআন দিয়েছেন, সে দিন-রাত তাই নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আবূ বকর বলেছেন, কামনা লালসা দুই প্রকারের। একটি— অন্য ব্যক্তির প্রাপ্ত নিয়ামত বিলীন হয়ে যাক— এটা হিংসা। এই কামনা নিষিদ্ধ। আর দ্বিতীয়, অন্য ব্যক্তির যেমন আছে তেমনি তারও হোক এই রূপ কামনা। অন্য ব্যক্তির প্রাপ্ত নিয়ামতের বিলীনতা সে কামনা করে না। তাই কামনা নিষিদ্ধ নয়, যদি তার দ্বারা কল্যাণ লক্ষ্য হয়। যৌক্তিকতার দিক দিয়েও তা সঙ্গত। নিষিদ্ধ কামনা বাসনার একটি দিক হচ্ছে যা ঘটা সম্ভব নয়, তার কামনা করা। যেমন মেয়েলোক তার কামনা করবে পুরুষ হওয়ার। অথবা কামনা করবে খিলাফত ও ইমামত নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভ করার ও এই ধরনের অন্যান্য জিনিস, যা হবে না ও হয় না বলে জানা-ই আছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'পুরুষদের জন্যে অংশ রয়েছে যা তারা অর্জন করেছে; তা থেকে এবং মেয়েদের জন্যে অংশ রয়েছে যা তারা নিজেরা অর্জন করেছে। এর ব্যাখ্যায় কয়েকটি দিক তুলে ধরা হয়েছে। একটি, প্রত্যেকের জন্যে সওয়াবের অংশ রয়েছে। তার ব্যাপারাদির উত্তম ব্যবস্থাপনার দরুন তার জন্য করা হয়েছে তাতে তার জন্যে মহানুভবতা করা হয়েছে। ফলে সে তা পেয়েছে। এবং পরিণামে সে উচ্চতর মর্যাদায় পৌঁছে গেছে। অতএব এই ব্যবস্থাপনার বিপরীত কিছু পাওয়ার কামনা করো না। কেননা প্রত্যেকের জন্যই তার নিজের অংশ রয়েছে। তাতে কিছু মাত্র কম করা হবে না, ত্রুটিপূর্ণও করা হয় না। আর দ্বিতীয়, প্রত্যেকেরই জন্যে তার উপার্জনের প্রতিফল রয়েছে। ফলে সে যেন অন্য একজনের পাওয়া জিনিসের কামনা করে তার আমল নিষ্ফল করে দিয়ে তা বিনষ্ট না করে, হারিয়ে না ফেলে।

এ পর্যায়ে আরও বলা হয়েছে, পুরুষ ও নারী প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাপ্য অংশ রয়েছে। আল্লাহ্‌র দেয়া বৈষয়িক যে নিয়ামত সে উপার্জন করবে, তা থেকে সে পাবে। অতএব আল্লাহ্ তার ভাগে যা দিয়েছেন তাই পেয়েই তার সন্তুষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয়। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ -

আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর অনুগ্রহ চাও।

এর তাৎপর্যে বলা হয়েছে, অন্য জনের যা আছে, তুমিও যদি তা পাওয়ার প্রয়োজন বোধ কর, তাহলে তা আল্লাহ্‌র নিকট চাও— তিনি যেন তার মতো তোমাকেও তাঁর অনুগ্রহ দান করেন। অন্যের যেটা আছে সেটাই পেতে চাইবে না। তবে সামগ্রিক কল্যাণের দৃষ্টিতে সেটা পাওয়াই যদি জরুরী শর্ত হয়, তাহলে ভিন্ন কথা।

## আল-আসাবা

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ -

এবং প্রত্যেকেরই জন্যে আমরা আসবা বানিয়ে দিয়েছি পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গেছে তা থেকে।

ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদাত বলেছেন, আয়াতের মাওয়ালী বলতে এখানে 'আসাবা' বোঝানো হয়েছে। সুদ্দী বলেছেন, মাওয়ালী অর্থ উত্তরাধিকারী। বলা হয়েছে ঃ الموالى শব্দের মূল وَلِىُّ الشَّىْءِ يَلِيْهِ একটি জিনিসে ওলী সেই জিনিসের নিকটবর্তী ও ঘনিষ্ঠ। আর তা হল অর্থনৈতিক কার্যকলাপে অভিভাবকত্ব সম্পৃক্ত হওয়া।

আবূ বকর বলেছেন, المولى শব্দটি বহু কয়টি অর্থের সমন্বয়। তার কয়েকটি দিক রয়েছে। المولى অর্থ, ব্যক্তির পিতার দাসত্ব মুক্তিদাতা। তার মুক্তি লাভে নিয়ামত দাতা। একারণেই مولى النعمه বলা হয়েছে। দাসত্ব শৃঙ্খল মুক্ত দাস তার প্রতি অবদান রাখার কারণে। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা অভিভাবকত্ব তার সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে। এই কথাটি ঠিক

তেমন, যেমন পাওনাদারকে আরবীতে 'গরীম' (উত্তমর্ণ বা পাওনাদার বলা হয়) কেননা তার পাওনা অবশ্য দেয়, তার দাবি; হক্ এর দাবিদার সে। আর যার নিকট পাওনা চাওয়া হয় তাকেও আরবী ভাষায় 'গরীম'ই বলা হয়। কেননা পাওনা পাওয়ার জন্যে দাবিটা তার-ই প্রতি হয়ে থাকে, তার ঋণ অবশ্য পরিশোধ্য। আর المولى অর্থ 'আসাবা' মাওলা অর্থ, حليف সন্ধি সম্পৃক্ত। কেননা সে কিরার চুক্তিতে সে তার ব্যাপার নিয়ে মাতুব্বরি করে। চাচার পুত্রকেও المولى বলা হয়। কেননা দুজনের মধ্যে বংশীয় নিকটবর্তিতা থাকার দরুন সাহায্য-সহযোগিতা খুবই অগ্রসর ও তৎপর থাকে। অভিভাবকও المولى । কেননা সে-ই ব্যক্তির বড় পৃষ্ঠপোষক। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكَافِرِيْنَ لَامَوْلٰى لَهُمْ -

তা এজন্যে যে, আল্লাহ্ ঈমানদার লোকদের মাওলা। আর কাফিরদের কেউ মাওলা নেই। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ১১)

চাচার বংশকে 'মাওয়ালী' বলা হয়েছে। ক্রীতদাসের মালিককেও 'মাওলা' বলা হয়। কেননা মালিকত্ব, হস্তক্ষেপ, পৃষ্ঠপোষকতা, সাহায্য ও সমর্থনের মাধ্যমে সে তার নিকটবর্তী থাকে। 'মাওলা' শব্দের এইরূপ বিভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে। এ এক বহু বহু অর্থ সমন্বিত শব্দ। এর সাধারণত্বকে গণ্য করা সহীহ্ হবে না। এই কারণে আমাদের ফিকাহ্বিদগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার মাওলার জন্যে অসিয়ত করেছে, অথচ তার রয়েছে উচ্চ দিকের 'মাওয়ালী' ও নিম্ন দিকের 'মাওয়ালী'। তার অসিয়ত বাতিল হবে। কেননা একই অবস্থায় এই উচ্চ ও নিম্নস্থ মাওয়ালী ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে শামিল হয় না। আর তাদের দু শ্রেণীর কোনটি অপরটির তুলনায় উত্তমও নয়। এই কারণে তার সে অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে।

কিন্তু مولى -র সব কয়টি অর্থের মধ্যে এখানে 'আসাব' অর্থটিই অধিক উত্তম। কেননা ইসরাঈল আবূ হুসায়ন আবূ সালেহ আবূ হুরায়রাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَنَا اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مَنْ مَّاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَمَالُهُ لِلْمَوَالِى الْعَصَبَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا اَوْضِيَاعًا فَاَنَا وَلِيُّهُ -

আমি মুমিনদের প্রসঙ্গে অনেক উত্তম সাহায্যকারী। যে লোক মরে গেল ও মাল রেখে গেল, তার এই মাল আসাবাদের মধ্যে বন্টন হবে। আর যে লোক দুর্বহ বোঝা রেখে গেল কিংবা রেখে গেল ধ্বংসোম্মুখ অসহায় সন্তান বংশধর, আমি-ই হচ্ছি তার ওলী— অভিভাবক।

মা'মার ইবনে তায়ূস তাঁর পিতা-ইবনে-ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَقْسِمُوْا الْمَالَ بَيْنَ اَهْلِ الْفَرَائِضِ ، فَمَا اَبْقَتِ السِّهَامُ فَلَاَوْلٰى رَجُلٍ ذَكَرٍ -

তোমার পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তি অংশীদারদের মধ্যে বন্টন করে দাও। যে অংশ অবশিষ্ট থেকে যাবে তা পুরুষ আসাবাদের জন্যে হবে।

নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীসে 'মাওয়ালী' বলতে আসাবাদের বুঝিয়েছেন। রাসূলের কথা ঃ 'পুরুষ আসাবাদের জন্যে'— কথাটি বের হয়ে এসেছে وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ থেকে।

ওরা আসাবা, আয়াতে 'মাওয়ালী' যাদের বলা হয়েছে।

ফিকাহবিদদের মধ্যে এ নিয়ে কোন মতানৈক্য নেই যে, নির্দিষ্ট অংশের অধিকারীদের অংশ দিয়ে দেয়ার পর যে অংশ অতিরিক্ত ও উদ্ধৃত হবে, তা মৃতের নিকটবর্তী আসাবারা পাবে। আর 'আসাবা' হচ্ছে সে সব পুরুষ লোক, যাদের সাথে মৃতের নিকটাত্মীয়তা বংশের ছেলে ও পিতার দিক দিয়ে প্রমাণিত হবে। যেমন দাদা ও পিতার দিকের ভাই, চাচা ও তার ছেলেরা— তাদের পরবর্তী। যারা পুত্র সন্তান ও পিতার দিক দিয়ে সম্পর্কিত হয়। তবে বোনরা আসাবা হয় কেবলমাত্র কন্যাদের সাথে। এই আসাবারা মীরাস পাবে সর্বাধিক নিকটবর্তী যে, তার পরে সর্বাধিক নিকটবর্তী— এই নিয়মে। নিকটবর্তী থাকলে দূরবর্তী পাবে না। তবে মৃতের সঙ্গে যারা কোন মেয়েলোকের সম্পর্কের দিক দিয়ে সম্পর্কিত হয়, সে যে 'আসাবা' হবে না, সে বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই।

দাসমুক্তির দিক দিয়ে যে মাওলা, সে মুক্ত দাসের 'আসাবা' হবে, হবে তার সন্তানের জন্যে। মুক্তিদাতার পুরুষ সন্তানরাও তাদের থেকে আসাবা হবে মুক্ত দাসের— যখন তাদের পিতা মরে যাবে এবং তার পৃষ্ঠপোষকতার (ولاء) সম্পর্ক সেই পুরুষ ছেলেদের জন্যে হবে, তার মেয়ে সন্তানদের জন্যে নয়। (ولاء) দ্বারা কোন মেয়েলোক আসাবা হবে না। হবে শুধু সে যে মেয়েলোক মুক্ত করেছে কিংবা যে মেয়েলোক মুক্ত করেছে তাকে যে পুরুষ মুক্ত করেছে সে। দাসমুক্তির মাধ্যমে এই আসাবা নীতি সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। আর আল্লাহ্র কথা ঃ 'প্রত্যেকের জন্যে আসাবা মাওয়ালী বানিয়েছি পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গেছে তা থেকে'-এর তাৎপর্য থেকেও তা প্রমাণিত হয়, যখন আসাবা হবে, তার পক্ষ থেকে 'আকীলা' দেয়া হবে, যেমন তার চাচার পুত্ররা তার পক্ষ থেকে 'আকীলা' দেবে।

যদি বলা হয়, মৃত ব্যক্তি দাসমুক্তির মাওলার নিকটাত্মীয়দের থেকে নয়। তার পিতা-মাতার দিক থেকেও নয়, তাহলে ?

জবাবে বলা যাবে, মৃতের সাথে সম্পর্কশীল কোন ওয়ারিস যদি তার সঙ্গে থাকে যেমন কন্যা ও বোন, তাহলে তার এই অংশে শরীক হওয়া জায়েয হবে। তখন সে আসল অংশ পাবে, যদিও সে মৃতের নিকটাত্মীয়দের মধ্যে থেকে নয়। কেননা ওয়ারিসদের মধ্যে এমন হবে যার সম্পর্কে এ কথা বলা সঙ্গত হবে যে, সে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের রেখে যাওয়া। তখন কোন কোন ওয়ারিস পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের মীরাস পেয়ে গিয়ে থাকবে।

নিম্নস্তরের ওলীর উচ্চ স্তরের ওলী থেকে মীরাস পাওয়ার ব্যাপারে মনীষীদের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে। আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ জুফার, মালিক, সওরী, শাফেয়ী ও সমগ্র

শরীয়তবিদগণ বলেছেন, নিম্ন পর্যায়ে মাওলা উচ্চ পর্যায়ে মাওলা থেকে মীরাস পাবে না। আবূ জাফর আত-তাহাভী আল-হাসান ইবনে জিয়াদ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, বলেছেন, নিম্ন পর্যায়ের মাওলা উচ্চ পর্যায়ের মওলা থেকে মীরাস পাবে। সেখানে একটি হাদীসকে ভিত্তি করা হয়েছে যা হাম্মাদ ইবনে সালামাতা ও হাম্মাদ ইবনে জায়দ, অহব ইবনে খালিদ, মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিমুত-তায়েফী, আমর ইবনে দীনার, আওসাজাতা মাওলা ইবনে আব্বাস ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ একটি ব্যক্তি তার দাস মুক্ত করে দিল। মুক্তিদানকারী মরে গেল, সে তার আযাদ করা দাস ছাড়া আর কোন উত্তরাধিকারী রেখে গেল না। তখন রাসূল (স) তার মীরাস তার আযাদ করা গোলামকে দিয়ে দিলেন।

আবূ জাফর বলেছেন, এ হাদীসের প্রতিবাদকারী কোন হাদীস নেই। তাই তার হুকুম অবশ্যই কার্যকর ও প্রতিষ্ঠিত হবে।

আবূ বকর বলেছেন, তার মীরাস মুক্ত গোলামকে দিয়ে দেয়া ঠিক মীরাস হিসেবে না-ও হতে পারে। বরং তার প্রয়োজন ও দারিদ্র্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই তা দেয়া হয়েছে। কেননা তা এমন মাল ছিল, যার কোন ওয়ারিস ছিল না। ফলে তা অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র লোকদের মধ্যেই বন্টন করা ছাড়া আর কোন ব্যবহার পথ ছিল না।

যদি বলা হয়, যেসব কারণে মীরাস দেয়া ওয়াজিব হয়, তা হল الولاء —বংশ ও বিবাহ। বংশের দিক দিয়ে সম্পর্কশীলরা তো পারস্পরিক মীরাস দেওয়া-পাওয়া চলছিলই। স্বামী-স্ত্রীও তাই। তারপর الولاء মীরাস পাওয়ার কারণ হবে উচ্চ শ্রেণীর জন্যে নিম্ন শ্রেণী থেকে। তেমনি নিম্ন শ্রেণীর জন্যে উচ্চ শ্রেণীর জন্যে।

আবূ বকর বলেছেন, এটা জরুরী বা ওয়াজিব নয়। কেননা বংশ সম্পর্কশীলদের মধ্যে এমন কোন লোক আছে যে অন্যের ওয়ারিস হয়। কিন্তু সে নিজে যখন মরবে তখন তার ওয়ারিস সে হবে না। কেননা মেয়েলোক যদি একটি বোন রেখে যায় বা একটি কন্যা ও তার ভাইর পুত্র, তাহলে কন্যা পাবে অর্ধেক। আর অবশিষ্ট সব পাবে ভাইর পুত্র। তদস্থলে ভাইর পুত্র যদি মরে যায় এবং রেখে যায় একটি কন্যা কিংবা একটি বোন ও তার নিজের ফুফু, তাহলে ফুফু কিছুই পাবে না। ভাইর পুত্র ফুফুর মীরাস পাবে সে অবস্থায়, যখন ফুফু ভাইর পুত্রের ওয়ারিস হবে না।

## বন্ধুত্বের সম্পর্কে মীরাস

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ -

তোমাদের কিরা-কসম যাদেরকে সম্পর্কযুক্ত ও চুক্তিবদ্ধ করেছে, তাদের অংশ তোমরা তাদেরকে দাও।

তালহা ইবনে মুসাররিফ সাঈদ ইবনে যুবায়র ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, উপরোদ্ধৃত আয়াতটির প্রসঙ্গে কথা হচ্ছে, সেকালে মুহাজির আনসারের মীরাস পেত, তার

যবীল আবহামরা পেত না। তা তারা পেত তাদের মধ্যে আল্লাহ্র কায়েম করা ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের ভিত্তিতে। পরে যখন ঃ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ এবং প্রত্যেকের জন্যেই আমরা মাওয়ালী বানিয়েছি পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয় যা রেখে গেছে তা থেকে— আয়াতটি নাযিল হল তখন মুহাজিরদের মীরাস পাওয়া মনসূখ হয়ে যায়। এরপর পড়েছেন তোমাদের কিরা-কসম যা চুক্তিবদ্ধ করেছে, তোমরা তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দাও। এটা সাহায্য ও বন্ধন ভিত্তিক মীরাস যা দেয়ার জন্যে মৃত ব্যক্তি অসিয়ত করে। এর ফলে মীরাস চলে যায়।

আলী ইবনে আবূ তাল্হা ইবনে আব্বাস থেকে উক্ত আয়াত পর্যায়ে বর্ণনা করেছেন। দুই ব্যক্তি পরস্পর চুক্তি করত যে, তাদের মধ্যে যে-ই আগে মরবে, অপরজন তার মীরাস পেয়ে যাবে— তখন এ আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا -

> যবীল আরহামরা পরস্পর পরস্পর থেকে অগ্রবর্তী আল্লাহ্র কিতাবে মুমিন ও মুহাজিরদের থেকে। তবে তোমরা যদি তোমাদের ওলীদের প্রতি কোনরূপ ভালো আচরণ কর তবে তা ভিন্ন কথা। (সূরা আহযাব ঃ ৬)

বলেছে, তবে লোকেরা যদি তাদের চুক্তিবদ্ধ ওলীদের জন্যে কোন অসিয়ত করে তাহলে তা জায়েয হবে এবং মৃতের সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ থেকে তা দিয়ে দিতে হবে। আয়াতে যে 'মারুফ' ভালো আচরণের কথা বলা হয়েছে তার তাৎপর্য এই।

আবূ বশর সাইদ ইবনে যুবায়র থেকে 'যাদেরকে তোমাদের কিরা-কসম চুক্তিবদ্ধ করেছে, তাদেরকে তাদের অংশ দাও' আল্লাহ্র এই কথাটির পর্যায়ে বলেছেন, জাহিলিয়াতের যুগে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে চুক্তি করত, সে মরে গেলে অপরজন তার ওয়ারিস হবে। আবূ বকর সিদ্দিক (রা) এক ব্যক্তির সাথে এইরূপ চুক্তি করেছিলেন। সেই ব্যক্তি মরে গেলে তিনি তার ওয়ারিস হয়েছিলেন। সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যিব বলেছেন ঃ এ আয়াত তাদের সম্পর্কে যারা কোন কোন পুরুষকে পালক পুত্ররূপে গ্রহণ করত এবং তাদেরকে ওয়ারিস বানাত। তখন আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে নাযিল করলেন যে, তাদের জন্যে অসিয়ত কর। আর মীরাস ফিরিয়ে দিলেন যবীল আরহাম ও আসাবা মাওয়ালীদের প্রতি।

আবূ বকর বলেছেন, আমরা আগের দিনের মনীষীদের যে মতের উল্লেখ করেছি তার আলোকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের যুগেও পারস্পরিক চুক্তিবদ্ধতা ও মাওয়ালাত-এর ভিত্তিতে মীরাস বন্টনের কাজ চলেছিল। পরে— বিশেষজ্ঞরা যেমন বলেছেন— আল্লাহ্র কথা আল্লাহ্র কিতাবে যবীল আরহামের কতক অপর কতক থেকে অধিক নিকটবর্তী— দ্বারা সে ব্যবস্থা মনসূখ হয়ে যায়। আর অন্যান্যরা বলেছেন, আসলে তা মনসূখ হয়নি। তবে যবীল আরহামকে চুক্তির মাওয়ালাত অপেক্ষা উত্তম ঘোষণা করা হয়েছে মাত্র। তাই নিকটাত্মীয়

বর্তমান থাকলে তাদের মীরাস মনসূখ মনে করতে হবে। আর নিকটাত্মীয়রা আসলে যেমন, তেমন কেউ অবশিষ্ট ও বেঁচে না থাকলে তাদের অংশ থেকে যাবে ও তারা তা পেয়ে যাবে।

মাওয়ালাতের মাওয়ালীর মীরাসের ব্যাপারে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ ও জুফার বলেছেন, যে লোক কোন ব্যক্তির হাতেই ইসলাম কবুল করেছে এবং তার সাথে মাওয়ালাতের চুক্তি করেছে, পরে সে মরে গেছে অথচ তার সে ছাড়া আর কেউ ওয়ারিস নেই, তখন তার মীরাস সেই পাবে। মালিক ইবনে শাবরামাতা, সওরী, আওজায়ী ও শাফেয়ী বলেছেন, তার মীরাস পাবে মুসলিম জনগণ। ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ বলেছেন, যদি সে দুশমনদের দেশ থেকে আসে, তারপর তার হাতে ইসলাম কবুল করে থাকে। তখন তার ولاء তার জন্যে যার সাথে সে মাওয়ালাতের সম্পর্ক স্থাপন করবে। যিম্মীদের কেউ যদি কোন মুসলমানের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে তা হলে তার ولاء সর্ব সাধারণ মুসলমানদের জন্যে। লায়স ইবনে সায়াদ বলেছেন, যে লোক কোন ব্যক্তির হাতে ইসলাম কবুল করবে, সে তারই মাওলা হয়েছে এবং তার মীরাস সে পাবে যার হাতে সে ইসলাম কবুল করেছে, যদি তাকে ছাড়া সে আর কোন ওয়ারিস রেখে না গিয়ে থাকে।

আবূ বকর বলেছেন, আয়াত অনুযায়ী মীরাস পাবে সে, যার সাথে তার মাওয়ালাতের চুক্তি হয়েছে। আমাদের ফিকাহবিদগণ-ও তাই বলেছেন। কেননা তা ইসলামের প্রথম যুগে একটি প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর বিধান ছিল। আয়াতের 'নস্ হিসেবে তা এখনও রয়েছে ও থাকবে। পরে বলেছেন ঃ 'যবীল আরহামরা কতক অপর কতক অপেক্ষা নিকটবর্তী আল্লাহ্র কিতাবে মুমিন ও মুহাজিরদের মধ্য থেকে।' এই কথায় যবীল আরহামকে চুক্তিবদ্ধ মাওয়ালী অপেক্ষা উত্তম ও অধিক নিকটবর্তী বানিয়েছেন। তাই যবীল আরহাম কেউ জীবিত না থাকলে তাদের মীরাস মাওয়ালীরা পাবে। এটাই আয়াতের চূড়ান্ত ফয়সালা। কেননা তাদের জন্যে যা ছিল, তা-ই যবীল আরহামকে দেয়া হয়েছিল। তাদের পাওয়া গেলে তারাই তা পাবে। আর তাদের কেউ যখন থাকবে না বা পাওয়া যাবে না, তখন মাওয়ালীদের দেয়া হবে। অতএব আয়াতটির মনসূখ হওয়ার কোন কথা না কুরআনে আছে, না সুন্নাতে-হাদীসে। এক্ষণে এই বিধান অটাক্য ও প্রতিষ্ঠিত, কাজে ব্যবহারোপযোগী। যবীল আরহাম না থাকলে মীরাস ওদের জন্যেই কার্যকর হবে। নবী করীম (স) থেকে এই বিধানের বর্তমান ও কার্যকর থাকা সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনা পাওয়া গেছে। যবীল আরহামের অনুপস্থিতিকালে তাদেরকে মীরাস দেয়ার হুকুম এখনও কার্যকর হবে। সে হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দায়ূদ ইয়াজীদ ইবনে খালেদ আর-রমলী ও হিশাম ইবনে আম্মার আদ-দিমাশকী ইয়াহ্ইয়া ইবনে হামজা— আবদুল আযীয ইবনে উমর সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মওহবকে উমর ইবনে আবদুল আযীয-কায়সাতা ইবনে যুয়াইব— তামীমুদ্দারী সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, হে রাসূল! এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির হাতে ইসলাম কবুল করেছে, এ বিষয়ে সুন্নাত কি? বললেন, সেই ব্যক্তি— যার হাতে সে ইসলাম কবুল করেছে— তার জন্যে তার নিজের জীবন ও মরণে সব লোকের তুলনায় অধিক নিকটবর্তী ও আপনজন।

রাসূল (স)-এর কথা ঃ সেসব লোকের তুলনায় তার জীবন ও মৃত্যুতে অধিক নিকটবর্তী— এর দাবি হল, তার মীরাস পাওয়ার দিক দিয়ে-ও সে সকলের তুলনায় অধিক নিকটবর্তী হবে।

কেননা মৃত্যুর সে দুজনের মধ্যে মীরাস ছাড়া আর কোন কিছুতে পৃষ্ঠপোষকতা ও বন্ধনের সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকেনি। আয়াতের প্রত্যেকের জন্যেই আমরা মাওয়ালী বানিয়ে দিয়েছি— এর তাৎপর্য এই। আয়াতে 'মাওয়ালী' অর্থ ওয়ারিস, উত্তরাধিকারী। হানাফী ফিকাহবিদদের এই মত হাদীস দ্বারা সমর্থিত।

হাদীসটি উমর ইবনে মাসউদ (রা), আল হাসান, ইবরাহীম থেকে এ পর্যায়ে বর্ণনা এসেছে। আর মা'মার জুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন, তার নিকট প্রশ্ন করা হয়েছিল, এক ব্যক্তি ইসলাম কবুল করল, সে অপর এক ব্যক্তিকে নিজের 'মাওলা' বা পৃষ্ঠপোষক (অভিভাবক) বানাল। এতে কি কোন দোষ আছে ? রেওয়ায়েতে তিনি বললেন, না এতে কোন দোষ নেই। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) এ কাজের অনুমতি দিয়েছেন।

কাতাদাতা সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন লোকের হাতে ইসলাম গ্রহণ করল, তার অপরাধসমূহের তারা দায়িত্ব গ্রহণ করল এবং তার নিজের মীরাস তাদের জন্যে হারাম করে দিল। রবীআতা ইবনে আবূ আবদুর রহমান বলেছেন, একজন কাফির যখন ইসলাম কবুল করে কোন মুসলিম ব্যক্তির হাতে শত্রু দেশে অথবা মুসলমানদের দেশে, তাহলে তার মীরাস সে পাবে, যার হাতে সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। আবূ আসেম আল-নবীল ইবনে জুরাইয, আবুয যুবায়র জাবির সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, নবী করীম (স) লিখেছেন ঃ

عَلٰى كُلِّ بَطْنٍ عُقُوْلُه -

প্রত্যেক গর্ভের উপরই (গর্ভের দিক দিয়ে সম্পর্কশীল লোকদের উপর) তার আকিলা বর্তিবে।

এবং বলেছেন ঃ لَا يَتَوَلّٰى مَوْلٰى قَوْمٍ اِلَّا بِاِذْنِهِمْ কোন জনগোষ্ঠীর মালিক সেই জনগোষ্ঠীর অনুমতি ব্যতিরেকে তাদের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব ধারণ করতে পারবে না। এই হাদীসটিতে দুটি তাৎপর্য সমন্বিত। একটি, 'মাওয়ালাত'— পরস্পরের মাওলা পৃষ্ঠপোষক অভিভাবক হওয়া জায়েয। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন, লোকদের অনুমতি ছাড়া 'মাওলা' হতে পারে না। তার অর্থ, তাদের অনুমতি 'মাওলাত' পৃষ্ঠপোষক অভিভাবকত্ব হতে পাবে। আর দ্বিতীয়, সে তার এই অভিভাবকত্ব অন্য একজনের নিকট হস্তান্তরিত করতে পারে, যদিও তা অপছন্দনীয়, মকরূহ— প্রথমোক্ত লোকদের অনুমতি ছাড়া। নবী করীম (স)-এর উক্ত কথার তাৎপর্য 'মাওয়ালাতের মাওলা পৃষ্ঠপোষকতার ধারক' ছাড়া আর কোন বক্তব্য হতে পারে না। কেননা দাস মুক্তির 'অলা' وَلَاء হস্তান্তরিত হতে পারে না, জায়েয নয়। এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই।

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ -

'অলা' একটা মাংসপিন্ড, বংশের মাংসখন্ডের মতই।

অবশ্য বিপরীত মতের দলীল হিসেবে কেউ মুহাম্মাদ ইবনে আবূ বকর বর্ণিত একটি

হাদীসের বর্ণনাকে পেশ করতে পারে। তিনি আবূ দাউদ, উসমান ইবনে আবূ শায়বা, মুহাম্মাদ ইবনে বশর ও ইবনে নুমাইর ও আবূ উসামা, যাকারিয়া সাদ ইবনে ইবরাহীম— তার পিতার যুবায়র ইবনে মুতয়িম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَا حِلْفَ فِيْ الْإِسْلَامِ، وَاَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ اِلَّا شِدَّةً -

ইসলামে কোন কিরা-কসমের স্থান নেই। তবে জাহিলিয়াতের যুগের প্রত্যেকটি কিরা-কসমকেই ইসলাম অধিকতর দৃঢ় ও শক্ত করে দিয়েছে।

এই হাদীস তো ইসলামের যুগের সব কিরা-কসমই বাতিল প্রমাণ করে এবং এর ভিত্তিতে পারস্পরিক মীরাস দেওয়া-পাওয়া চলতে পারে না।

এর জবাবে বলা যাবে, এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, ইসলামের কিরা-কসম নেই তার অর্থ সম্ভবত সেই কিরা-কসম যা জাহিলিয়াতের যুগে করা হচ্ছিল। তখনকার কিরা-কসম এভাবে হতো যে, তার দ্বারা তারা সক্রিয় চুক্তি করত। সে চুক্তিতে একজন অপর জনকে বলত ঃ 'আমার ধ্বংস তোমার ধ্বংস, আমার রক্ত তোমার রক্ত— তুমি আমার ওয়ারিস হবে, আমি তোমার ওয়ারিস হব। এ কিরা-কসমে এমন কিছু ব্যাপার ছিল, যা ইসলাম নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। তাতে অন্যকে পূর্ব সমর্থন করার, তার জন্যে রক্ত দেয়ার এবং যা তাকে ধ্বংস করবে, তা তাকেও ধ্বংস করবে, তখন সে তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে, তা হক হোক, কি বাতিল। ইসলামী শরীয়ত এ ধরনের কিরা-কসম ও চুক্তিকে সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়েছে। সেই সাথে মজলুমকে জালিমের হাত থেকে রক্ষা করা, ইনসাফ ও ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠা করা এবং তাতে নিকটাত্মীয়তা ও অনাত্মীয়তার দিকে লক্ষ্য না দেয়া ওয়াজিব করে দিয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْفَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا -

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা ন্যায়পরতা নিয়ে দাঁড়িয়ে যাও, আল্লাহ্র জন্যে সাক্ষ্যদাতা হয়ে— তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে হলেও বা পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে হলেও, সে ধনী হোক, কি গরীব, আল্লাহ তাদের দুজনার তুলনায় অনেক বেশি নিকটবর্তী, অতএব ন্যায়-বিচার করার ব্যাপারে তোমরা খাম-খেয়ালীর অনুসরণ করো না।

(সূরা নিসা ঃ ১৩৫)

এ আয়াতে আল্লাহ্ ন্যায়পরতা ও সুবিচারের আদেশ দিয়েছেন, তা আপন ও পর— নিকট ও দূর নির্বিশেষ হতে হবে। আল্লাহ্র হুকুমের ব্যাপারে সকলের প্রতি পূর্ণ সাম্য ও সমতা রক্ষা করতে আদেশ করেছেন। এর দ্বারা জাহিলিয়াতের যুগের নিকটবর্তী ও কিরা-কসমভুক্তদের অপর লোকের উপর সে জালিম হোক, কি মজলুম সাহায্য করার রীতিকে সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়েছে। নবী করীম (স)-ও ইরশাদ করেছেন ঃ

أُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْمَظْلُوْمًا -

তোমরা তোমার ভাইর সাহায্য কর, সে জালিম কি মজলুম।

সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, মজলুমকে সাহায্য করার আদেশ তো বুঝলাম। কিন্তু জালিমকে কিভাবে সাহায্য করব, বোঝা গেল না। জবাবে তিনি বললেন ঃ

أَنْ تَرُدَّهُ عَنِ الظُّلْمِ -

তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখাই তাকে সাহায্য করা।

জাহিলিয়াতের কিরা-কসমে আপন বংশের লোকের পরিবর্তে কিরা - কসমমূলক চুক্তিকারী লোকই মীরাস পেত। এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ ও উৎখাত প্রসঙ্গেই রাসূলে করীম (স) বলেছিলেনঃ 'ইসলামে কিরা-কসম নেই।' যে কিরা-কসম সাহায্য ও সহযোগিতার জন্যে করা হয় দ্বীন বা আদেশ কিংবা শরীয়তের বিধানের প্রতি লক্ষ্য না রেখে— চুক্তিকারী নিজের সম্পর্কে যা বাধ্যতামূলক করে নেয়, তার। এ কথাকেই অস্বীকার করা হয়েছে যা নিকটবর্তী লোকদেরকে মীরাস না দিয়ে চুক্তিকারীকে দেয়ার পন্থা করে দেয়। 'ইসলামে কিরা-কসম নেই' বলে রাসূলে করীম (স) এ কথা-ই বুঝিয়েছেন। তাঁর কথার শেষাংশ ঃ 'জাহিলিয়াতের প্রত্যেকটি কিরাকেই ইসলাম অধিক শক্ত করে দিয়েছে'-এর তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, তা বৈধ ও অকার্যকরকরণে ইসলাম অধিক কঠোরতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছে। 'তা সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়েছে'। যেন তিনি বলেছেন, ইসলামে এ ধরনের কোন কিরা-কসমের এক বিন্দু স্থান নেই— তা আদৌ জায়েয নয়, তাতে মুসলমানদের পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার যত কথাই থাকুক-না-কেন। তাই জাহিলিয়ত যুগের কিরা-কসমের তো কোন কথাই উঠতে পারে না।

আবূ বকর বলেছেন ঃ 'মাওয়ালাত' দ্বারা যে পারস্পরিক মীরাস দেওয়া-পাওয়া হতো তার সম্পর্কে এ কথাই চূড়ান্ত। যে লোক তার সমস্ত মাল সম্পত্তি এ মাওয়ালাতের ভিত্তিতে অন্যকে দেয়ার অসিয়ত করবে এমন অবস্থায় যে, তার ওয়ারিস কেউ নেই তবে তা জায়েয হবে বলে হানাফী ফিকাহবিদগণ মত দিয়েছেন। এটাই ছিল আগের ফিকাহবিদদের মত। তা এইজন্যে যে, মাওয়ালাতের চুক্তির ভিত্তিতে অন্য কারুর জন্যে তার মীরাস দেয়া যখন জায়েয এবং বায়তুলমাল থেকেও যখন তা আলাদা করে গোপন করে রাখা হবে, তখন সে তা মৃত্যুর পরে অন্য কাউকে দেয়ার অসিয়ত করে যেতে পারে, যাকে সে দিতে চাইবে। কেননা 'মাওয়ালাত' দুইজনের পারস্পরিক চুক্তি ও স্বীকৃতির ভিত্তিতে স্থিরকৃত হয়ে থাকে। আর তার পক্ষ থেকে যতক্ষণ আকিলা দেয়া হবে না, ততক্ষণ তার 'অলা'র ভিত্তিতে অন্য কাউকে দেয়া তার জন্যে জায়েয। তার কথা ও কবুলের মাধ্যমে যে অসিয়ত প্রতিষ্ঠিত হয়, এটা সেই রকমেরই হয়ে যায়। ইচ্ছা করলে তা প্রত্যাহারও সে করতে পারে। অবশ্য তাতে এক ধরনের অসিয়ত বিরোধী কাজ হবে। তা এভাবে যে, তা যদিও তার কথার দরুনই সে তা গ্রহণ করবে, কিন্তু গ্রহণ করবে মীরাস হিসেবে। যেমন মৃত ব্যক্তি যদি কোন যিহম সম্পর্কের ব্যক্তি রেখে যায়, তাহলে সে মাওয়ালাতের ওলীর পরিবর্তে মীরাস পাওয়ার অধিকার তার-ই হবে অনেক বেশি। কারোর জন্যে অসিয়ত করা হলে সে যেমন সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ থেকে পায়, মাওয়ালাতের 'ওলী' তা থেকেও পাবে না যদি তার নিকটাত্মীয় বা দাসমুক্তির 'অলা' সম্পর্কের কেউ ওয়ারিস থাকে।

তাবু মাওয়ালাতের 'অলা কতকটা অসিয়তের মতোই যখন তার ওয়ারিস কেউ থাকবে না। আর অপর একদিক দিয়ে তা সম্পূর্ণ ভিন্নতর ব্যাপার।

## স্বামীর আনুগত্য স্ত্রীর জন্যে বাধ্যতামূলক

আল্লাহ্‌র তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ -

পুরুষরা— স্বামীরা মেয়েদের— স্ত্রীদের উপর কর্তৃত্বশালী। আল্লাহ্‌ কতককে অপর কতকের উপর যে অধিক মর্যাদা দিয়েছেন সেই কারণে এবং একারণে যে, পুরুষরা— স্বামীরা তাদের ধন-মাল থেকে ব্যয় করে।

ইউনুস আল-হাসান থেকে বর্ণনা করেছে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে আহত করেছে। তখন তার ভাই রাসূল করীম (স)-এর নিকট কিসাসের দাবি করলো। তখন আল্লাহ উপরোক্ত আয়াত নাযিল করলেন। পুরুষরা— স্বামীরা স্ত্রীদের উপর কর্তৃত্বসম্পন্ন। নবী করীম (স) বললেন— আমরা একটা জিনিসের ইচ্ছা করেছিলাম কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিসের হল।

জরীর ইবনে হাজিম আল হাসান সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে চপেটাঘাত করল। তখন রাসূল (স) তার উপর বিচার করার ইচ্ছা করলেন। তিনি বললেন ঃ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصَ —তোমাদের উপর কিসাস বাধ্যতামূলক। তখন আল্লাহ নাযিল করলেন ঃ

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ -

আর কুরআন নিয়ে তাড়াহুড়া করো না যতক্ষণ না তার ওহী তোমার প্রতি পূর্ণরূপে নাযিল হওয়া চূড়ান্ত হয়। (সূরা ত্ব-হা ঃ ১১৪)

এরপর নাযিল হয়েছে— 'স্বামীরা স্ত্রীদের উপর কর্তৃত্বশালী'।

আবূ বকর বলেছেন, প্রথমোক্ত হাদীসটি প্রমাণ করে যে, স্বামী-স্ত্রী মধ্যে (ছোটখাটো ব্যাপারে) কোন কিসাস হতে পারে না, যতক্ষণ হত্যাকান্ড পর্যায়ের ঘটনা না ঘটছে। জুহরী থেকেও সেই বর্ণনা-ই এসেছে। আর দ্বিতীয় হাদীস সম্পর্কে বলা যায়, এটা সম্ভব যে, স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আচরণ করায় স্বামী তাকে চপেটাঘাত করেছে আর বিদ্রোহাত্মক আচরণ স্ত্রীর দিক থেকে স্বামীর বিরুদ্ধে হলে আল্লাহ জায়েয করেছেন স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে মারা। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ -

যে সব স্ত্রী থেকে বিদ্রোহমূলক আচরণের ভয় করবে, তাদেরকে উপদেশ দাও এবং শয্যায় তাদেরকে বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন করে রাখ আর (প্রয়োজন হলে) তাদেরকে মার।

যদি কেউ বলে, স্ত্রীকে স্বামীর মারাটা যদি বিদ্রোহাত্মক আচরণের দরুন হয়, তাহলে নবী করীম (স) সেজন্য কিসাস করা ওয়াজিব বলতেন না।

জবাবে বলা যেতে পারে, নবী করীম (স) উক্ত কথাটি বলেছিলেন এ আয়াতটির নাযিল হওয়ার পূর্বে, যাতে স্ত্রীর বিদ্রোহাত্মক আচরণ হলে তাকে মারা মুবাহ করেছেন। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'স্বামীরা স্ত্রীদের উপর কর্তৃত্ব সম্পন্ন .... তাদেরকে মার' পর্যন্ত নাযিল হয়েছে পরবর্তীকালে। তাই এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর কিসাসের কোন প্রশ্নই উঠে না। 'স্বামীরা স্ত্রীদের উপর কর্তৃত্ব সম্পন্ন' কথাটিতে স্বামীকে অধিকার দেয়া হয়েছে স্ত্রীদের আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষাদানের, গার্হস্থ্য ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু রাখা, সংরক্ষণ ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা কার্যকর করণের। তার কারণ হল, আল্লাহ পুরুষকে মেয়েলোকের উপর বিবেক-বুদ্ধি, বুঝ-সমঝ, ব্যয় নির্ধারণ ইত্যাদির দিক দিয়ে অধিক মর্যাদা দিয়েছেন। আর এ জন্যেও যে, স্ত্রী ও পরিবারের ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীর উপর অর্পণ করেন নি, করেছেন পুরুষ তথা স্বামীর উপর।

বোঝা গেল, আয়াতটির কয়েকটি অর্থ রয়েছে। একটি, মর্যাদা ও জ্ঞান বুদ্ধিতে মেয়েদের তুলনায় পুরুষদের অগ্রাধিকার দান। পুরুষরাই ঘর— সংসারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে। স্ত্রীকে প্রয়োজনীয় আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেবে। এ কথাই প্রমাণ করে যে, স্বামীর অধিকার আছে স্ত্রীকে তার ঘরে রাখার, ঘরে থাকতে বাধ্য করার এবং বাইরে ঘুরা-ফিরা করা থেকে বিরত রাখার। আর অপর দিকে স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীর আনুগত্য করা, তার আদেশ পালন করা— যতক্ষণ তা আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানী বা কোন গুনাহের কাজের আদেশ না হবে, আর স্ত্রীরও সেই সাথে গোটা পরিবারের ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব পুরুষকে পালন করতে হবে বলে স্পষ্ট বলা হয়েছে এ আয়াতে ঃ

وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ -

এবং এজন্যে যে, তারা তাদের ধন-মাল থেকে ব্যয় করবে।

যেমন, অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

এবং সন্তান যার— সন্তানের পিতা যে, তার উপর দায়িত্ব হচ্ছে স্ত্রীদের রিযিক ও পোশাকাদি প্রচলিত নিয়মে দেয়া। (সূরা বাকারাহ ঃ ২৩৩)

এবং আল্লাহ্‌র কথা ঃ

لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ -

যেন সচ্ছলতা সম্পন্ন ব্যক্তি তার সচ্ছলতা থেকে ব্যয় করে (পরিবারের জন্যে)।

(সূরা তালাক ঃ ৭)

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ –

এবং স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে তাদের রিযিক পাওয়ার ও তাদের পোশাক পাওয়ার প্রচলিত নিয়মে।

আল্লাহ্র কথা ঃ 'এজন্যে যে, তারা তাদের ধন-মাল থেকে ব্যয় করবে' মহ্রানা ও জীবন-যাত্রার ব্যয় উভয়কেই শামিল করে। কেননা এ দুটোই স্বামীকে দিতে হবে।

এরপর আল্লাহ্র কথা ঃ

فَالصَّالِحَتُ قَنِتَتٌ حَفِظَتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ –

নেক চরিত্রবতী স্ত্রীরা আল্লাহ্নুগত, আল্লাহ্র সংরক্ষণের অধীন স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের সার্বিক সংরক্ষণকারিণী।

প্রমাণ করে যে, মেয়েলোকদের মধ্যে নেক চরিত্রবতী মেয়েলোক আছে। আর قنتتٌ -এর অর্থ কাতাদাহ বলেছেন, 'অনুগত, আল্লাহ্র এবং তাদের স্বামীরা এর মূল। قُنُوْتٌ -এর আসল অর্থ স্থায়ী আনুগত্যশীলতা। বেতেরের নামাযে যে কুনুত-এর দো'আ পড়া হয়, তাকে কুনুতের দো'আ বলা হয় এজন্যে যে, তা পড়ার জন্যে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তা পড়তে হয়। আর حفظتٌ للغيب بما حفظ لله পর্যায়ে আতা ও কাতাদাহ্ বলেছেন ঃ তাদের স্বামী যেসব ধন-মাল রেখে ঘরের বাইরে চলে গেছে তারা তার সংরক্ষণকারী এবং তার নিজের ও অন্যান্য যে সব জিনিসের রক্ষণের দায়িত্ব তার উপর অর্পিত সে সবের সে সংরক্ষণ করবে। بما حفظ اللهَ পর্যায়ে আতা বলেছেন, এর অর্থ যেহেতু আল্লাহ্ মহ্রানা এবং স্বামীর উপর তাদের খরচাদি বহনের দায়িত্ব অর্পণ করে যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর করেছেন, তার বিনিময়ে তারা সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে। অন্যান্যরা এর তাৎপর্য বলেছেন; তারা যেহেত নিজেরাই নেক চরিত্রবতী, আল্লাহ্র অনুগত এবং আল্লাহ্র সংরক্ষণ ও তওফীকের দরুন আল্লাহ্র নাফরমানী থেকে তাদেরকে রক্ষা করেছেন, আর আল্লাহ্ তার বিশেষ অনুগ্রহে ও সাহায্যে তাদেরকে এ কাজে সহায়তা করেছেন, এ জন্যে। আবু মাগ্শার সাঈদুল মুকবেরী, আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) বলেছেন ঃ

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ اِذَا نَظَرْتَ اِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَاِذَا اَمَرْتَهَا اَطَاعَتْكَ وَاِذَا غِبْتَ عَنْهَا خَلَفَتْكَ فِىْ مَالِكَ وَنَفْسِهَا –

সর্বোত্তম মেয়েলোক সেই স্ত্রী, যার দিকে তাকালে সে তোমাকে উৎফুল্ল করবে, যখন তাকে কোন কাজের আদেশ করবে সে তোমার আনুগত্য করবে এবং তুমি যখন তার নিকট উপস্থিত থাকবে, তখন সে তোমার মাল-সম্পদে ও তার নিজের ব্যাপারে তোমার খলীফা— প্রতিনিধি— হয়ে দায়িত্ব পালন করবে।

এ কথা বলার পর রাসূল (স) পাঠ করলেন ঃ

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ -

## বিদ্রোহাত্মক আচরণ নিষিদ্ধ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ -

আর যেসব স্ত্রীদের বিদ্রোহাত্মক আচরণের তোমরা ভয় পাবে (আশংকাবোধ করবে) তাদের তোমরা বোঝাবে— উপদেশ নসীহত করবে এবং শয্যায় তাদেরকে পরিহার করবে ....।

আয়াতের تَخَافُوْنَ শব্দের দুটি অর্থ। একটি হল, তোমরা জানতে পারবে। কেননা একটা জিনিসের ভয় করার অর্থ, সে জিনিসটির সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে জানা। 'তোমরা জানবে' এর পরিবর্তে 'তোমরা ভয় পাবে' বলা সঙ্গত হয়েছে যেমন আরব কবি আবূ মহজন সকফী বলেছেন ঃ

وَلَا تَدْفِنَنِّىْ بِالْفَلَاةِ فَاِنَّنِىْ - اَخَافُ اِذَا مَامِتُّ اَنْ لَا اَذُوْقُهَا-

তুমি আমাকে শূন্য খাঁখাঁ করা প্রান্তরে সমাধিস্থ করবে না, কেননা আমি ভয় পাচ্ছি যে, আমি যখন মরব, তখন মৃত্যু স্বাধ আস্বাদন করতে পারব না।

خِفْتُ 'আমি ভয় করি' কথাটির আর একটি অর্থ, আমি ধারণা করি। আরবী ভাষা বিশারদ ফররা তা বলেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব বলেছেন, এ ভয় তা যা শান্তি ও নিরাপত্তার বিপরীত। যেন বলা হয়েছে ঃ তোমরা তাদের বিদ্রোহাত্মক আচরণকে ভয় করবে তোমাদের সে বিষয়ে জানান দানকারী অবস্থার কথা জানতে পেরে। আর اَلنُّشُوْزُ-এর পর্যায়ে ইবনে আব্বাস, আতা ও সুদ্দী বলেছেন, এর অর্থ, স্বামীর যেসব কথা মানা ও আনুগত্য করা কর্তব্য তাতে তার আনুগত্য করা, তার আদেশ মান্য করা। نُشُوْز শব্দের আসল অর্থ, স্বামীর বিরুদ্ধতা করে তার উপরে উঠতে চাওয়া। এর উৎপত্তি হয়েছে نَشَزَ الْاَرْضُ থেকে। অর্থাৎ জমি উচ্চ হয়ে উঠেছে।

আর আল্লাহ্র কথা فَعِظُوْهُنَّ 'তাদের ওয়ায কর' অর্থ, আল্লাহ্র এবং তার আযাবের কথা বলে তাদেরকে ভয় দেখাও— ভীত কর।

আল্লাহ্র কথা ঃ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ ইবনে আব্বাস, ইকরামা, দহাক ও সুদ্দী বলেছেন, এর অর্থ, কথা বলা ত্যাগ করা। সাঈদ ইবনে যুবায়র বলেছেন, তার সাথে সঙ্গম পরিহার করা। মুজাহিদ, শবী ও ইবরাহীম বলেছেন ঃ 'এক শয্যায় শয়ন পরিহার করা।'

আর وَاضْرِبُوْهُنَّ ইবনে আব্বাস বলেছেন, শয্যায় স্ত্রী যদি স্বামীর কথা শুনে— আনুগত্য করে. তাহলে স্ত্রীকে মারার কোন অধিকার স্বামীর নেই। মুজাহিদ বলেছেন ঃ স্ত্রী যদি তার সাথে শয্যায় একত্রিত হওয়া থেকে বিদ্রোহ করে, তাহলে স্বামী তাকে বলবে ঃ 'তুমি আল্লাহ্কে ভয়

কর এবং ফিরে এস।' মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাঊদ, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আন-নফীলী ও উসমান ইবনে আবূ শায়বা প্রমুখ, হাতিম ইবনে ইসমাঈল, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ, তাঁর পিতা, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, নবী করীম (স) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আরাফার ময়দানের উপত্যকা-গর্ভে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন ঃ

اِتَّقُوْا اللّٰهَ فِي النِّسَاءِ فَاِنَّكُمْ اَخَذْتُمُوْهُنَّ بِاَمَانَةِ اللّٰهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ، وَاِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ اَنْ لَا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ اَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ فَاِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করবে। কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্র আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং তাদের যৌনাঙ্গ তোমরা হালাল বানিয়ে নিয়েছ আল্লাহ্র কলেমার দ্বারা। আর তোমাদের জন্যে তাদের উপর অধিকার হচ্ছে, তারা তোমাদের শয্যায় এমন কাউকে দলিত-মথিত করতে দেবে না, যাকে তুমি পছন্দ কর না। যদি তারা তাই করে, তাহলে তোদেরকে মারবে কোনরূপ যখম না করে এবং তাদের জন্যে তোমাদের উপর অধিকার রয়েছে, তোমরা তাদের রিযিক ও পরিধেয় দেবে প্রচিলত নিয়মে।

ইবনে জুরাইয আতা থেকে বর্ণনা করেছেন, আঘাতহীন মার হতে পারে মিসওয়াক দিয়ে বা তার মতো কোন জিনিস দিয়ে। সাঈদ কাতাদাহ থেকে বলেছেন, অ-বীভৎস মার। বলা হয়েছে, রাসূল (স) আমাদের জন্যে বলেছেন, মেয়েলোকের দৃষ্টান্ত হচ্ছে পার্শ্বঅস্থি। তা বাঁকা, তাকে সোজা করতে চাইলে তা তুমি ভেঙ্গে ফেলবে। বরং তাকে থাকতে দাও, তার দ্বারা সুখ-ভোগ কর। আল-হাসান বলেছেন ঃ 'তাদেরকে মার, যেন কোরূপ যখম বা চিহ্ন না পড়ে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক, আল-হাসান ইবনে আবূ রুবাই,' আবদুর রায্যাক, মা'মার আল-হাসান ও কাতাদাতা ঃ 'তোমরা তাদের নসীহত কর এবং শয্যায় তাদেরকে পরিহার কর'-এর তাৎপর্য বলেছেন, স্বামী যখন তার বিদ্রোহের ভয় করবে, তাকে ওয়ায করবে— বোঝাবে, নসীহত করবে। তা মানলে তো ভাল-ই। অন্যথায় তাকে শয্যায় পরিহার করবে। এতেও যদি আনুগত্যশীলা না হয়, তা হলে মারবে। কিন্তু সে মা'র সাংঘাতিক হতে পারবে না। তার পরে বলেছেন ঃ

فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا -

তারপর যদি তারা আনুগত্যশীলা হয়, তাহলে তোমরা তাদের উপর চড়াও হওয়ার কোন পথ তালাশ করতে পারবে না।

অর্থাৎ অন্য কোন অপরাধের কারণে তাদেরকে মারধর করতে পারবে না।

## সালিসদ্বয় কিভাবে কাজ করবে

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا -

তোমরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনরূপ ফাটল বা মনোমালিন্য দেখা দেয়ার ভয় পাও, তাহলে স্বামীর পক্ষ থেকে একজন সালিস ও স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন সালিস নিযুক্ত কর।

এ আয়াতটি কাদেরকে লক্ষ্য করে পেশ করা হয়েছে, সে বিষয়ে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। সাঈদ ইবনে যুবায়র ও দহাক বলেছেন, তারা হচ্ছে শাসন ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তি, যাদের নিকট সংশ্লিষ্ট বিষয়টি পেশ করা যাবে। সুদ্দী বলেছেন, এ দুজন হচ্ছে একজন পুরুষ ও একজন মেয়েলোক।

আবূ বকর বলেছেন, 'তোমরা যেসব মেয়েলোকের বিদ্রোহাত্মক আচরণের ভয় পাও' কথায় স্বামীকে লক্ষ্য করে কথাটি বলা হয়েছে। আয়াতটির সন্নিবেশ ও ধারাবাহিকতাই তা প্রমাণ করে। তা হল ঃ তাদেরকে শয্যায় পরিত্যাগ কর ..... আলোচ্য আয়াতের কথা ঃ 'তোমরা যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনরূপ ফাটল ও মানোমালিন্যের ভয় পাও' কথায় উত্তম কথা হচ্ছে এ সম্বোধন শাসককে করা হয়েছে, যে পক্ষদ্বয়ের উপর নজর রেখে মীমাংসা করে দিতে সক্ষম এবং সীমালঙ্ঘন ও জুলুম থেকে উভয়কে বিরত রাখার ক্ষমতা রাখে। পূর্ববর্তী কথায় স্বামীকে বলা হয়েছে স্ত্রীকে নসীহত করার ও তাকে আল্লাহ্র ভয় দেখানোর জন্যে এবং পরে শয্যায় তার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করার জন্যে— যদি বিরত না হয়— আদেশ করা হয়েছে। তার পারেও সেই বিদ্রোহাত্মক আচরণে স্থিত থাকলে তাকে মারবার হুকুমও দেয়া হয়েছে। মারার পর স্বামীর বিচারকের নিকট বিচার চাওয়া ছাড়া অন্য কোন পন্থায় গ্রহণ বৈধ করা হয়নি। বিচারকের নিকট মামলা দায়ের হলে সে যেন জালিম ও মজলুমের মাঝে ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠিত করে দেয় এবং তার ফয়সালা পক্ষদ্বয়ের উপর ক্ষমতাবলে কার্যকর করে।

শু'বা আমর ইবনে মুররা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি কুরআনে কথিত সালিসদ্বয় সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। প্রশ্ন শুনে তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, তাতে কি হয়েছে? আমি বললাম, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কের ফাটলে যে দুইজন সালিস নিয়োগের কথা কুরআনে বলা হয়েছে, তাদের সম্পর্কেই জানতে চেয়েছিলাম। তখন তিনি বললেন, স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে যখন সম্পর্কের বক্রতা, মতপার্থক্য, মনোমালিন্য ও বিবাদ দেখা দেবে, তখন দুই জনের পক্ষ থেকে দুইজন সালিস নিয়োগ করতে হবে। তারা প্রথমে মূল বিবাদ সৃষ্টিকারীর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে নসীহত করবে। সে যদি তাদের উপদেশ মেনে নেয়, তাহলে ভালই। অন্যথায় অপর জনের নিকট যাবে। সে তাদের কথা শুনলে নিজেই অপরজনের নিকট গিয়ে নিজেদের বিবাদীয় বিষয় মিটমাট করে নেবে। আর তা-ও না হলে সালিসদ্বয় নিজেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তারা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তা জায়েয হবে এবং পক্ষদ্বয় মেনে নিতে বাধ্য হবে।

আবদুল ওহ্হাব আইয়ূব, সাঈদ ইবনে যুবায়র সূত্রে খুলা তালাকের দাবিদার স্ত্রী সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, তাকে তালাক না চাওয়ার জন্যে নসীহত করতে হবে। ফিরে গেলে বিপদ মিটে গেল। অন্যথায় তাকে পরিত্যাগ করবে। তাতে না ফিরলে তাকে মারবে। তাতেও না বিরত হলে তার ব্যাপারটি শাসন কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করবে। শাসন কর্তৃপক্ষ স্বামীর পক্ষ থেকে একজন সালিস এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে আর একজন সালিস নিযুক্ত করবে। স্ত্রী-পক্ষ থেকে নিযুক্ত সালিস বলবে, এই এই কর। আর স্বামীর পক্ষ থেকে নিযুক্ত সালিসও যা যা করণীয় তা করতে তাকে বলবে, এ দুজনের মধ্যে যে অধিক জালিম, তার ব্যাপারটি শাসন কর্তৃপক্ষের নিকট তুলে ধরবে। সে তাকে জোরপূর্বক মীমাংসায় রাযি হতে বাধ্য করবে— যেন পরিবার সংস্থা ভণ্ডুল ও বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। তা সত্ত্বেও স্ত্রীই যদি বিদ্রোহাত্মক আচরণে উঠে পড়ে লেগে থাকে, তাহলে স্বামীকে তারা আদেশ করবে খুলা তালাক দিয়ে দিতে।

আবূ বকর বলেছেন, ইন্নীন, মজবুব ও ঈলা প্রভৃতির ক্ষেত্রেও এ নীতিই অনুসৃত হবে। এ ব্যাপারটি যে বিচারক-শাসকের নিকট সোপর্দ হবে এবং দুজনের মধ্যে মীমাংসা করার দায়িত্বশীল হবে, সে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী করণীয় কাজের নির্দেশ করবে। যদি তাদের দুজনের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয় এবং স্বামী যদি স্ত্রীর বিদ্রোহাত্মক আচরণের দাবি করে আর স্ত্রী দাবি করে তার উপর স্বামীর জুলুম ও স্ত্রীর অধিকার আদায়ে স্বামীর ত্রুটি-বিচ্যুতি ও লঙ্ঘনের দাবি করে, তাহলে স্বামী ও স্ত্রীর প্রত্যেকের পক্ষ থেকে একজন করে সালিস নিয়োগ করবে। তারা দুইজন একসাথে দুজনের ব্যাপারটি সম্পর্কে চিন্তা-বিবেচনা করবে এবং স্বামী ও স্ত্রী সম্পর্কে তাদের দুজনার রায় ও সিদ্ধান্ত শাসন ক্ষমতাসীনের নিকট পেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা স্বামী ও স্ত্রী— উভয়ের পক্ষ থেকে একজন করে সালিস নিয়োগের কথা বলেছেন, তা এজন্যে যে, তারা দুজনের কোন একজনের নিকট অপরিচিত হলে কোন পক্ষপাতিত্বের কারণ না ঘটে এবং পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে বলে সন্দেহের সৃষ্টি না হয়। দুজনের পক্ষ থেকে দুজন সালিস হলে সে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকবে না। প্রত্যেক সালিস-ই স্বীয় মুয়াক্কিলের বক্তব্য স্পষ্ট করে পেশ করতে পারবে। তাহলে 'স্বামীর পক্ষ থেকে একজন সালিস ও স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন সালিস নিযুক্ত কর' কথাটি এ-ও প্রমাণ করে যে, দুইজন দুই জনের পক্ষের উকীল হিসেবে কাজ করবে। কথাটির ধরন এরূপ যেন বলা হয়েছে, একজন পুরুষ স্বামীর পক্ষ থেকে ও আর একজন স্ত্রীর পক্ষ থেকে নিযুক্ত কর। এ কথা বাতিল প্রমাণ করে এ মতকে যে, দুজন সালিসই ইচ্ছা হলে একত্রে ও ইচ্ছা হলে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্বামী ও স্ত্রীর নির্দেশ ছাড়াই কোন সিদ্ধান্ত নেবে। ইসমাঈল ইবনে ইসহাক মনে করেছেন, ইমাম আবূ হানীফা এবং তাঁর সঙ্গীগণ সালিসদ্বয়ের কাজ কি হবে, তা জানতেন না।

আবূ বকর বলেছেন, এটা তাঁদের উপর সম্পূর্ণ মিথ্যা আরোপ। অথচ মানুষের সব চাইতে মূল্যবান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জবান সংযতকরণ ও সংরক্ষণ। বিশেষ করে মনীষীবৃন্দের কোন কথা বর্ণনা করতে হলে তা যথাযথভাবেই বর্ণনা করা বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ -

—৩/৫৩

মানুষে যে কথাই উচ্চারণ করে, তার নিকট তার সর্বক্ষণ প্রস্তুত একজন সংরক্ষক উপস্থিত থাকে। (সূরা ক্বাফ ঃ ১৮)

বস্তুত যে লোক জানে যে তার কথার জন্যে তাকে পাকড়াও করা হবে, তাকে সেজন্যে জবাবদিহি করতে হবে, সে অবশ্যই কম কথা বলবে, যা জানে না তা বলবে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে শরীয়তের ঘোষণা হচ্ছে দুই পক্ষ থেকে দুই জন সালিস নিয়োগ করা। কুরআন মজীদে এই বিধান স্পষ্ট ভাষায় নেয়া হয়েছে। তাহলে সে কথা এ মনীষিগণের অজানা থাকতে পারে কিভাবে। অথচ এটা কুরআনী ইলমের ব্যাপার। দ্বীন ও শরীয়তের অকাট্য ব্যবস্থা। তবে তাঁদের মত হচ্ছে, সালিসদ্বয় দুইজনের উকীল হবে। একজন স্বামীর পক্ষের আর অপর জন স্ত্রীর পক্ষের। হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) থেকে তা-ই বর্ণিত। ইবনে উয়াইনাতা, আইয়ূব, ইবনে সীরীন, উবায়দাতা সূত্রে বর্ণিত, হযরত আলী (রা)-এর নিকট একজন পুরুষ ও তার স্ত্রী উপস্থিত হয়েছিল। তাদের প্রত্যেকের পক্ষে কিছু সংখ্যক লোক ছিল। হযরত আলী (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, এ দুইজন পুরুষ ও নারীর ব্যাপারটি কি ? তারা বলল, এ দুজনের মধ্যে ফাটল ও বিবাদ দেখা দিয়েছে। তিনি বললেন ঃ তাহলে স্বামীর পক্ষ থেকে একজন সালিস ও স্ত্রীর পক্ষ থেকে আর একজন সালিস নিযুক্ত কর। তারা সংশোধন ও মীমাংসা চাইলে আল্লাহ তাদের দু'জনের মধ্যে মিল-মিশ করে দেবেন। হযরত আলী (রা) বললেন, এ দুজনের কর্তব্য কি, তা কি তারা জানে? তোমরা দুইজন সালিস। তোমাদের কর্তব্য হল, ওরা দুজন মিলিত হতে চাইলে দুজনকে মিলিয়ে দেবে। আর যদি তোমরা মনে কর যে, তারা বিচ্ছিন্ন হতেই দৃঢ় সংকল্প, তাহলে দুজনকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। স্ত্রী বলল, আমি আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী মীমাংসায় রাজি আছি। স্বামী বলল, বিচ্ছিন্ন হতে চাই না। তখন আলী (রা) বললেন, তুমি মিথ্যা বললে। আল্লাহ্র নামে শপথ! তুমি আমার নিকট থেকে চলে যেতে পারবে না, যতক্ষণ স্ত্রীলোকটির মত অঙ্গীকার না করবে। তখন আলী (রা) জানালেন, সালিসদ্বয়ের কথা হবে স্বামী-স্ত্রীর সম্মতি অনুযায়ী। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে হানাফী ফিকহবিদগণ বলেছেন, স্বামী রাজি না হলে সালিসদ্বয় তাদের দুজনকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারবে না। তা এজন্যে যে, স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি খারাপ আচরণ করার কথা স্বীকার করে নেয়, তাহলে তাদের দুজনকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না এবং দুই জন সালিসের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে শাসক স্ত্রীকে তালাক দিতে স্বামীকে বাধ্য করা যাবে না। অনুরূপভাবে স্ত্রী যদি তার স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আচরণের কথা স্বীকার করে নেয়, তাহলে শাসক তাকে স্বামীর নিকট থেকে খুলা তালাক নিতে বাধ্য করতে পারবে না। তার নেয়া মহরানা ফেরত দিতেও বলতে পারবে না। দুইজন সালিস নিয়োগের পূর্বেই যখন অবস্থা এরূপ, তখন তাদেরকে নিযুক্ত করার পরও এরূপই হবে। স্বামীর সম্মতি ও তার দায়িত্ব দেয়ার পূর্বে তাদের দুজনের দিক থেকে তালাক ঘটিয়ে দেয়া জায়েয হবে না। আর স্ত্রীর সম্মতি ছাড়া তার নিয়ে নেয়া মহরানা ফেরত দিতেও তাকে বলা যাবে না। এ কারণে আমাদের হানাফী ফিকহবিদগণ বলেছেন, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতি ছাড়া তাদের দুজনের মধ্যে 'খুলা' তালাক ঘটানো জায়েয হবে না। হানাফী ফিকহবিদগণ এ-ও বলেছেন যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতি ছাড়া দুজনকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া সালিসদ্বয়ের জন্যে জায়েয নয়। কেননা শাসক-বিচারকই তা করতে পারে না।

তাহলে সালিসদ্বয় তা কি করে করতে পারে ? সালিসদ্বয় তো দুইজন উকীল মাত্র। একজন স্বামীর নিয়োজিত আর অপর জন্য স্ত্রী কর্তৃক নিয়োজিত। স্বামী তার উকীলকে খুলা তালাক দেয়ার বা দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়ার জন্যে কোন দায়িত্বশীল বানায় নি।

ইসমাঈল বলেছেন, উকীল তো বিচারক নয়। বিচার কার্যের দায়িত্ব তার উপর অর্পন করা না হলে সে কি করে বিচার করতে পারে ? হ্যাঁ, সে অস্বীকার করলেও তার উপর সে দায়িত্ব দেয়া যায় বটে।

কিন্তু এ কথা ভুল। কেননা যা বলা হয়েছে, তা উকীল বানানোর পরিপন্থী নয়। কেননা উকীল তো সে-ই যার উপর কোন কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়। যে কাজের দায়িত্ব তার উপর অর্পিত হয়েছে সে কাজ তো সে অবশ্যই করতে পারে। তাই সালিসদ্বয়ের তাদের দুজনের প্রতি কোন আদেশদান উকীল হওয়ার সীমালংঘনকারী কোন ব্যাপার নয়। দুজনের মধ্যে সৃষ্ট যে কোন বিবাদ ও ঝগড়া মিটমাট করার জন্যে দুই ব্যক্তিকে সালিস নিযুক্ত করাই যেতে পারে। তারা দুজন তাদের দুজনের মধ্যের মীমাংসা কার্য সম্পাদনের জন্যে উকীল হয়ে কাজ করবে। তারা তাদের দুজনের উপর অবশ্যই হুকুম চালাতে পারে। তারা যদি কোন কাজের আদেশ করে, তাহলে তা পালন করা দুজনের পক্ষেই বাধ্যতামূলক হবে। যেমন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ফাটল ও বিবাদ দেখা দিলে পারিবারিকভাবে দুজন 'হাকাম'— সালিস নিযুক্ত করার জন্যে কুরআনেই বলা হয়েছে। তাতে তাদের দুজনের আদেশ ওকালতীর তাৎপর্য-বহির্ভূত কোন ব্যাপার হয়ে যাবে না। দুই ব্যক্তির মধ্যকার ঝগড়া মিটমাট করার জন্যে সালিস নিযুক্তকরণ এক হিসাবে বিচারক নিয়োগের মতোই। আর বর্ণিত একটি দিক দিয়ে উকীল নিয়োগও সেই রকমেরই ব্যাপার। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সৃষ্ট ফাটল ও বিবাদে নিযুক্ত সালিসদ্বয় নিছক ও খালেস ওকালতীর দৌলতেই কর্তৃত্ব চালাতে পারে— যেমন উকিল নিয়োগের সমস্ত ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে।

ইসমাঈল বলেছেন, উকীলকে সালিস বা বিচারক বলা হয় না। কিন্তু ব্যাপারটি তিনি যা মনে করেছেন, তা নয়! এখানে উকীলকে 'হাকাম' বলা হয়েছে অর্পিত ওকালতের দায়িত্বকে তাগিদপূর্ণ করার জন্যেই। তার কথা ঃ হাকামদ্বয় স্বামী-স্ত্রীর উপর হুকুম চালাতে পারে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রী অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করলে সেরূপ করা যাবে না। স্বামী-স্ত্রীর উপর কোন আদেশ কার্যকর করা তাদের দুজনের জন্যে জায়েয হবে না, যদি তারা দুজন অস্বীকার ও অমান্য করে। কেননা তারা দুজন উকীল মাত্র। বিচারক তাদের দুজনের ব্যাপারটি বিচার-বিবেচনা করার জন্যে আদেশ দিতে বাধ্য। তাদের দুজনের ব্যাপারে হক এর প্রতিবন্ধক বিষয়াদি তাদেরকে জানিয়ে দেবে। ফলে তারা দুজন সালিস হওয়া থেকে পরিবর্তিত হয়ে বিচারকে পরিণত হবে যেমন করে তারা দুজন দুজনের ব্যাপার ভালো করে জানতে পেরেছে। ফলে তাদের দুজনের কথা তাদের ব্যাপারে অবশ্যই গ্রহণীয় হবে, যখন তারা দুজন একত্রিত হবে। জালিমকে অপর জনের উপর জুলুম করতে নিষেধ করা হবে। এ কারণে উকীল দুইজনকে 'দুইজন বিচারক' নাম দেয়া খুবই সমীচীন হবে। কেননা তাদের দুজনের কথা দুজনের জন্যে অবশ্যই কবুল করে নিতে হবে। তাই সে নামে দুজনের অভিহিত হওয়া খুবই সঙ্গত। কেননা স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই দেয়া দায়িত্ব অনুযায়ী তারা দুজন যদি খুলা তালাক দেয়,— তা তাদের দুজনের রায় ও সিদ্ধান্তের উপর অর্পিত ব্যাপার ছিল, মীমাংসা করার চেষ্টা করার জন্যে নিয়োজিত ছিল, তাই

তারা দুজন 'হাকাম' অভিধায় অভিহিত হয়েছে। কেননা 'হাকাম' নাম তো মীমাংসার চেষ্টা বোঝায় যে বিষয় সামনে আনা হয়েছে সেই বিষয়ে এবং বিচারের রায় পরম সত্যতা সহকারে কার্যকর করার জন্যে। তা যখন তাদের রায়-এর উপর অর্পিত ছিল ও একত্রিত রাখা বা বিচ্ছিন্নকরণের হুকুম কার্যকর করা তাদের দায়িত্ব ছিল, তখন যা তারা কার্যকর করবে, তা হবে। তাই এ বিবেচনায় তারা দুজন 'হাকাম' অভিধায় অভিহিত হল। তাই তাদের দুজনের কাজ যখন বিচারকে বিচার কার্যের মতো হল কল্যাণ ও মীমাংসার চেষ্টা করার দিক দিয়ে তখন তাদেরকে 'দুজন হুকুমদাতা' বলা খুবই সঙ্গত। তা সত্ত্বেও তারা দুজন কিন্তু স্বামী ও স্ত্রীর দুজন উকীল। কেননা স্বামী স্ত্রীর উপর খুলা বা তালাক পর্যায়ের কোন হুকুম কার্যকর করা তাদের দুজনের আদেশ ছাড়া কখনই সঙ্গত হতে পারে না।

তার ধারণা, হযরত আলী (রা) উপরোক্ত ঘটনায় স্বামীর উপর ঘৃণা ও আক্রোশ প্রকাশ করেছেন। কেননা সে কুরআনের ফয়সালা মেনে নিতে সম্মত হয়নি। তাকে উকীল নিযুক্ত করতেও রাজি করান নি। তিনি তাকে পাকড়াও করেছেন আল্লাহ্‌র কিতাবের ফয়সালা মেনে নিতে রাজি হয়নি বলে! কিন্তু ব্যাপারটি তা নয়, যেরূপ বলা হয়েছে। কেননা স্বামী যখন বলল বিচ্ছেদ নয়। আলী (রা) বললেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। স্ত্রী যেমন করে অঙ্গীকার করেছে তুমিও তেমন অঙ্গীকার না করা পর্যন্ত তুমি আমার কাছ থেকে যেতে পারবে না। এ কথার মাধ্যমে হযরত আলী (রা) স্বামীর প্রতি যে রুঢ়তা দেখিয়েছেন তা শুধু এ জন্যে যে, বিচ্ছেদের জন্যে উকীল নিয়োগ না করার জন্যে মাত্র। তিনি উক্ত কথার দ্বারা তাকে বিচ্ছেদের জন্যে উকীল বানাতে বলেছেন। স্বামী কুরআনের ফয়সালা মেনে নিতে তো অস্বীকৃতি জানায়নি তাই তার প্রতি সে কারণে রুঢ়তা দেখানোর কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। সে শুধু বলেছিল, আমি বিচ্ছেদে সম্মত নই। যদিও স্ত্রী 'হাকাম' নিয়োগ করে তাতে সম্মতি দিয়েছিল। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিচ্ছেদের রায় কার্যকর হতে পারে কেবল তখন, যদি স্বামী সেজন্যে কাউকে উকীল বানায়। অন্যথায় নয়।

আর আল্লাহ্ যখন বলেছেন ঃ

إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا -

তারা স্বামী-স্ত্রী দুজন যদি মীমাংসা চায়, তাহলে আল্লাহ্ তাদের দুজনের মধ্যে মিটমাট করে দেবেন।

এ থেকে আমরা জানলাম যে, 'হাকাম'দ্বয় তাদের ফয়সালা শুনিয়ে দেবে। তখন সালিস দুজন যদি প্রকৃত সত্যের ইচ্ছুক হয়, তাহলে আল্লাহ তাদেরকে সঠিক ও যথার্থ হুকুম বা ফয়সালা দেয়ার তওফীক দেবেন।

বলা হয়েছে, এ কথাটি উকীলদ্বয়ের প্রসঙ্গে বলা হয়নি। কেননা তাদের কোন একজনের জন্যেও জায়েয নয় যা করার আদেশ করা হয়েছে তা লঙ্ঘন করা। আর যা বলা হয়েছে তা ওকালতের তাৎপর্য পরিপন্থী নয়। কেননা উকীলদ্বয় যদি একত্রিত রাখা বা বিচ্ছিন্নকরণের মধ্যে যা-ই সমীচীন মনে করবে কল্যাণ ও মীমাংসার চেষ্টা ব্যাপদেশে তা করার জন্যেই তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত। তাই তাদের এর মধ্যে যা-ই তারা সিদ্ধান্ত করবে তা করার জন্যে ইজতিহাদ

করবে— তা-ই তাদের কর্তব্য। আর জানানো হয়েছে যে, আল্লাহ তাদের দুজনকে মীমাংসা করার তওফীক দেবেন যদি তাদের নিয়ত খালেস হয়। এরূপ অবস্থায় উকীল ও 'হাকাম' হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। কেননা তাদের প্রত্যেকের উপর কল্যাণ ও মীমাংসার দিক দিয়ে যা-ই তাদের উপর অর্পিত হয়েছে তা-ই তারা করবে। আল্লাহ্ এই যে গুণের কথা বলেছেন, এই গুণ তার সাথে অবশ্যই জড়িত থাকবে।

ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, আবূ সালমাতা, তায়ূস ও ইবরাহীম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা সকলেই বলেছেন, 'হাকাম' দ্বয় যে ফয়সালাই করবেন, তা-ই জায়েয ও সঙ্গত বিবেচিত হবে। আমরাও তাই মনে করি। কিন্তু তার কথার সমর্থনে এতে কোন দলীল নেই। কেননা তারা এ কথা বলেন নি যে, 'হাকাম'দ্বয়ের বিচ্ছিন্নকরণও 'খুলা' তালাক পর্যায়ে কাজ স্বামী-স্ত্রীর সম্মতি ছাড়া-ই সঙ্গত ও জায়েয; বরং বলেছেন যে, 'হাকাম'দ্বয় স্বামী-স্ত্রীর উকীল নিয়োগে সম্মত হওয়া ছাড়া বিচ্ছিন্নকরণের অধিকারী নয়। তা ছাড়া 'হাকাম'দ্বয় উকীলও হতে পারে না। তার পরে তারা যে ফয়সালা দেবে, তা অবশ্যই কার্যকর ও জায়েয হবে। স্বামীর সম্মতি ছাড়া 'হাকাম' দ্বয় দুজনকে খুলা তালাকেই বা রাজি করাতে পারে কিভাবে ? এবং স্ত্রী মালিকানা থেকে নিয়ে নেয়া মহরানা-ই বা বের করতে পারে কিভাবে ? অথচ আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

> তোমরা স্ত্রীদের মহরানা তাদেরকেই একনিষ্ঠভাবে দিয়ে দাও। তারা নিজেরা নিজেদের ইচ্ছা ও খুশীতে যদি তার কোন অংশ তোমাদেরকে দেয়, তাহলে তোমরা তা সুস্বাদু সুখাদ্য হিসেবে ভোগ কর।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

> তোমরা স্ত্রীদের যা দিয়েছ তা থেকে তোমরা কিছু ফেরত নেবে— তা তোমাদের জন্যে হালাল নয়। তবে স্বামী-স্ত্রী যদি আল্লাহ্র সীমা রক্ষা করতে পারবে না বলে ভয় পায়, তাহলে ভিন্ন কথা। আর তোমরা— সমাজের লোকেরা— যদি ভয় পাও যে, তারা দুজন আল্লাহ্র সীমা রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে স্ত্রী যে বিনিময় দেবে তা গ্রহণে রাজি হলে দুজনের কোন দোষ বা গুনাহ্ হবে না।

এ আয়াতে যে 'ভয়'-এর কথা বলা হয়েছে, তার-ই বাস্তব তাৎপর্য স্বরূপ বলা হয়েছে ঃ তাহলে তোমরা স্বামীর দিক থেকে একজন 'হাকাম' ও স্ত্রীর দিক থেকে একজন 'হাকাম' নিযুক্ত কর।

স্বামী স্ত্রীকে যা দিয়েছে তার কোন কিছুই ফেরত নিতে আল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। অবশ্য দুজন সম্পর্কে ভয়ের সঞ্চার হলে তারা আল্লাহ নির্ধারিত সীমা রক্ষা করতে পারবে না এই ভয়ের উদ্রেক হওয়ার শর্তে স্ত্রীর বিনিময় দিয়ে তালাক গ্রহণ জায়েয করে দেয়া হয়েছে এবং স্বামীর জন্যেও তা গ্রহণ করা হালাল করা হয়েছে। এরূপ অবস্থায় 'হাকাম'দ্বয় খুলা বা তালাক ঘটিয়ে দেবে তাদের সম্মতি ব্যতিরেকে, তা কি করে জায়েয হতে পারে ? অথচ আল্লাহ স্পষ্ট-অকাট্যভাবে স্বামীর দেয়া কোন কিছু স্ত্রীর নিকট থেকে ফিরিয়ে নেয়া হালাল নয় বলেছেন। হ্যাঁ, তারা তাদের মনের খুশীতে কিছু দিলে তা ভিন্ন কথা। তাই স্বামীর উকীল নিয়োগ ছাড়া-ই 'হাকাম'দ্বয় তাদের মধ্যে খুলা তালাক ঘটিয়ে দিতে পারে বলা কুরআনের ঘোষণার সুস্পষ্ট পরিপন্থী সন্দেহ নেই।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা তোমাদের ধন-মাল পারস্পরিকভাবে বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করো না। তবে যদি তোমাদের দুই পক্ষের সম্মতিক্রমে ব্যবসায়ের মাধ্যমে হয়, তবে ভিন্ন কথা।

এ আয়াতে মালের মালিকের সম্মতি ছাড়া তার মাল ভক্ষণ করা প্রত্যেকের জন্যেই হারাম করে দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

তোমরা তোমাদের ধন-মাল পারস্পরিকভাবে বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করো না শাসকের নিকট তা তুলে দিয়ে ....

এ আয়াতের দ্বারা আল্লাহ্ জানিয়েছেন যে, শাসক বা অন্যান্য কেউ-ই কারোর মাল তার সম্মতি ছাড়া নিয়ে নিতে পারে না, তা হালাল নয়।

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ اِلَّا بِطِيْبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ -

কোন মুসলিম স্বীয় খুশী মনে কিছু না দিলে মুসলিম ব্যক্তির কোন মাল নিয়ে নেয়া হালাল নয়।

তিনি আরও বলেছেন ঃ

فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ اَخِيْهِ بِشَيْئٍ فَاِنَّمَا اَقْطَعُ لَهٗ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ -

আমি যদি কারোর ভাইর হক্ তার জন্যে দিয়ে দেই তাহলে আগুনের— জাহান্নামের— একটি খন্ডই আলাদা করে তাকে দেই।

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, শাসকের পক্ষেও স্ত্রীর মাল নেয়া ও তা স্বামীকে দিয়ে দেয়া জায়েয নয়। স্বামীর উপর তার উকীল বানানো ব্যতিরেকে ও তার সম্মতি-সন্তুষ্টি ছাড়া তালাক চাপিয়ে দেয়ার কোন অধিকারই তার হতে পারে না। কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মতের ইজমার এটাই ফয়সালা ঃ শাসক তা ব্যতীত কোন হক প্রত্যাহার করতে ও তা অন্য কাউকে দিয়ে দিতে পারে না। অতএব 'হাকাম'দ্বয় নিযুক্ত হয় মীমাংসা ও মিলমিশ করিয়ে দেয়ার জন্যে, দুজনের মধ্যে কে জালিম তা প্রমাণ করার জন্যে। সাঈদ কাতাদাতা থেকে তা-ই বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্র কথা ঃ তোমরা সে দুজনের মধ্যে সম্পর্কের ফাটল ও বিবাদের ভয় পেলে ...... দুজন 'হাকাম' বা সালিস পাঠাতে বলা হয়েছে উক্ত আয়াতে তাদের মধ্যে সন্ধি ও মীমাংসা করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে মাত্র। তারা যদি তাদের মধ্যে সন্ধি করানো সম্ভব মনে করে, জালিমকে জুলুম থেকে বিরত রাখা সম্ভব মনে করে, তবে তাই করবে। দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর কোন অধিকার তাদের নেই। আতা থেকেও তা-ই বর্ণিত হয়েছে।

আবূ বকর বলেছেন, আয়াতের ধরনে প্রমাণ রয়েছে এ কথার যে, 'হাকাম'দ্বয়ের কোন অধিকার নেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়ার। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র এ কথাটি ঃ 'তারা দুজন সন্ধি ও মিলমিশ ঘটাতে চাইলে আল্লাহ তাদের দুজনের মধ্যে মিলমিশ ঘটিয়ে দেয়ার তওফীক দেবেন।' আল্লাহ বলেন নি যে, তারা দুজন তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে চাইলে তা ঘটানোর তওফীক তাদেরকে দেবেন। 'হাকাম'দ্বয়কে বলা হয়েছে দুজনের মধ্যে যে জন জালিম তাকে ওয়ায করতে— উপদেশ দিতে ও নসীহত করতে। তারা জুলুম বন্ধ করতে বলবে এবং সে বিষয়ে শাসককে জানিয়ে দেবে, যেন শাসক জালিমের হাত ধরে ফেলতে পারে। স্বামী-ই যদি জালিম হয়, তার এ জুলুমের প্রতিবাদ করতে হবে। তারা দুজন স্বামীকে বলবে, তোমার স্ত্রীকে কোনরূপ কষ্ট দেয়া তোমার জন্যে হালাল নয়, তুমি তাকে তোমার নিকট থেকে খুলা' তালাক নিতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যেও তা করতে পার না। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি জালিম হয়, তাহলে 'হাকাম'দ্বয় তাকে বলবে, তোমার জন্যে বিনিময় দিয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়া হালাল হয়েছে এবং তা গ্রহণ করতে স্বামী প্রস্তুত। কেননা 'হাকাম'দ্বয় স্ত্রী বিদ্রোহাত্মক আচরণের প্রমাণ পেয়েছে। সে দুজনের প্রত্যেকের জন্যে যখন সেই হুকুম-ই নির্দিষ্ট যা করার জন্যে তাকে নিযুক্ত করা হয়েছে, তখন বিচ্ছেদ ঘটানো ও খুলা তালাকের পথ প্রশস্ত করার কোন ইখতিয়ার তাদের কারোরই থাকতে পারে না। কেননা আগেই বলেছি, ওরা দুজন উকীল মাত্র। স্বামী-স্ত্রী দুজনই 'খুলা' তালাকে রাজি হলে তা তারা ঘটিয়ে দিতে পারে, তাদের পক্ষে তা করা জায়েয। আর তারা একত্রিত ও অবিচ্ছিন্ন থাকতে চাইলে তা থাকার ব্যবস্থা করে দেয়াই তাদের কর্তব্য। এটাই তাদের করা মীমাংসা হবে। ফলে এক অবস্থায় তারা দুজন সাক্ষী আর অপর অবস্থায় তারা দুজন মীমাংসাকারী আর তৃতীয় এক অবস্থায় তারা দুজন ভাল কাজের আদেশদাতা ও মন্দ কাজের নিষেধকারী। আর চতুর্থ অবস্থায় তারা দুজন উকীল, যখন একত্রিত রাখা বা বিচ্ছিন্নকরণ— এর মধ্যে কোন একটির দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করা হবে। স্বামী স্ত্রীর উকীল বানানো ছাড়া-ই দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবে বা 'খুলা' তালাকের উপায় করে দেবে বলে যারা মত দিয়েছে, তাদের মত অত্যন্ত নির্মম এবং কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বিধান-বহির্ভূত।

## শাসন ক্ষমতার মধ্যস্থতা ছাড়া-ই খুলা' তালাক হওয়া

ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, জুফার, মালিক, আল-হাসান ইবনে সালিহ্ ও শাফেয়ী বলেছেন, সরকারী প্রশাসনের সংস্পর্শ ছাড়া-ই খুলা' তালাক ঘটানো সম্পূর্ণ জায়েয। উমর, উসমান ও ইবনে উমর (রা) থেকেও এরূপ কথাই বর্ণিত হয়েছে। আল-হাসান ও ইবনে সীরীন বলেছেন, সরকারী প্রশাসনের মাধ্যম ছাড়াও যে তা জায়েয, তার প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا -

স্ত্রীরা নিজেদের খুশীতে ইচ্ছুক হয়ে মহরানা থেকে কিছু ফিরিয়ে দিলে তা তোমরা সুখাদ্য সুস্বাদু হিসেবে খেতে পার। (সূরা নিসা ঃ ৪)

এ আয়াতটির বাহ্যিক তাৎপর্যই তা গ্রহণ করা স্বামীর জন্যে জায়েয করে দেয়। খুলা' তালাকে স্ত্রী তো তার নেয়া মহরানা-ই স্বামীকে ফিরিয়ে দেয়। তা নেয়া এবং তা নিয়ে স্ত্রীকে খুলা' তালাক দেয়া জায়েয। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ -

স্ত্রী যা বিনিময় হিসেবে দেয়, তা তার দেয়া ও স্বামীর তা গ্রহণ করায় কোন দোষ নেই। (সূরা বাকারা ঃ ২২৯)

এ কাজে প্রশাসনের মধ্যস্থতার কোন উল্লেখ আয়াতে করা হয়নি। তাই বিবাহের আক্দ ও তার মত অন্যান্য বহু প্রকারের চুক্তিই যেমন সরকারী মধ্যস্থতায় ও মধ্যস্থতা ছাড়া-ই জায়েয, খুলা' তালাকের চুক্তিও তেমনি জায়েয। কেননা এ সবই চুক্তি, আর এই চুক্তিসমূহের মধ্যে কোন একটির বিশেষ বিশেষত্ব নেই। তা সরকারের মধ্যস্থতায়ই হতে হবে, এমন কোন শর্ত করা হয়নি।

## পিতা-মাতার খিদমত ও সদ্ব্যবহার করা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَّبِالْوَلِدَيْنِ اِحْسَانًا -

তোমরা আল্লাহ্র দাস হয়ে থাক, তাঁর সাথে একবিন্দু জিনিস শরীক করো না এবং পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ কর।

এ আয়াতে আল্লাহ্র ইবাদত ও তওহীদ স্বীকারের আদেশের পাশাপাশি পিতা-মাতার সাথে ভালো আচরণ ও তাদের কল্যাণ সাধনের আদেশ করেছেন। তার ইবাদত করার যেমন আদেশ করেছেন, তেমনি পিতা-মাতার সাথেও ভাল আচরণ করার আদেশ করেছেন। যেমন অপর আয়াতে আল্লাহ্র শোকর করার আদেশের পাশাপাশি পিতা-মাতার শোকর করারও আদেশ করেছেন। বলেছেন ঃ

اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ -

তুমি আমার শোকর কর, তোমার পিতা-মাতারও। পরিণতি তো আমারই নিকট। (সূরা লুকমান ঃ ১৪)

পিতা-মাতার হক্ যে অনেক বড় ও বিরাট এবং তাদের কল্যাণ সাধন ও তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার যে একান্তই কর্তব্য তা উদ্ধৃত আয়াত দুটিই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। আল্লাহ্ আরও বলেছেন ঃ

فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا -

তুমি তাদেরকে উহ্ বলো না, তাদেরকে ধিক্কার দিও না, গাল-মন্দ বল না এবং তাদের প্রতি সম্মানজনক কথা বল। (সূরা বনী ইসরাইল ঃ ২৩)

এ পর্যায়ের শেষ পর্যন্তকার কথা স্মরণীয়। অপর আয়াতে বলেছেন ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا -

এবং মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণের অসিয়ত করেছি, হুকুম দিয়েছি। (সূরা আনকাবুত ঃ ৮)

আর কাফির পিতা-মাতা সম্পর্কে বলেছেন ঃ

وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا -

কাফির পিতা-মাতা দুজনই যদি তোমার উপর জোর খাটায় তোমাকে বাধ্য করতে চায় আমার সাথে শিরক করার জন্যে যার বিষয়ে তোমার কিছুই জানা নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মেনে নিও না। তবু দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে উত্তম সংস্পর্শ রক্ষা করে চল। (সূরা লুকমান ঃ ১৫)

আবদুল্লাহ্ ইবনে উনাইস নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

اَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ، وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَا يَحْلِفُ اَحَدٌ وَاِنْ كَانَ عَلٰى مِثْلِ جَنَاحِ الْبَعُوْضَةِ اِلَّا كَانَتْ وَكْتَةً فِىْ قَلْبِهٖ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ -

কবীরা গুনাহ্ সমূহের মধ্যেও অতিবড় গুনাহ হল আল্লাহ্ সাথে শিরক করা, পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ও সর্বাত্মক কিরা-কসম। যাঁর মুষ্ঠিতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর নামের শপথ যে, কেউ যদি কিরা-কসম করে, তা মাছির ডানার সমান হলেও তার দিলের উপর কিয়ামত পর্যন্তকার জন্যে একটি চিহ্ন পড়ে যায়।

আবূ বকর বলেছেন, পিতা-মাতার আনুগত্য ওয়াজিব— মারুফ কাজে, আল্লাহ্র নাফরমানীর কাজে নয়। কেননা ঃ

لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ -

স্রষ্টার নাফরমানী করে সৃষ্টির আনুগত্য ও হুকুম পালন করা যেতে পারে না।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ সাঈদ ইবনে মনসূর আবদুল্লাহ ইবনে অহব আমর ইবনুল হারিস দররাজ আবুস্ সামাহ আবুল হায়সাম, আবূ সাঈদুল খুদরী সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইয়ামেনের এক ব্যক্তি হিজরত করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামার নিকট উপস্থিত হল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়ামেনে তোমার আপনজন কেউ আছে কি? লোকটি বলল, আমার পিতা-মাতা আছে। জিজ্ঞাসা করলেন, তারা দুজন তোমাকে হিজরত করার অনুমতি দিয়েছে কি? বলল, না। তখন তিনি বললেন, তুমি ফিরে চলে যাও

এবং তাদের দুজনের অনুমতি চাও, তারা যদি তোমাকে অনুমতি দেয়, তাহলে তুমি তাদের খেদমতে প্রাণপণে লেগে যাও (অথবা জিহাদ কর) আর তা না দিলে তাদের কল্যাণে নিয়োজিত থাক।

এ কারণে আমাদের হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া জিহাদে শরীক হওয়া জায়েয নয় যখন শত্রুর সাথে জিহাদে যাবে। তা তার জন্যে যার ঘরের বাইরে যাওয়া শোভন। তাঁরা বলেছেন, যদি সে জিহাদ শত্রুর সাথে না হয়, শুধু বাহির হওয়াই ফরয, তার জন্যে পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া-ই বাইরে যাওয়া ফরয। ব্যবসায়েও এ ধরনের কাজের উদ্দেশ্যে ঘরের বাইরে যাওয়া প্রসঙ্গে তারা বলেছেন, যদি তাতে যুদ্ধের ব্যাপার না থাকে, তাহলে পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া-ই বাইরে যাওয়া জায়েয। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া জিহাদ-যুদ্ধে যেতে নিষেধ করেছেন যদি সে ফরয আদায়ের কাজে অন্য লোকেরা অগ্রসর হয়ে থাকে। কেননা তাতে নিহত হওয়ার অবকাশ রয়েছে। আর তার ফলে পিতা-মাতার মনে মারাত্মক আঘাত লাগতে পারে। কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্য ও মুবাহ কার্যকলাপে— যাতে নিহত হওয়ার বাহ্যত কোন কারণ নেই— বাইরে যেতে নিষেধ করার কোন অধিকার পিতা-মাতার থাকতে পারে না। এ কারণে সে কাজে পিতা-মাতার অনুমতি লওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। আর আল্লাহ্ যেহেতু পিতা-মাতার হককে খুব বড় ও তাগিদপূণ করে পেশ করেছেন, এ জন্যে হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, কাফির পিতাকে হত্যা করা পুত্রের উচিত নয়, যদি সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীও হয়। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ 'তুমি তাদের জন্যে উহ্-ও বলো না।' বলেছেন ঃ 'পিতা-মাতা যদি তোমার উপর জোর খাটায় আমার সাথে শিরক করার জন্যে যে বিষয়ে তোমার কিছুই জানা নেই— তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না, তবে দুনিয়ায় তাদের সাথে ভালো আচরণ অবশ্যই করবে।' তারা যখন কুফর-এর উপর দাঁড়িয়ে থেকে যুদ্ধ করছে, সেই অবস্থায়ও তাদের সাথে ভাল আচরণ করার জন্যে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন। তাদের দুজনের উপর অস্ত্র না চালানো, তাদেরকে হত্যা না করা 'মারূফ' পর্যায়ের কাজ। অবশ্য তা না করে যদি কোন উপায়ই না থাকে, তাহলে তা করা যাবে, যেমন তাকে হত্যা না করলে সে-ই হয়ত সন্তানকে হত্যা করবে। সে অবস্থায় পুত্রের পক্ষে পিতাকে হত্যা করা জায়েয। কেননা তা না করলে সে নিজের হত্যার ব্যবস্থাই যেন করল। অথচ সে অবস্থা থেকে সে নিজেকে বাঁচাতে পারত। আর অন্যকে সুযোগ দেয়া তাকে হত্যা করার— এটা নিষিদ্ধ, যেমন নিষিদ্ধ আত্মহত্যা করা। এরূপ অবস্থায় পুত্র পিতাকে হত্যা করতে পারে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি হিন্‌জিলা ইবনে আবূ আমের পাদ্রীকে নিষেধ করেছিলেন তার পিতাকে হত্যা করতে, অথচ সে মুশরিক ছিল। হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, যে মুসলিম ব্যক্তির পিতা-মাতা কাফির অবস্থায় মরে, তাদেরকে সে গোসল করাবে, তাদের পেছনে পেছনে কবরস্থানে যাবে ও তাদেরকে দাফন করবে— যদি তারা খৃষ্টান হয়। হিন্দু হলে তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত হবে। কেননা এতটা কাজ নিশ্চয়ই 'মারূফ' পর্যায়ের, যা করার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ্ই দিয়েছেন।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'এবং পিতা-মাতার সাথে ইহসান করতে হবে'—এর প্রকৃত তাৎপর্য কি এবং এ কথাটি কাকে বলা হয়েছে ?

জবাবে বলা যাবে, এর তাৎপর্য ঃ তোমরা পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার ও তাদের কল্যাণ কামনা কর। অথবা হতে পারে ঃ 'তোমরা পিতা-মাতার সাথে শুভ শুভ আচরণ কর, যেমন তা হওয়া উচিত।'

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَبِذِى الْقُرْبٰى এবং নিকটবর্তী লোকদের সাথেও এটা সেলায়ে রেহমী রক্ষা করার আদেশ। নৈকট্য সম্পন্ন লোকদের প্রতি কল্যাণ করার এটা আদেশ। এ পর্যায়ে আলোচ্য সূরা আন্-নিসার শুরুতে والارحام পর্যায়ে বিস্তারিত কথা বলে এসেছি।

আল্লাহ্ সূরাটির সূচনা করেছেন আল্লাহর তওহীদ ও ইবাদতের কথা দিয়ে। কেননা তা-ই হচ্ছে সেই মূল, যার উপর সমস্ত শরীয়ত ও নবুয়্যত প্রতিষ্ঠিত। তা লাভ করতে পারলেই দ্বীনের সমস্ত কল্যাণ লাভ করা সম্ভব। পরে পিতা-মাতার প্রতি যে কল্যাণময় ব্যবহার ও আচরণ করা কর্তব্য তার কথা বলেছেন। তাদের হক্ আদায় করার ও তাদের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করার আদেশ করেছেন। তারপরে নৈকট্য সম্পন্ন প্রতিবেশীর কথা বলা হয়েছে। সে তোমার নিকটবর্তী মুমিন ব্যক্তি, তার নৈকট্যের কারণে তোমার উপর হক রয়েছে। তার সাথে মাওয়ামেলাত ও সাহায্য-সহযোগিতার ঋণের কথা বলা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীর কথা। সে বংশীয় সম্পর্কের দিক দিয়ে দূরবর্তী হলেও মুমিন হওয়ার কারণে সে তোমার প্রতিবেশি হওয়ায় হক্‌দার হয়েছে। আর ইসলামী মিল্লাতের সংরক্ষণের দাবিতে সে তোমার সাথে একাত্ম। তার সাথে তোমার আন্তরিক নিষ্ঠার চুক্তি থাকা খুবই স্বাভাবিক। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ ও দহাক— এঁরা সকলেই বলেছেন, এক প্রতিবেশী তোমার নিকটে বাস করে, বংশের দিক দিয়েও নিকটাত্মীয়। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ প্রতিবেশী তিন প্রকারের এবং প্রতিবেশীর তিনটি হক্ রয়েছে। তা হল প্রতিবেশী হওয়ার হক, নিকটাত্মীয়তার হক ও ইসলামের হক। আর এক প্রকারের প্রতিবেশীর দুটি হক। একটি প্রতিবেশী হওয়ার হক আর একটি মুসলিম হওয়ার হক। আর এক প্রকারের প্রতিবেশীর শুধু প্রতিবেশী হওয়ার হক থাকে। সে মুশরিক আহ্‌লি কিতাব।

আল্লাহ্‌র কথা وَالصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ পার্শ্ববর্তী সঙ্গী। এ পর্যায়ে ইবনে আব্বাস থেকে দুইটি বর্ণনার একটিতে এবং সাঈদ ইবনে যুবায়র, আল-হাসান, মুজাহিদ, কাতাদাতা, সুদ্দী, ও দহাক থেকে বর্ণিত, সে হচ্ছে সফর সঙ্গী। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, ইবরাহীম ও ইবনে আবূ লায়লা থেকে বর্ণিত, সে হচ্ছে স্ত্রী। ইবনে আব্বাস থেকে অপর বর্ণনাটিতে বলা হয়েছে, সে হচ্ছে সেই লোক, যে তোমার কল্যাণ কামনায় অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তোমার নিকট এসে থাকছে। কেউ কেউ বলেছেন, সে নিকটবর্তী ঘরের প্রতিবেশী। তার সাথে বংশীয় সম্পর্ক নিকটের হোক বা দূরের। অবশ্য যদি সে মুমিন হয়।

আবূ বকর বলেছেন, ব্যবহৃত শব্দের এসব অর্থই হতে পারে। তাই এসব অর্থই তার থেকে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। দলীল ছাড়া তার একটি বিশেষ অর্থ গ্রহণ সহীহ্ নয়। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهٗ سَيُوَرِّثُهٗ -

জিবরাঈল সব সময়ই আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে অসিয়ত ও নসীহত করেন। তার ফলে আমার মনে এ ধারণার উন্মেষ হল যে, সে সম্ভবত তাকে ওয়ারিস বানিয়ে দেবে।

সুফিয়ান আমর ইবনে দীনার— নাফে' ইবনে যুবায়র ইবনে মুতয়িম-আবূ শুরায়হ আল-হুজারী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) বলেছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهٗ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْلِيَصْمُتْ -

যে লোক আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার, সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে। যে লোক আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার সে যেন তার মেহ্মানকে সম্মান করে। আর যে লোক আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার, সে যেন ভালো কথা বলে। অন্যথায় যেন সে চুপ করে থাকে।

উবায়দুল্লাহ আল-অসাফী আবূ জাফর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) বলেছেন ঃ

مَا اٰمَنَ مَنْ اَمْسٰى شَبْعَانَ وَاَمْسٰى جَارُهٗ جَائِعًا -

যে লোক সন্ধ্যা ও রাত্রি যাপন করল পরিতৃপ্ত হয়ে এবং তার প্রতিবেশী থাকল ক্ষুধার্ত, অভুক্ত, সে কখনই ঈমানদার হতে পারে না।

উমর ইবনে হারুন আল-আনসারী, তার পিতা, আবূ হুরায়রাতা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) বলেছেন ঃ

مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ سُوْءَ الْجِوَارِ وَقَطِيْعَةُ الْاَرْحَامِ وَتَعْطِيْلُ الْجِهَادِ وَقَدْ كَانَتِ الْعَرَبُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ تُعَظِّمُ الْجِوَارَ وَتُحَافِظُ عَلٰى حِفْظِهٖ وَتُوْجِبُ فِيْهِ مَاتُوْجِبُ فِى الْقَرَابَةِ -

কিয়ামতের একটা বড় লক্ষণ হল খারাপ সম্পর্কের প্রতিবেশী, রিহম সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া, জিহাদ বন্ধ হওয়া। আরবরা জাহিলিয়াতের জামানায় প্রতিবেশীর সম্পর্ককে খুব বড় করে দেখত, তার সংরক্ষণে সহযোগিতা করত এবং নিকটাত্মীয়ের ব্যাপারে যা কর্তব্য মনে করত, প্রতিবেশীর প্রতিও সেই কর্তব্য মনে করত।

কবি জুহায়র বলেছে ঃ

وَجَارُالْبَيْتِ وَالرَّجُلُ الْمَادِى : اَمَامَ الْحَيِّ عَقْدُهُمَا سَوَاءٌ -

ঘরের প্রতিবেশী ও ঘোষক ব্যক্তি— গোত্রের সম্মুখে এ দুজনের চুক্তি অভিন্ন।

ঘোষক ব্যক্তি বলতে সভা-সম্মেলনে যে তোমার সঙ্গী তাকে বুঝিয়েছে। আর তা-ই গোত্রের মজলিস।

কোন কোন মনীষী الصاحب بالجنب বলে তাকে বুঝিয়েছেন, যে তোমার ঘরের সঙ্গে মিলিয়ে ঘর বেঁধেছে। আল্লাহ্ তার কথা বিশেষভাবে বলে তার হক্ সম্পর্কে তাগিদ করেছেন, যে ঘরের সঙ্গে মিলিত ঘরের বাসিন্দা তার হক যে এরূপ নয় তার থেকে ভিন্নতর। আবদুল বাকী ইবনে কানে আবূ আমর ও মুহাম্মদ ইবনে উসমান আল-কুরাশী, অরবাক আহ্মাদ ইবনে ইউনুস, ইসমাঈল ইবনে মুসলিম, আবদুস সালাম ইবনে হরব, আবূ খালিদ আদদালানী, আবূল উলা আল-আজদী, হুমায়দ ইবনে আবদুর রহমান আল-হুমাইরী একজন সাহাবী সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَاَجِبْ اَقْرَبَهُمَا بَابًا فَاِنَّ اَقْرَبَهُمَا بَابًا اَقْرَبُهُمَا جِوَارًا ، وَاِذَا سَبَقَ اَحَدُهُمَا فَابْدَأْ بِالَّذِيْ سَبَقَ –

দুইজন আহ্বানকারী এক সঙ্গে আহ্বান করলে দুজনের মধ্যে যার দুয়ার তুলনামূলকভাবে নিকটবর্তী তার আহ্বানে সাড়া দাও। কেননা তুলনামূলকভাবে যার ঘরের দুয়ার নিকটবর্তী সে নিকটতর প্রতিবেশী। আর সে দুজনের মধ্যে আগে-পরে হলে আগের জনের ডাকে সাড়া দাও।

নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, চল্লিশ ঘর পর্যন্ত প্রতিবেশী। আবদুল বাকী ইবনে কানে' আল-হাসান ইবনে শুবায়ব আল-মামরী, মুহাম্মাদ ইবনে মুসাফফা, ইউসুফ ইবনুস্ সফর, আল আওজায়ী, ইউনুস, জুহরী, আবদুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালিক তাঁর পিতার সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছে, রাসূল (স)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি অমুক গোত্রের মহল্লায় অবস্থান নিয়েছি, সেখানে আমার জন্যে কঠোর ও শক্ততম হচ্ছে আমার প্রতিবেশীর মধ্যে অধিক নিকটবর্তী ব্যক্তি। তখন নবী করীম (স) আবূ বকর, উমর ও আলী (রা)-কে পাঠালেন, তারা যেন সে মহল্লার মসজিদের দুয়ার দেশে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ঘোষণা করেন যে, তোমরা জেনে রাখো, চল্লিশ ঘর পর্যন্ত প্রতিবেশ বিস্তার্ণ। আর —

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ خَافَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ –

যে ব্যক্তির অনিষ্টকারিতায় তার প্রতিবেশী ভীত-সন্ত্রস্ত সে কখনই জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

বলেছেন, আমি জুহরীকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবূ বকর, চল্লিশ ঘর বলতে কি বুঝিয়েছেন? বললেন, এদিকে চল্লিশ ঘর ওদিকে চল্লিশ ঘর। আল্লাহ্ তা'আলা সমাজবদ্ধ জীবন বানিয়েছেন মদীনা নগরে প্রতিবেশ গড়ে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَا اِلَّا قَلِيْلًا –

মুনাফিক লোকেরা, যাদের মনে রোগ ও দোষ রয়েছে এবং যারা মদীনায় উত্তেজনাকর গুজব ছড়াচ্ছে, তারা যদি নিজেদের এ কাজ থেকে বিরত না হয়, তাহ্‌লে তাদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণের জন্যে আমরা তোমাকে দায়িত্বশীল বানাব। অতঃপর এ শহরে তোমার সাথে তাদের প্রতিবেশী হয়ে বসবাস করা কঠিনই হবে। (সূরা আহযাব ঃ ৬০)

এ আয়াতে আল্লাহ্ রাসূলের সাথে তাদের একত্র বাসকে প্রতিবেশ বানিয়ে দিয়েছেন। এ পর্যায়ে আল্লাহ্ যেসব কল্যাণের উল্লেখ করেছেন, তা কয়েকটি দিক দিয়ে হতে পারে। এক সমাজের দরিদ্র ব্যক্তি যখন ক্ষুধা ও বস্ত্রহীনতার কঠোর কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়, ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়, তখন তার প্রতি দয়ার্দ্রতা, সহানুভূতিশীলতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন। আর একটি হচ্ছে উত্তম সামষ্টিক জীবন ও প্রতিবেশীকে কষ্ট ও পীড়ন থেকে বাঁচানো, যেসব জুলুম মানুষকে গ্রাস করে তা থেকে রক্ষা করা। সেই সাথে উত্তম চরিত্রতা মহনুভবতা, শুভ সুন্দর কর্মশীলতা। এই প্রতিবেশের কারণে আল্লাহ্ শুফয়ার হক্ আদায় করা জরুরী করে দিয়েছেন আর তাহ্‌লে কারোর প্রতিবেশীর ঘর বা জমি বিক্রয় হলে তা ক্রয় করার অধিকার প্রতিবেশীরই সর্বাধিক।

## প্রতিবেশীর শুফয়া পর্যায়ে বিভিন্ন মত

আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ ও জুফার বলেছেন, পণ্যদ্রব্যে শরীক পথের শরীকের অপেক্ষা অধিক অধিকার সম্পন্ন। পরে পথের শরীক ব্যক্তি সংলগ্ন প্রতিবেশীর অপেক্ষা বেশি অধিকার সম্পন্ন। এ দুজনের পর সংলগ্ন প্রতিবেশীর অধিকার। ইবনে শাবরামাতা, সওরী, আল-হাসান ইবনে সালিহ্ এই মত প্রকাশ করেছেন। আর মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন ঃ

لَاشُفْعَةَ اِلَّا فِى مَشَاعٍ ، وَلَا شُفْعَةَ فِيْ بِئْرٍ لَا بِيَاضَ لَهَا وَلَا تَحْتَمِلُ الْقَسْمُ -

অবিভক্ত ও সম্মিলিত জিনিস ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্র শুফয়ার হক্ হয় না। আর যে কূপে উন্মুক্ত স্থান নেই— যা বিভক্ত হওয়ার যোগ্য নয়, তাতেও শুফ্য়া স্বীকৃত নয়।

প্রতিবেশীর শুফয়া'র হক রয়েছে, তা আগের কালের বিপুল সংখ্যক মনীষী থেকে বর্ণিত। উমর ও আবূ বকর ইবনে আবূ হাফসা ইবনে উমর থেকে বর্ণিত, কাযী শুরাইহ্ বলেছেন, তিনি উমর (রা) লিখেছিলেন, আমি প্রতিবেশীর জন্যে শুফ্য়ার পক্ষে রায় দিচ্ছি। আসিম শবী শুরাইহ থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ

اَلشَّرِيْكُ اَحَقُّ مِنَ الْخَلِيْطِ وَالْخَلِيْطُ اَحَقُّ مِنَ الْجَارِ ، وَالْجَارُ اَحَقُّ مِمَّنْ سَوَاهُ -

শরীফ ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকৃতির জিনিসের মিশ্রে একত্রিত ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অধিকার সম্পন্ন এবং বিভিন্ন প্রকৃতির জিনিসে একত্রিত ব্যক্তি প্রতিবেশী অপেক্ষা অধিক অধিকার সম্পন্ন। আর প্রতিবেশী তাদের ছাড়া অন্যান্যের মধ্যে অধিক অধিকার সম্পন্ন।

আইয়ূব মুহাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ বলা হতো যে, একটি জিনিসে শরীক ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকৃতির মিশ্রে একত্রিত ব্যক্তির অপেক্ষা শুফয়া'র অধিক হকদার। আর বিভিন্ন প্রকৃতির মিশ্রে শরীক ব্যক্তি অন্যান্যদের অপেক্ষা অধিক অধিকারসম্পন্ন।

ইবরাহীম বলেছেন, শরীক যদি কেউ না থাকে, তাহলে প্রতিবেশী শুফ্য়া পাওয়ার বেশি অধিকারী। তায়ূসও এরূপ মতই দিয়েছেন। ইবরাহীম ইবনে মায়সারাতা বলেছেন, উমর ইবনে আবদুল আযীয আমাদের নিকট লিখে পাঠিয়েছিলেন, সীমাসমূহ সুনির্দিষ্ট ও চিহ্নিত হয়ে যাওয়ার পর 'শুফ্য়া'র অধিকার থাকে না। তায়ূস বলেছেন ঃ প্রতিবেশী বেশি অধিকার রাখে। প্রতিবেশীর শুফ্য়া পাওয়ার অধিকার প্রমাণ করে সেই হাদীস, যা হুসায়ন আল-মুয়াল্লিম আমর ইবনে শুয়ায়ব, আমর ইবনুশ্ শরীদ তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি রাসূল (স)-কে বললাম ঃ আমার একখন্ড জমি আছে, তাতে কেউ শরীক নয়। শরীক আছে যত আমার প্রতিবেশী। তখন তিনি বললেন ঃ اَلْجَارُ اَحَقُّ بِسَقَبِهِ —প্রতিবেশী তার নৈকট্যের কারণে অধিক অধিকরী। আবূ হানীফা বর্ণনা করেছেন, আবদুল করীম আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরিমাতা, রাফে' ইবনে খদীজ (রা) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, সাদ তাঁর একখানি ঘর পেশ করলেন। বললেন, এ ঘরখানি নিয়ে নও। আমি তাতে দিয়ে দিলাম অনেক বেশি তুমি যা আমাকে দেবে তার তুলনায়। কিন্তু তুমিই তা পাওয়ার বেশি অধিকারী। কেননা আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ اَلْجَارُ اَحَقُّ بِسَقَبِهِ 'প্রতিবেশী তার নৈকট্যের কারণে বেশি অধিকারসম্পন্ন।' আবূ যুবায়র জাবির থেকে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, রাসূলে করীম (স) প্রতিবেশীর দাবিতে 'শুফয়া' পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দিয়েছেন। আবদুল মালিক ইবনে আবূ সুলায়মান, আতা, জাবির সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) বলেছেন ঃ প্রতিবেশী তার নৈকট্যের কারণে অধিক হক্দার, তার জন্যে অবশ্যই অপেক্ষা করা যাবে— করা হবে, যদি সে অনুপস্থিত থাকে, যখন তাদের দুজনের পথ অভিন্ন হয়। ইবনে আবূ লায়লা নাফে' ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন, প্রতিবেশী তার নৈকট্যের কারণে— যতটা ছিল— অধিক হকদার। কাতাদাতা, আল-হাসান, সামুরাতা সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

جَارُالدَّارِ اَحَقُّ بِشُفْعَةِ الْجَارِ -

ঘরের প্রতিবেশী প্রতিবেশীর শুফয়ায় অধিক হক্দার।

কাতাদাতা আনাস থেকে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

جَارُالدَّارِ اَحَقُّ بِالدَّارِ -

ঘরের প্রতিবেশী ঘর পাওয়ার অধিক হকদার।

সুফিয়ান মনসুর, আল-হিকাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী ও আবদুল্লাহ (রা) কে যিনি বলতে শুনেছেন, তিনি বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা দুজন বলেছেন ঃ রাসূল (স) প্রতিবেশী সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় দিয়েছেন। ইউনুস আল-হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, রাসূল (স) প্রতিবেশী পর্যায়ে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দিয়েছেন। এভাবে গোটা মুসলিম সমাজ-ই ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাসূল (স) থেকে এরূপ বর্ণনায় সম্পূর্ণ একমত হয়েছেন, যা ব্যাপক বিস্তৃতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। অতএব এ কথাকে যে লোক অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করবে, সে রাসূল (স) থেকে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত অগ্রাহ্যকারী বলে চিহ্নিত।

উক্ত মতের বিপরীত মতের ধারক একটি হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করতে চেয়েছে। হাদীসটি আবূ আসিম আন-নবীল মালিক, জুহরী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব ও আবূ সালমাতা ইববে আবদুর রহমান, আবূ হুরায়রাতা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

قَضَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِيْمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ فَلَا شُفْعَةَ -

রাসূলে করীম (স) শুফয়াকে অবিভক্ত সম্পত্তিতে কার্যকর করেছেন। কিন্তু তা বিভক্ত হয়ে যখন সামীনা দাঁড়িয়ে যায়, তারপর আর কোন শুফ্য়া নেই।

এ হাদীসটি মালিক থেকেও বর্ণনা করেছেন আবূ কুতাই লাতাল মাদানী ও আবদুল মালিক ইবনে আবদুল আযীয আল-মাজেশুন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও এ হাদীসটি 'মুত্তাসিল' হিসেবে এরাই বর্ণনা করেছেন। তার আসল সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকে মক্‌তু হিসেবে বর্ণনা করেছেন মায়ান অকী', আল-কা'নবী ইবনে অহব। এঁদের সকলের সনদ সূত্র হচ্ছে মালিক, জুহরী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব— তাতে আবূ হুরায়রার নাম উল্লেখ করা হয়নি, মুয়াত্তা ইমাম মালিককেও তা এমনিভাবেই উদ্ধৃত হয়েছে। তা যদি মুত্তাসিল হিসেবেও বর্ণিত হয়ে থাকে, তাহলে তার দ্বারা সেসব হাদীসের উপর আপত্তি তোলা যেতে পারে না, যা নবী করীম (স) থেকে অন্তত দশজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন প্রতিবেশীর জন্যে শুফয়া আছে বলে। কেননা তা মুতাওয়াতির পর্যায়ে গণ্য, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা তার উপর আপত্তি তোলা যেতে পারে না। সেসব দ্বারা আপত্তি উত্থাপনের বহু কয়েকটি দিক থাকলেও— যেমন ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি— তাতে প্রতিবেশীর জন্যে 'শুফ্য়া' প্রমাণকারী হাদীসসমূহের বিপরীত কোন কিছুই নেই। কেননা তাতে খুব বেশি যা বলা আছে তা হল— নবী করীম (স) শুফয়ার ফয়সালা করেছেন সেসব সম্পত্তিতে, যা বিভক্ত হয়নি। বিভক্তির সীমানা নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়ার পর 'শুফ্য়া'র কোন অবকাশ নেই।

বর্ণনাকারীর কথা ঃ নবী করীম (স) অবিভক্ত সম্পত্তিতে শুফয়ার ফয়সালা করেছেন।—এ হাদীস ব্যবহারে সকলেই একমত এ বিষয়ে যে, শুফয়া শরীকের জন্যে প্রমাণিত। তা সত্ত্বেও তা হচ্ছে নবী করীম (স)-এর কৃত ফয়সালার বর্ণনা, তা কোন সাধারণ নীতির ব্যাপার নয়। কোন সাধারণ সিদ্ধান্তেরও বর্ণনা তা নয়। রাসূল (স)-এর কথা ঃ সীমাসমূহ দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর 'শুফয়া'র কোন অবকাশ নেই'— এটা হাদীসের বর্ণনাকারীরও কথা হতে পারে। কেননা সে কথাটি নবী করীম (স)-এর বলে উল্লেখ করা হয়নি। তিনি সেটা সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় দিয়ে ফেলেছেন তা-ও তো বলা হয়নি। কথাটি রাসূল (স)-এর হতে পারে, হতে পারে হাদীসটির বর্ণনাকারীর—এই যখন সম্ভাবনা, বর্ণনাকারী হয়ত তা হাদীসের মূল কথার মধ্যে 'মুদরাজ' করে দিয়েছেন। বহু সংখ্যক হাদীসেই এরকমটা হয়ে থাকে। তাই ও কথাটি স্বয়ং রাসূল করীম (স)-এর তা জোর করে আমাদের বলা উচিত নয়। সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কোন কথা নবী করীম (স)-এর নামে চালিয়ে দেয়া খুবই অসমীচীন। কাজেই আমরা পূর্বে যা বলেছি, তার উপর কোন আপত্তি তোলা যায় না।

আরও একটি হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে তারা পেশ করেছে। হাদীসটি আবদুল বাকী ইবনে কানে' হামেদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-মুরদাফ, উবায়দুল্লাহ্ ইবনে উমর আল-কাওয়ারীরী, আবদুল ওয়াহিদ ইবনে জিয়াদ, মামার, জুহরী, আবূ সালমাতা ইবনে আবদুর রহমান, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ রাসূল (স) শুফ্য়া'র ফয়সালা করেছেন অবিভক্ত সম্পত্তিতে। যখন তা (বিভক্ত হয়ে) সীমাসমূহ দাঁড়িয়ে যাবে এবং পথ অন্য দিকে ফিরে যাবে, তখন আর শুফয়া'র প্রশ্ন উঠবে না।

এ হাদীসেও প্রতিবেশীর শুফয়ার হক্ অস্বীকৃতির কোন কথা নেই। দুটি দিক দিয়ে তা বিবেচনা করা যেতে পারে। একটি এসব হাদীসে বিভক্তি বন্টনের পর সীমা দাঁড়িয়ে গেলে ও পথ ভিন্ন দিকে ফিরে গেলে শুফয়া না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ থেকে বোঝা গেল, সংলগ্ন প্রতিবেশী ছাড়া অন্যের জন্যে শুফয়া অস্বীকৃত হয়েছে। কেননা পথ ভিন্ন দিকে ফিরে গেলে সংলগ্ন প্রতিবেশী হওয়ার অবস্থা শেষ হয়ে যায়। কেননা তখন প্রতিবেশী ও তার মধ্যে অন্য একটি পথ হয়ে গেলে। আর দ্বিতীয়, কথাটি যখন আমরা তার প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করব, তখন শব্দের দাবি হবে, সীমা দাঁড়িয়ে গেলেও পথ ফিরে গেছে শুফয়া পাওয়া যাবে না। আর সীমা দাঁড়িয়ে যাওয়া ও পথ ফিরে যাওয়া সম্পত্তির বণ্টন হলেই হয়ে থাকে। তার অর্থ হল, সম্পত্তি বন্টন হয়ে গেলে আর শুফ্য়া হবে না। হানাফী ফিকহবিদগণ তা-ই বলেছেন যে, সম্পত্তি বণ্টন হয়ে গেলে শুফয়া হবে না। প্রথমোদ্ধৃত হাদীসটিও সেই কথাই বলেছে। আবদুল মালিক ইবনে আবূ সুলায়মান, আতা, জাবির, নবী করীম (স) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, প্রতিবেশী তার নৈকট্যের দরুন অধিক হকদার হবে শুফ্য়া'র, তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে— যদি সে অনুপস্থিতও থাকে, যখন তাদের দুজনের পথ অভিন্ন থাকবে।

এ দুটি হাদীস জাবির সূত্রে ও নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ দুটিকে পরস্পর সাংঘর্ষিক মনে করতে পারে না। কেননা এ দুটিকেই এক সাথে কাজে লাগানো সম্ভব। আমরা যে দিকটির উল্লেখ করেছি সে দিক দিয়েও দুটিকে কাজে লাগানো যেতে পারে, দুটি অনুযায়ী-ই কাজ করা সম্ভব। অথচ আপত্তিকারী আমাদের বিরোধী মতের লোকেরা এ দুটি হাদীসকে পরস্পর বিরোধীরূপে দাঁড় করিয়েছে এবং একটির দ্বারা অন্যটিকে ফেলে দিয়েছে। আর এ কথাটি বিশেষ কোন কারণেও বলা হতে পারে। পরে বর্ণনাকারী তাকে রাসূল (স)-এর কথা হিসেবে শামিল করে বর্ণনা করেছেন। আর সে কারণটির তিনি উল্লেখই করেন নি। যেমন দুই ব্যক্তি তার নিকট মামলা দায়ের করেছে। একজন তার প্রতিবেশী আর অপরজন তার সাথে শরীক। তখন শরীক ব্যক্তির জন্যে শুফ্য়া'র হুকুম কার্যকর হবে, প্রতিবেশীর জন্যে হবে না। এ-ও বলেছেন, সীমা দাঁড়িয়ে গেলে প্রতিবেশী থাকা অবস্থায় বণ্টিত অংশের মালিক শুফয়া পাওয়ার অধিকারী হবে না। যেমন উসামা ইবনে যায়দ (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ لَا رِبَا اِلَّا فِى النَّسِيْئَةِ —সূদ হয় কেবল বিলম্বিত ঋণ ফেরত দানে। অথচ সব ফিক্হবিদদের মতে উক্ত কথাটি একটি কারণের ভিত্তিতে বলা কথা, নবী করীম (স)-এর কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বর্ণনাকারী এ কথাটি কারণ উল্লেখ না করেই শামিল করে বর্ণনা করে বসেছেন। হতে পারে, স্বর্ণ ও রৌপ্য যখন একটি দ্বারা অন্যটি বিক্রয় করা হবে, তখন এ দুইটি ভিন্ন

ধরনের ধাতু সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হয়েছিল। তখন নবী করীম (স) বলে দিয়েছেন ঃ রিবা শুধু ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করার ক্ষেত্রেই ধার্য হয়। এটা প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট কথা ছিল— যেমন আমরা বলেছি। উপরন্তু প্রতিবেশী হওয়ার দরুন শুফ্য়া হওয়া সক্রান্ত হাদীসমূহ এবং শুফ্য়া না হওয়া সংক্রান্ত হাদীসসমূহ যদি সমান সমানও হয়, তবু ইতিবাচক হাদীসসমূহ নৈতিবাচক হাদীসসমূহের তুলনায় অধিক গ্রহণীয় হবে। এটাই নিয়ম। কেননা আসলে তা ওয়াজিব নয়। শরীয়তের কোন দলীলই তা ওয়াজিব করতে পারে। পরন্তু শুফয়া অস্বীকৃতির হাদীস মূল অবস্থার প্রেক্ষিতে এসেছে। আর তা প্রমাণকারী হাদীস তার উপর এসেছে। অতএব তা-ই অগ্রাধিকার পাওয়ার অধিকারী হবে।

যদি বলা হয়, হাদীসে প্রতিবেশী বলে শরীককেই বুঝিয়েছে, তা-ও তো সম্ভব ?

জবাবে বলা যাবে, আমরা এ পর্যায়ে যে সব হাদীস উদ্ধৃত করেছি, তার অধিকাংশই এ ব্যাখ্যার পরিপন্থী। কেননা তাতে এ কথা রয়েছে ঃ

جَارُالدَّارِ اَحَقُّ لِشُفْعَةِ دَارِهِ -

ঘরের প্রতিবেশী সেই ঘরের শুফ্য়া পাওয়ার অধিক হক্দার।

কিন্তু শরীক ব্যক্তিকে তো 'ঘরের প্রতিবেশী' বলা হয় না। আর হযরত জাবির বর্ণিত হাদীসে يُنْتَظَرُ بِهِ وَاِنْ كَانَ غَائِبًا اِذَاكَانَ طَرِيْقُهُمَا وَاحِدً - —'সে জন্যে তার অপেক্ষা করা হবে যদি সে অনুপস্থিত থাকে এবং তাদের দুজনার পথ অভিন্ন হবে।'— এই কথাও বলা হয়েছে। এ কথা পণ্যে শরীক ব্যক্তির সম্পর্কে বলা কখনই সঙ্গত হতে পারে না। তাছাড়া, শরীককে কখনও প্রতিবেশী বলা হয় না। কেননা শরীকদারীর দৌলতে যদি প্রতিবেশী হওয়ার নাম পাওয়ার অধিকার হয়, তাহলে প্রত্যেক জিনিসের শরীকরাই প্রতিবেশী গণ্য হবে। যেমন একজন ক্রীতদাসের মালিকানায় কয়েকজনের শরীক হওয়া, একটি গরু বা মহিষের বা ঘোড়ার মালিকানায় একাধিক ব্যক্তির শরীক হওয়া— কিন্তু তাতে প্রতিবেশী হওয়ার অভিধায় অভিহিত হওয়া যায় না। বোঝা গেল ও প্রমাণিত হল যে, শরীককে কখনই প্রতিবেশী বলা যেতে পারে না। প্রতিবেশীর হক্ তো একটা স্বতন্ত্র ও বিশেষ ব্যাপার। শরীকের হক্ থেকে তার ভাগ সম্পূর্ণ ভিন্নতর। প্রত্যেকের মালিকত্ব অন্য সব লোকের মালিকত্ব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে থাকে।

আর হ্যাঁ, শরীকদারীর দরুনও শুফ্য়া'র হক পাওয়া যেতে পারে। কেননা তা সম্পত্তির বণ্টনের ফলে প্রতিবেশী হওয়ার অধিকারী বানায়। এ পর্যায়ের দলীল হচ্ছে, সমস্ত জিনিসের শরীকদারী শুফয়া অনিবার্য করে দেয় না। কেননা বণ্টনের দরুন তার দ্বারা প্রতিবেশীর অবস্থান অর্জিত হয় না। তাই তা প্রমাণ করল যে, কোন জমিনে শরীকদারীর দরুন শুফয়া পাওয়ার অধিকার হতে পারে তার বণ্টনকালে যদি প্রতিবেশী হওয়ার সুযোগ ঘটে। যদিও শরীক প্রতিবেশী অপেক্ষা শুফ্য়া'র অধিক হক্দার হয় সেই বিশেষত্বের কারণে, যা সে অর্জন করতে পারে, বণ্টনের দরুন প্রতিবেশীর হক সম্পর্কিত হওয়া সত্ত্বেও। তার দলীল হচ্ছে, সকল জিনিসে শরীকদারী শুফ্য়া ওয়াজিব করে দেয় না। কেননা তার দ্বারা প্রতিবেশী হওয়ার সুযোগ লাভ হয় না। যেমন আপন সহোদর ভাই— একই পিতা-মাতার সন্তান হিসেবে,— বৈমাত্রেয় ভাইর

অপেক্ষা মীরাস পাওয়ার অধিক হক্দার। যদিও বৈমাত্রের ভ্রাতৃত্ব ও আসাবা হয়ে মীরাস পছওয়ার অধিকারী বানায়, যখন আপন সহোদর ভাই থাকবে,না। একথা জানা আছে যে, মার দিক দিয়ে নৈকট্যের দম্নন আসাবা হওয়ার সুযোগ দেয় না যখন সেখানে পিতার০দিকের নৈকট্যের অনুপস্থিতি হবে। তবে তা পিতার দিকের নৈকট্যের আসাবা হওয়া অধিক তাগিদপূর্ণ। শরীকও থেঠনি। শরীকদারীর দরুন শুফ্য়া'র অধিকারী হয় বন্টনের মাধ্যমে প্রতিবেশী হওয়ার সুযোগ লছভের দরুন। আর শরীক তো প্রতিবেশীর তুলনায় উত্তম অর্চিত বিশেষত্বের দরুন—যেমন আসাবা হওয়া সম্পর্কে আমরয় বলেছি। যে তাৎপর্যের দরুন শুফ্য়া ওয়াজিব হয়, তা হল প্রতিবেশী হওয়া। আর যে তাৎপর্যের দরুন শরীকদারীর০মাধ্যমে শুফ্য়া ওয়াজিব হয়, তা শরীকের জন্যে চিরদিঁ"র যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রতিবেশীও তা হতে পারে। তাতে জ্বালা-যন্ত্রণা হতে পারে তার প্রত্যেক্ষকারী হওয়ার কারণে, তার ব্যাপারাদি সম্পর্কে অবহিতির কারণে, তার অবস্থা জানতে পারার কারণে। তাই তার জন্যে শুফ্য়া হওয়া ওয়াজিব। কেননা সেখানে সেই তাৎপর্য বিদ্যমান, যার কারণে শরীকের জন্যে শুফ্য়া ওয়াজিব হয়।

কিন্তু সে তাৎপর্য অসংলগ্ন প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। কেননা তার ও তার মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার ও খবরাখবর জানার প্রতিবন্ধক একটা পথ রয়েছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ وَابْنِ السَّبِيْلِ মুজাহিদ ও রুবাই ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, এর অর্থ পর্যটক, মুসাফির— বিদেশে গমনকারী। কাতাদাতা ও দহাক বলেছেন—এর অর্থ মেহমান বা অতিথি।

আবূ বকর বলেছেন, এর অর্থ হল পথিক— পথ চলায় রত ব্যক্তি। এ কথাটি ঠিক তেমনি, যেমন পানির পাখিকে বলা হয় 'পানি-পুত্র'। কবি বলেছেন ঃ

وَرَدْتُ اعْتِسَا فًا وَالثُّرَيَّا كَأَنَّهَا : عَلَى قِمَّةِ الرَّأْسِ ابْنُ مَاءٍ مُحَلِّقُ -

যে লোক উক্ত শব্দের অর্থ মেহমান বা অতিথি বলেছেন, তার কথাও যথার্থ। কেননা মেহমানও অতিক্রমকারী, অস্থায়ী অবস্থানকারী। 'পথ-পুত্র' বলে পথ অতিক্রমকারীর সাথে সাদৃশ্য স্থাপন করা হয়েছে। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে عابرسبيل পথ-চতিক্রমকারী। শাফেয়ী বলেছেন, পথ-পুত্র সে, যে বিদেশ ঢ়াত্রার ইচ্ছা রাখে, অথচ তার নিকট পাথেয় নেই। আমরা }লব, তা ভুল অর্থ। কেননা বিদেশ যাত্রার ইচ্ছা করলেই সে পথ-পুত্র হয়ে যায় না। যেমন তাকে মুসাফির— পরিভ্রমর্ণারী বা পথ অতিক্রমকারী বলা যায় না।

আল্লাহ্র কথা৷ঃ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ 'এবং যার মালিক হয় তোমাদের দক্ষিণ হস্ত'। অর্থাৎ যে সদাচরণ ও মহনুভবতা প্রদর্শনের আদেশ করা হয়েছে আয়াতের শুরুতে, তা এদের-ও প্রাপ্য। সুলায়মান আত্তায়মী কাতাদাতা, আনাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, রাসূলে করীম (স)-এর সাধারণ ও সর্বসময়ের অসিয়ত ছিল নামাযের ও তোমাদের দক্ষিণ হস্তের

মালিকানাভুক্তদের সম্পর্কে। শেষ পর্যন্ত এই কথা তাঁর বুকের মধ্যে গরগর ধ্বনির সৃষ্টি করেছে এবং তাঁর জিহ্বাও শুকিয়ে গেছে। উম্মে সালমা (রা)-ও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আমাস তালহা ইবনে মতরফ আবূ উমারাতা, আমার ইবনে শারাহবীল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْغَنَمُ بَرَكَةٌ وَ الْاِبِلُ عِزٌّ لِاَهْلِهَا، وَالْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِىْ نَوَا صِيْهَا الْخَيْرُ اِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ، وَالْمَمْلُوكُ اَخُوكَ فَاَحْسِنْ اِلَيْهِ فَاِنْ وَجَدْتَهُ مَغْلُوبًا فَاَعِنْهُ -

ছাগলে বিপুল প্রবৃদ্ধি হয়। উটে তার মালিকের উজ্জ্বত ও সম্মান হয়। আর অশ্বের ললাটে কিয়ামত পর্যন্তকার জন্যে কল্যাণ অংকিত। মালিকানাভুক্ত ব্যক্তি তোমার ভাই। অতএব তার প্রতি ভালো আচরণ কর। তাকে যদি পরাজিত বিপর্যস্ত দেখতে পাও, তাহলে তাকে সাহায্য কর।

মুররা ইবনে শারাহবীল আল-হামাদানী হযরত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) বলেছেন ঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَيْسَ قَدْ حَدَّثْتَنَا اِنَّ هٰذِهِ الْاُمَّةَ اَكْثَرُ الْاُمَمِ مَمْلُوْكِيْنَ وَاَتْبَاعًا ؟ قَالَ بَلٰى، فَاَكْرِمُوْهُمْ كَكَ اُمَّةِ اَوْلَادِكُمْ وَاَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ -

খারাপ মালিকত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না। বলা হল, হে রাসূল! আপনি কি আমাদের নিকট একথা বলেন নি যে, এই মুসলিম উম্মতের মালিকানাধীন ও অনুসারী লোক অন্যান্য সব উম্মতের তুলনায় অনেক বেশি হবে? তিনি জবাবে বললেন, হ্যাঁ, বলেছিলাম। অতএব তোমরা তাদেরকে সম্মান দাও যেমন সম্মান দাও তোমাদের নিজেদের সন্তানদেরকে এবং তোমরা নিজেরা যা খাও, তাদেরকেও তা-ই খেতে দাও।

আমাশ মারূর ইবনে সুয়াইদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ হযরত আবূ যার গিফারী যখন রবযায় অবস্থান করেছিলেন তখন আমি তাঁর নিকট গেলাম, তখন তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলে করীম (স) বলেছে ঃ

اَلْمَمَا لِيْكُ هُمْ اِخْوَانُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهُ تَعَالٰى خَوَلَكُمْ اِيَّاهُمْ، فَاَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ وَاَلْبِسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبِسُوْنَ -

তোমাদের মালিকানাভুক্ত লোকেরা তোমাদের ভাই। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে বিশেষভাবে তাদের উপর কর্তৃত্বের হকদার বানিয়েছেন। অতএব তোমরা তাদেরকে তাই খেতে দাও যা থেকে তোমরা খাও এবং পরতে দাও যা থেকে তোমরা পরিধান কর।

আর আল্লাহ্র কথা ঃ

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ -

যে সব লোক কার্পণ্য করে ও লোকদেরকে কার্পণ্য করতে বলে এবং আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর যে অনুগ্রহ দান করেছেন, তা লুকিয়ে রাখে .....

البخل এর অভিধানিক অর্থ বলা হয়েছে ঃ দেয়ার কষ্টকরতা। বলা হয়েছে البخل অর্থ, যা নিষেধ করায় কোন ফায়দা নেই এবং অ-ব্যয় করায় কোন ক্ষতি নেই তা নিষেধ করা— না দেয়া, ব্যয় না করা। বলা হয়েছে, البخل অর্থ যা কর্তব্য, তা না করা। এর অনুরূপ অর্থের শব্দ হচ্ছে الشح —লোভ এবং এর বিপরীত অর্থের শব্দ হল দানশীলতা। দ্বীনী নাম পর্যায়ে তার অর্থ বোঝা হয়েছে কর্তব্য না করা— তা থেকে বিরত থাকা। বলা হয়, এ শব্দটির দ্বীনী ব্যবহার কেবল এভাবেই সহীহ্ হতে পারে যে, তা যে করল, সে নিষেধ করে একটা বড় অপরাধ করল। অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ -سَيُطَوَّقُوْنَ مَابَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

যারা আল্লাহ্র দেয়া অনুগ্রহ নিয়ে কার্পণ্য করে, মনে করো না তা তাদের জন্যে খুব বেশি কল্যাণকর। বরং তা তাদের জন্যে খুবই খারাপ ও ক্ষতিকর। তারা যা নিয়ে কার্পণ্য করেছে কিয়ামতের দিন তা তাদের গলার বেষ্টনী বানানো হবে।

আল্লাহ্র হক্ নিয়ে যারা কার্পণ্য করে, এ আয়াতে তাদের সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।

আর আল্লাহ্র কথা ঃ وَيَكْتُمُوْنَ مَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ এই পর্যায়ে ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, ও সুদ্দী থেকে বর্ণিত হয়েছে, এ আয়াত ইয়াহুদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যখন তারা প্রাপ্ত রিযিক নিয়ে কার্পণ্য করছিল এবং হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর গুণ পরিচিতি পর্যায়ে যে ইল্ম তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, তা তারা গোপন করে রাখছিল— প্রকাশ করছিল না। এ-ও বলা হয়েছে যে, এ আয়াতে যাদের এরূপ পরিচিত ছিল তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছিল, তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল যারা আল্লাহ্র নিয়ামত গোপন করে রেখেছিল এবং তা অস্বীকার করেছিল। আর তা আল্লাহ্র প্রতি কুফর করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহের স্বীকৃতি ওয়াজিব। আর তার অস্বীকারকারী কাফির। কুফর মূলত আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহকে গোপন বা অপ্রকাশিত করে রাখা অর্থে ব্যবহৃত। তা লুকিয়ে রাখা এবং তা অস্বীকার করা একথা প্রমাণ করে যে, যে লোক আল্লাহ্র যে নিয়ামত পেয়েছে তা বলা— তার স্বীকারোক্তি করা তার জন্যে জায়েয। তবে তা অহংকার

ও গৌরব হিসেবে নয়, বরং শুধু স্বীকারোক্তি হিসেবে মাত্র যে, সে আল্লাহ্‌র নিয়ামত পেয়েছে এবং নিয়ামত দাতার শোকর হিসেবে। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ -

আর তোমার রব্ব এর দেয়া নিয়ামতের কথা তুমি বল— বর্ণনা কর। (সূরা দোহা ঃ ১১)

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَنَا سَيِّدُ وَلَدِ اٰدَمَ وَلَا فَخْرَ، وَاَنَا اَفْصَحُ الْعَرَبِ وَلَا فَخْرَ -

আমি আদম সন্তানদের সরদার— না, গৌরব করছি না। আমি গোটা আরবের মধ্যে সর্বাধিক শুদ্ধ ও স্পষ্টভাষী— সেটাও আমার গৌরব নয়।

এ হাদীসে নবী করীম করীম (স) আল্লাহ্‌র নিকট থেকে প্রাপ্ত নিয়ামতের কথাই বলেছেন। জানিয়েছেন যে, তিনি যে এই খবর জানাচ্ছেন, তা গৌরব অহংকার হিসেবে নয়।

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَا يَنْبَغِىْ لِعَبْدٍ اَنْ يَّقُوْلَ اَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بِنْ مَتّٰى -

আমি মতি পুত্র ইউনুস অপেক্ষা উত্তম, একথা কোন বান্দাহ্‌র বলা উচিত নয়।

নবী করীম (স) তার উম্মতের অপেক্ষা অধিক উত্তম ছিলেন; কিন্তু তা গৌরব অহংকার স্বরূপ বলতে তিনি নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى -

তোমরা নিজেদের পবিত্রতা-নির্দোষিতা-পরিশুদ্ধতার কথা বলে বেড়িও না, যে লোক তাক্ওয়া অবলম্বন করল, আল্লাহ্ তার সম্পর্কে খুব বেশি ভালো জানেন। (সূরা নজম ঃ ৩২)

নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি এক ব্যক্তিকে অপর এক ব্যক্তির প্রসংশা করতে শুনতে পেলেন। বললেন, লোকটি যদি তোমার কথা শুনতে পেত, তাহলে তুমি তার পিঠ কেটে দিতে। মিকদাদ (রা) এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে হযরত উসমানের প্রসংশা করেছে তার সম্মুখে। তখন লোকটির মুখের উপর মাটি নিক্ষেপ করলেন। বললেন, আমি নবী করীম (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ

اِذَا رَاَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَا حْثُوا فِيْ وُجُوْهِهِمُ التُّرَابَ -

তোমরা যখন প্রশংসাকারী লোক দেখবে, তাদের মুখের উপর মাটি নিক্ষেপ করবে।

এ-ও বর্ণিত হয়েছে ঃ

اِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَاِنَّهُ الذَّبْحُ -

তোমরা পারস্পরিক প্রশংসা থেকে দূরে থাক। কেননা এ কাজ যবেহ করার মতই।

অবশ্য তারীফ প্রশংসা সম্পর্কে এসব কথার প্রয়োগ হবে যদি তা গৌরব ও অহংকারস্বরূপ করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র নিয়ামতের উল্লেখস্বরূপ হলে তা কোনরূপ ক্ষতিকর হবে না বলেই আশা করি। তবে সর্বোত্তম নীতি হল, লোকদের প্রশংসায় মন যেন মাতোয়ারা হয়ে না উঠে এবং তাকে যেন খুব একটা গুরুত্ব না দেয়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ -

যারা লোক দেখানো ভাবে নিজেদের ধন-মাল ব্যয় করে, তারা আল্লাহ্‌ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার নয়।

এর তাৎপর্য— আল্লাহ্‌-ই ভালো জানেন ঃ যারা নিজেরা কার্পণ্য করে ও অন্য লোকদেরকে কার্পণ্য করার পরামর্শ দেয়, আর যারা লোক দেখানোভাবে নিজেদের ধন-মাল ব্যয় করে, তাদের জন্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা অপমানকর আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন। এ কথা প্রমাণ করে যে, যে বান্দাহ্‌ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে কোন কাজ করে, তাতে সে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে পারবে না, সে কাজের কোন সওয়াবও সে পাবে না। কেননা যা লোক দেখানোর ছলে করে সে তো দুনিয়াই তার কাজের বদলা পেয়ে যায়। যেমন তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে, মুখে মুখে প্রশংসার খৈ ফুটে অর্থাৎ যা পাওয়ার জন্যে কাজ করা হয়েছিল, তা তো পেয়েই গেছে। আর দুনিয়ার যে কাজের বিনিময় চাওয়া হবে, সে কাজের জন্যে আল্লাহ্‌র নৈকট্য তা অর্জিত হতে পারে না। যেমন হজ্জের উপর মজুরী গ্রহণ। বেতন নিয়ে নামায পড়ানো এবং এ ধরনের অন্যান্য যে সব কাজ মূলত আল্লাহ্‌র নৈকট্য পাওয়ার মাধ্যমে, তা যদি উপস্থিতভাবে বিনিময় পেয়ে করা হয়, তাহলে সে কাজ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের অর্জন ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোনক্রমেই করা উচিত নয়। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে বিনিময় পেয়ে এ সব কাজ করা হলে পরকালে তার কোন সওয়াব অধিকার না হওয়াই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হল। বরং এসব কাজে মজুরী গ্রহণ-ই না জায়েয, সম্পূর্ণ বাতিল পন্থা।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ -

ওরা যদি আল্লাহ্‌ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনতে ও আল্লাহ্‌র দেয়া রিযিক থেকে ব্যয় করত, তাহলে ওদের কি আসতো-যেতো ?

এ আয়াত এক শ্রেণীর হাদীসবিদদের মতকে বাতিল প্রমাণ করছে। কেননা তারা যদি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনতে ও আল্লাহ্‌র জন্যে অর্থ ব্যয় করতে সমর্থ না হয়, তাহলে তাদের সম্পর্কে উক্ত কথা বলা সঙ্গত হতে পারে না। কেননা তাদের অক্ষমতা সুস্পষ্ট। তা হল তাদেরকে যে কাজের আহ্বান জানানো হয়েছে তা গ্রহণ করতে তারা অক্ষম, কোন শক্তিই তাদের নেই। যেমন অন্ধ লোক সম্পর্কে বলা যায় না ওরা দেখলে ওদের কি আসতো যেতো ? রোগাক্রান্ত ব্যক্তি সম্পর্কে বলা যায় না, ও সুস্থ সবল হলে কি দোষ হতো ? এ পর্যায়ে সবচেয়ে সুস্পষ্ট অকাট্য দলীল হচ্ছে, ওদেরকে ঈমান আনার ও সমস্ত ফরমাবরদারী কাজ করার যে

দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সে পর্যায়ে ওদের সব ওযর-অক্ষমতাকে আল্লাহ্ কেটে দিয়েছেন। ওরা সে কাজ করতে আসলেই সক্ষম।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا -

আজকের দিন কাফির ও রাসূলের নাফরমানরা মনে মনে কামনা করবে, কতই না ভালো হতো যদি জমিন তাদেরকে সমান করে দিত, এবং তারা আল্লাহ্‌র নিকট কোন কথা গোপন করবে না।

আল্লাহ্ এ আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, সেখানে তারা আল্লাহ্‌র নিকট তাদের অবস্থার কোন কিছুই লুকিয়ে রাখতে পারবে না। তারা যা কিছু করেছে, তা-ও আল্লাহ্‌র নিকট অজানা থাকবে না। কেননা তারা জানে যে, আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত, তাদের সব গোপন তত্ত্ব আল্লাহ্‌র জানা। তাই তারা সব কিছু অকপটে স্বীকার করবে। কিছুই গোপন রাখবে না।

বলা হয়েছে এর অর্থ, তারা তাদের গোপন তত্ত্বসমূহ সে দিন গোপন রাখবে না, যেমন করে দুনিয়ায় তারা সব কিছু গোপন করে রাখতো।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা সে দিন বলবে ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমরা মুশরিক ছিলাম না।

জবাবে বলা যাবে, এর কয়েকটি দিক রয়েছে। একটি, পরকাল এমন একটি স্থান যেখানে খুব হালকা শব্দের আওয়াজ শোনা যাবে। এমন স্থান, সেখানে তারা মিথ্যা বলবে, বলবে আমরা কোন খারাপ কাজ করছিলাম না, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা মুশরিক ছিলাম না। আর তা এমন স্থানও, যেখানে তারা নিজেদের ভুল স্বীকার করবে, তারা আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করবে তাদেরকে দুনিয়ায় ফিরিয়ে আনার জন্যে। একথা আল-হাসান থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا 'ওরা আল্লাহ্‌র নিকট কোন কথা গোপন রাখবে না'— এটা ওদের কামনা ও বাসনার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের নির্লজ্জতার কথা আগেই বলে দেবে।

এ-ও বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হচ্ছে, ওরা তাদের কথা গোপন রাখতে সক্ষম হবে না। কেননা ওদের সব কিছুই আল্লাহ্‌র নিকট প্রকাশমান, কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নয়। তাহলে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়, ওরা সেখানে গোপন করার কাজে সক্ষম হবে না। কেননা আল্লাহ্ই সব প্রকাশ করে দেবেন।

এ-ও বলা হয়েছে, ওরা গোপন করতে ইচ্ছুক হবে না। কেননা ওরা যে বিভ্রান্তিতে সমাচ্ছন্ন হয়েছিল তা ওদেরকে আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে। আর ওরা যে গোপন করেছে তা থেকে ওদেরকে তা বের-ও করবে না।

## নাপাক শরীর নিয়ে মসজিদে যাতায়াত

আল্লাহ্‌র বলেছেন ঃ

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا -

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাযের নিকটেও যাবে না, যতক্ষণ না জানবে তোমরা কি বলছ এবং নাপাক শরীরেও নয়— পথ অতিক্রমকারী অবস্থা ছাড়া— যতক্ষণ না তোমরা গোসল করবে।

আবূ বকর বলেছেন ঃ এ আয়াতে ব্যবহৃত السكر। শব্দের তাৎপর্য কি, এ বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করা হয়েছে। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, ইবরাহীম ও কাতাদাতা বলেছেন, মদ্যপানের নেশা ও মাতালাবস্থা। মুজাহিদ ও আল-হাসান বলেছেন, মদ্যপান হারামের আয়াত দ্বারা এ আয়াত মনসূখ হয়ে গেছে। দহাক বলেছেন, এর তাৎপর্য হচ্ছে বিশেষ নিদ্রাচ্ছন্নতা, ঘুমের নেশা।

যদি বলা হয়, কারোর নেশাবস্থায় নেশাকে নিষেধ করা কিভাবে সঙ্গত ও সম্ভব হতে পারে! তখন তো সে বালকের মত— বুদ্ধি-বিবেকহীন।

জবাবে বলা যাবে, হতে পারে السكر। বলে সেই অবস্থা বোঝাতে চাওয়া হয়েছে, যাতে বিবেক-বুদ্ধি এতটা বিলুপ্ত হওয়ার ব্যপার ঘটেনি যাতে শরীয়ত পালনের দায়িত্বের বাইরে চলে গেছে বলে মনে করা যাবে। আর এ-ও হতে পারে যে, ফরয নামায তাদের নিকটবর্তী হওয়া কালে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়তে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। এ-ও সঙ্গত যে, তারা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়ার কাজটি করে থাকলে তাদেরকে তা সুস্থ অবস্থায় আবার পড়তে আদেশ করা হয়েছে। আর এ-ও হতে পারে যে, আয়াতটি নাযিল হওয়ার সময় এ সব-ই তার বক্তব্য ছিল।

যদি বলা হয়, যে লোক আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন السكر। কে ভিত্তি করে এভাবে যে, তার উপর অর্পিত শরীয়ত পালনের দায়িত্ব দূর হয়ে যায়নি, তাহলে এ অবস্থায় নামায পড়া কি করে নিষিদ্ধ হতে পারে, অথচ এই অবস্থায়ও নামায পড়া তার জন্যে ফরয— এ বিষয়ে সব মুসলমানই সম্পূর্ণ একমত?

জবাবে তাকে বলা যাবে, আল-হাসান ও কাতাদাহ থেকে বর্ণিত, এ আয়াতটি মনসূখ। এ-ও হতে পারে যে, আয়াতটি হয়ত মনসূখ নয়। বরং এতে রাসূল (স)-এর সঙ্গ বা জামা'আতের সাথে নামায পড়ার দিকেই তাকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে একথা বলা হয়েছে।

আবূ বকর বলেছেন, اَلسُّكْر -এর তাৎপর্যে সহীহ্ কথা হচ্ছে, তা মদ্যপানের ফলে সৃষ্টি মত্ততা। তা দুটি দিক দিয়ে। একটি, নিদ্রোন্বিত ব্যক্তি ও নিদ্রা যার চক্ষুদ্বয়কে বন্ধ করে রেখেছে তাকে কখনও سكران 'নেশাগ্রস্ত' বলা হয় না। মদ্যপানে যে লোক মত্ত হয়, তাকেই নেশাগ্রস্ত

—৩/৫৬

বলা হয় আসলের দিক দিয়ে। তাই শব্দটির সেই আসল অর্থই গ্রহণ করা উচিত। তা না করে তার কোন পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করা জায়েয হতে পারে না। অবশ্য তার কোন দলীল পাওয়া গেলে ভিন্ন কথা। আর দ্বিতীয় হল, সুফিয়ান আতা ইবনুস-সায়েব, আবূ আবদুর রহমান আলী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক আনসার বংশীয় ব্যক্তি বহু কয়জন লোককে দাওয়াত করল, তারা একত্রিত হয়ে মদ্যপান করল। তখন আবদুর রহমান ইবনে আতফ (রা) মাগরিবের নামাযে এগিয়ে গেলেন। নামাযে قُلْ يَاأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ সূরা পাঠ করলেন। কিন্তু তা তাঁর নিকট জড়িয়ে গেল— ঠিকভাবে সূরাটি পড়তে পারলেন না নেশাগ্রস্ততার কারণে। তখন নাযিল হল ঃ 'তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাযের নিকটও যাবে না' আয়াত।

আর জাফর ইবনে মুহাম্মদ-আল-ওয়াসেতী, জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ইয়ামান, আল মুয়াদ্দিব, আবূ উবায়দ, হাজ্জাজ, ইবনে জুরাইয ও উসমান ইবনে আতা, আতাউল খুরাসানী, ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ -

তোমাকে লোকেরা মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে ঃ হে নবী, আপনি বলে দিন, সে দুটিতে অতি বড় গুনাহ্ ও জনগণের ফায়দাও আছে। (সূরা বাকারাহ ঃ ২১৯)

এবং সূরা আন-নিসার উপরোক্ত আয়াত ঃ 'তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাযের কাছেও যাবে না' এ দুটি আয়াতকে মনসূখ করে দিয়েছে এ আয়াতটি ঃ 'মদ, জুয়া, বলিদানের স্থান ও তীর দ্বারা ভাগ্য জানা ....।'

আবূ উবায়দ বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালিহ্ মুআবিয়া ইবনে সালিহ্, আলী ইবনে আবূ তালহা, ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, 'তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বল, তাতে বড় গুনাহ্ ....' এবং 'তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাযের কাছেও যাবে না, যতক্ষণ না জানবে তোমরা কি বলছ .....

—এ দুটি আয়াত পর্যায়ে বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর লোকেরা নামাযের সময় হলে মদ্য পান করত না। রাত্রে এশার নামায পড়া হয়ে গেলে তারা তা পান করত।

আবূ উবায়দ বলেছেন, আবদুর রহমান সুফিয়ান— আবূ ইস্হাক— আবূ মায়সারাতা সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ -

হে আল্লাহ্ মদ সম্পর্কে আমাদেরকে স্পষ্ট জানিয়ে দিন।

তারপরে নাযিল হল, 'তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাযের কাছেও যাবে না, যতক্ষণ না জানবে তোমরা কি বলছ।'— এভাবে গোটা হাদীসের উল্লেখ করেছেন।

আবূ উবায়দ বলেছেন, হুশায়ম মুগীরা, আবূ রুজাইন সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ আমি সূরা আল-বাকারার আয়াত ও সূরা আন্-নিসার আয়াত নাযিল হওয়ার পর-ও মদ্যপান করেছি। তারা নামযে উপস্থিত হওয়ার সময় পর্যন্ত মদ্যপান করত। ঠিক নামাযের

সময়টায় তারা ত্যাগ করত। পরে সূরা আল-মায়িদার আয়াতে মদ্যপান সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যায়।

আবূ বকর বলেছেন, এরা সকলেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, اَلسُّكْرُ অর্থ 'মদের মত্ততা'— নেশাগ্রস্ততা। ইবনে আব্বাস ও আবূ রুজাইন জানিয়েছেন, নামাযের সময় মদ্যপান নিষেধের আয়াত নাযিল হওয়ার পর তারা এ নামাযের সময় মদ্যপান ত্যাগ করত। নামাযের সময় এড়িয়ে অন্য সময় তারা মদ্যপান করত। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারা 'মাতাল অবস্থায় নামাযের কাছেও যাবে না' কথা থেকে তারা মদ্যপান নিষিদ্ধ— সেই অবস্থায় যখন তারা মাতাল হয়ে আছে নামাযের ফরয ও বাধ্যতামূলক হওয়ার কথা বুঝেছিল। এ থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, 'তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাযের কাছেও যাবে না' আল্লাহ্ এ কথাটি নামাযের সময়ে মদ্যপান নিষিদ্ধ হওয়ার কথা বুঝিয়েছেন। ফলে এর অর্থ দাঁড়াল ঃ 'তোমাদের দ্বারা মদ্যপান হবে না যখন তোমরা নামাযের সময় মাতাল অবস্থার হতে পারে। যার দরুন তোমরা মাতাল অবস্থায় নামায পড়তে পার।' তার অর্থ তারা যখন নামায দ্বারা তার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহ্র ইবাদতকারী হবে, তখন তোমরা আদিষ্ট তা ত্যাগ করার জন্যে। এ কথাই আল্লাহ্ বলেছেন তাঁর ভাষায় ঃ

لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى -

তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাযের কাছেও যাবে না।

আমরা জানলাম, নামাযের সময়সমূহে মাতাল অবস্থায় থাকার সময়ও তাদের উপর থেকে ফরয নামায মনসূখ হয়ে যায়নি। যেমন ওযু না থাকা অবস্থায় নামায পড়তে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। বলেছেন ঃ

اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ .......

তোমরা যখন নামাযের জন্যে প্রস্তুত হবে, তখন তোমাদের মখমণ্ডল ধৌত কর .......

(সূরা মায়িদা ঃ ৬)

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ -

পবিত্রাবস্থা ছাড়া আল্লাহ্ কোন নামায কবুল করেন না।

এবং যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَاجُنُبًا اِلَّا عَبِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا -

এবং নাপাক অবস্থায়ও নয়— পথ অতিক্রমকারী হলে ভিন্ন কথা— যতক্ষণ না তোমরা গোসল করবে ....।

এ আয়াতে 'তাহারাত' পরিত্যাগ করতে নিষেধ করা হয়েছে। নামায পড়তে নিষেধ করা হয়নি। আর কোন লোকের নাপাক শরীর হওয়া বা বে-ওযু হওয়া ফরয পরিত্যক্ত হওয়ার কোন

কারণ হয় না। সংশ্লিষ্ট অবস্থায় সেই কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে মাত্র। তা সত্ত্বেও তাকে আগে-ভাগে 'তাহারাত' অর্জন করার আদেশ করা হয়েছে। তেমনি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তা প্রমাণ করল যে, মদ্যমান নিষিদ্ধ, যা নামাযের পূর্বে মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে। অথচ নামায তার উপর যথারীতি ফরয হয়েই আছে।

এ ব্যাখ্যা প্রমাণ করে একটি হাদীস, যা ইবনে আব্বাস ও রুজাইন থেকে বর্ণিত। আয়াতটি বাহ্যত এবং তার কথার ধরন তারই দাবি করে যেমন ইতিপূর্বে আমরা বলেছি।

এ ব্যাখ্যা মাতাল অবস্থায় নামায নিষিদ্ধ হওয়া পর্যায়ে আগের দিনের মনীষীদের যে মতের উল্লেখ করেছি, তার পরিপন্থীও নয়। কেননা এটা সম্ভব যে, তাদেরকে মদ্যপান করতে নিষেধ করা হয়েছে, যার ফলে নামাযের সময়ে তাদের নেশাগ্রস্ত হওয়ার কারণে হতে পারে। তাহলে তো তা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। অবস্থা যদি এই হয় যে, তারা মদ্যপান করল, ফলে নামাযের সময়ে তদ্দরুন তারা মাতাল হয়ে পড়ল, তাহলে নামায পড়তে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, আদেশ করা হয়েছে সুস্থ অবস্থায় পুনরায় নামায পড়ার জন্যে। অথবা এই নিষেধটা কেবল নবী করীম (স)-এর সাথে মিলিত হয়ে বা জামা'আতের সাথে নামায পড়া কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ হবে। এসব অর্থ ও তাৎপর্যই সহীহ্ এবং সঙ্গত। আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ এ সব অর্থই ধারণ করতে সক্ষম।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ -

যতক্ষণ না তোমরা জানবে তোমরা কি পড়ছ।

এ কথা প্রমাণ করে যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে সেই অবস্থায়, যখন নেশাগ্রস্ত অবস্থার এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যখন সে কি বলছে ও পড়ছে তা বুঝতে পারে না। যে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বলা কথা বুঝতে পারা যায় সেই অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়নি। এ কথা আমাদের উল্লিখিত ব্যাখ্যার সত্যতা-যথার্থতার সাক্ষ্য দেয়। আমরা দেখিয়েছি যে, নিষেধটা মদ্যপানের উপর আরোপিত, নামায পড়ার উপর নয়। কেননা যে মাতাল অবস্থায় জানা যায় না কি বলছে, তা এ অবস্থার উপর আরোপিত হয় না। যেমন পাগল, নিদ্রাচ্ছন্ন ও বুদ্ধি-বিবেচনাহীন বালক। যে বুঝতে পারে কি বলছে, এ নিষেধটা তার প্রতিও নয়। কেননা আলোচ্য আয়াতটিতে নামায পড়া মুবাহ যখন জানবে কি পড়ছে বা বলছে।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আয়াতটি মূলত মদ্যপান করতেই নিষেধ করছে। নামায পড়তে নিষেধ করছে না। সেই অবস্থায় যখন কি বলছে তা বুঝতে পারে না। কেননা যে মাতাল অবস্থা বুদ্ধি-বিবেক বিলুপ্ত করে, তা-ই বুঝিয়ে দেয় যে, যে নেশাগ্রস্ততা প্রসঙ্গে এ হুকুম তা হল, সে বুঝতে পারে না কি বলছে। আর তা ইমাম আবূ হানীফার কথা সহীহ্ প্রমাণ করে। তাঁর কথা, যে নেশাগ্রস্ত অবস্থা দণ্ডনীয়, তা হল, তখন পুরুষ বা নারীর পার্থক্য বোধ থাকে না — বুঝতে পারে না কি বলছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ -

যতক্ষণ না জানবে কি বলছ।

প্রমাণ করে যে, নামাযে কুরআন পাঠ ফরয। কেননা সে লোককে সে অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে যখন যথাযথভাবে কুরআন পাঠ সম্ভব হয় না। কুরআন পাঠ যদি নামাযের 'রুকন' না হতো, ফরয না হতো, তাহলে তা পড়তে না পারার দরুন নামায পড়তে নিষেধ করা হতো না।

যদি বলা হয়, এ কথার এমন দলীল নেই যা নামাযে কুরআন পাঠ ফরয প্রমাণ করে। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যতক্ষণে না জানবে কি বলছ' প্রমাণ করে যে, সে অবস্থায় যা বলছে তা বুঝতে পারে না, তখন নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, কুরআন পড়ার কথা তো বলা হয়নি। বলা হয়েছে, যা বলে তা না-জানার কথা। তা সকল প্রকারের কথা প্রসঙ্গেই প্রযোজ্য। আর মত্ততার দরুন যার এরূপ অবস্থা, তার পক্ষে নামাযে 'হুযুরি কলব' হওয়া সম্ভব হয় না। নামাযের সব 'রুকন' সঠিকভাবে আদায় করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। যার এরূপ অবস্থা তাকেই নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা নামাযের নিয়ত করা ও নামাযের অন্যান্য কাজ যথাযথভাবে আদায় করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। সেই সাথে এ-ও জানা যায় না যে, সে পবিত্র না ওযুহীন।

জবাবে বলা যাবে, এই যে তুমি বললে, এরূপ অবস্থা যার তার পক্ষে সমস্ত শর্তসহ নামায আদায় করা সম্ভব হয় না; একথা ঠিক। তবে তার বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে— বলার বিষয়টি। নামাযের অন্যান্য বিষয় ও অবস্থার উল্লেখ করা হয়নি। অন্য কোন অবস্থারও উল্লেখ হয়নি, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, 'কথা' বলতে সেই কথা বোঝানো হয়েছে যা নামাযে বলা হয়। আর তা হচ্ছে কুরআন পাঠ। তাই কুরআন পাঠ সম্ভব হবে না নেশাগ্রস্ততার যে অবস্থায়, সেই অবস্থায় নামায পড়াও নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ কুরআন পড়তে না পারার কারণে। তাতে প্রমাণিত হল যে, নামাযে কুরআন পড়া ফরয, একটি অন্যতম শর্ত। এ কথাটি ঠিক اقيموا الصلوة 'নামায কায়েম কর' কথাটির মতই। এ থেকে বোঝা গেল যে, নামাযে 'কিয়াম' ফরয। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ -

'রুকূ'কারীদের সাথে এক সাথে রুকূ' কর প্রমাণ করে যে, নামাযে রুকূ' ফরয।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا -

এবং নাপাক শরীরে— পথ অতিক্রমকারী হলে ভিন্ন কথা— যতক্ষণ গোসল না করবে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় শরীয়ত বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন কথা উদ্ধৃত হয়েছে। আল-মিনহাল ইবনে আমর জুর আলী (রা) সূত্রে এ আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন ঃ 'তবে যদি মুসাফির— বিদেশ পর্যটনকারী হয় ও কি দিয়ে তায়াম্মুম করবে তা না পায় এবং নামায পড়ে .....।

কাতাদাতা আবূ মজলজ ইবনে আব্বাস সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া গেছে। মুজাহিদও তাই বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, মসজিদে চলাচলের স্থানে কথা বলা হয়েছে। আতা ইবনে ইয়াসার ইবনে আব্বাস থেকে অনুরূপ কথা বর্ণনা করেছেন। এ আয়াতটি ব্যাখ্যা পর্যায়ে। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, আতা, অন্যান্য তাবেঈনের মধ্যে থেকে আমর ইবনে দীনারও এ কথাই বলেছেন।

মসজিদে নাপাক শরীরে যাতায়াত সম্পর্কে আগের মনীষিগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বল্লেছেন ঃ আমাদেরই একজন নাপাক শরীরে মসজিদে পথ অতিক্রমকারী হিসেবে যাতায়াত করত। আতা ইবনে ইয়াসার বলেছেন, নবী করীম (স)-এর সাহাবীগণ গোসল ফরয হলে ওযু করে মসজিদে যেতেন ও সেখানে বসে তারা কথা-বার্তা বলতেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব বলেছেন, যার শরীর নাপাক, সেই অবস্থায় সে যেন মসজিদে না বসে। তবে সে পথ অতিক্রম করে যেতে পারে। আল-হাসান থেকেও এ কথা বর্ণিত হয়েছে। এ পর্যায়ে আবদুল্লাহ থেকেও বর্ণনা এসেছে। তবে শরীক আবদুল করীম আল-জজরী আবূ উবায়দা সূত্রে যে ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে, তা সহীহ্। বলেছেন, নাপাক শরীর ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে দিয়ে য়াতায়াত করতে পারে। তবে সে মসজিদে বসবে না। মা'মার আবদুল করীম, আবূ ওবায়দা, আবদুল্লাহ্ সূত্রে এ কথা বর্ণনা করেছেন। বলা হয়, মা'মার ছাড়া আর কেউ-ই এই কথাটি যে মূলত আবদুল্লাহ্র— তা বলেনি। অন্যান্যরা কথাটি তাবেঈর— এই হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, জুফার ও আল-হাসান ইবনে জিয়াদ বলেছেন ঃ মসজিদে পবিত্র শরীর ছাড়া প্রবেশ করবে না। সেখানে বসে কোন চুক্তি করতে চাওয়া হোক বা অতিক্রম করেই যাওয়া হোক, তার মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না। মালিক ইবনে আনাস ও সওরীও এ মত প্রকাশ করেছেন। লায়স বলেছেন, নাপাক শরীরে মসজিদের মধ্যে যাতায়াত করতে পারে। তবে কারোর ঘরের দরজা যদি মসজিদের মধ্যে খোলে ও যাতায়াতের অন্য কোন পথ না থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা। শাফেয়ী বলেছেন, যাতায়াত করতে পারে, তবে বসবে না। নাপাক শরীরে মসজিদের মধ্যে দিয়া অতিক্রম করা জায়েয নয় একথার দলীল হচ্ছে একটি হাদীস, যা মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, মুহাম্মাদ, আবদুল ওয়াহিদ ইবনে জিয়াদ, আফলাতা ইবনে খলীফা, জামরাতা বিনতে দাজাজাতা সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ঃ হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ রাসূলে করীম (স) আসলেন। তাঁর সাহাবীগণের ঘরের মুখ মসজিদে উন্মুক্ত হতো। তিনি বললেন, তোমরা এ ঘরসমূহের মুখ মসজিদের বিপরীত দিকে উন্মুক্ত কর। পরে তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু লোকেরা এই আশায় রাসূলের আদেশ মত কিছুই করলেন না যে, হয়ত এ ব্যাপারের জন্যে কোন রুখসত নাযিল হবে। পরে রাসূল (স) তাদের নিকট গিয়ে আবারও বললেন ঃ তোমরা এই ঘরসমূহের মুখ মসজিদের বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দাও। কেননা কোন হায়য অবস্থার ও নাপাক অবস্থার লোকের মসজিদে আসা আমি হালাল মনে করি না। তিনি এ কথায় অতিক্রম করা ও বসার মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। ও-দু অবস্থার লোকদের জন্যে তা সমান।

আর দ্বিতীয়ত রাসূল (স) ঘরের দরজাসমূহ বিপরীত দিকে ফেরাতে বলেছেন। যেন লোকেরা মসজিদের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত না করে— যখন তাদের শরীর নাপাক হবে। কেননা শুধু বসতে নিষেধ করাই যদি তাঁর ইচ্ছা হতো, তাহলে ঘরসমূহের মুখ বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দিতে বলতেন না এবং 'আমি হায়য অবস্থার ও নাপাক শরীরের লোকদের জন্যে মসজিদ হালাল মনে করি না'— এই কথাটি বলারও কোন কারণ হতো না। তাই বোঝা গেল, ঘরসমূহের মুখ বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দিতে বলার কারণ হল লোকেরা যেন নাপাক শরীর নিয়ে মসজিদের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতে বাধ্য না হয়। কেননা ঘরসমূহের দরজা মসজিদের মধ্যে খুললে অন্য কোন দিকে বের হওয়ার পথ নেই।

সুফিয়ান ইবনে হামজা কাসীর ইবনে জায়দ, মুতালিব সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নাপাক শরীরে কেউ মসজিদের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করবে; কিন্তু সেখানে বসবে না, রাসূল (স) কাউকেই তার অনুমতি দিতেন না। অবশ্য হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা)-এর জন্যে অনুমতি ছিল। তিনি নাপাক শরীরে মসজিদের প্রবেশ করতেন ও তার মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতেন। কেননা তাঁর ঘর-ই ছিল মসজিদের মধ্যে। ফলে এ হাদীস জানিয়ে দিল যে, নবী করীম (স) মসজিদের মধ্য দিয়ে নাপাক শরীরে যাতায়াত করা ও বসাকে সাহাবীদের জন্যে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

হযরত আলী (রা)-এর জন্যে বিশেষ অনুমতি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা সহীহ। তা হাদীস বর্ণনাকারীর কথা। তাঁর কারণ ছিল এই যে, তার ঘরটাই ছিল মস্‌জিদের মধ্যে। নবী করীম (স) প্রথমোক্ত হাদীসে ঘরসমূহের দরজা মসজিদের বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দিতে আদেশ করেছিলেন। তাঁদের ঘর মসজিদে খোলে বলে তাঁদের জন্যে মসজিদের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত মুবাহ্ করে দেননি। এ ব্যাপারে হযরত আলী (রা)-র জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল, অন্য কারো জন্যে করা হয়নি। ঠিক যেমন হযরত জাফর (রা)-এর জন্যে জান্নাতে দুইখানি কক্ষ হওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে, অন্যান্য শহীদদের জন্যে তা করা হবে বলা হয়নি। হযরত হানজালা (রা)-কে ফিরিশতা গোসল দিয়েছিলেন নাপাক শরীরে শহীদ হয়েছিলেন বলে। হযরত দাহীয়া কলবী (রা)-এর আকৃতিতে হযরত জিবরাঈল নাযিল হলেন, এ বিশেষত্ব কেবল তাঁর-ই ছিল। যেমন হযরত যুবায়র (রা)-এর জন্যে রেশমী কাপড় পরার অনুমতি দেয়া হয়েছিল বিশেষ কারণে, যখন তিনি উকুনের যন্ত্রণার অভিযোগ করেছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, হযরত আলী (রা) ছাড়া নাপাক শরীরে মসজিদে প্রবেশ করা আর সকলের জন্যেই নিষিদ্ধ হয়েছিল— অতিক্রম করার জন্যে হোক বা অন্য কোন কারণে।

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একজন সাহাবী মসজিদে নাপাক শরীরে যাতায়াত করতেন, সেটা কোন দলীল হতে পারে না তা জায়েয হওয়ার জন্যে। কেননা বর্ণনায় বলা হয়নি যে, তা রাসূল করীম (স) জানতেন এবং তিনি তাঁকে নিষেধ করেন নি। এমনিভাবে আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত হয়েছে, সাহাবীগণ জানাবাত হলে ওযু করে মসজিদে যেতেন ও সেখানে বসে কথাবার্তা বলতেন, বিপরীত মতের কোন সমর্থন তাতে নেই। কেননা নবী করীম (স) তাঁদেরকে তা করার অনুমতি দিয়েছিলেন এমন কথা বলা হয়নি। তাছাড়া তা রাসূলে করীম (স)-এর নিষেধ করার আগের ব্যাপারও হতে পারে। যদি এই সবই রাসূল (স)

থেকে সহীহ্ প্রমাণিত-ও হয়। তাছাড়া নিষেধের হাদীস অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য এ জন্যে যে, তার দ্বারা বড় জোর মুবাহ প্রমাণ হতে পারে, আর নিষেধ তার পরের ব্যাপার। তাই বলা যায়, ফিকাহবিদদের ঐকমত্যের ভিত্তিতেই প্রমাণিত হয়েছে যে, জানাবাতেব অবস্থায় মসজিদে বসা মসজিদের মর্যাদা রক্ষার জন্যেই নিষিদ্ধ। সে অবস্থায় মসজিদের মধ্যে দিয়ে পথ অতিক্রম করাও নিষিদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয় মসজিদের তা'জীমের জন্যে। মসজিদে বসা নিষিদ্ধ হওয়ার 'ইল্লাত' বা কারণ হল শরীর নাপাক হওয়া। মসজিদের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করা কালেও তো এই 'ইল্লাত' বর্তমান। অপর কারোর মালিকানার অধীন স্থানে তার অনুমতি ছাড়া বসা যেমন নিষিদ্ধ— সেখানে অতিক্রম করা ও বসার হুকুম অভিন্ন। অনুরূপভাবে মসজিদে নাপাক শরীরে বসা যখন নিষিদ্ধ, তখন তার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করাও নিষিদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। এ সব ক্ষেত্রেই নিষেধের 'ইল্লাত' হচ্ছে শরীর নাপাক হওয়া।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا -

এর ব্যাখ্যায় যারা বলেছেন, মসজিদের মধ্য দিয়ে নাপাক অবস্থায় অতিক্রম করা মুবাহ; এ পর্যায়ে আলী ইবনে আব্বাস (রা)-এর যে ব্যাখ্যা এসেছে এর তাৎপর্য হল, যে মুসাফির শরীর নাপাক হওয়ার কারণে তায়াম্মুম করবে— এই ব্যাখ্যা উত্তম— সে ব্যাখ্যা অপেক্ষা যেখানে মসজিদের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার কথা বলা হয়েছে। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাযের কাছেও যাবে না'— উক্ত অবস্থায় মূল নামায পড়ার কাজটি করতেই নিষেধ করেছে। মসজিদে যাওয়া থেকে নিষেধ করা হয়নি। কেননা ব্যবহৃত শব্দের তা-ই প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ অর্থ, সম্বোধনের লক্ষ্যই তাই। কাজেই এখানে মসজিদের কথা বলা হলে তা হবে প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ অর্থ থেকে বিচ্যুতি— পরোক্ষ ও অপ্রকৃত অর্থের দিকে ঝুকে পড়া। তাতে নামায তার আসল তাৎপর্য থেকে সরে যাবে, তখন একটা জিনিসের নাম হিসেবে অন্য একটি জিনিসের নাম ব্যবহারের মতোই হবে পাশাপাশি হওয়ার দরুন অথবা তাতে সেই কারণ সংঘটিত হবে যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ - (الحج : ٤٠)

এখানে صلوات অর্থ, صلوات -এর স্থান। আর নিয়ম হচ্ছে, শব্দটির প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ অর্থ গ্রহণ সম্ভব হলে তা বাদ দিয়ে পরোক্ষ ও অপ্রকৃত অর্থ গ্রহণ জায়েয নয় কোন দলীল না পাওয়া পর্যন্ত। আর এখানে প্রকৃত অর্থ বাদ দেয়ার কোন দলীল নেই। কুরআন পাঠের ধারাবাহিকতায় এমন জিনিস রয়েছে যা বুঝিয়ে দেয় যে, এখানে প্রকৃত নামায-ই বোঝানো হয়েছে। 'যতক্ষণ না তোমরা জানবে কি বলছ' কথাটিও তাই। মসজিদের এমন কোন শর্ত নেই যা না হলে সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ হতে পারে নেশাগ্রস্ত হওয়ার দরুন সে শর্ত পূরণ না করার কারণে।

নামাযে কুরআন পাঠ শর্ত, কোন ওযরে তা করতে না পারার দরুন নামায পড়ার কাজটা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, এখানে আসল নামাযই বুঝিয়েছেন। তাই এর বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থের সাথে সঙ্গতি রেখে আয়াতের যে ব্যাখ্যা দেয়া হবে তা-ই হবে তার আসল ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ إِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا বলেছেন, 'পথ অতিক্রমকারী' অর্থ বিদেশী মুসাফির। কেননা মুসাফিরকেই পথ অতিক্রমকারী বলা হয়। এই নামটা যদি সেই অর্থে না হতো তা হলে আলী ও ইবনে আব্বাস (রা) এরূপ ব্যাখ্যা দিতেন না এ আয়াতের। কেননা আয়াতে ব্যবহৃত নাম যার উপর প্রয়োগ হয় না, তা দিয়ে আয়াতের ব্যাখ্যা দেয়া কারোর জন্যেই জায়েয হতে পারে না। মুসাফিরকে পথ অতিক্রমকারী বলা হয়েছে এজন্যে যে, সে তো পথের উপরই রয়েছে। যেমন পথ-পুত্র বলা হয়েছে। উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সফরকালে তায়াম্মুম করে নামায পড়া মুবাহ করেছেন নাপাক শরীর হলেও। এ কারণে আয়াত থেকে দুটি তাৎপর্য পাওয়া যায়। একটি হল— নাপাক শরীরে পানি না পেলে তায়াম্মুম করে নামায পড়া জায়েয। আর দ্বিতীয়, তায়াম্মুম জানাবাত দূর করে না। কেননা কুরআনে তায়াম্মুমকারী হওয়া সত্ত্বেও তাকে নাপাক শরীরে পানি না পেলে তায়াম্মুম করে নামায পড়া জায়েয। আর দ্বিতীয়, তায়াম্মুম জানাবাত দূর করে না। কেননা কুরআনে তায়াম্মুমকারী হওয়া সত্ত্বেও তাকে নাপাক শরীর নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ ব্যাখ্যা উত্তম। এ ব্যাখ্যা থেকে যাতে মসজিদে পথ অতিক্রমকারী বলে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا 'যতক্ষণ না তোমরা গোসল করবে। তায়াম্মুম করে নামায পড়া জায়েয হওয়ার শেষ সীমা। আর এই শেষ সীমা যে এই নিষেধের আওতার মধ্যে গোসল ওয়াজিব হওয়ার সময়টা শামিল সহ, তা নিয়ে কোন মতপার্থক্য নেই। পানি পাওয়ার পর গোসল পূর্ণ না হওয়া অবস্থায়ও নামায পড়া তার জন্যে জায়েয হবে না। কোনরূপ ক্ষতির আশংকা ছাড়াই পানি ব্যবহার সম্ভব হলে এই হুকুম। এ থেকে বোঝা যায় শেষ সীমাটা মোটামুটি পূর্ববর্তীর মধ্যে গণ্য।

আল্লাহ্‌র বলেছেন ঃ

ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ -

তোমরা রোযা সম্পূর্ণ কর রাত্র পর্যন্ত। (সূরা বাকারাহ ঃ ১৮৭)

এখানে শেষ সীমা— রাত— রোযা পূর্ণ করবে আদেশের বাইরে গণ্য। কেননা রাত্রির শুরুটা প্রবেশ করলেই রোযার আওতা থেকে বাইরে চলে যাওয়া হয়। আর إِلٰى যেমন শেষ সীমা নির্ধারণ করে, তেমনি حَتّٰى শব্দটিও।

এ একটি মৌলনীতি। তা প্রমাণ করে যে, শেষ সীমা কখনও পূর্ব কথার আওতা-ভুক্ত হতে পারে, আবার কখনও তা তার বাইরে গণ্য হয়। কোথায় তা আওতার মধ্যে পড়বে আর কোথায় তার বাইরে গণ্য হবে, তা দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। 'জানাবাত' সংক্রান্ত হুকুম-আহকাম তার তাৎপর্য রোগী মুসাফির সংক্রান্ত হুকুম প্রসঙ্গে সূরা আল-মায়িদার তাফসীরে এ বিষয়ে আলোচনা পেশ করব যখন আমরা সেখানে পৌছব ইনশা-আল্লাহ।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

أٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا -

তোমরা ঈমান গ্রহণ কর— তোমাদের নিকট যা রয়েছে তার সত্যতা ঘোষণাকারী আমরা যা নাযিল করেছি তার প্রতি মুখমণ্ডলসমূহ বিকৃত করে দেয়ার পূর্বেই।

এ আয়াতটি তালাক সংক্রান্ত একটি বিষয়ে আমাদের ফিকাহ্‌বিদের কথাকে প্রমাণ করে। সে বিষয়টি হল, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল ঃ তুমি তালাক অমুকের উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই। এ কথার পর তাৎক্ষণিকভাবেই স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে, সে লোক এসে পৌছুক, কি না-ই পৌছুক।

তাঁদের কারোর কারোর মত এই বর্ণিত হয়েছে যে, সেই ব্যক্তির এসে পৌঁছার পূর্বে স্ত্রী তালাক হবে না। কেননা অমুকের আসার পূর্বে এই কথাটি বলা যায় না, অথচ সে আসেনি। আসলে হানাফী ফিকাহ্‌বিদদের কথাই সহীহ্। উপরোক্ত আয়াতই তা প্রমাণ করে। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'হে কিতাব পাওয়া লোকেরা। তোমাদের নিকট রক্ষিত কিতাবের সত্যতা ঘোষণাকারী হিসেবে আমরা যা নাযিল করেছি, তার প্রতি ঈমান আন— আমরা যে মুখমন্ডলসমূহ বিকৃত করে দেব, তার পূর্বেই।' মুখমন্ডলসমূহ বিকৃত করার পূর্বেই ঈমান আনার এ আদেশ সহীহ্, যদিও মুখমণ্ডল বিকৃত করার এই কথিত ব্যাপারটি আদৌ ঘটে নি। অথচ এ ঈমানটা ছিল মুখমণ্ডল বিকৃত করার পূর্বে; কিন্তু লোকেরা সে বিকৃতি দেখতে পায় নি। যেমন আল্লাহ্ অপর আয়াতে বলেছেন ঃ

فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا -

দাস মুক্ত করতে হবে দুজনের পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে ..... (সূরা মজাদিলা ঃ ৩)

দাস মুক্ত করার এই আদেশ সহীহ্ যদিও তাদের দুজনের স্পর্শ করার ঘটনা ঘটে নি।

যদি বলা হয়, উপরোক্ত কথাটি ছিল ইয়াহুদীদের প্রতি আল্লাহ্‌র কঠোর হুমকি, ভীতি প্রদর্শন অথচ তারা ইসলাম কবুল করে নি, আর যা বলে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল, তা ঘটে নি।

জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, এ হুমকি ও ভীতি প্রদর্শনের পর কিছু সংখ্যক ইয়াহুদী ইসলাম কবুল করেছে বটে। আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম, সালাবাতা ইবনে সাইয়া, জায়দ ইবনে সানাতা, আসাদ ইবনে সাইয়া, আসাদ ইবনে উবায়দ ও মুখাইরীক প্রমুখ তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য। উক্ত ভীতি প্রদর্শনটা ছিল তাৎক্ষণিক, তাদের সকলের ইসলাম গ্রহণ না করার সাথে সম্পর্কিত। আর এ-ও সম্ভব যে, এ ভীতিটা পরকালে সংঘটিতব্য হিসেবে পেশ করা হয়েছিল। কেননা ইসলাম গ্রহণ না করলে এ আযাবটি দুনিয়ায়-ই যে তাৎক্ষণিভাবে ঘটবে তা বোঝাবার মত কোন শব্দ আয়াতে নেই।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ -

তুমি কি ওদের বিষয়ে ভেবে দেখেছ, যারা নিজদিগকে পবিত্র নির্দোষ যাহির করে ?

আল-হাসান, কাতাদাতা ও দহাক বলেছেন, আয়াতটি ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের সম্পর্কে। তারাই বলত, আমরা তো আল্লাহ্‌র পুত্র ও প্রিয় পাত্র। তারাই বলত, জান্নাতে যাবে কেবলমাত্র

তারাই, যারা ইয়াহুদী হয়েছে কিংবা খ্রিস্টান। আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, উক্ত আয়াতে লোকদের কতকের অপর কতককে নির্দোষ ও পবিত্র বলার কথা বলা হয়েছে। যারা দুনিয়ায় স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে তেমনটা করত।

আবূ বকর বলেছেন, আত্মপবিত্রতা ও নির্দোষিতা-নিষ্পাপতা প্রচার করতে এ কারণেই নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَلَاتُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ -

তোমরা নিজেদের নির্দোষিতা-নিষ্পাপতা প্রচার করে বেড়িও না। (সূরা নযম ঃ ৩২)

নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ 'তোমরা যখন কৃত্রিম প্রশংসাকারী দেখবে, তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করবে।'

আল্লাহ্র কথা ঃ

اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَا تَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ -

আল্লাহ্ ও-লোকদেরকে যে নিজের অনুগ্রহ দান করেছেন, ওরা কি সে জন্যে লোকদেরকে হিংসা করে ?

ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, দহাক, সুদ্দী ও ইকরামা থেকে বর্ণিত, এ আয়াতে 'লোকদেরকে' বলে বিশেষভাবে নবী করীম (স)-কে বুঝিয়েছেন। কাতাদাতা বলেছেন, তারা আরববাসী। অন্যান্যরা বলেছেন, তারা নবী করীম (স) এবং তাঁর সাহাবীগণ। আর এই কথাটিই উত্তম ও যথার্থ। কেননা কথার শুরুতে ইয়াহুদীদের সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। ওরা এর পূর্বে নিজেদের নিকট রক্ষিত কিতাবে নবী করীম (স)-এর নবুয়ত-রিসালাত, তাঁর বিশেষ গুণ পরিচিত ও তাঁর নবুয়্যতের অবস্থার কথা পাঠ করত। ওরাই আরবদেরকে ওয়াদার সূরে বলত; তিনি এলে তোমাদেরকে হত্যা করা হবে। কেননা ওরা এই ধারণা করে বসেছিল যে, আরবরা নবী করীম (স)-এর প্রতি ঈমান আনবে না, ফলে তারা নিহত হবে। ওরা তো এই কথাই মনে করে বসেছিল যে, শেষ নবী বনী ইসরাইল বংশে জন্মগ্রহণ করবেন। কিন্তু তিনি যখন ইসমাঈল-বংশে জন্মগ্রহণ করলেন, তখন ওরা আরবদের হিংসা করতে শুরু করল। নবী করীম (স)-এর প্রতি কুফর করল এবং তারা তাঁর সম্পর্কে আগে-থেকে যা জানতো, তা অস্বীকার করতে শুরু করল। এ কথাই আল্লাহ্ বলেছেন এ আয়াতে ঃ

وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهِ -

পূর্বে তারা ভবিষ্যতে যারা কুফরি করবে তাদের উপর নিজেদের বিজয়ী হওয়ার আগাম কথাবার্তা বলত। কিন্তু পরে যখন এসে-ই গেল যা তারা চিনতে পেরেছিল, তারা তার প্রতি কুফরী করল। (সূরা বাকারাহ ঃ ৮৯)

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم -

আহলি কিতাবদের বহু সংখ্যক লোক অন্তর দিয়ে কামনা করত— তোমাদের ঈমান গ্রহণের পর তারা যদি তোমাদেরকে কাফিরে পরিণত করতে পারত, এটা একান্তভাবে তাদের হিংসার পরিণাম মাত্র। (সূরা বাকারাহ ঃ ১০৯)

আরবদের বিরুদ্ধে ইয়াহুদীদের শত্রুতা ছিল প্রকাশ্যে রাসূলে করীম (স)-এর আগমনের পর এবং তা ছিল তাদের প্রতি তাদের পরম হিংসার কারণে। কেননা তারা বড় আশা করে বসেছিল যে, শেষ নবী তাদের বংশেই জন্মগ্রহণ করবেন। কিন্তু কার্যত তা হয়নি। অতএব আয়াতটির স্পষ্ট তাৎপর্য হচ্ছে, তারা রাসূল (স) এবং আরবদের বিরুদ্ধে হিংসায় জ্বলছিল। 'হিংসা' হচ্ছে অন্য একজনের নিকট যেসব নিয়ামত ও কল্যাণ রয়েছে তার বিলুপ্তি ও বিনাশ কামনা করা। এজন্যে বলা হয়েছে, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তুমি খুশী করতে পার, কিন্তু নিয়ামতের হিংসুককে খুশী করতে পার না। সে খুশী হতে পারে কেবল তখন, যদি তোমার নিকট রক্ষিত নিয়ামত বিলীন হয়ে যায়। অবশ্য 'গেবতা' নিন্দার্হ নয়। কেননা 'গেবতা' বলা হয় অনুরূপ নিয়ামত লাভের কামনা-বাসনা। অন্যের যা আছে তার বিলুপ্তি ও বিলীনতার কোন কামনা তাতে থাকে না। বরং তার নিকট সে নিয়ামত ও কল্যাণ থাকুক, তাতেই তার আনন্দ ও উল্লাস।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا -

যখনই তাদের চামড়া পেকে যাবে, তাদেরকে সে চামড়ার পরিবর্তে অন্য চামড়া দিয়ে বদল করে দেব।

এ পর্যায়ে বলা হয়েছে, তাদের দেহের চামড়া জ্বলে যাওয়ার পর সে চামড়ার পরিবর্তে আল্লাহ্ তাদের নতুন চামড়া বানিয়ে দেবেন। এই মত যাঁদের, তাঁরাই বলেছেন, চামড়া মানুষের অংশ নয়, গোশ্‌ত ও অস্থিও নয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষ হচ্ছে সেই রূহ, যা এই দেহসংস্থাকে কেন্দ্র করে অবস্থান করে। যিনি বলেছেন যে, চামড়া মানুষের কতকাংশ আর মানুষ হচ্ছে সেই সত্তা যা এ সবের দ্বারা পূর্ণত্ব পায়, তিনি বলেন, তা নিত্য নতুনত্ব পাচ্ছে, অ-জ্বলন্ত অবস্থায় তা যেমন ছিল, তেমনিই তা হয়ে যায়। যেমন একটি অঙ্গুরীয় গলিয়ে অপর একটি অঙ্গুরীয় নির্মাণ করা হয় একই ধাতু দিয়ে; কিন্তু তবু সেটা পূর্বেরটার থেকে ভিন্নতর একটি আংটি হয়ে যায় বা যেমন, কেউ তার জামা কেটে 'কাবা' বানাল। এটা আগের জামা থেকে ভিন্নতর একটি পোশাক হয়ে গেল।

কেউ কেউ বলেছেন, পরিবর্তনটা হয় শুধু পোশাকের, যা তারা পরেছে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা অত্যন্ত দূরবর্তী। কেননা পরিধেয় বস্ত্রকে কখনও চামড়া বলা হয় না।

## আমানত আদায়ের নির্দেশ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا -

আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চিতভাবে তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার যোগ্য ব্যক্তির নিকট প্রত্যর্পণ করে দাও।

আমানত আদায়ের এ আদেশ কাদেরকে দেয়া হয়েছে— তাফসীরকারগণ এ পর্যায়ে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, তারা কারা, যাদেরকে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে? জায়দ ইবনে আসলাম, মক্‌হুল ও শহর ইবনে হাওশব থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেছেন, এ আদেশ রাষ্ট্রীয় ব্যাপার পরিচালকদের প্রতি। শাসক গোষ্ঠীর প্রতিই এই নির্দেশ। ইবনে জুরাইয বলেছেন, আয়াতটি উসমান ইবনে তালহার প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল। আল্লাহ্ আদেশ করেছেন যে, কাবার চাবিসমূহ তার নিকট রক্ষিত ছিল, তার কাছ থেকেই নেয়া হয়েছে, অতএব তা তার নিকটই ফিরিয়ে দিতে হবে। ইবনে আব্বাস উবায় ইবনে কাব (রা), আল-হাসান ও কাতাদাতা বলেছেন, আয়াতটির প্রয়োগ এমন প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে হবে, যার নিকট কোন কিছু আমানত রাখা হয়েছিল। অবশ্য এ কথাটি উত্তম। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ করছেন' এমন একটি সম্বোধন, যা শরীয়ত পালনের বাধ্য সব লোকের প্রতিই প্রযোজ্য সাধারণ তাৎপর্য হিসেবে। তাই কতক লোককে বাদ দিয়ে অপর কতক লোক সম্পর্কে তা প্রযোজ্য বলা ঠিক নয়— কোন দলীল ছাড়া। আমি মনে করি, যাঁরা এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, হুকুমটি রাষ্ট্র পরিচালকদের প্রতি, তাঁরা নির্ভর করেছেন পরবর্তী কথার উপর। তা হল ঃ

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ -

আর তোমরা যখন লোকদের মধ্যে শাসনকার্য চালাবে— বিচার করবে, তখন অবশ্যই ন্যায়পরতা ও সুবিচার নীতি অনুযায়ী কার্য পরিচালনা করবে, বিচারের রায় দেবে।

এ কথাটি তো নিঃসন্দেহে রাষ্ট্র পরিচালকদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। তাই সম্বোধনের শুরু কথাগুলিও অবশ্যই তাদেরকে লক্ষ্য করেই বলা হয়ে থাকবে।

কিন্তু ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে তেমন নয়। কেননা এটা হতে পারে যে, সম্বোধনের প্রাথমিক কথা সাধারণভাবে সমস্ত মানুষকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে, আর শেষ পর্যায়ের সংযোজিত কথা বিশেষভাবে শাসক গোষ্ঠী সম্পর্কে বলা হয়েছে। আর এর বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি। কুরআনে তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

আবূ বকর বলেছেন, মানুষের নিকট বিশ্বাস করে যা-ই গচ্ছিত রাখা হয়েছে তা-ই তার নিকট আমানত। এ আমানতদারের কর্তব্য হচ্ছে, তা তার মালিকের— রক্ষকের নিকট ফিরিয়ে দেয়া। গচ্ছিত রাখা সব জিনিসই আমানত, যে তা রাখল তার কর্তব্য তা সেই ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দেয়া, যে তা তার নিকট রেখেছিল। সে আমানত যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে

আমানতদারকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা যাবে না— এ বিষয়ে বিভিন্ন দেশের ফিক্‌হবিদগণ সম্পূর্ণ একমত।

আগের দিনের কোন কোন মনীষীর এই মত-ও জানা গেছে যে, তাকে আমানতের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। শবী আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি আমার উপর কিছু দ্রব্যসামগ্রী সংরক্ষণের বোঝা চাপিয়ে দিল। পরে আমার কাপড়ের মধ্য দিয়ে তা নষ্ট হয়ে যায়। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) আমাকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করেছিলেন।

আবদুল বাকী ইবনে কানে' হামেদ ইবনে মুহাম্মাদ শুরাইহ্-ইবনে ইদরীস, হিশাম ইবনে হাসান, আনাস ইবনে সীরীন, আনাস ইবনে মালিক সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমার নিকট ছয় হাজার দিরহাম আমানত রাখা হয়েছিল। পরে তা হারিয়ে যায়। উমর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, তার সাথে তোমার কোন জিনিস গেছে কি? বললাম, না। তখন তার ক্ষতিপূরণ দিতে তিনি আমাকে বাধ্য করলেন।

হাজ্জাজ আবূ যুবায়র-জাবির সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তির নিকট কিছু সামগ্রী গচ্ছিত রাখা হয়েছিল। পরে তার নিজের সামগ্রীর সাথে মিলে তা হারিয়ে যায়। কিন্তু তার ক্ষতিপূরণ দিতে হযরত আবূ বকর (রা) তাকে বাধ্য করেন নি। তিনি বলেছিলেন, 'তা ছিল আমানত'।

আবদুল বাকী ইবনে কানে' ইসমাঈল ইবনুল ফযল, কুতায়বা, ইবনে লাহ্‌ইয়া, আমর ইবনে শুয়ার, তাঁর পিতা, তাঁর দাদা সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন:

مَنِ اسْتَوْدَعَ وَدِيْعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ -

যে ব্যক্তির নিকট কোন কিছু গচ্ছিত রাখা হবে, তাকে সেজন্যে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা যাবে না।

আবদুল বাকী ইবনে কানে' ইবরাহীম ইবনে হাশিম, মুহাম্মাদ ইবনে আওন, আবদুল্লাহ ইবনে নাফে', মুহাম্মাদ ইবনে নবীহুল হজবী, আমর ইবনে শুয়ায়ব, তাঁর পিতা, তার দাদা সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) বলেছেন:

لَا ضَمَانَ عَلَى رَاعٍ وَلَا عَلَى مُؤْتَمَنٍ -

রাখাল ও আমানতদারকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা যাবে না।

আবূ বকর বলেছেন, নবী করীম (স)-এর কথা: 'আমানতদারকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা যাবে না'— ধারে নেয়া টাকার ক্ষতিপূরণ দেয়ার বিপরীত অর্থ দেয়। কেননা ধারটাও এক ধরনের আমানত ধারে গ্রহণকারীর হাতে। কেননা ধারদাতা তাকে বিশ্বাস করেই ধার দিয়েছে। তবে গচ্ছিত জিনিসের যে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না, এ বিষয়ে ফিকাহবিদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই, যখন তাতে গচ্ছিত রাখা জিনিস গণনা করা হয় না। অথচ এই গচ্ছিত জিনিস বিনষ্টের ক্ষতিপূরণ দিতে হযরত উমর (রা) বাধ্য করেছেন। এর কারণ হতে পারে গচ্ছিত রক্ষক ব্যক্তি হয়ত এমন কিছু কথা স্বীকার করেছে যার কারণে তাঁর মতে ক্ষতিপূরণ দেয়া কর্তব্য হয়ে পড়েছে।

কিন্তু ধারে গ্রহণ করা জিনিস ও টাকা-পয়সার ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যাপারে আগের দিনের মনীষীদের মধ্যে যেমন মতপার্থক্য ছিল, তেমনি পরবর্তীকালের ফিকাহবিদদের মধ্যেও মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। উমর, আলী, জাবির (রা) এবং শুরাইহ্ ও ইবরাহীম থেকে বর্ণিত, ধারের জিনিসে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। আর ইবনে আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, জুফার ও আল-হাসান ইবনে যিয়াদ বলেছেন— না, তাতে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না যদি তা নষ্ট হয়ে যায় বা হারিয়ে যায়। ইবনে শাবরামাতা, সওরী ও আওজায়ীরও এ কথা। উসমান আল-বত্তী বলেছেন, ধারগ্রহীতা ক্ষতিপূরণ দেবে যা সে ধার বাবদ নিয়েছে তার। তবে পশু বা আকিলার দিতে হবে না। হ্যাঁ, যদি পশু ও আকিলার ক্ষেত্রে তার শর্ত করা হয়, তা হলে অবশ্যই সে ক্ষতিপূরণ দেবে।

ইমাম মালিক বলেছেন, ধারে পশু নিয়ে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। অবশ্য অলংকার, কাপড়-চোপড় ও অনুরূপ জিনিসের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। লায়স বলেছেন, ধার নিলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কিন্তু মুসলমানদের শাসক আবুল আব্বাস আমার নিকট লিখেছেন যে, আমি তার ক্ষতিপূরণ দেব। তাই আজকের বিচার তো এই যে, ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। শাফেয়ী বলেছেন, প্রত্যেকটি ধারেরই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

আবূ বকর বলেছেন, ধারে নেয়া জিনিস নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না যদি ধারে গ্রহীতা তাতে কোন অংশ গ্রহণ না করে থাকে। তার দলীল হল, ধার দাতা ধার গ্রহীতাকে যখন ধার দিয়েছে, তখন সে তাকে বিশ্বাস করেছে, সে কার্যত, আমানতদার হয়েছে আর আমানতদার হওয়ার কারণে তার ক্ষতিপূরণ দেয়া কর্তব্য হবে না। কেননা আমরা নবী করীম (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছি, তিনি বলেছেন ঃ لَاضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ —বিশ্বাস করে যার নিকট গচ্ছিত রাখা হয়, তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা যায় না। আর সর্ব পর্যায়ের আমানতদারকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য না করার তা-ই হচ্ছে মৌলনীতি। উপরন্তু জিনিসটি যখন তার মালিকের অনুমতিক্রমে হস্তগত করা হয়েছে, তখন ক্ষতিপূরণ দেয়ার কোন শর্ত করা হয়নি। অতএব এর কোন ক্ষতিপূরণ দেয়ার প্রশ্ন উঠে না। যেমন গচ্ছিত রাখা জিনিস। ভাড়ায় নেয়া কাপড়ের-ও কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে না মুনাফার ব্যয়ের শর্ত থাকলেও— হস্তগত করা জিনিসের ক্ষতিপূরণ দেয়ার শর্ত করা না হলে। অতএব ধারের ক্ষতিপূরণ না দেয়া উত্তমভাবেই প্রমাণিত হবে। কেননা তাতে ক্ষতিপূরণ দেয়ার শর্ত করা হয়নি কোনভাবে। অপর এক দিক দিয়ে যা ইজারা হিসেবে হস্তগত করা হয়েছে, তা হস্তগত করা হয়েছে মুনাফা পূর্ণ করে দেয়ার জন্যে। উপরন্তু 'হেবা' করা জিনিসের কোন ক্ষতিপূরণ যার জন্যে 'হেবা' করা হয়েছিল তাকে দিতে হবে না। কেননা তা তার মালিকের অনুমতিক্রমেই হস্তগত করা হয়েছে। তবে বিনিময় দেয়ার শর্ত করা হলে ভিন্ন কথা। আসলে একটা ভালো কাজ একটা মহানুভবতা। ধারের ব্যাপারটাও তেমনি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা তাও ভালো কাজ ও মহানুভবতা মাত্র। ধারে নেয়া জিনিসের যদি ব্যবহার করতে গিয়ে ত্রুটিযুক্ত হয়— কোন ক্ষতি ঘটে, তাহলে এই ক্ষতিরও ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে না। তা হস্তগত করার পর তার কোন অংশের যখন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না, তখন সমস্তটা যদি হারিয়ে বা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলেও ক্ষতিপূরণ না দেয়াই

স্বাভাবিক। কেননা যার ক্ষতিপূরণ হস্তগত করার সাথে সম্পর্কিত, তাতে সমগ্রটার হুকুম ভিন্নতর হতে পারে না। তার অংশেরও যেমন। যেমন ছিনতাই করা-কেড়ে লওয়া জিনিস ও অশুদ্ধ বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তগত করা জিনিস। সব ফিকহবিদ একমত হয়েছে এ বিষয়ে, অংশ যদি ক্ষতির দরুন নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না, তখন সমস্তটাও যদি নষ্ট হয় তার ক্ষতিপূরণ দেয়া কর্তব্য হবে না। যেমন গচ্ছিত রাখা ও আমানতস্বরূপ রাখা জিনিস।

ধারে গ্রহণ পর্যায়ে সফওয়ানইবনে উমাইয়্যাতা বর্ণিত হাদীসের শব্দ নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, তাতে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কিন্তু তাঁদের অন্যান্যরা তার উল্লেখ করেন নি। শরীক আবদুল আযীয ইবনে রফী, ইবনে আবূ মুলায়কা, উমাইয়্যাতা ইবনে সফওয়ান, ইবনে উমাইয়্যাতা-তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, নবী করীম (স) সফওয়ানের নিকট থেকে হুনায়ন যুদ্ধের দিন একটি লৌহ বর্ম ধার বাবদ গ্রহণ করেছিলেন, তখন সফওয়ান বলেছিলেন, হে মুহাম্মাদ, এটার কিন্তু ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। জবাবে তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। পরে তার একটি অংশ বিনষ্ট হয়ে যায়। তখন নবী করীম (স) তাঁকে বলেছিলেন, তুমি চাইলে যে অংশ নষ্ট হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ দেব। তখন সফওয়ান বলেছিলেন ঃ হে রাসূল, তার পরিবর্তে আমি বরং ইসলামের ব্যাপারেই বেশি আগ্রহী। ইসরাইল এ হাদীসটি আবদুল আযীয রফী, ইবনে আবূ মুলায়কা, সফওয়ান ইবনে উমাইয়্যাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, রাসূল (স) সফওয়ানের নিকট থেকে একটি বর্ম ধার বাবদ নিয়েছিলেন। তার কিছুটা অংশ নষ্ট হয়ে যায়। তখন নবী করীম (স) বলেছিলেন, তুমি চাইলে আমি তার ক্ষতিপূরণ তোমাকে দেব। তখন সফওয়ান বলেছিলেন, না হে রাসূল! শরীক এ বর্ণনাটির সূত্রসমূহ রাসূল (স) পর্যন্ত মিলিয়ে দিয়েছেন এবং তাতে ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা বলা হয়েছে। ইসরাঈলের বর্ণনা সূত্রে মুনকাতা, তাতে ক্ষতিপূরণের উল্লেখ করা হয়নি। কাতাদাতা আতা থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) সফওয়ান ইবনে উমাইয়্যাতার নিকট থেকে হুনায়ন যুদ্ধের সময় কতগুলি বর্ম ধার বাবদ নিয়েছিলেন। তখন সফওয়ান জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে রাসূল! এ ধার কি শোধ করে দেয়া হবে ? তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। জরীর আবদুল আযীয ইবনে রফী, আনাস আবদুল্লাহ ইবনে সফওয়ানের বংশধর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) হুনায়ন যুদ্ধে সংকল্প গ্রহণ করেন, ....... এরপর হাদীসটির উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাতে ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা উল্লেখ নেই। এও বলা হয়েছে যে, এ বর্ণনাকারী জরীর ইবনে আবদুল হামীদ অপেক্ষা হাদীস বর্ণনায় অধিক স্মরণশক্তি সম্পন্ন, অধিক দৃঢ় ও অধিক স্থিতিশীল নন। তিনি ক্ষতিপূরণের কথাটিরও উল্লেখ করেন নি। বর্ণনাকারীরা সমান-সমান হলেও তা 'মুজ্‌তারিব'— শব্দের ওলট-পালট অবস্থা। অন্যান্য হাদীসসমূহ আবূ আমামা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (স) বলেছিলেন যে, ধার অবশ্যই ফিরিয়ে দেয়া হবে। সফওয়ান বর্ণিত হাদীসে ক্ষতিপূরণ দেয়ার যে উল্লেখ আছে তা যদি সহীহ্ হয়, তাহলে তার অর্থ হচ্ছে ফিরিয়ে দেয়ার নিশ্চয়তা— যেমন সফওয়ান বর্ণিত কোন কোন হাদীসের শব্দ থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ, ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। এমনকি আমি তা তোমার নিকট ফিরিয়ে দেব। যেমন আবদুল বাকি ইবনে কানে' ফিরয়াবী, কুতায়বা, লায়স,

ইয়াযীদ ইবনে আবূ হুবায়ব, সাঈদ ইবনে আবূ হিন্দু সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, সর্বপ্রথম যে ধারে নেয়ার ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে, তা হল রাসূলে করীম (স) সফওয়ানকে বললেন ঃ তোমার হাতিয়ারসমূহ আমাদেরকে ধার দেও। তা আমাদের উপর চাপানো থাকবে, আমরা তা এনে তোমাকে ফেরত দেব। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, তিনি তা ফিরিয়ে দেয়ার নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। কেননা সফওয়ান তখন একজন কাফির যোদ্ধা ছিলেন। তিনি ধারণা করেছিলেন যে, রাসূল (স) তা অন্যান্য সব যুধ্যমান জনতার ধন-মালের মতো তার হাতিয়ারগুলিও বোধ হয় তিনি নিয়ে নেবেন। সেই কারণে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! আপনি কি এগুলি জোরপূর্বক নিয়ে নিচ্ছেন? জবাবে তিনি বলেছিলেন, না, ক্ষতিপূরণসহ ফিরিয়ে দেয়া হবে, আমিই এগুলি তোমার নিকট ফিরিয়ে দেব। ফিরিয়ে দেয়ার ধারস্বরূপ এটা নেয়া হচ্ছে। নবী করীম (স) এই কথা বলে জানিয়ে দিলেন যে, তা ফিরিয়ে দেয়ার ধারে নেয়া। যুধ্যমানদের মাল যেমন করে নেয়া হয় এটা ঠিক সেইভাবেই নেয়া হচ্ছে। যেমন কেউ কাউকে বলে ঃ আমি তোমার প্রয়োজন পূরণে জামিন হলাম। অর্থাৎ আমি তার দায়িত্ব নিলাম। আমি তা পূরণের জন্যে চেষ্টা করব।

আভিধানিকরা বলেছেন ঃ ضَمِنْتُمَا অর্থ, আমি উহার সংকল্প করেছি, উহার ইচ্ছা করেছি। উপরন্তু আমি বিরোধীদের জন্যে খবরের সত্যতা সমর্থন করছি, তাতে যে ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে মতপার্থক্য স্বরূপ আমরা বলব, তার কোন প্রমাণ তাতে নেই। কেননা তিনি বলেছেন, عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ 'এ এমন ধারে নেয়া যা ফেরত দেয়ার নিশ্চয়তা দিচ্ছে।' তিনি যে বর্মগুলি নিয়েছিলেন, তা ফেরত দেয়ার দায়িত্বভুক্ত করে দিয়েছিলেন। এতে ঠিক যে জিনিসটা নেয়া হয়েছিল সেটাই ফেরত দেয়ার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিল, তার মূল্য ফেরত দেয়ার নয়। কেননা তিনি বলেন নি, আমি এর মূল্যের দায়িত্ব গ্রহণ করছি। কথায় ব্যবহৃত শব্দের আসল ও প্রকৃত অর্থ-ই গ্রহণ করা উচিত, পরোক্ষ ও অপ্রকৃত অর্থ নয়। যতক্ষণ তা করার কোন দলীল না পাওয়া যাবে। উপরন্তু বিপরীত মতের লোক শব্দে যে সর্বনাম প্রমাণ করার দাবি করেছে তার-ও কোন দলীল নেই। অর্থাৎ মূল্যের নিশ্চয়তা। তাই তা প্রমাণ করা যাবে না। কেননা তার কোন দলীল নেই। তা একথাও প্রমাণ করে যে, ধারে নেয়া জিনিস ধ্বংস হলে তার মূল্যের ক্ষতিপূরণ দেয়ার নিশ্চয়তা দেয়া হয়নি। তাই নবী করীম (স) তার কয়েকটি বর্ম হারিয়ে গেলে তিনি সফওয়ানকে বলেছেন, তুমি চাইলে আমি সে কয়টির ক্ষতিপূরণ দেব। যদি মূল্যের ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা থাকত, তাহলে তিনি কখনই বলতেন না যে, তুমি চাইলে তোমার জন্যে ক্ষতিপূরণ দেব। তাহলে তিনি জরিমানা আদায়কারী হতেন। বোঝা গেল, ধারে নেয়া জিনিস ধ্বংস হয়ে গেলে জরিমানা দেয়া ওয়াজিব হয় না। সফওয়ান চাইলে নবী করীম (স) জরিমানা দিতে ইচ্ছা করেছিলেন। সে জরিমানাটা মহানুভবতা স্বরূপ হতো। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়, নবী করীম (স) যখন আবদুল্লাহ ইবনে রবীআতার নিকট থেকে ত্রিশ হাজার এই যুদ্ধেই 'করয' নিয়েছিলেন, পরে তিনি তা আবদুল্লাহকে ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ্ তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। তখন নবী করীম (স) বলেছিলেন ঃ তুমি এটা নিয়ে নাও। কেননা 'করযের' প্রতিদান হল, তা ফিরিয়ে দেয়া এবং প্রশংসা করা। তা যদি বাধ্যতামূলক জরিমানা হতো যে সব বর্ম হারিয়ে গেছে তার জন্যে, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই বলতেন না, তুমি চাইলে তোমার জন্যে আমরা জরিমানা দেব।

এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, তা হারিয়ে যাওয়া জিনিসের মূল্য দেয়ার ওয়াদাও ছিল না। কেননা সফওয়ান বলেছিলেন, এক্ষণে আমার দিলে ঈমান জেগে উঠেছে, যা পূর্বে ছিল না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (স)-এর এই বর্ম গ্রহণ মূল্য দেয়ার নিশ্চয়তাপূর্ণও ছিল না। কেননা যা দেয়ার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে তা দেয়ার ব্যাপারে কুফর ও ঈমানের দিক দিয়ে কোন পার্থক্য হতে পারে না।

আমাদের কোন কোন মনীষী বলেছেন, সফওয়ান যখন যুধ্যমান লোক ছিলেন তখন তার শর্ত তিনি অবশ্যই করতে পারতেন। কেননা আমাদেরও যুধ্যমানদের মাঝে শর্ত আরোপের ভিত্তিতে লেন-দেন করা খুবই সঙ্গত ছিল, যা আমাদের পরস্পরের মধ্যে সঙ্গত হয় না। যেমন তাদের মধ্যে যারা স্বাধীন তারা রিহনের ভিত্তিতে মুয়ামিলা করতে পারে। কিন্তু আমাদের মধ্যে পারস্পরিকভাবে তা জায়েয নয়। আবুল হাসান আল-কারখী এই ব্যাখ্যা মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, ক্ষতিপূরণের শর্ত করা সহীহ্ হতে পারে না যুধ্যমান লোকদের জন্যে যা ক্ষতিপূরণ দেয়ার জিনিস নয়, তাতে। যেমন আমরা যদি তাদের জন্যে গচ্ছিত রাখা ও মুজারিবাত ইত্যাদির শর্ত করি, তাহলে তা সহীহ্ হবে না।

যিনি ধারে নেয়া জিনিসের ক্ষতিপূরণ দেয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন, তিনি একটি হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। হাদীসটি শুবা ও সাঈদ ইবনে আবূ আরুবা কাতাদাতা আল-হাসান সামুরাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

عَلَى الْيَدِ مَا اَخَذَتْ حَتّٰى تُؤَدِّيَهُ -

হাতে-হাতে তুমি যা নেবে তা অবশ্যই ফেরত দেবে।

আর মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে এ হাদীসটিও প্রমাণ হিসেবে দাঁড়াতে পারে না। কেননা তাতে যে জিনিসটি নেয়া হয়েছে ঠিক সেই জিনিসটিই ফেরত দেয়া কর্তব্য করা হয়েছে। তাতে জিনিসটি ধ্বংস হলে মূল্য দিয়ে তার ক্ষতিপূরণের উল্লেখ নেই। আমরা বলছি, ধারে নিলে তা ফেরত দেয়া কর্তব্য। আর এতে কোন মতপার্থক্যও নেই। আর মতপার্থক্যের স্থানের সাথে তার কোন সম্পর্কও নেই।

## ন্যায়পরতা সহকারে শাসনকার্য পরিচালনা পর্যায়ে আল্লাহ্র হুকুম

আল্লাহ্র তা'আলা বলেছেন ঃ

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ -

তোমরা যখন লোকদের মধ্যে হুকুম চালাবে তখন যেন তোমরা ন্যায়পরতা সহকারে হুকুম চালাও।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ -

আল্লাহ্ নিশ্চিতভাবে আদেশ করেছেন ন্যায় বিচার ও দয়া-সহানুভূতির। (সূরা নহল ঃ ৯০)

বলেছেন ঃ

وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْكَانَ ذَاقُرْبٰى -

তোমরা যখন কথা বলবে তখন অবশ্যই সুবিচার করবে যদিও নিকটবর্তী ক্ষেত্রে হয়। (সূরা আন'আম ঃ ১৫২)

আবদুল বাকী ইবনে কানে' আবদুল্লাহ ইবনে মূসা ইবনে আবূ উসমান, উবায়দ ইবনে হুবাব আল-হুলী, আবদুর রহমান ইবনে আবুর-রিজাল, ইসহাক ইবনে ইয়াহ্য়া ইবনে তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ, সাবিতুল আরায, আনাস ইবনে মালিক সূত্রে আমাদের নিকট নবী করীম (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

لَا تَزَالُ هٰذِهِ الْاُمَّةُ بِخَيْرٍ مَّا اِذَا قَالَتْ صَدَقَتْ وَاِذَا حَكَمَتْ عَدَلَتْ وَاِذَا اسْتَرْحَمَتْ رَحَمَتْ -

এই মুসলিম উম্মাহ্ কল্যাণ ও মঙ্গলে ভরপুর থাকবে যতদিন পর্যন্ত তারা কথা বললে সত্য বলবে, শাসনকার্য চালাতে সুবিচার ও ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠিত করবে। আর তাদের নিকট রহম চাওয়া হলে তারা অবশ্যই রহমত করবে।

আবদুল বাকী বলেছেন, আমাদের নিকট বশর ইবনে মূসা আবদুর রহমান আল-মুকরী, কহমস ইবনে হাসান, আবদুল্লাহ আল-আসলামী সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে গাল-মন্দ বলল। ইবনে আব্বাস লোকটিকে বললেন ঃ তুমি নিশ্চয়ই আমাকে গাল-মন্দ বলেছ। তিনটি চারিত্রিক ব্যাপারে আমি নিশ্চিত কুরআনের আয়াত অনুযায়ী আমল করি। আমি আল্লাহ্র ওয়াস্তে কামনা ও পছন্দ করি যে, সব লোক-ই তা জানে, আমি যা জানি। আমি যখন শুনি, মুসলমানদের কোন শাসক তার শাসন কার্যে সুবিচার ও ন্যায়পরতা রক্ষা করে, আমি তাতে খুবই উৎফুল্ল হই। সম্ভবত আমি তার নিকট হয়ত কোন দিনই বিচার নিয়ে যাব না। আমি মুসলমানদের দেশসমূহের কোন দেশে বৃষ্টিপাতের কথা শুনি, তাতেও আমি খুবই খুশী হই, যদিও আমার পালানে কোন পশু নেই।

আবদুল বাকী আল-হারিস ইবনে আবূ উসামাতা, আবূ উবায়দ আল-কাসিম ইবনে সালাম, আবদুর রহমান ইবনে মাহ্দী, হাম্মাদ ইবনে সালামাতা, হুমায়দ, আল-হাসান সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اَخَذَ عَلَى الْحُكَّامِ ثَلَاثًا اَنْ لَّا يَتَّبِعُوا الْهَوٰى وَاَنْ يَّخْشَوْهُ وَلَا يَخْشَوَا النَّاسَ، وَاَنْ لَّا يَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ثُمَّ قَرَاَ : يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى -

আল্লাহ্ তা'আলা শাসকদেরকে তিনটি বিষয়ে শক্তভাবে পাকড়াও করেছেন। তা হল তারা নফসের খাহেশ অনুসরণ করবে না, কেবল আল্লাহ্কেই ভয় করবে, জনগণকে ভয় করবে না

এবং আল্লাহ্‌র আয়াত সামান্য মূল্যে বিক্রয় করবে না। তারপর পড়লেন হে দাউদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে পরম সত্য বিধান অনুযায়ী শাসন ও বিচার কার্য সম্পাদন কর এবং নফসের খাহেশের অনুসরণ করো না।

আল্লাহ বলেছেন ঃ

اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرٰاةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا -

আমরা নিশ্চিতভাবে তওরাত নাযিল করেছি। তাতে হেদায়েতের বিধান রয়েছে এবং আছে নূর। তার দ্বারা ইসলামের সব নবী শাসনকার্য পরিচালনা করেন। (সূরা মায়িদা ঃ ৪৪)

শেষের অংশ ঃ

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا - وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ -

অতএব তোমরা জনগণকে ভয় করবে না, ভয় করবে কেবল আমাকে এবং আমার আয়াতসমূহ সামান্য মূল্যে বিক্রয় করবে না। আর আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী যারাই শাসন ও বিচার কার্য চালায় না, তারাই কাফির। (সূরা মায়িদা ঃ ৪৪)

## উলিল আমর-এর আনুগত্য

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ -

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, অনুসরণ কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলদেরও।

আবূ বকর বলেছেন, 'উলিল আমর' বলতে কাদের বোঝায়, এ নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও ইবনে আব্বাস (একটি বর্ণনায়), আল-হাসান, আতা ও মুজাহিদ বর্ণনা করেছেন ঃ 'উলিল আমর' বলতে ফিকাহবিদ ও ইলমওয়ালা লোক বোঝানো হয়েছে। ইবনে আব্বাস (অপর একটি বর্ণনায়) ও আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত— তারা হচ্ছে সদাশয় শাসকবৃন্দ । আর হতে পারে, এদের সকলের কথাই এর তাৎপর্যভুক্ত। কেননা কথিত নামটি এদের সকলের জন্যে প্রযোজ্য। শাসকরাই সৈন্যবাহিনী ও অভিযানসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করে। শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কাজ-ও তারাই করে। আর শরীয়তবিদ আলিমগণ শরীয়ত ভিত্তিক শাসন নিশ্চিত করে। যা জায়েয তার নির্ধারণ ও যা না-জায়েয তার নিরসন করে। আয়াতে জনগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাদেরকে মেনে চলার জন্যে এবং শাসকগণ ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলরা যে ন্যায়পরতার প্রতিষ্ঠা করে তা কবুল করার জন্যে আদেশ করা হয়েছে। এ কালের আলিমগণ ন্যায় পথের পথিক, সর্বজন পছন্দনীয় ও দৃঢ় আস্থাভাজন ছিলেন। তাঁদের দ্বীনদারী ও আমানতদারী ছিল সর্বজনবিদিত। এ অর্থেরই আর একটি আয়াত হচ্ছে ঃ

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

তোমরা নিজেরা না জানলে যারা জানেন তাঁদের নিকট জিজ্ঞাসা কর। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৭)

কারো কারো মতে উলিল আমর-এর এখানে প্রকাশমান তাৎপর্য হচ্ছে আমীর ও শাসকগণ। কেননা এর পূর্বেই ন্যায়পরতা সহকারে শাসনকার্য চালাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আইন কার্যকর করার অধিকারী ও কর্তৃত্বশালী লোকদেরকেই এ সম্বোধনটা করা হয়েছে। আর তারাই হচ্ছে শাসক-প্রশাসক ও বিচারকমন্ডলী। এর পর এর সাথে সংযোজন করে আদেশ দেয়া হয়েছে 'উলিল আমর'কে মেনে চলার জন্যে। ওরা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব পরিচালকবৃন্দ। ওরাই জনগণের উপর আইন ও শাসন চালায়। তাদের মানতে হবে যতদিন তারা ন্যায়পরতা সম্পন্ন ও আস্থাভাজন থাকবে। অবশ্য যুদ্ধাভিযান পরিচালক ও আলিমগণ— এ দুই পর্যায়ে কর্তৃত্বশালী লোকদের আনুগত্য করার আদেশও তা হতে পারে, হওয়া নিষিদ্ধ নয়। কেননা অগ্রভাগে ন্যায়পরতা সহকারে শাসনকার্য চালানোর আদেশ দান নিশ্চিতভাবে বলে না যে, আনুগত্যকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে কেবল শাসকদের আনুগত্য করার মধ্যে, তার বাইরে আর কোন আনুগত্য থাকবে না। যদিও নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ اَطَاعَ اَمِيْرِىْ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ -

যে লোক আমার নিযুক্ত শাসককে মানল, সে আমাকে মানল।

জুহরী মুহাম্মাদ ইবনে যুবায়র ইবনে মুতয়িম, তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলে করীম (স) মিনায় অবস্থিত মসজিদে খায়ফ-এ দাঁড়ালেন এবং ভাষণ সূত্রে বললেন ঃ

نَضَّرَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِىْ فَوَعَاهَا ثُمَّ اَدَّاهَا اِلٰى مَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَا فِقْهَ لَهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ اِلٰى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُؤْمِنٍ اِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَطَاعَةُ ذَوِى الْاَمْرِ -

আল্লাহ্ সে বান্দাহ্কে আলোকোজ্জ্বল করবেন, যে আমার কথা শুনল, পরে সে তা পৌঁছিয়ে দিল যে তা শুনতে পায়নি তার নিকট। ফিকাহর অনেক বাহক-ই এমন যার ফিকাহ— সমঝ-বুঝ নেই, এবং ফিকাহর অনেক বাহক এমন যে তা বহন করে নিয়ে যায় তার নিকট, যে তার অপেক্ষা অধিক সমঝদার। তিনটি জিনিসের উপর সাধারণত হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা হয় না। মুমিনের দিল, আল্লাহ্র জন্যে আমলকে খালেস করা আর তৃতীয়টি সম্পর্কে কেউ বলেছেন, তা শাসকের আনুগত্য, কেউ বলেছেন, শাসকদের উপদেশ-নসীহত — কল্যাণ কামনা এবং মুসলিম জামা'আতের সাথে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক স্থাপন। কেননা তাদের আহ্বান তাদের ছাড়া অন্যদেরও পরিবেষ্টিত করে।

এ হাদীস থেকে প্রকাশ্যভাবে জানা যায়, 'উলিল আমর' বলে শাসককুলকেই বুঝিয়েছেন। তারপরই হুকুম হয়েছে ঃ

فَانْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ -

যদি তোমরা— শাসক ও শাসিত জনগণ— কোন বিষয়ে পারস্পরিক মতপার্থক্যজনিত ঝগড়ায় লিপ্ত হও তাহলে (সে বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসার জন্যে) সে বিষয়টি আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।

শাসককুলকে আদেশ করা হয়েছে বিবাদের বিষয়টি আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নতের দিকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে— তারই ভিত্তিতে চূড়ান্ত মীমাংসা করার জন্যে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, 'উলীল আমর' বলতে ফিকাহ— ইসলামী আইনবিদ্দের বুঝিয়েছেন। কেননা সমস্ত মানুষকেই তাদের আনুগত্য করার জন্যে আদেশ করা হয়েছে। কেননা সাধারণ সব মানুষ ও যারা ইল্ম-ওয়ালাদের মর্যাদাসম্পন্ন নয়, তাদের প্রতি এ আদেশ হতে পারে না। তারা জানেই না ব্যাপারটি কিভাবে আল্লাহ্র কিতাব ও সুন্নতে রাসূলের প্রতি ফেরানো যায় এবং ঘটনাবলীতে কুরআন ও সুন্নাহর আইন কার্যকর করার প্রকৃত পন্থা কি হতে পারে। বোঝা গেল, এ সম্বোধন আলিমগণের প্রতি।

এ আয়াতের দলীল দিয়ে কোন কোন মনীষী প্রমাণ করেছেন যে, 'ইমামত' পর্যায়ে রাফেযী খারেজীদের মত বাতিল। কেননা 'উলীল আমর'— যার আনুগত্য করা আদেশ দেয়া হয়েছে— হয় ফিকাহবিদ— আইনবিদরা হবেন, না হয় শাসকরা হবেন। কিংবা হবেন সেই ইমাম, যিনি জনগণের উপর নেতৃত্ব দিচ্ছেন। যদি এর অর্থ ফিকাহবিদরা ও শাসকরা হন, তা হলে এই ইমাম, ফিকাহবিদ ও শাসকগণ ভুল পথের পথিক, বিভ্রান্ত ও শরীয়ত অদল-বদল বা পরিবর্তনকারী হবেন, তা না-জায়েয হতে পারে না। কেননা তাদের আনুগত্য করার জন্যে আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে। এ মতে তো 'ইমামত' সংক্রান্ত ধারণাটাই বাতিল হয়ে যায়। কেননা তারা ইমামের মাসুম, নিষ্পাপ-নির্ভুল ও অদল-বদল-পরিবর্তনকারী হওয়া জায়েয নয় বলে মনে করে। আসলে শুধু ইমামই তার অর্থ হওয়া সঙ্গত নয়। কেননা কথার ধারাবাহিকতায়ই বলা হয়েছে ঃ

যদি তোমরা বিবাদে-ঝগড়ায় লিপ্ত হও কোন ব্যাপার নিয়ে, তাহলে তা আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে ফিরাও।

তাই ইমাম যদি এমন হয় যাকে মান্য করা ফরয, তাহলে তার নিকটই বিবাদীয় বিষয়টি নিয়ে যাওয়া কর্তব্য হবে। সে-ই মতপার্থক্য ও ঝাগড়া-বিবাদ মিটমাট করে দেবে। আদেশ হয়েছে বিবাদীয় বিষয়টি কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফেরানোর, ইমামের নিকট নিয়ে যাওয়ার আদেশ করা হয়নি। তাই প্রমাণিত হল যে, 'ইমামত' পর্যায়ে তাদের মত বাতিল। যদি এমন ইমাম-ই তার অর্থ হতো যাকে মেনে চলা ওয়াজিব, তাহলে আয়াতে বিষয়টি ইমামের নিকট নিয়ে যাওয়ার আদেশ করা হতো। কেননা তাদের মতে ইমাম-ই কিতাব ও সুন্নাহ্র কথা সম্পর্কে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেবে। কিন্তু আয়াতে অভিধান নেতৃবৃন্দ ও ফিকাহবিদদের আনুগত্য করতে বলা হয়েছে এবং বিবাদ বা ঝগড়ার ঘটনাবলীতে মীমাংসার কিতাব ও সুন্নাহর দিকে ফেরাতে আদেশ করা হয়েছে; ইমামের দিকে নয়। তা থেকে প্রমাণিত হল যে, ইমামের আনুগত্য ফরয নয় ঝগড়া-বিবাদের ঘটনাবলীতে চূড়ান্ত বিধান পাওয়ার ক্ষেত্রে। অথচ প্রত্যেক

ফিকাহবিদকে আদেশ করা হয়েছে কিতাব ও সুন্নাহ্‌র থেকে তার দৃষ্টান্তের দিকে ফেরানোর জন্যে।

এই গোষ্ঠীর লোকেরাই ধারণা করেছে 'উলুল আমর' অর্থ আলী ইবনে আবূ তালিব (রা)। কিন্তু এ এক অত্যন্ত খারাপ ব্যাখ্যা। কেননা 'উলুল আমর' বহু বচন, এক বচন নয়। তাই এক ব্যক্তি তার অর্থ হতে পারে না। অথচ আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) তো এক ব্যক্তি মাত্র। আর 'উলিল আমর'-এর আনুগত্য করতে আদেশ করা হয়েছে যা রাসূলে করীম (স)-এর জীবদ্দশায় ও। আর আলী (রা) রাসূলের জামানায় যে সর্বোচ্চ শাসক ছিলেন না, তা তো জানা কথা-ই। এ থেকে প্রমাণিত হল, 'উলিল আমর' রাসূল (স)-এর সময় ছিল তাঁর চালিত সরকারের প্রশানিক কর্মকর্তাবৃন্দ। আর তারা যতক্ষণ আল্লাহ্‌র নাফরমানীর কোন আদেশ না করছে, তাদের আনুগত্য করা ছিল জনগণের জন্যে কর্তব্য। নবী করীম (স)-এর পরও তাদের এ মর্যাদা জনগণের উপর রয়েছে, তাদের আনুগত্য ও অনুসরণ সব মুসলমানের জন্যেই কর্তব্য। এখানেও সেই শর্ত যে, তারা কোন গুনাহের কাজের আদেশ না-করা পর্যন্তই তাদেরকে মানা যাবে।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ -

এ পর্যায়ে মুজাহিদ, কাতাদাহ, মায়মুন ইবনে মিহরান ও সুদ্দী থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌ ও রাসূলের দিকে ফেরানোর অর্থ আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ্‌র দিকে ফেরানো।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর নবী ও রাসূলের সুন্নাহ্‌র দিকে ফেরানোর এ আদেশ সাধারণ। তা যেমন রাসূল (স)-এর জীবনকালে, তেমনি তাঁর দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও। কিতাব ও সুন্নাহ্‌র দিক ফেরানোর কাজটি দুভাবে সম্ভব। একটি তাতে যে সব বিষয়ে 'নস' রয়েছে তা তার নাম ও তাৎপর্য সহকারে কার্যকর করা। আর দ্বিতীয়, বোঝা যায়— প্রমাণ করে এবং তার ভিত্তিতে কিয়াস করা সম্ভব, এমনভাবে তা কাজে লাগানো। দৃষ্টান্ত, ও ব্যবহৃত শব্দের সাধারণ তাৎপর্য দুটি জিনিসকে এক সাথে শামিল করে। তাই কোন বিষয়ে শাসক ও শাসিতের মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হলে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র 'নস' হবে চূড়ান্ত মীমাংসাকারী। যদি তার হুকুম 'নস' হিসেবে কুরআন ও সুন্নাহ্য় পাওয়া যায়। তাহলে অকুণ্ঠিতভাবে সকলকে তা-ই মেনে নিতে হবে। আর যদি তাতে কোন 'নস' না পাওয়া যায়, তার দৃষ্টান্ত তালাশ করতে হবে ওই দুটোতেই। কেননা সর্বাবস্থায়ই সে দুটির দিকে বিবাদীয় বিষয়াদি ফেরানোর জন্যে আমরা আদিষ্ট। কখনও ফেরাতে হবে আর কখনও হবে না, তা হতে পারে না। কেননা আল্লাহ কোন বিশেষ সময় নির্ধারণ করে দেন নি ফেরানোর জন্যে এই বলে যে, অমুক সময় ফেরাতে হবে, অমুক সময় ফেরানো জরুরী হবে না। কথার ধরন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় এবং বাহ্যতও মনে হয় যে, যে বিষয়ে কোন 'নস' নেই, কেবল সেই বিষয়ই বুঝি সে দিকে ফেরাতে হবে। কেননা যে বিষয়ে 'নস' রয়েছে, তাতে সাহাবীগণের মধ্যে কোন ঝগড়া বা মতপার্থক্যের কারণ দেখা দিতে পারে না। তারা তো ভাষাভিজ্ঞ লোক ছিলেন। তাঁরা ভালো ভাবেই জানতেন কোন্‌টার সম্ভাব্যতা আছে আর কোন্‌টার নেই। তাই বাহ্যত মনে হয়

যে, কিতাব ও সুন্নাহ নযীর বা অনুরূপ ব্যাপারাদির দিকেই বিবাদীয় বিষয়গুলিতে ফেরাতে হবে।

যদি বলা হয়, এ আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে, বিবাদ-ঝগড়া পরিহার করা ও কিতাব ও সুন্নাহতে যা আছে তা অকপটে মেনে নেওয়াই কর্তব্য।

জবাবে বলা যাবে, আয়াতটি মুমিনদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে। শুরুতে 'হে ঈমানদার লোকেরা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তুমি যে ব্যাখ্যা দিয়েছ, তা যদি হয়, তাহলে তার অর্থ হবে, তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ মেনে চল এবং এই অনুসরণের মাধ্যমেই আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর। আর আমরা জানি যে, যে ব্যক্তিই ঈমান এনেছে, তার আকীদাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র হুকুম ও রাসূলের সুন্নাহ মেনে নেয়ার বাধ্যবাধকতা অনিবার্যভাবে মেনেনিতে হবে। তাহলে পরে বলা ঃ 'তা ফিরাও আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি'-এর ফায়দাটা নষ্ট হয়ে যায়। আর সে বিষয়ে তো আয়াতের শুরুতেই বলে দেয়া হয়েছে, নতুন করে আবার বলার তো প্রয়োজন পড়ে না। তাই যে বিষয়ে 'নস' নেই সেই বিষয়টা কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরালে এই কথাটির ফায়দা লাভ করা সম্ভব। কেননা 'নস' নেই বলেই ঝগড়ার সৃষ্টি হয়েছে। তাই সে ঝগড়ার মীমাংসা করতে হবে যে-বিষয়ে 'নস' আছে সেই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে। এবং সে যত বিষয়েই মতপার্থক্য হোক সেইসব বিষয়ই সাধারণভাবে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ও মতপার্থক্য শেষ করতে হবে। দলীল ছাড়া কোন জিনিস বা বিষয়কেই তার বাইরে রাখা যাবে না।

যদি বলা হয়, এই আয়াতটিতে সাহাবায়ে কিরামকেই প্রথমত সম্বোধন করা হয়েছে এবং নবী করীম (স)-এর জীবদ্দশায়ই কোন বিষয়ে মতবিরোধ হলে আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে সে বিষয়টি ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে তাদেরকেই আদেশ করা হয়েছে। আর এটা তো জানা-ই আছে যে, নবী করীম (স)-এর উপস্থিতিতে তাঁদের নিজেদের রায় ও কিয়াসকে ঘটনাবলীতে প্রয়োগ করে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ জায়েয ছিল না। বরং তাঁদের তো কর্তব্য ছিল তাঁর সামনে নত হওয়া ও তাঁর আদেশ পালন করা। কিয়াস-এর উপায়ে তা কুরআন-সুন্নাহর দিকে ফেরানোর কৃত্রিমতা তাঁদের জন্যে জায়েয ছিল না। এতে প্রামণিত হল যে, যে যে বিষয়ে 'নস' রয়েছে, সে অনুযায়ী আমল করাই তাঁদের কর্তব্য ছিল, চিন্তা-বিবেচনা ও ইজতিহাদ পরিহার করাই তাঁদের কর্তব্য ছিল যে বিষয়ে 'নস' নেই সেই বিষয়ও।

জবাবে বলা যাবে, একথা ঠিক নয়। কেননা রায় ও ইজতিহাদ ব্যবহার করা ও ঘটনাবলীকে 'নস'-এর নযীরের উপর ফেলে হুকুম জানতে চাওয়া স্বয়ং রাসূলে করীম (স)-এর জীবন-কালেও সম্পূর্ণ জায়েয ছিল— উভয় অবস্থাতেই। কোন একটি অবস্থায় জায়েয ও অপর অবস্থায় জায়েয নয়, এমনটা ছিল না। নবী করীম (স)-এর জীবনকালে যে দুটি অবস্থায় ইজতিহাদ করা জায়েয ছিল, তার একটি হল সেখানে রাসূলে করীম (স) নিজে অনুপস্থিত ছিলেন। যেমন হযরত মুয়ায (রা) ইয়ামেনে প্রেরণ কালে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ তোমার নিকট বিভিন্ন বিষয়ের বিচারের ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারাদি পেশ হলে তুমি কিভাবে ফয়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ? জবাবে তিনি বলেছিলেন, আমি বিচার করব, রায় দেব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব আল্লাহ্‌র কিতাবের ভিত্তিতে। বললেন, আল্লাহ্‌র কিতাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি না থাকলে বা না পেলে কি করবে ? বললেন, তাহলে আল্লাহ্‌র নবীর সুন্নাত অনুযায়ী কাজ করব।

বললেন, আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতে তা না থাকলে বা না পেলে কি করবে ? জবাবে বললেন ঃ اَجْتَهِدُ بِرَائِيْ وَلَا اٰلُوْ —আমি আমার রায় অনুযায়ী ইজতিহাদ করব এবং বিব্রত হব না। তখন নবী করীম (স) তাঁর হাত হযরত মুয়াযের বুকের উপর রাখলেন এবং বললেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ لِمَا يَرْضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ -

সমস্ত তারীফ সেই আল্লাহ্‌র জন্যে, যিনি আল্লাহ্‌র রাসূলের 'রাসূল'কে তওফীক দিয়েছেন সেই নীতি গ্রহণের যাতে স্বয়ং আল্লাহ্‌র রাসূল সন্তুষ্ট হন।

রাসূলের জীবদ্দশায় যে দুটি অবস্থায় ইজতিহাদ জায়েয ছিল, এ হল তার একটি, আর দ্বিতীয় অবস্থা ছিল তাই, যেখানে স্বয়ং রাসূল (স) তাঁর উপস্থিতিতেই ইজতিহাদ করার ও অনুরূপ ঘটনার আলোকে ফয়সালা করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেন তার ইজতিহাদে তার অবস্থা নির্ভুল হয় এবং তা সেই অবস্থায় প্রযোজ্য কিনা তা নিঃসন্দেহে জানা যায়। ইজতিহাদকারী ভুল করলে ও বিচার-বিবেচনার পথ পরিহার করলে, তিনি নিজে তাকে জানিয়ে দিতে ও ঠিক পথে নিয়ে আসতে পারেন। রাসূল (স) তাঁর পরে সমীপবর্তী ঘটনাবলীতে শরীয়তের হুকুম জানার জন্যে ইজতিহাদ করা কর্তব্য হবে, একথা জানিয়ে দিয়েছেন। তাই তাঁর বেঁচে থাকা অবস্থায়ও ইজতিহাদ করা এভাবেই জায়েয। যেমন আবদুল বাকী ইবনে কানে' আসলাম ইবনে সহল, মুহাম্মাদ ইবনে খালিদ ইবনে আবদুল্লাহ, তাঁর পিতা হিফস্ ইবনে সুলায়মান, কাসীর ইবনে শমযীর, আবুল আলীয়াতা, উকবা ইবনে আমের সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, দুইজন বিবাদমান ব্যক্তি রাসূল (স)-এর নিকট উপস্থিত হল, তখন নবী করীম (স) উকবাকে বললেন ঃ হে উকবা, তুমি এই দুইজনের বিবাদের ফয়সালা করে দাও। উকবা বললেন ঃ আপনি উপস্থিত রয়েছেন, এ অবস্থায় আমি কি করে এদের দুজনের মধ্যে বিচার করতে পারি ? তার পর-ও তিনি তাকেই বললেন ঃ তুমিই এ দুজনের মধ্যে বিচার কর। এ বিচারে তুমি যদি সঠিকভাবে কার্য সম্পাদন করতে পার, তাহলে দশটি নেকী পাবে। আর যদি ভুল কর, তাহলেও তুমি একটি নেকী পাবে। এতে নবী করীম (স) নিজেই এবং তাঁর উপস্থিতিতেই ইজতিহাদ করা মুবাহ করে দিয়েছেন। এর তাৎপর্য ঠিক তাই, যা আমরা বলেছি। নবী করীম (স) নিজেই হযরত মুয়ায ও হযরত উকবা ইবনে আমের (রা)-কে ইজতিহাদ করার জন্যে আদেশ করেছেন। আমাদের মতে এই অনুমতি উপরোদ্ধৃত আয়াত থেকেই নিঃসৃত। কথাটি হল ঃ তোমরা যদি পারস্পরিক মতপার্থক্যে লিপ্ত হও, তাহলে বিষয়টির চূড়ান্ত মীমাংসা আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের আলোকে ইজতিহাদের মাধ্যমে করে নাও। কেননা আমরা যখন রাসূল (স)-এর নিকট থেকে এমন কোন হুকুম পাব, যা কুরআনের সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন, আমরা বুঝব, সে হুকুমটি অবশ্যই কুরআন থেকে পাওয়া এবং নবী করীম (স) নিজের থেকে প্রথমেই এই হুকমটা দেননি। যেমন চোরের হাতে কাটা ও যিনাকারীকে দোররা মারার হুকুম এবং এ ধরনের আরও বহু শত হুকুম। কাজেই নবী করীম (স)-এর জীবদ্দশায় ঘটনাবলীর হুকুম জানার জন্যে ইজতিহাদ করা প্রচলিত ছিল না বলা কোনক্রমেই সহীহ্ তথা হতে পারে না। তখন-ও প্রত্যেকটি নবতর ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে শরীয়তের হুকুম জানা কর্তব্য ছিল। কাজেই কুরআন-সুন্নাহর যে সব বিষয়ে 'নস'

আছে, তাতে মতপার্থক্য ও ঝগড়া পরিহার করা ও সব কিছু মেনে নেয়াই কর্তব্য, এই তাৎপর্য বলা সহীহ্ নয়। হ্যাঁ, নবী করীম (স)-এর জীবদ্দশায় যে অবস্থায় ইজতিহাদের অবকাশ ছিল না, তা হল তার উপস্থিতিতে হুকুম কার্যকর করা ও নিজ মতের উপর স্বৈরতান্ত্রিক নীতি গ্রহণ। এরূপ ইজতিহাদ নিশ্চিতরূপেই পরিত্যক্ত, পরিহার্য এবং তা কারোর জন্যেই শোভন নয়।

## রাসূল (স)-এর আনুগত্য

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ -

তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং অনুসরণ কর রাসূলের।

বলেছেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ -

এবং আমরা যে রাসূল-ই পাঠিয়েছি, তা পাঠিয়েছি এ উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাকে মেনে চলা হবে।

বলেছেন ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ -

আর যে লোক রাসূলকে মানল, সে আল্লাহ্‌কে মানল।

বলেছেন ঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

না, তোমার রব্ব এর শপথ। ওরা কখনই ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না ওরা তাদের পারস্পরিক ঘটনাবলীতে তোমাকে— হে নবী ফয়সালাকারী মানবে। পরে তুমি যে ফয়সালা করে দেবে তা মেনে নিতে মনে একবিন্দু কুণ্ঠা পাবে না। বরং তারা মাথা পেতে দিয়ে সব কিছু পূর্ণরূপে মেনে নেবে।

এ সব আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ নিজেই রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ করা ফরয বলে জানিয়ে দিয়েছেন অত্যন্ত তাগিদ সহকারে। স্পষ্ট করেছেন যে, রাসূলের আনুগত্য ও আল্লাহ্‌র অনুসরণই আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও আল্লাহ্‌র হুকুম পালন। আর এর দ্বারা এই ফায়দাও পাওয়া গেছে যে, রাসূলের নাফরমানীই আল্লাহ্‌র নাফরমানী।

আল্লাহ্ আরও বলেছেন ঃ

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

যারা রাসূলের আদেশের বিরুদ্ধতা করে, তাদের ভয় করা উচিত, তাদের উপর কোন বিপদ আসতে পারে, পৌঁছতে পারে পীড়াদায়ক কোন আযাব। (সূরা নূর ঃ ৬৩)

এ আয়াতে রাসূলের আদেশের বিরুদ্ধতা করার পরিণামে কঠিন বিপদ ও আযাব আসার ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। রাসূলের আদেশের বিরুদ্ধতা ও তিনি যে দ্বীন ও বিধান নিয়ে এসেছেন তা মেনে নেয়া থেকে বিরত থাকা ও তাতে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করা ঈমান-বহির্ভূত কাজ। এ পর্যায়ে আল্লাহ্র কথাঃ 'ওরা কখনই ঈমানদার হতে পারবে না, যদি ওদের পরস্পরের মধ্যে সংঘটিত ব্যাপারাদিতে— হে নবী— তোমাকে বিচারক না মানে এবং তুমি যে ফয়সালাই করবে তা অকুণ্ঠিত চিত্তে মেনে না নেবে ও মাথা নত করে পুরোপুরি মেনে না নেবে।

আয়াতে حرج শব্দটির অর্থ বলা হয়েছে সংশয়। এটা মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। আসলে حرج শব্দের অর্থ হল সংকীর্ণতা (দ্বিধা-সংকোচও বলা যায়)। এ কথাটির তাৎপর্য এই হতে পারে যে, নবীর ফয়সালার ব্যাপারে মনে কোন সংশয় বা দ্বিধা-সংকোচ না রেখে-ই মাথা নত করে মেনে নেয়া ফরয। বরং সে ফয়সালার প্রতি হৃদয়ের উন্মুক্ততা, সমঝ ও দৃঢ় প্রত্যয় থাকতে হবে।

এ আয়াতটি এ কথাও প্রমাণ করে যে, সে লোক আল্লাহ্র কোন একটি আদেশও প্রত্যাখ্যান করবে অথবা রাসূলের কোন একটি আদেশ, সে লোক ইসলাম থেকে খারিজ গণ্য হবে। তা সন্দেহের কারণে হোক অথবা গ্রহণ না করা বা মেনে নেয়া থেকে বিরত থাকার কারণে হোক। আর এ কথাই প্রমাণ করে যে, যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল, সাহাবাগণ তাদেরকে মুর্তাদ গণ্য করেছিলেন এবং তাদেরকে হত্যা করা ও তাদের বাচ্চাদের বন্দী করেছিলেন, তা তাদের সহীহ ফয়সালা ছিল। কেননা আল্লাহ্ নিজেই বলে দিয়েছেন যে, যারা রাসূল (স)-এর ফয়সালা ও হুকুম মাথা পেতে মেনে না নেবে, তারা ঈমানদার লোক নয়।

যদি বলা হয়, রাসূলের আনুগত্যই যদি আল্লাহ্র আনুগত্য হয়, তাহলে রাসূলের আদেশ কেন আল্লাহ্র আদেশ হবে না?

জবাবে বলা যাবে, রাসূলের আনুগত্যই আল্লাহ্র আনুগত্য হয় এজন্যে যে, এ দুটির প্রত্যেকটি-ই আল্লাহ্র আদেশের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। কিন্তু আদেশ হল এক ব্যক্তির কথা ঃ কর। আর একটি আদেশের দুজন আদেশদাতা তো হতে পারে না। যেমন একটি কথা দুজনের কথা হতে পারে না, একটি কাজ দুজন কারকের হতে পারে না।

আল্লাহ্র কথা ঃ

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِانْفِرُوْا جَمِيْعًا -

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা তোমাদের আত্মরক্ষার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ কর। তার পরে তোমরা আলাদা-আলাদা ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বের হয়ে পড়, রওয়ানা দাও, কিংবা রওয়ানা হও সকলে একত্রে দলবদ্ধভাবে।

বলা হয়েছে, ثبات বহু বচনের শব্দ, এক বচনে ثبة। এ-ও বলা হয়েছে যে, ثبة গোষ্ঠীবদ্ধ বা বাহিনী হিসেবে চল। আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী বা গোষ্ঠী হিসেবে রওয়ানা

হওয়ার জন্যে— এক গোষ্ঠীর পর আর এক গোষ্ঠী একদিকে, আর এক গোষ্ঠী আর একদিকে। অথবা বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী হিসেবে নয়, সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রওয়ানা হওয়ার আদেশ দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, দহাক ও কাতাদাতা থেকে এ কথা বর্ণিত।

আর আল্লাহ্র কথা ঃ خذوا حذركم -এর অর্থ, তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র। অস্ত্রকে حذر বলা হয়েছে কেননা তার দ্বারা ভয়কে দূর করা যায়। এই অর্থ হওয়াও সম্ভব ঃ তোমরা তোমাদের অস্ত্র ধারণ করে তোমাদের শত্রুকে ভীত-সন্ত্রস্ত কর। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ -

এবং যেন তারা ধারণ করে তাদের রক্ষা ব্যবস্থা ও তাদের অস্ত্র-শস্ত্র। (সূরা নিসা ঃ ১০২)

বোঝা গেল, এই আয়াতটিতে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে অস্ত্র ধারণের আদেশ বিদ্যমান। তা বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিচ্ছিন্নতা কিংবা সকলের সম্মিলনের মাধ্যমে— তদবীর ও কৌশল হিসেবে যা-ই উত্তম বিবেচিত হবে, তা-ই করতে হবে। আর انفروا - تفوى থেকে, অর্থ ভীত হওয়া, ভয় পেয়ে পালিয়ে যাওয়া। কেউ যখন ভয় পায়, তখন বলা হয় ঃ- نفرا اليه انفرُواالى قتال বলা হয় যখন কোন ব্যাপরে ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। এখানে نفر - ينفر - نفور عدوكم শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের দিকে রওয়ানা হয়ে যাও। النفر দল— কয়েকজন লোকের সমষ্টি, যারা অনুরূপ অবস্থায় ভীত হয়। এ থেকেই আসে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার জন্যে যাত্রা করা। এ থেকে النافرة শব্দটি গঠিত। এর অর্থ, যেসব ব্যাপারে মতপার্থক্য হয় তাতে ভয় পেয়ে তার জন্যে অভিযোগ তোলা। এ কথাটির মূলে রয়েছে এই ব্যাপার যে, লোকেরা শাসককে প্রশ্ন করত, দল হিসেবে আমাদের মধ্যে অধিক শক্তিশালী কে? এ আয়াতটি মনসূখ হয়েছে বলে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। ইবনে জুরাইয, উসমান ইবনে আতা ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্র এ কথাটি ঃ

فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوا جَمِيْعًا -

এর বাহিনী, গোষ্ঠী বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে অথবা সকলে একত্রিত হয়ে শত্রুর মুকাবিলা করার জন্যে রওয়ানা হওয়ার আদেশ।

আর সূরা বারায়াত-এ বলা হয়েছে ঃ اِنْفِرُوا خِفَافًا وَّثِقَالًا তোমরা বের হয়ে পড় হালকাভাবে— ভারী অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়া-ই এবং হালকাভাবে ভারী অস্ত্র-শস্ত্র ও দ্রব্য সম্ভার ছাড়া-ই।

অপর আয়াতে বলা হয়েছে

اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا -

তোমরা যদি বের না হও, তাহলে তোমাদের অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব দেয়া হবে। (সূরা তওবা ঃ ৩৯)

এ আয়াতকেই মনসূখ করে দিয়েছে আল্লাহ্র এই কথাটি ঃ

وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً فَلَوْلَاَنَفَرَمِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ -

ঈমানদার সব লোকই যে শত্রুর মুকাবিলায় যুদ্ধে বের হবে, তা নয়। তবে প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠী থেকে কতিপয় ব্যক্তি কেন বের হয়ে যাচ্ছে না ......? (সূরা তওবা ঃ ১২২)

আর কতিপয় ব্যক্তি রাসূলে (স)-এর সাথে অবস্থান গ্রহণ করবে। নবী করীম (স) এর সাথে অবস্থা গ্রহণকারীরাই হচ্ছে দ্বীন-সম্পর্কে সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী। তারা যখন যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তারা তাদের ভাইদের পরকাল সম্পর্কে সতর্ক করবে এ আশায় যে, সম্ভবত তারা ভীত হয়ে সতর্কতাবলম্বন করবে ও মেনে চলবে আল্লাহ্ তার কিতাবে যে ফয়সালা করেছেন তা এবং তাঁর নির্ধারিত সীমাসমূহ মেনে নেবে ও রক্ষা করবে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

اَلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

'যারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্র পথে'।

বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্র পথে' অর্থ আল্লাহ্র আনুগত্যে। কেননা এই আনুগত্য আল্লাহ্র নিকট থেকে সওয়াব হিসেবে জান্নাত পাওয়ার অধিকারী করে দেবে, যা বেহেশতী লোকদের জন্যে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। কেউ-কেউ বলেছেন, আল্লাহ্র পথে অর্থ, আল্লাহ্র সেই দ্বীনের পথে যা তিনি বিধিবদ্ধ করেছেন তাঁর সওয়াব ও রহমত পাওয়ার মাধ্যম হিসেবে। তার অর্থ দাঁড়ায় ঃ আল্লাহ্র দ্বীনের সাহায্যে .... 'তাগুত' অর্থ কেউ বলেছেন ঃ শয়তান, এটা আল-হাসান ও শ'বীর মত। আবুল আলীয়া বলেছেন, 'তাগুত' অর্থ যাদুরকর-গণকদার। বলা হয়েছে, আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে যারই ইবাদত করা হবে তা-ই তাগূত।

আল্লাহ্র কথা ঃ

اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا -

নিশ্চয়ই শয়তানের ফাঁদ দুর্বল। كيد শব্দের অর্থ, কৌশলস্বরূপ উদ্দেশ্যমূলকভাবে অবস্থার বিপর্যয় সাধনের চেষ্টা, যা শুধু ক্ষতি করার উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। আল-হাসান বলেছেন, আল্লাহ 'শয়তানের ষড়যন্ত্র দুর্বল' একথা বলেছেন এজন্যে যে, তাদেরকে খবর জানানো হয়েছিল যে, ওরা ওদের উপর বিজয়ী হয়ে উঠবে। এ কারণে তা দুর্বল। এ-ও বলা হয়েছে, তাকে দুর্বল বলা হয়েছে, আল্লাহ মুমিনদেরকে যে সাহায্য করেন, তার তুলনায় ওদের জন্যে শয়তানের সাহায্য অত্যন্ত দুর্বল।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا -

তা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নিকট থেকে এসে থাকত, তাহলে তারা তাতে খুব বেশি পার্থক্য দেখতে পেত।

এ পার্থক্য তিন প্রকারের। পরস্পরের বিরোধিতার পার্থক্য— দুটি জিনিসের সীমা এমন

হতো যে, তার ফলে অপরটির বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে পড়ত। আর একটি অমিলের পার্থক্য। তার অর্থ, তার কতক হতো অত্যন্ত উচুমানের ও আর কতক অংশ-অত্যন্ত হীন নীচ, প্রত্যাহারযোগ্য। এই দুই প্রকারের পার্থক্য কুরআনের পরিপন্থী— কুরআনে তা হতে পারে না। আর তা-ই হচ্ছে কুরআনের মুজিযার একটি প্রমাণ। কেননা দুনিয়ার বড় বড় উচ্চমানের লেখক সাহিত্যের 'কালাম' কুরআনের যে-কোন দীর্ঘ সূরার মতো হলে তাতে অমিলের পার্থক্য অনিবার্য হয়ে পড়বে। আর তৃতীয় হচ্ছে, সামঞ্জস্যহীনতার পার্থক্য, আয়াতের পরিমিতিতে পার্থক্য এবং না সেখ-মনসূখের বিধানে পার্থক্য। আয়াতটিতে কুরআন সম্পর্কে একটি অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপনের উদ্বোধন রয়েছে, এ সব দিকই পরম সত্য প্রমাণ করে, যা বিশ্বাস করা আবশ্যক এবং যে অনুযায়ী আমল হওয়া উচিত।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ -

যদি তারা তা রাসূলের নিকট এবং তাদের মধ্যকার রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলদের নিকট পৌঁছিয়ে দিত তাহলে তা জানতে পারত তারা, যারা তা থেকে সত্য উদ্ঘাটন করতে পারত।

আল-হাসান, কাতাদাহ ও ইবনে আবূ লায়লা বলেছেন, ওরা হচ্ছেন সমাজের মধ্যের ইলম ও ফিকাহ্ পারদর্শী লোকেরা। সুদ্দী বলেছেন, ওরা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও কর্তৃত্বশীল লোকেরা।

আবূ বকর বলেছেন, হতে পারে এ কথার দ্বারা ইলম-ফিকাহ্ পারদর্শী ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীল— এ উভয় শ্রেণীর লোকদেরই বুঝিয়েছেন। কেননা ব্যবহৃত নাম এই উভয় শ্রেণীর লোকদের উপরই প্রযোজ্য।

যদি বলা হয়, 'উলিল আমর' হচ্ছে তারা যারা লোকদের উপর কর্তৃত্ব করার দায়িত্বের অধিকারী। কিন্তু এটা ইল্ম-ফিক্হবিদদের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়।

জবাবে বলা যাবে, আল্লাহ লোকদের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকারী কথা তো বলেন নি। ফিকাহবিদরাও 'উলিল-আমর' হতে পারেন। কেননা তাঁরা আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধের বিধান সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল! আর অন্যদের কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের কথা কবুল করা, মেনে নেয়া। এ কারণে তাদেরকে 'উলুল-আম্র' বলা খুবই সঙ্গত, যেমন অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ -

যেন তারা দ্বীনের সূক্ষ্ম সমঝ-বুঝ অর্জন করে এবং যখন তারা তাদের লোকদের নিকট ফিরে আসবে তখন তাদেরকে সতর্ক করবে এই আশায় যে, সম্ভবত তারা সতর্ক হবে।

এ আয়াতে ফিকাহবিদদের ভীতি প্রদর্শনে ভীত ও সতর্ক হওয়া লোকদের কর্তব্য বলা হয়েছে এবং তাদের জন্যে তাদের কথা গ্রহণকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ কারণে তাদেরকেও

'উলিল-আমর' বলা যায়। অবশ্য শাসক সম্প্রদায়ই 'উলিল-আমর' হওয়ার অধিক উপযুক্ত। কেননা তাদের অধীন লোকদের উপর তাদের আদেশ-নিষেধই কার্যকর হয়ে থাকে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ -

নিশ্চয়ই তা জানবে সে সব লোক, যারা তা থেকে মর্ম উদ্ধার করতে পারবে তাদের মধ্যে থেকে।

আয়াতের 'আল-ইস্তিম্বাত' অর্থ বের করা, উদ্ঘাটন করা। পানি বের করাও এর একটি অর্থ। ঝর্ণধারা প্রবাহিত করাও। যা-ই কোন কিছু থেকে বের করা হয়, তাকেই এই নামে অভিহিত করা চলে। এমন কি ঝর্ণাধারা দেখা; কিন্তু হৃদয়ের গভীর তত্ত্ব জ্ঞান অর্জন-ও এর অর্থ হতে পারে। আর শরীয়তের দৃষ্টিতে 'ইস্তিম্বাত' অর্থ, সমান ঘটনার দলীল দিয়ে সমান ঘটনার জন্যে হুকুম বের করা ও জানতে পারা।

এ আয়াতে দলীল রয়েছে কিয়াস কবুল করা এবং নিত্য ঘটিত ঘটনাবলীতে শরীয়তের হুকুম জানার জন্যে ইজতিহাদ করে রায় নির্ধারণ ওয়াজিব হওয়ার। কেননা তা এমন ব্যাপার যে, তাতে ঘটনাবলীকে রাসূল (স)-এর জীবনকালে সংঘটিত ঘটনাবলীর উপর ফেলে বিবেচনা করা ও সম্ভাব্য হুকুম জানা। বিশিষ্ট আলিমদেরও এ কাজ করা এবং তাঁদের ইন্তেকাল করে যাওয়ার পরও এ কাজ চলতে হবে। রাসূল (স)-এর দরবার থেকে অনুপস্থিত থাকা কালেও তা করতে হবে। অবশ্য তা নিশ্চয়ই সেসব ব্যাপারে ও ক্ষেত্রে হবে যেখানে কোন 'নস' নেই। কেননা যে-বিষয়ে 'নস' রয়েছে তাতে নতুন করে ইস্তম্বাত করে শরীয়তের হুকুম জানার কোন প্রয়োজন পড়ে না। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, যে বিষয়ে 'নস' আছে, তা-ই আল্লাহ্র হুকুম। আর কতক তো 'নস'-এ নিহিত রয়েছে। দলীল ও যুক্তির বলে সে বিষয়ে ইলম লাভ করার দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে হুকুম জানার কাজ আমাদের। ফলে দেখা যাচ্ছে, আয়াতটির বহু কয়টি তাৎপর্য হতে পারে। নিত্য ঘটিত ঘটনাবলীর মধ্যে যে বিষয়ে কোন 'নস' নেই— তবে 'নস' দ্বারা তা প্রমাণ করা বলে, তা সে ভাবেই প্রমান করতে হবে। এ হলো একটি। দ্বিতীয়, আলিমদের কর্তব্য হচ্ছে সেই হুকুম 'ইস্তিনবাত' করা— যে বিষয়ে 'নস' আছে তার উপর ফেলে যাচাই-পরখ ও তুলনা করে তা জানবার জন্যে চেষ্টা করা। আর তৃতীয় হল, নিত্য নতুন সংঘটিত ঘটনাবলী সম্পর্কে আলিমদের ইস্তিনবাত করা হুকুমকে জনগণের মেনে নেওয়া উচিত। এটাই হচ্ছে 'আলিমদের তাক্লীদ'। আর চতুর্থ, নবী করীম (স) নিজেও এ পর্যায়ের হুকুম 'ইস্তিনবাত' করার জন্য আদিষ্ট ও দায়িত্বশীল ছিলেন। দলীল ও যুক্তি প্রমাণের দ্বারা নতুন ঘটনায় শরীয়তের হুকুম জানতে চাওয়ার কাজ তাঁকেও করতে হয়েছিল। কেননা আল্লাহ্ সেই ঘটনাকে রাসূল ও উলিল আম্র এর নিকট নিয়ে যেতে-বা পৌঁছাতে বলে দিয়েছেন। তারপর বলেছেন ঃ

لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ -

নিশ্চয়ই তা জেনে নেবে সে সব লোক যারা তা তাদের মধ্য থেকে ইস্তিনবাত করবে।

কেবল উলুল-আমর-এর কথাই বলা হয়নি, রাসূলেরও সেই দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, 'ইস্তিনবাত' করা ও যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে হুকুম জানতে চেষ্টা করা সকলেরই কর্তব্য।

যদি বলা হয়, ঘটনাবলীতে হুকুম জানার জন্যে এটা ইস্তিনবাত তো নয়। বরং এখানে শত্রুপক্ষের ভয় ও শান্তির সময়ের কর্তব্য বিশেষ। কেননা আল্লাহ্‌র সম্পূর্ণ কথাটি হল ঃ

وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِالْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ -

তাদের নিকট যখন শান্তির বা ভয়ের কোন ব্যাপার এসে পৌঁছায়, তখনই তারা তা প্রকাশ ও প্রচার করে দেয়। অথচ তারা যদি সে ব্যাপারটি রাসূল ও তাদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলদের নিকট পৌঁছাতো, তাহলে যারা তা ইস্তিনবাত করে, তারা জানতে পারত।

এই কথাগুলি সেসব বিক্ষোভকারী সম্পর্কে, যারা মুনাফিক ছিল ও এ সব ক্ষেত্রে তারা ঝগড়া-ফাসাদের সৃষ্টি করত। তাই আল্লাহ্ এ সব 'আমল করতে নিষেধ করেছেন। বরং ব্যাপারটিকে রাসূল (স) ও রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের নিকট পৌঁছাবার আদেশ করেছেন, যেন তারা মুসলিম সমাজের মধ্যে কোন বিভেদ-বিচ্ছেদ ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করতে না পারে। যদি বাস্তবিকই ভয়ের কোন কারণ ঘটে থাকে, তাহলে তা প্রতিরোধ করার দায়িত্ব তো তাদেরই। আর যদি শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যাপার ঘটে থাকে এবং তাদের চেষ্টা থাকে যে, তারা যেন নিরাপত্তা পেতে না পারে, তাহলেই তারা জিহাদের যোগ্যতা হারাবে ও কাফিরদের ভয়ে ভীত হয়ে পড়বে। তাহলে নিত্য নতুন ঘটিত ঘটনাবলীতে শরীয়তের হুকুম ইস্তিনবাত করার কোন কাজ হয় না।

জবাবে বলা যাবে, আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِالْخَوْفِ -

যদি তাদের নিকট শান্তির বা ভয়ের কোন ব্যাপারে খবর আসে .....।

এটা তো কেবল শত্রুদের সাথে ব্যাপারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং মুসলমানদের ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রেও শরীয়তের হুকুম— তা মুবাহ না নিষিদ্ধ, তা জানার ব্যাপারে তো শান্তি ও ভয়ের কারণ ঘটতে পারে। কি জায়েয ও কি নাজায়েয যে প্রশ্নও তো উঠতে পারে। আর এ সব-ই ভয় ও শান্তির ব্যাপার। আয়াতে যে ভয় ও শান্তির কথা বলা হয়েছে তা যে বিশেষভাবে শত্রুর প্রসঙ্গেই হয়, এমন কথা তো আয়াতে বিশেষভাবে বলা হয়নি। আর তা কেবল মুনাফিকদের সৃষ্ট শান্তি ও ভয়ের কথাও বলা হয়নি। তাই সে ভয় ও শান্তির ব্যাপার সাধারণভাবে সর্ব ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে। আর সাধারণ লোকের মনে শরীয়তের হুকুমের প্রশ্নে তা নিষিদ্ধ না মুবাহ সে প্রশ্ন দেখা দেয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। আর সেই জন্যেই ব্যাপারটি রাসূল ও উলুল আমর-এর নিকট ফিরিয়ে দিতে বলা হয়েছে, যেন তারা যুক্তির সাহায্যে ও 'নস্' যে বিষয়ে তার দৃষ্টান্ত সামনে রেখে হুকুম ইস্তিনবাত করা সম্ভব হয়। উপরন্তু আমরা যদি তোমার

কথা মেনেও নেই যে, আয়াতটি বিশেষভাবে শত্রুপক্ষ সংশ্লিষ্ট ভয় ও শাস্তির প্রসঙ্গেই নাযিল হয়েছে, তবুও আমরা যা বলেছি, তাতেও প্রমাণ যথারীতি বিরাজ করছে। কেননা জিহাদের কলা-কৌশল উদ্ভাবন ও শত্রুর ষড়যন্ত্র জাল ছিন্ন করার উপায় উদ্ভাবন করতেই হয়, কখনও ভয়ে পেছনে সরে যেতে হয় আর কখনও অগ্রবর্তী হতে হয়, আর তৃতীয় কখনও শত্রুকে ছেড়েও দিতে হয়, আর এই সব অবস্থায়ই আমাদেরকে আল্লাহ্‌র বান্দা হিসেবে তাঁর বিধান পালনকারী হয়ে কাজ করতে হয়। আর এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকর্তাদের উপরই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তাদেরকেই সে জন্যে ইজতিহাদ করতে হয়। তাই প্রমাণিত হল যে, নিত্য ঘটিত ঘটনাবলীতে শরীয়তের হুকুম ইজতিহাদের মাধ্যমে জানতে চেষ্টা করা যুদ্ধ কৌশল ও শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রতিরোধের ব্যাপার। কাফিরদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ব্যাপার। তাই এ পর্যায়ের ইজতিহাদ ও ইবাদতসমূহের ক্ষেত্রে ইজতিহাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই, শরীয়তের খুটিনাটি ব্যাপারে হুকুম জানার ব্যাপারও তাই। কেননা এসবই আল্লাহ্‌র হুকুমের ব্যাপার। এ সব ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করতে নিষেধ করা নতুন বিষয়ে শরীয়তের হুকুম ইস্তিনবাত নিষিদ্ধ করা ঠিক সেই রকমের ব্যাপার, যেমন কেউ বিশেষভাবে ক্রয়-বিক্রয়ে ইস্তিনবাত করাকে মুবাহ মনে করল আর বিবাহ শাদীর ক্ষেত্রে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। অথবা নামাযের ক্ষেত্রে তা মুবাহ বলল, কিন্তু হজ্জের ক্ষেত্রে তা নিষিদ্ধ করল। কিন্তু এরূপ কথা অচল।

যদি বলা হয়, কেবল কিয়াস ও ইজতিহাদেই তো ইস্তিনবাত সীমাবদ্ধ নয়, সেসব দলীলের সাহায্য গ্রহণ ছাড়া, যার ভাষার দিক দিয়ে একটি অর্থই হতে পারে।

জবাবে বলা যাবে যে, দলীলের ভাষার দিক দিয়ে কেবল একটি অর্থই হয়, ভাষাবিদদের মধ্যে তা নিয়ে কোন ঝগড়ার সৃষ্টি হয় না। কেননা শব্দের অর্থের ব্যাপারে তা-ই যুক্তিসঙ্গত। তাহলে এটা তো কোন 'ইস্তিনবাত' হল না। বরং তা হল কথা থেকেই বুঝতে পারা তাৎপর্য। আমাদের মতে তা আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ 'এবং তাদের দুজনের জন্যে উহ্ বল না'-র মতোই। এ আয়াতে পিতা-মাতাকে মারধোর করতে, গালাগালি দিতে ও হত্যা করা নিষেধ করা হয়েছে— এ ধরনের অন্যান্য কাজসহ। কিন্তু তাতে অনুরূপ ক্ষেত্রে কোন মতপার্থক্য ঘটে না। যে দলীলের একটি অর্থ হয় বলে যদি এই ধরনের দলীলের কথা মনে করে থাক, তাহলে তাতে কোন ঝগড়ার সৃষ্টি হয় না। তাতে কোন ইস্তিনবাদেরও প্রয়োজন হয় না। আর দলীল বলতে কোন জিনিসকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যদি বুঝে থাক, তাহলে প্রমাণ হবে যে, তার বিপরীতের হুকুমও সে হুকুমের বিপরীত। কিন্তু এটা তো কোন দলীল হল না। 'উসুলুল ফিকাহ' গ্রন্থে আমরা তো সবিস্তারে বলেছি। এ যদি এক ধরনের দলীল হয়, তাহলে সাহাবাগণ এ বিষয়ে নিশ্চয়ই অবহিত থাকতেন না এবং ঘটনাবলীর হুকুম জানার জন্যে অন্যভাবে নিশ্চয়ই যুক্তি উপস্থাপন করতেন না। আর তাঁরা যদি এ দলীলটিকে ব্যবহার করতেন, তাহলে তো তাদের দ্বারা সকলেরই নিকট পরিচিত হতো। কিন্তু তাদের থেকে তা যখন বর্ণিত হয়নি, তখন তোমার কথা গ্রহণীয় প্রমাণিত হল না। উপরন্তু এটা যদি এক প্রকারের দলীল উপস্থাপন হতো, তাহলে যে যে ক্ষেত্রে রায় ও কিয়াসের উপায় ছাড়া হুকুম ইস্তিনবাত করার অন্য কোন পথ নেই— প্রত্যকটি স্বতন্ত্র ঘটনায় স্বতন্ত্রভাবে এ ধরনের দলীল পাওয়া সম্ভবও নয়— অথচ যে যে ক্ষেত্রে 'নস' পাওয়া যাবে না, যেসব ক্ষেত্রে ইস্তিনবাত করার জন্যে আমরা রীতিমত আদিষ্ট,

তাই যেসব ঘটনায় এ ধরনের দলীল পাব না, সেসব ক্ষেত্রে কিয়াস ও ইজতিহাদের মাধ্যমে তার হুকুম ইস্তিনবাত করা আমাদের জন্যে কর্তব্য। কেননা এ উপায় ছাড়া সেখানে আমাদের জন্যে আর কোন পথ উন্মুক্ত নেই।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্ যখন বলেছেন ঃ

لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ -

অবশ্যই তা জানবে তারা, যারা তা থেকে ইস্তিনবাত করবে।

তখন কিয়াসের দলীল আমাদেরকে তার দ্বারা প্রমাণিত ইল্‌ম পর্যন্ত পৌঁছবে না। কেননা কিয়াসকারী নিজেই নিজের উপর ভুল করে বসতে পারে। তার ইজতিহাদ ও কিয়াস তাতে যেখানে পৌঁছিয়েছে তা-ই আল্লাহ্র নিকট থেকে পাওয়া প্রকৃত সত্য, তা নিশ্চয় করে কিছুতেই বলা যায় না। এ থেকে আমরা বুঝলাম যে, এখানে নিশ্চয়ই কিয়াস ও ইজতিহাদের মাধ্যমে ইস্তিনবাত করার কথা বলা হয়নি।

জবাবে বলা যাবে, তোমার কথা ঃ কিয়াসকারী নিজেই নিশ্চিত করে বলতে পারে না যে, সে কিয়াস করে যা পেয়েছে তা-ই আল্লাহ্র নিকট-ও সত্য— এ কথা ভুল, আমরা তা বলব না। তা এজন্যে যে, ইজতিহাদের পথটা-ই হচ্ছে এই যে, মুজতাহিদকে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে, তার ইজতিহাদ যা প্রমাণ করেছে, তা অবশ্যই অকাট্য এবং আল্লাহ্র নিকট-ও তা-ই সত্য। আমাদের জানামতে এটাই আল্লাহ্র হুকুম। তাই ঘটনাবলী পর্যায়ে ইজতিহাদের মাধ্যমে পাওয়া হুকুম সহীহ্ ইলম দান করে এবং তার ইজতিহাদ যা পেয়েছে তা সহীহ্। যারা ইমামত সংক্রান্ত মতে বিশ্বাসী তাদের কথা যে বাতিল, তা আলোচ্য আয়াতও প্রমাণ করে। কেননা দ্বীন সংক্রান্ত সব হুকুম সম্পর্কেই যদি 'নস' থাকে, তাহলে তা ইমাম অবশ্য জানবে। আর তাহলে ইজতিহাদ ও ইস্তিনবাত করার কোন অবকাশই ইসলামে থাকে না। আর 'উলুল আমর'-এর নিকট কোন কিছু পৌঁছানোর আদেশ-ও অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। বরং তা ইমামের নিকটই পৌঁছানো কর্তব্য হয়। কেননা ইমাম তো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 'নস' দ্বারা সহীহ্ কোন্‌টি আর বাতিল কোন্‌টি তা অবহিত আছে-ই।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا -

তোমরা যদি কোন প্রকারের সালাম দ্বারা সম্বর্ধিত হও, তাহলে তোমরা তার চাইতে উত্তম সালাম দিয়ে অথবা সেটাই ফিরিয়ে দিয়ে সালাম কর।

আভিধানিকরা বলেছেন ঃ اَلتَّحِيَّةُ অর্থ الملك, লোকদের কথা ঃ حَيَّاكَ اللّٰهُ-এর অর্থ ঃ আল্লাহ্ তোমাকে বাদশাহ বানাক। সালাম-ও এর অর্থ। কেননা আরবরা বলত ঃ حَيَّاكَ اللّٰهُ 'আল্লাহ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখুন।' ইসলামের যুগে এটা পরিবর্তন করে সালাম-এর প্রচলন করা হয়েছিল এবং আগের কথার স্থানে এটা চালু হয়ে গেল।

হযরত আবূ যর আল-গিফারী বলেছেন, আমিই সর্ব প্রথম রাসূলে করীম (স)-এর ইসলামের নতুন চালু সংবর্ধনা বাক্য দ্বারা সংবর্ধিত করি। আমি বললাম ঃ আস্সালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আগের 'আল্লাহ্ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখুন' এই দো'আ মূলক সংবর্ধনার পূর্বে বলা হতো مَلَكَ اللّٰهُ 'আল্লাহ্ তোমাকে মালিক বানাক'-এর পর উপরোক্ত আয়াতকে আমরা যখন তা প্রকৃত বাস্তবতার আলোকে গ্রহণ করলাম, বোঝা গেল, যে লোক অন্যকে কোন জিনিসের মালিক বানায়, কোন বিনিময় ছাড়া-ই দেবে, তার অধিকার আছে মত বদলানোর যতক্ষণ তা হস্তান্তরিত না হবে। হস্তান্তরিত হয়ে গেলে তখন আর মত বদলানোর সুযোগ থাকবে না। কেননা সে জিনিসটি যখন নিয়ে আসা হল, তখন দুটি জিনিসের একটি ওয়াজিব করে দিয়েছে। নবী করীম (স) থেকে 'হেবা'য় মত বদলানোর ব্যাপারে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তা মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, সুলায়মান ইবনে দাউদ আস-সহ্রী ইবনে অহব, উসামা ইবনে যায়দ, আমর ইবনে শুয়ায়ব তার পিতা— তাঁর দাদা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

مَثَلُ الَّذِىْ يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِىءُ فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ -

যে লোক দান করা জিনিস ফিরিয়ে নেয়, সে সেই কুকুরের মত— যে বমি করে এবং নিজেই সেই বমি খায়।

তাই দানকারী যখন তার দান ফেরত নিতে চায়, তখন যেন সে থেমে যায় এবং যে জিনিস সে ফেরত নিচ্ছে, তাকে যেন লোকদের নিকট পরিচিত করে। পরে সে যেন যা দান করেছিল তা তাকে দিয়ে দেয়।

আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বাতা-আকী' ইবরাহীম ইবনে ইস্মাইল ইবনে মজম'— আমর ইবনে দীনার আবূ হুরায়রাতা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) বলেছেন ঃ

اَلرَّجُلُ اَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يَثُبْ مِنْهَا -

প্রত্যেক ব্যক্তি তার হেবা হস্তান্তরিত না করা পর্যন্ত সে তা পাওয়ার অধিকারী।

ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَايَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِىْ عَطِيَّةً اَوْ يَهِبُ هِبَةً فَيَرْجِعُ فِيْهَا اِلَّاالْوَالِدُ فِيْمَا يُعْطِىْ وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِىْ يُعْطِى الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَاِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَفِىْ قَيْئِهِ -

কোন ব্যক্তি কাউকে কোন দান দেবে বা কোন জিনিস হেবা করবে তার পরে মত পরিবর্তন করে তা ফিরিয়ে নেবে— এই কাজ কারোর জন্যেই হালাল নয়। তবে পিতা যদি তার সন্তানকে কোন জিনিস দেয়, তাহলে তার কথা ভিন্ন। যে ব্যক্তি কাউকে কোন জিনিস দেয়

পরে তাতে মত পরিবর্তন করে— না দেয়ার সিদ্ধান্ত করে, তাহলে সে সেই কুকুরের মত যে খায়— যখন পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয় তখন সে তা বমি করে ফেলে। পরে সে তার বমিতেই ফিরে আসে।

এই হাদীসটি দুটি তাৎপর্য প্রমাণ করে। একটি, 'হেবা' বা দানের মত বদলানো সহীহ্। আর দ্বিতীয়, তা মকরূহ এবং তা নিন্দনীয় চরিত্র ও চরম মাত্রার হীনতা-নীচতা।

তা এজন্যে যে, হেবায় মত পরিবর্তন করাকে সেই কুকুরের সাথে সাদৃশ্য দেখান হয়েছে যে তার বমিতে ফিরে আসে— বমি করা জিনিস পুনরায় ভক্ষণ করে। তা যেমন বলেছি— দুটি দিক দিয়ে প্রমাণিত হয়। একটি হল কুকুর যখন তার বমি করা জিনিস খায়, তখন তার সাথে তার সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। আর এ কাজ কুকুরের জন্যে যে হারাম নয়, তা তো জানা কথা। অতএব তার সাথে যাকে তুল্য করা হয়েছে সে তারই মত। আর দ্বিতীয়, হেবা'য় মত বদলানো যদি কোন অবস্থায়ই সহীহ না হতো, তাহলে তাকে বমিতে ফিরে আসা কুকুরের সাথে তার সাদৃশ্য দেখানো হতো না কখনই। কেননা যা আদৌ ঘটে না তার সাথে কোন জিনিসের সাদৃশ্য দেখানো জায়েয হয় না। তাহলে বোঝা গেল, তা কখন-ও না কখন-ও ঘটে। আর তাই প্রমাণ করে যে, হেবায় মত বদলানো সহীহ্— যদিও এ কাজ অত্যন্ত ঘৃণার্হ ও জঘন্য। যবীল আরহাম ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে হেবায় মত বদলানোর বিষয় হযরত আলী ও উমর (রা) এবং ফুযালা ইবনে উবায়দ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাতে কোন সাহাবী রাদীয়াল্লাহু আনহুম থেকে ভিন্নমত প্রকাশিত হয়নি। আগের মনীষীদের বিপুল সংখ্যক থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এ ব্যাপরটি সালামের জবাব দেয়ার পর্যায়ে গণ্য। এঁদের মধ্যে যাবির ইবনে আবদুল্লাহ উল্লেখ্য। আল-হাসান বলেছেন, সালাম দেয়া নফল বা মুস্তাহাব; কিন্তু তার জবাব দেয়া ফরয। একথা প্রমাণের জন্যে আলোচ্য আয়াতটির উল্লেখ করা হয়েছে। পরে তা নিয়ে বিভিন্ন মত হয়েছে এ প্রশ্নে যে, তা বিশেষভাবে মুসলিমদের জন্যে না মুসলিম ও কাফির সকলের জন্যে সাধারণ নিয়ম! আতা বলেছেন, তা-সালাম দেয়া— জবাব দেয়া— বিশেষভাবে মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইবনে আব্বাস, ইবরাহীম ও কাতাদাহর মত হল, তা উভয় শ্রেণীর লোকদের জন্যে সাধারণভাবে চলবে। আল-হাসান বলেছেন, কাফিরের সালামের জবাবে শুধু وَعليكم 'এবং তোমাদের উপর-ও' বলবে। 'ওরা-রহমাতুল্লাহ' কখনই বলবে না। কেননা কাফিরদের জন্যে 'ইস্তিগফার'— গুনার মাফী চাওয়া জায়েয নয়। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

لَاتَبْدَؤُا الْيَهُوْدَ بِالسَّلَامِ فَانْ بَدَؤُكُمْ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ -

তোমরা আগে-ভাগেই ইয়াহুদীদের সালাম করবে না। ওরা যদি প্রথমেই সালাম দেয়, তাহলে জবাবে শুধু 'তোমাদের উপর-ও' বলবে।

আমাদের হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, সালামের জবাব 'ফরযে-কিফায়া'। বহু সংখ্যক লোকের প্রতি সালাম করলে তাদের মধ্য থেকে মাত্র এক জানের জবাব দেয়াই যথেষ্ট।

আর আল্লাহ্র কথা ঃ بِأَحْسَنَ مِنْهَا 'তার চাইতেও উত্তম।' এ কথাটি যদি সালামের জবাব প্রসঙ্গে বলা হয়ে থাকে, তাহলে তার অর্থ হবে, দো'আর মাত্রা বৃদ্ধি। আর তাহল, যখন বলবে ঃ 'আস্-সালামু আলাইকুম', তখন জবাবে বলবে ঃ ওয়া-আলাইকুমুস সালাম-ওয়া রহমাতুল্লাহ। আর যদি বলে ঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়া-রহমাতুল্লাহ' তাহলে জবাবে বলবে ঃ 'ওয়া-আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ ওয়া-বারাকাতাহু।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا -

মুনাফিকদের দুটি বাহিনীর ব্যাপারে তোমাদের বক্তব্য কি ? আল্লাহ তাদের কর্মফলে তাদেরকে উল্টিয়ে দিয়েছেন।

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল এমন লোকদের প্রসঙ্গে, যারা মক্কায় ইসলাম গ্রহণ প্রকাশ করেছিল, অথচ তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য সহযোগিতা করছিল। কাতাদাতা থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। আল-হাসান ও মুজাহিদ বলেছেন, আয়াতটি নাযিল হয়েছিল এমন লোকদের সম্পর্কে, যারা মদীনায় এসে বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করেছিল। পরে তারা মক্কায় ফিরে গিয়েছিল এবং সেখানে তারা শিরক অবলম্বন করল। জায়দ ইবনে সাবিত (রা) বলেছেন, এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল ওহুদ যুদ্ধে রাসূল (স)-এর পেছনে থেকে যাওয়া লোকদের প্রসঙ্গে। তারা বলেছিল, যুদ্ধ হবেই তা জানতে পারলে আমরা নিশ্চয়ই আপনাদের সঙ্গে যেতাম।

কিন্তু আয়াতের ধরন-বিন্যাসে এই শেষ ব্যাখ্যার বিপরীত দলীল রয়েছে। আসলে ওরা মক্কার লোক ছিল, ওদের সম্পর্কেই আল্লাহ্র এই কথাটি ঃ

فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

ওরা আল্লাহ্র পথে হিজরত না করা পর্যন্ত ওদের মধ্য থেকে কোন লোককে বন্ধু পৃষ্ঠপোষকরূপে গ্রহণ করবে না।

আল্লাহ্র কথা ঃ أَرْكَسَهُمْ —ওদেরকে উল্টিয়ে দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস (রা) এ অর্থ বলেছেন। কাতাদাহ বলেছেন, এর অর্থ ঃ ওদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। অন্যান্য মনীষীরা বলেছেন, উল্টিয়ে ফেলেছেন। নাসায়ী বলেছেন, أَرْكَسَهُمْ ও رَكَسَهُمْ এর একই অর্থ। আর তার তাৎপর্য হচ্ছে তাদেরকে কুফরীতে ফিরিয়ে দেয়া— ছোট ও হীন লাঞ্ছিত করা। বলা হয়েছে, তাদেরকে বন্দী করা, হত্যা করা। কেননা প্রথমে ছিল মুনাফিক, পরে পুরা মুরতাদ হয়ে গেল। তাদেরকে মুনাফিক হিসেবে পরিচিত করা হয়েছে। পরে তারা ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়। কেননা পূর্বে তারা কুফর মনের মধ্যে লুকিয়া রাখত, পরে তাদেরকে সেই কুফর ও শির্ক-এর মধ্যে নিক্ষিপ্ত গণ্য করেছে। এটা আল-হাসানের ভাষ্য। আরবী ব্যাকরণবিদরা বলেছেন, শব্দের প্রথমে 'আলিফ' ও 'লাম' দ্বারা যে নির্দিষ্ট পরিচিত করা হয়েছে তা সত্ত্বেও এটা

ভাল। যেমন বলা হয় هٰذه العَجُوزَ —এই বৃদ্ধ, অথচ সে যুবতী, যুবতী ছিল। তাকে 'এই যুবতী' বলা সঙ্গত নয়। আল্লাহ্ এ আয়াতটি দ্বারা মুসলমানদেরকে অবহিত করেছেন এই মুনাফিক গোষ্ঠীর অবস্থা সম্পর্কে। ওরা তোমাদের নিকট ইসলামের প্রতি বিশ্বাস প্রকাশ করে, কিন্তু পরে ওরা যখন ওদের লোকজনের নিকট ফিরে যায়, তখন তাদের কাফির মুরতাদ হওয়ার কথা প্রকাশ করে। ওদের সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখতে আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন ওদের পক্ষ হয়ে বিসম্বাদ করতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُوْنَ سَوَاءً -

ওরা অন্তর দিয়ে কামনা করে তোমরা যদি কুফর গ্রহণ করতে, তাহলে তোমরা ওদের সাথে সমান-সমান ও একাকার হয়ে যেতে।

অর্থাৎ এই লোক-সমষ্টির মন-মানসিকতা ও আকীদা-বিশ্বাস প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে, যেন মুমিনরা ওদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করতে শুরু না করে, ওদের বদ-অভ্যাসের কথা যেন তারা সত্য জানে এবং ওদের সাথে সম্পর্ক যেন ছিন্ন করে।

আল্লাহ্র কথা ঃ তোমরা ওদের মধ্য থেকে বন্ধু— পৃষ্ঠপোষক রূপে গ্রহণ করবে না, যতক্ষণ ওরা হিজরত না করে অর্থাৎ ওরা মুসলিম না হলে ও হিজরত না করলে ..... কেননা ইসলাম গ্রহণের পর হিজরত করা জরুরী। ওরা ইসলাম কবুল করলেও হিজরত না করা পর্যন্ত ওদের সাথে আমাদের মুসলমানদের কোন বন্ধুত্বের সম্পর্কে হতেই পারে না। অপর আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে ঃ

مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوا -

ওরা যতক্ষণ হিজরত না করবে ওদের সাথে কোন বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা তোমাদের জন্যে জায়েয নয়। (সূরা আনফাল ঃ ৭২)

এই আয়াতটির প্রয়োগ ছিল তখন, যখন হিজরত ফরয ছিল। নবী করীম (স) বলেছিলেন ঃ

أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ أَقَامَ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِيْنَ، وَأَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ أَقَامَ مَعَ مُشْرِكٍ -

মুশরিকদের মধ্যে অবস্থানকারী প্রত্যেক মুসলিমের সাথে আমি সম্পর্কহীন, দায়িত্বমুক্ত। যে মুসলিমই মুশরিকদের মধ্যে অবস্থান নিয়েছে, তার দায়িত্ব আমার উপর নয়। এই কথা শুনে প্রশ্ন তোলা হয়, কেন হে রাসূল ?

জবাবে তিনি বলেন, এ দুই ব্যক্তির আগুন তো দেখা যাচ্ছে না। এ ভাবে মক্কা বিজয় কাল পর্যন্ত হিজরত ফরয ছিল। তার পরে এই ফরয বাতিল হয়ে যায়।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ-উসমান ইবনে আবূ শায়বা—জরীর-মনসূর-মুজাহিদ-তায়ূস ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূল (স) বলেছেন ঃ

يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَاهِجْرَةَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَاِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفِرُوْا -

মক্কা বিজয়ের দিন থেকে আর হিজরত নেই। অতঃপর আছে জিহাদ ও জিহাদের নিয়্যত। এক্ষণে যখনই তোমাদেরকে যুদ্ধে শরীক হওয়ার আহ্‌বান জানানো হবে, তখন তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়বে।

মুহাম্মাদ ইবনে আবূ দাউদ— মুসিল ইবনুল ফযল আল-অলীদ-আওজায়ী জুহ্‌রী আতা ইবনে ইয়াযীদ আবূ সাঈদুল খুদরী সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, একজন আরব বেদুঈন নবী করীম (স)-এর নিকট হিজরত সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছেন ঃ

وَيْحَكَ اِنَّ شَانَ الْهِجْرَةِ شَدِيْدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ ؟ قَالَ نعم، قَالَ فَهَلْ تُؤَدِّيْ صَدَقَتَهَا ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَّرَاءِ الْبِحَارِ فَاِنَّ اللّٰهَ لَنْ يَّتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا -

তোমার মন্দ হোক। হিজরত বড়ই কঠিন কাজ। তাহলে তোমার কোন উট আছে? বলল আছে। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি তার যাকাত দাও? বললে, হ্যাঁ, দেই। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ তাহলে তুমি সমুদ্রের ওধারে কাজ করতে থাক। আল্লাহ্ তোমার কাজ থেকে একবিন্দু ছেড়ে দেবেন না।

এ হাদীসে হিজরত না করাকে নবী করীম (স) মুবাহ করেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে বকর আবূ দাউদ মুহাম্মদ-ইয়াহ্‌য়া ইসমাঈল ইবনে আবূ খালিদ আমের সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রা) এর নিকট এসে বলল, আপনি রাসূল (স) থেকে শুনেছেন এমন কিছু কথা আমাকে বলুন। তখন তিনি বললেন ঃ

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لِلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ -

আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, মুসলিম তো সেই ব্যক্তি, যার মুখের জবান ও হাত থেকে অন্যান্য মুসলিমরা নিরাপদে থাকবে। আর মুহাজির-হিজরতকারী তো সে, যে আল্লাহ্‌র নিষেধ করা কাজ পরিহার করল।

আল-হাসান থেকে বর্ণিত, উপরে উদ্ধৃত আয়াতের হুকুম এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যেই প্রযোজ্য, যে দারুল হরব— কাফিরদের দেশে— অবস্থান নিয়েছে। এতে দেখা গেল, দারুল ইসলাম ইসলামের রাজ্যে হিজরত করে যাওয়া এখনও ফরয বলবত আছে।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ -

অতঃপর তাদেরকে ধর ও হত্যা কর।

কেননা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত এর অর্থ, তারা যদি হিজরত করা থেকে পৃষ্ট প্রদর্শন করে।

আবূ বকর বলেছেন, এর অর্থ, ওরা যদি ঈমান ও হিজরত থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করছে— ঈমান ও হিজরত দুটো কথাকেই এক সাথে শামিল করে আছে।

আর আল্লাহ্‌র কথা فَاِنْ تَوَلَّوْا 'ওরা যদি পৃষ্ঠা প্রদর্শন করে' .... এই ঈমান ও হিজরত দুটোর প্রতি ইঙ্গিত করে। কেননা এ সময় যদি কেউ ইসলাম কবুল করে; কিন্তু হিজরত না করে, তাহলে ঠিক সেই সময়ই তাকে হত্যা করা ওয়াজিব হবে না। বোঝা গেল, فَاِنْ تَوَلَّوْا ওরা ফিরে গেলে— অর্থাৎ ঈমান ও হিজরত করা থেকে, তাহলে তখন তাদেরকে ধর ও হত্যা কর।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ -

তবে তারা যদি এমন লোকদের সাথে মিলে যায়, যাদের ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে ..

আবূ উবায়দ বলেছেন ঃ يَصِلُوْنَ শব্দের অর্থ হচ্ছে, তাদের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হয়ে যায়। আবূ বকর বলেছেন, এই সম্পর্কিত হওয়ার ব্যাপারটি রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে হতে পারে, হতে পারে কিরা-কসম ও চুক্তির ভিত্তিতে, বন্ধুর মৈত্রীর চুক্তির ভিত্তিতে। তাতে যে কোন ব্যক্তি শামিল হতে পারে তার সময়ে, যেমন রাসূলে করীম (স) ও কুরায়শদের মধ্যে সন্ধি-চুক্তির মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, এরই ফলে বনু খুজায়া রাসূলে করীম (স)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। আর বনু কিনানা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল কুরায়শদের সাথে। আর একটি মত হচ্ছে, আয়াতটি মনসূখ। জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ওয়াসেতী জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ইয়ামান-আবূ উবায়দ-হাজ্জাজ-ইবনে জুরাইয ও উসমান ইবনে আতা আল-খুরাসানী ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا -

'আল্লাহ্ তাদের উপর তোমাদের জন্যে কোন পথ বানান নি' পর্যন্ত এবং আল্লাহ্‌র কথা ঃ

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ -

যেসব লোক দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে

তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের সাথে তোমরা ভালো আচরণ করবে ও সুবিচার-ন্যায়পরতা করবে— তা থেকে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না।

(সূরা মুমতাহিনা ঃ ৮

এসব মনসূখ করে দিয়েছে এ আয়াতটি ঃ

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلَى الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ -

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিক থেকে সম্পর্কহীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছ তাদের প্রতি .......' (সূরা তওবা ঃ ১)

وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ -

যারা জানে তাদের জন্যে আমরা আয়াতসমূহকে আলাদা আলাদা করে বলছি ....... পর্যন্ত।

(সূরা তওবা ঃ ১১)

সুদ্দী বলেছেন, اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ। তবে যারা মিশে সম্পর্কিত হয়েছে সেই লোকদের সাথে যাদের ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি আছে ....'

এর অর্থ, যে লোকদের সাথে তোমাদের নিরাপত্তা ও যুদ্ধহীনতার চুক্তি রয়েছে তাদের মধ্যে যারা দাখিল হয়ে যাবে, তাদের জন্যে তার থেকে তা-ই হবে যা তাদের জন্যে রয়েছে।

আল-হাসান বলেছেন, ওরা হল বনূ মুদলাজ। তাদের ও কুরায়শদের মধ্যে এবং রাসূল (স) ও কুরায়শদের মধ্যে চুক্তি হয়েছিল। তাই আল্লাহ বনু মুদলাজ থেকে সেই কাজ হারাম করে দিয়েছেন, যা কুরায়শদের থেকেও হারাম করে দিয়েছিলেন।

আবূ বকর বলেছেন, ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান তার ও কোন কাফির জনগোষ্ঠীর মধ্যে যদি চুক্তি করে তাহলে তাতে অবশ্যম্ভাবীরূপে সেসব লোক-ই দাখিল হবে, যারা রেহমী সম্পর্ক বা কিরা-কসম অথবা বন্ধুত্ব প্রীতির সম্পর্কে সম্পর্কিত হবে— যারা তাদের আওতার মধ্যে ও সাহায্য সহযোগিতার মধ্যে গণ্য থাকবে। যারা অন্যান্য লোকদের মধ্যে গণ্য, তারা এ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে না তার শর্ত না করা পর্যন্ত। চুক্তিবদ্ধদের মধ্যে অন্যান্য যে গোত্রের শামিল হওয়ার শর্ত করা হবে, সে অবশ্যই সে চুক্তির মধ্যে শামিল হবে— যদি চুক্তিটা তার উপর সম্পাদিত হয়। যেমন বনু কিনানা কুরায়শদের সাথে চুক্তিতে শামিল ছিল। যে লোক বলেছেন, এ নিয়ম মনসূখ, তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, মুশরিকদের সাথে চুক্তি ও তাদের সাথে বন্ধুত্ব-প্রীতির সম্পর্ক মনসূখ হয়ে গেছে আল্লাহ্‌র এ কথার দ্বারা ঃ

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ -

মুশরিকদের হত্যা কর যেখানেই তাদেরকে পাও। (সূরা তওবা ঃ ৫)

আল্লাহ্‌র এই কথাই এখন কার্যকর। কেননা আল্লাহ ইসলাম ও মুসলিমদের শক্তিশালী করে দিয়েছেন। তাই তাদেরকে আরব মুশরিকদের কাছ থেকে ইসলাম ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ না

করতে আদেশ করা হয়েছে অথবা তরবারি দিয়েই চূড়ান্ত ফয়সালা হবে আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ অনুযায়ী।

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ -

মুশরিকদের হত্যা কর যেখানেই তাদেরকে পাবে। তাদেরকে ধর, তাদেরকে পরিবেষ্টিত কর এবং প্রতিটি ঘাটিতেই তাদের প্রতি ওঁৎ পেতে বসে থাক। পরে তারা যদি তওবা করে ও নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। (সূরা তওবা ঃ ৫)

আরব মুশরিকদের ব্যাপারে এই হুকুম প্রমাণিত ও স্থায়ী। এ আয়াতের দ্বারা অব্যাহতি দেয়া, সন্ধি করা এবং তাদেরকে কুফর-এর উপর স্থিতিশীল হয়ে থাকা প্রভৃতি সব মনসূখ হয়ে গেছে। আর আহলি কিতাব লোকদের ব্যাপারে তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে আমরা আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ তারা ইসলাম গ্রহণ না করবে, অথবা জিযিয়া দিতে শুরু না করবে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ...... حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ -

তোমরা যুদ্ধ কর তাদের বিরুদ্ধে, যারা এক আল্লাহ্‌র প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে না, .... যতক্ষণ তারা নিজেদের হাতে বশ্যতা স্বীকার করে জিযিয়া না দেবে।
(সূরা তওবা ঃ ২৯)

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানদের জন্যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদিগকে কুফর-এই উপর স্থিতিশীল হয়ে থাকতে দেয়া জায়েয নয়, যতক্ষণ তারা জিযিয়া দিতে শুরু না করবে। আরবের মুশরিকরা প্রায় সকলেই সাহাবীদের সময়ে ইসলাম কবুল করেছিল। তাদের মধ্যে যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, তাদেরকে হত্যা করা হয়। যারা বেঁচে গিয়েছিল তারা ইসলামে ফিরে এসেছিল। কাফিরদের সাথে চুক্তি করা জিযিয়া ও যিম্মী না হওয়া ছাড়া-ই মনসূখ হয়ে গেছে, তার এটাই সহীহ্ কারণ। আল্লাহ ইসলামকে শক্তিশালী করেছিলেন এবং মুসলমানদের মুশরিকদের উপর বিজয়ী করে দিয়েছিলেন। তাই তারা তাদের সাথে কোনরূপ সন্ধি ও চুক্তি করার মুখাপেক্ষী থাকেনি, অতঃপর হয় তারা ইসলাম কবুল করবে, না হয় বশ্যতা স্বীকার করে জিযিয়া দেবে। তবে অবস্থা যদি কখনও এমন হয় যে, মুসলমানরা অক্ষম হয়ে পড়েছে, কাফিরদের মুকাবিলা বা প্রতিরোধ করতে পারে না, বা তাদের নিজেদের ও তাদের সন্তানদের ব্যাপারে তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হয়, তখন সেই অবস্থায় শত্রুদের অব্যাহতি দান ও সন্ধি করা— জিযিয়া আদায় করতে বাধ্য না করা জায়েয হতে পারে। কেননা তারা যখন শত্রুর মুকাবিলায় শক্তিশালী হবে, তাদের উপর প্রভাব ও কর্তৃত্ব করতে সক্ষম হবে, তখন তাদের সাথে কোনরূপ চুক্তি করা নিষিদ্ধ। ইসলামের প্রাথমিক যুগে সেইরূপ অবস্থা ছিল বলে তখন তা করা জায়েয ছিল। এই কারণের দরুনই তা নিষিদ্ধ ছিল। আর পরে এই কারণ যখন দূর হয়ে গেল, তখন

ব্যাপারটি সেই অবস্থায় এসে গেল, যে অবস্থায় মুসলমানরা আগে ছিল। তখন শত্রুদের ভয়ে তারা সব সময় আতংকগ্রস্ত ছিল। যবীল আহ্কামকে ওয়ারিস বানানোর পর চুক্তির কারণে মীরাস দেয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই যখন যবীল আরহাম ওয়ারিস কেউ থাকে না, তখন চুক্তির মাধ্যমে ওয়ারিস হওয়া জায়েয হয়।— আলোচ্য ব্যাপারটিও ঠিক তেমনি।

আল্লাহ্র কথা ঃ

اَوْجَاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْيُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ -

অথবা তারা তোমাদের নিকট এলো এ অবস্থায় যে, তাদের বক্ষ সংকীর্ণ হয়ে গেছে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে; কিংবা যুদ্ধ করবে তাদের লোকজনের বিরুদ্ধে .....

আল-হাসান ও সুদ্দী বলেছেন, 'তাদের অন্তর তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে সংকীর্ণ হয়ে গেছে।' الحصور। অর্থ সংকীর্ণ হওয়া। পাঠের কাজে সংকীর্ণতা, কেননা সেখানে সব মত ও পথ সংকীর্ণ হয়ে গেছে। ফলে তার পাঠের প্রতি লক্ষ্য দেয়া হয়নি। বন্দীকে الحصور। বলা হয়।

ইবনে আবূ নূজাইহ্ মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন, হিলাল ইবনে উয়াইমার আল-আসলমী বলেছেন, মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে যাদের অন্তর সংকীর্ণ হয়েছে বা তাদের নিজেদের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করায় অন্তর সংকীর্ণ হয়েছে, ওদের ও রাসূল (স)-এর মধ্যে চুক্তি ছিল।

আবূ বকর বলেছেন, বাহ্যত মনে হয়, যাদের অন্তর সংকীর্ণ হয়েছিল, ওরা ছিল মুশরিক লোক, নবী করীম (স)-এর বিরোধী। ওদের অন্তর সংকীর্ণ হয়েছিল ওদের জনগণের সাথে মিলিত হয়ে মুসলমানদের বিরোধিতা করার ব্যাপারে। কেননা ওদের ও রাসূল (স)-এর মধ্যে চুক্তি ছিল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে ওরা যুদ্ধ করতে পারছিল না। কেননা ওরা মুসলমানদের যবীল আরহাম ছিল। ওরা একই বংশের লোক ছিল। ওরা যখন মুসলমানদের থেকে আলাদা হয়ে গেল, তখন ওদের হাতকে বিরত রাখা— ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করতে আল্লাহ্ মুসলমানদের আদেশ করেছিলেন। ফলে ওরাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি। আর মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়েও মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি।

কোন কোন লোক বলেছেন, ওরা আসলে মুসলমানই ছিল, ওরা ওদেরই লোকজন মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও পছন্দ করেনি। কেননা ওদের পরস্পরের মধ্যে রিহ্মের সম্পর্ক ছিল। আয়াতটির বাহ্যিক অর্থ ও তার তাফসীর পর্যায়ে বর্ণিত হাদীস তার বিপরীত কথা প্রমাণ করে। কেননা মুসলমানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কখনও যুদ্ধ করেনি নবী করীম (স)-এর জীবন কালে। যদিও তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত রয়েছে। কেননা এই ধরনের যুদ্ধ করার জন্যে তারা কখনই আদিষ্ট ছিল না।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوْكُمْ -

আল্লাহ চাইলে ওদেরকে তোমাদের উপর কর্তৃত্বকারী বানিয়ে দিতেন, তখন তারা অবশ্যই তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত।

অর্থাৎ তোমরা যদি জালিম হয়ে ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে .... এই কথা প্রমাণ করে যে, ওরা মুসলমান ছিল না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَانِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَاَلْقُوا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا -

ওরা যদি তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা হয়ে যায় ও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে, বরং তোমাদের প্রতি আনুগত্য পেশ করে, তাহলে তাদের উপর কোন কিছু করার তোমাদের জন্যে পথ করে দেন নি।

এ কথাটির দাবি হল, ওরা মুশরিক ছিল। কেননা আয়াতে যা বলা হয়েছে, তা মুসলমানদের পরিচিতি হতে পারে না। এ থেকে স্পষ্ট হল যে, ওরা আসলেই মুশরিক ছিল, ওদের ও নবী করীম (স)-এর মধ্যে মৈত্রীর চুক্তি ছিল। তাই আল্লাহ তাঁর নবীকে ওদের দিকে আক্রমণের হাত প্রসারিত না করতে আদেশ করেছেন— যখন তারা মুসলমান ও মুশরিক উভয় থেকে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা হয়ে গেছে। আর তাদের আপনজন মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও ওদেরকে বাধ্য করতে নিষেধ করেছেন।

আয়াতে تسليط কর্তৃত্বশালী বানানোর যে কথাটি বলা হয়েছে, তা দুটি দিক রয়েছে। একটি হল, ওদের অন্তরের শক্তিশালী হওয়া ও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহসী হওয়া আর দ্বিতীয় হচ্ছে, তাদের আত্মরক্ষার ব্যাপারে যুদ্ধ করা তাদের জন্যে মুবাহ্ হওয়া।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

سَتَجِدُونَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُونَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ -

অন্যান্যদেরকে তোমরা এরূপ পাবে যে, তারা তোমাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে চায়, নিরাপত্তা দিতে চায় তাদের নিজেদের লোকদেরকেও।

মুজাহিদ বলেছেন, আয়াতটি মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। ওরা নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করত। পরে তারা কুরায়শদের নিকট ফিরে যেত এবং মূর্তি-প্রতিমা পূজায় লিপ্ত হতো, ওরা আসলে এখানে ও ওখানে— উভয় স্থানেই নিজেদের জন্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করাই ছিল ওদের লক্ষ্য ও বাসনা। ওরা যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে না থাকে ও সন্ধি না করে, তাহলে ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে আদেশ করা হয়েছে।

সুদ্দীর ছাত্রদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক উল্লেখ করেছেন, সুদ্দী বলেছেন, উক্ত আয়াতটি নয়াম ইবনে মাসউদ আল-আশজায়ী সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। সে মুসলমান ও মুশরিক সকলের নিকট নিজের নিরাপত্তার সন্ধান করে বেড়াত। সে নবী করীম (স)-এর কথা

মুশরিকদের বলে দিত এবং মুশরিকদের কথা রাসূলে (স)-কে বলে দিত। এই প্রেক্ষিতেই আল্লাহ বলেছেন ঃ 'তোমরা অন্যান্য লোকদেরকে পাবে আর তারা তোমাদেরকে নির্ভয় করতে এবং তাদের নিজেদেরকেও নির্ভয় করতে চেষ্টা করে।'

আয়াতটির বাহ্যিক অর্থ প্রমাণ করে যে, ওরা নবী করীম (স)-এর নিকট এসে নিজেদের ঈমানদার হওয়ার কথা প্রকাশ করত এবং পরে যখন তারা নিজেদের লোকদের নিকট ফিরে যেত তখন কুফর প্রকাশ করত। আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ

كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا -

ওরা যখনই ফিতনার দিকে ফিরে যেত, ওরা তারই মধ্যে উল্টোভাবে নিক্ষিপ্ত হতো।

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, ওরা পূর্বে নিজেদের মুসলিম হওয়া প্রকাশ করত। এই জন্যে আল্লাহ মুসলমানকে আদেশ করেছেন ওদের উপর আক্রমণ না করতে, ওদের থেকে অস্ত্র বিরত রাখতে। অবশ্য যখন তারা আলাদা হয়ে যাবে ও মুসলমানদের প্রতি নিরাপত্তার আশ্বাস দিতে থাকবে। অর্থাৎ তারা মুসলমানদের সাথে 'যুদ্ধ নয়'-এর সন্ধি করবে। যেমন আমাদেরকে বিরত থাকতে আদেশ করা হয়েছে তাদের থেকেও, যারা আমাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ লোকদের সাথে মিলে মিশে যাবে। তাদের থেকেও যারা আমাদের নিকট সংকীর্ণ মানসিকতা নিয়ে আসে। যেমন অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি ও তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না।

এবং যেমন বলেছেন ঃ

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ -

এবং তোমরা যুদ্ধ কর তাদের বিরুদ্ধে, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

(সূরা বাকারাহ ঃ ১৯০)

যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে মুসলমানদেরকে আদেশ করা হয়েছে।

পরে এই সব মনসূখ করে দিয়েছে এই আয়াত ঃ

মুশরিকদের যেখানেই পাবে, সেখানেই তাদেরকে হত্যা করবে।

এই পর্যায়ে ইবনে আব্বাসের বর্ণনা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

অন্য কিছু লোকদের মত হচ্ছে, এই সব আয়াতের কোনটিই মনসূখ নয়। আজ-ও যে সব কাফির মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না, তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ না করা সম্পূর্ণ জায়েয। কেননা যেসব লোক আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে ও আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিষেধ সম্বলিত আয়াতসমূহ যে মনসূখ হয়েছে তা প্রমাণিত

হয়নি। জিহাদ ফরয না হওয়ার মত যাঁর যাঁর বর্ণিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইবনে শাবরামাতা ও সুফিয়ান সওরী। এ বিষয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ্।

তবে এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে, যে সব কাফির আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে, তাদের বিরুদ্ধ যুদ্ধ করা সম্পর্কে এ সব আয়াতে নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু মুশরিকরা যদি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকেও তবুও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নিষেধ এ কথা কোন ফিকাহবিদ বলেছেন বলে আমরা জানি না। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা জায়েয কিনা এই বিষয়েই মতভেদ, তা নিষিদ্ধ হওয়া পর্যায়ে কোন মতপার্থক্য নেই। যে পরিচিতি আমরা উল্লেখ করলাম তা যাদের তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নিষেধ মনসূখ হয়ে যাওয়া সম্পর্কে সকলেরই ঐকমত্য পাওয়া গেছে।

খায়রুন প্রকাশনী